প্রথম খণ্ড

কুরআনুল কারীম

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)

খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ
সালমান ইবন আব্দুল আজীজ আলে সাউদ-এর
পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ স্বরূপ
প্রদত্ত বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
বিক্রয় নিষিদ্ধ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সৌদি আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কুরআনের এ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মুদ্রিত হলো।

تشرف بالأمر بطباعة هذا المصحف الشريف وترجمة معانيه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة البنغالية

المجلد الأول

من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النحل

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আজীজ আ'লে সাউদ- এর
পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ স্বরূপ প্রদত্ত
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
বিক্রয় নিষিদ্ধ

কুরআনুল কারীম

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)

প্রথম খণ্ড

সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা আন-নাহ্‌ল এর শেষ পর্যন্ত

বাদশাহ্ ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:
﴿... قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ﴾.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل:
«**خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه**».

أما بعد:

فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، بالعناية بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم المهمة تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله ﷺ: «**بلِّغوا عني ولو آية**».

وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة البنغالية يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة إلى اللغة البنغالية التي قام بها الدكتور أبو بكر محمد زكريا، وراجعها من قبل المجمع

الشيخ كوثر إرشاد والشيخ محمد إلياس بن صالح أحمد.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الناس.

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم -مهما بلغت دقتها- ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّه من خطأ ونقص.

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে ।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি তাঁর পবিত্র কুরআনে এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন- ﴿...قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ﴾

অর্থাৎ, "তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ" ।

আল্লাহর কিতাবের প্রতি গুরুত্বারোপ ও এর প্রচার সহজ করা এবং প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে এর বিতরণ নিশ্চিত করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ ও তাফসীর করা সম্বলিত খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন কল্পে, সর্বোপরি আমাদের বাংলা ভাষাভাষীদের সেবা প্রদানার্থে, মদীনাস্থ বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স সানন্দে সম্মানিত পাঠক সমীপে এই বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর উপস্থাপন করছে ।

মূলতঃ রাজকীয় সৌদি সরকারের ওয়াক্ফ, দাওয়াহ্, ইরশাদ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সকল ভাষায় কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করা, যাতে অনারব মুসলিমদের জন্য তা বুঝা সহজ হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আদিষ্ট "বালাগ" তথা পৌঁছে দেয়ার আহ্বান (অর্থাৎ, "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, তা একটি আয়াত হলেও")-এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এটিই সর্বোত্তম প্রচেষ্টা ।

এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর করেছেন, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া । আর কমপ্লেক্স-এর পক্ষে তা পূনর্পাঠ করেছেন, শাইখ কাউছার এরশাদ ও শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াছ ইবনে সালেহ আহ্মাদ ।

মহান আলাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন যা শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই এবং যা দ্বারা সবাই উপকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি ।

অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুবাদ (যতই সুনিপূণ হোক না কেন) তা আল্লাহর অমীয় বাণীর মর্মার্থ পুরোপুরি আদায়ে সমর্থ নয়; কেননা অনুবাদ হলো অনুবাদকের মেধাশক্তি দিয়ে কুরআনকে বুঝার প্রয়াস মাত্র, যার মধ্যে মানবীয় ভুল-ক্রুটি, অপূর্ণতা থাকা বিচিত্র কিছু নয় ।

তাই সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, যে কোন ভুল-ক্রটি, অপূর্ণতা কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় দৃষ্টিগোচর হলে তা নিঃসঙ্কোচে বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপেক্সকে অবহিত করবেন, যাতে আমরা পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করে নিতে পারি।

আল্লাহই তাওফীক দানকারী, সরলপথের দিশারী।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

শাইখ সালেহ্ ইবন আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ আলে শাইখ,

মাননীয় মন্ত্রী, ওয়াক্ফ, দাওয়াহ্, ইরশাদ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ও জেনারেল তত্ত্বাবধায়ক, কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স।
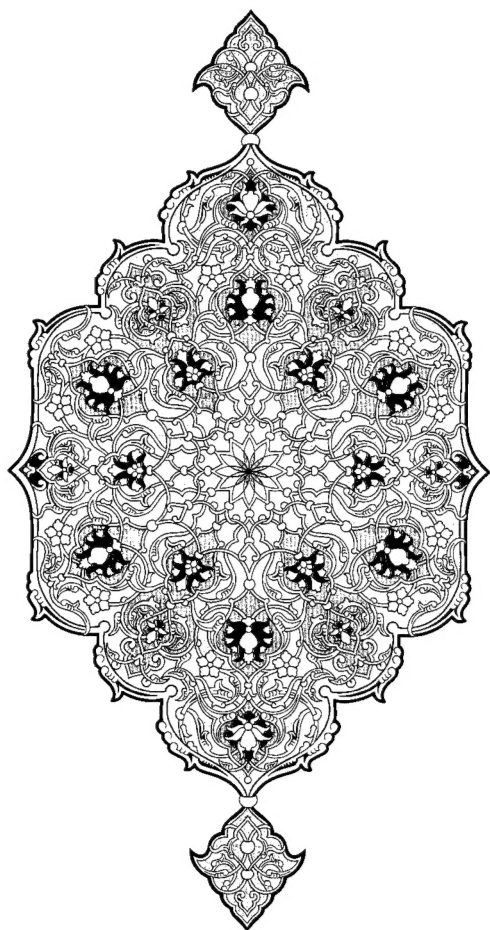
পবিত্র কুরআনের অর্থানুবাদসমূহের ভূমিকা

মুখবন্ধ

আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী। শব্দ ও অর্থসহ তা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত, সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উদ্দীপ্ত আলোকবর্তিকাস্বরূপ। নিম্নে সংক্ষেপে কুরআন কারীমের পরিচয় ও এর বার্তা তুলে ধরা হলো।

আল-কুরআনুল কারীমের সাধারণ পরিচিতি

এক. আল-কুরআনুল কারীমের পরিচিতি এবং এর নাম ও বৈশিষ্ট্যঃ

আল-কুরআনুল করীম হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র এমন বাণী, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত, তার নিকটে এর শব্দ ও অর্থ উভয়টিই ওহী আকারে প্রেরিত, যা মুসহাফে (গ্রন্থাকারে) লিপিবদ্ধ, মুতাওয়াতির সূত্রে (সন্দেহাতীত বহু মানুষ কর্তৃক) বর্ণিত এবং যা তেলাওয়াত করা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা ওহী আকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি নিজেই তার নাম দিয়েছেন 'আল-কুরআন' (অধিক পঠিত)। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنزِيلًا﴾ [الدهر: ٢٣] "নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।" [সূরা আল-ইনসানঃ ২৩] কারণ, এর বিশেষত্বই এই যে, তা পাঠ ও তেলাওয়াত করতে হবে এবং কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা এর আরেক নাম দিয়েছেন, 'আল-কিতাব' (লিখিত গ্রন্থ)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [النساء: ١٠٥] "আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি।" [সূরা আন-নিসা: ১০৫] কেননা, এর মর্যাদা এমন যে, তা লিখতে হবে এবং একে অবহেলা করা যাবে না।

এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমের কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ফুর্ক্বান (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), যিক্‌র

(স্মরণ), হুদা (হেদায়াত বা পথনির্দেশ), নূর (আলো), শিফা' (আরোগ্য), হাকীম (প্রজ্ঞাপূর্ণ), মাউ'ইযাতুন (উপদেশ) ইত্যাদি গুণসমূহ। এগুলো আল-কুরআনুল কারীমের মাহাত্ম্য ও এর বার্তার পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

আর 'মুসহাফ' শব্দটি 'সুহুফ' (পৃষ্ঠাসমূহ) শব্দ থেকে গৃহীত, যার উপর আল-কুরআনুল কারীম লেখা হয়েছিল। এ নামটি দ্বারা সাহাবীগণ ঐ গ্রন্থকে বুঝাতেন, যার পৃষ্ঠাসমূহে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বস্তুত আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, যা জিব্রীল আলাইহিস্সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٥] "আর নিশ্চয় এটি (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব হতে নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রীল) তা নিয়ে নাযিল হয়েছেন; আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" [সূরা শু'আরা: ১৯২-১৯৫]

আর এ ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলদের মধ্যে নতুন নন। তার রাসূল ভ্রাতৃবৃন্দ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম) -এর সবার উপরই জিব্রীল আলাইহিস্সালাম আল্লাহ্র নিকট থেকে ওহী নাযিল করতেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ মহান আমানতের জন্য যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥] "আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৭৫] তিনি ভালো করেই জানেন কে এর জন্য অধিক উপযুক্ত, আর কে এর উপযুক্ত নয়। কারণ, সকল সৃষ্টি তাঁরই তো সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ﴾ [القصص: ٦٨] "আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন।" [সূরা আল-কাসাস: ৬৮]

দুই. কুরআনুল কারীমের নাযিল হওয়া:

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের সতেরই রমযান সোমবার সম্মানিত নগরী মক্কার অন্যতম হেরা পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়। জিব্রীল আলাইহিস সালাম সেখানে এই আয়াতসমূহ নিয়ে নাযিল হন,

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۞ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ﴾ [العلق: ١-٥] "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" [সূরা আল-আলাক: ১-৫] এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়া আল-কুরআনুল কারীমের প্রথম অংশ।

তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের কাছে শঙ্কিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে ফিরে এলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তার স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে বর্ণনা করে তাকে বললেন, "আমি আমার নিজের আত্মার উপর ভয় করছি"। তখন খাদিজা বললেন, 'কখনো নয়, আপনি বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, যারা বহন করতে অক্ষম তাদের পক্ষ হয়ে বহন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।' তারপর খাদিজা তাকে নিয়ে ওরাকা ইবন নওফেল এর কাছে গেলেন, যিনি সঠিক মত বা পরামর্শ ও হিকমতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাদিজা ওরাকাকে বললেন, 'চাচা! আপনার ভাতিজা থেকে শুনুন।' অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছেন তার সংবাদ জানালেন, তখন ওরাকা ইবন নাওফেল তাকে বললেন, 'এই সে-ই নামূস যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে নাযিল হয়েছিলেন। হায় আমি যদি তখন যুবক থাকতাম, হায় আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম যখন তোমাকে তোমার জাতি দেশান্তর করবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তারা কি আমাকে দেশান্তর করবে?" ওরাকা বলেন, 'হ্যাঁ, করবে। তুমি যা নিয়ে এসেছ, অতীতে যিনিই তা নিয়ে এসেছেন তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমি সে দিন পাই, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।' এই সাক্ষাতের কিছু সময় পর ওরাকা মারা যান।

তবে সমগ্র আল-কুরআনুল কারীম একবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয় নি, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) -এর কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছিল। বরং তা পৃথক পৃথকভাবে তেইশ বছর যাবৎ নাযিল হয়েছে। একবারে সম্পূর্ণ একটি সূরা কিংবা একটি সূরার কয়েকটি আয়াত নাযিল হতো।

আল-কুরআনুল কারীম পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হওয়ার হেকমত হচ্ছে জিব্রীল আলাইহিসসালাম কর্তৃক পুনঃপুনঃ ওহী নাযিল হওয়ার মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর সুদৃঢ় করা, তাকে মযবুত করা এবং তাকে সাহায্য করা; যাতে করে তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি মুশরিকদের একগুঁয়েমি ও বিরোধিতার মুকাবেলা করতে তিনি অধিক সক্ষম ও স্থির-চিত্ত হতে পারেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন,

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢]

" আর কাফেররা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার কাছে একবার নাযিল হলো না কেন?' এভাবেই আমরা নাযিল করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।" [আল-ফুরক্বান: ৩২]

পৃথক পৃথকভাবে আল-কুরআনুল কারীম নাযিল হওয়ার মাঝে আরেকটি শিক্ষামূলক মহান উদ্দেশ্য ও হেকমত রয়েছে; তা হচ্ছে, দ্বীনের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানা ও আমল করার ক্ষেত্রে ঈমানদারদের পর্যায়ক্রমিক সুযোগ দান করা; যাতে করে তাদের জন্য দ্বীন জানা ও বুঝা এবং পূর্বে তারা যে অজ্ঞতা, কুফর ও শিরকের অন্ধকারে ছিল তা থেকে ঈমান, তওহীদ ও জ্ঞানের আলোয় বের হয়ে আসা সহজ হয়।

তিন. আল-কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধকরণ:

যেকোনো ভাষ্য সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে, লিপিবদ্ধকরণ। কারণ, যে কথা লিখে রাখা হয় না তা ভুলে যাওয়ার

সম্ভাবনা থাকে। আর আল-কুরআনুল কারীম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের হেদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে সেহেতু তা লিপিবদ্ধ হওয়া জরুরি ছিল।

কুরআন লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ তত্ত্বাবধান ও গুরুত্ব পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো কোনো সাহাবী, যারা লিখতে জানতেন তাদেরকে আল-কুরআনুল কারীমকে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন এবং তাদেরকে ওহী লেখক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, যায়েদ ইবন সাবেত আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখনই কোনো ওহী নাযিল হতো, তখনই তিনি তা হেফয করে নিতেন। তারপর তিনি যা তার কাছে নাযিল হতো তা কোনো এক ওহী লেখককে লেখার জন্য পড়ে শোনাতেন এবং বলতেন, "এ আয়াতগুলো সে সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বিষয়ের উলেখ আছে।" এভাবে তিনি তাদেরকে সে সূরার নাম বলতেন এবং তাতে সে আয়াতগুলো লিখে নিতে বলতেন। তারপর তিনি সাহাবীগণকে আল-কুরআনুল কারীমের যা নাযিল হয়েছে তা শিখতে এবং হিফয করতে নির্দেশ দিতেন। এভাবে আল-কুরআনুল কারীম পুরোটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিভিন্ন কাগজ বা চামড়ার টুকরোতে লেখা হয়েছিল।

জিব্রীল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর আল-কুরআনুল কারীমকে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একবার পেশ করতেন। আর যে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন, সে বছর বর্তমানে মুসলিমদের কাছে কুরআনুল কারীমের যে মুসহাফ আছে হুবহু তার আয়াত ও সূরার ক্রমধারা অনুসারে জিব্রীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা দু' বার পেশ করেছিলেন। আর তা ছিল মহান ও বরকতময় সত্য আল্লাহর এই বাণীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ﴾ [القيامة: ١٧، ١٨] "নিশ্চয় এর

সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই। কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন”। [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৭-১৮]

আর এই বাণীরও বাস্তবায়ন:

﴿سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦] “শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না।” [সূরা আল-আ'লা: ৬]

চার: আল-কুরআনুল কারীমকে পত্রসমূহে একত্রিতকরণ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর খলীফাতুর রাশেদ আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল-কুরআনকে সুশৃংখলভাবে পত্রসমূহে একত্রিত করার নির্দেশ দেন; যাতে হাফেযদের মৃত্যু কিংবা লিখিত কাগজ বা চামড়াগুলো নষ্ট হওয়ার ফলে কুরআনের কোনো অংশ হারিয়ে না যায়। এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন ওহী লেখক যায়দ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। এই নতুন সংকলনটি পুনঃনিরীক্ষা করা এবং চামড়া/কাগজের পত্রসমূহে লিখিত ও অন্তরে সংরক্ষিত ভাষ্যের সাথে তার অভিন্নতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর সেই একত্রিত পত্রগুলো আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর গৃহে তার মৃত্যু পর্যন্ত রাখা হয়। তারপরে দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর গৃহে সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়। তার মৃত্যুর পর সেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হাফ্‌সা বিনত উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার গৃহে সংরক্ষিত হয়।

অতঃপর যখন ইসলাম প্রসার লাভ করল, তখন মুসলিমরা কুরআন পড়ার জন্য গ্রন্থাবদ্ধ মুসহাফের প্রয়োজন অনুভব করল। কোনো কোনো সাহাবী খলীফাতুর রাশেদ উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিলেন একটি 'মুসহাফ ইমাম' বা প্রধান মুসহাফে মানুষকে একত্রিত করতে, যার অনুসরণ করে মানুষ কুরআন পাঠ করবে। তখন তিনি আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগে যেসব পত্রে কুরআন সংকলিত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নেতৃত্বে একদল লিখতে জানেন এরকম কুরআনের হাফেযকে এই দায়িত্ব দেন। তারা সেই

পত্রগুলোকে একটি মুসহাফে গ্রন্থরূপে সংকলন করেন এবং তা থেকে কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করেন। এর একটি করে অনুলিপি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক বৃহৎ মুসলিম অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং মুসলিমদেরকে সেগুলো থেকে মুসহাফের আরও কপি করে নিতে নির্দেশ দেন।

বর্তমান বিশ্বে পরিচিত সকল মুসহাফ, হস্তলিখিত হোক বা প্রেসে ছাপা হোক, সেসবের মূল হচ্ছে ঐ মুসহাফগুলো, যেগুলো কপি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। সেগুলোর পাঠে কিংবা বিন্যাসে কোনো তারতম্য নেই।

আর আজ পর্যন্ত মুসলিমগণ মুসহাফ শরীফ ছাপার প্রতি এবং মুদ্রণ-শিল্পের নিত্য-নতুন পদ্ধতি, কারিগরি ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে; যাতে করে 'আর-রাসমুল উসমানী' বলে প্রসিদ্ধ কুরআনের মূলপাঠের যে লিখন-পদ্ধতি খলিফাতুর রাশেদ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা লেখায় সর্বোচ্চ মান ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা যায়।

মদীনাতুন নববীয়ায় অবস্থিত বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন শরীফ প্রিন্টিং কম্প্লেক্স অনুরূপভাবে আল-কুরআনুল কারীমের প্রতি সর্বোচ্চ যত্নের অন্যতম একটি স্পষ্ট নিদর্শন। এছাড়াও এটি সৌদি আরব রাজ্যের শাসকগণ কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের প্রতি গুরুত্বারোপ, এর খেদমতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং মুসলিমদের হাতে সবচেয়ে সুন্দর মুদ্রণ, বাঁধাই, মান, যথার্থতা ও দক্ষতার সাথে পবিত্র কুরআনকে সহজে পৌঁছে দেওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছার সাক্ষ্য বহন করছে।

পাঁচ: কুরআনের বিন্যাস ও বিভাজন:

আল-কুরআনুল কারীম শুরু হয়েছে সূরা আল-ফাতেহার মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে সূরা আন-নাস এর মাধ্যমে। আর তা মোট ১১৪টি সূরা সম্বলিত। এই বিন্যাসটি 'তাওকীফী', অর্থাৎ তা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি গৃহীত; আর তাতে নাযিল হওয়ার ক্রমধারা রক্ষিত হয় নি। যেমন, সূরা আল-আলাক্ব প্রথম নাযিল হওয়া সূরা, অথচ কুরআনে তার ক্রম ৯৬তম। সাহাবীগণ সূরা

ও আয়াতের বিন্যাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পাঠ থেকে জানতেন।

বর্তমানে কুরআনকে ৩০টি পারা বা জুয্' -এ বিভক্ত করা হয়, যার প্রতিটি পারা দুটি হিয্ব (অংশ) -এ বিভক্ত। তারপর প্রতিটি হিয্বও চারটি রুব' (এক-চতুর্থাংশ) -এ বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজনের অধিকাংশই মুসলিমদের জন্য আল-কুরআনুল কারীমের পাঠ সহজ করার উদ্দেশ্যে আলেমগণ কর্তৃক ইজতিহাদ বা গবেষণা ।

ছয়: আল-কুরআনুল কারীম শিক্ষা:

মুসলিমগণ আল-কুরআনুল কারীম যেভাবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে সেভাবে তা শেখা, তার মূল-পাঠ হেফ্য ও সংরক্ষণ করা এবং তেলাওয়াত করার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। সাহাবীগণের মধ্যে যারা কুরআনের ক্বারী বা হাফেয ছিলেন, তারা তাবে'ঈদেরকে তা শেখানোর কাজে ব্রতী ছিলেন, ফলে তারা এর মূল-পাঠকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন। আর তারা সাহাবীগণকে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের কাছে থামিয়ে সে আয়াতসমূহের অর্থ সুক্ষ্মভাবে বুঝে নিতেন। এভাবে তাবে'ঈগণ সাহাবীগণের কাছ থেকে ইলম (জ্ঞান) ও আমল (কর্ম) দু'টোই শিখে নিয়েছিলেন। তারপর তাবে'ঈগণের মধ্যে যারা হাফেয ছিলেন তারা কুরআন তেলাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি, মূল-পাঠের যথার্থ সংরক্ষণ, এর অক্ষর ও শব্দসংখ্যার হিসাব, এর সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস, এর তাজভীদ, সুন্দরভাবে আদায় এবং তারতীল পদ্ধতি প্রভৃতি যেভাবে সাহাবীগণ থেকে শিখেছিলেন হুবহু এর অনুসরণ করেই তারা কুরআন শিক্ষাদানের বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ফলে অব্যাহতভাবে আজ পর্যন্ত ছাত্র তার হাফেয ক্বারী শিক্ষকদের মুখ থেকে সরাসরি বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ তরু-তাজাভাবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে সেভাবে আল-কুরআনুল কারীমের শিক্ষাগ্রহণ, হেফয ও তেলাওয়াত চলে আসছে।

আর কুরআনুল কারীম বেশ কয়েকটি কেরাআতে পড়া যায়, যেগুলো মূলত আল-কুরআনের অক্ষর ও শব্দ আদায়ের বিভিন্ন

পদ্ধতি ও উচ্চারণের নিয়ম-নীতি; যা তাবে'ঈগণ হাফেয ও ক্বারী সাহাবীগণের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আর সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং তিনিও তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এসব কেরাআতের মধ্যে আমাদের যুগে প্রসিদ্ধ হচ্ছে, আসেম এর কেরাআত যা তার ছাত্র হাফ্স ইবন সুলাইমানের বর্ণনা; অনুরূপভাবে নাফে' এর কেরাআত যা তার ছাত্র 'ওয়ার্শ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ উসমান ইবন সা'ঈদের বর্ণনা। তদ্রূপ আরও রয়েছে আবু আমর আল-বাছরী থেকে তার ছাত্র আদ্-দূরী এর বর্ণনা এবং নাফে' থেকে কালূন এর বর্ণনা।

সাতঃ আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরঃ

আল-কুরআনের তাফসীর বলতে তার অর্থ বর্ণনাকে বুঝায়। কোনো কথারই উদ্দেশ্য সে পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না যতক্ষণ না তা কিসের উপর প্রমাণবহ ও তার অর্থ কী তা যথাযথভাবে জানা না যায়। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাঠকারীদেরকে কুরআনের অর্থ বুঝার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [ص: ٢٩] "এক মুবারক কিতাব। এটি আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে **গভীরভাবে চিন্তা করে** এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করে উপদেশ।" [সূরা সোয়াদঃ ২৯] আয়াতে উল্লেখিত 'তাদাব্বুর' শব্দটির অর্থ, ভালো করে বুঝা।

সাহাবায়ে কিরামের কাছে আল-কুরআনুল কারীমের অর্থে যা যা খটকা লাগতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করে দিতেন। তবে সে সময়ে তাদের ভাষাগত দক্ষতার ফলে এবং আল-কুরআনুল কারীম তাদের ভাষায় নাযিল হওয়ায় আল-কুরআনুল কারীমের অর্থ সম্পর্কে তাদের অধিক প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যতই বছর পেরিয়ে যাচ্ছিল ততই মানুষের নিকট তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে ধরা পড়ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবীগণ ও তাদের ছাত্র তাবে'ঈদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ও বর্ণিত আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরই ইলমুত তাফসীরের মূল বীজের রূপ লাভ করেছে;

যাকে 'আত-তাফসীরুল মা'ছুর' বা প্রামান্য তাফসীর বলে নামকরণ হয়ে থাকে। এটি আল-কুরআনুল কারীম বুঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। কারণ, এটি দ্বারা উম্মতের প্রথম প্রজন্ম তাদের আরবী ভাষায় দক্ষতার কারণে ও আল-কুরআনুল কারীম নাযিল হওয়ার সময়ের যাবতীয় ঘটনা ও সার্বিক অবস্থা অবলোকনের মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ যেভাবে বুঝেছেন, তা আমাদের নিকট প্রকাশ পায়।

তাফসীরের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন তাফসীরকারক আলেমগণ ইলম ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী ছিলেন; ফলে তাদের (তাফসীরের) পদ্ধতিও বিভিন্ন ছিল। কিছু তাফসীরগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের অভিধানিক ও ভাষাগত দিক বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, আবার কিছু তাফসীরগ্রন্থ ফিকহের বিধি-বিধান বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। আর কিছু তাফসীরগ্রন্থ ঐতিহাসিক দিক, কিংবা বিবেক-বুদ্ধিগত দিক অথবা আচরণগত দিক ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এসব বিবেচনায় এনে আলেমগণ তাফসীরকে দু'ভাগে ভাগ করেন:

এক. আত-তাফসীর বিল মা'ছুর, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবীগণ ও তাবে'ঈদের থেকে বর্ণিত।

দুই. আত-তাফসীর বির্ রায়, অথবা যা সঠিক ইলমী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইজতিহাদের মাধ্যমে করা হয়েছে।

তাফসীরের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি ও তার নিয়ম-কানুন:

আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে 'আত-তাফসীর বিল মা'ছুর' বা প্রমাণ্য তাফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তার সাহাবীগণ এবং তাদের ছাত্র তাবে'ঈদের কাছ থেকে প্রাপ্ত, যারা এ বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানতেন। যদি 'আত-তাফসীর বিল মাছুর' এর মধ্যে কোনো আয়াত সম্পর্কে এমন বাড়তি বর্ণনা পাওয়া না যায়, যা এ আয়াতগুলো বুঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজন, তখন মুফাসসিরকে নিম্নোক্ত নিয়ম-নীতিগুলোর খেয়াল রাখতে হবে:

আয়াতের অর্থ বর্ণনায় 'আত-তাফসীর বিল মা'ছুর' দ্বারা যা সাব্যস্ত

হয়েছে তা খেয়াল রাখা এবং এর বিপরীত কিছু নিয়ে না আসা।

আল-কুরআনুল কারীম সাধারণভাবে যে অর্থগুলো নিয়ে এসেছে এবং নবীর সুন্নাত এ আয়াতসমূহের যে অর্থ স্পষ্ট করে দিয়েছে, তা অনুযায়ী তাফসীর করা। সুতরাং উপরোক্ত অর্থসমূহের বিপরীতে গিয়ে কোনো মুফাসসিরের জন্যই কুরআনের তাফসীর করা বৈধ নয়। কারণ, আল-কুরআনুল কারীমের একাংশ অপর অংশের তাফসীর করে, একাংশ অপর অংশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর নবীর সুন্নাত আল-কুরআনুল কারীমের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনাকারী এবং তাফসীর ও ব্যাখ্যাকারী।

আরবী ভাষার ব্যাকরণ যেমন, শব্দের চাহিদা, বাক্যের গঠনরীতি এবং ব্যবহারগত ভিন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, আল-কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, আর তাকে সে ভাষার নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করেই বুঝতে হবে।

মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহকে মুহকাম তথা স্পষ্ট আয়াতসমূহের আলোকে বুঝতে হবে। কারণ, কুরআনের একাংশ অপর অংশের তাফসীর করে। আর কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই 'মুহকাম' স্পষ্ট অর্থবোধক। তবে কুরআনের কিছু আয়াত রয়েছে 'মুতাশাবিহ' যার অর্থ কখনো কখনো কারও কাছে সন্দেহপূর্ণ মনে হতে পারে, তখন সে সব মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের দিকে ফিরিয়ে দিলে মুহকাম আয়াতগুলো মুতাশাবিহ আয়াতের চাহিদা বুঝতে এবং সেগুলোর অর্থ স্পষ্ট করতে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [آل عمران: ٧] "তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহ্‌কাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ্‌'; সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা

এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'। আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" [সূরা আলে ইমরান: ৭]

বিশ্বজগত সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করার সময় কেবলমাত্র বিজ্ঞানের প্রমাণিত বাস্তব তথ্যের সহযোগিতা নেওয়া। কোনো ক্রমেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ আকারের চিন্তাধারাকে আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীরের প্রবিষ্ট করা যাবে না। কারণ, এতে করে আল-কুরআনুল কারীমের অর্থে এমন কিছু প্রবেশ হতে পারে যা কুরআন সমর্থন করে না।

মহান আল্লাহর বাণীর অর্থকে পবিত্র শরী'আতের বাস্তব নিয়ম-নীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আরবী ভাষার ব্যাকরণের ব্যত্যয় ঘটায়, এমন কোনো অপব্যাখ্যা করা থেকে সাবধান থাকতে হবে; হোক তা বিকৃতির উদ্দেশ্যে; অথবা আরবি ভাষা, এর শব্দার্থ ও তা ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে; কিংবা এমন অসিদ্ধ কিছু অর্থ কল্পনা করার কারণে, যেগুলো থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী মুক্ত ও পবিত্র।

আট. আল-কুরআনুল কারীমের ই'জায (কুরআন কর্তৃক অন্যকে অপারগ করে দেওয়া)

পারিভাষিক অর্থে ই'জায হচ্ছে, এমন এক গুণ যা অনুরূপ কোনো কিছু নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়, হোক তা কোনো কাজ অথবা মত অথবা পরিকল্পনা। আর মু'জিযা হচ্ছে নতুন একটি বিশেষণ, যা নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাত ওয়াসসালামের (নবুওয়তের) নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআনুল কারীমে এ শব্দটি আসে নি; বরং সেখানে আয়াত (নিদর্শন), বুরহান (প্রমাণ) ইত্যাদি শব্দ এসেছে।

আর আল-কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহর কথা বা বাণী; তার অর্থের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা, তার আয়াত, বাক্য ও শব্দশৈলীতে রয়েছে পূর্ণ সৌন্দর্য, যার অনুরূপ কোনো কিছু আনতে সকল মানুষই অপারগ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الٓر كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١] "আলিফ-লাম-রা, এ

কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত: প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার কাছ থেকে ।” [সূরা হূদ: ১]

মুশরিকরা আল-কুরআনুল কারীমের উৎস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করতে এবং বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা রটনা ও সংশয় উত্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করে নি, তখন আল্লাহ সুবহানাহু বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেন, যেগুলোতে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে, যদি তারা (তাদের সেসব দাবীতে) সত্যবাদী হয়, তবে যেন এ কুরআনুল কারীমের মত অনুরূপ নিয়ে আসে, অথবা এর মত দশটি সূরা নিয়ে আসে, অথবা একটি সূরা যেন নিয়ে আসে, কিন্তু তারা এতে অপারগ হয় এবং মেনে নেয় যে, আল-কুরআনুল কারীম যদিও এটি আরবী ভাষায় তবুও এর অনুরূপ কিছু তৈরি করা কিংবা এর মতো কিছু নিয়ে আসা কখনও সম্ভব নয় । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨]

“নাকি তারা বলে, ‘তিনি এটা রচনা করেছেন’? বলুন, ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’ ।” [সূরা ইউনুস: ৩৮]

আর আল-কুরআনুল কারীম স্পষ্টভাষায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, সকল মানুষ তারপর সকল জিন সবাই একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে একে অপরকে সহযোগিতা করে প্রচেষ্টা চালালেও আল-কুরআনুল কারীমের অনুরূপ নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না ।

﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [بني إسرائيل: ٨٨] “বলুন, ‘যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না’ ।” । [সূরা আল-ইসরা: ৮৮]

আল-কুরআনুল কারীম এ জন্যই মু'জিয বা অপারগকারী যে, এটি আল্লাহর বাণী, যা মানুষের বাণীর সদৃশ নয় । এর বাক্য, আয়াত ও ভাষাশৈলীতে; এর বিভিন্ন বর্ণনার রীতি-নীতি ও অলংকারিক বৈশিষ্ট্যে; এর সংবাদ ও সত্য কাহিনীতে; এর মধ্যকার বিধি-বিধান

ও আইন-কানুনে; এর মধ্যস্থিত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের শক্তিতে এবং এর মধ্যে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাক-লাগানো চিরন্তন সত্যের কথা রয়েছে তাতে এটি নিঃসন্দেহে একটি আয়াহ্ বা নিদর্শন ও বুরহান বা প্রমাণ।

বহু পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী তাদের স্ব স্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আল-কুরআনুল কারীম কর্তৃক সুক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্যের বর্ণনা ও সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিতের ফলে কতই না বিস্ময়বিহ্বল হয়েছে! একজন নিরক্ষর রাসূল, যিনি একটি নিরক্ষর জাতিতে ছিলেন, যার সময়কার বিশ্ব যে সকল বিষয়াদি সম্পর্কে কিছুই জানত না-- তার কাছ থেকে এ সকল বিষয় বের হওয়া কল্পনাতীত। এ বিষয়টি তাদের অনেকের ইসলাম গ্রহণের কারণও হয়েছিল। কেননা, তারা হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, আল-কুরআনুল কারীম যা নিয়ে এসেছে তা কোনো মানুষের বাণী হতে পারে না, বরং তা সৃষ্টিজগত ও মানুষের স্রষ্টারই বাণী।

তাছাড়া মহান আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিশৈলীর উপর প্রমাণবহ বহু আয়াত আল-কুরআনুল কারীমে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ﴾ [حم السجدة: ٥٣] "অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাব বিশ্বজগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী?" [সূরা ফুসসিলাত: ৫৩]

নয়. আল-কুরআনুল কারীমের অর্থের অনুবাদঃ

তরজমা বা অনুবাদ হচ্ছে কোনো কথাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়া। অনুবাদ এমনিতেই কঠিন কাজ; কেননা, নস বা মূল-পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাষাগত অভিব্যক্তি ও ভঙ্গি। মূল-পাঠ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করার সময় সেই অভিব্যক্তির ভাষাগত চাহিদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা দূরূহ হয়ে

দাঁড়ায়।

যদি মানুষের রচিত ভাষ্যের অনুবাদকর্ম এরূপ কঠিন হয়ে থাকে, তবে অনুবাদ কাজটি আরও কঠিন হয় যখন আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়। কারণ, সেটি আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরবী ভাষায় নাযিলকৃত, তার শব্দ ও অর্থ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীকৃত; আর কোনো মানুষের পক্ষেই এটা দাবি করা সম্ভব নয় যে, সে আল-কুরআনুল কারীমের সকল অর্থ পূর্ণভাবে আয়ত্ব করেছে, অথবা মূল আরবী পাঠে যেরূপ আছে পুনরায় একে নতুন শব্দে সাজিয়ে সেভাবেই সে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে।

আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদ দূরূহ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম আলেমগণ আল-কুরআনুল কারীমের প্রচার ও তার রিসালাত বা মূলবার্তা যমীনের সকল জাতি, তাদের ভাষা যা-ই হোক না কেন, তাদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। আর এ কাজটি অনুবাদ ব্যতীত কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

আর আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদ অন্য ভাষায় করতে হলে নিম্নোক্ত দু'টির একটি অনুসরণ করতে হবে,

আল-কুরআনুল কারীমের অর্থের অনুবাদ করা। এটি তাফসীর-বিহীন অনুবাদ, যাতে আল-কুরআনের নস বা মূল পাঠের শব্দসমূহের যে অর্থ তা বর্ণনার উপর নিরস্ত থাকা হয়।

আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর বা ব্যাখ্যাগত অনুবাদ করা, যাতে স্পষ্টতা ও উদাহরণ পেশের সহযোগিতা নেয়া হয়। এটি মূলত আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর।

আল-কুরআনুল কারীমের অর্থের অনুবাদ যত সুক্ষ্মই হোক, আর অনুবাদক যতই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হোন এবং আয়াতের অর্থসমূহের ব্যাপারে যতই জ্ঞানী হোন না কেন, সে অনুবাদকে কখনই কুরআন নামকরণ করা যাবে না। এর কারণ দু'টি:

এক. আল-কুরআনুল কারীম মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম বা বাণী। তা আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এবং বর্ণনাশৈলী ও নিখুঁত হওয়ার দিক থেকে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আর এর আয়াতসমূহকে

আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় নতুন করে সাজিয়ে লেখা তার 'কুরআন' নামকরণ বাতিল করে দেয়।

দুই. অনুবাদ মূলত অনুবাদকের উপলব্ধি অনুসারে আল-কুরআনুল কারীমের অর্থ। এটি এদিক থেকে তাফসীরসদৃশ; সুতরাং যেভাবে তাফসীরকে কুরআন বলা যায় না, সেভাবে অনুবাদকেও কুরআন বলা যাবে না।

আর আল-কুরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ গ্রহণযোগ্য হতে হলে আলেমগণ আল-কুরআনুল কারীমের অর্থ বর্ণনার যে সকল নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলো তাতে অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে। সাথে সাথে সাবধান থাকতে হবে, যাতে অনুবাদক তার অনুবাদকে আল-কুরআনুল কারীমের বিকৃত অর্থ পেশের ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে অথবা মুসলিমদের বড় বড় নিদর্শনাবলি, চিহ্নসমূহ ও পবিত্র বিষয়াদির প্রতি কোনো প্রকার খারাপ কিছু পেশ করতে না পারে। আর এ কাজটিই অনেক অনুবাদে পরিলক্ষিত হয়, যার অনুবাদ করেছে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ অথবা অসত্যভাবে ইসলামের দিকে নিজের সম্পর্ক সৃষ্টিকারী কোনো কোনো অনুবাদক; যারা ফাসেদ ও খারাপ আকীদার ধারক-বাহক, মহান দ্বীনে ইসলামের মূল্যবোধকে নষ্ট করতে যাবতীয় প্রচেষ্টাই তারা করে যাচ্ছে, আর এর সহীহ আকীদা ও সহজ-সরল শরী'আতকে আক্রমণ করতে তারা বদ্ধপরিকর।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে রেখে মদীনাতুন নববীয়ায় অবস্থিত বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআন প্রিন্টিং কম্প্লেক্স তার কাঁধে বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের গ্রহণযোগ্য অর্থানুবাদ বের করার দায়িত্ব নিয়েছে। তার আকাঙ্ক্ষা যে, এর মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীমের মহান রিসালাত বা মূল-বার্তা অনারব ভাষাভাষীদের কাছে তাদের মূল ভাষায় পৌঁছুবে।

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য; আর আল্লাহ সালাত পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সকল সঙ্গী-সাথী ও কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের সবার উপর।

'নামূস' শব্দ দ্বারা জিব্রীল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে।

তিনি সেই ফেরেশতা যাকে নবীদের কাছে ওহী নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

দেখুন: তাফসীরুত তাবারী, ১৯/১০; আবূ শামা আল-মাকদিসী: আল-মুরশিদ আল-ওয়াজীয, পৃ. ২৮।

তাফসীরুত তাবারী ১/২৮।

সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৮৬; সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৮৬; অনুরূপভাবে হাকিমও তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন (হাদীস নং ৩৩২৫) আর বলেছেন, 'এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তের উপর সহীহ, তবে তারা এটিকে উল্লেখ করেন নি।'

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৯২, ৪৫৯৩।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮৬; সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ৩১০৩; মুসনাদে ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ৭৬।

দানী তার মুক্বনি' গ্রন্থে (পৃ. ৭) ইমাম মালিক ইবন আনাস থেকে তা বর্ণনা করেন।

দেখুন, যারকাশী, আল-বুরহান, ১/১৩।

দেখুন, তাফসীরুত-তাবারী, ১/৩৭; ইবন তাইমিয়্যা, মুকাদ্দামাতু উসূলিত তাফসীর, পৃ. ৩৫।

দেখুন, আয়াতসমূহ, আল-আন'আম (৭); আল-আন'আম (২৫); আল-আম্বিয়া (৫); সাবা (৪৩); ইয়াসীন (৬৯); আস-সাফফাত (৩৬); সোয়াদ (৪); আত-তূর (৩০)।

দেখুন, আয়াতসমুহ, আল-বাকারাহ (২৩); ইউনুস (৩৮); হূদ (১৩) আত-তূর (৩৪)।

দেখুন, ইবন মানযূর, লিসানুল আরব (শব্দমূল: رجم ও ترجم)।

দেখুন, ইবরাহীম আনীস, দালালাতুল আলফায, পৃ. ১৭১-১৭৫; মুহাম্মাদ 'আওদ্ব মুহাম্মাদ, ফানুনুত তারজামা, পৃ. ১৯।

ইবন তাইমিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/১১৬।

ইবন তাইমিয়্যা, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/১১৫, ৫৪২; মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১/২৩।

নাওয়াভী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব, ৩/৩৪২।

১- সূরা আল ফাতিহা

سُورَةُ الفَاتِحَة
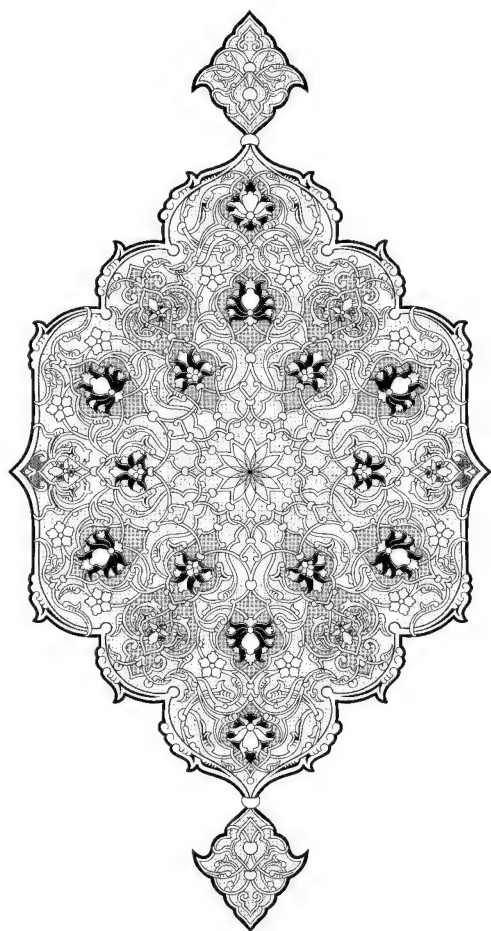
সূরার নাম ও কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

সূরা আল-ফাতিহা-ই সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে। [তাবারী, কাশশাফ, আল-ইতকান] সর্বপ্রথম অহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যে আয়াত বা সূরার অংশ নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা 'আল-'আলাক'-এর প্রাথমিক আয়াত কয়টি। [দেখুন, বুখারীঃ ৩] সূরা আল-মুদ্দাসসির-এর প্রাথমিক কতক আয়াত এর কিছুদিন পর নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৯২২, ৪৯২৪] কিন্তু এই খণ্ড আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার মধ্যে একটিও পূর্ণাঙ্গ সূরা ছিল না। পূর্ণাঙ্গ সূরা প্রথম যা নাযিল হয়েছে, তা হচ্ছে সূরা আল-ফাতিহা।

কুরআন মজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য একটি নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নামকরণ ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোন কোন সূরার নাম রাখা হয়েছে এর প্রথম শব্দ দ্বারা। কোন সূরায় আলোচিত বিশেষ কোন কথা কিংবা তাতে উল্লেখিত বিশেষ কোন শব্দ নিয়ে তা-ই নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও বিষয়বস্তুকে সম্মুখে রেখে। কয়েকটি সূরার নাম রাখা হয়েছে কোন একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি খেয়াল রেখে। সূরা আল-ফাতিহার নাম রাখা হয়েছে কুরআনে এর স্থান-মর্যাদা, বিষয়বস্তু-ভাবধারা, এর প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে। এদিক দিয়ে সূরা আল-ফাতিহার স্থান সর্বোচ্চ। কেননা অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা আল-ফাতিহার নাম মাত্র একটি নয়, অনেকগুলো। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হচ্ছে, ১. 'ফাতিহাতুল কিতাব' (فَاتِحَةُ الكِتَاب) কুরআনের চাবি-কাঠি। কেননা, এই সূরা দ্বারাই কুরআনের সূচনা হয়, কুরআনের প্রথম স্থানেই একে রাখা হয়েছে। কুরআন খুলে সর্বপ্রথম এই সূরা-ই পাঠ করতে হয়। কখনও কখনও এই নামের রূপান্তর হয়ে 'ফাতিহাতুল কুরআন' হয়ে থাকে। এতে অর্থের দিক দিয়ে কোন পার্থক্যই সুচিত হয় না। ২. "উম্মুল কিতাব"(أُمُّ الكِتَاب) আরবী ভাষায় 'উম্ম্' বলা হয় সর্ব ব্যাপক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসকে। সৈন্য বাহিনীর ঝান্ডাকে বলা হয় উম্ম্। কেননা সৈনিকবৃন্দ তারই ছায়াতলে সমবেত হয়ে থাকে। মক্কা নগরের আর এক নাম হচ্ছে, 'উম্মুল কুরা'-'জনপদসমূহের মা'। কেননা, হজ্জের মৌসুমে সমস্ত মানুষ–সকল গোত্র ও জাতি এই শহরেই একত্রিত হয়। ইমাম বুখারী কিতাবুত্ তাফসীর-এর শুরুতে লিখেছেনঃ এর নাম 'উম্মুল কিতাব' এজন্য বলা হয়েছে যে, কুরআন লিখতে ও পড়তে তা-ই প্রথম এবং সালাতের কেরাতেও তা-ই প্রথম পাঠ করতে হয়। ৩. "সূরাতুল-হামদ" (سُورَةُ الحَمْد) তা'রীফ ও প্রশংসার সূরা। হামদ এই সূরার প্রথম শব্দ। ইহাতে আল্লাহর হামদ-তা'রীফ-প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে, সেই জন্য এটি এ সূরার

জন্য যথার্থ নাম। ৪. “সূরাতুস-সালাত” (سُورَةُ الصَّلاة)–অর্থাৎ সালাতের সূরা। যেহেতু সব সালাতের সব রাক‘আতেই এটি পাঠ করতে হয় সেজন্যই এই নামকরণ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ, ‘যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সালাত হবে না।’ [বুখারীঃ ৭৫৬, মুসলিমঃ ৩৯৪] ৫. “আস্-সাব্‘য়ুল মাসানী” (السَّبْعُ الْمَثَانِي)–‘বার বার পাঠ করার সাতটি আয়াত’। সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা বার বার পাঠ করা হয় বলে এর আর এক নাম ‘সাব্‘য়ুল মাসানী’। অথবা সালাতের প্রতি রাক‘আতেই তা পড়া হয় বলেই এর এই নাম। [আল-কাশশাফ, বাগভী, তাফসীর ইবন কাসীর, আল-ইতকান, আত-তাফসীরুস সহীহ]

আয়াত সংখ্যা ঃ

এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই যে, সূরা ফাতিহার মোট সাতটি আয়াত রয়েছে। এ জন্য হাদীস শরীফে একে সাতটি পুনরাবৃত্তিমূলক আয়াতের সূরা السَّبْعُ الْمَثَانِي বলা হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৭০৩] পবিত্র কুরআনেও একে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। [সূরা আল-হিজর:৮৭] এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছেঃ সূরার পূর্বে যে “বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম” উল্লেখিত হয়েছে তা সূরা ফাতিহার মধ্যে গণ্য আয়াত ও এর অংশ, না তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন জিনিস? এর উত্তরে বলা যায়, কোন কোন সাহাবী “বিসমিল্লাহ”কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করতেন। পক্ষান্তরে অপর সাহাবীদের মতে এটি এ সূরার অংশ নয়। তবে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত কুরআনে এটিকে সূরা আল-ফাতিহার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ কেরাআতেও এটিকে সূরার প্রথমে একটি আয়াত ধরা হয়েছে এবং ‘সিরাতাল্লাযীনা আন‘আমতা আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওলাদ দ্বলীন’ পর্যন্ত পুরোটাকে একই আয়াত ধরা হয়েছে। আর যারা বিসমিল্লাহকে সূরার আয়াত হিসেবে গণ্য করেননি তারা ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ পর্যন্ত এক আয়াত, আর তার পরের অংশ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ কে আলাদা আয়াত সাব্যস্ত করে সাত আয়াত পূর্ণ করেছেন। [বাগভী]

নাযিল হওয়ার স্থান ঃ

গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে যে, সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কারও মতে এটা একবার মক্কায় এবং আর একবার মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া এর অর্ধেক মক্কায় এবং অপর অর্ধেক মদীনায় নাযিল হয়েছে বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সব মত গ্রহণযোগ্য নয়। তার বড় প্রমাণ এই যে, সূরা আল-হিজর সর্বসম্মতভাবে মক্কী। তার ৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ‘আমরা আপনাকে সাতটি বার বার পঠনীয় আয়াত ও কুরআনে ‘আযীম প্রদান করেছি।’ এই বার বার পঠনীয় সাতটি আয়াতই হল সূরা আল-ফাতিহা। [বাগভী] তাছাড়া সালাত

মক্কায়ই ফরয হয়েছিল এবং সূরা ফাতিহা ছাড়া কখনই সালাত পড়া হয়নি– এটাও সর্বসম্মত কথা।

সূরার ফযীলত ঃ

সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত বর্ণনায় অসংখ্য হাদীস এসেছে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে আমি দু'ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। বান্দা ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ বললে আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে; আর যখন সে ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ বলে তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ-গান করেছে। আর যখন সে বলে ﴿ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে। আর যখন সে বলে ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। আর যখন সে বলে ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴾ তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়"। [মুসলিম, ৩৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মুল কুরআন এর অনুরূপ কোন কিছু তাওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিল করেন নি। আর তা হলো পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত, যা আমি (আল্লাহ্) এবং বান্দাদের মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত।" [নাসায়ী, ৯১৩, তিরমিযী, ৩১২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরিল আলাইহিস্‌সালাম উপবিষ্ট ছিলেন। তখন হঠাৎ উপরের দিকে (এক ধরণের) শব্দ শুনা গেল। তখন জিবরিল আলাইহিস্ সালাম আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, এটা আকাশের একটি দরজা যা কখনও খোলা হয় নি। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, অতঃপর সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে দু'টি নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি যা আপনাকে দেয়া হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাকারাহ্ এর শেষাংশ। এর একটি অক্ষর পাঠের মাধ্যমে চাওয়া বস্তুও তাকে দেয়া হবে। [মুসলিম: ৮০৬] অনুরূপভাবে আবু সা'য়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে এক জায়গায় অবতরণ করলাম। সেখানে একটি মেয়ে এসে বলল, এ গ্রামের প্রধানকে সাপে দংশন করেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঝাঁড়-ফুক করার মত আছে? তখন মেয়েটির সাথে এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে ঝাঁড়-ফুক করে এল, আমরা তাকে ঝাঁড়-ফুক জানে বলে মনে করতাম না। এতে গ্রাম প্রধান আরোগ্য লাভ করেন। ফলে সে তাকে ত্রিশটি বকরী উপহার দিল এবং আমাদেরকে দুধ পান করাল। আমাদের সঙ্গীকে আমরা বললাম তুমি কি ভাল ঝাঁড়-ফুক করতে জান? সে বলল, আমি শুধু উম্মুল কুরআন দ্বারা ফুঁক দিয়েছি। আমরা সবাইকে

বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলোকে কিছু কর না । অতঃপর মদীনা পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, সে কিভাবে জানলো যে, এটি একটি ঝাঁড়-ফুক করার বস্তু! তোমরা এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমাকে তোমাদের সাথে এক ভাগ দিও। [মুসলিম: ২২০১] অন্য বর্ণনায় আবু সা'য়ীদ ইবনুল মু'আল্লা বলেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি সালাত শেষ করেই তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার কাছে আসা হতে তোমাকে কিসে বারণ করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে ডাকেন সে বস্তুর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মসজিদ হতে বের হবার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দিব। ... অতঃপর তিনি বললেন, তাহলো, ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾। এটি হলো সাতটি পূনঃ পূনঃ পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে। [বুখারী, ৪৬৪৭] উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সূরাটি সবচেয়ে মহান সূরা।

এই সূরা যদিও আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কালাম, তবুও এর ধরণ রাখা হয়েছে প্রার্থনামূলক। আল্লাহ্র নিকট মানুষকে কোন জিনিসের প্রার্থনা করতে হবে, সে প্রার্থনার নিয়ম ও প্রণালী কি হওয়া উচিত; আল্লাহর সম্মুখে মানুষের প্রকৃত স্থান কোথায় এবং সেই দৃষ্টিতে মানুষের আকীদা বিশ্বাস কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তার জন্য বিশুদ্ধ দ্বীন কি হতে পারে, এই দুনিয়ার অসংখ্য পথের মধ্যে হেদায়েতের পথ–আল্লাহর সন্তোষ লাভের সঠিক পথ–কোনটি, আর কোন পথে নাযিল হয় তাঁর অভিশাপ; এসব কথাই বিশ্ব-মানবের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এই সূরার মাধ্যমে। আল্লাহর বিশেষ পরিচয় ও গুণাবলীর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে কিয়ামত–বিচারের দিন এবং রিসালাত ও নবুওয়্যাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব দিক দিয়ে এই সূরাকে কুরআনের ভূমিকা বলা যেতে পারে। কুরআনের সমগ্র সূরার মধ্যে এর গুরুত্ব বেশী হওয়ার কারণেই একে কুরআনের শুরুতে স্থাপন করা হয়েছে। অন্য কথায় ত্রিশ পারা কুরআন শরীফে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, অতি সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে এই ছোট্ট সূরাটিতে। অথবা বলা যায়, পূর্ণ কুরআন এই ছোট সূরাটিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

১. রহমান, রহীম[১] আল্লাহ্‌র নামে[২]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

(১) সাধারণত আয়াতের অনুবাদে বলা হয়ে থাকে, পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। এ অনুবাদ বিশুদ্ধ হলেও এর মাধ্যমে এ আয়াতখানির পূর্ণভাব প্রকাশিত হয় না। কারণ, আয়াতটি আরও বিস্তারিত বর্ণনার দাবী রাখে। প্রথমে লক্ষণীয় যে, আয়াতে আল্লাহর নিজস্ব গুণবাচক নামসমূহের মধ্য হতে 'আর-রাহমান ও আর-রাহীম' এ দু'টি নামই এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। 'রহম' শব্দের অর্থ হচ্ছে দয়া, অনুগ্রহ। এই 'রহম' ধাতু হতেই 'রহমান' ও 'রহীম' শব্দদ্বয় নির্গত ও গঠিত হয়েছে। 'রহমান' শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র এমন একটি গুণবাচক নাম যা অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। [তাবারী] কুরআন ও হাদীসে এমনকি আরবদের সাহিত্যেও এটি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। পক্ষান্তরে 'রহীম' শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণ হলেও এটি অন্যান্য সৃষ্টজগতের কারও কারও গুণ হতে পারে। তবে আল্লাহ্‌র গুণ হলে সেটা যে অর্থে হবে অন্য কারও গুণ হলে সেটা সে একই অর্থে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রত্যেক সত্তা অনুসারে তার গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এখানে একই স্থানে এ দু'টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, আল্লাহ্ 'রহমান' হচ্ছেন এই দুনিয়ার ক্ষেত্রে, আর 'রাহীম' হচ্ছেন আখেরাতের হিসেবে। [বাগভী]

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর প্রতি সর্বপ্রথম 'ইক্‌রা বিসমে' বা সূরা আল-'আলাক এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। এতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাম নিয়ে পাঠ শুরু করতে বলা হয়েছিল। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহর এই প্রাথমিক আদেশ অনুযায়ী কুরআনের প্রত্যেক সূরা'র প্রথমেই তা স্থাপন করে সেটাকে রীতিমত পাঠ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার উপরিভাগে অর্থ ও বাহ্যিক আঙ্গিকতার দিক দিয়ে একটি স্বর্ণমুকুটের ন্যায় স্থাপিত রয়েছে। বিশেষ করে এর সাহায্যে প্রত্যেক দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করাও অতীব সহজ হয়েছে। হাদীসেও এসেছে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার শেষ তখনই বুঝতে পারতেন যখন বিসমিল্লাহ নাযিল করা হতো" [আবু দাউদ:৭৮৮] তবে প্রত্যেক সূরার প্রথমে ও কুরআন পাঠের পূর্বে এ বাক্য পাঠ করার অর্থ শুধু এ নয় যে, এর দ্বারা আল্লাহর নাম নিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে শুরু করার সংবাদ দেয়া হচ্ছে। বরং এর দ্বারা স্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার করা হয় যে, দুনিয়া জাহানের সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ কথাও মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন বিশেষ করে দ্বীন ও শরীয়াতের যে অপূর্ব ও অতুলনীয় নিয়ামত আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, তা আমাদের জন্মগত কোন অধিকারের ফল নয়। বরং তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব বিশেষ মেহেরবানীর ফল।

তাছাড়া এই বাক্য দ্বারা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনাও করা হয় যে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁর কালামে-পাক বুঝবার ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করার তওফীক

দান করেন। এ ছোট্ট বাক্যটির অন্তর্নিহিত ভাবধারা এটাই। তাই শুধু কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বেই নয় প্রত্যেক জায়েয কাজ আরম্ভ করার সময়ই এটি পাঠ করার জন্য ইসলামী শরীয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ প্রত্যেক কাজের পূর্বে এটি উচ্চারণ না করলে উহার মঙ্গলময় পরিণাম লাভে সমর্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন কথা ও কাজে এই কথাই ঘোষণা করেছেন। যেমন, তিনি প্রতিদিন সকাল-বিকাল বলতেন, بِسْمِ اللهِ الذِيْ لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ "আমি সে আল্লাহ্র নামে শুরু করছি যার নামে শুরু করলে যমীন ও আসমানে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না, আর আল্লাহ্ তো সব কিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন।" [আবুদাউদ: ৫০৮৮, ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৯] অনুরূপভাবে যখন তিনি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লিখেন তাতে বিসমিল্লাহ্ লিখেছিলেন [বুখারী, ৭] তাছাড়া তিনি যে কোন ভাল কাজে বিসমিল্লাহ বলার জন্য নির্দেশ দিতেন। যেমন, খাবার খেতে, [বুখারী: ৫৩৭৬, মুসলিম: ২০১৭, ২০২২] দরজা বন্ধ করতে, আলো নিভাতে, পাত্র ঢাকতে, পান-পাত্র বন্ধ করতে [বুখারী: ৩২৮০] কাপড় খুলতে [ইবনে মাজাহ: ২৯৭, তিরমিযী: ৬০৬] স্ত্রী সহবাসের পূর্বে [বুখারী: ৬৩৮৮, মুসলিম: ১৪৩৪], ঘুমানোর সময় [আবু দাউদ: ৫০৫৪] ঘর থেকে বের হতে [আবুদাউদ: ৫০৯৫] চুক্তিপত্র/ বেচা-কেনা লিখার সময় [সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৩২৮] চলার সময় হোঁচট খেলে [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৫৯] বাহনে উঠতে [আবু দাউদ: ২৬০২] মসজিদে ঢুকতে [ইবনে মাজাহ: ৭৭১, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৮৩] বাথরুমে প্রবেশ করতে [ইবনে আবি শাইবাহ: ১/১১] হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে [সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৭৯] যুদ্ধ শুরু করার সময় [তিরমিযী: ১৭১৫] শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্যাথা পেলে বা কেটে গেলে [নাসায়ী: ৩১৪৯] ব্যাথার স্থানে ঝাড়-ফুক দিতে [মুসলিম: ২২০২] মৃতকে কবরে দিতে [তিরমিযী: ১০৪৬]। এ ব্যাপারে আরও বহু সহীহ হাদীস এসেছে। আবার কোথাও কোথাও 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিবও বটে যেমন, যবাই করতে [বুখারী: ৯৮৫, মুসলিম: ১৯৬০]

যেহেতু মানুষের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, সে যে কাজই শুরু করুক না কেন, তা যে সে নিজে আশানুরূপে সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এমতাবস্থায় সে যদি আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করে এবং আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি হৃদয়-মনে অকুন্ঠ বিশ্বাস জাগরুক রেখে তাঁর রহমত কামনা করে, তবে এর অর্থ এ-ই হয় যে, সংশ্লিষ্ট কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সে নিজের ক্ষমতা যোগ্যতা ও তদবীর অপেক্ষা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের উপরই অধিক নির্ভর ও ভরসা করে এবং তা লাভ করার জন্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে।

২. সকল 'হাম্‌দ'[১] | اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(১) আরবী ভাষায় 'হাম্‌দ' অর্থ নির্মল ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা। গুণ ও সিফাত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। তা ভালও হয় আবার মন্দও হয়। কিন্তু হাম্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র ভাল গুণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের যা কিছু এবং যতকিছু ভাল, সৌন্দর্য-মাধুর্য, পূর্ণতা মাহাত্ম দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তা যেখানেই এবং যে কোন রূপে ও যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট, একমাত্র তিনিই–তাঁর মহান সত্তাই সে সব পাওয়ার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্যই এর যোগ্য হতে পারে না। কেননা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং তাঁর সব সৃষ্টিই অতীব সুন্দর। এর অধিক সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না–মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাঁর সৃষ্টি, লালন-পালন-সংরক্ষণ-প্রবৃদ্ধি সাধনের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাই এর দরুন মানব মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠা প্রশংসা ও ইচ্ছামূলক প্রশংসাকে 'হামদ' বলা হয়। এখানে এটা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক যে, 'আল-হামদু' কথাটি 'আশ-শুক্‌র' থেকে অনেক ব্যাপক, যা আধিক্য ও পরিপূর্ণতা বুঝায়। কেউ যদি কোন নিয়ামত পায়, তা হলে সেই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়। সে ব্যক্তি যদি কোন নিয়ামত না পায় (অথবা তার পরিবর্তে অন্য কোন লোক নিয়ামতটি পায়) স্বভাবতঃই তার বেলায় এজন্য শুকরিয়া নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ামত পায়, সে-ই শুকরিয়া আদায় করে। যে ব্যক্তি নিয়ামত পায় না, সে শুকরিয়া আদায় করে না। এ হিসেবে 'আশ-শুক্‌র লিল্লাহ' বলার অর্থ হতো এই যে, আমি আল্লাহ্‌র যে নিয়ামত পেয়েছি, সেজন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। অপরদিকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' অনেক ব্যাপক। এর সম্পর্ক শুধু নিয়ামত প্রাপ্তির সাথে নয়। আল্লাহ্‌র যত নেয়ামত আছে, তা পাওয়া যাক, বা না পাওয়া যাক; সে নিয়ামত কোন ব্যক্তি নিজে পেলো, বা অন্যরা পেলো, সবকিছুর জন্যই যে প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য সেটিই হচ্ছে 'হামদ'। এ প্রেক্ষিতে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে বান্দা যেন ঘোষণা করে, হে আল্লাহ্‌! সব নিয়ামতের উৎস আপনি, আমি তা পাই বা না পাই, সকল সৃষ্টিজগতই তা পাচ্ছে; আর সেজন্য সকল প্রশংসা একান্তভাবে আপনার, আর কারও নয়। কেউ আপনার প্রশংসা করলে আপনি প্রশংসিত হবেন আর কেউ প্রশংসা না করলে প্রশংসিত হবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। আপনি স্বপ্রশংসিত। প্রশংসা আপনার স্থায়ী গুণ। প্রশংসা আপনি ভালবাসেন। আপনার প্রশংসা কোন দানের বিনিময়ে হতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। [ইবন কাসীর]

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। أَحْمَدُ اللهَ 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি' এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, 'আহমাদুল্লাহ' বা 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি' এ বাক্যটি বর্তমানকালের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি বর্তমানকালে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। অন্যদিকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বা 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' সর্বকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) প্রযোজ্য। আর এ জন্যই হাদীসে বলা

আল্লাহ্‌র[১], যিনি

হয়েছে, أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ "সবচেয়ে উত্তম দো'আ হলো, আল-হামদুলিল্লাহ" । [তিরমিযী:৩৩৮৩] কারণ, তা সর্বকাল ব্যাপী । অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ "আর 'আল-হামদুলিল্লাহ' মীযান পূর্ণ করে" ।[মুসলিম: ২২৩] এ জন্য অধিকাংশ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাত্রির যিকর ও সালাতের পরের যিকর এর মধ্যে এ "আল-হামদুলিল্লাহ" শব্দই শিখিয়েছেন । এ "আল-হামদুলিল্লাহ" পুর্ণমাত্রার প্রশংসা হওয়ার কারণেই আল্লাহ্ এতে খুশী হন । বিশেষ করে নেয়ামত পাওয়ার পর বান্দাকে কিভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হবে তাও "আল-হামদুলিল্লাহ" শব্দের মাধ্যমে করার জন্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল শিখিয়ে দিয়েছেন । [দেখুন, ইবনে মাজাহ, ৩৮০৫] এভাবে "আল-হামদুলিল্লাহ" হলো সীমাহীন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার রূপ । আল্লাহ্‌র হামদ প্রকাশ করার ক্ষেত্র, মানুষের মন-মানষ, মুখ ও কর্মকাণ্ড । অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় শক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র হামদ করতে হয় । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র 'হামদ' বা প্রশংসা শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ রাখে । অনেকে মুখে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা আসেনি আর তার কর্মকাণ্ডেও সেটার প্রকাশ ঘটে না ।

(১) 'সকল হামদ আল্লাহ্‌র' এ কথাটুকু দ্বারা এক বিরাট গভীর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । পৃথিবীর যেখানেই যে বস্তুতেই যাকিছু সৌন্দর্য ভাল প্রশংসার যোগ্য গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে, মনে করতে হবে যে, তা তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বকীয় গৌরবের বস্তু নয় । কেননা সেই গুণ মূলতঃই তার নিজের সৃষ্টি নয়; তা সেই আল্লাহ্ তা'আলারই নিরঙ্কুশ দান, যিনি নিজের কুদরতে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন । বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত ভালোর মূল উৎস । মানুষ, ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব-প্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য–যেখানেই যা কিছু সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ রয়েছে, তা তাদের কারো নিজস্ব নয়, সবই আল্লাহর দান । অতএব এসব কারণে যা কিছু প্রশংসা হতে পারে তা সবই আল্লাহর প্রাপ্য । এসব সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহর সাথে কেউ শরীক ছিলনা, কাজেই এসব কারণে যে প্রশংসা প্রাপ্য হতে পারে তাতেও আল্লাহর সাথে কারো এক বিন্দু অংশীদারিত্ব থাকতে পারে না । সুন্দর, অনুগ্রহকারী, সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও ক্রমবিকাশদাতা আল্লাহর প্রতি মানুষ যা কিছু ভক্তি-শ্রদ্ধা ইবাদত-বন্দেগী এবং আনুগত্য পেশ করতে পারে; তা সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনেই নিবেদন করতে হবে । কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তার এক বিন্দুরও দাবীদার হতে পারে না । বরং তাঁরই রয়েছে যাবতীয় হাম্‌দ । হাম্‌দ জাতীয় সবকিছু কেবল তাঁরই প্রাপ্য, কেবল তিনিই সেটার একমাত্র যোগ্য । তাছাড়া ভালো বা মন্দ সকল অবস্থায় কেবল এক সত্তারই 'হামদ' বা প্রশংসা করতে হয় । তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ যদি কোন খারাপ কিছুর সম্মুখীন হয়, তখনও যেন

সৃষ্টিকুলের[১]

বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ বা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় হামদ ।[ইবন মাজাহ: ৩৮০৩]

কুরআন হাদীস হতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির গুণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার এতখানি প্রশংসাও করা যায় না যাতে তার ব্যক্তিত্বকেই অসাধারণভাবে বড় করে তোলা হয় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে যায় । মূলতঃ এইরূপ প্রশংসাই মানুষকে তাদের পূজার কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে । সে জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে বলেছেন; "যখন বেশী বেশী প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ কর ।" [মুসলিম:৩০০২] নতুবা তার মনে গৌরব ও অহংকারী ভাবধারার উদ্রেক হতে পারে । হয়ত মনে করতে পারে যে, সে বহুবিধ গুণ-গরিমার অধিকারী, তার বিরাট যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে । আর কোন মানুষ যখন এই ধরনের খেয়াল নিজের মনে স্থান দেয় তখন তার পতন হতে শুরু হয় এবং সে পতন হতে উদ্ধার হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না । তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো গুণ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করে, তখন মানুষ তার ভক্তি–শ্রদ্ধার জালে বন্দী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে মানুষের দাসত্ব ও মানুষের পূজা করতে আরম্ভ করে । এই অবস্থা মানুষকে শেষ পর্যন্ত চরম পঙ্কিল শির্কের পথে পরিচালিত করতে পারে । সে জন্যই যাবতীয় 'হামদ' একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে ।

(১) 'আলামীন' বহুবচন শব্দ, একবচনে 'আলাম' । কোন কোন তাফসীরকার বলেন, 'আলাম' বলা হয় সেই জিনিসকে, যা অপর কোন জিনিস সম্পর্কে জানবার মাধ্যম হয়; যার দ্বারা অন্য কোন বৃহত্তর জিনিস জানতে পারা যায় । সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি অংশ স্বতঃই এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক । এই জন্য সৃষ্টিজগতকে 'আলাম' এবং বহুবচনে আলামীন বলা হয় । [কাশশাফ] 'আলামীন' বলতে কি বুঝায়, যদিও এখানে তার ব্যাখ্যা করা হয় নি, কিন্তু অপর আয়াতে তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে । আয়াতটি হচ্ছে, ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ﴾ "ফির'আউন বললঃ রাব্বুল আলামীন কি? মূসা বললেনঃ যিনি আসমান-যমীন এবং এ দু'টির মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের রব ।" [সূরা আশ-শু'আরা:২৩-২৪] এতে 'আলামীন' এর তাফসীর হয়ে গেছে যে, সৃষ্টি জগতের আর সব কিছুই এর অধীন । আসমান ও যমীনে এত অসংখ্য 'আলাম' বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত সেগুলোর কোন সীমা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় নি । মানব-জগত, পশু-জগত, উদ্ভিদ-জগত–এই জগত সমূহের কোন সীমা-সংখ্যা নাই, বরং এগুলো অসীম অতলস্পর্শ জগত-সমুদ্রের কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র । মানব-বুদ্ধি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে একেবারেই সমর্থ নয় । [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

রব[১],

(১) 'রব্' শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু–লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ–সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিযিক্ দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। তাছাড়া ভাঙ্গা গড়ার অধিকারী হওয়া, জীবনদান করা, মৃত্যু প্রদান করা, সন্তান দেয়া, আরোগ্য প্রদান করা ইত্যাদি যাবতীয় অর্থই এতে নিহিত আছে। আর যিনি এক সঙ্গে এই সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই হচ্ছেন রব্। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'লায় এইরূপ ব্যাপক অর্থে রব্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ "আপনার রব্ এর নামের তাসবীহ্ পাঠ করুন, যিনি মহান উচ্চ; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ ভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন; এবং যিনি সঠিক রূপে প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর জীবন যাপন পন্থা প্রদর্শন করেছেন"। [সূরা আল-আ'লাঃ ১-৩] এই আয়াত হতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, 'রব্' তাঁকেই বলতে হবে যাঁর মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করার, সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সজ্জিত করার, প্রত্যেকটির পরিমাণ নির্ধারণ করার এবং হেদায়েত, দ্বীন ও শরী'আত প্রদান করার যোগ্যতা রয়েছে। যিনি নিজ সত্তার গুণে মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব-ভূবনকে সৃষ্টি করেছেন; শুধু সৃষ্টিই নয়–যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দান করেছেন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গই পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে নিজ নিজ স্থানে বসে গেছে। রব্ তিনিই–যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্বও দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য নিজের একটি ক্ষেত্র এবং তার সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ "যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এবং তার পরিমাণ ঠিক করেছেন।" [সূরা আল-ফুরকান:২] অতএব এক ব্যক্তি যখন আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথারই ঘোষণা করে যে, আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দৈহিক, আধ্যাত্মিক, দ্বীনী ও বৈষয়িক–যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। আমার এই সবকিছু একমাত্র তাঁরই মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমার সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই। আর কেউ তার কোন কিছু পূরণ করার অধিকারী নয়।

বস্তুতঃ সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্র দু'ধরনের রবুবিয়্যাত কার্যকর দেখা যায়: সাধারণ রবুবিয়াত বা প্রকৃতিগত এবং বিশেষ রবুবিয়াত বা শরী'আতগত।

১) প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিমূলক– মানুষের জন্ম, তাহার লালন পালন ও ক্রমবিকাশ দান, তার শরীরকে ক্ষুদ্র হতে বিরাটত্বের দিকে, অসম্পূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করা এবং তার মানসিক ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতা দান।

৩. দয়াময়, পরম দয়ালু[১],   الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২) শরীয়াত ভিত্তিক–মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে পথ প্রদর্শন করা, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নির্দেশের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ। যারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণত্ব বিধান করেন। এদেরই মাধ্যমে তারা হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়। নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকতে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলময় পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মানুষের রব্ হওয়ার ব্যাপারটি খুবই ব্যাপক। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের রব্ হওয়া কেবল এই জন্যই নয় যে, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের লালন পালন করেছেন এবং তাহার দৈহিক শৃঙ্খলাকে স্থাপন করেছেন। বরং এজন্যও তিনি রব্ যে, তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক জীবন যাপনের সুযোগদানের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে সেই ইলাহী বিধান দান করেছেন।

(১) 'রহমান-রাহীম' শব্দদ্বয়ের কারণে মূল আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত এবং সকল প্রকার প্রশংসার একচ্ছত্র অধিকারী কেবল এই জন্য নয় যে তিনি রব্বুল আলামীন, বরং এই জন্যও যে, তিনি 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম'। বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার অপার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত পরিবেশিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জগতে এই যে নিঃসীম শান্তি শৃংখলা ও সামঞ্জস্য-সুবিন্যাস বিরাজিত রয়েছে, এর একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহর রহমত সাধারণভাবে সব কিছুর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছে। কাফির, মুশরিক, আল্লাহ্‌দ্রোহী, নাস্তিক, মুনাফিক, কাউকেও আল্লাহ তার রহমত হতে জীবন-জীবিকা ও সাধারণ নিয়মে বৈষয়িক উন্নতি কোন কিছু থেকেই– বঞ্চিত করেন নি। এমন কি, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তাঁর বিরোধিতা করতে চাইলেও আল্লাহ নিজ হতে কাউকেও বাধা প্রদান করেন নি; বরং তিনি মানুষকে একটি সীমার মধ্যে যা ইচ্ছে তা করারই সুযোগ দিয়েছেন। এই জড় দুনিয়ার ব্যাপারে এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আর আমার রহমত সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে।" [সূরা আল-আরাফ:১৫৬] কিন্তু এই জড় জগত চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবার পর যে নূতন জগত স্থাপিত হবে, তা হবে নৈতিক নিয়মের বুনিয়াদে স্থাপিত এক আলাদা জগত। সেখানে আল্লাহর দয়া অনুকম্পা আজকের মত সর্বসাধারণের প্রাপ্য হবে না। তখন আল্লাহর রহমত পাবে কেবলমাত্র তারাই যারা দুনিয়ায় আখেরাতের রহমত পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। 'রাব্বুল আলামীন' বলার পর 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহিম' শব্দদ্বয় উল্লেখ করায় এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ বিশ্ব-লোকের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষন ও ক্রমবিকাশ দানের যে সুষ্ঠু ও নিখুত ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন, তার মূল কারণ সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে 'রাহমান' এর পর 'রাহীম' উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই বলতে চান

৪. বিচার দিনের মালিক[১]।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নিরপেক্ষ ও সাধারণ রহমত লাভ করে কেউ যেন অতিরিক্ত মাত্রায় মেতে না যায় এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর দেয়া দ্বীনকে ভুলে না বসে। কেননা দুনিয়ার জীবনের পর আরও একটি জগত, আরও একটি জীবন নিশ্চিতরূপে রয়েছে, যখন আল্লাহর রহমত নির্বিশেষে আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনই হবে সর্বোতভাবে সাফল্যমণ্ডিত।

(১) এখানে আল্লাহকে 'বিচার দিনের মালিক' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই দিনের প্রকৃত রূপটি যে কি এবং জনগণের সম্মুখে এই দিন কি অবস্থা দেখা দিবে তা এখানে প্রকাশ করে বলা হয় নি। অন্যত্র তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ ثُمَّ مَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ﴾ "বিচারের দিনটি কি, তা কিসে আপনাকে জানাবে? আবার জিজ্ঞাসা করি, কিসে আপনাকে জানাবে বিচারের দিনটি কি? তাহা এমন একটি দিন, যে দিন কেউই নিজের রক্ষার জন্য কোনই সাহায্যকারী পাবে না, এবং সমগ্র ব্যাপার নিরঙ্কুশ ভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত হবে।" [সূরা আল-ইনফিতার:১৭-১৯] আর ﴿يَوْمُ الدِّيْنِ﴾ বলিতে যে বিচারের দিন, প্রতিফল– তথা শাস্তি বা পুরস্কার দানের দিন বুঝায়, তা অন্য আয়াতাংশে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, ﴿يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ﴾ "আজকের দিনে আল্লাহ লোকদের প্রকৃত কর্মফল পূর্ণ করে দিবেন" [সূরা আন-নূর: ২৫] মোটকথা: আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন, তিনি কেবল 'রব্বুল আলামীন, আর-রহমান ও আর-রহীমই নন, তিনি 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন'-ও। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল এই জীবনের লালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই বিরাট জগত-কারখানা স্থাপন করেন নি, এর একটি চূড়ান্ত পরিণতিও তিনি নির্ধারিত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা কেউ মনে করো না যে, এই জীবনের অন্তরালে কোন জীবন নেই। এই ধারণাও মনে স্থান দিও না যে, সেদিনও তোমাদের তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা চলবে যেমন আজ চলছে বলে তোমরা ধারণা করছ বরং সে দিন নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও মালিকানা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর থাকবে। আজ যেমন তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারছ–অন্তত: এর পথে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় না, সে চূড়ান্ত বিচার দিনে কিন্তু তা কিছু মাত্র চলবে না। সেদিন কেবলমাত্র আল্লাহর মর্জি কার্যকর হবে। আজ যেমন লোকেরা সত্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে সুস্পষ্ট অন্যায় ও মারাত্মক যুলুম করেও সুনাম সুখ্যাতিসহ জীবন-যাপন করতে পারছে, সেদিন কিন্তু এসব ধোঁকাবাজী এক বিন্দুও চলবে না। বিচার দিবসের গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য আন্দাজ করা যায় এই কথা হতে যে, বিচারের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, "আজকার দিনে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কার?" তার উত্তরে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হবে, "তা সবই একমাত্র সার্বভৌম ও শক্তিমান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" [সূরা আল-গাফির:৫৯], অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা সে দিনের কথা যেদিন কোন লোকই অন্য কারও জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না। সে দিন

৫. আমরা শুধু আপনারই 'ইবাদাত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

৬. আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন[১],

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

সমস্ত কর্তৃত্বই হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য।" [সূরা আল-ইনফিতার:১৯] আল্লাহর এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কার্যকর হবে প্রথম সিংগায় ফুক দেয়ার দিন হতেই। বলা হয়েছে, "আর তাঁর নিরঙ্কুশ মালিকানা কার্যকর হবে সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিনই।" [সূরা আল-আন'আম:৭৩]

(১) স্নেহ ও করুণা এবং কল্যাণ কামনাসহ কাউকে মঙ্গলময় পথ দেখিয়ে দেয়া ও মনজিলে পৌঁছিয়ে দেয়াকে আরবী পরিভাষায় 'হেদায়াত' বলে। 'হেদায়াত' শব্দটির দুইটি অর্থ। একটি পথ প্রদর্শন করা, আর দ্বিতীয়টি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। যেখানে এই শব্দের পর দুইটি object থাকবে إلى থাকবে না, সেখানে এর অর্থ হবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। আর যেখানে এ শব্দের পর إلى শব্দ আসবে, সেখানে অর্থ হবে পথ-প্রদর্শন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেছেন, ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ "নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্যস্থলে—মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন না যাকে আপনি পৌঁছাতে চাইবেন। বরং আল্লাহ্ই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন।" [সূরা আল-কাসাস: ৫৬] এ আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর إلى ব্যবহৃত হয়নি বলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া অর্থ হয়েছে এবং তা করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধ্যায়ত্ত নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পথ প্রদর্শন রাসূলে করীমের সাধ্যায়ত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ "হে নবী! আর আপনি অবশ্যই সরল সঠিক দৃঢ় ঋজু পথ প্রদর্শন করেন।" [সূরা আশ-শূরা:৫২] কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তাই তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, ﴿وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ "আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল সোজা সুদৃঢ় পথে পৌঁছিয়ে দিতাম।" [সূরা আন-নিসা: ৬৮] সূরা আল-ফাতিহা'র আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর إلى শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এর অর্থ হবে সোজা সুদৃঢ় পথে মনজিলের দিকে চালনা করা। অর্থাৎ যেখানে বান্দাহ্ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে শুধু এতটুকু বলে না যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে সোজা সুদৃঢ় পথের সন্ধান দিন। বরং বলে, 'হে আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে চলবার তাওফীক দিয়ে মনজিলে পৌঁছিয়ে দিন। কেননা শুধু পথের সন্ধান পাইলেই যে সে পথ পাওয়া ও তাতে চলে মনজিলে পৌঁছা সম্ভবপর হবে তা নিশ্চিত নয়।

কিন্তু 'সিরাতে মুস্তাকীম' কি? সিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে, রাস্তা বা পথ। আর মুস্তাকীম

৭. তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত | صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

হচ্ছে, সরল সোজা। সে হিসেবে সিরাতে মুসতাকীম হচ্ছে, এমন পথ, যা একেবারে সোজা ও ঋজু, প্রশস্ত ও সুগম; যা পথিককে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়; যে পথ দিয়ে লক্ষ্যস্থল অতি নিকটবর্তী এবং মনযিলে মাকছুদে পৌঁছার জন্য যা একমাত্র পথ, যে পথ ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছার অন্য কোন পথই হতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমারও রব তোমাদেরও রব, অতএব একমাত্র তাঁরই দাস হয়ে থাক। এটাই হচ্ছে সিরাতুম মুস্তাকীম–সঠিক ও সুদৃঢ় ঋজু পথ।" [সূরা মারইয়াম: ৩৬] অর্থাৎ আল্লাহকে রব স্বীকার করে ও কেবল তাঁরই বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করলেই সিরাতুম মুস্তাকীম অনুসরণ করা হবে। অন্যত্র ইসলামের জরুরী বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর এটাই আমার সঠিক দৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এই পথ অনুসরণ করে চল। এছাড়া আরও যত পথ আছে, তাহার একটিতেও পা দিও না; কেননা তা করলে সে পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে–ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা ধ্বংসের পথ হতে আত্মরক্ষা করতে পার।" [সূরা আল-আন'আম: ১৫৩] একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে যে পথ ও বিধি-বিধান পাওয়া যাবে, তাই মানুষের জন্য সঠিক পথ। আল্লাহ্ বলেন, "প্রকৃত সত্য-সঠিক-ঋজু-সরল পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর, যদিও আরও অনেক বাঁকা পথও রয়েছে। আর আল্লাহ্ চাইলে তিনি সব মানুষকেই হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতেন।" [সূরা আন-নাহল:৯]

সিরাতে মুস্তাকীমের তাফসীর কোন কোন মুফাসসির করেছেন, ইসলাম। আবার কারও কারও মতে, কুরআন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] বস্তুত: আল্লাহর প্রদত্ত বিশ্বজনীন দ্বীনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত রূপ 'সিরাতুল মুস্তাকীম' শব্দ হতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব কবুল করে তাঁরই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার পথই হচ্ছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এবং একমাত্র এই পথে চলার ফলেই মানুষ আল্লাহর নিয়ামত ও সন্তোষ লাভ করতে পারে। সে একমাত্র পথই মানব জীবনের প্রকৃত ও চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই সে একমাত্র পথে চলার তওফীক প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই আয়াতটিতে।

কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে এই পথ কিরূপে পাওয়া যেতে পারে? সে পথ ও পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ এর তিনটি সুস্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ করেছেন: ১. এই জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে তা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, যারা উক্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর নিকট হতে নিয়ামত ও অসীম অনুগ্রহ লাভ করেছে। ২. এই পথের পথিকদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয় নি, অভিশপ্তও তারা নয়। ৩. তারা পথভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্টও নয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ কথা কয়টির বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

দিয়েছেন(১), যাদের উপর আপনার ক্রোধ আপতিত হয়নি(২) এবং যারা

وَلَا الضَّآلِّيْنَ۟

(১) এটা আল্লাহর নির্ধারিত সঠিক ও দৃঢ় পথের প্রথম পরিচয়। এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট হতে যে পথ নাযিল হয়েছে, তা অনুসরণ করলে আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তা এমন কোন পথই নয়, যাহা আজ সম্পূর্ণ নূতনভাবে পেশ করা হচ্ছে– পূর্বে পেশ করা হয় নি। বরং তা অতিশয় আদিম ও চিরন্তন পথ। মানুষের এই কল্যাণের পথ অত্যন্ত পুরাতন, ততখানি পুরাতন যতখানি পুরাতন হচ্ছে স্বয়ং মানুষ। প্রথম মানুষ হতেই এটা মানুষের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, অসংখ্য মানুষ এ পথ প্রচার করেছেন, কবুল করার আহ্বান জানিয়েছেন, এটা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নিকট হতে, অপূর্ব নিয়ামত ও সম্মান লাভের অধিকারী প্রমাণিত হয়েছেন। এই নিয়ামত এই দুনিয়ার জীবনেও তারা পেয়েছেন, আর আখেরাতেও তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। মূলত: আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের চলার পথ ও অনুসৃত জীবনই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য একমাত্র পথ ও পন্থা। এতদ্ব্যতীত মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয় ও কল্যাণকর পথ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা এবং তাদের পথ বাস্তবিক পক্ষে কি? এর উত্তর অন্য আয়াতে এসেছে, "যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। এবং তখন আমি আমার কাছ থেকে তাদেরকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করতাম এবং তাদেরকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করতাম। আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ (যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন) তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! এগুলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" [সূরা আন-নিসা: ৬৬-৭০] এ আয়াত থেকে সঠিক ও দৃঢ় জীবন পথ যে কোনটি আর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকগণ যে কোন পথে চলেছেন ও চলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার অধিকারী হয়েছেন তা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। তারা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন। [ইবন কাসীর]

(২) এটা আল্লাহর নির্ধারিত 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর দ্বিতীয় পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা যে পথ মানুষের সম্মুখে চিরন্তন কল্যাণ লাভের জন্য উপস্থাপিত করেছেন সে পথ অভিশাপের পথ নয় এবং সে পথে যারা চলে তাদের উপর কখনই আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে না। সে পথ তো রহমতের পথ বরং সে পথের পথিকদের প্রতি দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য বর্ষিত হয়ে থাকে, আখেরাতেও তারা আল্লাহর চিরস্থায়ী সন্তোষ লাভের অধিকারী হবে। এই আয়াতাংশের অপর একটি অনুবাদ হচ্ছে, "তাদের পথ নয় যাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়েছে।" এরূপ অনুবাদ করলে তাতে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' ছাড়া আরও একটি পথের ইঙ্গিত মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়, যা আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত এবং সেই পথ হতে মানুষকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য মনে হয়। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ মূলতঃ একটি পথই

পথভ্রষ্টও নয়[১] ।

উপস্থাপিত করেছেন এবং একটি পথেরই ইতিবাচক দুইটি বিশেষণ দ্বারা সেটাকে অত্যধিক সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তাই অনেকেই পূর্বোক্ত প্রথম অনুবাদটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [উভয় অর্থের জন্য দেখুন, যামাখশারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] প্রথম অনুবাদ বা দ্বিতীয় অনুবাদ যাই হোক না কেন এখানে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে প্রকারান্তরে এমন পথ ও পন্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহর অভিশাপের পথ, যে পথে চলে কোন কোন লোক 'অভিশপ্ত' হয়েছে।

কিন্তু সে অভিশপ্ত কারা, কারা কোন পথে চলে আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেয়া আবশ্যক। কুরআন মজীদ ঐতিহাসিক জাতিদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ "আর তাদের উপর অপমান লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত হানা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে।" [সূরা আল-বাকারাহ্‌: ৬১] পূর্বাপর আলোচনা করলে নিঃসন্দেহে এটা বুঝতে পারা যায় যে, এ কথাটি ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই 'মাগদুব' বলতে যে এখানে ইয়াহূদীদের বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে সমস্ত মুফাসসিরই একমত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও অনুরূপ স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২,৩৩]

(১) এটি 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর তৃতীয় ও সর্বশেষ পরিচয়। অর্থাৎ যারা সিরাতুল মুস্তাকীম এ চলে আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পেরেছেন তারা পথভ্রষ্ট নন–কোন গোমরাহীর পথে তারা চলেন না। পূর্বোল্লেখিত আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেরও অন্য অনুবাদ হচ্ছে, 'তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যারা গোমরাহ হয়ে আল্লাহর উপস্থাপিত পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।' রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ পথ-ভ্রষ্ট লোকদের পরিচয় জানতে পারা যায় যে, দুনিয়ার ইতিহাসে নাসারাগণ হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত এ গোমরাহ ও পথ-ভ্রষ্ট জাতি। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩২,৩৩, ৭৭]

কোন মুসলিম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথাই ঘোষণা করে যে, "হে আল্লাহ্‌ আমরা স্বীকার করি, আপনার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জীবন-ধারা গড়ে উঠে তা-ই একমাত্র মুক্তির পথ। এজন্য আপনার নির্ধারিত এ পথে চলে যারা আপনার নিয়ামত পেয়েছেন সেই পথই একমাত্র সত্য ও কল্যাণের পথ, আল্লাহ্‌ সেই পথেই আমাদেরকে চলবার তাওফীক দিন। আর যাদের উপর আপনার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ও যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের যেন আমরা অনুসরণ না করি। কেননা, সে পথে প্রকৃতই কোন কল্যাণ নেই।" বস্তুতঃ পবিত্র কুরআন দুনিয়ার বর্তমান বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সর্বশেষ আল্লাহ্‌র দেয়া গ্রন্থ। এর উপস্থাপিত আদর্শ ও জীবন পথই হচ্ছে বিশ্বমানবতার একমাত্র স্থায়ী ও কল্যাণের পথ। এর বিপরীত সমস্ত জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রমাণ করে

একমাত্র এরই উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদেরকে গঠন করা মুসলিমদের একমাত্র দায়িত্ব। মুসলিমরা আজও সেই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হলে সূরা আল-ফাতিহা তাদের জীবনে সার্থক হবে।
মূলত: যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দো'আ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ কবুল করবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ المَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّيْنَ، فَقُوْلُوْا آمِيْنَ؛ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه "যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ্ কবুল কর' একথাটি বল; কেননা যার কথাটি ফেরেশতাদের কথা অনুযায়ী হবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [বুখারী: ৭৮২, মুসলিম: ৪০৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ المَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ؛ فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ؛ يُجِبْكُمُ اللهُ "যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলে তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ্ কবুল কর' একথাটি বল; এতে আল্লাহ্ তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেন (দো'আ কবুল করবেন)।" [মুসলিম: ৪০৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَا حَسَدَتْكُمُ اليَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلام وَالتَّأْمِيْنِ "ইয়াহূদীরা তোমাদেরকে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলার চেয়ে বেশী কোন বিষয়ের উপর হিংসা করে না।" [ইবন মাজাহ: ৮৫৬]

২- সূরা আল-বাকারাহ্
২৮৬ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ البَقَرَة

সূরা আল-বাকারাহ্র গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

১) সূরাটি সবচেয়ে বড় সূরা।

২) সূরাটি সবচেয়ে বেশী আহ্কাম বা বিধি-বিধান সমৃদ্ধ। [ইবনে কাসীর]

৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা পাঠ করার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করেছেনঃ

- আবু উমামাহ্ আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর; কেননা, কেয়ামতের দিন এই কুরআন তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আসবে। তোমরা দু'টি পুষ্প তথা সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান তিলাওয়াত কর, কেননা কেয়ামতের দিন এ দু'টি সূরা এমনভাবে আসবে যেন এ দু'টি হচ্ছে দু'খণ্ড মেঘমালা, অথবা দু'টুকরো কালো ছায়া, অথবা দু'ঝাঁক উড়ন্ত পাখি। এ দু'টি সূরা যারা তিলাওয়াত করবে তাদের থেকে (জাহান্নামের আযাবকে) প্রতিরোধ করবে। তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত কর। কেননা, এর নিয়মিত তিলাওয়াত হচ্ছে বারাকাহ্ বা সমৃদ্ধি এবং এর তিলাওয়াত বর্জন হচ্ছে আফসোসের কারণ। আর যাদুকররা এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না'। [মুসলিম-৮০৪]
- অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্লে বাতিল তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৪৯]
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিওনা, নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায় যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়'। [মুসলিমঃ ৭৮০] অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পড়া হয় সেখানে শয়তান প্রবেশ করেনা। [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৮৪]
- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'প্রত্যেক বস্তুরই উচ্চ স্তম্ভ রয়েছে, কুরআনের সুউচ্চ শৃংগ হলো, সূরা আল-বাকারাহ্'। [তিরমিযীঃ ২৮৭৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৫৯]

৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের দিন সাহাবায়ে কেরামকে ডাকার সময় বলেছিলেনঃ 'হে সূরা আল-বাকারাহ্র বাহক (জ্ঞানসম্পন্ন) লোকেরা'। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২১৮]

৫) সূরা আল-বাকারাহ্ তিলাওয়াত করলে সেখানে ফিরিশ্তাগণ আলোকবর্তিকার মত অবতরণ করে। এ প্রসংগে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে বর্ণনা এসেছে। [বুখারীঃ ৫০১৮,

মুসলিমঃ ৭৯৬]

৬) যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সূরা আল-বাকারাহ্ জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধে আমীর বানাতেন। [তিরমিযী: ২৮৭৬, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ:৩/৫, হাদীস নং ১৫০৯, ৪/১৪০, হাদীস নং ২৫৪০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৬১১, হাদীস নং ১৬২২]

৭) অনুরূপভাবে যারা সূরা আল-বাকারাহ্ এবং সূরা আলে-ইমরান জানতেন, সাহাবাদের নিকট তাদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১২০,১২১]

৮) সর্বোপরি এ সূরাতে আল্লাহ্‌র "ইসমে 'আযম" রয়েছে যার দ্বারা দো'আ করলে আল্লাহ্ সাড়া দেন। এ সূরায় এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এ আয়াতটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, যাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

।। রহমান, রহীম আল্লাহর নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ্-লাম-মীম(১),

الٓمّٓ ①

---

(১) আলিফ, লাম, মীমঃ এ হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় 'হরূফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। ঊনত্রিশটি সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের হরূফে মুকাত্তা'আত ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা ১৪টি। একত্র করলে দাঁড়ায়: نَصٌّ حَكِيْمٌ قَاطِعٌ لَهُ سِرٌّ "প্রাজ্ঞ সত্ত্বার পক্ষ থেকে অকাট্য বাণী যাতে তার কোন গোপন ভেদ রয়েছে"। মূলতঃ এগুলো কতগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য, যথা-الٓمّٓ-حم-المص। এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন করে পড়া হয়ে থাকে। যথা-الف-لام-ميم (আলিফ্-লাম্-মীম্)। এ বর্ণগুলো তাদের নিকট প্রচলিত ভাষার বর্ণমালা হতে গৃহীত। যা দিয়ে তারা কথা বলে এবং শব্দ তৈরী করে। কিন্তু কি অর্থে এবং এসব আয়াত বর্ণনার কি রহস্য রয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে চারটি:

১) এগুলোর কোন অর্থ নেই, কেবলমাত্র আরবী বর্ণমালার হরফ হিসেবে এগুলো পরিচিত।

২) এগুলোর অর্থ আছে কিনা তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, আমরা এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা শুধুমাত্র তিলাওয়াত করবো।

৩) এগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, কারণ কুরআনের কোন বিষয় বা কোন আয়াত বা শব্দ অর্থহীনভাবে নাযিল করা হয়নি। কিন্তু এগুলোর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অন্য কেউ এ আয়াতসমূহের অর্থ জানেনা, যদি কেউ এর কোন অর্থ নিয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণভাবে ভুল হবে। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনের কোন অংশ অনর্থক নাযিল করেননি।

৪) এগুলো 'মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এ হিসাবে অধিকাংশ সাহাবী,

তাবেয়ী ও ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরুফে মুকাত্তা'আতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার প্রকৃত মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু 'মুতাশাবিহাত' আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে থাকলেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলো থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার জন্য এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্র নামের তত্ত্ব বিশেষ। আবার অনেকে এগুলোর স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করেছেন। যেমন আলেমগণ الم এ আয়াতটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেনঃ

(৫) এখানে আলিফ দ্বারা আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ যা মুখের শেষাংশ থেকে উচ্চারিত হয়, লাম বর্ণটি মুখের মধ্য ভাগ থেকে, আর মীম বর্ণটি মুখের প্রথম থেকে উচ্চারিত হয়, এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে এ কুরআনের শব্দগুলো তোমাদের মুখ থেকেই বের হয়, কিন্তু এগুলোর মত কোন বাক্য আনতে তোমাদের সামর্থ্য নেই।

(৬) এগুলো হলো শপথ বাক্য। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো দিয়ে শপথ করেছেন।

(৭) এগুলো কুরআনের ভূমিকা বা চাবির মত যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনকে শুরু করেন।

(৮) এগুলো কুরআনের নামসমূহ হতে একটি নাম।

(৯) এগুলো আল্লাহ্র নামসমূহের একটি নাম ।

(১০) এখানে আলিফ দ্বারা أنا (আমি) আর লাম দ্বারা আল্লাহ্ এবং মীম দ্বারা أَعْلَمُ (আমি বেশী জানি), অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ এর অর্থ বেশী জানি।

(১১) আলিফ দ্বারা আল্লাহ্, লাম দ্বারা জিবরীল, আর মীম দ্বারা মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর ও আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১২) এভাবে এ আয়াতের আরও অনেকগুলো অর্থ করা হয়েছে। তবে আলেমগণ এসব আয়াতের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করলেও এর কোন একটিকেও অকাট্যভাবে এগুলোর অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি। এগুলো উল্লেখের একমাত্র কারণ আরবদেরকে অনুরূপ রচনার ক্ষেত্রে অক্ষম ও অপারগ করে দেয়া। কারণ এ বর্ণগুলো তাদের ব্যবহৃত ভাষার বর্ণমালা এবং তারা যা দিয়ে কথা বলে থাকে ও শব্দ তৈরী করে থাকে, তা থেকে নেয়া হয়েছে।

(১৩) মোটকথা, এ শব্দ দ্বারা আমরা বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো লাভ করতে পারি, যদিও এর মধ্যকার কোন্ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা জানি না। তবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝার উপর নির্ভরশীল নয়। অথবা, এ হরফগুলোর মানে না বুঝলে কোন ব্যক্তির সরল-সোজা পথ লাভের মধ্যে গলদ থেকে যাবে এমন কোন কথাও নেই। তাই এর অর্থ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে অনুসন্ধান করার অতবেশী প্রয়োজনও নেই।

২. এটা[১] সে কিতাব; যাতে কোন সন্দেহ নেই[২], মুত্তাকীদের

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

(১) এখানে ذلك শব্দের অর্থ - ঐটা, সাধারণতঃ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে ذلك দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ থেকে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছেঃ

১) ذلك শব্দের অর্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল বুঝানো হয়েছে, তখন তার অর্থ হবেঃ হে মুহাম্মাদ! (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কিতাব যা আমি তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ করেছিলাম, তা-ই আপনার উপর নাযিল করেছি। অথবা, হে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমাদেরকে যে কিতাবের ওয়াদা আমি তোমাদের কিতাবে করেছি সেটা এই কিতাব যা আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল করেছি।

২) এখানে ذلك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ আয়াতসমূহের পূর্বে মক্কা ও মদীনায় নাযিল কুরআনের অন্যান্য সূরা ও আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা। আর যেহেতু সেগুলো আগেই গত হয়েছে, সেহেতু ذلك দ্বারা সম্বোধন শুদ্ধ হয়েছে।

৩) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে কিতাব বলতে ঐ কিতাবকে বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত।

৪) এখানে কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ভাল-মন্দ, রিয্‌ক, আয়ূ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৫) এখানে ঐ কিতাব বুঝানো হয়েছে যা তিনি নিজে লিখে রেখেছেন তাঁর কাছে আরশের উপর, যেখানে লেখা আছে, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে"। [বুখারী: ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১]

৬) الم দ্বারা যদি পবিত্র কুরআন বুঝানো হয়ে থাকে, অর্থাৎ الم কুরআনের নাম হয়ে থাকে, তাহলে ذلك الكتاب দ্বারা الم বুঝানো হয়েছে।

৭) এখানে ذلك দ্বারা هذا বুঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ এই কিতাব যার আলোচনা হচ্ছে, বা সামনে আসছে। সুতরাং এর দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ শেষোক্ত মতই সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ। সুতরাং الكتاب দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে।

(২) এ আয়াতে উল্লেখিত ريب শব্দের অর্থ এমন সন্দেহ যা অস্বস্তিকর। এ আয়াতের বর্ণনায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত পোষন করেছেনঃ

১) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

২) তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহ করো না। [ইবনে কাসীর]

৩) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এর অর্থ তোমরা এ কুরআনের মধ্যে কোন সন্দেহে নিপতিত হবে না। অর্থাৎ এর সবকিছু স্পষ্ট।

৪) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ যদি কিতাব দ্বারা ঐ কিতাব উদ্দেশ্য হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ভালমন্দ হওয়া লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তাহলে لا ريب দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন নেই।

জন্য[১] হেদায়াত,

৩. যারা গায়েবের[২] প্রতি ঈমান

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

(১) 'মুত্তাকীন' শব্দটি 'মুত্তাকী'-এর বহুবচন। মুত্তাকী শব্দের মূল ধাতু 'তাকওয়া'। তাকওয়া হলো, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা বিধান করা। শরী'আতের পরিভাষায় তাকওয়া হলো, বান্দা যেন আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, আর তা করতে হলে যা করতে হবে তা হলো, তাঁর নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নেয়া, এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তুকে পুরোপুরি ত্যাগ করা। আর মুত্তাকী হলেন, যিনি আল্লাহ্‌র আদেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে এবং তাঁর নিষেধ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। [ইবনে কাসীর] বর্ণিত আছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। উবাই বললেন, কিভাবে চলেছেন? উমর বললেন, কাপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। উবাই বললেনঃ এটাই হলো, তাকওয়া। [ইবনে কাসীর]
তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, মুত্তাকীগণকে কেন হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন? এ ব্যাপারে আলেমগণ বলেন, মূলতঃ মুত্তাকীরাই আল্লাহ্‌র কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে পারেন, অন্যান্য যারা মুত্তাকী নন তারা হেদায়াত লাভ করতে পারেন না। যদিও কুরআন তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। আর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এ অর্থের উপর প্রমাণবহ। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম তথা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ কুরআন তাদের জন্য হিদায়াত যারা হেদায়াত চেনার পর তা গ্রহণ না করার শাস্তির ভয়ে সদা কম্পমান। আর তারা তাঁর কাছ থেকে যা এসেছে তার সত্যায়নের মাধ্যমে রহমতের আশাবাদী। [তাফসীরে ইবনে কাসীর ও আত-তাফসীরুস সহীহ] তাছাড়া হিদায়াতের কোন শেষ নেই, মুত্তাকীরা সর্বদা আল্লাহ্‌র নাযিল করা হেদায়াতের মুখাপেক্ষী বিধায় হেদায়াতকে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে অন্যান্য আয়াতে কুরআনকে সমস্ত মানবজাতির জন্য হেদায়াতকারী বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানে এর অর্থ হলো, হিদায়াতের পথ তাদের দেখাতে পারে যদি তারা তা থেকে হিদায়াত নিতে চায়।

(২) غيب এর অর্থ হচ্ছে এমনসব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না, ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না। কুরআনে غيب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর সংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে

আনে(১),	সালাত	কায়েম	وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। এখানে غيب শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা, কেয়ামত এবং কেয়ামতে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশ্‌তাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আর এ সূরারই শেষে ২৮৫ নং আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

(১) ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দু'টির অর্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'কোন বিষয়ের স্বীকৃতি দেয়া'। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ঈমান বলতে বুঝায়, কোন বিষয়ে মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা এবং তা কাজে পরিণত করা। এখানে ঈমানের তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমতঃ অন্তরে অকপট চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। দ্বিতীয়তঃ সে বিষয়ের স্বীকৃতি মুখে দেয়া। তৃতীয়তঃ কর্মকাণ্ডে তার বাস্তবায়ন করা। শুধু বিশ্বাসের নামই ঈমান নয়। কেননা খোদ ইব্‌লিস, ফির'আউন এবং অনেক কাফেরও মনে মনে বিশ্বাস করত। কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। তদ্রূপ শুধু মুখে স্বীকৃতির নামও ঈমান নয়। কারণ মুনাফেকরা মুখে স্বীকৃতি দিত। বরং ঈমান হচ্ছে জানা ও মানার নাম। বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং কার্যে পরিণত করা -এ তিনটির সমষ্টির নাম ঈমান। তাছাড়া ঈমান বাড়ে ও কমে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঈমান বিল-গায়েব অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হেদায়াত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহ্‌লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। [ইবনে কাসীর]

'ঈমান বিল গায়েব' সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'গায়েবের বিষয়াদির উপর ঈমান আনার চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারও হতে পারে না। তারপর তিনি এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সাথে জিহাদ করেছি, আমাদের থেকে উত্তম কি কেউ আছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, তারা তোমাদের পরে এমন একটি জাতি, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান আনবে' [সুনান দারমী: ২/৩০৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৮৫] মূলতঃ এটি 'ঈমান বিল গায়েব' এর একটি উদাহরণ। সাহাবা, তাবে'য়ীনদের

করে[১] এবং তাদেরকে আমরা যা দান

থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় ঈমান বিল গায়েবের বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, কুরআন। আবার কেউ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ:৯৯] এ সবগুলোই ঈমান বিল গায়েবের উদাহরণ। ঈমানের ছয়টি রুকন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ঈমান বিল গায়েবের মূল অংশ।

(১) 'সালাত'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা বা দো'আ। শরী'আতের পরিভাষায় সে বিশেষ 'ইবাদাত, যা আমাদের নিকট 'নামায' হিসেবে পরিচিত। কুরআনুল কারীমে যতবার সালাতের তাকীদ দেয়া হয়েছে - সাধারণতঃ 'ইকামত' শব্দের দ্বারাই দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়ের কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এ জন্য 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। 'ইকামত' এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি, দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য 'ইকামত' স্থায়ী ও স্থিতিশীল অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় 'ইকামাতুস সালাত' অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে সালাত আদায় করা। শুধু সালাত আদায় করাকে 'ইকামাতুস সালাত' বলা হয় না। সালাতের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই 'ইকামাতুস সালাত' (সালাত প্রতিষ্ঠা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কুরআনুল কারীমে আছে - 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে'। [সূরা আল-আনকাবূত:৪৫] বস্তুত: সালাতের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন সালাত উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অনেক সালাত আদায়কারীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা সালাত আদায় করেছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। সুতরাং সালাতকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হবে। 'ইক্বামত' অর্থে সালাতে সকল ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। তাছাড়া সময়মত আদায় করা। সালাতের রুকু, সাজদাহ, তিলাওয়াত, খুশু, খুযু ঠিক রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবনে কাসীর] ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল প্রভৃতি সকল সালাতের জন্য একই শর্ত। এক কথায় সালাতে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরী'আতের নিয়মানুযায়ী আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইক্বামতে সালাত। তন্মধ্যে রয়েছে - জামা'আতের মাধ্যমে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। আর তা বাস্তাবায়নের জন্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার তদারকির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী কল্যাণ-রাষ্ট্রের যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তার মধ্যে সালাত কায়েম করাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের অন্যতম কর্ম বলে ঘোষণা

করেছি তা থেকে ব্যয় করে(১)।

৪. আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে(২), আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী(৩)।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ④

করে বলেনঃ "যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৪১]

(১) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-সদকা প্রভৃতি যা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে। [তাফসীর তাবারী] কুরআনে সাধারণত 'ইনফাক' নফল দান-সদকার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে 'যাকাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে গায়েবের উপর ঈমান, এরপর সালাত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) এখানে মুত্তাকীদের এমন আরও কতিপয় গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যাতে ঈমান বিল গায়েব এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরও একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুমিন ও মুত্তাকী দুই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন, এক শ্রেণী তারা যারা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য শ্রেণী হলেন যারা প্রথমে আহ্‌লে-কিতাব ইয়াহূদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতে কুরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবেন। [দেখুন, বুখারী: ৩০১১, মুসলিম: ১৫৪] প্রথমতঃ কুরআনের প্রতি ঈমান এবং আমলের জন্য, দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে, কুরআনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কুরআন নাযিল হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্‌কাম এবং পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে, তাই এখন আমল একমাত্র কুরআনের আদেশানুযায়ীই করতে হবে। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

(৩) এ আয়াতে মুত্তাকীগণের আরেকটি গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস বা দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য সেগুলোর

মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়। ইসলামী বিশ্বাসগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস, যা দুনিয়ার রূপই পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারীগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় এ আক্বীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকুও আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধারূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করে না, এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুস্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা অসামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি কোন আইনেরও নেই, এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের দাঁত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যকটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না। প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকারভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাংখা পর্যন্ত এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সংগে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের

৫. তারাই তাদের রব-এর নির্দেশিত হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম(১) ।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত। এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে يُؤْمِنُونَ শব্দ ব্যবহার না করে يُوقِنُونَ ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াক্বীন অর্থ দৃঢ় প্রত্যয়। যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতি এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কেই হতে পারে। এ দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব নির্ধারণে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সবর হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক, আর ইয়াক্বীন হচ্ছে পূর্ণ ঈমান" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৬]
মুত্তাকীদের এই গুণ আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান এবং সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরী'আত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরী'আতের বিচারে তাকে মুমিনও বলা হয়, কিন্তু কুরআন যে ইয়াক্বীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াক্বীন থাকতে পারে না। আর সে কুরআনী ইয়াক্বীনই মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়াত এবং সফলতার সে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

(১) যারা মুত্তাকী তারাই সফলকাম। এখানে মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণনা করার পরে হিদায়াতের জন্য তাদেরকে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তারাই তাদের রব-এর দেয়া হিদায়াত পাবে এবং তারাই সফলকাম হবে। আল্লাহ্‌র এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে। বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি, সাফল্য ও ব্যর্থতা আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহ্‌র শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্‌রে যাবে, সে-ই হচ্ছে সফলকাম। আর সেখানে যে উত্‌রোবে না, সে ব্যর্থ।
সূরা আল-বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হিদায়াত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হিদায়াতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাদেরকে কুরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হিদায়াতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কুরআনকে অস্বীকার করে

৬. যারা কুফরী[১] করেছে আপনি | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ

বিরুদ্ধাচারণের পথ অবলম্বন করেছে। কুরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলিমদের নিকট বলে, আমরা মুসলিম; কুরআনের হিদায়াত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর বা অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলিমদের ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কুরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনরটি আয়াত যারা কুরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ ও ৭নং আয়াতে যারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতই মুনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-বাকারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হিদায়াতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছেন যে, এর উৎস হচ্ছে তাঁর কিতাব এই কুরআন; অপরদিকে সৃষ্টিজগতকে এ হিদায়াত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মু'মিন-মুত্তাকী বলেছেন, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফেক বলেছেন। কুরআনের এ শিক্ষা থেকে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) কাফের শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী, কাফের শব্দটি মুমিন শব্দের বিপরীত। বিভিন্ন কারণে কেউ কাফের হয়, তন্মধ্যে বিশেষ করে ঈমানের ছয়টি রুকনের কোন একটির প্রতি ঈমান না থাকলে সে নিঃসন্দেহে কাফের। এ ছাড়াও ইসলামের আরকানসমূহও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলেও সে কাফের হবে। অনুরূপভাবে কেউ দ্বীনের এমন কোন আহকামকে অস্বীকার করলেও কাফের বলে বিবেচিত হবে যা দ্বীনের বিধিবিধান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আয়াত ও হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা কুফরীকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। বড় কুফর, ছোট কুফর। **প্রথমতঃ** বড় কুফ্‌র। আর তা পাঁচ প্রকারঃ

১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাথে সম্পৃক্ত কুফ্‌র। আর তা হল রাসূলগণের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করা। অতএব তারা যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তাতে যে ব্যক্তি তাদেরকে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে মিথ্যা সাব্যস্ত করল, সে কুফ্‌রী করল। এর দলীল হল আল্লাহ্‌র বাণীঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার কাছে সত্যের আগমণ হলে তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার

অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামেই কি কাফিরদের আবাস নয়"? [সূরা আল-'আন্‌কাবূতঃ ৬৮]

২) অস্বীকার ও অহংকারের মাধ্যমে কুফ্‌রঃ এটা এভাবে হয় যে, রাসূলের সত্যতা এবং তিনি যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা, কিন্তু অহংকার ও হিংসাবশতঃ তাঁর হুকুম না মানা এবং তাঁর নির্দেশ না শোনা। এর দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ "যখন আমরা ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল"। [সূরা আল-বাকারাহ্‌ঃ ৩৪]

৩) সংশয়-সন্দেহের কুফ্‌রঃ আর তা হল রাসূলগণের সত্যতা এবং তারা যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে ইতস্তত করা এবং দৃঢ় বিশ্বাস না রাখা। একে ধারণা সম্পর্কিত কুফ্‌রও বলা হয়। আর ধারণা হল একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত। এর দলীল আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ "আর নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই-ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার বন্ধু বিতর্কমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করতঃ তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাঙ্গ করেছেন পুরুষ আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ্‌ আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রবের শরীক করি না"। [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ৩৫-৩৮]

৪) বিমুখ থাকার মাধ্যমে কুফরঃ এদ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীন থেকে পরিপূর্ণভাবে বিমুখ থাকা এমনভাবে যে, স্বীয় কর্ণ, হৃদয় ও জ্ঞান দ্বারা ঐ আদর্শ থেকে দূরে থাকা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। এর দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ "কিন্তু যারা কুফ্‌রী করেছে তারা সে বিষয় থেকে বিমুখ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে"। [সূরা আল-আহকাফঃ ৩]

৫) নিফাকের মাধ্যমে কুফ্‌রঃ এদ্বারা বিশ্বাসগত নিফাক বুঝানো উদ্দেশ্য, যেমন ঈমানকে প্রকাশ করে গোপনে কুফর লালন করা। এর দলীল আল্লাহ্‌র বাণীঃ "এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না"। [সূরা আল-মুনাফিকূনঃ ৩]

দ্বিতীয়তঃ ছোট কুফ্‌র,

এ ধরনের কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে না এবং চিরতরে জাহান্নামে অবস্থান করাকেও তা অপরিহার্য করে না। এ কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধু কঠিন শাস্তির ধমক এসেছে। এ প্রকার কুফ্‌র হল নেয়ামত অস্বীকার করা। কুরআন ও সুন্নার মধ্যে বড় কুফর পর্যন্ত পৌঁছে না এ রকম যত কুফরের উল্লেখ এসেছে, তার সবই এ প্রকারের অন্তর্গত। এর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ "আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন

তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন[১], | أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

এমন এক জনপদের যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে তার প্রচুর জীবিকা আসত। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ্ সে জনপদকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদন"। [সূরা আন-নাহ্‌লঃ ১১২] এখানে অনুগ্রহ অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়েছে, যা ছোট কুফর। [আল-ওয়াজিবাতুল মুতাহাত্তিমাতু]

(১) আয়াতে ব্যবহৃত 'ইনযার' শব্দের অর্থ, এমন সংবাদ দেয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। এর বিপরীত শব্দ হলো, 'ইবশার' আর তা এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে 'ইনযার' বলতে ভয় প্রদর্শন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'ইনযার' বলা হয় না, বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বুঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। 'নাযীর' বা ভয়-প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই নবী-রাসূলগণকে খাসভাবে 'নাযীর' বলা হয়। কেননা, তারা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, যারা দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী-অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরীর উপর দৃঢ় হয়ে আছে, অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো আখেরাতে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায়। এ আয়াত থেকে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধনের চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কুরআনে কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

তারা ঈমান আনবে না[১]।

৭. আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহ ও তাদের শ্রবনশক্তির উপর মোহর করে দিয়েছেন[২], এবং তাদের দৃষ্টির উপর

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মানুষই ঈমান আনুক এবং তার অনুসরণ করে হিদায়াত প্রাপ্ত হউক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে এটা জানিয়ে দিলেন যে, ঈমান আনা ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। পূর্বে যার জন্য সৌভাগ্য লিখা হয়েছে সেই ঈমান আনবে। আর যার জন্য দূর্ভাগ্য লিখা হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের দ্বারা এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহ্ই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জবাব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহ্ই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে সীলমোহর মারার অর্থ হচ্ছে, যখন তারা উপরের বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে ও কানে সীলমোহর মেরে দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের কর্ম-কাণ্ডই তাদের হৃদয়সমূহকে সীলমোহর মারার উপযুক্ত করে দিয়েছে। আর এ অর্থই কুরআনের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, যথাঃ "কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে"। [সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনঃ ১৪] তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দকাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচা আকার ধারণ করেছে। ইমাম তাবারী বলেন, গোনাহ যখন কোন মনের উপর অনবরত আঘাত করতে থাকে তখন সেটা মনকে বন্ধ করে দেয়। আর যখন সেটা বন্ধ হয়ে যায় তখন সেটার উপর সীলমোহর ও টিকেট এঁটে দেয়া হয়। ফলে তাতে আর ঈমান ঢোকার কোন পথ পায় না। যেমনিভাবে কুফরী থেকে মুক্তিরও কোন সুযোগ থাকে না। আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতে বর্ণিত 'خَتَمَ' আর অন্য আয়াতে বর্ণিত 'طَبَعَ'। [ত্বাবারী] হাদীসে এসেছে, 'মানুষ যখন কোন একটি গোনাহ্র কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ পড়ার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথম অবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তাওবা না করে, আরও পাপ করতে থাকে, তবে

রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৮. আর[১] মানুষের মধ্যে এমন লোকও

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ

পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। [তিরমিযি: ৩৩৩৪, ইবনে মাজাহ: ৪২৪৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেতনা মনের ওপর বেড়াজালের কাজ করে। ফলে তা অন্তরকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু কালো আস্তরে আবৃত করে দেয়। যে অন্তর ফেতনার প্রভাব অস্বীকার করে, তা অন্তরকে শুভ্র সমুজ্জ্বল করে দেয়। ফলে কোন দিনই ফেতনা তার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু ফেতনা গ্রহণকারী সেই কালো অন্তরটি উপুড় করা কলসের মত ভালো মন্দ চেনার ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ে।' [মুসলিম: ২৩১] কাতাদাহ বলেন, তাদের উপর শয়তান ভর করেছে ফলে তারা তার অনুসরণ থেকে পিছপা হয় না। আর একারণেই আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর, শ্রবণেন্দ্রিয় ও চোখের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন। সুতরাং তারা হেদায়াত দেখবে না, শুনবে না, বুঝবে না এবং উপলব্ধি করতে পারবে না। [ইবনে কাসীর] যে ব্যক্তি কখনো দাওয়াতী কাজ করেছেন, তিনি অবশ্যই এ সীলমোহর লাগার অবস্থার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। আপনার উপস্থাপিত পথ যাচাই করার পর কোন ব্যক্তি একবার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন উল্টোপথে তার মন-মানস এমনভাবে দৌড়াতে থাকে যার ফলে আপনার কোন কথা তার আর বোধগম্য হয় না। আপনার দাওয়াতের জন্য তার কান হয়ে যায় বধির। আপনার কার্যপদ্ধতির গুণাবলী দেখার ব্যাপারে তার চোখ হয়ে যায় অন্ধ। তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, সত্যিই তার হৃদয়ের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

(১) এ আয়াত থেকে পরবর্তী ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এখানে নিফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে জানা আবশ্যক।
নিফাক অর্থঃ প্রকাশ্যে কল্যান ব্যক্ত করা আর গোপনে অকল্যান পোষণ করা। মুনাফেকী দু'প্রকারঃ ১। বিশ্বাসগত মুনাফেকী। ২। আমলগত (কার্যগত) মুনাফেকী। [তাফসীরে ইবনে কাসীর] তন্মধ্যে বিশ্বাসগত মোনাফেকী ছয় প্রকার, এর যে কোন একটা কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে জাহান্নামের সর্বশেষ স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। ১.রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার সামান্যতম অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা। ৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার সামান্যতম অংশকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা। ৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া। ৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের জয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া। আর কার্যগত মুনাফেকীঃ এ ধরণের

الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি', অথচ তারা মুমিন নয়।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

৯. আল্লাহ্ এবং মুমিনদেরকে তারা প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই নিজেরা প্রতারিত করছে, অথচ তারা তা বুঝে না[১]।

মুনাফেকী পাঁচ ভাবে হয়ে থাকেঃ এর প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটিঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে। [বুখারী: ৩৩, মুসলিম: ৫৯] অপর বর্ণনায় এসেছেঃ ঝগড়া করলে অকথ্য গালি দেয়, চুক্তিতে উপনীত হলে তার বিপরীত কাজ করে। [মুসলিম: ৫৮, নাসায়ী: ৫০২০] এ জাতীয় নিফাক দ্বারা ঈমানহারা হয় না ঠিকই কিন্তু এ জাতীয় নিফাক আকীদাগত নিফাকের মাধ্যম। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হবে এ জাতীয় নিফাক হতে নিজেকে দূরে রাখা। [আল-ওয়াজিবাতুল মুতাহাত্তিমাত]

(১) উপরোক্ত দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আছে, যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়, বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের সাথে প্রতারণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই প্রতারিত করছে না। এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও মূলতঃ প্রতারণামূলক। এটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্কে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়ত ভাবে না যে, তারা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে পারবে, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজি করার জন্যই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করছে। এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোঁকা ও প্রতারণার উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোঁকা-প্রতারণা থেকে নিরাপদ। কারও পক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হত। মুনাফিকরা ধারণা করত যে, তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও অনুরূপ আয়াত এসেছে, "যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহ্র কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভাল কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী" [সূরা আল-মুজাদালাহ: ১৮] সুতরাং তাদের ধারণা যে ভুল তা আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দিলেন।

১০. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন[১]। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী[২]।

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে যা আত্মিক ও দৈহিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমতঃ এ থেকে স্বীয় পালনকর্তার না-শোকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা - এ ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফেকদের দৈহিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিনরাত এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক ও শারীরিক ব্যাধিই বটে। তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলিমদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সবসময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে, কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে। "আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন"-এর অর্থ এই যে, তারা যেহেতু তাদের অন্তরকে ব্যাধি দিয়ে কলুষিত করেছে সেহেতু তাদের এ কলুষতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। এখানে মূলতঃ যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কারও উপর যুলুম করেন না। কেউ খারাপ পথে চলতে না চাইলে তাকে সে পথে জোর করে চলতে বাধ্য করেন না। এ কথা কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এসেছে। যেমন, সূরা আল-মায়েদার ৪৯, সূরা আল-আন'আমের ১১০, সূরা আত-তাওবাহর ১২৫, সূরা আস্-সফ্ফ -এর ৫নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের খারাপ কর্মকাণ্ডের কারণেই তাদের পরিণতি খারাপ হয়েছে। আর হিদায়াতও নসীব হয়নি।

(২) মুনাফিকদের এমন দু'টি চরিত্র ছিল যে, তারা নিজেরা মিথ্যা বলত, অপরকেও মিথ্যাবাদী বলত। [ইবনে কাসীর] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে বলেছে, "মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না'(১), তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংশোধনকারী'(২)।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ⑪

বিরত থাক"। [সূরা আল-হাজ্জ:৩০] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা ঈমান দূর করে"। [মুসনাদে আহমাদ: ১/৫]

(১) আবুল আলীয়া বলেন, 'ফাসাদ সৃষ্টি করো না' অর্থাৎ যমীনে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ো না। মুনাফিকদের ফাসাদ সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে, যমীনের বুকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও অবাধ্যতা অবলম্বন। কেননা, যে কেউ যমীনে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবে, অথবা অবাধ্যতার নির্দেশ দিবে সে অবশ্যই যমীনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করল। কারণ, আসমান ও যমীন একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) যেহেতু মুমিনদেরকে মুনাফিকদের মৌখিক ঈমান ধোঁকায় ফেলে, অতএব নিফাকের ফাসাদ সুস্পষ্ট। কেননা, তারা প্রতারণামূলক চটকদার কথা বলে মুমিনদেরকে ভুলিয়ে রাখে এবং মুমিনদের অভ্যন্তরীন কথা নিয়ে কাফের বন্ধুদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে। তারা এ ফাসাদকে মীমাংসা মনে করছে। তারা মনে করছে, আমরা মুমিন ও কাফিরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছি যেন উভয় দলের মধ্যে আপোস ও শান্তি বজায় রাখতে পারি। তারা মনে করছে, তারা মুমিন ও আহলে কিতাবদের মধ্যে আপোস-রফা চালাচ্ছে। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, মনে রেখ তারা যেটাকে আপোস বা মীমাংসা মনে করছে সেটাই আসলে ফাসাদের মূল সূত্র। কিন্তু তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে সেটাকে ফাসাদ হিসেবেই মনে করছে না। [ইবনে কাসীর] মূলত: মুনাফিকদের স্থায়ী কোন নীতি নেই। সুযোগ বুঝে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুনাফিকের উদাহরণ হলো ঐ ছাগীর ন্যায় যা দু' পাল পাঁঠা ছাগলের মাঝখানে অবস্থান করে। জৈবিক তাড়নায় সে উভয় পালের পাঁঠাদের কাছেই যাতায়াত করে। সে বুঝতে পারে না কার অনুসরণ করা দরকার।" [মুসলিম:২৭৮৪] মোটকথা: মুনাফিক ব্যক্তিত্বহীন। মহান আল্লাহ্ মুনাফিকদের এ চরিত্রের কথা ঘোষণা করে বলেন, "তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে!" [সূরা আন-নিসা: ১৪৩] কাতাদাহ বলেন, মুনাফিকের চরিত্র সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে, তাদের সবচেয়ে খারাপ চরিত্র হচ্ছে, তারা মুখে যা বলে অন্তরে তা অস্বীকার করে। আর কর্মকাণ্ডে তার বিপরীত করে। এক অবস্থায় সকালে উপনীত হয় তো অন্য অবস্থায় তার সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যা যে অবস্থায় হবে, সকাল হবে তার বিপরীত অবস্থায়। নৌকার মত নড়তে থাকে, যখনই কোন বাতাস জোরে প্রবাহিত হয়, সে বাতাসের সাথে নিজেকে প্রবাহিত করে। [আত-তাফসীরুসসহীহ]

১২. সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না[১]।

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লাকেরা ঈমান এনেছে'[২], তারা বলে, 'নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো[৩]?' সাবধান!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

---

(১) মুনাফিকরা ফেৎনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কুরআন পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজি নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

(২) এ আয়াতে মুনাফেকদের সামনে সত্যিকারের ঈমানের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, 'অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন'। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন নাযিলের যুগে তারাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তারা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের সমষ্টিগত ঈমানই ঈমানের কষ্টিপাথর। তাদের অনুসরণ করেই পরবর্তীরা ঈমানের অধিকারী হয়েছিলেন। সাহাবাদের ঈমানের মূলমন্ত্র ছিল আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, কিতাব, রাসূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য। সুতরাং তাদের মত ঈমানই সবার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(৩) সে যুগের মুনাফেকরা সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারনতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি। তাদের বোকামীর কারণেই তারা যে কঠিন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত

নিশ্চয় এরা নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

১৪. আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'(১), আর যখন তারা একান্তে তাদের শয়তানদের(২) সাথে একত্রিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করেন(৩),

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

সেটা বুঝতেই পারছে না। নিঃসন্দেহে বোকামী ও মূর্খতা যারা বুঝতেই পারে না তারা সবচেয়ে বড় বোকা। [ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াতে মুনাফেকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলিম হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের মুনাফিক কিংবা কাফের-মুশরিক ও আহলে কিতাব অথবা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলিমদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে বোকা বানাবার জন্য মিশেছি। [ইবনে কাসীর]

(২) আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জ্বিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জ্বিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে শায়াতীন বলতে মুশরিকদের বড় বড় সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সর্দাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

(৩) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বদলা নেয়ার জন্য তাদের সাথে উপহাস করেছেন'। কাফেরদের ঠাট্টা বা উপহাসের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাদের সাথে উপহাস বা ঠাট্টা করা দোষণীয় কিছু নয়। বরং এটা আল্লাহ্র এমন এক কর্মবাচক গুণ যা হওয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ্র দিকে সম্পৃক্ত করার দিক থেকে বিভিন্ন গুণাগুণ চার প্রকারঃ

১) এমন কিছু গুণ রয়েছে, যেগুলো গুণ হিসেবে পরিপূর্ণ ও উত্তম তবে কখনো কখনো এগুলো থেকে মন্দ অর্থও বুঝা যায়। এরূপ গুণসমূহ থেকে আল্লাহ্র নাম

يَعْمَهُونَ ⑮

এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ⑯

১৬. এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে[১]। কাজেই

গ্রহণ করা যাবে না। বরং গুণ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন, 'কালামুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র কথাবার্তা), 'ইরাদা' (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা) এগুলো আল্লাহ্‌র গুণ হিসেবে ব্যবহার হবে অর্থাৎ গুণ হিসেবে তাঁকে 'মুতাকাল্লেম' ও 'মুরীদ' বলা যাবে। কিন্তু এগুলো থেকে আল্লাহ্‌র নাম গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে 'মুতাকাল্লেম' ও 'মুরীদ' নাম দেয়া যাবে না। কেননা, কথাবার্তায় ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ইনসাফ-যুলুম সবকিছুই থাকে। ইচ্ছাও তদ্রূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাউকে আব্দুল মুতাকাল্লেম বা আব্দুল মুরীদ বলা যাবে না এবং আল্লাহ্‌কে ডাকার জন্য 'ইয়া মুতাকাল্লেম!' 'ইয়া মুরীদ!' বলা যাবে না।

২) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো পুরোপুরিভাবেই উত্তম গুণ। সেগুলো কোন মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এগুলো গুণ হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে এগুলো থেকে নামও গ্রহণ করা যাবে আর আল্লাহ্‌র অধিকাংশ নামও এ ধরণের গুণসমৃদ্ধ। যেমন, রাহমান, রাহীম, সামী', বাছীর ইত্যাদি। এগুলো থেকে তাঁর নাম সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জন্য দয়া, করুণা, শুনা ও দেখার গুণসমূহও সাব্যস্ত হবে।

৩) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো সাধারণতঃ উত্তম গুণ নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তা উত্তম গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতেই শুধু আল্লাহ্‌র গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন, ধোঁকা, কারসাজি, ঠাট্টা, কৌশল ইত্যাদি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করে বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ ধোঁকা দেন, ঠাট্টা করেন ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে বলা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যারা তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করে, ধোঁকাবাজি করে তাদের সাথে ঠাট্টা করেন, ধোঁকা দেন। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন অসম্মান বুঝা যায় না।

৪) এমনকিছু গুণ রয়েছে যেগুলো কোন অবস্থাতেই উত্তমগুণ নয়। যেমন, অপারগতা, দুর্বলতা, অন্ধত্ব, বধিরতা ইত্যাদি। এ জাতীয় গুণাবলী আল্লাহ্‌র জন্য কোন অবস্থাতেই সাব্যস্ত করা যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আল্লাহ্‌র উত্তম গুণের অন্তর্ভুক্ত। [মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমীন: আল-কাওলুল মুফীদ]

(১) ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ বলেন, হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কেনার অর্থ, হিদায়াত ত্যাগ করে ভ্রষ্টতা গ্রহণ করা। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, তারা ঈমান

তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়।

১৭. তাদের উপমা[১], ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ

এনেছে তারপর কুফরী করেছে। কাতাদাহ বলেন, তারা হিদায়াতের উপর ভ্রষ্টতাকে পছন্দ করে নিয়েছে। এর সমর্থনে অন্য আয়াতে এসেছে, "আর সামূদ সম্প্রদায়, আমরা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধপথে চলা পছন্দ করেছিল"। [সূরা ফুসসিলাত: ১৭] মোটকথা: তারা হিদায়াত বিমুখ হয়ে ভ্রষ্টতাকে গ্রহণ করেছে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মুনাফেকদের সম্পর্কে দু'টো উপমা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর বলেন, দু'টি উপমা দু'ধরনের মুনাফিকদের জন্য দেয়া হয়েছে। প্রথম উপমার মর্মার্থ হলোঃ মুনাফেকরা হলো এমন ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অন্ধকারে থাকার কারণে অনেক কষ্টে আগুন জ্বালিয়েছে, যার আলোতে সে ভাল-মন্দ চিনতে পেরেছে। এবং আশা করছে যে, সে এ আলো তার জন্য স্থায়ী হবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তার কাছ থেকে সে আলো নিয়ে গেলেন। ফলে সে অন্ধকারে হিমশিম খেতে লাগল। যতটুকু আলো পেয়েছিল তাও চলে গেল, কিন্তু রয়ে গেল কষ্টদায়ক আগুন। এতে সে কয়েক ধরণের অন্ধকারে পতিত হলো- রাতের অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার, বৃষ্টির অন্ধকার ও আলোর পরে হঠাৎ করে সৃষ্ট অন্ধকার। অনুরূপভাবে মুনাফেকদের অবস্থা হলো -তারা ঈমানদার থেকে ঈমানের আলো পেয়েছে। তাদের কাছে সে আলোর লেশমাত্রও ছিল না। তারপর যখন তারা সাময়িকভাবে এর দ্বারা আলোকিত ও উপকৃত হলো, পার্থিব জীবনে হত্যা থেকে নিস্কৃতি পেল, সম্পদ রক্ষা পেল ও সাময়িক নিরাপত্তা লাভ করলো। ইত্যবসরে তাদের উপর মৃত্যু এসে পড়ল। ফলে তারা সে আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলো। তাদের উপর আপতিত হলো যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা ও শাস্তি। এতে করে সে কয়েক ধরণের অন্ধকারে পতিত হলো- কবরের অন্ধকার, কুফরীর অন্ধকার, নিফাকের অন্ধকার, গোনাহ্র অন্ধকার সর্বোপরি জাহান্নামের অন্ধকার। যে অন্ধকার থেকে তার কোন মুক্তি নেই। [তাফসীর আস-সা'দী]

'আতা বলেন, এ আয়াতাংশ মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত। তারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ভালো মন্দ দেখে ও চিনে বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা তা কবুল করতে পারে না। ইবনে যায়েদ বলেন, তারা যখন ঈমান আনল, তাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলল, যেভাবে আগুন জ্বালালে চারদিক আলোকিত হয় ঠিক সেভাবে। এরপর যখন তারা কাফের হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঈমানের নূর বিলুপ্ত করে দিলেন, যেখানে আগুন নিভে গেলে আলো চলে যায়। ফলে তারা অন্ধকারে ডুবে গিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

তখন তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায়না ।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না[১] ।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ

১৯. কিংবা আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি[২] ও বিদ্যুৎ চমক ।বজ্রধ্বনিতে

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ, তারা হেদায়াত শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং তা বোঝতেও পারে না । অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা কল্যাণ শুনতে পায় না, দেখতে পায় না এবং বোঝতেও পারে না । সুতরাং তারা হেদায়াতের দিকে ফিরে আসবে না, কল্যাণের দিকেও নয় । ফলে তারা যেটার উপর রয়েছে সেটার উপরই থাকবে । সুতরাং নাজাত বা মুক্তি তাদের নসীবে জুটবে না । কাতাদাহ বলেন, তারা তাওবাহ করবে না এবং উপদেশও গ্রহণ করবে না । [আত-তাফসীরুস সহীহ]
আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ । কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের বধির, বোবা ও অন্ধ হওয়ার অর্থ তারা তাদের এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে না । মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; অতঃপর তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; যখন তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল । আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল" [সূরা আল-আহকাফ: ২৬] [আদওয়াউল বয়ান]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াহূদীরা জিজ্ঞেস করলো যে رَعْدٌ কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ্র ফেরেশতাদের মধ্য হতে এক ফেরেশতা । যাকে মেঘ-মালা সঞ্চালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । তার হাতে আগুনের চাবুক । সে এটা দিয়ে মেঘকে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ হয় সেখানে ধমকিয়ে ও হাঁকিয়ে নিয়ে যায় । তারা বলল, তাহলে যে আওয়াজ শুনা যায় সেটা কি? তিনি বললেন, সেটা তার গর্জন । তারা বলল: আপনি সত্য বলেছেন । [তিরমিযী: ৩১১৭, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭৪]
ইবনে কাসীর বলেন, আয়াতে ظُلُمٰتٌ বা 'অন্ধকার' বলে তাদের সংশয়, অবিশ্বাস, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও নিফাক বোঝানো হয়েছে । আর رَعْدٌ বা বজ্রধ্বনি বলে এমন গর্জন বোঝানো হয়েছে, যা তাদের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে । মুনাফিকদের জন্য তা অত্যধিক শংকাগ্রস্ত ও কম্পন সৃষ্টিকারী । যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে"[সূরা আল-মুনাফিকুন: ৪]

حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন[১]।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۙ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

২০. বিদ্যুৎ চমকে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়[২]। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলে এবং যখন অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়[৩]। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে

অন্যত্র বলেন, "ওরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, ওরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ওরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে। ওরা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে ওদিকেই দ্রুত পালিয়ে যাবে।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৬-৫৭]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ কাফেরদের উপর আযাব নাযিল করবেন। সে জন্য তারা তার বেষ্টনী থেকে বের হতে পারবে না। মুজাহিদ বলেন, বেষ্টন করার অর্থ, তিনি তাদেরকে (কিয়ামতের দিন) একত্রিত করবেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে কাসীর বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফের-মুনাফিকদের সকল দিক থেকেই ঘিরে রেখেছেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, "আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত--- ফির'আউন ও সামূদের? তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত; আর আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" [সূরা আল-বুরূজ: ১৭-২০]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, এখানে بَرْقٌ বলে, কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলোকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের অকাট্য আয়াতগুলো বা হকের তীব্র আলো যেন মুনাফিকদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে চায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের সম্পর্কে যে উপমা দিচ্ছেন তার মর্মার্থ হলো- এমন ব্যক্তির উদাহরণ যে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যে পথ অতিক্রম করছে, যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অন্ধকার। রাতের আঁধার, মেঘের আঁধার এবং বৃষ্টির আঁধার। আরও রয়েছে তাতে বিকট শব্দসম্পন্ন বজ্র, বিদ্যুত চমক। এ ভীষণ অন্ধাকারে যখন বিদ্যুত চমকায় তখন সে সামনে এগোয়, আবার যখন অন্ধকারে চেয়ে যায় তখন সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। মুনাফেকদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা, যখন তারা কুরআনের আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা শোনে তখন তারা নিজেদের কানে আঙুল দেয়। কুরআনের আদেশ-নিষেধ, পুরস্কার–শাস্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কারণ এগুলো তাকে বিব্রত করে। তারা এগুলোকে এমনভাবে অপছন্দ করে যেমনিভাবে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে বজ্রের শব্দকে

তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান[১]।

অপছন্দ করে কানে আঙুল দিত। কিন্তু মুনাফেকরা যত বিব্রতই হোক তারা কোনভাবেই নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। তারা কোনভাবেই তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে না বা তাঁকে অপারগও করে দিতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ তাদের কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করে সে অনুসারে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [তাফসীর আস-সা'দী]

ইবনে কাসীর বলেন, এই দ্বিতীয় উপমা সেই মুনাফিকদের জন্য যাদের কাছে সত্য কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবার কখনো তারা সন্দেহে পতিত হয়। সন্দেহের সময় তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃষ্টির মত। এই বৃষ্টি এখানে অন্ধকার অবস্থায়ই বর্ষিত হয়। সে অন্ধকার হচ্ছে, সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তদুপরি তারা থাকে সীমাহীন ভীতিপ্রদ অবস্থায়। সুতরাং সত্য যখন সে চিনতে পায়, তখন সে তা নিয়ে সে কথা বলে এবং এর অনুসরণও করে, কিন্তু যখন তাদের দোদুল্য মন কুফরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কেয়ামতের দিনেও তাদের অবস্থা হবে এই যে, যখন লোকদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী নূর দেয়া হবে, কেউ পাবে বহু মাইল পর্যন্ত, আবার কেউ কেউ তার চেয়েও বেশী, কেউ তার চেয়ে কম, এমনকি শেষ পর্যন্ত কেউ এতটুকু পাবে যে, কিছুক্ষণ আলোকিত হয়ে আবার তা অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা একটু গিয়েই থেমে যাবে, আবার কিছু দূর পর্যন্ত আলো পাবে, আবার তা নিবে যাবে। আবার এমন কিছু লোকও হবে যাদের আলো সম্পূর্ণভাবে নিভে যাবে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুনাফিক, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন, "সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান কর"। [সূরা আল-হাদীদঃ ১৩]

(১) উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে এ পযন্ত মানুষকে কয়েক শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. খাঁটি মুমিন। সূরা আল-বাকারার প্রথম চার আয়াতে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। দুই. খাঁটি কাফের। তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে। তিন. মুনাফিক, যারা আবার দুশ্রেণীর। প্রথম. খাঁটি মুনাফেক। আগুন জ্বালানোর উপমা দিয়ে তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়. সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান মুনাফিক। তারা কখনো ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়, কখনো কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বজ্র ও বিদ্যুতের উদাহরণ পেশ করে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দলের অবস্থা থেকে তাদের মুনাফেকী একটু নরম। এ বর্ণনার সাথে সূরা আন-নূরের ৩৫ নং আয়াতের বর্ণনার কোন কোন দিকের মিল রয়েছে।[ইবনে কাসীর]

২১. হে মানুষ[১]! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর[২] 'ইবাদাত কর যিনি

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

এর মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুমিনরা দু'ভাগে বিভক্ত। এক. সাবেকুন বা মুকাররাবুন, দুই. আসহাবুল ইয়ামীন, আবরার বা সাধারণ মুমিন। আর কাফেররা দু'ভাগে বিভক্ত: এক. অনুসৃত, বা কুফরির দিকে আহ্বানকারী কাফের দল, দুই. অনুসারী বা অনুসরণকারী সাধারণ কাফেররা। অনুরূপভাবে মুনাফিকদেরও শ্রেণী দু'টি। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিক হচ্ছে সেসব কট্টর মুনাফিক যাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে ঈমানের কিছু থাকলেও নিফাকের সব চরিত্র তাদের মধ্যে বিদ্যমান। [ইবনে কাসীর]

(১) আয়াতে উল্লেখিত 'নাস' আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের মুমিন-কাফির ও মুনাফিক এ তিন শ্রেণীই এ আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'তোমাদের রব-এর 'ইবাদাত কর'। 'ইবাদাতের আভিধানিক অর্থ নম্র ও অনুগত হওয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় 'ইবাদাত হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন এমন সব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের ব্যাপক একটি নাম'। এ সমস্ত কথা ও কাজ পরিপূর্ণ ভালবাসা ও পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র জন্য আদায় করলেই তা আমাদের পক্ষ থেকে 'ইবাদাত বলে গণ্য হবে। সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সেসব কাজ বা কথা ভালবাসেন তার বাইরে কোন কিছুর মাধ্যমে আমরা তাঁর 'ইবাদাত করতে পারব না। ইবাদাতের ভিত্তি তিনটি রুকনের উপর স্থাপিত। এক. আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভালবাসে"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৬৫] দুই. পরিপূর্ণ আশা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৭] তিন. আল্লাহ্কে পরিপূর্ণভাবে ভয় করা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং তারা তাঁর শাস্তিকে ভয় করে"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৭]

(২) এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ্' বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যেকোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, 'ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুনান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সাথে সাথে এ কথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে মানুষকে অগণিত এ নেয়ামত না পাথর-নির্মিত কোন মূর্তি

তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন[১], যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও[২]।

২২. যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنْزَلَ

দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার 'ইবাদাতের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা আদৌ 'ইবাদাতের যোগ্য নয়।

(১) এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নির্দেশ, আর সে নির্দেশই হচ্ছে তাওহীদের। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা তাওহীদ বিশ্বাস। যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়। এটি মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী।

তাওহীদ শব্দটি মাসদার বা মূলধাতু। যার অর্থ- কোন কিছুকে এক বলে জানা এবং ঘোষণা করা। সে অনুসারে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ অর্থ- আল্লাহ্ যে এক তা ঘোষণা করা। শরী'আতের পরিভাষায় তাওহীদ বলতে বুঝায় একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ই একমাত্র মা'বুদ। তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁর কোন সমকক্ষ নাই। একমাত্র তাঁর দিকেই যাবতীয় 'ইবাদাতকে সুনির্দিষ্ট করা। তাঁর যাবতীয় সুন্দর নাম ও গুণাবলী আছে বলে বিশ্বাস করা। এতে বুঝা গেল যে, তাওহীদ হলো আল্লাহ্‌কে রবুবিয়াত তথা প্রভূত্বে, তাঁর সত্তায়, নাম ও গুণে এবং 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে একক সত্তা বলে স্বীকৃতি দেয়া। তাই এ তাওহীদ বিশুদ্ধ হতে হলে এর মধ্যে তিনটি অংশ অবশ্যই থাকতে হবে - (১) আল্লাহ্‌র প্রভূত্বে ঈমান ও সে অনুসারে চলা। যা 'তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ' নামে খ্যাত। (২) আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীতে ঈমান আর সেগুলো তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা। যাকে 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত' বলা হয়। আর (৩) যাবতীয় 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট করা। যাকে 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ'ও বলা হয়। এ তিন অংশের কোন অংশ বাদ পড়লে তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা হবে না এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাবে না।

(২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করলেই তাকওয়ার অধিকারী হওয়া যাবে নতুবা নয়। যাদের কর্মকাণ্ডে শির্ক রয়েছে, তারা যত পরহেযগারী বা যত আমলই করুক না কেন তারা কখনো মুত্তাকী হতে পারবে না। তাই জীবনের যাবতীয় ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খালেসভাবে করতে হবে। এটা জানার জন্য ইবাদাত ও শির্ক সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যার আলোচনা সামনে আসবে।

مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ(১)

(১) আয়াতে উল্লেখিত أنداد শব্দটি ند এর বহুবচন। যার অর্থ সমকক্ষ স্থির করা। এখানে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ সমকক্ষ স্থির করাটাই শির্ক। আর শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ্‌। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্‌ কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি সৃষ্টি করেছেন...। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

শির্কের প্রকারভেদঃ শির্ক দু'প্রকার, যথা- বড় শির্ক ও ছোট শির্ক।

বড় শির্ক আবার দু'প্রকার। আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বে শির্ক করা। আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাত তথা 'ইবাদাতে শির্ক করা।

আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত বা প্রভূত্বে শির্ক দু'ভাবে হয়ে থাকে -

১) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার না করা যেমন কম্যুনিষ্ট, নাস্তিক, মুলহিদ ইত্যাদি সম্প্রদায়। আল্লাহ্‌র নাম, গুণ ও কর্মকাণ্ডকে স্বীকার না করা, যেমন- ঈসমা'ঈলী সম্প্রদায়, বাহাই সম্প্রদায়, বুহরা সম্প্রদায়, জাহমিয়া ও মু'তাজিলা সমপ্রদায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যে পার্থক্য না করে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক করে দেখা যেমন ওয়াহদাতুল অজুদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, যারা মনে করে যে, আল্লাহ্‌ কোন কিছুর সূরত ইখতিয়ার করে তাতে নিজেকে প্রকাশ করেন যেমন, হুলুলী সম্প্রদায় এবং যারা বিশ্বাস করে যে, কারো পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে একাকার হয়ে যাওয়া সম্ভব।

২) জগতের রব বা পালনকর্তা আল্লাহ্‌র সত্তা, নাম, গুণাবলী ও তাঁর কর্মকাণ্ডে কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা।

ক) আল্লাহ্‌র স্বত্ত্বার সমকক্ষ কোন সত্তা নির্ধারণ করার মত কোন শির্ক বনী আদমের মধ্যে বিরল। এ ধরণের দাবী প্রথম নমরূদ করেছিল, কিন্তু ইবরাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর সাথে বিতর্কে সে তার সে দাবীর সপক্ষে যুক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয়ে হেরে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে ফির'আউনও প্রকাশ্যে এ ধরণের দাবী করেছিল। আল্লাহ্‌ তাকে স্বপরিবারে দলবলসহ ধ্বংস করে তার দাবীর অসারতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

খ) আল্লাহ্‌র নামসমূহের কোন নাম অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করার মত শির্ক বিভিন্ন জাতিতে বিদ্যমান। যারাই তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহ্‌র নামের মত নাম দেয় তারাই এ ধরণের শির্কে লিপ্ত। যেমন হিন্দুগণ তাদের বিভিন্ন অবতারকে আল্লাহ্‌র নামসমূহের মত নাম দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন কোন বাতেনী গ্রুপের লোকেরা যেমন, দ্রুজ সম্প্রদায়, নুসাইরী সম্প্রদায়, আগাখানী ঈসমাঈলী সম্প্রদায় তাদের ঈমামদেরকে আল্লাহ্‌র নামসমূহে অভিহিত করে।

গ) আল্লাহ্‌র গুণ ও কর্মকাণ্ডকে অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা। আল্লাহ্‌র গুণ ও কর্মকাণ্ডের কোন শেষ নেই। সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত এবং হুকুম ও শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত।

১. আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সাথে যারা শির্ক করে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, মৃত্যু, জীবন, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার, উদ্দেশ্য হাসিলকারী বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সুফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেকে কবরবাসী কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রূপ অনেকে জাদুকর জাতীয় লোকদের সম্পর্কেও এ ধরণের বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে শি'য়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে এ ধরণের বিশ্বাস করে।
২. আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে যারা শির্ক করে থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করে। যেমন, অনেক অজ্ঞ মূর্খ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, অনেক সুফীরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে তারা গায়েব জানে। আবার অনেকে কবরবাসী কোন কোন লোক সম্পর্কে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। তদ্রূপ অনেকে গণক, জ্যোতিষ, জ্বিন, প্রেতাত্মা, ইত্যাদীতে বিশ্বাস করে যে, তারাও গায়েব জানে। অনুরূপভাবে শি'য়া সম্প্রদায়ও তাদের ইমামদের ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, তারা গায়েব জানতো।
৩. আল্লাহ্‌র শরী'আত ও হুকুমের সাথে যারা শির্ক করে থাকে তাদের উদাহরণ হলো, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ্‌র মত শরী'আত প্রবর্তনের অধিকার তাদের আলেম ও শাসকদের দিয়ে থাকে। যেমন, ঐ সমস্ত জাতি যারা সরকার বা পার্লামেন্টকে আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী আইন রচনার অনুমতি দিয়েছে। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য আইনে বিচার করা শ্রেয় বা জায়েয বা আল্লাহ্‌র আইন ও অন্যান্য আইন সমমানের মনে করে থাকে। শির্কের এ সমস্ত প্রকার আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত তথা প্রভূত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্‌র ইবাদাতে শির্কঃ আল্লাহ্‌র ইবাদাতে শির্ক বলতে বুঝায়, আল্লাহ্ যা কিছু ভালবাসেন সন্তুষ্ট হন বান্দার এমন সব কথা ও কাজ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা। যেমন আল্লাহ্ তাঁর কাছে দো'আ করা ভালবাসেন, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া ভালবাসেন, তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা ভালবাসেন, তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে বিনয়ী হওয়া ভালবাসেন, তাঁর জন্যই সিজ্‌দা, রুকু,

দাঁড় করিও না।

২৩. আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর[১] এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে[২] আহ্বান কর, যদি

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

সালাত, যবেহ, মানত ইত্যাদী ভালবাসেন। এর কোন কিছু যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করে তবে তা হবে আল্লাহ্র ইবাদাতে শির্ক। অনুরূপভাবে কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র মত ভালবাসলে, অন্য কারো কাছে পরিপূর্ণ আশা করলে, অন্য কাউকে গোপন ভয় করলেও তা শির্ক হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু বান্দার ইবাদাতসমূহ বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, সে হিসাবে ইবাদতের মধ্যেও এ তিন ধরণের শির্ক পাওয়া যায়। অর্থাৎ কখনো কখনো ইবাদত হয় মনের ইচ্ছার মাধ্যমে, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয় বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আবার কখনো কখনো তা সংঘটিত হয়ে থাকে কথাবার্তার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় প্রকার শির্ক হলোঃ ছোট শির্ক, কিন্তু তা'ও কবীরাগুনাহ হতে মারাত্মক। ছোট শির্কের উদাহরণ হলো, এ প্রকার বলা যে, কুকুর না ডাকলে চোর আসত, আপনি ও আল্লাহ্ যা চান, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা, সামান্য লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করা। ইত্যাদি। [ইবনুল কাইয়্যেম, 'আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা 'আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী'; শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আত-তামীমী, আল-ওয়াজিবুল মুতাহাত্তিমাতুল মা'রিফাহ'; আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস' গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছিল। আর এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে নবুওয়ত ও রিসালাতের সত্যতা সাব্যস্ত করা হচ্ছে। [ইবনে কাসীর]

(২) شُهَدَاء শব্দের ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, أَعْوَانُكُمْ বা সাহায্যকারীগণ। অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় আহ্বান কর যারা তোমাদেরকে এ ব্যপারে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে। আবু মালেক বলেন, এর অর্থ, شُرَكَاءُكُمْ তোমাদের অংশীদারদেরকে বা যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরীক করছ সে শরীকদেরকে আহ্বান করে দেখ তারা কি এর অনুরূপ কোন সূরা আনতে পারে কি না? মুজাহিদ বলেন, شُهَدَاء শব্দটি এখানে সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন লোকদের আহ্বান করে নিয়ে আস যারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য হবে যে, আল্লাহ্র কালামের বিপরীতে যা নিয়ে আসবে তা আল্লাহ্র

তোমরা সত্যবাদী হও[১]।

কালামের মত হয়েছে। ভাষাবিদদের সাক্ষ্য এর সাথে যোগ করে দাও। পবিত্র কুরআনে এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন স্থানে এসেছে। মক্কী সূরায়ও এমন চ্যালেঞ্জ এসেছিল। বলা হয়েছে, "এ কুরআন আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সমর্থক এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তারা কি বলে, 'তিনি এটা রচনা করেছেন?' বলুন, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" [সূরা ইউনুসঃ ৩৭-৩৮] তারপর মদীনায় নাযিল হওয়া সূরাসমূহেও এ ধরনের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-বাকারাহ এর আলোচ্য আয়াত। [ইবনে কাসীর]

(১) কুরআন নিয়ে যারাই গবেষণা করেছেন, তারা একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর ভাষাগত বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত আত্মিক স্বরূপ উভয় দিক দিয়েই এটা অতুলনীয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের কাছ থেকে; এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত"। [সূরা হূদঃ ১] সুতরাং কুরআনের ভাষা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও তার মর্ম সূদুরপ্রসারী ও ব্যাপক। ভাব ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই তা অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। সব সৃষ্টিজগত তার সমকক্ষতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তাতে একদিকে যেমন অতীতের ইতিহাস উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীও সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। ন্যায় অন্যায় ও ভালো মন্দ সম্পর্কিত সব কিছুই সুনিপুণভাবে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। [সূরা আল-আন'আমঃ ১১৫] অর্থাৎ যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত। আর যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন বিধানদাতা হিসেবে সেগুলোর ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রতিটি বিষয়ই সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি ও পথের দিশারী। এতে কোন ধারণাপ্রসূত কথা, রূপকথা কিংবা কাল্পনিক গালগল্প ও মিথ্যাচার যা সাধারণত কবিদের কাব্যে পাওয়া যায়, এতে এর বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও নেই।

কুরআনের মজীদের পুরোটাই হচ্ছে উচ্চাঙ্গের কথামালা। অনন্য ভাষাশৈলীতা এবং হৃদয়স্পর্শী উপমায় ভরপুর। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরাই কেবল কুরআনের ভাষারীতি ও ভাব সম্পদের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম। কুরআন যখন কোন খবর প্রকাশ করে, হোক তা বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত, আবার তা যদি একবারের জায়গায় বারবারও বলা হয়, তথাপি তার স্বাদ ও মাধুর্যে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। যতই পাঠ করবে ততই যেন অজানা এক স্বাদে মন উত্তরোত্তর উদ্বেলিত হয়েই চলবে। তার বারবার পাঠ করলে যেমন সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তেমনি অসাধারণ পাঠকরাও অনাগ্রহ প্রকাশ করেন না। আল-কুরআনের ভীতি

২৪. অতএব যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনই তা করতে পারবে না[১], তাহলে তোমরা সে আগুন

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

প্রদর্শনমূলক আয়াত ও কঠোর সতর্কবাণী ভালো করে অনুধাবন করলে কঠিন মানুষ তো দূরের কথা পাহাড় পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে থাকে।
অনুরূপভাবে তার আশ্বাসবাণী ও পুরস্কার বিবরণ দেখলে ও হৃদয়ঙ্গম করলে অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়, অবরুদ্ধ শ্রবণশক্তি প্রত্যাশার পদ-ধ্বনি শুনতে পায়। আর মৃত মন ইসলামের অমিত শরবত পানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এসব কিছু মিলে অজান্তে হৃদয়ে শান্তিধাম জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর মহান আল্লাহ্‌র আরশের কাছে থাকার তীব্র আকাংখা জাগ্রত হয়। এ কুরআনের বিষয় বৈচিত্র আশ্চর্যজনক। ভাষার অলংকারের ঔজ্জ্বল্য, নসীহতের প্রাচুর্য, হাজারো যুক্তি প্রমাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের আধিক্য কুরআনকে গ্রন্থ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। বিধিনিষেধের বাণীসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর, আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক প্রাচীন মনীষী বলেছেন, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ﴾ শোনার সাথে সাথে মনোযোগের সাথে কান পেতে পরবর্তী বক্তব্য শোন। কারণ, তারপর হয়ত কোন কল্যাণের পথে আহ্বান থাকবে, না হয় কোন অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ঘোষিত হবে। [ইবন কাসীর]
আর যদি আল-কুরআনে কিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ চিত্র, চির সুখের জান্নাতের নেয়ামতরাজী, জাহান্নামের চিরন্তন দূর্ভোগের বিবরণ, নেককারদের লোভনীয় পুরস্কার আর গুনাহগারদের নানা রকম ভয়াবহ শাস্তি, দুনিয়ার সম্পদ ও সুখ সম্ভোগের অসারতা ও পারলৌকিক জীবনের সুখ সম্ভোগের অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত আলোচনার দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় তবে তা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও কল্যাণমূলক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এসব বর্ণনা মানুষকে বার বার ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করে, মনকে ভয়ে বিগলিত করে এবং শয়তানের প্ররোচণায় জমানো অন্তরের কালি ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। আল- কুরআনের এ ধরনের অবিস্মরণীয় ও আশ্চর্যজনক মু'জিযার কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষের ঈমান আনার জন্য প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী হচ্ছে আমার মু'জিযা। আমি আশা করি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হবে।" [বুখারী: ৪৯৮১, মুসলিম: ১৫২] কারণ, প্রত্যেক নবীর মু'জিযা তাদের ইন্তেকালের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কুরআনুল কারীম কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বর্তমান থাকবে। সর্বকালের মানুষের কাছে অবিসংবাদিত হিসেবে থাকবে। [ইবনে কাসীর]

(১) এটা কুরআনের বিশেষ মু'জিযা। একমাত্র কুরআনই নিঃসংকোচে সর্বকালের জন্য নিজ স্বীকৃত সত্তার এভাবে ঘোষণা দিতে পারে। যেভাবে রাসূলের যুগে কেউ এ কুরআনের মত আনতে পারে নি। তেমনি কুরআন এ ঘোষণাও নিঃশঙ্ক ও নিঃসংকোচে দিতে পেরেছে যে, যুগের পর যুগের জন্য, কালের পর কালের জন্য এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া

থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর[1], যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে[2] কাফেরদের জন্য ।

হচ্ছে যে, এ কুরআনের মত কোন কিতাব কেউ কোন দিন আনতে পারবে না । অনুরূপই ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে । রাসূলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এ কুরআনের মত কিছু আনার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি । আর কোনদিন পারবেও না । গোটা বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর কথার সমকক্ষ কোন কথা কি কোন সৃষ্টির পক্ষে আনা সম্ভব?

(১) ইবনে কাসীর বলেন, এখানে 'পাথর' দ্বারা কালো গন্ধক পাথর বোঝানো হয়েছে । গন্ধক দিয়ে আগুন জ্বালালে তার তাপ ভীষণ ও স্থায়ী হয় । আসমান যমীন সৃষ্টির সময়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য তা সৃষ্টি করে প্রথম আসমানে রেখে দিয়েছেন । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে ঐ সমস্ত পাথর উদ্দেশ্য, যেগুলোর ইবাদাত করা হয়েছে । [ইবনে কাসীর] আর জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ । সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ এক ভাগ দিয়ে শাস্তি দিলেই তো যথেষ্ট হতো । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের আগুনের তুলনায় ঊনসত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত ।" [বুখারীঃ ৩২৬৫, মুসলিমঃ ২৪৮৩]

(২) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছে, জাহান্নাম কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে । এখানে أُعِدَّتْ এর সর্বনামটির ইঙ্গিত সুস্পষ্টতই মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্বলিত জাহান্নামের দিকে । অবশ্য এ সর্বনামটি পাথরের ক্ষেত্রেও হতে পারে । তখন অর্থ দাঁড়ায়, পাথরগুলো কাফেরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে । ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে উভয় অর্থের মধ্যে বড় ধরনের কোন তফাৎ নেই । একটি অপরটির পরিপূরক ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আগুন বিহীন যেমন পাথর জ্বলে না, তেমনি পাথর বিহীন আগুনের দাহ্য ক্ষমতাও বাড়ে না । সুতরাং উভয় উপাদানই কাফেরদের কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।

আয়াতের এ অংশ দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ দলীল নেন যে, জাহান্নাম বর্তমানে তৈরী করা অবস্থায় আছে । জাহান্নাম যে বাস্তবিকই বর্তমানে রয়েছে তার প্রমাণ অনেক হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় । যেমন, জাহান্নাম ও জান্নাতের বিবাদের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীস [বুখারীঃ ৪৮৪৯, মুসলিমঃ ২৮৪৬] , জাহান্নামের প্রার্থনা মোতাবেক তাকে বছরে শীত ও গ্রীষ্মে দুই বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি প্রদানের বর্ণনা [বুখারীঃ ৫৩৭, মুসলিমঃ ৬৩৭] ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক হাদীসে আছে, "আমরা একটি বিকট শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, এটা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথর জাহান্নামে পতিত হওয়ার আওয়ায ।" [মুসলিমঃ ২৮৪৪, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৭১] তাছাড়া সূর্যগ্রহণের

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত(১)। যখনই তাদেরকে ফলমুল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হত এতো তাই'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করেই(২) এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী(৩)। আর তারা সেখানে স্থায়ী

সালাত এবং মিরাজের রাত্রির ঘটনাবলীও প্রমাণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই তৈরী করে রাখা হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(১) 'জান্নাতের তলদেশে নদী প্রবাহিত' বলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, এর গাছের নীচ দিয়ে ও এর কামরাসমূহের নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতের নদী-নালাসমূহ মিশকের পাহাড় থেকে নির্গত। [সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭৪০৮] আনাস ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, 'জান্নাতের নহরসমূহ খাদ হয়ে প্রবাহিত হবে না' [সহীহুত তারগীব] অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাউজে কাউসারের দুই তীর লালা-মোতির গড়া বিরাট গম্বুজ বিশিষ্ট হবে। [বুখারী: ৬৫৮১] আর তার মাটি হবে মিশকের সুগন্ধে ভরপুর। তার পথে বিছানো কাঁকরগুলো হলো লাল-জহরত, পান্না-চুন্নি সদৃশ। [ইবনে কাসীর]

(২) জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন তাফসীরকারের মতে ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ জান্নাতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। অপর কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, ফলমূল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ, জান্নাতে পরিবেশিত ফল-মূলাদি দেখে জান্নাতিগণ বলবে যে, এটা তো গতকালও আমাদের দেয়া হয়েছে, তখন জান্নাতের খাদেমগণ তাদের বলবে যে, দেখতে একই রকম হলেও এর স্বাদ ভিন্ন। ইবনে আব্বাস বলেন, দুনিয়ার ফলের সংগে আখেরাতের ফল-মূলের কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে। [ইবনে কাসীর]

(৩) মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে 'যওজ', অর্থ হচ্ছে জোড়া। এ শব্দটি স্বামী বা স্ত্রী অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ'।

হবে(১)।

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না(২)। অতঃপর যারা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن

তবে আখেরাতে আযওয়াজ অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। জান্নাতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলূষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে এসেছে যে, "তাদের সংগে থাকবে আয়তনয়না, ডাগর চোখ বিশিষ্টাগণ" [সূরা আস-সাফফাত: ৪৮] আরও বলা হয়েছে, "তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল" [সূরা আর-রহমান: ৫৮] আরও এসেছে, "আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা" [সূরা আল-ওয়াকি'আ:২২-২৩] অনুরূপভাবে এসেছে, "আর সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী" [সূরা আন-নাবা: ৩৩] যদি দুনিয়ার কোন সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোন সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোন স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ, তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সৎ পুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোন স্বামী-স্ত্রী দুজনই সৎকর্মশীল হয়, তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

(১) বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয় যাতে যেকোন মূহুর্তে ধ্বংস ও বিলুপ্তির আশংকা থাকে। বরং জান্নাতবাসীগণ অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করে বিমল আনন্দ-স্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন। [ইবনে কাসীর]

(২) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মাকড়সা ও মাছি উদাহরণ পেশ করার পর মুশরিকরা বলাবলি করল যে, মাকড়সা ও মাছি কি উল্লেখযোগ্য কিছু? তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবুল আলীয়া বলেন, মশার উদাহরণ দেয়ার মধ্যে যৌক্তিকতা হচ্ছে, 'এ সমস্ত কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের যখন আয়ূ শেষ হয়ে যায় এবং সময় নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তারা মশার মত প্রাণীতে পরিণত হয়। কারণ, মশা পেট ভরলে মরে যায়, আর যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে বেঁচে থাকে। অনুরূপভাবে এ সমস্ত কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকরা যাদের জন্য উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তারাও দুনিয়ার জীবিকা শেষ

ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই এটা[১] তাদের রব-এর পক্ষ হতে সত্য। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা বলে যে, আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে এ উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে হেদায়াত করেন। আর তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকে এর দ্বারা বিভ্রান্ত করেন না[২]---

رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়[৩], তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায়

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

করার পর আল্লাহ্ শক্ত হাতে তাদের পাকড়াও করবেন এবং তাদের ধ্বংস করবেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ ঈমানদাররা নিশ্চিত জানে যে, এ উপমা প্রদান করা হক্ব বা যথাযথ। অথবা এর অর্থ, তারা জানে যে, এটা আল্লাহ্র বাণী এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হক হিসেবে তাদের কাছে এসেছে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তারা ফাসেক বা অবাধ্য হওয়াতেই তাদের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। কেউ খারাপ পথে চলতে চাইলে আল্লাহ্ তাকে সে পথে চলতে দেন।

(৩) আবুল আলীয়া বলেন, এটি মুনাফিকদের ছয়টি স্বভাবের অন্তর্গত। তারা কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে, সাথে সাথে আয়াতে বর্ণিত তিনটি কাজ, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যমীনের উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

জীবিত করবেন, তারপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২৯. তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর(১) তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ(২) করে

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ

(১) এখানে যমীন সৃষ্টির পরে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সূরা আন-নাযি'আতের ৩০ নং আয়াত বাহ্যতঃ এর বিপরীত মনে হয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা ফুসসিলাতের ১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এটা জানাই যথেষ্ট যে, সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে আসমানের আগেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার মধ্যে খাবার জাতীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেটাকে আসমান সৃষ্টির পূর্বে প্রসারিত ও সামঞ্জস্যবিধান করেন নি। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোযোগী হয়ে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেন। তারপর তিনি যমীনকে সুন্দরভাবে প্রসারিত ও বিস্তৃত করেছেন। এটাই এ আয়াত এবং সূরা আন-নাযি'আতের ৩০ নং আয়াতের মধ্যে বাহ্যতঃ উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করার আগেই যমীন সৃষ্টি করেন। যমীন সৃষ্টির পর তা থেকে এক ধোঁয়া বা বাষ্প উপরের দিকে উঠতে থাকে। আর সেটাই আল্লাহ্র বাণী: "তারপর তিনি আসমান সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করলেন এমতাবস্থায় যে, সেটা ছিল ধুম্রাকার" [সূরা ফুসসিলাত: ১১] [ইবনে কাসীর]

(২) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে اسْتَوٰى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার অর্থে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় তা তিনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে:

১) اسْتَوٰى শব্দটি যেখানে পূর্ণ ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তার পরে على বা إلى কিছুই না আসে তখন তার অর্থ হবে, সম্পূর্ণ হওয়া বা পূর্ণতা লাভ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেনঃ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ অর্থাৎ আর যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণতা লাভ করলেন। [সূরা আল-কাসাসঃ ১৪]

২) اسْتَوٰى শব্দটির সাথে যদি على আসে তখন তার অর্থ হবে - উপরে উঠা, আরোহণ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেনঃ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف:٥٤ يونس:٣ الرعد:٢ الفرقان:٥٩ السجدة:٤ ،الحديد:٤] অর্থাৎ তারপর তিনি আরশের উপর উঠলেন। অনুরূপভাবে সূরা طه তে এসেছেঃ [طه:٥] ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ অর্থাৎ দয়াময় (রহমান) আরশের উপর উঠলেন।

اسْتَوٰى শব্দটির সাথে যদি إلى আসে তখন তার অর্থ হবে - ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, মনোনিবেশ করা। আর সে অর্থই এ আয়াতে ব্যবহৃত ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ -

بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيۡمٌ ۝

সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

وَاِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۡ جَاعِلٌ فِى الۡاَرۡضِ

৩০. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদের(১) বললেন(২), 'নিশ্চয়

এর অর্থ করা হবে - আকাশ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। তবে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানেও উপরে উঠার অর্থ হবে।

শেষোক্ত দু'অবস্থায় استوى শব্দটি যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তা তাঁর একটি সিফাত বা গুণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ্‌র জন্য সে সিফাত বা গুণ কোন প্রকার অপব্যাখ্যা, পরিবর্তন, সদৃশ নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ওয়াজিব।

(১) এখানে মূল আরবী শব্দ 'মালায়িকা' হচ্ছে বহুবচন। এক বচন 'মালাক'। মালাক-এর আসল অর্থ হচ্ছে 'বাণী বাহক'। এরই শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, 'যাকে পাঠানো হয়েছে' বা ফেরেশ্‌তা। ফেরেশ্‌তা নিছক কিছু কায়াহীন, অস্তিত্বহীন শক্তির নাম নয়। বরং এরা সুস্পষ্ট কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশাবলী তারা প্রবর্তন করে থাকেন। মূর্খ লোকেরা ভুলক্রমে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও কাজ-কর্মে অংশীদার মনে করে। আবার কেউ কেউ তাদেরকে মনে করে আল্লাহ্‌র আত্মীয়। এজন্য দেবতা বানিয়ে তাদের পূজা করে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে তৈরী করা হয়েছে, জ্বিনদেরকে নির্ধুম আগুন শিখা হতে। আর আদমকে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।" [মুসলিম: ২৯৯৬] অর্থাৎ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে এমন এক মুষ্ঠি মাটি থেকে তৈরী করেছেন। যে মাটি তিনি সমস্ত যমীন থেকে নিয়েছেন। তাই আদম সন্তানরা যমীনের মতই বৈচিত্ররূপে এসেছে। তাদের মধ্যে লাল, সাদা, কালো এবং এর মাঝামাঝি ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। আর তাদের মধ্যে সহজ, পেরেশান, খারাপ ও ভাল সবরকমের সমাহার ঘটেছে।" [তিরমিযী: ২৯৫৫, আবুদাউদ: ৪৬৯৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪০০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬১, ২৬২]

(২) অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালে এ সম্পর্কে ফেরেশ্‌তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইংগিত ছিল যে, তারা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশ্‌তাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের কারণ তাদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশ্‌তাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা,

خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

আমি যমীনে খলীফা[১] সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে[২]? আর আমরা

পুণ্য ও সততা তাদের প্রকৃতিগত গুণ। তারা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃংখলা বিধানের কাজও হয়তো তারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাদের এ ধারণা যে ভুল, তা আল্লাহ্ শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকিফহাল নও। তা শুধুমাত্র আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত। অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশ্তাদের উপর আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে যে, বিশ্ব-খেলাফতের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(১) আয়াতে বর্ণিত 'খলীফা' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলছেন যে, আমি তোমাদের ছাড়া এমন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছি যারা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। ইবনে জারীর বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমি যমীনে আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে চাই, যে আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে ইনসাফের সাথে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবে। আর এ প্রতিনিধি হচ্ছে আদম এবং যারা আল্লাহ্র আনুগত্য ও আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে তার বিধান প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত হবে।

(২) এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ফেরেশতারা কিভাবে জানতে পারল যে, যমীনে বিপর্যয় হবে? এর উত্তর বিভিন্নভাবে এসেছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ যমীনে পূর্বে জ্বিনরা বাস করত। তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। [দেখুন, অনুরূপ বর্ণনা মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৮৭] ফেরেশতারা তাদের উপর কিয়াস করে একথা বলেছিলেন। আবার কারও কারও মতে, তারা মাটি থেকে আদমের সৃষ্টি দেখে বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের মধ্যে বিপর্যয় হবে। কাতাদাহ বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন যে, যমীনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে যদি কোন সৃষ্টি রাখা হয় তবে তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, রক্ত প্রবাহিত করবে। আর এজন্যই তারা বলেছিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে?' [তাবারী] তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবা থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে কিছু কথা উহ্য আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন বললেন যে, আমি যমীনে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। ফেরেশতারা বলল যে, হে আমাদের রব! সে কেমন খলীফা? আল্লাহ্ বললেন, তাদের সন্তান-সন্ততি হবে এবং তারা ঝগড়া ফাসাদ ও হিংসা বিভেদে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করবে। তখন তারা বলল, আপনি কি

আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি[১]। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জান না'[২]।

যমীনে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আল্লাহ্ বললেন, আমি তা জানি যা তোমরা জান না। [ইবনে কাসীর] ইবনে জুরাইজ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সৃষ্টির ব্যাপারে সংঘটিত সব অবস্থা বর্ণনার পর তাদেরকে আলোচনা করার অনুমতি দিলে তারা এ বক্তব্য পেশ করেন। তারা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, হে আমাদের রব! আপনি তাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কি করে তারা আপনার নাফরমান সাজবে? এমন নাফরমান জাতিকে আপনি কেন সৃষ্টি করবেন? আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে এ জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের ব্যাপারে তোমরা কিছু কথা জেনে থাকলেও অনেক কিছুই জান না। তাদের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। তাদের মধ্য থেকে অনেক অনুগত বান্দাও সৃষ্টি হবে। [ইবনে কাসীর] ইমাম তাবারী বলেন, ফেরেশতাগণ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন অজানা বিষয় জানার জন্যে। তারা যেন বললেন, হে আমাদের রব! আমাদেরকে একটু অবহিত করুন। সুতরাং এর উদ্দেশ্য অস্বীকৃতি নয়; বরং উদ্দেশ্য অবগত হওয়া। [তাবারী]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে উত্তম বাক্য কোনটি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ বাক্য যা আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তারা যা বলেছেন, সেটা হলোঃ سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী"। [মুসলিমঃ ২৭৩১]

(২) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ছিল যে, এই খলীফার মধ্য হতে নবী-রাসূল, সৎকর্মশীল বান্দা ও জান্নাতী লোক সৃষ্টি হবে। [ইবনে কাসীর] সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন ফেরেশতাগণ বান্দার আমল নিয়ে আসমানে আল্লাহর দরবারে পৌঁছেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা -সবকিছু জানা সত্ত্বেও- প্রশ্ন করেন, আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় রেখে এসেছ? তারা সবাই জবাবে বলেন, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি এবং আসার সময় সালাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি।' [বুখারীঃ ৫৫৫, মুসলিমঃ ৬৩২] কারণ তারা একদল ফজরে আসে এবং আসরে চলে যায় এবং আরেক দল আসরে আসে এবং ফজরে চলে যায়। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রাতের আমল দিনের আগেই এবং দিনের আমল রাতের আগেই পৌঁছে থাকে।" [মুসলিমঃ ১৭৯] আল্লাহ্ তা'আলা জবাব, ﴿إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ এর এটাই যথার্থ তাফসীর। [ইবনে কাসীর] মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ জানতেন যে, ইবলীস অবাধ্য হবে এবং তাকে শেষ পর্যন্ত অবাধ্যতার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। [তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, ফেরেশতাদের ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ এ বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা

৩১. আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন[১], তারপর সেগুলো[২] ফেরেশ্‌তাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

৩২. তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ বলেছেন। কেননা পুরো বক্তব্যেই বনী আদমের স্থলে তাদের পৃথিবীতে বসবাসের ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তোমরা আকাশের উপযোগী এবং আকাশে অবস্থানই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তোমরা সেটা বুঝতে পারছ না। [ইবনে কাসীর ও তাফসীরে কাবীর]

(১) অর্থাৎ আগে যে খলীফা বানানোর ঘোষণা আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আদম। সা'ঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আদমকে আদম এজন্যই নাম রাখা হয়েছে, কারণ তাকে যমীনের 'আদীম' বা চামড়া অর্থাৎ উপরিভাগ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [তাবাকাতু ইবনে সা'দ, তাবারী] আয়াত থেকে আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, আদম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কথা বলেছেন। হাদীসে এসেছে, আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আদম কি নবী ছিলেন? রাসূল বললেন, 'হ্যাঁ, যার সাথে কথা বলা হয়েছে'। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, তার মাঝে ও নূহের মাঝে ব্যবধান কেমন? রাসূল বললেন, দশ প্রজন্ম।" [ইবনে হিব্বান: ৬১৯০] প্রশ্ন হতে পারে যে, আদম আলাইহিস সালামকে কি কি নাম শিখানো হয়েছিল? কাতাদাহ বলেন, সবকিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, যেমন এটা পাহাড়, এটা সমুদ্র, এটা এই, ওটা সেই, প্রত্যেকটি বস্তুর নাম। তারপর ফেরেশতাগণের কাছে সেগুলো পেশ করে নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। [তাবারী, ইবনে কাসীর] আর তা ছিল মূলত: সমস্ত সৃষ্টিকুলের নাম এবং তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নাম। বিখ্যাত শাফা'আতের হাদীসেও এসেছে যে, "মানুষজন কিয়ামতের মাঠে যখন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করে বলবে যে, আপনি সকল মানুষের পিতা, আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সাজদাহ করিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ বা সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।" [বুখারী: ৪৪৭৬]

(২) ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, যে সমস্ত বস্তুর নাম আদমকে শিখিয়ে দিলেন সে বস্তুগুলো ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে তাদের কাছে এগুলোর নাম জানতে চাওয়া হলো। [ইবন কাসীর]

নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

৩৩. তিনি বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন'। অতঃপর তিনি (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান ও যমীনের গায়েব জানি। আরও জানি যা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন করতে'(১)।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنۡۢبِئۡهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۚ فَلَمَّآ اَنۡۢبَاَهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۙ قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ اِنِّىۡٓ اَعۡلَمُ غَيۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۙ وَاَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَمَا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজ্‌দা কর(২), তখন

وَاِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡٓا اِلَّآ اِبۡلِيۡسَ ؕ اَبٰى وَاسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿٣٤﴾

(১) কাতাদাহ ও আবুল আলীয়া বলেন, তারা যা গোপন করছিল তা হচ্ছে, আমাদের রব আল্লাহ্ তা'আলা যা-ই সৃষ্টি করুক না কেন আমরা তার থেকে বেশী জ্ঞানী ও সম্মানিত থাকব। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ] তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা যা প্রকাশ করেছিল তা হলো, "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে"। আর যা গোপন করছিল তা হচ্ছে, ইবলীস তার মনের মধ্যে যে গর্ব ও অহঙ্কার গোপন করে রাখছিল তা। [ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সিজ্‌দা করার হুকুম ফেরেশ্‌তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন এ কথা বলা হলো যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশ্‌তাই সিজ্‌দা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সিজ্‌দার নির্দেশ ইবলিসের প্রতিও ছিল। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশ্‌তাগণের উল্লেখ এ জন্য করা হলো যে, তারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন তাদেরকে আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে ইবলিস অতি উত্তম রূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল। অথবা সে যেহেতু ফেরেশতাদের দলের মধ্যেই অবস্থান করছিল তখন তাকে অবশ্যই নির্দেশ পালন করতে হত। সে নিজেকে নির্দেশের বাইরে মনে করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। শুধুমাত্র তার গর্ব ও অহঙ্কারই তাকে তা করতে বাধা দিচ্ছিল। [ইবনে কাসীর]

এ আয়াতে আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সিজ্‌দা করতে ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পিতা-মাতা ও ভাইগণ মিশর পৌঁছার পর ইউসুফকে সিজ্‌দা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

ইব্‌লিস(১) ছাড়া সকলেই সিজ্‌দা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল(২)। আর সে কাফেরদের

এটা সুস্পষ্ট যে, এ সিজ্‌দা 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের 'ইবাদাত শির্ক ও কুফরী। কোন কালে কোন শরী'আতে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না যে, প্রাচীনকালের সিজ্‌দা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মু'আনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাসসাস আহ্‌কামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শরী'আতে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সিজ্‌দা করা বৈধ ছিল। শরী'আতে মুহাম্মাদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসেবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকূ'-সিজ্‌দা এবং সালাতের মত করে হাত বেঁধে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস]

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সিজ্‌দায়ে তা'জিমী বা সম্মানসূচক সিজ্‌দার বৈধতার প্রমাণ তো কুরআনুল কারীমের উল্লেখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি? উত্তর এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক হাদীস দ্বারা সিজ্‌দায়ে তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যদি আমি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সিজ্‌দা করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে তার বৃহৎ অধিকারের কারণে সিজ্‌দা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু এই শরী'আতে সিজ্‌দায়ে-তা'জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সিজ্‌দা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৫৮]

(১) 'ইবলিস' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'চরম হতাশ'। আর পারিভাষিক অর্থে এমন একটি জ্বিনকে ইবলিস বলা হয় যে আল্লাহ্‌র হুকুমের নাফরমানী করে আদম ও আদম-সন্তানদের অনুগত ও তাদের জন্য বিজিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার ও কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ভুল পথে চলার প্রেরণা দান করার জন্য সে আল্লাহ্‌র কাছে সময় ও সুযোগ প্রার্থনা করেছিল। আসলে শয়তান ও ইবলিস মানুষের মত একটি কায়াসম্পন্ন প্রাণীসত্তা। তাছাড়া সে ফেরেশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ ভুল ধারণাও কারো না থাকা উচিত। কারণ পরবর্তী আলোচনাগুলোতে কুরআন নিজেই তার জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকার এবং ফেরেশ্‌তাদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিবেশন করেছে।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কারও অবশিষ্ট থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

অন্তর্ভুক্ত হল[১]।

৩৫. আর আমরা বললাম, ‘হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী[২] জান্নাতে বসবাস করুন

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا

[আবুদাউদ: ৪০৯১] আর ইবলীসের মন ছিল গর্ব ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র সমীপ থেকে দূরিভুত হওয়াই ছিল তার জন্য যুক্তিযুক্ত শাস্তি।

(১) সুদ্দী বলেন, সে ঐ সমস্ত কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল যাদেরকে আল্লাহ্‌ তখনও সৃষ্টি করেননি। যারা তার পরে কাফের হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী বলেন, আল্লাহ্‌ ইবলীসকে কুফরী ও পথভ্রষ্টতার উপরই সৃষ্টি করেছেন, তারপর সে ফেরেশতাদের আমল করলেও পরবর্তীতে যে কুফরির উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে তার দিকেই ফিরে গেল। [ইবনে কাসীর]

(২) কুরআনের বাকরীতি দ্বারা বোঝা যায় যে, আদম আলাইহিস সালাম এর জান্নাতে প্রবেশের আগেই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত করার পর আদমের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আদম আলাইহিস সালামকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা হল এবং তার বাম পাঁজর থেকে একখানা হাড় নেয়া হলো। আর সে স্থানে গোশ্‌ত সংযোজন করা হলো। তখনও আদম ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন হাড় থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হল এবং তাকে যথাযথ রূপ দান করা হল যেন আদম তার সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। যখন তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটল এবং নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন, তখন হাওয়াকে তার পাশে বসা দেখলেন। সাথে সাথে তিনি বললেন, আমার গোশ্‌ত, আমার রক্ত ও আমার স্ত্রী। [ইবনে কাসীর] অন্য বর্ণনায় ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে এসেছে, ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করা হল আর আদমকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেয়া হল। কিন্তু তিনি জান্নাতে একাকীত্ব অনুভব করতে থাকলেন। তারপর তার ঘুম আসল, সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তার মাথার পাশে একজন মহিলা বসে আছেন, যাকে তার পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? বললেন, মহিলা। আদম বললেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? বললেন, যাতে তুমি আমার কাছে প্রশান্তি লাভ কর। তখন ফেরেশতাগণ তাকে প্রশ্ন করলেন: হে আদম! এর নাম কি? আদম বললেন, হাওয়া। তারা বলল, তাকে হাওয়া কেন নাম দেয়া হল? তিনি বললেন, কেননা তাকে জীবিত বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [ইবনে কাসীর] এর সমর্থনে আমরা একটি হাদীস পাই। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা অংশ হচ্ছে, উপরিভাগ। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তবে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, সব সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ কর। [বুখারী: ৩৩৩১, মুসলিম: ১৪৬৮] হাফেজ ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে ইসহাক থেকে উপরোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেন।

مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

এবং যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করুন, কিন্তু এই গাছটির কাছে যাবেন না[১]; তাহলে আপনারা হবেন যালিমদের[২] অন্তর্ভুক্ত'।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

৩৬. অতঃপর শয়তান সেখান থেকে

---

(১) কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছিল যে, এর ধারে কাছেও যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কুরআনুল কারীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশংকা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহ্শাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

(২) যালিম শব্দটি গভীর অর্থবোধক। 'যুলুম' বলা হয় অধিকার হরণকে। যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালিম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম পালন করে না, তাঁর নাফরমানি করে সে আসলে তিনটি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ করে। প্রথমতঃ সে আল্লাহ্র অধিকার হরণ করে। কারণ আল্লাহ্র হুকুম পালন করতে হবে, এটা বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অধিকার। দ্বিতীয়তঃ এ নাফরমানি করতে গিয়ে সে যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার সে হরণ করে। তার দেহের অংগ-প্রত্যংগ, স্নায়ুমণ্ডলী, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশ্তাগণ এবং যে জিনিষগুলো সে তার কাজে ব্যবহার করে-এদের সবার তার উপর অধিকার ছিল, এদেরকে কেবলমাত্র এদের মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাদের উপর নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে তখন সে আসলে তাদের উপর যুলুম করে। তৃতীয়তঃ তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার উপর তার আপন সত্তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার অধিকার আছে। কিন্তু নাফরমানি করে যখন সে নিজেকে আল্লাহ্র শাস্তি লাভের অধিকারী করে তখন সে আসলে ব্যক্তি সত্তার উপর যুলুম করে। এসব কারণে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'গোনাহ্' শব্দটির জন্য যুলুম এবং 'গোনাহ্গার' শব্দের জন্য যালিম ব্যবহার করা হয়েছে।

فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

তাদের পদস্খলন ঘটালো[১] এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করল[২]। আর আমরা বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও; এবং কিছু দিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল যমীনে'।

---

(১) زَلَّ শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্খলন। অর্থাৎ শয়তান আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস্ সালামকে পদস্খলিত করেছিল বা তাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কুরআনের এসব শব্দে পরিস্কার এ কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া 'আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম লংঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না, বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন। এ বর্ণনার দ্বারা বোঝা গেল যে, আদম 'আলাইহিস্ সালামকে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এরপরও আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, এখানে কয়েকটি ব্যাপারে আলেমদের ইজমা তথা ঐক্যমত সংঘটিত হয়েছেঃ

১) নবীগণ উম্মতের নিকট আল্লাহ্র নির্দেশ পৌঁছানোর ব্যাপারে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি বা পাপ হতে মুক্ত।

২) অনুরূপভাবে মর্যাদাহানিকর নিম্নমানের কর্মকাণ্ড থেকেও মুক্ত।

৩) তাদের দ্বারা মর্যাদাহানিকর নয় এমন সগীরা গোনাহ্ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোন প্রকার গোনাহ্ বা ভুলের উপর অবস্থান করতে দেননা। অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তাদেরকে সাবধান করা হয়, যাতে তারা তাওবা করে সংশোধন করে নেন। ফলে তাদের মর্যাদা পূর্বের চেয়ে আরও বেশী বৃদ্ধি পায়।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সূর্য যে দিনগুলোতে উদিত হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। এতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এতেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এ দিনই তাকে জান্নাতে থেকে বের করা হয়েছে।" [মুসলিম: ৮৫৪] এখানে এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম 'আলাইহিস্ সালামকে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করলো? কারণ, শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

৩৭. তারপর আদম[১] তার রবের কাছ থেকে কিছু বাণী পেলেন[২]। অতঃপর আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন[৩]।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

---

(১) আদম 'আলাইহিস্ সালাম চরমভাবে বিচলিত হলেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ক্ষমা প্রার্থনারীতি সম্বলিত কয়েকটি বচন তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় প্রভূর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি করুণা করলেন। অর্থাৎ তাদের তাওবা গ্রহণ করে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক তাৎপর্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল - যেমন, তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশ্‌তা ও জ্বিন জাতির মাঝামাঝি এক নতুন জাতি - 'মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শর'য়ী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরী'আতী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।

(২) যেসব বাক্য আদম 'আলাইহিস্ সালামকে তাওবার উদ্দেশ্যে বলে দেয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্‌সির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের বর্ণনা রয়েছে। ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ "হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ২৩] আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তাওবার এই বাক্যগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো, তখন আদম 'আলাইহিস্ সালাম যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে তা গ্রহণ করলেন।

(৩) (তাওবা) এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তাওবার সম্বন্ধ মানুষের সংগে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি:- এক. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। দুই. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। তিন. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। আর যদি পাপ বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা ফেরৎ দেয়া বা তার থেকে মাফ নিয়ে নেয়া।

এ বিষয়গুলোর যেকোন একটির অভাব থাকলে তাওবা হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ্ তাওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। আয়াতে বর্ণিত ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ এর মধ্যে তাওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র সাথে। এর অর্থ তাওবা গ্রহণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন। এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা

নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু ।

৩৮. আমরা বললাম, 'তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও । অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]' ।

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহে[২] মিথ্যারোপ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

ছাড়া অন্য কেউ নয় । ইয়াহূদী ও নাসারাগণ এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে । তারা পাদ্রী-পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহ্‌র নিকটও মাফ হয়ে যায় । বর্তমানে বহু মুসলিমও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে । তারা কোন কোন পীরের কাছে তাওবা করে এবং মনে করে যে, পীর মাধ্যম হয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার পাপ মোচন করিয়ে নেবেন । অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না ।

(১) خَوْفٌ এর অর্থ আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশংকার নাম । আর حُزْنٌ বলা হয়, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে । লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রিভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই । এ আয়াতে আসমানী হিদায়াতের অনুসারীগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে । প্রথমতঃ তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়তঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না ।

(২) আরবীতে "আয়াত" এর আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত । এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ দেয় । কুরআনে এই শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী । কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত । কারণ এ বিশ্ব জাহানের অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করছে । কোথাও নবী-রাসূলগণ যেসব মু'জিযা দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র আয়াত । কারণ এ নবী-রাসূলগণ যে এ বিশ্ব জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভূর প্রতিনিধি এ মু'জিযাগুলো ছিল আসলে

করেছে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে[১]।

৪০. হে ইস্‌রাঈল[২] বংশধরগণ[৩]! তোমরা আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি[৪] এবং

يٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ ۝٤٠

তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কারণ, এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এ গ্রন্থের মহান মহিমান্বিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। কোথায় 'আয়াত' শব্দটির কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আর যারা জাহান্নামবাসী হিসেবে সেখানকার অধিবাসী হবে, তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না"। [মুসলিম: ১৮৫] অর্থাৎ কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা সেখানে স্থায়ী হবে। সুতরাং তাদের জাহান্নামও স্থায়ী।

(২) 'ইসরাঈল' ইয়া'কূব 'আলাইহিস্ সালামের অপর নাম। ইয়া'কূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর দু'টি নাম রয়েছে, ইয়া'কূব ও ইসরাঈল।

(৩) এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলিন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুস্কৃতির জন্য সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। এরপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনাপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে (হে ইসরাঈলের বংশধর) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সমাপ্তিপর্বেও সেগুলোরই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) বনী ইসরাঈলকে যে সমস্ত নে'আমত প্রদান করা হয়েছে তা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, ফের'আউন থেকে নাজাত, সমুদ্রে রাস্তার ব্যবস্থা করে তাদের বের করে আনা, তীহ ময়দানে মেঘ দিয়ে ছায়া প্রদান, মান্না ও সালওয়া নাযিলকরণ, সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করণ ইত্যাদি। তাছাড়া তাদের

আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর[১], আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

৪১. আর আমি যা নাযিল করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যতাপ্রমাণকারী। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না[২]। আর

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

হিদায়াতের জন্য অগণিত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও তৎকালীন বিশ্বের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানও উল্লেখযোগ্য।

(১) এ আয়াতে ইসরাঈল-বংশধরগণকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ "আর তোমরা আমার অংগীকার পূরণ কর"। অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে অংগীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। কাতাদাহ্ -এর মতে তাওরাতে বর্ণিত সে অংগীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল-বংশধর থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মাঝে থেকে বার জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম"। [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ১২] সমস্ত রাসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংগীকারই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সালাত, যাকাত এবং মৌলিক ইবাদতও এ অংগীকারভূক্ত। এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন যে, এ অংগীকারের মূল অর্থ মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসরণ।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অংগীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লংঘন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, 'অংগীকার ভংগকারীদেরকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন অংগীকার ভংগকারীদের পিছনে নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেয়া হবে এবং যত বড় অংগীকার ভংগ করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে'। [সহীহ্ মুসলিমঃ ১৭৩৮] এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

তোমরা শুধু আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

৪২. আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না[১] এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না[২]।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

হওয়ার অর্থ হলো, মানুষের মর্জি ও স্বার্থের বিনিময়ে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা। এ কাজটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

(১) কাতাদাহ ও হাসান বলেন, ‘হককে বাতিলের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ো না’ এর অর্থ ইয়াহূদীবাদ ও নাসারাবাদকে ইসলামের সাথে এক করে দেখবে না। কেননা, আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে, ইসলাম। আর ইয়াহূদীবাদ ও নাসারাবাদ (খৃষ্টবাদ) হচ্ছে বিদ‘আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয়। সেটি কখনো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। সুতরাং এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মকে একাকার করে এক ধর্মে পরিণত করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবুল আলীয়াহ্ বলেন, এর অর্থ তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে আল্লাহর বান্দাদের কাছে নসীহত পূর্ণ কর। অর্থাৎ তোমাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে বর্ণনা কর। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, তারা যে হককে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে। আর যে বাতিলকে হকের সাথে মিশিয়েছে তা হচ্ছে, তারা তাওরাতের কিছু অংশের সাথে কুফরী করেছে এবং তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যেমন, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সমস্ত গুণাগুণসহ অনুরূপ যা কিছু তারা গোপন করেছে এবং মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এর বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তবে কি তোমরা কিতাবের কিছুর উপর ঈমান আন, আর কিছুর সাথে কুফরী কর” [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৫] এ আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, তোমরা আমার রাসূল মুহাম্মাদ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সম্পর্কে যে জ্ঞান তোমাদের নিকট আছে তা গোপন কর না। অথচ তার সম্পর্কে তোমরা তোমাদের কাছে যে গ্রন্থ আছে তাতে নিশ্চিতভাবেই অনেক কিছু পাচ্ছ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মুজাহিদ বলেন, আহলে কিতাবগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোপন করে থাকে। অথচ

৪৩. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর[১]।

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও[২]!

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ

তারা তার ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জীলে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকে। [তাবারী] এ আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

(১) হাসান বলেন, 'সালাত এমন এক ফরয যা না পাওয়া গেলে অন্য কোন আমলই কবুল করা হয় না। অনুরূপভাবে যাকাতও।' [আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতে বর্ণিত 'রুকূ' এর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজ্‌দার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরী'আতের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা সালাতের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, 'রুকূ'কারীগণের সাথে রুকূ' কর'। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সালাতের সমগ্র অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে রুকূ'কে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে সালাতের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ 'ফজর সালাতের কুরআন পাঠ' বলে সম্পূর্ণ ফজরের সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়াতে 'সিজ্‌দা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকা'আত বা গোটা সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, সালাত আদায়কারীগণের সাথে সালাত আদায় কর। অর্থাৎ 'রুকূ'কারীদের সাথে' শব্দদ্বয়ের দ্বারা জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) এ আয়াতে ইয়াহূদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। এতে বুঝা যায় ইয়াহূদী আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করতো। কিন্তু নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। মূলত: তারাই অপরকে পুণ্য ও মংগলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ংকর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস্

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى

৪৫. আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর(১)। আর নিশ্চয় তা

সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জিব্‌রাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী - যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখতো না'। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১২০, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'কিছুসংখ্যক জান্নাতবাসী অপর কিছুসংখ্যক জাহান্নামবাসীদেরকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? জাহান্নামবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না'। [বুখারীঃ ৩২৬৭, মুসলিমঃ ২৯৮৯]

(১) মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্‌ 'সবর' এর তাফসীর করেছেন 'সাওম"। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, ধৈর্য্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট বিষয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এক সময় তার উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে এবং সে সফলকাম হবে। কিন্তু সালাতের মাধ্যমে কিভাবে সাহায্য প্রার্থনা করবে? এর উত্তর হচ্ছে, সালাতের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লিল কাজ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌ বলেন, "নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫] এটা নিশ্চয় এক বিরাট সাহায্য। তাছাড়া সালাতের মাধ্যমে রিযকের মধ্যে প্রশস্তি আসে। আল্লাহ্‌ বলেন, "আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন ও তাতে অবিচল থাকুন, আমরা আপনার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমরাই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াতেই নিহিত।" [সূরা ত্বা-হা: ১৩২] আর এ জন্যই "রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়তেন বা চিন্তাগ্রস্ত হতেন তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন"। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮] সুতরাং যে কোন বিপদাপদে ও সমস্যায় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কটা তাজা করে নেয়ার মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা যেতে পারে। সালফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও সত্যনিষ্ঠ ইমামগণ থেকে এ ব্যাপারে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট তার ভাই 'কুছাম' এর মৃত্যুর খবর পৌঁছল, তিনি তখন সফর অবস্থায় ছিলেন। তিনি তার বাহন থেকে নেমে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ অবস্থায় পড়লে একবার এমনভাবে বেহুশ হয়ে যান যে সবাই ধারণা করে বসেছিল যে, তিনি বুঝি মারাই গেছেন। তখন তার স্ত্রী উম্মে

الْخٰشِعِيْنَ ۝

বিনয়ীরা ছাড়া[১] অন্যদের উপর কঠিন।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাদের রব-এর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং নিশ্চয় তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে[২]।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৭. হে ইস্‌রাঈল বংশধরগণ! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। আর

কুলসুম মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬৯]

(১) কুরআন ও সুন্নায় যেখানে خُشُوْعٌ বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে 'ইবাদাত সহজতর হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে আল্লাহ্‌ভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে'। ইব্‌রাহীম নখয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকাই বিনয় নয়'। خُشُوْعٌ বা বিনয় অর্থ 'অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সংগে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেয়া।' সারকথা, ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

(২) আয়াতে বর্ণিত ظَنٌّ শব্দটির অর্থ, মনে করা বা ধারনা করা। কিন্তু মুজাহিদ বলেন, কুরআনে যেখানে ظَنٌّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই 'নিশ্চিত জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [তাবারী, ইবনে কাসীর] তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ظَنٌّ শব্দটি يَقِيْنٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হলেও সবস্থানেই যে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপারটি এমন নয়, যেমন, সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৪, সূরা আল-বাকারাহ: ৭৮, সূরা আন-নিসা: ১৫৭, সূরা আল-আন'আম:১১৬। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে এখানে সমস্ত মুফাসসিরের মতেই ظَنٌّ শব্দটি يَقِيْنٌ বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

নিশ্চয় আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম[১]।

৪৮. আর তোমরা সে দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না[২]। আর কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না[৩]

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

(১) কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, তাদেরকে তৎকালীন সময়ের সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। [তাফসীর আব্দুর রাজ্জাক, তাবারী] তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়াদি সম্পর্কে আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদেরকে রাজত্ব, রাসূল, কিতাব ইত্যাদি দিয়ে ঐ সময়কার সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে কাসীর বলেন, অবশ্যই এ শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত বলতে হবে। কারণ, এ উম্মত অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত তাদের থেকেও উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে। আহ্লে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল।" [সূরা আলে ইমরান: ১১০] তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সত্তরটি উম্মত পূর্ণ করবে। তন্মধ্যে তোমরা হচ্ছ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং সম্মানিত"। [ইবনে মাজাহ: ৪২৮৭, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩]

(২) অর্থাৎ কেউ অপর কারও পক্ষ থেকে কোন কিছু আদায় করবে না। [তাবারী] যেমন মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং ভয় কর সে দিনকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোন সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না" [সূরা লুকমান: ৩৩] তাছাড়া হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ ঐ বান্দাকে রহমত করুন, যার কাছে তার কোন ভাইয়ের কোন ইযযত আবরুর উপর হামলা জনিত যুলুম, অথবা তার সম্পদ ও সম্মানের উপর আঘাত ছিল, তারপর সে সেটা থেকে নিজেকে বিমুক্ত করতে পেরেছে, ঐ দিনের পূর্বেই যে দিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। বরং যদি তার কোন নেকী থাকে তবে তা থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে তার উপর মাযলুমের পাপসমূহ চাপিয়ে দেয়া হবে।" [বুখারী: ৬৫৩৪]

(৩) আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, আখেরাতে শাফা'আত বা সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। মূলত: ব্যাপারটি এরকম নয়। এ আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু কাফের-মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের জন্য কোন শাফা'আত বা সুপারিশ কাজে

এবং কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না[১]।

আসবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্‌ যার উপর সন্তুষ্ট নয় তার জন্য তারা সুপারিশ করবে না"। [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৮] আল্লাহ্‌ কাদের উপর সন্তুষ্ট নয় তা আল্লাহ্‌ নিজেই ঘোষণা করে বলেছেন, "আর আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট নন।" [সূরা আয-যুমার:৭] সুতরাং কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ নয়। আর কাফেররাও হাশরের দিন স্বীকৃতি দিবে যে, তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নেই, তারা বলবে "আমাদের তো কোন সুপারিশকারী নেই" [সূরা আশ-শু'আরা: ১০০] তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ নিজেও বলেছেন, "সুতরাং কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন উপকার দিবে না"।[সূরা আল-মুদ্দাসসির:৪৮] এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা কুফরী, শির্কী, নিফাকী অবস্থায় মারা যাবে তাদের জন্য কোন শাফা'আত বা সুপারিশ নেই।

পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্য শাফা'আত বা সুপারিশ অবশ্যই হবে। যা কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাদের জন্য সুপারিশের ব্যাপারেও শর্ত হচ্ছে, তন্মধ্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঈমান অবশিষ্ট থাকতে হবে। মূলতঃ এ ঈমানের কারণেই শাফা'আত তথা সুপারিশের হকদার হয়েছে। যার সামান্যতম ঈমান আছে তার উপর আল্লাহ্‌র সামান্যতম সন্তুষ্টি অবশিষ্ট আছে। সুতরাং যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার জন্য আল্লাহ্‌র সামান্যতম সন্তুষ্টি হলেও থাকতে হবে। যদিও অন্য অপরাধের কারণে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে নি। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, শাফা'আত বা সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুমতি থাকতে হবে। আল্লাহ্‌ বলেন, "এমন কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করে?" [সূরা আল-বাকারাহ:২৫৫] তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যিনি সুপারিশ করবেন তার উপরও আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আল্লাহ্‌ বলেন, "আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশ্‌তা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহ্‌র অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট" [সূরা আন-নাজম: ২৬] অর্থাৎ যিনি সুপারিশ করবেন তার কথা-বার্তা ও সুপারিশ আল্লাহ্‌র মনঃপুত হতে হবে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না" [সূরা ত্বা-হা: ১০৯] এ তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে নবী-রাসূল, শহীদগণ ও নেককার মুমিনগণ শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন। যা বহু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

(১) আলোচ্য আয়াতে যেদিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কেয়ামতের দিন। সাধারণতঃ মানুষের কোন শাস্তির হুকুম হলে তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ নিম্নলিখিত চারটি উপায় অবলম্বন করেঃ

৪৯. আর স্মরণ কর, যখন আমরা ফির'আউনের বংশ হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম, তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্রদের যবেহ করে ও তোমাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখত[১]।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٤٩

১) একজনের পরিবর্তে অন্যজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে "কেউ কারো পক্ষ থেকে আদায় করে না" বলে কেয়ামতের দিন এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

২) অথবা, একজনের জন্য অপরজন সুপারিশ করে শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্ভাবনাও নাকচ করে বলেনঃ "কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না"।

৩) অথবা, বিনিময় আদায়ের মাধ্যমে কেউ কেউ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে বিনিময় দু'ধরনের হতে পারে, ক) অন্যের কাছ থেকে কিছু সওয়াব লাভ করে তার বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। খ) টাকা-পয়সা ইত্যাদির বিনিময়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা "কারো কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না", এ কথা বলে এমন সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন।

৪) অথবা, শাস্তির হুকুমের বিপরীতে অপরাধীকে সাহায্যকারী দল থাকে, যারা তাকে তা না মানতে বা তার শাস্তি লাঘব করতে সাহায্য করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা "আর তারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না" এ কথা দ্বারা এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, তারা ঈমান আনেনি। কিন্তু যদি তাদের ঈমান থাকত তবে শর্ত সাপেক্ষে এ চারটির কোন কোনটি কাজে আসত। মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত আখেরাতে সেগুলোর কোনটাই কার্যকর হবে না।

(১) কোন ব্যক্তি ফির'আউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফির'আউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়তঃ এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সে স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী-পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে উল্লেখিত হত্যাকাণ্ড থেকে অব্যাহতি দানের কথা বুঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। এত বড় নে'আমতের শুকরিয়া স্বরূপ নবীগণ কি করেছেন? হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা আগমন করলেন, তখন দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা মহররমের দশ তারিখের সাওম পালন করছে। তিনি তাদেরকে বললেন,

আর এতে ছিল তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা[১];

৫০. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম[২] এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফির'আউনের বংশকে নিমজ্জিত করেছিলাম। আর তোমরা তা দেখছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. আর স্মরণ কর, যখন আমরা মূসার সাথে চল্লিশ রাতের অঙ্গিকার করেছিলাম[৩], তার (চলে যাওয়ার) পর তোমরা গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে)

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

ব্যাপারটি কি? তারা বলল: এটি একটি ভাল দিন। এ দিনে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, ফলে মূসা আলাইহিস সালাম এ দিন সাওম পালন করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা তোমাদের চেয়ে মূসার বেশী হকদার, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দিনের সাওম পালন করলেন এবং লোকদেরকে সেদিনের সাওম রাখার নির্দেশ দিলেন।" [বুখারী: ২০০৪, মুসলিম: ১২৮]

(১) অবশ্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ সনদে بلاء শব্দের অর্থ, নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে। তখন উদ্দেশ্য হবে, তাদের নাজাত ছিল এক বড় নেয়ামত। [তাবারী]

(২) এখানে কিভাবে ফির'আউনের হাত থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন সেটার বর্ণনা দিচ্ছেন। অন্য আয়াতে এসেছে, "আর অবশ্যই আমি মূসাকে ওহী করে বলেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতেই চলে যান" [ত্বাহা: ৭৭, আশ-শু'আরা:৫২] যাওয়ার পথে তার সামনে সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ্ তা'আলা মূসাকে বললেন, "আপনি সমুদ্রকে লাঠি দিয়ে আঘাত করুন, ফলে তা ভাগ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল।" [সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩] আর এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্র ভাগ করে দিলেন।

(৩) এখানে চল্লিশ রাতের ব্যাপারে এটা বলেন নি যে, এ চল্লিশ রাতের ওয়াদা প্রথমেই নিয়েছিলেন কি না? কিন্তু অন্যত্র বলে দিয়েছেন যে, তাকে প্রথমে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলেন তারপর আরও দশ রাত বাড়িয়ে দিয়ে তা চল্লিশে পূর্ণ করে দিলেন। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪২]

গ্রহণ করেছিলে[১]; আর তোমরা হয়ে গেলে যালিম[২]।

৫২. এর পরও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও 'ফুরকান[৩]' দান

وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ

(১) এখানে গো বৎসের উৎস ও কারিগর সম্পর্কে কিছু বলেন নি। অন্যত্র সেটা বিস্তারিত এসেছে। আল্লাহ্ বলেন, "মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা 'হাম্বা' শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা ওটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৮] আরও বলেন, "তারা বলল, 'আমরা আপনাকে দেয়া অংগীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করিনি ; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও (সেখানে কিছু মাটি) নিক্ষেপ করে। 'তারপর সে তাদের জন্য গড়লো এক বাছুর, এক অবয়ব, যা হাম্বা রব করত।' তারা বলল, 'এ তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে।'" [সূরা ত্বা-হা: ৮৭-৮৮]

(২) এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন ফির'আউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর ইসরাঈল-বংশধররা কারো কারো মতে মিশরে ফিরে এসেছিল, আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল। তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর খেদমতে ইসরাঈল-বংশধররা আরয করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যদি আমাদের জন্য কোন শরী'আত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অংগীকার প্রদান করলেন যে, আপনি তূর পর্বতে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত আমার 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার পর আপনাকে এক কিতাব দান করবো। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তাই করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে অতিরিক্ত আরও দশদিন 'ইবাদাত করতে নির্দেশ দিলেন। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো আর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তাওরাত দিলেন। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তো ওদিকে তূর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গোবৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়ায় সেটি শব্দ করতে থাকলো। আর ইসরাঈল-বংশধররা তারই পূজা করতে শুরু করে দিল। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) 'ফুরকান' দ্বারা হয়ত তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরী'আতী বিধানমালাকে বুঝানো হয়েছে।

تَهْتَدُوْنَ۝٥٣

করেছিলাম; যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۝٥٤

৫৪. আর স্মরণ কর, যখন মূসা আপন জাতির লোকদের বললেন, 'হে আমার জাতি! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, কাজেই তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তাওবা কর। তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তারপর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۝٥٥

৫৫. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না,' ফলে তোমাদেরকে বজ্র পাকড়াও করলো, যা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝٥٦

৫৬. তারপর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি তোমাদের মৃত্যুর পর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

৫৭. আর আমরা মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের

কেননা, শরী'আতের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে- যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার দাবীর ফয়সালা হয়। অথবা ফুরকানের মানে হচ্ছে দ্বীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি, যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। অথবা স্বয়ং তাওরাতই এর অর্থ। কেননা, এর মধ্যেও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

নিকট 'মান্না' ও 'সাল্ওয়া[১]' প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম), 'আহার কর উত্তম জীবিকা, যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি'। আর তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করেছিল।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর স্মরণ কর, যখন আমরা বললাম, এই জনপদে প্রবেশ করে তা হতে যা ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর এবং দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আর বলঃ 'ক্ষমা চাই'। আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। অচিরেই আমরা মুহসীনদেরকে বাড়িয়ে দেব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কিন্তু যালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। কাজেই আমরা যালিমদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করলাম[২]।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ

৬০. আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি চাইলেন। আমরা বললাম,

---

(১) ইসরাঈল-বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর প্রেরিত আসমানী খাবার। যা গাছের উপরে কুয়াসার ন্যায় জমা হয়ে থাকত। এ সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল-কামআ' [এক প্রকার উদ্ভিদ, যা অনেকটা মাশরুমের মত] মান্না এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর পানি চোখের আরোগ্য'। [বুখারীঃ ৪৪৭৮] আর 'সালওয়া' হলো এক প্রকার পাখি, যা চড়ুই পাখি থেকে আকারে একটু বড়।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মহামারী এমন একটি রোগ যা বনী ইসরাঈলের উপর অথবা তোমাদের পূর্বের লোকদের উপর আকাশ থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং যখন তোমরা কোথাও এর সংবাদ কোথাও শুনতে পাবে তখন সেখানে যাবে না। আর তোমরা যেখানে থাক সেখানে নাযিল হলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।" [বুখারী: ৩৪৭৩, মুসলিম: ২২১৮]

الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

'আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন'। ফলে তা হতে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (বললাম,) 'আল্লাহ্‌র দেয়া জীবিকা হতে তোমরা খাও, পান কর এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না'।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার রব-এর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর---তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্‌জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন'। মূসা বললেন, 'তোমরা কি উত্তম জিনিষের বদলে নিম্নমানের জিনিষ চাও? তবে কোন শহরে চলে যাও, তোমরা যা চাও, সেখানে তা আছে'[১]। আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য আপতিত হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হল। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে

(১) তীহ্ উপত্যকায় 'মান্না' ও 'সালওয়া'র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব শব্জী ও শস্যের জন্য আবেদন করলো। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগের নির্দেশ দেয়া হলো। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন, বলা হয়েছে- ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ 'আর সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার রব জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইয়াহূদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠোর শাস্তি পৌঁছাতে থাকবে'। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৭]

অন্যায়ভাবে হত্যা করত[১]। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল[২]।

৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে[৩] এবং নাসারা[৪] ও সাবি'ঈরা[৫] যারাই আল্লাহ্ ও শেষ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আযাব হবে সে লোকের যাকে কোন নবী হত্যা করেছে, অথবা কোন নবীকে হত্যা করেছে। আর ভ্রষ্ট ইমাম বা নেতা এবং ভাস্কর্য নির্মাণকারী।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪১৩,৪১৫]

(২) কাতাদাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ; কেননা পূর্বেকার লোকেরা এ দু'টির কারণেই ধ্বংস হয়েছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) তাদেরকে ইয়াহূদী নামকরণ তারা নিজেরাই করেছিল। কারও কারও মতে ইয়া'কুব আলাইহিস সালামের পুত্র 'ইয়াহূদা' এর নামানুসারে তাদের এ নাম দেয়া হয়েছিল। অপর কারও কারও মতে, 'হাওদ' শব্দের অর্থ ঝুঁকে যাওয়া। তারা তাওরাত পাঠের সময় সামনে-পিছনে ঝুঁকে যেত বলে তাদের এ নাম হয়েছে। অথবা 'হাওদ' এর অর্থ ফিরে আসা। তারা বলেছিল ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ "আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৬] সে অনুসারে তাদের নাম হয়েছে, ইয়াহূদ। পবিত্র কুরআনে যেখানেই তাদেরকে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই তাদের খারাপ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইয়াহূদী নামটি কোন ভাল গুণবাচক নাম নয়।

(৪) কাতাদাহ্ বলেন, তাদেরকে নাসারা নামকরণ করা হয়েছে, কেননা তারা 'নাসেরাহ' নামক এক গ্রামের অধিবাসী ছিল যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের কাছে এসেছিলেন। এ নামে তারা নিজেদেরকে নামকরণ করেছিল। তাদেরকে এ নাম দেয়ার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দেন নি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৫) সাবে'ঈন কারা এ নিয়ে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ তারা ইয়াহূদী-নাসারা এবং অগ্নি-উপাসকদের মাঝামাঝি একটি জাতি। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট দ্বীন নেই। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ তারা ফেরেশ্তা-উপাসক জাতি। তারা কেবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে। রাগেব ইস্পাহানী বলেনঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীনের অনুসরণ করে চলত। বস্তুতঃ সাবে'ঈনরা এক বিরাট জাতি, যাদের অস্তিত্ব ইরাক থেকে শুরু করে পূর্ব দিকের দেশগুলোতে দেখা যায়। বর্তমানেও ইরাকে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের কিছু 'ইবাদাত, যেমনঃ অযু, সালাত, কেবলা, সাওম ইত্যাদি প্রায় মুসলিমদের মতই। কিন্তু, আকীদাগতভাবে তারা দু'ভাগে বিভক্ত।

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

দিনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রব-এর কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম[২] এবং তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম 'তুর' পর্বত; (বলেছিলাম,) 'আমরা যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে[৩] তা

(এক) যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে। কিন্তু তারা কোন রাসূলের অনুসরণ করে না। (দুই) যারা তারকা-পূজারী এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি তারকার প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করে।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি ঈমান ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কুরআন নাযিল হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলিম হওয়াতেই সীমাবদ্ধ। আয়াতে ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ বা "সৎকাজ করে" এটুকু বলার মাধ্যমে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করার দ্বারাই তাদের নাজাত পাওয়া সীমাবদ্ধ এটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কারণ, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ না করা হয়, তবে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যার অর্থ এই যে, যে মুসলিম হবে, সে-ই আখেরাতে নাজাতের অধিকারী হবে। অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত ইয়াহূদী, নাসারা, সাবেয়ী, মাজুস এ সমস্ত লোকদের এতসব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরও কেউ যদি মুসলিম হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

(২) আবুল আলীয়াহ বলেন, এ অঙ্গীকার ছিল, নিষ্ঠাসহকারে একমাত্র আল্লাহ্ ইবাদত করা। আর কারও ইবাদত না করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর সাথে সাথে অঙ্গীকারের অন্যান্য বিষয়াবলী আয়াতের শেষেই বর্ণিত হয়েছে।

(৩) আয়াতে বর্ণিত بِقُوَّةٍ এর তাফসীর কেউ করেছেন, দৃঢ়তার সাথে। কাতাদাহ করেছেন, গুরুত্বের সাথে। আবুল আলীয়াহ বলেছেন, আনুগত্যের সাথে। আর মুজাহিদ বলেছেন, এর উপর আমল করার স্বীকারোক্তির সাথে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার[১]' ।

৬৪. এরপরও তোমরা মুখ ফিরালে! অতঃপর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা না থাকলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে[২] ।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾

(১) যখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তূর পর্বতে তাওরাত প্রদান করা হল, তখন তিনি ফিরে এসে তা ইসরাঈল-বংশধরকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন। এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল - কিন্তু তাদের অবস্থানুযায়ীই ছিল । এ সম্পর্কে প্রথম তারা এ কথাই বলেছিল যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, 'এটা আমার কিতাব' তখনই আমরা মেনে নেবো । (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা যে সত্তরজন লোক মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে সাক্ষী দিল । কিন্তু ইসরাঈল-বংশধররা পরিস্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না । ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে হুকুম করলেন, 'তূর পর্বতের একটি অংশ তুলে নিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুণি মাথার উপর পড়লো । অবশেষে নিরুপায় হয়ে তা মেনে নিতে হলো । এ আয়াতে বর্ণিত 'তূর পাহাড় উঠানোর' তাফসীর আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে করে দিয়েছেন । যেখানে বলা হয়েছে, "স্মরণ করুন, আমরা পর্বতকে তাদের উপরে উঠাই, আর তা ছিল যেন এক শামিয়ানা । তারা মনে করল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে । বললাম, 'আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ওটাতে যা আছে তা স্মরণ কর" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৭১]

(২) এ আয়াতের সম্বোধন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে সমস্ত ইয়াহূদীদের করা হচ্ছে, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে উপস্থিত ছিল । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ভংগেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তাদেরকে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভংগকারীদের আওতাভুক্ত করে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এরপরও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন আযাব নাযিল করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভংগকারীদের উপর নাযিল হয়ে থাকত । এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত ।

জেনেছিলে[১]। ফলে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও'।

৬৬. অতএব আমরা এটা করেছি তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি[২]। আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ[৩]।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

(১) আয়াতে বর্ণিত এ ঘটনাটি দাউদ 'আলাইহিস্ সালাম-এর আমলেই সংঘটিত হয়। ইসরাঈল-বংশধরদের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। তারা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করতো আর অপর ভাগে সৎ ও বিজ্ঞজনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কাতাদাহ্ বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শুকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনতো এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করতো। হাদীসে এসেছে, জনৈক সাহাবী একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইয়াহূদী সম্প্রদায়?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন তখন তিনি তাদের অবশিষ্ট বংশধর রাখেন না। বস্তুতঃ বানর ও শূকর পৃথিবীতে তাদের পূর্বেও ছিল'। [মুসলিমঃ ২৬৬৩] সুতরাং বর্তমান বানরদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরের কোন সম্পর্ক নেই। [দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ] যেমনিভাবে এ ধারণা করারও কোন সুযোগ নেই যে, মানুষ কোন এক সময় বানরের বংশধর ছিল।

(২) এ তাফসীর আবুল আলীয়াহ থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে মুজাহিদ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এর অর্থ "আমরা এটাকে তাদের এ ঘটনার পূর্বের গুনাহ এবং এ ঘটনার গোনাহের জন্য শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করে দিলাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দিলেন।

(৩) এ ঘটনা মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইয়াহূদীরা যে অন্যায় করেছে তোমরা তা করতে

৬৭. আর স্মরণ কর[১], যখন মূসা তার জাতিকে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন', তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' মূসা বললেন, 'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই '।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে আহ্বান কর তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, সেটা কিরূপ?' মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ বলছেন, সেটা এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়, মধ্যবয়সী। অতএব তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পালন কর'।

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক, সেটার রং কি, তা যেন আমাদেরকে বলে দেন'। মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হলুদ বর্ণের গাভী, উজ্জ্বল গাঢ় রং বিশিষ্ট, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়'।

قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾

যেও না। এতে তোমরা ইয়াহূদীদের মত আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা বাহানা করে হালাল করে ফেলবে।" [ইবনে বাত্তাহ: ইবতালুল হিয়াল: ৪৬, ৪৭]

(১) এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ইসরাঈল-বংশধরদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন, আল্লাহ্ তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে নির্দেশ দেন। ইসরাঈল-বংশধররা কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হতো না, বরং যেকোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু তারা প্রশ্ন করে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা সেটা করতে সমর্থ হয়। তারপর গরু জবাই করার পর মৃতদেহে সে গরুর গোশতের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মারা যায়। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

৭০. তারা বলল, 'তোমার রবকে আহবান কর, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, সেটা কোন্‌টি? নিশ্চয় গাভীটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমরা নিশ্চয় দিশা পাব'(১)।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

৭১. মূসা বললেন, 'তিনি বলছেন, সেটা এমন এক গাভী যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত'। তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ'। অবশেষে তারা সেটাকে যবেহ্ করল, যদিও তারা তা করতে প্রস্তুত ছিল না ।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে তারপর একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, আর তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ্ তা ব্যক্তকারী।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

৭৩. অতঃপর আমরা বললাম, 'এর কোন অংশ দিয়ে তাকে আঘাত কর'। এমনিভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন তাঁর নিদর্শন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার(২)।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

---

(১) ইকরিমাহ বলেন, যদি তারা "আল্লাহ ইচ্ছে করলে" বাক্য না বলত, তবে কখনই সে ধরনের গরু খুঁজে পেত না। [তাবারী]

(২) শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, বনী ইসরাইলের মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম হওয়ার অর্থই জন্মের পরে পুনরুত্থানের প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া। কেননা, যিনি একজনকে মৃত্যুর পরে জীবিত করতে সমর্থ, তিনি অবশ্যই সমস্ত জীবকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন। অথচ কোন কোন পাথর তো এমন যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আর কিছু এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে পড়ে[১], আর তোমরা যা কর

সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" [সূরা লুকমান: ২৮]

(১) এখানে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছেঃ (১) পাথর থেকে বেশী পানি প্রসরণ, (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) নীচে গড়িয়ে পড়া। মুজাহিদ বলেন, এ সবগুলিই আল্লাহ্‌র ভয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, পাথরের উপর যে ক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয় সেগুলো বাস্তব ঘটনা। প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এটা উহুদ পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।" [মুসলিম: ১৩৬৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "আমি মক্কায় এক পাথরকে চিনি, যে পাথর আমি নবী হওয়ার পূর্ব হতেই আমাকে সালাম করত, আমি এখনও সেটাকে চিনি।" [মুসলিম: ২২৭৭] তবে পাথরের উপর সংঘটিত উপরোক্ত তিনটি অবস্থার মধ্যে তৃতীয় ক্রিয়াটি কারো কারো অজানা থাকতে পারে। অর্থাৎ কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তা দ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথরের চেয়েও বেশী শক্ত। কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় বেশী দুর্বল। কিন্তু ইয়াহূদীদের অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, তারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী যে, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনো মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না। আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে তাদের 'কঠিন হৃদয়' হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়নি। তবে অন্যান্য আয়াতে সেটা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "সুতরাং তাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের

আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

৭৫. তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে, অথচ তারা জানে[১]।

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

হৃদয় কঠিন করেছি; তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গেছে।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৩] "আর তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল--- অতঃপর বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তর সমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল।" [সূরা আল-হাদীদ:১৬]

(১) এখানে আল্লাহ্র বাণী অর্থ তাওরাত। 'শ্রবণ করা' অর্থ নবীদের মাধ্যমে শ্রবণ করা। 'পরিবর্তন করা' অর্থ কোন কোন বাক্য অথবা তার অর্থ অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে যেসব ইয়াহূদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লেখিত কোন কুকর্ম যদি সংঘটিত নাও হয়ে থাকে, তবুও পূর্ববর্তীদের এসব দুস্কর্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করতো না। এ কারণে তারাও কার্যতঃ পূর্ববর্তীদেরই মত। কিন্তু কারা এবং কিভাবে তাদের কিতাবকে বিকৃত করত, তা এখানে বলা হয়নি। মুফাসসিরগণের মধ্যে মুজাহিদ বলেন, এ বিকৃত করা ও গোপন করার কাজটি তাদের আলেম সমাজই করত। আবুল আলীয়াহ্ বলেন, তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, আয়াতে বর্ণিত লোকগুলো হচ্ছে, ইয়াহূদরা। তারা আল্লাহ্র বাণী শুনত; তারপর সেগুলো বুঝে-শুনে বিকৃত করত। তারা আল্লাহ্র বিধানেও পরিবর্তন সাধন করত, হাদীসে এসেছে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল যে, তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যভিচার করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা তাওরাতে "রাজ্ম" বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কি কিছু পাও? তারা বলল, আমরা তদেরকে শাস্তি হিসেবে তাদেরকে লজ্জিত করি এবং বেত্রাঘাত করা হবে। অর্থাৎ তারা 'রাজম' অস্বীকার করল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে 'রাজম' এর কথা আছে। তখন তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং সেটা মেলে ধরল। তখন তাদের একজন 'রাজম' এর আয়াতের উপর হাত রেখে এর আগে এবং পরের অংশ পড়ল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর তারা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আবার যখন তারা গোপনে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, তোমরা কি তাদেরকে তা বলে দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন(১); যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রব-এর নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে তোমরা কি বুঝ না(২)?'

তুমি তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, সেখানে 'রাজম' এর আয়াত রয়েছে। তখন তারা বলল, মুহাম্মদ সত্য বলেছে। এতে 'রজম' এর আয়াত রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর 'রজম' করা হলো। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে লোকটি মহিলার উপর বাঁকা হয়ে তাকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। [বুখারীঃ ৩৬৩৫]

(১) এখানে 'যা আল্লাহ্ তোমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন' বলে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুমিনদের সাথে ইয়াহূদীদের সাক্ষাৎ হলে তারা মুমিনদের বলত- আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের সাথী আল্লাহ্র রাসূল। তবে তিনি শুধু তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, আমাদের প্রতি নয়। আবার শুধু তারা নিজেরা একত্রিত হলে একদল আরেক দলকে বলত- সাবধান! আরবদের কাছে তাও প্রকাশ করো না। কারণ, এর আগে তোমরা এই মুহাম্মদের সাহায্যে তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার কথা বলতে। এখন সে-ই তো তাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বলত, এ নবী সম্পর্কে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত হয়েছে অথবা আমাদের পবিত্র কিতাবসমূহে আমাদের বর্তমান মনোভাব ও কর্মনীতিকে অভিযুক্ত করার মত যে সমস্ত আয়াত ও শিক্ষা রয়েছে, সেগুলো মুসলিমদের সামনে বিবৃত করো না। অন্যথায় তারা আল্লাহ্র সামনে এগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ ইয়াহূদীদের বিশ্বাস এভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তারা যেন মনে করত, দুনিয়ায় যদি তারা আল্লাহ্র কিতাবকে বিকৃত করে ও সত্য গোপন করে তাহলে এজন্য আখেরাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলবে না। তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, তোমরা কি আল্লাহ্কে বেখবর মনে কর? [ইবনে কাসীর]

৭৭. তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে এবং যা ব্যক্ত করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা মিথ্যা আশা[১] ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে[২]।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. কাজেই দুর্ভোগ[৩] তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

---

(১) أَمَانِيَّ শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, মিথ্যা আশা। এ অর্থের পক্ষে অন্যান্য আয়াতও সাক্ষ্য দেয়। যেমন বলা হয়েছে, "আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এটা তাদের মিথ্যা আশা।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১১১] আরও এসেছে, "তোমাদের আশা-আকাংখা ও কিতাবীদের আশা-আকাংখা অনুসারে কাজ হবে না" [সূরা আন-নিসা: ১২৩] উপরোক্ত দুই আয়াতেও أَمَانِيّ শব্দ মিথ্যা আশা-আকাংখা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কোন কোন তাফসীরকার এর আরও একটি অর্থ করেছেন, তা হচ্ছে, লেখাপড়া না জানা। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে এক গোষ্ঠী আছে যারা কোন লেখা পড়া জানে না। তাদের কাজ হলো অন্যের অন্ধ অনুসরণ করা। কিন্তুবাক্যের প্রথমে أُمِّيُّونَ শব্দের উল্লেখ থাকায় এ অর্থটি খুব বেশী উপযুক্ত নয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ৭৫-৭৮ আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের তিন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে, আলেম সম্প্রদায় তাদের কাজ হলো আল্লাহ্র কালাম বিকৃত করা। আরেক দল হচ্ছে মুনাফিক। তারা মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে পেশ করে। আরেক শ্রেণী হচ্ছে, জাহেল মূর্খ গোষ্ঠী। তারা পড়ালেখা জানে না। তারা কেবল অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। [ইবনে কাসীর]

(৩) وَيْلٌ শব্দটি পবিত্র কুরআনে এখানেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরে এর অর্থ করা হয়েছে, দূর্ভোগ। এছাড়া এর এক তাফসীর 'আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যদি পাহাড়ও এতে নিয়ে ফেলা হয় তবে তার তাপে তাও মিইয়ে যাবে'। [ইবনুল মুবারকের আয-যুহদ, নং ৩৩২] আবু আইয়াদ আমর ইবনে আসওয়াদ আল-আনাসী বলেন, وَيْلٌ হচ্ছে, জাহান্নামের মূল অংশ থেকে যে পুঁজ বয়ে যাবে তার নাম' [তাবারী] মোটকথা: সব রকমের শাস্তি ও ধ্বংস তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে'। অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস[১]।

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. তারা বলে, 'সামান্য কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না'। বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কোন অংগীকার নিয়েছ; যে অংগীকারের বিপরীত আল্লাহ্ কখনও করবেন না? নাকি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?'

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

৮১. হ্যাঁ, যে পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'তোমরা কোন ব্যাপারে কিতাবীদেরকে কেন জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের কাছে রয়েছে তোমাদের রাসূলের কাছে নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র কিতাব। যা সবচেয়ে আধুনিক, (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসার ব্যাপারে) নবীন। তোমরা সেটা পড়ছ। আর সে কিতাবে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা তাদের কিতাবকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্বহস্তে সে কিতাব লিপিবদ্ধ করে বলেছে যে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তোমাদের কাছে এ সমস্ত জ্ঞান আসার পরও তা তোমাদেরকে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা থেকে নিষেধ করছে না। না, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের একজনকেও দেখিনি যে, সে তোমাদেরকে তোমাদের কাছে কি নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। [বুখারী: ৭৩৬৩] সুতরাং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছুতেই ইয়াহূদী-নাসারাদের কোন বর্ণনার প্রয়োজন আমাদের নেই।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর স্মরণ কর, যখন আমরা ইস্‌রাঈল-সন্তানদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ‘ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা(১), আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রের(২) সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে(৩)। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে, তারপর তোমাদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া(৪)

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কাছে কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, “সময়মত সালাত আদায় করা”। বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার”। বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা”। [বুখারী: ৫২৭, মুসলিম: ৮৫]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মিসকীন সে নয়, যে এক খাবার বা দুই খাবারের জন্য ঘুরে বেড়ায় বরং মিসকীন হচ্ছে, যার সামর্থ নেই অথচ সে লজ্জায় কারও কাছে চায় না। অথবা মানুষকে আগলে ধরে কোন কিছু চায় না।” [বুখারী: ১৪৭৬, মুসলিম: ১০৩৯]

(৩) আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলামনে বলবে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যখন মূসা ও হারূন ‘আলাইহিমাস্ সালাম-কে নবুয়ত দান করে ফির‘আউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, “তোমরা উভয়েই ফির‘আউনকে নরম কথা বলবে।” [সূরা ত্বা-হা: ৪৪] আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফির‘আউন অপেক্ষা বেশী মন্দ বা পাপিষ্ঠ নয়। সুতরাং সবার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা উচিত। হাদীসে এসেছে, “তোমরা সৎকাজের সামান্যতম কিছুকে খাটো করে দেখ না। যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করা।” [মুসলিম: ২৬২৬] তাছাড়া মানুষের সাথে সদালাপের অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, তা হচ্ছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) ‘অল্প কয়েকজন’ অর্থ, তারাই যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তাওরাত

তোমরা সকলেই অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

৮৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অন্যকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে। আর তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছ।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৮৫. তারপর তোমরাই তারা, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তোমরা একে অন্যের সহযোগিতা করছ তাদের উপর অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা। আর তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও[১]; অথচ তাদেরকে

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ۗ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম প্রবর্তিত শরী'আতের অনুসারী ছিল এবং তাওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামী শরী'আতের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, সালাত আদায় করা ও যাকাত দেয়া ইসলামী শরী'আতসহ পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহেও ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ সেগুলো ত্যাগ করে।

(১) ইসরাঈল-বংশধরকে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ খুনোখুনী না করা, দ্বিতীয়তঃ বহিস্কার অর্থাৎ দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা এবং তৃতীয়তঃ স্বগোত্রের কেউ কারো হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আউস' ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইয়াহূদীদের দু'টি গোত্র 'বনী-কুরাইযা' ও 'বনী-নাদীর' বসবাস করত। আউস গোত্র ছিল বনী-কুরাইযার মিত্র এবং খাযরাজ ছিল বনী-নাদীরের মিত্র। আউস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে

বহিস্কার করাই তোমাদের উপর হারাম ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِۡ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. তারাই সে লোক, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে; কাজেই তাদের শাস্তি কিছুমাত্র কমানো হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۡ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ

৮৭. অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি এবং আমরা মার্‌ইয়াম-পুত্র 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি[1] এবং

মিত্রতার ভিত্তিতে বনী-কুরাইযা সাহায্য করত এবং নাযীর খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আউস ও খাযরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হত, তাদের মিত্র বনী-নাদীরেরও তেমনি হত। বনী কুরাইযাকে হত্যা ও বহিস্কারের ব্যাপারে শত্রু পক্ষের মিত্র বনী-নাদীরেরও হাত থাকত। তেমনি নাদীরের হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রু পক্ষের মিত্র বনী-কুরাইযারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইয়াহূদীদের দুই দলের কেউ আউস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইয়াহূদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতঃ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলতঃ কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ আচরনেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। [ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াতে 'স্পষ্ট প্রমাণ' কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। তবে অন্য জায়গায় সেটা

بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۡ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

'রূহুল কুদুস'[১] দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনি কোন রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনি তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর (নবীদের) একদলের উপর মিথ্যারোপ করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা?

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৮৮. আর তারা বলেছিল, 'আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত', বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই ঈমান আনে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ

৮৯. আর যখন তাদের কাছে যা আছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তার সত্যায়নকারী[২]

বলা হয়েছে, যেমন, "আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে' (তিনি বলবেন) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।" [সূরা আলে ইমরান: ৪৯]

(১) কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-কে 'রূহুল কুদুস' বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আশ-শু'আরা: ১৯৩, সূরা মারইয়াম: ১৭।

(২) এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, তারা তাকে জানতে ও চিনতে পেরেছে। তার সপক্ষে বহু তথ্য-প্রমাণ সে যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইয়াহূদী আলেমের মেয়ে এবং আরেকজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনা আগমনের পর আমার বাবা ও চাচা দু'জনেই তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনিঃ চাচা বললেন, আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে, ইনি কি সত্যিই সেই নবী? পিতা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, ইনিই সেই নবী।

لِمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

কিতাব আসলো; অথচ পূর্বে তারা এর সাহায্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত, তারপর তারা যা চিনত যখন তা তাদের কাছে আসল, তখন তারা সেটার সাথে কুফরী করল(১)। কাজেই কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

৯০. যার বিনিময়ে তারা তাদের নিজদেরকে বিক্রি করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট! তা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তার সাথে কুফরী করেছে, হটকারিতাবশতঃ শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ নাযিল করেন।

চাচা বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত? পিতা বললেন, হ্যাঁ। চাচা বললেন, তাহলে এখন কি করতে চাও? বাবা বললেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাব। [দালায়েলুন নাবুওয়াহ লিল বাইহাকী, সীরাতে ইবনে হিসাম]

(১) নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমণের পূর্বে ইয়াহূদীরা তাদের পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর আগমনবার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দো'আ করত তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইয়াহূদী জাতির উন্নতি ও পুনরুত্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইয়াহূদী সম্প্রদায় নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করত, মদীনাবাসীরা নিজেরাই এর সাক্ষী। যত্রতত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতঃ ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের উপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালিমদের সবাইকে দেখে নেব। মদীনাবাসীরা এসব কথা আগের থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ দেখ, ইয়াহূদীরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এ নবীর দ্বীন গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চল, তাদের আগে আমরাই এ নবীর উপর ঈমান আনব। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল, যে ইয়াহূদীরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তার সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিণত হল। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৬৭, তাফসীর ইবনে কাসীর]

কাজেই তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে[১]। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি[২]।

৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো', তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি'। অথচ এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলুন, 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্‌র

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

---

(১) এখানে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়। তবে ইকরিমাহ বলেন, তাদের উপর এক ক্রোধ হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালামের উপর কুফরী করার কারণে, আর অন্য ক্রোধ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুফরীর কারণে। তাছাড়া শাস্তির সাথে অপমানজনক পদ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির আরেক কারণ হচ্ছে, তাদের অহঙ্কার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের সুরতে পিপড়ার মত করে জমায়েত করা হবে। ছোট সব কিছুই তাদের উপর থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জাহান্নামের এক কয়েদখানায় প্রবিষ্ট করানো হবে যার নাম হচ্ছে, বুলস। যাবতীয় আগুন তাদের উপরে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামবাসীদের পুঁজ 'তীনাতুল খাবাল' থেকে পান করানো হবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৯]

(২) আয়াতে উল্লেখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলেই মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভংগের অপরাধে বনী-কুরাইযা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নাদীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

নবীদেরকে হত্যা করেছিলে[১]?'

৯২. অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ[২] এসেছিলেন,

وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾

(১) 'আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না,' ইয়াহূদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা (তাওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে'। - এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিস্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআনুল কারীম, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআনুল কারীমকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র সকল গ্রন্থের মতেই নবীদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন নবীকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরী করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তির দ্বারা ইয়াহূদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াতে 'স্পষ্ট প্রমাণ' কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে সেটা এসেছে। যেমন, বলা হয়েছে, " তারপর আমরা তাদেরকে তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা অহংকারীই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৩৩] আরও বলা হয়েছে, "তারপর মূসা তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল এবং তিনি তাঁর হাত বের করলেন আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগল" [সূরা আল-আ'রাফ: ১০৭-১০৮] আরও এসেছে, "তারপর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল" [সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩] অনুরূপ আরও কিছু আয়াতে।

তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিলে। বাস্তবিকই তোমরা যালিম[১]।

৯৩. স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) 'যা দিলাম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং শোন'। তারা বলেছিল, 'আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম'। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎসপ্রীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। বলুন, 'যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!'

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. বলুন, 'যদি আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর---যদি সত্যবাদী হয়ে থাক'।

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানী।

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

---

(১) ইয়াহূদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শির্কে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কেই নয়, আল্লাহ্‌কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কুরআন নাযিলের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে যেসব ইয়াহূদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. আর আপনি অবশ্যই তাদেরকে জীবনের প্রতি অন্যসব লোকের চেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবেন, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও । তাদের প্রত্যেকে আশা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত; অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে নিস্কৃতি দিতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা ।

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৭. বলুন, 'যে কেউ জিব্‌রীলের[১] শত্রু হবে, এজন্যে যে, তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আপনার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবেরও সত্যায়ণকারী এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'[২] ।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'জিবরীল' শব্দটি আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এর মতই । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি কারণ এই বলা হয় যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাশেম! আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, যদি সেগুলোর জবাব আপনি দিতে পারেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করব, আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দিব এবং আপনার উপর ঈমান আনব । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যেমন ইয়া'কুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তিনি বলেন, "আমরা যা বলছি তাতে আল্লাহ্‌ই কর্মবিধায়ক" [সূরা ইউসুফ:৬৬] তখন তারা বলল, আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলামত কি বলুন । রাসূল বললেন, "তার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না" । তারা বলল, কিভাবে একজন নারী মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয় আর কিভাবে পুরুষ সন্তানের জন্ম দেয়? রাসূল বললেন, দুই বীর্য মিলিত হওয়ার পরে যদি মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের চেয়ে বেশী প্রাধান্য বিস্তারকারী হয় তবে মেয়ে সন্তান হয় । আর যদি পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তবে পুত্র সন্তান হয় । তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন । ---- তারা বলল, ইসরাঈল (ইয়াকুব) কোন

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

৯৮. 'যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিব্‌রীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের শত্রু[১]' ।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ

৯৯. আর অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ

১০০. এটা কি নয় যে, তারা যখনই কোন অংগীকার করেছে তখনই তাদের

বস্তুকে তার নিজের উপর হারাম করেছেন সেটা আমাদের জানান। তিনি বললেন, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বেদুইন এলাকায় বাস করতেন। তখন তার 'ইরকুন নিসা' নামক রোগ হয়। ফলে তিনি দেখলেন যে, উটের গোস্ত ও দুধ তার জন্য এ রোগের কারণ হয়েছে, তখন তিনি সেটা নিজের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা বলল, আপনার কাছে কোন ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসে তার সম্পর্কে আমাদের জানান। কেননা, প্রত্যেক নবীর কাছেই কোন না কোন ফেরেশতা তার রবের কাছ থেকে ওহী ও রিসালত নিয়ে আগমন করে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গীটি কে? এটি বাকী রয়েছে। যদি এটা বলেন তো আমরা আপনার অনুসরণ করব। রাসূল বললেন, তিনি তো জিবরীল। তারা বলল, এই তো সে যে যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে আসে। সে ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে আমাদের শত্রু। আপনি যদি বলতেন যে, তিনি মীকাইল, তবে আমরা আপনার অনুসরণ করতাম। কারণ তিনি বৃষ্টি ও রহমত নিয়ে আসে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭৪, তিরমিযী: ৩১১৭] আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কেউ জিবরীলের শত্রু হবে; সে শুধু এজন্যই শত্রু হবে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে যার উপর ইচ্ছা ওহী নিয়ে অবতরণ করে থাকেন। যারা আল্লাহ্‌র ফেরেশতা ও তার বিধানের বিরোধিতার জন্য জিবরীলের সাথে শত্রুতা করবে তার ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা ফেরেশ্‌তাদের উপর ঈমান আনবে না তারা কাফের। ফেরেশ্‌তারা হলো নূরের তৈরী। যারা কোন অপরাধ করে না। তারা আগবাড়িয়ে কিছু করে না। তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তাই শুধু তারা পালন করে। সুতরাং যারা ফেরেশ্‌তাদের সাথে শত্রুতা করে, তারা মূলতঃ আল্লাহ্‌র সাথেই শত্রুতা করল।

أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

কোন এক দল তা ছুঁড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

১০১. আর যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন, তাদের কাছে যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্র কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলল, যেন তারা জানেই না।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

১০২. আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্তাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরী করো না'[১]।

(১) জাদু এমন এক বিষয়কে বলা হয়, যার উপকরণ নিতান্ত গোপন ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। জাদু এমন সব গোপনীয় কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা দৃষ্টির অগোচরে থাকে। জাদুর মধ্যে মন্ত্রপাঠ, ঝাড়ফুঁক, বাণী উচ্চারণ, ঔষধপত্র ও ধুম্রজাল - এসব কিছুর সমাহার থাকে। জাদুর বাস্তবতা রয়েছে। ফলে মানুষ কখনো এর মাধ্যমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো নিহতও হয় এবং এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি করা যায়। তবে এর প্রতিক্রিয়া তাকদীরের নির্ধারিত হুকুম ও আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে। এটা পুরোপুরি শয়তানী কাজ। এ প্রকার কাজ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। দু'টি কারণে জাদু শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (এক) এতে শয়তানদের ব্যবহার করা হয়। তাদের

তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ

সাথে সম্পর্ক রাখা হয় এবং তাদের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করা হয়। (দুই) এতে গায়েবী ইলম ও তাতে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক হবার দাবী করা হয়। আবার কখনো কখনো জাদুকরকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। এ সবগুলোই মূলতঃ ভ্রষ্টতা ও কুফরী। তাই কুরআনুল কারীমে জাদুকে সরাসরি কুফরী-কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জিযার পার্থক্যঃ নবীগণের মু'জিযা দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার। মু'জিযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জিযা ও জাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মু'জিযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহ্‌ভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

নবীগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। নবীগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নবীগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। [দেখুন, বুখারী: ৩২৬৮, মুসলিম: ২১৮৯] তাছাড়া, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এরও জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার ঘটনা কুরআনেই উল্লেখিত রয়েছে ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ এবং ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ [ত্বাহাঃ ৬৬-৬৭] জাদুর কারণেই মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। [মা'আরিফুল কুরআন]

ঘটাতো[১]। অথচ তারা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রাপ্ত সওয়াব নিশ্চিতভাবে (তাদের জন্য) অধিক কল্যাণকর হত, যদি তারা জানত!

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

১০৪. হে মুমিনগণ! তোমরা 'রা'এনা'[২]

(১) এ ব্যাপারে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইবলীস তার চেয়ারটি পানির উপর স্থাপন করে। তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে। যে যত বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারবে তার কাছে তার মর্যাদা তত নৈকট্যপূর্ণ। তার বাহিনীর কেউ এসে বলে যে, আমি এই এই করেছি, সে বলে যে, তুমি কিছুই করনি। তারপর আরেক জন এসে বলে যে, আমি এক লোককে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ও তার স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কচ্যুতি না ঘটিয়েছি ততক্ষণ তাকে ছাড়িনি। তখন শয়তান তাকে তার কাছে স্থান দেয় এবং বলে, হ্যাঁ, তুমি।" অর্থাৎ তুমি একটা বিরাট করে এসেছ। [মুসলিম: ২৮১৩]

(২) رَاعِنَا বা 'রা'এনা' শব্দটি আরবী ভাষায় নির্দেশসূচক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন'। সাহাবাগণ এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। কিন্তু এ শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় এক প্রকার গালি ছিল, যা দ্বারা বুঝা হতো বিবেক বিকৃত লোক। তারা এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে উপহাসসূচক ব্যবহার করত। মুমিনরা এ ব্যাপারটি উপলব্ধি না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে ব্যবহার করা শুরু করে, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরণের কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে আয়াত

وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

বলো না, বরং 'উনযুরনা'[১] বলো এবং শোন। আর কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

১০৫. কিতাবীদের[২] মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হোক। অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে নিজ রহমত দ্বারা বিশেষিত করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১০৬. আমরা কোন আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে তা থেকে উত্তম অথবা তার সমান কোন আয়াত এনে

নাযিল করেন। অন্য আয়াতে এ ব্যাপারটিকে ইয়াহূদীদের কুকর্মের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং বলে, 'শুনলাম ও অমান্য করলাম' এবং শোনে না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 'রা'এনা'। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর', তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সংগত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।" [সূরা আন-নিসা: ৪৬]

(১) এ শব্দটির অর্থ 'আমাদের প্রতি তাকান'। এ শব্দের মাঝে ইয়াহূদীদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এ ধরণের শব্দ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, অমুসলিম তথা বাতিল পন্থীরা যে সমস্ত দ্ব্যর্থমূলক শব্দ এবং সন্দেহমূলক বাক্য ব্যবহার করে থাকে, সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে।

(২) আহলে-কিতাব শব্দদ্বয়ের অর্থ কিতাবওয়ালা বা গ্রন্থধারী। আল্লাহ্ তা'আলা আহলে-কিতাব বলে তাদেরকেই বুঝিয়েছেন, যাদেরকে তিনি ইতঃপূর্বে তাঁর পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত সম্বলিত গ্রন্থ প্রদান করেছেন। ইয়াহূদী এবং নাসারারা সর্বসম্মতভাবে আহলে কিতাব। এর বাইরে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন জাতিকে কিতাব দিয়েছেন বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি।

দেই[১]। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্‌ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

১০৭. আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র? আর আল্লাহ্‌ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, নেই সাহায্যকারীও।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল[২]? আর

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ

(১) এই আয়াতে কুরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত হয়েছে। অভিধানে ‘নস্‌খ’ শব্দের অর্থ দূর করা, লেখা, স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া। আয়াতে ‘নস্‌খ’ শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা - অর্থাৎ রহিত করাকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে ‘নস্‌খ’ বলা হয়। ‘অন্য বিধান’ টি কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে। [ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তার সাথীরা কি চেয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। সেটা অন্য আয়াতে বিস্তারিত এসেছে। বলা হয়েছে, “কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে; তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, ‘আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখাও।” [সূরা আন-নিসাঃ ১৫৩] অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, রাফে‘ ইবনে হারিমলাহ এবং ওয়াহাব ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, হে মুহাম্মদ! আমাদের জন্য একটি কিতাব আসমান থেকে নাযিল করে আন, যা আমরা পড়ে দেখব। আর আমাদের জন্য যমীন থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দাও। যদি তা কর তবে আমরা তোমার অনুসরণ করব ও তোমার সত্যয়ন করব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযথা প্রশ্ন করা উচিত নয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ঐ মুসলিম সবচেয়ে বড় অপরাধী, যে হারাম নয় এমন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে সেটি হারাম করে দেয়া হয়।” [বুখারীঃ ৭২৮৯, মুসলিমঃ ২৩৫৮] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন “যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে কিছু না বলি ততক্ষণ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

যে ঈমানকে কুফরে পরিবর্তন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ হারাল।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)। অতএব, তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর কোন নির্দেশ দেন(১)-- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

১১০. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পেশ করবে আল্লাহ্‌র কাছে তা পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا

১১১. আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো

তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছিল"। [বুখারী: ৭২৮৮, মুসলিম: ১৩৩৭]

(১) তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ নাযিল করেন। অতঃপর ইয়াহূদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়। সূরা আত-তাওবাহ এর ৫ ও ২৯ নং আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াতের এ ক্ষমার বিধান রহিত করা হয়। [তাবারী]

جَنَّاتে প্রবেশ করবে না'[১]। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর'।

اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾

১১২. হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয়[২] তার প্রতিদান তার

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। নাসারা ও ইয়াহূদী উভয় সম্প্রদায়ই দ্বীনের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতী ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে, এরা জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন। জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত উপায় পরবর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

(২) আল্লাহ্‌র কাছে কোন বান্দার আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ এক. ইখলাস তথা বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করবে। দুই. রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ। অর্থাৎ যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও 'ইবাদাত নিজের খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এ ক্ষেত্রেও আনুগত্য ও 'ইবাদাতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন। প্রথম বিষয়টি ﴿بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ﴾ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, আখেরাতের মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু ইখলাসই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম। আল্লাহ্‌র ইখলাস ও রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে মানুষের অবস্থান চার পর্যায়েঃ

ক) কারো কারো ইখলাস নেই, রাসূলের আনুগত্যও নেই, সে ব্যক্তি মুশরিক, কাফের।

খ) কারো কারো ইখলাস আছে, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য নেই, সে ব্যক্তি বিদ'আতকারী।

গ) কারো কারো ইখলাস নেই, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য আছে (প্রকাশ্যে), সে ব্যক্তি মুনাফেক।

يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

রব-এর কাছে রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَىْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. আর ইয়াহূদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই' এবং নাসারারা বলে, 'ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব পড়ে। এভাবে যারা কিছুই জানেনা তারাও একই কথা বলে[১]। কাজেই যে বিষয়ে তারা

ঘ) কারো কারো ইখলাসও আছে, রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণও আছে, সে ব্যক্তি হলো প্রকৃত মুমিন। [তাজরীদুত তাওহীদিল মুফীদ]

(১) ইয়াহূদী হোক অথবা নাসারা কিংবা মুসলিম - যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে। প্রত্যেক নবীর শরী'আতেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তাওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তাওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তা'ই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই ছিল সৎকর্ম, যা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও ইঞ্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কুরআনের যুগে ঐসব কাজ-কর্মই সৎকর্মরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী এবং তার মাধ্যমে আসা গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের হেদায়াতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইয়াহূদী ও নাসারাদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলছে, তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। ভুল বুঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, ওরা দ্বীনের আসল প্রাণ ও বিশ্বাস, সৎকর্মকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইয়াহূদী আর কোন সম্প্রদায়কে নাসারা নামে অভিহিত করেছে।

কুরআনুল কারীমে আহলে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্‌র ফয়সালা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলিম, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম মুসলিমদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদেরকে

মতভেদ করতো কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে (সে বিষয়ে) মীমাংসা করবেন।

১১৪. আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং এগুলো বিরাণ করার চেষ্টা করে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি[১]।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

মুসলিম বলি, সুতরাং জান্নাত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুসলিমদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই। এ ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলিমরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলিমের ঔরসে কিংবা মুসলিমদের আবাসভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলিম হয় না, বরং মুসলিম হওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়তঃ সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

(১) ইসলাম-পূর্বকালে ইয়াহূদীরা ইয়াহ্ইয়া 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করলে নাসারারা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে ইয়াহূদীদের উপর আক্রমণ চালায় - তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদ্দাসে আবর্জনা ও শুকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন করে দেয়। এতে ইয়াহূদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তারই নির্দেশক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস মুসলিমদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মুকাদ্দাস মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় নাসারাদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ট শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়্যুবী বায়তুল-মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন। এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা ও বিধানও প্রমাণিত হয়।

১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই; সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্র দিক[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী,

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে-নব্বীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। এক সালাতের সওয়াব মসজিদে হারামে একলক্ষ সালাতের সমান এবং মসজিদে নব্বীতে এক হাজার সালাতের সমান। আর বায়তুল-মুকাদ্দাস মসজিদে পাঁচশত সালাতের সমান। এই তিন মসজিদে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায় করা উত্তম মনে করে দূর-দুরান্ত থেকে সফর করে আসা জায়েয নেই।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিকর ও সালাতে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে সালাত আদায় ও তিলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের সালাত আদায় ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে সালাত আদায় করার জন্য কেউ আসে না কিংবা সালাত আদায়কারীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

(১) وَجْهُ اللّٰهِ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র চেহারা। মুসলিমদের আকীদা বিশ্বাস হলো এই যে, আল্লাহ্র চেহারা রয়েছে। তবে তা সৃষ্টির কারও চেহারার মত নহে। কিন্তু এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - সকল দিকই যেহেতু আল্লাহ্র সুতরাং মুসল্লী পূর্ব ও পশ্চিম যেদিকেই মুখ ফিরাক না কেন। সেদিকেই আল্লাহ্র কিব্লা রয়েছে। কেউ কেউ এ আয়াতটিকে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত মুখমণ্ডল বা চেহারা সাব্যস্ত করার জন্য দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। মূলতঃ এ আয়াতটিতে 'ওয়াজ্হ' শব্দটি দিক বা কেবলা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ্ এ আয়াতটিকে সিফাতের আয়াতের মধ্যে গণ্য করাকে ভুল আখ্যায়িত করেছেন। [দেখুন - মাজমু' ফাতাওয়াঃ ২/৪২৯, ৩/১৯৩, ৬/১৫-১৬]

কোন কোন মুফাস্সির ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ আয়াতকে এই নফল সালাতেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের

সর্বজ্ঞ[১] ।

১১৬. আর তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন' । তিনি (তা থেকে) অতি পবিত্র[২] । বরং আসমান ও যমীনে যা

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন । পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল সালাতেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে । তবে সালাতরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে সে অবস্থায়ই সালাত পূর্ণ করবে । এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে সালাত আদায়কারীর জানা না থাকলে, রাতের অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও সালাত আদায়কারী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে । [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এখানে কেবলামুখী হওয়ার সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্) বায়তুল্লাহ্ অথবা বায়তুল- মুকাদ্দাসের পূজা করা নয় । সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর কাছে অতি ছোট । এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে । আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্‌র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথমে বলা হয়েছে, তিনি وَاسِعٌ এ শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে । এক. প্রাচুর্যময়; অর্থাৎ তাঁর দান অপরিসীম । তিনি যাকে ইচ্ছা তার কর্মকাণ্ড দেখে বিনা হিসেবে দান করবেন । পূর্ব বা পশ্চিম তাঁর কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য নয় । তিনি দেখতে চাইছেন যে, কে তার কথা শুনে আর কে শুনে না । দুই. وَاسِعٌ শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, সর্বব্যাপী । অর্থাৎ তিনি যেহেতু সবদিক ও সবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন সুতরাং তাঁর জন্য কোন কাজটি করা হল সেটা তিনি ভাল করেই জানেন । সে অনুসারে তিনি তাঁর বান্দাকে পুরস্কৃত করবেন । এ অর্থের সাথে পরে উল্লেখিত দ্বিতীয় গুণবাচক নাম عَلِيْمٌ শব্দটি বেশী উপযুক্ত ।

(২) নাসারারা বলে থাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সন্তান গ্রহণ করেছেন । অথচ এটা সম্পূর্ণ একটি অপবাদ । কুরআনের অন্যত্র এসেছে, 'তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে । অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না' । [সূরা মার্‌ইয়ামঃ ৯১-৯৩] এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ বলেন, মানুষ আমার উপর মিথ্যারোপ করে, অথচ তাদের এটা উচিত নয় । মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ তাও তাদের জন্য উচিত নয় । মিথ্যারোপ করার অর্থ হলো, তারা বলে, আমি তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করে পূর্বের ন্যায় করতে সক্ষম নই । আর গালি

কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৭. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবক। আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর যারা কিছু জানে না তারা[১] বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কেন আসে না কোন আয়াত?' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মত কথা বলতো। তাদের অন্তর একই রকম[২]। অবশ্যই আমরা আয়াতসমূহকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি, এমন কওমের জন্য, যারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

দেয়ার অর্থ হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা থেকে আমি পবিত্র।" [বুখারীঃ ৪৪৮২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "কষ্টদায়ক কথা শুনার পর আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই, মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, তারপরও তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন ও রিযিক দেন।" [বুখারী: ৭৩৭৮, মুসলিম: ২৮০৪]

(১) এদের সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। এক. এরা হচ্ছে, ইয়াহূদী সম্প্রদায়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইবনে হারীমলাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, হে মুহাম্মদ যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক তবে আল্লাহ্‌কে বল আমাদের সাথে কথা বলতে যাতে করে আমরা তার কথা শুনতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। দুই. মুজাহিদ বলেন, এরা হচ্ছে, নাসারা সম্প্রদায়। তিন. কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, এরা হচ্ছে আরবের কাফের সম্প্রদায়। ইবনে কাসীর এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোন অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করেনি, যা এর আগের পথভ্রষ্টরা করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে। বার বার একই ধরণের সন্দেহ-সংশয়, অভিযোগ ও প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিই সে করে চলছে।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

১১৯. নিশ্চয় আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে[১]।আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

১২০. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত'। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও।

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ ۗ

১২১. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি[২],

(১) এখানে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণে ভূষিত করা হয়েছে। প্রথম. 'আল-মুরসাল বিল হক্ক' বা যথাযথভাবে প্রেরিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং তার রাসূল প্রেরণের উপর সাক্ষী হচ্ছেন যে, তিনি তাকে যথাযথভাবে হক সহ প্রেরণ করেছেন। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি 'বাশীর' বা সুসংবাদ প্রদানকারী। তিনি নেককারদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী। তৃতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি 'নাযীর' বা ভীতিপ্রদর্শনকারী। যারা তার অবাধ্য হবে তারা জাহান্নামবাসী হবে এ ভীতিপ্রদ সংবাদ তিনি সবাইকে প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরূপ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [সূরা আল-ইসরা: ১০৫, আল-ফুরকান: ৫৬] আরও বলা হয়েছে, ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [সূরা সাবা: ২৮] আরও এসেছে, ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [সূরা ফাতির: ২৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ [সূরা আল-মুযযাম্মিল: ১৫] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণটি শুধু কুরআনে নয়; পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, বুখারী: ২১২৫, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৪]

(২) কাতাদাহ বলেন, এখানে ইয়াহূদী ও নাসারাদের বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে[১], তারা তাতে ঈমান আনে। আর যারা তার সাথে কুফরী করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে ইস্‌রাঈল-বংশধররা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (তৎকালীন) সৃষ্টিকুলের সবার উপর।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর তোমরা সেদিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন কোন সত্তা অপর কোন সত্তার কোন কাজে আসবে না। কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

---

(১) যথাযথভাবে তিলাওয়াতের অর্থ, তিলাওয়াতের হক আদায় করা। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ যখন জান্নাতের বর্ণনা আসবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জান্নাত চাওয়া। আর জাহান্নামের বর্ণনা আসলে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি চাওয়া। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ, এগুলোর হালালকে হালাল হিসেবে নেয়া। আর হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করা। যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে পড়া। সেগুলোর কোন অংশকে বিকৃত না করা এবং সঠিক ব্যাখ্যার বিপরীতে কোন বাজে ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করা। মোটকথা: আল্লাহ্‌র আয়াতকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করাই এর যথাযথ তেলাওয়াত বলে বিবেচিত হবে। [ইবনে কাসীর] যথাযথ তেলাওয়াতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, ইয়াহূদী ও নাসারাদের যে কেউ আমার কথা শোনার পর আমার উপর ঈমান আনবে না, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে"। [মুসলিম: ১১৫৩]

وَاِذِ ابۡتَلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیۡ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ؕ قَالَ

১২৪. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীমকে তাঁর রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন(১), অতঃপর তিনি সেগুলো

(১) যে যে বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কুরআনে শুধু كَلِمَاتٍ (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সাহাবী ও তাবে'য়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মুল্যবান পোষাক উপহার দেয়া। তাই তাকে বিভিন্ন রকমের কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমনকি তার আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিপরীত একটি সনাতন দ্বীন তাকে দেয়া হয়। জাতিকে এ দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোর গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি নবীসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তিপূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ্ নমরূদ ও তার পরিবারবর্গ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্‌র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন, 'হে আগুন! ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।' [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৬৯]

এ পরীক্ষা শেষ হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র জন্মভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন। সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, স্ত্রী হাজেরা ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-কে সংগে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। [ইবনে কাসীর] জিবরীল 'আলাইহিস্ সালাম আসলেন এবং তাদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে যখন শুস্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্‌র বন্ধু তার রবের ভালবাসায় এ জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই তাদের

থাকতে বললেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশ পেলেন যে, স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যান। আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি' - স্ত্রীকে একটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হাজেরা তাকে চলে যেতে দেখে বললেন, 'আপনি কি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ পেয়েছেন?' ইবারাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, 'হ্যাঁ'। আল্লাহ্র নির্দেশের কথা জানতে পেরে হাজেরা বললেন, 'যান, যে প্রভূ আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না'। [বুখারীঃ ৩৩৬৪]

অতঃপর হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। সাথের সংরক্ষিত পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় এক সময় দারুন পিপাসা তাকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার উঠা-নামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষও দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাতবার ছুটোছুটি করে তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হাজেরা যখন নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম আগমন করলেন এবং শুস্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। [বুখারীঃ ৩৩৬৫] বর্তমানে এ ধারার নামই যম্যম্। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব পত্রও সংগৃহীত হল।

ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেল। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র ইংগিতে মাঝে মাঝে এসে স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়?' পিতৃভক্ত বালক বলল, পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ্ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন"। [সূরা আস্-সাফ্ফাতঃ ১০২] এর পরবর্তী ঘটনা সবার জানা আছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয় আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাবো'(১)। তিনি বললেন,

পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত থেকে এর পরিপূরক নাযিল করে তা কুরবানী করার আদেশ দিলেন। এই রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]
এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-কে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতাও তার উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিত্‌রাত' বা প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত, ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা আল-বারাআতে, দশটি সূরা আল-মুমিনূনে এবং দশটি সূরা আল-আহ্‌যাবে বর্ণিত হয়েছে।' [ইবনে কাসীর] ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু'আনহুমার উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলিমদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কুরআনে উল্লেখিত كلمات যেসব বিষয়ে খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে।

(১) এ আয়াত দ্বারা একদিকে বুঝা গেল যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে সাফল্যের প্রতিদানে মাবনসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় সূরা আল-বারাআত বা আত-তাওবার ১১২ নং আয়াত, সূরা আল-মুমিনূন এর ১-১১ এবং সূরা আল-আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুনান্বিত হওয়া শর্ত। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "যখন তারা সবর করলো এবং আমার নিদর্শনাবলীতে নিশ্চিত বিশ্বাসী হল, তখন আমরা তাদেরকে

'আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?' (আল্লাহ্) বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদেরকে পাবে না[১]।

১২৫. আর স্মরণ করুন[২], যখন আমরা কা'বাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র[৩]

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ

নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে"। [সূরা আস-সাজদাহ:২৪] এই আয়াতে বর্ণিত صَبر হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা। আর يَقِين হলো কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা। কারও মধ্যে এগুলোর পূর্ণতার ভিত্তিতেই নেতৃত্বের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

(১) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নবী ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তার সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে খলীলুল্লাহ্‌র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও যালিম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। সন্তানদের জন্য এ দো'আর মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য-মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর এ দো'আটিও কবুল হয়েছে। তার বংশধরদের মধ্যে কখনো সত্যদ্বীনের অনুসারী ও আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনো ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন, যায়েদ ইবনে আমর, ওরাকা ইবন নওফাল এবং কেস ইবন সায়েদা প্রমূখ।

(২) এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ও ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক কা'বা গৃহের নির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর কিছু বর্ণনা আসছে।

(৩) مثابةً শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বার বার তার দিকে ফিরে যেতে আকাংখী হবে। মুফাস্‌সির মুজাহিদ বলেন, 'কোন মানুষ কা'বা গৃহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারই

مَقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

ও নিরাপত্তাস্থল[১] করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর[২]। আর ইব্‌রাহীম ও

যিয়ারতের অধিক বাসনা নিয়ে ফিরে আসে'। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন আলেমের মতে, কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছার জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(১) أمناً শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ শান্তির আবাসস্থল। আর بيت শব্দের অর্থ ঘর। তবে এখানে শুধু কা'বাগৃহ উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্পূর্ণ মসজিদুল হারাম। কুরআনে بيت الله ও كعبة বলে সমগ্র হারাম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ "তারপর তাদের যবাইয়ের স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির কাছে" [সূরা আল-হাজ্জ:৩৩] কারণ, এতে কুরবানী যবাই করার কথা আছে। কুরবানী কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমরা কা'বার হারাম শরীফকে শান্তির আলয় করেছি'। শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(২) এখানে মাকামে ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু'জিযা হিসেবে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পদচিহ্ন অংকিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। [সহীহ্ আল-বুখারী] আনাস রাদিয়াল্লাহু'আনহু বলেন, আমি এই পাথরে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যিয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু'আনহুমা থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হারাম শরীফই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তাওয়াফের পর যে দু'রাকাআত সালাত মাকামে ইবরাহীমে আদায় করার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হারাম শরীফের যে কোন অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত।

ইস্‌মা'ঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য[১] আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে[২] ।

আয়াতে মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তাওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন যে, কা'বা ছিল তার সম্মুখে এবং কা'বা ও তার মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। [দেখুন, সহীহ্ মুসলিম: ১২১৮] আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাআত সালাত ওয়াজিব।

(১) শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা'বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তাওয়াফ, ই'তেকাফ ও সালাত। দ্বিতীয়তঃ তাওয়াফ আগে আর সালাত পরে। তৃতীয়তঃ ফরয হোক কিংবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোন সালাত আদায় করা বৈধ।

(২) এখানে কা'বাগৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরে বসে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভূ, মা'বুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ নির্দেশে بيتى শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾ উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু'আনহু মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন - তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, জান না? অর্থাৎ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। [মা'আরিফুল কুরআন]

১২৬. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, 'হে আমার রব! এটাকে নিরাপদ শহর করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে[১] তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন'। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব, তারপর তাকে আগুনের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

১২৭. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইস্মা'ঈল কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তারা বলছিলেন) 'হে আমাদের রব[২]! আমাদের পক্ষ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

(১) আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দো'আ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এক দো'আয় যখন ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় বংশধরের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ দো'আ কবুল হল, যালিম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দো'আটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দো'আ। খলীল 'আলাইহিস্ সালাম ছিলেন আল্লাহ্র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও আল্লাহ্ভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দো'আর শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দো'আ শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ﴿وَمَن كَفَرَ﴾ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের-মুশরিক হয়। তবে মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা আখেরাতে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে লক্ষণীয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম رب শব্দ দ্বারা দো'আ আরম্ভ করেছেন। তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দো'আ করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈলকে বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

থেকে কবুল করুন[১]। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

১২৮. 'হে আমাদের রব! আর আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আর আমাদেরকে 'ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে

ইসমাঈল বললেন, আপনার রব আপনাকে যা নির্দেশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম বললেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম পাশের একটি উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে 'এখানে' একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, তারপর তারা দু'জনে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে তা উঁচু করছিলেন। ইসমাঈল পাথর নিয়ে আসতেন আর ইবরাহীম ঘর বানাতেন। তারপর যখন ঘর উঁচু হয়ে গেল তখন ইসমাঈল এ পাথরটি এনে ইবরাহীমের পায়ের নীচে রাখলেন। তখন ইবরাহীম তাতে দাঁড়িয়ে ঘর বানাতে থাকলেন। এমতাবস্থায় তাদের মুখ থেকে এ দো'আ বের হচ্ছিল।" [বুখারী: ৩৩৬৪]

(১) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূ-খণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুস্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী ইবাদাতকারীর অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তার ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্‌র এমন একজন বন্ধু যিনি আল্লাহ্‌র প্রতাপ এবং মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহ্‌র উপযুক্ত 'ইবাদাত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দো'আ করা প্রয়োজন যে, হে আমার রব! আমার এ আমল কবুল হোক। কা'বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসংগে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাই বলেছেন, ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ - হে রব! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমতা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করেছেন।

দিন[১] এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই বেশী তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১২৯. 'হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান[২], যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন[৩]; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

(১) আয়াতে বর্ণিত مَنَاسِك এর অর্থ ইবাদাতও হয়, যেমনটি উপরে করা হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, হজের নিয়মাবলী। [তাবারী]

(২) হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি, আমার পিতা ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আ, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদ এবং আমার মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হল, যে আলোতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়েছে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৬২] ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদের অর্থ তার এ উক্তি ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ "আমি এমন এক নবীর সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তার নাম আহমাদ"। [সূরা আস্-সাফঃ ৬] তার জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তার পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসংগে দু'জায়গায়, সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আয় উল্লেখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইংগিত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যে নবীর জন্য দো'আ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

(৩) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আর কারণে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য তিনটি। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার একান্ত কর্তব্য। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব বলেন, 'আল্লাহ্‌র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তিলাওয়াত বলা যায় না'। [মুফরাদাতুল কুরআন]

দেবেন[১] এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন[২]। আপনি তো পরাক্রমশালী,

(১) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ অনুসারে নবী-রাসূলগণের বিশেষ করে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান। এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্‌র কিতাব বুঝানো হয়েছে। 'হিকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা - সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। ইমাম রাগেব বলেন, এ শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান ও সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য কথা ইত্যাদি। এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হিকমতের অর্থ কি? মূলত: এখানে হিকমত শব্দের অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর রাহিমাহুল্লাহ্ কাতাদাহ্ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হিকমত অর্থ কেউ কুরআনের তাফসীর, কেউ দ্বীনের গভীর জ্ঞান, কেউ শরী'আতের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ।

(২) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ অনুসারে নবী-রাসূলগণ বিশেষ করে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকরণ। আয়াতে উল্লেখিত يُزَكِّيهِمْ শব্দটি زكاة শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সকল প্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শির্ক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, দুনিয়াপ্রীতি ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে এসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হেদায়াত ও সংশোধনের ধারা দু'টি, আল্লাহ্‌র রাসূল ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থ। এ দু'টি ব্যতীত কারও হেদায়াত লাভ হতে পারে না।

এ আয়াতসমূহে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম অনেকগুলো দো'আ করেছিলেন (১) "আপনার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। আপনি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন - যাতে এখানে বসবাস করা আতংকজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়"। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেছেন এবং সে উষর মরু প্রান্তর মক্কা নগরীতে পরিণত হয়েছে। (২) "হে রব! শহরটিকে শান্তির ভূমি করে দিন"। অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখুন। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই দো'আও কবূল হয়েছে। মক্কা মুকার্‌রামা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চারদিক

প্রজ্ঞাময়'।

থেকে মুসলিমগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা হারাম শরীফের চতুঃসীমানায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। (৩) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর তৃতীয় দো'আ এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসেবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা-মুকার্‌রমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম -নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমের দো'আ কবুল করেন। মক্কার কাছেই তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়। এখনো সারা বিশ্ব থেকে ফলমূল মক্কায় নিয়ে আসা হয়। (৪) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর চতুর্থ দো'আ হচ্ছে, "হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি উত্থিত করুন। আমাদেরকে 'ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হোন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। এ দো'আটিও ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দো'আ করেন যে, আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন। কারণ, আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে তত বেশী অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। এ দো'আতে স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, যিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন, তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু আন্তরিকতা ও ভালবাসা রাখেন। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা শারিরিকের চাইতে আত্মিক ও জাগতিকের চাইতে পরলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা করেন বেশী। এ কারণেই ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন - "আমার সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর"। (৫) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ভবিষ্যত বংশধরদের দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক মংগলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করুন - যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তিলাওয়াত করে শোনাবেন, কুরআন ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দো'আয় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই নবী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তার সন্তানদের জন্য গৌরব-এর বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ স্বগোত্র থেকে নবী হলে তার চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهٖمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্‌রাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে! দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম।

إِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ أَسْلِمْ ۙ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ করুন', তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম(১)'।

---

(১) আল্লাহ্ তা'আলার أَسْلِم - 'আনুগত্য গ্রহণ কর' সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনেরই ভঙ্গিতে أَسْلَمْتُ لَكَ - 'আমি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করলাম' বলা যেত। কিন্তু খলীলুল্লাহ্ 'আলাইহিস্ সালাম এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ অর্থাৎ আমি সৃষ্টিকুলের রবের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্র স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারও প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমনটা করাই ছিল আমার প্রতি অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন বা সৃষ্টিকুলের রব। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, মিল্লাতে ইবরাহিমীর মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত - যার অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্য। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীনের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্র এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহ্র আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত নবীর অভিন্ন দ্বীন এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। আদম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তারা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে মিল্লাতে ইবরাহিমীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার দ্বীনের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দো'আ প্রসংগে বলেছিলেনঃ 'হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈল 'আলাইহিমুস্ সালাম) মুসলিম

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও

(অর্থাৎ আনুগত্যশীল) করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একদলকে আনুগত্যকারী করুন'। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার সন্তানদের প্রতি অসীয়ত প্রসংগে বলেছিলেনঃ 'তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের উপর মৃত্যু বরণ করো না'। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পর তারই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলিম'। এ উম্মতের দ্বীনও 'মিল্লাতে ইসলামিয়াহ্' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কুরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে"। [সূরা আল-হাজ্বঃ ৭৮] দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে ইয়াহূদী, নাসারা ও আরব-এর মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহিমী দ্বীনের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীনই ইবরাহিমী দ্বীনের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যত রাসূল আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরী'আত নাযিল হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হলো রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হিদায়াতের অনুসরণ। পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলিম এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা দ্বীনের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরী'আতের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে - যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরী'আতের অনুসরণ করছে বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ। গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদ পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

না[১]' ।

(১) ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর মিল্লাত বা দ্বীন ইসলাম তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকূব 'আলাইহিমুস্ সালাম কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ অসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ এই যে, সন্তানদের ভালবাসা এবং মঙ্গলচিন্তা রিসালাত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু যিনি এক সময় তার পালনকর্তার ইংগিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কুরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য তার পালনকর্তার দরবারে দো'আও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তার দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ ইসলাম। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার দামী বস্তু। অথচ নবী-রাসূলগণের দৃষ্টি অনেক ঊর্ধ্বে। তাদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রপ্তানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায় তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চুড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়। কিন্তু নবীগণ ও তাদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তারা সত্যিকার চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বলে মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। আর সেটা হচ্ছে দ্বীন ইসলামের উপর অটুট থাকা ও এর একনিষ্ঠ খাদেম হওয়া। এ জন্য তারা দো'আ করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসীয়ত করেন। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নবী-রাসূলগণের এ বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকারের ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না। নবীদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এরপর অন্যদিকে মনোযোগ

১৩৩. ইয়া'কূবের যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার 'ইবাদাত করবে?' তারা বলেছিল, 'আমরা

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে - প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতা-মাতার সাহায্যকারী হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলেঃ "হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর"। [সূরা আত-তাহরীমঃ ৬] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল তার হেদায়াত কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ "নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন"। [সূরা আশ্-শু'আরাঃ ২১৪] আরও বলা হয়েছেঃ "পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন এবং নিজেও সালাত অব্যাহত রাখুন"। [সূরা ত্বা-হাঃ ১৩২] মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন। তৃতীয়তঃ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচারকার্যের জবাবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়শকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেলঃ "মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকবে"। [সূরা আন্-নসরঃ ২] আজকাল দ্বীনহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতা-মাতা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ও দ্বীনী হলেও সন্তানদের দ্বীনী হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানদের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

আপনার ইলাহ্‌[1] ও আপনার পিতৃ পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল ও ইসহাকের ইলাহ্‌ - সেই এক ইলাহ্‌রই 'ইবাদাত করবো। আর আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণকারী'[2]।

১৩৪. তারা ছিল এমন এক জাতি, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। আর তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না[3]।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

---

(১) ইলাহ্‌ শব্দটি মাসদার। যার অর্থ উপাস্য বা যার উপাসনা করা হয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইলাহ্‌ হলেন যাকে সবাই উপাসনা করে। [তাফসীরে তাবারীঃ ১/৫৪] ইবনে আব্বাসের এই উক্তি শুধুমাত্র হক মা'বুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ ইলাহ্‌ শব্দ দ্বারা এমন মা'বুদকে বুঝানো হয়, যিনি 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। আর যিনি মা'বুদ হওয়ার যোগ্য তাঁর মধ্যে এমন গুণ থাকা আবশ্যক যার কারণে তাঁকে সর্বোচ্চ ভালবাসা এবং সবচেয়ে বেশী বিনয় প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।

(২) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, নবীদের সবার দ্বীনই ছিল ইসলাম। এ জন্যই এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নবীগণ হচ্ছেন বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের মাতা বিভিন্ন কিন্তু তাদের দ্বীন এক।" [বুখারী: ৩৪৪৩, মুসলিম: ২৩৬৫] মাতা বিভিন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের শরী'আত বিভিন্ন। আর দ্বীন এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাওহীদের মূলনীতিসমূহে তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(৩) আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না - যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। কুরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছেঃ "একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না"। [সূরা আল-আন'আমঃ ১৬৪, আল-ইস্‌রাঃ ১৫, ফাতিরঃ ১৮, আয্‌-যুমারঃ ৭, আন্‌-নাজমঃ ৩৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হে বনী-হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন অন্যান্য লোকজন নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে

১৩৫. আর তারা বলে, 'ইয়াহূদী বা নাসারা হও, সঠিক পথ পাবে'। বলুন, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করব[১] এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি[২] নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব-এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে[৩]।

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না'। [মুসলিমঃ ২৫৪৩] অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমল যাকে পিছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না'। [মুসলিম: ২৬৯৯, আবু দাউদ: ১৪৫৫]

(১) আয়াতের আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, বরং আমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করব, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। দুটো অর্থই এখানে গ্রহণযোগ্য। [তাফসীরে ফাতহুলকাদীর]

(২) কুরআন ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরকে أَسْبَاط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سِبْط বলার কারণ এই যে, ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বারজন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে মিশরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফির'আউনের সাথে মোকাবেলার পর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন মিশর থেকে ইসরাঈল-বংশধরকে নিয়ে বের হলেন, তখন তার সাথে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের একটি গোত্র ছিল। তার বংশে আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, অনেক নবী ও রাসূল ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশেই জন্মেছে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পড়ত এবং মুসলিমদের জন্য আরবীতে অনুবাদ করে দিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা তাদেরকে সত্যায়নও করবে না, মিথ্যারোপ

আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না[১]। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী'।

১৩৭. অতঃপর তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা বিরোধিতায় লিপ্ত সুতরাং তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. আল্লাহ্‌র রং এ রঞ্জিত হও[২]। আর

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ

করবে না; বরং বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব-এর নিকট হতে দেয়া হয়েছে।" [বুখারী: ৪৪৮৫]

(১) নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হচ্ছে, কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না অথবা কাউকে মানি এবং কাউকে মানি না - আমরা তাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত সকল নবীই একই চিরন্তন সত্য ও একই সরল-সোজা পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কাজেই যথার্থ সত্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকল নবীকে সত্যপন্থী ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি এক নবীকে মানে এবং অন্য নবীকে অস্বীকার করে, সে আসলে যে নবীকে মানে তারও অনুগামী নয়। তার আসল দ্বীন হচ্ছে বর্ণবাদ, বংশবাদ ও বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ। কোন নবীর অনুসরণ তার দ্বীন নয়।

(২) আল্লাহ্‌র রং বলতে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের নিকট উদ্দেশ্য হলোঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন বা ইসলাম। সারমর্ম হলো - যা কিছু বর্ণিত হলো, তা হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন, তাঁর নবী ইবরাহীমের মিল্লাত, এটা হলো সর্বোত্তম রং। আয়াতটির দু'টি অনুবাদ হতে পারে। (এক) আমরা আল্লাহ্‌র রং ধারণ করেছি। (দুই) আল্লাহ্‌র রং ধারণ কর। নাসারাদের দ্বীনের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইয়াহূদীদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের দ্বীন গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হত। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ্ যেন ধুয়ে গেল এবং তার জীবন যেন রং ধারণ করল। পরবর্তী কালে নাসারাদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে

وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ﴿۱۳۸﴾

রং এর দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র চেয়ে কে বেশী সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ‘ইবাদাতকারী।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِی اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. বলুন, ‘আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব! আমাদের জন্য আমাদের আমল। আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল[১]; এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ[২]’।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ

১৪০. তোমরা কি বল যে, ‘অবশ্যই ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী বা নাসারা ছিল?’ বলুন, ‘তোমরা কি বেশী জান, না

এর পরিভাষিক নাম হচ্ছে -‘ইস্‌তিবাগ’ বা রঙ্গিন করা (ব্যাপ্টিজম)। তাদের দ্বীনে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপ্টাইজড করা হয় না, বরং নাসারা শিশুদেরকেও ব্যাপ্টাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই বলা হচ্ছে যে, এ লোকাচারমূলক রঞ্জিত হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

(১) তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আর আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের ‘ইবাদাতকে বিভক্ত করে থাক এবং অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তার ‘ইবাদাত ও আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদেরকে তা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আমরা বলপূর্বক তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু আমরা নিজেদের যাবতীয় ‘ইবাদাত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদি তোমরা এ কথা স্বীকার করে নাও যে, আমাদেরও এ কাজ করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহলে তো ঝগড়াই মিটে যায়।

(২) এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সৎকর্ম করা; মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

আল্লাহ্?' তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্র কাছ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য আছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৪১. তারা এমন এক উম্মাত, যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। আর তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. মানুষের মধ্য হতে নির্বোধরা অচিরেই বলবে যে, এ যাবত তারা যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরালো? বলুন, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের হিদায়াত করেন'।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

১৪৩. আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী[১] জাতিতে পরিণত করেছি,

(১) وسطاً শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সা'য়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম عدل শব্দ দ্বারা وسط এর ব্যাখ্যা করেছেন। [বুখারী: ৭৩৪৯] এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। আবার وسط অর্থ হয় মধ্যবর্তী, মধ্যপন্থী। সে হিসাবে এ আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং নবী ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ। কুরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, 'আর আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার

করে'। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮১] এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য আলোচিত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাধ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা নেই। অন্য সূরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ 'তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখবে। [সূরা আলে-ইমরান:১১০] অর্থাৎ মুসলিমরা যেমন সব নবীর শ্রেষ্ঠতম নবীপ্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহ্ ভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা ত্যাগের বদৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাংখা ও তাদেরকে জান্নাতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। এ সম্প্রদায়টি গণমানুষের হিতাকাংখা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও মুসলিম জাতি এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায়।

তাদের মধ্যে রয়েছে, ঈমানের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা নবীগণকে আল্লাহ্র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছেঃ 'ইয়াহূদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলেছে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র'। [সূরা আত-তাওবাহ: ৩০] অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে নবীর উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদের নবী যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন তারা পরিস্কার বলে দিয়েছে, 'আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব'। [সূরা আল-মায়েদাহ:২৪] আবার কোথাও নবীগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদেরই হাতে নির্যাতিত হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও ভালবাসা পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আব্রু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই মনে করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা আল্লাহ্র দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তার প্রশংসা এবং গুণগান করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতর থাকে।

তাছাড়া মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে, কর্ম ও ‘ইবাদাতের ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরী‘আতের বিধি-বিধানগুলোকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ‘ইবাদাত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও ‘ইবাদাত বলে মনে করে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি যুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরোয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। মহিলাদের অধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়াদ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকামাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরী‘আত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লংঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।

তদ্রূপভাবে তাদের মধ্যে রয়েছে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য। অর্থনীতিতে অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরাবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরী‘আত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরী‘আত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও[১] এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন[২]। আর আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন সেটাকে আমরা এ উদ্দেশ্যে কেবলায় পরিণত করেছিলাম যাতে

ও সাধারণ ওয়াক্‌ফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

(১) এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল, ১. মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। ২. ইজমা শরী'আতের দলীল। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ ইজমা (মুসলিম আলেমদের ঐক্যমত) যে শরী'আতের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব।

(২) এ উম্মাত হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল নবীর উম্মতরা তাদের হিদায়াত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন নবীও আমাদের হেদায়াত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, নবীগণ সবযুগেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আনীত হিদায়াত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা নূহ 'আলাইহিস্‌ সালাম-কে ডেকে বলবেন, হে নূহ! আপনি কি আমার বাণী লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তখন তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের কাছে কি তিনি কিছু পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ্‌ বলবেনঃ হে নূহ! আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ও তার উম্মত। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ 'আলাইহিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌র বাণী লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। আর রাসূল তখন তোমাদের সত্যতার উপর সাক্ষ্য দেবেন। এটাই হলো আল্লাহ্‌র বাণীঃ "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন"। [বুখারীঃ ৪৪৮৭]

প্রকাশ করে দিতে পারি[১] কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন। আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করে দিবেন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের

(১) আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, لِنَعْلَمَ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, 'যাতে আমরা জানতে পারি'। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে কেউ কেউ এটা মনে করতে পারে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ বুঝি আগে জানতেন না, ঘটনা ঘটার পরে জানেন। মূলত: এ ধরনের বোঝার কোন অবকাশই ইসলামী শরী'আতে নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আগে থেকেই সবকিছু জানেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জানা বিষয়টি অনুসারে বান্দার কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দিয়ে বান্দার উপর তাঁর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করেন। যাতে করে তার জানার উপর ন্যায় বরং বাস্তব ভিত্তিতে তিনি বান্দাকে সওয়াব বা শাস্তি দিতে পারেন। মূলত: এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত।" [সূরা আলে ইমরান: ১৫৪] এ আয়াতে 'পরীক্ষা' করার কথা বলার মাধ্যমে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা। এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় আয়াতের শেষে 'আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত' এ কথা বলার মাধ্যমে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র যেমন, সূরা আল-কাহাফ:১২, সাবা: ২১ এ ব্যবহৃত لِنَعْلَمَ শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কোন সন্দেহের উদ্রেক হবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে ঈমান শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা দ্বীন ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। কোন কোন মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে সালাত। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব সালাত আদায় করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব মুসলিম ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন, তারা

প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।

১৪৪. অবশ্যই আমরা আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো লক্ষ্য করি(১)। সুতরাং অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন(২)। অতএব আপনি মসজিদুল

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে গেছেন - কা'বার দিকে সালাত আদায় করার সুযোগ পাননি, তাদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৪৮৬] এতে সালাতকে ঈমান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, ১. তাদের সব সালাতই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। ২. আমল ঈমানের অংগ। ৩. সালাত ঈমানের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, সালাতকে বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(১) কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার আগে থেকেই নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন ইসরাঈল-বংশীয়দের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বায়তুল-মুকাদ্দাসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহিমী কেবলার দিকে মুখ ফিরানোর সময় হয়ে গেছে। কা'বা মুসলিমদের কেবলা সাব্যস্ত হোক - এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আন্তরিক বাসনা। তিনি এর জন্য দো'আও করছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশ্তা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কি না।

(২) এ আয়াতাংশটি হচ্ছে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি তৃতীয় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাযিল হয়। ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দাওয়াত উপলক্ষে উম্মে বিশ্‌র ইবনে বারা' ইবনে মা'রুর-এর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় গিয়েছিল। তিনি সেখানে সালাতে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'রাকা'আত সালাত আদায় হয়ে গিয়েছিল। এমনি সময় তৃতীয় রাকা'আতে ওহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ও তার সঙ্গে জামা'আতে শামিল সমস্ত লোক বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ: ১/২৪২] এরপর মদীনা ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হল। বারা ইবনে 'আযেব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা এমন অবস্থায় পৌঁছল, যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই সবাই সে অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনে মালেক বলেন, এ খবরটি

হারামের দিকে[১] চেহারা ফিরান[২]। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও এবং নিশ্চয় যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এটা তাদের রব-এর পক্ষ হতে হক। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ

১৪৫. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সমস্ত দলীল নিয়ে আসেন, তবু তারা আপনার

কুবায় পৌঁছল পরের দিন ফজরের সালাতের সময়। লোকেরা এক রাকা'আত সালাত শেষ করেছিল, এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছলঃ 'সাবধান! কেবলা বদলে গেছে। এখন কা'বার দিকে কেবলা নির্দিষ্ট হয়েছে।' এ কথা শোনার সাথে সাথেই সমগ্র জামা'আত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। [অনুরূপ বর্ণনা, বুখারী: ৪৪৮৬]

(১) 'মসজিদুল হারাম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে এমন 'ইবাদতগৃহ, যার মধ্যস্থলে কা'বাগৃহ অবস্থিত।

(২) হিজরতের পূর্বে মক্কা-মুকার্‌রামায় যখন সালাত ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই সালাতের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল-মুকাদ্দাস ছিল - এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেনঃ ইসলামের শুরু থেকেই কিবলা ছিল বায়তুল-মুকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মুকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মুকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভব ছিল না। তাই তার মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেনঃ মক্কায় সালাত ফরয হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলিমদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল 'আলাইহিমুস্ সালাম-এরও কেবলা তাই ছিল। মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর তার কেবলা বায়তুল-মুকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ নাযিল হয়।

قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন[১]। আর তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার নিকট সত্য-জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তাহলে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে। আর নিশ্চয় তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে।

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. সত্য আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا

১৪৮. আর প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে, যে দিকে সে চেহারা ফিরায়[২]। অতএব

(১) আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কা'বা কেয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইয়াহূদী-নাসারাদের সে মতবাদ খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলিমদের কেবলার কোন স্থিতি নেই; ইতঃপূর্বে তাদের কেবলা ছিল কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস হল, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় কা'বা হল। আবারো হয়ত বায়তুল-মুকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে। [তাফসীরে বাহরে মুহীত]

(২) وجهة শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এর অর্থ কেবলা। এ ক্ষেত্রে উবাই ইবনে কা'ব وجهة এর স্থলে قبلة ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। তাফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই, প্রত্যেক জাতিরই 'ইবাদাতের সময় মুখ করার জন্য একটি নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা

تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. আর যেখান থেকেই আপনি বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। নিশ্চয় এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো সত্য। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন না কেন মসজিদুল হারামের দিকে আপনার চেহারা ফিরান এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন এর দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও[1], যাতে তাদের মধ্যে যালিম ছাড়া অন্যদের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর

নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ বাক্যটি তিনবার এবং ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈএর ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলিমদের জন্যও তাদের 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাজেই এ নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হত, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হত না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইংগিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনা নেই।

যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

১৫১. যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি[১], যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর[২],

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

(১) এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আর বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইংগিত করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দো'আরও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তার কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছু নেই।

كَمَآ أَرْسَلْنَاكَ বাক্যে উদাহরণসূচক যে 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লেখিত তাফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হলো এই যে, 'কাফ' এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত ﴿ فَٱذْكُرُونِىٓ ﴾ এর সাথে। অর্থাৎ আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহ্‌র যিক্‌রও আরেকটি নেয়ামত। সুতরাং এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

(২) যিক্‌র আরবী শব্দ। এর বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে - (১) মুখ থেকে যা উচ্চারণ করা হয়। (২) অন্তরে কোন কিছু স্মরণ করা। (৩) কোন জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করা। শর'য়ী পরিভাষায় যিক্‌র হচ্ছে, বান্দা তার রবকে স্মরণ করা। হোক তা তাঁর নাম নিয়ে, গুণ নিয়ে, তাঁর কাজ নিয়ে, প্রশংসা করে, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করে,

তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করে, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে অথবা তাঁর কাছে কিছু চেয়ে।

যিক্‌র দুই প্রকার। যথা - কওলী বা কথার মাধ্যমে যিক্‌র ও আমলী বা কাজের মাধ্যমে যিক্‌র। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে রয়েছে - কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের আলোচনা ও স্মরণ, তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে - ইলম অর্জন করা ও শিক্ষা দেয়া, আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কাম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার যিক্‌রের মধ্যে কিছু যিক্‌র আছে যা সময়, অবস্থা এবং সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, সকাল ও সন্ধ্যার যিক্‌র, সালাতের পরের যিক্‌র, খাওয়ার শুরু-শেষ, কাপড় পরিধান, মসজিদে প্রবেশ-বাহির ইত্যাদি সহ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ-কর্মের দো'আ বা যিক্‌রসমূহ। যে সকল যিক্‌র অবস্থা, সময় ও সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর সংখ্যা, সময় অথবা অবস্থা কোনটিরই পরিবর্তন করা জায়েয নেই। যে সকল যিক্‌র এ তিনটির সাথে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ সাধারণ যিক্‌র, সেগুলো সময়, সংখ্যা অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করাও জায়েয নেই। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'মৌখিক যিক্‌রের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হওয়া এবং নির্দিষ্ট শব্দ নির্ধারণ করা বিদ'আত'। [ইবনুল হুমাম, শরহে ফাত্‌হুল কাদীরঃ ২/৭২]

যিক্‌র এর ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ও তাকে স্মরণ করেন। আবু উসমান নাহ্‌দী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনুল কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন। সায়ীদ ইবনে যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ্ 'যিক্‌রুল্লাহ্'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিক্‌রের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার বক্তব্য হচ্ছেঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিকরই করে না; প্রকাশ্যে যতবেশী সালাত এবং তাসবীহ্‌ই সে পাঠ করুক না কেন'। মূলত: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, সেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, যদি তার নফল সালাত ও সিয়াম কিছু কমও হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে সালাত-সিয়াম, তাসবীহ্-তাহ্‌লীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ 'যে ব্যক্তি যিক্‌র করে এবং যে ব্যক্তি যিক্‌র করেনা তাদের উপমা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়'। [বুখারীঃ ২০৮] অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদেরকে কি এমন একটি উত্তম

আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

১৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর(১) ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন(২)।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

আমলের সংবাদ দেব যা তোমাদের মালিকের নিকট অধিকতর পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক, স্বর্ন ও রৌপ্য ব্যয় করা থেকেও তোমাদের জন্য উত্তম, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে গর্দান দেয়া-নেয়া থেকে উত্তম? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ্'। [তিরমিযীঃ ৫/৪৫৯] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদ্সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি'। [বুখারীঃ ৭৪০৫] মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিক্রুল্লাহ্র সমান নয়'। যুন্নূন মিসরী বলেনঃ 'যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্কে স্মরণ করে সে অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন'।

(১) 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস্ এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) 'ইবাদাত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যেকোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আল্লাহ্র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। [ইবনে কাসীর]। 'সবর'-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণা সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই 'সবর' হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে।

(২) সালাত এবং 'সবর'-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। 'আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন' বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সালাত আদায়কারী এবং সবরকারীগণের আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ হয়। মহান আল্লাহ্ আরশের উপর

১৫৪. আর আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত(১); কিন্তু তোমরা উপলব্ধি

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝١٥٤

থেকেও তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ দু'টি। প্রথম. সাধারন অর্থে 'সাথে থাকা'। যা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে, সবাই মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ভিতরে থাকা। মহান আল্লাহ্‌র যত সৃষ্টি সবার যাবতীয় অবস্থা তাঁর গোচরিভূত। তিনি ভাল করেই জানেন কে কোথায় কোন অবস্থায় কোন কাজে লিপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার 'সাথে থাকা' বিশেষ অর্থে। যা কেবলমাত্র তাঁর নেককার, সবরকারী, ইহসানকারী, মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটি হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে কারও সাথে থাকার অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, তিনি তার সাথে চলাফেরা করছেন বা কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন। অথবা তার সাথে লেগে আছেন। কারণ; মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। তিনি স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

(১) প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বা কবরে বিশেষ ধরণের এক প্রকার হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব ভোগ করে থাকে। তবে সে জীবনের হাকীকত আমরা জানি না। যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন, তাদেরকে শহীদ বলা হয়। তাদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনের অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "শহীদগণের রূহ সবুজ পাখীর প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। তারপর তারা আরশের নীচে অবস্থিত কিছু ঝাড়বাতির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন তাদের রব তাদের প্রতি এক দৃষ্টি দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি চাও? তারা বলে হে রব! আমরা কি চাইতে পারি? আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তো আপনি আপনার কোন সৃষ্টিকে দেন নি? তারপরও তাদের রব আবার তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন করেন। যখন তারা বুঝল যে, তারা কিছু চাইতেই হবে, তখন তারা বলে, আমরা চাই আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ফেরৎ পাঠান, যাতে আমরা পুনরায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হতে পারি। শহীদগণের সাওয়াবের আধিক্য দেখেই তারা এ কথা বলবে- তখন তাদের মহান রব তাদের বলবেন, আমি এটা পূর্বে নির্ধারিত করে নিয়েছি যে, এখান থেকে আর ফেরার কোন সুযোগ নেই।" [মুসলিম: ১৮৮৭] তবে সাধারণ নিয়মে শহীদদেরকে মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা

করতে পার না।

১৫৫. আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব[1] কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে--

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

যায় না, সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে ﴿لَّا تَشْعُرُونَ﴾ (তোমরা বুঝতে পার না) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি। এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, শহীদেরা পার্থিব জীবনের মত জীবিত নন। তাদেরকে জীবিত বলা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশেষ এক জীবন বরযখে দিয়েছেন, যার হাকীকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(১) কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পরে সমষ্টিগতভাবেই পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবর-এর পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে। মূলত: মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ-বালা মুসিবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯] অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তবে পরীক্ষা যেন কেউ আল্লাহ্র কাছে কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা কামনা করাই মুমিনের কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে বলতে শুনেছেন যে, "হে আল্লাহ্! আমাকে সবরের শক্তি দান কর। তখন তিনি বললেন, তুমি বিপদ কামনা করেছ, সুতরাং তুমি নিরাপত্তা চাও।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১,২৩৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূল বললেন, এমন কোন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয় যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই"। [তিরমিযী: ২২৫৪]

১৫৬. যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্রই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী[১]'।

الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।

أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের[২] অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা)

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن

(১) সবরকারীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে - 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দো'আটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি এ বাক্যের অর্থের প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রেখে তা পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তি লাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়। দো'আটির অর্থ হচ্ছে, "নিশ্চয় আমরা তো আল্লাহ্রই। আর আমরা তার দিকেই প্রর্তাবর্তন করব।" সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কোন কষ্ট দেন তবে তাতে কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তার উদ্দেশ্যকে সম্মান করতে পারা একটি মহৎ কাজ। আর এটাই হচ্ছে, সবর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের কর্মকাণ্ড আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই ভাল। মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য এমনটি হয় না। যদি তার কোন খুশীর বিষয় সংঘটিত হয় তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণের হয়। আর যদি তার কোন ক্ষতিকর কিছু ঘটে যায় তবে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কলাণকর হয়।" [মুসলিমঃ ২৯৯৯] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ বিপদ-মুসিবতে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলবে, এবং বলবে, হে আল্লাহ্ আমাকে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন এবং এর থেকে উত্তম বস্তু ফিরিয়ে দিন" অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে উত্তম কিছু ফিরিয়ে দিবেন" [মুসলিমঃ ৯১৮]

(২) ﴿شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। ﴿شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ বলতে সেসব আমলকে বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ঘরের হজ[1] বা 'উমরা[2] সম্পন্ন করে, এ দু'টির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন পাপ নেই[3]। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. নিশ্চয় যারা[4] গোপন করে আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ

(১) حج এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা পোষণ করা, সংকল্প করা। কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ শরীফে আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে গমন করে বিশেষ ধরনের কিছু কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্ব বলা হয়ে থাকে।

(২) عمرة শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরী'আতের পরিভাষায়, ইহরামসহ আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফে হাযির হয়ে তাওয়াফ-সা'য়ী প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি 'ইবাদাত সম্পাদনের নামই উমরাহ্।

(৩) 'সাফা' এবং 'মারওয়া' বায়তুল্লাহ্‌র নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। হজ কিংবা উমরার সময় কা'বা ঘরের তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরী'আতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সা'য়ী'। জাহেলী যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এ জন্য মুসলিমদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিল যে, বোধহয় এ সা'য়ী জাহেলী যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয়ত গোনাহ্‌র কাজ। কোন কোন লোক যেহেতু জাহেলী যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তারা একে জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার হিসেবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে এ আয়াতে বায়তুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আরও একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলের বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও সাফা-মারওয়ার মাঝখানের সা'য়ী প্রমাণিত। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪২১, ৪২২]

(৪) যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান গোপন করত, তারা ছিল ইয়াহূদী আলেম সম্প্রদায়। তারা সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনকে একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সাধারণ জনগণকে এ জ্ঞান থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এমনকি এ গোষ্ঠীর লোকগুলো নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য ভ্রষ্টতা ও শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়তে নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করত। এ আয়াতে এ ধরণের প্রবণতা থেকে মুসলিমদেরকে দূরে থাকার তাকীদ দেয়া হয়েছে।

يَلۡعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلۡعَنُهُمُ اللّٰعِنُوۡنَ ﴿۱۵۹﴾

নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর[১], তাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও[২] তাদেরকে লা'নত

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হিদায়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়ঃ এক. যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন'। [আবু দাউদঃ ৩৬৫৮, ইবনে মাজাহ্ঃ ২৬৬, আহমাদঃ ২/২৬৩] দুই. 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহ্তে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে ﴿مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى﴾ বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও, যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেত্না-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে। [বুখারী, কিতাবুল ইলম, ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দিমা] আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের সামনে 'ইলমের শুধু ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে। [বুখারী, কিতাবুল ইলমঃ ৪৯ নং অধ্যায়]

(২) যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফেরের নাম উল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও যালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা

করেন[১]।

১৬০. তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তাগণ ও সকল মানুষের লা'নত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

১৬২. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

জায়েয। এতে এ কথাও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলিম কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে 'মরদূদ', 'আল্লাহ্র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ আয়াতে কুরআনুল কারীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। মুফাসসিরগণ বলেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। মুজাহিদ ও আতা রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন, এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। [সুনান সাঈদ ইবনে মানসূর: ২/৬৩৮, ৬৩৯, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫/২৪] কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়।

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, দয়াময়, অতি দয়ালু তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই[1]।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

১৬৪. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে[2], রাত ও দিনের পরিবর্তনে[3],

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্‌র 'ইসমে আ'যাম' এ দু'টি আয়াতের মধ্যে রয়েছে"। তারপর তিনি এ আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। [তিরমিযী: ৩৪৭৮, আবু দাউদ: ১৪৯৬, ইবনে মাজাহ: ৩৮৫৫]

(২) আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কিভাবে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত, তা এ আয়াতে ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। অন্যত্র তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যেমন "তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমরা কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই? আর আমরা বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্‌গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্, আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।" [সূরা কাফ: ৬-৮] আর আসমান সম্পর্কে বলেছেন "যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি? তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে। আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।" [সূরা আল-মুলক: ৩-৫] তারপর যমীন সম্পর্কে বলেছেন, "তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিয্‌ক থেকে তোমরা আহার কর; আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে।" [সূরা আল-মুলক: ১৫]

(৩) রাত দিনের পরিবর্তন কিভাবে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত, তা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। যেমন, "বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?' বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?" [সূরা আল-কাসাস: ৭১,৭২]

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

মানুষের উপকারী[১] দ্রব্যবাহী চলমান সামুদ্রিক জাহাজে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন, তার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকবান কওমের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে[২]।

---

(১) এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যের আওতায় ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হত, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলো পচন অথবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল"। [সূরা আল-মুমিনূন: ১৮] কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র জমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যেকোন জায়গায় খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এ পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত একত্ববাদ সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তারই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা

১৬৫. আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ্র ভালবাসার মতই[১]; পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভালবাসে[২]। আর যারা যুলুম করেছে যদি তারা আযাব দেখতে পেত[৩], (তবে তারা নিশ্চিত

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾

ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ। অনুরূপভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালাকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হত না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারত না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হত না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনি ইচ্ছে করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক চরম ধৈর্যশীল ও একান্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" [সূরা আশ-শুরা: ৩৩]

(১) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে যেমন ভালবাসে তাদের মা'বুদদেরও তেমন ভালবাসে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা কাফেরদের মনেও ছিল, কিন্তু তা ছিল শির্কযুক্ত। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য নয়।

(২) আয়াতের এ অংশের অর্থ, কাফেরগণ তাদের মা'বুদদের যতবেশীই ভালবাসুক না কেন, ঈমানদারগণ আল্লাহ্কে তাদের থেকে অনেক বেশী ভালবাসে। কেননা, ঈমানদারগণ তাদের সম্পূর্ণ ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট করেছে। অপরপক্ষে, কাফেরগণ তাদের ভালবাসা তাদের মা'বুদদের মধ্যে বন্টন করেছে।

(৩) মুফাস্সিরগণ আয়াতের এ অংশের বিভিন্ন অর্থ করেছেনঃ

১) যারা দুনিয়াতে শির্কের মাধ্যমে যুলুম করছে তারা যদি আখেরাতের শাস্তি দেখতে পেত এবং এও দেখতে পেত যে, যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র, এবং আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা আর তাদের মা'বুদদের কোন শক্তিই নেই, তাহলে তারা যাদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে 'ইবাদাত করছে, কখনোই তাদের

হত যে,) সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে,

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে'[১]।

'ইবাদাত করতো না।

২) যারা দুনিয়াতে শির্কের মাধ্যমে যুলুম করেছে তারা যদি আল্লাহ্‌র শক্তি ও কঠোর আযাব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা তাদের মা'বুদদের 'ইবাদাত করার ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত।

৩) সঠিক 'কেরাআত'-এর মধ্যে কেউ কেউ يرى শব্দটিকে ترى পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে, হে নবী! আপনি যদি - যারা শির্কের মাধ্যমে যুলুম করছে - এ লোকদেরকে শাস্তি থেকে ভীত অবস্থায় দেখতে পেতেন, তাহলে আপনি জানতেন যে, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র। অথবা, এর অর্থ হবে, হে নবী! আপনি যদি যালিমদেরকে শাস্তি প্রত্যক্ষরত অবস্থায় দেখতেন কেননা, যাবতীয় শক্তি আল্লাহ্‌রই। তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে, তাদের শাস্তির পরিমাণ কত ভয়াবহ!

৪) সঠিক 'কেরাআত'-এর মধ্যে কেউ কেউ يَرَوْنَ শব্দটিকে يُرَوْنَ পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে, যারা যুলুম করেছে, যখন তাদেরকে শাস্তি দেখানো হবে তখন তারা দেখতে পাবে যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌র আর আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

(১) এ আয়াতে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে নেতারা ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে যে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ হবে সেটার কিছু কথোপকথন ও তাদের অনুতাপের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি আরও বেশী করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমরা এ কুরআনে কখনো বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নয়।' হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন

এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদেরকে দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ(১)। আর তারা কখনো আগুন থেকে বহির্গমণকারী নয়।

১৬৮. হে মানুষ! তোমরা খাও যমীনে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র(২) খাদ্যবস্তু রয়েছে

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।' যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দূর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিনরাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য সমকক্ষ (শির্ক) স্থাপন করি।' আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং যারা কুফরী করেছে আমরা তাদের গলায় শৃংখল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা সাবা: ৩১-৩৩]

(১) আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদের খারাপ আমলসমূহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আফসোস ও পরিতাপের কারণ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "সেদিন প্রত্যেকেই জান্নাতে তাদের ঘর এবং জাহান্নামে তাদের ঘরের দিকে তাকাবে। সেদিন হচ্ছে আফসোসের দিন। তিনি বলেন, জাহান্নামীরা জান্নাতে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে তাকাবে তারপর তাদেরকে বলা হবে, হায় যদি তোমরা এর জন্য আমল করতে! তখন তাদেরকে আফসোস পেয়ে বসবে। আর জান্নাতীরা জাহান্নামে তাদের জন্য নির্দিষ্ট তাদের ঘরের দিকে তাকাবে, তখন তাদের বলা হবে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর তার দয়া না করতেন তবে তো তোমরা সেখানকার অধিবাসীই হতে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৪৯৬-৪৯৭]

(২) حلّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিট খোলা। যেসব বস্তু সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়েছে। সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طيب শব্দের অর্থ পবিত্র। শরী'আতের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

তা থেকে। আর তোমরা শয়তানের পদাংক[১] অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْۗءِ وَالْفَحْشَاۗءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

১৬৯. সে তো শুধু তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়[২] মন্দ ও অশ্লীল[৩] কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলার যা তোমরা জান না[৪]।

---

(১) خُطُوَاتٌ শব্দটি خُطْوَةٌ এর বহুবচন। خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সে অনুসারে ﴿خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ﴾ এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী পদক্ষেপসমূহ বা শয়তানী কর্মকাণ্ড। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, "আমি আমার বান্দাকে যে সম্পদ দিয়েছি তা বৈধ। আর আমি আমার সকল বান্দাকেই একনিষ্ঠ দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের কাছে শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের উপর তা হারাম করে দেয় যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছিলাম।" [মুসলিম: ২৮৫৬] (অর্থাৎ তারা সেগুলোকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করে সেগুলোকে হারাম বানিয়ে ফেলে)

(২) এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াস্ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আদম সন্তানের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশ্তার প্রভাব বিদ্যমান থাকে' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৫৪৩] শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশ্তাদের ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়। [দেখুন, সহীহ ইবন হিব্বান: ৯৯৭]

(৩) سُوْءٌ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فَحْشَاءٌ অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سُوْءٌ এবং فَحْشَاءٌ - এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ সাধারণ গোনাহ্ এবং কবীরা গোনাহ্।

(৪) না জেনে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে কথা বলা বড় গোনাহ। এ আয়াতে এবং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে না জেনে কথা বলাকে বড় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আল-বাকারাহ: ৮০, সূরা আল-আ'রাফ: ২৮, ৩৩, সূরা ইউনুস: ৬৮] তবে এ আয়াতে 'না জেনে' কোন কথা বলতে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর’, তারা বলে, ‘না, বরং আমরা অনুসরণ করবো তার, যার উপর আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি’। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল

শয়তান মানুষকে নির্দেশ দেয় সেটা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র সেটার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য জন্তু-জানোয়ারকে ছেড়ে দেয়া, হালালকে হারাম করা ও হারামকে হালাল করা, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্‌র জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করা যা থেকে তিনি পবিত্র। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, “বাহীরাহ্‌, সায়েবাহ্‌, ওছীলাহ্‌ ও হামী আল্লাহ্‌ প্রবর্তণ করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না” [সূরা আল-মায়েদাহ: ১০৩] “তারা জিনকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র---মহিমান্বিত! এবং ওরা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে।” [সূরা আল-আন‘আম: ১০০] “যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম: ১৪০] “বলুন, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ্‌ তোমাদের যে রিয্‌ক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ?’ বলুন, ‘আল্লাহ্‌ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করছ” [সূরা ইউনুস: ৫৯] “তারা বলে, ‘আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি মহান পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্‌র উপর এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?” [সূরা ইউনুস:৬৮] “তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, ‘এটা হালাল এবং ওটা হারাম’। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না”[সূরা আন-নাহল: ১১৬] “আর তারা আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের উর্ধ্বে” [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

না, তবুও কি?[১]

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১. আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত যে, এমন কিছুকে ডাকছে যে হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা বুঝে না[২]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমরা যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে

---

(১) এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ এবং ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত। হিদায়াত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিস্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরী'আতের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়। অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি-বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞানের সাথে সাথে তার মধ্যে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র এবং তাঁর হুকুম-আহ্‌কাম মানার জন্যই হতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন, পরিমার্জিত]

(২) এ উপমাটির দু'টি দিক রয়েছে। (এক) তাদের অবস্থা সেই নির্বোধ প্রাণীদের মত, যারা এক-একটি পালে বিভক্ত হয়ে নিজেদের রাখালদের পিছনে চলতে থাকে এবং না জেনে-বুঝেই তাদের হাঁক-ডাকের উপর চলতে-ফিরতে থাকে। (দুই) এর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, কাফের-মুশরিকদেরকে আহ্বান করার ও তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের সময় মনে হতে থাকে যেন নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা কেবল আওয়াজ শুনতে পারে কিন্তু কি বলা হচ্ছে, তা কিছুই বুঝতে পারে না। [মুয়াসসার]

খাও[১] এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদাত কর।

১৭৩. তিনি আল্লাহ্ তো কেবল তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু[২],

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا

(১) আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হিদায়াত করেছেন যে- ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ অর্থাৎ "হে রাসূলগণ! পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করুন এবং নেক আমল করুন"। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দো'আ কবূল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবূল না হওয়ার আশংকাই থাকে বেশী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। তিনি মুমিনগণকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন যেটার নির্দেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র থেকে খাও এবং সৎকাজ কর, নিশ্চয় আমি তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবগত। [সূরা আল-মুমিনূন: ৫১] আরও বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু খাও" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭২] তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করেছে, ধুলি-মলিন অবস্থায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে বলতে থাকে হে রব! হে রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে খেয়েছেও হারাম। সুতরাং তার দো'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?" [মুসলিম: ১০১৫]

(২) অর্থাৎ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যবেহ্ করা জরুরী, সেসব প্রাণী যদি যবেহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম হবে। তবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হল'। [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯৬] এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ্ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিডিড নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল - মাছ এবং টিডিড (এক জাতীয় ফড়িং)'। [বাগভীঃ শরহুস্-সুন্নাহ্ঃ ২৮০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ্ঃ ৩২১৮] সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে

মাছ এবং ফড়িং মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ্ না করেও খাওয়া যাবে। অনুরূপ যেসব জীব-জন্তু ধরে যবেহ্ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত। আজকাল একরকম চোখা গুলী ব্যবহার হয়, এ ধরণের গুলী সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরদিকে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে গায়ে বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলী দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ার যবেহ্ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না। এক্ষেত্রে গুলী দ্বারা শিকার করা হলে তা আবার যবেহ্ করতে হবে।

এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলতে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সেই একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যেকোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়।

তাছাড়া আয়াতে 'মৃত' শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে ﴿عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫] শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলোর ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে, ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [সূরা আন-নাহল:৮০] এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ্ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। অনুরূপভাবে মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্দারা তৈরী যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। [মা'আরিফুল কুরআন]

أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

রক্ত[১], শূকরের গোশ্‌ত[২] এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে[৩], কিন্তু যে নিরূপায়

(১) আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا﴾ [সূরা আল-আন'আম: ১৪৫] অর্থাৎ 'প্রবাহমান রক্ত' উল্লেখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবাহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ্‌ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা এবং এরূপ জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল। আর যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ্‌ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহ্‌বিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। এখানে আরও একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা অর্জিত লাভালাভও হারাম।

(২) আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের গোশ্‌ত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্‌ম' বা গোশ্‌ত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশ্‌ত হারাম এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, গোশ্‌ত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সর্বসম্মতিক্রমেই হারাম। তবে লাহ্‌ম তথা গোশ্‌ত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ্‌ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশ্‌ত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ্‌ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু যবেহ্‌ করার পরও শূকরের গোশ্‌ত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা অপবিত্র বস্তু। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(৩) আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্‌ বা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ্‌ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ্‌ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত হয়। এমতাবস্থায় যবেহ্‌কৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। ﴿وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ﴾ আয়াতে যে অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ্‌ করা হয়, তবে যবেহ্‌ করার সময় তা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই যবেহ্‌ করা হয়। যেমন অনেক

অথচ নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না[১]।

অজ্ঞ মুসলিম পীর, কবরবাসী বা জীনের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ্ করে থাকে। কিন্তু যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহ্‌কৃত জন্তু মৃতের শামিল। দুররে মুখতার কিতাবুয্-যাবায়েহ্ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ 'যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তারই সম্মানার্থে কোন পশু যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহ্‌কৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ্ করা হয়' - এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত; যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। আল্লামা শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না, যবেহ্ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ্ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কুরআনের ভাষায় 'বহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছেঃ ﴿مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ﴾ "আল্লাহ্ তা'আলা 'বহীরা' ও 'সায়েবা' সম্পর্কে কোন বিধান দেননি"। [সূরা আল-মায়িদাহঃ ১০৩] তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরী'আতের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল ও বৈধ বলেনি; বলেছে, "তাতে তার কোন পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনো যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনোন্যপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে অনোন্যপায় হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মায়েদাহঃ৩] অর্থাৎ ক্ষুধার কারণেই শুধু হারাম বস্তু গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহ্ কিতাব হতে যা নাযিল করেছেন তা এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া[১] আর কিছুই খায় না। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে; সুতরাং আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. সেটা এ জন্যই যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে অবশ্যই তারা সুদূর বিবাদে লিপ্ত।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

১৭৭. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে[২] তোমাদের মুখ ফিরানোই সৎকর্ম নয়, কিন্তু

---

(১) এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরী'আতের হুকুম-আহ্কাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই।

(২) কাতাদাহ ও আবুল আলীয়াহ বলেন, ইয়াহূদীরা ইবাদতের সময় পশ্চিম দিকে আর নাসারারা পূর্ব দিকে মুখ করে থাকে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় বলেন, সালাতে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরী'আতের অন্য কোন হুকুম-আহ্কামই যেন আর নেই।

وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ

সৎকর্ম হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ্, শেষ দিবস, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান(১) আনবে। আর সম্পদ দান করবে তার(২) ভালবাসায়(৩) আত্মীয়-

---

(১) অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলিম, ইয়াহূদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের ভেতরই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি সালাতে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে দু'টি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ্র ভালবাসায় উপরোক্ত খাতে সম্পদ ব্যয় করা। দুই. সম্পদের প্রতি নিজের অতিশয় আসক্তি ও ভালাবাসা থাকা সত্ত্বেও সে উপরোক্ত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। উভয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শেষোক্ত মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [তাফসীরে বাগভী] এ মতের সপক্ষে বিভিন্ন হাদীসে সম্পদের আসক্তি সত্ত্বেও তা ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সব চেয়ে বেশী সওয়াবের সাদাকাহ কোনটি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি সুস্থ ও আসক্তিপূর্ণ অবস্থায়, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়, ধনী হওয়ার আকাংখা থাকা সত্ত্বেও সাদাকাহ করা"। [বুখারী: ১৪১৯, মুসলিম: ১০৩২]

(৩) এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে। অনুরূপ যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং দ্বীনীশিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের ফরয হওয়ার বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكَوٰةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَالصَّٰبِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

স্বজন[১], ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করবে[২], অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে[৩]। তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى

১৭৮. হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের[৪] বিধান

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম সদকাহ হচ্ছে সেটি যা এমন আত্মীয় স্বজনের জন্য করা হয় যারা তোমার থেকে বিমুখ হয়ে আছে"। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪০২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ৪/৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মিসকীনের উপর সদকাহ করলে সেটি সদকাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকাহ করা হয় তবে তা হবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সদকাহ। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮]

(২) অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গোনাহ্গাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না। তেমনিভাবে মু'আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

(৩) আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, 'সবর'-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বোতভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

(৪) 'কিসাস'-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু যুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশী কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই ১৯৪ নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে, 'অত:পর যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে'। অনুরূপ সূরা আন-নাহলের ১২৬ নং আয়াতে রয়েছে, 'আর যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে', এতে আলোচ্য বিষয়ই আরও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে মতে শরী'আতের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়। এখানে কয়েকটি বিষয় জানা বিশেষভাবে জরুরী: এক. কিসাস কেবল ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায়ই প্রযোজ্য। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয় সুতরাং 'কিসাস' অর্থাৎ 'জানের বদলে জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দুই. এ ধরনের হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আয়াতে স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, তা একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তিন. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, - যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে এবং অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাসের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে। শরী'আতের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট। চার. কেসাসের আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত রয়েছে। পাঁচ. নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে 'কিসাস' ও 'দিয়াত'-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাসের দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে। ছয়. 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইনী কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক

الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে তার ভাইয়ের[১] পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির[২] অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময় আদায় করা কর্তব্য। এটা তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে শিথিলতা ও অনুগ্রহ। সুতরাং এর পরও যে সীমালংঘন করে[৩] তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আর হে বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্নগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এ জন্য আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কিসাস'-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) 'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মাঝে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃ-সমাজেরই একজন সদস্য। তাছাড়া এখানে যে ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কিসাস না গ্রহণ করে দিয়াত গ্রহণ করা। [বুখারীঃ ৪৪৯৮]

(২) এখানে কুরআনে 'মা'রূফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে উঠেঃ হ্যাঁ, এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও ইসলামী পরিভাষায় 'উর্‌ফ' ও 'মা'রূফ' বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরী'আত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি, এমনসব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

(৩) ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করার পর হত্যা করতে উদ্যত হয়। [বুখারীঃ ১১১, মুসলিমঃ ১৩৭০]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসিয়াত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হল। এটা মুত্তাকীদের উপর কর্তব্য[১]।

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

১৮১. এটা শুনার পরও যদি কেউ তাতে পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা পাপের আশংকা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন অপরাধ

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর মতে অসিয়াত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি 'মীরাস'-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য অসিয়াত করা রহিত করে দেয়া হয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অসিয়াত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য অসিয়াত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজনবিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। অসিয়াত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কুরআনের মীরাস সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজের বিখ্যাত খোত্‌বায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত নেই'। [তিরমিযী: ২১২০, আবু দাউদ: ৩৫৬৫, ইবনে মাজাহ্: ২৭১৩]। তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তাদের মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়াত করা জায়েয।

নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের(১) বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল(২), যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার(৩)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

(১) صوم এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সাওম'। তবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়্যতে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা সিয়াম বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে কিংবা সহবাস করে, তবে সিয়াম হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি সিয়ামের নিয়্যত না থাকে, তবে তাও সিয়াম পালন হবে না। সিয়াম ইসলামের মূল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। সিয়ামের অপরিসীম ফযীলত রয়েছে।

(২) মুসলিমদের প্রতি সিয়াম ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিয়াম শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলিমদের এ মর্মে একটি সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে যে, সিয়াম একটা কষ্টকর 'ইবাদাত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা কষ্টকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়। আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, "সিয়াম যেমন মুসলিমদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল'; এ কথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের সিয়াম সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলিমদের উপর ফরযকৃত সিয়ামেরই অনুরূপ ছিল। যেমন, সিয়ামের সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের সিয়ামের সাথে মুসলিমদের সিয়ামের পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে সিয়ামের সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাকওয়া শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে সিয়ামের একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া'র ভিত্তি।

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. এগুলো গোনা কয়েক দিন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে[১] বা সফরে থাকলে[২] অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে[৩]। আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া- একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা[৪]। যদি

---

(১) বাক্যে উল্লেখিত 'রুগ্ন' সে ব্যক্তিকে বুঝায়, সাওম রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

(২) সফররত অবস্থায় সাওম না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সাহাবাগণ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে যেতেন। তাদের কেউ সাওম রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাতেন না।' [বুখারী: ১৯৪৭; মুসলিম: ১১১৬]

(৩) রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় বা সফরে যে কয়টি সাওম রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে বা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে কয়টি সাওম ছাড়তে হয়েছে, সে কয়টি সাওম অন্য সময়ে পূরণ করে নেয়া তাদের উপর ফরয।

(৪) আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং সাওম রাখার পূর্ণ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সাওম রাখতে চায় না, তাদের জন্যও সাওম না রেখে সাওমের বদলায় 'ফিদ্ইয়া' দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, 'সাওম রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর'। উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে সাওমে অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর নাযিলকৃত আয়াত ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্য জনিত কারণে সাওম রাখতে অপরাগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দূর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই। সাহাবী সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- বলেন, যখন ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ﴾ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে সাওম রাখতে পারে এবং যে সাওম রাখতে চায় না, সে 'ফিদ্ইয়া' দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ নাযিল হল, তখন ফিদ্ইয়া দেয়ার

কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণের যদি তোমরা জানতে।

১৮৫. রমাদান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে[১]। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে[২]। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

ইখ্‌তিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র সাওম রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল। [বুখারীঃ ৪৫০৭, মুসলিমঃ ১১৪৫, আবু দাউদ:২৩১৫, ২৩১৬ ও তিরমিযীঃ ৭৯৮]

(১) এই একটি মাত্র বাক্যে সাওম সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহ্‌কাম ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিত ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشّهر অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমাদান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমাদান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ বর্তমান থাকবে, তার উপর রমাদান মাসের সাওম রাখা কর্তব্য”। ইতঃপূর্বে সাওমের পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মনসূখ বা রহিত করে দিয়ে সাওম রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। রমাদান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হলো রমাদান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া, যাতে সাওম রাখার সামর্থ্য থাকে।

(২) আয়াতে রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যে, সে তখন সাওম না রেখে বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের সাওম কাযা করে নেবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু সাওমের পরিবর্তে ফিদ্‌ইয়া দেয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়ত রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরোল্লেখ করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৮৬. আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে(১)।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

---

(১) পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রামাদানের হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে সাওম ও ই'তিকাফের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান রব-এর অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ, সাওম সংক্রান্ত 'ইবাদাতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন বিষয়ে দো'আ করে, আমি তাদের সে দো'আ কবুল করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই। এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্‌কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাসীর দো'আর প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা সাওম রাখার পর দো'আ কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই সাওমের ইফতারের পর দো'আর ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সিয়াম পালনকারীর দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না অর্থাৎ কবুল হয়ে থাকে'। [ইবনে মাজাহ্: ১৭৫৩] সে জন্যই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ইফতারের সময় পরিবার পরিজনকে ডাকতেন এবং দো'আ করতেন। [ইবনে কাসীর]

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে[১]। তারা তোমাদের পোষাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোষাকস্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে ঊষার সাদা রেখা

(১) যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে হারাম ছিল। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রমাদানের সাওম ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেত। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়েস ইবনে সিরমাহ্ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোথাও থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন তখন সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা-পিনা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই সাওম পালন করেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। [বুখারী: ১৯১৫] অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে-সাদিক উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার আগে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাতে সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়[১]। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত[২] অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না[৩]।

---

(১) আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে সাওমের শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়-সীমার মধ্যে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সে জন্য ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ﴾ শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে-সাদিক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে-সাদিকের আলো ফোটার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং সাওমের মধ্যে সুবহে-সাদিকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবহে-সাদিক উদয় হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকীন হয়ে যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং সাওম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে-সাদিক উদয় হওয়া সম্পর্কে ইয়াকীন হওয়া পর্যন্তই সেহ্‌রীর শেষ সময়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন এক স্থানে অবস্থান করা। কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। জামা'আত হয় এমন যে কোন মসজিদেই ই'তেকাফ হতে পারে। ই'তিকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণত সাওম পালনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়।

(৩) অর্থাৎ সাওমের মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেও না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালংঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে সাওম অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভেতর পানি প্রবেশ করতে পারে; মুখের ভেতর কোন ঔষধ ব্যবহার করা, এসব ব্যাপার অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের পরিপন্থী। তাই সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ, ঐ সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমান্ত রেখার মধ্যে পার্থক্য করা এবং তাদের কিনারে পৌঁছে

এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে।

১৮৮. আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না[১]।

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

১৮৯. লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে[২]। বলুন, 'এটা

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কথা নয়। এ ব্যাপারে সাবধান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক বাদশারই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আল্লাহ্‌র সে সংরক্ষিত এলাকা হল, তাঁর নির্ধারিত হারাম বিষয়সমূহ। যে ব্যক্তি এর চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সে উক্ত সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে'। [মুসলিমঃ ২৬৮১]

(১) এ আয়াতটির এক অর্থ হচ্ছে, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করো না। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই যখন জানো এগুলো অন্যের সম্পদ, তখন শুধুমাত্র তার কাছে তার সম্পদের মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে অথবা একটু এদিক-সেদিক করে কোন প্রকারে প্যাঁচে ফেলে তার সম্পদ তোমরা গ্রাস করতে পার বলে তার মামলা আদালতে নিয়ে যেয়ো না। কেননা, আদালত থেকে ঐ সম্পদের মালিকানা অধিকার লাভ করার পরও প্রকৃতপক্ষে তুমি তার বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহ্‌র কাছে তো তা তোমার জন্য হারামই থাকবে।

(২) সমগ্র কুরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা আল-বাকারায়, একটি সূরা আল-মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আল-আ'রাফে দু'টি এবং সূরা আল-ইসরা, সূরা আল-কাহাফ, সূরা ত্বা-হা ও সূরা আন্-নাযি'আতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল - যার উত্তর কুরআনুল কারীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সূরা আল-আহযাব ও সূরা আয-যারিয়াতে একটি করে দু'টি প্রশ্ন ছিল।

لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময়-নির্দেশক'। আর পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই[১]; বরং পুণ্য আছে কেউ তাক্ওয়া অবলম্বন করলে। কাজেই তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

১৯০. আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে[২] তোমরাও আল্লাহ্র পথে

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, "মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি; দ্বীনের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্বেও তারা মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছিলেন"। [সুনান দারমী:১২৫]

(১) এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরী'আত প্রয়োজনীয় বা 'ইবাদাত বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা 'ইবাদাত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরী'আতে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরী'আতসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্বেও না জায়েয মনে করত এবং পাপ বলে গণ্য করত, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরী'আতে যার কোন আবশ্যকতা ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। মূলত: 'বিদ'আত'-এর নাজায়েয হওয়ার বড় কারণই এই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয-ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে নাজায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরী'আত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে নাজায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বিদ'আত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) মুসলিমগণ শুধুমাত্র সেসব কাফেরদের সাথেই যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদ্রী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক

يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর[১]; কিন্তু সীমালংঘন করো না[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ

১৯১. আর তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে[৩] এবং যে স্থান থেকে তারা

হয় না - সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে শুধুমাত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এ জন্য ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্ম প্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা ﴿الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' - এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেয়া হত, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

(১) আলেমগণ বলেন, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'কিতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে নাযিলকৃত কুরআনুল কারীমের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। [ইবন কাসীর]

(২) বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমসহ সে উমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়্যত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে উমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয়ত তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাদেরকে বাধা দেয়, তবে তারা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকল।

(৩) কেউ কেউ আল্লাহ্র বাণীঃ "তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে"-এ বাণীর ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামকে জংগীবাদের প্রেরণাদায়ক বলে অপবাদ দেয়, তারা মূলতঃ এ আয়াতের অর্থই বোঝেনি। কারণ, এই আয়াতে "তাদেরকে" বলে ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের বর্ণনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে এসেছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের হত্যা করার জন্য শর্ত দেয়া হয়েছে

তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে তোমরাও সে স্থান থেকে তাদেরকে বহিস্কার করবে। আর ফেত্‌না হত্যার চেয়েও গুরুতর[১]। আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না[২] যে পর্যন্ত না তারা

حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

দু'টি - (১) তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধকারী সম্প্রদায় হবে। (২) তোমরা যদি এসব যুদ্ধবাজ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর, তবুও তোমরা যেহেতু মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ সেহেতু হত্যা করতে সীমালংঘন করোনা। যুদ্ধরত কাফেরদের ছাড়া অন্যান্য সাধারণ কাফেরদের হত্যা করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করোনা। যেমন, শিশু, অসুস্থ আঘাতপ্রাপ্ত, নারী এজাতীয়দের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আরও কিছু শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, (৩) যদি যুদ্ধবাজ কাফেররা যুদ্ধ করা থেকে বিরত হয় তবে তোমরা তৎক্ষণাত যুদ্ধ ত্যাগ কর। (৪) তোমাদের উপর যতটুকু আক্রমণ হবে তোমরা ততটুকুই শুধু আক্রমণ করবে। (৫) তোমাদের যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হলোঃ ক) ফিতনা তথা যাবতীয় বিপর্যয়, শান্তিভংগ, ঘর-বাড়ি থেকে বহিস্কার, যুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, শির্ক, অসৎপথ ইত্যাদি থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। খ) তোমাদের 'ইবাদাত তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলতে যেন তারা বাধা না হয়। গ) তারা যেন তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করতে পারে। ঘ) তোমরা যে হক বা সত্যের অনুসারী, তার প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করা। এ পথের বাধা দূর করা।

(১) অর্থাৎ এ কথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শির্কের উপর অটল থাকা এবং মুসলিমদেরকে উমরাহ্ ও হজের মত 'ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হল। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত فتنة (ফেত্‌নাহ্) শব্দটির দ্বারা কুফর, শির্ক এবং মুসলিমদের 'ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ও তাফসীরে কুরতুবী]

(২) পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরী'আতসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে এই বলে সীমিত করা হয়েছে, "মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হারামে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়"। সাধারণতঃ মক্কার সম্মানিত এলাকা তথা হারাম এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তার প্রতিরোধকল্পে

সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফেরদের পরিণাম।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১৯২. অতএব, যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেত্না[১] চূড়ান্ত ভাবে দূরীভূত না হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমরা[২] ছাড়া আর কারও উপর আক্রমণ নেই।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে[৩]।

যুদ্ধ করা জায়েয। এ মর্মে সমস্ত ফেকাহ্বিদগণ একমত। এ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, প্রথম অভিযান, আক্রমণ বা আগ্রাসন শুধুমাত্র মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা বা মক্কার হারামেই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ যেমন অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

(১) অর্থাৎ যখন 'দ্বীন' আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ফেত্নাকে নির্মূল করে দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। এ জন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 'ফিতনা' এর তাফসীর করেছেন 'শির্ক'। [তাবারী]

(২) আবুল আলীয়াহ বলেন, যালিম তারাই, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে ও মানতে অস্বীকার করবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) সাহাবীগণের মনে সন্দেহ এই ছিল যে, আশহুরে-হারাম বা সম্মানিত মাসসমূহে কোথাও কারো সাথে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা যুদ্ধ শুরু করে তবে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব? তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার হারাম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরী'আতসিদ্ধ, তেমনি হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফেররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর[১] এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না[২]। আর

(১) এই আয়াত থেকে ফোকাহ্‌শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলিমদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমনকিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় কিংবা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ১.আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদ কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হল। [আবু দাউদ: ২৫১২, তিরমিযী: ২৯৭২] এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলিমদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সে জন্যই আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। ২.বারা' ইবনে 'আযেব ও নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, পাপের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত

তোমরা ইহ্সান কর[১], নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহ্সীনদের ভালবাসেন।

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ

১৯৬. আর তোমরা হজ ও 'উমরা পূর্ণ কর[২] আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদঈ[৩] প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না[৪],

---

ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। [মাজমাউয যাওয়ায়িদঃ ৬/৩১৭] এ জন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম। ইমাম জাস্সাস রাহিমাহুল্লাহ্-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত দু'টি অর্থই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) এ বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন 'ইহ্সান' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। ইহ্সান দু'রকমঃ (১) 'ইবাদাতে ইহসান ও (২) দৈনন্দিন কাজকর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্সান। 'ইবাদাতের ইহ্সান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাদীসে জিবরাঈল'-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে 'ইবাদাত কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। [মুসলিমঃ ৮] এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে ইহ্সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু'আনহু বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তা পছন্দ করো। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর না, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করবে না'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৭]

(২) হজ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন এবং ইসলামের ফরযসমূহ বা অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কুরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(৩) হাদঈ বলতে এমন জানোয়ার বুঝায় যা মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্য থেকে যারা হজ ও উমরা একই সফরে আদায় করবে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র জন্য যবেহ্ করা ওয়াজিব হয়। যার রক্ত হারাম এলাকায় পড়তে হয়। মনে রাখাতে হবে যে, তা সাধারণ কুরবানী নয়।

(৪) আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহ্রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহ্রাম অবস্থায় চুল ছাঁটা বা কাটা অথবা মাথা মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ।

أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

যে পর্যন্ত হাদঈ তার স্থানে না পৌঁছে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা পশু যবেহ দ্বারা তার ফিদ্ইয়া দিবে(১)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজের সঙ্গে মিলিয়ে লাভবান হতে চায়(২) সে সহজলভ্য হাদঈ যবাই করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন এ পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য,

---

(১) যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদ্ইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে সাওম পালন করা বা সদকা দেয়া বা যবেহ্ করা। ফিদইয়া যবেহ্ করার জন্য হারামের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সাওম পালন বা সদকা দেয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কুরআনের শব্দের মধ্যে সাওমের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী কা'ব ইবনে উজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেনঃ 'তিন দিন সাওম অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার দাও, প্রত্যেক মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' খাবার দাও এবং তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেল'। [বুখারীঃ ৪৫১৭]

(২) হজের মাসে হজের সাথে 'উমরাকে একত্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ ও উমরাহ্র জন্য একত্রে এহ্রাম করা। শরী'আতের পরিভাষায় একে 'হজে-কেরান' বলা হয়। এর এহ্রাম হজের এহ্রামের সাথেই ছাড়তে হবে, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু উমরার এহ্রাম করবে। মক্কায় আগমনের পর উমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহ্রাম খুলবে এবং ৮ই জিলহজ তারিখে মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে স্ব স্ব স্থান থেকে এহ্রাম বেঁধে নেবে। শরী'আতের পরিভাষায় একে 'হজে-তামাত্তু' বলা হয়।

যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর(১)।

১৯৭. হজ্ব হয় সুবিদিত মাসগুলোতে(২)। তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্ব করা স্থির করে সে হজ্বের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ(৩), অন্যায় আচরণ(৪) ও

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

(১) আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্ব ও উমরাকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ্ব ও উমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিওবা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকে ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নাত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্‌ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

(২) যারা হজ্ব অথবা উমরা করার নিয়্যতে এহ্‌রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে উমরার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের ব্যাপারটি উমরার মত নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিল্‌ক্বদ ও জিল্‌হজ্ব। হজ্বের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধা জায়েয নয়।

(৩) رفث 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী সহবাস ও তার আনুষাঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এহ্‌রাম অবস্থায় এ সবই হারাম। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ এমনভাবে হজ্জ করবে যে, তাতে 'রাফাস, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' তথা অশ্লীলতা, পাপ ও ঝগড়া ছিল না, সে তার হজ্জ থেকে সে দিনের ন্যায় ফিরে আসল যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।" [বুখারী: ১৫২১, মুসলিম: ১৩৫০]

(৪) فسوق 'ফুসুক' এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কুরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা

التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

কলহ-বিবাদ[1] করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই কর আল্লাহ্ তা জানেন[2] আর তোমরা

নাফরমানী করাকে ‘ফুসুক’ বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই ফুসুক বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ‘ফুসুক’ শব্দের অর্থ করেছেন - সে সকল কাজ-কর্ম যা এহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ এহ্রামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সবসময়ই নিষিদ্ধ। যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এহ্রামের জন্য নিষেধ ও নাজায়েয, তা হচ্ছে ছয়টিঃ (১) স্ত্রী সহবাস ও এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আচরণ; এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীব-জন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেয়া। (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই এহ্রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দু’টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পোষাকের মত করে পরিধান করা। (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। আলোচ্য ছয়টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস যদিও ‘ফুসুক’ শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে ‘রাফাস’ শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এহ্রাম অবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফ্ফারা দিয়েও পরের বছর পুনরায় হজ্ব করতেই হবে। এজন্যেই ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) جدال শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এ জন্যেই বড় রকমের বিবাদকে جدال বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কেউ কেউ এস্থলে ‘ফুসুক’ ও ‘জিদাল’ শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, ‘ফুসুক’ ও ‘জিদাল’ সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহ্রামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ‘ইবাদাতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং ‘লাব্বাইকা লাব্বাইকা’ বলা হচ্ছে, এহ্রামের পোষাক তাদেরকে সবসময় এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন ‘ইবাদাতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ। [মা‘আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(২) ইহ্রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লেখিত বাক্যে হিদায়াত করা হচ্ছে যে, হজের পবিত্র সময় ও স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকেই বিরত থাকা যথেষ্ট

পাথেয় সংগ্রহ কর[১]। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর[২]।

১৯৮. তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই[৩]। সুতরাং যখন তোমরা 'আরাফাত[৪] হতে ফিরে

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا

নয়, বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও 'ইবাদাত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম প্রতিদানও দেয়া হবে।

(১) এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ ও উমরাহ্ করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত আসবাব পত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ আমার শাস্তি, আমার পাকড়াও, আমার লাঞ্ছনা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে চলে না, আমার নিষেধ থেকে দূরে থাকে না তাদের উপর আমার আযাব অবধারিত।

(৩) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, জাহেলিয়াতের যুগে ওকায, মাজান্নাহ ও যুল মাজায নামে তিনটি বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজের সময় সাহাবীরা সেই বাজারগুলোতে ব্যবসা করা গুনাহ বলে মনে করতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। অর্থাৎ হজের মৌসুমে সেসব স্থানগুলোতে ব্যবসা করা কোনো দোষের কাজ নয়। [বুখারী: ১৭৭০, ২০৯৮]

(৪) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীলকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরণ করে তাকে হজ করান। তারা আরাফাতে পৌঁছলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, عَرَفْتُ বা আমি চিনতে পেরেছি। কারণ, জিবরীল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এর পূর্বেই সেখানে একবার নিয়ে এসেছিলেন। আর সে জন্যই সেটার নাম হয় 'আরাফাত'। [ইবনে কাসীর]

هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ

আসবে[1] তখন মাশ'আরুল হারামের[2] কাছে পৌঁছে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও এর আগে[3] তোমরা বিভ্রান্ত দের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১৯৯. তারপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে ফিরে আসে তোমরাও সে স্থান থেকে ফিরে আসবে[4]। আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১) আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া'মুর আদ-দীলী বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'হজ হচ্ছে আরাফাত। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্বেই আরাফায় আসতে সক্ষম হবে সে হজ পেল। আর মিনা হচ্ছে তিন দিন। সুতরাং যদি কেউ দুইদিনে তাড়াতাড়ি করলো তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করলো তারও কোনো পাপ নেই।' [আবু দাউদ: ১৯৪৯, তিরমিযী: ৮৮৯, ইবনে মাজাহ: ৩০১৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩০৯,৩১০]

(২) এখানে 'মাশ'আরুল হারাম' বলে মুযদালিফা বোঝানো হয়েছে। কারণ, এ অংশ হারাম এলাকার ভিতরে। [ইবনে কাসীর]

(৩) এখানে 'এর আগে' বলে 'হেদায়াত আসার পূর্বে' বা 'কুরআনের পূর্বে' অথবা 'রাসূল আসার পূর্বে' এ তিনটি অর্থই হতে পারে। অর্থগুলো পরস্পর কাছাকাছি। [ইবনে কাসীর]

(৪) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত আরাফাই অবস্থানের স্থান এবং উরনা উপত্যকা থেকে বের হয়ে যাও। আর মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থানস্থল এবং আর তোমরা ওয়াদী মুহাস্সার থেকে প্রস্থান করো। আর মক্কার প্রতিটি অলিগলিই যবেহ করার জায়গা এবং আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিনই যবেহ করা যাবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮২] অন্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'কুরাইশ ও তাদের মতানুসারীরা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে 'হুমুস' নামে অভিহিত করতো। আর বাকী সব আরবরা আরাফায় অবস্থান করতো। অতঃপর যখন ইসলাম আসলো তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আরাফাতে যেতে, সেখানে অবস্থান করতে এবং সেখান থেকেই প্রস্থান করতে নির্দেশ দান করেন। এ জন্যই এ আয়াতে মানুষের সাথে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারী: ৪৫২০, মুসলিম: ১২১৯]

২০০. অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এভাবে স্মরণ করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষদের স্মরণ করে থাক, অথবা তার চেয়েও অধিক[১]। মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিন'। আখেরাতে তার জন্য কোনও অংশ নেই।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০১. আর তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন[২]।'

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আর আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০৩. আর তোমরা গোনা দিনগুলোতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। অতঃপর

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن

(১) আতা বলেন, এর অর্থ হলো, শিশুরা যেমন পিতা মাতাকে সব সময় স্মরণ করে, তোমরাও হজ শেষ করার পর আল্লাহ্ তা'আলাকে তেমনি স্মরণ কর। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, জাহেলিয়াতে হজের সময় একত্রে বসে পরস্পরে বলাবলি করত যে, আমার পিতা একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের ভালো কাজ করে দিতেন। তিনি মানুষের দিয়াত বা রক্তপণ আদায় করে দিতেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে আল্লাহ্‌র যিকরকে তাদের পিতৃপুরুষের স্মরণের সাথে তুলনা করে বেশী বেশী করে যিকর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। [ইবনে কাসীর]

(২) আবদুল্লাহ্ ইবনে সায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বার দুই রুকনের মাঝখানে এ দো'আ বলতে শুনেছি'। [আবুদাউদ: ১৮৯২] আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এ দো'আ করতেন।' [বুখারী: ৪৫২২, মুসলিম: ২৬৯০]

تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবনে[১] যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে যমীনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্‌ ফাসাদ ভালবাসেন না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর', তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে, কাজেই জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৭. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিকিয়ে

---

(১) আয়াতের এ অংশের তিনটি অর্থ হতে পারেঃ (১) পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে। (২) পার্থিব জীবনে যাদের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে। এবং (৩) পার্থিব জীবনে আপনি চমৎকৃত হন তাদের কথাবার্তায়।

দেয়[১]। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

২০৮. হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾

২০৯. অতঃপর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

২১০. তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন[২]? এবং সবকিছুর মীমাংসা

(১) বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি সোহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তার তুনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, - হে কোরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাযী হয়ে গেল এবং সোহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু'আনহু নিরাপদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বললেন, সুহাইব লাভবান হয়েছে! সুহাইব লাভবান হয়েছে! [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩/৩৯৮]

(২) আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন

হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

سَلْ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ کَمْ اٰتَیْنٰهُمْ مِّنْ اٰیَةٍۭ بَیِّنَةٍ ؕ وَمَنْ یُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

২১১. ইস্‌রাঈল-বংশধরগণকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি! আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসার পর কেউ তা পরিবর্তন করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

زُیِّنَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِیْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

২১২. যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযিক্ দান করেন।

کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত[১]।

ঘটনা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র আগমন সত্য ও সঠিক। এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা আমরা জানি না।

(১) এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিঃসন্দেহে তাওহীদের উপর ছিল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আদম ও নূহ 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর মাঝে দশটি প্রজন্ম গত হয়েছেন, যারা সবাই তাওহীদের উপর ছিলেন। অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আদম ও নূহ 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর মাঝে দশটি প্রজন্ম হিদায়াতের উপর ছিল। [তাফসীরে তাবারী] অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও সঠিক মতকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল করেন। নবীগণের চেষ্টা পরিশ্রমের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল এবং তাদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক

النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন[১] যাতে মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের কাছে আসার পরে শুধু

পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত।

এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, দ্বীনের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলিম ও অমুসলিম দু'টি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ [সূরা আত-তাগাবুনঃ ২] আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে এ কথাও পরিস্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। বরং একক বিশ্বাস ও একক দ্বীনের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরশাদ হয়েছে যে, ﴿كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً﴾ সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্য দ্বীনের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহ্বান করেছেন। যারা তাদের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা একক জাতীয়তা থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে এবং বিচ্ছিন্ন জাতীয়তা গঠন করেছে।

(১) আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী-রাসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছিল বলেই আরও নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কুরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাযত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষাকে কেয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মাদীর মধ্য থেকে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য দ্বীনে অটল থেকে মুসলিমদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শক্রতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যেই তার পরে নবুওয়াত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খতমে-নবুওয়াত ঘোষণা করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

পরস্পর বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে তারা বিরোধিতা করত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হেদায়াত করেছেন সে সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল[১]। আর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছে সরল পথের দিকে হেদায়াত করেন।

২১৪. নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে[২] অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

(১) অর্থাৎ মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণ এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচারণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহ্‌গণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করতে থাকা। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করতে পারবে না। তবে কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চস্তরের বর্ণনা - যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সবচাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর (মর্যাদার দিক থেকে) তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ'। [ইবনে মাজাহ্‌ঃ ৪০২৩]

বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে[১]?' জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে।

২১৫. তারা কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে[২]। বলুন, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছুই তোমরা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৬. তোমাদের উপর লড়াই করাকে লিখে দেয়া হয়েছে যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

---

(১) নবীগণ ও তাদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে' তা কোন সন্দেহের কারণে নয়। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি আসুক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়াতের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুত নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

(২) অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই দানের পাত্র কারা? প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে, 'তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণ'। আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে, 'তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন'। বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদেরকে ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্র নিকট এর প্রতিদান পাবে।

হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না[১]।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে[২]; বলুন, 'এতে যুদ্ধ করা কঠিন অপরাধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া ও এর বাসিন্দাকে এ থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তারচেয়েও বেশী অপরাধ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

(১) আয়াতের মর্ম হলো, "যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরে ছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। তাই বলা হয়েছেঃ জিহাদ যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) আলোচ্য আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব, যিল্‌ক্বদ, যিল্‌হজ এবং মুহার্‌রাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। প্রখ্যাত মুফাসসির 'আতা ইবনে আবী রাবাহ্' শপথ করে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কুরতুবী বলেন, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমন করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক পাল্টা আক্রমণ করা মুসলিমদের জন্যও জায়েয। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪২৩]

করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে[১] এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে'।

২১৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে[২], তারাই আল্লাহ্র

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

(১) মুরতাদ সে ব্যক্তি, যে ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরে গেছে, চাই তা কথায় হোক, বিশ্বাসে হোক বা কাজে হোক। এ আয়াতের শেষে মুসলিম হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে। "তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বরবাদ হয়ে গেছে"। এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোন নিকটআত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন সালাত-সাওম যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। আর আখেরাতে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে 'ইবাদাতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফেরদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

(২) জিহাদের শাব্দিক অর্থ হলো: চেষ্টা করা, সাধনা করা, তা কাজ অথবা কথা যেকোন মাধ্যমে হতে পারে। শর'য়ী পরিভাষায় - কাফের, সীমালংঘনকারী অথবা মুরতাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনায় জিহাদের অসাধারণ ফযীলতের কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জিহাদকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে

নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং ওটাই তো মহাসাফল্য"। [সূরা আত্-তাওবাঃ ১১১] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ 'সকল কিছুর মূল হলো ইসলাম। যার খুঁটি হলো সালাত এবং সর্বোচ্চ শিখর জিহাদ'। [তিরমিযীঃ ২৬১৬] জিহাদের তুলনা অন্য কিছু দ্বারা হয় না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের পরিপূরক হতে পারে'। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেনঃ 'আমি পাইনি'। [বুখারীঃ ২৮১৮] এছাড়া আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদ করবে, তাদেরও অসংখ্য মর্যাদার কথা ঘোষিত রয়েছে কুরআন ও হাদীসে। যেমন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ "আর আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৫৪] অপর হাদীসে এসেছে, জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণকারীরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর সম্মানীত মেহমান। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'শহীদদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে - (১) রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেয়া হয়। (৩) কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে এবং মহা শংকার দিনে শংকামুক্ত থাকবে। (৪) তাকে ঈমানের অলংকার পরানো হবে। (৫) জান্নাতের হূর তাকে বিয়ে করানো হবে। (৬) তার নিকটাত্মীয়দের থেকে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করার সুযোগ দেয়া হবে'। [বুখারীঃ ২৭৯০]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সব সময়ই জিহাদ ফরয। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরযে-'আইনরূপে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরযে কেফায়া। যদি মুসলিমদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলিমই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলিমই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমাকে প্রেরণের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে, আমার উম্মতের সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে' [আবু দাউদঃ ২৫৩২] কুরআনের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান

অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।	وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

ও মালের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন"। [সূরা আন্-নিসাঃ ৯৫] সুতরাং যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন হতো, তবে তা বর্জনকারীদের সুফল দানের কথা বলা হত না। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বলল, জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেনঃ 'তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর'। [মুসলিমঃ ২৫৪৯] এতেও বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরযে-কেফায়া। যখন মুসলিমদের একটি দল ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলিম অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলিমদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান করেন, তখন জিহাদ ফরযে-আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের এরশাদ হয়েছেঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়"। [সূরা আত্-তাওবাঃ ৩৮] এ আয়াতে আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলিম দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের উপর এ ফরয পরিব্যপ্ত হয় এবং ফরযে-আইন হয়ে যায়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কেফায়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে-কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কেফায়াতে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

২১৯. লোকেরা আপনাকে মদ[১] | يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ

(১) ইসলামের প্রথম যুগের জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মধ্যে মদ্যপান স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পরও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের ঊর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থান ছিল সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। কেননা, যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তার অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যারা হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বেও মদ্যপান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি। মদীনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উমর, মু'আয ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ 'মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। [আবু দাউদঃ ৩৬৭০, তিরমিযীঃ ৩০৪৯, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৫৩] এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলিমদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নাযিল হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। [মা'আরিফুল কুরআন]

এ আয়াতে পরিস্কারভাবে মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্য পানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা দ্বীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে

ও জুয়া[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। | اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ

স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেত্‌নায় পড়তে না হয়, সে জন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সূরার আন-নিসা এর ৪৩ নং আয়াতে মদপানের সময় সীমিত করা হয়। সবশেষে সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৯০ নং আয়াতের মাধ্যমে মদকে চিরতরে হারাম করা হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৯০ নং আয়াতে করা হবে।

(১) আয়াতে উল্লেখিত ميسر শব্দটির অর্থ বন্টন করা, ياسر বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হত। কেউ একাধিক অংশ পেত আবার কেউ বঞ্চিত হত। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হত, আর গোশ্‌ত দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হত; নিজেরা ব্যবহার করত না। এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হত। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করত, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হত। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হত। [তাফসীরে কুরতুবী: ৩/৪৪২-৪৪৩] সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তার তাফসীরে এবং জাস্‌সাস 'আহকামুল-কুরআনে' লিখেছেন যে, মুফাস্‌সিরে কুরআন ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, কাতাদাহ্, মু'আবিয়া ইবনে সালেহ্, আতা ও তাউস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেছেনঃ সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও। ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ লটারীও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত। জাস্‌সাস ও ইবনে সিরীন বলেছেনঃ 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও 'মাইসির' এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, লটারীর মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় অপরদিকে অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, 'মাইসির' ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। [ইবনে কাসীর] এ জন্য সহীহ্ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজী ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বারীদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হাত রঞ্জিত করে'। [মুসলিমঃ ২২৬০]

مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ

বলুন, 'দু'টোর মধ্যেই আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; আর এ দু'টোর পাপ উপকারের চাইতে অনেক বড়' । আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি তারা ব্যয় করবে? বলুন, যা উদ্বৃত্ত[১] । এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর ।

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

২২০. দুনিয়া এবং আখেরাতের ব্যাপারে । আর লোকেরা আপনাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলুন, 'তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম' । তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই । আল্লাহ্ জানেন কে উপকারকারী এবং কে অনিষ্টকারী[২] । আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় ।

---

(১) অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর । এতে বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে । নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই । অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্‌র পছন্দ নয় ।

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, যখন "তোমরা উত্তম পদ্ধতি ব্যতীত ইয়াতিমের সম্পদের কাছেও যেও না" [সূরা আল-আন'আম: ১৫২, আল-ইসরা: ৩৪] নাযিল হল তখন অনেকেই ইয়াতিমদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে । ফলে ইয়াতিমরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে । তখন এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতিমদের সাথে কিভাবে চলতে হবে তা জানিয়ে দেন ।" [আবুদাউদ: ২৮৭১]

২২১. আর মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করো না[১]।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا

(১) আয়াতে মুশরিক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। বলা হয়েছে, "তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো" [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ৫]। তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐ সব বিশেষ অমুসলিমকেই বোঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলিম পুরুষদের সম্পর্কের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানদের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। মুসলিম বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার দ্বীনী ব্যাপারে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন দ্বীনহীন মুসলিম মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সে ক্ষেত্রে অমুসলিম মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু'আনহু যখন খবর পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলিমদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা দ্বীনী জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ। [তাফসীরে কুরতুবীঃ ৩/৪৫৬]

বর্তমান যুগের অমুসলিম আহলে কিতাব, ইয়াহূদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলিম সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলিমদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। ইসলামের খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু'আনহু-এর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইয়াহূদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদম-শুমারীর খাতায় যাদেরকে দ্বীনী দিক থেকে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত দ্বীনের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, নাসারা ও ইয়াহূদী মতের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণভাবেই দ্বীন বর্জনকারী। তারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকেও মানে না, তাওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও মানে না, আখেরাতও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কুরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণই হারাম। সূরা আল-মায়েদাহ এর আয়াতে যাদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আজকালকার

الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ښ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, অবশ্যই মুমিন কৃতদাসী তার চেয়ে উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা বিয়ে দিও না[১], মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও অবশ্যই মুমিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। তারা আগুনের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন[২]। আর

ইয়াহূদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলিমদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিম মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের দ্বীন সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় দ্বীনের আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন মুসলিম অমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু কোন অমুসলিমের সাথে কোন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। [তাবারী] যুহরী, কাতাদাহ বলেন, কোন অমুসলিম চাই সে ইয়াহূদী হোক বা নাসারা বা মুশরিক তার কাছে কোন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। [তাফসীরে আবদুর রাজ্জাক] এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে।

(২) আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষের বিয়ে কাফের নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলিম নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সাধারণত বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শির্কের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি

তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা শিক্ষা নিতে পারে।

২২২. আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়েয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'তা অশুচি'[১]। কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম থেকে বিরত থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত[২] (সংগমের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হবে না[৩]। তারপর তারা

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

হয় অথবা কুফর ও শির্কের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শির্কে জড়িয়ে পড়ে; যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহ্বান করেন এবং পরিস্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) আয়াতে বর্ণিত مَحِيضٌ অর্থ দু'টি। ১. হায়েযের স্থান ২. হায়েযের সময়। অর্থাৎ তারা আপনাকে হায়েয এর ব্যাপারে অথবা হায়েযের স্থান অথবা হায়েযের সময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। তারা হায়েযের সময়ে সে স্থানে কি করতে পারে, আর কি করতে পারবে না এ প্রশ্ন করছে। বলুন যে, সেটা أذى - এর এক অর্থ, কষ্ট। আরেক অর্থ, অপবিত্রতা, অশুচি। দু'টি অর্থই শুদ্ধ। [তাফসীরে কুরতুবী] হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কতটুকু মেলামেশা করা যাবে, তা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হায়েযের স্থানে সঙ্গম ব্যতীত আর সবই করতে পার"। [মুসলিমঃ ৩০২] উম্মুল মুমিনীন মায়মূনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হায়েয অবস্থায় কোন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চাইতেন তখন তাকে হায়েযের স্থানে কাপড় পরিধান করে নিতে বলতেন।" [বুখারীঃ ৩০৩, মুসলিমঃ ২৯৪]

(২) চরম যৌন উত্তেজনা বশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তাওবা করে নেয়া ওয়াজিব। তার সাথে সাথে কিছু দান-সদকা করে দিলে তা উত্তম। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ১/১৭১, ১৭২, তিরমিযীঃ ১৩৭] তবে মনে রাখতে হবে যে, পশ্চাদ পথে (অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় সংগম ক্রিয়া ব্যতীত তাদের সাথে সর্বপ্রকার মেলামেশাই জায়েয। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অংশে মেলামেশা জায়েয।

যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং তাদেরকেও ভালবাসেন যারা পবিত্র থাকে।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে[১] গমন করতে পার। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো[২] এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

২২৪. আর তোমরা সৎকাজ এবং তাকওয়া ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্‌র নামের শপথকে অজুহাত করো না। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ[৩]।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

---

(১) আল্লাহ্ এখানে স্ত্রীদের সাথে সংগমের কোন নিয়মনীতি বেঁধে দেননি। শুইয়ে, বসিয়ে, কাত করে সব রকমই জায়েয। তবে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ যেমন, পায়ূপথ, মুখ ইত্যাদিতে সংগম করা জায়েয নেই। কেননা, তা বিকৃত মানসিকতার ফল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে নিষেধ এসেছে।

(২) এখানে 'ভবিষ্যতের জন্য কিছু কর' বলতে অনেকের মতেই সন্তান-সন্ততির জন্য প্রচেষ্টা চালানো বুঝানো হয়েছে।

(৩) মুমিনদের জন্য কখনো ভাল কাজ না করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা উচিত হবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি যখনই কোন কাজের শপথ করি, তারপর তারচেয়ে ভাল কাজ শপথের বিপরীতে দেখতে পাই, তখনি আমি সে শপথ ভেঙ্গে যা ভাল সেটা করি এবং পূর্বকৃত শপথের কাফ্‌ফারা দেই'। [বুখারীঃ ৩১৩৩, মুসলিমঃ ১৬৪৯]

২২৫. তোমাদের অনর্থক শপথের[১] জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি সেসব কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন, তোমাদের অন্তর যা সংকল্প করে অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহিষ্ণু।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৬. যারা নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে[২] তারা চার মাস অপেক্ষা

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

(১) 'ইয়ামীনে লাগও' বা 'অনর্থক-কসম'- এর এক অর্থ হচ্ছে, কোন বিষয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে শপথ শব্দ বেরিয়ে পড়া। [বুখারী:৪৬১৩] কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলে মনে করেই শপথ করা। উদাহরণতঃ - নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে'। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। [কুরতুবী:৪/১৭] এ ধরনের শপথে কোন পাপ হবে না। আর সেজন্যই একে অহেতুক বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং এ ধরণের কসমের কোন কাফ্‌ফারাও নেই। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গামুস'। এতে পাপ হয়। এ আয়াতে দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও এক প্রকারের কসম আছে, যাকে বলা হয় 'মুন'আকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে এক্ষেত্রে তাকে কাফ্‌ফারা দিতেই হবে। [কুরতুবী: ৪/১৯] সূরা আল-মায়িদাহ্ এর ৮৯ নং আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা ও বিধান বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে, প্রথমতঃ কোন সময় নির্ধারণ করল না। দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখল। তৃতীয়তঃ চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করল। চতুর্থতঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল। বস্তুতঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিকগুলোকে শরী'আতে 'ঈলা' বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাত'য়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ পুনঃর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব

করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২৭. আর যদি তারা তালাক[১] দেয়ার সংকল্প করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ[২] তিন

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا

হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) ইসলামী শরী'আতে বিয়ে হচ্ছে, পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তিস্বরূপ। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি 'ইবাদাত। সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির ঊর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে 'ইবাদাতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না। আর তালাক; তা বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরী'আত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে 'ইবাদাতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। এ আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(২) ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিশ সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এজন্যই ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা

রাখা হয়েছে। ইসলামী শরী'আত অন্যান্য দ্বীনের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে। তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর যুলুম অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কিছু আদাব ও শর্ত রয়েছে। যেমন, এক. এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। দুই. রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। তিন. ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে চল্‌তি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চল্‌তি ঋতুর শেষে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। চার. পবিত্র অবস্থায়ও যে তুহুর বা সুচিতায় সহবাস হয়েছে তাতে তালাক না দেয়ার কথা বলা হয়েছে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কারণ, যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরও দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরও একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। পাঁচ. বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। ছয়. যদি পরিস্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে। সাত. প্রত্যাহারের এ অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক বা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। আট. যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। আর তারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এতে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশী হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে[১]। আর

---

(১) আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরী'আতী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী। প্রায় একই রকম বক্তব্য অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছেঃ "যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল"। [সূরা আন্-নিসাঃ ৩৪] ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুস্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হত। মীরাসের অধিকারিনী হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রবর্তিত দ্বীন ইসলামই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি পিতা হলেও কোন প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। স্বামী

আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২২৯. তালাক দু'বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিধিমত রেখে দেওয়া, নতুবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেওয়া। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে হালাল নয়[১]। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّآ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـًٔا اِلَّآ اَنۡ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۲۹﴾

তার নায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। আবার ইসলাম নারীদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেও দেয়নি; কারণ তা নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততি লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ জন্য কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর ঊর্ধ্বে।" অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। এ আয়াতে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপরই হয়ে থাকে। তাই আখেরাতের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এ ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

(১) অর্থাৎ 'তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মাহ্‌র ফেরত নেয়া হালাল নয়'। কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ট হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মাহ্‌র মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কুরআনুল কারীম এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে।

সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই[১]। এ সব আল্লাহ্র সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে তারাই যালিম।

২৩০. অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে[২]। অতঃপর সে

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

(১) অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মাহ্র ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মাহ্র ফেরত নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেয়া জায়েয হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণিত যে, সাবেত ইবনে কাইসের স্ত্রী নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাবেত ইবনে কাইসের দ্বীনদারী এবং চরিত্রের উপর আমার কোন অভিযোগ নেই; কিন্তু আমি মুসলিম হয়ে কুফরী করাটা মোটেও পছন্দ করি না। (তাদের উভয়ের সম্পর্কে অমিল ছিল) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি কি তাকে (স্বামীকে)-মাহ্র হিসেবে তোমাকে যে বাগান দিয়েছিল-তা ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বললেন, বাগানটি ফেরত নিয়ে তাকে এক তালাক দিয়ে দাও'। [বুখারীঃ ৫২৭৩]

(২) অর্থাৎ এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সবদিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পর অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি

حُدُوْدَاللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُاللّٰهِ يُبَيِّنُهَا | (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তালাক দেয় আর

এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যু বরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তালাক দেয়ার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিঃ কুরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্‌গণ একে আহ্‌সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন। [ইবনে আবী শাইবাহ্‌ঃ ১৭/৭৪৩] ইবনে আবি-শাইবা তার গ্রন্থে ইবরাহীম নাখ্‌'য়ী রাহিমাহুল্লাহ্‌ থেকে আরও উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবেই ছিন্ন হয়ে যাবে। মোটকথা: ইসলামী শরী'আত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরী'আতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরও সুবিধা হচ্ছে এই যে, এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরও এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরী'আতও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয়পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۝

তারা উভয়ে (স্ত্রী ও প্রথম স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না[১]। এগুলো আল্লাহ্‌র সীমারেখা, যা তিনি স্পষ্টভাবে এমন কওমের জন্য বর্ণনা করেন, যারা জানে।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও অতঃপর তারা 'ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয়, তখন তোমরা হয় বিধি অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দেবে, অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে[২]।

(১) এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। তা হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এ ধরণের বিয়ে মোটেই হালাল বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এ ধরণের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। আলী, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে 'আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমূখ সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক যোগে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করে তাদের উভয়ের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪৮, আবু দাউদঃ ২০৬২, তিরমিযীঃ ১১১৯, ১১২০]

(২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য এ আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার যাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা হয়েছে ﴿تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ﴾ এখানে تَسْرِيْحٌ -অর্থ

نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ؗ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে তা করে, সে নিজের প্রতি যুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু করো না[১] এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও কিতাব এবং হেকমত যা তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

খুলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। تَسْرِيْحٌ এর সাথে إِحْسَانٍ শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎ লোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

(১) এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেলা ও তামাশায় পরিণত করো না। অর্থাৎ বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দিয়ে দেয়া বা মুক্তি দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়্যতের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে, দ্বিতীয়টি তালাক এবং তৃতীয়টি রাজ'আত বা তালাকের পর স্ত্রী ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা'। [আবু দাউদঃ ২১৯৪, তিরমিযীঃ ১১৮৪, ইবনে মাজাহ: ২০৩৯]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

২৩২. আর তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, এরপর তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়[১], তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। এ দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হয়[২] তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, এটাই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও

---

(১) এখানে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধা সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরী'আত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে "উভয়ে শরী'আতের নিয়মানুযায়ী রাযী হবে"। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাযী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাযীও হয় আর তা শরী'আতের আইন মোতাবেক না হয়, যথা, বিয়ে না করেই উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই কোন নারী অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলিম তথা বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তারা সবাই এমন কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য এসব আহ্‌কাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

পবিত্রতম[১]। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

২৩৩. আর জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করাবে[২], এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের (মাতাদের) ভরণ-পোষণ করা[৩]। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কাজের

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا

(১) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এ বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

(২) এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদানসংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণতঃ তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায় সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান ও দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও যুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ "মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করাবে"। এখানে এটা স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, এ দু'বছরের পর শিশুকে আর মাতৃস্তন্যের দুধ পান করানো চলবে না।

(৩) এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। [কুরতুবী]

فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

ভার দেয়া হয় না। কোন মাতাকে তার সন্তানের জন্য[১] এবং যার সন্তান (পিতা) তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। আর যদি তোমরা (কোন ধাত্রী দ্বারা) তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য পান করাতে চাও, তাহলে যদি তোমরা প্রচলিত বিধি মোতাবেক বিনিময় দিয়ে দাও তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা (স্ত্রীগণ) নিজেরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক খবর রাখেন।

---

(১) এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

২৩৫. আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে (সে) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দাও বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ তবে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না; এবং নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৬. যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা মোহর নির্ধারণ না করেই তালাক দাও তবে তোমাদের কোন অপরাধ নেই[১]। আর তোমরা তাদের কিছু সংস্থান করে দেবে, সচ্ছল তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তার সামর্থ্যানুযায়ী, বিধিমত সংস্থান করবে, এটা মুহসিন লোকদের উপর কর্তব্য।

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৭. আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও, অথচ

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ

(১) অর্থাৎ এ অবস্থায় তালাক দেয়াতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। যদিও এতে স্ত্রীদের মন ভাঙ্গা হয়ে যায়। এতে তাদের কিছুটা কষ্ট হয় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাদের কিছুই থাকে না। এমতাবস্থায় তোমরা তাদেরকে কিছু উপভোগ্য জিনিস প্রদান করে সেটার সমাধান করতে পার। আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, এমতাবস্থায় তোমাদের উপর (মোহরের) কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

তাদের জন্য মাহ্‌র ধার্য করে থাক, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক(১), তবে যা স্ত্রীগণ অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয়(২) এবং মাফ করে দেয়াই

---

(১) মাহ্‌র ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে, যদি মাহ্‌র ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মাহ্‌র ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মাহ্‌র ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। চতুর্থতঃ মাহ্‌র ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মাহ্‌র পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।
২৩৬ ও ২৩৭ নং আয়াতদ্বয়ে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে ২৩৬ নং আয়াতে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে,মাহ্‌র কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। অন্ততপক্ষে তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কুরআনুল কারীম প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য এ কথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এমনি এক ব্যাপারে দশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ্‌ পাঁচশ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মাহ্‌র বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মাহ্‌রের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মাহ্‌রই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার।

(২) "যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে"-এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলেমগণ দু'টি মতে বিভক্ত - (১) একদল আলেম বলেনঃ এখানে "যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে" বলতে স্ত্রীর অভিভাবককে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ মত একদিকে শক্তিশালী, অপরদিকে দূর্বল, শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, ক্ষমা করাটা মূলতঃ স্ত্রীর অভিভাবকের পক্ষেই মানানসই। অপরদিকে দূর্বল হলো এ দিক থেকে যে, সত্যিকারভাবে বিয়ের বন্ধন স্বামীর হাতেই। স্ত্রীর অভিভাবকের এখানে কোন হাত নেই। (২) আরেক দল আলেম বলেনঃ এখানে যার হাতে বিয়ের বন্ধন বলতে স্বামীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের মতের সমর্থনেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ

তাকওয়ার নিকটতর। আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সবিশেষ প্রত্যক্ষকারী।

২৩৮.তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে[১], বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের[২] এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে;

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

সনদে বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমসহ অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীনদের থেকে বর্ণনা এসেছে। [দারা কুতনী: ৩/২৭৯] এ মতও একদিক থেকে শক্তিশালী, অপরদিক থেকে দূর্বল। শক্তিশালী হলো এদিক থেকে যে, মূলতঃ যার হাতে বিয়ের বন্ধন, সে হলো স্বামী। আর দূর্বল হলো এদিক থেকে যে, যদি স্বামী উদ্দেশ্য হয় তবে ক্ষমা কিভাবে করা হবে? মাহ্র দেয়া তো তার উপর ওয়াজিব। সে কিভাবে ক্ষমা করতে পারে? তবে ইবন জারীর রাহিমাহুল্লাহ্ এ মতের সমর্থন করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে - ক) স্বামীর হাতেই মূলতঃ বিয়ের বন্ধন। স্ত্রীর অভিভাবকের হাতে নেই। খ) স্বামীর পক্ষ থেকে ক্ষমার অর্থ হলো এই যে, তারা পূর্বকালে পূর্ণ মাহ্র আদায় করেই বিয়ে করত, তারপর বিয়ে ভঙ্গ হলে স্বামী বাকী অর্ধেক মাহ্র ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাতো।

(১) সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিষয় বর্ণনা করার পর সালাতের তাকীদ দিয়ে আল্লাহ্ এ ভাষণটির সমাপ্তি টানছেন। কারণ, সালাত এমন একটি জিনিষ যা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়, সততা, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ এবং আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে আর এ সঙ্গে তাকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। মানুষের মধ্যে এ বস্তুগুলো না থাকলে সে কখনো আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারত না।

(২) কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মতে মধ্যবর্তী সালাতের অর্থ হচ্ছে আসরের সালাত। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি সালাত - ফজর ও যোহর এবং অপরদিকে রাতের দু'টি সালাত - মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ সালাতের জন্য তাকীদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজকর্মের ব্যস্ততা থাকে। আসরের সালাতের গুরুত্ব বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার যেন পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ সবই ধ্বংস হয়ে গেল'। [বুখারীঃ ৫৫২] আর হাদীসে 'কানেতীন' বা 'বিনীতভাবে' বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে নীরবতার সাথে। [বুখারীঃ ১২০০]

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯. অতঃপর যদি তোমরা বিপদাশংকা কর, তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে(১)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪০. আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়াত করে(২)। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

---

(১) সালেহ্ বিন খাওয়াত ঐ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 'যাতুর রিকা'র যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভীতির সালাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ (সাহাবাগণের) একদল সালাত আদায়ের জন্য তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং আরেক দল শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকলেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমোক্ত দলের সাথে এক রাকা'আত সালাত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ একা একা দ্বিতীয় রাকা'আত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে দাঁড়ালে তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সাথে নিয়ে অবশিষ্ট (এক) রাকা'আত আদায় করে বসে থাকলেন। (দ্বিতীয় দলের) মুক্তাদীগণ নিজে নিজে দ্বিতীয় রাকা'আত শেষ করে বসলে তিনি তাদেরকে সংগে নিয়ে সালাম ফিরালেন। [বুখারীঃ ৪১২৯]

(২) স্বামীর মৃত্যুর দরুন স্ত্রীর ইদ্দতকাল ছিল এক বছর। কিন্তু পরবর্তীতে এ সূরার ২৩৪ নং আয়াতের মাধ্যমে বছরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, এ আয়াতটি এ সূরার ২৩৪ নং আয়াতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য[১]।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

২৪২. এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

২৪৩. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল[২]?

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ

(১) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য 'মাতা'' বা সংস্থান করে দেয়ার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মাহ্‌র ধার্য করা হয়েছে, তাদের 'মাতা'' বা সংস্থান করে দেয়ার এক অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মাহ্‌র দিয়ে দেয়া। আর যার মাহ্‌র ধার্য করা হয়নি, তার জন্য মাহরে-মিসাল দেয়া। আর যদি 'মাতা' শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে কিছু কাপড় বা আর্থিক দান বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ প্রথমোক্ত মহিলা যার সাথে স্বামীর সহবাসও হয়নি আর তার মাহ্‌রও নির্ধারিত হয়নি। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মুস্তাহাব। আর যদি 'মাতা'' শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেয়া ওয়াজিব। তালাকে-রাজ'য়ীই হোক আর তালাকে বায়েনই হোক, ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, কোন এক শহরে ইসরাঈল-বংশধরের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা পাঠালেন তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করানোর জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। ফেরেশ্‌তা দু'জন ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল। দীর্ঘকাল পর ইসরাঈল-বংশধরদের একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বদ্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা

اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা মরে যাও'। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না[১]।

অবগত করানো হল। তখন তিনি দো'আ করলেন এবং আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। [ইবনে কাসীর]

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক বা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তি বা তাকদীরের প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মূহুর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ।

(১) এ আয়াত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জিহাদ বা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। দ্বিতীয়তঃ কোনখানে কোন মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া বৈধও নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না'। [বুখারী: ৩৪৭৩, মুসলিম: ২২১৮] ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়'। এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি

তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়ত সে মারা যেত না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়ত এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হত না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকত, তার মৃত্যু এ সময়েই হত। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে। যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয়তঃ এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাযত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহ্র দেয়া তাকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর। এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিতঃ একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের কি অবস্থা হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত, তাদের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মরে গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে? দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়ত রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর থেকে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরও বেড়ে যাবে। কারণ প্রবাস জীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা তা সবারই জানা। তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়ত নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বনের বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 'এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে নাযিল হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হত তাদের ভেতর পাঠানো হত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৪. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

২৪৫. কে সে, যে আল্লাহ্‌কে কর্‌যে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন[১]। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ

২৪৬. আপনি কি মূসার পরবর্তী ইস্‌রাঈল-বংশীয় নেতাদের দেখেননি? তারা যখন তাদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি', তিনি বললেন, 'এমন

তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে'। [বুখারীঃ ৫৭৩৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীঃ 'প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগ আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'। [বুখারীঃ ৫৭৩২] এর ব্যাখ্যাও তাই। [মা'আরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

(১) কর্জ বা ঋণ দান করলে তার বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, 'যে ব্যক্তি তার উত্তম সম্পদ থেকে খেজুর সমপরিমাণ সদকা করবে, আল্লাহ্ উত্তম সম্পদ ছাড়া কবুল করেন না, আল্লাহ্ সে সম্পদ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সদকাকারীর জন্য তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন, যেমনি তোমাদের কেউ তার ঘোড়া শাবককে লালন-পালন করে পাহাড়সম বড় হওয়া পর্যন্ত। [বুখারীঃ ১৪১০] আল্লাহ্‌কে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'কোন একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু'বার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সদ্‌কা করার সমতুল্য'। [ইবনে মাজাহ্‌ঃ ২৪৩০] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে'। তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে'। [বুখারীঃ ২৬০৬]

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না'? তারা বলল, 'আমরা যখন নিজেদের আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হতে বহিস্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন যুদ্ধ করবো না'? অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল । আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করে পাঠিয়েছেন' । তারা বলল, 'আমাদের উপর তার রাজত্ব কিভাবে হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের বেশী হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেয়া হয়নি!' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন' । আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে স্বীয় রাজত্ব দান করেন । আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

২৪৮. আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত[১] আসবে

(১) বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল । তাতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল । বনী ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করতেন । জালূত ইসরাঈল-বংশধরদেরকে

اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٨﴾

যাতে তোমাদের রব-এর নিকট হতে প্রশান্তি এবং মুসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে নিশ্চয় তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে'।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

২৪৯. তারপর তালূত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হলো তখন সে বলল, 'আল্লাহ্ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তা থেকে পানি পান করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়; আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও'। অতঃপর অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা তা থেকে পানি পান করল[১]। সে এবং তার সংগী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা

পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশ্তাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। ইসরাঈল-বংশধররা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। [তাফসীরে বাগভী: ১/২৩০, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয: ১/৩৩৩]

(১) কোন কোন তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে তিন ধরণের লোক ছিল। একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টতার কথাও চিন্তা করেননি। [মা'আরিফুল কুরআন]

বলল, ‘জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে তারা বলল, ‘আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে’! আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

২৫০. আর তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন, আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন’।

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

২৫১. অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২. এ সব আল্লাহর আয়াত, আমরা আপনার নিকট তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি। আর নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

২৫৩. সে রাসূলগণ, আমরা তাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন[১], আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর মার্‌ইয়াম-পুত্র 'ঈসাকে আমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রদান করেছি ও রুহুল কুদুস দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু তারা মতভেদ করলো। ফলে তাদের কেউ কেউ ঈমান আনলো এবং কেউ কেউ কুফরী করল। আর

(১) 'কথা বলা' আল্লাহ্ তা'আলার একটি গুণ। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা শ্রুত বাক্য দ্বারা কথা বলেন। কথা বলার এ গুণটির উপর কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন"। [সূরা আন্-নিসাঃ ১৬৪] আল্লাহ্ আরও বলেনঃ "আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন মূসা বললেনঃ হে আমার রব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৪৩] আর সুন্নাহ্ হতে দলীল হলো, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আদম ও মূসা বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। মূসা আদমকে বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আমাদেরকে নিরাশ করে আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। আদম তাকে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ্ আপনাকে কথপোকথন দ্বারা নির্বাচিত করেছেন এবং নিজ হস্তে আপনাকে তাওরাত লিখে দিয়েছেন......। [বুখারীঃ ৬৬১৪, মুসলিমঃ ২৬৫২] তবে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বললেও তা অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়) আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পর কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সূরা আশ্-শুরার সে আয়াতটি দুনিয়ার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমরা যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর কাফেররাই যালিম।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ

২৫৫. আল্লাহ্[১], তিনি ছাড়া কোন সত্য

---

(১) এ আয়াতটিকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এটি মর্যাদার দিক থেকে কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হোক'। [মুসলিমঃ ৮১০] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'যে লোক প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না'। [নাসায়ী, দিন-রাতের আমলঃ ১০০] অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে। অনেকেই এ সূরার আয়াতুল কুর্সীতে "ইসমে 'আযম" আছে বলে মত দিয়েছেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ তাৎপর্যঃ এ আয়াতে মহান রব আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্শক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃংখলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাতে কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

ইলাহ্ নেই[১]। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক[২]। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়[৩]।

আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রতিটি বাক্যের সাথেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে।

(১) প্রথম বাক্য ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ এতে 'আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা 'ইবাদাতের যোগ্য। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্তা-ই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনিই একমাত্র হক মা'বুদ। আর সবই বাতিল উপাস্য।

(২) দ্বিতীয় বাক্য ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ আরবী ভাষায় حَيٌّ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্‌র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَيُّوم শব্দ কেয়াম থেকে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়্যুম' আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ গুণবাচক নাম যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়্যুম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আব্দুল কাইয়্যুম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়্যুম' বলে, তারা গোনাহ্‌গার হবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র এমন আরও কিছু নাম আছে, যেগুলো কোন বান্দাহ্‌র বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন, রাহ্‌মান, মান্নান, দাইয়্যান, ওয়াহ্‌হাব এ জাতীয় নামের ব্যাপারেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র নামের মধ্যে ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ অনেকের মতে 'ইসমে-আযম'।

(৩) তৃতীয় বাক্য ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ আরবীতে سِنَةٌ শব্দের সীন-এর كسرة দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نوم পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়্যুম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়ত ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করেছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মত মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই।

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর(১)। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে(২)? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন(৩)। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুকেই তারা

আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

(১) চতুর্থ বাক্য ﴿لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত لام অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

(২) পঞ্চম বাক্য ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে যে, তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারত যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সুপারিশ করব'। [মুসলিমঃ ১৯৩] একে 'মাকামে-মাহ্‌মুদ' বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস। অন্য কারো জন্য নয়।

(৩) ষষ্ঠ বাক্য ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অগ্র-পশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বের ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অপ্রকাশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দু'টিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয়দিকই বোঝানো হয়।

পরিবেষ্টন করতে পারে না[১]। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে[২]; আর এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না[৩]। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান[৪]।

২৫৬. দ্বীনগ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই[৫]; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ

(১) সপ্তম বাক্য ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

(২) অষ্টম বাক্য ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড় যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কছম, কুরসীর সাথে সাত আসমানের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। আর কুরসীর উপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আংটির বিপরীতে বিরাট ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব'। [ইবন হিব্বান: ৩৬১; বায়হাকী: ৪০৫]

(৩) নবম বাক্য ﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

(৪) দশম বাক্য ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ অর্থাৎ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(৫) কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীন গ্রহণে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ দ্বীন ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে? একটু গভীরভাবে

থেকে। অতএব, যে তাগূতকে[১] অস্বীকার | فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হত, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধ ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ﴿وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ﴾ "তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা ফাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না"। [সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪] এজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী যালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য। ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের এ কার্যপদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও যুদ্ধের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায় অনাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ-যুদ্ধের নির্দেশ ﴿لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ﴾ আয়াতের পরিপন্থী নয়। আবার কোন কোন নামধারী মুসলিম ইসলামের হুকুম-আহ্‌কাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা - "দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই" -এ অংশটুকু বলে। তারা জানে না যে, এ আয়াত দ্বারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি শুধু তাদেরকে জোর করে ইসলামে আনা যাবে না বলা হয়েছে। কিন্তু যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে, তারা ইসলামের প্রতিটি আইন ও যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কাম মানতে বাধ্য। সেখানে শুধু জোর-যবরদস্তি নয়, উপরন্তু শরী'আত না মানার শাস্তিও ইসলামে নির্ধারিত। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় আইন মানতে বাধ্য করানো অন্যান্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। যেমনটি সিদ্দীকে আকবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

(১) 'তাগূত' শব্দটি আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী বা নির্ধারিত সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় তাগূত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক 'ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে 'ইবাদাতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর 'ইবাদাতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহ্বান করেছে। [ইবনুল কাইয়্যেম: ই'লামুল মু'আক্কে'য়ীন] সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, তাগূত এমন বান্দাকে

বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভূ ও ইলাহ্ হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে।

আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় বান্দার প্রভূত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু কার্যত তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় 'ফাসেকী'। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আল্লাহ্‌র শাসন-কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় 'কুফরী ও শির্ক'। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায়, তাকেই বলা হয় তাগূত।

এ ধরণের তাগূত অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাগূত ওলামায়ে কেরাম পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন। (এক) শয়তান, সে হচ্ছে সকল প্রকার তাগূতের সর্দার। যেহেতু সে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত থেকে বিরত রেখে তার 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করতে থাকে, সেহেতু সে বড় তাগূত। (দুই) যে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে বলে দাবী করে বা অদৃশ্যের সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। যেমন, গণক, জ্যোতিষী প্রমূখ। (তিন) যে আল্লাহ্‌র বিধানে বিচার ফয়সালা না করে মানব রচিত বিধানে বিচার-ফয়সালা করাকে আল্লাহ্‌র বিধানের সমপর্যায়ের অথবা আল্লাহ্‌র বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে থাকে। অথবা আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিবর্তন করে বা মানুষের জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে। (চার) যার 'ইবাদাত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট। (পাঁচ) যে মানুষদেরকে নিজের 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় পাঁচ প্রকার তাগূতের পরিচয় তুলে ধরা হলেও তাগূত আরও অনেক রয়েছে। [কিতাবুত তাওহীদ]

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত নীতিমালার আলোকে আমরা সকল প্রকার তাগূতের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হব। (১) আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যত তথা প্রভূত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের দাবী করা। (২) আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাত বা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করা। এ হিসেবে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য যেমন, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, জীবিতকরণঃ, মৃত্যুদান, বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকরণঃ, হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন ইত্যাদিকে যে ব্যক্তি নিজের জন্য দাবী করবে সে তাগূত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌কে 'ইবাদাত করার যত পদ্ধতি আছে যে ব্যক্তি সেগুলো তার নিজের জন্য চাইবে সেও তাগূত। এর আওতায় পড়বে ঐ সমস্ত লোকগুলো যারা নিজেদেরকে সিজদা করার জন্য মানুষকে আহ্বান করে। নিজেদের জন্য মানত, যবেহ্, সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদির আহ্বান জানায়।

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

করবে[১] ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না[২]। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭. আল্লাহ্‌ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়[৩]। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي

২৫৮. আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ইব্‌রাহীমের সাথে তাঁর রব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্‌

(১) তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাগূত নেই বলে বিশ্বাস পোষণ করা। বরং তাগূতকে অস্বীকার করা বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ছাড়া অন্য কারো জন্য 'ইবাদাত সাব্যস্ত না করা এবং এ বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ছাড়া সকল প্রকার 'ইবাদাতই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আর যারা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যে কোন কিছু তাদের জন্য দাবী করে থাকে তাদেরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এ বিশ্বাস করা যে তাদের এ ধরণের কোন ক্ষমতা নেই।

(২) ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে জন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।

(৩) এখানে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

তাকে রাজত্ব[১] দিয়েছিলেন। যখন ইব্‌রাহীম বললেন, ' আমার রব তিনিই যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'। ইব্‌রাহীম বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো[২]। তারপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

২৫৯. অথবা সে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যা তার ছাদের উপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, 'মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন?' তারপর আল্লাহ্ তাকে এক শত বছর মৃত

أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ

(১) এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফের ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন বোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

(২) কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়ত বলতে পারত যে, যদি আল্লাহ্ বলে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত করুন! এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্বেও একথা জেগে উঠল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন এবং পূর্বদিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশ্বময় এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়। যেমন, মানুষ এ মু'জিযা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়। সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরই দেয় নি। অথবা তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরই ছিল না। এ জন্য সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। [বয়ানুল কুরআন]

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, ‘তুমি কতকাল অবস্থান করলে?’ সে বলল, ‘একদিন বা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি’। তিনি বললেন, বরং তুমি এক শত বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য কর, সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির দিকে। আর যাতে আমরা তোমাকে বানাবো মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। আর অস্থিগুলোর দিকে লক্ষ্য কর; কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই’। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলল, ‘আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান’।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

২৬০. আর যখন ইব্‌রাহীম বলল, ‘হে আমার রব! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান’, তিনি বললেন, ‘তবে কি আপনি ঈমান আনেন নি?’ তিনি বললেন, ‘অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয়[১]!’

(১) আয়াতে বর্ণিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে আরয করলেনঃ আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করলেনঃ ‘এরূপ আকাংখা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি আপনার আস্থা নেই?’ ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেনঃ আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে

আল্লাহ্ বললেন, 'তবে চারটি পাখি নিন এবং তাদেরকে আপনার বশীভূত করুন। তারপর সেগুলোর টুকরো অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন করুন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো আপনার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়(১)।

এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণঃ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রার্থনা কবূল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হল, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্রই হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এগুলোর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদির সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করুন, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক-একটি ভাগ রেখে দিন। তারপর এদেরকে ডাকুন। তখন এগুলো আল্লাহ্র কুদরতে জীবিত হয়ে উড়ে আপনার কাছে চলে আসবে। ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশ্ত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে উড়ে এসে উপস্থিত হল। [তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৩১৪]

(১) পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তা'আলার

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ(১)।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

২৬২. যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে(২) তারপর যা ব্যয় করে তা বলে

পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ না করানোর মধ্যে 'ঈমান বিল-গায়েব' বা গায়েবের উপর ঈমান স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে।

(১) ২৬২ থেকে ২৮৩ পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে অগ্নিগিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত, এক. প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করার শিক্ষা, যাকে সাদাকাহ বলা হয়। দুই. সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ। প্রথমে দান-সাদাকাহ্র ফযীলত, সেদিকে উৎসাহ দান এবং সে সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে সবশেষে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষেপিত]

(২) আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কুরআনুল কারীম কোথাও إِنْفَاق শব্দে, কোথাও إِطْعَام শব্দে, কোথাও صَدَقَة শব্দে এবং কোথাও إِيتَاءُ الزَّكَاة শব্দে ব্যক্ত করেছে। কুরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, إِطْعَام – إِنْفَاق – صَدَقَة প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-সদকা ও ব্যয়কেই বোঝায়; তা ফরয, ওয়াজিব কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্য কুরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ إيتاء الزكوة ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে বেশীর ভাগ إِنْفَاق শব্দ এবং কোথাও صَدَقَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর

لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

বেড়ায় না এবং কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৪. হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না[১] যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। ফলে তার উপমা হলো এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত সেটাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়[২]। যা তারা

অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-সদকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ আয়াতে সদকা কবূল হওয়ার দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

(২) এ উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান-সদকাকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়্যত ও প্রেরণার গলদসহ দান-সদকা করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়্যতের গলদ। এ বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল উপরিভাগেই লেপ্টে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এক্ষেত্রে তার জন্য লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-সদকা

উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না[১]।

২৬৫. আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে সেথায় ফলমূল জন্মে দ্বিগুন। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা যথার্থ প্রত্যক্ষকারী[২]।

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

যদিও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়্যতের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়্যত সৎ না হলে যত অধিক পরিমাণেই দান করা হোক না কেন তা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

(১) এখানে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়াত কবূল করতে পারে না।

(২) এ আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-সদকার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হালকা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুবই পরিজ্ঞাত। এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়্যত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎনিয়্যত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং আখেরাতের সাফল্যের কারণ।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকবে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং যেটাতে তার জন্য সবরকমের ফলমূল থাকবে। আর সে ব্যক্তিকে বার্ধক্য অবস্থা পেয়ে বসবে এবং তার কিছু দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকবে, তারপর তার (এ বাগানের) উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয়ে তা জ্বলে যাবে? এভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার[১]।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে-সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নযীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদাহরণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারো বাগান ও শষ্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-সৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তেই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল, বাগান তৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই

২৬৭.হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর[১] এবং আমরা যা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি[২] তা

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا

কথা। একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমরা কি জান এই আয়াতটি কি বিষয়ে নাযিল হয়েছে -"তোমাদের কেউ কি পছন্দ কর যে, তার একটি বাগান হবে"। [সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৬] এ কথা শুনে তারা বললেনঃ আল্লাহ্‌ই সবচাইতে ভাল জানেন। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রেগে গিয়ে বললেনঃ বরং (পরিস্কার করে) জানি অথবা জানিনা বলুন। তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এ ব্যাপারে আমার মনে একটি কথা জাগতেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ হে আমার ভাতিজা, বল, এবং তুমি তোমাকে ছোট মনে করো না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ এখানে আল্লাহ্‌ আমলের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ কোন উদাহরণ? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বললেনঃ শুধুমাত্র আমলের উদাহরণ (হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ মেনে আমল করছে; অতঃপর আল্লাহ্‌ তার নিকট শয়তানকে প্রেরণ করলেন। তখন শয়তানের নির্দেশে নাফরমানী করতে লাগল। এমনকি তার সমস্ত নেক আমলকে সে বরবাদ করে ফেলল। [বুখারী ঃ ৪৫৩৮]

সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ও দান-সদকা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে,তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়্যতের সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথেই করতে হবে - নাম-যশের জন্য নয়। অর্থাৎ ব্যয় করতে হবে ইখলাসের সাথে।

(১) এ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর'। [আবু দাউদঃ ৩৫২৮, ৩৫২৯, ইবনে মাজাহ্‌ঃ ২১৩৮]

(২) أَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে (যে জমিনের উৎপন্ন শষ্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। 'ওশর' ও 'খারাজ' ইসলামী

থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয়[১] এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী-প্রাচুর্যময়,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

শরী'আতের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক 'ইবাদাতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন - যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল-'আরদ' বা 'ভূমির যাকাত'ও বলা হয়। পক্ষান্তরে 'খারাজ' শুধু করকে বোঝায়। এতে 'ইবাদাতের কোন দিক নেই। মুসলিমরা 'ইবাদাতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়,তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা 'ইবাদাতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য্য করা হয়, তাকে 'খারাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রীর উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিতে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্য দ্রব্যে ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে।

(১) যখন কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং আল্লাহ্র ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়্যত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

সর্বজ্ঞ[১]।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছে হেকমত দান করেন। আর যাকে হেকমত[২] প্রদান

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ

---

(১) প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, - অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও ইয়াতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়্যতে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত হল যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে। সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে। [দেখুন, বুখারী: ৪১, মুসলিম: ১২৮]
আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্ত আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না, কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীল হবে না। এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না'। [মুসলিম: ১০১৫] (২) যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়্যতে কিংবা নাম-জশ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষকের মত, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। (৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযীলত অর্জিত হবে না।

(২) 'হেকমত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি।

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

করা হয় তাকে তো প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বিবেকসম্পন্নগণই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে ।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ

২৭০.আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর[১] অথবা যা কিছু তোমরা মানত[২] কর

হেকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা । এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুওয়াতের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে । তাই এখানে হেকমত বলতে নবুওয়াতকে বোঝানো হয়েছে । রাগেব ইস্পাহানী বলেনঃ হেকমত শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়াদির পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিস্কার । অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদানুযায়ী কর্ম । এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে । কোথাও এর অর্থ নেয়া হয়েছে কুরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্যকথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও দ্বীনের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহ্‌র ভয় । কেননা, আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত । আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নাহ্ বলে বর্ণিত হয়েছে । কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে উপরোল্লেখিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে । [বাহরে মুহীত]

(১) 'যা কিছু তোমরা ব্যয় কর' বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি । উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ।

(২) 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে । মানত বলতে বুঝায় - কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন কাজ করার শর্ত করা । যেমন, 'যদি আমার সন্তান হয় তাহলে আমি হজ করব' বা 'যদি আমার ব্যবসায় সাফল্য আসে তবে আমি এত টাকা দান করব' ইত্যাদি । মূলতঃ মানত পূরণ করা 'ইবাদাত । কিন্তু মানত করা 'ইবাদাত নয় । মানত করার ব্যাপারে শরী'আত কাউকে উৎসাহ দেয়নি । বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মানত কারো জন্য ভাল কিছু নিয়ে আসে না বরং মানত কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু বের করে' । [বুখারীঃ ৬৬০৮, ৬৬৯২, ৬৬৯৩] তাই মানত করার চেয়ে যে 'ইবাদাতের মানত করার ইচ্ছা করেছে, মানত না করে সে 'ইবাদাত পালন করে তার অসীলায় দো'আ করাই শরী'আত নির্দেশিত সঠিক পন্থা । এজন্য শরী'আতে মানত করা থেকে নিষেধ এসেছে । কিন্তু যদি কেউ মানত করে, তারপর যদি কাজটা সৎকাজ হয় তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব ।

نٌّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল; আর যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তা তোমাদের জন্য আরো ভাল; এবং এতে তিনি তোমাদের জন্য কিছু পাপ মোচন করবেন(১)। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্মক অবহিত(২)।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ

২৭২. তাদের হিদায়াত দানের দায়িত্ব আপনার নয়; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দেন। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য আর তোমরা তো

আর যদি অসৎকাজ হয় তাহলে তা পূরণ করা যাবে না। যেমন, কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হজ করার মানত করলে তাকে হজ করে মানত পূরণ করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাযারে বা পীরকে কিছু দেয়ার মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয হবে না। কেননা, তা শির্ক।

(১) অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

(২) বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকমের দান-সদকাকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্ব প্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে দ্বীনী ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। দ্বীনী উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ

শুধু আল্লাহ্কে[১] চেয়েই (তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই) ব্যয় করে থাক। আর তোমরা উত্তম কোন কিছু ব্যয় করলে তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবেই দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

لِلۡفُقَرَآءِ الَّذِیۡنَ اُحۡصِرُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ ضَرۡبًا فِی الۡاَرۡضِ یَحۡسَبُهُمُ الۡجَاهِلُ اَغۡنِیَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعۡرِفُهُمۡ بِسِیۡمٰهُمۡ ۚ لَا یَسۡـَٔلُوۡنَ النَّاسَ اِلۡحَافًا ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیۡمٌ

২৭৩. এগুলো অভাবগ্রস্থ লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না[২]; আত্মসম্মানবোধে না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে[৩]; আপনি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন[৪]। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না[৫]। আর যে

(১) এ আয়াতে ব্যবহৃত ﴿وَجۡهُ اللّٰهِ﴾ অর্থ আল্লাহ্র চেহারা। কিন্তু এখানে এ শব্দ দ্বারা তাঁর পূর্ণ সত্তাকেই বোঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি যাতী গুণ। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্র মুখমণ্ডল ও সত্তা দু'টোই সাব্যস্ত হবে।

(২) এখানে অভাবগ্রস্ত লোক বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা দ্বীনী কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

(৩) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও জায়েয হবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

(৪) এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খত্নাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলিমদের গোরস্তানে দাফন করা যাবে না। [তাফসীরে কুরতুবী]

(৫) এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না - এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তাফসীরকারক তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না। বরং সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে। [তাফসীরে কুরতুবী]

ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে ব্যাপারে সবিশেষ জ্ঞানী।

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে[১], গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের রব-এর নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[২]।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৫. যারা সুদ[৩] খায়[৪] তারা তার ন্যায়

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا

(১) এ আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-সদকার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিনরাতেরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়্যতে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়্যত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে দান করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) এখানে দান-সদকা নির্ভুল ও সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশংকা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

(৩) রিবা শব্দের অর্থ সুদ। 'রিবা' আরবী ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রিবা দু'প্রকারঃ একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে। আর অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। প্রথম প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার 'রিবা'কে 'রিবাল ফাদল' বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার রিবাকে বলা হয়, 'রিবা-আন্-নাসিয়্যাহ।' এটি জাহেলিয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেন-দেন করত। এর সংজ্ঞা হচ্ছে, ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেয়া। যাবতীয় 'রিবা'ই হারাম।

(৪) এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা, খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে

يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে[১]। এটা এ জন্য যে, তারা বলে[২], 'ক্রয়-বিক্রয় তো সূদেরই মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন[৩]। অতএব, যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং

বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ্ লিখেছেনঃ 'চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ, কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

(২) এ বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে, তারা দু'টি অপরাধ করেছেঃ (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছেঃ 'ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত'। অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলত, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তির জবাবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? হালাল ও হারাম কি কখনো এক?

তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

২৭৬. আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন(১)। আর আল্লাহ্ কোন অধিক কুফরকারী, পাপীকে ভালবাসেন না(২)।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদকাকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে সদকা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও দান-সদকা উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়্যতও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-সদকাকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তাফসীরকার বলেনঃ এ মেটানো ও বাড়ানো আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ আখেরাতে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-সদকাকারীদের ধন-সম্পদ আখেরাতে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তি লাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তাফসীরকারগণ বলেনঃ সুদকে মেটানো এবং দান-সদকাকে বাড়ানো আখেরাতে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি আখেরাতের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিস্কার; সত্য উপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিঃ "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা"। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৫] এর উদ্দেশ্যও তাই।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফের গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না"। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার ও পাপাচারী। [মা'আরিফুল কুরআন]

২৭৭.নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

২৭৮.হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

২৭৯.অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও[১]। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই[২]। তোমরা যুলুম

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

(১) আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহ্‌র কারণে কুরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) বলা হয়েছে 'যদি তোমরা তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মুলধন ফেরত পেয়ে যাবে'। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তাওবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে। এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তাওবা না করলে মূলধনও ফেরত পাবে না। সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তাওবা করেছে - তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না[১]।

২৮০. আর যদি সে অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তার অবকাশ। আর যদি তোমরা সদকা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[২], যদি

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

(১) এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্টবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ-বিচ্ছু, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিষের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিষের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর দুনিয়া ও আখেরাতের মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য। প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না। সুতরাং সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার স্বীকার হতে হয়।

(২) এ আয়াতে সুদখুরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয় - ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরী'আতের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম।

তোমরা জানতে(১) ।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয় । এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রনয়ণ করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত । সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম । এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনুল কারীম সদকা শব্দে ব্যক্ত করেছে । এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা তোমার জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে । এছাড়াও আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম । হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বের যামানায় এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত আর তার সন্তানদেরকে বলত যে, যখন কোন বিপদগ্রস্ত লোক আসে তখন তার কর্জ ক্ষমা করে দিও । হয়তো আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন । তিনি বলেনঃ অতঃপর (লোকটি মৃত্যুর পর) আল্লাহ্র সাক্ষাত পেল, তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন । [বুখারীঃ ৩৪৮০] অন্য এক হাদীসে এসেছেঃ 'যে কেউ অভাবীকে অবকাশ দিবে তার জন্য কর্জ পরিশোধের সময় পর্যন্ত প্রতিদিন সদকার সওয়াব লেখা হবে । তারপর যদি আবার তাকে নতুন করে কর্জ পরিশোধের অবকাশ দেয় তবে কর্জ আদায় করার সময় পর্যন্ত প্রতিদিন তার সদকার সওয়াব লেখা হবে । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৯, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬০]

এ আয়াত থেকে শরী'আতের এ বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, ইসলামী আদালাত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে যাতে তারা তাকে সময় দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে । এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস এসেছে ।

(১) সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮০ এ ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে । প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে । বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মত, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয় । হাদীসে বলা হয়েছেঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা । সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান জিন দিশেহারা করে দেয় । [ইমাম ত্বাবারী সহীহ সনদে তার তাফসীরে বর্ণনা করেন] তাছাড়া সুদখোরের শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস এসেছে,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৮১. আর তোমরা সেই দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের যুলুম করা হবে না[১]।

যেমন: (১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোরকে লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'যে সুদ খায়, আর যে খাওয়ায়, আর যে লিখে এবং সুদের কর্মকাণ্ডের দুই সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হোক। [ইবনে মাজাহ্ঃ ২২৭৭] (২) আবু যুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, যিনার ব্যবসা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সুদ দাতা, গ্রহীতা, শরীর খোদাই করে নকশা করা, যে করায়, যে ছবি অংকন করে, এদের সবার উপর লা'নত করেছেন'। [বুখারীঃ ৫৯৬২] (৩) সামূরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে, সে তার নিকট বলত যা আল্লাহ্ চাইতেন। একদিন সকালে তিনি বললেনঃ রাতে (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন আগন্তুক (ফেরেশ্‌তা) আসল। আমাকে তারা উঠাল। তারপর আমাকে বললঃ চলুন! আমি তাদের দু'জনের সাথে চললাম। ... সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নদীর নিকট পৌঁছলাম। ... সে নদীতে একজনকে সাঁতরাতে দেখলাম। নদীর পাড়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের এক স্তূপ। সাঁতারকারী লোকটি সাঁতরানো শেষ করে যার নিকট পাথরের স্তূপ ছিল তার নিকট এসে মুখ খুলে দিত। আর সে তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। তারপর সে সাঁতরাতে চলে যেত। সাঁতরিয়ে ফিরে এসে আবার অনুরূপ মুখ খুলে দিত। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি করে পাথর নিক্ষেপ করত। ....শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাঈল বললেনঃ আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল, যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন, যে পাথরের লোকমা খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। [বুখারীঃ ৩৪৮০]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে নসীহত করে বলছেন যে, দুনিয়ার আবাস ক্ষণস্থায়ী। এখান থেকে খুব কম সময়ের পরই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে। এখানকার যাবতীয় সম্পদ রেখেই সবাইকে খালি হাতে আমার সামনে আসতে হবে। সুতরাং সে দিনের ব্যাপারে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকা জরূরী যখন তোমরা আমার সামনে নীত হবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্ম অনুসারে তোমাদেরকে শাস্তি বা পুরস্কার

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

২৮২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রেখো[১]; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয়; কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে[২];

দেয়া হবে। সা'য়ীদ ইবনে জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে এর পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র ৩১ দিন জীবিত ছিলেন। [ইবনে কাসীর]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে। আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলত। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কুরআনুল কারীম এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে "তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও"। এতে প্রথম নীতি এই যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত - যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।
দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেনঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধান কাটার সময়'- এরূপ নির্ধাতির করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) অর্থাৎ এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন এক পক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে - যাতে কারো মনে সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার

مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

এবং যে ব্যক্তির উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) সে যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়[১] এবং সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তা থেকে কিছু যেন না কমায় (ব্যতিক্রম না করে)। অতঃপর যার উপর হক্ক রয়েছে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু সে বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়[২]। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, অতঃপর যদি দুজন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে

করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এরপর দলীল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখল। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র।

(২) লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনো নির্বোধ বা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মুক ও অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কুরআনুল কারীমের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বোঝায়।

তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়[১]। আর সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে[২]। আর তা (লেন-দেন) ছোট-বড় যাই হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হয়ো না। এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর

(১) এখানে বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে -যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরী'আতসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরী'আতসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না। আয়াতে এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়। অনুরূপভাবে (২) সাক্ষী মুসলিম হতে হবে। ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষী নির্ভরযোগ্য 'আদিল' (বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

(২) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেন-দেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক - সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপার বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহযোগীতা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয় - বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

ও সাক্ষ্যদানের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার জন্য অধিকতর উপযুক্ত। তবে তোমরা পরস্পর যে নগদ ব্যবসা পরিচালনা কর তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পর বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো। আর কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার[১]। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। আর আল্লাহ্‌ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে[২]। অতঃপর

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى

(১) আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী দিতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়ত মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারত। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে, ﴿وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌۢ بِكُمْ﴾ অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ্‌ হবে। এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহ্‌গণ বলেনঃ যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের নায্য অধিকার। তা না দেয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়।

(২) এ আয়াত দ্বারা সফর অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েয প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে মুকীম বা অবস্থানকালেও বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

أَوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

তোমাদের একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করলে, যার কাছে আমানত রাখা হয়েছে সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না[১]। আর যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী[২]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবগত।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২৮৪. আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে ও যা আছে যমীনে। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সেগুলোর হিসেব তোমাদের কাছ থেকে নিবেন[৩]। অতঃপর যাকে

ওয়াসাল্লাম নিজেও মুকীম অবস্থায় বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহূদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকী) কিছু খাদ্য সামগ্রী খরিদ করেন এবং ঐ সময়ের জন্য তিনি ইয়াহূদীর নিকট তার বর্ম বন্ধক রাখেন। [বুখারীঃ ২৫০৯]

(১) সাক্ষ্য দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষ্যে সত্য ঘটনা প্রকাশে বিরত থাকা উভয়টিই সত্য গোপন করার আওতায় পড়ে।

(২) এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাকীর ব্যাপারে কেউ যদি বিশ্বস্ততার জন্য কোন বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে। 'অন্তর গোনাহ্গার' বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্ প্রথম। [মা'আরিফুল কুরআন]

(৩) আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের

ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন(১)। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

২৮৫. রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৬. আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত(২)। সে ভাল যা উপার্জন

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ

হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেনঃ এ গোনাহ্টি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফেকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে। [বুখারীঃ ২৪৪১, মুসলিমঃ ২৭৬৮]

(১) এটি আল্লাহ্র অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর উপর কোন আইনের বাঁধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

(২) পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা

نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার উপরই বর্তায়। ‘হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর

গোপন রাখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন - মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেয়া। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশমত কাজ করলেন; যদিও তাদের মনে এ সংশয় ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথমে মুসলিমদের আনুগত্যের প্রশংসা করেন এবং বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মাফযোগ্য। যেসব কাজ ইচ্ছে করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। কুরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪১২, ১/৩৩২; মুসলিম: ১২৫] তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিমদেরকে একটি বিশেষ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের মত শাস্তিও যেন এ উম্মতের উপর না আসে, তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতে বলা হয়েছে।

যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন[১]।

---

(১) আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সহীহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট'। [বুখারীঃ ৪০০৮, ৫০০৮, মুসলিমঃ ৮০৮] অর্থাৎ বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট।

৩- সূরা আলে-ইমরান

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সূরার আয়াত সংখ্যাঃ ২০০ আয়াত।

সূরার নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা।

সূরার নামকরণঃ এ সূরার ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে আলে-ইমরানের কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার আরেক নাম আয্-যাহ্‌রাহ্ বা আলোকচ্ছটা। [মুসলিমঃ ৮০৪] এছাড়াও এ সূরাকে সূরা তাইবাহ্, আল-কান্‌য, আল-আমান, আল-মুজাদালাহ্, আল-ইস্তেগফার, আল-মা'নিয়্যাহ্ ইত্যাদি নাম দেয়া হয়েছে।

সূরার ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ, তা পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দু'টি আলোকচ্ছটাময় সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান পড়; কেননা, এ দু'টি সূরা কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি ছায়া অথবা দু'ঝাঁক পাখির মত। তারা এসে এ দু'সূরা পাঠকারীদের পক্ষ নেবে।' [মুসলিমঃ ৮০৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'কেয়ামতের দিন কুরআন আসবে যারা কুরআনের উপর আমল করেছে, তাদের পক্ষ হয়ে। তখন সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান থাকবে সবার অগ্রে।' [মুসলিমঃ ৮০৫]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

الٓمٓ ①

১. আলিফ্-লাম-মীম(১),

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ②

২. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই(২), তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার

(১) এগুলোকে হুরূফে মুকাত্তা'আত বলে। যার আলোচনা সূরা বাকারার প্রথমে চলে গেছে।

(২) এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যিনিই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন, একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরনতঃ আল্লাহ্ তা'আলার

তাওহীদের পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তার ওফাতের পর তার বংশধরদের মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কিত এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হওয়ার পর নূহ 'আলাইহিস্ সালাম আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কিত ঐসব বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের দিকে আদম 'আলাইহিস্ সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্ সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁরাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরন করেন। এরপর মুসা ও হারুন 'আলাইহিমাস্ সালাম এবং তাদের বংশের রাসূলগণ আগমন করেন। তারা সবাই সে একই কালেমায়ে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কালেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এরপরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সেই একই আহ্বান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, আদম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক রাসূল অন্য রাসূলের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তার দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন; বরং তাদের একজন অন্যজন থেকে বহুদিন পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী রাসূলগণের কোন অবস্থা তাদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তারা পূর্বসুরীদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই তাদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে সরলভাবে চিন্তা করে, তবে এত বিপুল সংখ্যক নবী-রাসূল বিভিন্ন সময় এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু রাসূলগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারো পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাদের দাওয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

ধারক[১]।

৩. তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে[২] তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জীল।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿٣﴾

৪. ইতোপূর্বে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ[৩]; আর তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন[৪]। নিশ্চয় যারা

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দু'টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইসমে আ'যম রয়েছে, এক, ﴿وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾ দুই, সূরা আলে ইমরানের প্রথম দু' আয়াত'। [তিরমিযীঃ ৩৪৭৮]

(২) কাতাদা বলেন এখানে পূর্বে যা এসেছে তা বলা দ্বারা কুরআনের পূর্বে যে সমস্ত কিতাবাদি নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মুজাহিদ বলেন, এখানে পূর্বে যা এসেছে বলে, পূর্বেকার যাবতীয় কিতাব ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই কুরআন পূর্বতন সকল নবী-রাসূল ও যাবতীয় কিতাবের সত্যয়নকারী। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) কাতাদা বলেন, এ দু'টি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব। এতে রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বর্ণনা। যে এ দু'টি থেকে হিদায়াত গ্রহণ করেছে, সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং সেটা অনুসারে আমল করেছে সে নিরাপত্তা পেয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটাকে মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ারপর এ দু'টি গ্রন্থ রহিত হয়ে গেছে, তা থেকে হিদায়াত লাভের আর কোন উপায় নেই।

(৪) ওয়াসিলা ইবন আসকা' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহ রামাদান মাসের প্রথম রাত্রিতে নাযিল হয়েছিল, তাওরাত নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, ইঞ্জীল নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের তের রাত্রি পার হওয়ার পর। আর ফুরকান নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের চব্বিশ রাত্রি পার হওয়ার পর।" [মুসনাদে আহমাদ ৪/১০৭] কাতাদাহ বলেন, আয়াতে ফুরকান বলে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা নাযিল করে এর মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর হালালকৃত বস্তুকে হালাল এবং হারামকৃত বস্তুকে এর মাধ্যমে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাঁর শরী'আতকে প্রবর্তন করেছেন। অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ۝

আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী[১]।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

৫. নিশ্চয় আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না[২]।

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন[৩]। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই; (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

দিয়েছেন। কি কি জিনিস ফরয করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার স্তরের মাঝে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের অনুরূপ নয় বিধায়, স্বতন্ত্র পরিচয় দূরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, ইবাদাত একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্যও নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন। সূরা আল-আন'আমে এ বিষয়টি বিস্তারিত এসেছে, সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, এসব কিছু তিনি যে শুধু জানেন তা-ই নয় বরং তিনি তা এক গ্রন্থে লিখেও রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর অদৃশ্যের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ৫৯]

(৩) কাতাদা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদের রব তাঁর বান্দাদেরকে মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা গঠন করতে পারেন। ছেলে বা মেয়ে, কালো বা গৌরবর্ণ, পূর্ণসৃষ্টি অথবা অপূর্ণসৃষ্টি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

৭. তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহ্‌কাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ্'(১), সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۭ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۗءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۗءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚوَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মুলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার দ্বারা অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ, কুরআনুল কারীমে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মুহ্‌কামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট আয়াত বলা হয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মুহকাম হচ্ছে, ঐ সব আয়াতগুলো, যা নাসেখ বা রহিতকারী, যাতে আছে হালাল-হারামের বর্ণনা, শরী'আতের সীমারেখা, ফরয-ওয়াজিব, ঈমান ও আমলের বিষয়াদির বর্ণনা। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ হচ্ছে, যা মানসূখ বা রহিত, যাতে উদাহরণ ও এ জাতীয় বিষয়াদি পেশ করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'উম্মুল কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতামুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা হল, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখা। যে আয়াতের অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। উদাহরণতঃ ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ ﴿اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ অর্থাৎ "সে আমার নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়।" [সূরা আয্-যুখরুফঃ ৫৯] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ ﴿اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৫৯] এসব আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র'- নাসারাদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তারা যদি كَلِمَةُ اللهِ 'আল্লাহ্‌র কালেমা' বা رُوْحٌ مِنْهُ 'তাঁর পক্ষ থেকে রূহ' শব্দদ্বয় দ্বারা দলীল নেয়ার চেষ্টা করে তখন তাদের বলতে হবে যে, পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহের আলোকেই এশব্দদ্বয়কে বুঝতে হবে। সে আলোকে উপরোক্ত كَلِمَةُ اللهِ ও رُوْحٌ مِنْهُ শব্দদ্বয় সম্পর্কে এটাই বলতে হয় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে সৃষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি রূহ মাত্র।

يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ⑦

উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে[১]। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর[২] তারা বলে, 'আমরা

(১) বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে'। ইবনে আব্বাস বলেন, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে এ কথা বলে যাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা মুহকাম আয়াতকে মুতাশাবিহ আয়াতের উপর এবং মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের উপর ইচ্ছাকৃত সন্দেহ লাগানোর জন্য নির্ধারণ করে, ফলে তারা নিজেরা সন্দেহে পতিত হয় এবং পথভ্রষ্ট হয়। তারা সঠিক পথ গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত দেখে বললেন, "তোমাদের পূর্বের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহ্র কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিপরীতে ব্যবহার করত। আল্লাহর কুরআন তো এ জন্যই নাযিল হয়েছিল যে, এর একাংশ অপর অংশের সত্যয়ণ করবে। সুতরাং তোমরা এর একাংশকে অপর অংশের কারণে মিথ্যারোপ করো না। এর যে অংশের অর্থ তোমরা জানবে সেটা বলবে, আর যে অংশের অর্থ জানবে না সেটা আলেম বা যারা জানে তাদের কাছে সোপর্দ করো।" [মুসনাদে আহমাদ ২/১৮৫, নং ৬৭৪১; মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ ১১/২১৬-২১৭, হাদীস নং ২৩৭০]

(২) এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ কি এ সমস্ত মুতাশাবিহাতের অর্থ জানে কি না? কোন কোন মুফাসসির এখানে تأويل শব্দের অর্থভেদে এর উত্তর দিয়েছেন। কারণ, تأويل শব্দটির এক অর্থ, তাফসীর বা ব্যাখ্যা। অপর অর্থ, সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার জন্য আয়াতটি নিয়ে আসা হয়েছে। যদি প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে এর কোন কোন অর্থ মুফাসসিরগণ করেছেন। যা ব্যাখ্যার পর্যায়ে পড়ে। সে হিসেবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা এগুলোর تأويلতথা ব্যাখ্যা জানে।' [তাবারী] আর যদি দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তখন এর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অধিকাংশ সাহাবী, তাবে'য়ী এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন যে, মুতাশাবিহাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের জ্ঞানের দৃঢ়তার পরিচয় এই যে, তারা মুহকাম ও মুতাশাবিহ সব ধরনের আয়াতের উপরই ঈমান এনেছে, অথচ তারা মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের تأويل তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না।' অনুরূপভাবে উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলোর تأويل তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না, বরং তারা বলে, 'আমরা এগুলোতে ঈমান আনি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'। [তাবারী]

এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'[১]; এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

৮. 'হে আমাদের রব! সরল পথ দেয়ার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।'

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ⑧

৯. 'হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি সমস্ত মানুষকে একদিন একত্রে সমবেত করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।'

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑨

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্‌র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্র। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বললেন, "যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা এ সমস্ত (মুতাশাবিহ) আয়াতের পিছনে দৌড়াচ্ছে, তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ্ এ সমস্ত লোকের কথাই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তখন তাদের থেকে সাবধান থাকবে।" [বুখারী: ৪৫৪৭; মুসলিম: ২৬৬৫]

(২) শাফা'আতের বিখ্যাত হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাপর সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন এক মাঠে একত্রিত করবেন। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তাদের চক্ষু পরস্পরকে বেষ্টন করবে এবং তারা যে কোন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পাবে। আর সূর্য তাদের নিকটবর্তী করা হবে।" [বুখারী: ৩৩৬১]

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না এবং এরাই আগুনের ইন্ধন(১) ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝١٠

১১. তাদের অভ্যাস ফির'আউনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায়, তারা আমার আয়াতগুলোতে মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন(২) । আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর ।

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١١

---

(১) মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে এটা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে । "যেদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি কাজে আসবে না, আর তাদের জন্য থাকবে লা'নত এবং তাদের জন্য থাকবে খারাপ আবাস" [গাফের: ৫২] দুনিয়াতে তাদেরকে যে সমস্ত সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হয়েছিল তাও তাদের কোন উপকার দিবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি ও কঠিন পাকড়াও থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে না । অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন, "কাজেই ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো এসবের দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান । ওরা কাফের থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে" [আত-তাওবাহ: ৫৫] আরও বলেন, "যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে । এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!"[সূরা আলে ইমরান: ১৯৬-১৯৭]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে ফির'আউনের পূর্বেকার যে সমস্ত সম্প্রদায়কে তাদের অপরাধের কারণে পাকড়াও করা হয়েছিল তাদের পরিচয় ও অপরাধের বিবরণ দেয়া হয়নি । পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তাদেরকে নূহ, হূদ, সালেহ, লূত ও শু'আইবের সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । সে সমস্ত স্থানে তাদের অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করেছিল এবং রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল । যেমন, সামূদ সম্প্রদায় কর্তৃক উষ্ট্রী হত্যা, লূত সম্প্রদায়ের সমকামিতা, শু'আইব এর সম্প্রদায় কর্তৃক মাপ ও ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি । [আদওয়াউল বায়ান]

১২. যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!'

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

১৩. দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল যুদ্ধ করছিল আল্লাহ্‌র পথে, অন্য দল ছিল কাফের; তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দেখছিল তাদের দ্বিগুণ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আপন সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন[১]। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে[২]।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাতশ' উট ও একশ' অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দু'টি অশ্ব, ছ'টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলিমদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলিমগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তারা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা- "যদি তোমাদের মধ্যে একশ' ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশ'র বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।" [সূরা আল-আনফালঃ ৬৬] -এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলিমদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেত, তবে তাদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়াটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। [সীরাতে ইবন হিশাম]

(২) বদর যুদ্ধের কয়েকটি বিষয় ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয়ঃ এক) মুসলিম ও কাফেররা যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল, তাতে উভয় দলের নৈতিক ও চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাদের একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিল, অপরদল

১৪. নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু[১]। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

তাগুত, শির্ক ও শয়তানের পথে যুদ্ধ করছিল। আল্লাহ্ তাঁর পথে যুদ্ধকারীদের অন্যদের উপর বিজয় দিয়েছিলেন। এ থেকে ইয়াহূদীরা শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। [আইসারুত তাফাসীর] দুই) মুসলিমরা সংখ্যায় নগণ্য ও অস্ত্রে অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে কাফেরদের বিশাল সংখ্যা ও উন্নত অস্ত্র-সস্ত্রের মোকাবেলা করেছে, তাতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট। [সা'দী] তিন) আল্লাহর প্রবল প্রতাপ ও অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে গাফেল হয়ে যারা সংখ্যাধিক্য ও সমরাস্ত্রের শক্তিতে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেছিল, আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। [মানার]

(১) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও আখেরাতের কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে আখেরাত বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। [সা'দী] অর্থাৎ এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না। আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনের জন্য যে নেয়ামত রেখেছেন, তার তুলনা দুনিয়ার জীবনের সামগ্রীসমূহের কোন কিছু দিয়েই দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত। তবে যা আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণে করা হয় ও তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং দ্বীনী জ্ঞানে আলেম ও দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারী। [তিরমিযী: ২৩২২; ইবন মাজাহ: ৪১১২]

১৫. বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সন্তুষ্টি(১)। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী(২)।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

---

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তারা বলবে, আমরা হাজির, তখন তিনি বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না অথচ আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দান করেছেন যা আর কোন সৃষ্টিকে দান করেননি। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদেরকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করব। তারা বলবে, হে রব! এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? তিনি বলবেন: আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতরণ করাব, এর পর আমি আর কখনও তোমাদের উপর ক্রোধান্বিত হব না।" [বুখারী: ৬৫৪৯, মুসলিম: ২৮২৯]

(২) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের রব আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রে যখন রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন প্রথম আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে যে আমি তাকে দিব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? [বুখারী: ১১৪৫; মুসলিম: ৭৫৮] এর দ্বারা শেষ রাত্রির ইবাদতের গুরুত্ব বোঝা যায়। এ সময়কার দো'আ কবুল হয়। এটা মূলত: তাহাজ্জুদের সময়।

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন[১] যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আর ফেরেশ্তাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৯. নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন[২]। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবলমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহ্র আয়াতসমূহে কুফরী করে,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

---

(১) অর্থাৎ যে আল্লাহ্ বিশ্ব জাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই এটি তার সাক্ষ্য। আর তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ পৃথিবীতে ইলাহের স্বত্ব দাবী করার অধিকার ও যোগ্যতা কারও নেই। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন হক্ক ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যুলুম ও অন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলার এ সাক্ষ্যের সাথে তিনি আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদেরকেও শরীক করেছেন। তারাও এ মহৎ সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আলেম তথা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানীদেরকেও এ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য গ্রহণ করে সম্মানিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মূলতঃ আলেম তথা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানীদের সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। [ইবনুল কাইয়্যেম: মিফতাহু দারিস সা'আদাহ; তাফসীরে সা'দী]

(২) সুদ্দী বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম'। এটা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা এবং জ্ঞানীদের সাক্ষ্যের বিষয়। অর্থাৎ তারা এ সাক্ষ্যও দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। [তাবারী] কাতাদা বলেন, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ক কোন মা'বুদ নেই এ সাক্ষ্য দেয়া, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন যা তিনি প্রবর্তন করেছেন, রাসূলদেরকে যা নিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর বন্ধুদেরকে যার দিশা দিয়েছেন। এটা ব্যতীত তিনি আর কিছু গ্রহণ করবেন না। এটা অনুপাতে না হলে তিনি কাউকে পুরস্কৃত করবেন না। [তাবারী]

তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০. সুতরাং যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারিগণও।' আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা[১]।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

তৃতীয় রুকূ'

২১. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে কুফরী করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ

(১) আয়াতে বর্ণিত أَسْلَمْتُمْ শব্দটির মূল অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'আত্মসমর্পণ করা' অনুবাদ করা হয়েছে। এর আরেক অনুবাদ এভাবেও করা যায় যে, যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি ইসলামকে কবুল করেছি এবং আমার অনুসারিগণও।' এর মাধ্যমে অপরাপর ধর্মের অনুসারীরা মুসলিমদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে যে, তাদেরকে আবার বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই। [সা'দী] আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে ও নিরক্ষর অর্থাৎ মক্কার কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছ?' যদি তারা তোমরা যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছ সেভাবে ইসলামকে কবুল করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে এবং তারা তোমাদের ভাই-বন্ধুতে পরিণত হবে। আর যদি তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। প্রচারের সওয়াব আপনি অবশ্যই পাবেন। তাদের উপরও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলীল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যাতে করে তাদের শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয়। [সা'দী]

يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾

ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তারপর তাদের একদল ফিরে যায় বিমুখ হয়ে[১]।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এটা এজন্যে যে তারা বলে থাকে, ‘মাত্র কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না।’ আর তাদের নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে[২]।

---

(১) কাতাদা বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দুশমন ইয়াহূদীরা। তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হয়, তাদেরকে আল্লাহ্‌র নবীর প্রতিও আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্যজনিত বিষয়ে তিনি ফয়সালা করে দেন। যে নবীর বর্ণনা তারা তাদের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। তারপরও তারা সে কিতাব ও নবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। [তাবারী]

(২) কাতাদা বলেন, তারা মনে করে থাকে যে, যে সময়টুকুতে তারা অর্থাৎ পূর্বপুরুষরা গো-বৎসের পুজা করেছিল, সে সময়টুকুতেই শুধু তাদের শাস্তি হবে। তারপর তাদের আর শাস্তি হবে না। এই যে বিশ্বাস তা কোন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের ভিত্তি হচ্ছে দ্বীনের উপর মিথ্যা দাবী করা। কারণ তারা দাবী করে বলে থাকে যে, ‘আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্তুতি ও প্রিয় মানুষ’ [সূরা আল-মায়িদাহ:১৮] এটা অবশ্যই তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন। [তাবারী]

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۙ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. সুতরাং (সেদিন) কি অবস্থা হবে? যেদিন আমি তাদেরকে একত্র করব যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেককে তাদের অর্জিত কাজের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾

২৬. বলুন, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে[১]। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۡ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۡ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

২৭. 'আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান; আপনি মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন।'

---

(১) আয়াতে আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছেঃ "আপনার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ"। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে রয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণ। কিন্তু আয়াতে শুধু আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ একথা বলা হয়েছে। অকল্যাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এধরণের শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তার কারণ হল, সহীহ্ আকীদা অনুসারে আল্লাহ্‌র প্রতি অকল্যাণের সম্পর্ক দেখানো জায়েয নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেনঃ 'অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়।' [মুসলিমঃ ৭৭১] কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জন্য অকল্যাণ চান না। মানুষের যাবতীয় অকল্যাণ মানুষের হাতের কামাই করা।

২৮. মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর[১]। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন[২] এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

২৯. বলুন, 'তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর,

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ

(১) কোন কাফেরের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এ আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মুসলিমদের কোন ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তি করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, যে কেউ সেটা করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র দ্বীনে তার কোন অংশ থাকবে না। কেননা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঈমানের সাথে একত্রিতভাবে থাকতে পারে না। ঈমান তো শুধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র বন্ধু মুমিনদের সাথে সম্পর্ক রাখতে বলে যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে জিহাদ করে। আল্লাহ্ বলেন, "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীরা তারা পরস্পর পরস্পরের ওলী" [সূরা আত-তাওবাহ: ৭১] সুতরাং কেউ যদি ঈমানদারদের ব্যতীত এমন কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় যারা আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় এবং তাঁর বন্ধুদেরকে বিপদে ফেলতে চায়, তাহলে সে মুমিনদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফেরদের গণ্ডিভুক্ত হবে। এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, কেউ যদি তাদেরকে বন্ধু বানায় তবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কাফেরদের থেকে দুরে থাকতে হবে, তাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না, তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে তাদের প্রতি অনুরাগী হওয়া যাবে না। কোন কাফেরকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া যাবে না। [সা'দী]

(২) আল্লাহ্‌র ভয়ের পরিবর্তে মানুষের ভয় যেন তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না রাখে; কেননা মানুষের ভয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়া ছাড়িয়ে আখেরাতেও ব্যাপৃত। সুতরাং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ভীত থাক। যে কাজে তার শাস্তি অবধারিত সে কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য হও তবে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। [সা'দী]

يَّعۡلَمۡهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعۡلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۲۹﴾

আল্লাহ্ তা অবগত আছেন[১]। আর আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٍ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٍ مُّحۡضَرًا ۖۚ وَّمَا عَمِلَتۡ مِنۡ سُوۡٓءٍ ۖۚ تَوَدُّ لَوۡ اَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهٗۤ اَمَدًاۢ بَعِيۡدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفۡسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ ﴿۳۰﴾

৩০. যেদিন প্রত্যেকে সে যা ভাল আমল করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে- যদি তার এবং এর মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকত[২]! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

চতুর্থ রুকূ'

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَيَغۡفِرۡ

৩১. বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর[৩], আল্লাহ্

(১) আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্যকরূপে জানেন। মানুষের অন্তরে কি আছে, এমনকি কি উদিত হবে তাও আল্লাহ্ জানেন। কারণ, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখন প্রথম কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, লিখ। তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা সবই লিখা হতে লাগল।" [মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৭] সুতরাং মানুষের মনে কি উদিত হবে সেটাও কলম লিখে রেখেছে।

(২) অর্থাৎ তার মধ্যে এবং তার আমলের মধ্যে বিশাল ব্যবধান কামনা করবে। তারা চাইবে যেন তাদের আমলনামা তাদেরকে দেয়া না হয়।

(৩) ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারো প্রতি কারো ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে, তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হল, অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহ্কে ভালবাসার দাবীদার এবং আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ জগতে যদি কেউ আল্লাহ্র ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য হবে, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না[১]।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম, নূহ্ ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের[২]

এবং তার শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে তার দুর্বলতা সেই পরিমানে পরিলক্ষিত হবে। ভালবাসা অনুসারে মানুষের হাশরও হবে। হাদীসে এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এর জন্য কি তৈরী করেছ? লোকটি বলল, আমি এর জন্য তেমন সালাত, সাওম ও সাদকা করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস"। [বুখারী: ৬১৭১]

(১) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না"। এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ্র আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে তারতম্য করা যাবে না। আল্লাহ্র নির্দেশ যেমন মানতে হবে, তেমনি রাসূলের নির্দেশও মানতে হবে। কেউ আল্লাহ্র আনুগত্য করল কিন্তু রাসূলের আনুগত্য করল না, সে কুফরীর গণ্ডি থেকে বের হতে পারল না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি যেন কাউকে এ রকম না দেখতে পাই যে, সে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে, তখন তার কাছে আমি যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ দিয়েছি সে সমস্ত আদেশ-নিষেধের কোন কিছু এসে পড়ল, তখন সে বলল: আমরা জানি না, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে যা পেয়েছি তার অনুসরণ করেছি"। [আবু দাউদ ৪৬০৫; তিরমিযী: ২৬৬৩; ইবনে মাজাহ: ১৩] সুতরাং কোন ঈমানদারের পক্ষে রাসূলের আদেশ-নিষেধ পাওয়ার পর সেটা কুরআনে নেই বলে বাহানা করার কোন সুযোগ নেই। যদি তা করা হয় তবে তা হবে সুস্পষ্ট কুফরী।

(২) এখানে ইমরান বলতে মার্ইয়াম 'আলাইহাস্ সালামের পিতাকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মূসা আলাইহিস সালাম এর পিতার নামও ইমরান ছিল। [মুসলিম: ১৬৫]

وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

বংশধরকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মনোনীত করেছেন[১]।

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. তারা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾

৩৫. স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে নিশ্চয় আমি তা একান্ত আপনার জন্য মানত করলাম[২]। কাজেই আপনি আমার নিকট থেকে তা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ

৩৬. তারপর যখন সে তা প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে।' সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে আল্লাহ্

তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। পরবর্তী আয়াত থেকেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে ইবরাহীম, ইমরান, ইয়াসীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের মধ্যে যারা ঈমানদার কেবল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ও রহমত বহনের জন্য মনোনীত করেছেন। এদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের বা মুশরিক তাদের বোঝানো হয়নি। [তাবারী]

(২) কাতাদা বলেন, ইমরানের স্ত্রী তার গর্ভে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দিয়ে দেয়ার মনস্থ করেছিলেন। তারা সাধারণত: পুরুষ সন্তানদেরকে উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। যদি কাউকে উপসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হত, সে কখনো উপাসনালয় ত্যাগ করত না। তার কাজই হতো উপাসনালয়ের দেখাশোনা করা। কোন মহিলাকে এ কাজের জন্য দেয়া হতো না। কারণ, মহিলাকে এ কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করা হতো না। কারণ, তার সৃষ্টিগত কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন, হায়েয ও নিফাস। যা উপাসনালয়ে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত ছিল না। এ জন্যই ইমরান স্ত্রী যখন সন্তান প্রসব করে দেখলেন যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন, তখন কি করবেন স্থির করতে না পেরে বলেছিলেন, 'রব! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি'। পরবর্তীতে মানত অনুসারে সে কন্যা সন্তানকেই উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। [তাবারী]

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

সম্যক অবগত। আর পুত্রসন্তান কন্যা সন্তানের মত নয়। আর আমি তার নাম মার্ইয়াম রেখেছি[১] এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার সন্তানকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি[২]।'

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ

৩৭. তারপর তার রব তাকে ভালভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন[৩] এবং তিনি তাকে যাকারিয়্যার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন[৪]। যখনই যাকারিয়্যা

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জন্মের দিনই নাম রাখা জায়েয। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'গত রাতে আমার এক সন্তান জন্ম হয়েছে, আমি তার নাম আমার পিতার নামানুসারে ইব্রাহীম রাখলাম।' [মুসলিমঃ ২৩১৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল, গত রাতে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, আমি তার কি নাম রাখব? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার নাম রাখ আব্দুর রহমান।' [বুখারীঃ ৬১৮৬, মুসলিমঃ ২১৩৩]

(২) এ দো'আর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা মার্ইয়াম ও ঈসা 'আলাইহিমাস্ সালামকে শয়তান থেকে হেফাযত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সন্তান জন্মগ্রহণের সাথে সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে, ফলে সে চিৎকার করে। কেবলমাত্র মার্ইয়াম ও তার সন্তান এর ব্যতিক্রম।' [বুখারীঃ ৩৪৩১, ৪৫৪৮, মুসলিমঃ ২৩৬৬]

(৩) এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তিনি তাকে দেহসৌষ্ঠবে মনোমুগ্ধকর বানিয়েছিলেন, ফলে যে কেউ তাকে দেখত তার ভক্ত হয়ে যেত। কাতাদা বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, মারইয়াম ও ঈসা দুনিয়ার অন্যান্য আদম সন্তানের মত গোনাহের কাজে জড়াত না। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) কিভাবে মারইয়াম আলাইহাস সালাম যাকারিয়্যা আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে আসলেন এখানে বর্ণনা করা হয় নি। পরবর্তী ৪৪ নং আয়াত থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। যাদেরকে উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হতো তারা সাধারণত উপাসনালয়েই থাকত। তাদের আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু যেহেতু মারইয়াম আলাইহাস সালাম কন্যা সন্তান ছিলেন, সেহেতু তৎকালীন সবাই চিন্তা করলেন যে, তার তত্ত্বাবধান করার মত লোকের প্রয়োজন। সবাই তার তত্ত্বাবধান চাচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাদের কলম দিয়ে তারা লটারী করেছিল। সে লটারীতে যাকারিয়্যা আলাইহিস সালামের নাম উঠে এসেছিল।

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

তার কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। তিনি বলতেন, 'হে মার্‌ইয়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে?' (মার্‌ইয়াম) বলতেন, 'তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিয্ক দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. সেখানেই যাকারিয়্যা তার রবের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী[১]।'

---

(১) যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম তখনো পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। সময়ও ছিল বার্ধক্যের- যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার আল্লাহ্‌র মহিমা ইতিপূর্বে তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু এসময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মার্‌ইয়ামকে ফল দান করেছেন, তখনই তার মনের সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠল এবং তার মনে হলো যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মওসুম ছাড়াই যদি ফল দিতে পারেন, তবে বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। বললেনঃ 'হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে সৎ সন্তান দান করুন', এতে বুঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্য দো'আ করা রাসূলগণের ও নেককারদের সুন্নাত। অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আপনার আগে তো আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম' অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নেয়ামত পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও দেয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং রাসূলদের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নাহ্ থেকেও বঞ্চিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ কিংবা সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। তিনি বলেনঃ 'বিবাহ আমার সুন্নাহ্। যে ব্যক্তি এ সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের আধিক্যের কারণে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব'। [ইবনে মাজাহ্ঃ ১৮৪৬]

৩৯. অতঃপর যখন যাকারিয়্যা ইবাদত কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফেরেশ্‌তারা তাকে আহ্বান করে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপনাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমনকৃত এক কালেমাকে সত্যায়নকারী(১), নেতা(২), ভোগ আসক্তিমুক্ত(৩) এবং পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী।'

فَنَادَتْهُ الْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ۝

৪০. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কিভাবে? অথচ আমার

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

(১) এখানে কালেমা বলতে 'ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র বাণী বলা হয়েছে, কারণ, তিনি শুধু আল্লাহ্‌র কালেমা বা নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে তাকে 'আল্লাহ্‌র কালাম' বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য। নতুবা সবকিছুই আল্লাহ্‌র কালেমার মাধ্যমেই হয়। তাঁর কালেমা ব্যতীত কিছুই হয় না।

(২) কাতাদা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ তিনি ইবাদাত, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান ও পরহেযগারীতে সবার শীর্ষ নেতা হিসেবে ছিলেন। পক্ষান্তরে মুজাহিদ বলেন, সাইয়্যেদ অর্থ হচ্ছে, তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ছিলেন। [তাবারী]

(৩) এটা ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস্‌ সালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এর অর্থ, যিনি যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। উদাহরণতঃ উত্তম পানাহার, উত্তম পোষাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারো অবস্থা ইয়াহ্‌ইয়া 'আলাইহিস্‌ সালামের মত হয়- অর্থাৎ অন্তরে আখেরাতের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভুত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবকাশ না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যে সব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে, তার পক্ষেই বিবাহ করা উত্তম।' [বুখারীঃ ১৮০৬, মুসলিমঃ ১৪০০] এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এর ব্যতিক্রম হলে বিবাহ ওয়াজিব নয়।

وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

বার্ধক্য এসে গিয়েছে[১] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই।' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন[২]।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

৪১. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন[৩]।' তিনি বললেন, 'আপনার নিদর্শন এই যে, তিন দিন আপনি ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলবেন না[৪] আর আপনার রবকে অধিক স্মরণ

---

(১) এ আয়াতে বার্ধক্যের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পক্ষান্তরে সূরা মারইয়ামে বার্ধক্যের পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আমি বার্ধক্যে এমনভাবে উপনীত হয়েছি যে আমার জোড়া ও হাড়ের মজ্জাও শুকিয়ে গেছে'। [সূরা মারইয়াম: ৮]

(২) যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। সন্তানের জন্য নিজে দো'আও করেছিলেন। দো'আ কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও 'কিভাবে আমার পুত্র হবে' বলার অর্থ, খুশী হওয়া এবং আশ্চার্যান্বিত হওয়া। [মুয়াসসার, সা'দী] তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? [বাগভী] আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। [কাশশাফ]

(৩) প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশ্যে যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। [কাশশাফ; ফাতহুল কাদীর] আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না। এ নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিদর্শন দিলেন যে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাসীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ্ কোথায়? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ দাসী মুসলিম। তাকে আযাদ করে দাও।' [মুসলিমঃ ৫৩৭]

করুন এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন ।'

পঞ্চম রুকূ'

৪২. আর স্মরণ করুন, যখন ফেরেশ্‌তাগণ বলেছিল, 'হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন আর বিশ্বজগতের নারীগণের উপর আপনাকে মনোনীত করেছেন[১] ।'

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. 'হে মার্‌ইয়াম! আপনার রবের অনুগত হন এবং সিজ্‌দা করুন আর রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করুন ।'

يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. এটা গায়েবের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা আমরা আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি । আর মার্‌ইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল[২] আপনি তখন

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

---

(১) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলেন মার্‌ইয়াম বিনতে ইমরান । অনুরূপভাবে সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ ।' [বুখারীঃ ৩৪৩২, মুসলিমঃ ২৪৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছে । মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ইমরানের কন্যা মার্‌ইয়াম পূর্ণতা লাভ করেছে আর সমস্ত নারীদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সমস্ত খাবারের উপর 'ছারীদ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব ।' [বুখারী: ৩৪৩৩; মুসলিম: ২৪৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সৃষ্টিকুলের মহিলাদের মধ্যে শুধু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ও ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া ।" [তিরমিযী: ৩৮৭৮; মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫; মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক: ১১/৪৩০]

(২) অর্থাৎ তারা কলম ফেলে লটারী করে মারইয়াম আলাইহাস সালাম কার তত্ত্বাবধানে

তাদের নিকট ছিলেন না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনো আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।

৪৫. স্মরণ করুন, যখন ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, 'হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন(১)। তার নাম মসীহ্, মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

থাকবেন সেটা নির্ধারণ করছিলেন। ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের ওপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা জায়েয। যথা- কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেয়া হবে, সেটা লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হত। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্যে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লটারী জায়েয। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) কালেমা দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে? কাতাদা বলেন, কালেমা দ্বারা كُنْ বা 'হও' শব্দ বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। কেননা, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারটি জাগতিক কোন মাধ্যম বাদেই সংঘটিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিদর্শন ও আশ্চর্যতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মারইয়ামের নিকট পাঠালেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার জামার ফাঁকে ফু দিলেন। এ পবিত্র ফেরেশতার পবিত্র ফুঁ মারইয়ামের গর্ভে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে ফুঁকটিকে পবিত্র রুহ হিসেবে পরিণত করলেন। আর এ জন্যই তাঁকে সম্মানিত করে 'রুহুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। [তাফসীরে সা'দী]

অন্যতম হবেন[১]।

৪৬. আর তিনি দোলনায়[২] ও বয়োঃপ্রাপ্ত অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলবেন[৩]

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

(১) অর্থাৎ দুনিয়াতে তার সম্মান হবে অনেক বড়। কারণ, আল্লাহ্ তাকে দৃঢ়সংকল্প রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বড় শরী'আত ও তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তার স্মরণকে এমনভাবে সারা দুনিয়াব্যাপী করেছেন যে, প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য তার সুনামে ভরপূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আখেরাতেও তার মর্যাদা হবে অনেক বেশী। অন্যান্য নবী-রাসূলদের সাথে তিনিও আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবেন। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে যারা তার সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তার মুখ থেকে সত্য বের করে বিশেষভাবে সম্মানিত করবেন। [তাফসীরে সা'দী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দোলনায় মাত্র তিন জন কথা বলেছেন। ঈসা, জুরাইজের সময়ের এক ছোট বাচ্চা আর একটি বাচ্চা।' [বুখারীঃ ২৪৮২, অনুরূপ ৩৪৩৬; মুসলিমঃ ২৫৫০] দোলনায় তিনি কি কথা কাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তিনি তার কাওমের লোকদেরকে তার নিজের পরিচয় দিয়ে তার মাকে বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। 'আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য; 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব।' [সূরা মারইয়াম: ৩০-৩৩]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম শৈশব ও পৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। নিঃসন্দেহে শৈশবে পূর্ণ বয়স্কদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধাসম্পন্ন প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাবে কথা বলা একটি মু'জিযা। কিন্তু তার সাথে 'পৌঢ় বয়সে কথা বলা'র ব্যাপারটির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অধিকাংশ আলেমদের নিকট এর উত্তর এই যে, মূলত: শৈশব অবস্থায় কথা বলার মু'জিযা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। তার সাথে পৌঢ় বয়সেও কথা বলবেন বলা দ্বারা উভয় অবস্থায়ই তার কথা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানীসুলভ হবে এমনটি বোঝানো হয়েছে। কোন কোন আলেম বলেন, তিনি যেহেতু যুবক বয়সে পৌঢ় হবার পূর্বেই আসমানে উত্থিত হয়েছেন, সেহেতু এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি পৌঢ় অবস্থায় আবার ফিরে এসে মানুষের সাথে কথা বলবেন। সুতরাং আবার ফিরে আসার ব্যাপারটি এ আয়াতের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়ে গেল। যা আরেকটি অলৌকিক ব্যাপার।

এবং তিনি হবেন পূণ্যবানদের একজন।'

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

৪৭. সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, এমতাবস্থায় আমার সন্তান হবে কিভাবে?' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই', আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়(১)।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল।'

---

(১) এ আয়াতে মারইয়াম আলাইহাস সালাম কর্তৃক ঈসা আলাইহিস সালামকে গর্ভে ধারনের বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা সূরা মারইয়ামে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, "বর্ণনা করুন এ কিতাবে মার্‌ইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল, তারপর তাদের থেকে সে পর্দা করল। এরপর আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মার্‌ইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) যদি তুমি 'মুত্তাকী হও', সে বলল, 'আমি তো তোমার রব-এর দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য। মার্‌ইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' সে বলল, 'এ রূপই হবে।' তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমরা তাকে এজন্যে সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমাদের কাছ থেকে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল; [১৬-২২] এখানেও গর্ভে ধারনের প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটা বলা হয়নি। সূরা আল-আম্বিয়ায় বলা হয়েছে যে, "অতঃপর আমরা তার (মারইয়ামের) মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম" [৯১]। আর যিনি রূহ ফুঁকে দেয়ার কাজটি করেছিলেন, তিনি ছিলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম। কারণ, সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মারইয়ামের কাছে যিনি এসেছিলেন, তিনি স্বয়ং জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এ সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মকাহিনী স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ۬ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ ۖ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأۡكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمۡ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে' (প্রেরণ করবেন, তিনি বলবেন) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হও।'

وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ ۚ وَجِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾

৫০. 'আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে। এবং আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ﴿٥١﴾

৫১. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। এটাই সরল পথ[১]।'

---

(১) এখানেও 'সিরাতে মুস্তাকীম' বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। যেমন পূর্বে সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৫২. যখন 'ঈসা তাদের থেকে কুফরী উপলব্ধি করলেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী[১]?' হাওয়ারীগণ[২] বলল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. 'হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।'

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর তারা কুটকৌশল করেছিল আল্লাহ্‌ও কৌশল করেছিলেন; আর

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٥٤﴾

---

(১) এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। মুজাহিদ বলেনঃ এর অর্থ হল কে আমার অনুসরণ করবে আল্লাহ্‌র পথে? সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ এর অর্থ কে আল্লাহ্‌র সাথে আমাকে সহযোগিতা করবে? মুজাহিদের কথা এখানে সবচেয়ে বেশী প্রণিধানযোগ্য। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট মত হল, এর অর্থ কে আমাকে সাহায্য করবে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে ডেকে ডেকে বলতেনঃ 'এমন কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে, যাতে করে আমি আমার প্রভূর বাণী প্রচার করতে পারি। কেননা, কুরাইশরা আমাকে আমার রবের বাণী প্রচারে বাধা দিচ্ছে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৩৯-৩৪০]

(২) ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী- তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোষাক পরিধান করতেন এ জন্য তাদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হত। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের উপাধি ছিল সাহাবী। কোন কোন তাফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'প্রত্যেক রাসূলের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের' [বুখারীঃ ২৬৯১, মুসলিমঃ ২৪১৫]

আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী[১]।

ষষ্ঠ রুকূ'

৫৫. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে 'ঈসা! নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব[২], আমার নিকট আপনাকে

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ

(১) আরবী ভাষায় 'মাকর' শব্দের অর্থ সুরক্ষা ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য মকর ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে পারে। এ আয়াতে কাফেরদের 'মাকার'-এর বিপরীতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও 'মাকার' করার কথা এ কারণেই যোগ করা সঠিক হয়েছে। বাংলা ভাষার বাচনভঙ্গিতে 'মাকার' শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্কে 'শ্রেষ্ঠতম কুশলী' বলা হয়েছে। তাছাড়া مَكْر ও خِدَاع এবং এ জাতীয় শব্দসমূহের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, এগুলো যদি কাফেরদের مَكْر ও خِدَاع এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয় তখন সেটি খারাপ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। বরং কাফেরদের مَكْر ও خِدَاع এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে مَكْر ও خِدَاع করা একটি ইতিবাচক গুণ। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, আস-সাক্কাফ] উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্র কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ্ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইয়াহূদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।

(২) مُتَوَفِّيكَ শব্দের ধাতু توفي এবং মূলধাতু وفي অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান গ্রন্থেই এ অর্থ রয়েছে। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ূপূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেয়া হয়। এ কারণে শব্দটি মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কুরআনে এ অর্থেও توفي শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের প্রাণও নিদ্রার সময় নিয়ে নেন।" [সূরা আয্-যুমারঃ ৪২] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ مُتَوَفِّيكَ এর অর্থ, 'আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব। এ তাফসীরের সারমর্ম এই যে, مُتَوَفِّيكَ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দে رَافِعُكَ إِلَيَّ প্রথমে ও مُتَوَفِّيكَ পরে হবে। এখানে مُتَوَفِّيكَ কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে

اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

উঠিয়ে নিব[১] এবং যারা কুফরী করে তাদের মধ্য থেকে আপনাকে পবিত্র করব। আর আপনার অনুসারিগণকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর প্রাধান্য দিব, তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' অতঃপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে আমি তোমাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দেব[২]।

উঠিয়ে নেয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জিযা। এতদসঙ্গে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং নাসারাদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ্ তা'আলার মতই চিরঞ্জীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে مُتَوَفِّيكَ বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) এতে বাহ্যতঃ ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বুঝা সম্পূর্ন ভুল। কুরআনের অন্যত্রও ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ﴿بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ﴾ অর্থাৎ ইয়াহূদীরা নিশ্চিতই ঈসাকে হত্যা করেনি, বরং "আল্লাহ্ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন্-নিসাঃ ১৫৮] "নিজের কাছে তুলে নেয়া" সশরীরে তুলে নেয়াকেই বলা হয়।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিপক্ষে ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেনঃ
সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তার মৃত্যু ইয়াহূদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না; বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কেয়ামতের নিকটতম যামানায় আসবে। তখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে আপাততঃ ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নেয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়। তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল

৫৬. তারপর যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই[১]।

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা। এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে ইয়াহূদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইয়াহূদীরা ঈসা আলাইহিস্ সালামের জন্ম বিষয়ে অপবাদ আরোপ করত। কুরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে ইলাহ্ হওয়ার দাবী করার অভিযোগও এনেছিল। কুরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বন্দেগী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্গীকারে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াতে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে নাসারা ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলিমরাও ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াতে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই আখেরাতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। নাসারারা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলিমরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা আখেরাতে মুক্তির অধিকারী হয়েছে। পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে।

(১) ইয়াহূদীরা একথা বলে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। বর্তমানে নাসারাগণও ইয়াহূদীদের আকীদা-বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে বলে থাকে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম শূলে বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। অবশ্য তারা এটাও বলে থাকে যে, তিনি পরে জীবিত হয়ে আবার আকাশে চলে গিয়েছেন। প্রকৃত কথা হলো, ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যেসব ইয়াহূদী তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এটা আমরা আপনার নিকট তেলাওয়াত করছি আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণী থেকে।

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে তিনি হয়ে যান।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

৬০. (এটা) আপনার রবের নিকট থেকে সত্য, কাজেই আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[১]।

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের ন্যায় করে দেন। অতঃপর ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ "তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলীতেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয়" [সূরা আন্-নিসাঃ ১৫৭] এভাবে তারা নিজেদের লোককে হত্যা করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইয়াহূদীদের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলিতেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইয়াহূদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(১) এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী রাসূলগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে আদম, নূহ্, ইব্‌রাহীম ও ইমরানের বংশধরের কথা একটি মাত্র আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এরপর প্রায় বাইশটি আয়াতে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে,

৬১. অতঃপর আপনার নিকট জ্ঞান আসার | فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

কুরআন যার প্রতি নাযিল হয়েছে তার উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের মাতামহীর উল্লেখ, তার মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তার নাম, তার লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়া প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তার আরো গুণাবলী, আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআন ও হাদীসে কোন রাসূলের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। সামান্য চিন্তা করলেই এ বিষয়টির কারণ পরিস্কার হয়ে যায় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোন নবী আসবেন না। এ কারণে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন। পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাজ্জাল। তার ফেৎনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নবুওয়াত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের ফেৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্য নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তার জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রাদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তার অবতরণের সময় তাকে চেনার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তার পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তার অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তার সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন? দ্বিতীয়, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সে সময় নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে আগমন করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুওয়াতের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তৃতীয়, ঈসা 'আলাইহিস্

تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাকে বলুন, 'এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আমরা মুবাহালা (বিনীত প্রার্থনা) করি, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত[১]।'

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চয় এগুলো সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হক ইলাহ্ নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সালামের অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তার অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্থানে এক সময় মির্যা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। মুসলিম ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালা হলো, যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র লা'নতের অধিকারী হয়। মূলতঃ 'লা'নত' অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই আল্লাহ্‌র ক্রোধে পড়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সে সময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

৬৩. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত[১]।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

সপ্তম রুকূ'

৬৪. আপনি বলুন, হে আহ্‌লে কিতাবগণ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

(১) এ 'মুবাহালা'র পটভুমি সম্পর্কে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাজরানের নাসারাদের মধ্য হতে 'আকেব ও আস-সাইয়্যেদ নামীয় দুই নেতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে [তাদের ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক তা নির্ধারণের ব্যাপারে] মুলা'আনাহ করার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বলল, এটা করতে যেয়ো না; কারণ, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তিনি নবী-ই হয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে বদ-দো'আ করেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কখনো সফলকাম হতে পারবো না। তারপর তারা দু'জন [পূর্ববর্তী মুবাহালা করার মত থেকে সরে এসে] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন তা-ই আমরা দিব, তবে আপনি আমাদের কাছে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠান। আমানতদার ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে পাঠাবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের সাথে বাস্তবিকই একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাব। এ কথা বলার পর সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই সেই আমানতদার ব্যক্তিটি হবার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ! তুমি উঠ।" যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এই হচ্ছে এ উম্মতের আমানতদার ব্যক্তি।" [বুখারী: ৪৩৮০, মুসলিম: ২৪২০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবন আব্বাস বলেন, "যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুবাহালাহ করতে চেয়েছিল তারা যদি তা করত তবে তারা ফিরে গিয়ে কোন সম্পদ-পরিবার খুজে পেত না।" [তিরমিযী: ৩৩৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১/২৪৮]

ইবন কাসীর বলেন, এ ঘটনা হিজরী ৯ম সনে সংঘটিত হয়েছিল। তার পূর্বেই জিযিয়া করের বিধান সম্বলিত সূরা আত-তাওবাহ্ এর আয়াত নাযিল হয়েছিল। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম[১]।'

৬৫. হে আহ্লে কিতাবগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছিল? সুতরাং তোমরা কি বুঝ না[২]?

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

---

(১) এ আয়াত থেকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহ্বান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ। আমন্ত্রণ লিপিতে লিখা হয়েছিলঃ 'আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি- যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মুসলিম হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গোনাহ্ আপনার উপর পতিত হবে। "হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করব না। তাঁর সাথে অংশীদার করব না এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না।" [বুখারীঃ ৭]

(২) এ আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আহলে কিতাবদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয়টি বর্ণিত হয় নি। তবে অন্য স্থানে সেটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের ঝগড়ার কারণ হচ্ছে, প্রত্যেকেই তাকে তাদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করছে। ইয়াহূদীরা বলে যে, ইবরাহীম ইয়াহূদী ছিলেন। আর নাসারারা বলে যে, তিনি নাসরানী ছিলেন। এর প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী: "তোমরা কি বল যে, 'অবশ্যই ইব্রাহীম, ইস্মা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী বা নাসারা ছিল?' বলুন, 'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্?" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪০] তবে পরবর্তী ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের

৬৬. সাবধান, তোমরা তো সে সব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরা তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. ইব্‌রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারাই ইব্‌রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এ নবী ও যারা ঈমান এনেছে; আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক[১]।

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

বিবাদের বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কারণ সেখানে বলা হয়েছে, "ইব্‌রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না"।

হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, নাজরানের নাসারা ও মদীনার ইয়াহূদী সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে একত্রিত হয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। ইয়াহূদীরা বলতে লাগল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইয়াহূদী ছিলেন, আর নাসারারা বলতে লাগল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নাসরানী ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের কি হলো যে, একটি প্রকাশ্য বিষয়কে ভিন্ন রূপ দিচ্ছ? তাওরাত ও ইঞ্জীল তো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরে নাযিল হয়েছে। আর সে কিতাবদ্বয়ের নাযিলের পরে ইয়াহূদীবাদ ও খ্রীস্টানবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিভাবে ইয়াহূদী বা নাসারা হতে পারে? [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতম হলেন যারা তার আনীত দ্বীনের উপর আছেন ও এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এই নবীর উম্মাতদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ মুহাজির-আনসার ও অন্যান্য পরবর্তী উম্মাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্য থেকে কিছু অভিভাবক থাকেন। আমার অভিভাবক হলেন আমার পিতা, আমার রবের খলীল (অর্থাৎ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম)।' [তিরমিযীঃ ২৯৯৮, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৯২, ৫৫৩]

৬৯. কিতাবীদের একদল চায় যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে পারে, অথচ তারা নিজেদেরকেই বিপথগামী করে। আর তারা উপলব্ধি করে না।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর[১]?

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর[২] এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান[৩]?

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

---

(১) কাতাদা বলেন, এর অর্থ, হে কিতাবী সম্প্রদায়! কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করতে পার, অথচ তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাগুণ তোমাদের কিতাবে রয়েছে। তারপর তোমরা তার সাথে কুফরী কর, তা অগ্রাহ্য কর এবং তার উপর ঈমান আনয়ন কর না। তোমরা তোমাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাকে উম্মী নবী হিসেবে দেখতে পাও, যিনি আল্লাহ্‌র উপর এবং তার কালেমার উপর ঈমান রাখেন। [তাবারী]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছাইফ, আদী ইবন যায়দ ও হারেস ইবন আওফ পরস্পর পরস্পরকে বলল: আস, যা মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের উপর নাযিল হয়েছে আমরা সেটার উপর সকালবেলায় ঈমান আনয়ন করি এবং সন্ধ্যা বেলা সেটার সাথে কুফরী করি। যাতে করে মুসলিমরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে আমরা যে রকম করেছি তারাও সে রকম করবে। আর এতে করেই তারা তাদের দ্বীন থেকে সরে আসবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। [তাবারী]
কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে 'তোমরা কেন হককে বাতিলের বা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর' এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা কেন ইসলামের সাথে ইয়াহূদী মতবাদ ও খ্রীস্টানদের মতবাদকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখছ? অথচ তোমরা ভাল করেই জান যে, যে দ্বীন ব্যতীত আর কোন কিছু আল্লাহ্ কবুল করবেন না, আর কোন প্রতিফল কেউ পাবে না, সেটি হচ্ছে ইসলাম। [তাবারী]

(৩) কাতাদা বলেন, জেনে-বুঝে সত্য গোপন করার অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়টি তারা গোপন করছে। অথচ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে আলোচনা ও গুণাগুণ দেখতে পায়। যিনি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবেন। [তাবারী]

অষ্টম রুকূ'

৭২. আর কিতাবীদের একদল বলল, 'যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তোমরা দিনের শুরুতে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে কুফরী কর; যাতে তারা ফিরে আসে(১)।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর যে তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাদেরকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না(২)।' বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা এ জন্যে যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে অথবা তোমাদের রবের সামনে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে(৩)।' বলুন, 'নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছে তা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ أَنْ يُّؤْتٰٓى أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

(১) কাতাদা বলেন, ইয়াহূদীরা একে অপরকে বলত: তাদের দ্বীনের ব্যাপারে দিনের শুরুতে সন্তোষ প্রকাশ কর। আর দিনের শেষে অস্বীকার কর। এতে করে মুসলিমরা তোমাদেরকে সত্যয়ন করবে এবং বুঝে নিবে যে, নিশ্চয় তোমরা মুসলিমদের মাঝে এমন কিছু দেখেছ যা অপছন্দনীয়। আর এভাবেই সহজে মুসলিমরা তাদের দ্বীন ছেড়ে দিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। [তাবারী]

(২) এটাও কিতাবীরা পরস্পরকে বলে। তারা এর মাধ্যমে শিখিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা কখনও কোন মুসলিমকে বিশ্বাস করে তোমাদের গোপন মনের কথা বলে দিও না। এতে তারা সাবধান হয়ে যাবে। [তাফসীরে ইবন কাসীর]

(৩) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তাদের এসব কর্মকাণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে, ইয়াহূদীরা তাদের ছাড়া অন্যদের মাঝে নবুওয়ত আসবে বা অন্যদের মত তারাও একইভাবে কোন দ্বীনের অনুসারী হবে, এটা সহ্য করতে পারছে না। ফলে হিংসা তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে। কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের সম্বোধন করে বলছেন, যখন আল্লাহ্ অন্যদের প্রতি তোমাদের কিতাবের মত কিতাব নাযিল করল এবং তোমাদের নবীর মত নবী অন্যদেরকেও প্রদান করল তখনি তোমরা হিংসা আরম্ভ করলে। [তাবারী]

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছে একান্ত করে বেছে নেন[১]। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৫. আর কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে[২]; আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখলেও তার উপর সর্ব্বোচ্চ তাগাদা না দিলে সে তা ফেরত দেবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই'[৩] আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা বলে।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

---

(১) অনুগ্রহ বলতে যাবতীয় অনুগ্রহই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে, এখানে অনুগ্রহ বলে নবুওয়াত বোঝানো হয়েছে। কারণ, পূর্বের আয়াতে এ কারণেই ইয়াহূদীরা হিংসা করে ঈমান আনতে বিরত থাকছে বলে জানানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আমানতে বিশ্বস্তদের প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে 'কিছু সংখ্যক লোক' বলে যদি ঐসব আহলে-কিতাবকে বুঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহলে-কিতাব বুঝানো হয়ে থাকে, যারা অমুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফেরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি? উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বুঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফেরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে পাবে। এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে।

(৩) কাতাদা বলেন, ইয়াহূদীরা বলত: আরবদের যে সমস্ত সম্পদ আমাদের হস্তগত হবে সেটা ফেরত দেয়ার কোন সুযোগ নেই। [তাবারী] বস্তুত ইয়াহূদীরা তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য সকল মানুষকে 'উমামী' বা 'জুয়ায়ী' ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, তারাই আল্লাহ্র একমাত্র পছন্দনীয় জাতি। তারা ব্যতীত আর কারও জান বা মালের কোন সম্মান থাকতে পারে না।

৭৬. হ্যাঁ অবশ্যই, কেউ যদি তার অংগীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন[১]।

بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই[২]। আর আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এখানে তাকওয়া বলে শির্ক থেকে বেঁচে থাকা বোঝানো হয়েছে। যারা শির্ক থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন। [তাবারী]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এক ব্যক্তি তার পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে এর চেয়ে বেশী মূল্য দিতে চেয়েছিল' অথচ তা সত্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে তার পণ্য গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। তখন এ আয়াত নাযিল হল। [বুখারীঃ ২০৮৮] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা বলেন, দালালমাত্রই সুদখোর ও খেয়ানতকারী। [বুখারী] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এক. কোন লোকের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও কোন মুসাফিরকে দিতে নিষেধ করেছে। দুই. কোন লোক রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে কেবলমাত্র দুনিয়ালাভের জন্যই আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। ফলে তাকে দুনিয়ার কোন সম্পদ দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট থাকে, না দেয়া হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে তার পণ্য বিক্রির জন্য বিছিয়ে নিয়েছে, তারপর বলতে থাকে যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে (পূর্বে) এ পণ্যের জন্য এত এত দেয়ার কথা বলেছে (অর্থাৎ লোকেরা এর দাম এত এত বলেছে)। আর এটা শুনে কোন লোক তাকে সত্যবাদী মনে করে নিয়েছে (এবং তা ক্রয় করে নিয়েছে)। তারপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [বুখারী: ২৩৫৮; মুসলিম: ১০৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি জেনে-বুঝে কোন মুসলিমের সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্‌র সাথে ক্রোধান্বিত অবস্থায় সাক্ষাত করবে।" তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীর সত্যায়নের জন্য উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [বুখারী: ৪৫৪৯, ৪৫৫০; মুসলিম: ১৩৮]

তাকাবেন না কেয়ামতের দিন। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না; এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি[১]।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৮. আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর; অথচ সেটা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে'; অথচ সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলে[২]।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

৭৯. কোন ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও'[৩], বরং তিনি

---

(১) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দু পক্ষের মধ্যে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্য জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত। কুরআন ও সুন্নায় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ (এক) জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। (দুই) আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না। (তিন) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহ্‌মতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। (চার) আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ মার্জনা করেন না। (পাঁচ) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

(২) কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, যারা এ গর্হিত কাজটি করে তারা হচ্ছে, ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিকৃত করে সেখানে মনগড়া কথা ঢুকিয়ে নিয়েছে, তারপর তারা সেটাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলে দাবী করছে। [তাবারী]

(৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন নাজরানের নাসারারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলো, সেখানে ইয়াহূদী

বলবেন, 'তোমরা রব্বানী[১] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।'

৮০. অনুরূপভাবে ফেরেশ্‌তাগণ ও নবীগণকে রবরূপে গ্রহণ করতে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবেন?

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝٨٠

নবম রুকূ'

৮১. আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন[২] যে,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَٰقَ النَّبِيِّۦنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم

ও নাসারা সবাই একত্রিত হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন আবু রাফে' আল-কুরাযী বলে বসল: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে, নাসারারা যেভাবে ঈসা ইবন মারইয়ামের ইবাদাত করে থাকে, সেভাবে আমরাও আপনার ইবাদাত করি? তখন নাসারাদের একজন যাকে 'আর-রায়িস' বলা হয় সে দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কি তা-ই চান? আর এটাই আপনার দাওয়াত? অথবা এরকম কোন কথা বলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারও ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাবো এমন কাজ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ আমাকে এ জন্য পাঠান নি। অথবা এরকম কোন কথা তিনি বললেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। [তাবারী]

(১) 'রব্বানী' শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত এসেছে। ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় এর অর্থ এসেছে, حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ حُلَمَاءُ অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী ও সহিষ্ণু হওয়া। হাসান বসরী বলেন, ফকীহ হওয়া। অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস, সা'য়ীদ ইবন জুবাইর, কাতাদাহ, আতা সহ অনেকের মতে এর অর্থ ইবাদত ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া। [ইবন কাছীর] এগুলোতে কোন বিরোধ নেই। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ্ বলেন: এ শব্দটি رُبَّانُ السَّفِينَةِ (জাহাজের নাবিক) শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ কর্ণধার, পরিচালক, বিপদে নেতৃত্বপ্রদানকারী। [মাজমূ' ফাতাওয়া]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সূরা আল-আ'রাফের ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সে অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব পণ্ডিতদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না

مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে- তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম(১)।'

করে। যার আলোচনা ﴿وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ﴾ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। [সূরা আলে ইমরানঃ ১৮৭] অনুরূপভাবে এ অঙ্গীকারের কথা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ৮৩ এবং সূরা আল-মায়েদার ১২ ও ৭০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য ৮১ নং আয়াতে ﴿وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ﴾ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ميثاق বা অঙ্গীকার কি? এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আলী ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সব রাসূলগণের কাছ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তারা স্বয়ং যদি তার আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। [তাবারী] পক্ষান্তরে তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেনঃ রাসূলগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল- যাতে তারা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। [তাবারী] বস্তুত উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে।

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব রাসূলের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন রাসূলের পর যখন অন্য রাসূল আগমন করেন- যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী রাসূল ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্যে জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুওয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কুরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী রাসূলগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। তাই যখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম

৮২. সুতরাং এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই তো ফাসেক।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তারা কি চায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে[১]! আর তাঁর দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

পৃথিবীতে পুনরায় নেমে আসবেন, তখন তিনিও কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধি-বিধানই পালন করবেন। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত বিশ্বজনীন। তার শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন, 'আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি' [বুখারী: ৪৩৮; অনুরূপ মুসলিম: ৫২১]

(১) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পন সমস্ত সৃষ্টিকেই করতে হয়। প্রতিটি সৃষ্টি জীবই আল্লাহ্‌র নিয়মের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। তাকে অবশ্যই মরতে হবে। তাকে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তাকে অবশ্যই রোগ-বালাই এর সম্মুখীন হতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু তারা সবাই তা মন বা মুখে স্বীকার করতে চায় না। বা স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতি স্বীকার করে না। সকল সৃষ্টজীবই এ প্রকার আত্মসমর্পনের অধীন। এ ধরনের আত্মসমর্পনের মধ্যে কোন সওয়াব নেই। তবে এদের মধ্যে একদল আছে যারা আল্লাহ্‌র এ নিয়ম-নীতি প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাঁর আনুগত্য করেছে। এ প্রকার আত্মসমর্পনই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার কাছে আশা করেন। এর মধ্যেই রয়েছে সওয়াব ও মুক্তি। [তাবারী] এ আয়াতে যে বক্তব্যটি বলা হচ্ছে পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বক্তব্য আরও এসেছে, যেমন বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়" [সূরা আর-রা'দ: ১৫] আরও এসেছে,"তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়? আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যমীনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফিরিশ্‌তাগণও, তারা অহংকার করে না। আর তারা ভয় করে তাদের উপর তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে।" [আন-নাহল:৪৮-৫০]

৮৪. বলুন, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল তাতে ঈমান এনেছি; আমরা তাঁদের কারও মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।'

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আল্লাহ্‌ কিভাবে হেদায়াত করবেন সে সম্প্রদায়কে, যারা ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আর আল্লাহ্‌ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না[১]।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

---

(১) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যায়। পরে সে লজ্জিত হয় ও তার স্বজাতির কাছে বলে পাঠায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা কর আমার কি কোন তাওবাহ্‌ আছে? তার স্বজাতির লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অমুক লজ্জিত হয়েছে এবং জানতে চেয়েছে যে, তার জন্য তাওবাহ্‌ আছে কি না? তখন এ আয়াতসহ পরবর্তী চারটি আয়াত নাযিল হয়। পরে সে ফিরে আসে এবং পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করে। [নাসায়ী: ৭/১০৭; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪৪৭৭; মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪৮] হাসান বলেন, এ আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের গ্রন্থে

৮৭. এরাই তারা যাদের প্রতিদান হলো, তাদের উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত।

أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না;

خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা এর পরে তাওবাহ্ করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৯০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথ ভ্রষ্ট[১]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾

৯১. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফেররূপে মৃত্যু ঘটেছে তাদের কারো কাছ থেকে যমীনভরা সোনা

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

স্পষ্ট দেখতে পেত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে তিনি তাদের কাছে আগমন করলে তাকে সাথে নিয়ে কাফেরদের উপর জয়ী হবে ঘোষণা করত। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে আসলেন, তখন তারা কূফরী করল। [তাবারী] তবে আয়াত দৃষ্টে মনে হয়; বক্তব্যটি ব্যাপক। যারাই এরকম কাজ করবে তারাই এ খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

(১) কাতাদা বলেন, তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দুশমন ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা ইঞ্জীল ও ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে কুফরী করেছে। তারপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সাথে কুফরী করছে। [তাবারী] সুতরাং তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিণতি। তাদের তাওবাহ কবুল হওয়ার নয়। আবুল আলীয়া বলেন, তাদের তাওবাহ কবুল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা কোন কোন গোনাহ হতে তাওবাহ করলেও মূল গোনাহ (কুফরী) থেকে তাওবাহ করে না। সুতরাং তাদের তাওবাহ কিভাবে কবুল হবে? [ইবন আবী হাতেম]

وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনো কবুল করা হবে না[১]। এরাই তারা, যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

দশম রুকূ‘

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿٩٢﴾

৯২. তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত[২]।

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করে বলা হবেঃ যদি তোমার নিকট পৃথিবীর সমান পরিমান স্বর্ণ থাকে, তাহলে কি তুমি এর বিনিময়ে এ শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করবে? তখন তারা বলবেঃ হ্যাঁ, তাকে বলা হবে যে, তোমার নিকট এর চেয়েও সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল... আমার সাথে আর কাউকে শরীক না করতে কিন্তু তুমি তা মানতে রাজি হওনি। [বুখারীঃ ৬৫৩৮]

(২) সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কুরআনী নির্দেশ পালনের জন্য তারা ছিলেন উম্মুখ। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করার জন্যে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বেশ ধনী ছিলেন। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তার একটি বাগান ছিল, যাতে ‘বীরাহা’ নামে একটি কুপ ছিল। বর্তমানে মাসজিদের নববীর বাব আল-মাজীদীর বাদশাহ ফাহদ গেট দিয়ে ভিতরে মাসজিদে ঢুকার পর পরই সামান্য বাম পার্শ্বে এ স্থানটি পড়ে। পরিচিতির সুবিধার্থে দুই থামের মাঝখানের তিনটি গোল চক্কর দিয়ে তার স্থান নির্দেশ করা আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কুপের পানি তিনি পছন্দও করতেন। আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তার বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেনঃ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে ইস্‌রাঈল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল[১] তা ছাড়া বনী ইস্‌রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল[২]। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর।'

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِالتَّوْرَىٰةِ فَاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে তারাই যালেম।

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫. বলুন, 'আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। কাজেই তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ কর, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে তুমি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। [বুখারীঃ ১৪৬১, মুসলিমঃ ৯৯৮] এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না- পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালামের 'ইরকুন্ নাসা' নামক রোগ ছিল। এজন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যদি তিনি এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন তাহলে তিনি উটের গোশ্ত ভক্ষণ ত্যাগ করবেন। আয়াতে এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৯২]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এসেছে- ইয়াহূদীরা আপত্তি করল যে, আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি হারাম ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ ভুল কথা, এগুলো তার প্রতি হালাল ছিল। ইয়াহূদীরা বললঃ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, সবই নূহ্ ও ইব্‌রাহীমের আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে ইয়াহূদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ তাওরাত নাযিলের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী-ইস্‌রাঈলের জন্যও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণবশতঃ ইয়াকূব আলাইহিস্ সালাম নিজেই নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। [দেখুন, তাফসীরে ইবন কাসীর]

৯৬. নিশ্চয় মানব জাতির[১] জন্য সর্বপ্রথম[২] যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে।[৩]

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

(১) প্রাচীনকাল থেকেই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

(২) আলোচ্য আয়াতে কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম ইবাদাতের স্থান। দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার। তৃতীয়তঃ এ গৃহ সারা সৃষ্টির জন্য পথপ্রদর্শক। আয়াতে বর্ণিত প্রথম শ্রেষ্ঠত্বের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা 'বাক্কা'য় অবস্থিত। 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্কা'। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদাতঘর। তখন অর্থ হবে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু ইবাদাতের জন্য কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও বর্ণিত রয়েছে। [দিয়া আল-মাকদেসী, আল-মুখতারাহ: ২/৬০ নং ৪৩৮] তাছাড়া আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস গৃহও ছিল না। এ কারণে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।

(৩) আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্বপ্রথম গৃহ। হাদীসে আছে, আবু যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? উত্তর হলোঃ মসজিদুল হারাম। আবারো প্রশ্ন করা হলোঃ এরপর কোন্‌টি? উত্তর হলোঃ মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই দু'টি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলোঃ চল্লিশ বৎসর। [বুখারীঃ ৩৩৬৬, মুসলিমঃ ৫২০] এ হাদীসে ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের হাতেই কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বলে বুঝা যায়। তাই সবচেয়ে প্রামাণ্য সঠিক মত হলো যে, ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামই সর্ব প্রথম কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কারণ এ হাদীসে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও ইব্‌রাহীম

'আলাইহিস্ সালামের হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর সম্পন্ন হয়। এরপর সুলাইমান 'আলাইহিস্ সালাম বায়তুল-মুকাদ্দাসের পুণঃনির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়। এ ছাড়া কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কা'বা গৃহ সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস্ সালাম নির্মাণ করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, 'আদম আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। উপরোক্ত দু'টি বর্ণনার কোনটিই সঠিক সনদে প্রমাণিত হয়নি। তাই আমরা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকেই কা'বা গৃহের প্রথম নির্মাণকারী বলতে পারি। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কুরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে। সর্বশেষ এ নির্মাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইব্রাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দু'টি- একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভুমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে- যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে; বরং তারা যাকে অনুমতি দেবে সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেছিলেনঃ 'আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।' [বুখারীঃ ৪৪৮৪, ১৫৮৩, মুসলিমঃ ১৩৩৩] এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ভাগ্নে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণ ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশী দিন টেকেনি। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাকে শহীদ করে দেয়। সে কা'বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলে কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ্ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করে ইমাম মালেক

৯৭. তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে[১], যেমন মাকামে ইব্‌রাহীম[২]। আর

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ

ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে ফতোয়া চান। তিনি তখন ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বা গৃহের ভাঙ্গা-গড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্‌দের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিৎ। সমগ্র মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে। বর্তমান আমলে বেশ কয়েক বছর পূর্বে সাবেক খাদেমুল হারামাইন আশ্‌-শরীফাইন বাদশাহ্ ফাহদ ইবনে আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ্ সবচেয়ে ব্যয়বহুল এক সংস্কার কাজ করে কা'বা গৃহের সৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত করেন।

(১) এ আয়াতে কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এতে আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন রয়েছে, আর তা হচ্ছে মাকামে ইব্‌রাহীম। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তৃতীয়তঃ সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এতে হজ্জ পালন করা ফরয; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে। কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্ তা'আলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হারামে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়।

(২) কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মাকামে ইব্‌রাহীম। যা একটি বড় নিদর্শন হওয়ার কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইব্‌রাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপরে দাঁড়িয়েই ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এ পাথরের গায়ে ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি পাথরের উপর পদচিহ্ন পড়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কুরআনে মাকামে-ইবরাহীমে সালাত আদায় করার আদেশ নাযিল হয় তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে সরিয়ে কা'বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কুপের নিকট স্থাপন করা হয়। বর্তমানে মাকামে- ইব্‌রাহীমকে সরিয়ে নিয়ে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। তাওয়াফ-পরবর্তী নামায এর আশে পাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মাকামে ইব্‌রাহীম সমগ্র মসজিদে হারামকেও বুঝায়। এ কারণেই ফিক্‌হবিদগণ বলেনঃ মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ পরবর্তী সালাত পড়ে নিলেই তা আদায় হয়ে যাবে।

آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ[১]। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ[২] করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য[৩]। আর যে

(১) কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা মুলত: সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও কিছুই বলত না। মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হারামের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বা গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টার জন্যেই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্যে কা'বার হারামে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেনঃ আমার পূর্বে কারো জন্যে হারামের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে। [বুখারী: ১৩৪৯; মুসলিম: ১৩৫৫]
তবে কাতাদা বলেন, হাসান বসরী বলেছেন, হারাম শরীফ কাউকে আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট হদ বা শাস্তি বাস্তবায়নে বাধা দেয় না। যদি কেউ হারামের বাইরে অন্যায় করে হারামে প্রবেশ করে তবে তার উপর হদ বা শাস্তি কায়েম করতে কোন বাধা নেই। যদি কেউ হারামে চুরি করে কিংবা ব্যভিচার করে বা হত্যা করে তার উপর শরী'আতের আইন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে [তাবারী]।

(২) হজ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ বলা হয়। হজের বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

(৩) আয়াতে কা'বা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য শর্তসাপেক্ষে কা'বা গৃহের হজ ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যা দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়।

কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন(১)।

৯৮. বলুন, 'হে আহ্‌লে কিতাবগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের সাথে কেন কুফরী কর? আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সাক্ষী।'

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۝

এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ী ঘরে চলাফেরাই দুস্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে? মহিলাদের পক্ষে মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়ত মতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌঁছার জন্যে রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আয়াতে সামর্থ বলতে, বান্দার শারীরিক সুস্থতা এবং নিজের উপর কোন প্রকার কমতি না করে পাথেয় ও বাহনের খরচ থাকা বুঝায়। [তাবারী]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে কুফরী বলতে বোঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তির কাজকে, যে হজ করাকে নেককাজ হিসেবে নিল না আর হজ ত্যাগ করাকে গোনাহের কাজ মনে করল না। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, কুফরী করার অর্থ, আল্লাহ্ ও আখেরাতকে অস্বীকার করল। [তাবারী] মোটকথাঃ বান্দা বড়-ছোট যে ধরনের কুফরীই করুক না কেন তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ তার মুখাপেক্ষী নয়। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। যদি সমস্ত লোকই কাফের হয়ে যায় তবুও এতে তার রাজত্বে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন, "তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও তারপরও আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার যোগ্য।" [সূরা ইবরাহীম:৮] আরও বলেন, "অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্ও (তাদের ঈমানের ব্যাপারে) ভ্রুক্ষেপহীন হলেন; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।" [সূরা আত-তাগাবুন:৬] সুতরাং তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ বান্দাদের উপকারার্থেই দিয়ে থাকেন। এ জন্যে দেন না যে, বান্দার আনুগত্য বা অবাধ্যতা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি বা উপকার করবে। [আদওয়াউল বায়ান]

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. বলুন, 'হে আহ্‌লে কিতাবগণ! যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে তাকে কেন আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিচ্ছ, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে? অথচ তোমরা সাক্ষী[১]। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।'

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

১০০. হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ছাড়বে[২]।

---

(১) কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ, হে আহলে কিতাব সম্প্রদায়! তোমরা কেন যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে, তাদেরকে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র নবী থেকে বাধা দিচ্ছ? অথচ তোমরা তোমাদের কাছে সংরক্ষিত আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পড় তার কারণে একথার সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন, যা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। তোমাদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তোমরা সেটা দেখতে পাও। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে সাবধান করছেন যে, তারা যেন আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের আনুগত্য না করে। কেননা তারা মুমিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে নবী ও কিতাবের নেয়ামত প্রদান করেছেন সেটার হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। কারণ তাদের অনুসরণ করলে তারা মুমিনদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা ঘোষণা করেছেন। যেমন, "কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯]। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইয়াহূদী-নাসারাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যেমনটি তোমরা শুনলে, তোমাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কেও সাবধান করেছেন, সুতরাং তোমরা কোনভাবেই তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ ভেবো না। আর তোমাদের জানের ব্যাপারেও কল্যাণকামী মনে করো না। প্রকৃতপক্ষেই তারা পথ ভ্রষ্ট হিংসুটে শত্রু। কিভাবে তোমরা এমন এক সম্প্রদায়কে নিরাপদ মনে করতে পার যারা তাদের কিতাবের সাথে কুফরী করেছে, রাসূলদের হত্যা করেছে, দ্বীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে এবং নিজেরা অপারগ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র শপথ, এরা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য ও শত্রু। [তাবারী]

১০১. আর কিভাবে তোমরা কুফরী করবে অথচ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল রয়েছেন[১]? আর কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথের হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

এগারতম রুকূ'

১০২. হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা কুফরী হওয়া এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তোমাদের কাছে তো আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ দিন-রাত্রি নাযিল হচ্ছেই। তাছাড়া তোমাদের সাথে আছেন আল্লাহ্‌র নবী যিনি সেটা তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন এবং তোমাদের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় তোমাদের পক্ষ থেকে কুফরী হওয়া আশ্চর্যজনক নয় কি? অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি বলেছেন, “আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছেন” [সূরা আল-হাদীদ:৮] কাতাদা বলেন, কুফরী না করার পক্ষে দু'টি বড় নিদর্শন রয়েছে। একটি আল্লাহ্‌র নবী অপরটি আল্লাহ্‌র কিতাব। তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী চলে গেছেন কিন্তু তাঁর কিতাব অবশিষ্ট রয়েছে। যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে হালাল-হারাম, আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিষয়ে যাবতীয় বিধি-বিধান। [ইবনে আবী হাতেম] কোন কোন বর্ণনায় এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আউস ও খাযরাজ গোত্রে অন্ধকার যুগে যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল কোন এক মজলিসে তারা সেটা স্মরণ করে পরস্পর মারমুখী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অর্জনের হক্ক আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক। কিন্তু তাকওয়ার হক বা যথার্থ তাকওয়া কি? আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ, রবী, কাতাদাহ্ ও হাসান রাহিমাহুমুল্লাহ্ বলেন, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা- কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- অকৃতজ্ঞ না হওয়া। [ইবন কাসীর]

এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না[১]।

১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার।

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ۪ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

(১) এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার নামই হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন। আয়াতের শেষে মুসলিম না হয়ে যেন কারও মৃত্যু না হয় সেটার উপর জোর দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে ঈমানদারের অবস্থান হবে আশা-নিরাশার মধ্যে। সে একদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের কথা স্মরণ করে নাজাতের আশা করবে, অপরদিকে আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা স্মরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার ভয় করবে। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা নিয়েই মরতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্ সম্পর্কে সু ধারণা না নিয়ে মারা না যায়।" [মুসলিম: ২৮৭৭] অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার আশা থাকবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন।

করবে[১]; আর তারাই সফলকাম।

১০৫. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে[২] ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

(১) ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পূণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যে সব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত 'মারূফ' তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্ম সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অসৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজিবাত' অর্থাৎ 'জরুরী করণীয় কাজ' ও 'মা'আসী' অর্থাৎ 'গোনাহর কাজ' -এর পরিবর্তে 'মারূফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এর পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও বাকী নেই।' [মুসলিমঃ ৪৯, আবু দাউদঃ ১১৪০] অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযিল করবেন। তারপর তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছে দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না।' [তিরমিযীঃ ২১৬৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৯১] অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, কোন লোক সবচেয়ে বেশী ভাল? তিনি বললেনঃ সবচেয়ে ভাল লোক হল যে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৩১]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'দুই কিতাবী সম্প্রদায় তাদের দ্বীনের মধ্যে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র একটি দল ব্যতীত। আর তারা হল আল-জামা'আতের অনুসারী। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু দল বেরুবে যাদেরকে কুপ্রবৃত্তি এমনভাবে তাড়িয়ে বেড়াবে, যেমন পাগলা কুকুরে কামড়ানো ব্যক্তিকে সর্বদা কুকুর তাড়িয়ে বেড়ায়।' [আবু দাউদঃ ৪৫৯৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১০২]

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে[১]; যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে[২]? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে ।'

---

(১) উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে । ইবনে-আব্বাস বলেনঃ আহলে সুন্নাত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদ'আতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে । আতা বলেনঃ মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বণী-নদ্বীরের মুখমণ্ডল কালো হবে । ইকরিমাহ বলেনঃ আহলে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো কিন্তু নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে । আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে । আর যারা তাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে ।' তিনি আরও বলেন, 'এটি যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাতবার না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না' [তিরমিযী: ৩০০০]

(২) তাদের চেহারা কেন কালো হবে, তার কারণ বর্ণনায় এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারা কালো হবার কারণ হচ্ছে, "তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে" । অন্য আয়াতে আল্লাহ্র উপর মিথ্যাচার করাকেই চেহারা কালো হওয়ার কারণ বলা হয়েছে, "আর যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারাসমূহ কালো দেখবেন । অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" [সূরা আয-যুমারঃ ৬০] আবার কোন কোন আয়াতে গোনাহ অর্জন করার কারণে তাদের চেহারা কালো হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে । "আর যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে ; আল্লাহ্ থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই ; তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত । তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।"[সূরা ইউনুস:২৭] কোন কোন আয়াতে কুফরী ও অপরাধী হওয়াকেই চেহারা কালো হবার কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে, "আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর, সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা । এরাই কাফির ও পাপাচারী ।" [সূরা আবাসা: ৪০-৪১] । বস্তুত: এগুলোতে কোন বিরোধ নেই । কারণ, এ সব কারণেই চেহারা কালো হবে । কাফেরদের চেহারা কালো হবেই ।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকবে(১), সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমরা আপনার কাছে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করছি। আর আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের প্রতি যুলুম করতে চান না।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. আর আসমানে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌র কাছেই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।

বারতম রুকূ‘

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত(২), মানব জাতির

(১) শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ এখানে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদাতই করুক না কেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ, ইবাদাত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সামর্থের বলেই মানুষ ইবাদাত করতে পারে। সুতরাং ইবাদাত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না। বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা সত্তরটি জাতিকে পূর্ণ করবে, তন্মধ্যে তোমরাই হলে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। [তিরমিযীঃ ৩০০১, ৪২৮৭] (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাদের সংখ্যা সত্তরটি। এর দ্বারা সংখ্যা বা আধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য। মানাওয়ী, ফায়দুল কাদীর) অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘জান্নাতীদের কাতার হবে একশ’ বিশটি। তন্মধ্যে আশিটি কাতার হবে এই উম্মতের।’ [তিরমিযীঃ ২৫৪৬, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৮৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৫] অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, এ উম্মত হবে জান্নাতীদের অর্ধেক। [বুখারীঃ ৬৫২৮, মুসলিমঃ ২২১] আরেক হাদীসে এসেছে, এ উম্মত সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ [মুসলিমঃ ৮৫৫, ইবনে মাজাহ্ঃ ১০৮৩]

بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে[১] এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে[২]। আর আহ্‌লে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে

---

(১) মুসলিম উম্মতকে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষনা করার কারণসমূহ কুরআনুল কারীম একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম উম্মতের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থে সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পুর্ণত্বলাভ করেছে। পুর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন দ্বীনের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে- যারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'- এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে। আবুল আলিয়া বলেন, এ উম্মতের চেয়ে বেশী কোন উম্মত ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, ফলে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] আয়াতে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ বলার সাথে সাথে তাদের কর্ম কেমন হওয়া উচিত তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মা'রূফ বা সৎকাজ হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দেয়া, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সেগুলোর স্বীকৃতি দেয়া এবং তার উপর কাফের মুশরিকদের সাথে জিহাদে থাকা। আর সবচেয়ে বড় মা'রূফ বা সৎকাজ হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতি আদায় করা। পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় মুনকার বা অসৎকাজ হচ্ছে, মিথ্যারোপ করা। [তাবারী]

(২) এ বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তাদের ঈমানের বিশেষ স্বাতন্ত্র থাকার কারণে বিশেষকরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; তারপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

১১২. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। আর তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত; তা এ জন্যে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তারা সবাই একরকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত এক দল আছে; তারা রাতে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা সিজ্‌দা করে[১]।

لَيْسُوا سَوَآءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাত অনেক দেরী করে আদায় করলেন, তারপর মসজিদের দিকে বের হয়ে দেখতে পেলেন যে, লোকেরা সালাতের অপেক্ষা করছে। তখন তিনি বললেনঃ কোন দ্বীনের কেউই তোমাদের মত এ সময়ে সালাত আদায় করে না। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম, সা'লাবাহ ইবন সা'ইয়াহ, উসাইদ ইবন সা'ইয়াহ ও আসাদ ইবন উবাইদ সহ একদল ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনল, তখন ইয়াহূদী নেতারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদের উপর যারা ঈমান এনেছে তারা হচ্ছে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ ইয়াহূদী-নাসারা সবাই যে ক্ষতিগ্রস্ত তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পাবে।

يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে ঈমান আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং তারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে(১)। আর তারাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে তা থেকে তাদেরকে কখনো বঞ্চিত করা হবে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র কাছে কখনো কোন কাজে আসবে না। আর তারাই অগ্নিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

---

(১) এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমত: তারা হক্কের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, কোন কিছুই তাদেরকে হক্ক পথ থেকে টলাতে পারে না। দ্বিতীয়ত: তারা রাতের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে। তৃতীয়ত: তারা সালাত আদায় করে। চতুর্থত: তারা আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ঈমান রাখে, পঞ্চমত: তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, ষষ্টত: তারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কদৃষ্টে মনে হয়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মাতে মুহাম্মদীকে সবচেয়ে উত্তম উম্মত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তার কারণ হিসেবে ঈমান ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার গুণ তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তখন এ গুণগুলো অন্যান্য উম্মত বিশেষ করে আহলে কিতাবদের যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে, তাদেরকেও উত্তম উম্মতের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ ঈমানদার আহলে কিতাবদের আরও কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, "আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে, তারা তাতে ঈমান আনে।" [সূরা আল-বাকারাহ:১২১] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আর কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না।" [সূরা আলে-ইমরান: ১৯৯]

১১৭. এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ূ, যা আঘাত করে ঐ জাতির শস্যক্ষেতে, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে; অতঃপর তা ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না[১]। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ক্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা-ই তারা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

(১) অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بطانة শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بطانة বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। 'কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بطانة বলা হয়।' এখানে بطانة বলে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়েছে। অতএব আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নিজেদের দ্বীনের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করে তাদের কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করতে যেও না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন নবী পাঠিয়েছেন বা কোন খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তখনই তার দু'ধরনের মিত্রের সমাহার ঘটে। এক ধরনের মিত্র তাকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং সেটার উপর উৎসাহ যোগায়। অপর ধরনের মিত্র তাকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সেটার উপর উদ্দীপনা দিতে থাকে। আল্লাহ্ যাকে হেফাযত করতে ইচ্ছা করেন তিনি ব্যতীত সে মিত্রের অকল্যাণ থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না।" [বুখারী: ৭১৯৮] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, অন্ধকার যুগে কোন কোন মুসলিমের সাথে কোন কোন ইয়াহূদীর সন্ধিচুক্তি ছিল। সে চুক্তির কারণে ইসলাম গ্রহণের পরও মুসলিমরা তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে ইয়াহূদী-নাসারা তথা অমুসলিমদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। [ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীরুস সহীহ]

কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর(১)। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর(২)।

---

(১) অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদেরকে সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।
উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহূদী হোক কিংবা নাসারা, কপট বিশ্বাসী মুনাফেক হোক কিংবা মুশরেক- কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলিমদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

(২) ইসলাম বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভুতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র ও তার বৈশিষ্ট্যপুর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলিমদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপুর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যে সব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলিমদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপুর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

هَٰٓأَنتُمْ أُولَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

১১৯. দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সব কিতাবে ঈমান রাখ। আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাটতে থাকে।' বলুন, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।' নিশ্চয় অন্তরে যা রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।' [আবু দাউদঃ ৩০৫২]

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলিমদের নিজস্ব সত্তার হেফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করো না। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উত্তরে বলেনঃ এরূপ করলে মুসলিমদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কুরআনে নির্দেশের পরিপন্থী।' [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ] ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলিমদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরন ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেনঃ "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মুর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।" আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়- এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করা হয় না। তাই মুসলিম শাসকগণেরও এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না[১]। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

তেরতম রুকূ'

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২১. আর স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনদের নিকট থেকে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মুমিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ্ উভয়ের অভিভাবক

---

(১) অর্থাৎ তাদের কাফেরসুলভ মনোভাবের আরো প্রমাণ হলো, তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে। অতঃপর আয়াতে এ ধরনের লোকদের চক্রান্ত এবং শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হচ্ছেঃ "তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না"। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন তারা মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ঐক্যবদ্ধতা দেখে এবং শত্রুদের উপর মুসলিমদের বিজয় প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা কষ্ট পায়। আর যখন মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি ও মতবিরোধ হয়েছে দেখতে পায়, অথবা মুসলিমদের কোন পরাজয় লক্ষ্য করে, তখনি তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। যখনি তাদের এ ধরনের লোকের আবির্ভাব হবে, তখনি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা চলতে থাকবে। [তাবারী]

ছিলেন[১], আর আল্লাহ্‌র উপরই যেন মুমিনগণ নির্ভর করে[২]।

(১) অর্থাৎ তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়ই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তবে আয়াতের منكم বাক্যটি তাদের ঈমানের পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের মধ্য থেকে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলতেন, 'এ আয়াত যদিও আমাদের বনু হারেসা ও বনু সালামাকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল এবং আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে। এ কারণে এ আয়াত নাযিল না হওয়া আমাদের জন্য সুখকর ছিল না।' [বুখারীঃ ৪০৫১, ৪৫৫৮, মুসলিমঃ ২৫০৫]

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই মুসলিমদের কর্তব্য। এতে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার পর ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের উপরই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই বনী-হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার। মূলত: 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের প্রতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। ইয়াদ ইবন গানম আল-আশ'আরী বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরপর পাঁচজনকে আমীর বানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যুদ্ধ শুরু হলে একমাত্র আমীর হবে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ। যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের ময়দান থেকে আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখলাম: মৃত্যু আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আমাদের জন্য সাহায্য পাঠান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটার উত্তরে লিখলেন, সাহায্য চেয়ে পাঠানো পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব যিনি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন, যাঁর সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত, তিনি হচ্ছেন, আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং তোমরা তার কাছেই সাহায্য চাও। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিনে তোমাদের চেয়ে কম সংখ্যা ও অস্ত্র-সস্ত্র নিয়েও কাফেরদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। অতএব, যখন আমার এ চিঠি আসবে তখন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, এ ব্যাপারে আর আমার সাথে যোগাযোগ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা যুদ্ধ করলাম এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলাম। [মুসনাদে আহমাদ ১/৪৯; সহীহ ইবন হিব্বান: ১১/৮৩-৮৪]

১২৩. আর[১] বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন অথচ তোমরা হীনবল ছিলে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১২৪. স্মরণ করুন, যখন আপনি মুমিনগণকে বলছিলেন, 'এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তিন হাজার ফিরিশ্‌তা নাযিল করে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন?[২]'

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۝

---

(১) এখানে ঐ যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হচ্ছে- যাতে মুসলিমরা পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন। অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য। আর সে যুদ্ধটি ছিল বদরের যুদ্ধ।

(২) এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহারণতঃ কওমে-লুতের বস্তি একা জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালামই উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল? এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল না। এ সব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আল-আনফালের ১২ নং আয়াতে আরও স্পষ্ট করে ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মুসলিমদের অন্তর স্থির রাখ- অস্থির হতে দিয়ো না।' অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কোন না কোন উপায়ে মুসলিমদের সামনে একথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সাহাবী জিবরাঈলের আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি কাউকে ডাকছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেশতাকে দেখেছেনও। কোন কোন সাহাবী কোন কোন কাফেরকে ফেরেশতাদের

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তারা দ্রুত গতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন[১]।

হাতে মরতেও দেখেছেন [দেখুন, মুসলিমঃ ১৭৬৩]

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলিমদের আশ্বস্ত করছিলেন যে, তারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলিমদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেয়া। পুরো যুদ্ধটাই ফেরেশতাদের দ্বারা করানো উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে জিহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দুরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদাত ও গোনাহ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিস্কার পৃথকীকরনের জন্যে হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি? উত্তর এই যে, সূরা আল-আনফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলিমগণ- যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন আর শত্রু সংখ্যা এক হাজার- আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়। অর্থাৎ শত্রু সংখ্যা যত, তত সংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা স্বীয় রব এর সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো'। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে মুসলিমদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তীতে সূরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বদরের মুসলিমদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরাইশদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে। পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলিমদের তিনগুণ বেশী ছিল। এ সংবাদে মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের আত্মিক প্রশান্তির জন্য করেছেন। আর সাহায্য তো শুধু পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র কাছ থেকেই হয়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. যাতে তিনি কাফেরদের এক অংশকে ধ্বংস করেন বা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন[১]; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তিনি তাদের তাওবা কবুল করবেন বা তাদেরকে শাস্তি দেবেন- এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ

হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়- যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলিমদের সংখ্যা তিনগুন বেশী হয়ে যায়। অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেয়া হয়েছে। শর্ত ছিল দু'টিঃ (এক) মুসলিমগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতির উচ্চস্তরে পৌছলে, (দুই) শত্রুরা আকস্মিক আক্রমন চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমন না হওয়া সত্বেও আল্লাহ্র ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তাফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। [তাফসীরে ফাতহুল কাদীর]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে বলেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন দু'টি কারণের কোন একটি কারণে। এক. তিনি হত্যা, বন্দী, গণীমত, শহর বিজয় ইত্যাদির মাধ্যমে কাফেরদের এক শক্তি ও ভিত্তি ভেঙে দেবেন; ফলে মুমিনরা শক্তিশালী হবে ও কাফেররা দুর্বল হবে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মূল শক্তি হল সৈন্য, ধন-সম্পদ, অস্ত্র ও ভূ-সম্পত্তি। এসব কিছুর মধ্যে কোন কিছু যদি দুর্বল করে দেয়া যায়, তবে তাদের শক্তি কমে যাবে। দুই. কাফেররা মুসলিমদের উপর জয়ী হওয়ার জন্য আশা করবে এবং প্রচেষ্টা চালাবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবেন ফলে তারা লাঞ্ছিত ও নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। মূলত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য দু'টির কোন একটি হয়ে থাকে; হয় তিনি মুসলিমদেরকে কাফেরদের উপর বিজয়ী করবেন, নতুবা কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আয়াতে এ দু'টি দিকই উল্লেখ করা হয়েছে। [তাফসীর সা'দী]

তারা তো যালেম[১]।

১২৯. আর আসমানে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

চৌদ্দতম রুকূ'

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ[২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا

(১) এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরনের কারণ এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্যে থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাত পড়ে গিয়েছিল এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেনঃ "যারা নিজেদের নবীর সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে? অথচ নবী তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন।" এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী, মুসলিমঃ ১৭৯১] এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে উঠার পর কাফেরদের উপর বদ দো'আ করতেন, কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তা ত্যাগ করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬০, ৪০৬৯, ৪০৭০ মুসলিমঃ ৬৭৫]

(২) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমর ইবনে আকইয়াশের জাহেলী যুগের কিছু সুদের কারবার ছিল সে তা উসুল করা জন্য ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসল, সে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাই অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করতঃ অমুক কোথায়? তারা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করলঃ অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ সেও উহুদের প্রান্তরে। এতে সে তার যুদ্ধাস্ত্র পরে নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ যখন তাকে দেখল তখন তারা বললঃ আমর! তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক। কিন্তু সে জবাব দিল 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি'। তারপর সে যুদ্ধ করে আহত হলো, তাকে তার পরিবারের কাছে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হল। সা'দ ইবনে মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এসে তার বোনকে বললেন তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কি জাতিকে বাঁচানোর জন্য, নাকি তাদের ক্রোধে শরীক হওয়ার জন্য, নাকি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেছে? তখন আমর জবাবে বললঃ বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছি। তারপর তিনি মারা

أَضْعَافًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

খেয়ো না[১] এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

১৩১. আর তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে[২]।

গেলেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, অথচ আল্লাহ্‌র জন্য এক ওয়াক্ত সালাত পড়ারও সুযোগ তার হয়নি। [আবু দাউদঃ ২৫৩৭, ইসাবাঃ ২/৫২৬] হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ আমি সর্বদা খুঁজে বেড়াতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের ঘটনার মাঝখানের সুদের কথা কেন নিয়ে আসলেন, তারপর যখন এ ঘটনা পড়লাম তখন আমার কাছে এ আয়াতকে এখানে আনার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হলো। [আল উজাবঃ ২/৭৫৩]

(১) আলোচ্য আয়াতে কয়েকগুণ বেশী অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। "আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারে" সুদ খাওয়া নিষেধ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে- যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুন সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে বিষয়গুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা, জাদু করা, যথার্থ কারণ ছাড়া আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষন করা, যুদ্ধ অবস্থায় জেহাদের ময়দান হতে পলায়ণ করা, পবিত্রা মুসলিম নারীর উপর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।' [বুখারীঃ ২৭৬৬]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের সবার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে কথা বলবেন যে, তার ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অনুবাদকারী থাকবে না। তারপর প্রত্যেকে তার সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে দেখবে যে, জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়।" [বুখারীঃ ৬৫৩৯]

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার(১) ।

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে(২) যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও

---

(১) আলোচ্য আয়াতে দু'টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ (এক) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলের আনুগত্য হুবহু আল্লাহ্‌র আনুগত্য বোঝায়। তারপরও এখানে রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্‌র করুণালাভের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কুরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ তথা অস্তিত্ব, প্রভুত্ব, নাম ও গুণ এবং ইবাদাত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা। (দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বর্ণনা আসছে।

(২) এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামুলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ আল্লাহ্‌র কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া হতে পারে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে এমন সব সৎকর্ম এর উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। এটাই মত। সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, 'কর্তব্য পালন'। ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, 'ইসলাম'। আবুল 'আলিয়া বলেছেন 'হিজরত'। আনাস ইবনে-মালেক বলেছেন 'সালাতের প্রথম তাকবীর। সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের বলেছেন 'ইবাদাত পালন'। দাহ্হাক বলেন 'জিহাদ'। আর ইকরিমা বলেছেন 'তওবা'। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বুঝানো

যমীনের সমান[১], যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে

হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে ।
এখানে দু'টি বিষয় জানা আবশ্যক । এক. শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকারঃ এক, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে । এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয় । উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া ইত্যাদি । দুই, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব , যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে । এ গুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয় । অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে । [যেমন, সূরা আন-নিসাঃ ৩২] কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন । এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই । সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না । চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না । তবে যে সব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মানুষের ইচ্ছা শক্তি কাজ করে থাকে সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ বহু আয়াতে দেয়া হয়েছে । ঠিক এ আয়াতেও আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয় এমন যাবতীয় কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা এটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় ।
দুই. আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয় । কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মুল্য হতে পারে না । জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি । তা' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সততা ও সত্য অবলম্বন কর, মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর । কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না । শ্রোতারা বললোঃ আপনাকেও নয়কি- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ । উত্তর হলোঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না । তবে আল্লাহ্ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন ।' [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬] মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয় । তবে আল্লাহ্ তাআয়ালার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐবান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে । বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ । অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিৎ নয় ।

(১) আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সমান । নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের চাইতে বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না । এ কারণে জান্নাতের প্রস্থতাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত । প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে । এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন । অবশ্য কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ জান্নাত দৈর্ঘ ও প্রস্থে

মুত্তাকীদের জন্য[১] ।

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয়[২]

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَٰظِمِينَ

সমান । কেননা তা আরশের নীচে গম্বুজের মত । গম্বুজের মত গোলাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হয়ে থাকে । এ বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, তিনি বলেছেনঃ 'তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে; কেননা তা সর্বোচ্চ জান্নাত, সবচেয়ে উত্তম ও মধ্যম স্থানে অবস্থিত জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত । আর তার ছাদ হলো দয়াময় আল্লাহ্‌র আরশ । [বুখারীঃ ২৭৯০, ৭৪২৩]
তবে আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীতে নেয়া হয় । কিন্তু যদি এর অর্থ হয় 'মূল্য' তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়- এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল । সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও । কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয় । উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য । এতে করে জান্নাত যে অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য । [তাফসীরে কাবীর]

(১) জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছেঃ জান্নাত মুত্তাকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে । এতে বুঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে । এছাড়া কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত তৈরী হয়ে আছে । আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস । তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে বলা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন । যেমন জান্নাতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের এক ইট রৌপ্যের ও এক ইট স্বর্ণের, তার নীচের আস্তর সুগন্ধি মিশকের, তার পাথরকুচিগুলো হীরে-মুতি-পান্নার সমষ্টি, মিশ্রণ হচ্ছে, ওয়ারস ও যা'ফরান । যে তাতে প্রবেশ করবে সে তাতে স্থায়ী হবে, মরবে না, নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, হতভাগা হবে না, যৌবন কখনও ফুরিয়ে যাবে না, কাপড়ও কখনও ছিড়ে যাবে না ।" [মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৪, ৩০৫, সহীহ ইবন হিব্বান: ১৬/৩৯৬]

(২) অর্থাৎ মোত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত । স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় কার্য অব্যাহত রাখে । বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে । এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না । অপর দিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য

الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী[১] এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ্ মুহ্সিনদেরকে ভালবাসেন;

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ

১৩৫. আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তামগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্কে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্‌র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'ঘায়েল বা পরাভূত করতে পারাটাই বীর হওয়ার লক্ষণ নয়, বীর হল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ক্রোধের সময় সম্বরণ করতে পেরেছে'। [বুখারীঃ ৬১১৪, মুসলিমঃ ২৬০৯] অনুরূপভাবে এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা আমার কাজে আসবে, আর তা সংক্ষেপে বলুন যাতে আমি তা আয়ত্ব করতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ রাগ করো না। সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। [বুখারীঃ ৬১১৬; মুসনাদের আহমাদঃ ৫/৩৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন'। [তিরমিযীঃ ২৩২৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ক্রোধকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে যে কোন হূর পছন্দ করে নেয়ার অধিকার দিবেন"। [ইবন মাজাহঃ ৪১৮৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রোধ সম্বরণ করার চেয়ে বড় কোন সম্বরণ বেশী সওয়াবের নেই।" [ইবন মাজাহঃ ৪১৮৯]

مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۝

করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে[1]? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।

أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ۝

১৩৬. তারাই, যাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর বললঃ হে আল্লাহ! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে যাই করুক না কেন। [বুখারীঃ ৭৫০৭, মুসলিমঃ ২৭৫৮] আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে আবু বকর হাদীস শুনিয়েছে। আর আবু বকর সত্য বলেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "কোন লোক যদি গুনাহ করে, তারপর পাক-পবিত্র হয় এবং সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।" [তিরমিযী: ৪০৬; ইবন মাজাহ: ১৩৯৫; আবু দাউদ: ১৫২১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা দয়া কর, তোমাদেরকেও রহমত করা হবে, তোমরা ক্ষমা করে দাও আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা কোন কথা না শোনার জন্য নিজেদেরকে বন্ধ করে নিয়েছে তাদের জন্য ধ্বংস, যারা অন্যায় করার পর জেনে-বুঝে বারবার করে তাদের জন্যও ধ্বংস"। [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৫]

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু (জাতির) চরিত গত হয়েছে[১], কাজেই তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কি পরিণাম[২]!

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. এগুলো মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও[৩]।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে 'সুনান' বলে কাফের, মুমিন, ভাল-মন্দ যে সমস্ত চরিত চলে গেছে তা বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কাতাদা বলেন, এর অর্থ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অল্প কিছুদিন উপভোগ দিয়েছি, তারপর তাদেরকে জাহান্নামে দিয়ে দিয়েছি। [তাবারী]

(৩) আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের হতাশ না হতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ওহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর কিছুক্ষণের জন্য মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। (দুই) খোদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিলো। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশংকা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলিমগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো ওদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. আর যাতে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি[১]?

এ জাতি অঙ্কুরেই মনোবল হারিয়ে না ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কুরআনের এ বাণীতে বলা হয় যে, 'ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও আল্লাহ্র পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।' উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যতে সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

(১) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কাউকে পরীক্ষা না করে জান্নাতে দিবেন না। তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে তারপর সে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পবিত্র কুরআনে এ কথাটি বারবার ঘোষিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে তোমরা তো তা কামনা করতে[১], এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

পনরতম রুকূ'

১৪৪. আর মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না; আর আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন[২]।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে?" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪] আরও বলেন, "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি?" [আত-তাওবাহ: ১৬] আরও এসেছে "মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ?" [সূরা আল-আনকাবূত:২]

(১) মৃত্যু বা বিপদ কামনা করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাত কামনা করো না; আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাও, তবে যদি তারপরও সাক্ষাত হয়ে যায় তা হলে ধৈর্য ধারন কর এবং জেনে রাখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে'। [বুখারীঃ ২৯৬৬, মুসলিমঃ ১৭৪২]

(২) এ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিওয়া সাল্লাম একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তার পরও মুসলিমদের দ্বীনের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরো বুঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তার মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে-কেরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা- যাতে তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তা

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى الشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু সেটার মেয়াদ সুনির্ধারিত[১]। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমরা তাকে তার কিছু দিয়ে থাকি[২] এবং কেউ আখেরাতের পুরস্কার চাইলে আমরা তাকে তার কিছু দিয়ে থাকি এবং শীঘ্রই আমরা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবো।

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আর বহু নবী ছিলেন, তাদের সাথে বিরাট সংখ্যক (ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) লোক যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্যসত্যই যখন তার মৃত্যু হবে, তখন যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করেই তাদের সান্ত্বনা দেন। [দেখুন, বুখারীঃ ১২৪১, ১২৪২, ৪৪৫৩, ৪৪৫৪]

(১) এ আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারো মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারো মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

(২) এ আয়াত থেকে এটা বুঝার সুযোগ নেই যে, দুনিয়া চাইলেই তাকে তা দেয়া হবে। কারণ, অন্য আয়াতে এটা শর্তসাপেক্ষে দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সে শর্ত হচ্ছে, সেটা দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকতে হবে। যেমন বলা হয়েছে, "কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছে এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি" [সূরা আল-ইসরা: ১৮]

১৪৭. এ কথা ছাড়া তাদের আর কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজের সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করুন, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখেরাতের উত্তম পুরস্কার দান করেন। আর আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।

فَـَٔاتَىٰهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْـَٔاخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

ষোলতম রুকূ'

১৪৯. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. বরং আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّٰصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. অচিরেই আমরা কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব[১], যেহেতু তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি। আর জাহান্নাম তাদের আবাস এবং কত নিকৃষ্ট আবাস যালেমদের।

سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا ۖ وَمَأْوَىٰهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّٰلِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫২. অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমাকে একমাসে অতিক্রম করার মত রাস্তার দূরত্ব থেকে কাফেরদের মনে ভয় ঢুকিয়ে সাহায্য করা হয়েছে'। [বুখারীঃ ৩৩৫, মুসলিমঃ ৫২১, ৫২৩]

الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۚ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু সংখ্যক দুনিয়া চাচ্ছিল(১) এবং কিছু সংখ্যক চাচ্ছিল আখেরাত। তারপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের (তোমাদের শত্রুদের) থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন(২)। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে

---

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আয়াতের এ অংশ নাযিল হবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায়, এটি আমার ধারনাও আসে নি। [মুসনাদে আহমাদ ১/৪৬৩]

(২) বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে পঞ্চাশ জনের এক দল সাহাবীকে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে দিয়ে বললেনঃ যদি তোমরা দেখ যে, পাখি আমাদেরকে ছুঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে তাতেও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করে যাবে না। যতক্ষন না আমি তোমাদেরকে ডেকে পাঠাই। অনুরূপভাবে যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করে দিয়েছি তাতেও তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না যতক্ষণ আমি তোমাদের ডেকে না পাঠাই। তারপর মুসলিমগণ কাফেরদের পরাজিত করল। বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি মহিলাদের চুড়ি, পায়ের গোড়ালি ইত্যাদিও দেখছিলাম, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের সাথীগণ বলতে আরম্ভ করলঃ গনীমতের মাল এসে পড়েছে, তোমাদের সাথীরা কাফেরদের উপর জয়লাভ করেছে, সুতরাং তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি রাসূলের নির্দেশ ভূলে গেছ? তারা বললঃ আমরা মানুষের কাছে গিয়ে গনীমতের মাল জমা করব। একথা বলে তারা স্থান ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। আর এতেই যুদ্ধের পট পরিবর্তিত হয়ে জয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সবাই পালাতে আরম্ভ করল। রাসূলের সাথে মাত্র বার জন লোক ছিল। রাসূল তাদেরকে ডাকতে থাকলেন। এভাবে মুসলিমদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীরা বদরের দিন একশত চল্লিশ জন কাফেরকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিলেন, তাদের সত্তর জন মারা যায় আর বাকী সত্তর জন আহত হয়ে বন্দী হয়। তখন আবু সুফিয়ান তিন বার বললঃ এখানে কি মুহাম্মাদ আছে? সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। তারপর আবু সুফিয়ান

ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

১৫৩. স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের (পাহাড়ের) দিকে ছুটছিলে এবং পিছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন[১], যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

তিন বার বললঃ এখানে কি ইবনে আবি কুহাফা আছে? তারপর আবু সুফিয়ান তিনবার বললঃ এখানে কি ইবনুল খাত্তাব আছে? তারপর সে তার সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললঃ এরা সবাই মারা পড়েছে। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। তিনি বলে বসলেনঃ হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি যাদের কথা বলেছ তারা সবাই জীবিত। আর তোমার যাতে খারাপ লাগে তা অবশ্যই বাকী আছে। তখন আবু সুফিয়ান বলে বসলঃ বদরের দিনের বদলে একটি দিন হলো আজ। আর যুদ্ধে জয়- পরাজয় আছেই। তুমি তোমাদের মৃতদের মাঝে কিছু বিকৃত লাশ দেখতে পাবে। আমি বিকৃত করার নির্দেশ দেইনি। কিন্তু আমার খারাপও লাগেনি। তারপর সে আবৃতি করতে লাগলঃ হুবলের জয় হোক, হুবলের জয় হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি তার জবাব দিবে না? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আমরা কি বলব? তিনি বললেনঃ 'তোমরা বলঃ আল্লাহ্ মহান ও সর্বোচ্চ। তখন আবু সুফিয়ান বললঃ আমাদের 'উয্যা আছে তোমাদের উয্যা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা জবাব দিবে না? সাহাবগণ বললেনঃ কি জবাব দেব? তিনি বললেনঃ বল যে, আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক-সাহায্যকারী, তোমাদের কোন অভিভাবক-সাহায্যকারী নেই। [বুখারীঃ ৩০৩৯, ৩৯৮৬, ৪০৪৩, ৪০৬৭, ৪৫৬১]

(১) কাতাদা বলেন, প্রথম বিপদ হচ্ছে, আহত-নিহত হওয়া। আর দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে, যখন তাদের কাছে খবর পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তখন তারা নিজেদের আহত-নিহত হওয়ার চেয়েও বেশী চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল[১] এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, 'আমাদের কি কোন কিছু করার আছে'? বলুন, 'সব বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে'। যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে সেগুলো গোপন রাখে। তারা বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না[২]।' বলুন, 'যদি তোমরা

(১) অর্থাৎ এ কঠিন বিপদের সময় তাদের উপর তন্দ্রা নেমে এসে তাদেরকে প্রশান্ত করে দিচ্ছিল। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা ওহুদের দিন কাতারবন্দী অবস্থাতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। এমনকি আমাদের হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল আর আমি বারবার তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম।' [বুখারী: ৪৫৬২] আর এটাই আল্লাহ্‌র বাণী "তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল" এর তাৎপর্য। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যুদ্ধের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর সালাতের মধ্যে শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এখানে আরেক দল বলে মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তারা সবচেয়ে ভীতু ও কাপুরুষ ও হক্বের বিপরীতে অবস্থানকারী সম্প্রদায় ছিল। [তাবারী] আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ উহুদের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, আল্লাহ্ আমাদের উপর ঘুম পাঠালেন, আমাদের প্রত্যেকের থুতনি বুকে লেগে যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র শপথ আমি যেন মু'আত্তাব ইবনে কুসাইরের কথা স্বপ্নের মাঝে শুনছিলাম। সে বলছিলঃ 'এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না' এ ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র উপরোক্ত বাণী নাযিল হয়। [আল-আহাদিসুল মুখতারাহঃ ৩/৬০, ৮৬৪]

তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের ফলে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন[১]।

(১) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম নিস্পাপ নন, তাদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তা সত্বেও উম্মতের জন্য তাদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাদের ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ অর্থাৎ "তাদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ১০০, সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২২] -এ মহাসম্মানজনক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোন অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে? সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর বললেনঃ আল্লাহ্ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো নেই। [দেখুন, বুখারী: ৪০৬৬]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, ইতিহাসে যেসব বর্ণনায় তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ

নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

সতেরতম রুকূ'

১৫৬. হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে দেশে সফর করে[১] বা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন

يَآيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ

তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত; যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে যে গুলোতে কম-বেশী করা হয়েছে এবং যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালজ্ঞন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হলো ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারে কটুক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই।' [আল-আকিদাতুল ওয়াসেতিয়্যা]

(১) সুদ্দী বলেন, এখানে দেশে দেশে সফর করা বলে, ব্যবসা করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] অর্থাৎ মুনাফিকদের যখন কোন লোক মারা যেত, তখন তারা বলত: যদি আমাদের কথা শুনতো এবং যুদ্ধে বের না হতো তবে তারা মারা যেতো না। বস্তুত মুনাফিকরা যুদ্ধের আগেই তাদের ভাইদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিত। অন্য আয়াতে এসেছে, "যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদেরকে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না" [সূরা আলে ইমরান: ১৬৮] আরও এসেছে, "যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।"[সূরা আত-তাওবাহ: ৮১] আরও এসেছে, " আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো।' তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে" [সূরা আল-আহযাবঃ ১৮] আরও এসেছে, "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" [সূরা আন-নিসা:৭২]

اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللهُ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরতো না এবং নিহত হত না।' ফলে আল্লাহ্ এটাকেই তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণে পরিণত করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সেসবের সম্যক দ্রষ্টা।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

১৫৭. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হলে অথবা তোমাদের মৃত্যু হলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্যই তার চেয়ে উত্তম।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ

১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে আল্লাহ্‌রই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

১৫৯. আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন[১]; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন[২], তারপর আপনি

---

(১) আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেনঃ 'হে আবু উমামা! মুমিনদের মাঝে কারো কারো জন্য আমার অন্তর নরম হয়ে যায়'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২১৭]

(২) অর্থাৎ ইতোপূর্বে যেমন কাজে-কর্মে এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তাদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, "যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়,

কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন(১); নিশ্চয় আল্লাহ্ (তার

সে আমানতদার"। [ইবন মাজাহ: ৩৭৪৫] অর্থাৎ সে আমানতের সাথে পরামর্শ দিবে, ভুল পথে চালাবে না এবং আমানত হিসেবেই সেটা তার কাছে রাখবে।

এই আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও দ্বীন-প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা পরিহার করা। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোন বিষয় সংঘটিত হলে সে জন্য প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা। তৃতীয়তঃ তাদের পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা। তাদের জন্য দো'আ-প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা। উল্লেখিত আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছেন। একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা আশ্-শূরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলিমদের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, "(যারা সত্যিকার মুসলিম) তাদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে"। এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমনকি আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

(১) উল্লেখিত আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে "পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেমতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন"। এতে নির্দেশ বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প হওয়াকে শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আযামতুম' বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কেরামের সংযুক্ততাও বুঝা যেতে পারত। এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোন কোন সময় উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের অভিমত বেশী শক্তিশালী হত, তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমনসব মনীষী উপস্থিত

উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করুক।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. আর কোন নবী 'গলুল'[১] (অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন) করবে, এটা অসম্ভব। এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কেয়ামতের দিন সে তা সাথে নিয়ে আসবে[২]। তারপর

থাকতেন, যারা ইবন আব্বাসের তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামও অনেক সময় 'শায়খাইন' অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রধান্য দান করেছেন। এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগল যে, উল্লেখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাযিল হয়ে থাকবে। মোটকথাঃ সর্বাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্টের মতই গ্রহণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। বরং এখানে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার কাছাকাছি যা হবে তা-ই হবে গ্রহণযোগ্য।

(১) গলুলের এক অর্থ হয় খেয়ানত করা, জোর করে দখল করে নেয়া। সে হিসেবেই এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্র নিকট বড় গলুল তথা খেয়ানত হল এক বিঘত যমীন নেয়া। তোমরা দু'জন লোককে কোন যমীনের বা ঘরের প্রতিবেশী দেখতে পাবে। তারপর তাদের একজন তার সাথীর অংশের এক বিঘত যমীন কেটে নেয়। যদি কেউ এভাবে যমীন কেটে নেয় সে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সাত যমীন গলায় পেঁচিয়ে থাকবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৪১]

(২) 'গলুল' এর অন্য অর্থ সরকারী সম্পত্তি থেকে কোন কিছু গোপন করা। গনীমতের মালও সরকারী সম্পদ। সুতরাং তা থেকে চুরি করা মহাপাপ। কোন নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতা নেই। আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল

প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না[১]।

হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে। ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্যে থেকে একটি চাদর খোয়া যায়। কোন কোন লোক বলল, হয়ত সেটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে থাকবেন। [তিরমিযীঃ ৩০০৯, আবুদাউদঃ ৩৯৭১] এসব কথা যারা বলত তারা যদি মুনাফেক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়ত মনে করে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে غلول বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চার ভয়াবহতা এবং কেয়ামতের দিন সে জন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ, নবীগণ যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত।

(১) এখানে একটা বিষয় জানা আবশ্যক যে, গনীমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা বা সরকারী সম্পদ থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করা, সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশী পাপের কাজ। কারণ, এ সম্পদের সাথে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনো কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যার্পন করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরি মালের মালিক সাধারণতঃ পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ্ যদি তওবাহ্ করার তাওফীক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোন এক যুদ্ধে এক লোক যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল বন্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হল, 'তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হল। তিনি রহমাতুললিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমস্ত সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করব? কাজেই কেয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়ো। [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৪৮৫৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২১৩, ৬/৪২৮] তাছাড়া গনীমতের মাল বা সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন পাপ হওয়ার আরও একটি কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২. আল্লাহ্ যেটাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ওর মত যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করা বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ “দেখ, কেয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল, এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শাফা‘আত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিস্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহ্‌র যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সবই পৌঁছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না”। [বুখারীঃ ৩০৭৩] মনে রাখা আবশ্যক যে, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ওয়াকফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলিমের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত হাদীয়া বা উপঢৌকণ গলুলের শামিল’। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪২৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইবনুল্লুতুবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ দেন। সে ফিরে এসে বললঃ এগুলো তোমাদের আর এগুলো আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ ‘কি হলো কর্মচারীর তাকে আমরা কোন কাজে পাঠাই পরে সে এসে বলে, এগুলো তোমাদের আর ওগুলো আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতা-মাতার ঘরে বসে দেখে না তার জন্য হাদীয়া আসে কি না? যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলছি, যে কেউ এর থেকে কিছু নিবে কিয়ামতের দিন সেটাই সে তার কাঁধে নিয়ে আসবে’। [বুখারীঃ ৬৯৭৯, মুসলিমঃ ১৮৩২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ ‘হে মানুষ সকল! তোমাদের কাউকে কোন কাজে লাগালে যদি সে আমাদের থেকে কিছু লুকায় তবে সে তা কেয়ামতের দিন সাথে নিয়ে আসবে’ [মুসলিমঃ ১৮৩৩] আবদুল্লাহ ইবন আমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিনিসপত্রের দায়িত্বে এক লোক ছিল, তাকে ‘কারকারাহ’ বলা হতো, হঠাৎ করে সে মারা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তো জাহান্নামে গেছে। লোকেরা তার জিনিসপত্র তল্লাশী করে দেখতে পেল যে, সে একটি জামা চুরি করেছে।” [বুখারীঃ ৩০৭৪]

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আল্লাহ্‌র কাছে তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ সেসব ভালভাবে দেখেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল(১)।

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۗ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. কি ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসলো (ওহুদের যুদ্ধে) তখন তোমরা বললে, 'এটা কোথেকে আসলো?' অথচ তোমরাতো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে (বদরের যুদ্ধে)। বলুন,

---

(১) এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয় সূরা আল-বাক্বারার ১২৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআনুল কারীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নেয়ামত ও মহাঅনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কুরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়াত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ বা 'মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়াত" বলারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হল এই যে, যদিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নেয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কুরআনুল কারীমও সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়াত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়াত ও নেয়ামতের ফল শুধু মুমিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

‘এটা তোমাদের নিজেদেরই[১] কাছ থেকে’[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৬৬. আর যেদিন দু’দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহ্‌রই হুকুমে[৩]; আর যাতে তিনি প্রকাশ করেন, কে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন।

وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭. আর মুনাফেকদের প্রকাশ করার জন্য। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘এস, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।’ তারা বলেছিল, ‘যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।’ সেদিন

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوْا ۗ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

(১) এক হাদীসে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বদরের ঘটনা বর্ণনার পর উহুদের যুদ্ধের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এটার কারণ হলোঃ বদরের যুদ্ধের বন্দীদের থেকে ফিদিয়া নেয়া। [দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদঃ ১/২০৭]

(২) সহীহ আকীদা বিশ্বাস হলো, কোন খারাপের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দিকে করা জায়েয নেই। আল্লাহ্ তা‘আলার দিকে সব সময় ভাল ফলাফলের সম্পর্ক করতে হয়। খারাপ ফলের ব্যহ্যিক কারণ সৃষ্ট জীব। খারাপ তাদেরই অর্জন করা। আর এজন্যই সূরা আল-জ্বিনে আল্লাহ্ তা‘আলা জ্বিনদের কথা উল্লেখ করে বলছেন যে, তারা বলেছিল “আর আমরা জানিনা যমীনের অধিবাসীদের জন্য খারাপ কিছুর ইচ্ছা করা হয়েছে নাকি তাদের প্রভূ তাদের জন্য সঠিক পথ দেয়ার ইচ্ছা করেছেন”। [সূরা জ্বিনঃ ১০] অন্য হাদীসে এসেছে, ‘আর খারাপ কিছু আপনার থেকে হয় না’ [মুসলিমঃ ৭৭১]

(৩) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা অনুমতি দু’প্রকার। এক. ‘ইযনে শার‘য়ী’ বা শরী‘আতগত অনুমোদন বা ইচ্ছা। এ অনুমোদনের সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক কাউকে সালাত আদায় করতে দেয়ার ইচ্ছা, কাউকে হক পথে চলতে দেয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি। এ ধরনের অনুমোদন বা ইচ্ছা সংঘটিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। দুই. ‘ইযনে কাওনী’ বা প্রকৃতিগত অনুমোদন বা ইচ্ছা। এ অনুমোদনের সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নেই। তবে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যেমন এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র অনুমোদন বা ইচ্ছা। [তাফসীরে সা‘দী]

তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা তা মুখে বলে এবং তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা অধিক অবগত।

১৬৮. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের প্রতি বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না। তাদেরকে বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর।'

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۗ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯. আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত[১]।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۗ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ আমরা এ আয়াত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ 'শহীদদের আত্মাকে সবুজ পাখির পেটে রাখা হয়। আরশের সাথে লটকানো ঝাড়বাতির সাথে যেগুলো অবস্থিত। জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা তারা সেখানে বিচরণ করতে পারে। তাদের প্রভু তাদের দিকে একবার তাকিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি কিছু চাও? তারা বললঃ আমাদের আর কি চাহিদা থাকতে পারে? আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারি? এভাবে তিনবার তিনি তাদের তা জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর যখন শহীদগণ বুঝতে পারল যে, তাদেরকে চাইতেই হবে, তখন তারা বললঃ হে রব! আমরা চাই আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক যাতে আমরা আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। তারপর আল্লাহ্ যখন দেখলেন যে, তাদের এর দরকার নেই তখন তাদের এভাবেই ছেড়ে দিলেন। [মুসলিমঃ ১৮৮৭]
অন্য এক হাদীসে এসেছে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত হলে বললেনঃ 'জাবের, তোমার কি হল, তোমার মন খারাপ দেখছি? আমি বললামঃ ওহুদের যুদ্ধে আমার বাবা শহীদ হয়ে গেলেন। তার পরিবার এবং অনেক ঋণ রেখে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাকে কি আমি তোমার বাবার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সাক্ষাত করেছেন সে সুসংবাদ দেব? আমি বললামঃ অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য এবং এজন্য যে আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না(১)।

আঠারতম রুকূ'

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

১৭২. যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে(২)। তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের

সবার সাথে কথা বলেন পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু তোমার বাবাকে আল্লাহ্ জীবিত করে সরাসরি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, "হে আমার বান্দা, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।" তিনি বললেনঃ হে আমার রব, আমাকে জীবিত করে দিন যাতে আমি আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। মহান আল্লাহ্ বললেনঃ "আমার পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত এই যে, এরা দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে যাবে না।" জাবের বলেনঃ তখন এই আয়াত নাযিল হয়।' [তিরমিযীঃ ৩০১০, ইবনে মাজাহ্ঃ ১৯০, ২৮০০] ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে।

(১) আয়াতটির অন্য অনুবাদ হচ্ছে, "তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না"। উভয় অনুবাদই শুদ্ধ। তবে তাবারী উপরোক্ত অনুবাদটি প্রাধান্য দিয়েছেন।

(২) উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেনঃ আমাকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, তোমার পিতা ও আমার পিতা ঐ সমস্ত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা যখমী হওয়ার পরে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। [বুখারীঃ ৪০৭৭] অর্থাৎ যুবাইর ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে[১]।

১৭৩. এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক'[২]!

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

---

(১) এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই যে, মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলিমকে খতম করে দেয়াই উচিৎ ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলিমদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরেকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গত কালকের যুদ্ধে কঠিন ভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। [বুখারীঃ ৪০৭৭]

(২) যখন সাহাবায়ে কিরাম 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন সেখানে নু'আইম ইবনে মাস'উদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না 'আল্লাহ্ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী'। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই আমাদের জন্য উত্তম যিম্মাদার'। এ কথাটি ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. তারপর তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল[১]।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. সে[২] তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي

১৭৬. যারা কুফরীতে দ্রুতগামী, তাদের আচরণ যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। তারা কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি

বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাকে এসে খবর দিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো, তারা বললঃ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম যিম্মাদার। [বুখারীঃ ৪৫৬৩]

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- "এরা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তাদের কোন রকম অনিষ্ট হলো না আর তারা হল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত।" আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তিনটি নেয়ামত প্রদান করলেন। প্রথম নেয়ামত হলো এই যে, কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নেয়ামতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নেয়ামত' শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় নেয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন এবং কাফেরদের ফেলে যাওয়া গণীমতের মাল থেকে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল'। তৃতীয় নেয়ামতটি হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নেয়ামতের ঊর্ধ্বে এবং যা এই জেহাদে তাদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে।

(২) এখানে 'সে' বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি মুমিনদের কাছে এসে বলেছিল যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ জড়ো হয়েছে কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো'। তারা ছিল বনী আব্দুল কায়েসের কিছু লোক। [তাবারী]

الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

করতে পারবে না। আল্লাহ্ আখেরাতে তাদেরকে কোন অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না। আর তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে(১)।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

১৭৮. কাফেরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমরা অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমরা অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়(২)।

(১) এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদিগকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ -বিলাসে যেন মুসলিমরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃতপক্ষে সেসবই ছিল জাহান্নামের অঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে, "কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটি কিস্তি যা আখেরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে"। [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৫]

(২) এ আয়াতে কাফেরদেরকে কেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপের কারণে শাস্তি না দিয়ে অবকাশ দিয়ে থাকেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তাদের এ অবকাশ তাদের জন্য মঙ্গল বা সুখকর নয়। এটা তাদের গোনাহ আরও বর্ধিত করে তাদেরকে ভালভাবে পাকড়াও করার জন্য। অন্য আয়াতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, তাদেরকে এ অবকাশ প্রদানের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরানোর সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরও যারা অবাধ্যতা অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি শক্তহাতে পাকড়াও করেন। আল্লাহ্ বলেন, "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি,

আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ।

১৭৯. অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মুমিনগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না । অনুরূপভাবে গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়; তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন(১) । কাজেই তোমরা

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে । তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি । অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে ।' তারপর হঠাৎ তাদেরকে আমরা পাকড়াও করি, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না" [সূরা আল-আ'রাফ: ৯৪-৯৫] আরও বলেন, "আপনার আগেও আমরা বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; তারপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয় । আমাদের শাস্তি তাদের উপর যখন আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? কিন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল । তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লাসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল" [সূরা আল-আন'আম: ৪২-৪৪] অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, এ অবকাশ প্রদান তাঁর মজবুত কৌশলের অন্তর্গত । আল্লাহ্ বলেন: "আর যারা আমাদের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারবে না । আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮২-১৮৩] আরও বলেন, "অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না । আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ।" [সূরা আল-কালাম: ৪৪-৪৫]

(১) অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেন না । কিন্তু নবী-রাসূলদের যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে কিছু কিছু গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান দান করেন । যাতে তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রচার করতে সমর্থ হন । যেমন, মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলকে কিছু কিছু

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।

১৮০. আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কেয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে[১]। আসমান ও যমীনের সত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

উনিষতম রুকূ'

১৮১. আল্লাহ্ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলে, 'আল্লাহ্ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত'[২]। তারা

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۗءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ

গায়েবী জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তাদের ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন। [আল-মুইয়াসসার] সুতরাং তোমাদের কাজ হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। গায়েবী সংবাদ জানার জন্য বসে থাকা তোমাদের কাজ নয়। যদি প্রকৃত ঈমান ও তাকওয়া তোমাদের অর্জিত হয়, তবে এতেই তোমাদের সাফল্য রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সে ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে। যার মাথায় চুল থাকবে এবং চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সাপটিকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে, সেটি তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলবেঃ আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত অর্থসম্পদ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬৫]

(২) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন

যা বলেছে তা এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমরা লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর(১) ।'

الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

১৮২. এ হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি মোটেই যালেম নন ।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾

কুরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইয়াহূদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর । সে জন্যেই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন । [তাবরী] মূলত: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে সাদকা ও কর্জ শব্দ ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইয়াহূদীদের উক্তিতে বিদ্যমান । কাজেই কুরআনুল কারীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে । শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত্য ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ এবং তার প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায় । অন্যথায় আল্লাহ্র জন্য লেখার কোনই প্রয়োজন নেই । অতঃপর ইয়াহূদীদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি । কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় । [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনের লক্ষ্য হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদীনাবাসী ইয়াহূদীবর্গ । আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হল ইয়াহইয়া ও যাকারিয়্যা আলাইহিমাস্ সালামের সময়ের । সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইয়াহূদীদের উপর আরোপ করা হল কেমন করে? তার কারণ এই যে, মদীনার ইয়াহূদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে । মূলতঃ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত । আয়াতের শেষাংশে এবং পরবর্তী আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে, 'এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়' ।

١٨٣. যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের কাছে এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা আগুন খেয়ে ফেলবে। তাদেরকে বলুন, 'আমার আগে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছ তা সহ তোমাদের কাছে এসেছিলেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?'

الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِى بِالْبَيِّنَٰتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, আপনার আগে যে সব রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানী সহীফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিলেন তাদের প্রতিও তো মিথ্যারোপ করা হয়েছিল।

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَٰبِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেবলমাত্র কেয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম[১]। আর পার্থিব

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

---

(১) পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই যে সফলতা চায় না। এ সফলতা এককেজন এককে দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারণ করে। কেউ দুনিয়ার প্রচুর সম্পদ, নারী, গাড়ী-বাড়ী, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ধারণ করে। কেউ আবার সুস্বাস্থ্যকে নির্ধারণ করে। কেউ আবার অন্যকিছু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সফলতা কিসে তা আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বলে দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেই সফলকাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এক বেত পরিমান জায়গা দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকে উত্তম"। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তিরমিযী: ৩০১৩]

জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়(১)।

১৮৬. তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ(২)।

لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

(১) এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায় হোক- যেমন, সৎকর্মশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে- অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক- যেমন, পাপী মুসলিমদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলিমই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্ত কালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে "দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।" তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখেরাতের সঞ্চয়।

(২) এ আয়াতে মুসলিমদেরকে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে হবে এবং কাফের, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের কটুক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল তাদের কর্তব্য। উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধায় চড়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে সা'দ ইবনে উবাদাকে দেখতে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো সে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

১৮৭. স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' এরপরও তারা তা তাদের পেছনে ফেলে রাখে (অগ্রাহ্য করে) ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে; কাজেই তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে[১], তারা শাস্তি থেকে মুক্তি

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। এমতাবস্থায় সে তার নাকে কাপড় দিয়ে বলল, আমাদেরকে আমাদের বৈঠকখানায় কষ্ট দিও না। যে তোমার কাছে যায় তাকে তোমার কথা শোনাও। এতে মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কষ্টে তাদের ঝগড়া থামিয়ে সা'দ ইবনে উবাদার কাছে গিয়ে ঘটনাটা জানালেন। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ আপনাকে সত্যদ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ লোকগুলো আপনার আসার পূর্বেই ঐ লোকটাকে নেতা বানাতে চেয়েছিল। আপনার আগমনের পর সে কিছু না পাওয়াতে তার মানসিক অবস্থা খারাপ হওয়াতে সে এসব কথা বলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীরা কাফেরদেরকে এমনিতেও ক্ষমা করে দিতেন। এভাবে তাদের কষ্ট সহ্য করে তিনি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। [বুখারীঃ ৪৫৬৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদনামী করে বেড়াত এবং কবিতার মাধ্যমে কাফেরদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী করে তুলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের লোক পেলেন। তাদের সাথে তিনি একটি সন্ধিতে আসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুশরিক ও ইয়াহূদীরা তাঁকে এবং সাহাবাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। তখন এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দিলেন। [আবু দাউদঃ ৩০০০]

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

পাবে- এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। আর তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

১৮৯. আর আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌রই; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿١٨٩﴾

বিশতম রুকূ'

১৯০. আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে[১], রাত ও দিনের পরিবর্তনে[২] নিদর্শনাবলী

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু মুনাফেক তাঁর সাথে যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছপা হত। এতে তারা নিজেদের মধ্যে আনন্দবোধ করত। তারপর যখন রাসূল ফিরে আসতেন, তখন তাঁর কাছে ওযর পেশ করত এবং অন্যান্যভাবে নিজেদের প্রশংসা শুনতে চাইত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬৭; মুসলিমঃ ২৭৭৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মারওয়ান ইবনে হাকাম তার দারওয়ানকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে পাঠিয়ে বললেনঃ যদি কোন লোক কোন কাজ না করেও প্রশংসা পেতে ভালবাসার কারণে শাস্তিযোগ্য হয়, তাহলে আমরা সবাইতো শাস্তি পাব। তখন ইবনে আব্বাস বললেনঃ তোমার আর এ আয়াতের মধ্যে কি সম্পর্ক? এ আয়াতের ঘটনা হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদী আলেমদেরকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার কারণে তারা সঠিক জবাব গোপন করে ভিন্ন জবাব দিয়ে রাসূলের প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করল। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৫৬৮; মুসলিমঃ ২৭৭৮]

(১) অর্থাৎ আসমান এবং যমীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

(২) চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন। আয়াতে উল্লেখিত اختلاف শব্দটি আরবী পরিভাষায়, 'পরে আসা' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেমতে বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন। আবার اختلاف শব্দ দ্বারা কম-বেশীও বুঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্রি হয় দীর্ঘ এবং দিন হয় খাটো, গরমকালে দিন বড় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘ্যেও তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দুরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ হয়। এসব বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরাতের অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

রয়েছে[১] বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি[২],

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

(১) آية এর বহুবচন হল آيات। শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা- মু'জিযাকে 'আয়াত' বলা হয়। অনুরূপভাবে, কুরআনের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয়। তৃতীয় অর্থে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(২) সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর মাহাত্ম্য ও কুদরাত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদাত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। উল্লেখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক সহজেই বুঝে যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে এ চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে। এটাই হল তাদের জীবনের লক্ষ্য। সুতরাং গোটা বিশ্ব-সৃষ্টি নিরর্থক নয় বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অসীম কুদরাত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উবাইদ ইবনে উমাইর বলেনঃ আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললাম, রাসূলের সবচেয়ে আশ্চর্য কি কাজ আপনি দেখেছেন, তা আমাদেরকে জানান। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা, আমাকে আমার রবের ইবাদাত করতে দাও।' আমি বললাম, 'হে রাসূল, আমি আপনার পাশে থাকতে ভালবাসি এবং যা আপনাকে খুশি করে তা করতে ভালবাসি।' তারপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন এবং সালাত আদায়ে নিবিষ্ট হলেন ও কাঁদতে থাকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? এ রাতে

আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন ।'

১৯২. 'হে আমাদের রব! আপনি কাউকেও আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হেয় করলেন এবং যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই ।'

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ١٩٢

১৯৩. 'হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন ।' কাজেই আমরা ঈমান এনেছি । হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন(১) ।

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣

১৯৪. 'হে আমাদের রব! আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ١٩٤

আমার উপর একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি তা তেলাওয়াত করল এবং চিন্তা-গবেষণা করল না, তার ধ্বংস অনিবার্য । তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন । [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৬২০]

(১) কাতাদা বলেন, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে আহ্বান শুনতে পেয়েছে তাতে তারা সুন্দরভাবে সাড়া দিয়েছে এবং এর উপর ধৈর্য ধারণ করেছে । আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ঈমানদার মানুষরা যখন আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে তাতে সাড়া দিয়েছে তখন তাদের কথা কি ছিল তা বর্ণনা করেছেন । পক্ষান্তরে ঈমানদার জিনরা আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে সে আহ্বানে যে কথা দিয়ে সাড়া দিয়েছে তা সূরা আল-জিন এ বর্ণনা করেছেন । সেখানে এসেছে, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যে সঠিক পথের দিশা দেয়, ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি । আর আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না ।" [সূরা জিন: ১-২] সাড়ার ব্যাপারে তাদের কোন পার্থক্য না থাকলেও কথার মধ্যে পার্থক্য ছিল । [তাবারী]

এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।'

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তারপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আমলকারী কোন নর বা নারীর আমল বিফল করি না[১]; তোমরা একে অপরের অংশ। কাজেই যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপ কাজগুলো অবশ্যই দূর করব[২] এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে।

---

(১) উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের হিজরত সম্পর্কে কোন কিছু বলেন না কেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩০০]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি গাফলতী ও পাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ঋণ বা ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বান্দার হক থেকে ক্ষমা পাওয়ার নিয়ম হল স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার উত্তরাধিকারীকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাযী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

১৯৭. এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আতিথেয়তা; আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য উত্তম।

لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. আর নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনে। তারা আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। তারাই, যাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী[১]।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خٰشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

২০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর[২], ধৈর্যে প্রতিযোগিতা

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

---

(১) আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজ্জাসীর মৃত্যুর খবর ঘোষিত হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তার উপর সালাত আদায় কর। তারা বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কি এ লোকটির উপর সালাত আদায় করব? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ২০৩৮]

(২) এ আয়াতটিতে মুসলিমগণকে চারটি বিষয়ে নসীহত করা হয়েছে- (১) সবর, (২) মুসাবারাহ্ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, -যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত। তন্মধ্যে 'সবর' এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা দেয়া। আর কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় এর অর্থ নফ্‌সকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে- (এক) 'সবর আলাত্বা'আত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

কর[১] এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক[২], আর আল্লাহ্‌র

ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (দুই) 'সবর 'আনিল মা'আসী' অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা। (তিন) 'সবর 'আলাল-মাসায়েব' অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিস্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা। [ইবনুল কাইয়্যেম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী; মাদারিজুস সালেকীন]

(১) 'মুসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। অথবা পরস্পর ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা।

(২) 'মুরাবাতাহ' অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

১) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়। এটিই 'রিবাত' ও 'মুরাবাতাহ' এর বিখ্যাত অর্থ। এর দু'টি রূপ হতে পারেঃ প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষাবাদ করে রুযী-রোজগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোজগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মুরাবিত ফী-সাবিলিল্লাহ্' হবে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এতদুভয় অবস্থায় 'রিবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। এক হাদীসে সাহ্ল ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'আল্লাহ্‌র পথে এক দিনের 'রিবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম। [বুখারীঃ ২৭৯৪, মুসলিমঃ ১৮৮১] অপর এক হাদীসে রয়েছে যে,

তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'একদিন ও একরাতের 'রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের সিয়াম এবং সমগ্র রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষা উত্তম । যদি এমতাবস্থায় কারো মৃত্যু হয়, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে । আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার রিয্ক জারী থাকবে এবং সে কবরের ফেতনা বা পরীক্ষা (প্রশ্নোত্তর) থেকে নিরাপত্তা পাবে । [মুসলিমঃ ১৯১৩]

ফুদালাহ্ ইবনে উবায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মুরাবিত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া । অর্থাৎ তার কাজ কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের হিসাব-নিকাশ থেকে নিরাপদ থাকবে । [আবু দাউদঃ ২৫০০]

এসব বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম । কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াক্ফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে । যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না । কারণ, সমস্ত মুসলিম সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে । ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলিমদের সৎকাজের কারণ হয় । সে কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত তার 'রিবাত' কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে । তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করত, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে ।

২) কুরআন ও হাদীসে 'রিবাত' দ্বিতীয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে খুবই যত্নবান হওয়া এবং এক সালাতের পরই দ্বিতীয় সালাতের জন্য অপেক্ষামান থাকা । এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের সংবাদ দিব না, যা করলে তোমাদের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই । তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টকর স্থান বা সময়ে অযুর পানি সঠিকভাবে পৌঁছানো, মসজিদের প্রতি বেশী বেশী পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পরে অপর সালাতের অপেক্ষায় থাকা । আর এটিই হচ্ছে, রিবাত ।" [মুসলিম: ২৫১]

বাস্তবে উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । প্রথম অর্থটি মানব শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ । আর দ্বিতীয় অর্থটি জিন শয়তানদের বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্র । সুতরাং আয়াতে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে ।

৪- সূরা আন-নিসা

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১৭৬।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির ফযিলতঃ সূরার ফযিলত সম্পর্কে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ প্রথম সাতটি সূরা গ্রহণ করবে সে আলেম হিসেবে গণ্য হবে"। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৮৫, ৬/৯৬] তাছাড়া আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে সূরা আলে ইমরান পড়বে সে অমুখাপেক্ষী হবে, আর সূরা আন-নিসা হচ্ছে সৌন্দর্যপূর্ণ।" [সুনান দারেমীঃ ৩৩৯৫]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। **রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে** ।।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর[১] যিনি

---

(১) সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন- অনাথ ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হক্কুল-'ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে। কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পারিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্-ভীতি এবং আখেরাতের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া'। বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খোত্বায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করা সুন্নাত। তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ এমন এক সত্তার

مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهٖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর[২] এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্

বিরুদ্ধাচারণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যাঁর রুবুবিয়্যাত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

(১) এখানে দু'টি মত রয়েছে, (এক) তার থেকে অর্থাৎ তারই সমপর্যায়ের করে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। (দুই) তার শরীর থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এ মতের সপক্ষে হাদীসের কিছু উক্তি পাওয়া যায়, যাতে বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে বাঁকা হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৩৩৩১, মুসলিমঃ ১৪৬৮]

(২) বলা হয়েছে যে, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক সে মহান সত্ত্বার তাকওয়া অবলম্বন কর। আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে - তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক - তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক এবং তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

(৩) আলোচ্য আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ। এ অর্থটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। [তাবারী] আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে পরস্পর কোন কিছু চেয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা সাধারণত বলে থাক যে, আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে কোন কিছু তোমার কাছে চাই। সুতরাং দু' কারণেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। এ অর্থটি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রাহেম'। যার অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে-রাহ্‌মী' বলা

তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক[১]।

২. আর ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো[২] এবং

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ

হয়। আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্ব'য়ে-রাহ্মী'। হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। [বুখারীঃ ২০৬৭; মুসলিমঃ ২৫৫৭] অন্য হাদীসে 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা'হল এইঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং রাতের বেলায় সালাতে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'। [মুসনাদে আহমাদ: ৫৪৫১; ইবন মাজাহ্: ৩২৫১] অন্য হাদীসে এসেছে, 'উম্মুল-মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এক বাঁদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাঁদিটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পূণ্য লাভ করতে পারতে'। [বুখারীঃ ২৫৯৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ 'কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু কোন নিকট আত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদ্কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পূণ্য লাভ করা যায়'। [বুখারীঃ ১৪৬৬, মুসলিমঃ ১০০০]

(১) এখানে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী।' আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোক লজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে এর কোন মূল্য নেই।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী 'ইয়াতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে- নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররাতুন-ইয়াতীমাতুন' বা 'নিঃসঙ্গ মুক্তা' বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়। ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না[১]। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় এটা মহাপাপ[২]।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ

৩. আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি[৩] সুবিচার

'বালেগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না।' [আবু দাউদঃ ২৮৭৩] ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন; তার উপরই ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন শর্তারোপ করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ৬ নং আয়াতে এ সম্পদ তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করার জন্য দু'টি শর্ত দিয়েছে। এক. ইয়াতীম বালেগ হতে হবে, দুই. ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। দুটো বিষয় তাদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফেরৎ দেয়া উচিত। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ তোমরা হালালকে হারামের সাথে মিশিয়ে ফেলো না। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এ সূরারই ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেটা ঘোষণা করে বলেছেন, "যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মত তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েদেরকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا

করতে পারবে না[১], তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার[২]; আর যদি

(১) জাহেলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধিনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকত আর তারা যদি সুন্দরী হত এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মাহ্‌র দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঠিক এ ধরণের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। 'জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মাহ্‌র' আদায় তো করলই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়'। [বুখারীঃ ৪৫৭৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখনকার দিনে কারও কাছে কোন ইয়াতীম থাকলে এবং তার সম্পদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলে সে তাকে বিয়ে করতে চাইত। তবে তাকে অন্যদের সমান মাহ্‌র দিতে চাইত না। তাই তাদের মাহ্‌র পূর্ণ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের না দিয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করার ইচ্ছা থাকলে তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য মহিলাদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারী: ৪৫৭৪] তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নারীদের বেলায় ইনসাফ বিধান করা লাগবে না। বরং অন্যান্য নারীদের বেলায়ও তা করতে হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) বহু-বিবাহ প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। বর্তমান যুগে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি

فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى

আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না[১] তবে একজনকেই বা তোমাদের

আরোপ করে তার ঊর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে কারও কারও দশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকত। ইসলাম এটাকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কায়েস ইবন হারেস বলেন, 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার স্ত্রী সংখ্যা ছিল আট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, 'এর মধ্য থেকে চারটি গ্রহণ করে নাও'। [ইবন মাজাহ: ১৯৫২, ১৯৫৩]

(১) পবিত্র কুরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরী'আত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে'। [আবু দাউদঃ ২১৩৩, তিরমিযীঃ ১১৪১, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৬৯, আহ্মাদঃ ২/৪৭১]

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। সূরা আন-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে "তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না" এ দু'আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে, এখানে মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্ব নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। যদি আমরা এ

ٱلَّا تَعُولُوا۟ ۝ অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব[১] না করার সম্ভাবনা বেশী।

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ

৪. আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্‌র[২] মনের সন্তোষের সাথে[৩]

আয়াতের শানে-নুযূলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলছেন, একটি ইয়াতীম মেয়ে এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল। লোকটি সে ইয়াতীম মেয়েটির সাথে সম্পদে অংশীদারও ছিল। সে তাকে তার সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য ভালবাসত। কিন্তু সে তাকে ইনসাফপূর্ণ মাহ্‌র দিতে রাযী হচ্ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে মাহ্‌র দানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেন। ইয়াতীম হলেই তার মাহ্‌র কম হয়ে যাবে, এমনটি যেন না হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করা হয়। [বুখারীঃ ২৪৯৪, ৪৫৭৪, ৫০৯২, মুসলিমঃ ৩০১৮]

(১) এতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنَىٰ এটি دُنُوٌّ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ ﴿أَلَّا تَعُولُوا۟﴾ যা عال শব্দ হতে উৎপন্ন, অর্থ ঝুঁকে পড়া। এখানে শব্দটি অসংগতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হল যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশংকা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরী'আতসম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; -এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে। تَعُولُوا শব্দের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে মিসকীন হয়ে যাওয়া। এর সপক্ষে সূরা আত-তাওবার ২৮ নং আয়াতে ﴿عَيْلَةً﴾ শব্দটি এসেছে। সেখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে দারিদ্রতা। ইমাম শাফে'য়ী বলেন, এর অর্থ, যাতে তোমাদের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ইসলামপূর্ব যুগে স্ত্রীর প্রাপ্য মাহ্‌র তার হাতে পৌছতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করত। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছেঃ ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ﴾ এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মাহ্‌র তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মাহ্‌র আদায় হলে যার প্রাপ্য তার হাতেই যেন অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

(৩) স্ত্রীর মাহ্‌র পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হত। প্রথমতঃ মাহ্‌র পরিশোধ করতে হলে মনে করা হত যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই ﴿نِحْلَةً﴾ শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ

لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

প্রদান কর; অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মাহ্‌রের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে(১) ভোগ কর।

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে ﴿نِحْلَةً﴾ বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়। মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাহ্‌র অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মাহ্‌রের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ কোন এক মহিলাকে এক 'নাওয়া' (পাঁচ দিরহাম পরিমাণ) মাহ্‌র দিয়ে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুশী দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে এক নাওয়া পরিমাণ মাহ্‌র দিয়ে বিয়ে করেছি। [বুখারী: ৫১৪৮]

(১) অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মাহ্‌র মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মাহ্‌রের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরণের যুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাহ্‌রের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।" অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মাহ্‌রের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তোমাদের পক্ষে তা ভোগ করা জায়েয হবে। এ ধরণের বহু নির্যাতনমূলক পন্থা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব যুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজো মুসলিম সমাজে মাহ্‌র সম্পর্কিত এ ধরণের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আয়াতে 'হৃষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মাহ্‌র স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে শরী'য়তের মূলনীতিরূপে এরশাদ করেছেনঃ 'কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪২৩] এ হাদীসটি এমন একটা মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

৫. আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদেরকে তাদের ধন-সম্পদ অর্পণ করো না[১]; যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের জীবন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং তা থেকে তাদের আহার-বিহার ও ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা কর। আর তোমরা তাদের সাথে সদালাপ কর।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

৬. আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে[২]

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ

(১) এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্পদের হেফাযতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ক্রটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন যে, কুরআনুল কারীমের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়। [তাবারী] উপরোক্ত ব্যাখ্যা মতে, এমন সবার হাতেই সম্পদ অর্পন করা যাবে না যাদের হাতে পড়ে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। [তাবারী] মোটকথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ'। [বুখারীঃ ২৪৮০, মুসলিমঃ ১৪১] অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে।

(২) আয়াতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের পর্যায়ে পৌঁছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা

آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا
اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ
فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে[1] তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও[2]। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে[3]। অতঃপর তোমরা যখন

দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার ও লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন।

(১) এ বাক্য দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনা'র সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিক্‌হবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়-সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

(২) অর্থাৎ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

(৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন 'আস বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার কোন সম্পদ নেই। আমার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম আছে, তার সম্পদ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে তুমি খেতে পার, অপব্যয় ও অপচয় না করে, তার সম্পদকে তোমার সাথে না মিশিয়ে এবং তার সম্পদের বিনিময়ে তোমার সম্পদের হেফাজত না করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৮৬, ২১৫,

তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

৭. পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ[১]।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

৮. আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে[২]।

২১৬, আবু দাউদঃ ২৮৭২] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যদি কেউ ফকীর হয়, সে ইয়াতীমের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তা থেকে খেতে পারবে। [বুখারী: ৪৫৭৫; মুসলিম: ৩০১৯]

(১) এ আয়াতে কি পরিমাণ অংশ তারা পাবে তা বর্ণনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ১১ নং আয়াত থেকে কয়েকটি আয়াত এবং এ সূরারই সর্বশেষ আয়াতে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াত মুহকাম, এ আয়াত রহিত হয় নি। অর্থাৎ এর উপর আমল করতে হবে। [বুখারী: ৪৫৭৬] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনগণকে তাদের মীরাস বন্টনের সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান এবং মিসকীনদের জন্য যদি মৃত ব্যক্তির কোন অসীয়ত থেকে থাকে, তবে সে অসীয়ত থেকে প্রদান করতে হবে। আর যদি অসীয়ত না থাকে, তবে তাদেরকে মীরাস থেকে কিছু পৌঁছাতে হবে। [তাবারী] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীরাস বন্টনের সময় -আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও জীবিত- আব্দুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহ ঘরে ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তার পিতার মীরাস থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, এ হিসেবে যে, এখানে ﴿الْقِسْمَةَ﴾ শব্দের অর্থ, বন্টন। তারপর সেটা ইবন আব্বাসকে

৯. আর তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই তারা যেন আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সঙ্গত কথা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ⑨

১০. নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে(১)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ⑩

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন(২): এক

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, ঠিক করে নি। কারণ এটা অসীয়ত করার প্রতি নির্দেশ। এ আয়াতটিতে অসীয়তের কথাই বলা হয়েছে। যখন মাইয়্যেত তার সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে চাইবে সে যেন্ নিঃস্ব, ইয়াতীম স্বজনদের না ভুলে সে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটি মৃত্যুর আগেই সম্পদের মালিকের করণীয় নির্দেশ করছে।

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কি? রাসূল বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণ সংহার করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং মুমিনা পবিত্রা নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।' [বুখারী: ২৭৬৬] সুতরাং ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করার শাস্তি কুরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারাই প্রমাণিত।

(২) ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হত না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর সব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহন করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের

পুত্রের[১] অংশ দুই কন্যার অংশের | الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু মাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। [রুহুল মা'আনী] বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিশ হতে পারত। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিশ বলে গণ্য হত না, প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একটি ঘটনা সংঘটিত হল, সা'দ ইবন রবী' রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ দু'টি সা'দ ইবন রবী'র কন্যা। তাদের বাবা আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। আর তাদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে গেল। তাদের জন্য কোন সম্পদই বাকী রাখল না, অথচ সম্পদ না হলে তাদের বিয়েও হয় না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্ এর ফয়সালা করবেন। ফলে মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চাচার কাছে লোক পাঠান এবং বলেনঃ তুমি সা'দ-এর কন্যাদ্বয়কে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ এবং তাদের মা-কে এক-অষ্টমাংশ দিয়ে দাও। আর যা বাকী থাকবে তা তোমার। [আবু দাউদঃ ২৮৯১, ২৮৯২, তিরমিযীঃ ২০৯২. ইবন মাজাহ্ঃ ২৭২০, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৫২]

জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমি অসুস্থ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলাম, তিনি আমার উপর তার ওযুর পানি ছিটিয়ে দিলে আমি চেতনা ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, মীরাস কার জন্য? আমার তো কেবল 'কালালা'ই ওয়ারিশ হবে। অর্থাৎ আমার পিতৃকুলের কেউ বা সন্তান-সন্ততি নেই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ১৯৪, ৪৫৭৭, মুসলিমঃ ১৬১৬] অন্য এক বর্ণনায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ তখনকার সময়ে সম্পদ শুধু ছেলেকেই দেয়া হত আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়ত করার নিয়ম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিবর্তন করে যা তিনি পছন্দ করেন তা নাযিল করেন এবং ছেলেকে দুই মেয়ের অংশ দেন আর পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ও তিন ভাগের এক নির্ধারণ করেন। স্ত্রীর জন্য আট ভাগের এক ও চার ভাগের এক নির্দিষ্ট করেন। স্বামীকে অর্ধেক অথবা চার ভাগের এক অংশ দেন। [বুখারীঃ ৪৫৭৮]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নির্ধারিত ফরয অংশসমূহ দেয়ার পর সবচেয়ে কাছের পুরুষ লোককে প্রদান করবে' [মুসলিম: ১৬১৫] তাই পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও أَقْرَبُونَ এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিশ হতে পারে না। কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। কুরআনে উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটির

مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

সমান; কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশী থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক(১)। তার সন্তান

অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। তার অভাব দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এ প্রশ্নে প্রাশ্চাত্যভক্ত নবশিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এ কথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না, তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মারা যাক। এখন কুরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্য লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কুরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয়ের মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ "যেসব দূরবর্তী, ইয়াতীম, মিসকীন পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়া। এটা তাদের জন্য এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ"। [সূরা আন-নিসাঃ ৮] তাছাড়া ইসলাম অসীয়ত করার একটি দায়িত্ব মানুষকে দিয়েছে। দাদা যখনই তার নাতিকে বঞ্চিত দেখবে, তখন তার উচিত হবে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তার জন্য অসিয়ত করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কারণ, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত নেই সুতরাং অসিয়তের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে, নিকটাত্মীয় অথচ কোন কারণে ওয়ারিশ হচ্ছে না, এমন লোকদের জন্য তা গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা। এ রকম অবস্থায় অসিয়ত করা কোন কোন আলেমের নিকট ওয়াজিব।

(১) কুরআনুল কারীম কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ 'দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ' বলার পরিবর্তে 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনেরা এ কথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি। এরূপ ক্ষমা শরী'য়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিশী স্বত্ব আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর গোনাহ্গার। তাদের মধ্যে আবার নাবালেগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেয়া দ্বিগুণ গোনাহ্। এক গোনাহ্ শরী'য়তসম্মত ওয়ারিশের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গোনাহ্ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার। এরপর আরো ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু

الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑪

থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ; তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ[১]; এ সবই সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর[২]। তোমাদের

একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমূখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশী হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

(১) কাতাদা বলেন, সন্তানরা মাকে এক তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক ষষ্টাংশে নিয়ে এসেছে, অথচ তারা নিজেরা ওয়ারিশ হয় নি। যদি একজন মাত্র সন্তান থাকে তবে সে তার মায়ের অংশ কমাবে না। কেবল একের অধিক হলেই কমাবে। আলেমগণ বলেন, মায়ের অংশ কমানোর কারণ হচ্ছে, মায়ের উপর তাদের বিয়ে বা খরচের দায়িত্ব পড়ে না। তাদের বিয়ে ও খরচ-পাতির দায়িত্ব তাদের বাপের উপর। তাই তাদের মায়ের অংশ কমানো যথার্থ হয়েছে। [তাবারী; ইবনে কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এখানে শরী'আতের নীতি হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরী'আত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওসিয়ত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওসিয়ত করে থাকলে এবং তা গোনাহ্র ওসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওসিয়ত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত কার্যকর হবে না। মোটকথা ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরী'আতসম্মত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। ওসিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] বন্টনের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, মিকদাম ইবন মা'দীকারব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সবচেয়ে নিকটতমের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর পরের নিকটতম ব্যক্তি। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩১]

পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না[১]। এ বিধান আল্লাহ্‌র; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ; তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর[২]।

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের পিতা ও সন্তানের মধ্যে কার দ্বারা তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে, তা বলতে পার না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র বেশী অনুগত, সে কিয়ামতের দিন বেশী উঁচু স্তরে অবস্থান করবে; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। [তাবারী]

(২) উপরোক্ত বর্ণনায় স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে। মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক - পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্যান্য ওয়ারিশরা পাবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঋণ পরিশোধ ও

আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর 'কালালাহ্[১]' বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশী হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে; এটা যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি না করে[২]। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশে অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মাহ্‌র পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মাহ্‌র পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মোহারানা দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মাহ্‌র পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মাহ্‌র বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিশই অংশ পাবে না।

(১) আলোচ্য আয়াতে 'কালালাহ্'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। 'কালালাহ্'র অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই 'কালালাহ্'। [তাবারী]

(২) 'কারো ক্ষতি না করে' এ কথার দু'টি দিক আছে। প্রথমত, মৃত ব্যক্তি যেন ওসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। ওসিয়ত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত না রাখে। এ রকমের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ। দ্বিতীয়ত, যারা কালালাহ জনিত ওয়ারিশ তারাও যেন মৃত ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অসিয়ত কার্যকরণে কোন প্রকার বাধা না দেয়। ইবন আব্বাস বলেন, ওসিয়্যতে ক্ষতিগ্রস্ত করা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। [তাবারী]

تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

১৩. এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৪. আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে[১]।

তৃতীয় রুকূ'

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে[২]। যদি তারা সাক্ষ্য

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা তথা ওয়ারিশী নীতির ব্যাপারে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা লজ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কেননা সে আল্লাহ্‌র হুকুমকে পরিবর্তন করেছে, আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতা করেছে। তখনই কেউ এরূপ করতে পারে যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তাকে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা দ্বারা শাস্তি দিবেন।

(২) এখানে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। বলা হয়েছে, যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণী থেকে হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরী'আত দু'রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে - নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য

يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ⑮

দেয় তবে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন(১)।

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ⑯

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। যদি তারা তাওবাহ্ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে তাদের থেকে বিরত থাকবে(২)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তাওবাহ্ কবুলকারী, পরম দয়ালু।

নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকামী লোকেরা শত্রুতাবশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চার জনের কম পুরুষ ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদী ও সাক্ষীরা সবাই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং একজন মুসলিমের চরিত্রে কলংক আরোপ করার দায়ে তাদেরকে 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তখনকার দিনে কোন মহিলা ব্যভিচার করলে, সে আমৃত্যু ঘরে বন্দী জীবন যাপন করত। [তাবারী] তিনি আরও বলেন, এখানে যে ব্যবস্থার ওয়াদা করেছেন সূরা আন-নূরে আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যবস্থা করেছেন। তিনি অবিবাহিতদের জন্য বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতদের জন্য পাথরের আঘাতে নিহত করা দ্বারা এ আয়াতকে রহিত করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে সুস্পষ্টভাবে তার নির্দেশ এসেছে। [দেখুন- মুসলিমঃ ১৬৯০, আবু দাউদঃ ৪৪১৫, তিরমিযীঃ ১৪৩৪, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩১৮]

(২) ইবন আব্বাস বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেউ ব্যভিচার করলে, তাকে তা'যীর বা অনির্ধারিত শাস্তি দেয়া হত। তাকে জুতো মারা হতো। পরবর্তীতে নাযিল হলো, 'ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের উভয়কে একশত বেত্রাঘাত কর' [সূরা আন-নূর:২] কিন্তু যদি তারা বিবাহিত হয়, তবে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুসারে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতে বর্ণিত ব্যবস্থা। [তাবারী]

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰٓئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবাহ্ কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশতঃ[১] মন্দ কাজ করে এবং তাড়াতাড়ি তাওবাহ্ করে, এরাই তারা, যাদের তাওবাহ্ আল্লাহ্ কবুল করেন[২]। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(১) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনুল কারীমে ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তাওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তাওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে আয়াতের ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্র কাজটি যে গোনাহ্, তা জানে না কিংবা গোনাহ্র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্র অশুভ পরিণাম ও আখেরাতের আযাবের ব্যাপারে গাফেল বা অসতর্কতাই তার গোনাহ্র কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহ্টি যে গোনাহ্, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে। তাই جهالة শব্দটি এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবুল আলিয়া ও কাতাদাহ্র বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, 'বান্দা যে গোনাহ্ করে- অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা'। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই হয়ে যায়'। ইকরিমা বলেন, দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহ্র আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে। মোটকথা, গোনাহ্র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ্ করে, শর্তসাপেক্ষে তার তাওবাও কবুল হতে পারে। তাছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, তারা গোনাহ করার সময় এর পরিণাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না। অথবা সে অপরাধ করার সময় আল্লাহ্ যে তাকে দেখছেন সে ব্যাপারে বেখবর হয়ে পড়ে। অথবা সে যখন অপরাধ করে তখন যে তার ঈমানের মধ্যে দূর্বলতা আসবে সে সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়ে। [তাফসীরে সা'দী]

(২) এখানে তাড়াতাড়ি তাওবাহ্ করা শর্তের অর্থ হলো দু'টি- (এক) মৃত্যুর বড় শ্বাস বের না হওয়ার আগ পর্যন্ত করা। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭, ইবন মাজাহ্ঃ ৪২৫৩] (দুই) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত করা। [দেখুন, সূরা আল-আন'আম: ১৫৮]

১৮. তাওবাহ্ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ্ করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমরা কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি[১]।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

১৯. হে ঈমানদারগণ! যবরদস্তি করে[২]

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ

(১) ইবন আব্বাস বলেন, এ আয়াত এবং ৪৮ নং আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফের অবস্থায় যারা মারা যাবে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। পক্ষান্তরে যাদের তাওহীদ ঠিক আছে তাদেরকে তিনি তাঁর ইচ্ছার উপর রেখেছেন। তাদেরকে তিনি ক্ষমা থেকে নিরাশ করেন নি। [তাবারী]

(২) ইসলামপূর্ব যুগে পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিশ ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, তারা সেগুলো হজম করে ফেলতো। যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত; যাতে সে এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়। কোন কোন সময় স্ত্রীর কোন দোষ না থাকলেও তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করতো না। আবার তালাক দিয়েও তাকে মুক্ত করত না। তালাক দিলেও অন্যত্র বিয়ে দিত না। যাতে তার মাহ্‌রের টাকা বাইরে না যায়। ইসলাম এসব কিছুর মুলোৎপাটন করে দিয়েছে। এ আয়াত সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনায় তা স্পষ্ট। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইসলামপূর্বযুগে কোন লোক মারা গেলে তার অভিভাবকরা তার স্ত্রীর অধিকারী হয়ে যেত। সে ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্যের নিকট বিয়ে দিয়ে দিত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৫৭৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, কায়েস ইবন সালত এর পিতা মারা গেলে তার ছেলে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাইল। জাহেলিয়াতে যা তাদের অভ্যাস ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ১১৫]

كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⑲

নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে(১)। আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে(২); তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ(৩)।

---

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে স্পষ্ট খারাপ আচরণ বলতে, স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীর সাথে শত্রুতা বোঝানো হয়েছে। যে মহিলা স্বামীর অবাধ্য সে মহিলা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য পুরুষটি তাকে দেয়া সম্পদ ফেরৎ নিতে পারবে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে। কথায়, কাজে, চলাফেরায় যতটুকু সম্ভব সৌন্দর্য রক্ষা করবে। যেমনটি তুমি তাদের কাছ থেকে আশা কর, তেমন ব্যবহারই করো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম। [তিরমিযীঃ ৩৮৯৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটা ছিল যে, তিনি সদাহাস্য সুন্দর ব্যবহার করতেন। পরিবারের সাথে হাস্যরস, নরম ব্যবহার ইত্যাদি করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে কখনো কখনো দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। [দেখুন- আবু দাউদঃ ২৫৭৮, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১২৯]

(৩) অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, ধৈর্যধারণ করে তাদের সাথে জীবনযাপন করলে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক ভাল কিছু এর বিনিময়ে রেখেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ এর অর্থ হল স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে, তারপর তাদের মধ্যে আল্লাহ্ সন্তান দান করবেন যে সন্তান তাদের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিয়ে আসবেন বা স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য ভালবাসা তৈরী করে দিবেন। [তাবারী] এছাড়া হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন চরিত্রের কোন একটি দিক তাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে অন্য দিক তাকে সন্তুষ্ট করবে। [মুসলিমঃ ১৪৬৯]

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অনেক অর্থও(১) দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٢٠

২১. আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি(২) নিয়েছে?

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝٢١

২২. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃ পুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না(৩); তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝٢٢

---

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাহ্‌র হিসাবে অনেক সম্পদ দেয়াও জায়েয। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বেশী পরিমাণে মাহ্‌র দিতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেনঃ তোমরা মহিলাদের মাহ্‌র নির্ধারণে সীমালংঘন করো না। কেননা, এটা যদি দুনিয়াতে সম্মানের ব্যাপার হত অথবা আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়ার বিষয় হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই এ কাজের সবেচেয়ে বেশী উপযুক্ত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার উকিয়ার বেশী তার কোন স্ত্রীকেও দেননি এবং কন্যাদের জন্যও গ্রহণ করেন নি। এমনকি কখনো কখনো মানুষ স্ত্রীর মাহ্‌র দিতে গিয়ে নিজেই নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। [আবু দাউদঃ ২১০৬, তিরমিযীঃ ১১১৪]

(২) কাতাদা বলেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার বলে বিয়ে বুঝানো হয়েছে। কারণ বিয়ের সময় মাহ্‌র দেয়া এবং স্ত্রীকে সঠিকভাবে পরিচালনা কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় করার অঙ্গীকার করার মত চুক্তি সংঘটিত হয়ে থাকে। [তাফসীর আবদির রাযযাক] সুতরাং একে অপরের সাথে মেলামেশা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এ জাতীয় আচরণ অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।

(৩) জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিত। [দেখুন- বুখারীঃ ৪৫৭৯] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে 'আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা

(সেটা ক্ষমা করা হলো) নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য[১] ও নিকৃষ্ট পন্থা।

চতুর্থ রুকূ'

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে[২] তোমাদের মা[৩], মেয়ে[৪],

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ

মানব-চরিত্রের জন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আলেমগণ বলেন, পিতা কোন নারীকে বিয়ে করার সাথে সাথেই সন্তানদের জন্য সে নারী হারাম হয়ে যাবে। চাই তার সাথে পিতার সহবাস হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে যে নারীকে পুত্র বিয়ে করেছে সেও পিতার জন্য হারাম হয়ে যাবে, তার সাথে পুত্রের সহবাস হোক বা না হোক [তাবারী]

(১) আবু বুরদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মতান্তরে হারেস ইবন 'আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাঠিয়েছেন এমন লোকের কাছে যে তার পিতার মৃত্যুর পরে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে- যেন তাকে হত্যা করা হয় এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। [আবু দাউদঃ ৪৪৫৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৯৭, তিরমিযীঃ ১৩৬২, ইবন মাজাহ্ঃ ২৬০৭]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা তিনভাগে বিভক্তঃ এক. ঐ সমস্ত হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে 'মুহার্‌রামাতে আবাদীয়্যা' বা 'চিরতরে হারাম মহিলা' বলা হয়। এ জাতীয় মহিলা তিন শ্রেণীরঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। দুই. কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়। তাদেরকে 'মুহাররামাতে মুআক্কাতাহ' বা সাময়িক কারণে হারাম বলা হয়। এরা আবার দু' শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পরস্ত্রী সে যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম। কিন্তু যখনই অপরের স্ত্রী হওয়া থেকে মুক্ত হবে তখনই সে হালাল হয়ে যাবে। (২) কোন কোন মহিলা শুধুমাত্র অন্যের সাথে একসাথে বিবাহ করা হারাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহ করা হারাম নয়। যেমন, দুই বোনকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা। খালা ও বোনঝিকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা।

(৩) অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। অর্থের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৪) স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম। মোটকথা, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম।

وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ

বোন[১], ফুফু[২], খালা[৩], ভাইয়ের মেয়ে[৪], বোনের মেয়ে[৫], দুধমা[৬], দুধবোন[৭], শাশুড়ী ও তোমাদের

---

(১) সহদোরা বোনকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকেও বিয়ে করা হারাম।

(২) পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

(৩) আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

(৪) ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক বৈমাত্রেয় হোক - বিয়ে হালাল নয়।

(৫) বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগ্নেয়ীর সাথেও বিয়ে হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

(৬) যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম। ফেকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে 'হুরমাতে রেযাআত' বলা হয়। তবে কেবলমাত্র শিশু অবস্থায় দুধ পান করলেই এই 'হুরমাত' কার্যকরী হয়।

(৭) অর্থাৎ দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের দেবর-ভাসুররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পরের বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীদের সাথে বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়। তাই একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না। উকবা ইবন হারেস বলেন, তিনি আবি ইহাব ইবন আযীযের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। এক মহিলা এসে বলল, আমি উকবাকে এবং যাকে সে বিয়ে করেছে উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। উকবা বললেন, আমি জানি না যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। এর পূর্বে আপনি আমাকে কখনো বলেননি। তারপর তিনি মদীনায় আসলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কিভাবে এটা সম্ভব অথচ বলা হয়েছে। তখন উকবা তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন এবং অন্য একজনকে বিয়ে করেন। [বুখারীঃ ৮৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে[১], তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ

সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ছিলেন। এমতাবস্থায় আয়েশা শুনতে পেলেন যে, হাফসার ঘরে যাওয়ার জন্য একজন পুরুষ লোক অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একলোক আপনার পরিবারভুক্ত ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার তো মনে হয় এটা অমুক ব্যক্তি। হাফসার কোন এক দুধ চাচা। তখন আয়েশা বললেন, অমুক যদি জীবিত থাকত- আয়েশার কোন এক দুধ চাচা- তাহলে কি সে আমার কাছে প্রবেশ করতে পারত? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, জন্মগত কারণে যা হারাম হয়, দুধগত কারণেও তা হারাম হয়। [বুখারী: ৫০৯৯; মুসলিম: ১৪৪৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, জন্মের কারণে যাদেরকে হারাম গণ্য করো দুধ পানের কারণেও তাদেরকে হারাম গণ্য করবে। [মুসলিম: ১৪৪৫] তবে এ দুধপান দু বছরের মধ্যে হয়েছে কি না সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী; কারণ, হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুধ পানের সময়টুকু যেন ঐ সময়েই সংঘটিত হয় যখন সন্তানের দুধ ছাড়া আর কোন খাবার দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ হতো না।' [বুখারী: ৫১০২; মুসলিম: ১৪৫৫]

(১) এখানে অভিভাবকত্ব থাকার কথাটা শর্ত হিসাবে নয়; বরং সাধারণতঃ এ ধরনের মেয়েরা মায়ের সাথেই থাকে আর মা দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তার স্বামীর কাছেই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ ধরনের মেয়েদের অভিভাবকত্ব থাকা না থাকা উভয় অবস্থাতেই তাদের বিয়ে করা হারাম। উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আবু সুফিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করবেন? রাসূল বললেন যে, তাকে বিয়ে করা আমার জন্য জায়েয হবে না। আমি বললাম, আমি শুনেছি আপনি নাকি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। রাসূল বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার মেয়ের কথা বলছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার রাবীবা নাও হত তারপরও আমার জন্য জায়েয হত না। কেননা, আমাকে এবং তার পিতাকে সুআইবাহ্ দুধ পান করিয়েছেন। তোমরা তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের বোনদের আমার কাছে বিয়ের জন্য পেশ করো না। [বুখারীঃ ৫১০৬]

তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী[১] ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে, হয়েছে[২]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৪. আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী[৩] ছাড়া সব

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ

(১) অর্থাৎ আপন পুত্রের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। যদিও পুত্র শুধু বিবাহই করে-সহবাস না করে।

(২) এখানে বুঝানো হয়েছে যে, পূর্বে এ ধরনের যা কিছু ঘটেছে তা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি কেউ এরূপ অবস্থায় ইসলামে প্রবেশ করে তবে তাদের মধ্য থেকে দু'জনের একজনকে তালাক দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, ফাইরোয আদ-দাইলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললামঃ আমি ঈমান এনেছি অথচ দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূল বললেনঃ তুমি তাদের যে কোন একজনকে তালাক দিয়ে দাও। [ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৫১, তিরমিযীঃ ১১২৯] অনুরূপভাবে এ একত্রিতকরণের মাসআলার মধ্যে এমন দু'জনকেও একত্রে বিয়ে করা জায়েয নাই, যাদের একজন পুরুষ সাব্যস্ত হলে অন্যজনের জন্য তাকে বিয়ে করা জায়েয হত না। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা এবং তার ফুফু অনুরূপভাবে কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। [বুখারীঃ ৫১০৯]

(৩) অধিকারভুক্ত দাসী বলতে ঐ সমস্ত নারীদেরকে বুঝায়, যারা কাফের ছিল। মুসলিমগণ যুদ্ধে তাদের পুরুষদের পরাজিত করে তাদেরকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে, তখন তাদেরকে মুসলিমদের জন্য বিয়ে ছাড়াই হালাল করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যোদ্ধাকে 'আওতাস'-এর দিকে পাঠান। তারা কাফেরদের উপর জয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে নিয়ে আসে। কিন্তু এরা কাফের নারী হওয়ার কারণে মুসলিমগণ তাদেরকে হালাল মনে করছিল না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরা তাদের জন্য হালাল, তবে শর্ত হলো এদের ইদ্দত শেষ হতে হবে। [মুসলিমঃ ১৪৫৬]

যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে-

(এক) অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা শুধুমাত্র মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হলেই হতে পারে। কোন কারণে যদি মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হয়, কিংবা মুসলিম দু'টি রাষ্ট্রে যুদ্ধের সূচনা হয়, অথবা মুসলিমদের কোন জাতিগত বা ভাষাগত বা রাজনৈতিক দাঙ্গা হয় সেখানে যে যুদ্ধ হবে সে যুদ্ধের কারণে

أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মাহ্‌র অর্পণ করবে[১]। মাহ্‌র নির্ধারণের

কাউকে অধিকারভুক্ত দাস-দাসী বানানোর অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। যদি কেউ এটা করতে চায় তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ ও ব্যভিচার। এ ধরনের লোকদেরকে ব্যভিচারের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(দুই) যে সমস্ত মেয়ে বন্দী হয় তাদেরকে ইসলামী আইন অনুযায়ী সরকারের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যে সমস্ত মুসলিম বন্দী রয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মাঝে বন্টনও করে দিতে পারে। তাই বন্দী করার সাথে সাথেই কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না। তাছাড়া কোন ক্রমেই যুদ্ধাবস্থায় এ অধিকার কারও থাকবে না। যদি কেউ যুদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(তিন) মেয়েটি গর্ভবতী নয় এতটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক মাসিক ঋতুশ্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সংগম করা যাবে না।

(চার) যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে সে-ই শুধু তাকে ভোগ করতে পারবে; অন্য কেউ নয়।

(পাঁচ) সন্তানের জননী হওয়ার পর এ মেয়েকে আর বিক্রয় করা যাবে না। মালিকের মৃত্যুর পরপরই সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

(ছয়) মালিক ইচ্ছে করলে তাকে অন্য কারো কাছে বিয়ে দিতে পারবে। তখন তার খেদমত মালিকের হবে কিন্তু মালিক তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

(সাত) কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মেটানোর অনুমতি দেয়, তবে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা, এ কাজ ও ব্যভিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(১) অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে মহিলাদের মধ্যে যাদের সাথে সম্ভোগ

পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য[২] না থাকলে তোমরা তোমাদের

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ

হয়েছে তাদেরকে মাহ্র পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হিসেবে এ আয়াত পূর্বোক্ত ২১ নং আয়াতের মতই। [আদওয়াউল বায়ান] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে মুত'আ বিবাহের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আ ও সাময়িক বিয়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অসংখ্য সহীহ্ হাদীসে এটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের কালে মুত'আ বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোস্ত হারাম করেছেন। [বুখারী: ৫১১৫, ৫৫২৩; আরও দেখুন- বুখারীঃ ৪২১৬, মুসলিমঃ ১৪০৬, ১৪০৭] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর মক্কা বিজয়ের বছর সেটাকে আবার বৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এ জাতীয় বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে। [মুসলিম: ১৪০৬] এ হিসেবে মুত'আ বিবাহ প্রথমে খায়বারের যুদ্ধে হারাম করা হয়। এরপর মক্কা বিজয়ের সময় হালাল করা হয়, অথবা কোন কোন সাহাবী রাসূলের অগোচরেই না জানা অবস্থায় সেটা করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের বছর আওতাসের যুদ্ধের সময় তিনদিন কোন কোন সাহাবী সেটা করার পর সেটা চিরতরে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়। [যাদুল মা'আদ]

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মাহ্র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ধার্যকৃত পূর্ণ মাহ্র প্রদান করে স্ত্রীকে তার মাহরের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত - দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। স্বাধীন ইয়াহূদী-নাসারা নারীদেরকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা, ইয়াহূদী ও নাসারা নারীরা আজকাল সাধারণতঃ স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলিমদেরকে বিয়ে করে।

الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে(১); আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে(২) এবং তাদেরকে তাদের মাহ্‌র ন্যায়সংগতভাবে দেবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি মুক্ত নারীর অর্ধেক(৩); তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে

---

(১) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈমানদার নয় এমন দাসী বিয়ে করা জায়েয নেই। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "আর কিতাবী মহিলাদের মধ্যে যারা মুহসিনা" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫] অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হালাল করা হয়েছে। এখানে মুহসিনা বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতে স্বাধীনা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কাফের দাসীদেরকে বিয়ে করা জায়েয নেই। যদিও তারা কিতাবী হয়। [তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা অপর মহিলাকে বিয়ে দেবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলা নিজেকেও বিয়ে দেবে না। যে মহিলা নিজেকে নিজে বিয়ে দেয়, সে ব্যভিচারে লিপ্ত। [ইবন মাজাহ্ঃ ১৮৮২] অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে।

(৩) মুক্ত নারীর শাস্তির কথা এখানে বলা হয় নি। অন্যত্র বলে দেয়া হয়েছে যে, 'ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর' [সূরা আন-নূরঃ ২] সে হিসেবে এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যভিচারিনী দাসীর শাস্তি হবে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। কিন্তু ব্যভিচারী দাসের ব্যাপারটি ভিন্ন কোন আয়াতে আসে নি। তাই ব্যাভিচারিনী দাসীর শাস্তি যেভাবে অর্ধেক হয়েছে সেভাবে ব্যভিচারী দাসের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্ধেক শাস্তি হবে; কারণ দাসত্বের দিক থেকে উভয়েই সমান। এটাও এক প্রকার কিয়াস। [আদওয়াউল বায়ান] তবে এটা জানা আবশ্যক যে, দাস-দাসীরা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক তাদের কোন 'রজম' তথা প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বা দেশান্তর নেই। [তাবারী]

ভয় করে এগুলো তাদের জন্য; আর ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল(১)। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

পঞ্চম রুকূ'

২৬. আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে(২)। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

২৭. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও(৩)।

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার কমাতে চান(৪); আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ

(১) অর্থাৎ দাসী বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে সামর্থ দিবে, তখন যেন স্বাধীনা নারী বিয়ে করতে পারে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মা ও কন্যাদের হারাম হওয়ার ব্যাপারটি বিস্তারিত বর্ণনা করতে চান। আর এটাও জানিয়ে দিতে চান যে, এটা পূর্বে কখনও হালাল ছিল না। সব শরী'আতেই মা ও মেয়ে হারাম ছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অনুরূপভাবে তিনি চান তোমাদেরকে হিদায়াত দিতে বা মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রতি দিকনির্দেশ করতে এবং বর্ণনা আসার পূর্বে তোমাদের কৃত এ জাতীয় গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিতে। [বাগভী]

(৩) আয়াতের অর্থে কাতাদা ও সুদ্দী বলেন, অর্থাৎ যারা ব্যভিচারী বা যারা অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী যেমন, ইয়াহূদী অথবা নাসারা, তারা চায় তোমাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত করতে, প্রবৃত্তি-পুজারী বানাতে। [তাবারী]

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হাল্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা

ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

দুর্বলরূপে[১]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি[২] অন্যায়ভাবে[৩] গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে[৪] ব্যবসা করা বৈধ[৫]; এবং নিজেদেরকে

সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মাহ্‌র নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন। এসব কিছুই হাল্কা ও সহজ করার স্বার্থেই করা হয়েছে।

(১) অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হত, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার শুধু অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আরও বুঝা যায় যে, নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

(৩) আয়াতে উল্লেখিত 'বাতিল' শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায়ভাবে'। আব্দুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। [বাহরে মুহীত]

(৪) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রির জন্য সন্তুষ্টি অপরিহার্য। [ইবন মাজাহ্‌ঃ ২১৮৫] এ সন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন, "বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত (সওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে– পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে–যারা খেয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সওদা করবে।" [বুখারী: ২১০৭]

(৫) এর দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

হত্যা করো না[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আগুনে পোড়াবো; এসব আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

৩১. তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ্[২] তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো[৩] ক্ষমা করব এবং

স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম। কাতাদা বলেন, ব্যবসা আল্লাহ্র রিযক ও আল্লাহ্র হালালকৃত বিষয়, তবে শর্ত হচ্ছে, এটাকে সত্যবাদিতা ও সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে। [তাবারী]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য কোন ধর্মের উপর। তাহলে সে ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বনী আদম যার মালিক নয় এমন মানত গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। যে কোন মুমিনকে লা'নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে যে কেউ কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল। [বুখারীঃ ৬০৪৭, মুসলিমঃ ১৭৬] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিমঃ ১৭৫]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ এমন প্রত্যেক গোনাহ্ যার পরিণতিতে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা আল্লাহ্র গযবের কথা এসেছে, অথবা লা'নতের কথা অথবা আযাবের কথা এসেছে, তাই কবীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্র সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ তা সাতশ' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। [তাবারী, ইবন আবী হাতেম]

(৩) উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, পাপ বা গোনাহ দু'রকম। কিছু কবীরা

তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

৩২. আর যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হাল্কা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার সগীরা গোনাহ্গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন। যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবগুলো সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা করে দেবেন। এখানে গোনাহের কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ এই যে, কর্তার সৎকর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 'কোন লোক যখন সালাত আদায়ের জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে।' [নাসায়ীঃ ১/১০৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৪৯] আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, অযু, সালাত প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহ্র কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হল সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্ একমাত্র তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ্ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সাহাবীগণ কবীরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, মুসলিম কোন আত্মাকে হত্যা করা এবং যুদ্ধের দিনে ময়দান থেকে পলায়ন করা।' [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১৩]

প্রাপ্য অংশ[১]। আর আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমরা উত্তরাধিকারী করেছি[২] এবং

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

(১) কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযেগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান বা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তার কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। তাই আয়াতের শেষাংশে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষরা যাকিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই পাবে। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেনঃ পুরুষরা যুদ্ধ করে, আমরা মহিলারা যুদ্ধ করতে পারি না তদুপরি আমাদের জন্য মীরাসের অর্ধেক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৩২২, তিরমিযীঃ ৩০২২] অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহ্ রাসূল, একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান মীরাস পায়, একজন পুরুষের সাক্ষী দুইজন মহিলার সাক্ষীর সমান। আমরা যখন কোন নেক কাজ করব, তখনও কি অর্ধেক সওয়াব হবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। যাতে বলা হয়েছে যে, এটা আমার ইনসাফ এবং এটা আমিই করেছি। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ১০/১১৬-১১৭, নং- ১১৫]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ মুহাজেররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসত, তখন আনসারদের নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন মুহাজেররা তাদের ওয়ারিস হত। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায়। [বুখারীঃ ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭]

كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

ষষ্ঠ রুকূ'

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ

৩৪. পুরুষরা নারীদের কর্তা[২], কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্যে যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে[৩]। কাজেই পূণ্যশীলা স্ত্রীরা

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন 'আর যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে' এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কেউ কেউ অপর কারও সাথে বংশীয় কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও চুক্তিবদ্ধ হতো, এর ফলে একে অপরের ওয়ারিশ হতো। তারপর যখন আল্লাহ্র বাণী 'আর আত্মীয়রা আল্লাহ্র বিধানে একে অন্যের চেয়ে বেশী হকদার।' [সূরা আল-আনফাল:৭৫; আল-আহযাব:৬] এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তাও রহিত হয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৪৬; তাবারী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আমি সিজ্দা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজ্দা করার অনুমতি দিতাম। [তিরমিযীঃ ১১৫৯]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্য থাকবে না; বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বতন্ত্র। **দ্বিতীয়তঃ** নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। মোটকথা: ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তাকে তার স্বামীর যা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। আর সে আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি দয়াবান থাকবে, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট করার কারণে আল্লাহ্ স্বামীকে স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। [তাবারী]

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

অনুগতা[১] এবং লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহ্‌র হেফাযতে তারা হেফাযত করে[২]। আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর[৩]। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্

(১) আরবী ﴿قَٰنِتَٰتٌ﴾ শব্দটির মূল হল قَانِتٌ। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, কুরআনের যেখানেই এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, সেখানেই অনুগত থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [তাবারী]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সবচেয়ে উত্তম নারী হল ঐ স্ত্রী যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে সে খুশী করে। তাকে নির্দেশ দিলে আনুগত্য করে। তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজেকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাযত করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৬১]

(৩) সেসব স্ত্রীলোক, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা'আলা সংশোধনের জন্য পুরুষদেরকে যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হল যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। তারপর যদি তাতেও সংশোধন না হয়, তবে মৃদুভাবে মারবে, তিরস্কার করবে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা যখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি, বরং তিনি বলেছেনঃ 'ভাল লোক এমন করে না'। [ইবন হিব্বানঃ ৯/৪৯৯, নং- ৪১৮৯, আবু দাউদঃ ২১৪৬, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৮৫] যাইহোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

(৪) পূর্বের আয়াতাংশে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন

শ্রেষ্ঠ, মহান।

৩৫. আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর; তারা উভয়ে নিস্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত[১]।

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَیۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَکَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَحَکَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ یُّرِیۡدَاۤ اِصۡلَاحًا یُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَیۡنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیۡمًا خَبِیۡرًا ﴿۳۵﴾

কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে চাকর-বাকরদের মত না মারে, পরে সে দিনের শেষে তার সাথে আবার সহবাস করল। [বুখারীঃ ৫২০৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক আছে? রাসূল বললেনঃ তুমি খেতে পেলে তাকেও খেতে দেবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধেয় বস্ত্র দেবে, তার চেহারায় মারবে না এবং তাকে কুৎসিৎও বানাবে না, তাকে পরিত্যাগ করলেও ঘরের মধ্যেই রাখবে। [আবু দাউদঃ ২১৪২]

(১) উল্লেখিত ব্যবস্থাটি ছিল এ কারণে, যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয় পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বীদের এবং মুসলিম সংস্থাকে সম্বোধন করে এমন এক পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছেন, তা হল এই যে, সরকার, উভয় পক্ষের মুরুব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলিমদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন স্বামীর পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حكم (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্টের বিষয়টিও

৩৬. আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না[১]; এবং পিতা-মাতা[২], আত্মীয়-

وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـئًا وَّبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى

নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত ও দ্বীনদারও হবেন।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং 'ইবাদাতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না। মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তার বাহনে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি হক? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক হল, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অনেক পথ চলার পর আবার বললেনঃ হে মু'আয ইবন জাবাল! তুমি কি জান, বান্দা যদি এ কাজটি করে তাহলে আল্লাহ্‌র উপর বান্দার কি হক রয়েছে? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক হল, তাদেরকে শাস্তি না দেয়া। [বুখারীঃ ৬৫০০]

(২) আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাওহীদের পর সমস্ত আপনজন-আত্মীয় ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পিতা-মাতার অধিকার সর্বাগ্রে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় 'ইবাদাত বন্দেগী ও হকসমূহের পর পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পিছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন ও বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, পিতা-মাতাই তাকে সেগুলোতে সাহায্য করেন এবং তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে তাঁর 'ইবাদাত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর"। [সূরা লুকমান: ১৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।" [তিরমিযী: ১৮৯৯]

وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

স্বজন[১], ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত[২], নিকট প্রতিবেশী[৩], দুর-প্রতিবেশী[৪],

---

(১) এখানে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত করতেন। তা হলো, "আল্লাহ্ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য"। [সূরা আন-নাহল:৯০] এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেয়াও অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হল সেলায়ে-রেহ্মীর সওয়াব। [মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৪, নাসায়ী: ২৫৮২] অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।

(২) অর্থাৎ লাওয়ারিশ তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতাও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে থাক।

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু যর, যখন তরকারী রান্না করবে তখন তাতে বেশী পরিমাণে পানি দিও এবং এর দ্বারা তোমার পড়শীর খোঁজ-খবর নিও। [মুসলিমঃ ২৬২৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার পড়শীর সম্মান করে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে সে যেন তার মেহমানের পুরস্কার দিয়ে তাকে সম্মানিত করে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, মেহমানের পুরস্কার কি? তিনি বললেন, একদিন ও রাত্রি। আর মেহমান তিন দিন এর পরের যা সময় তাতে ব্যয় করা সদকাস্বরূপ। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনে উপর ঈমান আনে সে যেন ভাল বলে অথবা চুপ থাকে। [বুখারী: ৬০১৯] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম সংগী হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংগীগণ। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম পড়শী হচ্ছেন ঐ পড়শী, যে তার পড়শীর জন্য উত্তম। [তিরমিযী: ১৯৪৪]

(৪) এ আয়াতে দু'রকমের প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। এ উভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, جَارِ ذِى الْقُرْبٰى বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ বলতে শুধু সে প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার

সঙ্গী-সাথী(১), মুসাফির(২) ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের(৩) প্রতি | وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ

সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। [তাবারী] কোন কোন মনীষী বলেছেন, 'জারে-যিলকোরবা' এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলিম। আর 'জারে-জুনুব' বলা হয় অমুসলিম প্রতিবেশীকে। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এ সমুদয় সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান। অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(১) যদিও এর শাব্দিক অর্থ হল সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে। ইসলামী শরী'আত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান - সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়াত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোন রকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, ধুমপান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি। যানবাহনে অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে এ কথা ভাবা উচিত যে, এখানে তার ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই 'সাহেবে-বিল-জাম্ব'-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্প-শ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক অথবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক। [রুহুল মা'আনী]

(২) আয়াতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় বা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কুরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। তা হল, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

(৩) এতে অধিকারভুক্ত দাস-দাসীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া পরার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত

أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে[১]।

কোন কাজ তাদের দ্বারা করাবে না। এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত দাস-দাসীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে কার্পণ্য বা বিলম্ব করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না। যদি শরী'আত মত তাদেরকে পরিচালনা করা হয় তবে তাদের যাবতীয় খরচও সদকার অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তুমি নিজে যা খাও তা তোমার জন্য সদকা এবং যা তোমার ছেলেকে খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা। অনুরূপভাবে যা তোমার খাদেমকে খাওয়াও সেটাও তোমার জন্য সদকা হিসাবে গণ্য হবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩১] অপর বর্ণনায় এসেছে, মা'রূর ইবন সা'য়ীদ বলেন, আমি আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়ে একটি চাদর দেখলাম, অনুরূপ আরেকটি চাদর তার দাসের গায়ে দেখলাম। এ ব্যাপারে আমরা আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একদিন এক লোককে গালি দিয়েছিলাম। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে গালি দিলে রাসূল আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে তার মায়ের ব্যাপার উল্লেখ করে অপমান করলে? তারপর তিনি বললেন, "এরা তোমাদের ভাই, তোমাদের অনুগামী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন। অতএব যার কোন ভাই তার কর্তৃত্বাধীন থাকে, তবে সে যা খায় তা থেকে যেন তাকে খাওয়ায়, যা পরিধান করে তা থেকে যেন তাকে পরিধান করায়। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব তাদেরকে দিবে না, যদি সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব দাও তবে তাদেরকে সাহায্য কর।" [বুখারী: ২৫৪৫; মুসলিম: ১৬৬২]

(১) আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে। আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সে সমস্ত লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে ওসীয়ত করে বলেছেনঃ 'কাউকে গালি দিও না। সাহাবী বললেনঃ এরপর আমি কোন স্বাধীন, দাস, উট বা ছাগল কাউকেই গালি দেইনি। তিনি আরো বললেনঃ সামান্য কোন নেক কাজকেও হেয় করে দেখবে না যদিও তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা হোক। আর তোমার কাপড়কে টাখনুর অর্ধেক পর্যন্ত উঠাবে, যদি তা করতে না চাও তবে দুই গিরা পর্যন্ত নামাতে পার।

৩৭. যারা কৃপণতা করে[১] এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আর আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি[২]।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

কাপড়কে 'ইসবাল' বা গিরার নীচে পরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ কর। কেননা, এটাই অহংকারের চিহ্ন। আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারীকে পছন্দ করেন না। যদি কোন লোক তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার কোন ত্রুটি জানতে পেরে তা নিয়ে উপহাস করে, তুমি তার সেরকম কিছু জেনেও তাকে উপহাস করো না। কারণ, এর প্রতিফল তাকেই ভোগ করতে হবে। [আবু দাউদঃ ৪০৮৪, তিরমিযীঃ ২৭২২]

(১) এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এ ধরনের মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করে। আয়াতে যে بخل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-নুযুল পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে بخل বা কার্পণ্য শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত। দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যে ক্ষতি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! সৎপথে ব্যয়কারীদেরকে শুভ প্রতিদান দান করুন। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দিন।' [বুখারীঃ ১৪৪২] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক, কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এ কৃপণতাই ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের কার্পণ্য নির্দেশ দিয়েছে কৃপণতা করার, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, অনুরূপভাবে তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা তা ছিন্ন করেছে এবং তাদেরকে অশ্লীলতার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা অশ্লীল কাজ করেছে। [আবু দাউদঃ ১৬৯৮]

(২) অর্থাৎ তারা কাফির। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের শাস্তি অবধারিত। মুজাহিদ বলেন, এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলোয় ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কারণ তারা এ কাজগুলো করত। [তাবারী] এরপর যাদের মধ্যেই উপর্যুক্ত খারাপ গুণাগুণ পাওয়া যাবে, তারাও আল্লাহ্‌র কাছে মন্দ বলে বিবেচিত হবে।

৩৮. আর যারা মানুষকে দেখাবার জন্য[১] তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ[২]!

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝٣٨

৩৯. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? আর আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝٣٩

৪০. নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না[৩]। আর কোন পূণ্য কাজ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً

(১) এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শির্ক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল'। [মুসনাদে ত্বায়ালেসীঃ ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৬৫]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভালবাসেন না। অথবা যারা উপর্যুক্ত কাজগুলো করবে, শয়তান তাদের সাথী হবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা পায় না তারা শয়তানের সঙ্গী হবে এটাই স্বাভাবিক। যারা শয়তানের সঙ্গী হবে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সংগীই পেল।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও সৎকর্মের সওয়াব এবং অশুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় ও যুলুম করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার সওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান। আল্লাহ্ তা'আলা হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে (সৎ কাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। প্রতিটি ভাল কাজ মীযানে পরিমাপ হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন

يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

হলে আল্লাহ্ সেটাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন[১] এবং আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন[২]।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ

৪১. অতঃপর যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব[৩]

করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] অনুরূপভাবে লুকমানের ওসিয়ত বর্ণনায় আল্লাহ্ বলেন, "হে প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন" [সূরা লুকমান: ১৬] অন্য সূরায় আল্লাহ্ বলেন, "সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়, কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে" [সূরা আয-যালযালাহ:৬-৮]

(১) এ আয়াতে কতগুণ বর্ধিত হবে, তার সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করে বলা হয় নি। পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সর্বনিম্ন বর্ধিতের পরিমাণ হচ্ছে, দশগুণ। আল্লাহ্ বলেন, 'যে কেউ কোন সৎকাজ করল, তার জন্য রইল সেটার অনুরূপ দশগুণ' [সূরা আল-আন'আম: ১৬০] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বহুগুণ বর্ধিত হওয়ার ব্যাপারে আরও বলেছেন যে, তা কখনও কখনও সত্তর গুণেরও বেশী হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।' [সূরা আল-বাকারাহ: ২৬১] এর অর্থ হচ্ছে, সাতশ গুণ হওয়াতেই এ বর্ধিতকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ নয়, বরং কখনও কখনও আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার থেকে বেশী বৃদ্ধি করে থাকেন। [আদওয়াউল বায়ান] মোটকথা: আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তা কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাই আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে চলে যতটুকু সম্ভব সৎ কর্মের মাধ্যমে তাঁর রহমতের অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিন জীবনের প্রধান কাজ।

(২) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কারও কারও জন্য সামান্য আমলকেও নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে তার নাজাতের অসীলা বানিয়ে দিবেন। শাফা'আতের বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, "অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা যাও এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে নাও। তখন তারা যাদের সম্পর্কে জানতে পারবে তাদেরকে বের করে আনবেন।" বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরোক্ত আয়াতটি পড়ার জন্য বললেন। [বুখারী: ৭৪৩৯]

(৩) এখানে আখেরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে। তাদের

عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۟

এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা হবে[১]?

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۟

৪২. যারা কুফরী করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত[২]! আর তারা আল্লাহ্ হতে কোন

কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে নিজ নিজ উম্মতের পাপ-পুণ্য ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও আমার রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করে নি। হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কুরআন শোনাও। আব্দুল্লাহ্ বললেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, অথচ কুরআন আপনার উপরই নাযিল হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ পড়। আব্দুল্লাহ্ বললেন, অতঃপর আমি সূরা আন্-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর এ আয়াত অর্থাৎ ﴿فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ﴾ পর্যন্ত পৌছার পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। [মুসলিমঃ ৮০০]

(১) কোন কোন মনীষী বলেছেন, هٰؤُلَاءِ এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে উপস্থিত কাফের মুনাফেকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাই হোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দান করবেন। কুরআনুল কারীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্য দান করতে পারেন। অন্যথায় কুরআনুল কারীমে তাঁর (অর্থাৎ সে নবীর এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের) বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুওয়াতেরও একটি প্রমাণ।

(২) এ আয়াতে হাশরের মাঠে কাফেরদের দূরাবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখানকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম। হাশরের

কথাই গোপন করতে পারবে না[১] ।

৪৩. হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়[২] | يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ

ময়দানে কাফেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে - হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছে "আর কাফেররা বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম ।" [সূরা আন-নাবা: ৪০]

(১) অর্থাৎ এই কাফেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না । তাদের হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রাসূলগণ সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'কাফেররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না । আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কছম খেয়ে খেয়ে বলবে ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র কছম আমরা শির্ক করিনি ।" [সূরা আল-আন'আমঃ ২৩] বাহ্যতঃ এ দু'টি আয়াতের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি? তখন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি এমন হবে যে, যখন প্রথমে কাফেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শির্ক ও অসৎকর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত । হয়ত আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি । কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে । এজন্যই বলা হয়েছে ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ 'কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না' । যদি কেউ ভাল কাজ করে তাও সে বলবে, এক হাদীসে এসেছে হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবেন যাকে তিনি সম্পদ দিয়েছিলেনঃ 'দুনিয়াতে তুমি কি কাজ করেছ? তখন সে কোন কথাই গোপন করবে না । সে বলবেঃ হে আমার রব, আপনি আমাকে সম্পদ দিয়েছেন, আমি মানুষের সাথে বেচা-কেনা করতাম । আমার স্বভাব ছিল মানুষকে ছাড় দেয়ার । আমি ধনীদের সাথে সহজ ব্যবহার করতাম আর দরিদ্রদেরকে সময় দিতাম । তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ 'আমি এটা করার জন্য তোমার চেয়েও বেশী উপযুক্ত । আমার বান্দাকে তোমরা ছাড় দাও ।' [মুসলিমঃ ১৫৬০]

(২) আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ইসলামী শরী'আতকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন । তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যাদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র

سُكٰرٰى حَتّٰى تَعۡلَمُوۡا مَا تَقُوۡلُوۡنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىۡ سَبِيۡلٍ حَتّٰى تَغۡتَسِلُوۡا ؕ وَاِنۡ كُنۡتُمۡ مَّرۡضٰۤى اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ اَوۡ جَآءَ اَحَدٌ مِّنۡكُمۡ مِّنَ الۡغَآٮِٕطِ اَوۡ لٰمَسۡتُمُ النِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُوۡا مَآءً

তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার[১] এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা গোসল

আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনো এই দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনো মদ স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদ অভ্যাসে লিপ্ত। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে সে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিমদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিস্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারে কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, সালাতের সময় সালাতের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলিমগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে সালাতে বাধা দান করে। কাজেই দেখা গেল অনেকে এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা আল-মায়েদার আয়াতে মদের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

(১) আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে এক আনসার দাওয়াত দিল। দাওয়াত শেষে আব্দুর রহমান ইবন আউফ এগিয়ে গিয়ে মাগরিবের সালাতের ইমামতি করলেন। তিনি সূরা আল-কাফেরূন তেলাওয়াত করতে গিয়ে এলোমেলো করে ফেললেন। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় যাতে মদ খাওয়ার পর বিবেকের সুস্থতা না ফেরা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ২/১৮৮ নং- ৫৬৭, অনুরূপ ২/১৮৭ নং- ৫৬৬; আবু দাউদঃ ৩৬৭১; তিরমিযী: ৩০২৬]

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

কর[১]। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর[২] সুতরাং মাসেহ কর তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

---

(১) অপবিত্র অবস্থা থেকে গোসল করার নিয়ম বর্ণনায় হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দু হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের অজুর মত অজু করতেন। তারপর পানিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতেন। তারপর তার মাথায় তিন ক্রোশ পানি দিতেন এবং সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। [বুখারী: ২৪৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা ধোয়া ব্যতীত সালাতের অজুর মত অজু করলেন, তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন, যে সমস্ত ময়লা লেগেছিল তাও ধৌত করলেন, তারপর তার নিজের শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর দু' পা সরিয়ে নিয়ে ধৌত করলেন। এটাই ছিল তার অপবিত্রতা থেকে গোসল করার পদ্ধতি। [বুখারী: ২৪৯]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, এক সফরে তিনি তার বোন আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে একটি হার ধার করে নিয়েছিলেন। তিনি সেটা হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা খুঁজতে এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং তিনি তা খুঁজে পান। ইত্যবসরে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করল। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হোদাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। যখনি কোন অপছন্দনীয় ব্যাপার আপনার উপর ঘটে গেছে, তখনি তা আপনার এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য কল্যাণের কারণ হয়েছে। [বুখারীঃ ৩৩৬, মুসলিমঃ ৩৬৭]
মূলতঃ তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার- যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে।

৪৪. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও- এটাই তারা চায়[১]।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আল্লাহ্‌ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবকত্বে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৬. ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে[২] এবং বলে, 'শুনলাম ও অমান্য করলাম' এবং শোনে না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্‌বা কুঞ্চিত করে এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্ল করে বলে,

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী নাসরারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ঈমানদারদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চায়। অন্য আয়াতে তাদের সংখ্যা অনেক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, তারা মুসলিমদের মুর্তাদ হয়ে যাওয়া কামনা করে। আরও বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও কেবলমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়েই তারা এটা করে থাকে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, "কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)।"[সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯] আরও বলেন, "কিতাবীদের একদল চায় যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে পারে, অথচ তারা নিজেদেরকেই বিপথগামী করে। আর তারা উপলব্ধি করে না।" [সূরা আলে-ইমরান: ৬৯] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইয়াহূদীদের নেতাদের মধ্যে রিফা'আ ইবন যায়েদ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বলত, তখন সে তার জিহ্বা ঘুরিয়ে বলত: হে মুহাম্মাদ! তুমি ভাল করে আমাদেরকে শোনাও যাতে আমরা বুঝতে পারি। তারপর সে ইসলামের দোষ-ত্রুটি খুজে বেড়াত। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র হুদুদসমূহ বিকৃত করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَأَقْوَمَ وَلٰكِن لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

'রাইনা'(১)। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন', তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সঙ্গত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন। ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحٰبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে কিতাবপ্রাপ্তগণ, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমরা যা নাযিল করেছি তাতে তোমরা ঈমান আন(২), আমরা মুখমণ্ডলগুলোকে বিকৃত করে তারপর সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার আগে(৩) অথবা আস্‌হাবুস্ সাব্‌তকে যেরূপ লা'নত করেছিলাম(৪) সেরূপ তাদেরকে

---

(১) সূরা আল-বাকারাহ এর ১০৪ নং আয়াতে এ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূলত: বাক্যটি দ্ব্যর্থবোধক। তারা এটাকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করত।

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একদল ইয়াহূদী সর্দার যেমন আব্দুল্লাহ ইবন সুওরিয়া, কা'ব ইবন আসওয়াদ প্রমুখদের সাথে কথোপকথন চলার সময় বলেছিলেন, হে ইয়াহূদীরা তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ঈমান আন। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা জান যে, আমি যা নিয়ে এসেছি তা বাস্তবিকই হক। তখন তারা বলল, মুহাম্মাদ! আমরা তা জানি না। তারা যা জানত তা অস্বীকার করল এবং কুফরীতে বহাল রইলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী]

(৩) ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেয়াও হতে পারে। অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে বরং গর্দানের মত পরিস্কার ও সমান্তরাল করে দেয়া। [রুহুল মা'আনী] তবে মুজাহিদ বলেন, এখানে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ, হক পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে দেয়া যাতে তারা পশ্চাতে ফেলে আসা ভ্রষ্ট পথেই ফিরে যায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) 'আসহাবুস সাবত' অর্থ শনিবারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ্ তা'আলা

লা'নত করার আগে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক[১] করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন[২]। আর যে-ই আল্লাহ্‌র সাথে

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

ইয়াহূদীদেরকে শনিবারে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা সে নির্দেশকে হীলা-বাহানা করে অমান্য করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন।[দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ: ৬৫] তা ছিল নিঃসন্দেহে অভিশাপ। এ আয়াতে সে ধরনের অভিশাপের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। [তাবারী]

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, যে কোন সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে তেমন কোন বিশ্বাস পোষণ করাই হল শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুকে 'ইবাদাত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করাই শির্ক। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তা উল্লেখ করেছেন যে, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ৯৭-৯৮] শির্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারাহ এর ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, যুলুম ও অবিচার তিন প্রকার। এক প্রকার যুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যুলুম যা মাফ হতে পারে। আর তৃতীয় প্রকার যুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না। প্রথম প্রকার যুলুম হচ্ছে শির্ক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা।[ইবন কাসীর] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যত গোনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করল। অন্য আয়াতে অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা শির্ককারীদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, ...তবে যদি তারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে"[সূরা আল-ফুরকান: ৭০] সুতরাং তাওবাহ করলে শির্কও মাফ হয়ে যায়।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমরা কবীরা গোনাহ্‌কারীর জন্য ইস্তেগফার করা থেকে বিরত থাকতাম। শেষ পর্যন্ত যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ আয়াত শুনলাম এবং আরো শুনলাম যে, তিনি বলছেনঃ 'আমি আমার দো'আকে গচ্ছিত রেখেছি আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্‌গারদের

শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।

৪৯. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন[১]।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

সুপারিশ করার জন্য। ইবন উমর বলেনঃ এরপর আমাদের অন্তরে যা ছিল, তা অনেকটা কেটে গেল ফলে আমরা ইস্তেগফার করতে থাকলাম ও আশা করতে থাকলাম। [মুসনাদে আবি ইয়া'লাঃ ৫৮১৩]

(১) আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, নিজেকে কেউ যেন দোষ-ক্রুটির ঊর্ধ্বে মনে না করে। মূলত: আত্মপ্রশংসা এবং নিজেকে ক্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয়। ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে; তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার কয়েকটি কারণ রয়েছে-

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে অহমিকা বা আত্মগর্ব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর প্রশংসা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা হচ্ছে জবাই করা।' [ইবন মাজাহ্ঃ ৩৭৪৩] কাতাদা বলেন, এখানে ইয়াহূদীদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের প্রশংসায় কোন প্রকার কসুর করত না। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি ও তাঁর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত। [তাবারী]

দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেযগারীর মধ্যেই হবে কিনা। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা তাকওয়ার পরিপন্থি। এক বর্ণনায় এসেছে, সালমা বিনতে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল بَرَّة (বার্রাহ্ বা পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বার্রাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।' [বুখারীঃ ৫৮৩৯, মুসলিমঃ ২১৪১]

নিষিদ্ধতার আরো এক কারণ এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সে লোক আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ক্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বৈব

আর তাদের উপর সূতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

৫০. দেখুন! তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

অষ্টম রুকূ'

৫১. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা জিব্‌ত ও তাগূতে বিশ্বাস করে(১)? তারা কাফেরদের

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَاۗءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ

মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে।
নিষিদ্ধতার আরেক কারণ হল, মানুষ জানে না তার কৃত আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা। কেননা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'যখন ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ﴾ 'আর যারা তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা দেয় এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত এজন্যে যে তারা তাদের রব এর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।'[সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৬০] এ আয়াত নাযিল হল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম তারা কি ঐ সম্প্রদায় যারা মদ খায় এবং চুরি করে? তিনি বললেন, না, হে সিদ্দিকের মেয়ে! তারা হল ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সালাত-সাওম আদায় করে এবং ভয় করে যে তাদের থেকে কবুল করা হবে না।' [তিরমিযীঃ ৩১৭৫, ইবন মাজাহ্ঃ ৪১৯৮, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১৫৯]

(১) আয়াতে 'জিব্‌ত' ও 'তাগূত' শীর্ষক দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তাফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় 'জ্বিবত' বলা হয় জাদুকরকে। আর 'তাগূত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন যে, 'জ্বিবত' অর্থ জাদু এবং 'তাগূত' অর্থ শয়তান। মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই তাগূত বলে অভিহিত হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কুরআন থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং তাগূত থেকে বেঁচে থাক।" [সূরা আন-নাহল: ৩৬] কিন্তু উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই গ্রহণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'জ্বিবত' প্রতিমাকেই বোঝাত, পরে

اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾	সম্বন্ধে বলে, 'এদের পথই মুমিনদের চেয়ে প্রকৃষ্টতর[১] ।'
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۖ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ	৫২. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে। [রুহুল মা'আনী] তাগূতের অর্থ ও প্রকারভেদ এবং প্রধান প্রধান তাগূত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ২৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীদের সর্দার হুইয়াই ইবন আখতাব ও কা'ব ইবন আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইয়াহূদী সর্দার কা'ব ইবন আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবন আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জ্বিবত ও তাগূতের) সামনে সিজ্‌দা কর। সুতরাং সে কুরাইশদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাই করল। তারপর কা'ব কুরাইশদেরকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা'বার প্রভূর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কা'বের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবু সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ন্যায়ের উপর রয়েছেন? তখন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর তাওয়াফ করি, পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পৈত্রিক দ্বীন পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন দ্বীনের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন দ্বীন উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবন আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোমরাহ্ হয়ে গেছেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন। [দেখুন- সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৬৫৭২]

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا

করেছেন[১] এবং আল্লাহ্‌ যাকে লা'নত করেন আপনি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবেন না[২]।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

৫৩. তবে কি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকে এক কপর্দকও দেবে না[৩]।

(১) আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখেরাতের অপমানের কারণ। লা'নত ও অভিসম্পাত এর অর্থ হল, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া- চরম অপমান, অপদস্থতা। যার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পতিত হয় সে কখনো আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হয়েছে, তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে।" [সূরা আল-আহযাব: ৬১] এটা তাদের পার্থিব অপমান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

(২) এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র লা'নতের যোগ্য কারা? এক হাদীসে আছে যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।' [মুসলিমঃ ১৫৯৮] অন্য এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে লোক লূত 'আলাইহিস্‌ সালামের সম্প্রদায়ের অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।' [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৯৬] অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হাত কাটা হয়।' [বুখারীঃ ৬৪০১] আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, 'সুদ গ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজেদের শরীর কেটে উল্কি আঁকে, যে অন্যের শরীর কেটেও উল্কি এঁকে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকারের উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত।' [বুখারীঃ ১৯৮০] অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্‌ তা'আলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।' [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৭]

(৩) ইবনে আব্বাস বলেন, খেজুরের দানার উপরে বিন্দুর মত যে ছিদ্র থাকে তাকেই আরবীতে نقير 'নাকীর' বলা হয়। [তাবারী] মোটকথা: সামান্যতম জিনিস বোঝানোর জন্যই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫৪. অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদেরকে ঈর্ষা করে[১]? তবে আমরা তো ইব্‌রাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম এবং আমরা তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৫. অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক তাতে ঈমান এনেছিল এবং কিছু সংখ্যক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল[২]; আর

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

(১) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের হিংসার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইয়াহূদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরত। আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে তাদের সে হিংসা বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তার কারণ বর্ণনা করেছেন। তা হল এই যে, তোমাদের এই হিংসা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণটা কি? যদি এ কারণ হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজ-ক্ষমতা না হয় আমরা নাই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে যাবে কেন? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক? তাহলে তার উত্তর হল এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাঁদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

এখন জানা দরকার ঈর্ষা কি? আর তার পরিণামই বা কি? আলেমগণ বলেন, হাসাদ বা ঈর্ষা হচ্ছে, ‘অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করা।’ যা হারাম ও নিন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না; বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিম ভাইয়ের পক্ষে অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।’ [বুখারী: ৬০৭৬; মুসলিমঃ ২৫৫৮]

(২) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

৫৬. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে অবশ্যই তাদেরকে আমরা আগুনে পোড়াব; যখনই তাদের চামড়া পুড়ে পাকা দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া বদলে দেব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে(১) । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

৫৭. আর যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে, অচিরেই আমরা তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে নদী-নালাসমূহ প্রবাহিত; যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে আমরা চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব(২) ।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত(৩) তার হকদারকে

সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল । আর কেউ কেউ রাসূলের পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখছিল । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে । হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে । যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও । সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে । [ইবন কাসীরঃ ১/৫১৪]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে এর ছায়ায় যদি কোন আরোহণকারী ভ্রমণ করতে চায় তাহলে একশত বছর ভ্রমণ করতে পারবে । তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পড়তে পার "আর সম্প্রসারিত ছায়া" [সূরা আল ওয়াকি'য়াঃ ১৩০, বুখারীঃ ৩২৫২]

(৩) আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা

রয়েছে। তা হল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবা করাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হত। কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজের মওসূমে হাজীদেরকে 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সিকায়া'। অনুরূপই কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবন তালহার উপর। এ ব্যাপারে স্বয়ং উসমান ইবন তালহার ভাষ্য হল এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহ্‌র দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে গেলে উসমান (যিনি তখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে উসমানের কটুক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে উসমান! হয়ত তুমি এক সময় বায়তুল্লাহ্‌র এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। উসমান ইবন তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কুরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তা নয়। তখন কুরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করলেন। (উসমান বললেন) তারপর আমি যখন আমার মনের ভিতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলিম হয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলিম হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। [দেখুন- তাবরানীঃ ১১/১২০]

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ফিরিয়ে দিতে[১]। তোমরা যখন | حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি - 'যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার দ্বীন নেই'। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫] তাছাড়া আমানতদারী না থাকা মুনাফেকীর একটি আলামত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে। [বুখারীঃ ৩৩; মুসলিমঃ ৫৯]

(১) এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনুল কারীম আমানতের বিষয়টিকে أمانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে উপরে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্‌র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্‌র খেদমতের একটা পদের নিদর্শন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমানতের গুরুত্ব লক্ষ্য করে এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ সমস্ত গোনাহের কাফফারা হলেও আমানতের কাফফারা হয় না। জিহাদে শহীদ ব্যক্তিকে সেদিন হাজির করে বলা হবে, আমানত আদায় কর, সে বলবে, কোত্থেকে তা আদায় করব? দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেছে। তখন তাকে হাবীয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। সে সেখানে গেলে আমানতকে যেদিন ত্যাগ করেছিল সেদিনের রূপে দেখতে পাবে। সে তখন তা ধরে কাধে নিয়ে আসতে চাইবে, যখনি সেখান থেকে সে বের হতে যাবে, তখন আমানত পালিয়ে যাবে, আর এভাবে সে আমানতের পিছনে সবসময় ছুটতে থাকবে। তারপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরোক্ত আয়াত পাঠ করলেন। [আল-মাতালিবুল আলীয়া, হিলইয়াতুল আউলিয়া, মাকারিমুল আখলাক] এ আমানতের পরিচয় সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন, যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা সবই আমানত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে[১]। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট[২]! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[৩]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ

৫৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের

---

(১) এ আয়াতে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। প্রথমতঃ প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হল আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি দ্বীন ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সংগত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, শাসনকতৃপক্ষের উপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে বিচার করা, আমানত আদায় করা। যদি তারা সেটা করে তবে জনগনের উপর কর্তব্য হবে তার কথা শোনা, আনুগত্য করা, তার আহ্বানে সাড়া দেয়া। [তাবারী]

(২) এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত নীতিমালা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

(৩) এ আয়াতের তাফসীর ইমাম আবু দাউদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি তার কানের উপর রাখলেন এবং পরবর্তী আঙ্গুলটি রাখলেন তার চোখের উপর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চোখ ও কান রয়েছে। [আবু দাউদ: ৪৭২৮]

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের[১], অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

নবম রুকূ'

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ

৬০. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল

---

(১) 'উলুল আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা, মুজাহিদ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমাল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্সিরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে 'উলুল আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তারাই হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। তাদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। মুফাস্সিরীনের অপর এক জামা'আত-যাদের মধ্যে আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন-বলেছেন যে, 'উলুল আমর' এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। ইমাম সুদ্দী এ মত পোষণ করেন। এছাড়া তাফসীরে ইবন কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। আল্লামা আবু বকর জাস্সাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, 'উলুল আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল আমর' বলতে ফকীহ্গণকে বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, أُولُوا الْأَمْرِ (উলুল আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহ্গণের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দু'টি প্রেক্ষিত রয়েছে। (এক) জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। (দুই) বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্গণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগে মুসলিমদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। দ্বীনী ব্যাপারে সাধারণ মুসলিমগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরী'আতের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও 'উলুল আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে।

يَّتَحَاكَمُوٓا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَنْ يَّكْفُرُوا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

৬১. তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন[১]।

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

৬২. অতঃপর কি অবস্থা হবে, যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন মুসীবত হবে? তারপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে আপনার কাছে এসে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছুই চাইনি।'

---

(১) অর্থাৎ তারা রাসূলের কাছে আসার ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অনীহা ব্যক্ত করেছে। এটা তাদের অহংকারেরই ফলশ্রুতি। তাদের এ অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতেও বলেছেন, "আর তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর।' তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।" [সূরা লুকমান:২১] মোট কথা: এখানে বলা হয়েছে যে, পারস্পারিক বিবাদ-বিসংবাদের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়। এরা এমন লোক, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রাসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফেক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। মুমিনরা কখনো এধরনের কাজ করতে পারে না। তাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুমিনদের উক্তি তো এই---যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।" [সূরা আন-নূর:৫১]

৬৩. এরাই তারা, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ্ তা জানেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে- এমন কথা বলুন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

৬৪. আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র আনুগত্য করার জন্যই আমরা রাসূলদের প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে[১]।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

৬৫. কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের[২] বিচার

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا

---

(১) ৬১ নং আয়াত থেকে এ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূল যদি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ্‌কে তারা ক্ষমাশীল পাবে। এ আয়াতটি মুনাফিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং রাসূলের জীবদ্দশায়ই তাঁর পক্ষে তাদের কথা শোনা ও তাদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব। রাসূলের মৃত্যুর পর তার কবরের কাছে এসে এ আয়াত তেলাওয়াত করে রাসূলের কাছে দো'আ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও শির্ক। অনুরূপভাবে রাসূলের মৃত্যুর পর তার কবরের কাছে এসে আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য দো'আ করা বা ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করা বেদ'আত ও শির্কের মাধ্যম। সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'য়ীন, হেদায়াতের ইমামগণ যেমন ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ সহ কেউই এ ধরনের কাজ করেন নি। তারা এটাকে জায়েয মনে করতেন না। কোন কোন কবরপুজারী কিছু কাহিনী রটনা করে এর সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে মানুষের ঈমান নষ্ট করার পাঁয়তারা করতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের বলেন, আনসারী এক ব্যক্তির সাথে খেজুর গাছে পানি দেয়া

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে(১) এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়(২)।

নিয়ে তার ঝগড়া হয়। আনসারী বলল, পানির পথ পরিস্কার করে দাও যাতে তা আমার জমির উপর যায়। যুবায়ের তা দিতে অস্বীকার করলে তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শালিসের জন্য আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনে বললেনঃ 'যুবায়ের তুমি তোমার জমিতে পানি দেয়ার পর তোমার পড়শীর জমিতে পানি দিয়ে দিও। লোকটি তা শুনে বলল, আপনার ফুফাত ভাই তো তাই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল এবং তিনি বললেন, যুবায়ের তুমি তোমার জমিতে পানি দেয়ার পর তা দেয়াল পর্যন্ত আটকে রাখ। যুবায়ের বলেন, আল্লাহ্র শপথ, আমার মনে হয় এ আয়াতটি এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। [বুখারীঃ ২৩৫৯, ২৩৬০, মুসলিমঃ ২৩৫৭] এ দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাসূলের আদেশ-নিষেধ নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া শুধু আচার অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আকীদা এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক। অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পারিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এবং তার অবর্তমানে তার প্রবর্তিত শরী'আতের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয।

(১) এতে এ কথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দূর্বলতার লক্ষণ। উদাহারণতঃ যে ক্ষেত্রে শরী'আত তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে যদি কেউ সম্মত না হয় তবে একে পরহেযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে সালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে সালাত আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত।

(২) এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির

৬৬. আর যদি আমরা তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর বা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাদের অল্প সংখ্যকই তা করত[১]। যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾

৬৭. আর অবশ্যই তখন আমরা তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করতাম।

وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

মস্তিস্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে রাসূলের কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল হিসেবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তার শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিস্পাপ রাসূল, রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু ব্যক্তিত্ব। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে, কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেয়া উচিত এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মনে রাখতে হবে যে, কুরআনের বাণী ও রাসূলের হাদীসসমূহের উপর আমল করা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরী'আতের মীমাংসাই হল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কিয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবেই বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর প্রবর্তিত শরী'আতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

(১) কাতাদা বলেন, এখানে ইয়াহূদীদেরকেই বলা হচ্ছে। যেমনিভাবে তাদের পুর্বপুরুষদের তাওবা কবুলের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাদের নিজেদের হত্যা করার নির্দেশ ছিল, তেমনি নির্দেশ যদি তাদের জন্যও আসত, তবে তারা তা অবশ্যই অমান্য করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

৬৮. এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

৬৯. আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক[১] (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ[২]- যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী[৩]!

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

---

(১) সিদ্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে পরম সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তার মধ্যে সততা ও সত্যপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। নিজের আচার আচরণ ও লেনদেনে সে হামেশা সুস্পষ্ট ও সরল-সোজা পথ অবলম্বন করে। সে সবসময় সাচ্চাদিলে হক ও ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সে পর্বত সমান অটল অস্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাও দেখায় না। সে এমনই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু, আপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্লজ্জ ও নিখাদ সত্যপ্রীতি, সত্য-সমর্থন ও সত্য-সহযোগিতা ছাড়া আর কিছুরই আশংকা করে না। কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা তাদের মনে কখনও স্থান পায় না। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমূখ।

(২) সালেহীন বা সৎকর্মশীল বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর সাথে নিজের জীবনে সৎ ও সুনীতি অবলম্বন করে। আর যারা প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের অনুবর্তী।

(৩) জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। জান্নাতীদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাদেরকেই বলা হয় সিদ্দীকীন। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন সালেহীনদের সাথে। সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা সুদূর দিগন্তে নক্ষত্রকে দেখ। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা কি শুধু নবী-রাসূলগণ? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অবশ্যই না, এমন কিছু

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝٧٠

৭০. এগুলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

দশম রুকূ'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝٧١

৭১. হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর; তারপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও

লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নবী-রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।' [বুখারীঃ ৩২৫৬, মুসলিমঃ ২৮৩১] তাই যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চাইবে, তাদেরকে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার মাধ্যমেই লাভ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন গোষ্ঠীর ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি?' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা, তার সাথে থাকবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাঁদের গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও তাঁর সাথেই থাকবেন। [বুখারীঃ ৬১৬৭, মুসলিমঃ ২৬৩৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার নিজের আত্মার চেয়েও প্রিয়। আপনি আমার নিকট আমার পরিবার-পরিজন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততিদের থেকেও প্রিয়। আমি আমার ঘরে অবস্থানকালে আপনার কথা স্মরণ হলে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখি ততক্ষণ স্থির থাকতে পারি না। যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি তখন বুঝতে পারি যে, আপনি নবীদের সাথে উঁচু স্থানে অবস্থান করবেন। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করি তবে আপনাকে দেখতে না পাওয়ার আশংকা করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীর কথার তাৎক্ষনিক কোন জওয়াব দিলেন না। শেষ পর্যন্ত জিবরীল আলাইহিস সালাম এ আয়াত নাযিল করলেন।' [আল-মু'জামুস সাগীর লিত তাবরানী ১/২৬; মাজমা'উদ যাওয়ায়িদ ৭/৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি শুনেছিলাম যে, নবীদেরকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়া ও আখেরাত যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থতার পর মারা গেলেন, সে অবস্থায় তার মুখ থেকে এ আয়াত শুনতে পেলাম। তখন আমি বুঝলাম যে, তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আর তিনি আখেরাত বেছে নিয়েছেন।" [বুখারী: ৪৪৩৫; মুসলিম: ২৪৪৪]

অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও[১]।

৭২. আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সঙ্গে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

৭৩. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম[২]।'

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

(১) আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বেশকিছু শিক্ষা রয়েছে - (১) কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। (২) অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। (৩) এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃংখল নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বাহির হবেনা, বরং ছোট ছোট দলে বাহির হবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বাহির হবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

(২) মুজাহিদ বলেন, এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে যাদেরকে বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে, মুনাফিক। যারা সাহাবাদের সাথে মিশে থাকত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] যুদ্ধের ঘোষণা শোনার সথে সাথেই তাদের মধ্যে গড়িমসি শুরু হত। এরপর যদি মুসলিমদের কোন বিপদ হতো, তখন তারা বলত যে, তাদের সাথে না থাকাটা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আশীর্বাদস্বরূপ। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ অবস্থায় তারা খুশীও প্রকাশ করত। আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়।" [সূরা আলে-ইমরান:১২০]

৭৪. কাজেই যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক। আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করলে সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমরা তো তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৭৫. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী[১] এবং শিশুদের

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ

"আপনার মংগল হলে তা ওদেরকে কষ্ট দেয় এবং আপনার বিপদ ঘটলে ওরা বলে, 'আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' এবং ওরা উৎফুল্ল চিত্তে সরে পড়ে" [আত-তাওবাহ:৫০] পক্ষান্তরে যখন মুসলিমদের কোন বিজয়ের কথা শুনত, তখন তারা বোল পাল্টিয়ে ফেলত যাতে করে যুদ্ধলব্দ সম্পদে ভাগ বসাতে পারে। যদিও মুসলিমদের বিজয় তাদের মনের জ্বালা বাড়িয়ে দেয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলিম রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করেছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যেমন ইবন আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবন হিশাম, ওলীদ ইবন ওলীদ, আবু জান্‌দাল ইবন সাহ্‌ল প্রমূখ। এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দো'আ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। 'ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি ও আমার মা অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম' [বুখারী: ৪৫৮৭]
এ আয়াতে মুমিনরা আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে দু'টি বিষয়ে দো'আ করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই(মক্কা) নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করুন এবং দ্বিতীয়টি হলো, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠান। আল্লাহ্‌ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই

وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের রব! এ জনপদ---যার অধিবাসী যালিম, তা--- থেকে আমাদেরকে বের করুন; আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে অভিভাবক করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করুন ।'

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

৭৬. যারা মুমিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে[১] । কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল[২] ।

রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাব ইবন উসায়দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন । অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন । আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাঁদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি । আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পিছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা । মুসলিমগণকে জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরীর কথাই ঘোষণা করা হয়েছে ।

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে । আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে । সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে যে, আমি আল্লাহ্‌র পথেই এ কাজ করছি । তার নির্দেশ ও নিষেধকে বাস্তবায়নই আমার জীবনের লক্ষ্য । কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈচাশিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শির্কী বিস্তার লাভ করতে পারে । আর কুফরী ও শির্কী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে ।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল । ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না । অতএব মুসলিমগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয় । তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা । পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না । এ আয়াতে শয়তানের

এগারতম রুকূ'

৭৭. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর[১] এবং যাকাত দাও[২]?' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তারচেয়েও বেশী এবং বলল, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদেরকে কিছু দিনের অবকাশ কেন দিলেন না[৩]?'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্খা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। এ দু'টি শর্তের যেকোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

(১) ইমাম যুহরী বলেন, সালাত কায়েম করার অর্থ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রত্যেকটিকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং তার কয়েকজন সাথী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন আমরা সম্মানিত ছিলাম। কিন্তু যখন ঈমান আনলাম তখন আমাদেরকে অসম্মানিত হতে হচ্ছে। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'আমি ক্ষমা করতে নির্দেশিত হয়েছি, সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো না। তারপর যখন আল্লাহ্ তাকে মদীনায় হিজরত করালেন এবং যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হল তখন তাদের কেউ কেউ যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ৩০৮৬; মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৬৭, ৩০৬]

(৩) সুদ্দী বলেন, তারা 'কিছু দিনের অবকাশ' বলে মৃত্যু পর্যন্ত সময় চাচ্ছিল। অর্থাৎ তারা যেন বলছে যে, তাদের মৃত্যু হয়ে গেলে তারপর এ আয়াত নাযিল হওয়ার দরকার ছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

বলুন, 'পার্থিব ভোগ সামান্য[১] এবং যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখেরাতই উত্তম[২]। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।'

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও[৩]। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আপনার কাছ থেকে[৪]।' বলুন, 'সবকিছুই আল্লাহ্‌র

(১) হাসান বসরী এ আয়াত পাঠ করে বলেন, ঐ বান্দাকে আল্লাহ্ রহমত করুন, যে দুনিয়াকে এ আয়াত অনুযায়ী সঙ্গী বানিয়েছে। দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উদাহরণ হচ্ছে, সে ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি ঘুম দিল, ঘুমের মধ্যে সে কিছু ভাল স্বপ্ন দেখল, তারপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে:
দুনিয়ার নেয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নেয়ামত অধিক।
দুনিয়ার নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের নেয়ামত অনন্ত-অফুরন্ত।
দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।
দুনিয়ার নেয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত। [তাফসীরে কাবীর]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরী'আত বিরুদ্ধ নয়। [কুরতুবী]

(৪) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে কল্যাণ দ্বারা বদরের যুদ্ধে বিজয় ও গনীমত লাভ বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অকল্যাণ দ্বারা ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ সংঘটিত হয়েছিল, যাতে রাসূলের চেহারা মুবারকে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দাত ভেঙ্গে গিয়েছিল তা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

কাছ থেকে[১] ।' এ সম্প্রদায়ের কি হল যে, এরা একেবারেই কোন কথা বুঝে না!

৭৯. যাকিছু কল্যাণ আপনার হয় তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে[২] এবং যাকিছু অকল্যাণ আপনার হয় তা আপনার নিজের কারণে[৩] এবং আপনাকে

مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় । কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাল কাজ হলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর মন্দ কাজ হলে তা বান্দার পক্ষ থেকে । এর কারণ হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা দু'প্রকার, (এক) সৃষ্টিগত সাধারণ ইচ্ছা, যার সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকা বাধ্যতামূলক নয় । (দুই) শরী'আতগত বিশেষ ইচ্ছা, যার সাথে সন্তুষ্ট থাকা অবশ্য জরূরী । আলোচ্য এ আয়াতে আল্লাহ্‌র সাধারণ ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কিছুই হয় না । কিন্তু খারাপ কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকে না । তিনি শুধু ভাল কাজেই সন্তুষ্ট হন । খারাপ পরিণতি বান্দার কর্মকাণ্ডের ফল । বান্দা যখন খারাপ কাজ করে তখন আল্লাহ্ তা হতে দেন যদিও তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না । এর বিপরীতে বান্দা যখন ভাল কাজ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা হতে দেয়ার পাশাপাশি তাতে সন্তুষ্টও হন । সুতরাং বুঝা যাচ্ছে খারাপ পরিণতির দায়-দায়ীত্ব কেবল বান্দার দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা যাবে, আল্লাহ্‌র দিকে সম্পর্কযুক্ত করা জায়েয নেই । [মাজমু' ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ]

(২) আয়াতে 'হাসানাহ্'-এর দ্বারা নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে । এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নেয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয় । মানুষ যত ইবাদাত-বন্দেগীই করুক না কেন, তাতে সে কোন নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না । কারণ, 'ইবাদাত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই লাভ হয় । তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই । এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত 'ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের 'ইবাদাত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্ তা'আলার শান মোতাবেক না হয়? অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ।' বলা হল, 'আপনিও কি যেতে পারবেন না'? তিনি বললেন, 'না আমিও না' । [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬]

(৩) বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম । মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার

আমরা মানুষের জন্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছি[১]; আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৮০. কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল[২], আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাই নি।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আযাব এর চাইতেও বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে তার মুক্তির কারণ। অথবা তার জন্য পদমর্যাদা বৃদ্ধির সোপান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন মুসলিমের উপর যে বিপদই আপতিত হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহের কাফ্ফারা করে দেন। এমনকি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।' [বুখারীঃ ৫৩২৪, মুসলিমঃ ২৫৭২]

(১) আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রাসূল ছিলেন না, বরং তাঁর রেসালাত ছিল সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। তারা তখন উপস্থিত থাকুক বা না-ই থাকুক। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যে অস্বীকার করেছে (সে জান্নাতবাসী হতে পারবে না)। জিজ্ঞাসা করা হলঃ কে অস্বীকার করেছে, হে রাসূল! উত্তরে বললেনঃ যে আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল না, সে অস্বীকার করল। [বুখারীঃ ৭২৮০] অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে আমার আনুগত্য করল সে অবশ্যই আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্র অবাধ্য হল। অনুরূপভাবে যে ক্ষমতাসীনের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ক্ষমতাসীনের অবাধ্য হলো সে আমার নাফরমানী করলো। ইমাম বা শাসক তো ঢালস্বরূপ, যার পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায় এবং যার দ্বারা বাঁচা যায়। যদি ইমাম বা শাসক আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেন এবং ইনসাফ করেন তা হলে সেটা তার জন্য সওয়াবের কাজ হবে। আর যদি অন্য কিছু করেন তবে সেটা তার উপরই বর্তাবে। [বুখারীঃ ২৯৫৭, মুসলিমঃ ১৮৩৫]

৮১. আর তারা বলে, 'আনুগত্য করি'; তারপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায় তখন রাতে তাদের একদল যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা যা রাতে পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করুন; আর কাজ উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট[১]।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

৮২. তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত[২]।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

---

(১) মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষকে হেদায়াতের জন্য দাওয়াত দেবে তাদেরকে নানারকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্বেও সে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ তারা কৃতকার্য হবেই।

(২) পবিত্র কুরআনে কোন একটি বিষয়েও অসংগতি নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্র কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ক্রটি, না আছে তাওহীদ, কুফর, কিংবা হালাল-হারামের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়েবী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কুরআনের ধারাবাহিকতার কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি

৮৩. যখন শান্তি বা শংকার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে(১)। যদি তারা তা রাসূল(২) এবং তাদের মধ্যে যারা নির্দেশ প্রদানের অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত(৩)। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষা-বিবৃতি ও রচনা-সংকলনে পরিবেশের কমবেশী প্রভাব অবশ্যই থাকে - আনন্দের সময় তা এক ধরণের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্যরকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় অন্য রকম। কিন্তু কুরআন এ ধরণের যাবতীয় ক্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। আর এটাই হলো কালামে-ইলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১) এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন শ্রুত কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শ্রুত কথা প্রচার করে।' [মুসলিম: ৫] অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেনঃ 'যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী'। [তিরমিযী: ২৬৬২; ইবন মাজাহ: ৩৮; মুসনাদে আহমাদ ৪/২৫৫]

(২) আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অপরজন হচ্ছেন, 'উলুল আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত'। আর এই নির্দেশটি অত্যন্ত ব্যাপক। রাসূল ও আলেম সমাজ এর আওতাভুক্ত।

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কুরআন তার একাংশ অপরাংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নাযিল হয়নি, বরং এর একাংশ অপরাংশের সত্যতা নিরূপন করে। সুতরাং তোমরা এর মধ্যে যা বুঝতে পার তার উপর আমল কর আর যা বুঝতে পারবে না সেটা যারা বুঝে তাদের হাতে ছেড়ে দাও। [ইবন মাজাহঃ ৮৫, মুসনাদে আহমাদ ২/১৮১]

ও রহমত না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।

৮৪. কাজেই আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন[১] এবং মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন[২], হয়ত আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি সংযত করবেন। আর আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে[৩]।

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾

---

(১) এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহ দানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশংকা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে - "আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।" অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্ তা'আলার সমর্থন রয়েছে, যার সমর শক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কিয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

(২) কিসে উদ্বুদ্ধ করা হবে, তা এ আয়াতে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে এসেছে, 'আর আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করুন'। [সূরা আল-আনফাল:৬৫]

(৩) এ আয়াতে 'শাফা'আত' অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর

আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর নজর রাখেন[১]।

এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালোও নয়। আরো বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও সওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এই উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে। এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহ্গার হবে। তবে সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায়।' [মুসলিমঃ ১৮৯৩] এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ্। এ সবই হচ্ছে দুনিয়ার সুপারিশের বিষয়। আখেরাতের সুপারিশের আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

(১) আভিধানিক দিক দিয়ে مُقِيْتٌ শব্দের অর্থ তিনটিঃ (এক) শক্তিশালী, সংরক্ষক ও ক্ষমতাবান, (দুই) উপস্থিত ও দর্শক এবং (তিন) রুযী বন্টনকারী। উল্লেখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক। কে কোন নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে করে, তিনি সে সবই জানেন। তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুযী বন্টনের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার। যার জন্য যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য। হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে। তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক।' [১৪৩২, মুসলিমঃ ২৬২৭] এ কারণেই কুরআনুল কারীমের

৮৬. আর তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা সেটারই অনুরূপ করবে[১]; নিশ্চয়ই আল্লাহ্

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন -আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক। তবে অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাঁদী বারীরা দাসী অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার স্বামী মুগীছের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান। মুগীছ বারীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীছকে গ্রহণ করার জন্য বারীরার কাছে সুপারিশ করেন। বারীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বারীরা জানতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিস্কার ভাষায় বললেনঃ তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করবো না। [বুখারীঃ ৪৯৭৯]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সালাম ও তার জবাবের আদব বর্ণনা করেছেন। মূলত: 'আস-সালাম' শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। যার অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তার আধার। বান্দা যখন এ কথা বলে তখন সে তার ভাইয়ের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও হেফাযত কামনা করে। সে হিসেবে 'আস-সালামু আলাইকুম' এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষক। সালামের উৎপত্তি সম্পর্কে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেন তখন তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করে বললেন, যাও, ফেরেশ্তাদের অবস্থানরত দলকে সালাম করো এবং মন দিয়ে শুনবে, তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। সুতরাং আদম 'আলাইহিস্ সালাম গিয়ে বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশ্তাগণ জবাব দিলেন- ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ফেরেশ্তাগণ ওয়া রাহমাতুল্লাহ বৃদ্ধি করলেন। তারপর যারা জান্নাতে যাবে তারা প্রত্যেকেই আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েই আসছে। [বুখারীঃ ৬২২৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক লোক এসে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, রাসূল তার সালামের জবাব

দিলেন। তারপর লোকটি বসল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ দশ। তারপর আরেকজন এসে বললঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ বিশ। তারপর আরও একজন এসে বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ ত্রিশ। [আবু দাউদঃ ৫১৯৫, তিরমিযীঃ ২৬৮৯]

এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, ইসলামী অভিবাদন অন্যান্য জাতির অভিবাদন থেকে উত্তম। জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পারিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন জাতির অভিবাদন ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা - সবাই আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি 'ইবাদাত এবং মুসলিম ভাইকে আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে। মোট কথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা, (১) এটি আল্লাহ্র একটি নাম। তাছাড়া এতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র, (২) আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয়া, (৩) মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরকে ভালবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না। আমি কি তোমাদেরকে একটা বিষয় শিক্ষা দিব, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।' [মুসলিমঃ ৫৪] (৪) মুসলিম ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দো'আ এবং (৫) মুসলিম ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ্ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলিম'। [বুখারীঃ ১৫; মুসলিমঃ ৪১] অমুসলিমরা কেউ যদি মুসলিমদেরকে সালাম দেয় তবে তার উত্তরে 'ওয়া আলাইকুম' পর্যন্ত বলতে হবে। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তবে ভালো পাবে, আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে বলে, তবে এটা তার জন্য বদ দো'আর কাজ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইয়াহূদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা প্রত্যোত্তরে 'ওয়া আলাইকুম' বা তোমাদের উপরও অনুরূপ

সবকিছুর হিসেব গ্রহণকারী[১]।

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই; অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্র করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।[২] আর আল্লাহ্র চেয়ে বেশী সত্যবাদী কে? [৩]

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

বারতম রুকূ'

৮৮. অতঃপর তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফেকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন[৪]। আল্লাহ্ যাকে

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

হোক এ কথাটি বলবে, কেননা তারা তোমাদের মৃত্যুর দো'আ করে থাকে। [বুখারী: ৬২৫৭; মুসলিম: ২১৬৪] তাছাড়া সালাম যেহেতু মুসলিমদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, সেহেতু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য তা প্রয়োগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে সালাম দিও না; যদি তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তবে তাকে সংকীর্ণ পথে চলে যেতে বাধ্য করবে'। [মুসলিম: ২১৬৭]

(১) অর্থাৎ মানুষ এবং ইসলামী অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জবাব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোরও হিসাব নেবেন।

(২) আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তাঁকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর 'ইবাদাতের নিয়তে কর। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সওয়াব সব সত্য।

(৩) কেননা এ সংবাদ আল্লাহ্র দেয়া। আল্লাহ্র চাইতে কার কথা সত্য হতে পারে? তিনি নিজে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি আরও ঘোষণা করছেন যে, তিনি সবাইকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। সুতরাং এ তাওহীদ ও আখেরাতের ব্যাপারে কারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত হবে না।

(৪) যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আর আল্লাহ্ কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না[১]।

৮৯. তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই আল্লাহ্র পথে হিজরত[২] না করা পর্যন্ত তাদের

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا

ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদের যুদ্ধে বের হলেন তখন তার সাথীদের মধ্য থেকে কিছু লোক ফিরে চলে আসলেন। তাদের ব্যাপারে সাহাবাগণ দ্বিমত পোষণ করলেন। কেউ বললেন হত্যা করব, কেউ বললেন হত্যা করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এই মদীনা নগরী কিছু মানুষকে দেশান্তর করে যেমনিভাবে আগুন দূর করে লোহার ময়লাকে। [বুখারীঃ ১৮৮৪, ৪০৫০, ৪৫৮৯, মুসলিমঃ ১৩৮৪, ২৭৭৬]

(১) এ আয়াতে যেভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেছেন, তাদের জন্য পথের দিশা পাওয়ার কোন উপায়ই অবশিষ্ট নেই। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা স্পষ্ট বলেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্র কাছে আপনার কিছুই করার নেই। এরাই হচ্ছে তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪১] অন্য আয়াতে এসেছে, "আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৬]

(২) হিজরত দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়- (১) দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা, যেমন সাহাবায়ে কেরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হিজরত হচ্ছে নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয ছিল। এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করতো, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। হিজরত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'যতদিন তাওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে'। [আবু দাউদঃ ২৪৭৯] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, বর্তমানেও যদি কোন দেশে মুসলিমরা তাদের ঈমান টিকিয়ে রাখতে সামর্থ না হয়, তাদেরকে সেখান থেকে

وَّلَا نَصِيْرًا

মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে আর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না।

إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ أَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ أَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا

৯০. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ফলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۗ كُلَّمَا رُدُّوْٓا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا إِلَيْكُمُ

৯১. তোমরা আরো কিছু লোক অবশ্যই পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চাইবে। যখনই তাদেরকে ফিত্নার দিকে

হিজরত করতে হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার হিজরত হচ্ছে, পাপকর্ম ত্যাগ করা। যেমন, এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৯৯] এ হিজরত সর্বাবস্থায় একজন মুমিনের কর্তব্য। এর জন্য দেশ ত্যাগের প্রয়োজন পড়ে না।

السَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

মনোনিবেশ করানো হয় তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে। আর আমরা তোমাদেরকে এদের বিরুদ্ধাচারণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি[১]।

---

(১) উপরোক্ত ৮৮ থেকে ৯১ আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যাবে।

প্রথম বর্ণনাঃ তাফসীরকার মুজাহিদ বলেন, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলিম; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা দ্বীনত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফের, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাহ্ তা'আলা ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতে এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন। [তাবারী] কাতাদা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এরা ছিল তিহামার একটি গোত্র, তারা রাসূলকে বলল যে, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করব না, আমাদের কাওমের সাথেও যুদ্ধ করব না। তারা রাসূল ও তাদের কাওমের যুগপৎ নিরাপত্তা চাচ্ছিল। তাদের অবস্থা বুঝে আল্লাহ্ তা'আলা তা মানতে অস্বীকার করেন। [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

দ্বিতীয় বর্ণনাঃ হাসান বসরী বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবন মালেক মুদলাজী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানালো, আমাদের গোত্র বনী-মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি খালেদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে পাঠালেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এইঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবো না। কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেলে আমরাও মুসলিম হয়ে যাবো। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ নং আয়াত নাযিল হয়।

তেরতম রুকূ'

৯২. কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়(১), তবে ভুলবশত

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ

তৃতীয় বর্ণনাঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, ৯১ নং আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করতো এবং স্বগোত্রের কাছে বলতো আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলিমদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের দ্বীনে আছি।
মোটকথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লেখিত হয়েছেঃ এক. মুসলিম হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হারবে চলে যায়। দুই. যারা স্বয়ং মুসলিমদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে। তিন. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।
প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের আওতা বহির্ভুত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

(১) হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয়তো মুসলিম, কিংবা যিম্মী, অথবা চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত, নতুবা দারুল হারবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দু'প্রকারঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভুলবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটিঃ (এক) মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলিমকে ভুলবশতঃ হত্যা, (তিন) যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা (সাত) হারবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা এবং (আট) হারবী কাফেরকে ভুলবশতঃ হত্যা। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান হচ্ছে, কিসাস ওয়াজিব হওয়া। যা সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৮] আর আখেরাতে এর পরিণতি সূরা আন-নিসা এর ৯৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ভুলবশতঃ মুমিনকে হত্যার বর্ণনা আলোচ্য সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতে এসেছে। অর্থাৎ দিয়াত দিতে হবে। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম কি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যার শাস্তি সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেটারও দিয়াত দিতে হবে। পঞ্চম প্রকার অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ইচ্ছাকৃত

مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ
أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

করলে সেটা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দু মাস সিয়াম পালন করবে[১]। তাওবাহ্‌র

হত্যা। এর হুকুম সূরা আন-নিসার ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূলত: তাদের এবং যিম্মীদের হুকুম একই। কেননা, ৯০ নং আয়াতে উল্লেখিত مِّيثَٰقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মী ও অভয়প্রাপ্ত কাফের এর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে জানা গেছে। কেননা, জিহাদে দারুল হারবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করা হয়। অতএব, ভুলবশতঃ হত্যার বৈধতা আরো সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।

(১) কিসাস ও দিয়াতের বিধান সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে হত্যা কয়েক প্রকারঃ প্রথম প্রকার عَمَدٌ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এমন অস্ত্র দ্বারা, যা দ্বারা হত্যা করা যায়। এ ধরনের হত্যার শাস্তি হচ্ছে কিসাস। দ্বিতীয় প্রকার شِبْهُ عَمَدٍ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এইঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার خطأ অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভুল হওয়া। যেমন দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হারবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভুলবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভুল বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ' উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে

জন্য এগুলো আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯৩. আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন(১)।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময়ও একশ' উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে। কাফ্‌ফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজিব। শরী'আতের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলাহ্' বলা হয়। এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরণের উচ্ছৃংখল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ক্রুটি করবে না। এর বাইরে অন্য এক প্রকার হত্যা রয়েছে। যাকে কোন কোন ফকীহ ভুলের পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। যেমন, কেউ কূপ এমন স্থানে খনন করলো যে, একজন তাতে পড়ে মারা গেল। এর বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যখন সূরা আল-ফুরকানের এ আয়াত নাযিল হল "আর তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।" [আয়াতঃ ৬৮] তখন মক্কার মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা তো আল্লাহ্‌র হারাম করা আত্মাকে হত্যা করেছি, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য ইলাহ্‌কেও ডেকেছি এবং ব্যভিচারও করেছি। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন "তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে" সুতরাং এই আয়াতটুকু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাদের কথা পূর্বে এসেছে। কিন্তু সূরা আন-নিসার আয়াত "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" এখানে ঐ লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে ইসলামকে ভালভাবে জানল, শরী'আতকে বুঝল, তারপর কোন

৯৪. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করবে তখন যাচাই-বাছাই করে নেবে[১] এবং কেউ তোমাদেরকে

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

মুমিনকে হত্যা করল- তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। [বুখারীঃ ৩৮৫৫, ৪৭৬৪-৪৭৬৬, মুসলিমঃ ৩০২৩] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা আরো বলেনঃ এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। একে কোন কিছু রহিত করেনি। [বুখারীঃ ৪৫৯০, মুসলিমঃ ৩০২৩] এতে বুঝা যায় যে, আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মত হল, যদি কেউ কোন মুমিনকে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তবে তার শাস্তি জাহান্নাম অবধারিত। আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেছেনঃ একজন মুমিন ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে মুক্তির সুযোগের মধ্যে থাকে যতক্ষন সে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা না করে। [বুখারীঃ ৬৮৬২] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের হত্যাকারীর জন্য তাওবাহ কবুল করতে আমার নিকট অস্বীকার করেছেন'। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহঃ ৬/১৬৩, নং-২১৬৪] অন্য হাদীসে এসেছে, আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন দু মুসলিম তাদের অস্ত্র নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয় তখন হত্যাকারী ব্যক্তি ও হত্যাকৃত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী। আবু বাকরাহ বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট, কিন্তু হত্যাকৃত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি জবাব দিলেন যে, সে তার সাথীকে হত্যা করার লালস করছিল। [বুখারীঃ ৬৮৭৫, মুসলিমঃ ২৮৮৮] হাদীসে আরো এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হবে মানুষের রক্তক্ষরণ তথা হত্যার ব্যাপারে। [বুখারীঃ ৬৮৬৪, মুসলিমঃ ১৬৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হত্যাকারী কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীর মাথা ধরে রাখবে এবং বলবেঃ হে রব! আপনি একে প্রশ্ন করুন, কেন আমাকে হত্যা করেছে? [ইবন মাজাহঃ ২৬২১, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪০]

(১) আয়াতের এ বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলিমরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হচ্ছে- তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিমরূপে পরিচয় দেয়, কালেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলিম মনে করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলিমদের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলিম হয়েছে না কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে

تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

সালাম করলে ইহ জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও[১]', কারণ আল্লাহ্‌র কাছে

প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামী স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলিমই বলা হবে। তার সাথে মুসলিমের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কালেমাও উচ্চারণ করে, অথবা প্রতিমাকে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেয়া হবে। তবে তাকে এ ব্যাপারে শরী'আতের জ্ঞান দিতে হবে এবং তার যদি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে, সে সন্দেহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপরই কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলিম বলতো। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কালেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্'ও উচ্চারণ করতো। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবী করতো, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে দ্বীনত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়। তবে শর্ত এই যে, ঐ লোকের কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। আর তাকে সেটা জানাতে হবে এবং তার সন্দেহ থাকলে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে অপনোদন করতে হবে।

(১) এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলিম বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলিমের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলাইমের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলিম। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলো যে সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তাঁরা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করলেন।

فَتَبَيَّنُوْا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো আগে এরূপই ছিলে[১], তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কাজেই তোমরা যাচাই-বাছাই করে নেবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ

৯৫. মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়[২]। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে, যারা

এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিওনা। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৩৫, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২২৯, ২৭২, ৩২৪, তিরমিযীঃ ৩০৩০]

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দু'টি ঘটনা ছাড়া আরো দু'টি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি নাযিলের কারণ হতে পারে।

(১) অর্থাৎ তোমাদেরও আগে এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। যুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন-যাপনের সুবিধা ভোগ করছ। কাফেরদের মুকাবেলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছ। কাজেই যেসব মুসলিম এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধা দানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে, তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

(২) বারা' ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন নাযিল হল "মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়" তখন আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূম এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো অন্ধ। তখন নাযিল হল "যারা অক্ষম নয়"-এ অংশটুকু। [বুখারীঃ ২৮৩১, ৪৫৯৩, মুসলিমঃ ১৮৯৮]

اللهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন[১]; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬. এসব তাঁর কাছ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

চৌদ্দতম রুকূ'

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۚ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۚ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;' তারা বলে, 'আল্লাহ্র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে[২]?' এদেরই

(১) আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহ্কে রব হিসাবে মেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবু সাঈদ এটা শুনে আশ্চার্য হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আবার বলুন। রাসূল তাই করলেন। তারপর বললেনঃ 'আরো কিছু কাজ রয়েছে, যার দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা উন্নত করা হয়, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মত। তিনি বললেন, সেটা কি? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূল বললেনঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। [মুসলিমঃ ১৮৮৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতের একশত স্তর রয়েছে, দু'স্তরের মাঝখানের দূরত্ব শত বৎসরের' [তিরমিযীঃ ২৫২৯]

(২) হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস[1]!

৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না।

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

(এক) হিজরতের ফযীলত, (দুই) হিজরতের দুনিয়া ও আখেরাতের বরকত ও (তিন) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফযীলতঃ এ বিষয়ে সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ -অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়"। [সূরা আল-বাকারাহ্‌ঃ ২১৮] অনুরূপভাবে আছে- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ -অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম"। [সূরা আত্-তাওবাহ্‌ঃ ২০] অন্যত্র এসেছে ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ - অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়"। [সূরা আন্-নিসাঃ ১০০] মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহ দান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহ্‌কে নিঃশেষ করে দেয়'। [মুসলিম: ১২১; সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ২৫১৫]

হিজরতের বরকতঃ হিজরতের বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যারা আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করবো এবং আখেরাতের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।" সূরা নিসার উল্লেখিত চার আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে"।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ কিছু মুসলিম কাফেরদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অংশগ্রহণ করত। এতেকরে কাফেরদের পাল্লা ভারী হত। কিন্তু যুদ্ধের সময় কোন কোন তীর এসে তাদেরকে হত্যা করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদেরকে এ অবস্থায় থাকা থেকে নিষেধ করেছেন। [বুখারীঃ ৪৫৯৬, ৭০৮৫]

৯৯. আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

فَأُولَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

১০০. আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে। আর কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে মুহাজির হয়ে বের হবার পর তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু(১)।

وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

পনরতম রুকূ'

১০১. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিত্‌না সৃষ্টি করবে, তবে সালাত 'কসর(২)' করলে তোমাদের কোন

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, হিজরত বাধ্যতামূলক হওয়ার সংবাদ পেয়ে অনেক সাহাবী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বের হওয়ার পর পথিমধ্যেই বিভিন্ন কারণে মারা যান। এতে কাফেররা তাদেরকে বিভিন্নভাবে উপহাস করতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, যাতে বলা হয়েছে যে, কেউ খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করতে বের হলেই তার পক্ষ থেকে হিজরত ধরে নেয়া হবে। [দেখুন- মুসনাদে আবি ইয়া'লাঃ ২৬৭৯] আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, খালেদ ইবন হিযাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে পথিমধ্যে সর্প-দংশনে মারা যান। তখন লোকেরা তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকায় এ আয়াত নাযিল হয়। [তাবাকাতে ইবন সা'দ]

(২) কসর শুধু চার রাকা'আতের ফরয সালাতের বেলায় হবে। মাগরিব ও ফযরের সালাতে কোন কসর নেই। পূর্ণ সালাতের স্থলে অর্ধেক সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে কারো মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধহয় এতে সালাত পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরী'আতেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্ হয় না; বরং সওয়াব পাওয়া যায়। ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যা বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে এ আয়াতে বর্ণিত 'যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিত্‌না

দোষ নেই। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২. আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন[১] তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজ্‌দা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে[২]। কাফেররা

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

সৃষ্টি করবে' এটা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলাম যে, এখন তো মানুষ নিরাপদ হয়েছে তারপরও সালাতের কসর পড়ার কারণ কি? তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যেটাতে আশ্চার্য হয়েছ, আমিও সেটাতে আশ্চার্যবোধ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এটা একটি সদকা যেটি আল্লাহ্ তোমাদের উপর সদকা করেছেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সদকা গ্রহণ কর'। [মুসলিমঃ ৬৮৬]

(১) আয়াতে বর্ণিত সালাতটিকে বলা হয়, 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়-ভীতিকালীন নামায। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার 'উসফান' উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূল সাহাবাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করতে দেখে কাফেরদের কেউ কেউ বলে বসল যে, এ সময় যদি আক্রমণ করা যেতো তবে তাদেরকে জব্দ করা যেতো। তখন তাদের একজন বলল, এরপর তাদের আরেকটি সালাত রয়েছে, যা তাদের কাছে আরও প্রিয়। অর্থাৎ আসরের সালাত। তখন তাদের কেউ কেউ সে সময়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করলে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে 'সালাতুল খাওফ' পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করে দেন। [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ ২/৪৬৩; মুসান্নাফ আবদির রাযযাক ২/৫০৫; মুসনাদে আহমাদ ৪/৫৯; আবুদাউদ ১২৩৬; নাসায়ীঃ ১৭৭; মুস্তাদরাকে হাকিম ২/৩০৮]

(২) আয়াতে বলা হয়েছেঃ আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন-এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ'- বা ভয়-ভীতিকালীন নামায- এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার

কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

১০৩. অতঃপর যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে(১), অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى

অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ সালাতে ইমাম হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফেকাহ্‌বিদের মতে 'সালাতুল খওফ'-এর বিধান এখনো অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি। মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশংকার কারণে 'সালাতুল খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং সালাতের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনো 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েয। আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকা'আত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকা'আতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকা'আতের পর সালাম ফিরিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বুখারী: ৯৪২; মুসলিম: ৩০৫, ৩০৬; তিরমিযী: ৩০৩৫; আবু দাউদ: ১২৪২]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন ফরয তার বান্দাদের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন তখনই সেটার একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারপর যারা সেটা করতে সক্ষম হবে না তাদেরকে ভিন্ন পথ বাতলে দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, 'আল্লাহ্‌র যিকর'। এই যিকর এর ব্যাপারে যতক্ষণ কেউ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ওযর আপত্তি পেশ করার সুযোগ দেন নি। সর্বাবস্থায় তাকে যিকর করতে হবে। রাত-দিন, জল-স্থল, সফর-মুকীম, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, গোপন-প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর চালিয়ে যেতে হবে। এ আয়াতের এটাই ভাষ্য। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ]

الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

যথাযথ সালাত কায়েম করবে[১]; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য[২]।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা যা আশা কর ওরা তা আশা করে না[৩]। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ যখন তোমরা নিরাপদ হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করবে, তখন পূর্ণরূপ সালাত আদায় করবে। [তাবারী] অর্থাৎ কেউ যেন মনে না করে বসে যে, তাদের সালাত কমে গেছে বা কম পড়লেও চলবে।

(২) এখানে নির্ধারিত সময় বলে, সালাতের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যেক সালাতের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তসমূহকে বোঝানো হয়েছে। এখানে সে ওয়াক্তসমূহ বলে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়" [সূরা আল-ইসরা: ৭৮] পাশাপাশি হাদীসে সালাতের ওয়াক্তের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সালাতের প্রথম ও শেষ সময় রয়েছে। যোহরের সালাতের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য হেলে যাবে। আর শেষ সময় হচ্ছে, আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করা পর্যন্ত। অনুরূপভাবে আসরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন এর ওয়াক্ত হবে। আর তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। তদ্রূপ মাগরিবের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য ডুবে যায়। তার শেষ সময় হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায়। আর এশার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায়। আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, মধ্য রাত পর্যন্ত। ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সুবহে সাদিক উদিত হয়। আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সূর্য উদিত হয়।' [তিরমিযী: ১৫১]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা সওয়াব, রহমত ও উঁচু মর্যাদা আশা কর, যা তারা করে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও" [সূরা আলে ইমরান: ১৩৯] আরও বলেন, "কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫]

بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না[১]।

তা সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। দেখ, তোমরাই ইহ জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? কেউ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে। অর্থাৎ যদি তারা ক্ষমা প্রার্থী হতো তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দিতেন। আর কেউ পাপ কাজ করলে সে ওটা তার নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে ওটা কোন নির্দোষ ব্যক্তি অর্থাৎ লবীদ ইবন সাহলের প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলকে উদ্দেশ্য করে নাযিল করলেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।' এ আয়াতসমূহ নাযিল হলে মূল ঘটনা স্পষ্ট হয়ে গেল। বনু উবাইরাকের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিফা'আর কাছে তা ফেরৎ দিলেন। তিনি সে সমুদয় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন। এদিক বিশর মুনাফেকী অবস্থা ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে মক্কায় সুলাফা বিনতে সা'দ ইবন সুমাইয়া নামীয় এক মহিলার কাছে গিয়ে সরাসরি মুর্তাদ হয়ে গেল। তখন ১১৫ নং আয়াত নাযিল হলো, যাতে হক প্রকাশিত হওয়ার পরে রাসূলের বিরুদ্ধাচারণের কারণে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।' [তিরমিযী: ৩০৩৬; মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৮৫] ঘটনা যাই হোক, কুরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলিমদের জন্য ব্যাপক। এছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র কসম অবশ্যই আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহর নিকট এস্তেগফার এবং তাওবা করে থাকি। [বুখারীঃ ৬৩০৭]

ষোলতম রুকূ'

১০৫. আমরা[১] তো আপনার প্রতি সত্যসহ

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

(১) সূরা আন-নিসার ১০৫ থেকে ১১৩ নং আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঘটনাটি হচ্ছে, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলিমদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর কিংবা গমের আটা। এগুলো প্রায়ই মদীনায় পাওয়া যেতো না। সিরিয়া থেকে কোন চালান এলে কেউ কেউ তা সংগ্রহ করে রাখত। রিফা'আ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের কিছু গমের আটা সংগ্রহ করে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যে কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। মদীনাতে তখন বনু উবাইরাক গোত্রের বিশর, বশীর ও মুবাশশির নামীয় তিন লোক বিশেষ কারণে খ্যাতি লাভ করেছিল। তন্মধ্যে বশীর ছিল প্রকৃতই মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বদনামী করে কবিতা রচনা করে অন্যের নামে চালিয়ে দিত। সেই বশীর সিঁধ কেটে রিফা'আ ইবন যায়েদের সে বস্তা বের করে নেয়। সকালে রিফা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার কাছে বিবৃত করলেন। বনু উবায়রাক বললো, সম্ভবত এটা লবীদ ইবন সাহলের কীর্তি। লবীদ ইবন সাহল তা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তরবারী কোষমুক্ত করে বললেন, আমার উপর অপবাদ চাপানো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পন্থায় কাতাদা ও রিফা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী উবাইরাকের কীর্তি। তখন কাতাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনু উবাইরাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনু উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে রিফা'আ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরী'আতসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করলেন। কিন্তু বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। যার মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তুলে ধরা হয়। প্রথমে আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ বনী উবাইরাক এর সমর্থনে তর্ক করবেন না।' আর আপনি ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহাবী কাতাদা ইবন নু'মানকে যা বলা হয়েছে সে জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থী হোন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাস ভংগকারী পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে

১০৬. আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾

১০৭. আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বিবাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না ।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾

১০৮. তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন ।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾

১০৯. দেখ, তোমরাই ইহ জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে?

هٰاَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾

১১০. আর কেউ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে(১) ।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾

---

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্‌র হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্ই তাওবা ও ইস্তেগফারের দ্বারা মাফ হতে পারে । তবে তাওবা ও ইস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরী । শুধু মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্ ওয়া আতুবু ইলাইহি' বলার নাম তাওবা ও ইস্তেগফার নয় । তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সে জন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে সংকল্পবদ্ধ না হয়, তবে মুখে মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলা তাওবার সাথে উপহাস বৈ কিছু নয় । তাওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরীঃ

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

১১১. আর কেউ পাপ কাজ করলে সে ওটা তার নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

১১২. আর কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে সেটা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে[১]।

সতরতম রুকূ'

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১৩. আর আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন[২] এবং

(এক) অতীত গোনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ্ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। তাছাড়া বান্দাহ্‌র হকের সাথে যেসব গোনাহ্‌র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দাহ্‌র কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তাওবার অন্যতম শর্ত।

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্‌কে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহ্‌র শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর শাস্তি।

(২) এ আয়াতে 'কিতাব'-এর সাথে 'হেকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ ও শিক্ষার নাম যে 'হেকমত' তাও আল্লাহ্ তা'আলারই নাযিলকৃত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহ্‌র শব্দাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব। সে জন্যই আলেমগণ বলেন, ওহী দুই প্রকারঃ (এক) مَتْلُوّ যা তিলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غَيْرُ مَتْلُوّ যা তিলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কুরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার

আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে ।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সাদকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের[১]; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমরা মহা পুরস্কার দেব ।

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

১১৫. আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস[২]!

ওহী হাদীস বা সুন্নাহ্ । এর শব্দাবলী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং মর্ম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে ভাল কিছু ইশারা করে বা বলে শান্তি স্থাপন করে দেয় । [বুখারীঃ ২৬৯২, মুসলিমঃ ২৬০৫] অন্য হাদীসে এসেছে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না এমন কাজ যা সিয়াম, সালাত ও সদকা থেকেও উত্তম? তারা বললঃ অবশ্যই । রাসূল বললেনঃ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া । কেননা, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হওয়া গর্দান কাটার সমান ।' [তিরমিযীঃ ২৫০৯]

(২) এ আয়াত থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের হয় । এক. আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরোধিতাকারী জাহান্নামী । দুই. কোন ব্যাপারে হক তথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত প্রকাশিত হওয়ার পর সেটার বিরোধিতা করাও জাহান্নামীদের কাজ । তিন. এ উম্মতের ইজমা বা কোন বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছার পর

আঠারতম রুকূ'

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না; আর তার থেকে ছোট যাবতীয় গোনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে সে ভীষণভাবে পথ ভ্রষ্ট হয়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

১১৭. তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে[১]।

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

১১৮. আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব।

لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

১১৯. আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾

সেটার বিরোধিতা করা অবৈধ। কারণ, তারা পথভ্রষ্টতায় একমত হবে না। মুমিনদের মত ও পথের বিপরীতে চলার কোন সুযোগ নেই।

(১) বর্তমান পৃথিবীতে ইয়াযিদী ফের্কা ছাড়া শয়তানকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা করে না বা তাকে সরাসরি আল্লাহ্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করে না। এ অর্থে কেউ শয়তানকে মা'বুদ বানায় না একথা সত্য; তবে নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-আকাংখা ও চিন্তা-ভাবনার লাগাম শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে যেদিকে সে চালায় সেদিকেই চলা এবং এমনভাবে চলা যেন সে শয়তানের বান্দা ও শয়তান তার প্রভু- এটাই তো শয়তানকে মা'বুদ বানাবার একটি পদ্ধতি। এ থেকে জানা যায়, বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ মেনে চলা এবং অন্ধভাবে কারো হুকুম পালন করার নামই ইবাদাত। আর যে ব্যক্তি এভাবে কারো আনুগত্য করে, সে আসলেই তার ইবাদাত করে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবে[১]।' আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

১২১. এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিস্কৃতির উপায় পাবে না।

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আল্লাহ্‌র চেয়ে কথায় সত্যবাদী[২]?

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত করেছেন সে সমস্ত মহিলাদের উপর যারা শরীর কেটে উল্কি আঁকে এবং যারা এ অংকনের কাজ করে, আরো লা'নত করেছেন যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভ্রূ কাটে এবং যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত কাটে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে। [বুখারীঃ ৪৮৮৬] আয়াতে বর্ণিত, ﴿خَلْقَ اللَّهِ﴾ অর্থ উপরে করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এর আরেক অর্থ, 'আল্লাহ্‌র দ্বীন'। যা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী] সুতরাং দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার জন্যও শয়তান কিছু লোককে নিয়োজিত করবে।

(২) বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কথা বা বাণীর উপর কারও কথা সত্য হতে পারে না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাব। আর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া পদ্ধতি। আর সবচেয়ে খারাপ কাজ হচ্ছে, দ্বীনে প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতিসমূহ, আর তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই আসবে, তোমরা তাঁকে অপারগ করে দিতে সক্ষম নও।' [বুখারীঃ ৭২৭৭; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩১০]

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾

১২৩. তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না[1]; কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে[2] এবং আল্লাহ্ ছাড়া তার জন্য সে কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না ।

(১) আয়াতে মুসলিম ও আহলে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লেখিত হয়েছে । এরপর কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়াত দেয়া হয়েছে । অবশেষে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনো ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না । এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় না । শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না; বরং প্রত্যেকের কাজকর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি । কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে । এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে- এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না ।

(২) এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "যে কেউ কোন অসৎকাজ করবে, সে জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে" । আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললামঃ এ আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি । সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও । কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট বা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে । এমনকি যদি কারো পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহ্র কাফ্ফারা বৈ নয় ।' [মুসলিমঃ ২৫৭৪] অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'মুসলিম দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায় ।' [বুখারীঃ ৫৬৪১, মুসলিমঃ ২৫৭৩] অন্য হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে কিছু বিপদাপদ দিয়ে থাকেন' । [বুখারীঃ ৫৬৪৫] মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর । কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী- শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না । বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে ।

১২৪. আর পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎ কাজ করলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

১২৫. তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন[১]।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

১২৬. আর আস্‌মান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾

ঊনিশতম রুকূ'

১২৭. আর লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও[২] এবং অসহায়

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মনে রেখ, আমি প্রত্যেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্তরঙ্গতা থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করছি, যদি আমি কাউকে 'খলীল' বা অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি নিজেই) আল্লাহ্‌র খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। [মুসলিম: ২৩৮৩] মূলতঃ খলীল বলা হয়, এমন বন্ধুত্বকে যার বন্ধুত্ব অন্তরের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিয়েছে। অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেভাবে আল্লাহ্‌র খলীল, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহ্‌র খলীল।

(২) উরওয়া ইবন যুবাইর বলেন, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তখনকার সময় কারও কারও তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম

শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাও পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন'। আর যে কোন সৎকাজ তোমরা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

১২৮. আর কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গোনাহ্ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষের অন্তরসমূহে লোভজনিত কৃপণতা বিদ্যমান। আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার খবর রাখেন(১)।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾

মেয়েরা থাকতো। তারা সে সব ইয়াতীম মেয়েদেরকে মাহ্র না দিয়েই বিয়ে করতে চাইতো। তখন এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। কিন্তু এর বাইরেও কিছু ইয়াতিম থাকতো যাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য ছিল না। তারা তাদেরকে বিয়ে করতে চাইতো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [মুসলিম: ৩০১৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, জাহেলিয়াত যুগে কারও কাছে ইয়াতিম থাকলে সে তার উপর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত। যাতে করে অন্যরা তাকে বিয়ে করতে সমর্থ না হয়। তারপর যদি মেয়েটি সুন্দর হতো, তাহলে সে তাকে বিয়ে করত এবং তার সম্পদ নিয়ে নিত। পক্ষান্তরে অসুন্দর হলে সে তাকে আমৃত্যু বিয়ে দিতে বাধা দিত। এভাবে সে তার মৃত্যুর পর তার সম্পদের মালিক বনে যেত। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেটা নিষেধ করে দেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ এ আয়াতটি এমন মহিলা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে কোন পুরুষের কাছে ছিল কিন্তু তার সন্তান-সন্ততি হওয়ার সম্ভাবনা পেরিয়ে গেছে। ফলে সে তাকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করতে চাইল। তখন সে মহিলা বলল, আমাকে তালাক দিও না, আমাকে রাত্রির ভাগ দিও না। [বুখারীঃ ৪৬০১, আবু দাউদঃ ২১৩৫] ইবন আব্বাস বলেন, এ জাতীয় মীমাংসা শরী'আত অনুমোদন করেছে। [তিরমিযী: ৩০৪০] ইবন আব্বাস থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

১২৯. আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না | وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ

তিনি এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত সে মহিলার ব্যাপারে, যে কোন লোকের স্ত্রী হিসেবে রয়েছে, সে লোক সাধারণতঃ স্ত্রীর কাছে যা কামনা করে তার কাছে তা দেখতে পায় না। আর সে লোকের অন্য স্ত্রীও রয়েছে। সে লোক অন্য স্ত্রীদেরকে তার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা সে লোককে নির্দেশ দিচ্ছেন, সে যেন ঐ স্ত্রীকে এটা বলে যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমি তোমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিচ্ছি। তারপরও যদি তুমি আমার কাছে থাকতে চাও তবে আমি তোমার খোরপোষ দিব, তোমার সমব্যথী হব, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি আমার সাথে এ পরিস্থিতিতে থাকতে না চাও, তবে তোমার পথ ছেড়ে দেব। তুমি ইচ্ছা করলে চলে যাবে। এ কথা বলার পর যদি সে মহিলা সেটার উপর রাযি হয়, তবে সে পুরুষের জন্য আর কোন গোনাহ থাকবে না। তাই এখানে যে 'সুলহ' বলা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে, 'স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেয়া'। যার মাধ্যমে মীমাংসার পথ সুগম হয়। পরিবারের সমস্যা দূরিভুত হয়। [তাবারী; ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

মূলত: এ আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পারিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। যেমন একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা কিংবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্য দিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়। এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য কোন কোন অধিকারের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়-দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে। কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অনত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে।

حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না[১] ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না; যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

১৩০. আর যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়[২]।

---

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার দু'জন স্ত্রী আছে তারপর সে একজনের প্রতি বেশী ঝুঁকে গেল, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে যেন তার একপার্শ্ব বাঁকা হয়ে আছে।' [আবু দাউদঃ ২১৩৩] তবে আয়াতে যে আদল বা ইনসাফের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি আদল বা সার্বিক সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না" সেটা হচ্ছে, ভালবাসা ও স্বাভাবিক মনের টান। কেননা, কোন মানুষই দু'জনকে সবদিক থেকে সমান ভালবাসতে পারে না। তবে শরী'আত নির্ধারিত অধিকার যেমন, রাত্রী যাপন, সহবাস, খোরপোষ ইত্যাদির ব্যাপারে 'আদল' অবশ্যই করা যায় এবং করতে হবে। সেটা না করতে পারলে তাকে একটি বিয়েই করতে হবে। যার কথা এ সূরারই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আর যদি তোমরা আদল বা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পার, তবে একটি স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ থাক' [আদওয়াউল বায়ান] সুতরাং মানসিক টান ও প্রবৃত্তিগত আবেগ কারও প্রতি বেশী থাকাটা আদল বা ইনসাফের বিপরীত নয়। কেননা তা মানবমনের ক্ষমতার বাইরে। [তাবারী]

(২) পূর্বে উল্লেখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথ-নির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কুরআনুল কারীম নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি

১৩১. আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই[১]; তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ

লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক পদ্ধতি বাতলে দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখী-সমৃদ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পারিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া, ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ ও উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে। এ আয়াতে শেষ চিকিৎসা তালাক ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে হেদায়াত দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই যে, সার্বিক সমঝোতা সম্ভব না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাদের উভয়ের প্রতি দয়াশীল হবেন না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়েরই রব। তিনি তাদের প্রত্যেককেই তাদের প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহ করবেন। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ পদ্ধতির ব্যাপারে কারও আপত্তি করা উচিত নয়।
মোটকথা, কুরআনুল কারীম উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ অধিকার দিয়েছে। অপরদিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়। তারপরও যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে জীবন সম্পর্কে হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ প্রত্যেককেই তাঁর রহমতে স্থান দিবেন।

(১) অর্থাৎ আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ্‌র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। তিনি অভাবীর কথা শুনেন ও অভাব দুর করবেন। কারও অভাব তাঁর অজানা নয়। তিনিই সবাইকে তার আরাধ্য বিষয় দিতে সামর্থ। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্ তা'আলার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌ভীতি ও আনুগত্য কর, তবে তিনি তোমাদের সব কাজে সহযোগিতা করবেন, এবং অনায়াসে তা সু-সম্পন্ন করে দেবেন। তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

اِنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾

তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর[১]। আর তোমরা কুফরী করলেও আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে তা সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾

১৩২. আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং কার্যোদ্ধারে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে ও অপরকে আনতে পারেন[২]; আর

---

(১) এ আয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়্যত। আগের ও পরের যাবতীয় মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত। যার বড় আর কোন অসিয়্যত হতে পারে না। বিভিন্ন নবী-রাসূলগণও যুগে যুগে তাদের উম্মতদেরকে এ ওসিয়ত করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তার কাছে কেউ ওসিয়্যতের অনুরোধ জানালে এ ওসিয়্যতটি প্রথমে করতেন। হাদীসে এসেছে, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ওসিয়্যত চাইলে তিনি বললেন, 'তোমার কর্তব্য হবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করা। আর তুমি প্রতিটি উঁচুস্থানে উঠা বা উল্লেখযোগ্য স্থানে তাকবীর বা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা।' [তিরমিযী: ৩৪৪৫; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৩৩] তাছাড়া যখনই কোন সেনাদল পাঠাতেন, তাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়্যত করতেন। [মুসলিম ১৭৩১; আবু দাউদ: ২৬১২]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওহী নাযিল হওয়ার সময়ে যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের স্থলে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। অন্য আয়াতে তিনি যে অন্য কাউকে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন সেটার প্রমাণও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছে তোমাদের স্থানে আনতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন" [সূরা আল-আন'আম: ১৩৩] অন্য আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে, তারা তাদের মতো হবে না, বরং তাদের চেয়ে ভালো হবে। বলা হয়েছে, "আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারপর তারা তোমাদের মত হবে না" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮] অন্য আয়াতে এ কাজটিকে

আল্লাহ্ তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৩৪. কেউ দুনিয়ার পুরস্কার চাইলে তবে (সে যেন জেনে নেয় যে) দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে[১]। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

বিশতম রুকূ'

১৩৫. হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۟ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৬. হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ বলে ঘোষণাও করেছেন। তিনি বলেন, "তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়" [সূরা ইবরাহীমঃ ১৯; সূরা ফাতিরঃ ১৬]।

(১) এ আয়াতদৃষ্টে মনে হতে পারে যে, দুনিয়ার পুরস্কার চাইলেই তাকে তা দেয়া হবে। মূলতঃ অন্য আয়াতে সেটাকে শর্তযুক্ত করে বলা হয়েছে যে, "যে দুনিয়া চায়, তাকে আমি দুনিয়াতে যা ইচ্ছা করি যতটুকু ইচ্ছা করি প্রদান করি" [সূরা আল-ইসরাঃ ১৮] সুতরাং দুনিয়া চাইলেই পাবে, তা কিন্তু নয়। যাকে যতটুকু দেয়ার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র হবে, ততটুকুই সে পাবে। এর বাইরে নয়।

তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফরী করে[১] সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, তারপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না[২]।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৮. মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾

১৩৯. মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের কাছে ইয্‌যত চায়?

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ

---

(১) কুফরী করার দু'টি অর্থ হয়। (এক) সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করা। (দুই) মুখে মেনে নেয়া কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা। অথবা নিজের মনের ভাবের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিষটি মেনে নেয়ার দাবী করছে আসলে সেটিকে মানে না। এখানে কুফরী শব্দটি দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তাওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা মুরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তাওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তাওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে। এখানে তাওবাহ কবুল না করার অর্থ এই যে, তারা কোন কোন গোনাহ থেকে তাওবা করলেও মূল গোনাহ অর্থাৎ শির্ক ও কুফর থেকে তাওবাহ করতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাদের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

لِلّٰهِ جَمِيۡعًا ﴿١٣٩﴾

সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহ্‌রই[১]।

وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِى الۡكِتٰبِ اَنۡ اِذَا سَمِعۡتُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَاُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوۡا مَعَهُمۡ حَتّٰى يَخُوۡضُوۡا فِىۡ حَدِيۡثٍ غَيۡرِهٖۤ ‌ۖ اِنَّكُمۡ اِذًا مِّثۡلُهُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الۡمُنٰفِقِيۡنَ

১৪০. কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে

---

(১) এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরণের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করে একেও অযথা অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ "তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত-সম্মানতো সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন।" কাফের ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার প্রধান কারণ এই যে, তাদের বাহ্যিক মানমর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাংখা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকারের কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকারের ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। অতএব, মানমর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামী। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, "আর ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ্, রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়।" [সূরা আল-মুনাফিকুন:৮] এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি বান্দাদের (মাখলুকের) মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।' [বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৭৪২১] সুতরাং আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ।

وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۟ۙ

লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না[১], নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে[২]। মুনাফিক এবং কাফের সবাইকে আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۟

১৪১. যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না।' আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে

---

(১) এ আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিশে বসা বা যোগদান করা মুসলিমদের জন্য হারাম। বাতিলপন্থীদের মজলিশে উপস্থিত ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার যোগ্য। পঞ্চমতঃ তাদের সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এমন মজলিশ যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্‌র অংশীদার হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথা-বার্তা মনে প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরী পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথা-বার্তা পছন্দ না করা সত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠাবসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হবার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরী'আতকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ।

রক্ষা করিনি[১]?' আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না[২]।

একুশতম রুকূ'

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন[৩]। আর

إِنَّ الْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ

(১) এটিই প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলিম হিসাবে যতটুকু স্বার্থ ভোগ করা যায় তা তারা ভোগ করে। আবার অন্যদিকে কাফের হিসাবে যে স্বার্থটুকু ভোগ করা সম্ভব তা ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে যোগ দেয়। তাদেরকে বলেঃ আমরা মোটেই গোঁড়া বা প্রতিক্রিয়াশীল অথবা মৌলবাদী-বিদ্বেষপরায়ণ মুসলিম নই। মুসলিমদের সাথে আমাদের নামের সম্পর্ক আছে কিন্তু আমাদের মানসিক ঝোঁক, আগ্রহ ও বিশ্বস্ততা রয়েছে তোমাদের প্রতি। চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, রুচি-প্রকৃতি ইত্যাদি সবদিক দিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের গভীর মিল। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরীর সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষই অবলম্বন করব।

(২) এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, দুনিয়াতে কোন কাফের ঈমানদারদের উপর বিজয়ী হবে না। কারণ, এটার মূলকথা আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত। আয়াতের শুরুতেই 'কিয়ামতের দিন' উল্লেখ করার মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক লোক এসে বলল যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না" অথচ কাফেররা মুমিনদের উপর বিজয়ী হচ্ছে। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আয়াতের প্রথমাংশের দিকে তাকাও। সেখানে বলা হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন'। সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩০৯; দ্বিয়া আল-মাকদেসী, আল-আহাদিসুল মুখতারাহ ২/৪০৬-৪০৭, হাদীস নং ৭৯৩] তবে ইমামগণ এ আয়াত থেকে দুনিয়াতে এ মাসআলা নিয়েছেন যে, কোন কাফের কোন মুমিনের ওয়ারিশ হয় না। [আত-তা'লিকুল মুমাজ্জাদ আলা মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ]।

(৩) কাফেরদের ধোঁকার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ। এতে আল্লাহ্‌র জন্য খারাপ গুণ বিবেচিত হবে না। কারণ, এটি তাদের কর্মের বিপরীতে আল্লাহর কর্ম। অনুরূপ আলোচনা সূরা আল-বাকারার ৯ ও ১৫ নং আয়াতের

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে[১]।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে[২]! আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে মুমিনগণ! মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের উপর

ব্যাখ্যাতেও বর্ণিত হয়েছে। তবে তাদেরকে কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ধোঁকায় ফেলবেন, তার বর্ণনায় সুদ্দী ও হাসান বসরী বলেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কিছু নূর বা আলো দেয়া হবে, ফলে তারা মুমিনদের সাথে চলতে থাকবে। যেমনিভাবে তারা দুনিয়াতে মুমিনদের সাথে ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে নূর বা আলো ছিনিয়ে নিবেন। ফলে তাদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তখন তারা অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ঠিক তখনি তাদের ও মুমিনদের মধ্যে প্রাচীর পড়ে যাবে। পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মূলত: এটি সূরা আল-হাদীদের ১৩ নং আয়াতের তাফসীরও বটে।

(১) আয়াতে মুনাফিকদের তিনটি খারাপ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. তারা তাদের সালাতে অলসতা করে। দুই. তারা সালাতে প্রদর্শনেচ্ছাসহকারে দাঁড়ায়। তিন. তারা খুব কমই আল্লাহ্র যিকর করে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তাদের এ বদ স্বভাবসমূহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, সূরা আত-তাওবাহ: ৫৪; সূরা আল-মা'উন: ৪-৬। তাছাড়া হাদীসেও মুনাফিকের এ সমস্ত চরিত্রের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঐটি হচ্ছে মুনাফিকের সালাত। সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর যখন সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখানে পৌঁছে (অর্থাৎ ডুবার কাছাকাছি পৌঁছে) তখন সে উঠে চারবার ঠোকর লাগায়। যাতে আল্লাহ্র স্মরণ খুব কমই করে থাকে।' [মুসলিম: ৬২২]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে, ঐ ছাগীর ন্যায়, যে দুই পাঠা ছাগলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। (প্রবৃত্তির তাড়নায়) কখনও এটার কাছে যায়, কখনও অপরটির কাছে যায়। [মুসলিম: ২৭৮৪] মুনাফিক নিজেকে মুশরিকও বলতে চায় না। আবার ঈমানদারও হতে চায় না। [তাবারী]

আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য অভিযোগ কায়েম করতে চাও[১]?

১৪৫. মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে[২] এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোন সহায় পাবেন না।

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৬. কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে[৩], আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে[৪],

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

(১) এ আয়াতের তাফসীরে পূর্ববর্তী ১৩৯ নং আয়াতের তাফসীর ও সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতের তাফসীর দেখা যেতে পারে।

(২) এ আয়াতে মুনাফিকদের স্থান নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অন্য স্থানে ফির'আউন ও তার অনুসারীদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। "আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফির'আউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে" [সূরা গাফির: ৪৬] আবার অন্যত্র বনী ইসরাইলের মধ্যে যাদেরকে আকাশ থেকে দস্তরখানসহ খাবার দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করবে তাদের জন্য এমন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে শাস্তি আল্লাহ্ আর কাউকে দিবেন না। "আল্লাহ্ বললেন, 'আমিই তোমাদের কাছে ওটা পাঠাব; কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকেও দেব না" [সূরা আল-মায়িদাহ: ১১৫] সুতরাং এটাই বলা চলে যে, সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে এ তিন শ্রেণীর লোক। [আদওয়াউল বায়ান] এ আয়াতে বর্ণিত 'দারকুল আসফাল' বা নিম্নতম স্তর কি এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেটা হবে বদ্ধ সিন্ধুক। [মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ: ১৩/১৫৪, নং ১৫৯৭২] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দারকুল আসফাল হচ্ছে, এমন কিছু ঘর যেগুলোর দরজা বন্ধ করা আছে। আর সেগুলোকে উপর ও নিচ থেকে প্রজ্জলিত করা হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, জাহান্নামের নীচে থাকবে। [তাবারী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, এখানে সংশোধন করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে নেয়া। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে একমাত্র ঐসব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়া তথা লোক দেখানো ও শোনানোর লেশমাত্র উদ্দেশ্য যার মধ্যে নেই।

তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দেবেন।

১৪৭. তোমরা যদি শোকর-গুজার হও(১) এবং ঈমান আন, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন? আর আল্লাহ্ (শোকরের) পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৮. মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে(২)। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

---

(১) আয়াতে শোকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আসল অর্থ হচ্ছে নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং তাঁর সাথে নিমকহারামী না কর; বরং যথার্থই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর আদায়কারী হও তাহলে আল্লাহ্ অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেবেন না। মোটকথা: আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার এবং শোকরগুজারকে শাস্তি দিবেন না। [তাবারী] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি? বস্তুত: হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এ অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হওয়ার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক উপায়। এ তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে শোকর। এ শোকরের দাবী হচ্ছে প্রথমতঃ অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করা। অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে অংশীদার না করা। দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতি নিজের হৃদয়ে ভরপুর থাকা এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র ভালবাসা, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক না থাকা। তৃতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করা, তার হুকুম মেনে চলা, তার নেয়ামগুলোকে তার মর্জির বাইরে ব্যবহার না করা।

(২) এ আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-যুলুমের অবসান ঘটানোর এক অপূর্ব বিধান পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মযলুমকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আবার যুলুম ও বাড়াবাড়ি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ যুলুম করা

সর্বজ্ঞ ।

১৪৯. তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে করলে বা গোপনে করলে কিংবা দোষ ক্ষমা করলে তবে আল্লাহ্‌ও দোষ মোচনকারী, ক্ষমতাবান(১) ।

إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার ।" [সূরা আন-নাহলঃ ১২৬] সাথে সাথে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম । মোটকথাঃ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মযলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকদের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগ করে, তবে তা হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না । কারণ যালিম নিজেই মযলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ করে দিয়েছে, বরং বাধ্য করেছে ।

(১) আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে মযলুমকে তার প্রতি যুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন । অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য আখেরাতের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন । এ আয়াতে মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেয়া । প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য । যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে । আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌র দু'টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন । তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল । আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা বা মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয় ।

এ হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত । একদিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা বা মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে । যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে ।" [সূরা ফুস্‌সিলাতঃ ৩৪] আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে । যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

১৫০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতক-এর উপর ঈমান আনি এবং কতকের সাথে কুফরী করি'(১)। আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়,

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾

১৫১. তারাই প্রকৃত কাফির। আর আমরা প্রস্তুত রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি(২)।

আশংকা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কুরআনুল কারীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সাদকাহ দ্বারা সম্পদ কমে না এবং কোন বান্দার মধ্যে ক্ষমা প্রবণতার গুণের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তার মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন। আর যে কেউ আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন।' [মুসলিমঃ ২৫৮৮]

(১) কাতাদা বলেন, এরা হচ্ছে, আল্লাহ্র দুশমন ইয়াহূদ ও নাসারা সম্প্রদায়। কারণ, তাদের মধ্যে ইয়াহূদীরা তাওরাত ও মূসার উপর ঈমান আনে কিন্তু ইঞ্জীল ও ঈসার উপর ঈমান আনে না। আর নাসারারা ইঞ্জীল ও ঈসার উপর ঈমান আনে কিন্তু কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ঈমান আনে না। এভাবে এ দু'টি সম্প্রদায় ইয়াহূদী ও নাসারা হয়েছে। অথচ এ দু'টি মতই বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। এভাবে তারা সমস্ত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে। [তাবারী]

(২) পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐসব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের দ্বীন ও দ্বীনী বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকেও মুক্তি লাভ করবে বলে বুঝাতে চায়। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত কোন কোন নবীকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

অমুসলিমদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও ইহ্সান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীরবিহীন। ইসলাম একদিকে মুসলিমদের

প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কু-প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম ও অমুসলিমরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলিমদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনুল কারীম ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের সাহায্যে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও কুরআন নাযিল করারও কোন প্রয়োজন থাকতো না।

পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলিম হয়েছে) এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃষ্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"। [সূরা আল-বাকারাহ: ৬২] এ আয়াত থেকেও ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। কেননা, কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে নবী-রাসূল, ফিরিশ্‌তা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। তাই তাদের প্রত্যেককে সাধারণ মুসলিমদের মত পুরোপুরি ঈমান আনতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে (চিনে রাখুন যে) তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৩৭] সূরা আন- নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত। রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না। শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐসব লোকের জন্যই সংরক্ষিত যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতি যথার্থ ঈমান রাখে। বস্তুত: কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করে। কুরআনী তাফসীরের পরিপন্থী কোন তাফসীর বর্ণনা কারো জন্য জায়েয নয়।

১৫২. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করেনি, অচিরেই তাদেরকে তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

বাইশতম রুকূ'

১৫৩. কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে; তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও।' ফলে তাদের সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে বজ্র পাকড়াও করেছিল; তারপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে আসার পরও তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; অতঃপর আমরা তা ক্ষমা করেছিলাম এবং আমরা মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾

১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য 'তূর' পর্বতকে আমরা তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'নত শিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর[১]।' আর আমরা তাদেরকে আরওবলেছিলাম, 'শনিবারে সীমালংঘন

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা (প্রস্তাবিত শহরে) সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ কর এবং বল, (হে আল্লাহ্ !) আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তারা তা পরিবর্তন (সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ না করে) নিতম্বের উপর ভর করে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এর পরিবর্তে যবের দানা চাই বলতে বলতে প্রবেশ করল। [বুখারীঃ ৩৪০৩]

করো না'; এবং আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ।

১৫৫. অতঃপর (তারা অভিসম্পাত পেয়েছিল[১]) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এ উক্তির জন্য । বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তার উপর মোহর মেরে দিয়েছেন । সুতরাং কেবল অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনবে ।

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

১৫৬. আর তাদের কুফরীর জন্য এবং মার্‌ইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য[২] ।

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

(১) বলা হয়েছে, 'আর তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে এবং---' কিন্তু এর কারণে কি হয়েছে সেটা বলা হয় নি । বরং উত্তরটি উহ্য রাখা হয়েছে । সূরা আল-মায়িদাহ এর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছিলাম' । সুতরাং এখানেও একই অর্থ গ্রহণ করা যায় । যাজ্জাজ বলেন, আয়াতের উত্তর হচ্ছে, তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে তাদের উপর আমরা অনেক হালাল বস্তু হারাম করেছি । কারণ, ১৬০ নং আয়াতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে । কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতের শেষে বর্ণিত, 'বরং আল্লাহ্ তাদের উপর মোহর করেছেন' এ কথাটিই উপরোক্ত কথার উত্তর । আবার কারও কারও মতে, আয়াতের শেষে বর্ণিত, 'কেবল অল্প সংখ্যকই ঈমান আনবে' এটাই হচ্ছে পূর্ববর্তী কথার উত্তর । [ফাতহুল কাদীর]

(২) মারইয়ামের উপর চাপানো তাদের গুরুতর অপবাদ কি ছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয় নি । অন্যত্র এসেছে যে, তারা মারইয়ামকে ব্যভিচারের অপবাদ দিতে ত্রুটি করে নি । আল্লাহ্ বলেন, "তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হল; তারা বলল, 'হে মার্‌ইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছ" । [সূরা মারইয়াম:২৭] এখানে অঘটন বলতে তারা ব্যভিচারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল । কারণ পরবর্তী আয়াতে মারইয়ামের বাবা খারাপ লোক না হওয়া এবং মা-ও বেশ্যা না হওয়া বলার মাধ্যমে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । [আদওয়াউল বায়ান]

১৫৭. আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল[১]।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ﴿۱۵۷﴾

(১) এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, ওরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যাও করতে পারেনি, শুলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সন্দেহ কি ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, সব বর্ণনার সার কথা হচ্ছে, ইয়াহূদীরা যখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তার ভক্ত-সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামও সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন চার হাজার ইয়াহূদী দূরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এই ঘর থেকে বের হতে ও নিহত হতে এবং আখেরাতে জান্নাতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম নিজের জামা ও পাগড়ী তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাদৃশ করে দেয়া হলো। যখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, তখন ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শুলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইয়াহূদীরা এক লোককে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতোপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আকাশে তুলে নেয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইয়াহূদীরা তাকেই ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম মনে করে পাকড়াও করলো, এবং শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। উক্ত বর্ণনা দু'টির মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কুরআনুল কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অবশ্য কুরআনুল কারীমের আয়াত ও তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনার সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইয়াহূদী-খৃষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও দাবী করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে যে, যারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে নানা মত পোষন করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ

আর নিশ্চয় যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি,

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৫৯. কিতাবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে[২] তার উপর ঈমান

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ

সম্পর্কে কোন সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামই বা কোথায় গেলেন? মোটকথা: ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইয়াহূদী ও নাসারা যারাই কথা বলে তারাই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই।

(১) "আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা (প্রজ্ঞাময়)।" ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজে নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলনের সত্যটি উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

(২) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকেও অস্বীকার করে,

কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল। এ আয়াতের موته অর্থাৎ 'মৃত্যুর পূর্বে' শব্দে ইয়াহূদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইয়াহূদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন আখেরাতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর নবুওয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফির'আওনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি। এ আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বিপুল জামা'আত কর্তৃক গৃহীত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো موته 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর হলো, কিতাবীরা এখন যদিও ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইয়াহূদীরা তো তাকে নবী বলে স্বীকারই করে না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করে। অপরদিকে নাসারারা যদিও ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইয়াহূদীদের মতই ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বয়ং আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআনুল কারীমের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারারা বর্তমানে যদিও ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করবে। নাসারারা তখন মুসলিমদের মত সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈসা ইবন মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করা হবে।' আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আরো বলেন - 'তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছেঃ "আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

আনবেই। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন[১]।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬০. সুতরাং ভাল ভাল যা ইয়াহূদীদের জন্য হালাল ছিল আমরা তা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের যুলুমের জন্য[২] এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬১. আর তাদের সূদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। আর

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" [বুখারীঃ ৩৪৪৮] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এর অর্থ ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মৃত্যুর পূর্বে'। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তখন তোমাদের কেমন লাগবে? যখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম তোমাদের মাঝে আগমন করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে ঈমাম হবেন'। [বুখারীঃ ৩৪৪৯] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! অবশ্যই ইবন মারইয়াম 'ফাজ্জ আর রাওহা' থেকে হজ্জ বা উমরা অথবা উভয়টির জন্যই ইহরাম বাঁধবেন।' [মুসলিমঃ ১২৫২] অন্য হাদীসে এসেছে, 'ইবন মারইয়াম দাজ্জালকে 'বাবে লুদ' এ হত্যা করবে'। [তিরমিযীঃ ২২৪৪] মোটকথাঃ কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের ব্যাপারটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যখন তিনি আসবেন তখন সমস্ত বিভ্রান্ত নাসারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবে।

(১) কাতাদা বলেন, এর অর্থ তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তাদের কাছে তার রবের রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন এবং তিনি যে বান্দা এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। [তাবারী]

(২) ইসলামী শরী'আতেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারিরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল। তাদের উপর কোন কোন জিনিস হারাম করা হয়েছিল তা সূরা আল-আন'আমের ১৪৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আমরা তাদের মধ্য হতে কাফিরদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে মজবুত তারা ও মুমিনগণ আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে। আর সালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমরা মহা পুরস্কার দেব[১]।

لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

তেইশতম রুকু'

১৬৩. নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম[২], যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম[৩]। আর ইবরাহীম,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ

---

(১) এ আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

(২) নবীগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। হারিস ইবন হিশাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'অহী কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের মত আমার নিকট আসে। আর ওটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টদায়ক অহী, এরপর ফেরেশ্‌তা আমার থেকে পৃথক হতো এমতাবস্থায় যে, তিনি যা বলেন তা শেষ হতেই তার কাছ থেকে আমি তা আয়ত্ব করে ফেলি। আবার কোন কোন সময় ফেরেশ্‌তা মানুষের আকারে এসে আমাকে যে অহী বলেন, আমি তা সাথে সাথে আয়ত্ব করে নেই। [বুখারীঃ ২]

(৩) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়েছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা

وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

১৬৪. আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি(১)। আর অবশ্যই আল্লাহ্ মূসার সাথে কথা বলেছেন।

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি(২), যাতে রাসূলগণ

তাকে অস্বীকার করে তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

(১) এ আয়াতে নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরে যেসব নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, এরা সবাই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাদের নিকটও বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথোপকথন করেছেন। যে কোন পন্থায়ই ওহী পৌঁছুক না কেন, তদানুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইয়াহূদীদের এরূপ আবদার করা যে, তাওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো, অন্যথায় নয় -সম্পূর্ণ আহম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরী'আতের অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল তিনশ' তের জন'। [সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৩৬১]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দূরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন কিয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, হে আল্লাহ্! কোন কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন কাজে আপনি অসন্তুষ্ট হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে

عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

আসার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন আপনার প্রতি যা তিনি নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে। তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে। আর ফেরেশতাগণও সাক্ষী দিচ্ছেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট[১]।

পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট নিদর্শনসহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁরা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবেলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কুরআনুল কারীম এমন এক অকাট্য দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকতে পারে না। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা ত্বা-হা এর ১৩৪ এবং সূরা আল-কাসাস এর ৪৭ নং আয়াত দেখা যেতে পারে।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে একদল ইয়াহূদী উপস্থিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। তারা অস্বীকার করলো। তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হলো- আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কিতাবের (আল-কুরআনের) মাধ্যমে -যা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন- আপনার নবুওয়াতের সাক্ষী দিচ্ছেন। আর ফিরিশ্‌তাগণও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ] এ আয়াতে কুরআনের সত্যতার উপর সাক্ষ্যদানের পাশাপাশি কুরআন যার উপর নাযিল হয়েছে তার সত্যতার উপরও সাক্ষ্য প্রদান হয়ে গেছে। তাছাড়া অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা শুধু কুরআনের জন্যও এ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, "আর আমরা সত্য-সহই কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্য-সহই নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।" [সূরা আল-ইসরাঃ ১০৫]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে তারা অবশ্যই ভীষনভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও যুলুম করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না,

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

১৭০. হে লোকসকল! অবশ্যই রাসূল তোমাদের রবের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে[১] আর যদি তোমরা কুফরী কর তবে আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

১৭১. হে কিতাবীরা! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না[২] এবং

---

(১) অর্থাৎ একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়াত সীমাবদ্ধ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইয়াহূদীদের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

(২) غُلُوّ শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা। আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী-নাসারা উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ এ বাড়াবাড়ি রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। নাসারারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাকে স্বয়ং আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পুত্র অথবা তিনের এক আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে ইয়াহূদীরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ি পথ অবলম্বন করেছে। তারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে স্বীকার করেনি।

عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا

আল্লাহ্‌র উপর সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা মসীহ কেবল আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী[১], যা তিনি মার্‌ইয়ামের

বরং তাঁর মাতা মারইয়াম 'আলাইহাস্ সালাম-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তার নিন্দাবাদ করেছে। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবড়ি ও সীমালংঘনের কারণে ইয়াহূদী ও নাসারাদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন নাসারারা ঈসা ইবন মারইয়াম 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর ব্যাপারে করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।' [বুখারীঃ ৩৪৪৫] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। হাদীসে এসেছে যে, হজের সময় 'রমীয়ে জামারাহ্' অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-কে কংকর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারি আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন, 'এ ধরণের মাঝারী আকারের কংকর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়।' বাক্যটি তিনি দু'বার বললেন। তারপর বললেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। [ইবন মাজাহ: ৩০২৯] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি কাজ করলেন যাতে রুখসত বা ছাড় ছিল। কিন্তু কিছু লোক সেটা করতে অপছন্দ করল। সেটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসার পর বললেন, কিছু লোকের এ কি অবস্থা হয়েছে যে, তারা আমি যা করছি তা করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়? আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমি তাদের থেকে সবচেয়ে বেশী জানি এবং তাদের থেকেও বেশী আল্লাহ্‌র ভয় করি।' [বুখারীঃ ৭৩০১]

(১) এখানে 'কালেমাতুহূ' শব্দে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কালেমা। মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন-

(এক) 'কালেমাতুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র সুসংবাদ। এর দ্বারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতোপূর্বে আল্লাহ্

ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর পক্ষ থেকে রূহ্। কাজেই তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন[১]!' নিবৃত্ত হও,

---

তা'আলা ফিরিশ্তার মাধ্যমে মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালামকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ﴾ "যখন ফিরিশ্তারা বললো, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন এক 'কালেমা'র" ।[সূরা আলে-ইমরানঃ ৪৫] (দুই) কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا﴾ [সূরা আত-তাহরীম: ১২] তাই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মার্ইয়ামের প্রতি 'কালেমা' পাঠাবার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মার্ইয়াম 'আলাইহাস্ সালামের গর্ভাধারকে কোন পুরুষের শুক্রকীটের সহায়তা ছাড়াই গর্ভধারণের হুকুম দিলেন। সে হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম শুধু আল্লাহ্র কালেমা বা নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (তিন) কাতাদা বলেন, কালেমা দ্বারা كُنْ বা 'হও' শব্দ বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারটি জাগতিক কোন মাধ্যম বাদেই আল্লাহ্র কালেমা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এখানে তাকে 'আল্লাহ্র কালাম' বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য। নতুবা সবকিছুই আল্লাহ্র কালেমার মাধ্যমেই হয়। তাঁর কালেমা ব্যতীত কিছুই হয় না। আল্লাহ্ ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিদর্শন ও আশ্চর্যতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মারইয়ামের নিকট পাঠালেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার জামার ফাঁকে ফু দিলেন। এ পবিত্র ফেরেশতার পবিত্র ফুঁ মারইয়ামের গর্ভে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে ফুঁকটিকে পবিত্র রুহ হিসেবে পরিণত করলেন। আর এ জন্যই তাঁকে সম্মানিত করে 'রুহুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। [তাফসীরে সা'দী]

(১) কুরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃষ্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক দল মনে করতো - মসীহ্ই আল্লাহ্। স্বয়ং আল্লাহ্ই মসীহ্রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো - মসীহ্ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল - তিন সদস্যের সমন্বয়ে আল্লাহ্র একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মারইয়াম এ তিনের সমন্বয়ে এক আল্লাহ্। অন্য একদলের মতে মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরিবর্তে 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্র আত্মা জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম ছিলেন তিন আল্লাহ্র একজন।
মোটকথা, খৃষ্টানরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তিনের এক আল্লাহ্ মনে করতো।

এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ই তো এক ইলাহ্; তাঁর সন্তান হবে---তিনি এটা থেকে পবিত্র-মহান। আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট(১)।

চব্বিশতম রুকূ'

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾

১৭২. মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশ্তাগণও করে না। আর কেউ

তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কুরআনুল কারীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তাঁর মাতা মারইয়াম 'আলাইহিস্ সালাম-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইয়াহূদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃষ্টানদের মত অতিভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

(১) অর্থাৎ আকাশ ও যমীনের উপর হতে নীচে পর্যন্ত যাকিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট; অন্য কারো সাহায্য-সহযোগীতার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না। সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন[১]।

১৭৩. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পূর্ণ করে দিবেন তাদের পুরস্কার এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। আর যারা (আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা) হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহংকার করেছে, তাদেরকে তিনি কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ ছাড়া তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

---

(১) ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বয়ং এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী ফিরিশ্‌তাগণ কখনো আল্লাহ্‌র বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ, আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম ও জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম প্রমূখ বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করাই লজ্জা বা অমর্যাদার কাজ। যেমন, নাসারারা ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্‌র পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা-আর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সঠিকভাবে ঈমান আনবে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে বক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল আর ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং সে কালেমা যা তিনি মারইয়াম 'আলাইহাস্ সালাম-এর মধ্যে পৌছিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ বিশেষ। আর এও ঈমান আনে যে, জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তার আমল যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [বুখারীঃ ৩৪৩৫]

১৭৪. হে লোকসকল! তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে(১) এবং আমরা তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি(২) নাযিল করেছি।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছে এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেছে তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়(৩)। বলুন, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ

(১) 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তার বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মু'জিযাসমূহ, তার প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কুরআন নাযিল হওয়া ইত্যাদি তার রেসালাতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তার মহান ব্যক্তিত্বই তার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

(২) আলোচ্য আয়াতে نور (নূর) শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। যেমন, সূরা আল-মায়েদার ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন এসেছে। আবার নূর অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল-কুরআনও হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে, হেদায়াতের নূর। যে আলোর ছোয়া লাগলে মানুষের হিদায়াত নসীব হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় দৈহিকতা থেকে মুক্ত শুধু নূর ছিলেন, যেমনটি কোন কোন ভ্রষ্ট সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে।

(৩) জাবের ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। তিনি অজু করে আমার উপর পানি ছিটিয়ে দিলে আমার হুঁশ আসে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মীরাস কারা পাবে? আমার তো 'কালালাহ' ছাড়া আর কোন ওয়ারিশ নেই। তখন ফারায়েযের আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ১৯৪; মুসলিমঃ ১৬১৬]

امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوْٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে[১] তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যদি দুই বোন থাকে তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ। আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে -এ আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত[২]।

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে এমন সব ভাই-বোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে, যারা মৃতের সাথে বাবা-মা উভয়ের দিক থেকে অথবা শুধুমাত্র বাবার দিক থেকে শরীক। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার তার এক ভাষণে এ ব্যাখ্যাই করেছিলেন। কোন সাহাবা তার এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি ইজমা বা সর্বসম্মত মতে পরিণত হয়েছে। আয়াতে এক বোনের জন্য অর্ধেক। আর দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ ঘোষণা করা হয়েছে। যদি দুই এর অধিক বোন থাকে তবে তাদের ব্যাপারে এখানে কিছু বলা হয় নি। অন্য আয়াতে সেটাও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, বোনদের সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে, দুই তৃতীয়াংশ। তারা যত বেশীই হোক না কেন এ সীমা অতিক্রম করে যাবে না। বলা হয়েছে, 'অতঃপর যদি তারা দুই এর অধিক মহিলা হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে।' [সূরা আন-নিসা:১১]

(২) বারা' ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সবশেষে নাযিলকৃত সূরা হল সূরা বারাআত (তাওবাহ)। আর সবশেষে নাযিলকৃত আয়াত হল এই আয়াত। [বুখারীঃ ৪৩৬৪, ৪৬০৫, ৪৬৫৬, মুসলিমঃ ১৬১৮]

৫- সূরা আল-মায়েদাহ্

سُوۡرَةُ الْمَائِدَة

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১২০।

নামকরণঃ এ সূরারই ১১২ ও ১১৬ নং আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত "মায়েদাহ" শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। মায়েদা শব্দের অর্থঃ খাবারপূর্ণ পাত্র।

সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ সূরা আল-মায়েদাহ্ সর্বসম্মত মতে মাদানী সূরা। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিকের সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত আছে, সূরা আল-মায়েদাহ্ যে সময় নাযিল হয়, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে 'আদ্বা' নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল। এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচে নেমে আসেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৫৫] কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর। বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। আবু হাইয়ান বলেনঃ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্জের সফরে নাযিল হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। [বাহরে মুহীত]

জুবায়ের ইবনে নুফায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একবার হজ্জের পর আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়েদাহ্ পাঠ কর? তিনি আরয করলেন, জী-হ্যাঁ, পাঠ করি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, এটি কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার নয়। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো। [দেখুনঃ মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩১১]

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. হে মুমিনগণ[১]! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ[২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ ۚ اُحِلَّتۡ

(১) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন শুনবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ' বা 'হে ঈমানদারগণ' বলছে তখন সেটাকে কান লাগিয়ে শুন। কেননা, এর মাধ্যমে কোন কল্যানের নির্দেশ আসবে বা অকল্যাণ থেকে নিষেধ করা হবে। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতে মুমিনগণকে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা 'উকুদ তথা ওয়াদা- অঙ্গীকারের সূরা। চুক্তি-অঙ্গীকার

পূর্ণ করবে[১]। যা তোমাদের নিকট | لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'আমর ইবন হায্মকে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন। [দেখুন, নাসায়ী: ৪৮৫৬; আল খাতীবুল বাগদাদী, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ: হাদীস নং ৩১৮ (হাদীসটির সনদ হাসান); দেখুন, 'আদেল ইউসুফ আল-'আয্যাযীর টিকা এবং ইরউয়াউল গালীল ১ম খণ্ড: পৃষ্ঠা নং ১৫৮-১৬১]

(১) عُقُوْدٌ শব্দটি عقد শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়েছে। এভাবে عقود এর অর্থ হয় عهود অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার। [তাবারী] বস্তুত: দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই আমরা আমাদের পরিভাষায় চুক্তি বলে অভিহিত করে থাকি। অতএব, উপরোক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস]

তবে এ আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকার যায়দ ইবনে আসলাম বলেনঃ এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি। মুজাহিদ, রবী, কাতাদা প্রমুখ বলেনঃ এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। [বাগভী]

প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। কারণ, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ইমাম আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বলেনঃ চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেনঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। (এক) পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। (দুই) নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া। (তিন) মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

বর্ণিত হচ্ছে[১] তা ছাড়া গৃহপালিত[২] চতুষ্পদ জন্তু[৩] তোমাদের জন্য হালাল করা হল, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না[৪]।

চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন-দেন,বিবাহ্‌, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। তবে শরী'আত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্যে বৈধ নয়। [তাফসীর আবুল লাইস আস-সামারকান্দী]

(১) 'যা বর্ণিত হচ্ছে' বলে যা বোঝানো হয়েছে, তা এখানে বর্ণিত হয় নি। পরবর্তী ৩ নং আয়াতে সেটার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) আয়াতে বর্ণিত أنعام শব্দটি نعم এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন- উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আল-আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে أنعام বলা হয়। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল ,গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরী'আতের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্‌ করে খেতে পার। [কুরতুবী]

(৩) এখানে সব ধরনের জন্তু বুঝানো হয়নি। বরং সুনির্দিষ্ট কিছু জন্তু বোঝানো হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে بَهِيْمَةٌ যেসব জীব-জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بَهِيْمَةٌ বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مُبْهَم তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। এখানে 'বাহীমা' বলে কোন কোন সাহাবীর মতে, জবাইকৃত প্রাণীর উদরে যে বাচ্চা পাওয়া যায় সেটাকে বোঝানো হয়েছে। [তাফসীরে কুরতুবী; সা'দী; বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(৪) ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে নিষেধ করার মাধ্যমে এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, পূর্বে বর্ণিত 'বাহীমাতুল আন'আম' বলতে সে সমস্ত প্রাণীকেও বোঝাবে, যেগুলোকে সাধারণত শিকার করা হয়। যেমন, হরিণ, বন্য গরু, খরগোশ ইত্যাদি। কারণ, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম হওয়ার অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল হওয়া। [সা'দী]

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যা ইচ্ছে আদেশ করেন(১)।

২. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ(২), পবিত্র মাস, কুরবানীর

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا

(১) আল্লাহ্ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমত যে কোন হুকুম দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। কাতাদা বলেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে যা ইচ্ছে বিধান প্রদানের অধিকারী। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যা ইচ্ছা তা বর্ণনা করেন, ফরয নির্ধারিত করেন, সীমা ঠিক করে দেন। আনুগত্যের নির্দেশ দেন ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়-নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার শুধু এ জন্যই তাঁর আনুগত্য করে না; বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ্র হুকুম বলেই তাঁর আনুগত্য করে। তাই কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য আল্লাহ্র অনুমোদন ও অননুমোদন ছাড়া আর দ্বিতীয় ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। তারপরও সেগুলোতে অনেক হেকমত নিহিত থাকে। যেমন তোমাদেরকে তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ, এতে রয়েছে তোমাদের স্বার্থ। আর এর বিপরীত হলে, তোমাদের স্বার্থহানী হবে। তোমাদের জন্য কিছু প্রাণী হালাল করেছেন সম্পূর্ণ দয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। আবার কিছু প্রাণী থেকে নিষেধ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত রাখার জন্য। অনুরূপভাবে তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষেধ করেছেন, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ হে মুমিনগন, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। এখানে شَعَائِر শব্দটি شَعِيْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলিম হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شَعَائِرُ الإسلام তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলী' বলা হয়। যেমন, সালাত, আযান, হজ, দাড়ী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সাফা, মারওয়া, হাদঈ ও কুরবানীর জন্তু ইত্যাদিও আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাহর নিদর্শনাবলী'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। সব উক্তির নির্যাস হলো এই যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরী'আত এবং ধর্মের নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব ও এদের সীমা। [ফাতহুল কাদীর]

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা হচ্ছে, প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [সা'দী] আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশটিই অন্যস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

জন্য কা'বায় পাঠানো পশু, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশু এবং নিজ রব-এর অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভের আশায় পবিত্র ঘর অভিমুখে যাত্রীদেরকে বৈধ মনে করবে না[১]। আর যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার[২]। তোমাদেরকে মস্‌জিদুল্ হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে[৩]। নেককাজ ও

প্রদর্শন করে, তা অন্তরের তাকওয়ারই লক্ষণ'। [সূরা আল-হাজ্জ:৩২] তাছাড়া আয়াতের বাকী অংশে এ নিদর্শণাবলীর কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

(১) অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] পবিত্র মাস হচ্ছে জিলকদ, জিলহজ, মুহাররাম ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরী'আতের আইনে অবৈধ ছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে পরবর্তী কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রখ্যাত তাবে'য়ী ইমাম 'আতা, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এবং ইবনুল কাইয়্যেম মনে করেন যে, এ আদেশ রহিত হয় নি। যদি কেউ আক্রমণ করে বা যুদ্ধ এর আগে থেকেই চলে আসে তবে এ মাসে যুদ্ধ করা যাবে, নতুবা নয়। [সা'দী, ইবন কাসীর]
এ আয়াতে পরবর্তী নির্দেশ হচ্ছে, কুরবানী করার জন্তু, বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কিছু পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা ঐসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালণকর্তার রহমত, দয়া ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না। [সা'দী]

(২) এখানে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ যে সম্প্রদায় হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং

তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে[১] এবং পাপ ও সীমালংঘনে

ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্জ করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে যুলুম। আর ইসলাম যুলুমের উত্তরে যুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম যুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম হক দ্বীন। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তি কি হবে সেটা আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন সৎকর্ম ও আল্লাহর ভয়কে আসল মাপকাঠি করেছে, এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। মূলতঃ সৎকর্ম ও তাকওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। কারণ, সমস্ত মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, 'কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪১১] আয়াতে বর্ণিত সৎকাজ ও পাপকাজ এর সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বির বা সৎকাজ হচ্ছে, সচ্চরিত্রতা। আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে উদিত হয় অথচ তুমি চাও না যে, মানুষ সেটা জানুক'। [মুসলিম: ২৫৫৩] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বির বা সৎকাজ হচ্ছে, যাতে অন্তর শান্ত হয়, চিত্তে প্রশান্তি লাভ হয়। আর পাপ হচ্ছে, যাতে অন্তরে শান্ত হয় না এবং চিত্তেও প্রশান্তি লাভ হয় না, যদিও ফতোয়াপ্রদানকারীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকুক'। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৯৪] আর সহযোগিতার ধরণ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অত্যাচারিতকে তো আমরা সাহায্য করে থাকি। কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল বললেন, তার দু'হাতে ধরে রাখবে। [বুখারী: ২৪৪৪] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ কোন মুসলিমের সম্মান-ইজ্জত-আব্রু নষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন। [তিরমিযী: ১৯৩১; মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৫০] তাকওয়া ও বির এর মধ্যে পার্থক্য করে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'নির্দেশিত বিষয় করার নাম বির, আর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া।' [তাবারী]

একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু[১], রক্ত[২], শূকরের গোস্ত[৩], আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা পশু[৪], গলা চিপে মারা যাওয়া জন্তু[৫], প্রহারে মারা যাওয়া জন্তু[৬], উপর থেকে পড়ে

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

(১) আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি জিনিস হারাম করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম হারাম বস্তু হিসেবে বলা হয়েছে, মৃত জিনিস। এখানে 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা যবেহ্ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এধরনের মৃত জন্তুর গোস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্রকার মৃতকে এ বিধানের বাইরে রেখেছেন, একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। [মুসনাদে আহমদঃ ২/৯৭, ইবন মাজাহঃ ৩৩১৪]

(২) আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কুরআনের অন্য আয়াতে ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ বা 'প্রবাহিত রক্ত' [সূরা আল-আন'আম:১৬৫] বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

(৩) আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে, শুকরের গোস্ত। গোস্ত বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর]

(৪) আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি যবেহ্ করার সময়ও অন্যের নাম নেয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শির্ক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরেকরা মূর্তিদের নামে যবেহ্ করত। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে কোন কোন মুর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ্ করে। যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে জবেহ বা কুরবানী করা হয়, তাই এ সব জন্তুও আয়াত দৃষ্টে হারাম।

(৫) আয়াতে বর্ণিত পঞ্চম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে। [ইবন কাসীর]

(৬) আয়াতে বর্ণিত ষষ্ঠ হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচন্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং

بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣﴾

মারা যাওয়া জন্তু(১), অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্তু(২) এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু(৩); তবে যা তোমরা যবেহ্ করতে পেরেছ তা ছাড়া(৪), আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলী দেয়া হয় তা(৫) এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ

তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে বর্ণিত সপ্তম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এমনিভাবে কোন পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায়, তবে তা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতে বর্ণিত অষ্টম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মোটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং- এর আঘাতে মরে যায়। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে বর্ণিত নবম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। [ইবন কাসীর] এগুলো ছাড়াও হাদীসে অন্যান্য আরো কয়েক ধরনের প্রাণী হারাম করা হয়েছে।

(৪) উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ অর্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে। এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ্ করার সম্ভাবনা নাই এবং শূকর এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যাবেহ্ করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শেষোক্ত এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে যবেহ্ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে। [ইবনে কাসীর]

(৫) আয়াতে বর্ণিত দশম হারাম বস্তু হচ্ছে, ঐ জন্তু, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্ করা হয়। নুছুব ঐ প্রস্তর বা বেদীকে বলা হয়, যা কাবা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কোরবানী করত। একে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত। জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তুর গোস্ত ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে হারাম করেছেন। [ইবন কাসীর] বর্তমানেও যদি কোথাও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য

নির্ণয় করা[১], এসব পাপ কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে[২]; কাজেই তাদেরকে ভয়

উৎসর্গ করার কোন বেদী বা কবর অথবা এ জাতীয় কিছু থাকে এবং সেখানে কেউ কোন কিছু যবেহ্ করে, তবে তাও হারাম হবে।

(১) আয়াতে উল্লেখিত একাদশ হারাম বস্তুটি হচ্ছে, 'ইস্তেকসাম বিল আযলাম'। যার অর্থ তীরের দ্বারা বন্টণকৃত বস্তু। أَزْلَام শব্দটি زَلَمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারত ছিল। এ কাজের জন্যে সাতটি তীর ছিল। তম্মধ্যে একটিতে نعم (হ্যাঁ), একটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তূন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হ্যাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের গোস্ত বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ্ করে তা গোস্ত প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বন্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী গোস্ত পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

আলেমগণ বলেন, ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে; যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, ইত্যাদি সব اسْتِقْسَام بِالْأَزْلَام এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। اسْتِقْسَام بِالْأَزْلَام শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা একে مَيْسِر নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। মোটকথা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা কোন কিছু নির্ধারণ করা হারাম। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ অদ্য কাফেররা তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহকে ভয় কর। এ আয়াতাংশ যখন নাযিল হয়, তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলিমদের করতলগত ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী বিধি-বিধান প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছেঃ ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নাই। এ কারণে মুসলিমরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে স্বীয় রবের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করুক। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্

করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম(১), আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম(২)। অতঃপর কেউ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আরব উপদ্বীপে মুসল্লীরা শয়তানের ইবাদত করবে এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়েছে, তবে সে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল লাগিয়ে রাখতে পারবে" [বুখারী: ১১৬২; আবু দাউদ: ১৫৩৮; তিরমিযী: ৪৮০; ইবন মাজাহ: ১৩৮৩]। কোন কোন মুফাসসির বলেন, কাফেরদের নিরাশ হওয়ার অর্থ, তারা তোমাদের মত হবে এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড তাদের মত হবে এ ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়েছে, কারণ, তোমাদের গুণাগুণ তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । [ইবনে কাসীর]

(১) দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেবার অর্থই হচ্ছে এর মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের নীতিগত ও বিস্তারিত জবাব পাওয়া যায়। হেদায়াত ও পথনির্দেশ লাভ করার জন্য এখন আর কোন অবস্থায়ই তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং এ নবীর পরে কোন নবী নেই। এ শরী'আতের পরে কোন শরী'আত নেই। এ শরী'আতে যা যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য ও ইনসাফপূর্ণ। আল্লাহ্‌ বলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ১১৫] [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতের এ অংশটি নাযিলের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে-আরাফাত। এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার বিশেষ স্থান। সময় আছরের পর-যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ দিনের এ সময়েই দো'আ কবুলের মূহুর্তটি ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দো'আ কবুলের সময়। হজ্জের জন্যে মুসলিমদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল-আলামীন সাহাবায়ে-কেরামের সাথে আরাফার সে বিখ্যাত পাহাড়ের নীচে স্বীয় উষ্ট্রী আদ্ববার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্জের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত। এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লেখিত পবিত্র আয়াতটি নাযিল হয়। [দেখুন, তিরমিযীঃ ৩০৪৪] আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এ আয়াত কুরআনের শেষ দিকের আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু

পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪. মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বলুন, 'তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত পবিত্র জিনিস[১]। আর শিকারী পশু-পাখি, যাদেরকে তোমরা শিকার শিখিয়েছ - আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে সেগুলোকে তোমরা শিখিয়ে থাক - সুতরাং এই (শিকারী পশুপাখি)-গুলো যা কিছু তোমাদের জন্য ধরে আনে তা থেকে খাও। আর এতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর[২] এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত-এর পর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পান। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে বর্ণিত طيبات শব্দের তিনটি অর্থ হয়ে থাকে। এক. যাবতীয় রুচিসম্পন্ন। দুই. যাবতীয় হালালকৃত। তিন. যাবতীয় যবাইকৃত প্রাণী। কারণ, যবাই করার কারণে সেগুলোতে পরিচ্ছন্নতা এসেছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম শর্তঃ কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে- নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপাখীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরৎ আসার জন্যে ডাক দেয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে- যদিও তখন কোন শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্যে শিকার করে, নিজের জন্যে নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গন্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার

অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।'

৫. আজ[১] তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরৎ না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়। দ্বিতীয় শর্তঃ আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مكلبين শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تكليب ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা দেয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করা বা إرسال এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তৃতীয় শর্তঃ শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি ﴿مِمَّآ اَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ শর্তঃ শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। উপরে বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; যবেহ্ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ্ ব্যতীত হালাল হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিকার হিসেবে ঐসব বন্য জন্তুর ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে, যে গুলো কারও করতলগত নয়। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত যবেহ্ করা ব্যতীত হালাল হবে না। [ইবন কাসীর ও কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী আদী ইবন হাতিমকে বললেন, 'যখন তুমি শিকারের উদ্দেশ্যে তোমার কুকুরকে পাঠাবে এবং পাঠানোর সময় আল্লাহ্‌র নাম নিবে, তারপর যদি সে কুকুর কোন শিকার পাকড়াও করে, তবে তা থেকে খাও, যদিও সে শিকারটিকে হত্যা করে ফেলে থাকে। তবে যদি কুকুর সেটা থেকে নিজে খেয়ে নেয় সেটা ভিন্ন। সেটা খেয়ো না। কারণ, সেটা সে নিজের জন্য শিকার করেছে এমন আশঙ্কা রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য কুকুর এর সাথে মিশে শিকার করলেও সেটা খেয়ো না।' [বুখারী: ৫৪৭৫; মুসলিম: ১৯২৯।

(১) এখানে 'আজ' বলে এ দিনকে বোঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্যে হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হল। [কুরতুবী]

الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

জিনিস হালাল করা হল[১] ও যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে[২] তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ । আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা[৩] নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হল[৪] যদি তোমরা তাদের

---

(১) এ আয়াতে طيبات অর্থাৎ পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ হালাল করেন তাদের জন্যে طيبات এবং হারাম করেন خبائث [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭] এখানে طيبات এর বিপরীতে خبائث ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। অভিধানে طيبات পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خبائث নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। [জালালাইন] কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাপারে নবীদের সিদ্ধান্ত সবার জন্যে অকাট্য দলীলস্বরূপ। কেননা, মানুষের মধ্যে নবীগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। কোন কোন মুফাসসির এখানে طيبات এর অর্থ আল্লাহর নামে যবাইকৃত হালাল প্রাণী অর্থ করেছেন। [বাগভী]

(২) এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য যে কিতাবটির অনুসারী বলে তারা দাবী করে, সে কিতাবটি আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা কিতাব কি না তা প্রমাণিত হতে হবে। সাথে সাথে স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, মূসা ও ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালামের সহীফা ইত্যাদি। আর যাদের গ্রন্থ আল্লাহর কিতাব বলে কুরআন ও সুন্নাহর নিশ্চিত পন্থায় প্রমাণিত নয়, তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূলতঃ কুরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও নাসারা জাতিই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে ইয়াহূদী ও নাসারা মহিলাদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তা হলো, তাদেরকে অবশ্যই 'মুহসানাহ্' বা সংরক্ষিত মহিলা হতে হবে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা সংরক্ষিত বা নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারিনী নয়, তারা এর ব্যতিক্রম। [সা'দী]

(৪) আয়াতে আহলে কিতাবদের খাদ্য বলা হয়েছে। সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগনের মতে 'খাদ্য' বলতে যবেহ্ করা জন্তুকে

মাহ্র প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে[১]।

দ্বিতীয় রুকূ'

৬. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসেহ কর[২] এবং পায়ের

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ

বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] কেননা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে-কিতাব, পৌত্তলিক, মুশরেক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ্ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলিমের জন্যে খাওয়া হালাল। [সা'দী] অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে, কাফেরদের মধ্য থেকে আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারাদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে। [ইবন কাসীর]

(১) ঈমানের সাথে কুফরী করার অর্থ, ইসলামী শরী'আতের সাথে কুফরী করলো শরী'আতের বিধি-বিধান মানতে অস্বীকার করল, তার সমস্ত আমল পণ্ড হয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর, মুয়াচ্ছার, সাদী] যারাই এভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর দেয়া শরী'আতের সাথে কুফরী করে সে অবস্থায় মারা যাবে। সে ঈমান অবস্থায় করা যাবতীয় আমল ধ্বংস করে ফেলবে। আখেরাতে সে কিছুরই মালিক থাকবে না। আলেমগণ এ আয়াত থেকে দলীল নিয়েছেন যে, যারাই মুর্তাদ হবে এবং সে অবস্থায় মারা যাবে, তাদের সমস্ত আমল পণ্ড হয়ে যাবে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৭] [সা'দী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, কুলি করা ও নাক পরিস্কার করাও মুখমণ্ডল ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑥

টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও[১]; এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে, বা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও[২] এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। সুতরাং তা দ্বারা মুখমণ্ডলে ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

মুখমণ্ডল ধোয়ার কাজটি কখনোই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর কান যেহেতু মাথার একটি অংশ, তাই মাথা মাসেহ্ করার মধ্যে কানের ভেতরের ও বাইরের উভয় অংশও শামিল হয়ে যায়। তাছাড়া অযু শুরু করার আগে দু'হাত ধুয়ে নেয়া উচিত। কারণ, যে হাত দিয়ে অযু করা হচ্ছে, তা পূর্ব থেকেই পবিত্র থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সর্বোপরি অযু করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অঙ্গসমূহ ধোয়ার মধ্যে বিলম্ব না করা উচিত। এসবের জন্যও হাদীসে বর্ণনা এসেছে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিধি-বিধানের জন্য তাফসীরে ইবন কাসীর ও তাফসীর কুরতুবী দেখা যেতে পারে]

(১) নু'আইম আল-মুজ্‌মির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তিনি ওযু করে বললেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতদেরকে কেয়ামতের দিন তাদেরকে 'গুর্‌রান-মুহাজ্জালীন' বলে ডাকা হবে। (অর্থাৎ ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো উজ্জ্বল অবস্থায় উপস্থিত হবে) কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম, সে যেন তা (বৃদ্ধি)করে। [বুখারীঃ ১৩৬]

(২) স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাত হোক বা স্বপ্নে বীর্য স্খলনের কারণে হোক উভয় অবস্থায়ই গোসল ফরয। এ অবস্থায় গোসল ছাড়া সালাত আদায় করা ও কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে তায়াম্মুমই যথেষ্ট। [সা'দী]

৭. আর স্মরণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তা; যখন তোমরা বলেছিলে, 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম'(১)। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে(২), এটা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত(৩)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

(১) সত্যনিষ্ঠ মুফাসসিরদের মতে, এখানে কোন মুখ দিয়ে বের হওয়া অঙ্গীকার উদ্দেশ্য নয়। বরং ঈমান আনার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধ পালনের যে অঙ্গীকার স্বতঃই এসে যায়, তা-ই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর, সা'দী, মুয়াসসার]

(২) এমনকি সন্তানদের মধ্যেও সুবিচার করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। নু'মান ইবন বাশীর বলেন, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আমি আমার এ সন্তানকে একটি দাস উপঢৌকন দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এ রকম উপঢৌকন দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল বললেন, তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।' [বুখারী: ২৫৮৬; মুসলিম: ১৬২৩]

(৩) এ আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে বলা হয়েছিলঃ ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ﴾ [সূরা আন-নিসা: ১৩৫] আর এখানে বলা হচ্ছেঃ ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ﴾ । সাধারণতঃ দুটি

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑨

১০. আর যারা কুফরী করে এবং আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ⑩

১১. হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত প্রসারিত করতে চেয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত রাখলেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আল্লাহ্‌র উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

কারণ মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (দুই) কোন ব্যাক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা আন-নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে আর সূরা আল-মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সূরা আন-নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা আল-মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। [বাহরে-মুহীত] তাছাড়া সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, “সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী” [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৮৩]।

(১) এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বার বার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যেসব পরিকল্পনা

তৃতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَوٰةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

১২. আর অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে বারজন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সংগে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাঁদেরকে সম্মান-সহযোগিতা কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে আমি তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।' এর পরও কেউ কুফরী করলে সে অবশ্যই সরল পথ হারাবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا

১৩. অতঃপর তাদের[1] অঙ্গীকার ভঙ্গের

করে, সেগুলো আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। সে সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের অদৃশ্য হেফাযতের কথা উল্লেখ করার পর প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত লাভ করার জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা জরুরী। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় বা কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী-ইস্রাঈল দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন। অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে। [ইবন কাসীর]

قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠিন করেছি; তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গেছে। আর আপনি সবসময় তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবেন[১], কাজেই তাদেরকে

(১) এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গের পাঁচটি শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে দু'টি শাস্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেনঃ "আমরা বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম"। ফলে এখন এতে কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনে 'মরিচা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্র আয়াত ও তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে 'মরিচা' পড়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেনঃ 'মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তাওবা করে এং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহ্র কারণে একটি করে কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষনাৎ বের হয়ে আসে। পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর কোন পুণ্য কাজকে পুন্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। [তিরমিযীঃ ৩৩৩৪, ইবন মাজাহঃ ৪২৪৪, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৯৭] অর্থাৎ ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে সওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতা বেড়েই চলে। এভাবে বনী-ইস্রাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ দুটি সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহ্র রহমত থেকে তারা দূরে সরে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায়। তৃতীয় সাজা হচ্ছে যে, আল্লাহ্র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ্র কালামে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তিলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক নাসারাও

ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যারা বলে, 'আমরা নাসারা', তাদেরও অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করেছিলাম; অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গিয়েছে। ফলে আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি[১]। আর তারা যা করত আল্লাহ্ অচিরেই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا

১৫. হে কিতাবীরা! আমাদের রাসূল

তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে তা কিছু কিছু স্বীকার করে। তাদের চতুর্থ সাজা হচ্ছে যে, তারা তাদেরকে কিতাবের যে অংশ দেয়া হয়েছিল তার অনেকাংশ হারিয়ে ফেলে বা ভুলে যায়। এটাও তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। তাদের পঞ্চম শাস্তি হচ্ছে যে, তারা সবসময় খেয়ানতে লিপ্ত থাকবে। আল্লাহ্র সাথেও তারা খেয়ানত করবে, তাঁর নির্দেশ ও নিষেধে ভ্রুক্ষেপ করবে না। অনুরূপভাবে তারা মানুষের সাথেও খেয়ানত করতে থাকবে। [সা'দী]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে- যা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বর্তমানেও নাসারাদের মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বড় মতানৈক্য, পরস্পর বিভেদ ও বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। নাসারাদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে যে সমস্ত বিভেদ তা বহুমাত্রিক। সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন কোনভাবেই সম্ভব নয়। [ইবন কাসীর] কাতাদা বলেন, 'এ সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্র কিতাব ছেড়ে দিল, ফরযসমূহ নষ্ট করল, হদসমূহ বাস্তবায়ণ বন্ধ করল, তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক করে দেয়া হলো, এটা তাদেরই খারাপ কর্মফলের কারণে তাদের উপর আপতিত হয়েছে। যদি তারা আল্লাহ্র কিতাব ও তার নির্দেশের বাস্তবায়ন করত, তবে তারা এ ধরনের মতপার্থক্য ও বিদ্বেষে লিপ্ত হতো না।' [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, এ আয়াতে যাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রাখার কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

তোমাদের নিকট এসেছেন[১], তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে[২]।

(১) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তাদের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পথ বলে দেবার পাশাপাশি তারা যে সমস্ত বিষয় গোপন করেছে সেগুলোর অনেকটাই প্রকাশ করে দেন। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে ব্যক্তি 'রাজম' তথা বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যার কথা অস্বীকার করবে, সে কুরআনের সাথে এমনভাবে কুফরী করল যে সে তা বুঝতেই পারছে না। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, 'হে কিতাবীরা! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন'। তারা যে সমস্ত জিনিস গোপন করেছিল, রজমের বিধান ছিল তার একটি। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৩৫৯]

(২) এ আয়াতে উল্লিখিত 'নূর' সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। যা মূলত পরস্পর সম্পূরক, বিপরীত নয়। কারও কারও মতে, এখানে 'নূর' দ্বারা উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারও কারও মতে, কিতাব বা কুরআন। বস্তুত রাসূল ও কিতাব একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাসূল ও কিতাব উভয় ক্ষেত্রেই 'নূর' বিশেষণ ব্যবহার হয়। এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য, ইসলামের দিকে আহ্বানকারী রাসূল, ইসলামের বিধানসম্বলিত কিতাব, অথবা রাসূল ও কিতাব উভয়ই। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় রাসূল ও কিতাব উভয়কে নূর বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। যেমন সূরা আহযাবের ৪৫-৪৬ নং আয়াতে 'নূর' ধাতু থেকে উদ্গত কর্তাবাচক বিশেষ্য 'মুনীর' শব্দ দ্বারা রাসূলকে বিশেষিত করা হয়েছে। আবার একাধিক জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনকে 'নূর' দ্বারা বিশেষিত করেছেন। যেমন, সূরা আশ-শূরা: ৫২; সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭; সূরা আত-তাগাবুন: ৮; সূরা আন-নিসা: ১৭৪। এসব জায়গায় 'নূর' দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অহী তথা শুধু কুরআনুল কারীমকে বুঝিয়েছেন। অন্যত্র অনুরূপভাবে অন্যান্য নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবকেও তিনি 'নূর' আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, সূরা আল-আন'আম: ৯১; সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪, ৪৬।

কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসমান থেকে নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র সকল কিতাবই 'নূর'। লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যেরূপ 'নূর' শব্দের কর্তাবাচক শব্দ 'মুনীর' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে,

১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন[১] এবং তাদেরকে নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।

يَّهۡدِيۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ۝١٦

১৭. যারা বলে, 'নিশ্চয় মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্ই আল্লাহ্', তারা অবশ্যই কুফরী করেছে[২]। বলুন, 'আল্লাহ্ যদি

لَقَدۡ كَفَرَ الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡمَسِيۡحُ ابۡنُ مَرۡيَمَ ؕ قُلۡ فَمَنۡ يَّمۡلِكُ مِنَ

অনুরূপ বিশেষণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেমন, সূরা আলে ইমরান: ১৮৫। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল, নাযিলকৃত অহী এবং সকল আসমানী কিতাব 'নূর'; যা বান্দাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে আগমন করেছে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকেই হিদায়াত করেন, যে তার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, অর্থাৎ তার মনোনীত দ্বীনের আলোকে চলে। কুরআনের অন্যত্র এ ঘোষণা এসেছে, যেমন সূরা আল-মায়িদাহ: ৩; সূরা আয-যুমার: ২২; সূরা আল-আন'আম: ১২২। অতএব এ নূর হচ্ছে অহীর নূর। এর মাধ্যমে বান্দা তার রবের ইবাদাত সম্পর্কে দিকনির্দেশনা লাভ করে। মানুষের সাথে সম্পর্কের নীতিমালা অর্জন করে। এ নূরই তার সঙ্গীতে পরিণত হয় এবং পথহারা অবস্থায় এ নূর দ্বারাই সে পথের সঠিক দিশা লাভ করে। মোদ্দাকথা: নূর অর্থ অহী, এ অহী যেহেতু রাসূলের উপর নাযিল হয়েছে, তাই কখনো তাকে নূর হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে, কখনো কুরআনকে, কখনো তাওরাত ও ইঞ্জীলকে। অতএব আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অহী সম্বলিত রাসূল ও স্পষ্ট কিতাব আগমন করেছে।

(১) সুদ্দী বলেন, শান্তির পথ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র পথ যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন এবং সেদিকে আহ্বান করেছেন। আর যা নিয়ে তিনি তাঁর রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। সেটিই হচ্ছে, ইসলাম। কোন মানুষ থেকে তিনি এটা ব্যতীত আর কোন আমল গ্রহণ করবেন না। ইয়াহূদীবাদও নয়, খ্রিষ্টবাদও নয়, মাজুসীবাদও নয়। [তাবারী]

(২) আলোচ্য আয়াতে নাসারাদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে- যা তাদের একদলের বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ তাদের একদলের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা মসীহ্ হুবহু আল্লাহ্। কিন্তু আয়াতে যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে নাসারাদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালামের আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন ইলাহ্‌র অন্যতম

اللهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্, তাঁর মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে ধ্বংস করতে ইচ্ছে করেন তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে?' আর আস্‌মানসমূহ ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন(১) এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ أَبْنٰٓؤُا اللهِ وَأَحِبّٰٓؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ

১৮. আর ইয়াহূদী ও নাসারারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন।' বলুন, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের

ইলাহ্ হওয়ার বিশ্বাসই হোক। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, যদি তিনি ঈসা ও তার মা মারইয়ামকে মারতে ইচ্ছা করেন, তবে কি এমন কেউ আছে যে তাদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে? তারা নিজেরাও সেটা করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তারা কিভাবে ইলাহ হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলার সামনে মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম এতই অক্ষম যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফাযত তার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। সুতরাং তিনিই কিভাবে ইলাহ হতে পারেন। আর তার মা যেহেতু মারা গেছেন সেহেতু কিভাবেই বা তিনি তিন ইলাহ্‌র অন্যতম ইলাহ্ বলে বিবেচিত হবেন? [তাফসীর মুয়াস্‌সার ও সা'দী]

(১) 'তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন' এ বাক্যে নাসারাদের পূর্বোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, মসীহ্‌কে আল্লাহ্ মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন। আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন অন্যত্র বলেছেন যে, "ঈসার উদাহরণ তো আদমের মত" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৫৯] এ আয়াতেও উক্ত সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করা তার ইলাহ্ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। লক্ষণীয় যে, আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ সবকিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, রব ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। [সা'দী; মুয়াস্‌সার; ইবন কাসীর]

بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন[১]? বরং তোমরা তাদেরই অন্তর্গত মানুষ যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।' যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেন[২]। আর আস্‌মানসমূহ্ ও যমীন এবং এ দুয়ের

(১) *অর্থাৎ যদি সত্যি-সত্যিই তোমারা আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দা হতে তবে তিনি তোমাদেরকে* শাস্তি দিতেন না। অথচ তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা নও। আল্লাহ্ যে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন এটা তোমরাও স্বীকার কর। তোমরা বলে থাক যে, 'আমাদেরকে সামান্য কিছুদিনই কেবল অগ্নি স্পর্শ করবে' [সূরা আল-বাকারাহঃ ৮০; সূরা আলে ইমরানঃ ২৪] আর যদি সত্যি সত্যিই তোমাদের কোন শাস্তি হবে না তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর না কেন? দুনিয়ার কষ্ট থেকে বেঁচে গিয়ে আখেরাতের স্থায়ী শান্তি যদি তোমাদের জন্যই নির্ধারিত থাকে, তবে তোমাদের উচিত মৃত্যু কামনা করা। অথচ তোমরা হাজার বছর বাঁচতে আগ্রহী। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, বলুন, 'যদি আল্লাহ্‌র কাছে আখেরাতের বাসস্থান অন্য লোক ছাড়া বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর---যদি সত্যবাদী হয়ে থাক'। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। [সূরা আল-বাকারাহঃ ৯৪-৯৫] আরও বলেন, বলুন, 'হে ইয়াহূদী হয়ে যাওয়া লোকরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে (তাদের কৃতকর্ম) এর কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। [সূরা আল-জুম'আঃ ৬-৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে দেন না।' [মুসনাদে আহমাদ ৩/১০৪] এক বর্ণনায় এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নো'মান ইবন আদ্বা, বাহরী ইবন আমর এবং শাস ইবন আদী এসে কথা বলল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানালেন, তাঁর শাস্তির ভয় দেখালেন। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখান? আমরা তো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও তার প্রিয়জন! নাসারাদের মতই তারা বলল। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন। [তাবারী]

(২) সুদ্দী বলেন, এর অর্থ, যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে হেদায়াত দেন, ফলে তাকে তিনি ক্ষমা করেন। আর যাকে ইচ্ছা কুফরীর উপর মৃত্যু দেন, ফলে তাকে তিনি শাস্তি দেন। [তাবারী]

মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٩

১৯. হে কিতাবীরা! রাসূল পাঠানোতে বিরতির পর[১] আমাদের রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন। তিনি তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছেন, যাতে তোমরা না বল যে, 'কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের কাছে আসেনি। অবশ্যই তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসেছেন[২]। আর

(১) অর্থাৎ নবীগণের আগমন-পরম্পরা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। ঈসা 'আলাইহিস্‌ সালামের পর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের সময় পর্যন্ত যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়েছে, সে সুদীর্ঘকাল সময়ে আর কোন নবী আসে নি। আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ মূসা ও ঈসা 'আলাইহিমাস্‌ সালামের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে নবীগণের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী-ইস্‌রাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার নবী এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। তারপর ঈসা 'আলাইহিস্‌ সালামের জন্ম ও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসল্লামের নবুওয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র চারশ' বা পাঁচশ' বা ছয়শ' বছরকাল নবীগণের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فترة তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় নবীগণের আগমন বন্ধ ছিল না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি ইবন মারইয়ামের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ। নবীরা বৈমাত্রেয় ভাই, আমার ও তাঁর মাঝে কোন নবী নেই।' [মুসলিমঃ ২৩৬৫; অনুরূপ বুখারী: ৩৪৪২]

(২) আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তার আগমনকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নেয়ামত মনে করা। কেননা, নবীর আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্যে তা আবার খোলা হয়েছে।
নবী আসার পর তোমাদের আর কোন ওজর আপত্তি অবশিষ্ট রইল না। সুতরাং তোমাদের উচিত ঈমান আনা। আর যদি তা না কর তবে মনে রেখ যে, আল্লাহ্‌

আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

চতুর্থ রুকূ'

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

২০. আর স্মরণ করুন[১], যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি

তা'আলা অপরাধীকে শাস্তি ও আনুগত্যকারীকে শান্তি দিতে সক্ষম। [ইবন কাসীর, মুয়াসসার ও তাবারী]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বনী-ইস্‌রাঈলের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় এবং মূসা 'আলাইহিস্‌ সালাম ও তার সম্প্রদায় বনী-ইস্‌রাঈল ফির'আউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে কিছু নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাদের পৈতৃক দেশ শামদেশকেও তাদের অধিকারে প্রত্যার্পণ করতে চাইলেন। সেমতে মূসা 'আলাইহিস্‌ সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি শাম (বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তীন তথা বাইতুল মুকাদ্দাস) এলাকায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেয়া হল যে, এ জিহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী-ইস্‌রাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহ্‌র বহু নেয়ামত তথা ফির'আউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্‌ তা'আলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত-পা শেকলে বাঁধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ মিসর ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথও চলত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে সকালে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস্‌ সালামের ওফাত হয়ে যায় এবং বনী-ইস্‌রাঈল তীহ্‌ প্রান্তরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হেদায়াতের জন্য অন্য একজন নবী প্রেরণ করলেন। এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী-ইস্‌রাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন নবীর নেতৃত্বে শাম দেশের সে এলাকা তথা সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্যে জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদাও পূর্ণতা লাভ করে। [ইবন কাসীর]

তোমাদের মধ্যে নবী করেছিলেন ও তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ করেছিলেন এবং সৃষ্টিকুলের কাউকেও তিনি যা দেননি তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন[১]।

---

(১) আল্লাহ বলেনঃ "তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবী পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি"। এতে তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি ঈমানী নেয়ামত; অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু নবী প্রেরণ। এর চাইতে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইসরাইল বংশীয়দেরকে নবীরা শাসন করতেন। যখনই কোন নবী মারা যেত, তখনই অন্য নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন'। [বুখারী: ৩৪৫৫; মুসলিম: ১৮৪২] আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নেয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ তাদেরকে রাজ্য দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী-ইস্‌রাঈল সুদীর্ঘ কাল ফির'আউন ও ফির'আউনবংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফির'আউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী-ইস্‌রাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। অথবা, এখানে রাজ্যদান বলতে রাজার হাল বোঝানো হয়েছে। কারণ, ইসরাইল বংশীয়দের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ব্যতীত তখনও আর কেউ রাজা হন নি। তাই এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা খুবই অবস্থাসম্পন্ন মানুষ ছিল। তারা রাজার হালে থাকত। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা বাড়ী, নারী ও দাস-দাসী নিয়ে জীবন যাপন করত বলেই তাদেরকে রাজা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] তৃতীয় নেয়ামত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নেয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছেঃ 'তোমাদেরকে এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেননি। আভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুওয়াত এবং রেসালাতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কুরআনের উক্তি ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [সূরা আলে-ইমরানঃ ১১০] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [সূরা আল-বাকারাহ্‌ঃ ১৪৩] -প্রভৃতি বাক্য এবং অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে সৃষ্টিকুলের ঐসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মূসা 'আলাইহিস্‌ সালামের আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐসব নেয়ামত পায়নি, যা বনী-ইস্‌রাঈল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উম্মত যদি আরো বেশী নেয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। [ইবন কাসীর]

২১. 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি লিখে দিয়েছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর[১]

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا

(১) এখানে পবিত্র ভূমি বলতে কোন্ ভূমি বোঝানো হয়েছে, এ প্রশ্নে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারো মতে কুদ্স শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন, আরিহা শহর- যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেস্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারো মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। কাতাদাহ্ বলেনঃ সমগ্র শামই পবিত্র ভূমি। [ইবন কাসীর, আত-তাফসীরুস সহীহ]

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে বনী-ইস্রাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শামদেশ দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, এ পবিত্র ভূখণ্ড তাদের জন্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। তা সত্বেও বনী-ইস্রাঈল চিরাচরিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল না; বরং মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে বললঃ হে মূসা, এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি। বিভিন্ন তাফসীরে এসেছে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল 'আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদের সাথেই জিহাদ করে বায়তুল-মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্যে বনী-ইস্রাঈলকে সঙ্গে নিয়ে শাম দেশ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু বনী-ইস্রাঈল যেখানে নবীর কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জবাবেরই আরও বিশ্রী ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করে বললঃ "আপনি ও আপনার আল্লাহ্ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব"। কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলিমদের মোকাবেলায় কাফেরদের এক হাজার সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করতে লাগলেন। এতে সাহাবী মিকদাদ ইবন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমরা কস্মিন কালেও ঐকথা বলব না, যা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে তার স্বজাতি বলেছিল; বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।' [বুখারীঃ ৩৭৩৬]

خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

এবং পশ্চাদপসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বলল, 'হে মূসা! নিশ্চয় সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সে স্থান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনোই সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না। অতঃপর তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে তবে নিশ্চয় আমরা সেখানে প্রবেশ করব।'

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۬ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা ভয় করত তাদের মধ্যে দুজন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দরজায় প্রবেশ কর, প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে এবং আল্লাহ্‌র উপরই তোমরা নির্ভর কর যদি তোমরা মুমিন হও।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা বলল, 'হে মূসা! তারা যতক্ষণ সেখানে থাকবে ততক্ষণ আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না; কাজেই তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকব।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার অধিকার নেই, সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিন।'

২৬. আল্লাহ্ বললেন, 'তবে তা[১] চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হল, তারা যমীনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, কাজেই আপনি ফাসিক সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না[২] ।'

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

পঞ্চম রুকূ'

২৭. আর আদমের দু'ছেলের কাহিনী আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনান[৩] । যখন তারা উভয়ে কুরবানী

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ

(১) অর্থাৎ সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার অধিকার তারা চল্লিশ বছরের জন্য হারিয়েছে। কারণ তারা অবাধ্যতা করেছিল। এটা ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত দুনিয়ার শাস্তি। হয়ত এর মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত কোন কঠোর শাস্তি লাঘব করা হয়েছিল। চল্লিশ বছর নির্ধারনের কারণ সম্ভবত: এই ছিল যে, এ সময়ের মধ্যে সে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের মৃত্যু সংঘটিত হবে, যারা ফির'আউনের দাসত্ব ও তাবেদারীর কারণে ইজ্জতের যিন্দেগী যাপন করার মত হিম্মত অবশিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে যারা সেই কঠোর প্রতিকুল অবস্থায় জন্মলাভ করেছিল তারাই শত্রুদের পরাভূত করার মত সাহসী হতে পেরেছিল। [সা'দী]

(২) মহান আল্লাহ্ যখন জানলেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম সম্ভবত: তার কাওমের জন্য দয়াপরবশ হবেন এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত শাস্তির জন্য দুঃখবোধ করতে থাকবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে এ ব্যাপারে আফসোস না করার নির্দেশ দিলেন। যাতে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এ শাস্তিটুকু তাদের অপরাধের কারণে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর সামান্যও জুলুম করেন নি। [সা'দী]

(৩) কুরআনুল কারীম কোন কিচ্ছা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর উপর শরী'আতের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনুল কারীমের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে, অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়। আদম 'আলাইহিস্ সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ

এবং প্রসঙ্গক্রমে শরী'আতের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

আদম-পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে তা হল, যখন আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস্ সালাম পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা- এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম 'আলাইহিস্ সালামের শরী'আতে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী হিসাবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহনকারিনী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত ভগিনীটি ছিল অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত ভগিনীটি কাবিলের ভাগে পড়ে। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জিদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ্ দিতে হবে। আদম 'আলাইহিস্ সালাম তাঁর শরী'আতের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেনঃ তোমরা উভয়েই আল্লাহ্র জন্যে নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী গৃহীত হবে, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। আদম 'আলাইহিস্ সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানীই গৃহীত হবে। তৎকালে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্যে পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবিলের কুরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিবাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল, আল্লাহ্র নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ্ভীরু মুত্তাকীদের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

করেছিল অতঃপর একজন থেকে কবুল করা হল এবং অন্যজনের কবুল করা হল না। সে বলল, 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব[১]।' অন্যজন বলল, 'আল্লাহ্ তো কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কবুল করেন।'

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি তোমার হাত প্রসারিত করলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি আমার হাত প্রসারিত করব না; নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি[২]।'

এতে আমার দোষ কি? তারপর যা ঘটেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তা পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যখন কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তখন তার পাপের একাংশ আদমের প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে।' [বুখারীঃ ৬৮৬৭] অন্য এক হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ 'আমার পরে তোমরা একে অপরের গলা কেটে কুফরীর পথে ফিরে যেয়ো না।' [বুখারীঃ ৬৮৬৮]

(২) আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যখন দু'জন মুসলিম তাদের হাতিয়ার নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের দু'জনই জাহান্নামে যাবে। বলা হল, এতে হত্যাকারীর ব্যাপারটি তো বোঝা গেল, কিন্তু যাকে হত্যা করা হয়েছে তার ব্যাপারটি কেমন? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সেও তো তার সাথীকে হত্যা করতে চেয়েছিল'। [বুখারী: ৭০৮৩; মুসলিম: ২৮৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে, সা'দ ইবন আবী ওক্কাস বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সে আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন কি করতে হবে আমাকে জানান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তখন আদম সন্তানদের মত হয়ে যাও'। তারপর বর্ণনাকারী তেলাওয়াত করলেন, 'যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমার প্রতি আমার হস্ত প্রসারিত করব না। [আবু দাউদ: ৪২৫৭; তিরমিযী: ২১৯৪] এর অর্থ, তুমি তাকে হত্যা করবে না সেটা জানিয়ে দাও। অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩

২৯. 'নিশ্চয় আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও(১) ফলে তুমি আগুনের অধিবাসী হও এবং এটা যালিমদের প্রতিদান ।'

فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠

৩০. অতঃপর তার নফ্‌স তাকে তার ভাই হত্যায় বশ করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল; এভাবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল ।

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ٣١

৩১. অতঃপর আল্লাহ্‌ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খুঁড়তে লাগল(২)। সে বলল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আবু যর! তোমার কি করণীয় থাকবে, যখন দেখবে যে, আহযারু যাইত স্থানও রক্তে ডুবে গেছে? আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য যা পছন্দ করবেন। রাসূল বললেন, তোমার উচিত তখন তুমি যেখান থাকো সেখানে থাকা। অর্থাৎ পরিবার পরিজনের বাইরে না যাওয়া। তিনি বললেন, আমি কি আমার তরবারী নিয়ে ঘাঁড়ে লাগাব না? রাসূল বললেন, তাহলে তো তুমি তাদের সাথে হত্যায় শরীক হলে। আবু যর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমার করণীয় কি? তুমি তোমার ঘরে অবস্থান করবে। আমি বললাম, যদি তারা আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন, যদি তুমি ভয় পাও যে, তরবারীর চমকানো আলো তোমাকে বিভ্রান্ত করবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, এতে করে (যদি তোমাকে সে হত্যা করে, তবে) সে তোমার ও তার গোনাহ নিয়ে ফিরে যাবে। [আবু দাউদ: ৪২৬১; ইবন মাজাহ: ৩৯৫৮; মুসনাদে আহমাদ ৫/১৬৩]

(১) কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, তুমি আমাকে হত্যা করার কারণে যে পাপ হবে তা তোমার পূর্ব পাপের সাথে যুক্ত হবে। [তাবারী]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একটি কাক আরেকটি মৃত কাকের নিকট এসে তার উপর মাটি দিতে দিতে সেটাকে ঢেকে দিল। এটা দেখে যে তার ভাইকে হত্যা করেছে সে বলতে লাগল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না'। [তাবারী]

মৃতদেহ গোপন করতে পারি?' অতঃপর সে লজ্জিত হল।

৩২. এ কারণেই বনী ইস্‌রাঈলের উপর এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা যমীনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে[১] সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল[২], আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

(১) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কবীরা গোনাহ্‌র মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শির্ক করা এবং কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। মিথ্যা কথা বলা, অথবা বলেছেন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। [বুখারীঃ ৬৮৭১] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক মা'বূদ নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তার রক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত প্রবাহিত করা অবৈধ। জীবনের বদলে জীবন (হত্যার বদলে কেসাস)। একজন বিবাহিত ব্যক্তি যদি অবৈধ যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম ত্যাগ করে এবং মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' [বুখারীঃ ৬৮৭৮]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে, অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা কিংবা যমীনে ফেতনা- ফাসাদসৃষ্টিকারী হবে না, যারা তাদের হত্যা করবে, তারা যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। এ আয়াতে যারা হত্যার বিনিময়ে হত্যা, অথবা ফেতনা-ফাসাদসৃষ্টিকারী হবে, তাদের কি অবস্থা হবে সেটা বর্ণনা করা হয় নি। তবে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলে দিয়েছেন, "আর আমরা তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৪৫] আরও বলেন, "হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৮] আরও বলেন, "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে" [সূরা আল-ইসরা: ৩৩] [আদওয়াউল বায়ান]

করল[১]। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন, তারপর এদের অনেকে এর পরও যমীনে অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে[২]। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখেরাতে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে[৩]।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কাউকে জীবিত করার অর্থ, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করেছেন সে ধরনের কোন মানুষকে হত্যা না করা। এতে করে সে যেন সবাইকে জীবিত রাখল। অর্থাৎ যে অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম মনে করে, তার থেকে সমস্ত মানুষ জীবিত থাকতে সমর্থ হলো। [তাবারী]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে কেউ ইসলামের শৃঙ্গে হাতিয়ার ব্যবহার করবে, যাতায়াতকে ভীতিপ্রদ করে দিবে, (ডাকাতি রাহাজানি করবে) তারপর যদি তাদেরকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়, তবে মুসলিম শাসকের এ ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবেন, নতুবা শুলে চড়াবেন, অথবা তার হাত-পা কেটে দিবেন। [তাবারী] হাদীসে এসেছে, একদল লোক মদীনায় আসল, তারা মদীনার আবহাওয়া সহ্য করতে পারল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাদকার উট যেখানে থাকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দিলেন। যাতে তারা উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে পারে। কিন্তু তারা রাখালকে হত্যা করল এবং উটগুলোকে নিয়ে চলে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পিছু ধাওয়া করতে নির্দেশ দিলেন। পরে তারা ধৃত হলো। তখন তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হলো, চোখ উপড়ে ফেলা হলো, এবং তাদেরকে মদীনার কালো পাথর বিশিষ্ট এলাকায় ফেলে রাখা হলো। [বুখারী: ১৫০১; মুসলিম: ১৬৭১]

(৩) ইসলামী শরী'আতে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত। তন্মধ্যে যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে

৩৪. তবে তারা ছাড়া, যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার আগেই তওবা করবে[1]। সুতরাং জেনে রাখ যে,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

দিয়েছে; তা হচ্ছে, হুদূদ ও কিসাস। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরী'আতের পরিভাষায় 'তা'যিরাত' তথা দণ্ড বলা হয়। কুরআনুল কারীম হুদূদ ও কিসাস পূর্ণ বিবরণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রাসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন।

আলেমরা বলেন, কুরআনুল কারীম যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্র হক হিসাবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়। কিসাসের শাস্তি হুদূদের মতই সুনির্ধারিত। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহ্র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না। কিন্তু কিসাস এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রবল হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেসাস হিসাবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। যখমের কেসাসও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। তন্মধ্যে তা'যীর বা দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোন বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না। শরী'আতে হুদূদ মাত্র পাঁচটিঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি বিভিন্ন হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

(১) হুদুদ জাতীয় শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তাওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তাওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ্ মাফ হতে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি

আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ষষ্ঠ রুকূ'

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

৩৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর।[১] আর তাঁর

ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তাওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তাওবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পর তাওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তাওবা দ্বারাও মাফ হয় না, হোক সে তাওবা গ্রেফতারীর পূর্বে অথবা পরে। [ইবন কাসীর অনুরূপ বর্ণনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর। ﴿الْوَسِيلَةَ﴾ শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ ইবাদাত, নৈকট্য, ঈমান সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত وسيلة শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'ওসীলা শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে'। ইবন জরীর আ'তা, মুজাহিদ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমুল্লাহ্ থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। [তাবারী; ইবন কাসীর] অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর। অন্য বর্ণনায় হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এ আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনে বললেন যে, ওসীলা অর্থ, নৈকট্য। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে যারা সংরক্ষণকারী তারা সবাই এটা ভালভাবেই জানেন যে, ইবন উম্ম আব্দ (ইবন মাসউদ) তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১২; অনুরূপ তিরমিযী: ৩৮০৭; মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৯৫]

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসীলা'। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন'। [মুসনাদে আহমাদঃ১১৩৭৪ আবু সাঈদ আল-খুদরী হতে] অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যখন মুয়ায্যিন আযান দেয়, তখন মুয়ায্যিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দুরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওসীলার দো'আ কর'। [মুসলিমঃ ৩৮৪]

উপর্যুক্ত ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবে'য়ীগণের

পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা | لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

তাফসীর থেকে জানা গেল যে, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ হয়, তাই অসীলা। পক্ষান্তরে শরী'আতের পরিভাষায় তাওয়াস্‌সুলের অর্থ হল - আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তা পালন করে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা ও জান্নাতে পৌঁছা।

ওসীলা শব্দটি কুরআন কারীমে দু'টি স্থানে এসেছেঃ সূরা আল- মায়েদার ৩৫ নং আয়াত এবং সূরা আল-ইস্‌রার ৫৭ নং আয়াত। আয়াতদ্বয়ে ওসীলার অর্থ হলঃ আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। হাফেয ইবন কাসীর রাহেমাহুল্লাহ প্রথম আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, ওসীলার অর্থ নৈকট্য। অনুরূপ তিনি মুজাহিদ, আবু ওয়ায়িল, হাসান বসরী, আবদুল্লাহ ইবন কাসীর, সুদ্দী, ইবন যায়েদ ও আরো একাধিক ব্যক্তি হতেও তা বর্ণনা করেন। আর সম্মানিত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিল হওয়া প্রসংগে বলেছেনঃ 'আয়াতটি আরবদের কিছুসংখ্যক লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা কিছুসংখ্যক জিনের উপাসনা করত। অতঃপর জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করল, অথচ তাদের উপাসনাকারী মানুষেরা তা টেরই পেল না'। [মুসলিম:৩০৩০; বুখারী ৪৭১৪]

অসীলার প্রকারভেদঃ অসীলা দু' প্রকারঃ শরী'আতসম্মত অসীলা ও নিষিদ্ধ অসীলা।

১. শরী'আতসম্মত অসীলাঃ তা হল শরী'আত অনুমোদিত বিশুদ্ধ ওসীলা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আর তা জানার সঠিক পন্থা হল কুরআন ও সুন্নার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ওসীলা সম্পর্কে এতদুভয়ে যা কিছু এসেছে সেগুলো জেনে নেয়া। অতএব যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় এ দলীল থাকবে যে, তা শরী'আত অনুমোদিত, তাহলে তাই হবে শরী'আতসম্মত অসীলা। আর এতদ্ব্যতীত অন্য সব অসীলা নিষিদ্ধ। শরী'আতসম্মত অসীলা তিন প্রকারঃ

প্রথমঃ আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের কোন একটি নাম অথবা তাঁর মহান গুণাবলীর কোন একটি গুণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। যেমন মুসলিম ব্যক্তি তার দো'আয় বলবেঃ হে আল্লাহ! আপনি যে পরম করুণাময় ও দয়ালু সে ওসীলা দিয়ে আমি আপনার কাছে আমাকে সুস্থতা দানের প্রার্থনা করছি। অথবা বলবে 'আপনার করুণা যা সবকিছুতে ব্যপ্ত হয়েছে, তার ওসীলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন আমায় ক্ষমা করে দেন এবং দয়া করেন', ইত্যাদি। এ প্রকার তাওয়াস্‌সুল শরী'আতসম্মত হওয়ার দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাক"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৮০]

দ্বিতীয়ঃ সে সকল সৎ কর্ম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন, যা বান্দা পালন করে থাকে। যেমন এরকম বলা যে, 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ঈমান, আপনার জন্য আমার ভালবাসা ও আপনার রাসূলের অনুসরণের ওসীলায়

সফলকাম হতে পার।

আমায় ক্ষমা করুন'। অথবা বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আমার ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি আমার ঈমানের ওসীলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমায় বিপদমুক্ত করেন'। এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ "যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন"। [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬] আর এ বিষয়ের দলীলের মধ্যে রয়েছে তিন গুহাবাসীর কাহিনীও, যা সহীহ বুখারীতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। [বুখারীঃ ৩৪৬৫]

তৃতীয়ঃ এমন সৎ ব্যক্তির দো'আর ওসীলায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, যার দো'আ কবুলের আশা করা যায়। যেমন এমন ব্যক্তির কাছে কোন মুসলিমের যাওয়া, যার মধ্যে সততা, তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যের হেফাযত লক্ষ্য করা যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আর আবেদন করা যাতে বিপদ থেকে মুক্তি ঘটে ও তার বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। শরী'আতে এ প্রকার অনুমোদিত হওয়ার দলীল হল, সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যাপক ও নির্দিষ্ট সকল প্রকার দো'আ করার আবেদন জানাতেন। হাদীসে রয়েছে, 'এক ব্যক্তি জুমার দিন মিম্বরমুখী দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি অবতরণ করেন'। আনাস বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উঠিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমাদের পানি দিন, হে আল্লাহ! আমাদের পানি দিন"। আনাস বলেনঃ আল্লাহর কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ, ছড়ানো ছিটানো মেঘের খণ্ড বা কোন কিছুই দেখিনি। আমাদের মধ্যে ও সেলা' পাহাড়ের মধ্যে কোন ঘর-বাড়ী ছিলো না। তিনি বললেনঃ এরপর সেলা' পাহাড়ের পেছন থেকে ঢালের মত একখণ্ড মেঘের উদয় হল। মেঘটি আকাশের মাঝ বরাবর এসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বৃষ্টি হল। [বুখারীঃ ১০১৩, মুসলিমঃ ৮৯৭] তবে এ প্রকার অসীলা গ্রহণ শুধু ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই হতে পারে, যার কাছে দো'আ চাওয়া হয়। তবে তার মৃত্যুর পর এটা জায়েয নেই; কেননা মৃত্যুর পর তার কোন আমল নেই।

২. নিষিদ্ধ অসীলাঃ তা হল- যে বিষয়টি শরী'আতে ওসীলা হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। এটি কয়েক প্রকার, যার কোন কোনটি অন্যটি থেকে অধিক বিপজ্জনক। তন্মধ্যে রয়েছে-

মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকে আহ্বান করার মাধ্যমে, তাদের দ্বারা পরিত্রাণের আবেদন এবং তাদের কাছে অভাব মোচন, বিপদ থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি প্রার্থনা করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। এটা শির্কে আকবার বা বড় শির্ক

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ যমীনে যা কিছু আছে যদি সেগুলোর সবটাই তাদের থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণও থাকে, তবুও তাদের কাছ থেকে সেসব গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি(১)।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে; কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হবার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৩৮. আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে

যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।
কবর ও মাযারের পাশে ইবাদাত পালন ও আল্লাহকে ডাকা, কবরের উপর সৌধ তৈরী করা এবং কবরে প্রদীপ ও গেলাফ দেয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। এটা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা তাওহীদ পরিপূর্ণ হওয়ার অন্তরায় এবং বড় শির্কের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়ার মাধ্যম।
নবীগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সম্মান এবং আল্লাহর কাছে তাদের মান ও মর্যাদার ওসীলায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। এটা হারাম। বরং তা নবআবিস্কৃত বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা এমনই তাওয়াস্‌সুল যা আল্লাহ বৈধ করেননি এবং এর অনুমতিও দেননি। এ ধরনের ওসীলা অবলম্বন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের যুগে পরিচিত ছিল না। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ 'দো'আকারী এ কথা বলা মাকরূহ যে, আমি আপনার কাছে অমুক ব্যক্তির যে হক্ব রয়েছে কিংবা আপনার অলীগণ ও রাসূলগণের যে হক্ব রয়েছে কিংবা বায়তুল্লাহ্ আল-হারাম (কা'বা শরীফ) ও মাশ'আরুল হারামের যে হক্ব রয়েছে তার ওসীলায় প্রার্থনা করছি'। [আত-তাওয়াসসুল ওয়াল অসীলা থেকে সংক্ষেপিত]

(১) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। [ইবনে হিব্বান, (আল-ইহসান) ১৬/৫২৭, ৭৪৮৩]

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে[১]। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. অতঃপর সীমালংঘন করার পর কেউ তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪০. আপনি কি জানেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই? যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ

৪১. হে রাসূল! আপনাকে যেন তারা চিন্তিত না করে যারা কুফরীর দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়---যারা মুখে বলে, 'ঈমান এনেছি' অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে নি[৩]- এবং যারা ইয়াহূদী[৪]

---

(১) চুরির শাস্তি হচ্ছে, ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কর্তন করা। তবে কতটুকু চুরি করলে সেটা করা হবে এবং কিভাবে চুরি করলে এ শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, এর বিস্তারিত আলোচনা ফিকহ এর কিতাবসমূহ থেকে জেনে নিতে হবে। শর্তপূরণ ও বাস্তবায়নের বাধা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। [বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে কুরতুবী দ্রষ্টব্য]

(২) চুরি করার পর তাওবাহ করলে, বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার গোনাহ মাফ হবে। কিন্তু বিচারকের কাছে চুরি যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাকে তার শাস্তি পেতেই হবে। এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। তবে চুরির মাল ফেরত দিতে হবে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে। [বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে ইবন কাসীর দ্রষ্টব্য]

(৩) এরা হচ্ছে মুনাফিক। তারা মুখে ঈমানের কথা বললেও অন্তরে ঈমানের কোন অস্তিত্ব নেই। তারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত। [ইবন কাসীর]

(৪) প্রাচীন কাল থেকেই ইয়াহূদীরা কখনো স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনো নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়াপ্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষতঃ

لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ

তারা (সকলেই) মিথ্যা শুনতে অধিক তৎপর[১], আপনার কাছে আসে নি

অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন ধনী ব্যক্তি অপরাধ করলে তারা তাওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থা ইয়াহূদীদের সামনে এল, তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। যেসব ইয়াহূদী তাওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মোকাদ্দমায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত -যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্য দিকে তাওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুষ্কৃতির আশ্রয় নিত। নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন না কোন পন্থায় মোকাদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে চাইত। উদ্দেশ্য এ রায় তাদের আকাঙ্খিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয়। এসব কিছুই তাদের অন্তরের কলুষতা প্রমাণ করত। [দেখুন, তাফসীর সা'দী]

বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে এক ইয়াহূদীকে মুখ কালো ও বেত্রাঘাত করা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা কি ব্যভিচারের শাস্তি এরকমই তোমাদের কিতাবে পাও? তারা বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের আলেমদের একজনকে ডেকে বললেন, "যে আল্লাহ্ মূসার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন তাঁর দোহাই দিয়ে তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি, তোমাদের কিতাবে কি এটাই ব্যভিচারের শাস্তি? সে বলল, না। তবে যদি আপনি আমাকে এর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস না করতেন, তাহলে আমি কখনই তা বলতাম না। আমাদের কিতাবে আমরা এর শাস্তি হিসেবে 'প্রস্তারাঘাতকেই দেখতে পাই। কিন্তু এটা আমাদের সমাজের উঁচু শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ফলে আমাদের উঁচু শ্রেণীর কেউ সেটা করলে তাকে ছেড়ে দিতাম। আর নিম্নশ্রেণীর কেউ তা করলে তার উপর শরী'আত নির্ধারিত হদ (তথা রজমের শাস্তি) প্রয়োগ করতাম। তারপর আমরা বললাম, আমরা এ ব্যাপারে এমন একটি বিষয়ে একমত হই যা আমাদের উঁচু-নীচু সকল শ্রেণীর উপর সমভাবে প্রয়োগ করতে পারি। তা থেকেই আমরা রজম বা প্রস্তারাঘাতের পরিবর্তে মুখ কালো ও চাবুক মারা নির্ধারণ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমি প্রথম আপনার সেই মৃত নির্দেশকে বাস্তবায়ন করব, যখন তারা তা নিঃশেষ করে দিয়েছে'। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দেয়া হল এবং তা বাস্তবায়িত হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। [মুসলিম: ১৭০০]

(১) অনুরূপভাবে ইয়াহূদীদেরও একটি বদভ্যাস হলো যে, তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা

مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান পেতে থাকে[১]। শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে[২]। তারা বলে, 'এরূপ বিধান দিলে গ্রহণ করো এবং সেরূপ না দিলে বর্জন করো[৩]।' আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই। এরাই হচ্ছে তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে মহাশাস্তি।

শোনাতে অভ্যস্ত। [ইবন কাসীর] এসব ইয়াহূদী তাদের ধর্মীয় আলেমদের দ্বারা তাওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কিস্‌সা-কাহিনীই শুনতে থাকত। দ্বীনে তাদের মজবুতির অভাবে যে কোন মিথ্যা বলার জন্য বলা হলে, তারা তাতে অগ্রণী হয়ে যেত। [সা'দী]

(১) এখানেও ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের দ্বিতীয় একটি বদঅভ্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এরা বাহ্যতঃ আপনার কাছে একটি দ্বীনী বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যেও আসে নি। বরং তারা এমন একটি ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশতঃ আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী আপনার মত জেনে এরা তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। [ইবন কাসীর]

(২) ইয়াহূদীদের তৃতীয় একটি বদ অভ্যাস হচ্ছে, তারা আল্লাহ্‌র কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধঃ তাওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইয়াহূদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাদের লোকদেরকে নবীজীর কাছে পাঠানোর সময় বলে দিত, যদি তোমাদেরকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে মুখ কালো ও চাবুক মারার কথা বলে তবে তোমরা গ্রহণ করো, আর যদি তোমাদেরকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যার কথা বলে তবে সাবধান হয়ে যাবে, অর্থাৎ তা গ্রহণ করো না। [মুসলিমঃ ১৭০০]

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۗ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তারা মিথ্যা শুনতে খুবই আগ্রহশীল এবং অবৈধ সম্পদ খাওয়াতে অত্যন্ত আসক্ত(১); সুতরাং তারা যদি আপনার কাছে আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন বা তাদেরকে উপেক্ষা করবেন(২)। আপনি যদি তাদেরকে

---

(১) ইয়াহূদীদের চতুর্থ বদভ্যাস হচ্ছে, উৎকোচ গ্রহণ। তারা 'সুহ্‌ত' খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহ্‌তের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেয়া। এ অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾ -অর্থাৎ "তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দেবেন। [সূরা ত্বা-হা:৬১] অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেয়া হবে। অধিকাংশ মুফাসসির এখানে 'সুহত' এর অর্থ করেছেন, হারাম খাওয়া। [তাফসীর সা'দী, ইবন কাসীর, মুয়াস্‌সার] এ অর্থে এক হাদীসে এসেছে, 'নিশ্চয় বেশ্যার বেশ্যাবৃত্তির পয়সা, কুকুর- বিড়াল বিক্রির মূল্য এবং শিংগা লাগানোর বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ 'সুহত' তথা হারাম সম্পদের অন্তর্ভুক্ত'। [সহীহ ইবন হিব্বান: ৪৯৪১]
তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্‌ত' বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী; বাগভী; জালালাইন] উৎকোচ বা ঘুষ সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারো জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ্‌ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে'। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/১১৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৭৯]

(২) আলোচ্য আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকাদ্দমার ফয়সালা করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন। আরো বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পরে বলা হয়েছে, যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ নিজ শরী'আত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সমস্ত শরী'আত রহিত হয়ে গেছে। কুরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। [বাগভী]

উপেক্ষা করেন তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবেন[১]; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

৪৩. আর তারা আপনার উপর কিভাবে বিচার ভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত যাতে রয়েছে আল্লাহ্র বিধান? তা সত্ত্বেও তারা এরপর মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

সপ্তম রুকূ'

৪৪. নিশ্চয় আমরা তাওরাত নাযিল করেছিলাম; এতে ছিল হেদায়াত ও আলো; নবীগণ, যারা ছিলেন অনুগত, তারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে হুকুম দিতেন[২]। আর রব্বানী ও বিদ্বানগণও

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ বনু-নদ্বীর এবং বনু-কুরাইযার মধ্যে যুদ্ধ হত। বনু-নদ্বীর বনু-কুরাইযা থেকে নিজেদেরকে সম্মানিত দাবী করত। বনু-কুরাইযার কোন লোক যদি বনু-নদ্বীরের কাউকে হত্যা করত তাহলে তাকেও হত্যা করা হত। কিন্তু বনু-নদ্বীর যদি বনু-কুরাইযার কাউকে হত্যা করত তাহলে এর বিনিময়ে একশ' ওসাক খেজুর রক্তপণ হিসাবে আদায় করত। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা মদীনায় পাঠালেন, তখন বনু-নদ্বীরের এক লোক বনু-কুরাইযার এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। বনু-কুরাইযা তাদের লোকের হত্যার বিনিময়ে কেসাস দাবী করল। তারা বললঃ আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাব এবং শেষ পর্যন্ত তার কাছেই আসল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আবু দাউদঃ ৪৪৯৪]

(২) আলোচ্য আয়াতে নবীদের প্রতিনিধিবর্গকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ 'রব্বানী'গণ এবং দ্বিতীয় ভাগ 'আহবার'। তম্মধ্যে 'রব্বানী' শব্দটির অর্থ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, رَبَّانِي শব্দটি رَبّ এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ওয়ালা বা আল্লাহ্ভক্ত। তবে বিজ্ঞ আলেমদের মতে, শব্দটি رُبَّانُ السَّفِينَة

شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخۡشَوُا النَّاسَ وَاخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُوۡا بِاٰيٰتِیۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ وَمَنۡ لَّمۡ يَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ

(তদনুসারে হুকুম দিতেন), কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল। আর তারা ছিল এর উপর সাক্ষী[১]। কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করো না। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের[২]।

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيۡهَاۤ اَنَّ النَّفۡسَ بِالنَّفۡسِ

৪৫. আর আমরা তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে,

বা জাহাজের নাবিক ও কর্ণধার অর্থে। [মাজমু' ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যা] পক্ষান্তরে 'আহবার' শব্দটি 'হিবর' বা 'হাবর' এর বহুবচন। ইয়াহূদীদের বাক পদ্ধতিতে আলেমকে حبر বলা হত। কাতাদা বলেন, রব্বানী হচ্ছে ফকীহগণ। আর আহবার হচ্ছে, আলেমগণ। ইবন যায়দ বলেন, রাব্বানী হচ্ছেন শাসকগণ, আর আহবার হচ্ছে আলেমগণ [তাবারী] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাব্বানী ঐ সমস্ত জ্ঞানীদেরকে বলা হয়, যারা বড় কোন ইলম দেয়ার পূর্বে ছোট ইলম প্রদান করে, উম্মতকে প্রস্তুত করে নেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ তারা এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। [জালালাইন] অথবা, তারা এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ তাদেরকে তাওরাতের সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আর তারা এটা স্বীকার করতেও বাধ্য যে, যখনই এর কোন ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সন্দেহ হবে, তারা সে সমস্ত ব্যাপারে আলেমদের মুখাপেক্ষী হবে। সাধারণ মানুষ যেখানে সালাত, সাওম, যাকাত, যিকর ইত্যাদি ইবাদত সম্পন্ন করার মাধ্যমেই নাজাত পাবে, সেখানে আলেমদের দায়িত্ব আরও বেশী। তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হচ্ছে, উপরোক্ত ইবাদাতসমূহ সম্পন্ন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যা যা প্রয়োজন হবে, যেখানে যেখানে তাদেরকে সাবধান করার দরকার হবে, সেখানে তাদেরকে তাও করতে হবে। [সা'দী]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছে তা অস্বীকার করবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। আর যে কেউ তা স্বীকার করবে, কিন্তু বাস্তবায়ন করে তদনুসারে বিধান দিবে না সে যালেম ও ফাসেক হবে। [তাবারী]

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑮

প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তা তার জন্য কাফফারা হবে[১]। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا

৪৬. আর আমরা তাদের পশ্চাতে মার্ইয়াম-পুত্র 'ঈসাকে[২] পাঠিয়েছিলাম,

(১) এ আয়াতে তাওরাতের বরাত দিয়ে কেসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "আমি ইয়াহূদীদের জন্য তাওরাতের এ বিধান নাযিল করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় আছে"। এ উম্মতের জন্যও কিসাসের উক্ত বিধান পুরোপুরি প্রযোজ্য। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতে মূসা আলাইহিস সালামকে যে বিধান দিয়েছিলেন, তাতে হত্যা, জখম, দাঁত, চোখ, কান ইত্যাদির বিপরীতে দিয়াত দেয়ার কোন সুযোগ ছিল না। হয় কিসাস নিতে হবে, না হয় তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। [তাবারী] এ উম্মতের জন্য তিনটি সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কিসাসের ব্যাপারটি এ আয়াতসহ অন্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর দিয়াতের ব্যাপারটি হাদীসে এসেছে, আনাস ইবন মালেকের ফুফী রুবাই' আনসারী এক মেয়ের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। রাসূলের কাছে যখন এ মোকদ্দমা আসল, তখন তিনি তারও দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবন মালেকের চাচা আনাস ইবন নদর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি রুবাইয়ার দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র কিতাব কিসাসের কথাই বলছে। সবশেষে আনসারী মহিলার অভিভাবকরা দিয়াত গ্রহণে রাজী হয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৬১১; মুসলিমঃ ১৬৭৫] এ হাদীসে কিসাস ও দিয়াত উভয় বিধানই প্রমানিত হলো। আর ক্ষমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে অংশের কেসাস ওয়াজিব হয়েছে সে অংশের কেসাস না নিয়ে সদকা করে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সে পরিমাণ গোনাহ্র কাফ্ফারা করে দেবেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩১৬]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি মার্ইয়াম-পুত্র ঈসার সবচেয়ে বেশী নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই; আমার এবং তার মধ্যে কোন নবী নেই।' [বুখারীঃ ৩৪৪২]

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾

তার সামনে তাওরাত থেকে যা বিদ্যমান রয়েছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর আমরা তাকে ইঞ্জীল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো; আর তা ছিল তার সামনে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর ইঞ্জীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুসারে হুকুম দেয়[১]। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক[২]।

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে কি বিধান ইঞ্জীলে দেয়া হয়েছে, সেটার বর্ণনা আসে নি। অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে সেটা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুসংবাদ। তার উপর ঈমান ও তার আনুগত্যের আবশ্যকতা। যেমন আল্লাহ্ বলেন, " আর স্মরণ করুন, যখন মার্‌ইয়াম-পুত্র 'ঈসা বলেছিলেন, 'হে বনী ইস্‌রাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহ্‌মাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।" [সূরা আস-সাফ: ৬] আরও বলেন "যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭] ইত্যাদি [আদওয়াউল বায়ান]।

(২) আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করা একদিক থেকে তা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত, অপরদিকে তা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্‌কে একমাত্র আইনদাতা হিসাবে না মানলে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতে শির্ক করা হয়। অপরদিকে আল্লাহ্‌র আইনকে না মেনে অন্য কারো আইনে বিচার-ফয়সালা করলে তাতে তাওহীদুল উলুহিয়্যাতে শির্ক করা হয়। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া অন্য কোন আইনের বিচার-ফয়সালা মনে-প্রাণে মেনে নেয়াও তাওহীদুল উলুহিয়্যাতে শির্ক করা হয়। সুতরাং এ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আইনদাতা হিসেবে আল্লাহ্‌কে মেনে নেয়া এবং আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করা তাওহীদের অংশ। [মাজমু ফাতাওয়া ও রাসাইলে ইবন উসাইমীন ২/১৪০-১৪৪ ও ৬/১৫৮-১৬২]

লক্ষণীয় যে, ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির"। পরবর্তী ৪৫ নং আয়াতে বলা

৪৮. আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে(১)।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ

হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম"। এর পরবর্তী ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক"। মোটকথা: যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিধান দেয় না। তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্র আইনে বিচার-ফয়সালা না করলে যালিম বা ফাসিক হওয়ার ব্যাপারটি স্বাভাবিক হলেও, এর মাধ্যমে সর্বাবস্থায়ই কি বড় শির্ক বা বড় কুফরী হবে?

মূলতঃ আল্লাহর আইন অনুসারে না চলার কয়েকটি পর্যায় হতে পারেঃ (১) আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে বিচার-ফয়সালা পরিচালনা জায়েয মনে করা। (২) আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা উত্তম মনে করা। (৩) আল্লাহর আইন ও অন্য কোন আইন শাসনকার্য ও বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের মনে করা। (৪) আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য কোন আইন প্রতিষ্ঠা করা। উপরোক্ত যে কোন একটি কেউ করলে সে সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু এর বাইরেও আরো কিছু পর্যায় রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্র আইনে বিচার না করা বা অন্য আইনের কাছে বিচার চাওয়ার কারণে গোনাহ্গার হলেও পুরোপুরি মুশরিক হয়ে যায় না। যেমন, (এক) কেউ আল্লাহ্র আইনে বিচার-ফয়সালা করা ফরয বলে মেনে নেয়ার পরে নিজের প্রবৃত্তি বা ঘুষের আশ্রয় নিয়ে অন্য কোন আইনে বিচার-ফয়সালা করে, তখন সে যালিম বা ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে। (দুই) কেউ মানুষের উপর যুলুম করার মানসে আল্লাহ্র আইন ব্যতীত বিচার করে, আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়ন করার সুযোগ না থাকে এবং বিচারের অভাবে মানুষের হক নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। তখন সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে। শেষোক্ত দু'টি বড় শির্ক কিংবা বড় কুফরীর পর্যায়ে পড়ে না। যারা এ কাজ করবে, তারা ছোট শির্ক বা ছোট কুফরী করেছে বলে গন্য হবে। [বিস্তারিত দেখুন, আদওয়াউল বায়ান; মাজমু' ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ ২৭/৫৮-৫৯; মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/১৩০-১৩২]

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ কুরআন এর পূর্বেকার সমস্ত গ্রন্থের জন্য আমানতদার হিসেবে নির্বাচিত। [তাবারী] সুতরাং অন্যান্য গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে, তা যদি কেউ পরিবর্তন করেও ফেলে কুরআন কিন্তু সেটা ঠিকই একজন আমানতদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সঠিকভাবে বর্ণনা করে দিবে। কাতাদা বলেন, এর অর্থ সাক্ষ্য। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত তথ্যের ব্যাপারে এই কুরআন সাক্ষ্যস্বরূপ।

مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

সুতরাং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করুন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না[১]। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি[২]। আর আল্লাহ্

(১) পূর্ববর্তী ৪২ নং আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার শরী'আত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কারণ, তারা আপনার কাছে হকের অনুসরণের জন্য আগমন করে না। বরং তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণই করবে। তাদের মনঃপুত হলে তা গ্রহণ করবে, নতুবা নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে ফয়সালা করার ব্যাপারটি আপনার পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে তাদের মধ্যে ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিধানকে রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে হক ফয়সালা করাই হচ্ছে বর্তমান কর্তব্য। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতটি ঐ সমস্ত অমুসলিম লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা আপনার কথা মানার জন্য আপনার সমীপে আগমণ করে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার ফয়সালা থাকা জরুরী। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া 'আলাইহিমুস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা ও শরী'আতসমূহও যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরী'আতের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরী'আতসমূহ পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরী'আতকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমরা তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ শরী'আত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরী'আত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদাতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরী'আত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের

ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন ও তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন, যাতে আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তারা এর কোন কিছু হতে আপনাকে বিচ্যুত না করে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কেবল তাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চান। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই তো ফাসেক।

জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরী'আত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে- এর বিপক্ষে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না। কারণ, তাদের মধ্যে মৌলিক দিক তথা আকীদা-বিশ্বাসের দিয়ে পার্থক্য ছিল না। যেমন, তাওহীদের ব্যাপারে সমস্ত নবীই এক কথা বলেছেন। পার্থক্য তো শাখা-প্রশাখা ও কর্ম জাতীয় বিষয়ে। যেমন, কোন বস্তু বা বিষয় কোন সময় হারাম ছিল, আবার তা অন্য সময়ে হালাল করা হয়েছে। এসব কিছুই মূলত তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। কোন কোন মুফাসসির বলেন এখানে جَعَلْنَا এর পরে ة অব্যয়টি উহ্য ধরা হবে। তখন অর্থ হবে, এ কুরআনকে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য সঠিক উদ্দেশ্য হাসিলের পন্থা ও সুস্পষ্ট পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছি। [ইবন কাসীর]

৫০. তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে[১]? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্‌র চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝٥٠

অষ্টম রুকূ'

৫১. হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝٥١

(১) জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলাম হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানের পথ। কারণ, ইসলামের পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ্ নিজেই। আর আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অপরদিকে ইসলামের বাইরের যে কোন পথই জাহেলিয়াতের পথ। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, কল্পনা, আন্দাজ, অনুমান বা মানসিক কামনা-বাসনার ভিত্তিতে মানুষেরা নিজেদের জন্য জীবনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। যেখানেই যে যুগেই মানুষেরা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে, তাকে অবশ্যই জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে। মোটকথা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত বিধান প্রদান করাই জাহিলিয়াত। [সা'দী] হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন। যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মধ্যে অন্যায় কাজ করে, যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও জাহেলী যুগের রীতি-নীতি অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি কোন অধিকার ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবী করে।' [বুখারীঃ ৬৮৮২] হাসান বসরী বলেন, যে কেউ আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের বিপরীত বিধান প্রদান করল সে জাহিলিয়াতের বিধান দিল। [ইবন আবি হাতিম, ইবন কাসীর]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, বিভিন্ন আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায় যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি ঐ সময়ই হবে, যখন ব্যক্তির সেখানে ইচ্ছা বা এখতিয়ার থাকবে। কিন্তু যখন ভয়-ভীতি বা সমস্যা থাকবে, তখন তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কস্থাপনের অনুমতি ইসলাম শর্তসাপেক্ষে দিয়েছে। তা হচ্ছে, যতটুকু করলে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও আন্তরিক বন্ধুত্ব থাকতে পারবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং যাদের অন্তরে অসুখ রয়েছে আপনি তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি ওদের সাথে মিলিত হতে দেখবেন এ বলে, 'আমরা আশংকা করছি যে, কোন বিপদ আমাদের আক্রান্ত করবে[১]।' অতঃপর হয়ত আল্লাহ্ বিজয় বা তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে[২]।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর মুমিনগণ বলবে, 'এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে?' তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়েছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৩]।

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে যাদের অন্তরে অসুখ রয়েছে বলে মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা ইয়াহূদীদের সাথে গোপন শলা-পরামর্শ ও তাদের খাতির করে কথা বলতে সাচ্ছন্দ বোধ করে। অনুরূপভাবে তারা তাদের সন্তানদের দুধ পান করাতেও অভ্যস্ত। এমতাবস্থায় তাদের আন্তরিক সম্পর্ক ইয়াহূদীদের সাথেই থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তারা সবসময় ভাবে যে, ইয়াহূদীদেরই বিজয় হবে। আর তখন তাদের কাছ থেকে তারা বাড়তি সুবিধা পাবে। [তাবারী]

(২) মুসলিমরা সে বিজয় দেখেছিল। সুদ্দী বলেন, সে বিজয় হচ্ছে, মক্কা বিজয়। [তাবারী] কাতাদা বলেন, এখানে বিজয় বলে আল্লাহ্‌র ফয়সালা বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] কাতাদা আরও বলেন, মুনাফিকরা তখন ইয়াহূদীদের সাথে তাদের যে গোপন আঁতাত, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তাদের বিরুদ্ধাচারণ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য লজ্জিত হবে। [তাবারী]

(৩) এ আয়াতে বিষয়টি আরো পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন

৫৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায়[১] আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না[২]; এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ[৩]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

মুসলিমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে, এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্র নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা যে অবস্থার কথা বর্ণনা করেছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যেক মুমিন-মুসলিম সবাই তার বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিল। [সা'দী] আল্লামা শানকীতী বলেন, মুনাফিকদের মিথ্যা শপথের মূল কারণ হচ্ছে, তারা প্রচন্ড ভীতুপ্রকৃতির মানুষ ছিল। যদি কোথাও পালাবার পথ তাদের জানা থাকত তবে তারা সেটাই করত। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কঠোর হুশিয়ারী দেয়া হচ্ছে যে, যারাই আল্লাহ্র পথ ও তাঁর দ্বীন থেকে পিছু ফিরে যাবে, তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীনের জন্য নতুন কোন জাতিকে এগিয়ে আনবেন। [তাবারী] আইয়াদ আল-আশ'আরী বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আবু মূসা, এরা হল তোমার সম্প্রদায়।' আর রাসূল হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন আবু মূসা আল-আশ'আরীর দিকে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩১৩]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কারো হক জানা থাকলে সে যেন তা বলতে কাউকে ভয় না করে।' বর্ণনাকারী আবু সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীস বর্ণনা করে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা অনেক বিষয় দেখেছি, কিন্তু ভয় করেছি। [ইবন মাজাহ্: ৪০০৭; তিরমিযী: ২১৯১]

(৩) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে

গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, সত্যদ্বীন ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলিমদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যিই ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ দ্বীনত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না- হতে পারে না। মুসলিমরাও যদি দ্বীনত্যাগী হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জায়গায় অন্য কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন। সে জাতির মধ্যে বেশ কিছু গুণ থাকবে। তাদের প্রথম গুণ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসবে। এ গুণটি দু'টি অংশে বিভক্ত- এক. আল্লাহ্র সাথে তাদের ভালবাসা। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। দুই. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে ভালবাসা। এতে বাহ্যতঃ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই। কিন্তু কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে রাসূল, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরন কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন, আর আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৩১] এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমনটা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। তাদের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে যে, তারা মুসলিমদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।' [আবু দাউদঃ ৪৮০০] মোটকথা, তারা মুসলিমদের সাথে স্বীয় অধিকার কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। তাদের তৃতীয় গুণ হচ্ছে যে, তারা কাফেরদের উপর প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীনের শত্রুদের মোকাবেলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না। উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, তারা হবে এমন এক জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীনের খাতিরে নিবেদিত হবে। এ একই বিষয়বস্তু সম্বলিত

৫৫. তোমাদের বন্ধু[১] তো কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল[২] ও মুমিনগণ- যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং তারা বিনীত[৩] ।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর যে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾ -অর্থাৎ "কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ।" [সূরা আল-ফাত্হঃ ২৯] তাদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে, "তারা সত্য দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে ।" এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও দ্বীনত্যাগের মোকাবেলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদাত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে । এই উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য পঞ্চম গুণ বলা হয়েছে, "দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরোয়া করবে না ।" [ইবন কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

(১) এ আয়াতে মুসলিমদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে হতে পারে, তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, প্রথমতঃ তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত সালাত আদায় করে । দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে । তৃতীয়তঃ তারা বিনম্র ও বিনয়ী; স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়, তারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করে । [সা'দী]

(২) ফাইরোয আদ-দাইলামী বলেন, তার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের প্রতিনিধি পাঠালেন । তারা এসে বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা তো ঈমান এনেছি, এখন আমার বন্ধু-অভিভাবক কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল । তারা বললঃ আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট এবং আমরা সন্তুষ্ট । [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৩২]

(৩) আয়াতে উল্লেখিত ﴿وَهُمْ رَٰكِعُونَ﴾ এ ركوع শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে । কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রুকূ' অর্থ পারিভাষিক রুকূ', যা সালাতের একটি রুকন । অর্থাৎ আর তারা রুকুকারী । [ফাতহুল কাদীর] এটা যেমন ফরয সালাতের সাধারণ রুকু উদ্দেশ্য হতে পারে, তেমনিভাবে নফল সালাত আদায়কারী অর্থেও হতে পারে । [বাগভী, জালালাইন] পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে রুকু বলে বিনম্র ও খুশু-খুযু সম্পন্ন হওয়া বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর, সা'দী] প্রথম অর্থের ক্ষেত্রে واو টি عطف এর জন্য । আর দ্বিতীয় অর্থের ক্ষেত্রে واو টি حال বা অবস্থা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । ইবন কাসীর এ অর্থটি গৌন বিবেচনা করেছেন ।

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী[১]।

নবম রুকূ'

৫৭. হে মুমিনগণ! তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক[২]।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যখন তোমরা সালাতের প্রতি আহ্বান কর তখন তারা সেটাকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তুরূপে গ্রহণ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, যারা কুরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা হবে বিজয়ী ও বিশ্বজয়ী। বলা হয়েছে, যেসব মুসলিম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহ্‌র দল। এরপর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্‌র দলই সবার উপর জয়ী হবে। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সবার উপর জয়ী হয়েছেন। এটি মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বড় সুসংবাদ। যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানবে, তারা তার দল ও বাহিনীভুক্ত হবে। তাদের জন্যই জয় অপেক্ষা করছে। যদিও মাঝে মাঝে তাদের উপর কোন কোন বিপদ আসে, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাঁর কোন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য তা করিয়ে থাকেন। তবে শেষ পর্যন্ত শুভ পরিণাম ও বিজয় তাদেরই পক্ষে যায়। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ বলেছেন, তিনি বলেছেন, "আর আমাদের বাহিনী অবশ্যই বিজয়ী হবে" [সূরা আস-সাফফাত: ১৭৩] [সা'দী]

(২) অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত এক. আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়। দুই. মুশরিক সম্প্রদায়। আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের কাছে যে ঈমান আছে তার চাহিদা হচ্ছে, তোমরা তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না। তাদের কাছে গোপন ভেদ প্রকাশ করবে না। তাদের সাথে বৈরীভাব রাখবে। তোমাদের কাছে যে তাকওয়া আছে তাও তোমাদেরকে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে। [সা'দী]

করে- এটা এ জন্যে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ٥٩

৫৯. বলুন, 'হে কিতাবীরা! একমাত্র এ কারণেই তো তোমরা আমাদের প্রতি শক্রতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা আগে নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি। আর নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশ ফাসেক[১]।'

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٦٠

৬০. বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে? যাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন এবং যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর যাদের কাউকে তিনি বানর ও কাউকে শূকর করেছেন[২] এবং (তাদের

(১) এ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তি এবং কুরআন নাযিলের পর তারা রাসূল ও কুরআন অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছিল। তখন আয়াতের অর্থ হবে, "তোমরা এজন্যই আমাদের সাথে শক্রতা পোষণ করে থাক যে আমরা ঈমান এনেছি, আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক হয়েছ। সুতরাং আমাদের ঈমান ও তোমাদের অধিকাংশের ফাসেকীই তোমাদেরকে আমাদের শক্রতায় নিপতিত করেছে। এ আয়াতের অন্য একটি অনুবাদ হতে পারে, "আর তোমরা আমাদের সাথে এ জন্যই শক্রতা করে থাক, কারণ তোমাদের অধিকাংশই ফাসেক"। তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "আর তোমরা এ জন্যই আমাদের সাথে শক্রতা করে থাক, আমরা আল্লাহ্ ও তিনি আমাদের উপর যা নাযিল করেছেন এবং যা তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, তার উপর ঈমান এনেছি, আর আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক।" [ফাতহুল কাদীর, সা'দী, মুয়াসসার]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্

কেউ) তাগূতের ইবাদাত করেছে। তারাই অবস্থানের দিক থেকে নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সবচেয়ে বেশী বিচ্যুত।'

৬১. আর তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', অথচ তারা কুফর নিয়েই প্রবেশ করেছে এবং তারা তা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ্ তা ভালভাবেই জানেন।

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আর তাদের অনেককেই আপনি দেখবেন পাপে, সীমালঙঘনে ও অবৈধ খাওয়াতে তৎপর[১]; তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

কোন বিকৃতদের বংশ বা উত্তরাধিকার রাখেন নি। এর আগেও বানর ও শূকর ছিল"। [মুসলিমঃ ২৬৬৩] সুতরাং বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা এভাবে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে নি। বানর ও শুকর এ ঘটনার আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে। বর্তমান বানর ও শূকরের সাথে বিকৃতদের কোন সম্পর্ক নেই।

(১) আয়াতে অধিকাংশ ইয়াহূদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় ও ক্রমাগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে -যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়া' শিরোনাম ব্যবহার করে কুরআনুল কারীম ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা এসব কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইয়াহূদীরা কুঅভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ তারা মনে করে যে, তারা উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। 'তারা যা আমল করে তা কতই না মন্দ!' [সা'দী] এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে, ﴿يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ﴾ অর্থাৎ "তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।" সৎকর্মে নবী এবং ওলীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এসেছে, ﴿يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ﴾ অর্থাৎ "তারা দৌড়ে দৌড়ে পূণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৯০]

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. রাব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ(১) কেন তাদেরকে পাপ কথা বলা ও অবৈধ খাওয়া থেকে নিষেধ করে না? এরা যা করছে নিশ্চয়ই তা কতই না নিকৃষ্ট(২)।

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, রব্বানী বলে নাসারাদের আলেম সম্প্রদায়, আর আহবার বলে ইয়াহূদীদের আলেমদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অপর মুফাসসিরগণ মনে করেন, এখানে শুধু ইয়াহূদীদের আলেমদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, এর পূর্বেকার আলোচনা তাদের সম্পর্কেই চলছিল। [ফাতহুল কাদীর] এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা এ সূরার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে।

(২) আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে ইয়াহূদীদের এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে। জাতিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না। লক্ষণীয় যে, পূর্বোক্ত আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। তাই এর শেষে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ বলা হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতে ইয়াহূদী মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এর শেষে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ বলা হয়েছে। কারণ, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فعل বলা হয়। عمل শব্দটি ঐ কাজকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صنع ও صنعت শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসাবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عمل শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صنع শব্দ প্রয়োগে ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ﴾ বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য সমগ্র কুরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারী আর কোথাও নাই। তাফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন, আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। [তাবারী]

এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের জন্যে কুরআন ও হাদীসে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কুরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কোন জাতির মধ্যে যখন কোন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৬৩] মালেক ইবন দীনার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশ্তারা বললেন, এ বস্তিতে

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن

৬৪. আর ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত[১] রুদ্ধ'[২]। তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত[৩], বরং আল্লাহ্‌র উভয়

আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও- আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি। [কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন সমস্ত যমীনকে তাঁর মুঠিতে ধারণ করবেন। এবং সমস্ত আকাশকে স্বীয় ডান হাতে নিয়ে নিবেন। তারপর বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ্।' [বুখারীঃ ৭৪১২]

(২) হাত রুদ্ধ বলে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, কৃপণতা বোঝানো হয়েছে। সূরা আল-ইসরার ২৯ নং আয়াতেও এ শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ্‌র হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে ইয়াহূদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন'। ঘটনা ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার ইয়াহূদীদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হতে থাকে যে, আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ্ কৃপণ হয়ে গেছেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ কথাটি ইয়াহূদীরা ঐ সময় বলেছিল যখন তারা দেখল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কর্জে হাসানাহ দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন লোকের দিয়াতের ব্যাপারে সবার থেকে সহযোগিতা নিচ্ছেন। তখন তারা বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদের ইলাহ ফকীর হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [কুরতুবী]
এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে আখেরাতে আযাব এবং দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন; যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন। [সা'দী]

رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

হাতই প্রসারিত[১]; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আপনার রব-এর কাছ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে। আর আমরা তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি[২]। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় তখনই আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা দুনিয়ায় ফাসাদ করে বেড়ায়; আর আল্লাহ্ ফাসাদকারীদেরকে ভালবাসেন না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমরা তাদের পাপসমূহ অবশ্যই মুছে ফেলতাম এবং তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ

৬৬. আর তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাদের রবের কাছ থেকে তাদের প্রতি

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্র ডান হাত পরিপূর্ণ। খরচ করে তা কমানো যায় না। রাত-দিন সবাইকে তিনি দিচ্ছেন। তোমরা কি দেখনা আসমান-যমীনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তিনি সবাইকে যা দিচ্ছেন, তাতে তাঁর ডান হাতে যা আছে তার একটুও কমেনি। আর তাঁর আরশ রয়েছে পানির উপর। তাঁর অপর হাতে রয়েছে গ্রহণ করা। উন্নতি এবং অবনতি তাঁরই হাতে। [বুখারীঃ ৭৪১৯, মুসলিমঃ ৯৯৩]

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি নাযিল করা কুরআনী নির্দেশাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রান্তও সফল হয় না। [বাগবী, ইবন কাসীর, সা'দী, ফাতহুল কাদীর]

إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

যা নাযিল হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত(১), তাহলে তারা অবশ্যই তাদের উপর থেকে ও পায়ের নীচ থেকে আহারাদী লাভ করত(২)। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী; এবং তাদের অধিকাংশ যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট(৩)।

---

(১) যিয়াদ ইবনে লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ব্যাপার উল্লেখ করে বললেনঃ 'এটা ঐ সময়ই হবে যখন দ্বীনের জ্ঞান চলে যাবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কিভাবে জ্ঞান চলে যাবে অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন পড়াচ্ছি, তারা তাদের সন্তানদেরকে পড়াবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত? তিনি বললেন. তোমার আম্মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক যিয়াদ! (আরবি ভাষায় ভর্ৎসনামূলক বাক্য) আমি তো মনে করেছিলাম তুমি মদীনার ফকীহ্‌দের অন্যতম। এই ইয়াহূদী এবং নাসারারা কি তাওরাত ও ইঞ্জীল পড়ে না, অথচ তারা এর থেকে কিছুই আমল করে না।' [ইবন মাজাহ্ঃ ৪০৪৮]

(২) এর সারমর্ম এই যে, যদি ইয়াহূদীরা আজও তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনুল কারীমের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে- ত্রুটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে দ্বীন বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা আখেরাতে প্রতিশ্রুত নেয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং দুনিয়াতেও তাদের সামনে রিয্‌কের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিয্‌ক বর্ষিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করতেন। ফলে যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হতো। আর এভাবেই তাদেরকে আসমান ও যমীনের বরকত প্রদান করা হতো। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থে এ কথা বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদীদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সমস্ত ইয়াহূদীদের অবস্থা নয়; বরং তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছে। সৎ পথের অনুসারী বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছিল, এরপর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে। অথবা তাদেরকে যারা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সঠিক মত পোষণ করে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল ছিলেন। তিনি ইলাহ বা ইলাহের সন্তান ছিলেন না। [তাবারী] তারপর বলা হয়েছে যে, 'যদিও তাদের অধিকাংশই কুকর্মী'। কারণ, তাদের অধিকাংশই ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে হয় বাড়াবাড়ি নতুবা মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করে থাকে। অনুরূপভাবে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও ঈমান আনে না। [তাবারী]

দশম রুকূ'

৬৭. হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না[১]। আর আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারকার্যের তাগিদ ও তার প্রতি সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যাতে করে তিনি নিরাশ কিংবা প্রচারকার্যে নিরুৎসাহিত না হন। বলা হচ্ছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশুনা করবেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌঁছাতে বাকী রাখেন, তবে আপনি নবুয়তের দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। বিদায় হজে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেনঃ 'শুন, আমি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি?' সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, 'জী হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন।' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো।' তিনি আরো বললেন, 'এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেবে।' [বুখারীঃ ৪১৪১, ৩২৬৬] অন্য এক হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তিনি তার কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে মিথ্যা বলেছে। [বুখারীঃ ৪৬১২]

আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত ও অনুরূপ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলের দায়িত্ব শুধু প্রচার করা। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দায়িত্ব যথাযথই পালন করেছেন। এ জন্যে আল্লাহ্ বলেন, "কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, এতে আপনি তিরস্কৃত হবেন না।" [সূরা আয-যারিয়াত:৫৪] সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কোন কিছুই গোপন করেন নি। [আদওয়াউল বায়ান] হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে কেউ তোমাকে বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তার কোন অংশ গোপন করেছেন, তাহলে মিথ্যা বলেছে।

থেকে রক্ষা করবেন[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

৬৮. বলুন, 'হে কিতাবীরা! তাওরাত, ইঞ্জীল ও যা তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তা[২] প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

কারণ, আল্লাহ্ বলেন, "হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না" [বুখারীঃ ৪৬১২]

(১) আয়াতের এ বাক্যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শক্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। [দেখুন- তিরমিযী, ৩০৪৬] কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়। তাছাড়া কোন কোন হাদীসে এ হিফাযতের বাস্তব নমূনাও আমরা দেখতে পাই। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নাজদের পথে যুদ্ধে বের হলাম। একটি ঘন বৃক্ষ সম্পন্ন উপত্যকায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তরবারীটি একটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে আরাম করছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম ছায়ার আশায় বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত ঘুরাফেরা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি লোক এসে আমার ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে আমার তরবারীটি হাতে নিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম যে, লোকটি আমার মাথার উপর উন্মুক্ত অসি নিয়ে বলছে, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্। লোকটি দ্বিতীয়বার আমাকে বলল, তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্। আর তখনি তরবারী পড়ে গেল। আর সে হচ্ছে এই বসা লোকটি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু করলেন না। [মুসলিম:৮৪৩; অনুরূপ বুখারীঃ ২৯১০]

(২) আয়াতে কিতাবী সম্প্রদায় তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বলা হয়েছে, 'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে'। পূর্বেই তাওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বলা হয়েছে, সুতরাং এখানে 'তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের

طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও[১]।' আর আপনার রব-এর কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরীই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করবেন না।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ

৬৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, আর সাবেয়ী[২] ও

প্রতি' বলে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কারণ, কুরআন সবার জন্যই নাযিল হয়েছে। আর কুরআন ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল বাস্তবায়ন করার সুযোগ নেই। তবে কোন কোন মুফাসসির মনে করেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল ছাড়াও তাদের নবীদের উপর আরও যে সমস্ত বিধি-বিধান সম্বলিত নাযিল করা হয়েছিল তা-ই এখানে উদ্দেশ্য। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে শরী'আত অনুসরণের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হে ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমরা দ্বীনের কোন অংশেই নেই। কেননা, কুরআনের উপরও তোমাদের ঈমান নেই, নবীর উপরও নেই। অনুরূপভাবে, তোমরা তোমাদের নবী, কিতাব, শরী'আত কিছুই অনুসরণ করনি। সুতরাং তোমরা কোন হকের উপর নও, কোন ভিত্তিকেও আকড়িয়ে থাকতে পারনি। সুতরাং তোমরা কোন কিছুরই মালিক হবে না। যদি তোমরা শরী'আতের নির্দেশাবলী পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এর কারণে আখেরাতে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ অর্থাৎ মুসলিম। দ্বিতীয়তঃ ﴿وَالَّذِيْنَ هَادُوْا﴾ অর্থাৎ ইয়াহূদী। তৃতীয়তঃ نصارى অর্থাৎ নাসারা, যারা ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে। চতুর্থতঃ সাবেউন। তন্মধ্যে এদের মধ্যে তিনটি জাতিঃ মুসলিম, ইয়াহূদী ও নাসারা সর্বজন পরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। কিন্তু 'সাবেয়ীন' সম্পর্কে চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, সাবেয়ীরা হচ্ছে, নাসারা ও মাজুসীদের মাঝামাঝি এক সম্প্রদায়, যাদের কোন দ্বীন নেই। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, তারা ইয়াহূদী ও মাজুসীদের মাঝামাঝি এক সম্প্রদায়। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, তারা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। হাসান বসরী ও হাকাম বলেন, তারা মাজুসীদের মতই। কাতাদাহ বলেন, তারা ফেরেশতাদের পূজা করে থাকে এবং আমাদের কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে

وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

নাসারাগণের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

সালাত আদায় করে থাকে। আর তারা যাবূর পাঠ করে থাকে। ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বলেন, তারা একমাত্র আল্লাহকেই চিনে। তাদের কোন শরী'আত নেই তবে তারা কুফরী করে না। ইবন ওয়াহাব বলেন, তারা ইরাকের কুফা অঞ্চলে বসবাস করে। তারা সমস্ত নবীর উপরই ঈমান আনে, ত্রিশ দিন সাওম পালন করে, ইয়ামানের দিকে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। তাছাড়া তাদের ব্যাপারে আরও কিছু বর্ণনা রয়েছে। [ইবন কাসীর] বর্তমানে তাদের অধিকাংশই ইরাকে বসবাস করে। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা বলেন, তাদের মধ্যে দু'টি দল রয়েছে। একটি মুশরিক, অপরটি একত্ববাদের অনুসারী। [মাজমূ' ফাতাওয়া] এ ব্যাপারে সূরা আল-বাকারার ৬২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(১) এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, এখানে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার কথা বলেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান ও তার অনুসরণের কথা বোঝানো হয়েছে। [মুয়াস্সার] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে এটা বোঝানই উদ্দেশ্য যে, মুক্তির একটিই পথ। আর সেটি হচ্ছে, আল্লাহ্র উপরে ঈমান, আখেরাতের উপর ঈমান এবং সৎকাজ করা। তিনি যখন যা নাযিল করেছেন তখন তা অনুসরণ করে চললে তাদের আর কোন ভয় বা চিন্তা থাকবে না। সর্বকালের জন্যই এটা মুক্তির পথ। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পরও আল্লাহ্র উপর ঈমান, আখেরাতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাযিল করেছেন সেটার উপর আমল করলে সবাই মুক্তি পাবে। [সা'দী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে 'সৎকর্ম' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও তার অনুসরণ বুঝানো হয়েছে। এতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতে ঈমান স্থাপন ব্যতীত কারো মুক্তি নাই। কেননা, কোন কাজই ঐ পর্যন্ত সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত না হবে। [ইবন কাসীর] এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আজ যদি মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তার উপায় ছিল না।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৩৮] অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলিম না হয়েই আখেরাতে মুক্তি পাবে, এরূপ আশা করা কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ।

৭০. অবশ্যই আমরা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম ও তাদের কাছে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনি কোন রাসূল তাদের কাছে এমন কিছু আনে যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনি তারা রাসূলগণের কারও উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং অপর কাউকে হত্যা করেছে।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন বিপর্যয় হবে না[২]; ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবাহ্

وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

---

(২) বনী-ইস্রাঈলের কাছে তাদের রাসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন, যা তাদের রুচি-বিরুদ্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং নবীদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এত সব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহীসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের জন্য কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং কোন প্রকার অশুভ পরিণতি কখনো তাদের সামনে আসবে না। কেননা, তারা মনে করতে থাকে যে, তারা আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন ও তাঁর প্রিয় বান্দা সুতরাং তাদের কোন অপরাধই ধর্তব্য নয়। এরূপ ধারণার কারণে তারা আল্লাহ্র নিদর্শন ও হুশিয়ারী থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত তাই করতে থাকে। এমনকি, কিছুসংখ্যক নবীকে তারা হত্যা করেছে আর কিছুসংখ্যককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ্ বখ্তে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। এরপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখ্তে নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসেন। তখন তারা তাওবাহ্ করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাদের সে তাওবাহ্ কবূল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুস্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া 'আলাইহিমাস্ সালামকে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। এমনকি ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। [আইসারুত তাফাসীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

কবুল করেছিলেন। তারপর তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল[১]। আর তারা যা আমল করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৭২. যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি তো মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্', অবশ্যই

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, বনী ইসরাঈল দু'বার অন্ধ ও বধির হয়েছিল। যার মাঝে আল্লাহ্ তাদের তাওবাহও কবুল করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সূরা আল-ইসরার ৪,৫,৬,৭ নং আয়াতে। যাতে বলা হয়েছে, "আর আমরা কিতাবে ওহী দ্বারা বনী ইস্‌রাঈলকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে" এটা ছিল প্রথমবার অন্ধ ও বধির হওয়া। এর শাস্তিস্বরূপ যা এসেছে, তার বর্ণনায় এসেছে, "তারপর এ দুটির প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হল তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম আমাদের বান্দাদেরকে, যুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু ধ্বংস করেছিল।" এরপর দ্বিতীয়বার তাদের অন্ধ ও বধির হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, "তারপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে (আমি আমার বান্দাদের পাঠালাম) তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল আবার সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য।" এ দু অন্ধত্ব ও বধিরতা ও এ দুয়ের শাস্তির মাঝখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি দয়াবান হয়ে যে তাওবা কবুল করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "তারপর আমরা তোমাদেরকে আবার তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম"। তারপর আল্লাহ্ বর্ণনা করলেন যে, আবার যদি তোমরা অন্ধ ও বধির হও এবং দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি কর, তবে আমি আবার তোমাদের জন্য শাস্তি নিয়ে আসব। তিনি বলেন, "কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমরাও পুনরাবৃত্তি করব"। [সূরা আল-ইসরা ৪-৮] বনী ইসরাঈল কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আবার অন্ধ ও বধির হয়েছিল এবং দুনিয়ার বুকে ফেতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে তারা গোপন করল। সুতরাং আল্লাহ্ও তাদের নবীর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দিলেন। বনু কুরাইযার যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হলো, তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা হলো, বনু কাইনুকা' ও বনু নদ্বীরকে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হলো, যেমনটি আল্লাহ্ তার কিছু বর্ণনা সূরা আল-হাশরে উল্লেখ করেছেন। [আদওয়াউল বায়ান]

وَقَالَ الْمَسِيحُ يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

তারা কুফরী করেছে[১]। অথচ মসীহ্ বলেছিলেন, 'হে ইস্‌রাঈল-সন্তানগণ! তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর।' নিশ্চয় কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন[২] এবং তার আবাস

---

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী-ইস্‌রাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল- যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। কতক নবীকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে। আলোচ্য আয়াতে বনী-ইস্‌রাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহ্‌র নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তে পরিণত করে দিয়েছে। তারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি তো মারইয়াম তনয় মসীহ্' এ কথা বলে তারা কুফরী করল এবং কাফের হয়ে গেল। ইতিহাস বলে যে, যারা এ ধরণের উক্তি করত তারা হচ্ছে, নাসারাদের মালেকিয়্যা, ইয়া'কুবিয়্যা এবং নাসতুরিয়্যাহ সম্প্রদায়। [ইবন কাসীর] আলোচ্য আয়াতে যদিও এ উক্তিটি শুধু নাসারাদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র এ ধরণের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইয়াহূদী এবং নাসারা উভয়ের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ﴾ অর্থাৎ "আর ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র', এবং খৃস্টানরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।' ওটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল ওরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে?" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ৩০]

(২) অর্থাৎ নাসারারা যতই বাড়াবাড়ি করুক এবং ঈসাকে তাদের ইলাহ ঘোষণা করুক, ঈসা এতে কখনও সন্তুষ্ট নন। তিনি নিজেই এর বিপরীত ঘোষণা করেছিলেন। দুনিয়ায় আসার পর দোলনাতেই তার মুখের প্রথম কথা ছিল, ﴿إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ﴾ অর্থাৎ আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস। [সূরা মারইয়াম: ৩০] তিনি আরও বলেছিলেন, আমার ও তোমাদের রব একমাত্র আল্লাহ্। তাঁরই ইবাদাত কর। সরল সঠিক পথ এটিই। [সূরা আলে ইমরান: ৫১; মারইয়াম: ৩৬; আযযুখরুফ: ৬৪] তাছাড়া যৌবনের পরবর্তী বয়সেও বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদাত কর, যারা তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের জন্যে আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করেছেন এবং

হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৭৩. তারা অবশ্যই কুফরী করেছে- যারা বলে, 'আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে তৃতীয়[1], অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আর তারা যা বলে তা থেকে বিরত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর অবশ্যই কষ্টদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,

---

তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে। যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ শির্কের গোনাহ কখনও ক্ষমা করবেন না"।[সূরা আন-নিসা: ৪৮, ১১৬] অনুরূপভাবে জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি চাইবে, তখন তারা উত্তরে বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ এ দুটি জিনিস কাফেরদের উপর হারাম করে দিয়েছেন।' [সূরা আল-আ'রাফ: ৫০] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করতে বলেছেন যে, 'শুধু মুমিন মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে'। [মুসলিম: ১১১] আরও বলেছেন, 'যতক্ষণ তোমরা ঈমানদার না হবে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' [মুসলিম: ৫৪] সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম কখনোও ইলাহ হওয়ার দাবী করেন নি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ ঈসা মসীহ্ 'আলাইহিস্ সালাম, রূহুল কুদ্স ও আল্লাহ্, কিংবা মসীহ্, মার্ইয়াম ও আল্লাহ্ -সবাই আল্লাহ্। তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ্। এরপর তারা তিনজনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে নাসারাদের সাধারণ বিশ্বাস। নাসারাদের মালেকিয়্যা, ইয়া'কুবিয়্যা ও নাসতুরিয়্যা এ তিনটি দলই উপরোক্ত বিশ্বাস পোষণ করে। [ইবন কাসীর] এ যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারো বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়। সুদ্দি বলেন, এখানে তিনের এক ইলাহ বলা হয়েছে। তিনজন বলতে, ঈসা, তার মা মারইয়াম এবং আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, অন্য আয়াতে কোন কোন নাসারাদের দ্বারা ঈসা ও তার মাকে ইলাহ হিসেবে গণ্য করার কথা উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। [আল-মায়েদাহ: ১১৬] ইবন কাসীর বলেন, এ মতটি অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। [ইবন কাসীর]

পরম দয়ালু[১]।

৭৫. মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্ শুধু একজন রাসূল। তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন[২] এবং তাঁর মা অত্যন্ত সত্য নিষ্ঠা ছিলেন। তারা দুজনেই খাওয়া-দাওয়া করতেন[৩]। দেখুন, আমরা তাদের জন্য আয়াতগুলোকে কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; তারপরও দেখুন, তারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর 'ইবাদাত কর যার কোন ক্ষমতা

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا

---

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'বান্দা তাওবাহ্ করলে আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির চাইতেও বেশী খুশী হন, যে ব্যক্তি তার উটকে মরুভূমির অজানা পথে হারিয়ে ফেলে। চিন্তায় মুমূর্ষ হয়ে পড়েছে; ঠিক এই মুহূর্তে সে তার উটকে পেয়ে গেলে যতটা খুশি হয়।' [বুখারীঃ ৬৩০৯] এখানেও আল্লাহ্‌র অপার রহমত যে, তিনি বান্দার শির্কের পরও যদি তাঁর কাছে তাওবাহ করে তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ অন্যান্য নবী যেমন দুনিয়াতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে চলে গেছেন; কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতই একজন মানুষ। একজন রাসূলের বেশী তো তিনি কিছু নন। তবে আল্লাহ্ তাকে বনী-ইসরাঈলদের জন্য নিদর্শন বানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তো কেবল আমারই এক বান্দা, যার উপর আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইস্‌রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত" [সূরা আয-যুখরুফ: ৫৯] [ইবন কাসীর]

(৩) যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী সে পৃথিবীর সবকিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্তু থেকে সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। পরমুখাপেক্ষীতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ্ ও মার্‌ইয়ামের উপাস্যতা খণ্ডণকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি, মসীহ্ ও মার্‌ইয়াম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। আর যে পানাহার থেকে মুক্ত নয়, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগতের মুখাপেক্ষী, সে কিভাবে আল্লাহ্ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী- [বাগভী, ইবন কাসীর, সা'দী, আইসারুত তাফাসীর]

وَلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٧٦

নেই তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার? আর আল্লাহ্ তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝٧٧

৭৭. বলুন, 'হে কিতাবীরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনে অন্যায়[১] বাড়াবাড়ি করো না[২]। আর যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না[৩]।'

---

(১) আলোচ্য আয়াতে ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ বলার সাথে সাথে ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। তাফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, দ্বীনে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এখানে ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ কথাটি دِين এর গুণ হিসেবে এসেছে। সুতরাং এর অর্থ হবে, তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, তোমাদের দ্বীনটি হকের বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। [তাবারী]

(২) غُلُوّ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। দ্বীনের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে দ্বীন যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা লংঘন করা। উদাহরণতঃ নবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের মধ্যে তাদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমা লংঘন। নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া অথবা তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে দেয়া বনী-ইস্রাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু'টি কাজই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। মূর্খ ব্যক্তি কখনো মিতাচার অথবা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। হয় সে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালংঘনে। তাই আয়াতে বনী-ইসরাঈলদেরকে এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী-ইস্রাঈলদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এর দ্বারা হয় তারা নিজেরাই

এগারতম রুকূ’

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

৭৮. ইস্‌রাঈল-বংশধরদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মার্‌ইয়াম-পুত্র ‘ঈসার মুখে অভিশপ্ত হয়েছিল(১)। তা এ জন্যে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল আর তারা সীমালংঘন করত।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট!

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝

৮০. তাদের অনেককে আপনি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। তাদের অন্তর যা তাদের জন্য পেশ করেছে (তাদের করা কাজগুলো) কত নিকৃষ্ট! যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। আর তারা আযাবেই স্থায়ী হবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاۗءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

৮১. আর তারা আল্লাহ্ ও নবীর প্রতি এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান আনলে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ

৮২. অবশ্যই মুমিনদের মধ্যে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকেই আপনি সবচেয়ে উগ্র

ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়েছিল, না হয় তাদেরকে অন্যরা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছিল। [তাবারী, ফাতহুল কাদীর]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, বনী ইসরাঈলরা ইঞ্জীলে ঈসা আলাইহিস সালামের মুখে লা’নত প্রাপ্ত হয়েছিল। আর যাবূরে দাউদ আলাইহিস সালামের মুখে লা’নত প্রাপ্ত হয়েছিল। [তাবারী]

مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

দেখবেন। আর যারা বলে 'আমরা নাসারা' মানুষের মধ্যে তাদেরকেই আপনি মুমিনদের কাছাকাছি বন্ধুত্বে দেখবেন, তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী রয়েছে। আর এজন্যেও যে, তারা অহংকার করে না।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যখন তারা শুনে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবেন(১)। তারা বলে, 'হে আমাদের

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহলে কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও আল্লাহ্‌ভীতির কারণে মুসলিমদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু ইয়াহূদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল একান্তই নগণ্য। উদাহরণতঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমূখ। নাসারাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী এবং উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাসী একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তখন তিনি জা'ফর ইবন আবু তালেব, ইবন মাস'উদ, উসমান ইবন মায'উনসহ একদল সাহাবাকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তারা সেখানে সুখে-শান্তিতেই বসবাস করছিল। মক্কার মুশরিকরা এ খবর পেয়ে আমর ইবন 'আসকে একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে নাজ্জাসীর কাছে পাঠায়। তারা নাজ্জাসীকে অনুরোধ জানায় যে, এরা আহম্মক ধরণের কিছু লোক। এরা বাপ-দাদার দ্বীন ছেড়ে আমাদেরই একজন লোক- যে নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে, তার অনুসরণ করছে। আমরা তাদেরকে ফেরৎ নিতে এসেছি। নাজ্জাসী জা'ফর ইবন আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ঈসা এবং তার মা সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? জবাবে তিনি বললেনঃ ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর এমন কালেমা যা তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মার্‌ইয়ামের কাছে অর্পণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ্। একথা শুনে নাজ্জাসী একটি কাঠি উঠিয়ে বললেনঃ তোমরা যা বলেছ, তার থেকে ঈসা এ কাঠি পরিমাণও বেশী নন। তারপর নাজ্জাসী তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা থেকে কি আমাকে কিছু

রব! আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত করুন।'

৮৪. 'আর আল্লাহ্‌র প্রতি ও আমাদের কাছে আসা সত্যের প্রতি ঈমান না আনার কি কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন?'

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. অতঃপর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা মুহসিনদের পুরস্কার।

فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে ও আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

বারতম রুকূ'

৮৭. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না[১]

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

শুনাতে পার? তারা বললঃ হ্যাঁ। নাজ্জাসী বললেনঃ পড়। তখন জা'ফর ইবন আবু তালেব কুরআনের আয়াত পড়ে শুনালে নাজ্জাসীসহ তার দরবারে সে সমস্ত নাসারা আলেমগণ ছিলেন তারা সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। [সহীহ্ সনদসহ তাবারী, বাগভী]

(১) আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ঘরে এসে তার ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাদেরকে তা জানানো হলে তারা সেসবকে অল্প মনে করল এবং বলল, আমরা কোথায় আর রাসূল কোথায়? তার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা রাত সালাত আদায় করব। অন্যজন বলল,

এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না[১]।

الْمُعْتَدِيْنَ

৮৮. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর প্রতি তোমরা মুমিন।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

৮৯. তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফ্‌ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আমি সারা বছর সিয়াম পালন করব। অপরজন বলল, আমি মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব এবং বিয়েই করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, 'তোমরা এসব কথা বলেছ? জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের সবার চাইতে আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করি এবং বেশী তাকওয়ারও অধিকারী। কিন্তু আমি সিয়াম পালন করি, সিয়াম থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং মেয়েদের বিয়েও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।' [বুখারীঃ ৫০৬৩] অপর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যুদ্ধে যেতাম, আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীরা থাকত না। তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম যে, আমরা 'খাসি' হয়ে যাই না কেন? তখন আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল।' তারপর আবদুল্লাহ এ আয়াত পাঠ করলেন। [বুখারী: ৪৬১৫]

(১) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার কাছে একবার খাবার নিয়ে আসা হলো। একলোক খাবার দেখে একদিকে আলাদা হয়ে গেল এবং বলল, আমি এটা খাওয়া হারাম করছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বললেন, কাছে আস এবং খাও। আর তোমার শপথের কাফফারা দাও। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৩,৩১৪; ফাতহুল বারী: ১১/৫৭৫]

কিংবা একজন দাস মুক্তি[১]। অতঃপর যার সামর্থ নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন[২]। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো[৩]। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

৯০. হে মুমিনগণ! মদ[৪], জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার শর[৫] তো

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ

---

(১) এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লাগ্ভ-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না অর্থাৎ কাফ্ফারা ওয়াজিব করেন না। অন্য শপথের জন্য কাফ্ফারা দিতে হবে। আর তা হল, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে। (এক) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যশ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দশ জন দরিদ্রকে সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (তিন) কোন গোলামকে মুক্ত করে দেয়া। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(২) এরপর বলা হয়েছেঃ "কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফ্ফারা এই যে সে তিন দিন রোযা রাখবে"। কোন কোন বর্ণনায় এখানে ধারাবাহিকভাবে তিনটি সিয়াম রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্ফারা হিসেবে যে সিয়াম পালন হবে তা ধারাবাহিকভাবে হওয়া জরুরী। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(৩) আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে প্রথমে إطعام শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। [কুরতুবী]

(৪) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় হবে যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড় ব্যবহার, মদ্যপান ও গান বাদ্যকে হালাল করবে।' [বুখারীঃ ৫৫৯০] অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে ও তাওবাহ্ করবে না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। [বুখারীঃ ৫৫৭৫]

(৫) أزلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যা দ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন কর-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার[১]।

যবাই করত। অতঃপর এর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অবিকৃত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অংকিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনীর মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে প্রত্যেক অংশীদারের জন্যে একটি করে শর বের করা হত। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে বঞ্চিত হত। [কুরতুবী] আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলো জুয়া এবং হারাম। পূর্বে এ সূরার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

(১) মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম আয়াত ছিল, ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৯] যাতে সাহাবায়ে কিরাম মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তাতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত ছিল ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ সূরা আন-নিসা: ৪৩] এতে বিশেষভাবে সালাতের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে যায়। কিন্তু সূরা আল-মায়িদাহ এর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ বিষয়ে শরী'আতের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হত। [ফাতহুল কাদীর]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ 'সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে মদ। [ইবন মাজাহ: ৩৩৭১] কারণ, এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'মদ এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না'। [নাসায়ীঃ ৮/৩১৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন। '(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্য আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী'। [ইবন মাজাহ্ঃ ৩৩৮০] আনাস রাদিয়াল্লাহু

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

৯১. শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে। তবে কি তোমরা বিরত হবে না[১]?

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

৯২. আর তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর সাবধানতা অবলম্বন কর; তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।

'আনহু তখন এক মজলিশে মদ্যপানে সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্, উবাই ইবন কা'ব, সোহাইল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমূখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন - এবার সমস্ত মদ ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৮১; বুখারী: ৪৬২০; মুসলিম: ১৯৮০]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যা-ই বিবেকশূণ্য করে তা-ই মদ। আর সমস্ত মাদকতাই হারাম। যে ব্যক্তি কোন মাদক সেবন করল, চল্লিশ প্রভাত পর্যন্ত তার সালাত অসম্পূর্ণ থাকবে। তারপর যদি সে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন, এভাবে চতুর্থবার পর্যন্ত। যদি চতুর্থবার পূণরায় তা করে, তখন আল্লাহ্‌র উপর হক হয়ে দাঁড়ায় তাকে 'ত্বিনাতুল খাবাল' থেকে পান করানো। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'ত্বীনাতুল খাবাল' কী? তিনি বললেন, জাহান্নামাবাসীদের পূঁজ। যে কেউ কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ককে মদ খাওয়াবে, যে হারাম হালাল সম্পর্কে জানে না, আল্লাহ্‌র উপর হক হয়ে যাবে যে তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করানো। [মুসলিম: ২০০২; আবু দাউদ: ৩৬৮০] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং তাওবা না করে মারা গেল, সে আখেরাতে তা পান করতে পারবে না। [মুসলিম: ২০০৩] আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনুগ্রহের খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [নাসায়ী : ৫৬৭২]

৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা আগে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ্ নেই, যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। তারপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে। তারপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ইহ্সান করে। আর আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন[১]।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

তেরতম রুকূ'

৯৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন শিকারের এমন বস্তু দ্বারা যা তোমাদের হাত[২] ও বর্শা[৩] নাগাল পায়, যাতে আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন, কে তাঁকে গায়েবের সাথে ভয় করে[৪]। কাজেই

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

(১) বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় তখন জনগণ বলতে আরম্ভ করল, এটা হারাম হওয়ার পূর্বে যারা এটা পান করেছে এবং সে অবস্থায় মারা গেছেন তাদের কি হবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩০৫১]

(২) অর্থাৎ সহজলভ্য শিকার। কারণ, এগুলো মুহরিম ব্যক্তির আশেপাশেই থাকে। এর মাধ্যমে মুহরিম ব্যক্তির পরীক্ষা করা হয়। মুজাহিদ বলেন, এখানে ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ বড় শিকার। [ইবন কাসীর] কারণ, বড় শিকার করতেই সাধারণতঃ বর্শা ব্যবহার করতে হয়।

(৪) মুকাতিল বলেন, মুসলিমরা যখন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থানস্থলে জমা হয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তারা ইতোপূর্বে দেখেনি। সুতরাং ইহরামের অবস্থায় তাদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করে দেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে, আর কে

এরপর কেউ সীমালংঘন করলে তার জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৯৫. হে ঈমানদারগণ! ইহ্রামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না[১]; তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক-কা'বাতে পাঠানো হাদঈরূপে[২]। বা সেটার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমান সংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা আবারো করলে আল্লাহ্

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

করছে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে 'যিকর' এর অনুসরণ করে এবং গায়েবের সাথে রহমানকে ভয় করে। অতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।' [সূরা ইয়াসীন: ১১] [ইবন কাসীর]

(১) এ নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্তু, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। কারণ, যে প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা বৈধ সেগুলোর বর্ণনা এক হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। তাই অপরাপর প্রাণীগুলো উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। [ইবন কাসীর] যে প্রাণীগুলো ইহরাম ও সাধারণ সর্বাবস্থায় বধ করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, পাঁচটি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'পাঁচ প্রকার প্রাণী আছে যা ইহ্রাম অবস্থায় হত্যা করলে কোন পাপ হয় না। কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর। [বুখারীঃ ১৮২৯, মুসলিমঃ ১১৯৯]

(২) অর্থাৎ এ হাদঈ বা জন্তু কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সেখানেই তা জবাই করতে হবে এবং হারাম শরীফের মিসকীনদের মধ্যে ওর গোশত বন্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। [ইবন কাসীর] হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসেবে হারাম এলাকায় যে পশু যবেহ করা হয় তাকে হাদঈ বলা হয়।

তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য । তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম । আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে ।

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا

৯৭. পবিত্র কা'বা ঘর, পবিত্র মাস, হাদঈ ও গলায় মালা পরানো পশুকে[১] আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের[২] জন্য

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করছেন । প্রথমতঃ কা'বা । আরবী ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয় । জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মনে হারাম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল । দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে, সম্মানিত মাস । সম্মানিত মাস বলে এখানে কারও কারও মতে, জিলহজ্জ মাস বোঝানো হয়েছে । অপর কারও কারও মতে, এর দ্বারা হারাম মাসসমূহ বোঝানো হয়েছে । আর তা হচ্ছে, রজব, জিলকদ ও জিলহজ ও মুহাররাম । তৃতীয় বস্তু হচ্ছে, 'হাদঈ' । হারাম শরীফে যে জন্তুকে তামাত্তু ও কেরান হজের কারণে যবাই করতে হয়, তাকে হাদঈ বলা হয় । যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না । এভাবে কুরবানীর জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায় । চতুর্থ বস্তুটি হচ্ছে, قلائد এ শব্দটি قلادة শব্দের বহুবচন । এর অর্থ, গলার হার । আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজের উদ্দেশ্যে বের হলে চিহ্নস্বরূপ তার হাদঈর গলায় একটি হার পরিয়ে দিত । ফলে কেউ তাকে কোন কষ্ট দিত না । এ কারণে قلادة শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায় । [ফাতহুল কাদীর]

(২) قيام ও قوام এর অর্থ ঐসব বস্তু , যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল । তাই ﴿قِيَامًا لِّلنَّاسِ﴾ এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায় । এর উপরই তাদের জীবিকা ও দ্বীন নির্ভরশীল ।

নির্ধারিত করেছেন। এটা এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, নিশ্চয় যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে আছে আল্লাহ্ তা জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮. জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর, আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৯. প্রচার করাই শুধু রাসূলের কর্তব্য। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তা জানেন[১]।

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. বলুন, 'মন্দ ও ভাল এক নয়[২] যদিও

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

এর মাধ্যমেই তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে যারা ভীত তারা সেখানে নিরাপত্তা পায়। যারা ব্যবসায়ী তারা ব্যবসায় লাভবান হয়। যারা ইবাদাত করতে চায়, তারা নির্বিঘ্ন ইবাদাত করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমার রাসূলের দায়িত্ব এতটুকই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন'। এরপর তা মানা না মানার লাভ ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রাসূলের কোন ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ্তা'আলাকে ধোঁকা দেয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্যে ও গোপন কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি তোমাদের আমলের প্রকৃত অবস্থা জেনে সেটা অনুসারে তোমাদেরকে এর প্রতিফল দিবেন। [সা'দী]

(২) ﴿الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ আরবী ভাষায় দুটি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে الطَّيِّب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে الْخَبِيث বলা হয়। অর্থাৎ কোন প্রকার خَبِيث এর সাথেই কোন প্রকার طَيِّب এর তুলনা চলে না। আয়াতে خَبِيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طَيِّب শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে, এমনকি প্রত্যেক সুস্থ্য বুদ্ধিমান লোকের দৃষ্টিতে, পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ﴿الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ শব্দ দুটি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই কোন বিচারেই সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। ঈমান ও কুফরী সমান নয়। জান্নাত ও জাহান্নাম সমান নয়। আনুগত্য ও অবাধ্যতা সমান

كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

মন্দের আধিক্য তোমাকে(১) চমৎকৃত করে(২)। কাজেই হে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'

চৌদ্দতম রুকূ'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ

১০১. হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে(৩)।

নয়। সুন্নাতের অনুসারী ও বিদ'আতের অনুসারী সমান নয়। [ইবন কাসীর, সা'দী, মুয়াসাসার]

(১) অর্থাৎ হে মানুষ! যদিও খারাপ বস্তু তোমাকে চমৎকৃত করে তবুও খারাপ বস্তু ও ভালো বস্তু কখনও সমান হতে পারে না। এখানে সাধারণভাবে সকল মানুষকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদের বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ। মন্দ বস্তু কখনও ভাল হতে পারে না। সুতরাং উপকারী হালাল বস্তু স্বল্প হলেও তা অপকারী হারাম বস্তু বেশী হওয়ার চেয়ে উত্তম। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অল্প ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে।' [মুসনাদে আহমাদ ৫/১৯৭]

(৩) আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাটাঘাটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি যে এমন বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, যা হারাম করা হয়নি। অতঃপর তার প্রশ্ন করার কারণে তা হারাম করে দেয়া হয়েছে।' [বুখারীঃ ৭২৮৯, মুসলিমঃ ২৩৫৮] আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুল এই যে, যখন হজ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ নাযিল হয়, তখন আকরা' ইবন হাবেস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ করা

الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

আর কুরআন নাযিলের সময় তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে(১)।

ফরয? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন, যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন, যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেইনা, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দাও- ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজ নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। [মুসলিম:১৩৩৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে এক অভূতপূর্ব ভাষণে বললেন, 'যদি তোমরা জানতে, যা আমি জানি তবে তোমরা অল্প হাসতে এবং বেশী করে কাঁদতে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ মুখ ঢেকে কান্না আরম্ভ করলেন। তখন এক লোক ডেকে বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার বাবা কে? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অমুক। তখন এ আয়াত নাযিল হল।' [বুখারীঃ ৪৬২১, মুসলিমঃ ২৩৫৯] অপর আরেক বর্ণনায় এসেছে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঠাট্টা করে প্রশ্ন করত। কেউ কেউ বলতঃ আমার বাবা কে? কেউ বলতঃ আমার উট হারিয়ে গেছে, তা কোথায় আছে? এসব ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৬২২]

(১) বলা হয়েছে, কুরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, যাতে কোন বিধান বুঝতে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে, যা একান্তই সহজ বিষয়। কিন্তু যদি অন্য সময় হয়, তবে তোমাদের উচিত এ ব্যাপারে চুপ থাকা। [সা'দী, ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন কুরআন নাযিল হচ্ছে, তখন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আসবেই। কিন্তু তোমরা নিজেরা নতুন করে প্রশ্ন করতে যেও না; কারণ, এতে করে তোমাদের উপর কোন কঠিন বিধান এসে যেতে পারে। [ইবন কাসীর] এতে 'কুরআন অবতরণকাল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুওয়াত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেয়া হবে। নবুওয়াতের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারো গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুওয়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয়

আল্লাহ্ সেসব[১] ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

১০২. তোমাদের আগেও এক সম্প্রদায় এ রকম প্রশ্ন করেছিল; তারপর তারা তাতে কাফির হয়ে গিয়েছিল[২]।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. বাহীরাহ্, সায়েবাহ্, ওছীলাহ্ ও হামী আল্লাহ্ প্রবর্তণ করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই বুঝে না[৩]।

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'মুসলিম হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলিম ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে।' [তিরমিযীঃ ২৩১৭, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৯৭৬] ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। তবে যদি কোন বিধানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কোন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসে থাকে, তবে সেটার বিস্তারিত জ্ঞান জেনে নেয়ার জন্য প্রশ্ন করা হলে সে ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা দেয়া হবে। আর যদি কোন বিষয়ে কোন বর্ণনাই না এসে থাকে, তবে সেটার ব্যাপারে নিরবতা পালন করাই হচ্ছে সঠিক নীতি। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি যতক্ষণ কোন বিষয় পরিত্যাগ করি ততক্ষণ তোমরা আমাকে ছাড় দাও; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের নবীদেরকে বেশী প্রশ্ন এবং বেশী বাদানুবাদের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে'। [মুসলিমঃ ১৩৩৭] [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে, এক. আল্লাহ্ তোমাদের অতীতের প্রশ্নগুলোর কারণে পাকড়াও করা ক্ষমা করেছেন। [জালালাইন] দুই. যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করছ আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দাদেরকে এর পরিণতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেন। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ তারা বিভিন্ন বিধি-বিধান চেয়ে নিয়েছিল। তারপর সেগুলোর উপর আমল করা ত্যাগ করে কুফরী করেছিল [জালালাইন] ফলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। [বাগভী] অথবা তারা বিভিন্ন বিধি-বিধান চেয়ে নিয়েছিল, তারপর সেগুলোকে মানতে অস্বীকার করেছিল, যার কারণে তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাই অতিরিক্ত প্রশ্নই তাদের কুফরির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল [কাশশাফ]

(৩) বাহিরাহ্, সায়েবাহ্, ওছীলাহ্, হামী প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও

১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস', তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেটাতে পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ্ বুখারী থেকে সায়ীদ ইবন মূসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি- 'বাহীরাহ্' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না। 'সায়েবাহ্' ঐ জন্তু যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেয়া হত। 'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমন ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। 'ওছীলাহ্' যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহেলিয়াত যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। [বুখারী: ৪৬২৩; অনুরূপ মুসলিম: ২৮৫৬] এসব কর্মকাণ্ড এমনিতেই শির্ক তদুপরি যে জন্তুর গোস্ত, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ্র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল? বাস্তবে তারা যেন শরী'আত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরো অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরিকসুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেননি; বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্র প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। [ফাতহুল কাদীর, সা'দী] যারা এরূপ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি আম্‌র ইবন 'আমের আল-খুজা'য়ীকে জাহান্নামে তার নিজের অন্ত্র নিয়ে টানাটানি করতে দেখলাম। কেননা, সে প্রথম সায়েবাহ্ ছেড়েছিল।' [বুখারীঃ ৪৬২৩-৪৬২৪, মুসলিমঃ ২৮৫৬, আহমাদঃ ২/২৭৫]

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

ভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না[১]। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন; তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى

১০৬. হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে

(১) এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কুরআনের যে সব আয়াতে ‘সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম জাতির একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার পরিপন্থি হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতটি নাযিল হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালামের সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি ‘সৎকাজে আদেশ দান’-এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি ‘সৎকাজে আদেশ দান’ পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। [ইবন কাসীর; সা‘দী] আবুবকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এক ভাষণে বলেন, তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ। জেনে রাখ, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছিঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ তা‘আলা সত্ত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। [আবু দাউদঃ ৪৩৪১, তিরমিযীঃ ৩০৫৮, ইবন মাজাহ্ঃ ৪০১৪] তাই মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। ‘সৎকাজে আদেশ দান’ও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। [সা‘দী] কুরআনের ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথ ভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি ‘সৎকাজে আদেশ দান’-এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়। সা‘য়ীদ ইবন মুসাইয়্যাব বলেন, এর অর্থ, যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ কর, তাহলে কেউ পথভ্রষ্ট হলে, তাতে তোমার ক্ষতি নেই, যখন তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হলে। [ইবন কাসীর]

الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

সাক্ষী রাখবে; অথবা[১] অন্যদের (অমুসলিমদের) থেকে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর বিপদ পেয়ে বসে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখবে। তারপর তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা তার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতঃপর যদি এটা প্রকাশ হয় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দুজন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে অবশ্যই আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব[২]।'

---

(১) অর্থাৎ যদি মুসলিম কোন সাক্ষী রাখা সম্ভবপর না হয়। কারণ, সাধারণতঃ সফর অবস্থায় সবসময় মুসলিমদের সাক্ষী হিসেবে পাওয়া দুস্কর। তাই প্রয়োজনের খাতিরে কাফেরদেরকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। [মুয়াসসার] তবে তাদেরকে সাক্ষী রাখার ক্ষেত্রে কি নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে তা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ বনী সাহ্মের এক লোক তামীম আদ্-দারী এবং আদী ইবনে বাদ্দারের সাথে সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সাহ্মী লোকটি মারা গেল; এমন জায়গায় মারা গেল যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার মীরাস নিয়ে যখন ফিরে আসল, তখন আত্মীয় স্বজনরা সোনা দিয়ে মোড়ানো

১০৮. এ পদ্ধতিই[১] বেশী নিকটতর যে, তারা সাক্ষ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে অথবা তারা (মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীরা) ভয় করবে যে, তাদের (নিকটাত্মীয়দের) শপথের পর (পূর্বোক্ত) শপথ প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং শুন[২]; আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

ذٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَـٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَـٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

পনরতম রুকূ'

১০৯. স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ্ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন?' তারা বলবেন, 'এ

۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾

একটি রুপার পাত্র খুঁজে পেল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাদের দু'জনকে শপথ করালে তারা এ সম্পর্কে কিছু জানে না বলে জবাব দিল। অপরদিকে এ পাত্রটি মক্কায় পাওয়া গেল এবং তারা বলল যে, আমরা তামীম এবং আদীর নিকট থেকে এ পাত্র খরিদ করেছি। অতঃপর সাহ্‌মীর পক্ষ থেকে দু'জন নিকটআত্মীয় দাঁড়িয়ে শপথ করে বলল যে, আমাদের শপথ ঐ দু'জনের শপথের চেয়ে উত্তম। এ পাত্রটি আমাদের লোকের। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।' [বুখারীঃ ২৭৮০, আবু দাউদঃ ৩৬০৬, তিরমিযীঃ ৩০৬০]

(১) অর্থাৎ সন্দেহের সময় সাক্ষীদেরকে সালাতের পরে শপথ করানো এবং তাদের মধ্যে শপথ ভঙ্গের সম্ভাবনা প্রাপ্ত হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করাটা হচ্ছে সঠিকভাবে সাক্ষ্য উপস্থাপনে লোকদের বাধ্য করার সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি। হয় তারা আখেরাতের শাস্তির ভয়ে সঠিক সাক্ষ্য দিবে, না হয় দুনিয়ায় মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের পাল্টা শপথের মাধ্যমে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রহণযোগ্যতা প্রকাশিত হওয়ার মত অপমানের ভয়ে তারা সঠিক সাক্ষ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ হবে। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করো না। তোমাদের মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে কোন হারাম সম্পদ কুক্ষিগত করো না। আর তোমাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তা ভালভাবে শোন এবং সেটা অনুযায়ী আমল কর। [মুয়াসসার]

বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই; আপনিইতো গায়েব সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন[১]।'

(১) অর্থাৎ কেয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সব নবী-রাসূলকে হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন"। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্ব প্রথম প্রশ্ন নবী-রাসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। নবী-রাসূলগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই, আপনারা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সত্য দ্বীনের দিকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তারা আপনাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? তারা আপনাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল। এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলবেনঃ "তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী"। ইমাম তাবারী বলেন, তারা আদব রক্ষার্থে বলবেন যে, আপনি ভাল জানেন। অথবা, তারা সেদিনের কঠিন অবস্থা বিবেচনায় জওয়াব দেয়ার চেয়ে আল্লাহ্‌র উপরই তার জওয়াবের ভার ছেড়ে দিবেন। অথবা তারা এটা এজন্যে বলবেন যে, বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। নবীদের দাওয়াতে কে কেমন সাড়া দিয়েছিল তা আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে কেউ ভাল জানে না। [ইবন কাসীর]

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাষের কাঠগড়ায় আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রাসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাষের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন্ (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িতে সে কোন্ (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইলম অনুযায়ী সে কি আমল করেছে? [তিরমিযীঃ ২৪১৭]

১১০. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে মার্ইয়ামের পুত্র 'ঈসা! আপনার প্রতি ও আপনার জননীর প্রতি আমার নেয়ামত[১] স্মরণ করুন, যখন 'রুহুল কুদুস'[২] দিয়ে আমি আপনাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং আপনি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতেন; আপনাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; আপনি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মত আকৃতি গঠন করতেন এবং তাতে ফুঁ দিতেন, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যেত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীদেরকে আপনি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতেন এবং আমার অনুমতিক্রমে আপনি মৃতকে জীবিত করতেন; আর যখন আমি আপনার থেকে ইস্রাঈল-সন্তানগণকে বিরত রেখেছিলাম[৩];

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের ঐসব অনুগ্রহের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে মু'জিযার আকার দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী-ইস্রাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'আল্লাহ্' কিংবা 'আল্লাহ্র পুত্র' আখ্যা দেয়। [আইসারুত তাফাসীর]

(২) রুহুল কুদুস অর্থ, পবিত্র আত্মা। এর দ্বারা জীবরিল আলাইহিস সালামকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহয় এ অর্থেই 'রুহুল কুদুস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। [যেমন, সুরা বাকারাহ:৮৭, ২৫৩; সূরা মায়েদাহ: ১১০; সূরা আন-নাহল: ১০২]

(৩) অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আমি তাদের হাত থেকে আপনাকে হেফাযত করে আপনাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। অথচ আপনি তাদের কাছে প্রকাশ্য মু'জিযা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। [মুয়াসসার]

আপনি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলেন তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল, 'এটাতো স্পষ্ট জাদু।'

১১১. আরো স্মরণ করুন, যখন আমি হাওয়ারীদের মনে ইলহাম করেছিলাম যে[১], 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন', তারা বলেছিল, 'আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।'

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

১১২. স্মরণ করুন, যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, 'হে মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা! আপনার রব কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাতে সক্ষম?' তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হও[২]।'

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তারা বলেছিল, 'আমরা চাই যে, তা

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا

---

(১) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হাওয়ারী দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিয়েছিলেন, ফলে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছিল। এখানে ওহী শব্দ ব্যবহার হলেও এর অর্থ হচ্ছে, মনে ইলহাম করা বা ঢেলে দেয়া। [মুয়াসসার]

(২) যখন হাওয়ারীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের কাছে আকাশ থেকে পাত্রপূর্ণ খাদ্য অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের আব্দার করে আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে চলার ব্যাপারে চেষ্টা চালানো। তবে হাওয়ারীগণ এ সন্দেহ থেকে মুক্ত থেকে বললেন যে, তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা, তাদের ও তাদের পরবর্তীদের জন্য এটি নিদর্শন হিসেবে কাজ করা এবং ঈমান বর্ধিত করা। [ইবন কাসীর]

وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

থেকে কিছু খাব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানব যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা এর সাক্ষী থাকতে চাই।'

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসা বললেন, 'হে আল্লাহ্ আমাদের রব! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠান; এটা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং আপনার কাছ থেকে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান করুন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।'

قَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْٓ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তা নাযিল করব; কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি সৃষ্টিকুলের আর কাউকেও দেব না[১]।'

---

(১) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নেয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক। এক হাদীসে এসেছে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললঃ আপনি আপনার রবের নিকট দো'আ করুন যেন তিনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দেন, এরপর আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি তা করবে? জবাবে তারা বললঃ হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলে জীব্রাঈল এসে বললেনঃ আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেনঃ যদি আপনি চান তবে তাদের জন্য তিনি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করবেন। কিন্তু এরপর তাদের মধ্যে যদি কেউ কুফরী করে তাহলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি পৃথিবীর কাউকে কোনদিন দিব না, আর যদি আপনি চান তবে তাদের জন্য আমি তাওবাহ্ এবং রহমতের দরজা খুলে দেব।

ষোলতম রুকূ'

১১৬. আরও স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যখন বলবেন, 'হে মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা! আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে আমার জননীকে দুই ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর?' তিনি বলবেন, 'আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি তো তা জানতেন। আমার অন্তরের কথাতো আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন।'

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

১১৭. 'আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি, তা এই যেঃ তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন(১) তখন আপনিই

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ বরং আমি চাই তাওবাহ্ এবং রহমতের দরজা।' [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪২, ২১৬৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৫৩]

(১) এ বাক্যটিকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ কথোপকথন কেয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তার সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। আয়াতের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, আপনি যখন যমীনের বুকে আমার মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং আমাকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিলেন,

তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী[১] ।'

১১৮. 'আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা[২], আর যদি

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ

তখন আপনিই কেবল তাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত । আর আপনি সবকিছুর সাক্ষী । আসমান ও যমীনে কোন কিছু আপনার কাছে গোপন নেই । [মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে এবং এর পরবর্তী আয়াতসমূহ বিশেষ করে সূরার শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে বনী-ইস্‌রাঈলের শেষ নবী ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে আলোচনা ও তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে । হাশরে তাকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে । এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী-ইস্‌রাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা । এ ময়দানে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে প্রশ্ন করা হবে যে, আপনার উম্মত আপনাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে । ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুওয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে সাফাই পেশ করবেন । একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি । প্রথমে বলবেনঃ "আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই"? স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সাক্ষী করে বলবেনঃ "যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত । কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত । কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-গুয়ূব' যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী" । এ দীর্ঘ ভূমিকার পর ঈসা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং বলবেনঃ "আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার তোমাদের সকলের পালনকর্তা । এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল । আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সম্যক সাক্ষী" । [সা'দী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং কিছুসংখ্যক লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । তখন আমি বলবঃ আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবেঃ আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কি সব নতুন পদ্ধতির

তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়(১) ।’	أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

প্রচলন করেছে। তখন আমি বলবঃ যেমন নেক বান্দা বলেছেন, “এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [বুখারীঃ ৪৬২৬]

(১) অর্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। আর যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। তাদের শাস্তির ব্যাপারে আপনার ক্ষমতাই চূড়ান্ত। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। যাতে নাসারাদেরকে সৃষ্টিকুলের সামনে কঠোরভাবে ধমকি দেয়া উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর] এর বিপরীতে ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে দো‘আ করে বলেছিলেনঃ “হে রব, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, আপনি স্বীয় রহমতে (তাওবাহ্ ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তিদান করে অতীত গোনাহ্) ক্ষমা করতে পারেন”। হাদীসে এসেছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এ আয়াতখানি পাঠ করে হাত উঠালেন এবং দো‘আ করে বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! এবং কাঁদতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা জিব্‌রাঈলকে বললেনঃ মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর -যদিও তিনি সর্ববিষয়ে ভাল জানেন- কেন তিনি কাঁদছেন? জিব্‌রাঈল তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আর রাসূলও তার উত্তর করলেন। তখন আল্লাহ্ আবার বললেনঃ হে জিব্‌রাঈল, মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে বল, আমরা আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব; অসন্তুষ্ট করব না। [মুসলিমঃ ২০২] হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার কিছু উম্মতকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আমি তখন ‘আমার সাথী’ বলতে থাকব, তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, তারা আপনার পরে দ্বীনের মধ্যে নতুন কি কি পন্থা উদ্ভাবন করেছিল। আমি তখন সেই নেক বান্দার মত বলব, যিনি বলেছিলেন, ‘আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারাতো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ [বুখারী: ৪৬২৫; মুসলিম: ৩০২৩]

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾

১১৯. আল্লাহ্ বলবেন, ‘এ সে দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যের জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট[১]; এটা মহাসফলতা[২]।’

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. আস্‌মান ও যমীন এবং এদুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

---

(১) আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। [বুখারী: ৬৫৪৯; মুসলিম: ১৮৩]

(২) এটিই মহান সফলতা। স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে এর জন্যই বলছেন যে, “এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা” [সূরা আস-সাফফাত: ৬১] আরও বলেন, “আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক” [আল-মুতাফফিফীন: ২৬]

৬- সূরা আল আন্‌'আম

سُورَةُ الأَنْعَامِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১৬৫ ।

নামকরণঃ এ সূরারই ১৩৬, ১৩৯ ও ১৪২ নং আয়াতসমূহে উল্লেখিত "আল-আন'আম" শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে । আল-আন'আম শব্দের অর্থঃ গবাদি পশু ।

সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ

এ সূরা মক্কী সূরা বলেই প্রসিদ্ধ । কুরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে এটাই প্রথম মক্কী সূরা । এ সূরার মৌলিক আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত । মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মুজাহিদ, কালবী, কাতাদাহ প্রমূখও প্রায় এ কথাই বলেন । আবু ইসহাক ইসফিরায়িনী বলেন, এ সূরাটিতে তাওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে । [কুরতুবী, আত-তাফসীরুল মুনীর]

সূরার ফযিলত:

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ সূরা আল-আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত বাদে গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় নাযিল হয়েছে । জাবের, ইবন আব্বাস, আনাস ও ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা আল-আন'আম নাযিল হচ্ছিল, তখন এত ফিরিশ্‌তা তার সাথে অবতরণ করেছিলেন যে, তাতে আকাশের প্রান্তদেশ ছেয়ে যায় । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৭০; ২৪৩১]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সূরা আল-আন'আম কুরআনের উৎকৃষ্ট অংশের অন্তর্গত । [সুনান দারমী ২/৫৪৫; ৩৪০১]

।। রহ্‌মান, রহীম, আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই[১] যিনি

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

(১) এ সূরাটিকে ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে । এতে খবর দেয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেয়া । যেন বলা হচ্ছে, হে মানুষ! তোমরা তাঁর জন্যই যাবতীয় হামদ ও শোকর নির্দিষ্ট কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আরও সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন । তাঁর সাথে কাউকেও সামান্যতম অংশীদারও করবে না । এ বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ হাম্‌দ বা প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, যার কোন শরীক নেই । তাকে ব্যতীত আর যে সমস্ত উপাস্যের ইবাদাত করা হয়, তারা এ হামদ প্রাপ্য নয় । [তাবারী] সুতরাং কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয় । এ বাক্যের পর আসমান ও যমীন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার

وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۥ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো(১)। এরপরও কাফেরগণ তাদের রব-এর সমকক্ষ দাঁড় করায়(২)।

প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞবান, তিনিই হাম্‌দ বা প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন। কাতাদা বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানকে যমীনের পূর্বে, অন্ধকারকে আলোর পূর্বে এবং জান্নাতকে জাহান্নামের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে سماوات শব্দটিকে বহুবচনে এবং أرض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমানের ন্যায় যমীনও সাতটি। [যেমন, সূরা আত-তালাক: ১২] এমনিভাবে ظلمات শব্দটিকে বহুবচনে এবং نور শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نور বলে বিশুদ্ধ সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظلمات বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য। তাছাড়া نور বা আলো ظلمات বা অন্ধকার থেকে উত্তম [বাহরে মুহীত; ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুশিয়ার করা যারা মূলতঃ একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে। অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন - ইয়ায্‌দান ও আহ্‌রামান। তারা ইয়ায্‌দানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহ্‌রামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দু'টিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে। এমনিভাবে নাসারারা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে 'ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর মাতা মার'ইয়াম 'আলাইহাস্ সালাম-কে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক' এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরকেও তাদের উপাস্য বানিয়েছে। [আল-মানার] মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ্ তা'আলা 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হল, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা এমনকি পোকা-মাকড়কেও সিজ্‌দার যোগ্য উপাস্য, রুযীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল। কুরআনুল কারীমের আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্ তা'আলাকে যমীন ও আসমানের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা, অন্ধকার ও আলো, আসমান ও যমীন এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট। অতএব, এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার করা যায়? যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি যারা সৃষ্টি করতে পারে না তাদের মত? সুতরাং কিভাবে ইবাদাতে ও সম্মানে তাঁর সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করানো যায়? [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]।

هُوَالَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ۗ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝

২. তিনিই তোমাদেরকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন[১], তারপর একটা সময় নির্দিষ্ট করেছেন এবং আর একটি নির্ধারিত সময় আছে যা তিনিই জানেন, এরপরও তোমরা সন্দেহ কর[২]।

---

(১) প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগত অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎবিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। আল্লাহ্ বলেনঃ “আল্লাহ্ই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন।” আল্লাহ্ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস্ সালাম-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। [ইবন কাসীর] সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার, চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা আদমকে এমন এক মুষ্টি মাটি থেকে তৈরী করেছেন যে মুষ্টি সমস্ত মাটি থেকে নেয়া হয়েছে। তাই আদম সন্তান মাটির মতই হয়েছে। তাদের মধ্যে লাল, সাদা, কালো, আবার এর মাঝামাঝি রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ নম্র, কেউ চিন্তাগ্রস্ত, কেউ মন্দ, কেউ ভাল, কেউ এর মাঝামাঝি পর্যায়ের রয়েছে।’ [আবুদাউদ: ৪৬৯৩]

(২) পূর্বে আদমসন্তানদের সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এর পরিণতির দু’টি মঞ্জিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টিজগত- সবার সামষ্টিক পরিণতি, যাকে কেয়ামত বলা হয়। প্রথমটির ব্যাপারে বলেছেন, ﴿ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا﴾ অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা‘আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুস্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও এর প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষ অবগত। কেননা, সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশের আদম-সন্তানদেরকে মারা যেতে দেখে। এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কেয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “আরো একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র তাঁর কাছেই” অর্থাৎ আল্লাহ্ই জানেন, এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফিরিশ্তাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগত অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহ্‌র

৩. আর আস্‌মানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ্[১], তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন[২]।

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ۚ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝

৪. আর তাদের রব-এর আয়াতসমূহের এমন কোন আয়াত তাদের কাছে উপস্থিত হয় না যা থেকে তারা মুখ না

وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। এটা যেহেতু সত্য, সেহেতু এরপরও আরেকটি সময় তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যার ঘোষণা আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে না। [ইবন কাসীর, সা‘দী, আল-মুনীর, ফাতহুল কাদীর, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এ কারণে আয়াতের শেষভাগে কিয়ামতের উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ﴿ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ﴾ অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর! এটা অনুচিত।

(১) এ আয়াতের অনুবাদে কোন প্রকার ভুল বুঝার অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপরই রয়েছেন। আসমান ও যমীনের সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান ও ক্ষমতা রয়েছে। তিনি সর্বত্রই মা‘বুদ। আয়াতের এক অর্থ এটাই। কোন কোন মুফাসসির অর্থ করেছেন, তিনিই আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীনের যত গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এখানে আসমান বলে ঊর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে। সেটা আরশও হতে পারে। সুতরাং আয়াতের অনুবাদ হবে, তিনিই আল্লাহ্ যিনি আসমানে তথা আরশের উপর রয়েছেন, সেখানে থাকলেও যমীনের যত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াদি রয়েছে সব কিছু জানেন। [তাবারী, বাগভী, কুরতুবী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে প্রথম দু’আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলাই এমন এক সত্তা, যিনি আসমান ও যমীনে ‘ইবাদাত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করো না। তিনি যেহেতু তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন সুতরাং তাঁর নাফরমানী করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করো এবং এমন কাজ করবে, যা তোমাদেরকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করবে, তাঁর রহমতের অধিকারী করবে। এমন কোন কাজ করো না, যাতে তার নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাও। [সা‘দী]

ফেরায়[১]।

৫. সুতরাং সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে তারা তো তাতে মিথ্যারোপ করেছে[২]। অতএব যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তার যথার্থ সংবাদ অচিরেই তাদের কাছে

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَٰٓؤُا مَا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

(১) এ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী থাকার পাশাপাশি নবী-রাসূলগণ তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছেন এবং তা তাদের কাছে স্পষ্টও হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াতের জন্য যে কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হলে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়- এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হল, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্য'র অর্থ কুরআন হতে পারে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও হতে পারে। [তাবারী, কুরতুবী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] কেননা, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তার শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা এ কথা পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষা লাভ করেননি। এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মি বা নিরক্ষর উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পন্ন বাণীসমূহের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের যাবতীয় জ্ঞানী-গুণীদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি আল্লাহ্‌র কালাম কুরআনের মোকাবেলা করার জন্য আরবের স্বনামখ্যাত, প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জান-মাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সামর্থ্য তাদের কারো হল না। এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে হাজারো মু'জিযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল।

পৌঁছবে[১]।

৬. তারা কি দেখে না[২] যে, আমরা তাদের আগে বহু প্রজন্মকে[৩] বিনাশ করেছি;

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ

(১) আয়াতের শেষে কাফেরদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আজ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযা, তার আনীত হেদায়াত, কেয়ামত ও আখেরাত সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে আর যদি তা না করা হয় তবে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তা দলীল-প্রমাণসহ তাদের সামনে উপস্থিত হবে। এত সাবধানবাণীর পরও কাফেররা তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে নি। তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসেনি। শেষপর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। বদরের দিন তিনি তাদের উপর তরবারীর মাধ্যমে সে ফয়সালা করে দেন। [তাবারী]
তাছাড়া তাদের বিচারের আরেক ব্যবস্থা রয়েছেই। তা কেয়ামতদিবসে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে প্রত্যেককে তার ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও অস্বীকার করলেও কোন উপকার বা ক্ষতি হবে না। কেননা, সেটা কর্মজগত নয়-প্রতিদান দিবস। আল্লাহ্ তা'আলা এখনো চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ সাধিত হবে। যদি তা না করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যারোপকারীদের বলবেন, "এটাই সে আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।" [সূরা আত-তূর:১৪] কিয়ামতের দিন কাফেরদের সামনে কিভাবে এ সত্যকে উপস্থাপন করা হবে তার বর্ণনায় আল্লাহ্ আরও বলেন, "আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না । কেন নয়? তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই এটা জানে না-- তিনি পুনরুত্থিত করবেন যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এবং যাতে কাফিররা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী" [সূরা আন-নাহল:৩৮, ৩৯] [সা'দী]

(২) আলোচ্য প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। [আল-মানার]

(৩) এ আয়াতে কাফেরদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "আমরা তাদের পূর্বে অনেক 'করণ' (প্রজন্ম)কে ধ্বংস করে দিয়েছি।" [সা'দী] قرن শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘ কাল।

فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

তাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; তারপর তাদের পাপের জন্য তাদেরকে বিনাশ করেছি(১) এবং তাদের পর অন্য প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি(২)।

দশ বছর থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। [বাগভী, কুরতুবী] কিন্তু قرن শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুছরকে বলেছিলেনঃ 'সে এক 'করণ' পর্যন্ত জীবিত থাকবে'। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ' পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮৯]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা আল্লাহ্র বিধান ও নবীগণের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। [তাবারী, ইবন কাসীর] এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তাদেরকে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহ্র নিদর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার। [ইবন কাসীর, আইসারুত তাফাসীর, মুয়াসসার]

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায় নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মক্কাবাসীদের উচিত ভয় করা। [কুরতুবী, ইবন কাসীর]

وَلَوۡ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ كِتٰبًا فِىۡ قِرۡطَاسٍ فَلَمَسُوۡهُ بِاَيۡدِيۡهِمۡ لَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ ۝

৭. আমরা যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম, অতঃপর তারা যদি সেটা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবুও কাফেররা বলত, 'এটা স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়[১]।'

وَقَالُوۡا لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ عَلَيۡهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوۡ اَنۡزَلۡنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الۡاَمۡرُ ثُمَّ لَا يُنۡظَرُوۡنَ ۝

৮. আর তারা বলে, 'তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল হয় না[২]?' আর যদি আমরা ফিরিশ্‌তা নাযিল করতাম, তাহলে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, তারপর তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হত না[৩]।

---

(১) এ আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের কাছে যদি কাগজে লিখা কিতাবও নাযিল করা হয় তবুও তারা ঈমান আনবে না। তেমনিভাবে অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষন তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে যা আমরা পাঠ করব' [সূরা আল-ইসরা: ৯৩] এমনকি যদি সত্যি সত্যিই তাদেরকে এ কিতাব দেয়া হতো আর তারা সেটাকে হাত দ্বারা স্পর্শও করত, তারপরও তারা ঈমান আনবার ছিল না। বরং তারা সেটাকে জাদু বলত। আল্লাহ্ বলেন, 'যদি আমরা তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই তারপর তারা তাতে আরোহন করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।' [সূরা আল-হিজর: ১৫]

(২) এখানে এটা ভাবার অবকাশ নেই যে, কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ফিরিশতা নাযিল হয় না এমনটি অস্বীকার করত। তারা স্পষ্টই জানত যে, রাসূলের কাছে ফিরিশতাই ওহী নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের কাছে তা জানাতেন। এখানে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলের সাথে কেন অপর একজন ফিরিশতা সতর্ককারী হিসেবে সার্বক্ষনিক থাকে না। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আরও তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল' যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?" [সূরা আল-ফুরকান: ৭] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ যদি ফিরিশতা নাযিল করা হতো তবে তারা তাদের অবাধ্যতা ও কুফরী দেখে তাদেরকে কোনরূপ সুযোগ না দিয়ে ধ্বংস করে দিতেন। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, 'আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রেরণ করি না; ফিরিশ্‌তারা উপস্থিত হলে তখন তারা আর অবকাশ পাবে না' [সূরা আল-হিজর:৮] আরও বলেন,

৯. আর যদি তাকে ফিরিশ্‌তা করতাম তবে তাঁকে পুরুষমানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম, আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে[১]।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑨

১০. আর আপনার আগে অনেক রাসূলকে নিয়েই তো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। ফলে রাসূলদের সাথে বিদ্রূপকারীদেরকে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তা-ই পরিবেষ্টন করেছে[২]।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

‘যেদিন তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, ‘রক্ষা কর, রক্ষা কর।’ [সূরা আল-ফুরকান:২২] [আদওয়াউল বায়ান]

(১) অর্থাৎ এ গাফেলরা এসব দাবী-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, মানুষদের থেকে রাসূল পাঠানো আল্লাহ্‌র এক বিরাট রহমত। যাতে একে অপরকে বুঝতে পারে, হেদায়াত নেয়া উম্মতের জন্য সহজ হয়। প্রশ্ন করা ও উত্তর নেয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছেঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব নবীকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারাননি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কি না তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না। আপনার পূর্বেও নবী-রাসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন নূহ আলাইহিস সালামকে তারা বলেছিল, ‘নবী হওয়ার পরে সুতার হয়ে গেলে’। হূদ আলাইহিস সালামকে বলেছিল, ‘আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে’ [সূরা হূদ:৫৪] সালেহ আলাইহিস সালামকে বলেছিল, ‘হে সালিহ্‌! তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এস, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।’ [সূরা আল-আ'রাফ:৭৭] লূত আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তারা বলেছিল, ‘লূত-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. বলুন, 'তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর, তারপর দেখ, যারা মিথ্যারোপ করেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল(১)!'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

১২. বলুন, 'আস্‌মানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা কার?' বলুন, 'আল্লাহ্‌রই'(২), তিনি তাঁর নিজের উপর দয়া করা লিখে নিয়েছেন(৩)। কিয়ামতের দিন

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ

তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।' [সূরা আন-নামল:৫৬] অনুরূপভাবে শু'আইব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছিল 'হে শু'আইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও' [সূরা হূদ:৯১] তাছাড়া তারা নবীর সালাত নিয়েও ঠাট্টা করে বলত, 'হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার 'ইবাদাত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও ? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, বুদ্ধিমান।' [সূরা হূদ:৮৭]। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) কাতাদা বলেন, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে পাকড়াও করে ধ্বংস করেছেন তারপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে পৌঁছে দিয়েছেন। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ্‌ নিজেই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেনঃ সবার মালিক আল্লাহ্‌। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শির্ক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই মানতো। অর্থাৎ তারা তাওহীদুর রবুবিয়াতের এ অংশে বিশ্বাসী ছিল। আর তারা যেহেতু তাওহীদের এ অংশে বিশ্বাস করছে, তাদের উচিত হবে তাওহীদের বাকী অংশ তাওহীদুল উলুহিয়ার স্বীকৃতি দেয়া এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করা। [সা'দী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) সহীহ্‌ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছেঃ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে'। [বুখারী: ৭৪০৪; মুসলিম: ২৭৫১]

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন[১], এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না[২]।

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

১৩. আর রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত হয়, তা তাঁরই[৩] এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

১৪. বলুন, 'আমি কি আস্‌মানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব[৪]? তিনিই খাবার দান করেন কিন্তু তাঁকে খাবার দেয়া

(১) এ বাক্যে إلى শব্দটি في অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বের ও পরের সব মানুষকে কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্রিত করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্রিত করতে থাকবেন এবং কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন আর তোমাদেরকে তোমাদের কর্মকাণ্ডের শাস্তি প্রদান করবেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাত ও কিয়ামতের বাস্তবতার উপর অনেক দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যাতে তা বাস্তব সত্যরূপে মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তারা অস্বীকার ছাড়া কিছুই করেনি। তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে, ফলে তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিপতিত হয়েছে এবং কুফরী করার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে। এতে করে তারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই বরবাদ করেছে। [সা'দী]

(৩) এখানে سُكُون অর্থ اِستَقَرَّ অবস্থান করা; অর্থাৎ পৃথিবীর দিবা-রাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই আল্লাহ্‌র [তাবারী] অথবা এর অর্থ سُكُون و حَرْكَت এর সমষ্টি। অর্থাৎ مَا سَكَنَ ومَا تَحَرَّكَ (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু سُكُون উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত حَرْكَتْ আপনা-আপনিই বুঝা যায়। অথবা سَكَنَ অর্থ যাবতীয় সৃষ্টি। অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির মালিকানা আল্লাহ্‌রই। [কুরতুবী]

(৪) সুদ্দী বলেন, এখানে ওলীরূপে গ্রহণ করার অর্থ, যাকে অভিভাবক মানা হয় এবং যার রবুবিয়াত এর স্বীকৃতি দেয়া হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

হয় না[১]। বলুন, 'নিশ্চয় আমি আদেশ পেয়েছি যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে যেন আমি প্রথম ব্যক্তি হই[২], আর (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে) 'আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'

১৫. বলুন, 'আমি যদি আমার রব-এর অবাধ্যতা করি, তবে নিশ্চয় আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির[৩]।'

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকুলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তিনি পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন রিযিকের প্রয়োজন পড়ে না। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা বলেছেন, 'আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। আমি তাদের কাছ থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই তো রিয্‌কদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী। [সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬-৫৮] [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ যে উম্মতের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি সে উম্মতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রথম ব্যক্তি হই। এর অর্থ এ নয় যে, সমস্ত জাতির মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হবেন। কারণ, কুরআনের বহু আয়াতে এটা এসেছে যে, তার পূর্বেও নবীগণ ইসলামের উপর ছিলেন এবং অনেক উম্মতও ইসলামের উপর গত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, "স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ করুন', তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম'।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৩১]। আর ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, "আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" [সূরা ইউসুফ: ১০১] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) আয়াতে নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারো কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীগণের যিনি নেতা, তাকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যদি কেউ আল্লাহ্র অবাধ্য হয় আর সে অবাধ্যতা হয় শির্ক বা কুফরীর মাধ্যমে তাহলে তার রক্ষা নেই। সে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্র ক্রোধে ও জাহান্নামে অবস্থান করবে। [সা'দী]

১৬. ‘সেদিন যার থেকে তা সরিয়ে নেয়া হবে, তার প্রতি তো তিনি দয়া করলেন[১] এবং এটাই স্পষ্ট সফলতা[২] ।’

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

১৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই । আর যদি তিনি আপনাকে কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান[৩] ।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

---

(১) বলা হয়েছে, হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে । কাতাদা বলেন, এখানে যা সরানোর কথা বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে শাস্তি । কারো উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ্র অশেষ করুণা হয়েছে । [তাফসীর আবদির রাযযাক]

(২) অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা । [কুরতুবী] এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ । কারণ, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।

(৩) এ আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে । অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা‘আলা । সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারো সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না । আল্লাহ্ যদি কারও লাভ করতে চান তবে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “আর আল্লাহ্ যদি আপনার মংগল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই । তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার কাছে সেটা পৌঁছান ।”[সূরা ইউনুসঃ ১০৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বাগভী আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, ‘একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন । কিছু দূর যাওয়ার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ ‘হে বৎস’! আমি আরয করলামঃ আদেশ করুন, আমি হাযির আছি । তিনি বললেনঃ ‘তুমি আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে হেফাযত করবে, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাযত করবেন । তুমি আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে হেফাযত করো তাহলে আল্লাহকে সাহায্যের সাথে তোমার সামনে পাবে । তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন । কোন কিছু চাইতে হলে তুমি আল্লাহ্র কাছেই চাও এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্র কাছেই চাও । জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে । সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে তোমার কোন উপকার করতে চাইলে যা তোমার তাকদিরে লিখা নেই তারা কখনো তা করতে পারবে না । পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোন ক্ষতি

১৮. আর তিনিই আপন বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী[১], আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

১৯. বলুন, ‘কোন্ জিনিস সবচেয়ে বড় সাক্ষী’? বলুন, ‘আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতা[২]। আর এ কুরআন আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এ দ্বারা

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনোই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আমল করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, তুমি যা অপছন্দ করো তার বিপক্ষে ধৈর্য ধারণ করায় অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত- কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত’। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩০৭]

পরিতাপের বিষয়, কুরআনুল কারীমের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলিমরা এ ব্যাপারে পথ ভ্রান্ত। তারা আল্লাহ্ তা‘আলার সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলিমের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্ তা‘আলাকে স্মরণ করে না এবং তারা তাঁর কাছে দো‘আ করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। কোন সৃষ্ট জীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলিমদেরকে সরল পথে কায়েম রাখুন।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহোত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না; তিনি নৈকট্যশীল রাসূলই হোন কিংবা রাজা বাদশাহ। আর তিনি যা আদেশ, নিষেধ, সাওয়াব, শাস্তি, সৃষ্টি বা নির্ধারণ যাই করেন তাই প্রজ্ঞাময়। তিনি গোপন যাবতীয় কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ সবকিছুই তাঁর তাওহীদের প্রমাণ। [সা‘দী]

(২) অর্থাৎ কোন্ জিনিসের সাক্ষ্য সাক্ষী হিসেবে বড় বলে বিবেচিত? বলুন, আল্লাহ্। তিনিই সবচেয়ে বড় সাক্ষী। তাঁর সাক্ষ্যের মধ্যে কোন প্রকার ভুল-ক্রটির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তিনিই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য যে, আমি রাসূল। [তাবারী, সা‘দী]

সতর্ক করতে পারি[১]। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌ও আছে? বলুন, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'। বলুন, 'তিনি তো একমাত্র প্রকৃত ইলাহ্ এবং তোমরা যা শরীক কর তা থেকে আমি অবশ্যই বিমুক্ত।'

২০. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে[২] সেরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাদের সন্তানদেরকে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারাই ঈমান আনবে না[৩]।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمُ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্যই ভীতিপ্রদর্শনকারী যার কাছে এ কুরআনের আহ্বান পৌঁছেছে, সে যে-ই হোক না কেন। সুতরাং যার কাছেই এ আহ্বান পৌঁছবে সে তাতে ঈমান আনতে বাধ্য। যদি তা না করে তবে সে হবে জাহান্নামী। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত যে সর্বকাল ও সর্বজনব্যাপী তার প্রমাণ কুরআনের অন্য আয়াতেও এসেছে, "বলুন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৮] আরও এসেছে, "আর আমরা তো আপনাকে কেবল সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি" [সূরা সাবা:২৮] আরও এসেছে, "কত বরকতময় তিনি ! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিকুলের জন্য সতর্ককারী হতে" [সূরা আল-ফুরকান:১]। আর যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনবে না, তাদের শাস্তি যে জাহান্নাম এ কথাও কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "অন্যান্য দলের যারা তাতে কুফরী করে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান" [সূরা হূদ:১৭] [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এর অর্থ, যাদের উপর কিতাব নাযিল করেছি তারা ভালভাবেই জানে যে, ইলাহ মাত্র একজনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য নবী ও রাসূল। [তাবারী] অনুরূপভাবে তারা এটাও ভাল করে জানে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালত, নবুওয়াত ও ওহীসহ যা নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যারা তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ঈমান ও তাওহীদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত থেকে মাহরূম হয়েছে, তারা যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। [সা'দী]

তৃতীয় রুকূ'

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে বা তাঁর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় যালিমরা সাফল্য লাভ করতে পারে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

২২. আর স্মরণ করুন, যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করব, তারপর যারা শির্ক করেছে তাদেরকে বলব, 'যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়[১]?'

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. তারপর তাদের এ ছাড়া বলার অন্য কোন অজুহাত থাকবে না, 'আমাদের রব আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না[২]।'

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

---

(১) এখানে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে ঐ দিনটিও স্মরণ যোগ্য, যেদিন আমরা সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। অতঃপর আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন? হাশরের মাঠে একত্রিত সবাই তখন তারা সে সব উপাস্যদের থেকে নিজদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করবে এবং বলবে, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না। এভাবে তারা বাতিল ও মিথ্যা কথা বলবে এবং ওযর-আপত্তি পেশ করতে চেষ্টা করবে। [তাবারী, কুরতুবী, মুয়াসসার, আইসারুত তাফাসীর]

(২) এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তাদের পরীক্ষায় তারা উপরোক্ত উত্তর দিবে। এ অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে। আবার শব্দটির অন্য অর্থ হতে পারে, তাদের ফিতনার শাস্তি। তখন ফিতনা অর্থ কুফর ও শির্ক। অর্থাৎ তাদের কুফর ও শির্কের শাস্তি তাই হবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা বলেন, এখানে ফিতনা বলে তাদের ওযর আপত্তি পেশ করাকে বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] তাছাড়া ফিতনা শব্দটি কারো প্রতি আসক্ত হয়ে

পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল। [বাগভী]

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কেয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল 'আলামীন-এর শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল 'আলামীন-এর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলবে! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহ্‌র মহান সত্তার কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ এর উত্তরে বলেনঃ তাদের এ উক্তি বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য এ শক্তিও দিয়েছেন যে, তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক- যাতে কুফর ও শির্কের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পটু, এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কুরআনুল কারীমের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিররা হাশরের মাঠে "আল্লাহ্‌র সাথে শপথ করে মিথ্যা বলবে, যেমন আজ মুসলিমদের সামনে মিথ্যা শপথ করে থাকে" [দেখুন, সূরা আল-মুজাদালাহ: ১৮] সুতরাং বোঝা গেল যে, তারা স্বয়ং রাব্বুল 'আলামীন-এর সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না। হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শির্ক ও কুফরী অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্ত-পদকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ -এরা সবাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছেঃ "আমি আজ এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের"। [ইয়াসীনঃ ৬৫] এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপনে ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ অর্থাৎ "আর তারা আল্লাহ্ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না"। [সূরা আন্-নিসাঃ ৪২] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথমে তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা শপথ করবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্ত-পদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না। মহা বিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ

মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনো তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার মিথ্যার আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দেবেন। ফলে তারা কোন কিছুই গোপন করতে সমর্থ হবে না। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

মৃত্যুর পর কবরে মুনকীর-নকীর ফিরিশ্তাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘মুনকীর-নকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ অর্থাৎ তোমার রব কে, তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? কাফের বলবেঃ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي অর্থাৎ হায়! হায়!! আমি কিছুই জানি না! এর বিপরীতে মুমিন বলবে, আমার রব আল্লাহ্, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদ। [আবু দাউদ: ৪৭৫৩] এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফেরও মু'মিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারতো। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফিরিশ্তা। তারা অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হলে ফিরিশ্তা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করতো, ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাথে হাশরের মাঠের সাক্ষাতে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? তোমাকে নেতা বানাইনি? তোমাকে বিয়ে-শাদী দেইনি? তোমার জন্য ঘোড়া উট করায়ত্ব করে দেইনি? তোমাকে নেতৃত্ব দিতে ও আরামে ঘুরতে ফিরতে দেইনি। তখন সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি বিশ্বাস করতে যে, আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? সে বলবে, না। তখন তিনি বলবেন, আজ আমি তোমাকে ছেড়ে যাব যেমন তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে অনুরূপ করবেন, সেও তা বলবে আর আল্লাহ্ তা'আলাও তদ্রূপ উত্তর করবেন। তারপর তৃতীয় ব্যক্তিকে অনুরূপ বলবেন, সে বলবে, হে রব! আমি আপনার উপর, আপনার কিতাবের উপর ও আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলাম, সালাত ও রোযা আদায় করেছিলাম, দান করেছিলাম এবং যত পারে প্রশংসা করবে। তখন তাকে বলা হবে এখানে তাহলে (অপেক্ষা কর)। তারপর তাকে বলা হবে, এখন তোমার উপর সাক্ষ্য উত্থাপন করা হবে। সে তখন তার মনে চিন্তা করবে, সেটা আবার কে যে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে? তখন তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে, আর তার উরু, মাংস ও অস্থিকে কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হবে, ফলে তার উরু, মাংস ও অস্থি তার আমল সম্পর্কে বলবে ... [মুসলিম: ২৯৬৮]

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে মিথ্যা শির্ককে অস্বীকার

২৪. দেখুন, তারা নিজেদের প্রতি কিরূপ মিথ্যাচার করে এবং যে মিথ্যা তারা রটনা করত তা কিভাবে তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল[১]।

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্টজীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবে বন্টন করে দিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করতো না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরিক ছিল না। [ফাতহুল কাদীর] কিন্তু কসম খাওয়া সত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

(১) এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে; আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যাদেরকে মিছেমিছি শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরীর অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেনঃ মনগড়া তৈরী করা বলতে মুশরিকদের ঐ সব অপব্যাখ্যাকে বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে মনে করত। উদাহরণতঃ তারা বলতো ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস এমন খারাপ অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় করা হয়েছে। কুরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। [ইবনে হাব্বানঃ ৫৭৩৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'যে কাজের দরুন মানুষ জাহান্নামে যাবে, তা কি?' তিনি বললেনঃ 'সে কাজ হচ্ছে

২৫. আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আপনার প্রতি কান পেতে শুনে, কিন্তু আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ করে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে; আর আমরা তাদের কানে বধিরতা তৈরী করেছি[১]। আর যদি সমস্ত আয়াতও তারা প্রত্যক্ষ করে তবুও তারা তাতে ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন আপনার কাছে উপস্থিত হয়, তখন তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'এটাতো আগেকার দিনের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِيٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتّٰىٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. আর তারা অন্যকে এগুলো শুনা থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এগুলো শুনা থেকে দুরে থাকে। আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না[২]।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِنْ يُّهْلِكُونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

মিথ্যা'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৭৬] অনুরূপভাবে, মে'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'এ ব্যক্তি কে?' জিবরাঈল বললেনঃ 'এ হলো মিথ্যাবাদী'। [বুখারীঃ ১৩৮৬; মুসনাদে আহমাদঃ ৫/১৪]

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে কুরাইশদের কথা বলা হচ্ছে, তারাই কান পেতে শুনত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, মুশরিকরা তাদের কান দিয়ে শুনত কিন্তু সেটা তারা বুঝতো না। তারা জন্তু-জানোয়ারদের মতো, যারা কেবল হাঁক-ডাকই শুনতে পায়। তাদেরকে কি বলা হচ্ছে সেটা জানে না। [তাফসীর আবদির রাযযাক]

(২) দাহ্‌হাক, কাতাদাহ্, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা কুরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদেরকে বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে

২৭. আপনি যদি দেখতে পেতেন[১] যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে, ‘হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হত, আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম[২] ।’

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. বরং আগে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আর তাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরৎ পাঠানো হলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾

থাকত। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তিনি তাকে কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস করতেন না। এমতাবস্থায় عنه শব্দের সর্বনামটির অর্থ কুরআনের পরিবর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হবেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৫]

(১) ইসলামের তিনটি মৌলনীতি রয়েছে- (এক) একত্ববাদ (দুই) রেসালাত ও (তিন) আখেরাতে বিশ্বাস। [তাফসীর মানার: ৯/৩৯] অবশিষ্ট সমস্ত বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে আখেরাত ও আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি একটি বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কুরআনুল কারীমের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে আখেরাতের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ সওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(২) এ আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, আখেরাতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্খা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা রব-এর প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। [মুয়াসসার]

হয়েছিল আবার তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী[১]।

২৯. আর তারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমাদেরকে পুনরুত্থিতও করা হবে না[২]।'

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. আর আপনি যদি দেখতে পেতেন, যখন তাদেরকে তাদের রব-এর সম্মুখে দাঁড় করান হবে; তিনি বলবেন, 'এটা কি প্রকৃত সত্য নয়?' তারা বলবে, 'আমাদের রব-এর শপথ! নিশ্চয়ই সত্য'। তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে কুফরী করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।'

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

---

(১) তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা ওয়াদা করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করবো না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারো মিথ্যারোপ করবে। [ইবন কাসীর] আবার এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনো যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্যে বলছে- অন্তরে এখনো তাদের সদিচ্ছা নেই। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে এ কথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না; এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। [ইবন কাসীর] মোট কথাঃ কাফের ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণ রক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরণের কথাবার্তা বলবে। কখনো মিথ্যা কসম খাবে, কখনো দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্খা করবে। এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নেয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। যদি তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দো'আ ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। এ কথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু তার সঠিক সীমা কারো জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে, না সত্তর ঘন্টা হবে, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না। সুতরাং দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জন্য সঠিকভাবে কাজে লাগানো উচিত।

চতুর্থ রুকূ'

৩১. যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে(১), এমনকি হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে(২) তখন তারা বলবে, 'হায়! এটাকে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ।' আর তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। সাবধান, তারা যা বহন করবে তা খুবই নিকৃষ্ট!

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۝

৩২. আর দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; অতএব, তোমরা কি অনুধাবন কর না?

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

৩৩. আমরা অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়;

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ

(১) যে সমস্ত কাফের মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তারা যখন কিয়ামতকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে দেখতে পাবে, আর তাদের খারাপ পরিণতি তাদেরকে ঘিরে ধরবে, তখন তারা নিজেদের দুনিয়ার জীবনকে হেলায় নষ্ট করার জন্য আফসোস করতে থাকবে। আর তারা তখন তাদের পিঠে গোনাহের বোঝা বহন করতে থাকবে। তাদের এ বোঝা কতই না নিকৃষ্ট! [মুয়াসসার] এ আফসোসের কারণ সম্পর্কে এক হাদীসে আরও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জাহান্নামীরা জান্নাতে তাদের জন্য যে স্থান ছিল সেটা দেখতে পাবে এবং সে জন্য হায় আফসোস! বলতে থাকবে।' [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কিয়ামত হঠাৎ করেই হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামত এমনভাবে সংঘটিত হবে যে, দু'জন লোক কোন কাপড় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসারিত করেছে, সেটাকে তারা আবার মোড়ানোর সময় পাবে না। কিয়ামত এমনভাবে হবে যে, একজন তার জলাধার ঠিক করছে কিন্তু সেটা থেকে পানি পান করার সময় পাবে না। কিয়ামত এমনভাবে হবে যে, তোমাদের কেউ তার গ্রাসটি মুখের দিকে নেওয়ার জন্য উঠিয়েছে কিন্তু সে সেটা খেতে সময় পাবে না।' [বুখারী: ৬৫০৬; মুসলিম: ২৯৫৪]

لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

কিন্তু তারা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং যালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে[১]।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আপনার আগেও অনেক রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছিল; কিন্তু তাদের উপর মিথ্যারোপ করা ও কষ্ট দেয়ার পরও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমাদের সাহায্য তাদের কাছে এসেছে[২]। আর আল্লাহ্‌র বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর অবশ্যই রাসূলগণের কিছু সংবাদ আপনার কাছে এসেছে।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর যদি তাদের উপেক্ষা আপনার কাছে কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ বা আকাশে সিঁড়ি খোঁজ করুন এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসুন। আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের সবাইকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করতেন। কাজেই আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(১) অর্থাৎ কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে। অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে নয়- আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলাকে ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। কাতাদা বলেন, অর্থাৎ তারা জানে যে আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল কিন্তু তারা ইচ্ছা করে সেটাকে অস্বীকার করছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কাতাদা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আপনার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূলকে অনুরূপ মিথ্যারোপের শিকার হতে হয়েছিল কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তাই আপনিও ধৈর্য ধারণ করুন। [তাবারী]

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. যারা শুনতে পায় শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতদেরকে আল্লাহ্ আবার জীবিত করবেন[১]; তারপর তাঁর দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর তারা বলে, ‘তার রব-এর কাছ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন আসে না কেন?’ বলুন, ‘নিদর্শন নাযিল করতে আল্লাহ্ অবশ্যই সক্ষম,’ কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না[২]।

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ আয়াতে মৃত বলে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতেও সেটা আমরা দেখতে পাই। যেমন, “যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমরা পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে” [সূরা আল-আন‘আম: ১২২] “এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে শোনান; আর আপনি শোনাতে পারবেন না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে” [সূরা ফাতের: ২২] [আদওয়াউল বায়ান; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) মুশরিকরা এমন কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল, যা দেখার পর তারা ঈমান আনবে বলে ওয়াদা করছে। আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াতে এটাই ঘোষণা করছেন যে, তাদের চাহিদা মোতাবেক নিদর্শন দেখানো আল্লাহ্‌র পক্ষে অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু তারা প্রকৃত অবস্থা জানে না। অন্য আয়াতে তারা কি জানে না সেটাও ব্যক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, যদি তাদের কথামত নিদর্শন দেয়ার পর তারা ঈমান না আনে, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তির পথে আর কোন বাধা থাকবে না। যেমনটি সালিহ আলাইহিস সালামের জাতির বেলায় ঘটেছিল। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “আর পূর্ববর্তিগণের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাদেরকে নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রাখে। আমরা শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উট দিয়েছিলাম, তারপর তারা এর প্রতি যুলুম করেছিল। আমরা শুধু ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি” [সূরা আল-ইসরা: ৫৯] অন্য আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, কুরআন নাযিল করার পর আর কোন নিদর্শনের প্রয়োজন নেই বিধায় তিনি তা নাযিল করেন না। “এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে।” [সূরা আল-আনকাবূত:৫১] সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কুরআনই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মু‘জিযা বা নিদর্শন। [আদওয়াউল বায়ান]

৩৮. আর যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি জীব বা দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। এ কিতাবে[১] আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি; তারপর তাদেরকে তাদের রব-এর দিকে একত্র করা হবে[২]।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝

৩৯. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তারা বধির ও বোবা, অন্ধকারে রয়েছে[৩]। যাকে ইচ্ছে আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি সরল পথে স্থাপন করেন।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ۗ مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۗ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

---

(১) এখানে কিতাব বলে, লাওহে মাহফুজের লেখা বোঝানো হয়েছে। তাতে সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে [তাবারী]

(২) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের দিন তোমরা সব হক আদায় করবে, এমনকি (আল্লাহ্ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে,) কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেয়া হবে'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬২] এমনিভাবে 'অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেয়া হবে'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবেঃ 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও'। সব পক্ষীকুল ও জন্তু-জানোয়ার তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবেঃ ﴿يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا﴾ অর্থাৎ "আফসোস আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম" এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ '(কেয়ামতের দিন) সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে, এমনকি, শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেয়া হবে'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৬৩, ৫/১৭২-১৭৩; মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৪৫; ৪/৬১৯]

(৩) কাতাদা বলেন, এটি কাফেরদের জন্য দেয়া উদাহরণ, তারা অন্ধ ও বধির। তারা হেদায়াতের পথ দেখে না। হেদায়াত থেকে উপকৃত হতে পারে না। হক থেকে তারা বধির। এমন অন্ধকারে তারা অবস্থান করছে যে, সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। [তাবারী]

৪০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হয় বা তোমাদের কাছে কিয়ামত উপস্থিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. 'না, তোমরা শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে দুঃখের জন্য তাঁকে ডাকছ তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সে দুঃখ দুর করবেন এবং যাকে তোমরা তাঁর শরীক করতে তা তোমরা ভুলে যাবে।

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪২. আর অবশ্যই আপনার আগে আমরা বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি[১],

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

(১) এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় ফেল করল এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরো বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হল। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেয়া হল এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা ছিল যে, তারা এসব নেয়ামত দেখে নেয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল। নেয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে

যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে(১)।

৪৩. সুতরাং যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হল, তখন তারা কেন বিনীত হল না? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ করা হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল(২)।

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

ধ্বংস করে দিয়েছে। নূহ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যপুরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়। লূত ‘আলাইহিস্ সালাম-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে ‘বাহ্‌র মাইয়্যেত’ বা ‘মৃত সাগর’ নামে অভিহিত করা হয়। মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে নাযিল হয়েছে, যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মারা গেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

(১) অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তি দান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। সুতরাং কষ্ট ও বিপদাপদের মাধ্যমে তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে ধাবিত করাই উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়া হয়। এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. ফলে যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র জন্যই[১]।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ আছে যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে?' দেখুন, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ননা করি; এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্‌র শাস্তি হঠাৎ বা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে যালিম সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?'

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর আমরা রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। অতঃপর যারা ঈমান আনবে ও নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার ধন-দৌলত প্রদান করছেন, অথচ সে গোনাহ্ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৪৫]

(১) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নেয়ামত। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ তিনি তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। [মুয়াসসার]

৪৯. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তাদেরকে স্পর্শ করবে আযাব, কারণ তারা নাফরমানী করত।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. বলুন, ‘আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারসমূহ আছে, আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা, আমার প্রতি যা ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি।’ বলুন, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?’ তোমরা কি চিন্তা কর না?

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

ষষ্ঠ রুকূ‘

৫১. আর আপনি এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রব-এর কাছে সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের জন্য থাকবে না কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী। যাতে তারা তাকওয়ার অধিকারী হয়[১]।

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

৫২. আর যারা তাদের রবকে ভোরে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না[২]। তাদের কাজের জবাবদিহিতার

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ

(১) যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, “যারা আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হওয়ার আশংকা করে, তাদেরকে কুরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন”। কারণ, তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে। [সা‘দী]

(২) সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ আমরা ছয়জন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমনসময় কতিপয় কুরাইশ

مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾

দায়িত্ব আপনার উপর নেই এবং আপনার কোন কাজের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তাদের উপর নেই, যে আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন; করলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর এভাবেই আমরা তাদের কাউকে অপর কারও দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, ‘আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?’ আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত নন?

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তাদেরকে আপনি বলুন, ‘তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক’, তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর দয়া

সর্দার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, তুমি এদের তাড়িয়ে দাও, যাতে তারা আমাদের উপর কথা বলতে সাহস না পায়। সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি ছিলাম, ইবন মাসউদ ছিলেন, হুযাইলের এক লোক ছিলেন, বিলাল ছিল, আরও দু’জন লোক ছিল যাদের নাম উল্লেখ করব না। তখন রাসূলের মনে এ ব্যাপারে আল্লাহ্ যা উদয় করার তার কিছু উদয় হয়েছিল, তিনি মনে মনে কিছু বলে থাকবেন, তখনি আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। [মুসলিম: ২৪১৩] এতে উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বুঝা যায় যে, কারো ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দূরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারো নেই। প্রায়ই এ ধরণের পোষাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র প্রিয়, তারা যদি কোন কাজের আব্দার করে বসেন, ‘এরূপ হবে’ তবে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের সে আব্দার অবশ্যই পূর্ণ করেন’। [তিরমিযী: ৩৮৫৪] অনুরূপভাবে, শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার অবমাননা। বরং এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

লিখে নিয়েছেন[১]। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত[২] যদি খারাপ

---

(১) এ বাক্যে উপরোল্লেখিত অনুগ্রহের উপর আরো অনুগ্রহ ও নেয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলিমদেরকে বলে দিনঃ তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমতঃ رب বা প্রতিপালক শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোন প্রতিপালক স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رب শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিস্কারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল ‘আলামীন-এর দ্বারা তা কিভাবে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘যখন আল্লাহ্ তা‘আলা সবকিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে ‘আর্শে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে’। [বুখারীঃ ৭৪০৪, মুসলিমঃ ২১০৭, ২১০৮]

(২) আয়াতে অজ্ঞতা শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, গোনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশতঃ কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, জেনেশুনে গোনাহ্ করলে হয়ত এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এ স্থলে ‘অজ্ঞতা’ বলে অজ্ঞতার কাজ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কাজ করে বসে, যা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তিই করে। এর জন্যে বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ جهالت শব্দটি বাকপদ্ধতিতে কার্যগত অজ্ঞতার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই কোন কোন আলেম বলেন, যে কেউ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে সে তা ‘জাহালাত’ বশতঃই তা করে। [ইবন কাসীর] চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বুঝানো হয়েছে। এর জন্য অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কুরআনুল কারীম ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়- অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দূর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়নাবশতঃ হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে দু’টি শর্তাধীনে গোনাহ্‌গারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে- (এক) তাওবা অর্থাৎ গোনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, অনুশোচনার নামই হলো তাওবা। [ইবন মাজাহ: ৪২৫২; মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৭৬] (দুই) ভবিষ্যতের জন্য আমল

কাজ করে, তারপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

সপ্তম রুকূ‘

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।’ বলুন, ‘আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।’

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. বলুন, ‘নিশ্চয় আমি আমার রব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা এতে মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা আমার

সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গোনাহ্র কারণে কারো অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহ্র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। [সা‘দী] আল্লাহ্র অধিকার যেমন, সালাত, সওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরয কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার- যেমন, কারো অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারো ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

(১) আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নেয়ামতও দান করবেন। এ জন্যই ক্ষমা গুণের সাথে রহমত গুণটিও উল্লেখ করা হয়েছে। বান্দা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে যতটুকু এগিয়ে আসবে তিনি তাঁর ক্ষমা ও রহমত দিয়ে বান্দাকে ততটুকু ঢেকে দিবেন। [সা‘দী]

কাছে নেই। হুকুম কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।’

৫৮. বলুন, ‘তোমরা যা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে তো ফয়সালা হয়েই যেত। আর আল্লাহ্ যালিমদের ব্যাপারে অধিক অবগত।’

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. আর[১] গায়েবের চাবি[২] তাঁরই

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي

---

(১) আলোচ্য ৫৯ থেকে ৬১ নং আয়াতসমূহে তাওহীদের মৌলিক দিকের পথনির্দেশ রয়েছে। সারা বিশ্বে যত ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে দ্বীন ইসলামের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদে বিশ্বাস। শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা, তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করা এবং তিনি ব্যতীত আর কারো ‘ইবাদাত না করাকে একত্ববাদ বলা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলীর মধ্যে হচ্ছে জীবন, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্টজীব কোন গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যেও দু’টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। (এক) জ্ঞান এবং (দুই) শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান-অবিদ্যমান, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড়, অণু-পরমাণু সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতেই পরিবেষ্টিত। [দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস; ৪৫৮-৪৯০ ও ৮৮৭-৯৮৯] যে ব্যক্তি এ আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তি এ দু’টি গুণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গোনাহ্ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য, কথায় কাজে, উঠায়-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারো চিন্তায় এ কথা উপস্থিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ও মনের ইচ্ছা-কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিতি কখনো তাকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দিবে না।

(২) مفاتح শব্দটি বহুবচন। এর একবচনে مفتاح ও مفتح উভয়টিই হতে পারে। مفتح এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مفتاح এর অর্থ চাবি- আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ারই অবকাশ আছে। তাই কোন কোন তাফসীরবিদ ও অনুবাদক مفاتح এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার,

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾

কাছে রয়েছে[১], তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কামাই কর তা তিনি জানেন। তারপর দিনে তোমাদেরকে তিনি আবার জীবিত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করা হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, 'চাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বোঝানো যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) কুরআনের পরিভাষায় গায়েবের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। উদাহারণতঃ কে কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিয্‌ক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায়, কি পরিমাণ হবে, অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকের গর্ভাশয়ে যে ভ্রূণ অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারো জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ যা সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি সীমা থেকে উহ্য রয়েছে। সুতরাং ﴿وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, গায়েবী বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ করায়ত্ত ও মালিকানায় থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, গায়েবী বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে- তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছেই রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে নাযিল করি"। [সূরা আল-হিজর: ২১]

অষ্টম রুকূ'

৬১. আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকারী এবং তিনি তোমাদের উপর প্রেরণ করেন হেফাযতকারীদেরকে। অবশেষে তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমাদের রাসূল (ফিরিশ্‌তা) গণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. তারপর তাদেরকে প্রকৃত রব আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। জেনে রাখুন, হুকুম তো তাঁরই এবং তিনি সবচেয়ে দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. বলুন, 'কে তোমাদেরকে নাজাত দেন স্থলভাগের ও সাগরের অন্ধকার থেকে? যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁকে ডাক যে, আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. বলুন, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে নাজাত দেন। এরপরও তোমরা শির্ক কর[১]।'

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

---

(১) এখানে ৬৩ ও ৬৪ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে হুশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়ে বলছেন যে, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌কে আহ্বান কর, কখনো প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনো মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদেরকে

৬৫. বলুন[১], 'তোমাদের উপর[২] বা | قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ

এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনিবাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করবো? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেব-দেবী, পীর, ফকীর, ওলী প্রভৃতি এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মূর্খতা!
সারকথা, কুরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই। প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ একমাত্র তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদের মুহূর্তে যে তাঁকে আহ্বান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তিনি ছাড়া অন্য কারো এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও এরূপ দয়া-মমতা নেই।

(১) এখানে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেকোন আযাব ও যেকোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যেকোন শাস্তি দেয়াও তাঁর পক্ষে সহজ। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন হয় না। বলা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপরদিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এক কে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন। মূলতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি তিন প্রকারঃ (এক) যা উপর দিক থেকে আসে, (দুই) যা নিচের দিক থেকে আসে এবং (তিন) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। এ সব প্রকার আযাব দিতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম।

(২) মুফাস্‌সিরগণ বলেন, উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন, নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবণাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আদ জাতির উপর ঝড়-ঝঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, লূত 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং ইসরাঈল

فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

নীচ থেকে শাস্তি পাঠাতে(১), বা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ

বংশধরদের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আব্‌রাহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূষির ন্যায় হয়ে যায়। [বাগভী]

(১) এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকারে এবং নীচের আযাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফির‘আউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারুণ স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল। [বাগভী] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণ বলেন, উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ্ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীনস্ত কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া। [ফাতহুল কাদীর]
আয়েশা রাদিআল্লাহু ‘আনহা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যখন আল্লাহ্ তা‘আলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক আল্লাহ্‌র কোন বিধান ভুলে গেলে সে তা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর যদি প্রশাসক আল্লাহ্‌র বিধান স্মরণ করে তখন সে তা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়; ফলে সে যখন আল্লাহ্‌র কোন বিধান ভুলে যায় তখন তারা তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি সে প্রশাসক নিজেই স্মরণ করে তখন তারা তাকে তা বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে না। [আবু দাউদ: ২৯৩২; নাসায়ী: ৪২০৪] এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত তাফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং যেসব কষ্ট অধীন কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব! এগুলো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। সুফিয়ান সওরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, যখন আমি কোন গোনাহ্ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেজাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে।

করাতে[১] তিনি (আল্লাহ্) সক্ষম।' দেখুন, আমরা কিরূপে বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে।

(১) আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে, বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যাওয়া এবং একদল অন্য দলের জন্য আযাব হওয়া। তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে, এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'সাবধান! তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।' [বুখারীঃ ১২১]

সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন, 'একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে চলতে চলতে বনী মুয়াবিয়ার মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলাম। তিনি তার রবের কাছে অনেকক্ষণ দু'আ করার পর বললেনঃ আমি রব-এর নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি- তিনি আমাকে দুটি বিষয় দিয়েছেন, আর একটি থেকে নিষেধ করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছি যে, (এক) আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'আ কবূল করেছেন। (দুই) আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'আও কবূল করেছেন। (তিন) আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দ্বারা ধ্বংস না হয়। আমাকে তা প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। [মুসলিমঃ ২৮৯০]

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না; কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই হুশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

অন্য আয়াতে এ বিষয়টি পূর্ববর্তী জাতিদের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, "তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।" [সূরা হূদঃ ১১৮-১১৯] এতে বুঝা গেল যে, যারা পরস্পর (শরী'আতসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। কেননা যারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে তারা আল্লাহ্র রহমত হতে দূরে সরে এসেছে।

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾

৬৬. আর আপনার সম্প্রদায় তো ওটাকে মিথ্যা বলেছে অথচ ওটা সত্য। বলুন, 'আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই।'

لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আমাদের আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগ শুরু করে[১]। আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না[২]।

---

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে মুসলিমদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ্, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ্। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, যদি শয়তান আপনাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজলিশে যোগদান করে ফেলেন- নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিশে আল্লাহ্‌র আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা আপনার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছেন। উভয় অবস্থাতেই যখন স্মরণ হয় তখনই মজলিশ ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ্। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, 'যদি আপনি সেখানে বসে থাকেন, তবে আপনিও তাদের মধ্যে গণ্য হবেন'। [সূরা আন-নিসা: ১৪০] আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোনাহ্‌র মজলিশ ও মজলিশের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিশ ত্যাগ করার মধ্যে যদি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্য

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর তাদের[১] কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের নয়। তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য, যাতে তারাও তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ

৭০. আর যারা তাদের দ্বীনকে খেল-

পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক, দ্বীনী ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়- তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।
মোটকথা, আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ্ এবং যে কাজ অন্য কেউ জোর-যবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ্ থেকে অব্যাহতি দান করেছেন। [ইবনে মাজাহ্ঃ ২০৪০, ২০৪৩] এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, যে মজলিশে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল কিংবা শরী‘আতের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করতে সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিশ বর্জন করা মুসলিমদের উচিত। হ্যাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিশে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নেই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে বুঝা যায় যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিশে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের বেশী দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় যালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনো যুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, “অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে”। [সূরা হূদ: ১১৩]

(১) অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত লোকেরা যালিম। কিন্তু তাদের হিসাব-নিকাশ ও তাদের শাস্তি বিধান করা সাধারণ মুমিন মুত্তাকীদের কাজ নয়। তারা তাদেরকে কেবল নসীহত ও হক কথা জানিয়ে দেয়ার কাজই করবে। যাতে তারা বাতিল পথ পরিহার করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে। [মুয়াসসার] কিন্তু যদি তাদেরকে নসীহত করলে ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাও পরিত্যাগ করতে হবে। [সা‘দী]

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

তামাশারূপে গ্রহণ করে[১] এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে আপনি তাদের পরিত্যাগ করুন। আর আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন[২], যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না[৩]। এরাই নিজেদের কৃতকর্মের

(১) আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা দ্বীনকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারেঃ (এক) তাদের জন্য সত্য দ্বীন ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। (দুই) তারা আসল দ্বীন পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে, তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং আখেরাত বিস্মৃত। আখেরাত ও কেয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনো এরূপ কাণ্ড করতো না। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাধারণ মুসলিমদেরকে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ (এক) উল্লেখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ইতিবাচকভাবে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং (দুই) আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করা।

(৩) আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে ﴿اَنْ تُبْسَلَ﴾ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া। কোন ভুল কিংবা কারো প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল

জন্য ধ্বংস হয়েছে; কুফরীর কারণে এদের জন্য রয়েছে অতি উষ্ণ পানীয় ও কষ্টদায়ক শাস্তি(১) ।

নবম রুকূ'

৭১. বলুন, 'আল্লাহ্ ছাড়া আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব, যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আর আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত দেবার পর আমাদেরকে কি আগের অবস্থায় ফিরানো হবে(২) সে ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান যমীনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে সে দিশেহারা? তার রয়েছে কিছু (ঈমানদার) সহচর, তারা তাকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করে বলে, 'আমাদের কাছে আস?'(৩) বলুন, 'আল্লাহ্‌র হিদায়াতই সঠিক হিদায়াত এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি

قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময়স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

(১) বলা হচ্ছে, এরা ঐ সব লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেয়া হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, "এ পানি তাদের নাড়িভূঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫] এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

(২) অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার পরে কি আমরা কুফরীতে ফিরে যাব? [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) কিন্তু সে ঈমানদার বন্ধুদের এ আহ্বানে সাড়া দেয় না। [মুয়াসসার]

সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে[১] ।'

৭২. 'এবং সালাত কায়েম করতে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করতে। আর তিনিই, যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে ।'

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

৭৩. তিনিই যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। গায়েব ও উপস্থিত

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

(১) এ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল যে, যারা আখেরাতের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক । তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীরাও পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে । পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতের সারমর্ম মুসলিমদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা । এটি যে কোন মানুষের জন্যই বিষতুল্য । কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমতঃ বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয় । এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ মনে করতে থাকে । যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ্ করে, তখন তার কলবে একটি কাল দাগ পড়ে । তারপর যখন তাওবা করে গোনাহের কাজ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তার কলব আবার পরিষ্কার হয়ে যায় । কিন্তু যদি গোনাহ বাড়িয়ে দেয়, তখন একের পর এক কালো দাগ বাড়াতে থাকে । কুরআনুল কারীমে ﴿رَانَ﴾ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে । বলা হয়েছে, "কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে ।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:১৪] [ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৪৪, তিরমিযীঃ ৩৩৩৪, ইমাম আহ্মাদ, মুসনাদঃ ২/২৯৭] অর্থাৎ ভাল-মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়ে বসে । চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌঁছায় । এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলে-সন্তানদেরকে এ ধরণের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা ।

বিষয়ে তিনি পরিজ্ঞাত। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

৭৪. আর স্মরণ করুন[১], যখন ইব্‌রাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন[২], ‘আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি[৩]।’

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে সম্বোধন এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকাপূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন। [নাযমুদ দুরার]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম তার পিতা আযরকে বললেন, আপনি স্বহস্তে নির্মিত স্বীয় উপাস্য স্থির করেছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি। ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর পিতার নাম ‘আযর’ বলেই প্রসিদ্ধ। কোনও কোনও ইতিহাসবিদ তার নাম ‘তারেখ’ উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে ‘আযর’ তার উপাধি। তবে কুরআনের বর্ণনাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। [বাগভী]

(৩) ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, “আর আপনি নিকটআত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন”। [সূরা আশ-শু‘আরা: ২১৪] সে অনুযায়ী তিনি সর্বপ্রথম সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেন। [আর-রাহীকুল মাখতূম] এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের কোন সম্মানিত যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী তা-ই। আরো জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকটআত্মীয়দের থেকে শুরু করা নবীগণের দাওয়াত পদ্ধতি। এছাড়া আয়াতে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে

وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرٰهِيۡمَ مَلَكُوۡتَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلِيَكُوۡنَ مِنَ الۡمُوۡقِنِيۡنَ ۝٧٥

৭৫. এভাবে আমরা ইব্‌রাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব[1] দেখাই, যাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন ।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ الَّيۡلُ رَاٰ كَوۡكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الۡاٰفِلِيۡنَ ۝٧٦

৭৬. তারপর রাত যখন তাঁকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি তারকা দেখে বললেন, 'এ আমার রব ।' তারপর যখন সেটা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না ।'

فَلَمَّا رَاَ الۡقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنۡ لَّمۡ يَهۡدِنِيۡ رَبِّيۡ لَاَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡقَوۡمِ

৭৭. অতঃপর যখন তিনি চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উঠতে দেখলেন তখন বললেন, 'এটা আমার রব ।' যখন

বলেনঃ আপনার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে । মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় । বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে সব জাতীয়তাই বর্জনীয় । কুরআনুল কারীম ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে । বলা হয়েছে, "ইবরাহীম ও তার সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য । তারা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদেরকে পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত । আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন অবস্থিত থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমবেত না হও" । [সূরা আল-মুমতাহিনাহ্: ৪]

(১) 'মালাকূত' শব্দের অর্থ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে । ইকরামা বলেন, এর অর্থ আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব ও মালিকানা বা কর্তৃত্ব । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি । মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, আসমান ও যমীনের নিদর্শনাবলী । [তাবারী] অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তাদের অসারতার কথা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট স্পষ্ট হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব, নিদর্শনাবলী ও বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জের পরিচালন ব্যবস্থা দেখান । [তাবারী]

ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧٧﴾

সেটাও অস্তমিত হল তখন বললেন, ‘আমাকে আমার রব হিদায়াত না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের শামিল হব।’

فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّى هَٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উঠতে দেখলেন তখন বললেন, ‘এটা আমার রব, এটা সবচেয়ে বড়।’ যখন এটাও অস্তমিত হল, তখন তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই।

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

৭৯. ‘আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই[১]।’

---

(১) আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়, যেমনিভাবে মূর্তি ও প্রতিমা উপাস্যের যোগ্য নয়। বলা হচ্ছে, এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন তিনি স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন, এ নক্ষত্র আমার রব। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের রব। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু ইলাহ্ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত। এরপর অন্য কোন রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন, (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার রব। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার রব আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা এবং উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এটিও আরাধনার যোগ্য নয়। এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার রব অন্য কোন শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয়। এরপর একদিন সূর্য উদিত

৮০. আর তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল । তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো? অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন । আমার রব অন্য কোন ইচ্ছে না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না, আমার রব জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. 'আর তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছ না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করছ

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেনঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার রব এবং এটি বৃহত্তম । কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্ত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে । সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত ।' তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবকেই আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছ । অতঃপর এ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না । এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত । বরং সেই সত্তা আমাদের সবার রব, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন । তাই আমি আমার চেহারা তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্ 'ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু'-এর দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় মুশরিক বা অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই । এ বিতর্কে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিস্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে । মনে রাখতে হবে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ তর্ক ছিল প্রতিপক্ষকে নিজের মত ও পথের পক্ষে যুক্তি দাড় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে । তিনি সম্পূর্ণ জেনে-বুঝেই প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডন করার জন্য এ প্রজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাতে তারা উপস্থিত সকল বস্তুর ইবাদতের অসারতা ঝুঝতে সক্ষম হয় । [দেখুন, সা'দী]

এমন কিছু, যার পক্ষে তিনি তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নাযিল করেন নি। কাজেই যদি তোমরা জান তবে বল, দু দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার।'

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম[১] (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য[২]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۟

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা হচ্ছে- যুলুমের অর্থ শির্ক- সাধারণ গোনাহ্ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكرة ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শির্কই এর অন্তর্ভুক্ত। يَلْبِسُوْا শব্দটি لَبْسٌ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শির্ক মিশ্রিত করে তার কোন নিরাপত্তা নেই। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক বা মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শির্ক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোন প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোন ফিরিশ্‌তা কিংবা রাসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহ্‌র কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে বা আল্লাহ্‌কে যা দিয়ে 'ইবাদাত করা হয় তাদেরকে তেমন কিছু দিয়ে 'ইবাদাত করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা কোন পীর, জ্বিন, ওলী বা মাযার ইত্যাদিকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই মুশরিক। তারা আল্লাহ্‌র রুবুবিয়াতে শির্ক করল। অনুরূপভাবে যারা কবরবাসী, ওলী, মাযার, জ্বিন ইত্যাদিকে আহ্বান করে, সিজ্‌দা করে, সাহায্য চায়, মান্নত করে, তাদের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করে- তারা সবাই মুশরিক। তাদের নিরাপত্তা নেই। তারা আল্লাহ্‌র উলুহিয়াতে শির্ক করল এবং তাওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

(২) অর্থাৎ শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে, তারপর সে ঈমানের সাথে কোনরূপ যুলুমকে মিশ্রিত করেনি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর যুলুম করেনি? এ আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে যুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'যুলুম' বলতে শির্ককে বোঝানো হয়েছে।

এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

দশম রুকূ'

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর এটাই আমাদের যুক্তি-প্রমাণ যা ইব্‌রাহীমকে দিয়েছিলাম তার জাতির মোকাবেলায়, যাকে ইচ্ছা আমরা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই আপনার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর আমরা তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, এদের প্রত্যেককে হিদায়াত দিয়েছিলাম; পূর্বে নূহকেও আমরা হিদায়াত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এভাবেই মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করি;

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۗ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর যাকারিয়্যা, ইয়াহ্‌ইয়া, 'ঈসা এবং ইল্‌য়াসকেও (হিদায়াত দিয়েছিলাম)। এরা প্রত্যেকেই সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন;

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۗ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এবং ইসমা'ঈল, আল্‌-ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকেও (হিদায়াত দিয়েছিলাম); আর তাদের প্রত্যেককে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম সৃষ্টিকুলের উপর।

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ

৮৭. এবং তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের কিছুসংখ্যককে। আর আমরা

দেখ, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, ﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ অর্থাৎ "নিশ্চিত শির্ক বিরাট যুলুম"।' [বুখারীঃ ৪৬২৯, ৬৯১৮] কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর 'ইবাদাতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৮৮. এটা আল্লাহ্‌র হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তিনি এ দ্বারা হিদায়াত করেন। আর যদি তারা শির্ক করত তবে তাঁদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত[১]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ

৮৯. এরাই তারা, যাদেরকে আমরা কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছি, অতঃপর যদি তারা এগুলোর সাথে কুফরী করে, তবে আমরা এমন এক সম্প্রদায়কে এগুলোর ভার দিয়েছি যারা এগুলোর সাথে কাফির নয়[২]।

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত দানসমূহ বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের একটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬৩] অপরদিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ তা‘আলা। তাঁর সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা, তাঁর ‘ইবাদাতে অপর কাউকে শরীক করা শির্ক, কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, তোমরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

(২) অর্থাৎ কিছুসংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনার নবুওয়াত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত মুসলিম এ ‘জাতি’র অন্তর্ভুক্ত। [আইসারুত তাফাসীর] এ আয়াত তাদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা প্রশংসার স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন।

৯০. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন[১]। বলুন, 'এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ[২] ।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

এগারতম রুকূ'

৯১. আর তারা আল্লাহকে তাঁর যথার্থ মর্যাদা দেয়নি, যখন তারা বলে, 'আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি'[৩] । বলুন, 'কে নাযিল করেছে

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদেরকে শোনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্বপুরুষরা শুধু পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই নবীগণ 'আলাইহিমুস্ সালামদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "এরা এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেছেন"। এরপর বলেছেন, "আপনিও তাদের হেদায়াত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন"। এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে- (এক) আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পৈত্রিক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত নবী-রাসূলদের অনুসরণ কর। (দুই) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী নবীগণের পন্থা অবলম্বন করুন।

(২) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী নবীগণও করেছেন। ঘোষণাটি হচ্ছে, আমি তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফি বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নাই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা। বস্তুত: শিক্ষা ও প্রচারকার্যের জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব নবীর নিকট অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

(৩) এ আয়াতে ঐসব লোকের জবাব দেয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কখনো কোন গ্রন্থ নাযিলই করেননি, গ্রন্থ ও রাসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ

قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াতস্বরূপ, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?' বলুন, 'আল্লাহ্‌ই'; অতঃপর তাদেরকে তাদের অযাচিত সমালোচনার উপর ছেড়ে দিন, তারা খেলা করতে থাকুক(১)।

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. আর এটি বরকতময় কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, যা তার আগের সব কিতাবের সত্যায়নকারী এবং যা দ্বারা আপনি মক্কা ও তার চারপাশের মানুষদেরকে সতর্ক

ভিত্তিহীন। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এটি মূর্তিপূজারী কুরাইশদের উক্তি [ইবন কাসীর]। ইবন জারীর তাবারী এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [তাবারী] কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য মুফাস্‌সিরদের মতে এটি ইয়াহূদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা পরম্পরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও দ্বীনের পরিপন্থী ছিল। [বাগভী] যদি আয়াতে বর্ণিত লোকেরা ইয়াহূদী হয়, তবে এতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেন, যারা এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনে নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্বাবস্থায় আসমানী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর, সে তাওরাত কে নাযিল করেছে? তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইয়াহূদীরা সেগুলো তাওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। [তাবারী, বাগভী, মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিতাব নাযিল না করে থাকলে তাওরাত কে নাযিল করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে; আপনিই বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলাই নাযিল করেছেন। [বাগভী] যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে, তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

করেন[১]। আর যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, তারা এটাতেও ঈমান রাখে[২] এবং তারা তাদের সালাতের হিফাযত করে।

৯৩. আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, কিংবা বলে, 'আমার কাছে ওহী হয়,' অথচ তার প্রতি কিছুই ওহী করা হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন আমিও তার মত নাযিল করব?' আর যদি আপনি দেখতে

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

(১) অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল- একথা যেমন তারা স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কুরআনও আমি নাযিল করেছি। কুরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষ থেকে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিলকৃত সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। মক্কা মু‘আয্যামাকে কুরআনুল কারীম 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। তাছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত সংরক্ষণ করে। এতে ইয়াহূদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা মেনে নেয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা, এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা- এটি আখেরাতে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌ভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা–ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে। চিন্তা করলে দেখা যায়, আখেরাতের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শির্কসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তাওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ভীতি এবং আখেরাতভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরায় আখেরাতের চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যার অন্তরে আখেরাতের উপর ঈমান নেই সে কখনো অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে না, আর ন্যায় কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে না। [দেখুন, তাবারী]

পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহংকার করতে।'

৯৪. আর অবশ্যই তোমরা আমাদের কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন আমরা প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম; আর আমরা তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা তোমাদের পিছনে ফেলে এসেছ। আর তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক মনে করতে, তোমাদের সে সুপারিশকারিদেরকেও আমরা তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও তোমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

বারতম রুকূ'

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীন বেরকারী[১]। তিনিই

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম- এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন- যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়। [জালালাইন; মুয়াসসার]

তো আল্লাহ্, কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে[১]?

৯৬. তিনি প্রভাত উদ্ভাসক[২]। আর তিনি রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরুপক করেছেন[৩]; এটা

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

(১) এগুলো সব এক আল্লাহ্‌র কাজ। অতঃপর এ কথা জেনে-শুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ। [মুয়াসসার]

(২) فالق শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং إصباح শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ -এর অর্থ প্রভাতের ফাঁককারী; অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। [জালালাইন] এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জ্বিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এ কথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জ্বিন, মানব, ফিরিশ্‌তা অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা‘আলারই কাজ। তিনি ধীরে ধীরে অন্ধকার চিরে আলোর উন্মেষ ঘটান। সে আলোতে মানুষ তাদের জীবিকার জন্যে বের হতে পারে। [সা‘দী]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়-অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। আল্লাহ্ তা‘আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল বিশাল গোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, “সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।” [সূরা ইয়াসীন:৪০] পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েকদিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা দিত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনিই চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। আসমানী কিতাব, নবী ও রাসূলগণ এ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যই প্রেরিত হন। কুরআনুল কারীমের এ বাক্য আরো ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টিই আল্লাহ্ তা‘আলার নেয়ামত। এর মাধ্যমেই সময় ও কাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এতে এক দিকে যেমন ইবাদতের সময় নির্ধারণ করা যায়, অপরদিকে এর মাধ্যমে লেন-দেনের সময়ও ঠিক রাখা যায়।

পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্ধারণ[১]।

৯৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা তোমরা স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও[২]। অবশ্যই আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি[৩]।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾

তাছাড়া কতটুকু সময় পার হয়েছে আর কতটুকু বাকী রয়েছে সেটা জানাও এ দুটোর কারণেই হয়ে থাকে। যদি এগুলো না থাকত, তবে এ সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকত না। এর জন্য বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন পড়ত। যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক স্বার্থ হানি ঘটত। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা- যাতে কখনো এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না- এটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই দু'টি মহান গুণ অপরিসীম শক্তি ও অপার জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। [মানার] এজন্যেই বাক্যের শেষে আল্লাহ্‌র দু'টি গুণ বাচক নাম 'পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী' উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অপার শক্তির কারণে সমস্ত কিছু তার অনুগত বাধ্য হয়েছে। আর তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে কোন গোপন বা প্রকাশ্য সবকিছু তার আয়ত্বাধীন রয়েছে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পিছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, স্থল ও জলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করে নিতে পারে। [মুয়াসসার] অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আজ বৈজ্ঞানিক কলকজার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। এ আয়াতেও মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত।

(৩) অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহ্‌কে চিনে না, তারা বেখবর ও অচেতন। কোন নিদর্শনই তাদের কাজে লাগে না। নবীদের বর্ণনাও তাদের কোন সন্দেহ দূর করতে পারে না। তাদের কাছে এসব বর্ণনা যত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবেই আসুক না কেন, তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। [সা'দী]

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. আর তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রয়েছে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান[১]। অবশ্যই আমরা অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. আর তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তারপর তা দ্বারা আমরা সব রকমের উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি; অতঃপর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি। যা থেকে আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি। আরও (নির্গত করি) খেজুর গাছের

---

(১) এ আয়াতে দু'টি শব্দ বলা হয়েছে, مستقرّ ও مستودع- তন্মধ্যে مستقر শব্দটি قرار থেকে উদ্ভুত। কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে مستقر বলা হয়। আর مستودع শব্দটি وديعت থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কারো কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেয়া। অতএব, مستودع ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ আদম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থানস্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। [সা'দী] কুরআনুল কারীমের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন, مستودع ও مستقر যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন, কবর ও আখেরাত। [ফাতহুল কাদীর] আবার কেউ বলেছেন, মায়ের পেট হচ্ছে مستقر আর পিতার পিঠ হচ্ছে مستودع [আইসারুত তাফাসীর, মুয়াসসার] এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কুরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেনঃ مستقر হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে আখেরাত পর্যন্ত সবগুলো স্তর, তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক কিংবা কবর বা বরযখই হোক- সবগুলোই হচ্ছে مستودع অর্থাৎ সাময়িক অবস্থানস্থল। [সা'দী] কুরআনুল কারীমের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়। যেখানে বলা হয়েছে, ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ -অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। [সূরা আল-ইনশিকাক:১৯-২০] এর সারমর্ম এই যে, আখেরাতের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মন্‌যিল অতিক্রম করতে থাকে।

মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি, আংগুরের বাগান, যায়তুন ও আনার। একটার সাথে অন্যটার মিল আছে, আবার নেইও। লক্ষ্য করুন, ওগুলোর ফলের দিকে যখন সেগুলো ফলবান হয় এবং সেগুলো পেকে উঠার পদ্ধতির প্রতি। নিশ্চয় মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এগুলোর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে[১]।

১০০. আর তারা জিনকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র---মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

তেরতম রুকূ'

১০১. তিনি আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিভাবে? তাঁর তো কোন সঙ্গিনী নেই। আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০২. তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব;

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

(১) উপরোক্ত ৯৫- ৯৯ আয়াতসমূহে প্রথমে অধঃজগতের বস্তুসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। এরপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। এরপর শূন্য জগতের উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এরপর উর্ধ্ব জগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে।

فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁর 'ইবাদাত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

১০৩. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না[১], অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন[২] এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক

---

(১) আলোচ্য আয়াতে أبصار শব্দটি بصر এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি। إدراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এস্থলে إدراك শব্দের অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা করেছেন। এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, জ্বিন, মানব, ফিরিশ্‌তা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। (এক) সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। (দুই) তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু-কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগত ও তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনো হয়নি এবং হতে পারেও না। কেননা, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ।

(২) মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাবে কিনা। এ মাস'আলার দু'টি দিক আছেঃ দুনিয়াতে তাঁকে কেউ দেখা সম্ভব কিনা? এ মাস'আলারও দু'টি দিক রয়েছে, একঃ তাঁকে স্বপ্নে দেখা। এ ধরণের দেখা সম্ভব বলেই অনেকে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আল্লাহকে দেখার উপর বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করেন। দুই, দুনিয়াতে সরাসরি চোখ দ্বারা আল্লাহ্‌কে দেখা। দুনিয়াতে এ ধরণের দেখা কখনই সম্ভব নয়। এর দলীল হলোঃ মুসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌কে দেখতে চেয়ে বলেছিলেনঃ ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ "হে রব! আমাকে দেখা দিন", তখন উত্তরে বলা হয়েছিলঃ ﴿لَن تَرَانِي﴾ "আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না"। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৩] আল্লাহ্‌র নবী হয়েও যখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জ্বিন ও মানুষের সাধ্য কি যে দুনিয়ার এ চোখ দিয়ে আল্লাহ্‌কে দেখবে!

আখেরাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাবে। আখেরাতে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত ঘটবে- হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে

অবহিত(১) ।

১০৪. অবশ্যই তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের কাছে চাক্ষুষ প্রমাণাদি এসেছে। অতঃপর কেউ চক্ষুষ্মান হলে সেটা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ অন্ধ সাজলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে(২) । আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই(৩) ।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

দৃষ্টিপাত করে বললেনঃ 'তোমরা স্বীয় রবকে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে' । [বুখারীঃ ৫৫৪, ৭৪৩৫, ৭৪৩৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, [ইবন আবিল ইয্ আল-হানাফী, শারহুল আকীদাতিত তাহাভীয়্যা]

(১) আরবী অভিধানে لطيف শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (এক) দয়ালু, (দুই) সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা বা জানা যায় না । خبير শব্দের অর্থ খবর রাখে । এখানে অর্থ হবে- তিনি খবর রাখেন । সমগ্র সৃষ্টিজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয় । এখানে لطيف শব্দের অর্থ দয়ালু নেয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্যে আমাদের গোনাহ্‌র কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গোনাহ্‌র কারণেই পাকড়াও করেন না । [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস্‌সুন্নাতি]

(২) এ আয়াতের بصائر শব্দটি بصيرة এর বহুবচন । এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান । অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে । আয়াতে بصائر বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে । আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে । [আল-মানার] অর্থাৎ কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বিভিন্ন মু'জিযা আগমন করেছে [ইবন কাসীর] তাছাড়া তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজকর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করছ । এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায় । অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে । [আল-মানার; আইসারুত তাফাসীর; মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব নয়, যেমন সংরক্ষকের দায়িত্ব হয়ে

পৌঁছার পরও। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাস। এর সপক্ষে দলীল প্রমাণাদি অনেক, নীচে তার কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

কুরআন থেকেঃ

আল্লাহর বাণীঃ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সেদিন কিছু চেহারা হবে সজীব ও প্রফুল্ল। তারা স্বীয় রবকে দেখতে থাকবে। [সূরা আল-কিয়ামাহঃ২২-২৩]

আল্লাহ্র বাণীঃ ﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ "তারা তাতে যা চাইবে তাই পাবে, আর আমাদের কাছে আছে আরো কিছু বাড়তি" [সূরা ক্বাফঃ৩৫]। এ আয়াতের তাফসীরে আলী ও আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'বাড়তি বিষয় হলোঃ আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর সৌভাগ্য'।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র বলেছেনঃ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ "কাফেররা সেদিন স্বীয় রব-এর সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত থাকবে" [সূরা আল-মুতাফফেফীনঃ ১৫]। এর দ্বারা কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্কে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতের দ্বারা এটা স্পষ্ট হলো যে, যারা ঈমানদার তাদের এ শাস্তি হবে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে দেখতে পাবে।

আল্লাহ্র বাণীঃ ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ "যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত,তদুপরি তার উপর রয়েছে কিছু বাড়তি"। [সূরা ইউনুসঃ২৬]। এ আয়াতের তাফসীরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি আল্লাহ্কে দেখা বলে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার আলোচনা পরবর্তী বর্ণনায় হাদীস থেকে আসছে।

সহীহ হাদীস থেকেঃ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সে সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইমাম দারকুতনী এ সংক্রান্ত বিশটির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আবুল কাসেম লালাকা'য়ী ত্রিশটির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নীচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরো কোন নেয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা নিবেদন করবেঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন! এর বেশী আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্র সাক্ষাত হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত'। [সহীহ্ মুসলিমঃ ১৮১] জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্র সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নেয়ামত।

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক চন্দ্রালোকিত রাতে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আর এভাবেই আমরা নানাভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করি[১] এবং যাতে তারা বলে, 'আপনি পড়ে নিয়েছেন[২]', আর যাতে আমরা এটাকে[৩] সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানী

থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৌঁছে দেয়া ও বুঝিয়ে দেয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ এভাবেই আমরা আমাদের আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। [জালালাইন]

(২) এর মর্ম এই যে, হেদায়াতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মু'জিযা, অনুপম প্রমাণাদি- যেমন, কুরআন- একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জ্বিন ও মানুষকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে- সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোন হটকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান তুমি কারো কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছ। এটা ছিল কাফেরদের নিত্য-মন্তব্যের একটি। তারা এ ধরনের মন্তব্য করেই যাচ্ছিল। অন্য আয়াতেও এটা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, "আমরা অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, 'তাকে তো শুধু একজন মানুষ শিক্ষা দেয়।' তারা যার প্রতি এটাকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য ঝুঁকছে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।" [সূরা আন-নাহল: ১০৩] আল্লাহ্ আরও বলেন, "অতঃপর সে বলল, 'এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়, 'এ তো মানুষেরই কথা।' অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব 'সাকার' এ" [আল-মুদ্দাসসির: ২৪-২৬] তিনি আরও বলেন, কাফেররা বলে, 'এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, সে এটা রটনা করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' সুতরাং অবশ্যই কাফেররা যুলুম ও মিথ্যা নিয়ে এসেছে।" তারা আরও বলে, 'এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; তারপর এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।' "বলুন, 'এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [আল-ফুরকান: ৪-৬] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এখানে এটা বলে কুরআন উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] অনুরূপভাবে পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে যে হক প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে তাও হতে পারে।

সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করি[১]।

১০৬. আপনার রব-এর কাছ থেকে আপনার প্রতি যা ওহী হয়েছে আপনি তারই অনুসরণ করুন, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৭. আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তারা শির্ক করত না। আর আমরা আপনাকে তাদের হিফাযতকারী বানাইনি এবং আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়কও নন।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ﴿۱۰۷﴾

উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের নানাভাবে বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা যারা জানে তারা হককে জানতে পারবে, সেটা গ্রহণ করতে পারবে, সে হকের অনুসরণ করতে পারবে। আর তারা হচ্ছে, মুমিনরা যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার উপর যা নাযিল হয়েছে সে সবের উপর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল। [মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়াতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে সত্যের পথ প্রদর্শক হয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে, কে মানে আর কে মানে না- তা আপনার দেখার বিষয় নয়। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ করার জন্য আপনার রব-এর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ ওহী প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না। এর কারণ এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলিম হয়ে যাক, তবে কেউ শির্ক করতে পারতো না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলিম করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। [দেখুন, আল-মানার]

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১০৮. আর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমলংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে; এভাবে আমরা প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ শোভিত করেছি; তারপর তাদের রব-এর কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি তাদেরকে তাদের করা কাজগুলো সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন[১]।

---

(১) আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়। কুরাইশ সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ ‘হয় তুমি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হও, না হয় আমরা তোমার প্রভুকে গালি দিবো’। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী] যাতে বলা হয়েছে, “আপনি ঐ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বনিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনো গালি দেননি। সম্ভবত কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। [তাফসীরে বায়যাভী; আইসারুত তাফাসীর] কুরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদেরকে গালি-গালাজ থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার আল্লাহ্‌কেও গালি-গালাজ করব। এতে কুরআনের এ নির্দেশ নাযিল হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এ ঘটনা ও এ সম্পর্কিত কুরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়ে এসেছে।

কোন পাপের কারণ হওয়া পাপঃ উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোন না কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা অবশ্যই বৈধ এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবতঃ সওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর

ফলশ্রুতিতে আশংকা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ্ তা‘আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [কুরতুবী; রাযী]
হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বললেনঃ জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা‘বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহিমী ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ কা‘বার যে অংশকে ‘হাতীম’ বলা হয়, তাও কা‘বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা‘বাগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু’টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিমের দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা‘বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা‘বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণ ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু আশংকা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন মুসলিম হয়েছে। কা‘বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবী রেখেছি। [এ ব্যাপারে দেখুন মুসলিমঃ ১৩৩৩] এটা জানা কথা যে, কা‘বা গৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ‘ইবাদাত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশংকা আঁচ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোন বৈধ এমনকি সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই যে, কোন মুসলিম কোন কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলিমদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলিমকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলিম হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তিলাওয়াত, আযান ও সালাতের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ ‘ইবাদাত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব? এর জবাব এই যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩⑨

১০৯. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা এতে ঈমান আনত(১)। বলুন, ‘নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র কাছেই’। আর কিভাবে তোমাদের উপলব্ধিতে আসবে যে, যখন তা (নিদর্শন) এসে যাবে, তখন

চাই। যেমন মিথ্যা উপাসকদের মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা‘বা গৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবু এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

(১) এ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জিদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরণের মু‘জিযা দাবী করছে। কুরাইশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মু‘জিযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুয়ত মেনে নেব এবং মুসলিম হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আচ্ছা, শপথ কর! যদি এ মু‘জিযা প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলিম হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দু‘আ করার জন্য দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল ‘আলাইহিস্ সালাম ওহী নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেব। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মু‘জিযা দাবী করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে। দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেনঃ এখন আমি এ মু‘জিযার দু‘আ করি না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী; সংক্ষিপ্তসার দেখুন আত-তাফসীরুস সহীহ]

তারা ঈমান আনবে না[১]?

১১০. আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমরাও তাদের অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পাল্টে দেব এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব[২]।

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

চৌদ্দতম রুকূ‘

১১১. আর আমরা তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে সমবেত করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

(১) এ আয়াতে তাদের উক্তির জবাব দেয়া হয়েছে যে, মু‘জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। যেসব মু‘জিযা ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মু‘জিযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মু‘জিযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এত নিদর্শন দেখার পরও যারা ঈমান আনেনি তারা আর ঈমান আনবে না। সুতরাং তাদের জন্য নতুন কোন মু‘জিযা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। [সা‘দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, এভাবেই আমরা তাদেরকে শাস্তি দেব। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয়নি। অথচ তাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌র আহ্বান ও তারই বাণী। সুতরাং তাদের অন্তর চিরন্তন পাল্টে যেতে থাকবে, ঈমান ও তাদের মাঝে বাধা এসে যাবে, তারা সঠিক পথে চলতে সক্ষম হবে না। এটা আল্লাহ্‌র ইনসাফেরই দাবী। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা তাদের নিজের উপর অপরাধ করে, তাঁর অবারিত রহমত দর্শনের পরও তাতে অবগাহন না করে, সঠিক পথ দেখানোর পরও তাতে না চলে, তিনি তাদের থেকে সেটা গ্রহণ করার তাওফীক উঠিয়ে নেন। [সা‘দী]

ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ[১]।

১১২. আর এভাবেই আমরা মানব ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি[২], প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়। যদি আপনার রব ইচ্ছে করতেন তবে তারা এসব করত না; কাজেই আপনি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রটনাকে পরিত্যাগ করুন।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩. আর তারা এ উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের মন যেন সে চমকপ্রদ কথার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয়। আর তারা যে অপকর্ম করে তাই যেন তারা করতে থাকে[৩]।

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪. (বলুন) 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ফয়সালাকারী হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন!' আর আমরা যাদেরকে

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে দেই; বরং এর চাইতেও বেশী ফিরিশ্‌তাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। [মুয়াসসার]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। তারাও নবী-রাসূলগণ যা নিয়ে আসত, তার বিরুদ্ধে লেগে যেত। অতএব, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। [সা'দী]

(৩) এতে এসব পাপাচারী কাজের কারণে তাদের প্রতি ধমকি দেয়া উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার]

কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, নিশ্চয় এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত[১]। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[২]।

(১) অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কুরআনুল কারীমের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। বলা হয়েছে যে, (এক) কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত । এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ- এর মোকাবেলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (দুই) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত কিতাব নাযিল করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. এখানে হারাম ও হালালের বিধান সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করা হয়েছে। কোন প্রকার সন্দেহে ফেলে রাখা হয়নি। দুই. এ কুরআন একসাথে নাযিল করা হয়নি, বরং পর্যায়ক্রমে কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়েছে। যাতে করে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয়। আর যাতে করে তা থেকে প্রয়োজনীয় বিধান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। [কুরতুবী, বাগভী] (তিন) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারারাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা এ কথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কুরআনুল কারীমের এ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর "আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না"। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। তাই এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে উম্মতের অন্যান্য লোকদেরকে শোনানই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে এরূপ সন্দেহ করতে পারে? [ফাতহুল কাদীর] অথবা এখানে ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আর ধরে নেয়ার পর্যায়ে থাকলে সেটা হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [ইবন কাসীর] আয়াতের আরেক অনুবাদ হচ্ছে যে, 'আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহে থাকবেন না যে, যাদের ওপর কিতাব নাযিল হয়েছে তারা এর সত্যতা সম্পর্কে জানে'। [বাগভী, কুরতুবী]

১১৫. আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ[১]। তাঁর বাক্যসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই[২]। আর তিনি সর্বশ্রোতা,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

(১) এ আয়াতে কুরআনুল কারীমের আরো দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কুরআনুল কারীম যে আল্লাহ্‌র কালাম, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে, 'আপনার রব-এর কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।' এখানে ﴿وَتَمَّتْ﴾ শব্দে পরিপূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] কুরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার- (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কুরআনুল কারীমের এ দু'প্রকার সাফল্য সম্পর্কে ﴿صِدْقًا وَّعَدْلًا﴾ দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صدق এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে; অর্থাৎ কুরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। عدل এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব বিধান عدل তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। [ইবন্ কাসীর] অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারো প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৮৬]

কুরআনুল কারীমের এ অবস্থাটি অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন সবই সত্য; এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারো প্রতি কোনরূপ অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণও লঙ্ঘন নেই। কুরআনের এ বৈশিষ্ট্য আরো প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম।

(২) কুরআনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ﴾ অর্থাৎ আল্লাহর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।' তিনি যেটা যে সময়ে হবে বলেছেন সেটা সে সময়ে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। সেটাকে রদ বা পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা কারো নেই। [তাবারী] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর অর্থ বলেন, আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে কেউ রদ করতে পারবে না। তাঁর বিধানকে পরিবর্তন করার অধিকার কারও নেই। অনুরূপভাবে তাঁর ওয়াদার বিপরীতও হবার নয়। [বাগভী] পরিবর্তনের এক প্রকার

সর্বজ্ঞ[১]।

১১৬. আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে[২]। তারা তো শুধু ধারণার

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা । পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্‌র কালামকে পূর্ণ বলার কারণে কারো মনে আসতে পারে যে, কোন কিছু পূর্ণ হওয়ার পর তাতে কি আবার অপূর্ণাঙ্গতা আসবে? এ রকম প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়েছে। আর পরিবর্তনের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। যেমন এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে পরিবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই উর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ অর্থাৎ "আমরাই এ কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক"। [সূরা আল-হিজর:৯] এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাবূহ্য ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? [রুহুল মা'আনী] কুরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দি ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশী ছিল; কিন্তু এর একটি যের-যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কুরআনের পরে আর কোন নবী ও কিতাব আসবে না। এমনকি ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আবার আসবেন তিনি এ কুরআন অনুসারেই জীবন অতিবাহিত করবেন। [রুহুল মা'আনী] এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ রাসূল এবং কুরআন সর্বশেষ কিতাব। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(১) আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্ সব শোনেন এবং সবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন। [তাবারী; আল- মানার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। [ইবন কাসীর] আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কুরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, "আর তাদের আগেও পূর্ববর্তীদের বেশীর ভাগ বিপথগামী হয়েছিল" [সূরা আস-সাফফাত:৭১] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।"

অনুসরণ করে; আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

১১৭. নিশ্চয় আপনার রব, কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে অধিক অবগত। আর সৎপথে যারা আছে, তাদের সম্বন্ধেও তিনি অধিক অবগত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

১১৮. সুতরাং তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে ঈমানদার হলে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তা থেকে খাও;

فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯. আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা থেকে খাবে না? যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের কাছে বিবৃত করেছেন[১], তবে তোমরা নিরুপায়

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

[সূরা ইউসুফ: ১০৩] সুতরাং অনুসরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আলেমদেরই অনুসরণ করতে হবে। যারা জানে না তারা যত বেশীই হোক না কেন তাদের অনুসরণ পথভ্রষ্টতাই ডেকে আনবে [আইসারুত তাফাসীর] এ আয়াত দ্বারা আরো বুঝা গেল যে, সংখ্যাধিক্যতা কোন অবস্থাতেই সঠিক হওয়ার দলীল নয়। কারণ হক বা সঠিক পথ ও মত দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যালঘুতার ভিত্তিতে নয়। সাধারণত, হকপন্থীরা সংখ্যায় কম থাকে, কিন্তু তারা আল্লাহর নিকট সওয়াবের দিক থেকে অধিক অগ্রগামী [সা'দী]

(১) অর্থাৎ কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল তার বিশদ বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোস্ত , আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা পশু, গলা চিপে মারা যাওয়া জন্তু, প্রহারে মারা যাওয়া জন্তু, উপর থেকে পড়ে মারা যাওয়া জন্তু , অন্য প্রাণীর শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু ; তবে যা তোমরা যবেহ্ করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলী দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ নির্ণয় করা, এসব পাপ কাজ। ...অতঃপর কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তবে

হলে তা স্বতন্ত্র[১]। আর নিশ্চয় অনেকে অজ্ঞতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করে; নিশ্চয় আপনার রব সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে অধিক জানেন।

১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে অচিরেই তাদেরকে তারা যা অর্জন করে তার প্রতিফল দেয়া হবে।

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

১২১. আর যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা খেও না; এবং নিশ্চয় তা গর্হিত[২]। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৩] তবে সূরা আল-মায়িদার এ আয়াতটি মদীনায় আবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা আল-আন'আমের এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সে জন্য কুরতুবী বলেন, এখানে 'বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন' বলে 'বিস্তারিত বর্ণনা করবেন' বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] তাছাড়া এ সূরাতেই ১৪৫ নং আয়াতে হারাম বস্তুসমূহের কিছু বর্ণনা এসেছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ উপরোক্ত হারামকৃত বস্তুসমূহও তোমাদের অপারগ অবস্থায় খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন কেউ ক্ষুধায় কাতর হয়ে হালাল বস্তু না পেলে নিরুপায় অবস্থায় তার জন্য মৃত বস্তুও খাওয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। [সা'দী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় নি এমন বস্তু খাওয়া ফিস্‌ক। এখানে ফিস্‌ক অর্থ আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তার বহির্ভূত [জালালাইন] সুতরাং যে সমস্ত প্রাণীর যবেহ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়ে অপর কোন কিছুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, যেমন মূর্তি বা দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হবে, তাও এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। অনুরূপভাবে ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করলে সে প্রাণীও অধিকাংশ আলেমের নিকট এ আয়াতের আওতাভুক্ত হওয়ার কারণে হারাম হবে। [সা'দী]

তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক[১]।

পনরতম রুকূ‘

১২২. যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমরা পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে আর বের হবার নয়? এভাবেই কাফেরদের জন্য তাদের কাজগুলোকে শোভন করে দেয়া হয়েছে।

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক জনপদে সেখানকার অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করতে দিয়েছি; কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. আর যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, ‘আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যা দেয়া হয়েছিল আমাদেরকেও তার অনুরূপ না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনব না।’

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

(১) কাফেররা যখন শুনল যে, মুসলিমরা নিজে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যা যবাই করে তা খায়, আর যা যবাই করা হয় নি, এমনিতেই মারা যায় তারা তা খায় না, তখন তারা বলতে লাগল, ‘আল্লাহ্ স্বয়ং যেটা যবাই করলেন সেটা তোমরা খাও না, অথচ যেটা তোমরা যবাই কর সেটা খাও, (অর্থাৎ এটা কেমন কথা?) [আবু দাউদ: ২৮১৮; ইবন মাজাহ: ৩১৭৩] আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের এ কথার জবাব দিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন [সা‘দী] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আনুগত্যের মধ্যেও শির্ক রয়েছে [কিতাবুত তাওহীদ] অর্থাৎ কেউ কোন কিছু শরী‘আত হিসেবে প্রবর্তন করলো আর অন্যরা তার আনুগত্য করলো, এতে যারা শরী‘আত হিসেবে প্রবর্তন করলো তারা হলো, তাগুত। আর যারা তার আনুগত্য করে সেটা মেনে নিলো তারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করলো। [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস. ৭৮-৭৯, ৪৯০-৪৯৩, ৯৯৫-১০৩১, ১১০৫-১১১৫]

আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত কোথায় অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন। যারা অপরাধ করেছে, তাদের চক্রান্তের কারণে আল্লাহ্‌র কাছে[১] লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি অচিরেই তাদের উপর আপতিত হবে[২]।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. সুতরাং আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ খুব সংকীর্ণ করে দেন; (তার কাছে ইসলামের অনুসরণ) মনে হয় যেন সে কষ্ট করে আকাশে উঠছে[৩]। এভাবেই আল্লাহ্

---

(১) 'আল্লাহ্‌র কাছে' -এর এক অর্থ এই যে, তারা নিজেদেরকে সম্মানিত ভাবলেও আল্লাহ্‌র নিকট তারা সম্মানিত নয়। অথবা কেয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ এই যে, এখানে অর্থ হবে, 'আল্লাহর কাছ থেকে' অর্থাৎ বর্তমানে বাহ্যতঃ তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং আখেরাতেও। [কুরতুবী] যেমন, নবীগণের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানী বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমূখ কুরাইশ সর্দারদের অবস্থা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

(২) অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্রে সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। [কুরতুবী] আল্লাহ্‌র কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে। যা তাদের বর্তমান অহংকারেরই যথাযথ শাস্তি। [সা'দী]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে, "যাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন"। বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ, সহজ করে দেয়া, উদ্যমী করা। আল্লাহ

শাস্তি দেন তাদেরকে, যারা ঈমান আনে না[১]।

১২৬. আর এটাই আপনার রব নির্দেশিত

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا

তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেছেনঃ “যার বক্ষকে আল্লাহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রভূর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নূরের উপর থাকে” [সূরা আয-যুমার: ২২] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ “কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছেন আর তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন কুফরী, ফাসেকী এবং অবাধ্যতা” [সূরা আল-হুজুরাতঃ ৭]। ইবনে আব্বাস বলেনঃ বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ হলোঃ তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তা প্রশস্ত হওয়া। [ইবন কাসীর] তারপর আল্লাহ বলছেনঃ “আর যাকে আল্লাহ্ তা‘আলা পথভ্রষ্ট রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারো আকাশে আরোহণ করা”। মুলত: বক্ষ সংকীর্ণ করার অর্থ, কঠিন, দুর্ভেদ্য করে দেয়া। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ মুনাফিকের কাল্‌ব হলো অনুরূপ সেখানে কোন ভাল কিছু পৌঁছুতে পারে না। [তাবারী; ইবন কাসীর] মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেন, এর অর্থ, সন্দেহে পড়ে থাকা। মানসিক অশান্তিতে বিরাজ করা। [ইবন কাসীর] আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়। সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নেয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রাসূল মূসা আলাইহিস সালাম-কে এ দু‘আ করার আদেশ দিয়েছেনঃ “হে আমার রব! আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিন”। [সূরা ত্বা-হাঃ ২৫]।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে ‘রিজস’ বলে কি বুঝানো হয়েছে তাতে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ এর দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংকীর্ণ বক্ষে শয়তান ঝেঁকে বসে থাকে, ফলে তার ঈমান আনা নসীব হয় না। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ ‘রিজস’ দ্বারা কল্যাণহীন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ঈমান আনবেনা তাদের মন সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সেখানে কোন কল্যাণ নেই। আব্দুর রাহমান ইবনে যাইদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এখানে ‘রিজস’ দ্বারা আযাব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ঈমান আনবেনা তাদের উপর আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে। [তাবারী; বাগভী; ইবন কাসীর]

الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ۝

সরল পথ[১]। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমরা তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি[২]।

---

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে هٰذَا (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মতে কুরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে। অথবা পূর্বে বর্ণিত বিষয়াদি যা দ্বীন হিসেবে পরিগণিত। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কুরআন কিংবা ইসলাম আপনার রব-এর পথ। অর্থাৎ এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে রব-এর দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্ তা'আলার উপকারের জন্য নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য পালনকর্তার দাবীর ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

(২) এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ (এক) رب শব্দকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্বোধন করে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কেননা, পালনকর্তা ও উপাস্যের দিকে কোন বান্দাকে সামান্যতম সম্বন্ধ করা বান্দার জন্য পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, "এটা আপনার প্রভূর রাস্তা" তখন তার সৌভাগ্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না। বান্দার মনে তখন সদা জাগরুক থাকে যে, এটা আল্লাহ্‌র দেয়া পথ। (দুই) مستقيماً শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مستقيماً কে صراط এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর; আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালকের স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম বা সরল হওয়া ছাড়া আর কোন সম্ভাবনাই নাই। এ পথে চলে ভ্রষ্ট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এতে বাড়াবাড়ি বা ছাড় প্রবণতা নেই। আঁকাবাকা পথে নয় বরং স্বাভাবিক পথের দিকেই এটি মানুষকে ধাবিত করে [বাগভী; মানার] (তিন) আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, "আমরা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহকে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছি"। এখানে ﴿فَصَّلْنَا﴾ শব্দটি تفصيل থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কোন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব, تفصيل এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিস্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, এতে কোন সংক্ষিপ্ততা

১২৭. তাদের রব-এর কাছে তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয়[১] এবং তারা যা করত তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক[২]।

لَهُمۡ دَارُ السَّلٰمِ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ وَهُوَ وَلِيُّهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٢٧﴾

বা অস্পষ্টতা রাখিনি। [আইসারুত তাফাসীর] (চার) এতে ﴿لِقَوۡمٍ يَّذَّكَّرُوۡنَ﴾ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিস্কার হলেও, তা দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে; জিদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। [তাবারী; সা'দী]

(১) অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কুরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ কুরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস্-সালাম'-এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস্-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট-শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে। [তাবারী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] অথবা দারুস সালাম এ জন্যই তাদের জন্য থাকবে, কারণ তারা সিরাতে মুস্তাকিমে চলার কারণে নিজেদেরকে নিরাপত্তায় রাখতে সামর্থ হয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতিফল তো তা-ই হওয়া বাঞ্ছনীয় যা নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আবদ্ধ। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'সালাম' আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। 'দারুস্-সালাম' অর্থ আল্লাহ্‌র গৃহ। আল্লাহ্‌র গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারো তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। অর্থাৎ জান্নাত। [তাবারী] জান্নাতকে দারুস্-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাব বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। [সা'দী] এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রাসূলও কখনো লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে 'দারুস্-সালাম' রয়েছে। 'প্রতিপালকের কাছে' -এর অর্থ এই যে, এ দারুস্-সালাম দুনিয়াতে নগদ পাওয়া যাবে না; কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় রব-এর কাছে যাবে, তখনই তা পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস্-সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। রব নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস্-সালামের নেয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন। [সা'দী]

১২৮. আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং বলবেন, ‘হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছিলে[১]’ এবং মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অপর কিছু সংখ্যক দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি’। আল্লাহ্ বলবেন, ‘আগুনই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের অভিভাবক। [ইবন কাসীর] দুনিয়াতে অভিভাবক হিসেবে তিনি তাদেরকে সঠিক পথের হিদায়াত দেন। আর আখেরাতে তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিফল দেন। [বাগভী] আর আল্লাহ্ যাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান, তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

(১) এ আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার পর উভয় দলের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা শয়তান জ্বিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন, তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছ। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে রেখেছ। আর তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলে। তোমরা মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করেছ। সুতরাং আজ তোমাদের উপর আমার লা‘নত অবশ্যম্ভাবী, আমার শাস্তি অপ্রতিরোধ্য। তোমাদের অপরাধ অনুপাতে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিব। কিভাবে তোমরা আমার নিষিদ্ধ বিষয়ে অগ্রগামী হলে? কিভাবে আমার রাসূল ও নেক বান্দাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে? অন্যদের পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে তোমাদের কোন ওজর আপত্তি শোনা হবে না। আজ তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করারও কেউ নেই। তখন তাদের উপর যে শাস্তি, অপমান ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে সেটা অবর্ণনীয়। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কুরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শুনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেয়ার জন্য মুখই খুলতে পারবে না। [সা‘দী]

সেখানে স্থায়ী হবে,’ যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছে করেন। নিশ্চয় আপনার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ[১]।

১২৯.আর এভাবেই আমরা যালিমদের কতককে কতকের বন্ধু বানিয়ে দেই, তারা যা অর্জন করত তার

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

(১) এরপর মানব শয়তান অর্থাৎ দুনিয়াতে যে সমস্ত মানব শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টতঃ এখানে উল্লেখ করা না হলেও অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ “হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে নবীগণের মাধ্যমে অঙ্গীকার নেইনি যে, শয়তানের ইবাদাত (অনুসরণ) করো না”? [সূরা ইয়াসীন:৬০] এতে বোঝা যায় যে, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরো বলবেঃ হ্যাঁ, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে; যেমন, মূর্তিপূজারীর মধ্যে বরং বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক মূর্খ মুসলিমের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত আছে, যা দ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি তারা মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এখন আপনি যে শাস্তি দিতে চান তা দিতে পারেন। কারণ এখন আপনারই একচ্ছত্র ক্ষমতা। এভাবে তারা যেন আল্লাহ্র কৃপাই পেতে চাইবে। কিন্তু এটা কৃপা করার সময় নয়। তাই এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ্ তা‘আলা বলবেনঃ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ্ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কুরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাও চাইবেন না। তাই অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে। [সা‘দী]

কারণে [১]।

ষোলতম রুকূ'

১৩০. 'হে জিন ও মানুষের দল! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের কাছে আসেনি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।' বস্তুত

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

(১) আয়াতে نُوَلِّي শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। মুফাস্‌সিরীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে। (এক) শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া, বন্ধু বানিয়ে দেয়া। যারা তাদেরকে তাদের কর্মের কারণে পথভ্রষ্টতার দিকে চালিত করবে। আব্দুল্লাহ্‌ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, ইবন যায়েদ, মালেক ইবনে দীনার রাহিমাহুমুল্লাহ্‌ প্রমূখ মুফাস্‌সিরীন থেকে এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তাফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন যালিমকে অপর যালিমের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এক কে অপরের হাতে শাস্তি দেন। তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর এমন কাউকে বসাবেন, এমন কাউকে সাথে জুড়ে দেবেন যারা তাদেরকে হক পথে চলা থেকে দূরে রাখবে, হক পথের প্রতি ঘৃণা ছড়াবে। খারাপ কাজের প্রতি উৎসাহ দেবে। এভাবেই মানুষের মধ্যে যখন ফাসাদ ও যুলমের আধিক্য হয়, আর আল্লাহ্‌র ফরয আদায়ে মানুষের মধ্যে গাফিলতি সৃষ্টি হয় তখনই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের উপর তাদের গোনাহের শাস্তিস্বরূপ এমন কাউকে বসিয়ে দেন যারা তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবে। [বাগভী; ইবন কাসীর; সা'দী] (দুই) আয়াতে বর্ণিত نُوَلِّي শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে, পরস্পরকে যুক্ত করে দেয়া ও নিকটবর্তী করে দেয়া। সায়ীদ ইবনে যুবায়ের, কাতাদাহ্‌ রাহিমাহুমাল্লাহ্‌ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে মানুষের দল বিভিন্ন বংশ, দেশ কিংবা ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল মুসলিম যেখানেই থাকবে, সে মুসলিমদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্য থেকে থাকুক না কেন। এরপর মুসলিমদের মধ্যেও সৎ ও দ্বীনী লোকেরা সৎ ও দ্বীনী লোকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে পাপী ও কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেয়া হবে। [বাগভী; ইবন কাসীর]।

দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল[১], আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দেবে, যে তারা কাফের ছিল[২] ।

(১) এ আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জ্বিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এইঃ তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার নবী পৌঁছেননি? তিনি তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে নবীগণের আগমন, আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী] এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি; বরং আল্লাহ্ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ অর্থাৎ তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই মূখ্য মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়। এভাবে তারা দুনিয়ার জীবনে রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের আনিত সত্যে ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল। তাদের উপস্থাপিত মু'জিযার বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এভাবে তারা হাশরের মাঠে নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, তারা দুনিয়াতে কাফের ছিল। আয়াতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও শির্ক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং রব-এর দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে, ﴿وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ﴾ অর্থাৎ আমাদের রব-এর কসম, আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না। [সূরা আল-আন'আম:২৩] অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শির্ক স্বীকার করে নেবে। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সে মতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরাত-বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। সেদিন আল্লাহ্‌র কুদরাতে সেগুলো বাকশক্তিপ্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিস্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে। তখন জ্বিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহ্বা সবই ছিল আল্লাহ্‌র গুপ্ত প্রহরী, যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিস্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে। [যামাখশারী; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

১৩১. এটা এ জন্যে যে, অধিবাসীরা যখন গাফেল থাকে, তখন জনপদসমূহের অন্যায় আচরনের জন্য তাকে ধ্বংস করা আপনার রব-এর কাজ নয়[১]।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২. আর তারা যা আমল করে, সে অনুসারে প্রত্যেকের মর্যাদা রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে আপনার রব গাফেল নন।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. আর আপনার রব অভাবমুক্ত, দয়াশীল[২]। তিনি ইচ্ছে করলে

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্ তা‘আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে নবীদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হিদায়াতের আলো প্রেরণ করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আদেশ-নিষেধ প্রদান না করবে। তাদেরকে আদেশ না মানার পরিণতি ও নিষেধে পতিত হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে জাগ্রত না করা হয়। যুলমের শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান না করা হয়। [ইবন কাসীর; আইসারুত তাফাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবী ও আসমানী কিতাবসমূহের অব্যাহত ধারা এজন্য ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ‘ইবাদাত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তাঁর কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়া গুণেও গুনান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ। নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতি-নীতিও জানে না। বিশেষতঃ অস্তিত্বের যে নেয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দো‘আ করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দো‘আ করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিস্ক প্রভৃতি এগুলো কোন মানব চেয়েছিল কি?

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ শব্দ দ্বারা বিশ্বপালকের অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথেই ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি করুণাময়ও বটে। অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্ তা‘আলারই বিশেষ গুণ। মানুষের মধ্যে এ গুণ

وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ

তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছে তোমাদের স্থানে আনতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

১৩৪. নিশ্চয় তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না[১]।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

১৩৫. বলুন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ কর, নিশ্চয় আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময়[২]। নিশ্চয় যালিমরা সফল হয় না।’

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ

১৩৬. আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন সে সবের মধ্য থেকে তারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট

নেই, কেননা, মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষি হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হত। আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, “মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষি দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে।” [সূরা আল-‘আলাক: ৬-৭] তাই আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকরী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমণ করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সে আযাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

(২) অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে, তখন কার পরিণাম ভালো সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। [মুয়াসসার]

بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ‘এটা আল্লাহ্‌র জন্য এবং এটা আমাদের শরীকদের[১] জন্য’। অতঃপর যা তাদের শরীকদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না নিকৃষ্ট[২]!

(১) অর্থাৎ মূর্তি, বিগ্রহ ইত্যাদি যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক নির্ধারণ করেছে তাদের জন্য। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানী হত, তার এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্‌র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হতো এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়েত ও রক্ষকদের জন্য ব্যয় করতো।
প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরো অবিচার করত এই যে, কখনো উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলতঃ আল্লাহ্ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্‌র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলতঃ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কুরআনুল কারীম তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছেঃ ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ অর্থাৎ তাদের এ বিচার পদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একপেশে। যে আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলনা ও কৌশলে অন্য দিকে পাচার করে দিয়েছে।
কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারীতে মুসলিমদের জন্য শিক্ষাঃ এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুশিয়ারী। এতে ঐসব মুসলিমের জন্যও শিক্ষার চাবুক

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

১৩৭. আর এভাবে তাদের শরীকরা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করেছে, তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের দ্বীন সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তারা এসব করত না। কাজেই তাদেরকে তাদের মিথ্যা রটনা নিয়েই থাকতে দিন।

وَقَالُوا هٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

১৩৮. আর তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছে করি সে ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না,' এবং কিছু সংখ্যক গবাদি পশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক পশু যবেহ্ করার সময় তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। এ সবকিছুই তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা

রয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে। বয়স ও সময়ের এক অংশকে তারা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে; অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই 'ইবাদাত ও আনুগত্যের ওয়াক্‌ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও আল্লাহ্‌র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্তটুকু আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত সময় তথা সালাত, তেলাওয়াত ও 'ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের থেকে কেটে নেই। কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব 'ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং সব মুসলিমদেরকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

রটনার উদ্দেশ্যে বলে; তাদের এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাদেরকে দেবেন।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. তারা আরো বলে, ‘এসব গবাদি পশুর পেটে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এটা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর সেটা যদি মৃত হয় তবে সবাই এতে অংশীদার।’ তিনি তাদের এরূপ বলার প্রতিফল অচিরেই তাদেরকে দেবেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ[১]।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা নির্বুদ্ধিতার জন্য ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে নিষিদ্ধ গণ্য করেছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না[২]।

---

(১) এ আয়াতসমূহে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মূর্খ মানুষ ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্-প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল, স্ত্রীলোকদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তু স্ত্রীলোকদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

(২) অর্থাৎ তারা তাদের পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল, তাদের কোন কাজেই হিদায়াত নসীব হয় নি। [সা'দী] আর তাদের মধ্যে হিদায়াত পাবার যোগ্যতাও ছিল না। [ফাতহুল কাদীর]

সতেরতম রুকূ‘

১৪১. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচানির্ভর অপর কিছু মাচানির্ভর নয় এবং খেজুর বৃক্ষ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, আর যায়তুন ও আনার, এগুলো একটি অন্যটির মত, আবার বিভিন্ন রূপেরও। যখন ওগুলো ফলবান হবে তখন সেগুলোর ফল খাবে এবং ফসল তোলার দিন সে সবের হক প্রদান করবে[১]। আর অপচয় করবে না;

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ڮ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

(১) বিভিন্ন বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু’টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবীর পরিপূরক। বলা হয়েছেঃ এসব বৃক্ষের ও শস্যক্ষেত্রের ফল ভক্ষন কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। ‘ফলন্ত হয়’ একথা বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার- পরিপক্ক হোক বা না হোক।

দ্বিতীয় নির্দেশ হলোঃ এ সমস্ত জমীনের ফসল কাটার সময় তার হক্ব আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حصاد বলা হয়। حصادশব্দের পরে ব্যবহৃত ہ সর্বনাম পূর্বোল্লেখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। ‘হক’ বলে ফকীর-মিসকীনকে দান করা বুঝানো হয়েছেঃ ﴿وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّاۗىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾ অর্থাৎ সৎ লোকদের ধন-সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে ফকীর-মিসকীনদের।

এখানে সাধারণ দান-সদকা বোঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের যাকাত ও ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের দু’রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে আর যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয করা

নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

১৪২. আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু সংখ্যক ভারবাহী ও কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ যা রিযিকরূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু;

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾

১৪৩. নর ও মাদী আটটি জোড়া[১], মেষের দুটি ও ছাগলের দুটি; বলুন, ‘নর দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কিংবা মাদী দুটিই অথবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর’[২];

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

হয়েছে। তাই এখানে ‘হক’-এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় নাযিল বলেছেন এবং حق -এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন। তাদের মতে যেসব ক্ষেতে পানি সেচনের ব্যবস্থা নেই, শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপ, নদী-নালা, পুকুর ইত্যাদির পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব। এটাও বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(১) অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত গবাদি পশুর মধ্যে উট গরু ও ছাগল মিলিয়ে আট প্রকার। সেগুলোকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর কোনটিই আল্লাহ্ হারাম করেননি। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ উপরোক্ত আট প্রকার আবার দু’ শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারটি ছাগল জাতীয় বা ছোট আকারের। দুটি হচ্ছে নর ও মাদী মেষ। বাকী দু’টি হচ্ছে ছাগলের নর ও মাদী। বলুন হে রাসূল, আল্লাহ্ তা‘আলা কি ছাগল জাতীয় পশুর দু’প্রকার নরকে হারাম করেছেন? যদি তারা বলে, হ্যাঁ; তবে তারা মিথ্যা বলবে। কেননা তারা ছাগল ও মেষের প্রতিটি নরকে নিষিদ্ধ মনে করে না। আবার আপনি তাদেরকে আরো জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ্ তা‘আলা কি ছাগল জাতীয় পশুর দু’প্রকার মাদীকে হারাম করেছেন? যদি তারা হ্যাঁ বলে, তবে তারা মিথ্যা বলবে। কেননা তারা ছাগল ও মেষের প্রত্যেক মাদীকে নিষিদ্ধ মনে করে না। তাদেরকে আরও জিজ্ঞাসা করুন,

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. এবং উটের দুটি ও গরুর দুটি। বলুন, 'নর দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কিংবা মাদী দুটিই অথবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা? নাকি আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দান করেন তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে?' কাজেই যে ব্যক্তি না জেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

আঠারতম রুকূ'

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. বলুন, 'আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে, লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ছাড়া[১]। কেননা এগুলো অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য উৎসর্গের কারণে'। তবে যে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না

আল্লাহ্ তা'আলা কি মেষ ও ছাগলের মাদীর গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? যদি তারা হ্যাঁ বলে, তবে তারা আবারও মিথ্যা বলবে, কেননা তারা গর্ভে অবস্থিত সকল ভ্রূণকেই নিষিদ্ধ মনে করে না। অতএব আমাকে এমন এক জ্ঞান ও প্রমাণের সন্ধান দাও, যা দ্বারা তোমাদের মতের সত্যতা বুঝতে পারি, যদি তোমরা তোমাদের রবের ব্যাপারে যা বলো সে বিষয়ে সত্যবাদী হও। [মুয়াসসার]

(১) পরবর্তীতে হাদীসের মাধ্যমে আরও কিছু প্রাণী ও পাখী হারাম করা হয়। যেমন প্রতিটি থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখী ও দাঁত দিয়ে আক্রমণকারী প্রাণী, কুকুর ও গৃহপালিত গাধা। সেগুলো সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখী ও দাঁত দিয়ে আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন"। [মুসলিম: ১৯৩৪]

করে নিরুপায় হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয় আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪৬. আর আমরা ইয়াহূদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে এগুলোর পিঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ছাড়া, তাদের অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে এ প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. অতঃপর যদি তারা আপনার উপর মিথ্যারোপ করে, তবে বলুন, ‘তোমাদের রব সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।’

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮. যারা শির্‌ক করেছে অচিরেই তারা বলবে, ‘আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করতাম না।’ এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল, অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি ভোগ করেছিল। বলুন, ‘তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া কথা বল[১]।’

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

(১) মহান আল্লাহ্ এখানে এটাই বলছেন যে, এ এমন একটি খোঁড়া দলীল যা প্রতিটি মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী উম্মত তাদের রাসূলদের সাথে ব্যবহার করেছে। এর মাধ্যমে তারা রাসূলদের দাওয়াতকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু এ জাতীয় দলীল-

প্রমাণাদি ও যুক্তি-তর্কাদি তাদের কোন কাজে আসে নি। তারা এর মাধ্যমে সাময়িক বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি আপতিত হয়েছে, আর তারা ধ্বংস হয়েছে। যদি তাদের এসব যুক্তি-তর্ক সঠিক হত, তবে তা সে সমস্ত উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। আর যেহেতু তাদের উপর আযাব আপতিত হয়েছিল এবং এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তির অধিকারী না হলে কাউকে শাস্তি দেন না, এতেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাদের এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ অযৌক্তিক, বরং মিথ্যা সন্দেহ। কারণ: যদি তাদের যুক্তি সঠিক হত, তবে তাদের উপর শাস্তি আসত না।

যে কোন যুক্তি-প্রমাণ জ্ঞান ও দলীল নির্ভর হতে হয়, কিন্তু যদি সেটি হয় কেবল অনুমান ও ধারণা নির্ভর, তবে সেটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। কেননা, ধারণা কখনো সত্য ও সঠিক পথের দিশা দেয় না। সুতরাং সেটি বাতিল হতে বাধ্য। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে কাফেরদের দাবীর বিপরীতে বলছেন যে, 'তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে?' যদি তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান থাকত, তবে তাদের মত ভীষণ ঝগড়াটে লোক তা পেশ করা থেকে পিছপা হতো না। তারপরও যখন তারা জ্ঞান-ভিত্তিক দলীল প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে, তখন এটাই প্রমাণ করছে যে, তাদের দাবীর সপক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। বরং তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া কথা বল"। আর যে তার প্রমাণাদি কল্পনা নির্ভর করেছে সে অবশ্যই ভুলের উপর আছে। তদুপরি যদি সে সীমালঙ্ঘন ও অনাচারের আশ্রয় নেয়, তাহলে সেটা যে কেমন অন্যায় তা বলাই বাহুল্য।

চূড়ান্ত প্রমাণাদির মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। যার প্রমাণ পেশের পরে আর কারও কোন ওজর-আপত্তি থাকতে পারে না। যার প্রদত্ত প্রমাণের সত্যতার উপর সমস্ত নবী-রাসূল, আসমানী কিতাবসমূহ, নবীদের মতামত, সঠিক বিবেক, সরল-সোজা মনের টান, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীও সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং এ সব অকাট্য প্রমাণের বিপরীতে কাফের ও মুশরিকদের যুক্তি অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। কারণ, হক্কের বিপরীতে বাতিল ছাড়া আর কিছু নেই।

তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টিকেই কোন কিছু করার ও ইচ্ছা করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কারও অসাধ্য কোন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেন নি। তাছাড়া এমন কিছুও হারাম করেন নি, যা ত্যাগ করা মানুষের জন্য অসম্ভব। সুতরাং এরপরও ভাগ্য ও পূর্ববর্তী ফয়সালার দোহাই দেয়া শুধু অন্যায়ই নয় বরং গোঁড়ামী।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে তাদের কাজের জন্য জবরদস্তি করেননি। বরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদেরই পছন্দ অনুসারে নির্ধারণ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. বলুন, ‘চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌রই[১]; সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হিদায়াত দিতেন।’

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. বলুন, ‘আল্লাহ্ যে এটা নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে হাযির কর।’ তারা সাক্ষ্য দিলেও আপনি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেন না। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না। আর তারাই তাদের রব-এর সমকক্ষ দাঁড় করায়।

করেছেন। যদি তারা চায় করবে, না চাইলে করবে না। এটা এমন এক বিষয় যার বাস্তবতা অস্বীকার করার জো নেই। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে অবশ্যই উদ্ধত ও গোঁয়ার। সে যেন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে অস্বীকার করেছে। প্রতিটি মানুষই ইচ্ছাকৃত নড়াচড়া ও ইচ্ছাবহির্ভুত নড়াচড়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। যদিও সবই আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছার অধীন।

যারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অন্যায় কাজের পক্ষে দলীল পেশ করে, তারা স্ববিরোধিতায় লিপ্ত। তারা এ দোহাই সব জায়গায় মেনে নেয় না। যদি কেউ তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে কিংবা তাদের সম্পদ হরণ করে বা অনুরূপ কোন কাজ করে, এবং বলে যে, তোমার ভাগ্যে ছিল, তাহলে তারা সেটাকে গ্রহণ করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে মোটেই পিছপা হয় না। সুতরাং তাদের জন্য আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, তারা অন্যায় ও অপরাধের সময় শুধু ভাগ্যের দোহাই দেয়, অন্য সময় নয়।

তাদের ভাগ্যের দোহাই দেয়া উদ্দেশ্য নয়, তারা জানে যে এটি কোন প্রমাণও নয়। বরং এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, হকের বিরোধিতা করা। তারা হক কথা ও কাজকে আক্রমনকারী মনে করে তা দূর করার জন্য মনে যা আসে তাই বলে, যদিও তারা নিশ্চিত যে তা ভুল। [সা‘দী]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছেই চুড়ান্ত প্রমাণাদি। তাঁর প্রমাণাদি দ্বারা তিনি তোমাদের যাবতীয় ধারণা ও অনুমানের মুলোৎপাটন করতে পারেন। [মুয়াসসার]

ঊনিশতম রুকূ'

১৫১. বলুন[১], 'এস[২], তোমাদের রব

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا

(১) আগত আয়াতসমূহে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "এ দ্বীনই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর"। এতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীন যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে- নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত পথকে অনুসরনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাঁর পথ ব্যতীত আরও বহু পথ রয়েছে সেগুলো মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। সঠিক পথ একটি, আর বাতিল পথ অনেক। যারা আল্লাহর পথে চলবে আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। [সা'দী]

আগত আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, (১) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে 'ইবাদাত ও আনুগত্যে অংশীদার স্থির করা, (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা, (৯) আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহ্ তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা। মুফাস্‌সির আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ সূরা আলে ইমরানের মুহ্‌কাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। আদম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের শরী'আতই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন দ্বীন বা শরী'আতে এগুলোর কোনটিই মনসূখ বা রহিত হয়নি। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৭] আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ যে বিষয়ের উপর ছিলেন সেটা জানতে চায় সে যেন সূরা আল-আন'আমের এ আয়াতগুলো পড়ে নেয়। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতগুলোর প্রথমেই বলা হয়েছে تعالوا যার অর্থঃ 'এস'। মূলতঃ উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদেরকে নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। [কাশশাফ; কুরতুবী] এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন, এস, যাতে আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা

تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا

তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা তিলাওয়াত করি, তা হচ্ছে, 'তোমরা তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না[১], পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে[২], দারিদ্র্যের

তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারো কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই [বাগভী] যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর। এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন- মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর। [দেখুন, তাফসীর আল-মানার]

(১) **সর্বপ্রথম মহাপাপ শির্ক, যা হারাম করা হয়েছেঃ** সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করো না। আরবের মুশরিকদের মত দেব-দেবীদেরকে বা মূর্তিকে ইলাহ্ বা উপাস্য মনে করো না। ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত নবীগণকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করো না। অন্যদের মত ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যা দিও না। মূর্খ জনগণের মত নবী ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করো না। আল্লাহ্‌র জন্য যে সমস্ত 'ইবাদাত করা হয়, তা অপর কাউকে দিও না; যেমন, দো'আ, যবেহ্, মানত ইত্যাদি।
এখানে شَيْـًٔا এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শির্ক ও 'খফী' অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন শির্ক- এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শির্কের অর্থ সবাই জানে যে, 'ইবাদাত-আনুগত্য অথবা অন্য বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শির্ক এই যে, নিজ কাজ-কর্মে দ্বীনী ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ্ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করেও কার্যতঃ অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো 'ইবাদাত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য সালাত ইত্যাদি ঠিকমত আদায় করা, নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-সদকা করা অথবা কার্যতঃ লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শির্কের অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন, আল-মানার; সা'দী; আশ-শির্ক ফীল কাদীম ওয়াল হাদীস, ১৬৮-১৮০; ১২৯৫-১৩১০]

(২) **দ্বিতীয় গোনাহ্ পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহারঃ** আয়াতে বলা হয়েছেঃ "পিতা-

بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিয্‌ক দিয়ে থাকি[১]। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের ধারে-

মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা"। উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না; কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখবিধানকে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে, "আপনার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। [সূরা আল-ইসরা: ২৩] অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, "আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার। তারপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন"। [সূরা লুকমান:১৪] অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে। তাছাড়া আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি'? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'সঠিক ওয়াক্তে সালাত আদায় করা', তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ 'এরপর কোন্‌টি'? উত্তর হলঃ 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার'। আবার প্রশ্ন করলেনঃ 'এরপর কোন্‌টি'? উত্তর হলঃ 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ'। [বুখারীঃ ৫২৭, মুসলিমঃ ৮৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন, 'লাঞ্ছিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে।' সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কে লাঞ্ছিত হয়েছে'? তিনি বললেনঃ 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে নি'। [মুসলিমঃ ২৫৫১]

(১) **তৃতীয় হারাম- সন্তান হত্যাঃ** আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতোপূর্বে পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছেঃ "দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমরা তোমাদেরকে এবং তাদেরকে- উভয়কেই জীবিকা দান করব"। জাহেলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষণ্ড প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কুরআনুল কারীম এ কু-প্রথা রহিত করে দিয়েছে। [ইবন কাসীর]

কাছেও যাবে না[১] । আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না[২] ।’

---

(১) **চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজঃ** আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না” । فواحش শব্দের সাধারণ অর্থঃ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ কাজ । যাবতীয় বড় গোনাহ্ فحشاء ও فحش এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত গোনাহ্‌কে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় । এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেও না । কাছে যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিশ ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা যেখানে গেলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যা দ্বারা এসব গোনাহ্‌র পথ খুলে যায় । কারণ, যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায় । [সা’দী] অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, “বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা ।” [সূরা আল-আ’রাফ: ৩৩] অনুরূপভাবে অন্যত্র এসেছে, “আর তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর” [সূরা আল-আন‘আম: ১২০] এ সব আয়াত একই অর্থবোধক । এসব আয়াতেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী আত্মাভিমানী কেউই নেই, সেজন্য তিনি প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা হারাম ঘোষণা করেছেন ।’ [বুখারী: ৪৬৩৪; মুসলিম: ২৭৬০]

(২) **পঞ্চম হারাম বিষয় অন্যায় হত্যাঃ** এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “আল্লাহ্ তা‘আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে” । এ ‘ন্যায়ভাবে’র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলিমের খুন হালাল নয় । (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (দুই) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কেসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং (তিন) সত্যদ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলিমদের জামা‘আত থেকে পৃথক হয়ে গেলে । [বুখারীঃ ৬৮৭৮, মুসলিমঃ ১৬৭৬]

বিনা কারণে মুসলিমকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলিমকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলিমের চুক্তি থাকে । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে । যে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না । অথচ জান্নাতের সুগন্ধী সত্তর বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যায় । [ইবন মাজাহ্: ২৬৮৭]

তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা বুঝতে পার।

১৫২. আর ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির ধারে-কাছেও যাবে না[১] এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে[২]। আমরা কাউকেও

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ

(১) **ষষ্ঠ হারাম ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করাঃ** এ আয়াতে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ যে ভক্ষণ করা হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ “ইয়াতীমের মালের কাছেও যেও না; কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বালেগ হয়ে যায়”। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন ইয়াতীমদের সম্পদকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেয়ার ব্যাপারে নিকটবর্তীও না হয়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, “যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।” [সূরা আন-নিসা:১০] তবে ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবতঃ লোকসানের আশঙ্কা নেই- এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। ইয়াতীমদের অভিভাবকদের এ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে এরপর ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, “সে বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত”। অর্থাৎ বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে। أَشُدَّ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমগণের মতে বয়োঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়োঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে, তাদের মধ্যে নিজের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। যোগ্যতা দেখলে বয়োঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। [কুরতুবী]

(২) **সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করাঃ** এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। ‘ন্যায়ভাবে’ বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না। দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশী করাকে কুরআন কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। মুফাস্‌সির আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ ‘ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে’। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; আদ-দুররুল মানসূর] আলোচ্য আয়াতে এরপর

اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

তার সাধ্যের চেয়ে বেশী ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও[১] এবং আল্লাহ্‌কে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে[২]। এভাবে

বলা হয়েছে, “আমরা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না।” এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন করো, তারপরও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায়, তবে তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; সা‘দী]

(১) **অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারামঃ** বলা হয়েছে, “তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আত্মীয়ও হয়”। এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নাই। তাই সাধারণ মুফাস্‌সিরীনগণের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারে সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক- সব ক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [কুরতুবী] মোকাদ্দমার সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা পরিস্কার বলে দেয়া- অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারো উপকার কিংবা কারো অপকারের ভ্রূক্ষেপ না করা। মোকাদ্দমার ফয়সালার সাক্ষীদেরকে শরী‘আতের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারো বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং কারো শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। আত্মীয়তা বা অনাত্মীয় যেই হোক না কেন ন্যায় ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া না করা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা‘দী; আইসারুত তাফাসীর; মুয়াসসার]

(২) **নবম নির্দেশঃ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করাঃ** বলা হয়েছে, “আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর”। এ অঙ্গীকারের দাবী হল এই যে, পালনকর্তার কোন নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে। এছাড়া এর অর্থ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রাসূলদের মুখে যে সমস্ত অঙ্গীকারের ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ করা। আল্লাহ্ বলেন, “হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? [সূরা ইয়াসীনঃ ৬০] আরও বলেন, “আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার

আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৫৩. আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর[১] এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না[২], করলে তা তোমাদেরকে তাঁর

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর" [সূরা আন-নাহল: ৯১] অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যকার পরস্পর যে সমস্ত অঙ্গীকার হয়ে থাকে সেগুলোই উদ্দেশ্য। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করবে" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭] মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরী'আতের যাবতীয় আদেশ নিষেধের মধ্যে পরিব্যপ্ত।

(১) **দশম নির্দেশঃ "ইসলামকে আঁকড়ে থাকবে"**। বলা হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত শরী'আতই হল আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চলো না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এখানে هٰذا শব্দ দ্বারা দ্বীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, তখন মনযিলে মকসূদের বা অভিষ্ট লক্ষ্যের সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা সেসব পথে চলো না। কেননা, সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ্ থেকে দূরেই সরে পড়বে। হাদীসে এসেছে, নাওয়াস ইবন সাম'আন আল-কিলাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন; একটি সরল পথ, এ পথের দু'পাশে প্রাচীর রয়েছে, তাতে দরজাগুলো খোলা। আর প্রত্যেক দরজার উপর রয়েছে পর্দা। পথটির মাথায় এক আহ্বানকারী আহ্বান করছে, আর তার উপর আরেক আহ্বানকারী আহ্বান করছে যে, 'আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন'। পথের দু'পাশের দরজাগুলো হল আল্লাহ্ তা'আলার সীমারেখা, যে কেউ আল্লাহ্‌র সীমারেখা লঙ্ঘন করবে তার জন্য সে পর্দা তুলে নেয়া হবে। উপরের আহ্বানকারী হল তার রব আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ প্রদানকারী'। [তিরমিযীঃ ২৮৫৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত এবং সূরা আশ-শূরার ১৩ নং আয়াতসহ এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনের যাবতীয় আয়াত

পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।

১৫৪. তারপর আমরা মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যে ইহসান করে তার জন্য পরিপূর্ণতা, সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত এবং রহমতস্বরূপ---যাতে তারা তাদের রব-এর সাক্ষাত সম্বন্ধে ঈমান রাখে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

বিশতম রুকূ'

১৫৫. আর এ কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি - বরকতময়। কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. যেন তোমরা না বল যে, 'কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল; আমরা তাদের

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

সম্পর্কে বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে পৃথক ও আলাদা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহ্‌র দ্বীনে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ার কারণে ধ্বংস হয়েছিল। [তাবারী}

কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ছাঁচে ঢেলে নিক এবং স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো গাফিল ছিলাম,'

১৫৭. কিংবা যেন তোমরা না বল যে, 'যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল হত, তবে আমরা তো তাদের চেয়ে বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম[১]।' সুতরাং অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত এসেছে। অতঃপর যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যারা আমাদের আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সত্যবিমুখিতার জন্য অচিরেই আমরা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দেব।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কুরআন নাযিল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য হচ্ছে, মক্কার কাফেরদের কোন ওযর-আপত্তি অবশিষ্ট না রাখা। তারা হয়ত বলতে পারত যে, আমাদের প্রতি যদি কোন কিতাব নাযিল করা হতো যেমনিভাবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তবে অবশ্যই আমরা বেশী হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার সুযোগ আর রাখলেন না। অন্য আয়াতে এসেছে যে, তারা শপথ করে সেটা বলত। কিন্তু যখন তাদের কাছে কিতাব নাযিল করা হলো তখন তাদের জন্য শুধু হঠকারিতাই বৃদ্ধি করল। আল্লাহ্ বলেন, "আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসলে তারা অন্য সকল জাতির চেয়ে সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে; তারপর যখন এদের কাছে সতর্ককারী আসল তখন তা শুধু তাদের দূরত্বই বৃদ্ধি করল--- যমীনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। আর কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করবে" [সূরা ফাতির:৪২-৪৩] [আদওয়াউল বায়ান] সুদ্দী বলেন, আয়াতের অর্থ, তোমাদের কাছে স্পষ্ট আরবী ভাষায় দলীল-প্রমাণাদি এসেছে, যখন তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিতাব পড়তে অক্ষম। আর যখন তোমরা বলেছিলে, আমাদের কাছে কিতাব আসলে তো আমরা তাদের থেকেও বেশী হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। [তাবারী]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তারা শুধু এরই তো প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা আসবে, কিংবা আপনার রব আসবেন, কিংবা আপনার রব-এর কোন নিদর্শন আসবে[১]? যেদিন আপনার রব-এর কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না,

(১) সূরা আল-আন‘আমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হে কাফের সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু‘জিযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তার সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মু‘জিযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্য সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, ঈমান আনার জন্য আর কিসের অপেক্ষা? এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছেঃ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তাদের কাছে পৌঁছবে। না কি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কেয়ামতের কোন একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে?
বিচার-ফয়সালার জন্য কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তা‘আলার উপস্থিতি কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তা‘আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরণের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা কেয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কিভাবে উপস্থিত হবেন, এ আলোচনা নিষিদ্ধ। কোন কোন আয়াতে এসেছে যে, আল্লাহ্‌র সাথে ফেরেশতাগণও কাতারে কাতারে উপস্থিত হবেন। "আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশ্‌তাগণও" [আল-ফাজর:২২] আবার কোথাও এসেছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা মেঘের ছায়া সমেত উপস্থিত হবেন। "তারা কি শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১০] এসবগুলোই সত্য। এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয। তবে কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

যে পূর্বে ঈমান আনেনি[১] অথবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করেনি[২]। বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা

(১) এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবূল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তাওবাও কবূল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তাওবা করতে চায়, তবে তা কবূল হবে না। কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তাওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবূল হতে পারে। আল্লাহ্র শাস্তি ও আখেরাতের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তাওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন কেয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে, তখন এ নিদর্শনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তাওবা গ্রহণীয় হবে না। [বুখারীঃ ৪৬৩৬] এ আয়াত থেকে এ কথা জানা গেল যে, কেয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাফের কিংবা ফাসেকের তাওবা কবূল হবে না। হুযায়ফা ইবনে আসীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কেয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ 'দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া, (তিন) দাব্বাতুল-'আরদ, (চার) ইয়াজুয-মাজুযের আবির্ভাব, (পাঁচ) ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর অবতরণ, (ছয়) দাজ্জালের অভ্যুদয়, (সাত, আট, নয়) প্রাচ্য, প্রাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন জায়গায় মাটি ধ্বসে যাওয়া এবং (দশ) আদনগর্ত থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া'। [মুসলিমঃ ২৯০১] ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-'আরদের আবির্ভাব'। [মুসলিমঃ ২৯৪১]

(২) সুদ্দী বলেন, 'তারা ঈমান আনার পরে কোন কল্যাণকর কাজ তথা সৎকাজ করেনি।' এটা দ্বারা সেসব কিবলার অনুসারী মুমিন লোকদের বোঝানো হয়েছে যারা ঈমান

কর, আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম।'

১৫৯. নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয় তো আল্লাহ্‌র নিকট, তারপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন(১)।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

এনেছে সত্য কিন্তু কোন সৎকাজ করে নি। যখনই তারা আল্লাহ্‌র কোন বৃহৎ নিদর্শন- পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া- দেখবে, তখনই সৎকাজের জন্য তৎপর হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের তখনকার আমল কোন কাজে আসবে না। কিন্তু যদি তারা এ নিদর্শন দেখার পূর্বে সৎকাজ করে থাকে, তবে এ নিদর্শন দেখার পরে সৎকাজ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।' [তাবারী]

(১) এ আয়াতে মুশরিক, ইয়াহূদী, নাসারা ও মুসলিম সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু পথ সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে; যেমন, মুশরিক ও আহ্‌লে-কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু পথ রয়েছে যা বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে-বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদ'আতের পথ। এগুলোও মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়। "যারা দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিস্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সম্পর্কিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।" আয়াতে উল্লেখিত 'দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করা' এবং 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার' অর্থ দ্বীনের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে দ্বীনে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেয়া। কিছু লোক দ্বীনের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বিদ'আতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, 'বনী-ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী-ইসরাঈলরা ৭২ টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩ টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তর হল, যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের

১৬০. কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে। আর কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তার অনুরূপ প্রতিফলই দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[১]।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে'। [তিরমিযীঃ ২৬৪০, ২৬৪১] অনুরূপভাবে ইরবায ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা, দ্বীনে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা'। [আবূদাউদ: ৪৬০৭; তিরমিযী: ২৬৭৬; ইবন মাজাহ: ৪৩; মুসনাদে আহমাদ: ৪/১২৬]

(১) এ আয়াতে আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করবে, তাকে শুধু একটি গোনাহ্র সমান বদলা দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়- ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ্ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহ্র দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প। [বুখারী: ৬৪৯১; মুসলিম: ১৩১]

অপর হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করে, সে দশটি সৎকাজের সওয়াব পায় বরং আরো বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহ্র সমপরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দেব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ্ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে বা' (অর্থাৎ দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৫৩] এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎকাজের

১৬১. বলুন, 'আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্‌রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না[১]।'

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

১৬২. বলুন, 'আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই জন্য[২]।'

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

প্রতিদান দশগুণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তা আরো বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

(১) অর্থাৎ এ দ্বীন সুদৃঢ় যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; কারো ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে- এমন কোন নতুন দ্বীনও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীন। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর নাম উচ্চারণ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক দ্বীনী ব্যক্তিরাই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইয়াহূদী, নাসারা ও আরবের মুশরিকরা যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হোক না কেন, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে দান করেছেন। [তাফসীর আল-মানার] তাছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেভাবে এ দ্বীনকে সঠিকভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন সেটা পরবর্তীদের জন্য আদর্শ হয়ে আছে। সুতরাং বিশেষ করে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে نسك শব্দের অর্থ কুরবানী। হজের ক্রিয়াকর্মকেও نسك বলা হয়। মুজাহিদ বলেন, نسك বলতে সে প্রাণীকে বুঝায় যা হজ বা উমরাতে যবেহ করা হয়। [তাবারী] তবে এ শব্দটি সাধারণ 'ইবাদাত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই ناسك শব্দটি عابد বা 'ইবাদাতকারী অর্থেও বলা হয়। [কুরতুবী] আয়াতে এ সবক'টি অর্থই নেয়া যেতে পারে। মুফাস্‌সিরীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ 'ইবাদাত অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার সালাত, আমার সমগ্র 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ- সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। এখানে দ্বীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে প্রথমে সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয়

১৬৩. 'তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে[১] এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।'

لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪. বলুন, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে রব খুঁজব? অথচ তিনিই সবকিছুর রব।' প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার গ্রহণ করবে না। তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের রব-এর দিকেই, অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে, তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন[২] এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾

সৎকর্মের প্রাণ ও দ্বীনের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য সব কাজ ও 'ইবাদাত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এ সবকিছুই একমাত্র বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত- যাঁর কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় এ কথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি।

(১) অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলিম। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম আমি। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কেননা, প্রত্যেক উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলিম স্বয়ং ঐ নবীই হন, যার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়। আর প্রত্যেক নবীর দ্বীনই ছিল ইসলাম। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত করা। অর্থাৎ এক প্রজন্মের উপর অপর প্রজন্মকে তাদের জায়গায় স্থান দিয়েছেন। কখনও কখনও এক জাতিকে ধ্বংস করে অপর জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তিপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়[১]।

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিন যদি জানত, আল্লাহ্র কাছে শাস্তির পরিমাণ কতখানি, তাহলে কেউই তাঁর জান্নাতের লোভ করত না। আর কাফের যদি জানত, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা কতখানি, তাহলে কেউই তার রহমত থেকে নিরাশ হতো না।" [মুসলিম: ২৭৫৫]

৭- সূরা আল-আ'রাফ

سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ২০৬ আয়াত।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ এ সূরা সর্বসম্মতভাবে মক্কী সূরা।

সূরার ফযীলতঃ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ প্রথম সাতটি সূরা গ্রহণ করবে সে আলেম হিসেবে গণ্য হবে"। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৫, ৬/৯৬]

সূরার নামকরণঃ এ সূরার নাম আল-আ'রাফ। এ নামকরণ এ জন্যই করা হয়েছে যে, এ সূরার ৪৬ ও ৪৮ নং আয়াতদ্বয়ে আল-আ'রাফ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ নামকরণের অর্থঃ এটা এমন একটি সূরা যাতে আ'রাফবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ, লাম, মীম, সাদ(১)।

الٓمّٓصٓ ۟

২. এ কিতাব(২) আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সুতরাং আপনার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ(৩) না থাকে। যাতে আপনি এর দ্বারা সতর্ক করতে পারেন(৪)। আর তা মুমিনদের

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۟

---

(১) এ হরফগুলোকে 'হুরুফে মুকাত্তা'আত' বলে। এ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারার প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(২) কিতাব বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্বচ্ছ মত হল- পবিত্র কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। [বাগভী] কারো কারো মতে এখানে শুধু এ সূরার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) 'হারাজ' হবার মানে হচ্ছে এই যে, বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার না দেখে মানুষের মন সামনে এগিয়ে চলতে পারে না; থেমে যায়। তাই মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এখানে 'হারাজ' বলে 'সন্দেহ' বুঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুকে 'দাইকে সদর' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-হিজরঃ ৯৭, সূরা আন্-নাহলঃ ১২৭, সূরা আন্-নামলঃ ৭০, সূরা হুদঃ ১২।

(৪) এ আয়াতে কাদেরকে সতর্ক করতে হবে তা বলা হয়নি। অন্য আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, "এবং বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে

জন্য উপদেশ ।

৩. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না । তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর[১] ।

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

৪. আর এমন বহু জনপদ রয়েছে, যা আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি । তখনই আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাতে অথবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল[২] ।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤

পারেন ।"[মারইয়াম: ৯৭] আরও বলেন, "বস্তুত এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;"[আল-কাসাস:৪৬] আরও বলেন, "বরং তা আপনার রব হতে আগত সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করবে ।" [সূরা আস-সাজদাহ:৩] অনুরূপভাবে এ আয়াতে কিসের থেকে সতর্ক করতে হবে তাও বলা হয়নি । অন্যত্র তা বলে দেয়া হয়েছে, যেমন, "তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য" [সূরা আল-কাহাফ:২] "অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি ।" [সূরা আল-লাইল:১৪] এ আয়াতে ভীতিপ্রদর্শন এবং সুসংবাদ প্রদান একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে ভীতিপ্রদর্শন কাফেরদের জন্য আর সুসংবাদ মুমিনদের জন্য । [আদওয়াউল বায়ান]

(১) অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকেই নিজের পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন একমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে । যারাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে এবং আল্লাহ্র পাঠানো নবীর আদর্শ অনুসরণ না করে অন্যের কাছ থেকে কিছু নিতে চেষ্টা করবে, তারাই আল্লাহ্র হুকুমকে বাদ দিয়ে অন্যের হুকুম গ্রহণ করল । [ইবন কাসীর]

(২) পূর্ববর্তী লোকদের উপর রাতে বা দুপুরে যে শাস্তি এসেছিল তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে সতর্ক করছেন । অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে? নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

৫. অতঃপর যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের দাবী শুধু এই ছিল যে, তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম[১]।'

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾

৬. অতঃপর যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করব এবং রাসূলগণকেও অবশ্যই আমরা জিজ্ঞেস করব[২]।

গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?"[সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৭-৯৮] আরও বলেন, "বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোনটিকে তাড়াতাড়ি পেতে চায়" [সূরা ইউনুস:৫০] বিশেষ করে যারাই খারাপ কুটকৌশল ও ষড়যন্ত্র করেছে তাদের পরিণতি যে কি ভয়াবহ হতে পারে সে ব্যাপারেও অন্যত্র আল্লাহ্ সাবধান করেছেন, "যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা তাদের উপর আসবে না শাস্তি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করবে না? অথ বা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? অতঃপর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয় তোমাদের রব অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু"। [আন-নাহল:৪৫-৪৬]

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা ধ্বংস করেছি বহু জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালেম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। তারপর যখন তারা আমাদের শাস্তি টের পেল তখনই তারা সেখান থেকে পালাতে লাগল। 'পালিয়ে যেও না এবং ফিরে এসো যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়।"[সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১১-১৩]

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? নবীগণকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কি না? এ আয়াতে রাসূলদেরকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং প্রেরিত লোকদেরকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা বর্ণনা করা হয়নি। তবে কুরআনের অন্যত্র সেটা বর্ণিত হয়েছে। যেমন প্রথমটি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ্

৭. অতঃপর অবশ্যই আমরা তাদের কাছে পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কাজগুলো বিবৃত করব, আর আমরা তো অনুপস্থিত ছিলাম না[১]।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ۝

রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন?" [সূরা আল-মায়িদাহ:১০৯] আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "আর সেদিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?" [সূরা আল-কাসাস:৬৫] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি মানুষদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, "কাজেই শপথ আপনার রবের! অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে, যা তারা আমল করত।" [সূরা আল-হিজর:৯২-৯৩]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ কেয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছি কি না? তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্র বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হে আল্লাহ্, আপনি সাক্ষী থাকুন'। [মুসলিমঃ ১২১৮]
অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি তাঁর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলবঃ পৌঁছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছ, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বলছেন যে, তিনি তাঁর বান্দারা ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বহীন যা করত বা বলত সবকিছু সম্পর্কে কিয়ামতের মাঠে বিস্তারিত জানাবেন। কারণ, তিনি সবকিছু দেখছেন, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, কোন কিছু সম্পর্কেই তিনি বেখবর নন। বরং তিনি চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কেও অবগত। আল্লাহ্ বলেন, "তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"[সূরা আল-আন'আম:৫৯] [ইবন কাসীর] সুতরাং আল্লাহ্ হাশরের মাঠে তাদেরকে যা জানাবেন তা জ্ঞানের ভিত্তিতেই জানাবেন। দুনিয়াতে যা কিছুই ঘটেছে সবই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। সবকিছু তিনি জানার পরও তাঁর ফেরেশতাদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি

৮. আর সেদিন ওজন[১] যথাযথ হবে[২] । | وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

উপস্থিত থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সংগেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন । তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত ।" [সূরা আল-মুজাদালাহ:৭] অন্যত্র বলেন, "তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয় আর যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়" [সূরা সাবা:২] আরও বলেন, "তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আসমান হতে যা কিছু নামে ও আসমানে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন---তিনি (জ্ঞানে) তোমাদের সংগে আছেন" [সূরা আল-হাদীদ:৪] আরও বলেন, "আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই" [সূরা ইউনুস:৬১] [আদওয়াউল বায়ান]

(১) সেদিনের সে দাঁড়িপাল্লায় কোন অপরাধীর অপরাধ বাড়িয়ে দেয়া হবে না। আর কোন নেককারের নেক কমিয়ে দেয়া হবে না। [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সেটা বলেছেন, "আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শস্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব;" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] তবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার আমলকে বহুগুণ বর্ধিত করবেন। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোন পুণ্য কাজ হলে আল্লাহ্ সেটাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।" [সূরা আন-নিসা:৪০] অনুরূপভাবে 'হাদীসে বিতাকাহ' নামে বিখ্যাত হাদীসেও [দেখুন, ইবন মাজাহ: ৪৩০০; তিরমিযী: ২১২৭] সেটা বর্ণিত হয়েছে।

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "সেদিন যে ভাল-মন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিকভাবেই হবে।" এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমান হতে পারে। মানুষের ভাল-মন্দ কাজকর্ম কোন জড় পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ্ তা'আলাও তা ওজন করতে পারবেন, এটা বিচিত্র কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিস্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোন প্রায়োজন নেই। এসব নবাবিস্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তুও ওজন করা

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে(১)।

যায়, যা ইতোপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়। এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তি-বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। হাদীসে রয়েছে যে, 'যদি কোন বান্দার ফরয কাজসমূহে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল 'আলামীন বলবেনঃ দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরযের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৬৫]
আমলের ওজন পদ্ধতিঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কেয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহ্র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পাঠ করলেন। ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ -অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন স্থির করবো না।' [বুখারীঃ ৪৪৫২, মুসলিমঃ ২৭৮৫] আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তার পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কেয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তার ওজন ওহূদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে।' [মুসনাদে আহমাদ:১/৪২০] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হাল্কা; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দু'টি হচ্ছে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'। [বুখারীঃ ৭৫৬৩] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ 'সুব্হানাল্লাহ্' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর 'আল্হামদুলিল্লাহ্' বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৬০, ৫/৩৬৫; সুনান দারমীঃ ৬৫৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমলের ওজনের বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না।' [আবু দাউদঃ ৪৭৯৯; তিরমিযীঃ ২০০৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কিরাত রেখে দেয়া হবে [বুখারীঃ ১২৬১]। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহূদ পাহাড়ের সমান।' [মুসলিমঃ ৬৫৪] কেয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরণের বহু হাদীস রয়েছে।

(১) মানুষের জীবনের সমগ্র কার্যাবলী দু'টি অংশে বিভক্ত হবে। একটি ইতিবাচক বা সৎকাজ এবং অন্যটি নেতিবাচক বা অসৎকাজ। ইতিবাচক অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে সত্যকে জানা ও মেনে নেয়া এবং সত্যের অনুসরণ করে সত্যের খাতিরে কাজ করা। আখেরাতে এটিই হবে ওজনদার, ভারী ও মূল্যবান। আর সে মূল্যবান কাজের

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝

৯. আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারাই সে সব লোক, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে[১], যেহেতু তারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি যুলুম করত।

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

১০. আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর[২]।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

১১. আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে

ফলাফলও মূল্যবান হবে। এ আয়াতে তা উল্লেখ না হলেও অন্য আয়াতে সেটা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর যার পাল্লাসমূহ ভারী হবে, সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে।" [সূরা আল-কারি'আহ্:৬-৭] অর্থাৎ জান্নাতে। অন্যদিকে সত্য থেকে গাফিল হয়ে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ নিজের নফস-প্রবৃত্তি বা অন্য মানুষের ও শয়তানের অনুসরণ করে অসত্য পথে যা কিছুই করে, তা সবই নেতিবাচক অংশে স্থান লাভ করবে। আর এ নেতিবাচক অংশটি কেবল যে মূল্যহীন হবে তাই নয়, বরং এটি মানুষের ইতিবাচক অংশের মর্যাদাও কমিয়ে দেবে। কাজেই মানুষের জীবনের সমুদয় কার্যাবলীর ভাল অংশ যদি তার মন্দ অংশের ওপর বিজয় লাভ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক কিছু দেবার পরও তার হিসেবে কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই আখেরাতে তার সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

(১) এখানে ক্ষতি বলতে কি তা বলা হয়নি। অন্য আয়াতে সেটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর যার পাল্লাসমূহ হাল্‌কা হবে, তার স্থান হবে 'হা-ওয়িয়াহ্', আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী? অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন" [সূরা আল-কারি'আহ: ৮-১১] আরও বলেন, "আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়" [সূরা আল-মুমিনূন: ১০৩-১০৪]

(২) মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছেঃ "তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"

সৃষ্টি করেছি, তারপর আমরা তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছি[১], তারপর আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সিজ্‌দা কর। অতঃপর ইবলীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

১২. তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন[২]।'

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

১৩. তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, নিশ্চয়

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

---

(১) এ আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস বলেন, এখানে সৃষ্টি করার অর্থ প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করা। আর আকৃতি প্রদানের কথা বলে তার সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, এখানে সৃষ্টি করার কথা বলে আদম এবং আকৃতি প্রদানের কথা বলে, আদমের সন্তানদেরকে আদমের পৃষ্ঠে আকৃতি প্রদানের কথা বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইবলীসকে আল্লাহ্ তা'আলা আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি ইবলীসকে সমস্ত জিন জাতির পিতা বলা হয়, তখন তো এ ব্যাপারে আর কোন কথাই থাকে না। কারণ অন্যান্য আয়াতেও জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর এর আগে আমরা সৃষ্টি করেছি জিনদেরকে অতি উষ্ণ নির্ধুম আগুন থেকে" [সূরা আল-হিজর:২৭] তাছাড়া অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, জিন জাতিকে 'মারেজ' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর 'মারেজ' হচ্ছে, নির্ধুম অগ্নিশিখা। আল্লাহ্ বলেন, "এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম আগুনের শিখা হতে।" [সূরা আর-রহমান: ১৫] [আদওয়াউল বায়ান]

তুমি অধমদের[১] অন্তর্ভুক্ত।'

(১) 'সাগেরীন' শব্দটি বহুবচন। এক বচন হলো 'সাগের'। অর্থ লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে নিজেকে নিয়ে রাখা। শব্দটি মূল হচ্ছে, 'সাগার' যার অর্থ, সবচেয়ে কঠিন লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হওয়া। [আদওয়াউল বায়ান] অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নিকৃষ্টতর অবস্থা অবলম্বন করে। সুতরাং আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি হয়েও তোমার অহংকারে মত্ত হওয়া এবং তুমি নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্বের যে ধারণা নিজেই তৈরী করে নিয়েছ তার দৃষ্টিতে তোমার রবের হুকুম তোমার জন্য অবমাননাকর মনে হওয়া ও সে জন্য তা অমান্য করার অর্থ নিজেই নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে দেয়া। শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহমিকা, মর্যাদার ভিত্তিহীন দাবী এবং কোন জন্মগত স্বতঃসিদ্ধ অধিকার ছাড়াই নিজেকে অযথা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন মনে করা তোমাকে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীল করতে পারে না। বরং এর ফলে তুমি মিথ্যুক, লাঞ্ছিত ও অপমানিতই হবে এবং তোমার এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে তুমি নিজেই। কুরআনের অন্যত্র মিথ্যা অহঙ্কারের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারী আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তাঁর নিদর্শনাবলী বুঝতে অক্ষম হয়ে যায়। সে তা থেকে হিদায়াত পায় না। আল্লাহ্ বলেন, "যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৬] আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারীর ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আল্লাহ্ বলেন, "কাজেই তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতঃপর অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!" [সূরা আন-নাহল: ২৯] আরও বলেন, "অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" [সূরা আয-যুমার:৬০] আরও বলেন, "বলা হবে, 'জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!" [সূরা আয-যুমার:৭২] "নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" [সূরা গাফির:৬০] আবার বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারীদের ঈমান নসীব হয় না। আল্লাহ্ বলেন, "শুধু তারাই আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা সেটার দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না।" [সূরা আস-সাজদাহ:১৫] আরও বলেন, "তাদেরকে -অপরাধীদেরকে- 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করত।" [সূরা আস-সাফফাত:৩৫] আবার কোথাও এসেছে যে, আল্লাহ্ অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। "নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।" [সূরা আন-নাহল:২৩] [আদওয়াউল বায়ান]

قَالَ أَنْظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

১৪. সে বলল, 'আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।'

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

১৫. তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত[১]।'

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

১৬. সে বলল, 'আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য বসে থাকব[২]।'

---

(১) এ আয়াতে ইবলীসকে দেয়া সময় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। কিন্তু অন্যান্য সূরায় এ অবকাশ নির্ধারণ করে বলা হয়েছে, ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ [সূরা আল-হিজরঃ ৩৮, সোয়াদঃ ৮১] এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কেয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ আলেমদের নিকট তার অবকাশের মেয়াদ হচ্ছে শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া পর্যন্ত। [আদওয়াউল বায়ান] সুদ্দি বলেন, তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়নি। কারণ, যখন শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া হবে, তখন ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ বা আসমান ও যমীনের সবাই মারা পড়বে, আর তখন ইবলীসও মারা যাবে। [তাবারী]

আলোচ্য ইবলিসের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, কাফেরদের দো'আ কবুল করা হয়। অথচ অন্যত্র আল্লাহর বাণী ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ "কাফেরদের দো'আ তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই" [সূরা আর-রা'দঃ ১৪] এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দো'আ কবুল হয় না। এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দো'আও কবুল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দো'আও কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু আখেরাতে কাফেরের দো'আ কবুল হবে না। উল্লেখিত আয়াত আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। আর কাফেরের কোন কোন দো'আ কবুল হয় বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা মাযলূমের দো'আ থেকে বেঁচে থাক, যদিও সে কাফের হয়; কেননা তার দো'আ কবুলের ব্যাপারে কোন পর্দা নেই।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৫৩; দিয়া আল-মাকদেসী, হাদীস নং ২৭৪৮]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'শয়তান আদম সন্তানের যাবতীয় পথে বসে পড়ে। তার ইসলামের পথে বসে পড়ে তাকে বলেঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আপন দ্বীন ও বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করবে? তারপর সে

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾

১৭. 'তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে[১] এবং

নাফরমানী করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের পথে বসে পড়ে তাকে বলতে থাকেঃ তুমি হিজরত করে তোমার ভূমি ও আকাশ ত্যাগ করবে? লম্বা পথে মুহাজিরের উদাহরণ তো হলো ঘোড়ার মত। কিন্তু সে তার নাফরমানী করে হিজরত করে। তারপর শয়তান তার জেহাদের পথে বসে বলতে থাকেঃ তুমি কি জিহাদ করবে এতে নিজের জান ও মালের ক্ষতির আশংকা, যুদ্ধ করবে এতে তুমি মারা পড়বে, তারপর তোমার স্ত্রীর বিয়ে হয়ে যাবে, সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। তাতেও সে শয়তানের নাফরমানী করে জিহাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'যে ব্যক্তি এতটুকু করতে পারবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে, যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর যথাযথ হয়ে পড়ে। আর যদি ডুবেও যায় তবুও আল্লাহ্র জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা যদি তার সফর করার জন্তু থেকে পড়ে সে মারা যায় তবুও আল্লাহ্র উপর যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪৮৩]

(১) মানুষের উপর শয়তানের হামলা শুধু চতুর্দিকেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো ব্যাপক। আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে। তারপর সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে সামনে থেকে আসার অর্থ, দুনিয়ায়। পশ্চাৎ দিক থেকে আসার অর্থ আখেরাতে। ডানদিক থেকে আসার অর্থ, নেককাজের মাধ্যমে আসা। আর বামদিক থেকে আসার অর্থ, গুনাহের দিক থেকে আসা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, ইবলীস মানুষের সামনে থেকে এসে বলে, পুনরুত্থান নেই, জান্নাত নেই, জাহান্নাম নেই। মানুষের পিছন দিক থেকে দুনিয়াকে তার কাছে চাকচিক্যময় করে তোলে এবং দুনিয়ার প্রতি লোভ লাগিয়ে সেদিক আহ্বান করতে থাকে। তার ডানদিক থেকে আসার অর্থ নেক কাজ করার সময় সেটা করতে দেরী করায়, আর বাম দিক থেকে আসার অর্থ, গোনাহ ও অপরাধমূলক কাজকে সুশোভিত করে দেয়, সেদিকে আহ্বান করে, সেটার প্রতি নির্দেশ দেয়। হে বনী আদম! শয়তান তোমার সবদিক থেকেই আসছে, তবে সে তোমার উপর দিক থেকে আসে না, কারণ, সে তোমার ও আল্লাহ্র রহমতের মধ্যে বাধা হতে পারে না। [তাবারী]

আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না[১] ।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি বললেন, 'এখান থেকে বের হয়ে যাও ধিকৃত, বিতাড়িত অবস্থায় । মানুষের মধ্যে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব[২] ।'

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯. 'আর হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করুন, অতঃপর যেথা হতে ইচ্ছা খান, কিন্তু এ গাছের ধারে-কাছেও যাবেন না, তাহলে আপনারা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।'

---

(১) শয়তান এটা বলেছিল তার ধারণা অনুসারে । সে মনে করেছিল যে, তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে, তার অনুসরণ করবে । যাতে সে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে । আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র শয়তানের এ ধারণার কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, "আর অবশ্যই তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল" [সূরা সাবা:২০] [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস বলেন, এখানে মানুষদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ না থাকার কথা বলে, তাওহীদের কথা বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আপনি তাদেরকে তাওহীদবাদী পাবেন না । [তাবারী]

(২) আয়াতে শয়তান ও শয়তানের অনুসারীদের দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে । এ কথা অন্য আয়াতেও এসেছে, যেমন, "তিনি বললেন, 'তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যিই বলি-- 'অবশ্যই তোমার দ্বারা ও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সবার দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব ।" [সূরা ছোয়াদ ৮৪-৮৫] আরও এসেছে, "আল্লাহ্ বললেন, 'যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে । 'আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও ।' আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না ।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৩-৬৪] আরও বলেন, "তারপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও" [সূরা আশ-শু'আরা: ৯৪-৯৫] অনুরূপ অন্যান্য আয়াত । [আদওয়াউল বায়ান]

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হও, এ জন্যেই তোমাদের রব এ গাছ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।'

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাংখীদের একজন[১]।'

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

২২. অতঃপর সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। এরপর যখন তারা সে গাছের ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?'

---

(১) কাতাদা বলেন, শয়তান তাদের দু'জনের কাছে শপথের মাধ্যমে এগিয়ে এসে ধোঁকা দিয়েছিল। কখনও কখনও আল্লাহ্‌র উপর খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিও ধোঁকা খেয়ে থাকে। অনুরূপ এখানেও শয়তান তাদের দু'জনকে ধোঁকা দিয়েছিল। সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের আগে সৃষ্ট হয়েছি। আমি তোমাদের থেকে ভাল জানি। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব।' কোন কোন মনীষী বলেন, কেউ আমাদেরকে আল্লাহর কথা বলে ধোঁকা দিলে আমরা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। [তাবারী]

২৩. তারা বলল, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব(১)।'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং যমীনে কিছুদিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।'

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে। আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে(২)।'

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

তৃতীয় রুকূ'

২৬. হে বনী আদম! অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য পোষাক নাযিল করেছি, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও বেশ-ভূষার জন্য। আর তাকওয়ার পোষাক(৩), এটাই

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

---

(১) কাতাদা বলেন, তারা দু'জন নিজেদের লজ্জাস্থান পরস্পর দেখতে পেত না। কিন্তু অপরাধের পর সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে রব! যদি আমি তাওবা করি এবং ক্ষমা চাই তাহলে কি হবে আমাকে জানান? আল্লাহ্ বললেন, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। কিন্তু ইবলীস ক্ষমা চাইলো না, বরং সে অবকাশ চাইল। ফলে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বিষয় দান করলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) ইবন কাসীর বলেন, এ আয়াতের অর্থ অন্য আয়াতের মত, যেখানে এসেছে, "আমরা মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।" [সূরা ত্বা-হা: ৫৫]

(৩) لِبَاسُ التَّقْوَىٰ শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোষাক দ্বারা গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি।

সর্বোত্তম[১]। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা

এ আল্লাহ্‌ভীতি পোষাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পায়। তাই পোষাকে যেন গুপ্তাঙ্গগুলি পুরোপুরি আবৃত হয়। উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর না হয়। অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই। অপব্যয় না থাকা চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষের পোষাকের মত আর পুরুষের জন্য মহিলাদের পোষাকের মত না হওয়া চাই। পোষাকে বিজাতির অনুকরণ না হওয়া চাই। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ তোমাদের পোষাক আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহান নেয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হয়নি- সমগ্র বনী-আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোষাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

(এক) ﴿لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ﴾ -এখানে يُوَارِي শব্দটি موارة থেকে উদ্ভুত, এর অর্থ আবৃত করা। আর سَوْآت শব্দটি سوءة এর বহুবচন, এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোষাক সৃষ্টি করেছি, যা দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার। মুজাহিদ বলেন, আরবের কিছু লোক আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ উলঙ্গ হয়ে সম্পাদন করত। আবার কোন কোন লোক যে পোষাক পরিধান করে তাওয়াফ করেছে সে পোষাক আর পরিধান করত না। এ আয়াতে তাদেরকেও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তাবারী]

(দুই) ﴿وَرِيْشًا﴾ -অর্থাৎ সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোষাক পরিধান করে, তাকে ريش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোষাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরো পোষাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তা দ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে 'রীশ' বলে 'সম্পদ' বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] বাস্তবিকই পোষাক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ।

(তিন) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾ অর্থাৎ তা হচ্ছে তাকওয়ার পোষাক আর এটিই সর্বোত্তম পোষাক। ইবন আব্বাস ও উরওয়া ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের তাফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোষাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতি বুঝানো হয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোষাক। কাতাদা বলেন, তাকওয়ার পোষাক বলে ঈমানকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

উপদেশ গ্রহণ করে[১]।

২৭. হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে---যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য[২] বিবস্ত্র করেছিল[৩]। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমরা শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না।

يٰبَنِيٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. আর যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে[৪] তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এতে পেয়েছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদেরকে এরই নির্দেশ দিয়েছেন।' বলুন, 'আল্লাহ্ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

(১) অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোষাক দান করা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম- যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

(২) শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রথম মঙ্গল বিধানকারী শরী'আত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই এরপর।

(৩) মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোষাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে দূরে ঠেলে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

(৪) فحش، فحشاء ও فاحشة এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট। [ফাতহুল কাদীর]

সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না[১] ?'

২৯. বলুন, 'আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের[২] ।' আর তোমরা প্রত্যেক সাজদাহ্ বা ইবাদতে তোমাদের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্‌কেই নির্ধারণ কর[৩] এবং তাঁরই আনুগত্যে

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۟

(১) ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশ ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কুরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হত, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করতে হত। এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে তাওয়াফ করত। তাদের নিকট এ শয়তানী কাজের যুক্তি হলো, যেসব পোষাক পরে আমরা পাপকাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা আরো বেশী বেআদবীর কাজ। হারামের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল। এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী] এতে বলা হয়েছেঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলতঃ আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরো বলত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। প্রথমটি সত্য হলেও দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে মিথ্যা।

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব মূর্খ উলঙ্গ তাওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা قسط এর নির্দেশ দেন। قسط এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমার লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরী'আতের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قسط শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদাত, আনুগত্য ও শরী'আতের সাধারণ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৩) এখানে ইবাদতের সময় সবকিছু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ইখলাসের সাথে আল্লাহকে উদ্দেশ্য নিতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে মাসজিদসমূহে যখন ইবাদত করা হয়। [মুয়াসসার] ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এ আয়াতে 'কিয়ামুল ওয়াজহ' বলে অন্য আয়াত 'ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া' যা বুঝানো হয়েছে, তাই বোঝানো হয়েছে। এ সবের অর্থ

বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাক(১)। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে(২)।

৩০. একদলকে তিনি হিদায়াত করেছেন। আর অপরদল, তাদের উপর পথ

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَٰلَةُ

হচ্ছে, ইখলাসের সাথে যাবতীয় ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। [ইসতিকামাহ ২/৩০৬] এখানে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইবাদতের জন্য বিশেষ করে ইখলাসের সাথে ইবাদতের জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হচ্ছে মাসজিদ, মাযার নয়। যেমনটি কোন কোন মানুষ মনে করে থাকে। [ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম ১/৩৯২] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ আয়াতের অর্থে বলেন, 'তোমরা তোমাদের চেহারাকে প্রতিটি মসজিদেই কিবলামূখী কর, যেখানেই সালাত আদায় কর না কেন'। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদাত খাঁটিভাবে তাঁরই জন্য হয়; এতে যেন অন্য কারো অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি গোপন শির্ক অর্থাৎ লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। এতে বোঝা গেল যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকেই শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্যই যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধুমাত্র আন্তরিকতাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের অনুসরণ ব্যতীত গ্রহনযোগ্য নয়।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে জমায়েত হবে খালি পা, কাপড় বিহীন, খতনাবিহীন অবস্থায়। তারপর তিনি বললেনঃ "তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে" এখান থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তারপর বললেনঃ 'মনে রেখ! কেয়ামতের দিন প্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্‌রাহীম। মনে রেখ! আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে তারপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবঃ হে রব! এরা আমার প্রিয় সাথীবৃন্দ। তখন বলা হবেঃ আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কি নতুন পদ্ধতির আবিস্কার করেছে। তারপর আমি তা বলব যা নেক বান্দা বলেছিল, "আর আমি তাদের মাঝে যতদিন ছিলাম তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, তারপর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দেন আপনিই তো তখন তাদের উপর খবরদার ছিলেন" তখন বলা হবেঃ আপনি তাদের কাছ থেকে চলে আসার পর থেকেই এরা তাদের পিছনে ফিরে গিয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৬২৫, মুসলিমঃ ২৮৫৯]

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۝

ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে(১)। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করেছিল এবং মনে করত(২) তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক গ্রহণ

(১) এ আয়াতের সমর্থনে আরও আয়াত ও অনেক হাদীস এসেছে। সূরা আত-তাগাবুনের ২নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এটা তাক্দীরের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে কাফের ও মুমিন এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু মানুষ জানেনা সে কোনভাগে। সুতরাং তার দায়িত্ব হবে কাজ করে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসেও তা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে সে জান্নাতের অধিবাসী অথচ সে জাহান্নামী। আবার তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় সে জাহান্নামী অথচ সে জান্নাতী। কারণ মানুষের সর্বশেষ কাজের উপরই তার হিসাব নিকাশ'। [বুখারীঃ২৮৯৮, ৪২০২, মুসলিমঃ ১১২, আহমাদ ৫/৩৩৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'প্রত্যেক বান্দাহ পুনরুত্থিত হবে সেটার উপর যার উপর তার মৃত্যু হয়েছে'। [মুসলিমঃ২৮৭৮]

(২) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এটা বর্ণনা করেছেন যে, কাফেররা শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছে। তাদের এ অভিভাবকত্বের স্বরূপ হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্র শরী'আতের বিরোধিতা করে শয়তানের দেয়া মত ও পথের অনুসরণ করে থাকে। তারপরও মনে করে থাকে যে, তারা হিদায়াতের উপর আছে। অন্য আয়াতে যারা এ ধরণের কাজ করবে তাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। " বলুন, 'আমরা কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কাজে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে " [সূরা আল-কাহাফঃ ১০৩-১০৪] [আদওয়াউল বায়ান] মূলতঃ শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন স্থায়ী ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তা দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞান বুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, নবী প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

কর[১]। আর খাও এবং পান কর

---

(১) আয়াতে পোষাককে 'যীনাত' বা 'সাজ-সজ্জা' শব্দের মাধ্যমে এ জন্যই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সালাতে শধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সজ্জার পোষাক পরিধান করা শ্রেয়। হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সালাতের সময় উত্তম পোষাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোষাক পরে হাজির হই।' যে গুপ্ত-অঙ্গ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ সালাত ও তাওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কি? কুরআনুল কারীম সংক্ষেপে গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমন্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল ছাড়া সমস্ত দেহ। হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। এ হচ্ছে গুপ্ত অঙ্গের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া সালাতই হয় না। সালাতে শুধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ-সজ্জার পোষাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। যেমন সাদা পোষাক, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের পোষাকাদির মধ্যে সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা, পোষাকাদির মধ্যে তাই উত্তম পোষাক। আর এতে তোমাদের মৃতদেরকে কাফনও দাও।' [আবু দাউদঃ ৩৮৭৮, তিরমিযীঃ ৯৯৪, ইবন মাজাহ্ঃ ১৪৭২] অনেকে সাজসজ্জার পোষাক পরাকে অহংকারী পোষাক মনে করে থাকে এটা আসলে ঠিক নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এক লোক বললঃ কোন লোক পছন্দ করে তার পোষাক উত্তম হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। রাসূল বললেনঃ 'অবশ্যই আল্লাহ্ সুন্দর, সুন্দরকে ভালবাসেন। অহংকার হল, হককে না মানা, মানুষকে অবজ্ঞা করা।' [মুসলিমঃ ১৪৭] আবার অহংকার হয় এমন পোষাকও পরা যাবে না যদিও তাতে কারো কারো নিকট বাহ্যিক সুন্দর রয়েছে। যেমনঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে অহংকার বশে কাপড় টাখনুর নীচে ছেড়ে দিবে আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।' [বুখারীঃ ৫৭৮৩] আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে এসেছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলিয়াতে মাসজিদে হারামে কা'বার তাওয়াফ করার সময় উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। এ ব্যাপারে তাদের দর্শন ছিল, যে কাপড় পরে গুণাহ করেছি তা দিয়ে তাওয়াফ করা যাবে না। বিশেষতঃ কুরাইশরা এ বিধি-বিধানের প্রবর্তন করে। তারাই শুধু তাওয়াফের জন্য কাপড় দিতে পারবে। এতে করে তারা কিছু বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারত। এমনকি মহিলারাও উলঙ্গ তাওয়াফ করত। শয়তান তাদেরকে এভাবে ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ করত এবং এ কাজকে তাদের মনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিত। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'মহিলা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ করত আর বলত, কে আমাকে তাওয়াফের কাপড় ধার দেবে? যা তার লজ্জাস্থানে রাখবে। আরও বলতঃ

কিন্তু অপচয় কর না[১]। নিশ্চয় তিনি

আজ হয় কিছু অংশ প্রকাশ হয়ে পড়বে নয়ত পুরোটাই। আর যা আজ প্রকাশিত হবে তা আর হালাল করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- "তোমরা তোমাদের মাসজিদ তথা ইবাদাতের স্থানে সুন্দর পোষাক পরবে।' [মুসলিমঃ ৩০২৮]

(১) এ আয়াত থেকে একটি মাসআলা এরূপ বুঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরী'আতের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। আয়াতে ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ বলে পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত إسراف শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। সীমালংঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। (এক) হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালংঘন যে হারাম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। (দুই) আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ্‌, তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ্‌। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা- এটাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লেখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ "অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" [সূরা আল-ইস্‌রাঃ ২৭] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্‌ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে- প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৬৭] এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সীমালংঘন ও অহংকার না করে খাও, দান কর এবং পরিধান কর।' [নাসাঈঃ ৫/৭৯, ইবন মাজাহ্‌ঃ ৩৬০৫] অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই। [বুখারী] অন্যত্র এটি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [নাসায়ীঃ ২৫৫৯] তবে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বাভাবিক সীমা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 'আদম সন্তান যে সমস্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করে, তন্মধ্যে পেট হল সবচেয়ে খারাপ। আদম সন্তানের জন্য স্বল্প কিছু লোকমাই যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার পিঠ সোজা রাখতে পারে। এর বেশী করতে চাইলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য নির্দিষ্ট করে।' [তিরমিযীঃ ২৩৮০, ইবন মাজাহঃ ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩২]

অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

চতুর্থ রুকূ'

৩২. বলুন, 'আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে[১]?' বলুন, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে এ সব

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

﴿وَكُلُوا۟ وَاشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟﴾ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি মাসআলা জানা যায়। (এক) যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা ফরয। (দুই) শরী'আতের কোন দলীল দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। (তিন) আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। (চার) যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। (পাঁচ) পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা সমীচীন নয়। (ছয়) এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহ্র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোষাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয়। খোরাক ও পোষাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নাতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোষাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, আরবরা জাহিলিয়াতে কাপড়-চোপড় সহ বেশ কিছু জিনিস হারাম করত। অথচ এগুলো আল্লাহ্ হারাম করেননি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ' বলুন, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করছ?" [সূরা ইউনুস:৫৯] তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী] কাতাদা বলেন, 'এ আয়াত দ্বারা জাহেলিয়াতের কাফেররা বাহীরা, সায়েবা, ওসীলা, হাম ইত্যাদি নামে যে সমস্ত প্রাণী হারাম করত সেগুলোকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।' [তাবারী]

তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে[১]।' এভাবে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।

৩৩. বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা[২]। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

(১) আয়াতের এ বাক্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত; উৎকৃষ্ট পোষাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কিন্তু আখেরাতে সমস্ত নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে বলা হয়েছে, "আপনি বলে দিনঃ সব পার্থিব নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনদেরই প্রাপ্য এবং কেয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে।" [তাবারী ইবন আব্বাস হতে] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার অপর মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আখেরাতে শাস্তির কারণ হবে না- এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নেয়ামত তারাও পায় বরং আরো বেশী পায়; কিন্তু এসব নেয়ামত আখেরাতে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে। কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নেয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয়। [কুরতুবী] কোন কোন তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নেয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কেয়ামতে যারা এসব নেয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা এবং কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। [বাগভী] উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই; এজন্যই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন আর আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই।' [বুখারীঃ ৫২২০]

কিছু বলা যা তোমরা জান না[১] ।'

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে[২] । অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেন, যারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিবৃত করবেন, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না ।

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

---

(১) আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে সাবধান করা হয়েছে । যেমনঃ সূরা আল-বাকারার ১৬৯, এবং সূরা আল-ইসরার ৩৬ নং আয়াত । আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলা আসলেই বড় গোনাহ্‌র কাজ । আল্লাহ্ সম্পর্কে, গায়েব সম্পর্কে, আখেরাত সম্পর্কে, আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে যাবতীয় কথা যতক্ষন পর্যন্ত কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক না হবে ততক্ষন তা আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার আওতায় পড়বে । অনুরূপভাবে যারা না জেনে-বুঝে ফাতাওয়া দেয় তারাও আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলেন । আর এজন্যই বলা হয়ঃ 'ফাতাওয়া দানে যে যতবেশী তৎপর জাহান্নামে যাওয়ার জন্যও সে ততবেশী তৎপর' ।

(২) এ সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসে থাকতে পারবে । কিন্তু এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাকড়াও করতে চাইবেন তখন তাদের আর সময় দেয়া হবে না । এ ব্যাপারে বিভিন্ন সূরায় অনুরূপ আলোচনা এসেছে, যেমনঃ সূরা আল-হিজ্‌রঃ ৫ ও সূরা নূহঃ ৪, সূরা আল-মুনাফিকূনঃ ১১ ।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? তাদের জন্য যে অংশ লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছবে[১]। অবশেষে যখন আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ তাদের জান কবজের জন্য তাদের কাছে আসবে, তখন তারা জিজ্ঞেস করবে, 'আল্লাহ্‌ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে[২] তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়েছে' এবং তারা নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, নিশ্চয় তারা কাফের ছিল।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আল্লাহ্‌ বলবেন, 'তোমাদের আগে যে জিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ কর'। যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অন্য দলকে তারা অভিসম্পাত করবে[৩]। অবশেষে যখন সবাই তাতে

---

(১) অর্থাৎ তাদের শাস্তির যে পরিমাণ লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছবেই। [তাবারী] কাতাদা বলেন, দুনিয়াতে তারা যে আমল করেছে সেটার ফলাফল আখেরাতে তাদের কাছে পৌঁছবেই। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে, যাদের তোমরা ইবাদত করতে এখন তারা কোথায়? তারা কি তোমাদেরকে এখন সাহায্য করতে পারে না? তারা কি তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না? তখন তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করত, যাদের ইবাদত করত, তারা সবাই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। এভাবে তারা তাদের নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষী দিল যে, তারা মুশরিক ছিল, তাওহীদবাদী ছিল না। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ যখনই কোন ধর্মাবলম্বী জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখনই সে তার ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদেরকে অভিসম্পাত দিতে থাকবে। সুতরাং মুশরিকরা মুশরিকদেরকে, ইয়াহূদীরা ইয়াহূদীদেরকে, নাসারারা

একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল[১]; কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।' আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।'

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাজেই তোমরা যা অর্জন করেছিলে, তার জন্য শাস্তি ভোগ কর[২]।'

وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪০. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

নাসারাদেরকে, সাবেয়ীরা সাবেয়ীদেরকে, অগ্নিউপাসকরা অগ্নিউপাসকদেরকে লা'নত দিতে থাকবে। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অভিসম্পাত দিবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে তাদেরকে কি কারণে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। সূরা আল-আহযাবের ৬৭ নং আয়াতে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ছিল তাদের নেতা গোছের লোক। তাদের নেতৃত্বের প্রভাবেই এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। সূরা সাবা'র ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি বা দল কোন ভুল চিন্তা বা কর্মনীতির ভিত্ রচনা করে সে কেবল নিজের ভুলের ও গোনাহের জন্য দায়ী হয় না বরং দুনিয়ায় যতগুলো লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদের সবার গোনাহের একটি অংশও তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকে। এ বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

না[১]- যতক্ষন না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এ আয়াতের বর্ণিত এক তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দো'আর জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দো'আ কবূল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কুরআনের সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লি'য়্যীন বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতেও উল্লেখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ -অর্থাৎ "মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে।" [সূরা ফাতেরঃ ১০]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অপর এক বর্ণনা আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন বারা' ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তার চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেনঃ মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্‌তারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মালাকুল মাউত আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তার মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা, এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফিরিশ্‌তাদের কাছে সমর্পণ করে। ফিরিশ্‌তারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফিরিশ্‌তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ পাক আত্মা কার? ফিরিশ্‌তারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার হত এবং বলেঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফিরিশ্‌তারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরো ফিরিশ্‌তা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লি'য়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফিরিশ্‌তা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করেঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার দ্বীন কি ? সে বলেঃ আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং দ্বীন ইসলাম। এরপর প্রশ্ন হয়ঃ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন একটি আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও,

প্রবেশ করে[১]। আর এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব।

৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; আর এভাবেই আমরা যালিমদেরকে প্রতিফল দেব।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে- আমরা কারো উপর তার

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়। এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফিরিশ্‌তা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটাবিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফিরিশ্‌তারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফিরিশ্‌তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ দুরাত্মাটি কার? ফিরিশ্‌তারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'আঁ-আঁ-- আমি জানি না' বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছাতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। [আহমাদঃ ৪/২৮৭, ২/৩৬৪-৩৬৫, ৬/১৪০; ইবন মাজাহ্: ৪২৬২; নাসায়ী: ৪৬২]

(১) আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট পেট বিশিষ্ট জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবতঃ অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেই না- তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আমরা তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব[১], তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। আর তারা বলবে, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত না করলে, আমরা কখনো হিদায়াত পেতাম না। অবশ্যই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।' আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের[২] ওয়ারিস করা হয়েছে।'

---

(১) এ আয়াতে জান্নাতীদের বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমরা তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব, তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে"। সূরা আল-হিজ্‌রের ৪৭ নং আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "আমরা জান্নাতীদের অন্তর থেকে যাবতীয় মালিন্য দূর করে দেব, তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে মুখোমুখী হয়ে খাটিয়ায় থাকবে এবং বসবাস করবে।" অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারো প্রতি কারো কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারো কাছে কারো পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরের প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে তার ঘরকে দুনিয়ায় তার ঘরের চেয়ে বেশী চিনবে।' [বুখারীঃ ২৪৪০]

(২) জান্নাতের বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীসে ব্যাপকভাবে এসেছে, সেখানে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন স্পেশাল ঘোষণা থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর---

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. 'যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত এবং সে পথে জটিলতা খুঁজে বেড়াত; এবং তারা আখেরাতকে অস্বীকারকারী ছিল।'

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

৪৬. আর তাদের উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে। আর আ'রাফে[১] কিছু

বলেনঃ 'আহ্বানকারী আহবান করে বলবেঃ তোমাদের জন্য এটাই উপযোগী যে, তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো তোমরা রোগাক্রান্ত হবে না। তোমাদের জন্য উপযোগী হলো জীবিত থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো মারা যাবে না। তোমাদের জন্য উচিত হলো যুবক থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য উচিত হলো নেয়ামতের মধ্যে থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো অভাব-অভিযোগে থাকবে না। আর এটাই হলো আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ যেখানে তিনি বলেছেনঃ "এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে"।' [মুসলিমঃ ২৮৩৭]

(১) **আ'রাফ কি?ঃ** সূরা হাদীদের ১২ থেকে ১৯নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। (দুই) মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। (তিন) মুনাফেকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলিমদের সাথে মিলে থাকত। হাশরের ময়দানেও প্রথম দিকে সাথে মিলে থাকবে এবং পুলসেরাত চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফেকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবেঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা

كُلًّا بِسِيمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ

লোক থাকবে, যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনবে[১]। আর তারা

উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফিরিশ্‌তা বলবেঃ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। ইবন জারীর ও অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতে উল্লেখিত أعراف বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বুঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা, أعراف শব্দটি عرف এর বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীর-বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যাক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আ'রাফ উঁচু টাওয়ারের মত যা জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে থাকবে। গোনাহ্‌গার কিছু বান্দাকে সেখানে রেখে দেয়া হবে।' কেউ কেউ বলেনঃ আ'রাফ নামকরণ এজন্য করা হয়েছে যে, এখান থেকে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে।

আ'রাফবাসী কারাঃ বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, আ'রাফবাসী ঐ সমস্ত লোকেরা যাদের সৎ এবং অসৎকর্ম সমান হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেনঃ কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা জাহান্নাম থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়। ইবন জারীর বলেন, তাদের সম্পর্কে এটা বলাই বেশী সঠিক যে, তারা হচ্ছে এমন কিছু লোক যারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে তাদের নিদর্শনের মাধ্যমে চিনতে পারবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিহ্ন কেমন হবে তা বর্ণনা করা হয়নি। অন্য আয়াতে তাদের কিছু চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে; যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ১০৬] "আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:২৪] আরও বলেন, "সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২] আরও বলেন, "অনেক চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল" [সূরা আবাসা:৩৮] সুতরাং চেহারা শুভ্র

لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের উপর সালাম[১]।' তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাংখা করে।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না[২]।'

ষষ্ঠ রুকূ'

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم

৪৮. আর আ'রাফবাসীরা এমন লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন

ও সুন্দর হওয়া জান্নাতীদের চিহ্ন। আর চেহারা কালো, বিকট ও নীলচক্ষুবিশিষ্ট হওয়া জাহান্নামীদের চিহ্ন। আল্লাহ্ বলেন, "তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা ইউনুসঃ ২৭] আরও বলেন, "আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর" [সূরা আবাসাঃ ৪০] আরও বলেন, "যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যেদিন আমরা অপরাধীদেরকে নীলচক্ষু তথা দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব।" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০২] আর এ জন্যই ইবন আব্বাস বলেন, জাহান্নামীদের চেনা যাবে তাদের কালো চেহারায়; আর জান্নাতীদের চেনা যাবে তাদের চেহারার শুভ্রতায়। [তাবারী]

(১) আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবেঃ 'সালামুন 'আলাইকুম'। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থে বলা হয় এবং বলা সুন্নাত। মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কেয়ামতেও বলা হবে। অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাগণও জান্নাতীদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে। [সূরা আর্-রা'আদঃ ২৪, সূরা আয্-যুমারঃ ৭৩] [তাবারী] কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে 'আস্সালামু 'আলাইকুম' বলা সুন্নাত।

(২) অর্থাৎ আ'রাফবাসীরা সবাইকে চিনবে, তারপর যখন জান্নাতীদেরকে তাদের পাশ দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা তাদেরকে 'সালামুন আলাইকুম' বলবে। যদিও জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবুও তারা আশায় থাকবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামীদেরকে যখন তাদের পাশ দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হবে এবং বলতে থাকবে, হে আমাদের রব আমাদেরকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। [তাবারী]

بِسِيمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

দ্বারা চিনবে, তারা বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না।'

اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এরাই কি তারা[1], যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে,) 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।'

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর ঢেলে দাও কিছু পানি, অথবা তা থেকে যা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন।' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ তো এ দুটি হারাম করেছেন কাফেরদের জন্য।

---

(১) জান্নাতের ঈমানদার লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে আ'রাফবাসীরা কাফেরদেরকে বলবে, তোমরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের ব্যাপারে উপহাস করতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি কোন প্রকার দয়া করবেন না। অথচ এখন তারাই জান্নাতে রয়েছে, তাদেরকে ভয়-ভীতি ও পেরেশানী ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তোমাদের অহংকার তোমাদের কোন কাজে আসে নি [মুয়াসসার] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আরাফবাসী হচ্ছে এমন কিছু লোক, যাদের অনেক বড় বড় গুনাহ রয়েছে। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়েছে। তাদেরকে দেয়ালের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং তারা যখন জান্নাতীদের দিকে তাকাবে তখন তারা জান্নাতের আশা করবে, আর যখন জাহান্নামীদের দিকে তাকাবে তখন তারা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি কামনা করবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে। আর তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, হে জাহান্নামবাসী, তোমরা কি এ আরাফবাসীদের নিয়েই বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন না? হে 'আরাফবাসী! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। [তাবারী]

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

৫১. 'যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছিল। আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।' কাজেই আজ আমরা তাদেরকে (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখব, যেমনিভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল[১], আর (যেমন) তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. আর অবশ্যই আমরা তাদের নিকট নিয়ে এসেছি এমন এক কিতাব, যা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি[২]। আর যা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ

৫৩. তারা কি শুধু সে পরিণামের অপেক্ষা করে? যেদিন সে পরিণাম প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা আগে সেটার

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে কেয়ামতের দিন দেখতে পাব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র দীদার সংক্রান্ত কথা উল্লেখ করে বললেনঃ 'তারপর আল্লাহ্ তাঁর কোন এক বান্দার সাথে সাক্ষাত করে বলবেন, হে অমুক! তোমাকে কি আমি সম্মানিত করিনি? নেতৃত্ব দেইনি? বিয়ে করাইনি? তোমার জন্য ঘোড়া ও উট আয়ত্বাধীন করে দেইনি? তোমাকে কি প্রধান এবং শুল্ক আদায়কারী বানাইনি? (তোমাকে এমন আরামে রেখেছি যে, তোমার কোন কষ্ট অনুভূত হয়নি।) সে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি আমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী ছিলে? সে বলবেঃ না। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে ছেড়ে দেব যেমন তুমি আমাকে ছেড়েছিলে। [মুসলিমঃ ২৯৬৮]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কাফের-মুশরিকদের ওজর আপত্তি তোলার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের জন্য রাসূলের মাধ্যমে কিতাব দিয়েছেন, যে কিতাবে সবকিছু স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য আয়াতেও এ বিস্তারিত আলোচনার কথা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি আবার ফেরত পাঠানো হবে-- যেন আমরা আগে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি?' অবশ্যই তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

সপ্তম রুকূ'

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়(১) দিনে(২)

(১) এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে সূরা ফুস্‌সিলাতের নবম ও দশম আয়াতে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছেঃ ﴿خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ﴾ আবার বলা হয়েছেঃ ﴿وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ﴾ যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ ﴿فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ﴾ -অর্থাৎ "অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে।" [সূরা ফুস্‌সিলাতঃ ১২] বাহ্যতঃ এ দু'দিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার; অর্থাৎ এ পর্যন্ত ছয় দিন হল। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) জানা কথা যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল? কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেনঃ ছয় দিন বলে জাগতিক ৬ দিন বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরিস্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবেনা। সহীহ্ বর্ণনা

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

সৃষ্টি করেছেন[১]; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন[২]। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি,

---

অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবার শেষ হয়।

(১) এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহুর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছেঃ "এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" [সূরা আল-কামারঃ ৫০] আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেনঃ হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়"। [যেমন, সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১১৭] এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি? তাফসীরবিদ সায়ীদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ্ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার ধারাবাহিকতা ও কর্মতৎপরতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন এটা সহীহ্ আকীদা। কিন্তু তিনি কিভাবে উঠেছেন, কুরআন-সুন্নায় এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য নাই বিধায় তা আমরা জানি না। এ বিষয়ে সূরা আল-বাকারার ২৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্কে কেউ استواء সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ استواء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন কখনো করেননি। কারণ, তারা এর অর্থ বুঝতেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ গুণে কিভাবে গুণান্বিত হলেন, তা শুধু মানুষের অজানা। এটি আল্লাহ্র একটি গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা যে রকম, তাঁর গুণও সে রকম। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযা'য়ী, লাইস ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমুখ বলেছেনঃ যেসব আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলো হক এবং এগুলোর অর্থও স্পষ্ট। তবে গুণান্বিত হওয়ার ধরণের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। বরং যেভাবে আছে সেভাবে রেখে কোনরূপ অপব্যাখ্যা ও সাদৃশ্য ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইমাম যাহাবী রচিত আল-উলু]

যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন[১]। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই[২]। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!

৫৫. তোমরা বিনিতভাবে ও গোপনে[৩]

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায় -মোটেই দেরী হয় না। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী। এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্র আদেশে চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর তখনই হবে কেয়ামত।

(২) الخلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং الأمر শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। যেমনিভাবে তিনিই উপর-নীচের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে নির্দেশ দানের অধিকারও তাঁর। এ নির্দেশ দুনিয়ায় তাঁর শরী'আত সম্বলিত নির্দেশকে বোঝানো হবে। আর আখেরাতে ফয়সালা ও প্রতিদান-প্রতিফল দেয়াকে বোঝানো হবে। [সা'দী]

(৩) এখানে দো'আর কতিপয় আদব শেখানো হচ্ছে। বলা হয়েছেঃ ﴿تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ এর মধ্যে تضرع শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خفية শব্দের অর্থ গোপন। এ শব্দদ্বয়ে দো'আর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ অপারগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা; যা দো'আর প্রাণ। আল্লাহ্র কাছে এর মাধ্যমে নিজের অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ চুপিচুপি ও সংগোপনে দো'আ করা; যা উত্তম এবং কবূলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চস্বরে দো'আ চাওয়ার মধ্যে প্রথমতঃ বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশংকা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কথা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খাইবার যুদ্ধের সময় দো'আ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ।' [বুখারীঃ ৬৬১০, মুসলিমঃ ২৭০৪] অনুরূপভাবে,

তোমাদের রবকে ডাক[১]; নিশ্চয় তিনি | الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾

আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক নবীর দো'আ উল্লেখ করে বলেনঃ ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ -অর্থাৎ "যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকলেন ।" [সূরা মার্ইয়ামঃ ৩] এতে বুঝা গেল যে, অনুচ্চস্বরে দো'আ করা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ ।

পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র স্মরণে ও দো'আয় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পেত না । বরং তাদের দো'আ তাদের ও আল্লাহ্র মধ্যে সীমিত থাকত । তাদের অনেকেই সমগ্র কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন; কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না । অনেকেই প্রভূত দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতেন; কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না । অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করতেন; কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না । হাসান বসরী আরো বলেনঃ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন ইবাদাত কখনো প্রকাশ্যে করেন নি । দো'আয় তাদের আওয়াজ অত্যন্ত অনুচ্চ হত । ইবন জুরাইজ বলেনঃ দো'আয় আওয়াজকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ । [ইবন কাসীর] আবু বকর জাস্সাস বলেনঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দো'আ করা জোরে দো'আ করার চাইতে উত্তম । এমনকি আয়াতে যদি দো'আর অর্থ যিক্র ও ইবাদাত নেয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরবে যিক্র সরব যিক্র অপেক্ষা উত্তম । [আহকামুল কুরআন]

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব যিক্রই কাম্য ও উত্তম । উদাহরণতঃ আযান ও একামত উচ্চঃস্বরে বলা, সরব সালাতসমূহে উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা, সালাতের তাকবীর, আইয়ামে তাশরীকের তাকবীর এবং হজে পুরুষদের জন্য লাব্বাইকা উচ্চঃস্বরে বলা ইত্যাদি । এ কারণেই এ সম্পর্কে আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিক্র করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই করা উচিত । এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিক্রই উত্তম ও অধিক উপকারী ।

(১) এ আয়াতে এদিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নেয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দো'আ-প্রার্থনা করা উচিত । তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা ও বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর । আরবী ভাষায় দো'আর দু'টি অর্থ হয়- (এক) বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা; যাকে দো'আয়ে-মাসআলা বলে । (দুই) যে কোন অবস্থায় ইবাদাতের মাধ্যমে কাউকে স্মরণ করা; যাকে দো'আয়ে-ইবাদাত বলে । আয়াতে দো'আ দ্বারা উভয় অর্থই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদাত কর । প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে স্বীয় অভাব-অনটনের

সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না[১]।

৫৬. আর যমীনে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না[২]। আর আল্লাহকে ভয় ও আশার

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ

সমাধান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয় অবস্থার অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদাত একমাত্র তাঁরই কর। [সা'দী] উভয় তাফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(১) مُعْتَدِيْنَ শব্দটি اِعْتِدَاء থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা দো'আয় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে- কোনটিই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরী'আতের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদাতের পরিবর্তে গোনাহে রূপান্তারিত হয়ে যায়।
দো'আয় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। (এক) দো'আয় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। (দুই) দো'আয় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন, বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু স্বীয় পুত্রকে এভাবে দো'আ করতে দেখলেনঃ 'হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে জান্নাতে শুভ্র রঙ্গের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেনঃ বৎস, তুমি আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন কিছু লোক হবে যারা দো'আ এবং পবিত্রতার মধ্যে সীমাতিক্রম করবে।' [আবু দাউদঃ ৯৬, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৮৬৪, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৮৭, ৫/৫৫] (তিন) সাধারণ মুসলিমদের জন্য বদ দো'আ করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং অনুরূপ এখানে উল্লেখিত দো'আয় বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম। (চার) এমন অসম্ভব বিষয় কামনা করা যা হবার নয়। যেমন, নবীদের মর্যাদা বা নবুওয়ত চাওয়া।

(২) এখানে صلاح ও فساد শব্দ দু'টি পরস্পর বিরোধী। صلاح শব্দের অর্থ সংস্কার আর إصلاح শব্দের অর্থ সংস্কার করা এবং فساد শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ আর إفساد শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা। মূলতঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকে 'ফাসাদ' বলা হয়; তা সামান্য হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি

সাথে ডাক[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ | الْمُحْسِنِيْنَ۝

করো না, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।
আল্লাহ্ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। (এক) প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, সূরা মুহাম্মাদের ২নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ (দুই) অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন, সূরা আল-আহ্‌যাবের ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (তিন) সংস্কারের নির্দেশ দান করা। যেমন, এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।" এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপনের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। (দুই) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। নবী-রাসূল, গ্রন্থ ও হেদায়াত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শির্ক, পাপাচার ইত্যাদি থেকে পবিত্র করেছেন। সৎ আমল দিয়ে পূর্ণ করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গোনাহ্ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। একদিকে দো'আ অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদ মর্যাদা অর্জন করে। এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন কোন আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন, যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ। [কুরতুবী] মোটকথা, দো'আর দু'টি আদব হল- বিনয় ও নম্রতা এবং আস্তে ও সংগোপনে দো'আ করা। এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দো'আর সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারগ ও ফকীরের মত করে নেয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মত না হওয়া। দো'আ সংগোপনে করার সম্পর্কও জিহ্বার সাথে যুক্ত। এ আয়াতে দো'আর আরো দু'টি আভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হল এই যে, দো'আকারীর মনে এ ভয় ও আশংকা থাকা উচিত যে, সম্ভবতঃ দো'আটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দো'আ কবূল হতে পারে। তবে দো'আকারীর মনে এটা প্রবল

মুহসিনদের খুব নিকটে[১]।

৫৭. আর তিনিই সে সত্তা; যিনি তাঁর রহমত বৃষ্টির আগে বায়ু প্রবাহিত করেন সুসংবাদ হিসেবে[২],

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ

থাকতে হবে যে, তার দো'আ কবূল হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে এমনভাবে ডাকবে যে, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি তা কবূল করবেন।' [তিরমিযীঃ ৩৪৭৯, হাকেমঃ ১/৪৯৩, মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৭৭]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দো'আর সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্চনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে কোন ক্রটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দ লোকের দো'আও কবূল করতে পারেন। কবূল না হওয়ার আশংকা স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহ্‌র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্‌র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহ্‌র সামনে দো'আর হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু তার খাদ্য, পানীয় ও পোষাক সবই হারাম- এরূপ লোকের দো'আ কিরূপে কবূল হতে পারে?' [মুসলিমঃ ১০১৫] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ্ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দো'আ না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দো'আ কবূল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তড়িঘড়ি দো'আ করার অর্থ কি? তিনি বলেনঃ এর অর্থ হল এরূপ ধারণা করে বসা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দো'আ করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবূল হল না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দো'আ ত্যাগ করা। [মুসলিমঃ ২৭৩৫] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখনই আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করবে তখনই কবূল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দো'আ করবে' [মুসনাদ আহমাদঃ ২/১৭৭, তিরমিযীঃ ৩৪৭৯] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতের ভাণ্ডারের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দো'আ করলে অবশ্যই দো'আ কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে করা, গোনাহ্‌র কারণে দো'আ কবুল না হওয়ার আশংকা অনুভব করা এর পরিপন্থী নয়।

(২) এতে رياح শব্দটি ريح শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বায়ূ। আর بُشْرًا শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্য বায়ূ প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠান্ডা বায়ূ প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভাবী বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে।

لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

অবশেষে যখন সেটা ভারী মেঘমালা বয়ে আনে[১] তখন আমরা সেটাকে মৃত জনপদের দিকে চালিয়ে দেই, অতঃপর আমরা তার দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করি[২], তারপর তা দিয়ে সব রকমের ফল উৎপাদন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর[৩]।

(১) سحاب শব্দের অর্থঃ মেঘ, এবং ثقال শব্দটি ثقيل এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ, পানিতে ভরপুর মেঘমালা- যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাস্প (মৌসুমী বায়ু) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে।

(২) অর্থাৎ বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। [মানার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]
এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়-বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমতঃ বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। এতে বুঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বুঝানো হয়েছে।
দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্র সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।
এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহ্র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, তারপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-মূল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদেরকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর উৎকৃষ্ট ভূমি-তার ফসল তার রবের আদেশে উৎপন্ন হয়। আর যা নিকৃষ্ট, তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মে না[১]। এভাবে আমরা

করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-মূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও এবং ঈমান আন [জালালাইন]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে, কোনকিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফুঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে।[দেখুন,মুসলিমঃ ২৯৫৫]

(১) অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু' প্রকার হয়ে থাকে। (এক) উর্বর ও ভাল- যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরণের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-মূল উৎপন্ন হয়। (দুই) শক্ত ও লবনাক্ত ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে হয়তো কিছুই উৎপন্ন হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে। [তাবারী, বাগভী, ইবন কাসীর, সা'দী, জালালাইন] এর উদাহরণ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম নিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল এমন মুষল বৃষ্টির মত যা কোন যমীনের উপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর যমীন ছিল। তন্মধ্যে কিছু ভাল জমি ছিল যা পানি গ্রহণ করল ফলে তাতে ফসল ও প্রচুর ঘাস জন্মালো, আবার তন্মধ্যে এমন কিছু নিম্ন যমীনও ছিল যা পানি আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, ফলে আল্লাহ্ তার দ্বারা মানুষের উপকার করলেন। তারা তা পান করল এবং ফসল সিক্ত করল, ক্ষেত খামার করল। আবার তন্মধ্যে এমন কিছু যমীনও ছিল যা শক্ত ভূমি যা পানিও ধারণ করতে পারল না, কিছু উৎপন্নও করতে পারল না। ঠিক এটাই হল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনের ফিকহ তথা সুক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেছে আর আল্লাহ্ আমাকে যা নিয়ে পাঠিয়েছে তা তার উপকারে আসল, সে সেটা নিজে জানল অপরকে জানাল। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে এর প্রতি মাথা উঠিয়ে তাকাল না, আর আমি যে হেদায়াত নিয়ে এসেছি তা কবুল করল না। [বুখারীঃ ৭৯, মুসলিমঃ ২২৮২]

কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি[১]।

অষ্টম রুকূ'

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥٩

৫৯. অবশ্যই আমরা নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।'

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٦٠

৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত দেখছি।'

قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٦١

৬১. তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই, বরং আমি তো সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে রাসূল।'

أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٦٢

৬২. 'আমি আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানি।'

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ

৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে

(১) বৃষ্টির কল্যাণধারার মত আল্লাহ্‌র হেদায়াত ও নির্দেশাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক; কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষও এ হেদায়াত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও এর মর্যাদা দিয়ে থাকে। [সা'দী]

مِّنۡكُمۡ لِيُنۡذِرَكُمۡ وَلِتَتَّقُوۡا وَلَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿٦٣﴾

তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ[১] এসেছে, যাতে তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন এবং যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। আর যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও ?'

فَكَذَّبُوۡهُ فَاَنۡجَيۡنٰهُ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗ فِى الۡفُلۡكِ وَاَغۡرَقۡنَا الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَوۡمًا عَمِيۡنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অতঃপর তারা তার উপর মিথ্যারোপ করল। ফলে তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল আমরা তাদেরকে উদ্ধার করি এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই। তারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়[২]।

---

(১) মূলে ذكر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদেরই একজন লোক, যার বংশ ও সত্যবাদিতা তোমাদের কাছে স্বীকৃত। তার কাছে এমন কিছু এসেছে যা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে, যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। [মুয়াসসার]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। আদম 'আলাইহিস্ সালাম যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর দ্বন্দ ছিল না। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শির্কের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালাত ও শরী'আতের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম ও তার নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ' বছরের সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল, তার নবীসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 'আদম 'আলাইহিস্ সালাম ও নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের মাঝখানে দশ 'করণ' বা প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে।' [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২/৫৪৬] কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স হয়েছিল নয়শ' পঞ্চাশ বছর। [সূরা আল-আনকাবূতঃ ১৪] কেউ কেউ বলেনঃ তিনি এক হাজার বছরই আয়ু পেয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়শ' পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পূর্বে আর পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পরে। উপরোক্ত আয়াতেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে।

নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং শির্কে লিপ্ত

ছিল । তাদের শির্ক সম্পর্কে সুস্পষ্ট কথা এই যে, তারাই যমীনের বুকে সর্বপ্রথম শির্ক করেছিল । হাদীসে এসেছে যে, 'তাদের সম্প্রদায়ের পাঁচজন মহাব্যক্তিত্ব যাদের নাম যথাক্রমে- উদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাসর; তারা অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন । হঠাৎ করেই তারা মারা যান । এতে করে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে । তখন শয়তান এসে তাদেরকে বলেঃ আমি কি তোমাদেরকে তাদের কিছু ছবি বানিয়ে দেব না, যাতে তোমরা তাদেরকে দেখে দেখে বেশী ইবাদাত করতে পার? তারা অনুমতি দিলে শয়তান কিছু ছবি বানিয়ে তাদের ইবাদাতখানার পিছনে টাঙিয়ে রাখে । পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে ইবাদাতখানার সম্মুখভাগে নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে মূর্তির আকৃতি দান করে । তখনো তাদের ইবাদাত শুরু হয়নি । এ প্রজন্ম মারা যাওয়ার পরে পরবর্তী প্রজন্ম কি উদ্দেশ্যে এ মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল তা ভুলে গেলে শয়তান তাদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোর ইবাদাত করত এবং এগুলোর উসিলায় আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত । শেষপর্যন্ত তারা এগুলোর ইবাদাত শুরু করে ।' [বুখারীঃ ৪৯২০] আর এখান থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূহে তার বিস্তারিত আলোচনা করে কিভাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন । এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের দাওয়াতের কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন । তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেনঃ "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই । আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি ।" এখানে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত রয়েছে । এটাই সব নীতির মূলনীতি । তারপর শির্ক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে । এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল । অতঃপর ঐ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি । এর অর্থ আখেরাতের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং দুনিয়ার প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে । তার সম্প্রদায়ের ঌ০ বা নেতা গোছের লোকেরা উত্তরে বললঃ আমরা মনে করি যে, তুমি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছ । কারণ, তুমি আমাদেরকে বাপ-দাদার দ্বীন পরিত্যাগ করতে বলছ । কেয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ আর কিছু নয় ।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়াত । উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন । বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই । তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক দ্বীনের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে রাসূল । আমি যা কিছু

নবম রুকূ'

৬৫. আর 'আদ[১] জাতির নিকট তাদের

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا

বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদের মঙ্গল। এতে না আল্লাহ্‌র কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এরপর তারা যেহেতু নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামকে তাদের মত মানুষ হওয়ার কারণে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছিল, সেহেতু তিনি তার জবাবে বলেনঃ তোমরা কি এর ফলে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার বাণী তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও এবং রহমত লাভে ধন্য হও? অর্থাৎ তার ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর যাতে করে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয়।

স্বজাতির মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবেই মিথ্যারোপ করে যেতে থাকল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ এর পরিণতিতে আমরা নূহ্ ও তার সঙ্গীদেরকে নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ।

মোটকথা, এখানে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে- (এক) পূর্বতন সমস্ত নবী-রাসূলের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। (দুই) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কঠিন বিপদেও রক্ষা করেন। (তিন) রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্‌র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

(১) 'আদ' ছিল আরবের প্রাচীনতম জাতি। 'আদ' প্রকৃতপক্ষে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের পুত্র সামের বংশধরের এক ব্যক্তির নাম। তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কুরআনুল কারীমে 'আদের সাথে কোথাও 'আদে উলা' বা 'প্রথম আদ' এবং কোথাও আদ ইরাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, 'আদ সম্প্রদায়কে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় 'আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, দ্বিতীয় 'আদ হলো সামূদ জাতি। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, 'আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ এবং

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾

ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না(১)?'

অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় 'আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। [তাফসীর ইবন কাসীর; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

কুরআনের বর্ণনা মতে এ জাতিটির আবাসস্থল ছিল 'আহকাফ' এলাকা। এ এলাকাটি হিজায, ইয়ামন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'রুবয়ুল খালী'র দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা ইয়ামানের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাদরামাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ জাতিটির নিদর্শণাবলী দুনিয়ার বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিন আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে।

(১) আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের হেদায়াতের জন্য হূদ 'আলাইহিস্ সালামকে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তার আদেশ অমান্য করে। তারা শক্তিমত্ত হয়ে বলে বসলঃ "আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে"? [সূরা ফুসসিলাত: ১৫] এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও তারা শির্ক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করল না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা মাটির সাথে মিশে যায়। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাই বলা হয়েছেঃ "আমরা মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি"। হূদ 'আলাইহিস্ সালামের আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শির্কে লিপ্ত থাকার কারণে যখন 'আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হূদ 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন। হূদ 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা আযাব থেকে মুক্তি পেলেন। [বিস্তারিত ঘটনা দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

'আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্টভাবে

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখছি। আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি(১)।'

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে একজন রাসূল(২)।'

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. 'আমি আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি এবং

উল্লেখিত রয়েছে। সুরা আল-মুমিনূনে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ "অতঃপর আমি তাদের পরে আরো একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি"। বাহ্যতঃ এরাই হচ্ছে 'আদ' জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজকর্ম ও কথাবার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছেঃ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব এসেছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় উভয়টিই হয়েছিল। [তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৪৭৪; সূরা আল-মুমিনূনের ৪১ নং আয়াতের তাফসীর]

(১) *অর্থাৎ তারা মনে করতে থাকল যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা বলছেন তা* মিথ্যা। [মুয়াসসার] যদিও তারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যাবাদী মনে করত না। কারণ নবীগণ সর্বযুগেই সত্যবাদী ছিলেন।

(২) অর্থাৎ সম্প্রদায়ের নেতা গোছের লোকেরা বললঃ "আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী।" এটা প্রায় নূহ্ 'আলাইহিস্‌সালামের সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই– শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। হূদ 'আলাইহিস্‌সালাম এর উত্তরে বললেনঃ আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাংখী। তাই তোমাদের পৈত্রিক মুর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপুত নয়।

আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী।

৬৯. 'তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে[১]? এবং স্মরণ কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) পরে তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন[২] এবং সৃষ্টিতে (দৈহিক গঠনে) তোমাদেরকে বেশী পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

---

(১) এখানে 'আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ্ 'আলাইহিস্‌সালামের সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোন ফিরিশ্‌তা হলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরেও হূদ 'আলাইহিস্ সালাম তেমনি জবাব দিয়েছিলেন, যা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য আসবেন। কেননা, মানুষকে বুঝানোর জন্য মানুষেরই নবী হওয়া বাস্তবসম্মত হতে পারে।

(২) 'আদ জাতির পূর্বে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশক্তির স্মৃতি তখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হূদ 'আলাইহিস্ সালাম আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি। বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় করনা?

করত তা ছেড়ে দেই[১]? কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যা ভয় দেখাচ্ছ[২] তা নিয়ে এস।'

৭১. তিনি বললেন, 'তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলি নাম সম্বন্ধে যেগুলোর নাম তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ[৩], যে সম্বন্ধে

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۭ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَاۗءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

(১) এখানে একথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ জাতিটিও আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। অথবা তাঁর ইবাদাত করতে অস্বীকার করছিল না। আসলে তারা হুদ আলাইহিস্‌সালামের একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং তাঁর ইবাদাতের সাথে আর কারোর ইবাদাত যুক্ত করা যাবে না- এ বক্তব্যটি মেনে নিতে অস্বীকার করছিল।

(২) মূলে تَعِدُنَا শব্দ এসেছে। যার সাধারণ অর্থ, 'তুমি যার ওয়াদা আমাদের কাছে করছ'। কিন্তু এখানে খারাপ কোন পরিণতির ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার] আলেমগণ বলেন, এখানে وعد শব্দটি وعيد এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'রাফের ৭৭, সূরা হূদ এর ৩২ এবং সূরা আল-আহকাফের ২২ নং আয়াতেও এ শব্দটি একই অর্থে এসেছে।

(৩) অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ুর দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা, আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে থাকো। অথচ তাদের কেউ মূলতঃ কোন জিনিসের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নয়। বর্তমান যুগেও আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখি। এ যুগেও লোকেরা দেখি কাউকে বিপদ মোচনকারী বলে থাকে। অথচ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতাই তার নেই। লোকেরা কাউকে 'গন্‌জ বখশ' (গুপ্ত ধন ভান্ডার দানকারী) বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তার কাছে কাউকে দান করার মত কোন ধনভান্ডার নেই। কাউকে 'গরীব নওয়াজ' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তিনি নিজেই গরীব। যে ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ফলে কোন গরীবকে প্রতিপালন ও তার প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে সেই ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তার কোন অংশ নেই। কাউকে 'গাউস' (ফরিয়াদ শ্রবণকারী) বলা হয় অথচ কারোর ফরিয়াদ শুনার এবং তার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। কাজেই এ ধরনের যাবতীয় নাম বা উপাধি নিছক নাম বা উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। যারা এগুলো নিয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক করে তারা আসলে

আল্লাহ্ কোন সনদ নাযিল করেননি[১]? কাজেই তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।'

৭২. তারপর আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে আমাদের অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমাদের আয়াতসমূহে যারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং যারা মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম[২]।

فَأَنْجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

দশম রুকূ'

৭৩. আর সামূদ[৩] জাতির নিকট তাদের

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ

কোন বাস্তব জিনিসের জন্য নয়, বরং কেবল কতিপয় নামের জন্যই ঝগড়া ও বিতর্ক করে।

(১) অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই যে আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ রব বলে থাকো তিনি তোমাদের এ বানোয়াট ইলাহদের সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের সপক্ষে কোন সনদ দান করেননি। তিনি কোথাও বলেননি যে, আমি অমুকের ও অমুকের কাছে আমার ইলাহী কর্তৃত্বের এ পরিমাণ অংশ স্থানান্তরিত করে দিয়েছি। কাউকে 'বিপদত্রাতা' অথবা 'গনজ বখশ' বা 'গাউস' হবার কোন পরোয়ানা তিনি দেননি। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী তাঁর ইলাহী ক্ষমতার যতটুকু অংশ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে দিয়েছো।

(২) এ অনুবাদটি এ হিসেবে যে, তাদের ধ্বংসের কারণ দু'টি। তারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং ঈমান না এনে কুফরী করেছিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আয়াতের অর্থ এভাবেও করা যায় যে, যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর তারা ঈমান গ্রহণকারী ছিল না, কারণ তারা আয়াতসমূহের উপর মিথ্যারোপ এবং সৎকাজ ছেড়ে দিয়েছিল। [মুয়াসসার]

(৩) সামূদ আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদ জাতির পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। উত্তর-পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজো 'আল হিজর' নামে খ্যাত, সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সাউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে মদীনা থেকে প্রায় ২৫০ কিঃমিঃ দূরে একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ। এটিই ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾

ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে[১]।

নির্মাণ করেছিল এখনো অনেক এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৩৪-৩৬]

(১) অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রির ঘটনা এই যে, সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তার কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবী করল যে, তুমি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র নবী হও, তবে আমাদেরকে পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাও।

সালেহ্ 'আলাইহিস্‌সালাম প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন। দো'আর সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ ঈমান এনে ফেলল এবং অবশিষ্টরাও ঈমান আনার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেব-দেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরণের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। সালেহ্ 'আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই নবীসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেনঃ এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। আয়াতে এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী' বলা হয়েছে কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ্ 'আলাইহিস্

এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে চরে খেতে দাও এবং তাকে কোন কষ্ট দিও না, দিলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পেয়ে বসবে[১]।

৭৪. 'আর স্মরণ কর, 'আদ জাতির (ধ্বংসের) পরে তিনি তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের)

وَاذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن

সালামের মু'জিযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাকে রূহুল্লাহ্ বা 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আত্মা' বলা হয়েছে। এর দ্বারা ঈসাকে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য।
সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরণের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। কুরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "হে সালেহ্, আপনি স্বজাতিকে বলে দিন যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে।" অর্থাৎ একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। [বিস্তারিত দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর ও আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

(১) জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমরা নিদর্শন চেয়ো না। সালেহ এর কাওম নিদর্শন চেয়েছিল। ফলে সেটা এ রাস্তা দিয়ে ঢুকত আর ঐ রাস্তা দিয়ে বের হত। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের রবের নির্দেশ অমান্য করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। সে উষ্ট্রীর জন্য একদিনের পানি নির্দিষ্ট ছিল, আর তাদের জন্য তার দুধ নির্ধারিত ছিল অপরদিন। কিন্তু তারা সেটাকে হত্যা করল। তখন তাদেরকে এক বিকট চিৎকার পেয়ে বসল। যা আসমানের নীচে তাদের যারা ছিল তাদের সবাইকে নিস্তেজ করে দিল। তবে একজন ছাড়া। সে ছিল আল্লাহ্‌র হারামে (মক্কায়)। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে লোকটি কে? তিনি বললেন, সে হচ্ছে, আবু রিগাল। কিন্তু সে যখনই হারাম থেকে বের হল তখনই তার পরিণতি তা-ই হয়েছিল যা তার সম্প্রদায়ের হয়েছিল।' [মুসনাদে আহমাদ ৩/২৯৬; মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩২০]

سُهُوۡلِهَا قُصُوۡرًا وَّتَنۡحِتُوۡنَ الۡجِبَالَ بُيُوۡتًا ۚ فَاذۡكُرُوۡۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ ۝

স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি তৈরী করছ(১)। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না(২)।'

قَالَ الۡمَلَاُ الَّذِيۡنَ اسۡتَكۡبَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِهٖ لِلَّذِيۡنَ اسۡتُضۡعِفُوۡا لِمَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُمۡ اَتَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرۡسَلٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرۡسِلَ بِهٖ مُؤۡمِنُوۡنَ ۝

৭৫. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা সে সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছিল- যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ তার রব এর পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বলল, 'নিশ্চয় তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তার উপর ঈমানদার।'

قَالَ الَّذِيۡنَ اسۡتَكۡبَرُوۡۤا اِنَّا بِالَّذِىۡۤ اٰمَنۡتُمۡ بِهٖ كٰفِرُوۡنَ ۝

৭৬. যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, 'নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তাতে কুফরীকারী(৩)।'

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন। তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীনের মূল বিশ্বাসসমূহে সব নবীই একমত। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(৩) এখানে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছেঃ সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত-অর্থাৎ যারা

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۝

৭৭. অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এস, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ۝

৭৮. অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল[১]।

বিশ্বাস স্থাপন করেছিল-তাদেরকে বললঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল? উত্তরে মুমিনরা বললঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে হেদায়াতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী। সামূদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আনীত বাণী। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহ্‌র দয়ায় আমরা তার আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের এ অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের দো'আয় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব-জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা। সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হত না। কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের এক যুবক উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। সে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং তরবারীর আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল। কুরআনুল কারীম তাকেই সামূদ জাতির সর্ববৃহৎ

হতভাগ্য লোক বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেঃ ﴿إِذِ انۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا﴾ [সূরা আস্-শামসঃ ১২] কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।
উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবন কাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। এরপরই আযাব নেবে আসবে। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী কার্যকর হয় না। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা ও প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দেই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না।" [সূরা আন্-নমলঃ ৫০] শেষপর্যন্ত ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধঃমুখী হয়ে ভূশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখিত রয়েছে। অন্যান্য আয়াতে ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দের কথা এসেছে। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল; নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার।
বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাব-বিধ্বস্ত এলাকার ভেতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে। আর যদি ঢুকতেই হয় তবে যেন ক্রন্দনরত অবস্থায় ঢুকে [দেখুন, বুখারীঃ ৪৩৩, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, ৩৩৮১, ৪৭০২, ৪৪২০, মুসলিমঃ ২৯৮০, ২৯৮১, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৬৬, ১১৭, ৭২, ৯১]
কোন কোন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবু রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হারামের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হারাম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে

৭৯. এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার রবের রিসালত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না(১)।'

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

৮০. আর আমি লূতকেও(২)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ

পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবু রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেনঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/২৯৬, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৪০, ৩৪১, সহীহ ইবন হিব্বানঃ ৬১৯৭]

এসব আযাব-বিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআনুল কারীম আরবদেরকে বার বার হুশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজো শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে।

(১) স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, কিন্তু আফসোস, তোমারা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

(২) লূত 'আলাইহিস্ সালাম ছিলেন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে নবী করে পাঠান। কিন্তু সবাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলিম হন। অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ্র নির্দেশে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্

সালাম বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই বসতি স্থাপন করেন।
লূত 'আলাইহিস্ সালামকেও আল্লাহ্ তা'আলা নবুওয়াত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআনুল কারীম বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও 'মু'তাফেকাত' শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হত। লূত 'আলাইহিস্ সালাম এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্ব প্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা লূত 'আলাইহিস্ সালামকে তাদের হেদায়াতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমরা এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।" অর্থাৎ লূত 'আলাইহিস্ সালামের জাতি নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। এটা ছিল এমন কাজ যা এর পূর্বে কোন জাতি করেনি। *এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী* সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ। লূত 'আলাইহিস্ সালামের উপদেশের জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও। তখন গোটা জাতিই আল্লাহ্র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত 'আলাইহিস্ সালাম ও তার কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "আমি লূত ও তার পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি।" কারণ, লূত 'আলাইহিস্ সালামের ঘরের লোকেরাই শুধু মুসলিম ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তার স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সারকথা এই যে, গোণা-গুণতি কয়েকজন মুসলিম ছিল। তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা লূত 'আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোককে নিয়ে শেষ রাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। লূত 'আলাইহিস্ সালাম এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে সাদূম ত্যাগ করেন। তার স্ত্রী প্রসঙ্গে দু'রকম বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাদের উপর আপতিত আযাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে

مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَٰلَمِينَ ⁘

পাঠিয়েছিলাম[১]। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কি এমন খারাপ কাজ করে যাচ্ছ যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ⁘

৮১. 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশী দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে থেকে জীব্রাঈল 'আলাইহিস্ সালাম গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। সূরা আল-হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছেঃ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। লূত 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। সূরা হূদের বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা আরবদেরকে হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, উল্টে দেয়া বস্তিগুলো যালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। এ দৃশ্য শুধু কুরআন নাযিলের সময়েরই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিতি। এর ভূ-ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরণের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদূমের অবস্থান স্থল। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৫৭-৬১]

(১) বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্দান বলা হয় সেখানেই ছিল এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এ এলাকাটি অবস্থিত। এ এলাকা এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করত। কিন্তু আজ এ জাতির নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে।

৮২. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।'

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনদের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল(১)।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

এগারতম রুকূ'

৮৫. আর মাদ্‌য়ানবাসীদের(২) নিকট তাদের

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছি যে, তারা লুতের জাতির কাজ করে বসবে'। [তিরমিযীঃ ১৪৫৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য যবেহ করে আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে তাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে পথ ভুলিয়ে দেয় তাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন, যে ব্যক্তি তার আপন মনিব ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব বানায় আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩০৯] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যদি কাউকে তোমরা লুত জাতির কাজ করতে দেখ তবে যে এ কাজ করছে এবং যার সাথে করা হচ্ছে উভয়কে হত্যা কর'। [আবু দাউদঃ ৪৪৬২]

(২) মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মূল এলাকাটি হেজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন যুগে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়েমেন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিশরের

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই; তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। কাজেই তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মুমিন হলে তোমাদের জন্য এটাই কল্যাণকর।'

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৮৬. 'আর তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য, আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিতে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে তোমরা প্রতিটি পথে বসে থেকো না।' আর স্মরণ কর, 'তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর।'

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا

৮৭. 'আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে

দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো অবস্থিত ছিল। এ কারণে আরবের লোকেরা মাদইয়ান জাতি সম্পর্কে জানতো। কারণ তাদের ব্যবসাও এ পথে চলাচল করতো।
মাদ্‌ইয়ানের বর্তমান নাম 'আল বিদা'। এ এলাকাটি একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। সৌদী আরবের শেষ প্রান্তে মিশরের সীমান্ত সংলগ্ন এ এলাকায় এখনো শু'আইব আলাইহিস সালামের জাতির বিভিন্ন চিহ্ন রয়ে গেছে। যা 'মাগায়েরে শু'আইব নামে খ্যাত। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৭২]

بِالَّذِيٓ أُرۡسِلۡتُ بِهِۦ وَطَآئِفَةٞ لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ فَاصۡبِرُواْ حَتَّىٰ يَحۡكُمَ اللَّهُ بَيۡنَنَاۚ وَهُوَ خَيۡرُ الۡحَٰكِمِينَ ۝٨٧

এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধর, যতক্ষন না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।'

قَالَ الۡمَلَأُ الَّذِينَ اسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَٰرِهِينَ ۝٨٨

৮৮. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, 'হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।' তিনি বললেন, 'যদিও আমরা সেটাকে ঘৃণা করি তবুও?'

قَدِ افۡتَرَيۡنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنۡ عُدۡنَا فِي مِلَّتِكُم بَعۡدَ إِذۡ نَجَّىٰنَا اللَّهُ مِنۡهَاۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلۡنَاۚ رَبَّنَا افۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِالۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ الۡفَٰتِحِينَ ۝٨٩

৮৯. 'তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আর আমাদের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে না করলে তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানের সীমায় রয়েছে, আমরা আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।'

وَقَالَ الۡمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَئِنِ اتَّبَعۡتُمۡ شُعَيۡبًا إِنَّكُمۡ إِذٗا لَّخَٰسِرُونَ ۝٩٠

৯০. আর তার সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, 'তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

৯১. অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২. শু'আইবকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হল তারা যেন কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। শু'আইবকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩. অতঃপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের রিসালাত (প্রাপ্ত বাণী) আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। সুতরাং আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি[১]!'

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

---

(১) শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআনুল কারীমে কোথাও তাদেরকে 'আহ্‌লে মাদ্‌ইয়ান' ও 'আসহাবে মাদ্‌ইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোথাও 'আসহাবে আইকাহ্' নামে। 'আইকাহ্' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আসহাবে মাদ্‌ইয়ান' ও 'আসহাবে আইকাহ্' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আসহাবে মাদ্‌ইয়ানের উপর কোথাও صيحة এবং কোথাও رجفة এবং আসহাবে আইকাহ্‌র উপর কোথাও ظلة -এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্পন এবং ظلة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকাহ্‌র উপর এভাবে আযাব নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে

হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্পন। ফলে সবাই নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।
কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আসহাবে মাদ্ইয়ান' ও 'আসহাবে আইকাহ্' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লেখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চীৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্পন হয়। ইবনে কাসীর এ তাফসীরেরই প্রবক্তা। [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস, পৃ. ২৮৫-২৯৩]
মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদের কাছে তাওহীদের বাণীই পৌঁছান। তারা শির্কের পাশাপাশি এমনকিছু কুকর্মে লিপ্ত ছিল, যা থেকে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে নিষেধ করেন। তারা একদিকে আল্লাহ্র হক নষ্ট করছিল, অপরদিকে বান্দার হকও নষ্ট করছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ্র হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়াতের জন্য শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদের সংশোধনের জন্য তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব নবী দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ বাণী পৌঁছানো হয়েছে। আরো বলা হয়েছেঃ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না। এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর সর্ব প্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন-সম্পদ, ইয্যত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন। এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারো ইয্যত-আবরু নষ্ট করা, কারো পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে

ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় করত। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের ইয্যত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। তৃতীয়তঃ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। অর্থাৎ পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুতঃ তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর আভ্যন্তরীণ সংস্কার হল আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি পরিত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে তোমাদের জন্য উত্তম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি তোমরা অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। দ্বীন ও আখেরাতের মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। দুনিয়ার মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে। এরপর তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশ্বর্য্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছেঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর- কওমে নূহ্, 'আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ কর। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের দাওয়াতের পর তার সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলিম হয়, এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছেঃ তাড়াহুড়া কিসের? আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন

সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে। জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথা-বার্তা ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ করলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে সত্যভাবে ফয়সালা করে দিন, এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ দো'আ কবূল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের আযাবকে এখানে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে ছায়াদিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। [সূরা আশ-শু'আরা: ১৮৯] 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নীচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেনঃ শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ট হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল সেখনে আরো বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই আসে। [তাবারী, ৬/৯/৪; আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস পৃ. ২৯২-২৯৩]

স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম বদদো'আ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আযাব এসে গেল তখন নবীসুলভ দয়ার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেনঃ আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাংখায় কোন ত্রুটি করিনি; কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি? [এ জাতির বিস্তারিত ঘটনা ও পরিণতি জানার জন্য দেখুন, ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৪৩৯]

বারতম রুকূ'

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذۡنَاۤ اَهۡلَهَا بِالۡبَاۡسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ یَضَّرَّعُوۡنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. আর আমরা কোন জনপদে নবী পাঠালেই সেখানকার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে[১]।

ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَكَانَ السَّیِّئَۃِ الۡحَسَنَۃَ حَتّٰی عَفَوۡا وَّقَالُوۡا قَدۡ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذۡنٰهُمۡ بَغۡتَۃً وَّهُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে।' অতঃপর হঠাৎ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করি, এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারে না[২]।

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং সকল জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কুরাইশ কাফেরদের জন্যও প্রযোজ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগী হতে পারে। তাঁরই দিকে ফিরে আসতে পারে, নবী-রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করা থেকে বিরত হয়। [তাবারী; সা'দী]

(২) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে দু'ধরণের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদেরকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং তা অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্য পরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি; বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। সৎ কিংবা

৯৬. আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম(১), কিন্তু তারা

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রাকৃতিক নিয়মই তাই- কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো রোগ, কখনো স্বাস্থ্য, কখনো দারিদ্র্য, কখনো স্বচ্ছলতা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে করে তারা তখনই নিপতিত হলো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। অর্থাৎ তারা যখন উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হল না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেল্লাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আর বরকতের মূল হচ্ছে, কোন কিছু নিয়মিত থাকা। [বাগভী] 'আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেয়া' বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেয়া। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনমত উৎপাদিত হত এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হত। [ফাতহুল কাদীর] তাতে তাদেরকে এমন কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপোড়নের সম্মুখীন হতে হত না যার দরুন বড় বড় নেয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনো মুল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্য দ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পেটভরে খাওয়া যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন সময় মূল বস্তুতে বাহ্যতঃ কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণে যা ছিল তাই থেকে যায় কিন্তু তার দ্বারা এতবেশী কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদুয়ার অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিষ তৈরী করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এই বরকত মানুষের ধন সম্পদে হতে পারে, মন মস্তিস্কে হতে পারে আবার কাজ কর্মেও হতে পারে।

মিথ্যারোপ করেছিল; কাজেই আমরা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে?

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ

৯৮. নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ

৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না[১]।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

কোন কোন সময় মাত্র এক গ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধও কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশী।

(১) মূলে 'মকর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আরবীতে এর মূল অর্থ হচ্ছে, ধোকাগ্রস্ত করা [ফাতহুল কাদীর] বা গোপনে গোপনে কোন চেষ্টা তদবীর করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমনভাবে গুটি চালানো, যার ফলে তার উপর চরম আঘাত না আসা পর্যন্ত সে জানতেই পারে না যে, তার উপর এক মহা বিপদ আসন্ন। বরং বাইরের অবস্থা দেখে সে একথাই মনে করতে থাকে যে, সব কিছু ঠিকমত চলছে। [আল-মানার ১১/২৭৪]

তবে এ আয়াতে যে 'মকর' বা কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তা আল্লাহর এক গুণ। তিনি তার বিরোধীদের পাকড়াও করার জন্য যে কৌশলই অবলম্বন করেন তা অবশ্যই প্রশংসাপূর্ণ গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ তারাও আল্লাহর সাথে অনুরূপ করে বলে মনে করে থাকে। তিনি যে রকম তাঁর গুণও সে রকম। তাঁর এ গুণে গুণান্বিত হবার ধরণ সম্পর্কে কেউ জানতে পারে না। এ জাতীয়

তেরতম রুকূ'

১০০. কোন দেশের জনগনের পর যারা ঐ দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমরা ইচ্ছে করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি[১]? আর আমরা তাদের হৃদয় মোহর করে দেব, ফলে তারা শুনবে না[২]।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

আলোচনা সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।[আরও দেখুন, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ]

(১) আয়াতে يهد অর্থ চিহ্নিতকরণ, প্রতীয়মান হওয়া এবং বাতলে দেয়া। এখানে এর কর্তা হল সে সমস্ত ঘটনাবলী যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূ-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ীর উত্তরাধিকারী হয়েছে কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলী একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্‌র তা'আলার আযাব ও গযব আসতে পারে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের স্থানে স্থানে এ বিষয়টি বার বার উল্লেখ করে মানুষকে পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। যেমনঃ সূরা তোয়াহাঃ ১২৮, সূরা আস্ সাজদাহঃ ২৬, সূরা ইবরাহীমঃ ৪৫, সূরা মারইয়ামঃ ৯৮, সূরা আল-আন'আমঃ ৬, ১০, সূরা আল-আহকাফঃ ২৫-২৭, সূরা সাবাঃ ৪৫, সূরা আল-মুলকঃ ১৮, সূরা আল-হাজঃ ৪৫-৪৬।

(২) অর্থাৎ এরা অতীত ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহ্‌র গযবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়, তারা তখন কিছুই শুনতে পায় না। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন লোক যখন প্রথমবার পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরে মালিন্যের একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাওবাহ্ না করে তাহলে এই কালি-বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে।' [দেখুন- ইবন মাজাহ্ঃ ৪২৪৪] তখন মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে,

تِلۡكَ الۡقُرٰى نَقُصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ اَنۡۢبَآئِهَا‌ۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ‌ۚ فَمَا كَانُوۡا لِيُؤۡمِنُوۡا بِمَا كَذَّبُوۡا مِنۡ قَبۡلُ‌ؕ كَذٰلِكَ يَطۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۱۰۱﴾

১০১. এসব জনপদের কিছু বিবরণ আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন; কিন্তু পূর্বে তারা যাতে মিথ্যারোপ করেছিল, তাতে তারা ঈমান আনার ছিল না[১], এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদের হৃদয় মোহর করে দেন।

وَمَا وَجَدۡنَا لِاَكۡثَرِهِمۡ مِّنۡ عَهۡدٍ‌ۚ وَاِنۡ وَّجَدۡنَاۤ اَكۡثَرَهُمۡ لَفٰسِقِيۡنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২. আর আমরা তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি; বরং আমরা তাদের অধিকাংশকে তো ফাসেকই পেয়েছি[২]।

সে ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কুরআনে رأن القلوب অর্থাৎ 'অন্তরের মরচে' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরো বহু আয়াতে 'মোহর এঁটে দেয়া হয়' বলা হয়েছে। এ অবস্থায় উপণীত হলে সত্যসেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না, কল্যাণের কোন স্থান সেখানে থাকে না, যা তাদের উপকারে আসবে এমন কিছু শুনতে পায় না। শুধু সেটাই শুনতে পায় যা তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগে। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ তাদের অন্তর মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটি মনস্তাত্বিক নিয়মের আওতাধীন হয়ে যায়, যার দৃষ্টিতে একবার জাহেলী বিদ্বেষ বা হীন ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পর মানুষ নিজের জিদ ও হঠকারিতার শৃংখলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে যে, তারপর কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, নিরীক্ষাই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তার মনের দুয়ার খুলে দেয় না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ, যদি আমরা তাদেরকে আবার জীবিতও করতাম, তারপরও তারা ঈমান আনত না। কারণ কুফরী ও শির্ক করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে উদ্দেশ্য এই যে, তারা পূর্বে যখন আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তখনই মিথ্যারোপ করেছিল। আল্লাহকে রব ও রাসূলদের মেনে ঈমান আনতে তখনও স্বতঃস্ফুর্তভাবে চায়নি। বরং তারা অনিচ্ছাসত্বেই ঈমানের কথা বলেছিল। সুতরাং যাতে তারা পূর্বে ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল তাতে তারা কখনও ঈমান আনবে না। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ কোন ধরনের অংগীকার পালনের পরোয়াই তাদের নেই। আল্লাহর পালিত বান্দা হবার কারণে জন্মগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে

১০৩. তারপর আমরা তাদের পরে মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছি; কিন্তু তারা সেগুলোর সাথে অত্যাচার করেছে[১]। সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করুন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَىٰ بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

১০৪. আর মূসা বললেন, 'হে ফির'আউন[২]!

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ

আবদ্ধ, তা প্রতিপালনের কোন পরোয়াই তাদের নেই। তারা সামাজিক অংগীকার পালনেরও কোন পরোয়া করে না, মানব সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি যার সাথে একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ অন্যদিকে নিজের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তগুলোতে অথবা কোন সদিচ্ছা ও মহৎ বাসনা পোষণের মুহূর্তে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়, তাও তারা পালন করে না। এ ধরনের অংগীকার ভঙ্গ করাকে এখানে ফাসেকী বলা হয়েছে। [সা'দী] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে অঙ্গীকার বলে সে অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা আদমের পিঠে মানুষ থেকে নিয়েছিলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আল্লাহ্র আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি যুলুম করার অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বুঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ যুলুমের প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীতে ব্যবহার করা। সে হিসেবে ফির'আউন মূসা আলাইহিস সালাম যে সমস্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন সেগুলোর সাথে যুলুম করেছিল। অন্য আয়াতে সে যুলুমের ব্যাখ্যা এসেছে, "আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল" [সূরা আন-নামল:১৪] সুতরাং তারা সত্য জেনেও সেগুলোকে যুলুমবশতঃ অস্বীকার করেছিল। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) মিসরীয় শাসকরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেকটি শাসক নিজেদের জন্য "ফির'আউন" (ফারাও) উপাধি গ্রহণ করে দেশবাসীর সামনে একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে, আমি-ই তোমাদের প্রধান রব বা মহাদেব। পরবর্তীতে ফির'আউন শব্দটি অহংকারী দাম্ভিক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেউ যদি অহংকারী ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে তখন বলা হয়, تَفَرْعَنَ فُلَانٌ বা অমুক দাম্ভিকতা, অহংকার ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। [কাশশাফ] কোন কোন মুফাসসির বলেন, প্রত্যেক চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারীকে تَفَرْعَنَ বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

الْعٰلَمِيْنَ ۝

নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে প্রেরিত।'

حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۝

১০৫. 'এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলব না। তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি, কাজেই বনী ইস্রাঈলকে তুমি আমার সাথে পাঠিয়ে দাও[১]।'

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১০৬. ফির'আউন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক, তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

১০৭. অতঃপর মূসা তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল[২]।

(১) মূসা আলাইহিস সালামকে দু'টি জিনিসের দাওয়াত সহকারে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এক, আল্লাহর বন্দেগী তথা ইসলাম গ্রহণ করো। দুই, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়, যারা আগে থেকেই মুসলিম ছিল, তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। কুরআনের কোথাও এ দু'টি দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এক সাথে আবার কোথাও স্থান-কাল বিশেষে আলাদা আলাদাভাবে এদের উল্লেখ এসেছে।

(২) সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্কর; আমি কখনো মিথ্যা বলিওনি বলতে পারিও না। কারণ নবী-রাসূলগণ খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত নিষ্পাপ। তাছাড়া শুধুমাত্র তাই নয় যে, আমি কখনো মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবীর সপক্ষে আমার মু'জিযাসমূহ প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন এবং আমার কথা মান। বনী-ইস্রাঈলকে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফির'আউন অন্য কোন কথাই লক্ষ্য করল না; মু'জিযা দেখবার দাবী করতে লাগল এবং বললঃ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।
মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন, আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল। 'সূ'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক 'মুবীন' শব্দ উল্লেখ করে বলে দেয়া

১০৮. এবং তিনি তাঁর হাত বের করলেন[১] আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগল[২]।

وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

চৌদ্দতম রুকূ'

১০৯. ফির'আউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর[৩],'

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না। সাধারণতঃ যা জাদুকরদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে সবার সামনে।

(১) نزع অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভেতর থেকে বের করলেন তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচ থেকে অর্থাৎ কখনো গলাবন্ধর ভিতরে ঢুকিয়ে তা বের করলে আবার কখনো বগল-তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকত।

(২) তখন ফির'আউনের দাবীতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দু'টি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া আর অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের শিক্ষায় হেদায়াতের জ্যোতি রয়েছে আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

(৩) ملأ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বুঝানোর জন্য। অর্থ হচ্ছে, ফির'আউন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললঃ এ যে বড় পারদর্শী জাদুকর। তার কারণ প্রত্যেকের চিন্তা তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কুদরাত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফির'আউনকে 'রব' আর জাদুকরদেরকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং জাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাজাদু। কিন্তু তারাও এখানে ساحر এর সাথে عليم শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ জাদুকরদের

১১০. 'এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও[১]?'

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও[২],'

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ জাদুকর।
বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বযুগেই নবী- রাসূলগণের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারীতা অবলম্বন না করে তাহলে মু'জিযা ও জাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। জাদুকররা সাধারণতঃ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশী হবে তাদের জাদুও তত বেশী কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী-রাসূলগণের সহজাত অভ্যাস। তাছাড়া মু'জিযা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কুদরাতের কাজ। তাই কুরআনুল কারীমে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন ﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ "এবং আল্লাহ্ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন"। [সূরা আল-আনফাল:১৭]
সারমর্ম এই যে, ফির'আউনের সম্প্রদায়ও মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযাকে নিজেদের জাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ তো বড় বিজ্ঞ জাদুকর, সাধারণ জাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

(১) এ আয়াতগুলোতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফির'আউন যখন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল; লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় তা লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ আসমানী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবী ছিল মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর ঈমান নিয়ে আসা। কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফির'আউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বললঃ তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তার উদ্দেশ্য হল তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদেরকে বের করে দেয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

(২) সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তার মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে

১১২. 'যেন তারা তোমার কাছে প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।'

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১৩. জাদুকররা ফির'আউনের কাছে এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো[১]?'

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾

১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ জাদুকর রয়েছে; যারা তাকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে জাদুকরদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে। তখন জাদু মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর জাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মূসা 'আলাইহিস্ সালামকেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেয়া হয়েছিল যাতে জাদুকরদের সাথে তার প্রতিদ্বন্দিতা হয় এবং মু'জিযার মোকাবেলায় জাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার রীতিও ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের কাছে বহুল প্রচলিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মু'জিযা দান করেছেন। ঈসা আলাইহিস্সালামের যামানায় চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাকে মু'জিযা দেয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আরবে অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মীতার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল কুরআন, যার মোকাবেলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

(১) ফির'আউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই মজুরী নিয়ে দরকষাকষি করতে শুরু করল। তার কারণ যারা ভ্রান্তবাদী পার্থিব লাভই হল তাদের মূখ্য। কাজেই যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রাসূলগণ এবং তাদের যারা নায়েব বা প্রতিনিধি তারা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেনঃ "আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্র উপরই রয়েছে"। [সূরা আস-শু'আরাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০] ফির'আউন তাদেরকে বললঃ তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

১১৫. তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব[১]?'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬. তিনি বললেন, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকদের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু নিয়ে এল[২]।

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

১১৭. আর আমরা মূসার কাছে ওহী পাঠালাম যে, 'আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন'[৩]। সাথে সাথে সেটা তারা

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

(১) অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকররা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে বললঃ হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপ করি। সম্ভবত তারা নিজেদের নিশ্চয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্যই তা বলেছিল। উদ্দেশ্য যেন এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই, যে ইচ্ছা প্রথমে তার কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করুক। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, "তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর"। কারণ, তাদের কর্মকাণ্ডের পর মু'জিযা বের হলে সেটা তাদের অন্তরে কঠোরভাবে রেখাপাত করতে বাধ্য হবে। [ইবন কাসীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নযরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নযরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়। [ইবন কাসীর] কিন্তু তাই বলে এ কথা প্রতীয়মান হয় না যে, জাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ। বরং জাদুর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকার অনুসারে শরী'আতে তার বিধানও ভিন্ন হয়ে থাকে।

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জাদুকরদের বিপরীতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে কিভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেনঃ আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম যে, আপনার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড়

যে অলীক বস্তু বানিয়েছিল তা গিলে ফেলতে লাগল;

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯. সুতরাং সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল,

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০. এবং জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হল।

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সৃষ্টিকুলের রবের প্রতি'।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. 'মূসা ও হারূনের রব।'

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. ফির'আউন বলল, 'কি! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তাতে ঈমান আনলে? এটা তো এক চক্রান্ত; তোমরা এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদেরকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য[১]। সুতরাং

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো জাদুকররা জাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মূসা 'আলাইহিস্ সালামের লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধারণ করে এল তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

(১) অর্থাৎ এটা একটা ষড়যন্ত্র যা তোমরা প্রতিদ্বন্দিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিল। তারপর জাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে বললঃ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে। অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহ্‌স্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারো কাম্য ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরও মুসলিম হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে-শুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।
এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা

তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে ।

১২৪. 'অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে টুকরো করে ফেলব; তারপর অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব(১) ।'

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব;'

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. 'আর তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ শুধু এ জন্যে যে, আমরা আমাদের রবের নিদর্শনে ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিমরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দিন ।'

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

আর জাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল । অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকীটি করল এই যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল, "তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদেরকে এখান থেকে বহিস্কার করতে চাও" । অথচ মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ ফির'আউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিস্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জাতি ও জনসাধারনের সাথে যার কোন সম্পর্কই ছিল না ।

(১) ফির'আউন মূল বিষয়টাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মত চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য জাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল । প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, "তোমাদের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে" অতঃপর তা পরিস্কারভাবে বলল, "আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব" । বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা । যাতে উভয় পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে ।

পনরতম রুকূ'

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আর ফির'আউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে[১] বর্জন করতে দেবেন?' সে বলল, 'শীঘ্রই আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের উপর শক্তিধর[২]।'

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর; নিশ্চয় যমীন আল্লাহ্‌রই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার

(১) এ কালেমায় দু'টি কেরাআত আছে, (এক) وآلهتك অর্থাৎ আপনার মা'বুদদেরকে। তখন এর অর্থ হবেঃ ফির'আউন নিজে ইলাহ হওয়ার দাবী করলেও তার আরও কিছু মা'বুদ ছিল। তার জাতির নেতা শ্রেণীর লোকেরা বলতে লাগল যে, কিভাবে এরা আপনাকে এবং আপনার মা'বুদদের ইবাদত ত্যাগ করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারে? (দুই) وإلاهتك অর্থাৎ আপনার ইবাদতকে। তখন এর অর্থ হবেঃ ফির'আউন আর কোন মা'বুদের ইবাদত করত না, বরং তার জাতির নেতা গোছের লোকেরা তাকে এ বলে উস্কাতে লাগল যে, তাদের কেমন সাহস যে, তারা আপনার ইবাদতকে ত্যাগ করতে পারে? [তাবারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ফির'আউনের সভাষদ নেতা গোছের লোকেরা ফির'আউনকে বলল যে, তাহলে কি তুমি মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে? এতে বাধ্য হয়ে ফির'আউন বললঃ তার বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব শুধু কন্যা-সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপর তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

ওয়ারিশ বানান। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই[১]।'

قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. তারা বলল, 'আপনি আমাদের কাছে আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনি আসার পরও।' তিনি বললেন, 'শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর তোমরা কি কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।'

ষোলতম রুকূ'

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর অবশ্যই আমরা ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

১৩১. অতঃপর যখন তাদের কাছে কোন কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 'এটা আমাদের পাওনা।' আর যখন কোন অকল্যাণ পৌঁছত তখন তারা মূসা ও তার সাথীদেরকে

---

(১) ফির'আউন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী-ইস্‌রাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করে মেয়েদেরকে জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে বনী-ইস্‌রাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের জন্মের পূর্বে ফির'আউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূলজনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকীরাই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে।

অলক্ষুণে[১] গণ্য করত। সাবধান! তাদের অকল্যাণ তো কেবল আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে; কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না।

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর তারা বলত, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের কাছে পেশ কর না কেন, আমরা তোমার উপর ঈমান আনব না।'

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. অতঃপর আমরা তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত বিস্তারিত নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করি। এরপরও তারা অহংকার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়[২]।

---

(১) কুলক্ষণ নেয়া কাফের মুশরিকদেরই কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কুলক্ষণ নেয়া শির্ক'। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৮৯] যুগে যুগে মুশরিকরা ঈমানদারদেরকে কুলক্ষণে, অপয়া ইত্যাদি বলে অভিহিত করত।

(২) ফির'আউনের জাদুকরদের সাথে সংঘটিত সে ঐতিহাসিক ঘটনার পরও মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ দিন যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। আলোচ্য আয়াতে এই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কেই বলা হয়েছে।
এই নয়টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থাৎ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের শুভ্রতা ফির'আউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জয়লাভ করেন। তারপরের একটি নিদর্শন যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে তা ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকূল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দো'আ করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. আর যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, 'হে মূসা! তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সাথে তিনি যে অংগীকার করেছেন সে অনুযায়ী; যদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি দূর করে দিতে পার তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনবই এবং বনী ইস্‌রাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দেব।'

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. আমরা যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি[১] দূর করে দিতাম এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অংগীকার ভংগ করত।

আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে, তা হল আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে আরো ছয়টি এমন নিদর্শন দেন যার উদ্দেশ্য ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়কে সৎপথে নিয়ে আসা। আল্লাহ্ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুন পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এতে ফির'আউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে। এসব আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কাছে পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেলে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর ঈমান আনবে। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন, ফলে তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহ্‌র আযাব চেপে থাকে, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করল।

(১) এখানে শাস্তি বলে মহামারী জাতীয় কিছু বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মহামারী এমন একটি শাস্তি যা আল্লাহ্ বনী ইস্‌রাঈলের উপর পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোথাও তা বিদ্যমান তখন তোমরা সেখানে যেও না। আর যদি মহামারী এলাকায় তোমরা থাক, তবে সেখান থেকে পালানোর জন্য বের হয়ো না। [বুখারীঃ ৬৯৭৪, মুসলিমঃ ২২১৮]

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. কাজেই আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমাদের নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে আমরা আমাদের কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি[১]; এবং বনী ইস্‌রাঈল সম্বন্ধে আপনার রবের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধরেছিল, আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।

---

(১) বলা হয়েছেঃ "যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হত, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।" কুরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে "যে জাতিকে ফির'আউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল" বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, "যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনো দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ, প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই হাতে।
আর যমীনের মালিক বানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَاَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। مَشَارِقَ শব্দটি مَشْرِقٌ এর বহুবচন। আর مَغَارِب হচ্ছে مَغْرِبٌ এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' বা উদয়াচলসমূহ এবং 'মাগারিব' বা অস্তাচলসমূহ বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমীন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে- যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কওমে-ফির'আউন ও কওমে-আমালেকাকে ধ্বংস করার পর বনী-ইস্‌রাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন। [ইবন কাসীর; সা'দী]

১৩৮. আর আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করিয়ে দেই; তারপর তারা মূর্তিপূজায় রত এক জাতির কাছে উপস্থিত হয়। তারা বলল, 'হে মূসা! তাদের মা'বুদদের ন্যায় আমাদের জন্যও একজন মা'বুদ স্থির করে দাও[1]। তিনি বললেন, 'তোমরা তো এক জাহিল সম্প্রদায়।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُونَ عَلٰٓى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يٰمُوسَى اجْعَل لَّنَآ إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. 'এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত করা হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক।'

إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খোঁজ করব অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?'

قَالَ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيكُمْ إِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদেরকে ফির'আউনের

وَإِذْ أَنجَيْنٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ

(১) বনী ইসরাঈলদের মত অবস্থা এ উম্মতের মধ্যে ঘটেছে এবং নিত্য ঘটছে। এ উম্মাতের মধ্যেও কিছু না বুঝে না শুনে অন্যান্য জাতির অনুকরণে শির্ক ও কুফরী করার মানসিকতা রয়ে গেছে। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে এসেছে, আবু ওয়াকিদ বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনের দিকে এক যুদ্ধে বের হলাম। আমরা একটা বরই গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমাদের জন্য এ গাছটিকে লটকানোর জন্য নির্ধারিত করে দিন যেমনটি নির্ধারিত রয়েছে কাফেরদের জন্য। কারণ কাফেরদের একটি বরই গাছ ছিল যাতে তারা তাদের হাতিয়ার লটকিয়ে রাখত এবং তার চতুষ্পার্শ ঘিরে বসত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহু আকবার! এটা তো এমন যেমন বনী ইসরাঈল মূসাকে বলেছিলঃ "তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে আমাদের জন্যও তেমন উপাস্য নির্ধারিত করে দিন"। অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে'। [তিরমিযীঃ ২১৮০, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২১৮, ইবন হিব্বানঃ ৬৭০২]

الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এতে ছিল তোমাদের রবের এক মহাপরীক্ষা[১]।

---

(১) অর্থাৎ আমরা বনী-ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফির'আউন সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় বনী-ইস্‌রাঈলের যে অলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণতঃ প্রাচুর্য আসার পর বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল। ঘটনাটি হল এই যে, এই জাতি মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফির'আউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইস্‌রাঈলেরও তাদের সেসব রীতি-নীতি পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা 'আলাইহিস্ সালামের নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরণের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদাত করতে পারি, আল্লাহ্‌র সত্তা তো আর সামনে আসে না। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে"। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। তাদের এসব ভ্রান্ত রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ, তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম। অতঃপর বনী-ইস্‌রাঈলকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, ফির'আউনের কওমের হাতে তারা এমনই নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে অব্যাহতি দেয়া হত সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ মূসা 'আলাইহিস্ সালামের বদৌলতে এবং তার দো'আর বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল 'আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এযে মহা যুলুম। এই থেকে তাওবাহ্ কর।

সতেরতম রুকূ'

وَوٰعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. আর মূসার জন্য আমরা ত্রিশ রাতের ওয়াদা করি(১) এবং আরো দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে(২) পূর্ণ হয়। এবং মূসা তার ভাই হারূনকে বললেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনি আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন, সংশোধন করবেন আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না(৩)।

(১) وَاعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি আর মূসা 'আলাইহিস্ সালামের পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং এ'তেকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَوَعَدْنَا না বলে وَوَاعَدْنَا বলা হয়েছে। ওয়াদার তাৎপর্য হল, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ত্রিশ রাত্রি তূর পর্বতে আল্লাহ্র ইবাদাতে অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরো দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ রাত্রি করে দিয়েছেন।

(২) এখান থেকে একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলগণের শরী'আতে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, এ আয়াতে ত্রিশ দিনের ক্ষেত্রে ত্রিশ রাত্রি আর চল্লিশ দিনের ক্ষেত্রে চল্লিশ রাত্রি উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ সৌর হিসাব পার্থিব লাভের জন্য, আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদতের জন্য। [কুরতুবী]

(৩) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় ভাই হারূন 'আলাইহিস্ সালামকে বললেনঃ "আমার অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করুন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া উত্তম। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনো যদি তাকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ

১৪৩. আর মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন[১], তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে

প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। [কুরতুবী]

মূসা 'আলাইহিস্ সালাম হারূন 'আলাইহিস্ সালামকে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে,কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হেদায়াত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল وَأَصْلِحْ এখানে أَصْلِحْ এর কোন 'কর্ম' উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ্ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ্ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও ইসলাহ্ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়াত হল এই যে, ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম হলেন আল্লাহ্র নবী, তার নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশংকাই ছিল না। কাজেই এই হেদায়াতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না। সুতরাং হারূন 'আলাইহিস্ সালাম যখন দেখলেন, তার সম্প্রদায় 'সামেরী'-এর অনুগমন করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তার সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামী থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন ধারণা করলেন যে, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

(১) কুরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে কথা বলেছেন। তাঁর এ কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমতঃ সেসব কালাম যা নবুওয়াত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সেসব কালাম যা তাওরাত দানকালে হয়েছিল এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কথা বলা হক ও বাস্তব। এতে বিশ্বাস করতেই হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ 'কথা বলা' সাব্যস্ত হচ্ছে। [দেখুন, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ্, ২১৬-২১৯]

إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝١٤٣

দেখতে পাবেন না[১]। আপনি বরং পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে দেখুন[২], সেটা যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন।' যখন তাঁর রব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন[৩] তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন[৪]। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে

---

(১) দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হত, তাহলে ﴿لَن تَرَىٰنِى﴾ না বলে বলা হত لَنْ أُرَى "আমার দর্শন হতে পারে না।" এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হল অধিকাংশ আহ্লে সুন্নাহ্র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন হাদীসে রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পারবে না।' [মুসলিমঃ ২৯৩১, আবু দাউদঃ ৪৩২০, ইবন মাজাহ্ঃ ৪০৭৭] এ ব্যাপারে সূরা আল-আন'আমের ১০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় দর্শক আল্লাহ্র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাও আপনার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়; মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

(৩) আরবী অভিধানে تَجَلّٰى অর্থ প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়া। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়; বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্র তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হয়েছিল, সে অংশটিই হয়ত প্রভাবিত হয়ে থাকবে। [আহমাদঃ ৩/১২৫, তিরমিযীঃ ৩০৭৪, হাকেমঃ ২/৩২০]

(৪) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলায় তার পুরস্কারস্বরূপ হাশরের মাঠে তাকে প্রথম সচেতন হিসাবে দেখা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের মাঠে মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে, আমিই সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ফিরে পাব, তখন দেখতে পাব যে, মূসা আল্লাহ্র আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

পেলেন তখন বললেন, 'মহিমাময় আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে তাওবাহ্ করছি এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।'

১৪৪. তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি আপনাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দিয়ে মানুষের উপর বেছে নিয়েছি; কাজেই আমি আপনাকে যা দিলাম তা গ্রহণ করুন এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

১৪৫. আর আমরা তার জন্য ফলকসমূহে[১] সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে[২] দিয়েছি; সুতরাং

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ

আমি জানি না তিনি কি আমার আগে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন, না কি তূর পাহাড়ে যে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন, তার বিনিময়ে তিনি সচেতনই ছিলেন।' [বুখারীঃ ৪৬৩৮, মুসলিমঃ ২৩৭৪]

(১) এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখ্‌তী মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখ্‌তীগুলোর নামই হল 'তাওরাত'। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ তখতীগুলো তাওরাতের আগে প্রদত্ত। [ইবন কাসীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আদম এবং (মূসা 'আলাইহিমাস্ সালাম) তর্ক করলেন। মূসা বললেন, আপনিই তো আমাদের পিতা, আশা-ভরসা সব শেষ করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসলেন। আদম বললেন, হে মূসা, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য পছন্দ করেছেন, স্বহস্তে আপনার জন্য লিখে দিয়েছেন। আপনি আমাকে এমন বিষয়ে কেন তিরস্কার করছেন, যা আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আমার তাকদীরে লিখেছেন। এভাবে আদম মূসার উপর তর্কে জিতে গেলেন। তিনবার বলেছেন। [বুখারীঃ ৬৬১৪] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন এবং আদম 'আলাইহিস্ সালামের জান্নাত থেকে বের হওয়াটা যেহেতু বিপদ ছিল সেহেতু তিনি তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ শুধুমাত্র বিপদের সময়ই জায়েয। গোনাহ্‌র কাজের মধ্যে জায়েয নাই। [মাজমু ফাতাওয়া ৮/১০৭; দারয়ূ তা'আরুযুল আকলি ওয়ান নাকলি: ৪/৩০৩]

قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

এগুলো শক্তভাবে ধরুন এবং আপনার সম্প্রদায়কে তার যা উত্তম তাই গ্রহণ করতে নির্দেশ দিন(১)। আমি শীঘ্রই(২) ফাসেকদের বাসস্থান(৩) তোমাদেরকে দেখাব।

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো গ্রহণ কর। আর নিষেধকৃত বস্তু পরিত্যাগ কর [সা'দী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণীর যদি কয়েক ধরনের অর্থ হয়, তখন যেন তারা কেবল উত্তম ও আল্লাহ্‌র শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থটিই গ্রহণ করে। [ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

(২) অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন সব জাতির প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ দেখবে যারা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ভুল পথে চলার ব্যাপারে অবিচল ছিল। সেই ধ্বংশাবশেষগুলো দেখে এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বনের পরিণাম কি হয় তা তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।

(৩) আয়াতের এক অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি শীঘ্রই ফাসেকদের বাসস্থান তোমাদের দেখাব।" এ হিসেবে এখানে ফাসেকদের বাসস্থান বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফির'আউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। [ফাতহুল কাদীর] আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই আবাসভূমি। [ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর] এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হল এই যে, ফির'আউনের সম্প্রদায় ডুবে মরার পর বনী-ইস্‌রাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ﴾ আয়াতের দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে ﴿دَارَ الْفٰسِقِينَ﴾ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে। আয়াতের অপর অর্থ হচ্ছে, 'শীঘ্রই আমি যারা ফাসেক তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম ফল কি হবে তা দেখাব।' এ হিসেবে পরিণাম ফল হিসেবে তীহ মাঠে তাদের যে কি মারাত্মক অবস্থা হয়েছে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. আর যারা আমাদের নিদর্শন ও আখেরাতের সাক্ষাতে মিথ্যারোপ করেছে তাদের কাজকর্ম বিফল হয়ে গেছে। তারা যা করে সে অনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

আঠারতম রুকূ'

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা 'হাম্বা' শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম[১]।

(১) এ থেকে বুঝা গেল যে, যারা গো বাচ্চার পূজা করেছিল তাদের বিবেক সঠিকভাবে কাজ করেনি। তারা দেখতেই পাচ্ছিল যে, শুধু হাম্বা রব ছাড়া আর কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হচ্ছে না। তার কাছ থেকে কোন হিদায়াতের কথা আসছে না, তারপরও সে কিভাবে ইলাহ হতে পারে? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরও

وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ١٤٩

১৪৯. আর তারা যখন অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন তারা বলল, 'আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই(১)।'

স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, "তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না" [সূরা ত্বা-হা:৮৯]

(১) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন তাওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে ইবাদাত করতে গেলেন এবং ইতোপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ইবাদাতের যে নির্দেশ হয়েছিল; সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যখন আরো দশ দিন মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইস্‌রাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তার সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী-ইস্‌রাঈলের লোকদের বললঃ তোমাদের কাছে ফির'আউন সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো আমাকে দাও। বনী-ইস্‌রাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকারাদি তার (সামেরীর) কাছে এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রুপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং জিব্‌রীল 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল, সোনা-রুপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে ঐ মাটি মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হল এবং তার ভিতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরুতে লাগল। এ ক্ষেত্রে ﴿عِجۡلٗا﴾ শব্দের ব্যাখ্যায় ﴿جَسَدٗا لَّهُۥ خُوَارٌ﴾ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

সামেরীর এ আবিস্কার যখন সামনে উপস্থিত হল, তখন সে বনী-ইস্‌রাঈলদেরকে কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, "এটাই হল ইলাহ্। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তো আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তূর পাহাড়ে। মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সত্যিই ভুলই হয়ে গেল।" বনী-ইস্‌রাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে তার ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে ইলাহ্ মনে করে তারই ইবাদাতে প্রবৃত্ত হল।

১৫০. আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলেন তখন বললেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমাদের রবের আদেশের আগেই তোমরা তাড়াহুড়ো করলে?' এবং তিনি ফলকগুলো ফেলে দিলেন[১] আর তার ভাইকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগলেন। হারূন বললেন, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। সুতরাং তুমি আমার সাথে এমন করবে না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে না।'

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا
قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ
رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ
إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِى
وَكَادُوا۟ يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا
تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট করুন। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ۖ
وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٥١﴾

উনিশতম রুকূ'

১৫২. নিশ্চয় যারা গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে তাদের উপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কানে শুনা খবর কখনো চাক্ষুষ দেখার মত হয় না। মহান আল্লাহ্ মূসাকে বাছুর নিয়ে কি করেছে তা জানানোর পরে তিনি তখতিগুলোকে ফেলে দেন নি, তারপর যখন তাদের কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখলেন তখন তখ্তীগুলোকে ফেলে দিলেন। ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়।' [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৭১]

الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

আপতিত হবেই[১]। আর এভাবেই আমরা মিথ্যা রটনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি[২]।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর যারা অসৎকাজ করে, তারা পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে আপনার রব তো এরপরও পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

(১) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায়, যেমনটি হয়েছিল সামেরী ও তার সঙ্গীদের বেলায়, কারণ গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তাওবাহ্ করল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সামেরীকে এ পৃথিবীতে অপমান-অপদস্থ করে ছেড়েছেন। তাকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয় এবং তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারাজীবন এমনিভাবে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সংস্পর্শে আসত না। কাতাদাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ "যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি।" সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'যারা দ্বীনী ব্যাপারে বিদ'আত অবলম্বন করে (অর্থাৎ দ্বীনে কোন প্রকার কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, দ্বীনী ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিস্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। [ইবন কাসীর;কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তাওবাহ্ করে নিয়েছে এবং তাওবাহ্র জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তাওবাহ্ কবূল হবে- তারা সে শর্তও পালন করল, তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশক্রমে তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের সবার তাওবাহ্ই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে আর যারা বেঁচে রয়েছে, তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। [তাবারী] এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তাওবাহ্ করে নিলে

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর মূসার রাগ যখন প্রশমিত হল, তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য সে কপিগুলোতে[১] যা লিখিত ছিল তাতে ছিল হিদায়াত ও রহমত।

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. আর মূসা তার সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে একত্র হওয়ার জন্য মনোনীত করলেন। অত:পর তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আপনি ইচ্ছে করলে আগেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন! আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সে জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটা তো শুধু আপনার পরীক্ষা, যা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছে বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক; কাজেই আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং

এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তাওবাহ্ করে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের রাগ যখন প্রশমিত হয়,তখন তাড়াতাড়ি ফেলে রাখা তাওরাতের তখতিগুলি আবার তুলে নিলেন। نسخة বা সংকলন বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম ক্রোধবশত যখন তাওরাতের তখতিগুলি মাথা থেকে তাড়াহুড়া করে নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পরে অন্য কোন কিছুতে লিখে তাওরাত দিয়েছিলেন, একেই নোসখা বলা হয়। [কুরতুবী]

আমাদের প্রতি দয়া করুন। আর ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ।'

১৫৬. 'আর আপনি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ লিখে দিন এবং আখেরাতেও। নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে ফিরে এসেছি[১]।' আল্লাহ্ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি আর আমার দয়া- তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে[২]।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ

(১) কুরআনের শব্দ هُدْنَا অর্থ আমরা ফিরে এসেছি অথবা তাওবাহ্ করেছি। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এই শব্দ থেকে তাদের নামকরণ করা হয়েছে 'ইয়াহূদ'। [ইবন কাসীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়েই অহংকার করল। জাহান্নাম বলল, হে রব! আমার কাছে প্রবেশ করে প্রতাপান্বিত-অত্যাচারী, অহংকারী, রাজা-বাদশা ও নেতাগোছের লোকেরা। আর জান্নাত বলল, হে রব! আমার কাছে প্রবেশ করে দূর্বল, ফকীর, মিসকীনরা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তি। তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আমি তাকে তা পৌঁছাই। আর জান্নাতকে বললনে, তুমি আমার রহমত, যা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তোমাদের প্রত্যেককেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। তখন জাহান্নামে তার বাসিন্দাদের নিক্ষেপ করা হবে......।" [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩; ৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন। তা থেকে মাত্র একটি রহমত তিনি সৃষ্টিকুলকে দিয়েছেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের চেয়েও প্রকাণ্ড। এর কারণেই মা তার সন্তানকে দয়া করে, এর কারণেই পাখি ও জীব-জন্তু পানি পান করে। অতঃপর যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে এ রহমতটি নিয়ে নিবেন এবং এটি ও বাকী ৯৯টির সবগুলিই তিনি মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করবেন। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র এ আয়াত, "কাজেই আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে"এর মর্ম। [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ: ১৩/১৮২] কাতাদা ও হাসান বলেন, দুনিয়াতে তিনি নেককার ও বদকার সবার জন্যই রহমত লিখেছেন তবে আখেরাতে তা শুধু মুত্তাকীদের জন্য। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এখানে তাকওয়া অর্থ শির্ক থেকে বেঁচে থাকা। [তাবারী] কাতাদা বলেন, যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। [তাবারী]

কাজেই আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে।

১৫৭. 'যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী[১] নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়[২],

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ

---

(১) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি পদবী 'রাসূল' ও 'নবী' এবং এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন আব্বাস বলেন, أمي 'উম্মী' শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর। যে লেখা-পড়া কোনটাই জানে না। [বাগভী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন, "আমরা নিরক্ষর জাতি। লিখা জানি না, হিসাব জানি না"। [বুখারীঃ ১০৮০] সাধারণ আরবদেরকে এ কারণেই কুরআন اُمِّيِّيْنَ বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। কারও কারও মতে উম্মী শব্দটি 'উম্ম' শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে। আর উম্ম অর্থ, মা। অর্থাৎ সে তার মা তাকে যেভাবে প্রসব করেছে সেভাবে রয়ে গেছে। কারও কারও মতে শব্দটি 'উম্মত' শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে। পরে সম্পর্ক করার নিয়মানুসারে 'তা' বর্ণটি পড়ে গেছে। তখন অর্থ হবে, উম্মতওয়ালা নবী। কারও কারও মতে, শব্দটি 'উম্মুল কুরা' যা মক্কার এক নাম, সেদিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কাবাসী। [বাগভী]
তবে বিখ্যাত মত হচ্ছে যে, উম্মী অর্থ নিরক্ষর। যদিও নিরক্ষর হওয়াটা কোন মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং ত্রুটি হিসাবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণবৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তার পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তার প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে?

(২) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব গুণবৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কুরআনুল কারীমেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা নিজে পড়েই

মুসলিম হয়েছেন। যেমন, কোন এক ইয়াহূদী বালক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা জানার জন্য সেখানে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তিলাওয়াত করছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হে ইয়াহূদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণবৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বললঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি (অর্থাৎ এই ছেলের পিতা) ভুল বলছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণবৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হক মা'বূদ নাই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলিম। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলিমরা করবে। তার পিতার হাতে দেয়া হবে না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এক ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সবগুণ বর্ণনা করেছে যা সে তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দেখেছে। তিনি বলেন, আমি আপনার সম্পর্কে তাওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি- "মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্, তার জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তার দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।" [মুস্তাদরাকঃ ২/৬৭৮ হাদীসঃ ৪২৪২]

কা'আবে আহবার বলেছেনঃ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লেখা রয়েছেঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। না-ইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তার জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে তাইবায়। তার দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তার উম্মাত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন ঊর্ধ্বারোহণকালে তাকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময়ে সালাত আদায় করতে পারে। তিনি তার শরীরের নিম্নাংশে লুঙ্গি পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযুর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহ্বান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন সালাতে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তিলাওয়াত ও যিক্রের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার

যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ | وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ

শব্দ। [সুনান দারামীঃ ৫, ৮, ৯]
ইবন সা'আদ রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাল মওলা খাইসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাল বলেনঃ আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে- 'তিনি খুব বেঁটেও হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তার দু'কাঁধের মধ্যস্থলে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তিনি ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালামের বংশধর হবেন। তার নাম হবে আহ্মাদ।' [তাবাকাত ইবন সা'আদঃ১/৩৬৩]
'আতা ইবন ইয়াসার বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা কে বললাম, আমাকে তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ কেমন এসেছে তা বর্ণনা করুন, তিনি বললেনঃ 'তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছেঃ 'হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়ীন অর্থাৎ আরবদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তার মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই' -এ কালেমার স্বীকৃতিদানকারী হয়ে যাবে, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।' [বুখারী : ২১২৫; ৪৮৩৮] তাওরাত ও ইঞ্জীল বর্ণিত শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মাতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। রহমতুল্লাহ্ কীরানভী মুহাজেরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ্ তার গ্রন্থ 'ইয্হারুল-হক'-এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জীল-যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে-তাতেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওরাত ও ইনজীলের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন- এসব স্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ ১৫-১৯, মথি-২১ঃ ৩৩-৪৬, যোহন-১ঃ ১৯-২১, ১৪ঃ ১৫-১৭, ২৫-৩০, ১৫ঃ ২৫-২৬, ১৬ঃ ৭-১৫।

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন(১)। আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল(২)। কাজেই যারা তার

---

(১) দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তুসামগ্রী যা শাস্তি স্বরূপ বনী-ইস্রাঈলের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন। উদাহরণতঃ পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী-ইস্রাঈলের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে শুকরের মাংস, সুদ এবং যে সমস্ত খাবার আল্লাহ্ হারাম করেছেন অথচ তারা সেগুলোকে হালাল বলে চালিয়েছিল। [তাবারী] অনুরূপভাবে, রক্ত, মৃত পশু, মদ ও অন্যান্য হারাম জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ হারাম উপায়ে আয় যথা- সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের উপর চেপে থাকা বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন। إصر 'ইসর' শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর أغلال 'আগলাল' غل এর বহুবচন। 'গাল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যা দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে। إصر 'ইসর' ও أغلال 'আগলাল' অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, বিধর্মী কাফেরদের সাথে জিহাদ করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী-ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না; বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী-ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কুরআনে সেগুলোকে 'ইসর' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দ্বীন সহজ।' [বুখারীঃ ৩৯]

প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম[১]।

কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ "আল্লাহ্ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৭৮]

(১) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছেঃ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে -অর্থাৎ যারা কুরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হল কল্যাণপ্রাপ্ত। এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা, দ্বিতীয়তঃ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়তঃ তার সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থতঃ কুরআন অনুযায়ী চলা। শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ 'আয্যারূহু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تعزير থেকে উদ্ভুত। 'তা'যীর' অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ 'আয্যারূহু' -এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। অর্থাৎ রাসূল হিসাবে তার প্রতি ঈমান আনতে হবে, নির্দেশদাতা হিসাবে তার প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসাবে তার সাথে গভীরতম ভালবাসা রাখতে হবে এবং নবুওয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। অপর এক আয়াতেও বলা হয়েছে ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ অর্থাৎ "তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর"। [সূরা আল-ফাতহঃ ৯] এছাড়া আরো কয়েকটি আয়াতে এই হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে এত উচ্চস্বরে কথা বলো না, যা তার স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে। [দেখুন, সূরা হুজুরাতঃ ২] অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না"। অর্থাৎ যদি মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থাপিত হয়, তাহলে তোমরা তার আগে কোন কথা বলো না। এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে কোন কোন সাহাবী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে। অনুরূপভাবে কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে

বিশতম রুকূ'

১৫৮. বলুন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল[১], যিনি আসমানসমূহ ও

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। [দেখুন, সূরা হুজুরাতঃ ২] এ আয়াতে শেষে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম যদিও সর্বক্ষণ-সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে এমনভাবে কথা বলব যেন কোন ভাইয়ের কাছে কেউ গোপন বিষয়ে বলে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৪৬২] এমনি অবস্থা ছিল উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুরও। [দেখুন- বুখারীঃ ৪৮৪৫] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এজন্য অপারগ যে, আমি কখনো তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি। [মুসলিমঃ ১২১] উরওয়া ইবন মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলিমদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল যে, আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কষ্মিনকালেও তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না। [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ১১/২১৬]

(১) এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিনঃ "আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি"। আমার নবুওয়ত লাভ ও রিসালাতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড

অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কেয়ামতকাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। অন্য আয়াতেও এসেছে, "আর আমরা তো আপনাকে কেবল সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি" [সূরা সাবা: ২৮] অনুরূপভাবে সূরা আলে ইমরান: ২০; সূরা আল-আন'আম: ৯০; সূরা হূদ: ১৭; সূরা ইউসুফ: ১০৪; সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭; সূরা আল-ফুরকান: ১; সূরা ছোয়াদ: ৮৭; সূরা আল-কালাম: ৫২; সূরা আত-তাকওয়ীর: ২৭।

হাফেজ ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষ নবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও রিসালাত যখন কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। [ইবন কাসীর]

হাদীসে এসেছে, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন লক্ষ্য করলেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দোষ আমারই বেশী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আমি যখন বললামঃ 'হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ্ রাসূল। তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।' [বুখারীঃ ৪৬৪০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। রাসূল সালাত শেষ

করে বললেনঃ আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হল এই যে, আমার রিসালাত ও নবুওয়াতকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাকে আমার শত্রুর মোকাবেলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হত। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আমাদের সালাত যমীনের যে কোন অংশে, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ না হয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদাত শুধু তাদের উপাসনালয়েই হত, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের সালাত বা ইবাদাত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্য না থাকে, তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেনঃ আর পঞ্চমটি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দো'আ কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাদের নিজ নিজ দো'আকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হল যে, আপনি কোন একটা দো'আ করুন। আমি আমার দো'আকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছি। সে দো'আ তোমাদের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত لا إله إلا الله 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক মা'বুদ নেই' কালেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২২২]

আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত বর্ণনায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইয়াহূদী-নাসারা হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৫০]

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য

وَالْأَرْضِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।'

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে[১]।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর যে লোক তার প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোন সাবেক শরী'আত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

(১) এ আয়াতে সত্যনিষ্ঠ দল বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে-
এক. অধিকাংশ অনুবাদক এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন- "মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় এবং ইনসাফ করে"। অর্থাৎ তাদের মতে কুরআন নাযিল হবার সময় বনী-ইস্‌রাঈলীদের যে নৈতিক ও মানসিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তারই কথা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত আয়াতসমূহে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের অসদাচরণ, কুটতর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটাই এমন নয়; বরং তাদের মধ্যে কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হল সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়াত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তখন তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তার উপর ঈমান আনে এবং তার যথাযথ অনুসরণও করে। বনী-ইস্‌রাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কুরআনুল

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. আর তাদেরকে আমরা বারটি গোত্রে বিভক্ত করেছি। আর মূসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি চাইল, তখন আমরা তার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'আপনার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত করুন'; ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা ধারা উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল। আর আমরা মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া দান করেছিলাম এবং তাদের উপর আমরা মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলাম। (বলেছিলাম) 'তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও।' আর তারা আমাদের প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা নিজদের উপরই যুলুম করত।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا

১৬১. আর স্মরণ করুন, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা এ জনপদে বাস কর ও যেখানে খুশি খাও এবং

কারীমে বারংবার করা হয়েছে। যেমন, সূরা আলে-ইমরানঃ ১১৩, ১৯৯, সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১২১, সূরা আল-ইস্‌রাঃ ১০৭-১০৯, সূরা আল-কাসাসঃ ৫২-৫৪। [ইবন কাসীর]

দুই. পূর্বাপর আলোচনা বিশ্লেষণ করে কোন কোন মুফাস্‌সির এ মত দিয়েছেন যে, এখানে মূসার সময় তথা বনী-ইস্‌রাঈলীদের যে অবস্থা ছিল তারই কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ জাতির মধ্যে যখন বাছুর পূজার অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার উপর পাকড়াও করা হয় তখন সমগ্র জাতি গোমরাহ ছিল না; বরং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখনো সৎ ছিল। [তাবারী; ইবন কাসীর] মোটকথা, আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা মূসার যুগে যারা হকপন্থী ছিল তারা। যারা গো-বাছুর পূজা করেনি বা নবীদেরকে হত্যা করেনি।

حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـَٔـتِكُمْ ۚ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

বল, 'ক্ষমা চাই'। আর নতশিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব। অবশ্যই আমরা মুহসিনদেরকে বাড়িয়ে দেব।'

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. অতঃপর তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। কাজেই আমরা আসমান থেকে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুলুম করত।

একুশতম রুকূ'

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আর তাদেরকে সাগর তীরের জনপদবাসী[১] সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করুন, যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করত; যখন শনিবার পালনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের কাছে আসত। কিন্তু যেদিন তারা শনিবার পালন করত না, সেদিন তা তাদের কাছে আসত না। এভাবে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতাম, কারণ তারা ফাসেকী করত।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর স্মরণ করুন, যখন তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ জনপদটি সাগর তীরে ছিল। মদীনা ও মিশরের মাঝামাঝি। যাকে 'আইলা' বলা হত। [তাবারী] বর্তমানে এটাকে 'ঈলাত' বলা হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, এজন্য ।'

১৬৫. অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমরা উদ্ধার করি । আর যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে আমরা কঠোর শাস্তি দেই, কারণ তারা ফাসেকী করত[১] ।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾

(১) এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ জনপদে তিন ধরনের লোক ছিল । এক, যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করছিল । দুই, যারা নিজেরা বিরুদ্ধাচারণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচারণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কী লাভ? তিন, যারা ঈমানী সম্ভ্রমবোধ ও মর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে করে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদেরকে বিরত রাখতে তৎপর ছিল যে, হয়তো ঐ অপরাধীরা তাদের উপদেশের প্রভাবে সৎপথে এসে যাবে, আর যদি তারা সৎপথে নাও আসে তাহলে অন্তত নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের দায়মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে । [ইবন কাসীর] এ অবস্থায় এ জনপদের উপর যখন আল্লাহর আযাব নেমে এলো, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তখন এ তিনটি দলের মধ্য থেকে তৃতীয় দলটিকেই বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছিল আর যারা অপরাধ করেছিল তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হয়েছিল । কিন্তু দ্বিতীয় দলটি, যারা অন্যায় করেনি তবে অন্যায় থেকে নিষেধ করেনি তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি । কারণ তারা ভাল কিংবা মন্দ কিছুই করেনি যে, তাদের কথা আলোচনায় আসবে । [ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় দ্বিতীয় দলটির পরিণতি কেমন হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তাফসীরবিদদের দু'টি মত পরিলক্ষিত হয় । ইবন আব্বাস থেকে এক সহীহ বর্ণনায় এসেছে যে, একমাত্র তারাই আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল, যারা অন্যায় করেছিল । আর বাকী দু'টি দল যারা বলেছিল যে, "আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?" আর যারা বলেছিল "তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য" আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয় দলকেই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন । [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]
কোন কোন তাফসীরবিদ, যারা অন্যায় করেনি তবে অন্যায় থেকে নিষেধও করেনি তাদেরকেও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে বলে মনে করেন । এ বর্ণনাটিও ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে । [ইবন কাসীর] তবে ইবন কাসীর প্রথম

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. অতঃপর তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ বাড়াবাড়ির সাথে করতে লাগল তখন আমরা তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও!'

মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ শেষোক্ত মতের পক্ষের লোকরা বলেন, কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সামষ্টিক অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা একই ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ ﴿وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً﴾ [সূরা আল-আনফালঃ ২৫] অর্থাৎ সেই বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাক যার কবলে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে যারা যুলুম করেছে তারাই পড়বে না। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মহান আল্লাহ বিশেষ লোকদের অপরাধের দরুন সর্বসাধারণকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ সাধারণ লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে এরপরও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কাজেই লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন'। [আবু দাউদ:৪৩৩৮; তিরমিযী: ২১৬৮; ইবন মাজাহ্: ৪০০৫: মুসনাদে আহমাদঃ ১/২] এ ছাড়াও আলোচ্য আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, এ জনপদের উপর দুই পর্যায়ে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয় কঠিন শাস্তি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা নাফরমানী অব্যাহত রেখেছিল তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়। [ফাতহুল কাদীর] দৃশ্যতঃ প্রথম পর্যায়ের আযাবে উভয় দলই শামিল ছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আযাব দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র প্রথম দলকে।

কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা ও তাফসীরবিদদের অধিকাংশের মত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় দলটিও শাস্তি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছিল। কারণ, তারা তো কোন যুলুম করেনি। আয়াতে শুধু যালেমদেরকেই শাস্তি দেয়ার কথা আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন। আরও একটি বিষয় এখানে জানা আবশ্যক যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ফরযে কিফায়া। যদি কেউ সেটা করে তবে অন্যদের থেকে কর্তব্য আদায় হয়ে যায়। সুতরাং যারা নিষেধ করেছে, তারা চুপ থাকা লোকদের থেকে ফরযে কিফায়া আদায় করে দিয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় দলটি যে একেবারে চুপ ছিল তা নয়, তারা বলেছিল যে, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন, তাদেরকে নসীহত করে কি লাভ?' এতে এক ধরণের ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। [সা'দী] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তারা সম্পূর্ণরূপে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা থেকে বিরত ছিল না। তাই তাদের উপর আযাব আসেনি এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

১৬৭. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ঘোষণা করেন যে[১] অবশ্যই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে[২]। আর নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৮. আর আমরা তাদেরকে যমীনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছি[৩]; তাদের কেউ

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ

---

(১) 'তাআযযানা' বাক্যাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, ঘোষনা দিয়ে জানিয়ে দেয়া। দুই, সুদৃঢ় ইচ্ছা এবং সে অনুসারে নির্দেশ। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তার উম্মত অর্থাৎ ইয়াহূদীদের অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। সে অনুসারে তাদের উপর শাস্তির ঘোষণা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। এমনকি ঈসা আলাইহিসসালামও তাদেরকে এ একই সতর্কবাণী শুনান। বিভিন্ন ইনজীল গ্রন্থে তাঁর একাধিক ভাষণ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সবশেষে কুরআনুল কারীমেও এ কথাটিকে দৃঢ়ভাবে পূনর্ব্যক্ত করেছে। আর তা হল কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইয়াহূদীরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, মূসা আলাইহিস সালাম তাদের উপর সাত বছর বা তেরো বছর খাজনা আরোপ করেছিলেন। তারপর গ্রীক, কাশদানী, কালদানী নৃপতিরা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নিয়ে আপতিত হয়েছিল। পরে বুখতানাসারের হাতে, তারপর নাসারাদের হাতে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। সবশেষে তারা দাজ্জালের সহযোগীরূপে বের হবে, তারপর দাজ্জাল যখন মারা পড়বে, তখন মুসলিমরা ঈসা আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে তাদের হত্যা করবে। [দেখুন, বুখারীঃ ২৯২৫, ২৯২৬] [ইবন কাসীর]।

(৩) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তা হল, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। কোথাও কোন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾

وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

কেউ সৎকর্মপরায়ণ আর কেউ অন্যরূপ(১)। আর আমরা তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে(২)।

এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تقطيع থেকে নির্গত। যার অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া। আর أُمَمًا হল أمة এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণী। এর মর্ম হল, আমি ইয়াহূদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি। সুতরাং যেখানেই কেউ ঢুকবে সেখানে ইয়াহূদীদের কোন সম্প্রদায় দেখতে পাবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের শ্রেণী বিভাগ করে বলা হচ্ছেঃ ﴿مِنْهُمُ الصَّٰلِحُونَ﴾ অর্থাৎ "এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" "অন্য রকম" -এর মর্ম হল এই যে, কাফের দুস্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। [তাবারী; ইবন কাসীর] এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক, যারা তাওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহ্‌কাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের আখেরাতকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ "আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে।" "ভাল অবস্থার দ্বারা"-এর অর্থ হল এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর "মন্দ অবস্থার দ্বারা"-এর অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। [তাবারী; ইবন কাসীর] সারমর্ম এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইহূদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের জন্য নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়ে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে, ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ হলেন ফকীর আর আমরা ধনী।" [সূরা আলে-ইমরান: ১৮১] আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছেঃ ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।" [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ৬৪]

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَأْخُذُوْهُ ۗ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়[১]; তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে[২]।' কিন্তু ওগুলোর অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে আসলে তাও তারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের কাছ থেকে নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলবে

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে অযোগ্য উত্তরপুরুষ বলে নাসারাদের বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন কাসীর বলেন, এখানে ইয়াহূদী, নাসারাসহ পরবর্তী সবাই উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেন, দুনিয়ার যে বস্তুতেই তাদের চোখ পড়বে, সেটা হালাল কিংবা হারাম যাই হোক না কেন, তারা তাই গ্রহণ করে, তারপর ক্ষমার তালাশে থাকে। আবার যদি আগামী কাল অনুরূপ কিছু নজরে পড়ে সেটাও গ্রহণ করে। [তাবারী] সুদ্দী বলেন, তাদের মধ্যে কাউকে বিচারক নিয়োগ করা হলে সে ঘুষ খেয়ে বিচার করত, তখন তাদের ভাললোকেরা একত্র হয়ে বলল যে, এটা করা যাবে না এবং ঘুষও দেয়া যাবে না। কিন্তু পূণরায় তাদের কেউ কেউ ঘুষ খেতে আরম্ভ করে। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলতো যে, আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তখন অন্যরা তাকে খারাপ বলত। তারপর এ বিচারকের পদচ্যুতি বা মৃত্যুর কারণে যদি অন্য কাউকেও নিয়োগ করা হতো, সেও ঘুষ খেত। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র কিতাব পড়েছে কিন্তু কিতাবের হুকুমের বিরোধিতা করেছে। দুনিয়ার যত নিকৃষ্ট কামাই আছে যেমন ঘুষ ইত্যাদি তা-ই তারা গ্রহণ করে। কারণ তাদের লোভ ও লালসা প্রচণ্ড। তারা গোনাহ্ করে, তারা জানে এ কাজটি করা গুণাহ। তবুও এ আশায় তারা এ কাজটি করে যে, কোন না কোনভাবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কারণ তারা মনে করে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং তারা যত কঠিন অপরাধই করুক না কেন তাদের ক্ষমালাভ অপরিহার্য। এ ভুল ধারণার ফলে কোন গুনাহ করার পর তারা লজ্জিত হয় না এবং তাওবাও করে না। বরং একই ধরনের গোনাহ্ করার সুযোগ এলে তারা তাতে জড়িয়ে পড়ে। তারপর আবার যদি তাদের কাছে দুনিয়ার কোন ভোগ এসে যায়, তা যত হারামই হোক তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বরং তা বারবার করতে থাকে। [মুয়াসসার]

না[১]? অথচ তারা এতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে[২]। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; তোমরা কি এটা অনুধাবন কর না?

১৭০. যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে ও সালাত কায়েম করে, আমরা তো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না[৩]।

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

---

(১) অর্থাৎ তারা নিজেরাই জানে যে, আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে একথা বলেননি এবং তাদের নবীগণও কখনো তাদেরকে এ ধরণের নিশ্চয়তা দেননি যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, তোমাদের সকল গুনাহ অবশ্যি মাফ হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ নিজে যে কথা কখনো বলেননি তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করার কি অধিকারই বা তাদের থাকতে পারে? অথচ তাদের কাছ থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর নামে কোন অসত্য কথা তারা বলবে না। তাওরাত কায়েম করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে। কুরআনের অন্যত্র তাদের এ অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এসেছে, "স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' এরপরও তারা তা তাদের পেছনে ফেলে রাখে (অগ্রাহ্য করে) ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে; কাজেই তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!" [সূরা আলে ইমরান: ১৮৭] কিন্তু তারা কিতাবের বিধান জানার পরও সেটাকে নষ্ট করে দেয়, তা অনুসারে আমল করে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ এমন নয় যে, তারা বুঝে না। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব অধ্যয়ণ করে, তারা জানে যে, তাদেরকে এ ধরনের হারাম বস্তু গ্রহণ করা থেকে তাদের কিতাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমন নয় যে, তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তা করছে। বস্তুত: তাদের কোন সন্দেহ নেই। তারা জেনে-বুঝেই এ অন্যায় করছে। এটা নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ। [সা'দী]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষতঃ বনী-ইস্‌রাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তাওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান রবের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী-ইস্‌রাঈলের আলেমগণ

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখানে আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে যে, বনী-ইস্‌রাঈলের সব আলেমই এমন নয়; কোন কোন আলেম এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি সালাতও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না। এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে-

প্রথমতঃ কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতোপূর্বে এসেছে। অর্থাৎ তাওরাত। অর্থাৎ যারা তাদের কিতাবে যে নবীর কথা বলা হয়েছে সে অনুসারে ঈমান এনেছে। মুজাহিদ বলেন, এ অনুসারে এটি আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আর এও হতে পারে যে, এতে কুরআনকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা বর্তমান নাযিলকৃত কিতাবের অনুসরণ করে তাদের প্রচেষ্টা ও আমল নষ্ট হবার নয়। তখন উম্মতে মুহাম্মাদীই উদ্দেশ্য হবে। [বাগভী; জালালাইন; সা'দী] অথবা সমস্ত আসমানী কিতাবই উদ্দেশ্য। তখন অর্থ হবে, যাদেরকেই আমরা কিতাব দিয়েছি তারা যদি তাদের সময়কার কিতাব অনুসারে চলে আমরা তাদের কর্মকাণ্ড ও আমল নষ্ট করি না। আর বর্তমানে কুরআন অনুসারেই সকলকে চলতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। তাতে যত হুকুম-আহকাম আছে তারা সেটার উপর যত্ন সহকারে আমল করে, এ ব্যাপারে তাদের কোন শৈথিল্য হয় না। যাদের আমল বিনষ্ট হয় না। তাদের পরিচয় হচ্ছে যে, তারা কঠোরভাবে এ কিতাবে বর্ণিত শরী'আতের উপর আমল করে। [আইসারুত তাফাসীর] সুতরাং একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে একটিমাত্র বিধান সালাত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল সালাত। [সা'দী] তদুপরি সালাতের অনুবর্তিতা আসমানী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক সালাতে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা পর্বতকে তাদের উপরে উঠাই, আর তা ছিল যেন এক শামিয়ানা। তারা মনে করল যে, সেটা তাদের উপর পড়ে যাবে[১]। (বললাম,) 'আমরা যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাক্‌ওয়ার অধিকারী হও।'

বাইশতম রুকূ'

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৭২. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম-সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি[২]

যে লোক সালাতের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সালাত হল দ্বীনের স্তম্ভ', [তিরমিযীঃ ২৬১৬] অর্থাৎ যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দ্বীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যে সালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তাস্‌বীহ্-ওযীফাই পড়ুক কিংবা যত প্রচেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই নয়।

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আর তাদের অংগীকার গ্রহণের জন্য 'তূর' পর্বতকে আমরা তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম" [সূরা আন-নিসাঃ ১৫৪] ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, বনী-ইসরাঈলদেরকে যখন তাওরাত দেয়া হলো, তারা সেটা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতে লাগল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড়কে সমূলে সামিয়ানার মত তাদের উপর তুলে ধরলেন এবং বললেন, যা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার ঘোষণা দাও, নতুবা তোমাদের উপর ছেড়ে দেব। [তাবারী] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তখন তারা সিজদায় পতিত হয়। তবে তারা তাদের বাম চক্ষুর পার্শ্বে সিজদা করে অপর চক্ষু দিয়ে উপরের দিকে তাকাতে থাকে। এখনও প্রত্যেক ইয়াহূদী অনুরূপ সিজদা করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতগুলোতে মহা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও

গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই[১]?' তারা বলেছিল,

اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ

সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সে সময় হয়েছিল, যখন এই পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় "প্রাচীন অঙ্গীকার"। কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়-ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোন আশংকাই তাদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্র রাসূলগণ নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রিসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তারা নিজেদের সবকিছু কুরবান করে দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী-রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য- যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ করেনি। এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতি, যা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমস্ত নবী-রাসূলগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যে, তারা 'নবীয়ে-উম্মী', খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাকে সাহায্য-সহায়তা করবেন। যার আলোচনা সূরা আলে ইমরানের ৮১ নং আয়াতে করা হয়েছে। আবার বনী-ইস্রাঈলদের কাছ থেকেও তাওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সূরা আল-আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোয় সে বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করছেন, যা সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে তিনি নিয়েছিলেন। যা সাধারণ ভাষায় 'প্রাচীন অঙ্গীকার' বলে প্রসিদ্ধ।

(১) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের তাফসীরে দু'টি প্রসিদ্ধ মত বর্ণিত হয়েছে। এক, এখানে যে অঙ্গীকার নেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা ফিতরাত বা স্বভাবজাত দ্বীনের উপর মানুষকে সৃষ্টি করা, যাতে তারা কোন প্রকার পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত না হলে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতো, এ বিষয়টিকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্র প্রশ্ন ও মানবজাতির প্রত্যুত্তর সবই অবস্থাভিত্তিক। অর্থাৎ তাদের মুখ দিয়ে কথা বের হয়নি। তাদের অবস্থাই একথার স্বীকৃতি দিচ্ছিল যে, তারা আল্লাহ্র রবুবিয়াতে পূর্ণ বিশ্বাসী। এ মতের সমর্থনে ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা যায় যাতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ফিতরাত বা স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন তারপর তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী বা নাসারা বা মাজুসী বানিয়েছে। শয়তান তাদেরকে দ্বীন

থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সত্যনিষ্ঠ আলেমদের এক বিরাট দল এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন কাসীর, ইবন আবুল ইযয আল হানাফী, আব্দুর রহমান আস-সা'দী রাহিমাহুমুল্লাহ্ সহ আরো অনেকে।
দুই, আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালামের পিঠ থেকে তার সন্তানদেরকে বের করে তাদের কাছ থেকে তিনি মৌখিক অঙ্গীকার নিয়েছেন। এ মতের সপক্ষে বাহ্যিকভাবে আলোচ্য আয়াত, সূরা আল-বাকারার ২৭ এবং সূরা আল-হাদীদের ৮ নং আয়াতকে তারা তাদের দলীল হিসাবে পেশ করেন। এ ছাড়াও এ মতের সমর্থনে বেশ কিছু হাদীস, সাহাবা-তাবেয়ীনদের উক্তি এবং মুফাসসেরীনদের মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসের বর্ণনায় সৃষ্টিলগ্নের এই প্রতিশ্রুতির আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। কিছু লোক উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তার কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হল এই- "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের হাত যখন তার পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তার ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেনঃ এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তার পিঠে হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তার ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেনঃ এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জাহান্নামে যাবার মতই কাজ করবে"। সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, প্রথমেই যখন জান্নাতী ও জাহান্নামী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যখন আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ্ যখন কাউকে জাহান্নামের জন্য তৈরী করেন, তখন সে জাহান্নামের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ"। [মুয়াত্তাঃ ২/৮৯৮, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪, আবু দাউদঃ ৪৭০৩, তিরমিযীঃ ৩০৭৫, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১/২৭, ২/৩২৪, ৫৪৪]। অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণীভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমবারে যারা আদম 'আলাইহিস্ সালামের ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ- যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল

'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম[১]।'

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পিতৃপুরুষরাও তো আমাদের আগে শির্ক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি (শির্কের মাধ্যমে) যারা তাদের আমলকে বাতিল করেছে তাদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন[২]?'

কৃষ্ণবর্ণ- যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৪১] অপর এক বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদমসন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল। [দেখুন, তিরমিযী: ৩০৭৬, মুস্তাদরাকে হাকেম: ২/২৮৬]। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, মহান আল্লাহ্ সবচেয়ে অল্প আযাবে লিপ্ত জাহান্নামবাসীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব তোমার হয় তাহলে কি তুমি এ আযাবের বিনিময় হিসাবে দিতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমার কাছে তার থেকেও সামান্য জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের পিঠে ছিলে, তা হল, আমার সাথে শির্ক কর না। কিন্তু তুমি শির্ক ছাড়া কিছু করলে না। [বুখারী: ৩৩৩৪; মুসলিম: ২৮০৫]

(১) এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সৃষ্টিলগ্নে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে অঙ্গীকার নেয়ার আরেকটি কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কেয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শির্ক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে, আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি বরং স্বয়ং তোমাদেরই

১৭৪. আর এভাবে আমরা নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে তারা ফিরে আসে[১]।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান[২] যাকে আমরা দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ, তারপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর শয়তান

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ, সৃষ্টিলগ্নের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক বীজ রোপন করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কঠিন ছিল না যে, একজন স্রষ্টা রয়েছেন, আমাকে তাঁরই ইবাদত করা উচিত। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; ফাতহুল কাদীর; মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌র নিদর্শণাবলী বর্ণনার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে, আমরা নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে কেউ যদি সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই সৃষ্টিলগ্নের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই তারা শির্ক থেকে ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে। তাঁর পথের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। মুফাসসিরগণ রাসূলের যুগের এবং তাঁর পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে এ দৃষ্টান্তের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'বাল'আম ইবন আবার' এর নাম নিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবদুল্লাহ ইবন আমর নিয়েছেন উমাইয়া ইবন আবীসসালতের নাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এ ব্যক্তি ছিল সাইফী ইবনুর রাহেব। [ইবন কাসীর] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদাহরণ হিসেবে যে বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা এখানে পেশ করা হয়েছে সে তো পর্দারন্তরালেই রয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তিই এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তার ব্যাপারে এ উদাহরণটি প্রযোজ্য হবেই। তবে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে যে, তখনকার দিনে এক লোক ছিল যার দো'আ কবুল হত। যখন মূসা আলাইহিস সালাম শক্তিশালী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলেন। তখন লোকেরা তার কাছে এসে বলল, তোমার দো'আ তো কবুল হয়, সুতরাং তুমি মূসার বিরুদ্ধে দো'আ কর। সে বলল, আমি যদি মূসার বিরুদ্ধে দো'আ করি, তবে আমার দুনিয়া ও আখেরাত সবই যাবে। কিন্তু তারা তাকে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত সে দো'আ করল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল হওয়ার সুযোগ রহিত করে দিলেন। [ইবন কাসীর]

তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথ গামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. আর আমরা ইচ্ছে করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে যমীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে[১] এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত; তার উপর বোঝা চাপালে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং বোঝা না চাপালেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়[২]।

---

(১) অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, দুনিয়ার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারতাম।[ইবন কাসীর] কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

(২) এখানে যে ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী ছিল। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে যে কর্মনীতিকে সে ভুল বলে জানতো তা থেকে দূরে থাকা এবং যে কর্মনীতিকে সঠিক মনে করতো তাকে অবলম্বন করাই তার উচিত ছিল। এ যথার্থ জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করলে আল্লাহ তাকে মানবতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতেন। কিন্তু সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রবৃত্তির লালসার মুকাবিলা করার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়। উচ্চতর বিষয়সমূহ লাভের জন্য সে পার্থিব লোভ-লালসার ঊর্ধে উঠার পরিবর্তে তার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যার ফলে নিজের সমস্ত উচ্চতর আশা-আকাংখা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে বসে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে এক অধঃপতন থেকে আরেক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে এ যালেম শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয় যারা তার ফাঁদে পা দিয়ে বুদ্ধি বিবেক সব কিছু হারিয়ে বসেছিল।

এরপর আল্লাহ এ ব্যক্তির অবস্থাকে এমন একটি কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন যার জিভ সবসময় ঝুলে থাকে। তার উপর বোঝা থাকলেও হাঁপাতে থাকে। আর বোঝা না থাকলেও একই অবস্থায় হাঁপাতে থাকে। মুজাহিদ বলেন, এ উদাহরণ দিয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে কিতাব পড়ে কিন্তু তার উপর আমল করে না। [তাবারী;

যে সম্প্রদায় আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে তাদের অবস্থাও এরূপ। সুতরাং আপনি বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তা করে[১]।

আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ উদাহরণটি কুকুরের জন্য এ উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে যে, তাকে কোন জ্ঞান ও হিকমতের কথা বললে সে তা নেয়ার মত যোগ্যতা রাখে না। আর যদি তাকে কোন কিছু না দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হয়, তবে কোন কল্যাণই বয়ে আনতে পারে না। যেমনিভাবে কুকুর বসে থাকলেও হাঁপাতে থাকে। আর দৌড়ালেও হাঁপায়। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কারও কারও মতে আয়াতের অর্থ, সে তার পথভ্রষ্টতায় নিপতিত থাকা এবং ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হলে তা দ্বারা উপকৃত না হওয়ার দিক থেকে কুকুরের মত। তার উপর বোঝা চাপলেও সে হাঁপায়, না চাপলেও হাঁপায়। অনুরূপভাবে এ লোকটি উপদেশ ও ঈমানের প্রতি দাওয়াত দ্বারা উপকৃত হয়নি। অন্য আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, "যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৬] অন্য আয়াতে এসেছে, "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৮০] অনুরূপ আরও আয়াতসমূহ। কারও কারও মতে, কাফের, মুনাফিক ও পথভ্রষ্টের অন্তর যেহেতু দুর্বল, হিদায়াতশূন্য থাকে সেহেতু সে খুব বেশী অস্থিরমতি। [ইবন কাসীর]

(১) উল্লেখিত আয়াতগুলোতে চিন্তা করলে যে শিক্ষা আমরা পাই তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য। [কুরতুবী] দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ যে সমস্ত উদাহরণ পেশ করেছেন সেগুলোতে গবেষণা করলে জ্ঞান বাড়বে। আর জ্ঞান বাড়লে সেটা অনুযায়ী আমল করতে হবে। [সা'দী] তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ স্বয়ং একটি আযাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরো হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য। চতুর্থতঃ এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় দ্বীনী ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ

১৭৭. সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত কত মন্দ! যারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে। আর তারা নিজদের প্রতিই যুলুম করত।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

১৭৯. আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি[২]; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল[৩]।

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেসবের উপর আপন নূরের জ্যোতি ফেললেন। যার উপর সে জ্যোতি পড়েছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে আর যার উপর সে জ্যোতি পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হবে। এজন্য আমি বলি, আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর লিখে কলম শুকিয়ে গেছে।' [তিরমিযীঃ ২৬৪২]

(২) এর অর্থ এটা নয় যে, আমি বিনা কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্যই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় এ সংকল্প করেছিলাম যে, তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবো। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমি তো তাদেরকে হৃদয়, মস্তিষ্ক, কান, চোখ সবকিছুসহ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এ বেকুফরা এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের অসৎ কাজের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাদের আমলই তাদেরকে জাহান্নামের উপযুক্ত করেছে। তাদের জাহান্নাম দেয়া আল্লাহ্র ইনসাফের চাহিদা। সে হিসেবে তিনি যেহেতু আগে থেকেই জানেন যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সুতরাং তাদেরকে যেন তিনি জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছেঃ এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শুনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও

১৮০. আর আল্লাহ্‌র জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক[১]; আর যারা

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ أَسْمَآئِهٖ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا

নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা বধিরও নয় যে, কোন কিছু শুনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বুঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শুনা উচিত ছিল তা তারা শুনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীবজন্তুর পর্যায়ের বুঝা, দেখা ও শুনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান। এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "এরা চতুস্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত", শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছেঃ "এরা চতুস্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।" তার কারণ চতুস্পদ জীব-জানোয়ার শরী'আতের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়- তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর-কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেজন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিবুর্দ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভূ ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পালনকর্তার আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুস্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল। কাজেই বলা হয়েছে "এরাই হলো প্রকৃত গাফেল।" [দেখুন, তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সব উত্তম নাম আল্লাহ্‌রই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।" এখানে উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর যার উর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এসব আসমাউল-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের কিছু আসমাউল-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত 'ইসম' বা নাম একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহ্‌কে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য। 'দো'আ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, ডাকা কিংবা আহ্বান করা। আর দো'আ শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহ্‌র যিকির, প্রশংসা ও

তাসবীহ্-তাহ্লীলের সাথে যুক্ত। যা ইবাদাতগত দো'আ নামে খ্যাত। আর অপরটি হল নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। যাকে প্রার্থনাগত দো'আ বলা হয়। এ আয়াতে "দো'আ" শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসা, তাসবীহ্-তাহ্লীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণগান করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব আসমাউল-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ দ্বারা ডাকবে যা আল্লাহ্র নাম বলে প্রমাণিত।

বস্তুত: এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দো'আ প্রার্থনার বিষয়ে দুটি হেদায়াত বা দিক নির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হয়ে আমাদিগকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে-কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি এমন নাম রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [বুখারীঃ ৬৪১০, মুসলিমঃ ২৬৭৭] এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সরাসরি সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়নি তাই সেগুলো নির্ধারনে কোন অকাট্য কিছু বলা যাবে না। আবার এটা জেনে নেওয়াও জরুরী যে, আল্লাহ্র নাম নিরানব্বইটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ্র নামের অসীলা দিয়ে দো'আ করা জরুরী। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।" [সূরা গাফেরঃ ৬০] আরও বলেনঃ "যখন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই" [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৮৬] উদ্দেশ্যসিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দো'আ ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না এবং ফললাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হল এই যে, দো'আ যে একটি ইবাদাত তার সওয়াব দো'আকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ 'দো'আই হল ইবাদাত।' [আবু দাউদঃ ১৪৭৯,

يَعْمَلُونَ۝

তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর[১]; তাদের কৃতকর্মের ফল

তিরমিযীঃ ৩২৪৭] যে উদ্দেশ্যে মানুষ দো'আ করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে দো'আকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহ্‌র হামদ ও সানার মাধ্যমে যিক্র করা হল ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ও তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই তা সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবেঃ لَا إِلَه إِلّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَه إِلّا اللهُ رَبُّ السَّموَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ।' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহান, সহনশীল। আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি আরশের মহান প্রতিপালক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইবাদতের যোগ্য মা'বূদ নেই, তিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক এবং আরশের মহান প্রতিপালক। [বুখারীঃ ৬৩৪৫, মুসলিমঃ ২৭৩০] অন্য এক হাদীসে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ফাতেমা যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেনঃ 'আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে? সে ওসীয়তটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দো'আটি পড়ে নেবে' يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّه وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ 'হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক! আমি আপনার রাহমাতের বিনিময়ে উদ্ধার কামনা করছি, আমার যাবতীয় ব্যাপার ঠিক করে দিন আর আমাকে আমার নিজের কাছে ক্ষনিকের জন্যও সোপর্দ করেন না'। [তিরমিযীঃ ৩৫২৪, অনুরূপ আবুদাউদঃ ৫০৯০] [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ]

সারকথা হল এই যে, উল্লেখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হেদায়াত দেয়া হয়েছে। একটি হল এই যে, যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকবে। কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হল এই যে, তাঁকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ্ তা'আলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

(১) *আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ সে সমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন,* যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী 'ইলহাদ' অর্থ

অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।

ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। কুরআনের পরিভাষায় 'ইলহাদ' বলা হয় সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়াকে। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুস্নার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে।
আল্লাহ্র নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা যা কুরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারুরই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণাগুণ প্রকাশ করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহ্ তা'আলার নাম কিংবা গুণ হিসেবে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্কে 'কারীম' বলা যাবে, কিন্তু 'ছখী' নামে ডাকা যাবে না। 'নূর' নামে ডাকা যাবে, কিন্তু জ্যোতি ডাকা যাবে না। কারণ, এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহ্র যে সমস্ত নাম কুরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়। বিকৃতির তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুসনাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কুরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো জন্য যেসব নামের ব্যবহার কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লেখিত 'ইল্হাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয ও হারাম। যেমন, রাহ্মান, রায্যাক, খালেক, গাফ্ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ] তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রায্যাক মনে করা হয়, তাহলে তা বড় শির্ক। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বুঝার দরুন কাউকে খালেক, রায্যাক, রাহ্মান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শির্কীসুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে। [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস]

১৮১. আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায়[১] ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

তেইশতম রুকূ'

১৮২. আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, অচিরেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না[২]।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথী মোটেই উন্মাদ নন[৩]; তিনি তো

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে একদল আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশকে বাস্তবায়ন করার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে কেউ মিথ্যারোপ করবে অথবা অপমান করবে তার পরোয়া তারা করবে না।' [বুখারীঃ ৭৪৬০, মুসলিমঃ ১০৩৭]

(২) অর্থাৎ দুনিয়াতে রিযিক ও জীবনোপকরণের ভাণ্ডার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। ফলে তারা মনে করবে যে, তারা যা করে চলছে তা গ্রহণযোগ্য। এভাবেই তারা প্রতারিত হতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, "অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল। ফলে যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র জন্যই।" [সূরা আল-আন'আম: ৪৪-৪৫]

(৩) সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন,"আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নন" [আত-তাকওয়ীর: ২২] আরও বলেন, "বলুন, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে

نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾

এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّأَنْ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে?(১) আর এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় নিকটে এসে গিয়েছে, কাজেই এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ---তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তিনি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র" [সাবা: ৪৬] অর্থাৎ তিনি তাদের মধ্যেই জন্মলাভ করেন। তাদের মধ্যে বসবাস করেন। শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পদার্পন করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সমগ্র জাতি তাকে একজন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট-ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব প্রকৃতি ও সুস্থ মন-মগজধারী মানুষ বলে জানতো। নবুওয়াত লাভের পর যে-ই তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করলেন, অমনি তাকে পাগল বলা আরম্ভ হয়ে গেল। একথা সুস্পষ্ট, নবী হওয়ার আগে তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলোর জন্য তাকে পাগল বলা হয়নি বরং নবী হওয়ার পর তিনি যেসব কথা প্রচার করতে থাকেন সেগুলোর জন্য তাকে পাগল বলা হতে থাকে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, যে কথাগুলো তিনি বলছেন তার মধ্যে কোন্‌টি পাগলামির কথা? কোন্ কথাটি অর্থহীন, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক? যদি তারা চিন্তা করতো তাহলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, শিরকের মতবাদ খণ্ডন, তাওহীদের প্রমাণ, রবের বন্দেগীর দাওয়াত এবং মানুষের দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহি সম্পর্কে তাদের সাথী তাদেরকে যা কিছু বুঝাচ্ছেন তা কোন পাগলের কথা নয়। তাঁর স্বভাব ও চরিত্র সবচেয়ে উন্নত। তার কথা সবচেয়ে সুন্দর। তিনি তো শুধু কল্যাণের দিকেই আহ্বান করেন। অন্যায় ও অকল্যাণ থেকেই শুধু নিষেধ করেন। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা তারা কি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও ক্ষমতা, এতদুভয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে না? তাহলে তারা এর মাধ্যমে শিক্ষা নিতে পারত যে, এগুলো একমাত্র সে সত্ত্বার জন্য যার কোন দৃষ্টান্ত নেই, নেই কোন সমকক্ষ, ফলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনত, তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মানত। তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসত। তার জন্য সাব্যস্ত করা যাবতীয় শরীক ও মূর্তি থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করত। তাছাড়া তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হতো যে, এভাবে তাদের জীবনের মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে, তখন যদি কুফরি অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় তবে তাদের স্থান হবে আল্লাহ্‌র আযাবেই। [ইবন কাসীর]

১৮৬. আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেন(১)।

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

১৮৭. তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (বলে) 'তা কখন ঘটবে'?(২) বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবেরই নিকট। শুধু তিনিই যথাসময়ে সেটার প্রকাশ ঘটাবেন; আসমানসমূহ ও যমীনে সেটা ভারী বিষয়(৩)। হঠাৎ করেই তা

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ۘ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্র কাছে আপনার কিছুই করার নেই। " [সূরা আল-মায়েদাহ: ৪১] আরও বলেন, "বলুন, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর।' আর যারা ঈমান আনে না, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন এমন সম্প্রদায়ের কোন কাজে আসে না" [সূরা ইউনুস: ১০১]

(২) এ আয়াতগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, জাবাল ইবন আবি কুশাইর ও শামওয়াল ইবন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামের নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন- এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে তো আমরাও জানি। এ ঘটনার ভিত্তিতেই আয়াতটি নাযিল হয়। [তাবারী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এক. কিয়ামতের জ্ঞান অত্যন্ত ভারী বিষয়, আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের থেকে তা গোপন রাখা হয়েছে। সুতরাং কোন নবী-রাসূল বা ফেরেশতাকেও আল্লাহ্ সে জ্ঞান দেননি। আর যে কোন জ্ঞান গোপন রাখা হয় তা অন্তরের উপর ভারী হয়ে থাকে। দুই. কিয়ামত এত ভারী সংবাদ যে আসমান ও যমীন সেটাকে সহ্য করতে পারে না। কারণ, আসমানসমূহ ফেটে যাবে, তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। আর সাগরসমূহ শুকিয়ে যাবে। তিন. কিয়ামতের গুণাগুণ বর্ণনা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের উপর কঠিন। চার. কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা তাদের জন্য এক ভারী বিষয়। [ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের উপর আসবে(১) ।' আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানী মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে । বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই নিকট,

(১) এ আয়াতে উল্লেখিত الساعة শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয় । আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই । আর গাণিতিকদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় "সা'আহ্", যাকে বাংলায় ঘন্টা নামে অভিহিত করা হয় । কুরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে । أيان (আইয়্যানা) অর্থ কবে । আর مُرسى (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া । يُجَلِّيهَا শব্দটি تجلية থেকে গঠিত । এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা । بغتة (বাগতাতান) অর্থ অকস্মাৎ । حفي (হাফিয়্যুন) অর্থ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি । প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে । [তাবারী] কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে । এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারো জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না । নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন । এতে কোন মাধ্যম থাকবে না । কেয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে । সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে । সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার দাবী । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে । এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে । এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনো তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে- তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । কেউ হয়ত খাবারের লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কেয়ামত হয়ে যাবে ।[বুখারীঃ ৬৫০৬, মুসলিমঃ ২৯৫৪] সুতরাং যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কেয়ামতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর-তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান ।

কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না[১] ।'

১৮৮. বলুন, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই । আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না । ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই[২] ।'

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

(১) বলা হয়েছে, আপনি লোকদিগকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন ফিরিশ্তা কিংবা নবী-রাসূলগণেরও জানা নেই । তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে । আর তা হল এই যে, এখন তা নিকটবর্তী । এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেনঃ 'আমার আবির্ভাব এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল' । [বুখারীঃ ৬৫০৩-৬৫০৫, মুসলিমঃ ২৯৫০]

(২) এ আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে; যা তারা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তারা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছেন । তাদের এই শির্কী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে-গায়েব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে । এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য । এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফিরিশ্তাই হোক আর নবী ও রাসূলগণই হোক, শির্ক এবং মহাপাপ । তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই গুণ । এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শির্ক । বস্তুতঃ এই শির্ক বা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছে । তাই এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি 'আলেমুল-গায়েব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে । তাছাড়া আমার যদি গায়বী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি

চব্বিশতম রুকূ'

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়[১]। তারপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে আসে তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহ্‌র কাছে

লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনো কোন ক্ষতি আমার ধারে-কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ-কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম বেঁধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে উমরা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হারাম শরীফে প্রবেশ কিংবা উমরা করা তখনো সম্ভব হতে পারেনি; সবাইকে ইহ্‌রাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে। তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হন এবং মুসলিমদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরো বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সংঘটিত হয়েছে। এ সবগুলো থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি গায়েবের জ্ঞান রাখেন না। শুধু ততটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ্ তাদের জানিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর সেটা জানাকে আর গায়েবের জ্ঞান বলা যাবে না।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাওয়াকে আদম থেকে সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, তার কাছে গেলে মন প্রশান্ত হবে। তার সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরী হবে, সন্তুষ্টি আসবে। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যে, তিনি সন্তান-সন্ততিদেরকেও একই উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা আর-রূম: ২১]

প্রার্থনা করে, 'যদি আপনি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব ।'

১৯০. অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সুসন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে তিনি যা দিয়েছেন সেটাতে আল্লাহ্‌র বহু শরীক নির্ধারণ করে[১]; বস্তুত তারা যাদেরকে (তাঁর সাথে) শরীক করে আল্লাহ্ তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে[২] ।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

(১) কাতাদা বলেন, হাসান বসরী বলতেন, এর দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করেন, কিন্তু তারা সেগুলোকে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা বানিয়ে ছাড়ে । [তাবারী; ইবন কাসীর]

(২) ইয়াহূদী ও নাসারা ছাড়াও বাস্তবে যারাই আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতকে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করে তারাও এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে । কারণ মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহই সর্বপ্রথম মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন । মুশরিকরাও এ কথা অস্বীকার করে না । তারপর পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি মানুষকেও তিনি অস্তিত্ব দান করেন । আর একথাটিও মুশরিকরা জানে । তাই দেখা যায়, গর্ভাবস্থায় সুস্থ, সবল ও নিখুঁত অবয়বধারী শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ব্যাপারে আল্লাহর উপরই পূর্ণ ভরসা করা হয় । কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়ে যদি চাঁদের মত ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেও জাহেলী কর্মকাণ্ড নবতর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন দেবী, অবতার, অলী ও পীরের নামে নজরানা ও শিন্নি নিবেদন করা হয় এবং শিশুকে এমন সব নামে অভিহিত করা হয় যেন মনে হয় সে আল্লাহর নয়, বরং অন্য কারোর অনুগ্রহের ফল । যেমন তার নামকরণ করা হয় হোসাইন বখশ, (হোসাইনের দান) পীর বখশ (পীরের দান), আব্দুর রাসূল (রাসূলের দাস), আবদুল উয্যা (উয্যার দাস), আবদে শামস (সূর্য দেবতার দাস) ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ের অপরাধ ছিল এই যে, তারা সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন সন্তান জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করতো কিন্তু সন্তানের জন্মের পর আল্লাহর এ দানে অন্যদেরকে অংশীদার করতো । নিঃসন্দেহে তাদের এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ । কিন্তু বর্তমানে তাওহীদের দাবীদারদের মধ্যে আমরা যে শির্কের চেহারা দেখছি তা তার চাইতেও খারাপ । এ তাওহীদের তথাকথিত দাবীদাররা সন্তানও চায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে । গর্ভ সঞ্চারের পর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের নামে মানত মানে এবং সন্তান জন্মের পর তাদেরই আস্তানায় গিয়ে

১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট[১],

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

১৯২. ওরা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে আর না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে[২]।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

নজরানা নিবেদন করে। এরপরও জাহেলী যুগের আরবরাই কেবল মুশরিক, আর এরা নাকি পাক্কা তাওহীদবাদী !!

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছেন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে মূর্তি, দেব-দেবী ইত্যাদিকে শরীক করে। অথচ তারা সৃষ্ট, মানুষের হাতের তৈরী। তারা কিছুরই মালিক নয়। ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। উপাসনাকারীদের পক্ষে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরং এগুলো হচ্ছে, মৃত। নড়াচড়া কিংবা শোনা বা দেখার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরং উপাসনাকারীরা এগুলোর চেয়ে বেশী শক্তিশালী; কারণ তাদের চোখ আছে, কান আছে, তারা পাকড়াও করার ক্ষমতা রাখে। তাহলে তোমরা কিভাবে তাদের ইবাদত করছ যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি? কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও যাদের নেই? [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ বলেছেন, "হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোন: তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষনকারী ও অন্বেষনকৃত কতই না দুর্বল; তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি যেমন মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।" [সূরা হজ-৭৩-৭৪] আল্লাহ্ বলেন, যে, তাদের উপাস্যগুলো সবাই একত্রিত হলেও কোন একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং যদি মাছি এ সমস্ত উপাস্যদের কোন নিকৃষ্ট খাবার নিয়ে উড়ে চলে যায়, তারা সেটাও মাছির কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। যার অবস্থা হচ্ছে এই, রিযক কিংবা সাহায্য লাভের জন্য কিভাবে ইবাদত তার করা হবে? [ইবন কাসীর]

(২) এমনকি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ সমস্ত মা'বুদদেরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন এবং এ বিষয়টি নিয়ে মুশরিকদের উপাস্যদেরকে অপমান করতে ছাড়েন নি। আল্লাহ্ বলেন, "তারপর ইবরাহীম তাদের উপর সবলে আঘাত হানলেন।" [সূরা আস-সাফফাত: ৯৩] আরও বলেন, "তারপর তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ছাড়া; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৫৮] [ইবন কাসীর]

১৯৩. আর তোমরা তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না; তোমরা ওদেরকে ডাক বা চুপ থাক, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান[১]।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই মত বান্দা; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক, অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. তাদের কি পা আছে যা দিয়ে ওরা চলে? তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে ওরা ধরে? তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে ওরা দেখে? কিংবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে ওরা শুনে? বলুন, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছ তাদেরকে ডাক তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না[২]';

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

---

(১) অর্থাৎ মুশরিকদের বাতিল মা'বুদদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের পক্ষে কাউকে সঠিক পথ দেখানো এবং নিজেদের অনুগামী ও পূজারীদেরকে পথের সন্ধান দেয়া তো দূরের কথা, তারা তো কোন পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করারও যোগ্যতা রাখে না। এমন কি কোন আহবানকারীর আহবানের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদেরকে কেউ ডাকল কি তাদেরকে পিষে ফেলল, সবই তাদের কাছে সমান। একথাটিই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বলেছিলেন, "যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় পিতা ! আপনি তার 'ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?" [সূরা মারইয়াম:৪২] [ইবন কাসীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ ছাড়া তারা যাদের আহ্বান করে, যাদের ইবাদত করে, যাদের প্রতি তাদের আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতি পোষণ করে, তাদের অপারগতা ও অসহায়তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের

১৯৬. 'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন[১] ।

إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩٦

আহ্বান করে থাক, তাদের কি পাকড়াও করার মত সত্যিকারের হাত আছে? নাকি তাদের সত্যিকারের চোখ আছে যে, তারা দেখবে? নাকি তাদের সত্যিকারের কান আছে যে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে? মানুষের কাছে যে সমস্ত শক্তি আছে তাদের কাছে তো তাও নেই। যদি এগুলো তোমাদের কোন কাজেই না আসে, তোমাদের আহ্বানেও সাড়া না দেয়, তারা তোমাদের মতই বান্দা বরং তোমরা তাদের থেকেও পরিপূর্ণ, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা তাদের ইবাদত কর? তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা একত্রিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমাকে কোন প্রকার অবকাশ দিও না। দেখতে পাবে যে, তোমরা আমার কোন ক্ষতি পৌঁছাতে সক্ষম নও। [সা'দী]

(১) এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী' সাহায্যকারী, অভিভাবক। আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন। 'সালেহীন' অর্থ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ভাষায় সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে না। এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলিম পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ্, যিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন নাযিল করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দেই এবং কুরআনের প্রতি আহ্বান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আমার কি চিন্তা?
আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণের মর্যাদা তো বহু ঊর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলিমদের জন্যও আল্লাহ্ সহায়, রক্ষাকারী ও অভিভাবক। অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমার সাহায্যকারী, তাঁর উপরই আমার ভরসা। আর তাঁর কাছেই আমি আশ্রয় চাই। দুনিয়া ও আখেরাতে তিনিই আমার অভিভাবক। আর আমার পরে প্রত্যেক নেককার বান্দারও তিনি অভিভাবক। [ইবন কাসীর] এ আয়াতের সমর্থনে অন্যত্র এসেছে, "আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর, 'আল্লাহ্ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; তারপর

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথে ডাকেন তবে তারা শুনবে না[১] এবং আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে; অথচ তারা দেখে না[২]।

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন[৩]।

আমাকে অবকাশ দিও না। আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়; নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে।" [সূরা হূদ: ৫৪-৫৬]

(১) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না।" [সূরা ফাতের: ১৪]

(২) অর্থাৎ এ উপাস্যদের দিকে তাকালে মনে হবে যেন, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। বস্তুত: তারা তাদের এ নির্জীব চোখ দিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে দেখলেও তারা কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। [ইবন কাসীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়াত দেয়া হয়েছে। [সা'দী] তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عفو গ্রহণ করুন। এখানে উল্লেখিত العفو শব্দটির আরবী অভিধান মোতাবেক একাধিক অর্থ হতে পারে এবং একত্রে সব ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। (এক) অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হল এই যে, عفو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। [ইবন কাসীর] তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ শরী'আত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে

আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবূল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ মানুষ যা করতে পারে তার প্রকাশ্য রূপ দেখেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তাদের প্রকৃতি যেটা করতে সমর্থ নয় সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দেব না। তাদের ভুল-ত্রুটি হলে সেটা উপেক্ষা করে যাব। তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করব না [ইবন কাসীর; সা'দী; ফাতহুল কাদীর] (দুই) عفو এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলেমগণের এক দল এক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-অপরাধীদের ক্ষমা করে দিন। [ইবন কাসীর, যায়দ ইবন আসলাম হতে]

আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عرف এর নির্দেশ দিন। এখানে العرف শব্দটির অর্থ, সৎকাজ বা পরিচিত কাজ। যে কোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

আয়াতের তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি জাহেল বা মূর্খদেরকে উপেক্ষা করুন। যারা জাহেল তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খ-জনোচিত কথা-বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন। তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়াত করাও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা রয়েছে যে, উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র হুর ইবন কায়সের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যারা ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ্ স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র

২০০. আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

হুরকে বললঃ তুমি তো আমীরুল মু'মীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু উয়াইনাহ্ উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যেঃ 'আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ'। উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবন কায়স নিবেদন করলেনঃ 'হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন, "আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন" আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন'। এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ। [বুখারীঃ ৪৬৪২]

(১) এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেনঃ বাক্যটি হল এই أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ সে লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল। [বুখারীঃ ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫, মুসলিমঃ ২৬১০, ইবন হিব্বানঃ ৫৬৯২, আবু দাউদঃ ৪৭৮০, তিরমিযীঃ ৩৪৫২,

২০১. নিশ্চয় যারা তাক্ওয়া অবলম্বন ক র ছ, তা দর ক শয়তান যখন কুমন্ণা[১] দেয় তখন তারা আল্লাহ্কে রণ ক র এবং সা থ সা থই তা দর চাখ খু ল যায়[২] ।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

২০২. তা দর সঙ্গী-সাথীরা তা দর ক ভু লর দি ক ট ন নয়। তারপর এ বিষ য় তারা কান টি ক র না[৩] ।

وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৪,নাসায়ী, আমলুল ইয়াওমে ওয়াল্লাইলাঃ৩৯৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়ালে তিনবার তাকবীর বলতেন, তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী তিনবার বলতেন, তারপর বলতেনঃ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই, তার কুমন্ত্রণা হতে, অহংকার হতে, তার হাতে মৃত্যু হওয়া থেকে। [আবু দাউদঃ ৭৬৪, ইবন মাজাহঃ ৮০৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৮৫]

(১) মূল আরবী হচ্ছে, طائف । মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ ক্রোধ। [তাবারী] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ শয়তানের কোন ছোঁয়া বা স্পর্শ। [তাবারী]

(২) শয়তান যেহেতু ইসলামের পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজটির উন্নতি কখনো দু'চোখে দেখতে পারে না তাই সে হামেশাই এ ব্যাপারে প্রতিকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা মুত্তাকী তারা নিজেদের মনে কোন শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোন অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করতেই সাথে সাথেই সজাগ হয়ে উঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দ্বীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং সত্য প্রীতির প্রকৃত দাবী কি তা তারা পরিষ্কার দেখতে পায়। তারা তাওবা করে এবং প্রচুর পরিমাণে সৎকাজ করে। ফলে শয়তান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যাদের কাজের সাথে স্বার্থপ্রীতি অংগাংগীভাবে জড়িত এবং এ জন্য শয়তানের সাথে যাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারা অবশ্যি শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারে না এবং তার কাছে পরাজিত হয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়। একের পর এক খারাপ ও পাপের পথে শয়তান তাদেরকে নিয়ে যায়। এসব কাজ করতে তারা সামান্যতমও পিছপা হয় না। সুতরাং শয়তান তাদের পথভ্রষ্টতায় কমতি করে না। আর তারাও খারাপ কাজে যেতে কসূর করে না। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ শয়তান মানুষদের মধ্যে যাদেরকে তাদের অনুগত পায়, তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত করতেই থাকে। তারপর শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতেই থাকে,

২০৩.আপনি যখন তাদের কাছে (তাদের চাওয়া মত) কোন আয়াত[১] নিয়ে আসেন না, তখন তারা বলে, 'আপনি নিজেই একটি আয়াত বানিয়ে নেন না কেন?' বলুন, 'আমার রবের পক্ষ থেকে যা আমার কাছে ওহী হিসেবে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ কুরআন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর হিদায়াত ও রহমত এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে[২]।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

এ ব্যাপারে তারা কোন প্রকার কমতি করে না। অনুরূপভাবে শয়তানের অনুসারীরাও শয়তানরা তাদেরকে যে সমস্ত গর্হিত কাজের প্ররোচনা দেয় সেগুলোর উপর আমল করতে সামান্যতম কুণ্ঠিত হয় না। [মুয়াসসার] সুতরাং অন্যায় কাজে তারা একে অপরের সহযোগী। তারা সর্বক্ষণ পথভ্রষ্টতাতেই লিপ্ত থাকে। তাদের কাছে কোন প্রকার ওয়ায নসীহত আসলেও তা কাজে লাগে না। ওয়ায ও নসীহত তাদের চক্ষু খুলে দেয় না, যেমনটি পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়লেও ওয়ায-নসীহত পেলে তাদের চোখ খুলে যায় এবং তারা অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে। কিন্তু যারা খারাপ লোক তারা শয়তানের প্ররোচনা ও ভ্রষ্টতাতেই লিপ্ত থাকে। তারা কখনো চক্ষুষ্মান হয় না। [জালালাইন]

(১) এখানে আয়াত বলে মু'জিযা ও অলৌকিক কিছু প্রদর্শনের কথা বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আমরা ইচ্ছে করলে আসমান থেকে তাদের কাছে এক নিদর্শন নাযিল করতাম, ফলে সেটার প্রতি তাদের ঘাড় বিনত হয়ে পড়ত" [সূরা আশ-শু'আরা:৪] কারণ মক্কার কুরাইশ ও কাফেররা সবসময় এটা বলত যে, আপনি কষ্ট করে এমন একটি মু'জিযা নিয়ে আসেন না কেন, যা দেখে আমরা ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যাই। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বলছেন যে, আপনি বলুন, মু'জিযা নিয়ে আসা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধু আমার রবের ওহীর অনুসরণ করি। তিনি যদি কোন মু'জিযা আমাকে প্রদান করেন আমি সেটা গ্রহণ করি। আর যদি না দেন তবে আমি নিজের পক্ষ থেকে সেটা চেয়ে নেই না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা কুরআন গ্রহণ করার প্রতি পথনির্দেশ করলেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এই কুরআন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনের এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায়

২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়[১]।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. আর আপনি আপনার রবকে নিজ মনে স্মরণ করুন[২] সবিনয়ে, সশংকচিত্তে

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً

থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছেঃ এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত ও হেদায়াত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অবলম্বনও বটে।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে- "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে"। তবে আয়াতের হুকুমটি কি সালাতের কুরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কুরআন পাঠের ব্যাপার, নাকি সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায়; তা সালাতেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। এ ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। [বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীর ইবন কাসীর দ্রষ্টব্য] এখানে প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কুরআনুল কারীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেজন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কুরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কুরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে। [সা'দী]

(২) স্মরণ করা অর্থ নামাযও এবং অন্যান্য ধরনের স্মরণ করাও। চাই মুখে মুখে বা মনে মনে যে কোনভাবেই তা হোক না কেন। সকাল-সাঁঝ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে এ দু'টি সময়ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আর এ দু' সময়ে আল্লাহর স্মরণ বলতে বুঝানো হয়েছে সকালের ও বিকালের নামাযকে। [তাবারী] অনুরূপ অর্থে অপর সূরায় এসেছে, "এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে" [সূরা কাফ: ৩৯] পক্ষান্তরে সকাল-সাঁঝ কথাটা "সর্বক্ষণ" অর্থেও ব্যবহৃত হয় [কাশশাফ] এবং তখন এর অর্থ হয় সবসময় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা। এর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তোমাদের অবস্থা যেন গাফেলদের মত না হয়ে যায়। দুনিয়ায় যা কিছু গোমরাহী ছড়িয়েছে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে যে বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ তার রব, সে আল্লাহর বান্দা, দুনিয়ার জীবন শেষ হবার পর তাকে তার রবের কাছে হিসাব দিতে হবে।

وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ

২০৬. নিশ্চয় যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহঙ্কার(১) করে না। আর তারা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে(২) এবং তাঁরই জন্য সিজ্‌দা(৩) করে।

---

(১) যারা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছেন তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করা ও রবের বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শয়তানের কাজ। এর ফল হয় অধঃপতন ও অবনতি। পক্ষান্তরে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর বন্দেগীতে অবিচল থাকা একটি ফেরেশ্‌তাসুলভ কাজ। এর ফল হয় উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। যদি তোমরা এ উন্নতি চাও তাহলে নিজেদের কর্মনীতিকে শয়তানের পরিবর্তে ফেরেশ্‌তাদের কর্মনীতির অনুরূপ করে গড়ে তোল।

(২) আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ যে ক্রটিমুক্ত, দোষমুক্ত, ভুলমুক্ত সব ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি যে একেবারেই পাক-পবিত্র এবং তিনি যে লা-শরীক, তুলনাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এ বিষয়টি সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। মুখে তার স্বীকৃতি দেয় ও অংগীকার করে এবং স্থায়ীভাবে সবসময় এর প্রচার ও ঘোষণায় সোচ্চার থাকে।

(৩) এখানে সালাত সংক্রান্ত ইবাদাতের মধ্য থেকে শুধু সিজ্‌দার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সালাতের সমগ্র আরকানের মধ্যে সিজ্‌দার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীসে রয়েছে যে, 'কোন এক লোক সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নীরব রইলেন; কিছু বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেনঃ আমি এ প্রশ্নটিই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সিজ্‌দা করতে থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সিজ্‌দা কর তখন তার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্‌ ক্ষমা করে দেন। লোকটি বললেনঃ সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে আলাপ করার পর আমি আবুদদারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন। [মুসলিমঃ ৪৮৮]

অন্য এক হাদীসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'বান্দা স্বীয় রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সিজ্‌দায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সিজ্‌দারত অবস্থায় খুব বেশী করে দো'আ-প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে। [মুসলিমঃ ৪৭৯, ৪৮২]

সুরা আল-আ'রাফের শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সিজ্‌দা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন আদম সন্তান যখন কোন সিজ্‌দার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সিজ্‌দায়ে তেলাওয়াতে সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সিজ্‌দার হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করল, ফলে তার ঠিকানা হল জান্নাত, আর আমার প্রতিও সিজ্‌দার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম।' [মুসলিমঃ ১৩৩]

৮- সূরা আল-আনফাল

سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ৭৫ ।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ এ সূরা সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা ।

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা আল-আনফাল; কারণ সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটির উল্লেখ আছে, যার অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ । এর অধিকাংশ বর্ণনা এ সংক্রান্ত । কেউ কেউ এটাকে সূরা 'বদর'ও নাম দিয়েছেন ।[বুখারীঃ ৪৮৮২] কারণ, অধিকাংশ আলোচনা ছিল বদর যুদ্ধের । আবার কেউ কেউ এ সূরাকে সূরা 'জিহাদ' নামেও অভিহিত করেছেন ।

নাযিল হওয়ার সময়কালঃ সূরা আল-আনফাল সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে । [বুখারীঃ ৪৬৪৫, মুসলিমঃ ৩০৩১] । সে হিসেবে এই সূরা ২য় হিজরী সনে বদর যুদ্ধের পরেই নাযিল হয়েছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ

১. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে[1]

---

(১) এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত । আয়াতের বিস্তারিত তাফসীরের পূর্বে সে ঘটনাটি জানা থাকলে এর তাফসীর বুঝতে সহজ হবে । ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলিমদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়,যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয় । [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩২২] বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উবাদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে । সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টনের ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল, যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্রে একটি অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অর্পণ করেন । আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে তা সমভাবে বন্টন করে দেন' ।

অন্য এক হাদীসে উবাদা ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন শত্রুদের পরাজিত করেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে । কিছু

আনফাল[১] (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্বন্ধে; | وَالرَّسُولِۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصۡلِحُوۡا ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ

লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যারা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তারা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারো ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন, তারা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতকল্পে তার পাশে সমবেত ছিলেন, তারা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-দের এসব কথাবার্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছার পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। এতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ্ তা'আলার; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই; শুধু তাকে ছাড়া, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩২৪] অতঃপর সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এই সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন।

(১) اَنۡفَالٌ শব্দটি نَفَلٌ এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল সালাত, রোযা, সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশীতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় 'নফল ও আনফাল' গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআনুল কারীমে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- (১) আন্‌ফাল (২) গনীমত এবং (৩) ফায়। اَنۡفَالٌ শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غنيمة (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فيئ এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত ﴿مَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ﴾ ... প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ①

বলুন, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের(১); সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র

أَنْفَالٌ বা গনীমত সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। [কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর فيء বা ফায় বলা হয় সে মালকে যা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর نفل বা أنفال (নফল বা আনফাল) পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের অধিনায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে দিয়ে থাকেন। [কাশশাফ; আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। আবার কখনো 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ মুফাস্সির এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ-অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুতঃ এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হলো সেটাই; যা ইমাম আবু ওবাইদ রাহিমাহুল্লাহ্ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী নফল বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল-সামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলিমদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না। [কিতাবুল আমওয়াল:৪২৬; ইবন কাসীর]

(১) উল্লেখিত আয়াতে আনফালের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্র এবং রাসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন। সেজন্যই আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস, ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং মুজাহিদ ও সুদ্দী রাহিমাহুমাল্লাহ্ প্রমুখ তাফসীরবিদগণের মতে এই হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, যখন গনীমতের মাল-সামান বিলি-বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন নাযিল হয়নি। [ইবন কাসীর] এ আয়াতে গনীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণ বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান এসেছে, তাতে বলা হয়েছে যে, গনীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুলমালে সাধারণ মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে

জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সূরা আল-আনফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন 'নাসেখ-মনসূখ' অর্থাৎ রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। [বাগভী] সূরা আল-আনফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য 'ফায়'-এর মালামাল- যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ "আমার রাসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক"। এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো সে সমস্ত মালামাল- যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত হয়। আর 'ফায়' হলো সে সমস্ত মালামাল- যা কোন রকম জিহাদ এবং লড়াই ছাড়াই হাতে আসে। আর أنفال (আন্‌ফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথীদেরকে পুরস্কার দেয়ার চারটি রীতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে প্রচলিত ছিল। (এক) এ কথা ঘোষণা করে দেয়া যে, যে লোক কোন বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে- যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না। (দুই) বড় কোন সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জিহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া এবং এমন নির্দেশ দেয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লেখিত বিশেষ দলের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ সাধারন মুসলিমদের প্রয়োজনে বায়তুল মালে জমা করতে হবে। (তিন) বায়তুল মালে গনীমতের যে এক-পঞ্চমাংশ জমা করা হয়, তা থেকে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)-কে তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসেবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। (চার) সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতি দেখাশোনা এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে তাদেরকে বিনিময় হিসাবে দান করা। [ইবন কাসীর]

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়ালো এই যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আপনার নিকট লোকেরা 'আনফাল' সম্পর্কে প্রশ্ন করে- আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'আনফাল' সবই হল আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ

তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও।'

২. মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্কে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয়[১] এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে[২]। আর তারা তাদের

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই কার্যকর হবে।

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতে সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মুমিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আয়াতে বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "তাদের সামনে যখন আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে"। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ভালবাসায় ভরপুর, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "(হে নবী!) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদিগকে, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়।" [সূরা হজ:৩৪] আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহ্র যিক্‌র-এর এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে, "জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিক্‌র-এর দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ:২৮]

(২) মুমিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ আয়াত এবং এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, ঈমান যেহেতু মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী দ্বীনী নির্দেশের উপর আমল করা এ তিনটি বস্তুর নাম, সেহেতু এগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে ভালভাবে জানলো, সে ব্যক্তির ঈমান ঐ ব্যক্তির চেয়ে অবশ্যই বেশী যার সে আয়াতের জ্ঞান নেই। সুতরাং ঈমানদারগণ তাদের ঈমানে সমপর্যায়ের নন। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর ঈমান অন্যান্য সাহাবাদের ঈমানের চেয়ে অনেক বেশী। সাহাবাদের ঈমান তাবেয়ীদের ঈমানের চেয়ে অনেক বেশী। অনুরূপভাবে যারা শরী'আতের হুকুম-আহ্‌কামের উপর আমল করে, তাদের ঈমান ঐ লোকদের থেকে বেশী যারা শরী'আতের হুকুম-আহ্‌কাম ঠিকমত পালন করে না।

সুতরাং যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কাম ও তাঁর বিধান অনুযায়ী না চলেও ঈমানের দাবী করে, তারা মূলতঃ ঈমানই বুঝে না। তাদের ঈমান সবচেয়ে নিম্নস্তরের ঈমান।

কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় আর অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। মহান আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ "আর যারা হেদায়াত অবলম্বন করে তিনি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন, তাদেরকে তাকওয়া প্রদান করেন"। [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৭] মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ "মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, এবং যখন তাঁর আয়াত সমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে"।[সূরা আল- আনফালঃ২] অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেনঃ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ "তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বর্ধিত হয়"।[সূরা আল-ফাতহঃ ৪] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে'। [বুখারীঃ ৭৫১০, মুসলিমঃ ১৯৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঈমানের সত্তরের উপর শাখা রয়েছে, তম্মধ্যে সর্বোচ্চ হলোঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক্ক মা'বুদ নেই, সর্বনিম্ন হলোঃ পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা'।[সহীহ মুসলিমঃ ৫৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কারণে ঈমান বাড়ে। আর তাদের অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। এমনকি কারো কারো ঈমানের পর্যায় সরিষা পরিমাণে পৌঁছে যায়। যেমনটি হাদীসে এসেছে। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি লাভ হয় এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, যাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই এক হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। [দেখুন, বুখারীঃ ১৬]

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হলো, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হবে, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ মুসলিমরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শোনে, যাতে থাকে না কুরআনকে বোঝার চেষ্টা, থাকে না কুরআনের আদব

রব-এর উপরই নির্ভর করে[১],

৩. যারা সালাত কায়েম করে[২] এবং আমরা তাদেরকে যা রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে[৩];

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৪. তারাই প্রকৃত মুমিন[৪]। তাদের রব-

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ

ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, আর থাকে না আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরণের তেলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না।

(১) মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলার উপর। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চালানোর পর সাফল্য আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন।

(২) মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা। আয়াতে সালাতের জন্য 'ইকামত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত: ইকামত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা করে দাঁড় করানো। কাজেই সালাত কায়েম করার মর্মার্থ হচ্ছে, যেমন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে ফরয ও নাফল যাবতীয় সালাত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সার্বিক দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, যেমন সালাতে কলব হাযির থাকা; কেননা এটাই সালাতের মূল বিষয়। [সা'দী] কাতাদা বলেন, ইকামাতুস সালাত অর্থ, সুনির্দিষ্ট সময়ে, ওজুসহ, রূকু-সাজদাসহ আদায় করা। [ইবন কাসীর]

(৩) মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্ তাকে যে রিয্ক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করবে। আল্লাহ্র পথে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরী'আত নির্ধারিত যাকাত, নফল দান-খয়রাত, আত্মীয়দেরকে প্রদান, বড়দের কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি দান-সদকাই অন্তর্ভুক্ত। [সা'দী]

(৪) মুমিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, ﴿اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا﴾ অর্থাৎ এমনসব লোকই হলো সত্যিকার মুমিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট অবর্তমান, তারা মুখে কালেমা পড়লেও বললেও তাদের অন্তরে থাকে না তাওহীদের রং, আর থাকে না

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

এর কাছে তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা[১]।

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝

৫. এটা এরূপ, যেমন আপনার রব আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার ঘর থেকে বের করেছিলেন[২] অথচ মুমিনদের এক দল তো তা অপছন্দ করছিল[৩]।

রাসূলের আনুগত্য। কোন এক ব্যক্তি হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে- 'হে আবু সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেন: ভাই, ঈমান দুই প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং জান্নাত-জাহান্নাম, কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আল-আনফালের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপূর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে, তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। [বাগভী; কুরতুবী]

(১) এখানে মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ মর্যাদা, (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিয্‌ক।

(২) আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই 'ঘর' বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদীনা মুনওয়ারাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। [মুয়াসসার] কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে بِالْحَقِّ শব্দ ব্যবহার করে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সত্যের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ মুসলিমদের কোন একটি দল এ জিহাদ কঠিন মনে করেছিল এবং পছন্দ করছিল না। কারণ, সাহাবায়ে কিরাম এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবন আব্বাস, ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমূখের বর্ণনা মতে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার

সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ্ ইবন নওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানতো যে, এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীসাথীদেরকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমাদান মাস। যুদ্ধেরও কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তারা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাদের নিকট এই মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদেও যেতে চায়, শুধু তারাই যাবে। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। বস্তুতঃ যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি তাদের এই অনিচ্ছার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অংশ গ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয়, যার মোকাবেলা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীদেরকে খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বি'রে সুক্ইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন একজন সাহাবীকে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেনঃ তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে সর্বমোট উটের সংখ্যা ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ার হয়েছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তারা ছিলেন আবু লুবাবাহ্ ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন

তারা বলতেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলবো। এ কথার প্রেক্ষিতে রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসতোঃ না তোমরা আমার চাইতে বেশী বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদেরকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে-যোরকায়' পৌঁছে এক ব্যক্তি কুরাইশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করছেন; তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দম্‌দম্ ইবন উমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাযি করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকার্‌রামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দেবে যে, তাদের কাফেলা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীসাথীদের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দম্‌দম্ ইবন উমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কা ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক ও কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোষাকের সামনে-পিছনে ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালের ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকলো, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ চৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারগ ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলিমদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরণের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলিম ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনো হিজরত করতে না পেরে তখনো মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে এবং বনু-হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি সন্দেহ হতো যে, এরা মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন। এভাবে সব মিলিয়ে এ বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ' ঘোড়া, ছ'শ' বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওয়ানা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে

তাদের খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো।

অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমাদান শনিবার মদীনা মুনওয়ারা থেকে রওয়ানা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌঁছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে সাগরের তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলিমদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। [ইবন কাসীর]

বলাবাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উঠে নিবেদন করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহ্র কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী-ইসরাঈলরা দিয়েছিল মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে। তারা বলেছিলঃ ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ অর্থাৎ কাজেই তুমি আর তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব। সে সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব'।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দো'আ করেন। কিন্তু তখনো আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসারগণের যে সহযোগীতার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমরা এই জিহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কি না? এ সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। সা'দ ইবন মো'আয আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে

৬. সত্য[১] স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে। মনে হচ্ছিল তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা যেন তা অবলোকন করছে।

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۝

৭. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু দলের[২] একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক[৩]। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

নিবেদন করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন'? তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ'। তখন সা'দ ইবন মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন, তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করবো। অতএব, আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্র নামে আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান'। এ বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহ্র নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে- একটি হলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। [বাগভী]

(১) এখানে 'হক' বলে যুদ্ধও উদ্দেশ্য হতে পারে। [বাগভী]

(২) অর্থাৎ বানিজ্য কাফেলা কিংবা কুরাইশ সৈন্য। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ বানিজ্য কাফেলা, যার সাথে কেবলমাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন রক্ষী ছিল। [বাগভী]

যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন[১];

৮. এটা এ জন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য ও বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করে না।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

৯. স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রব-এর নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশ্‌তা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।'

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

১০. আর আল্লাহ্ এটা করেছেন শুধু সুসংবাদ স্বরূপ এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. স্মরণ কর[২], যখন তিনি তাঁর পক্ষ

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم

(১) অর্থাৎ যার ফলে বাতিলকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। আর মুমিনদেরকে এমন বিজয় দেখাবেন যার কল্পনাও তাদের অন্তরে আসেনি। [সা'দী]

(২) আয়াতে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইসলামের সর্বপ্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে পানির কূপ সংলগ্ন উঁচু জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। আল্লাহ্ তা'আলা এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে বিবৃত করেছেন।

বদরে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হোবাব ইবন মুন্‌যির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, নাকি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন'? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'না, এটা আল্লাহ্র নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবন মুন্‌যির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিবেদন করলেনঃ 'তাহলে এখান থেকে গিয়ে মক্কীসর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানিপূর্ণ জায়গা দখল করেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন। অবস্থানগ্রহণ স্থল নিশ্চিত হওয়ার পর সা'দ ইবন মো'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিবেদন করেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার জন্য কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ্ যদি আমাদিগকে বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিশবেন, যারা মদীনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তারাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তারাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনার মদীনা থেকে বের হয়ে আসার সময় তারা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায় গিয়ে পৌঁছলে তারা হবেন আপনার সহকর্মী'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দো'আ করলেন। পরে রাসূলের জন্য একটি সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সিদ্দীকে আকবার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের হেফাজতের জন্য তরবারী হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তের জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবেলা নিজেদের চাইতে তিনগুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও তাদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুকাময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলিমদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণারও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের

مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন[১] এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র

উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী কর এবং এখনো আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের সালাতে ব্যাপৃত রয়েছ। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক সবারই ঘুম চলে আসলো। বদর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়োজিত থাকেন। [সীরাত ইবন হিশাম]
ইবন কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়োজিত ছিলেন তখন তার চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেনঃ 'হে আবু বকর! সুসংবাদ শুন; এই যে জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, "এ দল তো (শত্রুপক্ষ) শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখাবে"। [সূরা আল-কামার: ৪৫] কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেনঃ 'এটা আবু জাহলের হত্যার স্থান, এটা অমুকের, সেটা অমুকের'। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে। আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর এক বিশেষ ধরণের তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উদ্ধৃত করেছেন যে, 'যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর সালাতের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের পক্ষ থেকে'। [ইবন কাসীর] ওহুদের যুদ্ধেও মুসলিমগণ এ অভিজ্ঞতাই লাভ করে, যেমন সূরা আলে ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে। উভয় স্থানে মূল কারণ একই ছিল। যে সময়টি কঠিন ভয় ও শংকায় প্রকম্পিত, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের দিলকে এমন চিন্তাশূন্য ও ভয়ভীতি মুক্ত করে দিলেন যে, তাদের তন্দ্রা আসতে লাগল।

(১) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে তন্দ্রা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর সালাতে আসে শয়তানের পক্ষ থেকে"। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

করেন[১], আর তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের হৃদয়সমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫

১২. স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অবিচলিত রাখ'। যারা কুফরী করেছে অচিরেই আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; কাজেই তোমরা আঘাত কর তাদের ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে এবং জোড়ে[২]।

---

(১) এ রাতে মুসলিমগণ দ্বিতীয় যে নেয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এ বৃষ্টিপাতে কয়েকটি ফায়দা হয়। এক, মুসলিমরা যথেষ্ট পরিমাণে পানি লাভ করে এবং তারা সংগে সংগে কূপ বানিয়ে পানি আটকিয়ে রাখে। দুই, এতে গোটা সমরাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুস্কর হয়ে পড়ে। আর যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুস্কর। বৃষ্টি এখানে অল্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেয়া হয়। [ইবন ইসহাক; ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আলোচ্য আয়াতে আরেকটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যা বদরের সমরাঙ্গনে মুসলিমদেরকে দেয়া হয়েছে। তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ফিরিশ্‌তাকে মুসলিমদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদিগকে সাহস যোগাতে। আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের হত্যা কর দলে দলে। এভাবে ফিরিশ্‌তাদেরকে দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমতঃ মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফিরিশ্‌তাগণ কর্তৃক মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করে কিংবা

১৩. এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে। আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৪. এটি শাস্তি, সুতরাং তোমরা এর আস্বাদ গ্রহণ কর। আর নিশ্চয় কাফেরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৫. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফের বাহিনীর সম্মুখীন[১] হবে পরস্পর নিকটবর্তী অবস্থায়, তখন তোমরা তাদের সামনে পিঠ ফিরাবে না;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৬. আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে যোগ দেয়া[২] ছাড়া কেউ

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ

তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। তাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফিরিশ্‌তাগণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফিরিশ্‌তাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। [ইবন কাসীর; সা'দী]

(১) এ আয়াতে زحف শব্দের মর্মার্থ হলো, উভয় বাহিনীর মোকাবেলা ও সংঘর্ষ। দুটি দল পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলিমদের জন্য জায়েয নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এর থেকে ঈমানদারদেরকে নিষেধ করছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশল স্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কাবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হল ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ এর অর্থ। কারণ, تحرف অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া।
দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থা- যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তা হলো যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায়

আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ এর অর্থ তাই। কারণ, تَحَيُّز এর আভিধানিক অর্থ হলো মিলিত হওয়া এবং فِئَة অর্থ হল দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয। [ইবন কাসীর]

এ আয়াত দু'টির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যত বেশীই হোক না কেন, মুসলিমদের জন্য তাদের মোকাবেলার পশ্চাদপসরণ করা হারাম, তবে উল্লেখিত দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ' তের জনকে মোকাবেলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। [ইবন কাসীর] তারপর অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আল-আনফালের ৬৫ ও ৬৬তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশজন মুসলিমকে দু'শ' কাফেরের সাথে এবং একশ' মুসলিমকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬তম আয়াতে তা আরো শিথিল করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলিম যদি একশ' হয় তবে তারা দু'শ' কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে।" এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় মুসলিমদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পলায়ন নয়। [বাগভী; কুরতুবী] অবশ্য যে দু'জনের মোকাবেলা থেকে পালায় সে-ই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে। এখন এই হুকুমই কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরী'আতের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশী হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও কবীরা গোনাহ্। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন- বুখারীঃ ২৭৬৬, মুসলিমঃ ৮৯] তাছাড়া আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদীনা এসে আশ্রয় নেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে

أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑯

তাদেরকে পিঠ দেখালে সে তো আল্লাহ্‌র গজব নিয়েই ফিরল এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান[১]।

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ

১৭. সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন[২]। আর আপনি যখন

অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাকে দান করলেন। বললেনঃ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা পলাতক নও; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি'। [আবু দাউদঃ ২৬৪৭, তিরমিযীঃ ১৭১৬] এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাস্তবতাকেই পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, তাদের পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গন ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(১) অর্থাৎ যারা এই স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকৃষ্ট অবস্থান। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, বদর যুদ্ধের দিনে যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলিমদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করেনঃ 'ইয়া আল্লাহ্! আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন'। তখন জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালাম এসে নিবেদন করেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রুবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন'। তিনি তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একবার শত্রুবাহিনীর ডান অংশের উপর, একবার বাম অংশের উপর এবং একবার সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। সেই এক কিংবা তিন মুঠি কাঁকরকে আল্লাহ্ তাঁর একান্ত কুদরতে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকী ছিল না, যার চোখ অথবা মুখমণ্ডলে এই ধুলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রুবাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। [তাবারী] এভাবে মুসলিমগণ এই মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। আয়াতে মুসলিমদেরকে

بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন[১] এবং এটা মুমিনদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষার (মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করার) জন্য[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

১৮. এটা তোমাদের জন্য, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন[৩] ।

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ

১৯. যদি তোমরা মীমাংসা চেয়ে থাক, তাহলে তা তো তোমাদের কাছে এসেছে; আর যদি তোমরা বিরত হও

হেদায়াত দান করা হয় যে, নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমেরই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল । তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই হত্যা করেছেন ।

(১) অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন । কাঁকর নিক্ষেপের এই কাজটি যদিও আপনার দ্বারা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো কাফেরদের চোখে-মুখে পৌঁছে দেয়ার কাজটি ছিল আল্লাহ্র । [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আমি মুমিনগণকে এই মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে । بلاء এর শব্দগত অর্থ হল পরীক্ষা । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিনা যুদ্ধেই মুসলিমদের বিজয় দানে সক্ষম, কিন্তু তিনি চাচ্ছেন যেন মুসলিমরা যুদ্ধ করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে । [সা'দী] بلاء দ্বারা নেয়ামতও উদ্দেশ্য হতে পারে । তখন অর্থ হবে, আমি তাদেরকে যে নে'আমত দান করেছি তারা যেন সেটার শুকরিয়া করে । [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) অর্থাৎ মুসলিমদেরকে এ বিজয় এ কারণেই দেয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেয়া যায় এবং যাতে কাফেররা এ কথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোন কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না । তাদের কলা-কৌশল তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে । [সা'দী]

عَنۡكُمۡ فِئَتُكُمۡ شَيۡـًٔا وَّلَوۡ كَثُرَتۡ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۟

তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু যদি তোমরা আবার যুদ্ধ করতে আস তবে আমরাও আবার শাস্তি নিয়ে আসব। আর তোমাদের দল সংখ্যায় বেশী হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের সাথে আছেন[১]।

তৃতীয় রুকূ'

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَلَا تَوَلَّوۡا عَنۡهُ وَاَنۡتُمۡ تَسۡمَعُوۡنَ ۟

২০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে

(১) এ আয়াতে পরাজিত কুরাইশ কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলিমদের সাথে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশ বাহিনীর মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় ঘটেছিল। ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফেরদের বাহিনী মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবু জাহ্ল প্রমূখ বায়তুল্লাহ্‌র পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দো'আ করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দো'আর পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দো'আ করেছিলঃ 'ইয়া আল্লাহ্! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে দ্বীন উত্তম তাকেই বিজয় দান কর'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪৩১]
এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলিমদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়াতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দো'আটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দো'আর মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা। কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দো'আর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদো'আ ও মুসলিমদের জন্য নেকদো'আ করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলে দিলেন ﴿وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন মুসলিমদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কিইবা কাজে লাগতে পারে?

নিও না[১];

২১. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, 'শুনলাম'; আসলে তারা শুনে না[২]।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

২২. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম বিচরণশীল জীব হচ্ছে বধির, বোবা, যারা বুঝে না[৩]।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আর আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু আছে জানতেন তবে তিনি তাদেরকে শুনাতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে শুনালেও তারা উপেক্ষা

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

---

(১) মুসলিমগণ (তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও) শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এ সাহায্য আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর"। এবং তাতে স্থির থাক। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ, অসীয়ত, নসীহত সবই শুনতে পাচ্ছ। সুতরাং কুরআন ও সত্যবাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না। বিমুখ হলে বর্তমান অবস্থা থেকে তোমাদেরকে নিকৃষ্ট অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মুখে এ কথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শোনেনি। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলিমদেরকে এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে। কারণ, ঈমান দাবীর নাম নয়, ঈমান হচ্ছে যা অন্তরে প্রবেশ করে এবং যা সত্য হওয়ার উপর বান্দার আমল প্রমাণ বহন করে। [সা'দী]

(৩) الدَّوَابِّ শব্দটি دابة এর বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবকেই دابة বলা হয়। [কাশশাফ] কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دابة বলা হয় শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুক। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হক জানা ও সে পথে চলার জন্য চোখ ও কান দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেটা না করে সেগুলোকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে। [সা'দী]

করে মুখ ফিরিয়ে নিত[১]।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন[২]। আর নিশ্চয়

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদের বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে। তাদের এ বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দ্বীনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয়ে কোন লক্ষ্যই করেনি। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাকেই ঈমান থেকে বঞ্চিত করেন যার মধ্যে কোন কল্যাণ অবশিষ্ট নেই, যে পবিত্র হতে চায় না, যার কোন ভাল কথা কোন ফল দেয় না। আর এতে রয়েছে বিরাট হিকমত ও রহস্য। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।
(এক) একটি অর্থ হতে পারে যে, যখনই কোন সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেল; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনীমত জ্ঞান কর। কারণ, যে কোন সময় মানুষের রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনীমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, এ কথা কারোরই জানা নেই যে, কাল কি হবে। পরবর্তীতে ভাল কাজ করতে চাইলে সক্ষম নাও হতে পার। [সা'দী]
(দুই) এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোন বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তার অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারো ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সে কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দো'আ

তাঁরই দিকে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

২৫. আর তোমরা ফেৎনা থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম শুধু তাদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর[১]।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

করতেন يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوب ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ 'হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন'। [তিরমিযীঃ ২১৪১] [ইবন কাসীর]

(তিন) ইবনে অব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,এর অর্থ আল্লাহ্ কাফেরের ঈমান ও মুমিনের কুফরীর মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। [মুসানদে আহমাদ ৩/১১২] [ইবন কাসীর]

(চার) কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতটি যেহেতু বদর যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু তার অর্থ হবে- জেনে রাখ, আল্লাহ্ তাঁর নেক বান্দাদের ভাগ্যকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করেন। আর কাফেরদের প্রশান্ত অন্তরে অশান্তি ও ভয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। আবার তিনি ইচ্ছে করলে মুসলিমদের নিরাপদ অবস্থাকে ভীত অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) এ আয়াতে কিছু পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, পাপের আযাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে। সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে মুফাস্সিরীন ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে ফেতনা বলতে সে সব সামাজিক সামগ্রিক ফেতনা বুঝানো হয়েছে, যা এক সংক্রামক ব্যাধির মত জন-সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে কেবল গোনাহ্গার লোকরাই নিপতিত হয় না, সে লোকেরাও এতে পড়ে মার খায়, যারা গোনাহ্গার সমাজে বসবাস করাকে বরদাশত করে থাকে। [ইবন কাসীর] মুতাররিফ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদিল্লাহ! আপনারা কী জন্য এসেছেন? আপনারা এক খলীফা (উসমান) কে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। তারপর তার রক্তের দাবী নিয়ে এসেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর বললেন, আমরা ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾... এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমানের সময় পড়েছিলাম, কিন্তু আমরা মনে করেনি যে, আমরাই এর দ্বারা উদ্দিষ্ট। শেষ পর্যন্ত তা আমাদের মধ্যেই যেভাবে ঘটার ঘটে গেল। [মুসনাদে আহমাদ: ১/১৬৫] [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ 'আম্র বিল্ মা'রূফ' তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী 'আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা

২৬. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, যমীনে তোমরা দুর্বল হিসেবে গণ্য হতে। তোমরা আশংকা

وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَـَٔاوٰىكُمْ

পরিহার করাই হল এই পাপ। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ্ স্বীয় আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন'। [তাবারী] তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোন গোনাহ্গার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে নিরপরাধ বলতে সেসব লোককেই বোঝানো হচ্ছে যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আমর বিল্ মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যখন কোন জাতির এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখে বাধা দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ্র আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে'। [আবু দাউদঃ ৩৭৭৬, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৯৯৯] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন। [আবু দাউদঃ ৩৭৭৫, তিরমিযীঃ ২০৯৪] নু'মান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা আল্লাহ্র কানুনের সীমালংঘনকারী গোনাহ্গার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এবং নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা বলে বসে যে, যদি আমরা জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু করি, তবে আমরা আমাদের উপরের লোকদের কষ্ট দেয়া থেকে অব্যাহতি পাব। এখন যদি নিচের লোকদেরকে এ কাজ করতে দেয়া হয় এবং বাধা না দেয়া হয়, তবে বলাবাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে। আর তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না'। [সহীহ্ আল-বুখারীঃ ২৪৯৩]

এসব বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক মুফাস্সির মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فتنة (ফিত্নাহ্) বলতে 'এই পাপ' অর্থাৎ 'সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান' বর্জনকেই বোঝানো হয়েছে।

وَاَيَّدَكُمۡ بِنَصۡرِهٖ وَرَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۲۶﴾

করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হঠাৎ এসে ধরে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, নিজের সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জিনিষগুলো জীবিকারূপে দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَخُوۡنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ وَتَخُوۡنُوۡۤا اَمٰنٰتِكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭. হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের খেয়ানত করো না[১] এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও[২] খেয়ানত করো না[৩];

وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَاَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ ﴿۲۸﴾

২৮. আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার[৪]।

---

(১) আল্লাহ্‌র আমানত বলতে অধিকাংশের মতে যাবতীয় ফরয কাজ বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলের আমানত বলতে তার সুন্নাত ও নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। সে হিসাবে খেয়ানত হলো সেগুলো না মানা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) নিজেদের আমানত বলতে সে সব দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে, যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পূরনের দায়িত্ব হতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোন সংস্থার আভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি বিশ্বাস করে জন-সমাজ যদি তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন- নিসার ৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

(৩) আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে, প্রথম অর্থ যা উপরে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতসমূহেরও খেয়ানত করো না। [তাবারী; ইবন কাসীর] দ্বিতীয় অর্থ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না কারণ এতে করে তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত আমানতেরই খেয়ানত করে বসবে। [তাবারী; বাগভী]

(৪) যেহেতু আল্লাহ্ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফেলতী ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে

চতুর্থ রুকূ'

২৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান[১] তথা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "আর জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফেৎনা।" [সা'দী] 'ফেৎনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফেৎনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিনটি অর্থেই ফেৎনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুতঃ এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে।

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করবে-যাকে কুরআন ও শরী'আতের পরিভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয়-তাহলে সে এর বিনিময়ে কয়েকটি প্রতিদান লাভ করবে। (এক) ফুরকান, (দুই) পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও (তিন) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ। (চার) জান্নাত। [সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

فرقان ও فرق দু'টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فرقان (ফুরকান) এমনসব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। [কুরতুবী] সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে ফুরকান বলা হয়। কারণ তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যকেও ফুরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারাও সত্যপন্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কুরআনুল কারীমে বদরের যুদ্ধকে 'ইয়াওমুল-ফুরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ আয়াতে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফুরকান' দান করা হবে- কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাজত করেন। কোন শত্রু তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন এবং যে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পান। [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এ আয়াতে ফুরকান বলতে সেসব আলো বা জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। [আইসারুত তাফাসীর; সা'দী] অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভাল-মন্দ পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমি ইমাম মালেককে প্রশ্ন করেছি এখানে ফুরকান অর্থ

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন[১] এবং আল্লাহ্ মহাকল্যাণের অধিকারী[২]।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার জন্য, বা হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য। আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে) ষড়যন্ত্র করেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ

কি? তিনি বললেন, এখানে ফুরকান অর্থ, উত্তরণের পথ। তারপর তিনি দলীল হিসেবে সূরা আত-তালাকের এই আয়াত পাঠ করলেন, "আর যে কেউ আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন"। [সূরা আত-তালাক: ২] কারও কারও মতে, এখানে 'ফুরকান' দ্বারা আখেরাতে মুমিনদেরকে জান্নাত এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামে দেয়া বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) দ্বিতীয়তঃ তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হলো পাপের মোচন। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, দুনিয়াতে সেগুলোর কাফ্ফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফিক তার হয়, যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রাধান্য লাভ করে। তাকওয়ার বিনিময়ে তৃতীয় যে জিনিষটি লাভ হয়, তা হচ্ছে, আখেরাতে মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ। পাপের মোচন এবং মাগফিরাত দুটি সমার্থবোধক শব্দ হলেও একত্রে ব্যবহার হলে দুটির অর্থ ভিন্ন হয়। তখন পাপ মোচন দ্বারা ছোট গোনাহের ক্ষমা, আর মাগফিরাত দ্বারা বড় গোনাহের ক্ষমা উদ্দেশ্য হয়। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। তিনি বিরাট অনুগ্রহ ও ইহ্সানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোন পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও ইহ্সানের অনুমান করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে আরো বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য। তবে শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার উপর স্থান দিতে হবে। [সা'দী] কেউ কেউ এটাকে জান্নাত দ্বারা তাফসীর করেছেন। [আইসারুত তাফাসীর]

কৌশলী[১] ।

---

(১) হিজরত-পূর্বকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফের পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং তারা তাকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিস্মাৎ করে দেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেন। ঘটনা এই যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলিম হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তার ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন, তখন এদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এরা যেকোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারাম সংলগ্ন 'দারুন্-নাদ্ওয়া'তে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। যাতে আবু জাহ্ল, নযর ইবন হারেস, উমাইয়া ইবন খাল্ফ, আবু সুফিয়ান প্রমূখসহ সমগ্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। [এর জন্য দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৪৮]

পরামর্শ অনুযায়ী কাফেররা সন্ধ্যা থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং তিনি তা সবার দিকে লক্ষ্য করে ছিটিয়ে দিয়ে তাদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসেন। [সা'দী] কুরাইশ সর্দারদের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবক'টিই কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে "সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবচাইতে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে চাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার সাথে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩১. আর যখন তাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা তো শুনলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও এর মত করে বলতে পারি, এগুলো তো শুধু পুরোনো দিনের লোকদের উপকথা[১]।'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. আর স্মরণ করুন, যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদের উপর কোন মর্মন্তুদ শাস্তি নিয়ে আসুন[২]।'

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾

(১) এটা ছিল কাফের কুরাইশদের মুখের কথা। তারা কুরআনের বিপরীতে কিছুই আনতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এটা বলে তারা নিজেদেরকে ধোঁকায় ফেলছিল এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। [ইবন কাসীর] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আয়াতখানা নদর ইবন হারেসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। [তাবারী; বগভী] সে জাহেলী যুগে ইরানের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ ও ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিভিন্ন কাহিনী আয়ত্ব করেছিল। রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআনে কোন জাতি সম্পর্কে বলতেন তখন সে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন আজেবাজে কাহিনী রচনা করত এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বলতঃ আমার গল্প মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছে তার থেকে উত্তম। [বাগভী] বদরের যুদ্ধে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মিথ্যাচার, অপবাদ, ঠাট্টা বিদ্রূপের শাস্তি স্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কাফেরগণ প্রায়ই এ কুরআনকে গল্প বলে প্রচার করতে চেষ্টা করত এবং এর বিপরীত কিছু নিয়ে আসার দাবী করত কিন্তু তারা তা আনতে পারত না। [ইবন কাসীর] সুরা আল- ফুরকানের ৫ ও ৬ নং আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত হঠকারিতাপূর্ণ কথা উল্লেখ করে তার জবাব দিয়েছেন।

(২) আবু জাহ্ল এ বলে দো'আ করত যে, 'হে আল্লাহ্! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আযাব নাযিল করে দিন'। তখন এ আয়াত নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে আপনার অবস্থান করা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না আর আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [বুখারীঃ ৪৬৪৮]

৩৩. আর আল্লাহ্ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন[১]।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর তাদের কী ওজর আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না?[২]

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ

(১) এখানে কারা ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ তারা উক্ত কথা বলার পরে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তারা কাবা ঘরের তাওয়াফ করার সময় বলত, 'গোফরানাকা, গোফরানাক'। [আইসারুত তাফাসীর] অথবা, তাদের মাঝে ঐ সমস্ত লোকদেরকে এ আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা ঈমান আনবে বলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইলমে গায়েবে নির্ধারিত করেছেন। [ইবন কাসীর] অপরপক্ষে, কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে ঐ সমস্ত ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মক্কায় অসহায় অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন; হিজরত করতে সমর্থ হননি। তারা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলেন। [ইবন কাসীর] এ আয়াতটি উদ্দেশ্য করে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে দু'টি নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। যার একটি চলে গেছে। (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু।) কিন্তু আরেকটি রয়ে গেছে। (অর্থাৎ ইস্তেগফার) [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১/৫৪২] অনুরূপ বর্ণনা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও রয়েছে। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ইবলিস তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললঃ আপনার সম্মান ও ইজ্জতের শপথ করে বলছি, যতক্ষণ বনী আদমের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকব। ফলে আল্লাহ্ বললেনঃ আমি আমার সম্মান-প্রতিপত্তির শপথ করে বলছিঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব যতক্ষণ তারা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/২৯, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/২৬১]

(২) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তাদের মধ্যে থাকতে তাদেরকে আমি কিভাবে শাস্তি দেব? আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকবেন না, যখন আপনাকে বের করে আনব তখনই কেবল তাদের উপর শাস্তি আসতে পারে। কারণ, নবী-রাসূলরা যে জনপদে থাকবেন সেখানে আমি শাস্তি নাযিল করি না। তাছাড়া তারা তাদের গোনাহও কুফরী থেকে যদি তাওবাহ করে তবুও আমি তাদের উপর শাস্তি নাযিল করব না। কিন্তু তারা তো ক্ষমা প্রার্থনা করছে না বরং তাদের গোনাহর

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে? অথচ তারা সে মসজিদের অভিভাবক নয়, এর অভিভাবক তো কেবল মুত্তাকীগণই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর কা'বাঘরের কাছে শুধু শিস ও হাততালি দেয়াই তাদের সালাত, কাজেই তোমরা শাস্তি ভোগ কর, কারণ তোমরা কুফরী করতে[১]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অচিরেই তারা তা ব্যয় করবে; তারপর সেটা তাদের আফসোসের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে[২]। আর যারা

উপর স্থির রয়েছে সুতরাং তাদেরকে আমি কেন শাস্তি দেব না? তদুপরি তাদের শাস্তির আরও একটি কারণ অবধারিত হয়ে গেছে, তা হচ্ছে তারা মাসজিদুল হারাম থেকে মানুষদেরকে বাঁধা দেয়, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের কেউ নয়। [তাবারী] আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, আখেরাতে তাদের আযাব তো অবশ্যম্ভাবী। [তাবারী]

(১) আযাব বলতে এখানে দুনিয়ার আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের মাধ্যমে তাদের উপর নাযিল হয়। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(২) এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা মতে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আমীর আবু সুফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাজতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান-মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলিমদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ

কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।

৩৭. যাতে আল্লাহ্ অপবিত্রদেরকে পবিত্রদের থেকে আলাদা করেন[১]। তিনি

لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ

করতে পারি। তারা এ দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এই আয়াতে এই ঘটনার পূর্বেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেন। বলা হয়, যারা কাফের তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র দ্বীন থেকে মানুষকে বাধা দান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুতঃ ওহুদের যুদ্ধে ঠিক তাই ঘটেছে; সঞ্চিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে। [ইবন কাসীর]

তাফসীরকার দাহহাক এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। [ইবন কাসীর] কারণ, বদর যুদ্ধে এক হাজার জওয়ানের বাহিনী মুসলিমদের মোকাবেলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বার জন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। বলাবাহুল্য, এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খানা-পিনা প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল। হাফেয ইবন কাসীর ও ইমাম তাবারীর মতে, ঘটনাটি উহুদ বা বদরের সাথে সম্পৃক্ত হলেও এর ভাষা ব্যাপক। এর দ্বারা কাফেরদের যাবতীয় ব্যয়ই উদ্দেশ্য। তাদের ব্যয়ের কোন ভবিষ্যত নেই। তারা শুধু আফসোসই করবে। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে আর অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পবিত্র বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। طيب ও خبيث দু'টি বিপরীতার্থক শব্দ। এখানে خبيث ও طيب বলতে কি বোঝানো হয়েছে তাতে দু'টি মত রয়েছে।

(এক) অধিকাংশ মুফাস্সির خبيث ও طيب এর সাধারণ অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং পবিত্র বলতে মুমিন এবং অপবিত্র বলতে কাফের বুঝিয়েছেন। [তাবারী] এ অর্থে উল্লেখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা

الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

অপবিত্রদের একটাকে আরেকটার উপর রাখবেন এবং সেগুলোকে একসাথে স্তূপ করবেন, তারপর তা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

পঞ্চম রুকূ'

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, 'যদি তারা বিরত হয় তবে যা আগে হয়ে গেছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন; কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের রীতি তো গত হয়েছেই[১]।

পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মুমিন জান্নাতে আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

(দুই) خبيث শব্দটি অপবিত্র, পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর طيب তার বিপরীত পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তুকে বোঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু'টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফেরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলিমদের পবিত্র সম্পদ ও অর্থ বোঝা যেতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফেররা যে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে তার অশুভ পরিণতিতে মালও গেছে এবং জানও গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তা ব্যয়কারীরা বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গনীমতের মালামাল অর্জনেও সমর্থ হয়েছেন। এ অর্থে জাহান্নামে জমা করার অর্থ, এ সম্পদের দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৩৫]

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা জাহেলিয়াতে (অর্থাৎ কাফের অবস্থায়) যা করেছি, তার জন্য কি জবাবদিহি করতে হবে'? তিনি বললেনঃ 'যদি কেউ ইসলামে সুন্দরভাবে আমল করে তবে জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে না। আর যদি খারাপ আমল করে তবে পূর্বাপর সবকিছুর জন্যই ধরা হবে'। [বুখারীঃ ৬৯২১]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়[১] তারপর যদি তারা বিরত

---

(১) এ আয়াতে বর্ণিত ফেৎনা ও দ্বীন শব্দ দু'টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবহার অনুযায়ী আয়াতে শব্দ দু'টির একাধিক অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

এক. ফেৎনা অর্থ কুফর ও শির্ক আর দ্বীন অর্থ ইসলাম। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত হয়ে যায়। [তাবারী; ইবন কাসীর] এক্ষেত্রে এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হবে কিয়ামত পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না দুনিয়া থেকে শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত না হবে বা শির্কের প্রভাব কমে না যাবে।

দুই. যা আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, 'ফেৎনা' হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, পক্ষান্তরে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ প্রভাব ও বিজয়। মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলিমদের উপর এ ফেৎনা অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তারপরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে যে, মুসলিমগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন, মুসলিম আপন দ্বীন পালন করতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয় [ইবন কাসীর]

তিন. আয়াতের তৃতীয় আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এখানে জিহাদ করার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের নেতিবাচক দিক হচ্ছে ফেৎনা না থাকা আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হবে। কেবলমাত্র এ সর্বাত্মক উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করাই মুসলিমদের জন্য জায়েয বরং ফরয। তা ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করা মোটেই জায়েয নহে। তাতে অংশগ্রহণও ঈমানদার লোকদের শোভা পায় না। এ মতের সমর্থন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে পাই, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কি? আমাদের কেউ কেউ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে, আবার কেউ নিজস্ব অহমিকা (চাই তা গোত্রীয় বা জাতিগত যাই হোক তা) ঠিক রাখার জন্য যুদ্ধ করে। তখন রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর প্রতি মাথা উঠিয়ে বললেনঃ 'যে আল্লাহ্‌র কালেমা

হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।

৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৪১. আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র[১], রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের[২]

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۙ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

(তাওহীদ/দ্বীন/কুরআন)কে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল'। [বুখারীঃ ১২৩] কোন কোন মুফাসসির এখানে উপরোক্ত তিনটি অর্থই গ্রহণ করেছেন। [মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে গনীমতের বিধান ও তার বন্টননীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিধানে গনীমত বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শত্রুর নিকট থেকে লাভ করা হয়। শরী'আতের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলিমদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় 'গনীমত'। [ফাতহুল কাদীর] আর যা কিছু আপোষ, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকে বলা হয় 'ফাই'। [ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ 'গনীমত' ও 'ফাই') এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে এবং এ আয়াতে শুধুমাত্র গনীমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলিমদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে। 'ফাই'-এর আলোচনা সূরা হাশর-এ আসবে।

(২) এখানে জিহাদের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণীমতের হকদারদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সমস্ত সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। এর চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর বাকী এক পঞ্চমাংশ পাঁচভাগে ভাগ করা হবে। প্রথমভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এ অংশ মুসলিমদের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষনে ব্যয় হবে। দ্বিতীয়ভাগ রাসূলের স্বজনদের জন্য নির্ধারিত। তারা হলেন ঐ সমস্ত লোক যাদের উপর সদকা খাওয়া হারাম। অর্থাৎ বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব। কারণ তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব রাসূলের ছিল। তিনি তাঁর নবুওয়াতের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় তাদের জন্য এ গণীমতের মাল থেকে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তৃতীয়ভাগ ইয়াতিমদের জন্য সুনির্দিষ্ট। চতুর্থভাগ ফকীর ও মিসকিনদের জন্য, আর পঞ্চম ভাগ

الۡتَقَى الۡجَمۡعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۴۱﴾

যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্তে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম[১], যে দিন দু দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

اِذۡ اَنۡتُمۡ بِالۡعُدۡوَةِ الدُّنۡیَا وَهُمۡ بِالۡعُدۡوَةِ الۡقُصۡوٰی وَالرَّكۡبُ اَسۡفَلَ مِنۡكُمۡ ؕ وَلَوۡ تَوَاعَدۡتُّمۡ لَاخۡتَلَفۡتُمۡ فِی الۡمِیۡعٰدِ ۙ وَلٰكِنۡ لِّیَقۡضِیَ اللّٰهُ اَمۡرًا كَانَ مَفۡعُوۡلًا ۬ۙ لِّیَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۡۢ بَیِّنَةٍ وَّیَحۡیٰی مَنۡ حَیَّ عَنۡۢ بَیِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۴۲﴾

৪২. স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর আরোহী দল[২] ছিল তোমাদের থেকে নিম্নভূমিতে। আর যদি তোমরা পরস্পর যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পূর্বসিদ্ধান্তে থাকতে তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমরা মতভেদ করতে। কিন্তু যা ঘটার ছিল, আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করলেন, যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে

মুসাফিরদের জন্য। [ইবন কাসীর] ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, পুরো এক পঞ্চমাংশই বর্তমানে ইমামের কর্তৃত্বে থাকবে। তিনি মুসলিমদের অবস্থা অনুযায়ী কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবেন। [ইবন কাসীর] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, গণীমতের মাল যদিও পূর্বে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বলা হয়েছে তবুও তা মূলতঃ মুসলিমদের মধ্যেই পুনরায় বন্টন হয়ে গেছে। রাসূল তার জন্য তার জীবদ্দশায় যা কিছু পেতেন তাও বর্তমানে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

(১) অর্থাৎ সে সাহায্য ও সহায়তা, যার বদৌলতে তোমরা জয়লাভ করেছ। [মুয়াসসার] এখানে মীমাংসার দিন বলে বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ দিন তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, ঈমানের কালেমাকে কুফরীর কালেমার উপর বিজয়ী করেছেন এবং তাঁর দ্বীন, তাঁর নবী ও অনুসারীদেরকে উপরে উঠিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(২) আরোহী দল বলে এখানে মক্কার কুরাইশ কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। যাদের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান, যারা ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিল [ইবন কাসীর]

জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে(১); আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

৪৩. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় কম(২); যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় বেশী তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

৪৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে

---

(১) বিনা ঘোষণায় কাফের ও ঈমানদারদেরকে বদরের এ যুদ্ধে নিয়ে আসার পিছনে কি রহস্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাই ব্যক্ত করছেন। আর তা হলো, যাতে তোমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দেই, হকের ঝান্ডা বাতিলের উপর বুলন্দ করে দেখাই, ফলে কোনটা হক এবং কোনটা বাতিল তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম ও তার অনুসারীদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং কুফর-শির্ক ও তাদের অনুসারীরা অসম্মানিত হয়। [ইবন কাসীর] যাতে অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, মুসলিমরা হকের উপর আছে ফলে তাদের বিজয় এসেছে, আর কাফেররা বাতিলের উপর আছে ফলে তাদের বিপর্যয় ঘটেছে। সুতরাং যারা জীবিত আছে তারা দলীল প্রমাণসহ হক বেছে নিতে পারে। আর তাদের মধ্যে যে বাতিল বেছে নেয় সে তার স্বইচ্ছায় হক স্পষ্ট হওয়ার পরও বাতিলকে গ্রহণ করে নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনলো। মূলতঃ বদরের যুদ্ধের পর অধিকাংশ মানুষের কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আজও মানুষ বদর যুদ্ধের বিজয়কে হক ও বাতিল চেনার ক্ষেত্রে এক বিরাট নিদর্শন বলে বিশ্বাস করে।

(২) মুফাসসির মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছিল। আর তাই তিনি সাহাবাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। [তাবারী]

مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন[১] এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যাতে আল্লাহ্ সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা ঘটারই ছিল। আর আল্লাহ্র দিকেই সব বিষয় প্রত্যাবর্তন করা হয়।

ষষ্ঠ রুকূ'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৪৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাক[২] এবং আল্লাহ্কে বেশী পরিমাণ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও[৩]।

---

(১) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, বদরের দিন কাফেরদেরকে আমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখানো হয়েছিল। এমনকি আমার পাশের লোককে বলছিলাম যে, তুমি তাদের সংখ্যা সত্তর দেখতে পাও? সে বললঃ আমি একশত দেখতে পাচ্ছি। আব্দুল্লাহ বলেনঃ শেষে আমরা তাদের একজনকে বন্দী করে জিজ্ঞাসা করলে সে তাদের সংখ্যা এক হাজার বলে জানায়। [তাবারী]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক যুদ্ধে তিনি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা বলেনঃ এক যুদ্ধে রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য্য পশ্চিমাকাশে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ হে মানুষগণ! তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আকাংখায় থেকো না। আল্লাহর কাছে এর থেকে বিমুক্তি চাও। তারপরও যদি সাক্ষাত হয়ে যায় তখন ধৈর্যের সাথে টিকে থাক এবং মনে রেখ যে, তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত। [বুখারীঃ ২৯৬৫, ২৯৬৬]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য এক বিশেষ হেদায়াত দান করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ্র যিক্র। আল্লাহ্র যিক্র-এ নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে, তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং দৃঢ়পদ থাকা ও আল্লাহ্র যিক্র এ দু'টি বিজয়ের প্রধান কারণ। [সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

৪৬. আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর[১] এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না[২], করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে[৩]। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর[৪]; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন[৫]।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

(১) এ আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কুরআনী হেদায়াতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হল দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ্র যিক্র ও আনুগত্য।

(২) অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। এটি চতুর্থ হিদায়াত। [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) এখানে আরও একটি হিদায়াত দেয়া হয়েছে। যাতে দূর্বল ও শক্তিহীন হওয়ার কারণ বলে দেয়া হয়েছে, যাতে তা থেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া যায়। বলা হয়েছে, তোমরা যদি বিবাদে লিপ্ত হও তবে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে। [আইসারুত তাফাসীর] এখানে আনুগত্য না করার ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি পঞ্চম হিদায়াত।

(৪) বলা হয়েছে, 'আর ধৈর্য ধারণ কর।' এটি ষষ্ঠ হিদায়াত। [আইসারুত তাফাসীর] এটা যেমন বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা, তেমনি নিজেদের লোভ-লালসা ও আবেগ উচ্ছাসের ধারা সংযত রাখার উপায়। তাড়াহুড়া, ঘাবড়িয়ে যাওয়া, কাতর হয়ে পড়া, লোভ ও অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা পরিহার কর। বিপদ ও কঠিন অবস্থা সম্মুখে আসলেও যেন পদস্খলন না ঘটে, সে বিষয়ে সচেতন থাকবে। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মত মানসিকতা রাখতে হবে। মনকে এ ব্যাপারে তৈরী করে নিতে হবে।

(৫) এখানে সবর অবলম্বনের এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছেন যে, ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (যারা সবর তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এটি এমন এক মহা সম্পদ যে, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য। যারা এ সমস্ত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে পারবে আল্লাহর সহায়তা ও সাহায্য কেবল তারাই লাভ করবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্র কারো সাথে থাকার অর্থ এ নয় যে, তার সাথে লেগে থাকবে। বরং এর অর্থ দু'টি: এক. সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা সাথে থাকা। দুই. জ্ঞানের মাধ্যমে সাথে থাকা। কারণ, সবকিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানে রয়েছে। কোন কিছুই আল্লাহ্র কাছে গোপন নেই। [সিফাতিল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ] এখানে সবরকারীদের সাথে থাকার অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতায় তাদের সাথে থাকা। [সা'দী]

৪৭. আর তোমরা তাদের মত হবে না যারা গর্বের সাথে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ ঘর থেকে বের হয়েছিল[১] এবং তারা লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর তারা যা করে, আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের কার্যাবলীকে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয় অর্জনকারী নেই, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পাশে অবস্থানকারী।' অতঃপর দু দল যখন পরস্পর দৃশ্যমান হল তখন সে পিছনে সরে পড়ল এবং বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত, নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি,' আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর[২]।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

(১) অর্থাৎ ইখলাসের সাথে যুদ্ধ করবে, আর একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই অভিযানে বের হতে হবে। এটি সপ্তম হিদায়াত। [আইসারুত তাফাসীর] সুতরাং মুমিন কখনো কাফের, মুশরিক ও পাপাচারীদের মত হবে না। যেমনটি করেছিল আবু জাহল ও তার কাফের বাহিনী। কারণ তারা অত্যন্ত জাঁক-জমক ও শান-শওকত, গান বাদ্য, নারী দাসী সহ বের হয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশংকা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ-বকর গোত্রও আমাদের শত্রু; আমরা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে! সুতরাং কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ী থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশংকা তাদের পায়ের বেড়ী হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সোরাকাহ্ ইবন মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে

উপস্থিত হল যে, তার হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সুরাকাহ্ ইবন মালিক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কুরাইশদের মনে তারই আক্রমণের আশংকা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বলল, আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। আর বনূ-বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশংকা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি। আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। [তাবারী] মক্কার কুরাইশরা সুরাকাহ্ ইবন মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তাদের মন বসে গেল এবং বনূ-বকর গোত্রের আক্রমণাশংকা মুক্ত হয়ে মুসলিমদের মোকাবেলায় উদ্বুদ্ধ হল। এ দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলিম উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত হল, তখন শয়তান পিছন ফিরে পালিয়ে গেল। বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তায় একটি শয়তানী বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মোকাবেলায় জিবরাঈল ও মিকাঈল 'আলাইহিমাস্ সালাম-এর নেতৃত্বে ফিরিশ্তাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবন জরীর আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সুরাকাহ্ ইবন মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে জিবরাঈল-আমীন এবং তার সাথী ফিরিশ্তা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরাইশী যুবক হারেস ইবন হিশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেস তিরস্কার করে বললঃ এ কি করছ? তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেসকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেস তাকে সোরাকাহ্ মনে করে বললঃ হে আরব সর্দার সোরাকাহ্! তুমি তো বলেছিলে আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ! তখন শয়তান সুরাকাহর বেশেই উত্তর দিল, আমি কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ, আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ ফিরিশ্তা বাহিনী। আর আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। [তাবারী]

শয়তান যখন ফিরিশ্তা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি' সম্পর্কে তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম কাতাদাহ্ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যে বলেছিল। [ইবন কাসীর] ইবন ইসহাক বলেন, আর যখন সে বলেছিল যে, 'আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না।' এ কথাটি সত্যি বলেছে। [ইবন কাসীর]

সপ্তম রুকূ‘

৪৯. স্মরণ কর, যখন মুনাফেক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলছিল, ‘এদের দ্বীন এদের বিভ্রান্ত করেছে।’ বস্তুতঃ কেউ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়[১]।

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫০. আর আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন ফিরিশ্‌তাগণ যারা কুফরী করেছে তাদের প্রাণ হরণ করছিল, তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করছিল[২]। আর বলছিল ‘তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর[৩]।’

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

---

(১) বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলিমরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তাদেরকে তাদের দ্বীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড় করিয়েছে, এটাকেই মুনাফিকরা ধোঁকা বলছে। কারণ, তারা ঈমানদারগণকে সংখ্যায় কম দেখে মনে করেছিল যে, তারা নিশ্চিত মারা পড়বে [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের উত্তরে বলেছেন ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে, জেনে রাখ, সে কখনো অপমানিত ও অপদস্ত হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা সবকিছুর উপর পরাক্রমশালী। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। তিনি প্রজ্ঞাময়, হিকমতওয়ালা। তিনি জানেন কে সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত, আর কে অপমানিত হওয়ার উপযুক্ত। সে অনুসারে তিনি সম্মানিত বা অপমানিত করে থাকেন [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, ‘যখন আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর; আপনি যদি সে সময় তাদের অবস্থা দেখতেন’ এতটুকু বলা হয়েছে। এখানে ‘যদি’ শব্দের উত্তর বর্ণিত হয়নি, মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে উত্তর উহ্য রয়েছে, যার মূল কথা হচ্ছে, ‘তখন আপনি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন’। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে ‘যারা কুফরী করেছে’ বলে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে; এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছেঃ
কোন কোন মুফাসসির এ বিবরণকে সে সমস্ত কুরাইশ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত

৫১. এটা তো সে কারণে, যা তোমাদের হাত আগে পাঠিয়েছিল, আর আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন[১]।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলিমদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফিরিশ্তা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যেসব কাফের সর্দার নিহত হয়, তাদের মৃত্যুতে ফিরিশ্তাদের হাত ছিল। তারা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পিছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদেরকে হত্যা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন। [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে এখানে ঐ সমস্ত কাফেররাই উদ্দেশ্য যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে মারা যায়নি। সে হিসেবে এসমস্ত কাফেরদের মৃত্যুকালে কি হাল-অবস্থা হবে তা পূর্ব থেকেই জানিয়ে দিয়ে একদিকে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা, অপরদিকে কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে, 'যারা' শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোন কাফের মারা যায়, তখন মৃত্যুর ফিরিশ্তা রূহ্ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কিন্তু যেহেতু এই আযাবের সম্পর্ক জড় জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আযাব সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না। এ ব্যাপারে কুরআনের অন্যান্য আয়াত যেমন, সূরা আল-আন'আম: ৯৩; সূরা মুহাম্মাদ:২৭ এবং বারা ইবন আযিব বর্ণিত বিখ্যাত কবরের আযাবের হাদীসটি প্রমাণবহ। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে এ আযাব তোমাদের নিজেদের হাতেরই অর্জিত। সাধারণ কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। [জালালাইন] মর্মার্থ হল এই যে, এসব আযাব দুনিয়ার জীবনে তোমাদের নিজেদের খারাপ আমলেরই ফলাফল। সেটার শাস্তিই তোমাদের দেয়া হচ্ছে। [ইবন কাসীর] আর এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর যুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করা আমার উপর নিষিদ্ধ করে নিয়েছি। আর তা তোমাদের উপরও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! এগুলো তো তোমাদের আমল যা আমি তোমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব করে

৫২. ফির'আউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে; ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর[১]।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫৩. এটা এজন্যে যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

রাখি। যদি তোমাদের কেউ ভাল দেখতে পায়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি এর ব্যতিক্রম দেখতে পায়, তবে যেন সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তিরস্কার না করে। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি। [ইবন কাসীর; সা'দী]

(২) এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেন, তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়"। সুতরাং যে জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নেয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তিত করে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়। এ আয়াতটির ভাষ্য অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছে করেন তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।" [সূরা আর-রা'দ: ১১]
অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে সৎ ও ভাল অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেয়া কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নেয়ামত প্রাপ্তির পর তার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া। [সা'দী]

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. ফির'আউনের বংশধর ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত এরা এদের রব-এর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে তাদের পাপের জন্য আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফির'আউনের বংশধরকে নিমজ্জিত করেছি। আর তারা সকলেই ছিল যালেম।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে তারাই তো আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট, যারা কুফরী করেছে। সুতরাং তারা ঈমান আনবে না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. যাদের থেকে আপনি অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারপর তারা প্রত্যেকবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে[১]। আর তারা তাকওয়া অবলম্বন করে না[২]।

---

(১) অর্থাৎ যারা কুফরী, বেঈমানী ও খিয়ানত এ তিনটি বদঅভ্যাসের সমাহার নিজেদের মধ্যে ঘটিয়েছে, তারা কোন অঙ্গীকারের মূল্য দিবে না, কোন কথা রাখবে না। তারা হচ্ছে বিচরণশীল প্রাণীদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী। তারা গাধা ও কুকুর ইত্যাদির চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। তাদের মধ্যে কল্যাণের আশা করা বৃথা। সুতরাং তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করাই শ্রেয়। যাতে করে তাদের রোগ অন্যদের মধ্যে প্রসারিত না হয়। [সা'দী] এ আয়াতটি মদীনার ইয়াহূদী বনূ-কুরাইযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [তাবারী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে এক চুক্তি করেছিলেন। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবন কাসীর এর 'আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্' গ্রন্থে এবং সীরাত ইবন হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইয়াহূদীগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্য কিংবা গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু তারা এ চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি।

(২) অর্থাৎ চুক্তি ভংগের ব্যাপারে সামান্যতম তাকওয়াও দেখায় না। চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি হয়ে থাকে সে ব্যাপারে তারা মোটেই সাবধান হয় না। চুক্তি ভঙ্গ হয় এমন কোন কিছু করতে তারা মোটেই পিছপা হয় না। [ফাতহুল কাদীর]

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. অতঃপর যুদ্ধে তাদেরকে যদি আপনি আপনার আয়ত্তে পান, তবে তাদের (শাস্তিদানের) মাধ্যমে তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিন, যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে[১]।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন, তবে আপনি তাদের চুক্তি তাদের প্রতি সরাসরি নিক্ষেপ করুন[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি ভংগকারীদেরকে পছন্দ করেন না[৩]।

---

(১) আয়াতের অর্থ, "আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদের এমন কঠোর শাস্তি দিন যা অন্যদের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়"। এর মর্ম হল এই যে, তাদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিক ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলিমদের মোকাবেলা করার সাহস করবে না। [তাবারী] হয়তবা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে অথবা অঙ্গিকার ভঙ্গ করা ত্যাগ করবে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তাদেরকে তাদের চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করুন। তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের সাথে কৃত চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হয়েছে। তারা যেন আপনাকে কোন দোষারোপ করতে না পারে যে, আমরা আপনার সাথে কৃত চুক্তি শেষ হওয়ার ব্যাপারে অবহিত ছিলাম না। [জালালাইন, সা'দী]

(৩) আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেয়া হয়েছে। যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লজ্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং যদি কোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন। নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং রোমবাসীদের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলিতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিজেদের সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন মু'আবিয়ার সৈন্যদল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা

অষ্টম রুকূ‘

৫৯. আর কাফেররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে; নিশ্চয় তারা (আল্লাহ্‌কে) অপারগ করতে পারবে না[১]।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝

৬০. আর তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن

গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চঃস্বরে বললেনঃ ‘আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কোন জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোন সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোন গিট খোলা বা বাঁধাও উচিত নয়’। মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে বিষয়টি জানানো হল। দেখা গেল, কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী আমর ইবন আবাসাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। [আবু দাউদঃ ২৭৫৯, তিরমিযীঃ ১৫৮০, মুসনাদে আহ্‌মাদঃ ৪/১১১,১১৩] মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তৎক্ষনাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। [জালালাইন] তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না, তিনি যখনই তাদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা’ও সরতে পারবে না। হয়তবা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত। তিনি তাদেরকে ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। সময়মত তিনি ঠিকই তাদের পাকড়াও করবেন। তিনি যে তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়ে অবকাশ দিয়ে থাকেন এতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অনেক প্রজ্ঞা। যেমন, মুমিন বান্দাদের পরীক্ষা নেয়া, যাতে তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অন্বেষণে ব্যপ্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে তারা এর মাধ্যমে এমন গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হবে যা অন্য কোনভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আর সেটি হচ্ছে জিহাদের পথ। যার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে এসেছে। [সা‘দী]

زِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

বাহিনী[১], তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্

(১) এতে সমর যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপর বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেট-এর যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এসব কিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল। [দেখুন, সা'দী]

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট 'ইবাদাত ও মহাপূণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেনঃ জেনে রাখ, শক্তি হল, তীরন্দাযী। শক্তি হলো তিরন্দাযী। [সহীহ মুসলিমঃ ১৯১৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ 'তোমরা তিরন্দাযী কর এবং ঘোড়সওয়ার হও, তবে তীরন্দাযী করা ঘোড়সওয়ারী হওয়ার চেয়ে উত্তম। [আবু দাউদঃ২৫১৩, তিরমিযীঃ ১৬৩৭]

এখানে তৈরী রাখার অর্থ, যুদ্ধের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও এক স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সব সময়ই মওজুদ ও প্রস্তুত করে রাখা। যেন যথা সময়ে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বিপদ মাথার উপর ঘনীভূত হয়ে আসার পর ঘাবড়িয়ে গিয়ে ও তাড়াহুড়া করে স্বেচ্ছাসেবী, অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করার চেষ্টা অর্থহীন। কেননা যতদিনে এ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে ততদিনে শত্রুপক্ষ তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলবে।

প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখ এবং হাতের মাধ্যমে জিহাদ কর'। [আবু দাউদঃ ২৫০৪, নাসায়ীঃ ৩০৯৮] এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহেদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

তাদেরকে জানেন[১]। আর আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[২]।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

৬১. আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন[৩] এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন[৪];

---

(১) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলিমরা জানে। সেসব লোকদের সাথে মুসলিমদের মোকাবেলা চলছে। এছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনো মুসলিমরা জানে না। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিক, যারা এখনো মুসলিমদের মোকাবেলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোন কোন মুফাসসির এটাকে বনু কুরাইযা বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, পারস্যবাসী। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর] তবে এখানে সুনির্দিষ্ট করে না বলে কিয়ামত পর্যন্ত যত শত্রুই মুসলিমদের মুকাবিলা করবে তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে।

(২) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়। সে জন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র রাহে মাল বা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা-প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই গনীমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান। সেটি সাতশত গুণ ও আরও বেশী পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। [সা'দী]

(৩) এ আয়াতে সন্ধির হুকুম বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি কাফেররা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নিরাপত্তা সবসময়ই কাঙ্খিত বিষয়। সুতরাং যদি তারা সন্ধিতে আগ্রহী হয়, তবে আপনার উচিত তাদের সাথে সন্ধি করা। তাছাড়া এর মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তি সঞ্চিত থাকবে, পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে। অনুরূপভাবে সন্ধির অন্য সুবিধা হচ্ছে, মানুষ যখন নিরাপদ হবে, ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন ইসলামের পাল্লা ভারী হবে, কারণ, যার বিবেক আছে সে বিবেক খরচ করলেই বুঝতে পারবে যে, ইসলামই সত্য। [সা'দী]

(৪) অর্থাৎ যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পেলে আপনি তাদের সাথে সন্ধি করবেন। তাতে যদি এমন কোন সম্ভাবনা থাকে যে, তারা মুসলিমদেরকে ধোঁকা

নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬২. আর যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায় তবে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি আপনাকে নিজের সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন[১],

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩. আর তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি[২] স্থাপন করেছেন।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ

দিবে বা শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সে সম্ভাবনার বিপরীতে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন। কারণ, তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ফল তাদের উপরই এসে যাবে। [সা'দী]

(১) এ আয়াতে সন্ধির বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহ্র সাহায্য-সমর্থনেই আপনার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে বদরে আপনার সহায়তা করেছেন। আবার বাহ্যিকভাবে মুমিনদেরকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন [আইসারুত তাফাসীর] সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

(২) এখানে সে ভ্রাতৃত্বভাব ও বন্ধুত্বের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার আরববাসীদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি করে তাদেরকে এক মজবুত বাহিনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ এ বাহিনীর লোকেরা শতাব্দী কাল ধরে শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষভাবে আওস ও খজরাজ গোত্রদ্বয়ের ব্যাপারে আল্লাহর এ রহমত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট। তারা পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য গত একশত বিশ বছর লিপ্ত ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর এরূপ কঠিন শত্রুতাকে মাত্র দু-তিন বছরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও অপূর্ব অকৃত্রিম ভালবাসায় পরিণত করা এবং পরস্পর ঘৃণিত ব্যক্তিদের জুড়িয়ে এক অক্ষয় দূর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করা নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্রই কৃপায় সম্ভব হয়েছিল। নিছক বৈষয়িক সামগ্রী দ্বারা এ রূপ বিরাট কীর্তি সম্পাদন ছিল সত্যই অসম্ভব। [আইসারুত তাফাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

যমীনের যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

নবম রুকূ‘

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ

৬৫. হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে

ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে যখন মক্কার নওমুসলিমদেরকে অধিক হারে গণীমতের মাল দিলেন অথচ আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না, তখন আনসারদের মনে কিছুটা কষ্ট অনুভব হতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ ‘হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি? তারপর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। আর তোমরা ছিলে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত, আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তোমরা ছিলে দরিদ্র, আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে সম্পদশালী করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের ডাকে সাড়া দিতে কেন কুণ্ঠাবোধ করছ?’ তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ছাগল আর উট নিয়ে যাবে অপরদিকে তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে?’ [বুখারীঃ ৪৩৩০]

(১) এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ্ তা‘আলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলার না-ফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত। কুরআনুল হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে “আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [আলে ইমরানঃ ১০৩] এই আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে অর্থাৎ কুরআন তথা ইসলামী শরী‘আতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। ঝগড়া-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরী‘আত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়।

يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝

বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন এবং তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, কাজেই তোমাদের মধ্যে এক'শ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন[১]।

(১) আয়াতে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে ﴿وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরী'আতের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতার এ প্রতিশ্রুতি। আর এটাই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে থাকার সাথে কোন কিছুর তুলনা চলে না। কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক বলেছেন, সবরকারীগণ দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহ্‌র সাথে থাকার গৌরব অর্জন করেছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি তাদের হিফাযত করবেন, তত্ত্বাবধান করবেন, সংরক্ষণ করবেন। অন্যত্র তিনি সবরকারীদেরকে তিনটি বস্তুর ওয়াদা করেছেন, যার প্রতিটি দুনিয়া ও তাতে যা আছে তা থেকে উত্তম। তিনি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে স্মরণ, রহমত এবং হিদায়াতপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, "এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৭] [ইবনুল কাইয়্যেম, 'উদ্দাতুস সাবেরীন:৯২]

৬৭. কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে[১] তার | مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ

(১) আয়াতটি বদরের যুদ্ধে বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তাফসীর করার ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের প্রথম জিহাদ। তখনো জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের কোন বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নাযিল হয়নি। যেমন, জিহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু-সৈন্য নিজেদের আয়ত্বে এসে গেলে তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের সাথে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৩৩৫, মুসলিমঃ ৫২১] গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টির ব্যাপারে বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ বদর যুদ্ধে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণকে ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনো আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তড়িৎ পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা নাযিল হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দু'টি অধিকার মুসলিমগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দু'টি দিকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দু'টি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়ত এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলিম হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলিমগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও কিছুটা সহায়ক হতে পারে। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র উমর ইবনুল খাত্তাব ও সা'দ ইবন মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা প্রমূখ কয়েকজন সাহাবী এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন।

فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

নিকট যুদ্ধবন্দী থাকবে, যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন[১]। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ[২] এবং আল্লাহ্ চান আখেরাত; আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا

৬৮. আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে[৩]

তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলিমদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দু'টি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। [দেখুন, সীরাতে ইবন হিশাম; বাগভী; কুরতুবী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

(১) এ আয়াতে ﴿حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। إثخان এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারো শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। [তাবারী; কাশশাফ; ফাতহুল কাদীর] এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধুলিস্মাৎ করে দেন। যাতে বেশীরভাগ স্থানেই মুসলিমদের বিজয় সূচিত হয়। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে রাসূলের কোন দোষ নেই। তোমরাই আমার রাসূলকে এ পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদের বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলিমদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়। যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল- অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলিম হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) এখানে পূর্ব বিধান বলতে বুঝানো হয়েছে যে, পূর্ব থেকে এ উম্মাতের জন্য গণীমতের মাল ও ফিদিয়া গ্রহণ করা হালাল হওয়ার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও

أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

তোমরা যা গ্রহণ করেছ সে জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত ।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

৬৯. সুতরাং তোমরা যে গনীমত লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

দশম রুকূ'

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বলুন, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১] ।'

ফয়সালা অর্থাৎ 'কাদ্বা' ও 'কাদর' হিসাবে লিখা না হত তবে তোমাদের উপর আযাব আসত । এ ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করার কারণ হিসাবে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত ও ফয়সালাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন । [সা'দী; ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে 'কিতাব' বলে বুঝানো হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্‌র কাছে বদরে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমার ব্যাপারটি আগে নির্ধারিত না থাকত, তবে অবশ্যই তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত হত । অথবা যদি এটা পূর্বেই লিখিত না থাকত যে, আপনি তাদের মাঝে থাকাকালীন আমি তাদেরকে শাস্তি দেব না, তবে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি পেয়ে বসত । অথবা যদি না জানা অপরাধের কারণে পাকড়াও করবে না এটা লিখা না থাকত, তবে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি আসত । অথবা যদি আমি এ উম্মতের কবীরা গোনাহ তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা করব এটা লিখা না থাকত তবে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি আসত । [ফাতহুল কাদীর]

(১) বদর যুদ্ধের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় । ইসলাম ও মুসলিমদের সে শত্রু যা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনোই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে

দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসেবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ। এটা আল্লাহ্‌র একান্ত দয়া ও মেহেরবাণী যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে তাদের যে কষ্ট হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, যদি আল্লাহ্ তোমাদের মন-মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خير অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদেরকে এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজেদের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলিম হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করা ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেছেন যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। কারণ, তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তার বৈশিষ্ট ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে বিশ ওকিয়া (স্বর্ণমূদ্রা) সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি তো মুসলিম ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ্ আপনাকে এর প্রতিফল দিবেন। আমরা তো শুধু প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের উপর হুকুম দেব। সুতরাং আপনি আপনার নিজের এবং দুই ভাতিজা 'আকীল ইবন আবী তালেব ও নওফেল ইবন হারেসের মুক্তিপণও পরিশোধ করবেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবেদন করলেন, আমার এত টাকা কোত্থেকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময়ে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফয্‌লের নিকট রেখে এসেছেন? আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাত্রের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

৭১. আর তারা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে, তারা তো আগে আল্লাহ্‌র সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; অতঃপর তিনি তাদের উপর (আপনাকে) শক্তিশালী করেছেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে[১], তারা পরস্পর পরস্পরের

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে ব্যাপারে আমার রব আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। তখন আব্বাস বললেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল, সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য করা হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলিমদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। তারপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের ও দুই ভাতিজার ফিদইয়া দিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [সীরাতে ইবন হিশাম; ইবন কাসীর] আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ-বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দিরহামের কম নয়। [দেখুন, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ৩/৩২৪] তদুপরি হজের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এর তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। তাদের একশ্রেণী হচ্ছে, মুহাজির। যারা তাদের ঘর ও সম্পদ ছেড়ে বের হয়ে এসেছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে, তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে। আর এ পথে তাদের যাবতীয় জান ও মাল ব্যয় করেছে। মুমিনদের অপর শ্রেণী হচ্ছে, আনসার। যারা তখনকার মদীনাবাসী মুসলিম, তাদের মুহাজির ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের ঘরে, তাদের প্রতি সমব্যথী হয়ে সম্পদ বন্টন করে দিয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য যুদ্ধ

حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই(১); আর যদি তারা দ্বীন সম্বন্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য(২), তবে যে

করেছে। এ দু'শ্রেণী একে অপরের বেশী হকদার। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের দু'জন ছিল ভাই। একে অপরের ওয়ারিশ হতো। শেষ পর্যন্ত যখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়, তখন এ বিধানটি রহিত হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুহাজির ও আনসারগণ একে অপরের 'ওলী'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৬৩] এখানে কুরআনুল কারীম 'ওলী ও 'বেলায়াত' শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হাসান, কাতাদাহ্ ও মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে 'বেলায়াত' অর্থ উত্তরাধিকার এবং 'ওলী' অর্থ উত্তরাধিকারী। এ তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলিম মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলিমদের সাথে, আর না থাকবে সে সমস্ত মুসলিমদের সাথে যারা হিজরত করেনি। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তা নিয়েছেন। সে হিসেবে এ বিধান রহিত করার প্রয়োজন পড়ে না। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এরা মুসলিমদের তৃতীয় গোষ্ঠী। [ইবন কাসীর] যারা ঈমান আনার পরে হিজরত করেনি। তাদের মীরাসের অধিকারী তোমরা নও। তারা এ আয়াত অনুসারে আমল করত, সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণেও ঈমান ও হিজরতে সাথী হওয়ার পরও 'যবিল আরহাম' রক্ত সম্পর্কীয় গোষ্ঠী ওয়ারিস হত না। তারপর যখন তাদের মীরাসের আয়াত (সূরা আল-আনফালের ৭৫ এবং আল-আহযাবের ৬) নাযিল হয় তখন এটা রহিত হয়ে যায় এবং যবিল আরহাম বা রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের জন্য মীরাস নির্ধারিত হয়ে যায় [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলিম। যদি তারা নিজেদের দ্বীনের হেফাজতের জন্য মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা মুসলিমদের উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। [তাবারী] কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট

সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়[১]। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৭৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক[২], যদি তোমরা তা না কর তবে যমীনে ফিত্না ও মহাবিপর্যয় দেখা

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলিমের সাহায্য করা জায়েয নয়। [ইবন কাসীর]

(১) হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল-কোন রকমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলিমের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যে কারও জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তার সাহায্যের ব্যাপারে অপারগতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন। [দেখুন, বুখারী: ২৭০০; মুসনাদে আহমাদ ৪/৩২৩]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দুই মিল্লাতের লোকেরা পরস্পর ওয়ারিস হবে না। কোন মুসলিম কোন কাফেরকে ওয়ারিস করবে না। অনুরূপভাবে কোন কাফেরও মুসলিমকে ওয়ারিস করবে না।' তারপর তিনি আলোচ্য এ আয়াত পাঠ করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম:২/২৪০; অনুরূপ: মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৫২; মুসলিম: ১৭৩১; বুখারী: ৬৭৬৪] সুতরাং কাফেররা পরস্পর ওয়ারিস হবে। কারণ, তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা وَلِيٌّ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনি অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও।

দেবে[১] ।

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে[২] ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে[৩] তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্যের জন্য বেশী হকদার । নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

(১) অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে । এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহ্‌কামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । যেমন মুহাজিরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে- যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত । আর কাফেরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে । এটা না করে যদি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা কর তবে দুনিয়াতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে । [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তাদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত । যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, "ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয় ।" [মুসলিমঃ ১২১]

(৩) এ আয়াতে মুহাজিরদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন । এর ফলে তাদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদেরই অনুরূপ । তারা সবাই পরস্পরের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী হবেন । সুতরাং প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিররাও তোমাদেরই পর্যায়ভুক্ত । সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরদের মতই । [বাগভী; সা'দী]

সন্ধন্ধে সম্যক অবগত[১]।

---

(১) এটি সূরা আন্‌ফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। [ইবন কাসীর] তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনুল কারীম সূরা আন্-নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, “যাবিল ফুরূযে”র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির ‘আসাবাগণ’ অর্থাৎ পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেয়া হবে। [বুখারীঃ ৬৭৩২] অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর ‘আসাবা’-এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে। আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য ‘যওয়িল আরহাম’ শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে হয়েছে। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ‘উলুল আরহাম’ আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যওয়িল ফরূয, আসাবা এবং যওয়িল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত [ইবন কাসীর]।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যাংশটি দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মূলতঃ এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া হয়েছিল। সে সাময়িক প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা‘আলা মীরাসের ব্যাপারে তাঁর স্থায়ী বিধান নাযিল করেন যা সুরা আন-নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

৯- সূরা আত-তাওবাহ্

سُورَةُ التَّوْبَةِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সূরা নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা। বারা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সূরা বারা'আত সবশেষে অবতীর্ণ সূরা। [বুখারীঃ ৪৬৫৪, মুসলিমঃ ১৬১৮]

আয়াত সংখ্যাঃ ১২৯।

সূরার নামকরণঃ

তাফসীরে এ সূরার ১৩ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তম্মধ্যে বিখ্যাত হলোঃ সূরা আত-তাওবাহ্, সূরা আল- বারাআহ্ বা বারাআত। বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর 'তাওবাহ্' বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলিমদের তাওবাহ্ কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও এ সূরার আরও কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়, যেমন- সূরা আল-ফাদিহা বা গোপন বিষয় প্রকাশ করে লজ্জা দিয়ে মাথা হেটকারী। [বুখারীঃ ৪৮৮২, মুসলিমঃ ৩০৩১, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৩২৭৪] এ সূরার আরেক নামঃ সূরা আল-আযাব। এ ছাড়াও এ সূরার অন্যান্য নামের মধ্যে রয়েছে, 'আল মুকাশকেশাহ' 'আল বুহুস' 'আল-মুনাক্কেরাহ' 'আল-হাফেরাহ' 'আল-মুসীরাহ' 'আল মুবা'সিরাহ' 'আল মুদামদিমাহ' 'আল মুখযিয়াহ' 'আল মুনাক্কিলাহ' 'আল মুশাররিদাহ'। পরবর্তী নামগুলোর অধিকাংশই মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনাকারী। [আসমাউ সুওয়ারিল কুরআন]

সূরাটির প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া না পড়ার হুকুমঃ

সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কুরআন মজীদে এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখা হয় না, অথচ অন্যান্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়। কুরআন সংগ্রাহক উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু স্বীয় শাসনামলে যখন কুরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন অন্যান্য সূরার মত করে সূরা তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লিখা হয়নি। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে আপনারা আল-আনফালকে মাসানী বা শতের চেয়েও ছোট হওয়া সত্বেও সূরা বারাআত এর সাথে রাখলেন, অথচ বারাআত হচ্ছে, শত আয়াত সম্পন্ন সূরা? আবার এ দু'সূরার মাঝখানে কেনইবা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লাইনটি লিখলেন না? তারপরও সেটাকে লম্বা সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত কেন করলেন? তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কুরআনে মজীদ বিভিন্ন সময় ধরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন আয়াত নাযিল হত, তখনই যারা ওহী লিখত তাদের কাউকে ডেকে বলতেন, এটাকে ঐ সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিবে যাতে অমুক অমুক বিষয় লিখা আছে। সুতরাং যখনই কোন সূরা নাযিল হত, তখনই তিনি তাদেরকে বলতেন, এটাকে অমুক অমুক বিষয় যে সূরায় আলোচনা আছে তোমরা সেখানে স্থান দাও। আর সূরা আল-আনফাল ছিল মদীনায় নাযিল হওয়া প্রাথমিক সূরাগুলোর অন্যতম। পক্ষান্তরে

'বারাআত' ছিল কুরআনের শেষে নাযিল হওয়া সূরা। কিন্তু এ দু'টির ঘটনা একই ধরনের। তাই আমি মনে করেছি যে, এটা পূর্বের সূরারই অংশ। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়। অথচ তিনি আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেননি যে, এটি পূর্বের সূরার অংশ। এজন্যই আমি এ দু'টিকে একসাথে লিখেছি এবং এ দু'য়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিনি। তারপর সেটাকে প্রাথমিক সাতটি লম্বা সূরার মধ্যে স্থান দিলাম। [তিরমিযী: ৩০৮৬; মুসনাদে আহমাদ ১/৫৭; আবু দাউদ: ৭৮৬; নাসায়ী ফিল কুবরা: ৮০০৭; মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৩০]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা কর্তৃক আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে অপর একটি বর্ণনায় সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহ্‌তে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তাওবায় কাফেরদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। [কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

১. এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে, সে সব মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে[১]।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①

২. অতঃপর তোমরা যমীনে চারমাস সময় পরিভ্রমণ কর[২] এবং জেনে

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবম হিজরীতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজের আমীর করে পাঠানোর পরে এ আয়াতসমূহ নিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন। তিনি কুরবানীর দিন এগুলোকে মানুষের মধ্যে ঘোষণা করলেন। এর সাথে আরও ঘোষণা ছিল যে, এরপর আর কোন লোক উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করবে না। কোন মুশরিক হজ করবে না। মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। এভাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটা বলতেন, যখন অপারগ হতেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন। [ইবন কাসীর]

(২) এ চারমাস সময় কাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত থাকলেও সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, এ চারমাস সময় ঐ সমস্ত কাফেরদেরকে দেয়া হয়েছে যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন মেয়াদী চুক্তি ছিল না অথবা যাদের সাথে চারমাসের কম চুক্তি ছিল। কিন্তু যাদের সাথে মেয়াদী চুক্তি ছিল আর তারা সে চুক্তি বিরোধী কোন কাজ করে নি, তাদেরকে তাদের সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করতে দেয়া হয়েছিল। সে অনুসারে এ মেয়াদপূর্তির পর তাদের সাথে আর কোন নতুন চুক্তি করা হয়নি। [সা'দী]

مُعْجِزِي اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ۝

রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অপদস্থকারী[১]।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৩. আর মহান হজের দিনে[২] আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয় মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, তোমরা যদি তাওবাহ্ কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারবে না এবং কাফেরদেরকে

---

(১) এখানে বলা হচ্ছে যে, যদিও তাদেরকে চারমাসের সময় দেয়া হয়েছে, তাতে তাদেরকে শুধু আল্লাহ্‌র দ্বীন বোঝা ও জানার জন্য সে সময়টুকু দেয়া হচ্ছে। যদি তারা এ সময়টুকু সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারে এবং ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তারা যেন ভাল করেই জেনে নেয় যে, যমীনের কোথাও পালিয়ে থাকলেও আল্লাহ্‌র হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই। [সা'দী]

(২) এখানে মহান হজের দিনে বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, উমর, আবদুল্লাহ ইবন ওমর এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ সাহাবা বলেনঃ এর অর্থ আরাফাতের দিন। [ইবন কাসীর] কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন "হজ হল আরাফাতের দিন"। [তিরমিযী: ৮৮৯] পক্ষান্তরে আলী, আবদুল্লাহ ইবন আবি আওফা, মুগীরা ইবন শু'বাহ, ইবন আব্বাসসহ সাহাবায়ে কিরামের এক বড় দল এবং অনেক মুফাসসির বলেন, এর অর্থ কোরবানীর দিন বা দশই যিলহজ। [ইবন কাসীর] এর সপক্ষে বেশ কিছু সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর দিন প্রশ্ন করেছিলেন, "এটা কোন দিন? লোকেরা চুপ ছিল এমনকি মনে করেছিল যে, তিনি হয়ত: অন্য কোন নামে এটাকে নাম দিবেন, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা কি বড় হজের দিন নয়?"। [বুখারী: ৪৪০৬; মুসলিম: ১৬৭৯] ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহিমাহুল্লাহ্ এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বলেন, হজের দিনগুলো হজ্জে আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কোরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। [ইবন কাসীর]

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ④

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি(১), তোমরা তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন(২)।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস(৩) অতিবাহিত

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মুশরিকরা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয। [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে। যেমন, "যতক্ষন তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে" [সূরা আত-তাওবাহ:৭] অন্য আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে কটুক্তি করে, তবে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি নেই; যেন তারা নিবৃত্ত হয়।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১২] তবে এর বিপরীত কাউকে হত্যা করা জায়েয নেই। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ কোন অঙ্গীকারবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ এর গন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।" [বুখারী: ৬৯১৪]

(২) কাতাদা বলেন, এরা হচ্ছে কুরাইশ মুশরিক, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন। ঐ বছর কুরবানীর দিনের পর তাদের সুনির্দিষ্ট মেয়াদের তখনও চারমাস বাকী ছিল। তাই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এ সময়টুকু পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি ছিল না তাদেরকে অবকাশ দিলেন মুহাররাম মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত। আর যাদের সাথে চুক্তি ছিল সে চুক্তি শেষ হওয়ার পর আর কোন চুক্তি করা হবে না ঘোষণা দিলেন, সুতরাং তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' সাক্ষ্য দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের কাছ থেকে অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। [তাবারী]

(৩) এখানে "আশহুরে হুরুম" বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। ১) বিখ্যাত চারটি মাস যা হারাম হওয়া শরী'আতের স্বীকৃত সে চারটি মাস বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ ও মুহাররাম। ২) এখানে মূলতঃ পূর্ববর্তী

حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা কর[১], তাদেরকে পাকড়াও কর[২], অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাক; কিন্তু যদি তারা তাওবাহ্ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়[৩] তবে

আয়াতে অবকাশ দেয়া চার মাসকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে যে চারমাসের অবকাশ দেয়া হয়েছে তা যখনি শেষ হয়ে যাবে তখনি তাদের সাথে আর কোন চুক্তি করা হবে না। তাদের হয় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে নয় তো মক্কা ছেড়ে যেতে হবে। এর জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হলে তা ও করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা চার তরবারী নিয়ে পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে। যার প্রমাণ আলোচ্য আয়াত। দ্বিতীয়টি আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে। তার প্রমাণ সূরা আত-তাওবার ২৯ নং আয়াত। তৃতীয়টি মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। যা সূরা আত- তাওবার ৭৩ ও সূরা আত-তাহরীমের ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থটি বিদ্রোহী, সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে। যার আলোচনা সূরা আল-হুজুরাত এর ৯ নং আয়াতে এসেছে। [ইবন কাসীর]

(২) চাই তা হত্যার মাধ্যমে হোক বা বন্দী করার মাধ্যমে হোক, যে প্রকারেই হোক তাদের পাকড়াও করবে। তবে বন্দীকেই أَخِيذ বলা হয়। তাই এর অর্থ হচ্ছে, তাদের বন্দী কর। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর আরও বলেন, এ আয়াতে যেখানে পাও পাকড়াও করার সাধারণ কথা বলা হলেও তা অন্য আয়াত দ্বারা বিশেষিত। অন্য আয়াতে হারাম এলাকায় হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৯১]

(৩) ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত কায়েম করবে আর যাকাত প্রদান করবে। অতঃপর যদি তারা তা করে, তবে তাদের জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ হবে, কিন্তু যদি ইসলামের অধিকার আদায় করতে হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব নেয়ার ভার তো আল্লাহ্র উপর।" [বুখারী: ২৫; মুসলিম: ২২]

তাদের পথ ছেড়ে দাও[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

৬. আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন; যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ⑥

(১) আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াত দ্বারা যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। [দেখুন, বুখারীঃ২৫; মুসলিমঃ ২২] কেননা এখানে কুফরী ও শির্কী থেকে মুক্তির আলামত হিসাবে সালাত আদায়ের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] বর্তমানেও যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তাদের ব্যাপারে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। [সা'দী] কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ যাদেরকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন তাদেরকে ছেড়ে দাও। মানুষ তো তিন ধরনের। এক. মুসলিম, যার উপর যাকাত ফরয। দুই. মুশরিক, তার উপর জিযইয়া ধার্য। তিন. কাফের যোদ্ধা যে মুসলিমদের সাথে ব্যবসা করতে চায়, তার উপর কর ধার্য। [তাবারী]

(২) সুতরাং তিনি যারা তাওবাহ করবে তাদের শির্কসহ যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করবেন। তাদেরকে তাওফীক দেয়ার মাধ্যমে দয়া করবেন। তারপর তাদের থেকে তা কবুল করবেন। [সা'দী] সূরা তাওবাহ্‌র প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কাবিজয়ের পর মক্কা ও তার আশ-পাশের সকল কাফের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি উল্লেখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলিমদের আদেশ দেয়া হয়। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন মেয়াদী চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, তড়িৎ মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে, অথবা এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলিম হতে পারে। আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হল, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। অধিকাংশ আলেম এ সর্বশেষ আয়াতকে 'আয়াতুস সাইফ' বা তরবারীর আয়াত আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ হলো, এর মাধ্যমে যাবতীয় চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন হয় ইসলাম না হয় তরবারীই তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

পায়[১], তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন[২]; কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে[৩] তোমরা পারস্পারিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

(১) আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলিমদের কর্তব্য। অনুরূপভাবে কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্যে যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থান যেখান থেকে সে এসেছে সেখানে পৌঁছে দেয়াও মুসলিমের দায়িত্ব। [তাবারী] এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, তিনি স্বয়ং এ বাণীর প্রবক্তা। সুতরাং কুরআন সৃষ্ট নয়, যেমনটি কোনও কোনও বিদআতপন্থীরা মনে করে থাকে।

(২) এ সহনশীলতা প্রদর্শনের কারণ হলো, কাফের মুশরিকদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম শুনে এবং মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেয়া। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও রাসূলের প্রতি সাহাবাদের ভালবাসা দেখার পরে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল যা তাদের ঈমান গ্রহণে সহযোগিতা করেছিল। [ইবন কাসীর]
তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, তারা মূর্খতা বা অজ্ঞতা বশত: বিরোধিতায় লিপ্ত। আল্লাহ্‌র কালাম শোনার পর তাদের মধ্যে ভাবান্তর হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ হুদায়বিয়ার দিন যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল এখানে তাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এখানে মাসজিদুল হারাম বলে পুরো হারাম এলাকা বুঝানো হয়েছে। কুরআনের সুরা আল-ফাত্‌হ এর ২৫ নং আয়াতেও মাসজিদুল হারাম বলে মক্কার পুরো হারাম এলাকা বুঝানো হয়েছে। আর হুদায়বিয়ার একাংশ হারাম এলাকার ভিতরে, যা সবচেয়ে নিকটতম হারাম এলাকা।

থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

৮. কেমন করে চুক্তি বলবৎ থাকবে? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না; তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক ।

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝

(১) কুরআন মজীদ মুসলিমদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্যসংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকী সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণতঃ এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যা গুরু অপরাধী দলের ভাগ্যই বরণ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভংগ করেনি এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভংগ করোনা; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ এদের কষ্ট দেবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি অন্যত্র পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন, "কোন জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে"। [সূরা আল- মায়েদাহ্: ৮] অনুরূপভাবে আলোচ্য সূরা আত-তাওবাহ এর ৮ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী"। অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্র চিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তারা কারা এটা নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন, তারা হচ্ছে, কিনানা এর বনী বকরের কোন কোন গোষ্ঠী। যারা তাদের অঙ্গীকারে অটল ছিল। কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তাদের কোন ভুমিকা ছিল না। কারণ নবম হিজরীতে যে সময় এ ঘোষণা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রদান করেছিলেন, তখন মক্কাতে কুরাইশ বা খুযা'আতে কোন কাফের অবশিষ্ট ছিল না, আর কুরাইশ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝেও আর কোন চুক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং বুঝা গেল যে, তারা ছিল কিনানার বনী বকরের কিছু লোক। [তাবারী]

৯. তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে ফলে তারা লোকদেরকে তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে; নিশ্চয় তারা যা করেছে তা অতি নিকৃষ্ট!

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩

১০. তারা কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, আর তারাই সীমালংঘনকারী[১]।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠

১১. অতএব তারা যদি তাওবাহ্ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে দ্বীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই[২]; আর আমরা আয়াতসমূহ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝١١

(১) এ আয়াতে তাদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলিমদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে তা নয় বরং তারা যে কোন মুসলিমের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে। সুতরাং যে কারণে তারা তোমাদের বিরোধিতা করছে তা হচ্ছে, ঈমান। সেটাই তাদের কাছে কঠোর হয়েছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দ্বীনের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ কর। তোমাদের দ্বীনের শত্রুদেরকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। [সা'দী]

(২) মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের জন্যে তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না কুরআন যে আদর্শ ও ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলিমদের হেদায়াত দেয়ঃ "তবে, তারা যদি তাওবাহ্ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই"। এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলিম হয়, তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা মুসলিমদের কর্তব্য। এ শর্ত পূরণ করার ফলে তাদের উপর হাত তোলা ও তাদের জান-মাল নষ্ট করাই শুধু তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে না, বরং তার অধিক ফায়েদা এই হবে যে, তারা অন্যান্য মুসলিমদের সমান হতে পারবে। কোনরূপ বৈষম্য ও পার্থক্য থাকবে না। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও শির্ক থেকে তাওবাহ্। দ্বিতীয় সালাত কায়েম করা, তৃতীয় যাকাত আদায় করা। [আইসারুত তাফাসীর] কারণ, ঈমান ও তাওবাহ্ হল গোপন বিষয় এর যথার্থতা সাধারণ মুসলিমের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তাওবাহ্‌র দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়, আর তা হল,

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে[১]।

১২. আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে কটুক্তি করে[২], তবে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর[৩]; এরা এমন লোক যাদের কোন

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

সালাত ও যাকাত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলিমের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যারা নিয়মিত সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলিমরূপে গণ্য, তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফিকী যাই থাক না কেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্রধারনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। [তাবারী]

(১) এখানে জ্ঞান সম্পন্ন লোক বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার পরিণাম জানে ও বুঝে এবং তাঁর ভয়ও তাদের মনে জাগরুক রয়েছে। তাদের জন্যই আগের কথাগুলো বলা হলো, তাদের মাধ্যমেই আয়াত ও আহকাম জানা যাবে, আর তাদের মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম ও শরী'আত জানা যাবে। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করুন যারা জানে ও সে অনুসারে আমল করে [সা'দী]

(২) এ বাক্য থেকে আলেমগণ প্রমাণ করেন যে, মুসলিমদের ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম, ইসলামের নবী বা ইসলামী শরী'আতকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। শরী'আত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলে। [ইবন কাসীর]

(৩) কতিপয় মুফাস্‌সির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কোরাইশ প্রধান যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ এজন্যে দেয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হল এরা। [তাবারী; ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে অঙ্গীকার অর্থ, ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য। কারণ সন্ধি-চুক্তি তো পূর্বেই প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তারপর ভবিষ্যতে তাদের সাথে নতুন করে কোন চুক্তি বা সন্ধি করার এখন কোন ইচ্ছাই ছিল না। কাজেই এখানে অঙ্গীকার ভংগ করা ও চুক্তি বিরোধী কাজ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তা ছাড়া এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের পরেই উল্লেখিত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তারা যদি তাওবা করে, নামাজ পড়ে ও যাকাত আদায় করে তা হলে তারা

প্রতিশ্রুতি নেই[১]; যেন তারা নিবৃত্ত হয়[২]।

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেয়ার জন্য সংকল্প করেছে? আর তারাই প্রথম তোমাদের সাথে (যুদ্ধ) আরম্ভ করেছে[৩]। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে বেশী সমীচীন যদি তোমরা মুমিন হও।

তোমাদের ভাই হবে"। এরপর "তারা যদি অঙ্গীকার ভংগ করে" বলার পরিষ্কার অর্থ এই হতে পারে যে, এর দ্বারা সে লোকদের ইসলাম কবুল ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করা-ই বুঝানো হয়েছে। আসলে এ আয়াতে মুর্তাদ হওয়ার ফেতনার কথাই বলা হয়েছে, যা তখনো আসেনি। যা এর দেড় বছর পর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খিলাফতের শুরুতে হয়েছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ সময় যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন তা কিছুকাল পূর্বে এ আয়াতে দেওয়া হেদায়াত অনুরূপই ছিল। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) এখানে বলা হয়েছেঃ "এদের কোন শপথ নেই"; কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোন মূল্য মান নেই। [সা'দী]

(২) এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিমদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপর জাতির মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা। হয়ত তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে, ইসলামে অপবাদ দেয়া বাদ দিবে, অথবা ঈমান আনবে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ কাফেররাই প্রথম শুরু করেছে, কি শুরু করেছে? কেউ কেউ বলেনঃ এর দ্বারা বদরের যুদ্ধ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তাবারী] কারণ কাফের কুরাইশগণ যখন বদরে জানতে পারল যে, তাদের বাণিজ্য কাফেলা আশংকামুক্ত হয়েছে তখন তাদের মনের ভিতর হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তারা মুসলিমদের আক্রমণ করা ব্যতীত ক্ষান্ত হতে চাইল না, তারাই তখন বদরের প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে পাগলপ্রায় হয়ে গেল। কেউ কেউ বলেনঃ এর দ্বারা তাদের চুক্তিভঙ্গ করে বনু বকরের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলের মিত্র বনু খোযা'আকে আক্রমণ করা বুঝানো হয়েছে। [সা'দী]

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপদস্থ করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের চিত্ত প্রশান্তি করবেন,

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. আর তিনি তাদের[১] অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে অথচ এখনও আল্লাহ্ প্রকাশ করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি[২]? আর তোমরা যা কর, সে

(১) অর্থাৎ ঈমানদারদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। [তাবারী]

(২) এখানে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল, জিহাদের দ্বারা মুসলিমদের পরীক্ষা করা। [তাবারী] এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলিম এবং মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান সম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী। তাই বলা হয়েছেঃ তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শুনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে। অথচ আল্লাহ্ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী এবং কারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলিমদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ঈমানসম্পন্ন ইতস্ততঃকারী, যারা মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলো নিজেদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য এ আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয়। এক. শুধু আল্লাহ্‌র জন্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দুই. কোন অমুসলিমকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দ وليجة এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে بطانة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তৃতীয় রুকূ'

১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের আবাদ করবে---এমন হতে পারে না[১]। তারা এমন যাদের সব কাজই নষ্ট হয়েছে[২] এবং তারা আগুনেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِينَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُونَ ﴿١٧﴾

১৮. তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের আবাদ করবে[৩], যারা ঈমান আনে আল্লাহ্

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

[তাবারী] এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভেতর পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংস সাধনে কোন ক্রটি বাকী রাখবে না।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১১৮]

মোটকথাঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা জিহাদের মাধ্যমে তিনি ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবেন। এ ধরনের কথা সূরা আল-আনকাবূত এর ১-৩, সূরা আলে ইমরানের ১৪২, ১৭৯ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ যে মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগীর জন্য নির্মিত হয়েছে, তার মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, খাদেম ও আবাদকারী হওয়ার জন্য সেই লোকেরা কখনই যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না, যারা আল্লাহ্‌র সাথে আল্লাহর গুণাবলী, হক-হুকুক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ব্যাপারে অন্যদের শরীক করে। আল্লাহ্‌র ইবাদাতের সাথে অন্যদেরও ইবাদত করে। তাছাড়া তারা নিজেরাই যখন তাওহীদের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করছে এবং নিজেদের দাসত্ব-বন্দেগীকে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে প্রস্তুত নয় বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে, তখন যে ইবাদতখানার নির্মাণই হয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য তার মুতাওয়াল্লী হওয়ার তাদের কি অধিকার থাকতে পারে? [তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র ঘরের যে সামান্য কিছু খেদমত করেছে বলে যে অহঙ্কার করছে, তাও বিনষ্ট ও নিস্ফল হয়ে গেছে [ফাতহুর কাদীর] এই কারণে যে, তারা এ খেদমতের সঙ্গে সঙ্গে শির্কের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। [আইসারুত তাফাসীর] তাদের সামান্য পরিমাণ ভালো কাজকে তাদের বড় আকারের মন্দ কাজ নিস্ফল করে দিয়েছে।

(৩) এ আয়াতে আল্লাহর মসজিদ নির্মানের ও আবাদের যোগ্যতা কাদের রয়েছে তা জানিয়ে বলা হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরোক্ত

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. হাজীদের জন্য পানি পান করানো ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে তোমরা কি তার মত বিবেচনা কর, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে[২]? তারা আল্লাহ্র কাছে

গুণাবলীসম্পন্ন নেককার মুসলিমদের। এই থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাযত, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিক্র বা দ্বীনী ইল্মের শিক্ষা দানে কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি স্থান প্রস্তুত করেন।' [বুখারীঃ ৬৬২, মুসলিমঃ ৬৬৯] সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র যিয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হল মেহমানের সম্মান করা।' [আত-তাবরানী ফিল কাবীর ৬/২৫৫] তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মসজিদে নববী নতুন করে তৈরী করছিলেন তখন লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলছিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা বড্ড বেশী কথা বলছ, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ বানাবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর বানাবেন।' [বুখারী: ৪৫০; মুসলিম: ৫৩৩]

(১) ইবন আব্বাস থেকে এ আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিই মসজিদ নির্মাণ করবে, যে আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছে, শেষ দিবসের উপর ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা স্বীকার করে নিয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করেছে, আর আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করেনি, নিশ্চয় তারাই হবে সফলকাম। কুরআনে যেখানেই আল্লাহ্ তা'আলা 'আশা করা যায়' বলেছেন সেটাই অবশ্যম্ভাবী। [তাবারী]

(২) সুতরাং জিহাদ ও আল্লাহ্র উপর ঈমান এ দুটি অবশ্যই হাজীদেরকে পানি পান

সমান নয়[১]। আর আল্লাহ্ যালিম

করানো এবং মসজিদে হারামের আবাদ বা সেবা করা থেকে বহুগুণ উত্তম। কেননা, ঈমান হচ্ছে দ্বীনের মূল, এর উপরই আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে এবং চারিত্রিক মাধুর্যতা প্রকাশ পায়। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ হচ্ছে দ্বীনের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, যার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামী সংরক্ষিত হয়, প্রসারিত হয়, সত্য জয়যুক্ত হয় এবং মিথ্যা অপসৃত হয়। পক্ষান্তরে মাসজিদুল হারামের সেবা করা এবং হাজিদেরকে পানি পান করানো যদিও সৎকাজ, কিন্তু এ সবই ঈমানের উপর নির্ভরশীল। ঈমান ও জিহাদে দ্বীনের যে স্বার্থ আছে তা এতে নেই। [সা'দী]

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী তিনটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা হল মক্কার অনেক মুশরিক মুসলিমদের মোকাবেলায় গর্ব সহকারে বলতঃ মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারে না। নু'মান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক জুমআর দিন তিনি কতিপয় সাহাবার সাথে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেনঃ ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তার উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেনঃ মসজিদুল হারাম আবাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। অপর আরেকজন বললেনঃ আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। এভাবে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের ধমক দিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের কাছে শোরগোল বন্ধ কর! জুম'আর সালাতের পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথামত প্রশ্নটি তার কাছে রাখা হল। এর প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। [সহীহ মুসলিমঃ ১৮৭৯] এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জিহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সে যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে মুশরিকদের কা'বা নিয়ে গর্বের অন্ত ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-মু'মেনুনের ৬৬, ৬৭ নং আয়াতেও তা উল্লেখ করেছেন। আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল মুলতঃ মুশরিকদের অহংকার নিবারণ উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়। উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হল, শির্ক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবূল যোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ

সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না[১]।

রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলিমদের মোকাবেলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পান করানোর জায়গায় আসলেন এবং পানি চাইলেন, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে ফযল! তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে পানি নিয়ে আস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে পানি পান করাও। আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা পাত্রের পানিতে হাত ঢুকিয়ে ফেলে। তিনি বললেন, আমাকে পানি দাও। অতঃপর তিনি তা থেকে পান করলেন। তারপর তিনি যমযমের কাছে আসলেন, দেখলেন তারা সেখানে কাজ করছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা কাজ করে যাও, তোমরা ভালো কাজ করছ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমাদের কাজের উপর ব্যাঘাত আসার সম্ভাবনা না থাকত তাহলে আমিও নীচে নামতাম এবং এর উপর অর্থাৎ ঘাড়ের উপরে করে পানি নিয়ে আসতাম'। [বুখারী: ১৬৩৫]

মোটকথা: নেক আমলগুলোর মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা আল-মুলকের দ্বিতীয় আয়াতে আছেঃ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ অর্থাৎ "যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

(১) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, 'আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।' এখানে যুলুমের সর্বশেষ পর্যায় অর্থাৎ কুফর ও শির্ক বোঝানোই উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা কুফরী করবে তারা কখনো ভাল কাজ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে না। তারা ভাল কাজ করার তাওফীকও পাবে না। [মুয়াসসার] বস্তুতঃ ঈমান হল আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মত যা গ্রহণের অযোগ্য। আখেরাতের মুক্তির ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। গোনাহ্ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে তিনি ভাল-মন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" [সূরা আল-আনফাল: ২৯] অর্থাৎ ইবাদাত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠ বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে না। পক্ষান্তরে যারা যালিম, যারা নিজেদের নাফসের উপর যুলুম করেছে, তারা ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে, ফলে তাদের হিদায়াত নসীব হয় না।

২০. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফলকাম[১]।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের[২] এবং এমন জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহাপুরস্কার[৩]।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

(১) এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'সমান নয়' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] বলা হয়েছেঃ "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম।" পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ্ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলিমগণ এ সফলতার অংশীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা। সে হিসেবে অর্থ দাঁড়ায়, "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে তারা তাদের থেকে উত্তম যারা ঈমান আনলেও হিজরত করেনি। কারণ, তারা হিজরত না করার কারণে অনেক জিহাদেই অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এ আয়াতে হিজরত বলে মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করা বোঝানো হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ জান্নাতে যাবে, সে শুধু নে'আমতই প্রাপ্ত হবে, কখনও নিরাশ হবে না, তার প্রতি কঠোরতা করা হবে না। তার কাপড় কখনও পুরান হবে না, তার যৌবনও কখনও শেষ হবে না।' [মুসলিম: ২৮৩৬] অন্য হাদীসে এসেছে, 'যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ জিনিস দেব। তারা বলবে, হে আমাদের রব! এর থেকেও শ্রেষ্ঠ জিনিস কি? তিনি বলবেন, আমার সন্তুষ্টি।' [তাবারী]

(৩) আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক। এক. নেয়ামতের স্থায়িত্ব। দুই. নেয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের জন্যে এ আয়াতে এবং পূর্বের আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। আয়াতে আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের জন্য যে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতৃবর্গ ও ভাতৃবৃন্দ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না[১]। তোমাদের

রয়েছে, তাদের অন্তরে খুশীর অনুপ্রবেশ ঘটানো, তাদের সফলতার নিশ্চয়তা, আল্লাহ্ তা'আলা যে তাদের উপর সন্তুষ্ট সেটা জানিয়ে দেয়া, তিনি যে তাদের প্রতি দয়াশীল সেটার বর্ণনা, তিনি যে তাদের জন্য স্থায়ী নে'আমতের ব্যবস্থা করেছেন সেটার পরিচয় দেয়া। [আত-তাহ্‌রীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) পূর্বের আয়াতসমূহে হিজরত ও জিহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করা হয়। বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।" মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ দিয়ে কুরআনের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দু'সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক কতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক রাখা যাবে আর কখন রাখা যাবে না সে সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন, "আপনি পাবেন না আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারিদেরকে--- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। আর তিনি এদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে এরা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম।" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২২]। এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে সবকিছুর উপর স্থান দিতে হবে। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ থেকে অপর কিছুকে প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য কঠোর সাবধানবাণী দেয়া হয়েছে। আর সেটা চেনার উপায় হচ্ছে, যদি দুটি বিষয় থাকে একটি নিজের মনের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। আর অপরটি নিজের মনের পক্ষে কিন্তু তাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের

الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. বলুন, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়[১] তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস[২], তবে অপেক্ষা

অসন্তুষ্টি রয়েছে, এমতাবস্থায় যদি সে নিজের মনের পছন্দের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয় তবে বুঝা যাবে যে সে যালিম। তার উপর যে ওয়াজিব ছিল সেটাকে সে ত্যাগ করেছে। [সা'দী] পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, তবে এটা হবে প্রকৃত ত্যাগ ও কুরবানী। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামা'আতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে তাদের এ ত্যাগ ও কুরবানী। তারা সর্বক্ষেত্রে-সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই আফ্রিকার বেলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, রোমের সোহাইব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মক্কার কুরাইশ ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে দাঁড়াতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমরা 'ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা কর, গাভীর লেজ ধরে থাক, ক্ষেত-খামার নিয়েই সন্তুষ্ট থাক, আর জিহাদ ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ সে অপমান তোমাদের থেকে তিনি সরাবেন না।' [আবু দাউদ: ৩৪৬২]

(২) এখানে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে পার্থিব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলিমের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। এ ব্যাপারে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল

কর আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত।[১]' আর আল্লাহ্ ফাসিক

লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।' [বুখারীঃ ১৪, মুসলিমঃ ৪৪] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্য, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্য, অর্থ ব্যয় করে আল্লাহ্র জন্য এবং অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ্র জন্য, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।' [আবু দাউদ: ৪৬৮১; অনুরূপ তিরমিযী: ২৫২১] হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া এবং শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ঈমান লাভের পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও শরী'আতের হেফাযত এবং এতে ছিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

(১) সূরা আত্-তাওবাহ্র এ আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ তাদের ব্যাপারে যারা হিজরত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করে নি। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ "যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ নাফরমানদিগকে কৃতকার্য করেন না।"
এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ এখানে 'বিধান' অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। [তাবারী] বাক্যের মর্ম হল, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ এখানে বিধান অর্থ আল্লাহ্র আযাবের বিধান। যা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। [কুরতুবী; সা'দী] অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আযাব তো আছেই। হাদীসে এসেছে, 'শয়তান বনী আদমের তিন স্থানে বসে পড়ে তাকে এগোতে দেয় না। সে তার

সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না[১]।

চতুর্থ রুকূ'

২৫. অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে[২] যখন তোমাদেরকে

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ

ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে বলতে থাকে তুমি কি তোমার পিতা-পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করবে? তারপর বনী আদম তার বিরোধিতা করে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সে তার হিজরতের পথে বাঁধ সাধে। সে বলতে থাকে, তুমি কি তোমার সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করবে? তারপর বনী আদম তার বিরোধিতা করে হিজরত করে, তখন সে তার জিহাদের পথে বাঁধ সাধে। সে বলতে থাকে, তুমি কি জিহাদ করবে এবং নিহত হবে? তখন তোমার স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে, তারপর বনী আদম তার বিরোধিতা করে জিহাদ করে। এমতাবস্থায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র হক হয়ে যায়।' [নাসায়ী: ৩১৩৪]

(১) অর্থাৎ যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও আল্লাহ্র নির্দেশকে অমান্য করেছে, উপরোক্ত বস্তুগুলোকে বেশী ভালবেসেছে, দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং অর্থ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে আরাম-আয়েশ ও ভোগের আশা পোষণ করে আছে, জিহাদের আহ্বান আসার পরও সহায়-সম্পত্তির লোভ করে বসে আছে, তারা ফাসেক ও নাফরমান। আর আল্লাহ্র রীতি হল, তিনি নাফরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না। তাদেরকে হিদায়াত করেন না। তাদেরকে সফলতা ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করেন না। [সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

(২) এ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রে মুসলিমরা লাভ করে। বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে।" এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হুনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধে এমনসব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।
'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে পূর্ব দিকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি অনেকটা আরাফার দিকে। বর্তমানে এ স্থানকে 'আশ-শারায়ে' বলা হয়। [আতেক গাইস আল-বিলাদী, মু'জামুল মা'আলিমিল জুগরাফিয়্যাহ: ১০৭] অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কুরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াযেন গোত্র-যার একটি শাখা তায়েফের বনূ-সকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে

উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের | تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡـٔٗا وَّضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَرۡضُ

আশংকা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মত এ উদ্দেশ্যে হাওয়াযেন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা-গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক ইবন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলিম হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তার মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা- বনূ-কা'ব ও বনূ-কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা আল্লাহ্র শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক ইবন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধেক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল-হাদীস আল্লামা ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেনঃ এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় আত্তাব ইবন আসাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আমীর নিয়োগ করেন এবং মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে লোকদের ইসলামী তা'লীম দানের জন্য তার সাথে রাখেন। তারপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। ইমাম যুহরীর বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যারা মক্কা বিজয়ের জন্য তার সাথে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার ছিলেন আশপাশের অধিবাসী, যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হত 'তোলাকা' অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার রাসূলের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। রাসূল

সংখ্যাধিক্য হওয়া; কিন্তু তা তোমাদের | بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ইনশাআল্লাহ্‌, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনী-কেনানার সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশগণ ইতিপূর্বে মুসলিমদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এ বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্যে বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর যদি তারা জয়ী হয়ে যায় তা হলেও আমাদের ক্ষতি নেই। সে যা হোক, মুসলিম সেনা দল হুনাইন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এ সময় সুহাইল ইবন হানযালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ জনৈক অশ্বারোহী এসে শক্রদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিতহাস্যে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, ওদের সবকিছু গনীমতের মাল হিসাবে মুসলিমদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনে অবস্থান নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবন হাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শক্র সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেনঃ 'মুহাম্মাদ এখনো কোন সাহসী যুদ্ধবাজদের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবে কার সাথে তার মোকাবেলা। আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারীর কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে একসাথে আক্রমণ করবে'। বস্তুতঃ কাফেরদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুকায়িত রেখে দেয়।

এ হল শক্রদের রণপ্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এ ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। তাই কারো কারো মন থেকে বের হয়ে আসেঃ আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই শক্রদল পালাতে বাধ্য হবে। কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করে জনবলের উপর তৃপ্ত থাকবে এটা আল্লাহ্‌র পছন্দ ছিল না। এটাই হুনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাওয়াযেন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলিমদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুকায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলিমদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবাগণের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তারা পিছু

কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও যমীন তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে[১]।

২৬. তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى

হটতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। তার সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী। এরাও চাচ্ছিলেন যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর না হন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেনঃ উচ্চঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জিহাদের বাই'আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাক্বারাওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সাবই ফিরে এস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই আছেন।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর এ আওয়ায রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ্ এদের সাহায্যে ফেরেশতাদল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। কাফের সেনানায়ক মালেক ইবন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দূর্গে আত্মগোপন করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। যুদ্ধ শেষে মুসলিমদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চব্বিশ হাজার ছাগল এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য। [কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; প্রমূখ। বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন, ইবরাহীম ইবন ইবরাহীম কুরাইবী কৃত মারওয়িয়াতু গাযওয়াতি হুনাইন ওয়া হিসারুত তায়িফ]

(১) অর্থাৎ তোমরা সংখ্যাধিক্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলে, কারণ তারা সংখ্যায় ছিল বার হাজার, মতান্তরে ষোল হাজার। [কুরতুবী] এটা নিঃসন্দেহে এক বিরাট বাহিনী। তাদের কেউ কেউ বলেও বসল যে, আমরা আজ সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না। কিন্তু পরাজিত তাদের হতেই হলো, সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল। তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমরা সংখ্যাধিক্যে কখনও জয়লাভ করে না। তারা জয়লাভ করে আল্লাহ্‌র সাহায্যে [কুরতুবী]। এরপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং তোমাদের উপর তাঁর 'সাকীনাহ' বা প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং ফেরেশ্‌তাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করেন যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন।

الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

প্রশান্তি নাযিল করেন[১] এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী নাযিল করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি[২]। আর তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন; আর এটাই কাফেরদের প্রতিফল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২৭. এরপরও যার প্রতি ইচ্ছে আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবুল করবেন; আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

---

(১) এ বাক্যের অর্থ হলো, হুনাইনের যুদ্ধে প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুমিনদের ব্যাপারে প্রশান্তি লাভ করলেন। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর প্রশান্তি ছিল দু'প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য, অন্য প্রকার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য على বা 'উপর' শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ "অতঃপর আল্লাহ্ প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর এবং মুমিনদের উপর"। সাহাবাদের প্রতি প্রশান্তি প্রেরণের অর্থ হলো, তারা ভয়-ভীতির পরে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর প্রশান্তি নাযিল হওয়ার অর্থ মুসলিমদের ব্যাপারে তার মনে প্রশান্তি নাযিল হওয়া এবং বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) তারা ছিল ফেরেশতা। তাদের কাজ ছিল মুমিনদের পদযুগলে দৃঢ়তা স্থাপন আর কাফেরদের মনে ভয়-ভীতি উদ্রেককরণ [সা'দী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এখানে বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে দেখেনি। মূলতঃ এটা হলো সাধারণ লোকদের ব্যাপারে, তাই কেউ কেউ তাদেরকে মানুষের রুপে দেখেছেন বলে যে কতিপয় বর্ণনায় এসেছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়।

(৩) এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলিমদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ ঈমানের তাওফীক দেবেন। বাস্তবেও পরাজিত হাওয়াযেন ও সক্বীফ গোত্রদ্বয়ের অনেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা ও ভদ্র ব্যবহার দেখে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফেরৎ পেয়েছিল। [সা'দী] আর আল্লাহ্ প্রশস্ত রহমতের অধিকারী। তাঁর রহমত সর্বব্যাপী। তাওবাহকারীদের বড় গোনাহও ক্ষমা করে দেন। আর তাদেরকে তাওবাহ করার তাওফীক দেন, তাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করেন, সুতরাং বান্দা যত অন্যায়ই করুক না কেন তাঁর রহমত থেকে যেন সে নিরাশ না হয়। [সা'দী]

২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র[১]; কাজেই এ বছরের পর[২] তারা যেন মসজিদুল হারামের ধারে-কাছে না আসে[৩]। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন[৪]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, কাফেরগণ ব্যহ্যিক ও আত্মিক সর্ব দিক থেকেই অপবিত্র। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] তবে অধিকাংশ মুফাসসির বলেনঃ এখানে নাপাক বলতে তাদের দেহ সত্তা বুঝানো হয়নি, বরং দ্বীনী বিষয়াদিতে তাদের অপবিত্রতা বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে এর অর্থ, তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, আমল ও কাজ, তাদের জীবন - এসবই নাপাক। [ইবন কাসীর; সা'দী] আর এ সবের নাপাকির কারণেই হারাম শরীফের চৌহদ্দির মধ্যে তাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

(২) এ বছর বলতে অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের মতে ৯ম হিজরী বুঝানো হয়েছে। কাতাদা বলেন, এটা ছিল সে বছর যে বছর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিয়ে হজ করেছেন। তখন আলী এ বিষয়টির ঘোষণা লোকদের মধ্যে দিয়েছিলেন। তখন হিজরতের পর নবম বছর পার হচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তী বছর হজ করেছিলেন। তিনি এর আগেও হজ করেন নি, পরেও করেন নি। [তাবারী]

(৩) এখানে "মাসজিদুল হারাম" বলতে সাধারণতঃ বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কুরআন ও সুন্নার কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হারাম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যা কয়েক বর্গমাইল এলাকব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম। যেমন, মে'রাজের ঘটনায় মাসজিদুল হারামের উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐক্যমতে এখানে "মাসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ, মে'রাজের শুরু হয় উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ঘর থেকে, যা বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে। অনুরূপ সূরা তাওবার শুরুতে ৭ নং আয়াতে যে মাসজিদুল হারামের উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থও পূর্ণ হারাম শরীফ। কারণ, এখানে উল্লেখিত সন্ধির স্থান হলো 'হুদায়বিয়া' যা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে তার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। [আল-বালাদুল হারামঃ আহকাম ওয়া আদাব]

(৪) ইবনে আব্বাস বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে মাসজিদুল হারামে যাওয়া থেকে নিষেধ করলেন, তখন শয়তান মুমিনদের অন্তরে চিন্তার উদ্রেক ঘটাল যে, তারা কোত্থেকে খাবে? মুশরিকদেরকে তো বের করে দেয়া হয়েছে, তাদের বানিজ্য কাফেলা তো আর আসবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৯. যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে[1] তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ কর[2], যে পর্যন্ত না

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

করলেন। যাতে তিনি তাদেরকে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিলেন। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে বলে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে তারা হলোঃ ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ের ওজর বন্ধ করার জন্য বলেনঃ "তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছে, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম। [আল-আন'আমঃ১৫৬]
এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহলে কিতাবদের সাথে মুসলিমদের যে যুদ্ধ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি। [বাগভী; ইবন কাসীর] আহলে কিতাবের উল্লেখ করে এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের সাথে যে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু বর্ণিত হয়েছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। [বগভী; কুরতুবী; সা'দী] তবে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয়, কারণ এদের কাছে রয়েছে তাওরাত ইঞ্জীলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনছে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে যুদ্ধের চারটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমতঃ তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়তঃ আখেরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না। চতুর্থতঃ সত্য দ্বীন গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক। [কুরতুবী] ইয়াহূদী-নাসারাগণ যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইয়াহূদীগণ উযায়ের আর নাসারাগণ ঈসাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে প্রকারান্তরে শির্ক তথা অংশীবাদকেই সাব্যস্ত করছে। [বাগভী] অনুরূপভাবে আখেরাতের প্রতি যে ঈমান

তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিয্ইয়া[১]

রাখা দরকার তা আহলে কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, কিয়ামতে মানুষ দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হল জান্নাত আর অশান্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনে পেশকৃত ধ্যান ধারণার বিপরীত। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়। তৃতীয় কারণ বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী-নাসারাগণ আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হল তাওরাত ও ইঞ্জীলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। সেটা অনুসরণ করে না। [সা'দী] যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য- যা তাওরাত ও ইঞ্জীলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না। এ থেকে এ মাস'আলা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। চুতর্থত: তারা সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না। যদিও তারা মনে করে থাকে যে, তারা একটি দ্বীনের উপর আছে। কিন্তু তাদের দ্বীন সঠিক নয়। আল্লাহ্ সেটা কখনো অনুমোদন করেননি। অথবা এমন শরী'আত যেটা আল্লাহ্ রহিত করেছেন। তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী'আত দিয়ে সেটা পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং রহিত করার পর সেটা পাকড়ে থাকা জায়েয নয়। [সা'দী]

(১) 'জিয্ইয়া'র শাব্দিক অর্থঃ বিনিময়ে প্রদত্ত পুরস্কার। [ফাতহুল কাদীর] শরী'আতের পরিভাষায় জিয্ইয়া বলা হয় কাফেরদেরকে হত্যা থেকে মুক্তি এবং তাদেরকে মুসলিমদের মাঝে নিরাপত্তার সাথে অবস্থান করার বিনিময়ে গৃহীত সম্পদকে। যা প্রতি বছরই গ্রহণ করা হবে। ধনী, দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত প্রত্যেকে তার অবস্থানুযায়ী সেটা প্রদান করবে। যেমনটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার পরবর্তী খলীফাগণ গ্রহণ করেছিলেন। [সা'দী]

সঠিক মত হচ্ছে যে, দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে জিয্ইয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরী'আতের পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিয্ইয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজরানের নাসারাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। [আস-সুনানুস সগীর লিল বাইহাকী] প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ এক উকিয়া রুপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রুপার সমপরিমাণ। অনুরূপ তাগলিব গোত্রীয় নাসারাদের সাথে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিয্ইয়া কর প্রদান করবে। [মুয়াত্তা,

দেয়[১] ।

ইমাম মুহাম্মাদের বর্ণনায়] তাই মুসলিমগণ যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসিগণকে তাদের সহায় সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখে এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিযিয়ার হার তা হবে যা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন । তাহলো উচ্চবিত্তের জন্যে মাসিক চার দিরহাম, মধ্যবিত্তের জন্যে দু' দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিত্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম । [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস] বিকলাঙ্গ, মহিলা শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মজাযক এই জিযিরা কর থেকে অব্যাহতি পায় । [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস] কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিয্ইয়া আদায়ের বেলায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাগিদ ছিল যে, কারো সাধ্যের বাইরে যেন কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা না হয় । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম চালাবে, কিয়ামতের দিন আমি যালেমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব' [আবুদাউদঃ ৩০৫২] ।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এক মত পোষণ করেন যে, শরী'আত জিয্ইয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল । তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন ।

জিয্ইয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বেলায় প্রযোজ্য । তারা আহলে কিতাব হোক বা অন্য কেউ । [কুরতুবী] আর এ জন্যই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাজুসীদের থেকেও জিযইয়া নিয়েছিলেন । [দেখুন, বুখারীঃ ৩১৫৬]

আলোচ্য আয়াতে يد শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । যার অর্থ নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ হয়েছে । স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে, নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করা । কারও কারও মতে এর অর্থ, স্বহস্তে প্রদান করা । কারও কারও মতে, নগদ প্রদান করা, বাকী না করা । কারও কারও মতে, জোর করে নেয়া । কারও কারও মতে, এটা বুঝিয়ে নেয়া যে, তাদেরকে হত্যা না করে এ অর্থ নেয়ার দ্বারা তাদের উপর দয়া করা হচ্ছে । কার কারও মতে, ধিকৃত । [ফাতহুল কাদীর] তাই জিয্ইয়া যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মত না হয়, বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে ।

(১) আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে জিয্ইয়া প্রদান করে" । এ বাক্য দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয় । অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিয্ইয়া কর প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে । [সা'দী]

পঞ্চম রুকূ‘

৩০. আর ইয়াহূদীরা বলে, ‘উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র’(১), এবং নাসারারা বলে, ‘মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।’ এটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে(২)!

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

---

(১) আয়াতের ভাষ্য হতে বুঝা যায় যে, ইয়াহূদীদের সবাই এ কথা বলেছিল। কারও কারও মতে, এটি ইয়াহূদীদের এক গোষ্ঠী বলেছিল। সমস্ত ইয়াহূদীদের আকীদা বিশ্বাস নয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, সাল্লাম ইবন মিশকাম, নু‘মান ইবন আওফা, শাস ইবন কায়স ও মালেক ইবনুস সাইফ তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমরা কিভাবে আপনার অনুসরণ করতে পারি, অথচ আপনি আমাদের কেবলা ত্যাগ করেছেন, আপনি উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মেনে নেন না? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। [তাবারী; সীরাতে ইবন হিশাম ১/৫৭০] উযায়ের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ইয়াহূদীরা যখন তাওরাত হারিয়ে ফেলেছিল তখন উযায়ের সেটা তার মুখস্থ থেকে পুণরায় জানিয়ে দিয়েছিল। তাই তাদের মনে হলো যে, এটা আল্লাহ্‌র পুত্র হবে, না হয় কিভাবে এটা করতে পারল।[সা‘দী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] এটা নিঃসন্দেহে একটি মিথ্যা কথা যে, উযায়ের তাদেরকে মূল তাওরাত তার মুখস্থ শক্তি দিয়ে এনে দিয়েছিল। কারণ উযায়ের কোন নবী হিসেবেও আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়নি। এর মাধ্যমে ইয়াহূদীরা তাদের হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা তাদের দাবী মাত্র। ঐতিহাসিকভাবে এমন কিছু প্রমাণিত হয়নি। [দেখুন, ড. সাউদ ইবন আবদুল আযীয, দিরাসাতুন ফিল আদইয়ান- আল-ইয়াহূদিয়্যাহ ওয়ান নাসরানিয়্যাহ]

(২) এ আয়াতটি হলো পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা। পূর্বে আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে না। এখানে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা উযাইরকে আর নাসারারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। [ইবন কাসীর] তাই তাদের ঈমান ও তাওহীদের দাবী নিরর্থক। এরপর বলা হয়ঃ “এটি তাদের মুখের কথা”। এর অর্থ তারা মুখে যে কুফরী উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। কত মারাত্মক সে উক্তি যা তারা করে যাচ্ছে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, “এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে” [সূরা আল-কাহাফ: ৫] অতঃপর বলা হয়ঃ

৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদের[১]কে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে[২] এবং

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ

"এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে, আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন। এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। [ইবন কাসীর] এর অর্থ হল ইয়াহূদী ও নাসারারা নবীগণকে আল্লাহর পুত্র বলে পুর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছিল। [বাগভী]

(১) أحبار শব্দটি حبر এর বহুবচন। ইয়াহূদীদের আলেমকে حبر বলা হয়। পক্ষান্তরে رهبان শব্দটি راهب এর বহুবচন। নাসারাদের আলেমকে راهب বলা হয়। তারা বেশীরভাগই সংসার বিরাগী হয়ে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে বলা হয় যে, ইয়াহূদী-নাসারাগণ তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহর পরিবর্তে রব ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ ঈসা আলাইহিস সালামকেও মা'বুদ মনে করে। তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাকে মা'বুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মা'বুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; যতই তা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধী হোক না কেন? বলাবাহুল্য পাদ্রী ও পুরোহিতগণের আল্লাহ বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মা'বুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর, আর এটি হল প্রকাশ্য কুফরী ও শির্ক। আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি গলায় একটি সোনার ক্রুশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেনঃ হে আদী, তোমার গলা থেকে এ মূর্তিটি সরিয়ে ফেল এবং তাকে সূরা আত্-তাওবাহ্‌র এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুনলাম- "তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদাত করি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তারা তোমাদের জন্য কোন কিছু হালাল করলে তোমরা সেটাকে হালাল মনে কর আর কোন কিছুকে হারাম করলে তোমরা সেটাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। [তিরমিযীঃ ৩০৯৫]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরী'আতের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের নির্দেশনার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণর ততক্ষণই করতে পারবে যতক্ষণ না এর বিপরীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে কোন কিছু প্রমাণিত হবে। যখনই কোন কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতের বিপক্ষে হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে তখনি তা ত্যাগ করা ওয়াজিব। অন্যথায় ইয়াহূদী নাসারাদের মত হয়ে যাবে। কারণ ইয়াহূদী-নাসারাগণ আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ-

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

মার্‌ইয়াম-পুত্র মসীহ্‌কেও। অথচ এক ইলাহের 'ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র[১]!

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া আর কিছু করতে অস্বীকার করছেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে[২]।

নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। আয়াতে তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ অথচ তাদেরকে তো শুধু এ নির্দেশই দেয়া হচ্ছিল যে, তারা এক ইলাহেরই ইবাদত করবে, যিনি কোন কিছু হারাম করলেই কেবল তা হারাম হবে, আর যিনি হালাল করলেই তা হালাল হবে। অনুরূপভাবে যিনি শরী'আত প্রবর্তন করলে সেটাই মানা হবে, তিনি হুকুম দিলে সেটা বাস্তবায়িত হবে। তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তারা যা তাঁর সাথে শরীক করছে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র! তাঁর কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, সাহায্যকারী নেই, বিপরীতে কেউ নেই, সন্তান-সন্ততি নেই, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া কোন রব নেই। [ইবন কাসীর] কিন্তু তারা সে নির্দেশের বিপরীত কাজ করেছে। তাঁর সাথে শরীক করেছে। মহান আল্লাহ্ তাদের সে সমস্ত অপবাদ ও শরীক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর পূর্ণতার বিপরীত তাঁর জন্য যে সমস্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ গুণ সাব্যস্ত করে তা গ্রহণযোগ্য নয়। [সা'দী]

(২) এ আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহর সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। তারা দ্বীনের এ আলো, হিদায়াতের এ জ্যোতি, তাওহীদের এ আহ্বানকে শুধুমাত্র তাদের কথা, ঝগড়া ও মিথ্যাচার দিয়ে মিটিয়ে দিতে চায়। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্যে অসম্ভব, যেভাবে সূর্যের আলো বা চাঁদের আলোকে কেউ ফুৎকারে মিটিয়ে দিতে পারে না। বরং আল্লাহর অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের ও মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন? [ইবন কাসীর]

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ(১) পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে(২)।

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে হিদায়াত বলে সত্য সংবাদসমূহ, সহীহ ঈমান, উপকারী ইলম বোঝানো হয়েছে। আর দ্বীনে হক বলে দুনিয়া ও আখেরাতে কাজে আসবে এ রকম যাবতীয় বিশুদ্ধ আমল বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতের সারকথা এটাই যে, আল্লাহ আপন রাসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কুরআন এবং সত্য দ্বীন ইসলাম সহকারে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কুরআনে রয়েছে। যাতে সকল দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার জন্য যমীনকে একত্রিত করে (সঙ্কোচন করে) এনে দেখিয়েছেন। তাতে আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দেখতে পেয়েছি। আর নিশ্চয় আমার উম্মত ততটুকু করায়ত্ব করবে যতটুকু আমাকে জমা করে দেখানো হয়েছে। আর আমাকে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য)দুটি খনি প্রদান করা হয়েছে। (সোনা ও রুপার মালিক রোম সম্রাট সিজার ও পারস্য সম্রাট খসরুর সম্পদ)। আর আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমার উম্মতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে শেষ না করে দেন এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের ব্যতীত তাদের শত্রুকে চাপিয়ে না দেন, যাতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে বা তাদের সম্মান নষ্ট হবে। আমার রব আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় না। আমি আপনার উম্মতের জন্য আপনাকে এটা প্রদান করলাম যে, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস করব না। আর তাদের উপর তাদের নিজেদের ছাড়া শত্রুদেরকে এমনভাবে চাপিয়ে দেব না, যাতে তাদের ধ্বংস হয়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে সবস্থানের লোক একত্রিত হয় তবুও নয়। তবে তাদের একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করে রাখবে। [মুসলিম: ২৮৮৯] অপর হাদীসে এসেছে, আদী ইবন হাতেম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, *হে আদী! ইসলাম গ্রহণ কর, তুমি নিরাপদ হবে।* আমি বললাম, আমি একটি দ্বীনের উপর আছি। তিনি বললেন, আমি তোমার দ্বীন সম্পর্কে তোমার থেকে বেশী জানি। আমি বললাম, আপনি আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশী জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি (নাসারাদের) রাকূসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নও? আর তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের মিরবা' বা এক চতুর্থাংশ খাও না? (জাহেলী যুগে সমাজের নেতারা অন্যদের আয়ের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করত) আমি বললাম, অবশ্যই হ্যাঁ।

৩৪. হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত এবং সংসার- | يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ

তিনি বললেন, এটা তো তোমার দ্বীনে (নাসারাদের দ্বীনে) বৈধ নয়। আদী বলেন, এটা বলার সাথে সাথে আমি বিনীত হয়ে গেলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি জানি কোন জিনিস তোমাকে ইসলাম গ্রহণে বাঁধা দিচ্ছে। তুমি বলবে, এ দ্বীন তো দুর্বল লোকেরা গ্রহণ করেছে, যাদের কোন শক্তি-সামর্থ নেই; যাদেরকে আরবরা নিক্ষেপ করেছে। তুমি কি 'হীরা' চেন? আমি বললাম, দেখিনি তবে শুনেছি। তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আল্লাহ্ এ দ্বীনকে এমনভাবে পূর্ণ করবেন যে, হীরা থেকে কোন মহিলা সওয়ারী বের হয়ে অবশেষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে, তার সাথী কেউ থাকবে না। আর খসরু ইবন হুরমুয এর সম্পদরাশি তোমাদের হস্তগত হবে। আমি বললাম, খসরু ইবন হুরমুয? তিনি বললেন, হ্যাঁ, খসরু ইবন হুরমুয। অচিরেই সম্পদ এমন বেশী হবে যে, অধিক পরিমানে ব্যয় হবে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। আদী ইবন হাতেম বলেন, এই যে, মহিলা সওয়ারী বের হচ্ছে, সে কারও সাহচর্য ছাড়াই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছে। আর আমি নিজেই খসরু ইবন হুরমুযের সম্পদরাশি হস্তগত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, তৃতীয়টিও সংঘটিত হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি বলেছেন। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৭৭]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ অন্যান্য দ্বীনের উপর দ্বীনে ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক। যেমন: মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানিতদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে কিন্তু কালেমায়ে ইসলামীর অনুগত হবে'। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪] আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে। কিন্তু সে পরিস্থিতি সবসময় এক থাকবে না। আবার মানুষের মধ্যে কুফরীর সয়লাব হবে। হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত লাত ও উযযা উপাসনা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাত-দিন শেষ হবে না। (কিয়ামত হবে না) আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আল্লাহ্ "তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে" [সূরা তাওবাহ: ৩৩; সূরা আস-সাফ: ৯] এ আয়াত নাযিল করেছিলেন, তখন আমি মনে করেছিলাম যে, এটা পরিপূর্ণ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় এটা হবে, এবং যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন থাকবে। তারপর আল্লাহ্

وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই তো জনসাধারণের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে[১]। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না[২] আপনি তাদেরকে

এক পবিত্র বায়ু প্রেরণ করবেন, যা এমন প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে, যার মধ্যে সরিষা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে। এরপর যারা জীবিত থাকবে তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না, তারা তখন কুফরীতে ফিরে যাবে।' [মুসলিমঃ ২৯০৭]

(১) এ আয়াতে মুসলিমদের সম্বোধন করে ইয়াহূদী নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইয়াহূদী-নাসারাদের আলোচনায় মুসলিমদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইয়াহূদী-নাসারা সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাদের অধিকাংশই গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত রাখছে। এ বাতিল পন্থা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা গীর্জা ও ধর্মের নামে মানুষদের থেকে কর আদায় করত। এতে তারা মানুষদেরকে বোঝাত যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্যই গ্রহণ করছে। অথচ তারা এ সম্পদগুলো কুক্ষিগত করত। [কুরতুবী] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা বিচারকার্য ঘুষের উপর করত। [কুরতুবী] এভাবে তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা বাহানা সৃষ্টি করে নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট হতোনা বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। [সা'দী] কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। তাছাড়া তাদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়। অথবা আল্লাহ্‌র দ্বীন বলে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] অর্থাৎ তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না এনে অর্থলোভে পড়ে আছে। অন্যদেরকেও তেমনি ইসলামে প্রবেশ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে বাঁধা দিচ্ছে। [কুরতুবী]

(২) ইয়াহূদী নাসারা গোষ্ঠীর আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজার কথা বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে,

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন[১]।

৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, 'এগুলোই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর[২]।'

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥

তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন"। এখানে 'আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে' বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়।' [আবুদাউদ: ১৫৬৪]। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোনাহ নয়।

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন, তারপর সে যে সম্পদের যাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ তার জন্য চক্ষুর পাশে দু'টি কালো দাগবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে, তারপর সেটি তার চোয়ালের দু'পাশে আক্রমন করবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন। [বুখারী: ১৪০৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁর উটের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকে উত্তমভাবে এসে তাকে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ছাগলের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকেও উত্তমভাবে এসে তাকে তার খুর ও শিং দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে... আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন তাঁর কাধে ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যে ছাগল চিৎকার করতে থাকবে, তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুরই মালিক নই, আমি তো তোমার কাছে বাণী পৌছিয়েছি। আর তোমাদের কেউ যেন তাঁর কাধে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা শব্দ করছে। তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুর মালিক নই, আমি তো তোমাদেরকে পৌছিয়েছি। [বুখারী: ১৪০২; মুসলিম: ৯৮৮]

(২) এ আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয়

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ

৩৬. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই[১] আল্লাহর বিধানে[২] আল্লাহ্‌র কাছে গণনায় মাস বারটি[৩], তার মধ্যে চারটি

যে, তার এ সাজা তারই অর্জন করা। অর্থাৎ যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আযাবের কারণ হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে তাদেরকে সেই জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথরের ছেঁকার সুসংবাদ দিন, যা জাহান্নামের আগুনের দ্বারা দেয়া হবে। যা তাদের কারও স্তনের বোঁটার মধ্যে রাখা হবে, আর তা বের হবে দু কাঁধের উপরিভাগে। আর দু কাঁধের উপরিভাগে রাখা হবে যা স্তনের বোঁটার মধ্য দিয়ে বের হবে।' [মুসলিমঃ ৯৯২] অন্য হাদীসে এসেছে, যে কোন সোনার মালিক বা রুপার মালিক যাকাত প্রদান করবে না, কিয়ামতের দিন সেগুলো তার জন্য আগুনের পাত হিসেবে বানিয়ে নেয়া হবে, তারপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দিয়ে তার কপাল, পাঁজর ও পিঠে ছেঁকা দেয়া হবে। যখনই সেগুলো ঠাণ্ডা হবে, আবার তা উত্তপ্ত করা হবে, এমন দিনে যার পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। যতক্ষণ না বান্দাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করা শেষ হবে। তারপর তার স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নামে সেটা দেখানো হবে। [মুসলিমঃ ৯৮৭]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যে কৃপন ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়; কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রুকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) এর দ্বারা এদিকে ঈঙ্গিত করা হয় যে, মাসগুলোর ধারাবহিকতা নির্ধারিত হয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে। [সা'দী]

(২) এখানে ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি সৃষ্টির প্রথম দিনেই তাকদীরে সুনির্দিষ্ট করা আছে। [সা'দী] আর সে অনুসারে লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গণনায় মাস হল বারটি।' এখানে উল্লেখিত عدة অর্থ গণনা। شهور হল شهر এর বহুবচন। আয়াতের সারমর্ম হল, আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যাটি বারটি নির্ধারিত, এতে কম বেশি করার কারো সুযোগ নেই। জাহেলিয়াতের লোকেরা বদলালেও তোমরা সেটা বদলাতে পার না। তোমাদের কাজ হবে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ মোতাবেক সেটাকে ঠিক করে নেয়া। [কুরতুবী]

الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

নিষিদ্ধ মাস(১), এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন(২)। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

(১) বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন: 'তিনটি মাস হল ধারাবাহিক- যিলকদ, যিলহজ ও মহররম, অপরটি হল রজব। [বুখারীঃ ৩১৯৭; মুসলিমঃ ১৬৭৯] আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় সময় আবার ঘুরে তার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফিরে এসেছে। যে পদ্ধতিতে আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনের মত। মাসের সংখ্যা বারটি। তন্মধ্যে চারটি হচ্ছে, হারাম মাস। তিনটি পরপর যিলকদ, যিলহজ, ও মুহাররাম। আর হচ্ছে মুদার গোত্রের রজব মাস , যা জুমাদাস সানী ও শা'বান মাসের মাঝখানে থাকে।' [বুখারীঃ ৪৬৬২; মুসলিমঃ ১৬৭৯]

(২) অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসুগলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের ইলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হল সঠিক দ্বীন। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা পরিবর্তন - পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরী'আতে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়, বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তারতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরী'আতের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চন্দ্রমাসের হিসেব মতেই রোযা, হজ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। [কুরতুবী] তবে কুরআন মজীদ চন্দ্রের মত সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদন্ডরূপে অভিহিত করেছেন। [সূরা আল-আন'আমঃ ৯৬; সূরা আর-রাহমানঃ ৫; সূরা ইউনুসঃ৫] অতএব চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরী'আতের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চন্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া, সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহগার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে।

৩৭. কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া তো শুধু কুফরীতে বৃদ্ধি সাধন করা, যা দিয়ে কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা এটাকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে যাতে তারা, আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে, ফলে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে; আর আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য[১]।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

(১) অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। সেজন্য আয়াতে বলা হয়ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে?" হাদীসে এসেছে, "বৃদ্ধ মানুষের মনও দু'টি ব্যাপারে যুবক থেকে যায়, একটি হচ্ছে দুনিয়াপ্রীতি অপরটি বেশী বেশী আশা-আকাঙ্খা" [বুখারীঃ ৬৪২০] রোগ নির্ণয়ের পর তার প্রতিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হচ্ছে, যেমন তোমাদের কেউ তার আঙ্গুলকে সমুদ্রের

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান[১]।

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাঁকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ

মধ্যে ডুবায়, সুতরাং সে দেখুক, সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।' [মুসলিম: ২৮৫৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কোন এক উঁচু স্থান দিয়ে বাজারে প্রবেশ করলেন। বাজার লোকে লোকারণ্য। তিনি একটি কানকাটা মরা ছাগলের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি সেটির কানের বাকী অংশে ধরলেন। তারপর বললেন, কে এটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে রাজী আছ? লোকরা বলল, আমরা কেউ এটিকে কোন কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করব না। আর আমরা এটাকে নিয়ে কি করব? তিনি বললেন, তোমরা কি চাও যে এটা তোমাদের হোক? তারা বলল, যদি জীবিতও থাকত তারপরও সেটা দোষযুক্ত ছিল; কেননা তার কান নেই। তদুপরি সেটা মৃত। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি দুনিয়া আল্লাহ্র কাছে এর চেয়েও বেশী মূল্যহীন।' [মুসলিম: ২৯৫৭] সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা- ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তাই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

(১) এ আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকার উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। কাতাদা বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে শামের দিকে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জানেন এ যুদ্ধে কত কষ্ট রয়েছে। তারপরও তিনি এ যুদ্ধে বের না হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। [তাবারী]

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের কথা হেয় করেন। আর আল্লাহ্‌র কথাই সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

৪১. অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোন মানুষের সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন হিজরতের সময় করা হয়, যখন তার আপন গোত্র ও দেশবাসী তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কেউ ছিলনা। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না। বরং তা এক গিরী গুহা, যার দ্বারপ্রান্তে পর্যন্ত পৌঁছেছিল তার শত্রুরা। তখন গুহা সঙ্গী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তার বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিত। শুধু যে নিজের তা নয়, বরং সফর সঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (অর্থাৎ তাঁর সাহায্য আমাদের সাথে রয়েছে।) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি গিরী গুহায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমি কাফেরদের পদশব্দ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাদের কেউ যদি পা উঁচিয়ে দেখে তবে আমাদের দেখতে পাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে দুজনের সাথে আল্লাহ্ তৃতীয়জন তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? [বুখারী: ১৭৭] [তাছাড়া পুরো ঘটনাটির জন্য দেখুন, সীরাতে ইবন হিশাম]

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٤١

ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে(১)!

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝٤٢

৪২. যদি সহজে সম্পদ লাভের আশা থাকত ও সফর সহজ হত তবে তারা অবশ্যই আপনার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর অচিরেই তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম।' তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী(২)।

সপ্তম রুকূ'

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ

৪৩. আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা আপনার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা

---

(১) এ আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশ্যে পুনরোল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা তোমাদের জন্য বসে থাকা থেকে উত্তম। কেননা এ জিহাদেই রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কাছে উঁচু মর্যাদা পেতে পারে। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সাহায্য করতে পারে। এভাবেই একজন আল্লাহ্‌র সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। [সা'দী] তাদের এ কল্যাণ দুনিয়া ও আখেরাত ব্যাপী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে বের হবে, সে যদি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র বাণীতে ঈমানের কারণেই বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জিম্মাদারী নিলেন অথবা সে যে গনীমতের মাল গ্রহণ করেছে তা সহ তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরৎ পাঠাবেন।' [বুখারী: ৭৪৫৭]

(২) এ আয়াতে অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওযরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে যে, এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ যে শক্তি সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহ্‌র রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।

الْكٰذِبِيْنَ۝

মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ۝

৪৪. যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে যেতে আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ۝

৪৫. আপনার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে শুধু তারাই যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ۝

৪৬. আর যদি তারা বের হতে চাইত তবে অবশ্যই তারা সে জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্ অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি তাদেরকে অলসতার মাধ্যমে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হল, 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।'

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ۝

৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের ফাসাদই বৃদ্ধি করত এবং ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটোছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য কথা শুনার লোক রয়েছে[১]। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

---

(১) অর্থাৎ "তোমাদের কথা শুনে সেগুলো অন্যের কাছে পাচার করে থাকে"। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. অবশ্য তারা আগেও[১] ফিত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তারা আপনার বহু কাজে ওলট-পালট করেছিল, অবশেষে সত্যের আগমন ঘটল এবং আল্লাহ্‌র হুকুম বিজয়ী হল[২], অথচ তারা ছিল অপছন্দকারী।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিত্নায় ফেলবেন না।' সাবধান! তারাই ফিত্নাতে পড়ে আছে[৩]। আর জাহান্নাম তো

---

(১) অর্থাৎ তারা চিন্তাশক্তি ও মতামতকে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে খাটিয়েছিল। তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছে আপনার দ্বীনকে অপমানিত করতে। যেমন প্রথম যখন আপনি মদীনায় আগমন করেছিলেন তখন আপনার বিরুদ্ধে ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারপর যখন বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করল তখন আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ও তার সাথীরা বলল, এ কাজ তো দেখি পথে উঠে এসেছে। তারপর তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর যখনই কোথাও মুসলিমদের বিজয় দেখে তখনই তা তাদেরকে পীড়া দেয়। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ বিজয় হল", যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল। এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয় বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

(৩) এ আয়াতে জদ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওযর পেশ করে বলেছিল আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা তার কথার উত্তরে বলেনঃ "ভাল করে শোন", এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধে এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। সে যদি মহিলাদের মোহে পড়ার ফিতনা থেকে বাঁচতে এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত থাকে তবে জেনে নিক যে, সে আরও বড় ফিতনায় পড়েছে। আর সেটা হচ্ছে, দুনিয়াতে শির্ক ও কুফর, আর আখেরাতে তার শাস্তি। [ইবনুল কাইয়্যেমঃ ইগাসাতুল লাহফান ২/১৫৮-১৫৯]

কাফেরদের বেষ্টন করেই আছে[১]।

৫০. আপনার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়, আর আপনার বিপদ ঘটলে তারা বলে, 'আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' এবং তারা উৎফুল্ল চিত্তে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝٥٠

৫১. বলুন, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা লিখেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘটবে না; তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত[২]।'

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝٥١

---

(১) "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। [ইবন কাসীর; সা'দী] পরিবেষ্টন করার অর্থ, যারাই আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করবে, তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামে তাদের ঘিরে রাখবে, কিয়ামতের দিন তাদের সবাইকে একত্রিত করবে। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলছেনঃ "বলুনঃ আমাদের বিপদতো অতটুকুই হবে যতটুকু আল্লাহ্ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন"। অর্থাৎ আমরা যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হই, তা আগেই আল্লাহ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রতিটি বস্তুরই হাকীকত রয়েছে। কোন বান্দাই প্রকৃত ঈমানের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না এটা দৃঢ়ভাবে জানবে যে, তার যা ঘটেছে তা কখনো তাকে ছেড়ে যেতো না। আর যা তাকে ছেড়ে গেছে তা কখনো তার জন্য ঘটতো না।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৪৪১-৪৪২] তাই মুসলিমদের আবশ্যক আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা। আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভাল মন্দ নির্ভরশীল নয়। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌র হাতে। আমার উপর দায়িত্ব হবে সঠিক কাজটি করে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। তাঁরই কাছে সার্বিক সহযোগিতা কামনা। হাদীসে এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে বৎস! নিশ্চয় আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব, তুমি আল্লাহকে হিফাযত কর, তিনিও তোমার

৫২. বলুন, 'তোমরা আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন সরাসরি নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি[১]।'

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

হিফাযত করবেন, তুমি আল্লাহ্র হিফাযত কর, তুমি তাকে তোমার দিকে পাবে। যখন তুমি কোন কিছু চাইবে তখন তা চাইবে কেবল আল্লাহ্র কাছে। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন কেবল আল্লাহ্র সাহায্য চাইবে। আর জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকার করতে একত্রিত হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে সমর্থ হবে না, তবে শুধু ঐটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করতে ইচ্ছা করে, তবে শুধু ঐটুকু করতে পারবে যা আল্লাহ্ তোমার উপর লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর গ্রন্থটি শুকিয়ে গেছে।' [তিরমিযী: ২৫১৬]

(১) এ আয়াতে মুমিনদের এক বিরল অবস্থার উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করিনা বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মুমিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। আল্লাহ্ বলেন, বলুন, 'তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ'? । ইবন আব্বাস বলেন, সে দু'টি বিষয় হচ্ছে, বিজয় তথা গনীমত অথবা শাহাদাত। আমরা নিহত হলেও শাহাদাতে ধন্য হব, সেটা তো জীবন ও জীবিকার নাম। অথবা আল্লাহ্ আমাদের হাতে তোমাদেরকে অপমানিত করবেন। [তাবারী; কুরতুবী] অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কোন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলিমগনের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিস্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে। আর দুনিয়ার আযাব, হয়ত সে আযাব হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ধ্বংসকারী আযাব নাযিল হওয়ার মাধ্যমে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে পেয়ে বসেছিল। অথবা তিনি তোমাদের হত্যা করার অনুমোদন দিবেন। সুতরাং তোমরা শয়তানের ওয়াদার অপেক্ষায় থাকো, আমরাও আল্লাহ্র ওয়াদার অপেক্ষায় থাকলাম। [কুরতুবী]

৫৩. বলুন, 'তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের কাছ থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না; নিশ্চয় তোমরা হচ্ছ ফাসিক সম্প্রদায়।'

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর তাদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্যেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে[১] এবং সালাতে উপস্থিত হয় কেবল শৈথিল্যের সাথে, আর অর্থসাহায্য করে কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে[২]।

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾

(১) কারণ, ঈমান থাকা আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কাফের যত আমলই করুক না কেন ঈমান না থাকার কারণে সেটা আখেরাতে তার কোন কাজে আসবে না। কাফের যদি কোন ভাল কাজ করে, যেমন আত্মীয়দের দান করে, অসহায়কে সহায়তা দেয়, কাউকে বিপদ থেকে উত্তরণে সহায়তা করে, সে এ সমস্ত ভাল কাজের দ্বারা আখেরাতে উপকৃত হতে পারবে না। তবে দুনিয়াতেই তাকে সেটার কারণে পর্যাপ্ত রিযক দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইবন জুদ'আন, সে তো জাহেলিয়াতের যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করত, মিসকীনদের খাওয়াত, এগুলো কি তার কোন উপকার দিবে? তিনি বললেনঃ না, তার কোন উপকার দিবে না। কেননা, সে কোন দিন বলেনি, হে রব! কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও।' [মুসলিমঃ ২১৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন মুমিনের সামান্যতম সৎকাজও নষ্ট হতে দেন না। দুনিয়াতে সেটার বিনিময় দেন আর আখেরাতে তো তার জন্য প্রতিফল রয়েছেই। পক্ষান্তরে কাফের, তাকে তার প্রশংসনীয় কাজগুলোর বিনিময় দুনিয়াতে জীবিকা প্রদান করেন। অবশেষে যখন আখেরাতে পৌঁছবে, তখন তার এমন কোন কাজ থাকবে না যার প্রতিফল তিনি তাকে দেবেন।' [মুসলিমঃ ২৮০৮]

(২) আয়াতে মুনাফিকদের দুটি আলামত বর্ণিত হয়েছে। সালাতে অলসতা ও দান খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলিমদের প্রতি হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দুপ্রকার অভ্যাস থেকে দুরে থাকে। বরং তারা যেন সালাতে অত্যন্ত তৎপরতা ও আগ্রহের সাথে হাজির হয়, তাদের মধ্যে বিমর্ষভাব, অনীহা না থাকে। দানের ক্ষেত্রেও তারা যেন মন খুলে খুশী মনে একমাত্র আল্লাহ্র কাছে সওয়াবের আশা করে দান করে। কোনক্রমেই মুনাফিকদের মত না হয় [সা'দী]

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. কাজেই তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো এসবের দ্বারাই তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিতে চান। আর তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে কাফের থাকা অবস্থায়[১]।

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুত

(১) এ আয়াতে মুনাফিকদের জন্যে তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্যে পার্থিব জীবনেও এক বড় আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্যে নানা চেষ্টা তদবীর নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাযত আর না পরিবার পরিজনের সাথে আমোদ আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা ভাবনা প্রভৃতি হল একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপরে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয়না। পরিশেষে এ সকল অর্থ সম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাত ছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকেনা। বস্তুতঃ এসবই হল আযাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবা নিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখেরাতের আযাবের পটভূমি। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইগাসাতুল লাহফান: ১/৩৫-৩৬] এ আয়াতের সমর্থনে কুরআনের অন্যত্র আরও এসেছে, “আর আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না তার প্রতি, যা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আপনার রব-এর দেয়া জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।” [সূরা ত্বা-হা: ১৩১] আরও বলেন, “তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সহযোগিতা করছি, তার মাধ্যমে, তাদের জন্য সকল মংগল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা উপলব্ধি করে না” [সূরা আল-মুমিনূন: ৫৫-৫৬]

তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে।

৫৭. তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা লুকিয়ে থাকার কোন প্রবেশস্থল পেলে সেদিকেই পালিয়ে যাবে দ্রুততার সাথে।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদকা বন্টন সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে, তারপর এর কিছু তাদেরকে দেয়া হলে(১) তারা সন্তুষ্ট হয়, আর এর কিছু তাদেরকে না দেয়া হলে সাথে সাথেই তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. আর ভাল হত যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ

(১) আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ বন্টন করছিলেন, তখন যুল খুওয়াইসরা আত-তামীমী এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইনসাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুর্ভোগ তোমার, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে ছাড়ুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূল বললেন, তাকে ছেড়ে দাও; তার কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে যাদের সালাতের কাছে তোমরা তোমাদের সালাতকে, তাদের সাওমের কাছে তোমাদের সাওমকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর তূণীর থেকে বেরিয়ে যায়। ... আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বলেছেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। [বুখারী: ৬৯৩৩] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথাই বর্ণনা করছেন যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্টনের উপর আপত্তি উত্থাপন করত। তাদের এ আপত্তি বা সমালোচনা কোন সঠিক উদ্দেশ্য বা গ্রহণযোগ্য মতের উপর ভিত্তি করে ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু পাওয়া। কিছু দেওয়া হলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর কিছু না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এ অবস্থা বান্দার জন্য কাম্য হতে পারে না যে, তার সন্তুষ্টি ও ক্রোধ নির্ভর করবে তার দুনিয়ার চাহিদা বা খারাপ উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার উপর, বরং প্রত্যেকের উচিত তার চাহিদা হবে তার রবের সন্তুষ্টি অনুযায়ী। [সা'দী]

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

তাতে সন্তুষ্ট হত এবং বলত, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ্ আমাদেরকে দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূলও; নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই প্রতি অনুরক্ত।'

অষ্টম রুকূ'

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ

৬০. সদকা[১] তো শুধু[২] ফকীর,

(১) সাহাবা ও তাবেয়ীগনের ঐক্যমতে এ আয়াতে সেই ওয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা মুসলিমদের জন্যে সালাতের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদকারই খাত। হাদীস অনুযায়ী নফল সদকা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ব্যয় খাত ঠিক করে দিয়ে কারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তা বাতলে দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হুকুম মতেই যাকাতের বিলি বন্টন করেছেন নিজের খেয়াল খুশীমত নয়। এক হাদীসে এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। যিয়াদ ইবন হারিস আস-সুদায়ী বলেন, 'আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তার গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরেই প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিরত হোন আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। তারপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, 'তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা'। আমি আরয করলাম এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলিম হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সাহায্য চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জবাব দিলেন, সদকার ভাগ বাটোয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদকার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।' [আবুদাউদ: ১৬৩০; দারা কুতনী: ২০৬৩]

(২) আলোচ্য আয়াতের শুরুতে إِنَّمَا শব্দ আনা হয়। যার অর্থঃ কেবলমাত্র, শুধুমাত্র। তাই শুরু থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, সদকার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে আটটি খাতেই সকল ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা হবে, এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা যাবে না। [কুরতুবী] সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

মিসকীন[1] ও সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য[2], যাদের

প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদকার ক্ষেত্রেও কুরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বরং কোন কোন মুফাসসিরের তথ্য মতে কুরআনে যেখানে শুধু সদকা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদকা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। [কুরতুবী] আবার কতিপয় হাদীসে সদকা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, 'কোন মুসলিমের সাথে সৎ ও উত্তম কথা বলা সদকা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেওয়াও সদকা'। [মুসলিমঃ ১০০৯] 'কুপ থেকে নিজের জন্যে উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদকা।' [তিরমিযীঃ ১৯৫৬] এ হাদীসে সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। [কুরতুবী] ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথাঃ যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোশাক পরিচ্ছদ ও আসবাব পত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে। সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সেই নেসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। [কুরতুবী] অনুরূপ যার কাছে কিছু রূপা বা নগদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে সব মিলিয়ে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রুপার সমমূল্য হয় তবে সেও নেসাবের মালিক, তাকেও যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। কারণ সে ধনী ব্যক্তি। আর ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সদকা গ্রহণ জায়েয নয় ধনীর জন্য, অনুরূপভাবে শক্তিশালী উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্য' [আবু দাউদঃ ১৬৩৪; তিরমিযীঃ ৬৫২] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন শক্তিশালী লোককে সদকার জন্য দাঁড়াতে দেখে বললেন, 'তোমরা চাইলে আমি তোমাদের দেব, কিন্তু এতে ধনী এবং শক্তিশালী উপার্জনক্ষমের কোন হিস্যা নেই'। [আবু দাউদঃ ১৬৩৩]

(২) আমেলীনে সদকা অর্থাৎ সদকা সম্পৃক্ত কাজে নিযুক্ত কর্মী। এরা ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে বায়তুলমালের জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। [কুরতুবী] এরা যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে। এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের থেকে যাকাত ও অপরাপর

وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً

অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য[১], দাসমুক্তিতে[২], ঋণ ভারাক্রান্ত

সদকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে, "হে রাসূল! আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা গ্রহণ করুন।" [১০৩] উক্ত আয়াত মতে রাসূলের অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীরুল মুমেনীন বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর যাকাত ও সদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে "আমেলীন" বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেসব সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীসে এসেছে, 'ধনীদের জন্য সদকার অর্থ হালাল নয়, তবে পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই যদিও সে স্বদেশী ধনী। দ্বিতীয়তঃ সদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থশালী ব্যক্তি যার মজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি মূল্য আদায় করে গরীব মিসকীন থেকে সদকার মালামাল ক্রয় করে। পঞ্চমতঃ যাকে গরীব লোকেরা সদকার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে' [আবু দাউদ: ১৬৩৫]

(১) যাকাতের চতুর্থ ব্যয় খাত হল 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'। সাধারণত তারা তিন চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলিম, কিছু অমুসলিম। মুসলিমদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ক হয়। আর কেউ ছিল ধনী কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেই ছিল পরিপক্ক মুসলিম, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলিমদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না, বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া,দান ও সদ্ব্যবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টা ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহর বান্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুল কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদকার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) যাকাতের পঞ্চম ব্যয়খাত হলো, দাসমুক্তিতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা। আর তা হলো ঐ সমস্ত দাস যাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাদের মনিব তাদেরকে কিছু টাকা পয়সা দেয়ার চুক্তি করেছে। আর সে দাস তা পরিশোধ করতে পারছে না।

দের জন্য[1], আল্লাহ্‌র পথে[2] ও | مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠

(১) যাকাতের ষষ্ঠ ব্যয়খাত হল দেনাদার বা ঋণগ্রস্ত। আয়াতে বর্ণিত "গারেমীন" হলো "গারেম" এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার, [জালালাইন]। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, সে ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই "গারেম" বলা হয়, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে তার নিজ ও পরিবারের ব্যয় মেটানোর জন্য খরচ করতে গিয়ে এমন ঋণী হয়ে গেছে যে, সেটা শোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। [আইসারুত তাফাসীর] আবার কোন কোন ইমাম এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। [কুরতুবী] কোন পাপ কাজের জন্য যদি ঋণ করে থাকে-যেমন, মদ কিংবা নাজায়েয প্রথা অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না, যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা না হয়।

এখানে জানা আবশ্যক যে, ঋণগ্রস্থতা কয়েক কারণে হতে পারে। এক. মানুষের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্য, মীমাংসার জন্য কেউ কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে। যেমন, দু'দল লোকের মধ্যে সমস্যা লেগে গেছে, একজন লোক পয়সা খরচ করে দু'দলের সমস্যাটা সমাধান করে দেয়। এ ধরনের লোকের জন্য শরী'আতে যাকাতের টাকায় হিস্যা রেখেছে, যাতে করে মানুষ এ ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। দুই. যে ঋণগ্রস্থ হয় নিজের জন্য, তারপর ফকীর হয়ে যায়, তাকে তার ঋণগ্রস্থতা থেকে মুক্তির জন্য যাকাত থেকে দেয়া যেতে পারে। [বাগভী; সা'দী] প্রথম প্রকারের উদাহরণ যেমন হাদীসে এসেছে, কাবীসা ইবন মুখারিক আল-হিলালী বলেন, আমি একবার পরস্পর সম্পর্ক ঠিক রাখতে গিয়ে মাথার উপর ঋণের বিরাট বোঝা বহন করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আসি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমাদের কাছে অবস্থান কর, যাতে করে সদকা তথা যাকাতের মাল আসলে তোমাকে দিতে পারি। তারপর তিনি বললেন, হে কাবীসা! তিন জনের জন্যই কেবল চাওয়া জায়েয। এক. যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঋণের বোঝা বহন করেছে, তার জন্য চাওয়া জায়েয, যতক্ষণ না সে তা পাবে। তারপর তাকে চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। দুই. আর একজন যার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তারজন্যও কোন প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করা পর্যন্ত চাওয়া জায়েয। তিন. আর একজন লোক যাকে দারিদ্রতা পেয়ে বসেছে। তখন তার কাওমের তিনজন গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে যে, আল্লাহ্‌র শপথ! অমুক হত-দরিদ্র হয়ে পড়েছে। সে ব্যক্তিও জীবিকার ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত যাচঞা করতে পারে। এর বাইরে যত চাওয়া আছে সবই হারাম। [মুসলিম: ১০৪৪]

(২) সপ্তম যাকাতের ব্যয়খাত হলোঃ "ফি সাবীলিল্লাহ"। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর মর্ম সেসব গাযী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। এ জাতীয় কাজই নির্ভেজাল দ্বীনী খেদমত ও ইবাদাত। কাজেই যাকাতের মাল

মুসাফিরদের[১] জন্য। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত[২]। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[৩]।

৬১. আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো কর্ণপাতকারী।' বলুন, 'তাঁর কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শুনে।'

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۚ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ

এতে ব্যয় করা খুব জরূরী। [কুরতুবী] এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি ইবাদত আদায় করার জন্যই এ ব্রত গ্রহণ করে থাকে। [সা'দী]

(১) যাকাতের অষ্টম ব্যয়খাত হলোঃ মুসাফির। যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশ ফিরে যেতে সমর্থ হবে। [কুরতুবী; সা'দী]

(২) অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকার কল্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না।

(৩) এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, এ আটটি খাত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। তিনি জানেন বান্দাদের স্বার্থ কোথায় আছে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, এ আটটি খাতকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক. এমন কিছু খাত আছে যেগুলোতে ঐ লোকদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে ও উপকারার্থে দেয়া হচ্ছে, যেমন, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি। দুই. এমন কিছু খাত আছে যেগুলোতে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজনে, ইসলামের উপকারার্থে, কোন ব্যক্তির প্রয়োজনার্থে নয়। যেমন, মুআল্লাফাতি কুলূবুহুম, আমেলীন ইত্যাদি। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের সাধারণ ও বিশেষ যাবতীয় প্রয়োজনীয় পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। যদি ধনীগণ শরী'আত মোতাবেক তাদের যাকাত প্রদান করত, তবে অবশ্যই কোন মুসলিম ফকীর থাকত না। তাছাড়া এমন সম্পদও মুসলিমদের হস্তগত হতো যা দিয়ে তারা মুসলিম দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে সমর্থ হতো। আর যার মাধ্যমে তারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে পারত এবং যাবতীয় দ্বীনী স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হতো। [সা'দী]

اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করে; আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তিনি তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি(১)।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا

৬২. তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করে(২)। অথচ আল্লাহ্‌ ও তাঁর

---

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, নাবতাল ইবনুল হারেস রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বসত। তারপর সেখানে যা শুনত তা মুনাফিকদের কাছে পাচার করত। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ সে তাদের কাছে গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে বলেছিল যে, তিনি কান কথা বেশী শুনেন। তিনি সবার কথা শুনেন। [তাবারী] অথবা তারা বলতে চেয়েছিল যে, আমরা যা বলছি তা যদি মুহাম্মাদের কানে যায়, তারপরও কোন অসুবিধা নেই, কারণ তার কাছে গিয়ে ওজর পেশ করব। আর তিনি সব কথাই শুনে থাকেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। এভাবে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন খারাপ মন্তব্য করতে লাগল যে, তিনি সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম নন। অথচ তিনি তাদের হিদায়াতের জন্যই প্রেরিত। এটা নিঃসন্দেহে রাসূলকে কষ্ট দেয়া। [সা'দী]
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জবাবে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল কথা শুনেন। তার কথাগুলো ঈমানদারদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করেন। [তাবারী] শানকীতী বলেন, আয়াতে সে সমস্ত লোকদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত ও তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সেখানে এসেছে, "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি" [সূরা আল-আহযাব: ৫৭]

(২) কাতাদা বলেন, মুনাফিকদের এক লোক বলেছিল যে, যদি মুহাম্মদ যা বলে তা সত্য হয় তবে তারা গাধার চেয়েও অধম। একথা শুনে মুসলিমদের এক ব্যক্তি বলল যে, আল্লাহ্‌র শপথ, মুহাম্মাদ যা বলে তা সত্য, আর তুমি গাধার চেয়েও

مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

রাসূলই এর বেশী হকদার যে, তারা তাঁদেরকেই সন্তুষ্ট করবে[1], যদি তারা মুমিন হয়।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে[2] তার জন্য তো আছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে স্থায়ী হবে? এটাই চরম লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ

৬৪. মুনাফেকরা ভয় করে, তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না নাযিল হয়, যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে[3]!

অধম। মুসলিম লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি জানাল। তিনি মুনাফিকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ কথাটি তুমি কেন বলেছ? সে লা'নত দিতে লাগল এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলল যে, সে তা বলেনি। তখন মুসলিম লোকটি বলল, হে আল্লাহ্! আপনি সত্যবাদীকে সত্যায়ন করুন আর মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র নামে শপথ করে সন্তুষ্ট করতে চায়। অথচ তাদের উচিত ঈমান এনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করবে। [মুয়াসসার] কারণ একজন মুমিনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা। মুমিন এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয় না। তারা যেহেতু সেটা করছে না সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, তারা ঈমানদার নয়। [সা'দী]

(২) তারা যেহেতু রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, মুমিনদের কাছে মিথ্যা শপথ করে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে, সুতরাং তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় নেমেছে। আর যারাই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় নামে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আর তা নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিত জীবন। [সা'দী;মুয়াসসার]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে জানাচ্ছেন যে, মুনাফিকরা এ ভয়ে থাকে যে, কখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন সূরা নাযিল হয়ে তাদের অপমানিত করবে, তাদের মনের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করে দিবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিলেন যে, তারা যতই গোপন করুক না কেন আল্লাহ্ তা অবশ্যই বের করে দেবেন। [আদওয়াউল বায়ান] মুজাহিদ বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলে তারপর ভাবতে থাকে যে, এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ্ আমাদের এ গোপন

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

বলুন, 'তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা বের করে দেবেন।'

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে[১]?'

কথা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন? কাতাদা বলেন, তাদের মনের গোপন কথাগুলো বলে দিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে অপমানিত করলেন। আর এ জন্যই এ সূরার অপর নাম আল-ফাদিহা বা অপদস্থকারী বা অপমানকারী [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও তাদের এ আশঙ্কার কথা আল্লাহ্ জানিয়েছেন। যেমন, "যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না, আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে জানেন।" [সূরা মুহাম্মাদঃ ২৯-৩০] অন্য আয়াতে তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবের কথা অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে।" [সূরা আল-মুনাফিকুন:৪]

(১) যায়দ ইবন আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক মুনাফিক আওফ ইবন মালিককে তাবুকের যুদ্ধে বলে বসল: আমাদের এ কারীসাহেবগণ (রাসূল ও সাহাবায়ে কিরামদেরকে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে উপহাস করে দেয়া নাম) উদরপূর্তির প্রতি বেশী আগ্রহী, কথাবার্তায় মিথ্যাচার, আর শত্রুর সামনে সবচেয়ে ভীরু। তখন আওফ ইবন মালিক বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি মুনাফিক, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানাব। আওফ তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাতে গেলে দেখতে পেলেন কুরআন তার আগেই সেটা জানিয়েছে। যায়দ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর বলেন, তখন আমি ঐ মুনাফিক লোকটিকে দেখতে পেলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর পেছনের দিকে ঝুলে ছিল, পাথর তার উপর ছিটে এসে পড়ছিল, সে বলছিল, আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম'। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছিলেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?' [তাবারী]

৬৬. 'তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব---কারণ তারা অপরাধী[১]।'

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

নবম রুকূ'

৬৭. মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী একে অপরের অংশ, তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে, তারা তাদের হাতগুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন; মুনাফেকরা তো ফাসিক।

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. মুনাফেক পুরুষ, মুনাফেক নারী ও কাফেরদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি;

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. তাদের মত, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ

---

(১) ইকরিমা বলেন, মুনাফিকদের একজনকে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক ক্ষমা করলে সে বলল, হে আল্লাহ্! আমি একটি আয়াত শুনতে পাই যাতে আমাকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যা আমার চামড়া শিহরিত করে এবং অন্তরে আঘাত করে। হে আল্লাহ্! সুতরাং আমার মৃত্যু যেন আপনার রাহে শাহাদাতের মাধ্যমে হয়। কেউ যেন বলতে না পারে যে, আমি অমুককে গোসল দিয়েছি, তাকে কাফন দিয়েছি, তাকে দাফন করেছি। ইকরিমা বলেন, সে ইয়ামামাহ এর যুদ্ধে মারা গেল, কিন্তু অন্যান্য মুসলিমদের লাশ পাওয়া গেলেও তাকে পাওয়া যায় নি। [ইবন কাসীর]

مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑥٩

চেয়ে বেশী। অতঃপর তারা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে; আর তোমরাও তোমাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের ভাগ্যে যা ছিল তা ভোগ করেছে। আর তোমরাও সেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় তারা লিপ্ত ছিল[১]। ওরা তারাই যাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

---

(১) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, এ লোকগুলো সে রকম আযাবই পেয়েছে যে রকম আযাব তাদের পূর্ববর্তীরা পেয়েছে। অথচ তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও বেশী সম্পদ ও সন্তান সন্ততির অধিকারী ছিল। অতঃপর তারা ভোগ করেছে তাদের অংশ। হাসান বসরী বলেন, এখানে অংশ বলে দ্বীন বোঝানো হয়েছে। তারা তাদের দ্বীনের অংশ অনুসারে আমল করে চলেছে। যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের দ্বীনের অংশ অনুসারে আমল করে চলছ। অনুরূপভাবে তোমরা মিথ্যা ও অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছ যেমনি তারা মিথ্যা ও অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। [ইবন কাসীর] ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, এর অর্থ তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তোমরাও তা-ই করছ। আর তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দ্বীনের মধ্যে না জেনে কথা বলেছে, তোমরাও তা বলছ। তোমাদের ও তাদের পথভ্রষ্টতার ধরণ একই। কারণ দ্বীন নষ্ট হয় দু'ভাবে। কখনও বাতিল বিশ্বাস ও সে অনুসারে কথা বলার মাধ্যমে, আবার কখনও সঠিক জ্ঞানের বাইরে চলে বাতিল আমল করার মাধ্যমে। প্রথমটি হচ্ছে, বিদ'আত। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, খারাপ আমল। প্রথমটি সন্দেহ থেকে আসে আর দ্বিতীয়টি আসে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে। বর্তমান যুগের ফাসেক লোকরাও পূর্ববর্তী লোকদের মতই এ দু'টিতে লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। [ইগাসাতুল লাহফান: ২/১৬৬-১৬৭] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মপদ্ধতি অনুসরণ করবে, প্রতি গজে গজে প্রতি হাতে হাতে তাদের অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা 'দব' তথা ষাণ্ডার গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়? তিনি বললেন, তবে আর কারা? [বুখারী: ৩৪৫৬]

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তাদের পূর্ববর্তী নূহ, ‘আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদ্ইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের কাছে আসেনি? তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন। অতএব, আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের উপর যুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭১. আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু[১], তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

৭২. আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের---যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আরও (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের[২]। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনগণকে তুমি দেখবে তাদের দয়া, ভালবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে এক শরীরের ন্যায়। যার এক অংশে ব্যাথা হলে তার সারা শরীর নির্ঘুম ও জ্বরে ভোগে। [বুখারী: ৬০১১; মুসলিম: ২৫৮৬]

(২) জান্নাতের বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসেও এসেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতীরা জান্নাতের কামরাগুলোকে এমনভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশে তারকা দেখতে পাও”। [বুখারী: ৬৫৫৫] অন্য হাদীসে

সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই মহাসাফল্য।

দশম রুকূ'

৭৩. হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন[১], তাদের

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ

এসেছে, 'জান্নাতে এমন কিছু কক্ষ আছে যে কক্ষের ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায় আর বাইরে থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা এগুলো তো তাদের জন্য তৈরী করেছেন, যারা অপরকে খাদ্য খাওয়ায়, নম্রভাবে কথা বলে, নিয়মিত সাওম পালন করে এবং যখন মানুষ ঘুমন্ত, তখন সালাত আদায় করে।' [মুসনাদ আহমাদ: ৫/৩৪৩] অন্য হাদীসে এসেছে, "জান্নাতের প্রাসাদের এক ইট হবে রৌপ্যের, আরেক ইট হবে স্বর্ণের। ..."। [মুসনাদ আহমাদ: ২/৩০৪] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মুমিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি তাবু থাকবে, যা হবে মাত্র একটি ফাঁপা মুক্তা, আর যার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। মুমিন ব্যক্তির জন্য তাতে পরিবার-পরিজন থাকবে, সে তাদের কাছে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু তাদের একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না।" [বুখারী: ৪৮৭৯, মুসলিম: ২৮৩৪] আর আরশের অধিক নিকটবর্তী, জান্নাতের সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানের নাম ওয়াসীলা। এটাই জান্নাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শোন, তবে সে আযানের জবাব দাও। অতঃপর আমার উপর সালাত পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার সালাত পাঠ করেন। তারপর আমার জন্য তোমরা 'ওয়াসীলা'র প্রার্থনা কর। আর ওয়াসীলা হল জান্নাতের এমন এক মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যা কেবলমাত্র একজন বান্দা ছাড়া আর কারও উপযুক্ত নয়। আর আমি আশা করি, আমি-ই সে বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলার প্রার্থনা করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাবে।" [মুসলিম: ১৩৮৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবে, 'হে জান্নাতবাসীরা!' তখন তারা বলবে, হে রব আমরা হাজির, আমরা হাজির, আর সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। তখন তিনি বলবেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট?' তখন তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা আপনার কোন সৃষ্টিকেই দেন নি? তখন তিনি বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেব না?' তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম কী হতে পারে? তখন তিনি বলবেন, 'আমি আমার সন্তুষ্টি তোমাদের উপর অবতরণ করাব; এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না'।" [বুখারী: ৬৫৪৯, মুসলিম: ২৮২৯]

(১) আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া

عَلَيْهِمْ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

প্রতি কঠোর হোন[১]; এবং তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۗ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

৭৪. তারা আল্লাহ্র শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি[২]; অথচ তারা তো কুফরী

হয়েছে। [তাবারী] প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট যে তাদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে জিহাদ করতে হবে, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কিভাবে করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাদের বিরুদ্ধেও হাত দিয়ে, সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে, তাতেও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে তাদেরকে দেখলে কঠোরভাবে তাকানো। [বাগভী] ইবন আব্বাস বলেন, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জিহাদ এবং কোমলতা পরিত্যাগ। [তাবারী] অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। দাহহাক বলেন, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হচ্ছে, কথায় কঠোরতা অবলম্বন। কাতাদা বলেন, এক্ষেত্রে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তাদের উপর শরী'আতের হুকুম জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। [বাগভী]

(১) এখানে বর্ণিত غلظة এর প্রকৃত অর্থ হল, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رأفة এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল কোমলতা ও করুণা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলিমরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের সুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে তাবুক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দূরাবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন।

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কুফরী করেছে; আর তারা এমন কিছুর সংকল্প করেছিল যা তারা পায়নি। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা

জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে 'মিম্বরে-নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলেছে। আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দো'আ করেন যে, হে আল্লাহ্ আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত মুসলিম 'আমীন' বললেন। তারপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে-আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়। জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এখন স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবন কায়েস যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাওবাহ্ করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্র নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তাওবাহ্ করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার তাওবাহ্ কবুল করে নেন এবং তারপর তিনি নিজ তাওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়। [বাগভী]

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরণের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। যেমন, তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে জিবরীলে আমীন তাকে খবর দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

نَصِيْرٍ

করেছিল[১]। অতঃপর তারা তাওবাহ্ করলে তা তাদের জন্য ভাল হবে, আর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন; আর যমীনে তাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

৭৫. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা অবশ্যই সদকা দেব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

৭৬. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا

৭৭. পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে মুনাফেকী রেখে দিলেন[২] আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত,

---

(১) অনুরূপ কথাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট তারপর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। তোমরা ছিলে বিভক্ত, তারপর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। আর তোমরা ছিলে দরিদ্র, আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে ধনী করেছেন। তারা যখনই রাসূলের মুখ থেকে কোন কথা শুনছিল তখনই বলছিল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দয়াই বেশী' [বুখারী: ৪৩৩০; মুসলিম:১০৬১]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তাওবাহ্ করার ভাগ্যও হবে না। হাদীসে মুনাফিকদের আলামত বর্ণিত হয়েছে, "মুনাফিকের আলামত হচ্ছে, তিনটি, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে।" [বুখারী: ৩৩; মুসলিম: ৫৯]

يَكْذِبُوْنَ۝

তারা আল্লাহ্‌র কাছে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল সে কারণে।

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۝

৭৮. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ গায়েবসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ۝

৭৯. মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে[১]। অতঃপর তারা তাদের নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন[২]; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি

(১) আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন সদকার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা পরস্পর অর্থের বিনিময়ে বহন করতাম। তখন আবু আকীল অর্ধ সা' নিয়ে আসল। অন্য একজন আরও একটু বেশী আনল। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল, আল্লাহ্‌ এর সদকা থেকে অবশ্যই অমুখাপেক্ষী, আর দ্বিতীয় লোকটিও দেখানোর জন্যই এটা করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৬৬৮]

(২) আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক কাফের মুনাফিকদের উপহাসের বিপরীতে উপহাস করা কোন খারাপ গুণ নয়। তাই তাদের উপহাসের বিপরীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপহাস হতে পারে। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি] এ উপহাস সম্পর্কে কোন কোন মুফাসসির বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের পক্ষ নিয়ে কাফের ও মুনাফিকদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন। তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এভাবেই তিনি তাদের সাথে উপহাস করবেন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে তাদের উপর বদদো'আ করা হয়েছে যে, যেভাবে তারা মুমিনদের সাথে উপহাস করেছে আল্লাহ্‌ও তাদের সাথে সেভাবে উপহাস করুন। [ফাতহুল কাদীর]

সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না[১]।

كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٨٠

এগারতম রুকূ‘

৮১. যারা পিছনে রয়ে গেল[২] তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ[৩] করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপছন্দ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۝٨١

---

(১) তাফসীরবিদগণ বলেন, এ আয়াত তখন নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন মুনাফিকের জন্য ক্ষমার দো‘আ করছিলেন। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতে উল্লেখিত مخلفون শব্দটি مخلف এর বহুবচন। অর্থ– ‘পরিত্যক্ত’। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা ও পিছনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কারণ তারা হয় মুসলিমদের ক্ষতি করত না হয় তাদের অন্তর অপবিত্র হওয়ার কারণে জিহাদের সৌভাগ্য তাদের নসীব হয়নি। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কাজেই এরা জিহাদ ‘বর্জনকারী’ নয়; বরং জিহাদ থেকে ‘বর্জিত’। কারণ, রাসলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন। [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে উল্লেখিত خلاف শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে, একঃ পেছনে বা পরে, আবু ওবায়দা রহমাতুল্লাহ আলাইহি এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিক পক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। দ্বিতীয় অর্থ এক্ষেত্রে خلاف অর্থ مخالفة তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ এরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও এ কথাই বুঝাল যে, “গরমের সময়ে জিহাদে বেরিয়ো না”। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর; জালালাইন; ফাতহুল কাদীর]

করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' বলুন, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম[১],' যদি তারা বুঝত!

৮২. কাজেই তারা অল্প কিছু হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে[২] সেসব কাজের প্রতিফল হিসেবে যা কিছু তারা করেছে।

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

---

(১) একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচন্ড গরম পড়ছিল। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেছেন ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। মূলত এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনে সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী? জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, 'তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ' বলা হল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতটুকুই তো যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ আগুনের চেয়েও সেটা ঊনসত্তর গুণ বেশী, প্রতিটির উত্তাপই এর মত।' [বুখারী: ৩২৬৫; মুসলিম: ২৮৪৩] জাহান্নামের আগুনের আরও আন্দাজ পাওয়া যায় এ হাদীস থেকে, যাতে বলা হয়েছে, 'সবচেয়ে হাল্কা আযাব কিয়ামতের দিন যার হবে, তার আগুনের দুটি জুতা ও পিতা থাকবে, কিন্তু তার উত্তাপে তার মগজ এমনভাবে উৎরাতে থাকবে যেমন পাতিল উনুনের তাপে উতরায়। সে জাহান্নামীদের কাউকে তার চেয়ে বেশী শাস্তিপ্রাপ্ত মনে করবে না। অথচ সে সবচেয়ে হাল্কা আযাবপ্রাপ্ত।' [বুখারী: ৬৫৬২; মুসলিম: ২১৩]

(২) আয়াতের শব্দার্থ করলে "তারা যেন কম হাসে এবং বেশী বেশী কাঁদে" এ বাক্যটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছে যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে।[বাগভী; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতের তফসীরে ইবন আব্বাস থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে "দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। তারপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।" [ইবন কাসীর]

৮৩. অতঃপর আল্লাহ্ যদি আপনাকে তাদের কোন দলের কাছে ফেরত আনেন এবং তারা অভিযানে বের হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন আপনি বলবেন, 'তোমরা তো আমার সাথে কখনো বের হবে না[১] এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে; কাজেই যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসেই থাক।'

فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ أَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ

(১) অর্থাৎ এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জিহাদে অংশগ্রহনের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জিহাদে অংশগ্রহনের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহন করতে দেয়া না হয়। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদেরকে অনুরূপ ভাল কাজে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের সংগে যেতে দাও।' তারা আল্লাহ্‌র বাণী পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সংগী হতে পারবে না। আল্লাহ্ আগেই এরূপ ঘোষণা করেছেন।" [সূরা আল-ফাতহ: ১৫] কারণ, তাদের এক অপরাধ অন্য অপরাধকে ডেকে এনেছে, আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "আর তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি, তেমনি আমরাও তাদের অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পাল্টে দেব এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব" [সূরা আল-আন'আম: ১১০]

عَلٰى قَبْرِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না (১); তারা তো আলাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং ফাসেক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ্ তো এগুলোর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; আর তারা কাফের থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করে(২)।

---

(১) এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফেরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যেয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুলাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম আর কোন মুনাফিকের জানাযায় হাজির হতেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াতেন না। [ইবন কাসীর] আবু কাতাদা বলেন, রাসূলুলাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে যখন কোন জানাযা হাজির হতো, তখন তিনি তার সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞেস করতেন, তারা যদি ভালো বলে সত্যয়ন করত তখন তিনি তার উপর সালাত আদায় করতেন। পক্ষান্তরে যদি তারা তার সম্পর্কে অন্য কিছু বলতো, তখন তিনি বলতেন, তোমরা এটাকে নিয়ে কি করবে কর, তিনি নিজে সালাত আদায় করতেন না।[মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৯৯] অথচ যদি ঈমানদার হতেন, তাহলে রাসূলুলাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম তার জন্য দো'আ করার জন্য কবরের পাশে দাঁড়াতেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুলাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, যে কেউ জানাযার সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে তার জন্য এক কীরাত, আর যে কেউ সালাত শেষ হওয়ার পর দাফন পর্যন্ত থাকবে তার জন্য দুই কীরাত। বলা হল, কেমন দুই কীরাত? তিনি বললেন, তার ছোটটি ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য। [বুখারী: ১৩২৫; মুসলিম: ৯৪৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুলাহ্ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম যখন দাফন শেষ করতেন, তখন তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও, আর তার জন্য স্থিতি বা দৃঢ়তার জন্য দো'আ কর; কেননা তাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে।' [আবুদাউদ: ৩২২১]

(২) আয়াতে সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকেছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলিমদের ধারণা হতে পারত

৮৬. আর 'আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর'---এ মর্মে যখন কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তারা আপনার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদেরকে রেহাই দিন, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সাথেই থাকব ।'

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. তারা অন্তঃপুর বাসিনীদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করেছে এবং তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দেয়া হলো; ফলে তারা বুঝতে পারে না ।

رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন

لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟

যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে? এর উত্তরে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন- সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন রহ্‌মত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাব বিশেষ । আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই । দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন-সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা- ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না । আরাম আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে । এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন-সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে । তারা যখন মারা যায় তখনো এগুলোর ভালবাসা তাদের অন্তরে বেশী থাকার কারণে তাদের মৃত্যু হলেও সম্পদ হারানোর কারণে ভীষণ কষ্টে থাকে । এ কারণেই কুরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُم بِهَا বলা হয়েছে । আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত ধন সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান । সুতরাং এ কথা কক্ষনো ভাবা যাবে না যে, তাদেরকে এগুলো দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত করছেন । বরং এগুলো দিয়ে তিনি তাদেরকে অপমানিত করেছেন । [সা'দী; ইগাসাতুল লাহফান]

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে; আর তাদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৮৯. আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে; এটাই মহাসাফল্য।

বারতম রুকূ'

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৯০. আর মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করতে আসল যেন এদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল, তারা বসে রইল, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে অচিরেই তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে[১]।

---

(১) আয়াতের অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, এসব বেদুইন যাযাবরদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। প্রথমত, যারা ছল-ছুতা পেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। [ইবন কাসীর]
আল্লামা সা'দী বলেন, আয়াতের অর্থ, যারা রাসূলের সাথে বের হওয়ার ব্যাপারটি গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং বের হতে কসুর করেছে, তাদের অসভ্যতা ও লজ্জাহীনতার কারণে এবং তাদের দুর্বল ঈমানের কারণে, রাসূলের কাছে এসে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল। কিন্তু যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা মনে করেছিল তারা সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে বসে রইল, অব্যাহতি নেয়াও ছেড়ে দিল। অথবা আয়াতে 'ওজর পেশকারীরা' বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সত্যিকার অর্থেই ওজর ছিল। তারা রাসূলের কাছে ওজর পেশ করার জন্য এসেছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, কেউ ওজর পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। আর যারা অভিযানে

৯১. যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়(১)। মুহসিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ নেই; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

৯২. আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা আপনার কাছে বাহনের জন্য আসলে আপনি বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না'; তারা অশ্রুবিগলিত চোখে ফিরে গেল, কারণ তারা খরচ করার মত কিছুই

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

বের হওয়ার আবশ্যকতা সংক্রান্ত ঈমানের দাবীতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল তারা বসেই রইল, বের হওয়ার ব্যাপারে কোন কাজ করল না। [সা'দী]

(১) এখানে সে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলিমদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপরাগতার দরুণ জিহাদে অংশ গ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপরাগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জিহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুতঃ সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জিহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপরাগতার কথা জানিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক। তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে আয়াতে একটি শর্ত দেয়া হয়েছে যে তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হিতাকাঙ্খী হতে হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হিতাকাঙ্খাকেই দ্বীন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, দ্বীন হচ্ছে, নসীহত বা হিতাকাঙ্খা, দ্বীন হচ্ছে, হিতাকাঙ্খা, দ্বীন হচ্ছে, হিতাকাঙ্খা, আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম ইমামদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য। [মুসলিম: ৫৫]

পায়নি[১]।

৯৩. যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছিল; আর আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন, ফলে তারা জানতে পারে না।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪. তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে[২]। বলুন, 'তোমরা অজুহাত

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا

(১) আলোচ্য আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের অপারগতা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও যুদ্ধে বের হওয়ার পর যারা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে আসতে পারেনি তাদের ব্যাপারটি মনে রাখার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মদীনাতে এমন একদল লোক রয়েছে, তোমরা যে উপত্যকাই অতিক্রম কর না কেন, যে জায়গায়ই সফর কর না কেন তারা তোমাদের সাথে আছে। তারা বলল, তারা তো মদীনায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদেরকে ওযর আটকে রেখেছে।' [বুখারী: ২৮৩৯; মুসলিম: ১৯১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তারা তোমাদের সাথে সওয়াবে শরীক হবে। অসুস্থতা তাদেরকে আটকে রেখেছে' [মুসলিম: ১৯১১; ইবন মাজাহ: ২৭৬৫] এ আয়াতের পরে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে।

(২) আব্দুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালেক বলেন, আমি কা'ব ইবন মালেককে তাবুকের যুদ্ধে পিছিয়ে থাকা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র শপথ! ঈমান আনার পরে আল্লাহ্ আমার উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্য কথা বলার মত নে'আমত আর অন্য কিছু দেন নি। যখন অপরাপর মিথ্যুকরা মিথ্যা কথা বলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যখন তার কাছে ওহী নাযিল হয়েছিল এ বলে যে, তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে অচিরেই তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর। কাজেই তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতঃপর তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তো ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। [বুখারী: ৪৬৭৩]

اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না; অবশ্যই আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। তারপর গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে অতঃপর তোমরা যা করতে, তা তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন(১)।'

سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে অচিরেই তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপেক্ষা কর(২)। কাজেই

---

(১) এ আয়াতে সে সব লোকদের আলোচনা করা হচ্ছে, যারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফিকরা ওযর–আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। [ফাতহুল কাদীর] বস্তুতঃ ঘটনাও তাই ঘটেছিল। এ আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যখন এরা আপনার কাছে ওযর আপত্তি পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, মিথ্যা ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন রকম ওযর আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তবে এখনও অবকাশ রয়েছে যেন তারা মুনাফিকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলিম হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন ধরনের হয়। যদি তোমরা তাওবাহ্ করে নিয়ে সত্যিকার মুসলিম হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোন উপকারই সাধন করবে না। [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম

তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল।

৯৬. তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতঃপর তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ তো ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না[১]।

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭. আ'রাব[২] বা মরুবাসীরা কুফরী ও মুনাফেকীতে শক্ত; এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার অধিক উপযোগী[৩]। আর আল্লাহ্

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, আপনি যেন তাদের জিহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সেজন্য যেন কোন ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। অর্থাৎ আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভর্ৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ, ভর্ৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(১) এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলিমদেরকে রাযী করাতে চাইবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরী ও মুনাফিকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে রাযী হবেন? আর ঈমানদাররাই বা কি করে রাযী হতে পারে, যখন ঈমানদাররা সেটাতেই রাযী হয়ে থাকে যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল রাযী? [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) أعراب শব্দটি عرب শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি শব্দ পদ বিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একজন বুঝাতে হলে أعرابي বলা হয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতে মরুবাসী বেদুঈনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও

সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯৮. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তা জরিমানা গণ্য করে এবং তোমাদের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। তাদের উপরই হোক নিকৃষ্টতম বিপর্যয় [১]। আর আল্লাহ্

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

মুনাফিকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশী কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা এলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে অবস্থান করে। ফলে এরা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কুরআন তাদের সামনে আছে, না তার অর্থ মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে, বিশেষ করে যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই কাতাদা বলেন, এখানে রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] এক হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'যে কেউ মরুবাসী হবে সে অসভ্য হবে, যে কেউ শিকারের পিছনে ছুটবে সে অন্যমনস্ক হবে, আর যে কেউ ক্ষমতাশীনদের কাছে যাবে সে ফিৎনায় পড়বে।" [আবুদাউদ: ২৮৫৯] আর যেহেতু অসভ্যতা বেদুঈনদের সাধারণ নিয়ম, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকে কোন নবী-রাসূল পাঠান নি। আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা আপনার আগে কেবল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকে রাসূল বানিয়েছিলাম" [সূরা ইউসুফ: ১০৯] অন্য হাদীসে এসেছে, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু হাদীয়া দেয়। তিনি তাকে রাজী করতে দ্বিগুণ প্রদান করেন। তখন তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, হাদীয়া শুধু কুরাইশী অথবা সাকাফী অথবা আনসারী বা দাওসী থেকেই নেব।' [তিরমিযী: ৩৯৪৫] কারণ এ গোত্রগুলো লোকালয়ে বাস করার কারণে তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতেও এ সমস্ত বেদুঈনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত, জিহাদ প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য সালাতও পড়ে নেয় এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলিমদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে থাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উত্তরে বলছেন, তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত। মুমিনদের

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৯. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রাসূলের দো'আ লাভের উপায় গণ্য করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপায়; অচিরেই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন(১)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু(২)।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

জন্য রয়েছে তাদের শত্রুদের বিপরীতে উত্তম ফলাফল। [দেখুন, আইসারুত তাফাসীর; সা'দী]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সে সব বেদুঈনের আলোচনা সংগত মনে করেছেন যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলিম। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুঈনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে যাকাত-সদকা দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো'আ প্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে। ইবন আব্বাস বলেন, এখানে ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ বলে রাসূল তাদের জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন সেটা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাই। এক. বেদুঈনরাও শহরবাসীর মতই। তাদের মধ্যেও ভালো-খারাপ উভয় ধরনের লোক রয়েছে। সুতরাং তারা বেদুঈন হয়েছে বলেই তাদের দুর্নাম করা হয়নি। বরং তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ না জানাটাই তাদের নিন্দার কারণ। দুই. কুফর ও নিফাক অবস্থাভেদে বেশী, কম, কঠোর ও হাল্কা হয়ে থাকে। তিন. এ আয়াত দ্বারা ইলমের সম্মান বুঝা যাচ্ছে। যার ইলম নেই সে ক্ষতির অধিক নিকটবর্তী সে লোকের তুলনায়, যার কাছে ইলম আছে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তাদের নিন্দা করেছেন। চার. এ আয়াত থেকে আরও বুঝা যায় যে, উপকারী ইলম সেটাই যা মানুষের কাজে লাগে। যা থাকলে মানুষ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা জানতে পারে। যেমন, ঈমান, ইসলাম, ইহসান, তাকওয়া, সফলতা, আনুগত্য, সৎ, সুসম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞান। অনুরূপভাবে, কুফর, নিফাক, ফিসক, অবাধ্যতা, ব্যভিচার, মদ, সুদ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা; কেননা এগুলো জানলে আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলো মানা যায়, আর নিষেধকৃত বস্তুগুলো পরিত্যাগ করা যায়। পাঁচ. ঈমানদারের উচিত তার কর্তব্যকর্ম অত্যন্ত খুশীমনে আদায় করা। সে সবসময় খেয়াল রাখবে যে সে এগুলো করতে পেরে লাভবান, ক্ষতিগ্রস্ত নয়। [সা'দী]

তেরতম রুকূ‘

১০০. আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী[১] এবং যারা

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

---

(১) এ আয়াতে সাহাবাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা "সাবেকীন আওয়ালীন" বা 'প্রথম অগ্রগামী' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ "সাবেকীন আওয়ালীন কারা তা নির্ধারণে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

ক) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে "সাবেকীন আওয়ালীন" এর পরে ﴿مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ﴾ বাক্যে ব্যবহৃত مِن অব্যয়টি কারো কারো মতে تبعيض বা কিছু সংখ্যক বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ তাফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কেবলা পরিবর্তন কিংবা বদরযুদ্ধ অথবা বাইআতে রেদওয়ান অথবা মক্কা বিজয়ের পরে যারা মুসলিম হয়েছে তারা সবাই। তখন সাহাবাগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হবেন, এক) মুহাজেরীন ও আনসারদের মধ্যে যারা "সাবেকীন আওয়ালীন" বা ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে অগ্রবর্তী। দুই) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম। এ তাফসীর অনুসারে সাহাবাদের মধ্যে কারা "সাবেকীন আওয়ালীন বলে গণ্য হবেন এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মত রয়েছেঃ ১) কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে "সাবেকীন আওয়ালীন তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস ও কা'বার দিকে মুখ করে সালাত পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলিম হয়েছে তাদেরকে "সাবেকীন আওয়ালীন" গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব ও কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু– এর মত। [কুরতুবী] ২) আতা ইবন আবী রাবাহ্ বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী] ৩) ইমাম শা'বী রাহিমাহুল্লাহ্ এর মতে যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাই 'সাবেকীন আওয়ালীন'। [কুরতুবী] লক্ষণীয় যে, সবার নিকটই যারা কিবলা পরিবর্তনের আগে হিজরত করেছেন তারা নিঃসন্দেহে 'সাবেকীন আওয়ালীন'। আর যারাই বাই'আতে রিদওয়ান তথা হুদায়বিয়ার পরে হিজরত করেছেন তারা সবার মত অনুযায়ীই মুহাজির হোক বা আনসার সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে যারা হিজরত করেছে তারা সবাই সাবেকীনে আওয়ালীন। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/১৫৪-১৫৫]

খ) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি আংশিক বুঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। এ তাফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলিমদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম। পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত সবাই তাবেয়ীন বা তাদের অনুসারী [ফাতহুল কাদীর]

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে[১] আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন[২]। আর তিনি তাদের জন্য

(১) অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে অগ্রবর্তী মুসলিমদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। উপরোক্ত প্রথম তফসীর অনুযায়ী 'যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে বলে হুদায়বিয়ার সন্ধি পরবর্তী সে সমস্ত সাহাবা এবং মুসলিম, যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাদের অনসুরণ করবে। [কুরতুবী] আর উপরোক্ত দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলিমগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পারিভাষিকভাবে 'তাবেয়ী' বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কেয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলিমও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। যদি দুনিয়াতে তাদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। এর প্রমাণ হলো কুরআন করীমের এ আয়াত। এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে বলেছেনঃ ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ﴾ "যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে"। সুতরাং তাবেয়ীনদের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের পরিপূর্ণ সুন্দর অনুসরণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য। এ ব্যাপারে আরও প্রমাণ হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ ﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ অবশ্যই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের থেকে, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে বাই'আত হচ্ছিল"। [সূরা আল-ফাত্হঃ ১৮]। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মুজাদালাহ্র ২২ নং আয়াতেও সাহাবাদের প্রশংসা করে তাদের উপর সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে আরো স্পষ্ট দলীলের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্র বাণীঃ ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ 'হুসনা' বা সবচেয়ে ভাল পরিণামের ওয়াদা করেছেন"। [সূরা আন-নিসাঃ ৯৫]। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেনঃ ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ "তোমাদের মধ্যে

তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।

১০১. আর মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা মুনাফেকীতে চরমে পৌঁছে গেছে। আপনি তাদেরকে জানেন না[1]; আমরা তাদেরকে জানি। অচিরেই আমরা তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব তারপর তাদেরকে মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۗ لَا تَعْلَمُهُمْ ۗ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۗ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০২. আর অপর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে; আল্লাহ্ হয়ত

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۗ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

যারা ফাতহ তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের চেয়ে, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [সূরা আল-হাদীদঃ১০]। এতে বিস্তারিত এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হোন কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, "আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভংগিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন।" [সূরা মুহাম্মাদ:৩০] এবং বিভিন্ন হাদীসে যে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ১৪ বা ১৫ জনের নাম জানিয়ে দিয়েছেন সেটার সাথে এ আয়াতের কোন দ্বন্ধ নেই। কারণ, সূরা মুহাম্মাদের আয়াতে তাদের চিহ্ন বলে দেয়া উদ্দেশ্য, সবাইকে জানা নয়। অনুরূপভাবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যাদের নাম জানিয়েছেন তা দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হচ্ছে না যে, তিনি সবার নাম ও পরিচয় পূর্ণভাবে জানতেন। [ইবন কাসীর]

তাদেরকে ক্ষমা করবেন[1]; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

(১) যে দশজন মুমিন বিনা ওযরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, দশজন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এদের মধ্যে সাতজন নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা, যারা নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধেছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এরা আবু লুবাবা ও তার কিছু সাথী। যারা আপনার সাথে যাওয়া থেকে পিছনে ছিল। তারা নিজেদেরকে নিজেরা বেঁধে নিয়েছে এ বলে যে, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমাদের বাঁধন খুলে দিবেন এবং আমাদের ওযর কবুল করবেন, ততক্ষণ আমাদেরকে যেন কেউ না খুলে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমিও তাদের বাঁধন খুলব না, তাদের ওযর গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ নিজেই তাদের ছেড়ে দেন বা ওযর গ্রহণ করেন। তারা আমার থেকে বিমুখ ছিল, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে যায়নি। যখন তাদের কাছে এ কথা পৌঁছল তারাও বলল, আমরাও আল্লাহ্‌র শপথ নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ আমাদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা না করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ঘটনা যদিও সুনির্দিষ্ট তথাপি এর দাবী ব্যাপক। যারাই ভাল ও মন্দ আমলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য। যেমন হাদীসে এসেছে, সামুরা ইবন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, গত রাত্রে আমার কাছে দুজন এসেছেন, তারা আমাকে উঠালেন, তারপর আমাকে নিয়ে এমন এক নগরীতে নিয়ে গেলেন যার একটি ইট স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের। সেখানে আমরা কিছু লোক দেখলাম, যাদের শরীরের একাংশ এত সুন্দর যত সুন্দর তুমি মনে করতে পার। আর অপর অংশ এত বিশ্রী যত বিশ্রী তুমি মনে করতে পার। তারা দু'জন তাদেরকে বলল, তোমরা ঐ নালাতে গিয়ে পতিত হও। তারা সেখানে পড়ল। তারপর যখন তারা আমাদের কাছে আসল, দেখলাম যে, তাদের খারাপ অংশ চলে গেছে, অতঃপর ভীষণ সুন্দর হয়ে গেছে। তারা দু'জন আমাকে বলল, এটা হলো জান্নাতে আদন। আর ওখানেই আপনার স্থান। তারা দু'জন বলল, আর যাদেরকে আপনি অর্ধেক সুন্দর আর বাকী অর্ধেক বিশ্রী দেখেছেন, তারা হচ্ছেন,'যারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিশিয়ে ফেলেছে।' [বুখারী: ৪৬৭৪]

১০৩. আপনি তাদের সম্পদ থেকে 'সদকা' গ্রহণ করুন[১]। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দো'আ করুন। আপনার দো'আ তো তাদের জন্য প্রশান্তি কর[২]। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(১) মুফাসসিরগণ এ সাদকার প্রকৃতি নির্ধারণ নিয়ে দুটি মত দিয়েছেন। কারও কারও মতে, এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের তাওবাহ কবুল করা হয়েছে তাদের সদকা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সেটা ফরয বা নফল যে কোন সদকা হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এ মতের সমর্থনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন পূর্বোক্ত লোকদের তাওবা কবুল করা হয়, তখন তারা তাদের সম্পদ নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আমাদের সম্পদ, এগুলো গ্রহণ করে আমাদের পক্ষ থেকে সদকা দিন এবং আমাদের জন্য ক্ষমার দো'আ করুন। তিনি বললেন, আমাকে এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] তবে অধিকাংশের মতে, নির্দেশটি ব্যাপক, সবার জন্যই প্রযোজ্য। তবে সেটা ফরয সদকা বা যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [ফাতহুল কাদীর] এ মতের সমর্থনে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দো'আ করেছেন।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশ মোতাবেক সাহাবীদের মধ্যে কেউ যাকাত নিয়ে আসলে তাদের পরিবারের জন্য দো'আ করতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যাকাত নিয়ে আসলে তিনি বলতেন, 'আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা আলে ফুলান'। (হে আল্লাহ্! অমুকের বংশধরের জন্য সালাত প্রেরণ করুন) অতঃপর আমার পিতা তার কাছে যাকাত নিয়ে আসলে তিনি দো'আ করলেন, আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা আলে আবি আওফা'। হে আল্লাহ্! আবু আওফার বংশধরের জন্য সালাত প্রেরণ করুন) [বুখারী: ১৪৯৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দো'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সাল্লাল্লাহু আলাইকে ওয়া 'আলা যাওজিকে'। (আল্লাহ্ তোমার ও তোমার স্বামীর জন্য সালাত প্রেরণ করুন)। [আবু দাউদ: ১৫৩৩]

١٠٤. أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

১০৪. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ কবুল করেন এবং 'সদকা' গ্রহণ করেন[১], আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু?

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

১০৫. আর বলুন, 'তোমরা কাজ করতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।'

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

১০৬. আর আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কিছু সংখ্যক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হল---তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন[২]। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার সম্পূর্ণ পবিত্র সম্পদ থেকে কোন একটি খেজুর সদকা করে তখন সেটি আল্লাহ্ নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন, তারপর সেটা আল্লাহ্‌র হাতে এমনভাবে বেড়ে উঠে যে পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড হয়ে পড়ে।' [মুসলিম: ১০১৪]

(২) এখানে পূর্বোল্লেখিত দশ জন সাহাবী যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশ নেয়নি এবং মসজিদের স্তম্ভের সাথে নিজেদের বেঁধে নেয়নি এমন বাকী তিন জনের হুকুম রয়েছে। এ আয়াত নাযিল করে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। এক বছর পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা ছিল। তাদেরকে কি শাস্তি দেয়া হবে, নাকি তাদের তাওবা কবুল করা হবে তা তারা জানে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং তারা এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ্ করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়। যার আলোচনা অচিরেই আসবে।

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন[১], কুফরী ও মুমিনদের

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا

(১) মদীনায় আবু 'আমের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে নাসারা ধর্ম গ্রহণ করে আবু 'আমের পাদ্রী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু যার লাশকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও নাসারাদের দ্বীনের উপরই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু 'আমের তার কাছে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্তনা আসলো না। তদুপরি সে বলল, 'আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে।' সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলিমদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলিমদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। [বাগভী] কারণ, তখন এটি ছিল নাসারাদের কেন্দ্রস্থল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলিমদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। তারপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর। তারপর আমি রোম সম্রাটকে নিয়ে এসে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের উৎখাত করব।" [তাবারী]

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদীনার কুবা মহল্লায়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন- সেখানে সে মুনাফিকরা আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। [ইবন হিশাম, কুরতুবী; ইবন কাসীর প্রমুখ ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন] তারপর তারা মুসলিমদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা এক ওয়াক্ত সালাত সেখানে পড়াবে। এতে মুসলিমগণ নিশ্চিত হবে যে, পুর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ। এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করে যে, কুবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দূর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এমন প্রশস্তও নয় যে,

উপর(১), তাই আপনার সালাতের জন্য দাড়ানোর বেশী হকদার। সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে, আর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন(২)।

১০৯. যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহ্র তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারে, ফলে যা তাকেসহ

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

(১) প্রশংসিত সে মসজিদ কোনটি, তা নির্ণয়ে দু'টি মত রয়েছে, কোন কোন মুফাসসির আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তা হলো মসজিদে কুবা। [ইবন কাসীর; সা'দী] যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সালাত আদায় করতে আসতেন। [মুসলিম: ১৩৯৯] যার কেবলা জিবরীল নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন [আবুদাউদ: ৩৩; তিরমিযী: ৩১০০; ইবন মাজাহ: ৩৫৭] যেখানে সালাত আদায় করলে উমরার সওয়াব হবে বলে ঘোষণা করেছেন। [তিরমিযী: ৩২৪; ইবন মাজাহ: ১৪১১] হাদীসের কতিপয় বর্ণনা থেকেও এটিই যে তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত মসজিদ সে কথার সমর্থন পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এ মসজিদ বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ উল্লেখ করা হয়েছে। [উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মুসলিম: ১৩৯৮; মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৩১] বস্তুত: এ দু'য়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ উভয় মাসজিদই তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [কুরতুবী; সা'দী]

(২) এখানে সেই মসজিদকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া বুঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবাবাসীদের বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্র হও? তারা বলল, আমরা সালাতের জন্য অযু করি, জানাবাত থেকে গোসল করি এবং পানি দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করি। [ইবন মাজাহ: ৩৫৫]

জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়ে? আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. তাদের ঘর যা তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে- যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

চৌদ্দতম রুকূ'

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের হক ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো মহাসাফল্য[১]।

---

(১) আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয় বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়; কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ের স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। মালামাল হলো আল্লাহ্‌রই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে অর্থ সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করেন। তাই উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মালও মূল্য উভয়ই তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ্। [বগভী] হাসান বসরী বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ্ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন'। [বগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও। [বগভী] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন

وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর আগে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে[১], আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা কেবল ভালো চেয়েছি;' আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

১০৮. আপনি তাতে কখনো সালাতের জন্য দাঁড়াবেন না[২]; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার

এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তবে আমরা ধন্য হব। [বাগভী; ইবন কাসীর]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে সালাত আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে দ্বিরার সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমুলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। [বাগভী; সীরাতে ইবন হিশাম; ইবন কাসীর]

(১) এখানে এ মাসজিদ নির্মাণের মোট চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমতঃ মুসলিমদের ক্ষতিসাধন। দ্বিতীয়তঃ কুফরী করার জন্য, তৃতীয়তঃ মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। চতুর্থতঃ সেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে যেন আবু আমের আর রাহেব এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে মসজিদে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে দাঁড়ানো থেকে নিষেধ করার অর্থ, আপনি সে মসজিদে কখনো সালাত আদায় করবেন না। [ইবন কাসীর]

১১২. তারা[১] তাওবাহ্‌কারী, ‘ইবাদাতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী[২], রুকূ‘কারী, সিজ্‌দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী[৩]; আর

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

হয়ে যান যিনি তাঁর রাস্তায় বের হয়। তাকে শুধুমাত্র আমার রাহে জিহাদই এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাসই বের করেছে। আল্লাহ তার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যদি সে মারা যায় তবে তাকে জান্নাত দিবেন অথবা সে যা কিছু গনীমতের মাল পেয়েছে এবং সওয়াব পেয়েছে তা সহ তাকে তার সে ঘরে ফিরে পৌঁছিয়ে দিবেন যেখান থেকে বের হয়েছে’। [বুখারী: ৩১২৩; মুসলিম: ১৮৭৬]।

(১) এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে– ‘আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন’। আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। তবে এখানে যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। [কুরতুবী]

(২) অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে আয়াতে উল্লেখিত السائحون দ্বারা উদ্দেশ্য সাওম পালনকারীগণ। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, কুরআন মজীদে ব্যবহৃত سائحين শব্দের অর্থ রোযাদার। [বগভী; কুরতুবী] তাছাড়া سائح বলে জিহাদকারীদেরকেও বুঝায়। তবে মূল শব্দটি سياحة যার অর্থঃ দেশ ভ্রমণ। বিভিন্ন ধর্মের লোক দেশ ভ্রমণকে ইবাদাত মনে করতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার পরিজন ও ঘর–বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে [ইবন কাসীর] এর পরিবর্তে সিয়াম পালনের ইবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আবার কতিপয় বর্ণনায় জিহাদকেও দেশ ভ্রমনের অনুরূপ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।’ [আবুদাউদ: ২৪৮৬]

(৩) আলোচ্য আয়াতে মুমিন মুজাহিদের আটটি গুণ উল্লেখ করে নবম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে “আর আল্লাহ্‌র দেয়া সীমারেখার হেফাযতকারী” মূলতঃ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরী‘আতের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাযতকারী। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

আপনি মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দিন।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী[১]।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর ইব্‌রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্‌রাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইব্‌রাহীম তো কোমল হৃদয়[২] ও সহনশীল।

---

(১) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে এ আয়াত আবু তালেবের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [দেখুন, বুখারী: ৪৬৭৫; মুসলিম: ২৪] অন্য বর্ণনায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে, তিনি বলেন, এক লোককে তার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা চাইতে দেখলাম। অথচ তারা ছিল মুশরিক। আমি বললাম, তারা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তুমি কি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছ? সে বলল, ইবরাহীম কি তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযী]

(২) (أواه) শব্দটির অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত এসেছে। ইবন মাসউদ ও উবাইদ ইবন উমায়রের মতে এর অর্থ, বেশী বেশী প্রার্থনাকারী। হাসান ও কাতাদা বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি বেশী দরদী। ইবন আব্বাস বলেন, এটি হাবশী ভাষায় মুমিনকে বোঝায়। কালবী বলেন, এর অর্থ যিনি জনমানবশূণ্য ভূমিতে আল্লাহকে আহ্বান করে। কারও কারও মতে, বেশী বেশী যিকিরকারী। কারও কারও মতে, ফকীহ। আবার কারও কারও মতে বিনয়ী ও বিনম্র। কারও কারও মতে, এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে নিজের গোনাহের কথা স্মরণ হলেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কারও কারও মতে এর অর্থ, যিনি আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন তা থেকে সর্বদা প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। কারও কারও মতে এর অর্থ, যিনি কল্যাণের কথা মানুষদের শিক্ষা দেন। তবে এ শব্দটির মূল অর্থ যে বেশী বেশী আহ্ আহ্ বলে কোন গোনাহ হয়ে গেলে আফসোস করতে থাকে। মনে ব্যথা অনুভব হতে থাকে এবং এর জন্য তার মন থেকে আফসোসের শব্দ হতে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হিদায়াত দানের পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন--- যতক্ষণ না তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, যা থেকে তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে তা; নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ ।

إِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের মালিকানা তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই ।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটময় মুহূর্তে[১]- তাদের এক দলের হৃদয়

(১) কুরআন মজীদ তাবুক যুদ্ধের সময়টিকে 'সঙ্কটকময় মুহুর্ত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ, সে সময় মুসলিমরা বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। সে সময় তাদের না ছিল পর্যাপ্ত বাহন। দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে। এমনকি কখনও কখনও একটি খেজুর দু'জনে ভাগ করে নিতেন। কখনও আবার খেজুর শুধু চুষে নিতেন। তাই আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেছেন, তাদের ক্রটিসমূহ মার্জনা করেছেন। [ইবন কাসীর] এ যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে ইবন আব্বাস উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। আমরা এক স্থানে অবস্থান নিলাম। আমাদের পিপাসার বেগ প্রচণ্ড হল। এমনকি আমরা মনে করছিলাম যে, আমাদের ঘাঁড় ছিড়ে যাবে। এমনকি কোন কোন লোক পানির জন্য বের হয়ে ফিরে আসত, কিন্তু কিছুই পেত না। তখন পিপাসায় তার ঘাড় ছিড়ে যাবার উপক্রম হতো। এমনকি কোন কোন লোক তার উট যবাই করে সেটার ভূড়ি নিংড়ে তা পান করত। আর কিছু বাকী থাকলে সেটা কলজের উপর বেঁধে রাখত। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে

فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন; নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।

وَعَلَى الثَّلَٰثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ

১১৮. আর তিনি তাওবা কবুল করলেন অন্য তিনজনেরও[১], যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো দেখেছি, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলে কল্যাণ লাভ করি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দো'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি তা চাও? আবু বকর বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু' হাত উঠালেন। হাত গোটানোর আগেই একখণ্ড মেঘ আমাদের ছায়া দিল এবং সেখান থেকে বৃষ্টি পড়ল। সবাই তাদের সাথে যা ছিল তা পূর্ণ করে নিল। তারপর আমরা অবস্থা দেখতে গেলাম, দেখলাম যে, আমাদের সেনাবাহিনীর বাইরে আর কোন বৃষ্টি নেই। [ইবন হিব্বান: ১৩৮৩]

(১) এরা তিন জন হলেন কা'আব ইবন মালেক, মুরারা ইবন রবি' এবং হেলাল ইবন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা তিন জনই ছিলেন আনসারদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতিপূর্বে বাই'আতে 'আকাবা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো তারপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোর্পদ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারা ও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহ্‌র নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিস্কার ভাষায় তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে অপরাধের সাজা স্বরূপ তাদের সমাজ চ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সুরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থাও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, এ আয়াতটি তাঁদের তাওবাহ্ কবুল হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না যমীন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সেটা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা নিশ্চিত উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তাওবাহ্ কবুল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

পনরতম রুকূ'

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক[১]।

ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন। [এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তাবারী; বাগভী; ইবন কাসীর প্রমূখগণ বর্ণনা করেছেন]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকায় যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠাবান সাহাবীর দ্বারাও হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তাওবাহ্ কবুল হলো, এ ছিল তাঁদের তাকওয়ারই ফলশ্রুতি। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলিমকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর "তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক" বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। আর এভাবেই কেউ ধ্বংস থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারে। [ইবন কাসীর] হাদীসেও সত্যবাদিতার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর; কেননা সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে নিয়ে যায়, আর সৎকাজ জান্নাতের পথনির্দেশ করে। মানুষ সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে সত্যবাদী হিসেবে লিখা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক; কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, আর একজন মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টায় থাকে শেষ পর্যন্ত তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখা হয়।" [বুখারী: ৬০৯৪; মুসলিম; ২৬০৭]

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাবে এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে; কারণ আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা পেয়ে বসে এবং কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেক করে তাদের এমন প্রতিটি পদক্ষেপ আর শত্রুদেরকে কোন কষ্ট প্রদান করে[১], তা তাদের জন্য সৎকাজরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের কাজের প্রতিফল নষ্ট করেন না।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ
الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا
يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ
وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ
عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. আর তারা ছোট বা বড় যা কিছুই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়---যাতে তারা যা করে আল্লাহ্ তার উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ
اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. আর মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। অতঃপর তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন[২] করতে

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

---

(১) উপরোক্ত অনুবাদটিই অধিকাংশ মুফাসসির উল্লেখ করেছেন। তবে আবুস সা'উদ তাফসীরকারের মতে এখানে আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে তাদের উপর যে বিপদই অনুষ্ঠিত হোক না কেন তা তাদের জন্য সওয়াব হিসেবে লিখা হয়। [তাফসীর আবুস সাউদ]

(২) বলা হয়েছে ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ "যাতে দ্বীনের মধ্যে বিজ্ঞতা অর্জন করে"। উদ্দেশ্যে হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تفقه শব্দের অর্থও তাই। এটি فقه থেকে উদ্ভুত। فقه অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা, সুক্ষ্মভাবে বুঝা।

পারে[১] এবং তাদের সম্প্রদায়কে

(১) এ আয়াতটি দ্বীনের এলম হাসিলের মৌলিক দলীল। [কুরতুবী] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে এ ব্যাপারে আরও কিছু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এলেম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ্ এই চলার সওয়াব হিসাবে তাঁর রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ দ্বীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দো'আ ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল এবাতদকারী লোকের উপর আলেমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদের অনুরূপ। আলেমসমাজ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে এলমের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি এলমের মীরাস পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করল। [তিরমিযীঃ ২৬৮২] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। সদকায়ে জারিয়া (যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান)। এমন ইল্ম যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চর্চা অব্যাহত রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া।) নেক্কার সন্তান–যে তার পিতার জন্য দো'আ করে। [মুসলিমঃ ১৬৩১] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইল্ম শিক্ষা করা ফরয।' [ইবন মাজাহঃ ২২৪; ইবন আবদিল বার, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহিঃ ২৫, ২৬] বলাবাহুল্য, এ হাদীস ও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লেখিত ইল্ম' শব্দের অর্থ দ্বীনের ইল্ম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়াবী জ্ঞান–বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। কারণ, দ্বীনী জ্ঞান অর্জন দু'ভাগে বিভক্ত। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। ফরযে আইনঃ শরী'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর–নারীর জন্য ফরয। যেমন, ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাহসমূহের জ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতার হুকুম-আহকাম, সালাত, সাওম, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান। ফরযে কেফায়াঃ যেমন, অধিকার আদায় করা, হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের মধ্যে বিবাদ নিরসন ইত্যাদি। কেননা, সবার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকে এটা করতে গেলে নিজেদের অবস্থাও খারাপ হবে, অন্যদেরও। নিজেদের জীবন-জীবিকা অসম্পূর্ণ হবে বা বাতিল হবে। তাই কাউকে না কাউকে সুনির্দিষ্ট করে এর জন্য থাকতে হবে। আল্লাহ্ যাকে এর জন্য সহজ করে দেন সে এটা করতে পারে। তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্বেই এমন কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন যা অন্যদের দেননি। সে হিসেবে প্রত্যেকে তার জন্য যা সহজ হয় তা-ই বহন করবে। [কুরতুবী; বাগভী]

ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে[১], যাতে

(১) ইবনে কাসীর বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবাইকে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, বলা হলো যে, "তোমরা হাল্কা ও ভারী সর্বাবস্থায় বেরিয়ে পড়" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪১] এবং বলা হলো, "মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা আল্লাহ্র রাসূলের সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাবে এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে" [সূরা আত-তাওবাহ: ১২০] তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে বেরিয়ে পড়লে সবার উপরই বের হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তারপর এ আয়াত নাযিল করে সে নির্দেশের ব্যাপকতা রহিত করা হয়। তবে রহিত না বলে এটাও বলা যেতে পারে যে, আগের যে সমস্ত আয়াতে যুদ্ধে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ আয়াতে সে নির্দেশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রতিটি গোত্রের সবাই বের হবার অর্থ, প্রতি গোত্র থেকে সবার বের না হতে পারলে তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক বের হবে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে তার উপর যে সমস্ত ওহী নাযিল হয় সেটা গভীরভাবে জানবে, অনুধাবন করবে, তারপর তারা যখন তাদের গোত্রের কাছে ফিরে যাবে তখন তাদেরকে শত্রুদের অবস্থা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে যুদ্ধে বের হওয়া দ্বারা তাদের দু'টি কাজই পূর্ণ হবে। (রাসূলের কাছে অবস্থান করে ওহীর জ্ঞান অর্জন ও সেখান থেকে এসে নিজের জাতিকে শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে জানানো।) তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে যারাই গোত্র থেকে এভাবে যুদ্ধে বের হবে, তারা দু'টি সুবিধা পাবে না। তারা হয় ওহীর জ্ঞান অর্জনের জন্য, না হয় জিহাদের জন্য বের হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর এভাবে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া ফরযে কিফায়া। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস বলেন, আয়াতের অর্থ, মুমিনদের উচিত নয় যে, তারা সবাই যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যাবে, আর রাসূলকে একা রেখে যাবে। যাতে করে তাদের মধ্যে যারা রাসূলের নির্দেশ ও অনুমতি নিয়ে বের হবে, তারা যখন ফিরে আসবে, তখন এ সময়ে রাসূলের কাছে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা কুরআনের যা নাযিল হয়েছে তা যারা যুদ্ধে গেছে তাদেরকে জানাবে। তারা বলবে যে, তোমাদের যুদ্ধে যাওয়ার পরে আল্লাহ্ তোমাদের নবীর উপর কুরআনের যা নাযিল করেছেন তা আমরা শিখেছি। এভাবে যারা বের হয়েছিল তারা অবস্থান করে তাদের যাওয়ার পরে যা নাযিল হয়েছে তা শিখে নেবে। আর অন্য দল তখন যুদ্ধের জন্য বের হবে। আর এটাই হচ্ছে "যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে" এর অর্থ। অর্থাৎ যাতে করে নবীর কাছে যা নাযিল হয়েছে অবস্থান কারীরা তা জেনে নেয় এবং যারা অভিযানে গেছে তারা ফেরৎ আসলে সেটা অবস্থানকারীদের কাছ থেকে

তারা সতর্ক হয়।

জেনে নিতে পারে। এভাবে তারা সাবধান হতে পারে। [ইবন কাসীর]
ইবনে আব্বাস থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ আয়াত জিহাদের ব্যাপারে নয়, বরং যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুদার বংশের উপর দুর্ভিক্ষের বদদো'আ করেন, তখন তাদের দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন পুরো গোত্রই মদীনায় আসা আরম্ভ করে দিল এবং তারা মুসলিম বলে মিথ্যা দাবী করতে লাগল। এভাবে তারা মদীনার খাবার ও পানীয়ের সংকট সৃষ্টি করে সাহাবীদের কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, তারা মুমিন নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাদের পরিবার-স্বজনদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন এবং তাদের কাওমকে এরকম করা থেকে সাবধান করে দিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তারা সবাই যেন নবীর কাছে চলে না আসে। তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে কিছু লোক দ্বীন শেখার জন্য আসতে পারে। অতঃপর তারা যখন তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবে তখন তাদের সম্প্রদায়কে সাবধান করতে পারে। [ইবন কাসীর]
হাসান বসরী বলেন, এ আয়াতে 'দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও সাবধান করা'র যে কথা বলা হয়েছে এ উভয় কাজটিই যারা অভিযানে বের হয়েছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট। তখন অর্থ হবে, কেন একটি দল দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে বের হয় না। অর্থাৎ তারা দেখবে ও শিক্ষা নিবে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের উপর তাদেরকে বিজয় দিয়েছেন, আর কিভাবে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের সাহায্য করেছেন। আর তারা যখন তাদের কাওমের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা তাদের কাওমের কাফেরদেরকে সেটা দ্বারা সাবধান করবে, তাদেরকে জানাবে, কিভাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাহায্য করে থাকেন। ফলে তারা রাসূলের বিরোধিতা থেকে দুরে থাকবে। [বাগভী]
মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, সবাই একসাথে দাওয়াতের জন্য বের হবে না। বরং প্রতিটি বড় দল থেকে কোন ছোট একটি গ্রুপ দ্বীন শেখা এবং তাদের যাওয়ার পরে যা নাযিল হয়েছে তা জানার জন্য জ্ঞানীর কাছে যাবে। তারা জানার পর তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে সাবধান করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাবে। যাতে তারা আল্লাহ্র ভয় ও শাস্তি থেকে সাবধান হয়। আর তখনও একটি গ্রুপ কল্যাণের কথা জানার জন্য বসে থাকবে। [বাগভী]
মূলত: ফিকহ হচ্ছে, দ্বীনের আহকাম জানা। [বাগভী] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীনের ফিকহ প্রদান করেন" [বুখারী:৭১; মুসলিম:১০৩৭] অন্য হাদীসে এসেছে, "মানুষ যেন গুপ্তধন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের গুপ্তধনের মত। তাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতে উত্তম তারা ইসলামেও উত্তম, যদি তারা দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে।" [বুখারী: ৩৪৯৩; মুসলিম: ২৫২৬]

ষোলতম রুকূ'

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের কাছাকাছি তাদের সাথে যুদ্ধ কর[১] এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা[২] দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

---

(১) এ আয়াতসমূহে কোন নিয়মে কাফেরদের সাথে জিহাদ করা হবে তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। এখানে নিকট বলে নিকটবর্তী অবস্থান ও নিকট সম্পর্ক এ দু'রকমের হতে পারে। [বাগভী] (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। [ইবন কাসীর] (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। [বাগভী] যেমন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়ে বলেনঃ "হে রাসূল, নিজের নিকটআত্মীয়গণকে আল্লাহর আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।" [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪] তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ্র বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা -বনু- কোরাইযা, বনু-নদীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বুঝাপড়া করেন। তারপর পূর্ববর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [ইবন কাসীর]

(২) غلظة শব্দের অর্থঃ কঠোরতা [ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর] কারণ, প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে, ঈমানদারদের সাথে নরম ব্যবহার করে, আর কাফেরদের সাথে থাকে কঠোর। [ইবন কাসীর] সুতরাং তাদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশটি দিয়েছেন। তিনি বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৫৪] আরও বলেন, "মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল" [সূরা আল-ফাতহ:২৯] আরও বলেন, "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।" [সূরা আত-তাওবাহ:৭৩; আত-তাহরীম:৯]

১২৪. আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল[১]?' অতঃপর যারা মুমিন এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে। আর তাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. তারা কি দেখে না যে, 'তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয়[২]?' এর পরও তারা তাওবাহ্ করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

---

(১) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা–ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। তার উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা সহজ হয়ে উঠে। ইবাদাতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন এটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। তারপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গোনাহ্ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। তারপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কালো হয়ে যায়। [বাগভী] এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন আস, কিছুক্ষন একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। [বুখারী]

(২) এখানে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে বা পরীক্ষায় নিপতিত হয়। মুজাহিদ বলেন, তারা দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধায় পতিত হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অথবা রোগ-শোকে। হাসান বসরী বলেন, রাসূলের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে [কুরতুবী] তাছাড়া কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি মর্মপীড়া ভোগ করে। [বাগভী]

১২৭. আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি?' তারপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করে দেন; কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভালভাবে বোঝে না।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু[১]।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৯. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই[২]। আমি তাঁরই উপর

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের উপর তার ইহসানের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই সমগোত্রীয় এবং তাদেরই সমভাষার লোককে প্রেরণ করেছেন। [ইবন কাসীর] একথাটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জা'ফর ইবন আবি তালিব নাজাসীর দরবারে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন যাকে আমরা চিনি, তার বংশ ও গুণাগুণ সম্পর্কেও আমরা অবহিত। তার ভিতর ও বাহির সম্পর্কে, সত্যবাদিতা, আমানতদারী সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২০১] আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুমিনদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল।

(২) অর্থাৎ আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। কারণ নবীগনের সমস্ত

নির্ভর করি এবং তিনি মহা'আর্‌শের[১]
রব।'

কাজ হল স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা।

(১) আরশ সম্পর্কে আলোচনা সূরা আল-আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে চলে গেছে।

১০- সূরা ইউনুস

سُوْرَةُ يُوْنُسَ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১০৯।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা ইউনুস মক্কায় নাযিল হয়েছে। [ইবন কাসীর] কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মাদানী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী]

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা ইউনুস। কারণ সূরার ৯৮ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল-হর নামে।।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

১. আলিফ্-লাম-রা[১]। এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা তাদেরই একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি এ মর্মে যে, আপনি মানুষকে সতর্ক করুন[২] এবং

---

(১) এগুলোকে 'হরফে মোকাত্তা'আত' বলা হয়। এগুলোর আলোচনা পূর্বে সূরা আল-বাকারায় করা হয়েছে।

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফের মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও তার উত্তর তুলে ধরেছেন। সন্দেহটি ছিল এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রাসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ সন্দেহকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা যে শুধু কুরাইশ কাফেরদের সন্দেহ তা নয়। পূর্ববর্তী উম্মতরাও তা বলেছিল। তারা বলেছিল "মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে ?" [সূরা আত-তাগাবুনঃ ৬] নূহ ও হূদ এর কাওমও এ রকম বিস্মিত হয়েছিল। তখন নবীগণ তার জবাবে বলেছেন, "তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে?" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৬৩; ৬৯] অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাওমও বলেছে, "সে কি বহু ইলাহ্কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!" [সূরা সোয়াদঃ ৫] ইবন আব্বাস বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠালেন তখন আরবরা

مُّبِينٌ

মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে আছে উচ্চ মর্যাদা[১]! কাফিররা বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট জাদুকর!'

সেটা মানতে অস্বীকার করেছিল। অথবা তাদের মধ্যে অনেকেই এ জন্য অস্বীকার করেছিল যে, আল্লাহ্ মহান যে তিনি তাঁর রাসূল বানাবেন মুহাম্মাদের মত একজন মানুষকে। তিনি এটা করতেই পারেন না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছেন। এক আয়াতে বলেছেনঃ "যমীনের উপর যদি ফিরিশ্তারা বাস করত, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফিরিশ্তাকেই রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম"। [আল-ইসরাঃ ৯৫] যার মূল কথা হল এই যে, রিসালাতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল এবং যাদের মধ্যে রাসূল পাঠানো হচ্ছে এ দু'য়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ ফিরিশ্তার সম্পর্ক থাকে ফিরিশ্তাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রাসূল পাঠানোই উদ্দেশ্য, তখন কোন মানুষকেই রাসূল বানানো উচিত।

(১) এ বাক্যের দ্বারা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ 'যিকরুল আউয়াল' তথা লাওহে মাহফূযে তাদের তাকদীরে সৌভাগ্যবান লিখা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তারা যে উত্তম আমল পেশ করেছে সে জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে। [ইবন কাসীর; সা'দী] অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তারা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না। চিরকালই তারা সে সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। এ আয়াতের তাফসীর যদি আমরা কুরআনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, এর সমার্থে সূরা আল-কাহফের ২-৩ নং আয়াতে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'তারা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে'। মুজাহিদ বলেন, এর দ্বারা পূর্বে তারা যে আমল করেছে যেমন, তাদের সালাত, সাওম, সাদকা, তাসবীহ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, এক্ষেত্রে صدق শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারা করাও উদ্দেশ্য যে, জান্নাতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন এখানে 'যাবতীয় কল্যাণ' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾ বলে তাদের সৎকর্মকাণ্ডসমূহকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, তাদের সালাত, সাওম, সাদকা, তাসবীহ ইত্যাদি। [ফাতহুল কাদীর]

৩. তোমাদের রব তো আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন[১], তারপর তিনি 'আর্‌শের উপর উঠলেন[২]। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন[৩]। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই[৪]। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

(১) এ আয়াতে তাওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক-অংশীদার নেই, তখন 'ইবাদাত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে ('ইবাদাতে) অন্য কাউকে শরীক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালজ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এখানে কি পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যদিও কোন কোন মুফাসসির এ দিনগুলোকে আমাদের বর্তমান 'দিন' এর মত মনে করেছেন। কোন কোন মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন যে, এ দিনগুলো অন্য আয়াতে বর্ণিত, একদিন সমান একহাজার বছরের মত। [ইবন কাসীর]

(২) তারপর বলেছেন ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ অর্থাৎ 'আরশের উপর উঠেছেন। কুরআন এবং হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশ এক প্রকাণ্ড সৃষ্টি আর তা সমস্ত সৃষ্টিজগতের ছাদস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশের উপর উঠা বাস্তব বিষয়। এটা আল্লাহ্‌র একটি মহান কার্যগত গুণ। তিনি যে রকম তাঁর আরশের উপর উঠাও সেরকম। আমরা তার আরশের উপর উঠা কথাটা বুঝি তবে সে উঠার ধরণ আমরা জানিনা। আল্লাহর আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সূরা আল-বাকারায় করা হয়েছে।

(৩) সৃষ্টিজগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনিই পরিচালনা করেন। "আসমানও যমীনের অণু পরিমান বস্তুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।" [সাবাঃ ৩] কোন ব্যাপারে মনযোগ দিতে গিয়ে অন্য ব্যাপার তাঁর বাঁধা হয় না। [বুখারী] অগণিত আবেদনকারীর আবেদন তাঁর জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। চাওয়ার প্রচণ্ডতায় তিনি বিরক্ত হোন না। বৃহৎ কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করতে গিয়ে ছোট ছোট বস্তুগুলো তার খেয়ালচ্যুত হয়না। চাই তা সমুদ্রে বা পাহাড়ে বা জনবসতিপূর্ণ এলাকা যেখানেই হোক না কেন। [এ ব্যাপারে আরো দেখুনঃ সূরা হূদঃ ৬, সূরা আল-আন'আমঃ ৫৯]

(৪) অর্থাৎ দুনিয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কারো আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাঁর কোন ফায়সালা পরিবর্তন করার

রব; কাজেই তোমরা তাঁরই 'ইবাদাত কর[১]। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না[২]?

৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের ফিরে যাওয়া[৩]; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا

অথবা করো ভাগ্য ভাঙা-গড়ার ইখতিয়ারও নেই। বড়জোর সে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে পারে। কিন্তু তার দো'আ কবুল হওয়া না হওয়া পুরোপুরি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর এ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রাজ্যে নিজের কথা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করিয়ে নেবার মতো শক্তিধর কেউ নেই। এমন শক্তি কারোর নেই যে,তার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। এ সুপারিশের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। [দেখুনঃ সূরা আল-বাকারাহঃ ২৫৫, সূরা আন-নাজমঃ ২৬, সূরা সাবাঃ ২৩]

(১) উপরের তিনটি বাক্যে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব। এখন বলা হচ্ছে, এ প্রকৃত সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মূলত রবুবীয়াত তথা বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যখন পরোপুরি আল্লাহর আয়ত্বাধীন তখন এর অনিবার্য দাবী স্বরুপ মানুষকে তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা বলেছেন, তিনি বলেন, "আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে , তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৮৭] আরও বলেন, "বলুন, 'সাত আসমান ও মহা-'আরশের রব কে?' অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?" [সূরা আল-মুমিনূন: ৮৬-৮৭] তাছাড়া সূরা ইউনুসের এ আয়াতের আগের ও পরের আয়াতেও একই বক্তব্য এসেছে।

(২) অর্থাৎ যখন এ সত্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তখন এরপরও কি তোমাদের চোখ খুলবে না এবং তোমরা এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকবে? তোমরা কি তোমাদের অস্বীকার ও গোঁড়ামীতেই রত থাকবে যে তোমরা মোটেই উপদেশ গ্রহণ করবে না? [আইসারুত তাফাসীর]

(৩) অর্থাৎ তোমাদের এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিজেদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে। সে সুনির্দিষ্ট সময়ে তিনি তোমাদের সবাইকে একত্রিত কববেন। [ইবন কাসীর; সা'দী]

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④

সত্য[১]। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন[২] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিফল প্রদানের জন্য। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয়[৩] ও অতীব

(১) এ আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের বহু নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবী প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন জারি করবেন। কুরাইশ কাফেরদের অধিকাংশই আল্লাহকে তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারাই তাদের উপর দলীল নিচ্ছেন যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন তিনি অবশ্যই ধ্বংসের পর দ্বিতীয়বার সেটাকে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। [কুরতুবী] আর এটা তাঁর ওয়াদা। এ ওয়াদা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি যারা হৃদয় দিয়ে ঈমান এনেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পালন করে নেক আমল করেছে, তাদেরকে প্রতিফল দিবেন। [সা'দী] আর যারা কুফরী করবে তাদেরকেও তাদের কুফরীর কারণে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।

(২) এ বাক্যটির মধ্যে দাবী ও প্রমাণ উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। দাবী হচ্ছে, আল্লাহ পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। সে কখনো আল্লাহর পক্ষে এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিকে অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে করতে পারে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; এটা আমার কৃত প্রতিশ্রুতি, আর আমরা তা পালন করবই।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৪]

(৩) এ অত্যন্ত গরম পানীয় কাফেরদের জন্য শাস্তি স্বরূপ থাকবে। এ প্রচণ্ড গরম পানীয়ের বিভিন্ন গুণাগুণ অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আর-রাহমানের ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে" আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?"। [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫] আরো বলা হয়েছে " তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে"। [সূরা আল-হাজ্জঃ ১৯-২০]

কষ্টদায়ক শাস্তি; কারণ তারা কুফরী করত।

৫. তিনিই সূর্যকে দীপ্তিময় ও চাঁদকে আলোকময় করেছেন এবং তার জন্য মন্‌যিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ্ এগুলোকে যথাযথ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন[১]। তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৬. নিশ্চয় দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন[২] তাতে নিদর্শন রয়েছে

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে" [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ২৯] আরো বলা হয়েছেঃ "তারপর তোমরা পান করবে তার উপর অতি উষ্ণ পানি, ফলে তারা পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৫৪-৫৫] কুরআনের কোন কোন আয়াতে এ গরম পানিকে পুঁজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছেঃ "এবং পান করানো হবে গলিত পুঁজ; যা সে অতি কষ্টে একেক ঢোক করে গিলবে এবং তা গিলা প্রায় সহজ হবে না"। [সূরা ইব্‌রাহীমঃ ১৬-১৭] আবার কোন কোন স্থানে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য সমভাবে গরম পানীয় ও পুঁজ উভয়টিই থাকবে, "কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ"। [সূরা সোয়াদঃ ৫৭] আরো এসেছেঃ "সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীত, না কোন পানীয়, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া ; [সূরা আন-নাবা ২৪-২৫]।

(১) অর্থাৎ তিনি এগুলো অনাহুত সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রত্যেকটি কাজই প্রজ্ঞায় পূর্ণ। আসমান ও যমীন সৃষ্টির মাঝে কোন হেকমত নেই এমন কথা শুধুমাত্র কাফেররাই বলতে পারে। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা সোয়াদঃ ২৭, সূরা আল-মূমিনূনঃ ১১৫-১১৬]।

(২) আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন তাতে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সেগুলো আল্লাহ্‌রই মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছে। কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন, সূরা ইউসুফঃ ১০৫, সূরা ইউনুসঃ ১০১, সূরা সাবাঃ ৯, সূরা আলে ইমরানঃ ১৯০। এগুলোর পরিবর্তনের অর্থ, একটির পর অপরটি এমনভাবে আসা তাদের সুনির্দিষ্ট নিয়মের

এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

৭. নিশ্চয় যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে(১), আর যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَٰفِلُونَ ۝

৮. তাদেরই আবাস আগুন; তাদের কৃতকর্মের জন্য।

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের রব তাদের ঈমান আনার কারণে তাদেরকে পথ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَٰرُ فِي جَنَّٰتِ

কোন ব্যঘাত ঘটে না। [ইবন কাসীর] এ ব্যাপারে সূরা আল-আ'রাফ এর ৫৪, সূরা ইয়াসীন এর ৪০ নং এবং সূরা আল-আন'আমের ৯৬ নং আয়াতেও চাঁদ ও সূর্যের নিয়মানুবর্তিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) কাতাদা বলেন, দুনিয়াদারদের তুমি দেখবে যে, তারা দুনিয়ার জন্যই খুশী হয়, দুনিয়ার জন্যই চিন্তিত হয়, দুনিয়ার জন্যই অসন্তুষ্ট হয় আর দুনিয়ার জন্যই সন্তুষ্ট হয়। [তাবারী] এ আয়াতে জাহান্নামের অধিবাসীদের বিশেষ লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমতঃ তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, বিশ্বাসও করে না। দ্বিতীয়তঃ তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত-অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও তাদের যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোন সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য ছিল। চতুর্থতঃ এসব লোক আমার নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফিলতী করে চলেছে। সুতরাং এরা না আল্লাহ্‌র কুরআনের আয়াত দ্বারা উপকৃত হয়, না আসমান-যমীন কিংবা এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন সাধারণ সৃষ্টি অথবা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করে। তাই তাদের ঠিকানা, অবস্থান ও বাসস্থান হবে জাহান্নাম যেখান থেকে তারা আর কোথাও যেতে বা পালাতে পারবে না। কারণ তারা কুফরী, শির্ক ও বিভিন্ন প্রকার পাপের মাধ্যমে তাই অর্জন করেছে। [সা'দী]

নির্দেশ করবেন[1]; নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে[2]।	النَّعِيْمِ ⑨

(১) আয়াতে بِإِيْمَانِهِمْ শব্দের সাথে যে 'بِ' হরফটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার দু'টি অর্থ হতে পারে- (এক) কারণে। তখন আয়াতের অর্থ হবে- যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের প্রভু ঈমানের কারণে মহাপুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তাদেরকে হিদায়াত দিবেন। তিনি তাদেরকে তাদের জন্য যা উপকারী তা শিক্ষা দিবেন। হিদায়াতের কারণে তারা ভালো আমল করার তৌফিক লাভ করবেন, তারা আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনসমূহে দৃষ্টি দিতে পারবেন। এ দুনিয়াতে সৎপথে পরিচালিত করবেন। হিদায়াতুল মুস্তাকীম নসীব করবেন আর আখেরাতে পুল-সিরাতের পথে তাদের পরিচালিত করবেন যাতে তারা জান্নাতে পৌঁছতে পারে। [সা'দী] (দুই) সাহায্যে বা দ্বারা। [কাশশাফ; ইবন কাসীর] মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'তাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন ফলে তারা সে আলোকে আলোকিত হয়ে পথ চলতে পারবে'। [তাবারী] অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনও তাদের আলোকিত হবে। তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানা থাকার কারণে অন্ধকারে হাতিয়ে বেড়াবে না। তাদের জীবন হবে আলোকিত জীবন। [দেখুনঃ সূরা আল-আন'আমঃ ১২২, সূরা আশ-শুরাঃ ৫২, সূরা আল হাদীদঃ ২৮] আর আখেরাতের জীবনেও তারা তাদের প্রভুর যাবতীয় কল্যাণ লাভে সামর্থ হবেন। পুলসিরাতেও তাদের আলোর ব্যবস্থা থাকবে। যাবতীয় সংকটময় মুহুর্তে তাদের প্রভু তাদের পথ দেখানোর ব্যবস্থা করবেন। [দেখুনঃ সূরা আল-হাদীদঃ ১৩] কাতাদা ও ইবন জুরাইজ বলেন, তার আমল তার জন্য সুন্দর সূরত ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাসের রূপ ধারণ করে যখন সে কবর থেকে উঠবে তখন তার সম্মুখীন হয়ে তাকে যাবতীয় কল্যাণের সুসংবাদ জানাবে। সে তখন তাকে বলবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার আমল। তখন তার সামনে আলোর ব্যবস্থা করবে যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করায়। আর এটাই এ আয়াতের অর্থ। পক্ষান্তরে কাফেরের জন্য তার আমল কুৎসিত সূরত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসবে এবং তার সার্বক্ষণিক সাথী হবে যতক্ষণ না সে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাচ্ছে। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(২) যদি কেউ প্রশ্ন করে, কিভাবে বলা হল যে, তাদের নিচ দিয়ে নালাসমূহ প্রবাহিত হবে, আর আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের সবখানেই জান্নাতের এ নালাসমূহকে বাগানের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কথা জানিয়েছে, এটা তো সম্ভব শুধু এক অবস্থায়, সেটা হচ্ছে, তারা যমীনের উপরে থাকবে, আর নালাসমূহ থাকবে যমীনের নীচ দিয়ে? এটা তো জান্নাতের নালাসমূহের বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ, সেগুলো প্রবাহিত হবে যমীনের মধ্যে কোন প্রকার গর্ত না করে? উত্তর হচ্ছে, এ অর্থ নেয়াটা শুদ্ধ নয়। বরং নিচে দিয়ে নালা প্রবাহিত হওয়ার অর্থ তাদের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হওয়া। তাদের সামনে দিয়ে নে'আমতপূর্ণ বাগানসমূহে। এর অনুরূপ কথা আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামকে

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবেঃ 'হে আল্লাহ্! আপনি মহান, পবিত্র[১]!

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا

সম্বোধন করে বলেছিলেন, "অবশ্যই তোমার রব তোমার নিচ দিয়ে প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন" [সূরা মারইয়াম: ২৪] আর এটা জানা কথা যে, সে প্রস্রবণটি মারইয়ামের বসার নিচে ছিল না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে যে, তার নিকটে। তার সামনে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের ভাষণ সম্পর্কে বলেছেন, সে বলেছিল: "মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ নালাসমূহ কি আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত নয়?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৫১] এখানে নিচ দিয়ে অর্থ, কাছে বা সামনে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে জান্নাতবাসীদের প্রথম ও প্রধান অবস্থা বর্ণিত হয়েছে [সা'দী] বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের دعوى হবে ﴿سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ﴾। এখানে دعوى শব্দটির অর্থ কি, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারণ, دعوى শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে-

(এক) দাবী করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে সবসময়ই জান্নাতবাসীগণের দাবী ছিল আল্লাহ্ তা'আলাকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটিমুক্ত ঘোষণা করা, তাঁর জন্য উলুহিয়্যাত তথা যাবতীয় 'ইবাদাত সাব্যস্ত করা। তাই তারা জান্নাতেও এটার দাবী করবে। [তাবারী] কোন কোন মুফাস্‌সির আবার এ অর্থ করেছেন যে, এখানে দাবী করার অর্থ সার্বক্ষণিক এ কাজে লেগে থাকা। যেমনিভাবে দুনিয়াতে কেউ কারো কাছে কিছু দাবী করলে সার্বক্ষণিক তার পিছনে ছুটতে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(দুই) দো'আ করা। [তাবারী] আর দো'আ করার অর্থ নির্ধারণে আলেমগণ বেশকিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন- (ক) তাদের আহ্বান ও সম্বোধন হবে তাস্‌বীহ্ ও তাহ্‌মীদের মাধ্যমে। (খ) তাদের 'ইবাদাত হবে 'সুবাহানাকাল্লাহুম্মা' এ কালেমার মাধ্যমে। [বাগভী] (গ) তাদের কথা ও কাজও হবে উক্ত কালেমার মাধ্যমে। [বাগভী] এসবগুলোই অর্থ হতে পারে। কারণ, আমরা জানি যে, দু'আ দু'প্রকার। (এক) চাওয়ার মাধ্যমে দু'আ। যেমন আল্লাহ্ আমাকে অমুক বস্তু দান করুন। এ ধরণের দো'আ অনেক পরিচিত। (দুই) 'ইবাদাত ও প্রশংসার মাধ্যমে দো'আ। যাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং শুকরিয়া থাকে। এ হিসাবে কুরআন ও সুন্নায় বহু দো'আ এসেছে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'সবচেয়ে উত্তম দো'আ হলো আলহামদুলিল্লাহ্'। [তিরমিযীঃ ৩৩০৫, ইবনে মাজাহ্ঃ ৩৭৯০] অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'মুসীবতের দো'আ হচ্ছে- لَا إِله إِلَّا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِله إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم، لَا إِلَهَ إِلَّا الله رَبُّ السَّموَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيم অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি মহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি 'আরশের মহান রব। আল্লাহ্ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি আসমান-যমীনের রব এবং 'আরশের মহান রব'। [বুখারীঃ ৬৩৪৫, মুসলিমঃ ২৭৩০]

سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম'[১] আর তাদের শেষ ধ্বনি

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ 'যিন্‌নূন (ইউনুস) 'আলাইহিস্ সালাম যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন তার দো'আ (লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুব্‌হানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনায্‌যোয়ালিমীন)এ দো'আ দ্বারা যখনই কোন মুসলিম কিছুর জন্য দো'আ করবে, আল্লাহ্ তার দো'আ কবুল করবেন'। [তিরমিযীঃ ৩৫০০] এ সমস্ত হাদীস এবং এ জাতীয় অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে দো'আ করার নির্দেশ শরী'আতে এসেছে। তাই অনেক আলেম এ ধরণের প্রশংসাসূচক দো'আকে চাওয়াসূচক দো'আ হতে শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এসব কিছু থেকে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, জান্নাতের অধিবাসীগণের আল্লাহ্‌র প্রশংসা, পবিত্রতা ঘোষণা করা মূলতঃ আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা। কোন কোন মুফাসসির বলেন, যেহেতু তাদের উপর থেকে ইবাদতের যাবতীয় বোঝা নামিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে শুধু বাকী থাকবে সবচেয়ে বড় স্বাদের বিষয়। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকর করা। যা অন্যান্য যাবতীয় নে'আমতের চেয়ে তাদের কাছে বেশী মজাদায়ক হবে। যাতে থাকবে না কোন কষ্ট। [সা'দী]
(তিন) আশা-আকাঙ্খা করা, [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ জান্নাতে তাদের সবধরণের নেয়ামত লাভের পর তাদের আর কোন চাহিদা বাকী থাকবে না। তাই তারা শুধু 'সুবাহানাকাল্লাহুম্মা' বা 'হে আল্লাহ্! আপনি কতই না পবিত্র!' এ প্রশংসামূলক বাক্যই তাদের দ্বারা সর্বক্ষণ ঘোষিত হোক এমনটি আশা করবে এবং বলতে চাইবে। [ইবন কাসীর] মোটকথা, জান্নাতবাসীদের যাবতীয় দো'আ, কাজ, কথা, দাবী, আশা-আকাঙ্খা সবকিছুই হবে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ ও তাঁর তাহ্‌মীদ বা প্রশংসায় নিয়োজিত থাকা। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে খাবে এবং পান করবে, কিন্তু কোন থুথু, পায়খানা-পেশাব, সর্দি-কাশির সম্মুখীন হবে না। শুধুমাত্র ঢেকুর আসবে যাতে মিস্‌কের সুঘ্রাণ থাকবে। তাদের মনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ্-তাহ্‌মীদ (সুবাহানাল্লাহ্-আল্‌হামদুলিল্লাহ্) পাঠ করতে ইলহাম (মনে উদিত করে দেয়া) হবে'। [মুসলিমঃ ২৮৩৫]

(১) জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ﴾ প্রচলিত অর্থে تَحِيَّة বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার মাধ্যমে কোন আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান প্রভৃতি। সুতরাং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অথবা ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سلام এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, তোমরা যে কোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাযতে থাকবে। এ সালাম

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

হবেঃ 'সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র প্রাপ্য[১]!'

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনে রয়েছে ﴿سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ﴾ আবার ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। আবার ফিরিশতা কর্তৃক তাদের রবের পক্ষ থেকেও হতে পারে। [বাগভী] যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾ অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন 'আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। [সূরা আর-রা'দঃ ২৩-২৪] আর এ দু'টি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। আবার জান্নাতীগণ পরস্পরকে এ সালামের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ﴾ অর্থাৎ "যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের পরস্পর সম্ভাষণ হবে সালামের মাধ্যমে"। [সূরা আহ্‌যাবঃ ৪৪, অনুরূপ আয়াত আরো দেখুন, ওয়াকি'আঃ ২৫-২৬] অর্থাৎ সালাম শব্দটি তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে এবং মুমিনগণ পরস্পর নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে। সালাম শব্দের আরেক অর্থ দো'আ বা যাবতীয় আপদ থেকে নিরাপত্তা। তখন অর্থ হবে, জাহান্নামবাসীরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। [তাবারী]

(১) জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দো'আ হবে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলাকে জানার ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি লাভ করবে। তখন তারা শুধু তাঁর প্রশংসাই করতে থাকবে। জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দো'আ হবে ﴿سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ﴾ আর সর্বশেষ দো'আ হবে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ এতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর বিশেষ কিছু গুণ-বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [বাগভী] যেমন, পরাক্রম ও মহত্ত্ব গুণ যাতে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরো রয়েছে 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনুল কারীমের ﴿تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾ [সূরা আর্-রাহমান: ৭৮] আয়াতে এতদুভয় গুণ-বৈশিষ্টের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সদা প্রশংসিত। সহীহ হাদীসে এসেছে, "জান্নাতবাসীগণকে তাসবীহ ও তাহমীদ যথা সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহর ইলহাম এমনভাবে করা হবে যেমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ইলহাম করা হবে" [মুসলিমঃ ২৮৩৫] এটা একথাই প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ্ সদা প্রসংশিত। আমরা যদি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের প্রতি তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, আল্লাহ্ নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রশংসনীয় বলে ব্যক্ত করেছেন। সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে তার বর্ণনা চলে গেছে।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. আর আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণে (সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করেন, যেভাবে তিনি তাদের কল্যাণে (সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করেন, তবে অবশ্যই তাদের মৃত্যুর সময় এসে যেত[১]। কাজেই যারা আমাদের

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪

(১) এ আয়াতে الشر বা খারাপ বস্তু কি? এ নিয়ে মতভেদ আছে। এক. কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে খারাপ বস্তু বলতে নদর ইবনে হারেস নামীয় কাফেরের বদদো'আ বোঝানো হয়েছে। যাতে সে বলেছিলঃ হে আল্লাহ্! যদি মুহাম্মাদের দ্বীন সত্য হয়, তবে আমার উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করে আমাকে ধ্বংস করে দিন। [বাগভী] এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত এ আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজেদের জন্য যে বদদো'আ করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বদদো'আগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দো'আগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। দুই. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে এক্ষেত্রে বদদো'আর মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ কেউ রাগের বশবর্তী হয়ে নিজের সন্তান-সন্ততির কিংবা অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের বদদো'আ করে বসে কিংবা বস্তুসামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে- আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশতঃ সহসাই এসব দো'আ কবুল করেন না। [তাবারী; কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দো'আ-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবুল করে নেন। অবশ্য কখনো কখনো হেকমত ও কল্যাণের কারণে কবূল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কোন দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদো'আ করে বসে, অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আযাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবূল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদো'আ করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে। তারপরও কোন কোন সময় এমন কবূলিয়ত বা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোন কথা বের হয়,

সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমরা তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরতে ছেড়ে দেই।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

১২. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ডেকে থাকে[১]। অতঃপর আমরা যখন তার দুঃখ-দৈন্য দূর করি, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর

তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'নিজের সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদো'আ করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং দো'আ সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়'। [আবু দাউদঃ ১৫৩২, মুসলিমঃ ৩০০৯]

(১) এ আয়াতে সাধারণ মানুষের এক রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তা হলো এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ্‌কেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। [সা'দী] অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হল এই যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাঁকে ডাকেইনি, তাঁর কাছে যেন কোন বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করেছেন। যেমন, সূরা আয-যুমারঃ ৮, আয-যুমারঃ ৪৯, আল-ইসরাঃ ৮৩, ফুসসিলাতঃ ৫১।
কিন্তু যাদের হেদায়াত নসীব হয়েছে এবং ঈমান এনেছে, তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সূরা হূদের ১১ নং আয়াতে ব্যতিক্রম বলে ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মুমিনের কাজ-কারবার দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়, আল্লাহ্ তার জন্য যা কিছুই ঘটাক সেটাই তার জন্য কল্যাণের রূপ নেয়। যদি তার কোন ক্ষতি বা দুঃখজনক কিছু ঘটে তখন সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার কোন খুশী বা লাভজনক কিছু হয় তাতে সে কৃতজ্ঞ হয়, শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। এটা একমাত্র মুমিনই পেতে পারে, আর কারো পক্ষে নয়'। [মুসলিমঃ ২৯৯৯]

তার জন্য সে আমাদেরকে ডাকেইনি। এভাবেই সীমালংঘনকারীদের কাজ তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

১৩. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যখন তারা যুলুম করেছিল। আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি[১]।

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. তারপর আমরা তোমাদেরকে তাদের পর যমীনে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কাজ কর তা দেখার জন্য[২]।

---

(১) অর্থাৎ কেউ যেন আল্লাহ্ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিগত জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার সাক্ষীস্বরূপ বিভিন্ন রকম আযাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। এটা হচ্ছে জাতিসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ্র নীতি। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দো'আ কবুল করে নিয়েছেন যে, কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ্র আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবী করতে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আযাব না আসলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

(২) অর্থাৎ অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি। এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পিছনে আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "দুনিয়া হলো সুফলা সুমিষ্ট জিনিস, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধিত্ব

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৫. আর যখন আমাদের আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না[১] তারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন এটা ছাড়া, বা এটাকে বদলাও।' বলুন, 'নিজ থেকে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ

করাবেন। এতে করে তিনি দেখতে চান তোমাদের আমল কেমন? সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর এবং মহিলাদের ব্যাপারেও তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা বনী ইসরাঈলদের প্রথম পরীক্ষা ছিল মহিলাদের দ্বারা"। [মুসলিমঃ ২৭৪২]

(১) এ আয়াতে আখেরাত অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে। এসব লোক আল্লাহ্ তা'আলার ওহী ও রেসালাত সম্পর্কিত কোন পরিচয় জানত না। যে কুরআনুল কারীম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তারই কালাম, তারই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দাবী জানায় যে, কুরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাসের বিরোধী; যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সততঃ সম্মান করে এসেছে, কুরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিতাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কুরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাযী নই। সুতরাং হয় আপনি এ কুরআনের পরিবর্তে অন্য কুরআন তৈরী করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন। [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তারা আরও চাচ্ছিল যে, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিন। [তাবারী; কুরতুবী] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হেদায়াত দান করেছেন যে, আপনি তাদের বলে দিনঃ এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ্র ওহীর তাবেদার। আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গোনাহ্গার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব। [ফাতহুল কাদীর]

করি[১]। আমি আমার রবের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই মহা দিনের শাস্তির আশংকা করি।

১৬. বলুন, 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন আমিও তোমাদের কাছে এটা তিলাওয়াত করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি[২]; তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না[৩]?'

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦﴾

(১) এটি হচ্ছে ওপরের দু'টি কথার জবাব। এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার কাছে এসেছে এবং এর মধ্যে কোন রকম রদবদলের অধিকারও আমার নেই। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন প্রকার সমঝোতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এ সমগ্র দ্বীনকে হুবহু গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পুরোপুরি রদ করে দিতে হবে।

(২) এ সময়টুকু ছিল, চল্লিশ বৎসর। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত দেন"। [বুখারীঃ ৩৫৪৮, মুসলিমঃ ২৩৪৭]

(৩) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজে এ কিতাবের রচয়িতা নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে এটি তার ওপর নাযিল হচ্ছে, তার এ দাবীর সপক্ষে এটি একটি জোরালো যুক্তি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তো তাদের মাঝেই ছিল। নবুওয়াত লাভের আগে পুরো চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। কোন লেখা পড়া জানতেন না। [কুরতুবী] তিনি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চোখের সামনে তাঁর শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানেই বড় হন। যৌবনে পদার্পণ করেন তারপর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেন। থাকা-খাওয়া, ওঠাবসা, লেনদেন, বিয়ে শাদী ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল এবং তার জীবনের কোন দিক তাদের কাছে গোপন ছিল না। তার এ জীবনধারার মধ্যে দু'টি বিষয় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। মক্কার প্রত্যেকটি লোকই তা জানতো। এক, নবুওয়াত লাভ করার আগে তার জীবনের পুরো চল্লিশটি বছরে তিনি এমন কোন শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করেননি যার ফলে একদিন হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তার কণ্ঠ থেকে এ তথ্যাবলীর ঝর্ণাধারা নিঃসৃত হতে আরম্ভ করেছে। দ্বিতীয় যে কথাটি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে সুস্পষ্ট ছিল সেটি এই যে, নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকেই তিনি

১৭. অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা বা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে(১)? নিশ্চয় অপরাধীরা সফলকাম হবে না(২)।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

সততা ও আমানতদারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [কুরতুবী] মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ধোঁকা, শঠতা, ছলনা এবং এ ধরনের অন্যান্য অসৎগুণাবলীর কোন সামান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। মূলতঃ এটা এমন একটি দিক যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা কি তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) এ-ধরনের (অর্থাৎ নবুওয়তের) দাবীর পূর্বে কখনো মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে? আবু সুফিয়ান তখন বলেছিল, না-- অথচ আবু সুফিয়ান ঐ সময় কাফেরদের সর্দার ছিল। তারপরও সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হক কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল। আর জানা কথা যে, শত্রুদের মুখ থেকে যে প্রশংসা বের হয় তা যথার্থ প্রশংসা। মোট কথাঃ তখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস বলেছিলেনঃ "আমি এটা অবশ্যই বুঝি যে, সে মানুষের সাথে মিথ্যা কথা ত্যাগ করেছে তারপর সে আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা বলবে এটা কখনো হতে পারে না"। [বুখারীঃ ৭, মুসলিমঃ ১৭৭৩] অনুরূপভবে জা'ফর ইবনে আবি তালেবও আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাসির দরবারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলেছেন যে, "আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলকে পাঠিয়েছেন যার গুণাগুণ বংশ পরিচয় ও আমানতদারী সম্পর্কে আমাদের সবাই জানে"। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২০১]

(১) অর্থাৎ তার চাইতে বড় যালেম আর কেউ নেই যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করে এবং তাঁর বাণী পরিবর্তন করে। আর তিনি যা নাযিল করেছেন তার সাথে কোন কিছু যোগ করে দেয়। অনুরূপভাবে তোমাদের থেকে বড় যালেমও আর কেউ হবে না যদি তোমরা কুরআনকে অস্বীকার কর এবং আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দাও এবং বল যে, এটা আল্লাহ্র কালাম নয়। এটাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে এটা জানিয়ে দেন। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যাচার করে তারা কখনো সফলকাম হবে না। তাদের কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে মিথ্যা হিসেবে বিবেচিত হবেই। মূলত: নবী সত্য বা মিথ্যা এটা জানার বিভিন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, দু'জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কথাবার্তা, চাল-চলন ইত্যাদি তুলনা করা। বিবেকবান মাত্রই এ কাজটি সহজে করতে পারে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাইলামা কায্যাবের কোন তুলনা কি চলে? আমর ইবনে 'আস একবার মুসাইলামার কাছে গেল। মুসাইলামা তার পুরাতন বন্ধু ছিল। আমর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

১৮. আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর 'ইবাদাত করছে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এগুলো আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আসমানসমূহ ও যমীনের এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না(১)? তিনি মহান, পবিত্র'

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ⑱

তখন মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞাসা করলঃ হে আমর! তোমাদের লোকের (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) উপর এ সময়ে কি নাযিল হয়েছে? আমর ইবনে 'আস জবাবে বললঃ আমি তার সাথীদের একটি সূরা পড়তে শুনেছি। মুসাইলামা বললঃ সেটা কি? আমর বললোঃ ﴿وَٱلۡعَصۡرِ ۞ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ﴾ সূরাটি শুনে মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করতে থাকলো, তারপর বললোঃ আমার উপরও অনুরূপ নাযিল করা হয়েছে। আমর বললোঃ সেটা কি? সে বললঃ يَا وَبَر، إِنَّمَا أَنْتَ أُذُنَانِ وَصَدَرٌ، وَسَائِرُكَ حَقَرٌ نَقَرٌ তারপর মুসাইলামা বাহাদুরী নেয়ার আশায় আমরের দিকে তাকিয়ে বললোঃ আমর! কেমন লাগলো? তখন আমর বললোঃ আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তুমি অবশ্যই এটা জানো যে, আমি জানি, তুমি মিথ্যা বলছ"। [ইবন কাসীর; ইবন রাজাব, জামে'উল 'উলুম ওয়াল হিকাম: ১১২] এটাই যদি একজন কাফেরের বিশ্লেষণ তাহলে মুমিন কত সহজেই সত্য নবী ও মিথ্যা নবীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে তা বলাই বাহুল্য। অপরদিকে আমরা সত্য নবীর ব্যাপারেও তার সততার সাক্ষ্য খুব সহজভাবেই দেখতে পাই। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেনঃ "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমণ করলেন তখন লোকেরা চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসলো। আমিও তাদের সাথে আসার পর যখন আমি তাকে দেখলাম তখনি বুঝতে পারলাম যে, তার চেহারা কোন মিথ্যুক লোকের চেহারা নয়। তখন আমি প্রথম যে কথা কয়টি শুনেছিলাম তা হলোঃ হে মানব সম্প্রদায়! সালামের প্রসার কর, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখো এবং রাতে মানুষেরা যখন ঘুমন্ত থাকে তখন সালাত আদায় কর, ফলে তোমরা প্রশান্তির সাথে বা সালামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪২৮৩]।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞানী। আসমান ও যমীনে যা আছে তাঁর জ্ঞান সেটাকে ঘিরে আছে। তিনি তোমাদের জানাচ্ছেন যে, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর সাথে কোন ইলাহ নেই। আর হে মুশরিক সম্প্রদায়! তোমরা মনে করছ যে, তাঁর শরীক পাওয়া যায়? তোমরা কি তাঁকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তাঁর কাছে গোপন রয়েছে

এবং তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

১৯. আর মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে[১]। আর আপনার রবের পূর্ব-ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেত[২]।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ⑲

এবং তোমরা জেনে নিয়েছ? এটা নিঃসন্দেহে বড় অসার কথা। এ মূর্খ লোকগুলো কি রাব্বুল আলামীনের চেয়ে বেশী জানে? এ বিষয়টি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলেই এর অসারতা ধরা পড়ে। [সা'দী] কারণ, কোন জিনিসের আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেটির কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তো জানেন না আকাশে ও পৃথিবীতে তাঁর কোন শরীক আছে। অনুরূপভাবে তিনি জানেন না তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশকারী আছে, এটি সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতার ব্যাপারে একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যখন কোন সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহর জানা নেই এখন তোমরা কোন্ সুপারিশকারীদের কথা বলছ? [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি বলেছেন। তিনি বলেন, "আর তারা আল্লাহ্‌র বহু শরীক সাব্যস্ত করেছে। বলুন, তাদের পরিচয় দাও। নাকি তোমরা যমীনের মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না?" [সূরা আর-রা'দ: ৩৩]

(১) অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শির্ক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। একই উম্মত এবং সবার মুসলিম থাকার সময়কাল কতদিন এবং কবে ছিল তা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আদম ও নূহের মধ্যে দশ প্রজন্ম ছিল যারা তাওহীদের উপর ছিল। [তাবারী; ইবন কাসীর] এরপর মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শির্কী বিস্তার লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদেরকে ভীতিপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী হিসেবে কিতাবসহ প্রেরণ করেন। "যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে" [সূরা আল-আনফাল: ৪২] [ইবন কাসীর]

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, সে কলেমাটি হচ্ছে এই যে, তিনি এ উম্মতকে সবশেষে আনবেন এবং তাদেরকে দুনিয়াতে আযাব না দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। যদি এ অবকাশ না থাকত তবে অবশ্যই তাদের আযাব দিয়ে শেষ করে দেয়া

২০. আর তারা বলে, 'তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন[1]?' বলুন, 'গায়েবের

وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟

হতো অথবা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যেত। [কুরতুবী] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এখানে 'কালেমা' বলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, তিনি কাউকে দলীল-প্রমাণাদি ছাড়া পাকড়াও করবেন না। আর সেটা হচ্ছে, রাসূল প্রেরণ। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই" [সূরা আল-ইসরা: ১৫] কারও কারও মতে, এখানে 'কালেমা' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে বর্ণিত একটি কালেমাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে এসেছে, 'আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে' [বুখারী: ৭৫৫৩; মুসলিম: ২৭৫১] যদি তা না হতো তবে তিনি অপরাধীদেরকে তাওবার সময় দিতেন না। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিদর্শন যে, তিনি যথার্থই সত্য নবী এবং যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা পুরোপুরি ঠিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নিদর্শন পেশ করার দাবী তারা এ জন্য করেনি যে, তারা সাচ্চা দিলে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। আসলে নিদর্শনের এ দাবী শুধুমাত্র ঈমান না আনার জন্য একটি বাহানা হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। তাদেরকে যাই কিছু দেখানো হতো তা দেখার পরও তারা একথাই বলতো, আমাদের কোন নিদর্শনই দেখানো হয়নি। কারণ তারা ঈমান আনতে চাচ্ছিল না। আল্লাহ্ বলেনঃ "কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু-উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত এবং তিনি দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ! কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন"। [সূরা আল-ফুরকানঃ ১০] অন্য আয়াতে বলেনঃ "পূর্ববর্তীগণের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন পাঠান থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৫৯] কারণ, তাদের চাহিদা মোতাবেক নিদর্শন পাঠানোর পর যদি ঈমান না আনে তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, আল্লাহ্র নিয়ম হচ্ছে যে, সুনির্দিষ্ট কোন নিদর্শন চাওয়া হলে সেটা দেয়ার পর যদি ঈমান না আনে তবে তাদের ধ্বংস করা হয়। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন নিদর্শন দেয়া ও অবকাশ না দেয়া আর নিদর্শন না দিয়ে অবকাশ দেয়ার মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছিলেন [ইবন কাসীর] কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মোটেই কোন নিদর্শন দেখাননি। তাদেরকে অনেক বড় নিদর্শন দেখিয়েছেন। যেমন তাদের চাহিদা মোতাবেক চাঁদকে এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়েছেন যে, কাফেরগন দু'খণ্ডের মাঝে পাহাড় দেখতে পেয়েছিল। [বুখারীঃ ৩৬৩৬, মুসলিমঃ ২৮০০] কিন্তু তারপরও তারা ঈমান আনেনি। বরং আরো বেশী নিদর্শন দাবী করতে লাগল। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ঈমান আনা নয়, তাদের

إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝٢٠

জ্ঞান তো শুধু আল্লাহ্‌রই আছে। কাজেই তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি(১)।'

তৃতীয় রুকূ'

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝٢١

২১. আর দুঃখ-দৈন্য তাদেরকে স্পর্শ করার পর যখন আমরা মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদন করাই তারা তখনই আমাদের আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে অপকৌশল

উদ্দেশ্য হঠকারিতা। আল্লাহ্ বলেনঃ "তারা যত নিদর্শনই দেখুক না কেন ঈমান আনবে না"। [সূরা আল-আন'আমঃ ২৫] আরো বলেনঃ "তারা যাবতীয় নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৪৬] আরো বলেনঃ "নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে"। [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭] অন্য আয়াতে বলেনঃ "আমরা তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠালেও, মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাজির করলেও তারা কখনো ঈমান আনবে না; তবে যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছে হয়" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১১]। অহংকার ও সত্যকে অস্বীকার করা তাদের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তারা সুস্পষ্ট বিষয়কেও জেনে বুঝে অস্বীকার করতে দ্বিধা করে না। আল্লাহ্ বলেনঃ "যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহন করতে থাকে, তবুও তারা বলবে,'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'[সূরা আল-হিজরঃ ১৪-১৫] আরো বলেনঃ "তারা আকাশের কোন খন্ড ভেংগে পড়তে দেখলে বলবে, 'এটা তো এক পুঞ্জিভূত মেঘ।"[সূরা আত-তূরঃ ৪৪] আল্লাহ আরো বলেনঃ "আমরা যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম আর তারা যদি সেটা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবুও কাফিররা বলত, 'এটা স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।" [সূরা আল-আন'আমঃ ৭]

(১) অর্থাৎ আয়াত নাযিল করা একান্ত গায়েবী বিষয়। [কুরতুবী] আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তা আমি পেশ করে দিয়েছি। আর যা তিনি নাযিল করেননি তা আমার ও তোমাদের জন্য "গায়েবী বিষয়" এর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ার নেই। তিনি চাইলে তা নাযিল করতে পারেন। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেননি তা আগে তিনি নাযিল করুন–একথার ওপর যদি তোমাদের ঈমান আনার বিষয়টি আটকে থাকে তাহলে তোমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকো। [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, তোমরা আমাদের আল্লাহ্‌র ফয়সালার অপেক্ষা কর। তিনি হককে অবশ্যই বাতিলের উপর প্রকাশ করে দিবেন। [বাগভী]

করে[১]। বলুন, 'আল্লাহ্ কৌশল অবলম্বনে আরো বেশী দ্রুততর[২]।' নিশ্চয় তোমরা যে অপকৌশল কর তা আমাদের ফিরিশ্তারা লিখে রাখে।

২২. তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ 'আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

(১) অর্থাৎ যখনই আল্লাহর রহমতে তোমাদের বিপদ দূরীভূত হয়েছে তখনই তোমরা এ বিপদ আসার ও দূরীভূত হবার হাজারটা ব্যাখ্যা (চালাকি) করতে শুরু করে থাকো। এখানে বিপদ বলে সার্বিক বিপদ হলেও কোন কোন মুফাসসিরের মতে, অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টি, খরার পরে সতেজতা আসা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এটা যে আমার নিদর্শন সেটা স্বীকার করতে চাও না। বরং তোমরা আমাদের নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাক। [কুরতুবী] তারা তখন হককে প্রতিহত করার জন্য বাতিল নিয়ে আসে। [সা'দী] এভাবে তারা তাওহীদকে মেনে নেয়া থেকে নিস্কৃতি পেতে এবং নিজেদের শির্কের ওপর অবিচল থাকতে চায়।

(২) আয়াতে আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও مكر শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী অভিধান অনুসারে مَكْر বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। এ ব্যাপারে সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতে বিস্তারিত টিকা দেয়া হয়েছে। এর বাইরেও তোমরা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা তা লিখে নিতে থাকবেন। এভাবে এক সময় অকস্মাৎ মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবার জন্য তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন তিনি তোমাদের ছোট বড় সবকিছুর প্রতিদান দিবেন। [ইবন কাসীর]

فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করতে থাকে[১]। হে মানুষ! তোমাদের সীমালঙ্ঘন কেবলমাত্র তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে[২]; দুনিয়ার জীবনের সুখ ভোগ করে নাও[৩], পরে আমাদেরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমরা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে।

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ

২৪. দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপঃ যেমন আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন

---

(১) এর সমার্থে আরো আয়াত দেখুন, সূরা আল-ইসরাঃ ৬৭।

(২) অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, যুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'অন্যায়-অনাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া উপযুক্ত। তদুপরি আখেরাতে তার শাস্তি তো রয়েছেই'। [আবু দাউদঃ ৪৯০২, তিরমিযীঃ ২৫১১, ইবনে মাজাহ্‌ঃ ৪২১১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি গোনাহ্‌র শাস্তি তাড়াতাড়ি দেয়া হয়, দেরী করা হয় না। অন্যায়-অনাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৬, বুখারী আদাবুল মুফরাদঃ ৮৯৫, হাকেম মুস্তাদরাকঃ ৪/১৭৭] তাছাড়া হাদীসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সীমালঙ্ঘন বা যুলুম করো না, আল্লাহ্‌ যুলুমকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্‌ বলেনঃ 'তোমাদের যুলুম তো তোমাদের নিজের নফস বা আত্মার উপরই"। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৩৮]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তোমাদের সীমালঙ্ঘন তো দুনিয়ার ভোগ অর্জনের জন্যই। দুই. সীমালঙ্ঘন করে তোমরা দুনিয়ার ভোগ অর্জন করতে পারবে। তিন. তোমাদের সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে কেবল দুনিয়ার জীবনের সময়টুকুতেই উপকৃত হতে পারবে। চার. তোমরা যে সীমালঙ্ঘন করছ তার উদাহরণ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে ভোগ অর্জনের মত। [ফাতহুল কাদীর]

وَالْأَنْعَامُ حَتّٰٓى إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتٰىهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারিগণ মনে করে সেটা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমাদের নির্দেশ এসে পড়ে তারপর আমরা তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল না[১]। এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে[২]।

---

(১) অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু এতই ক্ষনস্থায়ী যে, সেটা হস্তচ্যুত হয়ে গেলে এমন মনে হয় যেন তা কোনদিনই তার ছিল না। পক্ষান্তরে আখেরাতের নেয়ামত এমন হবে যে, তার তুলনায় দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট মানুষ বেমালুম ভুলে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেনঃ “দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী নেয়ামতের অধিকারীকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার ঢুকিয়ে আনার পর জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি তোমার দুনিয়ার জীবনে কোন ভাল বা কল্যাণ কিছু পেয়েছিলে? তুমি কি কোন নেয়ামত পেয়েছিলে? সে বলবেঃ না। অপরপক্ষে, দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কষ্টের মধ্যে ছিল এমন লোককে নিয়ে আসা হবে তারপর তাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট দেখেছিলে? সে বলবেঃ না।”[মুসলিমঃ ২৮০৭]

(২) কারণ চিন্তাশীল মাত্রই বুঝতে পারে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। শুধু তাই নয় ধোকাবাজও। দুনিয়ার চরিত্রই হলো এমন যে, যারা এর পিছনে ছুটে সে তাদের থেকে দূরে ছুটে যায় আর যার তার থেকে দূরে থাকতে চায় সে তাদের পিছু নেয়। দুনিয়ার উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ‘যমীনের মধ্যে উৎপন্ন উদ্ভিদ’ বলে উল্লেখ করেছেন। [ইবন কাসীর] যেমন, “তাদের কাছে পেশ কর উপমা দুনিয়ার জীবনের: এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান” [সূরা আল-কাহফ: ৪৫] অনুরূপ আয়াত আরও এসেছে সূরা আয-যুমার ও সূরা আল-হাদীদে। [ইবন কাসীর]

২৫. আর আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন[1] এবং যাকে ইচ্ছে

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۖ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন। অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার এমন পদ্ধতির দিকে তোমাদের আহবান জানান, যা আখেরাতের জীবনে তোমাদের দারুস সালাম বা শান্তির ভবনের অধিকারী করে। যে শান্তি ভবনে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যাথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয়, আর না আছে ধ্বংস। এখানে السَّلام শব্দ দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছেঃ

একঃ 'দারুস্‌সালাম'-এর মর্মার্থ হলো জান্নাত। একে 'দারুস্‌সালাম' বলার কারণ হলো এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করবে। [বাগভী; ইবন কাসীর]

দুইঃ কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে সালাম অর্থ সম্ভাষণ, সালাম যা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হয়। সে হিসেবে 'দারুস্‌সালাম' এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছতে থাকবে। অনুরূপভাবে তারাও একে অন্যের সাথে সালাম বিনিময় করতে থাকবে। [কুরতুবী]

তিনঃ হাসান ও কাতাদাহ্ বলেনঃ 'আস্‌সালাম' যেহেতু আল্লাহ্‌র নাম, সেহেতু তাঁর ঘর হলো জান্নাত, সে হিসেবে 'দারুস্‌সালাম' অর্থ আল্লাহ্‌র ঘর। আর আল্লাহ্ তাঁর ঘরের দিকে আহ্বানের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, মনে হলো জিবরীল আমার মাথার কাছে, আর মীকাঈল পায়ের কাছে অবস্থান করছে, তাদের একজন অন্যজনকে বলছেঃ এর একটা উদাহরণ দাও। অপরজন তার উত্তরে বললঃ শুনুন! আমার কান শুনছে, অনুধাবন করুন, আপনার হৃদয় অনুধাবন করছে। আপনার এবং আপনার উম্মতের উদাহরণ হলো এমন বাদশাহ্‌র মত যিনি একটি বাড়ী নির্মাণ করে তাতে একটি ঘর বানালেন, তারপর সেখানে তিনি মেহমানদারীর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন, তারপর সেখানে খাবার খাওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে দূত প্রেরণ করলেন। দাওয়াতকৃতদের মধ্যে কেউ কেউ তার দাওয়াত গ্রহণ করে নিল। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা বর্জন করল। এখানে আল্লাহ্ হলেন বাদশাহ্, তাঁর বাড়ী হলো ইসলাম, তাঁর ঘর হলো জান্নাত আর হে মুহাম্মাদ! আপনি হলেন দূত। যে আপনার দাওয়াত কবূল করল সে ইসলামে প্রবেশ করল, আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে জান্নাতে প্রবেশ করল সে তা থেকে খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল'। [তাবারীঃ ১৭৬২৪, মুসতাদরাকঃ ৩/৩৩৮-৩৩৯]

অন্য এক হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'প্রতিদিন

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

সরল পথে পরিচালিত করেন[১]।

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ

২৬. যারা ইহসানের সাথে আমল করে (উত্তমরূপে কাজ করে) তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরো বেশী[২]।

সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে তার দু'পার্শ্বে দু'জন ফিরিশ্‌তা ডাকতে থাকে, যা মানুষ ও জিন ব্যতীত সবাই শোনে। তারা বলতে থাকেঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে আস...'। [তাবারীঃ ১৭৬২৩, ইবনে হিব্বানঃ ২৪৭৬, আহমাদঃ ৫/১৯৭]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌঁছে দেন। এখানে 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কুরআন। [কুরতুবী] কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ- হক, সত্য ও ন্যায়। আবুল আলীয়া ও হাসান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দুই সাথী আবু বকর ও উমর। [তাবারী] আবার কারও কারও মতে, ইসলাম। এর মর্মার্থ হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দারুস্‌সালামের দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়াতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়াতের বিশেষ প্রকার- সরল-সোজা পথে তুলে দেয়া এবং তাতে চলার তাওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে। আর তারা হলেন ঐ সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। [বাগভী; কুরতুবী] 'সিরাত' এর তাফসীর ইসলাম দ্বারা করলে সমস্ত অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। তাছাড়া এটি এক হাদীস দ্বারা সমর্থিত। যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরাতে মুস্তাকীমের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি একটি সোজা রাস্তা দেখালেন, যার দু' পাশে দু'টি দেয়াল রয়েছে, যাতে রয়েছে অনেকগুলো খোলা দরজা। যে দরজাগুলোতে আবার ঢিলে করে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর পথের উপর একজন আহ্বানকারী রয়েছেন। তিনি বলছেন, হে লোকসকল, তোমরা সকলে পথে প্রবেশ কর। বাঁকা পথে চলো না। (অথবা বাঁকা পথের দিকে তাকিয়ে আনন্দ নিতে চেষ্টা করো না) আর একজন ডাকছে রাস্তার মাঝখান থেকে। তারপর যখনই কেউ কোন দরজা খুলতে চেষ্টা করে, তখনি সে বলতে থাকে, তোমার জন্য আফসোস! তুমি এটা খুলো না, কেননা, তুমি এটা খুললে তাতে প্রবেশ করে বসবে। আর সে পথটি হচ্ছে ইসলাম। তার দু' পাশের দু'টি দেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমানা। আর খোলা দরজাগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্‌র হারামকৃত বিষয়াদি। আর পথের মাথা থেকে যে ডাকছে সে হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। আর যে রাস্তার উপর বা মাঝখান থেকে ডাকছে সে হচ্ছে, প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ্‌র নসীহতকারী।' [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮২]

(২) এ আয়াতে أَحْسَنُوا বলে বুঝানো হয়েছে ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা ইহ্‌সানের সাথে তাদের সৎকাজ করেছে। আর ইহ্‌সানের অর্থ যা হাদীসে এসেছে তা হলো, এমনভাবে

فِيهَا خٰلِدُوْنَ

কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না[১]। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ اُولٰٓئِكَ

২৭. আর যারা মন্দ কাজ করে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ মন্দ এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে[২]; আল্লাহ্ থেকে তাদের রক্ষা

আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে এটা যেন বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তো তাকে দেখছেন। সুতরাং যারা ইহ্সানের সাথে তাদের ‘ইবাদাত সম্পাদন করেছে তারা হলো পরিপূর্ণ তাওহীদ বাস্তবায়নকারী। তাদের জন্য দু'টি পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে- (১) اَلْحُسْنٰى যার অর্থ জান্নাত। (২) زِيَادَةٌ যার অর্থ বাড়তি পাওনা। এর অর্থ এও হতে পারে যে, তাদেরকে শুধু তাদের কাজ অনুসারেই প্রতিফল দেয়া হবে না বরং তাদের আমলের সওয়াব দশগুণ ও ততোধিক বহুগুণ যেমন সত্তরগুণে বর্ধিত করে দেয়া হবে। এ ছাড়া তাদের জন্য সেখানে অট্টালিকা, উদ্যান ও সুন্দর সুন্দর স্ত্রীসমূহ থাকবে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া আরো থাকবে আল্লাহর দীদার। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, ‘যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবেঃ হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের সাথে আল্লাহর একটি ওয়াদা রয়েছে যা তিনি পূরণ করতে চান। তারা বলবেঃ সেটা কি? তিনি কি আমাদের মীযানের পাল্লা ভারী করে দেননি? আমাদের চেহারা শুভ্র করে দেন নি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তারপর তাদের জন্য তাঁর পর্দা খুলে দেয়া হবে ফলে তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহর শপথ করে বলছিঃ আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয় এবং চক্ষু শীতলকারী আর কোন জিনিস দেননি। [সহীহ মুসলিমঃ ১৮১, তিরমিযীঃ ২৫৫২, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩৩] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে زِيَادَةٌ বা বাড়তি পাওনার মধ্যে আল্লাহ্র দীদার তথা তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকানো ও আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার সৌভাগ্যও শামিল। সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, মুজতাহেদীনসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলেম থেকে এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বরং তাদের চেহারা হবে শুভ্র, মন হবে আনন্দে উদ্বেলিত। যেমনটি সূরা আল-ইনসানের ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের মাঠে কাফেরদের চেহারা কেমন হবে তা এ আয়াতসহ আরো বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা আশ-শূরাঃ ৪৫, সূরা ইবরাহীমঃ ৪২-৪৪।

أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝

করার কেউ নেই[১]; তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত[২]। তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۝

২৮. আর যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করে যারা মুশরিক তাদেরকে বলব, 'তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর[৩];' অতঃপর আমরা

(১) যেমনটি সূরা আল-কিয়ামাহ এর ১০-১২ নং আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে।

(২) যেমনটি সূরা আলে ইমরান এর ১০৬-১০৭ এবং সূরা আবাসা এর ৩৮-৪২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের মাঠে সবাইকে একত্রিত করবেন। কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্ এ ঘোষণা দিয়েছেন। কোথাও কোথাও বলেছেন যে, তিনি কাউকেই ছাড়বেন না। যেমন, "আর আমরা তাদের সকলকে একত্র করব; তারপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমরা মানুষদের উপরে একটি উঁচু জায়গায় থাকব। তখন প্রত্যেক জাতিকে তাদের দেব-দেবীসহ ধারাবাহিকভাবে একের পর এক ডাকা হবে। তারপর আমাদের মহান রব আসবেন এবং বলবেন, তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? তখন তারা বলবে, আমরা আমাদের মহান রবের অপেক্ষায় আছি। তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখব। তখন তিনি তাদের জন্য তাজাল্লি দিবেন এমতাবস্থায় যে, তিনি হাসছেন। আর তখন মুমিন ও মুনাফিক প্রত্যেককে নূর দিবেন। যার উপরে অন্ধকার চাপা থাকবে। তারপর তারা তার অনুসরণ করবে পুল-সিরাতের দিকে। তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। সে পুল-সিরাতে থাকবে লোহার হুক ও বর্শি। এগুলো যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করবে। তারপর মুনাফিকদের নুর নিভিয়ে দেয়া হবে। আর মুমিনরা নাজাত পাবে। তখন প্রথম দল যারা নাজাত পাবে তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের রাত্রির চাঁদের মত। সত্তর হাজার লোক, তাদের কোন হিসাব হবে না। তারপর যারা তাদের কাছাকাছি হবে তারা হবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জল তারকাটির মত। তারপর অন্যরা। শেষ পর্যন্ত শাফা'আত আপতিত হবে। ফলে তারা শাফা'আত করবে, এমনকি যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, যার অন্তরে যব পরিমাণ তা থাকবে তাকেও বের করা হবে। তাকে জান্নাতের আঙ্গিনায় রাখা হবে। আর জান্নাতিরা তাদের গায়ে পানি ফেলতে থাকবে, ফলে তারা বন্যার উদ্ভিদ যেভাবে

তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেব[১] এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের 'ইবাদাত করতে না[২]।'

২৯. 'সুতরাং আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের 'ইবাদাত করতে এ বিষয়ে তো আমরা গাফিল ছিলাম।'

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ۝

৩০. সেখানে তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম পরীক্ষা করে নেবে[৩] এবং

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ

উৎপন্ন হয় সেভাবে উদ্গত হবে। আর তাদের পোড়া চলে যাবে। তারপর তারা আল্লাহ্র কাছে চাইবে, শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য থাকবে দুনিয়া ও তার মত দশগুণ। [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৪৫-৩৪৬]

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেনঃ আমরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবো [বাগভী] আবার কোন কোন তাফসীরকারের মতে এর অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবো অথবা তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো। [তাবারী; সা'দী] অথবা অর্থ হবে, তাদের মধ্যে এবং মুমিনদের মধ্যে আমরা পার্থক্য করে দেবো। [জালালাইন] যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর 'হে অপরাধিরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও" [সূরা ইয়াসীনঃ ৫৯]

(২) অর্থাৎ যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে, তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। আমরা তোমাদেরকে আমাদের ইবাদাত করার জন্য কোন নির্দেশই দেইনি। আল্লাহ্ সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আর যদি মা'বুদ বলে এখানে শয়তানদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে, তখন অর্থ হবে, তারা এ কথাগুলো ভীত হয়ে কিংবা বাঁচার জন্য মিথ্যা বলবে। [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে এটা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন প্রতিটি আত্মা পরীক্ষা করে নেবে এবং জানবে ভাল বা মন্দ যা সে আগে করেছে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে" [সূরা আল-কিয়ামাহঃ ১৩] আরও বলেন, "যেদিন গোপন

مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা তাদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হবে।

চতুর্থ রুকূ'

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

৩১. বলুন, 'কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন[১], জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করেন এবং সব বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন?' তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। সুতরাং বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না[২]?'

বিষয় পরীক্ষিত হবে" [সূরা আত-তারেক: ৯] আরও বলেন, "তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ট" [সূরা আল-ইসরা: ১৪-১৫] আরও এসেছে, "আর উপস্থাপিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধিদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে।' আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; আপনার রব তো কারো প্রতি যুলুম করেন না।" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯]

(১) অর্থাৎ যিনি তোমাদেরকে শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি দান করেছেন তিনি যদি ইচ্ছে করেন সেগুলোকে নিয়ে যেতে পারেন। সেগুলো তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেছেন, "বলুন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ" [সূরা আল-মুলক: ২৩] আরও বলেন, " বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ আছে যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবে?" [সূরা আল-আন'আম: ৪৬]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতসমূহে মুশরিকদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করছেন যে,

৩২. অতএব, তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য রব[১]। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে[২]? কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে[৩]?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

তাদেরই স্বীকৃতি মোতাবেক যদি তিনি আল্লাহ্ই একমাত্র রব হয়ে থাকেন, তবে একমাত্র তাঁর ইবাদত কেন করা হবে না? তাই তিনি বলছেন যে, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন? অর্থাৎ কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার ক্ষমতায় যমীন ফাটিয়ে তা থেকে বের করে আনেন, "নিশ্চয় আমরা প্রচুর বারি বর্ষণ করি, তারপর আমরা যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি, অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি শস্য; আংগুর, শাক-সব্জি, অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য" [সূরা আবাসা: ২৫-৩১] তিনি ছাড়া কি আর কোন ইলাহ আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, এটা শুধু আল্লাহ্ই করে থাকেন। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিয্ক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিয্ক বন্ধ করে দেন ? " [সূরা আল-মুলক: ২১]।

(১) অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, রব, প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদাতের হকদার। [ইবন কাসীর] কাজেই অন্যের, যাদের এসব কাজে কোন অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরীক হয়ে গেলো। কিভাবে তারা ইবাদত পেতে পারে?

(২) ইনিই হলেন সেই মহান সত্তা যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হলো, তারপরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন প্রমাণিত হলো যে, তিনি ছাড়া আর সবই বাতিল। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। [ইবন কাসীর] সুতরাং সেই নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ঈমান ও কুফরির মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা ঈমান হবে না, তাই কুফরী হবে। [কুরতুবী]

(৩) বলা হচ্ছে, "তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে?" অর্থাৎ যখন তোমরা জানতে পারলে যে, আল্লাহ্ই একমাত্র রব, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন তখন কিভাবে তাঁর ইবাদাত ছেড়ে অন্যের ইবাদতের দিকে তোমাদের ফেরানো হয়? [ইবন কাসীর] এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এমন কিছু বিভ্রান্তকারী রয়েছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে টেনে নিয়ে ভুল দিকে ফিরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে আবেদন জানানো হচ্ছে, তোমরা অন্ধ হয়ে ভুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেছনে ছুটে যাচ্ছো কেন? নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে চিন্তা করছো না কেন যে, প্রকৃত সত্য যখন

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

৩৩. যারা অবাধ্য হয়েছে এভাবেই তাদের সম্পর্কে আপনার রবের বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না[১]।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

৩৪. বলুন, 'তোমরা যাদের শরীক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনে ও পরে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটায়?' বলুন, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন[২]'। কাজেই (সত্য থেকে) তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে?

এই, তখন তোমাদেরকে কোন্ দিকে চালিত করা হচ্ছে?

(১) অর্থাৎ এ মুশরিকরা যেহেতু কুফরী করেছে এবং কুফরি চালিয়েই যাচ্ছে, আর আল্লাহ্র সাথে অন্যের ইবাদাত করছে, অথচ তারা জানে ও স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, তিনিই স্রষ্টা, তাঁর রাজত্বের সবকিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক, সেহেতু তাদের উপর আল্লাহ্র বাণী সত্য হয়ে গেছে যে, তারা হতভাগা। জাহান্নামের অধিবাসী। [ইবন কাসীর] অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, "তারা বলবে, 'অবশ্যই হ্যাঁ।' কিন্তু শাস্তির বাণী কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে।" [সূরা আয-যুমার: ৭১]

(২) সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও স্বীকার করতো যে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শরীক করে তাদের কারো এ কাজে কোন অংশ নেই। আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পক্ষেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন অবশেষে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। (আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্তকৃত) তোমাদের মা'বুদগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, তিনি (আল্লাহ্) সে সব (শরীক) থেকে মহিমাময়-পবিত্র ও অতি ঊর্ধ্বে।" [সূরা আর-রূম: ৪০] আরও বলেন, "আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।" [সূরা আল-ফুরকান: ৩]

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۗ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. বলুন, 'তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ করে?' বলুন, 'আল্লাহ্ই সত্য পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না-সে[১]? সুতরাং তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেমন বিচার করছ?'

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۗ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর তাদের অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান তো কোন কাজে আসে না, তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত[২]।

---

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মুশরিককে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এমন সকল লোককে জিজ্ঞেস করে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার মাধ্যমে তোমরা 'সত্যের পথনির্দেশনা' লাভ করতে পারো? অবশ্যি সবাই জানে, এর জবাব 'না' ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি না পারে তবে কেবলমাত্র যিনি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত কে হিদায়াত দিতে পারেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্। যিনি ব্যতীত কোন হক ইলাহ নেই। তাহলে বান্দা কি তার অনুসরণ করবে যে হকের দিকে পথ দেখাতে পারে, যে অন্ধত্ব থেকে চক্ষুষ্মান করতে পারে, নাকি অনুসরণ করবে তার যে তার অন্ধ ও বোবা হওয়ার কারণে কোন কিছুর দিকেই পথ দেখাতে পারে না? [ইবন কাসীর] এ ব্যাপারটিই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বলেছিলেন, "হে আমার প্রিয় পিতা! আপনি তার 'ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?" [সূরা মারইয়াম: ৪২]

(২) অর্থাৎ তাদের নেতারা যারা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, দর্শন রচনা করেছে তারাও এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এগুলোকে ইলাহ সাব্যস্ত করে নিয়েছে। অনুমান করেই বলছে যে এগুলো শাফা'আত করবে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন দলীল-প্রমাণ নেই। আর যারা এসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছে তারাও জেনেবুঝে নয় বরং নিছক অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে তাদের পেছনে চলেছে। [কুরতুবী] কারণ তারা মনে করে, এত বড় বড় লোকেরা যখন একথা বলেন এবং আমাদের বাপ-দাদারা এসব মেনে আসছেন আবার এ সংগে দুনিয়ার

৩৭. আর এ কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা[১]। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে[২]।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

৩৮. নাকি তারা বলে, 'তিনি এটা রচনা করেছেন?' বলুন, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস[৩] এবং

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ

বিপুল সংখ্যক লোক এগুলো মেনে নিয়ে এ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এই লোকেরা ঠিক কথাই বলে থাকবেন।

(১) "যা কিছু আগে এসে গিয়েছিল তার সত্যায়ন" –অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জীল সহ অন্যান্য কিতাবাদির সত্যায়ন। কারণ, সেগুলোতে এ কুরআনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। তারপর এ কুরআন সে সুসংবাদকে সত্যায়ন করে আগমন করেছে। শুরু থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে তথা তাওহীদ, আখেরাতের উপর ঈমান ইত্যাদিকে পাকাপোক্ত করছে। কারও কারও মতে, এখানে অর্থ হচ্ছে, কিন্তু এ কুরআন তার সামনে যে নবী রয়েছেন অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সত্যায়ন করছে। কেননা তারা কুরআন শোনার আগ থেকেই তাকে দেখেছে। [কুরতুবী] তারপর বলা হয়েছে যে, এটি "আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা" –অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সারমর্ম যে মৌলিক শিক্ষাবলীর সমষ্টি, সেগুলো এর মধ্যে দিয়ে যুক্তি -প্রমাণ সহকারে উপদেশ দান ও বুঝাবার ভংগীতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ, এতে যে বিধানাবলী রয়েছে সেগুলোকে স্পষ্ট করে বিস্তারিত বর্ণনা করছে। [বাগভী; কুরতুবী]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীকেই তার (যুগ) উপযোগী মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুসারে মানুষ তার উপর ঈমান এনেছে। আর নিশ্চয়ই আমাকে অহী দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর নাযিল করেছেন। অতএব, আমি আশা করছি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুগামী তাদের থেকে বেশী হবে। [বুখারীঃ ৪৯৮১]

(৩) এটা আল-কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ। [ইবন কাসীর] তারা যদি কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান হয় তবে তারা যেন এর মত একটি সূরা নিয়ে আসে। এর পূর্বে কাফেরদেরকে কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার

صٰدِقِيْنَ

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ

৩৯. বরং তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তাতে মিথ্যারোপ করেছে[১], আর যার প্রকৃত পরিণতি এখনো তাদের কাছে আসে নি[২]। এভাবেই

ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছিল। [দেখুন, সূরা আল-ইসরা: ৮৮] তারপর তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, কুরআনের মত কুরআন না আনতে সক্ষম হলে কুরআনের দশটি সূরা যেন নিয়ে আসে। [দেখুন, সূরা হূদ: ১৩] কিন্তু তারা তাতেও অপারগ হয়। তখন তাদেরকে এ আয়াতে কুরআনের সূরাসমূহের একটি সূরা নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করা হয় কিন্তু কাফের-মুশরিকগণ তাও আনতে সক্ষম হয়নি। আর তারা সেটা আনতে পারবেও না। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "অতএব যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনই তা করতে পারবে না" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৪]

এ চ্যালেঞ্জ কুরআনের শুধু ভাষাশৈলীর উপর করা হয়নি। সাধারণভাবে লোকেরা এ চ্যালেঞ্জটিকে নিছক কুরআনের ভাষাশৈলী অলংকার ও সাহিত্য সুষমার দিক দিয়ে ছিল বলে মনে করে। কুরআন তার অনন্য ও অতুলনীয় হবার দাবীর ভিত্তি নিছক নিজের শাব্দিক সৌন্দর্য সুষমার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি। নিঃসন্দেহে ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও কুরআন নজিরবিহীন। কিন্তু মূলত যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন মানবিক মেধা ও প্রতিভা এহেন কিতাব রচনা করতে পারে না, সেটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু, অলংকারিত্ব ও শিক্ষা। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তারা কুরআনকে এ জন্যই মিথ্যা সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে যে, তারা এটাকে বুঝতে পারেনি, চিনতে পারেনি। [কুরতুবী] তাদের অজ্ঞতাই কুরআনকে মানতে নিষেধ করছে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ এ রকম কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আর যখন তারা এটা দ্বারা হেদায়াত পায়নি তখন তারা অচিরেই বলবে, 'এ এক পুরোনো মিথ্যা" [সূরা আল-আহকাফ: ১১]

(২) এখানে تَأْوِيلٌ এর মর্মার্থ হলো প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতী ও নির্লিপ্ততার দরুন কুরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। তারা একটু চিন্তা করতে পারত যে পূর্ববর্তী যে সমস্ত সংবাদ এ কুরআন দিয়েছে তা সত্য কি না? বা ভবিষ্যতের যে সমস্ত সংবাদ দিচ্ছে তা সঠিকভাবে ঘটে কি না? কিন্তু তারা কোন কিছু ভাল করে বুঝার আগে তা অস্বীকার করে বসেছে। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। যদি তারা সত্যিকারভাবে এটা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত

তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, কাজেই দেখুন, যালিমদের পরিণাম কি হয়েছে!

৪০. আর তাদের মধ্যে কেউ এর উপর ঈমান আনে আবার কেউ এর উপর ঈমান আনে না এবং আপনার রব ফাসাদসৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে অধিক অবগত[১]।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۚ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

তাহলে অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারত। আর এটাও বুঝত যে, এটা আল্লাহ্‌র বাণী। [ফাতহুল কাদীর] আর যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান কাজ করে না যেমন পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি সেগুলোকে তারা অস্বীকার করে বসেছে, সেগুলোর সাথে কুফরি করেছে, অথচ এখনও কিতাবে তাদের উপর যা আপতিত হওয়ার ওয়াদা করা হচ্ছে তার প্রকৃত অবস্থা আসেনি। আর এ মুশরিকরা যেভাবে আল্লাহ্‌র ভীতি প্রদর্শনে মিথ্যারোপ করেছে তাদের পূর্বেকার উম্মতরাও তা অস্বীকার করেছিল। [মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ যারা কুরআনে মিথ্যারোপ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের অন্তরে এর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ভাল করেই জানে যে, এটি সত্য ও হক। কিন্তু সে অহংকার ও গোঁড়ামী করে তাতে মিথ্যারোপ করে থাকে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা এর উপর অন্তর থেকেই অবিশ্বাসী। তারা মূলত না জেনে এর উপর মিথ্যারোপ করছে। অথবা আয়াতের অর্থ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখন এ কুরআনে মিথ্যারোপ করলেও ভবিষ্যতে ঈমান আনবে। আবার কেউ কেউ ভবিষ্যতেও এর উপর ঈমান আনবে না বরং অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপর অটল থাকবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে কুরআনকে বোঝানো হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। তখনও উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার অর্থ হতে পারে। তাছাড়া কারও কারও মতে, আয়াতটি মক্কাবাসীদের সাথে নির্দিষ্ট। অপর কারও কারও মতে সেটি সকল কাফেরের জন্য ব্যাপক। [ফাতহুল কাদীর]
এরপর আল্লাহ্ বলছেন যে, তিনি বিপর্যয়সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে অধিক অবগত।" সে অনুসারে তাদেরকে তিনি প্রতিফল দিবেন। যারা গোঁড়ামী করে কুফরিতে অটল রয়েছে তিনি তাদের ভাল করেই জানেন। অথবা আয়াতের অর্থ, যারা ঈমান আনবে আর যারা ঈমান আনবে না তাদের সবাইকে তিনি ভালভাবে জানেন। তাদের মধ্যে যারা বিপর্যয়সৃষ্টিকারী তাদের সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। অনুরূপভাবে কারা অন্তরে ঈমান থাকার পরও মুখে স্বীকার করছে না, আর কারা অন্তর থেকেই না জেনে এর উপর কুফরী করছে তিনি সবাইকে ভালভাবেই জানেন। [ফাতহুল কাদীর]

পঞ্চম রুকূ'

৪১. আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলুন, 'আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত[১]।'

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান পেতে রাখে। তবে কি আপনি বধিরকে শুনাবেন, তারা না বুঝলেও[২]?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

---

(১) অর্থাৎ অযথা বিরোধ ও কূটতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তাহলে আমার কাজের জন্য আমি দায়ী হবো। এর কোন দায়ভার তোমাদের ওপর পড়বে না। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে থাকো তাহলে এর মাধ্যমে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর দ্বারা তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো। এটা দ্বারা তাদের কাজ-কর্মের স্বীকৃতি নয় বরং তাদের সাথে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। যেমনটি সূরা আল-কাফেরূনে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিসসালামও তার জাতির সাথে এ ধরণের সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেনঃ "তোমাদের সংগে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার 'ইবাদাত কর তার সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আনো"। [সূরা আল-মুমতাহিনাহঃ ৪]

(২) শ্রবণ কয়েক রকমের হতে পারে। পশুরা যেমন আওয়াজ শোনে তেমনি এক ধরনের শ্রবণ আছে। তাদের কথাও আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। [যেমন দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ: ১৭১] আবার আর এক ধরনের শ্রবণ হয়, যার মধ্যে অর্থের দিকে নজর থাকে এবং এমনি ধরনের একটা প্রবণতা দেখা যায় যে, যুক্তিসংগত কথা হলে মেনে নেয়া হবে। তাদের কথাও আল্লাহ্ কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ করেছেন [যেমন দেখুন, সূরা আল-আন'আম: ৩৬] তবে যারা কোন প্রকার বদ্ধ ধারণা বা অন্ধ বিদ্বেষে আক্রান্ত থাকে এবং যারা আগে থেকেই ফায়সালা করে বসে থাকে যে, নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা-বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তির আশা-আকাংখা ও আগ্রহ বিরোধী কথা যত যুক্তিসংগতই হোক না

৪৩. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে কি আপনি অন্ধকে পথ দেখাবেন, তারা না দেখলেও[১]?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْكَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

৪৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না[২], বরং মানুষই

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ

কেন মেনে নেবো না, তারা সবকিছু শুনেও আসলে কিছুই শোনে না। তাদের কথাও আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। [যেমন দেখুন, সূরা আয-যুখরুফ: ২২-২৩] তেমনিভাবে যারা দুনিয়ায় পশুদের মত উদাসীন জীবন যাপন করে, চারদিকে বিচরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই যাদের আগ্রহ নেই অথবা যারা প্রবৃত্তির স্বাদ-আনন্দের পেছনে এমন পাগলের মতো দৌড়ায় যে, তারা নিজেরা যা কিছু করছে তার ন্যায় বা অন্যায় হবার কথা চিন্তা করে না তারা শুনেও শোনে না। এদেরকে আল্লাহ্ পশুর সাথে তুলনা করেছেন। [যেমন, সূরা আল-আ'রাফ: ১৭৯] এ ধরনের লোকদের কান বধির হয় না কিন্তু মন বধির হয়। এ ধরনের বধির লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোনাতে পারবেন না বলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে আপনি যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় নেই তাদেরকে শোনাতে পারেন না তেমনিভাবে তাদেরকেও হিদায়াতের দিকে নিয়ে আসতে পারবেন না। আর আল্লাহ্ও তাদের উপর লিখে দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনবে না। [কুরতুবী]

(১) তাদের এ তাকানোর দ্বারা তারা আপনার কাছে নবুওয়াতের যে দলীল-প্রমাণাদি আছে তা দেখতে পায়, কিন্তু তারা এর দ্বারা উপকৃত হয় না। পক্ষান্তরে মুমিনগণ আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই আপনার সততার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে। তাই আপনার প্রতি সম্মানে তাদের চোখ ভরে যায়। কাফেরগণ আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও সম্মানের সাথে দেখে না। [ইবন কাসীর] আর যারা সম্মানের সাথে দেখবে না তাদের হিদায়াত তাওফীক হবে না। [কুরতুবী] আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে আরও বলেনঃ "তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এই-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? 'সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম।' যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা জানবে কে বেশী পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৪১-৪২]

(২) হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার নিজের উপর হারাম করেছি এবং তা তোমাদের মাঝেও হারাম ঘোষণা করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে

নিজেদের প্রতি যুলুম করে থাকে[১] । | أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

যাদেরকে আমি হেদায়াত করেছি তারা ব্যতীত সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছেই হেদায়াত চাও আমি তোমাদের হেদায়াত দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি খাবার খাওয়াই সে ব্যতীত সবাই অভূক্ত, ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও আমি তোমাদেরকে খাওয়াব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি পরিধান করাই সে ব্যতীত সবাই কাপড়হীন। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিধেয় বস্ত্র চাও আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিন-রাত অপরাধ করে যাচ্ছ আর আমি তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি করার কাছেও পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে। এমনকি তোমরা আমার কোন উপকার করার নিকটবর্তীও হতে পারবে না যে, আমার কোন উপকার তোমরা করে দেবে। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের যাবতীয় মানুষ ও জ্বিন একত্র হয়ে তাকওয়ার দিক থেকে একজনের অন্তরে পরিণত হও তাতেও আমার রাজত্বের সামান্য বৃদ্ধি ঘটবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একত্র হয়ে অন্যায় করার দিক থেকে একজনের অন্তরে পরিণত হও তাতেও আমার রাজত্বের তথা ক্ষমতার সামান্যও কমতি ঘটবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বাপর এবং যাবতীয় মানুষ ও জ্বিন এক মাঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে প্রত্যেকেই চায় তারপর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু দেই তাতে আমার ভাণ্ডার থেকে ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রে সুঁই ঢুকালে কমে। হে আমার বান্দাগণ! এগুলো তো শুধু তোমাদের আমল, আমি তা তোমাদের জন্য সংরক্ষন করে রাখি। তারপর তোমাদেরকে তা পূর্ণভাবে দেব। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ভালকিছু পাবে সে যেন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। আর যে অন্য কিছু পায় সে যেন তার নিজেকে ছাড়া আর কাউকে তিরস্কার না করে। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তো তাদের কানও দিয়েছেন এবং মনও দিয়েছেন। হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখার ও বুঝার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কোন জিনিস তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের চোখ কানা করে নিয়েছে, কানে তালা লাগিয়েছে এবং অন্তরকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দিয়েছেন, যাকে ইচ্ছা অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পথ দেখিয়েছেন। কিছু অন্ধ চক্ষু চক্ষুষ্মান করেছেন, কিছু বধিরকে শুনিয়েছেন। কিছু বদ্ধ অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কিছু লোককে ঈমান থেকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। নিজের রাজত্বে তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না। বরং লোকদেরকে তিনি প্রশ্ন করবেন। কারণ তিনি জ্ঞানী, তিনি প্রজ্ঞাবান, তিনি ইনসাফকারী। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

৪৫. আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন (সেদিন তাদের মনে হবে দুনিয়াতে) যেন তাদের অবস্থিতি দিনের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল(১); তারা পরস্পরকে চিনবে(২)। অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছে(৩) এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

৪৬. আর আমরা তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি আপনাকে (দুনিয়াতে) দেখিয়ে দেই অথবা (তাদের উপর তা আসার আগেই) আপনার মৃত্যু দিয়ে দেই, তাহলে তাদের ফিরে আসা তো

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝

---

(১) অর্থাৎ কাফেরগণ হাশরের মাঠে দুনিয়ার সময়টুকুকে অত্যন্ত সামান্য সময় বিবেচনা করবে। তাদের কেউ কেউ মনে করবে যে, দুনিয়াতে একঘন্টা অবস্থান করেছিল। যেমনটি এ আয়াতে এবং সূরা আল-আহকাফের ৩৫, সূরা ত্বা-হা এর ১০২-১০৪ এবং সূরা আর-রূমের ৫৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার তাদের কেউ কেউ মনে করবে যে, সে এক বিকাল বা দিবসের প্রথমভাগ অবস্থান করেছিল। যেমনটি সূরা আন-নাযি'আতের ৪৬ এবং সূরা আল-মুমিনূন এর ১১২-১১৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। তবে অন্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা চিনতে পারলেও একে অপরকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "সেদিন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে না" [সূরা আল-কাসাসঃ ৬৬] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন তাদের মাঝে না থাকবে বংশের সম্পর্ক, না তারা একে অপরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে" [সূরা আল-মুমিনুনঃ ১০১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "সেদিন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না"[সূরা আল-মা'আরিজঃ১০]

(৩) অর্থাৎ একদিন আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে, একথাকে মিথ্যা বলেছে।

আমাদেরই কাছে; তদুপরি তারা যা করে আল্লাহ্ই তার সাক্ষী[১]।

৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছে একজন রাসূল[২] অতঃপর যখন তাদের রাসূল আসে তখন তাদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা হয় এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয় না[৩]।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٤٧

(১) অর্থাৎ যদি আপনার জীবদ্দশায়ই তাদের উপর কোন প্রতিশ্রুত শাস্তি এসে পড়ে অথবা আপনাকে তার পূর্বেই মৃত্যু দিয়ে দেই তারপরও তো তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল আমার কাছেই। আমি তাদের কাজ-কর্মের সাক্ষী। সে অনুসারেই তাদের বিচার করব।

(২) বলা হয়েছে, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল রয়েছে।" এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা আন-নাহলঃ ৩৬, সূরা ফাতেরঃ ২৪। এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বের দাবী রাখে তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যদিও রাসূলকে সার্বজনিন করেছেন তারপরও তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে হেদায়াতকারীদের প্রেরণ করে থাকেন। তারা নবী বা রাসূল না হলেও নবী-রাসূলদের বাণী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে বহন করে থাকেন। এ ব্যাপারে সূরা রা'দ এর ৭ নং আয়াতে এসেছে যে, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াতকারী বা পথপ্রদর্শক আছেন"।

(৩) এর অর্থ হচ্ছে, রাসূলের দাওয়াত কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ধরে নিতে হবে যে, সেই গোষ্ঠীর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর যা কিছু করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। এরপর কেবল ফায়সালা করাই বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত যুক্তি বা সাক্ষ্য-প্রমাণের অবকাশ থাকে না। আর চূড়ান্ত ইনসাফ সহকারে এ ফায়সালা করা হয়ে থাকে। যারা রসূলের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভের অধিকারী হয়। আর যারা তাঁর কথা মেনে নেয় না তারা শাস্তি লাভের যোগ্য হয়। তাদেরকে এ শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া যেতে পারে বা এক জায়গায়। তাদের কাছে রাসূল এ জন্যই পাঠাতে হয়, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল না পাঠিয়ে, মানুষদেরকে সাবধান না করে কাউকে শাস্তি দেন না। আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই।" [সূরা আল-ইসরা: ১৫] [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

তাছাড়া এ আয়াতের আরেক প্রকার ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে রাসূলদের আগমন করার অর্থঃ কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে তাদের আগমণের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমনটি সূরা আয-যুমারের ৬৯ নং

৪৮. আর তারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, (তবে বল) এ প্রতিশ্রুতি কবে ফলবে[১]?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

৪৯. বলুন, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার কোন অধিকার নেই আমার নিজের ক্ষতি বা মন্দের।' প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও পিছাতে বা এগুতেও পারবে না।

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ۝

আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ "যমীন তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 'আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না"। সুতরাং প্রত্যেক উম্মতের আমলনামাই তাদের নবী-রাসূলদের উপস্থিতিতে পেশ করা হবে। তাদের ভাল-মন্দ আমল তাদের সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশ্তাগণদের মধ্য থেকেও সাক্ষী থাকবে। এভাবেই উম্মতের পর উম্মতের মধ্যে ফয়সালা করা হবে। উম্মতে মুহাম্মাদীয়ারও একই অবস্থা হবে তবে তারা সবশেষে আসা সত্ত্বেও সর্বপ্রথম তাদের হিসাব-নিকাশ করা হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমরা সবশেষে আগমণকারী তবে কিয়ামতের দিন সবার অগ্রে থাকব। [বুখারীঃ ৮৭৬] অপর হাদীসে এসেছে, "সমস্ত সৃষ্টিজগতের পূর্বে তাদের বিচার-ফয়সালা করা হবে" [মুসলিমঃ ৮৫৫]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কাফেরদের কুফরির সংবাদ দিয়ে বলছেন যে, কাফেররা যে আল্লাহ্র আযাবকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছে এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের কথা বলছে, এতে তাদের কোন লাভ নেই। অন্যত্রও আল্লাহ্ এ কথা বলেছেন, "যারা এটাতে ঈমান রাখে না তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তা থেকে ভীত থাকে এবং তারা জানে যে, তা অবশ্যই সত্য।" [সূরা আশ-শূরা:১৮] আরও বলেন, "আর তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভংগ করেন না। আপনার রব-এর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান" [সূরা আল-হজ: ৪৭] আরও বলেন, "তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৫৪] তাছাড়া এ সূরার ৫০ নং আয়াতে তাদেরকে রীতিমত সাবধানও করেছেন।

৫০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোনটিকে তাড়াতাড়ি পেতে চায়[১]?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝٥٠

৫১. তবে কি তোমরা এটা ঘটার পর তাতে ঈমান আনবে? এখন[২]?! অথচ

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ

(১) সারা জীবন তারা যে জিনিসটিকে মিথ্যা বলতে থাকে, যাকে মিথ্যা মনে করে সারাটা জীবন ভুল কাজে ব্যয় করে এবং যারা সংবাদদানকারী নবী-রাসূলদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে থাকে, সেই জিনিসটি যখন তাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে গুড়িয়ে দিয়ে অকস্মাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। নিজের কৃতকর্মের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকবে না। মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লজ্জায় ও আক্ষেপে অন্তর ভিতরে ভিতরেই দমে যাবে। সুতরাং কত বড় বিপদকে তারা তাড়াতাড়ি ডেকে আনছে? [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]
আয়াতের অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, বলুন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে তাহলে অপরাধীরা কোন জিনিস পেতে তাড়াতাড়ি করছে? আযাব তো তাদের খুব কাছের জিনিস। সকাল বা সন্ধ্যা যে কোন সময় এসে যেতে পারে। [দেখুন, বাগভী]

(২) অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর সময়ে হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি বলা হবে- ﴿ءَآلْـَٰٔنَ﴾ এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফির'আউন যখন বললঃ "আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন হক উপাস্য নেই তিনি ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা" [সূরা ইউনুসঃ ৯০]। উত্তরে বলা হয়েছিল- ﴿ءَآلْـَٰٔنَ﴾ অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে? বস্তুতঃ তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবা কবূল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়"। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭, মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৩২, হাকেম মুস্তাদরাকঃ ৪/২৫৭, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৫৩, ইবনে হিব্বানঃ ৬২৮] অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর ঈমান ও তাওবা আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তাওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তাওবা কবুল হয় না। আয়াতের শেষে এবং সূরা গাফেরের ৮৪ ও ৮৫ নং আয়াতদ্বয়ে একথাটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষাংশে ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর কওমের ঘটনা আসছে যে, তাদের তাওবা কবুল করে নেয়া হয়েছিল, তা এই

تَسْتَعْجِلُونَ

তোমরা তো এটাকেই তাড়াতাড়ি পেতে চাইছিলে!

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

৫২. তারপর যারা যুলুম করত তাদেরকে বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর; তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে[১]।'

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

৫৩. আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়, 'এটা কি সত্য?' বলুন, 'হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য[২] আর তোমরা মোটেই অপারগকারী নও।'

ষষ্ঠ রুকূ'

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

৫৪. আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি প্রত্যেক যুলুমকারী[৩] ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে সে মুক্তির বিনিময়ে সেসব দিয়ে দেবে এবং অনুতাপ গোপন করবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর

মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ, তারা দূরে থেকে আযাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে-কেটে তাওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তাওবা কবুল হত না।

(১) এটা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে। কারণ তারা এ আযাবকে অস্বীকার করেছিল। সূরা আত-তুরের ১৩-১৬ নং আয়াতেও তা বর্ণিত হয়েছে।

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে আল্লাহ্‌র সত্বার শপথ করে কেয়ামত যে আসন্ন তা বলতে নির্দেশ দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনের আরো দু'টি স্থানে এ ধরণের নির্দেশ এসেছে, যেমন সূরা সাবাঃ ৩, এবং আত-তাগাবুনঃ ৭] মূলতঃ কেয়ামতের ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখার কারণেই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে শপথ করে বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৩) এখানে যুলুম বলতে শির্ক ও কুফর বোঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার] কারণ, শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলম। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম'। [সূরা লুকমান:১৩]

তাদের মীমাংসা ন্যায়ভিত্তিক করা হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[১]।

৫৫. জেনে রাখ! আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

৫৭. হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও অন্তরসমূহে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করে বলা হবেঃ যদি তোমার নিকট পৃথিবীর সমান পরিমান স্বর্ণ থাকে, তাহলে কি তুমি এর বিনিময়ে এ শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করবে? তখন তারা বলবেঃ হ্যাঁ, তাকে বলা হবে যে, তোমার নিকট এর চেয়েও সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল... আমার সাথে আর কাউকে শরীক না করতে কিন্তু তুমি তা মানতে রাজি হওনি। [বুখারীঃ ৬৫৩৮]

(২) এখানে কুরআনুল কারীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে- এক. ﴿مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ - مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ এর প্রকৃত অর্থ হলো উৎসাহ কিংবা ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে পরিণাম সম্পর্কে স্মরণ করে দেয়া। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতীর পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লিলতা থেকে বিরত করে। [ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মাওয়ায়েযে হাসানাহ্'-এর অত্যন্ত সালঙ্কার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, সওয়াবের সাথে সাথে আযাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে।

৫৮. বলুন, 'এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়; কাজেই এতে তারা যেন আনন্দিত হয়।' তারা যা পুঞ্জীভূত

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

দুই. কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় গুণ ﴿وَشِفَاۤءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ﴾ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। شِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর صُدُوْرٌ হলো صَدْرٌ এর বহুবচন, যার অর্থ বুক। আর এর মর্মার্থ অন্তর। সারার্থ হচ্ছে যে, কুরআনুল কারীম অন্তরের ব্যাধিসমূহ যেমন সন্দেহ, সংশয়, নিফাক, মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদির জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। [কুরতুবী] অনুরূপভাবে অন্তরে যে সমস্ত পাপ পঙ্কিলতা রয়েছে সেগুলোর জন্যও মহৌষধ। [ইবন কাসীর] সঠিক আকীদা বিশ্বাস বিরোধী যাবতীয় সন্দেহ কুরআনের মাধ্যমে দূর হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন যে, কুরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি বিশেষতঃ অন্তরের রোগের শিফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়। কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। [আদ-দুররুল মানসূর] তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশী মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়। হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কুরআনুল কারীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা। তিন. কুরআনুল কারীমের তৃতীয় গুণ হচ্ছেঃ কুরআন হলো হেদায়াত। অর্থাৎ যে তার অনুসরণ করবে তার জন্য সঠিক পথের দিশা প্রদানকারী [কুরতুবী] আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কুরআনকে হেদায়াত বলে অভিহিত করেছেন। যেমন সূরা আল-বাকারার ২য় আয়াত, সূরা আল ইসরার নবম আয়াত, সূরা আল-বাকারাহঃ ৯৭, ১৮৫, সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৮, সূরা আল-আন'আমঃ ১৫৭, সূরা আল-আ'রাফঃ ৫২, ২০৩, সূরা ইউসুফঃ ১১১, সূরা আন-নাহলঃ ৬৪, ৮৯, ১০২, সূরা আয-যুমারঃ ২৩, সূরা ফুসসিলাতঃ ৪৪, সূরা আল-জাসিয়াহঃ ২০। চার. কুরআনুল কারীমের চতুর্থ গুণ হচ্ছেঃ কুরআন হলো রহমত। যার এক অর্থ হচ্ছে নে'আমত। [কুরতুবী] অনুরূপভাবে সূরা আল-ইসরার ৮২, সূরা আল-আন'আমঃ ১৫৭, আল-আ'রাফঃ ১৫২, ২০৩, সূরা ইউসুফঃ ১১১, সূরা আন-নাহলঃ ৬৪, ৮৯, সূরা আল-ইসরাঃ ৮২, সূরা আন-নামলঃ ৭৭, সূরা লুকমানঃ ৩, সূরা আল-জাসিয়াহঃ ২০, সূরা আল-কাসাসঃ ৮৬ নং আয়াতেও কুরআনকে রহমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসবই কিন্তু মুমিনদের জন্য কারণ তারাই এর দ্বার উপকৃত হয়, কাফেররা এর দ্বারা উপকৃত হয় না, কারণ তারা এ ব্যাপারে অন্ধ। [মুয়াসসার]

করে তার চেয়ে এটা উত্তম[১]।

(১) অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, সবই অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ সর্বদাই তার পতনাশঙ্কা লেগেই থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- ﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধন-সম্পদ ও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে। এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হর্ষের বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো فضل 'ফদল', অপরটি হলো رحمة 'রহমত'। আবু সাঈদ খুদরী ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাসহ অনেক মুফাস্‌সির বলেছেন যে, 'ফদল' অর্থ কুরআন; আর 'রহমত' অর্থ ইসলাম। [কুরতুবী] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, 'ফদল' হচ্ছে, কুরআন, আর তাঁর রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের অনুসারী করেছেন। হাসান, দাহহাক, মুজাহিদ, কাতাদা বলেন, এখানে 'ফদল' হচ্ছে ঈমান, আর তাঁর রহমত হচ্ছে, কুরআন। [তাবারী; কুরতুবী] বস্তুতঃ রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্য দিয়েছেন। কারণ, ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট ইরাকের খারাজ নিয়ে আসা হলো তখন তিনি তা গুনছিলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলেন। তখন তার এক কর্মচারী বললঃ এগুলো আল্লাহর দান ও রহমত। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ তোমার উদ্দেশ্য সঠিক নয়। আল্লাহর কুরআনে যে কথা বলা হয়েছে যে, "বল তোমরা আল্লাহর দান ও রহমত পেয়ে খুশী হও যা তোমরা যা জমা করছ তার থেকে উত্তম" এ আয়াত দ্বারা দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদ বুঝানো হয়নি। কারণ আল্লাহ তা'আলা জমা করা যায় এমন সম্পদ থেকে অন্য বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তা উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদই জমা করা যায়। সুতরাং আয়াত দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। [ইবনে আবী হাতিম] বরং ঈমান, ইসলাম ও কুরআনই এখানে উদ্দেশ্য। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারাও এ অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সুতরাং এ জাতীয় দ্বীনী কোন সুসংবাদ যদি কারো হাসিল হয় তিনিও এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আব্দুর রহমান ইবনে আবযা তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেনঃ "আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে এবং আমাকে তা তোমাকে পড়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে"। তিনি বললেন, আমি বললামঃ আমার নাম নেয়া হয়েছে? রাসূল বললেনঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি আমার পিতা (উবাই রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)

৫৯. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক[১] দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ[২]' বলুন, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করছ[৩]?'

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝٥٩

কে বললামঃ হে আবুল মুনযির! আপনি কি তাতে খুশী হয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমাকে খুশী হতে কিসে নিষেধ করল অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ "বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তারই রহমতের উপর তোমরা খুশী হও"। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৩/৩০৪, আবুদাউদঃ ৩৯৮০]

(১) আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে ইবন আব্বাস বলেন, জাহেলী যুগে তারা কিছু জিনিস-কাপড় ইত্যাদি নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল, সেটার সংবাদই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে প্রদান করেছেন। তারপর আল্লাহ্ অন্য আয়াতে সেটার ব্যাপারে বলেছেন, "বলুন, কে তোমাদের উপর সে সব বস্তু হারাম করেছেন যেগুলো আল্লাহ্ বান্দাদের জন্য বের করেছেন?" [সূরা আল-আ'রাফ: ৩২] [তাবারী] মূলতঃ রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তার রিযিক। এমনকি সন্তান-সন্ততিও রিযিক। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম লিখে দেন। [দেখুন, বুখারীঃ ৩০৩৬] এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এ শিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "যা কিছু আমি তাদের রিয্ক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ৩]

(২) অর্থাৎ তোমরা যে এটা কতবড় মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করছো তার কোন অনুভূতিই তোমাদের নেই। রিযিকের মালিক আল্লাহ। তোমরা নিজেরাও আল্লাহর অধীন। এ অবস্থায় আল্লাহর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ এবং তা ব্যবহার ও ভোগ করার জন্য তার মধ্যে বিধি-নিষেধ আরোপ করার অধিকার তোমরা কোথা থেকে পেলে? বিধি-নিষেধ তো তিনিই দেবেন। তিনিই হালাল বা হারামকারী, অন্য কেউ নয়। আর তা তাঁর রাসূলের মাধ্যমেই আসতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আবুল আহওয়াছ আউফ ইবনে মালেক ইবনে নাদলাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খুব অবিন্যস্ত অবস্থায় আসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ "তোমার কি সম্পদ আছে?" আমি বললামঃ হ্যাঁ, তিনি বললেনঃ "কি সম্পদ"? আমি বললামঃ

৬০. আর যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে, কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না(১)।

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

সপ্তম রুকূ'

৬১. আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ

সবধরণের সম্পদ, উট, দাস, ঘোড়া এবং ছাগল। তখন তিনি বললেনঃ "আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে কোন সম্পদ দিয়ে থাকেন তবে তা তোমার নিকট দেখা যাওয়া উচিত।" এরপর আরো বললেনঃ "তোমার সম্প্রদায়ের উটের বাচ্চা সুস্থ কান সম্পন্ন হওয়ার পরে তুমি ক্ষুর নিয়ে সেগুলোর কান কেটে বল না যে, এগুলো 'বুহুর'? এবং সেগুলো ফাটিয়ে দিয়ে বা সেগুলোর চামড়া ফাটিয়ে তুমি কি বলনা যে, এগুলোঃ 'ছুরম'? আর এতে করে তুমি সেগুলোকে তোমার এবং তোমার পরিবারের জন্য হারাম বানিয়ে নাও না? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আল্লাহ্‌ তোমাকে যা দান করেছেন তা অবশ্যই তোমার জন্য হালাল। আল্লাহ্‌র বাহুর ক্ষমতা তোমার বাহুর ক্ষমতা থেকে নিঃসন্দেহে বেশী শক্তিশালী, আর আল্লাহ্‌র ক্ষুর তোমার ক্ষুরের চাইতে ধারালো"। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৭৩] সুতরাং কোন হালাল বস্তুকে হারাম করার ক্ষমতা মানুষকে আল্লাহ্‌ দেন নি। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখেরাতের কঠিন ভয় দেখিয়ে এরূপ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন।

(১) অর্থাৎ এ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? তাদেরকে কি আল্লাহ্‌ এমনিই ছেড়ে দিবেন? কিয়ামতের দিন কি তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না? [ইবন কাসীর] কিন্তু তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তাঁর অনুগ্রহের এক প্রকাশ হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়ার বুকে এর কারণে দ্রুত শাস্তি দেন না। [তাবারী] আরেক প্রকাশ হচ্ছে, তিনি ঐ সব বস্তুই হারাম করেছেন যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিকর বিবেচিত। পক্ষান্তরে যা উপকারী তা অবশ্যই হালাল করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্‌র শোকরিয়া জ্ঞাপন না করে আল্লাহ্‌ তাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা হারাম করছে, এতে করে তারা তাদের নিজেদের উপর দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে নিচ্ছে। আর এ কাজটা মুশরিকরাই করে থাকে, তারা নিজেদের জন্য শরী'আত প্রবর্তন করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবগণও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারাও দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের প্রবর্তন করেছে। [ইবন কাসীর]

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- যারা আল্লাহ্‌র অলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার গ্লানি। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও। দুনিয়াতেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। আর আখেরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকার অর্থ জান্নাতে যাওয়া। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।
আয়াতে উল্লেখিত 'আওলিয়া' শব্দটি অলী শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় অলী অর্থ 'নিকটবর্তী'ও হয় এবং 'দোস্ত-বন্ধু'ও হয়। শরী'আতের পরিভাষায় অলী বলতে বুঝায়ঃ যার মধ্যে দু'টি গুণ আছেঃ ঈমান এবং তাকওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, "জেনে রাখ! আল্লাহর অলী তথা বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা, যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে"। [সূরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩] যদি আল্লাহর অলী বলতে ঈমানদার ও মুত্তাকীদের বুঝায় তাহলে বান্দার ঈমান ও তাকওয়া অনুসারে আল্লাহর কাছে তার বেলায়াত তথা বন্ধুত্ব নির্ধারিত হবে। সুতরাং যার ঈমান ও তাকওয়া সবচেয়ে বেশী পূর্ণ, তার বেলায়াত তথা আল্লাহর বন্ধুত্ব সবচেয়ে বেশী হবে। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহর বেলায়াতের মধ্যেও তারতম্য হবে।
আল্লাহ্‌র অলীদের সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
আল্লাহর নবীরা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অলী হিসাবে স্বীকৃত। নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তার রাসূলগণ। রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেনঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ তথা নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর

সমস্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর অলীগণ দুশ্রেণীতে বিভক্তঃ প্রথম শ্রেণীঃ যারা অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীঃ যারা ডান ও মধ্যম পন্থী। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ "যখন যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী (ক্বিয়ামত) তা ঘটবে, তখন তার সংঘটনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কেউ থাকবে না। তা কাউকে নীচ করবে, কাউকে সমুন্নত করবে। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে যমীন। পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। ফলে তা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেনীতে- ডান দিকের দল; ডান দিকের দলের কি মর্যাদা! আর বাম দিকের দল; বাম দিকের দলের কি অসম্মান! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত- নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতে। [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ১-১২] এখানে তিন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হয়েছেঃ যাদের একদল জাহান্নামের, তাদেরকে বামদিকের দল বলা হয়েছে। আর বাকী দু'দল জান্নাতের, তারা হলেনঃ ডানদিকের দল এবং অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্তগণ। তাদেরকে আবার এ সূরা আল-ওয়াকি'আরই শেষে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করে বলেছেন, "তারপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয় তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত। আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় তবে তোমার জন্য সালাম ও শান্তি; কারণ সে ডানপন্থীদের মধ্যে"। [সূরা আল- ওয়াকি'আহঃ ৮৮-৯১] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অলীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত হাদীসে বলেনঃ "মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমার বান্দার উপর যা আমি ফরয করেছি তা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন প্রিয় বস্তু নেই যার মাধ্যমে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে। আমার বান্দা আমার কাছে নফল কাজ সমূহ্ দ্বারা নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি। তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে আর তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে। তখন আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা অবশ্যই দেব, আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে অবশ্যই উদ্ধার করব"। [বুখারীঃ ৬৫০২] এর মর্ম হলো এই যে, তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় না। বস্তুতঃ এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রাসূলগণের প্রাপ্য। কারণ, প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ স্তর হলো সাইয়্যেদুল আম্বীয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর। এর পর প্রত্যেক ঈমানদার তার ঈমানের শক্তি ও স্তরের বৃদ্ধি-ঘাটতি

অনুসারে বেলায়েতের অধিকারী হবে। সুতরাং নেককার লোকেরা হলোঃ ডান দিকের দল, যারা আল্লাহর কাছে ফরয আদায়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করে। তারা আল্লাহ তাদের উপর যা ফরয করেছেন তা আদায় করে, আর যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ করে। তারা নফল কাজে রত হয় না। কিন্তু যারা অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত দল তারা আল্লাহর কাছে ফরয আদায়ের পর নফলের মাধ্যমে নৈকট্য লাভে রত হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর অলীগণ অন্যান্য মানুষদের থেকে প্রকাশ্যে কোন পোষাক বা বেশ-ভূষা দ্বারা বিশেষভাবে পরিচিত হন না। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ'আতকারী ও অন্যায়কারী ছাড়া সর্বস্তরে আল্লাহর অলীগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের অস্তিত্ব রয়েছে কুরআনের ধারক-বাহকদের মাঝে, জ্ঞানী-আলেমদের মাঝে, জিহাদকারী ও তরবারী-ধারকদের মাঝে, ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষকের মাঝে।

আল্লাহর অলীগণের মধ্যে নবী-রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নন, তাছাড়া কোন অলীই গায়েব জানেনা, সৃষ্টি বা রিযিক প্রদানে তাদের কোন প্রভাবও নেই। তারা নিজেদেরকে সম্মান করতে অথবা কোন ধন-সম্পদ তাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে মানুষদেরকে আহবান করেন না। যদি কেউ এমন কিছু করে তাহলে সে আল্লাহর অলী হতে পারে না, বরং মিথ্যাবাদী, অপবাদ আরোপকারী, শয়তানের অলী হিসাবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্‌র অলী হওয়ার জন্য একটিই উপায় রয়েছে, আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রঙে রঞ্জিত হওয়া, তার সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করা। যারা এ ধরনের অনুসরণ করতে পেরেছেন তাদের মর্যাদাই আলাদা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা রয়েছে যাদেরকে শহীদরাও ঈর্ষা করবে। বলা হলোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা কারা? হয়ত তাদের আমরা ভালবাসবো। রাসূল বললেনঃ "তারা কোন সম্পদ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যতীতই একে অপরকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবেসেছে। নূরের মিম্বরের উপর তাদের চেহারা হবে নূরের। মানুষ যখন ভীত হয় তখন তারা ভীত হয় না। মানুষ যখন পেরেশান ও অস্থির হয় তখন তারা অস্থির হয় না।" তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। [ইবনে হিব্বানঃ ৫৭৩, আবুদাউদঃ ৩৫২৭] অন্য বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ আসবে এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে মানুষ এসে জড়ো হবে, যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবেসেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে কাতারবন্দী হয়েছে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মিম্বরসমূহ স্থাপন করবেন, তারপর তাদেরকে সেগুলোতে বসাবেন। তাদের বৈশিষ্ট হলো মানুষ যখন ভীত হয় তখন তারা ভীত হয় না, মানুষ যখন পেরেশান হয় তখন

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

৬৩. যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত ।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۗ

৬৪. তাদের জন্যই আছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে[1], আল্লাহ্‌র

তারা পেরেশান হয় না। তারা আল্লাহর অলী, তাদের কোন ভয় ও পেরেশানী কিছুই থাকবে না। [মুসনাদে আহমাদ [৫/৩৪৩]। [উসুলুল ঈমান ফী দাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত, পৃ. ২৮২-২৮৬ (বাংলা সংস্করণ)]

(১) এখানে আল্লাহর অলীদের জন্য দুনিয়ার সুসংবাদ বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে এসেছে যে, তা হলো "কোন মুসলিম তার জন্য কোন ভাল স্বপ্ন দেখা বা তার জন্য অন্য কেউ কোন ভাল স্বপ্ন দেখা" ।[মুসলিমঃ ২৬৪২, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৫, ৬/৪৪৫, তিরমিযীঃ ২২৭৩, ২২৭৫, ইবনে মাজাহঃ ৩৮৯৮] কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যখন সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন প্রায় সত্য হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেশী সত্যবাদি তার স্বপ্নও বেশী সত্য। মুসলিম ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকারঃ সৎ স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ। আরেক প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে শয়তানের পুঞ্জিভূত করা বিষয়াদি। অন্য আরেক প্রকার স্বপ্ন আছে যা কোন ব্যক্তির নিজের সাথে কৃত কথাবার্তা। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে যেন উঠে সালাত আদায় করে এবং কাউকে না বলে।" [বুখারীঃ ৭০১৭, মুসলিমঃ ২২৬৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মুবাশশিরাত ব্যতীত নবুওয়তের আর কিছু বাকী নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ মুবাশশিরাত কি? তিনি বললেনঃ সৎস্বপ্ন" ।[মুসলিমঃ ৪৭৯]

অবশ্য কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে দুনিয়ার সুসংবাদ বলতে মুমিন বান্দাদের মৃত্যুর সময় তারা যে জান্নাত ও রহমতের ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ পেয়ে থাকেন তাই বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] যেমন সুরা ফুসসিলাতের ৩০-৩২ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বারা' ইবনে 'আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত এক বড় হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকালীন সময়ে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি কি কি দেখতে পায় এবং তার কি অবস্থা হয় তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। [দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৮৭-২৮৮, আবু দাউদঃ ৪৭৫৩] মূলতঃ উভয় তাফসীরই বিশুদ্ধ। এতে কোন স্ববিরোধিতা নেই।

আর আখেরাতে সুসংবাদ হচ্ছে জান্নাত ও উত্তম ব্যবহার। যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলের বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

বাণীর কোন পরিবর্তন নেই[১]; সেটাই মহাসাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর তাদের কথা আপনাকে যেন চিন্তিত না করে। নিশ্চয় সমস্ত সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক আল্লাহ্; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۗءَ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. জেনে রাখ! নিশ্চয় যারা আসমানসমূহে আছে এবং যারা যমীনে আছে তারা আল্লাহ্‌রই। আর যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে শরীকরূপে ডাকে, তারা কিসের অনুসরণ করে?[২] তারা তো শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যা কথাই বলে।

বলেনঃ "তাদেরকে (হাশরের মাঠের) কঠিন ভীতিকর অবস্থা পেরেশান করবে না, আর ফেরেশ্‌তাগণ তাদের সাক্ষাৎ করে বলবে, এটা তো ঐ দিন যার ওয়াদা তোমাদের করা হতো"।[সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "সেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদের সামনে ও ডানে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে। বলা হবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।" [সূরা আল-হাদীদঃ১২]

(১) অর্থাৎ উপরে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন মুত্তাকীদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা কখনো পরিবর্তনশীল নয়। এটা স্থায়ী অঙ্গীকার। [কুরতুবী]

(২) আয়াতের অন্য অনুবাদ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা মূলত শরীকদের অনুসরণ করে না। কেননা, যাকে প্রকৃত অর্থে ডাকতে হবে, তিনি হবেন রব। আর এ সমস্ত শরীকগুলো কখনও রব হতে পারে না। তাদেরকে তারা শরীক বললেও প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র শরীক নয়। আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতে শরীক সাব্যস্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে থাকে। [কুরতুবী] তাছাড়া কোন কোন মুফাসসির অনুবাদ করেছেন, আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য যাদেরকে তারা ডাকে, তারা তো তাদের ধারণা অনুসারে তাদেরই সাব্যস্ত করা শরীক। প্রকৃত অর্থে তারা শরীক নয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, এর অর্থ, তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া শরীক সাব্যস্ত করে থাকে সে সমস্ত নবী ও ফিরিশতাগণ তো আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেন না। সুতরাং তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো? [ফাতহুল কাদীর]

هُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই তৈরী করেছেন তোমাদের জন্য রাত, যেন তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং দেখার জন্য দিন। যে সম্প্রদায় কথা শুনে নিশ্চয় তাদের জন্য এতে আছে অনেক নিদর্শন।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলে, 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি মহান পবিত্র![১] তিনি অভাবমুক্ত[২]! যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে যমীনে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ্‌র উপর এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না[৩]?

---

(১) অর্থাৎ "আল্লাহ সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত।" উদ্দেশ্য, আল্লাহ তো ত্রুটিমুক্ত, কাজেই তাঁর সন্তান আছে একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে! এখানে আল্লাহ্ তাঁর জন্য স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, অংশীদার ও সমকক্ষ নির্ধারণ করা থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। [কুরতুবী] তিনি এ সব থেকে মুক্ত, তিনি অমুখাপেক্ষী, আর সবাই তার মুখাপেক্ষী। [ইবন কাসীর]

(২) সন্তানের সাথে অভাবমুক্তির সম্পর্ক হচ্ছে, মানুষ চায় সন্তান সন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে তার কাজ-কারবারে সাহায্য হবে। আর মৃত্যুর পর সে বেঁচে থাকবে এবং তার না থাকা জনিত অভাব কিছুটা প্রশমিত হবে। আল্লাহ্ তো সর্বক্ষম এবং সর্বদা আছেন। সুতরাং সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তাঁর অবর্তমানে অভাব ঘুচানোর ব্যাপারটি আসছে না। [তাবারী]

(৩) এটা দ্বারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মারাত্মক ভয়প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কিভাবে কথা বলছ? এর পরিণতি কি হতে পারে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমাদেরকে কি তিনি এমনিতে ছেড়ে দিবেন? পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও একই পদ্ধতিতে আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলার উপর প্রচণ্ড ধমকি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করছ। যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে

৬৯. বলুন, 'যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করবে তারা সফলকাম হবে না।'

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞

৭০. দুনিয়াতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমাদেরই কাছে তাদের ফিরে আসা। তারপর তাদেরকে আমরা কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব; কারণ তারা কুফরী করত।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۞

অষ্টম রুকূ'

৭১. আর তাদেরকে নূহ্‌-এর বৃত্তান্ত শোনান[১]। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ প্রদান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি। সুতরাং তোমরা তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ তাদেরকেও

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۞

বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।" [সূরা মারইয়ামঃ ৮৮-৯৫]

(১) এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে এ লোকদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাসে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে এবং সেগুলো ভুল কেন আর এর মোকাবিলায় সঠিক পথ কি এবং তা সঠিক কেন, একথা বুঝানো হয়েছিল। এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে হুকুম দিচ্ছেন, তাদেরকে নূহের ঘটনা শুনিয়ে দিন, এ ঘটনা থেকেই তারা আপনার ও তাদের মধ্যকার ব্যাপারটির জবাব পেয়ে যাবে। যেখানে তারা দেখতে পাবে যে, যারা কুফরিতে নিপতিত ছিল তাদেরকে কিভাবে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। [কুরতুবী] সুতরাং যারাই অনুরূপ কাজ করবে, আপনার উপর মিথ্যারোপ করবে, আপনার বিরোধিতা করবে তাদের পরিণতিও তা-ই হবে। [ইবন কাসীর]

ডাক, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন অস্পষ্টতা না থাকে। তারপর আমার সম্বন্ধে তোমাদের কাজ শেষ করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না(১)।

৭২. 'অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের কাছে আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাইনি, আমার পারিশ্রমিক আছে তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছে, আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি(২)।'

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

---

(১) এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বলা হচ্ছে, আমি নিজের কাজ থেকে বিরত হবো না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করো। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা হুদের ৫৫নং আয়াত।

(২) অর্থাৎ আমাকে যে ইসলামের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য আমি করছি। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম সমস্ত নবী-রাসূলদের দ্বীন। তাদের শরী'আত বিভিন্ন ছিল কিন্তু দ্বীন একই ছিল। নূহ আলাইহিস সালামের দ্বীন যে ইসলাম ছিল তা এ আয়াতে তার কথা থেকে আমরা তা জানতে পারলাম। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামও ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "আমি রাব্বুল আলামীনের জন্য আত্মসমর্পন তথা ইসলাম গ্রহণ করেছি"[সূরা আল-বাকারাহঃ১৩১] তাছাড়া ইয়াকুব আলাইহিসসালামও তার দ্বীনকে ইসলাম বলে ঘোষণা করেছিলেন [দেখুন সূরা আল-বাকারাহঃ১৩২] আর ইউসুফ ও মূসা আলাইহিমাসসালামও সেটা ঘোষণা করেছিলেন [দেখুন, সূরা ইউসুফঃ১০১, সূরা ইউনুসঃ৮৪] বরং মূসা আলাইহিসসালামের উপর ঈমান গ্রহণকারী জাদুকরগণ, রাণী বিলকিস, ঈসা আলাইহিসসালামের হাওয়ারীগণ এরা সবাই তাদের দ্বীনকে ইসলাম বলে জানিয়েছেন [দেখুনঃ সূরা আল-আ'রাফঃ১২৬, সূরা আন-নামলঃ ৪৪, সূরা আল-মায়েদাহঃ৪৪, ১১১] এমনকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীনের অনুসারী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ "বলুন, 'আমার সালাত, আমার 'ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।' 'তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।" [সূরা আল-আন'আমঃ১৬২,১৬৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমরা নবীগোষ্ঠি বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের দ্বীন একই'। [বুখারীঃ৩৪৪৩, মুসলিমঃ ২৩৬৫]

৭৩. অবশেষে তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল; ফলে আমরা তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকাতে ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম। কাজেই দেখুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল?

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তারপর আমরা নূহের পরে অনেক রাসূলকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই; অতঃপর তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। কিন্তু তারা আগে যাতে মিথ্যারোপ করেছিল তাতে ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না[১]। এভাবে আমরা

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

---

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত রয়েছে,
আল্লাহ্ তা'আলা নূহের পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান; কিন্তু নবীগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসার পরও সে সমস্ত সম্প্রদায় নবীরা যা নিয়ে এসেছিল তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল যেমনিভাবে তারা নবী আসার পূর্বে অস্বীকার করত। [কুরতুবী]
আল্লাহ তা'আলা নূহের পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান; কিন্তু তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসার পরেও সে সমস্ত সম্প্রদায় নবীরা যা নিয়ে এসেছিল তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল যেমনিভাবে নূহের জাতি নূহ আলাইহিস্সালামের দাওয়াতকে এর আগে অস্বীকার করেছিল। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর]
আল্লাহ্ তা'আলা নূহের পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান; কিন্তু তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসার পরেও সে সমস্ত সম্প্রদায় নবীরা যা নিয়ে এসেছিল তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল; তারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী আসার পূর্বেই তড়িঘড়ি করে রাসূলদের দাওয়াত মানতে অস্বীকার করেছিল, ফলে যখন তাদের কাছে রাসূলগণ নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলেন তখন পূর্বে অস্বীকার করণের শাস্তি স্বরূপ তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য

সীমালজ্ঘনকারীদের হৃদয় মোহর করে দেই[১]।

৭৫. তারপর আমরা আমাদের নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফির'আউন ও তার সভাষদদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারা অহংকার করে[২] এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়[৩]।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝

৭৬. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমাদের নিকট থেকে সত্য আসল তখন তারা বলল, 'এটা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۝

হলো না। এটা ছিল তাদের জন্য এক প্রকার শাস্তি। কারণ তারা পূর্বে সামর্থ থাকা সত্বেও ঈমান আনেনি। সুতরাং নিদর্শনাবলী দেখার পরেও পূর্বোক্ত হটকারিতার কারণে তাদেরকে ঈমানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হলো। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর] এ অর্থের সমর্থনে অন্যত্র এসেছে, "তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি তেমনি আমিও তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দেব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেব"। [সূরা আল-আন'আম:১১০] [সা'দী]

(১) সীমা অতিক্রমকারী লোক তাদেরকে বলে যারা একবার ভুল করার পর আবার নিজের কথার বক্রতা, একগুঁয়েমী ও হঠকারীতার কারণে নিজের ভুলের ওপর অবিচল থাকে এবং যে কথা মেনে নিতে একবার অস্বীকার করেছে তাকে আর কোন প্রকার উপদেশ, অনুরোধ-উপরোধ ও কোন উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ের যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেনে নিতে চায় না। এ ধরনের লোক যারা কুফরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করে যায় তাদের ওপর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এমন লানত পড়ে যে, তাদের আর ঈমান নসীব হয় না। [কুরতুবী] তাদের আর কোনদিন সঠিক পথে চলার সুযোগ হয় না। তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে সেখানে কোন কল্যাণ প্রবেশ করে না। এতে স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করেন নি। বরং তারাই তাদের কাছে হক আসার পরে হককে প্রতিহত করে এবং প্রথমবার হকের সাথে মিথ্যারোপ করে তাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছিল। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তারা নিজেদের ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে হক গ্রহণ করতে অহংকার করেছিল। [কুরতুবী]।

(৩) অর্থাৎ মুশরিক সম্প্রদায়। [কুরতুবী]

জাদু[১] ।'

৭৭. মূসা বললেন, 'সত্য যখন তোমাদের কাছে আসল তখন তা সম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ? এটা কি জাদু? অথচ জাদুকরেরা সফলকাম হয় না[২] ।'

قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. তারা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের কাছে এসেছ এবং যাতে যমীনে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয়, এজন্যে? আমরা তোমাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারী নই ।'

قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯. আর ফির'আউন বলল, 'তোমরা আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে আস ।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

---

(১) অর্থাৎ মূসার বাণী শুনে তারা সেই একই কথা বলেছিল যা মক্কার কাফেররা বলেছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে । কাফেররা বলেছিল, "এ ব্যক্তি তো পাক্কা জাদুকর ।" [সূরা ইউনুস: ২, অনুরূপ দেখুন, সূরা ছোয়াদ ৪] মূসা ও হারূন আলাইহিমাসসালামের দায়িত্ব তা-ই ছিল যা কুরআনের দৃষ্টিতে সকল নবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এবং সূরা নাযিআতে যে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলে দেয়া হয়েছেঃ "ফিরআউনের কাছে যান, কারণ সে সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তাকে বলেন, তুমি কি নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তৈরী আছো? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাবো তুমি কি তাঁকে ভয় করবে?" [১৭-১৯] কিন্তু ফির'আউন ও তার রাজ্যের প্রধানগণ এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি ।

(২) অর্থাৎ তোমরা এসব গুণাগুণ দেখে অবশ্যই বুঝতে পার যে আসলে এটা কি জাদু নাকি জাদু নয় । তাছাড়া জাদুকররা দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও সফলকাম হয় না । সুতরাং তোমরা দেখো কার পরিণাম কেমন হয়, আর কে-ই বা সফল হয় । পরবর্তীতে তারা ঠিকই সেটা জানতে পেরেছিল এবং প্রত্যেকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মূসা আলাইহিস সালামই সফলকাম । তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সবখানেই সফল । [সা'দী] এ সমগ্র বিষয় শুধু একটি বাক্যের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, "জাদুকর কোন কল্যাণ প্রাপ্ত লোক হয় না ।"

৮০. অতঃপর যখন জাদুকরেরা আসল তখন তাদেরকে মূসা বললেন, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, নিক্ষেপ কর।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۝٨٠

৮১. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেন, 'তোমরা যা এনেছ তা জাদু, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেগুলোকে অসার করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন না।'

فَلَمَّآ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝٨١

৮২. আর অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٨٢

নবম রুকূ'

৮৩. কিন্তু ফির'আউন এবং তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশংকায় মূসার সম্প্রদায়ের এক ছোট্ট নওজোয়ান দল[১] ছাড়া আর কেউ তার প্রতি ঈমান

فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝٨٣

(১) কুরআনের মূল বাক্যে ذُرِّيَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে সন্তান-সন্ততি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এখানে যে মুষ্টিমেয় যুবকদেরকে ঈমান এনেছিল বলে জানানো হলো এরা কারা? তারা কি ফির'আউনের বংশের? নাকি মূসা আলাইহিসসালামের বংশের লোক? আল্লামা ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এ মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনে জরীর আত-তাবারী রাহেমাহুল্লাহ ও আব্দুর রহমান ইবন নাসের আস-সা'দী দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দু'টি মতের স্বপক্ষেই যুক্তি রয়েছে। তবে আয়াত থেকে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে যে, যারাই তখন ঈমান এনেছিল তারা ছিল অল্প বয়স্ক যুবক। [ইবন কাসীর; সা'দী]
কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মক্কার জনবসতিতেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন না বরং তাদের বেশিরভাগই ছিলেন বয়সে নবীন।

আনেনি। আর নিশ্চয় ফির'আউন ছিল যমীনে পরাক্রমশালী এবং সে নিশ্চয় ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

৮৪. আর মূসা বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাক, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক'[২]।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

৮৫. অতঃপর তারা বলল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না[৩]।'

فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٥﴾

---

(১) আয়াতে مُسْرِفِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, সীমা অতিক্রমকারী। সে সত্যিকার অর্থেই সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। কারণ সে কুফরির সীমা অতিক্রম করেছিল। সে ছিল দাস, অথচ দাবী করল প্রভুত্বের। [কুরতুবী]

(২) মূসা আলাইহিসসালাম তার জাতিকে ঈমানের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার আহ্বান জানান। কারণ যারাই আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান [সূরা আয-যুমারঃ ৩৬, সূরা আত-তালাকঃ৩] আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও ইবাদতের সাথে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছেন। [যেমন, সূরা হূদঃ১২৩, সূরা আল-মুলকঃ২৯, সূরা আল-মুয্যাম্মিলঃ ৯]।

(৩) "আমাদেরকে জালেম লোকদের ফিতনার শিকারে পরিণত করবেন না"। অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর বিজয় দিবেন না। কারণ এটা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করবে। [কুরতুবী] অথবা তাদের হাতে আমাদের শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ আমাদের শত্রুদের হাতে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। আর আমাদেরকে এমন কোন শাস্তিও দিবেন না যা দেখে আমাদের শত্রুরা বলে যে, যদি এরা সৎপন্থী হতো তবে আমরা তাদের উপর করায়ত্ব করতে পারতাম না। এতে তারাও বিভ্রান্ত হবে, আমরাও। আবু মিজলায বলেন, এর অর্থ, তাদেরকে আমাদের উপর বিজয় দিবেন না, ফলে তারা মনে করবে যে, তারা আমাদের চেয়ে উত্তম, তারপর তারা আমাদের উপর সীমালঙ্ঘনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

৮৬. 'আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন ।'

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭. আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ওহী পাঠালাম যে, 'মিসরে আপনাদের সম্প্রদায়ের জন্য ঘর তৈরী করুন এবং তোমাদের ঘরগুলোকে 'কিবলা[১] তথা ইবাদাতের ঘর বানান, আর সালাত কায়েম করুন এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন[২] ।'

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

(১) এখানে ﴿وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً﴾ -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে তা নির্ধারনে কয়েকটি মত রয়েছে-
(এক) কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলামুখী করে তৈরী করে নাও । যাতে করে সেগুলোতে সালাত আদায় করলে ফির'আউনের লোকেরা বুঝতে না পারে । [ইবন কাসীর]
(দুই) কোন কোন মুফাস্‌সির-এর মতে এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করে নাও । যাতে সেগুলোতে সালাত আদায় করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে । কারণ পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত ছিল । যেখানে সেখানে সালাত আদায়ের অনুমতি ছিল না । [ইবন কাসীর]
(তিন) কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে মসজিদ বানিয়ে নেবে যাতে তার দিক হয় কেবলার দিকে এবং সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করবে । [কুরতুবী] এ আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, সালাত আদায়ের জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ও বিদ্যমান ছিল । [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । তখন অর্থ হবে, বর্তমানে ঈমানদারদের ওপর যে হতাশা, ভীতি-বিহ্বলতা ও নিস্তেজ-নিস্পৃহ ভাব ছেয়ে আছে তা দূর করে তাদেরকে আশান্বিত করুন । তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্যমশীল করুন । অপর মুফাসসিরগণের মতে এখানে মূসা আলাইহিস সালামকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । আর এটা বেশী সুস্পষ্ট । অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে সু সংবাদ দিন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করবেন । [কুরতুবী]

৮৮. মূসা বললেন, 'হে আমাদের রব! আপনি তো ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে শোভা ও সম্পদ(১) দান করেছেন, হে আমাদের রব! যা দ্বারা তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে(২)। হে আমাদের রব! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করুন, আর তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, ফলে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না(৩)।'

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তিনি বললেন, 'আপনাদের দুজনের দো'আ কবুল হল, কাজেই আপনারা

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا

---

(১) অর্থাৎ আড়ম্বর, শান-শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি-নীতির মোহে মত্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌঁছার আকাঙ্খা করতে থাকে।

(২) অর্থাৎ উপায়-উপকরণ, যেগুলোর প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের কলা-কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল। হে আমাদের রব, আপনিই তাদেরকে এগুলো দিয়েছেন, অথচ আপনি জানতেন যে, আপনি যা নিয়ে তাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন তারা তার উপর ঈমান আনবে না। এটা তো আপনি করেছেন তাদেরকে পরীক্ষামূলক ছাড় দেয়ার জন্য। [ইবন কাসীর]

(৩) এ দো'আটি মূসা আলাইহিস সালাম এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নিদর্শন দেখে নেবার এবং দ্বীনের সাক্ষ্য প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফির'আউন ও তার রাজসভাসদরা সত্যের বিরোধিতার চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গম্বর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে হঠকারিতার ভূমিকা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর নিজের ফায়সালারই অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না। মূসা আলাইহিসসালামের এ দো'আটি নূহ আলাইহিসসালামের দো'আর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছেঃ "হে আমার প্রভু! যমীনের বুকে কাফেরদের কোন আস্তানা অবশিষ্ট রাখবেন না; কারণ তাদেরকে যদি আপনি পাকড়াও না করে এমনি ছেড়ে দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং প্রচণ্ড অপরাধী এবং অতিশয় কাফের ছাড়া আর কিছুর জন্মও তারা দেবে না"। [সূরা নূহঃ ২৭]।

تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

দৃঢ় থাকুন[১] এবং আপনারা কখনো যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করবেন না।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓي اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَاۗءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

৯০. আর আমরা বনী ইস্রাঈলকে সাগর পার করালাম[২]। আর ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে এবং সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল তখন বলল, আমি ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

اٰۗلْــٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

৯১. 'এখন! ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে[৩]।

---

(১) দো'আর উপর দৃঢ় থাকার অর্থ হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাড়াতাড়ি না করা। আর তাড়াতাড়ি তখনই করবে না যখন মনে প্রশান্তি আসবে। আর প্রশান্তি তখনই আসবে যখন গায়েবী ব্যাপারে যা প্রকাশ পাবে তাতে উত্তমভাবে সন্তুষ্টি লাভ হবে। [কুরতুবী]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি দেখলেন ইয়াহূদীরা আশুরার সাওম পালন করছে। তিনি এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললঃ এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা মূসাকে ফির'আউনের উপর বিজয় দিয়েছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা মূসার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের থেকেও বেশী হকদার। সুতরাং তোমরা এদিনে সওম পালন কর'। [বুখারীঃ ৪৬৮০]

(৩) এ আয়াতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর বিখ্যাত মু'জিযা সাগর পাড়ি দেয়া এবং ফির'আনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- ﴿حَتّٰٓي اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَاۗءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, আল্লাহ্‌র উপর বনী-ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে- ﴿اٰۗلْــٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾ অর্থাৎ কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. 'সুতরাং আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক[১]। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল[২]।'

আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরী'আত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করে থাকেন, যতক্ষণ না মৃত্যুর ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়'। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭]
মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফিরিশ্‌তা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম-আহ্‌কাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফির'আউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফির'আউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে অন্য কিছু বলা বা বিশ্বাস করা কুরআন হাদীসের পরিপন্থী।

(১) এখানে ফির'আউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। কাতাদা বলেন, সাগর পাড়ি দেবার পর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন বনী-ইসরাঈলদেরকে ফির'আউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফির'আউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফির'আউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফির'আউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। [তাবারী] তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে গেল। লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

(২) অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নির্দশন দেখেও তাদের চোখ খোলে না। আর জানা কথা যে, ফির'আউন ও তার দলবলের ধবংস ও বনী ইসরাঈলের নাজাত ছিল আশুরার দিনে। [ইবন কাসীর]

দশম রুকূ'

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর অবশ্যই আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করালাম[১] এবং আমরা তাদেরকে উত্তম রিয্‌ক দিলাম, অতঃপর তাদের কাছে জ্ঞান আসলে তারা বিভেদ সৃষ্টি করল[২]। নিশ্চয় তারা যে বিষয়ে

(১) এ আয়াতে ফির'আউনের করুণ পরিণতির মোকাবেলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফির'আউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী-ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান করেছি। আর এ উত্তম আবাসকে কুরআনুল কারীমে ﴿مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾ শব্দে ব্যক্ত করেছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ উপযোগী। [মুয়াসসার] অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অধিকাংশ মুফাসসির 'উত্তম আবাসভূমি' বলে সূরা আল-ইসরায় বর্ণিত ﴿ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ﴾ বলে যা বুঝানো হয়েছে তা সবই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। [ইবন কাসীর; আদওয়াউল বায়ান] তখন এ স্থানটি অত্যন্ত ব্যাপক এলাকাকে শামিল করবে। অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস সংলগ্ন এলাকা, যা বর্তমান ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের বেশ কিছু এলাকাকে শামিল করে। এ ছাড়া সাধারণভাবে মিশরও তাদের পদানত হওয়ার কথা। কারণ, ফির'আউন ধ্বংস হওয়ার পর মিশর রাজত্ব যতটুকু ছিল ততটুকু সবটাই মূসা আলাইহিস সালামের আয়ত্বে চলে আসে। [ইবন কাসীর] কিন্তু ইতিহাসে এটা প্রমাণিত হয়নি যে, তারা আবার মিশরে ফিরে গিয়েছিল।

(২) অর্থাৎ তারা এরপর যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করেছিল তা অজ্ঞতার কারণে নয়। তাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। যার অর্থ হচ্ছে বিভেদ ও মতপার্থক্য না করা। কারণ, জ্ঞান দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাদের থেকে সন্দেহ, সংশয় দূর করেছিলেন। কিন্তু তারা মতভেদই করেছিল। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে যে দলাদলি শুরু করে এবং নতুন নতুন মাযহাব তথা ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠির উদ্ভব ঘটায় তার কারণ এ ছিল না যে, তারা প্রকৃত সত্য জানতো না এবং এ না জানার কারণে তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করে। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে সত্য দ্বীন, তার মূলনীতি, তার দাবী ও চাহিদা, কুফর ও ইসলামের পার্থক্য সীমা, আনুগত্য ইত্যাদির জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে গোনাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা সম্পর্কেও জ্ঞান দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও তারা একটি দ্বীনকে অসংখ্য দ্বীনে পরিণত করে এবং আল্লাহর দেয়া বুনিয়াদগুলো বাদ দিয়ে অন্য বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় ফেরকার প্রাসাদ নির্মাণ করে। তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের কারণে বায়তুল মুকাদ্দাস

বিভেদ সৃষ্টি করত[1] আপনার রব তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে সেটার ফয়সালা করে দেবেন।

৯৪. অতঃপর আমরা আপনার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে যদি আপনি

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ

ও ফিলিস্তিন এলাকায় অবস্থান কালে বারবার বিভিন্ন বিপর্যয়ে পতিত হয়। মূসা ও হারূন আলাইহিমাসসালামের মৃত্যুর পর ইউসা' বিন নূন তাদেরকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকা জয় করেন। তারপর বুখতনসর তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করে। কিন্তু তারা আবার আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসলে আবার তাদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরে আসে। এরপর তারা আবার পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লে তারা গ্রীকদের অধীন হয়। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে ঈসা আলাইহিসসালামকে পাঠালেন। কিন্তু তারা গ্রীক রাজাদেরকে ঈসা আলাইহিসসালামের উপর এই বলে ক্ষেপিয়ে তুলল যে, তিনি প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির পঁয়তারা চালাচ্ছেন। গ্রীকগণ তখন ঈসা আলাইহিসসালামকে ধরার জন্য লোক পাঠাল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের একজনকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা আলাইহিসসালামের আকৃতি দিয়ে ঈসা আলাইহিসসালামকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এর ৩০০ বছর পরে গ্রীক সম্রাট কস্টান্টিন নাসারা ধর্মে প্রবেশ করে। সে তখন বিভিন্ন ভিন্নমতাবলম্বী এবং নিজের পক্ষ থেকে জুড়ে দিয়ে নতুন অনেকগুলো আক্বীদা-বিশ্বাস ও শরী'আত প্রবর্তন করল এবং রাষ্ট্রিয় ক্ষমতাবলে সেগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করল। যারা ঈসা আলাইহিসসালাম আনীত দ্বীনের উপর ছিল তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করল। তারা বিভিন্নস্থানে পালিয়ে গেল। সে সবস্থানে তার মনমত লোক সেট করল। এবং দেশে দেশে তার মতের লোকদের দ্বারা উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করল। তাদের সে সমস্ত নতুন আকীদার মধ্যে ছিল, ঈসা আলাইহিসসালাম নবী নন। তিনি তিন ইলাহর একজন। তার মধ্যে ঐশ্বরিক এবং মানবিক দু'ধরণের গুণের সমাহার ছিল। তখন থেকে তারা ক্রুশকে পবিত্র চিহ্ন বলে বিবেচনা করল। শুকরের গোস্ত হালাল করল। বিভিন্ন গীর্জায় ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাসসালামের কল্পিত ছবি স্থাপন করল। এভাবে তারা তাদের দ্বীনকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে ফেলল। পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে সুস্থ সঠিক আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদের প্রতিষ্ঠা করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময়ে সাহাবাগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিকারী হন। [ইবন কাসীর, সংক্ষেপিত]

(১) তাদের বিভেদ সৃষ্টি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, ইয়াহূদীগণ একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর নাসারাগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৬২৪৭, ৬৭৩১]

الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

সন্দেহে থাকেন তবে আপনার আগের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন; অবশ্যই আপনার রবের কাছ থেকে আপনার কাছে সত্য এসেছে[১]। কাজেই আপনি কখনো সন্দেহপ্রবণদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না,

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে আপনি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না- তাহলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না[২]।

---

(১) বাহ্যত এ সম্বোধনটা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও সন্দেহে ছিলেন না। কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, 'আমি সন্দেহ করিনা এবং প্রশ্নও করিনা' [ইবন কাসীর, মুরসাল উত্তম সনদে] আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানোই মূল উদ্দেশ্য। এ সংগে আহলে কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথার্থই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। তাদের জন্য এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলে কিতাবের আলেমদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তাছাড়া আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ নবীর কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যা তাদের কিতাবে লিখা আছে। [ইবন কাসীর] যেমন আল্লাহ্ বলেন, "যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭]

(২) সে কথাটি হচ্ছে এই যে, যারা নিজেরাই সত্যের অন্বেষী হয় না এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে জিদ, হঠকারিতা, অন্ধগোষ্ঠি প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের তালা রাখে আর যারা দুনিয়া প্রেমে বিভোর হয়ে পরিণামের কথা চিন্তাই করে না তারাই ঈমান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। হ্যাঁ তারা একসময় ঈমান আনবে, আর তা

৯৭. যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে[১]।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

৯৮. অতঃপর কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তবে ইউনুস[২]এর সম্প্রদায় ছাড়া, তারা যখন ঈমান আনল তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

হচ্ছে, যখন তারা মর্মন্তুদ শাস্তি দেখতে পাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান আর গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এজন্যই মূসা আলাইহিস সালাম যখন ফির'আউন ও তার সভাষদদের উপর বদ-দো'আ করলেন, তখন বলেছিলেন, "হে আমাদের রব! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করুন, আর তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, তারা তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না"। [ইবন কাসীর]

(১) শাস্তি দেখার পর তাদের ঈমান আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। সূরা ইউনুসের ৮৮ নং আয়াতেও এ কথা বলা হয়েছে, মূসা আলাইহিসসালাম ফির'আউন সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না" অনুরূপভাবে সূরা আল-আন'আমের ১১১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "আমি তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ"। অর্থাৎ ঈমান না আনা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে সুতরাং যত নিদর্শনই তাদের কাছে আসুক না কেন তা কোন কাজে লাগবে না।

(২) ইউনুস আলাইহিস সালামকে আসিরিয়ানদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরীয়দেরকে এখানে ইউনুসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনোভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনোভা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

জীবনোপভোগ করতে দিলাম[১]।

(১) আয়াতের পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনই বা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো! অর্থাৎ আযাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হবার আগে যদি ঈমান নিয়ে আসতো, তবে তাদের ঈমান কবূল হয়ে যেত। কিন্তু ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আযাবের লক্ষণাদি দেখে আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তাওবা কবুল হয়ে যায়। আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নিয়মে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি; বরং একান্তভাবে তাঁর নিয়মানুযায়ীই তাদের ঈমান ও তাওবা কবুল করে নেয়া হয়েছে।

অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ে তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র সাধারণ রীতির আওতায়ই হয়েছে। তাবারী প্রমূখ তাফসীরকারও এ ঘটনাকে ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তাওবা করা ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিই আযাব না আসার কারণ। ঘটনা এই যে, ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক তিন দিন পর আযাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, আযাব আসেনি, তখন ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসলো যে, আমি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু নবী-রাসূলগণের রীতি হলো এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন দিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত তারা হিজরত করেন না। ইউনুস 'আলাইহিস্ সালাম- আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। সূরা আস্-সাফ্‌ফাতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ "স্মরণ করুন, যখন তিনি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গেলেন" [আস্-সাফ্‌ফাতঃ ১৪০] এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে أَبَقَ শব্দে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। অন্য সূরায় এসেছে, "আর স্মরণ করুন, যুন্-নূন-এর কথা, যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না।" [আল-আম্বিয়াঃ ৮৭] এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং তার প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ হলো, অনুমতির পূর্বে হিজরত করা। মোটকথাঃ পূর্বের কোন নবী-রাসূলের জনপদের সবাই ঈমান আনেনি। এর ব্যতিক্রম ছিল

৯৯. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে যমীনে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনত[১]; তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন[২]?

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

ইউনুসের কাওম। তারা ছিল নিনোভার অধিবাসী। তাদের ঈমানের কারণ ছিল, তারা তাদের রাসূলের মুখে যে আযাব আসার কথা শুনেছিল সেটার বিভিন্ন উপসর্গ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আর তারা দেখল যে, তাদের রাসূলও তাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছেন। তখন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইল, তাঁর কাছে উদ্ধার কামনা করল, কান্নাকাটি করল এবং বিনয়ী হল। আর তারা তাদের শিশু-সন্তান, জন্তু-জানোয়ারদের পর্যন্ত উপস্থিত করেছিল এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। আর তখনই আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত করেন এবং তাদের আযাব উঠিয়ে নেন, তাদেরকে কিছু দিনের জন্য দুনিয়াকে উপভোগ করার সুযোগ প্রদান করেন [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কুফরী ও নাফরমানীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে তাঁর জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে মুমিন ও অনুগত বানানো কঠিন ছিল না এবং নিজের একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতের মাধ্যমে তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্যে ভরে তোলাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর যে প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য কাজ করছে এ প্রাকৃতিক বল প্রয়োগ তা বিনষ্ট করে দিতো। তাই আল্লাহ নিজেই ঈমান আনা বা না আনা এবং আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখতে চান। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা হূদঃ ১১৮, ১১৯, সূরা আর-রা'দঃ৩১]

(২) ইবন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মানুষই ঈমান আনুক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, যাদের ঈমানের কথা পূর্বেই প্রথম যিকর তথা মানুষের তাকদীরে লিখা হয়েছে কেবল তারাই ঈমান আনবে, আর যাদের দূর্ভাগ্যের কথা প্রথম যিকর তথা প্রথম তাকদীর নির্ধারণে লিখা হয়েছে কেবল তারাই দূর্ভাগা হবে। [তাবারী; কুরতুবী] এর অর্থ প্রমাণের সাহায্যে হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার এবং সঠিক পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার যে দায়িত্ব ছিল তা আমার নবী পুরোপুরি পালন করেছেন। এখন যদি তোমরা নিজেরাই সঠিক পথে চলতে না চাও এবং তোমাদের সঠিক পথে যদি এর ওপর নির্ভরশীল হয় যে, কেউ তোমাদের ধরে বেঁধে সঠিক পথে চালাবে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করবেন না তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। এমন কেউ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা কারো সাধ্য নয় এবং যারা বোঝে না আল্লাহ্ তাদেরকেই কলুষলিপ্ত করেন।

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. বলুন, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর।' আর যারা ঈমান আনে না, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন এমন সম্প্রদায়ের কোন কাজে আসে না[১]।

নেই যে, তার মনের উপর জোর করে ঈমানের জন্য সেটাকে প্রশস্ত করে দেবে। তবে যদি আল্লাহ্ সেটা চান তবে ভিন্ন কথা। [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সেটা বর্ণনা করেছেন যে, "আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪১] আরও বলেন, "আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছে সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।" [সূরা আল-কাসাস: ৫৬] অনুরূপ আরও অন্যান্য আয়াতেও এসেছে, যেমন, সূরা আন-নিসা: ৮৮, ১৪৩; সূরা আর-আ'রাফ: ১৭৮; সূরা আর-রা'দ: ৩৩; সূরা আল-ইসরা: ৯৭; সূরা আল-কাহাফ: ১৭; সূরা আয-যুমার: ২৩; ৩৬; সূরা গাফির: ৩৩; সূরা আশ-শূরা: ৪৪; ৪৬।

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে এ নির্দেশই দিচ্ছেন যে, তারা যেন আসমান ও যমীনের বৃহৎ সৃষ্টিগুলোর দিকে তাকায় যেগুলো তাঁর মহত্বতা, পূর্ণতা, ও তিনিই যে একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ তার উপর প্রমাণবহ। অনুরূপ নির্দেশ তিনি অন্য আয়াতেও দিয়েছেন। যেমন, "অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী?" [সূরা ফুসসিলাত: ৫৩]। [আদওয়াউল বায়ান] বস্তুত: ঈমান আনার জন্য তারা যে দাবীটিকে শর্ত হিসেবে পেশ করতো এটি হচ্ছে তার শেষ ও চূড়ান্ত জবাব। তাদের এ দাবীটি ছিল, আমাদের এমন কোন নির্দশন দেখান যার ফলে আপনার নবুওয়াতকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের আকাংখা এবং সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে তাহলে যমীন ও আসমানের চারদিকে যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো মুহাম্মদের বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং তার চাইতেও

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তবে কি তারা কেবল তাদের আগে যা ঘটেছে সেটার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে? বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি(১)।'

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. তারপর আমরা আমাদের রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্ধার করি। এভাবে মুমিনদেরকে উদ্ধার করা আমাদের দায়িত্ব (২)।

একাদশ রুকূ'

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. বলুন, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের 'ইবাদাত কর আমি তাদের 'ইবাদাত করি না। বরং আমি 'ইবাদাত করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান

বেশী। শুধুমাত্র চোখ খুলে সেগুলো দেখার প্রয়োজন। কিন্তু যদি এ চাহিদা ও আগ্রহই তোমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে অন্য কোন নির্দশন, তা যতই অলৌকিক, অটল ও চিরন্তন রীতি ভংগকারী এবং বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য হোক না কেন, তোমাদেরকে ঈমানের নিয়ামত দান করতে পারে না।

(১) অর্থাৎ তারা তো কেবল তাদের পূর্বে যারা চলে গেছে, নূহ, হূদ ও সামূদের কাওমের উপর দিয়ে যে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল সেটার মত ঘটনারই অপেক্ষা করছে। [তাবারী] পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যারা নবী-রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের উপর যেমন শাস্তি এসেছিল এরাও কি তদ্রূপ শাস্তিরই অপেক্ষা করছে? [ইবন কাসীর]

(২) এ দায়িত্ব আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন। কেউ তাঁকে বাধ্য করার নেই। তিনি নিজ করুণাবশতঃ মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের প্রভূ তার নিজের উপর রহমতকে লিখে নিয়েছেন" [সূরা আল-আন'আমঃ৫৪] অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তাঁর কাছে আরশের উপর একটি কিতাবে লিখে রেখেছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে'। [বুখারীঃ ৩১৯৪, মুসলিমঃ ২৭৫১]

এবং আমি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি,

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আর এটাও যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন(১) এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না(২),

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. 'আর আপনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ এটা করলে তখন আপনি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।'

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন ক্ষতির স্পর্শ করান, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই । আর যদি আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল চান, তবে

(১) অর্থাৎ "নিজের চেহারাকে স্থির করে নিন ।" এর অর্থ, আপনি এদিক ওদিক, সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যাবেন না । একেবারে বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলুন, যেপথ আপনাকে দেখানো হয়েছে । তারপর বলা হয়েছে حنيفاً অর্থাৎ সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র একদিকে মুখ করে থাকুন । কাজেই দাবী হচ্ছে, এ দ্বীন, আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য করতে ও হুকুম মেনে চলতে হবে । এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়াও যাবে না । অন্য আয়াতেও সে নির্দেশ এসেছে, যেমন, "কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন । আল্লাহ্র ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), এর উপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই । এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না ।" [সূরা আর-রূমঃ ৩০]

(২) অর্থাৎ যারা আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও যা বেশী ভয় করছি তা কি বলে দিবনা? আমরা বললামঃ হ্যাঁ, তিনি বললেনঃ 'শির্কে খফী' । আর তা হলোঃ কোন মানুষ অপরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন নেক আমল করা । [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩০]

তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার কাছে সেটা পৌঁছান। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু[১]।'

১০৮. বলুন, 'হে লোকসকল! অবশ্যই তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে। কাজেই যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নই[২]।'

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯. আর আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করুন এবং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন, আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাপ্রদানকারী[৩]।

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

---

(১) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বলেছেন। যেমন, "আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনাকে কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান" [সূরা আল-আন'আম: ১৭]

(২) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বলেছেন। যেমন, "যে সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজেরই মংগলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য।" [সূরা আল-ইসরা: ১৫]

(৩) আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে নবী ও তার শত্রুদের মাঝে কি ফয়সালা করেছেন সেটা বর্ণনা করেন নি। অন্য আয়াতে অবশ্য তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি কাফেরদের উপর নবী ও তার অনুসারীদেরকে বিজয় দিয়েছেন। তাঁর দ্বীনকে অপরাপর সমস্ত দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা

ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী” [সূরা আন-নাসর] আরও বলেন, “নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয় যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন , এবং আল্লাহ্ আপনাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।” [সূরা আল-ফাতহ: ১-৪] আরও বলেন, “তারা কি দেখে না যে, আমরা এ যমীনকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি ? আর আল্লাহ্ই আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসেব গ্রহণে তৎপর।” [সূরা আর-রা'দ: ৪১] অনুরূপ “তারা কি দেখছে না যে, আমরা যমীনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি।” [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৪] [আদওয়াউল বায়ান]

১১- সূরা হূদ

سُوْرَةُ هُوْدٍ
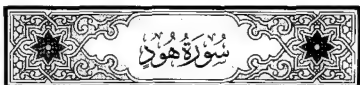
সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১২৩।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা হূদ মক্কায় নাযিল হয়েছে। [ইবন কাসীর]

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা হূদ। একজন প্রখ্যাত রাসূলের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। তার বাহ্যিক কারণ হচ্ছে, এ সূরার ৫৩ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যেখানে হূদ আলাইহিস সালাম ও তার কাওমের মধ্যকার কথোপকথন আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ এ সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সুরা হুদ ঐসব সুরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমুহের উপর আপতিত আল্লাহর গযব ও বিভিন্ন কঠিন আযাবের এবং পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বললেনঃ হ্যাঁ, সুরা হুদ এবং ওয়াকি'আ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন, ইযাস-শামছু কুওওয়িরাত আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। [তিরমিযীঃ৩২৯৭] উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সুরাগুলিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ সূরার একটি আয়াতে এসেছে, ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾ "যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে দৃঢ়পদ থাকুন" [১১২] এ নির্দেশই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

।। রহমান, রহীম আল-াহ্‌র নামে।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা, এ কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট(১), সুবিন্যস্ত ও

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝١

(১) অর্থাৎ এ কিতাবে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো পাকা ও অকাট্য কথা এবং সেগুলোর কোন নড়চড় নেই। ভালোভাবে যাচাই পর্যালোচনা করে সে কথাগুলো বলা হয়েছে। সুতরাং কুরআন পাকের আয়াতসমূহ সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিত। বাতিল এর কাছে প্রবেশের কোন সুযোগ পায় না [তাবারী] তাওরাত, ইঞ্জীল, ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমুহ পবিত্র কুরআন নাযিলের ফলে যেভাবে মনসূখ বা রহিত হয়েছে কুরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত

পরে বিশদভাবে বিবৃত[১] প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার কাছ থেকে[২];

২. যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের 'ইবাদাত করো না[৩], নিশ্চয় আমি

أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝

হবে না। [কুরতুবী] এর আয়াতসমূহ শব্দের দিক থেকে মুহকাম বা সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তিত। হাসান ও আবুল আলীয়া বলেন, নির্দেশ ও নিষেধ দ্বারা এটাকে মজবুত করা হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এ আয়াতগুলো বিস্তারিতও। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথা খুলে খুলে ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বক্তব্য জটিল, বক্র ও অস্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি কথা আলাদা আলাদা করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এর অর্থ, ওয়াদা, ধমক, সাওয়াব ও শাস্তির বিষয়াদি এতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী] কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ এটাকে বাতিলের জন্য অপ্রতিরোধ্য করেছেন, তারপর হালাল ও হারাম সংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, সামগ্রিকভাবে এটাকে মজবুত করেছেন। তারপর তাওহীদ, নবুওয়াত ও আখেরাতের পুনরুত্থানের বর্ণনা এক একটি আয়াত করে প্রদান করা হয়েছে। [কুরতুবী] সুতরাং এতে আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন আচার ব্যবহার ও নীতি নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কুরআন মজীদ একসাথে লাওহে মাহফুজে উৎকীর্ণ করা হয়েছে, কিন্তু তারপর স্থান কাল পাত্র পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবণ ক্রমানুসারে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়। [কুরতুবী] অথবা এক এক আয়াত করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হয়েছে যাতে এর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করা যায়। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি তাঁর বাণীসমূহ ও বিধানসমূহে মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে কুরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তাওহীদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না। অর্থাৎ এ কুরআন মজবুত ও বিস্তারিতভাবে এজন্যই নাযিল করা হয়েছে যাতে তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত না কর। [ইবন কাসীর] আয়াতের এটাও অর্থ হতে পারে যে, কুরআনকে এভাবে নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও ইবাদত করবে না। [কুরতুবী] মোটকথা: আয়াতে কুরআনের বিষয়বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না, যাকে

তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা[১]।

৩. আরো যে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকে ফিরে আস[২], তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের এক উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন[৩] এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে

وَّاَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡهِ یُمَتِّعۡكُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی وَّ یُؤۡتِ كُلَّ ذِیۡ فَضۡلٍ فَضۡلَهٗ ؕ وَ اِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡكُمۡ عَذَابَ یَوۡمٍ كَبِیۡرٍ ﴿۳﴾

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বলা হয়। এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে। মূলতঃ এটাই সমস্ত নবী-রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য। এ কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। [যেমন, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫, সূরা আন-নাহলঃ৩৬]

(১) এখানে কুরআনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, আর তা হচ্ছেঃ রিসালাত। ইরশাদ হচ্ছে, "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা"। এ আয়াতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশ্ববাসীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী। যে আমার অনুসরণ করবে সে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে যাবে, আর যে আমার বিরোধিতা করবে সে কঠোর শাস্তিতে নিপতিত হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশদের সমস্ত শাখা গোত্রকে ডেকে বললেনঃ "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি যদি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেই যে, এক আক্রমণকারী সেনাদল তোমাদেরকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে তাহলে কি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারবে?" তারা বললঃ আমরা তো আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন তিনি বললেনঃ "তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক কঠোর শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকারী"। [বুখারীঃ১৩৯৪, মুসলিমঃ ২০৮]

(২) অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে পূর্ববর্তী যাবতীয় গুণাহ হতে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্র দরবারে ফিরে আসার আহ্বান জানাই। এবং ভবিষ্যতে একমাত্র আল্লাহ্র সান্নিধ্যে থাকার প্রচেষ্টা চালাতে বলি। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাওবা করো, কারণ আমি দিনে একশত বার তাঁর কাছে তাওবা করি। [মুসলিম: ২৭০২]

(৩) অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাদের অবস্থান করার জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তিনি তোমাদের খারাপভাবে নয় বরং ভালোভাবেই রাখবেন। তাঁর নিয়ামতসমূহ তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে। তাঁর বরকত ও প্রাচুর্য লাভে তোমরা ধন্য হবে। তোমরা সচ্ছল ও সুখী-সমৃদ্ধ থাকবে। তোমাদের জীবন শান্তিময় ও নিরাপদ হবে। তোমরা

তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন[১]। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি।

লাঞ্ছনা, হীনতা ও দীনতার সাথে নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে। এ বক্তব্যটিই সূরা নাহ্‌লের ৯৭নং আয়াতে এভাবে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তিই ঈমান সহকারে সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।" অনুরূপভাবে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাই খরচ করবে তাতেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এর জন্য সওয়াব পাবে। এমনকি যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তাতেও"। [বুখারীঃ ৫৬, মুসলিমঃ ১৬২৮] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'যদি কেউ গুণাহর কাজ করে তখন তার জন্য একটি গুণাহ্ লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি সওয়াবের কাজ করে তবে তার জন্য দশটি সওয়াব লিখা হয়। তারপর যদি দুনিয়াতে তার গুণাহের শাস্তি পেয়ে যায় তবে তার জন্য আখেরাতে দশটি সওয়াবই বাকী থাকে, কিন্তু যদি দুনিয়াতে শাস্তি না পায় তবে আখেরাতে একটি গুণাহের বিনিময়ে একটি সওয়াব চলে গেলেও তার আরও নয়টি সওয়াব অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং যার একক দশকের উপর প্রাধান্য পায় তার তো ধ্বংসই অনিবার্য।' [তাবারী] এরপর আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ 'উত্তম জীবন সামগ্রী' প্রদান করবেন। এ হচ্ছে ইস্তেগফার ও তাওবার ফল। [কুরতুবী] আল্লামা শানকীতী বলেন, আয়াতে 'উত্তম জীবন সামগ্রী' বলে প্রশস্ত রিযক, জীবিকার উন্নত অবস্থা, দুনিয়াতে সার্বিক নিরাপত্তা বোঝানো হয়েছে। আর 'নির্দিষ্ট সময়' বলে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতেও সেটা বলা হয়েছে, যেমন হূদ আলাইহিস সালাম তার কাওমকে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না" [সূরা হূদঃ ৫২] অনুরূপ নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কাওমের কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর বলেছি, 'তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, 'এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা" [সূরা নূহঃ ১০-১২] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করো, কারণ আমি দিনে একশত বার তাঁর কাছে তাওবা করি। [মুসলিমঃ ২৭০২]

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, তার যে সমস্ত কাজ সে সওয়াবের আশায় করেছে। চাই তা সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে হোক অথবা হাত বা পা দ্বারা কোন ভাল আমল করেছে, অথবা কোন ভাল কথা বলেছে, অথবা তার যে সমস্ত ভাল কাজ অতিরিক্ত করেছে সে সবই তাকে প্রদান করা হবে। [তাবারী] কাতাদা বলেন, তা আখেরাতে প্রদান করা হবে। [তাবারী]

৪. আল্লাহ্‌রই কাছে তোমাদের ফিরে যাওয়া এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

৫. জেনে রাখ! নিশ্চয় তারা তাঁর কাছে গোপন রাখার জন্য তাদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। জেনে রাখ! তারা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন[১]। অন্তরে

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেরগণ সন্দেহ সংশয় করে মুখ লুকিয়ে থাকে আর মনে করে যে, এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আড়াল করতে পারবে। তারা মূলতঃ আল্লাহ্ থেকে কখনো আড়াল করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা থেকে কোন কিছুই আড়াল নেই। তাই যত চেষ্টাই করুক না কেন তারা নিজেদের আড়াল করতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "আমরাই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি।" [সূরা ক্বাফঃ ১৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "আর জেনে রাখ যে, তোমাদের অন্তরে যা গোপন আছে আল্লাহ্ তা জানেন সুতরাং তোমরা তাকে ভয় কর"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৩৫] অন্য আয়াতে বলেনঃ "তারপর আমরা অবশ্যই জ্ঞানসহ তাদের কাছে তা ব্যক্ত করব, আর আমরা তো অনুপস্থিত ছিলাম না।" [সূরা আল-আ'রাফঃ৭] আরও বলেনঃ "আপনি যে কোন অবস্থায় থাকেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে কোনো কাজ কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক---যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও আপনার প্রতিপালকের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই"। [সূরা ইউনুসঃ ৬১]

তবে তারা যে শুধু হক শোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত তা'ই নয়। বরং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র যে বাণী শোনাত তা'ও না শোনার ভান করত। আর মনে করত যে, এভাবে তারা আল্লাহ্ থেকে গোপন করছে। কারণ, মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলো তখন সেখানে এমন বহু লোক যারা বিরোধিতায় প্রকাশ্যে তেমন একটা তৎপর ছিল না কিন্তু মনে মনে তার দাওয়াতের প্রতি ছিল চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও বিরূপভাবাপন্ন। তারা তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলতো। তাঁর কোন কথা শুনতে চাইতো না। কোথাও তাঁকে বসে থাকতে দেখলে পেছন ফিরে চলে যেতো। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতো অথবা কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলতো, যাতে তাঁর মুখোমুখি হতে না হয় এবং তিনি তাদেরকে সম্বোধন

যা আছে, নিশ্চয় তিনি তা সবিশেষ অবগত।

৬. আর যমীনে বিচরণকারী সবার জীবিকার[১] দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই[২] এবং

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

করে কথা বলতে শুরু করে না দেন। এখানে এ ধরনের লোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। [তাবারী; বাগভী; সা'দী; ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অপর অনুবাদ হচ্ছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বা রাসূলের কাছ থেকে নিজেদের লুকানোর জন্য মাথা নীচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে চলে যেত। অথচ যত কাপড় দিয়েই তারা নিজদেরকে ঢাকুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা ঠিকই তাদের দেখছেন। [ইবন কাসীর] তাই আয়াতে বলা হয়েছে, এরা সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং উটপাখির মত বালির মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে মনে করে, যে সত্যকে দেখে তারা মুখ লুকিয়েছে তা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। অথচ সত্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং এ তামাশাও দেখছে যে, এ নির্বোধরা তার থেকে বাঁচার জন্য মুখ লুকাচ্ছে। অথবা আয়াতের অর্থ, তারা তাদের কুফরী তাদের অন্তরে গোপন করে রাখে আর মনে করে যে, আল্লাহ্ থেকে গোপন করছে। অথচ তারা যত কাপড় দিয়েই নিজেদেরকে আড়াল করুক না কেন আল্লাহ্ তো তাদের অবস্থা জানেন। [মুয়াসসার]

আবার তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোকও ছিল যারা তাদের প্রাত্যহিক গোপনীয় কাজসমূহ যেমন স্ত্রী-সহবাস, পায়খানা ব্যবহার করার সময়ও নিজেদের কাপড় খুলতে লজ্জাবোধ করত এবং তা আকাশের দিকে হয়ে যাওয়ার ভয় করত। কিন্তু অন্যান্য সময় আল্লাহ্‌র কোন খেয়াল রাখত না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এ আয়াত নাযিল করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'তারা (কাফেরগণ) স্ত্রী-সহবাসের সময় বা পায়খানা ব্যবহার করার সময় আকাশের দিকে মুখ করতে লজ্জাবোধ করত এবং কাপড় দিয়ে নিজেদের মাথা ঢেকে রাখত। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন'। [বুখারীঃ ৪৬৮১, ৪৬৮২, ৪৬৮৩]

(১) রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীব জন্তু রিযিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। কারণ, মালিক হওয়ার যোগ্যতাই ওদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। [কুরতুবী]

(২) এমন সব প্রাণীকে دابة বলে যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। [কুরতুবী] পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, খাদ্য গ্রহনের জন্য তারা ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের

رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑥

তিনি সেসবের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি[১] সম্বন্ধে অবহিত; সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে আছে[২]।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

৭. আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর 'আরশ

বাসস্থান ভু-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহ ও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা, সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহন করছেন। এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যদ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে, "তাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত"। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই, বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে গ্রহন করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এক পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে على শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরয বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোন কাজ ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না। বরং এটি সম্পূর্ণ তার অনুগ্রহ। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির অবশ্য বলেছেন যে, এখানে على বা উপরে বলে من বা হতে বলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সবার রিযক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। [কুরতুবী]

(১) আয়াতে উল্লেখিত مستقر এবং مستودع এর অর্থ, مستقر শব্দটির কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে, ১. যমীনের বুকে অবস্থান স্থল। বা পিতার পিঠে অবস্থানকে। ২. দিন বা রাতে আশ্রয় নেয়ার স্থান। আর مستودع শব্দটিরও কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, ১. মায়ের রেহেমে অবস্থান বা ডিমের মধ্যে অবস্থানকে। ২. মৃত্যু হওয়ার স্থানকে। [দেখুন, তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; সা'দী] এ ব্যাপারে এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যখন কারো মৃত্যু কোন যমীনে লিখা থাকে তখন সে সেখানে যাওয়ার জন্য কোন না কোন প্রয়োজন অনুভব করবে। তারপর সে যখন সেখানে পৌঁছবে তখন তাকে মৃত্যু দেয়া হয়। আর কিয়ামতের দিন যমীন তাকে বের করে দিয়ে বলবে, هٰذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِيْ অর্থাৎ এটা আমার কাছে আপনি আমানত রেখেছিলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ১/৪২, সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকীঃ ৯৮৮৯] কালেমাদ্বয়ের আরো বিস্তারিত তাফসীর সূরা আল-আন'আমের ৯৮ নং আয়াতে করা হয়েছে।

(২) আয়াতে বর্ণিত সুস্পষ্ট কিতাব বলতে লাওহে মাহফুজকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সমস্ত কর্মকাণ্ড সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে নিয়েছেন এবং তার জ্ঞান থেকে এর সামান্যও গোপন থাকে না, এটা তিনি পবিত্র কুরআনে বারবার ঘোষণা করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-আন'আমঃ৩৮, ৫৯, সূরা ইউনুসঃ ৬১]

ছিল পানির উপর[১], তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ[২] তা পরীক্ষা করার

أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ, দিন-রাত খরচ করলেও তা কমে না। তোমরা কি দেখ না যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সময় থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কত বিপুল পরিমাণে খরচ করেছেন? তবুও তার ডান হাতের কিছুই কমেনি। আর তাঁর আরশ পানির উপর অবস্থিত ছিল। তাঁর অন্য হাতের রয়েছে ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা, সে অনুসারে বৃদ্ধি-ঘাটতি বা উন্নতি অবনতি ঘটান। [বুখারীঃ ৭৪১৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “শুধু আল্লাহ্ই ছিলেন, তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর এবং তিনি যিক্‌র বা ভাগ্যফলে সবকিছু লিখে নেন এবং আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেন। [বুখারীঃ ৩১৯১] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,“আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর”। [মুসলিমঃ ২৬৫৩]

মোট কথা, কুরআনের ২১টি আয়াতে আরশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। সে সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মূলতঃ আরশ হলো আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি। সেটা প্রকাণ্ড ও সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আরশের সামনে কুরসী একটি রিং এর মতো, যেমনিভাবে আসমান ও যমীন কুরসীর সামনে রিং এর মতো। আরশের গঠন গম্বুজের মত। যা সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপরে রয়েছে। এমনকি জান্নাতুল ফেরদাউসও আরশের নীচে অবস্থিত। আরশের কয়েকটি পা রয়েছে। মূসা আলাইহিসসালাম হাশরের মাঠে তার একটি ধরে থাকবেন। এ আরশের বহনকারী কিছু ফিরিশ্‌তা রয়েছেন। তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন তারা হবেন আট। [সূরা আল-হাক্কাহঃ ১৭] তবে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে যে, আরশের বহনকারী ফিরিশ্‌তাগণ কি আট জন নাকি আট শ্রেণী নাকি আট কাতার। এ আয়াতে বর্ণিত পানির উপর আরশ থাকার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কোন কিছু সৃষ্টি করার আগে পানির উপর ছিল। এর দ্বারা পানি আগে সৃষ্টি করা বুঝায় না। তবে এখানে পানি দ্বারা দুনিয়ার কোন সমুদ্রের পানি বুঝানো হয়নি। কেননা, তা আরো অনেক পরে সৃষ্ট। বরং এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট কোন পানি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবনে কাসীর প্রণীত আল- বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১ম খণ্ড]।

(২) লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ “কে কাজে শ্রেষ্ঠ” তা তিনি পরীক্ষা করবেন। তিনি ‘কে বেশী কাজ করেছে পরীক্ষা করবেন’ তা কিন্তু বলেননি। কেননা,

জন্য[১]। আর আপনি যদি বলেন, | أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ

আল্লাহ্‌র দরবারে পরিমানের চেয়ে মান-সম্মত হওয়াই গ্রহণযোগ্য। আর আল্লাহ্‌র দরবারে কোন কাজ মান-সম্মত সে সময়ই হতে পারে যখন তা আল্লাহর নির্দেশ মত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পন্থায় হবে। নতুবা তা গ্রহণযোগ্যতাই হারাবে।

(১) এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এজন্য সৃষ্টি করেছেন যা মূলত তোমাদের (অর্থাৎ মানুষ) সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে পরীক্ষা করা। তিনি সেটাকে অকারণে বা অনাহূত তৈরী করেন নি। তিনি নিজেকে এ ধরনের অনাহূত ও বেহুদা সৃষ্টি করা থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া এটাও বলেছেন যে, কাফেররাই শুধু আসমান ও যমীনকে বেহুদা সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করে থাকে। তাদের এ ধারণার জন্য তিনি তাদের উপর কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, "আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের যারা কাফির, কাজেই কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। [সূরা সোয়াদঃ ২৭] আরো বলেনঃ "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; সম্মানিত 'আর্‌শের তিনি অধিপতি।' [সূরা আল-মুমিনূনঃ ১১৫-১১৬] তিনি আরো বলেনঃ "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা একমাত্র আমারই 'ইবাদাত করবে। [সূরা আয-যারিয়াতঃ৫৬] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্ বলেন, তুমি ব্যয় কর, তোমার উপর ব্যয় করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, আল্লাহ্‌র হাত পরিপূর্ণ। কোন প্রকার ব্যয় তাতে কোন কিছুর ঘাটতি করে না। দিন-রাত তা প্রচুর পরিমানে দান করে। তোমরা আমাকে জানাও, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে যত কিছু ব্যয় হয়েছে সেসব কিছু তার হাতে যা আছে তাতে সামান্যও ঘাটতি করে না। আর তার আরশ হচ্ছে পানির উপর এবং তার হাতেই রয়েছে মীযান, তিনি সেটাকে উপর-নীচু করেন।' [বুখারী: ৪৬৮৪; মুসলিম: ৩৭] অন্য হাদীসে ইমরান ইবন হুসাইন বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম আর আমার উটটি দরজার কাছে বেঁধে রাখলাম। তখন তার কাছে বনু তামীম প্রবেশ করলে তিনি বললেন, বনু তামীম তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারা বলল, সুসংবাদ তো দিলেন, এবার আমাদেরকে কিছু দিন (সম্পদ)। এটা তারা দু'বার বললেন। তখন রাসূলের কাছে ইয়ামেনের কিছু লোক প্রবেশ করল। তিনি বললেন, হে ইয়ামেনবাসী তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, যখন বনু তামীম সেটা গ্রহণ করল না। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরও বলল, আমরা এ বিষয়ে প্রথম কি তা জানতে চাই। তিনি বললেন, আল্লাহ্ই ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর তাঁর আরশ ছিল

بَعۡدِ الۡمَوۡتِ لَيَقُوۡلَنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ ۝

'নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে', তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, 'এ তো সুস্পষ্ট জাদু(১) ।'

وَلَئِنۡ اَخَّرۡنَا عَنۡهُمُ الۡعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعۡدُوۡدَةٍ

৮. নির্দিষ্ট কালের জন্য(২) আমরা যদি

পানির উপর । আর তিনি সবকিছু যিকর (লাওহে মাহফূযে) লিখে রেখেছিলেন । আর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন । বর্ণনাকারী ইমরান ইবন হুসাইন বলেন, তখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলল, হে ইবনুল হুসাইন! তোমার উষ্ট্রীটি চলে গেছে । তখন আমি বেরিয়ে পড়ে দেখলাম, উটটি এতদুর চলে গেছে যে, যেদিকে তাকাই শুধু মরিচিকা দেখতে পাই । আল্লাহ্‌র শপথ! আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আমি যেন সেটাকে একেবারেই ছেড়ে দেই (অর্থাৎ রাসূলের মাজলিস থেকে বের হতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না)' [বুখারীঃ ৩১৯১]

(১) অর্থাৎ যখন আপনি তাদেরকে পুনরুত্থানের কথা বুঝাতে থাকেন তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং আপনাকে এ বলে বিদ্রুপ করতে থাকে যে, আপনি তো জাদুকরের মতো কথা বলছেন । এভাবে তারা আখেরাতের দাবী ও যৌক্তিকতাকে বুঝা সত্বেও মেনে নিতে পারেনি । অথচ যিনি একবার সৃষ্টি করেছেন তারপক্ষে পূনর্বার সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয় । আল্লাহ্‌ বলেনঃ "আর তিনিই সৃষ্টিজগতকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনিই তা পূনর্বার করবেন, এটা তার জন্য অত্যন্ত সহজ ।" [সূরা আর রূমঃ ২৭] আল্লাহ্‌ আরো বলেনঃ "তোমাদের সৃষ্টি ও পূনঃসৃষ্টি তো একজনের মতই" [সূরা লুকমানঃ ২৮]

(২) এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা أمة শব্দটি ব্যবহার করেছেন । এ শব্দটি স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে থাকে [দ্রঃ কুরতুবী]
ক) সময় বা সুনির্দিষ্ট কাল, যেমন আলোচ্য আয়াত ও সূরা ইউসুফের ৪৫ নং আয়াত । ইবন আব্বাস থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে । [তাবারী]
খ) অনুসরণযোগ্য ইমাম, যেমন সূরা আন-নাহলের ১২০ নং আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের ব্যাপারে বলা হয়েছে ।
গ) ধর্ম ও রীতিনীতি অর্থে, যেমন সূরা আয-যুখরুফের ২৩ নং আয়াত ।
ঘ) দল বা বড় শ্রেণী বা জামা'আত তথা অনেক লোককে বুঝানোর অর্থে, যেমন সূরা আল-কাসাসের ২৩ নং আয়াত ।
ঙ) জাতি অর্থে, যাতে মুমিন কাফির সবাই অন্তর্ভুক্ত । যেমন সূরা আন-নাহলঃ৩৬, ইউনুসঃ৪৭ ।
চ) শুধু ঈমানদার জাতি বুঝানোর জন্য । যেমন সুরা আলে-ইমরানঃ ১১০ । অনুরূপভাবে হাদীসে এসেছে, হাশরের মাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেনঃ "উম্মতি, উম্মতি" আমার উম্মত, আমার উম্মত । এখানে শুধু মুসলিম জাতিকে বুঝানো হয়েছে ।

لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

তাদের থেকে শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'কিসে সেটা নিবারণ করছে?' সাবধান! যেদিন তাদের কাছে এটা আসবে সেদিন তাদের কাছ থেকে সেটাকে নিবৃত্ত করা হবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۝

৯. আর যদি আমরা মানুষকে আমাদের কাছ থেকে রহমত আস্বাদন করাই(১) ও পরে তার কাছ থেকে আমরা তা ছিনিয়ে নেই তবে তো নিশ্চয় সে হয়ে পড়ে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমরা তাকে সুখ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার বিপদ-আপদ কেটে গেছে', আর সে তো হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

ছ) এ ছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোন গোষ্ঠী বা অংশ বুঝানোর অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, সূরা আল-আ'রাফঃ১৫৯, সূরা আলে ইমরানঃ ১১৩]

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমরা তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে । আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরে যাইও তাঁর কাছে নিশ্চয় আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' অতএব, আমরা কাফিরদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।" [সূরা ফুসসিলাত: ৫০] আরও বলেন, "আর আমরা যখন মানুষকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন রহমত আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন তো মানুষ হয়ে পড়ে খুবই অকৃতজ্ঞ।" [সূরা আশ-শূরা: ৪৮]

১১. কিন্তু যারা ধৈর্যশীল[১] ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

১২. তবে কি আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার কিছু আপনি বর্জন করবেন এবং তাতে আপনার মন সংকুচিত হবে এ জন্যে যে, তারা বলে, 'তার কাছে ধন-ভান্ডার নামানো হয় না কেন অথবা তার সাথে ফিরিশ্‌তা আসে না কেন?' আপনি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সবকিছুর কর্মবিধায়ক[২]।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

---

(১) এ আয়াতে সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করে বলা হয়েছে যে, সে সব ব্যক্তি সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে যাদের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা। সবর শব্দটি আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বন্ধন করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যায় কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে সবর বলে। সুতরাং শরী'আতের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত তদ্রূপ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। এর বাইরে বিপদাপদে নিজেকে সংযত রাখতে পারাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। [ইবনুল কাইয়্যেম: মাদারেজুস সালেকীন] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যার হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ করে বলছি, একজন মু'মিনের উপর আপতিত যে কোন ধরনের চিন্তা, পেরেশানী, কষ্ট, ব্যথা, দুর্ভাবনা এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তার গুণাহের কাফ্‌ফারা করে দেন"। [বুখারীঃ৫৬৪১, ৫৬৪২, মুসলিমঃ ২৫৭৩] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ মু'মিনের জন্য যে ফয়সালাই করেছেন এটা তার জন্য ভাল হয়ে দেখা দেয়, যদি কোন ভাল কিছু তার জুটে যায় তখন সে শুকরিয়া আদায় করে সুতরাং তা তার জন্য কল্যাণ। আর যদি খারাপ কিছু তার ভাগ্যে জুটে যায় তখন সে ধৈর্য ধারণ করে তখন তার জন্য তা কল্যাণ হিসেবে পরিগণিত হয়। একমাত্র মুমিন ছাড়া কারো এ ধরনের সৌভাগ্য হয় না। [মুসলিমঃ ২৯৯৯]

(২) এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কাফেরদের কিছু অন্যায় আব্দারের কারণে তার মনের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার জবাব দিয়ে সান্ত্বনা

১৩. নাকি তারা বলে, 'সে এটা নিজে রচনা করেছে?' বলুন, 'তোমরা যদি (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার (এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য) ডেকে নাও(১) ।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

১৪. অতঃপর যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ, এটা তো আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনুসারেই নাযিল

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মূলতঃ তাদের আবদার ছিল নিরেট মুর্খতা ও চরম অজ্ঞতাপ্রসূত। যেমন এক আয়াতে এসেছে, "আরও তারা বলে , 'এ কেমন রাসূল' যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?' 'অথবা তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার এসে পড়ল না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে খেতো ?' যালিমরা আরো বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।" [সূরা আল-ফুরকান: ৭-৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাকে অমান্য করত তৎক্ষনাৎ গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত।

(১) আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের বড় মু'জিযা কুরআন তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জিযার দাবী করে থাক তাহলে কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোন মু'জিযা দাবী করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। আর যদি তারা বলতে চায় যে, কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম নয়; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি তোমরা তাই মনে করে থাক তা হলে, তোমরা অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তি দশটি সূরা তৈরি করতে হবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক মানুষ, জিন, তথা দেব দেবী সবাই মিলেই তা রচনা কর। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কুরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম, এটি ইলম ও কুদরতে নাযিল হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত।

করা হয়েছে এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। অতঃপর তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হবে?

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

১৫. যে কেউ দুনিয়ার জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমরা তাদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করেছিল আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে। আর তারা যা করত তা ছিল নিরর্থক[১]।

(১) অর্থাৎ প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও আখেরাতের মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ গুণ গরিমা, নীতি নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ সেটা যেহেতু পূণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ তা'আলা এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না, বরং এসব লোকের যা মূখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনেই তাকে দান করেন। অপরদিকে আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের প্রাণহীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নেয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও গোনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতে করে বোঝা যায় যে, এ আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, একজন মুসলিম যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আরাম আয়েশ ও নেয়ামত লাভ করবে।

১৭. তারা[১] কি তার সমতুল্য যে তার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত[২]

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ

কোন কোন মুফাসসিরের মতে এ আয়াতে ঐসব মুসলিমদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা কার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ শান্তি যশ খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে তারাও অবশ্য সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে। [কুরতুবী] সত্যনিষ্ঠ আলেমদের কারও কারও মতে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক অথবা নামধারী মুসলিম হোক। তাই যদি কোন মুসলিম শুধুমাত্র লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে অথবা শুধু দুনিয়া অর্জনের জন্য করে, তবে এ সব দুনিয়াকামী লোক ইচ্ছা ও বাসনায় আল্লাহর সাথে শির্ককারী বলে বিবেচিত হবে। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে তার যাবতীয় আমলই বিনষ্ট হয়ে যায়। সে হিসেবে ঐসব নামধারী মুসলিমও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের পরিণাম হবে জাহান্নাম। শির্ক করার কারণে তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, মাইমুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ পূর্ব ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে বর্ণিত কাফেরগণ কি এ আয়াতে আগত লোকদের সমতুল্য। [মুয়াসসার] অথবা যারা তাদের রবের প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তারা কি তাদের মত যারা তাদের রব প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? [জালালাইন]

(২) বলা হয়েছে, যে তার রবের পক্ষ থেকে আগত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা ঈমানদারগণ সবাই। [জালালাইন] আর 'স্পষ্ট প্রমাণ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

এক. এখানে 'বাইয়েনাহ' বা স্পষ্ট প্রমাণ বলে ফিতরাত তথা স্বভাবগত বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে। মূলতঃ প্রত্যেক মানুষই ফিতরাত তথা স্বভাবগতভাবে দ্বীন-ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। [ইবন কাসীর] পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সঙ্গদোষ, শয়তান, গাফিলতি ইত্যাদি তাদেরকে সে স্বভাবজাত দ্বীন-ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। সে হিসেবে আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সত্যিকারের মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকদের মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে- যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুটি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না।

দুই. অথবা আয়াতে 'বাইয়েনাহ' বা স্পষ্ট প্রমাণ বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [জালালাইন] তখন আয়াতের অর্থ হবে, যিনি বা যারা অর্থাৎ মুহাম্মাদ

مِّنۡهُ وَمِنۡ قَبۡلِهٖ كِتٰبُ مُوۡسٰۤى اِمَامًا وَّرَحۡمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ

এবং যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী[১] এবং যার আগে ছিল মূসার

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা মুমিনগণ স্পষ্ট প্রমাণ কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তার অনুসরণ করে একজন সাক্ষী তিনি হচ্ছেন জিবরীল। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের উপর সাক্ষী। তাছাড়া দ্বিতীয় আরেকটি সাক্ষ্যও রয়েছে আর তা হচ্ছে এ কুরআনের পূর্বে আগত কিতাব তাওরাত যা মূসা আলাইহিসসালামের উপর নাযিল হয়েছে। সে কিতাবও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য। [জালালাইন]

তিন. অথবা আয়াতে বর্ণিত বাইয়্যেনাহ বা স্পষ্ট প্রমাণ বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ কুরআনই নিজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর প্রথম সাক্ষী। তার দ্বিতীয় সাক্ষী হচ্ছে জিবরীল অথবা স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তৃতীয় সাক্ষী হচ্ছে পূর্বে মূসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিলকৃত কিতাব তাওরাত। যিনি এ তিন সাক্ষী-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তিনি কি দুনিয়া পুজারীদের মত? [মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে شاهد শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক ইমামগণের কয়েকটি অভিমত রয়েছেঃ

১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে শাহেদ অর্থ পবিত্র কুরআনের إعجاز এ'জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে যে কুরআনের উপর কায়েম রয়েছে? আর কুরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো কুরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতোপূর্বে তাওরাতরূপে এসেছে, যা মুসা আলাইহিসসালাম আল্লাহ তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা, কুরআন যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্য কিতাব এ সাক্ষ্য তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

২) কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে شاهد বলতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার]

৩) কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে شاهد বলতে فطرة বা বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষ্যকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন এসে এ প্রকৃতিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষ্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলো এবং তাকে জানালো তুমি বিশ্বপ্রকৃতিতে ও জীবন ক্ষেত্রে যার নিদর্শন ও পূর্বাভাস পেয়েছো প্রকৃতপক্ষে তাই সত্য। [ইবন কাসীর]

৪) ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে شاهد বলতে জিবরাইল আলাইহিসসালামকে বুঝানো হয়েছে; কেননা এর পরে বলা হয়েছে, "যার আগে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ" আর এটা নিঃসন্দেহ যে, মুহাম্মাদ এর

يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑰

কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ? তারাই এটাতে[১] ঈমান রাখে। অন্যান্য দলের যারা তাতে[২] কুফরী করে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান[৩]। কাজেই আপনি এতে[৪] সন্দিগ্ন হবেন না। এটা তো আপনার রবের প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না[৫]।

আগে কখনো মূসা আলাইহিসসালামের গ্রন্থ তেলাওয়াত করেননি। তাই এখানে সাক্ষ্য বলে জিবরাইল আলাইহিসসালাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত; কেননা তিনি মূসা আলাইহিসসালামের গ্রন্থও নিয়ে এসেছিলেন। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ এ কুরআনে ঈমান রাখে এবং এর নির্দেশ অনুসারে চলে। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ অন্যান্য যাবতীয় লোকেরা যারা কুরআনের উপর ঈমান রাখে না এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও রাসূল হিসেবে মানে না তাদের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

(৩) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "এ জাতি এবং ইয়াহূদী বা নাসারা যে জাতিই হোক না কেন তাদের কেউ যদি আমার কথা শোনার পরও আমার উপর ঈমান না আনবে তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে"। [মুসলিম: ১৫৩] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমি এ কথার সত্যায়নে আল্লাহ্র কিতাব থেকে প্রমাণাদি খুজছিলাম, শেষ পর্যন্ত এ আয়াত পেলাম "অন্যান্য দলের যারা এটাকে অস্বীকার করে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান"। তারপর ইবনে আব্বাস বললেনঃ এখানে الأحزاب বলে যাবতীয় দল ও গোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৪২]

(৪) অর্থাৎ এ কুরআনের সত্যতার উপর আপনি সন্দেহে থাকবেন না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও সন্দেহে নেই। এখানে উম্মতকে সাধারণভাবে পথ নির্দেশ দেয়াই উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার] শানকীতী বলেন, কুরআনের অন্যত্রও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানেও এ কুরআনকে সন্দেহমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-বাকারাহ: ২; সূরা সাজদাহ: ২। [আদওয়াউল বায়ান]

(৫) মূলত: ঈমান আনার জন্য সোজা মন ও আল্লাহ্র তাওফীক থাকতে হয়। সুতরাং নবী ইচ্ছা করলেই বা কুরআনের সত্যতা স্পষ্ট হলেই অধিকাংশ মানুষ ঈমান নিয়ে আসবে ব্যাপারটি এরকম নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের মতামতই যে সঠিক সিদ্ধান্ত হবে এমন কথাও ঠিক নয়। [এ ব্যাপারে আরো দেখুনঃ সূরা আল-আন'আমঃ ১১৬, ইউসুফঃ ১০৩, আর-রা'দঃ১, আল-ইসরাঃ ৮৯, আল-ফুরকানঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

১৮. আর যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে তাদের চেয়ে অধিক যালিম কে? তাদেরকে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল।[১] সাবধান! আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর,

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; আর এরাই তো আখিরাত অস্বীকারকারী।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ

২০. তারা যমীনে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারত না[২] এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী ছিল না; তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা

৫০, আস-সাফ্‌ফাতঃ৭১, গাফিরঃ ৫৯, আল-বাকারাহঃ১০০, আশ-শু'আরাঃ৮, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০]

(১) এটা হচ্ছে আখেরাতের জীবনের বর্ণনা। সেখানে এ ঘোষণা দেয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে আনা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের কাঁধে হাত রেখে তার গুনাহ সমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়ে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, অমুক গুনাহ জানা আছে কি? মনে আছে কি? ঈমানদার বলবে, হে আমার প্রভু, আমি আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি, এমন এমন গুনাহ অবশ্যই আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এভাবে দু'বার ঈমানদার স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ সমূহ ও অপরাধ গোপন রেখেছি। কিন্তু আজ তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি। তারপর সৎকাজ সমূহের আমলনামা ভাঁজ করে তাকে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে অপর দল তথা কাফেরদেরকে সাক্ষী-সমক্ষে ডেকে বলা হবে, এরাই ছিল সেসব লোক, যারা তাদের রবের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান! আল্লাহর লা'নত যালিমদের উপর।" [বুখারীঃ ৪৬৮৫]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ যালেমকে ছাড় দিতে থাকেন শেষ পর্যন্ত যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার পক্ষে আর পালানো বা হস্তচ্যুত হওয়া সম্ভব হয় না।" [বুখারীঃ ৪৬৮৬, মুসলিমঃ ২৫৮৩]

وَمَا كَانُوا۟ يُبْصِرُونَ ۝٢٠

হবে[১]; তাদের শুনার সামর্থ্যও ছিল না এবং তারা দেখতেও পেত না[২]।

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ۝٢١

২১. এরা তো নিজেদেরই ক্ষতি করল এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করত তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল[৩]।

---

(১) একটি আযাব হবে নিজের গোমরাহ হবার জন্য এবং আর একটি আযাব হবে অন্যদেরকে গোমরাহ করার । [সা'দী] [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরাঃ আন-নাহলঃ ৮৮, আল-আ'রাফঃ৩৮]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কাফের-মুশরিকদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন যে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানেই আল্লাহ্র আনুগত্যে সক্ষম হবে না। দুনিয়াতে তারা আনুগত্য করতে সক্ষম হবে না যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তাদের শুনার সামর্থ্যও ছিল না এবং ওরা দেখতেও পেত না"। আর আখেরাতের ব্যাপারে বলেছেনঃ "সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সিজ্‌দা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না; তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে" [সূরা আল-কালামঃ৪২-৪৩]

(৩) অর্থাৎ তারা আল্লাহ, বিশ্ব-জগত এবং নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব মতবাদ তৈরী করে নিয়েছিল তা সবই ভিত্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের উপাস্য, সুপারিশকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের ওপর যেসব আস্থা স্থাপন করেছিল সেগুলোও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যেসব চিন্তা-অনুমান করে রেখেছিল তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। তারা তখন সত্যিই বুঝতে পারবে যে, তারা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, আল্লাহ্ বলেনঃ " যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু এবং ঐগুলো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে।" [সূরা আল-আহকাফঃ৬] আরো বলেনঃ "তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এজন্যে যাতে ওরা তাদের সহায় হয়; কখনই নয়, ওরা তো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" [সূরা মারইয়ামঃ ৮১, ৮২] আরো বলেনঃ "ইব্‌রাহীম বললেন, 'তোমরা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা'নত দেবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ২৫] আরো বলেনঃ "যখন নেতারা অনুসারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে ও তাদের পারস্পারিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৬৬]

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٢٢

২২. নিঃসন্দেহে তারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٣

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, এবং তাদের রবের প্রতি বিনয়াবনত হয়েছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٤

২৪. দল দুটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের ন্যায়, তুলনায় এ দুটো কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

তৃতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۫ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢٥

২৫. আর অবশ্যই আমরা নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,'

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝٢٦

২৬. 'যেন তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর 'ইবাদাত না কর; আমি তো তোমাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করি।'

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝٢٧

২৭. অতঃপর তাঁর সম্প্রদায়ের নেতারা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল[১], 'আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছু দেখছি না; আমরা তো দেখছি, তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা

(১) নূহ আলাইহিস সালাম যখন তার জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তার নবুওয়াত ও রেসালাতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না[1], বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

---

(১) অর্থাৎ কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেনীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল- যাদের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছিল না । মূলত তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। প্রকৃতপক্ষে ইজ্জত কিংবা অসম্মান ধন দৌলত বিদ্যা বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মত, যা অনেক সময় সত্য ন্যায়কে গ্রহন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল। [কুরতুবী]

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই সেটার তদন্ত তাহকীক করতে মনস্থ করে। কেননা, সে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তার অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী ঈমান এনেছে নাকি ধনী শ্রেণী? তারা উত্তরে বলেছিল, বরং দরিদ্র ও দূর্বল শ্রেণী। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, এটা তো সত্য রাসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে। [দেখুন, বুখারীঃ ৭, ৫১, মুসলিমঃ ১৭৭৩]

মোদ্দাকথা: দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। সুফিয়ান সওরী রাহেমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও হীন কে? তিনি উত্তর দিলেন- যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ- তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই হীন ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আ'রাবী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, যারা দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই হীন। পুনরায় প্রশ্ন করা হল- সবচেয়ে হীন কে? তিনি জবাব দিলেন- যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও অর্বাচীন। [কুরতুবী] কারণ, সাহাবায়ে কিরামই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরী'আতের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَاٰتٰىنِىۡ رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِهٖ فَعُمِّيَتۡ عَلَيۡكُمۡ ؕ اَنُلۡزِمُكُمُوۡهَا وَاَنۡتُمۡ لَهَا كٰرِهُوۡنَ ۝

২৮. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করে থাকেন, অতঃপর সেটা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, আমরা কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর?'

وَيٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًا ؕ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ؕ اِنَّهُمۡ مُّلٰقُوۡا رَبِّهِمۡ وَلٰـكِنِّىۡۤ اَرٰٮكُمۡ قَوۡمًا تَجۡهَلُوۡنَ ۝

২৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাই না[১]। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই কাছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়; তারা নিশ্চিতভাবে তাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে[২]।

---

(১) আমি একজন নিঃস্বার্থ উপদেশদাতা। নিজের কোন লাভের জন্য নয় বরং তোমাদেরই ভালোর জন্য এত কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছি। এ সত্যের দাওয়াত দেওয়ার, এর জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করার ও বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হবার পেছনে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সক্রিয় আছে এমন কথা তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না।

(২) অর্থাৎ তাদের রবই তাদের মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। তাঁর সামনে যাবার পরই তাদের সবকিছু প্রকাশিত হবে। তারা যদি সত্যিকার মহামূল্যবান রত্ন হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ছুঁড়ে ফেলার কারণে তারা তুচ্ছ মূল্যহীন পাথরে পরিণত হয়ে যাবে না। আর যদি তারা মূল্যহীন পাথরই হয়ে থাকে তাহলে তাদের মালিকের ইচ্ছা, তিনি তাদেরকে যেখানে চান ছুঁড়ে ফেলতে পারেন। মোটকথা, এ আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, কারো ধন- সম্পদের প্রতি নবী রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তারা নিজেদের খেদমত ও তালীমের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহন করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই, তাদের দৃষ্টিতে ধনী- দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশংকা পোষণ করো না

কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?’

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. ‘আর আমি তোমাদেরকে বলি না, ‘আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন-ভান্ডার আছে,’ আর না আমি গায়েব জানি[১]

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ

যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহর দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেয়া অন্যায় ও অসঙ্গত। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও একই ধরনের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আপনি অবশ্যই এ সমস্ত দরিদ্র মুমিনদের তাড়িয়ে দিবেন না। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করার চিন্তাও করবেন না। [দেখুনঃ সূরা আল-আন‘আমঃ৫২, আল-কাহাফঃ ২৮] আল্লাহ্ তা‘আলা মূলতঃ দরিদ্র মুমিনদেরকে ঈমান আনার তাওফীক দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, কারা তাদের আত্মম্ভরিতা ও অহংকার ত্যাগ করে হক্ক কবুল করতে পারে আর কারা তা না পেরে বলতে থাকে যে, আল্লাহ্ কি তাদের মত লোকদের ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না? মহান আল্লাহ্ বলেনঃ “আমি এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, ‘আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?’ আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?” [সূরা আল-আন‘আমঃ৫৩]

(১) আর আমি গায়েবও জানিনা যে তোমাদের গোপন ও অব্যক্ত কথা ও কাজ বলে দেব। [সা‘দী] আল্লাহ্ যা জানিয়েছেন সেটার বাইরে তো আমি তোমাদেরকে গায়েবের কোন সংবাদ জানাতে পারবো না। [ইবন কাসীর] সম্ভবত: উক্ত জাহেলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার নবী, তারা নিশ্চয়ই গায়েবের খবর জানবেন। নূহ আলাইহিস সালামের উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুওয়াত ও রেসালতের জন্য গায়েবের ইল্‌ম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়েবের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ ছিফাত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, অলী বা ফেরেশ্‌তা সেটার

تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ښ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

এবং আমি এটাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা[১]। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না; তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ্ অধিক অবগত। (যদি এরূপ উক্তি করি) তা হলে নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব[২]।'

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৩২. তারা বলল, 'হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে বিতন্ডা করেছ---তুমি বিতণ্ডা করেছ আমাদের সাথে অতি মাত্রায়; কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ওয়াদা তুমি করছ তা আমাদের কাছে নিয়ে আস।'

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاۗءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

৩৩. তিনি বললেন, 'ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ই তা তোমাদের কাছে উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।'

অংশীদার হতে পারে না। তাদেরকে এ গুণে গুনান্বিত মনে করা স্পষ্ট শির্কী কাজ।

(১) বিরোধী পক্ষ তাঁর ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, তোমাকে তো আমরা আমাদেরই মত একজন মানুষ দেখছি। তাদের আপত্তির জবাবে একথা বলা হয়েছিল। এখানে নূহ আলাইহিস্‌সালাম বলেন, যথার্থই আমি একজন মানুষ। একজন মানুষ হওয়া ছাড়া নিজের ব্যাপারে তো আমি আর কিছুই দাবী করিনি। আমি তো কখনো ফেরেশতা হওয়ার দাবী করিনি। আমার বৈশিষ্ট্য এই যে, আমাকে মু'জিযা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] আমি কখনও আমার নিজেকে আমার মর্যাদার উপরে অন্য কারো মর্যাদার বলে দাবী করিনি। আমাকে আল্লাহ্ যে মর্যাদা দিয়েছেন আমি তো সেটাই বলি। কারও উপর আমি মনগড়া কোন কথাও বলি না। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা হেয় গণ্য করছ, তাদের সম্পর্কে আমি এটা বলি না যে, তাদের রবের কাছে তাদের ঈমানের কোন সওয়াব নেই। কারণ, আল্লাহ্ই জানেন তাদের ঈমানের অবস্থা। যদি তারা প্রকাশ্যে যেভাবে ঈমানদার তেমনি সত্যিকার অর্থেই ঈমানদার হয় তবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। যদি তারা ঈমানদার হওয়ার পরও কেউ তাদের সাথে খারাপ কথা বলে, তবে অবশ্যই সে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এমন কথা বলে যাতে তার কোন জ্ঞান নেই। [ইবন কাসীর]

৩৪. 'আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান[১]। তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. নাকি তারা বলে যে, তিনি এটা রটনা করেছেন? বলুন, 'আমি যদি এটা রটনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত[২]।'

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দুর্মতি এবং সদাচারে অনাগ্রহ দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে চাও সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা নুহ আলাইহিসসালামকে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনললনা তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন- "নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।"[সূরা নূহঃ ৫-৬] সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দো'আ করলেন, "হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।" [সুরা আল মুমিনূনঃ৩৯]

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটিও নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কাওমের কথা, যার ধারাবাহিকতা আগে থেকে চলে আসছিল। [বাগভী; কুরতুবী] তবে অন্যান্য মুফাসসিরদের মতে, এ বাক্যটুকু আগের বক্তব্যের মাঝখানে এসেছে আগের কাহিনীকে তাগিদ দেয়ার জন্য। [ইবন কাসীর] মনে হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে নূহ আলাইহিস্‌সালামের এ কাহিনী শুনে বিরোধীরা আপত্তি করে থাকবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নিজেই এ কাহিনী বানিয়ে পেশ করছে। যেসব আঘাত সে সরাসরি আমাদের ওপর করতে চায় না সেগুলোর জন্য সে একটি কাহিনী তৈরী করেছে।

চতুর্থ রুকূ'

৩৬. আর নূহের প্রতি অহী করা হয়েছিল, 'যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তারা যা করে তার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।'

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. 'আর আপনি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করুন[১] এবং যারা

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

এ কারণে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ভেংগে এ বাক্যে তাদের আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। [কুরতুবী]

বস্তুত: কোন একটি বক্তব্য নিরেট সত্য অথবা স্রেফ একটি বানোয়াট কাহিনী উভয়ই হতে পারে। এ উভয় রকমের সম্ভাবনা যেখানে সমান সমান, সে ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে তাকে একটি যথার্থ সত্য কথা মনে করে তার শিক্ষণীয় দিক থেকে ফায়দা হাসিল করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই এ মর্মে দোষারোপ করে যে, বক্তা নিছক তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এ মনগড়া কাহিনী রচনা করেছে তাহলে সে হবে নেহাতই একজন কুধারণা পোষক ও বক্র দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি। এ কারণে বলা হয়েছে, যদি আমি এ কাহিনী তৈরী করে থাকি তাহলে আমার অপরাধের জন্য আমি দায়ী কিন্তু তোমরা যে অপরাধ করছো তা তো যথাস্থানে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তার জন্য আমি নই, তোমরাই দায়ী হবে এবং তোমরাই পাকড়াও হবে। তোমরা যে অন্যায় করে গেলে তার কারণে তোমাদের পাকড়াও করা হবে, তাই তোমাদের অপরাধ থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করছি। আমি কখনও বলব না যে, এটা বানোয়াট বা রটনা। কেননা যারা এর উপর মিথ্যারোপ করবে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য কেমন শাস্তি নির্ধারিত আছে তা আমি জানি। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার চক্ষু রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাও তাই। [মাজমু' ফাতাওয়া: ৫/৯০] এ আয়াত থেকে অনেক মুফাসসিরই এটা বুঝেছেন যে, নূহ আলাইহিসসালামই সর্বপ্রথম নৌকা তৈরী করেছিলেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কেননা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ "আর আপনি নৌকা তৈরী করুন আমার চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে ও অহী অনুসারে"। এতে করে বুঝা গেল যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল আল্লাহ্ তাকে অহীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

যুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কোন আবেদন করবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে(১)।'

৩৮. আর তিনি নৌকা নির্মাণ করতে লাগলেন এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের নেতারা তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত; তিনি বললেন, 'তোমরা যদি আমাদেরকে নিয়ে উপহাস কর, তবে নিশ্চয় আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ(২);

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. 'অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার উপর আসবে এমন শাস্তি

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ

(১) আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। সুতরাং আপনি আমার কাছে তাদের কারও জন্য ক্ষমা চাইবেন না। তাদের কাউকে ক্ষমা করতে বলবেন না। তারা তাদের অর্জিত কুফরির কারণে তুফানে ডুবে মরবে। [তাবারী] এরূপ অবস্থায়ই নূহ আলাইহিসসালামের মুখে তার কাওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিলঃ 'হে আমার রব! যমীনের কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দেবেন না, 'আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির।[সূরা নূহঃ২৬-২৭] এই বদদো'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হল। যার ফলে সমস্ত কওম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

(২) এ আয়াতে নৌকা তৈরীকালীন সময়ে নূহ আলাইহিসসালামের কওমের উদাসীনতা গাফিলতি ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে নূহ আলাইহিসসালাম যখন নৌকা নির্মাণকর্যে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করত আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে তাই নৌকা তৈরী করছি। তখন তারা বলত, হে নূহ! আপনি তো আগে ছিলেন নবী এখন কি তাহলে কাঠমিস্ত্রি হয়ে গেলেন। আরও বলত: আপনি ডাঙ্গাতে জাহাজ কিভাবে চালাবেন? এভাবে তারা বিভিন্নভাবে উপহাস করেছিল [ফাতহুল কাদীর]। এর উত্তরে নূহ আলাইহিসসালাম বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ কিন্তু মনে রেখো সেদিন দূরে নয় যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরাও উপহাসের পাত্র হবে।

وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

যা তাকে লাঞ্ছিত করবে, আর তার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি ।'

حَتّٰٓى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۭ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসল এবং উনান উথলে উঠল[১]; আমরা বললাম, এতে উঠিয়ে নিন প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুটি[২], যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ছাড়া আপনার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে । আর তার সাথে ঈমান এনেছিল কেবল অল্প কয়েকজন[৩] ।

(১) এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায় । কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, প্লাবনের সূচনা হয় একটি বিশেষ চুলা থেকে । তার তলা থেকে পানির স্রোত বের হয়ে আসে । তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হতে থাকে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় মাটি ফুঁড়ে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে থাকে । এখানে কেবল চুলা থেকে পানি উথলে ওঠার কথা বলা হয়েছে এবং সামনের দিকে গিয়ে বৃষ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে । কিন্তু সূরা 'আল-কামার ১১-১৩' এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছেঃ "আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম । এর ফলে অনবরত বৃষ্টি পড়তে লাগলো । মাটিতে ফাটল সৃষ্টি করলাম । ফলে চারদিকে পানির ফোয়ারা বের হতে লাগলো । আর যে কাজটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ দু'ধরনের পানি তা পূর্ণ করার জন্য পাওয়া গেলো ।" তাছাড়া এ আয়াতে "তান্নুর" (চুলা) শব্দটির ওপর আলিফ-লাম বসানোর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয় যে, একটি বিশেষ চুলাকে আল্লাহ এ কাজ শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন । ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই চুলাটির তলা ঠিক সময়মতো ফেটে পানি উথলে ওঠে । পরে এ চুলাটিই প্লাবনের চুলা হিসেবে পরিচিত হয় । সূরা মুমিনূনের ২৭ আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, এ চুলাটির কথা নূহ আলাইহিস্‌সালামকে বলে দেয়া হয়েছিল । তবে আয়াতে বর্ণিত 'তান্নুর' শব্দটির অর্থ ইবন আব্বাস ও ইকরিমা এর মতে, ভূপৃষ্ঠ । [তাবারী; বাগভী; ইবন কাসীর] তখন অর্থ হবে, পুরো যমীনটাই ঝর্ণাধারার মতো হয়ে গেল যে, তা থেকে পানি উঠতে থাকল । এমনকি যে আগুনের চুলা থেকে আগুন বের হওয়ার কথা তা থেকে আগুন না বের হয়ে পানি নির্গত হতে আরম্ভ করল । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন । [ইবন কাসীর]

(৩) তারপর নূহ আলাইহিসসালামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ

৪১. আর তিনি বললেন, 'তোমরা এতে আরোহন কর, আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি[১], আমার রব তো অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٰىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾

৪২. আর পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল; নূহ তাঁর পুত্রকে, যে পৃথক ছিল, ডেকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না।'

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾

দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশ্‌তিতে তুলে নিন। তবে তখন ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। জাহাজে আরোহনকারীদের সঠিক সংখ্যা কুরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। [তাবারী]

(১) এ হলো মুমিনের সত্যিকার পরিচয়। কার্যকারণের এ জগতে সে অন্যান্য দুনিয়াবাসীর ন্যায় প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সমস্ত উপায় ও কলাকৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সে উপায় ও কলা-কৌশলের উপর ভরসা করে না। ভরসা করে একমাত্র আল্লাহর উপর। আর এটি অনস্বীকার্য সত্য যে প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাযত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অধীন। তাই আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার চলা ও থামা সবই আল্লাহ্‌র নামে হোক। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও কর্তৃত্বেই সেটি চলবে। [সা'দী] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামকে এরপর বলেছিলেন যে, "যখন আপনি ও আপনার সংগীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন তখন বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় থেকে।' আরো বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে নামিয়ে দিন কল্যাণকরভাবে; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।" [সূরা মুমিনূন: ২৮-২৯] আর এ জন্যই যখন কেউ কোন নৌকা কিংবা বাহনে উঠবে তার জন্য বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর ; যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে ; এবং বলবে, 'পবিত্র-মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ১২-১৪] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতেও এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা এসেছে। [ইবন কাসীর]

৪৩. সে বলল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।' তিনি বললেন, 'আজ আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন সে ছাড়া।' আর তরঙ্গ তাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেল, ফলে সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল[১]।

قَالَ سَاٰوِيۡۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعۡصِمُنِىۡ مِنَ الۡمَآءِ ‌ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الۡيَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ‌ ۚ وَحَالَ بَيۡنَهُمَا الۡمَوۡجُ فَكَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِيۡنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আর বলা হল, 'হে যমীন! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও, হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' আর পানি হ্রাস করা হল এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হল। আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হল[২]

وَقِيۡلَ يٰۤاَرۡضُ ابۡلَعِىۡ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقۡلِعِىۡ وَغِيۡضَ الۡمَآءُ وَقُضِىَ الۡاَمۡرُ وَاسۡتَوَتۡ عَلَى الۡجُوۡدِىِّ‌ وَقِيۡلَ بُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿٤٤﴾

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে নূহ আলাইহিসসালামের পরিবারবর্গ কিশতিতে আরোহন করল, কিন্তু একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। কোন কোন মুফাসসির বলেন এর নাম হচ্ছে, ইয়াম। [ইবন কাসীর] অপর কারো মতে, কিন'আন [কুরতুবী] তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ নূহ আলাইহিসসালাম তাকে ডেকে বললেন প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে নৌকায় আরোহন কর; কাফেরদের সাথে থেকো না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগসাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু নূহ আলাইহিসসালাম তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। [কুরতুবী] পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন তাহলে তার আহ্বানের মর্ম হবে নৌকায় আরোহনের পূবশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সঙ্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। [মুয়াসসার] কিন্তু হতভাগা প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলেছিল, আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। নূহ আলাইহিসসালাম পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে, আজকে কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং নিমজ্জিত করল। আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে যমীন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেয়া হল যে দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

(২) জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে

এবং বলা হল, 'যালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস'।

৪৫. আর নূহ্ তার রবকে ডেকে বললেন, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য(১), আর আপনি তো বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক(২)।'

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ۝

৪৬. আল্লাহ্ বললেন, 'হে নূহ্! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়(৩)। সে

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ

ইবনে ওমর দ্বীপের অদুরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। আধুনিক কালে এ পাহাড়ে নূহ আলাইহিসসালামের কিশতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মূলতঃ জুদি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তাওরাতে দেখা যায় যে, নূহ আলাইহিসসালামের কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই।

(১) অর্থাৎ আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার পরিজনদেরকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এখন ছেলে তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাকেও রক্ষা করুন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এরপর আর কোন আবেদন নিবেদন খাটবে না। আর আপনি নির্ভেজাল জ্ঞান ও পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। সে অনুসারে আপনি কারও জন্য নাজাতের নির্দেশ দিয়েছেন আর কারও জন্য দিয়েছেন ডুবে যাওয়ার নির্দেশ। [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, সুতরাং আপনি আমার জন্য পূর্বে যে ওয়াদা করেছেন সেটা পূর্ণ করুন আর আমার ছেলেকে নাজাত দিন। [তাবারী]

(৩) এ আয়াতাংশের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ এখানে 'সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়' বলে বুঝানো হয়েছে যে, যাদেরকে নাজাত দেয়ার ওয়াদা আমি করেছিলাম সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' [ইবন কাসীর] এর কারণ হলো, সে কাফের ছিল। আর মুক্তি বা নাজাতের ব্যাপারে কাফেরের সাথে ঈমানদারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাছাড়া পূর্ব আয়াতে এসেছে যে, "আপনার পরিবারকেও (তাতে উঠান) কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ছাড়া"। সে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে কুফরি ও তার পিতার অবাধ্যতার কারণে ডুবে মরবে। [ইবন কাসীর]

صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَٰهِلِينَ ﴿٤٦﴾

অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ(১)। কাজেই যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করবেন না(২)। আমি আপনাকে উপদেশ

(১) এটি হচ্ছে কুফরী ও ঈমানের বিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার। এখানে শুধুমাত্র যারা সৎ তাদেরকে রক্ষা করা হবে এবং যারা অসৎ ও নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে খতম করে দেয়া হবে। তার আমল যেহেতু খারাপ সুতরাং রক্ষা করা যাবে না। সে নিয়্যত ও আমলে আপনার বিপরীত কাজ করেছে। [তাবারী] তাছাড়া এ আয়াতের আরেকটি অর্থও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, এখানে إنه বলে নূহ আলাইহিসসালামের দো'আকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে নূহ! আপনি যে আপনার কাফের সন্তানের জন্য আমার শরনাপন্ন হয়েছেন এ কাজটা সৎ কাজ নয়। আপনার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কিছু চাওয়া ভাল কাজ নয়। [তাবারী; সা'দী]

(২) অর্থাৎ যে জিনিসের পরিণাম আপনার জানা নেই যে এটা ভাল-কি মন্দ বয়ে নিয়ে আসবে এমন কাজে আপনি এগিয়ে যাবেন না। এমন কিছু আমার কাছে চাইবেন না। আমি আপনাকে নসীহত করছি এমন এক নসীহত যা দ্বারা আপনি পূর্ণতা লাভ করবেন এবং জাহেলদের কর্মকাণ্ড থেকে নাজাত পাবেন। তখন নূহ আলাইহিস সালাম যা করেছেন সে জন্য ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং বললেন, 'হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এ জন্য আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। সুতরাং ক্ষমা ও রহমতের দ্বারাই কেউ নাজাত পেতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে [সা'দী] আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম তার সন্তানের নাজাতের জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন সেটা যে হারাম ছিল তা তার জানা ছিল না। তিনি মনে করেননি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত "যারা যুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কোন আবেদন করবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে" সেটা দ্বারা তাকে তার সন্তানের ব্যাপারে দো'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে তার কাছে দু'টি নির্দেশের মধ্যে বিরোধ লেগে গিয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন, তার সন্তানের জন্য নাজাতের আহ্বান পূর্বোক্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে "আর আপনার পরিবারকে" নৌকাতে উঠিয়ে নিন, সে ঘোষণায় তার সন্তান অন্তর্ভুক্ত হবে। সে হিসেবে তিনি নাজাতের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, সে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য কোন প্রকার দো'আ করা যাবে না। তখন তিনি সে অনুসারে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁর দয়া তলব করেন। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী] এতে স্পষ্ট হলো যে, একজন মহান মর্যাদাশালী নবী নিজের চোখের সামনে নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে ডুবে যেতে দেখছেন এবং অস্থির হয়ে সন্তানের গোনাহ মাফ করার

দিচ্ছি, আপনি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হন।'

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এ জন্য আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব[১]।'

জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে জবাবে তাকে ধমক দেয়া হচ্ছে। কারণ একটিই, সে ছেলের মধ্যে রয়েছে শির্ক ও কুফর। সুতরাং যার কাছে থাকবে শির্ক ও কুফর তার জন্য কেউ কোন সুপারিশ করতেও সক্ষম হবে না। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাঃ মাজমু' ফাতাওয়া ১/১৩১]

(১) উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দো'আকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দো'আ করা হবে তা জায়েয হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দো'আ করা নিষিদ্ধ। এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, যদি সে ঈমানদার না হয় তবে দ্বীনী দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর। দ্বীনী ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোন বংশের, যে কোন গোত্রের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের, যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন সবাই মিলে এক জাতি একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। তাই আল্লাহ্র বাণী "সকল মুসলিম ভাই ভাই" [সূরা হুজুরাতঃ১০] আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

৪৮. বলা হল, 'হে নূহ্! অবতরণ করুন আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং আপনার প্রতি ও যে সব সম্প্রদায় আপনার সাথে রয়েছে তাদের প্রতি; আর কিছু সম্প্রদায় রয়েছে আমরা তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমাদের পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে[১];

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. 'এসব গায়েবের সংবাদ আমরা আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা এর আগে আপনি জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও জানত না। কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য[২]।'

تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

(১) এখানে আদ জাতি এবং তাদের কাছে হূদ আলাইহিসসালামের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা কিছু দিন দুনিয়ার নে'আমত ভোগ করার পর আবার অবাধ্যতার কারণে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রত্যেক নবী ও তাদের জাতি যেমন সালেহ ও সামূদ জাতিও এ আয়াতে উল্লেখিত সম্প্রদায় বলে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, নূহ আলাইহিসসালামের সন্তানগণ যেহেতু পরবর্তী যাবতীয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ তাই পরবর্তী সময়ে যারাই শির্ক ও অন্যায় করেছে এবং তাদের কাছে প্রেরিত নবীদের বিরোধিতা করে আল্লাহ্‌র শাস্তির হকদার হয়েছে, তাদের সবাইকে এ আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের কল্যাণকর পরিণাম তো যারা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে, তাঁর ফরযকৃত বিষয়সমূহ আদায় করে, অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাদেরই জন্য। তারাই আখেরাতে যাবতীয় নে'আমত পেয়ে সফল হবে। দুনিয়াতেও তারা তাদের চাওয়া বিষয়াদি প্রাপ্ত হবে। যেভাবে শেষ পর্যন্ত নূহ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা আল্লাহর নির্দেশ মানার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করে দুনিয়াতে সফলতা লাভ করেছিলেন এবং ধ্বংস থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। আখেরাতে তাদেরকে আল্লাহ্ যা দিবার দিলেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। আর যারা মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে ডুবিয়েছিলেন এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছিলেন। [তাবারী] ঠিক তেমনি আপনি ও আপনার সাথীরাও সাফল্য লাভ করবেন এবং আপনাদেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চম রুকূ'

৫০. 'আর আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম[১] তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রটনাকারী[২]।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর পরিবর্তে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁরই কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না[৩]?

يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

---

(১) সূরা হূদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট নবী হূদ আলাইহিসসালামের আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই সূরার নামকরণ হয়েছে। এ সূরার মধ্যে নূহ আলাইহিসসালাম হতে মূসা আলাইহিসসালাম পর্যন্ত সাত জন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুসসালাম ও তাদের উম্মতগণের কাহিনী কুরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে যা যে কোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে। যদিও এ সূরার মধ্যে সাত জন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হূদ আলাইহিস সালাম এর নামে। যাতে বোঝা যায় যে এখানে হূদ এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ অন্যান্য যেসব মাবুদদের তোমরা বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করো তারা আসলে কোন ধরনের প্রভুত্বের গুণাবলী ও শক্তির অধিকারী নয়। বন্দেগী ও পূজা লাভের কোন অধিকারই তাদের নেই। তোমরা অযথাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছো। তারা তোমাদের আশা পূরণ করবে এ আশা নিয়ে বৃথাই বসে আছো। তোমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্য ইলাহ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যাচারই করে যাচ্ছ। তিনি ছাড়া তো কোন সত্যিকার ইলাহ নেই [তাবারী; কুরতুবী; সা'দী]

(৩) অর্থাৎ তোমরা কি বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না যে, আমি যে দিকে আহ্বান করছি তা ভেবে দেখা দরকার এবং তা কবুল করার অধিক উপযোগী, একে বাদ দেয়ার কোন বাঁধা নেই। [সা'দী]

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না[১]।'

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ

৫৩. তারা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি[২],

---

(১) আল্লাহ পাক হূদ আলাইহিসসালামকে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। [সা'দী] হূদ আলাইহিসসালামও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তাদেরকে মৌলিকভাবে তিনটি দাওয়াত দিয়েছিলেন। এক. তাওহীদ বা একত্ববাদের আহ্বান এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত উপাসনা না করার আহ্বান। দুই. তিনি যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তাতে তিনি একজন খালেস কল্যাণকামী, এর জন্য তিনি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চান না। তিন. নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী শির্কী ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ হতে তওবা কর। যদি তোমরা সত্যিকার তাওবা ও এস্তেগফার করতে পার তবে তার বদৌলতে আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই। দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি সামর্থ্য বর্ধিত হবে। এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধন বল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এর দ্বারা আরো জানা গেল যে তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে দুনিয়াতেও ধন সম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

(২) অর্থাৎ আপনি আপনার দাবীর স্বপক্ষে এমন কোন দ্ব্যর্থহীন আলামত অথবা কোন সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে আসেননি যার ভিত্তিতে আমরা নিসংশয়ে জানতে পারি যে, আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন এবং যে কথা আপনি পেশ করছেন তা সত্য। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এখানে যদি কাফেররা তাদের পক্ষ থেকে দাবীকৃত কোন সুনির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণের কথা বলে থাকে তবে সেটাই আনতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ٥٣

তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগকারী নই এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই ।

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٖۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ٥٤

৫৪. 'আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে[১] ।' তিনি

বরং নবী-রাসূলগণ এমন নিদর্শন নিয়ে আসেন যা দেখে তাদের দাবীর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় । আর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় এটা যে, তিনি তাদের কাছে এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসেননি যা তার কথার সত্যতার প্রমাণ বহন করবে, তবে তারা মিথ্যা বলেছে । কেননা, প্রত্যেক নবীকেই তার কাওমের কাছে এমন কিছু নিদর্শন দিয়ে পাঠানো হয় যা দেখে কিছু লোক ঈমান আনে । এমনকি যদি তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য দ্বীনকে নির্দিষ্ট করা, তাঁর কোন শরীক না করা, প্রতিটি ভাল কাজ ও সুন্দর চরিত্রের প্রতি নির্দেশ প্রদান, প্রত্যেক খারাপ কাজ যেমন আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক, অশ্লীলতা, যুলুম, অন্যায় কাজ কর্ম থেকে নিষেধকরণ, তাছাড়া হূদ আলাইহিসসালাম সে সমস্ত অনন্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়া, যা কেবল ভাল ও সত্যনিষ্ঠ মানুষদেরই গুণ হয়ে থাকে, এগুলো ছাড়া আর কোন নিদর্শন না এনে থাকেন তাও তার সত্যবাদিতার জন্য নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট । বরং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে অলৌকিক কিছুর চেয়েও এগুলো বেশী প্রমাণবহ । মু'জিযার মত কিছুর চেয়ে এগুলোর দাবী বেশী । তাছাড়া একজন লোক, যার কোন সাহায্য-সহযোগিতাকারী নেই, অথচ সে তার কাওমের মধ্যে চিৎকার করে আহ্বান করছে, তাদেরকে ডাকছে, তাদেরকে অপারগ করে দিচ্ছে এটা অবশ্যই তার সত্যতার উপর স্পষ্ট নিদর্শন । তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন যে, "নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর, 'আল্লাহ্ ছাড়া । সুতরাং তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; তারপর আমাকে অবকাশ দিও না ।" এটা তাদের সামনে ঘোষণা করছেন, যারা তার শত্রু, যাদের রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা ও প্রভাব । তারা চাচ্ছে যে কোনভাবে হোক তার কাছে যে আলো আছে সেটা নিভিয়ে দিতে, অথচ তিনি তাদের কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে, তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে এ ঘোষণা দিয়েই চলেছেন । আর তারা তার কোন ক্ষতি করতে অপারগ হয়ে থাকল, এতে অবশ্যই বিবেকবান-জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । [সা'দী; ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারেজুস সালেকীন: ৩/৪৩১]

(১) হূদ আলাইহিসসালামের আহ্বানের জবাবে তার দেশবাসী মুর্খতা সুলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখালেন না । শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ দাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করবো না এবং

বললেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর[১],

---

আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং সন্দেহ করছি যে আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলেছেন। অর্থাৎ আপনি কোন দেবদেবী, বা কোন মহাপুরুষের আস্তানায় গিয়ে কিছু বেয়াদবী করেছেন, যার ফল এখন আপনি ভোগ করছেন। এতে বুঝা গেল যে, তারা এক ধরনের অজানা ভয় করছিল – যা এক ধরনের শির্ক। সুবহানাল্লাহ! কিভাবে তারা এতবড় একজন বিবেকবান মানুষকে বিবেকহীন বলে অপবাদ দিলো। যদি আল্লাহ্ বর্ণনা না করতেন তবে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের নিঃস্বার্থ ও ভালো লোকের ব্যাপারে এ কথা বলা অত্যন্ত বেমানান। কিন্তু হূদ আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণভাবে নিজেকে এর থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেছেন এভাবে যে, এ ব্যাপারে আমার ভরসা আছে যে আমাকে কোন কিছু পেয়ে বসে নি। আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থেকো যে, আমি তোমাদের শরীকদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। [সা'দী] বর্তমানে অনেক মানুষ তাদের পীর বা কবরের মানত বন্ধ করলে বা তাদের কবর পুজার বিরোধিতা করলে কোন কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন এ ধরনের কথা বলে থাকে। তারা বলে যে, অমুক লোককে অমুক পীরের বদদো'আয় ধরেছে। অমুক কবরের শাপে অমুক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে শির্ক। এটাকেই বলা হয়, ভয়ের মাধ্যমে শির্ক করা। এ ধরনের অজানা ভয়ই বর্তমানে অধিকাংশ শির্কের কারণ।

(১) অর্থাৎ তাদের কথার উত্তরে হূদ আলাইহিসসালাম নবীসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান তবে শোন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের এবং আমার উপর আক্রমনের চেষ্টা করে দেখ আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে আমি আল্লাহর তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি; যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর যাবতীয় ফয়সালা, তাকদীর, তাঁর যাবতীয় শরী'আত ও নির্দেশ, তাঁর সমস্ত প্রতিদান প্রদান, সওয়াব দান এবং শাস্তি প্রদানে ন্যায়, ইনসাফ, প্রজ্ঞা ও প্রশংসাপূর্ণ পথেই রয়েছেন। তার কোন কাজ তাকে প্রশংসাপূর্ণ সেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে না। [সা'দী]

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

৫৫. 'আল্লাহ্ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; তারপর আমাকে অবকাশ দিও না[১]।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়[২]; নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে[৩]।

জাতির মধ্যে কেউ তার একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। আসলে এটা হূদ আলাইহিসসালামের একটি মু'জিযা। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু'জিযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে বলত তাদের কোন কোন দেব-দেবী আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হল। কারণ দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাকে জীবিত রাখত না।

(১) তারা যে কথা বলে আসছিল যে, আপনার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই –এর জবাবেই একথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আমার এ সিদ্ধান্তও শুনে রাখো, আমি তোমাদের এসব উপাস্যের প্রতি চরমভাবে বিরূপ ও অসন্তুষ্ট।

(২) পূর্বোক্ত বাক্যে তাদের দাবী 'আপনার ওপর আমাদের কোন দেবতার অভিশাপ পড়েছে' –তাদের এ বক্তব্যের জবাবেই একথা বলা হয়েছে। এর অর্থ প্রতিটি সৃষ্টিই তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। আরবরা 'ললাটের চুল' কারো হাতে থাকা বলে কর্তৃত্ব থাকার কথা বুঝায় [তাবারী; মুয়াসসার] তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেটাকে ঘুরান, যেখান থেকে ইচ্ছা নিষেধ করেন। কেননা কেউ কারো ললাটের চুল ধরে ফেললে সে তার কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়। তাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ঘুরাতে পারে। [কুরতুবী] সুতরাং তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। [কুরতুবী] অর্থাৎ সমস্ত জীব-জন্তুই যেহেতু তাঁর পূর্ণ কব্জায় সেহেতু তারা কিভাবে মুমিনের প্রতি কুদৃষ্টি বা অভিশাপ দিতে পারে? যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ই দেখা-শুনা করবেন। এটাই তো স্বাভাবিক। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে এর অর্থ, তাঁর মুঠিতেই সমস্ত সৃষ্টিজীবের ভাগ্য নিহিত। [কুরতুবী] এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা ইউনূস ৭১ আয়াত।

(৩) অর্থাৎ তিনি যা কিছু করেন ঠিকই করেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই সহজ সরল। তিনি পূর্ণসত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব করে যাচ্ছেন। তুমি পথ ভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হবে এবং তারপরও আখেরাতে সফলকাম হবে আর আমি

৫৭. 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; এবং আমার রব তোমাদের থেকে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না[১]। নিশ্চয় আমার রব সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যখন আমাদের নির্দেশ আসল তখন আমরা হূদ ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

সত্য-সরল পথে চলবো ও সৎকর্মশীল হবো এবং তারপরও ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল হবো, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না। তিনি যে সমস্ত নির্দেশ দেন তা তাদের প্রতি দয়াবশতঃ প্রদান করেন। তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে, তাঁর নিজের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি দয়া-দাক্ষিন্য, ইহসান ও রহমতের নিমিত্তে তাদেরকে সেগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজনে তা করেন নি। বান্দারা তাঁর কাছে কিছু পাবে সে হিসেবে তিনি দিচ্ছেন ব্যাপারটি এরকম নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে ন্যায়, ইনসাফ, হিকমত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যাকে যা দেবার তিনি দেবেন [ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারুস সা'আদাহ: ২/৭৯; মাদারেজুস সালেকীন, ৩/৪২৫]

(১) 'আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনছিনা' তাদের একথার জবাবে এ উক্তি করা হয়েছে। হূদ আলাইহিসসালাম বললেন, তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক তবে জেনে রাখ যে পায়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার রব তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের তিনি খবর রাখেন।

করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে[১] ।

৫৯. আর এ 'আদ জাতি তাদের রবের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলগণকে[২] এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল ।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾

৬০. আর এ দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল লা'নতগ্রস্ত এবং লা'নতগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনেও । জেনে রাখ! 'আদ সম্প্রদায় তো তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল । জেনে রাখ! ধ্বংসই হচ্ছে হূদের সম্প্রদায় 'আদের পরিণাম[৩] ।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾

---

(১) কিন্তু হতভাগা দল হূদ আলাইহিস সালাম এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না । তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল । অবশেষে প্রচন্ড ঝড় তুফান রূপে আল্লাহর আযাব নেমে এল । সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল । বাড়ী ঘর ধ্বসে গেল, গাছ পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূণ্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পুর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল । 'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হূদ আলাইহিস সালাম ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন ।

(২) তাদের কাছে মাত্র একজন রাসূলই এসেছিলেন । কিন্তু যেহেতু তিনি তাদেরকে এমন এক বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন যে দাওয়াত সবসময় সব যুগে ও সকল জাতির মধ্যে আল্লাহর নবীগণ পেশ করতে থেকেছেন, তাই এক রাসূলের কথা না মানাকে সকল রাসূলের প্রতি নাফরমানী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ।

(৩) 'আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর আপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য এরশাদ করেছেন যে কাওমে 'আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কাজ করেছে । যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং আখেরাতে অভিশপ্ত আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে ।

ষষ্ঠ রুকূ'

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬১. আর আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম(১)। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন(২)।

---

(১) ৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে সালেহ আলাইহিসসালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কাওমে সামূদ' এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তার কাওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখান করে বলল "এ পাহাড়ের প্রস্তরখন্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজী আছি? সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জিযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর তাহলে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হল না। আল্লাহ তা'আলার তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জিযা প্রকাশ করলেন। বিশাল প্রস্তরখন্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে তাদেরকে পাকড়াও করলেন। সালেহ আলাইহিসসালাম ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল।

(২) প্রথম বাক্যাংশে যে দাবী করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এটি হচ্ছে সেই দাবীর সপক্ষে যুক্তি। মুশরিকরা নিজেরাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহই তাদের স্রষ্টা। এ স্বীকৃত সত্যের ওপর যুক্তির ভিত্তি করে সালেহ আলাইহিস্‌সালাম তাদেরকে বুঝান, পৃথিবীর নিষ্প্রাণ উপাদানের সংমিশ্রণে যখন আল্লাহই তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে এ পার্থিব অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই যখন এ পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করেছেন, তখন তিনি ছাড়া আর কে বন্দেগী লাভের অধিকার পেতে পারে? সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না [সা'দী]

কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর তাঁর দিকেই ফিরে আস। নিশ্চয় আমার রব খুব কাছেই, ডাকে সাড়া প্রদানকারী[১]।'

৬২. তারা বলল, 'হে সালেহ্! এর আগে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল[২]।

قَالُوا۟ يَـٰصَـٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَـٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ

(১) অর্থাৎ তিনি তাঁর অতি নিকটে যে তাঁকে কোন কিছু চাওয়ার জন্য ডাকে, বা তার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান করে। তিনি তার ডাকে সাড়াও দেন। প্রার্থিত বিষয় তাকে দান করেন, ইবাদত কবুল করেন, সাওয়াব দেন পূর্ণরূপে। এখানে জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্র নৈকট্য দু'ধরনের, এক. ব্যাপক, দুই. বিশেষ। ব্যাপক নৈকট্য হচ্ছে, তিনি তাঁর জ্ঞানে সবার নিকটে, সমস্ত সৃষ্টি জগত সে হিসেবে তার নিকটে। আর এটাই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, "আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর" [সূরা কাফ: ১৬] আর বিশেষ নৈকট্য হচ্ছে, তিনি তার ইবাদতকারী, যাচঞাকারী, যারা তাকে ভালবাসে তাদের নিকটে থাকেন। আর এ নৈকট্য সম্পর্কে অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "আর সিজ্দা করুন এবং আমার নিকটবর্তী হোন" [সূরা আল-আলাক:১৯] অনুরূপ সূরা হূদের আলোচ্য আয়াত। তাছাড়া আরও এসেছে, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৬] এ ধরনের নৈকট্য এমন যে, আল্লাহ্র বিশেষ দয়া, দো'আ কবুল হওয়া, উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এজন্যই এ আয়াতের শেষে 'মুজীব' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। [সা'দী; ইবন তাইমিয়্যা, মাজমু' ফাতাওয়া: ৫/৪৯৩]

(২) অর্থাৎ "তাওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পুজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমাদের উচ্চাশা ছিল যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।" [কুরতুবী] তারা এটাই বলতে চাচ্ছিল যে, আপনার বুদ্ধিমত্তা, বিচারবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, গাম্ভীর্য ও মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব দেখে আমরা আশা করেছিলাম আপনি ভবিষ্যতে একজন বিরাট নামীদামী ব্যক্তি হবেন। একদিকে যেমন বিপুল বৈষয়িক ঐশ্বর্যের অধিকারী হবেন তেমনি অন্যদিকে আমরাও অন্য জাতি ও গোত্রের মোকাবিলায় আপনার প্রতিভা ও যোগ্যতা থেকে লাভবান হবার সুযোগ পাবো। কিন্তু আপনি এ তাওহীদ ও আখেরাতের নতুন ধূয়া তুলে আমাদের সমস্ত আশা-আকাংখা বরবাদ করে দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার

أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ ‘ইবাদাত করতে তাদের, যাদের ‘ইবাদাত করত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা?[1] নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছ।’

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৩. তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে জানাও, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি

ফলে সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। কিন্তু নবুওয়াতের দাবী ও মুর্তি পুজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তার বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল। তাদের প্রত্যাশার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে যখন তিনি তাওহীদ ও আখেরাত এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে কেবল নিরাশই হলো না বরং তাঁর প্রতি হয়ে উঠলো অসন্তুষ্ট। তারা বলতে লাগলো, বেশ ভালো কাজের লোকটি ছিল কিন্তু কি জানি তাকে কি পাগলামিতে পেয়ে বসলো, নিজের জীবনটাও বরবাদ করলো এবং আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাও ধূলায় মিশিয়ে দিল। [দেখুন, তাবারী; সা‘দী] আররের মুশরিকরাও অনুরূপ করেছিল। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের কথা ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত এবং ‘আল-আমীন’ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু যখনই তিনি এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন তখনই তারা বিরোধিতা করতে লাগল।

(১) সালেহ আলাইহিস্‌সালাম বলেছিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই এবং এর যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে বসবাস করিয়েছেন। এর জবাবে এ মুশরিকরা বলছে, এদের ইবাদাতও পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কারণ বাপ-দাদাদের আমল থেকে এদের ইবাদাত হতে চলে আসছে। তাছাড়া আপনি আমাদেরকে যে দিকে আহ্বান করছেন সেটা নিয়ে আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে আছি। তারা যেন এটা বুঝাতে চাচ্ছে যে, যদি আমরা আপনার কথার সত্যতা জানতে পারতাম তবে অবশ্যই আপনার অনুসরণ করতাম। এটা অবশ্যই তাদের মিথ্যা কথা। কারণ, পরবর্তী আয়াতে সালেহ আলাইহিস সালাম তাদের কাছে বিষয়টি আরও খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন। আসলে তারা এ সমস্ত মিথ্যাচার করেই যাচ্ছিল। [সা‘দী]

আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ(১) দান করে থাকেন, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে, আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই? কাজেই তোমরা তো শুধু আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ(২)।

৬৪. 'হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং এটাকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে খেতে দাও। এটাকে কোন কষ্ট দিও না, কষ্ট দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।'

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝٦٤

৬৫. কিন্তু তারা এটাকে হত্যা করল। তাই তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও। এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়(৩)।'

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝٦٥

৬৬. অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

(১) অর্থাৎ আমি আমার দাবীর ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর আছি। আর আমাকে আমার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে নবুওয়াত ও রিসালাত। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ যদি আমি আমার কাছে আসা স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন সেই জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিছক তোমাদের খুশী করার জন্য গোমরাহীর পথ অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি যদি তোমাদেরকে হক ও একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে দাওয়াত না দেই, তবে তোমরা এর দ্বারা আমার কোন উপকার করতে পারবে না। [ইবন কাসীর] বরং এভাবে তোমরা তো আমাকে কল্যাণের পথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিবে এবং অনিষ্টতাই বৃদ্ধি করবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা যখন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে উষ্ট্রীকে হত্যা করল তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেয়া হল এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেটা ঘটবেই। [মুয়াসসার]

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

আসল তখন আমরা সালেহ্ ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম সে দিনের লাঞ্ছনা হতে। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর যারা যুলুম করেছিল বিকট চীৎকার তাদেরকে পাকড়াও করল; ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল(১);

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

৬৮. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাস করেনি। জেনে রাখ! সামূদ সম্প্রদায় তো তাদের রবের সাথে কুফরী করেছিল। জেনে রাখ! ধ্বংসই হল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

সপ্তম রুকূ'

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর অবশ্যই আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্‌রাহীমের কাছে এসেছিল(২)। তারা বলল, 'সালাম।'

---

(১) অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল জিবরীল আলাইহিস সালামের গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর নেই। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, 'কাওমে সামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ'রাফ এর ৭৮ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল"। এতে বোঝা যায় যে ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মুফাসসিরগণ বলেনঃ উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোন বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভুমিকম্প শুরু হয়েছিল। এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে ইবরাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের একটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্য তার কাছে কতিপয় ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা ইবরাহীম আলাইহিসসালামের স্ত্রী সারা

তিনিও বললেন, 'সালাম[১] ।' অতঃপর

নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন কিন্তু উভয়ে বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তারা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তার নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো অবহিত করা হল যে, ইসহাক আলাইহিসসালাম দীর্ঘজীবি হবেন, সন্তান লাভ করবেন তার সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকুব' আলাইহিসসালাম। উভয়ে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় ইবরাহীম আলাইহিসসালাম তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভূনা গোসত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশ্‌তা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের মনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ ইব্‌রাহীম আলাইহিসসালামের অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে "আপনি শঙ্কিত হবেন না।" আমরা আল্লাহর ফেরেশ্‌তা। আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করে ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে লুত আলাইহিসসালামের কাওমের উপর আযাব নাযিল করা। ইবরাহীম আলাইহিসসালামের স্ত্রী 'সারা' পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুখবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে। আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন তুমি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে।

(১) আলোচ্য আয়াত থেকে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরত্বপূর্ণ হেদায়াত পাওয়া যায়ঃ

তারা সালাম বললেন, তিনি বললেনঃ সালাম।" এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমদের পারস্পারিক সাক্ষাৎ মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি কথা বলার আগেই প্রথমে সালাম করবে। [সা'দী]

পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা, সালামের সুন্নাত সম্মত বাক্য السلام عليكم। এখানে সর্বপ্রথম 'আসসালাম' আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহর যিকির করা হল, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দো'আ করা হল, নিজের পক্ষ হতে জান মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার

বিলম্ব না করে তিনি এক কাবাবকৃত বাছুর নিয়ে আসলেন।

৭০. অতঃপর তিনি যখন দেখলেন তাদের হাত সেটার দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলেন এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল[১]। তারা বলল, 'ভয় করবেন না, আমরা তো

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ؕ﴿۷۰﴾

প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হলো যে, সালাম দেয়ার এ নীতি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময়েও ছিল। [সা'দী]

এখানে পবিত্র কুরআনে ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ হতে 'সালাম' এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তরফ হতে শুধু 'সালাম' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মোতাবেক সালামের জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলবে। এ আয়াতেও প্রথম সালাম প্রদানের বাক্যটি ক্রিয়ামূলক বাক্য আর তার উত্তরে প্রদত্ত বাক্যটি বিশেষ্যমূলক বাক্য। বিশেষ্যমূলক বাক্য বেশী অর্থবহ। সেজন্য সালামের জওয়াব সালাম থেকেও বেশী থাকতে হয়। [সা'দী]

(১) তাদেরকে ভয় পাবার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি মত আছেঃ

একঃ কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এ ভয়ের কারণ ছিল এই যে, অপরিচিত নবাগতরা খেতে ইতস্তত করলে তাদের নিয়তের ব্যাপারে ইবরাহীমের মনে সন্দেহ জাগে এবং তারা কোন প্রকার শত্রুতার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কিনা–এ চিন্তা তাঁর মনকে আতংকিত করে তোলে। কারণ আরব দেশে কোন ব্যক্তি কারোর মেহমানদারীর জন্য আনা খাবার গ্রহণ না করলে মনে করা হতো সে মেহমান হিসেবে নয় বরং হত্যা ও লুটতরাজের উদ্দেশ্যে এসেছে। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

দুইঃ কথা বলার এ ধরণ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, খাবারের দিকে তাদের হাত এগিয়ে যেতে না দেখে ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা। আর যেহেতু ফেরেশতাদের প্রকাশ্যে মানুষের বেশে আসা অস্বাভাবিক অবস্থাতেই হয়ে থাকে, তাই ইবরাহীম মূলত যে বিষয়ে ভীত হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা বা তাঁর জনপদের লোকেরা এমন কোন দোষ করে বসেনি তো যে ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য ফেরেশতাদের এই আকৃতিতে পাঠানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

৭১. আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়ানো ছিলেন, অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন[১]। অতঃপর আমরা তাকে ইস্‌হাকের ও ইস্‌হাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম[২]।

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾

৭২. তিনি বললেন, 'হায়, কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার[৩]!'

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

---

(১) এ থেকে বুঝা যায় ফেরেশতার মানুষের আকৃতিতে আসার খবর শুনেই পরিবারের সবাই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। এ খবর শুনে ইবরাহীমের স্ত্রীও ভীত হয়েছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনলেন, তাদের গৃহের বা পরিবারের ওপর কোন বিপদ আসছে না। তখনই তার ধড়ে প্রাণ এলো এবং তিনি আনন্দিত হলেন। [বাগভী; কুরতুবী] অথবা তিনি আযাব নাযিল হওয়া এবং কাওমে লূতের গাফিলতির ব্যাপারটি জেনে হেসে দিলেন।[বাগভী] অথবা তিনি হেসেছিলেন সন্তানের সুসংবাদ শোনার পর। তখন অবশ্য আয়াতের শব্দের মধ্যে আগ-পিছ হয়েছে ধরে নিতে হবে। [বাগভী; কুরতুবী] অথবা তিনি ও তার স্বামী উভয়েই মেহমানের খিদমতে নিয়োজিত আছেন তারপরও তারা খাচ্ছেন না, এ কথাটি তিনি হেসে হেসেই বলেছিলেন। [ইবন কাসীর]

(২) ফেরেশতাদের ইবরাহীমের পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী সারাকে এ খবর শুনাবার কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে সাইয়্যিদিনা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সারা ছিলেন সন্তানহীনা। তাই তাঁর মনটিই ছিল বেশী বিষন্ন। তাঁর মনের এ বিষন্নতা দূর করার জন্য তাঁকে শুধু ইসহাকের মতো মহান গৌরবান্বিত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ সুসংবাদও দেন যে, এ পুত্রের পরে আসছে ইয়াকূবের মতো নাতি, যিনি হবেন বিপুল মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বর। [কুরতুবী]

(৩) ﴿يٰوَيْلَتٰٓى﴾ শব্দটি সাধারণত কোন দুর্ভোগে পড়লে মানুষ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে,সারা এ খবর শুনে যথার্থই খুশী হবার পরিবর্তে উল্টো একে দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। বরং আসলে এগুলো এমন ধরনের শব্দ ও বাক্য, যা মেয়েরা সাধারণত কোন ব্যাপারে অবাক হয়ে গেলে বলে থাকে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ ক্ষেত্রে নিছক বিস্ময় প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র কাজে আপনি বিস্ময় বোধ করছেন? হে নবী পরিবার! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ[১]। তিনি তো প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত সম্মানিত[২]।'

قَالُوٓا۟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝٧٣

৭৪. অতঃপর যখন ইব্‌রাহীমের ভীতি দূরীভূত হল এবং তার কাছে সুসংবাদ আসল তখন তিনি লূতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগলেন[৩]।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ۝٧٤

(১) এর মানে হচ্ছে, যদিও প্রকৃতিগত নিয়ম অনুযায়ী এ বয়সে মানুষের সন্তান হয় না তবুও আল্লাহর কুদরতে এমনটি হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপারও নয়। আর এ সুসংবাদ যখন তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে তখন তোমার মতো একজন মুমিনা মহিলার পক্ষে এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। [তাবারী; কুরতুবী] মুজাহিদ বলেন, তখন সারার বয়স ছিল ৯৯ বছর। আর ইবরাহীমের বয়স ছিল ১০০ বছর, সে হিসেবে ইবরাহীমের বয়স তার স্ত্রী অপেক্ষা ১ বছর বেশি। [বাগভী; কুরতুবী] ইবন ইসহাক বলেন, তার বয়স ১২০ বছর এবং তার স্ত্রীর ৯০ বছর। এতে আরও মতামত রয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী]

(২) বরকত শব্দের অর্থ, বৃদ্ধি ও প্রাচুর্যতা। এখানে যে বরকতের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে পরবর্তী সমস্ত নবী-রাসূল ইবরাহীমের বংশধরদের থেকেই হয়েছে। [কুরতুবী] এ আয়াতে বর্ণিত রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ থেকে ইবন আব্বাস মত নিয়েছেন যে, সালামের সর্বশেষ শব্দ হবে, 'বারাকাতুহু' [মুয়াত্তা মালিক: ২/৯৫৯; কুরতুবী]

(৩) ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ফেরেশতাদের সাথে কি নিয়ে ঝগড়া করলেন তা অবশ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সূরা আল-আনকাবূতের ৩১-৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের কাছে আসল, তারা বলেছিল, 'আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীরা তো যালিম।' ইব্‌রাহীম বললেন, 'এ জনপদে তো লূত রয়েছে।' তারা বলল, 'সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইবরাহীম আলাইহিসসালামের ঝগড়ার বিষয় ছিল যে, যদি কাওমে লূতকে ধ্বংস করা হয় তবে লূতের কি অবস্থা হবে? সে তো মুমিন, তাকে কিভাবে বাঁচানো যায়? তখন ফেরেশ্‌তাগণ ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে আশ্বস্ত করলেন যে, আপনার ঘাবড়াবার কারণ নেই। আমরা তাকে ও ঈমানদারদের রক্ষা করবই।

৭৫. নিশ্চয় ইব্‌রাহীম অত্যন্ত সহনশীল, কোমল হৃদয়[১], সর্বদা আল্লাহ্‌ অভিমুখী।

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ۝

৭৬. হে ইব্‌রাহীম! আপনি এটা থেকে বিরত হোন[২]; নিশ্চয় আপনার রবের বিধান এসে পড়েছে; আর নিশ্চয় তাদের প্রতি আসবে শাস্তি যা অনিবার্য।

يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝

৭৭. আর যখন আমাদের প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের কাছে আসল তখন তাদের আগমনে তিনি বিষণ্ন হলেন এবং নিজকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন এবং বললেন, 'এটা বড়ই বিপদের দিন[৩]!'

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

---

(১) সূরা আত-তাওবার ১১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এর বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে।

(২) অর্থাৎ লূতের কাওমের ব্যাপারে আপনার বিবাদ পরিত্যাগ করুন। [কুরতুবী] কারণ, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়ে গেছে। [ইবন কাসীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতসমূহে লূত আলাইহিসসালাম ও তার দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। লূত আলাইহিসসালামের কাওম একে তো কাফের ছিল অধিকন্তু এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল যা পূর্বে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃনা করে। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের মৈথুন করা। ব্যাভিচারের চেয়েও ইহা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আযাব নাযিল হয়েছে যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো নাযিল হয়নি। লূত আলাইহিসসালামের ঘটনা যা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আলাইহিসসালাম সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তারা ফিলিস্তীনে প্রথমে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের সমীপে উপস্থিত হন। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। লূত আলাইহিসসালাম ও তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে

وَجَآءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ اِلَيۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىۡ هُنَّ اَطۡهَرُ لَـكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِىۡ ضَيۡفِىۡ ؕ اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ ۝

৭৮. আর তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল এবং আগে থেকেই তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল(১)। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র(২)।

দেশবাসীর কু-স্বভাব তার অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন "আজেকের দিনটি বড় সংকটময়"। লূত আলাইহিসসালামের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচারন করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন লূত আলাইহিসসালামের গৃহে উপনীত হলেন তখন তার স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদের খবর দিল যে আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন। [কুরতুবী]

(১) লূত আলাইহিসসালামের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল। আল্লাহ্ বলেনঃ "তার কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তার গৃহপানে ছুটে এল। এর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্ত ছিল"। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, লূত আলাইহিসসালামের মত একজন সম্মানিত নবীর গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

(২) এ আয়াতে কন্যা বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে,

একঃ হতে পারে লূত সমগ্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ নবী তার সম্প্রদায়ের জন্য বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। আর সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাঁর দৃষ্টিতে নিজের মেয়ের মতো হয়ে থাকে। প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তার সন্তানস্বরূপ। যেমন কুরআনের সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াতের সাথে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্বেরাতে وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ বাক্যও বর্ণিত আছে। যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র "উম্মতের পিতা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। সে হিসাবে লূত আলাইহিসসালামের কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রী রূপে ব্যবহার কর। [তাবারী; কুরতুবী]

দুইঃ আবার এও হতে পারে যে, তাঁর ইঙ্গিত ছিল তাঁর নিজের মেয়েদের প্রতি। "এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর" –একথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি তাদের কাছে তার মেয়েদের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। লূতের বক্তব্যের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ যে জায়েয পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতেই নিজেদের যৌন কামনা পূর্ণ করো এবং এ জন্য মেয়েদের অভাব নেই। [কুরতুবী]

কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবোধ ব্যক্তি নেই?'

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা বলল, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানই[১]।'

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾

৮০. তিনি বললেন, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের[২]!'

---

(১) এরপর লূত আলাইহিসসালাম তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে বললেন "আল্লাহকে ভয় কর" এবং কাকুতি মিনতি করে বললেন "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না"। তিনি আরো বললেন "তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই?" আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্রও ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল "আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধু কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই । আর আমারা কি চাই তাও আপনি অবশ্যই জানেন"।

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা লূত আলাইহিসসালামের উপর রহমত করুন। তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।" [বুখারীঃ ৩৩৮৭, মুসলিমঃ ১৫১] আর তাই লূত আলাইহিসসালামের পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহন করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কোরাইশ কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল কিন্তু তার হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্মমতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষন করত। এ জন্যই সম্পূর্ন বনি হাশেম গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শামিল ছিল। যখন কোরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿۸۱﴾

৮১. তারা বলল, 'হে লূত! নিশ্চয় আমরা আপনার রব প্রেরিত ফিরিশ্‌তা। তারা কখনই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না[১]। কাজেই আপনি রাতের কোন এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ুন[২] এবং আপনাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে তাকাবে না, আপনার স্ত্রী ছাড়া[৩]। তাদের

(১) লূত আলাইহিসসালাম এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠলেন হায়! আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয় স্বজন যদি এখানে থাকত যারা এই যালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো তাহলে কত ভালো হতো। ফেরেশতাগণ লূত আলাইহিসসালামের অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেনঃ আপনি নিশ্চিত থাকুন আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না বরং আযাব নাযিল করে দুরাত্মা দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি। তারপরও লূত আলাইহিসসালাম তাদের বাঁধা দিতে থাকলেন। কিন্তু তারা কোন বাঁধাই মানল না। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বের হয়ে তাদের মুখের উপর তার ডানা দিয়ে এক ঝাপটা মারলেন। আর তাতেই তারা অন্ধ হয়ে গেল। তারা যখন ফিরছিল তারা পথ দেখতে পাচ্ছিল না। [ইবন কাসীর] এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর অবশ্যই তারা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করল, তখন আমরা তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং ভীতির পরিণাম।" [সূরা আল-কামার: ৩৭]

(২) তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে লূত আলাইহিসসালামকে বললেন- আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব ভোগ করতে হবে।

(৩) এর এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। এ হিসেবে তিনি তাকে সাথে নিয়ে বের হননি। [কুরতুবী] দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। [কুরতুবী] আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুশিয়ারী মেনে চলবে না। সুতরাং সে তাদের সাথে বের হবার পর যখন একটি পাথর পতনের শব্দ শুনে লূতের হুশিয়ারী না মেনে পিছনের দিকে তাকায় এবং বলে উঠে,

যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। নিশ্চয় প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত সময়। প্রভাত কি খুব কাছাকাছি নয়?'

৮২. অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসল তখন আমরা জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর,

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ۝

৮৩. যা আপনার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল[১]। আর এটা যালিমদের থেকে দূরে নয়[২]।

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝

হায় আমার জাতি! সে তাদের জন্য সমবেদনা জানাচ্ছিল। আর তখনি একটি পাথর এসে তাকে আঘাত করে এবং সে মারা যায়। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] এটি এক মর্মন্তুদ শিক্ষণীয় ঘটনা। এ সূরায় লোকদেরকে একথা শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন বুযর্গের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন বুযর্গের সুপারিশ তোমাদের নিজেদের গোনাহের পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে না।

(১) উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করালাম, যার প্রত্যেকটি পাথর চিহ্নিত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি পাথরকে কি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে হবে এবং কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর উপর পড়বে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ লূত আলাইহিস সালাম এর নাফরমান জাতির পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে, পাথর বর্ষণের আযাব বর্তমান কালের যালেমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কুরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যেন নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। আজ যারা যুলুমের পথে চলছে তারাও যেন এ আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে না মনে করে। [ইবন কাসীর] লূতের সম্প্রদায়ের উপর যদি আযাব আসতে পেরে থাকে তাহলে তাদের উপরও আসতে পারে। লূতের সম্প্রদায় আল্লাহর আযাব ঠেকাতে পারেনি, এরাও পারবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে এসেছে, 'তোমাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা লূতের সম্প্রদায়ের মত কাজ করতে পাবে, তাদের মধ্যে যারা তা করবে এবং যাদের সাথে তা করা হবে তাদের উভয়কে হত্য করবে'। [আবু দাউদ: ৪৪৬২]

অষ্টম রুকূ'

৮৪. আর মাদ্‌ইয়ানবাসীদের[১] কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম[২]। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, আর মাপে ও ওজনে কম করো না; নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে দেখছি[৩], কিন্তু আমি তোমাদের উপর আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তি।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

৮৫. 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপো ও ওজন করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে

وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে শু'আইব আলাইহিসসালাম ও তার কাওমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শেরেকী ছাড়া ওজনে-পরিমাপে লোকদের ঠকাতো। শু'আইব 'আলাইহিসসালাম তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।

(২) মাদইয়ান আসলে একটি শহরের নাম। বলা হয়ে থাকে, মাদইয়ান ইবন ইবরাহীম তার পত্তন করেছিলেন। [দেখুন, কুরতুবী] উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু "মাদইয়ান" বলা হত। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট নবী শু'আইব আলাইহিসসালাম উক্ত মাদইয়ান কওমের সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন তাই তাকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তার সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তার হেদায়াত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

(৩) তোমাদের মধ্যে জীবন-জীবিকা ও রিযকের প্রাচুর্যতা দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি ভয় পাচ্ছি যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র হারামকৃত জিনিসের সীমালঙ্ঘন কর তাহলে তোমাদের এ নে'আমত আর অবশিষ্ট থাকবে না। তোমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। [ইবন কাসীর]

বেড়িও না[১] ।

৮৬. 'যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকী থাকবে তা তোমাদের জন্য উত্তম; আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই[২] ।'

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝٨٦

---

(১) এখানে শু'আইব আলাইহিসসালাম নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন । কেননা, তারা মুশরিক ছিল । কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা গাছপালার পুজা করত । এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে আসহাবুল-আইকা বা জঙ্গলওয়ালা উপাধি দেয়া হয়েছে । আর কোন কোন মুফাসসিরের মতে তাদের বাসস্থানে গাছপালার অবিচ্ছিন্ন ছায়া বিরাজ করছিল বলে তাদেরকে "আসহাবুল আইকাহ" বলা হয়েছে । এহেন কুফরী ও শেরেকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজন-পরিমাপে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত । শু'আইব আলাইহিস সালাম তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন । এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরী ও শেরেকীই সকল পাপের মূল । যে জাতি তাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমেই তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয় । সাধারণত: ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না । কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এর প্রমাণ । তবে শুধু দুটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদ-আমলেরও দখল ছিল । প্রথম, লূত আলাইহিসসালাম এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে । দ্বিতীয় শু'আইব আলাইহিসসালামের জাতি । যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাপে কম দেয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে । এতে করে বুঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ । কারণ তা এমন দুটি কাজ যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত হয় এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয় ।

(২) অর্থাৎ ওজন-পরিমাপে হের-ফের করার হীন মানসিকতা দুর করার জন্য শু'আইব আলাইহিসসালাম প্রথমে তার জাতিকে নবীসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন, বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও স্বচ্ছল দেখছি । তোমাদের রিযক ও জীবন-জীবিকায় রয়েছে প্রাচুর্য । [ইবন কাসীর] হাসান বসরী বলেন, তাদের জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা । [কুরতুবী] সুতরাং প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না । তাই আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয় । তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে । এখানে আখেরাতের আযাব

৮৭. তারা বলল, 'হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার 'ইবাদাত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও[১]?

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

বুঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে এক আযাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে [ইবন কাসীর] তোমরা অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। তোমাদের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। [কুরতুবী]
তিনি আরো বললেনঃ মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তাই উত্তম। [তাবারী] পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়। তোমাদের উপর আমার কোন জোর নেই। আমি তো শুধু একজন কল্যাণকামী উপদেষ্টা মাত্র। বড় জোর আমি তোমাদের বুঝাতে পারি। তারপর তোমরা চাইলে মানতে পারো আবার নাও মানতে পারো। আমার কাছে জবাবদিহি করার ভয় করা বা না করার প্রশ্ন নয়। বরং আসল প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করা। [ইবন কাসীর] আল্লাহর কিছু ভয় যদি তোমাদের মনে থেকে থাকে তাহলে তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে বিরত থাকো। এভাবে তিনি তাঁর সুললিত বর্ণনা ও অপূর্ব বাগ্মীতার মাধ্যমে নিজ জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

(১) এত কিছু শোনার পরেও তার কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বললঃ আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পুজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পুজা করে আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে? শু'আইব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল এবাদতে মগ্ন থাকেন। [কুরতুবী] তাই তারা তার মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো- আপনার নামায কি আপনাকে এসব কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে? হাসান বসরী বলেন, অবশ্যই তার সালাত তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে নিষেধ করছে। [ইবন কাসীর] তাদের এসব মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এরা দ্বীনকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে

তুমি তো বেশ সহিষ্ণু, সুবোধ!'

৮৮. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি আমার রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে আমাকে উৎকৃষ্ট রিয্ক[১] দান করে থাকেন (তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব?) আর আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তার বিপরীত করতে ইচ্ছে করি না[২]। আমি তো

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَرَزَقَنِىۡ مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيۡدُ اَنۡ اُخَالِفَكُمۡ اِلٰى مَاۤ اَنۡهٰٮكُمۡ عَنۡهُ ؕ اِنۡ اُرِيۡدُ اِلَّا الۡاِصۡلَاحَ مَا اسۡتَطَعۡتُ ؕ وَمَا تَوۡفِيۡقِىۡۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ ۝٨٨

সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশী তেমন ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। [মুহাম্মাদ আল-মাক্কী: আত-তাইসীর ফী আহাদীসিত তাফসীর ৩/১৩৯] সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, তারা এটা বলেছিল যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকতে। [ইবন কাসীর]

এ থেকে একথাও আন্দাজ করা যেতে পারে যে, জীবনকে ধর্মীয় ও পার্থিব এ দু'ভাগে ভাগ করার চিন্তা আজকের কোন নতুন চিন্তা নয় বরং আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে শু'আইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ও এ বিভক্তির উপর ঠিক তেমনিই জোর দিয়েছিল যেমন আজকের যুগে পাশ্চাত্যবাসীরা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় শিষ্যবৃন্দ জোর দিচ্ছেন।

(১) রিযক শব্দটি এখানে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, সত্য-সঠিক জ্ঞান, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে এ শব্দটি থেকে সাধারণত যে অর্থ বুঝা যায় সেটি অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবন যাপন করার জন্য যে জীবন সামগ্রী দান করে থাকেন। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে এর অর্থ হচ্ছে নবুওয়াত ও রিসালত। [ইবন কাসীর] আর দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, হালাল রিযক। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ শু'আইব আলাইহিস সালাম বলছেন যে, আমার আল্লাহ্ যদি আমাকে হালাল রিযিক দিয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের নিন্দাবাদের কারণে এ অনুগ্রহ কি করে বিগ্রহে পরিণত হবে? আল্লাহ যখন আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন তখন তোমাদের ভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়াকে আমি সত্য ও হালাল গণ্য করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হই কেমন করে?

(২) অর্থাৎ একথা থেকেই তোমরা আমার সত্যতা আন্দাজ করে নিতে পারো যে, অন্যদের আমি যা কিছু বলি আমি নিজেও তা করি। এমন নয় যে, তোমাদেরকে যা থেকে

আমার সাধ্যমত সংস্কারই করতে চাই। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী।

৮৯. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় যার ফলে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালেহের সম্প্রদায়ের উপর; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾

৯০. 'আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে আস; আমার রব তো পরম দয়ালু, অতি স্নেহময়[১]।'

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾

নিষেধ করছি আমি নিজে তার বিরোধিতা করে তা গোপনে করে যাচ্ছি। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যদি আমি তোমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহর পূজা বেদীতে যেতে নিষেধ করতাম এবং নিজে কোন বেদীর সেবক হয়ে বসতাম তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা আমার কথার বাইরে চলার মত দলীল-প্রমাণাদি পেয়ে যেতে। যদি আমি তোমাদের হারাম জিনিস খেতে নিষেধ করতাম এবং নিজের কারবারে বেঈমানী করতে থাকতাম তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারতে যে, আমি নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈমানদারীর দাবি করছি। কিন্তু তোমরা দেখছো, যেসব অসৎকাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি। আমি নিজেও সেগুলো থেকে দূরে থাকছি। যেসব কলংক থেকে আমি তোমাদের মুক্ত দেখতে চাচ্ছি আমার নিজের জীবনও তা থেকে মুক্ত। তোমাদের আমি যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছি আমার নিজের জন্যও আমি সেই পথটিই পছন্দ করেছি। এসব জিনিস একথা প্রমাণ করে যে, আমি যে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ।

(১) অর্থাৎ তোমরা ইস্তেগফার ও তাওবা কর। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন শত্রুতা

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, 'হে শু'আইব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না[১] এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও[২]।'

নেই। তোমরা যতই দোষ করো না কেন যখনই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে তখনই তাঁর হৃদয়কে নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাবে। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত নেই। এ বিষয়বস্তুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোন ব্যক্তির উট যদি কোন বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশি হবে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন। [দেখুন, বুখারী: ৬৩০৮; মুসলিম: ২৭৪৪]

(১) শু'আইব কোন বিদেশী ভাষায় কথা বলছিলেন তাই তারা বুঝতে পারছিল না, এমন কোন ব্যাপার ছিল না। অথবা তাঁর কথা কঠিন, সূক্ষ্ম বা জটিলও ছিল না। কথা সবই সোজা ও পরিষ্কার ছিল। সেখানকার প্রচলিত ভাষায়ই কথা বলা হতো। তাহলে তারা কেন বুঝলো না? এর দু'টি কারণ হতে পারে। এক. তাদের মানসিক কাঠামো এত বেশী বেঁকে গিয়েছিল যে, শু'আইব আলাইহিস সালামের সোজা সরল কথাবার্তা তার মধ্যে কোন প্রকারেই প্রবেশ করতে পারতো না। তাদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর কিছু শোনার কারণে তারা বলতে থাকে যে, এসব আবার কেমন ধারার কথা! তারা বলল যে, আমরা বুঝিনা। তারা এটা অপমানসূচক তাদের নবীকে বলেছিল। দুই. অথবা তারা সত্যি সত্যিই বুঝতে চেষ্টা করছিল না। তাদের বক্তব্য হলো, আপনি আমাদেরকে পুনরুত্থান, ও হাশর-নশরের মত গায়েবী বিষয় বলছেন, এমন কিছুর উপদেশ দিচ্ছেন যা আগে আমরা বুঝিনি। [কুরতুবী]

(২) একথা অবশ্যি সামনে থাকা দরকার যে, এ আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন হুবহু একই রকম অবস্থা মক্কাতেও বিরাজ করছিল। সে সময় কুরাইশরাও একই ভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর

قَالَ يٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

৯২. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী শক্তিশালী? আর তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে রেখেছ। তোমরা যা কর আমার রব নিশ্চয় তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَيٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عٰمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

৯৩. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيٰرِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আর যখন আমাদের নির্দেশ আসল তখন আমরা শু'আইব ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা যুলুম করেছিল বিকট চীৎকার তাদেরকে আঘাত করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় পড়ে রইল[১]।

জীবননাশ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু শুধু বনী হাশেম তাঁর পেছনে ছিল বলেই তাঁর গায়ে হাত দিতে ভয় পাচ্ছিল। কাজেই শু'আইব আলাইহিস সালাম ও তার কওমের এ ঘটনাকে যথাযথভাবে কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে শু'আইব আলাইহিস সালামের যে চরম শিক্ষণীয় জবাব উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের জন্যও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে এ একই জবাব দেয়া হলো।

(১) কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল, আপনার গোষ্ঠী-জাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

৯৫. যেন তারা সেখানে কখনো বসবাস করেনি। জেনে রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদ্‌ইয়ানবাসীর পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়।

নবম রুকূ'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

৯৬. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম,

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

৯৭. ফির'আউন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ ফির'আউনের কর্যকলাপের অনুসরণ করেছিল। আর ফির'আউনের কার্যকলাপ সঠিক ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের সামনে থাকবে[১]। অতঃপর সে তাদেরকে আগুনে উপনীত করবে। আর যেখানে তারা উপনীত হবে তা উপনীত হওয়ার কত নিকৃষ্ট স্থান!

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

৯৯. আর অভিশাপ তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল এ দুনিয়ায় এবং কিয়ামতের দিনেও। কতই না নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হবে!

আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম। এরপরে শু'আইব আলাইহিসসালামের কোন কথা যখন তারা মানল না, তখন তিনি বললেনঃ ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষা করতে থাক।' তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে শু'আইব আলাইহিসসালামকে এবং তার সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালামের এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হল।

(১) অর্থাৎ সে তাদের সামনে সামনে জাহান্নামে যাবে। কারণ সে তাদের নেতা। [কুরতুবী]

১০০. এগুলো জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি। এ গুলোর মধ্যে কিছু এখনো বিদ্যমান এবং কিছু নির্মূল হয়েছে।

ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيۡكَ مِنۡهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيۡدٌ ﴿۱۰۰﴾

১০১. আর আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। অতঃপর যখন আপনার রবের নির্দেশ আসল, তখন আল্লাহ্ ছাড়া তারা যে ইলাহ্‌সমূহের 'ইবাদাত করত তারা তাদের কোন কাজে আসল না। আর তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের অন্য কিছুই বৃদ্ধি করল না।

وَمَا ظَلَمۡنٰهُمۡ وَلٰـكِنۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فَمَاۤ اَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىۡ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ شَىۡءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ‌ؕ وَمَا زَادُوۡهُمۡ غَيۡرَ تَتۡبِيۡبٍ ﴿۱۰۱﴾

১০২. এরূপই আপনার রবের পাকড়াও! যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন(১)।

وَكَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ‌ ؕ اِنَّ اَخۡذَهٗۤ اَلِيۡمٌ شَدِيۡدٌ ﴿۱۰۲﴾

১০৩. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন তার জন্য যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে(২)। সেটি এমন এক দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে; আর সেটি

اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ الۡاٰخِرَةِ‌ ؕ ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّجۡمُوۡعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُوۡدٌ ﴿۱۰۳﴾

---

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারীকে পৃথিবীতে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। আবার যখন তাকে ধরেন তখন আর ছাড়েন না। বর্ণনাকারী সাহাবী আবু মূসা আশ'আরী বলেনঃ তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ "এরূপই আপনার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা যুলুম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন।" [বুখারীঃ ৪৬৮৬, মুসলিমঃ ২৫৮৩]

(২) অর্থাৎ ইতিহাসের এ ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি নিশানী রয়েছে যে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আখেরাতের আযাব অবশ্যি আসবে এবং এ সম্পর্কিত নবীদের দেয়া খবর সত্য। তাছাড়া এ নিশানী থেকে সেই আখেরাতের আযাব কেমন কঠিন ও ভয়াবহ হবে সেকথাও জানতে পারবে। ফলে এ জ্ঞান তার মনে ভীতির সঞ্চার করে তাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

এমন এক দিন যেদিন সবাইকে উপস্থিত করা হবে[১];

وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর আমরা তো কেবল নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যই সেটা বিলম্বিত করছি।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫. যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না[২]; অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান[৩]।

---

(১) অর্থাৎ সেদিন আগের পরের সবাইকে একত্রিত করা হবে। কেউই বাকি থাকবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "আর আমি তাদের সবাইকে জমায়েত করেছি, তাদের কাউকেই ছাড়িনি। [সূরা আল-কাহাফঃ৪৭]

(২) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ "সেদিন রূহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবে না এবং সে সঠিক বলবে।" [সূরা আন-নাবাঃ ৩৮] অর্থাৎ সেদিনের সেই আড়ম্বরপূর্ণ মহিমান্বিত আদালতে অতি বড় কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তি এবং মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাও টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। আর যদি কেউ সেখানে কিছু বলতে পারে তাহলে একমাত্র বিশ্ব-জাহানের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মহান অধিকারীর নিজের প্রদত্ত অনুমতি সাপেক্ষেই বলতে পারবে।

(৩) উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন এ আয়াত "তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে ভাগ্যবান" নাযিল হলো তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! তা হলে কি জন্য আমল করব? যে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেছে সেটার জন্য আমল করব নাকি চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি এমন বস্তুর জন্য আমল করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "হে উমর! বরং যে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং কলম দিয়ে লিখা হয়ে গেছে এমন বিষয়ের জন্য আমল করবে। তবে যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেটাকে সহজ করে দেয়া হবে।" [তিরমিযীঃ৩১১১] অর্থাৎ তাকদীরের খবর আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। যদি সে ঈমানদার হিসেবে লিখা হয়ে থাকে তবে তার জন্য সৎকাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। আর যদি বদকার ও কাফের হিসেবে লেখা হয়ে থাকে তবে সে ভাল কাজ করতে চাইবে না, ভাল কাজ করা তার দ্বারা সহজ হবে না। তাই প্রত্যেকের উচিত ভাল কাজ করতে সচেষ্ট হওয়া। কারণ ভাল কাজের প্রতি প্রচেষ্টাই তার ভাগ্য ভাল কি মন্দ হয়েছে তার প্রতি প্রমাণবহ। তা না

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য তারা থাকবে আগুনে এবং সেখানে তাদের থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ,

خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে[১] যতদিন আকাশমণ্ডলী ও যমীন বিদ্যমান থাকবে[২] যদি না আপনার রব

করে নিছক তাকদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে অবশ্যই হতভাগা, তার তাকদীরে ভালো লিখা হয়নি। যা অধিকাংশ দুর্ভাগা মানুষ সবসময় করে থাকে। তারা ভাগ্যকে অযথা টেনে এনে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে এবং ভাগ্য নিয়ে অযথা বাদানুবাদ করে। অপরপক্ষে, যাদের ভাগ্য ভাল, তারা তাকদীরের উপর ঈমান রাখে কিন্তু সেটাকে টেনে এনে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে ভাল কাজ করতে সদা সচেষ্ট থাকে। তারপর যদি ভাল কিছু পায় তবে বুঝতে হবে যে, প্রচেষ্টা করার কথাও তার তাকদীরে লিখা আছে। আর যারা সৎ কাজের চেষ্টা না করে অযথা তাকদীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের সম্পর্কে বুঝতে হবে যে, তারা সৎকাজের প্রচেষ্টা করবে না এটাই লিখা হয়েছিল সে জন্য তারা দুর্ভাগা। তাকদীর সম্পর্কে এটাই হচ্ছে মূল কথা। [দেখুন, শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন: আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ ২/৪১৩-৪১৪]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুকে হাশরের মাঠে একটি সাদা-কালো ছাগলের সূরতে নিয়ে আসা হবে তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন, হে জান্নাতবাসী! ফলে তারা ঘাড় উঁচু করবে এবং তাকাবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিন? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, এটা হলো, মৃত্যু। তাদের প্রত্যেকেই তা দেখেছে। তারপর আহ্বানকারী আহ্বান করে ডাকবেন, হে জাহান্নামবাসী! তখন তারা ঘাড় উচু করে তাকাবে। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, আর তারা প্রত্যেকে তা দেখেছে, তারপর সেটাকে জবেহ করা হবে। তারপর বলবেনঃ হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে তোমরা এখানে থাকবে সুতরাং কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! স্থায়ীভাবে এখানে থাকবে সুতরাং কোন মৃত্যু নেই। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন সম্বন্ধে, যখন সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তারা গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না। (সূরা মারইয়ামঃ৩৯) [বুখারীঃ ৪৭৩০]

(২) এ শব্দগুলোর অর্থ আখেরাতের আসমান ও যমীন হতে পারে। এ জন্যই হাসান বসরী বলেন, সেদিন আসমান ও যমীন তো পরিবর্তিত হবে। আর সে আসমান ও যমীন স্থায়ী হবে। তাই তাদের অবস্থারও পরিবর্তন হবে না। [ইবন কাসীর] অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রতিটি জান্নাত ও জাহান্নামেরই আলাদা আসমান ও যমীন রয়েছে সে

অন্যরূপ ইচ্ছে করেন[১]; নিশ্চয় আপনার রব তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।

১০৮. আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্যরূপ ইচ্ছে করেন[২]; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ۝

অনুসারে এটা বলা হয়েছে। এটি ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত। [ইবন কাসীর] অথবা এর অর্থ যতক্ষণ আসমান আসমান থাকবে আর যতক্ষণ যমীন যমীন থাকবে। আর আখেরাতে সেটা অপরিবর্তনীয়। এটি আব্দুর রহমান ইবন যায়দ বলেছেন। [ইবন কাসীর] অথবা নিছক সাধারণ বাকধারা হিসেবে একে চিরকালীন স্থায়িত্ব অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তাদেরকে এ চিরন্তন আযাব থেকে বাঁচাবার মতো আর কোন শক্তিই তো নেই। তবে আল্লাহ নিজেই কিছু ইচ্ছে করেন সেটা ভিন্ন। এখান প্রশ্ন হচ্ছে, কাফেরের আযাব তো কখনো শেষ হবে না, তা হলে এখানে ব্যতিক্রম কি হতে পারে? এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তবে সবেচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে তাই যা ইমাম ইবন জারীর তাবারীসহ অধিকাংশ সত্যনিষ্ঠ আলেম গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে, এখানে গোনাহগার ঈমানদারদের কথা বলা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে নবী-রাসূল, ফিরিশতা ও মুমিনদের সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তারপর রহমতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে এমন লোকদেরকে বের করবেন, যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমানও অবশিষ্ট ছিল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তাদের জান্নাতে অবস্থান করাও এমন কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় যে তা আল্লাহকে এমনটি করতে বাধ্য করে রেখেছে। বরং আল্লাহ যে তাদেরকে সেখানে রাখবেন এটা হবে সরাসরি তাঁর অনুগ্রহ। যদি তিনি তাদের ভাগ্য বদলাতে চান, তা করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর আছে। [ইবন কাসীর] তাই তাদেরকে সর্বদা তাঁর জন্য তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করার ইলহাম করা হবে, যেমনি তাদেরকে নিঃশ্বাস নেয়ার ইলহাম করা হবে। [ইবন কাসীর] হাসান বসরী ও দাহহাক বলেন, এখানেও ব্যতিক্রম বলে গোনাহগার ঈমানদারদের বোঝানো হয়েছে। কারণ তারা কিছু সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে তারপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। [ইবন কাসীর]

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ

১০৯. কাজেই তারা যাদের 'ইবাদাত করে তাদের সম্বন্ধে সংশয়ে থাকবেন না, আগে তাদের পিতৃপুরুষেরা যেভাবে 'ইবাদাত করত তারাও তাদেরই মত 'ইবাদাত করে[১]। আর নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেব---কিছুমাত্র কম করব না।

দশম রুকূ'

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

১১০. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। আর আপনার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা তো হয়েই যেত[২]। আর নিশ্চয় তারা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে

(১) এর অর্থ এ নয় যে, এ মাবুদদের ব্যাপারে সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল। বরং আসলে একথাগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে শুনানো হচ্ছে।[কুরতুবী] এর অর্থ হচ্ছে, এরা যে এসব মাবুদের ইবাদত করছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করছে ও ভিক্ষা চাচ্ছে, নিশ্চয়ই এরা কিছু দেখে থাকবে যে কারণে এরা এদের থেকে উপকৃত হবার আকাংখা পোষণ করে–কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে এ ধরনের কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, এদের যাবতীয় ইবাদত, নযরানা ও প্রার্থনা আসলে কোন অভিজ্ঞতা ও সত্যিকার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নয় বরং এসব কিছু করা হচ্ছে নিছক অন্ধ অনুসৃতির ভিত্তিতে। এসব বেদী ও আস্তানা পূর্ববর্তী জাতিদেরও ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এলো তখন তারা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং বেদী ও আস্তানাগুলো কোন কাজে লাগলো না।

(২) এ পূর্ব সিদ্ধান্ত বা বাক্য সম্পর্কে দু'টি মত প্রসিদ্ধ। এক. পূর্ব থেকেই তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অবকাশ প্রদানের সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের উপর আযাব এসে যেতো। দুই. অথবা পূর্ব থেকেই যদি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত না থাকত যে, তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি দিবেন না, তাহলে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি আপতিত হতো। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন, “আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই” [সূরা আল-ইসরা: ১৫] [ইবন কাসীর]

নিপতিত[১]।

১১১. আর নিশ্চয় আপনার রব তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেবেন। তারা যা করে তিনি তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত;

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

১১২. কাজেই আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে অবিচল থাকুন এবং আপনার সাথে যারা তাওবা করেছে তারাও[২]; এবং তোমরা সীমালংঘন

فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

(১) অর্থাৎ এ কুরআন সম্পর্কে আজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলছে, নানা রকম সন্দেহ-সংশয় পোষণ করছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। বরং এর আগে মূসাকে যখন কিতাব দেয়া হয়েছিল তখন তার ব্যাপারেও এ ধরনের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। [কুরতুবী; সা'দী] কাজেই হে নবী! এমন সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা কুরআনে বলা হচ্ছে এবং তারপরও লোকেরা তা গ্রহণ করছে না–এ অবস্থা দেখে আপনার মন খারাপ করা ও হতাশ হওয়া উচিত নয়।

(২) ইস্তেকামত শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ডান বা বাম কোনদিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে থাকা। [কুরতুবী] মূলতঃ এটা সহজ কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল মুসলিমকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামত অবলম্বন করার জন্য এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'ইস্তেকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, সর্বাবস্থায় দ্বীনের পথে সঠিকভাবে চলার অর্থ হচ্ছে- আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামতের পরিপন্থী। দুনিয়ায় যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফরী ও শেরেকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রাসূল আলাইহিমুসসালামগণের প্রতি শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। তেমনি কোন রাসূলকে আল্লাহ্র

গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইয়াহূদী ও নাসারারা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য কুরআনে করীম নির্দেশিত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথের মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য নতুন সৃষ্ট পথ ও মত হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। [দেখুন, আবু দাউদ: ৪৬০৭] অতএব, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করা কক্ষনো ঠিক হবে না। কারণ, আকায়েদ, ইবাদাত, মু'আমালাত তথা লেন-দেন, আখলাক বা স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন করীম নির্দেশিত মূলনীতিগুলিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুষ্ঠু সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ধৈর্য, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, আল্লাহর উপর নির্ভরতা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামতের তাফসীর। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেনঃ "আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, তারপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর"। [মুসলিমঃ ৩৮] উসমান ইবন হাদের আল-আযদী বলেন, আমি ইবন আব্বাসের কাছে প্রবেশ করে তার কাছে অসীয়ত চাইলে তিনি বললেন, 'তুমি তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ইস্তেকামত গ্রহণ কর। অনুসরণ কর এবং বিদ'আত থেকে দূরে থাক। [সুনান দারমী: ১৪১] [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবন তাইমিয়্যা: আল-ইস্তিকামাহ ১/৩-৩২]

মূলত: ইস্তেকামতই সবচেয়ে দুস্কর কার্য। এজন্যই সালফে-সালেহীন বলতেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামতের মর্যাদা ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তার দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত

করো না[১]। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

১১৩. আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে[২]।

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

না হয়, তথাপি তার মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন "পূর্ণ কুরআনের মধ্যে এ আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয় নি।" তাই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতে রাসূলের বাণী "সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" এ সূরার ইস্তেকামতের নির্দেশই ছিল তার বার্ধক্যের কারণ। [কুরতুবী]

(১) ইস্তেকামতের আদেশ দানের পর আল্লাহ্ বলেনঃ 'সীমালজ্ঘন করো না। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয় নি। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন আনুগত্যের সময় শরী'আত নির্ধারিত সীমা লজ্ঘন না করে। যেমন কেউ সাওম পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে সেটাকে সবসময়ের জন্য করে নিল। আবার কেউ রাতে সালাতে দাঁড়াতে গিয়ে ঘুম বন্ধ করে দিল। যে বস্তু হালাল করা হয়েছে কেউ তা পরিত্যাগ করে দিল। [ফাতহুল কাদীর] যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অথচ আমি সাওম পালন করি, সাওম পালন থেকে বিরতও হই, রাতে সালাতের জন্য দাঁড়াই, সালাত থেকে বিরত হয়ে ঘুমও যাই। আর বিয়ে-শাদীও করি। অতঃপর যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।' [বুখারীঃ ৫০৬৩; মুসলিমঃ ১৪০১]

(২) এ আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলা হচ্ছেঃ "ঐসব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" এখানে তাদের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তাদের প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করাও নিষেধ করা হয়েছে। এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক। ইবন আব্বাস বলেন, যালেমদের চাটুকার হবে না। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তাদের শির্কী কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতিত্ব করবে না। [ইবন কাসীর] কাতাদাহ বলেন, এর অর্থঃ "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না,

এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১১৪. আর আপনি সালাত কায়েম করুন[১] দিনের দু প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে[২]। নিশ্চয় সৎকাজ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـَٔاتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى

তাদের কথামত চলবে না।” [মা'আনিল কুরআন লিন নাহহাস; কুরতুবী] ইবন জুরাইজ বলেন, এর অর্থঃ “পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না। [কুরতুবী] আবুল ‘আলিয়া বলেনঃ “তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।” [কুরতুবী; ইবন কাসীর] ‘সুদ্দী’ বলেনঃ “যালেমদের চাটুকারিতা করবে না।” ইকরিমা বলেনঃ “তাদের আনুগত্য করবে না।” [বাগভী] ইবন যায়দ বলেন, তাদের কুফরী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা পরিত্যাগ করবে না। [তাবারী] ইবন আব্বাস থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমরা যালেমদের পক্ষ নিও না। তাদের সাহায্য নিও না, তাহলে মনে হবে যেন তোমরা তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সন্তুষ্ট রয়েছে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে। ইবন যায়দ বলেন, এখানে যালেম বলে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] কিন্তু মুমিনদের মধ্যে যারা যালেম হবে তাদের সাথে সম্পর্ক বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল হবে। [ফাতহুল কাদীর] যদিও সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মধ্যে অনেকেই এ আয়াতটিকে সবার ক্ষেত্রেই ব্যাপক বলে মন্তব্য করেছেন। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যা, মাজমু' ফাতাওয়া: ১৩/২০৩; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/১১৭]

(১) আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে তাকে ও তার সমস্ত উম্মতকে নামায কায়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয সালাত। [কুরতুবী] আর ইকামতে সালাত অর্থ, পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে সালাত সম্পন্ন করা। কোন কোন আলেমের মতে সালাত কায়েম করার অর্থ, সমুদয় সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ, মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া। আবার কারো কারো মতে, জামাতের সাথে আদায় করা। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ। সূরা আল-বাকারার ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তার বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে।

(২) নামায কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, “দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কায়েম করবেন।” দিনের দু'প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে ইবন আব্বাস বলেন তা মাগরিবের নামায। [তাবারী;

لِلذّٰكِرِيْنَ ۞ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়[১]।

কুরতুবী; ইবন কাসীর] হাসান বসরী, কাতাদাহ ও দাহহাক আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অবশ্য এখানে একটি মত এটাও রয়েছে যে, দিনের দু'প্রান্ত বলে, যোহর ও আসরের সালাত বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে ইবন আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এটি হচ্ছে, এশার নামায। হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদাহ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। [ইবন কাসীর] অতএব এ আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল যোহরের নামায। এ ব্যাপারে ইবন কাসীর বলেন, এটি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার আগের নির্দেশ। আর তখন দু' ওয়াক্ত নামাযই ফরয ছিল। সূর্যোদয়ের আগের নামায এবং সূর্যাস্তের আগের নামায। আর রাতের বেলা রাসূল ও উম্মতের উপর কিয়ামুল লাইল করা ফরয ছিল। [ইবন কাসীর] অথবা যোহরের সালাতের ব্যাপারে কুরআনের অন্যত্র যা এসেছে তা থেকে প্রমাণ নেয়া যায়, তা হচ্ছে, "নামায কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৩৮]

(১) এখানে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে "পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়"। এখানে পুণ্যকাজ বলতে অধিকাংশ আলেমদের নিকট সালাত বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, তাবারী] যদিও সালাত, রোযা, হজ, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি যাবতীয় সৎকাজই উদ্দেশ্য হতে পারে। [কুরতুবী] তবে নিঃসন্দেহে এর মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রে-গণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন এবং রাসূলের বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনহসমূহ মিটিয়ে দেয়। এ হিসেবে ইমাম কুরতুবী বলেন, আয়াতটি পুণ্যকাজের ব্যাপারে ব্যাপক হলেও গোনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে বিশেষভাবে বিশেষিত। অর্থাৎ সগীরা গোনাহের সাথে সংশ্লিষ্ট। [কুরতুবী] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সৎকাজের দ্বারা পাপ ক্ষমা হয় এ কথা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক তাহলে তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গুনাহগুলি মিটিয়ে দেব"। [সূরা আন-নিসাঃ ৩১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম'আ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান দ্বারা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে'। [মুসলিমঃ ২৩৩] অর্থাৎ কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোজা, দান-সাদকাহ ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা-আপনিও মাফ হয়ে যায়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে

উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা[১] এক উপদেশ।

১১৫. আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না[২]।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে উহার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" [তিরমিযীঃ ১৯৮৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিয়ে ফেলল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ কথা উল্লেখ করলো। তখন তার এ ঘটনা উপলক্ষে উক্ত আয়াত নাযিল করা হলো। অর্থাৎ আপনি সালাত কায়েম করুন দিনের দু প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ"। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ্র রাসূল! এ হুকুম কি কেবল আমার জন্য, না সকলের জন্য? তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের যে কেউ নেক আমল করবে, এ হুকুম তারই জন্য"। [বুখারীঃ ৪৬৮৭] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে যদি কোন নদী থাকে আর দৈনিক পাঁচবার তাতে গোসল করা হয় তাহলে তার কি কোন ময়লা বাকী থাকবে?" সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ "তার কোন ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না"। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটাই হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। আল্লাহ্ এর মাধ্যমে গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। [বুখারীঃ৫২৮, মুসলিমঃ ২৭৬৩] তবে মনে রাখতে হবে যে, সৎকাজ দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা বা ছোট গুণাহ মাফ হয়। কবীরা গুণাহের জন্য তাওবা জরূরী। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, 'যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে'। [মুসলিম: ২৩৩]

(১) "এটা শব্দ দ্বারা কুরআন মজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে [কুরতুবী] অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। [বাগভী] সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে-এই কুরআন অথবা এতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। তবে এ কুরআন থেকে হেদায়াত নিতে হলে নফসকে বশ করা এবং সবর করার প্রয়োজন পড়ে। তাই পরবর্তী আয়াতে সবরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [সা'দী]

(২) বরং তারা যা আমল করে তন্মধ্যে যা উত্তম হয় তা তিনি কবুল করেন এবং সেটার প্রতিদান তিনি তাদেরকে তাদের আমলের চেয়েও উত্তমভাবে প্রদান করেন। তাই যখনই কারও মনে শিথিলতা আসে, তখনই এ সওয়াবের প্রতি দৃষ্টি দানের মাধ্যমে নিয়মিত সবর করার প্রতি উৎসাহ আসবে। [সা'দী]

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

১১৬. অতএব তোমাদের পূর্বের প্রজন্মসমূহের মধ্যে এমন প্রজ্ঞাবান কেন হয়নি, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে নিষেধ করত? অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আমরা তাদের মধ্য থেকে নাজাত দিয়েছিলাম[১]। আর যারা যুলুম করেছে তারা বিলাসিতার পেছনে পড়ে ছিল, আর তারা ছিল অপরাধী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. আর আপনার রব এরূপ নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী[২]।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারীই রয়ে গেছে[৩],

---

(১) এখানে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ 'আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবীদের যথার্থ অনুসরণ করেছে এবং তারাই আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল। [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ তারা যদি যালেম না হবে তবে তাদেরকে তিনি কেন ধ্বংস করবেন? যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।" [সূরা হূদঃ ১০১] [ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হবেই। [ইবন কাসীর] তবে যাদেরকে আপনার প্রভু রহমত করেছেন তাদের ব্যাপারটি ভিন্ন। তারা হচ্ছেন রাসূলের প্রকৃত অনুসারী। যারা রাসূলের নির্দেশ অনুসারে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে ছিল, রাসূল যা জানিয়েছেন সেটা অনুসারে তারা চলেছে। তারপর যখন তাদের কাছে

১১৯. তবে তারা নয়, যাদেরকে আপনার রব দয়া করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আর 'আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই', আপনার রবের এ কথা পূর্ণ হয়েছে[১]।

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

১২০. আর রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমরা আপনার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে আপনার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের কাছে এসেছে উপদেশ ও স্মরণ।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. আর যারা ঈমান আনে না তাদেরকে বলুন, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করতে থাক, আমরাও কাজ করছি।

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾

সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন, তখন তার অনুসরণ করেছে, তাকে সত্য বলে মেনেছে, তাকে সাহায্য করেছে। এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা লাভ করেছে। আর তারাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। [ইবন কাসীর]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের প্রভুর দরবারে বিবাদ করবে। জান্নাত বলবেঃ হে রব! আমার কাছে শুধু দূর্বল ও পতিত লোকজনই প্রবেশ করছে। আর জাহান্নাম বলবে, হে রব! আমাকে অহংকারীদের দ্বারা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে বলবেনঃ "তুমি আমার রহমত, আর জাহান্নামকে বলবেনঃ তুমি আমার আযাব। যাকে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাব। তবে তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করার দায়িত্ব আমারই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তবে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কাউকে সামান্যতম যুলুমও করবেন না। আর জাহান্নামের জন্য তিনি কিছু সৃষ্টি করবেন যা দ্বারা তিনি তা পুরা করবেন। তারপরও সে বলতে থাকবেঃ আর বেশী আছে কি? তিন বার বলবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ জাহান্নামে তাঁর পবিত্র পা রাখবেন ফলে তা পূর্ণ হয়ে যাবে। তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। এবং বলবেঃ কাত্ব, কাত্ব, কাত্ব। (অর্থাৎ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার শব্দ)। [বুখারীঃ ৭৪৪৯]

১২২. 'এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।'

وَانْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব আল্লাহ্‌রই মালিকানায় এবং তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তন করানো হবে। কাজেই আপনি তাঁর 'ইবাদাত করুন এবং তাঁর উপর নির্ভর করুন। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আপনার রব গাফিল নন[১]।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

---

(১) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনার উপর যারা মিথ্যারোপ করছে তাদের কোন কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নেই। তিনি তাদের অবস্থা, কথা সবই জানেন। সে অনুসারে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে এর প্রতিফল পূর্ণরূপেই প্রদান করবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্ আপনাকে ও আপনার দলকে দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন। [ইবন কাসীর]

১২- সূরা ইউসুফ

سُوْرَةُ يُوْسُفَ
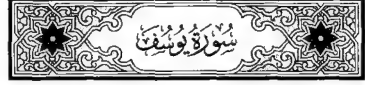
সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা ইউসুফ। কারণ পুরো সূরা জুড়ে আছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা।

আয়াত সংখ্যাঃ ১১১।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা ইউসুফ মক্কায় নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী] ইবন আব্বাস ও কাতাদা বলেন, এর চারটি আয়াত মাদানী। [কুরতুবী]

সূরার কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

এ সূরায় ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। [কুরতুবী] এ ছাড়া অন্যসব আম্বিয়া 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সুন্দর কিচ্ছা শোনানোর আব্দার করলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউসুফ নাযিল করেন। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২৩৪৫, সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৬২০৯, আল-আহাদীসুল মুখতারাঃ ১০৬৯]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে।।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١

১. আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত[1]।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٢

২. নিশ্চয় আমরা এটা নাযিল করেছি[2] কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় যাতে

---

(১) অর্থাৎ এগুলো কুরআনের আয়াত। [ইবন কাসীর] সে গ্রন্থ যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য হেদায়াত ও সঠিক পথের দিশা জানিয়ে দেয়। [বাগভী; মুয়াসসার] কাতাদা বলেন, এ কুরআন অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী। আল্লাহ্ তাঁর হেদায়াত ও পথের দিশা তাতে বর্ণনা করেছেন। [তাবারী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কুরআন নাযিল হয়েছে রামাদান মাসের চব্বিশ দিন গত হওয়ার পর'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১০৭]

তোমরা বুঝতে পার[১]।

৩. আমরা আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি[২], ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে; যদিও এর

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ

(১) অর্থাৎ আমি একে আরবী কুরআন হিসেবে নাযিল করেছি, হয়ত এতে তোমরা বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের ভাষায় এ কাহিনী নাযিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার পেছনে একটি কারণ হচ্ছে, আরবী ভাষা সবচেয়ে প্রাঞ্জল ভাষা এবং সবচেয়ে প্রশস্ত ভাষা। তাই আল্লাহ্ চাইলেন যে, তার সবচেয়ে সম্মানিত কিতাবটি সবচেয়ে মহৎ ভাষায় নাযিল করবেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাসূলের কাছে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফিরিশতার মাধ্যমে। আর তাও সংঘটিত হয়েছিল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমিতে। অনুরূপভাবে তার নাযিল হওয়াও শুরু হয়েছিল বছরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাসে। আর তা হচ্ছে রামাদান। তাই এ কুরআন সবদিক থেকেই পরিপূর্ণ। তাই এরপরই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, "আমরা আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে এ কুরআন পাঠিয়ে" অর্থাৎ এ কুরআন আপনার কাছে ওহী করার কারণেই তা বলা সম্ভব হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর অনেকদিন থেকে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমাদেরকে কোন কিছ্ছা শোনাতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন এবং ইউসুফ আলাইহিসসালামের কাহিনী শোনান।" [ইতহাফ আল খিয়ারাহঃ ১/২৩৮, ১৬২ মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৪৫, ইবনে হিব্বান -আলইহসান- ৬২০৯, দিয়া আল মাকদেসীঃ আল-মুখতারাহঃ১০৬৯]

এ কাহিনীকে উত্তম কাহিনী বলার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। কারও কারও মতে, কারণ এতে রয়েছে শিক্ষা, উপদেশ, হিকমত বা প্রজ্ঞা যা অন্য কোন কাহিনীতে নেই। কারও কারও মতে, কারণ এতে রয়েছে উত্তম কথোপকথন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর তার ভাইদের অত্যাচারের বিপরীতে সবর ও তাদেরকে ক্ষমার বর্ণনা। কারও কারও মতে, কারণ এতে রয়েছে নবীদের কথা, সৎলোকদের কথা, ফিরিশতাদের কথা, শয়তানের কথা, জিন, মানব, জন্তু জানোয়ার, পাখি, রাজা-বাদশাদের চরিত, ব্যবসায়ী, আলেম, জাহেল, পুরুষ, মহিলাদের কথা। মহিলাদের বাহানা ও তাদের ষড়যন্ত্রের কথা। [ফাতহুল কাদীর]

لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ۝

আগে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত(১)।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِيْنَ۝

৪. স্মরণ করুন, যখন 'ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি এগার নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে, দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজ্‌দাবনত অবস্থায়(২)।'

---

(১) অর্থাৎ আমি এ কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি নাযিল করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ থেকে রূহ ওহী করেছি; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমরা এটাকে করেছি আলো যা দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হেদায়াত দান করি" [সূরা আশ-শূরা:৫২] [সা'দী] এতে নবুওয়াতের দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যম আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আল্লামা ইবন কাসীর এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনির্দেশ করেছেন। তা হচ্ছে, যেহেতু এ কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেহেতু এ কিতাব নাযিল হওয়ার পর অন্য কোন কিতাবের প্রয়োজন নেই। কারণ, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন এক কিতাবী লোক থেকে একটি প্রাচীন গ্রন্থ পেয়ে তা নিয়ে এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমরা কি পেরেশান হয়ে গেছ? পরিণাম বিবেচনা না করে যা-তা করে বেড়াবে? যত্র-তত্র ঢুকে যাবে? যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, অবশ্যই আমি এটাকে শুভ্র,স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হিসেবে নিয়ে এসেছি। তোমরা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো না, ফলে তারা তোমাদেরকে কোন হক কথা জানাবে আর তোমরা মিথ্যা মনে করবে, আবার কোন বাতিল কথা জানাবে আর তোমরা সেটাকে সত্য মনে করবে। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মূসা জীবিত থাকতেন তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না।' [ইবন আবী আসেমঃ আস-সুন্নাহ ১/২৭]

(২) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কারীম ইবনে কারীম ইবনে কারীম ইবনে কারীম হল ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিমুস্ সালাম। অর্থাৎ চার পুরুষ

৫. তিনি বললেন, 'হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলো না[১]; বললে তারা তোমার

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ

ধরে সম্মানিত হচ্ছেন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম।' [বুখারীঃ ৩৩৯০, ৪৬৮৮] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে সম্মানিত কে? তিনি বললেনঃ তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হল যে বেশী তাকওয়ার অধিকারী। লোকেরা বললঃ আমরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করছি না, তখন তিনি বললেনঃ তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত হলেন আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ। তার পিতা একজন নবী ছিলেন, আর তার দাদাও একজন নবী, যেমনিভাবে তার পরদাদাও নবী। [বুখারী ৩৩৫০, মুসলিমঃ ২৩৭৮]

ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তার পিতাকে বললেনঃ পিতঃ! আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরো দেখেছি যে, তারা আমাকে সিজ্‌দা করছে। এটা ছিল ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এগারটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা। তিনি আরো বলেনঃ নবীদের স্বপ্ন ছিল ওহীর নামান্তর। [তাবারী; ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, 'নেক স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ স্বপ্ন দেখবে তখন সে যেন তা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চায় এবং তার বাম দিকে থুথু ফেলে। ফলে সেটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' [বুখারী: ৬৯৮৬]

(১) আয়াতে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাংখী ও সহানুভূতিশীল নয়- এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়- এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা করতে নেই। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'স্বপ্ন পাখির পায়ের সাথে থাকে যতক্ষণ না সেটার ব্যাখ্যা করা হয়। যখনই সেটার ব্যাখ্যা করা হয়, তখনই সেটা পড়ে যায়। তিনি আরও বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তিনি আরও বলেছেন, স্বপ্নকে যেন কোন বন্ধু বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও কাছে বিবৃত করা না হয়।' [ইবন মাজাহ: ৩৯১৪; মুসনাদ:৪/১০] অন্য হাদীসে এসেছে, 'তোমাদের কেউ যখন কোন পছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন যাকে মহব্বত করে তার নিকট বলে। আর যখন কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার অন্য পার্শ্বে শয়ন করে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে, আল্লাহ্‌র কাছে এর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চায়, কাউকে এ সম্পর্কে কিছু না বলে, ফলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' [মুসলিম:২২৬২] অন্যান্য হাদীসের

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে[১]। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু[২]।'

বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল -আইনগত হারাম নয়। সহীহ্ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 'আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারী 'যুলফিকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরো কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি।' এর ব্যাখ্যা ছিল হামযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-সহ অনেক মুসলিমের শাহাদাত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৭১]

(১) এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, মুসলিমকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন মন্দ অভ্যাস কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত কিংবা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ আয়াতে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রতি শত্রুতার আশংকা রয়েছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ্ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়। নবীগণের সব স্বপ্ন ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ মুসলিমদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারো জন্য প্রমাণ হয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যখন সময় ঘনিয়ে আসবে (কেয়ামত নিকটবর্তী হবে) তখন মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হবে। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশতম অংশ, আর যা নবুওয়াতের এ অংশের স্বপ্ন, তা মিথ্যা হবে না। বলা হয়ে থাকে, স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে মনের ভাষ্য, আরেক প্রকার হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি জাগ্রত করে দেয়া। আর তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে- আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বিবৃত না করে; বরং উঠে এবং সালাত আদায় করে।' [বুখারীঃ ৭০১৭]
অপর হাদীসে এসেছে, "যতক্ষন পর্যন্ত স্বপ্নের তা'বীর করা না হয় ততক্ষণ তা উড়ন্ত অবস্থায় থাকে, তারপর যখনি তা'বীর করা হয় তখনি তা পতিত হয় বা ঘটে যায়"। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১০, আবু দাউদঃ ৫০২০, তিরমিযীঃ ২২৭৮, ইবনে মাজাহঃ ৩৯১৪]
এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ-এর অর্থ কি? এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম

৬. আর এভাবে আপনার রব আপনাকে মনোনীত করবেন এবং আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা(১) শিক্ষা দেবেন(২) এবং

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ

ছ'মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নুবয়তের ৪৬তম অংশ। [কুরতুবী] এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ, কিন্তু নবুওয়াত নয়। নবুওয়াত আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'ভবিষ্যতে 'মুবাশ্‌শিরাত' ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশ বাকী নেই। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ 'মুবাশ্‌শিরাত' বলতে কি বুঝায়? উত্তর হলঃ সত্য স্বপ্ন। [বুখারীঃ ৬৯৯০] এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্‌শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়। তবে সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এটুকু বিষয়ই কারো সৎ, দ্বীনী এমনকি মুসলিম হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও নেক লোকদের স্বপ্ন সাধারণতঃ সত্য হবে -এটাই আল্লাহ্‌র সাধারণ রীতি। ফাসেক ও পাপাচারীদের সাধারণতঃ মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরণের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব। মোটকথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলিমদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়।

(১) উপরে বর্ণিত অর্থটি মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরকারক বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ সত্য কথার ব্যাখ্যা। সে হিসেবে আসমানী কিতাবসমূহের সঠিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। [সা'দী]

(২) অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, আয়াতটি ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর পূর্ব কথার পরিপূরক বাক্য অর্থাৎ ইয়া'কূব আলাইহিস সালাম নিজেই বলছেন, হে ইউসুফ! তুমি তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বলো না। কেননা, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। যেভাবে তুমি স্বপ্নে তোমাকে সম্মানিত দেখেছ, এভাবে আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করবেন নবী হিসেবে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে। অনুরূপভাবে তোমার উপর তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করবেন। [বাগভী; ইবন কাসীর] অথবা এ আয়াতটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি প্রদত্ত সুসংবাদ অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে কতিপয় নেয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম, আল্লাহ্ স্বীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা

يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

আপনার প্রতি ও ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন[১], যেভাবে তিনি এটা আগে পূর্ণ করেছিলেন আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর[২]। নিশ্চয় আপনার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[৩]।

দ্বিতীয় রুকূ'

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ ⑦

৭. অবশ্যই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের[৪] ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক

সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। [কুরতুবী] তবে প্রথম তাফসীরটি বেশী যুক্তিযুক্ত। এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) তৃতীয় ওয়াদা ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুওয়াত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার ভাইদেরকে আপনার প্রতি মুখাপেক্ষী বানাব। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন, আপনাকে প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার করব। [কুরতুবী] তবে আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে নবুওয়াতই বুঝানো হয়েছে।

(২) অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নবুওয়াতের নেয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এখানে নেয়ামত বলতে অন্যান্য নেয়ামতের সাথে সাথে নবুওয়াত ও রেসালাতই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। তিনি ভাল করেই জানেন কার কাছে ওহী পাঠাবেন, কাকে রাসূল বানাবেন। কে নবুওয়াত ও রিসালাতের অধিক উপযুক্ত। [ইবন কাসীর]

(৪) আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফসহ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী-ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনইয়ামীন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। [বাগভী; কুরতুবী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৪৫৫]

নিদর্শন রয়েছে[১]।

৮. স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, 'আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ এবং তার ভাই তো আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে[২]।

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

---

(১) এ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. এতে রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা। দুই. আশ্চর্যজনক কথাসমূহ। তিন. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ। কারণ, তিনি এ ঘটনা জানতেন না, যদি তার কাছে ওহী না আসে তো তিনি তা কিভাবে জানালেন? চার. এর অর্থ হচ্ছে, যারা প্রশ্ন করে জানতে চায় এবং যারা জানতে চায় না তাদের সবার জন্যই রয়েছে নিদর্শন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ কাহিনীর মধ্যে অনেক প্রকার শিক্ষা রয়েছে। যেমন, এতে রয়েছে ভাইদের হিংসা, তাদের হিংসার পরিণতি, ইউসুফের স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়ন, কুপ্রবৃত্তি থেকে, দাসত্ব অবস্থা, বন্দিত্ব অবস্থা ইত্যাদিতে ইউসুফের সবর, বাদশাহী প্রাপ্তি, ইয়া'কূবের পেরেশানী, তার ধৈর্য। শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত অবস্থায় উপনীত হওয়া ইত্যাদি সবই এখানে নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। [বাগভী] তাই এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

(২) এখানে ضلال বলে পথভ্রষ্টতা বুঝানো হয়নি। বরং কোন বিষয়ের আসল জ্ঞানের অভাব বুঝানো উদ্দেশ্য। কুরআনের অন্যত্রও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভ্রাতারা তার পিতাকে এ সূরার অন্যত্র বলেছিল, "আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো পুরাতন জ্ঞানহীনতাতেই আছেন।" [৯৫] তাছাড়া অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ বলেছেন যে, "আর আপনাকে তিনি (আল্লাহ্) পেয়েছেন (এ বিষয়ে) জ্ঞান-হীন, তারপর তিনি আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।" [সূরা আদ-দোহা: ৭] এখানে অর্থ হবে, যে সমস্ত জ্ঞান ওহী ব্যতীত পাওয়া যায় না সেগুলোতে আপনি জ্ঞানী ছিলেন না। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে এ কুরআন ওহী করার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতি দিক-নির্দেশ করেছেন এবং আপনাকে তা জানিয়েছেন। সে হিসেবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এ নয় যে, তারা ইয়া'কূব আলাইহিস সালামকে দ্বীনীভাবে ভ্রষ্ট বলছেন, কারণ এটা বললে কাফের হয়ে যাবে। বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো, তাদের পিতা তাদের ধারণা মতে বাস্তব অবস্থা বুঝতে অক্ষম,

৯. ‘তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা কোন স্থানে তাকে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে[১]।’

اِقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝

প্রতিটি বস্তুকে তার সঠিক স্থানে স্থান দেন নি। নতুবা কিভাবে তিনি দশজনকে ভাল না বেসে দু'জনকে ভালবাসলেন? দশজন তো দু'জনের চেয়ে বেশী উপকারী ও তার কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বেশী দক্ষ। [আদওয়াউল বায়ান]

এ আয়াত থেকে ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকূব ‘আলাইহিস্ সালাম-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করলঃ আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বিনইয়ামীনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। আমাদের পিতা আসলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নন। তার উচিত আমাদেরকে প্রাধান্য দেয়া। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূর দেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

(১) এ আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বললঃ তাকে কোন অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক- যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তাওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের ﴿وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ﴾ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। [কুরতুবী] অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা-মাতার কাছে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। কাউকে আর প্রাধান্য দেয়ার বিষয় থাকবে না। [কুরতুবী]

ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা যে নবী ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবীরা গোনাহ্ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা এবং তাকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও অসৎ চক্রান্ত ইত্যাদি। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾

১০. তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না এবং যদি কিছু করতেই চাও তবে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে(১)।'

قَالُوا يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ ﴿١١﴾

১১. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আপনার কি হলো যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না, অথচ আমরা তো তার শুভাকাংখী?

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿١٢﴾

১২. 'আপনি আগামী কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলাধুলা করবে(২)। আর

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বললঃ ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কুপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কুপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূরদেশে যেতে হবে না। কোন কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে। কারো কারো মতে এ অভিমত প্রকাশকারী সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ছোট ভাই বিনইয়ামীনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিলঃ আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না। [তাবারী; কুরতুবী]

(২) এ আয়াতে ইয়াকুব 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে আনন্দ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, তাদের আনন্দ-ভ্রমণ ও খেলাধুলা শরী'আতের সীমার মধ্যে ছিল। [কুরতুবী] আর খেলা-ধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়, বরং সহীহ্ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরী'আতের সীমা লঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরী'আতের বিধান লজ্জিত হতে পারে এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়।

আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হব ।'

১৩. তিনি বললেন, 'এটা আমাকে অবশ্যই কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে ।'

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

১৪. তারা বলল, 'আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ।'

قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

১৫. অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, আর এ অবস্থায় আমরা তাকে জানিয়ে দিলাম, 'তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা অবশ্যই বলে দেবে'; অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারবে না[১] ।

فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

---

(১) এ আয়াতের বিভিন্ন প্রকার অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

১) ইবনে আব্বাস বলেন, ভাইয়েরা যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌছল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে । তারা তখন তোমার অবস্থানের ব্যাপারটি সম্পর্কে কিছু কল্পনাই করতে পারবে না । [ইবন কাসীর]

২) কাতাদাহ্ বলেনঃ এ আয়াতের অর্থ- আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে কুপের মধ্যে ওহী প্রেরণ করে জানালেন যে, আপনি অচিরেই তাদেরকে এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করবেন । অথচ ইউসুফের ভাইয়েরা সে ওহী সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলনা । [ইবন কাসীর]

৩) ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর । (এক) কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তার সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন

وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

১৬. আর তারা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।

قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম[১] এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হই।'

وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৮. আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। তিনি বললেন, 'না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে।

করেছিল। (দুই) কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভবিষ্যত ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরো বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদেরকে তিরস্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

(১) ইবনুল আরাবী 'আহ্কামুল কুরআন গ্রন্থে বলেনঃ পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরী'আতসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাছাড়া ঘোড়দৌড়ও প্রমাণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা করেছেন। [দেখুন, বুখারী: ২৮৭৯; মুসলিম: ১৮৭০] সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। [দেখুন, মুসলিম: ১৮০৭; মুসনাদে আহমাদ: ৪/৫২] উল্লেখিত আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া সাধারণ দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হার-জিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা কুরআনুল কারীমে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। [আহকামুল কুরআন; অনুরূপ দেখুন, কুরতুবী]

কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল(১)।'

১৯. আর এক যাত্রীদল আসল, অতঃপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠালে সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, 'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর!(২)' এবং তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল(৩)। আর তারা

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَى هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

---

(১) অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ঠিকই বুঝলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্য্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি।

(২) ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। কোন কোন তাফসীরে বলা হয়েছেঃ এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। [কুরতুবী] তারা পানি সংগ্রহকারীকে কুপে প্রেরণ করল। লোকটি এই কুপে পৌঁছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যত মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলী তার মাহাত্ম্যের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কুপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে লোকটি সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলঃ ﴿يَا بُشْرَى هَٰذَا غُلَامٌ﴾ -আরে, আনন্দের কথা- এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আমি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাকে দান করেছেন।' [মুসলিমঃ ১৬২]

(৩) অর্থাৎ তারা তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল; কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে

যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত[১]।

২০. আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে[২] এবং তারা ছিল তার

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল। [তাবারী; কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফেলা কি করবে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেননি; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন। এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটার প্রতি ইঙ্গিত করলেন যে, আপনার কাওম আপনার উপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে তা আমার অজানা নয়, আমি এটার প্রতিকার করতে পারি। কিন্তু আমি তাদেরকে ছাড় দেই। তারপর উত্তম পরিণাম আপনার জন্যই হবে। আর তাদের বিচার আপনিই করবেন। যেমনটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর তার ভাইদের প্রাধান্য ও বিচারের ভার পড়েছিল। [ইবন কাসীর]

(২) আরবী ভাষায় شَرَاء শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফেরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল। আয়াতে বর্ণিত بَخْسٍ এর দু'টি অর্থ হতে পারেঃ (এক) খুব কম মূল্যে; [তাবারী] কারণ তারা বাস্তবিকই তাকে খুব কম মূল্যে বিক্রয় করেছিল। (দুই) অন্যায় বা নিকৃষ্ট বিক্রয় সম্পন্ন করল; কারণ তারা স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করেছিল। স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করা হারাম। [কুরতুবী] ইমাম কুরতুবী আরও বলেনঃ আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেন-দেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের ঊর্ধ্বে নয়, এমন লেন-দেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই دَرَاهِمَ শব্দের সাথে مَعْدُودَةٍ (গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের

ব্যাপারে অনাগ্রহী[১]।

তৃতীয় রুকূ'

২১. আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, 'এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি[২]।' আর এভাবেই

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۗ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۡ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۗ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

কম ছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিল। [কুরতুবী]

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে- (এক) ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফ-এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিল, তাই তারা এত কমদামে বিক্রয় করে দিয়েছিল। [ইবন কাসীর] ইউসুফকে কম মূল্যে বিক্রয় করার কারণ আবার দু'টি হতে পারে। প্রথমতঃ এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাদের আসল লক্ষ্য তার দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রয় করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশংকা করছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তাফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছুদূর পর্যন্ত কাফেলার পিছনে পিছনে গেল এবং তাদেরকে বললঃ দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিও না; বরং বেঁধে রাখ। [কুরতুবী; সা'দী] (দুই) এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, কাফেলার লোকেরা ইউসুফের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিচ্ছিল না, কেননা, কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর মূল্য আর কতই হতে পারে? [ফাতহুল কাদীর] কাফেলা বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মিশর পর্যন্ত পৌঁছে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বিক্রি করে দিল।

(২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ ইউসুফের বসবাসের সুন্দর বন্দোবস্ত কর। ইবনে কাসীর বলেনঃ যে ব্যক্তি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম- আযীযে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে

আমরা ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম[১]; এবং যাতে আমরা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই[২]। আর আল্লাহ্ তাঁর কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৩]।

স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়- ঐ কন্যা, যে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে তার পিতাকে বলেছিলঃ "পিতঃ, তাকে কর্মচারী রেখে দিন। কেননা, উত্তম কর্মচারী ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।" [আল-কাসাসঃ ২৬] তৃতীয়- আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, যিনি ফারূককে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন। [তাবারী; ইবনে কাসীর]

(১) অর্থাৎ যেভাবে ইউসুফকে কুপ থেকে বের করে আযীযে মিসর পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম তেমনিভাবে তাকে আমি যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ﴿وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ﴾ -এখানে শুরুতে واو কে عطف এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ্য মেনে নেয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তিনি এ সময়টুকুতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। আহকাম বিষয়ক ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ক সব জ্ঞান অর্জন করার সুযোগই তিনি লাভ করতে পারবেন। সুতরাং এভাবে তাকে আমরা বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। [সা'দী] অথবা এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ হিসেবে এসেছে অর্থাৎ তাকে আমি যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি, যার ভূমিকা হিসাবে আমি তাকে স্বপ্নের তা'বীর শিক্ষা দিয়েছি। [বাগভী] বস্তুতঃ তিনি এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। অথবা ইয়া'কূব আলাইহিস সালামের পূর্ব ঘোষিত বাণী, 'আল্লাহ্ আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন' এ কথাটির সত্যয়ণ হিসেবে আমি আপনাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। [ইবন কাসীর] কেউই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে কোন কাজ হাসিল করতে পারে না। কোন কিছু করতে হলে তিনি তো শুধু বলেন 'হও' আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়। [কুরতুবী] এর উদাহরণ হিসেবে কেউ কেউ বলেন, ইয়া'কূব আলাইহিস সালাম চেয়েছিলেন যেন ইউসুফের স্বপ্ন তার ভাইয়েরা না জানে, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, তারা জানুক, সুতরাং তাই হয়েছে। ইউসুফের ভাইয়েরা চেয়েছিল ইউসুফকে হত্যা করতে, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, সে বেঁচে থাকবে এবং কর্ণধার হবে, বাস্তবে হয়েছেও তাই। ইউসুফের ভাইয়েরা চেয়েছিল ইয়া'কূবের মন থেকে ইউসুফের কথা ঘুচে যাক কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, তা জাগরুক থাকুক।

২২. আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমরা তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম(১)। আর এভাবেই আমরা ইহসানকারীদেরকে পুরস্কৃত করি(২)।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

সুতরাং ইয়া'কূব সর্বক্ষণ ইউসুফের কথাই বলেছিল। তারা চাইলো যে, তাদের পিতাকে চোখের পানি দিয়ে ধোঁকা দিবে, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, ইয়া'কূব তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না, ফলে তাই হলো। আযীয পত্নী চেয়েছিল ইউসুফকে দোষারোপ করতে কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, তিনি দোষমুক্ত ঘোষিত হবেন, ফলে আযীযের মুখ থেকে আযীয পত্নীই দোষী সাব্যস্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ পেলেন। ইউসুফ চাইলেন যে, শরাব পরিবেশনকারী তার কথা বাদশাহকে বলে তাকে বিমুক্ত করে দিক, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন যে, শরাব পরিবেশনকারী তা ভুলে যাক, ফলে তাই হলো। এসবই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছায় প্রবল। [কুরতুবী]

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রবল। তিনি নিজে ইউসুফের কর্মকাণ্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তার কোন ব্যাপার অন্যের উপর ন্যস্ত করেন নি। যাতে করে তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র সফল হতে না পারে। [বাগভী]

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বোঝে না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অধিকাংশ বলে সকল মানুষকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, কেউই গায়েব জানে না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অধিকাংশই উদ্দেশ্য, কারণ, কোন কোন নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন কাজের হিকমত সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত করেন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অধিকাংশ মানুষ বলে মুশরিক এবং যারা তাকদীরের উপর ঈমান রাখে না তাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি দান করলাম। 'শক্তি ও যৌবন' কোন বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আর ইলম বা বুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুওয়াত দান করা। [ইবন কাসীর] মূলতঃ কুরআনের ভাষায় সাধারণভাবে এমন শব্দের মানে হয় "নবুওয়াত দান করা"। ফায়সালা করার শক্তিকে কুরআনের মূল ভাষ্যে বলা হয়েছে "হুকুম"। এ হুকুম অর্থ কর্তৃত্বও হয়। [কুরতুবী]

(২) আমি ইহসানকারীদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সদাচরণ, আল্লাহ্ ভীতি ও সৎকর্মের পরিণতি। এটা শুধু

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল, আর বলল, 'আস[১]।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি[২], নিশ্চয় তিনি আমার মনিব;

তারই বৈশিষ্ট নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে। সুতরাং যেভাবে আমি ইউসুফকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পার করে সফলতা দিয়েছি তেমনি আপনাকেও হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার কাওমের মুশরিকদের শত্রুতা থেকে নাজাত দেব এবং আপনাকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করব। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম থাকতেন, সে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তার সাথে কু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাকে বললঃ শীঘ্রই এসে যাও, তোমাকে বলছি। ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ শব্দের এক অর্থ, আমার কাছে এস, তোমার কাজ সম্পাদনের জন্য। দ্বিতীয় অর্থ, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]
প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আযীযে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এস্থলে কুরআন 'আযীয-পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' -এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরো অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে- তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। [ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন: ২৯৭-৩০০] আর এজন্যই ঐ সমস্ত লোকদেরকে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবে বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যারা সুন্দরী-ধনী মহিলার কুপ্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। এবং তাঁকে ভয় করে বলে ঘোষণা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাত শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আরশের নীচে ছায়া দেবেন। তন্মধ্যে ঐ ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন, যাকে কোন ধনাঢ্য-পদস্থ-সুন্দরী মহিলা খারাপ কর্মকাণ্ডের আহ্বান জানালে সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে ঘোষণা দিয়ে তা হতে দূরে থাকে। [বুখারীঃ ৬৬০]

(২) এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন নবীসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বস্তুতঃ গোনাহ্ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন হল আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া।

তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না[১]।'

২৪. আর সে মহিলা তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং তিনিও তার প্রতি আসক্ত[২] হয়ে পড়তেন যদি

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

(১) তিনি নবীসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং সেই মহিলাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেনঃ ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আযীযে-মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তার ইয্‌যতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনো কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। [কুরতুবী] এভাবে তিনি যেন স্বয়ং সেই মহিলাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরো বেশী স্বীকার করা দরকার। এ ব্যাখ্যা অনুসারে সমস্যা হলো, এখানে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আযীযে-মিসরকে স্বীয় 'রব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত এর কারণ, এখানে ربي বলে سيدي বা আমার মনিব বোঝানো হয়েছে। তখন সাধারণ নিয়মানুসারে তা ব্যবহার করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর দ্বারা বাহ্যিক নেয়ামতের মালিক বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ মূলতঃ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তখন দাস হিসেবেই আযীযে-মিসরের ঘরে অবস্থান করছিলেন। সে হিসেবে তিনি আযীযের স্ত্রীকে এ কথার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন যে, আমার উপর আমার মনিবের অনেক নেয়ামত রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি আমাকে লালন করছেন, আমার পক্ষে আমার মনিবের খেয়ানত করা সম্ভব নয়। আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে, এখানে إِنَّهُ শব্দের সর্বনামটির দ্বারা আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌কেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ যুলুম। এরূপ যুলুমকারী কখনো সফল হয় না। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, উল্লেখিত মহিলাটি অর্থাৎ আযীয-পত্নী তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনেও মানবিক স্বভাববশতঃ কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۝

না তিনি তার রবের নিদর্শন দেখতে পেতেন[১]। এভাবেই (তা হয়েছিল), যাতে আমরা তার থেকে মন্দকাজ ও

এ আয়াতে هَمَّ শব্দটি (মনে উদিত হওয়ার অর্থে) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম ও আযীয পত্নী উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেবলমাত্র কোন খারাপ কাজের কথা মনে উদিত হলেই গোনাহ্ হয় না। [ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন: ২৯৮] মোটকথা, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম থেকে এমন কিছু হয়নি যা গোনাহ্ বলে বিবেচিত হতে পারে। [ইবন তাইমিয়্যা: মাজমু' ফাতাওয়া] বরং আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর নবী ইউসুফকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেনঃ আমার বান্দা যখন কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, তখনি তা লিখে ফেলো না, যতক্ষণ সে তা করে না বসে। তারপর যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহ্ই লিপিবদ্ধ কর। আর যদি কোন সৎকাজের ইচ্ছা করে কিন্তু তা করল না, তবুও তার জন্য একটি নেকী লিখে দাও। তারপর যখন সে তা সম্পাদন করে তখন তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ বর্ধিত করে লিখে দাও।' [বুখারীঃ ৭৫০১, মুসলিমঃ ১২৮] মোটকথা এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এর বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার মর্যাদা আরো বেড়ে গেছে। [ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন:২৯৮] কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِۦ﴾ এ অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহ্‌র প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক, কিন্তু কোন কোন তাফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। [তাবারী; ইবন কাসীর; ইবন তাইমিয়্যা, মাজমু' ফাতাওয়া ১০/১০১, ২৯৬-২৯৭, ৭৪০]

(১) স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কুরআনুল কারীম তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর সেসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ কুরআনুল কারীম যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম এমন কিছু দেখেছেন, যদ্দরুন তার মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল তা নিশ্চিতরূপে নির্দিষ্ট করা যায় না।

অশ্লীলতা দূর করে দেই[১]। তিনি তো ছিলেন আমাদের মুখলিস বা বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

২৫. আর তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, আর তারা দু'জন স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে?'

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৬. ইউসুফ বললেন, 'সে-ই আমাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছে।' আর স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. আর তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া

فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ

(১) অর্থাৎ তার রবের প্রমাণ দেখা ও গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া আমার দেয়া সুযোগ ও পথ প্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কেননা, আমরা নিজের এ নির্বাচিত বান্দাটি থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করতে চাচ্ছিলাম। যেভাবে আমরা তাকে এ অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম তেমনি আমরা তাকে এর পরেও অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখব। [ইবন কাসীর]

كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

হয়েছে তখন সে বলল, 'নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ[১]।'

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. 'হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; তুমিই তো অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত[২]।'

চতুর্থ রুকূ'

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আর নগরের কিছু সংখ্যক নারী বলল, 'আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎকাজ কামনা করছে, প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যেই নিপতিত দেখছি।'

---

(১) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আযীযে-মিসর যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল এবং বুঝল যে, তার পত্নীরই দোষ ও ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম পবিত্র। তদানুসারে সে তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললঃ ﴿إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ﴾ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমিই নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যতঃ কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও আল্লাহ্‌ভীতির অভাববশতঃ তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে। আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, নারীদের ষড়যন্ত্র শয়তানের ষড়যন্ত্রের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, নারীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র তো ভীষণ।" পক্ষান্তরে শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল" [সূরা আন-নিসা: ৭৬] [আদওয়াউল বায়ান] তবে এখানে সব নারী বোঝানো হয়নি, বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরণের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে।

(২) আযীয-মিসর তার স্ত্রীর ভুল বর্ণনা করার পর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললঃ ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾ অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইয্‌যতি না হয়। অতঃপর তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললঃ ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ অর্থাৎ ভুল তোমারই। তুমি নিজে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

৩১. অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল[১] এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল। আর তাদের সবাইকে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলল, 'তাদের সামনে বের হও।' অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল[২] ও নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং তারা বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা[৩]।'

---

(১) অর্থাৎ আযীয-পত্নী মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল। এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে আযীয-পত্নী مكر অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ, বাহ্যতঃ তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে চক্রান্ত বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে সমস্ত মহিলারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্যের কথা শুনতে পেয়ে তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। তখন তারা কানঘুষা শুরু করে দিল যাতে তাকে দেখতে সমর্থ হয়। এটাই হচ্ছে তাদের চক্রান্ত। [ইবন কাসীর]

(২) মূল শব্দ যা ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ দাঁড়ায়, "তারা তাকে খুব বড় করল"। কিন্তু কিসে তাকে বড় করল? মূলত, তার সৌন্দর্যই তাকে তাদের দৃষ্টিতে বৃহৎ আকারে প্রতিভাত হলো, এজন্য আয়াতের অর্থ করা হয়েছে, তার সৌন্দর্যে তারা অভিভূত হল। এ অর্থের সপক্ষে আয়াতের পরবর্তী বাক্য "এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা"। কারণ ফেরেশ্‌তাদের সৌন্দর্য সর্বজনস্বীকৃত। অন্য অর্থ হচ্ছে, তার মর্যাদা তাদের কাছে অনেক গুণ বেড়ে গেল। তারা তাকে উচ্চ মর্যাদাশীল মনে করল। [মুয়াসসার]

(৩) এ আয়াত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, তাদের মধ্যেও ফিরিশ্‌তার উপর বিশ্বাস ছিল। অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে আরও জানতে পারি যে, ইউসুফ আলাইহিসসালাম অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন। ইসরা ও মিরাজের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসুফ আলাইহিসসালাম সম্পর্কে বলেনঃ "তারপর আমি আচানকভাবে ইউসুফকে দেখতে পেলাম। তাকে সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই দেয়া হয়েছে।" [মুসলিমঃ ১৬২]

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. সে বলল, 'এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তো তার থেকে অসৎকাজ কামনা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে; আর আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে অবশ্যই অবশ্যই কারারুদ্ধ হবে এবং অবশ্যই সে হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে[১]।'

---

(১) আযীয-পত্নী বললঃ দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ আযীয-পত্নী এখানে "কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে" একথা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সে বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে তার আরো একটি মহা সৌন্দর্য রয়েছে, আর তা হল, আত্মিক পবিত্রতা। যা তোমরা দেখতে পাওনি। [ইবন কাসীর]

আযীয-পত্নী যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে বলতে লাগলঃ তুমি আযীয-পত্নীর কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়। পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন, يَدْعُونَنِي এবং كَيْدَهُنَّ এগুলোতে বহুবচনে কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীস থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, এ আমন্ত্রিত মহিলাগুলো ইউসুফ আলাইহিসসালামকে তার সঙ্কল্প থেকে টলাতে চেষ্টা করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু শয্যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কয়েকজন এ মন্তব্য করল যে, আবু বকর নরমদিল মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্না চেপে রাখতে পারবেন না। সুতরাং উমর বা অন্য কাউকে সালাতের ইমামতির জন্য নির্দেশ দেয়া হোক। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার নির্দেশ দিলেন আর তিনবারই তাকে একথা জানানো হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ "তোমরা তো দেখছি ইউসুফের সেসব সঙ্গীনিদের মতই। আবুবকরকে বল যেন মানুষদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করে।" [বুখারীঃ ৬৪৬, মুসলিমঃ ৪২০]

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. ইউসুফ বললেন, 'হে আমার রব! এ নারীরা আমাকে যার দিকে ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশী প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব(১)।'

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং তার রব তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. তারপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে অবশ্যই কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।

পঞ্চম রুকূ'

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর তার সাথে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম, আমি মদের জন্য আংগুর নিংড়াচ্ছি', এবং অন্যজন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে

---

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম দেখলেন যে, আযীয-পত্নীর চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরয করলেনঃ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবতঃ আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। এ থেকে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই গোনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না। আরো জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহ্‌র কাজ মূর্খতাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্‌র কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং মূর্খতা ও মূর্খ ব্যক্তি নিন্দনীয়। [কুরতুবী]

দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এটার তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা তো আপনাকে মুহসিনদের অর্ন্তভুক্ত দেখছি[১]।'

৩৭. ইউসুফ বললেন, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার আগে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব[২]। আমি যা তোমাদেরকে বলব

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ

(১) কারাগারে ইউসুফকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হতো এ থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। ওপরে যেসব ঘটনার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সামনে রাখলে ব্যাপারটা আর মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, এ কয়েদী দুজন ইউসুফের কাছেই-বা এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলো কেন এবং তাঁকে "আমরা আপনাকে মুহসিন হিসেবেই পেয়েছি" বলে সম্মান করলো কেন। জেলখানার ভেতরে বাইরে সবাই জানতো, এ ব্যক্তি কোন অপরাধী নয়, বরং একজন অত্যন্ত সদাচারী পুরুষ। কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি নিজের আল্লাহভীতি ও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি রাতে ইবাদত করতেন, খুব কান্নাকাটি করতেন। তার কারণে কারাগারেও মানুষের মধ্যে পবিত্রতা ফিরে আসল। আজ সারাদেশে তাঁর মতো লোক একজনও নেই। এ কারণে শুধু কয়েদীরাই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না বরং কয়েদখানার পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মচারীরাও তাঁর ভক্তদলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে উঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক-নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আ ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরো দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহ্কে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। তাদের বিরুদ্ধে বাদশাহ্র খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগ ছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম

تَا، আমার রব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলব। নিশ্চয় আমি বর্জন করেছি সে সম্প্রদায়ের

بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

কারাগারে প্রবেশ করে নবীসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। তার এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তার ভক্ত হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে জানি। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বললঃ আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেনঃ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী]
মোটকথা, তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত, সে বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয় জন অর্থাৎ বাবুর্চি বললঃ আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল। এখানে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি নবীসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যে, যা কিছুই তোমরা স্বপ্নে দেখ না কেন আমি তার তা'বীর জানি। তোমাদের কাছে প্রাত্যহিক যে খাবার আসে তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্বপ্নের তা'বীর বলে দেব। [ইবন কাসীর; সা'দী]
কোন কোন মুফাস্সির এর অর্থ করেছেন ভিন্ন রকম। তারা বলেনঃ এর অর্থ আমি তোমাদের যাবতীয় স্বপ্নের তা'বীর বলে দিতে পারি। তারপর তিনি একথার প্রতি তাদের আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। তারা বলল, বলে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য এরকম এরকম খাবার আসবে। বাস্তবেও তাই ঘটে। আর এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে গায়েবী বিষয় জানিয়ে দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

ধর্মমত যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না। আর যারা আখিরাতের সাথে কুফরীকারী'।

৩৮. 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক এবং ইয়া'কূবের মিল্লাত অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের জন্য সংগত নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

৩৯. 'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপ্রতাপশালী এক আল্লাহ্?

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

৪০. 'তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের 'ইবাদাত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি। বিধান দেয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে, এটাই শাশ্বত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না[১]।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَاۗءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(১) এখানে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষণটি হচ্ছে তার প্রাণ। এটি কুরআনেরও তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম ভাষণগুলোর অন্যতম। ইউসুফের নিজের একটি নবুওয়াত মিশন ছিল এবং তার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তিনি কারাগারেই শুরু করে দিয়েছিলেন। এ প্রথম তিনি লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। প্রথমেই তিনি বলেন যে, হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব উত্তম, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? যিনি তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্য দিয়ে সবকিছুর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন? তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, যেগুলোর তোমরা ইবাদাত করো এবং যাদেরকে তোমরা ইলাহরূপে নাম দিয়েছ, সেটা নিতান্তই তাদের

يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْءَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

৪১. 'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের দুজনের একজন তার মনিবকে মদ পান করাবে[১] এবং অন্যজন[২] শূলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি খাবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে[৩]।'

মূর্খতা। তারা নিজেরাই সেগুলোর নাম রেখেছে। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছে মাত্র। এ ব্যাপারে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন প্রমাণ নেই। তারপর তিনি বললেন, রাজত্ব ও হুকুম সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র। আর তিনি তাঁর বান্দাদের সবাইকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারও যেন ইবাদাত করা না হয়। তারপর তিনি বললেন, এই যে বস্তুটির দিকে আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি, আল্লাহ্ জন্য তাওহীদ, একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠাসহকারে আমল করা সেটাই তো সরল সোজা প্রকৃত দ্বীন। যা গ্রহণ করার নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন। যার জন্য তিনি দলীল-প্রমাণাদি নাযিল করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না বলেই শির্কে লিপ্ত হয়। [ইবন কাসীর] ইবন জারীর বলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, তারা তাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে প্রশ্ন করছে তখন এটাকেই তাদেরকে তাওহীদ ও ইসলামের দিকে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি দেখতে পেলেন যে, তাদের প্রকৃতিতে কল্যাণ গ্রহণের ও শোনার প্রবণতা রয়েছে। আর সেজন্যই যখন তিনি তার দাওয়াত ও নসীহত শেষ করলেন, তখনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করলেন। দ্বিতীয়বার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকলেন না। [তাবারী]

(১) প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেনঃ তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে। অপরজনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

(২) ইবনে কাসীর বলেনঃ উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে -যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে। সবশেষে বলেছেনঃ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহ্‌র অটল ফয়সালা।

(৩) যেসব মুফাস্‌সির তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তারা একথাও বলেছেন

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলো', কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল; কাজেই ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রয়ে গেলেন(১) ।

ষষ্ঠ রুকূ'

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ

৪৩. আর রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে

যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠলঃ আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি, বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম । তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ - তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ্ করেছ, এখন তার শাস্তি তা-ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে । [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে,
এক. বন্দী দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন বাদশাহ্র কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে । কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কথা ভুলে গেল । এ হিসাবে فَأَنسَاهُ এর মধ্যে ব্যবহৃত সর্বনামটি দ্বারা সেই বন্দী লোকটিকে বুঝানো হবে । ফলে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মুক্তি আরো বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরো কয়েক বছর তাকে কারাগারে কাটাতে হল । [কুরতুবী; ইবন কাসীর]
দুই. মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ ইউসুফ আলাইহিসসালাম বন্দীর প্রভু বা রাজার কাছে তার কথা উল্লেখ করার কথা বলেছিলেন । এতে করে তিনি যেহেতু তার প্রভু রাব্বুল আলামিনকে ভুলে গিয়েছিলেন এর শাস্তি স্বরূপ তাকে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়েছে । এ হিসাবে فَأَنسَاهُ শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত সর্বনামটি দ্বারা ইউসুফ আলাইহিসসালামকে বুঝানো হবে । [কুরতুবী; ইবন কাসীর]
আয়াতে ﴿بِضْعَ سِنِينَ﴾ বলা হয়েছে । শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায় । কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ এ ঘটনার পর আরো সাত বছর তাকে জেলে থাকতে হয়েছে । [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۖ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِىْ فِىْ رُءْيٰىَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾

সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে সভাষদগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।'

قَالُوْٓا أَضْغٰثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তারা বলল, 'এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই[১]।'

وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهٖ فَأَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর সে দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল সে বলল, 'আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। কাজেই তোমরা আমাকে পাঠাও[২]।'

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মুক্তির জন্য একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং সভাষদদের একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর দিলঃ ﴿أَضْغٰثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ﴾ এখানে أَضْغَاثُ শব্দটি ضغث এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরণের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, তাদের এ উত্তরের মাধ্যমে তারা অজ্ঞতা ও তার উপর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়ার মত দু'টি ভুলই করেছিল। [সা'দী]

(২) এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বললঃ আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হোক। বাদশাহ্ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে উপস্থিত হল। [ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীম এসব ঘটনাকে একটি মাত্র শব্দ فَأَرْسِلُوْنِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নাম উল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরী অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনা-আপনি বোঝা যায়।

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. সে বলল, ‘হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী[১]! সাতটি মোটাতাজা গাভী, সেগুলোকে সাতটি দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন[২], যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি ও তারা জানতে পারে[৩]।’

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. ইউসুফ বললেন, ‘তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তা ছাড়া বাকী সবগুলো শীষসহ রেখে দেবে;

---

(১) মূল ভাষ্যে الصديق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সততা ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে যার কথা ও কাজ সত্য। [ইবন কাসীর] এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কারাগারে অবস্থান কালে এ ব্যক্তি ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবন ও চরিত্র দ্বারা কী বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল! দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও এ প্রভাব কেমন অটুট ছিল! তাই লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর صديق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। কেন তার কথা বাদশাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল সে ব্যাপারে কোন তিরস্কার না করেই। অনুরূপভাবে তাকে এখান থেকে বের করে নিতে হবে এমন কোন শর্ত না দিয়েই। [ইবন কাসীর]

(২) স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ্ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো গমের সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

(৩) অর্থাৎ আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরেই আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবতঃ তারা আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে। অথবা এর অর্থ- যাতে জনগণ এ স্বপ্নের তা'বীর জানতে পারে। কেননা, তারা তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে। [কুরতুবী]

৪৮. 'এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর[১], এ সাত বছর, যা আগে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকেরা তা খাবে; শুধুমাত্র সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ছাড়া[২]।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ۝

৪৯. 'তারপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ ফলের রস নিংড়াবে[৩]।'

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণ করতে গড়িমসি করল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর বদদোয়া করে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে তাদের ব্যাপারে ইউসুফ আলাইহিসসালামের সাত বছরের মত সাত বছর দিয়ে যথেষ্ট করুন। ফলে কুরাইশগণ এমন এক দুর্ভিক্ষে পতিত হলো যে, সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। এমনকি তারা হাঁড় খেতেও বাধ্য হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাদের কোন কোন লোক ক্ষুধার তাড়নায় আকাশের দিকে তাকালে শুধু ধোঁয়ার মত অস্বচ্ছ দেখতে পেত। আল্লাহ্ বলেনঃ "সুতরাং অপেক্ষা করুন সেদিনের যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে"। আল্লাহ্ বলেনঃ "অবশ্যই আমরা কিছু সময়ের জন্য আযাবকে উঠিয়ে নেব কিন্তু তোমরা ফিরে আসবে"। কিয়ামতের দিনের পরে কি তাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে? ধোঁয়া চলে গেছে তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও বাকী আছে। [বুখারীঃ ৪৬৯৩, মুসলিমঃ ২৭৯৮]

(২) কারণ সেটা তোমরা তোমাদের বীজ হিসেবে রেখে দিবে। অর্থাৎ তা খেয়ে ফেলো না। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন যে, এগুলো তোমরা না খেয়ে জমা রাখবে। [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে يعصرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক মানে হচ্ছে 'নিংড়ানো'। এখানে এর মাধ্যমে পরবর্তীকালের চতুর্দিকের এমন শস্য শ্যামল তরতাজা পরিবেশ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যা দুর্ভিক্ষের পর রহমতের বৃষ্টিধারা ও নীল নদের জোয়ারের পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে। জমি ভালোভাবে পানিসিক্ত হলে তেল উৎপাদনকারী বীজ, রসাল ফল ও অন্যান্য ফলফলাদি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ভালো ঘাস খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুরাও প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়। অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন

সপ্তম রুকূ'

৫০. আর রাজা বলল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস[১] ।' অতঃপর যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! নিশ্চয়

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝

যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয় যা কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্‌র স্বপ্নে বাহ্যতঃ এটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আরো কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। কাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তার জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছর যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে -যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে- অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত]

(১) ঘটনার গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহ্‌কে তা অবহিত করেছে। [কুরতুবী] বাদশাহ্ বৃত্তান্ত নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। [ইবন কাসীর] কিন্তু কুরআনুল কারীম এসব বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ﴾ অর্থাৎ বাদশাহ্ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে আসো। অতঃপর বাদাশাহ্‌র জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌছল। [ইবন কাসীর]

আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত[১] ।’

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٥١﴾

৫১. রাজা নারীদেরকে বলল, ‘যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকাজ কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল?’ তারা বলল, ‘অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।’ আযীযের স্ত্রী বলল, ‘এতদিনে সত্য প্রকাশ হল, আমিই তাকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম, আর সে তো অবশ্যই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।’

(১) ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহ্‌র প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর কাজের প্রশংসা করে বলেনঃ যদি ইউসুফের মত আমি এত বছর জেল খাটতাম, তারপর আমার কাছে বের হওয়ার আহ্বান আসত তাহলে আমি সে ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম। [বুখারীঃ ৬৯৯২, মুসলিমঃ ১৫১] এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ নিজেকে নম্রভাবে পেশ করে ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এর চেয়ে বেশী কষ্টের শি‘আবে আবী তালেবে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও আপোষ করেননি।

আল্লাহ্ তা‘আলা নবীগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম দূতকে উত্তর দিলেন, তুমি বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ্ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না? এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি; অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম আযীযের গৃহে লালিত-পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। [কুরতুবী]

৫২. এটা এ জন্যে যে, যাতে সে জানতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।'

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, কেননা, নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে[১], কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার রব দয়া করেন[২]। নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

---

(১) এখানে আযীয-পত্নী কর্তৃক ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নির্দোষিতা ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ আযীয-পত্নী তখন বললেনঃ "এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে, আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম, অবশ্যই সে (ইউসুফ) সত্যবাদীদের অন্তর্গত। আর এটা আমি এ জন্যই বলছি, যাতে করে সবাই জানতে পারে যে, আমি তার (ইউসুফের) অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন মিথ্যা ও খেয়ানতের অপবাদ দিচ্ছি না। [ইবনুল কাইয়্যেমঃ রাওদাতুল মুহিব্বীনঃ ২৯৯] আর অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা যারা খেয়ানত করে তাদের চক্রান্ত সফল হতে দেন না। আর আমি আমার নিজ আত্মাকে নির্দোষ বলছি না। আত্মা তো খারাপ কাজের নির্দেশই দেয়, অবশ্য যাদেরকে আল্লাহ্ করুনা করেছেন, তাদের কথা ভিন্ন। নিঃসন্দেহে আমার রব অতীব ক্ষমাশীল, দয়াময়।" এ তিনটি আয়াতই আযীয-পত্নী বলেছিল। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর আত্মা নফ্‌সে আম্মারা বা খারাপ কাজের আদেশদানকারী আত্মা নয়। এ ব্যাপারে সত্যান্বেষী আলেমগণ সবাই একমত। সুতরাং এখানে আযীয-পত্নী নিজ আত্মার কথাই বলেছে। আর তার আত্মা অবশ্যই নফ্‌সে আম্মারা ছিল, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর আত্মা নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ইবনুল কাইয়্যেম, রাওদাতুল মুহিব্বীন, ২৯৯-৩০০]

(২) মানব মন আপন সত্তার দিকে মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্ ও আখেরাতের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لَوَّامَة হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তাওবাকারী এবং যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা مُطْمَئِنَّة হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে। [ইবনুল কাইয়্যেম, আর রূহঃ ২২০]

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. আর রাজা বলল, 'ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার নিজের জন্য আপন করে নেব।' তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'আজ আপনি তো আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, আস্থাভাজন[১]।'

---

(১) অর্থাৎ বাদশাহ্ যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দাবী অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং আযীয-পত্নী ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেনঃ ইউসুফ ('আলাইহিস্ সালাম)-কে আমার কাছে নিয়ে আসো- যাতে তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার ফলে তার যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্ বললেনঃ আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত। অর্থাৎ আপনার কথা গ্রহণযোগ্য এবং আপনি এমনই বিশ্বস্ত যে আপনার পক্ষ থেকে কোন গাদ্দারীর ভয় নেই। [কুরতুবী, সংক্ষেপিত] এটা যেন বাদশাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, আপনার হাতে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সোপর্দ করা যেতে পারে। স্বপ্ন এবং অনাগত পরিস্থিতির ব্যাপারে বাদশাহ্ বললেনঃ এখন কি করা দরকার? ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে। এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীর কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্‌দেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্‌দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ্ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেনঃ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। [কুরতুবী থেকে সংক্ষেপিত] যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণ

৫৫. ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।'

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর এভাবে ইউসুফকে আমরা সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে অবস্থান করতে পারতেন। আমরা যাকে ইচ্ছে তার প্রতি আমাদের রহমত দান করি; এবং আমরা মুহসিনদের পুরস্কার নষ্ট করি না[১]।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম[২]।

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

ব্যয় করব এবং এক্ষেত্রে কোন কম-বেশী করব না। حفيظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عليم শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা।

(১) অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহ্‌র দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নেয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেনঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান জারি করা এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্‌কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তার অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্‌ও মুসলিম হয়ে যান। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আখেরাতের প্রতিদান ও সওয়াব তাদের জন্য দুনিয়ার নেয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। এখানে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জন্য আখেরাতে যা সঞ্চিত রেখেছেন তা পার্থিব রাষ্ট্রক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করা থেকে উত্তম। [ইবন কাসীর] কেননা, দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংসশীল, আর আখেরাতের সম্পদ চিরস্থায়ী। [কুরতুবী] সুতরাং জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আখেরাতে যে পুরস্কার দেবেন সেটিই সর্বোত্তম প্রতিদান এবং সেই প্রতিদানটিই মুমিনের কাংখিত হওয়া উচিত।

অষ্টম রুকূ'

৫৮. আর[১] ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল[২]। অতঃপর তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾

---

(১) এখানে আবার সাত আট বছরের ঘটনা মাঝখানে বাদ দিয়ে বর্ণনার ধারাবাহিকতা এমন এক জায়গা থেকে শুরু করে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে বনী ইসরাঈলের মিসরে স্থানান্তরিত হবার এবং ইয়াকূব আলাইহিসসালামের হারানো ছেলের সন্ধান পাওয়ার সূত্রপাত হয়। মাঝখানে যেসব ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের রাজত্বের প্রথম সাত বছর মিসরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এ সময় তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষ সমস্যা দূর করার জন্য পূর্বাহ্নে এমন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার পরামর্শ তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলার পর বাদশাহকে দিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় দুর্ভিক্ষের যামানা। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ-ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্যে মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তিনের একটি অংশ। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেনঃ তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে আসো। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনইয়ামীন ছিলেন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। তারা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে চিনল না; কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে ঠিকই চিনে ফেললেন। এরপর যে কোনভাবেই হোক ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তাদের কাছ থেকে তাদের আরেক ছোট ভাইয়ের তথ্য উদঘাটন করলেন। তারপর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন। বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর তিনি যখন তাদেরকে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলেন তখন তিনি বললেন[১], 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের পিতার পক্ষ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস[২]। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম

---

(১) ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তার মনে এরূপ আকাঙ্খার উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্বার আসুক। এজন্যে একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি। এরপর একটি সাবধান বাণীও শুনিয়ে দিলেন, তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ। এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না। অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্যবাবদ যে নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ী পৌঁছে যখন তারা আসবাবপত্র খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেয়ার জন্য আসতে পারে। মোটকথা, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তার সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে আরেকজনকে নিয়ে আস, যাতে তোমরা আরও এক বোঝা বেশী নিতে পার। তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, মিশরে আমি সুন্দরভাবে সওদার ওজন প্রদান করে থাকি। [তাবারী] তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের পিতার পক্ষীয় ভাই অর্থাৎ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে আস। তোমরা তো দেখছ যে আমি পূর্ণ মাপ প্রদান করে থাকি। মাপে কম দেই না। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন তাফসীরে এসেছে যে, তারা কথায় কথায় তাদের অপর ভাইয়ের কথা ইউসুফের কাছে বর্ণনা করেছিল। তিনি তাদেরকে সেটার সত্যতা নিরূপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাতে করে তার আপন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায় [যামাখশারী; ফাতহুল কাদীর]

অতিথিপরায়ণ[১]।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬০. 'কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে না নিয়ে আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার ধারে-কাছেও আসবে না।

قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. তারা বলল, 'তার ব্যাপারে আমরা তার পিতাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।'

وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. ইউসুফ তাঁর কর্মচারীদেরকে বললেন, 'তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, যাতে তারা আবার ফিরে আসে[২]।'

فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল, তখন তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা পরিমাপ করে রসদ পেতে পারি। আর আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

---

(১) এর দুই অর্থ হতে পারে, এক. আমি সুন্দর অতিথি পরায়ণ। দুই. আমার এখানে মানুষ নিরাপদ। [কুরতুবী]

(২) এর কারণ কারও কারও মতে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাদের সম্ভবতঃ পুনরায় ক্রয় করার মত অর্থ-কড়ি থাকবে না। ফলে তারা আর আসবে না। কারও কারও মতে, তিনি ভাইদের কাছ থেকে টাকা নিতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কারও কারও মতে, তিনি জানতেন যে, তারা যখন দেখবে যে এ টাকা তাদেরই, যা তারা পণ্যের বিনিময়ে দিয়েছিল, তখন সেটা ফেরৎ দেয়ার জন্য হলেও মিশর আসবে। [ইবন কাসীর]

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۭ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۠ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ নিরাপদ মনে করব, যেরূপ আগে নিরাপদ মনে করেছিলাম তোমাদেরকে তার ভাই সম্বন্ধে? তবে আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু[১]।'

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ۭ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۭ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۭ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের দেয়া পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে

---

(১) এ আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বললঃ আযীযে মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোটভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনইয়ামীনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন -যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাজত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না। পিতা বললেনঃ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি, ইউসুফকে হারিয়েছি। তখনও হেফাজতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে। এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নবীসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বান্দার ক্ষমতাধীন নয় -যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই বললেন, তোমাদের হেফাজতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্র হেফাজতের উপরই ভরসা করি এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। মোটকথা, ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্র ভরসায় কনিষ্ঠ সন্তানকেও তাদের সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আরো এক উট বোঝাই পণ্য আনব; ঐ পরিমাণ শস্য অতি সহজ[১]।'

৬৬. পিতা বললেন, 'আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই[২], অবশ্য যদি তোমরা বেষ্টিত হয়ে পড় (তবে ভিন্ন কথা)।'

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

(১) এতক্ষন পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, এ কাজ ভূলবশতঃ হয়নি; বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই ﴿رُدَّتْ اِلَيْنَا﴾ বলা হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বললঃ ﴿مَا نَبْغِيْ﴾ অর্থাৎ আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আযীযে মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন আশঙ্কার কারণ নেই; আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। ভাইকে নেয়ার বিনিময়ে যা পাব তা অত্যন্ত সহজেই পাচ্ছি। এ দুর্ভিক্ষের দিনে এত সহজে খাবার পাওয়া বিরাট ব্যাপার। [ইবন কাসীর] তাছাড়া এ বাড়তি পরিমাণ খাদ্যশস্য দেয়া আযীযের জন্যও কঠিন কিছু নয়। [ফাতহুল কাদীর; মুয়াসসার] আবার আপনার জন্যও এ সামান্য সময় আমাদের ছোট ভাইটিকে ছেড়ে থাকা কষ্টের হবে না। আমাদের বর্তমান খাদ্য শস্যের পরিমাণও কম সুতরাং বাড়িয়ে আনতে পারলেই লাভ বেশী।

(২) এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন, আমি বিনইয়ামীনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। [কুরতুবী] কাতাদাহ্‌র মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়। [ইবন কাসীর]

তারপর যখন তারা তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করল তখন তিনি বললেন, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ্ তার বিধায়ক(১)।'

৬৭. আর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে(২)। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। হুকুমের মালিক তো আল্লাহ্‌ই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

(১) অর্থাৎ ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম করল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ বিনইয়ামীনের হেফাজতের জন্য হলফ নেয়া-হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারো হেফাযত করতে পারে এবং দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। [কুরতুবী] নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থাধীন কোন কিছুই নয়।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস্সালামের পরে তার ভাইকে পাঠাবার সময় ইয়াকুব আলাইহিস্সালামের মন কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। নানা সন্দেহ ও আশংকা তার মনে জেগে ওঠা বিচিত্র নয় এবং সর্বদাই এ চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে গিয়ে থাকবেন যে, আল্লাহই ভালো জানেন এখন এ ছেলের চেহারাও আর দেখতে পাবো কি না। তাই তিনি হয়তো নিজের সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি না রাখতে চেয়েছিলেন। তখন ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগার ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো। এর কারণ কি, আল্লাহ্ তা বর্ণনা করেননি। তবে অনেকে মনে করেন- এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারো বদ নজর গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়ত কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে। [কুরতুবী]

করি। আর আল্লাহ্‌রই উপর যেন নির্ভরকারীরা নির্ভর করে[১]।'

৬৮. আর যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমের বিপরীতে তা তাদের কোন কাজে আসল না; ইয়া'কূব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করছিলেন[২] আর অবশ্যই তিনি আমাদের দেয়া শিক্ষায়

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

(১) ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসা, অথবা সন্দেহভাজন মনে করার আশঙ্কাবশতঃ ছেলেদের একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। তা হচ্ছে, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি যে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌রই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য। যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের সম্পর্কে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সুসংবাদ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আর তারা হলেন সে সমস্ত লোক যারা (তাদের অসুস্থতার সময়) কারও কাছে ঝাড়ফুক চায় না, লোহা গরম করে ছেঁক দেয় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং সর্বদা তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে। [বুখারীঃ ৬৪৭২]

(২) এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন। পূর্ব আয়াতের শেষ ভাগে ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে, ইয়াকূব বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ, আমি তাকে বিদ্যা দান করেছিলাম। এ কারণেই তিনি শরী'আতসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেননি। বরং কৌশল ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য স্থাপন করেছেন।

জ্ঞানবান ছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই জানে না[১]।

নবম রুকূ'

৬৯. আর তারা যখন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর, কাজেই তারা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না[২]।'

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. অতঃপর তিনি যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন তিনি তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র[৩]

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ

---

(১) আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ ও মাসআলা জানা যায়- (এক) বদ নযর লাগা সত্য। [দেখুন- বুখারীঃ ৫৭৪০, মুসলিমঃ ২১৮৭] সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরী'আতসিদ্ধ। (দুই) যদি অন্য কারো কোন গুণ অথবা নেয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নযর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে بَارَكَ الله অথবা ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। (তিন) নযর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরী'আতসম্মত যে কোন তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দো'আ, কুরআন-হাদীসভিত্তিক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম। [কুরতুবী, সংক্ষেপিত]

(২) অর্থাৎ মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তার সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম ছোট ভাই বিনইয়ামীনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেনঃ আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ। এখন তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এযাবত আমার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। [ইবন কাসীর]

(৩) কুরআনুল কারীম এ পাত্রটিকে এক জায়গায় السِّقَايَةَ শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র ﴿صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ [সূরা ইউসুফঃ ৭০ ও ৭২] শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেছে। السِّقَايَةَ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعَ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۝

রেখে দিলেন[১]। তারপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করে বলল, 'হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয় চোর[২]।'

[ইবন কাসীর] একে مَلِكٌ তথা বাদশাহ্‌র দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরো জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান ও মর্যাদাবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্‌র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্ নিজে তা দ্বারা পান করতেন। [বাগভী]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে রেখে দেয়ার জন্য ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল। বিনইয়ামীনের খাদ্যশস্য যে উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেয়া হল।
কোন কোন মুফাসসির মনে করেন, সম্ভবত পেয়ালা রেখে দেবার কাজটা ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম নিজের ভাইয়ের সম্মতি নিয়ে তার জ্ঞাতসারেই করেছিলেন। [বাগভী] আগের আয়াতে এ দিকে প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদের পর যালেম বৈমাত্রেয় ভাইদের হাত থেকে নিজের সহোদর ভাইকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। ভাই নিজেও এ যালেমদের সাথে ফিরে না যেতে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু ইউসুফের নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে তাকে আটকে রাখা এবং তার মিসরে থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর এ অবস্থায় এ পরিচয় প্রকাশ করাটা কল্যাণকর ছিল না। তাই বিনইয়ামীনকে আটকে রাখার জন্য দু'ভাইয়ের মধ্যে এ পরামর্শ হয়ে থাকবে। যদিও এর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য ভাইয়ের অপমান অনিবার্য ছিল, কারণ তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হচ্ছিল, কিন্তু পরে উভয় ভাই মিলে আসল ব্যাপারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেই এ কলংকের দাগ অতি সহজেই মুছে ফেলা যেতে পারবে। [দেখুন, বাগভী]

(২) অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বললঃ হে কাফেলার লোকজন! তোমরা চোর। এখানে ثُمَّ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে- যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। [বাগভী] মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল। তাদের এ ঘোষণার যৌক্তিক কারণ ছিল। কেননা, ঘটনার যে সরল আকৃতিটি সহজেই চোখে ধরা পড়ে তা হচ্ছে এই যে, পেয়ালাটি হয়তো নীরবে রেখে দেয়া হয়েছিল, পরে সরকারী কর্মচারীরা সেটি খুঁজে না পেলে অনুমান করা হয়েছিল, এটা নিশ্চয়ই সেই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত কোন লোকের কাজ যারা এখানে অবস্থান করেছিল। সুতরাং কর্মচারীরা সেটা না জেনেই তাদেরকে চোর বলেছিল। [ফাতহুল কাদীর]

৭১. তারা ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ[১]?'

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾

৭২. তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে তা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে[২] এবং আমি সেটার জামিন[৩]।'

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي

(১) অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললঃ তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

(২) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরী কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ মজুরী কিংবা পুরস্কার পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার-ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। [কুরতুবী]

(৩) ঘোষণাকারীগণ বললঃ বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের জামিন হতে পারে। [কুরতুবী] সাধারণ ফেকাহ্‌বিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা জামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি জামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। [কুরতুবী] ফুদালাহ ইবন উবাইদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "আমি জামিন, আর জামিন যিনি তিনি দায়িত্বগ্রহণকারী। যারা আমার উপর ঈমান এনেছে, আত্মসমর্পন করেছে এবং হিজরত করেছে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রান্তে একটি এবং জান্নাতের মধ্যভাগেও একটি ঘরের আমি জামিন হলাম বা দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। অনুরূপভাবে যারা আমার উপর ঈমান এনেছে, আত্মসমর্পন করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রান্তে একটি এবং জান্নাতের মধ্যভাগে একটি ও জান্নাতের উঁচু কামরায় একটি ঘরের আমি জামিন হলাম বা দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, যারা এ কাজ করেছে এমনভাবে যে, যত ভাল কাজ আছে তা করতে কোন প্রকার কসূর করেনি এবং যত খারাপ কাজ আছে তা থেকে পলায়ন করতে যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার মৃত্যু যেখানেই হোক না কেন। [নাসায়ীঃ ৬/২১, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৭১]

الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ

তো জান যে, আমরা এ দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই(১) ।'

قَالُوْا فَمَا جَزَاۤؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ

৭৪. তারা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি কী?'

قَالُوْا جَزَاۤؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاۤؤُهٗ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ

৭৫. তারা বলল, 'এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়।' এভাবে আমরা যালেমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি(২) ।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ اَخِيْهِ ۗ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۗ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ۗ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ

৭৬. অতঃপর তিনি তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির আগে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগলেন(৩), পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করলেন(৪) । এভাবে

(১) অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বললঃ তোমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছ যে আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই। কেননা, তারা তাদের ভাল দিকগুলো দেখেছে, যাতে বোঝা যায় যে, আমরা এ খারাপ গুণের উপযুক্ত লোক নই। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ ইউসুফ ভ্রাতাগণ বললঃ যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে; সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমনি ধরণের সাজা দেই। উল্লেখ্য, এ ভাইয়েরা ছিল ইবরাহিমী পরিবারের সন্তান। কাজেই চুরির ব্যাপারে তারা যে আইনের কথা বলে তা ছিল ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন। এ আইন অনুযায়ী চোরের শাস্তি ছিল, যে ব্যক্তির সম্পদ সে চুরি করেছে তাকে তার দাসত্ব করতে হবে। উদ্দেশ্য, ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর শরী'আতেও চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ সরকারী তল্লাশীকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বিনইয়ামীনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ সব শেষে বিনইয়ামীনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হয়ে এল। তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেঁট হয়ে গেল। তারা বিনইয়ামীনকে খারাপ কথা বলতে লাগল। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম[১]। রাজার আইনে তার ভাইকে আটক করা সংগত হতোনা, আল্লাহ্ ইচ্ছে না করলে। আমরা যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী[২]।

---

(১) অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। এ সমগ্র ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউসুফের সমর্থনে সরাসরি কোন কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল তা অবশ্যি এখানে ভেবে দেখার মতো বিষয়। একথা সুস্পষ্ট যে, পেয়ালা রাখার কৌশলটি ইউসুফ নিজেই করেছিলেন। এটাও সুস্পষ্ট, সরকারী কর্মচারীদের চুরির সন্দেহে কাফেলাকে আটকানোও একটি নিয়ম মাফিক কাজ ছিল, যা এ ধরনের অবস্থায় সব সরকারী কর্মচারীই করে থাকে। তাহলে আল্লাহর সেই কৌশল কোনটি? উপরের আয়াতের মধ্যে অনুসন্ধান চালালে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন জিনিসই এর ক্ষেত্র হিসেবে পাওয়া যেতে পারে না যে, সরকারী কর্মচারীরা নিয়ম বিরোধীভাবে নিজেরাই সন্দেহপূর্ণ অপরাধীদের কাছে চুরির শাস্তি জিজ্ঞেস করলো এবং জবাবে তারাও এমন শাস্তির কথা বললো যা ইবরাহিমী শরীয়াতের দৃষ্টিতে চোরকে দেয়া হতো। এর ফলে দু'টি লাভ হলো। প্রথমত ইউসুফ ইবরাহিমী শরী'আতকে কার্যকর করার সুযোগ পেলেন এবং দ্বিতীয়ত নিজের ভাইকে হাজতে পাঠাবার পরিবর্তে তিনি নিজের কাছে রাখতে পারলেন। তিনি বাদশাহ্র আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরের এই শাস্তি ছিল না। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর শরী'আতানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বিনইয়ামীনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

(২) অর্থাৎ আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তার ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরেই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা জ্ঞান ও ঈমানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকি। [কুরতুবী] হাসান বসরী বলেন, একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার তুলনায় আরো অধিক জ্ঞানী থাকে। মানবজাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর জ্ঞান সবারই ঊর্ধ্বে। [ইবন কাসীর]

৭৭. তারা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে তবে তার সহোদরও তো আগে চুরি করেছিল[১]।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না; তিনি (মনে মনে) বললেন, 'তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই অধিক অবগত[২]।'

قَالُوٓا إِن يَسۡرِقۡ فَقَدۡ سَرَقَ أَخٞ لَّهُۥ مِن قَبۡلُۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفۡسِهِۦ وَلَمۡ يُبۡدِهَا لَهُمۡۚ قَالَ أَنتُمۡ شَرّٞ مَّكَانٗاۖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧

৭৮. তারা বলল, 'হে 'আযীয, এর পিতা তো অত্যন্ত বৃদ্ধ; কাজেই এর জায়গায় আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মুহসিন ব্যক্তিদের একজন[৩]।'

قَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبٗا شَيۡخٗا كَبِيرٗا فَخُذۡ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٧٨

(১) অর্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে! তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়- বৈমাত্রেয় ভাই, তার এক সহোদর ভাই ছিল, সে-ও চুরি করেছিল। ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। [তাবারী; ইবন কাসীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম মনে মনে বললেনঃ তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেনঃ তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জানেন। [তাবারী; ইবন কাসীর] কুরতুবী বলেন, প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলেছেন। [কুরতুবী]

(৩) ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই সফল হচ্ছে না এবং বিনইয়ামীনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অথবা এ অনুগ্রহ আমাদের উপর আপনার থাকবে। [কুরতুবী]

৭৯. তিনি বললেন, 'যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে তো আমরা অবশ্যই যালেম হয়ে যাব[১]।'

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۷۹﴾

দশম রুকূ'

৮০. অতঃপর যখন তারা তার[২] ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিটি বলল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং আগেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে। কাজেই আমি কিছুতেই এ দেশ থেকে যাব না যতক্ষন না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ্‌ আমার জন্য কোন ফয়সালা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾

৮১. 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, 'হে আমাদের

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ

---

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্‌ সালাম ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেনঃ যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই; বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদের সাথে আমার কৃত চুক্তি অনুযায়ী যালেম হয়ে যাব। [কুরতুবী] কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

(২) অর্থাৎ যখন তারা তাদের ভাই বিন ইয়ামীনকে ছাড়িয়ে নেয়ার যাবতীয় প্রচেষ্টা করে নিরাশ হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল যে, আযীয মিশর কোনভাবেই তাকে ছাড়বে না। তখন তারা পরবর্তী করণীয় নিয়ে শলা পরামর্শের জন্য একত্রিত হলো। [সা'দী; মুয়াসসার]

سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾

পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম[১]। আর আমরা তো গায়েব সংরক্ষণকারী নই[২]।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ أَقْبَلْنَا فِيْهَا ۖ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. 'আর যে জনপদে আমরা ছিলাম সেখানকার অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি[৩]।'

---

(১) অর্থাৎ বড় ভাই বললেনঃ আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রতক্ষ্যদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

(২) অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনইয়ামীনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। গায়েবী অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরূপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনইয়ামীনের যথাসাধ্য হেফাযত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না। [ইবন কাসীর]

(৩) ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে একবার পিতাকে ধোঁকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেয়ার জন্য বললঃ আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ মিসর), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কেনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।
আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যরা তাকে অসৎ কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহ্য় লিপ্ত না হয়। ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বিনইয়ামীনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ

৮৩. ইয়া'কূব বললেন, 'না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে[১], কাজেই উত্তম ধৈর্যই আমি গ্রহণ করব; হয়ত আল্লাহ্ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আফসোস ইউসুফের জন্য।' শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন সংবরণকারী[২]।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾

মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মু'মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেনঃ আমার সাথে সাফিয়্যা বিন্তে হুয়াই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় গমন করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া বিচিত্র নয়। [বুখারীঃ ৭১৭১, মুসলিমঃ ২১৭৪]

(১) ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর নিকট ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম বিশ্বাস করতে পারলেন না; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম। তারপর তিনি বললেন, আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে অর্থাৎ ইউসুফ, বিনইয়ামীন এবং যে ভাই মিসরে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেনঃ ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাথায় ক্রন্দন করতে করতে তার চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল।

৮৫. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন, বা মারা যাবেন(১) ।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. তিনি বললেন, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তা জানি যা তোমরা জান না(২) ।

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেনঃ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। [বাগভী] ﴿فَهُوَ كَظِيْمٌ﴾ অর্থাৎ অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তার মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারো কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না। এ কারণেই كظم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগলঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনার শরীর দুর্বল হয়ে শক্তি নিঃশেষ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। [ইবন কাসীর] প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে। আপনি নিজের উপর থেকে বিষয়টাকে একটু হাল্কা করুন। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ছেলেদের কথা শুনে বললেনঃ "আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারো কাছে করি না; বরং আল্লাহ্‌র কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না"। এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে- (এক) আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন। (দুই) আমি জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা কায়মনো বাক্যে দো'আকারীর দো'আ ফেরৎ দেন না। (তিন) আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জানি যে, ইউসুফ জীবিত। (চার) অথবা, আমি জানি যে, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য হবে। (পাঁচ) অথবা, আমি মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কিছু আশা করি, যা তোমরা কর না। [ফাতহুল কাদীর]

৮৭. 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের সন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহ্‌র রহমত হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া[১]।'

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৮৮. অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন তারা বলল, 'হে 'আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি[২];

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝

(১) অর্থাৎ বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফের ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তাকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তাকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মূহুর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন। উভয়কেই খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বিনইয়ামীনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল; কিন্তু ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যতঃ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। সুদ্দী বলেন, যখন তার ছেলেরা তাকে বাদশার বিভিন্ন গুণাগুণ বর্ণনা করল তখন তিনি আশা করলেন যে, এটা যদি তার ছেলে ইউসুফ হতো! [বাগভী; কুরতুবী]

ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য নবীগণের অনুসরণ করা।

(২) অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দারিদ্র্যতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগলঃ হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমনকি এখন খাদ্যশস্য কেনার

আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন[১]; নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদের পুরস্কৃত করেন[২] ।'

জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই । আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি । আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবূল করে নিন এবং এর পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয় । আগে যেভাবে প্রদান করতেন । [ইবন কাসীর] বলাবাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই । আপনি সদকা মনে করেই দিয়ে দিন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সদকাদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন । অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই । তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ । [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] কুরআনে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে مُزْجَاةٍ । এর আসল অর্থ এমন বস্তু, যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয় । [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) এখানে সদকা শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে- কারো কারো মতে এখানে সদকা দ্বারা দানকেই বোঝানো হয়েছে । কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে অন্যান্য নবীদের উপর তা হারাম ছিল না । [ইবন কাসীর] অপর কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে সদকা দ্বারা দান উদ্দেশ্য না নেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন । তাদের মতে এখানে সদকা শব্দ দ্বারা সত্যিকারের সদকা বোঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় দেয়াকেই 'সদকা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে । কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি; বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল । অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন । [কুরতুবী]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা সদকাদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন । এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকার এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া । অপর একটি প্রতিদান শুধু আখেরাতেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ জান্নাত । এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য । এখানে আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে । ইউসুফ-ভ্রাতারা হয়তবা তখনো পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার না কাফের । তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল -উভয়কালই বোঝা যায় । এছাড়া এখানে বাহ্যতঃ আযীযে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, 'আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন ।' কিন্তু তারা হয়ত জানত না যে, আযীযে-মিসর ঈমানদার । তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন- এমন বলা হয়নি । [কুরতুবী]

৮৯. তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ[১]?'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

৯০. তারা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' তিনি বললেন, 'আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর; আল্লাহ্ তো আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন[২]। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন

قَالُوٓا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরাবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের স্মরণ আছে কি? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে পারতে না? এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের ঘটনার সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক! এ আযীযে-মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো! এরপর আরো চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরো তথ্য জানার জন্য বললঃ ﴿أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। [বাগভী; ইবন কাসীর]

(২) এরপর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। তিনি আমাদেরকে নাজাত ও কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। [কুরতুবী] তিনি আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ-সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয়ই যারা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

না[১] ।'

৯১. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম ।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾

৯২. তিনি বললেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ভর্ৎসনা নেই । আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু[২] ।'

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

(১) এর দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন, এ দু'টি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয় । কুরআনুল কারীম অনেক জায়গায় এ দু'টি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে । বলা হয়েছে, যেমন, অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না । [সূরা আলে-ইমরানঃ ১২০]

(২) এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া ছাড়া ইউসুফ-ভ্রাতাদের উপায় ছিল না । সবাই একযোগে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন । তুমি এরই যোগ্য ছিলে । আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম । আল্লাহ্‌ মাফ করুন । উত্তরে ইউসুফ 'আলাইহিস্‌ সালাম নবীসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই । তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা । এ হচ্ছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ । এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কার করা হবে না । অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন । তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যেদিন আল্লাহ্‌ রহমতকে সৃষ্টি করেছেন, সেদিন তাকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন । তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগই তাঁর নিকট রেখে দিয়েছেন । আর বাকী একভাগ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিজীবকে দিয়েছেন । যদি কোন কাফের আল্লাহ্‌র নিকট যে রহমত আছে, তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো তাহলে সে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হতো না । অপরপক্ষে কোন মুমিন যদি আল্লাহ্‌র কাছে যে শাস্তি রয়েছে তার পরিমান সম্পর্কে জানতো, তবে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ মনে করতো না । [বুখারীঃ ৬৪৬৯]

৯৩. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখো; তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো[১]।'

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

এগারতম রুকূ'

৯৪. আর যখন যাত্রীদল বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ-অপ্রকৃতস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি[২]।'

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো আপনার পুরোন বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন[৩]।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

---

(১) অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে আসো, যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

(২) অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালাম নিকটস্থ লোকদেরকে বললেনঃ তোমরা যদি আমাকে বোকা না মনে কর, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। [তাবারী] হাসান বসরীর বর্ণনা মতে দশ দিনের, অপর বর্ণনায় একমাসের রাস্তা ছিল। [কুরতুবী] ইবন জুরাইজ বলেন, আশি ফারসাখের রাস্তা ছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরোনো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। ইবন কাসীর বলেন, তারা তাদের পিতার সাথে এমন কথা বললো যা কোন পিতার সাথে বলা যায় না। আল্লাহ্‌র কোন নবীর সাথে বলাই যায় না। কুরতুবী বলেন, যারা এ কথা বলেছিল তারা ঘরের অন্যান্য লোকেরা। ছেলেরা বলেনি। কারণ, তারা তখনও কেন'আনে ফিরে আসেনি। পরবর্তী আয়াত থেকে তা বুঝা যাচ্ছে।

فَلَمَّآ أَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ أَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ ۚ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তাঁর চেহারার উপর জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন(১)। তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা জানি তা তোমরা জান না?’

قَالُوا يٰٓأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خٰطِـِٔينَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তারা বলল, ‘হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী(২)।’

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

৯৮. তিনি বললেন, ‘অচিরেই আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ اٰوٰٓى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِينَ ﴿٩٩﴾

৯৯. অতঃপর তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, ‘আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন(৩)।’

---

(১) অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর জামা ইয়াকূব ‘আলাইহিস্ সালাম-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এল।

(২) বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললঃ আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাতের দো‘আ করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মাগফেরাতের জন্য দো‘আ করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

(৩) ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম পরিবারের সবাইকে বললেনঃ আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী অভাব অনটন থেকে মুক্ত হয়ে, নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। [তাবারী] উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত। [বাগভী; কুরতুবী]

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ

১০০. আর ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে[১] উঁচু আসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সম্মানে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ল[২]। তিনি বললেন, ‘হে আমার পিতা! এটাই আমার আগেকার স্বপ্নের

(১) এখানে أَبَوَيْهِ (পিতা-মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অনেকের মতেই ইউসুফের মাতা জীবিত ছিলেন। [ইবন কাসীর] তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর মাতা তার শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকূব ‘আলাইহিস্ সালাম মৃতার ভগ্নিকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন। [বাগভী; কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন আর ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে সিজ্‌দা করলেন। এ “সিজদাহ” শব্দটি বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। এমনকি একটি দল তো এ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বাদশাহ ও পীরদের জন্য “আদবের সিজদাহ” ও “সম্মান প্রদর্শনের সিজদাহ”-এর বৈধতা আবিষ্কার করেছেন। এর দোষমুক্ত হবার জন্য অন্য লোকদের এ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে যে, আগের নবীদের শরী‘আতে কেবলমাত্র ইবাদাতের সিজদা আল্লাহ ছাড়া আর সবার জন্য হারাম ছিল। এ ছাড়া যে সিজদার মধ্যে ইবাদাতের অনুভূতি নেই তা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যও করা যেতে পারতো। তবে মুহাম্মাদী শরীয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য সব রকমের সিজদা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে “সিজদাহ” শব্দটি বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে গ্রহণ করার ফলেই যাবতীয় বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ হাত, হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া। অথচ সিজদাহর মূল অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র ঝুঁকে পড়া। আর এখানে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অর্থই ইমাম বাগভী পছন্দ করেছেন। এখানে আরও জানা আবশ্যক যে, কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, কাউকে অভ্যর্থনা জানাবার অথবা নিছক কাউকে সালাম করার জন্য সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ার রেওয়াজ প্রাচীন যুগের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ ধরনের ঝুঁকে পড়ার জন্য আরবীতে “সিজদাহ” শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেটাও এ শরী‘আতে মনসূখ বা রহিত। [কুরতুবী] এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, বর্তমানে ইসলামী পরিভাষায় “সিজদাহ” বলতে যা বুঝায় এ সিজদাহর অর্থ তা নয়। ইসলামী পরিভাষায় যাকে সিজদা বলা হয়, সে সিজদা আল্লাহর পাঠানো শরী‘আতে তা কোনদিন গায়রুল্লাহর জন্য জায়েয ছিল না। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘কোন মানুষের জন্য অপর মানুষকে সিজ্‌দা করা বৈধ নয়।’ [নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা: ৯১৪৭; ইবন আবী শাইবাহ, হাদীস নং: ১৭১৩২]

أَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ ۚ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

ব্যাখ্যা[১]; আমার রব এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[২]।'

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۟ أَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০১. 'হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক।

---

(১) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে যখন পিতা-মাতা ও এগার ভাই একযোগে সিজ্‌দা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ল। তিনি বললেনঃ পিতঃ, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজ্‌দা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

(২) এরপর ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম পিতা-মাতার কাছে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করে বললেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল"।
ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। ভ্রাতারা যে তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা উল্লেখ করেননি, কারণ, তিনি তা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেয়া সমীচীন মনে করেননি। [কুরতুবী]
ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম তারপর বললেন, 'আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।' তিনি তাঁর বান্দার স্বার্থ যাতে রয়েছে তাতে তাকে এমনভাবে প্রবেশ করান যে, কেউ তা জানতে পারে না। [কুরতুবী]

আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন(১) ।’

১০২. এটা গায়েবের সংবাদ যা আপনাকে আমরা ওহী দ্বারা জানাচ্ছি(২); ষড়যন্ত্র কালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল, তখন আপনি তাদের সাথে ছিলেন না(৩) ।

ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَیۡبِ نُوۡحِیۡهِ اِلَیۡكَ ۚ وَمَا كُنۡتَ لَدَیۡهِمۡ اِذۡ اَجۡمَعُوۡۤا اَمۡرَهُمۡ وَهُمۡ یَمۡكُرُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

(১) পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাঁর কাছে দো‘আয় মশগুল হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ “হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন । হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার কার্যনির্বাহী । আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন ।” ‘পরিপূর্ণ সৎ বান্দা’ নবীগণই হতে পারেন । এ দো‘আয় ‘খাতেমা বিলখায়ের’ অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । আল্লাহ্ তা‘আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে যত উচ্চ মর্যাদাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদাই তাদের পদচুম্বন করুক, তারা কখনো গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন । তাই তারা দো‘আ করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরো যেন বৃদ্ধি পায় ।

(২) বলা হয়েছে, এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি । এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে-ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে । সূরা হূদের ৪৯ তম আয়াতে নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা প্রসঙ্গেও তাই বলা হয়েছে । এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে নবীগণকে গায়েবের সংবাদ বলে দেন । বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এসব গায়েবের সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী নবীগণের তুলনায় বেশী । এ কারণে তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে । ‘কিতাবুল-ফিতান’ শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসের গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে । এ সমস্ত গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দান করেছেন ।

(৩) ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য

১০৩. আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়[১]।

وَمَآ اَكۡثَرُ النَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِيۡنَ ۝١٠٣

১০৪. আর আপনি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। এ (কুরআন) তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।

وَمَا تَسۡـَٔلُهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۝١٠٤

বারতম রুকূ'

১০৫. আর আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সবকিছু দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন।

وَكَاَيِّنۡ مِّنۡ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ يَمُرُّوۡنَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُوۡنَ ۝١٠٥

১০৬. তাদের বেশীর ভাগই আল্লাহ্‌র

وَمَا يُؤۡمِنُ اَكۡثَرُهُمۡ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمۡ مُّشۡرِكُوۡنَ ۝١٠٦

আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই কাহিনী ঐসব গায়েবী সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল। এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেয়া আপনার নবুওয়াত, রিসালাত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। [ইবন কাসীর] কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারো কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারো কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

(১) অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী এ ঘটনাগুলো এজন্যই জানিয়েছেন যাতে এর দ্বারা মানুষের জন্য শিক্ষণীয় উপকরণ থাকে এবং মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার নাজাতের মাধ্যম হয়। তারপরও অনেক মানুষই ঈমান আনে না। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেন যে, আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছা যতই থাকুক না কেন অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে" [সূরা আল-আন'আম: ১১৬] [ইবন কাসীর] সুতরাং অধিকাংশ মানুষ ঈমান না আনলে আপনার কিছু করার নেই। আপনি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। [কুরতুবী]

উপর ঈমান রাখে, তবে তাঁর সাথে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়[১]।

أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তবে কি তারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে বা তাদের অজান্তে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ হয়ে গেছে[২]?

---

(১) এখানে এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করে, তারাও শির্কের সাথে করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে রব, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা স্বীকার করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইবাদাত করার সময় আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্যদেরও ইবাদাত করে। [তাবারী; কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; সা'দী] তাদের ঈমান হল আল্লাহ্‌র প্রভূত্বের উপর, আর তাদের শির্ক হল আল্লাহ্‌র ইবাদাতে। এ আয়াতের মধ্যে ঐ সমস্ত নামধারী মুসলিমও অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাতের পাশাপাশি পীর, কবর ইত্যাদির ইবাদাতও করে থাকে।

ইবনে কাসীর বলেনঃ যেসব মুসলিম ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শির্কে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেনঃ রিয়া (লোক দেখানো ইবাদাত) হচ্ছে ছোট শির্ক। [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৯] এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম করাকেও শির্ক বলা হয়েছে। [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১০/১৯৯, হাদীস নং ৪৩৫৮] আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা এবং যবেহ্ করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আরও এসেছে, 'মুশরিকরা তাদের হজের তালবিয়া পাঠের সময় বলত: 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান হুয়া লাকা তামলিকুহূ ওমা মালাক। (অর্থাৎ আমি হাযির আল্লাহ্ আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নেই, তবে এমন এক শরীক আছে যার আপনি মালিক, সে আপনার মালিক নয়) এটা বলত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ শির্কী তালবিয়া পড়ার সময় যখন তারা ('লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা) পর্যন্ত বলত, তখন তিনি বলতেন যথেষ্ট এতটুকুই বল। [মুসলিম: ১১৮৫] কারণ এর পরের অংশটুকু শির্ক। তারা ঈমানের সাথে শির্ক মিশ্রিত করে ফেলেছে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর

১০৮. বলুন, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে, আমি[১] এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও[২]। আর

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, নবীগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে-লূতের জনপদসমূহকে উল্টে দেয়া হয়েছে। কওমে-'আদ ও কওমে সামূদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে তাদের উপর এ ধরনের আযাব আসার ব্যাপারে তারা কিভাবে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছে? আর আখেরাত তা তো তাদের কাছে হঠাৎ করেই আসবে। যখন তারা সেটার আগমন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। ইবন আব্বাস বলেন, যখন আখেরাতের সে চিৎকার আসবে তখন তারা বাজারে ও তাদের কর্মস্থলে কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকবে। [বাগভী]

(১) অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমার তরীকা এই যে, মানুষকে সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকব -আমি এবং আমার অনুসারীরাও। এটাই আমার পথ, পদ্ধতি ও নিয়ম যে আমি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই একমাত্র তিনিই মা'বুদ, তাঁর কোন শরীক নেই, এ সাক্ষ্য দানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাব। জেনে বুঝে, বিশ্বাস ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে এ পথে আহ্বান জানাবো। অনুরূপভাবে যারা আমার অনুসরণ করবে তারা সবাই এ পথের দাওয়াত দিবে। যে পথে তাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন। তারাও এটা করবে সম্পূর্ণরূপে জেনে-বুঝে, শরী'আত ও বিবেক অনুমোদিত পদ্ধতিতে। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। আমার উপর যারা ঈমান আনবে এবং আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তারাও এ দাওয়াতের কাজ করবে। [বাগভী]

(২) 'যারা আমার অনুসরণ করেছে' এখানে 'তার অনুসরণকারী কারা তা নির্ধারণে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এতে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞানের বাহক। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাদের চরিত্র অভ্যাস ও তরীকা আয়ত্ত কর। কেননা, তারা সরল পথের পথিক। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেনঃ এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং

আল্লাহ্ কতই না পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই[১]।'

১০৯. আর আমরা আপনার আগেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে[২] পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম[৩],

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟

কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। [বাগভী; কিওয়ামুস সুন্নাহ আল-ইস্ফাহানী, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ: ৪৯৮]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ শির্ক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শির্ককেও যুক্ত করে দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শির্ক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ্র দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই।

(২) এ আয়াতেই ﴿أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ﴾ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণতঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই রাসূল প্রেরণ করেছেন; কোন গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হননি। কারণ, সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাতপদ হয়ে থাকেন। [ইবন কাসীর] ইয়াকূব 'আলাইহিস্ সালামও শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তারা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। তাই কুরআনের সূরা ইউসুফেরই ১০০ নং আয়াতে তাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে কাফেরদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যেখানে তারা ফিরিশতার উপর এ কুরআন নাযিল হলো না কেন তা জিজ্ঞেস করেছিল। উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, আমি তো কেবল নগরবাসী পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে নবীগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, নবী সবসময় পুরুষই হন। নারীদের মধ্যে কেউ নবী বা রাসূল হতে পারে না। মূলতঃ এটাই বিশুদ্ধ মত যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রাসূল হিসেবে পাঠাননি। কোন কোন আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার দাবী করেছেন; উদাহরণতঃ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বিবি সারা, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর জননী এবং ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর জননী মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে ফিরিশ্তারা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপকসংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

যাদের কাছে ওহী পাঠাতাম। তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? ফলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল? আর অবশ্যই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম[১]; তবুও কি তোমরা বুঝ না?

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ (তাদের সম্প্রদায়ের ঈমান থেকে) নিরাশ হলেন এবং লোকেরা মনে করল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমাদের সাহায্য আসল। এভাবে আমরা যাকে ইচ্ছে করি সে নাজাত পায়। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

১১১. তাদের বৃত্তান্তে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা[২]।

মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুওয়াত ও রেসালাত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। [ইবন কাসীর]

(১) বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা আখেরাতের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, আখেরাতের সুখ-শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ আল্লাহ্‌র নিষেধকৃত যাবতীয় বিষয় থেকে নিজেকে হেফাযত করে শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

(২) অর্থাৎ নবীদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। এর অর্থ সমস্ত নবীর কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

এটা কোন বানানো রচনা নয়। বরং এটা আগের গ্রন্থে যা আছে তার সত্যায়ন[১] ও সব কিছুর বিশদ বিবরণ, আর যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

(১) অর্থাৎ এ কুরআন কোন মনগড়া কথা নয়। এর পূর্বে যা ছিল সেগুলোর মধ্যে যা যা সত্য সেগুলোকে এ কুরআন সমর্থন করে আর যেগুলো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করে। [ইবন কাসীর] অথবা এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তাওরাত ও ইঞ্জিলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। [কুরতুবী]

১৩- সূরা আর-রা'দ, ৪৩ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ الرَّعۡدِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. আলিফ্-লাম-মীম্-রা, এগুলো কিতাবের আয়াত, আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সত্য(১); কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই ঈমান আনে না(২) ।

الٓمّٓرٰ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيۡۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ الۡحَـقُّ وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝١

২. আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া(৩), তোমরা

اَللّٰهُ الَّذِىۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ثُمَّ

(১) আয়াতের প্রথমে "এগুলো কিতাবের আয়াত আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তা সত্য" বলে কি বুঝানো হয়েছে তাতে দু'টি মত রয়েছে। এক, এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে, [তাবারী; বাগভী] আর তখন "আর যা আপনার রব হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তাবারী] দুই, এখানে "এগুলো কিতাবের আয়াত" বলে কুরআনুল কারীম আল্লাহ্‌র কালাম এবং "আর যা আপনার রব এর পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে" বলে কুরআনই বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] সে মতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কুরআনে যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি নাযিল হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত। সেগুলোকে আঁকড়ে ধরুন। [বাগভী]

(২) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীর ভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়" [সূরা ইউসুফ: ১০৩]

(৩) আয়াতের এক অনুবাদ উপরে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে কোন খুঁটি ব্যতীত উপরে উঠিয়েছেন, তোমরা সে আসমানসমূহকে দেখতে পাচ্ছ। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন এক সত্তা, যিনি আসমানসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আসমানসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ। এ অর্থের স্বপক্ষে আমরা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র দেখতে পাই সেখানে বলা হয়েছে, "আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া।"[সূরা আল-হাজ্জঃ৬৫] তবে আয়াতের অন্য এক অনুবাদ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ অনুবাদটি ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] তবে ইবন কাসীর প্রথম তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ

তা দেখছ[১]। তারপর তিনি 'আর্‌শের উপর উঠেছেন[২] এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন[৩]; প্রত্যেকটি

(১) কুরআনুল কারীমের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে ﴿وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [সূরা আল-গাশিয়াহ্‌ঃ ১৮] বলা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এটা এসেছে যে, যমীনের আশেপাশে যা আছে যেমনঃ বাতাস, পানি ইত্যাদি প্রথম আসমান এ সবগুলোকে সবদিক থেকে সমভাবে বেষ্টন করে আছে। যে কোন দিক থেকেই প্রথম আসমানের দিকে যাত্রা করা হউক না কেন তা পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বে রয়েছে। আবার প্রথম আসমান বা নিকটতম আসমানের পুরূত্বও পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের মত। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আসমানও প্রথম আসমানকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছে। এ দুটোর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের মত। আবার দ্বিতীয় আসমানের পুরূত্বও পাঁচশত বছরের রাস্তার মত। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানও তদ্রূপ দূরত্ব ও পুরুত্ব বিশিষ্ট। এ আসমানসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে কোন প্রকার বাহ্যিক খুঁটি ব্যতীতই ধারন করে রেখেছেন। সেগুলো একটির উপর আরেকটি পড়ে যাচ্ছেনা এটা একদিকে যেমন তাঁর মহা শক্তিধর ও ক্ষমতাবান হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে অন্যদিকে আসমান ও যমীন যে কত প্রকাণ্ড সৃষ্টি তার এক প্রচ্ছন্ন ধারণা আমাদেরকে দেয়। [ইবন কাসীর] মহান আল্লাহ্ বলেন, "মানুষকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।" [সূরা গাফেরঃ ৫৭] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং তাদের মত পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। [সূরা আত-ত্বালাকঃ ১২] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাত আসমান ও এর ভিতরে যা আছে এবং এর মাঝখানে যা আছে তা সবই কুরসীর মধ্যে যেন বিস্তীর্ণ যমীনের মধ্যে একটি আংটি আর কুরসী হলো মহান আরশের মধ্যে তদ্রূপ একটি আংটি স্বরূপ যা এক বিস্তীর্ণ যমীনে পড়ে আছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আরশ তার পরিমাণ তো মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নির্ধারণ করে বলতে পারবে না। [তাবারী]

(২) এর ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহ এবং সূরা আল-আ'রাফে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে সংক্ষেপে এখানে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ আরশের উপর উঠার ব্যাপারটি তাঁর একটি বিশেষ গুণ। তিনি আরশের উপর উঠেছেন বলে আমরা স্বীকৃতি দেব। কিন্তু কিভাবে তিনি তা করেছেন তা আমাদের জ্ঞানের বাইরের বিষয়।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে। আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে তিনি সৃষ্টিকুলের উপকারের

لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝٢

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে(১) । তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন(২), যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার(৩) ।

জন্য, তাঁর বান্দাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত করেছেন, মূলতঃ প্রতিটি সৃষ্টিই স্রষ্টার আজ্ঞাধীন। [কুরতুবী] যে কাজে তাদেরকে আল্লাহ্ নিয়োজিত করেছেন তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। [কুরতুবী]

(১) আয়াতে উল্লেখিত أجل শব্দটির মূল অর্থঃ সময়। তবে অন্যান্য অর্থেও এর ব্যবহার আছে। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ বর্ণনায় কয়েকটি মত রয়েছেঃ
এক, এখানে ﴿أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ বা সুনির্দিষ্ট মেয়াদ বলতে বুঝানো হয়েছে যে, চাঁদ ও সূর্য কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে থাকবে। যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে, চাঁদকে নিষ্প্রভ করা হবে, তারকাসমূহ আলোহীন হয়ে পড়বে আর গ্রহ নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে, তখন পর্যন্ত এগুলো চলবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ" [সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮] এখানে গন্তব্য বলে সুনির্দিষ্ট সময়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]
দুই, কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে। [কুরতুবী]
তিন, অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের প্রতি ধাবিত করান। আর সে গন্তব্যস্থান হলো আরশের নীচে। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বিস্তারিত এসেছে সূরা ইয়াসীনে যার বর্ণনা আসবে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এর মানে, আল্লাহ্ তা'আলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলী তিনি বর্ণনা করছেন। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তিনি বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করছেন যে, যিনি পূর্ব বর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন তিনি অবশ্যই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় আনতে সক্ষম। [কুরতুবী] এগুলো আরও প্রমাণ করছে যে, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাঁর সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য

৩. আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন[১] এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়[২]। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন[৩]।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ③

কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে আখেরাত ও কেয়ামতে বিশ্বাসী হও এবং সত্য বলে মেনে নাও। [বাগভী] কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর আখেরাতে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্‌র শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না।

(১) পূর্বের আয়াতে উপরস্থিত আসমানের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছেন। আর এখানে নিচের বা যমীনের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল কারীম সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্ট জীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পর্বত-শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কুপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

(২) অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফল-ফসলের দু'প্রকার সৃষ্টি করছেনঃ লাল-হলুদ, টক-মিষ্টি। [বাগভী] তবে এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টি اثْنَيْنِ زَوْجَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ফলই দু' প্রকার হয়, রঙের দিক থেকে যেমন, সাদা-কালো, অথবা স্বাদের দিক থেকে যেমন, মিষ্টি-টক, অথবা আকৃতির দিক থেকে যেমন, বড়-ছোট, অথবা অবস্থাগত দিক থেকে যেমন, গরম ও ঠাণ্ডা। [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে, زَوْجَيْنِ এর অর্থ নর ও মাদী হওয়া [কুরতুবী]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি

নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য[১]।

৪. আর যমীনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড[২], আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একই মূল থেকে উদগত বা ভিন্ন

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ

নিয়ে আসেন; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে কালো করে দেয়া হয়। ফলে স্বচ্ছ শুভ্র উজ্জ্বল থাকার পর সেটা অন্ধকার কালোতে রূপান্তরিত হয়। [ফাতহুল কাদীর] আবার আরেক অর্থে, তিনি এ দু'টিকে এমন করেছেন যে, এর প্রত্যেকটি অপরটিকে তাড়িয়ে বেড়ায়। [ইবন কাসীর] একটি যাওয়ার সাথে সাথে আরেকটি আসবেই। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও তাদের বাসস্থান যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন তেমনি তিনি সময়ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

(১) উপরে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনাবলীকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলোতে কেউ চিন্তাভাবনা করলে অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনই আর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, আল্লাহর আদালতে মানুষের হাযির হওয়া এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব খবর দিয়েছেন সেগুলো সবই সত্য। [বাগভী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নতুন করে অন্য আরেক প্রকার নিদর্শন পেশ করছেন। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদনে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ গুলোর কোনটি এমন যে, তাতে শস্য উৎপন্ন হয় আবার কোন কোনটি একেবারে অকেজো ভূমি যাতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয়না অথচ এ দু'ধরনের ভূমিই পাশাপাশি অবস্থিত। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমান জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না। এ ভুখণ্ড লাল, অপরটি সাদা, কোনটি হলুদ, কোনটি কালো, কোনটি পাথুরে, কোনটি সমতল, কোনটি বালুময়, কোনটি দো-আঁশ, কোনটি মিহি, অথচ সবগুলোই পাশাপাশি। প্রতিটি তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে। এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ক্ষমতাধর সত্তা রয়েছেন যিনি এগুলো করেছেন। তিনিই একমাত্র ইলাহ, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই একমাত্র রব, তিনি ব্যতীত আর কোন রব নেই। [ইবন কাসীর] তাছাড়া কোন কোন ভুমি পাশাপাশি নয় অথচ তাদের মধ্যে একই ধরণের শক্তি, যোগ্যতা পাওয়া যায়। এখানে 'পাশাপাশি নয়' এ কথাটি উহ্য থাকতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ④

ভিন্ন মূল থেকে উদগত খেজুর গাছ[১] যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর স্বাদ-রূপের ক্ষেত্রে সেগুলোর কিছু সংখ্যককে আমরা কিছু সংখ্যকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি[২]। নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন[৩]।

---

(১) কিছু কিছু খেজুর গাছের মূল থেকে একটি খেজুর গাছ বের হয় আবার কিছু কিছুর মূল থেকে একাধিক গাছ বের হয়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ এবং তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলী দেখানো ছাড়া আরো একটি সত্যের দিকেও সূক্ষ্ম ইশারা করা হয়েছে। এ সত্যটি হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি। একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন, স্বাদ, গন্ধ, রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দু'টি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্টের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে অবশ্যই এতে একজন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সত্তার কার্য সক্রিয় আছে দেখতে পাবে। যিনি তার অসীম ক্ষমতায় এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সবশেষে বলেছেন যে, নিশ্চয় বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে রয়েছে প্রচুর নিদর্শন। [ইবন কাসীর]

(৩) বলা হচ্ছে, এই যে পরস্পর পাশাপাশি দু'টি ভুমিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেন, তন্মধ্যে একই ফল একই জমিতে একই পানি দ্বারা উৎপন্ন করি তারপরও সেটার স্বাদ দু'রকমের হয়। একটি মিষ্ট অপরটি টক। একটি অত্যন্ত উন্নতমানের অপরটি অনুন্নত পর্যায়ের। একটি চিত্তাকর্ষক অপরটি তেমন নয়। এসব কিছুতে কেউ চিন্তা, গবেষণা ও বিবেক খাটালে যে কেউ অবশ্যই মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, এর বিভিন্নতার প্রকৃত কারণ এক মহান প্রজ্ঞাময় সত্তার শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, সাধারণত: যে কারণে ফল-ফলাদিতে পার্থক্য সূচিত হয় তা দু'টি। এক. উৎপন্নস্থানের ভিন্নতা, দুই. পানির গড়মিল। কিন্তু যদি জমি ও পানি একই প্রকার হয়, তারপর যদি সেটাতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ফল পরিলক্ষিত হয় তবে বিবেকবান মাত্রই এটা বলতে বাধ্য হবে যে, এটা সেই অপার শক্তি ও আশ্চর্যজনক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

মুজাহিদ বলেন, এটা মূলত: আদম সন্তানদের জন্য একটি উদাহরণ, তাদের মধ্যে

৫. আর যদি আপনি বিস্মিত হন, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা[১]ঃ 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব[২]?'

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ

নেককার ও বদকার হয়েছে অথচ তাদের পিতা একজনই। হাসান বসরী বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানদের হৃদয়ের জন্য পেশ করেছেন। কারণ, যমীন মহান আল্লাহ্র হাতে একটি কাদামাটির পিণ্ড ছিল। তিনি সেটাকে বিছিয়ে দিলেন, ফলে সেটা পরস্পর পাশাপাশি টুকরায় পরিণত হলো, তারপর তাতে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, ফলে তা থেকে বের হলো, ফুল, গাছ, ফল ও উদ্ভিদ। আর এ মাটির কোনটি হল খারাপ, লবনাক্ত ও অস্বচ্ছ। অথচ এগুলো সবই একই পানি দিয়ে সিক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষও আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর আসমান থেকে তাদের জন্য স্মরণিকা (কিতাব) নাযিল হলো, কিছু অন্তর নরম হলো এবং বিনীত হলো, আর কিছু অন্তর কঠোর হলো এবং গাফেল হলো। হাসান বসরী বলেন, কুরআনের কাছে কেউ যখন বসে তখন সে সেখান থেকে বেশী বা কম কিছু না নিয়ে বের হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত , কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে" [সূরা আল-ইসরা: ৮২] এতে অবশ্যই বিবেকবানদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। [বাগভী]

(১) এ আয়াত ও পরবর্তী দুটি আয়াতে কাফেরদের মৌলিক তিনটি সন্দেহ ও তার উত্তর দেয়া হয়েছে। সন্দেহগুলো হচ্ছে, এক. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব কিতাব অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন, "আর কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে বলে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও অবশ্যই তোমরা হবে নতুনভাবে সৃষ্ট!" [সূরা সাবাঃ ৭] দুই. তাদের দ্বিতীয় সন্দেহটি হচ্ছে, যদি বাস্তবিকই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? তিন. কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক মু'জিযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এ সন্দেহ তিনটির উত্তর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য ৫ নং আয়াত এবং পরবর্তী ৬ ও ৭ নং আয়াতে প্রদান করেছেন।

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, কাফেররা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর প্রমাণসমূহ দেখে তিনি যা ইচ্ছে করতে সক্ষম এটার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য, তারপর তারা স্বীকার করছে যে,

اَصۡحٰبُ النَّارِ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۵﴾

এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে[১] আর এরাই তারা,

তিনিই সবকিছু প্রথম সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনি যখন প্রথম সৃষ্টি করেছেন তখন তারা কিছুই ছিল না। এতকিছুর পরও যদি কাফেররা প্রতিটি সৃষ্টিকে পুনর্জীবনের বিষয়টির উপর মিথ্যারোপ করে তবে আপনি অবশ্যই আশ্চর্য হবেন। কিন্তু তার চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী; ইবন কাসীর] কুরআনুল কারীম এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। তবে যেটা অন্য আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চাইতে অনেক বড় ব্যাপার। আর যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন তার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অনেক সহজ। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুওয়াতের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়াত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে? কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে, এটা কি সম্ভবপর? [বাগভী] কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে? আল্লাহ্ বলেন, "আর তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা আল-আহকাফ: ৩৩] সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্‌র শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদু'ভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন। মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়াত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিনকে অস্বীকার করা।

(১) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার পরিণতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা

যাদের গলায় থাকবে শিকল[১] । আর তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।

৬. আর তারা ভালোর পূর্বেই মন্দের জন্য তাড়াহুড়ো করছে । অথচ তাদের আগে শাস্তির অনুরূপ বহু (শিক্ষণীয়) দৃষ্টান্ত গত হয়েছে[২] । আর নিশ্চয় আপনার

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ

এর মাধ্যমে তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে । [ইবন কাসীর] কারণ, আখেরাতে মানুষকে পুনর্বার নিয়ে আসা আল্লাহ্র জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণ । তাদের আখেরাত অস্বীকার ছিল মূলত আল্লাহ, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞান অস্বীকারের নামান্তর । এজন্য তারা কাফের হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ।

(১) দুনিয়াতে তারা যেহেতু কুফরী করেছে সেহেতু তাদেরকে আখেরাতে এর পরিণতি ভোগ করতেই হবে । আখেরাতে তাদের পরিণতি হচ্ছে, তাদের গলায় থাকবে শেকল পরানো । গলায় শেকল পরানো থাকা কয়েদী হবার আলামত । তাদের গলায় যে শেকল পরানো হবে তা হবে আগুনের শিকল । [মুয়াসসার] তাদেরকে তা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । [ইবন কাসীর]

(২) কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল, যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? কখনো তারা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলতে থাকেঃ "হে আমাদের রব! এখনই তুমি আমাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দাও । কিয়ামতের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রেখো না ।" [সূরা সোয়াদঃ ১৬] । আবার কখনো বলতে থাকেঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাগুলো পেশ করছে এগুলো যদি সত্যি হয় এবং তোমারই পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করো ।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩২] । আবার কখনো তারা রাসূলকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বলতে থাকেঃ "তারা বলে, 'ওহে যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ । 'তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফিরিশ্তাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন?' আমরা ফিরিশ্তাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া নাযিল করি না; ফিরিশ্তারা উপস্থিত হলে তারা অবকাশ পাবে না ।" [সূরা আল-হিজরঃ ৬-৮] এ আয়াতে কাফেরদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর জবাব দিয়ে বলা হয়েছেঃ এ মূর্খের দল কল্যাণের আগে অকল্যাণ চেয়ে নিচ্ছে । আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে এরা এ অবকাশকে দ্রুত খতম করে দেয়ার এবং এদের বিদ্রোহাত্মক কর্মনীতির কারণে এদেরকে অনতিবিলম্বে পাকড়াও করার দাবী জানাচ্ছে । অন্যত্র

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥

রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুলুম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে কঠোর(১) ।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن

৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তার রবের কাছ থেকে তার উপর

বলা হয়েছেঃ "তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আসত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৫৩-৫৪] আরো এসেছে, "যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়।" [সূরা আশ-শূরাঃ ১৮]। মোটকথাঃ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে। এটা ছিল তাদের অবিশ্বাস, কুফরি, অবাধ্যতা, বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির চরম পর্যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদেরকে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ, উপদেশ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় তাদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مثلات শব্দটি مثلة -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। [ফাতহুল কাদীর]

(১) বলা হয়েছে, "মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও আপনার রব তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল"। মানুষের শত অন্যায়কেও তিনি ক্ষমা করেন। যদি তিনি ক্ষমাশীল না হতেন তবে কারোই রেহাই ছিল না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা ফাতিরঃ ৪৫] আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তিনি যে শুধু ক্ষমাশীল তা-ই নয় বরং তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর বান্দাকে আশা ও ভীতির মধ্যে রাখেন। [যেমন, সূরা আল-আন'আমঃ ১৪৭, সূরা আল-আ'রাফঃ ১৬৭, সূরা আল-হিজরঃ ৪৯-৫০] যাতে করে মানুষের জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকে। শুধু আশার বাণী শুনতে শুনতে মানুষ সীমালজ্ঘন করতে দ্বিধা করবে না। আবার শুধু ভয়-ভীতির কথা শুনতে শুনতে মানুষের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠবে না। এটাই আল্লাহ্ তা'আলা চান। সে জন্য তিনি যখনই কোন আশার কথা শুনিয়েছেন সাথে সাথেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ আশা ও ভীতির মাঝেই হলো ঈমানের অবস্থান। [ইবন কাসীর]

رَبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنۡتَ مُنۡذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ ۝

কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন[১]?' আপনি তো শুধু সতর্ককারী, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক[২]।

দ্বিতীয় রুকূ'

اَللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ اُنۡثٰى وَمَا تَغِيۡضُ الۡاَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُ ؕ وَكُلُّ شَىۡءٍ عِنۡدَهٗ بِمِقۡدَارٍ ۝

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন[৩] এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক

---

(১) কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূলের কাছে বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এখানে তারা এমন নিশানীর কথা বলতে চাচ্ছিল যা দেখে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর রাসূল হবার উপর ঈমান আনতে পারে। এটা ছিল মূলতঃ তাদের গোঁড়ামী। যেমন এর পূর্বেও তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার অযথা আব্দার করেছিল। তারা আরও বলেছিল যে, আপনি মক্কার পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দিন। সে পাহাড়ের জায়গায় নদী-নালার ব্যবস্থা করে দিন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে শুধু এটাই বিরত রেখেছে যে, তাদের পূর্ববর্তীগণ তাতে মিথ্যারোপ করেছিল।" [সূরা আল-ইসরা: ৫৯] [ইবন কাসীর] মু'জিযা প্রকাশ করা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারো দাবী ও ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যই বলা হয়েছেঃ ﴿اِنَّمَآ اَنۡتَ مُنۡذِرٌ﴾ অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

(২) আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী আর প্রতিটি কাওমের জন্য রয়েছে হিদায়াতকারী নবী, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করবেন। [বাগভী; ইবন কাসীর] দুই. আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং প্রতিটি কাওমের জন্যও আপনি হিদায়াতকারী অর্থাৎ আহ্বানকারী। [বাগভী; ইবন কাসীর] তিন. সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এর অর্থ আপনি তো একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর সত্যিকার হিদায়াতকারী তো আল্লাহ্ তা'আলাই। [বাগভী; ইবন কাসীর] প্রথম মতটিকে ইমাম শানকীতী প্রাধান্য দিয়ে বলেন, এর সমার্থে অন্যত্র এসেছে, "আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আছে একজন রাসূল" [সূরা ইউনুস: ৪৭] আরও এসেছে, "আর এমন কোন উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী" [সূরা ফাতির : ২৪] আরও এসেছে, "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম" [সূরা আন-নাহল: ৩৬] [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এর অর্থ হচ্ছে, মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অংগ-প্রত্যংগ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও

বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

৯. তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ(১)।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝

মানসিক ক্ষমতার যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ তা সবই আল্লাহ্ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে তাও আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলেমুল গায়েব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যা কিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে। [সূরা লোকমানঃ ৩৪] আমরা যদি সূরা লোকমান এর এ আয়াতটির সাথে আলোচ্য সূরার ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে তাফসীর করি তাহলে বর্তমান কালের এ আয়াত সংক্রান্ত অনেক সন্দেহের জবাব দেয়া সহজ হয়ে যাবে। কারণ সূরা লোকমানের আয়াতে যা বলা হয়েছে এ আয়াত তার তাফসীর হতে পারে। ফলে গর্ভাশয়ে অবস্থিত সন্তানের অবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেলেও তা সূরা লোকমান এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি গায়েব এর জ্ঞানের দাবী কেউ করতে পারবে না। বিশেষ করে সহীহ হাদীসে গায়েবের পাঁচটি বস্তু বর্ণনায় যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাও এ তাফসীর সমর্থন করছে। হাদীসে এসেছে, "পাঁচটি বিষয় হলো সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা জানে না ... আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস হয় তা জানে না।" [বুখারীঃ ৪৬৯৭] আর এটা সর্বজনবিদিত যে, গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বা হবে তা কেউ কোন দিন বলে দিতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত---যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে।" [সূরা আন-নাজম: ৩২] আরও বলেন, "তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন" [সূরা আলে ইমরান:৬] আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন কোন মহিলা কোন ধরণের সন্তান গর্ভে ধারণ করবে। তখন ما টি হবে موصولة [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে বা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট সমান[১]।

سَوَآءٌ مِّنۡكُمۡ مَّنۡ اَسَرَّ الۡقَوۡلَ وَمَنۡ جَهَرَ بِهٖ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفٍۢ بِالَّيۡلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿۱۰﴾

الكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং المتعال-এর অর্থ উচ্চ। তিনি মান মর্যাদার দিক থেকে যেমন সবার উপরে, ক্ষমতার দিক থেকেও সবার উপরে। অনুরূপভাবে তিনি অবস্থানের দিক থেকেও সবার উপরে। [ইবনুল কাইয়েম, মাদারিজুস সালেকীন: ১/৫৫] উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সবার চেয়ে বড়, তিনি সবকিছুর উপরে। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর ঊর্ধ্বে। কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি-দোষে তারা আল্লাহ্‌কে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমনসব গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। তিনি সেগুলো থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। [ফাতহুল কাদীর] উদাহরণতঃ ইয়াহূদী ও নাসারাগণ আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। আরবের মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআনুল কারীম তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছেঃ ﴿سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ﴾ [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১] -অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র যেগুলো তারা বর্ণনা করে। প্রথম ﴿عٰلِمُ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ এবং তৎপূর্ববর্তী ﴿اَللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ اُنۡثٰى﴾ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় ﴿الۡكَبِيۡرُ الۡمُتَعَالِ﴾ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্মের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার ঊর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। [সূরা আল-মুলকঃ ১৩-১৪] আরো বলেছেনঃ "যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।" [সূরা ত্বা-হাঃ ৭] অন্য আয়াতে বলেছেনঃ "এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর আর যা প্রকাশ কর" [সূরা আন-নামলঃ ২৫] অন্যত্র বলেছেনঃ "সাবধান! নিশ্চয়ই ওরা তাঁর কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! ওরা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন ওরা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। অন্তরে যা আছে, নিশ্চয়ই তিনি তা সবিশেষ অবহিত।" [সূরা হূদঃ ৫] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ

১১. মানুষের জন্য রয়েছে তার সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্

জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়।

(১) مُعَقِّبٰتٌ শব্দটি معقبة এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে معقبة অথবা متعقبة বলা হয়। ﴿مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ﴾ এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। ﴿مِنۡ خَلۡفِهٖ﴾ এর অর্থ পশ্চাদ্দিক। আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে।

এক. তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের কারণে তাকে হেফাযত করে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘুরাফেরা করে- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফিরিশ্‌তাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মূখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। রাতে তাদের জন্য কিছু পাহারাদার রয়েছে, যেমন রয়েছে দিনে। তারা তাকে বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে হেফাযত করে। যেমন আরও কিছু ফেরেশতা রয়েছে যারা তার ভাল কিংবা মন্দ আমল হেফাযত করে। রাতে কিছু ফেরেশতা দিনে কিছু ফেরেশতা। তার ডানে বামে দুজন, যারা তার আমল লিখে। ডান দিকের ফেরেশতা তার সৎকর্ম লিখে, আর বাম দিকের ফেরেশতা তার অসৎকর্ম লিখে। আবার দুজন ফেরেশতা রয়েছে যারা তাকে হেফাযত করে, একজন তার সামনের দিকে অপরজন তার পিছনের দিকে। সুতরাং সে দিনে রাতে চার ফেরেশতার মাঝখানে বসবাস করে। যারা পরিবর্তিতভাবে আগমন করে থাকে। দু'জন আমল হেফাযতকারী আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব। আর বাকী দু'জন লিখক। তাদের আমলনামা লিখে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছেঃ 'ফিরিশ্‌তাদের দু'টি দল হেফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজর ও আসরের সালাতের সময় একত্রিত হন। ফজরের সালাতের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের সালাতের পর তারা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফিরিশ্‌তারা

اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ⑪

কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে(১)।

দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।' [বুখারীঃ ৭৪২৯, মুসলিমঃ ৬৩২]
দুই. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণিত আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে তাকে হেফাযত করে।[ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাঁর কোন প্রকার আযাব যেমন, জিন ইত্যাদি থেকে তাদেরকে হেফাযত করে। [কুরতুবী] তারপর যখন তার তাকদীর অনুসারে কোন কিছু ঘটার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসে তখন ফিরিশ্‌তাগণ সরে পড়ে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফিরিশ্‌তাগণ তার হেফাযত করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ তবে কোন মানুষের তাকদীর লিখিত বিপদাপদে জড়িত হওয়ার সময় ফিরিশ্‌তারা সেখান থেকে সরে যায়।' [ইবনে হাজারঃ ফাতহুল বারী ৮/৩৭২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন ফিরিশ্‌তা এবং একজন শয়তান জুড়ে দেয়া আছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার সাথেও? তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সহযোগিতা করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পন করেছে, বা আমি নিরাপদ হয়ে গেছি, সে আমাকে ভাল কাজ ছাড়া আর কোন কিছুর নির্দেশ দেয় না।' [মুসলিমঃ ২৮১৪]। মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফিরিশ্‌তা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকের বিপদাপদ থেকেই মানুষকে নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তন করে না নেয়।" [বাগভী] তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। এ পরিবর্তন হয় তারা নিজেরা করে, অথবা তাদের উপর যারা কর্তৃত্বশীল তারা করে, নতুবা তাদেরই মধ্যকার অন্যদের কারণে সেটা সংঘটিত হয়। যেমন উহুদের মাঠে তীরন্দাযদের স্থান পরিবর্তনের কারণে মুসলিমদের উপর বিপদ এসে পড়েছিল। ইসলামী শরী'আতে এরকম আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে আয়াতের অর্থ এ নয় যে, তিনি কারও কোন গুনাহ ব্যতীত তাদের উপর বিপর্যয় দেন না। বরং কখন কখনও অপরের গুনাহের কারণে বিপর্যয় নেমে আসে। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আমাদের মধ্যে নেককাররা থাকা অবস্থায় কি আমাদের ধ্বংস করা হবে? তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, যখন অন্যায় অপরাধ ও পঙ্কিলতা

আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছে করেন তবে তা রদ হওয়ার নয়[১] এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই ।

১২. তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও আশা-আকাংখারূপে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ[২];

هُوَالَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

বৃদ্ধি পায়' [বুখারী: ৩৩৪৬; মুসলিম: ২৮৮০]
সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফিরিশ্তাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে পাপাচার, ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে । এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এটা এজন্যে যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি ওদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন; [সূরা আল-আনফালঃ৫৩]

(১) বলাবাহুল্য, যখন আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে আঘাত দিতে চান, বিপদে ফেলতে চান, অসুখ দিতে চান, রোগাক্রান্ত করতে চান, তখন কেউ তার সে বিপদ ফেরাতে পারে না [কুরতুবী] আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থেও কেউ এগিয়ে আসতে পারে না । সুতরাং তোমরা এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, যাই কিছু করতে থাকো না কেন আল্লাহর দরবারে এমন কোন শক্তিশালী পীর, ফকীর বা কোন পূর্ববর্তী -পরবর্তী মহাপুরুষ অথবা কোন জিন বা ফেরেশতা আছে যে তোমাদের নযরানার উৎকোচ নিয়ে তোমাদেরকে অসৎকাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না ।' [আল-আন'আমঃ ১৪৭] আরো বলেছেন "অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি রদ করা যায় না ।" [সূরা ইউসুফঃ ১১০]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করান । এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে । কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয় । আবার এটা আশার সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন । [বাগভী] আল্লাহ্ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন । কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে মুসাফিরের জন্য কষ্টের ভয় এবং মুকীম বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীর জন্য আশার বৃষ্টি ও রহমতের কারণ বলা হয়েছে । [ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

১৩. আর রা'দ তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে[১] এবং ফেরেশ্‌তাগণও তা-ই করে তাঁর ভয়ে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান অতঃপর যাকে ইচ্ছে তা দ্বারা আঘাত করেন[২] এবং তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, আর তিনি শক্তিতে প্রবল শাস্তিতে কঠোর[৩]।

---

(১) অর্থাৎ রা'দ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ্ পাঠ করে এবং ফিরিশ্‌তারা তাঁর ভয়ে তাসবীহ্ পাঠ করে। মুজাহিদ বলেন, রা'দ বলে যদি মেঘের গর্জন বুঝা হয়, তবে এ তাসবীহ্ পাঠ করার অর্থ হবে আল্লাহ্ তাতে জীবন সৃষ্টি করেন। [কুরতুবী] অথবা এটা ঐ তাসবীহ্ যা কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, "সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না" [সূরা আল-ইসরাঃ ৪৪] [ইবন কাসীর] কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ফিরিশ্‌তার নাম রা'দ। [দেখুন, তিরমিযীঃ ৩১১৭] এই অর্থে তাসবীহ্ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

(২) হাদীসে এসেছে, এক প্রতাপশালী লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠালে সে লোক বললঃ কে আল্লাহ্র রাসূল? আল্লাহ্ কি? সোনার না রূপার? নাকি পিতলের? এভাবে তিনবার সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো লোককে বলে পাঠাল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত করালেন। ফলে তার মাথা গুঁড়িয়ে যায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবনে আবি আসেমঃ আস্‌সুন্নাহঃ ৬৯২]

(৩) এখানে محال শব্দটি মীমের নীচে كسرة বা যের যোগে। যার অর্থঃ কৌশল, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি [বাগভী] শব্দটির বিভিন্ন অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তারা আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। [মুয়াসসার] তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল। যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে যে কোন কৌশল তিনি এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন যে, আঘাত আসার এক মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারে না কখন কোন দিক থেকে তার উপর আঘাত আসছে। এ ধরনের একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তা সম্পর্কে যারা না ভেবেচিন্তে এমনি হালকাভাবে আজেবাজে কথা বলে, কে তাদের বুদ্ধিমান বলতে পারে? তাঁর ক্ষমতা ও কৌশল সম্পর্কে কারও

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۗ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾

১৪. সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, তাদেরকে কোন কিছুতেই তারা সাড়া দেয় না[১]; তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এ আশায় তার দুহাত মেলে ধরে পানির দিকে, অথচ তা তার মুখে পৌঁছার নয়, আর কাফিরদের আহ্বান তো কেবল ভ্রষ্টতায় নিপতিত[২]।

কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তিনি যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও থেকে কেউই পালিয়ে যেতে পারবে না। [সা'দী] সুতরাং যদি তিনিই কেবল বান্দাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাদের জন্য রিযিকের মৌলিক ব্যবস্থাপনা করেন, তিনিই যদি তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত বড় বড় সৃষ্টি যেগুলো বান্দাদের মনে ভীতির উদ্রেক করে এবং বিরক্তির সঞ্চার করে তারাও যদি তাঁকেই ভয় পায়, তবে তো তিনিই সবচেয়ে বেশী শক্তিমান। একমাত্র তিনি ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত। আর তাই পরবর্তী আয়াতে তাকে ডাকার কথা বলা হয়েছে। [সা'দী]

(১) ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত। তাঁর আহ্বানই হক্ক আহ্বান। সে আহ্বানের মূল হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ক কোন মা'বুদ নেই। ﴿دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ শব্দের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এটাই বর্ণিত আছে। [দেখূন, তাবারী]

(২) মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ এর তাফসীরে বলেন, সে লোক মুখে পানির জন্য আহ্বান করছে আর পানির দিকে হাত বাড়াচ্ছে। এভাবে তো আর পানি কখনো মুখে পৌছে না। পানি পৌঁছার জন্য পানিকে আহ্বান না করে তা নিয়ে মুখে দিয়ে দিতে হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এটা হলো মুশরিকের উদাহরণ। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে তার উদাহরণ ঐ পিপাসার্ত ব্যক্তির মত যে তার মনে মনে পানির কথা ভেবে দূর থেকে পানি পাওয়ার আশা করে বসে আছে। সে পানি পাওয়ার শত আশা করলেও পানি পেতে পারে না। [তাবারী] তদ্রূপ মুশরিক ব্যক্তিও আল্লাহ্ ছাড়া অপর যাদেরকে ডাকে তাদের কাছে তার মনের যাবতীয় আশা-আকাংখা পূরণের আশা করে বসে আছে। কিন্তু তার আশা তো এভাবে কখনো পূরণ হবার নয়। তাকে তা পূরণ করতে হলে একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই যেতে হবে।

১৫. আর আল্লাহ্‌র প্রতিই সিজ্‌দাবনত হয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়(১) এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়(২) ।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩

১৬. বলুন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব?' বলুন, 'আল্লাহ্ ।'(৩) বলুন, 'তবে

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ قُلْ

(১) সিজ্‌দা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা । পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না –এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে । মুমিন স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁর সামনে নত হয় কিন্তু কাফেরকে বাধ্য হয়ে নত হতে হয় । কারণ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই । আর তারা নিজেরা স্রষ্টার মুখাপেক্ষী এটা প্রমাণ করছে । [কুরতুবী]

(২) 'তাদের ছায়াগুলো নত হওয়া ও সিজদা করা'র মানে হচ্ছে, ছায়ার সকাল-সাঁঝে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে সিজদা করা । এ এমন একটি আলামত যা থেকে বুঝা যায় যে, এসব জিনিস কারো হুকুমের অনুগত এবং কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন । [কুরতুবী] মুফাসসিরগণ বলেন, সিজদাকারীদের কেউ ইচ্ছাকৃত আল্লাহ্‌র সিজদা করে আবার কেউ করে অনিচ্ছাকৃত কিন্তু তাদের ছায়াগুলো ঠিকই ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করছে । [বাগভী] মুজাহিদ বলেন, ঈমানদারের ছায়া ইচ্ছাকৃত সিজদা করে, আর সেও তা মেনে নিয়েছে । পক্ষান্তরে কাফেরের ছায়া ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করে অথচ সে অপছন্দ করছে । [তাবারী] এ আয়াতের সমার্থে আরো এসেছে, "তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়?" [সূরা আন-নাহলঃ ৪৮]

(৩) উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের রব একথা তারা নিজেরা মানতো । এ প্রশ্নের জবাবে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারতো না । কারণ একথা অস্বীকার করলে তাদের নিজেদের আকীদাকেই অস্বীকার করা হতো । কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার পর তারা এর জবাব পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল । কারণ স্বীকৃতির পর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতো এবং এরপর শির্কের জন্য আর কোন যুক্তিসংগত বুনিয়াদ থাকতো না । তাই নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা অনুভব করেই তারা এ প্রশ্নের জবাবে কিছু বলত না । এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা কে? বিশ্ব-জাহানের রব কে? কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছেন? তারপর হুকুম দেন, আপনি নিজে নিজেই বলুন আল্লাহ এবং এরপর এভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহই যখন

أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ ﴿١٦﴾

কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বলুন, 'অন্ধ(১) ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো(২) সমান হতে পারে?' তবে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের

এ সমস্ত কাজ করছেন তখন আর কে আছে যার তোমরা বন্দেগী করে আসছো? এখানেও আল্লাহ্ তাদের সেই স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এ কথার স্বীকৃতি আদায় করছেন। কেননা, তারা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের রব হচ্ছেন আল্লাহ্, তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন, এতদসত্বেও তারা আল্লাহ্ ছাড়া বহু অভিভাবক ইলাহ গ্রহণ করে সেগুলোর ইবাদাত করছে, অথচ ইলাহগুলো না নিজেদের কোন লাভ-ক্ষতির মালিক, না তাদের ইবাদাতকারীদের। সেগুলো তাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর তাদের কোন ক্ষতিও দূর করতে পারে না। তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র সাথে এ সমস্ত ইলাহের ইবাদাত করে, আর যে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তার সাথে কাউকে শরীক করে না, আর সে তার রব প্রদত্ত স্পষ্ট আলোতে রয়েছে? [ইবন কাসীর]

(১) এখানে তিনি ঈমানদার ও কাফেরের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যেভাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না তেমনি কাফের ও ঈমানদার সমান হতে পারে না। [বাগভী] মুমিন হক প্রত্যক্ষ করে, পক্ষান্তরে মুশরিক হক দেখে না। [কুরতুবী] অথবা এখানে অন্ধ বলে তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইবাদাত করতো তাদের বুঝানো হয়েছে আর চক্ষুষ্মান বলে স্বয়ং আল্লাহকেই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) আলো মানে সত্যজ্ঞানের আলো। এখানে উদ্দেশ্য ঈমান। [কুরতুবী] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এ সত্য জ্ঞানের আলো ঈমান লাভ করেছিলেন। আর আঁধার মানে কুফরী। [কুরতুবী] কুফরীতে রয়েছে মূর্খতার আঁধার। নবীর অস্বীকারকারীরা এ আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আলো ও আঁধার কখনও সমান হতে পারে না। যে ব্যক্তি আলো পেয়ে গেছে সে কেন নিজের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আঁধারের বুকে হোঁচট খেয়ে ফিরতে থাকবে?

কাছে সদৃশ মনে হয়েছে[১]? বলুন, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা[২]; আর

(১) এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকতেন এবং কিছু জিনিস অন্য মাখলুকরা সৃষ্টি করতো আর কোনটা আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোনটা অন্যদের এ পার্থক্য করা সম্ভব না হতো তাহলে তো সত্যিই শিরকের জন্য কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু ব্যাপারটি এ রকম নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর] কারণ, তাঁর হুবহু যেমন কিছু নেই তেমনি তার মতও কিছু নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, তাঁর অনুরূপ কেউ নেই, তার কোন মন্ত্রী-সাহায্যকারী নেই, তাঁর কোন সন্তান নেই, আর না আছে তাঁর কোন সঙ্গিনী। আল্লাহ্র মর্যাদা এ সমস্ত বিষয়াদি থেকে বহু উর্ধ্বে। এ মুশরিকরা নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, এ সমস্ত মাবুদ যাদের ইবাদাত তারা করছে সেগুলো আল্লাহ্রই বান্দা, তাঁরই সৃষ্ট, যেমন তারা তাদের শির্কী তালবিয়াতে বলত: 'হাজির, তাঁর কোন শরীক নেই, তবে সে শরীক, যার কর্তৃত্ব আল্লাহ্র হাতে, আল্লাহ্র কর্তৃত্ব সে শরীকের কাছে নেই।' যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, "আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে এনে দেবে" [সূরা আয-যুমার: ৩] তারা যেহেতু এ ধরণের বিশ্বাস করে থাকে তাই আল্লাহ্ সেটা অস্বীকার করে বলেছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ নেই যে, সুপারিশ করবে। "আর যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না" [সূরা সাবা: ২৩] আরও বলেন, "আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।" [সূরা মারইয়াম: ৯৩-৯৫] সুতরাং এসবই যখন বান্দা ও দাস, তখন বিনা দলীল-প্রমাণে শুধু মতের উপর নির্ভরশীল হয়ে একে অপরের ইবাদত কেন করবে? তারপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের সবাইকে প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত সবাইকে এখেকে সাবধান করে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করার জন্যই পাঠিয়েছেন। ফলে তারা তার রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করল এবং তাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো, তাই তাদের উপর শাস্তির বাণী যথাযথ ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। "আর আপনার রব কারও উপর যুলুম করেন না" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯] [ইবন কাসীর]

(২) কেননা, কোন বস্তু নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেছে সেটা অসম্ভব ব্যাপার। আবার সৃষ্ট কোন কিছু স্রষ্টা ছাড়া এসেছে সেটাও অসম্ভব। তাতে বুঝা গেল যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। সৃষ্টিতে যার কোন শরীক থাকতে পারে না। কেননা, তিনি এক ও দাপুটে। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও জন্য একক ও মহাদাপুটে গুণ সাব্যস্ত করা যায় না। সৃষ্টিকুল এবং প্রতিটি সৃষ্টির উপরই কোন না কোন নিয়ন্ত্রণকারী দাপট দেখানোর মত সৃষ্টি রয়েছে। তারপর তারও উপর রয়েছে আরেক নিয়ন্ত্রণকারী। কিন্তু তার উপর রয়েছেন সেই মহা দাপুটে সর্বনিয়ন্ত্রণকারী একক সত্তা। সুতরাং দাপট ও

তিনি এক, মহা প্রতাপশালী(১) ।'

১৭. তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে। এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার বা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু আগুনে উত্তপ্ত করা হয়(২)। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

তাওহীদ একটি অপরটিকে বাধ্য করে। যা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। এভাবে বিবেকের শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করে তাদের কেউই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। আর এভাবেই তাদের ইবাদাত বাতিল প্রমাণিত হলো। [সা'দী]

(১) মূল আয়াতে 'কাহ্হার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার উপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্ত করে রাখেন। যার ইচ্ছার কাছে সমস্ত ইচ্ছাকারী হার মানে। [কুরতুবী] "আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা" একথাটি এমন সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। "তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী বা মহা দাপুটে" এটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবার্য ফল। কারণ যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিঃসন্দেহে তিনি এক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। এ অবস্থায় কোন সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকার তথা ইবাদতে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে? এভাবে তিনি নিঃসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করা এবং মহাপরাক্রমশালী সর্বনিয়ন্ত্রক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহ্বান করা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ ২/৪৬৪-৪৬৫; মাদারিজুস সালেকীন ১/৪১৪]

(২) অর্থাৎ নির্ভেজাল ধাতু গলিয়ে কাজে লাগাবার জন্য স্বর্ণকারের চূলা গরম করা হয়। কিন্তু যখনই এ কাজ করা হয় তখনই অবশ্যি ময়লা আর্বজনা ওপরে ভেসে ওঠে এবং এমনভাবে তা ঘূর্ণিত হতে থাকে যাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপরিভাগে শুধু আর্বজনারাশিই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন(১)।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মূলত দু'টি উদাহরণ পেশ করেছেন। একটি পানির, অপরটি আগুনের। এ দুটি উদাহরণে আল্লাহ্ তা'আলা হক্ব যে স্থায়ী এবং বাতিল যে ক্ষণস্থায়ী তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ দু'টির মধ্যে প্রথমটি হল, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন তখন উপত্যকাসমূহ তাদের নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। যদি উপত্যকাটি বড় হয়, তবে বেশী পানি ধারণ করে। আর যদি ছোট হয় তবে তার নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল এ উপমায় তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঈমানদার, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তির অধিকারী মানুষদেরকে এমনসব নদীনালার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলো নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রহমতের বৃষ্টি ধারায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করে প্রবাহিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য আছে। একজনের মনে অনেক জ্ঞান ধারণ করে। আরেক জনের মন বেশী জ্ঞান ধারণ করতে পারে না।' অন্যদিকে সত্য অস্বীকারকারী ও সত্য বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে হৈ-হাংগামা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তাকে এমন ফেনা ও আবর্জনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা হামেশা বন্যা হবার সাথে সাথেই পানির উপরিভাগে উঠে আসতে থাকে। প্লাবন তার উপরে আবর্জনা বহন করে বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এগুলো মূলতঃ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির সমষ্টি। হকের সাথে এগুলোও মানুষের মনে প্রবেশ করে মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করতে চায় কিন্তু অন্তরের আল্লাহ্র ওহীর পরিমাণ অনুসারে দ্রুত অথবা ধীরে ধীরে তারা তাদের ঈমানী জোরে সে সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তিকে দূরীভূত করে দিতে পারে। তখন শুধুমাত্র ঈমান বাকী থাকে। আর যা কুফরী ও সন্দেহ সেগুলো অপসৃত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল, আগুণে পুড়ে খাটি হওয়ার উদাহরণ। সোনা, রূপা এবং এ জাতীয় ধাতব বস্তু যখনই পোড়ানো হয় তখন তার মধ্যস্থিত যাবতীয় ময়লা ও খাদ আলাদা হয়ে যায়। শুধু খাটি অংশই বাকী থাকে। তেমনিভাবে ঈমান যখন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন যৎসামান্য তাতে ময়লা-আবর্জনা সহ অবস্থান করতে থাকে। তারপর ঈমান ও দলীল-প্রমাণাদি পরপর তার কাছে আসতে থাকে। ধীরে ধীরে তার সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তি দূরীভুত হয়ে সে খাঁটি হয়ে যায়। তার মনে আর কোন পংকিলতা স্থান পায় না।

এ দু'টি উদাহরণের আরেকটি দিক হলো, আল্লাহ্র দরবারে যতক্ষণ কোন আমল খাঁটিভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে না হবে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থাকবে ততক্ষণ তা দূর করার জন্য সচেষ্ট

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

১৮. যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, যমীনে যা কিছু আছে তার সবটুকুই যদি তারা মালিক হতো এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো কিছুও হতো তাহলেও তারা মুক্তিপণস্বরূপ তা দিত(১)। তাদেরই হিসেব হবে কঠোর(২)

থাকতে হবে। [ইবন কাসীর; অনুরূপ আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াকে'য়ীন: ১/১১৭; ইগাসাতুল লাহফান: ১/২১; আল-আমসাল ফিল কুরআন: ১১]

(১) আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশালী এবং দূর্ভাগাদের অবস্থা পরবর্তীতে কেমন তা ব্যাখ্যা করেছেন। একদিকে ঐ সমস্ত লোকগণ যারা তাদের প্রভুর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে। রাসূলের কথা মেনেছে, তার যাবতীয় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাদের পরিণাম হবে ভাল। জান্নাত ও জান্নাতের যাবতীয় নে'আমত তারা পাবে। অপরদিকে ঐসমস্ত লোক যারা তাদের প্রভুর কথা মানেনি। নবী-রাসূলদের কথা শুনেনি। তাদের উপর এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না। কিন্তু তারা কোত্থেকেই তা দিবে? [দেখুন, সা'দী]

(২) কঠোর বা নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। কুরআন থেকে আমরা আরো জানতে পারি, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হালকা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক সুকৃতিকে সামনে রেখে তাদের বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে" এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সাহাবায়ে কিরামের কাছে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সহজ কর, কাছাকাছি হও, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে,এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য

এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস, আর সেটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

তৃতীয় রুকূ'

১৯. আপনার রব হতে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে কি তার মত যে অন্ধ[১]? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকসম্পন্নগণই[২],

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন। [মুসলিমঃ ২৫৭৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছেঃ "যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে।" এর জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলোর উপস্থাপনা আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে ধ্বংস হবে" [বুখারীঃ ১০৩, মুসলিমঃ ২৮৭৬]

(১) অর্থাৎ যারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে যা এসেছে তা হক্ক বলে ঈমান এনেছে, তারা এটাও বিশ্বাস করেছে যে, এতে কোন সন্দেহ অসামঞ্জস্যতা নেই। এর একাংশ অন্য অংশের সত্যয়ন করে। কোন প্রকার স্ববিরোধিতা এতে পাওয়া যাবে না। এর যাবতীয় সংবাদ বাস্তব, যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ইনসাফে পূর্ণ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১৫] অর্থাৎ সংবাদ প্রদানে বস্তুনিষ্ঠ এবং আদেশ-নিষেধে ইনসাফপূর্ণ। যারা কুরআনকে এ ধরনের বিশ্বাস করে তারা কি ঐ লোকের মত হতে পারে যে, অন্ধই রয়ে গেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হয়নি এমনকি বোঝার চেষ্টাও করেনি? এ দু'ব্যক্তির নীতি দুনিয়ায় এক রকম হতে পারে না এবং আখেরাতে তাদের পরিণামও একই ধরনের হতে পারে না। তাই তো আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ "জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।" [সূরা আল-হাশরঃ ২০] [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো এ শিক্ষা এবং আল্লাহর রাসূলের এ দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না বরং তারা হয় বিবেকবান, সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের জীবন ও চরিত্র যে রূপ ধারণ করে এবং আখেরাতে তারা যে পরিণাম ফল ভোগ করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

২০. যারা[1] আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার | الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

(১) এ আয়াতে সত্যিকার বুদ্ধিমান লোকদের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে যাদের জন্য সুউত্তম পরিণাম রয়েছে, এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে, 'তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে।' অর্থাৎ তারা মুনাফিকদের মত নয় যারা কোন অঙ্গীকার করলে সেটা ভঙ্গ করে, ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, কেউ আমানত রাখলে খিয়ানত করে। [ইবন কাসীর] তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে, বান্দার সাথে কৃত অঙ্গীকারও পূর্ণ করে। [ফাতহুল কাদীর]

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে 'তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।' ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন নবীর সাথে সম্পাদন করে এবং ঐ সব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। সেগুলো তারা ভঙ্গ করে না। অনুরূপভাবে অঙ্গীকারের মধ্যে তাও পড়ে যা করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেমন, ফরয ও ওয়াজিব কাজসমূহ। অনরূপভাবে তাও এর অন্তর্ভুক্ত যা নিজেরা নিজেদের উপর বাধ্য করে নিয়েছে যেমন, মানত। [ফাতহুল কাদীর] কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার ঠিক রাখা এবং ভঙ্গ না করার কথা কুরআনে বিশোর্ধ স্থানে উল্লেখ করেছেন। [তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে সৃষ্টির প্রারম্ভে যা আদমের পিঠে নেয়া হয়েছিল। [কুরতুবী]

তৃতীয় গুণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা একটি সাধারণ নির্দেশ। সে অনুসারে এটার অর্থ এমন সব সম্পর্ক, যেগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়। যেগুলোকে আল্লাহ্ ঠিক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কর্তন করতে নিষেধ করেছেন। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা নিঃসন্দেহে এর অন্তর্ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি এবং তাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে। [কুরতুবী]

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তারা তাদের রবকে ভয় করে। যে ভয় তাদেরকে কর্তব্য কর্ম করতে এবং যা নিষেধ করেছে তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। [ফাতহুল কাদীর] অথবা আল্লাহ্ যে সম্পর্ক ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তাদের রবকে ভয় করে। [কুরতুবী]

পঞ্চম গুণ হচ্ছে, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুংখানুপুংখ হিসাব বুঝানো হয়েছে।

ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ

করে । প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় । কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক । কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা । এ কারণেই এর তিনটি প্রকার বর্ণনা করা হয় । (এক) صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং (দুই) صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ- অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা । (তিন) صَبْرٌ عَلَى الْأَقْدَارِ বিপদাপদে নিজের ঈমানের উপর অটল থাকা । [ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন: ২/১৫৫] আয়াতে সবরের সাথে ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয় । শুধুমাত্র যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সবর করবে তাদেরই এ সওয়াব । [ফাতহুল কাদীর] সত্যিকার অর্থে যারা প্রথম ধাক্কায় সবর ধরতে পেরেছে তারাই প্রকৃতভাবে সবরকারী । কেননা, যারা সবর করেনি তারাও কোন না কোন সময় সবর করতে বাধ্য হয় । আর এ ধরনের যেহেতু অপারগ অবস্থায় সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য নয় । যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই । এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেন না । সুতরাং এখানে যে সবরের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তা হচ্ছে, তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেদের আবেগ, অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানিতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও ভোগ-লালসা চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ দেখে পা পিছলে যায় না এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশ্‌ত করে যেতে থাকে । এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মুমিন আসলে পুরোপুরি একটি সবরের জীবন যাপন করে । কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখেরাতের স্থায়ী পরিণাম ফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ দুনিয়ায় আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবিলা করে । [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, মাদারিজুস সালেকীন, মানযিলাতুস সাবর]

সপ্তম গুণ হচ্ছে, 'সালাত কায়েম করা' । এর অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে যেভাবে আল্লাহ্ তা ফরয করেছেন সেভাবে সময়মত আদায় করা । এখানে ফরয সালাতই উদ্দেশ্য । আবার ব্যাপক সালাতও উদ্দেশ্য হতে পারে । [ফাতহুল কাদীর]

অষ্টম গুণ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্‌ক থেকে কিছু আল্লাহ্‌র নামেও ব্যয় করে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেয়া রিয্‌কের কিছু অংশ তোমাদের কাছে চান । এটা দেয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয় । এখানে অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সাথে ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, দান-সদকা সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ । এ জন্যই আলেমগণ বলেন যে, যাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম

পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না,

২১. আর আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে হিসাবকে,

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২২. আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের দ্বারা মন্দ কাজকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম।

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

এবং গোপনে দেয়া সমীচীন নয়- যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল দান-সদকা গোপনে দেয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

নবম গুণ হচ্ছে, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জবাবে মন্দ ব্যবহার করে না। অর্থাৎ তারা মন্দের মোকাবিলায় মন্দ করে না বরং ভালো করে। তারা অন্যায়ের মোকাবিলা অন্যায়কে সাহায্য না করে ন্যায়কে সাহায্য করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই বিশ্বাস ভঙ্গ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। এর সমার্থে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত এসেছে। [যেমন, সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯৬, সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৪] কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদাত করে। ফলে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেনঃ 'পাপের পর পূণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দেবে।' [মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১২১ নং ১৭৮]

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৩. স্থায়ী জান্নাত[১], তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও[২]। আর ফেরেশ্‌তাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং বলবে, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; আর আখেরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম[৩]!'

---

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের জন্যই রয়েছে আখেরাতের সাফল্য। আয়াতে বর্ণিত دار শব্দের অর্থ এখানে আখেরাত। [ফাতহুল কাদীর] আর এ আয়াতের প্রথমেই আখেরাতের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতে আদনে তারা থাকবে। عدن শব্দের অর্থ স্থায়ী আবাস। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে তাদেরকে বহিস্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। [ইবন কাসীর] কেউ কেউ বলেনঃ জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের। [ফাতহুল কাদীর] দাহ্হাক বলেনঃ عدن হলো জান্নাতনগরীর নাম। যাতে রাসূল, নবী, শহীদ এবং হেদায়াতের ইমামগণ থাকবে। মানুষজন থাকবে তাদের চার পাশে। আর অন্যান্য জান্নাতসমূহ এর চারপাশে থাকবে। [ইবন কাসীর]

(২) এরপর তাদের জন্য আরো একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ নেয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে এর উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলিম হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের খাতিরে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছে দেয়া হবে। [কুরতুবী] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন "এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি একটুও কমাবো না"। [সূরা আত-তূরঃ ২১]

(৩) এরপর তাদের আরও একটি আখেরাতের সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবেঃ সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। [ফাতহুল কাদীর] এটা আখেরাতের কতই না উত্তম পরিণাম। অর্থাৎ তারা তাদেরকে এ সুখবর

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্যই রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের মন্দ আবাস(১) ।

দেবে যে, এখন তোমরা এমন জায়গায় এসেছো যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান। এখন তোমরা এখানে সব রকমের আপদ-বিপদ, কষ্ট, কাঠিন্য, কঠোর পরিশ্রম, শংকা ও আতংকমুক্ত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা হলেন দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেয়া হয়। খারাপ অবস্থায় তাদের সাহায্য নেয়া হয়। তাদের অনেকেই এমনভাবে মারা যায় যে, তাদের মনে অনেক অপূর্ণ বাসনা রয়েই গেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদের বলবেনঃ তোমরা যাও এবং তাদেরকে সালাম-সম্ভাষণ জানাও। ফেরেশ্‌তাগণ বলবেনঃ আমরা আপনার আসমানের বাসিন্দা, আপনার শ্রেষ্ট সৃষ্টির অন্যতম তারপরও কি আপনি আমাদেরকে তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ বলবেনঃ তারা আমার এমন বান্দা ছিল যারা কেবলমাত্র আমার ইবাদত করত। আমার সাথে সামান্যও শির্ক করেনি। তাদের দ্বারা সীমান্ত পাহারা দেয়া হতো এবং বিপজ্জনক সময়ে তাদের সাহায্য নেয়া হত। তারা এমনভাবে মারা গেছে যে, তাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গেছে তা তারা পূরণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাদের কাছে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানাবে। 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এ পরিণাম' [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৬৮]

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত অপরিণামদর্শী লোকদের আলোচনা করা হচ্ছে, যারা পূর্ববর্তী গুণগুলোর বিপরীত কাজ করে। তাদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ সমস্ত অবাধ্য বান্দাদের স্বভাব হলো যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর তা ভংগ করে থাকে। হাদীসে অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের একটি আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

২৬. আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে তার জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু এরা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত, অথচ দুনিয়ার

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿۲۶﴾

তৃতীয় স্বভাব এই যে, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তারা কুফরি ও গোনাহ করে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে। [কুরতুবী] যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরওয়া করে না এবং কারো অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি-কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটা এক বিরাট ফাসাদ।

আবুল আলীয়া রাহেমাহুল্লাহ বলেন, মুনাফিক শ্রেণীর লোক যখন মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে তখন ছয়টি খারাপ অভ্যাস ও কর্ম করে থাকেঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার বিপরীত কাজ করে, তাদের কাছে আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে, আল্লাহ্র নেয়া অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা কর্তন করে এবং যমীনের মধ্যে বিপর্যয় ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। আর যখন তারা কর্তৃত্বে থাকে না বা অন্যরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে তখন তারা তিনটি কাজ করেঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তার বিপরীত করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। [ইবন কাসীর] হাদীসেও তাদের কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে তার বিপরীত করবে এবং যখন আমানত রাখা হবে তখন তার খেয়ানত করবে'। [বুখারীঃ ৩৩, মুসলিমঃ ৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যখন অঙ্গীকার করবে তা ভঙ্গ করবে, যখন ঝগড়া করবে গালি-গালাজ করবে'। [বুখারীঃ ৩৪, মুসলিমঃ ৫৮]

অবাধ্য বান্দাদের এই সমস্ত স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য লা'নত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। [কুরতুবী] বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আযাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফিরিশ্তারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নেয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি, তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয় ও স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ।

জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র[১]।

চতুর্থ রুকূ'

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তার রবের কাছ থেকে তার কাছে

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ

(১) এ আয়াতের পটভূমি হচ্ছে, সাধারণ মূর্খ ও অজ্ঞদের মতো মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস ও কর্মের সৌন্দর্য বা কদর্যতা দেখার পরিবর্তে ধনাঢ্যতা বা দারিদ্র্যের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করতো। তাদের ধারণা ছিল, যারা দুনিয়ায় প্রচুর পরিমাণ আরাম আয়েশের সামগ্রী লাভ করছে তারা যতই পথভ্রষ্ট ও অসৎকর্মশীল হোক না কেন তারা আল্লাহর প্রিয়। আর অভাবী ও দারিদ্র পীড়িতরা যতই সৎ হোক না কেন তারা আল্লাহর অভিশপ্ত। এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে, রিযিক কমবেশী হবার ব্যাপারটা আল্লাহর অন্য নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজন ও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রেক্ষিতে কাউকে বেশী ও কাউকে কম দেয়া হয়। এটা এমন কোন মানদণ্ড নয় যার ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক ও মানসিক সৌন্দর্য ও কদর্যতার ফায়সালা করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে কে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভুল পথ, কে উন্নত ও সৎগুণাবলী অর্জন করেছে এবং কে অসৎগুণাবলী –এরি ভিত্তিতে তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আসল মানদণ্ড নির্ধারণ হওয়া উচিত। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তা দ্বারা তাদের জন্য সকল মংগল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।" [আল-মু'মিনূনঃ ৫৫-৫৬] আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সামগ্রী যে আখেরাতের তুলনায় কিছুই নয় তা বর্ণনা করে বলেছেন যে, "দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।" অন্যত্র এসেছে, "বলুন, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য আখেরাতই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।" [সূরা আন-নিসাঃ ৭৭] আরো এসেছে, "কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।" [সূরা আল-আ'লাঃ ১৬-১৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হলো এমন যেন তোমাদের কেউ সমুদ্রে তার এই আঙ্গুল ঢুকিয়ে আনল", তারপর তিনি নিজের তর্জনীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। [মুসলিমঃ ২৮৫৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মরা কান ছোট ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তা দেখিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! এ ছাগলটি যেমন তার মালিকের নিকট মূল্যহীন তেমনি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্‌র নিকট তার ছেয়েও সামান্য" [মুসলিমঃ ২৯৫৭]

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?'[১] বলুন, 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যারা তাঁর অভিমুখী তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান[২]।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

২৮. 'যারা ঈমান আনে[৩] এবং আল্লাহ্‌র

(১) আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করলে তারা যে ধরণের নিদর্শন চাচ্ছে সেটা দিতে পারেন। [ইবন কাসীর] এমনকি হাদীসে এসেছে, 'যখন মক্কার কাফের কুরাইশরা চাইলো যে, আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। আমাদের জন্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিন। মক্কার পাশ থেকে পাহাড়গুলো সরিয়ে নিয়ে যান। যাতে সেখানে বাগান ও নদী-নালা পূর্ণ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের কাছে ওহী পাঠালেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি চাইলে আমি তাদেরকে তা প্রদান করব। কিন্তু তারপর যদি তারা কুফরি করে তবে তাদেরকে এমন শাস্তি দেব যা আমি সৃষ্টিকুলের কাউকে কোনদিন দেইনি। আর যদি আপনি চান যে, আমি রহমত ও তাওবার দরজা খুলে দেই তবে তা-ই করব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বরং তাদের জন্য রহমত ও তাওবার দরজা খোলা হোক।' [মুসনাদে আহমাদ ১/২৪২] [ইবন কাসীর] সুতরাং নিদর্শন পাওয়াই বড় কথা নয়, হিদায়াত নসীব হওয়াই বড় কথা। তাই তো আল্লাহ্ তাদের জন্য নিদর্শন না দিয়ে রহমত ও তাওবার রাস্তা খোলা রেখেছেন। পরবর্তীতে মক্কাবাসীদের অনেকেই সে রহমতে ধন্য হয়।

(২) অর্থাৎ যে নিজেই আল্লাহর দিকে রুজু হয় না বরং তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হিদায়াত গ্রহণ করতে চায় না, তাকে জোর করে সত্য-সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর রীতি নয়। যারা আল্লাহর পথের সন্ধান করে ফিরছে তারা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে এবং নিদর্শনসমূহ দেখেই তারা সত্য পথের সন্ধান লাভ করছে। তোমাদের কাছে যদি যাবতীয় নিদর্শনও আনা হয় তবুও তোমরা ঈমান আনবে না। [দেখুন, মুয়াসসার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" [সূরা ইউনুসঃ ১০১] অন্য আয়াতে এসেছে, "নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, এমনকি তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।" [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭] আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "আমি তাদের কাছে ফিরিশ্তা পাঠালেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১১]

(৩) অর্থাৎ তারা যে নিদর্শন চাচ্ছে তেমনি কোন নিদর্শন ছাড়াই যারা ঈমান আনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ۟

স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়[১];

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰى لَهُمۡ وَحُسۡنُ

২৯. 'যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে পরম আনন্দ[২]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর স্মরণ অর্থাৎ যিকির করে আর যে করে না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায়। [বুখারীঃ ৬৪০৭] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে, তার গুনাহ্ যদি সমুদ্রের ফেনাতুল্যও হয় তবুও আল্লাহ্ দয়া করে তা ক্ষমা করে দিবেন। [বুখারীঃ ৬৪০৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি দিনে একশতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর' পড়ে সে ব্যক্তি দশটি দাস স্বাধীন করার সওয়াব পাবে, তার জন্য একশ'টি নেকী লিখা হবে এবং তার একশ'টি গুণাহ্ মিটিয়ে দেয়া হবে। ওই দিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং তার চেয়ে উত্তম আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি এটা তার চেয়ে বেশী পড়ে সে ব্যতিত"। [বুখারীঃ ৬৪০৩]

(২) মূলে বলা হয়েছে, ﴿طُوۡبٰى لَهُمۡ﴾ বা তাদের জন্য রয়েছে 'তূবা'। এখানে তূবা শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এসেছে যে, এর অর্থঃ তাদের জন্য রয়েছে খুশী ও চক্ষু সিক্তকারী। ইকরিমা বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য যা আছে তা কতইনা উত্তম! দাহ্হাক বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য ঈর্ষান্বিত হওয়ার মত নেয়ামত। ইবরাহীম নাখ'য়ী বলেন, এর অর্থঃ তাদের জন্য কল্যাণ। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তূবা হলো জান্নাতের একটি গাছের নাম। [ইবন কাসীর] তবে নিঃসন্দেহে এ সমস্তের মূল অর্থঃ জান্নাত। কারণ জান্নাত এ সবগুলোর সমষ্টি। জান্নাতের নে'আমত অগণিত, অসংখ্য। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষে জান্নাতে গমনকারীকে বলবেন, তোমার যাবতীয় আকাংখা আমার কাছে ব্যক্ত কর। সে লোক চাইতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত যখন তার চাহিদা শেষ হয়ে যাবে। তার আর চাওয়ার কিছু থাকবে না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এটা থেকে চাও, ওটা থেকে চাও, এভাবে তাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিবেন। তারপর তিনি তাকে এসব দিয়ে বলবেন। তোমাকে এসবকিছু এবং এগুলোর দশগুণ দেয়া হলো"। [বুখারীঃ ৮০৬, ৮৪৩৭, ৮৪৩৮, মুসলিমঃ ১৮২] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে এসেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, জিন ও মানব সবাই যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে

مَاٰبِ۝

এবং সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল।'

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۠ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۭ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ۝

৩০. এভাবে আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি যাদের আগে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আমরা আপনারপ্রতি যা ওহী করেছি, তা তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন। তথাপি তারা রহমানকে অস্বীকার করে(১)।

চাইতে থাক, তারপর আমি তাদের সবাইকে তার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি, তবে তা আমার রাজত্বের কিছুই কমাবে না। তবে এতটুকু যতটুকু সুঁই সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে কমাতে পারে।' [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(১) অর্থাৎ তাঁর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে। তাঁর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছে। তাঁর দানের জন্য অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তারা নতুন কিছু করছে না, তাদের পূর্বেও আমরা অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি। তারা যেভাবে দয়াময় প্রভুকে ভুলে শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনিভাবে আপনার জাতির কাফেররাও রহমান তথা দয়াময় প্রভুকে অস্বীকার করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে তাদের শাস্তি অনিবার্য। [এ সংক্রান্ত আরো আয়াত দেখুন, সূরা আন-নাহলঃ ৬৩, সূরা আল-আন'আমঃ ৩৪] আয়াতে বলা হয়েছে, যে তারা "রাহমান"কে অস্বীকার করছে। এখানে মূলতঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে "রাহমান" বা অত্যন্ত দয়ালু এ গুণে গুণান্বিত করতে অস্বীকার করছিল। এটা ছিল আল্লাহ্র নাম ও গুণের সাথে শির্ক করা। কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে এসেছে যে, তারা এ নামটি অস্বীকার করত। যেমন, "যখনই তাদেরকে বলা হয়, 'সিজ্দাবনত হও 'রহ্মান' -এর প্রতি,' তখন তারা বলে, 'রহ্মান আবার কে? তুমি কাউকেও সিজ্দা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজ্দা করব?' এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৬০] হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ও কাফেররা আল্লাহ্র এ গুণটি লিখা নিয়ে আপত্তি করেছিল এবং বলেছিলঃ আমরা রহমানকে চিনি না। [বুখারীঃ ২৭৩১-২৭৩২] অথচ এ নামটি এমন এক নাম যে নাম একমাত্র তাঁর জন্যই ব্যবহার হতে পারে। আর কাউকে কোনভাবেই 'রহমান' নাম বা গুণ হিসেবে ডাকা যাবে না। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলছেন যে, তারা যদিও গোয়ার্তুমি করে এ নামটি অস্বীকার করছে আপনি তাদেরকে এ নামটি যে আমার তা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তুলে ধরুন এবং বলুনঃ 'তিনিই আমার রব ; তিনি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই কাছে আমার ফিরে যাওয়া।' তোমাদের অস্বীকার তার এ নামকে তার জন্য সাব্যস্ত করতে কোন ভাবেই ব্যাহত করতে পারবে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, "বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক বা 'রাহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।

বলুন, 'তিনিই আমার রব; তিনি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই কাছে আমার ফিরে যাওয়া।'

৩১. আর যদি কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা যমীনকে টুকরো টুকরো করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত[১], কিন্তু

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۗ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۗ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ

তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ করো না এবং খুব ক্ষীণও করো না; দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো। [সূরা আল-ইসরাঃ ১১০] আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "বলুন, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি"। [সূরা আল-মুলকঃ ২৯] আর এ নামটি সবচেয়ে বেশী মহিমান্বিত নাম হওয়াতে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, "আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে 'আব্দুল্লাহ ও আব্দুররাহমান'।" [মুসলিমঃ ২১৩২]

(১) এখানে উত্তর উহ্য আছে। কিন্তু উহ্য পদটি নির্ধারণে বিভিন্ন মত এসেছে।
এক, কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হবেঃ 'যদি কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা যমীনকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না, তারা রহমানের সাথে কুফরী করত'। [কুরতুবী] পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তারা রহমানের সাথে কুফরী করছে" এ বাক্যটি উপরোক্ত অর্থের স্বপক্ষে জোরালো দলীল।
দুই, কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হবেঃ 'যদি কোন কুরআন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত তা হলে তা এ কুরআনই হতো'। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] কারণ, এ কুরআনে নিহিত রয়েছে চ্যালেঞ্জ। জিন ও মানব এর মত বা এর একটি সূরার মত কিছু আনতে অপারগ। সে হিসেবে কুরআন শব্দ দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকেই বুঝানো হবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র 'কুরআন' শব্দটিকে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "যেভাবে আমরা নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর; যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।" [সূরা আল-হিজরঃ ৯০-৯১] আবার কোন কোন সহীহ হাদীসেও পূর্ববর্তী কোন কোন কিতাবকে কুরআন নাম দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাউদ আলাইহিসসালামের উপর পড়াকে এতই সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তার বাহনের লাগাম লাগানোর নির্দেশ দিতেন। আর তা লাগানোর পূর্বেই তার কুরআন পড়া শেষ হয়ে যেত"। [বুখারী ৩৪১৭] এখানে কুরআন বলে নিঃসন্দেহে তার কাছে নাযিলকৃত

সব বিষয়ই আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারভুক্ত[১]। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা জানে না[২] যে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

কিতাব যাবূরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থের দিক থেকেও পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে কুরআন বলা যায়। কারণ, কুরআন শব্দের অর্থ, জমা করা। সে সমস্ত গ্রন্থসমূহে আয়াত জমা করার পর তা কুরআনে পরিণত হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ অর্থের আরেকটি দলীল হলোঃ قرآناً শব্দের تنوين কারণ, এ তানভীনকে تنكير হলে তা আমাদের পরিচিত কুরআনকে বুঝানো হয়নি বলেই ধরে নিতে হয়।

(১) মূলতঃ এর কারণ হচ্ছে, সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। তিনি চাইলে তা হবে আর না চাইলে হবে না। তিনি যার হিদায়াত চান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর তিনি যার ভ্রষ্টতা চান তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারবে না। [ইবন কাসীর] কারণ, তারা যে সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, সেগুলো এর চাইতে কম ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে নিষ্প্রাণ কংকরের কথা বলা এবং তাসবীহ্ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জিযা। মি'রাজের রাত্রিতে মসজিদুল আক্‌সা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, সুলাইমান 'আলাইহিস্‌সালামের বায়ুকে বশ করার মু'জিযার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু যালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

(২) আয়াতের মূলশব্দ হচ্ছে, ييأس শব্দটির যে অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে অনুসারে অর্থ হবে, ঈমানদারগণ কি জানে না যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই নিদর্শন দেখানো ছাড়াই হিদায়াত দিয়ে দিতে পারেন? [কুরতুবী] তাছাড়া শব্দটির অন্য আরেকটি অর্থ হলো, নিরাশ হওয়া। তখন আয়াতের ভাবার্থ এভাবে বলতে হবে যে, মুসলিমগণ মুশরিকদের হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত প্রদান করতেন। কারণ, মুসলিমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে বার বার নিদর্শন দেখাবার দাবী শুনতো। ফলে তাদের মন অস্থির হয়ে উঠতো। তারা মনে করতো, আহা, যদি এদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হতো যার ফলে এরা মেনে নিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! [কুরতুবী] বস্তুতঃ যারা কুরআনের শিক্ষাবলীতে, বিশ্ব-জগতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, নবীর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবনে, সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জীবনধারায় কোন সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে না, তোমরা কি মনে করো তারা পাহাড়ের গতিশীল হওয়া, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া এবং কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসার মত অলৌকিক ঘটনাবলীতে কোন

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

সবাইকেই সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? আর যারা কুফরী করেছে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আবাসের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না[২]।

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. আর অবশ্যই আপনার আগে অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি

আলোর সন্ধান পাবে? আবুল আলীয়া বলেন, এর অর্থ অবশ্যই ঈমানদাররা তাদের হিদায়াত সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে তিনি হিদায়াত দিতে পারেন। [ইবন কাসীর]

(১) قَارِعَةٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য, আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল হওয়া। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া [ইবন কাসীর] অথবা এর অর্থ, বিপদাপদ। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাদের উপর আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্‌র ওয়াদা কোন সময়ই টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। তবে হাসান বসরীর মতে, ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কেয়ামতও হতে পারে। [ইবন কাসীর] এ ওয়াদা সব নবীগণের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফের ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

(২) অর্থাৎ তিনি রাসূলদের সাথে যে সমস্ত ওয়াদা করেছেন সেটা তিনি ভঙ্গ করেন না। তিনি তাদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সাহায্য সহযোগিতার যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সেটা বলেছেন, "সুতরাং আপনি কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী" [সূরা ইবরাহীম: ৪৭]।

কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি[১]!

৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক[২] (তিনি কি এদের অক্ষম ইলাহ্‌গুলোর মত?) অথচ তারা আল্লাহ্‌র বহু শরীক সাব্যস্ত করেছে। বলুন, তাদের পরিচয় দাও। নাকি তোমরা যমীনের মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না? নাকি (তোমরা) বাহ্যিক কথা মাত্র জানাচ্ছ? বরং যারা কুফরী করেছে তাদের কাছে তাদের ছলনা[৩] শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

(১) আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী রাসূলদের সাথে তাদের উম্মতদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের সাথে কৃত আল্লাহ্‌র ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা তাদের বর্তমান ছাড় দেয়া অবস্থাকে যেন স্থায়ী মনে করে না নেয়। তিনি কাউকে পাকড়াও করলে তার আর রক্ষা নেই। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ অত্যাচারীকে ছাড় দিতে থাকেন তারপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার আর পালানোর কোন পথ থাকে না।" [বুখারীঃ ৪৬৮৬, মুসলিমঃ ২৫৮৩]

(২) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং প্রত্যেকটি লোকের অবস্থা জানেন। কোন সৎলোকের সৎকাজ এবং অসৎলোকের অসৎকাজ যার দৃষ্টি আড়ালে নেই। তিনি কি ইবাদতের যোগ্য নাকি তারা যাদেরকে ইবাদত করছে তারা? অথচ এসমস্ত উপাস্যগুলো সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। [দেখুন, সা'দী] [এ অর্থে আরো দেখুন সূরা ইউনুসঃ ৬১, সূরা আল-আন'আমঃ ৫৯, সূরা হূদঃ ৬, সূরা আর-রা'দঃ ১০, সূরা ত্বা-হাঃ ৭, সূরা আল-হাদীদঃ ৪]

(৩) এখানে শির্ক ও কুফরকে ছলনা বা প্রতারণা বলা হয়েছে। কারণ তাদের এগুলো নিছক ভ্রষ্টতা ও আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যাচার। [বাগভী; ইবন কাসীর] এর মাধ্যমে কিছু লোক নিজেদেরকে ভ্রান্ত মা'বুদদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে আপন আপন স্বার্থোদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া শির্ক আসলেই একটি আত্মপ্রতারণা। অথবা তাদের কুফরিকেই এখানে প্রতারণা বলা হয়েছে, কারণ রাসূলের সাথে তাদের প্রতারণা ছিল কুফরি। [কুরতুবী]

সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে[১], আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

৩৪. তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! আর আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মত তাদের কেউ নেই[২]।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপঃ তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত[৩],

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ اُكُلُهَا دَاۗىِٕمٌ وَّظِلُّهَا ۭ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ

(১) অর্থাৎ তাদের কাছে যখন কুফরি সুশোভিত হলো এবং তাদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড তথা শির্ক ও কুফরি হক বলে প্রতিভাত হলো, তখন তারা সে দিকে মানুষদেরকে আহ্বান জানাতে থাকল। এভাবে তারা মানুষদেরকে রাসূলদের পথে চলা থেকে বিরত রাখল। অথবা আয়াতের অর্থ, যখন তাদের কাছে তারা যা করছে তা সুশোভিত করা হলো তখন এর দ্বারা তাদেরকে সত্য সঠিক পথে আসা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। [ইবন কাসীর] যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে, "আর আমরা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম মন্দ সহচরসমূহ, যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। আর তাদের উপর শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে, তাদের পূর্বে চলে যাওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায়।" [সূরা ফুসসিলাতঃ ২৫]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য দুনিয়াতে যে শাস্তি রেখেছেন তার থেকে আখেরাতের শাস্তি যে কত ভয়াবহ এখানে সে কথাই তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লি'আনকারী পুরুষ ও মহিলাকে আখেরাতের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "অবশ্যই দুনিয়ার আযাব আখেরাতের আযাবের চেয়ে অনেক সহজ" [মুসলিমঃ ১৪৯৩] কারণ, দুনিয়ার আযাব যত দীর্ঘ সময়ই হোক না কেন তা তো লোকের মৃত্যুর সাথে সাথে বা দুনিয়ার শেষদিনটির সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আখেরাতের আযাব কোন দিন শেষ হবার নয়, তা চিরস্থায়ী। আবার তার পরিমাণও অনেক বেশী। যার বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-ফাজরঃ২৫, ২৬, সূরা আল-ফুরকানঃ ১১-১৫]

(৩) মুত্তাকীদের জন্য কি পুরস্কার রেখেছেন এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝ | তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী(১)।

এ নহর সমূহের বিস্তারিত বর্ণনায় এসেছে যে, মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্তঃ তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামের স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?" [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫] অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "এমন একটি প্রস্রবণ যা হতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছে প্রবাহিত করবে।" [সূরা আল-ইনসানঃ ৬]

(১) জান্নাতের নে'আমতসমূহ সর্বদা থাকবে, তাতে কোন অভাব বা কমতি পরিলক্ষিত হবে না। একথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না।"[সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৩৩] এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সালাত আদায়ের সময় এগিয়ে গিয়ে কিছু একটা নিতে যাচ্ছিলেন তারপর আবার ফিরে আসলেন। পরে সাহাবায়ে কিরাম সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি জান্নাত দেখেছি, তার থেকে আঙ্গুরের একটি থোকা নিতে চাচ্ছিলাম। যদি তা নিয়ে নিতাম তবে যতদিন দুনিয়া থাকত ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে।" [বুখারীঃ ১০৫২, মুসলিমঃ ৯০৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তাতে কোন কমতি হতো না"। [মুসলিমঃ ৯০৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতবাসীগণ খাবে, পান করবে অথচ তাদের কোন কাশি, থুথু আসবে না, পায়খানা ও পেশাব করবে না। তাদের খাবারের ঢেকুর আসবে যার সুগন্ধ হবে মিস্‌কের সুগন্ধির মতো, দুনিয়াতে যেভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয় তেমনি তাদেরকে সেখানে তাসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণার জন্য ইল্‌হাম করা হবে।" [মুসলিমঃ ২৮৩৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল কাশেম! আপনি মনে করেন যে, জান্নাতবাসীগণ খানাপিনা করবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "অবশ্যই হ্যাঁ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! সেখানে জান্নাতবাসীদের প্রত্যেককে খানাপিনা ও কামবাসনার ক্ষেত্রে একশত জনের সমান ক্ষমতা দেয়া হবে।" লোকটি বললঃ যার খানাপিনা আছে তার তো আবার শৌচক্রিয়ারও প্রয়োজন পড়বে। অথচ জান্নাতে কোন ময়লা-আবর্জনা বা কষ্টের কিছু নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তাদের সে প্রয়োজনটুকু শুধুমাত্র একটু ঘামের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। যে ঘামের সুগন্ধ হবে মিসকের গন্ধের মত। আর এতেই তাদের পেট কৃশকায় হয়ে যাবে।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৬৭]

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এটা তাদের প্রতিফল আর কাফিরদের প্রতিফল আগুন(১)।

৩৬. আর আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে তাতে আনন্দ পায়(২)।

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا

আর জান্নাতের ছায়ার ব্যাপারে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার ছায়াও চিরস্থায়ী। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।" [সূরা ইয়াসীনঃ ৫৬] আল্লাহ্ আরো বলেছেনঃ "মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে" [সূরা আল-মুরসালাতঃ ৪১] আরো বলেনঃ "সন্নিহিত গাছের ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।" [সূরা আল-ইনসানঃ ১৪] আরো বলেছেনঃ "যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব।" [সূরা আন-নিসাঃ ৫৭] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন গাছও আছে, যার ছায়ায় অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহী উন্নত ঘোড়া নিয়ে শত বছর সফর করলেও শেষ করতে পারবে না" [বুখারীঃ ৩২৫১,৩২৫২,৬৫৫৩, মুসলিমঃ ২৮২৬, ২৮২৮]

(১) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এভাবেই জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিফলের তুলনামূলক উল্লেখ থাকে। যাতে করে অনুসন্ধিৎসু মন কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ তা সহজেই বুঝতে পারে। [যেমন, সূরা আল-হাশরঃ ২০, সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাচ্ছেন যে, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা যা নাযিল হয়েছে তা দেখে খুশী হয়। এখানে 'যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে' বলে কি বোঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক. কিতাবধারী বলে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে, কিতাবীদের মধ্যে যারা কিতাবের বিধানকে আঁকড়ে আছে, তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তারা আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কুরআন সেটা দেখলে খুশী হয়। কারণ, তাদের কিতাবে এ রাসূলের সত্যতা ও সুসংবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত আছে। [ইবন কাসীর] যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম, সালমান প্রমুখ। [কুরতুবী] দুই. কাতাদা বলেন, এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী তথা সাহাবীদের কথা বলা হয়েছে। তারা কুরআনের আলো নাযিল হতে দেখলেই খুশী হত। [তাবারী; কুরতুবী]

أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ﴿٣٦﴾

আর দলগুলোর[১] মধ্যে কেউ কেউ তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে। বলুন, 'আমি তো আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি তাঁরই দিকে ডাকি এবং তাঁরই কাছে আমার ফিরে যাওয়া।'

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর এভাবেই[২] আমরা কুরআনকে নাযিল করেছি আরবী ভাষায় বিধানরূপে। আর জ্ঞান পাওয়ার পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে[৩] আপনার কোন অভিভাবক

---

(১) দলগুলো বলে এখানে কাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে, এক. তারা মক্কার মুশরিক কুরাইশরা এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি তারা। [কুরতুবী] দুই. অথবা এখানে শুধু ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] তিন. অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যারা জোট বেঁধেছিল তারা সবাই এখানে উদ্দেশ্য। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ যেভাবে আপনার পূর্বে আমরা অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং আপনার পূর্বে যখনই প্রয়োজন মনে করেছি তখনই কিতাব পাঠিয়েছি সেভাবে আমরা আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি এবং আমরা আপনাকে কুরআন নামক গ্রন্থখানি দিয়েছি, তাকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার] এ কিতাব আপনার উপর নাযিল করে আমি আপনাকে সম্মানিত করেছি এবং অন্যদের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি। কারণ, এ কুরআনের বৈশিষ্ট্য অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। এটি এমন যে, "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না-সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪২] [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ যেভাবে প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে তাদের নিজস্ব ভাষায় কিতাব দিয়েছি তেমনি আপনাকে আরবী ভাষায় এ কুরআন প্রদান করলাম। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি ও পাকড়াও এর বিপরীতে আপনার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। [মুয়াসসার]

ও রক্ষক থাকবে না[১] ।

ষষ্ঠ রুকূ'

৩৮. আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম[২] । আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়[৩] । প্রত্যেক

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

(১) তাদের খেয়ালখুশীর কোন শেষ নেই । তবে বিশেষ করে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা । [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই কারও খেয়াল-খুশী ও কোন মনগড়া মতের অনুসারী হতে পারেন না । এখানে রাসূলের উম্মতদেরকে সাবধান করা হচ্ছে । বিশেষ করে এ উম্মতের আলেম সম্প্রদায়কেই এখানে বেশী উদ্দেশ্য করা হয়েছে । তারা যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ, কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার পর অন্য কোন কারণে সেটা বাস্তবায়ন করতে পিছপা না হয় । অন্য কোন মত ও পথের অনুসারী না হয় । অন্যথা তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ । দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী ও অভিভাবক থাকবে না । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উথাপন করা হতো এটি তার মধ্য থেকে আর একটি আপত্তির জবাব । তারা বলতো, এ আবার কেমন নবী, যার স্ত্রী-সন্তানাদিও আছে! নবী-রাসূলদের যৌন কামনার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না কি? এ রাসূলের কি হলো যে, তিনি বিয়ে করেন? [বাগভী; কুরতুবী] নবী-রাসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ না; বরং ফিরিশ্‌তা হওয়া দরকার । ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্টত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে । কুরআন তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব একাধিক আয়াতে দিয়েছে । হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি তো সিয়ামও পালন করি এবং সিয়াম ছাড়াও থাকি; আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং সালাতের জন্যও দণ্ডায়মান হই; এবং নারীদেরকে বিবাহও করি । যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয় । [বুখারীঃ৪৭৭৬, মুসলিমঃ ১৪০১]

(৩) এটিও একটি আপত্তির জবাব । কাফের ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিদর্শনের দাবী করত । আগেও সেটার জবাব দেয়া হয়েছে । এখানে আবার সেটার জওয়াব দেয়া হচ্ছে [কুরতুবী] অনুরূপভাবে তারা কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের জন্যও প্রস্তাব করত । তারা বলতো আল্লাহ্‌র কিতাবে আমাদের

বিষয়ের ব্যাপারেই নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ আছে(১) ।

অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান নাযিল হোক । তারা আব্দার করত যে, আপনি বর্তমান কুরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন নিয়ে আসুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন অথবা আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন । [দেখুন, সূরা ইউনুসঃ১৫] কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত বাক্যে آية শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে । কারণ, কুরআনের পরিভাষায় 'আয়াত' কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও । এ কারণেই এ 'আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরবিদ কুরআনী আয়াতের অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন নবীর এরূপ ক্ষমতা নেই যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন ।[কাশশাফ; আল-বাহরুল মুহীত; আত-তাহরীর ওয়াততানওয়ীর] তবে অধিকাংশ মুফাসসির এখানে আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রাসূল ও নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, তিনি যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করতে পারবেন । [তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; সা'দী] আয়াতের সারবস্তু এই যে, আমার রাসূলের কাছে কুরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায় ও ভ্রান্ত । আমি কোন রাসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি । এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবী করাও নবুওয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক । সেটা তো আমার কাছে, আমি যখন ইচ্ছা সেটা দেখাই ।

(১) এখানে أجل শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ । আর كتاب শব্দটির অর্থ গ্রন্থ অথবা লেখা । বাক্যের অর্থ নির্ধারনে কয়েকটি মত আছেঃ
এক, এখানে শরী'আতের কথাই আলোচনা হয়েছে । তখন অর্থ হবে, প্রত্যেক সময়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কিতাব আছে । আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কখন কোন কিতাবের প্রয়োজন । সে অনুসারে তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের সময়ে তাদের উপযোগী কিতাব নাযিল করেছেন । তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন কুরআন নাযিল করলেন, তখন সেটা পূর্ববর্তী সবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে ।[দেখুন, ইবন আবিল ইয, শারহুত তাহাওয়ীয়্যা, ১/১০১-১০২; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]
দুই, আয়াতের অর্থ বর্ণনায় প্রসিদ্ধ মত এই যে, এখানে তাকদীরের কথাই আলোচনা হচ্ছে । অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিখিত আছে । তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে । কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় তার মৃত্যু হবে, তাও লিখিত আছে । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "আপনি কি জানেন না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা জানেন । এ সবই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ ।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৭০] [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

৩৯. আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছে তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন[১] এবং তাঁরই কাছে আছে উম্মুল কিতাব[২]।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

৪০. আর আমরা তাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তার কিছু যদি আমরা আপনাকে দেখাই বা যদি এর আগে আপনার মৃত্যু ঘটাই[৩]-- তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা, আর হিসাব-নিকাশ তো আমারই দায়িত্ব।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

৪১. তারা কি দেখে না যে, আমরা এ যমীনকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছে তা পরিবর্তন করে অন্য কিছু নাযিল করেন, আবার যা ইচ্ছে তা ঠিক রাখেন। এটা সম্পূর্ণই তার ইচ্ছাধীন। শরী'আতের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁরই। তবে কোন জিনিস পরিবর্তন করবেন আর কোনটি পরিবর্তন করবেন না, কোন হুকুমকে অন্য হুকুমের পরিবর্তে নাযিল করবেন আর কোনটিকে পুরোপুরি রহিত করবেন সে সবই তাঁর কাছে যে মূল কিতাব আছে সে অনুসারেই হবে। সেখানে কোন পরিবর্তন নেই। [ইবন কাসীর, ইবন আব্বাস ও কাতাদা হতে]

(২) এখানে ﴿اُمُّ الْكِتٰبِ﴾ এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এর দ্বারা লওহে-মাহ্ফুয বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না। চাই সেটা শরী'আত সম্পর্কিত হোক অথবা তাকদীর সম্পর্কিত হোক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তার শরী'আতের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা তা রহিত করেন। আর যা ইচ্ছে তা নাযিল করেন। কিন্তু মূলটি উম্মুল কিতাব তথা লাওহে মাহফূযে আছে। সেখানে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। অনরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির তাকদীর সম্পর্কে লাওহে মাহফূজে যা লিখা আছে তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ আপনার শত্রুদেরকে যে অপমান ও লাঞ্ছনাজনক শাস্তির ধমক দেয়া হচ্ছে তা যদি দুনিয়াতেই এসে যায় তবে তা হবে দুনিয়াবী শাস্তি। আর যদি আপনাকে তাদের শাস্তি দেখানোর পূর্বেই আমরা মৃত্যু দিয়ে দেই, তবে আপনার দায়িত্ব তো শুধু দাওয়াত প্রচার করে যাওয়া, তারপর আমার কাছেই তাদের হিসাব ও প্রতিফল। [মুয়াসসার]

وَاللّٰهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ ﴿٤١﴾

করে আনছি[1]? আর আল্লাহ্ই আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসেব গ্রহণে তৎপর[2]।

وَقَدۡ مَكَرَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلِلّٰهِ الۡمَكۡرُ جَمِيۡعًا ؕ يَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ ؕ وَسَيَعۡلَمُ الۡكُفّٰرُ لِمَنۡ عُقۡبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২. আর তাদের আগে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল; কিন্তু সব চক্রান্তই আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে ।প্রত্যেক ব্যক্তি যা উপার্জন করে তা তিনি জানেন। আর কাফেররা শীঘ্রই জানবে আখেরাতের শুভ পরিণাম কাদের জন্য।

وَيَقُوۡلُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَسۡتَ مُرۡسَلًا ؕ قُلۡ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًاۢ بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَكُمۡ ۙ وَمَنۡ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ الۡكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তুমি আল্লাহ্র পাঠানো নও। বলুন, আল্লাহ্ এবং যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে

---

(১) অর্থাৎ আপনার বিরোধীরা কি দেখছে না ইসলামের প্রভাব আরব ভূখণ্ডের সর্বত্র দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়ছে? চতুর্দিক থেকে তার বেষ্টনী সংকীর্ণতর হয়ে আসছে? এখানে যমীন সংকুচিত করার আরেক অর্থ এও করা হয় যে, যমীনের ফল-ফলাদি কমিয়ে দেয়া। আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, ভাল লোকদের, আলেম ও ফকীহদের প্রস্থান করা। কারও কারও মতে, এর অর্থ কুফরীকারীদের জন্য যমীন সংকুচিত হয়ে ঈমান ও তাওহীদবাদীদের জন্য যমীনকে প্রশস্ত করা হচ্ছে। বাস্তবিকই ধীরে ধীরে ইসলামের আলো আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কুফরী ও শির্কী শক্তির পতন হয়ে গেছে। অনুরূপ আয়াত আরও দেখুন, সুরা আল-আহকাফ: ২৭ [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ নির্দেশ আল্লাহ্র হাতেই। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যা ইচ্ছা তা নির্দেশ দেন। তিনিই ফয়সালা করেন। যেভাবে ইচ্ছা ফয়সালা করেন। কাউকে মর্যাদায় উপরে উঠান আবার কাউকে নীচু করেন। কাউকে জীবিত করেন, কাউকে মারেন। কাউকে ধনী করেন, কাউকে ফকীর করেন। তিনি ফয়সালা দিচ্ছেন যে, ইসলাম সম্মানিত হবে এবং সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী থাকবে। [ফাতহুল কাদীর] তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তাঁর নির্দেশের পিছু নিয়ে কেউ সেটাকে রদ করতে বা পরিবর্তন করতে পারবে না। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। সেটা অনুসারে কাফেরদেরকে তিনি দ্রুত শাস্তি দিবেন আর মুমিনদেরকে দ্রুত সওয়াব দিবেন। [কুরতুবী]

যথেষ্ট[1]।

(১) অর্থাৎ আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দেবে যে, যা কিছু আমি পেশ করেছি তা ইতিপূর্বে আগত নবীগণের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমি আল্লাহরই রাসূল। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যা সত্যনিষ্ঠ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যয়নকারীরূপে উল্লেখ করেছেন। যেমন কুরআনে এসেছেঃ "আল্লাহ্ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি আর আমার দয়া---তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে। কাজেই আমি তা নির্ধারিত করব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে ঈমান আনে। 'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাঁর উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জীল, যা তাদের কাছে আছে তাতে লিখিত পায়"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৬-১৫৭, আরও এসেছে, "বনী ইস্‌রাঈলের পণ্ডিতগণ এ সম্পর্কে জানে---এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়?" [সূরা আস-শু'আরাঃ ১৯৭]

১৪- সূরা ইব্‌রাহীম[১],
৫২ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

।। রহমান, রহীম আল-াহ্‌র নামে।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ①

১. আলিফ-লাম্‌-রা, এ কিতাব, আমরা এটা আপনার প্রতি নাযিল করেছি[২] যাতে আপনি মানুষদেরকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে[৩], পরাক্রমশালী,

(১) 'সূরা ইব্‌রাহীম' মক্কায়, হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায় হিজরতের পূর্বে নাযিল, না মদীনায় নাযিল হয়েছে। এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুওয়াত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম' রাখা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি। এতে নাযিল করার কাজটি আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে করার দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থ আল-কুরআন অত্যন্ত মহান। একে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেছেন। এটি আসমান থেকে নাযিল হওয়া কিতাবাদির মধ্যে অতি সম্মানিত গ্রন্থ। তিনি তা নাযিল করেছেন আরব বা অনারব যমীনের অধিবাসী সকল মানুষের কাছে প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির উপর। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর, শির্ক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ আবার কারও কারও মতে, বিদ'আত। অপর কারও মতে, সন্দেহ। পক্ষান্তরে نور বলে ঈমানের আলো বোঝানো হয়েছে। অথবা সুন্নাত বা ইয়াকীন বা দৃঢ়বিশ্বাস বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কুফর ও শির্কের প্রকারভেদ অনেক। অমনিভাবে মন্দকর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। বিদ'আতের সংখ্যাও অনুরূপভাবে প্রচুর। আর যে সন্দেহ মানব ও জিন শয়তান মানুষের মনে তৈরী করে তা বহু রকমের। পক্ষান্তরে نور শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এ জন্য আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শির্ক ও মন্দকর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের রবের আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের

সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে[১],

২. আল্লাহ্‌র পথে---আসমানসমূহে যা কিছু রয়েছে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই[২]। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ[৩],

اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۙ

৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক ভালবাসে এবং মানুষকে ফিরিয়ে রাখে আল্লাহ্‌র

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ

আলোর দিকে আনয়ন করেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য।" [সূরা আল-হাদীদ: ৯] [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ। যে সুস্পষ্ট পথ আল্লাহ্ মানুষের চলার জন্য প্রবর্তন করেছেন। যে পথে যেতে এবং যে পথে প্রবেশ করতে তিনি মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] এস্থলে আল্লাহ্ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عزيز ও حميد উল্লেখ করা হয়েছে। عزيز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حميد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। [ফাতহুল কাদীর]। তিনি তার যাবতীয় কাজ, কথা, শরী'আত, নির্দেশ, ও নিষেধের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং তাঁর যাবতীয় নির্দেশের ক্ষেত্রে সত্যবাদী। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্‌র এ দু'টি গুণবাচক নাম আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং প্রশংসার হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। 'হামীদ' শব্দটির অপর অর্থ, প্রত্যেকের মুখেই তাঁর প্রশংসা, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় তিনি সম্মানিত। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মালিক হিসেবেও এগুলো তাঁর, দাস হিসেবেও এরা তাঁরই দাস, উদ্ভাবক হিসেবেও তিনিই এগুলোর উদ্ভাবক, আর স্রষ্টা হিসেবেও তিনিই তাদের স্রষ্টা। [কুরতুবী] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সবকিছু যার, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। [কুরতুবী]

(৩) ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অথবা শাস্তি ও ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত বাক্য। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, যারা কুরআনরূপী নেয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বিপর্যয়, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾

পথ থেকে, আর আল্লাহ্‌র পথ বাঁকা করতে চায়; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ

৪. আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী[১] করে পাঠিয়েছি[২] তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নবী পাঠিয়েছেন তার উপর তার ভাষায়ই নিজের বাণী নাযিল করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যেন নবীর কথা বুঝতে পারে এবং যা নাযিল হয়েছে তাও জানতে পারে। [ইবন কাসীর] যাতে করে পরবর্তী পর্যায়ে তারা এ ধরনের কোন ওজর পেশ করতে না পারে যে, আপনার পাঠানো শিক্ষা তো আমরা বুঝতে পারিনি কাজেই কেমন করে তার প্রতি ঈমান আনতে পারতাম। এ উদ্দেশ্যে কোন জাতিকে তার নিজের ভাষায়, যে ভাষা সে বোঝে, পয়গাম পৌঁছানো প্রয়োজন।

(২) আদম 'আলাইহিস্ সালাম জগতে প্রথম মানুষ। তিনি তাকেই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম নবী মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরী'আত নাযিল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন, ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাকে যে গ্রন্থ ও শরী'আত দান করা হয়েছে, তাতে তাকে সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছেন কিন্তু অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের জন্যই রাসূল করে পাঠিয়েছেন। কোন জাতির সাথে সুনির্দিষ্ট করে নয়। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৮] আরও বলেন, "কত বরকতময় তিনি! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য সতর্ককারী হতে।" [সূরা আল-ফুরকান: ১] আরও বলেন, "আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি" [সূরা সাবা:২৮] ইত্যাদি আয়াতসমূহ। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য, প্রতিটি ভাষাভাষির জন্য। প্রতি ভাষাভাষির কাছে এ বাণী পৌঁছে দেয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের কর্তব্য। [আদওয়াউল বায়ান]

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

করার জন্য[১], অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ

৫. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে আমাদের

(১) এ আয়াত এ প্রমাণ বহন করছে যে, যা দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে, ততটুকু আরবী ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন এবং আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয় বিষয়। কেননা এটা ব্যতীত আল্লাহ্‌র কাছে যা নাযিল হয়েছে তা জানা অসম্ভব। তবে যদি কেউ এমন হয় যে, তার সেটা শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে না যেমন ছোটকাল থেকে এটার উপর বড় হয়েছে এবং সেটা তার প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কারণ, তখন সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী থেকে দ্বীন ও শরী'আত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যেমন সাহাবায়ে কিরাম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আমি মানুষের সুবিধার জন্য নবীগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি- যাতে নবীগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন। সমগ্র জাতি যে ভাষা বোঝে নবী সে ভাষায় তার সমগ্র প্রচার কার্য পরিচালনা ও উপদেশ দান করা সত্ত্বেও সবাই হেদায়াত লাভ করে না। কারণ কোন বাণী কেবলমাত্র সহজবোধ্য হলেই যে, সকল শ্রোতা তা মেনে নেবে এমন কোন কথা নেই। সঠিক পথের সন্ধান লাভ ও পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল সূত্র রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান নিজের বাণীর সাহায্যে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যার জন্য চান না সে হিদায়াত পায় না।

আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌র দু'টি মহান গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। এ দু'টি গুণবাচক নাম এখানে উল্লেখ করার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। যার অর্থ, লোকেরা নিজে নিজেই সৎপথ লাভ করবে বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, এটা সম্ভব নয়। কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা অযথা পথভ্রষ্ট করবেন এটা তাঁর রীতি নয়। কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী হওয়ার সাথে সাথে তিনি জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞও। তাঁর কাছ থেকে কোন ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণেই হেদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তিকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করে ভ্রষ্টতার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয় সে নিজেই নিজের ভ্রষ্টতাপ্রীতির কারণে এহেন আচরণ লাভের অধিকারী হয়। [দেখুন, সা'দী]

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলাম[১] এবং বলেছিলাম, 'আপনার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসুন[২], এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনগুলোর দ্বারা উপদেশ দিন[৩]।'

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ আমি মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহ্‌র অন্ধকার থেকে দাওয়াত দিয়ে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে। [বাগভী] এখানে আয়াত শব্দের অর্থ তাওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] মুজাহিদ বলেন, এখানে নয়টি বিশেষ নিদর্শন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্ তা'আলা ন'টি মু'জিযা বিশেষভাবে দান করেন।

(২) এ আয়াতে 'কওম' তথা "সম্প্রদায়" শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে ناس (মানুষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ﴾ এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত সমগ্র মানুষের জন্য।

(৩) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করান। কিন্তু আইয়্যামুল্লাহ্ কি? أيام শব্দটি يوم এর বহুবচন, এর অর্থ দিন। ﴿اَيّٰمِ اللّٰهِ﴾ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শাস্তির দিনগুলো, যেমন কাওমে নূহ, আদ ও সামূদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। [ফাতহুল কাদীর] এসব ঘটনায় বিরাট জাতিসমূহের ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা। 'আইয়্যামুল্লাহ্'র অপর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এ জাতির উপর আল্লাহ্‌র যেসব নেয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণতঃ তীহ্ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] এগুলো স্মরণ করানোর

এতে তো নিদর্শন[১] রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য[২] ।

৬. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর[৩]

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জা বোধ করে । এখানে দু'টি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে । বিশেষ করে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “একদিন মূসা আলাইহিসসালাম তার কাওমকে 'আইয়ামুল্লাহ' সম্পর্কে নসীহত করছিলেন... আর 'আইয়ামুল্লাহ' হলো আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও বিপদাপদ” [মুসলিমঃ ২৩৮০]

(১) এখানে آيات-এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি । অর্থাৎ এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে এমন সব নির্দশন রয়েছে যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ক্ষমতাবান হওয়ার সত্যতা ও নির্ভুলতার প্রমাণ পেতে পারে । [ফাতহুল কাদীর] এ সংগে এ সত্যের পক্ষেও অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে যে, প্রতিদানের বিধান পুরোপুরি হক এবং তার দাবী পূরণ করার জন্য অন্য একটি জগত অর্থাৎ আখেরাতের জগত অপরিহার্য ।

(২) আয়াতে বর্ণিত صبار শব্দটি صبر থেকে مبالغة এর পদ । এর অর্থ অধিক সবরকারী । شكور শব্দটি شكر থেকে مبالغة এর পদ । এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ । [ফাতহুল কাদীর] বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট শক্তি বিদ্যমান ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী । সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা । সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌র রহমত আশা করা, আর আখেরাতে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা । [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, উদ্দাতুস সাবেরীন]

(৩) অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' বা নেয়ামত ও মুসিবত সম্পর্কে স্মরণ করানোর জন্য এ ভাষণটি প্রদাণ করেছিলেন । [ইবন কাসীর] এ নেয়ামতগুলো স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, নিয়ামতসমূহের কথা মুখে ও অন্তরে স্বীকার করে নেয়া । [সা'দী] অনুরূপভাবে নেয়ামতগুলোর অধিকার

يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির'আউন গোষ্ঠীদের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ্ করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; আর এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা[১]।'

দ্বিতীয় রুকূ'

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

৭. আর স্মরণ করুন, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে নিশ্চয় আমার শাস্তি তো কঠোর[২]।'

ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, সেগুলো যিনি প্রদান করেছেন তাঁর শোকরিয়া আদায় করে তাঁর নির্দেশের বাইরে না চলা। তাঁর বিধানের অনুগত থাকা, ইত্যাদি।

(১) আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে, بلاء এ শব্দটি বিপরীত অর্থবোধক, এর এক অর্থ, নেয়ামত আর অপর অর্থ, বিপদ বা পরীক্ষা। এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নেয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আদেশ দেয়া হয়। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর পূর্বে ফির্'আউন বনী-ইসরাঈলকে অবৈধভাবে দাসে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব দাসের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্য লালন-পালন করা হত। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে প্রেরণের পর তার দো'আয় আল্লাহ্ তা'আলা বনী-ইসরাঈলকে ফির্'আউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন। সুতরাং একদিক থেকে তা তাদের পরীক্ষা ছিল অপর দিক থেকে সে পরীক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিরাট নেয়ামত প্রদান করেন। উভয় অর্থটিই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর আমরা তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৮] [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) تأذن -শব্দটির অর্থ সংবাদ দেয়া ও ঘোষণা করা। [ইবন কাসীর]

৮. আর মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা এবং যমীনের সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও তারপরও আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও সর্বপ্রশংসিত(১)।

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ ۝

৯. 'তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদের ও সামূদের এবং যারা তাদের পরের? যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন, অতঃপর তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করেছিল(২) এবং বলেছিল, 'যা সহ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فِىٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَقَالُوٓا۟ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝

(১) অর্থাৎ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বজাতিকে বললেনঃ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করো, তবে স্মরণ রেখো, এতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফিরিশ্‌তা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর। কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য তাকীদ দেয়া হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশতঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন একত্রিত হয়ে তাকওয়ার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক জনের অন্তরে পরিণত হও তবুও তা আমার রাজত্বের সামান্যতম কিছুও বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন্ন একত্রিত হয়ে অন্যায়ের দিক থেকে একজনের অন্তরে পরিণত হও তবুও তা আমার রাজত্বের সামান্যতম অংশও কমাতে পারবে না..."। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(২) এ শব্দগুলোর ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে বেশ কিছু মত দেখা গেছে। কারো কারো মতে, এর অর্থ তারা নবীদেরকে চুপ থাকতে বলেছে। [ইবন কাসীর] অথবা মুখ দিয়ে সেগুলো উড়িয়ে দিয়েছে। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এর অর্থ করেছেনঃ 'তারা তাদের আঙ্গুলে কামড় দিয়েছে।' অর্থাৎ তারা যাতে বিশ্বাসী ছিল তাতে কামড়ে পড়ে ছিল, নবী-রাসূলদের কথা শুনেনি। [কুরতুবী] কাতাদা ও মুজাহিদ এখানে এর অর্থঃ 'রাসূলগণ

তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করলাম। আর নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে বিষয়ে[১], যার দিকে তোমরা আমাদেরকে ডাকছ।'

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা[২]?

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ

যা নিয়ে এসেছে তারা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করেছে আর মুখে তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছে'। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ এমন সংশয় যার ফলে প্রশান্তি বিদায় নিয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা নিয়ে এসেছ তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবো না। কারণ, তোমাদের দাওয়াতের ব্যাপারে আমরা শক্তিশালী সন্দেহে নিপতিত। [ইবন কাসীর] আমরা মনে করছি তোমরা রাজত্ব অথবা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় আছ। [কুরতুবী] কিন্তু পরবর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তারা সম্ভবত: ঈমান ও তাওহীদের ব্যাপারেই সন্দেহ করছিল। [দেখুন, মুয়াসসার] কারণ, রাসূলগণ তাদের কথার উত্তরে বলেছিলেন যে, তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সন্দেহ করতে পার? অথচ তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।

(২) আয়াতের অর্থে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। এক. আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে কি সন্দেহ আছে? অথচ মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি ফিতরাতই তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর স্বীকৃতি দেয়া বাধ্য করছে। সুতরাং যাদের প্রকৃতি ও স্বভাবজাত বিবেক ঠিক আছে তারা অবশ্যই তাঁর অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবী মনে করে। হ্যাঁ, তবে কখনও কখনও সে সমস্ত ফিতরাতে সন্দেহ ও দ্বিধার অনুপ্রবেশ ঘটে, আর তখনই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দলীল-প্রমাণাদির দিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়ে। আর এজন্যই রাসূলগণ এমন এক কথা এরপর বলেছেন যা তাদেরকে তাঁর পরিচয় ও তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। রাসূলগণ সেটাই তাদের উম্মতদেরকে বলেছেন যে, আমরা ঐ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বলছি যিনি "আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা"। তিনিই এ দুটোকে সৃষ্টি করেছেন এবং কোন পূর্ণ নমূনা ব্যতীত নতুনভাবে অস্তিত্বে এনেছেন। কেননা, এ দুটো নব্য হওয়া, সৃষ্ট হওয়া ও আজ্ঞাবহ হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং এগুলোর জন্য একজন নির্মাতা অবশ্যই প্রয়োজন। আর তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, সবকিছুর ইলাহ ও মালিক। [ইবন কাসীর]

দুই. রাসূলদের একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব মানতো এবং আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা একথাও স্বীকার

ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ⑩

তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য। তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের 'ইবাদাত করত তোমরা তাদের 'ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও[১]। অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ[২] উপস্থিত কর।

করতো। এরই ভিত্তিতে রাসূলগণ বলেছেন, এরপর তোমাদের সন্দেহ থাকে কিসে? আমরা যে জিনিসের দিকে তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ তোমাদের বন্দেগীলাভের যথার্থ হকদার। এরপর কি আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ আছে? অর্থাৎ স্রষ্টাকে মেনে নেয়া এটা সৃষ্টিজগতের সবার কাছেই স্বীকৃত ব্যাপার। মুখে যতই অস্বীকার করুক না কেন মন তাদের তা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। কেননা তারা যদি স্রষ্টা না হয়ে থাকে তবে তারা সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝে অবস্থানের সুযোগ নেই। সুতরাং তিনি যদি একমাত্র স্রষ্টা হয়ে থাকেন, একমাত্র তাঁর ইবাদাত করতে বাধা কোথায়? [দেখুন, ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "ওরা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি ওরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়।" [সূরা আত-তূরঃ ৩৫-৩৬]

(১) তাদের কথার অর্থ ছিল এই যে, তোমাদেরকে আমরা সব দিক দিয়ে আমাদের মত একজন মানুষই দেখছি। তোমরা পানাহার করো, নিদ্রা যাও, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, তোমাদের মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, শোক, ঠাণ্ডা ও গরমের তথা সব জিনিসের অনুভূতি আছে। এসব ব্যাপারে এবং সব ধরনের মানবিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তোমাদের সাদৃশ্য রয়েছে। তোমাদের মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্ব দেখছি না যার ভিত্তিতে আমরা এ কথা মেনে নিতে পারি যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে কথা বলেন এবং ফেরেশতারা তোমাদের কাছে আসে। তোমরা তো আমাদের কাছে কোন মু'জিযা নিয়ে আসনি।

(২) অর্থাৎ তোমরা এমন কোন প্রমাণ বা মু'জিযা নিয়ে আস যা আমরা চোখে দেখি এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করি। যে প্রমাণ দেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, যথার্থই আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা যে বাণী এনেছো তা আল্লাহর বাণী।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, 'সত্য বটে, আমরা তোমাদের মত মানুষই কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ উপস্থিত করার সাধ্য আমাদের নেই[১]। আর আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনগণের নির্ভর করা উচিত।

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আর আমাদের কি হয়েছে যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করব না? অথচ তিনিই তো আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন[২]। আর তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব[৩]।

(১) অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা তো মানুষই। তবে আল্লাহ নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে আমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। এখানে আমাদের সামর্থের কোন ব্যাপার নেই। এ তো আল্লাহর পূর্ণ ইখতিয়ারের ব্যাপার। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যা ইচ্ছা দেন। আমাদের কাছে যা কিছু এসেছে তা আমরা তোমাদের কাছে পাঠাতে বলতে পারি না এবং আমাদের কাছে যে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে তা থেকে আমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নিতেও পারি না। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ বা মু'জিযা নিয়ে আসতে পারি না। যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র কাছে আমরা তা চাইব এবং তিনি তা অনুমোদন করবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে সবচেয়ে সঠিক ও সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রকাশমান পথটির দিশা দিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(৩) এভাবে যখনই কোন নবী বা রাসূল কোন কাওমের কাছে এসেছে তখনই তাদের নেতা গোছের লোকেরা নবী-রাসূলদেরকে বিভিন্নভাবে চাপের মুখে রাখত। কখনও তাদেরকে দেশান্তর করার ভয় দেখাত। আবার কখনও তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হত। যেমন শু'আইব আলাইহিসসালামের কাওম তাকে বলেছিল, "তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, 'হে শু'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবই অথবা

সুতরাং নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক ।'

তৃতীয় রুকূ'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾

১৩. আর কাফিররা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে অবশ্যই বহিস্কৃত করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে[১] । অতঃপর রাসূলগণকে তাদের রব ওহী পাঠালেন, 'যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব;

তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে ।' তিনি বললেন, 'যদিও আমরা ওটাকে ঘৃণা করি তবুও?" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৮৮] লূত আলাইহিসসালামের জাতি তাকে বলেছিলঃ "উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লূত-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায় ।" [সূরা আন-নামলঃ ৫৬] তদ্রূপ অন্যত্রও এসেছে যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তারা অনুরূপ কথা বলেছিল, যেমনঃ "তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে আপনার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে থাকত ।"[সূরা আল-ইসরাঃ ৭৬] "স্মরণ করুন, কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার বা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন; আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী ।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩০]

(১) এর মানে এ নয় যে, নবুওয়াতের মর্যাদায় সমাসীন হবার আগে নবীগণ নিজেদের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মিল্লাত বা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতেন। বরং এর মানে হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যেহেতু তারা এক ধরনের নীরব জীবন যাপন করতেন, তাই তাদের সম্প্রদায় মনে করতো তারা তাদেরই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তারপর নবুওয়াতের কাজ শুরু করে দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হতো যে, তারা বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করেছেন। অথচ নবুওয়াত লাভের আগেও তারা কখনো মুশরিকদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনচ্যুতির অভিযোগ করা যেতে পারে। অথবা আয়াতের অর্থ, তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শের অনুসারী হয়ে যাবে। অথবা কাফেররা এটা দ্বারা নবীদের অনুসারীদের উদ্দেশ্য নিয়েছে। যারা নবীর উপর ঈমান আনার আগে তাদের ধর্মাদর্শে ছিল। নবীকেও তারা নবীর অনুসারীদের সাথে একসাথে সম্বোধন করে নিয়েছে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

১৪. আর অবশ্যই তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে দেশে বাস করাব[১]; এটা তার জন্য যে ভয় রাখে আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির[২]।

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

১৫. আর তারা বিজয় কামনা করলো[৩]

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

(১) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়াদা করেছেন, যেমন বলেছেনঃ "আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য আগেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।" [সূরা আস-সাফ্ফাতঃ ১৭১-১৭৩] আরো বলেছেনঃ "আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২১] আরও এসেছে, "যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে আমরা আমাদের কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি" [সূরা আল-আ'রাফ:১৩৭] আরও এসেছে, "আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের" [সূরা আল-আহযাব: ২৭] কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আখেরাতে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। [তাবারী]

(২) যদিও আল্লাহ্র ওয়াদা সবার জন্যই কিন্তু এর থেকে উপকার ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে শুধু দু'শ্রেণীর লোকেরাই। যারা কিয়ামতের মাঠে তাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে হবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখার কারণে তাদের মধ্যে ভাবান্তর হয় এবং সে ভয়ে সদা কম্পমান থাকে। আর যারা আল্লাহ্র ওয়াদাকে ভয় করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত হবেই। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ "তারপর যে সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়। জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে জান্নাতই হবে তার আবাস।" [সূরা আন-নাযি'আতঃ ৩৭-৪১] আরো বলেছেনঃ "আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।" [সূরা আর-রাহমানঃ ৪৬] আয়াতের অপর অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়াতে আমার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সাবধান হয়ে এটা বিশ্বাস করে যে, আমি অবশ্যই তাকে দেখছি, তার কর্মকাণ্ড আমার সার্বিক পর্যবেক্ষণে রয়েছে, তারাই ওয়াদা ও ধমকি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে কারা বিজয় কামনা করল এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক, এখানে রাসূলগণই বিজয় কামনা করেছিলেন। দুই, কাফেরগণ উদ্ধত ও কুফরী এবং শির্কী ব্যবস্থাপনার উপর থাকা সত্ত্বেও নিজেদের জন্য বিজয় কামনা করল। [ফাতহুল কাদীর] এ অর্থের সমর্থনে অন্যত্র বর্ণিত একটি আয়াত পেশ করা যায় যেখানে বলা

আর প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল[১]।

১৬. তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং পান করানো হবে গলিত পুঁজ[২];

مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

হয়েছে যে, কাফেররা তাদের দো'আয় বলেছিলঃ "হে আল্লাহ্! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিন।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩২] আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এটি উভয় সম্প্রদায়েরই কামনা হতে পারে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) جبار অর্থ, নিজের মতকে প্রাধান্যদানকারী এবং অপরের উপর নিজের মত চাপানোর প্রয়াস যিনি চালান। হক্ব গ্রহণের মানসিকতা যার নেই। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের লোকদের পরিণতি সম্পর্কে বলেছেনঃ "আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে, যে কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সংগে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" [সূরা ক্বাফঃ ২৪-২৬] তদ্রূপ হাদীসেও এসেছে, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তখন সে সমস্ত সৃষ্টিজগতকে ডেকে বলবে, "আমাকে প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী, উদ্ধতের ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।" [তিরমিযীঃ ২৫৭৪]

(২) আয়াতে এসেছে যে, তাদেরকে صديد পান করানো হবে। صديد শব্দের অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, পুঁজ ও রক্ত। [তাবারী] কাতাদা বলেন, এর দ্বারা কাফেরদের চামড়া ও গোস্ত থেকে যা গলিত হয়ে বের হবে তাই উদ্দেশ্য। [তাবারী] কারও কারও মতে, এর দ্বারা কাফেরদের পুঁজ ও রক্তের সাথে তাদের পেট থেকে যা বের হবে তা মিললে যা হয় তা বুঝানো হয়েছে। [তাবারী; বাগভী; ফাতহুল কাদীর] মোটকথা, এটা এমন খারাপ পানীয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেন, জাহান্নামবাসীদের পানীয় দু'ধরনের, হামীম অথবা গাস্‌সাক, তন্মধ্যে হামীম হলো সবচেয়ে গরম। আর গাস্‌সাক হলো সবচেয়ে ঠান্ডা ও ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পানীয়। এ আয়াতের সমার্থে অন্যত্র এসেছে, "এটা সীমালংঘনকারীদের জন্য। কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।" [সূরা ছোয়াদঃ ৫৭-৫৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?" [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৫] আরো বলেছেন "তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!" [সূরা আল-কাহফঃ ২৯]

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

১৭. যা সে অতি কষ্টে একেক ঢোক করে গিলবে এবং তা গিলা প্রায় সহজ হবে না। সকল স্থান থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যু[১] অথচ তার মৃত্যু ঘটবে না[২]। আর এরপরও রয়েছে কঠোর শাস্তি[৩]।

---

(১) ইবরাহীম আত-তাইমী বলেন, সবদিক থেকে মৃত্যু আসার অর্থ, শরীরের প্রতিটি লোমকুপ থেকে মৃত্যুর কষ্ট আসতে থাকবে। [তাবারী]

(২) আল্লাহ্ বলেন, "এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ২১], তারা সেটা গিলতে চেষ্টা করলেও সেটার দুর্গন্ধ, তিক্ততা, ময়লা আবর্জনা ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম হওয়ার কারণে সহজে গিলতে সমর্থ হবে না। এভাবে তার শাস্তি চলতেই থাকবে, তার সমস্ত শরীরে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে কিন্তু মৃত্যু তার আসবে না। তার অগ্র, পশ্চাত, উপর বা নীচ সবদিক থেকে তার শাস্তি এমন হবে যে, এর সবগুলিই তার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তার মৃত্যু হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ "কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না।" [সূরা ফাতিরঃ ৩৬]

(৩) অর্থাৎ এটাই তাদের শাস্তির শেষ নয়। এর পরও তাদের জন্য আরো ভয়াবহ, কঠোর ও মারাত্মক শাস্তি অপেক্ষা করছে। [ইবন কাসীর] অন্যত্র বলেছেনঃ "যাক্কুম গাছ, যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ, এ গাছ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা। তারা এটা থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে। তার উপর তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত আগুনের দিকে।" [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ৬২-৬৮] এভাবেই তারা কখনো যাক্কুম গাছ থেকে খাবে, আবার কখনো তারা ফুটন্ত পানি পান করবে যা তাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আবার কখনো তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে। এভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে তাদের শাস্তি হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "এটাই সে জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, ওরা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে।" [সূরা আর-রাহমানঃ ৪৩-৪৪] আরো বলেনঃ "নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ হবে---পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত, তাদের পেটে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও- এবং বলা হবে, 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত! 'এ তো তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।"[সূরা আদ-দোখানঃ ৪৩-৪৯] আরো বলেনঃ "আর বাম

১৮. যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমা হল, তাদের কাজগুলো ছাইয়ের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়(১)। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝١٨

১৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীন যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন(২)? তিনি ইচ্ছে করলে

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٩

দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! ওরা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কালোবর্ণের ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। [সুরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৪১-৪৪] আরো বলেনঃ "আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম--- জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল! এটা সীমালংঘনকারীদের জন্য। কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।" [সূরা ছোয়াদঃ ৫৫-৫৮]।

(১) উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যতঃ সৎ হলেও তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো। তারা দুনিয়াতে যা করেছে সবই বৃথা ও নিষ্ফল হবে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২৩] "এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, ওটা যে জাতি নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১১৭] "হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, তারপর ওটার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত ওটাকে পরিস্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৬৪]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্বশরীরে আবার পুনরায় নিয়ে আসতে তিনি যে সক্ষম সেটার পক্ষে দলীল পেশ করে বলছেন যে, মানুষ তো কোন ব্যাপার নয়। যে আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। কারণ, মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা বড় ব্যাপার। [ইবন কাসীর]

তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন,

২০. আর এটা আল্লাহ্‌র জন্য আদৌ কঠিন নয়[১]।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এটাকে তুলে ধরেছেন। যেমনঃ "তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। [সূরা আল-আহকাফঃ ৩৩] "মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি কথা ভুলে যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?' বলুন, 'তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।' তিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্বলিত কর। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।[সূরা ইয়াসীনঃ ৭৭-৮৩]

(১) অর্থাৎ তোমাদেরকে ধ্বংস করে সেখানে অন্যদের প্রতিষ্ঠিত করা তার জন্য কোন ব্যাপারই নয়। কোন বড় ব্যাপার নয় আবার কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। বরং এটা তার জন্য সহজ। যদি তোমরা তাঁর নির্দেশ অমান্য কর, তখন তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য কাউকে প্রতিস্থাপন করবেন। [ইবন কাসীর] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ "হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার যোগ্য। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।" [সূরা ফাতিরঃ ১৫-১৭] " যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।" [সূরা মুহাম্মাদঃ ৩৮] "হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে;" [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫৪] "হে মানুষ! তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে ও অপরকে আনতে পারেন; আল্লাহ্ তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।" [সূরা আন-নিসাঃ ১৩৩]

২১. আর তারা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে প্রকাশিত হবে(১)। তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করত তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে(২)?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই- উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান; আমাদের কোন

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَٰٓؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَىٰنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

---

(১) মূল শব্দ 'বারাযা'। 'বারাযা' মানে সামনে উন্মুক্ত হওয়া। প্রকাশ হয়ে যাওয়া। [কুরতুবী] অর্থাৎ তারা কবর থেকে উন্মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] প্রকৃতপক্ষে বান্দা তো সবসময় তার রবের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু তারা যেহেতু গোনাহ করার সময় মনে করে যে, আল্লাহ্‌র কাছে সেটা গোপন থাকবে, তাই আল্লাহ্ তাদের সে সন্দেহ অপনোদন করে দিলেন। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে উন্মুক্ত হওয়ার অর্থ, কিয়ামতের দিন নেককার-বদকার সমস্ত সৃষ্টির এক প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। তারা সেখানে এমন এক খোলা ভূমিতে একত্রিত হবে যেখানে কেউ নিজেকে গোপন করার কোন সুযোগ পাবে না। [ইবন কাসীর] এ জন্য অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সামনে যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৪৮]

(২) এটি এমন সব লোকের জন্য সতর্কবাণী যারা দুনিয়ায় চোখ বন্ধ করে অন্যের পেছনে চলে অথবা নিজেদের দুর্বলতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে শক্তিশালী যালেমদের আনুগত্য করে, তাদের কথামত একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা থেকে দূরে ছিল, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেনি, তাদের জানানো হচ্ছে, আজ যারা তোমাদের নেতা হয়ে আছে আগামীকাল এদের কেউই তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে সামান্যতম নিষ্কৃতিও দিতে পারবে না। কাজেই আজই ভেবে নাও, তোমরা যাদের পেছনে ছুটে চলছো অথবা যাদের হুকুম মেনে চলছো তারা নিজেরাই কোথায় যাচ্ছে এবং তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে।

পালানোর জায়গা নেই ।(১)’

(১) আয়াতদৃষ্টে মনে হয়, এ ঝগড়াটি জাহান্নামে প্রবেশের পরে হবে । যেমন, কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে । বলা হয়েছে, “যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা, যারা অনুসরণ করেছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে । আর তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, ‘হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে’ । এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদেরকে দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ । আর তারা কখনো আগুন থেকে বহির্গমণকারী নয় ।” [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৬৬-১৬৭] আরও এসেছে, “আর যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করেছিল তাদেরকে বলবে, ‘আমরা তো তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম সুতরাং তোমরা কি আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?’ অহংকারীরা বলবে, ‘নিশ্চয় আমরা সকলেই এতে রয়েছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন ।” [সূরা গাফিরঃ ৪৭-৪৮] আরও বলেন, “অবশেষে যখন সবাই তাতে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, ‘হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল ; কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন ।’ আল্লাহ্ বলবেন, ‘প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না ।’ আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে, ‘আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাজেই তোমরা যা অর্জন করেছিলে, তার জন্য শাস্তি ভোগ কর ।” [সূরা আল-আ'রাফঃ ৩৮-৩৯] আরও এসেছে, “যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, ‘হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!’ তারা আরো বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; ‘হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত ।” [সূরা আল-আহযাবঃ ৬৬-৬৮]

কিন্তু বিভিন্ন আয়াতদৃষ্টে মনে হয় যে, হাশরের ময়দানেও তারা ঝগড়া করবে, যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে, “হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, ‘তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম ।’ যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দূর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী ।’ যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, ‘প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিনরাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা

চতুর্থ রুকূ'

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২. আর যখন বিচারের কাজ সম্পন্ন হবে তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি[১], আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে ডাকছিলাম তাতে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। তোমরা যে আগে আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলে[২] আমি তা অস্বীকার

আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য সমকক্ষ (শির্ক) স্থাপন করি।' আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং যারা কুফরী করেছে আমরা তাদের গলায় শৃংখল পরাব। তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা সাবাঃ ৩১-৩৩] এ ঝগড়াটি হবে হাশরের মাঠে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ সত্যবাদী ছিলেন এবং আমি ছিলাম মিথ্যেবাদী। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র।" [সূরা আন-নিসা: ১২০] আরও বলেন, "আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।' আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৪]

(২) এখানে আবার বিশ্বাসগত শির্কের মোকাবিলায় শির্কের একটি স্বতন্ত্র ধারা অর্থাৎ কর্মগত শির্কের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। যাকে 'শির্ক ফিত তা'আহ' বা

করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'[১]।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক বলা হয়। একথা সুস্পষ্ট, বিশ্বাসগত দিক দিয়ে শয়তানকে কেউই আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করে না এবং কেউ তার পূজা, আরাধনা ও বন্দেগী করে না। সবাই তাকে অভিশাপ দেয়। তবে তার আনুগত্য ও দাসত্ব এবং চোখ বুজে বা খুলে তার পদ্ধতির অনুসরণ অবশ্যি করা হচ্ছে। এটিকেই এখানে শির্ক বলা হয়েছে। কুরআনে কর্মগত শির্কের একাধিক প্রমাণ রয়েছে। যেমন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের "আহবার" (উলামা) ও "রাহিব" (সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী) দেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" [সূরা আত-তাওবাঃ ৩১] প্রবৃত্তির কামনা বাসনার পূজারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: তারা নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। [সূরা আল ফুরকানঃ ৪৩] নাফরমান বান্দাদের সম্পর্কে এসেছে, "তারা শয়তানের ইবাদাত করতে থেকেছে।" [সূরা ইয়াসীনঃ ৬০] এ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই অথবা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোন গাইরুল্লাহর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে থাকাও শির্ক। শরী'আতের দৃষ্টিতে আকীদাগত মুশরিকদের জন্য যে বিধান তাদের জন্য সেই একই বিধান, কোন পার্থক্য নেই। [দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস, আশ-শির্ক ফিল উলুহিয়্যাহ ফিত তা'আহ অধ্যায়]

(১) এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতবাসীদের পরস্পর সাদর সম্ভাষন হবে সালাম। [আদওয়াউল বায়ান] আবার কারও কারও মতে, এ সালাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবে। [বাগভী] অন্যত্র আছে যে, ফেরেশ্‌তাগণ জান্নাতবাসীদেরকে এ শব্দে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। যেমনঃ "যখন তারা জান্নাতের কাছে উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।" [সূরা আয-যুমারঃ ৭৩] "স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও, এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে, এবং বলবে, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কত ভাল এ পরিণাম!"[সূরা আর-রা'দঃ

২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ্‌ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের(১) তুলনা উৎকৃষ্ট গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উপরে বিস্তৃত(২),

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

২৩-২৪] "তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৭৫] "সেখানে তাদের ধ্বনি হবেঃ 'হে আল্লাহ্‌! আপনি মহান, পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম' এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবেঃ 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌র প্রাপ্য!" [সূরা ইউনুসঃ ১০]

(১) মূল আয়াতে ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ বলা হয়েছে। "কালেমা তাইয়েবা"র শাব্দিক অর্থ "পবিত্র কথা।" পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ কালেমা।[বাগভী] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ হলোঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেয়া আর ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ হলো মু'মিন। [ইবন কাসীর] এরপর ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ এর অর্থ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মু'মিনের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। ﴿وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ অর্থ, এ কালেমার কারণে এর মাধ্যমে মু'মিনের আমল আসমানে উত্থিত হয়। [ইবন কাসীর] আর এ তাফসীরই দাহহাক, সা'য়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ এবং কাতাদা সহ অনেক মুফাসসেরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে। যার সারকথা হলো, উত্তম বৃক্ষ হলো মু'মিন যার তুলনা খেজুর গাছের সাথে বিভিন্ন হাদীসে দেয়া হয়েছে। খেজুর গাছ শুধু ভাল কিছুই উপহার দেয়। তেমনি ঈমানদার, শুধু ভালকাজই তার কাছ থেকে আসমানে উঠতে থাকে। সে ভাল কথা, ভাল কাজ করেই যেতে থাকে আর তা দুনিয়াতে হলেও তার ফলাফল নির্ধারিত হয় আকাশে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝর্ণা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে, দম্‌কা বাতাসে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সবসময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক তথ্যনির্ভর উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়-সবাই জানে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'কুরআনে উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ

এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্‌যল তথা মাকাল বৃক্ষ।' [তিরমিযিঃ ৩১১৯, নাসায়ীঃ ২৮২] আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তার কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেনঃ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মর্দে-মুমিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এ স্থলে তিনি আরো বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন বৃক্ষ? ইবনে উমর বললেনঃ আমার মন চাইল যে, বলে দেই- খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিশে আবু বকর, উমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।' [বুখারীঃ ৭২, ১৩১, ২২০৯, ৪৬৯৮, মুসলিমঃ ২৮১১, মুসনাদে আহমাদঃ ২/১২, ২/৬১]

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড়বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলিমদের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবেলায় জান, মাল ও কোন কিছুর পরওয়া করেনি। দ্বিতীয় কারণ তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামী থেকে সবসময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূপৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কুরআন বলেঃ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [সূরা ফাতিরঃ ১০] -অর্থাৎ পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার যেসব যিক্‌র, তাসবীহ্-তাহ্‌লীল, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছতে থাকে। চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সবসময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন, ১/১৩৩; আল-বাদর, তাআম্মুলাত ফী মুমাসালাতিল মু'মিন বিন নাখলাহ] উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ বাক্যে أُكُل শব্দের অর্থ হচ্ছে ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حين শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। এটিই সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। [তাবারী] যদিও এখানে অন্যান্য মতও রয়েছে। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

২৫. যা সব সময়ে তার ফলদান করে তার রবের অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ পেশ করে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আর অসৎবাক্যের তুলনা এক মন্দ গাছ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্নকৃত, যার কোন স্থায়িত্ব নেই[১]।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৭. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন[২]

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ

---

(১) ﴿كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ এটি কালেমা তাইয়্যেবার বিপরীত শব্দ। এখানে কাফেরদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। [কুরতুবী] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর তাফসীরে ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হান্‌যল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। [কুরতুবী] কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন। [বাগভী] কুরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যেতে পারে না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। [কুরতুবী] কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে, ইবন আব্বাস বলেন, শির্কের কোন মূল নেই, কোন প্রমাণ নেই যে, কাফের তা ধারণ করবে। আর আল্লাহ্ শির্ক মিশ্রিত কোন আমল কবুল করেন না। [তাবারী] অর্থাৎ কাফেরের দ্বীনের বিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এ বৃক্ষের ফল-ফুল অর্থাৎ কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয়। গ্রহণযোগ্য নয়। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াত থেকে আমরা আরো যে শিক্ষা পাই তা হলো, মুমিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তা হলোঃ মুমিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে এবং সে অনুসারে আমল করতে হবে। এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। যখন কোন সন্দেহ আসে তাদেরকে সে সন্দেহ থেকে

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝٢٧

এবং যারা যালিম আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন । আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন[১] ।

উত্তরণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি পথনির্দেশ দেয়া হয় । অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে যায়, তখনও তাদেরকে নিজের আত্মার অনিষ্টতা ও খারাপ ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে সবকিছুর উপর স্থান দেয়ার তাওফীক দেয়া হয় । আখেরাতেও মৃত্যুর পূর্বমূহূর্তে দ্বীনে ইসলামীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার মাধ্যমে তাকে উত্তম পরিসমাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয় । তারপর কবরে তাকে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের সহযোগিতা করা হয়, ফলে সে উত্তর দিতে পারে যে, আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নবী । [সা'দী] অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিস বলেন, এ আয়াত কবরের ফিতনা তথা প্রশ্নোত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট । বস্তুত: কবরের শাস্তি ও শান্তি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিমকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিবে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং এটাও বলবে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল । আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী- ﴿يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ﴾ -এর উদ্দেশ্য । [বুখারী: ৪৬৯৯, মুসলিম: ২৮৭১] এছাড়া আরো প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে । ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন । হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের । [সা'দী] সাহাবাগণ তাদের তাফসীরে আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আযাব সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন ।[বিস্তারিত দেখুন, ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা চান, তাই করেন । তিনি চাইলে কাউকে তাওফীক দেন, কাউকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেন । কাউকে সুদৃঢ় রাখেন । কাউকে পদস্খলিত করেন । [বাগভী] কাউকে আযাব দেন, কাউকে পথভ্রষ্ট করেন । [কুরতুবী] তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোন শক্তি নেই । উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবন ইয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেনঃ মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে । এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল । এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না । তারা আরো বলেনঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম । কারণ, এটাই মূলতঃ তাকদীরের উপর ঈমান । আর যে কেউ তাকদীরের ভাল বা মন্দ হওয়ার উপর ঈমান আনবে না তার ঈমানই শুদ্ধ হবে না । তার আবাস জাহান্নাম হবেই । [ইবনুল কাইয়্যেম, তরীকুল হিজরাতাইন: ১/৮২]

পঞ্চম রুকূ'

২৮. আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ঘরে[১]--

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৯. জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল!

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

৩০. আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ[২] নির্ধারণ করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, 'ভোগ করে নাও[৩], পরিণামে আগুনই তোমাদের

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

---

(১) অর্থাৎ "আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।" অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এখানে মক্কার কাফেরদের বুঝানো হয়েছে। [বুখারী: ৪৭০০] মুজাহিদ বলেন, এর দ্বারা কুরাইশদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বদরে মারা গেছে। [ইবন কাসীর] এখানে "আল্লাহ্‌র নেয়ামত" বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নেয়ামত বোঝানো যেতে পারে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে নেয়ামত দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। তারা তার সাথে কুফরি করে তাদের প্রতি প্রেরিত নেয়ামতকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। [বাগভী] মূলতঃ যাবতীয় কাফের ও মুশরিকরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে।

(২) أَنْدَاداً শব্দটি نِدٌّ-এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে أنداد বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। তারা আল্লাহ্‌র সাথে সেগুলোরও ইবাদত করত এবং অন্যদেরকে সেগুলোর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাত। [ইবন কাসীর] সূরা আল-বাকারাহ এর তাফসীরে এর বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে।

(৩) تَمَتُّع শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

ফিরে যাওয়ার স্থান ।'

৩১. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি বলুন, 'সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে(১)---সে দিনের আগে যে দিন থাকবে না কোন বেচা- কেনা এবং থাকবে না বন্ধুত্বও(২) ।'

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۝

সাল্লাম-কে আদেশ দেয়া হয়েছেঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি । দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ীত্বের কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । [দেখুনঃ সূরা লুকমানঃ ২৪, সূরা ইউনুসঃ ৭০, সূরা আয-যুমারঃ ৮, সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৭, সূরা আন-নিসাঃ ৭৭, সূরা আত-তাওবাহঃ ৩৮, সূরা আর-রা'দঃ ২৬, সূরা আন-নাহলঃ ১১৭, সূরা গাফেরঃ ৩৯, সূরা আয-যুখরুফঃ ৩৫, সূরা আল-হাদীদঃ ২০]

(১) এ আয়াতে মুমিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে । প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা সালাত কায়েম করুক । এর মানে হচ্ছে, মুমিনদের হতে হবে কৃতজ্ঞ । আর এ কৃতজ্ঞতার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য এদের সালাত কায়েম এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে হবে । সালাতের সময় অলসতা এবং সালাতের সুষ্ঠ নিয়মাবলীতে ত্রুটি না করা চাই । এছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্‌ক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক । ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিকেই বৈধ রাখা হয়েছে- গোপনে অথবা প্রকাশ্যে । কোন কোন আলেম বলেন: ফরয যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত- যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল দান-সদকা গোপনে করা উচিত যাতে রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মত মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশংকা না থাকে । [কুরতুবী] ব্যাপারটি আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল । যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম-যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযীলত শেষ হয়ে যায়- তা ফরয হোক কিংবা নফল । পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ । [দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর ১/৭০১; সূরা আল-বাকারার ২৭১ নং আয়াতের তাফসীর]

(২) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সালাত কায়েম করতে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে দান

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾

৩২. আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন(১), আর যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন এবং যিনি নৌযানকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সেগুলো সাগরে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে(২)।

করাকে দ্রুত করতে বলেছে। [ইবন কাসীর] কারণ, কখন কিয়ামত এসে যায় তখন আর তারা এগুলো করতে সক্ষম হবে না। কারণ সেদিন কোন লেন-দেনের মাধ্যমে নিজের আযাবকে অন্যের কাছে স্থানান্তর করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সেদিন কোন বন্ধুও তার জন্য কিছু দিতে পারবে না। [সা'দী] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তা আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেনঃ "হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেদিন আসার আগে, যেদিন কেনা-বেচা, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না এবং কাফিররাই যালিম।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৫৪]

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনেকগুলো নেয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে 'ইবাদাত ও আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, তিনিই এমন সত্তা, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যাদের উপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়ীত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফলফলাদি সৃষ্টি করেছেন। যাতে সেগুলো তাদের রিয্ক হতে পারে। অথচ তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করা হচ্ছে, তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে, তাঁর সাথে জোর করে অংশীদার বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব সবই তাঁর দান, যাঁর দানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এরা আল্লাহ্র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سَخَّرَ শব্দের অর্থ ذَلَّلَ وَيَسَّرَ অনুগত করেছেন এবং উপকৃত হওয়া সহজ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিছু জিনিস তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে কিছু এমন জিনিসও আছে যেগুলো থেকে কল্যাণ লাভ করা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। তিনি মেঘ থেকে বৃষ্টি নাযিল করেছেন। যা দ্বারা তিনি মৃত ভূমিকে জীবিত

৩৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম[১] একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে[২] ।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

৩৪. এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে[৩] । তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

করেছেন। তা থেকে তিনি তোমাদের রিযকের ব্যবস্থা করেছেন। তোমাদের জন্য নৌকা ও জাহাজকে অনুগত ও সহজ করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সেটি সমুদ্রে তোমাদের উপকারার্থে চলাফেরা করে। আর নদীগুলোকে তোমাদের পান করার জন্য, তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের পানের সুবিধার্থে, তোমাদের ক্ষেত-খামারে পানি দেয়ার স্বার্থে, অনুরূপ তোমাদের যাবতীয় উপকারার্থে অনুগত ও সহজ করে দিয়েছেন। [মুয়াসসার]

(১) অর্থাৎ তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। دَآئِبَيْن শব্দটি داب থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অভ্যাস। [কুরতুবী] অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টির (সূর্য ও চন্দ্র) অভ্যাসে পরিণত করে দেয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। কিয়ামত পর্যন্ত এ দু'টি চলতে থাকবে, কোন প্রকার ক্লান্ত না হয়ে। [কুরতুবী] অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জির অধীন। [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) এমনিভাবে রাতদিনকে মানুষের অনূবর্তী করে দেয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। [দেখুন, মুয়াসসার] ইবন কাসীর বলেন, রাত ও দিনকে মানুষের জন্য নিয়োজিত করার অর্থ, একটি অপরটি থেকে কিছু অংশ নিয়ে নেয়া। কখনও রাত দিন থেকে নেয় ফলে রাত বড় হয়, আর কখনও দিন রাত থেকে কিছু অংশ নিয়ে নেয় ফলে দিন বড় হয়। অন্য আয়াতেও যেমন বিষয়টি বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সূরা আল-হাজ্জ: ৬১; সূরা লুকমান: ২৯; সূরা ফাতির: ১৩; সূরা আল-হাদীদ: ৬।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ।

গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না[১]। নিশ্চয় মানুষ অতি

[আত-তাফসীরুস সহীহ; ফাতহুল কাদীর] তবে আল্লাহ্‌র দান ও পুরস্কার কারো চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন। আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে দান করেছেন। এ কারণেই কোন কোন মুফাস্‌সির এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। [বাগভী; কুরতবী; ফাতহুল কাদীর] কিন্তু বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তোমাদের প্রার্থিত প্রতিটি বস্তু থেকে কিছু কিছু তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন। এ অর্থ নেয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ যা যা চায়, তার কিছু অংশ তাকে দিয়েই দেয়া হয়। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে চাওয়া বলতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে বুঝানো হয়েছে, তখন অর্থ হবে, তোমাদের প্রকৃতির সর্ববিধ চাহিদা পূরণ করেছেন। তোমাদের মুখে চাওয়া হোক বা অবস্থায় সে চাওয়া বুঝা যাক। এসব তিনিই দান করেছেন। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সরবরাহ করেছেন। তোমাদের বেঁচে থাকা ও বিকাশ লাভ করার জন্য যেসব উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন ছিল তা সবই যোগাড় করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ জানেন যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদাপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নেয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গুণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তা'আলার অন্তহীন নেয়ামত নিহিত রয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নেয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়। সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কোনভাবেই আমরা সেটা গণনা করে শেষ করতে পারব না। এই অসংখ্য নেয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য 'ইবাদাত ও অসংখ্য শোকর জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। মানুষ সে শোকর আদায়ের ব্যাপারে অতিশয় যালেম, কারণ সে এ ব্যাপারে গাফেল থাকে। [ফাতহুল কাদীর] মূলত: মানুষের প্রকৃতিই এই যে, সে অত্যাচারী, যালেম, গোনাহ করার ব্যাপারে অতি উৎসাহী, রবের হক আদায়ে অমনোযোগী, আল্লাহ্‌র নেয়ামতের সাথে অধিক কুফরিকারী। সে শোকরিয়া তো আদায় করেই না, নেয়ামতের স্বীকারোক্তি পর্যন্ত করে না।

মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

ষষ্ঠ রুকূ'

৩৫. আর স্মরণ করুন[১], যখন ইব্‌রাহীম বলেছিলেন, 'হে আমার রব! এ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ

তবে এদের ব্যতিক্রম কিছু লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, তারা ঠিকই তাঁর শোকর আদায় করতে সচেষ্ট থাকে। রবের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং সেটা আদায় করতে নিজেকে নিয়োজিত করে। উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র যে নেয়ামত তাঁর বান্দাদের জন্য রয়েছে সেগুলোর সামান্য কিছুর বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের আহ্বান জানিয়েছেন। যেভাবে তাঁর নেয়ামত দিন-রাত ব্যাপী তেমনি তার শোকরও দিন-রাত করার জন্য উদগ্রীব করেছেন। [সা'দী] তালক ইবন হাবীব বলেন, বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত এত বেশী যে বান্দারা সেটা গুণে শেষ করতে পারবে না। তাই তোমরা সকাল-বিকাল তাওবা কর। [ইবন কাসীর] এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের পরে যে দো'আ শিখিয়েছেন, তাতে এসেছে, 'হে আল্লাহ্! আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যথেষ্ট হয়েছে না বলে, (অর্থাৎ যে প্রশংসা আমি করছি তা আপনার নেয়ামতের বিপরীতে যথেষ্ট নয় অথবা আমাদের খাবার হিসেবেও যা খেয়েছি সেটাই যথেষ্ট নয় বরং সারা জীবন এ নেয়ামত আমাদের লাগবে) এবং যে নেয়ামত থেকেও বিদায় নিতে পারব না (বা আমরা না নিয়ে পারব না)। আর এ নেয়ামত থেকে অমুখাপেক্ষীও আমরা হতে পারব না।' [বুখারী: ৫৪৫৮]

(১) সাধারণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার পর এবার আল্লাহ কুরাইশদের প্রতি যেসব বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর কথা বলছেন। এ সংগে একথাও বলা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রপিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কোন ধরনের প্রত্যাশা নিয়ে তোমাদের এখানে আবাদ করেছিলেন, তাঁর দোয়ার জবাবে আমি তোমাদের প্রতি কোন ধরনের অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম এবং এখন তোমরা নিজেদের প্রপিতার প্রত্যাশা ও নিজেদের রবের অনুগ্রহের জবাবে কোন ধরনের ভ্রষ্টতা ও দুষ্কর্মের অবতারণা করে যাচ্ছো। তিনি তো এ ঘরকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য তৈরী করেছিলেন। এ ইবরাহীম যার জন্য এ এলাকা আবাদ হয়েছে তিনি তো প্রচণ্ডভাবেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাতের বিরোধিতা করে গেছেন। তিনিই তো মক্কার জন্য নিরাপত্তার দো'আ করেছেন। [আল-বাহরুল মুহীত; ইবন কাসীর]

آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

শহরকে নিরাপদ করুন(১) এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন(২)।

(১) এখানে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দু'টি দো'আ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দো'আঃ ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ -অর্থাৎ হে আমার রব! এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা আল-বাকারায়ও [১২৬ নং আয়াতে] এ দো'আর উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بلد শব্দটি ألف ও لام ব্যতীত بلدا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। এর কারণ হিসেবে কোন কোন মুফাস্‌সির যা বলেন তা এই যে, এ দো'আটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দো'আ করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন। এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দো'আটি করেন। কারণ এর পরে তাঁর দু ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাকের কথা উল্লেখ করেছেন। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, দো'আটি পরেই করা হয়েছে। কারণ ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইসহাকের চেয়ে তের বছরের বড় ছিলেন। আর প্রথম যখন দো'আ করেছিলেন তখন ইসমাঈল ও তাঁর মা-এ দু'জনই ছিলেন। আর ইসমাঈল তখন ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। [আল-বাহরুল মুহীত; ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, সূরা বাকারার আয়াতে সে দেশ ও দেশের বাসিন্দা সবার নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে এ সূরায় শুধু দেশের নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে প্রথমে যে দো'আ করেন তা হচ্ছে, 'একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন।' আল্লাহ্ তা'আলা নবীর এ দো'আ কবুল করেছেন। তিনি অন্যত্র বলেন, "তারা কি দেখে না আমরা 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬৭] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সবকিছুর আগে নিরাপত্তার জন্য দো'আ করেছেন। কারণ, যদি কোন স্থানে নিরাপত্তার অভাব হয়, সেখানে দ্বীন- দুনিয়ার কোন কাজই সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) দ্বিতীয় দো'আ এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। নবীগণ নিস্পাপ। কিন্তু এখানে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আ করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে নবীগণ সর্বদা শংকা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দো'আ করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য নিজেকেও দো'আয় শামিল করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর দো'আ কবুল করেছেন। ফলে তার সন্তানরা শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। [তাবারী; কুরতুবী] তবে তার বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজা হবে না এমনটি বলা হয়নি এবং ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালামও এমন দো'আ করেননি। কারণ, মক্কাবাসীরা

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. 'হে আমার রব! এ সব মূর্তি তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে[১]। কাজেই যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

সাধারণভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এরই বংশধর। তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক দো'আকারীর উচিত তার নিজের ও পিতামাতা ও তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য এ দো'আ করা। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে পূর্ব আয়াতে বর্ণিত দো'আর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। অর্থাৎ মূর্তিগুলো মানুষকে আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের ভক্তে পরিণত করেছে। মূর্তি যেহেতু অনেকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে তাই পথভ্রষ্ট করার কাজকে তার কৃতকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে তথা ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে, তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দকর্ম নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। আর যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করার সঠিক অর্থ হলোঃ নবীসুলভ দয়া প্রকাশ করা। প্রত্যেক নবীর আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, প্রত্যেক কাফের ঈমান আনুক, তাই আল্লাহ্ তা'আলাকে "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু" -একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেনঃ ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [আল-মায়েদাঃ ১১৮] অর্থাৎ "আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান"। আপনি সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ কথা 'হে রব! এ মুর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে'

৩৭. 'হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাস করালাম[১] অনুর্বর

رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا

এ আয়াতাংশ এবং ঈসা আলাইহিস সালামের 'যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা' আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেন। তারপর তিনি তাঁর দু'হাত উপরে উঠালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ্! আমার উম্মত, হে আল্লাহ্! আমার উম্মত, হে আল্লাহ্! আমার উম্মত। আর কাঁদতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীলকে বললেন, হে জিবরীল তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও, -অথচ তোমার রব জানেন - তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি কাঁদছেন? তখন জিবরীল এসে রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও জিবরীলকে প্রশ্নোত্তর জানালেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, জিবরীল যাও, মুহাম্মাদের কাছে এবং তাকে বল, আমরা অবশ্যই আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনার জন্য খারাপ কোন কিছু করব না। [মুসলিম: ২০২]

(১) এখানে ইব্‌রাহীম আলাইহিসসালাম কিভাবে তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে এ মরুপ্রান্তরে রেখে গেলেন সে ঘটনাটি সহীহ বর্ণনার উপর নির্ভর করে বর্ণনা করা প্রয়োজন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাঈল আলাইহিসসালাম এর মাতা হাজেরা থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন গর্ভের নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। অতঃপর উভয়ের মনোমালিণ্য চরমে পৌঁছলে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম হাজেরা ও তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে নির্বাসন দানের জন্য বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে কাবাঘর অবস্থিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদের উঁচু অংশে যমযমের উপরিস্থত এক বিরাট বৃক্ষতলে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানির কোনরূপ ব্যবস্থা। অতঃপর সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইবরাহীম আলাইহিসসালাম নিজ গৃহ অভিমুখে ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা তার পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! কোথায় চলে যাচ্ছেন? আর আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী না আছে পানাহারের কোন বস্তু। তিনি বার বার এ কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিসসালাম সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ্ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ্ আমাদের ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। ইবরাহীমও সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাকে দেখতে

পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এ দো'আ করলেনঃ "হে আমাদের রব ! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে, হে আমাদের রব ! এ জন্যে যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" তখন ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তার শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন, শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে জমিনে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের দিকে তাকানো তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা'কেই একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন তারপর তিনি এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে ময়দানের দিকে মুখ করলেন, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি না? কিন্তু না কাউকে তিনি দেখলেন না। তখন দ্রুত সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নিচু ময়দানে পৌঁছলেন তখন আপন কামিজের এক দিক তুলে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন, মারওয়া পাহাড়ের নিকট এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখতে পান কি না? কিন্তু কাউকে দেখলেন না। তিনি অনুরূপভাবে সাতবার করলেন। ... তারপর যখন তিনি শেষবার মারওয়ার পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনছি। যদি তোমার কাছে উদ্ধার করার মত কিছু থাকে আমাকে উদ্ধার কর। অকস্মাৎ তিনি, যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পেলেন। সে ফেরেশ্‌তা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন। কিংবা তিনি বলেছেন-আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপচে উঠতে লাগল। হাজেরা এর চার পাশে বাঁধ দিয়ে তাকে হাউযের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উছলে উঠতে লাগল। ... তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশ্‌তা তাকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহ্‌র ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনঃ নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ্ তার পরিজনকে কখনও ধ্বংস করবেন না। ঐ সময় বায়তুল্লাহ জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি আসতো এবং ডান বাম থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যেতো।

হাজেরা এভাবেই দিন-যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত "জুরহুম" গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন, 'জুরহুম'

গোত্রের কিছু লোক 'কাদা' এর পথে এ দিক দিয়ে আসছিল। তারা মক্কার নিচুভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতগুলো পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তারপর তারা একজন বা দু'জন লোক সেখানে পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। বর্ণনাকারী বলেনঃ ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে সম্মতি জানালো। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল, তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। ফলে আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করলো এবং পরিবার-পরিজনের কাছে খবর পাঠালো, তারাও এসে সেখানে বসবাস শুরু করল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি খান্দান জন্ম নিল। ইসমাঈলও বড় হলেন, তাদের থেকে আরবী শিখলেন। জওয়ান হলে তিনি তাদের অধিক আগ্রহের বস্তু ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। বিয়ের পরে ইসমাঈলের মাতা মারা গেলেন। ... (ইতিমধ্যে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম দু'বার এসে ইসমাঈল ও স্ত্রীর খোঁজ নিলেন এবং এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিলেন)

পুনরায় ইবরাহীম আলাইহিসসালাম আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু দিন এদের থেকে দূরে রইলেন। এরপর আবার তাদের কাছে আসলেন। ইসমাঈল আলাইহিসসালাম যমযমের কাছে একটি গাছের নীচে বসে নিজের তীর মেরামত করছিলেন। পিতাকে যখন আসতে দেখলেন, দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন পিতা-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাত হলে যা করে তারা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেনঃ হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন। ইসমাঈল আলাইহিসসালাম জবাব দিলেন, আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা করে ফেলুন। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেনঃ তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল আলাইহিসসালাম বললেন, হ্যাঁ। আমি অবশ্যই আপনার সাহায্য করব। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এখানে এর চারপাশ ঘেরাও করে একটি ঘর বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন এবং স্থানটি দেখালেন। তখনি তারা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আলাইহিসসালাম পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম আলাইহিসসালাম গাঁথুনি করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল

উপত্যকায়[১] আপনার পবিত্র ঘরের কাছে[২], হে আমাদের রব! এ

لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْـِٕدَةً مِّنَ

আলাইহিসসালাম মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম আলাইহিসসালামের জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম এর উপর দাঁড়িয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল তাকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দো'আ করতে থাকলেনঃ "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ কাজটুকু) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন"। আবার তারা উভয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন। তারা কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন এবং উভয়ে এ দো'আ করছিলেনঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-বাকারাহঃ ১২৭), [বুখারীঃ ৩৩৬৪]

(১) ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে যান, তখন তিনি আবেদন করেছিলেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকার্‌রামায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুস্কর।

(২) এ আয়াতাংশ থেকে কেউ কেউ প্রমাণ নিতে চেষ্টা করেছেন যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের এবং বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে বলেনঃ সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস্ সালাম বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেন। নূহের মহাপ্লাবনের পর ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে এই ভিত্তির উপরেই বায়তুল্লাহ্ পূননির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস্ সালাম প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। [কুরতুবী] তবে সহীহ কোন দলীল সরাসরি এটা প্রমাণ করে না যে, ইবরাহীম আলাইহিসসালামের পূর্বে কেউ কা'বা ঘর বানিয়েছে। বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনায় আদম আলাইহিসসালাম এবং পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতির মক্কায় আসার কথা এসেছে, কিন্তু সেগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীতে টিকে না। যেখানে সরাসরি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, "প্রথম মাসজিদ বাইতুল্লাহিল হারাম তারপর বাইতুল মাকদিস, আর এ দুয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো চল্লিশ বছরের"। [দেখুনঃ মুসলিমঃ ৫২০] ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নির্মিত এই প্রাচীর জাহেলিয়াত যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মান করে। এ নির্মাণকাজে আবু তালেবের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও নবুওয়তের পূর্বে অংশগ্রহণ করেন। [মুসলিমঃ ৩৪০] এতে বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষণ محرم উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত। [কুরতুবী]

النَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

জন্যে যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে[১]। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন[২] এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করুন[৩], যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে[৪]।

---

(১) ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আর প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম সালাত কায়েমকারী করার দো'আ করেন। ইবন জারীর বলেন, এখানে বায়তুল্লাহকে কেন হারাম বা সম্মানিত/সুরক্ষিত করা হয়েছে তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটা হচ্ছে, যাতে মানুষ সেখানে সালাত আদায় করতে সমর্থ হয়। [তাবারী; ইবন কাসীর] তাছাড়া সালাত সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত। [আল-বাহরুল মুহীত] এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। যে এ সালাত ঠিকভাবে কায়েম রাখতে পারবে সে দ্বীন কায়েম রাখতে পারবে। [সা'দী] এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে সালাতের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটাই সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাংখা হবে।

(২) أفئدة শব্দটি فؤاد এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে أفئدة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تبعيض ও تقليل এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ যদি এ দো'আয় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত; তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইয়াহূদী, নাসারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভীড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম দো'আয় বলেছেনঃ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। যাতে করে শুধু মুসলিমরাই এখানে আসে। [ইবন কাসীর]

(৩) যাতে করে তারা এ ফল-মুল খেয়ে আপনার ইবাদতের জন্য শক্তি লাভ করতে পারে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা এ দো'আ কবুল করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "আমরা কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমাদের দেয়া রিয্‌কস্বরূপ" [সূরা আল-কাসাস: ৭৫] এ দো'আর প্রভাবেই মক্কা মুকার্‌রামা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না। এ দোআর বরকতেই সব যুগে সব ধরনের ফল, ফসল ও অন্যান্য জীবন ধারণ সামগ্রী সেখানে পৌঁছে থাকে। [কুরতুবী]

(৪) এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দো'আ এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে

৩৮. 'হে আমাদের রব! আপনি তো জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে[১]।

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِي وَمَا نُعۡلِنُۗ وَمَا يَخۡفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿٣٨﴾

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্‌মা'ঈল ও ইস্‌হাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণকারী[২]।

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾

সালাতের অনুবর্তিতা দ্বারা দো'আ শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলিমের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণার উপর আখেরাতের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দো'আ সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমার আন্তরিক অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আপনি আমার এ দো'আর উদ্দেশ্য ভাল করেই জানেন। আপনি জানেন যে, আমি এ দো'আ দ্বারা কেবল আপনার জন্য ইখলাস ও সন্তুষ্টিই কামনা করছি। [তাবারী; ইবন কাসীর] 'আন্তরিক অবস্থা' বলতে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়েছিল। [কুরতুবী] আর 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে স্পষ্টত: ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোন অবস্থাই তাঁর অজ্ঞাত নয়। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মুখে যা কিছু বলছি তা আপনি শুনছেন এবং যেসব আবেগ-অনুভূতি আমার হৃদয় অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে তাও আপনি জানেন।

(২) এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দো'আর পরিশিষ্ট। কেননা, দো'আর অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দো'আর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নেয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নেয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল করে তাকে সুসন্তান

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

৪০. 'হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের রব! আর আমার দো'আ কবূল করুন(১)।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

৪১. 'হে আমাদের রব! যেদিন হিসেব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন(২)।'

সপ্তম রুকূ'

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ

৪২. আর আপনি কখনো মনে করবেন না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল(৩), তবে তিনি

ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন। অবশেষে ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ﴾ বলে প্রশংসা বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণকারী তথা কবুলকারী।

(১) প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দো'আয় মশগুল হয়ে যানঃ ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾ এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য সালাত কায়েম রাখার দো'আ করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা! আমার দো'আ কবুল করুন। এখানে সালাতে কায়েম রাখার অর্থ, সালাতের হিফাযতকারী এবং এর সীমারেখা যথাযথভাবে কায়েম করা বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দো'আ করলেন, 'হে আমার রব! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারাজীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যও মাগফেরাতের দো'আ করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কুরআনুল কারীমেই উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দো'আটি তখন করেছেন, যখন ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে কাফেরদের জন্য দো'আ করতে নিষেধ করা হয়নি। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্‌কে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যতঃ

فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির[1]।

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. ভীত-বিহ্বল চিত্তে উপরের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটোছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে উদাস[2]।

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন, তখন যারা যুলুম করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব।' তোমরা কি আগে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের

প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি ও শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। [ফাতহুল কাদীর] পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফেলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন।

(১) অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে হবে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তারা তা দেখতে থাকবে যেন তাদের চোখের মনি স্থির হয়ে গেছে, পলক পড়ছে না। ঠায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তা আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় আসন্ন হলে হঠাৎ কাফিরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম।" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৯৭]

(২) অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হয়ে থাকবে। ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ -অর্থাৎ লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ -অর্থাৎ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে। ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ -অর্থাৎ ভয়ে তাদের অন্তর শূন্য, উদাস ও ব্যাকুল হবে। [কুরতুবী]

পতন নেই[১]?

৪৫. আর তোমরা বাস করেছিলে তাদের বাসভূমিতে, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল এবং তাদের সাথে আমরা কিরূপ (আচরণ) করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। আর তোমাদের জন্য আমরা অনেক দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছিলাম[২]।

وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝

(১) এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন যালিম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবেঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে আরো কিছুদিন সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েকদিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত নবীগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের এ অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন, "আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।" [সূরা আস-সাজদাহঃ ১২] আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জবাবে বলা হবেঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও আখেরাত অস্বীকার করে আসছিলে। অন্য আয়াতেও কাফেরদের এ আবদার ও তার জবাব বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে আবার ফেরত পাঠান, 'যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি।' না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই" [সূরা আল-মুমিনূনঃ ৯৯-১০০]

(২) এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরস্পরের মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন কিন্তু এরপরও তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। আল্লাহ্

৪৬. আর তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্‌র কাছে রক্ষিত হয়েছে[১], তবে তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যে, পর্বত টলে যাবে[২]।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

বলেন, "এটা পরিপূর্ণ হিকমত, কিন্তু ভীতিপ্রদর্শন তাদের কোন কাজে লাগেনি।" [সূরা আল-কামার:৫] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তিনি তাদের যাবতীয় চক্রান্ত বেষ্টন করে আছেন। তিনি সেগুলোকে পুনরায় তাদের দিকে তাক করে দিয়েছেন। আবার তিনি সেগুলোর বিনিময়ে তাদের শাস্তি দিবেন।

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদ ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ﴾ বাক্যের إن শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তারা সত্যদ্বীনকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলিমদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমত কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। তাদের কুটকৌশল এমন বড় কিছু নয় যে, পাহাড় টলে যাবে। সে অনুসারে তাদের যাবতীয় কুটকৌশলের হীনতা ও দূর্বলতা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এ অর্থে বলা হয়েছে, "ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করবেন না; আপনি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেন না এবং উচ্চতায় আপনি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবেন না।" [সূরা আল-ইসরাঃ৩৭] [ইবন কাসীর]

আয়াতের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হলো, "যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবেলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে" [কুরতুবী] কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে। আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণতঃ নমরূদ, ফির'আওন, কওমে-'আদ, কওমে সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবেলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আয়াতে উল্লেখিত مكر শব্দের অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে, শির্ক ও রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ। [কুরতুবী] অর্থাৎ তাদের শির্ক ও রাসূলের উপর মিথ্যারোপ মারাত্মক আকার ধারণ করলেও আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অন্য আয়াত থেকেও এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, শির্ক

৪৭. সুতরাং আপনি কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী[১]।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

৪৮. যেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমানসমূহও[২];

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

করার কারণে আকাশ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। [সূরা মারইয়ামঃ ৯০] [ইবন কাসীর]

(১) এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছেঃ "কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" তিনি নবীগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন। [বাগভী; কুরতুবী] তিনি তাদেরকে দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন, আখেরাতেও যেদিন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াবে সেদিনও তিনি তাদের সাহায্য করবেন। তিনি পরাক্রমশালী কোন কিছুই তার ক্ষমতার বাইরে নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা পূরণে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছেঃ "কেয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে।" পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেয়া হবে; যেমন কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত, গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَاۤ اَمْتًا﴾ [ত্বাহাঃ ১০৭] অর্থাৎ গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কেয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিস্কার ময়দান হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কেয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিস্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কারো কোন চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। [বুখারীঃ ৬৫২১, মুসলিমঃ ২৭৯০] অন্য এক হাদীসে এসেছে,

وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

আর মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে এক, একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্‌র সামনে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

৪৯. আর সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন পরস্পর শৃংখলিত অবস্থায়[১],

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার[২] এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এক ইয়াহূদী এসে প্রশ্ন করলঃ যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেনঃ পুলসিরাতের নিকটে অন্ধকারে থাকবে।’ [মুসলিমঃ ৩১৫] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বলেছিলেন, “সিরাতের উপর” [মুসলিম: ২৭৯১] এ থেকে জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ্ তা‘আলাই ভাল জানেন।

(১) অর্থাৎ যেদিন সমস্ত মানুষ মহান বিচারপতি আল্লাহ্‌র সামনে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। তখন যদি আপনি অপরাধীদের দিকে দেখতেন যারা কুফরি ও ফাসাদ সৃষ্টি করে অপরাধ করে বেড়িয়েছে, তারা সেদিন শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকবে।[ইবন কাসীর] এখানে কয়েকটি অর্থ হতে পারে, একঃ কাফেরগণকে তাদের সমমনা সাথীদের সাথে একসাথে শৃংখলিত অবস্থায় রাখা হবে। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “(ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে,) ‘একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ‘ইবাদাত করত তারা---” [সূরা আস-সাফফাত: ২২] আরও এসেছে, “আর যখন দেহে আত্মাসমূহ সংযোজিত হবে” [সূরা আত-তাকওয়ীর: ৭] যাতে করে শাস্তি বেশী ভোগ করতে পারে। কেউ কারো থেকে পৃথক হবে না। পরস্পরকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। দুইঃ তারা নিজেদের হাত ও পা শৃংখলিত অবস্থায় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [কুরতুবী] তিন. কাফের ও তাদের সাথে যে শয়তানগুলো আছে সেগুলোকে একসাথে শৃংখলিত করে রাখা হবে। [বাগভী; কুরতুবী]এমনও হতে পারে যে, সব কয়টি অর্থই এখানে উদ্দেশ্য।

(২) কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, قطران এর অর্থ প্রচণ্ড গরম তামা। [ইবন কাসীর] কারও কারও নিকট “কাতেরান” শব্দটি আলকাতরা, গালা ইত্যাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেগুলোতে সাধারণত আগুন বেশী প্রজ্জলিত হয়।

চেহারাসমূহকে[১];

৫১. যাতে আল্লাহ্ প্রতিদান দেন প্রত্যেক নাফসকে যা সে অর্জন করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে তৎপর[২]।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

৫২. এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, আর যাতে এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনিই কেবল এক সত্য ইলাহ্ আর যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

---

(১) এখানে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মুখ আগুনে আচ্ছন্ন থাকবে। অন্যত্র আরো বলেছেনঃ "আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়" [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ১০৪] "হায়, যদি কাফিররা সে সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের মুখ ও পিছন দিক থেকে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না!" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৩৯]

(২) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তিনি বান্দাদের হিসেব গ্রহণে দ্রুত তা সম্পন্ন করবেন। কেননা, তিনি সবকিছু জানেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। সমস্ত মানুষ তাঁর শক্তির কাছে একজনের মতই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" [সূরা লুকমান: ২৮] দুই. আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অচিরেই তিনি তাদের হিসেব গ্রহণ করবেন। কারণ কিয়ামত অতি সন্নিকটে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১] [ইবন কাসীর]

১৫- সূরা আল-হিজ্‌র,
৯৯ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الْحِجْرِ

।। রহমান, রহীম, আল্লাহ্‌র নামে ।।
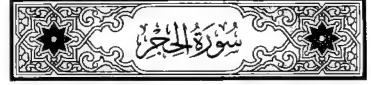
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. আলিফ-লাম-রা, এগুলো হচ্ছে আয়াত মহাগ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কুরআনের[১]।

الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ①

২. কখনো কখনো কাফিররা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত[২]!

رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ②

(১) কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ এ কুরআন হেদায়াত ও সঠিক পথ এবং কল্যাণের রাস্তাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। সুতরাং হেদায়াত চাইলে এ কুরআন অনুসরণের বিকল্প নেই। [তাবারী] এখানে তিনি হালাল, হারাম, হক ও বাতিল স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। [বাগভী]

(২) কখন কাফেরগণ সেটা আকাংখা করবে? কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা এটা মৃত্যুর সময় কামনা করবে। [ইবন কাসীর] তবে এ ব্যাপারে একটি হাদীসের দিকে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, সেটা আখেরাতে তারা কামনা করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "জাহান্নামবাসীরা যখন জাহান্নামে একত্রিত হবে, তারা তাদের সাথে কিছু গুনাহগার মু'মিনদেরকেও দেখতে পাবে, তখন তারা বলবেঃ তোমাদের ইসলাম তোমাদের কোন কাজে আসলো না, তোমরা তো দেখছি আমাদের সাথে জাহান্নামেই রয়ে গেলে। তারা বলবেঃ আমাদের কিছু গুনাহ ছিল যার কারণে আমাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা যা বলেছে আল্লাহ্ তা শুনলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তখন কিবলার অনুসারী মুসলিমগণকে বের করার নির্দেশ দেয়া হবে। আর তখন কাফেরগণ আফসোস করে বলবেঃ হায়! আমরা যদি মুসলিম হতাম তাহলে তারা যেভাবে বের হয়ে গেছে সেভাবে আমরাও বের হতে পারতাম। সাহাবী আবু মূসা আল-আশ'আরী বলেনঃ 'আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেনঃ "আলিফ-লাম-রা, এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের কখনো কখনো কাফিররা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত।"[মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৪২] এভাবে কাফেররা যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে তখন লজ্জিত হবে এবং আফসোস করে ঈমান আনার জন্য আকাংখা করতে থাকবে। কিন্তু তাদের সে আকাংখা কোন কাজে লাগবে না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ "আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদেরকে আবার ফেরত পাঠানো হত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" [সূরা আল-আন'আমঃ ২৭] " যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি

৩. তাদেরকে ছাড়ুন, তারা খেতে থাকুক[১], ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক[২], অতঃপর

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, 'হায়! এটাকে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ।' তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে; দেখুন, তারা যা বহন করবে তা খুবই নিকৃষ্ট! [সূরা আল-আন'আমঃ ৩১] "যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২৭]

(১) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা আখেরাত ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। এখানে দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও আনুগত্য ত্যাগ করে, দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন হওয়া, তাওবাহ ও আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন পরিত্যাগ করা এবং মৃত্যু ও আখেরাত থেকে নিশ্চিন্ত দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বারে দাড়িয়ে বললেনঃ 'হে দামেশ্‌কবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্খী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। 'আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে?' [ইবনুল মুবারক: আয-যুহদ ৮৪৭; কুরতুবী] হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্খার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।' [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ মানুষের আশা-আকাংখা, লোভ-লালসা এতবেশী যে, সে তার পিছনে এতই মগ্ন থাকে যে, তার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ তার আশা পুরোয় না। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অচিরেই তারা জানতে পারবে[1]।

৪. আর আমরা যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ কাল[2]।

وَمَآ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُوۡمٌ ۝

৫. কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ ۝

ওয়াসাল্লাম চার কোন বিশিষ্ট একটি ঘর আঁকলেন। তারপর তার মধ্যভাগ থেকে একটি রেখা এঁকে তা বৃত্তের বাইরে নিয়ে গেলেন। তারপর এ রেখার বাইরের অংশে ছোট ছোট কতগুলো রেখা আড়াআড়ি ভাবে মাঝ বরাবর আঁকলেন এবং বললেনঃ "এটা (মধ্যবিন্দু) হলো মানুষ, আর এর চারপাশে যে রেখা তাকে ঘিরে আছে দেখা যাচ্ছে সেটা তার আয়ূ। আর যে রেখা বাইরের দিকে চলে গেছে সেটা তার আশা-আকাংখা। আর এই যে, ছোট ছোট রেখাগুলো আছে সেগুলো তার বিপদাপদ বালা-মুসিবত। যদি কোন একটি থেকে বেঁচে যায় অপরটি তাকে জাপটে ধরে। তারপর এটা থেকে বেঁচে গেলেও অপরটি তাকে ঠিকই ধরে ফেলে। [বুখারীঃ ৬৪১৭]

(১) অচিরেই তারা জানতে পারবে তাদের ও তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম কি হবে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে সে পরিণামটি বলা হয়েছে, "বলুন, 'ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের ফিরে যাওয়ার স্থান।" [সূরা ইবরাহীম: ৩০] আরও এসেছে, "তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী, সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।" [সূরা আল-মুরসালাত: ৪৬-৪৭]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, তিনি কোন জনপদকে ঐ সময় পর্যন্ত ধ্বংস করেননি যতক্ষণ তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেন নি। শুধু প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করাই নয় বরং তাদের জন্য একটি সময় অবশ্যই আছে সে সময়ও আসতে হয়েছে। তাদের সে সময়ের আগেও তাদের ধ্বংস করা হবে না, তাদের সে সময়ের পরেও তাদের ধ্বংস বিলম্বিত হবে না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ কুফরী করার সাথে সাথেই আমি কখনো কোন জাতিকে পাকড়াও করিনি। তাদেরকে শুনবার, বুঝবার ও নিজেকে শুধরে নেবার জন্য অবকাশ দেয়া হবে। যতক্ষন এ অবকাশ থাকে এবং আমার নির্ধারিত শেষ সীমা না আসে ততক্ষন আমি ঢিল দিতে থাকি। এর মাধ্যমে মূলত: মক্কাবাসী কাফেরদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে তাদের শির্ক, ইলহাদ ও গোয়ার্তুমী থেকে ফেরৎ আসারই আহ্বান জানানো হচ্ছে, যে শির্ক, ইলহাদ ও গোয়ার্তুমীর কারণে তারা ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ তাফসীরের পক্ষে আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বাণী: "আর আমি যতক্ষণ কোন রাসূল প্রেরণ না করব ততক্ষণ শাস্তিদাতা নই" [সূরা আল-ইসরা: ১৫; অনরূপ দেখুন, সূরা ইউনুস: ৪৯]

৬. আর তারা বলে, 'হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি যিকর[১] নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ[২]।

وَقَالُوا يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝٦

৭. 'তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন?[৩]'

لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٧

৮. আমরা ফেরেশ্‌তাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রেরণ করি না; আর (ফেরেশ্‌তারা উপস্থিত হলে) তখন তারা আর অবকাশ পেত

مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًا مُّنظَرِينَ ۝٨

---

(১) যিকির বা বাণী শব্দটি পারিভাষিক অর্থে কুরআন মজীদে আল্লাহর বাণীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বাণী হচ্ছে আগাগোড়া উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। পূর্ববর্তী নবীদের ওপর যতগুলো কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলো সবই "যিকির" ছিল এবং এ কুরআন মজীদও যিকির। যিকিরের আসল অর্থ হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেয়া, সতর্ক করা এবং উপদেশ দেয়া।

(২) তারা ব্যঙ্গ ও উপহাস করে একথা বলতো। [সা'দী] এ বাণী যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে একথা তারা স্বীকারই করতো না। আর একথা স্বীকার করে নেয়ার পর তারা তাকে পাগল বলতে পারতো না। আসলে তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, "ওহে, এমন ব্যক্তি! যার দাবী হচ্ছে, আমার ওপর যিকির তথা আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।" [ইবন কাসীর] এটা ঠিক তেমনি ধরনের কথা যেমন ফের'আউন মূসা আলাইহিসসালামের দাওয়াত শুনার পর তার সভাসদদের বলেছিলঃ "নিশ্চয় যে রাসূল তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, অবশ্যই সে উন্মাদ।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ২৭]

(৩) তারা বলতঃ তুমি যদি মনে করে থাক যে তোমার কাছে আল্লাহ্‌র বাণী এসেছে তবে একথা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ফেরেশ্‌তাগণ এসে তা প্রমাণ করুন। নতুবা আমরা সেটা বিশ্বাস করছি না। এভাবে ফেরেশ্‌তা নাযিল করার দাবী কাফেরদের চিরাচরিত অভ্যাস। ফেরআউন বলেছিলঃ "মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফিরিশ্‌তাগণ দলবদ্ধভাবে?" [সূরা আয-যুখরুফঃ ৫৩] আরবের কাফেররাও বলেছিলঃ "যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না তারা বলে, 'আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রব কে দেখি না কেন?' তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২১]

না(১) ।

৯. নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক(২) ।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَٰفِظُونَ ⑨

(১) অর্থাৎ নিছক তামাশা দেখাবার জন্য ফেরেশতাদেরকে অবতরণ করানো হয় না। কোন জাতি দাবী করলো, ডাকো ফেরেশতাদেরকে আর অমনি ফেরেশতারা হাযির হয়ে গেলেন, এমনটি হয় না। যখন কোন জাতির শেষ সময় উপস্থিত হয় এবং তার ব্যাপারে চুড়ান্ত ফায়সালা করার সংকল্প করে নেয়া হয় তখনই ফেরেশতাদেরকে পাঠানো হয়। তখন কেবলমাত্র ফায়সালা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এর অর্থ ফেরেশতাগণ রিসালত ও শাস্তি নিয়েই নাযিল হয়ে থাকেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ এই বাণী, যার বাহক সম্পর্কে তোমরা খারাপ মন্তব্য করছ, আল্লাহ্ নিজেই তা অবতীর্ণ করেছেন। তিনি একে কোন প্রকার বাড়তি বা কমতি, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়া থেকে হেফাযত করবেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না---সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪২] আরও বলেছেন, "নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই। কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৭-১৯]। সুতরাং একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সুযোগ ও তোমরা কেউ কোনদিন পাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। রিসালাত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। দ্বীনি ব্যাপারাদীতে মুসলিমদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআনুল কারীম মুখস্ত করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখো লাখো বরং কোটি কোটি মুসলিম যুবক-বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকা, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষনাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবন ওয়াইনা এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, কুরআনুল কারীম যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছেঃ ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ﴾ [সূরা আল-মায়েদাঃ ৪৪] অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ কারণেই যখন ইয়াহূদী ও নাসারাগণ হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেল। পক্ষান্তরে কুরআনুল কারীম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ অর্থাৎ "আমিই এর সংরক্ষক"

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

১০. আর অবশ্যই আপনার আগে আমরা আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾

১১. আর তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না।

كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

১২. এভাবেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি[১],

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

১৩. এরা কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে না, আর অবশ্যই গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের রীতি[২]।

[সূরা আল-হিজরঃ৯]। সুতরাং এটি কখনও অসংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ নেই। [কুরতুবী]

(১) সাধারণত অনুবাদক ও তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন: আমি তাকে প্রবেশ করাই বা চালাই। এর মধ্যকার (০) সর্বনামটিকে বিদ্রুপ এর সাথে এবং (তারা এর প্রতি ঈমান আনে না) এর মধ্যকার সর্বনামটিকে এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। তারা এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি এভাবে এ বিদ্রুপকে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেই এবং তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান আনে না।" [সা'দী] যদিও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এতে কোন ত্রুটি নেই, তবুও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী উভয় সর্বনামই "যিকির" বা বাণীর সাথে সংযুক্ত হওয়াই বেশী নির্ভুল বলে মনে হয়। [ফাতহুল কাদীর] আরবী ভাষায় (سلك) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া অনুপ্রবেশ করানো, চালিয়ে দেয়া বা গলিয়ে দেয়া। যেমন সুঁইয়ের ছিদ্রে সূতো গলিয়ে দেয়া হয়। [কুরতুবী] কাজেই এ হিসেবে আয়াতের অর্থ, ঈমানদারদের মধ্যে তো এই "বাণী" হৃদয়ের শীতলতা ও আত্মার খাদ্য হয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু অপরাধীদের অন্তরে তা বারুদের মত আঘাত করে এবং তা শুনে তাদের মনে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যেন মনে হয় একটি গরম শলাকা তাদের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। তাদের অন্তরে এ কুরআন ঢুকলেও তা সেখানে স্থান পায় না। সেখান থেকে শুধু মিথ্যারোপই বের হয়। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের রীতি চলে গেছে যে, তারা ঈমান আনেনি। আর আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং বর্তমানকালের কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থাও তদ্রূপ হবে, তারা ঈমান আনবে না, আর আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [জালালাইন, আইসারুত তাফাসীর, মুয়াসসার]

১৪. আর যদি আমরা তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই অতঃপর তারা তাতে আরোহন করতে থাকে,

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

১৫. তবুও তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬. আর অবশ্যই আমরা আকাশে বুরুজসমূহ সৃষ্টি করেছি(১) এবং দর্শকদের জন্য সেগুলোকে সুশোভিত করেছি(২);

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

১৭. এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমরা সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছি;

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾

১৮. কিন্তু কেউ চুরি করে(৩) শুনতে

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

(১) بروج শব্দটি برج এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ও মজবুত ইমারত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্, প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এখানে بروج এর তাফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। [তাবারী] সে হিসেবে আয়াতের অর্থ, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। সাধারণতঃ সূর্যের পরিভ্রমণ পথকে যে বারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, 'বুরুজ' শব্দটি দ্বারা এখানে তা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে বলে কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেছেন। হাসান বসরী ও কাতাদা এটিকে গ্রহ-নক্ষত্র অর্থে গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অন্য এক স্থানে আকাশকে তারকারাজির সাহায্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কথা বলেছেন। যেমনঃ "আমি কাছের আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি, [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ৬] "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা" [সূরা আল-মুলকঃ ৫]

(৩) অর্থাৎ যেসব শয়তান তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদেরকে গায়েবের খবর এনে দেবার চেষ্টা করে থাকে, যাদের সাহায্যে অনেক জ্যোতিষী, গণক ও ফকির বেশধারী বহুরুপী অদৃশ্য জ্ঞানের ভড়ং দেখিয়ে থাকে, গায়েবের খবর জানার কোন একটি উপায়-উপকরণও আসলে তাদের আয়ত্বে নেই। তারা চুরি-চামারি করে কিছু শুনে নেবার চেষ্টা অবশ্যি করে থাকে।

চাইলে[১] প্রদীপ্ত শিখা[২] তার

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মাঝে মাঝে ফিরিশ্‌তারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আসমানের সংবাদাদী নিয়ে পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত এবং গণকদের কাছে তা গোপনে পৌঁছিয়ে দিত। গণকরা এগুলোর সাথে শত মিথ্যা নিজেদের পক্ষ থেকে জুড়ে দিয়ে তা বলে বেড়ায়”। [বুখারীঃ ৩২১০, ২২২৮] পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ্ যখন আসমানে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন ফেরেশ্‌তাগণ তার নির্দেশের আনুগত্য স্বরূপ তাদের ডানাগুলোকে মারতে থাকে তাতে পাথরের উপর জিঞ্জির পড়ার মত শব্দ অনুভূত হয়। তারপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর হয় তখন তারা বলতে থাকেঃ তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারাই আবার বলেঃ হক্ক বলেছেন, তিনি বড়, মহান। কান লাগিয়ে কথাচোরগণ এ কথোপকথন শুনতে পায়। আর এসব কান লাগিয়ে শ্রবণকারীগণ একটির উপর একটি থাকে। বর্ণনাকারী সুফিয়ান তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করলেন এবং একটির উপর আর একটি স্থাপন করলেন। তারপর কখনো কখনো উজ্জল আলোর শিখা সে কান লাগিয়ে শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে কথা পৌঁছানোর পূর্বেই আঘাতে করে জালিয়ে দেয়। আবার কখনো কখনো আলোর শিখা তার কাছে পৌঁছার আগেই সে তার নীচের সাথীকে তা পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে পৌঁছাতে পৌঁছাতে যমীন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তারপর যাদুকর বা গণকের মুখে রেখে দেয়। তখন সে যাদুকর তথা গণক সে সংবাদের সাথে শতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে বর্ণনা করে। আর এভাবেই তার কোন কোন কথা সত্যে পরিণত হয়। তারপর লোকেরা বলতে থাকেঃ সে কি আমাদেরকে বলেনি যে, অমুক অমুক দিন এই সেই হবে, তারপর আমরা কি সঠিক পাইনি? আসলে সেটা ছিল ঐ বাক্য যা আসমান থেকে শোনা গিয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৭০১]

(২) شهاب এর আভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল আগুনের শিখা। এখানে বলা হয়েছে, ﴿شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾ কুরআনের অন্য জায়গায় এজন্য ﴿شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আস-সাফ্‌ফাতঃ ১০] আবার কোথায়ও বলা হয়েছে, ﴿شِهَابًا رَّصَدًا﴾ [সূরা আল-জিনঃ ৯] আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ ইসলাম-পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তারা বললেনঃ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধরণের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেনঃ এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্ম-মৃত্যুর সাথে

পশ্চাদ্ধাবন করে।

১৯. আর যমীন, এটাকে আমরা বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; এবং আমরা তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করেছি সুপরিমিতভাবে[১],

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾

২০. আর আমরা তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের রিযিকদাতা নও তাদের জন্যও[২]।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. আর আমাদের কাছেই আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমরা তা পরিজ্ঞাত পরিমানেই নাযিল করে থাকি[৩]।

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾

এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়। [মুসলিমঃ ২২২৯]

(১) এর দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ এক অর্থ. প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। এ সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। দুই. যমীনে তিনি এমন জিনিস তৈরী করেছেন যা ওজন করা যায় এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। [ইবন কাসীর]

(২) আর তিনি সেখানে তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে তোমরা রিযিক দাও না। যেমন দাস-দাসী, কর্মচারী, সন্তান-সন্ততি তাদের রিযক তো আল্লাহ্ই প্রদান করেন। অথবা আয়াতের অর্থ, আর এ যমীনের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য যেমন রিযিক রেখেছি তেমনি তাদের জন্যও রিযিক রেখেছি। তখন যমীনে যেগুলো আছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন, সমস্ত প্রাণী। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে যে, সবকিছুর খযীনা তো তাঁর কাছেই। خزينة বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে মূল্যবান সামগ্রী হেফাযত করা হয়। খযীনা বলে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, যত কিছু হওয়া সম্ভব সবই তাঁর কাছে। তিনিই সেগুলোকে পরিমানমত অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে বৃষ্টি বোঝানো হয়েছে। কারণ, বৃষ্টির কারণে সেগুলো উৎপন্ন হয়। [ফাতহুল কাদীর] সুতরাং বায়ু, পানি, আলো, শীত, গ্রীষ্ম, জীব, জড়, উদ্ভিদ তথা প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি প্রজাতি, প্রত্যেকটি শ্রেণী ও প্রত্যেকটি শক্তির জন্য একটি সীমা নির্ধারিত রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর নির্ধারিত সীমার বাইরে কেউ পেতে পারে না। আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন, "আর যদি আল্লাহ্

وَاَرۡسَلۡنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسۡقَيۡنٰكُمُوۡهُ ۚ وَمَاۤ اَنۡتُمۡ لَهٗ بِخٰزِنِيۡنَ ﴿۲۲﴾

২২. আর আমরা বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু পাঠাই, তারপর আকাশ হতে পানি নাযিল করে তা তোমাদেরকে পান করতে দেই[১]; অথচ তোমরা নিজেরা তা ভাণ্ডারে জমাকারী নও[২] ।

তাঁর বান্দাদের রিয্‌ক প্রশস্ত করে দিতেন তবে তারা যমীনে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছেমত পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন । নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা" [সূরা আশ-শূরা:২৭]

(১) আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে । ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি বাতাস পাঠান, সেগুলো আকাশ থেকে পানি বয়ে নিয়ে যায় । তারপর মেঘের উপর দিয়ে যাওয়ার পরে সেটা এমনভাবে পড়ার মত হয় যেমন দোহানোর আগে জন্তুর দুধ পড়ার অবস্থা হয় । দাহহাক বলেন, আল্লাহ্ মেঘমালার উপর বায়ূ পাঠান তখন সেটা এমনভাবে সেটাকে পরাগায়ণের মত করে যে, তা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় । [ইবন কাসীর] এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেন । বাষ্পে বৃষ্টির উপকরণ বায়ু সৃষ্টি হয় এবং তা উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করে । অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এসব পানি পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌঁছে দিয়ে থাকেন । এরপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়েছে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা এই উড়ন্ত মেঘমালা থেকে সেখানে সে পরিমাণ পানি বর্ষণ করছে । আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ "তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন । তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক । তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ, দ্রাক্ষা এবং সব রকমের ফল । অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন ।" [সূরা আন-নাহলঃ ১০-১১] "তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি--- যা দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই ।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৪৮-৪৯]

(২) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ একঃ তোমরা এ পানির কোন ভান্ডারের মালিক নও যে তোমরা চাইলেই তা পাবে । এটা তো শুধু আমার পক্ষ থেকে দান করা । [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতে আল্লাহ্‌র কুদরতের ঐ ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জানোয়ারদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে । এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল

২৩. আর আমরাই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী ।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রগামী হয়েছে তাদেরকে জানি এবং অবশ্যই জানি তাদেরকে যারা পশ্চাতে গমনকারী[১] ।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

ও ধৌতকরণ এবং খেত-খামার ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায় । কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারো কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয় । এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং কারো কাছে তা দাবীও করা হয় না । আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি? [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৬৮-৬৯]
দুই, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে পানি নাযিল করান তা নাযিল করার পর তোমরা ইচ্ছে করলেই তা সংরক্ষন করে রাখতে পার না । [ফাতহুল কাদীর] যতক্ষন আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যবস্থা করে না দিবেন । কারণ তা নাযিল হওয়ার পর নষ্ট করে দেয়া, ব্যবহার উপযোগী না থাকা অসম্ভব কিছু নয় । আল্লাহ্ বলেন, "আমি ইচ্ছে করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি । তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ৭০] আরো বলেনঃ "এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; তারপর আমি তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম ।" [সূরা আল-মুমিনূনঃ ১৮] আরো বলেনঃ "অথবা তার পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে এবং তুমি কখনো সেটার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না ।" [সূরা আল-কাহফঃ ৪১] আরো বলেনঃ "বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?" [সূরা আল-মুলকঃ ৩০]

(১) এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদদের পক্ষ থেকে الْمُسْتَقْدِمِينَ (অগ্রগামী দল) এবং الْمُسْتَأْخِرِينَ (পশ্চাদগামী দল) -এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে ।
১) কাতাদাহ্ ও ইকরিমা বলেনঃ যারা পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তারা অগ্রগামী । আর যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী ।
২) ইবনে আব্বাস ও দাহ্হাক বলেনঃ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী । [ফাতহুল কাদীর]
৩) মুজাহিদ বলেনঃ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মাদী পশ্চাদগামী । [ফাতহুল কাদীর]
৪) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ ইবাদাতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী আর

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝٢٥

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব তাদেরকে সমবেত করবেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ(১)।

তৃতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝٢٦

২৬. আর অবশ্যই আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে কালচে মাটি হতে(২),

---

গোনাহ্‌গাররা পশ্চাদগামী। [তাবারী; বাগভী]

(৫) সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে যারা সালাতের কাতারে অথবা জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাদগামী। [ইবন কাসীর; বাগভী]
বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লেখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যপ্ত।

(১) অর্থাৎ তার অপার কর্মকুশলতা ও প্রজ্ঞার বলেই তিনি সবাইকে একত্র করবেন। আবার তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তার নাগালের বাইরে কেউ নেই। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন মানুষের মাটি হয়ে যাওয়া দেহের একটি কণাও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবনকে দূরবর্তী ও অবাস্তব মনে করে সে মূলত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কুশলতা সম্পর্কে বেখবর। আর যে ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, মরার পরে যখন আমাদের মৃত্তিকার বিভিন্ন অণু-কণিকা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের কিভাবে পুনর্বার জীবিত করা হবে, সে আসলে আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। এজন্যই যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ্‌র কুদরতের সাথে শির্ক করে। এটা শির্ক ফির রবুবিয়াহ। [দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস]

(২) মানুষের আদি উৎস সম্পর্কে কুরআন বলছে, সরাসরি মৃত্তিকার উপাদান থেকে তার সৃষ্টিকর্ম শুরু হয়। ﴿صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ "শুকনো কালো ঠনঠনে পচা মাটি" শব্দাবলীর মাধ্যমে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে। حمأ বলতে আরবী ভাষায় এমন ধরনের কালো কাদা মাটিকে বুঝায় যার মধ্যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাকে আমরা নিজেদের ভাষায় পংক বা পাঁক বলে থাকি অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যা মাটির গোলা বা মন্ড হয়ে গেছে। [সা'দী] مسنون শব্দের দুই অর্থ হয়। একটি অর্থ, পরিবর্তিত, অর্থাৎ এমন পচা, যার মধ্যে পচন ধরার ফলে চকচকে ও তেলতেলে ভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। [সা'দী] আর দ্বিতীয় অর্থ, চিত্রিত। অর্থাৎ যা একটি নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামোতে রুপান্তরিত

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৭. আর এর আগে আমরা সৃষ্টি করেছি জিনদেরকে অতি উষ্ণ[১] নির্ধুম আগুন থেকে।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾

২৮. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে কালচে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি;

فَاِذَا سَوَّیْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব[২] তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো[৩],

---

হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] صلصال বলা হয় এমন পচা কাদাকে যা শুকিয়ে যাওয়ার পর ঠনঠন করে বাজে। [এর জন্য আরও দেখুন, বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, গাঁজানো কাদা মাটির গোলা বা মন্ড থেকে প্রথমে প্রথম মানুষকে বানানো হয় এবং তা তৈরী হবার পর যখন শুকিয়ে যায় তখন তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দেয়া হয়।

(১) سموم বলা হয় গরম বাতাসকে। [বাগভী] আর আগুনকে সামুমের সাথে সংযুক্ত করার ফলে এর অর্থ হয় আগুনের প্রখর উত্তাপ। [সা'দী] কুরআনের যেসব জায়গায় জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াত থেকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে যায়।

(২) এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে যে রুহ ফুঁকে দেয়া হয় অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করা হয় তা মূলতঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৃত রুহ বা নির্দেশ বিশেষ। এ সম্পর্কটি সম্মানের জন্য করা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র কোন অংশ সৃষ্টির কারো কাছে নেই। [ফাতহুল কাদীর] মূলত: সৃষ্টির মধ্যে যেসব গুণের সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিরই উৎস ও উৎপত্তিস্থল আল্লাহরই কোন না কোন গুণ। যেমন হাদীসে বলা হয়েছেঃ "মহান আল্লাহ রহমতকে একশো ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর এর মধ্য থেকে ৯৯ টি অংশ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র একটি অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি মাত্র অংশের বরকতেই সমুদয় সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। এমনকি যদি একটি প্রাণী তার নিজের সন্তান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ জন্য তার ওপর থেকে নিজের নখর উঠিয়ে নেয় তাহলে এটিও আসলে এ রহমত গুণের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি" [বুখারী ৬০০০, মুসলিমঃ ২৭৫২]

(৩) এ সিজদা কোন ইবাদতের সিজদা ছিল না বরং সম্মানসূচক ছিল [বাগভী; ফাতহুল

৩০. অতঃপর ফেরেশ্‌তাগণ সবাই একত্রে সিজ্‌দা করল,	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. ইবলীস ছাড়া, সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।	اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আল্লাহ্‌ বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হল যে, তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?'	قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে বলল, 'আপনি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠন্‌ঠনে কালচে মাটি হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজ্‌দা করার নই।'	قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. তিনি বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত;	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. আর নিশ্চয় প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল লা'নত।	وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾
৩৬. সে বলল, হে আমার রব! যেদিন তাদের পুনরুত্থান করা হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।	قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের একজন,	قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. সুনির্দিষ্ট সময় আসার দিন পর্যন্ত।	اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. সে বলল, 'হে আমার রব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সে জন্য অবশ্যই আমি যমীনে মানুষের কাছে পাপকাজকে শোভন করে তুলব এবং	قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾

কাদীর] যেমনটি আমাদের সালামের বেলায় হয়ে থাকে। যার প্রকৃত স্বরূপ কেমন ছিল তা আমরা জানি না। [আল-মানার]

অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে বিপথ গামী করব[১],

৪০. তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া[২] ।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

৪১. আল্লাহ্‌ বললেন, এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল পথ ।

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝

৪২. বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না[৩];

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

(১) অর্থাৎ যেভাবে তুমি এ নগণ্য ও হীন সৃষ্টিকে সিজদা করার হুকুম দিয়ে আমাকে আপনার হুকুম অমান্য করতে বাধ্য করেছো ঠিক তেমনিভাবে এ মানুষদের জন্য আমি দুনিয়াকে এমন চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর জিনিসে পরিণত করে দেবো যার ফলে তারা সবাই এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে আপনার নাফরমানী করতে থাকবে, আখেরাতের জবাবদিহির কথা ভুলে যাবে। অথবা আয়াতের অর্থ, নাফরমানিকে তাদের কাছে এমন চিত্তাকর্ষক করে তুলব যে, তারা আপনার নির্দেশ ভুলে যাবে। [ফাতহুল কাদীর] ইবলীসের এ ঘোষণা কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এসেছে। [যেমন, সূরা আল-আ'রাফঃ ১৬-১৭, সূরা আন-নিসাঃ ১১৮, সূরা আল-ইসরাঃ ১৬২] শয়তান তার এ সমস্ত দাবীকে অনেকটাই সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ "তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল"। [সূরা সাবাঃ ২০]

(২) এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ, তোমার জোর খাটবে শুধুমাত্র এমন বিপথগামীদের ওপর যারা তোমাকে অনুসরণ করবে। আমার সত্যিকার বান্দাদের উপর তোমার কোন জোর খাটবে না। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যারা ইখলাসের সাথে ইবাদাত করবে, অন্য কোন দিকে তাকাবে না, তাদের উপর তোমার কোন প্রভাব কাজ করবে না। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন বলেঃ ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৫৫] এ থেকে জানা যায়া যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদের

৪৩. আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান,

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. 'সেটার সাতটি দরজা আছে[১], প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য (শয়তানের অনুসারীদের) নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে[২] ।'

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

চতুর্থ রুকূ'

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে ।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিস্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তারা তাদের নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না; ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ করে ফেলেন । উল্লেখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয় । কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা মাফ করা হয়েছিল । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে, তাছাড়া এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসও রয়েছে । [দেখুনঃ সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৪৬৬৩] এ গুলো অপরাধ অনুসারে শাস্তি দেয়ার জন্য একই জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জাহান্নামের দরজা সাতটি, সেগুলো একটির উপরে আরেকটি । প্রথমটি পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়টি তারপর তৃতীয়টি, এভাবে সবগুলো পূর্ণ হবে । ইকরিমা বলেন, জাহান্নামের সাত দরজার অর্থ, সাত তলা । ইবন জুরাইজ বলেন, প্রথমটি জাহান্নাম, দ্বিতীয়টি লাযা, তৃতীয়টি হুতামা, চতুর্থটি সা'য়ীর, পঞ্চমটি সাকার, ষষ্ঠটি জাহীম, আর সপ্তমটি হা-ওয়ীয়াহ । [ইবন কাসীর]

(২) যেসব গোমরাহী ও গোনাহের পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ নিজের জন্য জাহান্নামের পথের দরজা খুলে নেয় সেগুলোর প্রেক্ষিতে জাহান্নামের এ দরজাগুলো নির্ধারিত হয়েছে । যেমন কেউ নাস্তিক্যবাদের পথ পাড়ি দিয়ে জাহান্নামের দিকে যায় । কেউ যায় শির্কের পথ পাড়ি দিয়ে, কেউ মুনাফিকীর পথ ধরে, কেউ প্রবৃত্তি পূজা, কেউ অশ্লীলতা ও ফাসেকী, কেউ জুলুম, নিপীড়ন ও নিগ্রহ, আবার কেউ ভ্রষ্টতার প্রচার ও কুফরীর প্রতিষ্ঠা এবং কেউ অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রচারের পথ ধরে জাহান্নামের দিকে যায় । আবার জাহান্নামেও তাদের শাস্তির পর্যায় হবে ভিন্ন ভিন্ন । হাদীসে এসেছে, "তাদের কাউকে কাউকে আগুন দু গোড়ালী পর্যন্ত আক্রমন করবে । আবার কারো কারো হবে কোমর পর্যন্ত । আর কারো কারো গর্দান পর্যন্ত পাকড়াও করবে" । [মুসলিমঃ ২৮৪৫]

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর(১) ।'

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব(২); তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে(৩),

---

(১) এখানে জান্নাতীদের সওয়াবকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র আরো বিস্তারিতভাবে এসেছে, কোথায়ও বলা হয়েছে, " নিশ্চয় সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে, উপভোগ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।" [সূরা আয-যারিয়াতঃ ১৫-১৯] এ আয়াতগুলোতে তাদের জান্নাতে যাওয়ার কিছু কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেছেনঃ "মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে--- উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সংগিনী দান করব আয়তলোচনা হূর, সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন- আপনার রব নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহাসাফল্য।"[সূরা আদ-দুখানঃ ৫১-৫৭]

(২) অর্থাৎ সৎ লোকদের মধ্যে পারস্পারিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে দুনিয়ার জীবনে যদি কিছু মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তা দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের পক্ষ থেকে তাদের মন একেবারে পরিস্কার করে দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের কাছে আটকানো হবে। সেখানে দুনিয়াতে তাদের একজন অপরজনের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করেছে সেগুলোর কেসাস নেয়া হবে। তারপর যখন তারা সম্পূর্ণভাবে সাফ ও স্বচ্ছ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে ঢুকার অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তাদের প্রত্যেকে দুনিয়ায় তাদের অবস্থানস্থলের চেয়েও বেশী ভালোভাবে জান্নাতে তাদের অবস্থানস্থলের পথ পেয়ে যাবে।" [বুখারীঃ ৬৫৩৫]

(৩) বলা হচ্ছে যে, জান্নাতবাসীগণ আসনে অবস্থান করবে। একে অপরের মুখোমুখি হয়ে আনন্দিত অবস্থায় বসবে। কুরআনের অন্যত্র এ আসনগুলোর বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে; এবং অল্প সংখ্যক

৪৮. সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না[১]।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ-খচিত আসনে ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ১৩-১৬] আরো বলা হয়েছে, "ওরা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।" [সূরা আর-রাহমানঃ ৭৬] আরো বলা হয়েছে, "সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান, এবং বিছানা গালিচা"। [সূরা আল-গাশিয়াহঃ ১১-১৬]

(১) এ আয়াত থেকে জান্নাতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানা গেলঃ
প্রথমতঃ সেখানে কেউ কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। অন্য আয়াতেও তা বলা হয়েছে, "যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।" [সূরা সাবাঃ ৩৫] দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই, বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।
দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নেয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিস্কৃতও করা হবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ﴾ অর্থাৎ, "এ হচ্ছে আমাদের রিয্‌ক, যা কোন সময় শেষ হবে না। [সূরা সোয়াদঃ ৫৪] আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ অর্থাৎ, তাদেরকে কোন সময় এসব নেয়ামত ও সুখ থেকে বহিস্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোন বিরাট নেয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয়, তবুও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন্ সময় আবার নারাজ হয়ে তাকে বের করে দেয়। নিম্নলিখিত হাদীস থেকেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেনঃ "জান্নাতবাসীদেরকে বলে দেয়া হবে, এখন তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। এখন তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না। এখন তোমরা চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। এখন হবে চির অবস্থানকারী, কখনো স্থান ত্যাগ করতে হবে না।" [মুসলিমঃ ২৮৩৭] এর আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এমন সব আয়াত ও হাদীস থেকে যেগুলোতে বলা হয়েছে জান্নাতে নিজের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য মানুষকে কোন শ্রম করতে হবে না। বিনা প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রম ছাড়াই সে সবকিছু পেয়ে যাবে।

৪৯. আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু,

نَبِّئْ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

৫০. আর নিশ্চয় আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

৫১. আর তাদেরকে বলুন, ইব্‌রাহীমের অতিথিদের কথা,

وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٥١﴾

৫২. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।

إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা বলল, 'ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি(১)।'

قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

৫৪. তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ(২)?'

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

তৃতীয়তঃ আরেকটি সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নেয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়? কুরআনুল কারীম এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছেঃ ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ১০৮] অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

(১) অর্থাৎ ইসহাক আলাইহিস্ সালামের জন্মের সুসংবাদ। কারণ ইসমাঈল আলাইহিসসালাম এর পূর্বেই অন্য স্ত্রীর ঘরে দুনিয়ায় এসেছিলেন। [ইবন কাসীর]

(২) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ প্রশ্নটি ছিল অতিশয় আশ্চর্য থেকে। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর আমার স্ত্রীও বৃদ্ধা সুতরাং কিভাবে আমাদেরকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন? [বাগভী]

৫৫. তারা বলল, 'আমরা সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি; কাজেই আপনি হতাশ হবেন না।'

قَالُوا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তিনি বললেন, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার রবের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তিনি বললেন, 'হে প্রেরিত (ফেরেশ্‌তা) গণ! তোমাদের আর বিশেষ কি উদ্দেশ্য আছে?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তারা বলল, 'নিশ্চয় আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে---

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. তবে লূতের পরিবারের বিরুদ্ধে নয়[১], আমরা তো অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব,

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, নিশ্চয় সে পিছনে অবস্থানকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত।'

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

পঞ্চম রুকূ'

৬১. অতঃপর ফেরেশ্‌তাগণ যখন লূত পরিবারের কাছে আসল,

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. তখন লূত বললেন, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক'।

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. তারা বলল, 'না, তারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা আপনার কাছে

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

---

(১) এখানে পরিবারবর্গ বলে লূত আলাইহিস সালাম, তার পরিবারের ঈমানদার ও তার অনুগামী, অনুসারী সকল মুমিনকেই বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এর থেকে আরও বোঝা গেল যে, 'آل' শব্দটি أهل থেকেও ব্যাপক।

তা'ই নিয়ে এসেছি;

৬৪. আর আমরা আপনার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী;

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. কাজেই আপনি রাতের কোন এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পিছনে চলুন[১]। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে না তাকায়[২]; তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে তোমরা সেখানে চলে যাও[৩]।'

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. আর আমরা তাকে এ বিষয়ে ফয়সালা জানিয়ে দিলাম যে, নিশ্চয় তাদেরকে ভোরে সমূলে বিনাশ করা হবে।

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. আর নগরবাসী উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল।

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾

---

(১) অর্থাৎ নিজের পরিবারবর্গের পেছনে পেছনে এ জন্য চলুন যেন তাদের কেউ থেকে যেতে না পারে। তাদের হেফাযত করা সম্ভব হয়। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও যুদ্ধে যোদ্ধাদের পিছনে থাকতেন। দূর্বলদের হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেন, আর পথের বাহনের অভাবীকে বহন করে নিয়ে যেতেন। [দেখুন, আবু দাউদ: ২৬৩৯]

(২) অর্থাৎ যখন তোমরা শব্দ শুনবে তখন তোমরা পিছনে তাদের দিকে তাকিও না। তাদের আযাবে তাদেরকে থাকতে দাও [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা ছিল কাওমে লূতের ঈমানদারদের চিহ্ন যে তারা পিছনে ফিরে তাকাবে না। [বাগভী]

(৩) মনে হয় যেন তাদের সাথে এমন কেউ ছিল যে তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস বলেন, তাদেরকে শাম দেশে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। মুকাতিল বলেন, যগর নামক স্থানে তাদের যাওয়ার নির্দেশ ছিল। কেউ কেউ বলেন, জর্দান। [বাগভী]

قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيۡفِىۡ فَلَا تَفۡضَحُوۡنِۙ﴿٦٨﴾

৬৮. তিনি বললেন, নিশ্চয় এরা আমার অতিথি; কাজেই তোমরা আমাকে বেইয্‌যত করো না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ﴿٦٩﴾

৬৯. আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমাকে হেয় করো না।'

قَالُوۡۤا اَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বলল, আমরা কি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىۡۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ فٰعِلِيۡنَؕ﴿٧١﴾

৭১. লূত বললেন, একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার এ কন্যারা রয়েছে[১]।

لَعَمۡرُكَ اِنَّهُمۡ لَفِىۡ سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ﴿٧٢﴾

৭২. আপনার জীবন[২], নিশ্চয় তারা তাদের নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিল।

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِيۡنَۙ﴿٧٣﴾

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় প্রকাণ্ড চীৎকার তাদেরকে পাকড়াও করল;

---

(১) সূরা হূদ-এর ৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(২) এ কালেমাটির দু'টি অর্থ রয়েছে, কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন এই যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শপথ করেছেন। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত এমন কোন আত্মা সৃষ্টি ও পয়দা করেন নি। আমি আল্লাহকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও নামে শপথ করতে শুনিনি। [ইবন কাসীর] এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যে কোন সৃষ্টজীবের কসম বা শপথ করতে পারেন। কারণ এর মাধ্যমে তিনি সেটাকে সম্মানিত করেন। কিন্তু বান্দার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমেই শপথ করা যায়। নতুবা তা শির্কে পরিণত হয়।

তাছাড়া, কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের অর্থ করেছেন যে, এখানে শপথ উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা আরবী ব্যবহার বিধির একটি নিয়ম। এটা দ্বারা কসম বা শপথ উদ্দেশ্য না হয়ে কথায় জোর দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। [তাবারী]

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. তাতে আমরা জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর-কংকর বর্ষণ করলাম ।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর নিশ্চয় তা লোক চলাচলের পথের পাশেই বিদ্যমান[১] ।

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন । ﴿لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে । এক. মুজাহিদ ও দাহহাক বলেন, এর অর্থ চিহ্নিত জনপদে পরিণত হয়েছে । কাতাদা বলেন, স্পষ্ট পথে । কাতাদা থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, যমীনের এক প্রান্তে । [ইবন কাসীর] ইবনে কাসীর আরও বলেন, এই সাদূম জনপদটিতে যে বিপদ ঘটে গেছে, যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পরিবর্তন ঘটেছে, পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তা পঁচা দুর্গন্ধময় খারাপ সাগরে পরিণত হয়েছে, যা আজও একই অবস্থায় বিদ্যমান । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে ও সন্ধ্যায় । তবুও কি তোমরা বোঝ না?" [সূরা আস-সাফফাত: ১৩৭-১৩৮] কারণ, আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এ জনপদ অবস্থিত । আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে । অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এসব জনপদ সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, ﴿لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহ্‌র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর সামান্য কিছু ছাড়া বাকীগুলো পুনর্বার আবাদ হয়নি ।

এ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন । এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আলাহ্‌র ভয়ে তার মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন । [দেখুন, ইবন হিব্বান: ৬১৯৯] তার এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ । বরং সেগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির কথা চিন্তা করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে ।

কুরআনুল কারীমের বক্তব্য অনুযায়ী লূত 'আলাইহিস্ সালামের ধ্বংসপ্রাপ্ত

৭৭. নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

৭৮. আর 'আইকা'বাসীরা[১]ও তো ছিল সীমালংঘনকারী,

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ

৭৯. অতঃপর আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, আর এ জনপদ দু'টিই প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

ষষ্ঠ রুকূ'

৮০. আর অবশ্যই হিজ্‌রবাসীরা[২] রাসূলের

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ

জনপদসমূহ আজো আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট এলাকা নিয়ে রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি সাগরের আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যেই একে 'মৃত সাগর' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান এবং লবনের পরিমাণও; তাই এতে কোন সামুদ্রিক প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। আখেরাত থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কুরআনুল কারীম অবশেষে বলেছেঃ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ অর্থাৎ, এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

(১) আইকাবাসীগণ শু'আইব আলাইহিসসালামের উম্মত। তাদের প্রকৃত পরিচয় কি তা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আস-শু'আরাতে তাদের কর্মকাণ্ড ও তাদের উপর আপতিত আযাবের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। [সূরা আস-শু'আরাঃ ১৭৬-১৯১]

(২) তারা হলো সালেহ আলাইহিসসালামের জাতি। তারা যা যা করত এবং তাদের উপর কি কি আযাব এসেছিল তা এস্থান ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য স্থানে আলোচনা

প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল;

৮১. আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৮২. আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদে।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝

৮৩. অতঃপর ভোরে বিকট চীৎকার তাদেরকে পাকড়াও করল।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۝

৮৪. কাজেই তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি(১)।

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮৫. আর আসমান, যমীন ও তাদের মাঝে অবস্থিত কোন কিছুই যথার্থতা ছাড়া সৃষ্টি করিনি(২) এবং নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই। কাজেই আপনি পরম সৌজন্যের সাথে ওদেরকে ক্ষমা করুন(৩)।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝

করা হয়েছে। [দেখুন, সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৩-৭৮, সূরা হূদঃ ৬১-৬৮, সূরা আস-শু'আরাঃ ১৪১-১৫৯]

(১) অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে যেসব আলীশান ইমারত নির্মাণ করেছিল। তারা যে সমস্ত ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদির জন্য উষ্ট্রীটি হত্যা করেছিল, যাতে তাদের পানিতে ঘাটতি না পড়ে, তাদের এ সমস্ত সম্পদ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসল তখন তাদেরকে কোন প্রকারে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। [ইবন কাসীর]

(২) পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র ব্যবস্থা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিলের ওপর নয়। বিশ্ব জাহান আল্লাহ্ তা'আলা অনাহূত সৃষ্টি করেন নি। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?' সুতরাং আল্লাহ্ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন হক্ক ইলাহ্ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।" [সূরা আল-মুমিনূন: ১১৫-১১৬] তারপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী সেটা বলেছেন।

(৩) কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতের নির্দেশ হলো, সৌজন্যমূলকভাবে তাদেরকে

৮৬. নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী[১]।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾

৮৭. আর আমরা তো আপনাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন[২]।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾

ক্ষমা করে দেয়া। এ নির্দেশ পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। এখন শুধু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং "মুহাম্মাদুররাসূলুল্লাহ" এ কালেমাই তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে। [তাবারী] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, সুতরাং আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যান। [জালালাইন]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা যে আখেরাতের পূনর্বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন তাই প্রমাণ করছে। কারণ তিনি যদি মহান স্রষ্টাই হয়ে থাকেন তবে তার জন্য পূনর্বার সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। তদুপরি তিনি সর্বজ্ঞানী। তিনি জানেন যমীন তাদের কোন অংশ নষ্ট করেছে এবং তা কোথায় আছে। সুতরাং যিনি মহাস্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী তিনি অবশ্যই পূনরায় সবাইকে সৃষ্টি করতে পারবেন। অন্য আয়াতে আমরা এ কথারই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি। যেখানে বলা হয়েছেঃ "যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়"। [সূরা ইয়াসীনঃ ৮১-৮২]

(২) অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। এর প্রমাণ হলো আবু সাঈদ আল-মু'আল্লা বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেনঃ আমি সালাত আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ দিয়ে গমন করার সময় আমাকে ডাকলেন। আমি আসলাম না। সালাত শেষ করে তার কাছে আসলে তিনি বললেনঃ আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কে নিষেধ করল? আমি বললামঃ আমি সালাত আদায় করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আল্লাহ্ কি বলেননিঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিও"? তারপর তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কি তা জানিয়ে দেব না? তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বললেনঃ "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" এটাই "সাব'উল মাসানী" বা সাতটি আয়াত যা বার বার পড়া হয়, এবং কুরআনে কারীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।" [বুখারীঃ ৪৭০৩] অন্য বর্ণনায় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "উম্মুল কুরআন" বা সূরা আল-ফাতিহা হলো "সাব'উল মাসানী" এবং মহান কুরআন। [বুখারীঃ ৪৭০৪]

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি আপনি কখনো আপনার দুচোখ প্রসারিত করবেন না[১]। তাদের জন্য আপনি দুঃখ করবেন না[২]; আপনি

তবে কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন দু'শ আয়াত বিশিষ্ট সাতটি বড় বড় সূরা। অর্থাৎ আল-বাকারাহ, আলে ইমরান, আন-নিসা, আল-মায়েদাহ, আল-আন'আম, আল-আ'রাফ ও ইউনুস অথবা আল-আনফাল ও আত্‌তাওবাহ। [বাগভী; ইবন কাসীর] কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণের অধিকাংশই এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে সূরা ফাতিহার কথাই বলা হয়েছে। যা সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসের ভাষ্যসমূহ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এখানে মহান কুরআন বলেও সূরা আল-ফাতিহাকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সে হিসেবে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কুরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কুরআন। কেননা ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে। [কুরতুবী] যদিও কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কুরআনকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার অর্থ হলো, "আমরা আপনাকে সাব'উল মাসানী" সূরা ফাতেহা এবং পূর্ণ কুরআন দান করেছি। তখন দু'টির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

(১) একথাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীদেরকে সান্তনা দেবার জন্য বলা হয়েছে। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীরা চরম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। অন্যদিকে কুরাইশ সরদাররা পার্থিব অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে সবরকমের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। এ অবস্থায় বলা হচ্ছে, আপনার মন হতাশাগ্রস্ত কেন? আপনাকে আমি এমন সম্পদ দান করেছি যার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ। আপনাকে কুরআন প্রদান করে আমরা মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছি।

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের অবাধ্যতায় হতাশ ও পেরেশান না হতে বলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছিলেন কিন্তু তারা নিজেদের সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে এতই মগ্ন ছিল যে, হক্কের বাণী তাদের কানে প্রবেশ করতো না। তারা ঈমান আনছিল না। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্তনা দিচ্ছেন যে, আপনার এত পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি সাথে নিয়ে এগিয়ে চলুন এবং বলুন যে, আমি তো প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। হেদায়েতের চাবিকাঠি তো আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করবেন।

মুমিনদের জন্য আপনার বাহু নত করুন,

৮৯. এবং বলুন, 'নিশ্চয় আমিই প্রকাশ্য সতর্ককারী ।'

وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

৯০. যেভাবে আমরা নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর[১];

كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে উম্মতের হেদায়াতের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের কারণে নিজেকে আফসোস করে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-কাহফঃ ৬, সূরা আশ-শু'আরাঃ ৩, সূরা ফাতিরঃ ৮, সূরা আন-নাহলঃ ১২৭, সূরা আল-মায়িদাহঃ ৬৮] তারপরও তারা যে নিজেদের কল্যাণকামীকে নিজেদের শত্রু মনে করছে, নিজেদের ভ্রষ্টতা ও নৈতিক ত্রুটিগুলোকে নিজেদের গুণাবলী মনে করছে, নিজেরা এমন পথে এগিয়ে চলছে এবং নিজেদের সমগ্র জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার নিশ্চিত পরিণাম ধ্বংস এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখাচ্ছে তার সংস্কার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাদের এ অবস্থা দেখে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

(১) সেই বিভক্তকারী দল বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত বর্ণিত হয়েছে। কারও কারও মতে এখানে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নবীদের বিরোধিতার জন্য, তাদের উপর মিথ্যারোপ করার জন্য, তাদের কষ্ট দেয়ার জন্য পরস্পর শপথ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। যেমন সালেহ আলাইহিস সালামের লোকেরা এরকম করেছিল। "তারা বলল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, 'আমরা রাতেই শেষ করে দেব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে; তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত করে বলব যে, 'তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি" [সূরা আন-নামল: ৪৯] কারও কারও মতে, এখানে বাস্তবিকই সালেহ আলাইহিস সালামের কাওমের সে লোকদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মুকাতিল বলেন, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে ষোলজন এ জঘন্য কাজটি করেছিল। তারা পরস্পর শপথ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মানুষকে দূরে রাখছিল। [বাগভী] কারও কারও মতে, এখানে শব্দটি 'ভাগ-ভাটোয়ারা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কুরআনকে বলত, জাদু। কেউ বলত, কবিতা। কেউ বলত, মিথ্যা। আর কেউ বলত পূর্ববর্তীদের কাহিনী। কারও কারও মতে, এখানে ইয়াহূদী নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। [বাগভী] তাদেরকে বিভক্তকারী এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে। তার কিছু কথা মেনে নিয়েছে এবং কিছু কথা মেনে নেয়নি। [বাগভী]

করেছে[১]।

৯২. কাজেই শপথ আপনার রবের! অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩٢

৯৩. সে বিষয়ে, যা তারা আমল করত।

عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝٩٣

৯৪. অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝٩٤

৯৫. নিশ্চয় আমরা বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট[২],

إِنَّا كَفَيْنَـٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۝٩٥

৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌ নির্ধারণ করে। কাজেই শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٩٦

---

(১) عضين শব্দের অর্থ করা হয়েছে, বিভক্ত। শব্দটির অন্য অর্থঃ জাদু, গল্প। [বাগভী] এ অর্থের সমর্থনে সীরাত গ্রন্থে এসেছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ কুরাইশের এক সমাবেশে হাজির হয়ে বললঃ হজ্জের মওসুম শুরু হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে মানুষ এখন তোমাদের কাছে আসবে। এদিকে তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে তারা জেনে গেছে। তাই তোমরা তার ব্যাপারে একজোট হয়ে একটি মত পোষণ কর। তারা বললঃ তুমিই বল। সে বললঃ তোমরাই বল। তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে গণক। তখন সে বললঃ সে গণক নয়। তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে পাগল। সে বললঃ না, সে তো পাগল নয়। তারা বললঃ আমরা বলব সে কবি। সে বলল, না সে কবিও নয়। তারা বললঃ আমরা বলব সে যাদুকর। সে বললঃ না, সে যাদুকরও নয়। তখন তারা বললঃ তাহলে আমরা কি বলব? সে বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তার কথায় আছে মাধুর্য, তোমরা যা-ই বল না কেন বুঝা যাবে যে তোমাদের কথাই বাতিল। তবে তার কথা যাদুকরের কাছাকাছি। এ কথার উপরই সবাই সেখান থেকে চলে গেল। আর এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেনঃ "যারা কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে, কাজেই শপথ আপনার রবের! আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে, যা তারা করে।" [বাগভী; সীরাতে ইবনে হিশাম]

(২) এ বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি- আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। [বাগভী]

৯৭. আর অবশ্যই আমরা জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়;

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝٩٧

৯৮. কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন[১];

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّٰجِدِينَ ۝٩٨

৯৯. আর আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের 'ইবাদাত করুন[২] ।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝٩٩

---

(১) অর্থাৎ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ্ ও ইবাদাতে মশগুল হয়ে যাওয়া । আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করতেন । হাদীসে এসেছে, "যখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজে সমস্যা অনুভব করতেন তখনই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন" [আবুদাউদঃ ১৩১৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! দিনের প্রারম্ভে চার রাক'আত সালাত আদায়ে অপারগ হয়ো না । কারণ এতে করে আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট করব ।" [আবু দাউদঃ ১২৮৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৮৬]

(২) এখানে কুরআন ব্যবহার করেছে يقين শব্দটি । সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম শব্দটির তাফসীর করেছেনঃ মৃত্যু [বুখারীঃ ৪৭০৬] কুরআন ও হাদীসে 'ইয়াকীন' শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহার হওয়ার বহু প্রমাণ আছে । পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ "তারা বলবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, 'আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না, এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সাথে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম । 'আমরা কর্মফল দিন অস্বীকার করতাম, শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে মৃত্যু এসে যায় ।" [সূরা আল-মুদ্দাসসিরঃ ৪৩-৪৭] অনুরূপভাবে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মায'উন এর মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে বলেছেনঃ "কিন্তু সে! তার তো يقين তথা মৃত্যু এসেছে, আর আমি তার জন্য যাবতীয় কল্যাণের আশা রাখি । [বুখারীঃ ১২৪৩] সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে يقين শব্দের অর্থ মৃত্যুই । আর এ অর্থই সমস্ত মুফাসসেরীনদের থেকে বর্ণিত হয়েছে । সে হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করে যেতে হবে । যদি কাউকে ইবাদত থেকে রেহাই দেয়া হতো তবে নবী-রাসূলগণ তা থেকে রেহাই পেতেন কিন্তু তারাও তা থেকে রেহাই পাননি ।

তারা আমৃত্যু আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যদি কেউ এ কথা বলে যে, মারেফত এসে গেলে আর ইবাদতের দরকার নেই সে কাফের। কারণ সে কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মাতের বিপরীত কথা ও কাজ করেছে। এটা মূলতঃ মুলহিদদের কাজ। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

১৬- সূরা আন-নাহ্‌ল, ১২৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ النَّحْلِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আল্লাহ্‌র[১] আদেশ আসবেই[২];

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ

(১) এ সূরা নাহ্‌লকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্তু দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কেয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ তা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার প্রকাশ ও প্রয়োগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। ব্যাপারটা একেবারেই অবধারিত ও সুনিশ্চিত অথবা একান্ত নিকটবর্তী এ ধারণা দেবার জন্য ব্যাক্যটি অতীতকালের ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

তবে এ "আদেশ বা ফায়সালা" কি ছিল এবং কোন আকৃতিতে এসেছে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছেঃ

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন যে, এখানে 'আল্লাহ্‌র নির্দেশ' বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী কোন বিষয় নয়। অথবা, তা অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে অতীতকালের পদ ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১] আরও এসেছে, "কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে, আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে" [সূরা আল-কামার: ১] [ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ 'আল্লাহ্‌র নির্দেশ' বলে এখানে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত, হালাল হারাম সম্বলিত বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে "আল্লাহর নির্দেশ" বলে তাদের উপর যে শাস্তি আসার কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করাতেন তা বুঝানো হয়েছে। আযাবের ব্যাপারে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সবরের পেয়ালা কানায় ভরে উঠেছিল এবং শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছিল বলেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ দ্বারা একথা বলা হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

কাজেই তা[১] তাড়াতাড়ি পেতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যা শরীক করে তিনি তা থেকে ঊর্ধ্বে[২]।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ②

২. তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে[৩] স্বীয় নির্দেশে রূহ[৪] -ওহীসহ ফিরিশ্‌তা- পাঠান এ বলে যে, তোমরা সতর্ক কর, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন

(১) কাফের মুশরিকগণের চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, তারা আল্লাহর আযাবকে কামনা করত, তারা ভাবত যে আল্লাহর আযাব যদি আসবে তবে আসে না কেন? কিন্তু আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি কোন জাতিকে ধ্বংস করার পূর্বে তাকে প্রচুর সময় দেন। এ ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ করেছেন। [দেখুন, সূরা আল-আনকাবূতঃ ৫৩, ৫৪] [ইবন কাসীর]

(২) এখানে তাদের শির্ক বলতে, তারা যে আযাব তাড়াতাড়ি চাচ্ছিল, অথবা কিয়ামত তাড়াতাড়ি চাচ্ছিল তা-ই বোঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা তারা মূলত: আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে, এটা কুফরী ও শির্ক। তারা মনে করছে যে, আল্লাহ্ এটা করতে সম্ভব নন। তিনি সেটা করতে পারবে না। আর অপারগতা মূলত: বান্দাদের গুণ। বান্দাদের গুণকে আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করা শির্ক। এ হিসেবে তারা শির্কে লিপ্ত হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর] নতুবা আল্লাহর সাথে কারো শরীক হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সত্তা এর অনেক ঊর্ধ্বে এবং এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। মোট কথাঃ তারা যে শির্ক করছে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া এই আয়াতের সারমর্ম।

(৩) এখানে যার প্রতি ইচ্ছা বলে তাঁর নবী-রাসূলদের বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] [এ ব্যাপারে আরো দেখা যেতে পারে সূরা আল-হাজ্জঃ৭৫, সূরা গাফেরঃ১৫, ১৬]

(৪) আয়াতে روح শব্দ বলে ইবনে আব্বাসের মতে ওহী বুঝানো হয়েছে। যা নবুওয়াতের রূহ। এ রূহ বা প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়েই নবী কাজ করেন ও কথা বলেন। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনে প্রাণের যে মর্যাদা এ ওহী ও নবুওয়াতী প্রাণসত্তা নৈতিক জীবনে সেই একই মর্যাদার অধিকারী। ওহী দ্বারা মুমিনদের প্রাণ উজ্জীবিত হয়। এ ওহীর একটি হচ্ছে কুরআন। দ্বীনে কুরআনের মর্যাদা যেমন শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক। [ফাতহুল কাদীর] তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ওহীর জন্য 'রূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [দেখুনঃ সূরা আস-শূরাঃ ৫২] কোন কোন তাফসীরবিদগণের মতে রূহ শব্দ দ্বারা এখানে হেদায়াত বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অবশ্য দু' অর্থের মধ্যে বৈপরীত্য নেই।

সত্য ইলাহ্ নেই'[১]; কাজেই তোমরা আমার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর[২]।

৩. তিনি যথাযথভাবে[৩] আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারা যা শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে[৪]।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

(১) এ আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রাসূলই আগমন করেছেন তিনি জনসমক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। [দেখুন সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫] অথচ বাহ্যিক উপায়াদীর মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্যজনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন, হাজার হাজার নবী-রাসূল, যারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতঃই মানুষ একথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

(২) এই বাক্যের মাধ্যমে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, নবুওয়াতের রূহ যেখানেই যে ব্যক্তির ওপর অবতীর্ন হয়েছে সেখানেই তিনি এ একটিই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করতে হবে, তিনি একাই এর হকদার। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন সত্তা নেই যার অসন্তুষ্টির ভয়, যার শাস্তির আশংকা এবং যার নাফরমানির অশুভ পরিণামের ভয় করা যাবে। তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না।

(৩) এখান থেকে আবার তাওহীদের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর] প্রথমে আসমান ও যমীনকে আল্লাহ্ তা'আলা যে যথার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন সেটা বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন কোন খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। বরং এগুলোর সৃষ্টির পিছনে অনেক হিকমত রয়েছে। এগুলোর সৃষ্টি হক কারণেই হয়েছে আর তা হচ্ছে এগুলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও কুদরাতের উপর প্রমাণ বহন করে। আর বান্দাদের তাঁরই ইবাদাত করতে হবে যিনি সৃষ্টিকুলকে মৃত্যুর পর জীবিত করতে সক্ষম। অথবা এগুলো নিজেরাই প্রমাণ করবে যে, এগুলো ধ্বংসশীল। [ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া এগুলো সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ্‌র এক মহান উদ্দেশ্য হলোঃ যারা খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে শাস্তি আর যারা ভাল কাজ করেছে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। [দেখুনঃ সূরা আন-নাজমঃ ৩১] [ইবন কাসীর]

(৪) আল্লাহ্‌র সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তারা কোনভাবেই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হতে পারে না। তিনি তাদের শরীক করা থেকে অনেক উর্ধ্বে, অনুরূপভাবে কোন শরীকের শরীক হওয়া থেকেও তিনি অনেক উর্ধ্বে। [ফাতহুল কাদীর] তিনি সর্বদিক থেকে

৪. তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন[১]; অথচ দেখুন, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী[২]!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ④

ঊর্ধ্বে। সম্মানের দিক থেকে ঊর্ধ্বে তিনি, অবস্থানের দিক থেকেও তিনি আরশের উপর। সবকিছুর উপরে তাঁর অবস্থান, আর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকেও তার সমকক্ষ কেউ নেই।

(১) শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সে শুক্র হচ্ছে পুরুষ ও মহিলার সম্মিলিত বীর্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে" [সূরা আল-ইনসান:২] অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলার বীর্যের সংমিশ্রণে। এটা জানার পর আরও একটি জিনিস জানা দরকার, তাহচ্ছে অন্যত্র আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে বীর্য সেটির একটি বের হয় পিঠ থেকে, সেটি পুরুষের শুক্র, অপরটি বের হয় বুকের উপরের পাঁজর থেকে, সেটি মহিলার শুক্র। আল্লাহ্ বলেন, "অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পিঞ্জরাস্থীর মধ্য থেকে।" [সূরা আত-তারেক: ৫-৭]

(২) যেহেতু মানুষ সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই প্রথমেই মানুষ সৃষ্টির বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও কুদরতের আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর] 'মানুষ প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী' এর দুই অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত এখানে এ দুই অর্থই প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ একটি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে এমন মানুষ তৈরী করেছেন যে বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করার যোগ্যতা রাখে এবং নিজের বক্তব্য ও দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে। [কুরতুবী] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাক্‌শক্তি দান করা হলো, তখন সে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগলো। যে মানুষকে আল্লাহ শুক্রবিন্দুর মত নগণ্য জিনিস থেকে তৈরী করেছেন তার অহংকারের বাড়াবাড়িটা দেখ, সে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মোকাবিলায় নিজেকে পেশ করার জন্য বিতর্কে নেমে এসেছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] সে হিসেবে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে, বড় বড় বুলি আওড়ানোর আগে নিজের সত্তার দিকে একবার তাকাও। কোন আকারে কোথা থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় এসে পৌঁছেছো? কোথায় তোমার প্রতিপালনের সূচনা হয়েছিল? তারপর কোন পথ দিয়ে বের হয়ে তুমি দুনিয়ায় এসেছো? তারপর কোন পর্যায় অতিক্রম করে তুমি যৌবন বয়সে পৌঁছেছো এখন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে কার মুখের ওপর কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছো? [এ ব্যাপারে সূরা ফুরকানঃ ৫৪, ৫৫ এবং সূরা ইয়াসীনঃ ৭৭-৭৯ আয়াতসমূহ দেখুন] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের এস্বভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তিনি তার হাতের তালুতে থুতু ফেললেন, তারপর তাতে তার তর্জনী রেখে বললেনঃ "মহান আল্লাহ্ বলেন, হে বনী আদম! কিভাবে তুমি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ তোমাকে

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

৫. আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো, তিনি তা সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করে থাক(১)।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝

৬. আর তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি হতে ঘরে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তাদের সৌন্দর্য উপভোগ কর(২)।

আমি এ ধরণের হীনতা থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমার রূহ ওখানে (তিনি তার কণ্ঠনালির দিকে ইঙ্গিত করলেন) পৌঁছে, তখন তুমি বলঃ আমি সাদকা করব। তখন কি তার আর সদকার সময় বাকী আছে?" [ইবনে মাজাহঃ ২৭০৭; মুসনাদে আহমাদঃ৪/২১০]

(১) এখানে ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থে বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। যেমন, উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অধিকাংশ ক্ষেত্রে أنعام দ্বারা উট বোঝানো হয়ে থাকে। [কুরতুবী] এরপর এ সমস্ত জন্তু দ্বারা যে সব উপকার হয় তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] (এক) ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয়, টুপি ও বিছানা তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে। [তাবারী] (দুই) ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু যবেহ্ করে খাদ্যও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য তৈরী করে। [ইবন কাসীর] অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে- ﴿وَمَنَافِعُ﴾ বা 'উপকারাদী' অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরো অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। কারও কারও মতে এর দ্বারা এগুলোকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তবে সম্ভবত: এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতেও কিয়ামত পর্যন্ত আবিস্কৃত হবে।

(২) কাতাদা বলেন, যখন এগুলো বড় স্তন, লম্বা চুঁটিসহ চলে তখন তোমরা সেগুলো দেখে আনন্দে আপ্লুত হও। আর যখন মাঠে চরতে যায় তখনও তোমরা সেগুলো দেখে খুশি হও। [তাবারী]

৭. আর তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না[১]। তোমাদের রব তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু[২]।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

৮. আর তোমাদের আরোহনের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা[৩] এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা জান না[৪]।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

---

(১) এখানে এসব জন্তুর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিষপত্রকে দূর-দূরান্তের শহরে পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিষপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যান-বাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে আজো কাজে লাগায়। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা আল-মু'মিনূনঃ ২১, ২২, গাফেরঃ ৭৯-৮১]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ যেহেতু দয়ালু ও রহমতের আধার তাই তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এগুলোকে সৃষ্টি করে তোমাদের করায়ত্ব করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] এ ব্যাপারে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুনঃ সূরা আয-যুখরুফঃ ১২-১৪]

(৩) উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে করা হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। বলা হয়েছে, আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও। আর তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। [তাবারী]।

(৪) অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন আছে যা মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে বরং কি সেবা করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্যে ব্যবহার করে বলা হয়েছে- ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ -অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। যেমন, কীট-পতঙ্গ ও যমীনে অন্যান্য প্রাণী। যেগুলো যমীনের নীচে থাকে বা শুষ্ক স্থানে বা সমুদ্রে অবস্থান করে। যেগুলো মানুষ দেখতে

৯. আর সরল পথ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়[১], কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে[২]। আর তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন।

وَعَلَى اللّٰهِ قَصۡدُ السَّبِيۡلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدٰٮكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۝

পায়নি বা শুনতেও পায়নি। [কুরতুবী] কারও কারও মতে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য এবং জাহান্নামে জাহান্নামীদের জন্য যা সৃষ্টি করবেন বা করেছেন তা-ই বুঝিয়েছেন। [কুরতুবী] তাছাড়া সম্ভবতঃ এখানে ঐসব নবাবিস্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না; যেমন, রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি।

(১) ﴿قَصۡدُ السَّبِيۡلِ﴾ শব্দের অর্থঃ সরল পথ, মধ্যম পথ। এমন পথ যা উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়। [কুরতুবী] এর দ্বারা এখানে ইসলাম, হক্ক পথ বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুনিয়ার বাহ্যিক পথসমূহের বর্ণনার পর এ আয়াতে দ্বীনি পথের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। দুনিয়াতে যেমন চলার পথ আল্লাহর সৃষ্টি তেমনি আখেরাতের পথে কিভাবে চলতে হবে তাও মহান আল্লাহ্ শিখিয়ে দিচ্ছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, হক পথ হচ্ছে সেটিই যা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, "আল্লাহ্ বললেন, এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল পথ।" [সূরা আল-হিজর: ৪১] আরও বলেন, "আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।" [সূরা আল-আন'আম: ১৫৩]। অথবা আয়াতের অর্থ, হক পথ বর্ণনা করা আল্লাহ্‌র যিম্মায়। তিনি সেটা রাসূল, দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে বর্ণনা করেন। [কুরতুবী; মুয়াসসার, আত-তাফসীরুস সহীহ] দুনিয়াতে যেমন অনেক পথ আছে কিন্তু সব পথই গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারে না শুধু সে পথই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাবে যে পথের সন্ধানদাতা সে পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তেমনিভাবে দ্বীনি ব্যাপারেও অনেকে অনেক পথের দিকে আহ্বান জানাবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অপরাপর কোন পথই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে সহযোগিতা করতে পারবে না। [সা'দী]

(২) তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এখানে ইঙ্গিতে নবুওয়াতের পক্ষেও একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এ যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ দুনিয়ায় মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং কার্যত আছেও। যেমন, ইয়াহূদীবাদ, নাসারাবাদ, মজুসীবাদ ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] এসব পথ তো আর একই সংগে সত্য হতে পারে না। সত্য একটিই। বাকীগুলো সঠিক পথ নয়। বরং বাঁকা পথ। সেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছা যায় না। আর এসব পথে মানুষ হিদায়াতও পায় না। এসব পথে চলে হক পথে আসাও সম্ভব হয় না। [কুরতুবী]

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক[১]।

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ⑩

১১. তিনি তোমাদের জন্য তা[২] দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সব রকমের ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন[৩]।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ⑪

---

(১) পূর্বের আয়াতসমূহে আলাহ্ রাব্বুল আলামীন যমীনে যে সমস্ত প্রাণী চলাফেরা করে তাদেরকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে ঘোষণা দিয়েছেন। এখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করার মাধ্যমে মানুষের কি উপকার সাধিত হয় সেটা বর্ণনা করছেন। [ইবন কাসীর] এর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে পানি। তিনি আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেন সেগুলোকে তিনি সুমিষ্ট করেছেন, লবনাক্ত করেন নি। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে মানুষের জন্য বৃক্ষের ব্যবস্থা করেছেন। شجر শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شجر বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] কেননা, এর পরেই জন্তুদের চলার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক। تُسِيمُونَ শব্দটির অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেয়া। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ তোমাদের জন্য এমন গাছের ব্যবস্থা করেছেন যাতে তোমাদের জীব-জন্তু চরে বেড়াতে পারে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ একই পানি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বহু প্রকার ফল-ফলাদি, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে ও গন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিতে উৎপন্ন করেন এটা নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা আন-নামলঃ ৬০]

(৩) এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ও অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ যেন চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নেয়ামতগুলোর উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এসবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের

১২. আর তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন(১), সূর্য

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙয়ের ফুল-ফল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক-ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। তিনি একই পানি দ্বারা সেগুলোকে উৎপন্ন করেন, অথচ সেগুলোর প্রকার, স্বাদ, গন্ধ, রং, প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলো সবই প্রমান করছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার গাছ উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (আল্লাহ্‌র) সমকক্ষ নির্ধারণ করে।" [সূরা আন-নামল:৬০]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কিছু নেয়ামত হিসেব করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। [ইবন কাসীর] আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ বর্ণনা করছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ নেয়ামত নিয়োজিত করেছেন। এগুলোতে যে বিরাট উপকারিতা রয়েছে সেটা তিনি ব্যতীত কেউ পুরোপুরি জানে না। বিবেকবানদের কাছে এগুলোই স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি একজনই একমাত্র ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত। সে পাঁচটি নেয়ামত হচ্ছে, রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা। কুরআনে বারবার এ নেয়ামতগুলোকে নিয়োজিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে এগুলো উল্লেখ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমন, " নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন ; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন । তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই । সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!"[সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪] আরও বলেছেন, "আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৩] আরও বলেছেন, " আর তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমরা দিন অপসারিত করি , তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। আর চাঁদের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মন্‌যিল; অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়।" [সূরা ইয়াসীন: ৩৭-৩৯] আরও বলেন, "আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা

وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑫

ও চাঁদকে; এবং নক্ষত্ররাজিও তাঁরই নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন(১)।

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ⑬

১৩. আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের করে, নিশ্চয় তাতে সে সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে(২)।

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ

১৪. আর তিনিই সাগরকে নিয়োজিত করেছেন(৩) যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশ্‌ত খেতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে

এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।" [সূরা আল-মুলক: ৫] অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথনির্দেশ পায়" [সূরা আন-নাহল:১৬] [আদওয়াউল বায়ান]

(১) এখানে বলা হয়েছে যে, দিনরাত ও তারকারাজি আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক প্রমাণ রয়েছে। যারা আল্লাহ্‌ যে সমস্ত ব্যাপারে সাবধান করতে চেয়েছেন সেগুলো বুঝে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ সেটা বুঝার তাওফীক দিয়েছেন তাদের জন্য এতে আল্লাহর প্রচণ্ড ক্ষমতা ও অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) আসমানের বিভিন্ন চিহ্ন ও নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানানোর পর এখানে মাটিতে যে আশ্চর্যজনক বিষয়াদি ও বিভিন্ন বস্তু রয়েছে যেমন, জীবজন্তু, খনিজসম্পদ, উদ্ভিদরাজি ও নিশ্চল রং-বেরং এর ও বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টিসমূহ রয়েছে, সেগুলোর যে উপকারসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে এর মধ্যে অবশ্যই তাদের জন্য প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ স্মরণ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। [ইবন কাসীর]

(৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশ্‌ত লাভ করে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

تَشْكُرُوْنَ ⑭

পরে থাক(১); এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে(২) এবং এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑮

১৫. আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে হেলে না যায়(৩) এবং স্থাপন করেছেন

(১) এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةً এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐসব রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরী করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কুরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُونَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْكَ শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِرَ শব্দটি ماخرة এর বহুবচন। مخر এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

(৩) رَوَاسِي শব্দটি رَاسِيَة এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تَمِيد শব্দটি ميد থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হাল্কা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন- যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। তাই এখানে ﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ এর পূর্বে كَرَاهِيَة বা أن এর পরে لا শব্দটি উহ্য ধরে নিয়ে অর্থ করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াত থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠে পর্বত শ্রেণী স্থাপনের

নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার[১];

১৬. এবং পথ নির্দেশক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথনির্দেশ পায়[২]।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝١٦

উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে পৃথিবীর আবর্তন ও গতি সুষ্ঠ ও সুশৃংখল হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের এ উপকারিতা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, পাহাড়ের অন্য যে সমস্ত উপকারিতা আছে সেগুলো একেবারেই গৌণ। মূলত মহাশূন্যে আবর্তনের সময় পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে রক্ষা করাই ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ নদ-নদীর সাথে যে পথ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকাসমূহে এসব প্রাকৃতিক পথের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্যি সমতল ভূমিতেও এগুলোর গুরুত্ব কম নয়। উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধার কথা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মন্‌যিলে-মকসুদে পৌঁছার জন্য ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। [ইবন কাসীর] বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হতো তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

(২) অর্থাৎ দিনের বেলায় পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি যেমন কিছু নিদর্শন রেখেছেন, তেমনি রাতের বেলায় পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য রেখেছেন তারকাসমূহ। দিনের বেলায় বিভিন্ন নিদর্শন দেখে আর রাতের বেলায় তারকাদের অবস্থান দৃষ্টে মানুষ বলতে পারে যে, তার গন্তব্যস্থল কোথায় হতে পারে। [জালালাইন, মুয়াসসার] আল্লাহ সমগ্র যমীনকে একই ধারায় সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেকটি এলাকাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এর অন্যান্য উপকারিতার মধ্যে একটি অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য আলাদাভাবে চিনে নেয়। সুতরাং তারকারাজি সৃষ্টি করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাস্তার পরিচয় লাভ। এগুলোর দ্বারা কোন প্রকার ভাগ্য বা সৃষ্টিজগতের পরিচালনার নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা কুফরী। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা এ তারকাসমূহ তিনটি কারণে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের বিতাড়নকারী এবং কিছু আলামত যা দ্বারা পথের দিশা পাওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং যে কেউ এর বাইরে অন্য কিছু দিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা

১৭. কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না[১]?

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

১৮. আর তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু[২]।

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. আর তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা ঘোষণা কর আল্লাহ্ তা জানেন।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

করবে সে অবশ্যই ভুল করবে, তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, এবং এমন বস্তুর পিছনে অযথা দৌড়াবে যার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই।' [বুখারীঃ ৬/৩৪১]

(১) অর্থাৎ যদি তোমরা একথা মানো (যেমন বাস্তবে মক্কার কাফেররাও এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও মানতো) যে, একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা বরং এ বিশ্বজগতে তোমাদের উপস্থাপিত শরীকদের একজনও কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি করা ব্যবস্থায় অস্রষ্টাদের মর্যাদা কেমন করে স্রষ্টার সমান হতে পারে? যদি তা না হয় তবে তাঁর ইবাদাত ব্যতীত অন্যের ইবাদাত কেন করা হবে? তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, তাঁর সাথে এই যে মূর্তিগুলোর ইবাদাত করা হয় সেগুলোও তো সৃষ্ট। সেগুলো কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। যারা সেগুলোর ইবাদাত করে তাদের জন্যও এরা সামান্যতম লাভ বা ক্ষতি বয়ে আনতে পারে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পরপরই তাঁর ক্ষমাশীল ও করুণাময় হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর যে নেয়ামত মানুষের উপর আছে তা দাবী করছে যে মানুষ সর্বদা তাঁর শোকরগুজার হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর অপার মহিমায় তাদের অপরাধ মার্জনা করেন। যদি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিটি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে বাধ্য করা হতো, তবে তোমরা কেউই সেটা করতে সক্ষম হতে না। যদি এ ধরণের নির্দেশ আসতো তবে তোমরা দুর্বল হয়ে যেতে এবং তা করা ছেড়ে দিতে। আর যদি তিনি এর জন্য তোমাদেরকে আযাব দিতেন তবে তিনি যালেম বিবেচিত হতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন, অল্প কিছুরই শাস্তি দিয়ে থাকেন। [ইবন কাসীর] তোমরা যদি তাঁর কোন কোন নেয়ামতের শোকর আদায় করতে কিছুটা কসূর করে ফেল, তারপর তাওবাহ করো এবং তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসো তবে তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। তাওবাহ ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তো তোমাদের জন্য অতিশয় দয়ালু। [তাবারী]

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

২০. আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়[১]।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

২১. তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই[২]।

তৃতীয় রুকূ'

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝

২২. তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, কাজেই যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের অন্তর অস্বীকারকারী[৩] এবং

---

(১) আগের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, এ সমস্ত উপাস্যগুলো নিজেরা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। এ আয়াতে তা আরও স্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছে যে, কাফেরদের উপাস্যগুলো ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, সেগুলো কাউকে সৃষ্টি যেমন করতে পারে না। তেমনি নিজেরাও অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট। পূর্বের আয়াতে শুধু তাদের ভাল গুণ অস্বীকার করা হয়েছিল। এখানে ভাল গুণ অস্বীকার করার সাথে সাথে খারাপ গুণও সাব্যস্ত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ অতি ভক্তের দল এসব সত্তাকে সংকট নিরসনকারী, অভিযোগের প্রতিকারকারী, দরিদ্রের সহায়, ধনদাতা এবং আরো কত কিছু মনে করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ডাকতে থাকে। অথচ এরা আসলে মৃত নিশ্চল বস্তু এগুলোতে কোন রূহ নেই। এগুলো কোন কথা শুনে না, দেখে না, বুঝেও না। আরও অতিরিক্ত হচ্ছে যে, এগুলো জানে না কখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তাহলে তাদের কাছে কিভাবে কোন উপকারের আশা করা যেতে পারে? কিভাবে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা তাদের কাছে করা যায়? এটা তো শুধু তার কাছ থেকেই জানা যায় যে সবকিছু জানে এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, একমাত্র এক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আর এটাও জানাচ্ছেন যে, কাফেররা তা অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে ওয়ায নসীহত ও স্মরণ কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। তারা হক গ্রহণের বদলে শুধু অহংকারই করে বেড়ায়, কোন সঠিক কিছু মেনে নেয়াকে তারা অনেক বড় করে দেখে। অস্বীকার তাদের প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তারা এ জন্য প্রায়ই শুধু আশ্চর্যবোধ করত। তারা বলতঃ "তিনি কি সমস্ত ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছেন? এটা তো এক আশ্চর্য বস্তু"। [সূরা ছোয়াদঃ ৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেনঃ "শুধু এক আল্লাহ্র কথা

তারা অহংকারী(১) ।

২৩. নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্‌ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ঘোষণা করে। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

لَاجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝۲۳

২৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন? তখন তারা বলে, পূর্ববর্তীদের উপকথা!(২)'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۲۴

বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্যগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" [সূরা আয-যুমারঃ ৪৫]

(১) তাদের অহংকারের কারণে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। সূরা গাফেরের ৬০ নং আয়াতেও আল্লাহ্‌ তা উল্লেখ করেছেন। [ইবন কাসীর] হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার অন্তরে সামান্যতম অহংকারও থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। আর যার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকবে সে জাহান্নামে থাকবে না। একলোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন লোক যদি চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক? তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুন্দর তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে হককে না মানা ও মানুষকে হেয় করে দেখা।' [মুসলিমঃ ৯১]

(২) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের চর্চা যখন চারদিকে হতে লাগলো তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেতো সেখানেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হয়ে এসেছেন তিনি কি শিক্ষা দেন? কুরআন কোন ধরনের কিতাব, তার মধ্যে কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মক্কার কাফেররা সবসময় এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতো যাতে প্রশ্নকারীর মনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে কিতাবটি এনেছেন সে সম্পর্কে কোন না কোন সন্দেহ জাগতো অথবা কমপক্ষে তার মনে নবীর বা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সকল প্রকার আগ্রহ খতম হয়ে যেত। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা আল-ফুরকানঃ ৫] এভাবেই তারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যাচার করতো এবং তার সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সম্পূর্ণ অসার অলীক বাতিল কথাবার্তা বলতো। কেননা যারাই হকের বিপরীতে কথা বলবে, তারা যত প্রকারের কথাই বলুক না কেন, সবই ভুল ও অসার হতে বাধ্য। তারা বলত, জাদুকর, কবি, গণক, পাগল। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সবচেয়ে

لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে[১]। দেখুন, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট!

চতুর্থ রুকূ'

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَـٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীগণ চক্রান্ত করেছিল; অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি আসল এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধি করতে পারেনি[২]।

বড় শিক্ষক ওলীদ ইবন মুগীরা আল-মাখযুমী যা বলেছিল তাতেই সবাই একমত হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন, "সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করল! তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল! তারপর সে তাকাল। তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করল। অতঃপর সে বলল, 'এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির: ২৪] অর্থাৎ বলা হয়ে থাকে যে, তার আনিত বিষয় জাদু। শেষপর্যন্ত তারা এটার উপর পরস্পর একমত হয়ে চলে যায়। [ইবন কাসীর]

(১) যারাই কারো পথভ্রষ্টতার কারণ হবে তারাই ভ্রষ্টদের যাবতীয় পাপের ভাগী হবে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন "তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা ; আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।" [সূরা আল-আনকাবূত: ১৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কেউ ভালো কাজের সূচনা করলে যত লোক এর উপর আমল করবে তত লোকের আমলের সমপরিমান সওয়াব তার জন্য লিখা হবে, আর কেউ মন্দ কাজের সূচনা করলে যত লোক এ কাজ করবে ততলোকের কাজের সমপরিমান গুণাহ তার জন্য লিখা হবে। অথচ তাদের গুণাহের সামান্যতমও কমতি করা হবেনা"। [মুসলিমঃ ১০১৭]

(২) এ আয়াতে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এর দ্বারা নমরূদকে বুঝানো হয়েছে। যে

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন[১] এবং তিনি বলবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক[২] যাদের সম্বন্ধে তোমরা ঘোর বিতণ্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

নিজেকে ইলাহ বলে দাবী করেছিল এবং আকাশে উঠার জন্য সিঁড়ি স্থাপন করেছিল। সে সিঁড়ির মুলোৎপাটিত করা হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাকে সামান্য একটি মশা দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলেন। যা তার নাকের ছিদ্র পথে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর চারশ' বছর পর্যন্ত সে এ শাস্তি ভোগ করেছে। তার কাছে ঐ ব্যক্তি বেশী দরদী বলে বিবেচিত হতো যে দু'হাতে হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় পেটাতো। সে চারশ' বছর মানুষকে পদানত করে রেখেছিল। তাই আল্লাহ্ তাকে চারশ' বছর পর্যন্ত হাঁতুড়ির পেটা খাইয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দেন। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির অবশ্য বলেন যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য বুখতনাসর। [ইবন কাসীর] তার সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা ইয়াহূদী ও নাসারাদের গ্রন্থে এসেছে। অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসির বলেনঃ এখানে কোন সুনির্দিষ্ট লোক না বুঝিয়ে যারাই আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কুটকৌশল অবলম্বন করেছিল তাদের সবার জন্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। [দেখুন, সূরা ইবরাহীমঃ ৪৬, সূরা নূহঃ ২২, সূরা সাবাঃ ৩৩]

(১) তাদের গোপন ষড়যন্ত্রসমূহ ফাঁস করে দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করবেন। অনুরূপ কথা সূরা আত-তারেক এর ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "যে দিন গোপন তথ্যসমূহ ফাঁস করে দেয়া হবে সেদিন তাদের কোন শক্তি বা সাহায্যকারী থাকবে না"। অথচ তারা দুনিয়াতে এ শক্তি-সামর্থ্য ও সাহায্যকারীর কারণে গর্ব ও অহংকার করে বেড়াত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দার তথা বিশ্বাসঘাতকের পিছনের অংশে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে। তাতে বলা থাকবেঃ এটা অমুকের পুত্র অমুকের গাদ্দারীর প্রমাণপত্র"। [বুখারী: ৩১৮৭; মুসলিম:১৭৩৬] এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী ও ধোঁকাবাজের যাবতীয় গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে তাকে অপমানিত করবেন।

(২) এখানে শরীকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার মূল কারণ হচ্ছে ধমকি প্রদান। কারণ, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সবাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। আর তখন প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র সাথে যে শরীক নির্ধারণ করেছিলাম তা ছিল বোকামী। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

তারা বলবে[১], আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর--

২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্‌তাগণ তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করা অবস্থায়; তখন তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না।'[২] অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. কাজেই তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতঃপর অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হল, 'তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন'? তারা বলল,

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

---

(১) এখানে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জ্ঞানীদের সম্মানিত করা হয়েছে। যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি স্থাপন করা শেষ হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আযাবের বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আর কাফেররা ওজর আপত্তি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তখন জানবে যে, তাদের পালানোর কোন জায়গা নেই। তখন দ্বীনের জ্ঞানীরা এ কথা বলবে। তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের উপর-- [ইবন কাসীর] তারা হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানী। যারা দুনিয়াতে হক্ক কথা বলতে কখনো পিছপা হতো না তারা আখেরাতেও হক্ক কথা বলার সুযোগ পাবে। এটা তাদের জন্য বড় সম্মানের বিষয়। [ইবন কাসীর]

(২) এটা তাদের মিথ্যাচার। অন্য আয়াতে এসেছে, তারা বলবে "আল্লাহর শপথ আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না" [সূরা আল-আন'আমঃ ২৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহ্‌র কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ১৮] তাদের মিথ্যাচারের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তোমাদের কথা সঠিক নয়; বরং তোমরা যাবতীয় মন্দ কাজ করতে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

'মহাকল্যাণ[১]।' যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এ দুনিয়ায় মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম[২]!

৩১. সেটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে; তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু চাইবে তাতে তাদের জন্য তা-ই থাকবে[৩]। এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে,

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾

(১) ঈমানদারগণ তাদের কাছে যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তাকে বিরাট নেয়ামত জ্ঞান করে। তারা কাফেরদের মত এটা বলে না যে, পূর্ববর্তীদের গাঁথা। বরং তাদের কাছে এটা এক মহাকল্যাণের বস্তু, রহমত ও উত্তম জিনিস যারা তার অনুসরণ করবে ও তার উপর ঈমান আনবে। তারপর তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঈমানদারদের জন্য যে পুরস্কার রয়েছে তা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে এ দুনিয়ায় মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরো উৎকৃষ্ট। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।" [সূরা আন-নাহল: ৯৭] ইবন কাসীর বলেন, যে কেউ দুনিয়াতে উত্তম আমল করবে, আল্লাহ্ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে তার আমলটি সুন্দর করে দিবেন।

(২) এ আয়াতের সমার্থে আরো কিছু আয়াত রয়েছে। [দেখুনঃ সূরা ইউনুসঃ ২৬, সূরা আন-নাহলঃ ৯৭, সূরা আল-কাসাসঃ ৮০, সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৮, সূরা আল-আ'লাঃ ১৭, সূরা আদ-দোহাঃ ৪]

(৩) এ হচ্ছে জান্নাতের আসল পরিচয়। সেখানে মানুষ যা চাইবে তা পাবে। তার ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোন কাজই সেখানে হবে না। দুনিয়ার কোন প্রধান ব্যক্তি, কোন প্রধান নেতা এবং কোন বিশাল রাজ্যের অধিকারী বাদশাহও কোন দিন এ নিয়ামত লাভ করেনি। দুনিয়ায় এ ধরনের নিয়ামত লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসীই সেখানে আনন্দ ও উপভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তার জীবনে সর্বক্ষণ সবদিকে সবকিছু হবে তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী। তার প্রত্যেকটি আশা সফল হবে, প্রত্যেকটি কামনা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও আকাংখা বাস্তবায়িত হবে। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন সূরা আয-যুখরুফঃ ৭১]

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. ফিরিশ্‌তাগণ[১] যাদের মৃত্যু ঘটায় উত্তমভাবে। ফিরিশ্‌তাগণ বলবেন, তোমাদের উপর সালাম! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর[২]।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা তো শুধু তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা আসার প্রতীক্ষা করে অথবা আপনার রবের নির্দেশ আসার। তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই

---

(১) এ আয়াত এবং এর পরবর্তী যে আয়াতে মৃত্যুর পর মুত্তাকী ও ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজীদের এমন ধরনের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্ট ভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে। সূরা আল-মু'মিনের ৪৫-৪৬ আয়াতে এসবের চাইতে বেশী সুস্পষ্ট ভাষায় বর্‌যখের আযাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ ফির'আউন ও ফির'আউনের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বলেছেন, একটি কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। সকাল-সাঁঝে তাদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন কিয়ামতের সময় এসে যাবে তখন হুকুম দেয়া হবে– ফির'আউনের পরিবারবর্গকে কঠিনতম আযাবের মধ্যে ফেলে দাও।" এখানে এটা বিশ্বাস করা জরুরী যে, কবরের শাস্তি শুধু রূহের উপর হবে না। বরং রূহ এবং দেহ উভয়টির উপরই হবে। কিয়ামতের মাঠে এবং এর পরবর্তী জীবন হবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের যার সাথে দুনিয়ার জীবনের কোন তুলনাই চলে না। সেখানে সবকিছুর গতি প্রকৃতি ভিন্ন হবে।

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর সময় ঈমানদারগণের যে অবস্থা হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে কিভাবে সাদর সম্ভাষণ জানায় তা বর্ণনা করছেন। অনুরূপ আয়াত কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এসেছে। [দেখুনঃ সূরা ফুসসিলাতঃ ৩০-৩২] তবে একথা জানা আবশ্যক যে, সৎকাজ করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ। কিন্তু শুধুমাত্র সৎকাজই মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না, যতক্ষন তার সাথে আল্লাহ্‌র রহমত না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের বিনিময়ে নাজাত পাবে না। লোকেরা বললঃ আপনিও পাবেন না? তিনি বললেনঃ না, আমিও না। তবে আল্লাহ্ যদি তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করো, সকাল বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। এসব কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে। [বুখারীঃ ৬৪৬৩]

করত[১]। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত।

৩৪. কাজেই তাদের উপর আপতিত হয়েছে তাদেরই মন্দ কাজের পরিণতি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে তা-ই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

পঞ্চম রুকূ'

৩৫. আর যারা শির্ক করেছে, তারা বলল, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কিছুর 'ইবাদাত করতাম না[২]। আর কোন কিছু তাঁকে ছাড়িয়ে

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

(১) এর অর্থ হচ্ছে, যতদূর বুঝবার ব্যাপার ছিল আপনি তো প্রত্যেকটি সত্যকে উন্মুক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যুক্তির সাহায্যে তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থা থেকে এর পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শির্কের ওপর অবিচল থাকার কোন অবকাশই রাখেননি। এখন এরাই একটি সরল সোজা কথা মেনে নেবার ব্যাপারে ইতস্তত করছে কেন? এরা কি মউতের ফেরেশতার অপেক্ষায় আছে? এ ফেরেশতা সামনে এসে গেলে তখন জীবনের শেষ মুহূর্তে কি এরা তা মেনে নেবে? অথবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব সামনে এসে গেলে তার প্রথম আঘাতের পর তা মেনে নেবে? কাতাদাহ বলেন, ফিরিশতার আগমন বলে এখানে মৃত্যু নিয়ে ফিরিশতাদের আগমন বোঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে কিয়ামতের দিনের কথা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে কাফের মুশরিকদের একটি বড় সন্দেহের উল্লেখ করে তা অপনোদন করেছেন। সন্দেহটি হলোঃ যদি আল্লাহ্ আমাদের কর্মকাণ্ড অপছন্দ করতেন তবে অবশ্যই তার জন্য শাস্তি বিধান করতেন এবং আমাদেরকে তা করতে দিতেন না। যেহেতু তিনি আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন না এবং আমাদেরকে শির্ক করতে দিচ্ছেন তা দ্বারা বুঝা গেল যে, আমাদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট আছেন। তাই আমাদেরকে আর কোন দাওয়াত গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেনঃ ﴿كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ অর্থাৎ তাদের দাবীর মত দাবী তাদের পূর্বেকার কাফের মুশরিকগণও করেছিল। তাদের কাছে এটার ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। তারা তাদের মনগড়া কথাকে

হারামও ঘোষণা করতাম না'[১]। তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করত। রাসূলদের কর্তব্য কি শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া নয়?[২]।

চালিয়ে নিচ্ছে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা দু'ধরনের। এক ধরনের ফয়সালা আছে যাকে বলা হয় জাগতিক ফয়সালা, যার বাইরে কেউ যাবার অধিকার রাখে না। যেমন, জীবন -মৃত্যু, রোগ-শোক ইত্যাদি। এ ধরনের ফয়সালার সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নির্ভর করে না। আরেক ধরনের ফয়সালা আছে যাকে বলা হয় শর'য়ী ফয়সালা। যেমন ঈমান আনা, ভাল কাজ করা ইত্যাদি। এ ধরনের ফয়সালার সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে। এ ধরনের ফয়সালার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে ঈমান আনতে পারে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে। আবার কুফরীও এখতিয়ার করতে পারে যাতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ মানুষকে যে সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন তার কারণেই তাকে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র শরী'আত অনুসারে চলার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাঁর পথের দিশা দেন। তিনি তাদেরকে সে পথ মানতে বাধ্য করে দেন না। কারণ, বাধ্য করে দিলে তাকলীফ থাকে না। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রয়োজন পড়তো না। নবীদের কাজ তো শুধু হক পথকে মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এর পর যারা ঈমান আনবে তারা জান্নাতি হবে আর যারা ঈমান আনবে না তারা জাহান্নামি হবে। সুতরাং এখানে কাফেরদের উত্থাপন করা কুটতর্কের কোন অর্থ নেই। তারা অন্যান্য ব্যাপারে এ ধরনের কুটতর্ক মানে না, শুধু ঈমান ও নতুন আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে তা পেশ করে থাকে। তাদেরকে যদি গালি দেয়া হয় বা তাদের কাবাকে কেউ ধ্বংস করতে আসে তবে তা প্রতিহত করতে সদা প্রস্তুত থাকে। তখন একথা বলে না যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে হচ্ছে। শুধু ঈমান ও আল্লাহ্‌র আইনের ব্যাপারেই তারা এরকম করে থাকে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, মাজমু' ফাতাওয়া: ৮/২৫৬-২৬১; ১০/৩৪; ২০/৬৫; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/৬০]

(১) যেমন তারা বিভিন্ন জন্তুকে ছেড়ে দিত এবং এগুলোকে খাওয়া ও ধরা-ছোঁয়া হারাম ঘোষণা করত। যেমন, বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ইত্যাদি। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন সূরা আল-আন'আমঃ ১৩৮ এবং সূরা আল-মায়েদাঃ ১০৩]

(২) এটা কাফেরদের সন্দেহের উত্তর। বলা হয়েছে যে, তোমাদের দাবী যে আল্লাহ্ চাইলে আমরা তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করতে সক্ষম হতাম না, যদি তিনি চাইতেন তবে তিনি আমাদের এ কাজ অস্বীকার করেন না কেন? আমাদের কুফর, শির্ক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন না কেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের কার্যাবলীকে কঠোরভাবে ঘৃণা করেছেন এবং শক্তভাবে নিষেধ

করেছেন। আর সে জন্যই তিনি প্রতি জাতিতে প্রতি প্রজন্মে, প্রতি গোষ্ঠীতে তাঁর নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। তারা সবাই একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদাত না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক" এভাবে মানুষের কাছে তিনি রাসূলদেরকে পাঠিয়েই চলেছেন, যখন থেকে বনী আদমের মধ্যে শির্কের উৎপত্তি হয়েছে। কাওমে নূহের মধ্যে। যখন তাদের কাছে নূহকে তিনি পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি ছিলেন যমীনের অধিবাসীদের কাছে পাঠানো প্রথম রাসূল। এ রাসূলদের পাঠানোর ধারা তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে শেষ করেন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর অবশ্যই আমরা প্রতিটি উম্মতে রাসূলদেরকে এ বলে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর"। সুতরাং মুশরিকদের পক্ষে এটা বলা কিভাবে সঙ্গত হবে যে, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কিছুর 'ইবাদাত করতাম না। আর কোন কিছু তাঁকে ছাড়িয়ে হারামও ঘোষণা করতাম না'। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র শরী'আতগত ইচ্ছা তোমাদের সাথে নেই। কেননা তিনি তাঁর রাসূলদের মুখে তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি বল প্রকৃতিগত ইচ্ছা যা নির্ধারিত থাকার কারণে তোমরা শির্ক ও কুফরি ও অন্যান্য অন্যায় কাজ করতে সমর্থ হও, তবে এটা থেকে তোমাদের দলীল নেয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামও সৃষ্টি করেছেন, জাহান্নামের বাসিন্দা শয়তান ও কাফেরদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট নন। এর মধ্যে তাঁর বিশেষ হিকমত ও রহস্য রয়েছে। [ইবন কাসীর] রহস্যের তাগিদে তাদেরকে জোর করে ঈমানদার ও পরহেযগার বানানো সঠিক ছিল না। সুতরাং কাফেরদের একথা বলা যে, 'আমাদের ধর্মমত আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন', একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়। শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের দাবী যে, 'আমাদের কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র মনঃপুত: না হলে আল্লাহ্ কেন আমাদের কর্মকাণ্ড অস্বীকার করেন না' এ কথাটি মোটেই ঠিক নয়। কারণ, নবী পাঠিয়ে তোমাদের কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করা হয়েছে। সর্বোপরি তোমরা যখন রাসূলদের সাবধানবাণী অনুসারে শির্ক, কুফর ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত হলে না, তখন তিনি তোমাদের উপর শাস্তি নাযিল করেন। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হিদায়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; কাজেই তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে ?" অর্থাৎ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা আমার রাসূলদের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল এবং হকের উপর মিথ্যারোপ করেছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। "আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম"। [সূরা মুহাম্মাদ: ১০]

৩৬. আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর[১]। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হিদায়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; কাজেই তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে[২]?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

"আর এদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)।" [সূরা আল-মুলক: ১৮] [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াত থেকে একটি সত্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক নবীর মিশনই ছিল তাওহীদের। সবাই তাওহীদের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাগুত ও শির্ক থেকে তাদের উম্মতদেরকে সাবধান করে গেছেন। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের দাবী ছিল এক। কোন হেরফের ছিল না। আদম, নূহ, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকেই তাওহীদ তথা একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় উপাস্য পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের কেউই নিজেকে বা অপর কোন সৃষ্টিকে ইলাহ বলে ঘোষণা দেননি। নাসারাদের ত্রিত্ববাদ ঈসা আলাইহিসসালামের দাওয়াত নয়। [সমস্ত নবী-রাসূলদের দাওয়াত যে একই ছিল এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক প্রত্যেক জাতির নিকট নবী-রাসূল পাঠানোর বিষয়ে আরো দেখুন, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫, সূরা আয-যুখরুফঃ ৪৫]

(২) অর্থাৎ নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার চাইতে আর কোন বড় নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নেই। এখন তুমি নিজেই দেখে নাও, মানব ইতিহাসের একের পর এক অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করছে? আল্লাহর আযাব কার ওপর এসেছে-ফেরাউন ও তার দলবলের ওপর, না মূসা ও বনী ইসরাঈলের ওপর? সালেহকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের ওপর, না তাঁকে যারা মেনে নিয়েছিল তাদের ওপর? হূদ, নূহ ও অন্যান্য নবীদেরকে যারা অমান্য করেছিল তাদের ওপর, না মু'মিনদের ওপর? এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোর ফল কি এই দাঁড়িয়েছে যে, আমার ইচ্ছার কারণে যারা শির্ক করার ও মনগড়া শরী'আত গঠনের সুযোগ লাভ করেছিল তাদের প্রতি আমার সমর্থন ছিল? বরং বিপরীত পক্ষে এ ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করছে যে,

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আপনি তাদের হিদায়াতের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হলেও[১] আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে হিদায়াত দেন না এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নেই[২]।

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

৩৮. আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না[৩]। অবশ্যই

উপদেশ ও অনুশাসন সত্বেও যারা এসব গোমরাহীর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়ে চলেছে। আমার ইচ্ছাশক্তি তাদেরকে অপরাধ করার অনেকটা সুযোগ দিয়েছে। তারপর তাদের নৌকা পাপে ভরে যাবার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালালো। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ এবং যে সমস্ত প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি সেগুলোকে আগুন থেকে ফিরাবার চেষ্টা করল, তা সত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরে। তদ্রূপ আমিও তোমাদের কোমরের কাপড় ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।" [বুখারীঃ ৬৪৮৩]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় উম্মাতের হেদায়াতের জন্য ব্যস্ত থাকতেন। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, আপনি চাইলেই যে, তারা হেদায়াত পেয়ে যাবে এমনটি নয়। হেদায়াত দেয়ার মালিক আল্লাহ্। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করবেন। কিন্তু তাঁর চিরাচরিত নিয়ম হলো, তিনি তাদেরকেই হেদায়াত দেন যারা হেদায়াত পাওয়ার জন্য আগ্রহী। অপরপক্ষে যারা হেদায়াতের পথ থেকে দূরে থাকা বেশী পছন্দ করছে, হেদায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে তিনি হেদায়াত করেন না। [এ ব্যাপারে আরো দেখুন, সূরা আল-মায়েদাহঃ ৪১, সূরা হূদঃ ৩৪, সূরা আল-আ'রাফঃ ১৮৬, সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭]

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বনী আদম আমাকে গালি দেয় অথচ তাদের পক্ষে আমাকে গালি দেয়া উচিত নয়। আবার তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাও তাদের জন্য উচিত নয়। তাদের গালি হলো তারা আমার ব্যাপারে বলে যে, আমার সন্তান আছে, আর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলো এটা বলা যে, তিনি (আল্লাহ্) যেভাবে আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে পূনরায় সৃষ্টি করবেন না।" [বুখারীঃ ৩১৯৩]

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

হ্যাঁ, তাঁর নিজের উপর কৃত প্রতিশ্রুতি তিনি সত্যে রূপ দেবেন। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই জানে না[১]।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ

৩৯. যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে, তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য এবং কাফিরদের জানার জন্য যে, নিশ্চয় তারা ছিল মিথ্যাবাদী[২]।

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

৪০. আমরা কোন কিছুর ইচ্ছে করলে সে বিষয়ে আমাদের কথা তো শুধু এই যে, আমরা বলি, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়[৩]।

---

(১) জানেনা বলেই রাসূলদের বিরোধিতা করে এবং কুফরিতে নিপতিত হয়। [ইবন কাসীর] তারা এটাও জানে না যে, পুনরুত্থান ও হিসেব নেয়া তাঁর পক্ষে একেবারেই সহজ। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ বক্তব্য থেকে মৃত্যুর পরের জীবন এবং শেষ বিচারের দিনের জন্য মানুষের পুনরুত্থানের রহস্য ও হিকমত বর্ণনা করা হচ্ছে। [ইবন কাসীর] দুনিয়ায় যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সত্য সম্পর্কে অসংখ্য মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এ ধরনের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এই যে, এক সময় না এক সময় সঠিক ও নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হোক যথার্থই তাদের মধ্যে হক কি ছিল এবং বাতিল কি ছিল, কে সত্যপন্থী ছিল এবং কে মিথ্যাপন্থী। এ দুনিয়ায় এ যবনিকা সরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এমন যে, এখানে সত্য কোনদিন পর্দার বাইরে আসতে পারে না। কাজেই বিবেকের এ দাবী পূরণ করার জন্য ভিন্ন আরেকটি জগতের প্রয়োজন। আর সেটাই হচ্ছে আখেরাত। [এ বিষয়টির দিকে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন, দেখুন সূরা আত-তূরঃ ১৪-১৬, সূরা আল-কামারঃ ৫০, সূরা লুকমান ২৮] তাছাড়া আরও একটি কারণে মানুষের পুনরুত্থান প্রয়োজন বলে এখানে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, এ সমস্ত কাফের ও মুশরিকরা শপথ ও কসম করে কিয়ামতের আগমন ও সেখানে মানুষের পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করছে, সুতরাং কিয়ামত ও পুনরুত্থান হলে কারা তাদের শপথে মিথ্যাবাদী ছিল সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] তখন তাদের বিচার করা হবে। যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। [ইবন কাসীর] [এ ব্যাপারে দেখুন সূরা আন-নাজমঃ ৩১]

(৩) অর্থাৎ লোকেরা মনে করে, মরার পর মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা এবং সামনের

ষষ্ঠ রুকূ'

৪১. আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত[১] করেছে[২],

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

পেছনের সমগ্র মানব-কূলকে একই সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করা বড়ই কঠিন কাজ। অথচ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। নিজের কোন সংকল্প পূর্ণ করার জন্য তাঁর কোন সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ ও পরিবেশের আনুকুল্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশেই পূর্ণ হয়। বর্তমানে যে দুনিয়ার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, এটিও নিছক হুকুম থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং অন্য দুনিয়াটিও মুহূর্তকালের মধ্যে শুধুমাত্র একটি হুকুমেই জন্ম লাভ করবে। যখন তিনি 'হও' বলবেন তখনি তা হয়ে যাবে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর আমাদের আদেশ তো কেবল একটি কথা, চোখের পলকের মত।" [সূরা আল-কামার: ৫০] [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) هجرة আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করা। আল্লাহ্‌র জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় 'ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ্ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়'। [মুসলিম:১২১] হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে।

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, যেসব মুহাজির কাফেরদের অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেছিলেন এখানে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] অপর কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে মদীনায় হিজরতকারী সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যেমন, বিলাল, সুহাইব, খাব্বাব, আম্মার প্রমূখ। [কুরতুবী] তবে যারাই হিজরত করেছে এবং করবে আয়াত তাদের সবাইকে শামিল করে। [কুরতুবী] এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত মুমিন বান্দাদের ফযিলত সম্পর্কে জানাচ্ছেন যারা আল্লাহ্‌র পথে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য যুলুম, নির্যাতন, কষ্ট ও জাতির পক্ষ থেকে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে। যারা তাদেরকে ঈমান থেকে কুফরি ও শির্কের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য পরীক্ষায় ফেলেছে, ফলে তারা তাদের জন্মভূমি ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব। তার একটি দুনিয়াতেই তারা পাবে, আর সেটি হচ্ছে প্রশস্ত রিযিক ও স্বচ্ছন্দ জীবন। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা মদীনাকে তাদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তারা মহানুভব, সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তারা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাদের সামনে রিয্কের দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যারা ছিলেন ফকীর, মিসকীন, তারা হয়ে গেলেন বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দেব; আর আখিরাতের পুরস্কার তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। যদি তারা জানত!

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. যারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আপনার আগে আমরা ওহীসহ কেবল পুরুষদেরকেই[১] পাঠিয়েছিলাম[২], সুতরাং তোমরা

বিজিত হয়। তাদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমান কাল পর্যন্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাদেরকে এবং তাদের বংশধরদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অসামান্য ইয্‌যত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। [ফাতহুল কাদীর] আর দ্বিতীয়টি আখেরাতের সওয়াব। যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সওয়াবের তুলনায় সেটি অনেক বড়। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহ্র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফলকাম। তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং এমন জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে আছে মহাপুরস্কার।" [সূরা আত-তাওবাহ: ২০-২১] যদি তারা জানতে পারত যে যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে তাদের এত বড় সওয়াব রয়েছে তবে কেউই ঈমান ও হিজরত থেকে পিছপা হতো না। [সা'দী]

(১) এ আয়াত থেকে আকীদার একটি বিরাট মূলনীতি প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল হিসেবে একমাত্র পুরুষদেরকেই বাছাই করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের তিনটি স্থানে সরাসরি এ ঘোষণা দিয়েছেন, [সূরা ইউসুফঃ ১০৯, সূরা আন-নাহলঃ ৪৩, সূরা আল-আম্বিয়াঃ৭] সুতরাং কোন মহিলাকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল করে পাঠাননি। কারণ নবুওয়ত ও রিসালাতের গুরুদায়িত্ব কেবলমাত্র পুরুষরাই বহন করতে পারে।

(২) এখানে মক্কার মুশরিকদের একটি আপত্তি উদ্ধৃত না করেই তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ আপত্তিটি ইতোপূর্বে সকল নবীর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীনরাও তাঁর কাছে বারবার এ আপত্তি জানিয়েছিল। এ আপত্তিটি ছিল এই যে, আপনি আমাদের মতই একজন মানুষ, তাহলে আল্লাহ আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন আমরা একথা কেমন করে মেনে নেবো? আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ আপত্তি ও তার উত্তর এ আয়াত সহ কুরআনের

জ্ঞানীদেরকে[1] জিজ্ঞেস কর যদি না জান,

৪৪. স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ[2]। আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে[3],

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। [দেখুনঃ সূরা ইউনুসঃ ২, সূরা ইউসুফঃ ১০৯, সূরা আল-হিজরঃ ৯, সূরা আল-ইসরাঃ ৯৩-৯৫, সূরা আল-ফুরকানঃ ২০, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৮, সূরা আল-আহকাফঃ ৯, সূরা আল কাহ্‌ফঃ ১১০]

(১) অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়, আহলি কিতাবদের আলেম সমাজ এবং আরো এমন সব লোক যারা নাম-করা আলেম না হলেও মোটামুটি আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন বৃত্তান্ত জানেন। কুরআনের অন্য আয়াতেও এ নির্দেশটি ঘোষিত হয়েছে। যেমন, “আপনার আগে আমরা ওহীসহ পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম; সুতরাং যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর” [সূরা আল-আম্বিয়া: ৭]

(২) আয়াতের এ অংশটুকু পূর্ববর্তী আয়াতের “আমরা পাঠিয়েছিলাম” এর সাথে সংশ্লিষ্ট। [ইবন কাসীর] তখন আয়াতের পূর্ণ অর্থ হবেঃ “আমরা আপনার পূর্বেই শুধুমাত্র পুরুষ মানুষকেই ওহী দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহকারে”। আয়াতের অপর অর্থ হচ্ছে যে, এ আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতের ‘তোমরা যদি না জান’ কথার সাথে সংশ্লিষ্ট। তখন অর্থ হবে, যদি তোমরা স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থ সম্পর্কে না জান তবে পূর্ববর্তী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে ذكر এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কুরআনুল কারীম। [ইবন কাসীর] আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। কারণ, আপনি আপনার কাছে যা নাযিল হয়েছে সেটা সম্পর্কে ভাল জানেন। আর আপনি এটার উপর অত্যন্ত যত্নবান। আপনি এটার অনুসরণ করেই যাচ্ছেন। এটা এজন্যে যে, আমরা জানি আপনি সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি এবং আদম সন্তানদের সর্দার বা নেতা। সুতরাং যা সংক্ষিপ্ত হিসেবে আছে তা আপনি তাদের কাছে বিবৃত করুন, যা তাদের কাছে খটকা লাগে তা বর্ণনা করুন। যাতে তারা তাদের নিজেদের জন্য দেখে-শুনে হিদায়াত গ্রহণ করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা লাভ করতে পারে। [ইবন কাসীর] সুতরাং আপনি তাদের কাছে এ কিতাবের প্রতিটি বিধি-বিধান, ওয়াদা ও ধমকি সবই আপনার কথা ও কাজের মাধ্যমে বর্ণনা করে দিন। এতে বুঝা গেল যে,

তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে।

৪৫. যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা তাদের উপর আসবে না শাস্তি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করবে না(১)?

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? অতঃপর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয়

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন বর্ণনাকারী। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ কিতাবের যাবতীয় সংক্ষিপ্ত হুকুম সালাত, যাকাত ইত্যাদি যে সমস্ত আহকাম বিস্তারিতভাবে আসেনি সেগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন। [কুরতুবী]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, আখেরাতের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোন দূরারোগ্য প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিষের সাথে আঘাত লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। [এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা আল-মুলকঃ ১৬, ১৭, সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৭, ৯৮] [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের রব অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু(১)।

৪৮. তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া(২) ডানে ও বামে ঢলে পড়ে একান্ত অনুগত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যমীনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফিরিশ্‌তাগণও, তারা অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ এতে আল্লাহ্‌র দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারী প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়। তবে তা শুধুমাত্র গোনাহ্‌গার ঈমানদারদের ব্যাপারে। কিন্তু যারা কাফের তাদের জন্য দুনিয়ার আযাবের সাথে আখেরাতের আযাবও অপেক্ষা করছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় সহিষ্ণু আর কেউ নেই যে খারাপ শোনার পরও ধৈর্যধারণ করে, তারা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে তারপরও তিনি তাদেরকে রিযিক দেন এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করেন। [বুখারীঃ ৬০৯৯] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ যালেমকে ছাড় দিতেই থাকেন, তারপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন সে তার ধরা থেকে পালানোর কোন পথ পায় না, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেনঃ "এরূপই আপনার রবের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন ওরা যুলুম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন" [সূরা হূদঃ ১০২]। [মুসলিমঃ ২৫৮৩] অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হজ্জের ৪৮ নং আয়াতেও এটা উল্লেখ করেছেন।

(২) অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট সমস্ত জিনিসের ছায়া থেকে এ আলামতই জাহির হচ্ছে যে, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ সবাই একটি বিশ্বজনীন আইনের শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে কারোর সামান্যতম অংশও নেই। কোন জিনিসের ছায়া থাকলে বুঝতে হবে, সেটি একটি জড় বস্তু। আর জড় বস্তু হওয়ার অর্থ হলো, সেটি একটি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার অনুগত গোলাম। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ছায়ার সিজদা সংক্রান্ত আলোচনা এর পূর্বে সূরা আর-রা'দের ১৫ নং আয়াতে করা হয়েছে।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩

৫০. তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ[১] তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে ।

সপ্তম রুকূ'

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

৫১. আর আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না[২]; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্[৩] । কাজেই তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর ।'

---

(১) এ আয়াত এবং এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে সুউচ্চে অবস্থান করছেন । তিনি তাঁর আরশের উপর আছেন । এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা । এর বাইরের যাবতীয় আকীদা বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা ।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল । আর নিশ্চয় ঈসা আলাইহিসসালাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল এবং সে কালেমা যা তিনি মারইয়ামকে পৌছিয়েছেন ও তাঁর পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' মাত্র । জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যাই হোক, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । আর অন্য সনদে জুনাদা এ কথাগুলো বাড়িয়ে বলেছেন , জান্নাতের আট দরজার যে কোন দরজা দিয়েই সে চাইবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । [বুখারীঃ ৩৪৩৫]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে তাঁর সাথে আর কাউকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন । সাথে সাথে এ ঘোষণাই দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ । তারপর তাদেরকে তাঁকেই একমাত্র ভয় করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন । কেননা, ভাল-মন্দ তাঁর হাতেই । তিনি ব্যতীত আর কেউ কারো ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না । এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছেন । [দেখুনঃ সূরা আয-যারিয়াতঃ ৫০, ৫১] অনুরূপভাবে একাধিক ইলাহ্ বিবেকের দাবীতেও অগ্রহণযোগ্য । আল্লাহ্ বলেনঃ "যদি এতদুভয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আরও অনেক ইলাহ্ থাকত তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেত" । [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২২] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ "আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত । তারা যা বলে তার থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র!" [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১]

৫২. আর আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং সার্বক্ষণিক আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য[১]। তারপরও কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও তাকওয়া অবলম্বন করবে?

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর তোমাদের কাছে যে সব নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহ্‌রই কাছ থেকে; তারপর যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে ডাক[২]।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তারপর যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল তাদের রবের সাথে শির্ক করে[৩]---

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

---

(১) এ আয়াতের একটি অনুবাদ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাতাদাহ থেকে বর্ণিত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কোন কোন মুফাসসির বলেন, وَاصِبًا এর অর্থ হচ্ছে, واجبا বা বাধ্যতামূলকভাবে। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির وَاصِبًا এর অর্থ হচ্ছে, التَّعَبُ وَالإِعْيَاءُ বা ক্লান্তক্লিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেই যেতে হবে, যদিও বান্দা সেটা করতে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। [কুরতুবী] আর যদি واصبا শব্দের অর্থ خالصا ধরা হয় [কুরতুবী] তখন এর অর্থ হবে "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলোর ইবাদত একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে"। তখন আয়াতটির সমার্থবোধক হবে আল্লাহ্‌র বাণীঃ "তারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীন ব্যতীত অন্য কিছু খুঁজে ফিরছে? অথচ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পন করেছে" [সূরা আলে ইমরানঃ ৮৩] তাছাড়া আয়াতটির নির্দেশসূচক অর্থও করা যায়। অর্থাৎ তোমরা একমাত্র তাঁকেই ভয় কর এবং তাঁরই আনুগত্য কর। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "সাবধান দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই খালেস করে নাও" [সূরা আয-যুমারঃ ৩]

(২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও দেখা যেতে পারে, সূরা আল-ইসরাঃ ৬৭।

(৩) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, বনী আদম যখন দুঃখ কষ্ট পায় তখন আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালেস করে আহ্বান করতে থাকে, তারপর যখন আল্লাহ্ তাদের কষ্ট দূর করে দেন, বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেন, তখন তাদেরই একদল অর্থাৎ কাফের শ্রেণী সবচেয়ে স্বল্পতম সময়ে আগের অবস্থান কুফর ও অবাধ্যতায় ফিরে যায়। কুরআনের অন্যত্রও বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদেরকে

৫৫. আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। কাজেই তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর আমরা তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারণ করে[১] তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ 'আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করতে থাকে।" [সূরা ইউনুসঃ ২২] অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে কোন বুযর্গ বা দেব-দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতারও নযরানা পেশ করতে থাকে এবং নিজেদের প্রত্যেকটি কথা থেকে একথা প্রকাশ করতে থাকে যে, তাদের মতে আল্লাহর এ মেহেরবানীর মধ্যে উক্ত বুযর্গ বা দেব-দেবীর মেহেরবানীও অন্তর্ভুক্ত ছিল বরং তারাই মেহেরবানী করে আল্লাহকে মেহেরবানী করতে উদ্বুদ্ধ না করলে আল্লাহ কখনোই মেহেরবানী করতেন না। বর্তমানেও অধিকাংশ পথভ্রষ্ট মানুষ এ ধরণের শির্ক করে থাকে। তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য পীর-ফকীর, দরগাহর মেহেরবানী বা সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত আছে বলে বিশ্বাস করে থাকে।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের ঘৃণ্যতম আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে মূর্তি, দেবতা, সমকক্ষের ইবাদত করে থাকে। তারা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিকের একাংশ তাদের সেসব প্রতিমা, মূর্তির জন্য নির্ধারণ করে "নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র জন্য এবং এটা আমাদের শরীকদের জন্য'। অতঃপর যা তাদের শরীকদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়, তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট!" [সূরা আল-আন'আমঃ ১৩৬] অর্থাৎ তাদের জন্য নযরানা, ভেট ও অর্ঘ্য পেশ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপার্জন ও কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ তাদের উপাস্যদের জন্য আলাদা করে রাখতো। তারপর আল্লাহ্‌র অংশের উপর সেগুলোকে প্রাধান্য দিত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের আত্মার শপথ করে বলছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে তাদের এ মিথ্যাচারের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। [ইবন কাসীর]

জানে না[১]। শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

৫৭. আর তারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্‌র জন্য[২] কন্যা সন্তান[৩]--- তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত। আর তাদের জন্য তাই যা তারা কামনা করে[৪]!

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٥٧

---

(১) যে তারা কোন লাভ কিংবা ক্ষতি করতে পারে। [তাবারী] অথবা আয়াতের অর্থ, আর তারা এমনসব উপাস্যদের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিকের অংশ নির্ধারণ করে রাখে, যারা তাদের এ অংশ রাখা সম্পর্কে কিছুই জানে না। [সা'দী; মুয়াসসার] অথবা, তারা এমন সব উপাস্যের জন্য রিযিকের কিছু অংশ নির্ধারণ করে রাখে যাদের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তারা নিজেদের ঘরে কন্যাসন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করার কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিস্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফিরিশ্‌তারা হলো আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) আরব মুশরিকরা আল্লাহ্‌র বান্দা ফিরিশতাদেরকে মেয়ে বলত। তারপর সেগুলোকে আল্লাহর মেয়ে বলত। এরপর সেগুলোর ইবাদাত করতো। এভাবে তারা তিনটি স্থানেই ভুল করতো। প্রথমত: তারা আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে ভুল করেছিল। অথচ তাঁর কোন সন্তান নেই। তারপর তাঁকে সন্তান-সন্ততির মধ্যে তাদের নিকট যেটা খারাপ সেটা দিত। অর্থাৎ মেয়ে সন্তান। কারণ তারা এটা নিতে রাযী নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, "তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান? এ রকম বন্টন তো অসংগত।" এ আয়াতেও বলেছেন যে, "আর তারা তাঁর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে, তিনি কতই না পবিত্র" তাদের এ সমস্ত মিথ্যাচার ও অসত্য ও মনগড়া কথা হতে। "সাবধান! তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?" [সূরা আস-সাফফাত: ১৫১-১৫৪] [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ পুত্র। আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করলেও নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়[১]।

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে[২]।

চায় না। কন্যা সন্তান তাদের জন্য অসম্মানজনক। তাদের জন্য পুত্র সন্তানই তারা কল্যানজনক মনে করে। এভাবেই তারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করার মাধ্যমে এক অন্যায় ভাগ-বাটোয়ারায় লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "তোমরা আমাকে জানাও 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্পর্কে ? তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান? এ রকম বন্টন তো অসংগত। এগুলো কিছু নাম মাত্র যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে" [সূরা আন-নাজম:১৯-২৩]

(১) এর বিপরীতে ইসলাম কন্যা সন্তানকে আখেরাতের নাজাতের অসীলা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সন্তান সহ আমার কাছে এসে কিছু চাইল। সে আমার কাছে মাত্র একটি খেজুরই পেল। আমি তাকে তাই দিলাম। সে তা গ্রহণ করে তা দু'ভাগে ভাগ করে দু' মেয়েকে দিল। নিজে কিছুই খেল না। তারপর সে দাঁড়িয়ে গেল এবং বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে প্রবেশ করলে আমি তাকে ঐ মহিলা এবং তার মেয়েদের সম্পর্কে জানালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যে কেউ মেয়েদের নিয়ে দুঃখ কষ্টে পড়বে এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, সেগুলো তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। [বুখারীঃ ১৪১৮, মুসলিমঃ ২৬২৯]

(২) মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযথা মানুষের গায়ে পড়ে কথা বলা ও মতভেদ করা, বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, অনর্থক ধন-সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। মায়েদের অবাধ্য হতে, কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে, অধিকারীর অধিকার প্রদানে অস্বীকার করতে এবং অনধিকারভাবে অধিকার চাইতেও নিষেধ করেছেন।" [বুখারীঃ ৭২৯২]

সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!

৬০. যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না যাবতীয় খারাপ উদাহরণ (গুণাগুণ) তাদেরই, আর আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় মহোত্তম গুণাগুণ[১] আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

অষ্টম রুকূ'

৬১. আর আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না[৩]; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

(১) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণই সুন্দর ও মহোত্তম। তাঁর জন্য কোন প্রকার খারাপ নাম ও গুণ সাব্যস্ত করা জায়েয নেই। তবে এতে অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাগুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে তা অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার প্রত্যেকটিই সুন্দর। [দেখুন, উসাইমীনঃ আল-কাওয়া'য়িদুল মুসলা]

(২) আয়াতের শেষে আল্লাহর দু'টি গুণবাচক নাম ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে রাখা আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যের মোকাবেলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি। তিনি এমন প্রবল পরাক্রমশালী যে, তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। সুতরাং তারা যতই তাঁর দিকে মিথ্যা কথা ও কাজ সম্পর্কযুক্ত করুক না কেন, এটা তাঁর কোন ক্ষতি করবে না। তিনি তাঁর প্রতিটি কাজ ও কথায় হিকমতপূর্ণ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানিয়ে দিচ্ছেন। তা হচ্ছে, তিনি যদি মানুষকে তাদের অত্যাচার-অনাচারের কারণে পাকড়াও করতেন তবে যমীনের বুকে কোন প্রাণী রাখতেন না। এখানে প্রাণী বলে কাফের উদ্দেশ্য নেয়া হলে কোন সমস্যা নেই। কারণ, তিনি তাদেরকে অবকাশ দেয়ার শাস্তি দিবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি প্রাণী বলে যমীনে বিচরণশীল সব প্রাণীই উদ্দেশ্য হয় তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও দ্বারা কেবল মানুষই ধ্বংস হতো না বরং তাদের সহ যমীনের উপর যত প্রাণী আছে সবাইকে তা পেয়ে বসত। ফলে যমীন প্রাণীশূণ্য হয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। তিনি তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ

وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝٦١

কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল আগাতে বা পিছাতে পারে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۗ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝٦٢

৬২. আর যা তারা অপছন্দ করে তা-ই তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্‌বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল তো তাদেরই জন্য[১]। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আছে আগুন, আর নিশ্চয় তাদেরকেই সবার আগে

দিয়ে থাকেন। যাতে যারা তাওবা করার করতে পারে, আর যারা অন্যায়কারী তাদের অন্যায় কাজের পরিপূর্ণতা লাভ করে। [ফাতহুল কাদীর] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাফেরকে ধ্বংস করার পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীদেরকে কেন ধ্বংস করা হবে, অথচ তাদের কোন গোনাহ নেই? এর উত্তরে কোন কোন মুফাসসির বলেন, যালেমকে তার শাস্তি বিধান করতে ধ্বংস করবেন। আর যদি অন্যান্য প্রাণী হিসাব-নিকাশ আছে এ রকম হয় তবে তাদের সওয়াব পূর্ণ করার জন্য, আর যদি হিসাব-নিকাশ নেই এ রকম প্রাণী হয়, তবে যালেমদের যুলুমের কু-প্রভাবের কারণে। [ফাতহুল কাদীর] এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মানুষ অন্যায়ের কারণে অন্যান্য প্রাণীজগতকেও কষ্টে নিক্ষেপ করে। আর যদি ভাল কাজ করে তখন অন্যান্য প্রাণীকুলও তাদের ভালকাজের সুফল ভোগ করে। এ জন্যই যারা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী তাদের জন্য পানির মাছ এবং আকাশের পাখিও দো'আ করে। কারণ তারা দ্বীনি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অন্যায় আচরণ থেকে নিজেরা দূরে থাকবে অন্যদেরকেও দূরে রাখবে। ফলে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হওয়ার কারণ হবে। যা মানুষ ও সবার জন্য সমভাবে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের গুনাহ্‌র কারণে তাদেরকে অনাবৃষ্টির মাধ্যমে শাস্তি দেন। এ শাস্তি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীজগত সবাইকে শামিল করে। তাই মানুষের উচিত যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে দূরে থাকা। যাতে তাদের আচরণে এমন প্রাণীদের কষ্ট না হয় যারা কোন অন্যায় করেনি। [কুরতুবী; ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ: ১/৬৫]

(১) কাফের-মুশরিকদের অভ্যাস যে, তারা নিজেরা অন্যায় কাজ করার পরও বলে থাকে যে, আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী হবো। এটা তাদের আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ স্বভাবের কথা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করে তা খণ্ডন করেছেন। [দেখুনঃ সূরা হুদঃ ৯-১০, সূরা ফুসসিলাতঃ ৫০, সূরা মারইয়ামঃ ৭৭-৭৮, সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ৩৫,৩৬]

তাতে নিক্ষেপ করা হবে[১]।

৬৩. শপথ আল্লাহ্‌র! আমরা আপনার আগেও বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু শয়তান ঐসব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; কাজেই সে-ই আজ[২] তাদের অভিভাবক আর তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪. আর আমরা তো আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ[৩]।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আর আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

---

(১) مُفْرَطُوْنَ শব্দটি যদি فرط বা অগ্রগামী শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তার অর্থ হবেঃ তারা সবার আগে জাহান্নামে পতিত হবে। অনুবাদে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া কোন কোন মুফাসসিরের মতে, শব্দটির অর্থঃ তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে ছেড়ে রাখা হবে। [তাবারী; কুরতুবী]

(২) আজ বলে দুনিয়ার জীবনেও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার আখেরাতের জীবনেও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অন্য কথায় এ কিতাব নাযিল হওয়ার কারণে এরা একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। তাওহীদ ও পুনরুত্থানের বিভিন্ন অবস্থা ও শরী'আতের বিধানের মধ্যে যে সব মতবাদ ও ধর্মে এরা বিভক্ত হয়ে গেছে সেগুলোর পরিবর্তে সবাই একমত হতে পারে এ কুরআনের কাছে ফিরে আসার মাধ্যমে। [ফাতহুল কাদীর] এখন এ নিয়ামতটি এসে যাওয়ার পরও যারা অতীতের অবস্থাকেই প্রাধান্য দিয়ে যাওয়ার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে তাদের পরিণাম ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যারা এ কিতাবকে মেনে নেবে একমাত্র তারাই সত্য-সরল পথ পাবে এবং তারাই অঢেল বরকত ও রহমতের অধিকারী হবে।

করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা কথা শোনে(১)।

নবম রুকূ'

৬৬. আর নিশ্চয় গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তার পেটের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে(২)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

(১) অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন দ্বারা কুফরীর কারণে মৃত অন্তরসমূহকে জীবিত করেন। সেভাবে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে জীবিত করেন। [ইবন কাসীর] এর দ্বারা তিনি একদিকে তাঁর অপার শক্তি, তাওহীদের উপর প্রমাণ পেশ করছেন। কারণ, তাদের উপাস্যগুলো এটা করতে সক্ষম নয়। [কুরতুবী] অপর দিকে আল্লাহ যে মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে পুনর্বার জীবিত করবেন সেটার পক্ষেও প্রমাণ পাওয়া গেল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিস্কার দুধ বের করা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নীচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে। [ইবন কাসীর] প্রকৃতিতে এমন কে আছে যে চতুষ্পদ জন্তুরা যে খাবার খায়, যে পানীয় গ্রহণ করে সেটাকে দুধে রূপান্তরিত করতে পারে? [সা'দী] এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। [কুরতুবী] তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যখন আহার করবে তখন বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَارْزُقْنَا خَيْراً مِنْهُ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। অন্য বর্ণনায়, ভবিষ্যতে আরও উত্তম রিযিক দিন।) আর যখন তোমাদেরকে দুধ পান করানো হয়, তখন বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরো বেশী দান করুন।) (এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি।) কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। [আবুদাউদঃ ৩৭৩০, তিরমিযীঃ ৩৪৫৫, ইবনে মাজাহঃ ৩৩২২]তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন্য থেকে সে লাভ করে।

তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর।

৬৭. আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক[১]; নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন[২]।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৬৮. আর আপনার রব মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন[৩], 'ঘর তৈরী কর পাহাড়ে, গাছে ও মানুষ যে মাচান তৈরী করে তাতে;

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝

৬৯. 'এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু খাও, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর[৪]।' তার

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۭ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এর একটি হলো- মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ উত্তম রিয্ক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরের তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজবুতও করে নেয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। [দেখুন, সা'দী]

(২) অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে سَكَر এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে। আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় নাযিল হয়েছে। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলিমরা সাধারণভাবে তা পান করত। [ইবন কাসীর]

(৩) অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সূক্ষ্ম ও গোপন ইশারা, যা ইশারাকারী ও ইশারা গ্রহনকারী ছাড়া তৃতীয় কেউ টের পায় না। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শব্দটি ইলকা বা মনের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা ও ইল্হাম বা গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে ওহী করার অর্থ ইলহাম, হিদায়াত ও ইরশাদ। [ইবন কাসীর]

(৪) 'রবের সহজ পথ' এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তুমি অনুগত হয়ে সে পথে চল

شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

পেট থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন রং এর পানীয়(১); যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য(২)। নিশ্চয় এতে রয়েছে

যে পথ তোমার রব তোমাকে শিখিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। রবের রাস্তা বলা হয়েছে এজন্যে যে, সে রবই তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ পথে চলা শিখিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার রবের শিখিয়ে পথগুলোতে বিভিন্ন স্থানে রিযিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়। পাহাড়ে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে। অথবা আয়াতের অর্থ, হে মৌমাছি! তুমি যা খেয়েছ তা তোমার রবের নির্দেশক্রমে ও তাঁর শক্তিতে তোমার শরীরের মধ্য দিয়ে মধু তৈরীর প্রক্রিয়া পরিণত কর। অথবা আয়াতের অর্থ, হে মৌমাছি! যখন তুমি দূরে কোন স্থানে মধু আহরণের জন্য যাবে, তখন সেটা সংগ্রহ করে আবার তোমার গৃহে ফিরে আস, তোমার প্রভুর শিখিয়ে দেয়া পথসমূহ অবলম্বন করে। পথ হারিয়ে ফেলো না। [ফাতহুল কাদীর] মূলত: তিনটি অর্থই উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব।

(১) এখানে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাবও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণতঃ তরল আকারে থাকে, তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহ্‌র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু সাদা, হলুদ, লাল ইত্যাদি বহু রঙের হয়ে থাকে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ এবং তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কোন এক সাহাবী তার ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেনঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারো একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেনঃ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। যাও তাকে মধু খাইয়ে দাও, তারপর লোকটি গিয়ে মধু খাওয়ানোর পর সে আরোগ্য লাভ করল। [বুখারীঃ ৫৭১৬, মুসলিমঃ ২২১৭] এখানে আল্লাহর উক্তি সত্য এবং পেট মিথ্যাবাদী হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ঔষধের দোষ নাই। রুগীর বিশেষ মেজাযের কারণে ঔষধ দ্রুত কাজ

চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন(১) ।

করেনি । এরপর রুগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে । তবে সমস্ত রোগের জন্য সরাসরি মধু ব্যবহার করতে হবে তা এ আয়াতে বলা হয়নি । আবার কখনো কখনো বিভিন্ন উপাদানের সাথে মিশে তা আরোগ্য দানকারী প্রতিষেধকে পরিণত হয় । অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমরা দু’টি আরোগ্যকে আঁকড়ে ধরবে, কুরআন এবং মধু” [ইবনে মাজাহঃ ৩৪৫২, মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/২০০] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর হাদীসে বলেনঃ “তিনটি বস্তুতে আরোগ্য রয়েছে, শিঙ্গা, মধু এবং আগুনের ছেঁক । তবে আমি আমার উম্মাতকে ছেঁক দিতে নিষেধ করি” [বুখারীঃ ৫৬৮০, মুসলিমঃ ২২০৫] তবে আলোচ্য আয়াতে شفاء শব্দটি থেকে মধু যে প্রত্যেক রোগের ঔষধ, তা বোঝা যায় না । কিন্তু شِفَاءٌ শব্দের تنوين যা تعظيم এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময় শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরণের । যদিও কোন কোন আলেম বলেনঃ মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক । তারা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তারা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও । এ কারণেই হয়তঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মধু পছন্দ করতেন [দেখুনঃ বুখারীঃ ৫৪৩১, ৫৬১৪, মুসলিমঃ ১৪৭৪, আবুদাউদঃ ৩৭৫১, তিরমিযীঃ ১৮৩২, ইবনে মাজাহঃ ৩৩২৩, মুসনাদে আহমাদ ৬/৫৯] ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন । এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনে কি মধু সম্পর্কে ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ বলেননি? অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “এতে (অর্থাৎ মধুতে) মৃত্যু ছাড়া আর সব রকমের রোগের আরোগ্য রয়েছে” । [ইবনে মাজাহঃ ৩৪৫৭] আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরো জানা গেল যে, ঔষধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ । [কুরতুবী]
কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা একে নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন । অন্যত্র বলা হয়েছে- ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [আল-ইসরাঃ ৮২] । হাদীসে ঔষধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে । মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ঔষধ ব্যবহার করা যে বৈধ, এ বিষয়ে সকল আলেমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে ।

(১) নিশ্চয় এ ছোট প্রাণীটিকে সঠিক পথে সহজভাবে চলার ইলহাম করা, বিভিন্ন গাছ থেকে মধু নেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া, তারপর সেটাকে মোমের মধ্যে ও মধুর জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে রাখা যা অন্যতম উত্তম বস্তু হিসেবে বিবেচিত । অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বড় নিদর্শন রয়েছে । যা তার সৃষ্টিকর্তার মহত্বতার উপর প্রমাণবহ । এর দ্বারা তারা এটার উপর প্রমাণ গ্রহণ করবেন যে, তিনি সব করতে সক্ষম, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, দাতা, দয়ালু । [ইবন কাসীর]

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

৭০. আর আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রত্যাবর্তিত[১] করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে[২]; যাতে জ্ঞান লাভের পরেও তার সবকিছু অজানা হয়ে যায় । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পূর্ণ ক্ষমতাবান[৩] ।

---

(১) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাঁর কর্মকাণ্ড কিভাবে সম্পন্ন করেন সেটা বর্ণনা করছেন । তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন । তারপর তাদেরকে মৃত্যু প্রদান করেন । তাদের মধ্যে আবার কাউকে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত ছাড় দেন । যেমন, অন্য আয়াতেও বলেছেন, “আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে , দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি ; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য । তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম ।” [সূরা আর-রূম: ৫৪] [ইবন কাসীর] এখানে ﴿مَّنْ يُّرَدُّ﴾ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে । সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ । তখন সে কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না । তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম । সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল । এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন । এটা ছিল তার উন্নতির যুগ । এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন । এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা ছিল শৈশবে । আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, “অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি--- ।” [সূরা আত-তীন: ৪-৫] [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) ﴿اَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেনঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمُرِ، وَفِي رواية : مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি । অন্য এক রেওয়ায়েতে আছেঃ অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি । [বুখারীঃ ৪৭০৭] ﴿اَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ এর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই । তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয় । কুরআনও এর প্রতি ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا﴾ বলে ইঙ্গিত করেছে । অর্থাৎ যে বয়সে হুঁশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে । ফলে জানা বিষয়ও ভুলে যায় । [ফাতহুল কাদীর]

(৩) নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী । তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন

দশম রুকূ'

৭১. আর আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাসদাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়[১]। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করছে[২]?

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমতাধীন।

(১) প্রথম থেকে সমগ্র ভাষণটিই চলছে শির্ককে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও তাওহীদকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এবং সামনের দিকেও এ একই বিষয়বস্তুই একের পর এক এগিয়ে চলছে। এখানে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদে যখন নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদেরকে সমান মর্যাদা দাও না –অথচ এ সম্পদ আল্লাহর দেয়া– তখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতাহীন গোলামদেরকেও শরীক করা এবং ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ গোলামদেরকেও তাঁর সাথে সমান অংশীদার গণ্য করাকে তোমরা কেমন করে সঠিক মনে করো? [ইবন কাসীর] কুরআনের অন্যত্র এ একই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের সামনে একটি উপমা তোমাদের সত্তা থেকেই পেশ করেন। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তাতে কি তোমাদের গোলাম তোমাদের সাথে শরীক আছে? আর এভাবে শরীক বানিয়ে তোমরা ও তারা কি সমান সমান হয়ে গিয়েছ? এবং তোমরা কি তাদেরকে ঠিক তেমনি ভয় পাও যেমন তোমাদের সমপর্যায়ের লোকদেরকে ভয় পাও? এভাবে আল্লাহ খুলে খুলে নিশানী বর্ণনা করেন তাদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।" [সূরা আর-রূম: ২৮] দু'টি আয়াতের তুলনামূলক আলোচনা করলে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় স্থানেই একই উদ্দেশ্যে একই উপমা বা দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এদের একটি অন্যটির ব্যাখ্যা করছে।

(২) এখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকারের অর্থ, আল্লাহ্ই মানুষকে নে'য়ামত দান করেছেন। তিনি চান এর জন্য মানুষ একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করুক, তাঁরই কাছে কৃতজ্ঞ হোক।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ

৭২. আর আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন[১] এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন[২] এবং

আল্লাহর নিয়ামতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকৃতির এই তাৎপর্যটি অনুধাবন করার পর এ বাক্যাংশের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরা যখন প্রভু ও গোলামের পার্থক্য ভাল করেই জানে এবং নিজেদের জীবনে সর্বক্ষণ এ পার্থক্যের দিকে নজর রাখে তখন একমাত্র আল্লাহর ব্যাপারেই কি এরা এত অবুঝ হয়ে গেছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ মনে করছে? আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষেত-খামার ও পশুসম্পদের একটি অংশ শুধু তারা আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে থাকে। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করে তার সাথে অন্যকে শরীক করে। হাসান বসরী বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে লিখা চিঠিতে লিখলেন, 'আর আপনি দুনিয়াতে আপনাকে প্রদত্ত রিযিক নিয়ে তুষ্ট থাকুন। কেননা, দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কারও উপর অপর কাউকে রিযিকের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। এটা মূলতঃ পরীক্ষা, এর মাধ্যমে তিনি সবাইকে পরীক্ষা করেন। যার জন্য রিযিকে প্রশস্তি প্রদান করেছেন তাকে পরীক্ষা করেন যে, সে এর দ্বারা কিভাবে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে, আল্লাহ্ তার উপর এর মধ্যে যে হক ফরয করেছেন সেটা কিভাবে আদায় করে।' [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে একটি প্রধান নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পরের ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে। যদি অন্য প্রজাতি থেকে তা নির্ধারণ করতেন তবে তাদের মধ্যে এরকমের মিল-মহব্বত থাকত না। সুতরাং তাঁর রহমতের এক নিদর্শনস্বরূপ তিনি আদম সন্তানকে পুরুষ ও নারী এ দু'ভাগে সৃষ্টি করেছেন। আর নারীদেরকে পুরুষদের স্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন। এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়ীত্বের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন মুফাসসির আয়াতে উল্লেখিত حفدة শব্দের অর্থ করেছেনঃ খাদেম ও সাহায্যকারীগণ। এ অর্থ শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত حَفَدَةً শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। অবশ্য এ অর্থ পূর্ববর্তী তাফসীর অর্থাৎ যারা শব্দটির অর্থ "নাতি" করেছেন তার বিপরীত নয়। কারণ, আরবগণ তাদের ছেলে ও

اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন[১]। তবুও কি তারা বাতিলের স্বীকৃতি দিবে[২] আর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে[৩]?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

৭৩. আর তারা ইবাদাত করে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর, যেগুলো আসমান ও যমীন হতে তাদের কোন জীবনোপকরণের মালিক নয় এবং হতেও সক্ষম

নাতিদের দ্বারাই খেদমত গ্রহণ করে থাকেন। [ইবন কাসীর] সন্তানদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। তাই এক হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, "তোমার সন্তান সে তো তোমার দাস তথা খাদেম" [আবু দাউদঃ ২১৩১] কোন কোন মুফাসসির حَفَدَةً শব্দের অর্থ করেছেন, শ্বশুরগোষ্ঠী, জামাতা ইত্যাদি। এ অর্থেও শব্দটি আভিধানিক অর্থের সাথে মিল আছে, কারণ মানুষ তাদের জামাতা ও শ্বশুরগোষ্ঠি দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকে। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে ﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ﴾ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাও সরবরাহ করেছেন।

(২) 'বাতিলকে মেনে নেয়ার অর্থ, মূর্তি, প্রতিমা, দেব-দেবী ইত্যাদিকে মেনে নেয়া। [ইবন কাসীর] তারা মনে করে যে, তাদের দেব-দেবী তাদের ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তারা তাদের সম্পর্কে এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য ভাঙ্গা-গড়া, আশা-আকাংখা পূর্ণ করা, সন্তান দেয়া, রুজি-রোজগার দেয়া, বিচার-আচার ও মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করানো এবং রোগ-শোক থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি কতিপয় দেব-দেবী, জিন এবং অতীতের বা পরবর্তীকালের কোন মহাপুরুষ যেমন নবী- রাসূল, পীর-ফকীর ইত্যাদির হাতে রয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে বাতিল বলে তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যে সমস্ত পবিত্র বস্তু হারাম করে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেমন বাহীরা, সায়েবা ইত্যাদি। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ এরা আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতকে গোপন করে এবং সেগুলোকে অন্যদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার ওপর তাঁর দয়া প্রদর্শন করে বলবেন, আমি কি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উট অনুগত করে দেই নি? আমি তোমাকে নেতৃত্ব ও আরামে চলাফেরা করতে দেইনি? [মুসলিমঃ ২৯৬৮]

নয়[১] ।

৭৪. কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির করো না[২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না ।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন[৩] অন্যের

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ

(১) অর্থাৎ তোমাদের জন্য বৃষ্টি নাযিল করা, ফসল উৎপন্ন করা, গাছ-গাছালির ব্যবস্থা করা, এগুলো কিছুরই তারা মালিক নয় । তারা যদি এগুলো করতে চায়ও তারপরও তারা তা করতে সক্ষম হবে না । এজন্য আল্লাহ্ এরপরই বলেছেন, "কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির করো না ।" তিনি জানেন ও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন হক ইলাহ নেই, অথচ তোমরা তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করছ । [ইবন কাসীর]

(২) 'আল্লাহর জন্য সদৃশ স্থির করো না'- মুফাসসির যাজ্জাজ এর তাফসীরে বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করো না । কেননা, তিনি এক, তার কোন দৃষ্টান্ত নেই । আর তারা বলত যে, জগতের মা'বুদ এতই মহিয়ান যে তাকে আমাদের কেউ ইবাদত করতে পারে না । সুতরাং তারা মূর্তি-প্রতিমা, দেব-দেবী ও তারকারাজির মাধ্যম গ্রহণ করত । যেমন সাধারণ ছোট ছোট লোকেরা বাদশার দরবারে যেতে বড় বড় লোকদের দ্বারস্থ হয়ে থাকে । আর এ বড় বড় লোকগুলো বাদশার খেদমত করে, সুতরাং তাদের কথা শুনবে । এ আয়াতে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা-মহারাজা ও বাদশাহ-শাহানশাহদের সমপর্যায়ে রেখে বিচার করো না । রাজা-বাদশাহদের অনুচর, সভাসদ ও মোসাহেবদের মাধ্যম ছাড়া তাদের কাছে কেউ নিজের আবেদন নিবেদন পৌঁছাতে পারে না । ঠিক তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও তোমরা এ ধারণা করতে থাকো যে, তিনি নিজের শাহী মহলে ফেরেশতা, আউলিয়া ও অন্যান্য সভাসদ পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন এবং এদের মাধ্যমে ছাড়া তাঁর কাছে কারোর কোন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না । আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা । তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক ঊর্ধ্বে । এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করতে নিষেধ করার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, আল্লাহ্ জানেন তোমাদের উপর কি ইবাদাত করণীয়, তোমরা জান না তিনি ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করলে কি কঠিন পরিণতির সম্মুখীন তোমাদের হতে হবে । [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ যদি উপমার সাহায্যে কথা বুঝতে হয় তাহলে আল্লাহ সঠিক উপমা দিয়ে তোমাদের সত্য বুঝিয়ে দেন । তোমরা যেসব উপমা দিচ্ছো সেগুলো ভুল । তাই তোমরা সেগুলো থেকে ভুল ফলাফল গ্রহণ করে থাকো । তোমরা সঠিক উপমা দিতে জান না । আল্লাহ্ নিজেই তোমাদেরকে উপমা শিখিয়ে দিচ্ছেন । [ফাতহুল কাদীর]

شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে আমরা আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিয্‌ক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অন্যের সমান[১]? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য[২]; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না[৩]।

---

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা'আলা কাফের ও মুমিনের জন্য প্রদান করেছেন। ইবনে জরীর তাবারীও তা পছন্দ করেছেন। যে দাস কিছুরই ক্ষমতা রাখে না সে হচ্ছে কাফের। আর যাকে উত্তম রিযিক দেয়া হয়েছে আর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে সে হচ্ছে মুমিন। মুজাহিদ বলেন, এ উপমাটি মূর্তি-প্রতিমা ও আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পেশ করা হয়েছে। এ দু'টি কি সমান? যখন তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট, বোকা ছাড়া সবাই তা বুঝতে সক্ষম, তখন বলা হল যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। [ইবন কাসীর] কিন্তু তারা অধিকাংশই জানে না। যদি তারা জানত তবে যার জন্য ইবাদাত করা হক ও যথাযথ তাঁরই ইবাদাত করত, আর যিনি তাদেরকে এত এত নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন তাঁর নেয়ামতের স্বীকৃতি তারা দিত। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আলহাম্‌দুলিল্লাহ বা সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। এটা বলার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. কারণ, তিনিই তো সব নেয়ামত প্রদান করেছেন, তাঁর বান্দাদের কেউই তা দেয় নি। সুতরাং যারা মৌলিকভাবে অথবা মাধ্যম হয়ে কোনভাবেই কোন নেয়ামত দেয়নি তারা কিভাবে প্রশংসা পেতে পারে? দুই. সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্যে এ কারণে যে, তিনিই তাঁর বন্ধুদেরকে তাওহীদের মত নেয়ামত প্রদান করেছেন। তিন. অথবা এখানে নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে যে, আপনি বলুন, আল-হামদুলিল্লাহ। তখন নির্দেশটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যারাই এ নেয়ামত উপলব্ধি করতে পারবে তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চার. অথবা যে উদাহরণ পেশ করা হলো তা যে কত জোরালো, তার মোকাবিলায় যে তারা কোন কিছুই দাঁড় করাতে পারবে না, দলীল-প্রমাণের সে শক্তি অনুভব করে আল-হামদুলিল্লাহ বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে তাদেরকে 'জানে না' বলার কারণ হয়ত এই যে, তারা তাদের উপর যা কর্তব্য তা না জানার কারণে সত্যিকারেই জাহেল বা মূর্খে পরিণত হয়েছে। অথবা তারা হক জেনেও ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা করার জন্য তা মেনে নিচ্ছে না। এতে করে তারা যাদের জ্ঞান নেই, তাদের কাতারে নেমে গেছে। [ফাতহুল কাদীর]

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর আল্লাহ্ আরো উপমা দিচ্ছেন দু ব্যক্তিরঃ তাদের একজন বোবা, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের উপর বোঝা; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে কোন কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না; সে কি সমান ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে[১]?

এগারতম রুকূ'

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় আল্লাহ্‌রই। আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায়[২], অথবা তা থেকেও সত্বর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা'আলা মূর্তি-প্রতিমা ও তাঁর নিজের ব্যাপারে পেশ করেছেন। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ মূর্তিগুলো বোবা, কথা বলে না, কল্যাণ ও অকল্যাণ কোন প্রকার কথাই বলে না, কোন কিছুর উপরই তাদের ক্ষমতা নেই, কথায়ও নয়, কাজেও নয়। তদুপরি সে তার অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল। তাকে কোথাও পাঠানো হলে সে কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তার চেষ্টাতেও সফল হয় না। এমতাবস্থায় যার হচ্ছে এ ধরণের অক্ষমতার গুণ সে কি তার মত যে, ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলে, আর যে সঠিক পথের উপর আছে? [ইবন কাসীর]

(২) উপরোক্ত দু'টি উদাহরণ পেশ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা এখানে নিজের প্রশংসা করছেন যে, তিনিই শুধু গায়বের সংবাদের মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। আসমান ও যমীনে যা বর্তমানে গায়েব আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনের খবরও তিনিই জানেন; বান্দাদের কাছে তা গায়েব রাখা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর[১] ।

(১) অর্থাৎ এমন সব উপকরণ যার সাহায্যে তোমরা দুনিয়ার সব রকমের জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কর্ম চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছো । জন্মকালে মানব সন্তান যত বেশী অসহায় ও অজ্ঞ হয় এমনটি অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় না । কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপকরণাদির (শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক ও চিন্তাশক্তি) সাহায্যেই সে উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর সকল বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তাদের ওপর রাজত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে । আয়াতের শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অর্থ, এগুলোকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে কাজে লাগানো । সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যাতে হয় তাই শুধু সে করবে । এক হাদীসে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম । আমার বান্দার উপর যা আমি ফরয করেছি তা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোন প্রিয় বস্তু নেই যার মাধ্যমে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে । আমার বান্দা আমার কাছে নফল কাজসমূহ দ্বারা নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি । তারপর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে আর তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে । তখন আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা অবশ্যই দেব, আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে অবশ্যই উদ্ধার করব" । [বুখারীঃ ৬৫০২] হাদীসের অর্থ হচ্ছে, বান্দাহ যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র জন্যই করে, তখন তার সমস্ত কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায় । সে তখন এর বাইরে চলতে পারে না । সে যা শোনে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই শোনে । যা দেখে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই দেখে, অর্থ্যাৎ তার শরী'আতের অনুমোদন ছাড়া কিছুই দেখে না । অনুরূপভাবে তার যাবতীয় চলা-ফেরা, ধর-পাকড় কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য অনুসারে হয় । তাঁর সাহায্যেই অনুষ্ঠিত হয় । আর যখন বান্দা এরকম হয়, তখন আল্লাহ্‌ও তার ডাকে সাড়া দেন । তার যাবতীয় কাজ সফল হতে থাকে । বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাছে সবসময়ই চায় তাঁর বান্দাগণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । অন্য আয়াতেও সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে । যেমন, "বলুন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ । তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । বলুন, 'তিনিই যমীনে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে ।" [সূরা আল-মুলকঃ ২৩-২৪] [ইবন কাসীর]

৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই সেগুলোকে ধরে রাখেন না। নিশ্চয় এতে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে[১]।

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

৮০. আর আল্লাহ্ তোমাদের ঘরসমূহকে করেছেন তোমাদের জন্য আবাসস্থল[২]

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে একটু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। যেখানে পাখি আসমান ও যমীনের মাঝখানে ভাসমান হয়ে থাকে। কিভাবে তিনি সেটাকে দু'ডানা মেলে শূণ্যে ভেসে বেড়াতে দিয়েছেন। এগুলোকে তো আল্লাহই কেবল তাঁর কুদরতে ধারণ করে রাখেন। (তিনিই তো তাদেরকে ডানা মেলা ও বন্ধ করা শিখিয়েছেন। তারা সেভাবে ডানা মেলে ও বন্ধ করে যেমন কোন সাঁতারু পানিতে সাতার কাটার সময় করে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]।) সেখানে তিনি এমন শক্তির উদ্ভব করেছেন যে, তারা উড়ে বেড়াতে পারে। অনুরূপভাবে তিনি বাতাসকে নিয়োজিত করেছেন সেগুলোকে বহন করতে। আর পাখিও অনুরূপভাবে বাতাসে চলাফেরা করতে পারে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ নেয়ামতের কথা ও তাঁর কুদরতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা আল-মুলক: ১৯] এ সবকিছুতে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে। [ইবন কাসীর] এসবই আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁর অপার ক্ষমতার উপর প্রকৃষ্ট প্রমান। কিন্তু তারাই শুধু তা দেখতে পায় ও বুঝতে পারে যারা আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত শরী'আতের উপর ঈমান রাখে। [ফাতহুল কাদীর] যারা তাঁর এ সমস্ত নিদর্শন বুঝতে পারে তারা শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে যিনি তাদেরকে এ নেয়ামত দান করেছেন সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

(২) এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেয়ামতের কিছু বর্ণনা দিচ্ছেন। [ফাতহুল কাদীর] তিনি তাঁর বান্দাদের উপর যে নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, তিনি তাদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে তারা বসবাস করে, আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজেদেরকে অপরের কাছ থেকে গোপন রাখতে সমর্থ হয়, যত প্রকারের উপকার লাভ করা যায় এর মাধ্যমেই তাই তারা গ্রহণ করে। এ ঘর ছাড়াও তিনি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকে চামড়ার ঘরেরও ব্যবস্থা করেছেন। (অর্থাৎ পশুচর্মের তাঁবু। আরবে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।) এগুলোকে তোমরা সফর অবস্থায় বহন

مِّنْ جُلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَّمَتَاعًا إِلَىٰ حِيْنٍ ۝

এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়ার ঘর তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা সেটাকে সহজ মনে করে থাক তোমাদের ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে[১]। আর (ব্যবস্থা করেছেন) তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ[২]।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ

৮১. আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে[৩] তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার

করা তোমাদের জন্য হাল্কা বোধ করে থাক। এগুলোকে তোমরা তোমাদের সফরে ও স্থায়ী অবস্থানস্থলে ব্যবহার করতে পার। [ইবন কাসীর] তাছাড়া তিনি তোমাদের জন্য ভেড়ার পশম, উটের লোম ও ছাগলের চুলেরও ব্যবস্থা করেছেন। যা তোমাদের সম্পদ ও উপভোগ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। ঘরের আসবাব ও কাপড় হয়েছে। ব্যবসায়ী সম্পদ হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত তোমরা এগুলো ভোগ করতে পার। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, অথবা পুরনো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অথবা আমৃত্যু বা কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা এগুলো ভোগ করতে পার। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ যখন কোথাও রওয়ানা হয়ে যেতে চাও তখন তাকে সহজে গুটিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে বহন করতে পারে। আবার যখন কোথাও অবস্থান করতে চাও তখন অতি সহজেই ভাঁজ খুলে খাটিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলতে পারো। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহ্কৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশ্ত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে আরও কিছু নেয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে তাঁবুবাসীদের বর্ণনা চলে গেছে। কিন্তু এমনও এক রয়েছে যাদের কোন তাঁবু নেই। তাদের পাকা ঘরের ব্যবস্থাও নেই, যার ছায়ায় তারা আশ্রয় নিতে পারে, দারিদ্রতা কিংবা অন্য কোন

مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে[১] এবং তিনি

কারণে। তখন তাকে কোন গাছ বা দেয়াল অথবা আকাশের মেঘের ছায়ায় বা অনুরূপ কিছুর নিচে থাকতে হয়, তাই আল্লাহ্ তা'আলা এদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলছেন যে, "আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন"। কাতাদা বলেন, এর অর্থ গাছ। [ইবন কাসীর] তবে পূর্বে উল্লেখিত সবগুলোর ছায়াই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] তারপর মুসাফিরকে যেহেতু কখনও কখনও এমন কোন কিছুর আশ্রয় নিতে হয়, যেখানে সে অবস্থান করবে, আবার তার কাছে এমন কিছুও থাকতে হয় যা দ্বারা সে প্রচণ্ড তাপ ও খরা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "আর তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন"। [ফাতহুল কাদীর] পাহাড়ে তারা কিল্লা ও দূর্গ বানায় [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে সেখানে তাদের জন্য রয়েছে গিরিগুহাসমূহ যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে। বিপদাপদ ও লোকচক্ষু থেকে আড়াল করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] আর তিনি "তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য এমন কিছু যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। যেমন বর্ম ও লোহার অন্যান্য যুদ্ধের কাপড়। [ইবন কাসীর]

(১) ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার কথা না বলার কারণ সম্পর্কে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এ সূরার শুরুতে ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ বলে পোষাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা এবং উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে। অথবা একটির কথা বলায় অপরটি এমনিতেই এসে যাবে এজন্য ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অথবা, কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হলো গ্রীষ্মপ্রদান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ্ বলেন, এ সূরাকে 'সূরাতুন নি'আম' বা নেয়ামতের সূরা বলা হয়। আতা আল-খুরাসানী বলেন, কুরআন আরবদের জ্ঞান অনুসারে নাযিল হয়েছে। তুমি কি দেখনা আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর দিকে যেখানে বলা হয়েছে, "আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন" অথচ সমতল ভূমিতে আরও বড় ও বেশী ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্

ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন[১] যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾

৮২. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. তারা আল্লাহ্‌র নি'আমত চিনতে পারে; তারপরও সেগুলো তারা অস্বীকার করে[২] এবং তাদের অধিকাংশই

করে রেখেছেন কিন্তু সেটা উল্লেখ করেন নি। কেননা, তারা ছিল পাহাড়ী জাতি। অনুরূপভাবে তুমি দেখ না আল্লাহ্‌র বাণীর দিকে যেখানে বলা হয়েছে, "আর (ব্যবস্থা করেছেন) তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ" অথচ এর বাইরে আরও যে সমস্ত সামগ্রী তিনি মানুষের জন্য রেখেছেন তা অনেক বেশী কিন্তু তারা ছিল মেষপালক, পশমের বাড়িতে অবস্থানকারী গোষ্ঠী। তদ্রূপ তুমি কি দেখ না আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি, যেখানে তিনি বলেছেন, "আকাশে অবস্থিত মেঘের পাহাড়ের মধ্যস্থিত শিলাস্তূপ থেকে তিনি বর্ষণ করেন শিলা" [সূরা আন-নূর:৪৩] কারণ, তারা এটা নিয়ে আশ্চর্যবোধ করে। অথচ আল্লাহ্ যে বরফ নাযিল করেন তা আরও বড় ব্যাপারে ও অধিকহারেই। কিন্তু তারা সেটা জানত না। সেরকমই তুমি দেখবে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি লক্ষ্য করলে, যেখানে বলা হয়েছে, "এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে" অথচ ঠাণ্ডার ব্যাপারে তাঁর ব্যবস্থাপনা আরও বড় ও বেশী। কিন্তু তারা যেহেতু গরম এলাকার লোক, তাই তাদের কাছে গরমটাই উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) নিয়ামত পূর্ণ বা সম্পূর্ণ করার মানে হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ জীবনের প্রতিটি বিভাগে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন এবং তারপর একটি প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি সম্পূর্ণ তাঁর রহমতের কারণে এখানে সেখানে মানুষের উপর তাঁর নেয়ামত দিয়েই যাচ্ছেন। এভাবে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মক্কার কাফেররা একথা অস্বীকার করতো না যে, এ সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ তাদের প্রতি করেছেন। কিন্তু তাদের আকীদা ছিল, তাদের বুযর্গ ও দেবতাদের হস্তক্ষেপের ফলে তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করা হয়েছে। আর একারণেই তারা এসব অনুগ্রহের জন্য

কাফির[১]।

বারতম রুকূ'

৮৪. আর যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব[২] তারপর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে না ওযর পেশের অনুমতি দেয়া হবে[৩], আর না তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময় ঐসব বুযর্গ ও দেবতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো বরং তাদের প্রতি কিছুটা বেশী করেই প্রকাশ করতো। একাজটিকেই আল্লাহ নেয়ামতর অস্বীকৃতি এবং অকৃতজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বলা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কাফের। এখানে অধিকাংশ বলে সকলকেই বোঝানো হয়েছে। অথবা অধিকাংশ লোক বলে তাদের মধ্যকার বয়স্ক লোকদের বোঝানো হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে শিশু সন্তানরাও রয়েছে। অথবা এর অর্থ, তাদের অধিকাংশই সাধারণ লোক, তারা তাদের বিবেক খরচ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করতে শিখেনি। তারা যদি সত্যিকারভাবে নেয়ামতসমূহ উপলব্ধি করতে পারত তাহলে বুঝতে পারত যে, যিনি নেয়ামত দিয়েছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত অন্য কারও নয়। ফলে তারা নেয়ামতের শুকরিয়া না করে কাফির হয়েছে। আর বাকী মুশরিকরা যারা নেতৃত্বে আছে তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে। [ফাতহুল কাদীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ সেই উম্মতের নবী। [ইবন কাসীর] তিনি তাদের পক্ষে ঈমান ও সত্যায়ণের সাক্ষী হবেন। আর তাদের বিপক্ষে কুফরি ও মিথ্যারোপের সাক্ষী হবেন। [ফাতহুল কাদীর] তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তাদেরকে তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদেরকে শির্ক ও মুশরিকী চিন্তা-ভাবনা, ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করার ব্যাপারে সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন।

(৩) কেননা তারা নিজেরাও জানে যে, তারা যে সমস্ত ওযর আপত্তি পেশ করবে সবই বাতিল, অসার ও মিথ্যা। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এটা এমন এক দিন যেদিন না তারা কথা বলবে, আর না তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে ওযর পেশ করার।" [সূরা আল-মুরসালাত: ৩৫-৩৬] [ইবন কাসীর]

وَإِذَا رَاَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর যারা যুলুম করেছে, তারা যখন শাস্তি দেখবে তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না[১] এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

وَإِذَا رَاَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর যারা শির্ক করেছে, তারা যখন তাদের শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে ডাকতাম;' তখন শরীকরা এ কথা মুশরিকদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করবে[২] এবং তারা যে

(১) আয়াতের অর্থ, যখন মুশরিকরা আযাব পাবে, তখন তা তাদের থেকে সামান্য সময়ের জন্যও বন্ধ করা হবে না। আর তাদের কাছে সে আযাব পৌঁছতে দেরীও হবে না। বরং তাদেরকে দ্রুত সেটা গ্রাস করবে। হাশরের মাঠ থেকে পাকড়াও করে হিসাব বাদেই জাহান্নামে নিয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] যেমন হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের মাঠে জাহান্নামকে এমতাবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, এর সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রত্যেক লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা। [মুসলিম:২৮৪২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তখন জাহান্নাম থেকে এমন কিছু ঘাড় বের হবে যেগুলো সমস্ত সৃষ্টির উপর থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে। সেগুলো বলতে থাকবে, আমার উপর এমন প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী, দুর্দান্ত প্রতাপশীলের ভার ন্যস্ত হয়েছে যে আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত করবে।' [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৩৬] তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঝাপটে ধরবে এবং হাশরের মাঠের অবস্থান থেকে খুঁজে খুঁজে নিবে যেমন কোন পাখি কোন দানাকে খুঁজে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় সেটার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক ধ্বংসকে ডেকো না, বরং বহু ধ্বংসকে ডাক।" [আল-ফুরকান: ১২-১৪] [ইবন কাসীর]

(২) কাতাদা ও ইকরিমা বলেন, সেদিন তারা সবাই আনুগত্য করবে ও সবকথা মেনে

عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে[1]।

৮৮. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব[2]; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

৮৯. আর স্মরণ করুন, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের কাছে, তাদের থেকে তাদেরই বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব[3] এবং আপনাকে আমরা তাদের উপর সাক্ষীরূপে নিয়ে আসব[4]। আর

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

নিবে। তখন সবাই শ্রোতা ও আনুগত্যকারী হয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] তারা যে সেদিন কত বেশী শুনবে আর কত বেশী দেখবে! সেটা আশ্চর্যের বিষয়। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ আরও বলেন, "আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।" [আস-সাজদাহঃ ১২] আরও বলেন, "চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের কাছে সবাই হবে নিম্নমুখী" [ত্বা-হাঃ ১১১]

(১) অর্থাৎ তা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। দুনিয়ায় তারা যেসব নির্ভর বানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের ওপর ভরসা করতো, সেসব অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোন অভিযোগের প্রতিকারকারীকে সেখানে অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য পাবে না। কোন সংকট নিরসনকারীকে তাদের সংকট নিরসন করার জন্য সেখানে পাওয়া যাবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ একটা আযাব হবে কুফরী করার জন্য এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়ার জন্য হবে আর একটা আযাব। এ শাস্তির ধরন সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সেগুলো হবে এমন বিচ্ছু-সাপ, যার আক্রমনাত্মক দাঁতগুলো লম্বা খেজুর গাছের মত। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৫-৩৫৬]

(৩) তারা প্রত্যেক উম্মতের নবীগণ। কিয়ামতের দিন তারা তাদের উম্মতের উপর সাক্ষ্য হবেন। তারা সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা উম্মতের কাছে রিসালাত পৌঁছিয়েছেন, তাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। [কুরতুবী]

(৪) এ আয়াতাংশটি সূরা আন-নিসার ৪১ নং আয়াতের সমার্থবোধক। সেখানে এর বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি[১] প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ[২], পথনির্দেশ, দয়া ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ ।

তেরতম রুকূ'

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা)[৩],

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ

(১) আয়াতের প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাশরের মাঠে সাক্ষ্য বানানোর কথা ঘোষণা করার পর দ্বিতীয়াংশে কুরআন নাযিল করার কথা উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিনি আপনাকে কিতাব দিচ্ছেন এবং আপনার উপর তা প্রচার-প্রসার করা ফরয করে দিয়েছেন তিনিই আপনাকে এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন । এ ব্যাপারে কুরআনের আরও আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ।[দেখুনঃ সূরা আল-আ'রাফঃ ৬, সূরা আল-হিজ্‌রঃ ৯২-৯৩, সূরা আল-মায়েদাহঃ ১০৯, সূরা আল-কাসাসঃ ৮৫]

(২) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুরআন আমাদেরকে সবকিছুর জ্ঞান বর্ণনা করেছে এবং সবকিছু জানিয়েছে । মুজাহিদ বলেন, হালাল ও হারাম জানিয়েছে । তবে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাটি বেশী ব্যাপক । কেননা কুরআন প্রতিটি উপকারী জ্ঞানসমৃদ্ধ, যা গত হয়েছে সেটার সংবাদ এবং যা আসবে সেটার জ্ঞান । আর প্রতিটি হালাল ও হারাম । তেমনিভাবে মানুষ তাদের দুনিয়া ও দ্বীনের ব্যাপারে তাদের জীবিকা ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এতে পাবে । অন্তরসমূহের জন্য এতে রয়েছে হেদায়াত এবং মুসলিমদের জন্য এতে রয়েছে রহমত ও সুসংবাদ ।[ইবন কাসীর] ইমাম আওযা'য়ী বলেন, আয়াতের অর্থ, আমরা কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা সবকিছুর স্পষ্টব্যাখ্যারূপে নাযিল করেছি । [ইবন কাসীর] মোটকথা: কুরআন এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হিদায়াত ও গোমরাহী এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে । বস্তুত কুরআনুল কারীমে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে । যেসব মূলনীতির আলোকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করেছেন । কুরআনেই সেটা করতে রাসূলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেন, 'জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং কুরআনের অনুরূপও দেয়া হয়েছে ।' [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৩০]

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে জানিয়েছিলেন যে, কুরআনে সবকিছুর বর্ণনাই স্থান পেয়েছে, সে কথার সত্যায়ণ স্বরূপ এ আয়াতে এমন কিছু আলোচনা করছেন যা সমস্ত বিধি-বিধানের মূল ও প্রাণ ।[ফাতহুল কাদীর] তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশ

ইহসান (সদাচরণ)[১] ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের[২] নির্দেশ দেন[৩] এবং

ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

হচ্ছে, তিনি আদলের নির্দেশ দিচ্ছেন। মূলত: عدل শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عدل বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্‌সির এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভেতরে সমান হওয়া দ্বারা عدل শব্দের তাফসীর করেছেনে। ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কারও মতে আদল হচ্ছে, ফরয। কারও নিকট, আদল হচ্ছে, ইনসাফ। তবে বাস্তব কথা এই যে, عدل শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তার আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করা। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কেননা কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি যেমন খারাপ তেমনি কোন কিছুতে কমতি করাও খারাপ। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, ইহসান করা। বস্তুত: الإحسان -এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। যা ওয়াজিব নয় তা অতিরিক্ত প্রদান করা। যেমন, অতিরিক্ত সাদকা। [ফাতহুল কাদীর] ইমাম কুরতুবী বলেনঃ 'আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরীল'-এ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্‌সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে 'ইবাদাতের ইহ্‌সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এ স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক 'ইবাদাতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। আত্মীয়দের দান করা। কি বস্তু দেয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,"আত্মীয়কে তার প্রাপ্য প্রদান কর।" [সূরা আল-ইসরাঃ ২৬] বাহ্যতঃ আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা: তাদের যা প্রয়োজন তা প্রদান করা। [ফাতহুল কাদীর] ইহ্‌সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একে পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেনঃ সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেনঃ অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং যুলুম ও উৎপীড়ন। এ আয়াত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এটি হচ্ছে কুরআনুল কারীমের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত। [ইবন কাসীর] কোন কোন সাহাবী এ আয়াত

وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

তিনি অশ্লীলতা(১), অসৎকাজ(২) ও সীমালজ্ঘন(৩) থেকে নিষেধ করেন;

শ্রবণ করেই মুসলিম হয়েছিলেন। উসমান ইবনে মযউন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তার উপর ওহী নাযিলের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্র দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে।' উসমান ইবনে মযউন বলেনঃ এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩১৮]

(১) ওপরের তিনটি সৎকাজের মোকাবিলায় আল্লাহ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালজ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, "ফাহশা"। যার অর্থ অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা। কথায় হোক বা কাজে। [ফাতহুল কাদীর] প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীল। যেমন কৃপণতা, ব্যাভিচার, উলঙ্গতা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা-নির্লজ্জতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জন সমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগীর প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

(২) নিষিদ্ধ দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, 'মুনকার' তথা দুষ্কৃতি বা অসৎকর্ম। যা এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা শরী'আত হারাম করেছেন। যাবতীয় গোনাহই এর অন্তর্ভুক্ত। কারও কারও মতে এর অর্থ শিক। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) নিষিদ্ধ তৃতীয় জিনিসটি হচ্ছে, بغي -শব্দের আসল অর্থ সীমালজ্ঘন করা, [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে, যুলুম। কারও কারও মতে, হিংসা-দ্বেষ। মোটকথা: এর দ্বারা যুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা। তা আল্লাহর হক হোক বা বান্দার হক। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فحشاء ও بغي ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فحشاء কে পৃথক ও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৯১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের জামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন, যা তোমরা কর।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

৯২. আর তোমরা সে নারীর মত হয়ো না[২], যে তার সূতা মজবুত করে পাকাবার পর সেটার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদলের চেয়ে বেশী লাভবান হও। আল্লাহ্‌ তো এটা দিয়ে শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন[৩]।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

---

(১) আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, কোন ব্যাপারে শপথ করার পর তা রক্ষা করা জরুরী। কিন্তু যদি কেউ কোন কাজ করবে না বলে অথচ কাজটি হালাল ও ভাল। তখন কাজটি করা সুন্নাত, আর তার উচিত শপথের কাফ্‌ফারা দেয়া। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আল্লাহ চাহে তো যখনই এমন কোন কাজের শপথ করি তারপর এর বিপরীতে এর চেয়ে ভাল দেখি তখনই আমি ভাল কাজটি করি এবং শপথের কাফ্‌ফারা দেই [বুখারী: ৬৬২১; মুসলিম: ১৬৪৯]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর এবং সুদ্দী বলেনঃ এখানে মক্কার এমন এক বেঅকুফ নারীর কথা বলা হচ্ছে, যে কাপড় বুননের পর তা আবার খুলে ফেলত। মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইবনে যায়েদ বলেনঃ এটা একটি উদাহরণ যা ঐ সমস্ত লোকদের ক্ষেত্রে পেশ করা হয়, যারা কোন পাকাপাকি শপথ করার পর তা ভঙ্গ করত। ইবনে কাসীর এ দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(৩) এখানে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, প্রত্যেকটি অঙ্গীকার আসলে অঙ্গীকারকারী ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্‌ তা'আলা অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা বলে মানুষদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন। [তাবারী] সা'ঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এখানে পরীক্ষার বিষয় হচ্ছে, ‘বেশী লাভবান হতে দেখা।’

আর অবশ্যই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনা করে দেবেন যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর ইচ্ছে করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা করতে সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে[১]।

وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. আর পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না; করলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে; আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

[ইবন কাসীর] কারণ, সাধারণত জাহেলী যুগে মানুষ বেশী লাভবান হওয়ার আশায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। মোটকথাঃ আল্লাহ্ দেখতে চান কারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। আখেরাতের ময়দানে তিনি তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া মতবিরোধকে বর্ণনা করে, তাদের প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে ভাল-মন্দ প্রতিফল দেবেন। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই মানুষকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় মানুষদের পথ বিভিন্ন। কেউ গোমরাহীর দিকে যেতে চায় এবং আল্লাহ গোমরাহীর সমস্ত উপকরণ তার জন্য তৈরী করে দেন। কেউ সত্য-সঠিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পথনির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করেন। এ জন্যই হাদীসে এসেছে, "তোমরা কাজ করে যাও, কেননা যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে ধরনের কাজ করা সহজসাধ্য করে দেয়া হবে"। [বুখারীঃ ৪৯৪৭, মুসলিমঃ ২৬৪৭] সুতরাং বান্দার দায়িত্ব হলোঃ ভালো পথে চলার জন্য চেষ্টা করা এবং সে পথের উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সার্বক্ষনিক দো'আ করা।

৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না[১]। আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে শুধু তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম---যদি তোমরা জানতে!

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬. তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহ্‌ কাছে যা আছে তা স্থায়ী[২]। আর যারা ধৈর্য ধারণ করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে তারা যা করত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব[৩]।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۭ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন[৪] দান করব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

---

(১) এর অর্থ এই নয় যে, বড় লাভের বিনিময়ে তা বিক্রি করতে পারো। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশীই হোক না কেন, আখেরাতের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই বটে। [ইবন কাসীর] যে ব্যক্তি আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নেয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

(২) অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে (এতে আখেরাতে জান্নাতের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে সবরের পথ অবলম্বনকারীদের বলে এমন সব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিষেধ পালন করতে জীবনের যাবতীয় কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করেছে। এ পথে যত প্রকার কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা সবই যারা বরদাশ্‌ত করে নিয়ে আনুগত্যের উপর অটল থাকে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সিরের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থ করেছেন স্বল্পে তুষ্টি। দাহহাক বলেন, হালাল রিযক ও দুনিয়াতে ইবাদাত করার তাওফীক। কোন

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ

৯৮. সুতরাং যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন[১] তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে

কোন মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ আখেরাতের জীবন। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, জান্নাতে যাওয়া ব্যতীত কারোই জীবন স্বাচ্ছন্দময় হতে পারে না। সঠিক কথা হচ্ছে, হায়াতে তাইয়্যেবা এসব অর্থের সবগুলোকেই শামিল করে। [ইবন কাসীর] প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক- অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটর ও অসুস্থতার বিনিময়ে আখেরাতে সুমহান, চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শঃ আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সে ব্যক্তি অবশ্যই সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, চলনসই মত রিয্‌ক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছে তাতেই সে তুষ্ট হয়েছে। [মুসলিমঃ ১০৫৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দো'আ করতেনঃ "হে আল্লাহ্ আমাকে যা রিয্‌ক দিয়েছেন তাতে তুষ্ট করে দিন এবং তাতে আমার জন্য বরকত দিন আর আমার অনুপস্থিতিতে যে কাজ হয় তা ভালভাবে শোধ করুন।" [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৬]

(১) কোন কোন মুফাসসির এ আয়াত এবং এর পূর্বের আয়াতসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই এই আয়াতে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন, সর্বসম্মত মত হচ্ছে যে, এ নির্দেশটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কুরআন তেলাওয়াতের প্রথমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়ার কারণ হচ্ছে, যাতে শয়তান কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন প্রকার ঝামেলা করতে না পারে। কোন প্রকার

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾

আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন[১];

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই[২]।

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ

১০০.তার আধিপত্য তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে

সন্দেহে নিপতিত করতে না পারে এবং চিন্তা ও গবেষণা থেকে দূরে না রাখে। [ইবন কাসীর]

(১) এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র "আউযুবিল্লাহ" উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সংগে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিস্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ্ পড়া সুন্নত নয়। [ইবনুল কাইয়্যেমঃ ইগাসাতুল লাহফান] সে ক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্ পড়া উচিত। তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আ'উযুবিল্লাহ্‌র শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, "আ'উযুবিল্লাহি মিনাস শায়তানির রাজীম" পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। [দেখুনঃ বুখারী: ৩২৮২; মুসলিম: ২৬১০] পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস' পাঠ করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [দেখুনঃ বুখারী: ১৪২; মুসলিম: ৩৭৫]

(২) এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে (কেননা, তিনিই সৎকাজের তাওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরণের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। সুফিয়ান সাওরী বলেন, এর অর্থ, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে শয়তান তাদেরকে এমন গোনাহে লিপ্ত করতে পারে না যা থেকে সে তাওবাহ করে না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে শয়তান তাদের কাছে কোন প্রমাণ দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। কারও কারও মতে, এ আয়াতটি অন্য আয়াত "তবে আমার মুখলিস বান্দাদের ব্যতীত" [সূরা আল-হিজর: ৪০;সূরা ছোয়াদ: ৮৩] এর অর্থের অনুরূপ। [ইবন কাসীর] (সূরা আল-হিজরের তাফসীরে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।)

بِهٖ مُشْرِكُوْنَ

গ্রহণ করে[১] এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে।

চৌদ্দতম রুকূ'

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

১০১. আর যখন আমরা এক আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে অন্য আয়াত দেই--- আর আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন যা তিনি নাযিল করবেন সে সম্পর্কে--, তখন তারা বলে, 'আপনি তো শুধু মিথ্যা রটনাকারী', বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

১০২. বলুন, 'আপনার রবের কাছ থেকে রূহুল-কুদুস[২] (জিব্‌রীল) যথাযথ ভাবে একে নাযিল করেছেন, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।'

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যারা শয়তানের অনুসরণ করে তাদেরকেই সে পথভ্রষ্ট করে। অন্যরা বলেন, এর অর্থ, যারা তাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের উপরই তার প্রভাব কার্যকরী হয়। [ইবন কাসীর] আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আর যারা তার সাথে শরীক করে, তাদের উপরও তার ক্ষমতা কার্যকর থাকে। এর আরেক অর্থ হচ্ছে, যারা শয়তানের আনুগত্যের কারণে মুশরিক হয়েছে তাদের উপরও শয়তানের প্রভাব কার্যকর। [ইবন কাসীর]

(২) "রুহুল কুদুস" এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'পবিত্র রূহ' বা 'পবিত্রতার রূহ'। পারিভাষিকভাবে এ উপাধিটি দেয়া হয়েছে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে। এখানে অহী বাহক ফেরেশতার নাম না নিয়ে তার উপাধি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে এ সত্যটি জানানো যে, এমন একটি রূহ এ বাণী নিয়ে আসছেন যিনি সকল প্রকার মানবিক দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত। তিনি একটি নিখাদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রূহ। আল্লাহর কালাম পূর্ণ আমানতদারীর সাথে পৌঁছিয়ে দেয়াই তার কাজ। তিনি যে যথার্থ কাজই করেন এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশেরই পূর্ণ বাস্তবায়ন করেন তা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। [দেখুনঃ সূরা আল-বাকারাহঃ ৯৭, সূরা আস-শু'আরাঃ ১৯২-১৯৪], সূরা ত্বা-হাঃ ১১৪]

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, 'তাকে তো কেবল একজন মানুষ[১] শিক্ষা দেয়।' তারা যার প্রতি এটাকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য ঝুঁকছে তার ভাষা তো আরবী নয়; অথচ এটা (কুরআন) হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

১০৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তারাই তো শুধু মিথ্যা রটনা করে, আর তারাই মিথ্যাবাদী[২]।

---

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে এ ধারণা করতো। এক হাদীসে তার নাম বলা হয়েছে 'জাবর'। সে ছিল আমের আল হাদ্‌রামীর রোমীয় ক্রীতদাস। অন্য এক বর্ণনায় খুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্‌যার এক গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার নাম ছিল 'আইশ বা ইয়া'ঈশ'। তৃতীয় এক বর্ণনায় ইয়াসারের নাম নেয়া হয়েছে। তার ডাকনাম ছিল আবু ফুকাইহাহ্। সে ছিল মক্কার এক মহিলার ইহুদী গোলাম। অন্য একটি বর্ণনায় বিল্'আম নামক একটি রোমীয় গোলামের কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মোটকথা: এদের মধ্য থেকে যেই হোক না কেন, মক্কার কাফেররা শুধুমাত্র এক ব্যক্তি তাওরাত ও ইন্‌জিল পড়ে এবং তার সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতও হয়েছে শুধুমাত্র এটা দেখেই নিসংকোচে এ অপবাদ তৈরী করে ফেললো যে, আসলে এ ব্যক্তিই এ কুরআন রচনা করছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নামে নিজের পক্ষ থেকে এটিই পেশ করছেন। এভাবে মক্কার কুরাইশ কাফেররা সামান্য কিছু তাওরাত ও ইনজিল পড়তে পারতো এমন একজন অখ্যাত দাসকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত মহান ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় যোগ্যতর বিবেচনা করছিল। তারা ধারণা করছিল, এ দুর্লভ রত্নটি ঐ কয়লা খণ্ড থেকেই দ্যুতি লাভ করছে। কাফের কুরাইশদের এ ধারণাটি নিশ্চয় হাস্যকর। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যে কিছু মিথ্যা বানিয়ে বলা সম্ভব

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬. কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি[১]; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য[২] করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত[৩] ।

নয় তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ্ বলছেনঃ ঐ সমস্ত লোকেরাই শুধু মিথ্যা বানিয়ে বলতে পারে যারা আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান রাখে না। [ইবন কাসীর] নবী-রাসূলগণ তো এ রকম নয়! তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ও তাঁর আয়াতসমূহে ঈমান রাখে এবং সেগুলোর প্রতি ঈমানের জন্য মানুষকে আহ্বান করতে থাকে। রাসূল নবুওয়াতের আগেও কোনদিন মিথ্যা বলেননি, তাহলে তার প্রতি এ অপবাদ কেন? এ ব্যাপারটিই রোম সম্রাটকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি তৎকালিন কাফের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'তোমরা কি তাকে ইতোপূর্বে এ কথা (নবী হওয়ার) দাবী করার পূর্বে কখনো মিথ্যার অপবাদ দিতে? সে জবাবে বলেছিলঃ না, তখন হিরাক্লিয়াস বলেছিলঃ সে মানুষের সাথে মিথ্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলার মত কাজে জড়াতে পারে না।' [বুখারীঃ ৭]

(১) দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই মুরতাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। মুরতাদ আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। দুনিয়াতে তার শাস্তি হলোঃ মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে তার দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে তাকে তোমরা হত্যা কর"। [বুখারীঃ ৬৯২২] এটা এ জন্যই যে, সে হক্ক দ্বীনের প্রতি অপবাদ দিচ্ছে। যে শুধু নিজেকে ধ্বংস করছেনা তার সাথে হাজারো মানুষের মনে দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এতে করে সে মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হয়নি। সে বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে সুতরাং এর বিপরীতটি তার থেকে গ্রহণ করা যাবে না।

(২) إكراه-এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফরী কালেমা উচ্চারণ করা জায়েয। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে

পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ্ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে নাযিল হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী অবলম্বন করতে বলেছিল। যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তারা ছিলেন আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম। তাদের মধ্যে ইয়াসির ও তার স্ত্রী সুমাইয়্যা কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং সুমাইয়্যাকে দুই উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন। [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী]

তবে আয়াতের অর্থ এ নয় যে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা বলা বাঞ্ছনীয়। বরং এটি নিছক একটি "রুখ্‌সাত" তথা সুবিধা দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি অন্তরে ঈমান অক্ষুণ্ন রেখে মানুষ বাধ্য হয়ে এ ধরনের কথা বলে তাহলে তাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যথায় 'আযীমাত' তথা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ঈমানের পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষের এ রক্তমাংসের শরীরটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে যেন সত্যের বাণীরই ঘোষণা দিয়ে যেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এ উভয় ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়। একদিকে আছেন খাব্বাব ইবনে আর্‌ত রাদিয়াল্লাহু, আনহু তাঁকে জ্বলন্ত অংগারের ওপর শোয়ানো হয়। এমনকি তাঁর শরীরের চর্বি গলে পড়ার ফলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু এরপরও তিনি দৃঢ়ভাবে ঈমানের ওপর অটল থাকেন। বিলাল হাবশীকে রাদিয়াল্লাহু আনহু লোহার বর্ম পরিয়ে দিয়ে কাঠফাটা রোদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। তারপর উত্তপ্ত বালুকা প্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ উচ্চারণ করে যেতেই থাকেন। [দেখুনঃ ইবনে মাজাহঃ ১৫০] আর একজন সাহাবী ছিলেন হাবীব ইবন যায়েদ ইবন আসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু। মুসাইলামা কায্‌যাবের হুকুমে তাঁর শরীরের প্রত্যেটি অংগ-প্রত্যংগ কাটা হচ্ছিল এবং সেই সাথে মুসাইলামাকে নবী বলে মেনে নেবার জন্য দাবী করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি তার নবুওয়াত দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করছিলেন।এভাবে ক্রমাগত অংগ-প্রত্যংগ কাটা হতে হতেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অন্যদিকে আছেন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু। আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখের সামনে তাঁর পিতা ও মাতাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিয়ে শহীদ করা হয়। তারপর তাকে এমন কঠিন অসহনীয় শাস্তি দেয়া হয় যে,শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি কাফেরদের চাহিদা মত সবকিছু বলেন। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে মন্দ এবং তাদের উপাস্যদেরকে ভাল না বলা পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়নি।"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন "তোমার মনের অবস্থা কি?" জবাব দিলেন "ঈমানের ওপর পরিপূর্ণ নিশ্চিত।" একথায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "যদি তারা আবারো এ ধরনের জুলুম করে তাহলে তুমি তাদেরকে আবারো এসব কথা বলে দিয়ো"।[মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৭, বাইহাকীর আস-সুনানুল কুবরা ২/২০৮-২০৯]।

তবে ঈমানের উপর অবিচল থাকার কিছু নিদর্শন সাহাবাদের জীবনীতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী সময়েও পাওয়া যায়। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ আস-সাহমীকে রোমের নাসারাগণ কয়েদ করে তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেলে তাদের রাজা তাকে বললঃ নাসারাদের দ্বীন গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আমার রাজত্বের ভাগ দেব এবং আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব। তিনি তাকে বললেনঃ যদি আমাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিনিময়ে তুমি যা কিছুর মালিক তা এবং আরবদের সমস্ত সাম্রাজ্যও দাও, তবুও আমি ক্ষণিকের জন্যও তা করব না। রাজা বললঃ তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব। তিনি বললেনঃ তুমি সেটা করতে পার। তারপর রাজা তাকে শূলে চড়াবার আদেশ করল। এরপর তীরন্দাযদের তাকে কাছ থেকে তার হাত ও পায়ের পার্শ্বে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। রাজা তখনও তাকে নাসারাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকল। তিনি অস্বীকার করতে থাকলেন। রাজা তাকে শূল থেকে নামানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর একটি বড় ডেকচি আনার নির্দেশ দিলেন, তাতে পানি দিয়ে গরম করা হলো, তারপর তার সামনেই একজন মুসলিম কয়েদীকে এনে তাতে ফেলা হলো, ক্ষনিকেই কয়েদীটি হাড্ডিতে পরিণত হলো। এমতাবস্থায়ও তার কাছে নাসারাদের দ্বীন গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হলো কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন তাকে এ ডেকচির মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর তাকে যখন নিক্ষেপ করার জন্য উপরে উঠানো হলো তখন তিনি কাঁদলেন। তখন রাজা আশ্বস্ত হলো এবং তাকে ডাকল। তখন তিনি বললেনঃ আমি তো এজন্যই কেঁদেছি যে, আমার আত্মাতো একটি মাত্র যা এ মূহূর্তে ডেকচিতে আল্লাহর ওয়াস্তে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, আমার আকাংখা হলো যে, হায়! যদি আমার শরীরের প্রত্যেক পশমের পরিমাণ আত্মা হতো এবং সবগুলি আত্মা আল্লাহর জন্য এধরনের শাস্তি পেত। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাজা তাকে কয়েদ করে রেখে তাকে কয়েকদিন কোন খাবার সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকল। তারপর তাকে মদ এবং শুকরের গোস্ত দেয়া হলো। কিন্তু তিনি এর কাছেও ঘেষলেন না। তখন রাজা তাকে ডেকে বললোঃ তোমাকে খেতে বারণ করেছে কিসে? তিনি তখন বললেনঃ যদিও

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٠٧

১০৭. এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝١٠٨

১০৮. এরাই তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কান ও চোখ মোহর করে দিয়েছেন। আর তারাই গাফিল।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٠٩

১০৯. নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত যে, তারাই আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١٠

১১০. তারপর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, নিশ্চয় আপনার রব এ সবের পর, তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পনরতম রুকূ’

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝١١١

১১১. স্মরণ করুন সে দিনকে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে সে যা আমল করেছে তা পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

আমার জন্য এ অবস্থায় এ দু’টো বস্তু খাওয়া বৈধ তবুও আমি তোমাকে আমার বিপদগ্রস্ততা থেকে খুশী হতে দিতে পারি না। তখন রাজা তাকে বললোঃ তাহলে তুমি আমার মাথায় চুমু খাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। তিনি বললেনঃ আমার সাথী সমস্ত মুসলিম কয়েদীকেও ছেড়ে দেবে? রাজা বললোঃ হ্যাঁ। তখন তিনি রাজার মাথায় চুম্বন করলেন। রাজা তাকে ছেড়ে দিল এবং তার সাথের সমস্ত মুসলিম কয়েদীকেও ছেড়ে দিল। তারপর যখন তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে ফিরে আসলেন তখন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেনঃ “প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফার মাথায় চুমু খাওয়া। আর সেটা আমার দ্বারা শুরু হোক। এ কথা বলে তিনি দাঁড়ালেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফার মাথায় চুমু খেলেন। রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম ওয়া আরদাহুম। [ইবন কাসীর]

১১২. আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের[১] যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল[২],

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

(১) এখানে যে জনপদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তাকে চিহ্নিত করা হয়নি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ এখানে নাম না নিয়ে মক্কাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। [তাবারী] এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে এখানে ভীতি ও ক্ষুধা দ্বারা জনপদটির আক্রান্ত হবার যে কথা বলা হয়েছে সেটি হবে মক্কার দুর্ভিক্ষ, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মক্কাবাসীদের ওপর জেঁকে বসেছিল। অথচ মক্কা ছিল শান্তির নগরী, কিন্তু তাদের অপরাধের কারণেই তাদেরকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। [দেখুনঃ সূরা আল-কাসাসঃ ৫৭, সূরা ইব্‌রাহীমঃ ২৮-২৯]
তবে এ আয়াতের একটি তাফসীর উম্মুল মুমেনীন হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হজ্জে ছিলেন। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মদীনায় তার গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি যাকেই পেতেন তাকেই উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। অবশেষে একদিন তিনি দু'জন সওয়ারী দেখে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এটাই হলো সে জনপদ যার কথা আল্লাহ্র বাণী "আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল" এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে মূলে كفر শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ কুফরী আল্লাহ্র সাথে কুফরী ও আল্লাহ্র নেয়ামতের সাথে কুফরী উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর] কারণ, তারা আল্লাহ্র সাথে কুফরি করেছিল, তাঁর রাসূলদের সাথে কুফরি করেছিল। তাছাড়া তারা আল্লাহ্র নেয়ামতকেও অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ্র নেয়ামত অস্বীকারের উদাহরণ হিসেবে এক হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কুফরীকে ব্যবহার করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো, আমি দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তারা কুফরী করে"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি বললেনঃ "তারা স্বামীর প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারও উপকার

ফলে তারা যা করত সে জন্য আল্লাহ্ সেটাকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের[১]।

১১৩. আর অবশ্যই তাদের কাছে এসেছিলেন এক রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে[২],

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

কর, তারপরও সে তোমার কোন ত্রুটি দেখলে বলে, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল কিছু পাইনি"।[বুখারীঃ২৯]

(১) এ আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোষাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোষাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে।[ফাতহুল কাদীর] আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তাফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ একে মক্কা মুকার্‌রমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ের মত দূর্ভিক্ষের দো'আ করেছিলেন।[দেখুন, বুখারী: ৪৮২১; মুসলিম: ২৭৯৮] ফলে মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলিমদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল।[দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অবশেষে মক্কার সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করল যে, কুফরী ও অবাধ্যতার দোষে পুরুষরা দোষী হতে পারে, কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। আবু সুফিয়ান কাফের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দূর্ভিক্ষ দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য দো'আ করেন এবং দূর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।[ইবন কাসীর: আস-সীরাতুন নাবওয়ীয়্যাহ, ২/৯১]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদের রাসূল ছিল তাদের মধ্য থেকে অত্যন্ত পরিচিত জন। এমন নয় যে, তারা তাকে চিনত না বা তার সম্পর্কে কিছু জানে না।[ফাতহুল কাদীর] এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের আরো বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।[দেখুনঃ সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৪, সূরা আত-তালাকঃ ১০-১১, সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৬৯]

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল যুলুমকারী।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. অতএব আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদাত করে থাক।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ্‌ তো শুধু মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবেহ্‌কালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তা-ই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন[১], কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্‌ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

(১) এ আয়াতে ব্যবহৃত إنما শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লেখিত চারটিই। এর চাইতে আরো অধিক স্পষ্টভাবে ﴿قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [আল-আন'আমঃ ১৪৫] আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরো বহু বস্তু হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। এ সংশয়ের জবাব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ্‌ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে শুধু এগুলোই হারাম। অথবা আয়াতে যেগুলো হারাম করা হয়েছে, তারপরও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীসে বেশ কিছু জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো এর সাথে যুক্ত হবে। [কুরতুবী, সূরা আল-আন'আমের ১৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়]

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. আর তোমাদের জিহ্‌বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রটনা করার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম'[১]। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফলকাম হবে না।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর যারা ইয়াহূদী হয়েছে আমরা তো শুধু তা-ই হারাম করেছি (তাদের উপর) যা আপনার কাছে আমরা আগে উল্লেখ করেছি[২]। আর আমরা তাদের উপর কোন যুলুম করিনি, কিন্তু তারাই যুলুম করত নিজেদের প্রতি।

---

(১) এ আয়াতটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হালাল ও হারাম নির্দিষ্ট করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা করার ধৃষ্টতা দেখাবে সে নিজের সীমালংঘন করবে। নিজের হালাল ও হারাম করার স্বাধীন ক্ষমতাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ বলে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের বিধান তৈরী করে তার এ কাজটি দু'টি অবস্থার বাইরে যেতে পারে না। হয় সে দাবী করছে যে, যে জিনিসকে সে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদন ছাড়াই বৈধ বা অবৈধ বলছে তাকে আল্লাহ বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ নিজের হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনের শরীয়াত তৈরী করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ দু'টি দাবীর মধ্য থেকে যেটিই সে করবে তা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচার এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই হবে না। আল্লামা ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ যে কোন বিদ'আতকারীও এ আয়াতের হুকুমের আওতায় পড়বে। কারণ তারাও আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু হালাল বা হারাম ঘোষণা করছে।

(২) তাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে তা সূরা আল-আন'আমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসবকিছুই তাদের যুলুমের কারণে। [দেখুনঃ সূরা আল-আন'আমঃ ১৪৬, সূরা আন-নিসাঃ ১৬০] আল্লাহ্‌ তাদের উপর কোন যুলুম করেন নি।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে, তারা পরে তওবা করলে ও নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য আপনার রব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

ষোলতম রুকূ'

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিলেন এক 'উম্মাত'[২], আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত, একনিষ্ঠ[৩] এবং তিনি ছিলেন না

(১) আয়াতে جهل শব্দ নয় বরং جهالة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جهل শব্দটি علم এর বিপরীত অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে جهالة এর অর্থ হয় মূর্খসুলভ কান্ড, যদিও তা বুঝে-শুনে করা হয়। এজন্যই কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী বলেন, যাবতীয় গুণাহই মানুষ মূর্খসুলভ কাণ্ডের কারণে করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে أمة বা উম্মত শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। [ইবন কাসীর] তখন অর্থ হবে, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মাতের সমান। যখন দুনিয়ায় কোন মুসলিম ছিল না তখন একদিকে তিনি একাই ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী এবং অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মানুষ ছিল কুফরীর পতাকাবাহী। আল্লাহর এ একক বান্দাই তখন এমন কাজ করেন যা করার জন্য একটি উম্মাতের প্রয়োজন ছিল। তিনি এক ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না,ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার এবং যিনি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেন। অধিকাংশ মুফাস্‌সির এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। [তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মাসরূক রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে এ আয়াত পড়লে তিনি আমাকে বললেনঃ মু'আয ছিলো ﴿أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ﴾ এ কথা তিনি বারবার বললেন। শেষে বললেনঃ তোমরা কি أمة শব্দের অর্থ জান? যিনি মানুষকে ভাল ও কল্যাণ শিক্ষা দেয়। আর قانت হলো যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৮]

(৩) ইব্‌রাহীম আলাইহিসসালাম অনুগত-আজ্ঞাবহ এবং একনিষ্ঠ এ উভয় গুণেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত ব্যক্তিত্ব, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এক বাক্যে তার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তার দ্বীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইয়াহূদী, নাসারা ও মুসলিমরা তো তার প্রতি

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত;

১২১. তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ্‌ তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে(১)।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

১২২. আর আমরা তাঁকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল। আর নিশ্চয় তিনি আখিরাতে সৎকর্মপরায়ণদের দলভুক্ত(২)।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. তারপর আমরা আপনার প্রতি ওহী করলাম যে, 'আপনি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ)অনুসরণ করুন; এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. শনিবার পালন তো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করেছে। আর যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত আপনার রব তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের বিচার-মীমাংসা করে দেবেন(৩)।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

অগাধ শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মূর্তিপূজা সত্ত্বেও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার দ্বীনের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করত।

(১) অর্থাৎ ইসলামের পথে, দ্বীনে হকের পথে [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তাওহীদের পথে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং তাঁরই পছন্দকৃত শরী'আতের উপর তাকে পরিচালিত করেছেন।

(২) অর্থাৎ দুনিয়াতে একজন মুমিনের যা প্রয়োজন আমি তাকে তার সবই দান করেছিলাম। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ দুনিয়াতে কল্যাণ দানের অর্থঃ সৎ প্রশংসাসূচক বাণী। সবাই তার সম্মান করে, তাকে ভাল বলে জানে। [ইবন কাসীর]

(৩) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌ আমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে শুক্রবার সম্পর্কে অজ্ঞতায় রেখেছিলেন। ফলে ইয়াহূদীগণ শনিবারকে

১২৫. আপনি মানুষকে দা'ওয়াত[১] দিন আপনার রবের পথে হিকমত[২] ও সদুপদেশ[৩] দ্বারা এবং তাদের সাথে

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ

গ্রহণ করে। আর নাসারাগণ রবিবারকে গ্রহণ করে। এভাবে তারা কিয়ামতের দিনও আমাদের পিছে থাকবে। আমরা দুনিয়াবাসীদের দিক থেকে সবশেষে হলেও কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির আগে বিচারকার্য সম্পন্নকৃত হবো। [মুসলিমঃ ৮৫৬]

(১) دعوة এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। নবীগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রাসূলগণের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ পদবী হচ্ছে- আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হওয়া। এক আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে- ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [আল-আহ্‌যাবঃ ৪৬] এবং অন্য এক আয়াতে আরো বলা হয়েছে- ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ [আল-আহ্‌কাফঃ ৩১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে- ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।" [আলে-ইমরানঃ ১০৪] অন্য আয়াতে আছে- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ -অর্থাৎ "কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়?" [ফুস্‌সিলাতঃ ৩৩]

(২) 'হেকমত' শব্দটি কুরআনুল কারীমে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন মুফাস্‌সির হেকমতের অর্থ নিয়েছেন কুরআন, কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ্। [তাবারী] আবার কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। [ফাতহুল কাদীর] আবার কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে বিশুদ্ধ ও মজবুত সহীহ কথাকে হেকমত বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ - موعظة – وعظ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর] উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। [ইবন কাসীর] الْحَسَنَةِ -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই- শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। موعظة -শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকর ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমান বোধ করে। এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حسنة শব্দটি

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়[1]। নিশ্চয় আপনার রব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি বেশী জানেন এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালভাবেই জানেন।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর যদি তোমরা শাস্তি দাও[2], তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।

সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই,সদুপদেশ। এ দু'টিই মূলতঃ দাওয়াতের পদ্ধতি। কিন্তু কখনও কখনও দা'য়ী-র বিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে নামাতে হয়। তাই কিভাবে সেটা করতে হবে তাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ -جادل শব্দটি مجادلة ধাতু থেকে উদ্ভূত। مجادلة বলে এখানে তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলিমদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহ্‌লে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে, ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [আল-'আনকুবূতঃ ৪৬] -অন্য আয়াতে মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস্ সালাম-কে ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [ত্বাহাঃ ৪৪] নির্দেশ দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, ফির'আওনের মত অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

(২) ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ বাক্যে প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানকারীদেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তুএই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু যুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশী হতে পারবে না। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, 'এক ইয়াহূদী এক মেয়েকে দুই পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করে, মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিভিন্ন জনের জিজ্ঞাসা করা হলে সে এক ইয়াহূদীর প্রতি ইঙ্গিত করে। সে ইয়াহূদীকে নিয়ে আসা হলে সে তা স্বীকার করে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ইয়াহূদীকে দুই পাথরের মাঝখানে বেঁধে হত্যা করার আদেশ করেন।' [বুখারীঃ ৬৮৮৪, মুসলিমঃ ১৬৭২]

তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটা অবশ্যই উত্তম[১]।

১২৭. আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন[২], আপনার ধৈর্য তো আল্লাহ্‌রই

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

(১) আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হামযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে হত্যার পর তার লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। সাহাবায়ে কেরাম (আনসারগণ) বললেনঃ আমরা যদি তাদের উপর জয়লাভ করি, তবে তাদেরকে দেখিয়ে দেব। তারপর যখন মক্কা বিজয়ের দিন আসল, তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন- "যদি শাস্তি দিতে চাও তবে ততটুকুই দেবে, যতটুকু তোমরা শাস্তি ভোগ করেছ। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তবে তা ধৈর্যশীলদের জন্য অনেক উত্তম (কল্যাণকর)।" তখন এক লোক বললঃ আজকের পরে কুরাইশদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ চারজন ব্যতীত আর সবাইকে ছেড়ে দাও। [মুস্তাদরাকে হাকীমঃ ২/৩৫৮-৩৫৯, তিরমিযিঃ ৩১২৯, নাসায়ীঃ ২৯৯] এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর করেছিলেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় নাযিল হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নযিল হয়েছিল। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার নাযিল হয়েছে।

(২) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, তার মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে- ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ -অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না, সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহ্‌র সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এ সময় এক লোক এসে বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এ ভাগ-বাটোয়ারায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়। কথাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কঠিন ভাবে প্রতিক্রিয়া করল। তার চেহারার রং বদলে গেল। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তারপর তিনি বললেনঃ "মূসাকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। [বুখারীঃ ৬১০০]

وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

সাহায্যে। আর আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে আপনি মনঃক্ষুণ্ণও হবেন না।

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন[১]।

---

(১) এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। তাকওয়া ও ইহ্সান। তাকওয়ার অর্থ হারাম কাজ পরিত্যাগ করা এবং ইহ্সানের অর্থ সৎকাজ করা। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যারা শরী'আতের অনুসারী হয়ে নিয়মিত হারাম কাজ পরিত্যাগ করে, আর সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার? আল্লাহ্ তা'আলার এ সঙ্গ শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট। এ সঙ্গের অর্থ সাহায্য-সহযোগিতা ও তাওফীক দান করা। [বাগভী] নতুবা তিনি আরশের উপরই আছেন। তিনি কারও গায়ের সাথে লেগে নেই। ঈমানদারগণ আল্লাহর সান্নিধ্য ও সঙ্গ দ্বারা ধন্য হওয়ার কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। [দেখুনঃ সূরা আল-আনফালঃ ১২, সূরা ত্বা-হাঃ ৪৬, সূরা আত-তাওবাহঃ ৪০, সূরা আস-শু'আরাঃ ৬২] এ ছাড়া আরেক ধরনের সঙ্গ আছে যা আল্লাহর সাথে সমস্ত সৃষ্টির সম্পর্ক। সেটার অর্থঃ তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ও শক্তিতে তিনি সবার সাথে আছেন। সবাই তার মুঠোয়। কেউ তার আয়ত্ব ও জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। এ ধরনের সঙ্গ কোন প্রকার সম্মানের বিষয় নয়। এ বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন। [দেখুনঃ সূরা আল-হাদীদঃ ৪, সূরা আল-মুজাদালাহঃ ৭, সূরা ইউনুসঃ ৬১] [উসাইমীন, আল-কাওয়া'য়িদুল মুসলা]

فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

মাক্কী ও মাদানীর বর্ণনাসহ সূরাসমূহের নামের তালিকা

إنّ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

المشرفة على مجمع الملك فهد

لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة

إذ يسرها أن يصدر المجمع هذه الطبعة من القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة البنغالية

تسأل الله أن ينفع بها الناس

وأن يجزي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أحسن الجزاء على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله الكريم

والله ولي التوفيق

রাজকীয় সৌদি সরকারের দাওয়াহ্, ইর্‌শাদ, ওয়াক্‌ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মদীনা মুনাওয়ারাস্থ বাদশাহ্ ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রকাশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছে। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি এর দ্বারা সবাইকে উপকৃত করুন এবং আল্লাহর পবিত্র কালাম প্রচারে খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর এই বৃহৎ প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, আর আল্লাহ্ই একমাত্র তাওফীক দাতা।

আলাহ্
তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে
পবিত্র কোরআনের এই অনুবাদ
ও তাফসীরের মুদ্রণ রাজকীয় সউদী
সরকারের দাওয়াহ্, ইরশাদ, ওয়াক্বফ ও
ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে
বাদশাহ্ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ
কমপ্লেক্স, মদীনা মোনাওয়ারা
কর্তৃক সমাপ্ত ১৪৩৬ হিঃ

পোঃ বক্সনং-৬২৬২, মদীনা মোনাওয়ারা, সৌদি আরব

www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa

بعون الله وتوفيقه
تم طبع هذا المصحف الشريف
وترجمة معانيه في مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية
والأوقاف والدعوة والإرشاد في
المملكة العربية السعودية
عام ١٤٣٦هـ

ص.ب ٦٢٦٢ - المدينة المنورة
www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa

ⓒ **مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٣٦ هـ**
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الأمانة العامة.
مركز الدراسات القرآنية

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنغالية./ مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف. الأمانة العامة. مركز الدراسات
القرآنية - المدينة المنورة ١٤٣٦ هـ

٢ مج.

١٥٠٤ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٨-٠٠-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ **(مجموعة)**
٥-٠١-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ (ج١)

١- القرآن - ترجمة - اللغة البنغالية ٢- القرآن - تفسير أ. العنوان
ديوي ٤٩١٤٤، ٢٢١ ١٤٣٦/٣٠٥٨

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٣٠٥٨

ردمك: ٨-٠٠-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ **(مجموعة)**
٥-٠١-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ (ج١)

9 786038 173015

المجلد الأول

القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره

إلى اللغة البنغالية

وقف لله تعالى من خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولا يجوز بيعه

দ্বিতীয় খণ্ড

কুরআনুল কারীম
(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)

খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ
সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর
পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ স্বরূপ
প্রদত্ত বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
বিক্রয় নিষিদ্ধ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সৌদি আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কুরআনের এ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মুদ্রিত হলো।

تشرف بالأمر بطباعة هذا المصحف الشريف وترجمة معانيه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

وقف لله تعالى من خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولا يجوز بيعه
يوزع مجانا

القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره
إلى اللغة البنغالية

المجلد الثاني

من بداية سورة بني إسرائيل إلى نهاية سورة الناس

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ্‌ সালমান ইবন আব্দুল আজীজ আ'লে সাউদ- এর
পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ স্বরুপ প্রদত্ত
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
বিক্রয় নিষিদ্ধ

কুরআনুল কারীম
(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা বনী-ইসরাঈল থেকে সূরা আন-নাস এর শেষ পর্যন্ত

বাদশাহ্‌ ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স

১৭- সূরা বনী-ইসরাঈল

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
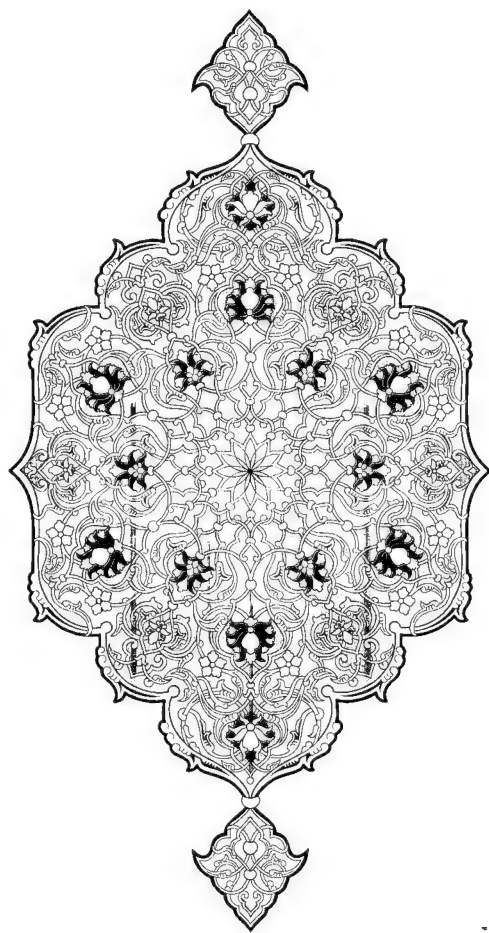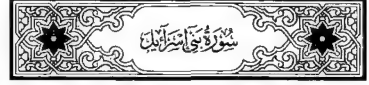
সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা আল-ইস্রা। কারণ সূরার প্রথমেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা সংক্রান্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া সূরাটি সূরা বনী ইসরাঈল নামেও প্রসিদ্ধ। এ নামটি হাদীসেও এসেছে। [দেখুন, তিরমিযী: ২৯২০] কারণ এতে বনী ইসরাঈলদের উত্থান-পতনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আয়াত সংখ্যাঃ ১১১।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা আল-ইসরা মক্কায় নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে এর তিনটি আয়াত মাদানী। [কুরতুবী]

সূরার কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, বনী ইসরাইল, আল-কাহফ, মারইয়াম, ত্বা-হা এবং আম্বিয়া এগুলো আমার সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বা সর্বপ্রথম পুঁজি। [বুখারীঃ ৪৭৩৯] এর অর্থ, প্রাচীন সূরা সমূহের মধ্যে এগুলো অন্যতম। এগুলোর বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ এগুলো অনেক কাহিনী এবং নবী-রাসূলদের কিস্সা সমৃদ্ধ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরাত্রে সূরা বনী ইসরাঈল ও আয-যুমার পড়তেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১৮৯, তিরমিযীঃ ২৯২০]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. পবিত্র মহিমাময় তিনি[১], যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করালেন[২]

---

(১) سبحان শব্দটি মূলধাতু। এর অর্থ, যাবতীয় ত্রুটি ও দোষ থেকে পবিত্র ও মুক্ত। আয়াতে এর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে, আমি তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করছি। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মূলে أسرى শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর ليلاً শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। ليلاً শব্দটি نكره ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মে'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মে'রাজ সূরা নাজমে উল্লেখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بعبده শব্দটি একটি বিশেষ ভালবাসার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِيْ

আল-মসজিদুল হারাম[১] থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত[২], যার

কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না। [ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-উবুদিয়্যাহ: ৪৭]

(১) আবু যর গেফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলামঃ বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেনঃ মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরয করলামঃ এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেনঃ এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই সালাত পড়ে নাও। [মুসলিমঃ ৫২০]

(২) ইসরা ও মে'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক ও আত্মিক ছিল, একথা কুরআনের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سبحان শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। [ইবন কাসীর; মাজুম' ফাতাওয়া: ১৬/১২৫] মে'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলিম, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে। عبد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। [ইবন কাসীর] তারপর "এক রাতে নিজের বান্দাকে নিয়ে যান" এ শব্দাবলীও দৈহিক সফরের কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। স্বপ্নযোগে সফরের জন্য নিয়ে যাওয়া শব্দাবলী কোনক্রমেই উপযোগী হতে পারে না। তাছাড়া আয়াতে দেখানোর কথা বলা হয়েছে সেটাও শরীর ছাড়া সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে বুরাকে উঠাও প্রমাণ করে যে, ইসরা ও মি'রাজ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সংঘটিত হয়েছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর] এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মে'রাজের ঘটনা উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল? তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, অনেকের ঈমান টলায়মান হয়েছিল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কান্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? সুতরাং আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে,

بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

আশপাশে আমরা দিয়েছি বরকত, যেন আমরা তাকে আমাদের নিদর্শন দেখাতে পারি[১]; তিনিই সর্বশ্রোতা,

---

এটি নিছক একটি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না । বরং এটি ছিল পুরোদস্তুর একটি দৈহিক সফর এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ । আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে এ সফর ও পর্যবেক্ষণ করান । তাফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির । নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী ইয়াদ শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন । ইমাম ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন এবং পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে । যেমন, ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী, ইবনে মাসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ আল-খুদরী, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্ত, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরাইদাহ, আবু আইউব আল-আনসারী, আবু উমামাহ, সামুরা ইবনে জুনদুব, সোহাইব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুম । এরপর ইবনে-কাসীর বলেন, ইসরা সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে । শুধু দ্বীনদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি । মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মুসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার মৃত্যুর পর সংঘটিত হয় । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ওফাত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল । ইমাম যুহরী বলেনঃ খাদীজার ওফাত নবুওয়াত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল । কোন কোন রেওয়ায়েত রয়েছে, মে'রাজের ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে । ইবনে ইসহাক বলেনঃ মে'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল । এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মে'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল । কোন কোন ঐতিহাসিক বলেনঃ ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে । আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, নবুওয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে । কারও কারও মতে হিজরতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল । মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি । [বিস্তারিত দেখুন, আশ-শাইখ সফিউর রহমান আল-মুবারকপূরী: আর-রাহীকুল মাখতূম]

(১) মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ ইমাম ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেনঃ সত্য কথা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন;

স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। তারপরের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আসমানে, তারপর অবশিষ্ট আসমানসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃতস্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। প্রত্যেক আসমানে সেখানকার ফেরেশতারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আসমানে সে সমস্ত নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাত হয়, যাদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আসমানে রয়েছে। যেমন, ষষ্ঠ আসমানে মূসা আলাইহিসসালাম এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে তাকদীর লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ এর প্রজাপতি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয়শত পাখা ছিল। তিনি বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মা'মুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুর্নবার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। সে সময় তার উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। তারপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এ দ্বারা ইবাদতের মধ্যে সালাতের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আসমানে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তারাও তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে সালাত আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের সালাতও হতে পারে। ইবনে-কাসীর বলেনঃ নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও মতে আসমানে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আসমানে নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, জিব্রাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে তার সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস

সর্বদ্রষ্টা[১]।

২. আর আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তাকে করেছিলাম বনী ইস্রাঈলের জন্য পথনির্দেশক[২]। যাতে 'তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ না করো[৩];

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝

৩. 'তাদের বংশধর[৪]! যাদেরকে আমরা

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا

পর্যন্ত আসেন এবং জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তাকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তার নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়। এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দেস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাক সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

(১) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, মি'রাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি কা'বার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ্ বাইতুল মাকদিসকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম। [বুখারীঃ৩৮৮৬]

(২) মাত্র একটি আয়াতে মি'রাজের কথা আলোচনা করে তারপর হঠাৎ বনী ইস্রাঈলের আলোচনা শুরু করে দেয়া হয়েছে। এটি মূলতঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আল্লাহ্র নবী মূসা আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করা। কারণ হচ্ছে, সাধারণত কুরআনের বহু স্থানে মূসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা, তাওরাত ও কুরআনের আলোচনা একসাথে থাকে। [ইবন কাসীর]

(৩) কর্মবিধায়ক তথা অভিভাবক অর্থাৎ বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভরসার ভিত্তিস্বরূপ যার উপর নির্ভর করা যায়। নিজের যাবতীয় বিষয় হাতে সোপর্দ করে দেয়া যায়। পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভ করার জন্য যার দিকে রুজু করা যায়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী, ইলাহ যেন না মানা হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর কাছেই এই বলে পাঠিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া যেন আর কারও ইবাদাত করা না হয়। [ইবন কাসীর]

(৪) এ আয়াতাংশের কয়েকটি অনুবাদ হতে পারে। এক. মূসা ছিলেন তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের কিশতিতে আরোহন করিয়েছিলাম। [আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ূন; ফাতহুল কাদীর] দুই. হে তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে কিশতিতে আরোহন করিয়েছিলাম। তোমাদেরকেই বিশেষ করে এ নির্দেশ দিচ্ছি। [বাগভী; ইবন কাসীর; আদওয়াউল বায়ান] তিন. তোমরা আমাকে ব্যতীত আর

شَكُورًا ③

নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম[১]; তিনি তো ছিলেন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা[২]।'

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ④

৪. আর আমরা কিতাবে বনী ইস্রাঈলকে জানিয়েছিলাম[৩] যে, 'অবশ্যই তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে

কাউকে কর্মবিধায়ক বানিওনা। কারণ তারা তোমাদেরই মত মানুষ। যাদেরকে আমরা নূহের কিশতিতে আরোহন করিয়েছিলাম [ফাতহুল কাদীর]

(১) মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'তারা হলো, নূহের সন্তানসমূহ ও তাদের স্ত্রীগণ এবং নূহ। তার স্ত্রী তাদের সাথে ছিল না। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ নূহ ও তাঁর সাথীদের বংশধর হবার কারণে একমাত্র আল্লাহকেই অভিভাবক করা তোমাদের জন্য শোভা পায়। কারণ তোমরা যার বংশধর তিনি আল্লাহকে নিজের অভিভাবক করার বদৌলতেই প্লাবনের ধ্বংসকারিতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। বিভিন্ন হাদীসেও নূহ আলাইহিসসালামকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। শাফা'আতের বৃহৎ হাদীসে এসেছে যে, 'লোকজন হাশরের মাঠে নূহ আলাইহিসসালামের কাছে এসে বলবে, হে নূহ! আপনি যমীনের অধিবাসীদের কাছে প্রথম রাসূল আর আল্লাহ্ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে ঘোষণা করেছে।' [বুখারীঃ ৪৭১২] নূহ আলাইহিসসালামকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে বলার পিছনে আরো একটি কারণ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, নূহ আলাইহিসসালাম যখনই কোন কাপড় পরতেন বা কোন খাবার খেতেন তখনই আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। সে জন্য তাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৬৩০]

(৩) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে কিতাব বলতে এমন কিতাব বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে এ বিষয়ে আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখানে قضينا শব্দের অর্থ হবে, ফয়সালা জানিয়ে দেয়া, খবর দেয়া। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এ অর্থে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ "আমি তাঁকে এ বিষয়ে ফয়সালা জানিয়ে দিলাম যে, ভোরে ওদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।" [সূরা আল-হিজরঃ৬৬] কারও কারও মতে, এখানে قَضَيْنَا শব্দটির অর্থ أَوْحَيْنَا বা আমরা ওহী প্রেরণ করেছি। এর কারণ এখানে শব্দটির পরে إلى এসেছে। যদি জানানো বা খবর দেয়ার অর্থ হতো, তবে এর পরে إلى ব্যবহৃত হতো না। আর যদি ফয়সালা করা বা বিচার করা অর্থ হতো, তবে শব্দটির পরে على আসতো। আর যদি পূর্ণ করার অর্থ হতো, তবে শব্দটির পরে ل আসত। সুতরাং এখানে قَضَيْنَا শব্দের অর্থ, أَوْحَيْنَا বা আমরা ওহী প্রেরণ করেছি হওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হবে।’

৫. অতঃপর এ দুটির প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হল তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম, যুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী আমাদের বান্দাদেরকে; অতঃপর তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। আর এটা ছিল এমন প্রতিশ্রুতি যা কার্যকর হওয়ারই ছিল।

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

৬. তারপর আমরা তোমাদেরকে আবার তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝

৭. তোমরা সৎকাজ করলে সৎকাজ নিজেদের জন্য করবে এবং মন্দকাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। তারপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে (আমি আমার বান্দাদের পাঠালাম) তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল আবার সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য[১]।

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُـۥٓـُٔوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝

(১) কাদেরকে বনী ইসরাঈলের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন। ইবন আব্বাস ও কাতাদা বলেন, তারা ছিল জালূত ও তার সৈন্যবাহিনী। তারা প্রথমে বনী ইসরাঈলের

৮. সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমরাও পুনরাবৃত্তি করব(১)। আর জাহান্নামকে আমরা করেছি কাফিরদের জন্য কারাগার।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝

৯. নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম(২)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ

উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেও পরে সেটা উল্টো হয়ে যায়, কারণ, দাঊদ জালুতকে হত্যা করেছিল। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এখানে যার কথা বলা হয়েছে সে ইরাকের মুওসিলের রাজা ও তার সেনাবাহিনী। অন্যরা বলেন যে, এখানে ব্যবিলনের বাদশাহ বুখতনাসরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে অনেক বড় বড় কাহিনী আলোচিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মুসা আলাইহিস সালাম-এর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরী'আতে মুহাম্মদীয় যুগ যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরী'আতে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলিমদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

(২) কুরআন যে পথনির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও। সুতরাং কুরআনের প্রদর্শিত পথটি সহজ, সরল, সঠিক, কল্যাণকর, ইনসাফপূর্ণ [আদওয়াউল বায়ান] এ থেকে বোঝা গেল যে, কুরআন মানুষের জীবনের জন্যে যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ উপরোক্ত গুণগুলো বিদ্যমান রয়েছে। তাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। যদিও মুলহিদ ও আল্লাহ্‌বিরোধী মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসংকুল মনে করতে থাকে এবং দ্বীনে ইসলামে বিভিন্নভাবে বদনামী করে থাকে। তারা মূলত আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের হিকমত ও রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ ও জানতে অপারগ। [আদওয়াউল বায়ান] কিন্তু রাব্বুল আলামীন

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

(সরল, সুদৃঢ়) এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

وَّأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

১০. আর যারা আখিরাতে ঈমান আনে না আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ

১১. আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে(১);

সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশী। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না। কুরআন যে উত্তম পথের পথনির্দেশ করে তার উদাহরণ হলো, কুরআন তাওহীদের দিকে পথ নির্দেশ করে, যা মানবজীবনের সবচেয়ে চরম ও পরম পাওয়া। কুরআন তাওহীদের তিনটি অংশ অর্থাৎ প্রভুত্বে, নাম ও গুণে এবং ইবাদতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয় যা মানুষের জীবনকে এক সুন্দর ও সাবলীল গতিতে নিয়ে যায়। কুরআন তালাকের ক্ষমতা পুরুষের হাতে দিয়েছে। কারণ, ক্ষেতের মালিকই জানেন কিভাবে তিনি সেটা পরিচালনা করবেন। কুরআন মিরাসের ক্ষেত্রে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ দিয়েছে। এটা তাঁর প্রাজ্ঞতার প্রমাণ। অনুরূপভাবে কুরআন কিসাসের প্রতি পথনির্দেশ করে যা মানুষের জানের নিরাপত্তা বিধান করে। তদ্রূপ কুরআন মানুষকে চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটার নির্দেশ দেয় যা মানুষের মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তেমনিভাবে কুরআন মানুষকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা এবং বেত্রাগাতের প্রতি দিকনির্দেশনা দেয় যা মানুষের সম্মানের হেফাজতের গ্যারান্টি দেয়। সুতরাং কুরআন সত্যিকার অর্থেই এমন পথের দিকনির্দেশনা দেয় যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ ও বিপদমুক্ত। [আদওয়াউল বায়ান; সংক্ষেপিত]

(১) মানুষ কিভাবে অকল্যাণ কামনা করে তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষ যখন নিজের কোন কাজের উপর রাগ হয় বা সন্তান-সন্ততির উপর বিরক্ত হয় তখন তাদের জন্য বদ-দো'আ করতে থাকে। বলতে থাকে, আমার ধ্বংস হোক, আমার পরিবার নাশ হোক ইত্যাদি। এ জাতীয় দো'আ করলেও তার মন কিন্তু সে দো'আ কবুল হওয়া চায় না। আবার যখন নিজে খুব ভালো অবস্থায় থাকে, বা সন্তান-সন্ততির উপর খুশী হয়ে যায় তখন বড় বড় নেক দো'আ করতে থাকে। সে তখন এটা কবুল হওয়া মন-প্রাণ থেকেই চায়। [আদওয়াউল বায়ান] কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রহমতের কারণে মানুষের নেক-দো'আ সমূহকে কবুল করে থাকেন আর বদ-দো'আর জন্য সময় দেন।

الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾

যেভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে খুব বেশী তাড়াহুড়াকারী।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾

১২. আর আমরা রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন[১] তারপর রাতের নিদর্শনকে মুছে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আর আমরা সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি[২]।

মানুষের এ তাড়াহুড়াকারী চরিত্রের কারণে যদি তিনি তাদের শাস্তি দিতেন তবে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে তার নিজের ও সন্তান সন্ততির উপর বদ-দো'আ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের নিজের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও তোমাদের কর্মচারীদের উপর বদ-দো'আ করো না। অনুরূপভাবে তোমাদের সম্পদ নাশের জন্যও বদ-দো'আ করো না কারণ এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্র দো'আ কবুলের সময় তোমাদের এ বদ-দো'আগুলো সংঘটিত হয়ে যাবে আর তা কবুল হয়ে যাবে।" [আবুদাউদঃ ১৫৩২] অন্য এক হাদীসে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কষ্ট ও যাতনায় পড়ে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে যেন বলেঃ "আয় আল্লাহ্! যতদিন বেঁচে থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখেন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য উত্তম হয়, তখন আমার মৃত্যু দেন।" [বুখারীঃ৬৩৫১]

(১) আমার একত্ববাদ ও আমার অপার ক্ষমতার উপর প্রমাণ। [এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৭, ইয়াসীনঃ ৩৭, ইউনুসঃ ৬, আল-মু'মিনূনঃ ৮০, আল-বাকারাহঃ ১৬৪, আলে ইমরানঃ ১৯০, আন-নূরঃ ৪৪, আল-ফুরকানঃ ৬২, আল-কাসাসঃ ৭৩, জাসিয়াঃ ৫]

(২) আলোচ্য আয়াতে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন

১৩. আর প্রত্যেক মানুষের কাজ আমরা তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমরা তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত(১)।

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। এ আয়াতে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, দিনের আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্প ও কারিগরী সব কিছুর জন্যে আলো অত্যাবশ্যক। আয়াতে দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলা হয়েছে তাহলো, দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এটা মূলতঃ দিন-রাত্রি উভয়টিরই উপকারিতা। উদাহরণতঃ ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে। এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে। তাছাড়া দিন-রাত্রি পরিবর্তন না হলে মানুষের পক্ষে তাদের ইবাদতসমূহের হিসাব রাখাও সম্ভব হতো না। তারা হজ্জের, সাওমের, মেয়েদের ইদ্দতের, জুম'আ ইত্যাদির হিসাব পেত না। [আদওয়াউল বায়ান থেকে সংক্ষেপিত]

(১) আয়াতে উল্লেখিত طائر শব্দটির অর্থ করা হয়েছে, কাজ। মূলতঃ এ শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

এক, মানুষের তাকদীর বা তার জন্য আল্লাহ্‌র পূর্বলিখিত সিদ্ধান্ত। মানুষ দুনিয়াতে যা-ই করুক না কেন সে অবশ্যই তার তাকদীর অনুসারেই করবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু জানে না তার তাকদীরে কি লিখা আছে তাই তার উচিত ভালো কাজ করতে সচেষ্ট থাকা। কারণ, যাকে যে কাজের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং যাকে যেখানে যাওয়ার জন্য নির্ধারন করা হয়েছে সে সমস্ত কাজ করা তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। সুতরাং তাকদীরের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ কারো নেই কিন্তু মানুষের উচিত নিজেকে ভালো ও সৎকাজের জন্য সদাপ্রস্তুত রাখা তাহলে বুঝা যাবে যে, তার তাকদীরে ভালো আছে এবং সেটা করতে সে সমর্থও হবে। পক্ষান্তরে যারা দুর্ভাগা তারা ভালো কাজ করার পরিবর্তে তাকদীরে কি আছে সেটা খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সেটার পিছনে দৌড়াতে থাকে ফলে সে ভালো কাজ করার সুযোগ পায় না। তাই যারা ভালো কাজ করে এবং ভালো কাজ করার প্রয়াসে থাকে তাদের কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র কাছে এমন প্রশংসিত হয়ে থাকে যে, যদি কোন কারণে সে ভালো কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেটা করতে সমর্থ না হয় তবুও আল্লাহ্ তার জন্য সেটার সওয়াব লিখে দেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট কাজের উপরই আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার শেষ লিখেন তারপর যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে

১৪. 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ট[১] ।'

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

১৫. যে সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য[২] । আর কোন বহনকারী অন্য

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলে, হে আমাদের প্রভূ! আপনার অমুক বান্দাকে তো আপনি (ভালো কাজ করা থেকে) বাধা দিলেন । তখন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তাকে তার পূর্ব কাজের অনুরূপ শেষ পরিণতি লিখ, যতক্ষন সে সুস্থ না হবে বা মারা না যাবে ।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৬৪১]

দুই, মানুষের কাজ বা তার আমলনামা । অর্থাৎ মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে । মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয় । কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আযাবের যোগ্য । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি তোমার হিসাবের ভার তোমার কাছেই অর্পণ করেছেন তিনি অবশ্যই তোমার সাথে সবচেয়ে বড় ইনসাফের কাজ করেছেন ।' [ইবন কাসীর] কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ সেদিন সবাই তাদের আমলনামা পড়তে পারবে যদিও সে দুনিয়াতে নিরক্ষর ছিল । [তাবারী]

(২) অর্থাৎ সৎ ও সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে কোন ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা সংশোধন প্রচেষ্টা পরিচালনাকারীদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করে না বরং সে তার নিজেরই কল্যাণ করে । অনুরূপভাবে ভুল পথ অবলম্বন করে অথবা তার উপর অনড় থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি করে । [আদওয়াউল বায়ান] আল্লাহর রাসূল ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষকে ভুল পথ থেকে বাঁচাবার এবং সঠিক পথ দেখাবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তা নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং মানবতার কল্যাণার্থেই চালান । কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, যেমন, "যে সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে । আপনার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নন ।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪৬; সূরা আল-জাসিয়াহ: ১৫] আরও বলেন, "যে কুফরী

কারো ভার বহন করবে না[১]। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই[২]।

করে কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা।" [সূরা আর-রূম: ৪৪] আরও বলেন, "অবশ্যই তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের কাছে চাক্ষুষ প্রমাণাদি এসেছে। অতঃপর কেউ চক্ষুষ্মান হলে সেটা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ অন্ধ সাজলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই।" [সূরা আল-আন'আম: ১০৪] আরও বলেন, "যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য আর আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন।" [সুরা আয-যুমার: ৪১]

(১) এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এটি না বুঝা পর্যন্ত মানুষের কার্যধারা কখনো সঠিক নিয়মে চলতে পারে না। এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে শরীক নেই। তবে অন্যত্র যে বলা হয়েছে, "ওরা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা" [সূরা আল-আনকাবূত: ১৩] এবং আরও যে এসেছে, "ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে"। [সূরা আন-নাহল: ২৫] আয়াতদ্বয় এ আয়াতে বর্ণিত মৌলিক সত্যের বিরোধী নয়। কারণ তারা খারাপ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে তাদের নিজেদেরকেই কলুষিত করেছে। তাই তারা অন্যের বোঝাকে নিজেদের বোঝা হিসেবে বহন করবে। অন্যের বোঝা হিসেবে বহন করবে না। এটা বান্দাদের সাথে আল্লাহ্‌র রহমত ও ইনসাফেরই বহিঃপ্রকাশ [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) তবে এ ধরনের আয়াত পড়ে যাদের কাছে কোন নবীর পয়গাম পৌঁছেনি তাদের অবস্থান কোথায় হবে, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, তার নিজের কাছে তো পয়গাম পৌঁছে গেছে, এখন তার অবস্থা কি হবে? আর অন্যের ব্যাপারে বলা যায়, কার কাছে, কবে, কিভাবে এবং কি পরিমাণ আল্লাহর পয়গাম পৌঁছেছে এবং সে তার সাথে কি আচরণ করেছে এবং কেন করেছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ বলতে পারেন না কার উপর আল্লাহর প্রমাণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কার উপর হয়নি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা হলো, নাবালক বাচ্চাদের নিয়ে। তাদের কি হুকুম হবে? এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হলো এই যে, মুমিনদের সন্তানগণ জান্নাতি হবে। কিন্তু

১৬. আর আমরা যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি[1], ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ⑯

কাফের মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন হাদীসের কারণে সর্বমোট চারটি মতে বিভক্ত হয়েছেঃ

১) তারা জান্নাতে যাবে। এ মতের সপক্ষে তারা এ আয়াত এবং সহীহ বুখারীর এক হাদীস [৪০৪৭] দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। অনুরূপ কিছু হাদীস মুসনাদে আহমাদ [৫/৫৮] ও মাজমাউয-যাওয়ায়েদ [৭/২১৯] ও এসেছে।

২) তাদের সম্পর্কে কোন কিছু বলা যাবে না। এ মতের সপক্ষেও সহীহ বুখারীর এক হাদীস [৩৮৩১, ৪৮৩১] থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩) তারা তাদের পিতাদের অনুগমণ করবে। মুসনাদে আহমাদে [৬/৪৮] বর্ণিত হাদীস থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৪) তাদেরকে হাশরের মাঠে পরীক্ষা করা হবে। সে পরীক্ষায় যারা পাশ করবে তারা হবে জান্নাতি। আর পাশ না করলে হবে জাহান্নামি। এ মতটি সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য মত। এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমাদের [৪/২৪] এক হাদীস থেকে প্রমাণ পাই। সত্যান্বেষী আলেমগণ এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবন কাসীর এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে ব্যবহৃত أمرنا শব্দটির অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছেঃ

১) এখানে أمرنا শব্দের অর্থ, 'নির্দেশ'। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, "সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ করে" কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে খারাপ কাজের নির্দেশ করেন? তাই এ অর্থ নেয়া হলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সমাধানে আলেমগণ কয়েকটি দিকনির্দেশ করেছেনঃ এক, এখানে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতিগত নির্দেশ ও প্রাকৃতিক বিধান। অর্থাৎ প্রকৃতিগত ভাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার সমৃদ্ধিশালী লোকেরা ফাসেক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার সংকল্প মানে এ নয় যে, আল্লাহ এমনিতেই বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার সংকল্প করে নেন, বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে। দুই, এখানে নির্দেশ দেয়ার অর্থ অসৎকাজের নির্দেশ নয়। বরং এখানে একটি বাক্য উহ্য আছে। তাহলো, "সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকাজের নির্দেশ করি কিন্তু তারা অসৎকাজে লিপ্ত হলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করি।" তখন এ নির্দেশটি

করে[১]; অতঃপর সেখানকার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমরা তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি[২]।

শর'য়ী নির্দেশ বলে বিবেচিত হবে। [ইবন কাসীর]

২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি أمرنا শব্দের অর্থ করেছেন سلطنا তখন অর্থ হবে, 'যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের উপর খারাপ লোকদের ক্ষমতায়ন করি ফলে তারা সেখানে আমার নাফরমানী করার কারণে তাদেরকে আমি ধ্বংস করি। [ইবন কাসীর]

৩) হাসান, কাতাদা সহ আরও অনেকে বলেন, أمرنا অর্থ بعثنا অর্থাৎ তাদের উপর এমন খারাপ লোকদের চড়াও করি যাতে তারা ধ্বংস হওয়ার কাজ করে। ফলে তাদের আমি ধ্বংস করি। [ফাতহুল কাদীর]

৪) ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে أمرنا অর্থ أكثرنا অর্থাৎ তাদের মধ্যে আমি আধিক্য দান করি। ফলে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং নাফরমানী করতে থাকে যাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন গোত্রের লোক বেড়ে যেত এবং শক্তি বৃদ্ধি পেত তখন বলা হতো, أَمِرَ بَنُوْ فُلَانٍ সে হিসেবে এখানেও একই অর্থ নেয়া হবে। [বুখারীঃ ৪৭১১]

(১) আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক-শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে। তাছাড়া যখন কোন জাতির লোকেরা খারাপ কাজ করে এবং অন্যান্যরা সেটাতে বাধা না দেয় তখন তারা হয় সেটায় রাজি আছে হিসেবে অথবা তার বিরোধিতা না করার কারণে শাস্তি লাভ করে। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আমাদের মধ্যে সৎ লোকগণ থাকা অবস্থায়ও আমরা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবো?' তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, যখন খারাপের পরিমান বৃদ্ধি পায়"। [মুসলিমঃ ২৮৮০]

(২) আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের

১৭. আর নূহের পর আমরা বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি এবং আপনার রবই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট[১]।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

১৮. কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমরা যাকে যা ইচ্ছে এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি[২]; পরে তার জন্য

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ্ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াব হলো, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী ও গোনাহের সংকল্প। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, গোনাহ যদি সমৃদ্ধশালীরা করে থাকে, তবে তার জন্য সাধারণ জনসাধারণ কেন শাস্তি ভোগ করবে? এর দু'টি উত্তর হতে পারে। এক. যারা সমৃদ্ধশালী নয় তারা সমৃদ্ধশালীদেরই অনুগামী থাকে। সেজন্য তারা তাদের মতই শাস্তি ভোগ করবে। এখানে সমৃদ্ধশালীদের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, সাধারণতঃ এরাই নেতা গোছের লোক হয়ে থাকে। দুই. তাদের কেউ যেহেতু অন্যায় করেছিল অন্যরা তাতে বাধা দেয়ার দরকার ছিল। কিন্তু তারা যেহেতু তা করেনি। সুতরাং তারাও সমান দোষে দোষী। [আদওয়াউল বায়ান; সংক্ষেপিত]

(১) আয়াত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফের মুশরিক এবং তাদের মত অন্যান্যদেরকে কঠোর সতর্কবাণী শোনানো হচ্ছে, তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, যেভাবে নূহ ও অন্যান্য জাতির অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন তেমনিভাবে এদেরকেও সে পরিণতির সম্মুখিন হতে হবে। আয়াতের শেষে এমন এক সতর্কবাণী উচ্চারন করা হয়েছে যা চিন্তা করলে যে কোন খারাপ লোক তার যাবতীয় কুকর্ম থেকে বিরত হতে বাধ্য হবে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আপনার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। কেউ যদি আল্লাহকে সদা সর্বদা এ বিশ্বাসের সাথে খেয়াল রাখে যে, তিনি তাকে দেখছেন, জানছেন, তাহলে অবশ্যই খারাপ কাজ করার আগে অনেক চিন্তা-ভাবনা করবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে, আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান

জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে শাস্তিতে দগ্ধ হবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়[১]।

১৯. আর যারা মুমিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য[২]।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

২০. আপনার রবের দান থেকে আমরা এদের ও ওদের প্রত্যেককে সাহায্য করি এবং আপনার রবের দান

كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, আমার হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এ আয়াতটি এ জাতীয় যত আয়াতে শর্তহীনভাবে দেয়ার কথা আছে সবগুলোর জন্য শর্ত আরোপ করে দিয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না অথবা আখেরাত পর্যন্ত সবর করতে প্রস্তুত নয় এবং শুধুমাত্র দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সাফল্য ও সমৃদ্ধিকেই নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, সে যা কিছু পাবে এ দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতে সে কিছুই পেতে পারে না। কারণ সে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, সুতরাং সে আখেরাতের জন্য কিছুই করেনি। সুতরাং সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। [ইবন কাসীর]

(২) মুমিন যখনই যে কাজে আখেরাতের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়। এ অবস্থাটি হচ্ছে মুমিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سعيها শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা আখেরাতের লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। তাই তাকে সে কাজটি সুন্নাত অনুযায়ীই করতে হবে। কাজেই যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়- সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভূক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন- আখেরাতের জন্যে উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আখেরাতেও কল্যাণকর নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

অবারিত(১)।

২১. লক্ষ্য করুন, আমরা কিভাবে তাদের একদলকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আখিরাত তো অবশ্যই মর্যাদায় মহত্তর ও শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর(২)!

أُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

২২. আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ সাব্যস্ত করো না; করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বসে পড়বে(৩)।

لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

(১) অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবিকা ও জীবন উপকরণ দুনিয়াদাররাও পাচ্ছে এবং আখেরাতের প্রত্যাশীরাও পাচ্ছে। এসব অন্য কেউ নয়, আল্লাহই দান করছেন। আখেরাতের প্রত্যাশীদেরকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা দুনিয়া পূজারীদের নেই এবং দুনিয়া পূজারীদের কাছে আল্লাহর নিয়ামত পৌঁছার পথে বাধা দেবার ক্ষমতা আখেরাত প্রত্যাশীদেরও নেই। তিনি সর্বময় কর্তৃত্ববান, তিনি কোন যুলুম করেন না। তিনি প্রত্যেককে তার সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য সবই প্রদান করেন। তাঁর হুকুমকে কেউ রদ করতে পারে না, তিনি যা দিয়েছেন তা কেউ নিষেধ করতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ দেখুন, কিভাবে আমরা দুনিয়াতে মানুষকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ গরীব আবার কেউ মাঝামাঝি। অন্যদিকে কেউ সুন্দর কেউ কুৎসিত, আবার কেউ মাঝামাঝি। কেউ শক্তিশালী, কেউ দূর্বল। কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, কেউ আহমক, কেউ বুদ্ধিমান। দুনিয়াতে এ পার্থক্য মানুষের মধ্যে আছেই। এটা আল্লাহ্‌ই করে দিয়েছেন। এর রহস্য মানুষের বুঝার বাইরে। [ফাতহুল কাদীর] কিন্তু আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানদারদেরই থাকবে। সেখানকার পার্থক্য দুনিয়ার পার্থক্যের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিবে। সেখানে কেউ থাকবে জাহান্নামের নীচের স্তরে, জাহান্নামের জিঞ্জির ও লোহার বেড়ির মধ্যে আবদ্ধ। আর কেউ থাকবে জান্নাতের উঁচু স্তরে, নেয়ামতের মধ্যে, খুশির মধ্যে। তারপর আবার জাহান্নামের লোকদেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর হবে। আর জান্নাতের লোকদের স্তরও বিভিন্ন হবে। তাদের কারও মর্যাদা অপরের মর্যাদার চেয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যকার পার্থক্যের মত হবে। বরং উঁচু স্তরে যে সমস্ত জান্নাতীরা থাকবে তারা ইল্লিয়্যীনবাসীদের দেখবে, যেমন দূরের কোন নক্ষত্রকে আকাশের প্রান্তে কেউ দেখতে পায়। [ইবন কাসীর]

(৩) সাধারণত যারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে তাদের বেশিরভাগেই বিপদাপদে আল্লাহকে ভুলে বিভিন্ন পীর-ফকীর, অলী, দরগাহ ইত্যাদিকে ডাকে এবং তাদের কাছে নিজের অভাব গোছানো বা বিপদমুক্তির আহ্বান জানাতে থাকে। এতে তারা শির্ক করার কারণে আখেরাতে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হবে। কারণ, আল্লাহ্‌র সাথে কেউ শরীক

তৃতীয় রুকূ'

২৩. আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে[১] ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে[২]। তারা একজন

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا ﴿۲۳﴾

করলে আল্লাহ্ তাকে আর সাহায্য করবেন না। বরং তাকে সে শরীকের কাছে ন্যস্ত করে দেন যাকে সে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছে। অথচ সে তার কোন ক্ষতি কিংবা উপকারের মালিক নয়। কারণ, ক্ষতি বা উপকারের মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার কারণে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েই থাকতে হবে। [ইবন কাসীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"অভাব ও সমস্যাগ্রস্ত কেউ যখন তার অভাব ও সমস্যা মানুষের কাছে ব্যক্ত করে তখন তার সে অভাব পূর্ণ হয় না, পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করে অচিরেই আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা দ্রুত ধনী করার মাধ্যমে।" [আবু দাউদঃ ১৬৪৫, তিরমিযীঃ ২৩২৬, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪০৭]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে قضى শব্দের অর্থ أمر বা নির্দেশ দিয়েছেন। মুজাহিদ বলেন, এখানে قضى অর্থ وصى বা অসিয়ত করেছেন। [ইবন কাসীর] অন্য কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এখানে قضى শব্দটি قضاء شرعي বা শরী'আতগত ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [সা'দী]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ "আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও" [সূরা লুকমানঃ ১৪]। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলঃ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেনঃ সময় হলে সালাত পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলঃ এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। [মুসলিমঃ ৮৫] তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্ন করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যেমনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত

বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে

কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও"[তিরমিযীঃ ১৯০১]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত"[তিরমিযীঃ ১৮৯৯]। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সে ব্যক্তির নাক ধুলিমলিন হোক, তারপর ধুলিমলিন হোক, তারপর ধুলিমলিন হোক", সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কে? রাসূল বললেনঃ "যে পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেল তারপর জান্নাতে যেতে পারল না"। [মুসলিমঃ ২৫৫১] আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, কোন আমল মহান আল্লাহ্‌র কাছে বেশী প্রিয়? রাসূল বললেনঃ সময়মত সালাত আদায় করা। তিনি বললেন, তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি বললেন, তারপর? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। [বুখারীঃ ৫৯৭০] তবে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়। সে হিসেবে কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েযও নয়। কিন্তু পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলিম হওয়া জরুরী নয়, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেনঃ আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" [মুসলিমঃ ১০০৩] কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেনঃ " আমি মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে ওরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মেনো না। [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৮] আল্লাহ্ আরেক জায়গায় বলেনঃ "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে"। [সূরা লুকমানঃ ১৫] অর্থাৎ যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, 'আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। ইসলাম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের এমনই গুরুত্ব দিয়েছে যে, যদি জিহাদ ফরযে আইন না হয়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, তখন পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "একলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিহাদের যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না[১]; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল[২]।

তাকে বললেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত? সে বললঃ হ্যাঁ। রাসূল বললেন, "তাহলে তুমি তাদের খেদমতে জিহাদ করো"। [মুসলিমঃ ২৫৪৯] অনুরূপভাবে পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করারও নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন লোকের জন্য সবচেয়ে উত্তম নেককাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" [মুসলিমঃ ২৫৫২]

(১) পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানদের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তদুপরি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিল। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। أُفٍّ বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদ্দারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ। এরপর বলা হয়েছে, ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ এখানে نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

(২) প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

২৪. আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর[১] এবং বল, 'হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন[২]।'

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

২৫. তোমাদের রব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবেই তো তিনি আল্লাহ্-অভিমুখীদের প্রতি খুবই ক্ষমাশীল[৩]।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

(১) পাখি যেভাবে তার সন্তানদেরকে লালন পালন করার সময় তার দু' ডানা নত করে আগলে রাখে তেমনি পিতা-মাতাকে আগলে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পাখি যখন উড়ে তখন ডানা মেলে ধরে তারপর যখন অবতরণ করতে চায় তখন ডানা গুটিয়ে নেয়, তেমনি পিতামাতার প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাখি যেভাবে নিচে নামার জন্য গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে নিচে নামায় তেমনি তুমি নিজেকে গর্ব-অহংকার মুক্ত হয়ে পিতা-মাতার সাথে ব্যবহার করবে। [ফাতহুল কাদীর] উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন এর অর্থ, তাদের নির্দেশ মান্য করা এবং তাদের কাংখিত কোন বস্তু দিতে নিষেধ না করা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। বৃদ্ধ অবস্থা ও মৃত্যুর সময় তাদেরকে রহমত করেন। [ইবন কাসীর] সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দো'আর মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়। পিতা-মাতা মুসলিম হলেই তাদের জন্য রহমতের দো'আ করতে হবে, কিন্তু মুসলিম না হলে তাদের জীবদ্দশায় পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা ও ঈমানের তওফীক লাভের জন্য করা যাবে। মৃত্যুর পর তাদের জন্যে রহমতের দো'আ করা জায়েয নেই।

(৩) আয়াতটি নতুন কথাও হতে পারে, তখন অর্থ হবে, তোমাদের অন্তরে ইখলাস আছে কি না, আনুগত্যের অবস্থা কি, গোনাহ থেকে তাওবাহ করার প্রস্তুতি কেমন আছে এসব আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। [ফাতহুল কাদীর] আবার পূর্বকথার রেশ ধরে পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে। তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন

২৬. আর আত্মীয়-স্বজনকে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরকেও[১] এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না[২]।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ[৩]।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। তাই বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্যে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্যে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] আওয়াবীন শব্দের অর্থ নিয়ে বেশ মতভেদ থাকলেও এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, প্রত্যাবর্তনকারী। সে হিসেবে এর অর্থ দাঁড়ায়, যারা গোনাহ থেকে তাওবাহ করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। যারাই ইখলাসহীন অবস্থা থেকে ইখলাসের দিকে ফিরে আসে তাদেরকেও তিনি পূর্বে কথা, কাজ ও বিশ্বাসে যে ভুল-ক্রটি হয়ে গেছে সেগুলো ক্ষমা করে দিবেন। মূলত: যে তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। যে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে আল্লাহ্ও তার দিকে ফিরে আসেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভূক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে বর্ণিত আত্মীয়দের হক, মিসকিনের হক এবং মুসাফিরের হক, এ তিনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন-দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবে না বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের অধিকারও আদায় করবে।

(৩) ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপনতাও করে না, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী" [সূরা আল-ফুরকান: ৬৭] ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপচয় হচ্ছে, অন্যায় পথে ব্যয় করা। মুজাহিদ বলেন, যদি কোন লোক তার সমস্ত সম্পত্তি হক পথে ব্যয় করে তারপরও সেটা অপচয় হবে না। আর যদি অন্যায়ভাবে এক

২৮. আর যদি তাদের থেকে তোমার মুখ ফিরাতেই হয়, যখন তোমার রবের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল[১];

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

২৯. আর তুমি তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে মেলেও দিও না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও আফসোসকৃত হয়ে বসে পড়বে[২]।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

মুদ পরিমাণও ব্যয় করে তবুও সেটা অপচয় হবে। কাতাদাহ বলেন, অপচয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, অন্যায় ও ফাসাদ-সৃষ্টিতে ব্যয় করা। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগস্ত লোকেরা সাহায্য চায় এবং আপনার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্যে অপমানজনক না হওয়া উচিত, বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য। কাতাদা বলেন, প্রয়োজনে তাদেরকে ভালো কিছু দেয়ার ওয়াদা কর। [ইবন কাসীর]

(২) "হাত বাঁধা" কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়া"র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। [ইবন কাসীর] আয়াতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তার মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। যখনই তুমি তোমার সামর্থ্যের বাইরে হাত প্রশস্ত করবে, তখনই তুমি খরচ করার কিছু না পেয়ে বসে পড়বে। তখন তুমি 'হাসীর' হবে। হাসীর বলা হয় সে বাহনকে যে দুর্বল ও অপারগতার কারণে চলতে অপারগ হয়ে গেছে। [ইবন কাসীর] হাসীর এর আরেক অর্থ তিরস্কৃত হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা: কৃপণতা যেমন খারাপ গুণ, অপচয়ও তেমনি খারাপ গুণ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কৃপণ ও খরচকারীর উদাহরণ হচ্ছে সে দু'জন লোকের মত। যাদের উপর লোহার দু'টি বর্ম রয়েছে। যা তার দু'স্তন থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। খরচকারী যখনই খরচ করে তখনই তা প্রশস্ত হতে থাকে এমনকি তার পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং তার পদচিহ্ন মিটিয়ে দেয়। আর কৃপণ সে যখনই কোন খরচ করতে চায় তখনি তা সে বর্মের এক কড়া আরেক কড়ার সাথে লেগে যায়, সে যতই সেটাকে প্রশস্ত করতে চায় তা আর প্রশস্ত হয় না।'

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

৩০. নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য ইচ্ছে তার রিয্‌ক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে তা সীমিত করেন; নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা[১]।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

৩১. আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমিই রিয্‌ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ[২]।

[বুখারীঃ ২৯১৭] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিদিন সকালবেলা দু'জন ফেরেশতা নাযিল হয়। তাদের একজন বলতে থাকে, আল্লাহ্! আপনি খরচকারীকে বাকী থাকার মত সম্পদ দান করুন, অপরজন বলে, আল্লাহ্! আপনি কৃপনকে নিঃশেষ করে দিন।' [বুখারীঃ ১৪৪২; মুসলিমঃ ১০১০]

(১) সুতরাং কাউকে রিযক বেশী ও কম দেয়ার মধ্যে তাঁর বিরাট হেকমত রয়েছে। তিনি জানেন কাকে বেশী দিলে সে আরো বেশী পেতে চাইবে বা গর্বে সীমালঙ্ঘন করবে অথবা কুফরীর কারণ হবে। আবার কাকে বেশী না দিলে তার জন্য তা কুফরীর কারণ হবে। আর কাকে কম দিলেও সে ধৈর্যশীল প্রমাণিত হবে। আর কাকে সম্পদ কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবে। সুতরাং যিনি সবকিছুর খবর রাখেন তিনি প্রত্যেককে তার জন্য যা উপযোগী সে অনুসারে রিয্‌ক দান করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] অথবা, আয়াতের আল্লাহ্‌র নাম দু'টোর উদ্দেশ্য, তিনি জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবহিত, তাদের রিযক বণ্টনের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তিনিই বান্দাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তাই পরবর্তী আয়াতে মানুষের রিযিকের আলোচনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, "সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা অবশ্যই বড় কিন্তু তারপর কি? তিনি

৩২. আর যিনার ধারে-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ(১) ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۝٣٢

বললেন, এবং তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা" । [বুখারীঃ ৪৪৭৭] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন । অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ । তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন । যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন । তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ?

(১) "যিনার কাছেও যেয়ো না" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও । আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ । মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় । অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় । কিন্তু যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অংশও বাকী আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে তারা ব্যভিচারকে অন্যায় বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না । আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন । এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বস । যুবকটি বসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহ্র শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না । তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহ্র শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অনুরূপভাবে মানুষ তাদের মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না । তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহ্র শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না । তখন রাসূল বললেনঃ তদ্রূপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না । (এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফুফু ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন"

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف

৩৩. আর আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না[১]! কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর এ যুবককে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৫৬, ২৫৭] দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

(১) অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা আরেক নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্র কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ।[তিরমিযীঃ ১৩৯৫, ইবনে মাজাহঃ ২৬১৯] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ প্রত্যেক গোনাহ্ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলিমকে হত্যা করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে না।[নাসায়ীঃ ৭/৮১] সুতরাং কোন মু'মিনকে হত্যা করা অন্যায়। শুধুমাত্র তিনটি কারণে অন্যায় হত্যা ন্যায়ে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে মুসলিম আল্লাহ্ একমাত্র সত্যিকার মাবুদ এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরী'আতসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা। [মুসলিমঃ ১৬৭৬] এ তিনটি শাস্তির দাবী করার অধিকার প্রতিটি মু'মিনের তবে এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতা কেউ যেন নিজ হাতে নিয়ে না নেয়। বরং একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে।

দাহহাক বলেন, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা তখন মক্কায় ছিল। এটি হত্যা সংক্রান্ত নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত। তখন মুসলিমদেরকে কাফেররা গোপনে বা প্রকাশ্যে হত্যা করছিল।

فِّي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

তার উত্তরাধিকারীকে তো আমরা তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি[১]; কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে[২]; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই ।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মুশরিকদের কেউ তোমাদের হত্যা করছে বলে তোমরা তাদের পিতা, ভাই, অথবা তাদের গোত্রীয় কাউকে হত্যা করো না । যদিও তারা মুশরিক হয় । তোমাদের হত্যাকারী ছাড়া কাউকে হত্যা করো না । [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি ।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে হত্যাকারীর উপর কিসাস দাবী করতে পারে । এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকদ্দমায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ । তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে । [ইবন কাসীর] তবে যদি মূল অভিভাবক না থাকে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারে । [ফাতহুল কাদীর]

(২) এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয নয় । প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য । হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে । এগুলো সবই নিষিদ্ধ । যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা । অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা । কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের উপর মনের ঝাল মেটানো । অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি । [ইবন কাসীর] যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরী'আতের আইন তার পক্ষে থাকবে । আল্লাহ্ তাআলা তার সাহায্যকারী হবেন । পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উম্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মযলুম না হয়ে যালেম হয়ে যাবে । আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে যুলুম থেকে বাঁচাবে ।
যায়েদ ইবন আসলাম এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত । কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত । কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উম্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না, বরং

৩৪. আর ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির ধারে-কাছেও যেও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

৩৫. আর মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দাও এবং ওজন কর সঠিক দাঁড়িপাল্লায়(১), এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট(২)।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না(৩); কান, চোখ,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। আয়াতে মুসলিমদেরকে এরকম কিছু না করতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেয়া হারাম। [ইবন কাসীর]

(২) এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ দুনিয়াতে এটি উত্তম হওয়া যুক্তি ও বিবেকের দাবী। (দুই) এর পরিণতি শুভ। এতে আখেরাতের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার উত্তম পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই এর পরিণতি শুভ। [ইবন কাসীর] দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের উপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির উপর।

(৩) আয়াতে উল্লেখিত ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ শব্দটির সঠিক অর্থ, পিছু নেয়া, অনুসরণ করা। [ফাতহুল কাদীর] সে অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে যে বিষয়ে তুমি জাননা সে বিষয়ের পিছু নিওনা। [ফাতহুল কাদীর] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, বলো না। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কাউকে অভিযুক্ত করো না। কাতাদাহ্ বলেন, যা দেখনি তা বলো না। মুহাম্মাদ ইবনুল

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে(১)।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

৩৭. আর যমীনে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না(২)।

হানাফিয়া বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। [ইবন কাসীর] মোটকথা: যে বিষয় জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলাকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সবচেয়ে বড় গুনাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা---যার কোন সনদ তিনি পাঠাননি, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।" [আল-আ'রাফঃ ৩৩] অনুরূপভাবে ধারণা করে কথা বলাও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় ধারনা করে কথা বলা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা বিবিধ ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা কোন কোন ধারনা করা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে।"[সূরা আল-হুজুরাতঃ১২] হাদীসে এসেছে, "তোমরা ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা ধারনা করে কথা বলা মিথ্যা কথা বলা।" [বুখারীঃ ৫১৪৩, মুসলিমঃ ২৫৬৩]

(১) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ
এক, কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সম্পর্কে তার মালিককে প্রশ্ন করা হবেঃ প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি শরী'আত বিরোধী কাজ কর্ম করে থাকে, তবে এর জন্য সে ব্যক্তিকে আযাব ভোগ করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]
দুই, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ্ সেগুলোকে প্রশ্ন করবেন। এটা হাশরের ময়দানে গুনাহগারদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছেঃ "আজ (কেয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের" [৬৫]। অনুরূপভাবে সূরা আন-নূরে এসেছে, "যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে[২৪]।

(২) অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তাআলা ওহীর

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

৩৮. এ সবের মধ্যে যা মন্দ তা আপনার রবের কাছে ঘৃণ্য(১) ।

ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٩﴾

৩৯. আপনার রব ওহীর দ্বারা আপনাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত । আর আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে(২) ।

মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা অবলম্বন কর । কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর যুলুম না করে ।' [মুসলিমঃ ২৮৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদের পূর্বেকার জাতিদের মধ্যে কোন এক লোক দু'খানি চাদর নিয়ে গর্বভরে চলছিল । এমতাবস্থায় যমীন তাকে নিয়ে ধ্বসে গেল, সে এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে ঢুকতে থাকবে । [বুখারীঃ ৫৭৮৯, মুসলিমঃ ২০৮৮]

(১) অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহ্‌র কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয় । উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না । কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন- পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি । যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয় । অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দনীয় কাজ । [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত سَيِّئُهُ বাক্য অন্য কেরা'আতে سَيِّئَةً পড়া হয়েছে । তখন আয়াতের অর্থ হবে, এ সবগুলোই মন্দ কাজ । আল্লাহ এগুলো অপছন্দ করেন । [ইবন কাসীর]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলেও উদ্দেশ্য হলো তার উম্মত । কারণ তিনি শির্ক করার অনেক উর্ধ্বে । লক্ষণীয় যে, এ আদেশ, নিষেধ ও অসিয়তের শুরু হয়েছিল শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে । শেষ করা হলো আবার সেই শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়েই । এর দ্বারা এটাই বোঝানো ও এ বিষয়ে তাকীদ দেয়া উদ্দেশ্য যে, দ্বীনের মূলই হচ্ছে শির্ক থেকে দূরে থাকা । তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা । কেউ কেউ বলেন, প্রথম যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছিল তখন তার শাস্তি বলা হয়েছে যে, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বসে পড়বে, অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা এভাবে সাহায্যহীন হয়ে থাকবে । তারপর সবশেষে যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছে তখন তার শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাহলে জাহান্নামে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে । এটা নিঃসন্দেহে আখেরাতে হবে । [ফাতহুল কাদীর]

أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ إِنَٰثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

৪০. তোমাদের রব কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে কি ফিরিশ্‌তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক[১]!

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

৪১. আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনে (বহু বিষয়) বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. বলুন, 'যদি তাঁর সাথে আরও ইলাহ্ থাকত যেমন তারা বলে, তবে তারা 'আরশ-অধিপতির (নৈকট্য লাভের) উপায় খুঁজে বেড়াত[২]।'

---

(১) এ আয়াতের সমার্থে আরো আয়াত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। যেমন, সূরা মারইয়ামঃ ৮৮-৯৫] এ আয়াতে কাফের মুশরিকদের মারাত্মক ভুল ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা ফেরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে, এতে করে তারা তিনটি ভুল করেছে। এক, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে। দুই, তাদেরকে আল্লাহ্‌র মেয়ে হওয়ার দাবী করেছে। তিন, তারপর তাদের ইবাদতও করেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সমস্ত অযৌক্তিক ও মিথ্যা দাবী ও কর্মকাণ্ডকে খণ্ডন করে বলছেন, তোমরা কিভাবে এটা মনে করছ যে, যাবতীয় পুরুষ সন্তান তোমাদের জন্য রেখে তিনি তাঁর নিজের জন্য মেয়ে সন্তানগুলোকে নির্ধারণ করেছেন? তোমরা তো এক মারাত্মক কথা বলছ। নিজেদের জন্য অপছন্দ করে আল্লাহ্‌র জন্য তা সাব্যস্ত করা কি যুলুম নয়?

(২) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ
এক, যদি আল্লাহ্‌র সাথে আরো অনেক ইলাহ থাকত তবে তারা আরশের অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতো। যেমনিভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশারা করে থাকে। [ফাতহুল কাদীর] এ অর্থটি ইমাম শাওকানী প্রাধান্য দিয়েছেন।
দুই, আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো, যদি আল্লাহ্‌র সাথে আরও ইলাহ্ থাকত, তবে তারা তাদের অক্ষমতা জেনে আরশের অধিপতি সত্যিকারের ইলাহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত। [ইবন কাসীর] এ শেষোক্ত অর্থটিই

سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

৪৩. তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ

৪৪. সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে[1] এবং এমন

সঠিক। ইমাম ইবন কাসীর এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা ও ইবনুল কাইয়্যেমও প্রাধান্য দিয়েছেন। [দেখুন, আল-ফাতাওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ; মাজমু' ফাতাওয়া: ১৬/১২২-১২৪, ৫৭৭; ইবনুল কাইয়্যেম, আল-জাওয়াবুল কাফী: ২০৩; আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ: ২/৪৬২] কারণ প্রথমত, এখানে ﴿إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ﴾ আরশের অধিপতির দিকে বলা হয়েছে, عَلَىٰ ذِيْ الْعَرْشِ আরশের অধিপতির বিপক্ষে বলা হয়নি। আর আরবী ভাষায় إلى শব্দটি নৈকট্যের অর্থেই ব্যবহার হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾ [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৩৫] পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য على শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [সূরা আন-নিসাঃ ৩৪] দ্বিতীয়ত, এ অর্থের সমর্থনে এ সূরারই ৫৭ নং আয়াত প্রমাণবহ। সেখানে বলা হয়েছে, "তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।" এতে করে বুঝা গেল যে, এখানে এ আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যদি তারা যেভাবে বলে সেভাবে সেখানে আরো ইলাহ থাকত তবে সে বানানো ইলাহগুলো নিজেদের অক্ষমতা সম্যক বুঝতে পেরে প্রকৃত ইলাহ রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার প্রতি নৈকট্য লাভের আশায় ধাবিত হতো। এ অর্থের সমর্থনে তৃতীয় আরেকটি প্রমাণ আমরা পাই এ কথা থেকেও যে কাফেরগণ কখনও এ কথা দাবী করেনি যে, তাদের ইলাহগণ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিদ্বন্দ্বী বরং তারা সবসময় বলে আসছে যে, "আমরা তো কেবল তাদেরকে আল্লাহর কাছে নৈকট্য লাভে সুপারিশকারী হিসেবেই ইবাদত করে থাকি"। [সূরা আয-যুমারঃ ৩] এখানেও আয়াতে বলা হয়েছে, "যেমনটি তারা বলে"। আর তারা কখনো তাদের মা'বুদদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘোষণা করেনি। এ দ্বিতীয় তাফসীরটি প্রখ্যাত তাফসীরবিদ কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

(১) ইচ্ছাগত তাসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তাআলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তাসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। [ইবন কাসীর] কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তাসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয়না। এ আয়াতেই বলা হয়েছে, ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ এ উক্তি এ কথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত

تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

৪৫. আর আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন তখন আমরা আপনার ও যারা আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই।

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ

৪৬. আর আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে

তাসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তাসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তাসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়, সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে। তাছাড়া মু'জেযা ও কারামত হিসেবে কখনও কখনও অচেতন বস্তু সমূহের তাসবীহও আল্লাহ্ তা'আলা মাঝে মধ্যে শুনিয়ে থাকেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবার খেতাম, এমতাবস্থায় আমরা খাবারের তাসবীহও শুনতাম" [বুখারীঃ৩৫৭৯] অনুরূপভাবে মরা খেজুরগাছের কাঠের কান্না। [বুখারী: ৩৫৮৩] মক্কার এক পাথর কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেয়া। [মুসলিম: ২২৭৭] উদাহরণতঃ সূরা ছোয়াদে দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তাসবীহ্ পাঠ করে"। [১৮] সূরা আল-বাকারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "কতক পাথর আল্লাহ্র ভয়ে নীচে পড়ে যায়" [৭৪]। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্র ভয় রয়েছে। সূরা মারইয়ামে নাসারা সম্প্রদায় কর্তৃক ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্র পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছেঃ "তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করছ; যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়!" [৮৮-৯২] বলাবাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

দিয়েছি বধিরতা; 'আপনার রব এক', এটা যখন আপনি কুরআন থেকে উল্লেখ করেন তখন তারা পিঠ দেখিয়ে সরে পড়ে[১]।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

৪৭. যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শুনে তখন তারা কেন কান পেতে শুনে তা আমরা ভাল জানি এবং এটাও জানি, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ[২]।'

(১) অর্থাৎ আপনি যে একমাত্র আল্লাহকে নিজের রব গণ্য করেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করেন, তারা যাদের ভক্তি করে তাদের কোন কথা বলেন না, এটা তাদের কাছে বড়ই বিরক্তিকর ঠেকে। মানুষ কেবল আল্লাহর কথা বলতে থাকবে, বুযর্গদের কার্যকলাপের কোন কথা বলবে না, মাযার, পবিত্রস্থান ইত্যাদির অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যলাভের কোন স্বীকৃতি দেবে না এবং তাদের উদ্দেশ্যে কোন প্রশংসাবাণীও নিবেদন করবে না, এ ধরনের আচরণ তাদের একদম পছন্দ নয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ কথাটির প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্যগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়"। [সূরা আয-যুমারঃ৪৫] কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, মুসলিমরা যখন বলত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক ইলাহ নেই), তখন কাফেররা সেটা অস্বীকার করত। আর এটা তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিত। অনুরূপভাবে তা ইবলীস ও তার দলবলকে ক্লিষ্ট করত। তখন আল্লাহ্ চাইলেন যে, তিনি তাঁর কালেমাকে প্রসার করবেন, উন্নত করবেন, সাহায্য করবেন এবং যারা এটার বিরোধিতা করবে তাদেরও বিপক্ষে এটাকেই বিজয়ী করবেন। [ইবন কাসীর]

(২) মক্কার কাফের সরদাররা পরস্পর যেসব কথা বলাবলি করতো, এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো এবং তারপর তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতো। অনেক সময় তাদের নিজেদের লোকদের মধ্য থেকে কারো প্রতি তাদের সন্দেহ হতো যে, সে কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়েছে। তাই তারা সবাই মিলে তাকে এ বলে বুঝাতো যে, ভাই এ তুমি কার ধোঁকায় পড়ে গেলে ? এতো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ কোন শত্রু এর উপর জাদু করে দিয়েছে। তাইতো প্ররোচনামূলক কথা বলে চলছে। [ইবন কাসীর]

৪৮. দেখুন, তারা আপনার কী উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে[১], সুতরাং তারা পথ পাবে না।

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৯. আর তারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব[২]?'

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৫০. বলুন, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর বা লোহা[৩],

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫১. 'অথবা এমন কোন সৃষ্টি যা তোমাদের অন্তরে খুবই বড় মনে

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ

---

(১) অর্থাৎ এরা আপনার সম্পর্কে কোন একটি মত প্রকাশ করছে না। বরং বিভিন্ন সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী কথা বলছে। কখনো বলছে, আপনি নিজে জাদুকর। কখনো বলছে, আপনাকে কেউ জাদু করেছে। কখনো বলছে, আপনি কবি। কখনো বলছে, আপনি পাগল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এদের যে আসল সত্যের খবর নেই, এদের এসব পরস্পর বিরোধী কথাই তার প্রমাণ। নয়তো প্রতিদিন তারা একটা করে নতুন মত প্রকাশ করার পরিবর্তে কোন একটা চূড়ান্ত মত প্রকাশ করতো। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, তারা নিজেরা নিজেদের কোন কথায়ও নিশ্চিত নয়। একটি অপবাদ দেয়ার পর নিজেরাই অনুভব করছে, এটা তো ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। তাই পরে আর একটা অপবাদ দিচ্ছে। আবার সেটাকেও খাপ খেতে না দেখে তৃতীয় আর একটা অপবাদ তৈরী করছে। এভাবে নিছক শত্রুতা বশত তারা একের পর এক বড় বড় মিথ্যা রচনা করে চলছে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েই চলেছে, তারা যা বলছে সেগুলোতে তারা সঠিক পথে নেই। হেদায়াত থেকে দূরে সরে গেছে। সে পথভ্রষ্টতা থেকে আর বের হতে পারছে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) একই অর্থে অন্যান্য সূরায়ও আখেরাতে পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহের কথা উল্লেখ করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। [যেমন, এ সূরারই ৯৮ নং আয়াত এবং সূরা আন-নাযি'আতঃ ১০-১২, ইয়াসীনঃ ৭৮-৭৯]

(৩) অর্থাৎ যদি তোমরা আশ্চর্য মনে করে থাক যে, আমরা অস্থি ও চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেলে কিভাবে আবার পুনরুত্থিত হব, তাহলে তোমরা যদি পার তো পাথর বা লোহা হয়ে যাও। [তাবারী] অথবা আয়াতের অর্থ, যদি তোমরা পাথর ও লোহাও হয়ে যাও তারপরও তোমরা আল্লাহ্‌র হাত থেকে রেহাই পাবে না। অথবা এর অর্থ, যদি তোমরা পাথর কিংবা লোহাও হয়ে যাও তারপরও আল্লাহ্ তোমাদেরকে তেমনি নিয়ে আসবেন, যেমনি তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

হয়[১];' তবুও তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে?' বলুন, 'তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন[২]।' অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে[৩] ও বলবে, 'সেটা কবে?[৪]' বলুন, 'সম্ভবত সেটা হবে শীঘ্রই,

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে যা বড় মনে হয় বলে আসমান, যমীন ও পাহাড় বোঝানো হয়েছে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা ইচ্ছে তা হয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, আবু সালেহ, হাসান, কাতাদা এবং দাহ্হাক বলেন, তাদের উদ্দেশ্য, মৃত্যু। কারণ বনী আদমের কাছে এর চেয়ে বড় বিষয় আর নেই। অর্থাৎ যদি তোমরা মৃতই হয়ে যাও তারপরও তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন তারপর জীবিত করবেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এ আয়াতে তাদের সন্দেহের দু'টি উত্তর দেয়া হয়েছে, এক, তোমাদেরকে প্রথম যিনি সৃষ্টি করেছেন সে মহান প্রভু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কেমন হতে পারে? কিভাবে মনে করতে পারলে যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারবেন না? তোমরা তাঁর শক্তি সামর্থ সম্পর্কে এতই অজ্ঞ রয়ে গেলে? দুই, তোমরা যদি পুনরায় সৃষ্টি করাকে অসম্ভব মনে করে থাক তবে অত্যন্ত বাজে ধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করছ। কারণ, তোমরা জান যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যত কঠিন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার থেকেও সহজ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য পুনরায় সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। এ ধরনের আলোচনা অন্য সূরায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আর-রূমঃ২৭]

(৩) আরবীতে ব্যবহৃত "ইন্‌গাদ" শব্দের মানে হচ্ছে, উপর থেকে নিচের দিকে এবং নিচ থেকে উপরের দিকে মাথা নাড়া। এভাবে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। [ইবন কাসীর]

(৪) তারা দু'টি কারণে একথাটি বলেছে, এক, তারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে এভাবে উপর-নীচ মাথা ঝাকাচ্ছিল। [ইবন কাসীর] দুই, তারা এ পুনরুত্থান কেন তাড়াতাড়ি হচ্ছেনা সে প্রশ্ন তুলছে। কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তাদের এ ধরনের আচরণ উল্লেখ করা হয়েছে। [যেমন সূরা আল-মুলকঃ ২৫, আস-শূরাঃ ১৮]

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫২. 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, এবং তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে[১] এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে[২] ।'

---

(১) আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়ায অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে। ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিন ও কাফের সবারই এই অবস্থা হবে। কিন্তু ইবন আব্বাস বলেন, এখানে হামদ দ্বারা তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগত হয়ে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কাতাদা বলেন, এর অর্থ তোমরা তাঁর পরিচয় জানতে পারবে এবং আনুগত্য করে তাঁর ডাকে সাড়া দিবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলে, এর অর্থ হচ্ছে, আর তাঁর জন্যই যাবতীয় হামদ ও স্তুতি সর্বাবস্থায়। [ইবন কাসীর] কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্‌দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্‌দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্‌দের মাধ্যমে হবে। যেমন- বলা হয়েছে, "আর তাদের (হাশরবাসীদের) ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র জন্যে।" [সূরা আয-যুমারঃ ৭৫]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুকাল থেকে নিয়ে কিয়ামতের দিনে উত্থান পর্যন্তকার সময়কালটা মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তোমরা তখন মনে করবে, আমরা সামান্য একটু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে হঠাৎ এ কিয়ামতের শোরগোল আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে। কুরআন তাদের এ সমস্ত কথাবার্তার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। কোথাও বলেছে, "যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে!" [সূরা আন-নাযি'আতঃ ৪৬] আবার বলা হয়েছে, "যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০২-১০৪] আরো বলা হয়েছে, "যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত।" [সূরা আর-রূমঃ ৫৫] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয়, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্প কালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে! [সূরা আল-মুমিনূনঃ ১১২-১১৪]

ষষ্ঠ রুকূ'

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আমার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন এমন কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। ইচ্ছে করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন অথবা ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন[১]; আর আমরা আপনাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে পাঠাইনি[২]।

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾

৫৫. আর যারা আসমানসমূহ ও যমীনে আছে তাদের সম্পর্কে আপনার রব অধিক অবগত। আর অবশ্যই আমরা নবীগণের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যাবূর[৩]।

---

(১) অর্থাৎ হেদায়াতের বিষয়টি কারও হাতে নেই। এ বিষয়টির ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই সকল মানুষের ভিতর-বাহির এবং বর্তমান-ভবিষ্যত জানেন। কার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে এবং তাকে তাঁর আনুগত্যের দিকে নিয়ে আসতে হবে এটা তিনিই ভাল জানেন। আর কে এ অনুগ্রহের হকদার নয় এটাও তিনি ভাল জানেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তাদের উপর আপনাকে যবরদস্তিকারী হিসেবে পাঠাইনি যে আপনি তাদেরকে জোর করে ঈমানদার বানিয়ে ছাড়বেন। তাদের জন্য আপনাকে 'বাশীর' বা সুসংবাদপ্রদানকারী এবং 'নাযীর' হিসেবেই পাঠিয়েছি। তারপর যদি কেউ আপনার আনুগত্য করে তবে সে জান্নাতে যাবে আর যদি অবাধ্য হয় তবে জাহান্নামে যাবে। [ইবন কাসীর] এ অর্থে কুরআনের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। [যেমন, সূরা আল-আন'আমঃ ১০৭, আয-যুমারঃ ৪১, আস-শূরাঃ ৬, ক্বাফঃ ৪৫]

(৩) যাবূর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটি গ্রন্থ। আমরা ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

৫৬. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে কর তাদেরকে ডাক, অতঃপর দেখবে যে, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই[১]।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে[২] যে, তাদের মধ্যে কে

তা'আলা দাউদ আলাইহিসসালামকে একখানি গ্রন্থ দিয়েছিলেন যার নাম যাবূর। তবে বর্তমানে বাইবেলে যে দাউদের সংগীত নামে অভিহিত অংশ আছে তা তার গ্রন্থ বলা যাবে না। কারণ, এর পক্ষে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। কোন কোন হাদীসে দাউদ আলাইহিসসালামের গ্রন্থের নাম "কুরআন" বলা হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে, 'পাঠকৃত' বা পাঠের যোগ্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "দাউদের উপর কুরআন সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তার বাহনের লাগাম লাগাতে নির্দেশ দিতেন। তারা তা লাগিয়ে শেষ করার আগেই তিনি তা পড়া শেষ করে ফেলতেন।" [বুখারীঃ ৪৭১৩]

(১) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কেবল গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা) সিজদা করাই শির্ক নয় বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার কাছে দো'আ চাওয়া বা তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকাও শির্ক। দো'আ ও সাহায্য চাওয়া ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী একজন মূর্তি পূজকের সমান অপরাধী। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোন আপদ-বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে না এবং কোন খারাপ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতেও পারে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস রাখা ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২) এ শব্দগুলো নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব মাবুদ ও ত্রাণকর্তার কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তা বা অতীত যুগের আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ইবন আব্বাস বলেন, শির্ককারীরা বলত: আমরা ফেরেশতা, মসীহ ও উযায়ের এর ইবাদাত করি। অথচ যাদের ইবাদত করা হচ্ছে তারাই আল্লাহকে ডাকছে। [ইবন কাসীর] আয়াতের অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ নবী হোক বা আউলিয়া অথবা ফেরেশতা, কারোই তোমাদের প্রার্থনা শুনার এবং তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তোমরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে অসিলায় পরিণত করছো কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত এবং তাঁর বেশী বেশী নিকটবর্তী হবার জন্য অসিলা ও উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

কত নিকটতর হতে পারে, আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে[১]। নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আর এমন কোন জনপদ নেই যা আমরা কিয়ামতের দিনের আগে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না; এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে[২]।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "কিছু লোক অপর কিছু জিনের ইবাদত করত, পরে সে জিনগুলো ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু সে মানুষগুলো সে সমস্ত জিনের ইবাদত করতেই থাকল। তারা বুঝতেই পারল না যে, তারা যাদের ইবাদত করছে তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়"। [বুখারীঃ ৪৭১৪, ৪৭১৫, মুসলিমঃ ৩০৩০]

(১) অসীলা শব্দের অর্থ, নৈকট্য অর্জন। যেমনটি কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্‌র কাছে ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরী'আতের বিধি-বিধান অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যলাভে সদা তৎপর থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন। আয়াতে রহমতের আশা এবং আযাবের ভয় করার কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। ভয় থাকলে অন্যায় থেকে দূরে থাকবে, আর আশা থাকলে ইবাদাত ও আনুগত্যে প্রেরণা পাবে। [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, নিশ্চয় তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব ভীতিপ্রদ। তাই আযাব থেকে ভয়ে থাকা এবং আযাবে নিক্ষেপ করে এমন কাজ করা থেকেও সাবধান থাকা উচিত। [ইবন কাসীর]

(২) কিতাব বলে এখানে 'লাওহে মাহফূজ' বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] তাদের কর্মফলের কারণেই তাদের জন্য এ শাস্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ধ্বংসের ব্যাপারেও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আর আমরা তাদের উপর যুলুম করিনি বরং তারাই তাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছে"। [সূরা হূদঃ১০১] অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "কত জনপদ তাদের প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমরা

৫৯. আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে শুধু এটাই বিরত রেখেছে যে, তাদের পূর্ববর্তীগণ তাতে মিথ্যারোপ করেছিল। আর আমরা শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা সেটার প্রতি যুলুম করেছিল। আমরা তো শুধু ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি(১)।

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। তারপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই হল তাদের কাজের পরিণাম।” [সূরা আত-তালাকঃ ৮,৯]

(১) এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ ধরনের মু'জিযা দেখার পর যখন লোকেরা একে মিথ্যা বলতে থাকে তখন তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তখন এ জাতিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। মানব জাতির অতীত ইতিহাস প্রমাণ করে , বিভিন্ন জাতি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখে নেবার পরও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন এটা পুরোপুরি আল্লাহর রহমত যে, তিনি এমন ধরনের কোন মু'জিযা আর পাঠাচ্ছেন না। এর মানে হচ্ছে , তিনি তোমাদের বুঝবার ও সংশোধিত হবার অবকাশ দিচ্ছেন। কিন্তু তোমরা এমনি নির্বোধ যে, মু'জিযার দাবী জানিয়ে সামুদ জাতির পরিণাম ভোগ করতে চাচ্ছ। সামূদ জাতি সুস্পষ্ট নিদর্শন চেয়েছিল। তারপর যখন তাদের কাছে তা আসল এবং তারা কুফরী করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়মানুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জানা থাকলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'মক্কাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ দাবী করল যে, আপনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। আমাদের জন্য মক্কার পাহাড়গুলো স্থানান্তরিত করে আমাদের মধ্যে প্রশস্ততার ব্যবস্থা করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আপনি যদি চান তো আমি তারা যা চায় তা তাদেরকে দিব কিন্তু তারপর যদি তারা কুফরী করে তবে তাদের পূর্ববর্তীগণ যেভাবে ধ্বংস হয়েছে সেভাবে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেব। আর যদি আপনি চান তো আমি অপেক্ষা করব হয়ত বা তাদের বংশধরদের কেউ ঈমান আনবে।' তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'বরং আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করব।' তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৫৮, দ্বিয়া আল-মাকদেসী, আল-মুখতারাহঃ ১০/৭৮-৮০] সুতরাং কোন ম্যাজিক বা দর্শনীয় খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

৬০. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা আপনাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয় আপনার রব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন[১]। আর আমরা যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা[২] এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত গাছটিও[৩] শুধু মানুষের জন্য ফিতনাস্বরূপ[৪]

কখনো মু'জিযা দেখানো হয় না। সব সময় মু'জিযা এই উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে যে, লোকেরা তা দেখে সাবধান হয়ে যাবে, তারা বুঝতে পারবে নবীর পেছনে আছে এক সর্বময় শক্তিশালী সত্তার অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর নাফরানীর পরিণাম কি হতে পারে তাও তারা জানতে পারবে।

(১) অর্থাৎ আপনার নবুওয়াতী দাওয়াতের সূচনালগ্নেই যখন মক্কার এ কাফেররা আপনার বিরোধিতা করতে এবং আপনার পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে শুরু করেছিল তখনই আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম, আমি এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছি, এরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, কোন ভাবেই এরা আপনার দাওয়াতের পথ রোধ করতে পারবে না এবং আপনি যে কাজে হাত দিয়েছেন সব রকমের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে কাজ সম্পন্ন হবেই। অথবা আয়াতের অর্থ, আপনি দাওয়াত দিতে থাকুন, তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তারা সবাই আল্লাহ্র আয়ত্বাধীন। [ইবন কাসীর] আল্লাহ বিরোধীদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং নবীর দাওয়াত আল্লাহর হেফাজতে রয়েছে–একথা মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন সূরা বুরুজে বলা হয়েছেঃ "কিন্তু এ কাফেররা মিথ্যা বলার ও অস্বীকার করার কাজে লেগেই আছে এবং আল্লাহ সবদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন"। [১৯-২০] এর জন্য আরো দেখুন, সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯, সূরা ফুসসিলাতঃ ৫৪।

(২) এ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে الرؤيا (স্বপ্ন) বলে رؤية (দেখা) বোঝানো হয়েছে। যা ইসরা ও মি'রাজের রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ "যাক্কুম"। এ সম্পর্কে কুরআনে খবর দেয়া হয়েছে, এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশে উৎপন্ন হবে এবং জাহান্নামীদের তা খেতে হবে। একে অভিশপ্ত করার মানে হচ্ছে এই যে, যারা এ গাছ থেকে খাবে তারা অভিশপ্ত হবে। [ফাতহুল কাদীর] যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যাক্কুম গাছ হবে, পাপীর খাদ্য" [সূরা আদ-দোখান: ৪৩-৪৪]

(৪) অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রিতে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফেতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ফেতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত

নির্ধারণ করেছি। আর আমরা তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু এটা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

সপ্তম রুকূ'

৬১. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজ্‌দা কর', তখন ইব্‌লীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল। সে বলেছিল, 'আমি কি তাকে সিজ্‌দা করব যাকে আপনি কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন?'

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾

৬২. সে বলেছিল, 'আমাকে জানান, এই যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে শপথ করে বলছি আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব[১]।'

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী। আরেক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বলেনঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফেতনা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শবে-মে'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্ক নও মুসলিম মুরতাদ হয়ে যাবার অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর]

(১) যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাফেরদের শত্রুতার অবস্থা বর্ণনা করলেন, তখন রাসূলকে এ সান্তনা দিতে চাইলেন যে, নবীদের সাথে এ বিরোধিতা অনেক থেকে চলে এসেছে। ইবলীস সেটা শুরু করেছিল। [ফাতহুল কাদীর] আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা না করার সময় ইবলিস দু'টি কথা বলেছিল। এক, আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾

৬৩. আল্লাহ্ বললেন, 'যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

৬৪. 'আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে[১] ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।'

প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলা বাহুল্য। এর বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। ইবলীসদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে (অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া) পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেনঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোমার গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোমার বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দূর্দশা তাই হবে, যা তোমার জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তোমাদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী রয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী থাকা অবাস্তব নয়। এবং তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেনঃ যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। আয়াতে উল্লেখিত শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং- তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) ধন সম্পদে শরীক হওয়ার বহু পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সুদ-ঘুষের মাধ্যমে লেনদেন করা। [আইসারুত তাফাসীর]

আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না ।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

৬৫. 'নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই ।' আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আপনার রবই যথেষ্ট ।

رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

৬৬. তোমাদের রব তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সাগরে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার । নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

৬৭. আর সাগরে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা ডেকে থাক তারা হারিয়ে যায়[১]; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও । আর মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ ।

---

(১) অর্থাৎ যখন বিপদাপদ দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করে তাদেরকে ভুলে যায় । তারা তখন তাদের মন থেকে হারিয়ে যায় । একমাত্র আল্লাহকেই তারা ডাকতে থাকে । মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবন আবি জাহল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে হাবশা চলে যাচ্ছিল । সাগরের মাঝে তার নৌকা প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে যায় । তখন নৌকার সবাই একমাত্র আল্লাহকে ডাকার জন্য একে অপরকে পরামর্শ দিতে থাকে । আর ঠিক তখনি ইকরিমা নিজ মনে বলছিল যে, যদি সাগর বক্ষে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেউ রক্ষা করার না থাকে তা হলে ডাঙ্গাতেও তিনিই একমাত্র রক্ষক । হে আল্লাহ্! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যদি এ বিপদ থেকে বেঁচে যাই তবে অবশ্য ফিরে গিয়ে মুহাম্মাদের হাতে হাত রেখে ঈমান আনব । তাকে আমি অবশ্যই রহমদিল পাব । তারপর তারা যখন সমুদ্র বক্ষ থেকে বের হলো তখনি তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলেন এবং ঈমান আনলেন । আর তার ইসলাম ছিল অত্যন্ত সুন্দর । [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৩/২৪১-২৪২]

৬৮. তোমরা কি নির্ভয় হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে সহ কোন অঞ্চল ধসিয়ে দেবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন না? তারপর তোমরা তোমাদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক পাবে না।

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

৬৯. নাকি তোমরা নির্ভয় হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সাগরে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরী করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? তারপর তোমরা এ ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না।

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৭০. আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি[১]; স্থলে ও সাগরে

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা আদম-সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণতঃ সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে" [সূরা আত-তীন:৪] তাকে দু' পায়ে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাকে হাতে খাওয়ার শক্তি দেয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রাণী চারপায়ে এবং মুখ দিয়ে খায়। মানুষের মধ্যে যে চোখ, কান ও অন্তর দেয়া হয়েছে সে এসবগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে সে এগুলো দ্বারা ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। [ইবন কাসীর] বস্তুত এ বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র ঊর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তার পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۟

তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এবং তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি আর আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

অষ্টম রুকূ'

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

৭১. স্মরণ করুন সে দিনকে, যখন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের 'ইমাম'(১)সহ ডাকব। অতঃপর যাদের

---

(১) إمام শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে।
কেউ কেউ এখানে إمام দ্বারা গ্রন্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সে হিসেবে গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন- কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ﴾ "আর যাবতীয় বস্তুই আমি সুস্পষ্ট গ্রন্থে গুনে রেখেছি"। [সূরা ইয়াসীনঃ ১২] এখানেও ﴿اِمَامٍ مُّبِيْنٍ﴾ বলে সুস্পষ্ট গ্রন্থ বুঝানো হয়েছে। তাই এ আয়াতেও তাদের বিচারের জন্য তাদের আমলনামার গ্রন্থ হাযির করার কথা বলাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ অর্থের সমর্থনে কুরআনের আরো কিছু আয়াত প্রমাণ বহন করছে। [যেমনঃ সূরা কাহাফঃ৪৯, আল-জাসিয়াঃ ২৮,২৯, আয-যুমারঃ৬৯, আন-নিসাঃ ৪১]
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণতঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী দল, মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী দল, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেয়াও সম্ভবপর। [ফাতহুল কাদীর] এ অর্থের সপক্ষে আরো প্রমাণ হলো, আল্লাহ্র বাণীঃ "প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন ওদের রাসূল আসবে তখন ন্যায়বিচারের সাথে ওদের মীমাংসা করে দেয়া হবে এবং ওদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" [সূরা ইউনুসঃ৪৭] তাছাড়া একই অর্থে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আরো আয়াত এসেছে। [যেমন সূরা আন-নিসাঃ ৪১, আন-নাহলঃ ৮৪, ৮৯, আল-হাজ্বঃ ৭৮, আল-কাসাসঃ ৭৫, আয-যুমারঃ ৬৯] কোন কোন সালফে সালেহীন বলেন, এ আয়াত দ্বারা হাদীসের প্রকৃত অনুসারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। কারণ তাদের নেতা হলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

فَتِيْلًا ﴿٧١﴾

ডান হাতে তাদের ‘আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের ‘আমলনামা পড়বে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ أَعْمٰى

৭২. আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ[১] সে আখিরাতেও অন্ধ[২] এবং সবচেয়ে

তবে আয়াতের পরবর্তী অংশ অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে إمام বলতে গ্রন্থই বুঝানো হয়েছে। ইবন কাসীর এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, “যাদের ডান হাতে তাদের ‘আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের ‘আমলনামা পড়বে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না”। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তখন যাকে তার ‘আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘লও, আমার ‘আমলনামা পড়ে দেখ; ‘আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।’ [সূরা আল-হাক্কাহঃ ১৯-২০]। আর কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার ‘আমলনামা, ‘এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!”[সূরা আল-হাক্কাহঃ ২৫-২৬] যদিও মূলতঃ উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, তাদের আমলনামার উপর সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যেক উম্মতের নবীদেরকে হাজির করা হবে। তারা সেগুলোর সত্যায়ন করবে। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে অন্ধ বলে বাহ্যিক অন্ধদের বুঝানো হয়নি। বরং যাদের মন হক্ক বুঝার ক্ষেত্রে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখার ক্ষেত্রে অন্ধত্ব গ্রহণ করেছে। হক্ক মানতে চায়না এবং নিদর্শনাবলী দেখতে চায়না এমন প্রকৃত অন্ধদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়।” [সূরা আল-হাজ্বঃ ৪৬] পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা অন্ধ তারা যদি ঈমানদার হয় এবং সৎকাজ করে ও ধৈর্যধারণ করে তবে তাদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রশংসা বাণী এসেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, “তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি আসল। আপনি কেমন করে জানবেন---সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত।” [সূরা আবাসাঃ ১-৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ জানানো হয়েছে যারা অন্ধ হয়ে যাবার পর ধৈর্যধারণ করেছে।

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাতে অন্ধ হবে। আখেরাতে তাদের অন্ধত্বের ধরণ সম্পর্কে দু’টি মত রয়েছে। এক, তারা বাস্তবিকই শারীরিকভাবে অন্ধ হিসেবে

وَاَضَلُّ سَبِيۡلًا

বেশী পথভ্রষ্ট।

وَاِنۡ كَادُوۡا لَيَفۡتِنُوۡنَكَ عَنِ الَّذِىۡۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِىَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوۡكَ خَلِيۡلًا

৭৩. আর আমরা আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে ওরা আপনাকে পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চুড়ান্ত করেছিল, যাতে আপনি আমাদের উপর সেটার বিপরীত মিথ্যা রটাতে পারেন[১]; আর নিঃসন্দেহে তখন তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।

وَلَوۡلَاۤ اَنۡ ثَبَّتۡنٰكَ لَقَدۡ كِدتَّ تَرۡكَنُ اِلَيۡهِمۡ شَيۡـًٔـا

৭৪. আর আমরা আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি অবশ্যই তাদের দিকে

হাশরের মাঠে উঠবে। এ অর্থের সমর্থনে কুরআনের অন্যত্র এসেছে, "যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।"[ত্বা-হাঃ ১২৪] আরো এসেছে, "কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে [সূরা আল-ইসরাঃ ৯৭] দুই, এ ছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ করা হয়ে থাকে যে, তারা কিয়ামতের দিন তাদের দুনিয়ার জীবনে যে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি ব্যবহার করে হক্ক পথ থেকে দূরে থাকে, সে সব থেকে তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে। মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। [ইবন কাসীর]

(১) কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সমস্ত প্রস্তাব দিত তন্মধ্যে এক বিশেষ প্রস্তাব ছিল যে, আপনি এ কুরআন বাদ দিয়ে ভিন্নধর্মী কিছু নিয়ে আসুন যা আমাদের মনঃপুত হবে। কিন্তু একজন নবীর পক্ষে কিভাবে ওহী ব্যতিত অন্য কিছু আনা সম্ভব হতে পারে? তিনি যদি তা করেন তবে হয়ত তারা তাকে বন্ধু বানাবে কিন্তু আল্লাহ্ কি তাকে এভাবেই ছেড়ে দিবেন? অবশ্যই না। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, "তিনি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, আমি অবশ্যই ডান হাতে ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।"[সূরা আল-হাক্কাহঃ ৪৪-৪৬] সুতরাং নবীর পক্ষে ওহী ব্যতীত কিছু বলা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন এটা ছাড়া, বা এটাকে বদলাও।' বলুন, 'নিজ থেকে এটা বদলান আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি আমার রবের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি।" [সূরা ইউনুসঃ ১৫] তাই একজন সত্য নবীর পক্ষে কক্ষনো নিজ থেকে বানিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

قَلِيلًا ۝

প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন[১];

إِذًا لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ الْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

৭৫. তাহলে অবশ্যই আমরা আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতেন না[২]।

وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৭৬. আর তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে আপনার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে

---

(১) অর্থাৎ যদি অসম্ভবকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি দুনিয়াতেও দ্বিগুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা আখেরাতেও দ্বিগুণ হত। কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলী ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পত্নীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে "হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।" [সূরা আল-আহযাবঃ৩০]

(২) এ সমগ্র কার্যবিবরণীর উপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ দু'টি কথা বলেছেন । এক, যদি আপনি সত্যকে জানার পর মিথ্যার সাথে কোন আপোস করে নিতেন তাহলে বিক্ষুব্ধ জাতি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর গযব তোমার উপর নেমে পড়ত এবং আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই দ্বিগুণ সাজা দেয়া হতো । দুই, মানুষ নবী হলেও আল্লাহর সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা তার সহযোগী না হলে শুধুমাত্র নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে সে মিথ্যার তুফানের মোকাবিলা করতে পারে না। শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সাহায্যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য ও ন্যায়ের উপর পাহাড়ের মতো অটল থাকেন এবং বিপদের সয়লাব স্রোত তাকে একচুলও স্থানচ্যুত করতে পারেনি। তিনিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, দৃঢ়পদ রেখেছেন, হেফাযত করেছেন, অপরাধী ও দুষ্ট লোকদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ করেছেন। আর তিনিই তার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন। তিনিই তাকে জয়ী করবেন। তিনি তাকে কারও কাছে তাঁর কোন বান্দার কাছে সোপর্দ করবেন না। তার দ্বীনকে তিনি তার বিরোধী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তির পরাজিত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবেন। [ইবন কাসীর]

থাকত[১]।

৭৭. আমাদের রাসূলদের মধ্যে আপনার আগে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং আপনি আমাদের নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবেন না[২]।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

নবম রুকূ'

৭৮. সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন[৩]

أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ

(১) এটি একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। সে সময় এটি তো নিছক একটি হুমকি মনে হচ্ছিল। কিন্তু দশ বারো বছরের মধ্যেই এর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গেলো। এ সূরা নাযিলের দেড় বছর পর মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জন্মভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করলো। তারপর বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের চরম বিপর্যয় ঘটলো, তাদের নেতারা মারা গেল [ইবন কাসীর] তারপর ৮ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কা মুয়ায্যামায় প্রবেশ করলেন। তারপর দু'বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুশরিক শূন্য করা হলো। এরপর যারাই এ দেশে বসবাস করেছে মুসলিম হিসেবেই বসবাস করেছে, মুশরিক হিসেবে কেউ সেখানে টিকতে পারেনি।

(২) সকল নবীর ব্যাপারে আল্লাহ এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ যে জাতি তাদেরকে হত্যা ও দেশান্তরী করেছে, তারপর সে আর বেশীদিন স্বস্থানে অবস্থান করতে পারেনি। এরপর হয় আল্লাহর আযাব তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যদি আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের জন্য রহমতস্বরূপ না আসতেন তবে তাদের উপর এমন আযাব আসত যার মোকাবিলা করা তাদের কারও পক্ষে সম্ভব হতো না। [ইবন কাসীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সময় মত সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। [ইবন কাসীর] পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ সংক্রান্ত আকীদা, আখেরাতের জন্য পুনরুত্থান ও প্রতিফল বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এখানে সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর] পর্বত সমান সমস্যা ও সংকটের আলোচনা করার পর পরই সালাত কায়েম করার হুকুম দেয়ার মাধ্যমে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন যে, এ অবস্থায় একজন মুমিনের জন্য যে অবিচলতার প্রয়োজন হয় তা সালাত কায়েমের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শত্রুদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে সালাত কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ "আমি জানি যে, কাফেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে

الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

এবং ফজরের সালাত(১)। নিশ্চয়

আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।" [৯৭-৯৮] এ আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্ ও সালাতে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র যিকর ও সালাত বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবাস্তব নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে সালাত। যেমন কুরআন পাক বলেঃ "সবর ও সালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ৪৫]

(১) আয়াতে قرآن শব্দ এসেছে, যার অর্থঃ পড়া। আরও এসেছে فجر শব্দ, 'ফজর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ভোর হওয়া বা প্রভাতের উদয় হওয়া। অর্থাৎ একেবারে সেই প্রথম লগ্নটি যখন প্রভাতের শুভ্রতা রাতের আঁধার চিরে উঁকি দিতে থাকে। তাই এ শব্দদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়, ফজরের কুরআন পাঠ। কুরআন মজীদে সালাতের প্রতিশব্দ হিসেবে সালাতের বিভিন্ন অংশের মধ্য থেকে কোন একটির নাম নিয়ে সমগ্র সালাতটি ধরা হয়েছে। যেমন তাসবীহ, যিকির, হাম্‌দ(প্রশংসা), কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকূ, সিজদাহ ইত্যাদি। এখানে قرآن শব্দ বলে সালাত বোঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন পাঠ নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কাজেই আয়াতের দ্বারা ফজরের সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]
অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, دلوك শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دلوك বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এস্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন। আর غسق শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এভাবে ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ এর মধ্যে চারটি সালাত এসে গেছেঃ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এর পরবর্তী বর্ণনা ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ দ্বারা ফজরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে সংক্ষেপে মি'রাজের সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল তার সময়গুলো কিভাবে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করা হবে তা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একটি সালাত পড়ে নিতে হবে সূর্যোদয়ের আগে। আর বাকি চারটি সালাত সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত পড়ে নিতে হবে। তারপর এ হুকুমটি ব্যাখ্যা করার জন্য জিবরীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছে। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযগুলোর সঠিক সময়ের শিক্ষা দান করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "জিবরীল দু'বার আমাকে বায়তুল্লাহর কাছাকাছি জায়গায় সালাত পড়ান। প্রথম দিন যোহরের সালাত ঠিক এমন সময় পড়ান যখন সূর্য সবেমাত্র হেলে পড়েছিল এবং ছায়া জুতার একটি ফিতার চাইতে

ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়[১]।

বেশী লম্বা হয়নি। তারপর আসরের সালাত পড়ান এমন এক সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ ছিল। এরপর মাগরিবের সালাত এমন সময় পড়ান যখন রোযাদার রোযার ইফতার করে। তারপর পশ্চিমাকাশের লালিমা খতম হবার পরপরই এশার সালাত পড়ান আর ফজরের সালাত পড়ান ঠিক যখন রোযাদারের উপর খাওয়া দাওয়া হারাম হয়ে যায় তেমনি সময়। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে যোহরের সালাত এমন সময় পড়ান যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান ছিল। আসরের সালাত পড়ান এমন সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিল। মাগরিবের সালাত পড়ান এমন সময় যখন সাওমপালনকারী সাওমের ইফতার করে। এশার সালাত পড়ান এমন সময় যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ফজরের সালাত পড়ান আলো চারদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। তারপর জিব্রীল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, যে মুহাম্মাদ! এই হচ্ছে নবীদের সালাত আদায়ের সময় এবং এ দু'টি সময়ের মাঝখানেই হচ্ছে সালাতের সঠিক সময়।" [তিরমিযীঃ ১৫৯, আবুদাউদঃ ৩৯৩]

কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায়ও পাঁচ সালাতের এ ওয়াক্তসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেমন সূরা হূদে বলা হয়েছেঃ "সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব) এবং কিছু রাত পার হয়ে গেলে (অর্থাৎ এশা)। [১১৪] সূরা 'ত্বা-হা'য়ে বলা হয়েছেঃ "আর নিজের রবের হাম্‌দ (প্রশংসা) সহকারে তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) এবং রাতের সময় আবার তাসবীহ করো (এশা) আর দিনের প্রান্তসমূহে (অর্থাৎ সকাল, যোহর ও মাগরিব)" [১৩০] তারপর সূরা রূমে বলা হয়েছেঃ "কাজেই আল্লাহর তাসবীহ করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (মাগরিব) এবং যখন সকাল হয় (ফজর)। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর তাসবীহ করো দিনের শেষ অংশে (আসর) এবং যখন তোমাদের দুপুর (যোহর) হয়।"[১৭-১৮] তবে যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশই সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এর পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখ্যা কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়েছে। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সালাত আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কুরআনকে হাদীস ও রাসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে, তারা সালাত কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে সালাতে কুরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(১) مشهود শব্দটি شهد ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ উপস্থিত হওয়া। হাদীসসমূহের বর্ণনা

৭৯. আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ[১] আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত[২]। আশা করা যায় আপনার

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۞

অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা সালাতে উপস্থিত হয়। তাই একে مشهود বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "রাতের ফেরেশ্তা এবং দিনের ফেরেশ্তাগণ এ সময় উপস্থিত হয়।" [তিরমিযীঃ ৩১৩৫] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "জামাতের সালাতের ফযীলত একাকী সালাতের চেয়ে পচিশ গুণ বেশী। রাতের ফেরেশ্তা এবং দিনের ফেরেশ্তাগণ ফজরের সালাতে একত্রিত হন।" [বুখারীঃ ৬৪৮, মুসলিমঃ ৬৪৯]

(১) تهجد শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা بـه এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আর কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ সালাত পড়া। এ কারণেই শরী'আতের পরিভাষায় রাত্রিকালীন সালাতকে "তাহাজ্জুদ" বলা হয়। সাধারণতঃ এর অর্থ, এরূপ নেয়া হয় যে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে সালাত পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের সালাত। হাসান বসরী বলেনঃ এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। [ইবন কাসীর] তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থেই অনেকে তাহাজ্জুদ বুঝে থাকেন। সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের সালাত পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে। তাহাজ্জুদের সালাতের ব্যাপারে বহু হাদীসে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রমযানের সাওমের পর সবচেয়ে উত্তম হলো আল্লাহ্র মাস মুহররামের সাওম আর ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উত্তম সালাত হলো, রাতের সালাত"। [মুসলিমঃ ১১৬৩]

(২) نافلة শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব সালাত, দান-সদকা ওয়াজিব ও জরুরী নয়- করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে نافلة শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় এটাই বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের সালাত বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জন্যে নফল। অথচ সমগ্র উম্মতের জন্যেও নফল। এজন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে نافلة শব্দটিকে উম্মতের ওপর তো শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই ফরয; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব, এখানে نافلة শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরয। নফলের সাধারণ অর্থে নয়। [তাবারী] আবার কোন কোন মুফাসসির

রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে(১)।

বলেন, এখানে نافلة শব্দটি তার সাধারণ অর্থ অতিরিক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, তখন অর্থ হবেঃ আপনার যাবতীয় পূর্ব ও পরের গুণাহ মাফ হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার জন্য তাহাজ্জুদের সালাত অতিরিক্তই রয়ে গেল। [ইবন কাসীর] আপনার উম্মাতের জন্য সেটার প্রয়োজনীয়তা হলো, গোনাহ্ মাফ পাওয়া। কিন্তু আপনার জন্য তা মর্যাদা বৃদ্ধি কারক। কিন্তু নফল হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন যে, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا অর্থাৎ 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?' [মুসলিমঃ ২৮১৯]

(১) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাকামে মাহমুদের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। মাকামে মাহমূদ শব্দদ্বয়ের অর্থ, প্রশংসনীয় স্থান। এই মাকাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট-অন্য কোন নবীর জন্যে নয়। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ্ হাদীস সমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে "বড় শাফা'আতের মাকাম"। [ফাতহুল কাদীর] হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক নবীর কাছেই শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব নবীই শাফা'আত করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। তখন কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সমগ্র মানবজাতির জন্যে শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক উম্মত তার নিজের নবীর কাছে যাবে। তারা বলবে, হে অমুক (নবী)! আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। হে অমুক (নবী)! আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। (কিন্তু তারা কেউ শাফা'আত করতে রাযী হবেন না)। শেষ পর্যন্ত শাফা'আতের দায়িত্ব এসে পড়বে নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর। আর এই দিনেই আল্লাহ্ তাকে মাকামে মাহমূদে দাঁড় করাবেন। [বুখারীঃ ৪৭১৮] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়েমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদীলাহ ওয়াব'আসহু মাকামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়াদ্তাহূ" তার জন্য আমার শাফা'আত হালাল হয়ে যাবে। [বুখারীঃ৪৭১৯] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি এ আয়াতে مَقَامٌ مَحْمُود "মাকামে মাহমূদ তথা প্রশংসিত স্থান" সম্পর্কে বলেছেনঃ "এটা সে স্থান যেখান থেকে আমি আমার উম্মাতের জন্য শাফা'আত করব।" [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৪৪১, ৫২৮]

৮০. আর বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করান সত্যতার সাথে এবং আমাকে বের করান সত্যতার সাথে[১] এবং আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।'

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا ۝

৮১. আর বলুন, 'হক এসেছে ও বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে;' নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল[২]।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

(১) উপরোক্ত অনুবাদটি বাগভীর অনুকরণে করা হয়েছে। অন্য অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সন্তোষ যেভাবে হয় সেভাবে প্রবেশ করানো এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ যাতে রয়েছে সেভাবে বের করা। মূলতঃ مخرج ও مدخل এর অর্থ প্রবেশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صدق বিশ্লেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী ভাষায় صدق এমন কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যতঃ ও আভ্যন্তরীন উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে 'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদীনা এবং 'বহির্গমনের স্থান' বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্, মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। এই তাফসীরটি অনেক তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(২) এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করেছিলেন। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্‌র চতুর্পার্শ্বে তিনশ ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল, এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। [বুখারীঃ ২৪৭৮, ৪৭২০, মুসলিমঃ ১৭৮১] সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মিথ্যা অপসৃত হবেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১৮] আরো বলেন, "বলুন, 'সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নূতন কিছু সৃজন করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।' [সূরা সাবাঃ ৪৯] আরো বলেনঃ "আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আশ-শূরাঃ ২৪]

৮২. আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত[১], কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে[২]।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

৮৩. আর আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।

وَاِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾

৮৪. বলুন, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আপনার রব সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সবচেয়ে নির্ভুল।'

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

দশম রুকূ'

৮৫. আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে[৩]। বলুন, 'রূহ আমার রবের

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۗ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

(১) কুরআন যে অন্তরের ঔষধ এবং শির্ক, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। মুমিনরা এর দ্বারা উপকৃত হয় আর কাফেররা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

(২) অর্থাৎ যারা এ কুরআনকে নিজেদের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য তা নিরাময়। কিন্তু যেসব যালেম একে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পথ নির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ কুরআন তাদেরকে আরো বেশী ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেয়। একথাটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট তাৎপর্যবহ বাক্যের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ কুরআন হয় তোমার সপক্ষে প্রমাণ আর নয়তো তোমার বিপক্ষে প্রমাণ। [মুসলিমঃ ২২৩]

(৩) এ আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লেখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কুরআনে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই, যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ - প্রাণ যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কুরআন পাকের এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, ﴿فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ "তারপর আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে

পাঠালাম, সে তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।" [মারইয়ামঃ ১৭] এবং ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্যেও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কুরআনও ওহীকে রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন-﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ "এভাবে আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি এটাকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে পথনির্দেশ করি; আপনি তো দেখান শুধু সরল পথ"। [সূরা আস-শূরাঃ ৫২] কিন্তু এখানে রূহ বলে কি বোঝানো হয়েছে? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কুরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ অর্থাৎ ৮২ নং আয়াতে এ কুরআনের উল্লেখ ছিল এবং পরবর্তী আয়াতসমূহেও আবার ওহী ও কুরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ বলে ওহী, কুরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কুরআন এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি। [ফাতহুল কাদীর]

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা প্রাণীর মধ্যস্থিত রূহ সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ কি? মানবদেহে রূহ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করছিলঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করছেন। তাকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেনঃ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ তখন তারা পরস্পর বলল, তোমাদেরকে নিষেধ করিনি যে, তাকে প্রশ্ন করো না? [বুখারীঃ ১২৫, মুসলিমঃ ২৭৯৪] অন্য বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ কোরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম - কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

আদেশঘটিত[১] এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾

৮৬. আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তারপর এ বিষয়ে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতেন না[২]।

থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মাদের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। তদনুসারে কুরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রশ্ন প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। [মুসনাদে আহমাদ১/২৫৫, তিরমিযীঃ ৩১৪০, ইবনে হিব্বানঃ ৯৯, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৫৩১] এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতটিকে 'মাদানী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী।

(১) রূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বলুন! রূহ আমার প্রভুর নির্দেশঘটিত"। এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জওয়াবে তা বলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুসমূহের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ্ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্যে যথেষ্ট। এর বেশী জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয়। আল্লাহ্‌র তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারে। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত। বিশেষতঃ যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও

৮৭. তবে এটা প্রত্যাহার না করা আপনার রবের দয়া; নিশ্চয় আপনার প্রতি আছে তাঁর মহাঅনুগ্রহ[১]।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ⁨٨٧⁩

৮৮. বলুন, 'যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ⁨٨٨⁩

৮৯. 'আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হয়নি।'

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ⁨٨٩⁩

৯০. আর তারা বলে, 'আমরা কখনই তোমার উপর ঈমান আনব না, যতক্ষন না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে,

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ⁨٩٠⁩

৯১. 'অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রাসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না। আয়াতে আরেকটি দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, তা হলো, এ কুরআন ওহী হিসেবে আপনার কাছে আসে। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি যা এসেছে তাও প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বাস্তবিকই কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এ কুরআনকে মানুষের মন ও কিতাবের পাতা থেকে উঠিয়ে নেবেন। [দেখুন, সুনান ইবনে মাজাহঃ ৪০৪৯]

(১) এ কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করা, তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা, তাকে আল্লাহ্র বন্ধু মনোনীত করা অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ অনুগ্রহের কথা এ আয়াতে এবং কুরআনের অন্যত্রও এ অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। [যেমন, সূরা আন-নিসাঃ ১১৩, সূরা আল-ফাতহঃ ১-২, সূরা আশ-শারহঃ ১-৫]

الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা।

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

৯২. 'অথবা তুমি যেমন বলে থাক, সে অনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্তাদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে,

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۖ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

৯৩. 'অথবা তোমার একটি সোনার তৈরী ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষন তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে যা আমরা পাঠ করব(১)।' বলুন, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো হচ্ছি শুধু একজন মানুষ রাসূল(২)।'

---

(১) মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের প্রত্যেকের নামে চিঠি আসে না কেন? যাতে করে আমরা সে চিঠি সর্বদা বালিশের কাছে রেখে দিতে পারি। [ইবন কাসীর] কাফেরগণ যে এ ধরনের আলাদা আলাদা চিঠি দাবী করেছিল তার বর্ণনা অন্যান্য আয়াতেও এসেছে, বলা হয়েছে, "বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক"। [সূরা আল-মুদ্দাস্সিরঃ ৫২]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে যে কথাটি বুঝাতে চাচ্ছেন তা হলো, যদি তারা যা চায় তা দেয়াও হয় তারপরও তারা ঈমান আনবে না। কেননা যারা হতভাগা, যাদের ঈমান আনার ইচ্ছা নেই তারা এরপরও আরো অনেক কিছু খুঁজে বেড়াবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটিকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম আর তারা যদি সেটা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবুও কাফিররা বলত, 'এটা স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।" [সূরা আল-আন'আমঃ৭] অন্যত্র বলেছেন, "তারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা এতে ঈমান আনত। বলুন, 'নিদর্শন তো আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত। তাদের কাছে নিদর্শন আসলেও তারা যে ঈমান আনবে না এটা কিভাবে তোমাদেরকে বোঝান যাবে? [সূরা আল-আন'আমঃ ১০৯] আরো বলেছেনঃ "আমি তাদের কাছে

এগারতম রুকূ'

৯৪. আর যখন মানুষের কাছে হিদায়াত আসে, তখন তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে কেবল তাদের এ কথা যে, 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন(১)?'

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰىٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوٓا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾

৯৫. বলুন, 'ফিরিশ্‌তাগণ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে যমীনে বিচরণ করত তবে আমরা আসমান থেকে তাদের কাছে অবশ্যই ফিরিশ্‌তা রাসূল করে পাঠাতাম।'

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾

ফিরিশ্‌তা পাঠালেও এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না" [সূরা আল-আন'আমঃ১১১] আবার অন্য জায়গায় বলেছেন, "যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহন করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।" [সূরা আল-হিজরঃ ১৪-১৫] আরো বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, এমনকি তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।" [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭]

(১) অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকে যে, মানুষ কখনো রাসূল হতে পারে না। তাই যখন কোন রাসূল এসেছেন এবং তারা দেখেছে তিনি পানাহার করছেন, তাঁর স্ত্রী-সন্তানাদি আছে , তিনি রক্ত -মাংসের মানুষ তখন তারা ফায়সালা দিয়ে বসেছে যে, এ ব্যক্তি রসূল নয়, কারণ এতো মানুষ। কুরআনের অন্যান্য বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। [যেমন, সূরা ইউনুসঃ ২, সূরা আত-তাগাবুনঃ৬, সূরা আল-মূমিনূনঃ ৪৭, সূরা ইবরাহীমঃ ১০] এভাবে তার জীবদ্দশায় তারা তাকে রাসূল হিসেবে মানেনি আর তিনি চলে যাবার দীর্ঘকাল পর তাঁর ভক্তদের মধ্যে এমনসব লোক জন্ম নিতে থাকে যারা বলতে থাকে, তিনি মানুষ ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন রসূল । ফলে কেউ তাঁকে আল্লাহ বানিয়েছে, কেউ বানিয়েছে আল্লাহর পুত্র, আবার কেউ বলেছে আল্লাহ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। মোটকথা মানবিক সত্তা ও নবুওয়াতী সত্তার একই সত্তার মধ্যে একত্র হওয়া হামেশা মূর্খদের কাছে একটি হেঁয়ালি হয়েই থেকেছে।

৯৬. বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট[১];

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বনী ইসরাঈলের এক লোক বনী ইসরাঈলের অপর এক লোকের নিকট এক হাজার দীনার কর্জ চাইল। কর্জদাতা বললঃ কয়েকজন সাক্ষী আনুন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। কর্জগ্রহীতা বললঃ সাক্ষীর জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বলল, তবে একজন যামিন উপস্থিত করুন। কর্জগ্রহীতা বললঃ যামিন হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বললঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার কর্জ দিয়ে দিল। তারপর কর্জগ্রহীতা সমূদ্র যাত্রা করল এবং তার ব্যবসায়িক প্রয়োজন সমাধা করল। তারপর সে বাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে সে কর্জদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোন রূপ বাহন সে পেল না। অগত্যা সে এক টুকরা কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করে কর্জদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। তারপর ঐ কাঠখন্ডটা নিয়ে সমুদ্র তীরে গিয়ে বললঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তো জান, আমি অমুকের কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ চাইলে সে আমার কাছে যামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, যামিন হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, এতে সে রাযী হয়েছিল। সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার প্রাপ্য তার কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাঠখন্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তারপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য বাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে কর্জদাতা নির্ধারিত দিনে এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা দেনাদার তার পাওনা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাঠখন্ডটি তার নজরে পড়ল যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ি নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরাটি চিরল তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠি সে পেয়ে গেল। কিছুকাল পর দেনাদার লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পাওনাদারের নিকট এসে হাজির হলো এবং বললঃ আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার মাল যথা সময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু যে জাহাজটিতে করে আমি এখন এসেছি এটির আগে আর কোন জাহাজই পেলাম না। কর্জদাতা বললঃ আপনি কি আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছিলেন? দেনাদার বললঃ আমি তো আপনাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাজই আমি পাইনি। কর্জদাতা বললঃ আপনি কাঠের টুকরোর ভিতরে করে যা পাঠিয়েছিলেন তা আল্লাহ্ আপনার হয়ে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে ফিরে চলে আসল। [বুখারীঃ ২২৯১]

بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾

নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত, পূর্ণদ্রষ্টা।'

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. আর আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক পাবেন না। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে[১]। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব[২]।

---

(১) অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যে অবস্থায় ছিল, সত্যকে দেখতে পেতো না, সত্য কথা শুনতে পেতো না এবং সত্য কথা বলতো না, ঠিক তেমনিভাবেই কিয়ামতেও তাদেরকে উঠানো হবে। তারা অন্ধ হিসেবে উঠার কি অর্থ তা এ সূরার ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বধির ও মূক হিসেবে হাশরের মাঠে উঠানোর অর্থ করা হয়েছে যে, তারা এমন মূক হবে যে, দুনিয়াতে তাদের যে সমস্ত আজে বাজে চিন্তাধারাকে দলীল হিসেবে পেশ করত তখন তারা তা পেশ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা খুশীর কিছু শুনতে পাবে না। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, তারা তাদের মুখের উপর দিয়ে চলবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাফের কিভাবে তার চেহারার উপর হাশরের দিন চলবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ের উপর হাঁটতে দিয়েছেন তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের উপর হাঁটাতে পারবেন না?"। [বুখারী৪৭৬০, মুসলিমঃ ২৮০৬]

(২) আয়াতের অর্থে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের আগুন যখনই কিছুটা স্তিমিত হবে তখনই তার আগুনে নতুন মাত্রা যোগ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তাদের নতুন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে যাতে শাস্তি ভোগ করতে পারে। [তাবারী] সে হিসেবে এ আয়াতটি সূরা আন-নিসাঃ৫৬ নং আয়াতের সমার্থবোধক।

৯৮. এটাই তাদের প্রতিদান, কারণ তারা আমাদের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, 'অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও আমরা কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব[১]?'

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৯. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান[২]? আর তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যালিমরা কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হয়নি।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

১০০. বলুন, 'যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এ আশংকায় তোমরা তা ধরে রাখতে; আর মানুষ তো খুবই কৃপণ[৩]।'

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য এ সূরারই ৪৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

(২) এ অর্থে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আরো আয়াত এসেছে। [যেমন, সূরা গাফিরঃ ৫৭, সূরা ইয়াসিনঃ ৮১, সূরা আল-আহক্বাফঃ ৩৩, সূরা আন-নাযি'আতঃ ২৭-৩৩]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রহমতের ভান্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভান্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র রহমতের ভান্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌র হাত পরিপূর্ণ, খরচে তা কমেনা, দিন রাতে প্রচুর প্রদানকারী, তোমরা কি দেখ না যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টির সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু তিনি খরচ করেছেন তাতে তার ডান হাতের মধ্যস্থিত কিছুই কমেনি।" [বুখারীঃ ৭৪১৯, মুসলিমঃ৯৯৩] কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। [দেখুন, সূরা আল-মা'আরিজঃ ১৯-২২] অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

বারতম রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِذْ جَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১০১. আর আমরা মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম[১]; সুতরাং আপনি বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন; যখন তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন, অতঃপর ফির'আউন তাঁকে বলেছিল, 'হে মূসা! আমি মনে করি নিশ্চয় তুমি জাদুগ্রস্ত।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَاۤءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ

১০২. মূসা বললেন, তুমি অবশ্যই জান[২]

(১) এখানে আবার মক্কার কাফেরদের মু'জিযা পেশ কবার দাবীর জবাব দেযা হয়েছে এবং এটি তৃতীয় জবাব। কাফেররা বলতো, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি অমুক অমুক কাজগুলো করে দেখাবে। জবাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের পূর্বে ফির'আউন মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এ ধরনের 'আয়াত' চেয়েছে। (পবিত্র কুরআনে "আয়াত" শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক, নিদর্শন দুই, কিতাবের আয়াত অর্থাৎ আহকামে এলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। তবে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে "আয়াত" দ্বারা নিদর্শন বা মু'জেযা অর্থ নিয়েছেন।) তখন মূসা আলাইহিসসালামকে আল্লাহ্ নয়টি প্রকাশ্য "আয়াত" দিয়েছিলেন। অর্থাৎ একটি দু'টি নয় পরপর ৯টি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখানো হয়েছিল। তারপর এতসব মু'জিযা দেখার পরও যখন সে নবীকে অস্বীকার করলো তখন তার পরিণতি কি হলো তা তোমরা জানো। এখানে নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় 'আয়াতের সংখ্যা' নয়ের বেশী না হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। সে নয়টি নিদর্শন নির্দিষ্টকরণে অনেক মতভেদ আছে, তবে তম্মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত হলো, (১) মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, (২) শুভ্র হাত, যা জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, (৩) ফল-ফলাদির অভাব হওয়া। (৪) দুর্ভিক্ষ লাগা (৫) অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, (৬) তুফান প্রেরণ করা, (৭) শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং (৯) রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে ফির'আউনকে বলা হচ্ছে যে, 'মূসা আলাইহিসসালাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা রাব্বুল আলামীনই যে নাযিল করেছেন তা সে জানে'। এভাবে কুরআনের অন্য আয়াতেও তাই বলা হয়েছে, যেমন, সূরা আন-নামলে বলা হয়েছে, "তারা অন্যায় ও

وَالْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

যে, এ সব স্পষ্ট নিদর্শন আসমানসমূহ ও যমীনের রবই নাযিল করেছেন---প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। আর হে ফির'আউন! আমি তো মনে করছি তুমি হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর ফির'আউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করল; তখন আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম(১)।

وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর আমরা এরপর বনী ইস্‌রাঈলকে বললাম, 'তোমরা যমীনে বসবাস কর এবং যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সবাইকে আমরা একত্র করে উপস্থিত করব।

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا

১০৫. আর আমরা সত্য-সহই কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্য-সহই

উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!" [১৪] এতে করে একথা স্পষ্ট হলো যে, ফির'আউন অবশ্যই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল কিন্তু সে তা অহংকার বশতঃ অস্বীকার করেছিল।

(১) এটিই হচ্ছে এ কাহিনীটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদেরকে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবের মাটি থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে আপনার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে থাকত"। [সূরা আল-ইসরাঃ ৭৬] তাই তাদেরকে শুনানো হচ্ছে, ফির'আউন এসব কিছু করতে চেয়েছিল মূসা ও বনী ইসরাঈলের সাথে। কিন্তু কার্যত হয়েছে এই যে, ফির'আউন ও তার সাথীদেরকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে মূসা ও তার অনুসারীদেরকে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন তোমরাও যদি এ একই পথ অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের পরিণামও এর থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।

وَّنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

নাযিল হয়েছে[১]। আর আমরা তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. আর আমরা কুরআন নাযিল করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে; যাতে আপনি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারেন ক্রমে ক্রমে এবং আমরা তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি[২]।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. বলুন, 'তোমরা কুরআনে ঈমান আন আর নাই ঈমান আন, নিশ্চয় যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা তেলাওয়াত করা হয় তখনই তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে।'

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর তারা বলে, 'আমাদের রব পবিত্র, মহান। আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে।'

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

---

(১) আয়াতের ভাবার্থ হলো, আমরা এ কুরআনকে হক তথা সঠিক তথ্যসম্বলিত করে নাযিল করেছি। তাতে আল্লাহ্ তাঁর আপন ইলম যা তিনি তোমাদেরকে জানাতে চেয়েছেন যেমন তার নির্দেশ, নিষেধ, হুকুম-আহকামসমূহ সম্বলিত করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, 'আর এ কুরআন হক তথা সঠিকভাবেই নাযিল হয়েছে'। অর্থাৎ হে নবী! এ কুরআন আপনার কাছে সংরক্ষিত, অবিকৃত ও অমিশ্রিতভাবে, কোন কিছু বেশী বা কম না করেই নাযিল হয়েছে। কেননা, এটা তো সে মহাশক্তিশালী স্বত্তার পক্ষ থেকে এসেছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কুরআনকে একত্রে নাযিল না করে খন্ড খন্ড ভাবে নাযিল করার একটি কারণ বর্ণনা হয়েছে। আর তা হল. পরিবেশ পরিস্থিতি, প্রশ্নোত্তর ও রাসূলের অন্তরকে প্রশান্তি প্রদান করা। তবে আল্লাহ্ তা'আলা লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে এ কুরআনকে পুরোপুরি নাযিল করে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজ্জতে নাযিল করেছেন বলে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৬৮, ইবনে হাজার আল-আসকালানীঃ ফাতহুল বারীঃ ৪/৯]

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

১১০. বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক বা 'রাহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। আর আপনি সালাতে স্বর খুব উচ্চ করবেন না আবার খুব ক্ষীণও করবেন না; বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন(১)।

---

(১) এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে এসেছে যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে উঁচুস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত এবং কুরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৭২২, মুসলিমঃ ৪৪৬] এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যেত এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে সালাতে কুরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে সশব্দে পঠিত সালাতসমূহের জন্যে। যোহর ও আসরের নামাযে নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জাহরী বা উচ্চঃস্বরে পড়তে হয় এমন সালাত বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার সালাত বোঝায়। তাহাজ্জুদের সালাতও এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু - এর কাছ দিয়ে গেলে আবু বকরকে নিঃশব্দে এবং ওমরকে উচ্চঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু - কে বললেনঃ আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেনঃ যাঁকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা গোপনতম আওয়াযও শ্রবণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর ওমরকে বললেনঃ আপনি এত উচ্চঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেনঃ আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্যে উচ্চঃস্বরে পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ দিলেন, যে একটু অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। [তিরমিযীঃ৪৪৭] তবে তাহাজ্জুদের সালাতে ইচ্ছা করলে কেরাত উচ্চস্বরে পড়তে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিচুস্বরেও পড়তে

১১১. বলুন, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি[1], তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই[2] এবং দুর্দশাগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন নেই[3]। আর

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

পারে। এ ব্যাপারে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। [দেখুনঃ তিরমিযীঃ ৪৪৮] তবে এ আয়াতে বর্ণিত "সালাত" শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আরো কিছু মত রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, এ আয়াতে সালাত বলতে দো'আ বুঝানো হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৭২৩, মুসলিমঃ ৪৪৭]। সুতরাং সে অনুসারে দো'আ করতে স্বর খুব উঁচু করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(১) এখানে প্রত্যক্ষভাবে রাসূলকে নির্দেশ দেয়া হলেও নির্দেশটি সমস্ত উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য। সবাইকে তাওহীদের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাওহীদের এ অংশের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ এসেছে। [যেমন, সূরা ইখলাস, সূরা আল-জিনঃ৩, সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১, সূরা আল-আন'আমঃ ১০১, সূরা আল-বাকারাহঃ ১১৬, সূরা ইউনুসঃ ৬৮, সূরা আল-কাহফঃ ৪, সূরা মারইয়ামঃ ৮৮-৯২, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৬, সূরা আল-ফুরকানঃ ২] এ সমস্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, দয়াময় আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান গ্রহণ অসম্ভব। সন্তান তো তারাই আশা করে যারা তাদের অবর্তমানে তাদের কাজকারবার দেখাশুনা, তাদের নাম টিকিয়ে রাখা, তাদের চাহিদা পূরণ, তাদের কর্মকাণ্ডে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত কিছু থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি সর্বদা আছেন ও থাকবেন। তার কোন অভাব নেই। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং আল্লাহ্‌র কোন সন্তান হতে পারে না। এতে ইয়াহূদী ও নাসারাদের দাবীর রদ করা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আরও যে সমস্ত কারণে মানুষ তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয় তা হচ্ছে, কোন কোন মানুষ মনে করে থাকে যে, যদি তার সন্তান নাও থাকে তার রাজত্বে ও রবুবিয়াতে অন্য কেউ শরীক আছে। সুতরাং তাদেরকেও সন্তুষ্ট করা উচিত। যেমন, মাজুস সম্প্রদায় মনে করে থাকে। তারা দু'জন ইলাহ নির্ধারণ করে থাকে। [ফাতহুল কাদীর] অনুরূপভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে এ ধরনের বিশ্বাস করে থাকে।

(৩) এখানে সে সমস্ত মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে যারা বিভিন্ন দেবতা ও জ্ঞানী গুণী মহামানবদের সম্পর্কে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজের রাজত্বের বিভিন্ন এলাকা তাদের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দিয়েছেন। এখানে তাদের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন কাজ করতে গিয়ে অপর কাজ করতে অপারগ হয়ে পড়েন।

আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন ।'

সুতরাং তার সহকারী কেন লাগবে? সুতরাং তাদের যে বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ নিজে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বোঝা বহন করতে অক্ষম, তাই তিনি নিজের জন্য কোন সাহায্যকারী ও নির্ভর তালাশ করে বেড়াচ্ছেন । এটা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস । তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ অক্ষম নন । তাঁর কোন ডেপুটি, সহকারী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই । [দেখুন, ইবন কাসীর]

১৮- সূরা আল-কাহ্‌ফ

سُورَةُ الكَهْفِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা আল-কাহাফ। কারণ সূরার মধ্যে কাহাফ বা গুহাবাসীদের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আয়াত সংখ্যাঃ ১১০।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা আল-কাহাফ মক্কায় নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী]

সূরার কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে'। [আবু দাউদঃ ৪৩২৩, আহমাদঃ ৬/৪৪৯] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের শেষ দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকবে'। [মুসলিমঃ ৮০৯] অন্য এক হাদীসে বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক লোক সূরা আল-কাহাফ পড়ছিল তার ঘরে ছিল একটি বাহন। বাহনটি বারবার পালাচ্ছিল। সে তাকিয়ে দেখল যে, মেঘের মত কিছু যেন তাকে ঢেকে আছে। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেটা বর্ণনা করার পর রাসূল বললেন: হে অমুক! তুমি পড়। এটাতো কেবল 'সাকীনাহ' বা প্রশান্তি যা কুরআন পাঠের সময় নাযিল হয়। [বুখারী: ৩৬১৪, মুসলিম: ৭৯৫]। অন্য হাদীসে এসেছে, 'যে কেউ শুক্রবারে সূরা আল-কাহাফ পড়বে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত সে নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৬৮, সুনান দারমী ২/৪৫৪] অপর হাদীসে এসেছে, 'যেভাবে সূরা আল-কাহাফ নাযিল হয়েছে সেভাবে কেউ তা পড়লে সেটা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর বা আলোকবর্তিকা হবে'। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৫৬৪]

।। রহমান রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন[১] এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি[২];

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ

---

(১) সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ্ নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। এ ধরনের প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। প্রথম ও শেষ সর্বাবস্থায় শুধু তাঁরই প্রশংসা করা যায়। তিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কিতাব নাযিল করেছেন সুতরাং তিনি প্রশংসিত; কারণ এর মাধ্যমে তিনি মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন। এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী-ই বা আছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোন কথাবার্তা নেই যা বুঝতে পারা যায় না। আবার সত্য ও

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٢

২. সরলরূপে[১], তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং মুমিনগণ যারা সৎকাজ করে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার,

مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝٣

৩. যাতে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে,

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝٤

৪. আর সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন[২],

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝٥

৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে[৩]।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا

৬. তারা এ বাণীতে ঈমান না আনলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে আপনি

ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত এমন কথাও নেই যা মেনে নিতে কোন সত্যপন্থী লোক ইতস্তত করতে পারে। [ইবন কাসীর]

(১) এমন সরল ও সহজরূপে যে তাতে নেই কোন স্ববিরোধিতা। [মুয়াসসার]

(২) যারা আল্লাহর সন্তান-সন্ততি আছে বলে দাবী করে এদের মধ্যে রয়েছে নাসারা, ইহুদী ও আরব মুশরিকরা। [ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া পাক-ভারতের হিন্দুরাও আল্লাহ্র জন্য সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করে থাকে।

(৩) অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, অমুক আল্লাহর পুত্র অথবা অমুককে আল্লাহ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এগুলো তারা এ জন্য বলছে না যে, তাদের আল্লাহর পুত্র হবার বা আল্লাহর কাউকে পুত্র বানিয়ে নেবার ব্যাপারে তারা কিছু জানে। বরং নিছক নিজেদের ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ির কারণে তারা একটি মনগড়া মত দিয়েছে এবং এভাবে তারা যে কত মারাত্মক গোমরাহীর কথা বলছে এবং বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভূ আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কত বড় বেয়াদবী ও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই। এভাবে তারা নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হচ্ছে তেমনি ভ্রষ্ট করছে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾

দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন[১]।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

৭. নিশ্চয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমরা সেগুলোকে তার শোভা করেছি[২], মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

৮. আর তার উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমরা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব[৩]।

---

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সে সময় যে মানসিক অবস্থার টানাপোড়ন চলছিল এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি তাদের হিদায়াতের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার এ মানসিক অবস্থাকে একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো যে আলোর জন্য আগুন জ্বালালো কিন্তু পতংগরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো পুড়ে মরার জন্য। সে এদেরকে কোনক্রমে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু এ পতংগরা তার কোন প্রচেষ্টাকেই ফলবতী করতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়ছো।" [বুখারীঃ ৩২৪৪, ৬১১৮ ও মুসলিমঃ ২২৮৪]। সূরা আশ্ শু'আরার ৩ নং আয়াতেও এ ব্যাপারে আলোচনা এসেছে।

(২) অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি- এগুলো সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'দুনিয়া সুমিষ্ট নয়নাভিরাম দৃশ্যে ভরা, আল্লাহ্ এতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে দেখতে চান তোমরা এতে কি ধরনের আচরণ কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়ায় মত্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক এবং মহিলাদের থেকেও বেঁচে থাক। কেননা; বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম ফিতনা ছিল মহিলাদের মধ্যে। [মুসলিম: ২৭৪২]

(৩) অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে তোমরা এই যেসব সাজ সরঞ্জাম দেখছো এবং যার মন ভুলানো চাকচিক্যে তোমরা মুগ্ধ হয়েছ, এতো নিছক একটি সাময়িক সৌন্দর্য, নিছক তোমাদের পরীক্ষার জন্য এর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এসব কিছু আমি তোমাদের আয়েশ আরামের জন্য সরবরাহ করেছি, তোমরা এ ভুল ধারণা করে বসেছো। এগুলো আয়েশ আরামের জিনিস নয় বরং পরীক্ষার উপকরণ। যেদিন এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সেদিনই ভোগের এসব সরঞ্জাম খতম করে দেয়া হবে এবং তখন এ পৃথিবী

৯. আপনি কি মনে করেন যে, কাহ্ফ[১] ও রাকীমের[২] অধিবাসীরা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর[৩]?

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝

একটি লতাগুল্মহীন ধূ ধূ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) كهف-এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। [কুরতুবী]

(২) رَقِيْم-এর শাব্দিক অর্থ مرقوم বা লিখিত বস্তু। এ স্থলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে-
(এক) সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশপথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে কাহ্ফকে রকীমও বলা হয়।
(দুই) মুজাহিদ বলেন, রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে কাহ্ফের গুহা ছিল।
(তিন) ইবন আব্বাস বলেন, সে পাহাড়টিই রকীম।
(চার) ইকরিমা বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না কি জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই।
(পাঁচ) কা'ব আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। [ইবন কাসীর]
মূলতঃ 'আসহাবে কাহ্ফ' ও 'আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? এ মতভেদ নিয়েই উপরোক্ত মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যদিও কোন সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ্' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। ইমাম বুখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তার মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল। হাফেজ ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম একই দল।

(৩) অর্থাৎ যে আল্লাহ্ এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, রাত-দিনের ব্যবস্থা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্ররাজিকে তাদের কক্ষপথে নিয়মবদ্ধ করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার পক্ষে কয়েকজন লোককে দু'তিনশো বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখা তারপর তাদেরকে ঘুমাবার আগে তারা যেমন তর-তাজা ও সুস্থ-সবল ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় জাগিয়ে তোলা কি তোমরা কিছুমাত্র অসম্ভব বলে মনে কর? যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে কেউ কখনো

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের রব! আপনি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন[১]।'

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ⑩

১১. অতঃপর আমরা তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম[২],

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ⑪

১২. পরে আমরা তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম জানার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন্‌টি[৩] তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ⑫

দ্বিতীয় রুকূ'

১৩. আমরা আপনার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি: তারা তো

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ

চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে একথা কেউ মনে করতে পারে না যে, আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ। মহান আল্লাহ্‌র জন্য তো এটা ক্ষুদ্র ব্যাপার। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এ ধরনের দো'আ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও করতেন এবং উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন: اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْداً "হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আপনি যা ফয়সালা করেছেন সেগুলোর সুন্দর সমাপ্তি দিন"। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮১]

(২) ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾ -এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ মতবিরোধে লিপ্ত দু'টি দলের মধ্যে কারা তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারে। এখানে জানা অর্থ, প্রকাশ করা। [ফাতহুল কাদীর]

ছিল কয়েকজন যুবক(১), তারা তাদের রব-এর উপর ঈমান এনেছিল(২) এবং

آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

(১) فتية শব্দটি فتى এর বহুবচন, অর্থ যুবক। [ফাতহুল কাদীর] তাফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়াত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক। [ইবন কাসীর]

(২) আসহাবে কাহ্ফের স্থান ও কাল নির্ণয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। এগুলোর কোন্‌টি যে সঠিক সে ব্যাপারে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে দু’টি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাদের একদলের মত হলো, আমাদেরকে শুধু এ ঘটনার শুদ্ধ হওয়া ও তা থেকে শিক্ষা নেয়ার উপরই প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তাদের স্থান ও কাল নির্ধারনে ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্য একদল মুফাসসির ও ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পেশ করার মাধ্যমে কাহিনীটি বোঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চেয়েছেন। তাদের অধিকাংশের মতে, আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাটি ঘটে আফসোস নগরীতে। হাফেয ইবন কাসীর রাহেমাহুল্লাহ তার তাফসীরে এ সাতজন যুবকের কালকে ঈসা আলাইহিসসালামের পূর্বেকার ঘটনা বলে মত দিয়েছেন। ইয়াহূদীগণ কর্তৃক এ ঘটনাটিকে বেশী প্রাধান্য দেয়া এবং মক্কার মুশরিকদেরকে এ বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করতে শিখিয়ে দেয়াকে তিনি তার মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটিকে ঈসা আলাইহিসসালামের পরবর্তী ঘটনা বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাদের মতে, ঈসা আলাইহিস সালামের পর যখন তার দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবকও শির্ক থেকে তাওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাদের যে বর্ণনা এসেছে তা সংক্ষেপ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তরের কথা শুনে তৎকালীন রাজা তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি? তারা জানতেন, এ রাজা ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোন প্রকার শংকা না করে পরিষ্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো। রাজা প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো, নয়তো আমি এখনই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো। তারপর কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, তোমরা এখনো শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত

বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভাল, নয়তো তোমাদের শিরচ্ছেদ করা হবে। এ তিন দিন অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটাকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সংগ ত্যাগ করতে রাযী হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর বিস্তৃত গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়েন। কয়েকশত বছর পর তারা জেগে উঠেন। তখন ছিল অন্য রাজার শাসনামল। রোম সাম্রাজ্য তখন নাসারাধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আফসোস শহরের লোকেরাও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল।

এটা ছিল এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে জমায়েত ও হিসেব নিকেশ হওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছিল। আখেরাত অস্বীকারের বীজ লোকদের মন থেকে কিভাবে নির্মূল করা যায় এ ব্যাপারটা নিয়ে কাইজার নিজে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দো'আ করেন যেন তিনি এমন কোন নির্দশন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই এ যুবকরা ঘুম থেকে জেগে উঠেন। জেগে উঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? কেউ বলেন একদিন, কেউ বলেন দিনের কিছু অংশ। তারপর আবার একথা বলে সবাই নীরব হয়ে যান যে এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। এরপর তারা নিজেদের একজন সহযোগীকে রূপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান। তারা ভয় করছিলেন, লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং মূর্তি পূজা করার জন্য আমাদের বাধ্য করবে। কিন্তু লোকটি শহরে পৌঁছে সবকিছু বদলে গেছে দেখে অবাক হয়ে যান। একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকানদারকে একটি মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায়ে অনেক পুরাতন দিনের সম্রাটের ছবি ছাপানো ছিল। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, এ মুদ্রা কোথায় পেলে? লোকটি বলে, এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। লোকদের ভীড় জমে উঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পৌঁছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্ত ধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। সে বলেন, কিসের গুপ্তধন? এ আমার নিজের টাকা। কোন গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন, তোমার একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা এনেছো এতো কয়েক শো বছরের পুরনো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা

আমরা তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম[১],

১৪. আর আমরা তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, 'আমাদের রব। আসমানসমূহ ও যমীনের রব। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকব না; যদি ডাকি, তবে তা হবে খুবই গর্হিত কথা।

وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

১৫. 'আমাদের এ স্বজাতিরা, তারা তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে।

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ

দেখেনি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। লোকটি যখন শোনেন অত্যাচারী যালেম শাসক মারা গেছে বহুযুগ আগে তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি এবং আমার ছয়জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং যালেম বাদশার যুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। লোকটির একথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন। বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায়। তারা যে যথার্থই অনেক আগের সম্রাটের আমলের লোক সেখানে পৌঁছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনার খবর তৎকালীন সম্রাটের কাছেও পাঠানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন। তারপর হঠাৎ তারা সাতজন গুহার মধ্যে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে। এ সুস্পষ্ট নির্দশন দেখে লোকেরা যথার্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে। এ ঘটনার পর সম্রাটের নির্দেশে গুহায় একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করা হয়। [বিস্তারিত দেখুন, কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; তাফসীর ও আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ২/৫৭০]

(১) আয়াতের অর্থ হলো, যখন তারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনলো তখন আল্লাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমে সঠিকপথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের ন্যায় ও সত্যের উপর অবিচল থাকার সুযোগ দিলেন। তারা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে কিন্তু বাতিলের কাছে মাথা নত করবে না। এ আয়াত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি সুস্পষ্ট দলীল যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অনুরূপ দলীল সূরা মুহাম্মাদ এর ১৭, সূরা আত-তাওবার ১২৪ এবং সূরা আল-ফাতহ এর ৪ নং আয়াতেও এসেছে।

عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ۗ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

এরা এ সব ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? অতএব যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে?'

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের 'ইবাদাত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর[১]। তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনোপকরণের বিষয়টি সহজ করে দিবেন[২]।

(১) এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোথাও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, সেখানে অবস্থান করলে তাওহীদ ও ঈমান বজায় রাখা সম্ভব হবে না তখন সেখান থেকে হিজরত করতে হবে। যেখানে গেলে দ্বীন নিয়ে থাকতে পারবে সেখানে তাকে যেতে হবে। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন একজন ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে কিছু ছাগল পাল যেগুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চুড়া এবং বৃষ্টিস্নাত ভূমির পিছনে ছুটতে থাকবে। তার মূল উদ্দেশ্য হবে ফিতনা থেকে তার নিজ দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখা। [বুখারী: ১৯, ৩৩০০, সুনান আবু দাউদ: ৪২৩৭, মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৩] [ইবন কাসীর]

(২) তারা যখন তাদের দ্বীন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল মহান আল্লাহ্ তখন তাদের জন্য তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সহজ সরল করে দিলেন। তারা পালিয়ে গুহাতে আশ্রয় নিল, তাদের জাতি তাদেরকে খুজে বের করতে অসমর্থ হলো এমনকি তৎকালীন বাদশাহও তাদের ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করে শেষে অপারগ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরকেও এমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে রক্ষা করেছিলেন। তারা উভয়ে সাওর গিরি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুরাইশরা তাদের পিছু নিয়ে গর্তের মুখে প্রায় চলে আসছিল কিন্তু তারা তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারল না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটু ভীত হয়ে বলেই ফেললেন, রাসূল! যদি তারা তাদের পায়ের নীচে তাকিয়ে দেখে তবে আমাদের দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্ত চিত্তে উত্তর করলেন: 'আবু বকর! যে দু'জনের জন্য তৃতীয় জন আল্লাহ্

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

১৭. আর আপনি দেখতে পেতেন- সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহার ডান পাশে হেলে যায় এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে[১], অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে, এ সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট

রয়েছেন তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?' [বুখারী: ৩৬৫৩, মুসলিম: ২৩৮১] মহান আল্লাহ্ গুহাবস্থানের এ ঘটনাটিকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে বলেছেন: "যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তাঁর সংগীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে আছেন।' তারপর আল্লাহ্ তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪০] সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুহাবস্থানের ঘটনা আসহাবে কাহফের গুহাবস্থানের ঘটনা থেকে অধিক মর্যাদা, গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক।

(১) আয়াতের অর্থ বর্ণনায় দু'টি মত রয়েছে। এক, তারা গুহার এক কোনে এমনভাবে আছে যে, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে না। স্বাভাবিক আড়াল তাদেরকে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করছে। কারণ, তাদের গুহার মুখ ছিল উত্তর দিকে। এ কারণে সূর্যের আলো কোন মওসূমেই গুহার মধ্যে পৌঁছুতো না এবং বাহির থেকে কোন পথ অতিক্রমকারী দেখতে পেতো না গুহার মধ্যে কে আছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]
দুই, তারা একটি প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করা সত্বেও দিনের বেলার আলো সূর্যের উদয় বা অস্ত কোন অবস্থায়ই তাদের কাছে পৌঁছে না। কেননা, মহান আল্লাহ্ তাদের সম্মানার্থে এ অলৌকিক ব্যবস্থা করেছেন। প্রশস্ত স্থানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে কোন বাধা না থাকলেও তিনি তার স্পেশাল ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে সূর্যের আলোর তাপ থেকে রক্ষা করেছেন। এ অর্থের সপক্ষে প্রমাণ হলো এর পরে বর্ণিত মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "এটা তো আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম"। যদি স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা হতো তবে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বলার প্রয়োজন ছিল না। [ফাতহুল কাদীর] ইবনে আব্বাস বলেন, সূর্যের আলো যদি তাদের গায়ে লাগত তবে তাদের কাপড় ও শরীর পুড়ে যেতে পারত। [ইবন কাসীর]

করেন, আপনি কখনো তার জন্য কোন পথনির্দেশকারী অভিভাবক পাবেন না ।

তৃতীয় রুকূ'

১৮. আর আপনি মনে করতেন তারা জেগে আছে, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত[১] । আর আমরা তাদেরকে পাশ ফিরাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে[২] এবং তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহার দরজায় প্রসারিত করে । যদি আপনি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখতেন, তবে অবশ্যই আপনি পিছন ফিরে পালিয়ে যেতেন । আর অবশ্যই আপনি তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তেন[৩];

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

১৯. আর এভাবেই[৪] আমরা তাদেরকে

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ

(১) অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে গুহায় অবস্থানকালে দেখতে পেতেন তাহলে মনে করতেন যে, তারা জেগে আছে অথচ তারা ঘুমন্ত। তাদেরকে জেগে আছে মনে করার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, তারা পাশ ফিরাচ্ছে । আর যারা পাশ ফিরে শুতে পারে তারা সামান্য হলেও জাগ্রত হয় । অথবা কারও কারও মতে, তারা ঘুমন্ত হলেও তাদের চোখ খোলা থাকত । [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ কেউ বাইর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেও তাদের সাতজনের মাঝে মাঝে পার্শ্বপরিবর্তন করতে থাকার কারণে এ ধারণা করতো যে, এরা এমনিই শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে না । পার্শ্ব পরিবর্তনের কারণ কারও কারও মতে, যাতে যমীন তাদের শরীর খেয়ে না ফেলে । [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে একটি অন্ধকার গুহায় কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনের দিকে কুকুরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতো তারাই ভয়ে পালিয়ে যেতো । তাছাড়া আল্লাহ্ তাদের উপর ভীতি ঢেলে দিয়েছিলেন, সুতরাং যে কেউ তাদের দেখত, তারই ভয়ের উদ্রেক হতো । [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৪) وَكَذَٰلِكَ এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয় । এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে । প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ﴾ আয়াতে ব্যক্ত

مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

জাগিয়ে দিলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে[১]। তাদের একজন বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ?' কেউ কেউ বলল, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ।' অপর কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ তা তোমাদের রবই ভাল জানেন[২]। সুতরাং তোমরা

করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كذلك ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর] এখানে বর্ণিত ليتساءلوا এর ل টিকে বলা হয়, لام صيرورة বা لام العاقبة যার অর্থ পরিণামে যাতে এটা হয়। অর্থাৎ তাদেরকে জাগ্রত করার পরিণাম যেন এই দাঁড়ায়। [কুরতুবী] মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শতশত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহ্‌র অপার শক্তির একটি নিদর্শন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চুড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে। আর তারা মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র শক্তির কথা স্মরণ করে। [ফাতহুল কাদীর] বস্তুতঃ যে অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল এবং দুনিয়াবাসীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনি সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে উঠাও ছিল আল্লাহর শক্তিমত্তার বিস্ময়কর প্রকাশ।

(২) অর্থাৎ আসহাবে কাহ্‌ফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল: একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা, তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যরা অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সেই দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর

তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ বাজারে পাঠাও। সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম তারপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য[১]। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে। আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়।

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

২০. 'তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তো তারা তোমাদেরকে পাথরের আঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফল হবে না।'

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ

২১. আর এভাবে আমরা মানুষদেরকে তাদের হদিস জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জানে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই[২]। যখন তারা তাদের কর্তব্য

ছেড়ে দিয়ে ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে পাঠানো হোক। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আসহাবে কাহ্‌ফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। (এক) অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। (দুই) অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। (তিন) খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়- কেউ কম খায় আর কেউ বেশী খায়। [দেখুন, কুরতবী]

(২) সেকালে সেখানে কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে বিষম বিতর্ক চলছিল। যদিও রোমান শাসনের প্রভাবে সাধারণ লোক ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আখেরাত

الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর ।' তাদের রব তাদের বিষয় ভাল জানেন[১] । তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা[২]

এ ধর্মের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অংগ ছিল তবুও তখনো রোমীয় শির্ক ও মূর্তি পূজা এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী । এর ফলে বহু লোক আখেরাত অস্বীকার অথবা কমপক্ষে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো । ঠিক এ সময় আসহাবে কাহ্‌ফের ঘুম থেকে জেগে উঠার ঘটনাটি ঘটে এবং এটি মৃত্যুর পর পনরুত্থানের সপক্ষে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পেশ করে যা অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বক্তব্যের তাৎপর্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে,এটি ছিল ঈসায়ী সজ্জনদের উক্তি । তাদের মতে আসহাবে কাহ্‌ফ গুহার মধ্যে যেভাবে শুয়ে আছেন সেভাবেই তাদের শুয়ে থাকতে দাও এবং গুহার মুখ বন্ধ করে দাও । তাদের রবই ভাল জানেন তারা কারা,তাদের মর্যাদা কি এবং কোন ধরনের প্রতিদান তাদের উপযোগী । [ইবন কাসীর]

(২) সম্ভবত: এখানে রোম সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্মীয় নেতৃবর্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের মোকাবিলায় সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী ঈসায়ীদের কথা মানুষের কাছে ঠাঁই পেতো না । পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাধারণ নাসারাদের মধ্যে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহে শির্ক, আউলিয়া পূজা ও কবর পূজা পুরো জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল । বুযর্গদের আস্তানা পূজা করা হচ্ছিল এবং ঈসা, মারইয়াম ও হাওয়ারীগণের প্রতিমূর্তি গীর্জাগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছিল । আসহাবে কাহ্‌ফের নিদ্রাভংগের মাত্র কয়েক বছর আগে মতান্তারে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল এ 'আফসোস' নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । সেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের ইলাহ হওয়া এবং মারইয়াম আলাইহাসসালামের "ইলাহ-মাতা" হওয়ার আকীদা চার্চের সরকারী আকীদা হিসেবে গণ্য হয়েছিল । এ ইতিহাস সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, এখানে ﴿الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ﴾ বাক্যে যাদেরকে প্রাধান্য লাভকারী বলা হয়েছে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঈসা আলাইহিসসালামের সাচ্চা অনুসারীদের মোকাবিলায় তৎকালীন খৃষ্টান জনগণের নেতা এবং তাদের শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী যাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল । মূলত এরাই ছিল শির্কের পতাকাবাহী এবং এরাই আসহাবে কাহ্‌ফের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ তথা ইবাদাতখানা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহেমাহুল্লাহ এ সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । [দেখুন, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম: ১/৯০]

বলল, 'আমরা তো নিশ্চয় তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব[১] ।'

سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর' এবং কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', গায়েবী বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে । আবার কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, তাদের

(১) মুসলিমদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মজীদের এ আয়াতটির সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে। তারা এ থেকে প্রমাণ করতে চান যে, নবী-রাসূল সাহাবী ও সৎ লোকদের কবরের উপর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ জায়েয। অথচ কুরআন এখানে তাদের এ গোমরাহীর প্রতি ইংগিত করছে যে, এ যালেমদের মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আখেরাত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি করার জন্য তাদেরকে যে নির্দশন দেখানো হয়েছিল তাকে তারা শির্কের কাজ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে নেয় এবং ভাবে যে, ভালই হলো পূজা করার জন্য আরো কিছু আল্লাহর অলী পাওয়া গেলো। তাছাড়া এই আয়াত থেকে "সালেহীন" তথা সৎলোকদের কবরের উপর মসজিদ তৈরী করার প্রমাণ কেমন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছেঃ "কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের প্রতি আল্লাহ্ লানত বর্ষণ করেছেন।" [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৩১৮০, মুসনাদে আহমদঃ ১/২২৯, ২৮৭, ৩২৪, তিরমিযীঃ ৩২০, আবু দাউদঃ ৩২৩৬]। আরো বলেছেনঃ "সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিতো। আমি তোমাদের এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করছি।" [মুসলিমঃ ৫৩২]। আরো বলেনঃ "আল্লাহ ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদাতখানায় পরিণত করেছে।" [আহমদঃ১/২১৮, মুসলিমঃ ৩৭৬]। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "এদের অবস্থা এ ছিল যে, যদি এদের মধ্যে কোন সৎলোক থাকতো তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তার ছবি তৈরী করতো। এরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে।" [বুখারীঃ ৪১৭, মুসলিমঃ ৫২৮]। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি কুরআন মজীদে ঈসায়ী পাদ্রী ও রোমীয় শাসকদের যে ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড কাহিনীচ্ছলে বর্ণনা করা হয়েছে তাকেই ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি করার জন্য দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবার দুঃসাহস কিভাবে করতে পারে? [এ ব্যাপারে আরও দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বলুন, 'আমার রবই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন'; তাদের সংখ্যা কম সংখ্যক লোকই জানে[১]। সুতরাং সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং এদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন না[২]।

চতুর্থ রুকূ'

২৩. আর কখনই আপনি কোন বিষয়ে বলবেন না, "আমি তা আগামী কাল করব,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৪. 'আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে' এ কথা না বলে।[৩]" আর যদি ভুলে যান তবে

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

(১) এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনার পৌনে তিনশো বছর পরে কুরআন নাযিলের সময় এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে নাসারাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সাধারণ লোকদের জানা ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে ঘটনাবলী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাদের বহু বিবরণ গল্পের রূপ নিতো। তবুও যেহেতু তৃতীয় বক্তব্যটির প্রতিবাদ আল্লাহ করেননি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল। তাছাড়া ইবন্ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলতেন: 'আমি সেই কম সংখ্যক লোকদের অন্যতম যারা তাদের সংখ্যা জানে, তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন।' [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সংখ্যাটি জানা আসল কথা নয় বরং আসল জিনিস হচ্ছে এ কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারো জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকারঃ যদি আল্লাহ্ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামী কাল করব। ইনশাআল্লাহ্ বাক্যের

وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

আপনার রবকে স্মরণ করবেন[১] এবং বলবেন, 'সম্ভবত আমার রব আমাকে এটার চেয়ে সত্যের কাছাকাছি পথ নির্দেশ করবেন।'

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৫. আর তারা তাদের গুহায় ছিল তিন'শ বছর, আরো নয় বছর বেশী [২]।

অর্থ তাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'সুলাইমান ইবনে দাউদ 'আলাইহিমাস্ সালাম বললেনঃ আমি আজ রাতে আমার সত্তর জন স্ত্রীর উপর উপগত হব। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- নব্বই জন স্ত্রীর উপগত হব, তাদের প্রত্যেকেই একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেবে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাকে ফিরিশ্‌তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, বলুনঃ ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু তিনি বললেন না। ফলে তিনি সমস্ত স্ত্রীর উপর উপনীত হলেও তাদের কেউই কোন সন্তান জন্ম দিল না। শুধু একজন স্ত্রী একটি অপরিণত সন্তান প্রসব করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ, সে যদি বলত ইনশাআল্লাহ্, তবে অবশ্যই তার ওয়াদা ভঙ্গ হত না। আর তা তার ওয়াদা পূর্ণতায় সহযোগী হত'। [বুখারীঃ ৩৪২৪, ৫২৪২,৬৬৩৯, ৭৪৬৯, মুসলিমঃ ১৬৫৪, আহমাদঃ ২/২২৯, ৫০৬]

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, যখনি আপনি কোন কিছু ভুলে যাবেন তখনই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবেন। কারণ, ভুলে যাওয়াটা শয়তানের কারসাজির ফলে ঘটে। আর মহান আল্লাহ্‌র স্মরণ শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয় যা পুনরায় স্মরণ করতে সাহায্য করবে। এ অর্থটির সাথে পরবর্তী বাক্যের মিল বেশী। অপর কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতটি পূর্বের আয়াতের সাথে মিলিয়ে অর্থ করতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি ইনশাল্লাহ ভুলে যান তবে যখনই মনে হবে তখনই ইনশাআল্লাহ বলে নেবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। অর্থাৎ গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল। এ আয়াতের তাফসীরে কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ বাক্যে তিন'শ ও নয় বছরের যে সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে তা লোকদের উক্তি, এটা আল্লাহর উক্তি নয়। অর্থাৎ এখানে মতভেদকারীদের মত উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষ থেকে তাদের গুহায় অবস্থানের কাল বর্ণনা করা হয়েছে। সে হিসাবে এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিনশ' নয় বছর। এখন কাহিনীর শুরুতে ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল। [ইবন কাসীর]

قُلِ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُوۡا ۚ لَهٗ غَیۡبُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ اَبۡصِرۡ بِهٖ وَاَسۡمِعۡ ؕ مَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِیٍّ ۫ وَّلَا یُشۡرِکُ فِیۡ حُکۡمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

২৬. আপনি বলুন, 'তারা কত কাল অবস্থান করেছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন', আসমান ও যমীনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।

وَاتۡلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنۡ کِتَابِ رَبِّکَ ۚؕ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمٰتِهٖ ۚ۟ وَلَنۡ تَجِدَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مُلۡتَحَدًا ﴿۲۷﴾

২৭. আর আপনি আপনার প্রতি ওহী করা আপনার রব-এর কিতাব থেকে পড়ে শুনান। তাঁর বাক্যসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর আপনি কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবেন না।

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَدٰوۃِ وَالۡعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجۡهَهٗ وَلَا تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡهُمۡ ۚ تُرِیۡدُ زِیۡنَۃَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَکَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾

২৮. আর আপনি নিজকে ধৈর্যের সাথে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে[১] এবং আপনি দুনিয়ার জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না[২]। আর আপনি তার

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্র স্মরণে অনুষ্ঠিত মজলিসে যারা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানে একত্রিত হবে তাদের ব্যাপারে আকাশ থেকে আহ্বান করে বলা হয় তোমরা যখন তোমাদের মজলিস শেষ করবে তখন তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে আর তোমাদের গোনাহসমূহ সৎকাজে পরিবর্তিত হবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৪২]

(২) এ আয়াতটির মূল বক্তব্য সূরা আল-আন'আমের ৫২ নং আয়াতের মতই। সেখানে আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের আব্দার ছিল, 'আপনি যদি গরীব মুসলিমদেরকে আপনার মজলিস থেকে দূরে সরিয়ে দেন তবেই আমরা আপনার সাথে বসার কথা চিন্তা করে দেখতে পারি' [দেখুন, মুসলিম: ২৪১৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৬১] এ ধরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়- নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে

আনুগত্য করবেন না---যার চিত্তকে আমরা আমাদের স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে ও যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর বলুন, 'সত্য তোমাদের রব-এর কাছ থেকে; কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে কুফরী করুক।' নিশ্চয় আমরা যালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল[১]!

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ---আমরা তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না- যে উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করেছে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ

৩১. তারাই এরা, যাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ

রাখুন। সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজেকর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ও যিক্‌র করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। অপরদিকে কাফেরদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) সূরা আল-ফুরকানের ৬৬ নং আয়াতেও অনুরূপ কাফেরদের শেষ আবাসস্থান সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে[১], তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে[২]; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল[৩]!

পঞ্চম রুকূ'

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩২. আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন দু'ব্যক্তির উপমা: তাদের একজনকে আমরা দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুরের বাগান এবং এ দু'টিকে আমরা খেজুর গাছ দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এ দু'টির মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না আর আমরা উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।

---

(১) প্রাচীনকালে রাজা বাদশাহরা সোনার কাঁকন পরতেন। [ফাতহুল কাদীর] জান্নাতবাসীদের পোশাকের মধ্যে এ জিনিসটির কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সেখানে তাদেরকে রাজকীয় পোশাক পরানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎ মজদুর সেখানে থাকবে রাজকীয় জৌলুসের মধ্যে।

(২) বলা হয়েছে তারা আসন গ্রহণ করবে 'আরাইক এ। এ 'আরাইক' শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে "আরীকাহ" আরবী ভাষায় আরীকাহ এমন ধরনের আসনকে বলা হয় যার উপর ছত্র খাটানো আছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এর মাধ্যমেও এখানে এ ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী রাজকীয় সিংহাসনে অবস্থান করবে।

(৩) সূরা আল-ফুরকানের ৭৫-৭৬ নং আয়াতেও জান্নাতবাসীদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

৩৪. এবং তার প্রচুর ফল-সম্পদ[১] ছিল। তারপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।'

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. আর সে তার বাগানে প্রবেশ করল নিজের প্রতি যুলুম করে। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে[২];

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾

৩৬. 'আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি আমার রব-এর কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তবে আমি তো নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল পাব[৩]।'

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

(১) ثمر শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধন-সম্পদ। এখানে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] কামুস গ্রন্থে আছে ثمر একটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। [অনুরূপ দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যে বাগানগুলোকে সে নিজের জান্নাত মনে করছিল। সে মনে করেছিল এগুলো স্থায়ী সম্পদ। অর্বাচীন লোকেরা দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শান-শওকতের অধিকারী হলেই সর্বদা এ বিভ্রান্তির শিকার হয় যে, তারা দুনিয়াতেই জান্নাত পেয়ে গেছে। এখন আর এমন কোন জান্নাত আছে যা অর্জন করার জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে? এভাবে সে ফল-ফলাদি, ক্ষেত-খামার, গাছ-গাছালি, নদী- নালা, ইত্যাদি দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হবে এবং মনে করবে এগুলো কখনো ধ্বংস হবে না। ফলে সে দুনিয়ার মোহে পড়ে থাকবে এবং আখেরাত অস্বীকার করে বসবে। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যদি আখেরাত থেকেই থাকে তাহলে আমি সেখানে এখানকার চেয়েও বেশী সচ্ছল থাকবো। কারণ এখানে আমার সচ্ছল ও ধনাঢ্য হওয়া এ কথাই প্রমাণ করে যে, আমি আল্লাহর প্রিয়। অন্য আয়াতেও ধনবান কাফেরদের এধরনের কথা এসেছে, যেমন, "আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরেও যাই তাঁর কাছে নিশ্চয় আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।"[সূরা ফুসসিলাত: ৫০]

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু বিতর্কমূলকভাবে তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁর সাথে কুফরী করছ[১] যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি ও পরে বীর্য থেকে এবং তারপর পূর্ণাংগ করেছেন পুরুষ-আকৃতিতে?'

لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮. 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ্, আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রব-এর সাথে শরীক করি না।'

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

৩৯. 'তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ্ যা চান তা-ই হয়, আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি নেই[২]?' তুমি যদি

(১) যে ব্যক্তি মনে করলো, আমিই সব, আমার ধন-সম্পদ ও শান শওকত কারোর দান নয় বরং আমার শক্তি ও যোগ্যতার ফল এবং আমার সম্পদের ক্ষয় নেই,আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার কেউ নেই এবং কারোর কাছে আমাকে হিসেব দিতেও হবে না, সে আল্লাহকে মূলত: অস্বীকারই করল। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সে অস্বীকার করল। শুধু তাকে নয়, তিনি প্রথম মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি হচ্ছেন আদম। তারপর নিকৃষ্ট পানি হতে তাদের বংশধারা বজায় রেখেছেন। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, "তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮]

(২) অর্থাৎ "আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমাদের যদি কোন কিছু চলতে পারে তাহলে তা চলতে পারে একমাত্র আল্লাহরই সুযোগ ও সাহায্য -সহযোগিতা দানের মাধ্যমেই।" এ আয়াত থেকে সালফে সালেহীনের কেউ কেউ বলেনঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করে না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকে বা তাতে চোখ লাগার মত ক্ষতি হয় না। সহীহ হাদীসেও এ আয়াতের মত একটি হাদীস এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন: "আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি মূল্যবান সম্পদের সন্ধান দেব না? সেটা হলো: "লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। [বুখারী: ৬৩৮৪, মুসলিম: ২৭০৪] আবার কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, জান্নাতের সে মূল্যবান সম্পদ হলো: "লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৩৫]

ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে নিকৃষ্টতর মনে কর---

৪০. 'তবে হয়ত আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে নির্ধারিত বিপর্যয় পাঠাবেন[১], যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে।

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

৪১. 'অথবা তার পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে এবং তুমি কখনো সেটার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না[২]।'

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾

৪২. আর তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতের তালু মেরে আক্ষেপ করতে লাগল যখন তা মাচানসহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার রব-এর সাথে শরীক

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾

(১) ইবনে আব্বাস এর অর্থ নিয়েছেন আযাব। অপর কারও মতে, অগ্নি। আবার কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর অর্থ: এমন বৃষ্টিপাত যাতে গাছ-গাছড়া উপড়ে যায়, ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যে আল্লাহর হুকুমে তুমি এসব কিছু লাভ করেছো তাঁরই হুকুমে এসব কিছু তোমার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেয়া যেতে পারে। তুমি যদি এখন প্রচুর পানি পাওয়ার কারণে ক্ষেত-খামার করার সুবিধা লাভ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে যাচ্ছ, তবে মনে রেখো তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের এ পানি পুনরায় ভূগর্ভে প্রোথিত করে দিতে পারেন, তারপর তুমি কোন ভাবেই তা আনতে সক্ষম হবে না। কুরআনের অন্যত্রও এ কথা বলে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর এ বিরাট নেয়ামত পানি নিঃশেষ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেন: "বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?" [সূরা আল-মুলক: ৩০] [ইবন কাসীর]

না করতাম[১]!'

৪৩. আর আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।

وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝

৪৪. এখানে কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই[২], যিনি

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۗ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا

(১) এখানে বাহ্যত: সে দুনিয়া লাভের জন্য, দুনিয়ার সম্পদ বাঁচানোর জন্য একথা বলেছিল। অথবা বাস্তবেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে শির্ক থেকে তাওবাহ্ করতে চেয়ে একথা বলেছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতটির অর্থ নির্ধারণে দু'টি প্রসিদ্ধ মত এসেছে:
এক, আয়াতে উল্লেখিত هنالك শব্দটির অর্থ আগের বাক্যের সাথে করা হবে। আর الولاية থেকে নতুনভাবে অর্থ করা হবে। সে মতে পূর্বের আয়াতের অর্থ হবে: যেখানে আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়েছে সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না। দুই, আর যদি هنالك শব্দটিকে এ আয়াতের পরবর্তী বাক্য الولاية এর সাথে মিলিয়ে অর্থ করা হয় তখন আয়াতের দু'ধরনের অর্থ হয়।
যদি الولاية শব্দটির واو এর উপর فتحة দিয়ে পড়া হয় তখন শব্দটির অর্থ হয়, অভিভাবকত্ব, বন্ধুত্ব। আর আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: যখন আযাব নাযিল হয় তখন কাফের বা মুমিন সবাই অভিভাবক ও বন্ধু হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরবে, তাঁর আনুগত্য মেনে নিবে। এর বাইরে কোন কিছু চিন্তাও করবে না। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারপর তারা যখন আমার শাস্তি দেখতে পেল তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।" [সূরা গাফের: ৮৪] অনুরূপভাবে ফির'আউনের মুখ থেকেও বিপদকালে এ কথাই বের হয়েছিল, মহান আল্লাহ্ বলেন: "পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইস্‌রাঈল যাঁর উপর বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। 'এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" [সূরা ইউনুস: ৯০-৯১]
আর যদি الولاية শব্দটির واو এর নীচে كسرة দিয়ে পড়া হয় যেমনটি কোন কোন قراءة তে আছে, তখন শব্দটির অর্থ হয় ক্ষমতা, নির্দেশ ও আইন। আর আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: যখন আযাব নাযিল হবে তখন একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, আইন ও নির্দেশই কার্যকর হবে। অন্য কারো কোন কথা চলবে না। তিনি তাদের ধ্বংস করেই ছাড়বেন। [ইবন কাসীর]

وَّخَيْرٌ عُقْبًا

সত্য[১]। পুরস্কার প্রদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ষষ্ঠ রুকূ'

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

৪৫. আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন উপমা দুনিয়ার জীবনের: এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান[২]।

---

(১) আয়াতের দু'টি অর্থ করা যায়। এক, তখন একমাত্র হক্ক ও সত্য ইলাহ আল্লাহ্ তা'আলারই কর্তৃত্ব। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারপর তাদের হক্ক ও সত্য প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে তারা ফিরে আসে। দেখুন, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসেব গ্রহনে তিনিই সবচেয়ে তৎপর।" [সূরা আল-আন'আম: ৬২] দুই, তখন একমাত্র হক্ক ও সত্য কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব আল্লাহ্‌রই। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "সে দিন সত্য ও হক্ক কর্তৃত্ব ও অভিভাকত্ব হবে কেবলমাত্র দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্য সে দিন হবে কঠিন।" [সূরা আল-ফুরকান: ২৬] [ইবন কাসীর]

(২) কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ্ দুনিয়ার জীবনকে আকাশ থেকে নাযিল হওয়া পানির সাথে তুলনা করেছেন। দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের উদাহরণ হলো আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত। যা প্রথমে যমীনে পতিত হওয়ার সাথে সাথে যমীনে অবস্থিত উদ্ভিদরাজিতে প্রাণের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে পানি পুরিয়ে গেলে, পানির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলে আবার সে প্রাণের নিঃশেষ ঘটে। দুনিয়ার জীবনও ঠিক তদ্রুপ; এখানে আসার পর জীবনের বিভিন্ন অংশের প্রাচুর্যে মানুষ মোহান্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে বসে থাকে কিন্তু অচিরেই তার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সে আবার হতাশ হয়ে পড়ে। এ কথাটি মহান আল্লাহ্ কুরআনের অন্যত্র এভাবে বলেছেন: "বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে ওটা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি ওটা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও ওটার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" [সূরা ইউনুস: ২৪] আরো বলেছেন: "আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ

৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা; আর স্থায়ী সৎকাজ[1]

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

হতে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটাকে খড়-কুটোয় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।" [সূরা আয-যুমার: ২১] আরও বলেছেন: "তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটোয় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।" [সূরা আল-হাদীদ: ২০] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন: "দুনিয়া হলো সুমিষ্ট সবুজ-শ্যামল মনোমুগ্ধকর। সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক আর মহিলাদের থেকে নিরাপদ থাক" [মুসলিম: ২৭৪২]

(১) স্থায়ী সৎকাজ বলতে কুরআনে বর্ণিত বা হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত যাবতীয় নেককাজই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়েছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দাস হারেস বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একদিন বসলে আমরা তার সাথে বসে পড়লাম। ইতিমধ্যে মুয়াজ্জিন আসল। তিনি পাত্রে করে পানি নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সে পানির পরিমাণ সম্ভবত এক মুদ (৮১৫.৩৯ গ্রাম মতান্তরে ৫৪৩ গ্রাম) পরিমান হবে। (দেখুন, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা) তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সে পানি দ্বারা অজু করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ অজুর মত অজু করতে দেখেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি কেউ আমার অজুর মত অজু করে জোহরের সালাত আদায় করে তবে এ সালাত ও ভোরের মাঝের সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারপর যদি আসরের সালাত আদায় করে তবে সে সালাত ও জোহরের সালাতের মধ্যকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এরপর যদি মাগরিবের সালাত আদায় করে তবে সে সালাত ও আসরের সালাতের মধ্যে কৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর এশার সালাত আদায় করলে সে সালাত এবং মাগরিবের সালাতের মধ্যে হওয়া সমূদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এরপর সে হয়ত: রাতটি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিবে। তারপর যখন ঘুম থেকে জেগে অজু করে এবং সকালের সালাত আদায় করে তখন সে সালাত এবং এশার সালাতের মধ্যকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এগুলোই হলো এমন সৎকাজ যেগুলো অপরাধ মিটিয়ে দেয়। লোকেরা এ হাদীস শোনার পর

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

আপনার রব-এর কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাংখিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

৪৭. আর স্মরণ করুন, যেদিন আমরা পর্বতমালাকে করব সঞ্চালিত[১] এবং আপনি যমীনকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর[২], আর আমরা তাদের সকলকে একত্র করব; তারপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।

বলল, হে উসমান এগুলো হলো "হাসানাহ" বা নেক-কাজ। কিন্তু 'আল-বাকিয়াতুস-সালেহাত' কোনগুলো? তখন তিনি বললেন: তা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। [মুসনাদে আহমাদ: ১/৭১] 'আল-বাকিয়াতুস-সালেহাত' এর তাফসীরে এ পাঁচটি বাক্য অন্যান্য অনেক সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবন্ আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: 'আল-বাকিয়াতুস-সালেহাত' দ্বারা আল্লাহ্‌র যাবতীয় যিক্‌র বা স্মরণকে বুঝানো হয়েছে। সে মতে তিনি 'তাবারাকাল্লাহ', 'আস্তাগফিরুল্লাহ', 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পাঠ', সাওম, সালাত, হজ্জ, সাদাকাহ, দাসমুক্তি, জিহাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণ সহ যাবতীয় সৎকাজকেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন: এর দ্বারা ঐ সমূদয় কাজই উদ্দেশ্য হবে যা জান্নাতবাসীদের জন্য যতদিন সেখানে আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন বাকী থাকবে অর্থাৎ চিরস্থায়ী হবে; কারণ জান্নাতের আসমান ও যমীন স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ যখন যমীনের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে এবং পাহাড় ঠিক এমনভাবে চলতে শুরু করবে যেমন আকাশে মেঘেরা ছুটে চলে। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ অবস্থাটিকে এভাবে বলা হয়েছে: "আর আপনি পাহাড়গুলো দেখছেন এবং মনে করছেন এগুলো অত্যন্ত জমাটবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু এগুলো চলবে ঠিক যেমন মেঘেরা চলে।" [সূরা আন-নামলঃ ৮৮] আরো বলা হয়েছে: "যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত; [সূরা আত-তূর: ৯-১০] আরো এসেছে: "আর পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত।" [সূরা আল-কারি'আ: ৫]

(২) অর্থাৎ এর উপর কোন শ্যামলতা, বৃক্ষ তরুলতা এবং ঘরবাড়ি থাকবে না। সারাটা পৃথিবী হয়ে যাবে একটা ধু ধু প্রান্তর। এ সূরার সূচনায় এ কথাটিই বলা হয়েছিল এভাবে যে, "এ পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সেসবই আমি লোকদের পরীক্ষার জন্য একটি সাময়িক সাজসজ্জা হিসেবে তৈরী করেছি। এক সময় আসবে যখন এটি সম্পূর্ণ একটি পানি ও বৃক্ষ লতাহীন মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে।"

৪৮. আর তাদেরকে আপনার রব-এর কাছে উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে[১] এবং আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদেরকে আমরা প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছ[২], অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য আমরা কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করব না[৩]।'

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

(১) সারিবদ্ধভাবে বলা দ্বারা এ অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে যে, সবাই এক কাতার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে: "সেদিন রূহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণ এক কাতার হয়ে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে।" [সূরা আন-নাবা: ৩৮] অথবা এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তারা কাতারে কাতারে দাঁড়াবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে: "এবং যখন আপনার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্‌তাগণও" [সূরা আল-ফাজর: ২২]

(২) কেয়ামতের দিন সবাইকে বলা হবে: আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে, নগ্ন পায়ে, কোন খাদেম ব্যতীত, যাবতীয় জৌলুস বাদ দিয়ে, খালি গায়ে, কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। কুরআনের অন্যত্রও এ ধরনের আয়াত এসেছে, যেমন সূরা আল-আন'আম: ৯৪, সূরা মারইয়াম: ৮০, ৯৫, সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৪। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'লোকসকল! তোমরা কেয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি গায়ে, পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোষাক পরানো হবে, তিনি হবেন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম। একথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেনঃ সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তা ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারো প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না।' [বুখারীঃ ৩১৭১, মুসলিমঃ ২৮৫৯]

(৩) অর্থাৎ সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবেঃ দেখো, নবীগণ যে খবর দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে তো। তারা তোমাদের বলতেন, আল্লাহ যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলে। কিন্তু এখন বলো, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হয়েছে কি না?

৪৯. আর উপস্থাপিত করা হবে ‘আমলনামা, তখন তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, ‘হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে[১]।’ আর তারা যা আমল করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে[২];

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

(১) দুনিয়ার বুকে তারা যা যা করেছিল তা সবই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সে সব লিখিত গ্রন্থগুলো সেখানে তারা দেখতে পাবে। তাদের কারও আমলনামা ডান হাতে আবার কারও বাম হাতে দেয়া হবে। তারা সেখানে এটাও দেখবে যে, সেখানে ছোট-বড়, গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বহীন সবকিছুই লিখে রাখা হয়েছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ তাদের আমলনামা সম্পর্কে বলেন: “প্রত্যেক মানুষের কাজ আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। ‘তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ঠ।”[সূরা আল-ইসরা: ১৩]

(২) অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। অন্যান্য আয়াতে আরো স্পষ্ট ভাষায় তা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে: “যে দিন প্রত্যেকে সে যা ভাল কাজ করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সেদিন সে তার ও ওটার মধ্যে ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করতেছেন। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র।” [সূরা আলে-ইমরান: ৩০] আরও বলা হয়েছে: “সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে।” [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৩] আরও বলা হয়েছে: “যে দিন গোপন ভেদসমূহ প্রকাশ করা হবে” [সূরা আত-ত্বারেক:৯] মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, এসব কৃতকর্মই প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবেঃ আমি তোমার সম্পদ। [বুখারীঃ ১৩৩৮, তিরমিযীঃ ১১৯৫] সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্য আগমন করবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৮৭] মানুষের গোনাহ্ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে, কুরআনে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- ﴿اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا﴾ [সূরা আন্-নিসাঃ ১০] অথবা, আয়াতের এ

আর আপনার রব তো কারো প্রতি যুলুম করেন না[১]।

সপ্তম রুকূ'

৫০. আর স্মরণ করুন, আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর', তখন তারা সবাই সিজ্‌দা করল ইব্‌লীস ছাড়া; সে ছিল জিন্‌দের একজন[২],

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

অর্থও করা যায় যে, তারা তাদের কৃতকর্মের বিবরণ সম্বলিত দপ্তর দেখতে পাবে, কোন কিছুই সে আমলনামা লিখায় বাদ পড়েনি। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ্ এ আয়াত শুনিয়ে বলতেন: তোমরা যদি লক্ষ্য কর তবে দেখতে পাবে যে, লোকেরা ছোট-বড় সবকিছু গণনা হয়েছে বলবে কিন্তু কেউ এটা বলবে না যে, আমার উপর যুলুম করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা ছোট ছোট গুনাহর ব্যাপারে সাবধান হও; কেননা এগুলো একত্রিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে ধ্বংস করে ছাড়বে। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি অপরাধ করেনি কিন্তু সেটি খামাখা তার নামে লিখে দেয়া হয়েছে, এমনটি কখনো হবে না। আবার কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের কারণে প্রাপ্য সাজার বেশী দেয়া হবে না এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা পাকড়াও করেও শাস্তি দেয়া হবে না। জাবের ইবন আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে অথবা বলেছেন বান্দাদেরকে নগ্ন, অখতনাকৃত এবং কপর্দকশূণ্য অবস্থায় একত্রিত করবেন। তারপর কাছের লোকেরা যেমন শুনবে দূরের লোকরাও তেমনি শুনতে পাবে এমনভাবে ডেকে বলবেন: আমিই বাদশাহ, আমিই বিচার-প্রতিদান প্রদানকারী, জান্নাতে প্রবেশকারী কারও উপর জাহান্নামের অধিবাসীদের কোন দাবী অনাদায়ী থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে, জাহান্নামে প্রবেশকারী কারও উপর জান্নাতের অধিবাসীদের কারও দাবীও অনাদায়ী থাকতে পারবে না। এমনকি যদি তা একটি চপেটাঘাতও হয়। বর্ণনাকারী বললেন: কিভাবে তা সম্ভব হবে, অথচ আমরা তখন নগ্ন শরীর, অখতনাকৃত ও রিক্তহস্তে সেখানে আসব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: নেককাজ ও বদকাজের মাধ্যমে সেটার প্রতিদান দেয়া হবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'শিংবিহীন প্রাণী সেদিন শিংওয়ালা প্রাণী থেকে তার উপর কৃত অন্যায়ের কেসাস নিবে।' [মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৯৪]

(২) ইবলিস কি ফেরেশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল নাকি ভিন্ন প্রজাতির ছিল এ নিয়ে দু'টি মত দেখা যায়। [দুটি মতই ইবন কাসীর বর্ণনা করেছেন।] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, সে ফিরিশতাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন তাদের মতে, এ আয়াতে আল্লাহ্

সে তার রব-এর আদেশ অমান্য করল[১]। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে[২]

তা'আলার বাণী "সে জিনদের একজন" এর 'জিন' শব্দ দ্বারা ফেরেশতাদের এমন একটি উপদল উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যাদেরকে 'জিন' বলা হতো। সম্ভবত: তাদেরকে মানুষের মত নিজেদের পথ বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। সে হিসেবে ইবলিস আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের আওতায় ছিল কিন্তু সে নির্দেশ অমান্য করে অবাধ্য ও অভিশপ্ত বান্দা হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে ইবলীস ফেরেশ্তাদের দলভুক্ত ছিল না। তারা আলোচ্য আয়াত থেকে তাদের মতের সপক্ষে দলীল গ্রহণ করেন। ফেরেশ্তাদের ব্যাপারে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলে, তারা প্রকৃতিগতভাবে অনুগত ও হুকুম মেনে চলেঃ "আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুমই দেন না কেন তারা তার নাফরমানী করে না এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।"[সূরা আত-তাহরীমঃ ৬] আরো বলেছেনঃ "তারা অবাধ্য হয় না, তাদের রবের, যিনি তাদের উপর আছেন, ভয় করে এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।" [সূরা আন-নাহলঃ ৫০] তাছাড়া হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশ্তাদেরকে নূর থেকে তৈরী করা হয়েছে, ইবলীসকে আগুনের ফুল্কি থেকে এবং আদমকে যা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে বিবৃত করা হয়েছে।' [মুসলিম: ২৯৯৬]

(১) এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জিনরা মানুষের মতো একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে জন্মগত আনুগত্যশীল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদেরকে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয়টি করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ সত্যটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইবলীস ছিল জিনদের দলভুক্ত, তাই সে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে ফাসেকীর পথ বাছাই করে নেয়। এখানে আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে অবাধ্য হয়েছিল এর দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. সে আল্লাহর নির্দেশ আসার কারণে অবাধ্য হয়েছিল। কারণ সিজদার নির্দেশ আসার কারণে সে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। এতে বাহ্যত: মনে হবে যে, আল্লাহ্র নির্দেশই তার অবাধ্যতার কারণ। অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্র নির্দেশ ত্যাগ করে সে অবাধ্য হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]

তবে ইবলীস ফেরেশ্তাদের দলভুক্ত না হয়েও নির্দেশের অবাধ্য কারণ হচ্ছে, যেহেতু ফেরেশ্তাদের সাথেই ছিল, সেহেতু সিজদার নির্দেশ তাকেও শামিল করেছিল। কারণ, তার চেয়ে উত্তম যারা তাদেরকে যখন সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তখন সে নিজেই এ নির্দেশের মধ্যে শামিল হয়েছিল এবং তার জন্যও তা মানা বাধ্যতামূলক ছিল। [ইবন কাসীর]

(২) وَذُرِّيَّتَهُ এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ এখানে ذرية অর্থাৎ বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো

অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু[১]। যালেমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট[২]!

৫১. আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী করিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও নয়, আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণকারী নই[৩]।

مَآ أَشۡهَدتُّهُمۡ خَلۡقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَا خَلۡقَ أَنفُسِهِمۡ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلۡمُضِلِّينَ عَضُدٗا ٥١

হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি হওয়া জরুরী নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট লোকদেরকে তাদের এ বোকামির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া যে, তারা নিজেদের স্নেহশীল ও দয়াময় আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যত নেয়ামত তোমার প্রয়োজন সবই সরবরাহ করেছেন এবং শুভাকাংখী নবীদেরকে ত্যাগ করে এমন এক চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে পা দিচ্ছে যে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সবসময় তোমার ক্ষতি করার অপেক্ষায় থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) যালেম তো তারা, যারা প্রতিটি বস্তুকে তার সঠিক স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রেখেছে। তাদের রবের ইবাদাতের পরিবর্তে শয়তানের ইবাদাত করেছে। এত কত নিকৃষ্ট অদল-বদল! আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানের ইবাদাত! [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, “আর ‘হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।’ হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ‘ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ। শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি ?” [সূরা ইয়াসীন: ৫৯-৬২]

(৩) তাদের সৃষ্টি করার সময় আমার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। যাদেরকে তোমরা আহ্বান করছ তারা সবাই তোমাদের মতই তাঁর বান্দাহ, কোন কিছুরই মালিক নয়। আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার সময় তারা সেখানে ছিল না, তাই দেখার প্রশ্নও উঠে না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন: “বলুন, ‘তোমরা ডাক তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এ দু'টিতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউই তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।” [সূরা সাবা: ২২-২৩]

৫২. আর সেদিনের কথা স্মরণ করুন, যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক[১]।' তারা তখন তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না[২] আর আমরা

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

(১) অর্থাৎ তারা যেহেতু তাদেরকে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে নিয়েছে, তাই তাদের ধারণামতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছে তাদেরকে আহ্বান জানাতে বলা হয়েছে। নতুবা কোন শরীক হওয়া থেকে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে যাদের শরীক করতে তাদেরকে আহ্বান করে তাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে উদ্ধার পাওয়া বা আযাবের বিপরীতে সাহায্য লাভ করো কি না দেখ। [ইবন কাসীর] তারা তাদেরকে আহ্বান করবে কিন্তু তাদের সে আহ্বান কোন কাজে আসবে না। ঐ সমস্ত উপাস্যের দল এদের ডাকে সাড়াও দিবে না, উদ্ধারও করবে না। কুরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ্ তা বর্ণনা করেছেন: "পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন, 'কোথায় আমার সেসব শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতন্ডা করতে?' যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমংগল কাফিরদের---' [সূরা আন-নাহ্‌ল: ২৭] আরও এসেছে, "এবং সেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়?' যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! এদেরকেই আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম; এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা তো আমাদের 'ইবাদাত করত না।' তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাক।' তখন তারা ওদেরকে ডাকবে। কিন্তু ওরা এদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর এরা শাস্তি দেখতে পাবে। হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত।" [সূরা আল-ক্বাসাস: ৬২-৬৪]। আরও এসেছে, "যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন তারা বলবে, 'আমরা আপনার কাছে নিবেদন করি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।' আগে তারা যাকে ডাকত তারা উধাও হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিস্কৃতির কোন উপায় নেই।" [সূরা ফুস্‌সিলাত: ৪৭-৪৮]। আরও বলেন: "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের মত কেউই আপনাকে অবহিত

তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দেব এক ধ্বংস-গহ্বর[১]।

৫৩. আর অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তারা সেখান থেকে কোন পরিত্রাণস্থল

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

করতে পারে না।" [সূরা ফাতের: ১৩-১৪] অন্যত্র বলেছেন: "সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু এবং ঐগুলো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে।" [সূরা আল-আহকাফ: ৫-৬]

(১) এখানে "তাদের উভয়ের" বলে কাদের বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে, এক. তাদের এবং তারা যাদের ইবাদত করত সে সব বাতিল উপাস্যদের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন যে তারা একে অপরের কাছে পৌঁছুতে পারবে না। তাদের মাঝখানে থাকবে ধ্বংস গহ্বর। [ফাতহুল কাদীর] দুই. অথবা "তাদের উভয়ের" বলে ঈমানদার ও কাফের দু'দলকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] তখন আয়াতের অর্থ হবে, ঈমানদার ও কাফের এর মাঝে পার্থক্য করে দেয়া হবে। কাফেরদের সামনে থাকবে শুধু ধ্বংস গহ্বর। এ অর্থে কুরআনের অন্যত্র এসেছে, "যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে থাকবে; এবং যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আখিরাতের সাক্ষাত অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" [সূরা আর-রূম: ১৪-১৬] আরও বলা হয়েছে, "আপনি সরল দ্বীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দিন অনিবার্য তা উপস্থিত হওয়ার আগে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা।" [সূরা আর-রূম: ৪৩-৪৪] আরও এসেছে, "আর 'হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।"[সূরা ইয়াসীন: ৫৯] অন্য সূরায় এসেছে, "এবং যেদিন আমি ওদের সবাইকে একত্র করে যারা মুশরিক তাদেরকে বলব, 'তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর;' আমি ওদেরকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে দিলাম এবং ওরা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের 'ইবাদাত করতে না। 'আল্লাহ্‌ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের 'ইবাদাত করতে এ বিষয়ে আমরা গাফিল ছিলাম। সেখানে তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম পরীক্ষা করে নেবে এবং ওদেরকে ওদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং ওদের উদ্ভাবিত মিথ্যা ওদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হবে।"[সূরা ইউনুস: ২৮-৩০]

পাবে না[১]।

অষ্টম রুকূ'

৫৪. আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি[২]। আর মানুষ সবচেয়ে বেশী বিতর্কপ্রিয়[৩]।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

---

(১) হাশরের দিন জাহান্নাম দেখার পর তারা স্পষ্ট বুঝতে ও বিশ্বাস করবে যে, তারা জাহান্নামে পতিত হচ্ছেই। তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে: "হায়, আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আপনি আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকাজ করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।" [সূরা আস-সাজদাহ: ১২] আরও এসেছে: "তুমি এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।"[সূরা ক্বাফ: ২২] অনুরূপ এসেছে: "তারা যেদিন আমার কাছে আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।" [সূরা মারইয়াম: ৩৮] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিনের সময় কাফেরের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর নির্ধারণ করা হবে। আর কাফের চল্লিশ বছরের রাস্তা থেকে জাহান্নাম দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে সে তাতে পতিত হচ্ছে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৭৫]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন, আমরা কুরআনে প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। কোন ফাঁক রাখিনি। যাতে তারা সৎপথ থেকে হারিয়ে না যায়; হেদায়াতের পথ থেকে বের না হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করার পরও এখন সত্যকে মেনে নেবার পথে তাদের জন্য কি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? শুধুমাত্র এটিই যে তারা আযাবের অপেক্ষা করছে।

(৩) সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবেঃ হে আমার রব! আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবেঃ আমি এই আমলনামা মানি না। আমি এ আমলনামার লেখকদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ

৫৫. আর যখন তাদের কাছে পথনির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা ও তাদের রব-এর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত রাখে শুধু এ যে, তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাদের কাছে সরাসরি ‘আযাব[১]।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

সামনে লওহে-মাহ্ফুয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবেঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্ বলবেনঃ নিশ্চয় যুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবেঃ হে আমার রব! যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ হতে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর এবং শির্ক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।’ [দেখুন মুসলিমঃ ৫২৭১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, ‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আলী ও ফাতেমাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি বললেনঃ তোমরা রাতে সালাত আদায় কর না? তারা বললেনঃ আমরা ঘুমোলে আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ হরণ করে তাঁর হাতে নিয়ে নেন। সুতরাং আমরা কিভাবে সালাত আদায় করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গেলেন, তারপর তাকে শুনলাম তিনি ফেরা অবস্থায় নিজের রানে আঘাত করছেন আর বলছেন, মানুষ ভীষণ ঝগড়াটে।’ [বুখারীঃ ১১২৭, ৪৭২৪, মুসলিমঃ ৭৭৫] এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার পক্ষ থেকে এ ধরনের বিতণ্ডা অপছন্দ করলেন। কারণ, এটা বাতিল তর্ক। মহান আল্লাহ্র আনুগত্য না করার জন্য তাকদীরের দোহাই দেয়া জায়েয নেই।

(১) আয়াতে ব্যবহৃত قُبُلًا শব্দের অর্থ, সামনা সামনি বা চাক্ষুষ। [ইবন কাসীর] কাফেররা সবসময় নিজের চোখে আযাব দেখতে চাইত। কুরআনের অন্যত্র এসেছে, “তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।”[সূরা আশ-শু‘আরা: ১৮৭] অনুরূপ বলা হয়েছে, “উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, ‘আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আনয়ন কর---তুমি যদি সত্যবাদী হও।” [সূরা আল-আনকাবূত: ২৯] “স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, ‘হে আল্লাহ্! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিন।” [সূরা আল-আনফাল:৩২] “তারা বলে, ওহে যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ। ‘তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফিরিশ্তাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন?” [সূরা আল-হিজর: ৬, ৭]

৫৬. আর আমরা শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু কাফেররা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। আর তারা আমার নিদর্শনাবলী ও যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৭. আর তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে[১] এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে? নিশ্চয় আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি[২]। আর আপনি তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৮. আর আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান[৩]। তাদের কৃতকর্মের

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন থাকা, দ্বীন শিক্ষা করতে ও করাতে আগ্রহী না হওয়া কুফরী। এসবগুলোই বড় কুফরীর অংশ। [দেখুন, নাওয়াকিদুল ইসলাম]

(২) অর্থাৎ তাদের গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ আবরণ দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারাহ: ৭, সূরা আল-ইসরা: ৪৫-৪৭, সূরা মুহাম্মাদ: ২৩, সূরা হূদ: ২০।

(৩) এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর দু'টি গুণ ব্যবহার করেছেন। এক, তিনি ক্ষমাশীল। দুই, তিনি রহমতের মালিক। যে রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাদের অন্যায়ের কারণে দ্রুত শাস্তি দিচ্ছেন না। [ফাতহুল কাদীর]

كَسَبُوا الْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি তরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা থেকে তারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবে না[১]।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৫৯. আর ঐসব জনপদ--তাদের অধিবাসীদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম[২], যখন তারা যুলুম এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমরা স্থির করেছিলাম নির্দিষ্ট সময়[৩]।

নবম রুকূ'

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰىٓ اَبْلُغَ مَجْمَعَ

৬০. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সঙ্গী

(১) অর্থাৎ কেউ কোন দোষ করলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা ফাতের: ৪৫] আরও বলেন: "মংগলের আগেই ওরা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও ওদের আগে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও আপনার রব তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং আপনার প্রতিপালক শাস্তি দানে তো কঠোর।" [সূরা রা'দ: ৬] তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, গোপন রাখেন, ক্ষমা করেন, কখনও তাদের কাউকে হেদায়াতের পথেও পরিচালিত করেন। তারপরও যদি কেউ অপরাধের পথে থাকে তাহলে তার জন্য তো এমন এক দিন রয়েছে যে দিন নবজাতক বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভধারিনী তার গর্ভ রেখে দিবে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে আদ, সামূদ ইত্যাদি জাতির বিরাণ এলাকাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অনুরূপভাবে তোমরাও নবীর বিরোধিতা করে সে ধরনের শাস্তির সম্মুখিন হতে চলেছ। তাদেরকে যেভাবে শাস্তি পেয়ে বসেছে সেভাবে তোমাদেরকেও পাকড়া করতে পারে। কেননা তোমরা সবচেয়ে মহান নবী ও সর্বোত্তম রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করছ। তোমরা আমার কাছে তাদের থেকে বেশী ক্ষমতাধর নও। সুতরাং তোমরা আমার আযাব ও ধমকিকে ভয় কর। [ইবন কাসীর]

الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ⑥

যুবককে[১] বলেছিলেন, 'দু'সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব[২]।'

(১) এ ঘটনায় 'মূসা' নামে প্রসিদ্ধ নবী মূসা ইবনে ইমরান 'আলাইহিস্ সালাম-কে বোঝানো হয়েছে। فتى এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। [ফাতহুল কাদীর] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, এই খাদেম ছিল ইউশা' ইবনে নূন। [ইবন কাসীর] ﴿مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ -এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলাবাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন্ জায়গা বোঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদী দৃষ্টে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। [ফাতহুল কাদীর]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'একদিন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বনী-ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলঃ সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেনঃ আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমাকে তার ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাত পাবেন। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশমত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার সাথে তার খাদেম ইউশা' ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে যাওয়ার সাথে সাথে আরো একটি মু'জিযা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা' ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা'

ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মূসা 'আলাইহিস্ সালাম খাদেমকে বললেনঃ আমাদের নাশ্‌তা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশ্‌তা চাওয়ার পর ইউশা' ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললঃ শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বললঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।)
সে মতে তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তদবস্থায় সালাম করলে খাদির 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ আমি মূসা! খাদির 'আলাইহিস্ সালাম প্রশ্ন করলেনঃ বনী-ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, আমিই বনী-ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। খাদির বললেনঃ যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।
একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা খাদিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খাদির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম (স্থির থাকতে না পেরে) বললেনঃ তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খাদির বললেনঃ আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ওযর পেশ করে বললেনঃ আমি ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল। (ইতিমধ্যে) একটি পাখি উড়ে এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খাদির 'আলাইহিস্ সালাম মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললেনঃ আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬১. অতঃপর তারা উভয়ে যখন দু'সাগরের মিলনস্থলে পৌঁছল তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ফলে সেটা সুড়ঙ্গের মত নিজের পথ করে সাগরে নেমে গেল[১]।

উভয়ের মিলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তারা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খাদির একটি বালককে অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খাদির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মারা গেল। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহ্র কাজ করলেন। খাদির বললেনঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বের চাইতেও গুরুতর। তাই বললেনঃ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করে দিল। খাদির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বিস্মিত হয়ে বললেনঃ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করলো অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খাদির বললেনঃ ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ﴾ অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। এরপর খাদির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে বর্ণনা করে বললেনঃ ﴿ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো আপনি দেখে ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো কিছু জানা যেত। [বুখারীঃ ১২২, মুসলিমঃ ২৩৮০] এই দীর্ঘ হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী-ইসরাঈলের নবী মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবন নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খাদির 'আলাইহিস্ সালাম। [ফাতহুল কাদীর]

(১) মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

৬২. অতঃপর যখন তারা আরো অগ্রসর হল মূসা তার সঙ্গীকে বললেন, 'আমাদের দুপুরের খাবার আন, আমরা তো এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৩. সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন মাছের যা ঘটেছিল আমি তা আপনাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম শয়তানই সেটার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; আর মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সাগরে নেমে গেল।'

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

৬৪. মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম[১]।' তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

৬৫. এরপর তারা সাক্ষাত পেল আমাদের বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে

অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরী করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরী করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রের যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরী হয়ে যেত। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] উপরোক্ত হাদীস থেকে তা-ই জানা যায়। দ্বিতীয় বার যখন ইউশা' ইবন নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে عَجَبًا শব্দের অর্থ: আশ্চর্যজনকভাবে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের এ নিশানীটিই তো আমাকে বলা হয়েছিল। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ইংগিতেই মূসা আলাইহিসসালাম এ সফর করছিলেন। তার গন্তব্য স্থলের চিহ্ন হিসেবে তাকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, যেখানে তাদের খাওয়ার জন্য নিয়ে আসা মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে সেখানে তারা আল্লাহর সেই বান্দার দেখা পাবেন, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝٦٥

আমরা আমাদের কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান[১]।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝٦٦

৬৬. মূসা তাকে বললেন, 'যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন, যা দ্বারা আমি সঠিক পথ পাব, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি[২]?'

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝٦٧

৬৭. সে বলল, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না,

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝٦٨

৬৮. 'যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কেমন করে[৩]?'

---

(১) কুরআনুল কারীমে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ (আমার বান্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তার নাম 'খাদির' উল্লেখ করা হয়েছে। খাদির অর্থ সবুজ-শ্যামল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। [বুখারীঃ ৩৪০২] খাদির কি নবী ছিলেন, না ওলী ছিলেন, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য আলেমদের মতে, খাদির 'আলাইহিস্ সালামও একজন নবী। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নবী ও শীর্ষস্থানীয় রাসূল হওয়া সত্ত্বেও খাদির 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, ছাত্রকে অবশ্যই উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করতে হবে। [ইবন কাসীর]

(৩) খাদির 'আলাইহিস্ সালাম মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললেনঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরণের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজের কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন। [ইবন কাসীর]

৬৯. মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।'

قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعۡصِي لَكَ أَمۡرًا ۝٦٩

৭০. সে বলল, 'আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলি।'

قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعۡتَنِي فَلَا تَسۡـَٔلۡنِي عَن شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ أُحۡدِثَ لَكَ مِنۡهُ ذِكۡرًا ۝٧٠

দশম রুকূ'

৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বললেন, 'আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করার জন্য তা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!'

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَاۖ قَالَ أَخَرَقۡتَهَا لِتُغۡرِقَ أَهۡلَهَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـًٔا إِمۡرًا ۝٧١

৭২. সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?'

قَالَ أَلَمۡ أَقُلۡ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرًا ۝٧٢

৭৩. মূসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।'

قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِي مِنۡ أَمۡرِي عُسۡرًا ۝٧٣

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, অবশেষে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করল। তখন মূসা বললেন, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلۡتَ نَفۡسًا زَكِيَّةَۢ بِغَيۡرِ نَفۡسٍ لَّقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـًٔا نُّكۡرًا ۝٧٤

অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন[১]!'

৭৫. সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?'

قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكَ اِنَّكَ لَنۡ تَسۡتَطِیۡعَ مَعِیَ صَبۡرًا ﴿۷۵﴾

৭৬. মূসা বললেন, 'এর পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না; আমার 'ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।

قَالَ اِنۡ سَاَلۡتُكَ عَنۡ شَیۡءٍۭ بَعۡدَهَا فَلَا تُصٰحِبۡنِیۡ ۚ قَدۡ بَلَغۡتَ مِنۡ لَّدُنِّیۡ عُذۡرًا ﴿۷۶﴾

৭৭. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইল[২]; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তারা এক

فَانۡطَلَقَا ٝ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَتَیَاۤ اَهۡلَ قَرۡیَةِ ۣاسۡتَطۡعَمَاۤ اَهۡلَهَا فَاَبَوۡا اَنۡ یُّضَیِّفُوۡهُمَا فَوَجَدَا فِیۡهَا جِدَارًا یُّرِیۡدُ اَنۡ یَّنۡقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَیۡهِ اَجۡرًا ﴿۷۷﴾

(১) একবার নাজদাহ্ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, খাদির 'আলাইহিস্ সালাম নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জবাব লিখলেনঃ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা খাদির 'আলাইহিস্ সালাম-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। [মুসলিমঃ ১৮১২] উদ্দেশ্য এই যে, খাদির 'আলাইহিস্ সালাম নবুওয়াতের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর নবুওয়াত বন্ধ হয়ে যাবার কারণে এখন এই জ্ঞান আর কেউ লাভ করতে পারবে না।

(২) খাদির 'আলাইহিস্ সালাম যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা তার আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় সে গ্রামটি সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'কৃপণ জনগোষ্ঠী সম্বলিত গ্রামে এসে পৌঁছলো।' [মুসলিমঃ ২৩৮০, ১৭২] সুনির্দিষ্ট কোন গ্রামের উল্লেখ করা হয়নি।

প্রাচীর দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন সে সেটাকে সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বললেন, 'আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।'

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮. সে বলল, 'এখানেই আমার এবং আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি অচিরেই আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৭৯. 'নৌকাটির ব্যাপার---এটা ছিল কিছু দরিদ্র ব্যক্তির, ওরা সাগরে কাজ করত[১]; আমি ইচ্ছে করলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগ করে প্রত্যেকটি ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত।

وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮০. 'আর কিশোরটি-- তার পিতামাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমরা আশংকা করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে[২]।

فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮১. 'তাই আমরা চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়া-মায়ায় ঘনিষ্ঠতর।

---

(১) অর্থাৎ এর দ্বারা সমুদ্রে কাজ করে জীবিকার তালাশ করত। [মুয়াসসার]

(২) হাদীসে এসেছেঃ যে বালককে খাদির 'আলাইহিস্ সালাম হত্যা করেছিলেন, সে কাফের হিসেবে লিখা হয়েছিল। যদি বড় হওয়ার সুযোগ পেত তবে পিতা-মাতাকে কুফরী ও সীমালংঘনের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে ছাড়ত। [মুসলিমঃ ২৬৬১]

৮২. 'আর ঐ প্রাচীরটি-- সেটা ছিল নগরবাসী দুই ইয়াতিম কিশোরের এবং এর নীচে আছে তাদের গুপ্তধন(১) আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ(২)। কাজেই আপনার রব তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আর আমি নিজ থেকে কিছু করিনি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা(৩)।'

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

(১) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সে প্রাচীরের নীচে খনি আছে বলেছেন। এর অতিরিক্ত কোন তাফসীর করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও সহীহ্ কোন তাফসীর বর্ণিত হয়নি। তাই এ ব্যাপারে সঠিক কোন মতামত দেয়া যায় না। তবে কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে গচ্ছিত খনি বলতে সম্পদ বোঝানো হয়েছে। আর আয়াতের ভাষ্য থেকেও এ অর্থই বেশী সুস্পষ্ট। [দেখুন, তাবারী]

(২) এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাদির 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমে ইয়াতীম বালকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হেফাযত এজন্য করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। [ইবন কাসীর]

(৩) খাদির 'আলাইহিস্ সালাম জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছেঃ এ বিষয়ের সাথে কুরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে একটি বর্ণনা। যাতে বলা হয়েছেঃ 'যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদা-কালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভীড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকেঃ আল্লাহ্‌র দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে এবং তিনি প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা, যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও

এগারতম রুকূ'

৮৩. আর তারা আপনাকে যুল-কার্‌নাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে[১]। বলুন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ ইনি খাদির 'আলাইহিস্ সালাম।' [মুস্তাদরাকঃ ৩/৫৯, ৬০] তবে বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

পক্ষান্তরে যারা খাদির 'আলাইহিস্ সালাম-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে-

এক) আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "আমরা আপনার আগেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৩৪] সুতরাং খাদির আলাইহিসসালামও অনন্ত জীবন লাভ করতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই অন্যান্য মানুষের মত মারা গেছেন।

দুই) আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ দিকে এক রাতে আমাদেরকে নিয়ে এশার সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেনঃ 'তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ' বছর পর আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।' [মুসলিমঃ ২৫৩৭]

তিন) অনুরূপভাবে, খাদির 'আলাইহিস্ সালাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে জীবিত থাকলে তার কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তার জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে "মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৩৮] (কারণ, আমার আগমনের ফলে তার দ্বীন রহিত হয়ে গেছে।)

চার) বদরের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ "যদি আপনি এ ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করেন তবে যমীনের বুকে আপনার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না"। [মুসলিমঃ ১৭৬৩] এতে বোঝা যাচ্ছে যে, খাদির নামক কেউ জীবিত নেই।

এ সব দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, খাদির 'আলাইহিস্ সালাম জীবিত নেই। সুতরাং যারাই তার সাথে সাক্ষাতের দাবী করবে, তারাই মিথ্যার উপর রয়েছে। এটাও অসম্ভব নয় যে, শয়তান তাদেরকে খিদিরের রূপ ধরে বিভ্রান্ত করছে। কারণ, শয়তানের পক্ষে খিদিরের রূপ ধারণ করা অসম্ভব নয়। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন কাসীর; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু ফাতাওয়া ৪/৩৩৭]

(১) যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হল কেনঃ যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র

مِّنْهُ ذِكْرًا

'অচিরেই আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করব।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

৮৪. আমরা তো তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম[১]।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي

৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্ত

মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেনঃ তার মাথার চুলে দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেনঃ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার মাথায় শিং-এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তার মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ 'যুলকারনাইন নবী বা ফিরিশ্‌তা ছিলেন না, একজন নেক বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্‌কে তিনি ভালবেসেছিলেন, আল্লাহ্‌ও তাকে ভালবেসেছিলেন। আল্লাহ্‌র হকের ব্যাপারে অতিশয় সাবধানী ছিলেন, আল্লাহ্‌ও তার কল্যাণ চেয়েছেন। তাকে তার জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা তার কপালে মারতে মারতে তাকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে আবার জীবিত করলেন, এজন্য তার নাম হল যুলকারনাইন।' [মুখতারাঃ ৫৫৫, ফাত্‌হুল বারীঃ ৬/৩৮৩] যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনুল কারীম যা বর্ণনা করেছে, তা এইঃ তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন- পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে উভয় পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

(১) আরবী অভিধানে سبب শব্দের অর্থ এমন বস্তু বোঝায়, যা দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেয়া হয়। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুলকারনাইনকে দেশ বিজয়েরই জন্য সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, তা সবই দান করেছিলেন।

عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

গমন স্থানে পৌঁছল[১] তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল[২] এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমরা বললাম, 'হে যুল-কার্‌নাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।'

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

৮৭. সে বলল, 'যে কেউ যুলুম করবে অচিরেই আমরা তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর তাকে তার রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮. 'তবে যে ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, তিনি পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করতে করতে স্থলভাগের শেষ সীমানায় পৌঁছে যান, এরপর ছিল সমুদ্র। এটিই হচ্ছে সূর্যাস্তের সীমানার অর্থ। হাবীব ইবন্ হাম্মায বলেন: আমি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একলোক তাকে জিজ্ঞেস করল যে, যুলকারনাইন কিভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিল? তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আকাশের মেঘকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিলেন। পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ দিয়েছিলেন এবং প্রচুর শক্তি-সামর্থ দান করেছিলেন। তারপর আলী বললেন: আরও বলব? লোকটি চুপ করলে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও চুপ করে যান।' [আল-মুখতারাহ: ৪০৭] [ইবন কাসীর]

(২) حَمِئَةٍ এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। অর্থাৎ তিনি সূর্যকে তার দৃশ্যে মহাসাগরে ডুবতে দেখলেন। আর সাধারণত: যখন কেউ সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া প্রত্যক্ষ করবে, তখনই তার এটা মনে হবে, অথচ সূর্য কখনও তার কক্ষপথ ত্যাগ করেনি। [ইবন কাসীর] এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নীচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত, তা হলো, কুরআন একথা বলেনি যে, সূর্য কালো জলাশয়ে ডুবে। বরং এখানে যুলকারনাইনের অনুভূতিই শুধু ব্যক্ত করা হয়েছে।

কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমরা নরম কথা বলব ।'

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তারপর সে এক উপায় অবলম্বন করল,

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

৯০. চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থলে পৌছল তখন সে দেখল সেটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোন অন্তরাল আমরা সৃষ্টি করিনি;

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই, আর তার কাছে যে বৃত্তান্ত ছিল তা আমরা সম্যক অবহিত আছি ।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

৯২. তারপর সে আরেক মাধ্যম অবলম্বন করল,

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৩. চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে(১) পৌছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা তার কথা তেমন বুঝতে পারছিল না ।

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

৯৪. তারা বলল, 'হে যুল-কার্নাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ(২) তো যমীনে

---

(১) যে বস্তু কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, سد তাকে বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক । এখানে سدين বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে । এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল । কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত । [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম] যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন ।

(২) ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত । অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সন্তান-সন্ততি । কুরআনুল কারীম স্পষ্টতঃই বলেছেঃ

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ [আস্-সাফ্ফাতঃ ৭৭] অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর।[মুসনাদে আহমাদঃ ৫/১১] তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ্ হাদীস হচ্ছে নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীসটি। সেখানে দাজ্জালের ঘটনা ও তার ধ্বংসের কথা বিস্তারিত বর্ণনার পর বলা হয়েছে, "এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করবেনঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই (হে ঈসা!) আপনি মুসলিমদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। (সে মতে তিনি তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্যান্য মুসলিমরা নিজ নিজ দূর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য মুসলিমরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবেন। (আল্লাহ্ দো'আ কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাধি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যেই ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধহাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করবেন। (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়)। আল্লাহ্ তা'আলা এ দো'আও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। (তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেনঃ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদ্‌গীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য

যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃংখলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি মনোরম বায়ূ প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলিমের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলিই অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।' [মুসলিমঃ ২৯৩৭]

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের বর্ণনায় ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছেঃ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবেঃ আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌র আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।) [মুসলিমঃ ২৯৩৭]। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্‌ সালাম-কে বলবেনঃ আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি বলবেনঃ হে আমার রব! তারা কারা? আল্লাহ্‌ বলবেনঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরান্নব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ চিন্তা করো না। তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। [মুসলিমঃ ২২২] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব ও উমরাহ্‌ অব্যাহত থাকবে। [বুখারীঃ ১৪৯০]। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ 'আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী! আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে।' অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান। যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ আমি এ কথা শুনে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়। [বুখারীঃ ৩৩৪৬, মুসলিমঃ ২৮৮০]। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা একথা বলে ফিরে

مُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلٰۤی اَنۡ تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدًّا ﴿۹۴﴾

অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবেন?'

قَالَ مَا مَكَّنِّیۡ فِيۡهِ رَبِّیۡ خَيۡرٌ فَاَعِيۡنُوۡنِیۡ بِقُوَّةٍ اَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا ﴿۹۵﴾

৯৫. সে বলল, 'আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তা-ই উৎকৃষ্ট। কাজেই তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব(১)।

اٰتُوۡنِیۡ زُبَرَ الۡحَدِيۡدِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی بَيۡنَ الصَّدَفَيۡنِ قَالَ انۡفُخُوۡا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِیۡۤ

৯৬. 'তোমরা আমার কাছে লোহারপাতসমূহ নিয়ে আস,' অবশেষে মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই

যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামী কাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ্র ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবেঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা আগামী কাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহ্র নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে।) পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। [তিরমিযিঃ ৩১৫৩, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪১৯৯, হাকিম মুস্তাদরাকঃ ৪/৪৮৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫১০, ৫১১]। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ 'হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মান করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই।' তাছাড়া কুরআনে তারা ছিদ্র পুরোপুরি করতে পারছে না বলা হয়েছে, যা হাদীসের ভাষ্যের বিপরীত নয়।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ দেশের যে অর্থভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এবং যে ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন তা এ কাজ সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। তবে শারীরিক শ্রম দিয়ে ও নির্মান যন্ত্র তোমাদের আমাকে সাহায্য করতে হবে। [ইবন কাসীর]

أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, ‘তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক।’ অতঃপর যখন সেটা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল, ‘তোমরা আমার কাছে গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা ঢেলে দেই এর উপর(১)।’

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৭. অতঃপর তারা সেটা অতিক্রম করতে পারল না এবং সেটা ভেদও করতে পারল না।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

৯৮. সে বলল, ‘এটা আমার রব-এর অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রব-এর প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রব-এর প্রতিশ্রুতি সত্য।’

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

৯৯. আর সেদিন আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেব এ অবস্থায় যে, একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় আছড়ে পড়বে(২)। আর শিংগায় ফুঁক দেয়া

---

(১) زبر শব্দটি زبرة এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। ইবন আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, এটি যেন ইটের মত ব্যবহার করা হয়েছিল। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। الصَّدَفَيْنِ-দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক। [ফাতহুল কাদীর] قِطْرًا অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে এর অর্থ গলিত লোহা অথবা রাঙতা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) بعضهم এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ ইয়াজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে- বাহ্যতঃ এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। [ফাতহুল কাদীর] উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম] তাফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন। যেমন তারা মানুষের সাথে মিশে যমীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে, এখানে কিয়ামতের সময়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে, যেদিন বাঁধ নির্মান শেষ হয়েছে সেদিন

হবে, অতঃপর আমরা তাদের সবাইকে[১] পুরোপুরি একত্রিত করব।

১০০. আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব কাফেরদের কাছে,

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝١٠٠

১০১. যাদের চোখ ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝١٠١

বারতম রুকূ'

১০২. যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করেছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে[২] অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে[৩]? আমরা তো

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝١٠٢

ইয়াজুজ মাজুজ বাঁধের ভিতরে পরস্পর পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(১) فَجَمَعْنَاهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে সমগ্র জিন ও মানুষকে একত্রিত করা হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) عِبَادِي (আমার দাস) বলে এখানে ফিরিশ্‌তা, নেককার লোক এবং সেসব নবীগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্‌র শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন, উযায়ের ও ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম। কিছুসংখ্যক আরব ফিরিশ্‌তাদেরও উপাসনা করত, [ফাতহুল কাদীর] তাই আয়াতে ﴿الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا﴾ বলে কাফেরদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির "আমার বান্দা" অর্থ সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা, এমনকি গরু ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে; তারা কি মনে করে যে, এ কাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? [ফাতহুল কাদীর] এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কখনই নয়, ওরা তো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" [সূরা মারইয়াম: ৮২]

কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম ।

১০৩. বলুন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত(১)?'

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৪. ওরাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে,

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৫. 'তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রব-এর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে কুফরি করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা তাদের জন্য কেয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না(২) ।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৬. 'জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ ।'

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

---

(১) এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে । কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল । কুরতুবী বলেনঃ এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয় । (এক) ভ্রান্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি । [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যতঃ বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়িপাল্লায় তার কোন ওজন হবে না । কেননা, কুফর ও শির্কের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কেয়ামতের দিন দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, আল্লাহ্‌র কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না । অতঃপর তিনি বলেনঃ যদি এর সমর্থন চাও, তবে কুরআনের এই আয়াত পাঠ কর- ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [বুখারীঃ ৪৭২৯, মুসলিমঃ ৪৬৭৮]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস[১]।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না[২]।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

১০৯. বলুন, 'আমার রব-এর কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার রব-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে-- আমরা এর সাহায্যের জন্য এর মত আরো সাগর আনলেও[৩]।'

---

(১) فردوس এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহ্‌র আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।' [বুখারীঃ ২৭৯০, ৭৪২৩, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৩৫]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও কি খারাপ মনে হতে থাকবে?। আলোচ্য আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নেয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় মনে জাগবে না। অর্থাৎ তার চেয়ে আরামদায়ক কোন পরিবেশ কোথাও থাকবে না। ফলে জান্নাতের জীবন তার সাথে বিনিময় করার কোন ইচ্ছাই তাদের মনে জাগবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ যদি সাগরের পানি আল্লাহ্‌র কালেমাসমূহ লেখার কালি হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্‌র কালেমাসমূহ শেষ হওয়ার আগেই সাগরের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও এর কালি বাড়ানোর জন্য আরও সাগর এর সাথে যুক্ত করা হয়।[আদওয়াউল

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

১১০. বলুন, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র সত্য ইলাহ্। কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর 'ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে(১)।'

বায়ান] অনুরূপ অন্য স্থানেও আল্লাহ্ বলেছেন। যেমন, "আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরো সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।" [সূরা লুকমান: ২৭] এ আয়াতসমূহ প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্র কালেমাসমূহ কখনও শেষ হবে না। [আদওয়াউল বায়ান] হাদীসে এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে, কুরাইশ সর্দাররা ইয়াহূদীদের কাছে এসে বলল, আমাদেরকে এমন কিছু দাও যা আমরা ঐ লোকটাকে প্রশ্ন করতে পারি। তারা বলল, তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। তারা তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নাযিল হল, ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ অর্থাৎ "আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, 'রূহ আমার রবের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই।" [সূরা আল-ইসরা: ৮৫] এটা শুনে ইয়াহূদীরা বলতে লাগল, আমাদেরকে তো অনেক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওরাত। আর যাকে তাওরাত দেয়া হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়েছে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩১৪০]

(১) এ আয়াতকে দ্বীনের ভিত্তি বলা হয়ে থাকে, এখানে এমন দু'টি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে যার উপরই সমস্ত দ্বীন নির্ভর করছে। এক, কার ইবাদত করছে দুই, কিভাবে করছে। একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে ইখলাসের সাথে। আবার সে ইবাদত হতে হবে নেক আমলের মাধ্যমে। আর নেক আমল হবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে আমল করলেই। মোদ্দাকথা, শির্ক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এ আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

এখানে উল্লেখিত শির্ক শব্দ দ্বারা যাবতীয় শির্কই বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু শির্ক আছে যেগুলো শির্ক হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট তাই তা থেকে বাঁচা খুব সহজ। এর বিপরীতে কিছু কিছু শির্ক আছে যেগুলো খুব সুক্ষ্ম বা গোপন। এ সমস্ত গোপন শির্কের উদাহরণের মধ্যে আছে, সামান্য রিয়া তথা সামান্য লোক দেখানো মনোবৃত্তি। সারমর্ম এই যে, আয়াতে যাবতীয় শির্ক হতে তবে বিশেষ করে রিয়াকারীর গোপন শির্ক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে

তাও এক প্রকার গোপন শির্ক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। মাহমুদ ইবনে লবীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেনঃ রিয়া।' [আহমাদঃ ৫/৪২৮, ৪২৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেনঃ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।' কেননা, আল্লাহ্ শরীকদের শরীকানার সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। [তিরমিযীঃ ৩১৫৪, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২০৩, আহমাদঃ ৪/৪৬৬, বায়হাকী শু'আবুল ঈমানঃ ৬৮১৭]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত; সে আমলকে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল। [মুসলিমঃ ২৯৮৫] আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। [আহমাদঃ ২/১৬২, ১৯৫, ২১২, ২২৩] অন্য হাদীসে এসেছে, "পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শির্ক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে।" তিনি আরো বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শির্ক ও ছোট শির্ক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দো'আ পাঠ করো اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ [মুসনাদে আবু ইয়ালাঃ ১/৬০, ৬১ নং ৫৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ ১০/২২৪]

১৯- সূরা মার্‌ইয়াম[1]
৯৮ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ مَرْيَمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

كٓهٰيٰعٓصٓ ①

১. কাফ্-হা-ইয়া-‘আঈন-সোয়াদ[2];

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ②

২. এটা আপনার রব-এর অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার[3] প্রতি,

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③

৩. যখন তিনি তার রবকে ডেকেছিলেন নিভৃতে[4],

---

(১) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: বনী ইসরাইল, আল্-কাহফ, মার্‌ইয়াম, ত্বা-হা এবং আম্বিয়া এগুলো আমার সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বা সর্বপ্রথম পুঁজি। [বুখারীঃ ৪৭৩৯] তাই এ সূরাসমূহের গুরুত্বই আলাদা। তন্মধ্যে সূরা মার্‌ইয়ামের গুরুত্ব আরো বেশী এদিক দিয়েও যে, এ সূরায় ঈসা আলাইহিস্‌সালাম ও তার মা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা অনুধাবন করলে নাসারাদের ঈমান আনা সহজ হবে। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: হাবশার রাজা নাজাসী জা‘ফর ইবন আবি তালিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু কি আছে? উম্মে সালামাহ বলেন, তখন জা‘ফর ইবন আবি তালিব বললেন: হ্যাঁ। নাজাসী বললেন: আমাকে তা পড়ে শোনাও। জা‘ফর ইবন আবি তালিব তখন কাফ্-হা-ইয়া-‘আইন-সাদ থেকে শুরু করে সূরার প্রথম অংশ শোনালেন। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, এটা শোনার পর নাজাসী এমনভাবে কাঁদতে থাকল যে, তার চোখের পানিতে দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। তার দরবারের আলেমরাও কেঁদে ফেলল। তারা তাদের ধর্মীয় কিতাবসমূহ বন্ধ করে নিল। তারপর নাজাসী বলল: ‘অবশ্যই এটা এবং যা মূসা নিয়ে এসেছে সবই একই তাক থেকে বের হয়েছে।’ [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬৬-৩৬৮]

(২) এ শব্দগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-বাকারার শুরুতে করা হয়েছে।

(৩) হাদীসে এসেছে, যাকারিয়্যা আলাইহিসসালাম কাঠ-মিস্ত্রির কাজ করতেন। [মুসলিম: ২৩৭৯] এতে বুঝা গেল যে, নবী-রাসূলগণ জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কারিগরি পেশা অবলম্বন করতেন। তারা কখনো অপরের উপর বোঝা হতেন না।

(৪) এতে জানা গেল যে, দো‘আ অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। কাতাদা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র মন জানেন এবং গোপন শব্দ শুনেন। [তাবারী] তিনি যে দো‘আ করেছিলেন তা-ই পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

৪. তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে(১), বার্ধক্যে আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে(২); হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি(৩)।

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

৫. 'আর আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। কাজেই আপনি আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী,

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

৬. 'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে(৪)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

(১) অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। [ফাতহুল কাদীর]

(২) اشتعل এর শাব্দিক অর্থ, প্রজ্বলিত হওয়া, এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে দো'আর পূর্বে যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ এই যে, এমতাবস্থায় সন্তান না আসাই স্বাভাবিক। এখানে দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, দো'আ করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্থতা উল্লেখ করা দো'আ কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। [কুরতুবী] তারপর বলছেন যে, আপনাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি। আপনি সবসময় আমার দো'আ কবুল করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৪) আলেমদের মতে, এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ নবুওয়াত-রিসালত তথা ইলমের উত্তরাধিকার। আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমতঃ যাকারিয়্যার কাছে এমন কোন অর্থ সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর। এছাড়া যাকারিয়্যা আলাইহিসসালাম নিজে কাঠ-মিস্ত্রি ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাঠ-মিস্ত্রির কাজের মাধ্যমে এমন সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হয় না যার জন্য চিন্তা করতে হয়। দ্বিতীয়ত: সাহবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।"- [আবু দাউদ:

এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়া'কূবের বংশের(১) এবং হে আমার রব! তাকে করবেন সন্তোষভাজন'।

৭. তিনি বললেন, 'হে যাকারিয়্যা! আমরা আপনাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া; এ নামে আগে আমরা কারো নামকরণ(২) করিনি।'

يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۝

৮. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত!'

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

৩৬৪১, ইবনে মাজাহ: ২২৩, তিরমিযী: ২৬৮২] তৃতীয়তঃ স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে এর ﴿يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ﴾ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দো'আ করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব আলাইহিসসালামের উত্তরাধিকার হওয়াই যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনরা যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তী আত্মীয় রেখে দুরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থী। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র নিজের উত্তরাধিকারী চাই না বরং ইয়াকুব বংশের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী চাই। সে নবী হবে যেমন তার পিতৃপুরুষরা যেভাবে নবী হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) سَمِيًّا শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে ইয়াহ্‌ইয়া নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। [তাবারী] নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন: ইয়াহ্‌ইয়া অর্থ জীবিতকরণ, তিনি এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ্ ঈমানের মাধ্যমে জীবন্ত রেখেছিলেন। [তাবারী] পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় তখন উদ্দেশ্য হবে, তার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা তার পূর্ববর্তী নবীগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম পূর্ববর্তী নবীদের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও মূসা কলীমুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত।

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩

৯. তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' আপনার রব বললেন, 'এটা আমার জন্য সহজ; আমি তো আগে আপনাকে সৃষ্টি করেছি যখন আপনি কিছুই ছিলেন না[১]।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠

১০. যাকারিয়্যা বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন।' তিনি বললেন, 'আপনার নিদর্শন এ যে, আপনি সুস্থ[২] থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে তিন দিন কথাবার্তা বলবেন না।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١

১১. তারপর তিনি ('ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট) কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন।

---

(১) অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব প্রদান করা এটা তো মহান আল্লাহ্‌রই কাজ। তিনি ব্যতীত কেউ কি সেটা করতে পারে? তিনি যখন চাইলেন তখন বন্ধ্যা যুগলের ঘরে এমন অনন্য নাম ও গুণসম্পন্ন সন্তান প্রদান করলেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুকেই অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন। এর জন্য শুধু তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ্ বলেন: "মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমরা তাকে আগে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?" [সূরা মারইয়াম: ৬৭] আরও বলেন: "কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।" [সূরা আল-ইনসান: ১] [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) سويًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্য যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন রোগবশতঃ ছিল না। এ কারণেই আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে তার জিহবা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল; বরং এ অবস্থা মু'জেযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। [ইবন কাসীর]

১২. ‘হে ইয়াহ্‌ইয়া[১]! আপনি কিতাবটিকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন।’ আর আমরা তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম প্রজ্ঞা[২]।

يٰيَحۡيٰى خُذِ الۡكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيۡنٰهُ الۡحُكۡمَ صَبِيًّا ﴿۱۲﴾

১৩. এবং আমাদের কাছ থেকে হৃদয়ের কোমলতা[৩] ও পবিত্রতা; আর তিনি ছিলেন মুত্তাকী।

وَّحَنَانًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿۱۳﴾

১৪. পিতা-মাতার অনুগত এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য[৪]।

وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُنۡ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾

---

(১) মাঝখানে এই বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়নি যে, আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী ইয়াহ্‌ইয়ার জন্ম হয় এবং শৈশব থেকে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এখন বলা হচ্ছে, যখন তিনি জ্ঞানলাভের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছেন তখন তাঁর উপর কি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এখানে মাত্র একটি বাক্যে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাওরাতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবেন এবং বনী ইসরাঈলকে এ পথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন। আর যদি কিতাব বলে কোন সুনির্দিষ্ট সহীফা ও চিঠি সংবলিত গ্রন্থ বুঝানো হয়ে থাকে তবে তাও উদ্দেশ্য হতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে الحكم শব্দ দ্বারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুঝ, দৃঢ়তা, স্থিরতা, কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামিতা এবং অসৎকাজ থেকে বিমুখতা বুঝানো হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই তিনি এ সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক বলেন, মা'মার বলেন: ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়্যাকে কিছু ছোট ছেলে-পুলে বলল যে, চল আমরা খেলতে যাই। তিনি জবাবে বললেন: খেল-তামাশা করার জন্য তো আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি! [ইবন কাসীর]

(৩) حنان শব্দটি মমতার প্রায় সমার্থক শব্দ। আল্লাহ্ তার জন্য মায়া-মমতা ঢেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ও তাকে ভালবাসতেন তিনিও আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে ভালবাসতেন। একজন মায়ের মনে নিজের সন্তানের জন্য যে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহশীলতা থাকে, যার ভিত্তিতে সে শিশুর কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ে, আল্লাহর বান্দাদের জন্য ইয়াহ্‌ইয়ার মনে এই ধরনের স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৪) তিনি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা হতে মুক্ত ছিলেন। হাদীসে এসেছে, ‘কিয়ামতের দিন আদম সন্তান মাত্রই গুনাহ নিয়ে আসবে তবে ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়্যা এর ব্যতিক্রম।’ [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫৪, ২৯২]

১৫. আর তার প্রতি শান্তি যেদিন তিনি জন্ম লাভ করেন, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবেন[১]।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মার্‌ইয়ামকে, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল[২],

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

১৭. অতঃপর সে তাদের নিকট থেকে নিজেকে আড়াল করল। তখন আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল[৩]।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

---

(১) সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেন: তিন সময় মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়। এক. যখন সে দুনিয়াতে প্রথম আসে। কারণ সে তাকে এক ভিন্ন পরিবেশে আবিস্কার করে। দুই. যখন সে মারা যায়। কারণ সে তখন এমন এক সম্প্রদায়কে দেখে যাদেরকে দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। তিন. হাশরের মাঠে; কারণ তখন সে নিজেকে এক ভীতিপ্রদ অবস্থায় জমায়েত দেখতে পায়। তাই ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়্যা আলাইহিসসালামকে এ তিন বিপর্যয়কর অবস্থার বিভিষিকা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেনঃ গোসল করার জন্য পানি আনতে গিয়েছিলেন। কেউ বলেনঃ অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্যে কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেনঃ এ কারণেই নাসারারা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে 'রূহ' বলে জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্যে সহজ নয়- এতে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। এ কারণে জিব্‌রাঈল আলাইহিসসালাম মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। [ফাতহুল কাদীর] যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গিরি গুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

১৮. মার্‌ইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) যদি তুমি 'মুত্তাকী হও'(১)।

قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۝١٨

১৯. সে বলল, 'আমি তো তোমার রব-এর দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য(২)।'

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ۝١٩

২০. মার্‌ইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?'

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝٢٠

২১. সে বলল, 'এ রূপই হবে।' তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজ। আর আমরা তাকে এজন্যে সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝٢١

---

(১) মারইয়াম যখন পর্দার ভেতর আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশঙ্কা করলেন এবং বললেনঃ "আমি তোমার থেকে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি, যদি তুমি তাকওয়ার অধিকারী হও"। [ইবন কাসীর] এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন যালেমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করেঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি যুলুম করো না। এ যুলুম থেকে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্যে সমীচীন। [বাগভী] অথবা এর অর্থ: যদি তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আমার আশ্রয় প্রার্থনাকে মূল্য দাও তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। [তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(২) সে দূত হলেন, জিবরাঈল আলাইহিসসালাম। আল্লাহ্ তাঁর দূত জিবরাঈলকে পবিত্র ফুঁ নিয়ে পাঠালেন। যে ফুঁর মাধ্যমে মারইয়ামের গর্ভে এমন সন্তানের জন্ম হলো যিনি অত্যন্ত পবিত্র ও কল্যাণময় বিবেচিত হলেন। মহান আল্লাহ্ তার সম্পর্কে বলেন: "স্মরণ করুন, যখন ফিরিশতাগণ বলল, হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তার নাম মসীহ্ মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' [সূরা আলে-ইমরান: ৪৫-৪৬]

এক নিদর্শন[১] ও আমাদের কাছ থেকে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার ।'

২২. অতঃপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা সহ দূরের এক স্থানে চলে গেল[২];

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২৩. অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর-গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল । সে বলল, 'হায়, এর আগে যদি আমি মরে যেতাম[৩] এবং

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

(১) এটা এমন এক নিদর্শন যা সর্বকালের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে নেয়া যায় । এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর অপার কুদরতের বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন । [ফাতহুল কাদীর] তিনি আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত, হাওয়াকে মাতা ব্যতীত আর সমস্ত মানুষকে পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু ঈসা আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত । এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর সব ধরনের শক্তি ও ক্ষমতা দেখিয়েছেন । তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন । তার নিকট কোন কিছুই কঠিন নয় ।

(২) দূরবর্তী স্থানে মানে বাইত লাহ্‌ম । [কুরতুবী] কাতাদা বলেন, পূর্বদিকে । [তাবারী] মারইয়াম আলাইহাস সালাম হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন । এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ই'তিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবারের লোকেরাই নয়, সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকরাও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো । তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার পর নীরবে নিজের ই'তিকাফ কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়লেন, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্ণাম থেকে রক্ষা পান । [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যে পিতা ছাড়াই হয়েছিল এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি বিরাট প্রমাণ । যদি তিনি বিবাহিত হতেন এবং স্বামীর ঔরসে সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোন কারণই ছিল না । সুতরাং নাসারাদের মিথ্যাচার এখানে স্পষ্ট । তারা তাকে বিবাহিত বানিয়ে চাড়ছে ।

(৩) বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন বিপদে পড়ে অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা না করে"

মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতাম!'

২৪. তখন ফিরিশ্‌তা তার নিচ থেকে ডেকে তাকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না[১], তোমার পাদদেশে তোমার রব এক নহর সৃষ্টি করেছেন[২];

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیًّا ﴿٢٤﴾

২৫. 'আর তুমি তোমার দিকে খেজুর-গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, সেটা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে।

وَهُزِّیْٓ اِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿٢٥﴾

২৬. 'কাজেই খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। অতঃপর মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ তখন বলো, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা

فَكُلِیْ وَاشْرَبِیْ وَقَرِّیْ عَیْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِیْٓ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًّا ﴿٢٦﴾

[বুখারীঃ ৫৯৮৯, মুসলিমঃ ২৬৮০, ২৬৮১, আবুদাউদঃ ৩১০৮] সম্ভবত: মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবতঃ এর মোকাবেলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে অধৈর্য হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলেও গোনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তাই এখানে মৃত্যু কামনা মূল উদ্দেশ্য নয়, গোনাহ থেকে বাঁচাই উদ্দেশ্য। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এখানে কে মারইয়াম আলাইহাসসালামকে ডেকেছিল তা নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। এক. তাকে ফেরেশতা জিবরীলই ডেকেছিলেন। তখন 'তার নীচ থেকে' এর অর্থ হবে, গাছের নীচ থেকে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] দুই. কোন কোন মুফাসসির বলেছেন: তাকে তার সন্তানই ডেকেছিলেন। তখন এটিই হবে ঈসা আলাইহিসসালামের প্রথম কথা বলা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন কেরাআতে ﴿مَنْ تَحْتَهَآ﴾ ('যে তার নীচে আছে') পড়া হয়েছে। যা শেষোক্ত অর্থের সমর্থন করে। তবে অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম অর্থটিকেই গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন।

(২) এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। [ইবন কাসীর] এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারী করে দেন [ফাতহুল কাদীর] অথবা সেখানে একটি মৃত নহর ছিল। আল্লাহ্ সেটাকে পানি দ্বারা পূর্ণ করে দেন। [ফাতহুল কাদীর]

অবলম্বনের মানত করেছি[১]। কাজেই আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলব না।[২]'

২৭. তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হল; তারা বলল, 'হে মার্‌ইয়াম! তুমি তো এক অঘটন করে বসেছ[৩]।

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا

২৮. 'হে হারূনের বোন[৪]! তোমার পিতা

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ

(১) কাতাদাহ বলেন, তিনি খাবার, পানীয় ও কথা-বার্তা এ তিনটি বিষয় থেকেই সাওম পালন করেছিলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, ইসলাম পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার সাওম পালন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [ইবন কাসীর] ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়।" [আবু দাউদঃ ২৮৭৩]

(৩) فريًّا আরবী ভাষায় এ শব্দটির আসল অর্থ, কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয় তাকে فرى বলা হয়। [কুরতুবী] উপরে সেটাকেই 'অঘটন' অনুবাদ করা হয়েছে। শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে, বড় বিষয় বা বড় ব্যাপার। [ইবন কাসীর]

(৪) মুসা আলাইহিস সালাম-এর ভাই ও সহচর হারূন আলাইহিস সালাম মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পুর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। মুগীরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ তুমি বলে দিলে না কেন যে, বনী ইসরাঈলগণ নবীদের নামে নাম রাখা পছন্দ করতেন" [মুসলিমঃ ২১৩৫, তিরমিযীঃ ৩১৫৫] এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। (এক) মারইয়াম হারূন আলাইহিস সালাম এর বংশধর ছিলেন বলেই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে- যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান

أُمُّكِ بَغِيًّا ۝٢٨

অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী[১] ।'

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٢٩

২৯. তখন মার্‌ইয়াম সন্তানের প্রতি ইংগিত করল । তারা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?'

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝٣٠

৩০. তিনি বললেন, 'আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা । তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন,

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝٣١

৩১. 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময়[২] করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও

রয়েছে; যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যেমন তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে أخا تميم এবং আরবের লোককে أخا العرب বলে অভিহিত করে । [ইবন কাসীর] (দুই) এখানে হারূন বলে মুসা আলাইহিস সালাম -এর সহচর হারূন নবীকে বোঝানো হয়নি বরং মারইয়ামের কোন এক জ্ঞাতি ভ্রাতার নামও ছিল হারূন যিনি তৎকালিন সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছিল । এভাবে মারইয়াম হারুন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ । [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) কুরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ্ হয় । কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয় । কাজেই সম্মানিত লোকদের সন্তানদের উচিত সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা । গোনাহ ও অপরাধ থেকে দূরে থাকা । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে বরকতের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা । কারও কারও মতে, বরকত অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে বৃদ্ধি । অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার সব বিষয়ে প্রবৃদ্ধি ও সফলতা দিয়েছেন । কারও কারও মতে, বরকত অর্থ, মানুষের জন্য কল্যাণকর হওয়া । কেউ কেউ বলেন, কল্যাণের শিক্ষক । কারও কারও মতে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ।[ফাতহুল কাদীর] বস্তুত: ঈসা আলাইহিস সালামের পক্ষে সবগুলো অর্থই সম্ভব ।

যাকাত আদায় করতে[১]-

৩২. 'আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য;

وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٢

৩৩. 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি[২], যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব।'

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣

৩৪. এ-ই মার্‌ইয়াম-এর পুত্র 'ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে[৩]।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝٣٤

৩৫. আল্লাহ্ এমন নন যে, কোন সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র মহিমাময়।

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ اِذَا

---

(১) তাকিদ সহকারে কোন কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তাকে أوصى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা আলাইহিস সালাম এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সালাত ও যাকাতের ওসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে আল্লাহ্ আমাকে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ্ এ আয়াতের অন্য অর্থ করেছেন। তিনি বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মৃত্যু পর্যন্ত যা হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদের জন্য এ কথা অনেক বড় আঘাত। [ইবন কাসীর]

(২) জন্মের সময় আমাকে শয়তান স্পর্শ করতে পারে নি। সুতরাং আমি নিরাপদ ছিলাম। অনুরূপভাবে মৃত্যুর সময় ও পুনরুত্থানের সময়ও আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। অথবা আয়াতের অর্থ, সালাম ও সম্ভাষণ জানানো। [ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর বলেন, এর মাধ্যমে তার বান্দা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বান্দাদের মধ্য হতে একজন। অন্যান্য সৃষ্টির মত জীবন ও মৃত্যুর অধীন। অনুরূপভাবে অন্যদের মত তিনিও পুনরুত্থিত হবেন। তবে তার জন্য এ কঠিন তিনটি অবস্থাতেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নাসারারা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তার অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে তাকে জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝٣٥

তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন সেটার জন্য বলেন, 'হও' তাতেই তা হয়ে যায়।

وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝٣٦

৩৬. আর নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার রব ও তোমাদের রব; কাজেই তোমরা তাঁর 'ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ[১]।

فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٣٧

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল[২], কাজেই দুর্ভোগ কাফেরদের জন্য মহাদিবস প্রত্যক্ষকালে[৩]।

---

(১) এখানে জানানো হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতও তাই ছিল যা অন্য নবীগণ এনেছিলেন। তিনি এছাড়া আর কিছুই শিখাননি যে কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত তথা দাসত্ব করতে হবে। সুতরাং নবীদের সবার দাওয়াতী মিশন একটাই। আর তা হচ্ছে, তার ও অন্যান্য সবার রব। এভাবে তিনি বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ নাসারাগণ ঈসা আলাইহিসসালামের ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ বলল, তিনি জারজ সন্তান। তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত হোক। তারা বলল যে, তার বাণীসমূহ জাদু। অপর দল বলল, তিনি আল্লাহ্র পুত্র। আরেকদল বলল, তিনি তিনজনের একজন। অন্যরা বলল, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। এটাই হচ্ছে সত্য ও সঠিক কথা, আল্লাহ্ যেটার প্রতি মুমিনদেরকে হেদায়াত করেছেন। [ইবন কাসীর]

(৩) এ হচ্ছে যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য সুস্পষ্ট ভীতি-প্রদর্শন। তিনি ইচ্ছে করলে দুনিয়াতেই তাৎক্ষনিক তাদেরকে পাকড়াও করতে পারতেন কিন্তু তিনি তাদেরকে কিছু সময় অবকাশ দিয়ে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের সুযোগ দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দিতে চান। কিন্তু তারা তাদের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করবেন। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ যালেমকে ছাড় দিতেই থাকেন তারপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার আর পালাবার কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না।' [বুখারী:৪৬৮৬, মুসলিম:২৫৮৩] আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যে, মহান আল্লাহ্র জন্য সন্তান ও পরিবার সাব্যস্ত করে? হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'কষ্টদায়ক কিছু শুনার পরে আল্লাহ্র চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই, তারা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করছে অথচ তিনি তাদেরকে জীবিকা ও নিরাপত্তা দিয়েই যাচ্ছেন।' [বুখারী:

৩৮. তারা যেদিন আমাদের কাছে আসবে সেদিন তারা কত চমৎকার শুনবে ও দেখবে[১]! কিন্তু যালেমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّٰلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٣٨

৩৯. আর তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন[২] সম্বন্ধে, যখন

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي

৬০৯৯, মুসলিম: ২৮০৪] পক্ষান্তরে যারা এর বিপরীত কাজ করবে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'কেউ যদি এ সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র আল্লাহ্ যার কোন শরীক নেই তিনি ব্যতীত হক কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসাও আল্লাহ্‌র বান্দা, রাসূল ও এমন এক বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি আত্মা। আর এও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত বাস্তব, জাহান্নাম বাস্তব। আল্লাহ্ তাকে তার আমল কম-বেশ যা-ই থাকুক না কেন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [বুখারী: ৩৪৩৫, মুসলিম: ২৮]

(১) দুনিয়াতে কাফের ও মুশরিকরা দেখেও দেখে না শুনেও শুনে না। কিন্তু হাশরের দিন তারা সবচেয়ে ভাল দেখতে পাবে, বেশী শুনতে পাবে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখ থেকেই এ কথা বের করে এনেছেন। আল্লাহ্ বলেন: 'হায়, আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আপনি আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকাজ করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।' [সূরা আস-সাজদাহ:১২]

(২) কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ, জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কোন এক দল মানুষ যখন কোন বৈঠকে বসবে তারপর আল্লাহ্‌র যিকর এবং রাসূলের উপর দরুদ পাঠ করা ব্যতীত যদি সে মজলিস শেষ হয় তবে কিয়ামতের দিন সেটা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হিসেবে দেখা দিবে"। [তিরমিযী: ৩৩৮০] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর মৃত্যুকে একটি ছাগলের রূপে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে হাজির করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা কি এটাকে চেন? তারা ঘাড় উচিয়ে দেখবে এবং বলবে: হ্যাঁ, এটা হলো মৃত্যু। তারপর জাহান্নামীদের বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চেন? তারাও মাথা উঁচু করে দেখবে এবং বলবে: হ্যাঁ, এটা হলো মৃত্যু। তখন সেটাকে

غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ তারা রয়েছে গাফলতিতে নিমজ্জিত এবং তারা ঈমান আনছে না।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ

৪০. নিশ্চয় যমীন ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমাদেরই রইবে এবং আমাদেরই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে(১)।

তৃতীয় রুকূ'

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيْمَ ۥ إِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا

৪১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইব্‌রাহীমকে(২); তিনি তো ছিলেন এক

জবাই করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং বলা হবে: হে জান্নাতীরা! চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর আর কোন মৃত্যু নেই।! হে জাহান্নামীরা! চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে আর কোন মৃত্যু নেই।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন এবং তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন: "দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার গাফিলতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত"। [বুখারী: ৪৭৩০, মুসলিম: ২৮৪৯]

(১) এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যমীন ও এতে যা আছে সবকিছুরই চূড়ান্ত ওয়ারিশ তিনিই হবেন। এর অর্থ, যমীনের জীবিত সবাইকে তিনি মৃত্যু দিবেন। তারপরই সমস্ত কিছুর মালিক তিনিই হবেন, যেমনটি তিনি পূর্বে মালিক ছিলেন। কারণ তিনিই কেবল অবশিষ্ট থাকবেন। [ইবন কাসীর] কিয়ামতের দিন আবার সবাই তাঁর নিকটই ফিরে আসতে হবে। মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন: "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর,অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর রহমান: ২৬-২৭] আরও বলেন: "আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।" [সূরা আল-হিজর: ২৩]

(২) এখান থেকে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে। তারা তাদেরকে যুবক পুত্র, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অপরাধে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল যেমন ইবরাহীমকে তার বাপ-ভাইয়েরা দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা ইবরাহীমকে নিজেদের নেতা বলে মানতো এবং তাঁর আওলাদ হবার কারণে সারা আরবে গর্ব করে বেড়াতো, একারণে অন্য নবীদের কথা বাদ দিয়ে বিশেষ করে ইবরাহীমের কথা বলার জন্য এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

সত্যনিষ্ঠ[১], নবী।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

৪২. যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, 'হে আমার পিতা! আপনি তার 'ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?'

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৩. 'হে আমার পিতা! আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান যা আপনার কাছে আসেনি; কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ

৪৪. 'হে আমার পিতা! শয়তানের 'ইবাদাত করবেন না[২]। শয়তান তো দয়াময়ের

(১) صديق 'সিদ্দীক' শব্দটি কুরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সত্যবাদী বা সত্যনিষ্ঠ। [ফাতহুল কাদীর] শব্দটির সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেনঃ যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেনঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা বসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। [কুরতুবী, সূরা আন-নিসা: ৬৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ] সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নবী-রাসূলগণ সবাই সিদ্দীক। কিন্তু সমস্ত সিদ্দীকই নবী ও রাসূল হবেন এমনটি জরুরী নয়, বরং নবী নয়- এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। মারইয়ামকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে স্বয়ং সিদ্দীকাহ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি নবী নন। কোন নারী নবী হতে পারেন না।

(২) বলা হচ্ছে, "শয়তানের ইবাদাত করবেন না।" যদিও ইবরাহীমের পিতা এবং তার জাতির অন্যান্য লোকেরা মূর্তি পূজা করতো কিন্তু যেহেতু তারা শয়তানের আনুগত্য করছিল তাই ইবরাহীম তাদের এ শয়তানের আনুগত্যকেও শয়তানের ইবাদাত গণ্য করেন। আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আপনি এ মূর্তিগুলোর ইবাদাত করার মাধ্যমে তার আনুগত্য করবেন না। কেননা, সেই তো এগুলোর ইবাদাতের প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান জানায় এবং এতে সে সন্তুষ্ট। [ইবন কাসীর] বস্তুত: শয়তান কোন কালেও মানুষের মাবুদ (প্রচলিত অর্থে) ছিল না বরং তার নামে প্রতি যুগে মানুষ অভিশাপ বর্ষণ করেছে। তবে বর্তমানে মিশর, ইরাক, সিরিয়া, লেবাননসহ বিভিন্ন আরব ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রে শয়তানের ইবাদতকারী 'ইয়াযীদিয়্যাহ' ফের্কা নামে একটি দলের

عَصِيًّا

অবাধ্য।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا

৪৫. 'হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।'

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا

৪৬. পিতা বলল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও তবে অবশ্যই আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব; আর তুমি চিরতরে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও।'

قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا

৪৭. ইব্রাহীম বললেন, 'আপনার প্রতি সালাম[১]। আমি আমার রব-এর কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব[২], নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি

সন্ধান পাওয়া যায়, যারা শয়তানের কাল্পনিক প্রতিকৃতি স্থাপন করে তার ইবাদাত করে।

(১) ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম أَبَتِ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু আযর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। তখন ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেনঃ سَلَامٌ عَلَيْكَ এখানে سلام শব্দটি অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, বয়কটের সালাম অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআন আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলেঃ "মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মোকাবেলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৬৯] অথবা এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কোন কাফেরের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরী'আতের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা আবু তালেবকে বলেছিলেনঃ 'আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়: "নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরেকদের

খুবই অনুগ্রহশীল।

৪৮. 'আর আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের 'ইবাদাত কর তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি; আর আমি আমার রবকে ডাকছি; আশা করি, আমার রবকে ডেকে আমি দূর্ভাগা হব না।'

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৯. অতঃপর তিনি যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের 'ইবাদাত করত সেসব থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং প্রত্যেককে

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

জন্যে ইস্তেগফার করা বৈধ নয়।" [সূরা আত-তাওবাহঃ ১১৩] এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার জন্যে ইস্তেগফার ত্যাগ করেন। ইবরাহীম আলাইহিসসালাম কর্তৃক তার পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার উত্তর এই যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওয়াদা "আপনার জন্যে আমার প্রভুর কাছে ইস্তেগফার করব" এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়। তারপর তিনি তার পিতার জন্য সুপারিশ করা পরিত্যাগ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "ইব্‌রাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্‌রাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইব্‌রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" [সূরা আত-তাওবাহঃ ১১৪] তারপরও ইবরাহীম আলাইহিসসালাম হাশরের মাঠে যখন তার পিতাকে কুৎসিত অবস্থায় দেখবেন তখন তার জন্য কোন দো'আ বা সুপারিশ করবেন না। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হাশরের মাঠে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম তার পিতাকে দেখে বলবেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আজকের দিনে অপমান থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন। আমার পিতার অপমানের চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ "আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি।" তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে তার পায়ের নীচে তাকাবার নির্দেশ দিবেন। তিনি তাকিয়ে একটি মৃত দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা জানোয়ার দেখতে পাবেন, ফলে তিনি তার জন্য সুপারিশ না করেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। [বুখারীঃ ৩১৭২, ৪৪৯০, ৪৪৯১]

নবী করলাম[১]।

৫০. এবং তাদেরকে আমরা দান করলাম আমাদের অনুগ্রহ, আর তাদের নাম-যশ সমুচ্চ করলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

চতুর্থ রুকূ'

৫১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসাকে, তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত[২] এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰٓى ۚ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

৫২. আর তাকে আমরা ডেকেছিলাম তূর পর্বতের ডান দিক থেকে[৩] এবং

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ

(১) পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দো'আ করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যতঃ এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দো'আ বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দো'আ কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেব-দেবীকে পরিহার করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে আল্লাহ তা'আলা তাকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা নবী ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(২) مُخْلَصًا এর মানে হচ্ছে, "বিশেষভাবে মনোনিত করা, একান্ত করে নেয়া।" [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি মুখলিস যে ব্যক্তি একান্তভাবে আল্লাহর জন্য আমল করে, মানুষ এর প্রশংসা করুক এটা চায় না। [ইবন কাসীর] মূসা আলাইহিসসালাম এ ধরনের বিশেষ গুণে বিশেষিত থাকায় মহান আল্লাহ তাকে তার কাজের পুরস্কারস্বরূপ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্যে খাঁটি করে নেন তিনি পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। নবীগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন, যেমন- কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আমি তাদেরকে (নবীদেরকে) আখেরাতের স্মরণ করা কাজের জন্যে একান্ত করে নিয়েছি।" [সূরা ছোয়াদঃ ৪৬]

(৩) এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়া, মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও

نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

আমরা অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আমরা নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৪. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী[১] এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী;

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ

৫৫. তিনি তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন[২] এবং তিনি

পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। তুর পাহাড়ের ডানদিকে মুসা আলাইহিস সালামের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তুর পাহাড়ের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তুর পাহাড় তার ডান দিকে ছিল। [দেখুন,ফাতহুল কাদীর]

(১) ওয়াদা পালনে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই এর জন্যে পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। [ইবন কাসীর] একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ইসমাইল আলাইহিস সালামের আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। কুরআনে সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছেঃ "তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।"[সূরা আত-তাহরীম:৬] এ ব্যাপারে ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন। তিনি চাননি তার পরিবারের লাকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করুক। এ ব্যাপারে তিনি কোন ছাড় দেন নি। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'আল্লাহ্ ঐ পুরুষকে রহমত করুন যিনি রাতে সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হলো এবং তার স্ত্রীকে জাগালো তারপর যদি স্ত্রী জাগতে গড়িমসি করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ঐ মহিলাকে রহমত করুন যিনি রাতে সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হলো এবং তার স্বামীকে জাগালো তারপর যদি স্বামী জাগতে গড়িমসি

رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝٥٥

ছিলেন তার রব-এর সন্তোষভাজন।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝٥٦

৫৬. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইদ্‌রীসকে, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী;

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝٥٧

৫৭. আর আমরা তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়(১)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۫ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۫ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۝٥٨

৫৮. এরাই তারা, নবীদের মধ্যে আল্লাহ্ যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ থেকে এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইব্‌রাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত, আর যাদেরকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম; তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত তিলাওয়াত করা

করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল।' [আবু দাউদ:১৩০৮, ইবন মাজাহ:১৩৩৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যদি কোন লোক রাতে জাগ্রত হয়ে তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করে তাহলে তারা দু'জনের নাম অধিক হারে আল্লাহ্‌র যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিনী মহিলাদের মধ্যে লিখা হবে।' [আবু দাউদ:১৩০৯, ইবন মাজাহ:১৩৩৫]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইদরীস আলাইহিস সালামকে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাকে উচ্চ স্থান তথা আকাশে অবস্থান করার ব্যবস্থা করেছি। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন আমাকে আকাশে উঠানো হয়েছিল মি'রাজের রাত্রিতে আমি ইদরীসকে চতুর্থ আসমানে দেখেছি।' [তিরমিযী: ৩১৫৭] কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ইদরীস আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেনঃ এটা কা'ব আল-আহবারের ইসরাঈলী বর্ণনা। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কাজেই আকাশে জীবিত অবস্থায় তুলে নেয়ার বিষয়টি স্বীকৃত নয়। আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তাকে উঁচু স্থান জান্নাতে দেয়া হয়েছে। অথবা তাকে নবুওয়াত ও রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

হলে তারা লুটিয়ে পড়ত সিজ্‌দায়[১] এবং কান্নায়[২]।

৫৯. তাদের পরে আসল অযোগ্য উত্তরসূরীরা[৩], তারা সালাত নষ্ট করল[৪]

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

(১) অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "বলুন, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এটা পড়া হয় তখনই তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে।' তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। 'এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' [সূরা আল-ইসরা: ১০৭-১০৯]

(২) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং নবীদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও সৎকর্মশীলদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এ সূরা পড়ে সিজদা করলেন এবং বললেন, সিজদা তো হলো, কিন্তু ক্রন্দন কোথায়! [ইবন কাসীর]

(৩) خلف শব্দে লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরী, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরী এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। এখানে সাকিনযুক্ত হওয়ায় এর অর্থ হচ্ছে: খারাপ উত্তরসূরী। [ফাতহুল কাদীর] এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'ষাট বছরের পর থেকে খারাপ উত্তরসূরীদের আবির্ভাব হবে, যারা সালাত বিনষ্ট করবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, তারা অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে। তারপর এমন কিছু উত্তরসূরী আসবে যারা কুরআন পড়বে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নভাগে যাবে না। আর কুরআন পাঠকারীরা তিন শ্রেণীর হবে: মুমিন, মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠ। বর্ণনাকারী বশীর বলেন: আমি ওয়ালিদকে এ তিন শ্রেণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: কুরআন পাঠকারী হবে অথচ সে এর উপর কুফরকারী, পাপিষ্ঠ কুরআন পাঠকারী হবে যে এর দ্বারা নিজের রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা করবে আর ঈমানদার কুরআন পাঠকারী হবে যে এর উপর ঈমান আনবে'। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৩৮, সহীহ ইবন হিব্বান: ৩/৩২, ৭৫৫]

(৪) মুজাহিদ বলেন: কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন সালাতের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে। এ আয়াতে 'সালাত নষ্ট করা' বলে বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে, অসময়ে সালাত পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: সময়সহ সালাতের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা সালাত নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'সালাত নষ্ট করা' বলে জামা'আত ছাড়া নিজে

এবং কুপ্রবৃত্তির[১] অনুবর্তী হল। কাজেই | وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

গৃহে সালাত পড়া বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেনঃ 'আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি সালাত নষ্ট করে সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশী নষ্ট করবে। [মুয়াত্তা মালেকঃ ৬] তদ্রূপ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে সালাতের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কবে থেকে এভাবে সালাত আদায় করছ? লোকটি বললঃ চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ "তুমি একটি সালাতও পড়নি। যদি এ ধরনের সালাত পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।" [নাসায়ীঃ ৩/৫৮, সহীহ ইব্‌ন হিব্বানঃ১৮৯৪] অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "ঐ ব্যক্তির সালাত হয় না, যে সালাতে 'একামত' করে না।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার সালাত হয় না। [তিরমিযীঃ ২৬৫] মোটকথাঃ সালাত আদায় ত্যাগ করা অথবা সালাত থেকে গাফেল ও বেপরোয়া হয়ে যাওয়া প্রত্যেক উম্মতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। সালাত আল্লাহর সাথে মু'মিনের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্ক জুড়ে রাখে। এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এ বাঁধন ছিন্ন হবার সাথে সাথেই মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে বহুদূরে চলে যায়। এমনকি কার্যকর সম্পর্ক খতম হয়ে গিয়ে মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে। তাই আল্লাহ একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এখানে একথাটি বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের বিকৃতি শুরু হয়েছে সালাত নষ্ট করার পর। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'বান্দা ও শির্কের মধ্যে সীমারেখা হলো সালাত ছেড়ে দেয়া' [মুসলিম:৮২] আরও বলেছেন: 'আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যে একমাত্র সালাতই হচ্ছে পার্থক্যকারী বিষয়, (তাদের কাছ থেকে এরই অঙ্গীকার নিতে হবে) সুতরাং যে কেউ সালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল'। [তিরমিযী:২৬২১]

(১) 'কুপ্রবৃত্তি' বলতে বুঝায় এমন কাজ যা মানুষের মন চায়, মনের ইচ্ছানুরুপ হয় এবং যা থেকে সে তাকওয়া অবলম্বন করে না। যেমন হাদীসে এসেছে, "জান্নাত ঘিরে আছে অপছন্দনীয় বিষয়াদিতে, আর জাহান্নাম ঘিরে আছে কুপ্রবৃত্তির চাহিদায়" [মুসলিম: ২৮২২] অনুরূপভাবে এখানেও 'কুপ্রবৃত্তি' বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে গাফেল করে দেয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লেখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

অচিরেই তারা ক্ষতিগ্রস্ততার[১] সম্মুখীন হবে।

৬০. কিন্তু তারা নয়---যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا ۝٦٠

৬১. এটা স্থায়ী জান্নাত, যে গায়েবী প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন[২]। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় আসবেই।

جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا ۝٦١

৬২. সেখানে তারা 'সালাম' তথা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না[৩] এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝٦٢

(১) আরবী ভাষায় غي শব্দটি رشد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشد বলা হয়। অপরদিকে প্রত্যেক অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয়কে غي বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেনঃ 'গাই' জাহান্নামের এমন একটি গর্তের নাম যাতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'গাই' জাহান্নামের এমন একটি গুহা জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় আল্লাহ্ তাদেরকে এমন অবস্থায় দিয়েছেন যখন ঐ জান্নাতসমূহ তাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে। সেটা একমাত্র গায়েবী ব্যাপার। [ইবন কাসীর]

(৩) لغو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা গালিগালাজ একং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। যেমন দুনিয়াতে কখনও কখনও মানুষ এটা শুনে থাকে। [ইবন কাসীর] জান্নাতবাসিগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবেনা। অন্য আয়াতে এসেছে, "সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ছাড়া।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২৫-২৬] জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। তারা দোষ-ক্রটিমুক্ত হবে। জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোন আজেবাজে, অর্থহীন ও কটূ কথা শোনা যাবে না। তারা শুধু তা-ই শুনবে যা তাদেরকে শান্তি দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

জন্য থাকবে তাদের রিযিক ।[১]

৬৩. এ সে জান্নাত, যার অধিকারী করব আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে[২] ।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

(১) জান্নাতে সুর্যোদয়, সুর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। [ফাতহুল কাদীর] একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতিগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলেঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দশীল। হাদীসে এসেছে, 'শহীদগণ জান্নাতের দরজায় নালাসমূহের উৎপত্তিস্থলে সবুজ গম্বুজে অবস্থানরত রয়েছে, তাদের নিকট জান্নাত থেকে সকাল-বিকাল খাবার যায়' [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৬৬] অন্য হাদীসে এসেছে, 'প্রথম দলটি যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের রূপ হবে চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের রূপ। সেখানে তারা থুথু ফেলবে না, শর্দি-কাশি ফেলবে না, পায়খানা-পেশাব করবে না। তাদের প্লেট হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের সুগন্ধি কাঠ হবে ভারতীয় উদ কাঠের, তাদের ঘাম হবে মিশকের। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দু'জন করে স্ত্রী, যাদের সৌন্দর্য এমন হবে যে, গোস্তের ভিতর থেকেও হাঁড়ের ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। মতবিরোধ থাকবে না, থাকবেনা ঝগড়া-হিংসা হানাহানি, তাদের সবার অন্তর এক রকম হবে। সকাল বিকাল তারা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করবে।" [বুখারীঃ ৩২৪৫] কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খায়েশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে। [ইবন কাসীর]

(২) তাকওয়ার অধিকারীদের জন্যই জান্নাত, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ হবে একথা এখানে যেমন বলা হয়েছে কুরআনের অন্যত্রও তা বলা হয়েছে, সূরা আল-মুমিনূনের প্রারম্ভে মুমিনদের গুণাগুণ বর্ণনা করে শেষে বলা হয়েছেঃ 'তারাই হবে অধিকারী---অধিকারী হবে ফিরদাওসের যাতে তারা স্থায়ী হবে। [১০-১১] আরো এসেছে, 'তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তকীদের জন্য। [সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৩] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর যারা তাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।' [সূরা আয-যুমারঃ ৭৩]

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৪. 'আর আমরা আপনার রব-এর আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না(১); যা আমাদের সামনে ও পিছনে আছে ও যা এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই। আর আপনার রব বিস্মৃত হন না(২)।'

رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সে সবের রব। কাজেই তাঁরই 'ইবাদাত করুন এবং

---

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ সর্বক্ষণ অহীর অপেক্ষা করতেন। এর সাহায্যে তারা নিজেদের পথের দিশা পেতেন এবং মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনাও লাভ করতেন। অহীর আগমনে যতই বিলম্ব হচ্ছিল ততই তাদের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় জিবরীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাহচর্যে আগমন করলেন। হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে বললেন: আপনি আমাদের নিকট আরো অধিকহারে আসতে বাধা কোথায়? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৭৩১] একথা ক'টির মধ্যে রয়েছে এত দীর্ঘকাল জিবরীলের নিজের গরহাজির থাকার ওজর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনাবাণী এবং এ সংগে সবর ও সংযম অবলম্বন করার উপদেশ ও পরামর্শ।

(২) বলা হয়েছে, আপনার রব বিস্মৃত হবার নয়। তিনি ভুলে যান না। জিবরীল বেশী বেশী নাযিল হলেই যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ভুলেননি বা তার বান্দাদের জন্য বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আসবে নইলে নয় ব্যাপারটি এরূপ নয়। [ফাতহুল কাদীর] মহান আল্লাহ্ তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন। তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন এবং তার রাসূল ও ঈমানদারদেরকে রক্ষা করবেন এটাই মূল কথা। তিনি কোন কিছুই ভুলে যান না। সুতরাং তাড়াহুড়ো বা জিবরীলকে না দেখে অস্থির হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। যে সমস্ত ব্যাপারে চুপ থেকেছেন কোন কিছু জানাননি সেগুলো নিরাপদ। সুতরাং সে সমস্ত নিরাপদ বিষয় তোমরা গ্রহণ করতে পার; কেননা আল্লাহ্ ভুলে যাওয়া কিংবা বিস্মৃত হওয়ার মত গুণে গুণান্বিত নন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৭৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। কারণ, রাসূল নিজ থেকে কিছুই করেননি। শরী'আতের প্রতিটি কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তিনি প্রবর্তন করেছেন।

তাঁর 'ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন[১]। আপনি কি তাঁর সমনামগুণসম্পন্ন কাউকেও জানেন[২]?

পঞ্চম রুকূ'

৬৬. আর মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হব?'

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমরা তাকে আগে সৃষ্টি করেছি যখন সে

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ

(১) اصطبار শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। [ফাতহুল কাদীর] এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদাতের স্থায়িত্ব পরিশ্রম সাপেক্ষ। ইবাদাতকারীর এ জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত। আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায়, তাঁর আদেশ ও নিষেধ সবরের সাথে পালন করুন। [বাগভী]

(২) মূলে سَمِيًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "সমনাম"। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। এ জন্যেই বলা হচ্ছে যে, কেউ কি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে এ নামে ডেকেছে? [বাগভী] সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোন সমনাম নেই। মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবন্ জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে এ স্থলে سَمِيًّا শব্দের অর্থ অনুরূপ সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য, সমকক্ষ কেউ নেই। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, তোমাদের জানা মতে দ্বিতীয় কোন আল্লাহ্ আছে কি? যদি না থাকে এবং তোমরা জানো যে নেই, তাহলে তোমাদের জন্য তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁরই হুকুমের দাস হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে কি? তোমরা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কোন নাম ও গুণ অন্যকে দিও না। সৃষ্টিজগতের কোন নাম-গুণও তাঁর জন্য সাব্যস্ত করো না। সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণগুলো তো তাঁরই জন্য। তিনিই এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার বেশী হকদার। যাদের কোন গুণ নেই, কাজ নেই, যাদের নামের বাস্তবতাও নেই তারা নিজেরাও অস্তিত্বহীন হওয়াটাই বেশী যুক্তিযুক্ত। [ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহঃ ৩/১০২৮]

شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾

কিছুই ছিল না[১]?

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৮. কাজেই শপথ আপনার রব-এর! আমরা তো তাদেরকে ও শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করবই[২] তারপর

(১) কাফের মুশরিকদের ভ্রান্তির মূল হলো, পুনরুত্থানে অস্বীকার। তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে এ ধরনের বিশ্বাস কেউ করলে আশ্চার্যবোধ করত। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন: "যদি আপনি বিস্মিত হন, তবে বিস্ময়ের বিষয় ওদের কথা:'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব?" [সূরা আর-রা'দ: ৫] আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে প্রথমবার জীবন দেয়া যেমন তাঁর জন্য সহজ ছিল দ্বিতীয়বার জীবন দেয়া তাঁর জন্য আরো সহজ হবে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মানুষ কেন এটা মনে করে না যে, এক সময় তার কোন অস্তিত্বই ছিল না, আল্লাহ্ তাকে অস্তিত্বে এনেছেন। তারপর সে অস্তিত্বকে বিনাশ করে আবার তাকে তৈরী করা প্রথমবারের চেয়ে অনেক সহজ কাজ। মহান আল্লাহ্ বলেন: "তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ।" [সূরা আর-রূম:২৭] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন: "মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি কথা ভুলে যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?' বলুন, 'তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [সূরা ইয়াসীন: ৭৭-৭৯] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'মহান আল্লাহ্ বলেন: আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যাচার করে অথচ মিথ্যাচার করা তার জন্য কখনও উচিত নয়। অনুরূপভাবে আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় অথচ আমাকে কষ্ট দেয়া তার জন্য অগ্রহণযোগ্য কাজ। তার মিথ্যাচার হলো সে বলে: প্রথম যেভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছে সেভাবে আল্লাহ্ আমাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবে না। অথচ আমার কাছে প্রথমবারের সৃষ্টি যেমন সহজ পুনর্বার সৃষ্টিও তেমনি সহজ। আর সে আমাকে কষ্ট দেয় একথা বলে যে, আমার সন্তান রয়েছে। অথচ আমি হলাম এমন একক অমুখাপেক্ষী সত্ত্বা যিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্মও দেয়নি এবং তার সমকক্ষও কেউ নেই।' [বুখারী: ৪৯৭৪]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই

আমরা নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারদিকে তাদেরকে উপস্থিত করবই[১]।

৬৯. তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের সর্বাধিক অবাধ্য আমরা তাকে টেনে বের করবই[২]।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৭০. তারপর আমরা তো তাদের মধ্যে জাহান্নামে দগ্ধ হবার যারা সবচেয়ে বেশী যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি।

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১. আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে[৩], এটা আপনার রব-এর

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

মাঠে আলাদা থাকবে না; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিনগণকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশী, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাতলাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। [কুরতুবী]

(২) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতটি দ্বারা পুলসিরাত সংক্রান্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা প্রমাণিত হয়। মূলত: সিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থঃ স্পষ্ট রাস্তা। আর শরী'আতের পরিভাষায় সিরাত বলতে বুঝায়ঃ এমন এক পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের উপর প্রলম্বিত, যার উপর দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই পার হতে হবে, যা হাশরের মাঠের লোকদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা। সিরাতের বাস্তবতার স্বপক্ষে কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমরা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব"।

[সূরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২] অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এখানে 'জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম' দ্বারা তার উপরস্থিত সিরাতের উপর দিয়ে পার হওয়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর এটাই ইবনে আব্বাস, ইবনে মাস'উদ এবং কা'ব আল-আহবার প্রমূখ মুফাসসিরদের থেকে বর্ণিত। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীস যাতে আল্লাহর দীদার তথা আল্লাহকে দেখা এবং শাফা'আতের কথা আলোচিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ".. 'তারপর পুল নিয়ে আসা হবে, এবং তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে', আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূলঃ 'পুল' কি? তিনি বললেনঃ "তা পদস্খলনকারী, পিচ্ছিল, যাতে লোহার হুক ও বর্শি এবং চওড়া ও বাঁকা কাটা থাকবে, যা নাজদের সা'দান গাছের কাঁটার মত। মুমিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও অন্যান্য বাহনের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলসে যাবে। এমন কি সর্বশেষ ব্যক্তি টেনে-হেঁচড়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকম অতিক্রম করবে"। [বুখারী: ৭৪৩৯] এ ছাড়া আরও বহু হাদীসে সিরাতের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তার মূল কথা হলোঃ সিরাত চুলের চেয়েও সরু, তরবারীর চেয়েও ধারাল, পিচ্ছিল, পদস্খলনকারী, আল্লাহ যাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান সে ব্যতীত কারো পা তাতে স্থায়ী হবে না। অন্ধকারে তা স্থাপন করা হবে, মানুষকে তাদের ঈমানের পরিমাণ আলো দেয়া হবে, তাদের ঈমান অনুপাতে তারা এর উপর দিয়ে পার হবে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুমিনগণ জাহান্নাম অতিক্রম করবে। মুমিনরা তাতে প্রবেশ করবে এমন কথা বলা হয়নি। তাছাড়া কুরআনের উল্লেখিত মূল শব্দ ورود এর আভিধানিক অর্থও প্রবেশ করা নয়। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ﴾ "আর যখন মূসা মাদইয়ানের কূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল" সূরা আল-কাসাস:২৩] এখানেও ورود অর্থ প্রবেশ করা নয় বরং অতিক্রম করা। তাই এটিই এর সঠিক অর্থ যে, সবাইকেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে এবং জালেমদেরকে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। তদুপরি একথাটি কুরআন মজীদ এবং বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীসেরও বিরোধী, যেগুলোতে সৎকর্মশীল মুমিনদের জাহান্নামে প্রবেশ না করার কথা চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের পরশও পাবে না। [যেমন, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০১-১০২] অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় وُرُوْدٌ শব্দ দ্বারা প্রবেশ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। [যেমন, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩২৮, মুসনাদে হারেস: ১১২৭ এ আবু সুমাইয়া এবং মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৬৩০ এ মুস্‌সাহ আল-আযদিয়্যাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস] সে সমস্ত বর্ণনার কোনটিই সনদের দিক থেকে খুব শক্তিশালী নয়। আর যদি وُرُوْدٌ অর্থ প্রবেশ করাই হয়। তবে তা মুমিনদের জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক বিবেচিত হবে

অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

৭২. পরে আমরা উদ্ধার করব তাদেরকে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭৩. আর তাদের কাছে আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ তোলাওয়াত করা হলে কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, 'দু'দলের মধ্যে কারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে উত্তম(১)?'

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوٓا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৪. আর তাদের আগে আমরা বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি---যারা তাদের চেয়ে সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾

যেমনটি উক্ত হাদীসের ভাষ্যেই জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(১) অর্থাৎ কাফেরদের যুক্তি ছিল এ রকমঃ দেখে নাও দুনিয়ায় কার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে? কার গৃহ বেশী জমকালো? কার জীবন যাত্রার মান বেশী উন্নত? কার মজলিসগুলো বেশী আড়ম্বরপূর্ণ? যদি আমরা এসব কিছুর অধিকারী হয়ে থাকি এবং তোমরা এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখো, এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, আমরা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও এভাবে দুনিয়ার মজা লুটে যেতে থাকবো আর তোমরা হকের পথে অগ্রসর হয়েও এ ধরনের ক্লান্তিকর জীবন যাপন করে যেতে থাকবে? [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; সা'দী] কাফেরদের এই বিভ্রান্তি পবিত্র কুরআন এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত ও সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা, দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মুর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্বানের চাইতেও বেশী লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশী ধন-দৌলত স্তুপীকৃত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো তো তাদের কোন কাজে আসেনি। [দেখুন, সা'দী]

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ⑺

৭৫. বলুন, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দেবেন যতক্ষণ না তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা দেখবে; তা শাস্তি হোক বা কেয়ামতই হোক[১]। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ⑺

৭৬. আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন[২]; এবং স্থায়ী সৎকাজসমূহ[৩] আপনার

---

(১) কাফের মুশরিকদের অবাধ্যতার পরও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন তারপর সময়মত তাদের ঠিকই পাকড়াও করেন। তাদের সে পাকড়াও কখনও দুনিয়াতে হয় আবার কখনো কখনো তা কিয়ামতের মাঠ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন: "কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মংগলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সূরা আলে-ইমরান: ১৭৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল।" [সূরা আল-আন'আম: ৪৪] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফের মুশরিকদের জন্য পেশকৃত 'মুবাহালা' বা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর দো'আ করবে, কারণ যদি তোমাদের এটাই মনে হয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় হওয়ার কারণেই দুনিয়ার জিনিস বেশী পাচ্ছ, তাহলে মৃত্যু কামনা কর। তখন দেখা যাবে আসলে কারা আল্লাহ্‌র প্রিয়। [তাবারী]

(২) কাফেরদেরকে পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেয়ার কথা বলার পর এখানে ঈমানদারদের অবস্থা বলা হচ্ছে যে, তিনি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন। [ইবন কাসীর] তিনি তাদেরকে অসৎ কাজ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচান। তাঁর হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার মাধ্যমে তারা অনবরত সত্য-সঠিক পথে এগিয়ে চলে। এ আয়াত থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি, বাড়তি-কমতি আছে। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা কারও ঈমান বাড়িয়ে দেন। আবার তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ঈমানের এক বিরাট অংশ হারিয়ে ফেলে। [অন্যান্য সূরাতেও ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রমাণাদি রয়েছে। যেমন, সূরা আত-তাওবাহ: ১২৪-১২৫; সূরা আল-ফাতহ:৪, সূরা মুহাম্মাদ:১৭]

(৩) সূরা আল-কাহফের ৪৬ নং আয়াতের তাফসীরে ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রব-এর পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতির দিক দিয়েও অতি উত্তম।

৭৭. আপনি কি জেনেছেন (এবং আশ্চর্য হয়েছেন) সে ব্যক্তি সম্পর্কে, যে আমাদের আয়াতসমূহে কুফরি করে এবং বলে, 'আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দেয়া হবে(১)।'

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

৭৮. সে কি গায়েব দেখে নিয়েছে, নাকি দয়াময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

৭৯. কখনই নয়, সে যা বলে আমরা তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধিই করতে থাকব(২)।

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

---

(১) খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বললঃ তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেনঃ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আ'স বললঃ ভালো তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ, তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। [বুখারীঃ ১৯৮৫, ২০৯১, ২১৫৫, ২২৭৫ মুসলিমঃ ২৭৯৫] অর্থাৎ সে বলে, তোমরা আমাকে যতই পথভ্রষ্ট ও দুরাচার বলতে এবং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকো না কেন আমি তো আজো তোমাদের চাইতে অনেক বেশী সচ্ছল এবং আগামীতেও আমার প্রতি অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হতে থাকবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ বিকৃত মন-মানসিকতা উল্লেখ করে সেটার উত্তর দিয়ে বলেছেনঃ সে কিরুপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে?

(২) অর্থাৎ তার অপরাধের ফিরিস্তিতে তার এ দাম্ভিক উক্তিও শামিল করা হবে, সেটাকে লিখে নেয়া হবে। তারপর সেটার শাস্তি বিধান করা হবে এবং এর মজাও তাকে টের পাইয়ে দেয়া হবে।

৮০. আর সে যা বলে তা থাকবে আমাদের অধিকারে[১] এবং সে আমাদের কাছে আসবে একা।

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ۝٨٠

৮১. আর তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য বহু ইলাহ্‌ গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের সহায় হয়[২];

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۝٨١

৮২. কখনই নয়, ওরা তো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে[৩]।

كَلَّا ۭ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝٨٢

ষষ্ঠ রুকূ'

৮৩. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমরা কাফেরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি, তাদেরকে মন্দ কাজে

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۝٨٣

---

(১) সে যে আখেরাতেও সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার দাম্ভিকতা দেখাচ্ছে সেটা কক্ষনো হবার নয়, কারণ সেগুলো তো তখন আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন হবে। তার কাছ থেকে দুনিয়াতে প্রাপ্ত যাবতীয় সম্পদই কেড়ে নেয়া হবে। সে হাশরের মাঠে শুধু একাই রিক্ত হস্তে উপস্থিত হবে।

(২) মূলে عِزًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এদের জন্য ইজ্জত ও মর্যাদার কারণ হবে। এর আরেক অর্থ হচ্ছে, শক্তিশালী ও যবরদস্ত হওয়া। উদ্দেশ্য সেগুলো তার ধারণা মতে তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করবে। কারও কারও নিকট এর অর্থ হচ্ছে, সহযোগী হওয়া। অথবা আখেরাতে সুপারিশকারী হওয়া। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীত তাদের শত্রু হয়ে যাবে। তারা বলবে, আল্লাহ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল। আমরা কখনো এদেরকে বলিনি আমাদের ইবাদাত করো এবং এরা যে আমাদের ইবাদাত করছে তাও তো আমরা জানতাম না। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্‌ সেটা বলেছেন, "আর সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও গাফেল। আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন সেগুলো হবে এদের শত্রু এবং এরা তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে।" [সূরা আল-আহকাফ: ৫-৬]

বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য[১]?

৮৪. কাজেই তাদের বিষয়ে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না। আমরা তো গুণছি তাদের নির্ধারিত কাল[২],

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫. যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীগণকে সম্মানিত মেহমানরূপে[৩] আমরা সমবেত করব,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬. এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭. যারা দয়াময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে, তারা ছাড়া কেউ সুপারিশ

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ

---

(১) ﴿تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ শব্দের অর্থ দ্রুত করতে চাওয়া। [ফাতহুল কাদীর] তার অন্য অর্থ হচ্ছে, নাড়াচাড়া দেয়া, কোন কাজের জন্যে প্রলুব্ধ করা, উৎসাহিত করা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং সেগুলোর অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে। সীমালঙ্ঘন করতে দেয়। [ইবন কাসীর]

(২) এর মানে হচ্ছে, এদের বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জন্য আযাবের দো'আ করবেন না। [ইবন কাসীর] কারণ, এদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। পাত্র প্রায় ভরে উঠেছে। আল্লাহর দেয়া অবকাশের মাত্র আর ক'দিন বাকি আছে। এ দিনগুলো পূর্ণ হতে দিন। সুতরাং আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। [ইবন কাসীর]

(৩) যারা বাদশাহ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বাহনে চড়ে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানদারদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের প্রভুর সমীপে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে জান্নাত ও সম্মানিত ঘরে প্রবেশ করানো হবে। [ফাতহুল কাদীর] পরবর্তী আয়াতে এর উল্টো চিত্রই ফুটে উঠেছে। সেখানে অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করানোর কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

করার মালিক হবে না[১]।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৮৮. আর তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾

৮৯. তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করছ;

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

৯০. যাতে আসমানসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, আর যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে,

اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯১. এ জন্যে যে, তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে[২]।

وَمَا يَنْۢبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়!

---

(১) عهد অর্থ অঙ্গীকার আদায় করা। বলা হয়ে থাকে, বাদশাহ এ অঙ্গীকার নামা অমুকের জন্য দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] যেটাকে সহজ ভাষায় পরোয়ানা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে তার পক্ষেই সুপারিশ হবে এবং যে পরোয়ানা পেয়েছে সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। আয়াতের শব্দগুলো দু'দিকেই সমানভাবে আলোকপাত করে। সুপারিশ কেবলমাত্র তার পক্ষেই হতে পারবে যে রহমান থেকে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এ সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সেটার হক আদায় করেছে। ইবন আব্বাস বলেন, পরোয়ানা হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে কোন প্রকার শক্তি-সামর্থ ও উপায় তালাশ না করা, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে আশা না করা। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষতঃ আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'খারাপ কথা শোনার পর মহান আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ধৈর্য-সহনশীল আর কেউ নেই, তার সাথে শরীক করা হয়, তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা হয় তারপরও তিনি তাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন।' [বুখারী: ৬০৯৯, মুসলিম: ২৮০৪]

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

৯৩. আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

৯৪. তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন[১],

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

৯৫. আর কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা[২]।

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে সম্যক জানেন। তিনি সেগুলোকে সীমাবদ্ধ করে গুণে রেখেছেন সুতরাং তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। সৃষ্টির শুরু থেকে ছোট বড়, পুরুষ মহিলা সবই তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে তার জন্য তিনি ভালবাসা তৈরী করেন। অন্য অর্থ হচ্ছে, তিনি নিজে তাকে ভালবাসেন, অন্য ঈমানদারদের মনেও ভালবাসা তৈরী করে দেন। মুজাহিদ ও দাহহাক এ অর্থই করেছেন। ইবন আব্বাস থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি মুসলিমদের মধ্যে দুনিয়াতে তার জন্য ভালবাসা, উত্তম জীবিকা ও সত্যকথা জারী করেন। সুতরাং ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায়। একজন সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস। তারপর জিবরাঈল সব আসমানে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে নাযিল করা হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। [বুখারীঃ ৫৬৯৩, মুসলিমঃ ২৬৩৭, তিরমিযীঃ ৩১৬১, এ বর্ণনায় আরও এসেছে, তারপর বর্ণনাকারী উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন]

৯৭. আর আমরা তো আপনার জবানিতে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারেন।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾

৯৮. আর তাদের আগে আমরা বহু প্রজন্মকে বিনাশ করেছি! আপনি কি তাদের কারো অস্তিত্ব অনুভব করেন অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পান[১]?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا ﴿٩٨﴾

সালফে সালেহীনদের মধ্য থেকে হারেম ইবনে হাইয়ান বলেনঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন মানুষ ভাল কিংবা মন্দ যে আমলই করুক তাকে আল্লাহ্ সে আমলের চাদর পরিধান করিয়ে দেন। [ইবন কাসীর] ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যে দো'আ করে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন।" এ দো'আর ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দুরতিক্রমা বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

(১) বোধগম্য নয়- এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكز বলা হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যেমন নূহ, আদ, সামূদ, ফির'আউন ইত্যাদি রাজ্যাধিপতি, জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয় তখন তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ আলোড়ন শোনা যায় না। তাদের সবাইকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয় যে, কাউকেই ছেড়ে দেয়া হয় না। বরং তাদের ধ্বংস পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়েই আছে। [সা'দী]

২০- সূরা ত্বা-হা[১]
১৩৫ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ طٰهٰ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত্বা-হা,[২]

طٰهٰ ①

২. আপনি কষ্ট-ক্লেশে পতিত হন- এ জন্য আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি[৩];

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ②

---

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ সূরা এবং আরো কয়েকটি সূরা সম্পর্কে বলেছেন: 'বনী ইসরাইল, আল-কাহফ, মার্‌ইয়াম, ত্বা-হা এবং আম্বিয়া এগুলো আমার সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বা সর্বপ্রথম পুঁজি। [বুখারীঃ ৪৭৩৯] এর অর্থ, প্রাচীন সূরাসমূহের মধ্যে এগুলো অন্যতম। তাছাড়া সূরা ত্বা-হা, আল-বাকারাহ ও আলে-ইমরান সম্পর্কে এসেছে যে, এগুলোতে মহান আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত নাম রয়েছে যার অসীলায় দো'আ করলে আল্লাহ্ তা কবুল করেন'। [ইবনে মাজাহ: ৩৮৫৬]

(২) ত্বা-হা শব্দটি 'হুরুফে মুকাত্তা'আতের অন্তর্ভুক্ত'। যেগুলো সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর প্রকৃত অর্থ মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে উম্মতের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এর কিছু অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, হে মানব! অথবা হে পুরুষ। কাযী ইয়াদ বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাতে এক পায়ের উপর ভর করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যা তার জন্য অনেক কষ্টের কারণ হয়ে পড়েছিল ফলে এ সম্বোধনের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, যমীনের সাথে মিশে থাকেন অর্থাৎ দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে অথবা বসে বসেও আপনি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন। [ইবন কাসীর]

(৩) لِتَشْقٰٓى শব্দটি شقاء থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ কুরআন নাযিল করে আমি আপনার দ্বারা এমন কোন কাজ করাতে চাই না যা আপনার পক্ষে করা অসম্ভব। কুরআন নাযিলের সূচনাভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। তিনি পরপর দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায়ের জন্য এক পায়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, পরে অন্য পায়ে ভর দিয়ে সালাত আদায় করতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পা ফুলে যায়। কাফের মুশরিক কুরাইশরা বলতে থাকে যে, এ কুরআন মুহাম্মাদকে কষ্টে নিপতিত করার জন্যই নাযিল হয়েছে। [ইবন কাসীর] আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে: আপনাকে কষ্ট ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন নাযিল করিনি। যারা আখেরাত ও

৩. বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ হিসেবে[১],

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

৪. যিনি যমীন ও সমুচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এটা নাযিলকৃত,

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ۝

৫. দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন[২]।

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۝

৬. যা আছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলে তাদের জন্য এ কুরআন উপদেশবাণী। তারাই এর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করতে পারে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান করুন কুরআনের সাহায্যে।" [সূরা ক্বাফ: ৪৫] আরও এসেছে, "আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে উপদেশ তথা কুরআনকে মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" [সূরা ইয়াসীন: ১১] কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আয়াতের অর্থ- আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তিনি এ কুরআনকে দুর্ভাগা বানানোর জন্য নাযিল করেননি। বরং তিনি তা নাযিল করেছেন রহমত, নূর ও জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শক হিসেবে। [ইবন কাসীর]

(১) মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'আল্লাহ্ যার কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।' [বুখারীঃ ৭১, মুসলিমঃ ১০৩৭] কিন্তু এখানে সেসব জ্ঞানীকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআন বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় বিদ্যমান আছে। সুতরাং কুরআন নাযিল করে তাকে কষ্টে নিপতিত করা হয়নি। বরং তার জন্য অনেক কল্যাণ চাওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কিতাব নাযিল হওয়া, তাঁর রাসূলদেরকে প্রেরণ করা তাঁর বান্দাদের জন্য রহমত। এর মাধ্যমে তিনি যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে চায় তাদেরকে স্মরণ করার সুযোগ দেন, কিছু লোক এ কিতাব শুনে উপকৃত হয়। এটা এমন এক স্মরনিকা যাতে তিনি তার হালাল ও হারাম নাযিল করেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন বলে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। তিনি কিভাবে আরশে উঠেছেন সেটার ধরণ আমাদের জানা নেই। এটা ঈমান বিল গায়েবের অংশ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

ভূগর্ভে[১] তা তাঁরই।

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝

৭. আর যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গোপন ও অতি গোপন সবই জানেন[২]।

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۝

৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই[৩]।

---

(১) আদ্র ও ভেজা মাটিকে ثرى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। অর্থাৎ সাত যমীনের নিচে। কেননা এ মাটি সাত যমীনের নিচে অবস্থিত। [জালালাইন] একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, মাটির অভ্যন্তরের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ। তিনি আরশের উপর থেকেও সব জায়গার খবর রাখেন। তাঁর অগোচরে কিছুই নেই। আসমানসমূহ ও যমীনের অভ্যন্তরের যাবতীয় বিষয়াদি তাঁর জানা রয়েছে। কারণ, সবকিছু তাঁরই রাজত্বের অংশ, তাঁর কব্জায়, তাঁর কর্তৃত্বে, তাঁর ইচ্ছা ও হুকুমের অধীন। আর তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মালিক, তিনিই ইলাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, কোন রব নেই। [ইবন কাসীর]

(২) মানুষ মনে যে গোপন কথা রাখে, কারো কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سر পক্ষান্তরে أخفى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-ফুরকান: ৬] সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে একই সৃষ্টির মত। এ সবের জ্ঞান তাঁর পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা লুকমান: ২৮] [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতটিতে তাওহীদকে সুন্দরভাবে ফুটে তোলা হয়েছে। এখানে প্রথমেই মহান আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করে তাঁর পরিচয় দেয়া হয়েছে যে, তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই। তারপর বলা হয়েছে যে, সুন্দর সুন্দর যত নাম সবই তাঁর। আর এটা সুবিদিত যে, যার যত বেশী নাম তত বেশী গুণ। আর সে-ই মহান যার গুণ বেশী। আল্লাহ্র প্রতিটি নামই অনেকগুলো গুণের ধারক। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র অনেক নাম ও গুণ বর্ণিত হয়েছে। তার নাম ও গুণের কোন সীমা ও শেষ নেই। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, মহান আল্লাহ্র এমন কিছু নাম আছে যা তিনি কাউকে না জানিয়ে তার ইলমে গায়েবের ভাণ্ডারে রেখে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে কেউ কোন বিপদে পড়ে নিম্নোক্ত দো'আ

৯. আর মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি[১]?

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿٩﴾

১০. তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন তার পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি তো আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আমি আগুনের কাছে-

إِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْا إِنِّيْ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

পাঠ করবে মহান আল্লাহ্ তাকে তা থেকে উদ্ধার করবেন সেটি হচ্ছে: হে আল্লাহ্! আমি আপনার দাস এবং আপনারই এক দাস ও আরেক দাসীর পুত্র। আমার ভাগ্য আপনারই হাতে, আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর। আমার প্রতি আপনার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি আপনার যে সমস্ত নাম আপনি আপনার জন্য রেখেছেন অথবা আপনার যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন বা আপনার সৃষ্টি জগতের কাউকেও শিখিয়েছেন অথবা আপন ইলমে গাইবের ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করে রেখেছেন সে সমস্ত নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি আপনি কুরআনকে করে দিন আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উৎকণ্ঠা দূরকারী।' [সহীহ ইবন হিব্বান: ৩/২৫৩, মুসনাদে আহমাদ:১/৩৯১] তবে কোন কোন হাদীসে এ সমস্ত নামের মধ্যে ৯৯টি নামের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করে সেগুলো দ্বারা আহ্বান জানালে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'অবশ্যই আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম রয়েছে কেউ সঠিকভাবে সেগুলোর মাধ্যমে আহ্বান করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে' [বুখারী:২৭৩৬, মুসলিম:২৬৭৭] কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, শুধু এ ৯৯টিই আল্লাহ্‌র নাম, বরং এখানে আল্লাহ্‌র নামগুলোর মধ্য থেকে ৯৯টি নামের ফযীলত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুরআনুল কারীমের মাহাত্ম্য এবং সে প্রসঙ্গে রাসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালাত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন, অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ অর্থাৎ "আমি নবীগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এজন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয়।" [সূরা হূদঃ ১২০]

ধারে কোন পথনির্দেশ পাব[১] ।'

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾

১১. তারপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন তখন ডেকে বলা হল, 'হে মূসা!

اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

১২. 'নিশ্চয় আমি আপনার রব, অতএব আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন, কারণ আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন[২] ।

(১) মনে হচ্ছে তখন সময়টা ছিল শীতকালের একটি রাত। খুব অন্ধকার একটি রাত। [কুরতুবী] মূসা আলাইহিসসালাম সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ এলাকা অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে একটি আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন সেখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে যার সাহায্যে পরিবারের লোকজনদের সারারাত গরম রাখার ব্যবস্থা হবে অথবা কমপক্ষে সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানে এসেছে যে, তিনি পরিবারকে বলেছিলেন যে, আমি যাচ্ছি যাতে আমি জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারি। অন্য আয়াতে এসেছে, একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।' [সূরা আল-কাসাস: ২৯] এর দ্বারা বোঝা গেল যে, রাতটি ছিল প্রচণ্ড শীতের। তারপর বলেছেন যে, অথবা আমি পথের সন্ধান পাব। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। যখন আগুন দেখলেন, তখন ভাবলেন, যদি কাউকে পথ দেখানোর মত নাও পাই, সেখান থেকে আগুন নিয়ে আসতে পারব। [ইবন কাসীর] তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন আর পেয়ে গেলেন সেখানে আখেরাতের পথ।

(২) জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ যা কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় তা হলো, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর জুতাদ্বয় ছিল মৃত গাধার চর্মনির্মিত। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হাসান বসরী ও ইবনে জুরাইজ রাহিমাহুমাল্লাহ্ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেনঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেনঃ 'তুমি তোমার জুতা খুলে নাও।' [নাসায়ীঃ ২০৪৮,আবু দাউদঃ ৩২৩০, ইবনে মাজাহ্ঃ ১৫৬৮] জুতা পাক হলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা সব ফেকাহ্‌বিদের মতে জায়েয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা প্রমাণিতও রয়েছে।

১৩. 'আর আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী পাঠানো হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শুনুন।

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾

১৪. 'আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ্ নেই। অতএব আমারই 'ইবাদাত করুন[১] এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করুন[২]।

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

(১) লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এটা ছিল প্রথম নির্দেশ, যা একজন নবীর প্রতি আল্লাহ্ জারি করেছেন। সে হিসেবে প্রত্যেক মানুষের উপর প্রথম ওয়াজিব ও কর্তব্য হল এ কালেমার সাক্ষ্য দেয়া। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে সালাতের মূল উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সালাত কায়েম করুন, যাতে আমাকে স্মরণ করতে পারেন। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ মানুষ যেন আল্লাহ থেকে গাফেল না হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাত প্রতিদিন কয়েকবার মানুষকে দুনিয়ার কাজকারবার থেকে সরিয়ে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। কোন কোন মুফাসসির এ অর্থও নিয়েছেন যে, সালাত কায়েম করো, যাতে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে: "আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণ রাখবো।"[সূরা আল-বাকারাহঃ ১৫২] [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের অর্থ করেছেন, যদি কোন সালাত ভুলে যায় যখনই মনে পড়বে তখনই সালাত পড়ে নেয়া উচিত। [ফাতহুল কাদীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোন ব্যক্তি কোন সময় সালাত পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে যখন তার মনে পড়ে যায় তখনই সালাত পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া এর আর কোন কাফফারা নেই।" [বুখারীঃ ৫৭২ মুসলিমঃ ৬৮০, ৬৮৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'ঘুমানোর কারণে কারও সালাত ছুটে গেলে অথবা সালাত আদায় করতে বেখবর হয়ে গেলে যখনই তা স্মরণ হয় তখনই তা আদায় করা উচিত; কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন: "আর আমার স্মরনার্থে সালাত কায়েম করুন"।' [মুসলিম: ৩১৬] এ সমস্ত হাদীসে এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা এ তাফসীরের যথার্থতার উপর প্রমাণবহ। অন্য এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমরা সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি বলেন, "ঘুমের মধ্যে কোন দোষ নেই। দোষের সম্পর্ক তো জেগে থাকা অবস্থার সাথে। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে তখন জেগে উঠলে বা মনে পড়লে তৎক্ষণাৎ সালাত পড়ে নেবে।" [তিরমিযীঃ ১৭৭, আবু দাউদঃ ৪৪১]

১৫. 'কেয়ামত তো অবশ্যম্ভাবী[১], আমি এটা গোপন রাখতে চাই[২] যাতে প্রত্যেককে নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়[৩]।

إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾

১৬. 'কাজেই যে ব্যক্তি কিয়ামতে ঈমান রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন আপনাকে তার উপর ঈমান আনা থেকে ফিরিয়ে না রাখে, নতুবা আপনি ধ্বংস হয়ে

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾

---

(১) তাওহীদের পরে যে দ্বিতীয় সত্যটি প্রত্যেক যুগে সকল নবীর সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এবং যার শিক্ষা দেবার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আখেরাত। বলা হচ্ছে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আর সেটা হতেই হবে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ কেয়ামত কখন হবে সে ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই; এমনকি নবী ও ফিরিশ্‌তাদের কাছ থেকেও। [ইবন কাসীর] أكاد বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত-আখেরাতের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কেয়ামত আসবে -একথাও প্রকাশ করতাম না। বিভিন্ন মুফাসসিরের মতে, এর অর্থ কিয়ামতকে এমন গোপন রেখেছি, মনে হয় যেন আমি আমার নিজের কাছেই গোপন রাখছি। অথচ আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। [ইবন কাসীর] যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আসমানসমূহ ও যমীনে সেটা ভারী বিষয়। হঠাৎ করেই তা তোমাদের উপর আসবে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৭]

(৩) "যাতে প্রত্যেকেই নিজ কাজ অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে"। এই বাক্যটি اٰتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কেয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎকর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়- একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হবে। [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কেয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কেয়ামত তথা মৃত্যু আর বিশ্বজনীন কেয়ামত তথা হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। [ফাতহুল কাদীর]

যাবেন[১]।

১৭. 'আর হে মূসা! আপনার ডান হাতে সেটা কী[২]?'

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾

১৮. মূসা বললেন, 'এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ফেলে থাকি আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে[৩]।'

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

---

(১) এতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নেবেন না। তাহলে তা আপনার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের পক্ষ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসত্ত্বেও মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তার উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শেখানো। অর্থাৎ তোমরা তাদের অনুসরণ করো না যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে পড়ে তাদের রব ও মাওলার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছে। আর নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। যারাই তাদের মত হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর পক্ষ থেকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তার প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানীর সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও আল্লাহ্র কালাম শোনার কারণে তার মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এছাড়া এ প্রশ্নের আরো একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তার হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনার হাতে কি আছে দেখে নিন। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জিযা প্রদর্শন করা হল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] নতুবা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধহয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি। সুতরাং জ্ঞান লাভ করার বা জানার জন্য এ প্রশ্ন ছিল না।

(৩) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এ প্রশ্নটির উদ্দেশ্য হাতের বস্তুটির নাম কি? অথবা হাতের বস্তুটি কোন কাজে লাগে। এ দু'ধরনের প্রশ্ন উদ্দেশ্য হতে পারে। মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত আদবের কারণে দু সম্ভাবনার জবাবই প্রদান করেছেন। প্রথমে বলেছেন, এটা লাঠি। তারপর কি কাজে লাগে সেটার জওয়াবও দিয়েছেন যে, এটার উপর আমি ভর দেই। এটা

১৯. আল্লাহ্ বললেন, 'হে মূসা! আপনি তা নিক্ষেপ করুন।'

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

২০. তারপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাপ[1] হয়ে ছুটতে লাগল,

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

২১. আল্লাহ্ বললেন, 'আপনি তাকে ধরুন, ভয় করবেন না, আমরা এটাকে তার আগের রূপে ফিরিয়ে দেব।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

২২. 'এবং আপনার হাত আপনার বগলের[2]

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ

দিয়ে আমি পাতা ঝেড়ে ছাগলকে দেই। এতে করে তিনি জানালেন যে, এটা মানুষের যেমন কাজে লাগে তেমনি জীব-জন্তুরও কাজে লাগে। [সা'দী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর জবাব লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তাতে মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পারাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। মহব্বতের দাবী এই যে, আল্লাহ্ যখন অনুকম্পাবশতঃ মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবী এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেনঃ "আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে"। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর হাতের লাঠি আল্লাহ্র নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় বলা হয়েছে ﴿كَاَنَّهَا جَآنٌّ﴾ [সূরা আন-নামলঃ ১০, সূরা আল-কাসাসঃ ৩১] আরবী অভিধানে দ্রুত নড়াচড়াকারী সরু সাপকে جَآنٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ﴿فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ﴾ [সূরা আল-আ'রাফঃ ১০৭, সূরা আশ-শু'আরাঃ ৩২] অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে, এটা ব্যাপক শব্দ। প্রত্যেক ছোট-বড়, মোটা-সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। সাপটির অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, এটি চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে جَآنٌّ বলা হত। আর আকারে বড় হওয়ায় লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হত বলে ثُعْبَانٌ বলা হত। [ইবন কাসীর]

(২) মূলে ব্যবহৃত হয়েছে جناح শব্দটি। جناح আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার বাজু বা পার্শ্বদেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পাখা বা ডানা এজন্য বলা হয়েছে কারণ, এটি তার জন্য ডানার স্থান। [ফাতহুল কাদীর] এটি এখানে

سُوْۤءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ۝٢٢
সাথে মিলিত করুন, তা আরেক নিদর্শনস্বরূপ নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হবে।

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۝٢٣
২৩. 'এটা এ জন্যে যে, আমরা আপনাকে আমাদের মহানিদর্শনগুলোর কিছু দেখাব ।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝٢٤
২৪. 'ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালংঘন করেছে(১) ।'

দ্বিতীয় রুকূ'

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝٢٥
২৫. মূসা বললেন(২), 'হে আমার রব! আমার

উদ্দেশ্য নিজের বাহু অর্থাৎ বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা চাঁদের আলোর ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ মিসরের বাদশা ফির'আউনের কাছে যান। যার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানান। আর তাকে বলুন, যেন বনী ইসরাঈলের সাথে ভাল ব্যবহার করে। তাদেরকে যেন শাস্তি না দেয়। কেননা সে সীমালঙ্ঘন করেছে, বাড়াবাড়ি করেছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং মহান রবকে ভুলে গেছে। [ইবন কাসীর]

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র কালাম লাভের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন তিনি নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই দারস্থ হলেন। কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো হিম্মত সৃষ্টি করে দিন। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিন। আমাকে এমন ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম, সহনশীলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করুন যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন। ইবন কাসীর বলেন, এর কারণ, তাকে আল্লাহ্ এমন এক গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন এমন এক লোকের কাছে, যে তখনকার সময়ে যমীনের বুকে সবচেয়ে বেশী অহংকারী, দাম্ভিক, কুফরিতে চরম, সৈন্য-সামন্ত যার অগণিত। বহু বছর থেকে যার রাজত্ব চলে আসছে, তার ক্ষমতার দম্ভে সে দাবী করে বসেছে যে, আল্লাহকে চেনে না। তার প্রজারা তাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বলে মানে না। তিনি তার ঘরেই ছোট বেলায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাদেরই একজনকে হত্যা

বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিন[১]।

২৬. 'এবং আমার কাজ সহজ করে দিন[২]।

وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ۝٢٦

২৭. 'আর আমার জিহ্‌বার জড়তা দূর করে দিন---

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝٢٧

২৮. 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে[৩]।

يَفْقَهُوا۟ قَوْلِي ۝٢٨

করে পালিয়েছিলেন। এতকিছুর পর আবার তার কাছেই ফিরে যাচ্ছেন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে। একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত দিতে যাচ্ছেন। সুতরাং তার তো প্রচুর দো'আ করা প্রয়োজন। [ইবন কাসীর] তাই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে পাঁচটি বিষয়ে দো'আ করলেন। যার বর্ণনা সামনে আসছে।

(১) প্রথম দো'আ, হে আমার রব, আমার বক্ষ ঈমান ও নবুওয়াত দিয়ে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দিন। [কুরতুবী] অন্য আয়াতে বলেছেন "এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়ছে" [সূরা আশ-শু'আরা: ১৩] এভাবে তিনি তার অপারগতা ও প্রার্থনা প্রকাশ করলেন। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ অন্তরে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়াতের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) দ্বিতীয় দো'আ, আমার কাজ সহজ করে দিন। এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুওয়াতেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে কারো জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজও কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলিমদেরকে নিম্নোক্ত দো'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দো'আ করবেঃ "হে আল্লাহ্! আপনি যা সহজ করে দেন তা ব্যতীত কোন কিছুই সহজ নেই। আর আপনি চাইলে পেরেশানীযুক্ত কাজও সহজ করে দেন।"[সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৩/২৫৫, হাদীস নং ৯৭৪]

(৩) তৃতীয় দো'আ, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম হারূনকে রিসালাতের কাজে সহকারী করার যে দো'আ করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, "হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী।" [সূরা আল-কাসাসঃ ৩৪] এ থেকে জানা যায় যে, ভাষাগত

২৯. 'আর আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনদের মধ্য থেকে[১];

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾

৩০. 'আমার ভাই হারূনকে;

هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾

৩১. 'তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন,

اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾

৩২. 'এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন[২],

وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾

কিছু একটা সমস্যা তার মধ্যে ছিল। এছাড়া ফির'আউন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, "সে তার বক্তব্য পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে না"। [সূরা আয-যুখরুফঃ ৫২] মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তার দো'আয় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকুতে লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলাবাহুল্য, সে পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) চতুর্থ দো'আ, আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উযীর করুন। এই দো'আটি রিসালাতের করণীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উযীর নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। ইবন আব্বাস বলেন, সাথে সাথে হারূনকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [ইবন কাসীর] অভিধানে উযীরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উযীর তার বাদশাহ্‌র বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উযীর বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] এ থেকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি তার উপর অর্পিত বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন উযীর চেয়ে নিয়েছেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উযীর দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উযীর তাতে সাহায্য করেন।' [নাসায়ীঃ ৪২০৪]

(২) পঞ্চম দো'আ হচ্ছে, হারূনকে নবুওয়াত ও রিসালাতেও শরীক করুন। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তার দো'আয় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উযীর আমার পরিবারভুক্ত লোক হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উযীর করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারূন- যাতে রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি। হারূন 'আলাইহিস্ সালাম মূসা 'আলাইহিস্

৩৩. 'যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর,

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

৩৪. 'এবং আমরা আপনাকে স্মরণ করতে পারি বেশী পরিমাণ[১]।

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. 'আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।'

إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৬. তিনি বললেন, 'হে মূসা! আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেয়া হলো[২]।

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৭. 'আর আমরা তো আপনার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম[৩];

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ﴿٣٧﴾

সালাম থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং মূসার পূর্বেই মারা যান। বর্ণিত আছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার উমরায় বের হলে পথিমধ্যে এক বেদুঈনের মেহমান হলেন। তিনি তখন দেখলেন, তাদের একজন তার সাথীদের প্রশ্ন করছে, দুনিয়াতে কোন ভাই তার ভাইয়ের সবচেয়ে বড় উপকার করেছে? তারা বলল, জানি না। লোকটা বলল, মূসা। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য নবুওয়াত চেয়ে নিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, সত্য বলেছে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তার প্রশংসায় বলেছেন, "আর আল্লাহ্র কাছে তিনি মর্যাদাবান।" [সূরা আল-আহযাব: ৬৯] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ হারূনকে উযীর ও নবুওয়াতে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশী পরিমাণে আপনার যিক্র ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সমস্ত ইবাদাতের প্রাণ হচ্ছে যিকির। তাই তিনি তার ভাইকে সহ এটা করার সুযোগ দানের দো'আ করলেন। [সা'দী]

(২) এ পর্যন্ত পাঁচটি দো'আ সমাপ্ত হল পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দো'আ কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে অর্থাৎ হে মূসা! আপনি যা যা চেয়েছেন, সবই আপনাকে প্রদান করা হল। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুওয়াত ও রিসালাত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাকে সেসব নেয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবত তার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٨﴾

৩৮. 'যখন আমরা আপনার মাকে জানিয়েছিলাম যা ছিল জানাবার[১],

أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴿٣٩﴾

৩৯. 'যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও[২] যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়[৩], ফলে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে[৪]। আর আমি আমার কাছ থেকে আপনার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম[৫], আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে

---

(১) বলা হয়েছে, 'জানিয়েছিলাম যা ছিল জানাবার'। তবে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলঃ وحي। এ ওহী ছিল ইলহামের আকারে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরে বিষয়টি জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। অথবা তাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন। অথবা ফিরিশ্তার মাধ্যমেও জানিয়ে থাকতে পারেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ফির'আউন তার সিপাহীদেরকে ইস্রাঈলী নবজাতক শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে এক আদেশ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্র তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, *যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু; অর্থাৎ ফির'আউন। [ফাতহুল কাদীর]*

(৫) এখানে مَحَبَّةً শব্দটি আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে আপনার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই আপনাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। ইবনে আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থ হচ্ছে, আপনার শত্রুর কাছে আপনাকে আদরণীয় বানিয়ে দিয়েছি। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

প্রতিপালিত হন[১]।'

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. 'যখন আপনার বোন চলছিল, অতঃপর সে গিয়ে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব যে এ শিশুর দায়িত্বভার নিতে পারবে?' অতঃপর আমরা আপনাকে আপনার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; আর আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন; অতঃপর আমরা আপনাকে মনঃকষ্ট থেকে মুক্তি দেই এবং আমরা আপনাকে বহু পরীক্ষা করেছি[২]। হে মূসা! তারপর আপনি কয়েক বছর মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন, এর পরে আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন।

وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾

৪১. 'এবং আমি আপনাকে আমার নিজের

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব বাদশাহ ফির'আউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে। তার খাবার ছিল বাদশাহর খাবার। এটাই ছিল তৈরী করার অর্থ [ইবন কাসীর] এখানে عيني দ্বারা এও অর্থ হবে যে, আমার চোখের সামনে। এতে আল্লাহ্‌র জন্য চোখ থাকার গুণ সাব্যস্ত হবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসেও আল্লাহ্ তা'আলার এ গুণটি প্রমানিত।

(২) অর্থাৎ আমরা বার বার আপনাকে পরীক্ষা করেছি অথবা আপনাকে বার বার পরীক্ষায় ফেলেছি। সম্ভবত: মূসা আলাইহিসসালামের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জীর দিকেই এখানে সামষ্টিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এতদসংক্রান্ত এক বিরাট বর্ণনা কোন কোন হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত এর দ্বারা মূসা আলাইহিস সালামের মনকে শক্ত করা উদ্দেশ্য যে, যেভাবে আমরা আপনাকে বিগত সময়ে পরীক্ষা করেছি এবং সমস্ত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ করেছি, সেভাবে সামনেও সাহায্য করব, সুতরাং আপনার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। [ফাতহুল কাদীর]

জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি[১]।

৪২. 'আপনি ও আপনার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করুন এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করবেন না[২],

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِیْ وَلَا تَنِيَا فِیْ ذِكْرِیْ ۝

৪৩. 'আপনারা উভয়ে ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালংঘন করেছে।

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

৪৪. 'আপনারা তার সাথে নরম কথা বলবেন[৩], হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

(১) অর্থাৎ আপনাকে আমার ওহী ও রিসালাত বহনের জন্য তৈরী করে নিয়েছি, যাতে আমার ইচ্ছামত সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। [ইবন কাসীর] যাজ্জাজ বলেন, এর অর্থ, আমার দলীল-প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনাকে আমি পছন্দ করে নিয়েছি। আর আপনাকে আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে ওহী ও রিসালাতের বাহক হিসেবে নির্ধারণ করছি। এতে আপনি তাদের কাছে যখন প্রচার করবেন, তখন যেন সেটা আমিই প্রচার করছি ও আহ্বান জানাচ্ছি ও দলীল-প্রমাণাদি পেশ করছি। [ফাতহুল কাদীর] এ ভাবেই মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের পছন্দ করেন তাদেরকে নিজের করে তৈরী করেন। যাতে করে পরবর্তী দায়িত্বের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। অন্যত্র বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে ও ইব্‌রাহীমের বংশধর ও 'ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।" [সূরা আলে-ইমরান: ৩৩]

(২) এর এক অর্থ হচ্ছে, আমার ওহী ও রিসালাত প্রচারে কোন প্রকার দেরী করবেন না। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ আপনারা দু'জন আমার স্মরণ কখনও পরিত্যাগ করবেন না। ফির'আউনের কাছে যাওয়ার সময়ও যিকির করবেন, যাতে করে যিকির আপনাদের জন্য তাকে মোকাবিলার সময় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ আপনাদের দাওয়াত হবে নরম ভাষায়, যাতে তা তার অন্তরে প্রতিক্রিয়া করে এবং দাওয়াত সফল হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "আপনি মানুষকে দা'ওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা" [সূরা আন-নাহল: ১২৫] এ আয়াতে দাওয়াত প্রদানকারীদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে। সেটা হচ্ছে, ফির'আউন হচ্ছে সবচেয়ে বড় দাম্ভিক ও অহংকারী, আর মূসা হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় লোকদের অন্যতম। তারপরও ফির'আউনকে নরম ভাষায় সম্বোধন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাংখার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

করবে অথবা ভয় করবে[১]।'

৪৫. তারা বলল, 'হে আমাদের রব! আমরা আশংকা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে[২]।'

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

৪৬. তিনি বললেন, 'আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি[৩], আমি শুনি ও আমি দেখি।'

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾

---

(১) মানুষ সাধারণতঃ দু'ভাবে সঠিক পথে আসে। সে নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে-শুনে ও উপদেশবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, অথবা অশুভ পরিণামের ভয়ে সোজা হয়ে যায়। তাই আয়াতে ফির'আউনের জন্য দুটি সম্ভাবনাই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে মূসা আলাইহিস সালাম কিভাবে সে নরম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেটার বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেছিলেন, "আপনার কি আগ্রহ আছে যে, আপনি পবিত্র হবেন--- 'আর আমি আপনাকে আপনার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাতে আপনি তাঁকে ভয় করেন?" [সূরা আন-নাযি'আত: ১৮-১৯] এ কথাটি অত্যন্ত নরম ভাষা। কেননা, প্রথমে পরামর্শের মত তাকে বলা হয়েছে যে, আপনার কি আগ্রহ আছে? কোন জোর নয়, আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে, আপনি পবিত্র হবেন, এটা বলা হয়নি যে, আমি আপনাকে পবিত্র করব। তৃতীয়তঃ তার রবের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যিনি তাকে লালন পালন করেছেন। [সা'দী]

(২) ﴿إِنَّنَا نَخَافُ﴾ মূসা ও হারূন 'আলাইহিমাস্ সালাম এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় ﴿أَن يَفْرُطَ﴾ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফির'আউন সম্ভবতঃ আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং অনাকাঙ্খিত কিছু করে বসবে। [ইবন কাসীর] দ্বিতীয় ভয় ﴿أَن يَطْغَىٰ﴾ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবতঃ সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশী অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। অথবা তাড়াতাড়ি আক্রমন করে বসবে। অথবা আমাদের উপর তার হাত প্রসারিত করবে। ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করবে। [ইবন কাসীর]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর আছেন, এটাই একজন মুমিনের আক্বীদা-বিশ্বাস। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর সঠিক বান্দা ও সৎলোকদের সাথে আছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা

৪৭. সুতরাং আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন, 'আমরা তোমার রব-এর রাসূল, কাজেই আমাদের সাথে বনী ইস্‌রাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার কাছে এনেছি তোমার রব-এর কাছ থেকে নিদর্শন। আর যারা সৎপথ অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি।

فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٤٧﴾

৪৮. 'নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, শাস্তি তো তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾

৪৯. ফির'আউন বলল, 'হে মূসা! তাহলে কে তোমাদের রব[1]?'

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾

অনুসারে সে সমস্ত আয়াতে সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের সাথে থাকবে। পরবর্তী বাক্য, "আমি শুনি ও আমি দেখি"ও এ কথা প্রমাণ করে যে, এখানে সহযোগিতার মাধ্যমে সংগে থাকা বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) ফির'আউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা দু'জন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছো, মিসর ও মিসরবাসীদের রব তো আমিই। অন্যত্র এসেছে, সে বলেছিল, "আমি তোমাদের প্রধান রব।" [সূরা আন-নাযি'আত:২৪] অন্যত্র বলেছে, "হে আমার জাতি! মিসরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই? আর এ নদীগুলো কি আমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৫১] আরও বলেছিল, "হে জাতির সরদারগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি উপরে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে চাই।" [সূরা আল-কাসাস:৩৮] অন্য সূরায় সে মূসাকে ধমক দিয়ে বলেঃ "যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে কয়েদিদের অন্তর্ভুক্ত করবো।" [সূরা আশ-শু'আরা: ২৯] এভাবে সে প্রকাশ্যে একজন ইলাহের অস্বীকার করছিল যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর মালিক। [ইবন কাসীর] আসলে সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোন সত্তা তার উপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে

৫০. মূসা বললেন, 'আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার সৃষ্টি আকৃতি দান করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন[১]।'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

৫১. ফির'আউন বলল, 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী[২]?'

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ۝

হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে। মূলতঃ ফির'আউন সর্বেশ্বরবাদী লোক ছিল। সে মনে করত যে, তার মধ্যে ইলাহ ভর করেছে। আত্মগর্ব, অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং নিজে ইলাহ ও উপাস্য হবার দাবীদার ছিল। [এর জন্য বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যা, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম: ২/৩৯১; মাজমু ফাতাওয়া: ২/১২৪; ২/২২০; ৬/৩১৪; ৮/৩০৮]

(১) আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তিনি প্রতিটি বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। দুই. মানুষকে মানুষই বানাচ্ছেন, গাধাকে গাধা, ছাগলকে ছাগল। তিন. তিনি প্রতিটি বস্তুর সুনির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছেন। চার. প্রতিটি সৃষ্টিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরী করেছেন। পাঁচ. প্রতিটি সৃষ্টিকে তার জন্য যা উপযোগী সে রকম সৃষ্টিরূপ দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের জন্য গৃহপালিত জন্তুর কোন সৃষ্টিরূপ দেননি। গৃহপালিত জন্তুকে কুকুরের কোন অবস্থা দেননি। কুকুরকে ছাগলের বৈশিষ্ট্য দেননি। প্রতিটি বস্তুকে তার অনুপাতে বিয়ে ও তার জন্য যা উপযুক্ত সেটার ব্যবস্থা করেছেন। সৃষ্টি, জীবিকা ও বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে কোন কিছুকে অপর কোন কিছুর মত করেননি। [ইবন কাসীর] ছয়. তিনি প্রতিটি বস্তুকেই যেটা তার জন্য ভাল সেটার জ্ঞান দিয়েছেন। তারপর সে ভাল জিনিসটার দিকে কিভাবে যেতে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] সাত. কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণী "আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন" [সূরা আল-আ'লা: ৩] এর মত, তখন এর দ্বারা অর্থ হবে, আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর সেটাকে সে তাকদীরের দিকে চলার জন্য পথ দেখান। তিনি কার্যাবলী, আয়ূ ও রিযিক লিখে নিয়েছেন। সে হিসেবে সমস্ত সৃষ্টিকুল চলছে। এর ব্যতিক্রম করার সুযোগ কারও নেই। এর থেকে বের হওয়াও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মূসা বললেন, আমাদের রব তো তিনিই, যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং সৃষ্টিকুলকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চালাচ্ছেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে যে, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাকে দুনিয়ায় কাজ করার পথ বাতলে দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রব নেই, তাহলে এ আমাদের সবার বাপ দাদারা, যারা বংশ পরম্পরায় ভিন্ন প্রভূ ও ইলাহর বন্দেগী করে চলে এসেছে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে?

৫২. মূসা বললেন, 'এর জ্ঞান আমার রব-এর নিকট কিতাবে রয়েছে, আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না[১] ।'

قَالَ عِلۡمُهَا عِنۡدَ رَبِّیۡ فِیۡ کِتٰبٍ ۚ لَا یَضِلُّ رَبِّیۡ وَ لَا یَنۡسَی ﴿۵۲﴾

৫৩. 'যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ, আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন।' অতঃপর তা দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি[২] ।

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ مَهۡدًا وَّ سَلَکَ لَکُمۡ فِیۡهَا سُبُلًا وَّ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡ نَّبَاتٍ شَتّٰی ﴿۵۳﴾

তারা সবাই কি গোমরাহ ছিল? তারা সবাই কি আযাবের হকদার হয়ে গেছে? এ ছিল ফির'আউনের কাছে মূসার এ যুক্তির জবাব। হতে পারে সে আসলেই তার পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল। [ইবন কাসীর] অথবা ফির'আউন আগের প্রশ্নের উত্তরে হতবাক হয়ে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য এ প্রশ্ন করেছিল। [ফাতহুল কাদীর] অথবা সে নিজের সভাসদ ও সাধারণ মিসরবাসীদের মনে মূসার দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে। সে মূসা আলাইহিসসালামের বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাচ্ছিল। কারণ, মানুষ তাদের পিতামাতার ব্যাপারে যখন এটা শুনবে যে, তারা জাহান্নামে গেছে, তখন তারা মূসা আলাইহিসসালামের বিরুদ্ধে জোট করতে দ্বিধা করবে না।

(১) এটি মূসার সে সময় প্রদত্ত একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব। তিনি বলেন, তারা যাই কিছু ছিল, নিজেদের কাজ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কার্যাবলী এবং কাজের পেছনে নিহিত অন্তরের ইচ্ছাসমূহ জানার কোন উপায় নেই। কাজেই তাদের ব্যাপারে আমি কোন সিদ্ধান্ত দেই কেমন করে? তাদের সমস্ত রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তার কারণসমূহের খবর আল্লাহই জানেন। কোন জিনিস আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং তাঁর স্মৃতি থেকেও কোন জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আল্লাহই জানেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। ছোট বড় কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। সাধারণত: মানুষের জ্ঞানে দু' ধরণের সমস্যা থাকে। এক. সবকিছু জানা সম্ভব হয় না। দুই. জানার পরে ভুলে যাওয়া। কিন্তু আমার রব এ দু'টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এটি মূসা আলাইহিস সালামের ভাষণেরই বাকী অংশ। ফির'আউন রব সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল এ ছিল সে প্রশ্নের উত্তরের অবশিষ্ট অংশ। এখানে মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র অন্যান্য গুণাগুণ বর্ণনা করছেন। মাঝখানে ফির'আউনের এক প্রশ্ন

৫৪. তোমরা খাও ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য[১]।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٤﴾

তৃতীয় রুকূ'

৫৫. আমরা মাটি থেকে[২] তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব[৩]।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

ও তার উত্তর গত হয়েছে। [ইবন কাসীর] অথবা আগের আয়াতে বর্ণিত "আমার রব তিনি যিনি ভুলেন না", এখানে যে রবের কথা বলেছেন সে রবের পরিচয় দিচ্ছেন। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা: এখানে মূসা আলাইহিস সালাম তার রবের পরিচয় তুলে ধরে বলছেন যে, আমার রব তো তিনি যিনি যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন, এখানে মানুষ অবস্থান করে, ঘুমায়, এর পিঠে ভ্রমন করে। এর মধ্যে রাস্তা ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে মানুষ তাতে চলাফেরা করে। তারপর যমীনের বিবিধ নেয়ামত উল্লেখ করছেন। তাতে তিনি উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতা-গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর স্বাদ, গন্ধ, রূপ বিভিন্ন প্রকার। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহরোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এতে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। نهى শব্দটি ناهية-এর বহুবচন। [ফাতহুল কাদীর] বিবেককে ناهية (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যারা ভারসাম্যপূর্ণ সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে এ নিদের্শনাবলী তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের একজন রব আছেন এবং সমগ্র রবুবিয়াত ও ইলাহী কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্য কোন রবের জন্য এখানে কোন অবকাশই নেই। আর তিনিই একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) منها শব্দের সর্বনাম দ্বারা মাটি বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। কারণ মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন আদম 'আলাইহিস্ সালাম তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। একটি পর্যায় হচ্ছে, বর্তমান জগতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়টি মৃত্যু থেকে

৫৬. আর আমরা তো তাকে আমাদের সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম[১]; কিন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে এবং অমান্য করেছে ।

وَلَقَدْ أَرَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۝

৫৭. সে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করে দেয়ার জন্য[২]?

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ ۝

কেয়ামত পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হবার পরের পর্যায় । এই আয়াতের দৃষ্টিতে এ তিনটি পর্যায়ই অতিক্রান্ত হবে এ যমীনের উপর । যমীন থেকে তাদের শুরু । তারপর মৃত্যুর পর যমীনেই তাদের ঠাঁই । আর যখন সময় হবে তখন এখান থেকেই তাদেরকে পুনরুত্থান ঘটানো হবে । [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন , এবং তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে ।" [সূরা আল-ইসরা: ৫২] আলোচ্য আয়াতটি অন্য একটি আয়াতের মত, যেখানে বলা হয়েছে, "তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে । আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ২৫]

(১) অর্থাৎ তাওহীদ ও নবুওয়তের যাবতীয় নিদর্শন আমরা তাকে দেখিয়েছিলাম ।[কুরতুবী] পৃথিবী ও প্রাণী জগতের যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং মূসাকে প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিযাও সে প্রত্যক্ষ করেছে । ফির'আউনকে বুঝাবার জন্য মূসা আলাইহিসসালাম যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে একের পর এক যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছিল সেগুলোও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে । কিন্তু সেগুলোর প্রতি সে মিথ্যারোপ করেছিল । সে তা করেছিল সম্পূর্ণরূপে গোঁড়ামী ও অহংকারবশত [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল । সুতরাং দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!" [সূরা আন-নামল: ১৪]

(২) জাদু বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লাঠি ও সাদা হাতকে । সূরা আল-আ'রাফ ও সূরা আশ-শু'আরায় এসেছে যে, মূসা প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রকাশ্য দরবারে একথা পেশ করেছিলেন । এ মু'জিযা দেখে ফির'আউন যেরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তা কেবলমাত্র তার এ একটি বাক্য থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, "তোমার জাদুর জোরে তুমি আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দিতে চাও ।"এসব

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৮. 'তাহলে আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে উপস্থিত করব এর অনুরূপ জাদু, কাজেই আমাদের ও তোমার মধ্যে স্থির কর এক নির্দিষ্ট সময় এক মধ্যবর্তী স্থানে, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৫৯. মূসা বললেন, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হলো উৎসবের দিন এবং যাতে সকালেই জনগণকে সমবেত করা হয়[১]।'

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾

৬০. অতঃপর ফির'আউন প্রস্থান করে তার যাবতীয় কৌশলসমূহ একত্র করল[২], তারপর সে আসল।

মু'জিযা নয়, জাদু এবং আমার রাজ্যের প্রত্যেক জাদুকরই এভাবে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে। সুতরাং তুমি যা দেখাচ্ছ তা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। [ইবন কাসীর]

(১) ফির'আউনের উদ্দেশ্য ছিল, একবার জাদুকরদের লাঠি ও দড়িদড়ার সাহায্যে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেই তাহলে মূসার মু'জিযার যে প্রভাব লোকদের উপর পড়েছে তা তিরোহিত হয়ে যাবে। মূসাও মনেপ্রাণে এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ জন্য কোন পৃথক দিন ও স্থান নির্ধারণ করার দরকার নেই। উৎসবের দিন কাছেই এসে গেছে। সারা দেশের লোক এদিন রাজধানীতে চলে আসবে। সেদিন যেখানে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই ময়দানেই এই প্রতিযোগিতা হবে। সমগ্র জাতিই এ প্রতিযোগিতা দেখবে। আর সময়টাও এমন হতে হবে যখন দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে কারো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কোন অবকাশই না থাকে।

(২) ফির'আউন ও তার সভাসদদের দৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। সারা দেশে লোক পাঠানো হয়। যেখানে যে অভিজ্ঞ-পারদর্শী জাদুকর পাওয়া যায় তাকেই সংগে করে নিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। এভাবে জনগণকে হাযির করার জন্যও বিশেষভাবে প্রেরণা দান করা হয়। এভাবে বেশী বেশী লোক একত্র হয়ে যাবে, তারা স্বচক্ষে জাদুর তেলেসমাতি দেখে মূসার লাঠির ভয় ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে।

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾

৬১. মূসা তাদেরকে বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। আর যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে[১]।'

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾

৬২. তখন তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে বিতর্ক করল[২] এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল।

قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা বলল, 'এ দুজন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে[৩] এবং

---

(১) মু'জিযা দ্বারা জাদুর মোকাবেলা করার পূর্বে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জাদুকরদের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না। অর্থাৎ তোমরা জাদু দিয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করেছ বলে দাবী করবে অথচ তোমরা সৃষ্টি করতে পার না। এভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করবে। [ইবন কাসীর] অথবা মূসা আলাইহিস সালাম এখানেও দ্বীনের দাওয়াত দিতে ছাড়েননি। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে তাঁর সাথে ফির'আউন অথবা অন্য কাউকে শরীক করো না। আর মু'জিযাগুলোকে জাদু বলো না। [কুরতুবী] এরূপ করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ, এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই তাদের কেউ কেউ বললঃ এদের মোকাবেলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। [ইবন কাসীর]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, এরা দু'জন বড় জাদুকর। জাদুর সাহায্যে তোমাদের রাজ্য অধিকার করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। সুতরাং সেটার মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ কর। [দেখুন, ইবন কাসীর]

তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করতে[১]।

৬৪. 'অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল (জাদুক্রিয়া) জোগাড় কর, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। আর আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফল হবে[২]।'

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾

৬৫. তারা বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর নতুবা আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই[৩]।'

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾

৬৬. মূসা বললেন, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' অতঃপর তাদের জাদু-প্রভাবে হঠাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে[৪]।

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

---

(১) অর্থাৎ এরা জাদুকর। তারা সমস্ত জাদুকরদের পরাজিত করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়। তারা তোমাদের কওমের সর্দার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবেলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে এক যোগে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, এরা দু'জন তোমাদের মধ্যকার ভালো লোক যাদেরকে তোমরা কাজে খাটাতে পার এমন লোক অর্থাৎ বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে চলে যেতে চায়। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এদের মোকাবিলায় সংযুক্ত মোর্চা গঠন করো। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করল। [ইবন কাসীর]

(৩) জাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জবাবে বললেনঃ بَلْ أَلْقُوا অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। জাদুকররা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যতঃ সাপ হয়ে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করতে লাগল। [ইবন কাসীর]

(৪) এ থেকে জানা যায় যে, ফির'আউনী জাদুকরদের জাদু ছিল এক প্রকার নযরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই

৬৭. তখন মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলেন[১]।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝٦٧

৬৮. আমরা বললাম, 'ভয় করবেন না, আপনিই উপরে থাকবেন।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۝٦٨

৬৯. 'আর আপনার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করুন, এটা তারা যা করেছে তা খেয়ে ফেলবে[২]। তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।'

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝٦٩

৭০. অতঃপর জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হল[৩], তারা বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার রব-এর প্রতি ঈমান আনলাম।'

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۝٧٠

নযরবন্দীর কারণে সাপরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরূপই হয়ে থাকে। [ইবন কাসীর]

(১) মনে হচ্ছে, যখনই মূসার মুখ থেকে "নিক্ষেপ করো" শব্দ বের হয়েছে তখনই জাদুকররা অকস্মাৎ নিজেদের লাঠিসোটা ও দড়িদড়াগুলো তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে দিয়েছে এবং হঠাৎই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিলবিল করতে করতে তাঁর দিকে দৌড়ে চলে আসছে। [ইবন কাসীর] এ দৃশ্য দেখে মূসা আলাইহিসসালাম তাৎক্ষণিকভাবে এ আশংকা করলেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। [ইবন কাসীর]

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, আপনার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করুন। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তার লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, এ কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং নিঃসন্দেহে এটা মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। এ অবস্থায়ই তারা ঘোষণা করলঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনলাম। [ইবন কাসীর]

৭১. ফির'আউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে! সে তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে[১]। কাজেই আমি তো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটবই[২] এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই[৩] আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۭ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۡ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ۝

(১) সূরা আল-আ'রাফে বলা হয়েছেঃ "এটি একটি ষড়যন্ত্র, তোমরা শহরে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে লোকদেরকে এখান থেকে হটিয়ে দেবার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো।" এখানে এ উক্তিটির বিস্তারিত বর্ণনা আবার এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে শুধু পারস্পরিক যোগসাজশ আছে তাই নয় বরং মনে হচ্ছে এ মূসা তোমাদের দলের গুরু। তোমরা মু'জিযার কাছে পরাজিত হওনি বরং নিজেদের গুরুর জাদুর পাতানো খেলার কাছে পরাজিত হয়েছো। বুঝা যাচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে এ মর্মে পরামর্শ করে এসেছো যে, নিজেদের গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং একে তার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ ফির'আউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবতঃ ফির'আউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটা নমুনা হয়ে যায়। তাই ফির'আউন এই ব্যবস্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে সেই সর্বপ্রথম এটা প্রচলন করেছে। [ইবন কাসীর]

(৩) শূলিবিদ্ধ করার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপঃ একটি লম্বা কড়িকাঠ মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো। অথবা পুরাতন গাছের গুড়ি একাজে ব্যবহৃত হতো। এর মাথার উপর একটি তখতা আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেয়া হতো। অপরাধীকে উপরে উঠিয়ে তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে তখতার গায়ে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হতো। এভাবে অপরাধী তখতার সাথে ঝুলতে থাকতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতো। লোকদের শিক্ষালাভের জন্য শূলিদণ্ডপ্রাপ্তকে এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো। ফির'আউনও তাই বলছিল যে, হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে। মুফাসসিরগণ বলেন, এ জন্যই فِي শব্দ ব্যবহার করেছে। কারণ, فِي দ্বারা স্থায়িত্ব বোঝায়। [ফাতহুল কাদীর]

মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী[১] ।'

৭২. তারা বলল, 'আমাদের কাছে যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। কাজেই তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবার নিতে পার। তুমি তো শুধু এ দুনিয়ার জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার[২] ।'

قَالُوا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۖ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৭৩. 'আমরা নিশ্চয় আমাদের রব-এর প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

(১) অর্থাৎ মূসা বেশী শাস্তি দিতে পারে নাকি আমি বেশী শাস্তি দিতে পারি। এখানে মূসাকে শাস্তিদাতা হিসেবে উল্লেখ করা এক ধরনের প্রহসন। মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে শাস্তি দান কেন করবেন? অথবা মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে কুফরি ও শির্কের উপর থাকলে যে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলেছিলেন এটাকে নিয়েই সে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করছিল। অথবা এখানে মূসা বলে মূসার রব বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) জাদুকররা ফির'আউনী কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হল না। তারা বললঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মু'জিযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। ﴿فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ﴾ এখন তোমার যা খুশী, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজার ইচ্ছা দাও। ﴿اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্‌র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

করেছ তা[1]। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।'

৭৪. যে তার রব-এর কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না[2]।

إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾

৭৫. আর যারা তাঁর কাছে সৎকর্ম করে মুমিন অবস্থায় আসবে, তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা।

وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা তাদেরই পুরস্কার যারা পরিশুদ্ধ হয়।

جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

চতুর্থ রুকূ'

৭৭. আর আমরা অবশ্যই মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম এ মর্মে যে, আমার

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى

(১) জাদুকররা এখন ফির'আউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ফির'আউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা সবার জন্য অথবা কিছু লোকের জন্য বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। সম্ভবত: তারাই এখানে তার উপর দোষ দিচ্ছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। পুরোপুরি মৃত্যু হবে না। যার ফলে তার কষ্ট ও বিপদের সমাপ্তি সূচিত হবে না। আবার জীবনকে মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দেবার মতো জীবনের কোন আনন্দও লাভ করবে না। জীবনের প্রতি বিরূপ হবে কিন্তু মৃত্যু লাভ করবে না। মরতে চাইবে কিন্তু মরতে পারবে না। কুরআন মজীদে জাহান্নামের আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এ অবস্থাটি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ। এর কল্পনায়ও হৃদয় মন কেঁপে উঠে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আর যারা জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে জাহান্নামে যাবে তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না।' [মুসলিম: ১৮৫]

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى

বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হন সুতরাং আপনি তাদের জন্য সাগরের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথের ব্যবস্থা করুন, পিছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা করবেন না এবং ভয়ও করবেন না[১]।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

৭৮. অতঃপর ফির'আউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পিছনে ছুটল, তারপর সাগর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল[২]।

---

(১) এ সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। মূসা সবাইকে নিয়ে লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। ফির'আউন একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঠিক এমন সময় পৌঁছে গেলো যখন এ কাফেলা সবেমাত্র সাগরের তীরেই উপস্থিত হয়েছিল। মুহাজিরদের কাফেলা ফির'আউনের সেনা দল ও সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। [ইবন কাসীর] ঠিক এমনি সময় আল্লাহ মূসাকে হুকুম দিলেন "সমুদ্রের উপর আপনার লাঠি দ্বারা আঘাত করুন।" "তখনই সাগর ফেটে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা একটি বড় পর্বত শৃংগের মতো দাঁড়িয়ে গেলো।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ৬৩] সহীহ হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহূদীরা মহররমের দশ তারিখ সাওম পালন করছে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা বললো, এ দিন মূসা ফির'আউনের উপর জয় লাভ করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমরা তাদের চেয়েও মূসার বেশী নিকটের সুতরাং তোমরাও সাওম পালন করো।' [বুখারীঃ ৪৭৩৭]

(২) এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্র তাকে ও তার সেনাদেরকে ডুবিয়ে মারলো। অন্যত্র বলা হয়েছে, মুহাজিরদের সাগর অতিক্রম করার পর পরই ফির'আউন তার সৈন্য সামন্ত সহ সমুদ্রের বুকে তৈরী হওয়া এ পথে নেমে পড়লো। [সূরা আশ-শু'আরাঃ ৬৩-৬৪] সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অন্য তীর থেকে ফির'আউন ও তার সেনাদলকে ডুবে যেতে দেখছিল।[৫০] অন্যদিকে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, ডুবে যাবার সময় ফির'আউন চিৎকার করে উঠলোঃ "আমি মেনে নিয়েছি যে আর কোন ইলাহ নেই সেই ইলাহ ছাড়া যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমিও মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।"[৯০] কিন্তু এ শেষ মুহূর্তের ঈমান গৃহীত হয়নি এবং জবাব দেয়া হলোঃ "এখন! আর ইতিপূর্বে এমন অবস্থা ছিল যে, নাফরমানীতেই ডুবে ছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেই চলছিলে। বেশ, আজ আমি তোমার লাশটাকে রক্ষা করছি, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।" [৯১-৯২]

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى

৭৯. আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি ।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমরা তো তোমাদেরকে শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের ডান পাশে[১] এবং তোমাদের উপর মান্না ও সাল্‌ওয়া নাযিল করেছিলাম[২],

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى

৮১. তোমাদেরকে আমরা যা রিযিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে সে তো ধ্বংস হয়ে যায় ।

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

৮২. আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারপর সৎপথে

---

(১) অর্থাৎ ফির'আউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এবং তার মধ্যস্থতায় বনী-ইস্রাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের ডান পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেন। এখানেই মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তাকে এখানেই তাওরাত দেয়া হয়। [ইবন কাসীর]

(২) এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী-ইস্রাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আয় নানা রকম নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এইসব নেয়ামতের অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্যে দেয়া হত। [কুরতুবী]

অবিচল থাকে[১]।

৮৩. হে মূসা! আপনার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে আপনাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করল কে?

وَمَآ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَٰمُوسَىٰ ۝٨٣

৮৪. তিনি বললেন, 'তারা তো আমার পিছনেই আছে[২]। আর হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এ জন্য।'

قَالَ هُمۡ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلۡتُ إِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضَىٰ ۝٨٤

৮৫. তিনি বললেন, 'আমরা তো আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি আপনার চলে আসার পর। আর সামেরী[৩]

قَالَ فَإِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۢ بَعۡدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۝٨٥

(১) অর্থাৎ মাগফিরাতের জন্য রয়েছে চারটি শর্ত। এক, তাওবা। অর্থাৎ বিদ্রোহ, নাফরমানী অথবা শির্ক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা। দুই, ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল এবং কিতাব ও আখেরাতকে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া। তিনি, সৎকাজ। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে ভালো কাজ করা। চার, সত্যপথাশ্রয়ী হওয়া। অর্থাৎ সত্য সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং তারপর ভুল পথে না যাওয়া। ইবন আব্বাস বলেন, সন্দেহ না করা। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। কাতাদাহ বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর থাকা। সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, এর অর্থ সে জানল যে, এগুলোর সওয়াব আছে। [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে আছে। এখানে 'তারা আমার পিছনে' বলে কারও কারও মতে বুঝানো হয়েছে যে, তারা আমার পিছনেই আমাকে অনুসরণ করে আসছে। অপর কারও কারও মতে, তারা আমার পিছনে আমার অপেক্ষায় আছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে কাওমের সত্তর জন লোকের কথা বলা হচ্ছে যাদেরকে মূসা আলাইহিস সালাম সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পর্বতের কাছাকাছি এসে তিনি তাদেরকে রেখে আল্লাহ্‌র কথা শুনার আগ্রহে তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিলেন। [বাগভী] অথবা আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি; কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। আপনাকে খুশী করার জন্যই আমি তাড়াতাড়ি এসেছি।

(৩) কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, সামেরী কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং সে সময় সামেরী নামে এক গোত্র ছিল এবং তাদের এক বিশেষ ব্যক্তি ছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎস পূজার প্রচলনকারী এ সামেরী। সে তাদেরকে গো বৎস পূজার আহ্বান জানিয়েছিল এবং শির্কে নিপতিত করেছিল। [ফাতহুল কাদীর]

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।'

৮৬. অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে[১]। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি[২]? তবে কি প্রতিশ্রুতি কাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছে[৩]? না তোমরা

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًاۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًاۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

(১) এ বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, নিজ সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে মূসা আলাইহিসসালাম আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আগ্রহের আতিশয্যে আগে চলে গিয়েছিলেন। তূরের ডান পাশে যেখানকার ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের সাথে করা হয়েছিল সেখানে তখনো কাফেলা পৌঁছুতে পারেনি। ততক্ষণ মূসা একাই রওয়ানা হয়ে গিয়ে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিলেন। এ সময় আল্লাহ ও বান্দার সাথে যা ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা আল-আ'রাফের ১৪৩-১৪৫ নং আয়াতে। মূসার আল্লাহর সাক্ষাতের আবেদন জানানো এবং আল্লাহর একথা বলা যে, আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না তারপর আল্লাহর একটি পাহাড়ের উপর সামান্য তাজাল্লি নিক্ষেপ করে তাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়া এবং মূসার বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া, তারপর পাথরের তখতিতে লেখা বিধান লাভ করা- এসব সেই সময়েরই ঘটনা। এখানে এ ঘটনার শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার সাথে সম্পর্কিত অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) এর দু'টি অর্থ হতে পারেঃ এক, "ভালো ওয়াদা করেননি"ও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, তোমাদেরকে শরী'আত ও আনুগত্যনামা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের মতে তা কি কোন কল্যাণ ও হিতসাধনের ওয়াদা ছিল না?। মূলতঃ এই ওয়াদার জন্যই তিনি বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলাবাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী-ইসরাঈলের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল এসে যেত। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে যেসব কল্যাণের ওয়াদা করেছেন তার সবই তোমরা লাভ করতে থেকেছো। তোমাদের নিরাপদে মিসর থেকে বের করেছেন। দাসত্ব মুক্ত করেছেন। তোমাদের শত্রুকে তছনছ করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য তাই মরুময় ও পার্বত্য অঞ্চলে ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সমস্ত ভালো ওয়াদা কি পূর্ণ হয়নি? [ইবন কাসীর]

(৩) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তোমাদের নিকট কি দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মাত্র যে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, এরপর

চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রব-এর ক্রোধ[১], যে কারণে তোমরা আমাকে দেয়া অঙ্গীকার[২] ভঙ্গ করলে?'

৮৭. তারা বলল, 'আমরা আপনাকে দেয়া অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করিনি[৩]; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা। তাই আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করি[৪], অনুরূপভাবে সামিরীও (সেখানে কিছু মাটি) নিক্ষেপ করে।

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

কি অনেক বেশী সময় অতীত হয়ে গেছে যে, তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে? তোমাদের বিপদের দিনগুলো কি সুদীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গেছে যে, তোমরা পাগলের মতো বিপথে ছুটে চলেছো? দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "ওয়াদা পূর্ণ হতে কি অনেক বেশী সময় লাগে যে, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছো?" অর্থাৎ তাওরাত প্রদানের মাধ্যমে পথনির্দেশনা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে তো কোন প্রকার বিলম্ব হয়নি, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য ওজর বা বাহানা হিসেবে দাঁড় করাতে পারো। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই; এখন এ ছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এমন কাজ করতে চেয়েছে যা তোমাদের রবের ক্রোধের উদ্রেক করবে? [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ ওয়াদা হচ্ছেঃ তিনি তূর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। অথবা তাদের কাছ থেকে তিনি ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার পিছনে পিছনে আস, কিন্তু তারা না এসে সেখানেই অবস্থান করে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলাবাহুল্য, তাদের এই দাবী সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। [দেখুন, ইবন কাসীর] সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। তবে এটা সত্য যে, সামেরী তাদের গো-বাছুর পূজার কারণ ছিল।

(৪) যারা সামেরীর ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল এটি ছিল তাদের ওজর। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা অলংকার ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। এরপর যা ঘটেছে তা আসলে এমন ব্যাপারই ছিল যে, সেগুলো দেখে জাতির পথভ্রষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, এটাই ইলাহ। [ইবন কাসীর]

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾

৮৮. 'অতঃপর সে তাদের জন্য গড়লো এক বাছুর, এক অবয়ব, যা হাম্বা রব করত।' তখন তারা বলল, এ তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, অতঃপর সে (মূসা) ভুলে গেছে।[১]

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে কি তারা দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না[২]?

---

(১) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. মূসা নিজেই তার ইলাহকে ভুলে দূরে খুঁজতে চলে গেছে । দুই. মূসা ভুলে গেছে তোমাদেরকে বলতে যে, এটাই তার ইলাহ। তিন. সামেরী ভুলে গেল যে সে এক সময় ইসলামে ছিল, অতঃপর সে ইসলাম ছেড়ে শির্কে প্রবেশ করল। [ইবন কাসীর]

(২) এ বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের এই কথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে ইলাহ্ হওয়ার কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জবাব দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে ইলাহ্ মেনে নেয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি? ইবন আব্বাস বলেন, এর শব্দ তো আর কিছুই নয় যে, বাতাস এর পিছন দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বের হয়। তাতেই আওয়াজ বের হতো। এ মূর্খরা যে ওজর পেশ করেছে তা এতই ঠুনকো ছিল যে তা যে কোন লোকই বুঝতে পারবে। তারা কিবতী কাওমের স্বর্ণালঙ্কার থেকে বাঁচতে চেয়ে সেগুলোকে নিক্ষেপ করল অথচ তারা গো বৎসের পূজা করল। তারা সামান্য জিনিস থেকে বাঁচতে চাইল অথচ বিরাট অপরাধ করল। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবন উমর এর কাছে এক লোক এসে বলল, মশার রক্তের বিধান কি? ইবন উমর বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়? লোকটি বলল, ইরাকের অধিবাসী। তখন ইবন ওমর বললেন, দেখ ইরাকবাসীদের প্রতি! তারা আল্লাহ্র রাসূলের মেয়ের ছেলেকে হত্যা করেছে, আর আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। [বুখারী: ৫৯৯৪]
এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিনি রব ও ইলাহ হবেন তাঁকে অবশ্যই কথা বলার মত গুণবিশিষ্ট হতে হবে। যার এ গুণ নেই তিনি ইলাহ হওয়ার উপযুক্ত নন। তাই আল্লাহ্ তা'আলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কথাবলার গুণে গুণান্বিত বলে বিশ্বাস করে। এটা এ গুণের স্বপক্ষে একটা দলীল। এটা ছাড়াও কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বহু দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে।

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ۝٩٠

৯০. অবশ্য হারূন তাদেরকে আগেই বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দ্বারা তো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর তোমাদের রব তো দয়াময়; কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।'

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۝٩١

৯১. তারা বলেছিল, 'আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না।'

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۝٩٢

৯২. মূসা বললেন, 'হে হারূন! আপনি যখন দেখলেন তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে আপনাকে বাধা দিল ---

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۝٩٣

৯৩. 'আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি আপনি আমার আদেশ অমান্য করলেন[১]?'

---

(১) হুকুম বলতে এখানে পাহাড়ে যাবার সময় এবং নিজের জায়গায় হারূনকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার পূর্ব মুহূর্তে মূসা তাকে যে হুকুম দিয়েছিলেন সে কথাই বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আর মূসা (যাওয়ার সময়) নিজের ভাই, হারুনকে বললেন, আপনি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করুন এবং সংশোধন করবেন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না।" [আল-আ'রাফঃ ১৪২] আর অনুসরণের অর্থ সম্পর্কেও দু'টি মত রয়েছে। এক, এখানে অনুসরণের অর্থ, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। দুই, কোন কোন মুফাস্সির অনুসরণের এরূপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন আপনি তাদের মোকাবেলা করলেন না কেন? কেননা, আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম। আপনারও এরূপ করা উচিত ছিল। [ফাতহুল কাদীর]

৯৪. হারূন বললেন, 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরবে না[১]। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, 'আপনি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন ও আমার কথা শুনায় যত্নবান হননি।'

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

৯৫. মূসা বললেন, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৬. সে বলল, 'আমি যা দেখেছিলাম তারা তা দেখেনি, তারপর আমি সে দূতের পদচিহ্ন হতে একমুঠি মাটি নিয়েছিলাম তারপর আমি তা

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

(১) হারূন 'আলাইহিস্ সালাম এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারূন 'আলাইহিস্ সালাম এরূপ ওযর বর্ণনা করলেনঃ ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ [আল-আ'রাফঃ ১৫০] অর্থাৎ বনী-ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা, অন্যদের মোকাবেলায় আমার সঙ্গী-সাথী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এ সূরায় আরো বলা হয়েছে যে, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে গো-বৎস পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ 'হে আমার কওম! তোমরা ফেৎনায় নিপতিত, অবশ্যই তোমাদের একমাত্র মা'বুদ হল রহমান। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা শোন।' কিন্তু তারা তার কথা শুনল না; বরং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। অন্যত্র হারূন 'আলাইহিস্ সালাম তার ওযরগুলো বর্ণনা করে বলেনঃ আমি আশংকা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৪২] -বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। কারণ, এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে।

নিক্ষেপ করেছিলাম[১]; আর আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এরূপ করা।'

৯৭. মূসা বললেন, 'যাও; তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে, 'আমি অস্পৃশ্য'[২] এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট সময়, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার সে ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা সেটাকে জ্বালিয়ে দেবই, তারপর সেটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই।'

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلٰى إِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো শুধু আল্লাহ্ই যিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, সবকিছু তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

---

(১) অর্থাৎ "আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখেনি" এখানে জিবরাঈল ফিরিশ্‌তাকে বোঝানো হয়েছে। তাকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক বর্ণনা এই যে, যেদিন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মু'জিযায় নদীতে রাস্তা হয়ে যায়, বনী-ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফির'আউনী সৈন্য বাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছেঃ সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। সুতরাং সে সে সমস্ত অলঙ্কারের মধ্যে এ মাটি তাতে নিক্ষেপ করে। ফলে তাতে শব্দ হতে থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারো গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। [দেখুন, কুরতুবী]

৯৯. পূর্বে যা ঘটেছে তার কিছু সংবাদ আমরা এভাবে আপনার নিকট বর্ণনা করি। আর আমরা আমাদের নিকট হতে আপনাকে দান করেছি যিক্‌র[১]।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

১০০. এটা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে[২]।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

১০১. সেটাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য এ বোঝা হবে কত মন্দ!

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

১০২. যেদিন শিংগায়[৩] ফুঁক দেয়া হবে

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ

(১) অর্থাৎ যেভাবে আপনার কাছে মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করলাম এবং তার সাথে ফির'আউন ও তার দলবলের ঘটনা বিবৃত করলাম এভাবেই আমরা পূর্ববর্তী কালের সংবাদ আপনার কাছে কোন রূপ বৃদ্ধি বা কমতি না করে বর্ণনা করব। আর আপনার কাছে তো যিক্‌র বা কুরআন তো আমাদের পক্ষ থেকেই প্রদান করা হয়েছে। এটা এমন কিতাব যার সামনে বা পিছনে কোথাও বাতিলের কোন হাত নেই। হিকমতওয়ালা ও প্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এ কুরআনের মত কোন কিতাব পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। [ইবন কাসীর] এখানে কুরআনকে যিক্‌র নাম দেয়া হয়েছে। কারণ এতে কর্তব্যকর্মসমূহ স্মরণিকা ও শিক্ষণীয়রূপে তুলে ধরা হয়েছে। অথবা যিকর বলতে এখানে সম্মান বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মান।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৪৪] [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। তবে আয়াতে বর্ণিত কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে; যথা- কুরআনের উপর মিথ্যারোপ করা, এর আদেশ নিষেধের আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। কুরআন ছাড়া অন্য কিতাবে হেদায়াতের তালাশ করা। সুতরাং যে তা করবে আল্লাহ্‌ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন, তাকে জাহান্নামের পথে ধাবিত করবেন। [ইবন কাসীর]

(৩) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলঃ صور (ছূর) কি? তিনি বললেনঃ শিঙ্গা। এতে ফুৎকার দেয়া হবে। [আবু দাউদঃ ৪৭৪২, তিরমিযিঃ ৩২৪৩, ৩২৪৪,

زُرْقًا

এবং যেদিন আমরা অপরাধীদেরকে নীলচক্ষু তথা দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব[১]।

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

১০৩. সেদিন তারা চুপিসারে পরস্পর বলাবলি করবে, 'তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।'

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

১০৪. আমরা ভালভাবেই জানি তারা কি বলবে, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথে ছিল (বিবেকবান ব্যক্তি) সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'

ষষ্ঠ রুকূ'

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا

১০৫. আর তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

১০৬. 'তারপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে,

আহমাদঃ ২/৩১২, সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৭০১২, হাকেমঃ ২/৪৩৬, ৫০৬] অর্থ এই যে, صور শিঙ্গা-এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফিরিশ্‌তা ফুঁক দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে এর কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছেঃ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'ইস্রাফিল শিঙ্গা মুখে পুরে আছেন, তার কপাল তীক্ষ্ণভাবে উৎকর্ণ করে নীচু করে রেখেছে, অপেক্ষা করছে, কখন তাকে ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। [তিরমিযিঃ ২৪৩১, আহমাদঃ ৩/৭, ৭৩, হাকেমঃ ৪/৫৫৯] এর থেকে বোঝা যায় যে, এটা এক প্রকার শিঙ্গার মত, এর একাংশ মুখে পুরা যায়। তবে এর প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(১) অর্থাৎ ভয়ে ও আতংকে তাদের রক্ত শুকিয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যেন তাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত নেই। অথবা শব্দটি "আয্‌রাকুল আইন" বা নীল চক্ষুওয়ালার অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন অত্যাধিক ভয়ে তাদের চোখের মণি স্থির হয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'যাতে আপনি বাঁকা ও উঁচু দেখবেন না[১] ।'

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না। আর দয়াময়ের সামনে সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; কাজেই মৃদু ধ্বনি[২] ছাড়া আপনি কিছুই শুনবেন না।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না[৩] ।

---

(১) এ পাহাড়গুলো ভেঙ্গে বালুকারাশির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া হবে এবং সেগুলো ধূলোমাটির মতো সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে সমগ্র দুনিয়াকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেয়া হবে যেখানে কোন উঁচু নীচু, ঢালু বা অসমতল জায়গা থাকবে না। তার অবস্থা এমন একটি পরিষ্কার বিছানার মতো হবে যাতে সামান্যতমও খাঁজ বা ভাঁজ থাকবে না। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) মূলে 'হামস' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি পায়ের আওয়াজ, চুপিচুপি কথা বলার আওয়াজ, আরো এ ধরনের হালকা আওয়াজের জন্য বলা হয়। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সেখানে চলাচলকারীদের পায়ের আওয়াজ, হাল্কা শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ শোনা যাবে না। [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতের অর্থ "সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তারকথা শুনতে পছন্দ করেন"। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশ করার জন্য স্বতপ্রণোদিত হয়ে মুখ খোলা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটি করারও কারো সাহস হবে না। এ দু'টি কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছেঃ "কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে?" [সূরা আল বাকারাহঃ ২৫৫] আরো বলা হয়েছেঃ "সেদিন যখন রূহ ও ফেরেশতারা সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, একটুও কথা বলবে না, শুধুমাত্র সে - ই বলতে পারবে যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যে ন্যায়সংগত কথা বলবে।" [সূরা আন-নাবাঃ ৩৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "আর তারা কারোর জন্য সুপারিশ করে না সেই ব্যক্তির ছাড়া যার পক্ষে সুপারিশ শোনার জন্য (রহমান) রাজী হবেন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।" [সূরা

১১০. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১১. আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত-সর্বসত্তার ধারকের কাছে সবাই হবে নিম্নমুখী এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে যুলুম বহন করবে[১]।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১২. আর যে মুমিন হয়ে সৎকাজ করে, তার কোন আশংকা নেই অবিচারের এবং অন্য কোন ক্ষতির।

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১৩. আর এভাবেই আমরা কুরআনকে নাযিল করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা এটা তাদের মধ্যে স্মরণিকার উৎপত্তি করে।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৪. সুতরাং প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ অতি

فَتَعَٰلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن

আল-আম্বিয়াঃ ২৮] আরো বলা হয়েছেঃ "কত ফেরেশতা আকাশে আছে, তাদের সুপারিশ কোনই কাজে লাগবে না, তবে একমাত্র তখন যখন আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পর সুপারিশ করা হবে এবং এমন ব্যক্তির পক্ষে করা হবে যার জন্য তিনি সুপারিশ শুনতে চান এবং পছন্দ করেন।" [সূরা আন-নাজ্‌মঃ ২৬]

(১) যে কেউ যুলুম নিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে তার মত হতভাগা আর কেউ নেই। কেননা, সে প্রত্যেক মাজলুমকে তার হক বুঝিয়ে দিতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তখন তার উপর অপরের গোনাহের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক; কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন প্রগাঢ় অন্ধকার হিসেবে দেখা দিবে' [মুসলিম:২৫৭৮] এ যুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় যুলুম হলো, শির্ক। কারণ এটি আল্লাহর সাথে কৃত সবচেয়ে বড় গুনাহ। যে কেউ শির্কের ভার নিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে তার আর বাঁচার কোন পথ রইলো না। মহান আল্লাহ্ বলেন: "অবশ্যই শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম" [সূরা লুকমান: ১৩]

قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾

মহান, সর্বোচ্চ স্বত্বা[১]। আর আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন।'

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿۱۱۵﴾

১১৫. আর আমরা তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন; আর আমরা তার মধ্যে সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি[২]।

---

(১) মহান আল্লাহ্ বলছেন, যখন পুনরুত্থানের দিন, ভাল-মন্দ প্রতিফলের দিন অবশ্যই ঘটবে, তখন আমরা এ কুরআন নাযিল করেছি, যাতে এরা নিজেদের গাফলতি থেকে সজাগ হবে, ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে কিছুটা স্মরণ করবে এবং পথ ভুলে কোন পথে যাচ্ছে আর এই পথ ভুলে চলার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে এদের মনে বেশ কিছুটা অনুভূতি জাগবে। সুতরাং সেই মহান হক বাদশাহর জন্যই যাবতীয় মহত্ব। যিনি হক, যাঁর ওয়াদা হক, যাঁর সতর্কীকরণ হক, যাঁর রাসূলরা হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক। তার থেকে যা কিছু আসে সবই হক। তাঁর আদল ও ইনসাফ হচ্ছে যে, তিনি কাউকে সাবধান না করে রাসূল না পাঠিয়ে শাস্তি দেন না। যাতে করে তিনি মানুষের ওযর আপত্তির উৎস বন্ধ করে দিতে পারেন। ফলে তাদের কোন সন্দেহ বা প্রমাণ অবশিষ্ট না থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, আপনার অনেক পূর্বে আদম('আলাইহিস্ সালাম)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করবেন না, এমনকি এর নিকটেও যাবেন না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নেয়ামতরাজি আপনাদের জন্য। সেগুলো ব্যবহার করুন। আরো বলেছিলাম যে, ইবলীস আপনাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে আপনাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম 'আলাইহিস্ সালাম এসব কথা ভুলে গেলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যাপারে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন- তন্মধ্যে প্রথম শব্দটি হলো: فَنَسِيَ এ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়ঃ (ক) ত্যাগ করা, অর্থাৎ যে কাজের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা ত্যাগ করা। আর এ অর্থই এখানে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ করেছেন। (খ) কারো কারো মতে এখানে فَنَسِيَ শব্দ দ্বারা এখানে ভুলে যাওয়া অর্থ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তা তিনি ভুলে গেলেন। আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভুলের কারণেও পাকড়াও করা হত। ভুলের কারণে ধরপাকড় না করা শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর

সপ্তম রুকূ'

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

১১৬. আর স্মরণ করুন[১], যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বললাম, 'তোমরা আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর,' তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল; সে অমান্য করল।

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾

১১৭. অতঃপর আমরা বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এ আপনার ও আপনার স্ত্রীর শত্রু, কাজেই সে যেন কিছুতেই আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়[২], দিলে আপনারা দুঃখ-

---

বৈশিষ্ট্য। (গ) কেউ কেউ শব্দটিকে نُسِّيَ পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে শয়তান তাকে প্ররোচনার মাধ্যমে ভুলিয়ে দিলেন। [ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে ব্যবহৃত দ্বিতীয় শব্দটি হল- عزم এর অর্থ দৃঢ় অঙ্গীকার। কোন কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। আদম 'আলাইহিস্ সালাম যদিও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তার দৃঢ়তায় চ্যুতি ঘটেছিল। عزم শব্দের আরেক অর্থ হল صبر বা ধৈর্য্য ও প্রতিষ্ঠিত থাকা। আদম 'আলাইহিস্ সালাম নিষিদ্ধ গাছ থেকে খাওয়ার সময় তার উপর অটল থাকেননি। [ফাতহুল কাদীর]

(১) এখান থেকে আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানব জাতির আদি শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোষাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফিরিশ্‌তাকে আদমের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস ফিরিশ্‌তাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফিরিশ্‌তারা সবাই সিজ্‌দা করল, কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বললঃ আমি অগ্নিসৃজিত

কষ্ট পাবেন[১]।

১১৮. 'নিশ্চয় আপনার জন্য এ ব্যবস্থা রইল যে, আপনি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবেন না, নগ্নও হবেন না;

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

১১৯. 'এবং সেখানে পিপাসার্ত হবেন না, আর রোদেও আক্রান্ত হবেন না[২]।'

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

আর সে মৃত্তিকাসৃজিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সিজ্‌দা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নেয়ামতের দরজা উম্মুক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হল যে, এটা থেকে আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা আল-বাকারাহ্‌ ও সূরা আল-আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বলেনঃ দেখুন, সিজ্‌দার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস আপনাদের শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে আপনাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। যদি তার প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করেন তাহলে এখানে থাকতে পারবেন না এবং আপনাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেসব ছিনিয়ে নেয়া হবে।

(১) অর্থাৎ শয়তান যেন আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, আপনারা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবেন। আপনাদেরকে খেটে আহার্য উপার্জন করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর] পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভবিশেষ এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিস্কৃত হলে এসব নেয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

(২) জান্নাত থেকে বের হবার পর মানুষকে যে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তার বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে। এ সময় জান্নাতের বড় বড়, পূর্ণাংগ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলো উল্লেখ করার পরিবর্তে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান এ চারটি মৌলিক নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু মানুষকে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল, 'হে আদম! আমি কি আপনাকে বলে দেব অনন্ত জীবনদায়িনী গাছের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা(১)?'

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

১২১. তারপর তারা উভয়ে সে গাছ থেকে খেল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগলেন। আর আদম তার রব-এর হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি পথভ্রান্ত হয়ে গেলেন(২)।

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰىٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

১২২. তারপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন(৩), অতঃপর তার তাওবা কবূল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

---

(১) অন্যত্র আমরা শয়তানের কথাবার্তার আরো যে বিস্তারিত বিবরণ পাই তা হচ্ছে এই যে, "আর সে বললো, তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছটি থেকে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত রেখেছেন, যাতে তোমরা দু'জন ফেরেশতা অথবা চিরঞ্জীব না হয়ে যাও।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ২০]

(২) غوى শব্দটির অনুবাদ ওপরে 'পথভ্রান্ত' করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ, তার জীবনটা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কারণ, দুনিয়াতে অবতরণ করার অর্থই হচ্ছে, জীবন দুর্বিষহ হওয়া। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ শয়তানের মতো আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত করেন নি। আনুগত্যের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যেখানে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে তাকে পড়ে থাকতে দেননি বরং উঠিয়ে আবার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন কারণ নিজেদের ভুলের অনুভূতি হবার সাথে সাথেই তারা বলে উঠেছিলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি এবং যদি আপনি আমাদের মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি করুণা না করেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ২৩]

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾

১২৩. তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়ে একসাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

১২৪. 'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত[১] এবং আমরা তাকে

(১) এখানে যিক্‌র-এর অর্থ কুরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও হতে পারে, যেমন- অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَّسُولًا বলা হয়েছে। [কুরতুবী] তবে অধিকাংশের নিকট এখানে কুরআন বোঝানো হয়েছে। সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কুরআনের বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, কুরআনের নির্দেশের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অন্যদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করে, তার পরিণাম এই যে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে। [ইবন কাসীর] কুরআনের ভাষ্যে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র কুরআন ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলতে বিমুখ হয়। কিন্তু কোথায় তাদের সে সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবন হবে তা নির্ধারণে বেশ কয়েকটি মত রয়েছেঃ

এক) তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে। যা তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদা-সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে। কেননা, সুখ-শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু প্রাচুর্যে নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

দুই) অনেক মুফাস্‌সিরের মতে এখানে সংকীর্ণ জীবন বলতে কবরের জীবনকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাদের কবর তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যাবে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে। এতে করে কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ﴿مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত ও

কিয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়[১] ।'

১২৫. সে বলবে, 'হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান ।

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

সেখানকার আযাব বোঝানো হয়েছে । [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৮১, নং- ৩৪৩৯, ইবনে হিব্বানঃ ৭/৩৮৮, ৩৮৯ নং- ৩১১৯] তাছাড়া বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে কবরের যিন্দেগীর বিভিন্ন শাস্তির যে বর্ণনা এসেছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ্, কুরআন ও রাসূলের প্রদর্শিত দ্বীন থেকে বিমুখ হবে, কবরে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'মুমিন তার কবরে সবুজ প্রশস্ত উদ্যানে অবস্থান করবে আর তার কবরকে ৭০ গজ প্রশস্ত করা হবে । পূর্নিমার চাঁদের আলোর মত তার কবরকে আলোকিত করা হবে । তোমরা কি জান আল্লাহ্‌র আয়াত (তাদের জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন) কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? তোমরা কি জানো সংকীর্ণ জীবন কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তা হল কবরে কাফেরের শাস্তি । যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি- তাকে ন্যস্ত করা হবে ৯৯টি বিষাক্ত তিন্নিন সাপের কাছে । তোমরা কি জান তিন্নিন কি? তিন্নিন হল ৯৯টি সাপ । প্রত্যেকটি সাপের রয়েছে ৭টি মাথা । যেগুলো দিয়ে সে কাফেরের শরীরে ছোবল মারতে থাকবে, কামড়াতে ও ছিঁড়তে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত । [ইবনে হিব্বানঃ ৩১২২, দারেমীঃ ২৭১১, আহমাদঃ ৩/৩৮, আবু ইয়া'লাঃ ৬৬৪৪, আব্‌দ ইবনে হুমাইদঃ ৯২৯, মাজমা'উয্-যাওয়ায়েদঃ ৩/৫৫]

(১) অর্থাৎ তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় হাশর করা হবে । এখানে অন্ধ অবস্থার কয়েকটি অর্থ হতে পারে- (এক) বাস্তবিকই সে অন্ধ হয়ে উঠবে । (দুই) সে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না । (তিন) সে তার পক্ষে পেশ করার মত কোন যুক্তি থেকে অন্ধ হয়ে যাবে । কোন প্রকার প্রমাণাদি পেশ করা থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তখন তার পরবর্তী আয়াতের অর্থ হবে- সে বলবেঃ হে আমার রব! আমাকে কেন আমার যাবতীয় যুক্তিহীন অবস্থায় হাশর করেছেন? আল্লাহ্ উত্তরে বলবেনঃ অনুরূপভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলো ত্যাগ করে ভুলে বসেছিলে, তাই আজকের দিনেও তোমাকে যুক্তি-প্রমাণহীন অবস্থায় অন্ধ করে ত্যাগ করা হবে, ভুলে যাওয়া হবে । কারণ এটা তো তোমারই কাজের যথোপযুক্ত ফল । [ইবন কাসীর]

১২৬. তিনি বলবেন, 'এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ছেড়ে দিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখা হবে(১)।'

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

১২৭. আর এভাবেই আমরা প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তার রব-এর নিদর্শনে ঈমান না আনে(২)। আর আখেরাতের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

১২৮. এটাও কি তাদেরকে(৩) সৎপথ দেখাল না যে, আমরা এদের আগে ধ্বংস করেছি বহু মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে?

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

---

(১) বিস্মৃত হওয়া ছাড়া نسيان শব্দের আরেক অর্থ আছে ছেড়ে রাখা। অর্থাৎ যেভাবে আমার হেদায়াতকে দুনিয়াতে ছেড়ে রেখেছিলে তেমনি আজ তোমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে রাখা হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আল্লাহ "যিকির" অর্থাৎ তাঁর কিতাব ও তাঁর প্রেরিত উপদেশমালা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের দুনিয়ায় যে "অতৃপ্ত জীবন" যাপন করানো হয় সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবেই যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর মিথ্যারোপ করে আমরা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিফল দিয়ে থাকি। "তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! আর আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মত তাদের কেউ নেই।" [সূরা আর-রা'দ:৩৪] [ইবন কাসীর]

(৩) সে সময় মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখা হয়েছিল এবং এখানে তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়াত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর? দুই. আল্লাহ্ কি তাদেরকে হেদায়াত দেননি বা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাননি? এ অর্থের উপর আরো প্রমাণ হল- কোন কোন কিরাআতে نَهْدِ পড়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

নিশ্চয় এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন[১]।

অষ্টম রুকূ'

১২৯. আর আপনার রব-এর পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটা সময় নির্ধারিত না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

১৩০. কাজেই তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন[২] এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে আপনার রব-এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, এবং দিনের প্রান্তসমূহেও[৩], যাতে

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

---

(১) অর্থাৎ ইতিহাসের এ ঘটনাবলী, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের এ পর্যবেক্ষণ, মানব জাতির এ অভিজ্ঞতায় তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৪৬] [ইবন কাসীর]

(২) মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল কারীম এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (এক) আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। (দুই) আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল হয়ে যান। ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ - বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ যেহেতু মহান আল্লাহ এখনই তাদেরকে ধ্বংস করতে চান না এবং তাদের জন্য একটি অবকাশ সময় নির্ধারিত করে ফেলেছেন, তাই তাঁর প্রদত্ত এ অবকাশ সময়ে তারা আপনার সাথে যে ধরনের আচরণই করুক না কেন আপনাকে অবশ্যি তা বরদাশ্‌ত করতে হবে এবং সবরের সাথে তাদের যাবতীয় তিক্ত ও কড়া কথা শুনেও নিজের সত্যবাণী প্রচার ও স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আপনি সালাত থেকে এ সবর, সহিষ্ণুতা ও সংযমের শক্তি লাভ করবেন। এ নির্ধারিত সময়গুলোতে আপনার প্রতিদিন নিয়মিত এ সালাত পড়া উচিত।

আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন[১]।

১৩১. আর আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না[২] সে সবের প্রতি,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا

"রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা" করা মানে হচ্ছে সালাত। যেমন সামনের দিকে আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ "নিজের পরিবার পরিজনকে সালাত পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নিয়মিত তা পালন করতে থাকুন।" সালাতের সময়গুলোর প্রতি এখানেও পরিষ্কার ইশারা করা হয়েছে। সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত। সূর্য অস্ত যাবার আগে আসরের সালাত। আর রাতের বেলা হচ্ছে এশা ও তাহাজ্জুদের সালাত। দিনের প্রান্তগুলো অবশ্যি তিনটিই হতে পারে। একটি প্রান্ত হচ্ছে প্রভাত, দ্বিতীয় প্রান্তটি সূর্য ঢলে পড়ার পর এবং তৃতীয় প্রান্তটি হচ্ছে সন্ধ্যা। কাজেই দিনের প্রান্তগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের সালাত হতে পারে। সহীহ্ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের রবকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবে যেমনিভাবে তোমরা এ (পূর্নিমার চাঁদ)কে দেখতে পাচ্ছ। দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না। সুতরাং তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের সালাতগুলো আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হতে মুক্ত হতে পার তবে তা কর; অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের প্রভূর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর) এ আয়াতটি বললেন। [বুখারীঃ ৫৭৩] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করবে সে জাহান্নামে যাবে না।' অর্থাৎ ফজর ও আসর। [মুসলিমঃ ৬৩৪] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তাসবীহ্ ও ইবাদাত এজন্যে করুন যাতে আপনার জন্য এমন কিছু অর্জিত হয়, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। মুমিনের সঠিক সন্তুষ্টি আসবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে জান্নাতবাসী! তারা বলবেঃ হাজির হে আমাদের প্রভূ, হাজির। তারপর তিনি বলবেনঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবেঃ কেন আমরা সন্তুষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, সৃষ্টি জগতের কাউকে তা দেননি। তারপর তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদেরকে তার থেকেও উত্তম কিছু দেব। তারা বলবেঃ এর থেকে উৎকৃষ্ট আর কিইবা আছে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের উপর এমনভাবে সন্তুষ্ট হব, যার পরে আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না। [বুখারীঃ ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসলিমঃ ২৮২৯]

(২) এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে

مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾

যা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রব-এর দেয়া রিযিকই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী ।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন ও তাতে অবিচল থাকুন[১], আমরা আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না; আমরাই আপনাকে রিযিক দেই[২]। আর শুভ পরিণাম

আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা যে নেয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যতঃ এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ এবং (দুই) নিজেও সালাত অব্যাহত রাখা। এর এমন ফলাফল সামনে এসে যাবে যাতে আপনার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। এ অর্থটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্যত্র সালাতের হুকুম দেবার পর বলা হয়েছেঃ "আশা করা যায়, আপনার রব আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' (প্রশংসিত স্থান) পৌঁছিয়ে দেবেন।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৭৯] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আপনার জন্য পরবর্তী যুগ অবশ্যি পূর্ববর্তী যুগের চাইতে ভালো। আর শিগগির আপনার রব আপনাকে এত কিছু দেবেন যার ফলে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।" [সূরা 'আদ-দুহা'ঃ ৪-৫]

(২) অর্থাৎ আপনি নিজের পরিবারবর্গের রিয্ক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন এবং সালাত থেকে দূরে থাকবেন এটা যেন না হয়। আপনি আল্লাহ্র ইবাদাতের দিকে বেশী মশগুল হোন। আপনি যদি সালাত কায়েম করেন তবে আপনার রিযিকের কোন ঘাটতি হবে না। কোত্থেকে রিযিক আসবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়, আল্লাহ্ তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিক্ষিপ্ত করে দেন। আর তার কপালে দারিদ্র্যতা লিখে দেন। আর তার কাছে দুনিয়া শুধু অতটুকুই নিয়ে আসে, যতটুকু আল্লাহ্ তার জন্য লিখেছেন। এবং যার যাবতীয় উদ্দেশ্য হবে

তো তাকওয়াতেই নিহিত[১]।

১৩৩. আর তারা বলে, 'সে তার রব-এর কাছ থেকে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন?' তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি যা আগেকার গ্রন্থসমূহে রয়েছে[২]?

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. আর যদি আমরা তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার নিদর্শনাবলী অনুসরণ করতাম।'

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

১৩৫. বলুন, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে,

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ

আখেরাত, আল্লাহ্ তার যাবতীয় কাজ গুছিয়ে দেন, তার অন্তরে অমুখাপেক্ষীতা সৃষ্টি করে দেন। আর দুনিয়া তার কাছে বাধ্য হয়ে এসে পড়ে। [ইবনে মাজাহ্ঃ ৪১০৫]

(১) আমার কোন লাভের জন্য আমি তোমাদের সালাত পড়তে বলছি না। বরং এতে লাভ তোমাদের নিজেদেরই। সেটি হচ্ছে এই যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আর এটিই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে স্থায়ী ও শেষ সাফল্যের মাধ্যম। এক হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে, তার কাছে রুতাব 'তাজা' খেজুর নিয়ে আসা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার ব্যাখ্যা করলেন যে, আমাদের এ দ্বীনের মর্যাদা দুনিয়াতে বৃদ্ধি পাবে। [দেখুন, মুসলিমঃ ২২৭০]

(২) অর্থাৎ এটা কি কোন ছোটখাটো মু'জিযা যে, তাদের মধ্য থেকে এক নিরক্ষর ব্যক্তি এমন একটি কিতাব পেশ করেছেন, যাতে শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাবলীর নির্যাস বের করে রেখে দেয়া হয়েছে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহীফা ইত্যাদি আল্লাহ্র গ্রন্থসমূহ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি? [ফাতহুল কাদীর]

مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى

কাজেই তোমরাও প্রতীক্ষা কর[১]। তারপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে[২]।'

(১) অর্থাৎ যখন থেকে এ দাওয়াতটি তোমাদের শহরে পেশ করা হয়েছে তখন থেকে শুধুমাত্র এ শহরের নয় বরং আশেপাশের এলাকারও প্রতিটি লোক এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। কার জন্য বিজয় রয়েছে এটা মুমিন, কাফের সবাই দেখার অপেক্ষায় আছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু এই দাবী কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তা-ই হতে পারে, যা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্র কাছে কোনটি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল। কে জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। [কুরতুবী] এটা কুরআনের অন্য আয়াতের মত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, "আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ফুরকান: ৪২] [ইবন কাসীর]

২১- সূরা আল-আম্বিয়া'[১]
১১২ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন[২], অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে[৩]।

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①

২. যখনই তাদের কাছে তাদের রব-এর

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: বনী ইসরাঈল, কাহ্ফ, মার্ইয়াম, ত্বা-হা ও আম্বিয়া- এগুলো আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। [বুখারীঃ ৪৪৩১] এর থেকে বুঝা যায় যে, এ সুরাগুলো প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। এগুলোর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের আলাদা দরদ ছিল। তাই আমাদেরও উচিত এগুলোকে বেশি ভালবাসা এবং এগুলো থেকে হেদায়াত সংগ্রহ করা।

(২) অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। লোকদের নিজেদের কাজের হিসেব দেবার জন্য তাদের রবের সামনে হাজির হবার সময় আর দূরে নেই। মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন একথারই আলামত যে, মানব জাতির ইতিহাস বর্তমানে তার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এখন সে তার সূচনাকালের পরিবর্তে পরিণামের বেশী নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সূচনা ও মধ্যবর্তীকালীন পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এবার শেষ পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি হাদীসে একথাই বলেছেন। তিনি নিজের হাতের দু'টি আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে বলেনঃ "আমার আগমন এমন সময়ে ঘটেছে যখন আমি ও কেয়ামত এ দু'টি আঙ্গুলের মতো অবস্থান করছি।" [বুখারীঃ ৪৯৯৫] অর্থাৎ আমার পরে শুধু কেয়ামতই আছে, মাঝখানে অন্য কোন নবীর আগমনের অবকাশ নেই। যদি সংশোধিত হয়ে যেতে চাও তাহলে আমার দাওয়াত গ্রহণ করে সংশোধিত হও।

(৩) অর্থাৎ কোন সতর্কসংকেত ও সর্তকবাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয় না। দুনিয়া নিয়ে তারা এতই মগ্ন যে, আখেরাতের কথা ভুলে গেছে। আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হলে যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান, তাঁর ফরায়েযগুলো আদায় করতে হয়, নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকতে হয় সেটার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে না। [ফাতহুল কাদীর] আর যে নবী তাদেরকে সর্তক করার চেষ্টা করছেন তার কথাও শোনে না। তাদের রাসূলের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ওহী এসেছে তারা সেটার প্রতি দৃষ্টি দেয় না। এ নির্দেশটি প্রাথমিকভাবে কুরাইশ ও তাদের মত যারা কাফের তাদেরকে করা হচ্ছে। [ইবন কাসীর]

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ②

কোন নতুন উপদেশ আসে[1] তখন তারা তা শোনে কৌতুকচ্ছলে[2],

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ③

৩. তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। আর যারা যালেম তারা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে জাদুর কবলে পড়বে[3]?'

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

৪. তিনি বললেন, 'আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কথাই আমার রব-এর

---

(১) অর্থাৎ কুরআনের যে নতুন সূরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয় এবং তাদেরকে শুনানো হয়। [ইবন কাসীর] তারা এটাকে কোন গুরুত্বের সাথে শুনে না। ইবন আব্বাস বলেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তাদের কাছে যা আছে তা জিজ্ঞেস কর, অথচ তারা তাদের কিতাবকে বিকৃতকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বাড়ানো-কমানো সবই করেছে। আর তোমাদের কাছে রয়েছে এমন এক কিতাব যা আল্লাহ্ সবেমাত্র নাযিল করেছেন, যা তোমরা পাঠ করে থাক, যাতে কোন কিছুর সংমিশ্রণ ঘটেনি। [বুখারী: ২৬৮৫]।

(২) যারা আখেরাত ও কবরের আযাব থেকে গাফেল এবং তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কুরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, তারা খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে স্বয়ং কুরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ-তামাশা করতে থাকে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, এখানে খেলা মানে হচ্ছে এই জীবনের খেলা। আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল লোকেরা এ খেলা খেলছে। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো কোনক্রমে নবী হতেই পারে না। কারণ এতো আমাদেরই মতো মানুষ, খায় দায়, বাজারে ঘুরে বেড়ায়, স্ত্রী-সন্তানও আছে। কাজেই এ লোক কি করে নবী হয়? তবে কিনা এ ব্যক্তির কথাবার্তায় এবং এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে জাদু আছে। ফলে যে ব্যক্তি এর কথা কান লাগিয়ে শোনে এবং এর কাছে যায় সে এর ভক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই যদি নিজের ভালো চাও তাহলে এর কথায় কান দিয়ো না এবং এর সাথে মেলামেশা করো না। কারণ এর কথা শোনা এবং এর নিকটে যাওয়া সুস্পষ্ট জাদুর ফাঁদে নিজেকে আটকে দেয়ার মতই। [দেখুন, ইবন কাসীর]

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④

জানা আছে এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।(১)'

بَلْ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍۭ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ⑤

৫. বরং তারা বলে, 'এসব অলীক কল্পনা, হয় সে এগুলো রটনা করেছে, না হয় সে একজন কবি(২)। অতএব সে নিয়ে আসুক আমাদের কাছে এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ।'

مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ⑥

৬. এদের আগে যেসব জনপদ আমরা ধ্বংস করেছি সেখানকার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি; তবে কি তারা ঈমান আনবে(৩)?

---

(১) অর্থাৎ নবী তাদের মিথ্যা প্রচারণা ও গুজব রটনার এই অভিযানের জবাবে এটাই বলেন যে, তোমরা যেসব কথা তৈরী করো, সেগুলো জোরে জোরে বলো বা চুপিসারে কানে কানে বলো, আল্লাহ সবই শোনেন ও জানেন। [ফাতহুল কাদীর] তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত কথা জানেন। কোন কথাই তার কাছে গোপন নেই। আর তিনিই এ কুরআন নাযিল করেছেন। যা আগের ও পরের সবার কল্যাণ সমৃদ্ধ। কেউ এর মত কোন কিছু আনতে পারবে না। শুধু তিনিই এটা আনতে পারবেন যিনি আসমান ও যমীনের গোপন রহস্য জানেন। তিনি তোমাদের কথা শুনেন, তোমাদের অবস্থা জানেন। [ইবন কাসীর]

(২) যেসব স্বপ্নের মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে أحلام বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ "অলীক কল্পনা" করা হয়েছে। এর আরেক অর্থ হয়, মিথ্যা স্বপ্ন। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কুরআনকে জাদু বলেছে, এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে। এভাবে কাফেররা সীমালঙ্ঘন ও গোঁড়ামীর বশে যা ইচ্ছে তা-ই এ কুরআনের জন্য সাব্যস্ত করছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "দেখুন, তারা আপনার কী উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে , সুতরাং তারা পথ পাবে না।" [সূরা আল-ইসরা: ৪৮] [ইবন কাসীর]

(৩) এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিদর্শন দেখাবার দাবীর যে জবাব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে। এক, পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে যে ধরনের নিদর্শন দেয়া হয়েছিল

৭. আর আপনার আগে আমরা ওহীসহ পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম[১]; সুতরাং যদি তোমরা না জান তবে

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۖ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

তোমরা তেমনি ধরনের নিদর্শন চাচ্ছো? কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছো হঠকারী লোকেরা সেসব নিদর্শন দেখেও ঈমান আনেনি। দুই, তোমরা নিদর্শনের দাবী তো করছো কিন্তু একথা মনে রাখছো না যে, সুস্পষ্ট মু'জিযা স্বচক্ষে দেখে নেবার পরও যে জাতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তারা এরপর শুধু ধ্বংসই হয়ে গেছে। তিন, তোমাদের চাহিদামতো নিদর্শনাবলী না পাঠানো তো তোমাদের প্রতি আল্লাহর একটি বিরাট মেহেরবাণী। কারণ এ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর হুকুম শুধুমাত্র অস্বীকারই করে আসছো কিন্তু এ জন্য তোমাদের উপর আযাব পাঠানো হয়নি। এখন কি তোমরা নিদর্শন এ জন্য চাচ্ছো যে, যেসব জাতি নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি এবং এ জন্য তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তোমরাও তাদের মতো একই পরিণতির সম্মুখীন হতে চাও? তাদের পূর্বের লোকদের কাছে নিদর্শন পাঠানোর পরও তারা যখন ঈমান আনেনি তখন এরাও আসলে ঈমান আনবে না। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।" [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭] এত কিছু বলা হলেও মূল কথা হচ্ছে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন নিদর্শন দেখেছে যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের কাছে যে সমস্ত নিদর্শন ছিল তা থেকে অনেক বেশী স্পষ্ট, অকাট্য ও শক্তিশালী। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এটি হচ্ছে "এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ" তাদের এ উক্তির জবাব। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক সত্তাকে তাঁর নবী না হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে পেশ করতো। জবাব দেয়া হয়েছে যে,পূর্ব যুগের যেসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে বলে তোমরা মানো তারা সবাইও মানুষ ছিলেন এবং মানুষ থাকা অবস্থায়ই তারা আল্লাহর অহী লাভ করেছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর আমরা আপনার আগেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের কাছে ওহী পাঠাতাম।" [সূরা ইউসুফঃ ১০৯]

এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, মহান আল্লাহ্ নবুওয়ত ও রিসালাতের জন্য শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই মনোনীত করেছেন। নারীরা এটার যোগ্যতা রাখে না বলেই তাদের দেয়া হয়নি। সৃষ্টিগতভাবে এতবড় গুরু-দায়িত্ব নেয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। নবুওয়তের প্রচার-প্রসারের জন্য যে নিরলস সংগ্রাম দরকার হয় তা নারীরা কখনো করতে পারে না। তাদেরকে তাদের সৃষ্টি উপযোগী দায়িত্বই দেয়া হয়েছে। তাদের দায়িত্বও কম জবাবদিহীতাও স্বল্প। তাদেরকে এ দায়িত্ব না দিয়ে আল্লাহ্ তাদের উপর বিরাট রহমত করেছেন।

জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর[১]।

৮. আর আমরা তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাবার গ্রহণ করত না; আর তারা চিরস্থায়ীও ছিল না[২]।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ﴿٨﴾

৯. তারপর আমরা তাদের প্রতি কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখালাম, ফলে আমরা

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا

---

(১) এখানে ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ বা "জ্ঞানীদের" বলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যে ইহুদীরা ইসলাম বৈরিতার ক্ষেত্রে আজ তোমার সাথে গলা মিলিয়ে চলছে এবং তোমাদেরকে বিরোধিতা করার কায়দা কৌশল শেখাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, মূসা ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীগণ কী ছিলেন? মানুষ ছিলেন, না ফেরেশতা ছিলেন? কেননা, তারা সবাই জানে যে পুর্ববর্তী সকল নবী মানুষই ছিলেন। এটা তো মূলত: তাদের জন্য রহমতস্বরূপ। কারণ, তাদের মধ্য থেকে পাঠানোর কারণেই তিনি তাদের কাছে বাণী পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন। আর মানুষও নবীদের থেকে রিসালাত ও হুকুম আহকাম গ্রহণ করতে পেরেছেন। [ইবন কাসীর]
এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরী'আতের বিধি -বিধান জানে না, এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে তদনুযায়ী আমল করবে। [সা'দী]

(২) এটা তাদের আরেক প্রশ্নের উত্তর। তারা বলত যে, এটা কেমন নবী হলেন যে, খাওয়া-দাওয়া করেন? বলা হচ্ছে যে, যত নবী-রাসূলই পাঠিয়েছি তারা সবাই শরীর বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তারা খাবার খেতেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনার আগে আমরা যে সকল রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই তো খাওয়া-দাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।" [সূরা আল-ফুরকান: ২০] অর্থাৎ তারাও মানুষদের মতই মানুষ ছিলেন। তারাও মানুষদের মতই খানা-পিনা করতেন। কামাই রোযগার করতে, ব্যবসা করতে বাজারে যেতেন। এটা তাদের কোন ক্ষতি করেনি। তাদের কোন মানও কমায়নি। কাফের মুশরিকরা যে ধারণা করে থাকে তা ঠিক নয়। তারা বলত: "এ কেমন রাসূল' যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?' 'অথবা তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার এসে পড়ল না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে খেতো?' যালিমরা আরো বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।" [সূরা আল-ফুরকান: ৭-৮] [ইবন কাসীর]

الْمُسْرِفِينَ ۝٩

তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছে রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালংঘনকারীদেরকে করেছিলাম ধ্বংস[১] ।

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٠

১০. আমরা তো তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের আলোচনা, তবুও কি তোমরা বুঝবে না[২]?

দ্বিতীয় রুকূ’

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝١١

১১. আর আমরা ধ্বংস করেছি বহু জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালেম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি ।

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۝١٢

১২. অতঃপর যখন তারা আমাদের শাস্তি টের পেল[৩] তখনই তারা সেখান থেকে পালাতে লাগল ।

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ

১৩. ‘পালিয়ে যেও না এবং ফিরে এসো যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত

(১) অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইতিহাসের শিক্ষা শুধুমাত্র একথা বলে না যে, পূর্বে যেসব রাসূল পাঠানো হয়েছিল তারা মানুষ ছিলেন বরং একথাও বলে যে, তাদের সাহায্য ও সমর্থন করার এবং তাদের বিরোধিতাকারীদেরকে ধ্বংস করে দেবার যতগুলো অংগীকার আল্লাহ তাদের সাথে করেছিলেন সবই পূর্ণ হয়েছে এবং যেসব জাতি তাদের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিল তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে । [ইবন কাসীর] কাজেই নিজেদের পরিণতি তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে নাও ।

(২) কিতাব অর্থ কুরআন এবং যিক্‌র অর্থ সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব, খ্যাতি, উল্লেখ, আলোচনা ও বর্ণনা । আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এটা তোমাদের জন্য সম্মান, প্রতিপত্তি ও স্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু । যদি তোমরা এর উপর ঈমান আন এবং এটা অনুসারে আমল কর । বাস্তবিকই সাহাবোয়ে কিরাম এর বড় নিদর্শন । তারা এর উপর ঈমান এনেছিল এবং আমল করেছিল বলেই তাদের সম্মান এত বেশী । [সা’দী]

(৩) অর্থাৎ যখন তাদের নবীর ওয়াদামত আল্লাহর আযাব মাথার উপর এসে পড়েছে এবং তারা জানতে পেরেছে যে, তাদের ধ্বংস এসে গেছে তখন তারা পালাতে লাগল । [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ⑬

ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়[১]।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑭

১৪. তারা বলল, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম যালেম[২]।'

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ⑮

১৫. অতঃপর তাদের এ আর্তনাদ চলতে থাকে আমরা তাদেরকে কাটা শস্য ও নেভানো আগুনের মত না করা পর্যন্ত।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ⑯

১৬. আর আসমান, যমীন ও যা এতদুভয়ের মধ্যে আছে তা আমরা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

---

(১) অর্থাৎ তোমরা পালিয়ে যেও না। এ কথাটি হয় ফেরেশতারা বলেছিল অথবা মুমিনরা তাদেরকে উপহাস করে তা বলেছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তোমরা নিজের আগের ঠাঁট বজায় রেখে সাড়ম্বরে আবার মজলিস গরম করো। হয়তো এখনো তোমাদের চাকরেরা বুকে হাত বেঁধে জিজ্ঞেস করবে, হুজুর, বলুন কি হুকুম। নিজের আগের পরিষদ ও কমিটি নিয়ে বসে যাও, হয়তো এখনো তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ ও জ্ঞানপুষ্ট মতামত থেকে লাভবান হবার জন্য দুনিয়ার লোকেরা তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু এটা আর কখনও সম্ভব নয়, তারা আর সে মজলিসগুলোতে ফিরে যেতে পারবে না। তাদের কর্মকাণ্ড ও অহংকার নিঃশেষ হয়ে গেছে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ খেলা-তামাসা করা আমার কাজ নয়। এগুলোকে আমি অনাহুত ও অসার সৃষ্টি করিনি। বরং এটা বোঝানোর জন্য যে, এর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, যিনি ক্ষমতাবান, যার নির্দেশ মানতে সবাই বাধ্য। তিনি নেককার ও বদকারের শাস্তি বিধান করবেন। তিনি আসমান ও যমীন এজন্যে সৃষ্টি করেননি যে মানুষ একে অপরের উপর যুলুম করবে। এজন্যে সৃষ্টি করেননি যে, তাদের কেউ কুফরী করবে, তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করবে। তারপর মারা যাবে কিন্তু তাদের কোন শাস্তি হবে না। তাদেরকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি যে, তাদেরকে দুনিয়াতে ভাল কাজের নির্দেশ দিবেন না, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবেন না। এ ধরনের খেলা একজন প্রাজ্ঞ থেকে কখনও হতে পারে না। এটা অবশ্যই প্রজ্ঞা বিরোধী কাজ। [কুরতুবী] বরং আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য। বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন, "যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে।" [সূরা আন-নাজম: ৩১] [ইবন কাসীর]

১৭. আমরা যদি খেলার উপকরণ গ্রহণ করতে চাইতাম তবে আমরা আমাদের কাছ থেকেই তা গ্রহণ করতাম; কিন্তু আমরা তা করিনি[১]।

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾

১৮. বরং আমরা সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়[২]। আর তোমরা আল্লাহকে যে গুণে গুণান্বিত

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

(১) অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং একাজ আমাকে করতেই হত, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? একাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত। لَهْو শব্দের আসল অর্থ, কর্মহীনতার কর্ম, বা রং-তামাশার জন্য যা করা হয় তা। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা ঊর্ধ্ব জগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্টবস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, সে এভাবে করে না। এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোন কাজ কোন ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয় - আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধ্বে। তাছাড়া لَهْو শব্দটি কোন কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের দাবী খণ্ডন করা। তারা উযায়ের ও ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হত, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতটির বক্তব্য অন্য আয়াতের মত, যেখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল প্রতাপশালী।" [সূরা আয-যুমার: ৪]

(২) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চুর্ণ -বিচুর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

করছ তার জন্য রয়েছে তোমাদের দুর্ভোগ[১]!

১৯. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা তাঁরই; আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে[২] তারা অহংকার-বশে তাঁর 'ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না[৩]।

وَلَهُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

২০. তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না[৪]।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

২১. এরা যমীন থেকে যেগুলোকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে সেগুলো কি

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের যাবতীয় কু ধারণার মুলোৎপাটন করা হয়েছে। তারা আল্লাহকে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিমুক্ত করে রাখে। তারা তাঁকে মনে করে থাকে যে, তিনি এমনিতেই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া। এ সমস্ত মিথ্যা কথা ও রটনা দ্বারা আল্লাহকে খারাপ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় বিধায় এ আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা হলেন 'ফিরিশ্তারা'। আরব মুশরিকরা সেসব ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সন্তান অথবা প্রভুত্ব কর্তৃত্বে শামিল মনে করে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল। [কুরতুবী] এখানে তাদের ধারণা খণ্ডন করা হচ্ছে।

(৩) অন্য আয়াতেও এসেছে, "মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশ্তাগণও করে না। আর কেউ তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৭২]

(৪) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদাতে কোন অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদাতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদাতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দান করে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা রাত দিন তসবীহ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করেন না। যাজ্জাজ বলেন, আমাদের নিঃশ্বাস নিতে যেমন কোন কাজ বাধা হয় না, তেমনি তাদের তাসবীহ পাঠ করতে কোন কাজ বাধা হয় না। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম[১]?

২২. যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ্ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হত[২]। অতএব, তারা

لَوْكَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾

(১) 'ইনশার' মানে হচ্ছে, কোন পড়ে থাকা প্রাণহীন বস্তুকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া। [কুরতুবী] এতে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে এবং যাদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, নিষ্প্রাণ বস্তুর বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে? যদি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে এ শক্তি না থেকে থাকে আর আরবের মুশরিকরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, এ শক্তি কারো মধ্যে নেই তাহলে তারা তাদেরকে ইলাহ্ ও মাবুদ বলে মেনে নিচ্ছে কেন? [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এটা তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই ইলাহ্ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই ইলাহ্র নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপ হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক ইলাহ্ চাইবে যে এখন দিন হোক, অপর ইলাহ্ চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অপরজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে? যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও ইলাহ্ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় ইলাহ্ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? তার উত্তর হলো এই যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে ইলাহ্ হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্তী আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে ইলাহ্ হতে পারে না। ইলাহ তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নয়, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই ইলাহ্ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা ইলাহ হওয়ার পদমর্যদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

যা বর্ণনা করে তা থেকে 'আরশের অধিপতি আল্লাহ্ কতই না পবিত্র।

২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ۝٢٣

২৪. তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ্ গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ দাও। এটাই, আমার সাথে যা আছে তার উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের সাথে যা ছিল তার[১]। কিন্তু তাদের

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٢٤

[দেখুন, সা'দী] এটি একটি সরল ও সোজা যুক্তি আবার গভীর তাৎপর্যপূর্ণও। এটি এত সহজ সরল কথা যে, একজন মরুচারী বেদুঈন, সরল গ্রামবাসী এবং মোটা বুদ্ধির অধিকারী সাধারণ মানুষও একথা বুঝতে পারে। এ আয়াতটি অন্য আয়াতের মত, যেখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র- মহান!" [সূরা আল-মুমিনূন: ৯১] [ইবন কাসীর] তবে লক্ষণীয় যে, আয়াতে এটা বলা হয়নি যে, যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ্ থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। বরং বলা হয়েছে যে, 'বিশৃংখল হত' বা ফাসাদ হয়ে যেত। আর সেটাই প্রমাণ করে যে, এখানে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর ব্যত্যয় ঘটলে কিভাবে দুনিয়াতে ফাসাদ হয় সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মাবুদের ইবাদাত করলে সেখানেই ফাসাদ অনিবার্য। কিন্তু যদি দুই ইলাহ থাকত, তবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, আয়াতটি যেভাবে তাওহীদুর রবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বে একত্ববাদের প্রমাণ, সাথে সাথে সেটি তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদেরও প্রমাণ। তবে এর দ্বারা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতে একত্ববাদের প্রয়োজনীয়তাই বেশী প্রমাণিত হচ্ছে। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ্, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৩৮৭; আন-নুবুওয়াত: ১/৩৭৬; ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ: ১/২০৬, ২/১১, ১২২; তরীকুল হিজরাতাইন ৫৭,১২৫; আল-জাওয়াবুল কাফী ২০৩]

(১) এর অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত যতগুলো কিতাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার কোন দেশে কোন জাতির নবী-রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে তার মধ্যে থেকে যে কোন একটি খুলে একথা দেখিয়ে দাও যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য

বেশীর ভাগই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৫. আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ ﴿۲۵﴾

২৬. আর তারা বলে, 'দয়াময় (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ بَلۡ عِبَادٌ مُّكۡرَمُوۡنَ ﴿۲۶﴾

২৭. তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না[১];

لَا يَسۡبِقُوۡنَهٗ بِالۡقَوۡلِ وَهُمۡ بِاَمۡرِهٖ يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۷﴾

কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের সামান্যতম অধিকারী এবং অন্য কেউ ইবাদাত ও বন্দেগীর সামান্যতমও হকদার। কুরআন পুরোপুরিই এটার দাওয়াত দিচ্ছে যে, তোমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত কর না। তাওরাত ও ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধিত হওয়া স্বত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বরং প্রত্যেক নবী-রাসূলের গ্রন্থেই রয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন হক ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।' অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদাত করা যায় এমন কোন ইলাহ্ স্থির করেছিলাম?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৪৫] আরও এসেছে, "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর।" [সূরা আন-নাহল: ৩৬] সুতরাং যত নবীই আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন সবই একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাতের দাওয়াত দিত। আর এর উপর ফিতরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতিও প্রমাণবহ। মুশরিকরা যা বলছে এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তাদের জন্য রয়েছে গযব ও শাস্তি। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে ফেরেশতাদের কথাই বলা হয়েছে। আরবের মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো। আর মনে করতো যে, এরা

তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত(১)।

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তাদের মধ্যে যে বলবে, 'তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ্', তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তির প্রতিদান দেব; এভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি(২)।

আল্লাহ্‌র দরবারে এদের জন্য সুপারিশ করবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] পরবর্তী ভাষণ থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। বলা হচ্ছে, ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজ করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয় তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না।

(১) মুশরিকরা দু'টি কারণে ফেরেশতাদেরকে মাবুদে পরিণত করতো। এক. তাদের মতে তারা ছিল আল্লাহর সন্তান। দুই. তাদেরকে পূজা (খোশামোদ তোশামোদ) করার মাধ্যমে তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য শাফা'আতকারীতে (সুপারিশকারী) পরিণত করতে চাচ্ছিল। এ আয়াতগুলোতে এ দু'টি কারণই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে কেউ দাবী করবে আল্লাহ্‌র সাথে আমিও ইলাহ বা মাবুদ আমি অবশ্যই তাকে জাহান্নাম দিয়ে শাস্তি দিব। এভাবেই আমি যালেমদের বা মুশরিকদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। এর অর্থ এ নয় যে, কেউ এ দাবী করবে। [ইবন কাসীর] এ পর্যন্ত কেউ এ দাবী করেনি। যদি কেউ দাবী করে তবে সে নিঃসন্দেহে তাগুত। একমাত্র ইবলিসই এ দাবী করেছিল বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] তাই ইবলিসকে সমস্ত তাগুতের প্রধান বলা হয়।

তৃতীয় রুকূ'

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

৩০. যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না[১] যে, আসমানসমূহ ও যমীন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম[২]; এবং প্রাণবান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে[৩]; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

(১) চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) رتق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া, আর فتق এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رتق ও فتق কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে হিসেবে আয়াতের অনুবাদ এই দাঁড়ায় যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ হচ্ছেঃ আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিত ছিল তারপর আমরা সে দুটিকে পৃথকীকরণ করেছি। হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমাল্লাহ বলেনঃ এতদুভয়ের মধ্যে বাতাস দ্বারা পৃথকীকরণ করেছেন। [ইবন কাসীর; কুরতুবী] মোটকথাঃ এ শব্দগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহান প্রথমে একটি পিণ্ডের আকারে ছিল। পরবর্তীকালে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদি স্বতন্ত্র জগতে পরিণত করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া। [কুরতুবী] তখন এ আয়াতের অর্থে আরও এসেছে, "শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি, এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়" [সূরা আত-তারেক: ১১-১২]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।" জওয়াবে তিনি বললেনঃ "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে"। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৯৫]

৩১. এবং আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে যমীন তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায়(১) এবং আমরা সেখানে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২. আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে(২) বিচরণ করে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর আমরা আপনার আগেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি(৩);

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ

---

(১) ميد আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব অপরিসীম।

(২) প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فلك বলা হয়। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فلكة المغزل বলা হয়। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] আর একই কারণে আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। "সবাই এক একটি ফালাকে (কক্ষপথে) সাঁতরে বেড়াচ্ছে"-এ থেকে দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। এক, প্রত্যেকের ফালাক বা কক্ষপথ আলাদা। দুই, ফালাক এমন কোন জিনিস নয় যেখানে এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খুঁটির মতো প্রোথিত আছে এবং তারা নিজেরাই এ খুঁটি নিয়ে ঘুরছে। বরং তারা কোন প্রবাহমান অথবা আকাশ ও মহাশূন্য ধরনের কোন বস্তু, যার মধ্যে এই গ্রহ-নক্ষত্রের চলা ও গতিশীলতা সাঁতার কাটার সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

(৩) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, খাদির আলাইহিসসালাম মারা গেছেন। কারণ, তিনি একজন মানুষ। মানুষদের মধ্যে কাউকেই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব করেননি। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু ফাতাওয়া ৪/৩৩৭]

مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝٣٤

কাজেই আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে?

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝٣٥

৩৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে(১); আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি(২) এবং আমাদেরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٣٦

৩৬. আর যারা কুফরি করে, যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে শুধু বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। তারা বলে, 'এ কি সে, যে তোমাদের দেব-দেবীগুলোর সমালোচনা করে?' অথচ তারাই তো 'রহ্‌মান' তথা দয়াময়ের স্মরণে কুফরী করে(৩)।

(১) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। [ফাতহুল কাদীর] একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ণ ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। [ইবনুল কাইয়্যেম, আর-রূহ: ১৭৮]

(২) অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভালো উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। প্রত্যেক স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয় যেমন- অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে মন্দ বলে অপরদিকে ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন-সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-ধনাঢ্যতা, জয়-পরাজয়, শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, সুস্থতা-রুগ্নতা ইত্যাদি সকল অবস্থায় তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে হালাল, হারাম, আনুগত্য, অবাধ্যতা, হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এ সবই পরীক্ষার সামগ্রী। [দেখুন, ইবন কাসীর] আলেমগণ বলেন, বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ 'আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।' [ইবনুল কাইয়্যেম, উদ্দাতুস সাবেরীন: ৬৪]

(৩) অর্থাৎ মূর্তি ও বানোয়াট ইলাহদের বিরোধিতা তাদের কাছে এত বেশী অপ্রীতিকর যে, এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবমাননা করে, কিন্তু

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ[১], শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব; কাজেই তোমরা তাড়াহুড়া কামনা করো না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?'

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. যদি কাফেররা সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের চেহারা ও পিঠ থেকে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না (তাহলে তারা সে শাস্তিকে তাড়াতাড়ি চাইত না।)

بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

৪০. বরং তা তাদের উপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

তারা যে আল্লাহ বিমূখ এবং আল্লাহর নামোল্লেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়, নিজেদের এ অবস্থার জন্য তাদের লজ্জাও হয় না। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? 'সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতাম।' আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ফুরকান: ৪১-৪২]

(১) ত্বরাপ্রবণতার স্বরূপ হচ্ছে, কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআনের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবন" [সূরা আল-ইসরাঃ ১১] আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণতঃ কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলেঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে। ঠিক তেমনি এখানে অর্থ করা হবে যে, ত্বরাপ্রবণতা মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। [দেখুন, কুরতুবী]

৪১. আর আপনার আগেও অনেক রাসূলের সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

চতুর্থ রুকূ'

৪২. বলুন, 'রহ্মান হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে রাতে ও দিনে[১]?' তবুও তারা তাদের রব-এর স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তবে কি তাদের এমন কতেক ইলাহ্ও আছে যারা আমাদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? এরা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমাদের থেকে তাদের আশ্রয়দানকারীও হবে না।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. বরং আমরাই তাদেরকে ও তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম; তার উপর তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। তারা কি দেখছে না যে, আমরা যমীনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি[২]। তবুও

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

(১) আয়াতের আরেক অর্থ, রহমানের পরিবর্তে কে তোমাদেরকে রাত বা দিনে হেফাযত করবেন? তোমাদের এ সমস্ত ইলাহ্ তো তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, যদি রাত বা দিনের কোন সময় অকস্মাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করতে চান তবে তাঁর পাকড়াও থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিশালী সহায়ক ও সাহায্যকারী তোমাদের কে আছে? [কুরতুবী]

(২) এ আয়াতের প্রসিদ্ধ তাফসীর হলো, মক্কার কাফের মুশরিকরা কি এটা প্রত্যক্ষ করে না যে, আমরা চারদিক থেকে তাদেরকে সংকুচিত করে এনেছি। আর তা হচ্ছে, ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় ঘাঁটির পতন দেখে। ইসলামের বিজয়

কি তারা বিজয়ী হবে?

৪৫. বলুন, 'আমি তো শুধু ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি', কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সে আহ্বান শুনে না।

قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর আপনার রব-এর শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা অবশ্যই বলে উঠবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালেম!'

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব[1], সুতরাং কারো প্রতি কোন

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

কেতন উড়ার মানেই হলো কুফরী ও শির্কী পতাকার অবনমিত হওয়া, তাদের শক্তির পতন হওয়া। এসব দেখেও তারা ঈমান আনতে কেন পিছপা হচ্ছে? [দেখুন, কুরতুবী]

(১) লক্ষণীয় যে, এখানে موازين শব্দটি ميزان শব্দের বহুবচন। [কুরতুবী] অর্থ ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতের অর্থ, দাঁড়িপাল্লাসমূহ স্থাপন করা হবে। এখন প্রশ্ন হলো, মানদন্ড কি একটি না বহু? এখানে আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্য অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। আমলের শ্রেণী অনুসারে অনেক দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। অথবা, প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, একই মীযানকে বহু হিসেবে দেখানো হয়েছে। [কুরতুবী]
কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণের মতে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। যার থাকবে দু'টি পাল্লা। যে দু'টি পাল্লা সবাই দেখতে পাবে, অনুভব করতে পারবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ হয়ত এটাই যে, মীযানের পাল্লাতে যেমনিভাবে বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে তেমনিভাবে বান্দার আমলকেও সরাসরি ওজন করা হবে এমনকি বান্দাকেও ওজন করা হবে। সে হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। [শারহুত তাহাভীয়্যাহ]
বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে তার প্রমাণঃ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ আমার উম্মতের মধ্যে একলোককে কেয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে পৃথক করে একান্তে ডেকে তার জন্য

خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শষ্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব; আর হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট ।

৯৯ টি দপ্তর বের করবেন যার প্রত্যেকটি চোখ যতদুর যায় তত লম্বা হবে । তারপর তাকে বলবেনঃ "তুমি কি এগুলো অস্বীকার কর? আমার রক্ষণাবেক্ষণকারী লেখক ফেরেশ্তাগণ কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে? সে বলবেঃ না, হে প্রভূ! তারপর আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার কি কোন ওজর বা সৎকর্ম আছে? লোকটি তখন হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলবেঃ না, হে প্রভূ! তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ অবশ্যই তোমার একটি সৎকর্ম আছে, তোমার উপর আজ কোন যুলুম করা হবে না । তারপর তার জন্য একটি কার্ড বের করা হবে যাতে আছেঃ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন হক্ক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল ।" তারপর আল্লাহ্ বলবেনঃ সেটা নিয়ে আস । তখন লোকটি বলবেঃ হে প্রভু! ঐ সমস্ত দপ্তরের বিপরীতে এ কার্ড কি ভূমিকা রাখতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার উপর যুলুম করা হবে না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তারপর সে সমস্ত দপ্তর এক পাল্লায় এবং কার্ডটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে । রাসূল বললেনঃ আর তাতেই সমস্ত দপ্তর উপরে উঠে যাবে এবং কার্ডটি ভারী হয়ে যাবে । আল্লাহ্র নামের বিপরীতে কোন কিছু ভারী হতে পারে না ।" [তিরমিযীঃ ২৬৩৯, ইবনে মাজাহঃ ৪৩০০] এ হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে ।

বান্দার আমলই সরাসরি ওজন করার প্রমাণঃ হাদীসে এসেছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দু'টি বাক্য এমন যা দয়াময়ের কাছে প্রিয়, জিহবার উপর হাল্কা, মীযানের মধ্যে ভারী, আর তা হলোঃ 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে), 'সুবহানাল্লাহিল 'আজীম' (মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র)" । [বুখারীঃ৭৫৬৩, মুসলিমঃ ২৬৯৪]

স্বয়ং আমলকারীকেও ওজন করা হবেঃ তার স্বপক্ষে প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ "সুতরাং আমরা তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন কোন ওজন স্থির করব না" । [সূরা আল-কাহাফঃ১০৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আরাক' গাছে উঠলেন, তিনি ছিলেন সরু গোড়ালী বিশিষ্ট মানুষ, ফলে বাতাস তাকে নাড়াচ্ছিল তাতে উপস্থিত লোকেরা হেসে উঠল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমরা হাসছ কেন?" তারা বললঃ হে আল্লাহর নবী! তার সরু গোড়ালীর কারণে । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ দু'টি মীযানের উপর উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী" । [মুসনাদ আহমাদঃ ১/৪২০-৪২১, মুস্তাদরাক ৩/৩১৭]

৪৮. আর অবশ্যই আমরা দিয়েছিলাম[১] মূসা ও হারূনকে 'ফুরকান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য[২]---

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. আর এ হচ্ছে বরকতময়[৩] উপদেশ,

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۚ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ

(১) এখান থেকে নবীদের আলোচনা শুরু হয়েছে। একের পর এক বেশ কয়েকজন নবীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। প্রথমে মূসা তারপর ইবরাহীম, লূত, ইসহাক, ইয়া'কূব, দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইসমাঈল, ইদরীস, যুল কিফল, যুন্নুন বা ইউনুস, যাকারিয়্যা, ইয়াহ্ইয়া। সবশেষে একজন সিদ্দীকাহ মারইয়ামের আলোচনার মাধ্যমে তা শেষ করা হয়েছে।

(২) প্রথমেই মূসা আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে সাধারণত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার সাথে সাথে মূসা আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়। অনুরূপভাবে কুরআনের আলোচনার সাথে তাওরাতের আলোচনা করা হয়। এখানেই সেই একই পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] প্রথমেই বলা হয়েছে যে, "অবশ্যই আমরা দিয়েছিলাম মূসা ও হারূনকে 'ফুরকান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য ---"। এখানে তাওরাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত ছিল হক ও বাতিল, হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী, মানুষকে ভীতি ও আশার মাধ্যমে সত্য-সরল পথ দেখাবার আলোক বর্তিকা বা অন্তরের আলো এবং মানব জাতিকে তার বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেবার উপদেশ। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে 'ফুরকান' বলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা আলাইহিস সালামের সাথে ছিল। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ ফির'আউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন, মোকাবেলার সময় আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফির'আউনী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফির'আউনের সৈন্যবাহিনীর সলিলসমাধি হয়। এমনিভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। তবে আয়াতে মুত্তাকীনদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যদিও তা পাঠানো হয়েছিল সমগ্র মানব জাতির জন্য কিন্তু তা থেকে কার্যত লাভবান তারাই হতে পারতো যারা ছিল এসব গুণে গুণান্বিত। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) বরকত সংক্রান্ত আলোচনা সূরা মারইয়ামের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

এটা আমরা নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার কর?

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. আর আমরা তো এর আগে ইব্‌রাহীমকে তার শুভবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান দিয়েছিলাম[১] এবং আমরা তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, 'এ মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ!'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের 'ইবাদত করতে দেখেছি।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. তিনি বললেন, 'অবশ্যই তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ, না তুমি খেলা

(১) রুশ্‌দ এর অর্থ হচ্ছে সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করে সঠিক কথা বা পথ অবলম্বন করা এবং বেঠিক কথা ও পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া। যাকে আরবীতে صلاح বলা যায়। [বাগভী] এ অর্থের প্রেক্ষিতে "রুশ্‌দ" এর অনুবাদ "সত্যনিষ্ঠা"ও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু রুশ্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠা নয় বরং এমন সত্যজ্ঞানের ভাব প্রকাশ করে যা সঠিক চিন্তা ও ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠু বুদ্ধি ব্যবহারের ফলশ্রুতি, তাই "শুভবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান" এই দু'টি শব্দ একত্রে এর অর্থের কাছাকাছি। তাই অনুবাদ করা হয়েছে, "ইবরাহীমকে তার শুভবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান দান করেছিলাম।" [দেখুন, কুরতুবী] এখানে 'তার' বলার অর্থ, যতটুকু তার জন্য এবং তার মত অন্যান্য রাসূলদের জন্য উপযুক্ত ততটুকু আমরা তাকে দান করেছিলাম। [ফাতহুল কাদীর] সুতরাং সে যে সত্যের জ্ঞান ও শুভবুদ্ধি লাভ করেছিল তা আমরাই তাকে দান করেছিলাম। এটা তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল। যা ছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ।

করছ[১]?'

৫৬. তিনি বললেন, 'বরং তোমাদের রব তো আসমানসমূহ ও যমীনের রব, যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।'

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۵۶﴾

৫৭. 'আর আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা পিছন ফিরে চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব[২]।'

وَتَاللّٰهِ لَاَكِیْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۵۷﴾

৫৮. অতঃপর তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِیْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَیْهِ

---

(১) এ বাক্যটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তুমি কি আমাদের সামনে সত্য পেশ করছো, না খেলা করছো?" আমরা তো এর আগে আর কারও কাছে এমন কথা শুনিনি। [ইবন কাসীর] অপর কারো কারো মতে এর অর্থ তুমি কি আমাদের সামনে প্রকৃত মনের কথা বলছো, নাকি কৌতুক করছো? [কুরতুবী] নিজেদের ধর্মের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তারা গুরুত্ব সহকারে কেউ এ কথা বলতে পারে বলে কল্পনাও করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা বললো, তুমি নিছক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেলা-তামাশা করছো, না কি প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমার চিন্তাধারা? তাদের কাছে এটা ছিল ইবরাহীমের বোকামীসূলভ কথাবার্তা। [দেখুন, সা'দী]

(২) আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের কাছে (আমি অসুস্থ) এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মুর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীম একাজ করেছে। এর জওয়াব কয়েকটি হতে পারেঃ তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। শুধু একজন লোক তা শুনেছিল আর সেই তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। [কুরতুবী] অথবা সম্প্রাদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মুর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে। [ইবন কাসীর]

يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾

ছাড়া[১]; যাতে তারা তার দিকে[২] ফিরে আসে।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তারা বলল, 'আমাদের মা'বুদগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই অন্যতম যালেম।'

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬০. লোকেরা বলল, 'আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম।'

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. তারা বলল, 'তাহলে তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা সাক্ষ্য হয়[৩]।'

---

(১) অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মুর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন। শুধু বড় মুর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মুর্তিদের চাইতে বড় ছিল [কুরতুবী] না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে إليه বা 'তার দিকে' বলে কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছেঃ (এক) এখানে 'তার দিকে' বলে ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ আশায় কাজটি করলেন যে তাদের উপাস্য মুর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পুজার যোগ্য নয় এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। [কুরতুবী] (দুই) কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে 'তার দিকে' বলে كبيرهم বা তাদের প্রধান মুর্তিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মুর্তিকে খণ্ড বিখণ্ড এবং বড় মুর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবতঃ এই মুর্তিটির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? আর তারা মনে করবে যে, বড় মূর্তিই বোধ হয় নিজের আত্মসম্মানবোধের কারণে ছোট ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) এভাবে ইবরাহীমের মনের আশাই যেন পূরণ হলো। কারণ তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। ব্যাপারটিকে তিনি শুধু পুরোহিত ও পূজারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক। তারাও আসুক, দেখে নিক এই যে মূর্তিগুলোকে তাদের অভাব পূরণকারী হিসেবে রাখা হয়েছে এরা কতটা অসহায় এবং স্বয়ং পুরোহিতরাই এদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। [ইবন কাসীর]

قَالُوٓا۟ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿٦٢﴾

৬২. তারা বলল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমিই কি আমাদের মা'বুদগুলোর প্রতি এরূপ করেছ?'

قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ

৬৩. তিনি বললেন, 'বরং এদের এ প্রধান-ই তো এটা করেছে(১), সুতরাং এদেরকে

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেননি। তন্মধ্যে দু'টি খাস আল্লাহর জন্যে বলা হয়েছে। একটি ﴿بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ﴾ (বরং তাদের প্রধানই তো এটা করেছে) বলা। দ্বিতীয়টি ঈদের দিনে সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে ﴿إِنِّى سَقِيمٌ﴾ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রী সারাহ্ সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল যালেম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্বামীকে হত্যা করত ও তার স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী ভাইয়ের সাথে থাকলে সেই এরূপ করত না। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই যালেম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছে দিলে সে সারাহকে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করল: এই মহিলা সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যালেমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন: সে আমার ভগিনী। (এটা হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা)। [বুখারীঃ ৩১৭৯, ৪৪৩৫ মুসলিমঃ ২৩৭১]

এই হাদীসে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন কোন আলেমের ব্যাখ্যা হলো যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় "তাওরিয়া"। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজেই সারাহকে বলেছিলেন আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমি ও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে আমরা উভয় ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটাই "তাওরিয়া"। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায় বলা যায় যে, অসুস্থ শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় অর্থেই "আমি অসুস্থ" বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বোঝেছিলেন। মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিতে তিনি যে ভাঙ্গার কাজটি বড় মূর্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত

إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

জিজ্ঞেস কর যদি এরা কথা বলতে পারে।'

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তখন তারা নিজেরা পুনর্বিবেচনা করে দেখল এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো যালেম'।

ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তারপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল এবং তারা বলল, 'তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না।'

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৬. ইব্রাহীম বললেন, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদাত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না?

أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. 'ধিক্ তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের জন্য! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?'

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে ফেল, আর সাহায্য কর তোমাদের মা'বুদদের, তোমরা যদি কিছু করতে চাও।'

করেছিলেন এ ব্যাপারে আলেমগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন:
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ উক্তি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল; অথাৎ তোমরা একথা ধরেই নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মুর্তিই করে থাকবে। ধরে নেয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না। [ফাতহুল কাদীর]
কোন কোন মুফাসসিরের মতে, মূলতঃপ্রধান মূর্তিটিই ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার সম্প্রদায় এই মুর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]
তবে এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, নবী-রাসূলগণ কখনো নবুওয়ত ও তাবলীগ বা প্রচার-প্রসার সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তারা জগতশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী লোক ছিলেন। [ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ ১/৪৪৬]

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আমরা বললাম, 'হে আগুন! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. আর তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. এবং আমরা তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সে দেশে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি সৃষ্টিজগতের জন্য[১]।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবংআমরাইব্‌রাহীমকেদানকরেছিলাম ইস্‌হাক আর অতিরিক্ত পুরস্কারস্বরূপ ইয়া'কূবকে[২]; এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ।

---

(১) অর্থাৎ ইবরাহীম ও লূতকে আমরা নমরূদের অধিকারভূক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছতে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীদের জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি। মূলতঃ সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটিতে অনেক নবী-রাসূলের সমারোহ ঘটেছিল। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদী, প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে। [দেখুন, কুরতুবী]
কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে মক্কাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, " নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে।" [সূরা আলে ইমরান: ৯৬] [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আমি তাকে (দো'আ ও অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। অর্থাৎ ছেলের পরে পৌত্রকেও নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছি। দো'আর অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نافلة বলা হয়েছে। [কুরতুবী]

৭৩. আর আমরা তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত; আর আমরা তাদেরকে সৎকাজ করতে ও সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ওহী পাঠিয়েছিলাম; এবং তারা আমাদেরই 'ইবাদাতকারী ছিল।

وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর লূতকে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান[১] এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে[২] যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে[৩]; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ ফাসেক সম্প্রদায়।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫. এবং তাকে আমরা আমাদের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম; তিনি ছিলেন সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

وَأَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

---

(১) মূলে "হুকুম ও ইলম" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। "হুকুম" অর্থ এখানে নবুওয়ত। তাছাড়া এর অন্য অর্থ, প্রজ্ঞা। [ফাতহুল কাদীর] আর "ইলম" এর অর্থ হচ্ছে এমন সত্য যথার্থ ইলম যা অহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। অন্য কথায় দ্বীনের জ্ঞান এবং মানুষের মধ্যে যা ঘটবে তার সঠিক ফয়সালা [কুরতুবী] লূতের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন সূরা আল-আ'রাফ ৮০-৮৪, সূরা হুদ ৬৯-৮৩ এবং সূরা আল-হিজর ৫৭-৭৬ আয়াত।

(২) যে জনপদ থেকে লূত আলাইহিস সালামকে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদূম। [ইবন কাসীর] এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্যে একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেয়া হয়েছিল। [কুরতুবী]

(৩) পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও তাদের মধ্যে ছিল। [দেখুন, কুরতুবী]

ষষ্ঠ রুকূ'

৭৬. আর স্মরণ করুন নূহ্‌কে; পূর্বে তিনি যখন ডেকেছিলেন[১] তখন আমরা সাড়া দিয়েছিলাম তার ডাকে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট[২] থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۝٧٦

৭৭. এবং আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ করেছিল; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এজন্য আমরা তাদের সবাইকেই নিমজ্জিত করেছিলাম।

وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٧٧

৭৮. আর স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আর আমরা তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম[৩]।

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ۝٧٨

---

(১) নূহের দো'আর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দো'আ করেছিলেন "হে রব! আমি হেরে গেছি আমাকে সাহায্য করো।" [সূরা আল কামারঃ ১০] এবং "হে আমার রব! পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাফেরকেও ছেড়ে দিয়ো না।" [সূরা নূহঃ ২৬]

(২) "মহাসংকট" অর্থ একটি অসৎ কর্মশীল জাতির মধ্যে জীবন যাপন করার বিপদ অথবা মহাপ্লাবন। নূহের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৫৯ থেকে ৬৪, সূরা ইউনুস ৭১ থেকে ৭৩, সূরা হূদ ২৫ থেকে ৪৮ এবং বনী ইসরাঈল ৩ আয়াতসমূহ।

(৩) মুফাসসিরগণ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, দুই লোক দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগলপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগলপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে

৭৯. অতঃপর আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান[১]। আর

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۖ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾

দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগলপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) দাউদ আলাইহিস-সালাম রায় দিলেন যে, ছাগলপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পন করুক। (কেননা, ফিক্হ এর পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগলপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তার পুত্র) সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। সুলাইমান বলেনঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্য উপকারী হত। তারপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে এ কথা জানালেন। দাউদ আলাইহিসসালাম বলেনঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেনঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগলপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগলপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে তখন শস্যক্ষেত্র উহার মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যার্পণ করুন। দাউদ আলাইহিস সালাম এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতি জানা যায় যে, দু'জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দু'জনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তবুও দু'জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যদি বিচারক নিজের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দু'টি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান।" [বুখারীঃ ৬৯১৯, মুসলিমঃ ১৭১৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমরা পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত(১), আর আমরাই ছিলাম এ

বলেছেনঃ "বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জান্নাতী এবং দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক যিনি সত্য চিহ্নিত করতে পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।" [আবুদাউদঃ ২৫৭৩, তিরমিযীঃ ১৩২২, ইবনে মাজাহঃ ২৩১৫]

(১) আয়াতে مع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দাউদ আলাইহিস সালামের সাথে পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও দাউদের সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আমরা তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর সমবেত পাখিদেরকেও (অনুগত করা হয়েছিল)। তারা প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী।" [সূরা সাদঃ১৮,১৯] অন্য সূরায় আরও অতিরিক্ত বলা হয়েছেঃ "পাহাড়গুলোকে আমরা হুকুম দিয়েছিলাম যে, তার সাথে সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করো এবং এই একই হুকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।" [সূরা সাবাঃ ১০]

এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তার উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় ও পাখিরা গেয়ে ফেলত এবং একটা অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হতো। তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন, তখন পক্ষীকুল শূন্যে তার সাথে তসবীহ্ পাঠ করতে থাকত। [ইবন কাসীর] সমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ্ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জেযা। মু'জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যেও বিশেষ চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একবার আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তার কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেনঃ "এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৯] আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তিলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেনঃ আপনি শুনছেন - একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত

সবের কর্তা ।

৮০. আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম[১], যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; কাজেই তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. আর সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত[২] যেখানে আমরা প্রভূত কল্যাণ

وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَٰلِمِينَ ﴿٨١﴾

করার চেষ্টা করতাম । [ইবনে হিব্বানঃ ৭১৯৭, অনুরূপ মুসলিমঃ ৭৯৩] এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ কাম্য ও পছন্দনীয় ।

(১) এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হেফাযতের জন্যে ব্যবহৃত হয় । অন্য এক আয়াতে আছেঃ "আমরা দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম ।" [সূরা সাবাঃ ১০] আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ আলাইহিস সালামকে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেয়া হয়েছে যে, "যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে (সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত থেকে) হেফাযত করে" এই প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার কেউই মুক্ত নয় । তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন । এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত । নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে । [দেখুন, কুরতুবী]

(২) এ সম্পর্কে অন্যত্র আরো বিস্তারিত আলোচনা এসেছে, বলা হয়েছেঃ "আর সুলাইমানের জন্য আমরা বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত ।" [সূরা সাবাঃ ১২] অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ "কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুম সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো ।" [সূরা সাদঃ৩৬] এ থেকে জানা যায় বাতাসকে সুলাইমানের হুকুমের এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তার রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোন স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন । যাওয়ার সময়ও সব সময় তার ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও । আল্লাহ্ তাআলা যেমন দাউদ

রেখেছি[১]; আর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমরাই সম্যক জ্ঞানী ।

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ছাড়া অন্য কাজও করত[২]; আর আমরা তাদের রক্ষাকারী ছিলাম ।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩. আর স্মরণ করুন আইয়ূবকে[৩], যখন

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ

আলাইহিস সালাম এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তার আওয়াজের সাথে তসবীহ্ পাঠ করত, তেমনি সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন । বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন । তিনি বায়ূতে তার কাঠের বিছানা পাততেন । তারপর তাতে রাষ্ট্রের যত প্রয়োজনী জিনিস যেমন ঘোড়া, উট, তাঁবু, সৈন্য-সামন্ত সবাই উঠানো হত । তারপর বাতাসকে বলা হত তা বহন করার জন্য । বাতাস তার নিচে ঢুকে তা বহন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত । তখন তাদের উপরে পাখি ছায়া দিত, এভাবে তিনি যেখানে চাইতেন সেখানে নিয়ে যেত । যখন তিনি নামতেন তখন তার সাথে তার রাজকীয় সামগ্রী সবই থাকত । [ইবন কাসীর]

(১) যেখানে বরকত বা প্রভূত কল্যাণ রেখেছি বলে শাম দেশ তথা সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন এলাকাকেই বোঝানো হয়েছে । যার আলোচনা আগেই চলে গেছে ।

(২) অর্থাৎ আমরা সুলাইমানের জন্যে শয়তানের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্যে বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মুর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরী করত ।" [সূরা সাবাঃ ১৩] সুলাইমান তাদেরকে অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন । অন্য আয়াতে এসেছে, " আর (অধীন করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তান (জিন) দেরকেও, এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে ।" [সূরা ছোয়াদঃ ৩৭-৩৮]

(৩) কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে রোগ থেকে মুক্তি পান । এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল । এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করেন । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র নবী আইয়ূব আলাইহিস্‌সালাম আঠার বছর মুসীবত ভোগ করেছিলেন । অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাকে তার ভাই বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে দু'জন ব্যতীত সবাই ত্যাগ করে চলে

গিয়েছিল। এ দু'জন সকাল বিকাল তার কাছে আসত। তাদের একজন অপরজনকে বলল: জেনে নাও আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আইয়ূব এমন কোন গোনাহ করেছে যার মত গোনাহ সৃষ্টিজগতের কেউ করেনি। তার সাথী বলল: এটা কেন বললে? জবাবে সে বলল: আঠার বছর থেকে সে এমন কঠিন রোগে ভূগছে অথচ আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে তা থেকে মুক্তি দিচ্ছে না। এ কথা শোনার পর সাথীটি আইয়ূব আলাইহিসসালামের সাথে দেখা করতে গিয়ে ব্যথিত হয়ে কথাটি তাকে জানিয়ে দিল। তখন আইয়ূব আলাইহিসসালাম তাকে বললেন: আমি জানি না তুমি কি বলছ, তবে আল্লাহ্ জানেন পূর্বে আমি কখনও কখনও ঝগড়ায় লিপ্ত দু'জনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এটাও শোনতাম যে, তারা আল্লাহ্র কথা বলে বলে নিজেদের ঝগড়া করছে। তখন আমি বাড়ী ফিরে তাদের পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করতাম এই ভয়ে যে, তারা হক ছাড়া অন্য কোন ভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেনি তো? ঘটনা বর্ণনা করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আইয়ূব আলাইহিসসালাম তার প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হতেন। কাজ সারার পর তার স্ত্রী তার হাত ধরে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রাকৃতিকর কাজ সারার পর তার স্ত্রীর কাছে ফিরতে দেরী করছিলেন এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ূব আলাইহিসসালামের কাছে ওহী পাঠালেন যে, "আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।" [সূরা সোয়াদ:৪২] তার স্ত্রী তার আগমনে দেরী দেখে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌঁছলেন। তখন আইয়ূব আলাইহিসসালামের যাবতীয় মুসিবত দূর হয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় সুন্দর হয়ে গেলেন। তার স্ত্রী তাকে দেখে বললেন: হে মানুষ! আল্লাহ্ আপনার উপর বরকত দিন, আপনি কি ঐ বিপদগ্রস্ত আল্লাহ্র নবীকে দেখেছেন? আল্লাহ্র শপথ, যখন সে সুস্থ ছিল তখন সে ছিল আপনার মতই দেখতে। তখন আইয়ূব আলাইহিসসালাম বললেন যে, আমিই সেই ব্যক্তি। আইয়ূব আলাইহিসসালামের দুটি উঠান ছিল। একটি গম শুকানোর অপরটি যব শুকানোর। আল্লাহ্ তা'আলা সে দু'টির উপর দু'খণ্ড মেঘ পাঠালেন। এক খণ্ড মেঘ সে গমের উঠোনে এমনভাবে স্বর্ণ ফেললো যে, সেটি পূর্ণ হয়ে গেল। অপর মেঘ খণ্ডটি সেটির উপর এমনভাবে রৌপ্য বর্ষণ করল যে, সেটাও পূর্ণ হয়ে গেল। [সহীহ ইবন্ হিব্বান: ৭/১৫৭, হাদীস নং ২৮৯৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬৩৫, ৪১১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: একবার আইয়ূব আলাইহিসসালাম কাপড় খুলে গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ঝাঁক স্বর্ণের টিডিড (পঙ্গপাল) তার উপর পড়তে আরম্ভ করল, তিনি সেগুলো মুঠি মুঠি তার কাপড়ে জমা করছিলেন। তখন তার প্রভু তাকে ডেকে বললেন: হে আইয়ূব আমি কি আপনাকে যা দেখছেন তা থেকেও বেশী প্রদান করে ধনী করে দেইনি? উত্তরে আইয়ূব আলাইহিসসালাম বললেন: অবশ্যই হে প্রভু! তবে আপনার দেয়া বরকত থেকে আমি কখনো অমুখাপেক্ষী হবো না। [বুখারী: ৩৩৯১, ২৭৯] এ ছাড়া আইয়ূব আলাইহিসসালাম সংক্রান্ত আরো কিছু কাহিনী বিভিন্ন

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾

তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, 'আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু(১)!'

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪. অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম(২), তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং আরো দিলাম তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ, আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতরূপে এবং 'ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّٰبِرِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং স্মরণ করুন ইসমা'ঈল, ইদরীস ও যুলকিফলকে, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল(৩);

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে এসেছে কিন্তু সেগুলো খুব বেশী গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি বিধায় এখানে উল্লেখ করা গেল না।

(১) দো'আর ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন-"আপনি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কোন অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোন জিনিসের দাবী নেই। তাতেই আল্লাহ্ খুশী হয়ে তার দো'আ কবুল করলেন। পরবর্তী আয়াতে দো'আ কবুল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) কুরআনের অন্যত্র এসেছে, আল্লাহ্ তাকে বলেনঃ "নিজের পা দিয়ে আঘাত করুন, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।" [সূরা ছোয়াদঃ ৪২] এ থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ্ তার জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন। এ ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময় এদিকে ইংগিত করে যে, তার কোন মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল।

(৩) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিন জন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআনে তাদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে -কাসীর বলেনঃ তার নাম দু'জন নবীর সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্র নবী ছিলেন। কিন্তু

৮৬. আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে প্রবেশ করালাম; তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।

وَأَدْخَلْنٰهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. আর স্মরণ করুন, যুন্-নূনকে[১], যখন

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নবীদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। তবে সঠিক মত হলো এই যে, তিনি নবী ও রাসূলই ছিলেন। তার সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য জানা যায় না। ইসরাঈলী বর্ণনায় যে সমস্ত ঘটনা এসেছে সেগুলোর কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। [এ ব্যাপারে ইবন কাসীর আরও তথ্য বর্ণনা করেছেন।]

(১) ইউনুস ইবনে মাত্তা আলাইহিস সালাম এর কাহিনী পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুস, সূরা আল-আম্বিয়া, সূরা আস-সাফ্‌ফাত ও সূরা আল-কালামে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তার আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও যুননুন এবং কোথাও ছাহেবুল হূত উল্লেখ করা হয়েছে। নূন ও হূত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন নূন ও সাহেবুল হূতের অর্থ মাছওয়ালা। ইউনুস আলাইহিস সালামকে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল এই আশ্চার্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে যুন-নূন বা ছাহেবুল হূত শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন তাফসীরে এসেছে যে, ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্ম করার দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আযাবের ভয় দেখিয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে এখন আযাব এসেই যাবে। (কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) তাই অনতিবিলম্বে তারা শির্ক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মা দের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এদিকে ইউনুস আলাইহিস সালাম ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তার সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তার সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী

تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ

তিনি ক্রোধ ভরে[১] চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না[২]। তারপর তিনি

প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এর ফলে ইউনুস আলাইহিস সালাম –এর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহন করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাক্রমে এখানে ইউনুস আলাইহিস সালাম এর নাম বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে "লটারীর ব্যবস্থা করা হলে তার (ইউনুস আলাইহিস সালাম এর) নামই তাতে বের হয়।" [সূরা আস-সাফফাতঃ ১৪১] তখন ইউনুস আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস আলাইহিস সালাম –কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস আলাইহিস সালাম এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তার কয়েদখানা। [ইবন কাসীর] কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তার এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসন্তোষের কারণ হন এবং তাকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

(১) অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যতঃ এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত। [ফাতহুল কাদীর] অন্য অর্থ হচ্ছে, তিনি জাতির উপর রাগ করে চলে গেলেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অভিধানের দিক দিয়ে نقدر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, কাবু করা। অর্থাৎ তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন নবী তো দূরের কথা সাধারণ মুসলিমও করতে পারে না। কারণ, এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। [ফাতহুল কাদীর] কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় অর্থ, সংকীর্ণ করা; যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ ﴿اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ﴾ "আল্লাহ্ যার জন্যে জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন।" [সূরা আর-রা'দঃ২৬, অনুরূপ আয়াত আরও দেখুন,

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

অন্ধকারে[১] এ আহ্বান করেছিলেন যে, 'আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি'[২]।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম, আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি[৩]।

সূরা আল-ইসরাঃ ৩০, সূরা আল-কাসাসঃ৮২, সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬২, সূরা আর-রূমঃ৩৭, সূরা সাবাঃ৩৬, সূরা আয-যুমারঃ৫২, সূরা আশ-শূরাঃ১২] যেখানে সর্বসম্মতভাবে অর্থ হচ্ছেঃ সংকীর্ণ করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে, ইউনুস আলাইহিস সালাম মনে করলেন, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। [ফাতহুল কাদীর] তৃতীয় অর্থ, বিচারে রায় দেয়া। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস আলাইহিস সালাম মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ক্রটি ধরা হবে না। তাই আমাকে পাকড়াও করা হবে না।[ইবন কাসীর] মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা, তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

(১) অর্থাৎ মাছের পেটের মধ্য থেকে সেখানে তো অন্ধকার ছিলই, তার উপর ছিল সাগরের অন্ধকার ও রাতের অন্ধকার। [ইবন কাসীর] অথবা মাছের পেটের অন্ধকার, সে মাছের পেট থেকে অপর মাছের পেটের অন্ধকার তার উপর রয়েছে সমুদ্রের অন্ধকার। [ইবন কাসীর] ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস বলেন, তাকে নিয়ে মাছটি সমুদ্রের গভীরে চলে গেলে সেখানে ইউনুস আলাইহিস সালাম পাথরের তাসবীহ শুনতে পেয়ে তাসবীহ পড়ার কথা স্মরণ করলেন। এবং তিনি সেই দো'আটি করলেন। [ইবন কাসীর]

(২) ইউনুস আলাইহিস সালামের দো'আ প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্যে মকবুল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "মাছের পেটে পাঠকৃত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর এই দো'আটি যদি কোন মুসলিম কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেন।" [তিরমিযীঃ ৩৫০৫]

(৩) অর্থাৎ আমরা যেভাবে ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার

৮৯. আর স্মরণ করুন যাকারিয়্যাকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখে দিবেন না, আপনি তো শ্রেষ্ঠ ওয়ারিশ[১] ।'

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾

৯০. অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া, আর তার জন্য তার স্ত্রীকে (গর্ভধারণের) যোগ্যা করেছিলাম । তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট ভীত-অবনত[২] ।

فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾

সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) স্ত্রীকে যোগ্য করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেয়া এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে গর্ভধারণের উপযোগী করা । "সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী আপনিই" মানে হচ্ছে, সন্তান না দিলে কোন দুঃখ নেই । আপনার পবিত্র সত্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট । কারণ আমার জানা আছে যে, আপনারা দ্বীনের জন্য আপনি কাউকে না কাউকে মনোনীত করবেন । যিনি আপনার দ্বীনকে সঠিকভাবে প্রচার করতে পারবে । [ফাতহুল কাদীর] যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম–এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল । তিনি তারই দো'আ করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলেছিলেন যে, পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ । এটা নবীসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয় । আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, ওয়ারিশ বানানোর মালিক তো আপনিই । আপনিই তো দিতে পারেন । আপনার দ্বীন কখনও ধ্বংস হবে না । কিন্তু আমার ইচ্ছা আমার বংশ এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত না হউক । [কুরতুবী; সা'দী]

(২) তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে । এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দো'আর সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে । আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ্ ও ত্রুটির জন্যে ভয়ও করে । ভালো কিছু পাওয়ার আশা তারা করে, আর খারাপ কিছু থেকে বাঁচার আশাও তারা করে । [সা'দী]

وَالَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং স্মরণ করুন সে নারীকে[1], যে নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমরা আমাদের রূহ্[2] ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম সৃষ্টিজগতের জন্য এক নিদর্শন।

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ ﴿٩٢﴾

৯২. নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি---এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর[3]।

---

(১) এখানে মার্‌ইয়াম আলাইহাস সালামের কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে যেভাবে ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা বলা হলো অন্যত্র তদ্রুপ আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও এসেছে, যেমন বলা হয়েছেঃ "আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরী করছি। কাজেই যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে তৈরী করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো তখন (হে ফেরেশতারা !) তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যাবে।" [সূরা সাদঃ ৭১-৭২] আদম আলাইহিসসালামের ব্যাপারে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা যেভাবে বলা হয়েছে তেমনিভাবে ঈসা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ "আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর কালেমা, যা মার্‌ইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে একটি রূহ।" [সূরা আন-নিসাঃ ১৭১] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আর ইমরানের মেয়ে মার্‌ইয়াম, যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, কাজেই ফুঁকে দিলাম আমরা তার মধ্যে আমাদের রূহ।" [সূরা আত-তাহরীমঃ ১২] এ সংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ্ ঈসা আলাইহিসসালাম ও আদমের আলাইহিসসালামের জন্মকে পরস্পরের সদৃশ গণ্য করেন। তাই অন্য সূরায় আল্লাহ্ বলেনঃ "ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র কাছে আদমের মতো, যাকে আল্লাহ্ মাটি থেকে তৈরী করেন তারপর বলেন,"হয়ে যাও" এবং সে হয়ে যায়। [সূরা আলে ইমরানঃ ৫৯] এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে একথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ্ কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে "নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি" শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন। এ রূহের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে সম্ভবত এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেয়াটা অলৌকিক ধরনের। ফলে সম্মানসূচক এ রূহকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের বলে সম্পর্কিত করেছেন, এটি সৃষ্ট রূহ।

(৩) এখানে "তোমরা" শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমস্ত মানুষকে। এর অর্থ হচ্ছে, হে মানবজাতি! তোমরা সবাই আসলে একই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর]

وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।

সপ্তম রুকূ'

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. কাজেই যদি কেউ মুমিন হয়ে সৎকাজ করে তার প্রচেষ্টা অস্বীকার করা হবে না এবং আমরা তো তার লিপিবদ্ধকারী।

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আর যে জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, তার অধিবাসীরা ফিরে আসবে না[১],

---

দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তারা সবাই একই দ্বীন নিয়ে এসেছেন। আর তাদের সেই আসল দ্বীন এই ছিলঃ কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহ্ই মানুষের রব এবং এক আল্লাহ্রই বন্দেগী করা উচিত। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্ম তৈরী হয়েছে সবগুলোই এ দ্বীনেরই বিকৃত রূপ। অন্যত্র রাসূলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "আর আপনাদের এ যে জাতি এ তো একই জাতি এবং আমিই আপনাদের রব; অতএব আমার তাকওয়া অবলম্বন করুন।" [সূরা আল-মুমিনূন: ৫২] সুতরাং যে রাসূলদের কথা বলা হলো, তারা তোমাদের নেতা, তোমাদেরকে তাদেরই অনুসরণ করতে হবে, তাদের হেদায়াতই তোমাদের জন্য পাথেয়। তারা সবাই একই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের পথ একটিই, তাদের রবও একজনই। [সা'দী]

(১) এ আয়াতটির কয়েকটি অর্থ হয়ঃ

একঃ যে জাতির অন্যায় আচরণ, ব্যাভিচার, বাড়াবাড়ি ও সত্যের পথ নির্দেশনা থেকে দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে নেয়া এত বেশী বেড়ে যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তাকে আবার ফিরে আসার ও তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয় না। গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হতে পারে না। [ইবন কাসীর]

দুইঃ যে জনপদ আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের কেউ যদি দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কেয়ামত দিবসের জীবনই হবে। আল্লাহ্র আদালতেই তার শুনানি হবে। [ইবন কাসীর; সা'দী]

তিনঃ এখানে 'হারাম' শব্দটি' শরী'আতগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন

৯৬. অবশেষে যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে মুক্তি দেয়া হবে[1] এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি হতে দ্রুত ছুটে আসবে[2]।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. আর অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হবে, আকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা তো ছিলাম যালেম[3]।'

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের কোন আমল কবুল করা অসম্ভব। [কুরতুবী]

(১) হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম: আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেনঃ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। [মুসলিমঃ ২৯০১] তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন। এ আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে فتحت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখনই এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। সুরা কাহফে ইয়াজুজ, যুরকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আলোচনা হয়েছে।

(২) حدب শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি-বড় পাহাড় কিংবা ছোট ছোট টিলা। [ইবন কাসীর] সূরা কাহফে ইয়াজুজ–মাজুজের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা কোন কোন পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তারা পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়ে যমীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। [ইবন কাসীর]

(৩) তারা নিজেদের গাফলতি বর্ণনা করার পর আবার নিজেরাই পরিষ্কার স্বীকার করবে, নবীগণ এসে আমাদের এ দিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই মূলত আমরা গাফেল ও বেখবর ছিলাম না বরং আমরাই নবীদের কথা না শুনে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করে দোষী ও অপরাধী ছিলাম। এভাবে তারা নিজেদের অপরাধের স্বীকৃতি দিবে, কিন্তু তা তাদের কোন কাজে আসবে না। [ইবন কাসীর]

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮. নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. যদি তারা ইলাহ্ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; আর তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে,

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. সেখানে থাকবে তাদের নাভিশ্বাসের শব্দ(১) এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না;

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. নিশ্চয় যাদের জন্য আমাদের কাছ থেকে পূর্ব থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে(২)।

---

(১) ভয়ংকর গরম, পরিশ্রম ও ক্লান্তিকর অবস্থায় মানুষ যখন টানা টানা শ্বাস বের করতে থাকে সেটাকে বলা হয় "যাফীর"। আর সে শ্বাস টানাকে বলে "শাহীক"। [ইবন কাসীর]

(২) পূর্ববর্তী ৯৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্দন হবে।" দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াত শোনার পর কাফেররা এটা বলতে শুরু করল যে, যদি প্রত্যেক অবৈধ উপাস্যই জাহান্নামে যায় তবে ঈসা আলাইহিসসালাম ও ফেরেশ্তারাও জাহান্নামে যাবে; কারণ অবৈধ ইবাদত তো ঈসা আলাইহিস সালাম ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। তাহলে তারাও কি জাহান্নামে যাবেন? এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [দেখুনঃ মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৮৪-৩৮৫]

এ থেকে জানা যায় যে,যারা দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী করার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাদেরকেই উপাস্য পরিণত করে অথবা যারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর যে দুনিয়ায় তাদের বন্দেগী ও পূজা করা হচ্ছে এবং এ কর্মে তাদের ইচ্ছা ও আকাংখার কোন দখল নেই, তাদের জাহান্নামে যাবার কোন কারণ নেই। কারণ, তারা এ শির্কের জন্য দায়ী নয়।

১০২. তারা সেসবের ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না[1] এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী।

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. মহাভীতি[2] তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এ বলে, 'এ তোমাদের সে দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।'

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. সেদিন আমরা আসমানসমূহকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর[3]; যেভাবে আমরা

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا

---

(১) অর্থাৎ তারা তাদের শরীরে সামান্যতম আগুনের আঁচও পাবে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আগুনের শব্দও পাবে না। যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরও কোন শব্দ তারা পাবে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে আব্বাস বলেনঃ ﴿الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ বা "মহাভীতি" বলে শিঙ্গার ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] যার ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্যে উত্থিত হবে। [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। আবার কারও মতে, মৃত্যুর সময় বোঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে, যখন মানুষকে জাহান্নামের দিকে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। কারও কারও মতে, যখন জাহান্নামীদের উপর আগুন বাস্তবায়ন করা হবে। কারও কারও মতে যখন মৃত্যুকে যবাই করা হবে। [কুরতুবী] তবে দ্বিতীয় ফুঁৎকার হওয়াটাই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেভাবে গুটানো হবে। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন ও আকাশমন্ডলীকে গুটিয়ে নিজের ডান হাতে রাখবেন।" [বুখারীঃ ৪৫৪৩, ৭৪১২ মুসলিমঃ ২৭৮৭] অন্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন, যদি যমীন মুষ্টিবদ্ধ থাকে এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে থাকে তাহলে মানুষ কোথায় থাকবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ "তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে। [মুসলিম:২৭৯১] এক বর্ণনায়

فٰعِلِيْنَ۝

প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; এটা আমার কৃত প্রতিশ্রুতি, আর আমরা তা পালন করবই।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ۝

১০৫. আর অবশ্যই আমরা 'যিকর' এর পর যাবূরে[১] লিখে দিয়েছি যে, যমীনের[২] অধিকারী হবে আমার

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সরিষার একটিদানা পরিমাণ হবে।

(১) زبور শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো زُبُر। এর অর্থ কিতাব। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] দাউদ আলাইহিস সালাম–এর প্রতি নাযিলকৃত বিশেষ কিতাবের নামও যাবুর। এখানে 'যাবূর' বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। কারো কারো মতে ذكر বলে তওরাত আর زبور বলে তওরাতের পর নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র অন্যান্য গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা ইঞ্জীল, যবুর ও কুরআন। আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে ذكر বলে লওহে মাহফুয زبور বলে নবীদের উপর নাযিলকৃত সকল ঐশী গ্রন্থই বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে এখানে যমীন বলে জান্নাতের যমীন বোঝানো হয়েছে। কুরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে "তারা প্রবেশ করে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ যমীনের; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছে বসবাস করব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!" [সূরা আয-যুমারঃ৭৪] এটাও ইঙ্গিত যে, যমীন বলে জান্নাতের যমীন বোঝানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ার যমীনের মালিক তো মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের যমীনের মালিক হওয়ার কথাটি কেয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কেয়ামতের পর জান্নাতের যমীনই তো বাকী থাকবে।

তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে যমীন বলে বর্তমান সাধারণ দুনিয়ার যমীন ও জান্নাতের যমীন উভয়টিই বোঝানো হবে। জান্নাতের যমীনের মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগন হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার যমীনের মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কুরআনের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছেঃ "যমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে সেটার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা আল-আরাফঃ ১২৮] অন্য

যোগ্য বান্দাগণই।

১০৬. নিশ্চয় এতে রয়েছে 'ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু।

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوۡمٍ عَٰبِدِينَ ۝١٠٦

১০৭. আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি[১]।

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ ۝١٠٧

আয়াতে এসেছেঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন" [সূরা আন-নূরঃ ৫৫] আরও এক আয়াতে আছেঃ "নিশ্চয় আমরা আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কেয়ামতের দিন সাহায্য করব।"[সূরা গাফেরঃ ৫১] ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদংশ অধিকারভূক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটল ছিল। [ইবন কাসীর]

(১) العالمين শব্দটি عالم শব্দের বহুবচন। মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার জন্যেই রহমতস্বরূপ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত"। [ত্বাবরানী, মু'জামুল আওসাত্বঃ ৩০০৫, আস-সাগীরঃ ১/১৬৮, নং২৬৪, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ১/৯১ নং ১০০, মুসনাদে শিহাবঃ ১১৬০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৬৯, ৩০৫, মারফু' সনদে আর সুনান দারমী, হাদীস নং ১৫ মুরসাল সহীহ সনদে] তাছাড়া যদি আখেরাতই সঠিক জীবন হয় তাহলে আখেরাতের আহ্বানকে প্রতিষ্ঠিত করতে কুফর ও শির্ককে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবেলায় জেহাদ করাও সাক্ষাত রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। যারা রাসূলের উপর ঈমান আনবে ও তার কথায় বিশ্বাস করবে তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান হবে, আর যারা ঈমান আনবে না তারা দুনিয়াতে পূর্ববর্তী উম্মতদের মত ভূমিধ্বস বা ডুবে মরা থেকে অন্তত নিরাপদ থাকবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় রহমত। [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, আমরা আপনাকে সবার জন্যই রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু এটা তাদের জন্যই যারা ঈমান আনবে এবং আপনাকে মেনে নিবে। কিন্তু যারা আপনার কথা মানবে না, তারা দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন, "আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ঘরে -- জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল!" [সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯] অন্য আয়াতে

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. বলুন, 'আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?'

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনি বলবেন, 'আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে[১], আমি জানি না, তা কি খুব কাছে, নাকি তা দূরে।

إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. নিশ্চয় তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর[২]।

وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

১১১. 'আর আমি জানি না হয়ত এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা

কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বলুন, 'এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য।' আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন এদের (অন্তরের) উপর অন্ধত্ব তৈরী করবে। তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান হতে।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪৪] তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে অভিশাপকারী করে পাঠানো হয়নি, আমাকে রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে।" [মুসলিম: ২৫৯৯]

(১) অর্থাৎ ইসলামের বিজয় ও কুফরির পরাজয়। এ সময়টি কখন আসবে সেটা আমি জানি না। অথবা আয়াতের অর্থ, আমি জানি না কখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ এসে যাবে। তখন আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। অথবা আয়াতে আখেরাতের পাকড়াও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিনের সময় কেউ জানে না। কোন পাঠানো নবী বা কোন ফেরেশতাও তা জানে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় কুফরি, বিরোধিতাপূর্ণ কথা, ষড়যন্ত্র সবই আল্লাহ জানেন। চাই তা প্রকাশ্যে বল বা গোপনে বল। কারণ তিনি গায়বের খবর জানেন। [ফাতহুল কাদীর] তোমাদের শির্কের শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। [কুরতুবী] সুতরাং এমন মনে করো না যে, এসব বাতাসে উড়ে গেছে এবং এসবের জন্য আর কখনো জবাবদিহি করতে হবে না।

এবং জীবনোপভোগ কিছু কালের জন্য[১] ।'

১১২. রাসূল বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিন, আর আমাদের রব তো দয়াময়, তোমরা যা সাব্যস্ত করছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই ।'

قٰلَ رَبِّ احۡكُمۡ بِالۡحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحۡمٰنُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوۡنَ ﴿۱۱۲﴾

(১) অর্থাৎ এ বিলম্বের কারণে তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছো। তোমাদের সামলে উঠার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেবার এবং দ্রুততা অবলম্বন করে সংগে সংগেই পাকড়াও না করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছো। তিনি তো তোমাদেরকে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন এবং দেখতে চাচ্ছেন যে তোমরা কি কর। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

২২- সূরা আল-হাজ্জ(১), ৭৮ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ الْحَجِّ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর(২); নিশ্চয়

(১) এই সূরাটি মক্কায় নাযিল না মদীনায় নাযিল, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিকসংখ্যক তাফসীরবিদগণ বলেনঃ এই সূরাটি মিশ্র। এতে মক্কায় নাযিল ও মদীনায় নাযিল উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এই উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাস্‌সির এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য উল্লেখ করে বলেনঃ এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে নাযিল হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহ্‌কাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ্ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে নাযিলের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। [কুরতুবী]

(২) হাদীসে এসেছে, সফর অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম তার আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেনঃ এই আয়াতে উল্লেখিত কেয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে সম্বোধন করে বললেনঃ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম 'আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞেস করবেনঃ কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বললেনঃ এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেনঃ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়।

شَيۡءٌ عَظِيۡمٌ ① | কেয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার(১)!

[তিরমিযিঃ ৩১৬৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩৫, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ১/২৮, সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৭৩৫৪]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "এবং শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন তারা ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সবাই মূৰ্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।" [সূরা আয্ যুমারঃ ৬৮] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কেয়ামতের দু'টি পর্যায় রয়েছেঃ এক) ইস্রাফিল কর্তৃক প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। ঐ ফুঁক দেয়া মাত্রই সবকিছু কম্পিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে মহা ধ্বংসের কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। দুই) ইস্রাফিল কর্তৃক দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। ঐ ফুঁক দেয়ার সাথে সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌র সামনে নীত হবে। তখন হাশরের মাঠে সবাই জমায়েত হবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভূকম্পন কখন হবে অর্থাৎ কেয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেনঃ কেয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে ভূকম্পন হবে এবং এটা কেয়ামতের প্রাথমিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে বসতকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। যেমনঃ "যখন সিংগায় এক ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙে দেয়া হবে তখন সে বিরাট ঘটনাটি ঘটে যাবে।" [সূরা আল- হাক্কাহ ১৩-১৫] "যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো?" [সূরা আয-যালযালাহ্ ১-৩] "যেদিন প্রকম্পনের একটি ঝট্‌কা একেবারে নাড়িয়ে দেবে এবং এরপর আসবে দ্বিতীয় ঝট্‌কা। সেদিন অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং দৃষ্টি ভীতবিহ্বল হবে।" [সূরা আন- নাযিআত ৫-৯] "যে দিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুঁড়ো হয়ে ধূলির মতো উড়তে থাকবে।" [সূরা আল ওয়াকি'আহ, ৪-৬] "যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদেরকে বুড়া করে দেবে এবং যার প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে?" [সূরা আল মুয্যাম্মিল, আয়াত ১৭-১৮] এ মতটি বেশ কিছু তাবে'য়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অপর একদল আলেমের মতে, এখানে হাশরের মাঠে যখন একত্রিত করা হবে তখনকার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে সুস্পষ্ঠভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে যখন তার সন্তানদের থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা করতে বলবেন, তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে। [বুখারীঃ ৩১৭০, মুসলিমঃ ২২২] আদম 'আলাইহিস্

يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّآ أَرۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ ۝٢

২. যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে(১); মানুষকে দেখবেন নেশাগ্রস্তের মত, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন(২)।

সালাম-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। আর আয়াতের তাফসীরে এটাই সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। তবে কোন কোন সত্যনিষ্ঠ আলেম বলেনঃ উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়া বহু সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দু'টিই উদ্দেশ্য হতে পারে; কারণ দু'টিই ভয়াবহ ব্যাপার।

(১) কেয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কেয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। কোন কোন মুফাসসির বলেন, مرضعة এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন কার্যত সে দুধ পান করাতে থাকে এবং শিশু তার স্তন মুখের মধ্যে নিয়ে থাকে। [ইবন কাসীর] কাজেই এখানে যে ছবিটি আঁকা হয়েছে সেটি হচ্ছে, যখন কেয়ামতের সে কম্পন শুরু হবে, মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে করাতে ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি হলো, একথা কোন মায়ের মনেও থাকবে না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] পক্ষান্তরে যদি এ ঘটনা হাশর-নশরের পরে হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা কারো কারো মতে এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কেয়ামতের দিন সে তদাবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। তারা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর কথা চিন্তাও করবে না। [কুরতুবী]

(২) একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের উপর দলীল প্রমাণাদি পেশ করা। তাই পরবর্তী আয়াতে সেদিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অথবা উদ্দেশ্য তাদেরকে সেদিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করা ও নেক কাজ করার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। [কুরতুবী]

৩. মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক না জেনে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে[১] এবং সে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝

৪. তার সম্বন্ধে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তাকে অভিভাবক বানাবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

৫. হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক তবে অনুধাবন কর---আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি[২] মাটি হতে[৩], তারপর

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ

(১) এখানে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে বিতর্কের উপর আলোচনা করা হচ্ছে তা হচ্ছে আখেরাতে বিচারের জন্য তাদেরকে মৃত্যু ও মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত করতে পারেন কি না? আল্লাহ্ এখানে তাদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছেন, যারা আল্লাহ্ যা তাঁর নবীর উপর নাযিল করেছেন তার অনুসরণ না করে, শয়তানের দেয়া পথের অনুসরণ করে পুনরুত্থান ও আল্লাহ্র শক্তিকে অস্বীকার করছে। আর সাধারণত: যারাই রাসূলের উপর আল্লাহ্র নাযিলকৃত বাণী ও সুস্পষ্ট হকের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে, তারাই বাতিলপন্থী নেতা, বিদ'আতের প্রতি আহ্বানকারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতটিকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থানের উপর প্রথম প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। প্রথম সৃষ্টি যার পক্ষে করা সম্ভব তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় সৃষ্টি কিভাবে কঠিন হবে? প্রথম সৃষ্টিই প্রমাণ করছে যে, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। [ইবন কাসীর] আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ বলেনঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশ্তা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয়ঃ (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে। [বুখারীঃ ২৯৬৯, মুসলিমঃ ২৬৪৩]

(৩) এর অর্থ হচ্ছে মানুষ নামের প্রজাতির সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালাম থেকে।

مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

শুক্র[১] হতে, তারপর 'আলাকাহ'[২] হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হতে[৩]--

তাঁকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "মানুষের সৃষ্টি শুরু করেন মাটি থেকে তারপর তার বংশ-ধারা চালান একটি নির্যাস থেকে যা বের হয় তুচ্ছ পানির আকারে।" [সূরা আস্ সাজদাহ, ৭-৮]

(১) নুতফা শব্দের অর্থ শুক্র বা বীর্য। সাধারণতঃ নুতফা বলা হয়, অল্প পানিকে। [কুরতুবী] মাটি থেকে আদম সৃষ্টির পর তার বংশধারা জারি রাখা হয়েছে পানির মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে" [সূরা আল-মুমিনূন: ১২] অন্য আয়াতে বলেন, "তারপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।" [সূরা আস-সাজদাহ: ৮]

(২) আলাকা শব্দের অর্থ শক্ত রক্ত, ঘন তাজা রক্ত। বা প্রচণ্ড লাল বর্ণ [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] মানব সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে যখন শুক্রটি মহিলার গর্ভাশয়ে স্থির হয়ে যায়, তখন সেটা চল্লিশ দিন এ অবস্থায় থাকে। এর সাথে যা জমা হবার তা জমা হয়। তারপর সেটি একটি পর্যায়ে আল্লাহ্‌র হুকুমে লাল তাজা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এভাবে সেটি চল্লিশ দিন অতিবাহিত করে। তারপর সেটি পরিবর্তিত হয়ে একখণ্ড গোস্তের টুকরোতে পরিণত হয়ে যায়। তখন তাতে কোন রূপ বা সূরত থাকে না। তারপর সেটি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তখন তা থেকে মাথা, দু'হাত, বুক, পেট, দুই রান, দুই পা এবং বাকী অংগ-প্রত্যঙ্গসমূহ। কখনও কখনও সেটি সূরত গ্রহণ করার আগেই গর্ভপাত ঘটে যায়, আবার কখনও পূর্ণ অবয়ব ঘটনের পর সেটির গর্ভপাত হয়ে যায়। [ইবন কাসীর]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেঃ يَارَبِّ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয়া হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾ বলা হয়, তবে ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করেঃ ছেলে না মেয়ে, হতভাগা না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জবাব তখনই ফিরিশ্‌তাকে বলে দেয়া হয়। [ইবনে জরীর, ও ইবনে আবী হাতিম] উল্লেখিত শব্দদ্বয়ের তাফসীর থেকে এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾। আর যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্‌সির ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾ ও ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ এর এরূপ তাফসীর করেন যে, যে

ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٥

যাতে আমরা বিষয়টি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করি। আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি[১], পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও[২]। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে[৩] প্রত্যাবৃত্ত

শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে ﴿مُّخَلَّقَةٍ﴾ অর্থাৎ পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম, সে ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তি দান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। [ইবন কাসীর]

(২) أشد শব্দটির অর্থ বুদ্ধি, শক্তি ও ভাল-মন্দ পৃথকীকরণে পূর্ণতা। কারও কারও মতে, ত্রিশ থেকে চল্লিশ বয়সের মধ্যে। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়। [ইবন কাসীর]

(৩) এটা সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বয়স থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দো'আ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ من الْجُبْنِ وَأَعوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ العُمُرِ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدّنْيا وَأَعوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبر 'হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি ভীরুতা থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি। অনুরূপভাবে হীনতম বয়সে উপণীত হওয়া থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তদ্রুপ আমি দুনিয়ার ফেতনায় নিপতিত হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাছাড়া আমি কবরের শাস্তি থেকেও আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' [বুখারীঃ ৫৮৯৩] এমন বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের নিজের শরীরের ও অংগ-প্রত্যংগের কোন খোঁজ-খবর থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে জ্ঞান দিতো বুড়ো হয়ে সে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাকে শিশুদের অবস্থার সাথে তুলনা করা

করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না। আর আপনি ভূমিকে দেখুন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমরা পানি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সব ধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ(১);

৬. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ই সত্য(২) এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান;

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

৭. এবং এ কারণে যে, কেয়ামত আসবেই,

وَأَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّٰهَ

যায়। যে জ্ঞান,জানা শোনা, অভিজ্ঞতা ও দুরদর্শিতা ছিল তার গর্বের বস্তু তা এমনই অজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, একটি ছোট ছেলেও তার কথায় হাসতে থাকে। এভাবে বান্দার শক্তি দু'টি দুর্বল অবস্থা ঘিরে আছে। এক.ছোট কালের দুর্বলতা, দুই. বৃদ্ধাবস্থার দুর্বলতা। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম।" [সূরা আররূম: ৫৪] [সা'দী]

(১) আয়াতের এ অংশে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থানের উপর দ্বিতীয় আরেকটি প্রমাণ পেশ করছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যেভাবে তিনি মৃত ভূমিকে জীবিত করতে পারেন, যে যমীনে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না। তারপর তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করে তিনি জীবনের উন্মেষ ঘটান, সেভাবে তাঁর পক্ষে পুনরুত্থান ঘটানো কোন কঠিন বিষয় নয়।

(২) এ ধারাবাহিক বক্তব্যের মধ্যে এ বাক্যাংশটির তিনটি অর্থ হয়। এক, আল্লাহই সত্য এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের কোন সম্ভাবনা নেই, তোমাদের এ ধারণা ডাহা মিথ্যা। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] দুই, আল্লাহ, তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তিন, তিনি কোন খেলোয়াড় নন যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য খেলনা তৈরী করেন এবং তারপর অযথা তা ভেঙ্গে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বরং তিনি সত্য তাঁর যাবতীয় কাজ গুরুত্বপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক ও বিজ্ঞানময়। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডে হক ও যথার্থ। তিনি কিয়ামত যথার্থ কারণেই সংঘটিত করবেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] বস্তুত: এখানে হক শব্দের অর্থ হচ্ছে, এমন অস্তিত্ব, যার কোন পরিবর্তন নেই, অস্থায়ী নয়। [ফাতহুল কাদীর]

يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে আছে তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন[১]।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

৮. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান[২], না আছে পথনির্দেশ[৩], না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব[৪]।

---

(১) উপরের আয়াতগুলোতে মানুষের জন্মের বিভিন্ন পর্যায়, মাটির উপর বৃষ্টির প্রভাব এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকে পাঁচটি সত্য নির্ণয়ের প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সত্যগুলো হচ্ছেঃ একঃ আল্লাহই সত্য। দুইঃ তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনঃ তিনি সর্বশক্তিমান। চারঃ কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবেই। পাঁচঃ যারা মরে গেছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন।

(২) অর্থাৎ ব্যক্তিগত জ্ঞান, যা সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। [ফাতহুল কাদীর] তবে জ্ঞান বলতে ব্যাপক জ্ঞান বুঝাই যথার্থ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা কোন যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, অথবা কোন জ্ঞানের অধিকারীর পথনির্দেশনা দানের মাধ্যমে লাভ করা যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ এমন জ্ঞান, যা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব থেকে লাভ করা যায়। এ আয়াতে তর্কশাস্ত্রের বিশেষ কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। কোন তর্ক শুরুর পূর্বে সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ ধরনের জ্ঞানের তিনটি উৎস থাকে। এক. পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। যে সমস্ত কাফের ও মুশরিক আল্লাহ্ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করছে তারা যদি দাবী করে যে, আমরা যা বলছি অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত না হওয়া, পুনরুত্থান না ঘটা, একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতে বাধ্য না হওয়া আমাদের সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ফল তবে তারা যেন তা পেশ করে। কিন্তু তারা তা কখনো পেশ করতে পারবে না বরং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ তাদের দাবীর বিপরীতে আল্লাহ্র যাবতীয় ওয়াদাকে সত্য বলে প্রমাণ করছে। দুই. দ্বিতীয় যে ধরনের জ্ঞান থাকলে তর্ক করা যায় তা হলো, গ্রহণযোগ্য যুক্তি বা কোন জ্ঞানের অধিকারীর পথনির্দেশ প্রাপ্ত হলে। কাফের ও মুশরিকরা যারা তাওহীদ বা আখেরাত সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল তারা তাদের মতের সমর্থনে এ ধরনের কিছুও পেশ করতে ব্যর্থ ছিল। তিন. তৃতীয় যে ধরনের প্রমাণ যুক্তি-তর্কে পেশ করা হয় তা হলো, পূর্ববর্তী কোন কিতাবলব্ধ জ্ঞান। কাফের মুশরিকদের তাওহীদ ও আখেরাত বিরোধী কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকেও কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। মোটকথা: তাদের তর্কের সপক্ষে কোন সুস্থ বিবেকের প্রমাণ যেমন নেই, তেমনি সহীহ ও স্পষ্টভাষী কোন কিতাব বা নবী-রাসূলদের পেশকৃত জ্ঞানও নেই। তারা শুধু মত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। [ইবন কাসীর]

৯. সে বিতণ্ডা করে অহংকারে ঘাড় বাঁকিয়ে[(১)] লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্য[(২)]। তার জন্য লাঞ্ছনা আছে দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনে আমরা তাকে আস্বাদন করাব দহন যন্ত্রণা।

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩

১০. 'এটা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলুমকারী নন।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠

---

(১) عطف শব্দের অর্থ পার্শ্ব। [ফাতহুল কাদীর] এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বোঝানো হয়েছে। এর তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ এক, মুর্খতাপ্রসূত জিদ ও হঠকারিতা। দুই, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা। তিন, যে ব্যক্তি বুঝায় ও উপদেশ দান করে তার কথায় কর্ণপাত না করা। এখানে সব প্রকারই উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ হকের দিকে আহ্বান করলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঘাঁড় বাঁকিয়ে চলে যায়, তাকে যে হকের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে অহংকারবশত: তা থেকে বিমুখ হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।" [সূরা আন-নিসা: ৬১] [ইবন কাসীর] কুরতুবী বলেন, তর্কের সময় সে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তার কথা-বার্তা ও দলীল-প্রমাণাদির মধ্যে গভীর দৃষ্টি দেয়া থেকেও বিরত থাকে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে এটা শুনতে পায়নি" [সূরা লুকমান: ৭] অন্যত্র এসেছে, "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন' তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়" [সূরা আল-মুনাফিকূন: ৫] আরও এসেছে, "আর আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়।" [সূরা আল-ইসরা: ৮৩] অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ৩৩]

(২) অর্থাৎ তারা শুধু নিজেরাই পথভ্রষ্ট নয় বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। [ফাতহুল কাদীর] এখানে আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, সে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা না করলেও তার কর্মকাণ্ডের ফলাফল তা-ই দাঁড়ায়। [ইবন কাসীর]

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে[১]; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্ব চেহারায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি[২]।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

(১) অর্থাৎ দ্বীনী বৃত্তের মধ্যখানে নয় বরং তার এক প্রান্তে বা কিনারায় অথবা অন্য কথায় কুফর ও ইসলামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করে। অথবা সন্দেহে দোদুল্যমান থাকে। [ইবন কাসীর] যেমন কোন দো-মনা ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি দেখে সেনাদল বিজয়লাভ করছে তাহলে তাদের সাথে মিলে যায় আর যদি দেখে পরাজিত হচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে। এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের মানসিক গঠন অপরিপক্ক, আকীদা-বিশ্বাস নড়বড়ে এবং যারা প্রবৃত্তির পূজা করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে লাভের শর্তে। তাদের ঈমান এ শর্তের সাথে জড়িত হয় যে, তাদের আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দ্বীন তাদের কাছে কোন স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং দুনিয়াতে তাদের কোন ইচ্ছা ও আশা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। এসব হলে তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তার দ্বীন তাদের কাছে খুবই ভালো। কিন্তু যখনই কোন আপদ বালাই নেমে আসে অথবা আল্লাহর পথে কোন বিপদ, কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হতে হয় কিংবা কোন আকাংখা পূর্ণ হয় না তখনই আর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, রাসূলের রিসালাত ও দ্বীনের সত্যতা কোনটার উপরই তারা নিশ্চিন্ত থাকে না। এরপর তারা লাভের আশা ও লোকসান থেকে বাঁচার জন্য শির্ক করতে পিছপা হয় না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকেরাও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলতঃ এই দ্বীন ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলতঃ এই দ্বীন মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে দ্বীন ত্যাগ করে বসে। [বুখারীঃ ৪৭৪২]

(২) অর্থাৎ এ দো-মনা মুসলিম নিজের দুনিয়ার স্বার্থও লাভ করতে পারে না এবং আখেরাতেও তার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সে তো আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করে আছে। [ইবন কাসীর] এভাবে সে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারায়।

১২. সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারে না আর যা তার উপকারও করতে পারে না; এটাই চরম পথভ্রষ্টতা!

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾

১৩. সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই তার উপকারের চেয়ে বেশী নিকটতর[১]। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর[২]!

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

---

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, মূলত ও যথার্থই তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। এ আয়াতে তাদের ক্ষতিকে উপকারের চেয়ে অধিক নিকটতর বলা হয়েছে। এর কারণ দু'টি হতে পারে। এক. এখানে অধিক বলে 'সম্পূর্ণরূপে' বোঝোনো হয়েছে। অথবা তর্কের খাতিরে বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র এ ধরনের ব্যবহার এসেছে, "হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।" [সূরা সাবা: ২৪][ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ পূর্ববর্তী যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না, তারা হচ্ছে মূর্তি ও প্রতিমা। আর এ আয়াতে ঐ সমস্ত মাবুদদের কথা বলা হচ্ছে যারা জীবিত অবস্থায় তাদের যারা ইবাদাত করে তাদের কোন কোন উপকার করতে পারে। যেমন, তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে ভরে দিতে পারে। তাদের কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে দিতে পারে। যেমন ফির'আউন। যারা তার ইবাদাত করত, হয়ত সে তাদের কোন স্বার্থ হাসিল করে দিত। সে জন্যই এখানে من শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিবেকসম্পন্নদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর পূর্ববর্তী আয়াতে ما শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিবেকহীন মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট। [আদওয়াউল বায়ান] এতো গেল দুনিয়ার ব্যাপার কিন্তু আখেরাতে তার যে ক্ষতি হবার সেটা নিঃসন্দেহ ও সম্পূর্ণ দৃঢ় সত্য। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মানুষ বা শয়তান যে-ই হোক না কেন, যে তাকে এ পথে এনেছে সে নিকৃষ্টতম কর্মসম্পাদক ও অভিভাবক এবং নিকৃষ্টতম বন্ধু ও সাথী। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে সাহায্যকারী ও বন্ধু বানিয়েছে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে যারা সাহায্যকারী বানিয়েছে সে গুলো কতই না নিকৃষ্ট! [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, সে লোকটি কতই না খারাপ ও নিকৃষ্ট যে দোদুল্যমান অবস্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদাত করেছে। [তাবারী; ইবন কাসীর] অথবা সে কাফের আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী বানিয়েছিল কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলবে, তোমরা কত নিকৃষ্ট বন্ধু। [ফাতহুল কাদীর]

১৪. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত(১); নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা-ই করেন(২) ।

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

১৫. যে কেউ মনে করে, আল্লাহ্ তাকে কখনই দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রশি বিলম্বিত করার পর কেটে দিক, তারপর দেখুক তার এ কৌশল তার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না(৩) ।

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

---

(১) অর্থাৎ যাদের অবস্থা উল্লেখিত মতলবী, ধান্দাবাজ, দো-মনা ও দৃঢ় বিশ্বাসহীন মুসলমানের মতো নয় বরং যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুব ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতকে মেনে নেবার ফায়সালা করে তারপর ভালো মন্দ যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে হোক এবং বিপদের পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ুক বা বৃষ্টিধারার মতো পুরষ্কার ঝরে পড়ুক সর্বাবস্থায় দৃঢ়পদে সত্যের পথে এগিয়ে চলে। তারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, খারাপ কাজ থেকে দূরে থেকেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের সেই উঁচু বাগ-বাগিচার ওয়ারিশ বানিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। দুনিয়ায় বা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তিনি যাকে যা চান দিয়ে দেন এবং যার থেকে যা চান ছিনিয়ে নেন। তিনি দিতে চাইলে বাধা দেবার কেউ নেই। না দিতে চাইলে আদায় করারও কেউ নেই। যেহেতু তিনি কাউকে হিদায়াত করেছেন আর কাউকে পথভ্রষ্ট করেছেন তাই আয়াতের শেষে বলেছেন, "তিনি যা ইচ্ছে তা করেন।" [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু মত হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছেঃ
একঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে ছাদের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক। [ইবন কাসীর]
দুইঃ আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন, এর অর্থ, যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে কোন দড়ির সাহায্যে আকাশে যাবার ও সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক। [ইবন কাসীর]

১৬. আর এভাবেই আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে তা নাযিল করেছি; আর নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

১৭. নিশ্চয় যারা[1] ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী[2],

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ

তিনঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে গিয়ে অহীর সূত্র কেটে দেবার ব্যবস্থা করুক। [আদওয়াউল বায়ান]

চারঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে গিয়ে তার রিযিক বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক। [তাবারী, মুজাহিদ থেকে]

পাঁচঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে নিজের গৃহের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক। কারণ, যে জীবনে আল্লাহ্র সাহায্য নেই সে জীবনে কল্যাণ নেই। [তাবারী; কুরতুবী]

(১) এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতায় নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল, যারা আকীদা-বিশ্বাসে দোদুল্যমান থাকবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কি অবস্থা? তাই এ আয়াতে বিশ্বের যাবতীয় মূল ধর্মাবলম্বীদের আলোচনা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র বিধান জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) প্রাচীন যুগে সাবেয়ী নামে দু'টি সম্প্রদায় সর্বজন পরিচিত ছিল। এদের একটি ছিল ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুসারী। তারা ইরাকের উচ্চভূমিতে বিপুল সংখ্যায় বসবাস করতো। ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুগামী হিসেবে তারা মাথায় পানি ছিটিয়ে ধর্মান্তরিত হবার পদ্ধতি মেনে চলতো। তারকা পূজারী দ্বিতীয় দলের লোকেরা নিজেদের শীশ ও ইদরিস আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করতো। তারা মৌলিক পদার্থের উপর গ্রহের এবং গ্রহের উপর ফেরেশতাদের শাসনের প্রবক্তা ছিল। হার্রান ছিল তাদের কেন্দ্র। ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল। এ দ্বিতীয় দলটি নিজেদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার কারণে বেশী খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু এখানে প্রথম দলটির কথা বলা হয়েছে এ সম্ভাবনাই প্রবল। বর্তমানে ইরাকে এ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে তাদের অনেকেই বর্তমানে প্রচণ্ডতম বিভ্রান্তি-মূলক আকীদায় বিশ্বাসী। [বিস্তারিত দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস]

وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

নাসারা ও অগ্নিপূজক[১] এবং যারা শির্ক করেছে[২] কেয়ামতের দিন[৩] আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর

(১) অর্থাৎ ইরানের অগ্নি উপাসকগণ, যারা আলোক ও অন্ধকারের দু'জন ইলাহর প্রবক্তা ছিল এবং নিজেদেরকে যরদশ্তের অনুসারী দাবী করতো। মায্দাকের ভ্রষ্টতা তাদের ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সাংঘাতিকভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ আরব ও অন্যান্য দেশের মুশরিকবৃন্দ, যারা উপরের বিভিন্ন দলীয় নামের মতো কোন নামে আখ্যায়িত ছিল না। কুরআন মজীদ তাদেরকে অন্যান্য দল থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য "মুশরিক" ও "যারা শির্ক করেছে" ধরনের পারিভাষিক নামে স্মরণ করেছে। অবশ্য মুমিনদের দল ছাড়া বাকি সবার আকীদা ও কর্মধারায় শির্ক অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু শির্কের প্রধান দর্শনীয় বিষয় হচ্ছে, মূর্তিপুজা। উপরোক্ত ইয়াহূদী, নাসারা, সাবেয়ী, মাজূস এরা কেউ মূর্তিপূজা করে না। মূর্তিপূজার শির্ক ব্যতীত সকল শির্কই তাদের মধ্যে আছে। তাই মূর্তিপুজার শির্কের উল্লেখ আলাদাভাবে করা হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) অর্থাৎ মানুষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে যে মত বিরোধ ও বিবাদ রয়েছে এ দুনিয়ায় তার কোন ফায়সালা হবে না। তার ফায়সালা হবে কেয়ামতের দিন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] সেখানে তাদের মধ্যে কারা সত্যপন্থী এবং কারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়া হবে। তারপর যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কেননা আল্লাহ্ তাদের কাজ দেখছেন, তাদের কথাবার্তা সংরক্ষণ করছেন। তাদের গোপন ভেদ জানেন, তাদের মনের গোপন তথ্য সম্পর্কেও তিনি অবগত। [ইবন কাসীর]

(৪) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জন্য এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। এ আয়াতে মোট ছয়টি ধর্মনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদি পৃথিবীর ধর্মসমূহের মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে তাদেরকে এ ছয়টি মৌলিক ধর্মমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে পাব। আর সে জন্যই আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: "দ্বীন হলো ছয়টি তন্মধ্যে একটি আল্লাহ্র সেটা হলো ইসলাম। আর বাকী পাঁচটি শয়তানের"। [তাফসীর তাবারী:১৭/২৭, রাগায়েবুল ফুরকান ১৭/৭৪, ইবনুল কাইয়্যেমঃ হিদায়াতুল হায়ারা, পৃ.১২, মাদারেজুসসালেকীন ৩/৪৭৬] বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত হলো: ১। ইয়াহূদী, ২। সাবেয়ী, ৩। নাসারা, ৪। অগ্নি উপাসক। এ চারটি সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়। এদের অনেকেই নিজেদেরকে আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে এবং কোন কোন নবীর অনুসারী হওয়ার

সম্যক প্রত্যক্ষকারী ।

১৮. আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে যারা আছে আসমানসমূহে ও যারা আছে যমীনে, আর সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু[১] এবং সিজ্‌দা করে মানুষের

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن

দাবী করে। এ চারটি সম্প্রদায়ের বাইরে যারা আছে তারা এত পথ ও মতে বিভক্ত যে, তাদেরকে মৌলিকভাবে কোন একটি পরিচয়ে নিবন্ধন করতে হলে এটাই বলতে হবে যে, এরা মুশরিক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচটি প্রধান ধর্মমতের কথা উল্লেখ করে বাকীদের একক পরিচয় এভাবে দিলেন যে, "আর যারা শির্ক করেছে"। এতে করে পৃথিবীর যাবতীয় মুশরিক যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সবই একই কাতারে মুশরিক হিসেবে শামিল হয়ে যাবে।[এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-হিন্দুসিয়্যাহ ওয়া তাআসসুরু বা'দিল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাতি বিহা]

(১) সমগ্র সৃষ্টজগত স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। কারো কারো মতে এখানে সিজ্‌দা করার দ্বারা আনুগত্য করা বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার- (এক) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, জীবিত, মৃত, জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়।এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (দুই) সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী মেনে চলা। আয়াতে এ প্রকার আনুগত্যই বোঝানো হয়েছে। আসমান যমীনে যত কিছু আছে যেমন ফেরেশতা, যাবতীয় জীব-জন্তু সবাই আল্লাহকে সিজদা করে বা তাঁর আনুগত্য করে। অনুরূপভাবে সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও সিজদা করে। সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহকে আলাদাভাবে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত এ গুলোর ইবাদাত করা হয়েছিল, তাই জানিয়ে দেয়া হলো যে, তোমরা এদের পূজা কর, অথচ এরা আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করে। অন্য আয়াতে সেটা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করো না, চাঁদকেও নয় ; আর সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন , যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত কর।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৭] [ইবন কাসীর] যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে তো বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআনুল কারীমের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্টবস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কম-বেশী

মধ্যে অনেকে[১]? আবার অনেকের | مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩

এগুলো বিদ্যমান আছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণতঃ অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না" [সূরা আল-ইসরা: ৪৪] তাছাড়া সূর্য আরশের নিচে সিজদা করার কথা হাদীসে এসেছে। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল বেশী জানেন। তিনি বললেন, এটা যায় তারপর আরশের নিচে সিজদা করে। অতঃপর অনুমতি গ্রহণ করে। অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন তাকে বলা হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।' [বুখারী: ৩১৯৯] আবুল আলীয়া বলেন, আকাশের যত তারকা আছে, সূর্য ও চাঁদ সবই যখন ডুবে তখন আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করে, যতক্ষণ সেগুলোকে অনুমতি না দেয়া হয়, ততক্ষণ সেগুলো ফিরে আসে না। তারপর তাদের উদিত হওয়ার স্থানে উদিত হয়। আর পাহাড় ও গাছের সিজদা হচ্ছে ডানে ও বামে তাদের ছায়া পড়া। [ইবন কাসীর] কাজেই আলোচ্য আয়াতে সে আনুগত্যকে সিজ্‌দা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানব জাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্তু স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সিজ্‌দা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে।

তবে মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। এ জন্য তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে- (এক) মুমিন, অনুগত ও সিজ্‌দাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাধ্য ও সিজ্‌দার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সিজ্‌দার তাওফীক না দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। [সা'দী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত পড়ে (এবং সিজদা করে), শয়তান তখন দূরে গিয়ে কাঁদতে থাকে। সে বলতে থাকে, আদম সন্তানকে সিজদা করতে বলা হয়েছে সে সিজদা করেছে, তার জন্য নির্ধারিত হলো জান্নাত। আর আমাকে সিজদা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আর আমি তা করতে অস্বীকার করেছি, ফলে আমার জন্য নির্ধারিত হলো জাহান্নাম।' [মুসলিম: ৮১] এ আয়াতটি সিজদার আয়াত। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'সূরা আল-হজ্জে দু'টি সাজদাহ রয়েছে।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩৪৭২]

(১) অর্থাৎ এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা নিছক বাধ্য হয়েই নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, সানন্দে ও আনুগত্যশীলতা সহকারেও তাঁকে সিজদা করে। [ইবন কাসীর] পরবর্তী বাক্যে

প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি[১]। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন[২] তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন।

১৯. এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ[৩], তারা

هٰذٰنِ خَصۡمٰنِ اخۡتَصَمُوۡا فِیۡ رَبِّهِمۡ ۫ فَالَّذِیۡنَ

তাদের মোকাবিলায় মানব সম্প্রদায়ের অন্য যে দলের কথা বলা হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর সামনে মাথা নত হতে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে। [ইবন কাসীর] কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টির মতো তারাও প্রাকৃতিক আইনের বাঁধন মুক্ত নয়। কিন্তু তারাও ইচ্ছে করলেই যা ইচ্ছে তা করে বেড়াতে পারে না। তাদেরকেও জন্ম, মৃত্যু, জ্বরা, রোগ-শোক ইত্যাদিতে আল্লাহ্র নিয়মনীতির বাইরে চলার সুযোগ দেয়া হয়নি। সে হিসেবে আনুগত্যের ব্যাপকতা ও বাধ্যতামূলক সিজদার মধ্যে তারাও শামিল রয়েছে। নিজেদের ক্ষমতার পরিসরে বিদ্রোহের নীতি অবলম্বনের কারণে তারা আযাবের অধিকারী হয়।

(১) তাদের অনেকের উপর আযাব অবধারিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা আনুগত্য করেনি। তারা সিজদা করেনি। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাকে আল্লাহ্ কাফের ও দূর্ভাগা বানিয়ে অপমানিত করেছেন। সুতরাং তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউ নেই যে সে তার দ্বারা সৌভাগ্যশালী ও সম্মানিত হতে পারে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। দূর্ভাগা হওয়া, সৌভাগ্যশালী হওয়া, সম্মানিত বা অপমানিত হওয়া এ সবই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। [ফাতহুল কাদীর] যে ব্যক্তি চোখ মেলে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল সত্য দেখে না এবং যে তাকে বুঝায় তার কথাও শোনে না সে নিজেই নিজের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার ডাক দেয়। সে নিজে যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ভাগ্যে তাই লিখে দেন। তারপর আল্লাহই যখন তাকে সত্য অনুসরণ করার মর্যাদা দান করেননি তখন তাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার ক্ষমতা আর কার আছে?

(৩) আয়াতে উল্লেখিত দুই পক্ষ হচ্ছে, সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফের দল; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। ইয়াহূদী, নাসারা, সাবেয়ী, মাজূস ও শির্ককারী সবাই এ কাতারভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত সেই দুই পক্ষ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিমদের মধ্য থেকে আলী, হামযা, ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবী'আ, তার পুত্র ওলীদ ও তার ভাই শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের তিন জনই নিহত এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে আলী ও হামযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ⑲

তাদের রব সম্বন্ধে বিতর্ক করে; অতএব যারা কুফরী করে তাদের জন্য কেটে তৈরী করা হয়েছে আগুনের পোষাক(১), তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ⑳

২০. যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে।

কাছে শাহাদাত বরণ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [দেখুন- বুখারীঃ ২৭৪৩, মুসলিমঃ ৩০৩৩] কিন্তু বাহ্যতঃ এই হুকুম তাদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- যে কোন যামানার উম্মতই হোক না কেন। আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিরোধকারী সমস্ত দলগুলোকে তাদের সংখ্যাধিক্য সত্বেও দু'টি পক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি পক্ষ নবীদের কথা মেনে নিয়ে আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় পক্ষ নবীদের কথা মানে না এবং তারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে। তাদের মধ্যে বহু মতবিরোধ রয়েছে এবং তাদের কুফরী বিভিন্ন বিচিত্র রূপও পরিগ্রহ করেছে। কাতাদা বলেন, মুসলিম ও আহলে কিতাব দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে তর্কে লিপ্ত হলো। আহলে কিতাবরা বলল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর আগে আর আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের আগে, সুতরাং আমরা তোমাদের থেকে উত্তম। অপরদিকে মুসলিমরা বলল, আমাদের কিতাব সমস্ত কিতাবের মধ্যে ফয়সালা করে (সেগুলোর সত্যাসত্য নিরূপন করে)। আর আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, সুতরাং আমরা তোমাদের থেকে উত্তম। তখন আল্লাহ্ ইসলামের অনুসারীদেরকে তাদের শত্রুদের উপর প্রাধান্য দিয়ে আয়াত নাযিল করেন। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে দুই প্রতিপক্ষ বলে জান্নাত ও জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। জাহান্নাম বলেছিল, আমাকে আপনার শাস্তির জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর জান্নাত বলেছিল, আমাকে আপনার দয়ার জন্য নির্ধারিত করে দিন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে আয়াতে দু'টি দল বলে মুমিন ও কাফের ধরে নিলে সব মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) ভবিষ্যতে যে বিষয়টির ঘটে যাওয়া একেবারে সুনিশ্চিত তার প্রতি জোর দেবার জন্য সেটি এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যেন তা ঘটে গেছে। আগুনের পোশাক বলতে সম্ভবত এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যাকে সূরা ইবরাহীমের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তাদের জামা হবে আলকাতরার"। অর্থাৎ তাদের জন্য আগুনের টুকরা দিয়ে কাপড়ের মত করে তৈরী করে দেয়া হবে। [ইবন কাসীর] সা'য়ীদ ইবন জুবাইর বলেন, এখানে জামাগুলো হবে, তামার। যা গরম হলে সবচেয়ে বেশী তাপ সৃষ্টি হয়। [ইবন কাসীর]

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার গদা তথা হাতুড়ি।

كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

২২. যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে; এবং বলা হবে, 'আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা।'

তৃতীয় রুকূ'

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা[১] এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের[২]।

---

(১) মাথার মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পূর্বকালের রাজা-বাদশাদের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। সাধারণ পুরুষদের মধ্যে যেমন মাথায় পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতির-এ বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসা-য় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেনঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকমের কংকন পরানো হবে- স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী] জান্নাতীদের কংকন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "মুমিনের কংকন ততটুকুতে থাকবে, যতটুকুতে তার অযু থাকবে।" [মুসলিমঃ ২৫০]

(২) আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোষাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। [কুরতুবী] বলাবহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা পরিধান করবে না।' [বুখারীঃ ৫৮৩৩] আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে আখেরাতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

২৪. আর তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল[১] এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথে।

وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও মানুষকে বাধা দিয়েছে আল্লাহ্‌র পথ[২] থেকে

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তাদের পোষাক হবে রেশমী কাপড়"। [ইবন কাসীর]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এখানে কালেমা তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন বর্ণনায় কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ। [কুরতুবী] কারও কারও নিকট,আল-কুরআনের প্রতি তাদেরকে পথ দেখানো হবে। এজন্যই বলা হয় যে, এখানে দুনিয়ায় পথ দেখানো উদ্দেশ্য। সুতরাং দুনিয়াতে তাদেরকে কালেমায়ে শাহাদাত এবং কুরআন পড়ার প্রতি পথনির্দেশ করা হয়েছিল। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে উত্তম বাণী বলে আখেরাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আখেরাতে তাদেরকে "আলহামদুলিল্লাহ" বলার প্রতি হেদায়াত করা হবে। কেননা তারা জান্নাতে বলবে, "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত করেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৪৩] "আর তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন"। [সূরা ফাতিরঃ ৩৪] সুতরাং জান্নাতে কোন খারাপ কথা ও মিথ্যা বা অসার শোনা যাবে না। তারা যাই বলবে তা-ই ভাল কথা। আর তারা জান্নাতে আল্লাহ্‌র পথেই চলবে, কারণ সেখানে আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধী কোন কিছু থাকবে না। কারও কারও মতে, আয়াতে উত্তম কথা বলে সে সমস্ত কথা বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের কাছে উত্তম সুসংবাদ আকারে প্রদান করা হয়ে থাকে। [কুরতুবী]

আর প্রশংসিতের পথে বলে এমন স্থানের কথা বলা হয়েছে যেখানে তারা তাদের রবের প্রশংসা করবে। কারণ তিনি তাদের প্রতি দয়া করেছেন, নেয়ামত দিয়েছেন। অর্থাৎ জান্নাত। যেমন হাদীসে এসেছে, "তাদের প্রতি তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করার ইলহাম হবে যেমন দুনিয়াতে কেউ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকে।" [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৮৪] অপর কারও মতে, এখানে দুনিয়াতে সিরাতুল মুস্তাকীম প্রাপ্তির কথা বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্‌র পথ বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ

ও মসজিদুল হারাম থেকে[১], যা আমরা করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সব মানুষের জন্য সমান[২], আর যে

(১) এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্। তারা মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদুল হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হারাম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় 'মসজিদুল হারাম' বলে মক্কার সম্পূর্ণ হারাম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন- হুদায়বিয়ার ঘটনাতে মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুধু মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি; বরং হারামের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্ হাদীস দ্বারা তা-ই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআনুল কারীম এ ঘটনায় মসজিদুল হারাম শব্দটি সাধারণ হারাম অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছেঃ ﴿وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [সূরা আল-ফাত্হঃ ২৫] তাফসীরে দুররে-মনসূরে এ স্থানে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হারাম এলাকা বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে যারা কুফরি করেছে, আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিচ্ছে এবং মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয় তাদের কি অবস্থা হবে সেটা উল্লেখ করা হয় নি। তবে আয়াত থেকে সেটা বুঝা যায়, আর তা হচ্ছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা ধ্বংস হবে। [ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে বর্ণিত 'সব মানুষের জন্য সমান' বলে বুঝানো হয়েছে যে, হারাম কোন ব্যক্তি, পরিবার বা গোত্রের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। বরং সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত, যার যিয়ারত থেকে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। মাসজিদুল হারাম ও হারাম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়; যেমন- ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মীনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালিফার গোটা ময়দান, এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ। কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফেকাহ্বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকার্‌রমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হারামের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফেকাহ্বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াক্ফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলিম যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিকসংখ্যক ফেকাহ্বিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা হতে পারে। কারণ, ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্য জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হারামের যে যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াক্ফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেয়া

بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

সেখানে অন্যায়ভাবে 'ইলহাদ[১]' তথা দ্বীনবিরোধী পাপ কাজের ইচ্ছে করে, তাকে আমরা আস্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

চতুর্থ রুকূ'

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ

২৬. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ইব্‌রাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম[২] ঘরের

হারাম । আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয় । [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) অভিধানে إلحاد-এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া, ঝুঁকে পড়া । অর্থাৎ কোন বড় মারাত্মক গোনাহ করার ইচ্ছা পোষণ করাই ইলহাদ । [ইবন কাসীর] তবে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা যুলুমের সাথে ইলহাদের কথা বলেছেন । ইবন আব্বাস এর অর্থ করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে এ অপরাধ করা । ইবন আব্বাস থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, হারাম শরীফে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন যেমন, হত্যা, খারাপ আচরণ, এসবের কোন কিছুকে হালাল মনে করা । ফলে যে যুলুম করেনি তার উপর যুলুম করা, যে হত্যা করেনি তাকে হত্যা করা । সুতরাং কেউ যদি এ ধরনের কোন আচরণ করে তবে আল্লাহ্ তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন । অপর কারও কারও মতে, এখানে যুলুম অর্থ শির্ক । মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা । মুজাহিদ থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, কোন খারাপ করাই যুলুম শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য । [ইবন কাসীর] মোটকথাঃ যাবতীয় খারাপ কাজই এর মধ্যে শামিল হবে । যদিও সকল অবস্থায় খারাপ কাজ করা পাপ কিন্তু হারাম শরীফে একাজ করা আরো অনেক বেশী মারাত্মক পাপ । মুফাস্‌সিরগণ বিনা প্রয়োজনে কসম খাওয়া কিংবা চাকরদেরকে গালি দেয়াকে পর্যন্ত হারাম শরীফের মধ্যে বেদ্বীনী গণ্য করেছেন এবং একে এ আয়াতের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এই আয়াতের তাফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হারাম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লেখা হয় না, যতক্ষণ না তা কার্যে পরিণত করা হয় । কিন্তু হারামে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ্ লেখা হয় । [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে । যারা আল্লাহ্‌র সাথে এমন ঘরে শির্ক করে যার ভিত্তি রচিত হয়েছিল তাওহীদের উপর । আল্লাহ্ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সেটার স্থান দেখিয়ে দিলেন, তার কাছে সমর্পন করলেন এবং তা তৈরী করার অনুমতি

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۝

স্থান[১], তখন বলেছিলাম, 'আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবেন না[২]

দিলেন। [ইবন কাসীর] অভিধানে بوأ শব্দের অর্থ বর্ণনা করা। [জালালাইন] অপর অর্থ, তৈরী করা, কারণ সেটার স্থান অপরিচিত ছিল। [মুয়াসসার] আয়াতের অর্থ এইঃ একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে বায়তুল্লাহ্‌র অবস্থানস্থলের ঠিকানা বর্ণনা করে দিয়েছি। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে ঘর বানানোর নির্দেশ দেয়া হলো, তিনি বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলকে নিয়ে তা বানাতে বের হলেন, যখন মক্কার উপত্যকায় আসলেন তখন তিনি তার মাথার উপর ঘরের স্থানটুকুতে মেঘের মত দেখলেন, যাতে মাথার মত ছিল, সে মাথা থেকে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে বলা হলঃ হে ইব্‌রাহীম! আপনি আমার ছায়ায় বা আমার পরিমাণ স্থানে ঘর বানান, এর চেয়ে কমাবেন না, বাড়াবেনও না। তারপর যখন ঘর বানানো শেষ করলেন, তখন তিনি বের হয়ে চলে গেলেন এবং ইসমাঈল ও হাজেরাকে ছেড়ে গেলেন, আর এটাই আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ﴾ আয়াতের মর্মার্থ। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৫৫১]

(১) ﴿مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম 'আলাইহিস্ সালাম ও তৎপরবর্তী নবীগণ বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতেন। কিন্তু এ সমস্ত বর্ণনা খুব শক্তিশালী নয়। সহীহ বর্ণনানুসারে ইবরাহীম আলাইহিসসালামই প্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমরা তাকে হবু ঘরের স্থান দেখিয়েছিলাম। এ অর্থ হবে না যে, সেখানে ঘর ছিল আর তা নষ্ট হয়ে যাবার পরে আবার তা ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে নির্মাণের জন্য দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল। ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, এ আয়াত থেকেই অনেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামই প্রথম আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করেছেন। তার পূর্বে সেটি নির্মিত হয়নি। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাস। আমি বললাম, এ দুয়ের মাঝখানে কত সময়? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। [বুখারীঃ ৩৩৬৬; মুসলিমঃ ৫২০]

(২) অর্থাৎ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে এই ঘরের কাছেই পুনর্বাসিত করার পর কতগুলো আদেশ দেয়া হয়। তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশটি ছিল সর্বকালের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। আর তা হলো, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না।' ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ, একমাত্র আমার জন্যই এ ঘরটি বানাবেন। অথবা এ ঘরে

এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দণ্ডায়মান, এবং রুকূ' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন(১)।

২৭. আর মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দিন(২), তারা আপনার কাছে

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى

শুধু আমাকেই ডাকবেন। অথবা এর অর্থ, আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না। [ফাতহুল কাদীর]

(১) দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেয়া হয় যে, আমার গৃহকে পবিত্র রাখুন। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শির্ক থেকে পবিত্র রাখা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অনুরূপভাবে বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা।[ফাতহুল কাদীর] ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম নিজেই শির্ক ও কুফরী থেকে মুক্ত ছিলেন, তিনি আল্লাহ্‌র ঘরকে ময়লা-আবর্জনামুক্ত করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়। আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, এখানে কাবাঘরের সেবার দাবীদার তৎকালীন কাফের মুশরিকদের সাবধান করা হচ্ছে যে, এ ঘর নির্মাণের জন্য তোমাদের পিতার উপর শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তিনি এটাকে শির্কমুক্ত রাখবেন। তোমরা সে শর্তটি পূর্ণ করতে পারনি বরং শির্ক দ্বারা কলুষিত করেছ। [ফাতহুল কাদীর] এ নির্দেশের সাথে কাদের জন্য ঘরটি পবিত্র রাখবেন তাদের কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা হচ্ছেন, তাওয়াফকারী ও সালাতে দণ্ডায়মানকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারী লোকদের জন্য। বিশেষ করে তাওয়াফ এ ঘর ছাড়া আর কোথাও জায়েয নেই, আর সালাত এ ঘর ব্যতীত অন্য কোন দিকে মুখ করে পড়া (নফল ও যুদ্ধের সময়কার সালাত ব্যতীত) জায়েয নেই। অনুরূপভাবে রুকু ও সিজদা বলার কারণে ইবাদাতের মধ্যে এ দু'টি রুকনের গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই যে, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দিন যে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আরয করলেনঃ এখানে তো জনমানবহীন প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেনঃ আপনার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম মাকামে ইব্‌রাহীমে দাঁড়িয়ে

كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝

আসবে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের কৃশকায় উটের পিঠে করে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে[১];

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে[২]

ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে দুই কানে আঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেনঃ 'লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তা গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের প্রত্যেকের কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইব্‌রাহিমী আওয়াজের জবাবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। [দেখুন- তাবারীঃ ১৪/১৪৪, হাকীম মুস্তাদরাকঃ ২/৩৮৮]

(১) এ আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে চলে আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দুরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। পরবর্তী নবীগণ এবং তাদের উম্মতগণও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্বেও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে বর্ণিত ছিল। যদিও পরবর্তীতে আরবরা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় হজ্জের সঠিক পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সে সমস্ত ভুলের সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

(২) অর্থাৎ দূর-দুরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে منافع শব্দটি نكرة ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে দ্বীনী উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়।

أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্‌ক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে[১]। অতঃপর

চিন্তা করলে এ বিষয়টি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে যে, হজ্জের দ্বীনী কল্যাণ অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোন অংশে কম নয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহ্‌র কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; [বুখারীঃ ১৪৪৯, ১৭২৩,১৭২৪, মুসলিমঃ ১৩৫০] অর্থাৎ জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়'। তাছাড়া আরেকটি উপকার তো তাদের অপেক্ষায় আছে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে হজ্জের মধ্যে আরাফাহ, মুযদালিফাহ, ইত্যাদি হজের স্থানে অবস্থান ও দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করা যায়। [কুরতুবী] তবে এখানে কেবলমাত্র দ্বীনী কল্যাণের কথাই বলা হয়নি, এর সাথে পার্থিব কল্যাণও সংযুক্ত রয়েছে। এ হজ্জের বরকতেই আরবের যাবতীয় সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতা অন্তত চারমাসের জন্য স্থগিত হয়ে যেতো এবং সে সময় এমন ধরনের নিরাপত্তা লাভ করা যেতো যার মধ্যে দেশের সকল এলাকার লোকেরা সফর করতে পারতো এবং বাণিজ্য কাফেলাও নিরাপদে চলাফেরা করতে সক্ষম হতো। এজন্য আরবের অর্থনৈতিক জীবনের জন্যও হজ্জ একটি রহমত ছিল। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৮] অর্থাৎ ব্যবসা। [কুরতুবী] ইসলামের আগমনের পরে হজ্জের দ্বীনী কল্যাণের সাথে সাথে পার্থিব কল্যাণও কয়েকগুণ বেশী হয়ে গেছে। প্রথমে তা ছিল কেবলমাত্র আরবের জন্য রহমত, এখন হয়ে গেছে সারা দুনিয়ার তাওহীদবাদীদের জন্য রহমত।

(১) বায়তুল্লাহ্‌র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হল যে, তারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। এরপর দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে- ﴿وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ - অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। হাদঈ বা কুরবানীর গোশ্‌ত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নেয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানী করা জায়েয, অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, এখানে ﴿أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ﴾ বলে যিলহজ্জের দশ দিন এবং আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোসহ মোট তের দিনকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অবশ্য এ ব্যাপারে সহীহ্ হাদীসেও এসেছে, রাসূল

তোমরা তা থেকে খাও(১) এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও(২)।

২৯. তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে(৩) এবং তাদের মানত পূর্ণ

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের আমলের মত উৎকৃষ্ট আমল আর কিছু নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এমনকি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেনঃ এমনকি জিহাদও নয়, তবে যদি সে মুজাহিদ তার জান ও মাল নিয়ে জিহাদ করতে বের হয়ে আর ফিরে না আসে।' [বুখারীঃ ৯৬৯] আয়াতে পশু বলতে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ভেড়া, যেমন সূরা আল-আন'আমের ১৪২-১৪৪ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাদের উপর আল্লাহর নাম নেওয়ার অর্থ হচ্ছে,আল্লাহর নামে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাদেরকে যবেহ করা যেমন পরবর্তী বাক্য নিজেই বলে দিচ্ছে। কুরআন মজীদে কুরবানীর জন্য সাধারণভাবে "পশুর উপর আল্লাহর নাম নেওয়া"র পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সব জায়গায়ই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে পশু যবেহ করা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এভাবে যেন এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ করা কাফের ও মুশরিকদের পদ্ধতি। মুসলিম যখনই পশু যবেহ করবে আল্লাহর নাম নিয়ে করবে এবং যখনই কুরবানী করবে আল্লাহর জন্য করবে। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) এখানে كلوا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; [কুরতুবী] যেমন- কুরআনের ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [সূরা আল-মায়েদাহ্‌ঃ ২] আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে আহার করানোর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তিকে আহার করানো যেতে পারে না। বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অভাবী না হলেও তাদেরকে কুরবানীর গোশত দেওয়া জায়েয। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত। আলকামা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমার হাতে কুরবানীর পশু পাঠান এবং নির্দেশ দেন,কুরবানীর দিন একে যবেহ করবে, নিজে খাবে, মিসকীনদেরকে দেবে এবং আমার ভাইয়ের ঘরে পাঠাবে। [আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ১০২৩৮] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাও একই কথা বলেছেন অর্থাৎ একটি অংশ খাও, একটি অংশ প্রতিবেশীদেরকে দাও এবং একটি অংশ মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করো। [ইবন কাসীর]

(৩) تفث এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। [ফাতহুল কাদীর] ইহ্‌রাম অবস্থায় চুল মুণ্ডানো, চুল কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা

করে[১] আর তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের[২]।	وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের কুরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ এহ্রাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নীচের চুলও পরিস্কার কর। [কুরতুবী] আয়াতে প্রথমে হাদঈ জবাই ও পরে ইহ্রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ী এসব কার্যাদি সম্পন্ন করা মুস্তাহাব। যদি এতে আগ-পিছ হয়, তবে কোন সমস্যা নেই। কারণ, হাদীসে এসেছে, 'সেদিন (১০ই যিলহজ্জ তারিখে) হজ্জের কাজগুলোর মধ্যে কোনটা আগ-পিছ করার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যখনই কোন প্রশ্ন করা হয়েছে, তখনি তিনি বলেছেনঃ কর, কোন সমস্যা নেই।' [বুখারীঃ ৮১, ১২১, ১৬২১, ১৬২২, ৬১৭২, মুসলিমঃ ১৩০৬] এ প্রসংগে এ কথা জেনে নেয়া উচিত যে, পাথর নিক্ষেপ ও মাথামুণ্ডন এ দু'টির যে কোন একটি এবং হাদঈ জবাইয়ের কাজ শেষ করার পর অন্যান্য যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায় কিন্তু স্ত্রী সহবাস ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হয় না যতক্ষণ না "তাওয়াফে ইফাদাহ" শেষ করা হয়।

(১) نذور শব্দটি نذر এর বহুবচন। অর্থাৎ এ সময়ের জন্য যে ব্যক্তি কোন মানত করে সে যেন তা পূরণ করে। শরী'আতে মানতের স্বরূপ এই যে, শরী'আতের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি এ কাজ করব অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার জন্য এ কাজ করা জরুরী, একেই নযর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলতঃ তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটা গোনাহ্ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গোনাহ্র কাজের মানত করে, সেই গোনাহ্র কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। [কুরতুবী] তবে কসমের কাফ্ফারা আদায় করা জরুরী হবে। মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব; আলোচ্য আয়াত থেকে মূলতঃ তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াতে উট বা গৃহপালিত জন্তুর যা যবেহ করার জন্য মানত করেছে সেটাকে পূরণ করতে বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য, হজ ও হাদঈ সংক্রান্ত মানত এবং এমন মানত যা হজের সময় সম্পন্ন করতে হয়। কারও কারও মতে হজের যাবতীয় কাজকে এখানে মানত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে তাওয়াফ বলে তাওয়াফে যিয়ারত বা "তাওয়াফে ইফাদাহ" বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্জের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও হাদঈ যবাই করার পর করা হয়। এটি হজ্জের রোকন তথা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। যা কখনও বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। [কুরতুবী] আর যেহেতু ধূলা-ময়লা দূর করার হুকুমের সাথে সাথেই এর উল্লেখ করা হয়েছে তাই এ বক্তব্য একথা প্রকাশ করে যে, হাদঈ যবাই করার এবং ইহরাম খুলে

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝

৩০. এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র সম্মানিত বিধানাবলীর[১] প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার রব-এর কাছে তার জন্য এটাই উত্তম। আর যেগুলো তোমাদেরকে তিলাওয়াত করে জানানো হয়েছে[২] তা ব্যতীত তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু। কাজেই তোমরা বেঁচে

গোসল করে নেবার পর এ তাওয়াফ করা উচিত। এখানে কাবাঘরের জন্য عتيق শব্দ অত্যন্ত অর্থবহ।"আতীক" শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে প্রাচীন। দ্বিতীয় অর্থ স্বাধীন,যার উপর কারোর মালিকানা নেই। তৃতীয় অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এ তিনটি অর্থই এ পবিত্র ঘরটির বেলায় প্রযোজ্য। তাছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ্‌র এ ঘরটি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতেও মুক্ত। মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ্ তাঁর গৃহের নাম ﴿الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ রেখেছেন; কারণ, আল্লাহ্ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তী-বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

(১) ﴿حُرُمٰتِ اللّٰهِ﴾ - বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরী'আতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্‌র অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবে, তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি বর্জন করবে এবং যার কাছে হারামকৃত বিষয়াদি করা অনেক বড় গোনাহের কাজ বলে মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, তবে তা তার রবের নিকট তার জন্য উত্তম। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেন, মক্কা, হজের বিধি-বিধান, মক্কার বিভিন্ন সম্মানিত এলাকা, এসব কিছুই এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য। এগুলোর সম্মান করা, এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা, আর আল্লাহ্ যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্য লাভের উপায়। [ইবন কাসীর]

(২) সূরা আল-আনআম ও সূরা আন-নাহ্‌লে যে হুকুম দেয়া হয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছেঃ মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করা পশু।[সূরা আল-আন'আমঃ ১৪৫ ও সূরা আন-নাহলঃ ১১৫] এ গুলো ব্যতীত বিভিন্ন হাদীসে আরও কিছু জীব-জন্তু পাখী হারাম করার ঘোষণা এসেছে। সেগুলোও এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হবে। কারণ রাসূলের কথা ও বাণী ওহীর অন্তর্ভুক্ত এবং তা মানা অপরিহার্য।

থাক মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে[১]
এবং বর্জন কর মিথ্যা কথা[২] ।

(১) رجس শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা। [ফাতহুল কাদীর] অপবিত্রতা বলা হয়েছে; কারণ, এরা মানুষের অন্তরকে শির্কের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। رجس শব্দের অন্য অর্থ হচ্ছে رجز বা শাস্তি। সে হিসেবে মূর্তিদেরকে رجس বলা হয়েছে, কারণ এগুলো শাস্তির কারণ। [ফাতহুল কাদীর] أوثان শব্দটি وثن এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। তা কাঠ, লোহা, সোনা বা রূপা, যাই হোক। আরবরা এগুলোর পূজা করত। আর নাসারারা ক্রুশ স্থাপন করত এবং তা পূজা করত, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। [কুরতুবী] তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, মূর্তিপূজা থেকে এমনভাবে দূরে থাক যেমন দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা থেকে মানুষ নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে আসে। অনুরূপভাবে মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাক, কারণ তা স্থায়ী শাস্তির কারণ।

(২) ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ -এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তা-ই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। [কুরতুবী] আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা থেকে নিষেধ করার সাথে মিথ্যা কথাকে একসাথে অন্যত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, “বলুন, ‘নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।” [সূরা আল-আ'রাফ: ৩৩] আর আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার একটি হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। [ইবন কাসীর] যাজ্জাজ বলেন, আরবের মুশরিকরা যে মিথ্যার ভিত্তিতে “বাহীরা”, “সায়েবা” ও “হাম” ইত্যাদিকে হারাম গণ্য করতো তাও এ ফরমানের সরাসরি আওতাধীনে এসে যায়। [ফাতহুল কাদীর] যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আর তোমাদের কণ্ঠ যে মিথ্যা বিধান দিয়ে থাকে যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, এ ধরনের বিধান দিয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না।” [সূরা আন নাহলঃ১১৬] সহীহ হাদীসেও শির্ককে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সাব্যস্ত করার পর পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষীকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই বলবেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তারপর তিনি বসা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বললেন, সাবধান! এবং মিথ্যা কথা বলা। সাবধান! এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া [বুখারী: ৫৯৭৬; মুসলিম: ৮৭] ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া শির্কের সমপর্যায়ের। [ইবন কাসীর] এর কারণ হচ্ছে, ‘মিথ্যা কথা’ শব্দটি ব্যাপক। এর সবচেয়ে বড় প্রকার হচ্ছে শির্ক। তা যে শব্দের মাধ্যমেই হোক না কেন। [ফাতহুল কাদীর] আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করা এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার তথা ইবাদাতে তাঁর বান্দাদেরকে অংশীদার করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।

৩১. আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে যেন[১] আকাশ হতে পড়ল, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

৩২. এটাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে[২] সম্মান

ذٰلِكَ ۤ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

অনুরূপভাবে পারস্পরিক লেন-দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ সংগে মিথ্যা কসমও একই বিধানের আওতায় আসে। ইমামদের মতে, যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা প্রমাণিত হয়ে যাবে তার নাম চারদিকে প্রচার করে দিতে হবে। [কুরতুবী] উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তার পিঠে চাবুক মারতে হবে, মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে, মুখ কালো করে দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে।" উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আদালতে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তিনি তাকে একদিন প্রকাশ্যে জনসমাগমের স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে ওমুকের ছেলে ওমুক, এ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, একে চিনে রাখো। তারপর তাকে কারাগারে আটক করেন। [বাইহাকী: মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার: ১৪/২৪৩] বর্তমান কালে এ ধরনের লোকের নাম খবরের কাগজে ছেপে দিলেই ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

(১) এ আয়াতে যারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে তারা হেদায়াত থেকে কত দূরত্বে অবস্থান করছে এবং ঈমানের সুউচ্চ শৃংগ থেকে কুফরীর অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততার দিক থেকে তাদের অবস্থা কেমন দাঁড়ায় তার উদাহরণ দেয়া হয়েছে এমন এক ব্যক্তির সাথে যে আকাশ থেকে পড়ে গেল এমতাবস্থায় হয় সে পাখির শিকারে পরিণত হবে যাতে তার সমস্ত শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়, অথবা কঠিন ঝড়ো হাওয়া তাকে বয়ে নিয়ে অনেক দুরে নিয়ে ফেলে আসল। [সা'দী] এ অবস্থা যেমন অত্যন্ত খারাপ তেমনি অবস্থা দাঁড়ায় শির্ককারীর অবস্থা। সে শয়তানের শিকারে পরিণত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার অবস্থা হবে বেসামাল।

(২) شَعَائِر শব্দটি شعيرة-এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। আল্লাহ্‌র শা'য়ীরা বা চিহ্ন বলতে বুঝায় এমন প্রতিটি বিষয় যাতে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের চিহ্ন দেয়া আছে। [কুরতুবী] সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলিম হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শা'আয়েরে ইসলাম' বলা হয়। [দেখুন, সা'দী] এগুলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন। বিশেষ করে হজের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি যেমন, হজের

الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

করলে এ তো তার হৃদয়ের তাক্‌ওয়াপ্রসূত[১]।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

৩৩. এ সব চতুষ্পদ জন্তুগুলোতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত[২]; তারপর তাদের

যাবতীয় কর্মকাণ্ড। [কুরতুবী; সা'দী] হাদঈর জন্য হাজীদের সংগে নেয়া উট ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বা চিহ্ন সম্মান করার দ্বারা হাদঈর জন্তুটি মোটাতাজা ও সুন্দর হওয়া বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি সাদাতে কালো রঙ্গ মিশ্রিত শিং বিশিষ্ট ছাগল দিয়ে কুরবানী করেছেন। [আবু দাউদ: ২৭৯৪] তাছাড়া তিনি চোখ, কান, ভালভাবে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। [ইবন মাজাহ: ৩১৪৩] সুতরাং যারা এ নির্দেশ গুলো উন্নত মানের জন্তু হাদঈ ও কুরবানীতে প্রদান করবে সেটা তাদের মধ্যে তাকওয়ার পরিচায়ক। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহ্‌ভীতির লক্ষণ যার অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এ সম্মান প্রদর্শন হৃদয় অভ্যন্তরের তাকওয়ার ফল এবং মানুষের মনে যে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় আছে তা এরই চিহ্ন। [সা'দী] তাইতো কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অমর্যাদা করলে এটা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার মনে আল্লাহর ভয় নেই। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তাকওয়া এখানে, আর তিনি বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন" [মুসলিম: ২৫৬৪] আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা সাধারণ উপদেশ। আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত সকল মর্যাদাশালী জিনিসের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য একথা বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদে হারাম, হজ্জ, উমরাহ ও মক্কার হারামের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ বক্তব্যে সেগুলোই প্রধানতম উদ্দেশ্য। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]]

(২) পূর্বের আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাকে মনের তাকওয়ার আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর যেহেতু হাদঈ তথা হজ্জ অথবা ওমরাহ্‌কারী ব্যক্তি যবেহ্ করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায়, তাও হজ্জের একটি নিদর্শন। যেমন কুরআন নিজেই পরবর্তী পর্যায়ে বলছেঃ "এবং এ সমস্ত হাদঈর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছি।"[৩৬] অর্থাৎ হাজীদের সাথে আনা হাদঈর পশুও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে কি এ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা কি হালাল নয়? আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখানোর যে

যবাইয়ের স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির কাছে[১]।

হুকুম ওপরে দেয়া হয়েছে তার দাবী কি এই যে, কুরবানীর পশুগুলোকে যখন আল্লাহর ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদেরকে কোন ভাবে ব্যবহার করা যাবে না? তাদের পিঠে চড়া অথবা পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দেয়া কিংবা তাদের দুধ পান করা কি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবার বিরোধী? আরবের লোকেরা একথাই মনে করতো। তারা এ পশুগুলোকে একেবারেই আরোহীশূন্য অবস্থায় সুসজ্জিত করে নিয়ে যেতো। পথে তাদের থেকে কোন প্রকার লাভবান হওয়া তাদের দৃষ্টিতে ছিল পাপ। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে, জবাই করার জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা এ পশুদের থেকে লাভবান হতে বা উপকার অর্জন করতে পারো। এটা আল্লাহর নিদর্শনালীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী নয়। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস রয়েছে। [দেখুন- বুখারীঃ ১৬৯০, মুসলিমঃ ২৩২৩, ১৩২৪]

(১) এখানে ﴿الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (প্রাচীন গৃহ) বলতে কা'বা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা কি শুধু কা'বা উদ্দেশ্য না কি পূর্ণ হারাম উদ্দেশ্য?
যদি শুধু কা'বা উদ্দেশ্য নেয়া হয় তখন এর অর্থ হবে, হজের কর্মকাণ্ড, আরাফায় অবস্থান, পাথর নিক্ষেপ, সা'য়ী ইত্যাদি সবই বাইতুল্লাহর তাওয়াফে ইফাদার মাধ্যমে শেষ হবে। আর তখন محل শব্দের অর্থ হবে, মুহরিমের জন্য ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার স্থান। [কুরতুবী] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ তাফসীরটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার সাথে সাথে হালাল হয়ে যাবে। তারপর তিনি এ আয়াতাংশ তেলাওয়াত করলেন। [ইবন কাসীর] ইবনুল আরাবী এখানে এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, আয়াতে স্পষ্টভাবে কা'বার কথা আছে। [আহকামুল কুরআন; কুরতুবী]
আর যদি 'প্রাচীন গৃহ' বলে পূর্ণ হারাম এলাকা বোঝানো হয়ে থাকে, তখন আয়াতের অর্থ হবে, হাদঈ কা'বার কাছে পৌঁছতে হবে। আর محل অর্থ হাদঈর জন্তুর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান বা যবেহ্ করার স্থান বোঝানো হয়েছে। কারণ, হারাম বায়তুল্লাহ্‌রই বিশেষ আঙিনা। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ এই যে, হাদঈর জন্তু যবেহ্ করার স্থান বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকট; অর্থাৎ সম্পূর্ণ হারাম এলাকা। এতে বোঝা গেল যে, হারাম এলাকার ভিতরে হাদঈ যবেহ্ করা জরুরী, হারাম এলাকার বাইরে জায়েয নয়। হারাম এলাকার যে কোন স্থানে হাদঈর প্রাণী যবেহ করা যাবে। সে হিসেবে মক্কার হারাম এলাকা, মিনা, মুযদালিফার যেখানেই হাদঈর প্রাণী যবেহ্ করা হোক, তা শুদ্ধ হবে। শুধু কা'বা ঘরের কাছে হতে হবে এমন কথা নেই। আয়াতের অর্থ এই নয় যে, কাবাঘরে বা মসজিদে হারামে হাদঈ জবাই করতে হবে বরং এর অর্থ হচ্ছে হারামের সীমানার মধ্যে হাদঈ জবাই

পঞ্চম রুকূ'

৩৪. আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 'মানসাক'(১) এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেসবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে(২)।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

করতে হবে। কুরআন যে কা'বা, বায়তুল্লাহ বা মসজিদে হারাম শব্দ উচ্চারণ করে এ থেকে সাধারণত শুধুমাত্র কাবার ইমারত নয় বরং মক্কার হারাম অর্থ গ্রহণ করে, এটি তার আর একটি প্রমাণ। কুরআনের অন্যত্র এ ধরনের অর্থে কা'বা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক- কা'বাতে পাঠানো হাদঈরূপে" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯৫] ও "তারাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মসজিদুল-হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে।" [সূরা আল-ফাতহ: ২৫] এ আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে পূর্ণ হারাম এলাকা বোঝানো হয়েছে। কারণ, মুশরিকরা মুসলিমদের হাদঈকে শুধু কা'বাতে পৌঁছতেই বাধা দেয়নি। বরং হারাম এলাকায় প্রবেশ করতেই বাধা দিয়েছিল।

(১) আরবী ভাষায় منسك ও نسك কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, জন্তু যবেহ্ করা, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, ঈদের জন্য একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। তাফসীরকারক মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ সহ অনেকে এখানে منسك এর অর্থ হাদঈর প্রাণী যবেহ্ করা নিয়েছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, এই উম্মতকে হাদঈ যবেহ্ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও এ ধরনের আদেশ দেয়া হয়েছিল। [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে কাতাদাহ্ রাহেমাহুল্লাহর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্জ ফরয করা হয়েছিল। তখন মক্কার সাথে এটি সুনির্দিষ্ট হবে। হজ্জের জায়গা মক্কা ছাড়া আর কোথাও ছিল না। তখন منسك শব্দের অর্থ হবে হজ্জ এর স্থান। [কুরতুবী] তবে প্রথম মতটি বেশী বিশুদ্ধ। পরবর্তী আয়াতাংশ এর উপর প্রমাণবহ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) أنعام বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলোকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং যবেহ যেন একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে হয় সেটার খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে, কারণ, তিনিই তো এ রিযিক তাদেরকে দিয়েছেন।[কুরতুবী] এ প্রসংগে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর হালাল

তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, কাজেই তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিন বিনীতদেরকে[১]।

৩৫. যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়[২] আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

হওয়ার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, হাদঈ বা কুরবানী কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারাই সম্ভব। অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূলে এসেছে, المخبتين । আরবী ভাষায় خبت শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। [ফাতহুল কাদীর] এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خبيت বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। [ফাতহুল কাদীর] এ কারণেই কাতাদাহ্ ও দাহহাক مخبتين-এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ সন্তুষ্টচিত্ত মানুষ। আমর ইবন্ আউস বলেনঃ এমন লোকদেরকে مخبتين বলা হয়, যারা অন্যের উপর যুলুম করে না। কেউ তাদের উপর যুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র ফায়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مخبتين। [ইবন কাসীর] মূলতঃ কোন একটিমাত্র শব্দের সাহায্যে এর অন্তরনিহিত অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি অর্থঃ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও বিনয়াবনত ভাব অবলম্বন করা। তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া। তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া। পরবর্তী আয়াতই এর সবচেয়ে সুন্দর তাফসীর। [ইবন কাসীর]

(২) وجل এর আসল অর্থ ঐ ভয়-ভীতি, যা কারো মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। এটা তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমানী শক্তির প্রমাণ। [ফাতহুল কাদীর] অন্যত্র এসেছে, "মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে। আর তারা তাদের রব-এর উপরই নির্ভর করে।" [সূরা আল-আনফাল: ২] আরও এসেছে, "আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।" [সূরা আয-যুমার: ২৩]

৩৬. আর উট[১]কে আমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম করেছি[২]; তোমাদের জন্য তাতে অনেক মঙ্গল রয়েছে[৩]। কাজেই এক পা বাঁধা ও বাকী তিনপায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর[৪]। তারপর যখন

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

(১) মূলে الْبُدْن শব্দটি এসেছে। আরবী ভাষায় তা শুধুমাত্র উটের জন্য ব্যবহার করা হয়। [কুরতুবী] সাধারণতঃ ঐ উটকেই بدن বলা হয় যা কা'বার জন্য 'হাদঈ' হিসেবে প্রেরণ করা হয়। আর 'হাদঈ' হচ্ছে, উট, গরু, ছাগল সবগুলোর জন্য ব্যবহৃত নাম। [কুরতুবী] তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর বিধানে গরুকেও উটের হুকুমের সাথে শামিল করেছেন। একটি উট কুরবানী করলে যেমন তা সাতজনের জন্য যথেষ্ট, ঠিক তেমনি সাত জন মিলে একটি গরু কুরবানী দিতে পারে। হাদীসে এসেছে, জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন কুরবানীতে উটের ক্ষেত্রে সাতজন এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজন শরীক হয়ে যাই।" [মুসলিমঃ ১২১৩] হজ্জের হাদঈতেও কুরবানীর মত একটি গরু, মহিষ ও উটে সাতজন শরীক হতে পারে। [কুরতুবী]

(২) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদাতকে شعائر বলা হয়। হাদঈ যবেহ্ করা এমন বিধানাবলীর অন্যতম। কাজেই এ ধরণের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) অর্থাৎ তোমরা তা থেকে ব্যাপকহারে কল্যাণ লাভ করে থাকো। দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক উপকারিতা তাতে রয়েছে। এখানে কেন হাদঈ যবাই করতে হবে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যেসব জিনিস থেকে লাভবান হয় তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই আল্লাহর নামে কুরবানী করা উচিত, শুধুমাত্র নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নয় বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি দেবার জন্যও, যাতে মানুষ মনে মনে ও কার্যত একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন এ সবই তাঁর। তারপরও এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করে থাকে। মুজাহিদ বলেন, এতে যেমন সওয়াব রয়েছে তেমনি রয়েছে উপকার। [ইবন কাসীর] দুনিয়ার উপকারিতা যেমন, খাওয়া, সদকা, ভোগ করা ইত্যাদি। [সা'দী] ইবরাহীম নাখ'য়ী বলেন, যদি প্রয়োজন হয় তার উপর সওয়ার হতে পারবে এবং দুধ দুইয়ে খেতে পারবে। [ইবন কাসীর] আর আখেরাতের কল্যাণ তো আছেই।

(৪) صَوَآفَّ শব্দের অর্থ তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে।

তারা কাত হয়ে পড়ে যায়[১] তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে[২]; এভাবে আমরা সেগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

উটের জন্য এই নিয়ম । [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কুরবানী করা সুন্নত ও উত্তম । অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় যবেহ্ করা সুন্নত ।[দেখুন, কুরতুবী] তাউস ও হাসান صَوَافَّ শব্দটির অর্থ করেছেন, খালেসভাবে । অর্থাৎ একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য । তাঁর নামের সাথে আর কারও নাম নিও না । [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এখানে "তাদের উপর আল্লাহর নাম নাও" বলে আল্লাহ্‌র নামে যবাই করার কথা বলা হয়েছে । ইসলামী শরী'আতে আল্লাহর নাম না নিয়ে পশু যবেহ করার কোন অবকাশ নেই । তাছাড়া এখানে নাম নেয়ার অর্থ শুধু নাম উচ্চারণ নয় বরং মনে-প্রাণে আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরই নামে যবাই করা বুঝাবে । যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে এবং অন্য কোন ব্যক্তি যথা পীর, কবর, মাজার, জিন ইত্যাদির সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে তবে তা সম্পূর্ণভাবে হারাম ও শির্ক বলে বিবেচিত হবে ।

(১) এখানে وَجَبَتْ-এর অর্থ سَقَطَتْ বা পড়ে যাওয়া করা হয়েছে । যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় الشَّمْسُ وَجَبَتْ অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়েছে । এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে । [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] সুতরাং সম্পূর্ণভাবে রূহ নির্গত না হওয়া পর্যন্ত প্রাণী থেকে কিছু খাওয়া জায়েয নেই । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর উপর দয়া লিখে দিয়েছেন । সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন সুন্দরভাবে তা কর । আর যখন যবাই করবে তখন সুন্দরভাবে তা কর । তোমাদের কেউ যেন তার ছুরিটি ধার দিয়ে নেয় এবং যবেহকৃত প্রাণীটিকে শান্তি দেয় ।" [আবু দাউদ: ২৮১৫]

(২) যাদেরকে হাদঈ ও কুরবানীর গোশ্‌ত দেয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بائس বলা হয়েছে । এর অর্থ দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত । এই আয়াতে তদস্থলে قَانِعٌ ও مُعْتَرّ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে । قَانِعٌ ঐ অভাবগ্রস্ত ফকীরকে বলা হয়, যে কারো কাছে যাচঞা করে না, দারিদ্র্য সত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে । পক্ষান্তরে مُعْتَرّ ঐ ফকীরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে-মুখে সওয়াল করুক বা না করুক । [দেখুন, ইবন কাসীর]

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া(১)। এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন; কাজেই আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে(২)।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاؕ اِنَّ اللّٰهَ

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন(৩), তিনি কোন

(১) এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, হাদঈ যবেহ্ করা বা কুরবানী করা একটি মহান ইবাদাত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এর গোশ্‌ত ও রক্ত পৌঁছে না কারণ তিনি অমুখাপেক্ষী। আর হাদঈ ও কুরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। তাঁকে যথাযথভাবে স্মরণ করা। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ অন্তরে তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নাও এবং কাজে তার প্রকাশ ঘটাও ও ঘোষণা দাও। এরপর কুরবানীর হুকুমের উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। পশুদের উপর আল্লাহ মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, শুধুমাত্র এ নিয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে যে, এগুলো যাঁর পশু এবং যিনি এগুলোর উপর আমাদের কর্তৃত্ব দান করেছেন, আমরা অন্তরে ও কাজে-কর্মেও তাঁর মালিকানা অধিকারের স্বীকৃতি দেবো, যাতে আমরা কখনো ভুল করে একথা মনে করে না বসি যে, এগুলো সবই আমাদের নিজেদের সম্পদ। কুরবানী করার সময় যে বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় তার মধ্য দিয়ে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রকাশ ঘটে। যেমন সেখানে বলা হয় "হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য উপস্থিত"। [আবুদাউদঃ২৭৯৫]

(৩) আয়াতে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যাবতীয় ক্ষতি দূরিভূত করবেন। এটা শুধু তাদের ঈমানের কারণে। তিনি কাফেরদের ক্ষতি, শয়তানের কুমন্ত্রণার ক্ষতি, নাফসের কুমন্ত্রণার ক্ষতি, তাদের খারাপ আমলের পরিণতি সংক্রান্ত ক্ষতি, এসব কিছুই প্রতিহত করবেন। কোন অপছন্দ কিছু সংঘটিত হলে তিনি তারা যা বহন করার ক্ষমতা নেই সেটা বহন করে নিবেন, ফলে মুমিনদের জন্য সেটা হাল্কা হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুমিনই তার ঈমান অনুসারে

لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝

বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না[১]।

এ প্রতিহত ও প্রতিরোধ প্রাপ্ত হবে। কারও বেশী ও কারও কম। [সা'দী] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" [সূরা আত-তালাক: ৩] "আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়।" [সূরা আয-যুমারঃ ৩৬] আরও বলেন, "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপদস্থ করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের চিত্ত প্রশান্তি করবেন, আর তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহঃ ১৪-১৫] আরও বলেন, "আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা।" [সূরা আর-রূমঃ ৪৭] আরও বলেন, "আর আমাদের বাহিনীই হবে বিজয়ী।" [সূরা আস-সাফফাতঃ ১৭৩] অনুরূপ আরও আয়াত। এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের থেকে যাবতীয় খারাপ ও বিপদাপদ প্রতিরোধ করবেন। কেননা আল্লাহ্র উপর ঈমান বিপদাপদ থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় কারণ। অথবা আয়াতের অর্থ, তিনি মুমিনদের পক্ষ থেকে বেশী বেশী প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করবেন। যখনই আক্রমণকারী আক্রমণ করে তখনই তিনি তাদের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করবেন। তারা যত বেশীই ষড়যন্ত্র ও আক্রমনের সমাবেশ করুক না কেন, তিনি তত বেশীই তাদের পক্ষ থেকে তা প্রতিহত করবেন। [আদওয়াউল বায়ান] সুতরাং কুফর ও ঈমানের সংঘাতে মুমিনরা একা ও নিঃসঙ্গ নয় বরং আল্লাহ নিজেই তাদের সাথে এক পক্ষ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাদেরকে সমর্থন দান করেন। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। অনিষ্টকারকদের অনিষ্টকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকেন। কাজেই এ আয়াতটি আসলে হক পন্থীদের জন্য একটি বড় রকমের সুসংবাদ। তাদের মনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন জিনিস হতে পারে না।

(১) যারাই আল্লাহ্র অর্পিত আমানতের খেয়ানত করে, আল্লাহ্র হক নষ্ট করে, মানুষের হক নষ্ট করে এমন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারীকে আল্লাহ্ কখনও ভালবাসেন না। কারণ, আল্লাহ তার কাছে যেসব আমানত সোপর্দ করেছেন সেগুলোতে সে খেয়ানত করেছে এবং তাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি ও নেমকহারামির মাধ্যমে তার জবাব দিয়ে চলছে। কাজেই আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া ও ইহসান করেন, আর সে আল্লাহ্র প্রতি কুফরী ও অবাধ্যতা করে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ্ এটা পছন্দ করতে পারেন না। বরং তিনি সেটা ঘৃণা করেন। ক্রোধান্বিত হন। তিনি তাদের কুফরী ও খেয়ানতের শাস্তি তাদেরকে প্রদান করবেন। [সা'দী]

ষষ্ঠ রুকূ’

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে[১]; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে[২] । আর

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয়। [ইবন কাসীর] অধিকাংশ মনীষী বলেছেন, জিহাদের ব্যাপারে এটিই প্রথম নাযিলকৃত আয়াত। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হলো, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এরা অবশ্যই ধ্বংস হবে, তারা তাদের নবীকে বের করে দিয়েছে। ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন’ তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। আর এটিই প্রথম যুদ্ধের আয়াত। [তিরমিযী: ৩১৭১; মুসনাদে আহমাদ: ১/২১৬] এর আগে মুসলিমদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তাদেরকে সবর করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল। [মুয়াসসার]

(২) এদের উপর যে ধরনের অত্যাচার করে বের করে দেয়া হয় তা অনুমান করার জন্য একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়: সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশ বংশীয় কাফেররা তাঁকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছো। যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। কারো দান তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু ঐ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরণের কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না। [ইবন হিব্বান: ১৫/৫৫৭] মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকেই এ ধরনের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও যালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি। মোটকথাঃ মক্কায় মুসলিমদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলিম তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলিমদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলতেনঃ সবর কর। আমাকে এখনো যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম[1];

৪০. তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

(১) অর্থাৎ তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের বিনা যুদ্ধে সাহায্য করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি চান তাঁর বান্দারা তাদের প্রচেষ্টা তাঁর আনুগত্যে কাজে লাগাবে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত কর, অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধ; তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। যতক্ষণ না যুদ্ধ এর ভার (অস্ত্র) নামিয়ে না ফেলে। এরূপই, আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে। আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হতে দেন না। অচিরেই তিনি তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।" [সূরা মুহাম্মাদঃ ৪-৬] আর এজন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তিনি অবশ্যই সে সাহায্য করেছেন। [ইবন কাসীর] জিহাদ তো তিনি তখনই ফরয করেছেন যখন তার উপযোগিতা দেখা গিয়েছিল। কেননা, তারা যখন মক্কায় ছিল তখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম। যদি তখন জিহাদের কথা বলা হত, তবে তাদের কষ্ট আরও বেড়ে যেত। আর এজন্যই যখন মদীনাবাসীরা আকাবার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত বা শপথ নিয়েছিল, তারা ছিল আশি জনেরও কিছু বেশী। তখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি উপত্যকাবাসীদের উপর আক্রমন করবো না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এ জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। তারপর যখন তারা সীমালঙ্ঘন করল, আর তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের কাছ থেকে বের করে দিল এবং তাকে হত্যা করতে চাইল। আর সাহাবায়ে কিরামের কেউ হাবশাতে কেউ মদীনাতে হিজরত করল। তারপর যখন মদীনাতে তারা স্থির হলো এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পৌঁছালেন, তারা তার চারপাশে জমা হলেন। তাকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তাদের জন্য একটি ইসলামী দেশ হলো, একটি কেল্লা হলো যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে, তখনই আল্লাহ্ শত্রুদের সাথে জিহাদ করার অনুমতি দিলেন। [ইবন কাসীর]

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

না করতেন[১], তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয়[২] এবং মসজিদসমূহ---যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্

(১) অর্থাৎ আল্লাহ কোন একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি, এটি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ায় একটি দলকে দিয়ে তিনি অন্য একটি দলকে প্রতিহত করতে থেকেছেন। নয়তো কোন একটি নির্দিষ্ট দল যদি কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করতো তাহলে ইবাদাতগৃহসমূহও বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতো না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুকে এভাবে বলা হয়েছেঃ "যদি আল্লাহ লোকদেরকে একজনের সাহায্যে অন্যজনকে প্রতিহত না করতে থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতি বড়ই করুণাময়।" [আয়াত ২৫১]

(২) আয়াতে বলা হয়েছে, صَوَامِعُ এ শব্দটি صَوْمَعَةٌ এর বহুবচন। এটা নাসারাদের বিশেষ ইবাদাতখানা। আর بِيَعٌ -শব্দটি بِيْعَةٌ এর বহুবচন। নাসারাদের সাধারণ গীর্জাকে بِيْعَةٌ বলা হয়। ইয়াহূদীদের ইবাদাতখানাকে صَلَوَاتٌ এবং মুসলিমদের ইবাদাতখানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়। [ইবন কাসীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ নাযিল না হলে কোন যুগেই আল্লাহ্‌র দ্বীনের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর আমলে صَلَوَاتٌ ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর আমলে صَوَامِعُ ও بِيَعٌ এবং শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। তবে বিগত যামানায় যত শরী'আতের ভিত্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এখন তা পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শির্কে পরিণত হয়েছে, সেসব শরী'আতের ইবাদাতগৃহসমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যামানায় তাদের ইবাদাতগৃহসমূহের সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। বর্তমানে সেসব ইবাদতস্থানের সম্মান করার নিয়ম রহিত হয়ে গেছে। লক্ষণীয় যে, আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের উপাসনালয় কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহী নির্ভর ছিল বলে প্রমাণিত হয়নি। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) এ বক্তব্যটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং সত্য দ্বীন কায়েম ও

শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪১. তারা(১) এমন লোক যাদেরকে আমরা

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

মন্দের জায়গায় ভালোকে বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, আর এজন্যে তারা নবী-রাসূল ও তাদের আনীত দ্বীনকে সাহায্য করে এবং আল্লাহ্‌র বন্ধুদের সাহায্য করে, তারা আসলে আল্লাহর সাথে সহযোগিতা করে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।" [সূরা মুহাম্মাদঃ ৭-৮] [ইবন কাসীর]

(১) এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এজন্যেই আবুল আলীয়া বলেন, এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] হাসান বসরী বলেন, তারা হচ্ছে এ উম্মতের সে সমস্ত লোক, যারা কোন জায়গা জয় করলে সেখানে সালাত কায়েম করে। ইবন আবী নাজীহ্ বলেন, এখানে শাসকদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। দাহহাক বলেন, এটা এমন এক শর্ত যা আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করেছেন তাদের উপর আরোপ করেছেন। [কুরতুবী] উমর ইবন আবদুল আযীয বলেন, এটি শুধু গভর্ণরের দায়িত্ব নয়, এটা গভর্ণর ও যাদের উপর তাকে গভর্ণর বানানো হয়েছে তাদের সবার দায়িত্ব। আমি কি তোমাদেরকে গভর্ণরের উপর কি দায়িত্ব আর গভর্ণরের জন্য তোমাদের উপর কি দায়িত্ব সেটা জানিয়ে দেব না? গভর্ণরের দায়িত্ব হচ্ছে, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র হকের ব্যাপারে তোমাদেরকে পাকড়াও করা। আর তোমাদের কারও দ্বারা অপর কারও আক্রান্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে তার হক আদায় করা। আর যতটুকু সম্ভব তোমাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথে পরিচালিত করা। আর তোমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আনুগত্য করা। তবে জোর করে নয়। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য কথার বিপরীতে গোপনে ভিন্ন কথা না বলা। [ইবন কাসীর] আতিয়্যাহ আল-আওফী বলেন, এ আয়াতটি অন্য একটি আয়াতের মত। যেখানে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে"। [সূরা আন-নূরঃ ৫৫]

আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা তাদের ক্ষমতাকে সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন নাযিল হয়, যখন মুসলিমদের কোথাও পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা ক্ষমতা লাভ করলে তা দ্বীনের উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই

যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে[1], যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চুড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।	وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾
৪২. আর যদি লোকেরা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তবে তাদের আগে নূহ্, ‘আদ ও সামূদের সম্প্রদায়ও তো মিথ্যারোপ করেছিল।	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾
৪৩. এবং ইব্‌রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়,	وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর মাদ্‌ইয়ানবাসীরা; অনুরূপভাবে মিথ্যারোপ করা হয়েছিল মূসার প্রতিও। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব (প্রত্যক্ষ করুন) আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি) কেমন ছিল[2]!	وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾

ওসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ ثَنَاءٌ قَبْلَ بَلَاءٍ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার এই এরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা করার শামিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এরপর আল্লাহ্ তা‘আলার এই নিশ্চিত সুসংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন এ আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। [কুরতুবী] আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকেই ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যয় করেন। তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

(১) সালাত কায়েম করার অর্থ হলোঃ সময়মত, সালাতের সীমারেখা, আরকান ও আহকামসহ জামা‘আতের সাথে আদায় করা।

(২) এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো, نكير এর অর্থ, কোন কিছুকে পূর্ণভাবে অস্বীকার করা। অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অস্বীকার করে আমার যে সমস্ত কর্মপ্রণালী ছিল তা কেমন হয়েছে তা দেখে নিন। তারা নবী-রাসূলদেরকে অস্বীকার

৪৫. অতঃপর আমরা বহু জনপদ ধ্বংস করেছি যেগুলোর বাসিন্দা ছিল যালেম। ফলে এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে বহু কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অনেক সুদৃঢ় প্রাসাদও!

فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত[১]। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভংগ করেন না[২]।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

করে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নের মাধ্যমে যে অন্যায় করেছিল আমি সে অন্যায়কে অস্বীকার করে তার প্রতিকার করেছি তাদেরকে প্রথমে ছাড় দিয়ে তারপর পাকড়াও করে শাস্তি বিধান করার মাধ্যমে। তাদের নেয়ামতসমূহ ধ্বংস করার মাধ্যমে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে এতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের পূর্ণ অর্থ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে- (এক) এসব মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা তাদের মূর্খতা, অবাধ্যতা ও অদূরদর্শিতার কারণে তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌র আযাব কামনা করছে। অথচ আল্লাহ্ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। তিনি যে শাস্তির ধম্‌কি দিয়েছেন, তা আসবেই। তারা আপনার কাছে তাড়াতাড়ি সে শাস্তি কামনা করলেও তা তো আর আপনার কাছে নেই, সুতরাং তাদের এই তাড়াহুড়া করা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কিছুই নেই। কেননা, তাদের সামনে রয়েছে কেয়ামত দিবস, যেদিন তিনি পূর্বাপর সমস্ত সৃষ্টিজগতকে একত্রিক করবেন। তখন

تَعُدُّوْنَ۝

আর নিশ্চয় আপনার রব-এর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান[১];

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ۝

৪৮. আর আমি অবকাশ দিয়েছি বহু জনপদকে যখন তারা ছিল যালেম; তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি, আর আমারই কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল।

সপ্তম রুকূ'

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ۝

৪৯. বলুন, 'হে মানুষ! আমি তো কেবল তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ۝

৫০. কাজেই যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা[২];

তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিফল দেবেন। তাদের উপর তো চিরস্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে। সুতরাং দুনিয়ার বুকে তাদের উপর শাস্তি আসুক বা নাই আসুক, সেদিন তা তাদের উপর আসবেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] (দুই) যদি আয়াতে উল্লেখিত আযাব দ্বারা দুনিয়ার আযাব উদ্দেশ্য হয় তখন আগের অংশের সাথে পরের অংশের মিল হবে এভাবে যে, তোমাদের উপর আযাব দুনিয়াতেই আসবে। আর সেটা এসেছিল বদরের যুদ্ধে। [কুরতুবী]

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে, "আপনার রব-এর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান"। আখেরাতের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'নিঃস্ব মুসলিমগণ ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।' [তিরমিযিঃ ২৩৫৩, ২৩৫৪]। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, বান্দাদের এক হাজার বছরের সমান হচ্ছে আল্লাহ্র একদিন। [ইবন কাসীর]

(২) "মাগফেরাত" বলতে বুঝানো হয়েছে অপরাধ,পাপ, ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে চলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। আর "সম্মানজনক জীবিকা"র অর্থ, জান্নাত। [ইবন কাসীর]

৫১. এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

৫২. আর আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি[১], তাদের কেউ যখনই (ওহীর কিছু) তিলাওয়াত করেছে[২], তখনই শয়তান তাদের

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ

(১) এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয়; পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। তবে এ পার্থক্য নির্ধারণে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছেঃ
(এক) রাসূল বলা হয়- যার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে এবং প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর নবী বলা হয়- যার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে কিন্তু প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়নি। (দুই) রাসূল হলেন যাকে নতুন শরী'আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর নবী হলেন যাকে পূর্ববর্তী শরী'আতের অনুসারী সংস্কারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। (তিন) রাসূল হলেন যাকে দ্বীনের বিরোধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, আর নবী হলেন যাকে দ্বীনের স্বপক্ষীয় জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হল- রাসূল হলেনঃ যাকে দ্বীন-বিরোধী জাতি অর্থাৎ কাফের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মানুষকে তার কাছে যে শরী'আত আছে সে শরী'আতের দিকে আহ্বান করবেন। তাকে সে জাতির কেউ কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। তিনি প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশিত হবেন। কখনো কখনো তার সাথে কিতাব থাকবে আর এটাই স্বাভাবিক, আবার কখনো কখনো রাসূলের সাথে কিতাব থাকবে না। কখনো তার শরী'আত হবে সম্পূর্ণ নতুন, আবার কখনো তার শরী'আত হবে পূর্ববর্তী শরী'আতের পরিপূরক হিসেবে। অর্থাৎ সেখানে বাড়তি বা কমতি থাকবে। আর নবী হলেনঃ যার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হবেন। পূর্ব শরী'আত অনুযায়ী হুকুম দেবেন। পূর্ব শরী'আতকে পূনর্জীবিত করবেন এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। তাকে প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশও দেয়া হবে। তার জন্য নতুন কিতাব থাকাও অসম্ভব নয়। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ২/৭১৮; ইবনুল কাইয়্যেম, তরীকুল হিজরাতাইন, ৩৪৯; ইবন আবিল ইযয, শারহুত তাহাভীয়্যা: ১৫৮; ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার, আর-রুসুল ওয়ার রিসালাত: ১৪-১৫]

(২) মূল শব্দটি হচ্ছে, تمنى (তামান্না)। আরবী ভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের আশা-আকাংখা করা। [ফাতহুল কাদীর] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিলাওয়াত অর্থাৎ কিছু পাঠ করা। তবে আয়াতে تمنى শব্দের অর্থ قرأ অর্থাৎ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

তিলাওয়াতে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন[১]। তারপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি সেটাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে আর যারা

আবৃত্তি করে এবং أمنية শব্দের অর্থ قراءة অর্থাৎ আবৃত্তি করা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আরবী অভিধানে এ অর্থ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আয়াতের অর্থ হল- আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে যখনই কোন নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন, তিনি যখন মানুষকে উপদেশ দেয়ার জন্য আদেশ-নিষেধ প্রদান করতেন, তখনি সেখানে শয়তান মানুষের কানে তার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তমূলক এমন কথাবার্তা প্রবিষ্ট করত যা নবীর কথা ও পড়ার সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। আর আল্লাহ্ যেহেতু নবী-রাসূলদেরকে উম্মতের জন্য প্রচার করা বিষয়সমূহ এবং তাঁর ওহীর হেফাযত ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করেছেন, সেহেতু তিনি শয়তানের সে সমস্ত কারসাজি ও ষড়যন্ত্রকে স্থায়িত্ব দেন না; বরং অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেন। ফলে কোনটা আল্লাহ্র আয়াত আর কোনটা তাঁর আয়াত নয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহের হেফাযত করে থাকেন। মূলতঃ আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত মহাশক্তিধর। তিনি একদিকে তাঁর সুনির্দিষ্ট হেকমত ও প্রজ্ঞার কারণে শয়তানের পক্ষ থেকে তা হতে দেন অপরদিকে তাঁর শক্তিতে তাঁর ওহীর হেফাযত করেন। যাতে করে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং কঠোর হৃদয়ের অধিকারী মানুষদের মনে শয়তানের এ বাক্যগুলো ফেৎনা সৃষ্টি করতে পারে। এর বিপরীতে যাদের কাছে রয়েছে ইলম বা জ্ঞান, তারা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয় ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্র আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। বরং এতে তাদের অন্তরে ঈমান বর্ধিত হয় এবং তারা আল্লাহ্র জন্য বিনম্র ও বিনয়ী হয়ে পড়ে। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী থেকে সংক্ষেপিত]

(১) অর্থাৎ তিনি জানেন শয়তান কোথায় কি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং তার কি প্রভাব পড়েছে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শয়তানী ফিতনার প্রতিবিধান করে থাকে। তিনি শয়তানী চক্রান্তকে কখনো সফল হতে দেন না। প্রক্ষিপ্ত অংশ বাতিল করে দেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

পাষাণহৃদয়[১]। আর নিশ্চয় যালেমরা দুস্তর বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. আর এ জন্যেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো সত্য; ফলে তারা তার উপর ঈমান আনে ও তাদের অন্তর তার প্রতি বিনয়াবনত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাতে সন্দেহ পোষণ থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের কাছে কেয়ামত এসে পড়বে হঠাৎ করে, অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি[২]।

---

(১) অর্থাৎ শয়তানের ফিতনাবাজীকে আল্লাহ লোকদের জন্য পরীক্ষা এবং নকল থেকে আসলকে আলাদা করার একটা মাধ্যমে পরিণত করেছেন। বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা এসব জিনিস থেকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এগুলো তাদের জন্য ভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত হয়। অন্যদিকে স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী লোকেরা এসব কথা থেকে নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্য হবার দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে এবং তারা অনুভব করতে থাকে যে, এগুলো শয়তানের অনিষ্টকর কার্যকলাপ। এ জিনিসটি তাদেরকে একদম নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, এটি নির্ঘাত কল্যাণ ও সত্যের দাওয়াত। যা আল্লাহ্র জ্ঞানে ও সংরক্ষণে নাযিল হয়েছে, সুতরাং তার সাথে অন্য কিছু মিলে মিশে যাবে না। বরং এটি হচ্ছে এমন প্রাজ্ঞ কিতাব, "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না---সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪২] এভাবে তাদের ঈমান আরও দৃঢ় হয়। তারা বিশ্বাসী এবং অনুগত হয়। তাদের মন এ কুরআনের জন্য বিনয়ী হয়ে যায়। [ইবন কাসীর]

(২) মূলে আছে عقيم শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "বন্ধ্যা"। [ফাতহুল কাদীর] দিনকে বন্ধ্যা বলার দু'টি অর্থ হতে পারে। যদি দুনিয়ার দিন উদ্দেশ্য হয়, তখন অর্থ হবে, আযাব ও শাস্তি নাযিলের দিন। যা এমন ভাগ্য বিড়ম্বিত দিন তাতে কোনরকম কলাকৌশল কার্যকর হয় না। কোন কল্যাণ ও দয়া অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়

اَلْمُلْكُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

৫৬. সেদিন আল্লাহ্‌রই আধিপত্য; তিনিই তাদের মাঝে বিচার করবেন। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা নেয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৫৭. আর যারা কুফরী করেছে ও আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

অষ্টম রুকূ'

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্‌র পথে, তারপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।

প্রত্যেকটা আশা নিরাশায় পরিণত হয়। যেমন, বদরের দিন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ দিনটি প্রতি উম্মতের জন্যই এসেছিল। যেদিন নূহের জাতির উপর তুফান এলো সেদিনটি তাদের জন্য ছিল 'বন্ধ্যা' দিন। এমনিভাবে আদ, সামুদ, লূতের জাতি, মাদইয়ানবাসী ও অন্যান্য সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির জন্য আল্লাহর আযাব নাযিলের দিনটি বন্ধ্যা দিনই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, "সেদিনের" পরে আর তার "পরের দিন" দেখা যায়নি এবং নিজেদের বিপর্যস্ত ভাগ্যকে সৌভাগ্যে রূপান্তরিত করার কোন পথই খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রহমত ও দয়ার দেখা তারা আর পায় নি। সুতরাং দুনিয়াতে এ আযাব ও যুদ্ধের দিনগুলো হচ্ছে বন্ধ্যা দিন। অথবা এখানে বন্ধ্যা দিন বলে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সেটা এমন দিন যার পরে আর কোন রাত নেই। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী] সেদিন যখন আসবে তখন কাফেররা জানতে পারবে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। আর তারা অনুশোচনা করবে, কিন্তু তাদের সে অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। তারা যাবতীয় কল্যাণ হতেই নিরাশ ও হতাশ হয়ে যাবে। তখন আশা করবে, যদি তারা রসুলের উপর ঈমান আনত এবং তার পথে চলত। সুতরাং এ আয়াতে তাদের মিথ্যা পথ ও বানোয়াট রাস্তায় স্থির থাকার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। [সা'দী]

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে, আর আল্লাহ্ তো সম্যক জ্ঞানী[১], পরম সহনশীল।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৬০. এটাই হয়ে থাকে, আর কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করলে[২] তারপর পুনরায় সে নিপীড়িত হলে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন[৩]; নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল[৪]।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

---

(১) এ আয়াতের শেষে আল্লাহ্র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণসম্পন্ন নাম এসেছে, যার সাথে আয়াতের বক্তব্যের সম্পর্ক নির্ণয়ে বলা যায় যে, প্রথম গুণটি বলা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন عليم বা সর্বজ্ঞাত অর্থাৎ তিনি জানেন কে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছে এবং সে কোন ধরনের পুরস্কার লাভের যোগ্য। দ্বিতীয়গুণটি বলা হয়েছে, তিনি حليم বা পরম সহিষ্ণু অর্থাৎ এ ধরনের ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে তাদের বড় বড় কর্মকাণ্ড ও ত্যাগকে তিনি বিনষ্ট করে দেবেন না। তিনি সেগুলো উপেক্ষা করবেন এবং তাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন। [ইবন কাসীর]

(২) প্রথমে এমন মাযলুমদের কথা বলা হয়েছিল যারা যুলুমের জবাবে কোন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। আর এখানে এমন মযলুমদের কথা বলা হচ্ছে যারা যুলুমের জবাবে শক্তি ব্যবহার করে। আয়াতে মযলুমকে যালিমের সাথে সে ধরনের ব্যবহার করতে বলেছে যে ধরনের ব্যবহার সে মাযলুমের সাথে করেছে। সুতরাং যদি কেউ যালেমের সাথে তার যুলুম অনুরূপ ব্যবহার করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। [সা'দী] এটাকে শাস্তি বলা হলেও আসলে এটি প্রতিশোধ। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ যুলুমের জবাবে যে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তাতে দোষের কিছু নেই। তারপর যদি তার উপর আবার যুলুম করা হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। কেননা সে মাযলুম। সুতরাং সে তার অধিকার আদায় করেছে বা প্রতিশোধ নিয়েছে বলে তার উপর যুলুম করা বৈধ হবে না। সুতরাং যদি অন্যায় ও যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার পর কেউ প্রতিশোধ নেয়ার কারণে তার উপর যুলুম করা হলে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, তাহলে যে ব্যক্তি তার উপর অন্যায় ও যুলুমের প্রতিশোধ নেয়নি সে আল্লাহ্র সাহায্য পাবার অধিক নিকটবর্তী। [সা'দী]

(৪) আয়াতের এ অংশের সম্পর্ক শুধুমাত্র নিকটবর্তী শেষ বাক্যটির সাথে হলে এর অর্থ হবে, যদিও প্রথম অন্যায়কারীর অন্যায় বেশী, তারপরও তোমরা বেশী প্রতিশোধ না

৬১. এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ রাতকে প্রবেশ করান দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[২];

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

৬২. এজন্যেও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য[৩]। আর নিশ্চয়

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ

নিয়ে প্রতিশোধে সমতা বিধানের কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্র ক্ষমা ও মার্জনা গুণ দু'টি এটাই চাচ্ছে যে, যুলুমের বিপরীতে সম প্রতিশোধই নেয়া হোক, কারণ, তা হকের কাছাকাছি। আর যদি এ গুণ দু'টির সম্পর্ক উপরের কতেক আয়াতের সাথে সমভাবে হয়, অর্থাৎ হিজরতকারীদের সাথে হয়, তখন অর্থ হবে, মুহাজিরদের এরকম প্রতিফল এজন্যেই দেব যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী। তিনি তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ তিনিই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক এবং দিন রাত্রির আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তিনি রাতের এক অংশে দিনের প্রবেশ ঘটান, আবার দিনের একাংশে রাত প্রবেশ করান। তাই কখনও দিন বড় হয়, আবার কখনও রাত বড় হয়। [ইবন কাসীর] এই বাহ্যিক অর্থের সাথে সাথে এ বাক্যের মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, রাতের অন্ধকার থেকে যে আল্লাহ দিনের আলো বের করে আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের উপর যিনি রাতের অন্ধকার জড়িয়ে দেন তাঁরই এমন ক্ষমতা আছে যার ফলে আজ যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের দ্রুত দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার তাঁর হুকুমে সরে যাবে এবং এ সংগে সেদিনের উদয় হবে যেদিন সত্য, সততা ও জ্ঞানের আলোকে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠবে। মুমিনরা বিজয় লাভ করবে। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) এ আয়াতে মহান আল্লাহ্র দু'টি মহান গুণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ তিনি অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন বরং এমন আল্লাহ যিনি দেখতে ও শুনতে পান। বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা, কার্যক্রম ও উঠাবসা তাঁর কাছে গোপন নেই। [ইবন কাসীর] সুতরাং কে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে এবং কার সাহায্য করা দরকার এটা তিনি সম্যক অবগত। আর তিনি তাকে সেভাবে সময়মত ঠিকই সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

(৩) অর্থাৎ তিনিই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ও যথার্থ রব। একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা যাবে। কারণ, তিনিই মহান শক্তিধর, তিনি যা চাইবেন তা হবে, আর যা চাইবেন না তা হবে না। সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য। [ইবন কাসীর] সুতরাং তাঁর বন্দেগীকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। আর অন্যান্য

الْكَبِيرُ ۝٦٢

আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান(১) ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

৬৩. আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্ পানি বর্ষণ করেন আকাশ হতে; যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে যমীন(২)? নিশ্চয়

সকল মাবুদই আসলে পুরোপুরি অসত্য ও অর্থহীন। তাদেরকে যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে সেগুলোর মূলত কোন ভিত্তি নেই। তারা লাভ বা ক্ষতি কিছুরই মালিক নয়। [ইবন কাসীর] সুতরাং আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভরসায় যারা বেঁচে থাকে তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।

(১) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। অনুরূপ অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫] আরও এসেছে, "তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।" [সূরা আর-রা'দ: ৯] সুতরাং সবকিছুই তাঁর ক্ষমতা, প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের অধীন। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত আর কোন রব নেই। তিনিই মহান, তাঁর চেয়ে মহৎ কেউ নেই। তিনিই সর্বোচ্চ সত্তা, তাঁর উপরে কেউ নেই, তিনিই বড় তাঁর থেকে বড় কেউ নেই। যালেমরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র ও মহান! [ইবন কাসীর]

(২) এখানে আবার প্রকাশ্য অর্থের পেছনে একটি সুক্ষ্ম ইশারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রকাশ্য অর্থ তো হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা বর্ণনা করা। কিন্তু এর মধ্যে এ সুক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তার ছিটেফোঁটা পড়ার সাথে সাথেই যেমন তোমরা দেখো বিশুষ্ক ভূমি অকস্মাৎ সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি আজ যে অহীর শান্তিধারা বর্ষিত হচ্ছে তা শিগগিরই তোমাদের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখাবে। তোমরা দেখবে আরবের অনুর্বর বিশুষ্ক মরুভূমি জ্ঞান, নৈতিকতা ও সুসংস্কৃতির গুলবাগীচায় পরিণত হয়ে গেছে। অথবা আয়াতে পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসের জন্য এ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কারণ, সাধারণত: বৃষ্টি ও তার দ্বারা নতুন করে ফসলের উৎপাদনের ব্যাপারটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসেবে এসেছে। যেমন, "আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুস্ক ও ঊষর, তারপর যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৯] কারণ, তারপরেই স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, "নিশ্চয় যিনি যমীনকে জীবিত করেন তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৯] অন্যত্র বলেছেন, "সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করুন, কিভাবে তিনি যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর।" [সূরা আর-রূম: ৫০] কারণ আল্লাহ্ তারপর বলেছেন, "এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

خَبِيرٌ ۝٦٣

আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত(১)।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٦٤

৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, পরম প্রশংসিত(২)।

[সূরা আর-রূমঃ ৫০] আরও বলেছেন, " বান্দাদের রিয্‌কস্বরূপ। আর আমরা বৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে।" [সূরা কাফঃ ৯-১১] কারণ আয়াতের শেষাংশেই আল্লাহ্ বলেছেন, এভাবেই উত্থান ঘটবে।" [সূরা কাফঃ ১১] অর্থাৎ মৃত্যুর পর কবর থেকে জীবিত হয়ে বের হওয়া, বা পুনরুত্থান ঘটা। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে।" [সূরা আর-রূমঃ ১৯] আরও এসেছে, "আর এভাবেই আমরা মৃতদের বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৫৭] এ সংক্রান্ত আরও বহু আয়াত রয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান] সুতরাং আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাকরার পাশাপাশি আখেরাতের জন্য পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাসেরও প্রমাণ পেশ করা হয়ে গেছে।

(১) এ আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্‌র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণসম্পন্ন নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে, তিনি لطيف। এর মানে হচ্ছে, অননুভূত পদ্ধতিতে নিজের ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণকারী। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে লোকেরা তার সূচনায় কখনো তার পরিণামের কল্পনাও করতে পারে না। তিনি এত সুক্ষ্মদর্শী যে, ছোট বড় কোন কিছু তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। [ফাতহুল কাদীর] অনরূপভাবে, তিনি বান্দার রিযক অত্যন্ত সুক্ষ্ম পদ্ধতিতে পৌঁছিয়ে থাকেন। তদ্রূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তিনি কোন দানার কাছে পানির ব্যবস্থা করে সেটাকে মাটি থেকে তা উৎপন্ন করেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] لطيف এর অন্য অর্থ হচ্ছে, মেহেরবান, দয়াশীল। সে হিসেবে তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের রিযিকের ব্যবস্থাও করেন। [আদওয়াউল বায়ান] তারপর দ্বিতীয় গুণটি বলা হয়েছে যে, তিনি خبير অর্থাৎ তিনি নিজের দুনিয়ার অবস্থা, প্রয়োজন ও উপকরণাদি সম্পর্কে অবগত। কোথায় কোন দানা কিভাবে পড়ে আছে সেটাকে কি করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সেগুলোতে পানির অংশ পৌঁছিয়ে সেটা থেকে উদ্ভিদ বের করে আনেন। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "হে প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" [সূরা লুকমানঃ ১৬]

(২) এ আয়াতের শেষেও মহান রাব্বুল আলামীনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নামের সমাহার আমরা লক্ষ্য করি। বলা হয়েছে যে, তিনি ﴿الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ অর্থাৎ তিনি "অমুখাপেক্ষী" সবকিছুরই তিনি মালিক, আর সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী, তাঁরই

নবম রুকূ'

৬৫. আপনি কি দেখতে পান না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন[১] পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসবকে এবং তাঁর নির্দেশে সাগরে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আসমানকে[২] ধরে রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় যমীনের উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ, পরম দয়ালু।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾

বান্দা। [ইবন কাসীর] আর তিনিই "প্রশংসার্হ" অর্থাৎ প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র তাঁরই জন্য এবং কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের জীবজন্তু, নিশ্চল বস্তুনিচয়, ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদি সবকিছুই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে"। [সূরা আল-জাসিয়া: ১৩] [ইবন কাসীর] এখানে জানা দরকার যে, যমীনের সবকিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, আজ্ঞাধীন করে দেননি। কারণ, আজ্ঞাধীন করে দিলে এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তন করার আদেশ করত, অন্যজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হত না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌঁছে দিয়েছেন।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্র বিশেষ রহমত যে, তিনি আকাশকে যমীনের উপর ছেড়ে দেন না। যদি তাঁর রহমত ও শক্তি তা না করত, তবে আসমান যমীনের উপর পড়ে যেত। ফলে এতে যা আছে তা ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখতে পারে না। অবশ্যই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" [সূরা ফাতির: ৪১] [সা'দী]

৬৬. আর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন; তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। মানুষ তো খুব বেশী অকৃতজ্ঞ(১)।

وَهُوَ الَّذِيٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

৬৭. আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি 'মানসাক'(২) (ইবাদত

لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا

(১) অর্থাৎ এসব কিছু দেখেও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যে সত্য পেশ করেছেন তা অস্বীকার করে যেতে থাকে। এটা নি:সন্দেহে বড় ধরনের কুফরী। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে। তারা বরং আরও বেড়ে গিয়ে পুনরুত্থান ও আল্লাহ্‌র শক্তিকেও অস্বীকার করে বসে। [সা'দী]

(২) আয়াতের منسك শব্দটি مصدر ধরে অর্থ করা হবে, শরী'আত। [কুরতুবী] অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সুনির্দিষ্ট শরী'আত ও ইবাদাত পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। তারা সে অনুসারে ইবাদাত করবে। যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য ছিল কিন্তু মূল আদল, হিকমতে কোন পার্থক্য ছিল না। [সা'দী] সে সব উম্মত তাদের কাছে যে শরী'আত এসেছে, সেটা অনুসারে আমল করে। সুতরাং তাওরাত ছিল ইবাদাত ও শরী'আতের পদ্ধতি, কিন্তু তা ছিল মূসা আলাইহিস সালামের সময় হতে ঈসা আলাইহিস সালামের সময় পর্যন্ত। আর ইঞ্জীল ছিল ইবাদাত ও শরী'আতের পদ্ধতি, তবে তা ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের সময় হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় পর্যন্ত। সে ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদাত ও হজ্জের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং তাদেরকে তা মেনে চলতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]
অথবা আয়াতের منسك শব্দটি اسم ظرف বা স্থান নির্দেশক বিশেষ্য। তখন এর অর্থ হবে نسك এর স্থান। হজ্জের স্থান, বা ইবাদাতের স্থান। [ফাতহুল কাদীর] কেননা, অভিধানে نسك এর অর্থ এমন নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজ্জের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে। [ইবন কাসীর] সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, প্রতিটি উম্মতের জন্যই আমরা শরী'আত হিসেবে ইবাদতের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করেছি। তারা সেখানে একত্রিত হবে। তাই কাফেররা যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে ঝগড়া না করে। অথবা আয়াতের অর্থ, প্রতিটি উম্মতই একটি স্থানকে তাদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। আর আল্লাহ্ প্রকৃতিগতভাবে তাদের সেটা করতে দেন। (শরী'আতগতভাবে সেগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়) তারা সেটা

يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

পদ্ধতি) যা তারা পালন করে। কাজেই তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আর আপনি আপনার রব-এর দিকে ডাকুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।

وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর তারা যদি আপনার সাথে বিতণ্ডা করে তবে বলে দিন, 'তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত'[১]।

করবেই। সুতরাং আপনি তাদের সে সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ে তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। তাদের সাথে এ সমস্ত বাতিল বিষয় নিয়ে তর্ক করে আপনি আপনার কাছে যে হক এসেছে সেটাকে ছেড়ে দিবেন না। আর এজন্যই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, "আপনি তাদেরকে আপনার রব-এর দিকে ডাকুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।" অর্থাৎ আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত। আপনি স্পষ্ট সরল-সোজা পথে আছেন যা আপনাকে মনজিলে মাকসূদে পৌঁছে দিবে। [ইবন কাসীর]

অথবা আয়াতে منسك অর্থ যবেহ্ করার বিধি-বিধান বা জন্তুর গোশ্ত খাওয়ার পদ্ধতি। [ফাতহুল কাদীর] সে হিসেবে আয়াতে কাফেরদের কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। কোন কোন কাফের মুসলিমদের সাথে তাদের যবেহ্ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত: তোমাদের দ্বীনের এই বিধান আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃত জন্তু তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [কুরতুবী] অতএব, এখানে منسك এর অর্থ হবে যবেহ্ করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে, মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরী'আতেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে নবীগণের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।

(১) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলুন, 'আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।" [সূরা ইউনুস: ৪১] তারপর বলা হয়েছে, 'তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত' যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।" [সূরা আল-আহকাফ: ৮]

৬৯. 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দেবেন(১) ।'

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৭০. আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। এসবই তো আছে এক কিতাবে(২); নিশ্চয় তা আল্লাহ্র নিকট অতি সহজ।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

(১) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "সুতরাং আপনি তার দিকে ডাকুন এবং তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকুন যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না; এবং বলুন, 'আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে।" [সূরা আশ-শূরা: ১৫]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁর সৃষ্টিকুল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের কথা জানাচ্ছেন। আর এও জানাচ্ছেন যে, আসমান ও যমীনের সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান ঘিরে আছে। তা থেকে ছোট কিংবা বড় সামান্যতম জিনিসও বাদ পড়ে না। তিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছু সেগুলোর অস্তিত্বের আগ থেকেই জানেন। আর তিনি সেগুলো লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন। আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর"। [মুসলিম: ২৬৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ্ বললেন, যা হবে সবই লিখ। তখন কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে কলম চালু হল।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭] এ সবই আল্লাহ্র পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ যে, তিনি সবকিছু হওয়ার আগেই তা জানেন। আর তিনি সেটা নির্ধারণ করেছেন এবং লিখে রেখেছেন। সুতরাং বান্দারা যা করবে, কিভাবে করবে সেটা তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। সৃষ্টির আগেই জানেন যে, এ সৃষ্টি তার ইচ্ছা অনুসারে আমার আনুগত্য করবে, আর এ সৃষ্টি তার ইচ্ছা অনুসারে আমার অবাধ্য হবে। আর তিনি সেটা লিখে রেখেছেন এবং জ্ঞানে সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন। এটা তাঁর জন্য সহজ ও অনায়াসসাধ্য। [ইবন কাসীর]

৭১. আর তারা ‘ইবাদাত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল নাযিল করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই(১)। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই(২)।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

৭২. আর তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে আপনি কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ দেখতে পাবেন। যারা তাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বলুন, ‘তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও মন্দ কিছুর

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহর কোন কিতাবে বলা হয়নি, ‘আমি অমুক অমুককে আমার সাথে প্রভুত্বের কর্তৃত্বে শরীক করেছি। কাজেই আমার সাথে তোমরা তাদেরকেও ইবাদাতে শরীক করো।’ সুতরাং তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, “আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না।” [সূরা আল-মুমিনূন: ১১৭] আর কোন জ্ঞান মাধ্যমেও তারা এ কথা জানেনি যে, এরা অবশ্যই প্রভুত্বের কর্তৃত্বে অংশীদার এবং এজন্য এরা ইবাদাতলাভের হকদার। সুতরাং এখন যেভাবে বিভিন্ন ধরনের উপাস্য তৈরী করে এদের গুণাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আকীদা তৈরী করে নেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, এসব কিছু জাহেলী ধারণার অনুসরণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে? এ ব্যাপারে তাদের সর্বোচ্চ কথা হচ্ছে, তারা এগুলো তাদের পিতা-প্রপিতা পূর্বপুরুষদেরকে করতে দেখেছে। আর তারা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কোন দলীল-প্রমাণ তাদের নেই। কেবল শয়তান তাদের অন্তরে এগুলো সুশোভিত করে দিয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এ নির্বোধরা মনে করছে, আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হলে এ উপাস্যরা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাহায্যকারী হবে। অথচ আসলে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই, এ উপাস্যরা তো নয়ই। কারণ তাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা নেই। আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী নন। [ইবন কাসীর]

সংবাদ দেব? --- এটা আগুন[১]। যারা কুফরি করে আল্লাহ্ তাদেরকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এটা কত নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান!'

দশম রুকূ'

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُۥٓ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোন: তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও[২]। এবং মাছি যদি কিছু

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহর কালাম কুরআন পেশ করা হয়, সঠিক দলীল প্রমাণাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে তাওহীদের কথা জানানো হয় এবং বলা হয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর রাসূলগণ হক ও সত্য, তখন যারা সঠিক দলীল প্রমাণাদি উপস্থাপন করে, তাদের প্রতি এদের হাত মুখ আক্রমণাত্মক হয়ে যায়। বলুন, তোমাদের মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠে তার চেয়ে মারাত্মক জিনিস অথবা তাঁর আয়াত যারা শুনায় তাদের সাথে যে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার তোমরা করতে পারো তার চেয়েও খারাপ জিনিসের মুখোমুখি তোমাদের হতে হবে। আর তা হচ্ছে জাহান্নাম ও তার শাস্তি ও নিগ্রহ। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী তো দুর্বল হবার কারণেই তার চাইতে উচ্চতর কোন শক্তির কাছে সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সে যাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে তাদের দুর্বলতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা একটি মাছির কাছেও হার মানে। এখন তাদের দুর্বলতার অবস্থা চিন্তা করো যারা নিজেরাও দুর্বল এবং যাদের উপর নির্ভর করে তাদের আশা-আকাংখা-কামনা-বাসনাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারাও দুর্বল। আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের ইবাদাত করে, এরা সবাই যদি একত্রিত হয়ে একটি মাছি বানাতে চেষ্টা করে তবে তাতেও সমর্থ হবে না। যেমন এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চায়? তাহলে সে একটি পিপড়া বা ছোট বস্তু তৈরী করে দেখাক, অথবা একটি মাছি তৈরী করুক, অথবা একটি দানা তৈরী করে দেখাক" [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৯১] অন্য বর্ণনায় আরও এসেছে, "সে যেন একটি যবের দানা তৈরী করে দেখায়" [বুখারী: ৫৯৫৩, ৭৫৫৯] অপর বর্ণনায় এসেছে, "সে যেন একটি মশা তৈরী করে দেখায়।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৫৯] বস্তুত তারা একটি মাছি তৈরী করতেও সক্ষম নয়। বরং তার চেয়েও তাদের অবস্থা আরও অধম। [ইবন কাসীর]

ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও অন্বেষণকৃত কতই না দুর্বল[১];

৭৪. তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি যেমন মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল[২], নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٤﴾

৭৫. আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও[৩]; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা[৪]।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٥﴾

---

(১) বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব, তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ﴾ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামী ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরো বেশী শক্তিহীন হবে। ইবন আব্বাস বলেন, মূর্তি ও মাছি উভয়ই দুর্বল। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্র মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। এমন সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার সাথে তাঁর সৃষ্ট কোন কোন বান্দাকে শরীক সাব্যস্ত করছে। [দেখুন ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর নিজের পূর্ণতা ও মূর্তিদের দুর্বলতা বর্ণনা করলেন, আর এও বর্ণনা করলেন যে তিনিই একমাত্র মা'বুদ, এ আয়াতে তাঁর রাসূলদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারা সমস্ত সৃষ্টি থেকে আলাদা প্রকৃতির। তাদের রয়েছে ভিন্ন বিশেষত্ব। [সা'দী]

(৪) অর্থাৎ যিনি রাসূলদেরকে পছন্দ করে নিয়েছেন তিনি এমন নন যে, তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বেখবর। বরং তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। প্রত্যেক ব্যক্তির

৭৬. তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সব বিষয়ই আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত করা হবে[১]।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

৭৭. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজ্‌দা কর এবং তোমাদের রব-এর 'ইবাদাত কর ও সৎকাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার[২]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৭৮. আর জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত[৩]। তিনি

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ

প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জানেন কোথায় তাঁর রিসালাত রাখতে হবে আর কে এর জন্য অধিক উপযুক্ত। তিনি রাসূলদের পাঠান, ফলে তাদের কেউ কেউ এতে সাড়া দেয়, আর কেউ দেয় না। কিন্তু রাসূলদের দায়িত্ব এখানেই শেষ। তারপরই তারা আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে যাবে। সেখানেই তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফল পাবে। [সা'দী]

(১) তারা যা করেছে এবং যা কল্যাণকর ছিল অথচ তারা করেনি এসবই আল্লাহ্ জানেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠায় ও যা তারা পিছনে রেখে যায়।" [সূরা ইয়াসীন: ১২]

(২) অর্থাৎ সফল হতে হলে এ কাজগুলো করতে হবে। সালাত কায়েম করতে হবে, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে, এ দু'টি সালাতেরই গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আর এ ইবাদতই হচ্ছে চক্ষু শীতলকারী, চিন্তান্বিত অন্তরের জন্য সান্ত্বনা। আর আল্লাহ্‌র রুবুবিয়াতে বিশ্বাসের এটাই দাবী যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং যাবতীয় কল্যাণের কাজ করবে। [সা'দী]

(৩) جهاد ও مجاهدة শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। [বাগভী] কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলিমরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। ﴾حَقَّ جِهَادِهِ﴿ -এর অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে সম্পদ, জিহ্বা ও জান দিয়ে জিহাদ করা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা। কারও কারও মতে, ﴾حَقَّ جِهَادِهِ﴿ বা যথাযথ জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র যাবতীয় নির্দেশ মান্য করা, আর যাবতীয় নিষেধ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজেদের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা এবং নাফসকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে

اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ

তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন[১]। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি[২]।

ফিরিয়ে আনা। আর শয়তানের সাথে জিহাদ করবে তার কুমন্ত্রণা ঝেঁড়ে ফেলে দিয়ে, যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে তাদের যুলুমের প্রতিরোধ করে এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তাদের কুফরিকে প্রতিহত করে। [কুরতুবী] কারও কারও মতে, ﴿حَقَّ جِهَادِهٖ﴾ এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। [ফাতহুল কাদীর] দাহ্হাক ও মুকাতিল বলেনঃ ﴿حَقَّ جِهَادِهٖ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ্‌র জন্য কাজ করা, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা যেমন করা উচিত। আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক বলেনঃ এ স্থলে জিহাদ বলে নিজের প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে। [বাগভী]

(১) ওয়াসিলা ইবনে আসকা' রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বনী-ইসমাঈলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। [মুসলিমঃ ২২৭৬]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীনে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। 'দ্বীনে সংকীর্ণতা নেই' -এই বাক্যের তাৎপর্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থঃ এই দ্বীনে এমন কোন গোনাহ্ নেই, যা তাওবা করলে মাফ হয় না এবং আখেরাতের আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্ও ছিল, যা তাওবা করলেও মাফ হত না। [ফাতহুল কাদীর]

কারও কারও নিকট এর অর্থ, দ্বীনের মধ্যে এমন কোন হুকুম নেই যা মানুষকে সমস্যায় নিপতিত করবে। বরং এখানে যাবতীয় সংকীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় আছে। মূলতঃ ইসলাম সহজ দ্বীন, সুনির্দিষ্ট কোন দিক নয়; বরং সর্বদিক দিয়েই ইসলাম সহজ দ্বীন। এ দ্বীনে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীন ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ দ্বীন হিসাবে অবশিষ্ট রাখবেন। তাই সর্বসাধারণের উপযোগী করে তিনি এ দ্বীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দ্বীনের মধ্যে সংকীর্ণতা না থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- অযুর পানি না পেলে তায়াম্মুমের অনুমতি, যমীনের সমস্ত স্থান সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া, সফর অবস্থায় সালাতের কসর, সওমের জন্য অন্য সময়ে পূরণ করার অনুমতি ইত্যাদি অন্যতম। [দেখুন, ইবন কাসীর]

ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

তোমাদের পিতা[১] ইব্‌রাহীমের মিল্লাত[২]। তিনি আগে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও[৩]; যাতে রাসূল তোমাদের

(১) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তোমাদের পিতা বলে কাদের বোঝানো হয়েছে? কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধর। [কুরতুবী] এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলিম এই ফযীলতে শামিল হয়; যেমন-হাদীসে আছেঃ সব মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলিম মুসলিম কুরাইশদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশদের অনুগামী। [মুসনাদে আহমাদঃ ১৯, অনুরূপ হাদীস- বুখারীঃ ৩৪৯৫, মুসলিমঃ ১৮১৮, ইবনে হিব্বানঃ ৬২৬৪] কারও কারও মতে, এ আয়াতে সব মুসলিমকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এদিক দিয়ে সবার পিতা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির জন্য ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে নেতা হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি আনুগত্যের চরম পারাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, সুতরাং সমস্ত আনুগত্যকারীদের তিনি পিতা। তাছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্মান করা তেমনি অবশ্য কর্তব্য যেমনি সন্তান তার পিতার সম্মান করা একান্ত কর্তব্য। কারণ তিনি তাদের নবীর পিতা। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর মিল্লাতকে আঁকড়ে ধর। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তোমাদের দ্বীনে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি, যেমন তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। [তাবারী; ইবন কাসীর] অপর অর্থ হচ্ছে, পূর্ববর্তী আয়াতে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কল্যাণমূলক কাজ এবং যথাযথ জিহাদ করা এগুলো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাত। তখন আয়াতটির সমর্থন অন্য আয়াতেও এসেছে, "বলুন, 'আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্‌রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১৬১] কারণ, রুকু, সিজদা, কল্যাণমূলক কাজ, যথাযথ জিহাদ এসবই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) তিনি তোমাদেরকে পূর্বে এবং এ কিতাব কুরআনে মুসলিম নামকরণ করেছেন। এখানে তিনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে- (এক) এখানে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালামই কুরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ

জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষের জন্য[১]।

জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন; যেমন, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই দো'আ কুরআনে বর্ণিত আছেঃ ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا﴾ [সূরা আল-বাকারাঃ ১২৮] -কুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নন, কিন্তু কুরআনের পূর্বে তার এই নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দিকে করে দেয়া হয়েছে। (দুই) প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলঃ এখানে "তিনি" বলে আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এবং কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] সে হিসেবে এখানে "তোমাদের" সম্বোধনটি শুধুমাত্র এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ এ উম্মতকেই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী কিতাব ও এ কিতাবে মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন। এটি এ উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র খাস রহমত ও দয়া। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ ওপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৪৩] এখানে একথাটিও জানা দরকার যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্যলোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে, যার সারমর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তখন উম্মতে মুহাম্মাদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য নবীগণ যখন এই দাবী করবেন, তখন তাদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মাদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব নবীগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা করা হবে যে, আমাদের যামানায় উম্মতে মুহাম্মাদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষ্য হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে জেরার জবাবে বলা হবেঃ

الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

কাজেই তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও[১] এবং আল্লাহ্‌কে মজবুতভাবে অবলম্বন কর[২]; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে এ কথা শুনেছি, যার সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর হাদীসে বর্ণিত আছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৩৩৩৯]

(১) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এস্থলে শুধু সালাত ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরী‘আতের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য। মূলকথা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা অবশ্য কর্তব্য করেছেন সেটা সম্পন্ন করা এবং যা হারাম করেছেন সেটা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হক আদায় করা। আর তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি ইহসান বা দয়া করা, আল্লাহ্ ফকীরদের জন্য, দুর্বল ও অভাবীদের জন্য ধনীদের উপর তাদের সম্পদ থেকে বছরে যৎকিঞ্চিত যা ফরয করেছেন তা বের করে আদায় করা। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার উপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো। তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে দো‘আ কর- তিনি যেন তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেনঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে- ‘আমি তোমাদের জন্য দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু’টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নাত। [মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ ১৩৯৫]

২৩- সূরা আল-মুমিনূন(১)
১১৮ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. অবশ্যই সফলকাম হয়েছে(২) মুমিনগণ,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

২. যারা তাদের সালাতে ভীতি-অবনত(৩),

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

---

(১) সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আয়াত সংখ্যাঃ ১১৮। এর প্রথম আয়াতের المؤمنون শব্দ থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরায় মুমিনদের গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও এ সূরাটি ফজরের সালাতে পড়তেন। [দেখুন, মুসলিমঃ৪৫৫]

(২) فلاح শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সাফল্য, [সা'দী] أفلح শব্দটির অর্থ, উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া, অপছন্দ বিষয়াদি থেকে মুক্তি পাওয়া, কারও কারও নিকটঃ সর্বদা কল্যাণে থাকা [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ মুমিনরা অবশ্যই সফলতা অর্জন করেছে। অথবা মুমিনরা সফলতা অর্জন করেছে এবং সফলতার উপরই আছে। [ফাতহুল কাদীর] তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করেছে। [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা তাওহীদের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে তারা সৌভাগ্যবান হয়েছে। [বাগভী]

(৩) এ হচ্ছে সফলতা লাভে আগ্রহী মুমিনের প্রথম গুণ। "খুশূ" এর আসল মানে হচ্ছে, স্থিরতা, অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, ভীত ও শান্ত থাকা। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেনঃ দৃষ্টি অবনত রাখা। শব্দ নিচু রাখা। [বাগভী] "খুশূ' এবং খুদূ' দুটি পরিভাষা। অর্থ কাছাকাছি। তবে খুদূ' কেবল শরীরের উপর প্রকাশ পায়। আর খুশূ' মন, শরীর, চোখ ও শব্দের মধ্যে প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ বলেন, "আর রহমানের জন্য যাবতীয় শব্দ বিনীত হয়ে গেছে।" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০৮] আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খুশূ' হচ্ছে, ডানে বা বাঁয়ে না থাকানো। [বাগভী] অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, খুশূ' হচ্ছে মনের বিনয়। [ইবন কাসীর] সা'য়ীদ ইবন জুবাইর বলেন, খুশূ' হচ্ছে, তার ডানে ও বামে কে আছে সেটা না জানা। আতা বলেনঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। [বাগভী]
উপরের বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, "খুশূ"র সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের 'খুশূ' হচ্ছে, মানুষ

৩. আর যারা অসার কর্মকাণ্ড থেকে থাকে | وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝

কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। সালাতে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটি বুঝায় এবং এটাই সালাতের আসল প্রাণ।

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, তবুও শরী'আতে সালাতের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় সালাতের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়মগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, সালাত আদায়কারী যেন ডানে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে না তাকায়, সালাতের মধ্যে বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাড়াহুড়া করে টপাটপ সালাত আদায় করে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, সালাতের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা বিনা প্রয়োজনে উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে সালাতের মধ্যে জেনে বুঝে সালাতের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পুর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে সালাতের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় সালাতের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ 'খুশু' হচ্ছে, অন্তরে বাড়তি চিন্তা-ভাবনা ইচছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অনর্থক নড়াচড়া না করা। বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

বিমুখ(১),

‘সালাতের সময় আল্লাহ তা‘আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না সে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দেয়। তারপর যখন সে অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তার দিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।’ [ইবনে মাজাহঃ ১০২৩]

(১) পূর্ণ মুমিনের এটি দ্বিতীয় গুণঃ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। لغو এর অর্থ অসার ও অনর্থক কথা বা কাজ। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। শির্কও এর অন্তর্ভুক্ত, গোনাহের কাজও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে [ইবন কাসীর] অনরূপভাবে গান-বাজনাও এর আওতায় পড়ে [কুরতুবী] মোটকথা: যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যেও ভালো নয় সেগুলোর সবই ‘বাজে’ কাজের অন্তরভুক্ত। যাতে কোন দ্বীনী উপকার নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। রাসূলুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে। [তিরমিযীঃ ২৩১৭, ২৩১৮, ইবনে মাজাহঃ ৩৯৭৬] এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছেঃ “যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।” [সূরা আল ফুরকানঃ ৭২]

এ ছাড়াও মুমিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প-গুজব তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাঙ্গ, কৌতূক ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশ্ত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপুর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন

৪. এবং যারা যাকাতে সক্রিয়[১],

৫. আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত[২],

৬. নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত[৩],

৭. অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُونَ ۝

إِلَّا عَلٰى أَزْوٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ۝

তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, "সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।" [সূরা মারইয়ামঃ ৬২, সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ২৫, সূরা আন-নাবাঃ ৩৫, অনুরূপ সূরা আত-তূরের ২৩ নং আয়াত]

(১) পূর্ণ মুমিনের এটি তৃতীয় গুণঃ তারা যাকাতে সদা তৎপর। এটি যাকাত দেয়ার অর্থই প্রকাশ করে। [কুরতুবী] এখানে যাকাত দ্বারা আর্থিক যাকাতও হতে পারে আবার আত্মিক পবিত্রতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর] এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-আ'লায় বলা হয়েছেঃ "সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করেছে।" সূরা আশ-শামসে বলা হয়েছেঃ "সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে।"

(২) পূর্ণ মুমিনের এটি চতুর্থ গুণঃ তা হচ্ছে, যৌনাঙ্গকে হেফাযত করা। তারা নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না। আর তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও যুদ্ধলব্ধ দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে হেফাযতে রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরী'আতের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না।

(৩) দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ ও স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন।

সীমালংঘনকারী[১],

৮. আর যারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত[২] ও প্রতিশ্রুতি[৩],

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

৯. আর যারা নিজেদের সালাতে থাকে যত্নবান[৪]

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

(১) অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা যুদ্ধলব্ধ দাসীর সাথে শরী'আতের বিধি মোতাবেক কামবাসনা করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক আলেমের মতে হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) পূর্ণ মুমিনের পঞ্চম গুণ হচ্ছে, আমানত প্রত্যার্পণ করাঃ আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা হয়। দ্বীনী বা দুনিয়াবী, কথা বা কাজ যাই হোক। [দেখুন, কুরতুবী] এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটিকে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকুকুল-এবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। [ফাতহুল কাদীর] আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরী'আত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানতও যে অন্তর্ভুক্ত তা সুবিদিত; অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যার্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীআতসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করেনা এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে না। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেনঃ যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দ্বীনদারী নেই। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৩৫]

(৩) পূর্ণ মুমিনের ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে, অঙ্গীকার পূর্ণ করা। আমানত সাধারণত যার উপর মানুষ কাউকে নিরাপদ মনে করে। আর অঙ্গীকার বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বা বান্দার পক্ষ থেকে যে সমস্ত অঙ্গীকার বা চুক্তি হয়। আমানত ও অঙ্গীকার একসাথে বলার কারণে দ্বীন-দুনিয়ার যা কিছু কারও উপর দায়িত্ব দেয়া হয় সবই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) পূর্ণ মুমিনের সপ্তম গুণ হচ্ছে, সালাতে যত্নবান হওয়া। উপরের খুশূ'র আলোচনায় সালাত শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে "সালাতসমূহ" বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ্য ছিল মূল সালাত আর এখানে পৃথক

১০. তারাই হবে অধিকারী---

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑩

১১. যারা অধিকারী হবে ফিরদাউসের[১], যাতে তারা হবে স্থায়ী[২]।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑪

পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের সালাত সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। "সালাতগুলোর সংরক্ষণ" এর অর্থ হচ্ছেঃ সে সালাতের সময়, সালাতের নিয়ম-কানুন, আরকান ও আহকাম, প্রথম ওয়াক্ত, রুকু সিজদা, মোটকথা সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ গুণগুলোর শুরু হয়েছিল সালাত দিয়ে আর শেষও হয়েছে সালাত দিয়ে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সালাত শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ইবাদাত। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তবে তোমরা কখনও পুরোপুরি দৃঢ়পদ থাকতে পারবে না। জেনে রাখ যে, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সালাত। আর মুমিনই কেবল ওযুর ব্যাপারে যত্নবান হয়।" [ইবন মাজাহ: ২৭৭]

(১) ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির বেশীরভাগ ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। মুজাহিদ ও সা'য়ীদ ইবন জুবাইর বলেন, ফিরদৌস শব্দটি রুমী ভাষায় বাগানকে বলা হয়। কোন কোন মনীষী বলেন, বাগানকে তখনই ফেরদৌস বলা হবে, যখন তাতে আঙুর থাকবে। [ইবন কাসীর] কুরআনের দু'টি স্থানে এ শব্দটি এসেছে। বলা হয়েছেঃ "তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে।" [সূরা আল-কাহফঃ ১০৭] আর এ সূরায় বলা হয়েছেঃ "যারা অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী।" [১১] অনুরূপভাবে ফিরদৌসের পরিচয় বিভিন্ন হাদীসেও বিস্তারিত এসেছে। এক হাদীসে এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, জান্নাতের রয়েছে একশ'টি স্তর। যা মহান আল্লাহ্ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রতি দু'স্তরের মাঝের ব্যবধান হলো আসমান ও যমীনের মাঝের ব্যবধানের সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাইবে তখন তার নিকট ফিরদাউস চাইবে ; কেননা সেটি জান্নাতের মধ্যমনি এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। আর তার উপরেই রয়েছে দয়াময় আল্লাহ্র আরশ। সেখান থেকেই জান্নাতের নালাসমূহ প্রবাহিত। [বুখারীঃ ২৬৩৭]

(২) উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের অধিকারী বা ওয়ারিশ বলা হয়েছে। ওয়ারিশ বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন ওয়ারিশদের মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। তাছাড়া ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই। মুজাহিদ বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি স্থান রয়েছে। একটি স্থান জান্নাতে, অপর স্থানটি জাহান্নামে। মুমিনের ঘরটি জান্নাতে নির্মিত হয়, আর জাহান্নামে তার ঘরটি ভেঙে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কাফেরের জন্য জান্নাতে যে ঘরটি সেটা ভেঙে দেয়া হয়, আর তার জন্য জাহান্নামের ঘরটি তৈরী করা হয়। [ইবন কাসীর] কোন কোন মনীষী বলেন, মুমিনরা

১২. আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে[১],

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝

১৩. তারপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ ভাণ্ডারে;

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝

১৪. পরে আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকা-তে, অতঃপর 'আলাকা-কে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে, অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দিয়ে; তারপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে[২]। অতএব (দেখে

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

জান্নাতের কাফেরদের স্থানসমূহেরও মালিক হবে। তারা আনুগত্যের মাধ্যমে এ অতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করবে। বরং হাদীসে এটাও এসেছে যে, 'কিয়ামতের দিন কিছু মুসলিম পাহাড় পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আসবে, তারপর আল্লাহ্‌ তাদের সে গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং সেগুলোকে ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর রাখবেন।' [মুসলিমঃ ২৭৬৭] এ আয়াতটির মত অন্য আয়াত হচ্ছে, " এ সে জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।" [সূরা মারইয়াম: ৬৩] "আর এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কাজের ফলস্বরূপ।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭২]

(১) سلالة শব্দের অর্থ সারাংশ এবং طين অর্থ আর্দ্র মাটি। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী] মানব সৃষ্টির সূচনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে এবং তার সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ﴿ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً﴾ "তারপর আমরা তাকে করে দিয়েছি বীর্য" বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর আদম সন্তানদের সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। [দেখুন, কুরতুবী] মুজাহিদ বলেন, এখানে ﴿سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ﴾ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, পরিষ্কার নিংড়ানো পানি হতে তৈরী করেছি। ইবন আব্বাস থেকেও এ অর্থ বর্ণিত আছে। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর,

নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা(১) আল্লাহ্ কত বরকতময়(২)!

ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টিটির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এ শেষোক্ত স্তরকে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বলেছেনঃ "তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি।" এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তরে সে পূর্ণত্ব লাভ করেনি। শেষ স্তরে এসে সে সম্পূর্ণ এক মানুষে পরিণত হয়েছে। এ কথাই বিভিন্ন তাফসীরকারকগণ বলেছেন। তারা বলেন, এ স্তরে এসে তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা 'রূহ সঞ্চার' করিয়েছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, "তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি।" এর অর্থ তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছি। প্রথমে শিশু, তারপর ছোট, তারপর কৈশোর, তারপর যুবক, তারপর পূর্ণবয়স্ক, তারপর বৃদ্ধ, তারপর অতি বয়স্ক। বস্তুত দু'টি অর্থের মধ্যে বিরোধ নেই। কারণ, রূহ ফুঁকে দেয়ার পর এসবই সংঘটিত হয়। [ইবন কাসীর]

(১) خالق এর আসল অর্থ নুতনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা যা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خالق একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা-ই। কিন্তু মাঝে মাঝে خلق ও تخليق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্বে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ কারও কারও দ্বারা হওয়া সম্ভব। তখন এর অর্থ হবে, উদ্ভাবন করা, আকৃতি প্রদান করা, গঠন করা ইত্যাদি। এ অর্থেই কুরআনের অন্যত্র ইবরাহীম আলাইহিসসালামের মূখে এসেছে, ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ "তোমরা তো আল্লাহ্ ছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ১৭] অনুরূপভাবে ঈসা আলাইহিসসালামও বলেছেনঃ ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ "আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর ওটাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহর হুকুমে ওটা পাখি হয়ে যাবে।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৪৯] তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও ঈসা আলাইহিসসালামকে তার উপর কৃত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ "আপনি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মত আকৃতি গঠন করতেন এবং ওটাতে ফুঁক দিতেন, ফলে আমার অনুমতিক্রমে ওটা পাখি হয়ে যেত" [সূরা আল মায়েদাহঃ ১১০] এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টির অর্থে নয়। [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী]

(২) মূলে تبارك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর এক অর্থ তিনি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। অথবা এর অর্থ, তাঁর কল্যাণ ও বরকত বৃদ্ধি পেয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

১৫. এরপর তোমরা নিশ্চয় মরবে,

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর কেয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে[১]।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

১৭. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাতটি আসমান[২] এবং আমরা সৃষ্টি বিষয়ে মোটেই উদাসীন নই[৩],

---

(১) পূর্ববর্তী ১২-১৪ নং আয়াতে সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। মৃত্যুর পর আবার কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের ভাল কিংবা মন্দের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছে দেয়া হয়। [দেখুন, ইবন কাসীর] এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি।

(২) মানুষ সৃষ্টির কথা আলোচনা করার পর সাত আসমান সৃষ্টি করার আলোচনা করা হচ্ছে। সাধারণত: যখনই আল্লাহ্ আসমান যমীনের সৃষ্টির কথা আলোচনা করেন, তখনই মানুষ সৃষ্টির কথা আলোচনা করেন। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি অবশ্যই বড় বিষয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" [সূরা গাফির: ৫৭] অনুরূপভাবে সূরা আস্-সাজদাহ এর ৪-৯ আয়াতসমূহ। [ইবন কাসীর] আকাশ সৃষ্টির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, "আমরা তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাতটি طرائق। এ طرائق শব্দটি طريقة শব্দের বহুবচন। এর মানে পথও হয় আবার স্তরও হয়। [কুরতুবী] যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় এখানে রাস্তা বলতে ফেরেশতাদের চলাচলের পথ বুঝানো হয়েছে। কারণ, সবগুলো আসমান বিধানাবলী নিয়ে যমীনে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ। [বাগভী; কুরতুবী] আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে طرائق এর অর্থ তাই হবে যা ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ বা সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে [সূরা আল-মুলক:৩; নূহ: ১৫] এর অর্থ হয়। অর্থাৎ স্তরে স্তরে সাত আসমান তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর দ্বারা যেন এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের চাইতে বড় জিনিস আমি নির্মাণ করেছি সেটা হলো, এ আকাশ। মুজাহিদ বলেন, এখানে সাত আসমানই বলা উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে " [সূরা আল-ইসরা: ৪৪] [ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ আমি যা কিছুই সৃষ্টি করেছি তাদের কারোর কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো গাফিল এবং কোন অবস্থা থেকে কখনো বেখবর থাকিনি। প্রত্যেকটি বিন্দু,

১৮. আর আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে[১]; অতঃপর আমরা তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আর অবশ্যই আমরা তা নিয়ে যেতেও সম্পূর্ণ সক্ষম[২] ।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۚ﴿١٨﴾

বালুকণা ও পত্র-পল্লবের অবস্থা আমি অবগত থেকেছি। আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি। আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের পালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্যে খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। [দেখুন, কুরতুবী]

অথবা আয়াতের অর্থ, আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে কখনো গাফেল নই। আমি আমার সৃষ্টির সবকিছু জানি। যমীনে যা প্রবেশ করে, যমীন থেকে যা বের হয়, আকাশ থেকে যা নাযিল হয়, যা আকাশে উঠে, তিনি সবই জানেন। তোমরা যেখানেই থাক সেখানেই তোমরা তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ তা সম্যক দেখছেন। তিনি এমন এক সত্তা, কোন আসমান অপর আসমানের, কোন যমীন অপর যমীনের মধ্যে তার দৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কোন পাহাড়ের কঠিন স্থানে, কোন সমুদ্রের গভীর কোণে কি আছে সবই তাঁর জানা। পাহাড়ে, টিলায়, বালু, সমুদ্রে, মরুভূমিতে, গাছে কি আছে আর পরিমাণ কত সবই তিনি জানেন। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ৫৯]

(১) এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بقدر বা 'পরিমিত পরিমান' কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। কারণ, পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্যে বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়। যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ সেটাকে অদৃশ্য করার কোন একটাই পদ্ধতি নেই। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে যে কোনটিকে আমরা যখনই চাই ব্যবহার করে তোমাদেরকে জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি থেকে বঞ্চিত করতে পারি। এভাবে এ আয়াতটি সূরা আল-মুলকের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে, যেখানে

১৯. তারপর আমরা তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক(১);

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝١٩

২০. আর সৃষ্টি করি এক গাছ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং যারা খায় তাদের জন্য খাবার তথা তরকারী(২) ।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْـَٔاكِلِينَ ۝٢٠

২১. আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে চতুষ্পদ জন্তুগুলোয়; তোমাদেরকে আমরা পান করাই তাদের পেটে যা আছে তা থেকে এবং তাতে

وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝٢١

বলা হয়েছেঃ “তাদেরকে বলুন, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো , যমীন যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে চুষে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঝর্ণাধারা এনে দেবে?”[৩০] অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য সূরা আল-কাহাফে নির্দেশিত আয়াত থেকেও ব্যাপকতর, যেখানে বলা হয়েছেঃ “অথবা তার পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে এবং আপনি কখনো সেটার সন্ধান লাভে সক্ষম হবেন না ।”[৪১]

(১) এখানে হিজাযবাসীদের মেজায ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন । বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে । তারপর এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি । এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে । কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম । যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানের কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয় ।[দেখুন, ইবন মাজাহ: ৩৩১৯] যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে । বলা হয়েছে سيناء এই সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত । এ পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশ ভূমি ।[দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; আর তোমরা তা থেকে খাও[১],

২২. আর তাতে ও নৌযানে তোমাদের বহনও করা হয়ে থাকে[২] ।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

২৩. আর অবশ্যই আমরা নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে[৩] । তিনি বললেন, 'হে আমার

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

(১) এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয় । বলা হয়েছে, তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে । তারপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্যে পাক-সাফ দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য । এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত ও গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস ।[সূরা আন-নাহলঃ ৬৬] মূলতঃ পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে । এরপর বলা হয়েছেঃ শুধু দুধই নয় এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের অনেক উপকারিতা রয়েছে । চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ মানুষের কাজে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য সরঞ্জাম তৈরী হয় । জন্তুদের পশম, অস্থি, অন্ত্র ইত্যাদি প্রতিটি অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তা গণনা করা কঠিন । এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, এগুলোর মধ্য থেকে যে সমস্ত জন্তু হালাল সেগুলোর গোশত মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে সবশেষে জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনেরও কাজে নিযুক্ত কর । এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তুদের সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরীক আছে । মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় । তাই এর সাথে নৌকার আলোচনা করা হয়েছে । কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এখানে গবাদি পশু ও নৌযানকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরববাসীরা আরোহণ ও বোঝা বহন উভয় কাজের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উট ব্যবহার করতো এবং উটের জন্য "স্থল পথের জাহাজ" উপমাটি অনেক পুরানো । [দেখুন, আদওয়াউল বায়ান]

(৩) তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফের ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুসের ৭১ থেকে ৭৩; হূদের ২৫ থেকে ৪৮; বনী ইসরাঈলের ৩ এবং আল আম্বিয়ার ৭৬-৭৭ আয়াত ।

সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না[১]?'

২৪. অতঃপর তার সম্প্রদায়ের নেতারা, যারা কুফরী করেছিল[২], তারা বলল, 'এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ফেরেশ্‌তাই নাযিল করতেন; আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ ঘটেছে বলে শুনিনি।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. 'এ তো এমন লোক যাকে উন্মাদনা পেয়ে বসেছে; কাজেই তোমরা এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২৬. নূহ্ বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে[৩]।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

---

(১) অর্থাৎ নিজেদের আসল ও যথার্থ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করতে, তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করতে তোমাদের ভয় লাগে না? [ইবন কাসীর]

(২) নূহের সম্প্রদায় আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না এবং তারা একথাও অস্বীকার করতো না যে, তিনিই বিশ্ব-জাহানের প্রভু এবং সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নির্দেশের অনুগত, এ বক্তব্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শির্ক বা আল্লাহকে অস্বীকার করা এ জাতির আসল ভ্রষ্টতা ছিল না বরং তারা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা এবং তাঁর অধিকার তথা ইবাদতে শরীক করতো। অন্য আয়াত থেকেও সেটা সুস্পষ্ট হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ আমার প্রতি এভাবে মিথ্যা আরোপ করার প্রতিশোধ নিন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "কাজেই নূহ নিজের রবকে ডেকে বললেন : আমাকে দমিত করা হয়েছে, এখন আপনিই এর বদলা নিন।" [সূরা আল-কামারঃ ১০] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আর নূহ বললোঃ হে আমার রব! এ পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে একজন অধিবাসীকেও ছেড়ে দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে থাকতে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে গোমরাহ করে দেবে এবং তাদের বংশ থেকে কেবল দুষ্কৃতকারী ও সত্য অস্বীকারকারীরই জন্ম হবে।" [সূরা নূহঃ ২৬-২৭]

২৭. তারপর আমরা তার কাছে ওহী পাঠালাম, 'আপনি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধান ও আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ করুন, তারপর যখন আমাদের আদেশ আসবে এবং উনুন[১] উথলে উঠবে, তখন উঠিয়ে নেবেন প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং আপনার পরিবার-পরিজনকে, তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না যারা যুলুম করেছে। তারা তো নিমজ্জিত হবে।

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন তখন বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় থেকে।'

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّىٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. আরো বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে নামিয়ে দিন কল্যাণকরভাবে; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।'

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. এতে অবশ্যই রয়েছে বহু নিদর্শন[২]।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

---

(১) تنور এ শব্দটির অর্থ উনুন বা চুল্লী। যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরী করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ এর দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থ নিয়েছেন। কারও কারও মতে এটি কোন এক জায়গার নাম। তবে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন তিনি এর দ্বারা কোন সুনির্দিষ্ট চুল্লি উদ্দেশ্য নিয়েছেন নাকি তখনকার যাবতীয় চুল্লিই উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[এ ব্যাপারে সূরা হূদের ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে]

(২) অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে নাজাত দেয়া এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করার মধ্যে রয়েছে অনেক নিদর্শন যেগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া জরুরী। এ শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে,

আর আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলামⁱ[১] ।

৩১. তারপর আমরা তাদের পরে অন্য এক প্রজন্ম[২] সৃষ্টি করেছিলাম;

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿٣١﴾

৩২. এরপর আমরা তাদেরই একজনকে তাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম! তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

তাওহীদের দাওয়াতদানকারী নবীগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শির্কপন্থী কাফেররা ছিল মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নবী-রাসূলরা সত্যবাদী। তারা যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে এসেছে তা হক। আর তিনি যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। সবকিছু তার জ্ঞানে রয়েছে। [ইবন কাসীর] আর রাসূলের যুগে মক্কায় সে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা এক সময় ছিল নূহ ও তার জাতির মধ্যে। এর পরিণামও তার চেয়ে কিছু ভিন্ন হবার নয়। আল্লাহর ফায়সালা যতই বিলম্ব হোক না কেন একদিন অবশ্যই তা হয়েই যায় এবং অনিবার্যভাবে তা হয় সত্যপন্থীদের পক্ষে এবং মিথ্যাপন্থীদের বিপক্ষে।

(১) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ রাসূলদেরকে পাঠিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে মানুষের জন্য অথবা ফেরেশতাদের জন্য প্রকাশ করতে চাইলেন যে, কে আনুগত্য করে আর কে অবাধ্য হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) কোন কোন মুফাসসির এখানে সামূদ জাতির কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেছেন। কারণ সামনের দিকে গিয়ে বলা হচ্ছেঃ এ জাতিকে "সাইহাহ"তথা প্রচণ্ড আওয়াজের আযাবে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে , সামূদ এমন একটি জাতি যার উপর এ আযাব এসেছিল। [হূদঃ৬৭; আল-হিজ্‌রঃ৮৩ ও আল-কামারঃ৩১]। অন্য কিছু মুফাসসির বলেছেন, এখানে আসলে আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে নূহের জাতির পরে এ জাতিটিকেই বৃহৎ শক্তিধর করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। [দেখুনঃ আল-আ'রাফঃ ৬৯] এ দ্বিতীয় মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলা যায়। কারণ "নূহের জাতির পরে" শব্দাবলী এ দিকেই ইংগিত করে। আর "সাইহাহ্" (প্রচণ্ড আওয়াজ, চিৎকার, শোরগোল, মহাগোলযোগ) এর সাথে যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে নিছক এতটুকু সম্বন্ধই এ জাতিকে সামূদ গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এ শব্দটি সাধারণ ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্য দায়ী বিকট ধ্বনির জন্য যেমন ব্যবহার হয় তেমনি ধ্বংসের কারণ যা-ই হোক না কেন ধ্বংসের সময় যে শোরগোল ও মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার জন্যও ব্যবহার হয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই[১], তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

তৃতীয় রুকূ'

৩৩. আর তার সম্প্রদায়ের নেতারা, যারা কুফরী করেছিল ও আখেরাতের সাক্ষাতে মিথ্যারোপ করেছিল এবং যাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম দুনিয়ার জীবনের প্রচুর ভোগ-সম্ভার[২], তারা বলেছিল, 'এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা খাও, সে তা-ই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে;

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. 'যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে[৩];

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

---

(১) এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে,আল্লাহর অস্তিত্বকে তারাও অস্বীকার করতো না। তাদেরও আসল ভ্রষ্টতা ছিল শির্ক তথা আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক করা। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ জাতির এ অপরাধই বর্ণনা করা হয়েছে।[যেমন দেখুন, আল-আরাফঃ ৬৫; হূদঃ ৫৩-৫৪; ফুসসিলাতঃ ১৪ এবং আল-আহকাফঃ ২১-২২ আয়াত]।

(২) এখানে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ভেবে দেখার মতো। নবীর বিরোধিতায় যারা এগিয়ে এসেছিল। তারা ছিল জাতির নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের সবার মধ্যে যে ভ্রষ্টতা কাজ করছিল তা ছিল এই যে, তারা আখেরাত অস্বীকার করতো। তাই তাদের মনে আল্লাহর সামনে কোন জবাবদিহি করার আশংকা ছিল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় তার তাওহীদের দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এটিই ছিল সেখানকার পরিস্থিতি।

(৩) মানুষ নবী হতে পারে না এবং নবী মানুষ হতে পারে না, এ চিন্তাটি সর্বকালের পথভ্রষ্ট লোকদের একটি সম্মিলিত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন বারবার এ জাহেলী ধারণাটির উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ করেছে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে একথা বর্ণনা করেছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং মানুষদের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া

৩৫. 'সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে বের করা হবে?

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. 'অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব।

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. 'একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই। আর আমরা পুনরুত্থিত হবার নই।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. 'সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আমরা তো তাকে বিশ্বাস করার নই।'

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন; কারণ তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

৪০. আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।'

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. তারপর এক বিরাট আওয়াজ সত্য-ন্যায়ের সাথে[১] তাদেরকে পাকড়াও

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً

উচিত। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-আরাফ, ৬৩-৬৯ ; ইউনুস, ২ ; হূদ, ২৭-৩১ ; ইউসুফ, ১০৯; আর রা'দ, ৩৮ ; ইবরাহীম, ১০-১১ ; আন-নামল, ৪৩ ; বনী-ইসরাঈল, ৯৪-৯৫ ; আল-আম্বিয়া, ৩-৮; আল-মুমিনূন, ৩৩-৩৪ ও ৪৭; আল-ফুরকান, ৭-২০ ; আশ্‌শুআরা, ১৫৪-১৮৪; ইয়াসীন, ১৫ ও ফুসসিলাত, ৬ আয়াত]।

(১) অর্থাৎ তাদের উপর যে আযাব এসেছে সেটা যথার্থ ছিল। তাদের উপর কোন প্রকার যুলুম করা হয়নি। তাদের অপরাধের কারণেই সেটা এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর যুলুম করেন না। তারা কুফরি ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে এটার হকদার হয়েছিল। সম্ভবতঃ বিরাট আওয়াজের সাথে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাসও তাদের পেয়ে বসেছিল। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "এটা তার রবের নির্দেশে সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' অতঃপর তাদের পরিণাম এ হল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।" [সূরা আল-আহকাফ: ২৫]

فَبُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿٤١﴾

করল, ফলে আমরা তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনার মত[১] করে দিলাম। কাজেই যালেম সম্প্রদায়ের জন্য রইল ধ্বংস।

ثُمَّ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قُرُوۡنًا اٰخَرِيۡنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তারপর তাদের পরে আমরা বহু প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।

مَا تَسۡبِقُ مِنۡ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَاۡخِرُوۡنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوۡلُهَا كَذَّبُوۡهُ فَاَتۡبَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ بَعۡضًا وَّجَعَلۡنٰهُمۡ اَحَادِيۡثَ ۚ فَبُعۡدًا لِّقَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. এরপর আমরা একের পর এক আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির কাছে তার রাসূল এসেছেন তখনই তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। অতঃপর আমরা তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করে দিয়েছি। কাজেই যারা ঈমান আনে না সে সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংসই রইল!

ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوۡنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. তারপর আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারূনকে পাঠালাম[২],

---

(১) মূলে غثاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় বন্যার তোড়ে ভেসে আসা ময়লা আবর্জনা, যা পরবর্তী পর্যায়ে কিনারায় আটকে পড়ে পচে যেতে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) নিদর্শনের পরে "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলার অর্থ এও হতে পারে যে, ঐ নিদর্শনাবলী তাঁদের সাথে থাকাটাই একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত নবী। অথবা নিদর্শনাবলী বলতে বুঝানো হয়েছে "লাঠি" ছাড়া মিসরে অন্যান্য যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছে সেগুলো সবই, আর "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলতে "লাঠি" বুঝানো হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে যে মু'জিযার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলোর পরে তো

৪৬. ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করল; আর তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়[১]।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অতঃপর তারা বলল, 'আমরা কি এমন দু'ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্বকারী[২]?'

فَقَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. সুতরাং তারা তাদের উভয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করল, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হল[৩]।

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর আমরা তো মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব; যাতে তারা হেদায়াত পায়।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. আর আমরা মার্‌ইয়াম-পুত্র ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

একথা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এরা দু'ভাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূলে ﴿قَوْمًا عَالِينَ﴾ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ, তারা ছিল বড়ই আত্মম্ভরী, জালেম ও কঠোর। তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতো এবং উদ্ধত আস্ফালন করতো। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে "ইবাদাতকারী" বলে আনুগত্যকারী বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা আমার অনুগত, আমাদের নির্দেশকে এমনভাবে পালন করে যেমন একজন দাস তার মনিবের কথা পালন করে। আর যে ব্যক্তি কারোর বন্দেগী-দাসত্ব ও একনিষ্ঠ আনুগত্য করে সে যেন তার ইবাদাত করে। মুবাররাদ বলেন, 'আবেদ' বলে অনুগত ও মান্যকারী বোঝানো হয়ে থাকে। আবু উবাইদা বলেন, যারাই কোন কর্তৃত্বের অধীনতা গ্রহণ করে আরবরা তাদেরকে তার 'আবেদ' বা ইবাদাতকারী বলে। আবার এটাও সম্ভব যে, সে যখন ইলাহ হওয়ার দাবী করল, তখন তাদের কেউ কেউ তাকে তা মেনে নিয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) মূসা ও ফেরাউনের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য পড়ুন সূরা আল-বাকারাহঃ ৪৯-৫০; আল-আ'রাফঃ ১০৩-১৩৬; ইউনুসঃ ৭৫-৯২; হূদঃ ৯৬-৯৯ ; বনী ইসরাঈলঃ ১০১-১০৪ এবং ত্বা-হাঃ ৯-৮০ আয়াত।

এক অবস্থানযোগ্য ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে[১]।

চতুর্থ রুকূ'

৫১. 'হে রাসূলগণ[২]! আপনারা পবিত্র বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকাজ করুন[৩]; নিশ্চয় আপনারা যা করেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٥١

---

(১) আভিধানিক অর্থে "রাবওয়াহ" এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উঁচু। অন্যদিকে "যা-তি কারার" মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর "মাঈন" মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নির্ঝরিণী। [ইবন কাসীর] এখানে কুরআন কোন স্থানটির প্রতি ইংগিত করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। বিভিন্নজন এ থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশ্ক। কেউ বলেন, রামলাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাকদিস আবার কেউ বলেন, ফিলিস্তিন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ থেকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, প্রতি যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে আগমনকারী নবীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে একই হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাদের সবাইকে হালাল খাওয়ার এবং সৎকাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) طيبات শব্দের আভিধানিক অর্থ, পবিত্র ও উত্তম বস্তু। [ফাতহুল কাদীর] এখানে এর দ্বারা এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা নিজেও পাক-পবিত্র এবং হালাল পথে অর্জিতও হয়। তাই طيبات দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নাসারাদের বৈরাগ্যবাদ ও অন্যদের ভোগবাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]
এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো এই যে, নবী-রাসূলগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর। দুই, সৎকর্ম কর। আর এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্যে এই আদেশ আরও বেশী পালনীয়। বস্তুতঃ আসল উদ্দেশ্য উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা। আলেমগণ বলেনঃ এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত এই যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক হতে থাকে। [দেখুন, ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা আপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে

সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত।

৫২. 'আর আপনাদের এ উম্মত তো একই উম্মত[১] এবং আমিই আপনাদের রব; অতএব আমারই তাকওয়া অবলম্বন করুন[২]।'

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ۝٥٢

যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।" তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "এক ব্যক্তি আসে সুদীর্ঘ পথ সফর করে। দেহ ধূলি ধূসরিত। মাথার চুল এলোমেলো। আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করেঃ হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, কাপড় চোপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যে তার দেহ প্রতিপালিত হয়েছে। এখন কিভাবে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে?" [মুসলিমঃ ১০১৫] এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদতে ও দো'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দো'আ কুবল হওয়ার যোগ্য হয় না।

(১) "তোমাদের উম্মত একই উম্মত"। অর্থাৎ তোমরা একই দলের লোক। أمة শব্দটি যদিও সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ নবীর জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত, তবুও কোন কোন সময় তরীকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ﴿إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ﴾ "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি দ্বীনে (তরীকা বা জীবনপদ্ধতিতে) পেয়েছি" [সূরা আয-যুখরুফঃ ২২-২৩] তাই "উম্মত" শব্দটি এখানে এমন ব্যক্তি সমষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা কোন সম্মিলিত মৌলিক বিষয়ে একতাবদ্ধ। নবীগণ যেহেতু স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্বেও একই বিশ্বাস ও একই দাওয়াতের উপর একতাবদ্ধ ছিলেন, তাই বলা হয়েছে, তাঁদের সবাই একই উম্মত। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] পরবর্তী বাক্য নিজেই সে মৌলিক বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছে যার উপর সকল নবী একতাবদ্ধ ও একমত ছিলেন। আর তা হলো, একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা। যার অপর নাম ইসলাম। নবীরা সবাই ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের দ্বীনও ছিল ইসলাম। তাদের অনুসারীরাও ছিল মুসলিম। এ হিসেবে সমস্ত নবী-রাসূল ও তাদের সত্যিকারের উম্মতগণ একই উম্মত হিসেবে গণ্য। তারা সবাই মুসলিম উম্মত।

(২) আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী যখন এ তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন তখন অনিবার্যভাবে এ থেকে প্রমাণ হয়, এ ইসলামই মানুষের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন। সুতরাং একমাত্র তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। তাঁকেই রব মানা এবং

فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. অতঃপর লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের এ বিষয় তথা দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে[১]। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।

তাঁরই কেবল ইবাদাত করাই এর দাবী। এমন কোন কাজ করো না যা তোমাদের উপর আমার আযাবকে অবশ্যম্ভাবী করে দিবে। যেমন আমার সাথে শির্ক করা, অথবা আমার নির্দেশের বিরোধিতা, আমার নিষেধের বিপরীত কাজ করা। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াত অন্য আয়াতের মত যেখানে বলা হয়েছে, আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।" [সূরা আল-জিন: ১৮] [কুরতুবী]

(১) زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর এক অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব নবী ও তাদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দ্বীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন কিতাবের অনুসারী হয়েছে। যে কিতাবগুলো তারা নিজেরা রচনা করেছে। তারা কিছু ভ্রষ্ট চিন্তাধারার অনুসরণ করেছে, যেগুলো তারা নিজেরা ঠিক করে নিয়েছে। [কুরতুবী] অথবা তারা কিতাবকে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। তাদের কেউ তাওরাতের অনুসরণ করেছে, কেউ যাবুরের কেউ ইঞ্জীলের। তারপর তারা সবগুলোকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধন করেছে। [তাবারী; কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, তাদের কোন দল যদি কোন কিতাবের উপর ঈমান আনে তো অন্যান্য কিতাবের উপর কুফরি করে। [কুরতুবী]
আবার زبر শব্দটি কোন কোন সময় زُبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। যেমন অন্য আয়াতে এ অর্থে এসেছ, "তোমরা আমার কাছে লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে আস" [সূরা আল-কাহাফ: ৯৬] এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা মূলত: একই দ্বীনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে বিশ্বাস ও মূলনীতিতে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী] এ আয়াতের অর্থে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের পূর্বেকার কিতাবীরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তরটি জাহান্নামে যাবে, আর একটি জান্নাতে। আর সেটি হচ্ছে, 'আল-জামা'আহ'। [আবু দাউদ: ৪৫৯৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, সে দলটি কারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, যার উপর আমি ও আমার সাহাবীরা থাকবে। [তিরমিযী: ২৬৪১]

৫৪. কাজেই কিছু কালের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দিন[১]।

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সহযোগিতা করছি, তার মাধ্যমে,

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তাদের জন্য সকল মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা উপলব্ধি করে না[২]।

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

---

(১) অর্থাৎ তাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা ও ভুলের মধ্যে তাদের ধ্বংসের সময় পর্যন্ত ছেড়ে দিন। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য।" [সূরা আত-তারেক: ১৭]

(২) কাফেরদের মতে, যে ব্যক্তি ভালো খাবার, ভালো পোশাক ও ভালো ঘর-বাড়ি লাভ করেছে, যাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হয়েছে এবং সমাজে যে খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ মৌলিক বিভ্রান্তির ফলে তারা আবার এর চেয়ে অনেক বড় আর একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সেটি ছিল এই যে, এ অর্থে যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে সে নিশ্চয়ই সঠিক পথে রয়েছে বরং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নয়তো এসব সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে এ সাফল্য থেকে যাদেরকে আমরা প্রকাশ্যে বঞ্চিত দেখছি তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ভুল পথে রয়েছে। এ বিভ্রান্তিটি আসলে কাফের লোকদের ভ্রষ্টতার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম। একে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে খণ্ডন করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে প্রকৃত সত্য কি তা বলে দেয়া হয়েছে। [দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ২১২; আত তাওবাহ, ৫৫, ৬৯ ও ৮৫; হূদ, ২৭ থেকে ৩১; আর রা'দ, ২৬; আল কাহ্ফ, ২৮, ৩২ থেকে ৪৩; মার্‌ইয়াম, ৭৭ থেকে ৮০; ত্বা-হা, ১৩১ ও ১৩২; আল আম্বিয়া, ৪৪ ও সূরা সাবা: ৩৫ আয়াত]। যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি একদিকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ফাসেকী, অশ্লীল কার্যকলাপ, যুলুম ও সীমালংঘন করতে থাকে এবং অন্যদিকে তার উপর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে তখন বুঝতে হবে, বুদ্ধি ও কুরআন উভয় দৃষ্টিতে আল্লাহ তাকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং তার উপর আল্লাহর করুণা নয় বরং তাঁর ক্রোধ চেপে বসেছে। আর এজন্যই কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের সন্তান ও সম্পদের ব্যাপারে তাদের সাথে ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। হে আদম সন্তান! তুমি সন্তান ও সম্পদ দিয়ে

৫৭. নিশ্চয় যারা তাদের রব-এর ভয়ে সন্ত্রস্ত,

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যারা তাদের রব-এর নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে,

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. আর যারা তাদের রব-এর সাথে শির্ক করে না[১],

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. আর যারা যা দেয়ার তা দেয়[২] ভীত-কম্পিত হৃদয়ে, এজন্য যে তারা তাদের রব-এর কাছে প্রত্যাবর্তনকারী[৩] ।

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

কারও বিচার করো না, বরং তাদের ঈমান ও সৎকর্ম দিয়ে তাদের ভাল মন্দ সত্য ও অসত্য বিচার করো । [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে । তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করে না । তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে । আর এটা দৃঢ়ভাবে জানবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই । তিনি একক, অমুখাপেক্ষী । তিনি কোন সঙ্গিনী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি । তাঁর মত কিছু নেই । [ইবন কাসীর]

(২) يؤتون শব্দটি إيتاء শব্দ থেকে উদ্ভুত । এর অর্থ দেয়া, খরচ করা ও দান-খয়রাত করা । তা যাকাতও হতে পারে, আবার নফল সাদকাহও হতে পারে । [ইবন কাসীর] এমনকি এর দ্বারা যাবতীয় নেক ও কল্যাণের কাজ যেমন সালাত, যাকাত, সাদাকাহ ও হজ্জ ইত্যাদি সবই উদ্দেশ্য হতে পারে । [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি শূন্য ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে না । যা মনে আসে তাই করে না । বরং তাদের মন সবসময় তাঁর ভয়ে ভীত থাকে । তারা আরও ভয় করে যে, আমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক দেয়ার পরও তা আমাদের থেকে কবুল করা হচ্ছে কি না? আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করে বললাম যে, এই কাজ করে যারা ভীত কম্পিত হবে তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না হে সিদ্দীক তনয় ! বরং এরা ঐ সমস্ত লোক যারা সাওম পালন করে, সালাত পড়ে । এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই আমল আল্লাহর কাছে (আমাদের কোন ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না । এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে [আহমদ ৬/২০৫, তিরমিযীঃ ৩১৭৫] হাসান রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয় যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না । [কুরতুবী] মুফাসসিরগণ

৬১. তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়[১]।

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আর আমরা কাউকেও তার সাধ্যের বেশী দায়িত্ব দেই না। আর আমাদের কাছে আছে এমন এক কিতাব[২] যা

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

তাদেরকে যা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা তারা দেয়া সত্ত্বেও ভয় পায় যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে তিনি প্রত্যেকের যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তাই তাদের দান যথাযোগ্য পন্থায় হয়েছে কি না সে ভয়ে তারা ভীত।

অথবা, তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবার কারণেই ভয় করছে, কারণ তাঁর কাছে কোন কাজই গোপন নেই। যে কোন ভাবেই তিনি ইচ্ছা করলে পাকড়াও করতে পারেন।

তাছাড়া, আয়াতের অন্য কেরাআত হলোঃ أَتَوا তখন অর্থ হবে, তারা যা কাজ করার তা করে, তারপর তারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রব-এর কাছে ফিরে যেতে হবে ফলে তিনি তাদের কাজের হিসাব নিবেন। আর যার হিসেব কড়াভাবে নেয়া হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা দ্বীনী উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। তাই তারা সময়ের আগেই সেটা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন সালাতের প্রথম ওয়াক্তে তা আদায় করে। এ কারণেই তারা অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। অন্যদেরকে তারা পিছনে ফেলে নিজেরা এগিয়েই থাকে। [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, আর তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র কাছে সৌভাগ্য লেখা হয়েছে। তাই তারা ভাল কাজে তাড়াতাড়ি করে। [তাবারী]

(২) কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, কিতাব বলে এখানে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] প্রত্যেক ব্যক্তির এ আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে তৈরী হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি নড়াচড়া এমনকি চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা-সংকল্পের প্রত্যেকটি অবস্থা পর্যন্ত তাতে সন্নিবেশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে, "আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তারপর তোমরা দেখবে অপরাধীরা তার মধ্যে যা আছে তাকে ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! এ কেমন কিতাব, আমাদের ছোট বা বড় এমন কোন কাজ নেই যা এখানে সন্নিবেশিত

সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

৬৩. বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এছাড়াও তাদের আরো কাজ আছে যা তারা করছে[১]।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাদের বিলাসী[২] ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ

হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল সবই নিজেদের সামনে হাজির দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করেন না।" [সূরা আল-কাহ্ফঃ ৪৯] অন্য আয়াতে এসেছে, "এই আমাদের লেখনি, যা তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে সত্যভাবে। নিশ্চয় তোমরা যা আমল করতে তা আমরা লিপিবদ্ধ করেছিলাম।" [সূরা আল-জাসিয়াহঃ ২৯] আবার কোন কোন মুফাসসির এখানে কিতাব অর্থ কুরআন গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য শির্ক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না। বরং অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে এর অর্থ, তাদের তাকদীরে আরও কিছু খারাপ কাজ করবে বলে লিখা রয়েছে। সুতরাং তারা তাদের মৃত্যুর পূর্বে সেটা করবেই। যাতে করে তাদের উপর আযাবের বাণী সত্য পরিণত হয়। ইবন কাসীর বলেন, এ মতটি প্রকাশ্য এবং শক্তিশালী। তিনি এর সপক্ষে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যাতে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে সত্তা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তার শপথ, কোন লোক আমল করে যেতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজ দূরত্ব থাকে, তখনি তার কিতাব তথা তাকদীরের লেখা এগিয়ে আসে আর সে জাহান্নামের আমল করে জাহান্নামে প্রবেশ করে।" [বুখারীঃ ৩২০৮; মুসলিমঃ ২৬৪৩] সুতরাং কেউ যেন নিজের আমল নিয়ে গর্ব বা অহংকার না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্ ভয়ে ভীত ও তাঁর কাছে নত থাকে।

(২) মূলে শব্দ এসেছে, مُتْرَفِيْنَ "মুতরাফীন"। শব্দটি আসলে এমন সব লোককে বলা হয় যারা পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার থেকে গাফিল হয়ে গেছে। "বিলাসপ্রিয়" শব্দটির মাধ্যমে এ শব্দটির সঠিক মর্মকথা প্রকাশ হয়ে যায়। এ আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেনঃ সে আযাব বলে বদর যুদ্ধে মুসলিমদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর যে শাস্তি আপতিত হয়েছিল সেটাই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বদদো'আর

يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾

পাকড়াও করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে।

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তাদেরকে বলা হবে, 'আজ আর্তনাদ করো না, তোমাদেরকে তো আমাদের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে না।'

قَدْ كَانَتْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হত[১], কিন্তু তোমরা উল্টো পায়ে পিছনে সরে পড়তে---

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. দম্ভভরে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজবে[২]

কারণে মক্কাবাসীদের চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। [কুরতুবী] রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের জন্যে খুবই কম বদদো'আ করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলিমদের উপর তাদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দো'আ করেন, "হে আল্লাহ্! আপনি মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করে দিন। আর তাদের জন্য এটাকে ইউসুফ আলাইহিসসালামের দুর্ভিক্ষের মত করে দিন।" [বুখারীঃ ৭৭১, মুসলিমঃ ৬৭৫]

(১) আয়াত বলে এখানে কুরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। কারণ এখানে 'তিলাওয়াত করা' বলা হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ. তারা যখন ঈমান না এনে পিছনে ফিরে যায়, তখন তারা সেটা করে থাকে অহংকারবশত। তারা হক পন্থীদেরকে ঘৃণা ও হেয় মনে করে নিজেদেরকে বড় মনে করে এটি করে থাকে। এমতাবস্থায় আয়াতের পরবর্তী অংশ به এর অর্থ নির্ণয়ে তিনটি মত রয়েছে। এক. به এর সর্বনাম পবিত্র মক্কার হারামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তবে 'হারাম' শব্দটি পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তার সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হারামে বসে খারাপ কথা বলে রাত কাটায়। দুই. অথবা এখানে به বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ তারা এ কুরআন নিয়ে খারাপ কথা বলে রাত কাটায়। কখনও এটাকে বলে জাদু, কখনও বলে কবিতা, কখনও গণকের কথা, ইত্যাদি বাতিল কথা। তিন. অথবা به শব্দ দ্বারা এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে খারাপ ও কটু কথা বলে রাত কাটায়। কখনও তাকে কবি,

রাত মাতিয়ে[১] তোমরা খারাপ কথা বলতে।

৬৮. তবে কি তারা এ বাণীতে চিন্তা-গবেষণা করেনি[২]? নাকি এ জন্যে যে, তাদের

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ

আবার কখনও গণক, কখনও জাদুকর, কখনও মিথ্যাবাদী অথবা পাগল, ইত্যাদি বাতিল ও অসার কথাসমূহ বলে থাকে। অথচ তিনি আল্লাহ্র রাসূল। যাকে আল্লাহ্ তাদের উপর বিজয় দিয়েছেন আর তাদেরকে সেখান থেকে অপমানিত ও হেয় করে বের করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তারা যখন ঈমান না এনে পিছনে ফিরে যায়, তখন তারা কা'বা ঘর নিয়ে অহংকারে মত্ত থাকে। এ অহংকারেই তারা হক গ্রহণ করতে রাযী হয় না। কারণ, তারা কা'বার সাথে সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্বে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। তারা মনে করে যে, যতকিছুই হোক তাদের ব্যাপারটা আলাদা। কারণ, তারা কা'বার অভিভাবক, অথচ তারা কা'বার অভিভাবক নয়। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস বলেন, তারা সেখানে বসে রাত জেগে খোশগল্পে মেতে থাকত। মসজিদ ও কা'বাকে খোশ-গল্প ও অসার কথাবার্তার আসরে পরিণত করেছিল, ইবাদাতের মাধ্যমে আবাদ করেনি। [ইবন কাসীর]

(১) রাত্রিকালে কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। বর্তমান কালেও যারা সবচেয়ে ভয়ংকর ধরনের লোক তারা রাত জেগে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও দ্বীনের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথা মিটানোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি "এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করেন।" [বুখারীঃ ৫৭৪] এর পেছনে সম্ভবত অন্য এক রহস্য এটাও ছিল যে, এশার সালাতের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই সালাত সারাদিনের গোনাহসমূহের কাফ্ফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমতঃ এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও বহু রকমের গোনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাদের এ মনোভাবের কারণ কি? তারা কি এ কুরআন বুঝে না? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?" [সূরা আন-নিসা: ৮২] তারা যদি এ কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত, তবে তা তাদেরকে গোনাহের কাজ থেকে দূরে রাখত। কিন্তু তারা মুতাশাবাহ আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। [ইবন কাসীর]

الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি[১]?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. নাকি তারা তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করছে[২]?

---

(১) অর্থাৎ বরং তারা এজন্যেই বিরোধিতা করছে যে, তাদের কাছে এমন কিতাব এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে আসে নি। তাদের তো উচিত ছিল এ কুরআনকে নেয়ামত মনে করে শুকরিয়াস্বরূপ ঈমান আনা। তা না করে তারা উল্টো কাজই করে চলেছে। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, নাকি তাদের কাছে এমন কোন নিরাপত্তার গ্যারান্টি এসে গেছে যা তাদের পূর্ববর্তী ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কাছে আসে নি? [ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবীদের আসা, কিতাবসহকারে আসা, তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, আখেরাতের জবাবদিহির ভয় দেখানো, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও এমন নয় যা ইতিহাসে আজ প্রথমবার দেখা দিয়েছে। তাদের আশপাশের দেশগুলোয় ইরাকে, সিরিয়ায় ও মিসরে নবীর পর নবী এসেছেন। তারা এসব কথাই বলেছেন। এগুলো তারা জানে না এমন নয়। তাদের নিজেদের দেশেই ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এসেছেন। হূদ, সালেহ ও শোআইব আলাইহিমুস সালামও এসেছেন। তাদের নাম আজো তাদের মুখে মুখে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যে দাওয়াত ও নবুওয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন্ন দেশের লোক। তার বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাকে নবী রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভ্রান্ততম কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তার যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র সময় তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তার কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাকে 'সাদিক' ও 'আমীন'- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তার চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোন দিন কোন সন্দেহই করেনি। তারপর তারা এও জানতো যে, নবুওয়াতের দাবীর একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তার মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি কোন দাবী করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর যেদিন তিনি দাবী করেন তার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একই কথা বলে আসছেন। আবার তার জীবন যাপন প্রণালী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অন্যদেরকে তিনি যা কিছু বলেন, তা সবার আগে নিজে পালন করে দেখিয়ে দেন। তার কথায় ও কাজে কোন বৈপরীত্য নেই। কাজেই তাদের

৭০. নাকি তারা বলে যে, তিনি উন্মাদনাগ্রস্ত ?[১] না, তিনি তাদের কাছে সত্য এনেছেন, আর তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দকারী[২] ।

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝

এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাকে চেনে না। তাই জা'ফর ইবন আবু তালেব হাবশার বাদশাকে বলেছিলেন, "হে রাজন! আল্লাহ্ আমাদের কাছে এমন এক রাসূল পাঠিয়েছেন আমরা তার বংশ, সত্যবাদিতা ও আমানতদারীসহ যাবতীয় পরিচয় জানি।" [মুসনাদে আহমাদ ৫/২৯০] অনুরূপভাবে আবু সুফিয়ান ইবন হারবের কাছে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ, বংশ, সত্যবাদিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল তখন সে কাফের থাকা অবস্থায়ও সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল। [বুখারী: ৭]

(১) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার করার কারণ কি এই যে,তারা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল মনে করে? মোটেই না, এটাও আসলে কোন কারণই নয়। মুখে তারা যাই বলুক না কেন মনে মনে তারা তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়ে চলছে। বরং আল্লাহ্ হক নিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। আর তিনি হক নিয়ে এসেছেন। তিনি যে বাণী বহন করে এনেছেন কোন পাগল বা রোগীর মুখ দিয়ে তা বের হতে পারে না। সুতরাং তাদের এ দাবীও অসার। [সা'দী]

(২) ঈমান না আনার পেছনে যে সমস্ত সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে ৬৩, ৬৭-৭০ ও পরবর্তী ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ঈমান আনার পক্ষে যুক্তিস্বরূপও অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করেছেন। ঈমান না আনার পক্ষে তাদের যে সমস্ত কারণ থাকতে পারে তা বর্ণনা করে তার প্রত্যেকটি খণ্ডন করেছেন। ঈমান না আনার কারণসমূহ উল্লেখ করে প্রথমেই বলেছেন, ১. তাদের মন ও অন্তর এ ব্যাপারে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। ২. হারাম শরীফের তত্ত্বাবধান তথা ইবাদত-বন্দেগীর গর্ব ও অহংকার। ৩. ভিত্তিহীন গল্প-গুজবে মেতে থাকা। ৪. খারাপ গালি-গালাজ ও রাত্রি জাগরণ করে সময় নষ্ট করা। ৫. কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা। ৬. কুরআনে যা এসেছে তা পূর্ববর্তীদের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার থেকে ভিন্নতর হওয়ার দাবী করা। ৭. নবীকে বুঝতে চেষ্টা না করা। ৮. নবীকে মোহগ্রস্থ বা পাগল বলে দাবী করা। ৯. কুরআন ও রাসূলের আহ্বান তাদের প্রবৃত্তির বিপরীত হওয়া। ১০. কুরআন থেকে বিমুখতা। কাফেরদের এসব যুক্তি উল্লেখ করে তা পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে। এর বিপরীতে ঈমান আনার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ১. কুরআন গবেষণা করা। ২. আল্লাহ্র নেয়ামতকে কবুল করা। ৩. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে জানা। তাঁর পূর্ণ সত্যবাদিতা ও আমানতদারী সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ৪. দাওয়াতের উপর বিনিময় না চাওয়া। ৫. তিনি তাদের উপকারার্থে যাবতীয় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

৭১. আর হক্ব যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তবে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আসমানসমূহ ও যমীন এবং এগুলোতে যা কিছু আছে সবকিছুই[১]। বরং আমরা তাদের কাছে নিয়ে এসেছি তাদের ইজ্জত ও সম্মান সম্বলিত যিক্‌র[২] কিন্তু তারা তাদের এ যিক্‌র

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

৬. তিনি সঠিক সরল পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। যে পথ চলা অত্যন্ত সহজ। যে পথে চললে মনজিলে মাকসূদে পৌঁছা যায়। তারপরও তারা আপনার অনুসরণ না করে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? আপনার অনুসরণ না করার পিছনে তাদের কোন যুক্তি নেই। তারা হাতে শুধু পথভ্রষ্টতাই রয়েছে। আর এভাবে যারাই হক থেকে দূরে থাকে তারা সবকিছু বক্রভাবেই দেখে। আল্লাহ্ বলেন, "তারপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবেন তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" [সূরা আল-কাসাস:৫০] [দেখুন, সা'দী]

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে হক বলে আল্লাহকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তাদের মনের প্রবৃত্তি অনুসারে সাড়া দেন, আর সেটা অনুসারে শরী'আত প্রবর্তন করেন তবে আসমান ও যমীন এবং তাতে যা আছে সেগুলোতে বিপর্যয় লেগে যেত। যেমন তারা বলেছিল যে, "আর তারা বলে, 'এ কুরআন কেন নাযিল করা হল না দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৩১] তখন আল্লাহ্ বললেন, "তারা কি আপনার রবের রহমত বণ্টন করে?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৩২] [ইবন কাসীর]
মুকাতিল ও সুদ্দী বলেন, এর অর্থ, যদি তারা যেভাবে পছন্দ করে সেভাবে আল্লাহ্ তাঁর জন্য কোন শরীক নির্ধারণ করেন, তবে আসমান ও যমীন ফাসাদে পূর্ণ হয়ে যেত। এ তাফসীর অনুসারে আয়াতটি অন্য আয়াতের অনুরূপ, যেখানে বলা হয়েছে, "যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ্ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হয়ে যেত।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২২] [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে 'যিকর' শব্দটি দু'বার এসেছে। প্রথম বর্ণিত 'যিক্‌র' শব্দটির অর্থ কুরআন ধরা হলে, অর্থ হবে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সে কুরআন এসে গেছে অথচ তারা "কুরআন" থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। [ইবন কাসীর] অথবা 'যিকর' দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমরা এমন জিনিস তাদের কাছে এনেছি যা তারা গ্রহণ করলে তারাই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে। এ থেকে

(কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৭২. নাকি আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান?[১] আপনার রব-এর প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকেই আহ্বান করছেন।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর নিশ্চয় যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত,

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْءَاخِرَةِ عَنِ الصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আর যদি আমরা তাদেরকে দয়া করি এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করি তবুও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, তারপরও তারা তাদের রব-এর প্রতি অবনত হল না এবং কাতর প্রার্থনাও করল

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

তাদের এ মুখ ফিরিয়ে নেয়া অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই উন্নতি এবং নিজেদেরই উত্থানের একটি সুবর্ণ সুযোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর। [ফাতহুল কাদীর]

(১) এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। অর্থাৎ নিজের এ কাজে আপনি পুরোপুরি নিঃস্বার্থ। কোন ব্যক্তি সততার সাথে এ দোষারোপ করতে পারে না যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আপনার সামনে রয়েছে তাই আপনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটি এমন একটি যুক্তি যা কুরআনে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নয় বরং সাধারণভাবে সকল নবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বারবার পেশ করা হয়েছে। [যেমনঃ সূরা আল আন'আমঃ ৯০; ইউনুসঃ ৭২; হূদঃ ২৯ ও ৫১ ; ইউসুফঃ ১০৪ ; আল ফুরকানঃ ৫৭ ; আশ্ শু'আরাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৮০; সাবাঃ ৪৭ ; ইয়াসিনঃ ২১ ; সাদঃ ৮৬ ; আশশূরাঃ ২৩ ও আন্ নাজমঃ ৪০]।

না[১] ।

৭৭. অবশেষে যখন আমরা তাদের উপর কঠিন কোন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব তখনই তারা এতে আশাহত হয়ে পড়বে[২] ।

حَتّٰٓى اِذَا فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيۡدٍ اِذَا هُمۡ فِيۡهِ مُبۡلِسُوۡنَ ۟

পঞ্চম রুকূ'

৭৮. আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন;

وَهُوَ الَّذِيۡۤ اَنۡشَاَ لَكُمُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَالۡاَفۡـِٕدَةَ ؕ

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে । আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে । এ আয়াতে তাদের এমনি ধরণের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আর বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং শির্ককেই আঁকড়ে ধরে থাকে । মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব দেয়ার জন্য দো'আ করেছিলেন । ফলে কুরাইশরা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয় । অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলেঃ আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি । আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই । আবু সুফিয়ান বললঃ স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন । যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন । আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায় । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলেন । ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে যায় । এর পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাযিল হয় । আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি । বাস্তব ঘটনা তাই ছিল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো'আয় দুর্ভিক্ষ দূর করা হলো কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শির্ক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল ।[সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১৭৫৩ (মাওয়ারিদুজ্জামআন)] ।

(২) অর্থাৎ হতাশ হয়ে পড়বে । তারা কি করবে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না । [ফাতহুল কাদীর]

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾	তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।
وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾	৭৯. আর তিনিই তোমাদেরকে যমীনে বিস্তৃত করেছেন[১] এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে।
وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾	৮০. আর তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন আর তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন[২]। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?
بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾	৮১. বরং তারা বলে, যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীরা।
قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾	৮২. তারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?
لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾	৮৩. 'আমাদেরকে তো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।'
قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾	৮৪. বলুন, 'যমীন এবং এতে যা কিছু আছে এগুলো(র মালিকানা) কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)।'
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾	৮৫. অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ

(১) ذرأ অর্থ, সৃষ্টি করা [জালালাইন; মুয়াসসার] তাছাড়া এখানে বিস্তৃত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার অর্থও হয়। [সা'দী]

(২) কিভাবে একটির পর আরেকটি আসছে। কিভাবে সাদা ও কালো পরপর আসছে। কিভাবে একটি কমছে অপরটি বাড়ছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আসছে। তাদের কোন বিরতি নেই। [ফাতহুল কাদীর]

করবে না?'

৮৬. বলুন, 'সাত আসমান ও মহা-'আরশের রব কে?'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৭. অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্ ।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮. বলুন, 'কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না[১], যদি তোমরা জান (তবে বল) ।'

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্ ।' বলুন, 'তাহলে কোথা থেকে তোমরা জাদুগ্রস্থ হচ্ছো? '

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০. বরং আমরা তো তাদের কাছে হক নিয়ে এসেছি; আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী[২] ।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন কারও সাধ্য নেই যে তার কোন অনিষ্ট করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাউকে বালা-মুসিবত, দু:খ-কষ্টে নিপতিত হতে দেন তবে কারও সাধ্য নেই যে, তার মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও এ কথা সত্য যে, আল্লাহ যাঁর উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। আখিরাতের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশও করতে পারবে না। [দেখুন, সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য যে সঙ্গিনী ও সন্তান সাব্যস্ত করছে এ ব্যাপারে তারা নির্লজ্জ মিথ্যা বলছে। অনুরূপভাবে তাঁর জন্য যে তারা শরীক সাব্যস্ত করছে তাতেও তারা মিথ্যাবাদী। [ফাতহুল কাদীর]

৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত[১]। তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র- মহান!

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۹۱﴾

৯২. তিনি গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, সুতরাং তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৯৩. বলুন, 'হে আমার রব! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে, আপনি যদি তা আমাকে দেখাতে চান,

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৪. 'তবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না[২]।'

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۴﴾

---

(১) অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন শক্তির ও বিভিন্ন অংশের স্রষ্টা ও প্রভু যদি আলাদা আলাদা ইলাহ হতো তাহলে তাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় থাকতো না। বিশ্ব-জাহানের নিয়ম শৃংখলা ও তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক একাত্মতা প্রমাণ করছে যে, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একজন একক আল্লাহর হাতে কেন্দ্রীভূত। যদি কর্তৃত্ব বিভক্ত হতো তাহলে কর্তৃত্বশীলদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। আর এ মতবিরোধ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ পর্যন্ত না পৌঁছে ছাড়তো না। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "যদি পৃথিবী ও আকাশে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ থাকতো তাহলে এ উভয়ের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২২] আরও বলা হয়েছেঃ "যদি আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহও থাকতো, যেমন লোকেরা বলে,তাহলে নিশ্চয়ই তারা আরশের মালিকের নৈকট্যলাভের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকত" [সূরা আল-ইসরাঃ ৪২]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর যে আযাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কেয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়,

৯৫. আর আমরা তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি, আমরা তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম(১) ।

وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ ۝٩٥

৯৬. মন্দের মুকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা; তারা (আমাকে) যে গুণে গুণান্বিত করে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত(২) ।

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝٩٦

তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তার যমানায় তার চোখের সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু যালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সৎলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে হয়ত এ কারণে আখেরাতে তাদের আযাবের ভার লাঘব হবে। তাছাড়া এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। আল্লাহ বলেনঃ "এমন আযাবকে ভয় করো, যা এসে গেলে শুধু যালেমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না" [সূরা আল-আনফালঃ ২৫] বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে। তাই এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দো'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি বলুনঃ হে আল্লাহ, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই যালেমদের সাথে রাখবেন না। আমাকে তাদের বাইরে রাখবেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) যেহেতু কাফেররা আযাবকে অস্বীকার করত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা করত, তাই আল্লাহ্ বলেন, আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আযাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যদিও এই উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেনঃ "আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩৩] কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপরি দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিমদের তরবারির আযাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, যুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾

৯৭. আর বলুন, 'হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে(১) ।'

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

৯৮. 'আর হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে ।'

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

৯৯. অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব!

প্রতিহত করুন । এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলিমদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত । আর এটি শুধু তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যশীল । আর এর অধিকারী তারাই হবে কেবল যারা মহাভাগ্যবান ।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৪-৩৫] অর্থাৎ যুলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাক । কারও কারও মতে, কাফেরদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে । কারও কারও মতে, উম্মতের নিজেদের মধ্যে এর বিধান ঠিকই কার্যকর । শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রে তা রহিত হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর] কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন-কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলিমদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা । কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে 'মুছলা' তথা বিকৃত না করা ইত্যাদি ।

(১) همز শব্দের অর্থ পশ্চাদ্দিক থেকে চাপ দেয়া । [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদুরপ্রসারী অর্থবহ দো'আ । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে এই দো'আ পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দো'আর বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে । এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও দো'আটি পরীক্ষিত । এক সাহাবীর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাকে নিম্ন বর্ণিত দো'আটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন । তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান । দোয়াটি এইঃ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ [আবুদাউদঃ ৩৮৯৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৫৭, ৬/৬]

আমাকে আবার ফেরত পাঠান[১],

১০০. 'যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি[২]।' না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই[৩]। তাদের সামনে

لَعَلِّيْٓ اَعۡمَلُ صَالِحًا فِيۡمَا تَرَكۡتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنۡ وَّرَآئِهِمۡ بَرۡزَخٌ اِلٰى يَوۡمِ يُبۡعَثُوۡنَ ۝

(১) এখানে ارْجِعُونِ শব্দটি এসেছে, যার মূল অর্থ, 'তোমরা আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও'। এখানে লক্ষণীয় যে, সম্বোধন করা হচ্ছে আল্লাহকে অথচ বহুবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি কারণ এ হতে পারে যে, এটি সম্মানার্থে করা হয়েছে যেমন বিভিন্ন ভাষায় এ পদ্ধতি প্রচলন আছে। [কুরতুবী] দ্বিতীয় কারণ কেউ কেউ এও বর্ণনা করেছেন যে,আবেদনের শব্দ বারবার উচ্চারণ করার ধারণা দেবার জন্য এভাবে বলা হয়েছে। যাতে তা 'আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও' এর অর্থ প্রকাশ করে। এ ছাড়া কোন কোন মুফাসসির এ মত প্রকাশ করেছেন যে, رَبِّ বলে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহকে এবং ارْجِعُونِ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব ফেরেশতাদেরকে যারা সংশ্লিষ্ট অপরাধী আত্মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি আখেরাতের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, "আর আমরা তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ্ দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"[সূরা আল-মুনাফিকূন: ১০-১১] আরও এসেছে, "আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করুন, আমরা যা করতাম তার পরিবর্তে সৎকাজ করব।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো ? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। কাজেই শাস্তি আস্বাদন কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" [সূরা ফাতির: ৩৭] কিন্তু তাদের সে চাওয়া পূরণ করা হবে না। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ ফেরত পাঠানো হবে না। নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য তাকে আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। তাছাড়া যদি তাদের কথামত তাদেরকে পাঠানোও হতো তারপরও তারা আবার অন্যায় করত। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর তারা আবার ফিরে গেলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তাই করত" [সূরা আল-আন'আম: ২৮] [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

বার্‌যাখ[১] থাকবে উত্থান দিন পর্যন্ত।

১০১. অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে[২] সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না[৩] এবং একে অন্যের খোঁজ-খবর নেবে না[৪],

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾

(১) 'বারযাখ' এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরযখ বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] এ কারণেই মৃত্যুর পর কেয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বারযাখ বলা হয়। কারণ এটা দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোম্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না, এটাই নিয়ম।

(২) দু'বার শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের ফলে যমীন-আসমান এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কুরআনের ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ আয়াতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতে শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুঁৎকার-এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যদিও দ্বিতীয় ফুঁৎকার বুঝানোই অধিক সঠিক মত বলে মনে হয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ হচ্ছে, সে সময় বাপ ছেলের কোন কাজে লাগবে না এবং ছেলে বাপের কোন কাজে লাগবে না। প্রত্যেকে এমনভাবে নিজের অবস্থার শিকার হবে যে, একজন অন্যজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তো দূরের কথা কারোর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো চেতনাও থাকবে না। অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ "কোন অন্তরংগ বন্ধু নিজের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না।" [সূরা আল-মা'আরিজঃ ১০] আরও বলা হয়েছে, "সেদিন অপরাধীর মন তার নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও নিজের সহায়তাকারী নিকটতম আত্মীয় এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে এবং নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করতে চাইবে।" [সূরা আল-মা'আরিজঃ ১১-১৪]। অন্যত্র বলা হয়েছে, "সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাপ ও স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থার মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে, তার কারোর কথা মনে থাকবে না।" [সূরা আবাসাঃ ৩৪-৩৭]

(৪) অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ "আর তারা একে অপরকে প্রশ্ন করতে এগিয়ে যাবে"। [সূরা আস-সাফফাতঃ ২৭] অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

১০২. অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম,

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়[১];

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত না? তারপর তোমরা সেসবে মিথ্যারোপ করতে[২]।

করবে। এই আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোন অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও আতঙ্কহ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। [দেখুন, বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে এসেছে তারা كالح অবস্থায় থাকবে। যার অর্থ করা হয়েছে বীভৎস চেহারা। অবশ্য অভিধানে كالح এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রুপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় আমার নবী ক্রমাগতভাবে তোমাদের বলেছেন যে, দুনিয়ার জীবন নিছক হাতে গোনা কয়েকটি পরীক্ষার ঘণ্টা মাত্র। একেই আসল জীবন এবং একমাত্র জীবন মনে করে বসো না। আসল জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সেখানে তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে। এখানকার সাময়িক লাভ ও স্বাদ-আহলাদের লোভে এমন কাজ করো না যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তোমাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু তখন তোমরা তাঁর কথায় কান দাওনি। তোমরা এ আখেরাতের জগত অস্বীকার করতে থেকেছো। তোমরা মৃত্যুপরের জীবনকে একটি মনগড়া কাহিনী মনে করেছো। তোমরা নিজেদের এ ধারণার উপর জোর দিতে থেকেছো যে, জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারটি নিছক এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে চুটিয়ে মজা

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়;

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'হে আমাদের রব! এ আগুন থেকে আমাদেরকে বের করুন; তারপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি, তবে তো আমরা অবশ্যই যালিম হব।'

قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না[১]।'

إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. 'কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণ। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।'

লুটে নিতে হবে। কাজেই এখন আর অনুশোচনা করে কী লাভ। তখনই ছিল সাবধান হবার সময় যখন তোমরা দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে এখানকার চিরন্তন জীবনের লাভ বিসর্জন দিচ্ছিলে।

(১) হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে কিন্তু এ পঞ্চমটির জওয়াবে ﴿ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না। [বাগভী]

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

১১১. 'নিশ্চয় আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।'

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা যমীনে কত বছর অবস্থান করেছিলে?'

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ; সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।'

قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্প কালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে!

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

১১৫. 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?'

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. সুতরাং আল্লাহ্ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন হক্ক ইলাহ্ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহ্কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর বলুন, 'হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

২৪- সূরা আন্-নূর,
৬৪ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ النُّوْرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১. এটা একটি সূরা, এটা আমরা নাযিল করেছি এবং এর বিধানকে আমরা অবশ্য পালনীয় করেছি, আর এতে আমরা নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে[১],

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

(১) جلد শব্দের অর্থ মারা। [ফাতহুল কাদীর] جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। [বাগভী] একশ' বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। [সা'দী] হাদীসে এসেছে, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিবাদে লিপ্ত হলো। তাদের একজন বলল: আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফয়সালা করে দিন। অপরজন-যে তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে জ্ঞানী ছিল সে- বললোঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন: বল। লোকটি বলল: আমার ছেলে এ লোকের কাজ করতো। তারপর সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। লোকেরা আমাকে বললো যে, আমার ছেলের উপর পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম রয়েছে। তখন আমি একশত ছাগল এবং একটি দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে আনি। তারপর আমি জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললো যে, আমার সন্তানের উপর ১০০ বেত্রাঘাত এবং একবছরের দেশান্তর। পাথর মেরে হত্যা তো তার স্ত্রীর উপরই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরৎ যাবে। তারপর তিনি তার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের দেশান্তরের শাস্তি দিলেন। এবং উনাইস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন: এ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাও। যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা কর। পরে মহিলা স্বীকারোক্তি করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। [বুখারী: ৬৬৩৩, ৬৬৩৪, মুসলিম: ১৬৯৭, ১৬৯৮] অনুরূপভাবে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন:

مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে[১], যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে[২]।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

৩. ব্যভিচারী পুরুষ-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী, তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না[৩], আর মুমিনদের জন্য

আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তার প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় নাযিল করা হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি দ্বীনী কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য- যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। [বুখারীঃ ৬৮২৯, মুসলিমঃ ১৬৯১]

(১) ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। [সা'দী] তাই সাথে সাথে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকর করণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। [দেখুন,ইবন কাসীর,বাগভী,তাবারী]

(২) অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী,সা'দী]

(৩) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন। তাদের মতে আয়াতের ভাষ্য হলো, ব্যভিচারী মহিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

এটা হারাম করা হয়েছে(১)।

৪. আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর(২) প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

আরোপ করা। [বাগভী] কোন কোন মুফাস্সির এ হুকুমকে সুনির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর, কুরতুবী,বাগভী,ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সে যুগে এক মহিলার নাম ছিল উম্মে মাহযুল। সে যিনা করত (বেশ্যা ছিল)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৫৯, ২/২২৫, নাসায়ীঃ কিতাবুত্-তাফসীর, হাদীস নং- ৩৭৯, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৯৩-১৯৪, বায়হাকীঃ ৭/১৫৩] অনুরূপ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে যুগে 'আনাক' নাম্নী এক বেশ্যা ছিল, মারসাদ নামীয় এক সাহাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযীঃ ৩১৭৭, আবু দাউদঃ ২০৫১, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৬৬]

(১) আয়াতের ذَٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিয়ে এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে [দেখুন, কুরতুবী]
কোন নারী বা কোন পুরুষ যিনাকারী হিসাবে পরিচিত হলে যদি সেই কাজ থেকে তাওবাহ্ না করে তবে তাকে বিয়ে করা জায়েয নাই।[আয়সারুত-তাফাসির,সা'দী]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তিন ধরনের লোক জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ্ তাদের দিকে কেয়ামতের দিন তাকাবেন না। (এক) পিতা-মাতার অবাধ্য, (দুই) পুরুষের মত চলাফেরাকারিণী মহিলা এবং (তিন) দায়্যুস (যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপকর্ম হতে দেখেও তার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয় না)। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৩৪, ইবনে হিব্বানঃ ৭৩৪০]

(২) محصنات শব্দটি إحصان থেকে উদ্ভুত। শরীয়তের পরিভাষায় إحصان 'ইহসান' দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে إحصان এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞান সম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলিম হতে হবে এবং শরীয়ত সম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিয়ে করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তি যিনা করলে তার প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য إحصان এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞান সম্পন্ন বালেগ, মুক্ত ও মুসলিম হতে হবে, সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। [দেখুন,কুরতুবী,বাগভী,সা'দী,যাদুল মাসির]

وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤

তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো ফাসেক[১]।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

৫. তবে যারা এরপর তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ্ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত,

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧

৭. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র লা'নত।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨

৮. আর স্ত্রী লোকটির শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় তার স্বামীই মিথ্যাবাদী,

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ

৯. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর

---

(১) যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে, সে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোন কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। আর তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। [ইবন কাসীর,মুয়াস্‌সার]

নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গযব(১)। | الصّٰدِقِيْنَ ۝٧

(১) যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করাতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চার জন সাক্ষী পেশ করে যারা স্ত্রীর ব্যভিচারের পক্ষে এমনভাবে সাক্ষ্য দিবে যে স্ত্রীর ব্যভিচার বিচারকের কাছে প্রমাণিত হয়ে পড়ে, তখন স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চার জন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লি'আন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে উল্লেখিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত বা অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচ বার কসম না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচ বার কসম করে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকেও কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচ বার কসম করিয়ে নেয়া হবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। আর এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম করতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম করে নেয়, তবে লি'আন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। আখেরাতের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী আখেরাতের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লি'আন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। [ইবন কাসীর,কুরতুবী,সা'দী]

হাদীসের কিতাবাদিতে লি'আন সংক্রান্ত দু'টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ঘটনা হেলাল ইবন্ উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ্ বুখারীতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনায় রয়েছে। এ ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদে এভাবে রয়েছে- ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যখন কুরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً﴾ আয়াত নাযিল হল, তখন মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ এতে কোন নারীর প্রতি

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে এক জন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এ আয়াত শুনে আনসারদের সর্দার সা'দ ইবনে উবাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, এ আয়াতগুলো ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সর্দার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তার একথা বলার কারণ তার তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসন করি এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চার জন লোক এনে এটা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ণ করবে না?

সা'দ ইবনে উবাদার এ কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হেলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে এক জন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সর্দার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালের ব্যাপার শুনে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে বললেনঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের

শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। [বুখারীঃ ৪৭৪৭, ৫৩০৭] এই কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস্ সালাম লি'আনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন' অর্থাৎ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾

আবু ইয়ালা এই বর্ণনাটিই আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লি'আনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হেলাল বললেনঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালের স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বললঃ আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে তাওবাহ্ করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হেলাল বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লি'আন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে বলা হল যে, তুমি কুরআনের বর্ণিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হেলাল আদেশ অনুযায়ী চার বার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যর কুরআনী ভাষা এরূপঃ "যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হবে।" এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালকে বললেনঃ দেখ হেলাল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল বললেনঃ আমি কসম করে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে আখেরাতের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যর শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরণের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেয়া হল। পঞ্চম সাক্ষ্যর সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ একটু থাম। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতেও অনেক কঠোর। এ কথা শুনে সে কসম করতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বললঃ আল্লাহ্‌র কসম আমি আমার গোত্রকে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্‌র গজব বা ক্রোধ আপতিত হবে। এভাবে লি'আনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিয়ে নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে- পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৩৮-২৩৯, আবু দাউদঃ ২২৫৬, আবু ইয়া‘লাঃ ২৭৪০]

বুখারী ও মুসলিমে সাহ্‌ল ইবনে সা‘দ সায়েদীর বর্ণনা এভাবে আছে যে, ওয়াইমের আজলানী রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? বা তার কি করা উচিত? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্‌ তা‘আলা তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহ্‌ল বলেনঃ তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে লি‘আন করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লি‘আন সমাপ্ত হল, তখন ওয়াইমের বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। [বুখারীঃ ৪৭৪৫, ৪৭৪৬, ৫৩০৯, মুসলিমঃ ১৪৯২]

আলোচ্য ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লি‘আনের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লি‘আনের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এরপর ওয়াইমের এমনি ধরণের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারটি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হল তখন তিনি বললেনঃ তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ এবং ওয়াইমেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قَدْ نَزَّلَ اللهُ فِيْكَ এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।

উপরোক্ত দু’টি বর্ণনা ছাড়াও লি‘আন সংক্রান্ত আরো কিছু হাদীস এসেছে যেগুলো থেকে লি‘আনের গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন, ইবন্‌ উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, স্বামী-স্ত্রী লি‘আন শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন। [বুখারীঃ ৫৩০৬,৪৭৪৮ মুসনাদে আহমদঃ ২/৫৭] ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি‘আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি

করে দেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। [বুখারীঃ ৫৩১৫,৬৭৪৮] ইবনে উমরের আর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, উভয়ে লি'আন করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের হিসাব এখন আল্লাহর জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যুক।" তারপর তিনি পুরুষটিকে বলেন, এখন এ আর তোমার নয়। তুমি এর উপর নিজের কোন অধিকার দেখাতে পারো না। এর উপর কোনরকম হস্তক্ষেপও করতে পারো না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই। পুরুষটি বলে, হে আল্লাহর রসূল! আর আমার সম্পদ? (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা আমাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করুন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সম্পদ ফেরত নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার উপর সত্য অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে ঐ সম্পদ সে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হালাল করে তার থেকে লাভ করেছো। আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে তা বেশী দূরে রয়েছে।" [বুখারীঃ ৫৩৫০] অপর বর্ণনায় আলী ইবন্ আবু তালেব ও ইবন্ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ "সুন্নাত এটিই নির্ধারিত হয়েছে যে, লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো বিবাহিতভাবে একত্র হতে পারে না।" [দারু কুতনী ৩/২৭৬] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরা দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারে না। [দারুকুত্নীঃ ৩/২৭৬] লি'আনের উপযুক্ত আয়াত এবং এ হাদীসগুলোর আলোকে ফকীহগণ লি'আনের বিস্তারিত আইন-কানুন তৈরী করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছেঃ

একঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লি'আনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে 'হদ' জারি করার তথা আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্ বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দু'জন সাক্ষী আনতে হবে। মালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার যিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী পেশ করবে

অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে একথা স্বীকার করে যাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সংগে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে।
দুইঃ ঘরে বসে লি'আন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরী।
তিনঃ লি'আন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার উপর যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বংশধারা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে লি'আন দাবী করতে পারে।
চারঃ সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লি'আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু'জনের মধ্যে কি কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফেঈ বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার ক্ষমতা আছে সে লি'আন করতে পারে। প্রায় একই ধরনের অভিমত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, লি'আন শুধুমাত্র এমন স্বাধীন মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে যারা কাযাফের অপরাধে শাস্তি পায়নি। যদি স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই কাফের, দাস বা কাযাফের অপরাধে পূর্বেই শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে লি'আন হতে পারে না। এ ছাড়াও যদি স্ত্রীর এর আগেও কখনো হারাম বা সন্দেহযুক্ত পদ্ধতিতে কোন পুরুষের সাথে মাখামাখি থেকে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও লি'আন ঠিক হবে না।
পাঁচঃ নিছক ইশারা-ইংগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে না। বরং কেবলমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় সন্তানকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে।
ছয়ঃ যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম খেতে ইতঃস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে, তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষণ সে লি'আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বলে মেনে নিলে তার বিরুদ্ধে কাযাফের দণ্ড জারি হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেক, শাফেঈ এর মতে, লি'আন করতে ইতঃস্তত করার ব্যাপারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। ফলে কসম করতে ইতঃস্তত করলেই তার উপর কাযাফের হদ্ ওয়াজিব হয়ে যায়।
সাতঃ স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্ত্রী যদি লি'আন করতে ইতঃস্তত করে, তাহলে হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে লি'আন করবে অথবা যিনার স্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে উপরোক্ত ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় তাকে রজম করে দেয়া হবে। তারা কুরআনের ঐ উক্তি থেকে যুক্তি পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্ত্রী শাস্তি মুক্ত হবে। এখন যেহেতু সে কসম খাচ্ছে না, তাই নিশ্চিতভাবেই সে শাস্তির যোগ্য হবে।
আটঃ যদি লি'আনের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী

গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার ঔরষজাত গণ্য না হবার জন্য লি'আন নিজেই যথেষ্ট। ইমাম শাফেঈ বলেন, স্বামীর যিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করা এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ঔরসজাত গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী যিনাকারিনী হওয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে যিনার কারণে জন্ম নিয়েছে, এটা অপরিহার্য নয়।

নয়ঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ স্ত্রীর গর্ভধারণকালে স্বামীকে গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরই ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় গর্ভবতী পেয়েছে যখন তার মতে এ গর্ভস্থিত সন্তান তার হতে পারে না তখন এ অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোন কোন রোগের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসঞ্চার হয় না।

দশঃ যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, একবার সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশধারা অস্বীকার করলে কাযাফের শাস্তির অধিকারী হবে।

এগারঃ যদি স্বামী তালাক দেওয়ার পর সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি'আন হবে না। বরং তার বিরুদ্ধে কাযাফের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ লি'আন হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীটি তার স্ত্রী নয়। তবে যদি রজ'ঈ তালাক হয় এবং রুজু করার (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার) সময়-কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

বারঃ লি'আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোন কোনটার ব্যাপারে সবাই একমত আবার কোন কোনটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ

লি'আন অনুষ্ঠিত হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হবে না। স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে।

নারীকে ব্যভিচারিনী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। যদিও লি'আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে[১]; এবং আল্লাহ্ তো

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ

ফলে তার ব্যাভিচারিনী হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে, তবুও তাকে ও তার সন্তানকে একথা বলার অধিকার থাকবে না।

যে ব্যক্তি লি'আনের পরে তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তি করবে সে 'হদে'র যোগ্য হবে।

নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে না।

ইদ্দত পালনকালে নারী পুরুষের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের হকদার হবে না।

নারী ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

তাছাড়া, দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক, লি'আনের পরে পুরুষ ও নারী কিভাবে আলাদা হবে? এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ লি'আন শেষ করবে, নারী জবাবী লি'আন করুক বা না করুক তখনই সংগে সংগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সা'দ ও যুফার বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন লি'আন শেষ করে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা , আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেন, লি'আনের ফলে ছাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না বরং আদালত ছাড়াছাড়ি করে দেবার ফলেই ছাড়াছাড়ি হয়। যদি স্বামী নিজেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, অন্যথায় আদালতের বিচারপতি তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করার কথা ঘোষণা করবেন। দুই, লি'আনের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সম্ভব? এ বিষয়টিতে ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, শাফেঈ, আহমাদ ইবন্ হাম্বল বলেন, লি'আনের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে তারা এরপর থেকে চিরকালের জন্য পরস্পরের উপর হারাম হয়ে যাবে। তারা পুনর্বার পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও কোন অবস্থাতেই পারবে না। উমর, আলী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমও এ একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সা'ঈদ ইবন্ মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার উপর কাযাফের হদ জারি হয়ে যায় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে পুর্নবার বিয়ে হতে পারে। তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লি'আন। যতক্ষণ তারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে তখনই লি'আন খতম হয়ে যাবে এবং হারামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। [দেখুন,কুরতুবী]

(১) এখানে বাক্যের বাকী অংশ উহ্য আছে। কারণ, এখানে অনেক কিছুই বর্ণিত হয়েছে যদি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ না থাকত তবে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারত।

حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

দ্বিতীয় রুকূ'

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ

১১. নিশ্চয় যারা এ অপবাদ[১] রচনা

যদি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে এ আয়াতসমূহ নাযিল না করা হতো তবে এ সমস্ত বিষয় মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিত। যদি আল্লাহ্‌র রহমত না হতো তবে কেউ নিজেদেরকে তাওবার মাধ্যমে পবিত্র করার সুযোগ পেত না। যদি আল্লাহ্‌র রহমত না হতো তবে তাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর লা'নত বা গজব নাযিল হয়েই যেত। এ সমস্ত সম্ভাবনার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে উত্তরটি উহ্য রেখেছেন।[দেখুন,তাবারী,বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(১) পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও আখেরাতের মহা বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি, তারপর অপবাদের শাস্তি ও পরে লি'আনের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে চার জন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন পবিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম পবিত্রা নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফেক উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি এমনি ধরণের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলিমও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলিম সচ্চরিত্রা নারীদের পক্ষে অত্যাধিক গুরুতর ছিল। তাই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পবিত্রতা বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন।[ইবন কাসীর] এসব আয়াতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পবিত্রতা ঘোষণা করতঃ তার ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে 'ইফ্‌কের ঘটনা' নামে খ্যাত। ইফ্‌ক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। [বাগভী]এসব আয়াতের তাফসীর বুঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে

নারীদের পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার নিয়ম। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাতে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রয়োজন সারতে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও হারিয়ে গেল। তিনি সেখানে হারটি খুঁজতে লাগলেন। এতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার আসনটি যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। এমনকি উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূণ্য এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হল না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক খুঁজে দেখার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত তখন আমার খোঁজে তারা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য আমাকে খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে যাবে। সময় ছিল শেষ রাত, তাই তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে তার মুখ থেকে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজি'উন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কানে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সফওয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِیْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল[১]; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপকাজের ফল[২] এবং তাদের

হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফেক ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কিছুসংখ্যক সরল-প্রাণ মুসলিমও কানকথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হাস্সান ইবনে সাবিত, মিস্তাহ্ ইবনে আসাল এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ বিনতে জাহাশ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত।
যখন এই মুনাফেক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুবই মর্মাহত হলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলিমগণও তীব্রভাবে বেদানাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পবিত্রতা বর্ণনা এবং অপবাদ রটনাকারী ও এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দা করে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কুরআনী-বিধান অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। আবু দাউদের বর্ণনায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন জন মুসলিম মিসতাহ্, হামানাহ্ ও হাস্সানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। [আবু দাউদঃ ৪৪৭৪] অতঃপর মুসলিমরা তাওবাহ্ করে নেয় এবং মুনাফেকরা তাদের অবস্থানে কায়েম থাকে। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তি দিয়েছেন প্রমাণিত হয়নি। যদিও তাবরানী কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাস্তি দিয়েছেন। [দেখুন- মু'জামুল কাবীরঃ ২৩/১৪৬(২১৪), ২৩/১৩৭(১৮১), ২৩/১২৫(১৬৪), ২৩/১২৪(১৬৩)]

(১) عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ জন পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশীর জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছে, তাদের জন্য সে পরিমাণ গোনাহ্ লেখা হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তাদের শাস্তি হবে। [বাগভী]

মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহা শাস্তি[১]।

১২. যখন তারা এটা শুনল তখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীগণ তাদের নিজেদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করল না এবং (কেন) বলল না, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ[২]?'

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

---

(১) উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আযাব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফেক আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই। [মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এক, যখন তোমরা শুনেছিলে তখনই কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেনি? অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, নিজেদের লোকদের অথবা নিজেদের সমাজের লোকদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করনি কেন? আয়াতের শব্দাবলী দু'ধরনের অর্থের অবকাশ রাখে। অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলিম পুরুষ ও নারী নিজেদের মুসলিম ভাই-বোনদের সম্পর্কে সুধারণা করলে না কেন এবং একথা বললে না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ ﴿بِأَنفُسِهِمْ﴾ শব্দ দ্বারা কুরআনুল কারীম ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলিম অন্য মুসলিমের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ, ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে কুরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে ﴿وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾ [সূরা আল-হুজরাতঃ ১১] অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলিম পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। এ আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ বলা হয়েছে। এতে হাল্কা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের প্রেক্ষাপটে মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবী। এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এই আয়াতের শেষ বাক্য ﴿هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শুনামাত্রই মুসলিমদের 'এটা প্রকাশ্য অপবাদ' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবী। অর্থাৎ তাদের এ সব অপবাদ তো বিবেচনার যোগ্যই ছিল না। একথা শোনার সাথে সাথেই প্রত্যেক মুসলিমের একে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার, মিথ্যা বানোয়াট কথা ও অপবাদ আখ্যা দেয়া উচিত ছিল। [বাগভী]

لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সুতরাং তারাই আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী[১]।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

১৪. দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে জড়িয়ে গিয়েছিলে তার জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত[২],

---

(১) এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলিমদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবী করা। ব্যভিচারের অপরাধ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চার জন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবী করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের সপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। কারণ, তাদের দাবীর সপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। সামান্য সন্দেহ করাও সেখানে গর্হিত। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্‌র কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। এখানে "আল্লাহর কাছে" অর্থাৎ আল্লাহর আইনে অথবা আল্লাহর আইন অনুযায়ী। নয়তো আল্লাহ তো জানতেন ঐ অপবাদ ছিল মিথ্যা। তারা সাক্ষী আনেনি বলেই তা মিথ্যা, আল্লাহর কাছে তার মিথ্যা হবার জন্য এর প্রয়োজন নেই। [দেখুন-বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(২) যেসব মুসলিম ভুলক্রমে এই অপবাদে কোন না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এরপর তাওবাহ্ করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতে তাদের সবাইকে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর। এর কারণে দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং আখেরাতেও কঠোর শাস্তি হত। কিন্তু মুসলিমদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহ মূলত: দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব নাযিলের পক্ষে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গোনাহ্‌র জন্য সত্যিকার তাওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তাওবাহ্ কবুল করেছেন। আখেরাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফেরাতের ওয়াদা দিয়েছেন। [দেখুন-মুয়াস্‌সার,বাগভী]

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে[১] এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। আর তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়[২]।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. আর তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!'

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না করো[৩]।'

---

(১) تلقى শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা ও বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বুঝানো হয়েছে। অপর قراءة-এ পড়া হয় تَلِقُوْنَهُ তখন এর অর্থ হবে মিথ্যা বানিয়ে বলা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এভাবে পড়তেন। [বুখারীঃ ৪১৪৪]

(২) অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শুনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু করেছিলে। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলিম দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন কোন লোক আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হয় এমন কথা বলে, অথচ সে জানে না যে, এটা কতদূর গিয়ে গড়াবে (অর্থাৎ সে কোন গুরুত্বের সাথে বলেনি)। অথচ এর কারণে সে জাহান্নামের আসমান ও যমীনের দূরত্বের চেয়েও বেশী গভীরে পৌঁছবে।' [বুখারীঃ ৬৪৭৮, মুসলিমঃ ২৯৮৮]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে যে কোন খারাপ সংবাদ, অপবাদ তাদের কাছে বর্ণনা করা হলে তার সাথে কি আচরণ করতে হবে সে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। তাদেরকে এ সমস্ত অপবাদ মুখে উচ্চারণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা, মানুষের প্রতিটি কথারই হিসাব দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন কিছু মনে

১৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

২০. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে[১]; আর আল্লাহ্ তো দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

তৃতীয় রুকূ'

২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

২২. আর তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ

উদ্রেক হয় কিন্তু মুখে উচ্চারণ না করে, তবে তাতে গোনাহ্ লেখা হয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মনে যা উদিত হয় তা যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে না বলে ততক্ষণের জন্য তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।' [বুখারীঃ ৫২৬৯, মুসলিমঃ ১২৭]

(১) এখানেও ১০ নং আয়াতের মতো উত্তর উহ্য রাখা হয়েছে। [বাগভী]

اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

স্বজন, অভাবগ্রস্তকে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে[১]। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন[২]?

(১) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলিমদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাস্‌সান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করেন। তারা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তাওবাহ্‌র তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন আয়েশার দোষমুক্ততা প্রকাশ্যে আয়াত নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলিমদের তাওবাহ্ কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন কন্যা-বৎসল পিতা আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহ্‌র প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম করে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকীরকে আর্থিক সাহায্য নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলিমের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কাউকে আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্‌র কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তাওবাহ্ এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম করেছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত। [দেখুন-কুরতুবী]

(২) আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছেঃ তোমরা কি পছন্দ করা না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন? আয়াত শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেনঃ بَلٰى وَاللّٰهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্

আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

২৩. যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা-নির্মলচিত্ত, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে[১] তারা তো দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি[২]।

আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি মিসতাহ্র আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেনঃ এ সাহায্য কোনদিন বন্ধ হবে না। [বুখারীঃ ৪৭৫৭, মুসলিমঃ ২৭৭০]

(১) মূলে (গাফেলাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সরলমনা ও ভদ্র মহিলারা, যারা ছল-চাতুরী জানে না, যাদের মন নির্মল,কলুষমুক্ত ও পাক-পবিত্র, যারা অসভ্যতা ও অশ্লীল আচরণ কি ও কিভাবে করতে হয় তা জানে না এবং কেউ তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে একথা যারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিষ্কলুষ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া সাতটি "সর্বনাশা" কবীরাহ গোনাহের অন্তরভুক্ত। [দেখুন, বুখারীঃ ২৭৬৬, মুসলিমঃ ৮৯]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহ্র নেয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম- হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে ফিরিশ্তা জিব্রাঈল 'আলাইহিস্ সালাম একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং বলেন: এ আপনার স্ত্রী। [তিরমিযী: ৩৮৮০]

দ্বিতীয়- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিয়ে করেননি।

তৃতীয়- তার কোলে মাথা রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

চতুর্থ- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখনো ওহী নাযিল হত, যখন তিনি আয়েশার সাথে একই লেপের নীচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন স্ত্রীর এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। [তিরমিযীঃ ৩৮৭৯]

ষষ্ঠ- আসমান থেকে তার নির্দোষিতার বিষয় নাযিল হয়েছে।

২৪. যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে[১]---

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের হক্ব তথা প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জেনে নেবে যে, আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য।

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾

২৬. দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য;

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ

সপ্তম- তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে দুনিয়াতেই ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা।

অষ্টম- সাহাবাগণ কোন ব্যাপারে সমস্যায় পড়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে আসলে তার কাছে কোন না কোন ইলম পেতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ফকীহ্ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে মূসা ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। [তিরমিযীঃ ৩৮৮৪] কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে ওর সাক্ষ্য দ্বারা তার দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। মার্ইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার শিশু পুত্র ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের সাক্ষ্য দ্বারা তাকে দোষমুক্ত করেন। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাযিল করে তার দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তার গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

(১) অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা ও হস্তপদাদী কথা বলবে ও তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে এসেছে, কেয়ামতের দিন যে গোনাহ্গার তার গোনাহ্র স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্ গোপন রাখবেন। [দেখুন- বুখারীঃ ৬০৭০, মুসলিমঃ ২৭৬৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৭৪] পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি; পরিদর্শক ফিরিশ্তারা ভুল করে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। [দেখুন- মুসলিমঃ ২৯৬৮, ২৯৬৯]

لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ أُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে তার সাথে তারা সম্পর্কহীন; তাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা[১]।

চতুর্থ রুকূ'

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

২৭. হে মুমিনগণ[২]! তোমরা নিজেদের ঘর

(১) অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। এ আয়াতে একটি নীতিগত কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।
কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের এ অর্থও করেছেন যে, খারাপ কথা খারাপ লোকদের জন্য (অর্থাৎ তারা এর হকদার) এবং ভালো কথা ভালো লোকদের জন্য, আর ভালো লোকদের সম্পর্কে দুর্মুখেরা যেসব কথা বলে তা তাদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র। অন্য কিছু মুফাসসির এর অর্থ করেছেন এভাবে, খারাপ কাজ খারাপ লোকদের পক্ষেই সাজে এবং ভালো কাজ ভালো লোকদের জন্যই শোভনীয়, ভালো লোকেরা খারাপ কাজের অপবাদ বহন থেকে পবিত্র। ভিন্ন কিছু তাফসীরকারক এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে, খারাপ কথা খারাপ লোকদেরই বলার মতো এবং ভালো লোকেরা ভালো কথাই বলে থাকে, অপবাদদাতারা যে ধরনের কথা বলছে ভালো লোকেরা তেমনি ধরনের কথা বলা থেকে পবিত্র। [দেখুন-ইবন কাসীর,সা'দী,কুরতুবী,বাগভী]

(২) এ আয়াতে অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধান আলোকপাত করা হয়েছে। অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে প্রতিটি ইমানদার নারী, পুরুষ, মাহ্‌রাম ও গায়র-মাহ্‌রাম সবাই শামিল রয়েছে। আতা ইবন আবী রাবাহ্ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ অনুমতি নেয়া মানুষ অস্বীকার করছে, বর্ণনাকারী বলল, আমি বললামঃ আমার কিছু

حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

ছাড়া অন্য কারো ঘরে তার অধিবাসীদের সম্প্রীতিসম্পন্ন অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে[১] প্রবেশ

ইয়াতীম বোন রয়েছে, তারা আমার কাছে আমার ঘরেই প্রতিপালিত হয়, আমি কি তাদের কাছে যাবার সময় অনুমতি নেব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি কয়েকবার তার কাছে সেটা উত্থাপন করে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম করার অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। এবং বললেনঃ তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে চাও? [বুখারীঃ আদাবুল মুফরাদ- ১০৬৩] ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলঃ আমি আমার মায়ের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, অনুমতি চাও। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো আমার মায়ের ঘরেই বসবাস করি। তিনি বললেনঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে যাবে না। লোকটি আবার বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো সর্বদা তার কাছেই থাকি। তিনি বললেনঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে যাবে না। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বললঃ না। তিনি বললেনঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। [মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ ১৭২৯]

(১) আয়াতে ﴿حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا﴾ বলা হয়েছে; অর্থাৎ দু'টি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না।

প্রথম বলা হয়েছে, تَسْتَأْنِسُوْا বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ, تَسْتَأْذِنُوْا বা অনুমতি হাসিল করা। কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। تَسْتَأْذِنُوْا বললে আয়াতের অর্থ হতোঃ "কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও।" এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ تَسْتَأْنِسُوْا শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হয়, পরিচিতি, অন্তরংগতা, সম্মতি ও প্রীতি সৃষ্টি করা। আর এটা যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের সাথে অন্তরংগ করা, সম্প্রীতি তৈরী করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবেঃ "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরংগ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে।" অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এখানে اسْتِينَاسٌ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, ফলে সে আতঙ্কিত হয় না। [দেখুন-বাগভী,সা'দী,আইসারুত তাফাসির]

দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্র-পশ্চাত

করো না[1]। এটাই তোমাদের জন্য

নেই। কোন কোন আলেম বলেনঃ যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম করবে। [দেখুন- বাগভী] কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে চায়। বিভিন্ন হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হাদীসে আছে, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, السَّلامُ عَلَيْكُم هٰذا عَبْدُ الله بن قَيْس، السَّلامُ عَلَيْكُم هَذا أَبو مُوسَى، السَّلامُ عَلَيْكُم هَذا الأَشْعَري [মুসলিমঃ ২১৫৪] এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবু মূসা বলেছেন, এরপর আরো নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আল-আশ'আরী বলেছেন।

(১) এ হুকুমটি নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন নীচে সেগুলোর কিছু বর্ণনা করা হলোঃ

একঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাহির থেকে চেয়ে দেখা নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং ঠিক তার দরজার উপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে। সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" [আবু দাউদঃ ৫১৭৪] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। [আবু দাউদঃ ৫১৮৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। [আবু দাউদঃ ৫১৭১] অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।" [মুসলিমঃ২১৫৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২২৩, ২/৪২৮] অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।"[আবু দাউদঃ৫১৭২]

দুইঃ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" [ইবনে কাসীর]

তিনঃ প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত শিক্ষা দেন। যেমন, তাদেরকে ঘরে ঢুকার অনুমতির জন্য সঠিক শব্দ নির্বাচন করা শিখিয়ে দেনঃ একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে "আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খাদেমকে বললেনঃ এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, "আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?" বলতে হবে। [আবু দাউদঃ৫১৭৭]।

তাদেরকে নিজের পরিচয় স্পষ্টভাবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেনঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি?" অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? [বুখারীঃ ৬২৫০, মুসলিমঃ ২১৫৫, আবু দাউদঃ ৫১৮৭] এতে বুঝা গেল যে, অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমতি নেয়ার ক্ষেত্রে বলতেনঃ "আসসালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?" [আবু দাউদঃ৫২০১]

সালাম ব্যতীত কেউ ঢুকে গেলে তাকে ফেরত দিয়ে সালামের মাধ্যমে ঢুকা শিখিয়ে দিলেনঃ এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আসসালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। [আবু দাউদঃ৫১৭৬]

অনুমতি লাভের জন্য সালাম দেয়াঃ অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে আসলেন এবং তিনবার সালাম দিলেন। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কোন উত্তর না করায় তিনি ফিরে চললেন। তখন লোকেরা বললঃ আবু মূসা ফিরে যাচ্ছে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ তাকে ফিরিয়ে আন, তাকে ফিরিয়ে আন। ফিরে আসার পর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি ফিরে

উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও তাহলে সেখানে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়[১]। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র[২]। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

যাচ্ছিলে কেন? আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আবু মূসা বললেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'অনুমতি তিন বার, যদি তাতে অনুমতি দেয় ভাল, নতুবা ফিরে যাও।' [বুখারীঃ ৬২৪৫, মুসলিমঃ ২১৫৪] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে ফিরে গেলেন। সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দো'আ বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচু স্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। [আবু দাউদঃ ৫১৮৫ ও আহমাদঃ ৩/১৩৮]

চারঃ অনুরূপভাবে কেউ যদি সফর হতে ফিরে আসে তবে আপন স্ত্রীর কাছে যাবার আগেও অনুমতি নিয়ে যাওয়া সুন্নত। যাতে তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় না পায়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস এসেছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৫০৭৯, মুসলিমঃ ৭১৫]

(১) অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যদি আপাততঃ ফিরে যেতে বলা হয়, তখন হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। [দেখুন- বাগভী,মুয়াস্সার]

২৯. যে ঘরে কেউ বাস করে না[1] তাতে তোমাদের কোন ভোগ করা[2] বা উপকৃত হওয়ার অধিকার থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে[3]; এটাই

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

---

(১) আয়াতে ﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ, হোটেল,বাজার এবং একই কারণে মসজিদ, দ্বীনী পাঠাগার ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। [তাবারী,ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্‌সার]

(২) مَتَاعٌ - শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। [কুরতুবী,বাগভী]

(৩) যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলোঃ
কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ– যাতে কামভাব পূর্ণ হয় এবং হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। [দেখুন-সা'দী,ফাতহুল কাদীর] আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে- দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ- যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইবনে সীরীন রাহিমাহুল্লাহ্ আবিদা আস্‌-সালমানী রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবীরা গোনাহ্। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত- সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা

হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। জারীর ইবন আব্দুল্লাহ্ বাজালী থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। [মুসলিমঃ ২১৫৯] আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে আছে, 'প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত গোনাহ্।' [আবু দাউদঃ ২১৪৯, তিরমিযীঃ ২৭৭৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫১, ৩৫৭] এর উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের উপর কিছু কিছু ব্যভিচার (যিনা) হবে জানিয়ে দিয়েছেন, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। চক্ষুর যিনা হল তাকানো, ...। [বুখারীঃ ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসলিমঃ ২৬৫৭]
তদ্রুপ নিজের সতরকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও যৌনাঙ্গ সংযত করার পর্যায়ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর] পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর।" [দারুকুতনীঃ ৯০২] শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। জারহাদে আল- আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?" [তিরমিযী ২৭৯৬, আবু দাউদঃ ৪০১৪] অন্য একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেনঃ "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর হকদার।" [আবু দাউদঃ ৪০১৭, তিরমিযীঃ ২৭৬৯, ইবনে মাজাহঃ ১৯২০]। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কোন লোক যেন অপর লোকের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়, অনুরূপভাবে কোন মহিলা যেন অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায় এবং কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষের সাথে একই কাপড়ে অবস্থান না করে, তদ্রূপ কোন মহিলাও যেন অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ে অবস্থান না করে। [মুসলিমঃ ৩৩৮] অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক। লোকেরা বললঃ আমরা এ ধরণের বসা থেকে বাঁচতে পারি না; কেননা, সেখানে বসে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি বসা ব্যতীত তোমার গত্যন্তর না থাকে তবে পথের হক আদায় করবে। তারা বললঃ পথের দাবী কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চক্ষু নত করা, কষ্টদায়ক

يَصْنَعُوْنَ ۝

তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

৩১. আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে[১] এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত

বিষয় দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। [বুখারীঃ ২৪৬৫, মুসলিমঃ ২১২১]

অনুরূপভাবে দাড়ি-গোঁফ বিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করাও অনুচিত। ইবনে কাসীর লিখেছেন- পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম।

(১) এ দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর] অনেক আলেমের মতেঃ নারীদের জন্য মাহ্‌রাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। [ইবন কাসীর] তার প্রমাণ উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছেঃ 'একদিন উম্মে-সালমা ও মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়-কাল ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে-সালমা বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। [তিরমিযীঃ ২৭৭৮, আবু দাউদঃ ৪১১২] তবে হাদীসটির সনদ দূর্বল। অপর কয়েকজন ফেকাহ্‌বিদ বলেনঃ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দোষনীয় নয়। তাদের প্রমাণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার হাদীস, যাতে বলা হয়েছেঃ একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুচকাওয়াজ নিরিক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। [বুখারীঃ ৪৫৫, মুসলিমঃ ৭৯২]

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

করে[১]; আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য[২] প্রদর্শন না করে তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে[৩]।

(১) অর্থাৎ তারা যেন অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। [তাবারী,ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, “মহিলা হলো আওরত তথা গোপণীয় বিষয়” [তিরমিযীঃ ১১৭৩, সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৫৫৯৯, সহীহ ইবনে খুযাইমাহঃ ১৬৮৫] পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন-পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন, তার বোন আসমা বিনতে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাতলা কাপড় পরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেনঃ “হে আসমা ! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার এটা ও ওটা ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।” বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের কব্জি ও চেহারার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। [আবু দাউদঃ ৪১০৪]

(২) আয়াতের অর্থ এই যে, মুহরিম ব্যতিত সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। [তাবারী,বাগভী]

(৩) আয়াতে পর্দার বিধানের কয়েকটি ব্যতিক্রম আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ অর্থাৎ নারীর কোন সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় সেসব অঙ্গ স্বভাবতঃ খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গোনাহ্ নেই। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের তাফসীর দু'ধরনের। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজ-সজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজ-সজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাও বলেনঃ এখানে প্রকাশ্য সৌন্দর্য বলতে চেহারা, চোখের সুরমা, হাতের মেহেদী বা রঙ এবং আংটি। সুতরাং এগুলো সে তার ঘরে যে সমস্ত মানুষ তার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি আছে, তাদের সামনে প্রকাশ করবে।

কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ নারীর আসল বিধান এই

আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে[১]। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা,

اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ

যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোন কিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবতঃ যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো অপারগতার কারণে গোনাহ্ থেকে মুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেন-দেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ- গোনাহ্ নয়। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির ﴿اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ এর অর্থ নিয়েছেনঃ "মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়" এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর,সহীহ্ আল-মাসবুর]

(১) অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خُمُر শব্দটি خمار এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جيوب শব্দটি جيب এর বহুবচন- এর অর্থ জামার কলার। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর] জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের উপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। তাই মুসলিম নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, এতে করে যেন সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। [ইবন কাসীর] আয়াত নাযিল হবার পর মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তার প্রশংসা করে বলেনঃ সূরা নূর নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ﴾ বাক্যাংশ শোনার পর তারা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। [বুখারীঃ ৪৭৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, যখন ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ﴾ এ আয়াত নাযিল হলো, তখন তাদের মাথা এমনভাবে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলল মনে হয় যেন তাদের মাথার উপর কাক রয়েছে। [আবু দাউদঃ ৪১০১] এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেনঃ আল্লাহ্ প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহমত নাযিল করুন তারা ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ﴾ নাযিল হওয়ার পরে পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করে। [আবু দাউদঃ ৪১০২]

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن

শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা[১], তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ[২] এবং নারীদের গোপন

---

(১) পর্দার বিধান থেকে পরবর্তী ব্যতিক্রম হলো আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿أَوْ نِسَآئِهِنَّ﴾ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক;এর উদ্দেশ্য মুসলিম স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। [ইবন কাসীর]
তবে আয়াতে 'তাদের নিজেদের স্ত্রীলোক' বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের মুশরিক স্ত্রীলোকরা পর্দার হুকুমের ব্যতিক্রম নয়। তাদের সাথে পর্দা করা প্রয়োজন। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেনঃ এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলিম নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ্ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সামনে কাফের নারীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষদের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলিম ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। [দেখুন-বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(২) একাদশ প্রকার ﴿أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোকদের বুঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। ইবনে জরীর তাবারী একই বিষয়বস্তুই আবু আব্দুল্লাহ্, ইবনে জুবায়র, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমনসব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং নারীদের রূপ-গুণের প্রতিও তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে।
তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীসে আছে, জনৈক খুনসা বা হিজড়া ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে আসা-যাওয়া করত। রাসূলের স্ত্রীগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত ﴿غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। [দেখুন, মুসলিমঃ ২১৮০] এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেনঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয়, তবুও সে ﴿غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ﴾ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে

زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক[১] ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে[২]। হে মুমিনগণ! তোমরা

﴾غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴿ শব্দের সাথে ﴾أَوِ التَّابِعِينَ﴿ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। [দেখুন-তাবারী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(১) দ্বাদশ প্রকার ﴾أَوِ الطِّفْلِ﴿ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে 'মোরাহিক' অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যার দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। [ফাতহুল কাদীর] এখানে মূল উদ্দেশ্য নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি ও সেগুলোর সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ার যাবতীয় বস্তুই নিষেধ করা। অনুরূপভাবে দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে।" [আবু দাউদঃ ৫৬৫, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৪৩৮] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "যে মেয়ে মসজিদে খোশবু মেখে আসে তার সালাত ততক্ষণ কবুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।" [আবু দাউদঃ ৪১৭৪, ইবনে মাজাহঃ ৪০০২, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৪৬] আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন । তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।" [আবু দাউদঃ ৪১৭৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪০০]।

তদ্রূপ নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দ্বীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে

সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আস[১],
যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।

এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দ্বীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ পুরুষদেরকে শুনাবে এটা পছন্দ করা হয়নি । কাজেই সালাতে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদেরকে সুবহানাল্লাহ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের উপর অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । [দেখুন, বুখারীঃ ১২০৩, মুসলিমঃ ৪২১,৪২২] ।

(১) অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ কর । [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, তাওবাহ্ হলো, অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা, [ইবনে মাজাহ্‌ঃ ৪২৫২]
এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছেঃ
একঃ মাহরাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য লোকেরা (আত্মীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে পারে না । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না । কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে ।” [তিরমিযীঃ ১১৭২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মাহরাম তার সাথে থাকে । কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান ।” [মুসনাদে আহমাদঃ ১/১৮]
দুইঃ কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মাহরাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ করেননি । তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই‘আত করতেন । কিন্তু মেয়েদের বাই‘আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন ভিন্ মেয়ের শরীরে লাগেনি । তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই‘আত হয়ে গেছে ।” [বুখারীঃ ৫২৮৮, মুসলিমঃ ১৮৬৬] ।
তিনঃ মেয়েদের মাহরাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করতেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “কোন পুরুষ যেন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মাহরাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন মাহরাম তার সাথে থাকে ।” [বুখারীঃ ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, ৫২৩৩, মুসলিমঃ ১৩৪১]

৩২. আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন'[১] তাদের বিয়ে সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও[২] । তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে[৩] এবং তোমাদের মালিকানাধীন

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

(১) أيامى শব্দটি أيم-এর বহুবচন । অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিয়ে বর্তমান নেই; একেবারেই বিয়ে না করার কারণে হোক কিংবা বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক । [দেখুন-বাগভী]এমন নর ও নারীদের বিয়ে সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে । বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বিভিন্ন হাদীসেও নির্দেশ এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল এমন মহিলাদের পুনরায় বিয়ে দিতে হলে তার সরাসরি স্পষ্টভাষায় মতামত না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না । আর যাদের বিয়ে ইতিপূর্বে হয়নি, তাদের বিয়েতেও অনুমতি নিতে হবে । সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, তার অনুমতি কিভাবে নিবে? তিনি জবাব দিলেনঃ চুপ থাকা । [বুখারীঃ ৫১৩৬, মুসলিমঃ ১৪১৯] অন্য বর্ণনায় আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের নির্দেশ দিতেন, বৈরাগ্যপনা (অবিবাহিত থাকা) থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং বলতেনঃ 'যারা স্বামীকে ভালবাসবে এবং বেশি সন্তান জন্ম দেয় এমন মেয়েদের তোমরা বিয়ে কর । কেননা, আমি কেয়ামতের দিন নবীদের কাছে বেশী সংখ্যা দেখাতে পারব ।' [ইবনে হিব্বানঃ ৪০২৮, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৫৮, ২৪৫]

(২) অর্থাৎ নারীদেরকে বিয়েতে বাধা না দেয়ার জন্য অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেনঃ 'তোমাদের কাছে যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিয়ে সম্পাদন করে দাও । এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে ।' [তিরমিযীঃ ১০৮৪, ১০৮৫]

(৩) অর্থাৎ যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না এবং বিয়ে করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহ্গার হয়ে যাবে, তারা

خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর। আর তোমাদের দাসীরা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে দুনিয়ার জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ্ তো

যেন পবিত্রতা ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী বানিয়ে দেন। বিয়ে করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নাত পালনের নিয়তে তা সম্পাদন করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। [দেখুন-কুরতুবী] এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা বেশী পরিমানে সিয়াম পালন করবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিয়ের সামর্থ্য পরিমানে অর্থ-সম্পদ দান করবেন। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই এ আয়াতগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "হে যুবকগণ ! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ে করতে পারে তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কারণ এটি হচ্ছে চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার এবং মানুষের সততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আর যার বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার সাওম পালন করা উচিত। কারণ সাওম মানুষের দেহের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।" [বুখারীঃ ১৯০৫, মুসলিমঃ ১০১৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। এক ব্যক্তি হচ্ছে, যে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, মুক্তিলাভের জন্য যে গোলাম লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তার মুক্তিপণ দেবার নিয়ত রাখে। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়।" [তিরমিযীঃ ১৬৫৫, নাসাঈঃ ৬/১৫, ইবনে মাজাহঃ ২৫১৮, আহমাদঃ ২/২৫১]।

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

৩৪. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

পঞ্চম রুকূ'

৩৫. আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর[২],

اللَّهُ نُورُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ

(১) এ আয়াতে বর্ণিত, "আর তোমাদের দাসীরা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে দুনিয়ার জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।" এখানে "লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে" কথাটি শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং সাধারণ নিয়মের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, সাধারণতঃ পবিত্রা মেয়েদেরকে জোর জবরদস্তি ছাড়া অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে পরবর্তীতে বলা হয়েছে, "আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" এখানেও এ মেয়েদেরকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। যবরদস্তিকারীদেরকে নয়। যবরদস্তিকারীদের গোনাহ অবশ্যই হবে। তবে যাদের উপর যবরদস্তি করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) নূরের সংজ্ঞাঃ নূর শব্দের আভিধানিক অর্থ আলো। [ফাতহুল কাদীর] কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র জন্য নূর কয়েকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে।
এক) আল্লাহ্র নাম হিসাবে। যে সমস্ত আলেমগণ এটাকে আল্লাহ্র নাম হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন তারা হলেন, সুফিয়ান ইবনে উ'য়াইনাহ্ খাত্তাবী, ইবনে মান্দাহ্, হালিমী, বাইহাকী, ইস্পাহানী, ইবনে আরাবী, কুরতুবী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যেম, ইবনুল ওয়াযীর, ইবনে হাজার, আস-সা'দী, আল-কাহ্তানী, আল-হামুদ, আশ্-শারবাসী, নূরুল হাসান খান প্রমুখ।
দুই) আল্লাহ্র গুণ হিসাবে। আল্লাহ্ তা'আলা নূর নামক গুণ তাঁর জন্য বিভিন্ন ভাবে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন-
(ক) কখনো কখনো সরাসরি নূরকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্র নূরের উদাহরণ হলো ...। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ অর্থাৎ "আর আলোকিত হলো যমীন তার প্রভূর আলোতে।" [সূরা আয-যুমারঃ ৬৯] হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাতে তাঁর নূরের কিছু ঢেলে দিলেন। সুতরাং এ নূরের কিছু অংশ যার উপরই পড়েছে, সে হেদায়াত লাভ করেছে। আর যার উপর পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে।' [তিরমিযীঃ ২৬৪২]

(খ) কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ নূরকে তাঁর চেহারার দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'আসমান ও যমীনের যাবতীয় নূর তাঁরই চেহারার আলো।' [আবু সাইদ আদ-দারেমী]
তিন) আল্লাহ্র নূরকে আসমান ও যমীনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর।" এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান ও যমীনের আলো এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তারও (আলো)...। [বুখারীঃ ১১২০, মুসলিমঃ ১৯৯]
চার) আল্লাহ্র পর্দাও নূর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তাঁর পর্দা হলো নূর।' [মুসলিমঃ ২৯৩] আর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে এর নূরই দেখেছিলেন। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'আপনি কি আপনার প্রভূকে দেখেছিলেন? তিনি বললেনঃ নূর! কিভাবে তাকে দেখতে পারি?' [মুসলিমঃ ২৯১] অপর বর্ণনায় এসেছে, 'আমি নূর দেখেছি।' [মুসলিমঃ ২৯২] এ হাদীসের সঠিক অর্থ হলো, আমি কিভাবে তাঁকে দেখতে পাব? সেখানে তো নূর ছিল। যা তাকে দেখার মাঝে বাঁধা দিচ্ছিল। আমি তো কেবল নূর দেখেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্র পর্দাও নূর। এ নূরের পর্দার কারণেই সবকিছু পুড়ে যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যদি তিনি তাঁর পর্দা খুলতেন তবে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর নজর পড়ত সবকিছু তাঁর চেহারার আলোর কারণে পুড়ে যেত।' [মুসলিমঃ ২৯৩-২৯৫]
সুতরাং আসমান ও যমীনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'ধরনের নূরই আল্লাহ্র।
প্রকাশ্য নূর যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নূর। তাঁর পর্দা নূরের। যদি তিনি তাঁর সে পর্দা উন্মোচন করেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর দৃষ্টি পড়বে তার সবকিছুই ভস্ম হয়ে যাবে। তাঁর নূরেই আরশ আলোকিত। তাঁর নূরেই কুরসী, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি আলোকিত। অনুরূপভাবে তাঁর নূরেই জান্নাত আলোকিত। কারণ, সেখানে তো আর সূর্য নেই।
আর অপ্রকাশ্য নূর যেমন- আল্লাহ্র কিতাব নূর [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৭], তাঁর শরীয়ত নূর [সূরা আল-মায়েদাঃ ৪৪], তাঁর বান্দা ও রাসূলদের অন্তরে অবস্থিত ঈমান ও জ্ঞান তাঁরই নূর [সূরা আয-যুমারঃ ২২]। যদি এ নূর না থাকত তাহলে অন্ধকারের উপর অন্ধকারে সবকিছু ছেয়ে যেত। সুতরাং যেখানেই তাঁর নূরের অভাব হবে সেখানেই অন্ধকার ও বিভ্রান্তি দানা বেঁধে থাকে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেনঃ 'হে আল্লাহ্, আমার অন্তরে নূর দিন, আমার শ্রবণেন্দ্রীয়ে নূর দিন, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দিন, আমার ডানে নূর দিন, আমার বামে নূর দিন, আমার সামনে নূর দিন, আমার পিছনে

তাঁর[১] নূরের উপমা যেন একটি | فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ

নূর দিন, আমার উপরে নূর দিন, আমার নীচে নূর দিন। আর আমার জন্য নূর দিন অথবা বলেছেনঃ আমাকে নূর বানিয়ে দিন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আমার জন্য আমার আত্মায় নূর দিন। আমার জন্য বৃহৎ নূরের ব্যবস্থা করে দিন। [বুখারীঃ ৬৩১৬, মুসলিমঃ ৭৬৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'হে আল্লাহ্, আমাকে নূর দিন, আমার জন্য আমার অস্থি ও শিরা-উপশিরায় নূর দিন। আমার মাংসে নূর দিন, আমার রক্তে নূর দিন, আমার চুলে নূর দিন, আমার শরীরে নূর দিন।' অপর বর্ণনায় এসেছে, 'হে আল্লাহ্, আমার জন্য আমার কবরে নূর দিন। আমার হাড্ডিতে নূর দিন।' [তিরমিযীঃ ৩৪১৯] অন্যত্র এসেছে, 'আর আমার নূর বাড়িয়ে দিন, আমার নূর বাড়িয়ে দিন, আমার নূর বাড়িয়ে দিন। [বুখারীঃ আদাবুল মুফরাদ- ৬৯৫] 'আমাকে নূরের উপর নূর দান করুন।' [ফাতহুল বারীঃ ১১/১১৮]

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সত্তার জন্য ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ কোন কোন তাফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্যদানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে নূর বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হেদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। [দেখুন- বাগভী] ইবনে কাসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এর তাফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেনঃ اللهُ هَادِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়াতকারী। [ইবন কাসীর]

(১) ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের কয়েকটি উক্তি এসেছেঃ

(এক) এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র নূর হেদায়াত যা মুমিনের অন্তরে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكَاةٍ এটা ইবনে-আব্বাসের উক্তি। অর্থাৎ মুমিনের অন্তরস্থিত কুরআন ও ঈমানের মাধ্যমে সঞ্চিত আল্লাহ্‌র নূরকে তুলনা করে বলা হচ্ছে যে, এ নূরের উদাহরণ হলো এমন একটি তাকের মত যেখানে আল্লাহ্‌র নূর আলোর মত উজ্জল ও সদা বিকিরনশীল। সে হিসেবে আয়াতের প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ অতঃপর মুমিনের অন্তরে অবস্থিত তাঁরই নূর উল্লেখ করেছেন ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ - উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কেরাআতও ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ এর পরিবর্তে مَثَلُ نُورِ مَنْ آمَنَ بِهِ পড়তেন। সাঈদ ইবনে যুবায়ের এই কেরাআত এবং আয়াতের এই অর্থ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও বর্ণনা করেছেন।

(দুই) এই সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বুঝানো হয়েছে। তখন দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে,

মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ । এতে যে স্বচ্ছ যয়তূন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা নূরে ঈমানের দৃষ্টান্ত । এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা । যয়তূন তৈল অগ্নি স্পর্শে প্রজ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে, এমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূরে-হেদায়াত যখন আল্লাহ্‌র ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয় । সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন । এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে । নতুবা এই সৃষ্টিগত হেদায়াতের নূর যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় ও স্বভাবে এই হেদায়াতের নূর রাখা হয় । এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে । তারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক, কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী । তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন । তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে । ফলে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই অস্বীকার করে । একটি সহীহ্ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় । এতে বলা হয়েছে, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থাৎ "প্রত্যেকটি শিশু ফিত্‌রতের উপর জন্মগ্রহণ করে ।"[বুখারীঃ ২৪৪, মুসলিমঃ ২৬৫৮] এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিত্‌রতের দাবী থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে । এই ফিত্‌রতের অর্থ ঈমানের হেদায়াত । ঈমানের হেদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয় । যখন নবী ও তাদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয় । তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন । তারা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে । সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল । এতে মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি । কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ﴿يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন" । এখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় না । যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে । নতুবা আল্লাহ্‌র তৌফিক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক; বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয় ।

(তিন) এখানে نُوْرِهٖ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের নূরকে বুঝানো হয়েছে । ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, একবার ইবনে আব্বাস

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত, তা জ্বালানো হয় বরকতময় যায়তূন গাছের তৈল দ্বারা[১] যা শুধু পূর্ব দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত) নয় আবার শুধু পশ্চিম দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্তও) নয়, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; নূরের উপর নূর! আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন তাঁর নূরের দিকে। আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করে থাকেন এবং আল্লাহ্‌ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কা'ব আহ্‌বারকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এই আয়াতের তাফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহ্‌বার তাওরাত ও ইঞ্জিলের সুপণ্ডিত মুসলিম ছিলেন। তিনি বললেনঃ এটা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশ্‌কাত তথা তাক মানে তার বক্ষদেশ, زُجَاجَةٍ তথা কাঁচপাত্র মানে তার পবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাগভী]

(১) এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল সংগ্রহ করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না- আপনাআপনিই ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। [বাগভী] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।" [তিরমিযীঃ ১৮৫১, ১৮৫২, ইবনে মাজাহ্‌ঃ ৩৩১৯]

৩৬. সে সব ঘরে[১] যাকে সমুন্নত করতে[২] এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরে নিজের হেদায়াতের আলো রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেনঃ এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ চান ও তাওফীক দেন। [ইবন কাসীর] আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনদের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনদের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষতঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় দৃষ্টিগোচর হয়- সেসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। [দেখুন-কুরতুবী,বাগভী]

(২) কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ নিয়েছেন মু'মিনদের ঘর এবং সেগুলোকে উন্নত করার অর্থ সেগুলোকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা, নৈতিক মান রক্ষার জন্য তাতে মসজিদের ব্যবস্থা করা। এ অর্থের সমর্থনে আমরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে একটি হাদীস পাই যাতে তিনি বলেছেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ সালাত আদায় করার বিশেষ জায়গা তৈরী করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্য আদেশ করেছেন। [ইবনে মাজাহ্ঃ ৭৫৮, ৭৫৯]

তবে অধিকাংশ মুফাসসির এ "ঘরগুলো"কে মসজিদ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে উন্নত করার অর্থ নিয়েছেন এগুলো নির্মাণ ও এগুলোকে মর্যাদা প্রদান করা। "সেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন" এ শব্দগুলো বাহ্যত মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার বেশী সমর্থক দেখা যায়। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহকে সমুন্নত করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করা মানে সম্মান করা। উচ্চ করার দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে-

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ উচ্চ করার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।

হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ رَفْعُ مَسَاجِدَ বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইয্যত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ্ আর তার কাফ্ফারা হলো তা দাফন করা, মিটিয়ে দেয়া"। [বুখারীঃ ৪১৫, মুসলিমঃ ৫৫২]

(২) ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেনঃ رفع বলে মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে; যেমন কা'বা

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন[১], সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে[২],

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ

৩৭. সেসব লোক[৩], যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য

নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ এখানে رفع قواعد বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে আল্লাহ্র জন্য মসজিদ বানায়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন"। [বুখারীঃ ৪৫০, মুসলিমঃ ৫৩৩] প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা, পাক-পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,কুরতুবী] এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুন ও পেঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তির মুখে রসুন বা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেনঃ যে ব্যক্তি রসুন-পেঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তম রূপে পাকিয়ে খায় যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়।" [মুসলিমঃ ৫৬৭]

(১) আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তি গৃহে অযু করে ফরয সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহ্রাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে ব্যক্তি এশরাকের সালাত আদায়ের জন্য গৃহ থেকে অযু করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ। এক সালাতের পর অন্য সালাত ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন অপ্রয়োজনীয় কাজ না করে।" [আবু দাউদঃ ৫৫৮] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" [আবু দাউদঃ ৫৬১, তিরমিযীঃ ২২৩]

(২) আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা দ্বারা এখানে তাসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা), তাহ্মীদ (প্রশংসা বর্ণনা), নফল সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনী শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিক্র বুঝানো হয়েছে। [তাবারী,সা'দী,মুয়াস্সার]

(৩) এখানে رجال শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে সালাত আদায় করা উত্তম। [বাগভী,কুরতুবী] মুসনাদে আহমাদে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ"। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/২৯৭]

الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ

ও ক্রয়-বিক্রয় কোনটিই আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

৩৮. যাতে তারা যে উত্তম কাজ করে তার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কার দেন[১] এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশী দেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

৩৯. আর যারা কুফরী করে[২] তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসা কাতর ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু যখন সে সেটার কাছে আসে তখন দেখে সেটা কিছুই নয় এবং সে পাবে সেখানে[৩]

---

(১) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ্ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নেয়ামতও দান করবেন। [মুয়াস্‌সার]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ এবং সে সময় আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যের শিক্ষা দিচ্ছিলেন সরল মনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। [দেখুন-মুয়াস্‌সার]

(৩) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে 'সেখানে' বলে দুনিয়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।কারণ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফেরদের কর্মকাণ্ডের যাবতীয় প্রতিফল দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। যেমনিভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি ওদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। ওদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং ওরা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক।" [সূরা হুদ: ১৫-১৬] অন্যত্র এসেছে, "যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই

আল্লাহ্কে, অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় দেবেন। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

৪০. অথবা তাদের কাজ গভীর সাগরের তলের অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ্ যার জন্য নূর রাখেননি তার জন্য কোন নূরই নেই।

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৪১. আপনি কি দেখেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান পাখীরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার 'ইবাদাতের ও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত[১]।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

থাকবে না।" [সূরা আশ-শূরাঃ ২০] তবে অধিকাংশ আলেমদের নিকট এ আয়াতে 'সেখানে' বলে আখেরাতে মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতির কথা বুঝানো হয়েছে। সেখানে তারা দুনিয়াতে যা করেছে সেটার প্রতিফল যদি প্রাপ্য হতো তবে তা দেয়া হতো। কিন্তু যেহেতু তাদের কৃত যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হয়েছে সেহেতু তারা সেখানে কিছুই পাবে না। যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব।" [সূরা আল-ফুরকান:২৩]

(১) আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি,

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

৪২. আর আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যাওয়া[১]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৪৩. আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর তিনি তা একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর আপনি দেখতে পান, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আর তিনি আকাশে অবস্থিত মেঘের পাহাড়ের মধ্যস্থিত শিলাস্তূপ থেকে বর্ষণ করেন শিলা অতঃপর এটা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তার উপর থেকে এটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি প্রায়

মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপৃত আছে এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্দারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ্ এবং ইবাদাত শেখানো হয়েছে; যাতে তারা মশগুল থাকে। ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ﴾ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ্ ও সালাতে সমগ্র সৃষ্টজগতই ব্যাপৃত আছে, কিন্তু প্রত্যেকের সালাত ও তাসবীহ্‌র পদ্ধতি ও আকার বিভিন্নরূপ। ফিরিশ্‌তাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদরা অন্য পদ্ধতিতে সালাত ও তাসবীহ্ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। [দেখুন-তাবারী, কুরতুবী, সা'দী, ফাতহুল কাদীর]

(১) সবকিছুই তাঁর মালিকানাভুক্ত। তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। তাদের মধ্যে যারা সেথায় তাসবীহ পাঠ করেছে তারা হবে পুরস্কৃত। আর যারা করেনি তারা হবে তিরস্কৃত। [দেখুন-তাবারী, মুয়াস্‌সার]

কেড়ে নেয়(১) ।

৪৪. আর আল্লাহ্ রাত ও দিনের আবর্তন ঘটান(২), নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য(৩) ।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে(৪), অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু সংখ্যক দু'পায়ে চলে এবং কিছু সংখ্যক চলে চার পায়ে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬. অবশ্যই আমরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন ।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য করেছি।' এর পর

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ

---

(১) অর্থাৎ যিনি এ মেঘমালা সৃষ্টি করেছেন এবং এটাকে তিনি তার মুখাপেক্ষী বান্দাদের জন্য হাঁকিয়ে নিয়ে গেছেন, আর এমনভাবে সেটাকে নাযিল করেছেন যে এর দ্বারা উপকার অর্জিত হয়েছে, ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়েছে, তিনি কি পূর্ণ শক্তিমান, ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, প্রশস্ত রহমতের অধিকারী নন? [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তিনি ঠাণ্ডা থেকে গরম, আবার গরম থেকে ঠাণ্ডা, দিন থেকে রাত আবার রাত থেকে দিন তিনিই পরিবর্তন করেন। অনুরূপভাবে তিনিই বান্দাদের মধ্যে দিনগুলো ঘুরিয়ে আনেন। [সা'দী]

(৩) যারা সত্যিকার বান্দা, বুদ্ধি ও বিবেকবান, তারা এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এগুলো কেন সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু তারা ব্যতিক্রম, যারা পশুদের মত এগুলোর দিকে তাকায়। [সা'দী]

(৪) সুতরাং যেগুলো জন্তু সেগুলো বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়। যা পুরুষ জন্তু মাদী জন্তুর উপর ফেলে। আর যেগুলো যমীনে তৈরী হয়, সেগুলোও আদ্র যমীন ছাড়া তৈরী হয় না। যেমন, কীট-পতঙ্গ। সুতরাং কোন কিছুই পানি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। [সা'দী]

بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; আসলে তারা মুমিন নয়।

وَإِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَإِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْٓا إِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর যদি হক্ক তাদের সপক্ষে হয়, তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।

أَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوْٓا أَمْ يَخَافُوْنَ أَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ بَلْ أُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।

সপ্তম রুকূ'

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. মুমিনদের উক্তি তো এই---যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য[১]।

(১) এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উমার রাদিয়াল্লাহু

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা অবশ্যই বের হবে; আপনি বলুন, 'শপথ করো না, আনুগত্যের ব্যাপারটি জানাই আছে। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

৫৪. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী;

'আনহুর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। ফারূকে আযম একদিন মসজিদুন্ নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ, জনৈক রূমী গ্রাম্য ব্যক্তি তার কাছে এসে বলতে লাগলোঃ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেনঃ ব্যাপার কি? সে বললোঃ আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলিম হয়ে গেছি। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেনঃ এর কোন কারণ আছে কি? সে বললোঃ হ্যাঁ, আমি তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও পূর্ববর্তী নবীগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলিম কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট্ট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেনঃ আয়াতটি কি? রূমী ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতটিই তিলাওয়াত করলো এবং সাথে সাথে তার অভিনব তাফসীরও বর্ণনা করলো যে, ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ﴾ আল্লাহ্‌র ফরয কার্যাদির সাথে, ﴿وَرَسُوْلَهٗ﴾ রাসূলের সুন্নাতের সাথে, ﴿وَيَخْشَ اللّٰهَ﴾ অতীত জীবনের সাথে এবং ﴿وَيَتَّقْهِ﴾ ভবিষ্যত জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ﴾ এর সুসংবাদ দেয়া হবে। فائز তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একথা শুনে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুদূরপ্রসারী স্বল্পবাক্যসম্পন্ন অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন।" [বুখারীঃ ২৮১৫, মুসলিমঃ ৫২৩]

আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, মূলত: রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ।

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন । তারা আমার 'ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না[১], আর এরপর যারা

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۗ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

---

(১) উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথীরা যখন মদীনায় তাশরীফ আনলেন এবং আনসারগণ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তখন সমস্ত আরব এক বাক্যে তাদের শত্রুতে পরিণত হলো । সাহাবাগণ তখন রাতদিন অস্ত্র নিয়ে থাকতেন । তখন তারা বললোঃ আমরা কি কখনো এমনভাবে বাঁচতে পারবো যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করে সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুমাতে পারবো? তখন এ আয়াত নাযিল হয় ।" [ত্বাবারানী, মুজামুল আওসাত্বঃ ৭/১১৯, হাদীসঃ ৭০২৯, হাকীম- মুস্তাদরাকঃ ২/৪০১, দ্বিয়া আল-মাকদেসীঃ মুখতারাহ্ঃ ১১৪৫]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন । (১) আপনার উম্মাতকে যমীনের বুকে খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, (২) আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং (৩) মুসলিমদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোন ভয়ভীতি থাকবে না । আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূণ্যময় আমলে মক্কা, খাইবার, বাহ্রাইন, সমগ্র আরব উপদ্বীপ ও সমগ্র ইয়ামান তারই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর

কুফরী করবে তারাই ফাসিক।

৫৬. আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা যায়।

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. যারা কুফরী করেছে তাদের ব্যাপারে আপনি কক্ষনো এটা মনে করবেন না যে, তারা যমীনে অপারগকারী[১]।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তার ওফাতের পর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খলীফা হন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তিনি তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান প্রেরণ করেন। বসরা ও দামেস্ক তারই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়। আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে উমার ইবনুল খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, নবীগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তার আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা তার করতলগত হয়। তার হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর উসমান ইবন্ আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফতকালে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্য চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তার আমলেই মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হয়। [দেখুন-কুরতুবী] সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে।" [সহীহ্ মুসলিমঃ ২৮৮৯] আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি উসমান ইবন্ আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আমলেই পূর্ণ করে দেন। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে।" [আবু দাউদঃ ৪৬৪৬, তিরমিযীঃ ২২২৬, আহমাদঃ ৫/২২১]

(১) এর অর্থ হচ্ছে, তারা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। বা তারা আমার পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে আগুন; আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল!

অষ্টম রুকূ'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ
مَرّٰتٍ ۗ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاۤءِ ۗ
ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۗ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ۝٥٨

৫৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের আগে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলে রাখ তখন এবং 'ইশার সালাতের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া (অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই[১]। তোমাদের একক অন্যের কাছে তো যেতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ

---

(১) এ আয়াতে বিশেষ তিনটি সময়ে অনুমতি চাওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফযরের সালাতের পূর্বে, দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার সালাতের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহ্রাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি বুদ্ধিসম্পন্ন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাসদাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন কারো নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময় কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাবে থাকা ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে, ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ﴾ অর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই। [কুরতুবী]

বিবৃত করেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৯. আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বড়রা। এভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৬০. আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। আর এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম[১]। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

---

(১) এখানে একটি নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্‌রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্‌রামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যেসব অঙ্গ মাহ্‌রামের সামনে খোলা যায়- যে মাহ্‌রাম নয় এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ অর্থাৎ সে যদি মাহ্‌রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে নেবার এ অনুমতি এমন সব বৃদ্ধাদেরকে দেয়া হচ্ছে যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও শখ খতম হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শীতল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ আগুনের মধ্যে এখনো একটি স্ফুলিংগ সজীব থেকে থাকে এবং তা সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলম্বন করতে থাকে তাহলে আর এ অনুমতি থেকে লাভবান হওয়া যেতে পারে না। [দেখুন- মুয়াস্‌সার,সা'দী]

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রুগ্নের জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই খাওয়া-দাওয়া করা তোমাদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, মাতাদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচা-জেঠাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে অথবা সেসব ঘরে যেগুলোর চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে খাও বা পৃথক পৃথকভাবে খাও তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা কোন ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা পরস্পরের প্রতি সালাম করবে অভিবাদনস্বরূপ যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أُمَّهٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ أَوْ صَدِيْقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

নবম রুকূ'

৬২. মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না; নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখে। অতএব তারা তাদের কোন কাজের জন্য আপনার অনুমতি চাইলে তাদের

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে আপনি অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬৩. তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরকে আড়াল করে অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ্‌ তো তাদেরকে জানেন[1]। কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[2]।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

(১) আয়াতের অর্থ নির্ধারনে বেশ কয়েকটি মত এসেছে, (এক) ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ﴾ এর অর্থ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে মুসলিমদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা إضافة إلى الفاعل) আয়াতের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেয়া না দেয়া ইচ্ছাধীন; বরং তখন সাড়া দেয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনাধারার সাথে এই তাফসীর অধিক নিকটবর্তী ও মিলে যায়। (দুই) আয়াতের অপর একটি তাফসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, ﴿دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা إضافة إلى المفعول)। এই তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তার নাম নিয়ে ‘ইয়া মুহাম্মাদ’ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবে না- এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌’ অথবা ‘ইয়া নবীআল্লাহ্‌’ বলবে। [বাগভী]

(২) অর্থাৎ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথের বিরোধিতা করে, তার প্রবর্তিত শরীয়ত ও আইন অনুসারে জীবন পরিচালনা করে না, তার সুন্নাতের বিরোধিতা করে, তারা যেন তাদের অন্তরে কুফরী, নিফাকী, বিদ‘আত ইত্যাদি লালন

৬৪. জেনে রাখ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই; তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা অবশ্যই জানেন। আর যেদিন তাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা যা করত। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٦٤﴾

করে অথবা তারা তাতে নিপতিত হওয়ার আশংকা করে। আরো আশংকা করে যে, তাদের উপর কঠোর শাস্তি আসবে। হত্যা, দণ্ডবিধি, জেল ইত্যাদি দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যা আমার প্রদর্শিত পথের উপর নয়, তা তার উপরই ফিরিয়ে দেয়া হবে, গ্রহণযোগ্য হবে না।” [বুখারীঃ ২৬৯৭, মুসলিমঃ ১৭১৮]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমার এবং তোমাদের মাঝে উদাহরণ হলো এমন এক ব্যক্তির, যে আগুন জ্বালালো, তারপর সে আলোয় যখন চতুর্দিক আলোকিত হলো, তখন দেখা গেল যে, পোকামাকড় এবং ঐসমস্ত প্রাণী যা আগুনে পড়ে, সেগুলো আগুনে পড়তে লাগলো। তখন সে ব্যক্তি তাদেরকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলো। কিন্তু সেগুলো তাকে ছাড়িয়ে সে আগুনে ঝাঁপ দিতে থাকলো। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটাই হলো আমার এবং তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদের কোমরের কাপড়ের গিরা ধরে আগুন থেকে দূরে রাখছি এবং বলছিঃ আগুন থেকে দূরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ।” [বুখারীঃ ৬৪৮৩, মুসলিমঃ ২২৮৪]

২৫- সূরা আল-ফুরকান, ৭৭ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কত বরকতময় তিনি[১]! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য[২] সতর্ককারী

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝

(১) تَبَارَكَ শব্দটি بركة থেকে উদ্ভূত। এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন। এর শব্দমূল রয়েছে ب-ر-ك অক্ষরত্রয়। এ থেকে بركة ও بروك দু'টি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথম শব্দ بركة শব্দের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ, বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা ও প্রাচুর্যের ধারণা। আর بروك এর মধ্যে স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্যতার ধারণা রয়েছে। তারপর এ ধাতু থেকে যখন تبارك এর ক্রিয়াপদ তৈরী করা হয় তখন تفاعل এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর মধ্যে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও পূর্ণতা প্রকাশের অর্থ শামিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় চরম প্রাচুর্য, বর্ধমান প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থায়িত্ব। আল্লাহর জন্য تبارك শব্দটি এক অর্থে নয় বরং বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- একঃ মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ, কল্যাণকারী। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের মহান নিয়ামত দান করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। দুইঃ বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানীয়। কারণ, পৃথিবী ও আকাশে তাঁরই রাজত্ব চলছে। তিনঃ বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ, তাঁর সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই। ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তাঁর কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই। কাজেই তাঁর স্থলাভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই। চারঃ বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই। পাঁচঃ শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। [দেখুন,তাবারী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হবার যে কথা এখানে বলা হয়েছে এ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত কোন একটি দেশের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্য এবং কেবলমাত্র নিজেরই যুগের জন্য নয় বরং ভবিষ্যতের সকল যুগের জন্য। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ "হে মানুষেরা ! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৮] আরো এসেছে, "আমার কাছে এ কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে

হওয়ার জন্য।

২. যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ②

৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। আর মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ③

৪. আর কাফেররা বলে, 'এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, সে এটা রটনা করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' সুতরাং অবশ্যই কাফেররা যুলুম ও মিথ্যা নিয়ে এসেছে।

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ④

এটা পৌঁছে যায় তাদের সতর্ক করে দেই।" [সূরা আল-আন'আমঃ ৯] আরো বলা হয়েছে, "আমরা আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি"। [সূরা আস-সাবাঃ ২৮] অন্য আয়াতে এসেছে, "আর আমরা আপনাকে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৭]
এ বিষয়বস্তুটিকে আরো সুস্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বার বার বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেছেনঃ "আমাকে লাল-কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।" [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩০১] আরো বলেছেনঃ "প্রথমে একজন নবীকে বিশেষ করে তার নিজেরই জাতির কাছে পাঠানো হতো এবং আমাকে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।" [বুখারীঃ ৩৩৫, ৪৩৮, মুসলিমঃ ৫২১] তিনি আরো বলেনঃ "আমাকে সমস্ত সৃষ্টির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আমার আগমনে নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।" [মুসলিমঃ ৫২৩]

৫. তারা আরও বলে, 'এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; তারপর এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।'

وَقَالُوٓا اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ اكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلٰى عَلَيۡهِ بُكۡرَةً وَّاَصِيۡلًا ۝٥

৬. বলুন, 'এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قُلۡ اَنۡزَلَهُ الَّذِيۡ يَعۡلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ۝٦

৭. আরও তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল' যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারীরূপে?'

وَقَالُوۡا مَالِ هٰذَا الرَّسُوۡلِ يَاۡكُلُ الطَّعَامَ وَيَمۡشِيۡ فِي الۡاَسۡوَاقِ ؕ لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مَلَكٌ فَيَكُوۡنَ مَعَهٗ نَذِيۡرًا ۝٧

৮. 'অথবা তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার এসে পড়ল না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে খেতো?' আর যালিমরা আরো বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।'

اَوۡ يُلۡقٰۤى اِلَيۡهِ كَنۡزٌ اَوۡ تَكُوۡنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاۡكُلُ مِنۡهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوۡنَ اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُوۡرًا ۝٨

৯. দেখুন, তারা আপনার কি উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সুতরাং তারা পথ পেতে পারে না[১]।

اُنۡظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُوۡا لَكَ الۡاَمۡثَالَ فَضَلُّوۡا فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ سَبِيۡلًا ۝٩

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. কত বরকতময় তিনি যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু---উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী-নালা প্রবাহিত

تَبٰرَكَ الَّذِيۡۤ اِنۡ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيۡرًا مِّنۡ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ وَيَجۡعَلۡ لَّكَ قُصُوۡرًا ۝١٠

(১) এ আয়াত সংক্রান্ত কিছু আলোচনা সূরা আল-ইসরায় করা হয়েছে।

এবং তিনি দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ!

১১. বরং তারা কিয়ামতের উপর[১] মিথ্যারোপ করেছে। আর যে কিয়ামতে মিথ্যারোপ করে তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

১২. দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার।

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

১৩. আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে শৃংখলিত অবস্থায় সেটার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে।

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾

১৪. বলা হবে, আজ তোমরা এক ধ্বংসকে ডেকো না, বরং বহু ধ্বংসকে ডাক।'

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

১৫. বলুন, 'এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে?' তা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾

১৬. সেখানে তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় যা চাইবে তাদের জন্য তা-ই থাকবে; এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার রব-এরই দায়িত্ব।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾

১৭. আর সেদিন তিনি একত্র করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের 'ইবাদাত করত তাদেরকে, তারপর তিনি জিজ্ঞেস

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

---

(১) الساعة শব্দ দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

করবেন, 'তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়েছিল?'

১৮. তারা বলবে, 'পবিত্র ও মহান আপনি! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না[১]; আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন; পরিণামে তারা যিকর তথা স্মরণ ভুলে গিয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে[২]।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢ بُوْرًا ⑱

১৯. (আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন) 'তোমরা যা বলতে তারা তো তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। কাজেই তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ⑲

(১) কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুটি এসেছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই বন্দেগী করতো? তারা বলবেঃ পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়। এরা তো জিনদের (অর্থাৎ শয়তান) ইবাদাত করতো। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল।" [সূরা সাবা ৪০-৪১] অনুরূপভাবে আরো বলা হয়েছেঃ "আর যখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন,হে মারইয়ামের ছেলে ঈসা ! তুমি কি লোকদের বলেছিলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্যে পরিণত করো? সে বলবে,পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, যে কথা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য কবে শোভন ছিল? আমি তো এদেরকে এমন সব কথা বলেছিলাম যা বলার হুকুম আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব।" [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ১১৭]

(২) অর্থাৎ তারা ছিল সংকীর্ণমনা ও নীচ প্রকৃতির লোক। তিনি রিযিক দিয়েছিলেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা সবকিছু খেয়েদেয়ে নিমকহারাম হয়ে গেছে এবং তাঁর প্রেরিত নবীগণ তাদেরকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তা ভুলে গেছে। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

পারবে না এবং সাহায্যও পাবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে যুলুম তথা শির্ক করবে আমরা তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাব[১]।'

২০. আর আপনার আগে আমরা যে সকল রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই তো খাওয়া-দাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত[২]। এবং (হে মানুষ!) আমরা তোমাদের এক-কে অন্যের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? আর আপনার রব তো সর্বদ্রষ্টা।

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

তৃতীয় রুকূ'

২১. আর যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, 'আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?' তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে[৩] এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

(১) এখানে জুলুম বলতে আল্লাহর সাথে শির্ক করাকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর,আদওয়াউল বায়ান]

(২) কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি নবী হলে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটবাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্‌র রাসূল মানব হতে পারেন না- ফিরিশ্‌তাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব নবীকে তোমরা নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তারাও তো মানুষই ছিলেন; তারা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা নিজেদের মনে মনে নিজেদের নিয়ে বড়ই অহংকার করে। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর,আয়সারুত-তাফাসির]

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২২. যেদিন তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।[১]'

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৩. আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৪. সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম[২]।

---

(১) এখানে ﴿وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ এ উক্তিটি কাদের তা নির্ধারণে দু'টি মত রয়েছে। যদি উক্তিটি ফেরেশতাদের হয় তবে এর অর্থ হবে, তারা বলবে যে, তোমাদের জন্য কোন প্রকার সুসংবাদ হারাম করা হয়েছে। অথবা বলবে, তোমাদের সাহায্য করা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় নিচ্ছি। আর যদি উক্তিটি কাফেরদের হয় তখন অর্থ হবে, তারা ভয়ে আর্তচিৎকার দিতে দিতে বলবে, বাঁচাও বাঁচাও এবং তাদের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করবে কিন্তু পালাবার কোন পথ তারা পাবে না। অথবা বলবে, কোন বাধা যদি এ আযাবকে বা ফেরেশ্‌তাদেরকে আটকে রাখত! মূলত حجر শব্দের অর্থ সুরক্ষিত স্থান। محجور অর্থ এর তাকীদ। আরবী বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয়ঃ আশ্রয় চাই! আশ্রয় চাই! অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কেয়ামতের দিন যখন কাফেররা ফিরিশ্‌তাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী এ কথা বলবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এর অর্থ حراما محرما বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফিরিশ্‌তারা জবাবে ﴿حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ বলবে। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) مستقر শব্দের অর্থ হলো স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مقيل শব্দটি قيلولة থেকে উদ্ভুত- এর অর্থ দুপুরে বিশ্রাম করার স্থান। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে জান্নাতের হকদার লোকদের সাথে অপরাধীদের থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করা হবে। তাদের সম্মানের সাথে বসানো হবে। হাশরের দিনের কঠিন দুপুর কাটাবার জন্য তাদের আরাম করার জায়গা দেয়া হবে। সেদিনের সব রকমের কষ্ট ও কঠোরতা হবে অপরাধীদের জন্য। সৎকর্মশীলদের জন্য নয়। [দেখুন-আদওয়াউল বায়ান,বাগভী]

২৫. আর সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে মেঘপুঞ্জ দ্বারা[1] এবং দলে দলে ফিরিশ্‌তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে--

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬. সে দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের[2] এবং কাফেরদের জন্য সে দিন হবে অত্যন্ত কঠিন।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ࣙالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

---

(১) এখানে بِالْغَمَامِ এর অর্থ عَنِ الْغَمَامِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা হতে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফিরিশ্‌তারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা বিচার-ফয়সালার জন্য হাশরের মাঠে নেমে আসবেন; আশপাশে থাকবে ফিরিশ্‌তাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হবার সময়; সূরা আল-বাকারার ২১০ নং আয়াতেও একথা বলা হয়েছে। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয় যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও যমীনকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর হবে। তখন নতুন ধরনের আসমান ও যমীন পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। মোটকথা, আসমানসমূহ বিদীর্ণ হবার পর সেগুলোর উপরস্থিত সাদা মেঘ দেখা যাবে। রাব্বুল আলামীন যে মেঘসহ সৃষ্টিকুলের মধ্যে ফায়সালা করতে নাযিল হবেন। আসমানসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবার পর প্রত্যেক আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ কাতারে কাতারে দাঁড়াবে। তারপর তারা সৃষ্টিজগতকে ঘিরে রাখবে। তারা তাদের রব-এর নির্দেশ পালন করে যাবে। তাদের মধ্যে কেউই আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বলবে না। যদি ফিরিশ্‌তাদেরই এ অবস্থা হবে তাহলে অন্যান্য সৃষ্টিকুলের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। [দেখুন- কুরতুবী, বাগভী, আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ সেখানে কেবলমাত্র একটি রাজত্বই বাকি থাকবে এবং তা হবে এ বিশ্ব-জাহানের যথার্থ শাসনকর্তা আল্লাহর রাজত্ব। [আদওয়াউল বায়ান] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "সেদিন যখন এরা সবাই প্রকাশ হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এদের কোন জিনিস গোপন থাকবে না, জিজ্ঞেস করা হবে আজ রাজত্ব কার? সবদিক থেকে জবাব আসবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি সবার উপর বিজয়ী।" [সূরা গাফিরঃ ১৬] হাদীসে এ বিষয়বস্তুকে আরো বেশী স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এক হাতে পৃথিবীগুলো ও অন্য হাতে আকাশসমূহ গুটিয়ে নিয়ে বলবেনঃ "আমিই বাদশাহ, আমিই শাসনকর্তা। এখন সেই পৃথিবীর বাদশাহরা কোথায়? কোথায় স্বৈরাচারী একনায়কের দল? অহংকারী ক্ষমতাদর্পীরা?" [বুখারীঃ ৭৪১২, মুসলিমঃ ২৭৮৮]।

২৭. যালিম[১] ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম[২]!

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

২৮. 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

২৯. 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌঁছার পর।' আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

৩০. আর রাসূল বললেন, 'হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো এ

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا

---

(১) এখানে যালিম ব্যক্তি বলতেঃ মুশরিক, কাফের, মুনাফিক ও সীমালঙ্ঘনকারী অবাধ্যদের বুঝানো হয়েছে। [দেখুন-সা'দী]

(২) অর্থাৎ যারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে না চলে অন্য কারো পথে চলবে, তারাই হাশরের মাঠে আফসোস করতে থাকবে এবং নিজের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে। কিন্তু তখন তাদের সে আফসোস করা তাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সত্যকে তুলে ধরেছেন। [যেমন, সূরা আল-আহযাবঃ ৬৬-৬৮, সূরা আয্-যুখরুফঃ ৬৭] এই আয়াতের ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবতঃ আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فلانا বা "অমুক" শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্মিলিত হয় এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীতে একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কেয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধনসম্পদ (সঙ্গীদের দিক দিয়ে) যেন মুত্তাকী ব্যক্তিই খায়।" [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৮, সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ২/৩১৫, হাদীস নং ৫৫৫, তিরমিযীঃ ২৩৯৫, আবু দাউদঃ ৪৮৩২] অর্থাৎ মুত্তাকী বা পরহেযগার নয় এমন কোন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত।" [আবু দাউদঃ ৪৮৩৩, তিরমিযীঃ ২৩৭৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৩৪]

الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝٣٠

কুরআনকে পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করেছে।'

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ۝٣١

৩১. আল্লাহ্ বলেন, 'আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের থেকে শত্রু বানিয়ে থাকি। আর আপনার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝٣٢

৩২. আর কাফেররা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার কাছে একবারে নাযিল হলো না কেন?' এভাবেই আমরা নাযিল করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝٣٣

৩৩. আর তারা আপনার কাছে যে বিষয়ই উপস্থিত করে না কেন, আমরা সেটার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনার কাছে নিয়ে আসি।

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝٣٤

৩৪. যাদেরকে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তারা স্থানের দিক থেকে অতি নিকৃষ্ট এবং অধিক পথভ্রষ্ট।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝٣٥

৩৫. আর আমরা তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে সাহায্যকারী করেছিলাম,

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۗ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝٣٦

৩৬. অতঃপর আমরা বলেছিলাম, 'তোমরা সে সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ

করেছে[১] ।' তারপর আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম;

৩৭. আর নূহের সম্প্রদায়কেও, যখন তারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল[২] তখন আমরা তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য নিদর্শনস্বরূপ করে রাখলাম। আর যালিমদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَٰهُمْ وَجَعَلْنَٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

৩৮. আর আমরা ধ্বংস করেছিলাম 'আদ, সামূদ, 'রাস্'[৩] -এর অধিবাসীকে এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু প্রজন্মকেও।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَأَصْحَٰبَ الرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

৩৯. আর আমরা তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম এবং তাদের সকলকেই আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَٰلَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০. আর তারা তো সে জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি তারা এসব দেখতে পায় না[৪]? বস্তুত

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

(১) এতে ফির'আউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। [মুয়াস্‌সার]

(২) এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা স্বয়ং নূহ 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। দ্বীনের মূলনীতি সকল নবীগণের বেলায়ই অভিন্ন, তাই একজনের প্রতি মিথ্যারোপ সবার প্রতি মিথ্যারোপ করার শামিল। [বাগভী, মুয়াস্‌সার]

(৩) ﴿وَأَصْحَٰبَ الرَّسِّ﴾ অভিধানে رَسّ শব্দের অর্থ কাঁচা কুপ। তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কুপের ধারে বাস করত। [দেখুন-আদওয়াউল বায়ান,বাগভী]

(৪) অর্থাৎ লূত জাতির জনপদ। নিকৃষ্টতম বৃষ্টি মানে পাথর বৃষ্টি । কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে। হিজায বাসীদের বানিজ্য কাফেলা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া

তারা পুনরুত্থানের আশাই করে না ।

৪১. আর তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

৪২. 'সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতাম ।' আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট ।

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪৩. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪. নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট ।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪৫. আপনি কি আপনার রব-এর প্রতি লক্ষ্য করেন না[১] কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছে করলে এটাকে তো স্থির রাখতে পারতেন;

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

যাবার পথে এ এলাকা অতিক্রম করতো । সেখানে তারা কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখতো না বরং আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখে লূত জাতির শিক্ষণীয় ধ্বংস কাহিনীও শুনতো । [দেখুন-কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(১) ৪৫ থেকে ৬০ -এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ প্রমাণিত হয় এবং এতে বান্দার করণীয় কি তাও বর্ণনা করা হয়েছে । [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

তারপর আমরা সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।

৪৬. তারপর আমরা এটাকে আমাদের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٦﴾

৪৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা[১] এবং ছড়িয়ে পড়ার জন্য করেছেন দিন[২]।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾

৪৮. আর তিনিই তাঁর রহমতের বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমরা আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি[৩]-

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾

৪৯. যাতে তা দ্বারা আমরা মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমরা যা সৃষ্টি করেছি তার মধ্য হতে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই[৪],

لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾

---

(১) এ আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سبت থেকে উদ্ভুত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سُبَاتٌ এমন বস্তু যদ্দারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়। নিদ্রাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ। [দেখুন- কুরতুবী, আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে দিনকে نشور অর্থাৎ 'জীবন বা ছড়িয়ে পড়া' বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) طهور শব্দটি আরবী ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طهور বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তদ্দারা পবিত্র করা যায়। [বাগভী]

(৪) আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু এবং অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। [দেখুন-মুয়াস্সার]

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰىٓ اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

৫০. আর আমরা তো তা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। অতঃপর অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে[১]।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾

৫১. আর আমরা ইচ্ছে করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

৫২. কাজেই আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে বড় জিহাদ চালিয়ে যান।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর তিনিই দুই সাগরকে সমান্তরালে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অন্যটি লোনা, খর; আর তিনি উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান[২]।

---

(১) ইকরিমা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, অর্থাৎ তারা বলে আমরা অমুক নক্ষত্র এবং অমুক নক্ষত্রের কাছাকাছি হওয়ার কারণে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। ইকরিমা রাহেমাহুল্লাহর এ তাফসীরের সপক্ষে আমরা হাদীস থেকে প্রমাণ দেখতে পাই। একবার রাত্রিকালে বৃষ্টি হওয়ার পর ভোরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাদের কতক লোক আমার উপর ঈমানদার এবং কতক লোক কাফেরে পরিণত হয়েছে। যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ায় বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি তারা আমার উপর ঈমান এনেছে এবং নক্ষত্ররাজির উপর কুফরী করেছে। আর যারা বলে, আমরা অমুক অমুক নক্ষত্রের কাছাকাছি হওয়ার কারণে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্ররাজির উপর ঈমান এনেছে। [মুসলিমঃ ১২৫]

(২) مرج শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেয়া। عذب মিঠা পানিকে বলা হয়। فُرَاتٌ-এর অর্থ সুপেয়, مِلْحٌ-এর অর্থ লোনা এবং أُجَاجٌ এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার সাগর সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায়

৫৪. আর তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; তারপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন[১]। আর আপনার রব হলেন প্রভূত ক্ষমতাবান।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৫. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ‘ইবাদাত করে, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং তাদের অপকারও করতে পারে না। আর কাফের তো তার রব-এর বিরোধিতায় সহযোগিতাকারী।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

৫৬. আর আমরা তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৭. বলুন, ‘আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময় চাই না, তবে যে

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ

এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ সাগরের পানি রহস্যবশতঃ তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝর্ণা, নদনদী, নহর ও বড় বড় সাগর আছে। এগুলোর পানি মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশী সামুদ্রিক জন্তুজানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হত, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবনধারন দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যেন সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে, তাও পচতে পারে। [দেখুন-আদওয়াউল-বায়ান]

(১) পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نسب বলা হয় এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে صهر বলা হয়। [আদওয়াউল বায়ান,বাগভী]

أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ۝٥٧

তার রব-এর দিকের পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা করে।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ۝٥٨

৫৮. আর আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত হিসেবে যথেষ্ট।

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ۝٥٩

৫৯. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রাহ্‌মান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝٦٠

৬০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'সিজ্‌দাবনত হও 'রাহ্‌মান' -এর প্রতি,' তখন তারা বলে, 'রাহ্‌মান আবার কি[১]? তুমি কাউকে সিজ্‌দা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজ্‌দা করব?' আর এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়।

---

(১) মক্কার কাফেররা এ নামটি যে জানত না তা নয়। তারা এ নামটি জানত তবে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করতে দ্বিধা করত। তারা এ নামটিকে কোন কোন মানুষকেও প্রদান করত। অথচ এ নামটি এমন এক নাম যা শুধুমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যই নির্দিষ্ট। কোন ক্রমেই অন্য কারো জন্য এ নামটিকে নাম হিসেবে বা গুণ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নেই। কিন্তু তারা হঠকারিতাবশতঃ প্রশ্ন করল যে, রহমান কে এবং কি? হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনও তারা এমনটি অস্বীকার করে বলেছিলঃ "আমরা রহমান বা রহীম কি জিনিস তা জানিনা; বরং যেভাবে তুমি আগে লিখতে, সেভাবে 'বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা' লিখ।" [মুসলিমঃ ১৭৮৪] সূরা আল-ইসরার ১১০ নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে তাঁর এ নামের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন যে, "আল্লাহ্‌কে ডাক বা রহমানকে ডাক, যেভাবেই ডাক এগুলো তাঁর সুন্দর নামসমূহের অন্তর্গত"।

ষষ্ঠ রুকূ'

৬১. কত বরকতময় তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন বিশাল তারকাপুঞ্জ এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ(১) ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ ।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾

৬২. আর তিনিই করেছেন রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তার জন্য---যে উপদেশ গ্রহণ করতে বা কৃতজ্ঞ হতে চায় ।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

৬৩. আর 'রাহ্‌মান' -এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে(২) এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

---

(১) অর্থাৎ সূর্য ।[বাগভী] যেমন সূরা নূহে পরিষ্কার করে বলা হয়েছেঃ "আর সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন" [১৬]

(২) অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা না করা । বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো । খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয় । কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নাত বিরোধী । হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতেন । হাদীসের ভাষা এরূপ, كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ অর্থাৎ "চলার সময় পথ যেন তার জন্য সংকুচিত হত" । [ইবনে হিব্বানঃ ৬৩০৯] এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন । উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি অসুস্থ? সে বললঃ না । তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন । [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাদাইউত তাফসির]

হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ ﴿يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا﴾ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, আল্লাহ্‌র সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে । অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে, অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল । তবে তাদের উপর আল্লাহ্‌ভীতি

তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'(১);

৬৪. এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রব-এর উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে(২);

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে আখেরাতের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং আখেরাতের কাজেও অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নেয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরী রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে- 'সালাম'। এখানে جاهلون শব্দের অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। মূর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী,বাদাইউত তাফসির] যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছেঃ "আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।"[সূরা আল-কাসাসঃ ৫৫]

(২) অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজ্‌দারত অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদাতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে সালাত ও ইবাদাতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোকদেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল থাকে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছেঃ "তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়।" [সূরা আস-সাজদাহঃ ১৬] অন্যত্র আরো বলা হয়েছেঃ "এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দো'আ করতো।" [সূরা আয-যারিয়াতঃ ১৭-১৮]

৬৫. এবং তারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন, তার শাস্তি তো অবিচ্ছিন্ন ।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥

৬৬. নিশ্চয় সেটা বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে খুব নিকৃষ্ট ।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝٦٦

৬৭. এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপনতাও করে না, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী[১] ।

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝٦٧

আরো বলা হয়েছেঃ “যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে?” [সূরা আয-যুমারঃ ৯] হাদীসে সালাতুত্ তাহাজ্জুদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় কর । কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সকল নেককারদের অভ্যাস ছিল । এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফ্‌ফারা এবং গোনাহ্ থেকে নিবৃত্তকারী ।” [সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্ঃ ১১৩৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ “যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা‘আতে আদায় করে, সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদাতে অতিবাহিত করে এবং যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করে, তাকে অবশিষ্ট অর্ধরাত্রিও ইবাদাতে অতিবাহিতকারী হিসেবে গণ্য করা হবে ।” [মুসলিমঃ ৬৫৬]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে । আয়াতে إِسْرَافٌ এবং এর বিপরীতে إِقْتَارٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । إِسْرَافٌ এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা । শরীয়তের পরিভাষায় ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ্, ইবনে জুবায়রের মতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা إِسْرَافٌ তথা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সাও হয় । কেউ কেউ বলেন, বৈধ এবং অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত । কেননা, تَبْذِيْرٌ তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গোনাহ্ । আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ﴾ [সূরা আল-ইসরাঃ ২৭]
إقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা । শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে ব্যয় না করা বা কম করা । এই তাফসীরও ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে । তখন

৬৮. এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না[১]। আর আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না[২]। আর তারা ব্যভিচার করে না[৩]; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বর্ধিতভাবে প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়;

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৭০. তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের গুণাহসমূহ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রটির মাঝখানে সততা ও মিতব্যয়ীতার পথ অনুসরণ করে। [দেখুন- [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(১) পূর্ববর্তী ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদাতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'একজন মুমিন ঐ পর্যন্ত পরিত্রাণের আশা করতে পারে যতক্ষণ সে কোন হারামকৃত রক্ত প্রবাহিত না করে'। [বুখারী: ৬৮৬২]

(৩) রহমানের বান্দারা কোন ব্যভিচার করে না। ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয় না। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সবচেয়ে বড় গুণাহ কি? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি কাউকে (প্রভুত্ব, নাম-গুণে এবং ইবাদতে) আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাও"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি তোমার পড়শীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর"। [বুখারীঃ ৬৮৬১, মুসলিমঃ ৮৬]

৭১. আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝٧١

৭২. আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে আপন মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে[১]।

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝٧٢

৭৩. এবং যারা তাদের রব-এর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে তার উপর অন্ধ এবং বধিরের মত পড়ে থাকে না[২]।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝٧٣

৭৪. এবং যারা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো। আর আপনি আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝٧٤

৭৫. তারাই, যাদেরকে প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ[৩]

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জেনে শুনে আজে-বাজে কথা ও কাজ দেখতে বা শুনতে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করে না। আর যদি কখনো তাদের পথে এমন কোন জিনিস এসে যায়, তাহলে তার প্রতি একটা উড়ো নজর না দিয়েও তারা এভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তূপ অতিক্রম করে চলে যায়। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্‌র আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। [তাবারী]

(৩) غرفة শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু কক্ষ, উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন উঁচু কক্ষ পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীদের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের নিকট তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। [বুখারীঃ ৩০৮৩, মুসলিমঃ ২৮৩১, মুসনাদে আহমাদঃ ৮৪৫২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো

تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۙ

যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

৭৬. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট!

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاۗؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝

৭৭. বলুন, 'আমার রব তোমাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না, যদি না তোমরা তাকে ডাক[১]। অতঃপর তোমরা মিথ্যারোপ করেছ, সুতরাং অচিরেই অপরিহার্য হবে শাস্তি।'

বলেনঃ "জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি সৎ ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলিমকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে।" [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৫০৯, সহীহ্ ইবনে খুযাইমাঃ ২১৩৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১/১৫৩, তিরমিযীঃ ১৯৮৪, মুসনাদে আহমাদঃ ১৩৩৭]

(১) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। তবে স্পষ্ট কথা হলো, আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদাত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা। [বাগভী]যেমন অন্য আয়াতে আছে ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾ [সূরা আয্-যারিয়াতঃ ৫৬] অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি।

২৬- সূরা আশ-শু'আরা', ২২৭ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত্বা-সীন-মীম ।

طٰسٓمّٓ ①

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. তারা মুমিন হচ্ছে না বলে আপনি হয়ত মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বেন ।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③

৪. আমরা ইচ্ছে করলে আসমান থেকে তাদের কাছে এক নিদর্শন নাযিল করতাম, ফলে সেটার প্রতি তাদের ঘাড় অবনত হয়ে পড়ত ।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

৫. আর যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের কাছ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑤

৬. অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছে । কাজেই তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের কাছে শীঘ্রই এসে পড়বে ।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

৭. তারা কি যমীনের দিকে লক্ষ্য করে না? আমরা তাতে প্রত্যেক প্রকারের অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি[১]!

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑦

৮. নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন, আর

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

(১) زَوْج এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যুগল । এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْج বলা হয় । অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে, সেগুলোকে এদিক দিয়ে زَوْج বলা যায় । কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয় । এ হিসাবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْج বলা যায় । كَرِيْم শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু । [দেখুন-আদওয়াউল বায়ান,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

৯. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

দ্বিতীয় রুকূ‘

১০. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব মূসাকে ডেকে বললেন, ‘আপনি যালিম সম্প্রদায়ের কাছে যান,

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

১১. ‘ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের কাছে; তারা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾

১২. মূসা বলেছিলেন, ‘হে আমার রব! আমি আশংকা করি যে, তারা আমার উপর মিথ্যারোপ করবে,

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾

১৩. ‘এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নেই। কাজেই হারূনের প্রতিও ওহী পাঠান।

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾

১৪. ‘আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে, সুতরাং আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।’

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ্ বললেন, ‘না, কখনই নয়, অতএব আপনারা উভয়ে আমাদের নিদর্শনসহ যান, আমরা তো আপনাদের সাথেই আছি, শ্রবণকারী।

قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

১৬. ‘অতএব আপনারা উভয়ে ফির‘আউনের কাছে যান এবং বলুন, ‘আমরা তো সৃষ্টিকুলের রব-এর রাসূল,

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৭. যাতে তুমি আমাদের সাথে যেতে দাও বনী ইসরাঈলকে[১]।'

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٧﴾

১৮. ফির‘আউন বলল, ‘আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ,

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

১৯. ‘এবং তুমি তোমার কাজ যা করার তা করেছ; তুমি তো অকৃতজ্ঞ।'

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

২০. মূসা বললেন, ‘আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম বিভ্রান্ত'[২]।

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾

২১. ‘তারপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমার রব আমাকে প্রজ্ঞা (নবুওয়ত) দিয়েছেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

২২. ‘আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে তুমি দয়া দেখাচ্ছ তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ[৩]।'

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٢﴾

---

(১) বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফির‘আউন বাধা দিত। এভাবে চার শত বছর ধরে তারা ফির‘আউনের বন্দীশালায় গোলামীর জীবন যাপন করছিল। [দেখুন- বাগভী,কুরতুবী]

(২) সারকথা এই যে, এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضلال শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তোমরা যদি বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন না চালাতে তাহলে আমি প্রতিপালিত হবার জন্য তোমাদের গৃহে কেন আসতাম? তোমাদের জুলুমের কারণেই

২৩. ফির'আউন বলল, 'সৃষ্টিকুলের রব আবার কী?'

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. মূসা বললেন, 'তিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. ফির'আউন তার আশেপাশের লোকদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা কি ভাল করে শুনছ না?'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. মূসা বললেন, 'তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব।'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. ফির'আউন বলল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো অবশ্যই পাগল।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

২৮. মূসা বললেন, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব; যদি তোমরা বুঝে থাক!'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. ফির'আউন বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব'।

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. মূসা বললেন, 'আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আসি, তবুও[১]?'

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾

তো আমার মা আমাকে ঝুড়িতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নয়তো আমার লালন-পালনের জন্য কি আমার নিজের গৃহ ছিল না? তাই এ লালন-পালনের জন্য অনুগৃহীত করার খোঁটা দেয়া তোমার মুখে শোভা পায় না। [দেখুন- কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ যদি আমি সত্যিই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের, আকাশ ও পৃথিবীর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রবের পক্ষ থেকে যে আমাকে পাঠানো হয়েছে এর সপক্ষে সুস্পষ্ট আলামত

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

৩১. ফির'আউন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর।'

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾

৩২. তারপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষনাৎ তা এক স্পষ্ট অজগরে(১) পরিণত হল।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর মূসা তার হাত বের করলে তৎক্ষনাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

তৃতীয় রুকূ'

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. ফির'আউন তার আশেপাশের পরিষদবর্গকে বলল, 'এ তো এক সুদক্ষ জাদুকর!

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. 'সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তার জাদুবলে বহিস্কৃত করতে চায়। এখন তোমরা কী করতে বল?'

قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও,

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. 'যেন তারা তোমার কাছে প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকরকে উপস্থিত করে।'

পেশ করি, তাহলে এ অবস্থায়ও কি আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হবে এবং আমাকে কারাগারে পাঠানো হবে? [দেখুন- বাগভী]

(১) কুরআন মজীদে কোন জায়গায় এ জন্য حية (সাপ) আবার কোথাও جانّ (ছোট সাপ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে ثعبان (অজগর)। এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যায় যে حية আরবী ভাষায় সর্পজাতির সাধারণ নাম। তা ছোট সাপও হতে পারে আবার বড় সাপও হতে পারে। আর ثعبان শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক আয়তন ও স্থূলতার দিক দিয়ে তা ছিল অজগরের মতো। অন্যদিকে جان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ছোট সাপের মতো তার ক্ষীপ্রতা ও তেজস্বীতার জন্য। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর]

৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হল,	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হল, 'তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?	وَّقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. 'যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।'	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. অতঃপর জাদুকরেরা এসে ফির'আউনকে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?'	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾
৪২. ফির'আউন বলল, 'হ্যাঁ, তখন তো তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের শামিল হবে।'	قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. মূসা তাদেরকে বললেন, 'তোমরা যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।'	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল, 'ফির'আউনের ইয্যতের শপথ! আমরাই তো বিজয়ী হব।'	فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন, সহসা সেটা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।	فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. তখন জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হয়ে পড়ল।	فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সৃষ্টিকুলের রব-এর প্রতি---	قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. 'যিনি মূসা ও হারূনেরও রব।'

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۝٤٨

৪৯. ফির'আউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করলে? সে-ই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।'

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٤٩

৫০. তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই[1], আমরা তো আমাদের রব-এর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।

قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۝٥٠

৫১. আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী।'

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٥١

চতুর্থ রুকূ'

৫২. আর আমরা মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম এ মর্মে যে, 'আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হউন[2],

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۝٥٢

---

(১) অর্থাৎ যখন ফির'আউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে হত্যা, হস্ত-পদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলঃ তুমি যা করতে পার, কর। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব, সেখানের আরামই আরাম। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্সার]

(২) এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদুঈনের বাসায় গেলে সে তাঁকে সম্মান করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসো। বেদুঈন রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ কিছু চাও? সে বললঃ এক উট তার মালামালসহ, আর কিছু ছাগল যা আমার স্ত্রী দোহাতে পারে।

অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।'

৫৩. তারপর ফির'আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল,

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এ বলে, 'এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল,

إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫. আর তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে;

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর আমরা তো সবাই সদা সতর্ক।'

وَإِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. পরিণামে আমরা ফির'আউন গোষ্ঠীকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে

فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।

وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯. এরূপই ঘটেছিল এবং আমরা বনী

كَذٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি কি বনী ইস্‌রাঈলের বৃদ্ধার মত হতে পারলে না? সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ বনী ইস্‌রাঈলের বৃদ্ধা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে আবার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন বনী ইস্‌রাঈলদের নিয়ে বের হলেন, তখন পথ হারিয়ে ফেললেন। তিনি বনী ইস্‌রাঈলদের বললেনঃ কেন এমন হল? তখন তাদের মাঝে আলেমগণ বললেনঃ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম মৃত্যুর পূর্বে বনী ইস্‌রাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, বনী ইস্‌রাঈল মিসর ছেড়ে যাবার সময় অবশ্যই তার কফিনের বাক্স সাথে নিয়ে যাবে। আর যেহেতু তা নেয়া হয়নি, সেহেতু পথ হারিয়ে যাচ্ছে। তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কফিনের সন্ধান করা হল, কেউই তার হদিস দিতে পারল না শুধু এক বৃদ্ধা ব্যতীত। কিন্তু সে শর্ত সাপেক্ষে বলতে রাজী হল। সে জান্নাতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে থাকার শর্ত দিল। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম কিছুতেই রাজী হন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম রাজী হলেন। তখন বৃদ্ধা এক এলাকায় সেটা দেখিয়ে দিল। সেখানে পানি ছিল। লোকজন সেই পানি সেঁচে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কফিনের বাক্স বের করে আনলে সমস্ত পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। [ইবনে হিব্বানঃ ৭২৩, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৪০৪-৪০৫, ৫৭১,৫৭২]

ইসরাঈলকে করেছিলাম এসবের অধিকারী[১]।

৬০. অতঃপর তারা সূর্যোদয়কালে ওদের পিছনে এসে পড়ল।

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!'

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

৬২. মূসা বললেন, 'কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার রব[২]; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।'

قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

৬৩. অতঃপর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল[৩];

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

৬৪. আর আমরা সেখানে কাছে নিয়ে এলাম অন্য দলটিকে,

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

---

(১) এ আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে, ফির'আউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইস্‌রাঈলকে করে দেয়া হয়। [তাবারী,কুরতুবী] এই ঘটনাটি কুরআনুল কারীমের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, সূরা আল-আ'রাফের ১৩৬ ও ১৩৭ নং আয়াতে, সূরা আল-কাসাসের ৫ নং আয়াতে, সূরা আদ্‌-দোখানের ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াতসমূহে এবং সূরা আশ্‌-শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নং আয়াতে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

(২) পশ্চাদ্ধাবনকারী ফির'আউনী সৈন্য বাহিনী যখন তাদের সামনে এসে যায়, তখন সমগ্র বনী ইস্‌রাঈল চিৎকার করে উঠল, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অতিবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র-অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মূসা 'আলাইহিস্‌ সালাম-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনো সজোরে বলেনঃ كَلَّا আমরা তো ধরা পড়তে পারি না। ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন। [দেখুন-কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ পানি উভয় দিকে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। [কুরতুবী]

৬৫. এবং আমরা উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে,

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. তারপর নিমজ্জিত করলাম অন্য দলটিকে।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

পঞ্চম রুকূ'

৬৯. আর আপনি তাদের কাছে ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

৭০. যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কিসের 'ইবাদাত কর?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা বলল, 'আমরা মূর্তির পূজা করি সুতরাং আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোকে আঁকড়ে থাকব।'

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾

৭২. তিনি বললেন, 'তোমরা যখন আহ্বান কর তখন তারা তোমাদের আহ্বান শোনে কি?'

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. 'অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?'

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তারা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত।'

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. ইবরাহীম বললেন, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যাদের 'ইবাদাত তোমরা করে থাক,

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. 'তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা!

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝٧٦

৭৭. সৃষ্টিকুলের রব ব্যতীত এরা সবাই তো আমার শত্রু ।

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝٧٧

৭৮. 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন ।

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝٧٨

৭৯. আর 'তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান ।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝٧٩

৮০. 'এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন(১);

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝٨٠

৮১. 'আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন ।

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝٨١

৮২. 'এবং যার কাছে আশা করি যে, তিনি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন ।

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝٨٢

৮৩. 'হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দিন ।

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝٨٣

৮৪. 'আর আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন(২),

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝٨٤

---

(১) অর্থাৎ আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন । এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার যে, রোগাক্রান্ত হওয়াকে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যদিও আল্লাহ্‌র নির্দেশেই সবকিছু হয় । এটাই হল আল্লাহ্‌র সাথে আদাব বা শিষ্টাচার । [দেখুন-বাগভী,কুরতুবী]

(২) এ আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদ্‌গুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে । [ফাতহুল কাদীর,বাগভী,কুরতুবী]

৮৫. 'এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন,

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

৮৬. 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন[১]।

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. 'এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থানের দিনে[২]

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾

---

(১) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই ওরা জাহান্নামী" । [সূরা আত্-তাওবাঃ ১১৩] কুরআনুল কারীমের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত; তার জন্য মাগফেরাতের দো'আ করা অবৈধ ও হারাম । কিন্তু এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আ উল্লেখ করে বলেছেনঃ ﴿وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ "আর আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন" । তা থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফেরাতের দো'আ করলেন? আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই কুরআনুল কারীমে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন । তিনি বলেনঃ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [সূরা আত্-তাওবাঃ ১১৪] -অর্থাৎ " ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে; তারপর যখন এটা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইব্রাহীম তার থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করলেন । ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল ।"

(২) অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ 'হে আমার রব! যেদিন সমস্ত সৃষ্টিজগতকে পুনরুত্থান করা হবে, সেই কেয়ামতের দিন আমাকে লজ্জিত করবেন না ।'হাদীসে এসেছে, ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম কেয়ামতের দিন তার পিতা আজরকে তার মুখে ধুলিমলিন কুৎসিত অবস্থায় দেখতে পাবেন । তখন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাকে বলবেনঃ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্য হবেন না? তখন তার বাবা তাকে বলবেনঃ আমি আজ তোমার অবাধ্য হব না । তখন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বলবেনঃ হে রব! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিনে লজ্জিত না করার ওয়াদা করেছেন । আমার পিতার ধ্বংসের চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি । তারপর বলা হবেঃ হে ইব্রাহীম! আপনার পায়ের

৮৮. 'যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না;

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. 'সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।'

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

৯০. আর মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত,

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১. এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম[১];

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২. তাদেরকে বলা হবে, 'তারা কোথায়, তোমরা যাদের 'ইবাদাত করতে---

وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩. 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?'

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথ ভ্রষ্টকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে[২],

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾

নীচে কি? তখন তিনি তাকালে দেখতে পাবেন বিদঘুটে কুৎসিত হায়েনা জাতীয় এক প্রাণী। তখন তার চার পা ধরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (অর্থাৎ সে এমন ঘৃণিত হবে যে, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালাম তার জন্য কথা বলতে চাইবেন না।) [বুখারীঃ ৩৩৫০]

(১) অর্থাৎ একদিকে মুত্তাকিরা জান্নাতে প্রবেশ করার আগেই দেখতে থাকবে, আল্লাহর মেহেরবানীতে কেমন নিয়ামতে পরিপূর্ণ জায়গায় তারা যাবে। অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা তখনো হাশরের ময়দানেই অবস্থান করবে। যে জাহান্নামে তাদের গিয়ে থাকতে হবে তার ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(২) মূলে كُبْكِبُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি অর্থ নিহিত। এক, একজনের উপর অন্য একজনকে ধাক্কা দিয়ে অধোমুখী করে ফেলে দেয়া হবে। দুই, তারা জাহান্নামের গর্তের তলদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে থাকবে। [দেখুন-কুরতুবী]

وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝٩٥

৯৫. এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও ।

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝٩٦

৯৬. তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে,

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٩٧

৯৭. ‘আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম’,

اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩٨

৯৮. ‘যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের রব-এর সমকক্ষ গণ্য করতাম ।

وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٩٩

৯৯. ‘আর আমাদেরকে কেবল দুস্কৃতিকারীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল;

فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ۝١٠٠

১০০. ‘অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই ।

وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝١٠١

১০১. এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই ।

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٢

১০২. ‘হায়, যদি আমাদের একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম[১]!’

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٠٣

১০৩. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয় ।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝١٠٤

১০৪. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।

ষষ্ঠ রুকূ‘

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ۝١٠٥

১০৫. নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল ।

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٠٦

১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া

---

(১) এ আকাংখার জবাবও কুরআনের এভাবে দেয়া হয়েছে, “যদি তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা তাই করতে থাকবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ।” [সূরা আল-আন‘আম: ২৮]

অবলম্বন করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর(১)।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. 'আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾

১১০. 'কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?'

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. নূহ্ বললেন, 'তারা কী করত তা আমার জানার কি দরকার?'

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. 'তাদের হিসেব গ্রহণ তো আমার রব-এরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে!

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর আমি তো 'মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার নই।

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. 'আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

---

(১) আয়াতটি তাকীদ বা গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করা তো আরো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। [ফাতহুল কাদীর]

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তারা বলল, 'হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে নিহতদের মধ্যে শামিল হবে।'

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

১১৭. নূহ্ বললেন, 'হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. 'কাজেই আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে, তাদেরকে রক্ষা করুন(১)।'

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾

১১৯. অতঃপর আমরা তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌযানে(২)।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. এরপর আমরা বাকী সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

১২১. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

১২২. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

---

(১) অর্থাৎ নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমার ও আমার জাতির মধ্যে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথী ঈমানদারদেরকে রক্ষা করুন। [দেখুন-মুয়াস্সার] অন্যান্য সূরাসমূহেও নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম-এর এ দো'আ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-কামারঃ ১০-১৪।

(২) "বোঝাই নৌযান" এর অর্থ হচ্ছে, এ নৌকাটি সকল মু'মিন ও সকল প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। [দেখুনঃ ফাতহুল কাদীর, সা'দী] পূর্বেই এ প্রাণীদের এক একটি জোড়া সংগে নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন সূরা হূদ ৪০ আয়াত।

সপ্তম রুকূ'

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. 'আদ সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

১২৫. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. 'আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই।

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. 'তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে(১) স্তম্ভ নির্মাণ করছ নিরর্থক(২)?

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. 'আর তোমরা প্রাসাদসমূহ(৩) নির্মাণ করছ যেন তোমরা স্থায়ী হবে(৪)।

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতে رِيع উচ্চ স্থানকে বলা হয়। মুজাহিদ ও অনেক তাফসীরবিদের মতে رِيع দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। [কুরতুবী]

(২) آيَةً-এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُونَ শব্দটি عبث থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অযথা বা যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। [ইবন কাসীর]

(৩) مَصَانِعَ শব্দটি مَصْنَعٌ-এর বহুবচন। কাতাদাহ্ বলেনঃ مَصَانِعَ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৪) ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ ইমাম বুখারী সহীহ্ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لعل শব্দটি تشبيه অর্থাৎ উদাহরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস এর অনুবাদে বলেনঃ كَأَنَّكُمْ تَخْلُدُونَ-অর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। [কুরতুবী]

১৩০. আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক স্বেচ্ছাচারী হয়ে ।	وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর ।	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾
১৩২. আর তোমরা তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সে সমুদয়, যা তোমরা জান ।	وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র সন্তান,	أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾
১৩৪. এবং উদ্যান ও প্রস্রবণ;	وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. 'আমি তো তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিনের শাস্তির ।'	إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. তারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান ।	قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. 'এটা তো কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব ।	إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. 'আমরা মোটেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না ।'	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯. সুতরাং তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল ফলে আমরা তাদেরকে ধ্বংস করলাম । এতে তো অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়[১] ।	فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

(১) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তারা তাদের নবী হুদ আলাইহিস সালাম এর উপর মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন । [ইবন কাসীর]

অষ্টম রুকূ’

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. সামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. যখন তাদের ভাই সালিহ্ তাদেরকে বললেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. ‘আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. ‘আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. ‘তোমাদেরকে কি নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে-

فِي جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. ‘উদ্যানে, প্রস্রবণে

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. ‘ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فٰرِهِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. ‘আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করছ।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾

১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. আর তোমরা সীমালংঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না;

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. 'যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সংশোধন করে না ।'

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম ।

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. 'তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর ।'

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. সালিহ্ বললেন, 'এটা একটা উষ্ট্রী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা;

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. 'আর তোমরা এর কোন অনিষ্ট সাধন করো না; করলে মহাদিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে ।'

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. অতঃপর তারা সেটাকে হত্যা করল, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল ।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল । এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয় ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।

নবম রুকূ'

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল,

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾

১৬২. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. 'কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. 'আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. 'সৃষ্টিকুলের মধ্যে তো তোমরাই কি পুরুষের সাথে উপগত হও?

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. 'আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. তারা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. লূত বললেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের ঘৃণাকারী।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. 'হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করুন।'

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. তারপর আমরা তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম

১৭১. এক বৃদ্ধা ছাড়া[১], যে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغٰبِرِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২. তারপর আমরা অপর সকলকে ধ্বংস করলাম ।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. আর আমরা তাদের উপর শাস্তি মূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট[২]!

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয় ।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

দশম রুকূ'

১৭৬. আইকাবাসীরা[৩] রাসূলগণের প্রতি

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾

---

(১) এখানে عَجُوز বলে লূত 'আলাইহিস্ সালাম-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে । সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল । সূরা আত-তাহরীমে নূহ ও লূত আলাইহিমাসসালামের স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "এ মহিলা দু'টি আমার দু'জন সৎ বান্দার গৃহে ছিল । কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে" [১০] অর্থাৎ তারা উভয়ই ছিল ঈমান শূন্য এবং নিজেদের সৎ স্বামীদের সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তারা তাদের কাফের জাতির সহযোগী হয় । এজন্য আল্লাহ যখন লূতের জাতির উপর আযাব নাযিল করার ফায়সালা করলেন এবং লূতকে নিজের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করার হুকুম দিলেন তখন সাথে সাথে নিজের স্ত্রীকে সংগে না নেবার হুকুমও দিলেন: "কাজেই কিছু রাত থাকতেই আপনি নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়ে যান এবং আপনাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায় । কিন্তু আপনার স্ত্রীকে সংগে করে নিয়ে যাবেন না । তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে ।" [সূরা হূদ: ৮১]

(২) কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ বৃষ্টি বলতে এখানে পানির বৃষ্টি বুঝানো হয়নি, বরং পাথর বৃষ্টির কথা বুঝানো হয়েছে । [দেখুন-তবারী,মুয়াস্‌সার]

(৩) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরে আল্লাহ্ তা'আলা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-কে পাঠান । তার জাতি ছিল মাদ্‌ইয়ান জাতি । [সূরা আল-আ'রাফঃ ৮৫] মাদ্‌ইয়ান

মিথ্যারোপ করেছিল,

১৭৭. যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. 'কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾

১৮০. 'আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮১. 'মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে; আর যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২. 'এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. 'আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. আর তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের আগে

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

ছিল শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জাতির এক পূর্বপুরুষের নাম। অপরদিকে কখনো কখনো পবিত্র কুরআনে শুয়াইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর কওম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আসহাবুল আইকাহ্' বা গাছওয়ালাগণ ।[সূরা আশ্-শুয়ারাঃ ১৭৬] অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে আইকাবাসীদ্বারা মাদ্ইয়ান জাতিকে বুঝানো হয়েছে। [আদওয়া আল-বায়ান]

যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।'

১৮৫. তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত;

قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. 'আর তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. 'সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।'

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. তিনি বললেন, 'আমার রব ভাল করে জানেন তোমরা যা কর।'

قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৯. সুতরাং তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল, ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল[১]। এ তো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি!

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

১৯০. এতে তো অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন[২],

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

(১) এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কালো মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন তাদের উপর আল্লাহ্র সুনির্ধারিত শাস্তি এসে গেল। আর তাতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। [মুয়াস্সার]

(২) শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জাতির ধ্বংসের কথা পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে এসেছে। এর কারণ হল, শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জাতির অপরাধ ছিল বিভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক প্রকার অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি হয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন সেখানে সে অপরাধ মোতাবেক শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা আশ্-শু'আরায় এসেছে, তারা বলেছিলঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের জন্য আকাশের টুকরা ফেলে দাও। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে

আর তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১৯১. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

এগারতম রুকূ'

১৯২. আর নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব হতে নাযিলকৃত। وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. বিশ্বস্ত রূহ (জিব্‌রাঈল) তা নিয়ে নাযিল হয়েছেন। نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়[১]। بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. বনী ইস্‌রাঈলের আলেমগণ এ সম্পর্কে জানে---এটা কি তাদের জন্য اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾

বলেনঃ তাদেরকে ছায়ার দিনে শাস্তি পেয়ে বসল। [সূরা আশ্-শু'আরাঃ ১৮৯] যা তাদের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরা আল-আ'রাফের ৮৮ নং আয়াতে তারা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সাথীদেরকে এমন ভয় দেখাল যে, তারা কেঁপে উঠেছিল। তারা বলেছিলঃ "হে শু'আইব! আমরা তোমাকে এবং যারা তোমার উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের দলে ফিরে আসবে।" তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ "তাদেরকে পেয়ে বসল কম্পন।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৯১] কিন্তু সূরা হূদের ৮৭ নং আয়াতে তারা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর সালাত নিয়ে ঠাট্টা করে তাকে অপমান করেছিল। সে ঠাট্টার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তি হিসাবে বলেছেনঃ "তাদেরকে পেয়ে বসল চিৎকার।" [সূরা হূদঃ ৯৪]

(১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কুরআনই কুরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কুরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা হবে না। দেখুন- [ইবন কাসীর]

নিদর্শন নয়[১]?

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. আর আমরা যদি এটা কোন অনারবের উপর নাযিল করতাম

فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. এবং এটা সে তাদের কাছে পাঠ করত, তবে তারা তাতে ঈমান আনত না;

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০০. এভাবে আমরা সেটা অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চার করেছি[২]।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾

২০১. তারা এতে ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে;

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

২০২. সুতরাং তা তাদের কাছে এসে পড়বে

---

(১) অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলেমরা একথা জানে যে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা ঠিক সেই একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে দেয়া হয়েছিল। মক্কাবাসীরা কিতাবের জ্ঞান না রাখলেও আশেপাশের এলাকায় বনী ইসরাঈলের বিপুল সংখ্যক আলেম ও বিদ্বান রয়েছে। তারা জানে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ প্রথমবার তাদের সামনে কোন অভিনব ও অদ্ভুত "কথা" রাখেননি বরং হাজার হাজার বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ এই একই কথা বারবার এনেছেন। এ নাযিলকৃত বিষয়ও সেই একই রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এসেছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নাযিল করেছিলেন, এ কথাটি কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার জন্য যথেষ্ট নয়? [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতের কাছাকাছি আয়াত সূরা আল-হিজরের ১২ নং আয়াতেও এসেছে। সেখানে এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। মূলতঃ অনেকেই এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমরা এভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, কুফরী করা, অস্বীকার করা এবং সীমালঙ্ঘন করাকে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেই, তারা হক্ক এর প্রতি ঈমান আনবে না।" আরবী ভাষায় (سلك) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া, অনুপ্রবেশ করানো, চালিয়ে দেয়া বা গলিয়ে দেয়া। যেমন সুঁইয়ের ছিদ্রে সূতো গলিয়ে দেয়া হয়। কাজেই এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, অপরাধীদের অন্তরে এ কুরআন বারুদের মত আঘাত করে এবং তা শুনে তাদের মনে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যেন মনে হয় একটি গরম শলাকা তাদের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। সুতরাং তারা এটা সহ্য করতে পারবে না, এর উপর ঈমানও আনবে না। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

হঠাৎ করে; অথচ তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না।

২০৩. তখন তারা বলবে, 'আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে?'

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪. তারা কি তবে আমাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. আপনি ভেবে দেখুন, যদি আমরা তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই[১],

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬. তারপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের কাছে এসে পড়ে,

ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

২০৭. তখন যা তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছিল তা তাদের কি উপকারে আসবে?

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾

২০৮. আর আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না[২];

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

---

(১) এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তা'আলার একটি নেয়ামত। কিন্তু যারা এই নেয়ামতের না-শোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। আর এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কাফেরকে নিয়ে এসে জাহান্নামে এক প্রকার চুবিয়ে আনার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি তোমার জীবনে কখনো ভাল কিছু পেয়েছ? সে বলবেঃ হে প্রভূ! আপনার শপথ, কখনো পাইনি। অপরদিকে দুনিয়ার সবচেয়ে দূর্ভাগা ব্যক্তিকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি দুনিয়াতে কখনো কষ্ট পেয়েছ? সে বলবে, আপনার শপথ, হে আমার প্রভূ! কখনো নয়। [মুসলিমঃ ২৮০৭]

(২) অর্থাৎ আমি কোন জনপদ ধ্বংস করে দেয়ার পূর্বে সতর্ককারী ছিল, তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য। আমি যালেম নই। আল্লাহ্ তা'আলা বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেন না।

ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾

২০৯. (তাদের জন্য) স্মরণ হিসেবে, আর আমরা যুলুমকারী নই,

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾

২১০. আর শয়তানরা এটাসহ নাযিল হয়নি।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾

২১১. আর তারা এ কাজের যোগ্যও নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না ।

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾

২১২. তাদেরকে তো শোনার সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾

২১৩. অতএব আপনি অন্য কোন ইলাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সাথে ডাকবেন না, ডাকলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

২১৪. আর আপনার নিকটস্থ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে সতর্ক করুন।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾

২১৫. এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি আপনার পক্ষপুট অবনত করে দিন।

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾

২১৬. অতঃপর তারা যদি আপনার অবাধ্য হয় তাহলে আপনি বলুন, 'তোমরা যা কর নিশ্চয় আমি তা থেকে দায়মুক্ত।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾

২১৭. আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর,

الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান[১],

সে জন্য তিনি যুগে যুগে সতর্ককারী নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। [দেখুন-মুয়াস্‌সার] অনুরূপ আয়াত আরো দেখুন- সূরা আল-ইস্‌রাঃ ১৫, সূরা আল-কাসাসঃ ৫৯]

(১) এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে-
(এক) আপনি একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করুন যিনি আপনার হেফাজত

وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾

২১৯. এবং সিজ্‌দাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসা[১]।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾

২২০. তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾

২২১. তোমাদেরকে কি আমি জানাব কার কাছে শয়তানরা নাযিল হয়?

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾

২২২. তারা তো নাযিল হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে।

يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী[২]।

করবেন, আপনার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। যেমনটি অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- "আপনি আপনার প্রভূর নির্দেশের উপর ধৈর্য ধারণ করুন, কারণ আপনি আমাদের হেফাজতে রয়েছেন। আমাদের চক্ষুর সামনেই আছেন। [সূরা আত্-তূরঃ ৪৮]

(দুই) ইবনে আব্বাস বলেনঃ যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান।

(তিন) ইকরামা বলেনঃ যিনি তার কিয়াম, রুকূ', সিজ্‌দা ও বসা দেখেন।

(চার) কাতাদাহ্ বলেনঃ সালাতে দেখেন, যখন একা সালাত আদায় করেন এবং যখন জামা'আতে অন্যদের সাথে সালাত আদায় করেন। এটা ইকরামা, হাসান বসরী, আতা প্রমূখেরও মত। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাগভী]

(১) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে । এক, আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সময় নিজের মুকতাদীদের সাথে উঠা-বসা ও রুকূ'-সিজ্‌দা করেন তখন আল্লাহ আপনাকে দেখতে থাকেন। দুই, রাতের বেলা উঠে যখন নিজের সাথীরা (যাদের বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ হিসেবে "সিজদাকারী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) তাদের আখেরাত গড়ার জন্য কেমন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন তখন আপনি আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকেন না। তিন, আপনি নিজের সিজ্‌দাকারী সাথীদেরকে সংগে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তা অবগত আছেন। চার, সিজ্‌দাকারী লোকদের দলে আপনার যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর নজরে আছে। তিনি জানেন আপনি কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কিভাবে ও কেমন পর্যায়ে তাদের আত্মশুদ্ধি করছেন এবং কিভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন। [দেখুন-তবারী,বাগভী]

(২) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, শয়তানরা কিছু শুনে নিয়ে নিজেদের

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. আর কবিগণ, তাদের অনুসরণ তো বিভ্রান্তরাই করে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. আপনি কি দেখেন না যে, ওরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. এবং তারা তো বলে এমন কথা, যা তারা করে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. কিন্তু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, আল্লাহ্‌কে বেশী পরিমাণ স্মরণ করেছে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আর যালিমরা শীঘ্রই জানবে কোন ধরনের গন্তব্যস্থলে তারা ফিরে যাবে।

চেলাদেরকে জানিয়ে দেয় এবং তাতে সামান্যতম সত্যের সাথে বিপুল পরিমাণ মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মিথ্যুক-প্রতারক গণকরা শয়তানের কাছ থেকে কিছু শুনে নেয় এবং তারপর তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেকটা মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের কানে ফুঁকে দিতে থাকে। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর] একটি হাদীসে এর আলোচনা এসেছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তিনি বলেন, ওসব কিছুই নয়। তারা বলে, হে আল্লাহর রাসূল ! কখনো কখনো তারা তো আবার ঠিক সত্যি কথাই বলে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, সত্যি কথাটা কখনো কখনো জিনেরা নিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদের কানে ফুঁকে দেয় তারপর তারা তার সাথে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি কাহিনী তৈরী করে। [বুখারী: ৩২১০]

২৭- সূরা আন-নাম্‌ল, ৯৩ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ النَّمْلِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত্বা-সীন; এগুলো আল-কুরআন এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (১);

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝١

২. পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য(২)।

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

৩. যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে(৩)।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٣

---

(১) "সুস্পষ্ট কিতাবের" একটি অর্থ হচ্ছে, এ কিতাবটি নিজের শিক্ষা, বিধান ও নিদের্শগুলো একেবারে দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে দেয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এ আয়াতগুলো হচ্ছে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। যার অর্থ "পথনির্দেশকারী" ও "সুসংবাদদানকারী"। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো কেবলমাত্র এমনসব লোকদেরই পথ নির্দেশনা দেয় এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদও একমাত্র এমনসব লোকদের দান করে যাদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, তারা ঈমান আনে এবং সে ঈমান অনুসারে আমল করে। ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে তারা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করে। এক আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র উপাস্য ও রব বলে মেনে নেয়। কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করে নেয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করে। আর আমল করার অর্থ হচ্ছে, তারা এ বিষয়গুলো কেবলমাত্র মেনে নিয়েই বসে থাকে না বরং কার্যত এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তারা ঈমান রাখে যে, এ জীবনের পর দ্বিতীয় আর একটি জীবন আছে, সেখানে আমাদের নিজেদের কাজের হিসেব দিতে এবং প্রত্যেকটি কাজের প্রতিদান লাভ করতে হবে। এ দু'টি শর্ত যারা পূর্ণ করবে কুরআন মজীদের আয়াত তাদেরকেই দুনিয়ায় সত্য সরল পথের সন্ধান দেবে। [ইবন কাসীর] এ পথের প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। তাদেরকে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার ফল দুনিয়ায় যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তারই বদৌলতে চিরন্তন সফলতা

৪. নিশ্চয় যারা আখেরাতে ঈমান আনে না, তাদের জন্য তাদের কাজকে আমরা শোভন করেছি[১], ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়;

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾

৫. এদেরই জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং এরাই আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত[২]।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾

৬. আর নিশ্চয় আপনি আল-কুরআন প্রাপ্ত হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট থেকে[৩]।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য।' আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন এদের (অন্তরের) উপর অন্ধত্ব তৈরী করবে।" [সূরা ফুসসিলাত:৪৪]

(১) এখানে বলা হয়েছে যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না আমরা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকে উত্তম মনে করে পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। এটা এ জন্যই যে, তারা আখেরাতকে অস্বীকার করেছে। [ইবন কাসীর] সুতরাং আখেরাতকে অস্বীকার করাই তাদের জন্য যাবতীয় পতনের মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হলো। এক গুনাহ অন্য গুনাহর কারণ হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি তেমনি আমরাও তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দেব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেব।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১১০]

(২) এ নিকৃষ্ট শাস্তিটি কিভাবে, কখন ও কোথায় হবে। তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কারণ তা ব্যাপক, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি। [ইবন কাসীর] এ দুনিয়ায়ও বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও জাতি নানাভাবে এ শাস্তি লাভ করে থাকে। এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় একেবারে মৃত্যুর দ্বারদেশেও যালেমরা এর একটি অংশ লাভ করে। মৃত্যুর পরে "আলমে বরযখে"ও (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়) মানুষ এর মুখোমুখি হয়। আর তারপর হাশরের ময়দানে এর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং তারপর এক জায়গায় গিয়ে তা আর কোনদিন শেষ হবে না।

(৩) অর্থাৎ এ কুরআনে যেসব কথা বলা হচ্ছে এগুলো কোন উড়ো কথা নয়। এগুলো কোন মানুষের আন্দাজ অনুমান ও মতামত ভিত্তিকও নয়। বরং এক জ্ঞানবাদ প্রাজ্ঞ সত্তা এগুলো নাযিল করেছেন। যাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধে রয়েছে প্রাজ্ঞতা। তিনি

৭. স্মরণ করুন, যখন মূসা তার পরিবারের লোকদেরকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি আগুন দেখেছি, অচিরেই আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব জলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার[১]।'

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

৮. অতঃপর তিনি যখন সেটার কাছে আসলেন[২], তখন ঘোষিত হল, 'বরকতময়, যা আছে এ আলোর মধ্যে এবং যা আছে এর চারপাশে[৩],

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

নিজের সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণ এবং তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, অনুরূপ ছোট বড় সবকিছু সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। বান্দাদের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্য তাঁর জ্ঞান সর্বোত্তম কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাঁর পাঠানো যাবতীয় সংবাদ কেবল সত্য আর সত্য। তাঁর দেয়া যাবতীয় বিধান ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ।" [সূরা আল-আন'আম: ১১৫] [ইবন কাসীর]

(১) মূসা আলাইহিসসালাম এ স্থলে দু'টি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক, হারানো পথ জিজ্ঞাসা। দুই, আগুন থেকে উত্তাপ সংগ্রহ। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। [বাগভী] এ ব্যাপারে আরও আলোচনা পূর্বে সূরা ত্বা-হা এর ১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে।

(২) যখন তিনি গাছের কাছে আসলেন, তখন তিনি ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক এক দৃশ্য দেখতে পেলেন, তিনি সেখানে দেখতে পেলেন সবুজ গাছে আগুন জ্বলছে। আর সে আগুনে শুধু আলোর তীব্রতাই প্রকাশ পাচ্ছে। অপরদিকে গাছটিতেও সবুজতা ও সজীবতা বেড়েই চলেছে। তারপর তিনি তার মাথা উপরের দিকে উঠালেন, দেখলেন সে নূর আকাশ পর্যন্ত ছেয়ে আছে। ইবন আব্বাস বলেন, এটা কোন আগুন ছিল না। বরং জ্বলে উঠার মত আলো ছিল। তখন মূসা আলাইহিস সালাম আশ্চর্যান্বিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর তখনই বলা হল, যিনি আগুনে আছেন তিনি বরকতময় হোন। ইবন আব্বাস বলেন, বরকতময় হওয়ার অর্থ, পবিত্র ও মহিয়ান হওয়া। আর তার পাশে যারা আছে তারা হচ্ছেন ফিরিশতা। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে আল্লাহ্‌র বাণীঃ "বরকতপূর্ণ হয়েছে, যা আছে এ আলোর মধ্যে এবং যা আছে এর চারপাশে" এর মধ্যে আলোতে কে আছে এবং আলোর চারপাশে কি আছে তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

আর সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত[১]!

এক, এখানে 'অগ্নিতে যা আছে' তা দ্বারা মূসা আলাইহিসসালামকে বুঝানো হয়েছে। আর তখন 'এর চারপাশে যা আছে' তা বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশ্‌তাদেরকে বুঝানো হবে। [বাগভী; কুরতুবী]
দুই, কোন কোন মুফাসসির এখানে 'অগ্নিতে যা আছে' বলে ফেরেশ্‌তাদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং 'এর চারপাশে যা আছে' তা বলে মূসা আলাইহিসসালামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। [বাগভী]
তিন, 'এখানে অগ্নিতে যা আছে' তা বলে আল্লাহর নূরকে বুঝানো হয়েছে, আর 'এর চারপাশে যা আছে' তা বলে ফেরেশ্‌তা [ইবন কাসীর] অথবা মূসা বা সেই পবিত্র উপত্যকা অথবা সে গাছ সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে কোন অবস্থাতেই এখানে 'অগ্নিতে যা আছে' দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও মহান সত্তা বুঝানো হবে না। কেননা স্রষ্টা তাঁর আরশে রয়েছেন। কোন সৃষ্টিবস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না। এটা তাওহীদের পরিপন্থী কথা। সুতরাং রাব্বুল আলামিনের নূরের আলোর দ্বারাই সে গাছ কোন ভাবে আলোকিত হয়েছিল। তবে সরাসরি কোন আলো কোথায় পতিত হলে তা ভস্ম হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ ঘুমান না, ঘুমানো তার জন্য সমীচীনও নয়, ইনসাফের পাল্লা বাড়ান এবং কমান, দিবাভাগের আগেই রাতের আমল তার কাছে উত্থিত হয় অনুরূপভাবে রাত্রি আগমণের আগেই তার কাছে দিবাভাগের আমল উত্থিত হয়। তাঁর পর্দা হলো নূরের। যদি তিনি তার পর্দাকে অপসারণ করেন তবে তা তার চেহারার আলো দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদুর জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।"[সহীহ মুসলিমঃ ১৭৯]

(১) অর্থাৎ তিনি আরশের উপর থেকেও যমীনে এক গাছের উপরে তাঁর আলো ফেলে সেখান থেকে তাঁর বান্দা মূসার সাথে কথা বলছেন। তিনি অত্যন্ত মহান ও পবিত্র, তিনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। তাঁর সত্তা, গুণাগুণ ও কার্যধারা কোন কিছুই কোন সৃষ্টজীবের মত হতে পারে না। তাঁর সৃষ্ট কোন কিছু তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না। আসমান ও যমীন তাঁকে ঘিরে রাখতে পারে না। তিনি সুউচ্চ, সুমহান, সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক। [ইবন কাসীর] তিনি এ গাছের উপর থেকে কথা বললেও এটা যেন কেউ মনে না করে বসে যে, তিনি সৃষ্ট কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করেছেন। এ আয়াতাংশ বলার উদ্দেশ্য সম্ভবত এও হতে পারে যে, দুনিয়াতে অধিকাংশ শির্ক সংঘটিত হয়েছে আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। তাঁর কোন দৃষ্টি কোন কিছুর উপর পতিত হলে মানুষ সেটাকেই ইলাহ মনে করে পুজা করতে আরম্ভ করে। যদি আল্লাহকে সঠিকভাবে তাঁর মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি দেয়া হতো তা হলে কেউ শির্কে লিপ্ত হতো না। তাই এখানে তাঁকে এ ধরণের কাজ থেকে মুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

৯. 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্[১]! পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,

يٰمُوسٰٓى إِنَّهٗٓ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩

১০. 'আর আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন।' তারপর যখন তিনি সেটাকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখলেন তখন তিনি পিছনের দিকে ছুটতে লাগলেন[২] এবং ফিরেও তাকালেন না। 'হে মূসা! ভীত হবেন না, নিশ্চয়

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوسٰى لَا تَخَفْ ۖ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ ۝١٠

(১) মূসা আলাইহিসসালামের এ ঘটনা কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে, ﴿إِنِّىٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ۝ إِنَّنِىٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَاعْبُدْنِى ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىٓ﴾ "আমিই আপনার রব, অতএব আপনার পাদুকা খুলে ফেলুন, কারণ আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন। এবং আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী পাঠানো হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শুনেন। 'আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার 'ইবাদাত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কয়েম করুন"। [সূরা ত্বা-হাঃ ১২-১৪] অনুরূপভাবে সূরা আল-কাসাসে বলা হয়েছে, ﴿فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُودِىَ مِن شٰطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يٰمُوسٰىٓ إِنِّىٓ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ﴾ "যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমির উপর অবস্থিত একটি গাছের দিক থেকে তাঁকে ডেকে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকুলের রব;" [সূরা আল-কাসাসঃ ৩০] এ সূরাত্রয়ের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নরূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড়ের কাছে এক গাছে মূসা আলাইহিসসালামকে তাঁর আলো দেখালেন।

আয়াত থেকে এটাই জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, যিনি তাকে সম্বোধন করছেন, তার সাথে আলাপ করছেন, তিনি তার একমাত্র প্রবল পরাক্রমশালী রব, যিনি সবকিছুকে তাঁর ক্ষমতা, প্রভাব, ও শক্তি দিয়ে অধীন করে রেখেছেন। তিনি তাঁর প্রতিটি কাজ ও কথা প্রজ্ঞার সাথে সম্পন্ন করেন। [ইবন কাসীর]

(২) সূরা আল-আ'রাফে ও সূরা আশ-শু'আরাতে এ জন্য ثعبان (অজগর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একে جآنّ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। "জান" শব্দটি বলা হয় ছোট সাপ অর্থে। এখানে "জান"শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক দিক দিয়ে সাপটি ছিল অজগর কিন্তু তার চলার দ্রুততা ছিল ছোট সাপদের মতো। সূরা ত্বা-হা-য় ﴿حَيَّةٌ تَسْعٰى﴾ (ছুটন্ত সাপ) এর মধ্যেও এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি এমন যে, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না(১);

১১. 'তবে যে যুলুম করে,(২) তারপর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎকাজ করে, তাহলে নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

১২. 'আর আপনি আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ অবস্থায় । এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত(৩) । তারা তো ছিল ফাসেক সম্প্রদায় ।'

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِى تِسْعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿١٢﴾

১৩. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমাদের নিদর্শনসমূহ দৃশ্যমান হল, তারা বলল, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু ।'

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

---

(১) অর্থাৎ আমার কাছে রাসূলদের ক্ষতি হবার কোন ভয় নেই । রিসালাতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য যখন আমি কাউকে নিজের কাছে ডেকে আনি তখন আমি নিজেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকি । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে বলা হয়েছে, 'তবে যে যুলুম করে' অর্থাৎ যে যুলুম করে সে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা পেতে পারে না । অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের বলা হয়েছে অর্থাৎ নবী-রাসূলদের কথা, তাদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে না । পূর্ববর্তী আয়াতে নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বিধানের পর কারা নিরাপত্তা পাবে না তাদের আলোচনা করা হচ্ছে । কারণ, নবীগণ নিষ্পাপ । [ইবন কাসীর]

(৩) সূরা আল্-ইসরায় বলা হয়েছে মূসাকে আমি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরনের নয়টি নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছিলাম । সূরা আল-আ'রাফে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ (১) লাঠি, যা অজগর হয়ে যেতো (২) হাত, যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যের মতো ঝিকমিক করতো । (৩) যাদুকরদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাজিত করা (৪) মূসার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া । (৫) বন্যা ও ঝড় (৬) পংগপাল (৭) সমস্ত শস্য গুদামে শস্যকীট এবং মানুষ-পশু নির্বিশেষে সবার গায়ে উকুন । (৮) ব্যাঙয়ের আধিক্য (৯) রক্ত । [দেখুন, সূরা আল-আ'রাফ: ১৩৩]

১৪. আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল[১]। সুতরাং দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৫. আর অবশ্যই আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম[২]

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ

(১) কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, যখন মূসা আলাইহিস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী মিসরের উপর কোন সাধারণ বালা-মুসীবত নাযিল হতো তখন ফির'আউন মূসাকে বলতো, আপনার আল্লাহর কাছে দো'আ করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন তারপর আপনি যা বলবেন তা মেনে নেবো। কিন্তু যখন সে বিপদ সরে যেতো তখন ফির'আউন আবার তার আগের হঠকারিতায় ফিরে যেতো। [সূরা আল-আ'রাফঃ১৩৪ এবং সূরা আয্‌ যুখরুফঃ ৪৯-৫০] তাছাড়া এমনিতেও একটি দেশের সমগ্র এলাকা দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও ঘূর্ণি কবলিত হওয়া, সারা দেশের উপর পংগপাল ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ব্যাঙ ও শস্যকীটের আক্রমণ কোন জাদুকরের তেলসমাতি হতে পারে বলে কোনক্রমেই ধারণা করা যেতে পারে না। এগুলো এমন প্রকাশ্য মু'জিযা ছিল যেগুলো দেখে একজন নিরেট বোকাও বুঝতে পারতো যে, নবীর কথায় এ ধরনের দেশ ব্যাপী বালা-মুসীবতের আগমন এবং আবার তার কথায় তাদের চলে যাওয়া একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই হস্তক্ষেপের ফল হতে পারে। এ কারণে মূসা ফির'আউনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেনঃ "তুমি খুব ভালো করেই জানো, এ নিদর্শনগুলো পৃথিবী ও আকাশের মালিক ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি।" [সূরা আল-ইসরাঃ ১০২] কিন্তু যে কারণে ফির'আউন ও তার জাতির সরদাররা জেনে বুঝে সেগুলো অস্বীকার করে তা এই ছিলঃ "আমরা কি আমাদের মতই দু'জন লোকের কথা মেনে নেবো, অথচ তাদের জাতি আমাদের গোলাম ?" [সূরা আল-মুমিনূনঃ৪৭]

(২) এখানে নবীদের নবুওয়ত-রেসালত সহ যাবতীয় প্রশস্ত জ্ঞান সবই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর; জালালাইন; সা'দী] যেমন দাউদ আলাইহিসসালামকে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। নবীগণের মধ্যে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাসসালাম এই বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন যে, তাদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। তাদেরকে বিচার-ফয়সালার জ্ঞানও প্রদান করা হয়েছিল। সুলাইমানের রাজত্ব এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়- জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তার শাসন ক্ষমতা ছিল।

الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی كَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿١٥﴾

এবং তারা উভয়ে বলেছিলেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন(১) ।’

وَوَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا

১৬. আর সুলাইমান হয়েছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী(২) এবং তিনি বলেছিলেন,

---

(১) আসলে আল্লাহর দেয়া যে ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। কারণ, এ ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য তাদেরকে প্রকৃত মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফির‘আউন শাসন ক্ষমতা ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, এগুলো লাভ করেছিল এবং দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামও সে ধরনের নেয়ামত লাভ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতা তাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে তা বর্ণনার জন্যই এখানে সুলাইমান আলাইহিসসালামের ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) উত্তরাধিকার বলে এখানে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে- আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। [ইবন কাসীর] কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমরা নবীগোষ্ঠি আমরা কাউকে ওয়ারিশ করি না” [মুসনাদে আহমাদঃ২/৪৬৩, মুসনাদে হুমাইদীঃ ২২] অর্থাৎ নবীগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাদের উত্তরাধিকার হয় না। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু নবীগণ দীনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না বরং তারা জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করে থাকেন। সুতরাং যে কেউ সেটা গ্রহণ করতে পেরেছে সে তা পূর্ণরূপেই গ্রহণ করতে পেরেছে”। [আবুদাউদঃ ৩৬৪১, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৯৬] অর্থাৎ আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু নবীগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে-আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, দাউদ আলাইহিসসালামের মৃত্যুর সময় তার আরও সন্তান ছিল। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে সুলাইমান আলাইহিসসালামকে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে বুঝা গেল যে, এখানে উত্তরাধিকার বলতে নবুওয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে। [বাগভী] এর সাথে আল্লাহ্ তা‘আলা দাউদ আলাইহিসসালামের রাজত্বও সুলাইমান আলাইহিসসালামকে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তার রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার এবং বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ূকে তার নির্দেশাধীন করে দেন।

مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

'হে মানুষ! আমাদেরকে[১] পাখিদের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেয়া হয়েছে[২], এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।'

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

১৭. আর সুলাইমানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে---জিন্ মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে[৩]।

(১) লক্ষণীয় যে, এখানে সুলাইমান আলাইহিসসালাম 'আমাদেরকে' বলে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন অথচ তিনি একজন মাত্র। অধিকাংশ আলেমদের মতে শুধু তাকেই আল্লাহ্ তা'আলা পশু-পাখিদের ভাষার জ্ঞান দিয়েছিলেন। সে জন্য আলেমগণ বলেন, সুলাইমান আলাইহিসসালাম একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে তার প্রতি সম্মান ও ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও সুলাইমান আলাইহিসসালামের আনুগত্যে শৈথিল্যও প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্ণর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধিনস্থদের উপস্থিতিতে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে না হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; আত-তাহ্‌রীর ওয়াত তানওয়ীর] আমরা চিন্তা করলে আরো বুঝতে পারব যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজ সত্তাকে কুরআনের অধিকাংশ স্থানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, এটাও তাঁর নিজের সম্মান, প্রতিপত্তি প্রকাশের জন্য। যাতে বান্দাগণ তাঁর মত মহান সত্তার ব্যাপারে সাবধান হয়। তাছাড়া একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্যই বহু-বচনের শব্দ অহংকার ও গর্ব সহকারে বলার অধিকার রয়েছে, আর কারও সেটা নেই। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ: ৩/৪৪৮; ইবন ফারিস, মু'জামু মাকায়ীসুল লুগাহ: ৩৫৩; ইবন কুতাইবাহ, শারহু মুশকিলিল কুরআন: ২৯৩]

(২) সবকিছু বলতে এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, একজন নবী ও বাদশাহর জন্য যা যা দরকার তার সবই আমাকে দেয়া হয়েছে। [সা'দী; মুয়াসসার] 'আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমার কাছে আছে' একথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য। সুলাইমান অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা বলেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দান ও দাক্ষিণ্যের শোকর আদায় করা। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) يوزعون শব্দটি وزع শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ, বিরত রাখা। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘুরাপিরা না করে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় চলাফেরা করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। [মুয়াসসার]

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوۡا عَلٰى وَادِ النَّمۡلِ ۙ قَالَتۡ نَمۡلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمۡلُ ادۡخُلُوۡا مَسٰكِنَكُمۡ ۚ لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمٰنُ وَجُنُوۡدُهٗ ۙ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮. অবশেষে যখন তারা পিপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপড়া বলল, 'হে পিপড়া-বাহিনী! তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পায়ের নীচে পিষে না ফেলে।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنۡ قَوۡلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِىۡۤ اَنۡ اَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰٮهُ وَاَدۡخِلۡنِىۡ بِرَحۡمَتِكَ فِىۡ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯. অতঃপর সুলাইমান তার এ কথাতে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন[১] যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি এমন সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন[২]। আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার

---

(১) এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন। আমাকে ইলহাম করুন। [মুয়াসসার] যাতে আমি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কারণ, আপনি আমাকে পাখি ও জীবজন্তুর কথা বুঝতে শিখিয়েছেন। আর আমার পিতার উপর নেয়ামত দিয়েছেন যে, তিনি আপনার কাছে আত্মসমর্পন করেছেন এবং ঈমান এনেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে সৎকাজ করার সাথে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, 'যা আপনি পছন্দ করেন' অর্থাৎ যাতে আপনার সন্তুষ্টি বিধান হয়। এর দ্বারা মূলতঃ কবুল হওয়াই উদ্দেশ্য। তখন আয়াতের অর্থ হবে, হে আল্লাহ্! আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। নবী-রাসূলগণ তাদের সৎকর্মসমূহ মাকবুল হওয়ার জন্যেও দো'আ করতেন; যেমন ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস্‌সালাম কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দো'আ করেছিলেনঃ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا﴾ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে তা কবুল করুন"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১২৭] এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কাকুতি-মিনতির মাধ্যমে দো'আ করা উচিত।

সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করুন(১)।'

২০. আর সুলাইমান পাখিদের সন্ধান নিলেন(২) এবং বললেন, 'আমার কি হলো(৩) যে, আমি হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ۝

(১) সুলাইমান আলাইহিসসালাম এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়ার দরখাস্ত করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, জান্নাতে যাওয়া আল্লাহ্‌র রহমতের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না। হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আপনিও কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও না, তবে যদি আমাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পরিবেষ্টন করে" [বুখারীঃ ৫৩৪৯, ৬৮০৮, ৬০৯৮, মুসলিমঃ ২৮১৬]

(২) 'সন্ধান নেয়া'র দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই সুলাইমান আলাইহিসসালাম এ সন্ধান ও খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ কাজটি করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার খেলাফতের আমলে নবীদের এ সুন্নাতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তার জীবনীতে উল্লেখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন বাঘ কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে। এ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের নবী-রাসূলদের রীতি-নীতি যা তারা তাদের অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তা বাস্তবায়িত করেছেন। যার ফলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ, শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।[দেখুন, কুরতুবী]

(৩) সুলাইমান আলাইহিসসালাম বললেন, 'আমার কি হলো যে, আমি হুদহুদকে দেখছিনা' কথাটি অন্যভাবেও বলা যেত, যেমনঃ হুদহুদের কি হল যে, সে উপস্থিত নেই? বা হুদহুদ কোথায় গেল? কথাটি এভাবে নিজের দিকে সম্বোধন করার কারণ কোন কোন মুফাসসিরের মতে এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য বিহংগকুল তার অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্‌

না! না কি সে অনুপস্থিত?

২১. 'আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা তাকে যবেহ্ করব[১] অথবা সে আমার নিকট উপযুক্ত কারণ দর্শাবে[২]।'

لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

২২. কিছুক্ষণ পরেই হুদ্‌হুদ্ এসে পড়ল এবং বলল, 'আপনি যা জ্ঞানে পরিবেষ্টন করতে পারেননি আমি তা পরিবেষ্টন করেছি[৩] এবং 'সাবা'[৪] হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩. 'আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে[৫]।

إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ

তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে সুলাইমান আলাইহিসসালামের মনে এ আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবতঃ আমার কোন ক্রটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখি অর্থাৎ হুদহুদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? এটা একধরনের মুহাসাবাতুন-নাফস বা আত্মসমালোচনা। আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতকে ধরে রাখার জন্য এটা খুব জরুরী বিষয়। [কুরতুবী]

(১) এ আয়াত থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা পাই, এক. শাস্তি দিতে হবে অপরাধ মোতাবেক শরীর মোতাবেক নয়। দুই. যদি কোন পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করে তবে প্রয়োজনমাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেয়া জায়েয। তবে বিনা কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া জায়েয নেই। [কুরতুবী]

(২) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তা গ্রহণ করা উচিত। [দেখুন, তাবারী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবী-রাসূলগণ গায়েব জানেন না। তাদেরকে আল্লাহ্ যতটুকু জ্ঞান দান করেন তাই শুধু জানতে পারেন। [কুরতুবী]

(৪) সাবা ছিল আরবের দক্ষিণ এলাকার একটি বিখ্যাত ব্যবসাজীবী জাতি। তাদের রাজধানী মারিব বর্তমান ইয়ামানের রাজধানী সান্'আ থেকে তিন দিনের পথের দূরত্বে (৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে) অবস্থিত ছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(৫) 'সাবা' জাতির এ সম্রাজ্ঞীর নাম কোন কোন বর্ণনায় বিলকীস বিনত শারাহীল বলা

شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

তাকে দেয়া হয়েছে সকল কিছু হতেই[1] এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. 'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করছে[2]। আর শয়তান[3] তাদের কার্যাবলী তাদের

হয়েছে।[ইবন কাসীর] এ আয়াত থেকে কোন ক্রমেই নারীদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর প্রমাণ নেয়া জায়েয নয়। কারণ, এটা ছিল বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা। ইসলাম গ্রহণের পরে সুলাইমান আলাইহিসসালাম তাকে এ পদে বহাল রেখেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তদুপরি ইসলামী শরীয়তে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শোনলেন যে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছে তখন তিনি বললেনঃ "যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না।" [বুখারীঃ ৪১৬৩] এ কারণেই আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং সালাতের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসনকর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। [কুরতুবী; উসাইমীন, তাফসীরু সূরাতায়িল ফাতিহা ওয়াল বাকারাহ: ৩/১০৬]

(১) অর্থাৎ একজন রাষ্ট্রনায়কের যা প্রয়োজন সে সবই তার আছে।[কুরতুবী; ইবন কাসীর] সে যুগে যেসব বস্তু অনাবিস্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়।

(২) এ থেকে জানা যায়, সেকালে এ জাতিটি সূর্যের পূজা করতো। আরবের প্রাচীন বর্ণনাগুলো থেকেও এ জাতির এ একই ধর্মের কথা জানা যায়।[আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) বক্তব্যের ধরণ থেকে অনুমিত হয় যে, হুদহুদের বক্তব্য এর পূর্বের অংশটুকু। অর্থাৎ "সূর্যের সামনে সিজদা করে" পর্যন্ত তার বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। এরপর এ উক্তিগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। [কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এ অনুমানকে যে জিনিস শক্তিশালী করে তা হচ্ছে এ বাক্যটি "আর তিনি সবকিছু জানেন, যা তোমরা লুকাও এবং প্রকাশ করো।" এ শব্দগুলো থেকে প্রবল ধারণা জন্মে যে, বক্তা হুদ্‌হুদ এবং শ্রোতা সুলাইমান ও তার দরবারীগণ নন বরং বক্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি সম্বোধন করছেন মক্কার মুশরিকদেরকে, যাদেরকে নসিহত করার জন্যই এ কাহিনী শুনানো হচ্ছে। তবে কারও কারও মতে পুরো কথাটিই হুদহুদের। [তাবারী]

কাছে সুশোভিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধাগ্রস্থ করেছে, ফলে তারা হেদায়াত পাচ্ছেনা;

২৫. ‘নিবৃত্ত করেছে এ জন্যে যে, তারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের লুক্কায়িত বস্তুকে বের করেন[১]। আর যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর।

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝٢٥

২৬. ‘আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি মহা‘আরশের রব[২]।’

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ۝٢٦

২৭. সুলাইমান বললেন, ‘আমরা দেখব তুমি কি সত্য বলেছ, নাকি তুমি মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত?

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝٢٧

২৮. ‘তুমি যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর;

اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

---

(১) যিনি প্রতিমুহূর্তে এমন সব জিনিসের উদ্ভব ঘটাচ্ছেন যেগুলো জন্মের পূর্বে কোথায় কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউ জানে না। ভূ-গর্ভ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য উদ্ভিদ, বিভিন্ন ধরনের রিযিক এবং নানা ধরনের খনিজ পদার্থ বের করছেন। উর্ধ্ব জগত থেকে প্রতিনিয়ত এমন সব জিনিসের আর্বিভাব ঘটাচ্ছেন, যার আবির্ভাব না ঘটলে মানুষের ধারণা ও কল্পনায়ও কোনদিন আসতে পারতো না। যেমন বৃষ্টির পানি। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তিনি সবচেয়ে প্রকাণ্ড সৃষ্টি আরশের রব। আর যেহেতু হুদহুদ কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী, এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত প্রদানকারী, একমাত্র তাঁর জন্যই সিজদা করার আহ্বান করে থাকে, তাই হাদীসে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। [দেখুন, আবু দাউদ: ৫২৬৭; ইবন মাজাহ: ৩২২৪]
এ আয়াত পড়ার পর সিজদা করা ওয়াজিব। [দেখুন, কুরতুবী; আদওয়াউল বায়ান] এখানে সিজদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মুমিনের সূর্যপূজারীদের থেকে নিজেকে সচেতনভাবে পৃথক করা এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে একথার স্বীকৃতি দেয়া ও একথা প্রকাশ করা উচিত যে, সে সূর্যকে নয় বরং একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই নিজের সিজদার ও ইবাদাতের উপযোগী এবং যোগ্য মনে করে।

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

তারপর তাদের কাছ থেকে সরে থেকো[১] এবং লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কী?'

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯. সে নারী বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র[২] দেয়া হয়েছে;

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩০. 'নিশ্চয় এটা সুলাইমানের কাছ থেকে এবং নিশ্চয় এটা রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে[৩],

---

(১) সুলাইমান আলাইহিসসালাম হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য। [কুরতুবী]

(২) সম্মানিত পত্র বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতেঃ মোহরাঙ্কিত পত্র বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] অথবা এর কারণ, পত্রটি এসেছে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক পথে। কোন রাষ্ট্রদূত এসে দেয়নি। বরং তার পরিবর্তে এসেছে একটি পাখি। কারও কারও মতে, যখন তিনি দেখলেন যে, একটি হুদহুদ এটি বয়ে এনেছে আর সে হুদহুদ আদব রক্ষা করে সরে দাঁড়িয়েছে, তার বুঝতে বাকী রইল না যে, এটা কোন সম্মানিত ব্যক্তি থেকেই এসে থাকবে। তারপর যখন চিঠি পড়লেন, তখন বুঝলেন যে, এটি নবী সুলাইমানের পক্ষ থেকে। সুতরাং নবীর পত্র অবশ্যই সম্মানিত হবে। পূর্বোক্ত দিকনির্দেশনাগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি কারণেও পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। পত্রটি শুরু করা হয়েছে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে। সর্বোপরি যে বিষয়টি এর গুরুত্ব আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, পত্রে আমাকে একেবারে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে, আমি যেন অবাধ্যতার পথ পরিহার করে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করি এবং হুকুমের অনুগত বা মুসলিম হয়ে সুলাইমানের সামনে হাজির হয়ে যাই। আর এতে এটাও বলা হয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তাদের কারও নেই। এসবই প্রমাণ করে যে চিঠিটি অত্যন্ত সম্মানিত। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) এ একটি আয়াতে অনেকগুলো পথনির্দেশ বা হেদায়াত রয়েছেঃ তন্মধ্যে সর্বপ্রথম দিকনির্দেশ এই যে, পত্রের প্রারম্ভেই প্রেরকের নাম লেখা নবীদের সুন্নাত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, 'কোথা থেকে এলো?' এরূপ খোঁজাখুঁজি

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

৩১. 'যাতে তোমরা আমার বিরোধিতার ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করো এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও[১]।'

তৃতীয় রুকূ'

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

৩২. সে নারী বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমার এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত দাও[২]। আমি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত

করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এভাবেই তার যাবতীয় পত্র লিখতেন। এতে ছোট-বড় ভেদাভেদ করা উচিত নয়। কারণ সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চিঠি লিখতেন তখনও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। যেমন, রাসূলের কাছে লিখা 'আলা ইবনুল হাদরামীর চিঠি। তবে এটা জানা আবশ্যক যে, এর বিপরীত করলে সুন্নাত মোতাবেক না হলেও তা জায়েয। বর্তমানে খামের উপর প্রেরকের নাম লিখা থাকলে তার মাধ্যমে উপরোক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। আলোচ্য ঘটনাতে দ্বিতীয় দিকনির্দেশ হলো, পত্রের উত্তর দেয়া উচিত। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা পত্রের উত্তর দেয়াকে সালামের উত্তরের মত ওয়াজিব মনে করতেন। এখানে তৃতীয় আরেকটি দিক নির্দেশ হলো, বিসমিল্লাহ লেখা। তবে এখানে দেখা যায় যে, আগে প্রেরকের নাম লিখার পর বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রেরকের নামের পরে বিসমিল্লাহ্ লিখা জায়েয প্রমাণিত হলো। যদিও আগেই বিসমিল্লাহ লেখার নিয়ম বেশী প্রচলিত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ কাজটি বেশী করতেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) "মুসলিম" হয়ে হাযির হবার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, অনুগত হয়ে হাযির হয়ে যাও। দুই, তাওহীদবাদী হয়ে যাও বা দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে হাযির হয়ে যাও। প্রথম হুকুমটি সুলাইমানের শাসকসুলভ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। দ্বিতীয় হুকুমটি সামঞ্জস্য রাখে তার নবীসুলভ মর্যাদার সাথে। [বাগভী; ইবন কাসীর] সম্ভবত এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পত্রে উভয় উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে।

(২) أَفْتُونِي শব্দটি فتوى শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলাইমান আলাইহিসসালামের পত্র পৌঁছল তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া ।

৩৩. তারা বলল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন ।'

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. সে নারী বলল, 'রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তো সেটাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্ত করে, আর এরূপ করাই তাদের রীতি[১];

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. 'আর আমি তো তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি, দূতেরা কী

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ

মনোরঞ্জনের জন্য একথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না ।[ফাতহুল কাদীর] এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে সম্পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল । এ থেকে বোঝা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করার পদ্ধতি সুপ্রাচীন । ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বিভিন্ন কাজে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাকে পরামর্শ করার নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে । [বাগভী; কুরতুবী]

(১) আর এরূপ করাই তাদের রীতি । এ কথাটি যদি 'সাবা' সম্রাজ্ঞীর হয় তবে এর অর্থ দু'টি হতে পারেঃ এক, কথাটি তিনি আগের কথার তাকিদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন । অর্থাৎ রাজা বাদশাহগণ কোন দেশ জোর করে দখল করেন তখন সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের অসম্মানিত করে তাদের মনে ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা তাদের চিরাচরিত নিয়ম । [মুয়াসসার] দুই, অথবা তিনি একথা বলতে চেয়েছেন যে, যেহেতু রাজা-বাদশাহগণ এরূপ করে থাকেন তাই সুলাইমান ও তার সৈন্য-সামন্তরা অনুরূপ কাজই করবে । [জালালাইন] আর যদি এ কথাটি আল্লাহ্‌র কথা হয় তবে তা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা সাবা সম্রাজ্ঞীর কথাকে বাস্তব বলে স্বীকৃতি দিলেন । [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

الْمُرْسَلُونَ ۝

নিয়ে ফিরে আসে[১]।'

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝

৩৬. অতঃপর দূত সুলাইমানের কাছে আসলে সুলাইমান বললেন, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট[২] বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল

(১) বিলকীস সুলাইমান আলাইহিসসালামকে পরীক্ষা করার মনস্থ করলেন। তিনি কি নবী নাকি আধিপত্যবাদী অর্থলিপ্সু কোন অত্যাচারী শাসক। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনকে বেশী গুরুত্ব দেন নাকি আধিপত্য বিস্তারের গুরুত্ব তার কাছে বেশী। এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকিসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি নবী হলে তার আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। [দেখুন, ইবন কাসীর] এ পরীক্ষার জন্য তিনি সুলাইমান ও তার সভাষদদের জন্য কিছু উপঢৌকন পাঠালেন। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি নবী হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে সুলাইমান আলাইহিসসালাম হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করেননি। এটা কি এ জন্যে যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নেই নাকি তিনি এজন্যে গ্রহণ করেননি যে, ঈমান ও ইসলাম ছাড়া তার কাছে আর কোন কিছুর তেমন গুরুত্বই নেই। শেষোক্তটিই এখানে বেশী স্পষ্ট। তারপর এটাও আমাদের জানা দরকার যে, কাফেরদের দেয়া হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা যাবে কি না? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'ধরনের সহীহ বর্ণনা এসেছে। কখনও কখনও তিনি গ্রহণ করেছেন আবার কখনো কখনো তিনি কাফের-মুশরিকদের হাদীয়া গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং বলেছেন আমি মুশরিকদের হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করি না। এমতাবস্থায় সঠিক মত হলো, যদি কাফেরের হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করার মাধ্যমে দ্বীনি কোন স্বার্থ থাকে যেমন সে ইসলাম গ্রহণ করবে বা তার শত্রুতা থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকবে তখন তা গ্রহণ জায়েয। আর যদি এটা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন কোন ধারনা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে তবে তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। মূলকথাঃ পুরো ব্যাপারটি দ্বীনী 'মাসলাহাত' বা স্বার্থ চিন্তা করে করতে হবে। [দেখুন, কুরতুবী]

বোধ কর(১) ।

৩৭. 'তাদের কাছে ফিরে যাও, অতঃপর আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্য বাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই । আর আমরা অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কৃত করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অপদস্থ ।'

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

৩৮. সুলাইমান বললেন, 'হে পরিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে(২) আমার কাছে আসার(৩) আগে তোমাদের

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

(১) অর্থাৎ হাদীয়া ও উপঢৌকন নিয়ে খুশী হওয়া তোমাদের কাজ, আমার কাজ নয় । কারণ, তোমরা দুনিয়ার সম্পদ ভালবাসো । আমি দুনিয়ার সম্পদের তোয়াক্কা করি না । আল্লাহ্ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন তদুপরি তিনি আমাকে নবুওয়তও দিয়েছেন । আমি সম্পদ চাই না চাই তোমাদের ঈমান । অহংকার ও দাম্ভীকতার প্রকাশ এ কথা বা কাজের উদ্দেশ্য নয় । আসল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের অর্থ-সম্পদ আমার লক্ষ্য নয় বরং তোমরা ঈমান আনো এটাই আমার কাম্য । [ফাতহুল কাদীর] তোমরা কি মনে করেছ যে সম্পদ নিয়ে আমি তোমাদেরকে শির্ক এর উপর রেখে দেব? তোমাদের সম্পদের তুলনায় আমার রব নবুওয়ত ও রাজত্বের আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা ঢের বেশী । কাজেই তোমাদের সম্পদের প্রতি আমার লোভাতুর হওয়ার প্রশ্নই উঠে না । হাদীয়া নিয়ে তোমরাই খুশী হয়ে থাক, আমি তো কেবল ইসলাম অথবা তরবারী এ দু'টোর যে কোন একটায় শুধু খুশী হই । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) মূলে مسلمين শব্দ আছে । যার আভিধানিক অর্থ, আত্মসমর্থন । এখানে কোন কোন মুফাসসির আভিধানিক অর্থ হওয়াটাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন । কেননা, সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি । সে মূলতঃ আত্মসমর্পন করতেই আসছিল । পরবর্তী বিভিন্ন আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সাবার রাণী সুলাইমান আলাইহিসসালামের দরবারে আসার পর বিভিন্ন নিদর্শণাবলী দেখার পর ঈমান এনেছিল । তাই এখানে ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণই অধিক যুক্তিসম্মত । [দেখুন, মুয়াসসার] তবে এখানে পারিভাষিক অর্থে মুসলিম হয়ে যাওয়ার অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে । কারণ, যদি মুসলিম হয়ে যায় তবে তার সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(৩) সুলাইমান আলাইহিসসালামের কথা ও কর্মকান্ড ও তার প্রতিপত্তি দেখে সাবার রাণীর দূতগণ হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল । সুলাইমান আলাইহিসসালামের যুদ্ধ ঘোষণার

মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে?'

৩৯. এক শক্তিশালী জিন্ বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আমি তা এনে দেব[১] এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই শক্তিমান, বিশ্বস্ত[২]।'

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

৪০. কিতাবের জ্ঞান যার ছিল[৩], সে বলল,

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ

কথা শুনিয়ে দিলে সাবার রাণী তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণা ছিল যে, সুলাইমান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে সুলাইমান আলাইহিসসালামের দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। সুলাইমান আলাইহিসসালাম সেটা বুঝতে পেরে তার সভাষদদের মধ্যে জানতে চাইলেন যে, কে এমন আছে যে বিলকীসের সিংহাসনটি সে আসার আগেই এখানে আনতে পারে? কারণ, তিনি চাইলেন যে বিলকীস রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি নবীসুলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার ঈমান আনার অধিক সহায়ক হবে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(১) সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিয়ম ছিল যে, তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাষ্ট্র, বিচারকাজ ও খাওয়া দাওয়ার জন্য মজলিসে বসতেন। তাই জিনটি বলেছিল, আপনি সে বসা শেষ করার আগেই আমি সে সিংহাসনটি নিয়ে হাযির হব। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, আমি নিজে তার কোন মূল্যবান জিনিস চুরি করে নেব না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) বলা হয়েছেঃ 'কিতাবের জ্ঞান যার কাছে ছিল সে বলল' এখানে কিতাবের জ্ঞান কার কাছে ছিল তার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যক্তি কে ছিল, তার কাছে কোন্ বিশেষ ধরনের জ্ঞান ছিল এবং যে কিতাবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন ছিল সেটি কোন্ কিতাব ছিল, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলা সম্ভবপর নয়। কুরআনে বা কোন সহীহ হাদীসে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয়নি। তাফসীরকারদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলেন, সে ছিল একজন ফেরেশতা আবার কেউ কেউ বলেন, একজন মানুষই ছিল। তারপর সে মানুষটিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। এভাবে কিতাব সম্পর্কেও মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। কেউ বলেন, এর অর্থ লাওহে মাহফুজ এবং কেউ বলেন, শরী'আতের কিতাব। কিন্তু এগুলো সবই নিছক অনুমান। আর কিতাব থেকে ঐ অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কেও বিনা যুক্তি-প্রমাণে ঐ একই ধরনের অনুমানের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে এমন

بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۝

'আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।' অতঃপর সুলাইমান যখন তা সামনে স্থির অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, 'এ আমার রব-এর অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, সে জেনে

সম্ভাবনাও আছে যে, স্বয়ং সুলাইমান আলাইহিসসালামই তিনি। কেননা, আল্লাহ্‌র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তারই বেশী ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং সাবার রাণীকে নবীসুলভ মু'জিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এ লোক সুলাইমান আলাইহিসসালামের সহচর ছিলেন, যার নাম ছিলঃ আসেফ ইবন্ বরখিয়া। সে হিসেবে এটা একটি কারামত ছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] এখানে মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করছিঃ
মু'জিযা নবুওয়তের দাবীর সাথে সম্পৃক্ত। আর কারামতের ব্যাপারে এ দাবী থাকতে পারে না।
মু'জিযা নবীর ইচ্ছাধীন। তিনি সেটা দেখাতে ও প্রকাশে সমর্থ হন। পক্ষান্তরে কারামত দেখাবার ব্যাপার নয়। আল্লাহ্ তা'আলা কারামতের মাধ্যমে নবীর উম্মতের মধ্যে যাকে ইচ্ছে সম্মানিত করেন। তারা প্রকাশ্য সৎকর্মশীল লোকই হয়ে থাকেন।
নবীদের মু'জিযার উপরে তার উম্মাতের কারো কারামত প্রাধান্য পেতে পারে না। অর্থাৎ নবীর মু'জিযা জাতীয় হবে। নবীকে ছাড়িয়ে কেউ কারামত দেখাতে পারে না।
কারামত মূলতঃ নবীর মু'জিযারই অংশ। নবীর অনুসরণ না করলে কারামত কখনো হাসিল হতে পারে না। যারা নবীর অনুসরণ করবে না তারা যদি এ ধরণের কিছু দেখায় তবে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, সেটা কোন যাদু বা সম্মোহনী অথবা ধোঁকার অংশ। [ইমাম আল-লালকায়ী, কারামাতু আওলিয়ায়িল্লাহ এর ভূমিকা; ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ৫০৩; উমর সুলাইমান আল-আশকার; আর-রুসুল ওয়ার রিসালাহ]

রাখুক যে, আমার রব অভাবমুক্ত, মহানুভব[১]।'

৪১. সুলাইমান বললেন, 'তোমরা তার সিংহাসনের আকৃতি তার কাছে অপরিচিত করে বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দিশা নেই[২]?

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

৪২. অতঃপর সে নারী যখন আসল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তোমার

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ

(১) অর্থাৎ তিনি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না আবার কারো অকৃতজ্ঞতার ফলে তাতে এক চুল পরিমাণ কমতিও হয় না। তিনি নিজস্ব শক্তি বলে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। বান্দাদের মানা না মানার উপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। কুরআন মজীদে একথাটিই এক জায়গায় মূসার মুখ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ "যদি তোমরা এবং সারা দুনিয়াবাসীরা মিলে কুফরী করো তাহলেও তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না, তিনি অমুখাপেক্ষী এবং আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৮] অনুরূপভাবে, নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এ একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছেঃ "মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে তার ফলে আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না। হে আমার বান্দারা ! যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী বদকার ব্যক্তিটির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহীতে কোন কমতি দেখা যাবে না। হে আমার বান্দারা! এগুলো তোমাদের নিজেদেরই কর্ম, তোমাদের হিসেবের খাতায় আমি এগুলো গণনা করি, তারপর এগুলোর পুরোপুরি প্রতিদান আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। কাজেই যার ভাগ্যে কিছু কল্যাণ এসেছে তার উচিত আল্লাহর শোকরগুজারী করা এবং যে অন্যকিছু লাভ করেছে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে"। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(২) এর অর্থ হচ্ছে, হঠাৎ তিনি স্বদেশ থেকে এত দূরে নিজের সিংহাসন দেখে একথা বুঝতে পারেন কি না যে এটা তারই সিংহাসন এবং এটা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে তিনি সত্য-সঠিক পথের সন্ধান পান অথবা নিজের ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করতে থাকেন কি না এ অর্থও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

সিংহাসন কি এরূপই?' সে বলল, 'মনে হয় এটা সেটাই। আর আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি[১]।'

وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا

৪৩. আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত সেটাই তাকে নিবৃত্ত করেছিল[২],

---

(১) আয়াতের শেষাংশ অর্থাৎ 'আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি' এটা কার কথা তা নির্ধারণে দুটি মত রয়েছেঃ এক, এটা সাবার রাণীর বক্তব্য। সুতরাং তখন অর্থ হবে, আমাদের কাছে আপনার নবুওয়ত ও ঐশ্বর্যের জ্ঞান আগেই এসেছে তাই আমরা পূর্ব থেকেই আনুগত্য প্রকাশ করে নিয়েছি। এর আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখার আগেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের যেসব গুণাবলী ও বিবরণ আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি নিছক একটি রাজ্যের শাসনকর্তা নন বরং আল্লাহর একজন নবী। দুই, এটা সুলাইমান আলাইহিসসালামের কথা। তখন অর্থ হবে, আমরা আগে থেকেই আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকায় তাঁর উপর ঈমান এনেছি। বা আমরা আগে থেকেই জানতাম যে, আপনি আনুগত্য করবেন অথবা আপনার আগমনের পূর্বেই আমাদের জানা ছিল যে, আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আপনি অনুগত হয়ে আসছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত সেটাই তাকে নিবৃত্ত করেছে' এখানে যে অর্থ করা হয়েছে তার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যে সমস্ত বস্তুর ইবাদত সে করত যেমন চাঁদ-সূর্য সেগুলিই তাকে ঈমান আনতে বাধ সাধছিল। কারণ, মানুষের মনে একবার কোন কিছুর মহব্বত গেঁথে গেলে সেটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সে জন্য সে হক জানার পরও ঈমান আনতে দেরী করছিল। এ অর্থানুসারে আলোচ্য বাক্যাংশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে জিদ ও একগুয়েমী ছিল না। শুধুমাত্র কাফের জাতির মধ্যে জন্ম নেয়ার কারণেই তিনি তখনো পর্যন্ত কাফের ছিলেন। সচেতন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হবার পর থেকেই যে জিনিসের সামনে সিজদাবনত হবার অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটিই ছিল তার পথের প্রতিবন্ধক। সুলাইমান আলাইহিসসালামের মুখোমুখি হবার পর যখন তার চোখ খুলে তখন এ প্রতিবন্ধক দূর হতে এক মুহূর্তও দেরী হয় নি। আয়াতের আরেকটি অর্থ এও করা হয় যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত সে করত তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে'। তখন নিবৃত্তকারী স্বয়ং আল্লাহ্ হতে পারেন কারণ তিনি তা হারাম ঘোষণা করেছেন। অথবা সুলাইমান আলাইহিসসালামও হতে পারেন। কারণ, ঈমান আনতে বাধ্য করার মাধ্যমে

كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝٤٣

সে তো ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٤

৪৪. তাকে বলা হল, 'প্রাসাদটিতে প্রবেশ কর।' অতঃপর যখন সে সেটা দেখল তখন সে সেটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের গোছা দুটো অনাবৃত করল। সুলাইমান বললেন, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল, 'হে আমার রব! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম(১), আর আমি সুলাইমানের সাথে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করছি।'

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝٤٥

৪৫. আর অবশ্যই আমরা সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম এ আদেশসহ যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর(২),' এতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল(৩)।

সুলাইমান আলাইহিসসালাম তাকে অন্য কিছুর ইবাদত ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। [দেখুন, তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ শির্ক করার মাধ্যমে, তাছাড়া পূর্বেকার যে সমস্ত কুফরি ও গোনাহ সে করেছিল সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর]

(২) তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য সূরা আল-আ'রাফের ৭৩ থেকে ৭৯,হূদের ৬১ থেকে ৬৮, আশ্‌ শু'আরার ৪১ থেকে ৫৯, আল-কামারের ২৩ থেকে ৩২ এবং আশ্‌-শামসের ১১ থেকে ১৫ আয়াত পড়ুন।

(৩) অর্থাৎ সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তার জাতি দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। একটি দল মুমিনদের এবং অন্যটি অস্বীকারকারীদের এ বিভক্তির সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতও শুরু হয়ে গেলো। [ইবন কাসীর] যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে: "তার জাতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত সরদাররা

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের আগে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ[১]? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমরা রহমত পেতে পার?'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি[২]।' সালেহ্‌ বললেন, 'তোমাদের 'কুলক্ষণ গ্রহণ করা' আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে,

---

দলিত ও নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললো, সত্যই কি তোমরা জানো, সালেহ তার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন নবী? তারা জবাব দিল, তাকে যে জিনিস সহকারে পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান রাখি। এ অহংকারীরা বললো, তোমরা যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছো আমরা তা মানি না।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৫-৭৬] মনে রাখতে হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মক্কায়ও এ একই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

(১) অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণ চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো কেন? অন্য জায়গায় সালেহের জাতির সরদারদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ "হে সালেহ! আনো সেই আযাব আমাদের উপর, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যি তুমি রসূল হয়ে থাকো।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৭]

(২) তাদের উক্তির একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার এ কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য বড়ই অমংগলজনক প্রমাণিত হয়েছে। যখন থেকে তুমি ও তোমার সাথীরা পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছো তখন থেকেই নিত্যদিন আমাদের উপর কোন না কোন বিপদ আসছে। কারণ আমাদের উপাস্যরা আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। এ অর্থের দিক দিয়ে আলোচ্য উক্তিটি সেই সব মুশরিক জাতির উক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যারা নিজেদের নবীদেরকে অপয়া গণ্য করতো। সূরা ইয়াসীনে একটি জাতির কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের নবীদেরকে বললোঃ "আমরা তোমাদের অপয়া পেয়েছি" [১৮] মূসা সম্পর্কে ফির'আউনের জাতি এ কথাই বলতো: "যখন তাদের সুসময় আসতো, তারা বলতো আমাদের এটাই প্রাপ্য আর যখন কোন বিপদ আসতো তখন মুসা ও তার সাথিদের কুলক্ষুণে হওয়াটাকে এ জন্য দায়ী মনে করতো।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৩১]

বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে[১] ।'

৪৮. আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি[২], যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সংশোধন করত না ।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. তারা বলল, 'তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, 'আমরা রাতেই শেষ করে দেব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে; তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত করে বলব যে, 'তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী[৩] ।'

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

(১) অর্থাৎ তোমরা যা মনে করছো আসল ব্যাপার তা নয় । আসল ব্যাপারটি তোমরা এখনো বুঝতে পারোনি । সেটি হচ্ছে, আমার আসার ফলে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে । যতদিন আমি আসিনি ততদিন তোমরা নিজেদের মূর্খতার পথে চলছিলে । তোমাদের সামনে হক ও বাতিলের কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা ছিল না । এখন তোমাদের সবাইকে যাচাই ও পরখ করা হবে । অথবা আয়াতের অর্থ, তোমাদের গোনাহের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে । [কুরতুবী]

(২) এখানে যে শব্দটি এসেছে, তা হলো: رهط এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, ব্যক্তি । কিন্তু শব্দটির আসল অর্থঃ দল । অর্থাৎ ন'জন সরদার । তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি বিরাট দল । এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رهط বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল । কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে । [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব । এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি । একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব ।[দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

হুবহু এ একই ধরনের চক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করার জন্য মক্কার গোত্রীয় সরদাররা চিন্তা করতো । অবশেষে হিজরতের সময়

৫০. আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি[১]।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে---আমরা তো তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২. সুতরাং এ তো তাদের ঘরবাড়ী---যুলুমের কারণে যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে, সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে[২]।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য এ চক্রান্ত করলো। অর্থাৎ তারা সব গোত্রের লোক একত্র হয়ে তার উপর হামলা করবে। এর ফলে বনু হাশেম কোন একটি বিশেষ গোত্রকে অপরাধী গণ্য করতে পারবে না এবং সকল গোত্রের সাথে একই সংগে লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। [আল-আজুররী; আশ-শারী'আহ: ৪/১৬৬০]

(১) অর্থাৎ তারা নিজেদের স্থিরীকৃত সময়ে সালেহের উপর নৈশ আক্রমণ করার পূর্বেই আল্লাহ তাঁর আযাব নাযিল করলেন এবং এর ফলে কেবলমাত্র তারা নিজেরাই নয় বরং তাদের সমগ্র সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেলো। মনে হয়, উটনীর পায়ের রগ কেটে ফেলার পর তারা এ চক্রান্তটি করেছিল। সূরা হূদে বলা হয়েছে, যখন তারা উটনীকে মেরে ফেললো তখন সালেহ তাদেরকে নোটিশ দিলেন। তাদেরকে বললেন, ব্যস আর মাত্র তিন দিন ফূর্তি করে নাও তারপর তোমাদের উপর আযাব এসে যাবে একথায় সম্ভবত তারা চিন্তা করেছিল, সালেহ আলাইহিসসালামের কথিত আযাব আসুক বা না আসুক আমরা উটনীর সাথে তারও বা দফা রফা করে দিই না কেন। কাজেই খুব সম্ভবত নৈশ আক্রমণ করার জন্য তারা সেই রাতটিই বেছে নেয়, যে রাতে আযাব আসার কথা ছিল এবং সালেহের গায়ে হাত দেবার আগেই আল্লাহর জবরদস্ত হাত তাদেরকে পাকড়াও করে ফেললো। [বিস্তারিত দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তাদের জন্যই নিদর্শন রয়েছে যারা প্রকৃত অবস্থা জানে। আর যারা আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি নাযিল হওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারা আরও

৫৩. আর আমরা উদ্ধার করেছিলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল। আর তারা তাকওয়া অবলম্বন করত।

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর স্মরণ করুন লূতের কথা[১], তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা জেনে-দেখে[২] কেন অশ্লীল কাজ করছ?

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ

জানে যে, আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুদের সাথে কি ব্যবহার করেন। তাদের এটাও জানা রয়েছে যে, যুলুমের পরিণতি হচ্ছে, ধ্বংস ও বিপর্যয়, আর ঈমান ও ইনসাফের পরিণতি হচ্ছে নাজাত ও সফলতা। [সা'দী] কিন্তু মূর্খদের ব্যাপার আলাদা। তারা তো বলবে, সামূদ জাতি যে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় তার সাথে সালেহ ও তার উটনীর কোন সম্পর্ক নেই। এসব তো প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান লোক মাত্রই জানেন, কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের উপর রাজত্ব করছেন না বরং এক সর্বজ্ঞ ও পরম বিজ্ঞ সত্তা এখানে সকলের ভাগ্যের নিষ্পত্তি করছেন।

(১) কওমে লূতের কাহিনী তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফঃ ৮০ থেকে ৮৪, হূদঃ ৭৪ থেকে ৮৩, আল হিজরঃ ৫৭ থেকে ৭৭, আল-আম্বিয়াঃ ৭১ থেকে ৭৫, আশ্ শু'আরাঃ ১৬০ থেকে ১৭৪, আল আনকাবুতঃ ২৮ থেকে ৭৫, আস্ সাফ্ফাতঃ ১৩৩ থেকে১৩৮ এবং আল- কামারঃ ৩৩ থেকে ৩৯ আয়াত।

(২) এখানে تبصرون শব্দটির দু অর্থ হতে পারেঃ এক, চাক্ষুষ দেখা। তখন এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সম্ভবত এ সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এ কাজটি যে অশ্লীল ও খারাপ তা তোমরা জানো না এমন নয়। বরং জেনে বুঝে তোমরা এ কাজ করো। [সা'দী] দুই, তোমরা প্রকাশ্যে কোন প্রকার রাখ-ডাক ছাড়াই এ অশ্লীল কাজ করে যাচ্ছো। কারণ, তারা এ সমস্ত কদর্য কাজগুলো লোকসমক্ষেই করে বেড়াত। তাদের বিভিন্ন বৈঠকেও তারা সেটা করত। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অন্যদিকে চক্ষুস্মান লোকেরা তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তোমরা নিজেদের মজলিসে বদকাম করে থাকো।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ২৯] দুই, অন্তর দিয়ে জেনে উপলব্ধি করা। তখন অর্থ হবে, তোমরা অন্তর দিয়ে ভালকরেই জানো ও বোঝ যে, কোন ক্রমেই এ কাজটি ভাল নয়। তারপরও তোমরা সেটা করে যাচ্ছ। [কুরতুবী]

النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝٥٥

তো এক অজ্ঞ[1] সম্প্রদায়।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۝٥٦

৫৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লূত-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র থাকতে চায়।'

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ۝٥٧

৫৭. অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, আমরা তাকে অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۝٥٨

৫৮. আর আমরা তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; সুতরাং ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বর্ষণ কতই না নিকৃষ্ট ছিল!

পঞ্চম রুকূ'

قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ

৫৯. বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই[2]

(১) تجهلون শব্দের মূল হলো جهالة। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি। [আল-কাসেমী, মাহাসীনুত তাওয়ীল: ৩/৫০, ৪/৩৭৬; উসাইমীন, তাফসীরু সূরাতায়িল ফাতিহা ওয়াল বাকারাহ: ২৩৫] গালি গালাজ ও বেহুদা কাজ কারবার করলেও তাকে জাহেলী কাজ বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন। [দেখুন, বুখারী: ৩০] আবার এ শব্দটি জ্ঞানহীনতা অর্থেও ব্যবহার করা হয়, [ইবন কাসীর] তখন এর অর্থ হবে, তোমরা নিজেদের এ খারাপ কাজটির পরিণাম জানো না। তোমরা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েই এ ধরণের জঘন্য কাজ করছ। তোমরা জানো না যে, এর শাস্তি কত ভয়াবহ হতে পারে। তোমরা তো একথা জানো, তোমরা যা অর্জন করছো তা প্রবৃত্তিকে তৃপ্তি দান করে। কিন্তু তোমরা জানো না এ চরম অপরাধমূলক ও জঘন্য ভোগ লিপ্সার জন্য শীঘ্রই তোমাদের কেমন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আবার এটাও অর্থ হতে পারে যে, এটা যে হারাম সেটা তোমরা জান না বা জানতে চেষ্টা করছ না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ ভূমিকার মাধ্যমে মুসলিমরা কিভাবে তাদের বক্তৃতা শুরু করবে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সঠিক ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা সব সময় আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দো'আ করে

اصۡطَفٰیؕ ءٰٓاللّٰهُ خَیۡرٌ اَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ﴿۵۹﴾

এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি(১)!' শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করে তারা(২)?

তাদের বক্তৃতা শুরু করে থাকেন। [কুরতুবী] কিন্তু আজকাল কোন কোন মুসলিম বক্তারা তো এর মাধ্যমে বক্তৃতা শুরু করার কথা কল্পনাই করতে পারেন না অথবা এভাবে বক্তৃতা শুরু করতে তারা লজ্জা অনুভব করেন।

(১) পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতদের আযাব ও ধ্বংসের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী নবী ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। এখানে 'আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ্' বলে সে সমস্ত ঈমানদার লোকদেরকেই বুঝানো হবে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন প্রকার শির্ক করেনি। কোন ধরনের কুফরীতে লিপ্ত হয়নি। নি:সন্দেহে তারা হলেন নবী-রাসূলগণ। যারা তাওহীদ বাস্তবায়ণ করেছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি!" [সূরা আস-সাফফাত: ১৮১] তাছাড়া নবী-রাসূলদের অনুসারীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন তারাও নবী-রাসূলদের অনুগামী হয়ে এ 'সালাম' বা শান্তি লাভের দো'আর আওতায় পড়বেন। আমাদের নবীর উম্মতদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম এদের অগ্রভাগে রয়েছেন। আর এ জন্যই কোন কোন মুফাসসির এখানে 'আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ্' বলে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে বলেও মত প্রকাশ করেছেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আর যদি 'আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ্' বলে সাহাবায়ে কেরামদের বোঝানো হয়ে থাকে তবে এ আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হবে যে, নবীদের প্রতি 'আলাইহিস সালাম' বলে সালাম প্রেরণের সাথে সাথে তাদের অনুসারীদের জন্য সেটি ব্যবহার জায়েয। কিন্তু নবীদের প্রতি সালাম প্রেরণ ব্যতীত অন্যান্যদের উপর সরাসরি 'আলাইহিস্ সালাম' বলার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। বরং সেটা বিদ'আত হিসেবে বিবৃত হবে। যেমন, আলী আলাইহিসসালাম বলা বা হুসাইন আলাইহিসসালাম বলা। তাই এ ধরনের ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে। [দেখুন, ইবন কাসীর: ৬/৪৭৮; তাফসীরুল আলূসী: ৬/৭, ১১/২৬১]

(২) মুশরিকদের একজনও একথার জবাবে বলতে পারতো না, একাজ আল্লাহর নয়, অন্য কারো অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কেউ তাঁর একাজে শরীক আছে। কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানে মক্কার কাফের সমাজ ও আরব মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, মহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী সত্তাই এসব সৃষ্টি করেছেন।"[সূরা আয-যুখরুফঃ ৯] আরো এসেছে, "আর যদি তাদেরকে

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. নাকি তিনি[১], যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার গাছ উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (আল্লাহ্‌র) সমকক্ষ নির্ধারণ করে[২]।

জিজ্ঞেস করেন, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।" [সূরা আয-যুখরুফঃ ৮৭] আরো বলেছেনঃ "আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছে এবং মৃত পতিত জমি কে জীবিত করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬৩] আল্লাহ্‌ আরো বলেছেনঃ "তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন? এ শ্রবণও দর্শনের শক্তি কার নিয়ন্ত্রণাধীন? কে সজীবকে নির্জীব এবং নির্জীবকে সজীব করেন? কে এ বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" [সূরা ইউনুসঃ ৩১] আরবের মুশরিকরা এবং সারা দুনিয়ার মুশরিকরা সাধারণত একথা স্বীকার করতো এবং আজো স্বীকার করে যে, আল্লাহই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনাকারী। তাই কুরআন মজীদের এ প্রশ্নের জবাবে তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিতান্ত হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমীর আশ্রয় নিয়ে ও নিছক বিতর্কের খাতিরেও বলতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্য দেবতারা আল্লাহর সাথে এসব কাজে শরীক আছে। কারণ যদি তারা একথা বলতো তাহলে তাদের নিজেদের জাতির হাজার হাজার লোক তাদেরকে মিথ্যুক বলতো এবং তারা পরিষ্কার বলে দিতো, এটা আমাদের আকীদা নয়।

(১) পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে 'নাকি তিনি' বলে এটা বলাই উদ্দেশ্য যে, যিনি এ কাজগুলো করতে পারেন, তিনি কি তাদের মত, যারা কিছুই করতে পারে না? কথার আগ-পিছ থেকে এটা বোঝা যায়, যদিও দ্বিতীয়টি এখানে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া আগের আয়াত "শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্‌, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করে তারা?" এ কথা এর উপর প্রমাণবহ। [ইবন কাসীর]

(২) মূলে يَعْدِلُوْنَ শব্দ এসেছে, এ শব্দটির পরে যদি ب অব্যয় যুক্ত হয়ে তখন এর অর্থ হয়, সমকক্ষ দাঁড় করানো যেমন, সূরা আল-আন'আমের ১ম আয়াতে এসেছে। কিন্তু যদি এর পরে عن অব্যয় আসে তখন এর অর্থ হয়, কোন কিছু ত্যাগ করে অন্য কিছু গ্রহণ

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬১. নাকি তিনি, যিনি যমীনকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়[১]; আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

৬২. নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে[২] সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে

করা। এ আয়াতে যেহেতু কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি সেহেতু এর অর্থ নির্ধারণে দুটি মত এসেছে, একঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। দুইঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা হক্বকে পরিত্যাগ করে বাতিলকে গ্রহণ করেছে। [ফাতহুল কাদীর] তবে এখানে প্রথম অর্থটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। [ইবন কাসীর] তাছাড়া يعدلون শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ইনসাফ করা। যেমন সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৯, ১৮১। কিন্তু এ অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়।

(১) অর্থাৎ মিঠা ও নোনা পানির ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডার এ পৃথিবীতেই রয়েছে কিন্তু তারা কখনো পরস্পর মিশে যায় না। ভূ-গর্ভের পানির স্রোতও কখনো একই এলাকায় মিঠা পানির স্রোত আলাদা এবং নোনা পানির স্রোত আলাদা দেখা যায়। নোনা পানির সাগরেও দেখা যায় কোথাও মিঠা পানির স্রোত আলাদা প্রবাহিত হচ্ছে। [দেখুন ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) مضطر শব্দটি اضطرار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, কোন অভাব হেতু অপারগ ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مضطر বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম পরিস্থিতিতে যে দো'আ করতে বলেছেন তা হলোঃ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার রহমতের আশা করি। অতএব, মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার নিজের কাছে সমর্পণ করবেন না। আর আপনি আমার সবকিছু ঠিক-ঠাক করে দিন। আপনি ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই।' [আবু দাউদঃ ৫০৯০, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪২]

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

এবং বিপদ দূরীভূত করেন[১], আর তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান[২]। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করে থাক।

---

(১) নিঃসহায়ের দো'আ কবুল হওয়ার মূল কারণ হলো, আন্তরিকতা। কারণ, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দো'আ করার মাধ্যমে ইখলাস প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইখলাসের মর্তবা ও মর্যাদাই আলাদা। মুমিন, কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই ইখলাস পাওয়া যায় তার প্রতিই দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার করুণা হয়। [ফাতহুল কাদীর] যেমন কোন কোন আয়াতেও এসেছে যে, "তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরংগমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ 'আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালজ্ঘন করতে থাকে।" [সূরা ইউনুস:২২-২৩] আরও এসেছে, "তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। তারপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়" [সূরা আল-আনকাবূত: ৬৫] অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে যাদের দো'আ কবুল হয় বলে ঘোষণা এসেছে সেটার গূঢ় রহস্যও এ ইখলাসে নিহিত। যেমন, উৎপীড়িতের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ। অনুরূপভাবে সন্তানের জন্য দো'আ বা বদ-দো'আ। এসব ঐ সময়ই হয় যখন তাদের আর করার কিছু থাকে না। তারা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয়। তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেন। যদিও তিনি জানেন যে, তারা অচিরেই শির্কের দিকে ফিরে যাবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে কাদের স্থলাভিষিক্ত করেন সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। আর তাই সেটা নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছেঃ এক, তোমাদের এক প্রজন্মকে অন্য প্রজন্মের শেষে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। অর্থাৎ এক প্রজন্ম ধ্বংস করেন এবং তার স্থানে অন্য প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক জাতির পর আর এক জাতির উত্থান ঘটান। দুই, তোমাদের সন্তানদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। তিন, মুসলিমদেরকে কাফেরদের স্থলাভিষিক্ত করেন, তাদের যমীন ও ভিটে-মাটিতে মুসলিমদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেন। [ফাতহুল কাদীর]

৬৩. নাকি তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলভূমি ও সমূদ্রের অন্ধকারে পথ দেখান[১] এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. নাকি তিনি, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি করবেন[২] এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে জীবনোপকরণ দান করেন[৩]। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন

أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾

---

(১) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা তোমরা স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও।" [সূরা আল-আন'আম: ৯৭] অর্থাৎ যিনি তারকার সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার ফলে তোমরা রাতের অন্ধকারেও নিজেদের পথের সন্ধান করতে পারো। মানুষ জলে-স্থলে যেসব সফর করে, সেখানে তাকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যাতে সে সহজেই পথ চিনে নিতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ সবই আল্লাহর জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। অন্যত্র এসবগুলোকে আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। [দেখুন, সূরা আন-নাহল: ১৫-১৬]

(২) অর্থাৎ যিনি মাতৃগর্ভে শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করেন, [জালালাইন] তারপর তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় তাদেরকে উত্থিত করবেন, তাঁর সাথে কি আর কোন শরীক আছে? এ কাজ কি তিনি ব্যতীত আর কেউ করতে পারে? তাহলে তিনি ব্যতীত অন্যরা কিভাবে ইবাদাত পেতে পারে? যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয় তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন।" [সূরা আল-বুরূজ: ১৩]

(৩) এ পৃথিবীতে পশু প্রাণীর বহু শ্রেণী পাওয়া যায়। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাদ্যের প্রয়োজন। স্রষ্টা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্যবস্তু এত বিপুল পরিমাণে এবং প্রত্যেকের আহরণ ক্ষমতার এত কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন যার ফলে কোন শ্রেণীর কোন একজনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন, এর দ্বারা যমীন থেকে উদ্ভিদ উদ্গাত করেন, যা যমীনের বরকত হিসেবে গণ্য। তিনি আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেন তা তিনি যমীনের অভ্যন্তরে সুচারুরূপে

ইলাহ্ আছে কি? বলুন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর[১] ।'

৬৫. বলুন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না[২] এবং

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ

পরিচালিত করেন, তারপর তা থেকে বের করেন হরেক রকম ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদি ও ফুল ইত্যাদি। এসব তো আল্লাহ্‌র কাজ। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ কি এগুলো করতে পারেন? যদি আর কেউ করতে না পারে তবে তাকে কিভাবে ইবাদাত করা হবে? [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ এসব কাজে সত্যিই অন্য কেউ শরীক আছে, এর সপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করো অথবা যদি তা না পারো তাহলে কোন যুক্তিসংগত প্রমাণের সাহায্যে একথা বুঝিতে দাও যে, এ সমস্ত কাজ তো একমাত্র আল্লাহরই কিন্তু বন্দেগী ও ইবাদাত লাভের অধিকার লাভ করবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অথবা তাঁর সাথে অন্যজনও। যা আল্লাহ্ করেন তারা কি তা করতে পারে? যদি তোমাদের কোন দলীল-প্রমাণাদি না থাকে তবে এ সমস্ত বাতিল ইলাহ ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতই শুধু কর। তা না করলে তোমরা কখনো সফলকাম হতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।" [সূরা আল-মুমিনূন: ১১৭] [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মাখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশ্তা, যত মাখলুক যমীনে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি-তাদের কেউই গায়েবের খবর রাখে না। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সেসবের খবর রাখেন। গায়েব একমাত্র একজনের কাছে দৃশ্যমান। তিনি হচ্ছেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাঁর কাছে কোন জিনিস অদৃশ্য নয়। সবকিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ জ্ঞানের অধিকারী নয়। এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান যতটুকু চান জ্ঞান দান করেন। কোন অদৃশ্য বা কতগুলো অদৃশ্য জিনিসকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু অদৃশ্য জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেউ লাভ করতে পারে না এবং "আলেমুল গায়েব" অদৃশ্য জ্ঞানী উপাধি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ বলেনঃ "আর তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবিগুলো, সেগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" [সূরা আল-আন'আম ৫৯] তিনি আরও বলেনঃ "একমাত্র আল্লাহই রাখেন কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি (লালিত) হচ্ছে, কোন প্রাণী জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং

তারা উপলব্ধিও করেনা কখন উত্থিত হবে[১]।’

إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ⑥

কোন প্রাণী জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।” [সূরা লুকমানঃ ৩৪] তিনি আরও বলেনঃ “তিনি জানেন যা কিছু সৃষ্টির সামনে আছে এবং যা কিছু আছে তাদের অগোচরে। আর তাঁর জ্ঞানের কিছুমাত্র অংশও তারা আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যে জিনিসটির জ্ঞান তাদেরকে দিতে চান, দেন।” [সূরা আল বাকারাহঃ ২৫৫]
কোন সৃষ্টি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে এ ধারণা কুরআন সর্বতোভাবে নাকচ করে দেয়। এমনকি বিশেষভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন এবং তাকে অদৃশ্যের কেবলমাত্র ততটুকু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যতটুকু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। দেখুনঃ সূরা আল-আন‘আমঃ ৫০, সূরা আল-আ‘রাফঃ ১৮৭ , সূরা আত-তাওবাহঃ ১০১, সূরা হূদঃ ৩১, সূরা আল-আহযাবঃ ৬৩, সূরা আল-আহকাফঃ ৯, সূরা আত-তাহরীমঃ ৩, এবং সূরা জিনঃ ২৬ আয়াত এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের অবকাশই রাখেনি। কুরআনের এ সমস্ত সুস্পষ্ট ভাষণ আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য সমর্থন ও ব্যাখ্যা করে এর পর এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা এবং যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে–এ কথা মনে করা পুরোপুরি একটি শির্কী আকীদা ও বিশ্বাস। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি দাবী করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী কাল কি হবে তা জানেন, সে আল্লাহর প্রতি মহা মিথ্যা আরোপ করে। কারণ আল্লাহ তো বলেন, হে নবী ! আপনি বলে দিন আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।” [বুখারীঃ ৩০৬২, মুসলিমঃ ২৮৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৯]

(১) অর্থাৎ অন্যরা, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে,তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং এ জন্য যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করে নিয়েছো, তারা নিজেরা তো নিজেদের ভবিষ্যতের খবর রাখে না। তারা জানে না, কিয়ামত কবে আসবে যখন আল্লাহ পুনর্বার তাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করাবেন। কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা এ তারকাগুলোকে তিনটি কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, তার মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়ার জন্য আর শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। এর বাইরে অন্য কোন কাজ যারা এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট করবে, তারা নিজের পক্ষ থেকে একটা কথা বানিয়ে বলেছে এবং তার বিচার-বিবেকে ভুল করেছে, সঠিক তথ্য হারিয়েছে। আর এমন কাজে এগিয়ে গেছে যাতে তার কোন

৬৬. বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে[১]; তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ[২] ।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۗ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

জ্ঞান নেই। কিছু মূর্খ লোক আছে যারা এগুলোতে গণনার ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা বলে থাকে, যে ব্যক্তি অমুক অমুক তারকার সময় বিয়ে করবে, তার এটা এটা হবে, আর যে ব্যক্তি অমুক অমুক তারকার সময় সফর করে, তার এটা বা ওটা হবে, যার সন্তান অমুক ও অমুক তারকার সময় হবে, সে এরকম বা ওরকম হবে। নিঃসন্দেহ যে, প্রতি তারকার সময়েই লাল, কালো, বেঁটে, লম্বা, সুন্দর, কুৎসিত জন্মগ্রহণ করে। এ সকল তারকা থেকে জ্ঞানের দাবী, এ চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সম্পর্ক করে কোন জ্ঞানের দাবী, এবং এ সকল পাখির ডান বা বাম হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করে জ্ঞান বের করা কখনো গায়েবের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ্ এ ফয়সালা করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের খবর জানবে না। আর তারা জানে না কখন তাদেরকে উত্থিত করা হবে। [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, اِدّٰرَكَ শব্দটি। এ শব্দে বিভিন্ন কেরাআত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা উক্তি রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন تكامل অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং ﴿فِي الْاٰخِرَةِ﴾ কে اِدّٰرَكَ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, আখেরাতে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে তারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। তখন পরবর্তী বাক্য 'তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ' এর দ্বারা দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ একই আয়াতের প্রথমাংশ আখেরাতের সাথে আর বাকী অংশ দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আবার কেউ কেউ 'আখেরাতে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হওয়া' কথাটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অস্বীকারের সুরে এবং উপহাস হিসেবে নিয়েছেন। অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যে, তারা এতো বেপরোয়া হয়ে গেছে? পরবর্তী আয়াতাংশ 'তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ' এর দ্বারা উপরোক্ত অর্থের জোরালো সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরকারের মতে, اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ ضَلَّ ও غَابَ এবং ﴿فِي الْاٰخِرَةِ﴾ শব্দটি عِلْمُهُم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ আখেরাতের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) عَمُوْنَ শব্দটি عم শব্দের বহুবচন। এটা অন্তরের অন্ধত্বকে বুঝায়। অর্থাৎ তারা অন্তর্দৃষ্টির অভাবে কোন দলীল-প্রমাণই প্রত্যক্ষ করছে না। তারা যেন অন্ধই থেকে

ষষ্ঠ রুকূ'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ءَإِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۝٦٧

৬৭. কাফেররা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে বের করা হবে?

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝٦٨

৬৮. 'এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং আগে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।'

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝٦٩

৬৯. বলুন, 'তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল[১]।'

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝٧٠

৭০. আর তাদের উপর আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না[২]।

যাবে। তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণই কাজে আসবে না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ পূর্ববর্তী অপরাধীদের পরিণতি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং আখেরাত অস্বীকার করার যে নির্বোধসুলভ বিশ্বাস তাদেরকে অপরাধীতে পরিণত করেছিল তার উপর টিকে থাকার চেষ্টা করো না। বিভিন্ন জায়গায় সফর করে দেখো কিরূপ হয়েছিল নবী-রাসূলদের সাথে যারা মিথ্যারোপ করেছিল, যারা আখেরাত, পুনরুত্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত নবী-রাসূলদের আনীত বিষয়াদিতে মিথ্যারোপ করেছিল তাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি কেমন হয়েছিল তা দেখে নাও। এ সমস্ত ঘটনায় আল্লাহ্‌ তাঁর নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারী মুমিনদেরকে কিভাবে সুন্দরভাবে রক্ষা করলেন সেটাও দেখে নিন। এটা অবশ্যই নবী-রাসূলদের সত্যতা ও তাদের আনীত বিধানের সঠিক হওয়া প্রমাণ করে। [ইবন কাসীর]

(২) সব মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। তিনি সর্বদা চাইতেন যে, সবাইকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। কেউ তার কথা কবুল না করলে তিনি নিদারুন মর্মপিড়া অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিতও হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য

৭১. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾

৭২. বলুন, 'তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবত তার কিছু তোমাদের পেছনে এসেই আছে[১]!'

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর নিশ্চয় আপনার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি অবশ্যই জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আর আসমান ও যমীনে এমন কোন

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

করে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভংগিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। এ আয়াতটিও তাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়। বলা হচ্ছে যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন এর উপর মিথ্যারোপকারীদের নিয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। আর নিজেকে বিনাশ করে ফেলবেন না। তারা আপনার প্রতি যে ষড়যন্ত্র করছে তাতে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না; কারণ আল্লাহ্ আপনার হিফাযত করবেন, সাহায্য-সহযোগিতা করবেন, আপনার দ্বীনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধীদের উপর জয়ী করবেন। [ইবন কাসীর]

(১) এটি একটি রাজসিক বাকভংগীমা। সর্বশক্তিমানের বাণীর মধ্যে যখন "সম্ভবত", "বিচিত্র কি" এবং "অসম্ভব কি" ধরনের শব্দাবলী এসে যায় তখন তার মধ্যে সন্দেহের কোন অর্থ থাকে না বরং তার মাধ্যমে একটি বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠে। ইবন আব্বাস বলেন, কুরআনে এ ধরনের শব্দ 'অবশ্যম্ভাবী' হওয়ার অর্থ দেয়। [দেখুন, তাবারী, সূরা আত-তাওবাহ এর ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়] অর্থাৎ তাঁর শক্তি এতই প্রবল ও প্রচণ্ড যে, তাঁর কোন জিনিস চাওয়া এবং তা হয়ে যাওয়া যেন একই ব্যাপার। তিনি কোন কাজ করতে চান এবং তা করা সম্ভব হলো না এমন কোন কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না। এজন্য তাঁর পক্ষে "এমন হওয়া বিচিত্র কি" বলা এ অর্থ প্রকাশ করে যে, যদি তোমরা সোজা না হও তাহলে এমনটি হবেই।

كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ۝

গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۝

৭৬. বনী ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, নিশ্চয় এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের কাছে বিবৃত করে(১)।

---

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কুরআন সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথনির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। আমরা যদি আহ্‌লে কিতাব তথা বনি ইসরাঈলদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে তা দেখি এবং এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য দেখি তাহলে আমরা সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারব যে, এ কুরআন সত্যিকার অর্থেই মানুষদেরকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই দুনিয়াতে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ নীচে এমন কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি যাতে আহলে কিতাবগণ বিভিন্ন মতে বিভক্ত অথচ কুরআন সেখানে সুস্পষ্ট মত দিয়ে দিয়েছে।

আহলে কিতাবগণ ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে এ ব্যাপারে দু মেরুতে অবস্থান নিয়েছে। তাদের মধ্যকার ইয়াহূদীরা তার সম্পর্কে খুব খারাপ মন্তব্য করে; পক্ষান্তরে নাসারারা তার সম্পর্কে অতিরঞ্জন করে। তখন কুরআন তাদের মধ্যে হক ও ইনসাফপূর্ণ মধ্য পন্থা ঘোষণা করেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের অন্যতম এবং তাঁর রাসূলদের একজন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "এ-ই মার্‌ইয়াম-এর পুত্র 'ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে।" [সূরা মারইয়াম: ৩৪] [ইবন কাসীর]

অনুরূপভাবে খোদ নাসারারা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত। তারা বলে থাকে যে, তিনি ইলাহ্ বা তিন ইলাহর একজন। এ ব্যাপারে তাদের মতভেদ চরম আকার ধারণ করেছে, তারা কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারেনি। কুরআন সেখানে তাদেরকে সঠিক দিশা দিয়ে বলছে যে, তিনি ইলাহ নন, যেমনিভাবে তার মাকেও ইলাহ সাব্যস্ত করা ভ্রষ্টতা। "মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্ তো শুধু একজন রাসূল। তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন এবং তার মা সত্যনিষ্ঠা ছিলেন। তারা দুজনেই খাওয়া-দাওয়া করত। দেখুন, আমি ওদের জন্য আয়াতগুলোকে কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; আরো দেখুন, ওরা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!" [সূরা আল-মায়েদাহঃ ৭৫]

তারা মনে করে যে, ঈসা আলাইহিসসালামকে শূলে চড়িয়েছে, এ ব্যাপারে তাদের কোন কোন সম্প্রদায় দ্বিমত পোষণ করে। কুরআন সেখানে স্পষ্ট ঘোষণা করেছে

৭৭. আর নিশ্চয় এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত ।

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. আপনার রব তো তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন । আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ ।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

৭৯. সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন; আপনি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

৮০. মৃতকে তো আপনি শোনাতে পারবেন না[১], বধিরকেও পারবেন না ডাক

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ

যে, "আর তাদের কথা, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি' । অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল । যারা তাঁর সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না । এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।" [সূরা আন-নিসাঃ ১৫৭-১৫৮]

অনুরূপভাবে আহলে কিতাবগণ যে সমস্ত নবী-রাসূলদের শানে আজে-বাজে কথা বলেছে সেখানে কুরআন তাদেরকে সম্মানিত করেছে এবং তাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরেছে । যেমন, নূহ, লূত, হারূন, দাউদ ও সুলাইমানসহ আরও অনেক নবী-রাসূলদের সম্পর্কে তাদের মনগড়া মতবাদকে কুরআন খণ্ডন করেছে এবং তাদের মর্যাদাকে সংরক্ষণ করেছে ।

(১) মৃতরা কি কিছু শুনতে পায়? আর মৃতদের কি কিছু শোনানো সম্ভব? যে সমস্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমদের মাঝেও মতপার্থক্য ছিল মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম । [মাজমূ' ফাতাওয়া: ৩/২৩০, ১৯/১২৩; আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূয়িল ফাতাওয়া: ১/৯৪] আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এর পক্ষে এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন । [দেখুন, বুখারী: ৩৯৮০, ৩৯৮১; মুসলিম: ৯৩২] তাই তাবেয়ীগণ এবং এর পরবর্তী আলেমগণ সবাই ভিন্ন দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন । কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যা এসেছে এখানে তা বর্ণনা করছি । আলোচ্য সূরা আন-নামল এর আয়াতে বলা হয়েছে, "মৃতকে তো আপনি শোনাতে পারবেন না" । সূরা আর-রূমে বলা হয়েছে, "আপনি তো মৃতকে শুনাতে পারবেন না" [৫২] অনুরূপভাবে সূরা ফাতিরে এসেছে, "আপনি শোনাতে পারবেন না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে" [২২] এতে বুঝা যায় যে,

الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝٨٠

শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۗ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝٨١

৮১. আপনি অন্ধদেরকেও তাদের পথ ভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না। আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমাদের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। অতঃপর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا

৮২. আর যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি আসবে তখন আমরা তাদের জন্য যমীন থেকে এক জীব বের করব[১],

---

মৃতদেরকে শোনানোর দায়িত্ব মানুষের নয়, এটা আল্লাহ্‌র কাজ। তাই সর্বাবস্থায় মৃতরা শুনতে পাবে এটার সপক্ষে কোন দলীল নেই। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মাঝে মধ্যে তারা যে শুনতে পায় তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি এক হাদীসে, বদরের যুদ্ধের পরে কাফেরদের লাশ যখন একটি গর্তে রেখে দেয়া হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের লাশদের উদ্দেশ্য করে নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেনঃ তোমরা কি তোমাদের মা'বুদদের কৃত ওয়াদাকে বাস্তব পেয়েছ? আমরা তো আমাদের মা'বুদের ওয়াদা বাস্তব পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেনঃ রাসূল! আপনি এমন লোকদের সাথে কি কথা বলছেন যারা মরে পঁচে গেছে? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা আমার কথা তাদের থেকে বেশী শুনতে পাচ্ছ না'। [বুখারীঃ ৩৭৫৭] সুতরাং কবর যেহেতু আখেরাতের ব্যাপার। আর আখেরাতের ব্যাপারে যতটুকু কুরআন ও হাদীসে যা এসেছে তার বাইরে কোন কিছু বলা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। [বিস্তারিত দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; নূ'মান খাইরুদ্দীন আল-আলূসী, আল-আয়াতুল বাইয়্যিনাত ফী 'আদামি সামা'য়িল আমওয়াত]

(১) 'যমীন থেকে এক জীব বের করব' যা কিয়ামতের আলামত। কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিদর্শনবাহী বেশ কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ড হতে দেবেন, এটা সেগুলোর অন্যতম। কিয়ামতের দশটি বড় বড় নিদর্শন সম্পর্কে হুযাইফা ইবনে আসীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেনঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করছিলাম, তিনি বললেনঃ 'তোমরা কি আলোচনা করছিলে'? আমরা বললামঃ 'আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছিলাম'। তিনি বললেনঃ 'যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি বৃহৎ আলামত বা নিদর্শন না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না'। তারপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, বিশেষ ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব, পশ্চিমে সূর্য উদিত হওয়া, 'ঈসা ইবনে

بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

যা তাদের সাথে কথা বলবে[১] যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস করত না।

সপ্তম রুকূ'

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর স্মরণ করুন সে দিনের কথা, যেদিন আমরা সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একেকটি দলকে, যারা

মারইয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবতরণ, ইয়া'জুজ ও মা'জুজ, তিনটি ভূমি ধস যার একটি প্রাচ্যে, আরেকটি প্রাশ্চাত্যে, অন্যটি আরব উপদ্বীপে হবে, আর এ আলামাতগুলোর সবশেষে ইয়ামেন থেকে একটি আগুন বের হবে যা মানুষকে তাদের একত্রিত হওয়ার স্থানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে"। [মুসলিমঃ ২৯০১] কোন কোন হাদীসে মাহদী, ক্বাবার ধ্বংস ও যমীন থেকে কুরআন উঠে যাওয়ার কথা এসেছে। সে যাই হোক, সবার মতেই দাব্বাতুল আরদ হলো কিয়ামতের বড় আলামতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের পূর্বে তার আবির্ভাব হবে, যেমন আলোচ্য আয়াত তার প্রমাণ। তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তিনটি বস্তু যখন বের হবে তখন কোন আত্মার ঈমান গ্রহণ করা তার কোন উপকারে আসবে না যদি তারা আগে ঈমান না এনে থাকে বা তারা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণকর কিছু অর্জন না করে থাকে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া, দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আরদ বা যমীন থেকে উত্থিত জীব" [মুসলিমঃ ১৫৮]। অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ "দাব্বাহ বের হয়ে মানুষের নাকের উপর দাগ দিয়ে দিবে, তারপর তোমাদের মধ্যে বিচরণ করবে, এমনকি কোন লোক উট খরিদ করার পর কেউ জিজ্ঞাসা করবে কার থেকে খরিদ করেছ? বলবেঃ একজন নাকের উপর দাগ বিশিষ্ট লোক থেকে" [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৬৮]। সুতরাং আমাদেরকে এটার উপর ঈমান আনতে হবে।

(১) ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ কুরআনে উল্লেখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ ﴿اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ﴾ বা "মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস করত না"। এ বাক্যটি সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এইঃ অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমাদের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। যদিও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, অদ্ভুত সে জন্তুটি শুধু কথাই বলবে না বরং দাগও দিবে। অর্থাৎ ঈমানদার ও কাফেরদেরকে দাগ দিয়ে পৃথক করে দিবে। [ফাতহুল কাদীর]

আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা হবে[১]।

৮৪. শেষ পর্যন্ত যখন তারা এসে যাবে তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ তা তোমরা জ্ঞানে আয়ত্ত করতে পারনি[২]? নাকি তোমরা আর কিছু করছিলে[৩]?'

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

---

(১) يُوْزَعُوْنَ শব্দটি وزع শব্দ থেকে উদ্ভূত। উপরে এর অর্থ করা হয়েছেঃ সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা। অর্থাৎ আগের ও পরের সবাই সেখানে থাকবে। যাতে তাদেরকে প্রশ্ন করে তাদের দোষের স্বীকৃতি আদায় করা যায়। [সা'দী] এর আরেক অর্থ আছে, বাধা দেয়া। তখন অর্থ হবে, তাদের অগ্রবর্তী অংশকে বাধা প্রদান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কোন কোন মুফাসসির وزع শব্দের অর্থ করেছেন, ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হিসাবের জন্য হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ কোন তথ্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তোমরা এ আয়াতগুলোর মিথ্যা হবার কথা জানতে পেরেছিলে, এ আয়াতগুলো অস্বীকার করার পেছনে তোমাদের এ কারণ কখনোই ছিল না। তোমরা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ; বিশেষতঃ যখন কেউ চিন্তা-ভাবনাও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, যারা ইসলামী শরী'আতের কোন ইলম যথা আরবী ভাষা বা উসুলে ফিকহ বা এ জাতীয় কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা নিঃসন্দেহে মূর্খ। মূর্খতাই তাদেরকে এ ধরনের কার্যকলাপে নিপতিত করে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ যদি এমন না হয়, তাহলে কি তোমরা একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, গবেষণা-অনুসন্ধানের পর তোমরা এ আয়াতগুলোকে মিথ্যা পেয়েছিলে এবং সত্যিই কি তোমরা এ আয়াতগুলোয় যা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রকৃত সত্য নয়, এ ধরনের কোন জ্ঞান লাভ করেছিলে? মূলত: তোমরা এগুলোতে কোন শ্রম দাওনি। তোমরা তোমাদের কোন কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতি নজর দিতে, আর সেগুলোর অর্থের প্রতি চিন্তা গবেষণা করা থেকে তোমাদেরকে বিরত রেখেছিল? [ফাতহুল কাদীর]

৮৫. আর যুলুমের কারণে তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝٨٥

৮৬. তারা কি দেখে না যে, আমরা রাত সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি দৃশ্যমান? এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে[১]।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٨٦

৮৭. আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহ ও যমীনের সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে[২],

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ

---

(১) অর্থাৎ কেন তারা রাতের বেলা আরাম করার মুহূর্তে এবং দিনের সুযোগে লাভবান হবার সময় একথা চিন্তা করেনি যে, এক মহাবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় সত্তা এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন এবং তিনি তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এটি কোন আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। আবার এগুলো বহু ইলাহ্‌র কার্যপ্রণালীও নয়। এগুলো মূলত: মহান আল্লাহ্‌র শক্তি ও সামর্থের উপরই প্রমাণবহ। তারা কেন আমার এ সমস্ত ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে না, ফলে তারা ঈমান আনত? [দেখুন, কুরতুবী]

(২) فزع শব্দের অর্থ, অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। [সূরা আয-যুমার: ৬৮] এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিঙ্গার ফুঁক দেয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। [দেখুন, ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির এ ফুৎকারকে সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতবিহ্বল অবস্থায় উত্থিত হবে। অথবা তাড়াতাড়ি আহ্বানে সাড়া দেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। কারণ, তাড়াতাড়ি আহ্বানে সাড়া দেয়াকেও فزع বলা হয়ে থাকে। [কুরতুবী]

কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের সুত্র ধরে বলেন, সিঙ্গায় তিন বার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই মারা যাবে আর তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মুসনাদে আবী ইয়া'লায় একটি দীর্ঘ হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসটির সনদ দুর্বল। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই

اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝

তবে আল্লাহ্ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত(১) এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে হীন অবস্থায়।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৮৮. আর আপনি পর্বতমালা দেখছেন, মনে করছেন, সেটা অচল, অথচ ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান(২)। এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকেই করেছেন সুষম(৩)। তোমরা

ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহ হাদীসে এও এসেছে যে, উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের মত ব্যবধান থাকবে। [দেখুন, বুখারী: ৪৮১৪; মুসলিম: ২৯৫৫] এ ব্যাপারে এটা বলাও সম্ভব যে, এ অস্থির ও উদ্বিগ্ন অবস্থা দুটি ফুৎকারের সময়ই হবে। এটি আলাদা কোন ফুৎকার নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে কিছুসংখ্যক লোক ভীতবিহ্বল হবে না। তারা কারা তা নির্ধারণে বিভিন্ন মত এসেছে। কারও কারও মতে তারা ফেরেশ্‌তা, বিশেষ করে জিবরাঈল ও মীকাইল ও ইস্‌রাফীল। আবার কারো মতে, নবীগণ। [ফাতহুল কাদীর] আবার কারও কারও মতে তারা হলেন শহীদগণ। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন যে, এরা সমস্ত মুমিন। কারণ পরবর্তী ৮৯ নং আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তবে কারও কারও মতে উপরে বর্ণিত সবাই এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। এটা কিয়ামতের প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে হবে। অন্য আয়াতে এসেছে, "যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত;[সূরা আত-তূরঃ ৯-১০] "তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'আমার রব ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। 'তারপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে, 'যাতে আপনি বাঁকা ও উঁচু দেখবেন না।" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০৫-১০৭] "স্মরণ করুন, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করব সঞ্চালিত এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সবাইকে আমি একত্র করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না" [সূরা আল-কাহফঃ ৪৭]

(৩) صنع - শব্দের অর্থ কারিগরবিদ্যা, শিল্প। কোন কিছু অপর কিছুর সাথে জুড়ে দিয়ে কিছু বানানো। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর أتقن - শব্দটি إتقان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও সংহিত করা। [জালালাইন] বাহ্যতঃ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং শিঙ্গার ফুৎকার থেকে হাশর-নাশর পর্যন্ত সব অবস্থা। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে,

যা কর নিশ্চয় তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

৮৯. যে কেউ সৎকাজ নিয়ে আসবে, সে তা থেকে উৎকৃষ্ট প্রতিফল[১] পাবে এবং সেদিন তারা শংকা থেকে নিরাপদ থাকবে[২]।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০. আর যে কেউ অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে 'তোমরা যা করতে তারই

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾

এগুলো মেটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফিরিশ্‌তা নয়। বরং বিশ্বজগতের পালনকর্তা। আর যা তাঁর কাজ হবে সেটা অবশ্যই মজবুত ও সংহিত হবে। [কুরতুবী]

(১) এটা হাশর-নাশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, حسنة বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বুঝানো হয়েছে। [তাবারী; কুরতুবী] কারও কারও নিকট: ইখলাস ও তাওহীদ [বাগভী] কেউ কেউ সাধারণ 'ইবাদত ও আনুগত্য তথা ফরয কাজসমূহ অর্থ নিয়েছেন। তবে বস্তুত এখানে সব ধরনের ভাল কাজ বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের কল্যাণ লাভ করবে বা কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলাবাহুল্য, সৎকর্ম তখন সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাত'শ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) فزع বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়। যেমন, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ﴿اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ﴾ অর্থাৎ অবশ্যই আপনার রবের আযাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণে নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সে দিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "মহাভীতি তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৩] [ইবন কাসীর] তাছাড়া পূর্বে ৮৭ নং আয়াতে যাদেরকে ভয়ভীতি থেকে ব্যতিক্রম থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে তারা যদি এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মশীল লোকগণ হয়ে থাকেন তবে এ আয়াতকে পূর্বোক্ত আয়াতের তাফসীর হিসেবে ধরা যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।'

৯১. আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি এ নগরীর রবের[১] 'ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। আর সমস্ত কিছু তাঁরই। আরো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

(১) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, بلدة বলে মক্কা মুকাররামাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তো বিশ্বজাহান এবং নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। [ইবন কাসীর] তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেশী প্রিয় ছিল। [ফাতহুল কাদীর] حرم শব্দটি تحريم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কেউ হারামে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়, হারামে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়, হারামের ভুমিতে শিকার বধ করাও জায়েয নয়, বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়... ইত্যাদি। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় এই শহর (মক্কা) যেদিন আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই হারাম ঘোষণা করেছেন। এটা আল্লাহ্‌র হারাম করার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে।" [বুখারীঃ ৩১৮৯; মুসলিমঃ ১৩৫৩] এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, চরম অশান্তি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত বিধ্বস্ত আরব ভূখণ্ডের এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ বিপুল অনুগ্রহ করেছেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তোমাদের এ শহর সমগ্র আরব দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তোমরা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে চাইলে হতে পারো কিন্তু আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই এবং তাঁরই সামনে নিজের বিনয় ও নম্রতার শির নত করি। তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছো তাদের কারো এ শহরকে হারামে পরিণত করার এবং আরবের যুদ্ধপ্রিয় ও লুটেরা গোত্রগুলোকে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই আসল অনুগ্রহকারীকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার সামনে মাথা নত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যাদের আমার প্রতি সামান্যতমও অনুগ্রহ ও অবদান নেই। অন্য আয়াতে এসেছে, "অতএব, তারা 'ইবাদাত করুক এ ঘরের রবের যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।" [সূরা কুরাইশঃ ৩-৪] [দেখুন, ইবন কাসীর]

৯২. আমি আরো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, কুরআন তিলাওয়াত করতে(১); অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভুল পথ অনুসরণ করলে, আপনি বলুন, 'আমি তো শুধু সতর্ককারীদের একজন।'

وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩. আর বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই(২), তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে(৩)।' আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আপনার রব গাফিল নন(৪)।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

(১) উপরোক্ত দু'টি আয়াত থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি কাজের নির্দেশ বিশেষভাবে প্রদান করা হয়েছে। এক. তাওহীদ তথা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করতে। দুই. কুরআন তিলাওয়াত করতে। মানুষকে এ তেলাওয়াত শোনাতে ও তাদের কাছে পয়গাম পৌঁছাতে। অর্থাৎ তিনি তো শুধু প্রচারকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। তারপর যদি কেউ হেদায়াত গ্রহণ করে তবে সেটা তার নিজেরই উপকারার্থে, আর যদি পথভ্রষ্ট হয়, তবে সেটার ভারও তার নিজের উপর। রাসূলের উপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। তাই রাসূলকে বলতে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ পথভ্রষ্ট হয়, তবে আমি তো কেবল অন্যান্য নবী-রাসূলদের মত ভীতি প্রদর্শন করতে পারি। তারা যেভাবে তাদের সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেই তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, সেভাবে আমিও তাদের অনুসরণ করব। তারপর সে সমস্ত সম্পদ্রায়ের হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই উপর। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এজন্যই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে, তিনি কারও বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করে শাস্তি দেন না। অনুরূপভাবে কাউকে ওযর পেশ করার সুযোগ শেষ করা পর্যন্ত আযাব নাযিল করেন না। আর সে জন্যই তিনি তাঁর আয়াতসমূহ নাযিল করবেন। যাতে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বলতে না পারে যে, আমাদের কাছে আয়াত আসলে তো আমরা ঈমান আনতাম। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, " অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য।" [সূরা ফুসসিলাত: ৫৩]

(৪) বরং তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী। [ইবন কাসীর] তাঁর কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত নয়।

২৮- সূরা আল-কাসাস[১],
৮৮ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الْقَصَصِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত্বা-সীন-মীম;

طٰسٓمٓ ①

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. আমরা আপনার কাছে মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি[২], এমন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যারা ঈমান আনে[৩]।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ③

৪. নিশ্চয় ফির'আউন যমীনের বুকে অহংকারী হয়েছিল[৪] এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ

---

(১) সূরা আল-কাসাস মক্কায় নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ সূরা। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এ সূরাটি মক্কা ও মদীনার মাঝখানে হিজরতের সফরে নাযিল হয়েছিল। এ সূরার শেষভাগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল বাকারাহঃ ৬০-৭২, আল-আ'রাফঃ ১০৩-১৭৪, ইউনুসঃ ৭৫-৯২, হূদঃ ৯৬-১১০, আল-ইসরাঃ ১০১-১০৪, মারয়ামঃ ৫১-৫২, ত্বা-হাঃ ৯-৯৯, আল মুমিনুনঃ ৪৫-৫০, আশ্ শু'আরাঃ ১০-৬৮, আন নামলঃ ৭-১৪, আল-আনকাবূতঃ ৩৯-৪০, গাফিরঃ ২৩-৪৬, আয্ যুখরুফঃ ৪৬-৫৬, আদ্ দুখানঃ ১৭-৩৩, আয্ যারিয়াতঃ ৩৮-৪০, এবং আন্নাযিআ'তঃ ১৫-২৬, আয়াতসমূহ।

(৩) অর্থাৎ যারা কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে কথা শুনানো তো অর্থহীন। তাই যারা মনের দুয়ারে একগুঁয়েমীর তালা ঝুলিয়ে রাখে না, এ আলোচনায় সেই মুমিনদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(৪) মূলে علا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সে উদ্ধত হয়ে মাথা উঠিয়েছে, বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে, নিজের আসল মর্যাদা অর্থাৎ দাসত্বের স্থান থেকে উঠে স্বেচ্ছাচারী ও প্রভুর রূপ ধারণ করেছে, অধীন হয়ে থাকার পরিবর্তে প্রবল হয়ে গেছে এবং স্বৈরাচারী ও অহংকারী হয়ে যুলুম করতে শুরু করেছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] এখানে যমীন বলে, মিসর বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ④

বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী[১]।

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ⑤

৫. আর আমরা ইচ্ছে করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে, আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে;

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ⑥

৬. আর যমীনে তাদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা সে দূর্বল দলের কাছ থেকে আশংকা করত[২]।

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا

৭. আর মূসা-জননীর প্রতি আমরা নির্দেশ দিলাম[৩], 'তাকে দুধ পান করাও।

---

(১) অর্থাৎ তার কাছে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে হেয় করে রেখেছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে ফির'আউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা ও অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালকের জন্মরোধ করতে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতককে হত্যা করেছিল সে বালককে আল্লাহ্ তা'আলা এই ফির'আউনের ঘরে তারই হাতে লালন-পালন করালেন এবং সে বালকের জননীর মনতুষ্টির জন্যে তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছে দিলেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) বলা হয়েছে, وأوحينا এর মূল হলো, وحي যার শাব্দিক অর্থ হলো, الإِعْلَامُ فِي خَفَاءٍ বা গোপনে কোন কিছু জানিয়ে দেয়া। [দেখুন, ফাতহুল বারী: ১/২০৪৪৫] এখানে

خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে, তখন একে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, পেরেশানও হয়ো না। আমরা অবশ্যই একে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং একে রাসূলদের একজন করব।'

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝

৮. তারপর ফির'আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণাম তো এ ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে[১]। নিঃসন্দেহে ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

৯. ফির'আউনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে ওরা এর পরিণাম উপলব্ধি করতে পারেনি।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১০. আর মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয় সে জন্য আমরা তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত।

মূসা-জননীকে আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন উপায়ে তাঁর কোন নির্দেশ পৌঁছানোই উদ্দেশ্য। যে অর্থে কুরআনে নবুওয়তের ওহী ব্যবহার হয়েছে সে অর্থের وحي হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

(১) অর্থাৎ এটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং এ ছিল তাদের কাজের পরিণাম। যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা এমন এক শিশুকে উঠাচ্ছিল যার হাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস হতে হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪

১১. আর সে মূসার বোনকে বলল, 'এর পিছনে পিছনে যাও।' সে দূর থেকে তাকে দেখছিল অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারছিল না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ⑫

১২. আর পূর্ব থেকেই আমরা ধাত্রী-স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর মূসার বোন বলল, 'তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?'

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑬

১৩. অতঃপর আমরা তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর কাছে, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর সে জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

১৪. আর যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল[১] তখন আমরা

(১) أَشُدّ শব্দের আভিধানিক অর্থ, শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌঁছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর এমন এক সময় আসে, যখন অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই أشد বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কোন কোন মুফাস্‌সির এটাকে ৩৪ বছর বলে মত প্রকাশ করেছেন। যাকে আমরা পরিণত বয়স বলে থাকি এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে استوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, استوى তথা পরিণত বয়স ত্রিশ বছর থেকে শুরু করে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; তাছাড়া সূরা আল-আন'আমের ১৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু আলোচনা এসেছে]

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٤

তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম[১]; আর এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি ।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝١٥

১৫. আর তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক[২] । সেখানে তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন, একজন তার নিজ দলের এবং অন্যজন তার শত্রুদলের । অতঃপর মূসার দলের লোকটি ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন[৩]; এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন । মূসা বললেন, 'এটা শয়তানের কাণ্ড[৪] । সে তো প্রকাশ্য

(১) হুকুম অর্থ হিকমত, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা-ধী-শক্তি ও বিচারবুদ্ধি । আর জ্ঞান বলতে বুঝানো হয়েছে দ্বীনী জ্ঞান বা ফিক্হ । অথবা নিজের দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার পিতৃপুরুষদের দ্বীন । [ফাতহুল কাদীর] কারণ নিজের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজের বাপ-দাদা তথা ইউসুফ, ইয়াকুব ও ইসহাক আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন ।

(২) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, মূসা আলাইহিসসালাম দুপুর সময়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন । এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত । [ফাতহুল কাদীর] কারণ, তিনি তার সঠিক দ্বীন সম্পর্কে জানার পর ফির'আউনের দ্বীনের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে আরম্ভ করলে, সেটা প্রসিদ্ধি লাভ করে । তাই তিনি বাইরে বের হতেন না । [কুরতুবী]

(৩) وكز শব্দের অর্থ ঘুষি মারা । ঘুষির সাথেই লোকটি মারা গেল । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৪) কিব্তী লোকটিকে হত্যা করা শয়তানের কারসাজী ছিল । কারণ, যে স্থানে মুসলিম এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে; সেইস্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি যা অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচারণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল । [ফাতহুল কাদীর] সারকথা এই যে, কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা

শত্রু ও বিভ্রান্তকারী ।'

১৬. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ।' অতঃপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন । নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

১৭. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না[১] ।'

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

জায়েয হত না, কিন্তু মূসা আলাইহিসসালাম তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার যুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন । এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না । কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল । [ফাতহুল কাদীর] মুসা আলাইহিসসালাম অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি না করলেও চলত । এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কারসাজী আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ।

(১) মূসা আলাইহিসসালামের এই বিচ্যুতি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করলেন । তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না । এর অর্থ কেবল এই নয় যে, আমি কোন অপরাধীর সহায়ক হবো না বরং এর অর্থ এটাও হয় যে, আমার সাহায্য-সহায়তা কখনো এমন লোকদের পক্ষে থাকবে না যারা দুনিয়ায় যুলুম ও নিপীড়ন চালায় । মুসলিম আলেমগণ সাধারণভাবে মূসার এ অঙ্গীকার থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, একজন মু'মিনের কোন যালেমকে সাহায্য করা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা উচিত । প্রখ্যাত তাবেঈ আতা ইবন আবী রাবাহর কাছে এক ব্যক্তি বলে, আমার ভাই বনী উমাইয়া সরকারের অধীনে কূফার গভর্ণরের কাতিব বা লিখক, বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করা তার কাজ নয়, তবে যেসব ফায়সালা করা হয় সেগুলো তার কলমের সাহায্যেই জারী হয় । এ চাকুরী না করলে সে ভাতে মারা যাবে । আতা জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, তোমার ভাইয়ের নিজের কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত, রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ । আর একজন কাতিব 'আমের শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু 'আমর! আমি শুধুমাত্র হুকুমনামা লিখে তা জারী করার দায়িত্ব পালন করি মূল ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নয় । এ জীবিকা কি আমার জন্য বৈধ?" তিনি জবাব দেন, "হতে পারে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার ফায়সালা করা হয়েছে এবং তোমার কলম দিয়ে তা জারী হবে । হতে পারে, কোন সম্পদ অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অথবা কারো গৃহ

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সে নগরীতে তার ভোর হল। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন আগের দিন যে ব্যক্তি গতকাল তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বললেন, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি(১)।'

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا

১৯. অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলেন, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল(২), 'হে মূসা! গতকাল

ধসানোর হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমার কলম দিয়ে জারী হচ্ছে"। তারপর ইমাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। আয়াতটি শুনেই কাতিব বলে ওঠেন, "আজকের পর থেকে আমার কলম বনী উমাইয়ার হুকুমনামা জারী হবার কাজে ব্যবহৃত হবে না।" ইমাম বললেন, "তাহলে আল্লাহও তোমাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না।" [কুরতুবী]

আবদুর রহমান ইবনে মুসলিম যাহ্হাককে শুধুমাত্র বুখারায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বেতন বণ্টন করে দেবার কাজে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, এতে ক্ষতি কি? তিনি বলেন, আমি জালেমদের কোন কাজেও সাহায্যকারী হতে চাই না। [কুরতুবী] পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে আরও বহু বর্ণনা এসেছে।

(১) অর্থাৎ তুমি ঝগড়াটে স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। প্রতিদিন কারো না কারো সাথে তোমার ঝগড়া হতেই থাকে। গতকাল একজনের সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিলে, আজ আবার আরেকজনের সাথে বাধিয়েছো। [বাগভী]

(২) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ কথাটি ইসরাঈলী লোকটিই বলেছিল। সে মূসা আলাইহিসসালামের পূর্ববর্তী সম্বোধনের কারণে এ ভয় করেছিল যে, মূসা আলাইহিসসালাম বুঝি তাকেই আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে। আর মূসা আলাইহিসসালামের আক্রমণ মানেই নির্ঘাত মৃত্যু; কারণ গতকালই এক লোককে আক্রমণ করে শেষ করে দিয়েছে। আজ বুঝি আমাকেই শেষ করে দেবে। তাই সে গতকালের কিবতী হত্যার গোপণ কথা ফাঁস করে দিয়েছে। আর তাতেই কিবতী লোকটি সুযোগ পেয়ে তা ফের'আউনের পরিষদবর্গের কাছে জানিয়ে দিলে তারা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হয়। [ইবন কাসীর]

তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ কথাটি ইসরাঈলী লোকটির নয়। বরং এটা কিবতী লোকেরই কথা। সে মূসা আলাইহিসসালামের ভয়াল চিত্র দেখে ঘাবড়ে

قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো যমীনের বুকে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, তুমি তো চাও না শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে!'

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

২০. আর নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বলল, 'হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে[১]। কাজেই তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার কল্যাণকামী।'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

২১. তখন তিনি ভীত সতর্ক অবস্থায় সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেন, 'হে আমার রব! আপনি যালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

তৃতীয় রুকূ'

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن

২২. আর যখন মূসা মাদ্ইয়ান[২] অভিমুখে

গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল যে, আজ যে আমাকে এমনভাবে মারার জন্য এগিয়ে আসছে সেই নিশ্চয়ই গতকালের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। সে ছাড়া আর কার এমন বুকের পাটা আছে যে, আমাদের শাসকগোষ্ঠীর গায়ে হাত তুলে? তাই সে অনুমান নির্ভর হয়ে বলে বসে যে, তুমি কাল যেভাবে হত্যা করেছ আজ কি সে রকমই আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ? [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ার ফলে হত্যা রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট মিসরীয়টি যখন গিয়ে সরকারকে জানিয়ে দিল তখন এ পরামর্শের ঘটনা ঘটে। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) মাদইয়ান নামক এ শহরটি মতান্তরে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের ছেলে মাদইয়ানের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। জায়গাটি সম্পর্কে বলা হয় যে, সেটি ফের'আউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মূসা আলাইহিসসালাম ফির'আউনের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বাভাবিক আশংকাবোধ করে মিশর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য,

يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

যাত্রা করলেন তখন বললেন, 'আশা করি আমার রব আমাকে সরল পথ দেখাবেন(১)।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আর যখন তিনি মাদ্‌য়ানের কূপের কাছে পৌঁছলেন(২), দেখতে পেলেন, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পিছনে দুজন নারী তাদের পশুগুলোকে আগ্‌লে রাখছে। মূসা বললেন, 'তোমাদের কী ব্যাপার(৩)?' তারা বলল, 'আমরা

এই আশংকাবোধ নবুওয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনটিরই পরিপন্থি নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম আলাইহিসসালামের বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা আলাইহিসসালামও এই বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এমন পথ যার সাহায্যে সহজে মাদ্‌য়ানে পৌঁছে যাবো। উল্লেখ্য, সে সময় মাদ্‌ইয়ান ছিল ফেরাউনের রাজ্য-সীমার বাইরে। মূসা আলাইহিসসালাম সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিশর থেকে বের হন। তার সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করে এ দো'আ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল করলেন। [কুরতুবী]

(২) এ স্থানটি, যেখানে মূসা পৌঁছেছিলেন, এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে। বর্তমানে এ জায়গাটিকে আল বিদ্‌'আ বলা হয়। সেখানে একটি ছোট মতো শহর গড়ে উঠেছে। আমি ২০০৪ সালে তাবুক যাওয়ার পথে এ জায়গাটি দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে জানিয়েছে, বাপ-দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদ্‌য়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। এর সন্নিকটে সামান্য দূরে একটি স্থানকে বর্তমানে "মাগায়েরে শু'আইব" বা "মাগারাতে শু'আইব" বলা হয়। সেখানে সামূদী প্যাটার্নের কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক মাইল দু'মাইল দূরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি দু'টি অন্ধকূপ। স্থানীয় লোকেরা আমাদের জানিয়েছে, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এ দু'টি কূয়ার মধ্য থেকে একটি কূয়ায় মূসা তাঁর ছাগলের পানি পান করিয়েছেন।

(৩) মূসা আলাইহিসসালাম নারীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে

আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আর আমাদের পিতা খুব বৃদ্ধ[১]।'

২৪. মূসা তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালেন।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ

এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ নারীদ্বয়ের পূর্বোক্ত বাক্য শুনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে একাজে আসতে হয়েছে? নারীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি একাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

এ মেয়েদের পিতার ব্যাপারে আমাদের সাধারণভাবে এ কথা প্রচার হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন শু'আইব আলাইহিস সালাম। কিন্তু কুরআন মজীদে ইশারা ইংগিতে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যা থেকে বুঝা যেতে পারে তিনি শু'আইব আলাইহিস সালাম ছিলেন। অথচ শু'আইব আলাইহিস সালাম কুরআনের একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ মেয়েদের পিতা যদি তিনিই হতেন তাহলে এখানে একথা সুস্পষ্ট না করে দেয়ার কোন কারণই ছিল না। শু'আইব নবী না হলেও এ সৎ ব্যক্তিটির দ্বীন সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, মূসা আলাইহিস সালামের মতো তিনিও ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। কেননা, যেভাবে মূসা ছিলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আলাইহিমাসসালামের আওলাদ ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন মাদ্‌ইয়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশধর। কুরআন ব্যাখ্যাতা নিশাপুরী হাসান বাসরীর বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ "তিনি একজন মুসলিম ছিলেন। শু'আইবের দ্বীন তিনি গ্রহন করে নিয়েছিলেন"। মোট কথা তিনি নবী শু'আইব ছিলেন না। কোন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তবে তার নাম 'শু'আইব' থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ, বনী ইসরাঈলগণ তাদের নবীদের নামে নিজেদের সন্তানদের নামকরণ করতেন। আর হয়ত সে কারণেই লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে সংশয় বিরাজ করছে। [শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ ব্যাপারটি তার কয়েকটি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন, আল-জাওয়াবুস সহীহ, ২/২৪৯-২৫০; জামেউর রাসায়িল: ১/৬১-৬২; মাজমু' ফাতাওয়া: ২০/৪২৯]

لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

তারপর তিনি ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললেন, 'হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল(১) ।'

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۡ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তখন নারী দুজনের একজন শরম-জড়িত পায়ে তার কাছে আসল(২) এবং বলল, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য ।' অতঃপর মূসা তার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, 'ভয় করো না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ ।'

---

(১) মূসা আলাইহিসসালাম বিদেশে অনাহারে কাটাচ্ছেন । তিনি এক গাছের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন । এটা দো'আ করার একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি । خير শব্দটির অর্থ কল্যাণ । এখানে তিনি আহার্য হতে শুরু করে যাবতীয় কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী হলেন । [কুরতুবী]

(২) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাক্যাংশটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেনঃ "সে নিজের মুখ ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে লজ্জাজড়িত পায়ে হেঁটে এলো । সেই সব ধিংগি চপলা মেয়েদের মতো হন হন করে ছুটে আসেনি, যারা যেদিকে ইচ্ছা যায় এবং যেখানে খুশী ঢুকে পড়ে ।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত কয়েকটি বর্ণনা সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনুল মুনযির নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন । এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে এ মনীষীগণ লজ্জাশীলতার যে ইসলামী ধারণা লাভ করেছিলেন তা অপরিচিত ও ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খুলে রেখে ঘোরাফেরা করা এবং বেপরোয়াভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরা করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল । উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু পরিষ্কার ভাষায় এখানে চেহারা ঢেকে রাখাকে লজ্জাশীলতার চিহ্ন এবং তা ভিন পুরুষের সামনে উন্মুক্ত রাখাকে নির্লজ্জতা গণ্য করেছেন । [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

২৬. নারীদ্বয়ের একজন বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত[১] ।'

قَالَتۡ اِحۡدٰىهُمَا یٰۤاَبَتِ اسۡتَاۡجِرۡهُ ۫ اِنَّ خَیۡرَ مَنِ اسۡتَاۡجَرۡتَ الۡقَوِیُّ الۡاَمِیۡنُ ﴿۲۶﴾

২৭. তিনি মূসাকে বললেন, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছে। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।'

قَالَ اِنِّیۡۤ اُرِیۡدُ اَنۡ اُنۡکِحَکَ اِحۡدَی ابۡنَتَیَّ هٰتَیۡنِ عَلٰۤی اَنۡ تَاۡجُرَنِیۡ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنۡ اَتۡمَمۡتَ عَشۡرًا فَمِنۡ عِنۡدِکَ ۚ وَ مَاۤ اُرِیۡدُ اَنۡ اَشُقَّ عَلَیۡکَ ؕ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۲۷﴾

২৮. মূসা বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দুটি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার কর্মবিধায়ক।'

قَالَ ذٰلِکَ بَیۡنِیۡ وَ بَیۡنَکَ ؕ اَیَّمَا الۡاَجَلَیۡنِ قَضَیۡتُ فَلَا عُدۡوَانَ عَلَیَّ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُوۡلُ وَکِیۡلٌ ﴿۲۸﴾

চতুর্থ রুকূ'

২৯. অতঃপর মূসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর[২] সপরিবারে যাত্রা

فَلَمَّا قَضٰی مُوۡسَی الۡاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهۡلِهٖۤ اٰنَسَ

(১) এ পরামর্শের অর্থ ছিল, আপনার বার্ধক্যের কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের মেয়েদের বিভিন্ন কাজে বাইরে বের হতে হয়। বাইরের কাজ করার জন্য আমাদের কোন ভাই নেই। আপনি এ ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন। সুঠাম দেহের অধিকারী বলশালী লোক। সবরকমের পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে। আবার নির্ভরযোগ্যও। সে আমাদের মতো মেয়েদেরকে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের সাহায্য করেছে এবং আমাদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকায়ওনি। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ মূসা আলাইহিসসালাম চাকুরীর নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মূসা আলাইহিসসালাম আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন নাকি দশ বছরের? এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন যে, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ

مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْا إِنِّيْ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

করলেন[১], তখন তিনি তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিজনবর্গকে বললেন, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

فَلَمَّا أَتٰهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يّٰمُوْسٰى إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. অতঃপর যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন উপত্যকার ডান পাশে[২] বরকতময়[৩] ভূমির উপর অবস্থিত সুনির্দিষ্ট গাছের দিক থেকে তাকে ডেকে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকুলের রব[৪];'

বছর মেয়াদকাল তিনি পূর্ণ করেছিলেন। নবীগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। [বুখারীঃ ২৫৩৮] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকুরী, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে।

(১) এর থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষ তার পরিবারের উপর কর্তৃত্বশীল। সে তাদেরকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাওয়ার অধিকার রাখে। [কুরতুবী] এ সফরে মূসার তূর পাহাড়ের দিকে যাওয়া দেখে অনুমান করা যায় তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সম্ভবত মিসরের দিকে যেতে চাচ্ছিলেন। কারণ মাদ্ইয়ান থেকে মিসরের দিকে যে পথটি গেছে তূর পাহাড় তার উপর অবস্থিত। সম্ভবত মূসা মনে করে থাকবেন, দশটি বছর চলে গেছে, এখন যদি আমি নীরবে সেখানে চলে যাই এবং নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে অবস্থান করতে থাকি তাহলে হয়তো আমার কথা কেউ জানতেই পারবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মূসার ডান হাতের দিকে যে কিনারা ছিল সেই কিনারা বা পাশ থেকে। [কুরতুবী]

(৩) সূরা মারইয়ামের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বরকত সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) এ আয়াত সংক্রান্ত ব্যাখ্যা সূরা আন-নামলের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে।

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩১. আরও বলা হল, 'আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন।' তারপর, তিনি যখন সেটাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং ফিরে তাকালেন না। তাকে বলা হল, 'হে মূসা! সামনে আসুন, ভয় করবেন না; আপনি তো নিরাপদ।

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. 'আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জল নির্দোষ হয়ে। আর ভয় দূর করার জন্য আপনার দুহাত নিজের দিকে চেপে ধরুন। অতঃপর এ দু'টি আপনার রব-এর দেয়া প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য[১]। তারা তো ফাসেক সম্প্রদায়।

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

৩৩. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে[২]।

---

(১) এ মু'জিযা দু'টি তখন মূসাকে দেখানোর কারণ তাকে ফির'আউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন। এ দু'টি মু'জিযাই ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নবুওয়াতের পক্ষে বিরাট ও অকাট্য প্রমাণ। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এর অর্থ এ ছিল না যে, এ ভয়ে আমি সেখানে যেতে চাই না। বরং অর্থ ছিল, আপনার পক্ষ থেকে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা দরকার যার ফলে আমার সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই কোন প্রকার কথাবার্তা ও রিসালাতের দায়িত্বপালন করার আগেই তারা যেন আমাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করে না নেয়। কারণ এ অবস্থায় তো আমাকে যে উদ্দেশ্যে এ অভিযানে সেখানে পাঠানো হচ্ছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরবর্তী আয়াত থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মূসার এ আবেদনের উদ্দেশ্য ছিল স্বাভাবিক ভয় যা মানুষ মাত্রই করে থাকে। এ ধরনের ভয় থাকা নবুওয়তের মর্যাদার পরিপন্থী কোন কাজ নয়।

وَأَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِيْٓ إِنِّيْٓ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. 'আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বাগ্মী[১]; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا بِاٰيٰتِنَآ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরেই আমরা আপনার ভাইয়ের দ্বারা আপনার বাহুকে শক্তিশালী করব এবং আপনাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আপনারা এবং আপনাদের অনুসারীরা আমাদের নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবেন।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْأَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তারা বলল, 'এটা তো অলীক জাদু মাত্র[২]! আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে কখনো এরূপ কথা শুনিনি[৩]।'

---

(১) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, ওয়াজ ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়। তবে হারূন আলাইহিসসালাম তার ভাই মূসা আলাইহিসসালাম থেকে বেশী বাগ্মি হলেও ফের'আউনের সাথে কথাবার্তা মূসা আলাইহিসসালামের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল বলেই প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাগ্মীতার যেমন প্রয়োজন তেমনি জ্ঞানের পরিধিরও আলাদা কদর রয়েছে।

(২) বলা হয়েছেঃ অলীক জাদু বা বানোয়াট জাদু। [কুরতুবী] তুমি নিজে এটা বানিয়ে নিয়েছ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মূসা আলাইহিসসালাম যেসব কথা বলেছিলেন সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য জায়গায় এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। অন্যত্র এসেছে, মূসা তাকে বলেনঃ "তুমি কি পবিত্র-

৩৭. আর মূসা বললেন, 'আমার রব সম্যক অবগত, কে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। যালিমরা তো কখনো সফলকাম হবে না[১]।'

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. আর ফির'আউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলে জানি না! অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; হয়ত আমি সেটাতে উঠে মূসার ইলাহ্‌কে দেখতে পারি। আর আমি তো মনে করি, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾

পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করতে আগ্রহী? এবং আমি তোমাকে তোমার রবের পথ বাতলে দিলে কি তুমি ভীত হবে? [সূরা আন-নাযি'আতঃ ১৮-১৯] সূরা ত্বা-হায়ে বলা হয়েছেঃ "আর আমরা তোমার রবের রাসূল, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নির্দশন নিয়ে এসেছি। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারী হয় তার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে এ মর্মে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [৪৭-৪৮] এ কথাগুলো সম্পর্কেই ফির'আউন বলে, আমাদের বাপ দাদারাও কখনো একথা শোনেনি যে, মিসরের ফির'আউনের উপরেও কোন কর্তৃত্বশালী সত্তা আছে, যে তাকে হুকুম করার ক্ষমতা রাখে, তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে নির্দেশ দেবার জন্য কোন লোককে তার দরবারে পাঠাতে পারে এবং যাকে ভয় করার জন্য মিসরের বাদশাহ্‌কে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা আমরা আজ এক ব্যক্তির মুখে শুনছি। অথবা আয়াতের অর্থ আমরা নবুওয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে আগে কখনও শুনিনি। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আমার রব আমার অবস্থা ভালো জানেন। তিনি জানেন তাঁর পক্ষ থেকে যাকে রাসূল নিযুক্ত করা হয়েছে সে কেমন লোক। পরিণামের ফায়সালা তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনিই তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তিনিই জানেন কার জন্য তিনি আখেরাতের সুন্দর পরিণাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। [ইবন কাসীর]

৩৯. আর ফির'আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. অতঃপর আমরা তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখুন, যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল!

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. আর আমরা তাদেরকে নেতা করেছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকত[১]; এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

৪২. আর এ দুনিয়াতে আমরা তাদের

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের পরিষদবর্গকে খারাপ ও নিন্দনীয় ব্যাপারে নেতা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যারাই খারাপ কাজ করবে, যারাই কোন খারাপ কাজের প্রচার ও প্রসার ঘটাবে ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গকে তারাই উত্তরসূরী হিসেবে পাবে। এরা হলো সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের হোতা। এ ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতে থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত যারাই পথভ্রষ্ট কোন মত ও পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে তারাই ফির'আউন ও তার সভাষদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] তারা জাহান্নামের পথের সর্দার। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফরী ও যুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহ্বান করে। আমরা যদি জাতিসমূহের পথভ্রষ্টতার উৎসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে দেখতে পাব যে, সবচেয়ে প্রাচীন ভ্রষ্টতার উৎপত্তি ঘটেছে মিসর থেকে। ফির'আউন সর্বপ্রথম 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' তথা সর্বেশ্বরবাদের দাবী তুলেছিল। আর সে দাবী এখনো পর্যন্ত ভারত তথা হিন্দুস্থানের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও সুফীবাদের অনেকের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর এ জন্যেই ফের'আউনকে অনেক সুফীরা ঈমানদার বলার মত ধৃষ্টতা দেখায়।

الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত[১]।

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর অবশ্যই পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মকে বিনাশ করার পর[২] আমরা মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানবজাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা; পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

---

(১) مقبوح শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে, বিকৃত ঘৃণিত। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তারা "মাকবূহীন"দের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তারা হবে প্রত্যাখ্যাত ও বহিস্কৃত। আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় করে দেয়া হবে। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে। তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালোবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে। তারা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) 'পূর্ববর্তী বহু প্রজন্ম' বলে নূহ, হূদ, সালেহ আলাইহিমুসসালামের সম্প্রদায়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা মূসা আলাইহিসসালামের পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো যেমনিভাবে পূর্বের নবীদের শিক্ষাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অশুভ পরিণাম ভোগ করেছিল তেমনিভাবে ফির'আউন ও তার সৈন্যরা সে একই ধরনের পরিণতি দেখেছিল। তার পরে মূসা আলাইহিস সালামকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যাতে মানব জাতির একটি নব যুগের সূচনা হয়। এরপর থেকে আর কোন সম্প্রদায়ের সকলকে একত্রে আযাব দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেননি। [ইবন কাসীর]
بصائر শব্দটি بصيرة এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে উদ্দেশ্য সেই জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে, হক জানতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। যা অনুসরণ করলে মানুষ হেদায়াত পেতে পারে। পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এখানে ناس বলে মূসা আলাইহিসসালামের উম্মতদের বোঝানো হয়েছে। কারণ; তাওরাত তাদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ ছিল। আমাদের নবীর উপর কুরআন নাযিল হওয়ার পর সে আলোকবর্তিকার পরিবর্তে অন্য আলোকবর্তিকা এসে যাওয়ায় পূর্বেরটা রহিত হয়ে গেছে। এখন আর তা থেকে হেদায়াত নেওয়ার দরকার নেই।

৪৪. আর মূসাকে যখন আমরা বিধান দিয়েছিলাম তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না[১] এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. বস্তুত আমরা অনেক প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; তারপর তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর আপনি তো মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না যে তাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন[২]। মূলতঃ আমরাই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী[৩]।

وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর মূসাকে যখন আমরা ডেকেছিলাম তখনও আপনি তূর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলেন না[৪]। বস্তুত

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ

(১) পশ্চিম প্রান্ত বলতে সিনাই উপদ্বীপের যে পাহাড়ে মূসাকে শরীয়াতের বিধান দেয়া হয়েছিল সেই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এ এলাকাটি হেজাযের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যখন মূসা মাদ্‌ইয়ানে পৌঁছেন, তার সাথে সেখানে যা কিছু ঘটে এবং দশ বছর অতিবাহিত করে যখন তিনি সেখান থেকে রওয়ানা দেন তখন সেখানে কোথাও আপনি বিদ্যমান ছিলেন না। আপনি চোখে দেখে এ ঘটনাবলীর উল্লেখ করছেন না বরং আমার মাধ্যমেই আপনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ আপনাকে তো আমরা রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি। সে কারণেই আপনি এ সমস্ত ঘটনাবলী আপনার কাছে নাযিলকৃত ওহী থেকে বর্ণনা করতে সক্ষম হচ্ছেন। [কুরতুবী] সরাসরি এ তথ্যগুলো লাভ করার কোন উপায় আপনার ছিল না। আজ দু'হাজার বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও যে আপনি এ ঘটনাবলীকে এমনভাবে বর্ণনা করছেন যেন চোখে দেখা ঘটনা, আল্লাহর অহীর মাধ্যমে এসব তথ্য তোমাদের সরবরাহ করা হচ্ছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সত্তর জন প্রতিনিধি যাদেরকে শরীয়াতের বিধান মেনে চলার অংগীকার করার জন্য মূসার সাথে ডাকা হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]

مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি[১], যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন বিপদ হলে তারা বলত, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰىؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَاۗ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. অতঃপর যখন আমাদের কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য আসল, তারা বলতে লাগল, 'মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ দেয়া হল না কেন?' কিন্তু আগে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, 'দু'টিই জাদু, একে অন্যকে সমর্থন করে।' এবং তারা বলেছিল, 'আমরা সকলকেই প্রত্যাখ্যান করি।'

---

(১) এখানে কাওম বলে ইসমাঈল আলাইহিসসালামের বংশধর মক্কার আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ইসমাঈল আলাইহিসসালামের পর থেকে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন নবী প্রেরিত হয়নি। সূরা ইয়াসীনের প্রথমেও এটা এসেছে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ﴾ অর্থাৎ এমন কোন উম্মত নেই, যাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন নবী আসেনি। মক্কার আরবদের নিকটও নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেছিল। তাই এখানে বা এ জাতীয় যেখানেই বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে নবী-রাসূল আসেনি তার অর্থ, অদূর অতীতে আগমন না করা।

৪৯. বলুন, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক কিতাব নিয়ে আস, যা পথনির্দেশে এ দু'টি থেকে উৎকৃষ্ট হবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করব।'

قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤٩

৫০. তারপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবেন তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আর আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥٠

ষষ্ঠ রুকূ'

৫১. আর অবশ্যই আমরা তাদের কাছে পরপর বাণী পৌঁছে দিয়েছি(১); যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥١

৫২. এর আগে আমরা যাদেরকে কিতাব

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ

(১) وصّلنا শব্দটি توصيل থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে একের পর এক হেদায়াত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়। [কুরতুবী] এ থেকে জানা গেল যে, সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা নবীগণের তাবলীগ তথা দ্বীন-প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তারা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেয়ার সাধ্য তো কোন সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তারা ছিলেন আপোষহীন। আজকালও যারা দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

দিয়েছিলাম, তারা এতে ঈমান আনে[১]।

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর যখন তাদের কাছে এটা তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এতে ঈমান আনি, নিশ্চয়

(১) এ আয়াতে সেসব আহ্‌লে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও কুরআন নাযিলের পূর্বেও তাওরাত ও ইঞ্জীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলিম হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি , তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে , তারা তাতে ঈমান আনে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১২১] কোন কোন ঐতিহাসিক ও জীবনীকার এ ঘটনাকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'আবিসিনিয়ায় হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং তার দাওয়াতের খবর যখন সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্রায় ২০ জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মক্কায় এলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাৎ করলো। কুরাইশদের বহু লোকও এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন মজীদের আয়াত তাদের সামনে পাঠ করলেন। কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনলেন। মজলিস শেষ হবার পর আবু জাহল ও তার কয়েকজন সাথী প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাদেরকে যাচ্ছে তাই বলে তিরস্কার করলো। তাদেরকে বললো, "তোমাদের সফরটাতো বৃথাই হলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তার কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।" একথায় তারা জবাব দিল, "ভাইয়েরা, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলী বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাকো। আমরা জেনেবুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে পারি না।" [সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৩২, এবং আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/৮২]।

এটা আমাদের রব হতে আসা সত্য। আমরা তো আগেও আত্মসমর্পণকারী[১] ছিলাম;

৫৪. তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে[২]; যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে[৩]। আর আমরা তাদেরকে যে

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

(১) অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাবের এই আলেমগণ বললঃ আমরা তো কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বেই মুসলিম ছিলাম। এর এক অর্থ, আমরা পূর্ব থেকেই তাওহীদপন্থী ছিলাম। অথবা আমরা এটার উপর ঈমানদার ছিলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হবে, আর তার উপর কুরআন নাযিল হবে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। পবিত্র কুরআনে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ "তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব দু'বার" [সূরা আল-আহযাবঃ ৩১] অনুরূপভাবে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তিন ব্যক্তির জন্য দু'বার পুরস্কার রয়েছে ১। যে কিতাবধারী পূর্বে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারপর এই নবীর প্রতি ঈমান এনেছে ২। যে অপরের মালিকানাধীন দাস মনিব এবং তার মূল প্রভু রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য করে ৩। যার মালিকানায় কোন যুদ্ধ-লব্ধ দাসী ছিল সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।' [বুখারীঃ ৯৭]

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দু বার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেক আমল যেহেতু দুটি, তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র স্ত্রীগণের দুই আমল এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও মহব্বত রাসূল হিসেবেও করেন, আবার স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং তার মালিকের আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা, আর দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয় বরং ভালো দিয়ে দেয়। মিথ্যার মোকাবিলায় মিথ্যা নয় বরং সত্য নিয়ে আসে। যুলুমকে যুলুম দিয়ে নয় বরং ইনসাফ দিয়ে

রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর তারা যখন অসার বাক্য শুনে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, 'আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি 'সালাম'। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়াতে চাই না[১]।'

প্রতিরোধ করে। দুষ্টামির মুখোমুখি দুষ্টামির সাহায্যে নয় বরং ভদ্রতার সাহায্যে হয়। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে অনেক উক্তি বর্ণিত আছেঃ কেউ বলেন, ভাল বলে ইবাদাত এবং মন্দ বলে গোনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা, পুণ্য কাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "গোনাহের পর নেক কাজ কর। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে"। [তিরমিযীঃ ১৯৮৭] কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অসহনশীলতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। [বাগভী] প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত রয়েছেঃ এক, কারও দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। দুই, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। দুনিয়া ও আখেরাতে এর উপকারিতা অনেক। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "ভাল ও মন্দ একসমান হতে পারে না। মন্দ ও যুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর। (যুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।" [সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৪]

(১) অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়াতে চাই না। ইমাম জাস্সাস বলেন, সালাম দুই প্রকারঃ এক, মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই, সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। বরং আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছে সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন[১]।

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ

৫৭. আর তারা বলে, 'আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে[২]।' আমরা কি তাদের জন্য

---

(১) 'হেদায়াত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, শুধু পথ দেখানো। এর জন্য জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয় সে গন্তব্যস্থলে পৌছতেই হবে। দুই, পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। প্রথম অর্থের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরং সমস্ত নবীগণ যে হাদী বা পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হেদায়াত যে তাদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এই হেদায়াতই ছিল তাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাদের ক্ষমতাধীন না হলে তারা নবুওয়াত ও রিসালাতের কর্তব্য পালন করবে কীরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিদায়াতের উপর ক্ষমতাশীল নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়াত বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন এবং মুমিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। এ সংক্রান্ত আলোচনা সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাউকে মুমিন-মুসলিম করে দেয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। [দেখুন, বুখারীঃ ৩৬৭১, মুসলিমঃ ২৪]।

(২) মক্কার কাফেররা তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেয়া হবে। আরবের সমস্ত উপজাতি মিলে আমাদের মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

এক নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমাদের দেয়া রিযিকস্বরূপ[১]? কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই এটা জানে না।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর আমরা বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের অহংকার করত! এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে[২]। আর আমরাই তো

হেফাযতের জন্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারাম করে দিয়েছেন। তাছাড়া জগতের অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কীভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শির্কই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তাওহীদ অনুসরণের মাধ্যমে ধ্বংসের ভয় নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) মক্কা মোকাররমা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ গৃহের জন্যে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে মক্কায় লাখ লাখ লোক একত্রিত হয়। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, সেখানে কোন প্রকার অভাব হয়েছে। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শির্ক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এদেশে কোন কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে-এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে অর্থ হবে এই যে, অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আযাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বাস করছে। এই 'সামান্য'র অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন

চুড়ান্ত ওয়ারিশ (প্রকৃত মালিক)!

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর আপনার রব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, সেখানকার কেন্দ্রে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে এবং আমরা জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা যালিম হয়।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও শোভামাত্র। আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

সপ্তম রুকূ'

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১. যাকে আমরা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সে তো তা পাবেই, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমরা দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, তারপর কিয়ামতের দিন সে হবে হাযিরকৃতদের[১] অন্তর্ভুক্ত?

বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'সামান্য'র অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে; যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও বিশ্রাম নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

(১) কিয়ামতের দিন সবাই হাযির হবে। তবে যাকে আল্লাহ্ ভালো ওয়াদা করেছেন, যাকে তার আনুগত্যের কারণে জান্নাতে যাওয়ার ফরমান আল্লাহ্ দিয়েছেন, সে তা অবশ্যই পাবে। কিন্তু যে দুনিয়ার জীবনে সবকিছু পেয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌র কাজ করেনি। সে তো হিসাব ও প্রতিফল পাওয়ার জন্য হাযির হবে। আর যার হিসাব নেয়া হবে সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং দু'দল কখনো সমান হতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিত জেনে বুঝে যা ভাল তা গ্রহণ করা। [মুয়াসসার] এভাবে প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে ঈমানদার, তার জন্য জান্নাত। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কাফের, সে জাহান্নামে হাযির হবে। [জালালাইন] মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ তারা জাহান্নামে শাস্তি পাবে। [ইবন কাসীর]

৬২. আর সেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়[১]?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. যাদের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! এরা তো তারা যাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম; আমরা এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা তাদের ব্যাপারে দায়মুক্ততা ঘোষণা করছি[২]। এরা তো আমাদের 'ইবাদাত করত না।'

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

---

(১) অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শির্ক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে নবী-রাসূলগণ ও তাদের প্রতিনিধিগণ তাদেরকে হেদায়াতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় নবী-রাসূলগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়।

(২) এখানে দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. আমরা তাদের ইবাদাত হতে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। তারা আমাদের ইবাদাত করত না। তারা তো শয়তানের ইবাদাত করত। [ইবন কাসীর; সা'দী] দুই. অথবা আয়াতের অর্থ, আমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি। আমরা তাদের সাহায্য করতে পারব না। [মুয়াসসার]

৬৪. আর তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের (পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র জন্য শরীক করা) দেবতাগুলোকে ডাক[১] ।' তখন তারা ওদেরকে ডাকবে। কিন্তু ওরা এদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর তারা শাস্তি দেখতে পাবে। হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত[২] ।

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আর সেদিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. অতঃপর সেদিন সকল তথ্য তাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হবে তখন এরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল এবং ঈমান এনেছিল ও সৎকাজ করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন[৩],

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ

---

(১) অর্থাৎ যাতে তারা তোমাদেরকে তোমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে। যেভাবে তোমরা দুনিয়ার জীবনে এ উদ্ধারের আশায় তাদের ইবাদাত করতে। তখন তারা ডাকবে। কিন্তু সে উপাস্যগুলো এদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর তারা আযাব দেখতে পাবে এবং তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, জাহান্নামের দিকেই তাদের পদযাত্রা শুরু হবে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা তখন আশা করত যে, যদি দুনিয়ার জীবনে তারা সঠিক পথের উপর থাকত, তাহলেই কেবল তা তাদের উপকারে লাগত। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতটির তাফসীরে সঠিক মত হচ্ছে, যা ইমাম বাগাভী তার তাফসীরে এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম তার যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য

الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

এতে ওদের কোন হাত নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে!

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর আপনার রব জানেন এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে।

মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব ﴿وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ﴾ "আর তারা বলেঃ 'এ কুরআন কেন নাযিল করা হল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?"[সূরা আয-যুখরুফঃ ৩১] অর্থাৎ কাফেররা এটা বলে যে, এ কুরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হল না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে প্রভু সমগ্র সৃষ্টিজগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যাতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনিত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ঊর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর, জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশ্তাগণকে অন্য ফেরেশ্তাদের উপর, নবী-রাসূলগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাদের মধ্যে দৃঢ়চেতা নবী-রাসূলগণকে অন্য নবী-রাসূলদের উপর, ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়াসাল্লামকে অন্য দৃঢ়চেতা নবী-রাসূলগণের উপর, ইসমাঈল আলাইহিসসালামের বংশধরদের সমগ্র মানবজাতির উপর, কুরাইশদেরকে আরবদের উপরে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলিমদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথাঃ শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ইচ্ছাই। এখানে অন্য কিছুর হাত নেই।

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই; আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৭১. বলুন, 'আমাকে জানাও, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۗ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

৭২. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না[১]?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۗ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাতের সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, ﴿بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ﴾ অর্থাৎ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে শুধু بِضِيَاءٍ বলা হয়েছে। ضياء বা আলোকের কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে বলেছেন, তবুও কি তোমরা দেখবে না? এখানে দেখার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তোমরা কি ভেবে দেখবে না যে, তোমরা যে শির্কের উপর আছ সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ। তারপরও কি তোমরা সেটা থেকে ফিরে আসবে না? তোমরা যদি তোমাদের বিবেক খাটাও তাহলে অনায়াসেই সরল সোজা পথে সমর্থ হতে পার। [জালালাইন; সা'দী] অথবা তোমরা যদি আল্লাহ্র এ বিরাট নে'আমতের উপর চিন্তা-ভাবনা করো তাহলে তা তোমাদেরকে ঈমান আনতে সহযোগিতা করতে পারে। [ইবন কাসীর] দুই. তোমরা কি রাত দিনের এ পার্থক্য স্বচক্ষে দেখতে পাও না? [মুয়াসসার]

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রাত ও দিন, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর সেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়?'

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব[১] এবং বলব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তারা জানতে পারবে যে[২], ইলাহ্ হওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌রই এবং তারা যা মিথ্যা রটনা করত তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে[৩]।

লক্ষণীয় যে, রাতের অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ বলেছেন "তোমরা কি কর্ণপাত করবে না?" আর দিনের অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর বলেছেন, "তোমরা কি দেখবে না?" কারণ, রাতে শ্রবণশক্তির কাজ বেশী আর দিনে দৃশ্যমান হওয়া বেশী কার্যকর। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ নবী ও যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। অথবা নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে এমন কোন হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতের মধ্যে সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিংবা কোন প্রচার মাধ্যম যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট উম্মতের কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছেছিল।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ই একমাত্র হক ইলাহ। [জালালাইন] আর তখন তারা জানতে পারবে যে, তারা যে সমস্ত কথা বলেছিল, যাদেরকে ইলাহ বা উপাস্য বানিয়েছিল সবই ছিল মিথ্যা, অসার ও অলীক। আর তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, ইলাহ হওয়ার ব্যাপারে সঠিক তথ্য তো শুধু আল্লাহ্‌রই। তাদের উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণাদি ভেস্তে গেছে। আর আল্লাহ্‌র পক্ষে যে সমস্ত প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছিল তা-ই শুধু বাকী আছে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা যে সমস্ত মিথ্যাচার করত যে, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক আছে, সে সমস্ত কথা সবই তখন হারিয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

অষ্টম রুকূ'

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬. নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আর আমরা তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'অহংকার করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. 'আর আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না[১]; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন

---

(১) অর্থাৎ ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল যে, আল্লাহ্ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা দ্বারা আখেরাতের শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না। তবে এখানে দুনিয়ার অংশ বলে কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছেঃ

কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এর অর্থঃ মানুষের বয়স এবং এ বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা আখেরাতে কাজে আসতে পারে। সাদকাহ্ দানসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি-এগুলোকে আখেরাতের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু আখেরাতের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিশদের প্রাপ্য।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্বারা আখেরাতের ব্যবস্থা কর, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্যে রাখ। এই তাফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে।

এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।'

৭৮. সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি(১)।' সে কি জানত না আল্লাহ্ তার আগে ধ্বংস করেছেন বহু প্রজন্মকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল বেশী(২)?

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

---

(১) বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে 'ইলম' দ্বারা অর্থনৈতিক কলাকৌশল বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, আমি যা কিছু পেয়েছি নিজের যোগ্যতার বলে পেয়েছি। এটা কোন অনুগ্রহ নয়। অধিকার ছাড়াই নিছক দয়া করে কেউ আমাকে এটা দান করেনি। তাই আমাকে এখন এজন্য এভাবে কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই যে, যেসব অযোগ্য লোককে কিছুই দেয়া হয় নি তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে আমি এর মধ্য থেকে কিছু দেবো অথবা আমার কাছ থেকে এ সম্পদ যাতে ছিনিয়ে না নেওয়া হয় সেজন্য কিছু দান খয়রাত করে দেবো। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বানিজ্য -এগুলোও তো আল্লাহ্ তা'আলারই দান ছিল- তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।
এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আমার মতে আল্লাহ এই যে সম্পদরাজি আমাকে দিয়েছেন এটি তিনি আমার গুণাবলী সম্পর্কে জেনেই দিয়েছেন। যদি তাঁর দৃষ্টিতে আমি একজন পছন্দনীয় মানুষ না হতাম, তাহলে তিনি এসব আমাকে কেন দিলেন? আমার প্রতি তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হওয়াটাই প্রমাণ করে আমি তাঁর প্রিয় পাত্র এবং আমার নীতিপদ্ধতি তিনি পছন্দ করেন।

(২) কারূনের উক্তির আসল জওয়াব তো এটাই যে, যদি স্বীকার করে নেয়া যায় যে, তোমার ধন-সম্পদ তোমার বিশেষ কর্মতৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা, এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্ তা'আলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই আল্লাহ্ তা'আলা এটা উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছেন যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় বরং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআন অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও

আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না[১]।

৭৯. অত:পর কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হয়েছিল জাঁকজমকের সাথে। যারা দুনিয়ার জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা, কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি সেরূপ দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান[২]।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿۷۹﴾

৮০. আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া তা কেউ পাবে না[৩]।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿۸۰﴾

করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। সুতরাং এ ব্যক্তি যে নিজেকে বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী,গুণী ও চতুর বলে দাবী করে বেড়াচ্ছে এবং নিজের যোগ্যতার অহংকারে মাটিতে পা ফেলছে না, সে কি জানে না যে, তার চাইতেও বেশী অর্থ,মর্যাদা, প্রতিপত্তি শক্তি ও শান শওকতের অধিকারী লোক ইতিপূর্বে দুনিয়ায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যোগ্যতা ও নৈপূণ্যই যদি পার্থিব উন্নতির রক্ষাকারী বিষয় হয়ে থাকে তাহলে যখন তারা ধ্বংস হয়েছিল তখন তাদের এ যোগ্যতাগুলো কোথায় গিয়েছিল? আর যদি কারো পার্থিব উন্নতি লাভ অনিবার্যভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তার কর্ম ও গুণাবলী পছন্দ করেন তাহলে সর্বনাশ হলো কেন?

(১) এখানে তাদের প্রশ্ন না করার অর্থ হলো, তাদের অপরাধ কি তা জানার জন্য কোন প্রশ্ন আল্লাহ্ তাদেরকে করবেন না। কেননা তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক খবর রাখেন। তাদেরকে তাদের অপরাধের স্বীকৃতি আদায় এবং অপরাধের কারণেই যে তারা শাস্তির যোগ্য হয়েছে তা প্রমাণের জন্যই শুধু প্রশ্ন করা হবে।

(২) হ্যাঁ সত্যিই সে মহা ভাগ্যবান, তবে সেটা তাদের দৃষ্টিতে, যাদের কাছে মানুষের ভাগ্য শুধু দুনিয়ার প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল। যারা মৃত্যুর পরের জগত সম্পর্কে মোটেও চিন্তা করে না, সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে না। তারা তো এটা বলবেই [সা'দী]

(৩) পূর্ব আয়াতে বর্ণিত 'যারা দুনিয়ার জীবন কামনা করত' তাদের বিপরীতে এ আয়াতে

৮১. অতঃপর আমরা কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۝

৮২. আর আগের দিন যারা তার মত হওয়ার কামনা করেছিল, তারা বলতে লাগল, 'দেখলে তো, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে কমিয়ে দেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফেররা সফলকাম হয় না[১]।'

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

বলা হয়েছে, 'যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল'। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তারা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। আয়াতে আল্লাহ্‌র সাওয়াব বলে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন যেমন আল্লাহ্‌র ইবাদাত, তাঁর ভালবাসা, তাঁর কাছে যাওয়ার আগ্রহ, তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনি আখেরাতের জান্নাত ও তার নেয়ামতও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যে নেয়ামতের কোন শেষ নেই। আর যে নেয়ামতের কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করেও মানুষ দুনিয়াতে শেষ করতে পারবে না। মনে যা চাইবে তা পাবে, চোখে যা দেখবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক প্রসারিত বা সংকুচিত করা যেটাই ঘটুক না কেন তা ঘটে তাঁর ইচ্ছাক্রমেই। এ ইচ্ছার মধ্যে তাঁর ভিন্নতর উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। কাউকে বেশী রিযিক দেবার অর্থ নিশ্চিত ভাবে এ নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাই তাকে পুরস্কার দিচ্ছেন। অনেক সময় কোন ব্যক্তি হয় আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণিত ও অভিশপ্ত কিন্তু তিনি তাকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত দিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি এ ধন শেষ পর্যন্ত তার উপর আল্লাহর কঠিন আযাব নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে যদি

নবম রুকূ'

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এটা আখেরাতের সে আবাস যা আমরা নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না[১]। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য[২]।

কারো রিযিক সংকুচিত হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে তার এ অর্থ হয় না যে, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। অধিকাংশ সৎলোক আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া সত্বেও আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এ অভাব অনটন তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমতে পরিণত হয়েছে। এ সত্যটি না বোঝার ফলে যারা আসলে আল্লাহর গযবের অধিকারী হয় তাদের সমৃদ্ধিকে মানুষ ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

(১) এ আয়াতে আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। علو শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فساد বলে, অপরের উপর যুলুম বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, গোনাহ মাত্রই যমীনে ফাসাদের শামিল। কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, যুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।
আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে আখেরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গোনাহের বদ্ধপরিকতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ। তবে পরে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গোনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা ষোলআনাই করে, তবে গোনাহ্ না করলেও তার আমলনামায় গোনাহ্ লিখা হবে।

(২) এর সারমর্ম এই যে, আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দু'টি বিষয় জরুরী। এক, ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং দুই, তাকওয়া অবলম্বন করা। আখেরাতের মুক্তির জন্য শুধু ঔদ্ধত্য ও অনর্থ থেকে মুক্ত থাকলেই চলবে না সাথে সাথে তাকওয়ার অধিকারীও হতে হবে। ফির'আউন দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য, অনর্থ ও অহংকার করেছিল যা এ সূরার প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে কারূনও চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ করেছিল ফলে আখেরাতে সে কোন কল্যাণ লাভ করবে না। পক্ষান্তরে মূসা ও অপরাপর নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ বিনীত ও নিরহংকার তাকওয়াভিত্তিক জীবন-যাপন করেছেন সুতরাং তাদের জন্যই আখেরাতের যাবতীয় আবাসভূমি অপেক্ষা করছে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. যে কেউ সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে তার চেয়েও উত্তম ফল, আর যে মন্দকাজ নিয়ে উপস্থিত হয় তবে যারা মন্দকাজ করে তাদেরকে শুধু তারা যা করেছে তারই শাস্তি দেয়া হবে।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

৮৫. যিনি আপনার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান, তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে নেবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে[১]। বলুন, 'আমার রব ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে আর কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।'

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর আপনি আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব নাযিল হবে। এ তো শুধু আপনার রব-এর অনুগ্রহ। কাজেই আপনি কখনো কাফেরদের সহায় হবেন না।

(১) বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরয করেছেন, বিধান হিসেবে দিয়েছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি পুনরায় আপনাকে 'মা'আদে' ফিরিয়ে নিবেন। কোন কোন মুফাসসিরের মতে,এখানে 'মা'আদ' বলে আখেরাতের জান্নাত বোঝানো হয়েছে। কারণ, যিনি আপনার প্রতি বিধান নাযিল করেছেন, হালাল ও হারামের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন তিনি আপনাকে ও আপনার অনুসরণ যারা করবে, তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের সঠিক প্রতিফল জান্নাত অবশ্যই প্রদান করবেন। [সা'দী] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে 'মা'আদ' বলে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। [জালালাইন] উদ্দেশ্য এই যে, কিছু দিনের জন্যে আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি হারাম ও বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। মূলতঃ এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। মক্কার কাফেররা তাকে বিব্রত করেছে, তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলিমদের জীবন দুঃসহ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাঁর রাসূলকে সবার উপর বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা হতে কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৮৭. আর আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা যেন কিছুতেই আপনাকে সেগুলো থেকে বিরত না করে। আপনি আপনার রব-এর দিকে ডাকুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[১]।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৮. আর আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকবেন না, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল[২]। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যখন না চাইতেই তোমাদের এ নেয়ামত দান করেছেন তখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সমস্ত শক্তি ও শ্রম এর পতাকা বহন করা এবং এর প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করবে এ কাজে ত্রুটি ও গাফলতি করার মানে হবে তোমরা সত্যের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করেছো। এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরনের কোন ভুলের আশংকা ছিল। বরং এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের নবীকে এ হিদায়াত দান করছেন যে, এদের শোরগোল ও বিরোধিতা সত্বেও আপনি নিজের কাজ করে যান এবং আপনার এ দাওয়াতের ফলে সত্যের দুশমনরা তাদের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার যেসব আশংকা প্রকাশ করে তার পরোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

(২) এখানে وجهه বলে আল্লাহ্ তা'আলার পুরো সত্তাকে বোঝানো হলেও অন্য দিক থেকে এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'চেহারা' রয়েছে। কারণ; যার চেহারা নেই তার সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহার করা যায় না। মূল উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, وجهه বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়। তখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে- এছাড়া সব ধ্বংসশীল। উভয় তাফসীরই বিশুদ্ধ। [ইবন কাসীর]

سُورَةُ العَنكَبُوت

২৯- সূরা আল-'আনকাবূত
৬৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম;

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ②

২. মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা[১] না করে অব্যাহতি দেয়া হবে[২]?

---

(১) يفتنون শব্দটি فتنة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। [ফাতহুল কাদীর] ঈমানদার বিশেষত: নবীগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা জান ও মালের উপর ছিল। [ফাতহুল কাদীর] এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার পরীক্ষা হয়ে যেত। কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ নবীগণ, শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে। বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায়, আলোচ্য আয়াত সেসব সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, যারা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করা হয় নবীদেরকে, তারপর সৎকর্মপরায়ন বান্দাদেরকে, তারপর তাদের অনুরূপ, তারপর তাদের অনুরূপদেরকে। প্রত্যেক মানুষকে তার দ্বীনদারী অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি দ্বীনদারী বেশী হয় তাকে বেশী পরীক্ষা করা হয়। [তিরমিযী:২৩৯৮, ইবনে মাজাহ:৪০২৩] কুরআনের অন্যত্রও এ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, যেমন: 'তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ আল্লাহ্ এখনো তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে তাদের জেনে নেননি। [সূরা আত-তাওবাহ:১৬]

(২) যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু'আয্যামায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন

৩. আর অবশ্যই আমরা এদের | وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ

প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে নি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে খাব্বাব ইবনে আরত বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, 'যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ-প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিঃশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।" [বুখারী: ৩৬১২, মুসনাদে আহমাদ: ৫/১০৯]

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বুঝান, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষা অতিক্রম করতে হবেই। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ-ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪] অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলিমদের ওপর আবার বিপদ-মুসীবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয়ঃ "তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" [সূরা আলে ইমরান: ১৪২] প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ , সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের মনে এ সত্যটি গেঁথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়।

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۝٣

পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম[১]; অতঃপর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী[২]।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُونَا ۚ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝٤

৪. তবে কি যারা মন্দকাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে[৩]? তাদের সিদ্ধান্ত

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে? [দেখুন, সা'দী]

(২) মূল শব্দ হচ্ছে لَيَعْلَمَنَّ এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন"। অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। [মুয়াসসার] আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন। বস্তুত: মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। ভাল-মন্দ, ধনী-গরিব, দুঃখ-কষ্ট, সার্বিক অবস্থায় ফেলে তিনি তাদের পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসমস্ত অবস্থায় তারা হয় সন্দেহে নিপতিত হয় নতুবা প্রবৃত্তির তাড়নায় চলে বেড়ায়। তার আকীদা-বিশ্বাসে সন্দেহ হলে যদি সে তা তাড়িয়ে দিয়ে ঈমানের উপর স্থির থাকতে পারে তবেই সে সফলকাম। অনুরূপভাবে তার প্রবৃত্তির পাগলা ঘোড়া তাকে যা ইচ্ছে তা করতে বললে সে যদি তা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে তবেই সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পাশ করেছে বলে বিবেচিত হবে। [দেখুন, সা'দী]

(৩) মূল শব্দ হচ্ছে سابق অর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।" [সা'দী] অপর অর্থ হচ্ছে, তারা কি মনে করে যে, তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও গোনাহসমূহ এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ এগুলো

কত মন্দ!

৫. যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় আসবেই[১]। আর তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

থেকে উদাসীন হয়ে যাবেন? আর এজন্যই কি তারা অপরাধগুলো করে যাচ্ছে? [সা'দী] কারও কারও মতে, এখানে এর অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় তা করতে তাদের সফল হওয়া। [দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যারা অপরাধী তারা যেন এটা মনে না করে যে, তারা পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। এ ধারণা কখনো ঠিক নয়। তারা যদি এ দুনিয়াতে পারও পেয়ে যায়, তাদের সামনে এমন শাস্তি ও আযাব রয়েছে তা তাদের জন্য যথেষ্ট। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেব-নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ-অনুমানের বিপরীত নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বুদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে। তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। [বাগভী; জালালাইন; ফাতহুল কাদীর] দীর্ঘ জীবন-কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর 'ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে"। [সূরা আল-কাহাফ:১১০]

(২) অর্থাৎ তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] তিনি জানেন কে কোন নিয়তে কাজ করে, আরও জানেন কে তাঁর মহব্বতের উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নয়। [সা'দী]

৬. আর যে কেউ প্রচেষ্টা চালায়, সে তো নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়[১]; আল্লাহ্ তো সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী[২]।

وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা অবশ্যই তাদের থেকে তাদের মন্দকাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে তারা

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِیْ كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝

(১) "মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, প্রচেষ্টা চালানো। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মুমিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে নাফস, শয়তান ও কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। [সা'দী] তাকে শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়, কারণ সে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাংখার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দ্বীনের সাথে সংঘর্ষিক। তাকে কাফেরদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়। [দেখুন, সা'দী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এ প্রচেষ্টা এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানে ও প্রতি দিকে। হাসান বসরী বলেন, একজন মানুষ প্রতিনিয়ত জিহাদ করে যাচ্ছে অথচ একদিনও তরবারী ব্যবহার করেনি। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং আখেরাতে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহর কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে। তাছাড়া এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার যার কথা সূরার শুরুতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী; ইবনুল কাইয়্যেম, শিফাউল আলীল: ২৪৬]

যে উত্তম কাজ করত, তার প্রতিদান দেব[১]।

৮. আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে[২]। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই[৩], তাহলে

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنٗاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآۚ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٨

(১) আয়াতে ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে, এক: মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে। দুই: তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। পাপ ও দুষ্কৃতি দূর করে দেয়ার অর্থ সৎকাজের কারণে গোনাহ ক্ষমা পেয়ে যাওয়া। কারণ সৎ কাজ সাধারণ গোনাহ মিটিয়ে দেয়। [জালালাইন; সা'দী] যেমন হাদীসে এসেছে, ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। [দেখুন, মুসলিম: ১২১] আর সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দেয়ারও দু'টি অর্থ হয়। এক. মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। যেমন মানুষের সৎকাজের মধ্যে রয়েছে ওয়াজিব-ফরয ও মুস্তাহাব কাজ। এ দু'টি অনুসারে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ, তার আমলের কিছু আমল আছে মুবাহ বা জায়েয আমল, সেটা অনুসারে নয়। [সা'দী] দুই. মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশী ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। [ফাতহুল কাদীর] একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশী দেয়া হবে।" [সূরা আল-আন'আম: ১৬০] আরো বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।" [সূরা আল কাসাসে: ৮৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ তো কণামাত্রও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।" [সূরা আন-নিসা: ৪০]

(২) হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: সময়মত সালাত আদায় করা। বলল: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। বলল: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।' [বুখারী:৫৯৭০]

(৩) আয়াতে বর্ণিত 'যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না' বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি

তুমি তাদেরকে মেনো না[১]। আমারই

প্রদান করা হয়েছে। এতে শির্কের জঘন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শির্কের সপক্ষে কোন জ্ঞান নেই। কেউ শির্ককে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। [সা'দী] এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু শির্কের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন গোনাহর কাজেও নয়। যেমনটি রাসূলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [মুয়াসসার] এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে পিতামাতার অন্ধ অনুকরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

(১) অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শির্ক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/১৩১] কোন কোন বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তার মাতা হামনা বিনতে সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। [মুসলিমঃ ১৭৪৮] এই আয়াত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিনদিন তিনরাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহ্‌র ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তার মাতা অনশন ভঙ্গ করল। [বাগভী]

কাছে তোমাদের ফিরে আসা। অতঃপর তোমরা কি করছিলে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব[১]।

৯. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ ۝

১০. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি'[২], কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ

(১) অর্থাৎ এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা-ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা-মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা-মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও হবে। যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা-মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে কিন্তু পিতা-মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ্ বলছেন যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের পিতামাতার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছ এবং তোমাদের দ্বীনের উপর যে দৃঢ়পদ থেকেছ তার জন্য পুরস্কৃত করব। আর আমি তোমাকে সৎবান্দাদের সাথে হাশর করব, তোমার পিতা-মাতার দলে নয়। যদিও তারা দুনিয়াতে তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। কারণ, একজন মানুষের হাশর কিয়ামতের দিন তার সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে। অর্থাৎ দ্বীনী ভালবাসা। তাই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন যে, "আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।" [ইবন কাসীর; আরও দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) যদিও বক্তা এক ব্যক্তিমাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি"। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইংগিত রয়েছে তা হলো মুনাফিক সবসময় নিজেকে মুমিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মুমিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে

وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

তারা নিগৃহীত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে(১)। আর আপনার রবের কাছ থেকে কোন সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম(২)।' সৃষ্টিকুলের

বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। [আত-তাফসীরুল কাবীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে যে এটা বোধ হয় আল্লাহ্‌র শাস্তি তখন সে ঈমান থেকে সরে যায়। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, তখন সে এমন পেরেশান হয়ে যায় যে রকম পেরেশান হতে হয় আল্লাহ্‌র আযাবের ক্ষেত্রে। ফলে মুরতাদ হয়ে যায় [মুয়াসসার] অথবা আয়াতের অর্থ, তারা মানুষের নির্যাতনের সম্মুখীন হলে সে নির্যাতন তাদের জন্য দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া বা মুরতাদ হওয়ার কারণে পরিণত হয়, যেমন আল্লাহ্‌র আযাব কুফরি ও গোনাহ থেকে ফিরে থাকার কারণ হয়। [সা'দী; আদওয়াউল বায়ান] এ আয়াতের সমর্থনে অন্য আয়াত হচ্ছে, "আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে ; তার মংগল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।" [সূরা আল-হাজ্জ: ১১]

(২) অর্থাৎ আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মুমিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দ্বীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও সে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যখন এ দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়-দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল গনীমতের মাল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলিমদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দো'আ করছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "যারা তোমাদের অমংগলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না।' আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল

অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন?'

১১. আর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক[১]।

وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ ⑪

ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?" [সূরা আন-নিসা: ১৪১] আরও বলেন, "আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।" [সূরা আন-নিসা: ৭২-৭৩] আরও বলেন, "অতঃপর হয়ত আল্লাহ্ বিজয় বা তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫২] মোটকথা পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকুলের অন্তরের সব খবর জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, আল্লাহ্ অবশ্যই জানবেন কারা ঈমান এনেছে, আর অবশ্যই জানবেন কারা মুনাফিক। আল্লাহ্র এ জানার অর্থ প্রকাশ করে দেয়া। যাতে করে মুমিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যাকিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ বারবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ মুমিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছো (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো।) যতক্ষণ না তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেবেন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৭৯] আরও এসেছে, "আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাঁর জ্ঞান অনুসারে কোন ফয়সালা করতে চান না। তিনি চান তাদের অন্তরের লুকানো বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ুক। আর সে জন্যই তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যাতে কিয়ামতের মাঠে বলতে না পারে যে, আপনি আমাদের যদি পরীক্ষা করতেন হয়ত আমরা সে পরীক্ষায় টিকে যেতাম। [সা'দী]

১২. আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব[১] ।' কিন্তু ওরা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী[২] ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩. তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা[৩]; আর তারা যে মিথ্যা

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

(১) কুরাইশ সর্দারদের এ উক্তিটি ছিল সেসব ঈমানদারদের প্রতি যারা তাওহীদ ও আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করত। তারা তাদেরকে তাওহীদের কথা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, হিসেব ও শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কে বলত, এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি আখেরাতের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি। আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরস্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো। আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন দ্বীন ত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের দ্বীনের দিকে ফিরে এসো। [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) 'মিথ্যাচার' মানে তারা যে বলেছিল "তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো।" এটা পুরোপুরি মিথ্যাচার। [দেখুন, মুয়াসসার] কারণ কিয়ামতে একে অপরের বোঝা কখনও বহন করবে না। আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন, " আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও তা বহন করতে ডাকে তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না--- এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও।" [সূরা ফাতির: ১৮] আরও বলেন, "আর সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না, তাদেরকে করা হবে একে অন্যের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে---" [সূরা আল-মা'আরিজ: ১০-১১]

(৩) অর্থাৎ কাফেররা মুসলিমগণকে বলত, তোমরা অহেতুক আখেরাতে শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। [ইবন কাসীর] সাধারণ মুসলিমগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের উক্তির জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। আখেরাতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করবেই না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা।

রটনা করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ

১৪. আর আমরা তো নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম[১]। তিনি তাদের

তাছাড়া তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে- একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে। [ইবন কাসীর] এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় এ নিয়মটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "যাতে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করে এবং এমনসব লোকদের বোঝার একটি অংশও বহন করে যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়াই গোমরাহ করে।" [সূরা আন-নাহল: ২৫] আর এ নিয়মটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, এ জন্য তাদের প্রাপ্যে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি করা হবে না।" [মুসলিম: ২৬৭৪]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলিমদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্তনা দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব-উৎপীড়নের কারণে তারা কোন সময় সাহস হারাননি। মুমিনদের উচিত কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া না করা। পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত: এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম নবী, যিনি কুফর ও শির্কের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়ত: তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন নবী ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তার সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ⑭

মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; এমতাবস্থায় যে তারা ছিল যালিম(১)।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ⑮

১৫. অতঃপর আমরা তাকে এবং যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সৃষ্টিকুলের জন্য এটাকে করলাম একটি নিদর্শন(২)।

কুরআনের এ সূরায় বর্ণিত তার বয়স সাড়ে নয়শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা তার প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তার আরও বয়স আছে। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো–এগুলো সব নূহ আলাইহিস সালাম-এরই বৈশিষ্ট্য। এখানে এ জিনিসটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, হে মুহাম্মাদ ! আপনি কাফের মুশরিকদের অবাধ্যতায় আফসোস করে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। কারণ হেদায়াত আল্লাহ্‌র হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করবেন আর যাকে ইচ্ছে হেদায়াত থেকে দূরে রাখবেন। আপনার দায়িত্ব তো তাবলীগের মাধ্যমেই সমাপ্ত হবে। তবে এটা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ আপনার দ্বীনকে জয়ী করবেন। আপনার শত্রুদের বিনাশ করবেন। [ইবন কাসীর] আর আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদের হেদায়াত দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা তো মাত্র পাঁচ বছর থেকে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করছো এবং একটি গোমরাহ জাতির হঠকারিতা বরদাশ্‌ত করে চলছো কিন্তু আমার এ বান্দা যে অনবরত সাড়ে নয়শ' বছর ধরে এসবের মোকাবিলা করেছে তার সবর ও দৃঢ়তার কথা ভেবে দেখো। তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৩৩-৩৪; আন নিসা, ১৬৩; আল আন'আম, ৮৪; আল-আ'রাফ, ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ ও ৭৩; হূদ, ২৫ ও ৪৮; আল আম্বিয়া, ৭৬ ও ৭৭; আল মুমিনূন, ২৩ ও ৩০; আল ফুরকান, ৩৭; আশ্ শো'আরা, ১০৫ থেকে ১২৩; আস্ সাফ্‌ফাত, ৭৫ ও ৮২; আল কামার, ৯০; আল হাক্কাহ,১১ ও ১২ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

(১) অর্থাৎ তারা নিজেদের যুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকা অবস্থায় মহাপ্লাবনের গ্রাসে পরিণত হয়। যদি মহাপ্লাবন আসার আগে তারা নিজেদের যুলুম-নিপীড়ন থেকে বিরত হতো তাহলে আল্লাহ তাদের ওপর এ আযাব পাঠাতেন না। কিন্তু তারা নূহের কথা না শুনে যুলুম ও শির্কেই নিপতিত ছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এ নৌকাটিকে আমরা সৃষ্টিকুলের জন্য শিক্ষণীয় নির্দশন করেছি। পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। অন্যত্র এসেছে, "আর নূহকে আমরা

১৬. আর স্মরণ করুন ইব্‌রাহীমকে[১], যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যদি তোমরা জানতে!

وَإِبْرٰهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۖ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. 'তোমরা তো আল্লাহ্ ছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ[২]। তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া

إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ

বহন করালাম কাঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; এটা পুরস্কার তাঁর জন্য, যিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। আর আমরা এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" [সূরা আল-কামার: ১৩-১৫] এর মাধ্যমে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নৌকাটিই ছিল শিক্ষণীয় নির্দশন। শত শত বছর ধরে সেটি পর্বত শৃংগে অবস্থান করছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যেতে থেকেছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় এমন ভয়াবহ প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। [ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতে ঈমানদারদেরকে নাজাত দেয়াকেই নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [মুয়াসসার]

(১) এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্ করার ঘটনা ইত্যাদি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী প্রসঙ্গে লুত আলাইহিস সালাম ও তার উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন নবী ও তাদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাদেরকে দ্বীনের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ তোমরা এসব মূর্তি তৈরী করছো না বরং মিথ্যা তৈরী করছো। এ মূর্তিগুলোর অস্তিত্ব নিজেই একটি মূর্তিমান মিথ্যা। তার ওপর তোমাদের এ আকীদা-বিশ্বাস যে, এরা দেব-দেবী, আল্লাহর অবতার, তাঁর সন্তান, আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ও তাঁর কাছে শাফা'আতকারী অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রোগ নিরাময়কারী আবার কেউ সন্তান-দাতা এবং কেউ রিযিকদাতা এসবই মিথ্যা কথা। তোমরা নিজেদের ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে এসব রচনা করেছো। আসল সত্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এগুলো নিছক হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি এবং এদের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব নেই। এগুলো কখনো ইলাহ হতে পারে না। [দেখুন, সা'দী; মুয়াসসার]

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

যাদের ইবাদাত কর তারা তো তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছেই রিযিক চাও এবং তাঁরই 'ইবাদাত কর। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۭ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

১৮. 'আর যদি তোমরা মিথ্যারোপ কর তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না[২], কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? তারপর তিনি তা আবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

---

(১) এ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি একত্র করেছেন। মনে হয় যেন তিনি বলছেন, যে নিজে অসম্পূর্ণ, অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় তার অস্তিত্বের জন্য, যে মূর্তিগুলো তোমাদের কোন প্রকারের কোন রিযিক দান করতে পারে না, তারা সামান্য– সামান্যতমও কোন প্রকার ইবাদাতের মালিক হতে পারে না। তোমাদেরকে তো আল্লাহর দিকে ফিরে যেতেই হবে। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। [সা'দী]

(২) ১৯-২৩ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো কি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বাকী কথা নাকি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রসংগ, এ নিয়ে দুটি মত রয়েছে। ইবন কাসীর বলেন, এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথার বাকী অংশ। তবে ইবন জারীর তাবারী বলেন, এটি মূল আলোচনার মাঝখানে স্বতন্ত্র প্রাসংগিক বিষয় হিসেবে আনা হয়েছে। সে হিসেবে ইবরাহীমের কাহিনীর ধারা বর্ণনা ছিন্ন করে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে একথাগুলো বলেছেন। অর্থাৎ হে কুরাইশরা তোমরা তাদের মতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করেছ যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর মিথ্যারোপ করেছে। [তাবারী]

২০. বলুন, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? তারপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢٠

২১. তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। আর তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝٢١

২২. আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না যমীনে[১], আর না আসমানে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই[২]।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝٢٢

তৃতীয় রুকূ'

২৩. আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ

(১) অর্থাৎ আসমান ও যমীনের কেউ আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না। [তাবারী] অথবা, তোমরা পালিয়ে এমন কোন জায়গায় চলে যেতে পারো না যেখানে গিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো। [দেখুন, সা'দী; মুয়াসসার] সূরা আর রাহমানে এ কথাটিই জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জের সুরে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে একটু বের হয়ে দেখিয়ে দাও। তা থেকে বের হবার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই তোমরা কোনক্রমেই বের হতে পারো না। [সূরা আর-রাহমান : ২৩]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোন অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারে। [দেখুন, তাবারী] যারা শির্ক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর নাফরমানী করেছে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই।

يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়েছে। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, 'একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর(১)।' অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে(২)।

---

(১) অর্থাৎ ইবরাহীমের ন্যায়সংগত যুক্তির কোন জবাব তাদের কাছে ছিল না। তাদের যদি কোন জবাব থেকে থাকে তাহলে তা এই ছিল যে, হক কথা বলছে যে কণ্ঠটি সেটি স্তব্ধ করে দাও এবং যে ব্যক্তি আমাদের ভুল আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে এবং তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলছে তাকে জীবন্ত রেখো না। এভাবে তারা তাদের ক্ষমতা ও শক্তির জোর দেখাল। [ইবন কাসীর] "হত্যা করো ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারো" শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, সমগ্র জনতা ইবরাহীমকে মেরে ফেলার ব্যাপারে একমত ছিল তবে মেরে ফেলার পদ্ধতির ব্যাপারে ছিল বিভিন্ন মত। কিছু লোকের মত ছিল, তাঁকে হত্যা করা হোক। আবার কিছু লোকের মত ছিল, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক, এর ফলে ভবিষ্যতে যারা এ ভূখণ্ডে হক কথা বলার পাগলামী করতে চাইবে এটা তাদের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। তবে সবশেষে পুড়িয়ে ফেলার ব্যাপারেই তাদের মত স্থির হলো। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) এর মধ্যে ঈমানদারদের জন্য এ মর্মে নিদর্শন রয়েছে যে, তারা রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার প্রমাণ পাবে। আর এটাও জানতে পারবে যে, নবী-রাসূলগণ সবচেয়ে বড় নেককার ও তারা মানুষের কল্যাণকামী। আরও প্রমাণ পাবে যে, যারা নবী-রাসূলদের বিরোধিতা করবে তাদের কথা অসার ও স্ববিরোধী। আরও প্রমাণ পাবে যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলদের বিরোধিরা যেন পরস্পর শলা-পরামর্শ করে রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছে ও পরস্পর এ ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছে। [সা'দী] তাছাড়া এতে আরও নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, তাঁর রাসূলদের সম্মান রক্ষা, তাঁর ওয়াদার বাস্তবায়ণ, তাঁর শত্রুদের হেয়করণ। তাছাড়া আরও প্রমাণ রয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্ট সে বড় কিংবা ছোট যাই হোক না কেন আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরতের অধীন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তাছাড়া এ ব্যাপারেও নির্দশন রয়েছে যে, তিনি আগুনের

২৫. ইব্‌রাহীম আরও বললেন[১], 'তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে[২]। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা'নত দেবে। আর তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না[৩]।'

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾

ভয়াবহ শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিহার করতে প্রস্তুত হননি। নিদর্শন এ ব্যাপারেও রয়েছে যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও পরীক্ষার পুল পার না করিয়ে ছাড়েননি। আবার এ ব্যাপারেও যে, ইবরাহীমকে আল্লাহ যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন তাতে তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন, তবে এই আল্লাহর সাহায্য তার জন্য এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে আসে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) বক্তব্যটি আগুনে নিক্ষেপের আগেও বলা হয়ে থাকতে পারে। তবে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, আগুনের মধ্য থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসার পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম লোকদেরকে একথা বলেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে মূর্তিপূজার ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছো। এ ব্যবস্থা দুনিয়ার জীবনের সীমানা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় সত্ত্বাকে একত্র করে রাখতে পারে। কারণ এখানে সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে যে কোন আকীদার ভিত্তিতেই যে কোন ঐক্য ও সমাজ গড়ে উঠুক না কেন তা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব ও অন্যান্য সকল ধর্মীয়, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে। সেটাই কেবল তোমাদেরকে এ শির্কের উপর একত্রিত করে রেখেছে। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) অর্থাৎ মিথ্যা আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের এ সম্পর্ক আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সেখানে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, সহযোগিতা, আত্মীয়তা এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কামনা-বাসনার কেবলমাত্র এমন ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে যা দুনিয়ায় এক আল্লাহর বন্দেগী এবং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফরী ও শির্ক এবং ভুল পথ ও কুপথের সাথে জড়িত যাবতীয় সম্পর্ক সেখানে ছিন্ন হয়ে যাবে। সকল ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হবে। সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। একে অন্যের ওপর লা'নত বর্ষণ করবে

২৬. অতঃপর লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। আর ইব্‌রাহীম বললেন, 'আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি[১]। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۶﴾

২৭. আর আমরা ইব্‌রাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব[২] এবং

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِیْ

[ইবন কাসীর] এবং প্রত্যেকে নিজের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবে, এই যালেম আমাকে ধ্বংস করেছে, কাজেই একে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। একথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে: "বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।" [সূরা যুখরুফ: ৬৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার কাছের দলের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে প্রবেশ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলের বিরুদ্ধে বলবে: হে আমাদের রব! এ লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে, কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৩৮] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তারা বলবে , হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের বিপথগামী করেছে। হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের ওপর বড় রকমের লানত বর্ষণ করুন।" [সূরা আল-আহযাব:৬৭-৬৮]

(১) লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম যিনি মুসলিম হন। তিনি এবং তার পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোন ও মুসলিম ছিলেন, দেশত্যাগের সময় তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী হন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ-ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদাতে কোন বাধা নেই। ইবরাহীম নখ'য়ী ও কাতাদাহ বলেন, ﴿اِنِّیْ مُهَاجِرٌ﴾ ইবরাহীমের উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য ﴿وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ﴾ তে নিশ্চিতরূপে তারই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার ﴿اِنِّیْ مُهَاجِرٌ﴾ কে লূত আলাইহিস সালাম-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কিন্তু পূর্বাপর বর্ণানাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। লূত আলাইহিস সালামও এই হিজরতে শরীক ছিলেন, কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি লূত আলাইহিস সালাম-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

(২) ইসহাক আলাইহিস্ সালাম ছিলেন তাঁর পুত্র এবং ইয়াকূব ছিলেন পৌত্র। এখানে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের অন্যান্য পুত্রদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম সন্তানদের মাদ্‌ইয়ানী শাখায় কেবলমাত্র শু'আইব আলাইহিস সালামই

ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবূওয়ত ও কিতাব। আর আমরা তাকে তার প্রতিদান দুনিয়ায় দিয়েছিলাম; এবং আখিরাতেও তিনি নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবেন(১)।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর স্মরণ করুন লূতের কথা, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি।'

নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসমাঈলী শাখায় মুহাম্মাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরে আর কোন নবী আসেননি। পক্ষান্তরে ইসহাক আলাইহিস সালাম থেকে যে শাখাটি চলে তার মধ্যে একের পর এক ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নবুওয়াত ও কিতাবের নেয়ামত প্রদত্ত হতে থাকে।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছেন। তাঁকে মানুষের প্রিয় ও নেতা করেছেন। যারাই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল তারা সবাই দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, আজ দুনিয়ার কোথাও তাদের কোন নাম নিশানাও নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার অপরাধে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় স্বদেশভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল তাকে আল্লাহ এমন সফলতা দান করেন যে, দুনিয়াতে তাকে উত্তম স্বচ্ছন্দ রিযিক, প্রশস্ত আবাস, উত্তম নেককার স্ত্রী, সুপ্রশংসা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে তার নাম সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দুনিয়ার সকল মুসলিম, নাসারা ও ইয়াহূদী রাব্বুল আলামীনের সেই খলীল তথা বন্ধুকে একযোগে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে। একমাত্র সেই ব্যক্তি এবং তার সন্তানদের থেকেই তারা হিদায়াতের আলোকবর্তিকা লাভ করতে পেরেছে। আখেরাতে তিনি যে মহাপুরস্কার লাভ করবেন তাতো তার জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে কিন্তু এ দুনিয়ায়ও তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টায় জীবনপাতকারীদের একজনও আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি। [দেখুন, ইবন কাসীর; সা'দী; আদওয়াউল বায়ান] এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো আখেরাতে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎকর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

২৯. 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক[১]।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর---তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।'

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

চতুর্থ রুকূ'

৩১. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের কাছে আসল,

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا

(১) এখানে লূত আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, পুংমৈথুন, যা এর পূর্বে আদম সন্তানদের আর কেউ করে নি। সাথে সাথে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করত এবং রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করত। দ্বিতীয়ত, রাহাজানি, অর্থাৎ পথে মানুষদেরকে আক্রমন করে তাদের হত্যা করত এবং সবকিছু নিয়ে নিত। আর তৃতীয়ত, তারা মজলিসে সবার সামনে এমন অপকর্ম করত, যা সম্পূর্ণ অশোভনীয় ছিল। তাদের একজন অন্যজনকে তা থেকে বাধা দিত না। কুরআন তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গুনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ্। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্যে মজলিসে করত। উদাহরণত: পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়া। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই মজলিসের সবার সামনে করত। কারও কারও মতে, তারা প্রকাশ্যে বড় শব্দ করে গুহ্যদেশ দিয়ে বাতাস বের করত। কারও কারও মতে, ছাগল ও মোরগ লড়াই চালিয়ে যেত। এই সবই তারা করত। আর তারা আরও কঠিন প্রকৃতির খারাপ কাজ করত। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে এক গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব[১], এর অধিবাসীরা তো যালিম।'

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. ইব্রাহীম বললেন, 'এ জনপদে তো লূত রয়েছে।' তারা বলল, 'সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভাল জানি, নিশ্চয় আমরা লূতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তার স্ত্রীকে ছাড়া[২]; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ লূতের কাছে আসল, তখন তাদের জন্য তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। আর তারা বলল, 'ভয় করবেন না, দুঃখও করবেন না; আমরা আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, আপনার স্ত্রী ছাড়া; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত;

---

(১) "এ জনপদ" বলে লূত জাতির এলাকা সাদূমকে বুঝানো হয়েছে। [বাগভী; মুয়াসসার] ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এ সময় ফিলিস্তিনের বর্তমান আল খলীল শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মৃতসাগরের অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়।

(২) এ মহিলা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, লূতের এই স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফায়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্বেও তা তার কোন কাজে লাগবে না। [যেমন, সূরা আত-তাহরীম:১০] যেহেতু আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হয় তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে, তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়েছিল। সে তার কাওমের কুফরিকে সমর্থন করছিল এবং তাদের সীমালঙ্ঘনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর]

৩৪. 'নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করছিল।'

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আর অবশ্যই আমরা এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি[১]।

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর আমরা মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, এবং শেষ দিনের আশা কর[২]। আর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।'

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. অতঃপর তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; ফলে তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾

---

(১) এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মৃতসাগর। একে লূত সাগরও বলা হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই যালেম জাতিটির ওপর তার কৃতকর্মের বদৌলতে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার একটি চিহ্ন আজো প্রকাশ্যে রাজপথে বর্তমান রয়েছে। তোমরা সিরিয়ার দিকে নিজেদের বাণিজ্য সফরে যাবার সময় দিনরাত এ চিহ্নটি দেখে থাকো। [দেখুন, সূরা আল-হিজর: ৭৫-৭৭; সূরা আস-সাফফাত: ১৩৭] বর্তমান যুগে এখানে পানির মধ্যে কিছু ডুবন্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

(২) এর দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আখেরাতের আগমন কামনা করো। একথা মনে করো না, যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই এবং এরপর আর এমন কোন জীবন নেই, যেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে এবং তার পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করো যার ফলে তোমরা আখেরাতে ভালো পরিণতি লাভের আশা করতে পারো। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে ওদের মধ্যে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৬] [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۟

৩৮. আর আমরা 'আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরের কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে[১]। আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ[২]।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۟ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۟

৩৯. আর আমরা ধ্বংস করেছিলাম কারূন, ফির'আউন ও হামানকে। আর অবশ্যই মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল; অতঃপর তারা যমীনে অহংকার করেছিল; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ

৪০. সুতরাং তাদের প্রত্যেককেই আমরা তার অপরাধের জন্য পাকড়াও

---

(১) আরবের যেসব এলাকায় এ সব জাতির বসতি ছিল আরবের লোকেরা তা জানতো। দক্ষিণ আরবের যেসব এলাকা বর্তমানে আহকাফ, ইয়ামন ও হাদরামাউত নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে সে এলাকাগুলোতে ছিল আদ জাতির বাস। হিজাযের দক্ষিণ অংশে রাবেগ থেকে আকাবাহ পর্যন্ত শু'আইব জাতির এবং মদীনার ওয়াদিউল কুরা থেকে তাইমা ও তাবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আজো সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ দেখা যায়। কুরআন নাযিল হবার যুগে এ ধ্বংসাবশেষগুলোর অবস্থা বর্তমানের তুলনায় আরো কিছু বেশী সুস্পষ্ট থেকে থাকবে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) مستبصر এর অর্থ বিচক্ষণ বা চক্ষুষ্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শির্ক করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উম্মাদ ছিল না। তারা দলীল-প্রমাণাদি থেকে সত্য গ্রহণ করতে সমর্থ ছিল, কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল। তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ও খোলা চোখে শয়তান যে পথ দেখিয়েছিল এবং যে পথে তারা বড়ই লাভ ও ভোগের সন্ধান পেয়েছিল সে পথে পাড়ি জমিয়েছিল এবং এমন পথ পরিহার করেছিল যা তাদের কাছে নীরস, বিস্বাদ এবং নৈতিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হবার কারণে কষ্টকর মনে হচ্ছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] অন্যত্র বলা হয়েছে: "তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে ; কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন।" [সূরা আর-রূম: ৭]

حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

করেছিলাম। তাদের কারো উপর আমরা পাঠিয়েছিলাম পাথরকুচিসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝটিকা[১], তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমরা প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে আমরা করেছিলাম নিমজ্জিত। আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ

৪১. যারা আল্লাহ্ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়[২], যে ঘর বানায়। আর ঘরের

(১) অর্থাৎ আদ জাতির। তাদের ওপর অবিরাম সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ভয়াবহ তুফান চলতে থাকে। [সূরা আল-হাক্কাহ:৭]

(২) মাকড়সাকে "আনকাবূত" বলা হয়। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জাল দুর্বলতর। যা সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে। [ইবন কাসীর] বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে যারা একেবারে অক্ষম বান্দা ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর নির্ভর করে চলেছে তার প্রকৃত অবস্থা মাকড়শার জালের চাইতে বেশী কিছু নয়। মাকড়শার জাল যেমন আঙ্গুলের সামান্য একটি টোকাও বরদাশ্ত করতে পারে না, তেমনি তোমাদের আশার অট্টালিকাও আল্লাহর ব্যবস্থার সাথে প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। সামান্য বৃষ্টিও যার সবকিছু বিনষ্ট করে দেয়, তোমাদের সামান্যতম উপকারও তারা করতে পারে না [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] সুতরাং সত্য কেবল এই যে, একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করা যায় না। আল্লাহ্ বলেন: "যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে) অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন মজবুত নির্ভরকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬]

الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত[১]।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

৪২. তারা আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তো তা জানেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর এ সকল দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য দেই; কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে[৩]।

---

(১) এর দুটি অর্থ হয়। এক. যদি তারা জানত যে তাদের মা'বুদগুলো মাকড়শার জালের মত, তবে এ ধরনের মা'বুদের পিছনে কখনও থাকত না। দুই. যদি তাদের কোন জ্ঞান থাকত, তবে তারা জানত যে, আল্লাহ্ তাদের মা'বুদদের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যেসব জিনিসকে এরা মা'বুদে পরিণত করেছে এবং যাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে, তাদের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতার মালিক এবং তাঁরই বিচক্ষণ কর্মকুশলতা ও জ্ঞান এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে, আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই নয় (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও ক্ষমতাহীন) এবং একমাত্র তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের শাস্তি দিবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না। মূলতঃ কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহ্র কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে। আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২০৩] এটা নিঃসন্দেহে আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে। আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেন: "এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই, কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে"। [ইবন কাসীর]

খَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন(১); এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য ।

পঞ্চম রুকূ'

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ

৪৫. আপনি(২) তেলাওয়াত করুন কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়(৩) এবং সালাত কায়েম করুন(৪) ।

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ আসমান ও যমীন যথাযথই সৃষ্টি করেছেন । তিনি কোন খেলাচ্ছলে তা সৃষ্টি করেন নি । [ইবন কাসীর] তিনি আসমান ও যমীন ইনসাফ ও আদলের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন । অথবা আয়াতের অর্থ, তিনি আসমান ও যমীন তাঁর কালেমা ও নির্দেশ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন । অথবা আয়াতের অর্থ, তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যখন সেটা সৃষ্টি করা ছিল যথাযথ । [ফাতহুল কাদীর]

(২) আপাত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে সমস্ত মুসলিমদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে । এতে দু'টি অংশ আছে, কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত কায়েম করা । কারণ এ দু'টি জিনিসই মুমিনকে এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নতর যোগ্যতার অধিকারী করে যার সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল বন্যা এবং দুষ্কৃতির ভয়াবহ ঝঞ্ঝার মোকাবিলায় সঠিক পথে থাকতে পারে । [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) কুরআন তেলাওয়াতের এ শক্তি মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে যখন সে কুরআনের শুধুমাত্র শব্দগুলো পাঠ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার শিক্ষাগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে সেগুলোকে সঞ্চারিত করে যেতে থাকে । আসলে যে তেলাওয়াতের পরে মানুষের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র-কর্মনীতিতে কোন পরিবর্তন আসে না বরং কুরআন পড়ার পরও কুরআন যা নিষেধ করে মানুষ তা সব করে যেতে থাকে তা একজন মুমিনের কুরআন তেলাওয়াত হতেই পারে না । মূলতঃ কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে যে কুরআনের প্রতি ঈমানই আনেনি । এ অবস্থাটিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট বাক্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেনঃ "কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ ।" [মুসলিম: ২২৩]

(৪) কুরআন তেলাওয়াতের পর দ্বিতীয় যে কাজটির প্রতি উম্মতকে অনুবর্তী করার নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে তা হলো, সালাত । সালাতকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, সালাত স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং দ্বীনের স্তম্ভ । এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, সালাত

নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে[১]। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ[২]। তোমরা যা

وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। [ইবন কাসীর] আয়াতে ব্যবহৃত 'ফাহ্‌শা' শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে 'মুনকার' এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরী'আত বিশারদগণ একমত। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] 'ফাহ্‌শা' ও 'মুনকার' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা। সালাতের মাধ্যমে এ সকল বাধা দূরীভুত হয়।

(১) এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে সালাতের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি? এর কয়েকটি জওয়াব দেয়া হয়। এক. প্রকৃত সালাত আদায়কারীকে সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখবে। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, যার সালাত তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখল না সে সালাত দ্বারা আল্লাহ্ থেকে দূরেই রয়ে গেল। [তাবারী] দুই. ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ যারা নিয়মিত সালাত আদায় করবে, তাদের এ অবস্থাটি তৈরী হবে। হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল,অমুক লোক রাতে সালাত আদায় করে, আর সকাল হলে চুরি করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অচিরেই তার সালাত তাকে তা থেকে নিষেধ করবে। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৪৭]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহ্‌র যিকির সবচেয়ে বড় ইবাদাত। সালাত বড় ইবাদাত হবার কারণ হচ্ছে, এতে আল্লাহর যিকির থাকে। সুতরাং যে সালাতে যিকির বেশী সে সালাত বেশী উত্তম। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ অনেক বড় জিনিস, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মানুষের কোন কাজ এর চেয়ে বেশী বড় নয়। [তাবারী] এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে আল্লাহ কর্তৃক তোমাকে স্মরণ করা অনেক বেশী বড় জিনিস। [তাবারী] কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৫২] কাজেই বান্দা যখন সালাতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে তখন অবশ্যই আল্লাহ্‌ও তাকে স্মরণ করবেন। আর বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার তুলনায় আল্লাহর বান্দাকে স্মরণ করা অনেক বেশী উচ্চমানের। বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশেও স্মরণ করেন। আল্লাহ্‌র এ স্মরণ

কর আল্লাহ্ তা জানেন।

৪৬. আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না[১], তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলুম করেছে[২]। আর

وَلَا تُجَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ

ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, সালাত পড়ার মধ্যে গোনাহ্ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ্ স্বয়ং সালাত আদায়কারীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। [দেখুন, বাগভী]

(১) অর্থাৎ কিতাবীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত: কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসূলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও। বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ সহকারে, ভদ্র ও শালীন ভাষায় এবং বুঝবার ও বুঝাবার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর] এর ফলে যার সাথে আলোচনা হয় তার চিন্তার সংশোধন হবে। প্রচারকের চিন্তা করা উচিত, তিনি শ্রোতার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সত্যকথা তার মধ্যে বসিয়ে দেবেন এবং তাকে সঠিক পথে আনবেন। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিতাবীদের সাথে বিতর্ক-আলোচনা করার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বিশেষভাবে কিতাবীদের জন্য নয়। মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। বরং দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। যেমন বলা হয়েছে, "আহ্বান করুন নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনা করুন।" [সূরা আন-নাহল: ১২৫] আরো বলা হয়েছে, "সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমান নয়। (বিরোধীদের আক্রমণ) প্রতিরোধ করুন উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। আপনি দেখবেন এমন এক ব্যক্তি যার সাথে আপনার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেমন আপনার অন্তরংগ বন্ধু।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৪] আরো এসেছে, "আপনি উত্তম পদ্ধতিতে দুষ্কৃতি নির্মূল করুন। আমরা জানি (আপনার বিরুদ্ধে) তারা যেসব কিছু তৈরী করে।" [সূরা আল-মুমিনূন: ৯৬] বলা হয়েছে, "ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন, ভালো কাজ করার নির্দেশ দিন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন। আর যদি (মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য) শয়তান আপনাকে উসকানী দেয় তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চান।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৯-২০০]

(২) অর্থাৎ যারা যুলুমের নীতি অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের যুলুমের প্রকৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন নীতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সবসময় সব অবস্থায় সব ধরনের লোকদের মোকাবিলায় নরম ও সুমিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকলে

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

তোমরা বল, 'আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী(১)।'

চলবে না। যেন মানুষ সত্যের আহ্বায়কের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ও অসহায়তা মনে না করে বসে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবশ্যই ভদ্রতা, বিনয়, শালীনতা ও যুক্তিবাদিতার শিক্ষা দেয় কিন্তু হীনতা ও দীনতার শিক্ষা দেয় না। এ আয়াতে আল্লাহর পথে দাওয়াতের আরও একটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, যারা যুলুম করে এবং সীমালঙ্ঘন করবে তাদের সাথে তারা যে রকম ব্যবহার করবে সে রকম ব্যবহার করা বৈধ। সুতরাং যারা তোমাদের প্রতি যুলুম করে তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবেলায় জেদ ও হঠকারিতা করে তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেয়া যাবে, যদিও তখনো তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে: "তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়। [সূরা আন-নাহল:১২৬] [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মুজাহিদ বলেন, এখানে যারা যুলুম করে বলে, সরাসরি যোদ্ধা কাফেরদের বোঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে। জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে তাদের সাথে আর সাধারণ সুন্দর অবস্থা বিরাজ করবে না। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলিমগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের নবীগণের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সে ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের নবীদের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই। এ বাক্যগুলোতে মহান আল্লাহ নিজেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। সত্য প্রচারের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তাদের এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এখানে শেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিতর্ক করতে হবে তার ভ্রষ্টতাকে আলোচনার সূচনা বিন্দুতে পরিণত করো না। বরং সত্য ও ন্যায়-নীতির যে অংশগুলোর তোমার ও তার মধ্যে সমভাবে বিরাজ করছে সেগুলো থেকে আলোচনা শুরু করো। অর্থাৎ বিরোধীয় বিন্দু থেকে আলোচনা শুরু না করে ঐক্যের বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে। তারপর সেই সর্বসম্মত বিষয়াবলী থেকে যুক্তি পেশ করে শ্রোতাকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে যে, তোমার ও তার মধ্যে

৪৭. আর এভাবেই আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি[1] অতঃপর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর উপর ঈমান রাখে[2]। আর এদেরও[3] কেউ কেউ এতে ঈমান রাখে। আর কাফিররা ছাড়া কেউই আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে না।

وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۚ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايٰتِنَآ إِلَّا الْكٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আপনি তো এর আগে কোন কিতাব পড়েননি এবং নিজ হাতে কোন কিতাবও লেখেননি যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করবে[4]।

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

যেসব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোতে তোমার অভিমত সর্বসম্মত ভিত্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং তার অভিমত হচ্ছে তার বিপরীতধর্মী। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি আমি কিতাব নাযিল করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে এ কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করেছি। [তাবারী] দুই, আমি এই শিক্ষা সহকারেই একে নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী কিতাবগুলো অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলোর সত্যায়ণকারী রূপেই নাযিল করেছি। [সা'দী]

(২) পূর্বাপর বিষয়বস্তু নিজেই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে সমস্ত আহলে কিতাবের কথা বলা হয়নি। বরং এমন সব আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাবের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের সামনে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে সত্যায়িত করে এ শেষ কিতাবটি এলো তখন তারা কোন প্রকার জিদ, হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতির আশ্রয় নিলেন না এবং তাকেও ঠিক তেমনি আন্তরিকতা সহকারে স্বীকার করে নিলেন যেমন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে স্বীকার করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ও সালমান আল-ফারেসী এবং তাদের মত যারা ছিলেন। [ইবন কাসীর]

(৩) "এদের" শব্দের মাধ্যমে কুরাইশ ও অন্যান্য আরববাসীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] এর অর্থ হচ্ছে, সত্যপ্রিয় লোকেরা, তারা আহলে কিতাব বা অ-আহলে কিতাব যারাই হোক না কেন, সর্বত্রই এর প্রতি ঈমান আনছে।

(৪) অর্থাৎ আপনি কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর। আল্লাহ্ তা'আলা

৪৯. বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন[১]।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত প্রমাণ করার জন্যে যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে একটি যুক্তি। তার স্বদেশবাসী ও আত্মীয়-বান্ধবগন, যাদের মধ্যে তিনি শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন, সবাই ভালোভাবে জানতো তিনি সারা জীবন কখনো কোন বই পড়েননি এবং কলম হাতে ধরেননি। [দেখুন, ইবন কাসীর] এ সত্য ঘটনাটি পেশ করে মহান আল্লাহ বলছেন, এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাবলী, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্ম ও দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস, প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস এবং সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিক জীবন যাপনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে যে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের প্রকাশ ও নিরক্ষর নবীর কণ্ঠ থেকে হচ্ছে তা তিনি অহী ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে অর্জন করতে পারতেন না। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন তবে হয়ত কেউ বলতে পারত যে, তিনি আগেকার নবীদের কোন কিতাব থেকে শিখে নিয়ে তা মানুষদের মধ্যে প্রচার করছেন। তবে মক্কার কিছু লোক রাসূলের নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও একথা বলতে ছাড়েনি যে, তিনি কারও কাছ থেকে লিখে নিয়ে তা সকাল বিকাল পড়ে শোনাচ্ছেন। যেমন তারা বলেছিল, "তারা আরও বলে, 'এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; তারপর এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।" [সূরা আল-ফুরকান: ৫] এর জওয়াবে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-ফুরকান: ৬]

(১) অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, "বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।" অর্থাৎ এ কুরআন তার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও সংবাদে হকের উপর প্রমাণবহ হওয়ার দিক থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন। আলেমগণ এটাকে তাদের বক্ষে সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটা মুখস্থ, তেলাওয়াত ও তাফসীর সহজ করে দিয়েছেন। এ সবই এ কুরআনের জন্য বিরাট নিদর্শন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য ; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" [সূরা আল-কামার: ১৭] অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন, "প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু নিদর্শন দেয়া হয়, যা দেখে মানুষ তার উপর ঈমান আনে। আমাকে দেয়া হয়েছে ওহী। যা আল্লাহ্ আমার কাছে ওহী করেছেন। আমি আশা করব যে তাদের থেকেও বেশী অনুসারী পাব।" [বুখারী: ৪৯৮১; মুসলিম: ১৫২] [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, একজন নিরক্ষরের পক্ষে কুরআনের মতো একটি কিতাব পেশ করা এবং সহসা এমনসব অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রকাশ ঘটানো, যেগুলোর জন্য

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

আর শুধু যালিমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে।

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা আরও বলে, 'তার রব- এর কাছ থেকে তার কাছে নিদর্শনসমূহ নাযিল হয় না কেন?' বলুন, 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌রই কাছে। আর আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৫১. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়[১]। এতে তো অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে।

ষষ্ঠ রুকূ'

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তিনি জানেন। আর যারা বাতিলে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'

পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ আয়োজন কখনো কারো চোখে পড়েনি, এগুলোই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের দৃষ্টিতে তার নবুওয়াতের প্রমাণ পেশকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছেও এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এই যে অপারগকারী কিতাব নিয়ে এসেছেন, যার মোকাবিলা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি, এটাই তো তাদের নিদর্শনের জন্য যথেষ্ট। এ কিতাবে রয়েছে পূর্ববর্তীদের খবর, পরবর্তীদের খবর, তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ব্যাপারসমূহের সঠিক ফয়সালা। তারপরও তারা কেন নিদর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করছে? [ইবন কাসীর]

৫৩. আর তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। আর যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আসত। আর নিশ্চয় তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, অথচ তারা উপলব্ধিও করবে না।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, আর জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫. সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে তাদের উপর থেকে ও তাদের নীচ থেকে। আর তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে তা আস্বাদন কর।'

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার যমীন প্রশস্ত; কাজেই তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর[১]।

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৭. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; তারপর তোমরা আমাদেরই কাছে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে মুসলিমগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা। আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদাত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্র জন্যে সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আর এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্য সাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করেছিলেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

৫৮. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত[২], সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সে সকল কর্মশীলদের জন্য,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. যারা ধৈর্য ধারণ করে[৩] এবং তাদের

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

(১) হিজরতের পথে প্রথম বাধা হলো, মৃত্যুর ভয়। স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ প্রথম যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হলো, নিজের প্রাণের আশংকা। স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। আয়াতে এই আশংকার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। [ফাতহুল কাদীর] বিশেষত: আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের কারণ। আখেরাতে এই সুখ ও নেয়ামত পাওয়া যাবে। তাই প্রাণের কথা ভেবে ঈমান ও হিজরত থেকে পিছপা হয়ো না।

(২) সে সমস্ত প্রাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'নিশ্চয় জান্নাতে এমন প্রাসাদ আছে যার অভ্যন্তর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায় আর বাইরের অংশ থেকে অভ্যন্তরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ্ তা তাদের জন্যই তৈরী করেছেন যারা খাবার খাওয়ায়, নরমভাবে কথা বলে, পরপর সাওম রাখে আর মানুষের নিদ্রাবস্থায় সে সালাত আদায় করে।' [মুসনাদ:৫/৩৪৩]

(৩) অর্থাৎ যারা সব রকমের সমস্যা, সংকট, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবিলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যারা ঈমান আনার বিপদ নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। ঈমান ত্যাগ করার পার্থিব উপকারিতা ও মুনাফা যারা নিজের চোখে দেখেছে কিন্তু এরপরও তার প্রতি সামান্যতমও ঝুঁকে পড়েনি। যারা কাফের ও ফাসেকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি। একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর কাছে যা আছে তা পাবার আশায়, তাঁর ওয়াদার সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, শত্রুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসেছে, তাদের জন্যই স্থায়ী জান্নাত রয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

রব-এর উপরই তাওয়াক্কুল করে[১]।

৬০. আর এমন কত জীবজন্তু রয়েছে যারা নিজেদের রিযিক মজুদ রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

(১) অর্থাৎ যারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, কাজ-কারবার ও বংশ-পরিবারের ওপর ভরসা করেনি বরং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতিটি কাজে নিজেদের রবের ওপর ভরসা করেছে। তারাই উক্ত জান্নাতের অধিকারী। [দেখুন, ইবন কাসীর] যারা দুনিয়াবী উপায়-উপাদানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিছক নিজেদের রবের ভরসায় ঈমানের খাতিরে প্রত্যেকটি বিপদ সহ্য করার জন্য তৈরী হয়ে যায় এবং সময় এলে বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। যারা নিজেদের রবের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখে যে, ঈমান ও নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান তাঁর কাছে কখনো নষ্ট হবে না এবং বিশ্বাস রাখে যে, তিনি নিজের মুমিন ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এ দুনিয়ায় সহায়তা দান করবেন এবং আখেরাতেও তাদের কার্যক্রমের সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।

(২) হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? এ আয়াতসমূহে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিকদান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] হাদীসে আছে, 'পক্ষীকূল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।' [তিরমিযী: ২৩৪৪] অথচ তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটভর্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়। বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

৬১. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে!

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই'[১]। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুধাবন করে না।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

সপ্তম রুকূ'

৬৪. আর এ দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়[২]। আর

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ

(১) এখানে "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" শব্দগুলোর দু'টি অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব যখন আল্লাহরই কাজ তখন একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। অন্যেরা প্রশংসা লাভের অধিকার অর্জন করলো কোথায় থেকে ? দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আল্লাহর শোকর, তোমরা নিজেরাও একথা স্বীকার করছো। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে পার্থিবজীবন ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ। পার্থিব জীবনের বাস্তবতা শুধুমাত্র এতটুকুই যেমন ছোট ছেলেরা কিছুক্ষণের জন্য নেচে গেয়ে

الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন[১], যদি তারা জানত!

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। তারপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়[২];

আমোদ করে এবং তারপর যার যার ঘরে চলে যায়। জীবনের কোন একটি আকৃতিও এখানে স্থায়ী ও চিরন্তন নয়। যে যে অবস্থায়ই আছে সাময়িকভাবে একটি সীমিত সময়কালের জন্যই আছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ যদি তারা একথা জানতো, এ দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষার অবকাশ মাত্র এবং মানুষের জন্য আসল জীবন, যা চিরকাল স্থায়ী হবে, তা হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাহলে তারা এখানে পরীক্ষার সময়-কালকে খেলা-তামাশায় নষ্ট না করে এর প্রতিটি মুহূর্ত এমনসব কাজে ব্যবহার করতো যা সেই চিরন্তন জীবনের জন্য উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হতো। দুনিয়ার জীবনের উপর আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিত। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে মুশরিকদের একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌কে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও ইবাদতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই উদ্ধার করতে পারেন। তাহলে সবসময় তাঁকেই কেন ডাকা হয় না? [দেখুন, ইবন কাসীর] উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্যে কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দো'আ কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যালেমরা যখন তীরে পৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। ফলে এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের সাথে কুফরি করে। তাই তারা কিছু দিন ভোগ করে নিক। অচিরেই তারা জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি, তার সাথে কুফরী করার এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার উদ্দেশ্যে; সুতরাং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তারা কি দেখে না আমরা 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়। তবে কি তারা বাতিলকে স্বীকার করবে, আর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করবে[১]?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর কাছ থেকে সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে[২]?

---

(১) কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হত যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত দ্বীনকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলিম হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে। এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ্‌ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হারাম তথা নিরাপদ আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত বৈ নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ নবী রিসালাতের দাবী করেছেন এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো। এখন বিষয়টি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। নবী যদি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা দাবী করে থাকেন, তাহলে তার চেয়ে বড় যালেম আর কেউ নেই। আর যদি তোমরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাক, তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় যালেম আর কেউ নেই। [ইবন কাসীর]

জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?

৬৯. আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন[২]।

وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

---

(১) جهاد ও مجاهدة এর আসল অর্থ দ্বীনের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। এখানে এ নিশ্চয়তা দান করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতা সহকারে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করবে তাদেরকে মহান আল্লাহ তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তিনি তাদেরকে পথ দেখান এবং তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাদের জন্য খুলে দেন। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কিভাবে লাভ করতে পারে তা তিনি প্রতি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন। এই আয়াতের তফসীরে ফুদাইল ইবন আয়াদ বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই। [বাগভী]

(২) আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার সঙ্গে থাকা দু ধরনের। এক. মুমিন, কাফির নির্বিশেষে সবার সঙ্গে থাকার অর্থ হচ্ছে তাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ জানা, তাদেরকে পর্যবেক্ষনে রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা। দুই. মুমিন, মুহসিন, মুত্তাকীদের সাথে থাকা। তাদের সঙ্গে থাকার অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের হেফাযত করা। তাছাড়া তাদের সম্পর্কে জানা, দেখা, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তো আছেই। তবে এটা অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপরেই আছেন।

৩০- সূরা আর-রূম
৬০ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الرُّوْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম,

الٓمّٓ ۟

২. রোমক[১]রা পরাজিত হয়েছে---

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۟

(১) রোম বা রোমান কারা? ইবন কাসীর বলেন, ঈসু ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের বংশধরদেরকে রোম বলা হয়। যারা বনী-ইসরাঈলদের চাচাতো ভাইদের গোষ্ঠী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ আয়াতে 'রোম' বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? বস্তুত: আরবদের ভাষায় রোম বলতে দু'টি সম্প্রদায় থেকে উত্থিত একটি বিরাট জাতিকে বুঝায়। একদিকে গ্রীক, শ্লাভ সম্প্রদায়ভুক্ত রোমান, অপরদিকে লাতিন ভাষাভাষী ইতালিয়ান রোমান। যারা পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের মিশ্রণে একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠে। যার কিছু অংশ ইউরোপে আর কিছু অংশ এশিয়া মাইনরে। এই পুরো মিশ্রিত জাতিটাকেই আরবরা 'রোম' জাতি নামে অভিহিত করত। তবে মূল ল্যাটিন রোমানরা সবসময় স্বতন্ত্র ছিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তাদেরকে 'বনুল আসফার' বা হলুদ রংয়ের সন্তানও বলা হয়। তারা গ্রীকদের ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল। আর গ্রীকরা সাতটি বিখ্যাত তারকার পূজারী ছিল। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ৩০০ বছর (মতান্তরে ৩২২ বছর) পর্যন্ত রোমরা গ্রীকদের ধর্মমতের উপরই ছিল। তাদের রাজত্ব শাম তথা বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন সহ জাযীরা তথা আরব সাগরীয় উপদ্বীপের এলাকাসমূহে বিস্তৃত ছিল। এ অংশের রাজাকে বলা হতো: কায়সার। তাদের রাজাদের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি নাসারাদের ধর্মে প্রবেশ করে সে হচ্ছে, সম্রাট কন্সটান্টাইন ইবন অগাস্টি। তার মা তার আগেই নাসারা হয়েছিল। সে তাকে নাসারা ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তা গ্রহণ করে। তার সময়ে নাসারাদের মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। পরস্পর বিরোধিতা এমন পর্যায় পৌঁছেছিল যে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব ছিল না। তখন ৩১৮ জন ধর্মীয় নেতা একত্রিত হয়ে কন্সটান্টাইনের জন্য এক প্রকার আকীদা বিশ্বাসের ভিত রচনা করে দেয়। যেটাকে তারা "প্রধান আমানত" বলে অভিহিত করে থাকে। বস্তুত তা ছিল নিকৃষ্টতম খিয়ানত। আর তারা তার জন্য আইনের বই রচনা করে। যাতে প্রয়োজনীয় হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল করে নেয়। এভাবে তারা মসীহ ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীন পরিবর্তন করে নেয়, তাতে কোথাও বাড়িয়ে নেয় আবার কোথাও কমিয়ে নেয়। আর তখনই তারা পূর্বদিকে ফিরে সালাত আদায় করা আবিস্কার করে, শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে সম্মানিত দিন ঘোষণা করে, ক্রুশের ইবাদাত চালু করে, শুকর হালাল করে দেয়, নতুন নতুন ঈদের প্রচলন করে, যেমন ক্রুশ দিবসের ঈদ, কাদ্দাস বা পবিত্র ঈদ, গাতাস ঈদ ইত্যাদি। তারা এর জন্য পোপ

সিষ্টেম চালু করে। যে হবে তাদের নেতা। তার নীচে থাকবে বাতারেকা (কার্ডিনেল), তার নীচে মাতারেনা, তার নীচে উসকুফ (বিশপ)ও কিসসিস (পাদ্রী), তার নীচে শামামিছাহ (ডিকন)। তাছাড়া তারা বৈরাগ্যবাদ চালু করে। বাদশাহ তখন তাদের জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে গীর্জা ও ইবাদাতখানা তৈরী করে দেয়। আর তার নামের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এক নগরীর পত্তন করে তার নাম দেয়া হয়, কন্সটান্টিনোপল। বলা হয়ে থাকে যে, সে রাজ্যে বার হাজার গীর্জা তৈরী করে। বেথেলহামকে তিন মিহরাব বিশিষ্ট ইবাদাতখানা তৈরী করে। তার মা তৈরী করে কুমামাহ গীর্জা। এ দলটিকেই বলা হয়, আল-মালাকিয়্যাহ, যারা বাদশাহর দলভুক্ত লোক। তারপর তাদের থেকে ইয়া'কুবীয়্যাহ সম্প্রদায় বের হয়। যারা ছিল ইয়া'কূব আল-ইসকাফ এর অনুসারী। তারপর তাদের থেকে বের হয় নাসতুরীয়্যাহ সম্প্রদায়। যারা নাসতূরা এর অনুসারী ছিল। তাদের দলের কোন কূল কিনারা নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নাসারারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে" [আবু দাউদ: ৪৫৯৭] মোটকথা: তখন থেকে সে দেশের রাজারা খৃষ্টান ধর্মমতের উপর ছিল। যখনই কোন কায়সার মারা যেত, তার স্থানে অন্য কায়সার আসত। অবশেষে যে ছিল তার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস। [ইবন কাসীর]

এ মিশ্রিত জাতির অর্থাৎ গ্রীক শ্লাভ ও এশিয়া মাইনরের জাতিদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যে নব্য রোমান সমাজ সৃষ্টি হয়েছে তাদের সাথে মূল ইতালিয়ান রোমানদের সংযুক্তির কারণ হচ্ছে, সম্রাট ইউলিয়ূস তার দিগ্বিজয়ী আগ্রাসনে ইতালিয়ান রোমান এলাকা থেকে বের হয়ে এশিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়ার কোন কোন অঞ্চল যেমন ইরাক ও আরমেনিয়া, অনুরূপভাবে মিশর পর্যন্ত তার সম্রাজ্য বিস্তৃত করে। অন্যদিকে শ্লাভদের এলাকা সহ বসফরাসের তীরবর্তী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মসীহ এর প্রায় জন্মের ৪০০ বছর আগে আলেক্সান্ডার এর সময় পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সম্প্রদায় আশেপাশের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে এক রাষ্ট্র অভিহিত হত। আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর পর বাইজেন্টাইন সম্রাজ্য আলাদা হয়ে যায় এবং ইতালিয়ান রোমানদের অধীনে চলে যায়। তখন থেকে ৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অবস্থায় ছিল। তারপর সম্রাট কন্সটান্টাইন যখন কায়সার (সীজার) হন, তখন তিনি তার রাষ্ট্রকে আরও বিস্তৃত করেন এবং পুরো সাম্রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে ইটালিয়ান রোম নগরীকে বাছাই করেন। আর পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের সাথে মিলিয়ে এক শহর পত্তন করেন। যার নাম দিলেন, কন্সটান্টিনিয়্যাহ। (বর্তমান ইস্তাম্বুল)। তিনি এমনভাবে এ শহরটির পিছনে শ্রম দেন যে, তার প্রসিদ্ধি ও সুনাম ইটালিয়ান রোম নগরীকে ছাড়িয়ে যায়। ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর পুরো রাজ্যটি তার সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হয়। তখন এ পূর্বাংশ যা রোম দেশ নামে খ্যাত হয় তা তার সন্তান কন্সটান্টিনোস এর করায়ত্বে আসে। তখন থেকে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রাষ্ট্রকে বলা হতে লাগল, রোম সাম্রাজ্য। আর রোমা নগরীটি ইটালিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের অধীন থেকে গেল। কিন্তু

فِىٓ اَدۡنَى الۡاَرۡضِ وَهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُوۡنَ ۝٣

৩. কাছাকাছি অঞ্চলে[১]; কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে,

فِىۡ بِضۡعِ سِنِيۡنَ ؕ لِلّٰهِ الۡاَمۡرُ مِنۡ قَبۡلُ وَمِنۡۢ

৪. কয়েক বছরের মধ্যেই[২]। আগের ও

তখনও রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে যায়নি। তারপর ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিয়োদিসিয়োস তার দুই পুত্রের মধ্যে পুরো রোমান সম্রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দেন। পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাষ্ট্র। তখন থেকে পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র 'বিলাদুর রোম' বা রোম সাম্রাজ্য নামে খ্যাতি লাভ করে। যার রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল। ইউরোপিয়ানরা এ রাষ্ট্রকে বাইজেন্টাইন রাষ্ট্র নামেই অভিহিত করত। (মূল ইটালী ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য থেকে আলাদা করে বুঝার সুবিধার্থে)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি শাম (সিরিয়া, লেবানন) ও ফিলিস্তিন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর তখনকার রাজার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস। যার কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তার সাথে তখনকার দিনের অপর শক্তিমান রাষ্ট্র পারস্যের রাজা খসরু ইবন হুরমুযের যুদ্ধে যখন পারসিকরা তাদের উপর জয়লাভ করে এবং ইন্তাকিয়া ও দামেশক পারসিকদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ পারস্যের অনুপাতে রোমকদের সবচেয়ে কাছের জনপদে রোমকগণ পারসিকদের হাতে পরাজিত হয়েছে। [তাবারী]

(২) এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল নাসারা আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলিমদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। [ইবন কাসীর]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরু'আত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শির্ক ও প্রতিমা পুজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলিমদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। [সা'দী] কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনষ্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলিমদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার

بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

পরের সব ফয়সালা আল্লাহ্‌রই। আর সেদিন মুমিনগণ খুশী হবে[১],

بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন এবং তিনিই প্রবলপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলিমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়। [সা'দী] সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আল্লাহর দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। একথা বলে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনের এই জন্যে بضع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন বর্ণনা মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল। [তিরমিযী: ৩১৯৩,৩১৯৪] বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে।

(১) অর্থাৎ যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলিমরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যতঃ এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হাল্কা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর নয়। বিশেষতঃ যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলিমরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবিলায় তাদের জিত হয় [সা'দী]।

وَعۡدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخۡلِفُ اللّٰهُ وَعۡدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۝

৬. এটা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না ।

يَعۡلَمُوۡنَ ظَاهِرًا مِّنَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۖۚ وَهُمۡ عَنِ الۡاٰخِرَةِ هُمۡ غٰفِلُوۡنَ ۝

৭. তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে গাফিল[১] ।

اَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُوۡا فِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمۡ لَكٰفِرُوۡنَ ۝

৮. তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ্ আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য । কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তো তাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে কাফির ।

اَوَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ كَانُوۡۤا اَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الۡاَرۡضَ وَعَمَرُوۡهَاۤ اَكۡثَرَ مِمَّا عَمَرُوۡهَا وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلٰكِنۡ كَانُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ۝

৯. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল, শক্তিতে তারা ছিল এদের চেয়ে প্রবল, তারা জমি চাষ করত, তারা সেটা আবাদ করত এদের আবাদ করার চেয়ে বেশী । আর তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের প্রতি যুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল ।

---

(১) অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে । ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, দালান-কোঠা কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ কিভাবে আহরণ করবে-এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত । [কুরতুবী; আরও দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ]

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

১০. তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ[1]; কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যা আরোপ করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত ।

দ্বিতীয় রুকূ'

ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

১১. আল্লাহ্‌ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন[2], তারপর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করানো হবে ।

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

১২. আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সে দিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে ।

وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَٰٓؤُا۟ وَكَانُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٣﴾

১৩. আর (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীককৃত তাদের উপাস্যগুলো তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারা তাদের শরীককৃত উপাস্যগুলোকে অস্বীকারকারী হবে ।

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে ।

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে খোশহালে থাকবে[3];

---

(১) ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ যারা কুফরী করেছে তাদের প্রতিদান হচ্ছে, শাস্তি । [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) সৃষ্টির সূচনা করা যার পক্ষে সম্ভবপর তার পক্ষে একই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করা আরো ভালোভাবেই সম্ভবপর [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত । পবিত্র কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, “দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে ।”

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ⑯

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাতের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, পরিণামে তাদেরকেই আযাবের মাঝে উপস্থিত রাখা হবে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ⑰

১৭. কাজেই[১] তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যা কর এবং যখন তোমরা ভোর কর,

---

[সূরা আস-সাজদাহ:১৭]। কাতাদাহ বলেন, তারা ফুলের সুগন্ধে, ঘন উদ্ভিদঘেরা বাগানে, জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার ফুলের মধ্যে খুশী প্রকাশ করবে। অতি মনোমুগ্ধকর শব্দ এবং প্রাচুর্যপূর্ণ উত্তম জীবিকা আস্বাদন করবে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) এখানে ف শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য কারণ সূচক। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তাই অনুবাদ করা হয়েছে, "কাজেই"। আয়াতে তাসবীহ, তাহমীদ দ্বারা যিকর উদ্দেশ্য হতে পারে। [সা'দী] তাছাড়া সালাত উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। [কুরতুবী] এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন, এই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত পেশ করলেন। ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ﴾ এর অর্থ মাগরিবের সালাত, ﴿وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ﴾ শব্দে ফজরের সালাত, عشياً দ্বারা আসরের সালাত এবং حين تظهرون শব্দে যোহরের সালাত উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে ﴿وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ﴾ [সূরা আন-নূর:৫৮] এশার সালাতের কথা এসেছে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৫, নং ৩৫৪১] অবশ্য হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহর মতে ﴿حِيْنَ تُمْسُوْنَ﴾ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় সালাতই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [বাইহাকী, সুনানুল কুবরা: ১/৩৫৯] সে হিসেবে এ সূরাতেই সমস্ত সালাতের উল্লেখ আছে বলা যায়। এ ছাড়াও সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন মজিদে আরো যেসব ইশারা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: "সালাত কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠ করো।" [সূরা আল-ইসরা:৭৮] আরো এসেছে, "আর সালাত কায়েম করো দিনের দুই মাথায় এবং রাতের কিছু অংশে।" [সূরা হূদ, ১১৪] অন্যত্র এসেছে, "আর তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো সূর্য উদিত হবার আগে এবং তার অস্ত যাবার আগে। আর রাতের কিছু সময়ও আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তভাগেও।" [সূরা ত্বা-হা, ১৩০] এভাবে সারা দুনিয়ার মুসলিমরা আজ যে পাঁচটি সময়ে সালাত পড়ে থাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে সে সময়গুলোর প্রতি ইংগিত করেছে।

১৮. এবং বিকেলে, আর যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও। আর তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা আসমানে ও যমীনে।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং তিনিই বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে[১], আর যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর এবং এভাবেই তোমাদের বের করে আনা হবে[২]।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

তৃতীয় রুকূ'

২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে[৩] রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ[৪]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

---

(১) হাসান বসরী বলেন, এর অর্থ কাফের থেকে মুমিনকে বের করেন, আর মুমিন থেকে কাফের বের করেন। [তাবারী]

(২) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, যাকে আমরা সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে বের করি শস্য, অতঃপর তা থেকেই তারা খেয়ে থাকে। আর সেখানে আমরা সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং সেখানে উৎসারিত করি কিছু প্রস্রবণ" [সূর ইয়াসীন: ৩৩-৩৪] [ইবন কাসীর]

(৩) ২০ থেকে ২৭নং আয়াতসমূহে মহান আল্লাহর যেসব নিদর্শন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেগুলো বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে আখেরাতের সম্ভাবনা ও অস্তিত্বশীলতার কথা প্রমাণ করে, কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারতো, এ আয়াতসমূহে তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেয়া হয়েছে [ফাতহুল কাদীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]।

(৪) আল্লাহর কুদরাতের প্রথম নিদর্শন: প্রথম নিদর্শন এই যে, মানব জাতীকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা। মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা , একথা আদম আলাইহিস সালামের দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের মূলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয় [কুরতুবী]। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]।

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া[১]; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও[২] এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে[৩]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

---

(১) আল্লাহর কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শনঃ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সংগিনী হয়েছে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখবে সে যেন তার পড়শীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা মহিলাদের প্রতি কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দাও; কেননা তারা বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বাঁকা অংশ হচ্ছে হাড়ের উপরের অংশ। যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি ছেড়ে যাও তবে সব সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা মহিলাদের প্রতি কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দাও।' [বুখারী: ৫১৮৫, ৫১৮৬]

(২) ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তোমাদের মধ্যে প্রশান্তি আসে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৯]

(৩) এখানে নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। [আদওয়াউল-বায়ান; সা'দী]

জ্ঞানীদের জন্য[১]।

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ হতে। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শোনে[২]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করান বিদ্যুৎ, ভয় ও আশার সঞ্চারকরূপে এবং আসমান থেকে পানি নাযিল

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۴﴾

---

(১) আল্লাহর কুদরতের তৃতীয় নিদর্শনঃ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও আল্লাহর বিস্ময়কর ব্যাপার। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী ফারসী, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্য জনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। [সা'দী] এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। [ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(২) আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নিদর্শনঃ মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাত্রে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। [ফাতহুল কাদীর]

করেন অতঃপর তা দিয়ে যমীনকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর; নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে[১] ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۗ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি থাকে; তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠার জন্য একবার ডাকবেন তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে[২] ।

---

(১) আল্লাহর কুদরতের পঞ্চম নিদর্শনঃ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে উহার পতিত হওয়ার এবং ক্ষতি করারও আশংকা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চয় হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ বলেন, এখানে যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণত মুসাফিরদের মনে উদ্রেক হয়। আর যে আশার কথা বলা হয়েছে সেটা সাধারণতঃ মুকীম বা স্থায়ী অবস্থানকারীদের মনে উদ্রেক হয়। [তাবারী]

(২) আল্লাহর কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শনঃ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তাআলারই আদেশে কায়েম আছে। এতে নেই কোন খুঁটি। [তাবারী] হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ তাআলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এ যমীনের পরিবর্তে অন্য যমীন ও আসমান তৈরী হবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "“যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।" [সূরা আল-ইসরা: ৫২] অন্য আয়াতেও এসেছে, "অতঃপর তা তো একটিমাত্র প্রচণ্ড ধমক---আর তখনই তারা দেখবে।" [সূরা আস-সাফফাত: ১৯] আরও এসেছে, "এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ, তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।" [সূরা আন-নাযি'আত: ১৩-১৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, "এটা হবে শুধু এক বিকট শব্দ; তখনই এদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমাদের সামনে" [সূরা

২৬. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবকিছু তাঁরই অনুগত[১]।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি সেটা পুনরাবৃত্তি করবেন; আর এটা তাঁর জন্য অতি সহজ[২]। আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ গুণাগুন তাঁরই[৩]; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

চতুর্থ রুকূ'

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ তোমাদেরকে আমরা যে রিয্ক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأٰيٰتِ لِقَوْمٍ

ইয়াসীন: ৫৩] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন ব্যাপারে কঠিন শপথ করতে চাইতেন তখন বলতেন, لَا، وَالَّذِيْ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِه অর্থাৎ শপথ তাঁর যাঁর নির্দেশে আসমান ও যমীন স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) এ আনুগত্য কারও পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক, আবার কারও পক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছার বাইরে। ঈমানদারগণ ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, পক্ষান্তরে কাফিররা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর আনুগত্য করে না। কিন্তু তারা কখনো তাঁর ফয়সালাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। [ইবন কাসীর]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে অথচ এটা করা তার জন্য উচিত ছিল না। অনুরূপ সে আমাকে গালি দেয় অথচ সেটা তার জন্য ঠিক নয়। তার মিথ্যারোপ হচ্ছে এটা বলা যে, 'আমাকে যেভাবে পূর্বে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে সৃষ্টি করবে না। অথচ প্রথম সৃষ্টি থেকে দ্বিতীয় সৃষ্টি আরো সহজ'। আর তার গালি হচ্ছে সে বলে 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী, জন্ম দেইনি, জন্ম নেইনি। আর আমার সমকক্ষ কেউ নেই' [বুখারী: ৪৯৭৪]

(৩) যত সুন্দর সুন্দর গুণ সবই মহান আল্লাহ্‌র রয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তাঁর মত কোন কিছুই নেই। [তাবারী]

يَّعۡقِلُوۡنَ ۝٢٨

কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে[১]।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ۚ فَمَنۡ يَّهۡدِىۡ مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ۝٢٩

২৯. বরং যালিমরা অজ্ঞতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, কাজেই আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন কে তাকে হিদায়াত দান করবে? আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

فَاَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّيۡنِ حَنِيۡفًا ؕ فِطۡرَتَ اللّٰهِ الَّتِىۡ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيۡهَا ؕ لَا تَبۡدِيۡلَ لِخَلۡقِ

৩০. কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন[২]। আল্লাহ্র ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমুহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা ইত্যাদি সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদেরকে ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেরও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব, চিন্তা কর, ফেরেশ্তা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগত আল্লাহর সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর? [দেখুন, কুরতুবী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারাকে এদিকে স্থির নিবদ্ধ করো, এরপর আবার অন্যদিকে ফিরে যেও না। জীবনের জন্য এ পথটি গ্রহণ করে নেবার পর অন্য কোন পথের দিকে দৃষ্টিও দেয়া যাবে না। [ফাতহুল কাদীর]

اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

বা দ্বীন ইসলাম)[১], যার উপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই[২]। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

(১) অর্থাৎ এ দ্বীনকে আঁকড়ে থাকো। অন্য কোন মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে কলুষিত করো না। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তবে এখানে ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলিম সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলিমই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী বানায় বা নাসারা বানায় অথবা মাজুসী বানায়। যেমন কোন জন্তুকে তোমরা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত জন্ম নিতে দেখ, সেখানে তোমরা তাকে নাক কাটা অবস্থায় পাও না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।' [বুখারী:৪৭৭৫, মুসলিম: ২৬৫৮]

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। [ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

(২) এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এক: তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করো না। [ফাতহুল কাদীর] দুই. এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহ্‌র এ দ্বীনকে পরিবর্তন করোনা। তিনি মানুষকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাদেরকে অন্যান্য মানব মতবাদে দীক্ষিত করো না। [বাগভী] তিন. অথবা আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে নিজের বান্দায় পরিণত করেছেন। কেউ চাইলেও এ কাঠামোয় কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ বান্দা থেকে অ-বান্দা হতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে নিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মানুষের ইলাহ হতে পারে না। [ইবন কাসীর]

৩১. তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই অভিমুখী হয়ে থাক আর তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সালাত কায়েম কর। আর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের,

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

৩২. যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে পরিণত হয়েছে[১]। প্রত্যেক দলই যা তাদের কাছে আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল।

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা তাদের রবকে ডাকে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। তারপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের রবের সাথে শির্ক করে;

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. ফলে তাদেরকে আমরা যা দিয়েছি, তাতে তারা কুফরী করে। কাজেই তোমরা ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে!

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. নাকি আমরা তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নাযিল করেছি যা তারা যে শির্ক করছে সে সম্পর্কে বক্তব্য দেয়[২]?

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর আমরা যখন মানুষকে রহমত আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয় এবং যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে কোন অনিষ্ট পৌঁছে তখনি তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারা। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আমরা কি এমন কোন কিতাব নাযিল করেছি যাতে তাদের শির্কের ঘোষণা রয়েছে? [তাবারী]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন? এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে[১]।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. অতএব আত্মীয়কে দাও তার হক[২] এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও[৩]। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি[৪] কামনা করে তাদের জন্য এটা উত্তম এবং তারাই তো সফলকাম।

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই

---

(১) অনুরূপ আয়াত আরও এসেছে, সূরা আর-রা'দ: ২৬; সূরা আল-ইসরা: ৩০।

(২) কাতাদাহ বলেন, তোমার যদি কোন নিকটাত্মীয় থাকে, তারপর তুমি তাকে কোন সম্পদ না দাও বা তার কাছে না যাও, তাহলে তুমি তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করেছ, সম্পর্ক রক্ষা করনি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) আলোচ্য আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাত বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) আত্মীয়-স্বজন, (দুই) মিসকীন, (তিন) মুসাফির। অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্যে ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা, প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবী; কোন অনুগ্রহ নয়। [তাবারী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(৪) ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ এর মধ্যস্থিত وجه এর এক অর্থ চেহারা। সে হিসেবে এর দ্বারা আল্লাহর চেহারা থাকার গুণ সাব্যস্ত হয়। আবার অন্য অর্থ হচ্ছে, جهة বা দিক। তখন অর্থ হয়; আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। অধিকাংশ মুফাসসির এ অর্থই করেছেন। তাছাড়া এর দ্বারা চেহারা (দর্শন) কামনা করাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

সমৃদ্ধশালী[১]।

৪০. আল্লাহ্[২], যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন অবশেষে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। (আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্তকৃত) তোমাদের মা'বুদগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন কিছু করতে পারে[৩]? তারা যাদেরকে শরীক করে, তিনি (আল্লাহ্) সে সব (শরীক) থেকে মহিমাময়-পবিত্র ও অতি ঊর্ধ্বে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآىٕكُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ

(১) এ বৃদ্ধির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। যে ধরনের ঐকান্তিক সংকল্প, গভীর ত্যাগের অনুভূতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রবল আকাংখা সহকারে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে অনুরূপভাবেই আল্লাহ তাকে বেশী বেশী প্রতিদানও দেবেন। তাই একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সাদকা কবুল করেন এবং ডান হাতে তা গ্রহণ করেন, তারপর তিনি সেটাকে এমনভাবে বাড়িয়ে তোলেন যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে বাড়িয়ে তোলে। এমনকি শেষ পর্যন্ত সেই একটি লোকমাও বাড়িয়ে ওহুদ পাহাড়ের সমান করে দেন।' [তিরমিযী: ৬৬২, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৭১]

(২) এখান থেকে আবার মুশরিকদেরকে বুঝাবার জন্য বক্তব্যের ধারা তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে এসেছে। [আইসারুত-তাফাসীর]

(৩) অর্থাৎ তোমাদের তৈরী করা উপাস্যদের মধ্যে কেউ কি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা? জীবন ও মৃত্যু দান করা কি কারো ক্ষমতার আওতাভুক্ত আছে? অথবা মরার পর সে আবার কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে? তাহলে তাদের কাজ কি? তোমরা তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন? [তাবারী]

يَرْجِعُونَ

কাজের শাস্তি আস্বাদন করান[১], যাতে তারা ফিরে আসে[২]।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

৪২. বলুন, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে!' তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

৪৩. সুতরাং আপনি সরল-সঠিক দ্বীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দিন অনিবার্য তা উপস্থিত

(১) অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। [সা'দী, কুরতুবী, বাগভী] অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন।" [সূরা আশ-শূরা: ৩০] উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহর কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ, তো ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে এটা সত্য যে, সমস্ত গোনাহর কারণে বিপদ আসে না বরং কোন কোন গোনাহর কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহর কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।" [সূরা আন-নাহল: ৬১] আল্লাহ্ আরো বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।" [সূরা ফাতির: ৪৫] বরং অনেক গোনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করান।

(২) কাতাদাহ বলেন, এটা আল্লাহ্ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর আগের অবস্থার বর্ণনা। যখন যমীন ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ যখন তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন, তখন মানুষের মধ্যে যারা ফিরে আসার তারা ফিরে আসল। [তাবারী]

হওয়ার আগে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে[১]।

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যাতে করে আল্লাহ্ যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বায়ু পাঠান সুসংবাদ দেয়ার জন্য[২] এবং তোমাদেরকে তাঁর কিছু রহমত আস্বাদন করাবার জন্য; আর যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কিছু সন্ধান করতে পার, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও[৩]।

---

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আপনি ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন। সেদিন আসার পূর্বেই। যেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে, একদল জান্নাতী হবে, আরেকদল হবে জাহান্নামী। [তাবারী] আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত এ সূরার অন্য আয়াতের অনুরূপ যেখানে এসেছে, "আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে খোশহালে থাকবে; আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাতের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, পরিণামে তাদেরকেই আযাবের মাঝে উপস্থিত রাখা হবে।" তাছাড়া অন্য সূরায় এসেছে, "এবং সতর্ক করতে পারেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জলন্ত আগুনে।" [সূরা আশ-শূরা: ৭]।

(২) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) এ আয়াতের সমার্থে আরও দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৪; সূরা আল-মুমিনূন: ২২

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর আমরা তো আপনার আগে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন; অতঃপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা[১]।

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আল্লাহ্, যিনি বায়ু পাঠান, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি এটাকে যেমন ইচ্ছে আকাশে ছড়িয়ে দেন; পরে এটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, ফলে আপনি দেখতে পান সেটার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা; তারপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের কাছে ইচ্ছে এটা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় আনন্দিত,

وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. যদিও ইতোপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের আগে তারা ছিল একান্ত নিরাশ।

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

৫০. সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করুন, কিভাবে তিনি যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। এভাবেই তো আল্লাহ্ মৃতকে জীবিতকারী, আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান[২]।

---

(১) অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। [সা'দী]

(২) এ আয়াতের সমার্থে সূরা আল-আ'রাফের ৫৭ নং আয়াত দেখুন।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

৫১. আর যদি আমরা এমন বায়ু পাঠাই যার ফলে তারা দেখে যে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা কুফরী করতে শুরু করে।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং আপনি তো মৃতকে[১] শুনাতে পারবেন না, বধিরকেও পারবেন না ডাক শুনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আপনি অন্ধদেরকেও পথে আনতে পারবেন না তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে। যারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে শুধু তাদেরকেই আপনি শুনাতে পারবেন; কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।

---

(১) এখানে এমন সব লোককে মৃত বলা হয়েছে, যাদের বিবেক মরে গেছে, যাদের মধ্যে নৈতিক জীবনের ছিঁটেফোটাও নেই এবং যাদের আপন প্রবৃত্তির দাসত্ব, জিদ ও একগুঁয়েমি সেই মানবীয় গুণাবলীর অবসান ঘটিয়েছে যা মানুষকে হক কথা বুঝার ও গ্রহণ করার যোগ্য করে তোলে। কাতাদাহ বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের উদ্দেশ্য করে পেশ করেছেন। যেভাবে মৃতরা আহ্বান শুনতে পায় না, তেমনি কাফেররাও শুনতে পায় না। অনুরূপভাবে যেভাবে কোন বধির ব্যক্তি পিছনে ফিরে চলে গেলে তাকে পিছন থেকে ডাকলে শুনতে পায় না, তেমনি কাফের কিছুই শুনতে পায় না, আর শুনলেও সেটা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। [তাবারী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বদর যুদ্ধের পর বদরের কুপের পাশে যেখানে কাফেরদের লাশ রাখা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে কাফেরদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মাবুদরা তোমাদেরকে যা দেবার ওয়াদা করেছে তা কি তোমরা পেয়েছ? তারপর তিনি বললেন: তারা এখন আমি যা বলছি তা শুনছে। তারপর এ হাদীসটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জানানো হলে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এটাই বলেছেন যে, তারা এখন অবশ্যই জানছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছি তা-ই যথাযথ। তারপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন'। [বুখারী: ৩৯৮০,৩৯৮১]

ষষ্ঠ রুকূ'

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾

৫৪. আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য(১)। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম।

وَیَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا یُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি(২)। এভাবেই তাদেরকে পথ

---

(১) কাতাদাহ বলেন, প্রথম দুর্বলতা হচ্ছে শুক্র। আর শেষ দুর্বলতা হচ্ছে বৃদ্ধ বয়স যখন তার চুল সাদা হয়ে যেতে থাকে। [তাবারী] আল্লামা শানকীতী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম দুর্বলতা ও শেষ দুর্বলতা উভয়টির কথাই কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন প্রথম দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, "আমরা কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?" [সূরা আল-মুরসালাত: ২০] "মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।" [সূরা ইয়াসীন: ৭৭] "অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে" [সূরা আত-তারেক: ৫-৬] "কখনো নয়, আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।" [সূরা আল-মা'আরেজ: ৩৯] "তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; অথচ দেখুন, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!" [সূরা আন-নাহল: ৪] আর দ্বিতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, "আর আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে; যাতে জ্ঞান লাভের পরেও তার সবকিছু অজানা হয়ে যায়।" [সূরা আন-নাহল: ৭০] "আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৫] "আর আমরা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, সৃষ্টি অবয়বে তার অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না?" [সূরা ইয়াসীন: ৬৮]

(২) অর্থাৎ হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশী থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি

ভ্রষ্ট করা হত[১]।

৫৬. আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে[২] তারা বলবে, 'অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র লিখা অনুযায়ী পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। সুতরাং এটাই তো পুনরুত্থান দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না।'

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. সুতরাং যারা যুলুম করেছে সেদিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে তিরস্কৃত হওয়ার (মাধ্যমে আল্লাহ্‌র

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

বর্ণিত আছে, "তারা কসম খেয়ে বলবে আমরা মুশরিক ছিলাম না।" [সূরা আল-আন'আম:২৩] এর কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণমাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্যে তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্ত-পদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। আলোচ্য আয়াতের অর্থ তাই। কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন এরশাদ হয়েছে, "যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না"। [সূরা হূদ:১০৫] এর বিপরীতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মাদ কে ? তখন সে বলবে, 'হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না' [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৮৭, ২৯৫-২৯৬, আবু দাউদ: ৪৭৫৩]।

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ এভাবেই তারা দুনিয়াতে মিথ্যা বলত। তারা সত্য থেকে বিমুখ থাকত। সত্য থেকে বিরত হয়ে মিথ্যার দিকে চলে যেত। [তাবারী]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে বলে, ফেরেশতাগণ, রাসূলগণ, নবীগণ, সৎবান্দাগণ সবই উদ্দেশ্য হতে পারে।[আদওয়াউল বায়ান]

সন্তুষ্টি লাভের) সুযোগও দেয়া হবে না।

৫৮. আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। আর আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে যারা কুফরী করেছে তারা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো বাতিলপন্থী[১]।'

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. যারা জানে না আল্লাহ্ এভাবেই তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন[২]।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য[৩]।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, অবশ্যই আমরা হক বর্ণনা করেছি, হককে তাদের জন্য স্পষ্ট করেছি, হকের জন্য বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ তাদের সামনে তুলে ধরেছি। যাতে তারা হক চিনতে পারে এবং হকের অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, চাই সেটা তাদের প্রস্তাবনা মোতাবেকই হোক বা অন্যভাবেই পেশ করা হোক, তারা এর উপর ঈমান আনবে না। আর তারা বিশ্বাস করতে থাকবে যে, এটা জাদু ও বাতিল। যেমন চাঁদ দু'খণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের অবস্থান। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।" [সূরা ইউনুস: ৯৬-৯৭]

(২) সুতরাং সেখানে কোন কল্যাণ প্রবেশ করবে না, সে অন্তরে কোন বস্তুর সঠিক রূপ প্রকাশিত হবে না। বরং সেখানে হক বাতিলরূপে এবং বাতিল হকরূপে তাদের কাছে প্রতিভাত হবে। [সা'দী]

(৩) সুতরাং আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতেও লেগে থাকুন, তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া দেখলেও তা যেন আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিমুখ না করে। আর বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা হক। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা বিশ্বাস থাকলে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে। কারণ, বান্দা যখন জানতে পারে যে, তার কাজ নষ্ট হচ্ছে না, বরং সে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় পাবে, তখন এ পথে যত কষ্টের মুখোমুখিই সে হোক না কেন, সে সেটাকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বেশী কাজও তার কাছে অল্প মনে হয়, আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়। [সা'দী]

الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে[১]।

---

(১) কারণ, তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের দৃঢ়তা কমে গেছে, তাই তাদের বিবেক হাল্কা হয়ে গেছে, তাদের সবর কমে গেছে। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সাবধান থাকুন। আপনি যদি তাদের থেকে সাবধান না থাকুন, তবে তারা আপনাকে বিচলিত করে দিতে পারে, আপনাকে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের উপর থেকে সরিয়ে দিতে পারে। কারণ, সাধারণত মন চায় তাদের মত হতে। আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক মুমিনই দৃঢ়বিশ্বাসী, স্থির বিবেকসম্পন্ন, তাই তার জন্য ধৈর্য ধারণ করা সহজ। পক্ষান্তরে প্রত্যেক দুর্বল বিশ্বাসী, অস্থিরমতি থাকে। [সা'দী]

سُورَةُ لُقْمَانَ

৩১- সূরা লুকমান
৩৪ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

الٓمّٓ ۟

১. আলিফ-লাম-মীম;

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۟

২. এগুলো হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত,

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۟

৩. পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ মুহসিনদের জন্য(১);

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۟

৪. যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী;

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۟

৫. তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর আছে এবং তারাই সফলকাম(২)।

---

(১) অর্থাৎ এ আয়াতগুলো সঠিক পথনির্দেশক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহের রূপ লাভ করে এসেছে। কিন্তু এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ থেকে লাভবান হয় একমাত্র তারাই যারা সৎকাজ করার পথ অবলম্বন করে, সৎ হতে চায়, কল্যাণ ও ন্যায়ের সন্ধান করে এবং অসৎকাজ সম্পর্কে যখনই সতর্ক করে দেয়া হয় তখনই তা পরিহার করে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ যখনই সামনে খুলে রেখে দেয়া হয় তখনই সে পথে চলতে শুরু করে। আর যারা অসৎকাজ করে ও অসৎ মনোবৃত্তির অধিকারী তারা এ পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবে না এবং এ অনুগ্রহেরও কোন অংশ পাবে না। [তাবারী, ফাতহুল কাদীর]

(২) যাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ বলা হয়েছে তারা কেবলমাত্র এ তিনটি গুণাবলীর অধিকারী, একথা বলা হয়নি। আসলে প্রথমে 'সৎকর্মপরায়ণ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, এ কিতাব যেসব অপকর্মে বাধা দেয় এ সৎকর্মশীলরা সেসবগুলো থেকেই বিরত থাকে। আর এ কিতাব যেসব সৎকাজ করার হুকুম দেয় এরা সেসবগুলোই করে। তারপর এ "সৎকর্মশীলদের" তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, বাদবাকি সমস্ত সৎকাজ কিন্তু এ তিনটি সদগুণের ওপরই নির্ভর করবে। তারা সালাত কায়েম করে। এর ফলে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া তাদের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তারা যাকাত দেয়। এর ফলে আত্মত্যাগের

৬. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয়[১]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا

প্রবণতা তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহ প্রদমিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখা জেগে ওঠে। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগে। এর বদৌলতে তারা এমন জন্তু-জানোয়ারের মতো হয় না যারা চারণক্ষেত্রে বাঁধনহারা হয়ে এদিক ওদিক চরে বেড়ায়। বরং তারা এমন মানুষদের মতো হয়ে যায় যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। মনে করে, তারা কোন প্রভুর গোলাম এবং নিজেদের সমস্ত কাজের জন্য প্রভুর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ তিনটি বিশেষত্বের কারণে এ "সৎকর্মশীলরা" ঠিক তেমনি ধরনের সৎকর্মশীল থাকে না যারা ঘটনাক্রমে কোন সৎকাজ করে বসে এবং তাদের অসৎকাজও তেমনি সৎকাজের মতো একই ধারায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। পক্ষান্তরে এ বিশেষত্বগুলো তাদের মধ্যে একটি চিন্তা ও নৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় যার ফলে তাদের সৎকাজগুলো একটি ধরা বাঁধা নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং অসৎকাজ যদি কখনো হয়ে যায়ই তাহলে তা হয় ঘটনাক্রমে। তাদের কোন গভীর চিন্তা ও নৈতিক উদ্যোগ তাদেরকে নিজেদের প্রাকৃতিক চাহিদা অনুসারে অসৎপথে নিয়ে যায় না। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ বাক্যটিতে حديث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لهو শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لهو বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لهو বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়। আলোচ্য আয়াতে ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুম- এর মতে এর অর্থ, গান-বাদ্য করা। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾। ইমাম বুখারী তার কিতাবে ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, لَهْوُ الْحَدِيثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُه অর্থাৎ, ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ বলে গান ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ এর তাফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। তবে কোন কোন সাহাবী আয়াতের ব্যাপক তাফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোন খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়। আলেমগণ পবিত্র কুরআনের ﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ আয়াতের শব্দের তাফসীর করেছেন গান-বাজনা। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।" [বুখারী: ৫৫৯০, আবু দাউদ: ৪০৩৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। [আহমদ:১/৩৫০, আবূ দাউদ: ৩৬৯৮] এতদ্ভিন্ন বহু প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না-জায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ যাতে কোন দ্বীনী বা পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মাকরূহ। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যায়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় না-জায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান হলো, যেসব সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজ-সরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ।

এর বাইরে এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তে রঞ্জিত করে। [মুসলিম: ২২৬০] এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। [আবূ দাউদ: ৪৯৪০] এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম

জ্ঞান ছাড়াই[১] এবং আল্লাহ্‌র দেখানো | أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

এমন কি সালাত, সাওম ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।
তাই সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে। হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। [সাঈদ ইবন মানসূর: ২৪৫০, ইবন আবি শাইবাহ: ৫/৩২০,৩২১ নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা ৪৩৫৪, ৮৯৩৮, ৮৯৩৯, ৮৯৪০, আস-সুগরা: ৬/২৮, ত্বাবরানী: আল-মু'জামুল কাবীর ১৭৮৫, আবু দাউদ: ২৫১৩, আল-মুনতাকা: ১০৬২, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৪,১৪৬, ১৪৮] কোন কোন বর্ণনায় এর সাথে যোগ করা হয়েছে, সাঁতার কাটা। [ত্বাবরানী: মু'জামুল কাবীর ২/১৯৩, (১৭৮৬)। অপর বর্ণনায় এর সাথে যোগ করা হয়েছে, দৌড় প্রতিযোগিতা করা। [নাসায়ী: সুনানুল কুবরা ৫/৩০২, (৮৯৩৯)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সালামাহ ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। [মুসলিম: ১৮০৭] এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ।
আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলা-কৌশল অনুশীলনকল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। [বুখারী: ৪৫৪] অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তারা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দুর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে "তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দিবে। [আবূ দাঊদ: ১৫২৮] এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

(১) "জ্ঞান ছাড়াই" শব্দের সম্পর্ক "কিনে নেয়" এর সাথেও হতে পারে আবার "বিচ্যুত করে" এর সাথেও হতে পারে। যদি প্রথম বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া

পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑦

৭. আর যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে এটা শুনতে পায়নি[১], যেন তার কান দুটো বধির; অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ⑧

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত;

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨

৯. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য (অকাট্য)। আর তিনি প্রবল পরাক্রমশালী,

---

হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, সেই মূর্খ অজ্ঞ লোক এই মনোমুগ্ধকর জিনিসটি কিনে নেয় এবং সে জানে না কেমন মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে সে কেমন ধ্বংসকর জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে আছে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশনা সমৃদ্ধ আল্লাহর আয়াত। বিনামূল্যে সে তা লাভ করছে কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে সব অর্থহীন ও বাজে জিনিস। সেগুলো চিন্তা ও চরিত্রশক্তি ধ্বংস করে দেয়। নিজের টাকা পয়সা খরচ করে সে সেগুলো লাভ করছে। আর যদি একে দ্বিতীয় বাক্যাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, সে জ্ঞান ছাড়াই লোকদের পথ দেখাচ্ছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে সে যে নিজের ঘাড়ে কত বড় জুলুমের দায়ভার চাপিয়ে নিচ্ছে, তা সে জানে না।

(১) অহংকারই মূলত কাফের-মুশরিকদেরকে ঈমান থেকে দূরে রেখেছিল। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্য প্রকাশ করে বলেছেন, দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। তাকে সংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির; যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। তাদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে ওরাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। [সূরা আল-জাসিয়াহ্: ৭-১০]

হিকমতওয়ালা[১]!

১০. তিনি আসমানসমূহ নির্মাণ করেছেন খুঁটি ছাড়া---তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ; তিনিই যমীনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব-জন্তু। আর আমরা আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি তারপর এতে উদ্‌গত করি সব ধরনের কল্যাণকর উদ্ভিদ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑩

১১. এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! সুতরাং তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। বরং যালিমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে[২]।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ⑪

দ্বিতীয় রুকূ'

১২. আর অবশ্যই আমরা লুক্‌মান[৩] কে

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ

(১) অর্থাৎ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন থেকে কোন জিনিসই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না এবং তিনি যা কিছু করেন ঠিকমতো জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী অনুযায়ীই করেন। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ যখন এরা এ বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন সৃষ্টি চিহ্নিত করতে পারেনি এবং একথা সুস্পষ্ট যে, তারা তা করতে পারে না তখন তাদের যারা স্রষ্টা নয় এমন সত্ত্বাকে আল্লাহর একচ্ছত্র ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা, তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ও অভাব মোচন করার জন্য আবেদন জানানোকে সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

(৩) কোন কোন তাবে'য়ী আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত লুকমানকে আইয়্যূব আলাইহিস সালাম-এর ভাগ্নে বলেছেন। আবার কেউ কেউ তার খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ূ লাভ করেছিলেন এবং দাউদ আলাইহিস সালাম–এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদ আর-রাব'ঈও একথাই বলেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন,

---

লুকমান চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুজাহিদ বলেন, তিনি ফাটা পা ও পুরু ঠোঁটবিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। এ বক্তব্যগুলো প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সূদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই উক্ত বক্তব্যগুলোতে একই ব্যক্তিকে নূবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাব্দিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। এ ব্যক্তি আসলে বাসিন্দা ছিলেন মাদ্‌য়ান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনা অনুযায়ী লুকমান কাঠ চেরার কাজ করতেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি দর্জি ছিলেন।

কোন কোন গবেষক লুকমানকে আদ জাতির অন্তর্ভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো। তাদের মতে 'আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হূদ আলাইহিস্ সালামের সাথে তাদের যে ঈমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভুত। ইয়ামনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্ভবতঃ এর কারণ হচ্ছে, ইতিহাসে লুকমান ইব্‌ন 'আদ নামক এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কোন কোন গবেষক তাকে এই লুকমান হাকীমই ধরে নিয়েছেন। আল্লামা সুহাইলী এ সন্দেহ অপনোদন করে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়।

লুকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন। ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র বা সনদ দুর্বল। ইমাম বগবী বলেন, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ্ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। ইবনে কাসীর আরো বলেন, তার সম্পর্কে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ লুকমানকে নবুওয়ত ও হেকমত বা প্রজ্ঞা–দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তাকে নবুওয়ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।" কাতাদা থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, লুকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে নবুওয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুওয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান

হিকমত[১] দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত[২]।

فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑫

করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো। বর্ণিত আছে যে, দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে লুকমান শরীয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। লুকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন তাবে'য়ী বলেন, আমি লুকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশী অধ্যায় অধ্যায়ন করেছি। একদিন লুকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি -যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো? লুকমান বলেন, হ্যাঁ-আমিই সে লোক। অতঃপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহ্‌র গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লুকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দু'টি কাজ-[এক] সর্বদা সত্য বলা, [দুই] অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, লুকমান বলেছেন, এমন কতগুলো কাজ আছে যা আমাকে এর স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই : নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহ্‌মানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা। [ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

(১) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য, যুগ ও সময়োপযোগী কথা বলা ও কাজ করার যোগ্যতা ইত্যাদি। [তাবারী,ইবন কাসীর,বাগভী]

(২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো

১৩. আর স্মরণ করুন, যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, ‘হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক বড় যুলুম[১]।’

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِابْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

কৃতজ্ঞতা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান, কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্জ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতার ব্যাপারে কথা বলা। সে জন্য লুকমানের সর্বপ্রথম কথা হলো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ্ কে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, ‘হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করো না, অংশীদার স্থাপন করা গুরুতর যুলুম’। জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শির্ক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই। তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত বড় অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই বন্দেগী করবে, এটা মানুষের ওপর তার স্রষ্টার অধিকার। কিন্তু সে অন্যের বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে। তারপর স্রষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা-শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং এই সঙ্গে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক যুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও যুলুমমুক্ত নয়।

১৪. আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও[১]। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ⑭

১৫. আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

পক্ষান্তরে মুমিন এ ধরনের অবস্থা থেকে মুক্ত। হাদীসে এসেছে, 'যখন নাযিল হল 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ ঘটায়নি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা। [সূরা আল-আন'আম:৮২] তখন সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত ভীত হয়ে গেলেন; (কারণ তারা যুলুমের আভিধানিক অর্থ ধরে নিয়েছিলেন)। তারা বলতে লাগলেন, আমাদের কেউ কি এমন আছে যে, যার ঈমানের সাথে যুলুম নেই? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা সেই যুলুম নয় (যার ভয় তোমরা করছ)। তোমরা কি শুননি লুকমান তার ছেলেকে কি বলেছে, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম' [বুখারী: ৪৭৭৬]

(১) এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন করার ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরী'য়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। যদি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা না হয় তাতে আল্লাহ্‌রও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হয় না সে আল্লাহ্‌র কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।' [আবুদাউদ:৪৮১১, তিরমিযী:১৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ:২/২৯৫]

وَّاتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۵﴾

কোন জ্ঞান নেই[১], তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে[২] আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার

(১) অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয়। অথবা তুমি আমার কোন শরীক আছে বলে জান না। তুমি তো শুধু এটাই জান যে, আমি এক, আমার কোন শরীক নেই। এমতাবস্থায় কিভাবে তুমি তোমার পিতা-মাতার কথা মানতে পার? অন্যায়কে যেন তুমি প্রশ্রয় না দাও। শির্ক গুরুতর অপরাধ হওয়ার কারণেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ এই যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্যে সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, এমন কি বাধ্য করার পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়। যেমনটি হয়েছিল, সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে তার মায়ের আচরণ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার মা শপথ করলেন যে, যতক্ষণ তুমি আবার পূর্ববর্তী দ্বীনে ফিরে না আসবে ততক্ষণ আমি কোন খাবার গ্রহণ করবনা। কিন্তু সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এ কথা মান্য করলেন না। তার সমর্থনেই এই আয়াত নাযিল হয়। [মুসলিম : ১৭৪৮]

(২) যদি পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল তাদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাঁদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক – প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশীদার স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে যে, দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারগতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে। [কুরতুবী, তাবারী, সা'দী]

পথ অনুসরণ কর। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

১৬. 'হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

১৭. 'হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর তোমার উপর যা আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এটা অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

---

(১) এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আসমান ও যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন - মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও এর বাইরে কেউ যেতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মণ্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর বহু নিকটতর। ভূমির বহু নিম্ন স্তরে পতিত কোন জিনিস, তোমার কাছে কোথায়, কোন অবস্থায় ও কী অবস্থায় রয়েছে, তুমি যে কোন সৎ বা অসৎ কাজই করো না কেন, তা আল্লাহর অগোচরে নয়। তিনি কেবল তা জানেন তাই নয় বরং যখন হিসেব-নিকেশের সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

১৮. 'আর তুমি মানুষের প্রতি অবজ্ঞাভরে তোমার গাল বাঁকা কর না[১] এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না[৩] ।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৯. 'আর তুমি তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর[৪] এবং

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

---

(১) পঞ্চম উপদেশ সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, বলা হয়েছে যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না-যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী । এর আরেক অর্থ হলো, মানুষের প্রতি গাল বাঁকা করে কথা বলো না । এ অর্থ অনুসারে তার প্রতি তাকিয়েও যদি গাল বাঁকা করে তাকে অপমান করা উদ্দেশ্য হয় তবে তাও নিষিদ্ধ হবে । [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সহিত বিচরণ করো না । আল্লাহ্ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন । তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই । তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর-নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর । আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করো না । আল্লাহ্ কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার অন্তরে শরিষা দানা পরিমান ঈমান আছে সে জাহান্নামে যাবে না, পক্ষান্তরে যার অন্তরে শরিষা দানা পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না ।' [মুসলিম:১৩২] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আর তিনজনকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, অহংকারী, দাম্ভিক । যেমন তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাও, তারপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন । আর দান করে খোঁটা প্রদানকারী কৃপণ ব্যক্তি; এরং শপথের মাধ্যমে বিক্রয়কারী । [মুসনাদে আহমাদ:৫/১৭৬]

(৩) 'মুখতাল' মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে । আর 'ফাখূর' তাকে বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে । [ইবন কাসীর] মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে চায় । [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ দৌড়-ধাপসহ চলো না, যা সভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী । এভাবে চলার ফলে নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশংকা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে । আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না–যা সেসব গর্বস্ফীত

إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١٩

তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো[১]; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর[২] ।'

তৃতীয় রুকূ'

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ٢٠

২০. তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন[৩]? আর মানুষের

আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েয। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন-সুস্থ থাকা সত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে সেসব নেয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবনযাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা-এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেয়া, আল্লাহ্-রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলিমদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা- এসবই প্রকাশ্য

মধ্যে কেউ কেউ কোন জ্ঞান, কোন পথনির্দেশ বা কোন দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

২১. আর তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর।' তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।' শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে, তবুও কি? (তারা পিতৃ পুরুষদের অনুসরণ করবে?)

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

২২. আর যে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে, এমতাবস্থায় যে সে মুহসিন(১) সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মযবুত হাতল। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌রই কাছে।

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

২৩. আর কেউ কুফরী করলে তার কুফরী

নেয়ামতসমূহের পর্যায়ভূক্ত। আর গোপনীয় নেয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত–যথা ঈমান, আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি। অথবা যেসব নেয়ামত মানুষ জানে না এবং অনুভবও করে না সেগুলো গোপন নিয়ামত। মানুষের নিজের শরীরে এবং তার বাইরে দুনিয়ায় তার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে এমন অগণিত ও অসংখ্য জিনিস রয়েছে কিন্তু মানুষ জানেও না যে, তার স্রষ্টা তার হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তাকে জীবিকা দান করার জন্য, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য এবং তার কল্যাণার্থে কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(১) অর্থাৎ মুখে নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করার ঘোষণা দেয়া হবে কিন্তু কার্যত আল্লাহর অনুগত বান্দার নীতি অবলম্বন করা হবে না, এমনটি যেন না হয়। আর তা হবে কেবলমাত্র রাসূলকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। এ আয়াতের প্রথম অংশ তাওহীদ আর দ্বিতীয় অংশ রাসূলের অনুসরন করা বাধ্য করে দিয়েছে। তাওহীদ পরিশুদ্ধ হতে হলে রাসূলের অনুসরণ জরূরী। [সা'দী]

فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

যেন আপনাকে কষ্ট না দেয়[১]। আমাদেরই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমরা তাদেরকে তারা যা করত সে সম্পর্কে অবহিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমরা তাদেরকে ভোগ করতে দেব স্বল্প[২]। তারপর আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

২৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই; নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত[৩]।

---

(১) সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অর্থ হচ্ছে, হে নবী! যে ব্যক্তি আপনার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, সে তো নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা মনে করে যে, ইসলামকে প্রত্যাখ্যান এবং কুফরীকে মেনে নিয়েও তার ওপর জোর দিয়ে সে আপনাকে অপমানিত করেছে। কিন্তু আসলে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। সে আপনার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। কাজেই সে যদি আপনার কথা না মানে তাহলে তার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই।[সা'দী]

(২) স্বল্প পরিমানও হতে পারে। আবার স্বল্প সময়ের জন্যও উদ্দেশ্য হতে পারে। দুনিয়ায় কাফেররা যা-ই পায় তা আখেরাতের তুলনায় পরিমানে স্বল্প আবার আখেরাতের তুলনায় স্বল্প সময়ের জন্যেই পেয়ে থাকে। [তাবারী, কুরতুবী, বাগভী]

(৩) অর্থাৎ কেবল এতটুকুই সত্য নয় যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ বরং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তিনিই এসবের মালিক। [মুয়াস্‌সার]

২৭. আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী[১] নিঃশেষ হবে না।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

(১) 'আল্লাহর কালেমা বা কথা' এর মানে কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে। যদিও এর প্রতিটিই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহ্‌র কালেমা বা কথা বলে মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলীই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণীর কোন শেষ নেই। [সা'দী; মুয়াসসার] এ কুরআন তার বাণীরই অংশ। অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্রে সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্বেও এসবগুলির পানি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে– সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কুরআনের অন্য এক আয়াতে–যেখানে বলা হয়েছে –' আল্লাহ্‌র মহিমাসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে–কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।' [সূরা আল-কাহফ: ১০৯] মোটকথা: সমুদ্রসমুহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি–বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে–কিন্তু আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত– কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে আয়ত্ব করতে পারে? [দেখুন, ইবন কাসীর, কুরতুবী, সা'দী]

কোন কোন মুফাসসিরের মতে 'আল্লাহ্‌র কালেমা বা কথা' বলে এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর নেয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,- কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, তাই বুঝিয়েছেন। [কুরতুবী; মুয়াসসার; ইবন কাসীর] মূলত: আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর নেয়ামতসমূহ কোন কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করা চলে না, এখানে আল্লাহ্ এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভু-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা–প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান–গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন– যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রেও অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা ।

২৮. তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা ।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾

২৯. আপনি কি দেখেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান? আর তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন কাজে নিয়োজিত, প্রত্যেকটিই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত(১); এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত ।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾

৩০. এগুলো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য(২) এবং তারা তাঁকে ছাড়া যাকে ডাকে,

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ

কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর অর্থ, তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর শক্তির নিদর্শন । [কুরতুবী] অর্থাৎ পৃথিবীর গাছগুলো কেটে যতগুলো কলম তৈরী করা যেতে পারে এবং পৃথিবীর বর্তমান সাগরের পানির সাথে আরো তেমনি সাতটি সাগরের পানিকে কালিতে পরিণত করলে তা দিয়ে আল্লাহর শক্তি ও সৃষ্টির কথা লিখে শেষ করা তো দূরের কথা হয়তো পৃথিবীতে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর তালিকা তৈরী করাই সম্ভবপর হবে না । শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই যেসব জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোই গণনা করা কঠিন, তার ওপর আবার এই অথৈ মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিবরণ লেখার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না ।

(১) প্রত্যেকটি জিনিসের যে বয়স তথা সময়-কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে । চন্দ্র, সূর্য বা বিশ্ব-জাহানের অন্য গ্রহ-নক্ষত্র কোনটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয় । প্রত্যেকের একটি সূচনাকাল আছে । তার পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না । আবার প্রত্যেকের আছে একটি সমাপ্তিকাল । তারপর আর তার অস্তিত্ব থাকবে না । এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, এ ধরনের ধ্বংসশীল ও ক্ষমতাহীন বস্তু ও সত্তাগুলো উপাস্য হতে পারে কেমন করে ? [দেখুন, তাবারী, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ । [মুয়াস্‌সার]

الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝٣٠

তা মিথ্যা[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোচ্চ[২], সুমহান।

চতুর্থ রুকূ'

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٣١

৩১. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলো সাগরে বিচরণ করে, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু দেখাতে পারেন? নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝٣٢

৩২. আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ছায়ার মত[৩], তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে[৪]; আর শুধু বিশ্বাসঘাতক, কাফির ব্যক্তিই আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার

---

(১) অর্থাৎ তারা সবাই নিছক তোমাদের কাল্পনিক ইলাহ্। তোমরা কল্পনার জগতে বসে ধারণা করে নিয়েছো যে, অমুকজন আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার এবং অমুক মহাত্মা সংকট নিরসন ও অভাব মোচন করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউ কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের ঊর্ধে এবং সবার শ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে সব জিনিসই নীচু। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে মেঘের ছায়া উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার পাহাড় বা অনুরূপ বড় কিছুর ছায়াও উদ্দেশ্য হতে পারে। [কুরতুবী, মুয়াস্‌সার]

(৪) অর্থাৎ তখন তাদের মধ্যে একদল মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে, আল্লাহ্‌র সত্যিকার শোকর আদায় করে না। আর তাদের মধ্যে আরেক দল সম্পূর্ণভাবে শির্ক ও কুফরি করে। তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করে। [জালালাইন; সা'দী; মুয়াসসার] আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম দলের বর্ণনার পর দ্বিতীয় দলের বর্ণনা করেননি। কারণ, পরবর্তী বাক্য থেকে অপর দলটির অবস্থান বোঝা যাচ্ছে।

করে[১] ।

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং ভয় কর সে দিনকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোন সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না[২] । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

(১) বিশ্বাসঘাতক এমন এক ব্যক্তি যে মারাত্মক রকমের বেঈমানী করে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার পালন করে না । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না । অনুরূপভাবে কোন পুত্রও পিতার কোন কল্যাণ করতে পারবে না । বন্ধু, নেতা, পীর এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা তবুতো দূর সম্পর্কের । দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে । কিন্তু সেখানে অবস্থা হবে যদি পুত্র পাকড়াও হয়, তাহলে পিতা এগিয়ে গিয়ে একথা বলবে না যে, তার গোনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করো । অন্যদিকে পিতার দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেলে পুত্রের একথা বলার হিম্মত হবে না যে, তার বদলে আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও । এ অবস্থায় নিকট সম্পর্কহীন ভিন্ন ব্যক্তিরা সেখানে পরস্পরের কোন কাজে লাগবে এ আশা করার কি অবকাশই বা থাকে ! [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] তবে এটা সত্য যে, যদি পিতা-পুত্র উভয়েই ঈমানদার হয় তবে মহান আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের পদ-মর্যাদা উন্নীত করে তাদের একজনকে অপরের কাছাকাছি রাখবেন । যেমন, কুরআন করীমে রয়েছে: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান–সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে–আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে; আমরা এ সন্তান–সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব ।" [সূরা আত-তূর: ২১] যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয় । সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কেয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে, যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে । অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে, ﴿جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ﴾ "তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা–মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র–পরিজনও" [সূরা আর-রা'দ: ২৩] তাদের সাথে প্রবেশ করবে যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বোঝানো হয়েছে । এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমানিত হয় যে, পিতা–মাতা ও সন্তান–সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে ।

সত্য[১]; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক[২] যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্[৩], তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

---

(১) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) আয়াতে'আল-গারূর' বা 'প্রতারক' বলতে শয়তান কে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর, সা'দী]

(৩) এ আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লুকমান শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই রয়েছে (অর্থাৎ, কোন বছর কোন তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ, কন্যা না পুত্র, কতদিন বাঁচবে, কি রিযিক পাবে, কোন স্বভাবের অধিকারী হবে ইত্যাদি) এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন স্থানে মারা যাবে, তাও কেউ জানে না। প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। [দেখুন, তাবারী, কুরতুবী] এ পাঁচ বস্তুকে সূরা আল-আন'আমের ৫৯ নং আয়াতে (অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে)। তাছাড়া কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে ব্যাপারে হাদীসে জিবরীল নামে খ্যাত হাদীসেও অনুরূপ বলা হয়েছে যে, এর জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে নেই। [দেখুন, বুখারী:৪৭৭৭, মুসলিম:৯, ১০]

৩২- সূরা আস-সাজ্‌দাহ
৩০ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম,

الٓمّٓ ﴿١﴾

২. এ কিতাব সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া, এতে কোন সন্দেহ নেই[১]।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾

৩. নাকি তারা বলে, 'এটা সে নিজে রটনা করেছে[২]?' না, বরং তা আপনার রব হতে আগত সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি[৩], হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

৪. আল্লাহ্‌, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি 'আর্‌শের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾

---

(১) এ কিতাব রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলেই এখানে শেষ করা হয়নি। বরং এর পরেও পূর্ণ জোরেশোরে বলা হয়েছে যে, এটা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর কাছ থেকে এর অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশই নেই। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(২) এটি নিছক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা নয়। বরং এখানে মহাবিস্ময় প্রকাশের ভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। [বাগভী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, তারা ছিল নিরক্ষর জাতি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে তাদের কাছে দূর অতীতে কোন সতর্ককারী আসে নি। [তাবারী]

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ⑤

৫. তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সব কিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর[১]।

ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥

৬. তিনি, গায়েব ও উপস্থিত (যাবতীয় বিষয়ে) জ্ঞানী, প্রবল পরাক্রমশালী[২], পরম দয়ালু[৩]।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ⑦

৭. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে[৪] এবং কাদা হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ⑧

৮. তারপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।

---

(১) অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর হবে। কাতাদাহ বলেন, দুনিয়ার দিনের হিসেবে সে সময়টি হচ্ছে, এক হাজার বছর। তন্মধ্যে পাঁচশত বছর হচ্ছে নাযিল হওয়ার জন্য, আর পাঁচ শত বছর হচ্ছে উপরে উঠার জন্য। মোট: এক হাজার বছর। [তাবারী] অন্যত্র বলা হয়েছে, "সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।" [সূরা আল-মা'আরিজ:৪] এর এক সহজ উত্তর তো এই যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিধায় মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ বলে মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কিছু লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পাঁচশত বছর বলে মনে হবে। আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। [তাবারী, বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর প্রাধান্যের অধিকারী। [মুয়াস্‌সার]

(৩) অর্থাৎ তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ও করুণাময়। [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটাই উত্তম ও সুন্দর। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, তিনি প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি অত্যন্ত মজবুত ও নৈপুণ্য সহকারে সম্পন্ন করেছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ⑨

৯. পরে তিনি সেটাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ থেকে। আর তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ, তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর[১]।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۭ بَلْ هُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ⑩

১০. আর তারা বলে, 'আমরা মাটিতে হারিয়ে গেলেও কি আমরা হবো নূতন সৃষ্টি?' বরং তারা তাদের রবের সাক্ষাতের সাথে কুফরিকারী।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ⑪

১১. বলুন, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে[২]। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ⑫

১২. আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী[৩]।'

---

(১) আয়াতের সমার্থে আরও দেখুন, সূরা আল-মুমিনূন: ১৩-১৪।

(২) আলোচ্য আয়াতে "মালাকুল মাউত" এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ অপর আয়াতে রয়েছে "ফেরেশ্‌তাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়" [সূরা আল-আন'আমঃ৬১] এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, "মালাকুল মাউত" একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশ্‌তা তাঁর অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। [কুরতুবী, আদওয়াউল-বায়ান]

(৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ জানিয়েছেন যে, তাদেরকে যদি ফেরৎ দেয়া হত, তবে তারা পুনরায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর মিথ্যারোপ করত। আল্লাহ্‌ বলেন, "আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করান হবে তখন তারা বলবে, 'হায়!

১৩. আর আমরা ইচ্ছে করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হেদায়াত দিতাম[১]; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ কথা অবশ্যই সাব্যস্ত যে, আমি নিশ্চয় কতেক জিন ও মানুষের সমন্বয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

১৪. কাজেই 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। আমরাও তোমাদেরকে পরিত্যাগ করলাম[২]। আর তোমরা যা আমল করতে তার জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।'

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. শুধু তারাই আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা সেটার দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠান হত, আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' বরং আগে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আর তারা আবার ফিরে গেলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-আন'আম: ২৭-২৮]

(১) কাতাদাহ বলেন, যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তবে তারা সবাই ঈমান আনত। আর যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তবে তাদের উপর আসমান থেকে এমন কোন নিদর্শন নাযিল করতেন, যা দেখার পর তারা সবাই সেটার সামনে মাথা নত করে দিত। কিন্তু তিনি জোর করে ঈমানে নিয়ে আসতে চান না। কারণ, তাঁর কাছ থেকে তাদের উপর একটি বাণী সত্য হয়েছে যে, তিনি তাদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। [তাবারী]

(২) এখানে نسي শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করা, ছেড়ে যাওয়া। আরবী ভাষায় এ শব্দটি ভুলে যাওয়া, ছেড়ে দেয়া এ দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। [তাবারী; কুরতুবী]

১৬. তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দূরে থাকে[১] তারা তাদের রবকে ডাকে আশংকা ও আশায়[২] এবং আমরা

تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ⑯

(১) অর্থাৎ আয়েশ-আরাম করে রাত কাটাবার পরিবর্তে তারা নিজেদের রবের ইবাদাত করে। তাদের অবস্থা এমনসব দুনিয়াপূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ-গান, শরাব পান ও খেলা তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে। তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাংখা সমর্পণ করে। [দেখুন, মুয়াস্সার, কুরতুবী, বাগভী]

(২) আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহর যিক্র ও দো'আয় আত্মনিয়োগ করে। কেননা, এরা মহান আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পূণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিক্র ও দো'আর জন্য ব্যাকুল করে রাখে। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দো'আয় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। মা'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি এবং জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, সাওম রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন, এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়)। আর সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের সালাত; এই বলে কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। [তিরমিযী: ২৬১৬, ইবনে মাজাহ্: ৩৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১]

সাহাবী আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদাহ ও যাহহাক রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা এশা ও ফজর উভয় সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেন। প্রখ্যাত সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত

তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

১৭. অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ[১]!

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

আছে, উল্লেখিত আয়াত যারা এশার সালাতের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। [আবু দাউদ: ১৩২১, তিরমিযী: ৩১৯৬] ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের সালাতই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

(১) হাদীসে কুদসীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব জিনিস তৈরী করে রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষ কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে না।" [বুখারী: ৪৭৭৯; মুসলিম: ১৮৯, ২৪২৪] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন, জান্নাতে কার অবস্থানগত মর্যাদা সবচেয়ে সামান্য হবে? তিনি বললেন, সে এক ব্যক্তি, তাকে সমস্ত জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পরে জান্নাতের নিকট নিয়ে আসা হবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে রব! সবাই তাদের স্থান নিয়ে নিয়েছে। তারা তাদের যা নেবার তা নিয়েছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি সন্তুষ্ট হবে, যদি তোমাকে দুনিয়ার বাদশাদের রাজত্বের মত রাজত্ব দেয়া হয়? সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট। তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তা-ই রইল, আরও অনুরূপ, আরও অনুরূপ, আরও অনুরূপ, আরও অনুরূপ। পঞ্চম বারে আল্লাহ্‌ বলবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছ? সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট। তখন তিনি বলবেন, এটা তোমার জন্য, তাছাড়া অনুরূপ দশগুণ। আর তোমার জন্য থাকবে তাতে যা তোমার মন চায়, তোমার চোখ শান্তি করে, সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট। সে বলবে, হে রব! (এই যদি আমার অবস্থা হয়) তবে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারীর কি অবস্থা? তিনি বলবেন, তাদের জন্য আমি নিজ হাতে তাদের সম্মানের বীজ বপন করেছি, আর তাতে আমার মোহর মেরে দিয়েছি। সুতরাং কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, আর কোন মানুষের মনে তা উদিত হয়নি। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [মুসলিম: ১৮৯] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ জান্নাতে যাবে নেয়ামত প্রাপ্ত হবে, সে কোনদিন নিরাশ হবে না, তার কাপড় পুরনো হবে না, আর তার যৌবন নিঃশেষ হবে না।" [মুসলিম: ২৮৩৬]

১৮. সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি তার ন্যায় যে ফাসেক[১]? তারা সমান নয়।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ⑱

১৯. যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑲

২০. আর যারা নাফরমানী করে, তাদের বাসস্থান হবে আগুন; যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'যে আগুনের শাস্তিতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে, তা আস্বাদন কর।'

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ⑳

২১. আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে মহা শাস্তির পূর্বে কিছু লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব[২], যাতে তারা ফিরে আসে।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ㉑

২২. যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালিম

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ㉒

---

(১) এখানে মুমিন ও ফাসেকের দু'টি বিপরীতমুখী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মুমিন বলতে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহকে নিজের রব ও একমাত্র উপাস্য মেনে নিয়ে আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে আইন-কানুন পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করে। পক্ষান্তরে ফাসেক হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ফাসেকী আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসা বা অন্যকথায় বিদ্রোহ, বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে। [দেখুন, তাবারী, কুরতুবী]

(২) নিকটতম শাস্তি বা "ছোট শাস্তি" বলে বোঝানো হয়েছে, এ দুনিয়ায় মানুষ যেসব কষ্ট পায় সেগুলো। যেমন, ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন রোগ, নিজের প্রিয়তম লোকদের মৃত্যু, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মারাত্মক ক্ষতি,ব্যর্থতা ইত্যাদি। আর বৃহত্তর শাস্তি বা "বড় শাস্তি" বলতে আখেরাতের শাস্তি বোঝানো হয়েছে। কুফরী ও ফাসেকীর অপরাধে এ শাস্তি দেয়া হবে। [মুয়াস্‌সার]

আর কে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

তৃতীয় রুকূ'

২৩. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব আপনি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহে থাকবেন না[১] এবং আমরা ওটাকে করে দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াতস্বরূপ ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۤىِٕهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ۚ﴿٢٣﴾

২৪. আর আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

---

(১) لقاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ। এ আয়াতে কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لقائه এর ـه (সর্বনাম) কিতাব অর্থাৎ কুরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ মুসা আলাইহিস্ সালামকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেমন কুরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং নিশ্চয় আপনাকে প্রজ্ঞাময় প্রশংসিতের পক্ষ থেকে কুরআন প্রদান করা হবে"। [সূরা আন-নামল: ৬] ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এবং কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, لقائه এর ـه (সর্বনাম) মুসা আলাইহিস্ সালাম এর দিকে ধাবিত হয়েছে। সে হিসেবে এ আয়াতে মুসা আলাইহিস্ সালাম এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে আপনার সাক্ষাত সংঘটিত হবে। সুতরাং মে'রাজের রাতে এক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; [দেখুন, বুখারী:৩২৩৯; মুসলিম:১৬৫] অতঃপর কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, মূসা আলাইহিস্ সালামকে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাঁকে নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশ্‌ত করুন।

করেছিল। আর তারা আমাদের আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত[১]।

২৫. নিশ্চয় আপনার রব, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে তিনি কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেটার ফয়সালা করে দিবেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. এটাও কি তাদেরকে হেদায়াত করলো না যে, আমরা তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি বহু প্রজন্মকে ---যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? নিশ্চয় এতে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা শুনবে না?

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমরা শুকনো ভূমির[২] উপর পানি প্রবাহিত করে, তার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যা থেকে আহার্য গ্রহণ করে তাদের চতুষ্পদ জন্তু এবং তারা নিজেরাও? তারপরও কি তারা লক্ষ্য করবে না[৩]?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

---

(১) অর্থাৎ আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়াত করতেন। [দেখুন, মুয়াস্সার]

(২) অর্থাৎ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। ﴿الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ শুষ্ক ভূমিকে বলা হয় যেখানে কোন বৃক্ষলতা উদগত হয় না। ইবন আব্বাস বলেন, এখানে এমন ভূমির কথা বলা হচ্ছে, যে ভূমিতে অল্প পানি পড়লে কোন কাজে লাগে না। তবে সেখানে যদি প্রবল বর্ষণের পানি আসে তবেই সেটা কাজে লাগে। [তাবারী]

(৩) শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহে; এবং সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগত হওয়ার বর্ণনা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা

২৮. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হবে এ বিজয়(১)?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. বলুন, 'বিজয়ের দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না(২) ।'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতএব আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও তো অপেক্ষমান(৩) ।

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে । অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয় । [কুরতুবী; সা'দী]

(১) তাফসীরকার মুজাহিদ আলোচ্য আয়াতে বিজয় এর অর্থ কেয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন । [ইবন কাসীর; বাগভী] কাতাদাহ বলেন, এখানে فتح বলে বিচার ফয়সালাই বোঝানো হয়েছে । [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, কারণ, কুরআনের বহু আয়াতে এ শব্দটি বিচার-ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন শু'আইব আলাইহিস সালাম এর যবানীতে এসেছে, "হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৯] [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব এসে যাবে এবং তাঁর ক্রোধ আপতিত হবে, তখন কাফেরদের ঈমান কোন কাজে আসবে না । আর তাদেরকে তখন আর কোন সুযোগও দেয়া হবে না । যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "অতঃপর তাদের কাছে যখন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ আসলেন, তখন তারা নিজেদের কাছে বিদ্যমান থাকা জ্ঞানে উৎফুল্ল হল । আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করল । অতঃপর তারা যখন আমাদের শাস্তি দেখল তখন বলল, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদের সাথে কুফরী করলাম ।' কিন্তু তারা যখন আমার শাস্তি দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না । আল্লাহ্‌র এ বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং তখনই কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।" [সূরা গাফির: ৮৩-৮৫]

(৩) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "নাকি তারা বলে, 'সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি । বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।" [সূরা আত-তূর: ৩০-৩১]

৩৩- সূরা আল-আহ্‌যাব[১]
৭৩ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা[২]।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

২. আর আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা ওহী হয় তার অনুসরণ করুন[৩]; নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ

৩. এবং আপনি নির্ভর করুন আল্লাহ্‌র

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

(১) সূরাতুল-আহযাব মদীনায় নাযিল হয়। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্ সমীপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতা, তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাকে দুঃখ–যন্ত্রণা দেয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও সহায়ক। তাছাড়া বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলাকে রজম করার আয়াতটি এ সূরাতেই ছিল। পরবর্তীতে সেটার বিধান বহাল রেখে তেলাওয়াত রহিত করা হয়। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ ব্যাপারে উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, মুসনাদে আবী দাউদ আত-তায়ালিসী, ৫৪২; ইবন হিব্বান ৪৪২৮; মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৩৫৯]

(২) এ আয়াতের উপসংহার ﴿اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾ বলে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করার এবং কাফের ও মুনাফেকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, যে আল্লাহ্ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর পরিজ্ঞাত। [ইবন কাসীর]

(৩) এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ-যেন আপনি কাফের ও মুনাফেকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, আপনি কেবল তাই অনুসরণ করুন। [ফাতহুল কাদীর]

উপর। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৪. আল্লাহ্ কোন মানুষের জন্য তার অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। আর তোমাদের স্ত্রীগণ, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি[১] এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি[২];

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ④

(১) এ আয়াতে 'যিহার'-এর দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরী'য়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরা মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যিহারের কাফ্ফারা আদায় করে; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরা আল-মুজাদালায়' আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। [দেখুন, মুয়াস্‌সার; বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দু'টি অন্ত:করণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। দেখুন,[মুয়াস্‌সার,সা'দী] অর্থাৎ, অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও তার প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না। যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে; সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশংকা রয়েছে। হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসাকে যায়েদ ইবন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে সম্বোধন করতাম। [বুখারী: ৪৭৮২, মুসলিম: ২৪২৫] কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি। এ আয়াতটি নাযিল হবার পর কোন ব্যক্তির নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা হয়। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে

এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

৫. ডাকো তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র নিকট এটাই বেশী ন্যায়সংগত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ

৬. নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর[১] এবং তাঁর স্ত্রীগণ

ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।"[বুখারীঃ ৪৩২৬, মুসলিমঃ ৬৩] অন্য হাদীসে এসেছে, 'তোমরা তোমাদের পিতাদের সাথে সম্পর্কিত হওয়া থেকে বিমুখ হয়োনা, যে তার পিতা থেকে বিমুখ হয় সে কুফরী করল।' [মুসলিমঃ৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোন মানুষ যখন না জেনে কোন নসব প্রমান করতে যায় বা অস্বীকার করতে যায় তখন সে কুফরী করে, যদিও তা সামান্য হোক'। [ইবনে মাজাহ:২৭৪৪]

(১) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলিমদের এবং মুসলিমদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমস্ত মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। নবী ও মুমিনদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজিত, অন্য কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক তার সাথে কোন দিক দিয়ে সামান্যতমও তুলনীয় নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের জন্য তাদের বাপ-মায়ের চাইতেও বেশী স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র হৃদয় এবং তাদের নিজেদের চাইতেও কল্যাণকামী। তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এমন

أُمَّهَٰتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ | তাদের মা[১]। আর আল্লাহ্‌র বিধান

কাজই করতে পারেন যাতে তাদের সত্যিকার সাফল্য অর্জিত হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে পারে, বোকামি করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য তাই করবেন যা তাদের জন্য লাভজনক হয়। আসল ব্যাপার যখন এই মুসলিমদের ওপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অধিকার আছে তখন তারা তাকে নিজেদের বাপ-মা ও সন্তানদের এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করবে। দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসবে। নিজেদের মতামতের ওপর তার মতামতকে এবং নিজেদের ফায়সালার ওপর তার ফায়সালাকে প্রাধান্য দেবে। তার প্রত্যেকটি হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে। তাই হাদীসে এসেছে, "তোমাদের কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।" [বুখারীঃ ১৪, মুসলিমঃ ৪৪] সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা পালন করা জায়েয নয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাংক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'এমন কোন মুমিনই নেই যার পক্ষে আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত মানবকূলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মন চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত পাঠ করতে পার।' [বুখারীঃ ২৩৯৯]

(১) রাসূলের পূণ্যবর্তী স্ত্রীগণকে সকল মুসলিমের মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ-সম্মান ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহ্‌কাম, যথা-পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া, মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর রাসূলের পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়। মোটকথাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ শুধুমাত্র এ অর্থে মুমিনদের মাতা যে, তাদেরকে সম্মান করা মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব। বাদবাকি অন্যান্য বিষয়ে তারা মায়ের মতো নন। যেমন তাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলিম তাদের জন্য গায়ের মাহরাম ছিল এবং তাদের থেকে পর্দা করা ছিল ওয়াজিব। তাদের মেয়েরা মুসলিমদের জন্য বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন না, যার ফলে তাদের সাথে মুসলিমদের বিয়ে নিষিদ্ধ হতে পারে। তাদের ভাই ও বোনেরা মুসলিমদের জন্য মামা ও খালার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কোন ব্যক্তি নিজের মায়ের তরফ থেকে যে মীরাস

فِي كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণের চেয়ে---যারা আত্মীয় তারা পরস্পর কাছাকাছি(১)। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কল্যাণকর কিছু করার কথা আলাদা(২)। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

৭. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম(৩) এবং আপনার কাছ থেকেও, আর নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ‘ঈসার কাছ থেকেও। আর আমরা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার--

---

লাভ করে তাদের তরফ থেকে কোন অনাত্মীয় মুসলিম সে ধরনের কোন মীরাস লাভ করে না। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; মুয়াস্‌সার, বাগভী]

(১) এ আয়াতের মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক চুক্তির বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে। হিজরতের পর পরই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। যার কারণে তাদের একজন অপরজনের ওয়ারিশ হতো। এটা ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। তারপর যখন প্রত্যেকের অবস্থারই পরিবর্তন হলো তখন এ নীতির কার্যকারিতা রহিত করে যাবিল আরহামদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো। [তাবারী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি চাইলে হাদীয়া, তোহ্‌ফা, উপঢৌকন বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের কোন দ্বীনী ভাইকে সাহায্য করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) উল্লেখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকূল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে সহীহ সনদে এসেছে, ‘রেসালত ও নবুওয়ত সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে’। [আহমাদ:৫/১৩৫, মিশকাতুল মাসাবীহ: ১/৪৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩২৪, আল-লালকায়ী: আস-সুন্নাহ: ৯৯১, ইব্‌ন বাত্তাহ: আল-ইবানাহ ২/৬৯,৭১,২১৫,২১৭] নবী আলাইহিস সালামগণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুওয়ত ও রেসালাত বিষয়ক দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত।

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾

৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। আর তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[১]।

দ্বিতীয় রুকূ'

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল অতঃপর আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঘূর্ণিবায়ু[২] এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখনি[৩]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾

১০. যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হতে[৪], তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত[৫], আর

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ কেবলমাত্র অংগীকার নিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ অংগীকার কতটুকু পালন করা হয়েছে সে সর্ম্পকে তিনি প্রশ্ন করবেন। [কুরতুবী, মুয়াস্‌সার]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে মৃদৃ বাতাস দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে। আর আ'দ সম্প্রদায়কে ঝঞ্ঝা বাতাসে ধ্বংস করা হয়েছে' [বুখারী:১০৩৫]

(৩) এমন বাহিনী বলে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। [তাবারী, ইবন কাসীর, বাগভী, ফাতহুল কাদীর]

(৪) এর একটি অর্থ হতে পারে, সবদিক থেকে চড়াও হয়ে এলো। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, নজ্‌দ ও খায়বারের দিক থেকে আক্রমণকারীরা ওপরের দিক থেকে এবং মক্কা মো'আয্‌যামার দিক থেকে আক্রমণকারীরা নিচের দিক থেকে আক্রমণ করলো। [ফাতহুল কাদীর]

(৫) হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অন্তরসমূহ

তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে;

১১. তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

১২. আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।'

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

১৩. আর যখন তাদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিববাসী[১]! (এখানে রাসূলের কাছে প্রতিরোধ করার) তোমাদের কোন স্থান নেই সুতরাং তোমরা (ঘরে) ফিরে যাও' এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

কণ্ঠাগত হয়েছে, আমরা কি কিছু বলব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল, اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا 'হে আল্লাহ্! আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং আমাদেরকে ভীতি থেকে নিরাপত্তা দাও'। আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফলে আল্লাহ্ শত্রুদের মুখে ঝঞ্ঝা বায়ূ প্রবাহিত করলেন, এভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে বাতাস দিয়ে পরাজিত করলেন। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৩]

(১) ইয়াসরিববাসী বলে এখানে মদীনাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। এটা মদীনার ইসলাম পূর্ব নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে পরিবর্তন করে মদীনা রাখেন। দেখুন, [কুরতুবী,মুয়াস্‌সার,ফাতহুল কাদীর] তিনি বলেন, 'আমাকে এমন এক জনপদের দিকে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমস্ত জনপদকে গ্রাস করবে (করায়ত্ত্ব করবে) লোকেরা সেটাকে বলে ইয়াসরিব, প্রকৃতপক্ষে সেটা হলো মদীনা। সেখান থেকে খারাপ লোককে এমনভাবে নির্বাসিত করে যেমন কামারের হাঁপর লোহার ময়লা দূর করে।' [বুখারী: ১৮৭১, মুসলিম:১৩৮২]

১৪. আর যদি বিভিন্ন দিক হতে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটত, তারপর তাদেরকে শির্ক করার জন্য প্ররোচিত করা হত, তবে অবশ্যই তারা সেটা করে বসত, তারা সেটা করতে সামান্যই বিলম্ব করত[১]।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝

১৫. অবশ্যই তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্‌র সাথে করা অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে[২]।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝

১৬. বলুন, 'তোমাদের কোন লাভই হবে না পালিয়ে বেড়ানো, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পালিয়ে যাও, তবে সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।'

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৭. বলুন, 'কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে বাধা দান করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছে করেন অথবা তিনি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছে করেন?' আর তারা আল্লাহ্

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

(১) আয়াতের আরেক অর্থ হলো, তারা এরপর সামান্যই মদীনাতে অবস্থান করতে সমর্থ হতো; কারণ তারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যেত। [বাগভী]

(২) অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধের সময় তারা যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল তারপর লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করে তারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল যে, এবার যদি পরীক্ষার কোন সুযোগ আসে তাহলে তারা নিজেদের এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু আল্লাহকে নিছক কথা দিয়ে প্রতারণা করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে কোন অংগীকার করে তাঁর সামনে তিনি পরীক্ষার কোন না কোন সুযোগ এনে দেন। এর মাধ্যমে তার সত্য ও মিথ্যা যাচাই হয়ে যায়। তাই ওহুদ যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পরেই তিনি তার চাইতেও বেশী বড় বিপদ সামনে নিয়ে এলেন এবং এভাবে তারা তাঁর সাথে কেমন ও কতটুকু সাচ্চা অংগীকার করেছিল তা যাচাই করে নিলেন। [দেখুন, মুয়াস্‌সার]

ছাড়া নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১৮. আল্লাহ্‌ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো।' তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে---

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

১৯. তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত[১]। অতঃপর যখন ভীতি আসে তখন আপনি দেখবেন, মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার দিকে তাকায়। কিন্তু যখন ভয় চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে[২]। তারা ঈমান আনেনি ফলে আল্লাহ্‌ তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল করেছেন এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

২০. তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ

(১) তারা তোমাদের জন্য তাদের জান, মাল, শক্তি-সামর্থ ব্যয় করতে কৃপণতা করে। কারণ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না, তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। [মুয়াস্‌সার, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, বাগভী]

(২) আভিধানিক দিক দিয়ে আয়াতটির দু'টি অর্থ হয়। এক, যুদ্ধের ময়দান থেকে সাফল্য লাভ করে যখন তোমরা ফিরে আসো তখন তারা বড়ই হৃদ্যতা সহকারে ও সাড়ম্বরে তোমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং বড় বড় বুলি আউড়িয়ে এই বলে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে যে, আমরাও পাক্কা মুমিন এবং এ কাজ সম্প্রসারণে আমরাও অংশ নিয়েছি কাজেই আমরাও গনীমাতের মালের হকদার। দুই, বিজয় অর্জিত হলে গনীমাতের মাল ভাগ করার সময় তাদের কণ্ঠ বড়ই তীক্ষ্ণ ও ধারাল হয়ে যায় এবং তারা অগ্রবর্তী হয়ে দাবী করতে থাকে, আমাদের ভাগ দাও, আমরাও কাজ করেছি, সবকিছু তোমরাই লুটে নিয়ে যেয়ো না। [দেখুন, কুরতুবী]

يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত! আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করত তবে তারা খুব অল্পই যুদ্ধ করত ।

তৃতীয় রুকূ'

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২১. অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ[১], তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহ্‌কে বেশী স্মরণ করে ।

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

২২. আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, 'এটা তো তাই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন ।' আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল ।

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৩. মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) মারা গেছে[২] এবং কেউ

---

(১) এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে । এরই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে' । এদ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয় । [দেখুন, মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াতে উল্লেখিত ﴿قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ এর তাফসীরে কয়েকটি মত এসেছে, এক. আল্লাহ্‌র

কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি;

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ﴿٢٤﴾

২৪. যাতে আল্লাহ্‌ পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং শাস্তি দেন মুনাফিকদেরকে যদি তিনি চান অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ﴿٢٥﴾

২৫. আর আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। আর যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; এবং আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ﴿٢٦﴾

২৬. আর কিতাবীদের(১) মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ হতে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি

সাথে কৃত তাদের মানত পূর্ণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে। দুই. আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার তারা করেছে তারা তা পূর্ণ করা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। তারা এ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন অন্যথা করেনি। তিন. তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছে। এ আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার চাচা আনাস, যার নাম আমার নাম। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে, প্রথম যুদ্ধেই আমি রাসূলের সাথে থাকতে পারিনি। যদি আল্লাহ্‌ আমাকে এর পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয় তাহলে আল্লাহ্‌ দেখবেন আমি কি করি। তারপর তিনি রাসূলের সাথে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধের ময়দানে সা'দ ইবনে মু'আজকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আমর! কোথায়? তিনি জবাবে বললেন, আমি ওহুদের দিকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। তারপর আনাস ইবনে নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ডরকম যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এমনকি তার গায়ে আশিটিরও বেশী আঘাত পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার জন্যই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। [বুখারী: ৪৭৮৩]

(১) অর্থাৎ বনী কুরাইযার ইয়াহূদী সম্প্রদায়। [মুয়াস্‌সার]

সঞ্চার করলেন; তোমরা তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করছ এবং কিছু সংখ্যককে করছ বন্দী[১]।

২৭. আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করনি[২]। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

চতুর্থ রুকূ'

২৮. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, 'তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সমগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই[৩]।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

---

(১) এখানে বনু-কুরাইযার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুসলিমগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন। [দেখুন, মুয়াস্‌সার]

(২) এখানে মুসলিমদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলিমদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমন সব ভু–খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) উল্লেখিত আয়াতসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে; সেদিকে যেন তারা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে রাসূলের স্ত্রীদেরকে তালাক

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

২৯. 'আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাস, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন(১)।'

গ্রহণের যে অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্দারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান। এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে, একদিন স্ত্রীগণ সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে তাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমান বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। [মুসলিম: ১৪৭৮]

(১) এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্তমান দারিদ্র্যপীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং আখেরাতে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "তাখঈর"। অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে থাকার বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা করার ইখতিয়ার দান করা। [ফাতহুল কাদীর;বাগাওয়ী] হাদীসে এসেছে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব-উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক অপার অনুগ্রহ। কেননা, তার অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝٣٠

৩০. হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত 'ফাহেশা', তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তার জন্য বাড়িয়ে দেয়া হবে শাস্তি --- দ্বিগুণ এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝٣١

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব দু'বার। আর তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযিক।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٣٢

৩২. হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

৩৩. আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে[১]

ও আখেরাতকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মত সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন; রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না। [মুসলিম: ১৪৭৫]

(১) আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়,নারীর আসল অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে। [ইবন কাসীর,মুয়াস্‌সার] আয়াতের শব্দাবলী থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস একে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেয়। মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারবে যখন নিজের ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তানদেরকে আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোন অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আশংকামুক্ত

ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ۝

এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাক[১]। হে নবী-পরিবার[২]! আল্লাহ্‌ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

৩৪. আর আল্লাহ্‌র আয়াত ও হিকমত থেকে যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে[৩];

থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করবে সে ঘরে বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, "নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান করে।" [সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ১৬৮৫, সহীহ ইবন হিব্বান: ৫৫৯৯]

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণের প্রতি কুরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েত হলো, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ কর। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে আহলে বাইত বা নবী পরিবার বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাগভী]

(৩) মূলে وَٱذۡكُرۡنَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ: "স্মরণ রেখো" এবং "বর্ণনা করো।" প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায়: হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কখনো ভুলে যেয়ো না যে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াকে আল্লাহর আয়াত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়া হয় সেটিই তোমাদের আসল গৃহ। তাই তোমাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। তোমাদের গৃহে যেসব বিষয় আলোচনা হয় সেসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রেখো –যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হয়: হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা যা কিছু শোনো এবং দেখো তা লোকদের সামনে বর্ণনা করতে থাকো। কারণ রাসূলের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে এমন অনেক বিধান তোমাদের গোচরীভূত হবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে লোকদের জানা সম্ভব হবে না। রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

পঞ্চম রুকূ'

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী--- তাদের জন্য আল্লাহ্‌ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ وَالْقَٰنِتِينَ وَالْقَٰنِتَٰتِ وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَٰتِ وَالصَّٰبِرِينَ وَالصَّٰبِرَٰتِ وَالْخَٰشِعِينَ وَالْخَٰشِعَٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَٰتِ وَالصَّٰٓئِمِينَ وَالصَّٰٓئِمَٰتِ وَالْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَٰفِظَٰتِ وَالذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেয়া তাদের দায়িত্ব।
এ আয়াতে দু'টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহর আয়াত, দুই, হিকমাত বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আল্লাহর আয়াত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত। কিন্তু হিকমাত শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সকল প্রকার জ্ঞানের কথা এর অন্তরভুক্ত, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে শেখাতেন। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার ওপরও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তার মধ্যেই একে সীমিত করে দেবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত শুনানো ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র জীবন ও নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যে হিকমাতের শিক্ষা দিতেন তাও অপরিহার্যভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন: তাবারী, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো[১]।

---

(১) আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এক ঘটনা হচ্ছে, যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনা। ঘটনার সংক্ষিপ্ত রূপ এই যে, যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একজন স্বাধীন লোক ছিলেন। কিন্তু জাহেলী যুগে কিছু লোক তাকে অল্প বয়সে ধরে এনে ওকায বাজারে বিক্রি করে দেয়, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সে লোক থেকে তাকে খরীদ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দান করেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভুষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাকে 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামপুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হত। কুরআনে কারীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যৌবনে পদার্পনের পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শকে তার নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং যয়নব ও তার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। যাতে এ দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরী'য়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরী'য়তে একাজ যে লোক পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যয়নব ও তার ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যায়। অত:পর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। [বাগাওয়ী]

এ আয়াত সম্পর্কে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয় তা হলো, জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ঘটনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য কোন এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বদ্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তার পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দো'আ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়ীটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অঙ্কই ছিল সবচাইতে বেশী। পরবর্তীকালে জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এক জিহাদে শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

৩৭. আর স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর(১)।' আর আপনি আপনার অন্তরে গোপন করছিলেন এমন কিছু যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিচ্ছেন(২); এবং আপনি লোকদেরকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ্‌কেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। তারপর যখন যায়েদ তার (স্ত্রীর) সাথে প্রয়োজন শেষ করল(৩), তখন আমরা তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম(৪), যাতে

(১) অর্থাৎ "স্মরণ করুন যখন আল্লাহ্ ও আপনি নিজে যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও।" এ ব্যক্তি হলো যায়েদ। আল্লাহ্ তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। একদিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে এসব অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: 'নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর।' [দেখুন, বাগভী; ফাতহুল কাদীর; তাবারী]

(২) এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যয়নবকে তালাক দিলে পরে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। [ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(৩) অর্থাৎ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তার ইদ্দত পুরা হয়ে গেলো। "প্রয়োজন পূর্ণ করলো" শব্দগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, তার কাছে যায়েদের আর কোন প্রয়োজন থাকলো না। [মুয়াস্‌সার; ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ আপনার সাথে তার বিয়ে স্বয়ং আমরা সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে একথা

মুমিনদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীদেরকে (স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে) কোন সমস্যা না হয় যখন তারা (পোষ্য পুত্ররা) নিজ স্ত্রীর সাথে প্রয়োজন শেষ করবে (এবং তালাক দিবে)। আর আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৮. নবীর জন্য সেটা (করতে) কোন সমস্যা নেই যা আল্লাহ্ বিধিসম্মত করেছেন তার জন্য। আগে যারা চলে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান[১]। আর আল্লাহ্‌র ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করত, আর তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করত না[২]। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই সম্পন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। [তাবারী; বাগভী]

(১) এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ? এরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই দ্বীনি স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোককে বিয়ে করার অনুমতি ছিল। যন্মধ্যে দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [বাগভী]

(২) নবী আলাইহিমুস সালামগণের যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, এসব মহাত্মাবৃন্দ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। [মুয়াস্‌সার, ফাতহুল কাদীর]

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন[১]; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী । আর আল্লাহ্ সর্বকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ ।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۴۰﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۴۲﴾

৪৩. তিনিই, যিনি তোমাদের প্রশংসা করেন[২] এবং দো'আ ও ক্ষমা চান তোমাদের জন্য তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ; যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনেন আলোর দিকে । আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু ।

هُوَ الَّذِیْ يُصَلِّیْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿۴۳﴾

---

(১) উল্লেখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী যায়েদ বিন হারেসাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি যয়নবকে তালাক দেয়ার পর নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তার বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তার প্রতি পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত । এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, যায়েদের পিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন বরং তার পিতা হারেসা । কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াচ্ছলে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন' । যে ব্যক্তি সন্তান–সন্ততিদের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তার প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে যে, তার পুত্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্ত স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত্রবধূ বলে তার জন্য হারাম হবে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী খাদিজার গর্ভস্থ তিন পুত্র-সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম–মোট চার পুত্র–সন্তান ছিলেন । কিন্তু এরা সবাই শৈশবাবস্থায় মারা যান । [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(২) 'সালাত' শব্দটি যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ । আর যখন এটি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় দো'আ,ইসতিগফার । [ফাতহুল কাদীর]

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'(১)। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. হে নবী! অবশ্যই আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে(২);

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্‌বানকারী(৩) ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে(৪)।

---

(১) আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তার সাথে মোলাকাতের সময় সেদিন তাদের অভ্যর্থনা হবে সালাম"। অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এদের সাক্ষাত ঘটবে–তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম বা আস্‌সালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এ সালাম কখন দেয়া হবে? এর উত্তরে বিভিন্ন সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশের মতে, এখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ সালাম মুমিনগণের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় বা হবে। ইমাম রাগেব প্রমূখের মতে, আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন হলো আখেরাতের দিন। আবার কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো জান্নাতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাস্‌সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ সালাম মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রদান করবে। [দেখুন, ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) 'মুবাশ্‌শির' এর মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং 'নাযির' অর্থাৎ, তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন। [তাবারী, বাগভী]

(৩) ﴿وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ﴾ এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ্‌র সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বানকারী। আয়াতে بإذنه শব্দ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করায় বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করেন। [কুরতুবী, সা'দী, বাগভী]

(৪) আয়াতে ﴿وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ এর মর্মার্থ 'পবিত্র কুরআন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

৪৭. আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাঅনুগ্রহ।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করুন এবং নির্ভর করুন আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৯. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন 'ইদ্দত নেই যা তোমরা গুণবে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দেবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

৫০. হে নবী! আমরা আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীগণকে, যাদের মাহ্‌র আপনি দিয়েছেন এবং বৈধ করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ্‌ আপনাকে যা দান করেছেন তাদের মধ্য থেকে যারা আপনার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে। আর বিয়ের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে এবং এমন মুমিন নারীকে (বৈধ করেছি) যে নবীর জন্যে নিজেকে সমর্পণ করে, যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়--- এটা বিশেষ করে

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। আমরা অবশ্যই জানি মুমিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে তাদের উপর যা নির্ধারিত করেছি[১]। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫১. আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার কাছে স্থান দিতে পারেন[২]। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই[৩]। এ বিধান এ জন্যে যে, এটা তাদের চোখ জুড়ানোর অধিক নিকটবর্তী এবং তারা দুঃখ পাবে না আর তাদেরকে আপনি যা দেবেন তাতে তাদের প্রত্যেকেই

تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

(১) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তাদের উপর যা ফরয করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে, কোন মহিলাকে অভিভাবক ও মাহ্‌র ব্যতীত বিয়ে করবে না। আর থাকতে হবে দু'জন গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য, আর তাদের জন্য চার জন নারীর অধিক বিয়ে করা জায়েয নয়, তবে যদি ক্রীতদাসী হয় সেটা ভিন্ন কথা। [তাবারী]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে সমস্ত নারীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদেরকে দান করত এবং বিয়ে করত, আমি তাদের প্রতি ঈর্ষাণ্বিত হতাম। আমি বলতাম, একজন মহিলা কি করে নিজেকে দান করতে পারে? কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি দেখছি আপনার রব আপনার ইচ্ছা অনুসারেই তা করেছেন। [বুখারী: ৫১১৩; মুসলিম: ১৪৬৪]

(৩) মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আপনার স্ত্রীদের কাউকে যদি তালাক ব্যতীতই আপনি দূরে রাখতে চান, অথবা যাদেরকে দূরে রেখেছেন তাদের কাউকে কাছে রাখতে চান, তবে সেটা আপনি করতে পারেন। এতে কোন অপরাধ নেই। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

খুশী থাকবে[১]। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

৫২. এরপর আপনার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে[২]; তবে আপনার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপার ভিন্ন। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণকারী।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ اَنۡ تَبَدَّلَ
بِهِنَّ مِنۡ اَزۡوَاجٍ وَّلَوۡ اَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ
اِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِيۡنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ
رَّقِيۡبًا ﴿٥٢﴾

সপ্তম রুকূ'

৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাবার-দাবার তৈরীর জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করো তারপর খাওয়া শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَدۡخُلُوۡا بُيُوۡتَ النَّبِىِّ
اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡذَنَ لَـكُمۡ اِلٰى طَعَامٍ غَيۡرَ نٰظِرِيۡنَ اِنٰٮهُ
وَلٰـكِنۡ اِذَا دُعِيۡتُمۡ فَادۡخُلُوۡا فَاِذَا طَعِمۡتُمۡ
فَانۡتَشِرُوۡا وَلَا مُسۡتَاۡنِسِيۡنَ لِحَدِيۡثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمۡ
كَانَ يُؤۡذِى النَّبِىَّ فَيَسۡتَحۡىٖ مِنۡكُمۡ وَاللّٰهُ
لَا يَسۡتَحۡىٖ مِنَ الۡحَـقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلۡتُمُوۡهُنَّ

---

(১) অর্থাৎ কাতাদাহ বলেন, তারা যখন জানতে পারবে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলের জন্য বিশেষ ছাড়, তখন তাদের অন্তরের পেরেশানী ও দুঃখ কমে যাবে এবং তাদের অন্তর পবিত্র হয়ে যাবে। [তাবারী]

(২) ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, দাহহাক, কাতাদাহ সহ অনেক আলেমের নিকট এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের পুরস্কারস্বরূপ নাযিল হয়েছিল। তারা যখন দুনিয়ার সামগ্রীর উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কষ্টকর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে এ আয়াত নাযিল করে তাদের অন্তরে খুশীর প্রবেশ ঘটালেন। [ইবন কাসীর] তবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগেই আল্লাহ্ তার জন্য বিয়ে করা হালাল করে দিয়েছেন। এ হিসেবে এ আয়াতটি পূর্বের ৫১ নং আয়াত দ্বারা রহিত। এটি মৃত্যু জনিত ইদ্দতের আয়াতের মতই হবে, যেখানে তেলাওয়াতের দিক থেকে আগে হলেও সেটি পরবর্তী আয়াতকে রহিত করেছে। [ইবন কাসীর]

مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। নিশ্চয় তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কারণ তিনি তোমাদের ব্যাপারে (উঠিয়ে দিতে) সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না[১]। তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য বেশী পবিত্র[২]। আর তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া সংগত নয় এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের

---

(১) কোন কোন লোক খাওয়ার দাওয়াতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে এমনভাবে ধর্ণা দিয়ে বসে চুটিয়ে আলাপ জুড়ে দেয় যে, আর উঠবার নামটি নেয় না, মনে হয় এ আলাপ আর শেষ হবে না। গৃহকর্তা ও গৃহবাসীদের এতে কি অসুবিধা হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তারা করে না। ভদ্রতাজ্ঞান বিবর্জিত লোকেরা তাদের এ আচরণের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কষ্ট দিতে থাকতো এবং তিনি নিজের ভদ্র ও উদার স্বভাবের কারণে এসব বরদাশত করতেন। শেষে যয়নবের ওলিমার দিন এ কষ্টদায়ক আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন, 'রাতের বেলা ছিল ওলিমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু দু'তিনজন লোক বসে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং পবিত্র স্ত্রীদের ওখান থেকে এক চক্কর দিয়ে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন তারা যথারীতি বসেই আছেন। তিনি আবার ফিরে গেলেন এবং আয়েশার কামরায় বসলেন। অনেকটা রাত অতিবাহিত হয়ে যাবার পর যখন তিনি জানলেন তারা চলে গেছেন। তখন তিনি যয়নবের কক্ষে গেলেন। এরপর এ বদ অভ্যাসগুলো সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়ার ব্যাপারটি স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিজেই গ্রহণ করলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াত সে সময়ই নাযিল হয়। [বুখারী: ৫১৬৩, মুসলিম: ১৪২৮] [দেখুন, তাবারী, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে বর্ণিত পর্দার হুকুমটি শুধু নবী-স্ত্রীদের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং প্রতিটি ঈমানদার নারীই পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। [আদওয়াউল-বায়ান; কুরতুবী]

জন্য কখনো বৈধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।

৫৪. যদি তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা তা গোপন রাখ (তবে জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৫. নবী-স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভাইগণ, ভাইয়ের ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, আপন নারীগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে তা[১] পালন না করা অপরাধ নয়। আর হে নবী-স্ত্রীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষদর্শী।

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۗ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ নবীর জন্য দো'আ-ইসতেগফার করেন[২]। হে

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

---

(১) অর্থাৎ তাদের সাথে পর্দা করা বাধ্যতামূলক নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দো'আ প্রশংসা। অধিকাংশ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীর প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ, আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন। তার কাজে বরকত দেন। তার নাম বুলন্দ করেন। তার প্রতি নিজের রহমতের বারি বর্ষণ করেন। ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ থেকে তার উপর সালাত প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, তারা তাকে চরমভাবে ভালোবাসেন এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করেন, আল্লাহ যেন তাকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তার শরীয়াতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং তাকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। তার উপর রহমত নাযিল করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দো'আ ও প্রশংসার সমষ্টি। এ আয়াতের তাফসীরে আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আল্লাহ্ তা'আলার সালাতের অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক ফিরিশতাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও প্রশংসা করা। [সহীহ বুখারী, কিতাবুত্তাফসীর] আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ

ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত[১] পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি ফিরিশতাদের কাছে তার কথা আলোচনা করেন। তাছাড়া তার নামকে সমুন্নত করেন। তিনি পূর্ব থেকেই তার নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের সাথে সাথে তার নামও শামিল করে দিয়েছেন, তার দ্বীন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তার শরী'য়তের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তার শরী'য়তের হেফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে আখেরাতে তার সম্মান এই যে, তার স্থান সমগ্র সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোন নবী ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে "মাকামে-মাহ্‌মুদ" বলা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাসূলের উপর সালাত প্রেরণের ক্ষেত্রে সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ (রহমত, দো'আ ও প্রশংসা) নেয়ার পরিবর্তে সালাত শব্দের এক অর্থ নেয়াই সঙ্গত অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, জালাউল আফহাম]

(১) আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হওয়া বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সালাত পাঠ করে না।' [তিরমিযী: ৩৫৪৫] অন্য এক হাদীসে আছে– 'সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।' [তিরমিযী: ৩৫৪৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যের জন্য 'সালাত' পেশ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একটি দল, কাযী ঈয়াদের নাম এ দলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একে সাধারণভাবে জায়েয মনে করে। এদের যুক্তি হচ্ছে, কুরআনে আল্লাহ নিজেই অ-নবীদের ওপর একাধিক জায়গায় সালাতের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একাধিকবার অ-নবীদের জন্য সালাত শব্দ সহকারে দো'আ করেন। যেমন একজন সাহাবীর জন্য তিনি দো'আ করেন, হে আল্লাহ!

ভাবে সালাম[১] জানাও ।

আবু আওফার পরিজনদের ওপর সালাত পাঠাও । জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রীর আবেদনের জবাবে বলেন, আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর সালাত পাঠান । যারা যাকাত নিয়ে আসতেন তাদের পক্ষে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! ওদের উপর সালাত পাঠাও' । সা'দ ইবনে উবাদার পক্ষে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! সা'দ ইব্‌ন উবাদার পরিজনদের ওপর তোমার সালাত ও রহমত পাঠাও' । আবার মুমিনের রূহ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, ফেরেশ্‌তারা তার জন্য সালাত পাঠ করে । কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের মতে এমনটি করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য তো সঠিক ছিল কিন্তু আমাদের জন্য সঠিক নয় । তারা বলেন, সালাত ও সালামকে মুসলিমরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে । এটি বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে । তাই নবীদের ছাড়া অন্যদের জন্য এগুলো ব্যবহার না করা উচিত । এ জন্যই উমর ইবনে আবদুল আযীয একবার নিজের একজন শাসনকর্তাকে লিখেছিলেন, "আমি শুনেছি কিছু বক্তা এ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করেছেন যে, তারা 'আস-সালাতু আলান নাবী'-এর মতো নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীদের জন্যও "সালাত" শব্দ ব্যবহার করেছেন । আমার এ পত্র পৌঁছে যাবার পরপরই তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং সালাতকে একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য মুসলিমদের জন্য দো'আ করেই ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দাও ।" [রূহুল মা'আনী]

(১) এ হুকুমটি নাযিল হবার পর বহু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদের বলে দিয়েছেন । (অর্থাৎ নামাযে "আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ" এবং দেখা সাক্ষাত হলে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলা ।) কিন্তু আপনার প্রতি সালাত পাঠাবার পদ্ধতিটা কি? [দেখুন,তাবারী,কুরতুবী,তাহরীর ওয়া তানওয়ীর] এর জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন সময় যেসব সালাত বা দরূদ শিখিয়েছেন তা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে । যেমন,

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [বুখারী: ৩৩৬৯, ৬৩৬০,৯৭৯]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [বুখারী: ৩৩৭০]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ [বুখারী: ৪৭৯৮]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১১৯]

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

৫৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি(১)।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় যা তারা করেনি তার জন্য; নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করলো(২)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়ার ফযীলত সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে [ফাতহুল কাদীর]। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে ফেরেশ্‌তারা তার প্রতি দরূদ পাঠ করে যতক্ষণ সে দরূদ পাঠ করতে থাকে।" [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪৪৫, ইবনে মাজাহ: ৯০৭] আরো বলেছেন, "যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার ওপর দশবার দরূদ পড়েন।" [মুসলিম: ৩৮৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশী হকদার হবে সেই ব্যক্তি যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে।" [তিরমিযী:৪৮৪] আরো বলেছেন, আমার কথা যে ব্যক্তির সামনে আলোচনা করা হয় এবং সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না সে কৃপণ। [তিরমিযী: ৩৫৪৬]

(১) যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তার সত্তা অথবা গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর; মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াত দ্বারা কোন মুসলিমকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; মুয়াস্‌সার] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কেবল সে-ই মুসলিম, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কষ্ট না পায় আর কেবল সে-ই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে। [তিরমিযী: ২৬২৭] তাছাড়া এ আয়াতটি অপবাদেরও সংজ্ঞা নিরূপণ করে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে দোষ নেই অথবা যে অপরাধ মানুষ করেনি তা তার ওপর আরোপ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, গীবত কি? জবাবে বলেন, "তোমার নিজের ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা যা সে অপছন্দ করে।" জিজ্ঞেস করা হয়, যদি

অষ্টম রুকূ'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ

৫৯. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়[১]।

আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষ সত্যিই থেকে থাকে? জবাব দেন, "তুমি যে দোষের কথা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার ওপর অপবাদ দিলে ।" [মুসলিমঃ ২৫৮৯]

(১) উল্লেখিত আয়াতের جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচন । 'জিলবাব' অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর ।[দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন : এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয় । [ইবনে কাসীর] ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরীন বলেনঃ আমি আবীদা আস-সালমানীকে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে ادناء ও جلباب এর তাফসীর কার্যত: দেখিয়ে দিলেন । আর নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপরদিক থেকে লটকানো । সুতরাং চেহারা, মাথা ও বুক ঢেকে রাখা যায় এমন চাদর পরিধান করা উচিত । এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে । ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে । (এই আবীদা আস-সালমানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুসলিম হন কিন্তু তাঁর খিদমতে হাযির হতে পারেননি । উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আমলে তিনি মদীনা আসেন এবং সেখানেই থেকে যান । তাকে ফিক্‌হ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাযী শুরাইহ্-এর সমকক্ষ মনে করা হতো ।) ইবন আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা করেন । তার যেসব উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুওইয়া উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তার যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ্ মহিলাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ খোলা রাখে ।" কাতাদাহ ও সুদ্দীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন ।

সাহাবা ও তাবে'ঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাসসির অতিক্রান্ত হয়েছেন তারা সবাই একযোগে এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন । ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন, 'ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাঁদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয় । তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন খোলা না থাকে । বরং তাদের নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে

غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না(১) । আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

৬০. মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে

দেয়া উচিত । ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস করবে না ।' [জামে'উল বায়ান, ২২/৩৩]

আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস বলেন, "এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে । এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের 'পবিত্রতাসম্পন্না' হবার কথা প্রকাশ করা উচিত । এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না ।" [আহকামুল কুরআন, ৩/৪৫৮]

যামাখ্‌শারী বলেন, 'তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের একটি অংশ লটকে নেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয় ।' [আল-কাশ্‌শাফ, ২/২২১]

আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, 'নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয় । এভাবে মেয়েদেরকে মাথা ও চেহারা ঢাকার হুকুম দেয়া হয়েছে ।' [গারায়েবুল কুরআন, ২২/৩২]

ইমাম রাযী বলেন, 'এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয় । কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের 'সতর' অন্যের সামনে খুলতে রাজী হবে । এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না ।" [তাফসীরে কবীর, ২/৫৯১]

(১) "চেনা সহজতর হবে" এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে । "না কষ্ট দেয়া হয়" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয় । [দেখুন,তাবারী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

প্রবল করব; এরপর এ নগরীতে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে---

৬১. অভিশপ্ত হয়ে; তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে[১]।

مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

৬২. আগে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। আর আপনি কখনো আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

৬৩. লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকটই আছে।' আর কিসে আপনাকে জানাবে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে?

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে করেছেন অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন;

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾

৬৫. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক পাবে না, কোন সাহায্যকারীও নয়।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

৬৬. যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!'

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, "ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করত: হত্যা করা হবে।" [ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর;বাগভী]

৬৭. তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল;

وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾

৬৮. 'হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।'

رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

নবম রুকূ'

৬৯. হে ঈমানদারগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না; অতঃপর তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ্‌ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন(১); আর তিনি ছিলেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْا۟ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا۟ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

(১) এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলিমদেরকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, এই বিরোধিতা তাদের কষ্টের কারণ। তাদেরকে মূসা আলাইহিস্‌ সালামের কওমের মত হতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা সবসময় মূসা আলাইহিস্‌ সালামকে সার্বিকভাবে কষ্ট দিত। [দেখুন,ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, মূসা আলাইহিস্‌ সালাম অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা আলাইহিস্‌ সালাম কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল– এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খুঁত আছে– হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে মূসা আলাইহিস্‌ সালাম-এর নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন মূসা আলাইহিস্‌ সালাম নির্জনে গোসল করার জন্যে কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহ্‌র আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা আলাইহিস্‌ সালাম তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে "আমার কাপড় আমার কাপড়" বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না– যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী- ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল। তখন সেসব লোক মূসা আলাইহিস্‌ সালাম-কে উলঙ্গ

আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান[১]।

৭০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল[২];

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

৭১. তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন[৩]। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

৭২. আমরা তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত[৪] পেশ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অবস্থায় দেখে নিল এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন খুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র কসম, মূসা আলাইহিস্ সালাম এর আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল। [বুখারী:৩৪০৪]

(১) অর্থাৎ মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। [কুরতুবী]

(২) এর তাফসীর সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা করা হয়েছে। ইবন কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ, তোমরা যদি মুখকে ভুলভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলার অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। [তাবারী]

(৪) এখানে আমানত শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরী'য়তের ফরয কর্মসমূহ, লজ্জাস্থানের হেফাযত, ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, সালাত, যাকাত, সওম, হজ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, দ্বীনের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। শরী'য়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরী'য়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন: আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

করেছিলাম, কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল, আর মানুষ তা বহন করল; সে অত্যন্ত যালিম, খুবই অজ্ঞ[১]।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

৭৩. যাতে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। মোটকথা, এখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে "আমানত" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বহ সে ধারণা দেবার জন্য আল্লাহ বলেন, আকাশ ও পৃথিবী তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার বিশাল ও বিপুলায়তন দেহাবয়ব ও গম্ভীরতা সত্ত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না কিন্তু দুর্বল দেহাবয়বের অধিকারী মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, বাগভী]

(১) ظلوم অর্থ নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং جهول এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। [বাগভী]

سُوْرَةُ سَبَإٍ

৩৪- সূরা সাবা
৫৪ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ①

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক এবং আখিরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি হিকমতওয়ালা, সম্যক অবহিত(১)।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ②

২. তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে(২) এবং যা তা থেকে নির্গত হয়, আর যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়(৩)। আর তিনি পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ

৩. আর কাফিররা বলে, 'আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না।' বলুন, অবশ্যই হ্যাঁ, শপথ আমার রবের, নিশ্চয় তোমাদের কাছে তা আসবে।' তিনি

---

(১) অর্থাৎ তিনি তাঁর যাবতীয় নির্দেশে প্রাজ্ঞ, তিনি তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ আসমান থেকে যে পানি নাযিল হয় সে পানির কতটুকু যমীনে প্রবেশ করে তা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। [আদওয়াউল বায়ান] যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন তারপর তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়।" [সূরা আয-যুমারঃ ২১]

(৩) যমীন থেকে যা নির্গত হয় যেমন, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ, পানি। আর আসমান থেকে যা নাযিল হয় যেমন, বৃষ্টির পানি, ফেরেশতা, কিতাবাদি। আকাশে যা উত্থিত হয় যেমন, ফেরেশতাগণ, মানুষের আমল। তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াশীল বলেই তাদের অপরাধের কারণে তাদের উপর দ্রুত শাস্তি নাযিল করেন না। যারা তাঁর কাছে তাওবা করবে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। [মুয়াসসার]

ذٰلِكَ وَلَآ اَكۡبَرُ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡنٍ ۙ

গায়েব সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত; আসমানসমূহ ও যমীনে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার চেয়ে ছোট বা বড় কিছু; এর প্রত্যেকটিই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে[১]।

لِّيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓـئِكَ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّرِزۡقٌ كَرِيۡمٌ

৪. যাতে তিনি প্রতিদান দেন তাদের, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক[২]।

وَالَّذِيۡنَ سَعَوۡ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيۡنَ اُولٰٓـئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِيۡمٌ

৫. আর যারা আমাদের আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তাদেরই জন্য রয়েছে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَيَرَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ الَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ هُوَ الۡحَـقَّ ۙ وَيَهۡدِىۡۤ اِلٰى صِرَاطِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ

৬. আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা জানে যে, আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা-ই সত্য; এবং এটা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে।

وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا هَلۡ نَدُلُّكُمۡ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمۡ اِذَا مُزِّقۡتُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمۡ لَفِىۡ خَلۡقٍ جَدِيۡدٍ ۚ

৭. আর কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে জানায় যে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও অবশ্যই তোমরা হবে নতুনভাবে সৃষ্ট[৩]!'

---

(১) অর্থাৎ কোন কিছুই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সবকিছুই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। সে কিতাব হচ্ছে, লাওহে মাহফূয। [মুয়াসসার]

(২) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, তাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে সম্মানজনক রিযিক। [তাবারী]

(৩) এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা তাদের আখেরাত অস্বীকৃতির চরম সীমানায় গিয়ে এসব কথা বলত। [মুয়াসসার]

৮. সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, নাকি তার মধ্যে আছে উন্মাদনা[১]? বরং যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ فِى ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلْبَعِيدِ ۝٨

৯. তারা কি তাদের সামনে ও তাদের পিছনে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না[২]? আমরা ইচ্ছে করলে ধ্বসিয়ে দেব তাদেরসহ যমীন অথবা পতন ঘটাব তাদের উপর আসমান থেকে এক খণ্ড; নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন, আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য।

أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٩

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. আর অবশ্যই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দাউদকে দিয়েছিলাম মর্যাদা এবং আদেশ করেছিলাম, 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে বার বার আমার পবিত্রতা ঘোষণা

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۝١٠

(১) অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন মারাত্মক অপবাদ আরোপ করছে যে, এ লোক যেহেতু মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথা বলছে, তা হলে সে দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয় সে ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বানিয়ে বলছে, নতুবা তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে। কি বলছে তা জানে না। আল্লাহ্ তার জওয়াবে বলেন, তোমরা যা মনে করেছ ব্যাপারটি তা নয়। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। আর যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে না। আর সেটার জন্য আমল করবে না, তারা তো স্থায়ী কঠিন শাস্তিতে থাকবে। দুনিয়াতেও তারা সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে থাকবে। [মুয়াসসার]

(২) কাতাদাহ বলেন, তারা কি তাদের ডানে ও তাদের বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে না যে, কিভাবে আসমান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে? যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে যমীন তাদেরকে নিয়ে ধ্বসে যেতে পারে যেমন তাদের পূর্বে কিছু লোকের ব্যাপারে তা ঘটেছিল। অথবা আমরা আকাশ থেকে একটি টুকরো তাদের উপর নিক্ষেপ করতে পারি। [তাবারী]

কর' এবং পাখিদেরকেও। আর তার জন্য আমরা নরম করে দিয়েছিলাম লোহা---

১১. (এ নির্দেশ দিয়ে যে) আপনি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করুন[১] এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করুন'। আর তোমরা সৎকাজ কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।

أَنِ اعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَٰلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

১২. আর সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা ভোরে একমাসের পথ অতিক্রম করত ও সন্ধ্যায় একমাসের পথ অতিক্রম করত[২]। আমরা তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম এবং তার রবের অনুমতিক্রমে জিনদের কিছু সংখ্যক তার সামনে কাজ করত। আর তাদের মধ্যে যে আমাদের নির্দেশ অমান্য করে, তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব[৩]।

وَلِسُلَيْمَٰنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, সর্বপ্রথম বর্ম দাউদ আলাইহিস সালামই তৈরী করেন। তার আগে কেউ সেটা তৈরী করে নি। [তাবারী] কাতাদাহ আরও বলেন, তিনি এটা বানাতে আগুনের ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তাছাড়া লাঠি দিয়েও আঘাত করতে হতো না। [তাবারী]

(২) এর অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন তিনি দু'মাসের পথ বাতাসের উপর করে ভ্রমণ করতেন। [তাবারী]

(৩) অর্থাৎ কোন জিন যদি সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এখানে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাদের উপর একজন ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

১৩. তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ[১], ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত। 'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!'

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

১৪. অতঃপর যখন আমরা সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর জানাল শুধু মাটির পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি পড়ে গেলেন তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েব জানত, তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না[২]।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

১৫. অবশ্যই সাবাবাসীদের[৩] জন্য তাদের

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ

(১) মুজাহিদ বলেন, এগুলো ছিল প্রাসাদের চেয়ে ছোট আকৃতির ঘর-দোর বিশেষ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিল্ডিং ও মাসজিদ। [তাবারী]

(২) কারণ, সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার ঘরে ইবাদাতে মশগুল ছিলেন। তারপর জিনরা তার জন্য বিল্ডিং বানাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যু দিলেন। কিন্তু জিনরা তা জানতেই পারল না। শেষ পর্যন্ত তার লাঠিতে যমীনের পোকা লেগে সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তিনি পড়ে গেলেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় সেটা ছিল পূর্ণ এক বছর পর। তখন জিনরা তাদের ভুল বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েবের কিছু জানত তবে এতদিন কষ্ট করত না। [সা'দী]

(৩) হাদীসে এসেছে, 'সাবা ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার বংশ থেকে নিম্নোক্ত গোত্রগুলোর উদ্ভব হয়ঃ কিন্দাহ, হিম্‌য়ার, আয্‌দ, আশ'আরিয়্যীন, মায্‌হিজ, আনমার (এর দু'টি শাখাঃ খাস'আম ও বাজীলাহ), আমেলাহ, জুযাম, লাখ্‌ম ও গাস্‌সান।' [তিরমিযী:৩২২২] ইবনে কাসীরের মতে, ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [ইবন কাসীর]

وَّشِمَالٍ ۬ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শনঃ দুটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অন্যটি বাম দিকে(১)। বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের রবের দেয়া রিযিক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর(২)। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল রব।'

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ

১৬. অতঃপর তারা অবাধ্য হল। ফলে আমরা তাদের উপর প্রবাহিত করলাম 'আরেম'(৩) বাঁধের বন্যা এবং তাদের

---

(১) শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফল-মুলের বাগান তৈরী করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। সমগ্র সাবা রাজ্য শ্যামল সবুজ ক্ষেত ও বনানীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে দেখা যেতো ডানেও বাগান এবং বাঁয়েও বাগান। এ সব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও পবিত্র কুরআন দু'টি বাগানের কথা ব্যক্ত করেছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ফল-মুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কাতাদাহ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমুল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।[ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লাহ তা'আলা নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক। আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি,ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নামগন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। [দেখুন-কুরতুবী]

(৩) ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এইঃ ইয়ামনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের

مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۖ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৭. ঐ শাস্তি আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের কুফরির কারণে। আর অকৃতজ্ঞ ছাড়া আমরা আর কাউকেও এমন শাস্তি দেই না।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۖ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর তাদের ও যেসব জনপদের মধ্যে আমরা বরকত দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে আমরা দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমনের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম। বলেছিলাম, ‘তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিনে ও রাতে।’

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾

১৯. অতঃপর তারা বলল, ‘হে আমাদের রব! আমাদের সফরের মন্‌যিলের ব্যবধান বাড়িয়ে দিন।’ আর তারা নিজদের প্রতি যুলুম করেছিল।

জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের উপরে-নীচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃংখলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নীচের তৃতীয় দরজা খুলে দেয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নীচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

ফলে আমরা তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

২০. আর অবশ্যই তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল;

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢٠

২১. আর তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। তবে কে আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং কে তাতে সন্দিহান, তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আর আপনার রব সবকিছুর সম্যক হিফাযতকারী।

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝٢١

তৃতীয় রুকূ'

২২. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দু'টিতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয়[১]।'

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۝٢٢

(১) এ আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদাতের মুলোৎপাটন করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তারা কেউই কোন কিছুর মালিক নয়। যদি মালিক না হয় তবে কিভাবে কোন কিছু দাবী করতে পারে? আর তাছাড়া ইবাদাতের অন্য কারণ এটাও হতে পারত যে, তারা মালিক না হলেও অংশীদার। কিন্তু আসমান ও যমীনে কোন কিছুতেই তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই।

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৩. আর আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের রব কী বললেন?' তার উত্তরে তারা বলে, 'যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন।[১]' আর

সুতরাং তাদের ইবাদাত কেন করা হবে? তাছাড়া ইবাদাতের আরও একটি কারণ হতে পারত যে, তারা মালিক বা অংশীদার না হলেও আল্লাহ্ তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তিনি তাদের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র তো কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাদের ইবাদাত কেন করা হবে? আর যদি বলা হয় যে, তারা কোন কিছুর মালিক নয়, তারা অংশীদার নয়, তারা সাহায্যকারীও নয়, কিন্তু তারা নেক বান্দা, তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এ শেষোক্ত সন্দেহটির উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, তাদের কারও কারও যদি সুপারিশ থেকেও থাকে, তবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই হবে। তিনি তাদেরকে সেটার অনুমতি না দিলে তারা সেটার জন্য অগ্রণী হয়ে কিছু করবে না। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে শির্কের মুলোৎপাটন করা হয়েছে। [ইবন তাইমিয়্যা, আল-জাওয়াবুস সহীহ, ৩/১৫৪; আর-রাদ্দু আলাল মানতিকিয়্যীন, ৫২৯; দারয়ু তাআরিযিল আকলি ওয়ান নাকল ৫/১৪৯] বরং যাদের সুপারিশ কামনা করা হয়, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ফেরেশতাগণ। আল্লাহ্‌র সামনে তাদের অবস্থা কি তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(১) আয়াতের একটি তাফসীর বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এসেছে, তা হলো আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ নাযিল হওয়ার সময় ফেরেশ্‌তাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। হাদীসে এসেছে যে, 'যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশ্‌তা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে। (এবং সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে যায়) অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারী করেছেন। [বুখারী: ৪৮০০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশ্‌তাগণও তসবীহ পাঠ করে। অতঃপর তাদের তসবীহ শুনে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশ্‌তাগণ তসবীহ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ

তিনি সমুচ্চ, মহান।

২৪. বলুন, 'আসমানসমূহ ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করেন?' বলুন, 'আল্লাহ্। আর নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত[১]।'

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫. বলুন, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।'

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. বলুন, 'আমাদের রব আমাদের সকলকে একত্র করবেন, তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৭. বলুন, 'তোমরা আমাকে তাদের দেখাও, যাদেরকে তোমরা শরীকরূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনো না, বরং তিনিই আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।'

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৮. আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ

তথা সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশ্‌তাগণও তসবীহ্ পাঠে আত্মনিয়োগ করে ফেলে। অতঃপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণের নিকটবর্তী ফেরেশ্‌তাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশ্‌তারা উপরের ফেরেশ্‌তাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌঁছে যায়। [মুসলিম: ২২২৯]

(১) অর্থ্যাৎ দু'দলের মধ্যে কেউ হক পথে থাকবে, আর কেউ থাকবে ভ্রান্ত পথে। [সা'দী]

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি[1]; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?'

قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. বলুন, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিনের প্রতিশ্রুতি, তা থেকে তোমরা মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারবে না, আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।'

---

(১) আলোচ্য আয়াতে রেসালাতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সমগ্র জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। [তাবারী,ইবন কাসীর]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল তার নিজের দেশ বা যুগের জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, একথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছেঃ "আর আমার প্রতি এ কুরআন অহীর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছে যায় তাকেই সতর্ক করে দেই।" [সূরা আল-আন'আম: ১৯৭] "হে নবী ! বলে দিন, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্র রাসূল।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৮] "আর হে নবী ! আমি পাঠিয়েছি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্যই রহমত হিসেবে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭] "বড়ই বরকতসম্পন্ন তিনি যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যাতে তিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হন।" [সূরা আল-ফুরকান: ১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন। যেমন, "আমাকে সাদা কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩০৪, ৪/৪১৬] "আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমার আগে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁকে নির্দিষ্ট জাতির কাছে পাঠানো হতো।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/২২২] "প্রথমে প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তার জাতির কাছে পাঠানো হতো আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। [বুখারী:৩৩৫, মুসলিম: ৫২১] "আমার আগমন ও কিয়ামতের অবস্থান এরূপ, একথা বলতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দু'টি আঙুল উঠান।" [বুখারী:৪৯৩৬, মুসলিম:৮৬৭]

চতুর্থ রুকূ'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩১. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমরা এ কুরআনের ওপর কখনো ঈমান আনব না এবং এর আগে যা আছে তাতেও না।' আর হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে, যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. যারা অহঙ্কারী ছিল তারা, যাদেরকে দূর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী।'

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা, যারা অহঙ্কার করেছিল তাদেরকে বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিনরাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য সমকক্ষ (শির্ক) স্থাপন করি[১]।'

---

(১) অন্যকথায় এ জনতার জবাব হবে, তোমরা এ দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমান অংশীদার করছ কেমন করে? তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা চালবাজী, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার কেমন মোহময় যাদু সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং রাতদিন আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকাবার জন্য কেমন সব পদক্ষেপ নিয়েছিলে?

আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং যারা কুফরী করেছে আমরা তাদের গলায় শৃঙ্খল পরাব। তারা যা করত তাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

৩৪. আর আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার সাথে কুফরী করি[১]।'

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ٣٤

৩৫. তারা আরও বলেছে, 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; আর আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না[২]।'

وَقَالُوا۟ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٣٥

তোমরা আমাদের সামনে দুনিয়া পেশ করেছিলে এবং আমরা তার জন্য জান দিয়ে দিলাম, ব্যাপারতো মাত্র এতটুকুই ছিল না বরং তোমরা রাতদিনের প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে আমাদেরকে বেকুব বানাচ্ছিলে এবং তোমাদের প্রত্যেক শিকারী প্রতিদিন একটি নতুন জাল তৈরী করে নানা ছলচাতুরী ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল, এটাও ছিল বাস্তব ঘটনা। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেতাদের এই বিবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন, সূরা আল-আ'রাফ, ৩৮-৩৯ সূরা ইবরাহীম, ২১; আল কাসাস, ৬৩; আল মুমিন, ৪৭-৪৮ এবং হা মীম আস্ সাজদাহ, ২৯ আয়াত।

(১) একথা কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের দাওয়াতকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে রুখে দাঁড়াতো সমাজের সচ্ছল শ্রেণী, যারা অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন, [আল আন'আম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০,৬৬,৭৫,৮০,৯০; সূরা হুদ, ২৭; বনী ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিনূন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮,৪৬,৪৭ এবং আয্ যুখরুফ, ২৩ আয়াত]।

(২) এখানে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ 'আমরা ধনে-জনে সবদিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে পতিত হব না।' (বাহ্যতঃ তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদের এই

৩৬. বলুন, 'আমার রব যার প্রতি ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে না।'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

পঞ্চম রুকূ'

৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ প্রতিদান; আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।

وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾

বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?) ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটি পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছেঃ 'তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্যে পরিণাম ও আখেরাতের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক? (কখনই নয়) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বে-খবর।' [সূরা আল-মুমিনূন: ৫৫-৫৬] (অর্থাৎ তারা বেখবর যে, যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, তা তাদের জন্যে শাস্তিস্বরূপ) এ ছাড়াও পবিত্র কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে দুনিয়া পূজারীদের এ বিভ্রান্তির উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। [দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুনঃ আল বাকারাহ, ১২৬,২১২; আত তাওবাহ, ৫৫, ৬৯; হূদ, ৩, ২৭; আর রা'দ, ২৬; আল কাহ্ফ, ৩৪-৪৩; , মার্‌ইয়াম, ৭৩-৭৭; ত্বা-হা, ১৩১; আল মুমিনূন, ৫৫-৬১; আশ্ শু'আরা, ১১১; আল কাসাস, ৭৬-৮৩; আর্ রূম, ৯; আল মুদ্দাসসির, ১১-২৬; এবং আল ফাজর, ১৫-২০;] আয়াত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। [মুসলিম : ২৫৬৪]

৩৮. আর যারা আমাদের আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তারা হবে শাস্তিতে উপস্থিতকৃত।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য সীমিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন[১] এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. আর স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত করত[২]?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. ফেরেশ্‌তারা বলবে, 'আপনি পবিত্র, মহান! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা তো ইবাদাত করত জিনদের। তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি ঈমান রাখত।

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

---

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিদিন ভোরে দু'জন ফেরেশতা নাযিল হয়। তাদের একজন এ দো'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ্, আপনি ব্যয়কারীকে প্রতিফল দিন। আরেকজন দো'আ করে যে, হে আল্লাহ্, যে ব্যয় করে না তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন' [বুখারী:১৪৪২, মুসলিম:১০১০]

(২) কিয়ামতে এ প্রশ্ন কেবল ফেরেশ্‌তাদেরকেই করা হবে না বরং দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত ও পূজা করা হয় তাদেরকেও করা হবে। তাই অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "যেদিন আল্লাহ এদেরকে এবং যেসব সত্তার এরা ইবাদাত করতো তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না এরা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল ?" [সূরা আল-ফুরকান:১৭]

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. 'ফলে আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার বা অপকার করার মালিক হবে না।' আর যারা যুলুম করেছিল আমরা তাদেরকে বলব, 'তোমরা যে আগুনের শাস্তিতে মিথ্যারোপ করেছিলে তা আস্বাদন কর।'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ যার 'ইবাদাত করত এ ব্যক্তিই তো তার 'ইবাদাতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়।' তারা আরও বলে, 'এটা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়'। আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট জাদু।'

وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর আমরা তাদেরকে আগে কোন কিতাব দেইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং আপনার আগে এদের কাছে কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি[১]।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। অথচ তাদেরকে আমরা যা দিয়েছিলাম, এরা (মক্কাবাসীরা) তার এক-দশমাংশও পায়নি, তারপরও তারা আমার রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে কেমন হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)!

---

(১) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আরব জাতির কাছে কুরআনের আগে কোন কিতাব পাঠান নি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে (দূর অতীতে) কোন নবীও পাঠান নি। [তাবারী]

ষষ্ঠ রুকূ'

৪৬. বলুন, 'আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ---তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র[১]।'

قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. বলুন, 'যদি আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই তবে তা তোমাদেরই জন্য[২]; আমার পুরস্কার তো আছে কেবল আল্লাহ্‌র কাছে এবং তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষকারী।'

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

৪৮. বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব সত্য দিয়ে আঘাত করেন[৩]; যাবতীয় গায়েবের

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

---

(১) আয়াতে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার এক সুন্দর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বিনা চিন্তা-ভাবনা করে আমার অনুসরণ করতে বলছি না। অনুরূপভাবে তোমাদের কথাও ছেড়ে দিতে তোমাদের বলছি না। আমি তো শুধু এটাই বলব যে, তোমরা নিজেরা সব রকমের প্রবৃত্তি তাড়িত কথা পরিত্যাগ করে এ নবী সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, তিনি কিসের আহ্বান জানাচ্ছেন, এতে তার লাভ কি? তিনি কি আসলেই পাগলামীর মত কিছু বলছেন। যদি তোমরা এককভাবে চিন্তা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পার, তবে দুইজন পরস্পর আলোচনা করে সিদ্ধান্তে যাও। যদি তোমরা এটা কর, তবে নিশ্চিত যে, তোমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে। [সা'দী]

(২) কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, বলুন, 'আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, তবে যে ইচ্ছে করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।' [সূরা আল-ফুরকান: ৫৭] আরও এসেছে, বলুন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' [সূরা আশ-শূরাঃ ২৩]

(৩) অর্থাৎ আমার আলেমুল-গায়ব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারেন। ফলে

সম্যক জ্ঞানী ।'

৪৯. বলুন, 'সত্য এসেছে, আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে[১] ।'

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

৫০. বলুন, 'আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই, আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্যে যে, আমার রব আমার প্রতি ওহী পাঠান । নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী ।'

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর আপনি যদি দেখতেন যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তখন তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা খুব কাছের স্থান থেকে ধরা পড়বে,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا۟ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

৫২. আর তারা বলবে, 'আমরা তাতে ঈমান আনলাম ।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান থেকে তারা (ঈমানের) নাগাল পাবে কিরূপে[২] ?

وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

মিথ্যা চুরমার হয়ে যায় । উদ্দেশ্য, মিথ্যার মোকাবেলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা । মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয় । এটা একটা উপমা । কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায় । তাই এরপর বলা হয়েছে, সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সুচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না ।

(১) এখানে বাতিল বলে ইবলীস বুঝানো হয়েছে । [বাগভী]

(২) تناوش অর্থ হাত বাড়িয়ে কোন কিছু তুলে নেয়া । বলাবাহুল্য, যে বস্তু বেশী দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে তোলা যায় । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কেয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কুরআনের প্রতি অথবা রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম । কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে । ঈমান আনার জায়গা ছিল দুনিয়া । সেখান থেকে এখন তারা বহুদূরে চলে এসেছে । আখেরাতের জগতে

৫৩. আর অবশ্যই তারা পূর্বে তা অস্বীকার করেছিল; এবং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে গায়েবের বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারত[১]।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে[২], যেমন আগে করা হয়েছিল এদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে[৩]। নিশ্চয় তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

পৌঁছে যাবার পর এখন আর তাওবা করা ও ঈমান আনার সুযোগ কোথাও পাওয়া যেতে পারে? কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। আখেরাত কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

(১) না জেনে বিভিন্ন কথা বলত। মুজাহিদ বলেন, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, জাদুকর, গণক বরং কবি। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদা বলেন, তারা আখেরাত সম্পর্কে না জেনে অনুমানের উপর কথা বলত, তারা বলত, কোন পুনরুত্থান নেই, কোন জান্নাত বা জাহান্নাম নেই। [তাবারী]

(২) হাসান বসরী বলেন, এর অর্থ, তাদের ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের মাঝে ব্যবধান রেখে দেয়া হয়েছে। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, তাদের ও তারা যে সমস্ত সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সামগ্রী কামনা করে সেগুলোর মধ্যে অন্তরায় তৈরী করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, পূর্বেও যারা ঈমান আনেনি, তারা যখন আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হতে দেখেছিল তখন ঈমান আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাদের ঈমান তখন আর গ্রহণ করা হয়নি। [তাবারী]

৩৫- সূরা ফাতির
৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ', মক্কী

سُورَةُ فَاطِرٍ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ①

১. সকল প্রশংসা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই[১]--- যিনি রাসূল করেন ফিরিশ্‌তাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট[২]। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছে বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী

---

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁর নিজের প্রশংসা করছেন। কারণ তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিই প্রমাণ করছে যে, তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর যিনি এত ক্ষমতার অধিকারী তাঁর প্রশংসা করাই যথাযথ। [সা'দী] এ আয়াত ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ ধরণের প্রশংসা আল্লাহ্ নিজেই করেছেন। যেমন, সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে, সূরা আল-আন'আমের শুরুতে, সূরা আস-সাফফাতের শেষে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্বারা তারা উড়তে পারে। এ ফেরেশ্‌তাদের হাত ও ডানার অবস্থা ও ধরণ জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এ অবস্থা ও ধরন বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ যখন এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের ভাষায় পাখিদের হাত ও ডানার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন অবশ্যই আমাদের ভাষায় এ শব্দকেই আসল অবস্থা ও ধরণ বর্ণনার নিকটতর বলে ধারণা করা যেতে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুরত্ব বার বার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে। ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন ফেরেশ্‌তাকে আল্লাহ বিভিন্ন পর্যায়ের শক্তি দান করেছেন এবং যাকে দিয়ে যেমন কাজ করতে চান তাকে ঠিক তেমনিই দ্রুতগতি ও কর্মশক্তি ও দান করেছেন। এখানেই শেষ নয়, এক হাদীসে এসেছে, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের ছয়শ' পাখা রয়েছে [বুখারী: ৩২৩২, মুসলিম: ১৭৪]। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে।

وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে পরে কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই(১)। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা(২)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ③

৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে(৩)?

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④

৪. আর যদি এরা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনার আগেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা

---

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।" [সূরা আল-মুলক: ২১]

(২) এক হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেন, হে বৎস! জেনে রাখ, যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে সে আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন এর বাইরে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, পক্ষান্তরে যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ক্ষতি করতে চায় তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তোমার উপর লিখে রেখেছেন।' [তিরমিযী:২৫১৬]

(৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব?' বলুন, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে?' তবে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা ; আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী।" [সূরা আর-রা'দ: ১৬] [আদওয়াউল বায়ান]

হয়েছিল[১]। আর আল্লাহ্‌র দিকেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫. হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে প্রবঞ্চিত না করে[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্যে যে, তারা যেন প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী হয়।

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٦﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হচ্ছে, যেমনটি তোমরা শুনতে পাচ্ছ। [তাবারী]

(২) الغرور শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ, "অতি প্রবঞ্চক" বা "বড় প্রতারক" এখানে হচ্ছে শয়তান যেমন সামনের বাক্য বলছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। বলা হয়েছে, 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকা না দেয়। মূলত: শয়তানের ধোঁকা বিভিন্ন ধরনের। কখনো কখনো সে মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে মানুষদেরকে তাতে লিপ্ত করে দেয়। তখন মানুষের অবস্থা হয় যে, তারা গোনাহ্ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং তাদের শাস্তি হবে না। আবার কখনো কখনো সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। শয়তান লোকদেরকে একথা বুঝায় যে, আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই এবং কিছু লোককে এ বিভ্রান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ একবার দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম করছেন, এখন তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব-জাহানের সাথে কার্যত তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি মানুষকে পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কিছু লোককে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ করে দেবেন এবং তাঁর এমন কিছু প্রিয় বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান ফী মাসায়িদিস শায়তান]

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

৭. যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

দ্বিতীয় রুকূ'

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

৮. কাউকে যদি তার মন্দকাজ শোভন করে দেখানো হয় ফলে সে এটাকে উত্তম মনে করে, (সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকাজ করে?) তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন(১)। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ۝

৯. আর আল্লাহ্, যিনি বায়ু পাঠিয়ে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। তারপর আমরা সেটাকে নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, এরপর আমরা তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করি। এভাবেই হবে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে উঠা(২)।

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেগুলোতে তার নূরের আলো ফেললেন। সুতরাং যার কাছে এ নূরের কিছু পৌঁছেছে সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার কাছে সে নূরের আলো পৌঁছেনি সে ভ্রষ্ট হবে। আর এজন্যই বলি, আল্লাহ্র জ্ঞান অনুসারে কলম শুকিয়ে গেছে। [তিরমিযী: ২৬৪২; মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৬]

(২) মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার উদাহরণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্রও পেশ করেছেন। [আদওয়াউল বায়ান]

১০. যে কেউ সম্মান-প্রতিপত্তি চায়, তবে সকল সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক তো আল্লাহ্‌ই[১]। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত[২]। আর যারা মন্দকাজের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আর তাদের ষড়যন্ত্র, তা ব্যর্থ হবেই।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

১১. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে; তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। আর কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা রয়েছে 'কিতাবে'[৩]। এটা আল্লাহ্‌র

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

(১) অর্থাৎ সম্মান চাইলে কেবলমাত্র তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। আর তা চাইতে হবে তাঁর আনুগত্য করেই। কারণ, তিনি সম্মান প্রতিপত্তির মালিক। [বাগভী,মুয়াসসার] আসল ও চিরস্থায়ী মর্যাদা, দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত যা কখনো হীনতা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে পারে না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি তাঁর হয়ে যাও, তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবে এবং যদি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবন আব্বাস বলেন, ভাল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র যিকির। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ফরয আদায় করা, সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্‌র ফরয আদায়ে আল্লাহ্‌র যিকির করবে তারই সে আমল উপরের দিকে উঠবে। আর যে কেউ যিকির করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র ফরয আদায় করবে না তার কথা তার আমলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন সেটা তার ধ্বংসের কারণ হবে। [তাবারী] কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমল ব্যতীত কোন কথা কবুল করেন না। যে ভাল বলল এবং ভাল আমল করল সেটাই শুধু আল্লাহ্ কবুল করেন। [তাবারী]

(৩) কিতাবে বলে লাওহে মাহফুযে রয়েছে বুঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার] অধিকাংশ

জন্য সহজ[১]।

১২. আর সাগর দুটি একরূপ নয়ঃ একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটির পানি লোনা, খর। আর প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশ্‌ত খাও এবং

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى

তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার মর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ্ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ বলেন: "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" [বুখারী:২০৬৭, মুসলিম:২৫৫৭] এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। সারকথা, যেসব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ, পূর্বেই তার তাকদীরে লিখা আছে অমুক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাই তার আয়ূ বর্ধিত আকারে দেয়া হলো। সুতরাং যে কেউ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাওফীক পাবে সে যেন এটা বুঝে নেয় যে, এ কারণেই হয়তঃ তার আয়ূ বৃদ্ধি ঘটেছে।

(১) যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক তবে অনুধাবন কর--আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর 'আলাকাহ' (রক্তপিণ্ড বা লেগে থাকে এরকম পিণ্ড) হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হতে -- যাতে আমরা বিষয়টি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করি। আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না। [সূরা আল-হাজ্জ: ৫] আরও বলেন, "তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; অথচ দেখুন, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী !" [সূরা আন-নাহল: ৪]

الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑫

আহরণ কর অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা দেখ তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ⑬

১৩. তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব। আধিপত্য তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়[১]।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ⑭

১৪. তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে[২]। সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র

(১) মূলে "কিতমীর" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিতমীর বলা হয় খেজুরের আঁটির গায়ে জড়ানো পাতলা ঝিল্লি বা আবরণকে। [মুয়াসসার] উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, মুশরিকদের মাবুদ ও উপাস্যরা কোন তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসেরও মালিক নয়। [সা'দী] তারা যে সমস্ত মুর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা করে; বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমত: তারা শুনতেই পারবে না। কেননা, তাদের মধ্যে শ্রবনের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্যে সুপারিশও করতে পারে না।

(২) অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা কখনো এদেরকে বলিনি, আমরা আল্লাহর শরীক এবং তোমরা আমাদের ইবাদাত করো। বরং আমরা এও জানতাম না যে,

মত কেউই আপনাকে অবহিত করতে পারে না[১]।

তৃতীয় রুকূ'

১৫. হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; আর আল্লাহ্, তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

১৬. তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

১৭. আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

১৮. আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না[২]; এবং কোন

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

এরা আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে শরীক করছে এবং আমাদের কাছে প্রার্থনা করছে। এদের কোন প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি এবং এদের কোন নজরানা ও উৎসর্গ আমাদের হস্তগত হয়নি। বরং তারা বলবে, "আপনিই তো কেবল আমাদের অভিভাবক, তারা নয়।" [সাবা:৪১]

(১) সর্বতোভাবে অবহিত বলে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। [সা'দী; মুয়াসসার; জালালাইন] অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি তো বড় জোর বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে শির্ক খণ্ডন ও মুশরিকদের মাবুদদের শক্তিহীনতা বর্ণনা করবে। কিন্তু আমি সরাসরি প্রকৃত অবস্থা জানি। আমি নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের জানাচ্ছি, লোকেরা যাদেরকেই আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন করে রেখেছে তারা সবাই ক্ষমতাহীন। তাদের কাছে এমন কোন শক্তি নেই যার মাধ্যমে তারা কারো কোন কাজ সফল বা ব্যর্থ করে দিতে পারে। আমি সরাসরি জানি, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের এসব মা'বুদরা নিজেরাই তাদের শির্কের প্রতিবাদ করবে।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। "বোঝা" মানে কৃতকর্মের দায়-দায়িত্বের বোঝা। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার কাজের জন্য দায়ী এবং প্রত্যেকের ওপর কেবলমাত্র তার নিজের কাজের দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। এক ব্যক্তির কাজের দায়-দায়িত্বের বোঝা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন ব্যক্তি অন্যের দায়-দায়িত্বের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য তার অপরাধে নিজেকে পাকড়াও করাবে

إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ⑱

ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও তা বহন করতে ডাকে তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না--- এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও[১]। আপনি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। আর যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

এরও কোন সম্ভাবনা নেই। সূরা আল-আনকাবূতে বলা হয়েছে: "যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।" [১৩] এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে। বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পথ–ভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যাবে– একটি পথ ভ্রষ্ট হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নেই।

(১) এ বাক্যে বলা হয়েছে, আজ যারা বলছে, তোমরা আমাদের দায়িত্বের কুফরী ও গোনাহের কাজ করে যাও কিয়ামতের দিন তোমাদের গোনাহর বোঝা আমরা নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেবো তারা আসলে নিছক একটি মিথ্যা ভরসা দিচ্ছে। যখন কিয়ামত আসবে এবং লোকেরা দেখে নেবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তারা কোন ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তখন প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাবার ফিকিরে লেগে যাবে। ভাই ভাইয়ের থেকে এবং পিতা পুত্রের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেউ কারো সামান্যতম বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিতে প্রস্তুত হবে না। ইকরিমা উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অত:পর পিতা বলবে, বৎস, আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পূণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন– কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে, সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার স্ত্রীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পূণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। স্ত্রীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে। [ইবন কাসীর]

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝١٩

১৯. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝٢٠

২০. আর না অন্ধকার ও আলো,

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝٢١

২১. আর না ছায়া ও রোদ,

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝٢٢

২২. এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে শোনান; আর আপনি শোনাতে পারবেন না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে।

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ۝٢٣

২৩. আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝٢٤

২৪. নিশ্চয় আমরা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; আর এমন কোন উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী[১]।

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝٢٥

২৫. আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে এদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল---তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

---

(১) একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ায় এমন কোন জাতি ও সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যাকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি। আরো বলা হয়েছে, 'আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে হেদায়াতকারী' [সূরা আর-রা'দ:৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর আপনার আগে আমরা আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম' [সূরা আল-হিজর:১০] অন্য সূরায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।' [সূরা আন-নাহল:৩৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না; [সূরা আশ-শূ'আরা:২০৮]

২৬. তারপর যারা কুফরি করেছিল আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। সুতরাং (দেখে নিন) কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)!

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

চতুর্থ রুকূ'

২৭. আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন; তারপর আমরা তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ---শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল[১]।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

২৮. আর মানুষের মাঝে, জন্তু ও গৃহপালিত জানোয়ারের মাঝেও বিচিত্র বর্ণ রয়েছে অনুরূপ। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

---

(১) পর্বতের ক্ষেত্রে جدد বলা হয়েছে। جدد শব্দটি جدة এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কেউ কেউ جدد এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। [ফাতহুল কাদীর] উভয় অবস্থায় এর উদ্দেশ্য, পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রং উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে حمر বলা হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছে যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, ক্রোধ, পরাক্রম, সার্বভৌম কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী জানবে সে ততবেশী তাঁর নাফরমানী করতে ভয় পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে তত বেশী নির্ভীক হবে। এ আয়াতে জ্ঞান অর্থ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক ইত্যাদি স্কুল-কলেজে পঠিত বিষয়ের জ্ঞান নয়। বরং এখানে জ্ঞান বলতে আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এ জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হবার প্রশ্ন নেই। তাই আয়াতে العلماء বা 'উলামা' বলে এমন লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহ্র দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা–গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ–অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী

পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় 'আলেম' বলা হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেও এ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সে নিছক একজন মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী জানে এবং নিজের অন্তরে তাঁর ভীতি পোষণ করে সে অশিক্ষিত হলেও জ্ঞানী। তবে কারও ব্যাপারে তখনই এ আয়াতটির প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এক হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, 'যদি আমি যা জানি তা তোমরা জানতে তবে হাসতে কম কাঁদতে বেশী। [বুখারী:৬৪৮৬, মুসলিম:২৩৫৯] এর কারণ, রাসূল আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী জানেন, তার তাকওয়াও সবচেয়ে বেশী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একথাই বলেছেন, "বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহভীতিই জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।" ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'তারাই হচ্ছে আলেম যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।' তিনি আরও বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি রহমান সম্পর্কে আলেম যিনি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেন নি, তাঁর হালালকে হালাল করেছেন, হারামকে হারাম করেছেন, তাঁর অসীয়ত বা নির্দেশাবলীর পূর্ণ হিফাযত করেছেন, আর বিশ্বাস করেছেন যে, একদিন তাকে তার সাথে সাক্ষাত করতে হবে এবং তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে।' হাসান বাসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে না দেখে বা একান্তে ও জনসমক্ষে যে ভয় করে সেই হচ্ছে আলেম। আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন সেদিকেই আকৃষ্ট হয় এবং যে বিষয়ে আল্লাহ নারাজ সে ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ পোষণ করে না।" সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন যে, জ্ঞানী তিন ধরনের হয়। এক. আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক অবগত, তাঁর নির্দেশ সম্পর্কেও জ্ঞানী। দুই. আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক অবগত, কিন্তু তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ। তিন. আল্লাহ্র নির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানী, কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং যে আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক অবগত ও তার নির্দেশ সম্পর্কেও জ্ঞানী সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর ফরয ওয়াজিবের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আর যে আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানী কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু তাঁর ফরয ওয়াজিবের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা। আর যে আল্লাহ্র নির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানী অথচ তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা সে এ ব্যক্তি যে, আল্লাহকে ভয় করে না কিন্তু আল্লাহর ফরয ওয়াজিবের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহ্ ভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ্ মিসরী বলেন, অধিক বর্ণনা ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি নেই, সে আলেম নয়। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

২৯. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩০. যাতে আল্লাহ তাদের কাজের প্রতিফল পরিপূর্ণ ভাবে দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী।

وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩১. আর আমরা কিতাব হতে আপনার প্রতি যে ওহী করেছি তা সত্য, এর আগে যা রয়েছে তার প্রত্যয়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

৩২. তারপর আমরা কিতাবের অধিকারী করলাম তাদেরকে, যাদেরকে আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে আমরা মনোনীত করেছি(১); তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী(২)। এটাই তো

---

(১) অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। [ইবন কাসীর] আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলিমগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) অর্থাৎ যাদেরকে মনোনীত করে কুরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। [ইবন কাসীর] এক. যুলুমকারী মুসলিম। এরা হচ্ছে এমনসব লোক যারা আন্তরিকতা সহকারে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বলে মানে কিন্তু কার্যত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণের হক আদায় করে না। এরা মুমিন কিন্তু গোনাহগার। অপরাধী কিন্তু বিদ্রোহী

নয়। দূর্বল ঈমানদার, তবে মুনাফিক নয় এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফেরও নয়। তাই এদেরকে আত্মনিপীড়ক হওয়া সত্বেও কিতাবের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। নয়তো একথা সুস্পষ্ট, বিদ্রোহী, মুনাফিক এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফেরদের প্রতি এ গুণাবলী আরোপিত হতে পারে না। তিন শ্রেণীর মধ্য থেকে এ শ্রেনীর ঈমানদারদের কথা সবার আগে বলার কারণ হচ্ছে এই যে, উম্মাতের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশী।

দুইঃ মাঝামাঝি অবস্থানকারী। এরা হচ্ছে এমন লোক যারা এ উত্তরাধিকারের হক কমবেশী আদায় করে কিন্তু পুরোপুরি করে না। হুকুম পালন করে এবং অমান্যও করে। নিজেদের প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি লাগামহীন করে ছেড়ে দেয়নি বরং তাকে আল্লাহর অনুগত করার জন্য নিজেদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এদের জীবনে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজের সমাবেশ ঘটে। এরা সংখ্যায় প্রথম দলের চেয়ে কম এবং তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী হয়। তাই এদেরকে দু'নম্বরে রাখা হয়েছে।

তিনঃ ভালো কাজে যারা অগ্রবর্তী । এরা যাবতীয় ফরয,ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোন কোন মোবাহ বিষয়, ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়। এরা কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। এরাই আসলে এ উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী। কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রেও এরা অগ্রগামী। [বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ একটি তাফসীর বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী' অর্থাৎ অত্যাচারীকে হাশরের মাঠে চিন্তা ও পেরেশানীর মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। আর 'কেউ মধ্যমপন্থী' যার হিসেব হবে সহজ এবং 'কেউ আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী' তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। [মুসনাদে আহমাদ:৫/১৯৪] সে হিসেবে আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اصطفى বা 'মনোনয়ন' গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে মুহাম্মাদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যতঃ ক্রটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত তাফসীর ছাড়াও এ আয়াতের আরও একটি তাফসীর রয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের তিন শ্রেণীকে সূরা আল-ওয়াকি'আর তিন শ্রেণী অর্থাৎ মুকাররাবীন, আসহাবুল ইয়ামীন এবং আসহাবুশ শিমাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। সে অনুসারে আয়াতে 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী' বলে কাফের, মুনাফিকদের বোঝানো হয়েছে। আর 'কেউ মধ্যমপন্থী' বলে ডানপন্থী সাধারণ ঈমানদার এবং 'কেউ আল্লাহ্র ইচ্ছায়

মহাঅনুগ্রহ---[১]

৩৩. স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে[২], সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ

কল্যাণের কাজে অগ্রগামী' বলে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের বোঝানো হয়েছে। এ তাফসীরটিও সহীহ সনদে কাতাদা, হাসান ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] কিন্তু প্রথম তাফসীরটিই এখানে অগ্রগণ্য। কারণ তা সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। তাছাড়া পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

(১) "এটাই মহা অনুগ্রহ" বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটতম বাক্যের সাথে ধরে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়াই হচ্ছে বড় অনুগ্রহ এবং যারা এমনটি করে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে তারাই সবার সেরা। আর এ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে করা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া এবং এ উত্তরাধিকারের জন্য নির্বাচিত হওয়াই বড় অনুগ্রহ এবং আল্লাহর সকল বান্দাদের মধ্যে সেই বান্দাই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনে এ নির্বাচনে সফলকাম হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) মুফাসসিরগণের একটি দলের মতে এ বাক্যের সম্পর্ক নিকটবর্তী দু'টি বাক্যের সাথেই রয়েছে। অর্থাৎ সৎকাজে অগ্রগামীরাই বড় অনুগ্রহের অধিকারী এবং তারাই এ জান্নাতগুলোতে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে প্রথম দু'টি দলের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা করে এবং নিজেদের বর্তমান অবস্থা থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, ওপরের সমগ্র আলোচনার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে, এ তিনটি দলই শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কোনপ্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই বা হিসেব নিকেশের পর এবং সব রকমের জবাবদিহি থেকে সংরক্ষিত থেকে অথবা কোন শাস্তি পাওয়ার পর যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন। কুরআনের পূর্বাপর আলোচনা এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন দিচ্ছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] কারণ সামনের দিকে কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মোকাবিলায় অন্যান্য দল সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।" এ থেকে জানা যায়, যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসও এর প্রতি সমর্থন জানায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যারা সৎকাজে এগিয়ে গেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনরকম হিসেব-নিকেশ ছাড়াই। আর যারা মাঝপথে থাকবে তাদের হিসেব-নিকেশ হবে, তবে তা হবে হাল্কা। অন্যদিকে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদেরকে হাশরের দীর্ঘকালীন

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের ।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয় আমাদের রব তো পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী;

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাসে প্রবেশ করিয়েছেন যেখানে কোন ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং কোন ক্লান্তিও স্পর্শ করে না ।'

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন । তাদের উপর ফয়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না । এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি ।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

৩৭. আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করুন, আমরা যা করতাম তার পরিবর্তে সৎকাজ

সময়ে আটকে রাখা হবে, তারপর তাদেরকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে নিয়ে নেয়া হবে এবং এরাই হবে এমনসব লোক যারা বলবে, "সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের থেকে দুঃখ দূর করে দিয়েছেন ।" [তাফসীর তাবারী:২২/১৩৭] এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন উক্তি মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সাহাবী যেমন, উমর, উসমান, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আয়েশা, আবু সাঈদ খুদরী, এবং বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে উদ্ধৃত করেছেন । আর একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাহাবীগণ এহেন ব্যাপারে কোন কথা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারেন না, যতক্ষণ না তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে থাকবেন ।[বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝

করব।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো[১]? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল[২]। কাজেই তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।'

---

(১) অর্থাৎ জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? আলী ইবন হুসাইন যয়নুল আবেদীন রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। কাতাদাহ্ আঠার বছর বয়স বলেছেন। [ইবন কাসীর] এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য সম্ভবত এই যে, কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরী'আতে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। এ বয়সে মানুষ সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে ফারাক করতে চাইলে করতে পারে এবং গোমরাহী ত্যাগ করে হিদায়াতের পথে পাড়ি দিতে চাইলেও দিতে পারে। যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও নবী-রাসূলগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে। [দেখুন-ইবন কাসীর,বাগভী] একথাটিই একটি হাদীসে এসেছে এভাবে, 'যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে তার জন্য তো ওজরের সুযোগ থাকে কিন্তু ৬০ বছর এবং এর বেশী বয়সের অধিকারীদের জন্য কোন ওযর নেই।' [বুখারী: ৬৪১৯] আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আল্লাহ্ যে বয়সে গোনাহ্গার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। ইবনে আব্বাসও এক বর্ণনায় চল্লিশ, আর অন্য বর্ণনায় ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোন ওযর আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। কারণ, ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওযর আপত্তি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। [দেখুন, ইবনে মাজাহ:৪২৩৬]

(২) এ সতর্ককারী সম্পর্কে কয়েকটি মত আছে। কারও কারও মতে, চুল শুভ্র হওয়া। বার্ধক্যের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া। আবার কারও কারও মতে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। [ইবন কাসীর] আবার কারও নিকট, কুরআনুল কারীম। কেউ কেউ বলেছেন, জ্বর-ব্যাধি। [ফাতহুল কাদীর]

পঞ্চম রুকূ'

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় অবগত। নিশ্চয় অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক জ্ঞাত।

إِنَّ اللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٣٨

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করেছেন[১]। কাজেই কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى الْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝٣٩

৪০. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমাদের যে সব শরীকদের ডাক, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা যমীনে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আসমানের সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমরা তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমানের উপর তারা নির্ভর করে[২]?' বরং যালিমরা একে

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝٤٠

(১) خَلَائِف শব্দটি خَلِيْفَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ, স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাছাড়া, আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। [বাগভী]

(২) কাতাদাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ্ বলেন, বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমাদের যে সব শরীকদের ডাক, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা যমীনে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও' তারা এর মধ্য থেকে কিছুই সৃষ্টি করে নি। 'অথবা আসমানের সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি?' না, তারা আসমান সৃষ্টিতেও শরীক নয়। এতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব নেই। 'না কি আমরা

অন্যকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেয় না ।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَاۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখতে পারে[১] । নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ণ ।

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪২. আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসলে এরা অন্য সকল জাতির চেয়ে সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে; অতঃপর যখন এদের কাছে সতর্ককারী আসল[২], তখন তা শুধু তাদের বিমুখতা ও দূরত্বই বৃদ্ধি করল---

ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَۚ فَلَن تَجِدَ

৪৩. যমীনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে[৩] । আর কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করবে । তবে কি এরা প্রতীক্ষা করছে

তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমানের উপর তারা নির্ভর করে' । অর্থাৎ নাকি তাদেরকে আমরা কোন কিতাব দিয়েছি যা তাদেরকে শির্ক করতে নির্দেশ দেয়? [তাবারী]

(১) অন্য আয়াতে এসেছে, "আপনি কি দেখতে পান না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসবকে এবং তাঁর নির্দেশে সাগরে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আসমানকে ধরে রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় যমীনের উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া । নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ, পরম দয়ালু ।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৬৫] [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । [তাবারী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, এখানে কূট ষড়যন্ত্র বলে শির্ক বোঝানো হয়েছে । [তাবারী]

لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبۡدِيۡلًا ۚ وَلَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحۡوِيۡلًا ﴿٤٣﴾

পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত পদ্ধতির[১]? কিন্তু আপনি আল্লাহ্‌র পদ্ধতিতে কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করবেন না।

أَوَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِي الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ وَكَانُوۡۤا اَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعۡجِزَهٗ مِنۡ شَيۡءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الۡاَرۡضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيۡمًا قَدِيۡرًا ﴿٤٤﴾

৪৪. আর এরা কি যমীনে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা তারা দেখতে পেত। আর তারা ছিল এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী[২]। আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তাঁকে অক্ষম করতে পারে কোন কিছু আসমানসমূহে আর না যমীনে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।

وَلَوۡ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوۡا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهۡرِهَا مِنۡ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنۡ يُّؤَخِّرُهُمۡ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمۡ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيۡرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. আর আল্লাহ্ মানুষদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করলে, ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণীকেই তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন তো আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা[৩]।

---

(১) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের শাস্তি। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ অবহিত করছেন যে, তিনি সে সমস্ত জাতিকে এমন কিছু দিয়েছেন যা তোমাদেরকে দেন নি। [তাবারী]

(৩) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল আগাতে বা পিছাতে পারে না।" [সূরা আন-নাহল: ৬১]

سُوْرَةُ يٰسٓ

৩৬- সূরা ইয়াসীন
৮৩ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ইয়াসীন[১], — يٰسٓ ۝١

২. শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের, — وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢

৩. নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত; — اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣

৪. সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। — عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤

৫. এ কুরআন প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিলকৃত। — تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥

৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, সুতরাং তারা গাফিল। — لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦

৭. অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর সে বাণী অবধারিত হয়েছে[২]; কাজেই তারা ঈমান আনবে না। — لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

---

(১) ইয়াসীন শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে। তবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহ্ শপথ করেছেন। আর তা আল্লাহ্‌র একটি নাম। অবশ্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, এর অর্থ: হে মানুষ। [তাবারী,বাগভী]

(২) আল্লামা শানক্বীতী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতে 'বাণী অবধারিত হয়ে গেছে' বলে অন্যান্য আয়াতে যেভাবে ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ [সূরা ফুসসিলাত:২৫], বা ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ﴾ [সূরা আস-সাফফাত-৩১] বা ﴿اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ [সূরা আয-যুমার:১৯] অথবা, ﴿حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ [সূরা আয-যুমার:৭১] অথবা ﴿حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [সূরা ইউনুস:৯৬] এসবগুলোর অর্থ একই আয়াতের তাফসীর। আর তা হচ্ছে: ﴿لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ﴾ [সূরা আস-সাজদাহ:১৩] অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিন জাতি থেকে জাহান্নাম পূর্ণ করব। তাই এ আয়াতের قول এবং উপরোক্ত অন্যান্য আয়াতের كلمة শব্দসমূহ একই অর্থবোধক।

৮. নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۝٨

৯. আর আমরা তাদের সামনে প্রাচীর ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি তারপর তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না[১]।

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩

১০. আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠

১১. আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে 'যিক্‌র' এর অনুসরণ করে[২] এবং গায়েবের সাথে রহমানকে ভয় করে। অতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝١١

১২. নিশ্চয় আমরা মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠায় ও যা তারা পিছনে রেখে যায়[৩]। আর

إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ

---

(১) অর্থাৎ তারা হেদায়াত দেখতে পায় না এবং এর দ্বারা উপকৃতও হতে পারে না। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, এখানে যিক্‌র বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। আর যিক্‌রের অনুসরণ বলে কুরআনের অনুসরণ বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(৩) যা তারা পিছনে রেখে যায় তাও লিপিবদ্ধ করার ঘোষণা আয়াতে এসেছে। অর্থাৎ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায় কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। আয়াতে বর্ণিত آثار শব্দের দু'ধরনের অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. এর অর্থ, কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে। উদাহরণত: কেউ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যদ্দারা মানুষের দ্বীনী উপকারিতা লাভ করা যায় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল-তার এই সৎকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে।

مُّبِينٍ ۝١٢

আমরা প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি[১]।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝١٣

১৩. আর তাদের কাছে বর্ণনা করুন এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাদের কাছে এসেছিল রাসূলগণ।

অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকার্য যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়- কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানূন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। [দেখুন, ইবন কাসীর] যেমন, এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই পন্থার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব-অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহও তার আমলনামায় লিখিত হবে। অথচ আমলকারীর গোনাহ্ হ্রাস করা হবে না' [মুসলিম: ১০১৭]

দুই. آثار শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, 'কেউ সালাতের জন্যে মাসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়' [মুসলিম:১০৭০] কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এখানে آثار বলে এ পদাংকই বোঝানো হয়েছে। সালাতের সাওয়াব যেমন লেখা হয় তেমনি সালাতে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লেখা হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তারা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মান করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তা থেকে বিরত করলেন এবং বললেন, 'তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে পদক্ষেপ যত বেশী হবে তোমাদের সওয়াব তত বেশী হবে।' [মুসলিম: ৬৬৫]

(১) বলা হয়েছে, আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে। কেননা যা হয়েছে এবং যা হবে সব কিছুই সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তা অনুসারেই তাদের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হবে। [ইবন কাসীর,মুয়াস্সার] সূরা আল-ইসরা এর ১৭ নং আয়াতেরও একই অর্থ। অনুরূপভাবে সূরা আল-কাহফের ৪৯ নং আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।

১৪. যখন আমরা তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম দুজন রাসূল, তখন তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তারপর আমরা তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। অতঃপর তারা বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।'

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۝

১৫. তারা বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ(১), রহমান তো কিছুই

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ

(১) অন্য কথায় তাদের বক্তব্য ছিল, তোমরা যেহেতু মানুষ, কাজেই তোমরা আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হতে পারো না। মক্কার কাফেররাও এ একই ধারণা করতো। তারা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাসূল নন, কারণ তিনি মানুষ। "তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে"। [সূরা আল-ফুরকান: ৭] "আর যালেমরা পরস্পর কানাঘুষা করে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি! তারপর কি তোমরা চোখে দেখা এ যাদুর শিকার হয়ে যাবে?" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৩] কুরআন মজীদ মক্কার কাফেরদের এ জাহেলী চিন্তার প্রতিবাদ করে বলে, এটা কোন নতুন জাহেলীয়াত নয়। আজ প্রথমবার এ লোকদের থেকে এর প্রকাশ হচ্ছে না। বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে সকল মূর্খ ও অজ্ঞের দল এ বিভ্রান্তির শিকার ছিল যে, মানুষ রাসূল হতে পারে না এবং রাসূল মানুষ হতে পারে না। নূহের জাতির সরদাররা যখন নূহের রিসালাত অস্বীকার করেছিল তখন তারাও একথাই বলেছিলঃ "এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে চায় তোমাদের ওপর তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। অথচ আল্লাহ চাইলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। আমরা কখনো নিজেদের বাপ-দাদাদের মুখে একথা শুনিনি।" [সূরা আল-মুমিনূন: ২৪] আদ জাতি একথাই হুদ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছিলঃ "এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তাই খায় যা তোমরা খাও এবং পান করে তাই যা তোমরা পান করো। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" [সূরা আল-মুমিনূন: ৩৩-৩৪] সামূদ জাতি সালেহ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কেও এ একই কথা বলেছিলঃ "আমরা কি আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের আনুগত্য করবো?" [সূরা আল-ক্বামার: ২৪] আর প্রায় সকল নবীর সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হয়। কাফেররা বলেঃ তোমরা আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।" নবীগণ তাদের জবাবে বলেনঃ "অবশ্যই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই।

নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ।	الرَّحۡمٰنُ مِنۡ شَیۡءٍ ۙ اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا تَکۡذِبُوۡنَ ﴿۱۵﴾
১৬. তারা বললেন, 'আমাদের রব জানেন---নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।	قَالُوۡا رَبُّنَا یَعۡلَمُ اِنَّاۤ اِلَیۡکُمۡ لَمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾
১৭. আর 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।'	وَ مَا عَلَیۡنَاۤ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِیۡنُ ﴿۱۷﴾
১৮. তারা বলল, 'আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি[১], যদি	قَالُوۡۤا اِنَّا تَطَیَّرۡنَا بِکُمۡ ۚ لَئِنۡ لَّمۡ تَنۡتَہُوۡا

কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি চান অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" [সূরা ইবরাহীমঃ ১১] এরপর কুরআন মজীদ বলছে, এ জাহেলী চিন্তাধারা প্রতি যুগে লোকদের হিদায়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং এরই কারণে বিভিন্ন জীবনে ধ্বংস নেমে এসেছেঃ "তোমাদের কাছে কি এমন লোকদের খবর পৌঁছেনি? যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল তারপর নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে এবং সামনে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এসব কিছু হয়েছে এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসতে থেকেছে কিন্তু তারা বলছে,"এখন কি মানুষ আমাদের পথ দেখাবে?" এ কারণে তারা কুফরী করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" [সূরা আত-তাগাবুনঃ ৫-৬] "লোকদের কাছে যখন হিদায়াত এলো তখন এ অজুহাত ছাড়া আর কোন জিনিস তাদের ঈমান আনা থেকে বিরত রাখেনি যে, তারা বললো, "আল্লাহ মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?" [সূরা ইসরাঃ ৯৪] তারপর কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে বলছে, আল্লাহ চিরকাল মানুষদেরকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রাসূল হতে পারে কোন ফেরেশ্তা বা মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোন সত্তা এ দায়িত্ব পালন করতে পারে নাঃ "তোমার পূর্বে আমি মানুষদেরকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি অহি পাঠাতাম। যদি তোমরা না জানো তাহলে জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞেস করো। আর তারা আহার করবে না এবং চিরকাল জীবিত থাকবে, এমন শরীর দিয়ে তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি।" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৭-৮] "আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই আহার করতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ২০] "হে নবী! তাদেরকে বলে দিন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে থাকতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি ফেরেশতাদেরকেই রাসূল বানিয়ে নাযিল করতাম।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৯৫]

(১) মূলে تطير বলা হয়েছে, এর অর্থ অশুভ, অমঙ্গল ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য

لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑱

তোমরা বিরত না হও তোমাদেরকে অবশ্যই পাথরের আঘাতে হত্যা করব এবং অবশ্যই স্পর্শ করবে তোমাদের উপর আমাদের পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।'

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ⑲

১৯. তারা বললেন, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে[১]; এটা কি এজন্যে যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে[২]? বরং তোমরা এক সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায় ।

এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে । কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাদের অবাধ্যতা ও রাসূলদের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দূর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায় । ফলে তারা তাদেরকে অলক্ষুণে বলল । কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়াতকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে । অথবা তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, তোমরা এসে আমাদের উপাস্য দেবতাদের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো তার ফলে দেবতারা আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের ওপর যেসব বিপদ আসছে তা আসছে তোমাদেরই বদৌলতে । ঠিক এ একই কথাই আরবের কাফের ও মোনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বলতোঃ "যদি তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হতো, তাহলে বলতো, এটা হয়েছে তোমার কারণে ।" [সূরা আন-নিসাঃ ৭৮] তাই কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ ধরনের জাহেলী কথাবার্তাই প্রাচীন যুগের লোকেরাও তাদের নবীদের সম্পর্কে বলতো । সামূদ জাতি তাদের নবীকে বলতো, "আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অমংগল জনক পেয়েছি ।" [সূরা আন-নমল:৪৭] আর ফেরাউনের জাতিও এ একই মনোভাবের অধিকারী ছিলঃ "যখন তারা ভালো অবস্থায় থাকে তখন বলে, এটা আমাদের সৌভাগ্যের ফল এবং তাদের ওপর কোন বিপদ এলে তাকে মূসা ও তার সাথীদের অলক্ষুণের ফল গণ্য করতো ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৩১]

(১) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ ও অকল্যাণের পরোয়ানা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি ।" [সূরা আল-ইসরা:১৩]

(২) অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে উপদেশ দেয়াতে, আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াতেই কি তোমরা আমাদের অলক্ষুণে মনে করছ? তোমরা তো সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায় । [তাবারী]

২০. আর নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল, সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর;

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ رَجُلٌ یَّسْعٰی قَالَ یٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۲۰﴾

২১. 'অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না[১] এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا یَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

২২. 'আর আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, আমি তাঁর 'ইবাদাত করব না?

وَمَا لِیَ لَاۤ اَعْبُدُ الَّذِیْ فَطَرَنِیْ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۲﴾

২৩. 'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব[২]? রহমান আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তাদের সুপারিশ

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ یُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْـًٔا وَّلَا یُنْقِذُوْنِ ﴿۲۳﴾

(১) কাতাদাহ বলেন, সে ব্যক্তি যখন রাসূলদের কাছে এসে পৌঁছলেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের এ কাজের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চাও? তারা বলল, না। তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চান না, আর তারা তো সৎপথপ্রাপ্ত। [তাবারী]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এর অর্থ, আমি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত কর তাদের ইবাদাত করব না। আমার আল্লাহ্ যদি আমার কোন ক্ষতির ইচ্ছা করেন, তবে এ মাবুদগুলো আমার কোন কাজে আসবে না। তারা আমার থেকে সে ক্ষতিকে প্রতিহত করতে পারবে না। আর আমাকে বিপদ থেকেও উদ্ধার করতে পারবে না। এ আয়াতে এ সমস্ত উপাস্যরা যে কোন উপকার করতে পারে না বলে বর্ণিত হয়েছে, তা অন্য আয়াতেও এসেছে। যেমন, "বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারীগণ তাঁর উপরই নির্ভর করে।" [সূরা আয-যুমার: ৩৮] "বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে কর তাদেরকে ডাক, অতঃপর দেখবে যে, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।" [সূরা আল-ইসরা: ৫৬]

আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

২৪. 'এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٢٤

২৫. 'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।'

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ۝٢٥

২৬. তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর[১]।' সে বলে উঠল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত---

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝٢٦

২৭. 'কিরূপে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۝٢٧

২৮. আর আমরা তার পরে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন বাহিনী পাঠাইনি এবং পাঠাবারও ছিলাম না[২]।

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۝٢٨

২৯. সেটা ছিল শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ۝٢٩

---

(১) কুরআনের উপরোক্ত বাক্য থেকে এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, লোকটিকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কেননা, কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর। [দেখুন-কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ বলেন, এ লোকটি তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং তাদের জন্য উপদেশ ব্যক্ত করেছে, কিন্তু তারা তাকে হত্যা করেছে। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ তাদের জন্য আর কোন কথা বা কোন প্রকার তিরস্কার আসমান থেকে করা হয়নি। বরং সাথে সাথেই তাদের জন্য আযাবের পরোয়ানা নাযিল হয়ে গিয়েছিল। আর সেটা ছিল এক বিকট শব্দ, যা তাদের নিরব নিথরে পরিণত করল। [তাবারী]

৩০. পরিতাপ বান্দাদের জন্য(১); তাদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে(২)।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারা কি লক্ষ্য করে না, আমরা তাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি(৩)? নিশ্চয় তারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

৩২. আর নিশ্চয় তাদের সবাইকে একত্রে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হবে(৪)।

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, বান্দারা তাদের নফসের উপর যে অপরাধ করেছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশকে বিনষ্ট করেছে, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তারা যে ঘাটতি করেছে সে জন্য তাদের নিজেদের উপর তাদের আফসোস। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্ বান্দাদের উপর আফসোস করলেন এ জন্যে যে, তারা তাদের রাসূলদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। [তাবারী] ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, এখানে حسرة এর অর্থ ويل বা দূর্ভোগ। [তাবারী] অথবা আয়াতের অর্থ, পরিতাপ সে সমস্ত বান্দাদের জন্য যাদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে। [জালালাইন] অথবা আয়াতের অর্থ, হায় বান্দাদের জন্য আফসোস ও পরিতাপ! যখন তারা কিয়ামতের দিন আযাব দেখতে পাবে। কারণ তাদের কাছে দুনিয়াতে যখনই কোন রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন তখনই তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতের ব্যাপকতা থেকে অন্য আয়াতে কেবল ইউনুস আলাইহিস সালামের জাতিকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “অতঃপর কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তবে ইউনুস এর সম্প্রদায় ছাড়া, তারা যখন ঈমান আনল তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।” [সূরা ইউনুস: ৯৮]

(৩) অর্থাৎ আদ, সামূদ ও অন্যান্য বহু প্রজন্ম। [তাবারী]

(৪) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। [তাবারী]

তৃতীয় রুকূ’

৩৩. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, যাকে আমরা সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে বের করি শস্য, অতঃপর তা থেকেই তারা খেয়ে থাকে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর সেখানে আমরা সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং সেখানে উৎসারিত করি কিছু প্রস্রবণ,

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৫. যাতে তারা খেতে পারে তার ফলমূল হতে অথচ তাদের হাত এটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল প্রকার সৃষ্টি, যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ এবং তাদের (মানুষদের) মধ্য থেকেও (পুরুষ ও নারী)। আর তারা যা জানে না তা থেকেও[১]।

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমরা দিন অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে[২]।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে[৩], এটা পরাক্রমশালী,

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ

---

(১) অনুরূপ আয়াত দেখুন, সূরা আল-আন'আম: ৯৯; সূরা আল-হাজ্জ: ৫; সূরা ক্বাফ: ৭-১১; সূরা আল-হিজর: ১৯।

(২) কাতাদা বলেন, এর অর্থ, রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করাই, আর দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করাই।[তাবারী]

(৩) এ আয়াতের দু'টি তাফসীর হতে পারে। এক. কোন কোন তাফসীরবিদ এখানে

الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾

সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর চাঁদের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মন্‌যিল; অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়।

কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন, অর্থাৎ সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কেয়ামতের দিন। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌঁছে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এ তাফসীর প্রখ্যাত তাবে'য়ী কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে।

দুই. কতক তাফসীরবিদ আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন। [ইবন কাসীর] তাদের মতের সমর্থনে এক হাদীসে এসেছে, আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সুর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবু যর বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌঁছে সিজদা করে। অতঃপর বললেন, ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ আয়াতে مستقر বলে তাই বোঝানো হয়েছে। [বুখারী: ৪৮০২, ৪৮০৩, মুসলিম: ১৫৯]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর থেকে এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক দিন সূর্য আরশের নীচে পৌঁছে সিজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে না, বরং যেখান থেকে অস্ত গিয়েছে সেখানেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। এটা হবে কেয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তাওবাহ ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহগার, কাফের ও মুশরিকের তাওবাহ কবুল করা হবে না। [বুখারী:৩১৯৯, মুসলিম: ১৫৯]

এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা জরুরী, তা হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকগণ কিছু দিন আগেও বলতেন যে, সূর্য স্থায়ী, পৃথিবী এর চার পাশে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু বর্তমানে তারা তাদের মত পাল্টিয়ে বলতে শুরু করেছে যে, সূর্যও তার কক্ষপথে ঘুরে। এটি কুরআনের এ বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা যা এখন আবিষ্কার করে বলেছে, আল্লাহ তা'আলা তা বহু শতক পূর্বে কুরআনে বলে দিয়েছেন। যা কুরআনের সত্যতার উপর প্রমাণবহ।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

৪১. আর তাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমরা তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম[১];

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে[২]।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আমরা ইচ্ছে করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তাদের কোন উদ্ধারকারী থাকবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না---

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আমার পক্ষ থেকে রহমত না হলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'যা তোমাদের সামনে ও তোমাদের পিছনে রয়েছে সে ব্যাপারে তাকওয়া

---

(১) এখানে الفُلك দ্বারা নূহ আলাইহিস্ সালাম এর নৌকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [ইবন কাসীর,কুরতুবী]

(২) বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবাহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় স্তূপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سَفِيْنَةُ البَرِّ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

অবলম্বন কর[১]; যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়,

৪৬. আর যখনই তাদের রবের আয়াতসমূহের কোন আয়াত তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর' তখন কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, 'যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে খাওয়াতে পারতেন আমরা কি তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. তারা তো অপেক্ষায় আছে এক বিকট শব্দের, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতণ্ডাকালে[২]।

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, তাদেরকে বলা হয়, তোমরা তোমাদের পূর্বেকার উম্মতদের উপর যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটেছে, তাদের উপর যে সমস্ত আযাব এসেছে, সে সমস্ত আযাব তোমাদের উপর আসার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমাদের সামনে যা রয়েছে অর্থাৎ কিয়ামত, সে ব্যাপারেও তাকওয়া অবলম্বন কর। [তাবারী] তবে মুজাহিদ বলেন, তোমাদের পূর্বে বলে, তাদের যে সমস্ত গোনাহ ও অপরাধ ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তাবারী]

(২) কাফেররা ঠাট্টা ও পরিহাসচ্ছলে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে কেয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন বছর ও কোন তারিখে সংঘটিত হবে। বর্ণিত আয়াতে তারই জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় জানার জন্যে নয়, বরং ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে নিছক চ্যালেঞ্জের ঢংয়ে কূটতর্ক করার জন্য। এ ব্যাপারে তারা একথা বলতে চাচ্ছিল যে, কোন কিয়ামত হবে না, তোমরা খামাখা আমাদের ভয়

৫০. তখন তারা ওসিয়াত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরেও আসতে পারবে না।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَّلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝

চতুর্থ রুকূ'

৫১. আর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে(১)।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۝

দেখাচ্ছো। এ কারণে তাদের জবাবে বলা হয়নি, কিয়ামত অমুক দিন আসবে বরং তাদেরকে বলা হয়েছে, তা আসবে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে আসবে। জানার জন্য হলেও কেরামতের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেয়াই স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের দাবি ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এ জ্ঞান তাঁর নবী-রসুলকেও দান করেননি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে কেয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবি। কিন্তু তারা এমনি গাফেল যে, কেয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে যে, তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে-সুস্থে আসবে এবং লোকেরা তাকে আসতে দেখবে, এমনটি হবে না। বরং তা এমনভাবে আসবে যখন লোকেরা পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের কাজ কারবারে মশগুল থাকবে এবং তাদের মনের ক্ষুদ্রতম কোণেও এ চিন্তা জাগবে না যে, দুনিয়ার শেষ সময় এসে গেছে। এ অবস্থায় অকস্মাৎ একটি বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে এবং যে যেখানে থাকবে সেখানেই খতম হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকেরা পথে চলাফেরা করবে, বাজারে কেনাবেচা করতে থাকবে, নিজেদের মজলিসে বসে আলাপ আলোচনা করতে থাকবে, এমন সময় হঠাৎ শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। কেউ কাপড় কিনছিল। হাত থেকে রেখে দেবার সময়টুকু পাবে না, সে শেষ হয়ে যাবে। কেউ নিজের পশুগুলোকে পানি পান করাবার জন্য জলাধার ভর্তি করবে এবং তখনো পানি পান করানো শুরু করবে না তার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে। কেউ খাবার খেতে বসবে এবং এক গ্রাস খাবার মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবার সুযোগও পাবে না। [বুখারীঃ ৬৫০৬]

(১) صور শব্দের অর্থ শিঙ্গা। সঠিক মত অনুসারে কিয়ামতের শিঙ্গার ফুঁক দু'টি। এক. ধ্বংসের ফুৎকার। যার কথা এ সূরারই ৪৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা বলবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? দয়াময় আল্লাহ্ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।'

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা হবে শুধু এক বিকট শব্দ; তখনই এদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমাদের সামনে,

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. অতঃপর আজ কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এ দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে,

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু,

سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৮. পরম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে সালাম, (সাদর সম্ভাষণ বা নিরাপত্তা)।

দুই. পূনরুত্থানের জন্য ফুৎকার। এ আয়াতে এ ফুঁৎকারের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান] তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। এখানে ينسلون শব্দটি نسلان থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ দ্রুত চলা। [ইবন কাসীর] অন্য এক আয়াতে এসেছে, "যেদিন তাদের উপরস্থ জমীন বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে, এ সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।" [সূরা কাফ: ৪৪] আরও এসেছে, "সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা যেন কোন উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে" [সূরা মা'আরিজ:৪৩] অপর আয়াতে বলা হয়েছে, "হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৮]

৫৯. আর 'হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও[১]।'

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না[২], কারণ সে

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

(১) হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য আয়াতে এ অবস্থার চিত্র বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত" [সূরা আল-কামার:৭] কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, অপরাধীরা সৎকর্মশীল মুমিনদের থেকে ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও। কারণ দুনিয়ায় তোমরা তাদের সম্প্রদায়, পরিবার ও গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত থাকলে থাকতে পারো, কিন্তু এখানে এখন তোমাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে কাফের, মুমিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর যখন আত্মাসমূহকে জোড়া জোড়া করা হবে"। [সূরা আত-তাকওয়ীর:৭] আলোচ্য আয়াতেও এ পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ পৃথকীকরণের কথা কুরআনের অন্যান্য সূরায়ও বর্ণিত হয়েছে, যেমন: সূরা ইউনুস: ৩৮, সূরা আর-রূম:১৪,৪৩, সূরা আস-সাফ্‌ফাত:২২-২৩। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাও। এখন তোমাদের কোন দল ও জোট থাকতে পারে না। তোমাদের সমস্ত দল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তোমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা খতম করে দেয়া হয়েছে। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন একাকী ব্যক্তিগতভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। [দেখুন,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ সমস্ত মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কেয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণত শয়তানের এবাদত করত না, বরং দেবদেবী অথবা অন্যকোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? এর জওয়াব হচ্ছে, এখানে আল্লাহ "ইবাদাত" কে আনুগত্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই ইবাদত। শয়তানকে নিছক সিজদা করাই নিষিদ্ধ নয় বরং তার আনুগত্য করা এবং তার হুকুম মেনে চলাও নিষিদ্ধ। কাজেই আনুগত্য হচ্ছে ইবাদাত। শয়তানের ইবাদাত করার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কখনো এমন হয়, মানুষ একটি কাজ করে এবং তার অংগ-প্রত্যংগের সাথে সাথে তার কণ্ঠও তার সহযোগী হয় এবং মনও তার সাথে অংশ গ্রহণ করে। আবার কখনো এমনও হয়, অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ একটি কাজ করে কিন্তু অন্তর ও কণ্ঠ সে কাজে তার সহযোগী হয় না। এ হচ্ছে নিছক বাইরের অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে শয়তানের ইবাদাত। আবার এমন কিছু লোকও

তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

৬১. আর আমারই 'ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِیْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۶۱﴾

৬২. আর শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি?

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِیْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬৩. এটাই সে জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৪. তোমরা যে কুফরী করতে সে কারণে আজ তোমরা এতে দগ্ধ হও[১]।

اِصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৫. আমরা আজ এদের মুখ মোহর করে দেব, এদের হাত কথা বলবে আমাদের সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের[২]।

اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَیْدِیْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾

আছে যারা ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধ করে এবং মুখেও নিজেদের এ কাজে আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করে। এরা ভিতরে বাইরে উভয় পর্যায়ে শয়তানের ইবাদাতকারী। তারা চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। সে অনুসারেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা না করে অর্থের মহব্বতে এমনসব কাজ করে, যদ্দারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমনসব কাজ করে যদ্দারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। [দেখুন: বুখারী: ২৮৮৬, তিরমিযী: ২৩৭৫]

(১) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে 'এটাই সে আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।' এটা কি তবে জাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না!" [সূরা আত-তূর: ১৩-১৫]

(২) হাশরে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, "আল্লাহর শপথ আমরা মুশরিক ছিলাম না" [সূরা আল-আন'আম:২৩] তাদের কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের

যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্য দানের উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, [সূরা ফুসসিলাতঃ ২১-২২, সূরা নূরঃ ২৪]।
এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো এবং অন্যদিকে সূরা নূরের আয়াতে বলেন, এদের কণ্ঠ সাক্ষ্য দেবে এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে ? এর জবাব হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার অর্থ হলো, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া। এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদেরকে কোন কোন কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন ধরনের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিতনা সৃষ্টি করেছিল এবং কোন কোন সময় তাদের মাধ্যমে কোন কোন কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীসে এ ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা এসেছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো আমি কেন হাসছি? আমরা বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দা তার প্রভুর সাথে যে ঝগড়া করবে তা নিয়ে হাসছি। সে বলবে, হে রব, আমাকে কি আপনি যুলুম থেকে নিরাপত্তা দেননি? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, তখন সে বলবে, আমি আমার বিরুদ্ধে নিজের ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি নিজেই তোমার হিসেবের জন্য যথেষ্ঠ। আর সম্মানিত লেখকবৃন্দকে সাক্ষ্য বানাব। তারপর তার মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হবে। ফলে সেগুলো তাদের কাজের বিবরণ দিবে। তারপর তাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে তখন তারা বলবে, তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমাদের জন্যই তো আমি প্রতিরোধ করছিলাম। [মুসলিমঃ ২৯৬৯] অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদেরকে মূক করে ডাকা হবে। তারপর প্রথম তোমাদের উরু এবং দু'হাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৪৬, ৪৪৭, ৫/৪-৫] অন্য হাদীসে এসেছে ... তারপর তৃতীয় জনকে ডাকা হবে। আর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? সে বলবেঃ আমি আপনার বান্দা, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার নবী ও কিতাবাদির প্রতিও। আর আপনার জন্য সালাত, সাওম, সাদাকাহ্ ইত্যাদি ভাল কাজের প্রশংসা করে তা আদায় করার দাবী করবে। তখন তাকে বলা হবে, আমরা কি তোমার জন্য আমাদের সাক্ষীকে উপস্থাপন করব না? তখন সে চিন্তা করবে যে, এমন কে আছে যে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়? আর তখনই তার মুখের উপর মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং তার উরুকে বলা হবে, কথা বল। তখন তার

৬৬. আর আমরা ইচ্ছে করলে অবশ্যই এদের চোখগুলোকে লোপ করে দিতাম, তখন এরা পথ অন্বেষণে দৌড়ালে[১] কি করে দেখতে পেত!

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. আর আমরা ইচ্ছে করলে অবশ্যই স্ব স্ব স্থানে এদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম, ফলে এরা এগিয়েও যেতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

পঞ্চম রুকূ'

৬৮. আর আমরা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, সৃষ্টি অবয়বে তার অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না[২]?

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

উরু, গোস্ত, হাঁড় যা করেছে তার সাক্ষ্য দিবে। আর এটাই হলো মুনাফিক। এটা এজন্যই যাতে তিনি (আল্লাহ্) নিজের ওজর পেশ করতে পারেন এবং তার উপরই আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। [মুসলিম: ২৯৬৮]

(১) অর্থাৎ জান্নাতের দিকে যেতে হলে যে পথ পাড়ি দিতে হবে, যদি তাদের অন্ধ করে দেয়া হয় তবে সে পুলসিরাত তারা কিভাবে পার হতে পারবে? [সা'দী] অথবা আমরা যদি তাদেরকে সৎপথ থেকে অন্ধ করে দেই, তারা কিভাবে সৎপথ পাবে? [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, আয়াতের অর্থ, তাদের সৃষ্টিকে উল্টিয়ে দেই। আগে যেভাবে সৃষ্টি করেছি ঠিক তার বিপরীত সৃষ্টি করি। কারণ, তাদেরকে দূর্বল শরীর দিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, যেখানে বিবেক ও জ্ঞানের অভাব ছিল। তারপর তা বাড়াতে লাগলাম এবং এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় স্থানান্তর চলতে থাকল। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হতে লাগল, শেষ পর্যন্ত সে পূর্ণতা পেল। তার শক্তি-সামর্থ সর্বোচ্চ পর্যায়ে গেল। যে বুঝতে পারল ও জানতে পারল কোনটা তার পক্ষে আর কোনটা তার বিপক্ষে। যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখনই তার সৃষ্টিকে আমরা উল্টিয়ে দিলাম। তার সবকিছুতে ঘাটতি দিতে থাকলাম, অবশেষে সে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ছোট বাচ্চাদের মতই দুর্বল শরীর, স্বল্প বিবেক ও জ্ঞানহীন হয়ে গেল। বস্তুত: تنكيس এর অর্থই হচ্ছে কোন বস্তুর উপরের অংশ নিচের দিকে করে দেয়া। [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি

৬৯. আর আমরা রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়[১]। এটা তো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন;

وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

৭০. যাতে তা সতর্ক করতে পারে জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾

৭১. আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমাদের হাত যা তৈরী করেছে তা থেকে তাদের জন্য আমরা সৃষ্টি করেছি গবাদিপশুসমূহ অতঃপর তারাই এগুলোর অধিকারী[২]?

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَٰمًا فَهُمْ لَهَا مَٰلِكُونَ ﴿٧١﴾

দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।" [সূরা আর-রূম: ৫৪] আরও বলেন, "অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে , তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি" [সূরা আত-তীন: ৪-৫] এক তাফসীর অনুসারে এখানে এ বার্ধক্যই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও এসেছে, "আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি , পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও । তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৫] আরও এসেছে, "আর আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে; যাতে জ্ঞান লাভের পরেও তার সবকিছু অজানা হয়ে যায়।" [সূরা আন-নাহল: ৭০]

(১) দেখুন, সূরা আল-হাক্কাহ: ৪১।

(২) আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ তা'আলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্তে নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্ব প্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে। [দেখুন, তাবারী, সা'দী]

٧٢. وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর আমরা এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়েছে তাদের বাহন। আর কিছু সংখ্যক থেকে তারা খেয়ে থাকে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা এবং আছে পানীয় উপাদান। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. কিন্তু তারা (এ সব ইলাহ্) তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়; আর তারা তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিতকৃত হবে[১]।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতএব তাদের কথা আপনাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমরা তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

---

(১) এখানে جند এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তবে হাসান ও কাতাদাহ্ রাহেমাহুমাল্লাহ্ থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসীর এই যে, কাফেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হেফাযত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা মূর্তিদের নেই। অথবা আয়াতের অর্থ, তারাও জাহান্নামে হাযির হবে, যেমন তাদের এ মূর্তিগুলোও জাহান্নামে তাদের সাথে উপস্থিত থাকবে। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ۖ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর সে আমাদের সম্বন্ধে উপমা রচনা করে[১], অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়[২]। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?'

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. বলুন, 'তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন[৩] এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি

---

(১) সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ায়াতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়াতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন। [মুস্তাদরাক ২/৪২৯]

(২) অর্থাৎ বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহর কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাতে থুথু ফেললেন। তারপর তার তর্জনী সেখানে রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ বলেন, হে বনী আদম! কিসে আমাকে অপারগ করল? অথচ তোমাকে এ ধরণের বস্তু থেকে আমি সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমার আত্মা তোমার কণ্ঠনালীর কাছে পৌঁছায় তখন তুমি বল, আমি সাদাকাহ করব। তোমার সাদাকাহ দেয়ার সময় তখন আর কোথায়? [ইবন মাজাহ: ২৭০৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০২]

(৩) অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিষ্প্রাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে আল্লাহ্র কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বনী ইসরাইলের এক মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু সময় উপস্থিত হলো, সে তার পরিবার-পরিজনকে এ বলে অসিয়ত করল যে, যখন আমি মারা যাব তখন তোমরা আমার জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে দিও। তারপর যখন আগুন আমার গোস্ত খেয়ে ফেলবে এবং আমার হাঁড় পর্যন্ত কঙ্কাল হয়ে যাবে তখন তা নিয়ে গুড়ো

সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ।’

৮০. তিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন, ফলে তোমরা তা থেকে আগুন প্রজ্বলিত কর ।

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই । আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ।

اَوَلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰی ٭ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمُ ﴿٨١﴾

৮২. তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায় ।

اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْـًٔا اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[১] ।

فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিও । তারা তাই করল । তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে পুরোপুরি একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমনটি কেন করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে । আল্লাহ্ তখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন । [বুখারী: ৩৪৫২, ৩৪৮১, ৩৪৭৮, মুসলিম: ২৭৫৬, ২৭৫৭]

(১) অনুরূপ বর্ণনা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরায় এসেছে, [যেমন: সূরা আল-মুমিনূন:৮৮, সূরা আল-মুলক:১] এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নিজ সত্তাকে পবিত্র ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং সমস্ত ক্ষমতা যে তাঁরই হাতে সে ঘোষণা দিয়ে বান্দাকে আখেরাতের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছেন যে, তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে তখন তিনি সবাইকে তার কাজ ও কথার সঠিক প্রতিফল প্রদান করবেন । আয়াতে ব্যবহৃত ملكوت এবং ملك একই অর্থবোধক । যার অর্থ ক্ষমতা, চাবিকাঠি ইত্যাদি । তবে ملكوت এর পরিধি ব্যাপক । [দেখুন- ইবন কাসীর]

৩৭- সূরা আস-সাফ্ফাত
১৮২ আয়াত, ৫ রুকু', মক্কী

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান(১)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾

২. অতঃপর যারা কঠোর পরিচালক(২)

فَالزّٰجِرٰتِ زَجۡرًا ۙ﴿۲﴾

৩. আর যারা 'যিক্‌র' আবৃত্তিতে রত-(৩)

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكۡرًا ۙ﴿۳﴾

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ এক,

اِنَّ اِلٰهَكُمۡ لَوَاحِدٌ ؕ﴿۴﴾

৫. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী সবকিছুর রব এবং রব সকল উদয়স্থলের(৪) ।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ الۡمَشَارِقِ ؕ﴿۵﴾

৬. নিশ্চয় আমরা কাছের আসমানকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِزِيۡنَةِ الۡكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির শপথ করেছেন, তারপর আরেক সৃষ্টির শপথ করেছেন, তারপর অপর সৃষ্টির শপথ করেছেন। এখানে কাতারবন্দী দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা আকাশে কাতারবন্দী হয়ে আছেন। [তাবারী]

(২) মুজাহিদ বলেন, এখানে কঠোর পরিচালক বলে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] পক্ষান্তরে কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা কুরআনে যে সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ্ সতর্ক করেছেন তাই বুঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(৩) মুজাহিদ বলেন, এখানে তেলাওয়াতে রত বলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আর কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআন থেকে মানুষের ঘটনাবলী ও পূর্ববর্তী উম্মতদের কাহিনী যা তোমাদের উপর তেলাওয়াত করে শোনানো হয়। [তাবারী] আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে কাতারবন্দী, কঠোর পরিচালক ও তেলাওয়াতকারী বলে ফেরেশতাদের কয়েকটি দলকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, এ সূরারই অন্যত্র কাতারবন্দী থাকা ফেরেশতাদের গুণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, "আর আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।" [১৬৫-১৬৬]

(৪) সুদ্দী বলেন, এর বহু বচনের কারণ হচ্ছে, শীত কাল এবং গ্রীষ্ম কালে সূর্য উদিত হওয়ার স্থানের ভিন্নতা। তিনি আরও বলেন, সারা বছরে সূর্যের ৩৬০টি উদিত হওয়ার স্থান রয়েছে, অনুরূপভাবে সূর্যাস্ত যাওয়ারও অনুরূপ স্থান রয়েছে। [তাবারী]

করেছি[১],

৭. এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে[২]।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝

৮. ফলে ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শুনতে পারে না[৩]। আর তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সব দিক থেকে---

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝

৯. বিতাড়নের জন্য[৪] এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝

১০. তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

১১. সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না আমরা অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা[৫]? তাদেরকে তো আমরা সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি হতে।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝

১২. আপনি তো বিস্ময় বোধ করছেন, আর তারা করছে বিদ্রূপ[৬]।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۝

---

(১) এর সমার্থে দেখুন, সূরা ফুসসিলাত: ১২; সূরা আল-হিজর: ১৬; সূরা আল-মুলক: ৫।

(২) অনুরূপ দেখুন, সূরা আল-হিজর: ১৭-১৮।

(৩) কাতাদাহ বলেন, ﴿الْمَلَاِ الْاَعْلٰى﴾ বলে ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাদের নীচে যারা আছে তাদের উপরে অবস্থান করছে। সেখান থেকে কোন কিছু শোনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [তাবারী]

(৪) কি নিক্ষিপ্ত হয়, তা বলা হয়নি। কাতাদাহ বলেন, তাদের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। [তাবারী] আর মুজাহিদ বলেন, এখানে دحوراً শব্দটির অন্য অর্থ বিতাড়িত অবস্থায় [তাবারী]

(৫) মুজাহিদ বলেন, অন্য সৃষ্টি যেমন, আসমান, যমীন ও পাহাড়। [তাবারী]

(৬) কাতাদাহ বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হচ্ছিলেন যে, এ কুরআন তাকে দেয়া হয়েছে, অথচ পথভ্রষ্টরা এটাকে নিয়ে উপহাস করছে। [তাবারী]

وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করে না ।

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা উপহাস করে

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৫. এবং বলে, 'এটা তো এক সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয় ।

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. 'এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও?'

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. বলুন, 'হ্যাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত ।'

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অতঃপর তা তো একটিমাত্র প্রচণ্ড ধমক---আর তখনই তারা দেখবে[১] ।

وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো প্রতিদান দিবস ।'

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. এটাই ফয়সালার দিন, যার প্রতি তোমরা মিথ্যা আরোপ করতে ।

দ্বিতীয় রুকূ'

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا

২২. (ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে,) 'একত্র কর যালিম[২] ও তাদের

---

(১) زجرة শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে । এর এক অর্থ, 'প্রচণ্ড ধমক' বা 'ভয়ানক শব্দ' । এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, যালেম বলে এখানে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে । কারণ, পরবর্তী অংশ 'আর যাদের ইবাদাত করত তারা আল্লাহর পরিবর্তে' থেকে এটাই সুস্পষ্ট । কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যুলুম বলে শির্ক উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । [আদওয়াউল বায়ান]

يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

সহচরদেরকে[১] এবং তাদেরকে, যাদের 'ইবাদাত করত তারা---

مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। আর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে[২],

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. 'আর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে তো প্রশ্ন করা হবে।

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. 'তোমাদের কী হল যে, তোমরা একে অন্যের সাহায্য করছ না?'

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. বস্তুত তারা হবে আজ আত্মসমর্পণকারী।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর তারা একে অন্যের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে---

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

২৮. তারা বলবে, 'তোমরা তো তোমাদের শপথ নিয়ে আমাদের কাছে আসতে[৩]।'

---

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এখানে أزواج বলে অনুরূপ ও সমমতের লোক বোঝানো হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা তাদের মত অন্যান্য কাফের বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) অথবা জাহান্নামের চতুর্থ দরজা হচ্ছে জাহীম। তাদেরকে সেদিকে পথনির্দেশ কর। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তোমরা তোমাদের শপথ নিয়ে এসে বলতে যে, তোমরা হকের উপর আছ, তাই আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম। তোমরা এমনভাবে আসতে যে, আমরা তোমাদেরকে নিরাপদ মনে করতাম। ফলে আমরা তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম। অর্থাৎ তোমরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছ। [জালালাইন] দুই. অন্য অর্থ হচ্ছে, তোমরা দ্বীন ও হকের লেবাস পরে আসতে, আর আমাদেরকে শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে উদাসীন করে দিতে। তা থেকে দূরে রাখতে। আর আমাদের কাছে ভ্রষ্ট পথকে শোভিত করে দেখাতে। [তাবারী; মুয়াসসার] তিন. তোমরা তোমাদের শক্তি ও প্রভাব নিয়ে আমাদেরকে প্রভাবিত করতে, ফলে আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। [সা'দী]

২৯. তারা (নেতৃস্থানীয় কাফেররা) বলবে, 'বরং তোমরা তো মুমিন ছিলে না,

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. 'তাই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে, নিশ্চয় আমরা শাস্তি আস্বাদন করব।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. 'সুতরাং আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।'

فَأَغْوَيْنٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. অতঃপর তারা সবাই সেদিন শাস্তির শরীক হবে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের সাথে এরূপ করে থাকি।

إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. তাদেরকে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করত[১]।

إِنَّهُمْ كَانُوْٓا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

---

(১) অহংকারের কারণেই তারা মূলতঃ এ কালেমা উচ্চারণ করেনি। যদি তারা এ কালেমা উচ্চারণ করত তবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা হতো। তিনি বলেছেন, 'আমি তো মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যদি তারা তা বলে তবে তাদের জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ হবে। তবে ইসলামের হক ছাড়া। আর তাদের হিসেব তো আল্লাহ্‌রই উপর। [বুখারী:২৫, মুসলিম:২২] ইমাম যুহরী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবেও তা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর কিতাবে একদল লোকের অহংকারের কথা বর্ণনা করে বলেছেন, "তাদেরকে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করত"। আরও বলেছেন, "যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা---অজ্ঞতার যুগের অহমিকা , তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায় সুদৃঢ় করলেন," আর সেই তাকওয়ার কালেমা

৩৬. এবং বলত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্‌দেরকে বর্জন করব?'	وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۢ
৩৭. বরং তিনি তো সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তিনি রাসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন।	بَلۡ جَآءَ بِٱلۡحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
৩৮. তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদনকারী হবে,	إِنَّكُمۡ لَذَآئِقُواْ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَلِيمِ
৩৯. এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে---	وَمَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ
৪০. তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।	إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
৪১. তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক---	أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ رِزۡقٞ مَّعۡلُومٞ
৪২. ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত,	فَوَٰكِهُ وَهُم مُّكۡرَمُونَ
৪৩. নেয়ামত-পূর্ণ জান্নাতে	فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
৪৪. মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে।	عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ
৪৫. তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র[১]	يُطَافُ عَلَيۡهِم بِكَأۡسٖ مِّن مَّعِينِۢ

হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুশরিকরা হুদাইবিয়ার দিন এটা বলা থেকে অহংকার করে বিরত ছিল। [ইবন হিব্বান: ১/৪৫১-৪৫২; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) শরাবের পানপাত্র নিয়ে ঘুরে ঘুরে জান্নাতীদের মধ্যে কারা পরিবেশন করবে সেকথা এখানে বলা হয়নি। এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে অন্যান্য স্থানেঃ "আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরবে তাদের খাদেম ছেলেরা যারা এমন সুন্দর যেমন ঝিনুকে লুকানো মোতি।" [সূরা আত-তূর: ২৪] "আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরে ফিরবে এমন সব বালক যারা হামেশা বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে মোতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।" [সূরা আল-ইনসান: ১৯]

৪৬. শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ

৪৭. তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না,

لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ

৪৮. তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না[১], ডাগর চোখ বিশিষ্টা[২] (হূরীগণ)।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ

৪৯. তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব[৩]।

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ

৫০. অতঃপর তারা একে অন্যের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ

৫১. তাদের কেউ বলবে, 'আমার ছিল এক সঙ্গী;

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ

৫২. 'সে বলত, 'তুমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস করে যে,

يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ

---

(১) এখানে জান্নাতের হুরীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে প্রথমে তাদের গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন 'অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা' হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না। [দেখুন, তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে হুরীদের দ্বিতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের চোখ বড় বড় হবে। মেয়েদের চোখ বড় হলে সুন্দর দেখায়। [দেখুন,তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এখানে জান্নাতের হুরীগণের তৃতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে সুরক্ষিত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছ এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে, তা এমনই সুরক্ষিত থাকে যে, এর উপর বাইরের ধূলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে; যা আরবদের কাছে মহিলাদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসেবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। [দেখুন,তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

৫৩. 'আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?'	ءَاِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيۡنُوۡنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. আল্লাহ্‌ বলবেন, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?'	قَالَ هَلۡ اَنۡتُمۡ مُّطَّلِعُوۡنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;	فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىۡ سَوَآءِ الۡجَحِيۡمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে,	قَالَ تَاللّٰهِ اِنۡ كِدۡتَّ لَتُرۡدِيۡنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. 'আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো হাযিরকৃত[১] ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।	وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّىۡ لَـكُنۡتُ مِنَ الۡمُحۡضَرِيۡنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. 'আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না	اَفَمَا نَحۡنُ بِمَيِّتِيۡنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না!'	اِلَّا مَوۡتَتَنَا الۡاُوۡلٰى وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِيۡنَ ﴿٥٩﴾
৬০. এটা তো অবশ্যই মহাসাফল্য।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿٦٠﴾
৬১. এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা,	لِمِثۡلِ هٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ الۡعٰمِلُوۡنَ ﴿٦١﴾
৬২. আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেয়, না যাক্কুম গাছ?	اَذٰ لِكَ خَيۡرٌ نُّزُلًا اَمۡ شَجَرَةُ الزَّقُّوۡمِ ﴿٦٢﴾
৬৩. যালিমদের জন্য আমরা এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ,	اِنَّا جَعَلۡنٰهَا فِتۡنَةً لِّلظّٰلِمِيۡنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. এ গাছ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে,	اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخۡرُجُ فِىۡۤ اَصۡلِ الۡجَحِيۡمِۙ ﴿٦٤﴾
৬৫. এর মোচা যেন শয়তানের মাথা,	طَلۡعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوۡسُ الشَّيٰطِيۡنِ ﴿٦٥﴾

(১) অর্থাৎ যদি আমার উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত না থাকত, তবে তো আমি জাহান্নামের শাস্তিতে হাযিরকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। [সা'দী]

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তারা তো এটা থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে[১]।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৭. তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে প্রজ্বলিত আগুনেরই দিকে।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা তো তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী,

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. অতঃপর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল[২]।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

৭১. আর অবশ্যই তাদের আগে পূর্ববর্তীদের বেশীর ভাগ বিপথগামী হয়েছিল,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর অবশ্যই আমরা তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. কাজেই লক্ষ্য করুন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল!

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র[৩]।

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তারা তো যাক্কুম গাছ থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। অন্যত্রও তা বলেছেন, "তারপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যারোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম গাছ থেকে, অতঃপর সেটা দ্বারা তারা পেট পূর্ণ করবে, তদুপরি তারা পান করবে তার উপর অতি উষ্ণ পানি--অতঃপর পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ৫১-৫৫]

(২) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ কোন কিছুর পিছনে দ্রুত চলা। [তাবারী] কাতাদাহ বলেন, খুব দ্রুত চলা। [তাবারী]

(৩) সুদ্দী বলেন, এরা হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ যাদেরকে তাঁর নিজের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করে নিয়েছেন। [তাবারী]

তৃতীয় রুকূ'

৭৫. আর অবশ্যই নূহ্ আমাদেরকে ডেকেছিলেন, অতঃপর (দেখুন) আমরা কত উত্তম সাড়াদানকারী ।

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬. আর তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে ।

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৭. আর তার বংশধরদেরকেই আমরা বিদ্যমান রেখেছি (বংশপরম্পরায়)[১],

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮. আর আমরা পরবর্তীদের মধ্যে তার জন্য সুখ্যাতি রেখেছি ।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক ।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾

৮০. নিশ্চয় আমরা এভাবে মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি,

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম ।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২. তারপর অন্য সকলকে আমরা নিমজ্জিত করেছিলাম ।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩. আর ইব্‌রাহীম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত[২] ।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾

৮৪. স্মরণ করুন, যখন তিনি তার

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ শুধু নূহের সন্তানরাই অবশিষ্ট ছিল । [তাবারী]

(২) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী বিস্তারিত দেখুন, তার পিতা ও সম্প্রদায়ের সাথে তার বিভিন্ন আলোচনা, সূরা মারইয়াম: ৪১-৪৯; সূরা আশ-শু'আরা: ৬৯-৭০ । ইবন আব্বাস বলেন, এখানে তার অনুগামী বলে, তার দ্বীনের অনুগামী বোঝানো হয়েছে । [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, তার পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতির অনুগামী বোঝানো হয়েছে । [তাবারী]

রবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশুদ্ধচিত্তে[১];

৮৫. যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা কিসের ইবাদাত করছ?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলোকে চাও?

أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭. 'তাহলে সকলসৃষ্টির রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী[২]?'

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. অতঃপর তিনি তারকারাজির দিকে একবার তাকালেন,

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

৮৯. এবং বললেন, 'নিশ্চয় আমি অসুস্থ[৩]।'

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

---

(১) সুদ্দী বলেন, অর্থাৎ শির্কমুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসলেন। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ যদি তোমরা তাঁর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছ যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্যকে ইবাদাত করেছ। [তাবারী] তখন তাঁর ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? তিনি কি তোমাদের এমনিই ছেড়ে দিবেন?

(৩) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার জীবনে তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে এটি তার একটি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অসুস্থ বলে বোঝানো হয়েছে যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় فعيل এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যৎ কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [সূরা আয-যুমার:৩০] এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ হল, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনিভাবে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম سقيم এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব'। এ কথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সংকোচ; যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে তার মনে সৃষ্টি হচ্ছিল। 'আমার মন খারাপ' বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, এ বাক্যে 'মানসিক সংকোচ' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯০. অতঃপর তারা তাকে পিছনে রেখে চলে গেল।

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

৯১. পরে তিনি চুপিচুপি তাদের দেবতাগুলোর কাছে গেলেন এবং বললেন, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?'

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. 'তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা কথা বল না?'

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৯৩. অতঃপর তিনি তাদের উপর সবলে আঘাত হানলেন।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসল।

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তিনি বললেন, 'তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই ইবাদাত কর?

এর একথাটিকে মিথ্যা বা বাস্তববিরোধী বলার জন্য প্রথমে কোন উপায়ে একথা জানা উচিত যে, সে সময় ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামের কোন প্রকারের কোন কষ্ট ও অসুস্থতা ছিল না এবং তিনি নিছক বাহানা করে একথা বলেছিলেন। যদি এর কোন প্রমাণ না থেকে থাকে, তাহলে অযথা কিসের ভিত্তিতে একে মিথ্যা গণ্য করা হবে? হতে পারে ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তার মামুলি অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। আলেমগণ এটাকেই তাওরিয়াহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। অর্থাৎ যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। [দেখুন-তাবারী; ফাতহুল কাদীর] এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। কারণ, এক হাদিসে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এর উক্তি ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ এর জন্যে كذب (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [বুখারী:৩৩৫৮] এ হাদীসেরই কোন কোন বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, "এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়; যা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বলা হয়নি"। [তিরমিযী: ৩১৪৮]

৯৬. অথচ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও[১]।'

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. তারা বলল, 'এর জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর, তারপর একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।'

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾

৯৮. এভাবে তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমরা তাদেরকে খুবই হেয় করে দিলাম[২]।

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তিনি বললেন, 'আমি আমার রবের দিকে চললাম[৩], তিনি আমাকে অবশ্যই হেদায়াত করবেন,

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾

১০০.'হে আমার রব! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।'

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. অতঃপর আমরা তাকে এক সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিলাম[৪]।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০২. অতঃপর তিনি যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইব্‌রাহীম বললেন, 'হে

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰاَبَتِ

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকে তৈরী করেন' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৩১] অর্থাৎ মানুষের কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ্। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ এরপর আর তাদের সাথে বিতণ্ডায় যেতে হয়নি। তারপূর্বেই তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ তিনি বললেন, তিনি তার আমল, মন ও নিয়্যত সব নিয়েই যাচ্ছেন। [তাবারী]

(৪) এখান থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বড় সন্তান ইসমাঈলের কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে। এখানে আরও আছে ইসমাঈলের যবেহ ও তার বিনিময় দেয়ার আলোচনা। এ সূরা আস-সাফফাত ব্যতীত আর কোথাও এ ঘটনা আলোচিত হয় নি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾

প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি[১], এখন তোমার অভিমত কি বল?' তিনি বললেন, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন[২] এবং ইব্‌রাহীম তার পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করলেন,

وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. তখন আমরা তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইব্‌রাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. 'আপনি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলেন!'---এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾

১০৬. নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. আর আমরা তাকে মুক্ত করলাম এক বড় যবেহ এর বিনিময়ে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর আমরা তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি।

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾

১১০. এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

---

(১) কাতাদাহ বলেন, নবী-রাসূলদের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তারা যখন স্বপ্নে কিছু দেখতেন সেটা বাস্তবে রূপ দিতেন। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, যখন ইসমাঈল তার আত্মাকে আল্লাহ্‌র জন্য সোপর্দ করলেন, আর ইবরাহীম তার ছেলেকে আল্লাহ্‌র জন্য সমর্পন করলেন। [তাবারী]

১১১. নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম;

إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١١١﴾

১১২. আর আমরা তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, তিনি ছিলেন এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

وَبَشَّرۡنَٰهُ بِإِسۡحَٰقَ نَبِيّٗا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩. আর আমরা ইবরাহীমের ওপর বরকত দান করেছিলাম এবং ইস্‌হাকের উপরও; তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুহসিন এবং কিছু সংখ্যক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

وَبَٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلَىٰٓ إِسۡحَٰقَۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحۡسِنٞ وَظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ مُبِينٞ ﴿١١٣﴾

চতুর্থ রুকূ'

১১৪. আর অবশ্যই আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,

وَلَقَدۡ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١١٤﴾

১১৫. এবং তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে আমরা উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে[১]।

وَنَجَّيۡنَٰهُمَا وَقَوۡمَهُمَا مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

১১৬. আর আমরা সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই হয়েছিল বিজয়ী।

وَنَصَرۡنَٰهُمۡ فَكَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ ﴿١١٦﴾

১১৭. আর আমরা উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব[২]।

وَءَاتَيۡنَٰهُمَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلۡمُسۡتَبِينَ ﴿١١٧﴾

১১৮. আর উভয়কে আমরা পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।

وَهَدَيۡنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

---

(১) সুদ্দী বলেন, মহাসংকট বলে ডুবে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] তবে হাসান বসরী বলেন, মহাসংকট বলে ফের'আউনের বংশধরদের বুঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ তাওরাত দিয়েছিলাম। যাতে হেদায়াত বর্ণিত ছিল, বিস্তারিত ও আহকামসমৃদ্ধ ছিল। [তাবারী]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯. আর আমরা তাদের উভয়ের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি ।

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তা) ।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

১২১. এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি ।

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. নিশ্চয় তারা উভয়ে ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ।

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর নিশ্চয় ইল্ইয়াস ছিলেন রাসূলদের একজন[১] ।

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. ‘তোমরা কি বা‘আলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা---

اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. ‘আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের প্রাক্তন পিতৃপুরুষদেরও রব ।’

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে ।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র ।

---

(১) কাতাদা বলেন, ইলইয়াস ও ইদ্রীস একই ব্যক্তি । [তাবারী] অন্যদের নিকট তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । [ইবন কাসীর] সে মতে তিনি ছিলেন, ইলইয়াস ইবনে ফিনহাস ইবনে আইযার ইবনে হারূন ইবনে ইমরান । তারা বা‘ল নামীয় এক মূর্তির পূজা করত । তিনি তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন । কিন্তু তারা তা থেকে বিরত হয় না । [ইবন কাসীর]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. আর আমরা তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. ইল্‌য়াসীনের[1] উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

১৩১. এভাবেই তো আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. তিনি তো ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম।

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. আর নিশ্চয় লূত ছিলেন রাসূলদের একজন।

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. স্মরণ করুন, যখন আমরা তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম---

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত এক বৃদ্ধা ছাড়া।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. আর তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে

---

(১) অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এটি ইলিয়াসের দ্বিতীয় নাম। যেমন ইবরাহীমের দ্বিতীয় নাম ছিল আব্রাহাম। আর অন্য কোন কোন মুফাসসিরের মতে আরববাসীদের মধ্যে ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় শব্দাবলীর বিভিন্ন উচ্চারণের প্রচলন ছিল। যেমন মীকাল ও মীকাইল এবং মীকাইন একই ফেরেশ্‌তাকে বলা হতো। একই ঘটনা ঘটেছে ইলিয়াসের নামের ব্যাপারেও। স্বয়ং কুরআন মজীদে একই পাহাড়কে একবার "তূরে সাইনা" বলা হচ্ছে এবং অন্যত্র বলা হচ্ছে, "তূরে সীনীন।"[তাবারী]

وَبِالَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. ও সন্ধ্যায়[১]। তবুও কি তোমরা বোঝ না?

পঞ্চম রুকূ'

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. আর নিশ্চয় ইউনুস ছিলেন রাসূলদের একজন।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

১৪০. স্মরণ করুন, যখন তিনি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গেলেন,

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. অতঃপর তিনি লটারীতে যোগদান করে পরাভূতদের অন্তর্ভুক্ত হলেন[২]।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৪২. অতঃপর এক বড় আকারের মাছ তাকে গিলে ফেলল, আর তিনি ছিলেন ধিকৃত।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. অতঃপর তিনি যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন[৩],

(১) এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কুরাইশ ব্যবসায়ীরা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন যাবার পথে লূতের সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত জনপদ যেখানে অবস্থিত ছিল দিনরাত সে এলাকা অতিক্রম করতো। [দেখুন, তাবারী,মুয়াস্‌সার,ফাতহুল কাদীর]

(২) কাতাদাহ বলেন, তিনি নৌকায় উঠার পর নৌকাটির চলা থেমে গেল। তখন লোকেরা বুঝল যে, কোন ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে এটা আটকে গেছে। তখন তারা লটারী করল। তাতে ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম আসল। তখন তিনি তার নিজেকে সাগরে নিক্ষেপ করলেন। আর তখনি একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। [তাবারী]

(৩) এর দু'টি অর্থ হয় এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, ইউনুস আলাইহিস সালাম পূর্বেই আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বরং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ছিলেন আল্লাহর চিরন্তন প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন তিনি মাছের পেটে পৌঁছুলেন তখন আল্লাহরই দিকে রুজূ করলেন এবং তারই প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকলেন। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "তাই সে অন্ধকারের মধ্যে তিনি ডেকে উঠলেন, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই,পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধী।" [সূরা আল আম্বিয়া: ৮৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মাছের পেটে

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

১৪৪. তাহলে তাকে উত্থানের দিন পর্যন্ত থাকতে হত তার পেটে।

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

১৪৫. অতঃপর ইউনুসকে আমরা নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে[১] এবং তিনি ছিলেন অসুস্থ।

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ

১৪৬. আর আমরা তার উপর ইয়াকতীন[২] প্রজাতির এক গাছ উদ্‌গত করলাম,

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

১৪৭. আর তাকে আমরা একলক্ষ বা তার চেয়ে বেশী লোকের প্রতি পাঠিয়েছিলাম।

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমরা তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

১৪৯. এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'আপনার রবের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান[৩] এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?'

ইউনূস আলাইহিস্ সালাম-এর পঠিত দোআ যে কোন মুসলিম যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দো'আ কবুল হবে। [তিরমিযী:৩৫০৫]

(১) এটি কাতাদাহ এর মত। ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, এর অর্থ, নদীর তীরে। [তাবারী]

(২) ইয়াকতীন আরবী ভাষায় এমন ধরনের গাছকে বলা হয় যা কোন গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না বরং লতার মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন লাউ, তরমুজ, শশা ইত্যাদি। মোটকথা সেখানে অলৌকিকভাবে এমন একটি লতাবিশিষ্ট বা লতানো গাছ উৎপন্ন করা হয়েছিল যার পাতাগুলো ইউনুসকে ছায়া দিচ্ছিল এবং ফলগুলো একই সংগে তার জন্য খাদ্য সরবরাহ করছিল এবং পানিরও যোগান দিচ্ছিল। [দেখুন, তাবারী]

(৩) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে আরবের কুরাইশ, জুহাইনা, বনী সালামাহ, খুযা'আহ এবং অন্যান্য গোত্রের কেউ কেউ বিশ্বাস করতো, ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর কন্যা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ জাহেলী আকীদার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন সূরা আন নিসা, ১১৭ ; আন নাহল, ৫৭-৫৮; আল-ইসরা, ৪০ ; আয্ যুখরুফ, ১৬-১৯ এবং আন নাজম, ২১-২৭ আয়াতসমূহ।

১৫০. অথবা আমরা কি ফেরেশ্‌তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা দেখেছিল[১]?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَٰئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. সাবধান! তারা তো মনগড়া কথা বলে যে,

أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২. 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' আর তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন?

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. নাকি তোমাদের কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?

أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব[২] উপস্থিত কর।

فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. তারা আল্লাহ্ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে[৩],

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ

(১) অন্যস্থানে এসেছে, " আর তারা রহমানের বান্দা ফেরেশ্‌তাগণকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ১৯]

(২) কাতাদাহ বলেন, এখানে কিতাব বলে, গ্রহণযোগ্য ওযর উদ্দেশ্য। [তাবারী]

(৩) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরদার দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা ও জিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতাগণ জন্মলাভ করেছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল, জিন সরদার-দুহিতারা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কোন

الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

অথচ জিনেরা জানে, নিশ্চয় তাদেরকে উপস্থিত করা হবে (শাস্তির জন্য)।

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. তারা (মুশরিকরা) যা আরোপ করে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান---

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া,

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. অতঃপর নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের ‘ইবাদাত কর তারা---

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তোমরা (একনিষ্ঠ বান্দাদের) কাউকেও আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না---

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. শুধু প্রজ্জলিত আগুনে যে দগ্ধ হবে সে ছাড়া[১]।

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. ‘আর (জিবরীল বললেন) আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে,

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. ‘আর আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান,

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. ‘এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী[২]।’

কোন আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ) ইবলীস আল্লাহর ভ্রাতা। আল্লাহ্ মঙ্গলের স্রষ্টা আর সে অমঙ্গলের স্রষ্টা। এখানে তাদের বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, তোমরা কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, আর আমিও তোমাদের কাউকে পথভ্রষ্ট করব না তবে যার জন্য আমার ফয়সালা হয়ে গেছে সে জাহান্নামে দগ্ধ হবে, তার কথা ভিন্ন। [তাবারী] কাতাদাহ বলেন, তোমরা তোমাদের বাতিল দিয়ে আমার বান্দাদের কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, তবে যে জাহান্নামের আমল করে তোমাদেরকে বন্ধু বানিয়েছে সে ছাড়া। [তাবারী]

(২) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আসমানসমূহের মধ্যে এমন এক

১৬৭. আর তারা (মক্কাবাসীরা) অবশ্যই বলে আসছিল,

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮. 'পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত,

لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯. 'আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।'

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾

১৭০. কিন্তু তারা কুরআনের সাথে কুফরী করল সুতরাং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে[১];

فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. আর অবশ্যই আমাদের প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমাদের এ বাক্য আগেই স্থির হয়েছে যে,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭২. নিশ্চয় তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. এবং আমাদের বাহিনীই হবে বিজয়ী।

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. অতএব কিছু কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. আর আপনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করুন, শীঘ্রই তারা দেখতে পাবে।

وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾

আসমান রয়েছে যার প্রতি বিঘত জায়গায় কোন ফেরেশতার কপাল অথবা তার দু'পা দাঁড়ানো অথবা সিজদা-রত অবস্থায় আছে। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তাফসীর আবদুর রাযযাক: ২৫৬৫] হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি সেভাবে কাতারবন্দী হবে না যেভাবে ফেরেশতারা তাদের রবের কাছে কাতারবন্দী হয়? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে তারা তাদের রবের কাছে কাতারবন্দী হয়? তিনি বললেন, প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করে এবং কাতারে প্রাচীরের ন্যায় ফাঁক না রেখে দাঁড়ায়। [মুসলিম: ৫২২]

(১) অর্থাৎ তারা তাদের কাছে নাযিলকৃত কিতাব কুরআনের সাথে কুফরী করেছে। অচিরেই তারা এ কুফরীর পরিণাম জানতে পারবে। [জালালাইন]

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝١٧٦

১৭৬. তারা কি তবে আমাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝١٧٧

১৭৭. অতঃপর তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ[১]!

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝١٧٨

১৭৮. আর কিছু কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন।

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝١٧٩

১৭৯. আর আপনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করুন, শীঘ্রই তারা দেখতে পাবে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝١٨٠

১৮০. তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝١٨١

১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি!

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٨٢

১৮২. আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য[২]।

---

(১) আরবী বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। "সকাল" বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণতঃ এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাই করতেন। তিনি কোন শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রিবেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। [মুসলিম: ৮৭৩] হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সকালবেলায় খায়বার দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলি উচ্চারণ করেন, اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ মহান। খায়বার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়। [বুখারী: ৩৭১, মুসলিম: ১৩৬৫]

(২) ১৮০-১৮২ নং আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। কি সুন্দর সমাপ্তি! সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তাওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে,

আল্লাহ তা'আলা সেগুলো থেকে পবিত্র। সে মতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সে মতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাফেরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সে মতে এই প্রশংসা ও স্তুতির ওপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

তাছাড়া এ তিন আয়াতের পরস্পর এক ধরনের সামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়, প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফের মুশরিকরা যে সমস্ত খারাপ গুণে মহান আল্লাহ্কে চিত্রিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র! তাদের কথা ও কর্মকাণ্ড তাঁর মহান সমীপে ও তার মর্যাদার সামান্যতমও হেরফের করার ক্ষমতা রাখে না। তারা তাঁকে খারাপ গুণে গুণান্বিত করতে চায়, পক্ষান্তরে নবী রাসূলগণ তাঁকে সঠিকভাবে জানে বিধায় তাঁর জন্য সমস্ত হক নাম ও সঠিক গুণে গুণান্বিত করে। তাই তারা সালাম পাওয়ার যোগ্য। তারা নিরাপত্তা পাবে কারণ তারা আল্লাহ্র ব্যাপারে নিরাপত্তার বেষ্টনী অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্র সঠিক গুণাগুণকে অস্বীকার করেনি। তারা তাঁকে তাঁর সঠিক নাম ও গুণ দ্বারা গুণান্বিত করে এবং সেগুলোর অসীলায় আহ্বান করে। আর তাদের আহ্বানে তিনিই সাড়া দেন; কারণ তিনিই তো সর্বপ্রশংসিত সত্ত্বা। দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বদা সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত। আর এটাই শেষ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম আয়াতে তাসবীহ বা পবিত্রতা ও মহানুভবতা ঘোষণার মাধ্যমে যাবতীয় খারাপ গুণকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। আর পরোক্ষভাবে যাবতীয় সৎ ও সঠিক গুণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে তাহমীদ বা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যাবতীয় সৎ ও সঠিক গুণাবলীকে আল্লাহ্র জন্য সরাসরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর পরোক্ষভাবে যাবতীয় খারাপ গুণ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাঝখানে রাসূলদের উল্লেখ করে এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এ তাওহীদ বা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সে নীতি অবলম্বন করা উচিত, যা প্রথম ও তৃতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা একমাত্র রাসূলগণই সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন; সুতরাং তারাই সালাম ও নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য। এর বিপরীতে যারা আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নামসমূহকে অস্বীকার করে, তার সিফাত বা গুণাগুণকে বিকৃত করে তারা রাসূলদের পথে নয়, তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। [দেখুন, মাজমু' ফাতাওয়া ৩/১৩০; ইবনুল কাইয়্যেম, বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ ২/১৭১; জালাউল আফহাম: ১৭০]

৩৮- সূরা সোয়াদ
৮৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ صٓ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১. সোয়াদ[১], শপথ উপদেশপূর্ণ

صٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكۡرِ ١

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো কাফের-মুশরিক ও তাদের সেই মজলিসের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ আবু তালিব ও আবু জাহলসহ কুরাইশ কাফেরদের অন্যান্য নেতৃবর্গের প্রস্তাব সম্পর্কিত ঘটনা। যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল [মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৪৩২] এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতব্য আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুস্পুত্রের পূর্ণ দেখা-শোনা ও হেফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবু জাহল, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালেব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি মারা যান এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবে: আবু তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবু তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে। সেমতে তারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল: আপনার ভ্রাতুস্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। আবু তালেব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মজলিসে ডেকে এনে বললেন: ভ্রাতুস্পুত্র, এ কোরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। অবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমনি বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবু তালেব বললেন: সে বিষয়টি কি? তিনি বললেন: আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা বলাতে চাই, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবদের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবু জাহল বলে উঠল: বল, সে কলেমা কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল: আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে

কুরআনের!

২. বরং কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় নিপতিত আছে।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝

৩. এদের আগে আমরা বহু জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্ত চীৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই সময় ছিল না।

كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۝

৪. আর তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, এদের কাছে এদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, 'এ তো এক জাদুকর(১), মিথ্যাবাদী।'

وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝

৫. 'সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!'

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝

৬. আর তাদের নেতারা এ বলে সরে পড়ে যে, 'তোমরা চলে যাও এবং

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ

অবলম্বন করব? এ যে, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়।[দেখুন, তিরমিযী:৩২৩২, আত-তাফসীরুস সহীহ ৪/২১৭]

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জাদুকর শব্দটি তারা যে অর্থে ব্যবহার করতো তা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে এমন কিছু জাদু করতেন যার ফলে তারা পাগলের মতো তাঁর পেছনে লেগে থাকতো। কোন সম্পর্কচ্ছেদ করার বা কোন প্রকার ক্ষতির মুখোমুখি হবার কোন পরোয়াই তারা করতো না। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ত্যাগ করতো। স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতো এবং স্বামী স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যেতো। হিজরাত করার প্রয়োজন দেখা দিলে একেবারে সবকিছু সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে পড়তো। কারবার শিকেয় উঠুক এবং সমস্ত জ্ঞাতি-ভাইরা বয়কট করুক কোনদিকেই দৃষ্টিপাত করতো না। কঠিন থেকে কঠিনতর শারীরিক কষ্টও বরদাশ্‌ত করে নিতো কিন্তু ঐ ব্যক্তির পেছনে চলা থেকে বিরত হতো না।[দেখুন, কুরতুবী]

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝٦

তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।'

مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧

৭. 'আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে[১] এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।

أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۖ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۝٨

৮. 'আমাদের মধ্যে কি তারই উপর যিক্‌র (বাণী) নাযিল হল? প্রকৃতপক্ষে তারা তো আমার বাণীতে (কুরআনে) সন্দিহান। বরং তারা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝٩

৯. নাকি তাদের কাছে আছে আপনার রবের অনুগ্রহের ভাণ্ডার, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝١٠

১০. নাকি তাদের কর্তৃত্ব আছে আসমানসমূহ ও যমীন এবং এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকলে, তারা কোন উপায় অবলম্বন করে আরোহণ করুক!

جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝١١

১১. এ বাহিনী সেখানে অবশ্যই পরাজিত হবে, পূর্ববর্তী দলসমূহের মত[২]।

---

(১) অন্য ধর্মাদর্শ বলে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এখানে সর্বশেষ মিল্লাত নাসারাদের দ্বীনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অপর বর্ণনা মতে এখানে কুরাইশদের পুর্বপুরুষদের দ্বীন বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী,বাগভী]

(২) অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী সময়ের লোকেরা তাদের নবীর উপর মিথ্যারোপ করার কারণে পরাজিত হয়েছে, তেমনি এ মিথ্যারোপকারী কাফের বাহিনীও পরাজিত হবে। এখন তাদেরকে কখন পরাজিত করা হয়েছে সে ব্যাপারে কারও কারও মত হচ্ছে, বদরের যুদ্ধে। [মুয়াস্‌সার,কুরতুবী]

১২. এদের আগেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, ‘আদ ও কীলকওয়ালা ফির‘আউন[১],

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾

১৩. সামূদ, লূত সম্প্রদায় ও ‘আইকা’র অধিবাসী; ওরা ছিল এক-একটি বিশাল বাহিনী।

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾

১৪. তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি ছিল যথার্থ।

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

দ্বিতীয় রুকূ’

১৫. আর এরা তো কেবল অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দের, যাতে কোন বিরাম থাকবে না[২]।

وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾

১৬. আর তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! হিসাব দিবসের আগেই আমাদের

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ

(১) এর শাব্দিক অর্থ-“কীলকওয়ালা ফেরাউন”। এর তাফসীরে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেনঃ এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই কি ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেনঃ সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেনঃ এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে সে যে বহু সেনাদলের অধিপতি ছিল এবং তাদের ছাউনির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার সম্ভবত কীলক বলতে মিসরের পিরামিডও বুঝানো যেতে পারে, কেননা এগুলো যমীনের মধ্যে কীলকের মতো গাঁথা রয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) আরবীতে فواق এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فواق বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না। [দেখুন- বাগভী,কুরতুবী]

الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

প্রাপ্য[১] আমাদেরকে শীঘ্রই দিয়ে দিন!'

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾

১৭. তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং স্মরণ করুন আমাদের শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; তিনি ছিলেন খুব বেশী আল্লাহ্ অভিমুখী[২]।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় আমরা অনুগত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾

১৯. এবং সমবেত পাখীদেরকেও; সবাই ছিল তার অভিমুখী[৩]।

(১) আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলীল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি "অংশ" অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন। [তাবারী]

(২) এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত ছিল দাউদ আলাইহিস্ সালাম -এর সালাত এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় সাওম ছিল দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর সাওম। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। [বুখারী: ১১৩১, মুসলিম:১১৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না।' [বুখারী: ১৯৭৭, মুসলিম:১১৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করতেন না, শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না' [মুসনাদে আহমাদ:২/২০০]

(৩) এ আয়াতে দাউদ আলাইহিস্সালাম-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের ইবাদতের তাসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহ পাঠকে আল্লাহ তা'আলা এখানে দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, এতে দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, মু'জিযা এক বড় নেয়ামত। [দেখুন, কুরতুবী]

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝٢٠

২০. আর আমরা তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা[১]।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝٢١

২১. আর আপনার কাছে বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে আসল 'ইবাদাতখানায়,

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝٢٢

২২. যখন তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করল, তখন তাদের কারণে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। তারা বলল, 'ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ---আমাদের একে অন্যের উপর সীমালজ্ঘন করেছে; অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ

২৩. 'নিশ্চয় এ ব্যক্তি আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি ভেড়ী[২]। আর

---

(১) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হেকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুওয়াত। ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। দাউদ আলাইহিস্ সালাম উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর أما بعد শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। তার বক্তব্য জটিল ও অস্পষ্ট হতো না। সমগ্র ভাষণ শোনার পর শ্রোতা একথা বলতে পারতো না যে তিনি কি বলতে চান তা বোধগম্য নয়। বরং তিনি যে বিষয়ে কথা বলতেন তার সমস্ত মূল কথাগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরতেন এবং আসল সিদ্ধান্ত প্রত্যাশী বিষয়টি যথাযথভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে তার দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে দিতেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা,বিচার-বিবেচনা ও বাকচাতূর্যের উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থান না করলে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দের মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। [তাবারী]

(২) نعجة শব্দের মূল অর্থ, ভেড়ী বা বন্যগরু। [আল-মু'জামুল ওয়াসীত] সাধারণত:

وَّاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

আমার আছে মাত্র একটি ভেড়ী। তবুও সে বলে, 'আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও', এবং কথায় সে আমার প্রতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

২৪. দাউদ বললেন, 'তোমার ভেড়ীটিকে তার ভেড়ীগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। আর শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর তো সীমালঙ্ঘন করে থাকে---করে না শুধু যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আর তারা সংখ্যায় স্বল্প।' আর দাউদ বুঝতে পারলেন, আমরা তো তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি তার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন[১], আর তাঁর অভিমুখী হলেন।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

২৫. অতঃপর আমরা তার ক্রটি ক্ষমা করলাম। আর নিশ্চয় আমাদের কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল ।

আরবরা এ শব্দটি দিয়ে অনিন্দ্য সুন্দরী ও বড় চোখ বিশিষ্টা নারীকে বুঝায়। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; জালালাইন; ফাতহুল কাদীর; সা'দী; মুয়াসসার] এখানে এ শব্দটি দ্বারা কি উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে "রুকু" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে সাজদাহ বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর,বাগভী] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'সোয়াদ' এর সাজদাহ বাধ্যতামূলক নয়। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ করতে দেখেছি। [বুখারী:১০৬৯] অপর বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, দাউদকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দাউদ যেহেতু সাজদাহ করেছেন সেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাজদাহ করেছেন। [বুখারী:৪৮০৭]

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلۡنٰکَ خَلِیۡفَۃً فِی الۡاَرۡضِ فَاحۡکُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ بِالۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الۡهَوٰی فَیُضِلَّکَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِیۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا یَوۡمَ الۡحِسَابِ ﴿۲۶﴾

২৬. 'হে দাউদ! আমরা আপনাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব আপনি লোকদের মধ্যে সুবিচার করুন এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, কেননা এটা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে।' নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে আছে।

তৃতীয় রুকূ'

وَمَا خَلَقۡنَا السَّمَآءَ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَیۡنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِکَ ظَنُّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ۚ فَوَیۡلٌ لِّلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنَ النَّارِ ﴿۲۷﴾

২৭. 'আর আমরা আসমান, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি[১]। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের যারা কুফরী করেছে, কাজেই যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের দুর্ভোগ।

اَمۡ نَجۡعَلُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کَالۡمُفۡسِدِیۡنَ فِی الۡاَرۡضِ ۫ اَمۡ نَجۡعَلُ الۡمُتَّقِیۡنَ کَالۡفُجَّارِ ﴿۲۸﴾

২৮. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করব? নাকি আমরা মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?

کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡکَ مُبٰرَکٌ لِّیَدَّبَّرُوۡۤا اٰیٰتِهٖ وَلِیَتَذَکَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۲۹﴾

২৯. এক মুবারক কিতাব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে গভীরভাবে

(১) অর্থাৎ নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। একথাটিই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমনঃ "তোমরা কি মনে করেছো আমরা তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে না।" [আল-মুমিনূন: ১১৫] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে বিশ্ব-জাহান রয়েছে তাদেরকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমরা তাদেরকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। চূড়ান্ত বিচারের দিনে তাদের সবার জন্য উপস্থিতির সময় নির্ধারিত রয়েছে।" [আদ দুখান:৩৮-৪০]

চিন্তা করে এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করে উপদেশ।

৩০. আর আমরা দাউদকে দান করলাম সুলাইমান[১]। কতই না উত্তম বান্দা তিনি! নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝

৩১. যখন বিকেলে তার সামনে দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে[২] পেশ করা হল,

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝

৩২. তখন তিনি বললেন, 'আমি তো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে;

فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝

৩৩. 'এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' তারপর তিনি ওগুলোর পা এবং গলা ছেদন করতে লাগলেন[৩]।

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۚ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

---

(১) সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে, যেমন: সূরা আল-বাকারাহ: ১০৪; আল-ইসরা:৭; আল-আম্বিয়া:৭০-৭৫; আন-নামল, ১৮-৫৬ এবং সাবা: ১২-১৪]

(২) মূলে বলা হয়েছে الصَّافِنَات এর অর্থ হচ্ছে এমনসব ঘোড়া যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ায়। [দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ,বাগভী]

(৩) আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতসমূহে সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই যে, সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, আসরের সালাত আদায়ের নিয়মিত সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তার প্রতিকার করেন। এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে তিনি সে প্রতিকার করেছিলেন? কুরআন বলছে, ﴿فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ﴾ এর অর্থ বর্ণনায় বিভিন্ন মত রয়েছে,
এক, তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ করে দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহর স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল। এ সালাত নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, নবী-রাসূলগণ এতটুকু ক্ষতিও পুরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয সালাত হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ হয়

না। কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম তার উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন। এ তাফসীরটি কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবন কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলেমও এই তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন নবীর পক্ষে শোভা পায় না। কোন কোন তাফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশ্বরাজি সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরী'আতে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহর নামে কোরবানী করেছেন।

দুই, আলোচ্য আয়াতের আরও একটি তাফসীর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেনঃ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ, এগুলো জেহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জেহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেনঃ এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সে মতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন। প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে উভয় তাফসীরের অবকাশ আছে।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবী। কোন সময় আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কোন মুবাহ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া জায়েয। কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু জাহম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে সালাত পড়লেন এবং ফিরে এসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললেন, চাদরটি আবু জাহামের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা, সালাতে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। [বুখারীঃ ৩৭৩, মুসলীম:১৭৬] হাদীসে আরও এসেছে,

৩৪. আর অবশ্যই আমরা সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়[১]; তারপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হলেন ।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝٣٤

৩৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য[২] যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না । নিশ্চয় আপনি পরম দাতা ।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٣٥

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে গিয়ে যা-ই ত্যাগ করবে আল্লাহ তার থেকে উত্তম বস্তু তোমাকে দিবে । [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৭৮,৭৯, ৩৬৩] [দেখুন, কুরতুবী]

(১) এখানে ধড় বলে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে । এক. এখানে ধড় বলে একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান বোঝানো হয়েছে । কারণ, সুলাইমান আলাইহিস সালাম শপথ করে বলেছিলেন, আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলে প্রত্যেকেই একটি সন্তান নিয়ে আসবে, যাতে করে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে, কিন্তু তিনি ইনশাল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তারপর তিনি তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল একজনই একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিল । তারপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার রবের দিকে ফিরে আসলেন এবং তাওবাহ করলেন [মুয়াসসার]
দুই. এখানে ধড় বলে সে জিনকে বোঝানো হয়েছে যে সুলাইমান আলাইহিস সালামের অবর্তমানে তার সিংহাসনে আরোহন করেছিল এবং কিছুদিন রাজ্য শাসন করেছিল । তারপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম আল্লাহর দিকে ফিরে গেলেন এবং তাওবাহ করলেন । [সা'দী]

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ দো'আর অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয় । সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায় যে, সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তী কালে কেউ হতে পারেনি । কেননা, বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতি বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি । সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি । এক হাদীসে এসেছে, এক দুষ্ট জিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত নষ্ট করতে চাইলে তিনি সেটাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালামের এ দো'আর কথা স্মরণ করে তার সম্মানে তা করা ত্যাগ করেন । [দেখুন, বুখারী:৩৪২৩]

৩৬. তখন আমরা তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, তিনি যেখানে ইচ্ছে করতেন সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত,

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর (অধীন করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তানসমূহকেও,

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে[১] ।

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৯. 'এসব আমাদের অনুগ্রহ, অতএব এ থেকে আপনি অন্যকে দিতে বা নিজে রাখতে পারেন । এর জন্য আপনাকে হিসেব দিতে হবে না ।'

هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৪০. আর নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল ।

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾

চতুর্থ রুকূ'

৪১. আর স্মরণ করুন, আমাদের বান্দা আইউবকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে',

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

৪২. (আমি তাকে বললাম) 'আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়[২] ।'

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

---

(১) শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে ।[আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর শৃংখলিত জিন বলতে এমনসব জিন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে বন্দী করা হতো ।[ইবন কাসীর] অথবা তারা এমনভাবে তার বশ্যতা স্বীকার করেছিল যে, তিনি তাদেরকে বন্দী করে রাখতে সমর্থ হতেন ।[বাগভী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝরণা প্রবাহিত

৪৩. আর আমরা তাকে দান করলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরো অনেক; আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ(১) ।

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪৪. 'আর (আমি তাকে আদেশ করলাম), একমুঠ ঘাস নিন এবং তা দ্বারা আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না।' নিশ্চয় আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল(২)। কতই উত্তম বান্দা

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল আইয়ূবের জন্য তার রোগের চিকিৎসা। সম্ভবত আইয়ূব কোন কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। [দেখুন, মুয়াসসার,কুরতুবী]

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর আইয়ূবের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল, এমন কি সন্তানরাও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তার কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাকে আরো সন্তান দান করলাম। একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তার বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় তার আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভালমন্দ সরাসরি এক ও লা শরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার চাইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত। [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, আইয়্যুব আলাইহিস্ সালামের অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইয়্যুব আলাইহিস্ সালামের পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাকে আরোগ্য দান করেছি। এ স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাই না। স্ত্রী আইয়্যুবকে একথা বললে, তিনি বললেন -তোমার সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল। এ ঘটনার বিশেষতঃ তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক এমন একটা প্রস্তাব তার সামনে

তিনি! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী।

৪৫. আর স্মরণ করুন, আমাদের বান্দা ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের কথা, তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

৪৬. নিশ্চয় আমরা তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিল আখিরাতের স্মরণ[১]।

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর নিশ্চয় তারা ছিলেন আমাদের নিকট মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্যতম।

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্‌লের কথা, আর এরা প্রত্যেকেই ছিলেন সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

৪৯. এ এক স্মরণ[২]। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস---

هٰذَا ذِكْرٌ ۗ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾

উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ, প্রস্তাবটা ছিল শেরেকীতে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বসলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাকে একশত বেত্রাঘাত করব। সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, শপথ ভঙ্গ করো না, বরং হাতে এক মুঠো তৃণশলাকা নিয়ে তদ্বারা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে শপথ পূর্ণ কর। তবে কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরী'আতের বিধান। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা। [মুসলিম:১৬৫০]

(১) অর্থাৎ তাদেরকে আখেরাত স্মরণের জন্য বিশেষ লোক হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম। সুতরাং তারা আখেরাতের জন্যই আমার আনুগত্য করত ও আমল করত। মানুষদেরকে তারা এর জন্য উপদেশ দিত এবং আখেরাতের প্রতি আহ্বান জানাত। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ এ কুরআন আপনার ও আপনার জাতির জন্য এক সম্মানজনক স্মরণ। এতে আপনাকে ও আপনার জাতির সুন্দর প্রশংসা করা হয়েছে। [মুয়াসসার]

جَنّٰتِ عَدۡنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الۡاَبۡوَابُ ﴿٥٠﴾

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত[১]।

مُتَّكِـِٕيۡنَ فِيۡهَا يَدۡعُوۡنَ فِيۡهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾

৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।

وَعِنۡدَهُمۡ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ اَتۡرَابٌ ﴿٥٢﴾

৫২. আর তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কারা।

هٰذَا مَا تُوۡعَدُوۡنَ لِيَوۡمِ الۡحِسَابِ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা হিসেবের দিনের জন্য তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

اِنَّ هٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهٗ مِنۡ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. নিশ্চয় এটা আমাদের দেয়া রিযিক যা নিঃশেষ হবার নয়।

هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيۡنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. এটাই। আর নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল---

جَهَنَّمَ ۚ يَصۡلَوۡنَهَا ۚ فَبِئۡسَ الۡمِهَادُ ﴿٥٦﴾

৫৬. জাহান্নাম, সেখানে তারা অগ্নিদগ্ধ হবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

هٰذَا ۙ فَلۡيَذُوۡقُوۡهُ حَمِيۡمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. এটাই। কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ[২]।

---

(১) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, এসব জান্নাতে তারা দ্বিধাহীনভাবে ও নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করবে এবং কোথাও তাদের কোনপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। দুই, জান্নাতের দরজা খোলার জন্য তাদের কোন প্রচেষ্টা চালাবার দরকার হবে না বরং শুধুমাত্র তাদের মনে ইচ্ছা জাগার সাথে সাথেই তা খুলে যাবে। তিন, জান্নাতের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকবে তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দেখতেই তাদের জন্য দরজা খুলে দেবে। [ইবন কাসীর, সা'দী,ফাতহুল কাদীর] এ তৃতীয় বিষয়বস্তুটি কুরআনের এক জায়গায় বেশী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'এমনকি যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে এবং তার দরজা আগে থেকেই খোলা থাকবে তখন জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে, 'সালামুন আলাইকুম, শুভ আগমন' চিরকালের জন্য এর মধ্যে প্রবেশ করুন।' [সূরা আয-যুমার:৭৩]

(২) মূলে غساق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিকগণ এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা

৫৮. আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি[১]।

وَّاٰخَرُ مِنۡ شَكۡلِهٖۤ اَزۡوَاجٌ ﴿۵۸﴾

৫৯. 'এ তো এক বাহিনী, তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন। নিশ্চয় তারা আগুনে জ্বলবে।'

هٰذَا فَوۡجٌ مُّقۡتَحِمٌ مَّعَكُمۡ ۚ لَا مَرۡحَبًۢا بِهِمۡ ؕ اِنَّهُمۡ صَالُوا النَّارِ ﴿۵۹﴾

৬০. অনুসারীরা বলবে, 'বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও কোন অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আগে আমাদের জন্য ওটার ব্যবস্থা করেছ। অতএব কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল[২]!'

قَالُوۡا بَلۡ اَنۡتُمۡ ۟ لَا مَرۡحَبًۢا بِكُمۡ ؕ اَنۡتُمۡ قَدَّمۡتُمُوۡهُ لَنَا ۚ فَبِئۡسَ الۡقَرَارُ ﴿۶۰﴾

৬১. তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! যে এটাকে আমাদের সম্মুখীন করেছে, আগুনে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিন।'

قَالُوۡا رَبَّنَا مَنۡ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدۡهُ عَذَابًا ضِعۡفًا فِى النَّارِ ﴿۶۱﴾

৬২. তারা আরও বলবে, 'আমাদের কী হল যে, আমরা যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না[৩]।

وَقَالُوۡا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمۡ مِّنَ الۡاَشۡرَارِ ؕ ﴿۶۲﴾

করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে বের হয়ে আসা রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি জাতীয় নোংরা তরল পদার্থ এবং চোখের পানিও এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অত্যন্ত ও চরম ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম দুর্গন্ধযুক্ত পচা জিনিস। কিন্তু প্রথম অর্থেই এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার হয়, যদিও বাকি দু'টি অর্থও আভিধানিক দিক দিয়ে নির্ভুল। [তাবারী]

(১) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর দ্বারা প্রচণ্ড শীত বোঝানো হয়েছে। আর ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, অনুরূপ। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, এটা অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে। [তাবারী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, তারা জান্নাতীদেরকে দেখতে পাবে না। তখন বলবে, আমরা দুনিয়াতে তাদেরকে উপহাস করতাম, এখন তো তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। নাকি তারা জাহান্নামেই আছে তবে আমাদের চোখ তাদেরকে পাচ্ছে না? [তাবারী]

৬৩. 'তবে কি আমরা তাদেরকে (অহেতুক) ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে[১]?'

أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٦٣﴾

৬৪. নিশ্চয় এটা বাস্তব সত্য--- জাহান্নামীদের এ পারস্পরিক বাদ-প্রতিবাদ ।

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿٦٤﴾

---

(১) ফলে চোখ তাদের দেখতে পাচ্ছে না? [তাবারী] ইবন কাসীর বলেন, বস্তুত এটি এক উদাহরণ । নতুবা সকল কাফেরের অবস্থাই এ রকম । তারা বিশ্বাস করত যে, মুমিনরা জাহান্নামে যাবে । তারপর যখন তারা জাহান্নামে যাবে আর সেখানে মুমিনদের খুঁজতে থাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে সেখানে পাবে না । তখন তারা বলবে যে, 'আমাদের কী হল যে, আমরা যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, 'আমরা তো দুনিয়াতে তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; এরপর তারা নিজেদেরকে শুধুই অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে বলবে, নাকি তারা আমাদের সাথেই জাহান্নামে আছে তবে তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? তখন তারা জানতে পারবে যে, মূলত: তারা জান্নাতের সুউচ্চ স্তরে রয়েছে । আর সেটাই হচ্ছে তা যা অন্যত্র বলা হয়েছে, " আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি । তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ ।' অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর--- 'যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করত এবং সে পথে জটিলতা খুঁজে বেড়াত; এবং তারা আখেরাতকে অস্বীকারকারী ছিল ।' আর তাদের উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে । আর আ'রাফে কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনবে । আর তারা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের উপর সালাম ।' তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাংখা করে । আর যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না ।' আর আ'রাফবাসীরা এমন লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তারা বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না ।' এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে) 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না ।" [৪৪-৪৯] [ইবন কাসীর]

পঞ্চম রুকূ'

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৫. বলুন, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং সত্য কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী ।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৬. 'যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, প্রবল পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল ।'

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭. বলুন, 'এটা এক মহাসংবাদ,

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. 'যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. 'ঊর্ধ্বলোক সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন তারা বাদানুবাদ করছিল[১] ।

(১) অর্থাৎ আমার রেসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জানার কথা নয় । এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । [ইবন কাসীর] ফেরেশতাগণ বলেছিল, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে? [কুরতুবী] এসব কথাবার্তাকে এখানে اختصام বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ "ঝগড়া করা" অথবা "বাকবিতণ্ডা করা" । অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল । কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اختصام শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে ।
উপরোক্ত তাফসীর ছাড়াও এ বিবাদের আরেক অর্থ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার রব আজ স্বপ্নে আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে আসেন । তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন কি নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে ঝগড়া হচ্ছে? আমি বললাম: না, তারপর তিনি তাঁর হাত আমার কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, এমনকি আমি তার শীতলতা আমার গলা ও বক্ষদেশে

৭০. 'আমার কাছে তো এ ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

إِن يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٧٠

৭১. স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদা থেকে,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝٧١

৭২. 'অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো।'

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ۝٧٢

৭৩. তখন ফেরেশ্‌তারা সকলেই সিজ্‌দাবনত হল---

فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝٧٣

৭৪. ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٧٤

অনুভব করি। তখন জানতে পারলাম আসমানে ও যমীনে যা আছে তা। বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন ঊর্ধ্বলোকে কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, বললেন, কাফফারা নিয়ে। কাফফারা হচ্ছে, সালাতের পরে মসজিদে অবস্থান করা এবং জামা'আতের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া; আর কষ্টকর জায়গায় অযুর পানি পৌঁছানো। যে ব্যক্তি এটা করবে সে কল্যাণের সাথে জীবন অতিবাহিত করবে এবং কল্যাণের সাথে মারা যাবে। আর সে তার গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে যেমন তার মা তাকে প্রথম জন্ম দিয়েছিল। আরও বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যখন সালাত আদায় করবেন তখন বলবেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণকর কাজ করার সামর্থ চাই, অন্যায়-অশ্লীলতা পরিত্যাগ করার সামর্থ চাই এবং দরিদ্রদের ভালবাসার তাওফীক চাই। আর যখন আপনি আপনার বান্দাদেরকে কোন পরীক্ষায় নিপতিত করতে চান তখন আমাকে আপনার কাছে বিনা পরীক্ষায় নিয়ে নিন'। অনুরূপভাবে (ঊর্ধ্বালোকের আরেকটি) বিবাদের বিষয় হচ্ছে, 'দারাজাহ' বা উচ্চ পদ মর্যাদা সম্পর্কে। 'দারাজাহ' বা উচ্চ পদ মর্যাদা হচ্ছে, প্রথম সালাম দেয়া, খাবার খাওয়ানো এবং মানুষ যখন ঘুমায় তখন সালাত আদায় করা।' [তিরমিযী:৩২৩৫] তবে হাফেয ইবনে কাসীর প্রথম তাফসীরটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ ٧٥

৭৫. তিনি বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাতে[১] সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?'

قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ ٧٦

৭৬. সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে।'

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ ٧٧

৭৭. তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কেননা নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।

وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٧٨

৭৮. 'আর নিশ্চয় তোমার উপর আমার লা'নত থাকবে, কর্মফল দিন পর্যন্ত।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ٧٩

৭৯. সে বলল, 'হে আমার রব! অতএব আপনি আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যে দিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ٨٠

৮০. তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে---

(১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর হাত রয়েছে। তবে সেটার স্বরূপ আমরা জানি না। [ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্পর্কযুক্ত গ্রন্থ, আল-ফিকহুল আকবার: ২৭] আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে নিজ দু' হাতে সৃষ্টি করেছেন। অন্য হাদীসে তাওরাত লেখার কথাও এসেছে। [বুখারী: ৬৬১৪] তাছাড়া তিনি জান্নাতও নিজ হাতে তৈরী করেছেন। [মুসলিম: ১৮৯] অনুরূপভাবে তিনি নিজ হাতে একটি কিতাব লিখে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন যাতে লিখা আছে যে, তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে। [ইবন মাজাহ: ১৮৯] [বিস্তারিত দেখুন, উমর সুলাইমান আল-আশকার, আল -আকীদা ফিল্লাহ: ১৭৭-১৭৮]

৮১. 'নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

৮২. সে বলল, 'আপনার ক্ষমতা-সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩. 'তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. তিনি বললেন, 'তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি--

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

৮৫. 'অবশ্যই তোমার দ্বারা ও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সবার দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. বলুন, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অন্তর্ভুক্ত নই[১]।'

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এ তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ মাত্র[২]।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন আমি তা থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে বলব না, এর বাইরে বাড়তি কিছুই আমি চাই না। বরং আমাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই আমি আদায় করে দিয়েছি। আমি এর চেয়ে কোন কিছু বাড়াবোও না, কমাবোও না। আমি তো শুধু এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতই কামনা করি। [ইবন কাসীর] মাসরূক বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের নিকট আসলাম। তিনি বললেন, হে মানুষ! তোমরা কোন কিছু জানলে বলবে। আর না জানলে বলবে, আল্লাহ্ জানেন। কেননা, জ্ঞানের কথা হচ্ছে, কেউ যদি কোন কিছু না জানে তবে বলবে, আল্লাহ্ জানেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে বলেছেন, "বলুন, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অন্তর্ভুক্ত নই" [বুখারী: ৪৭৭৪; মুসলিম: ২৭৯৮]

(২) অর্থাৎ এ কুরআন সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ মাত্র। এটা জিন ও ইনসানকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কাজে আসে। [মুয়াসসার]

৮৮. আর এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুদিন পরে[১] ।

وَلَتَعۡلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعۡدَ حِيۡنٍ ﴿٨٨﴾

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা কয়েক বছরের মধ্যে স্বচক্ষে দেখে নেবে আমি যা বলছি তা সঠিক প্রমাণিত হবেই । আর যারা মরে যাবে তারা মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করার পরপরই জানতে পারবে, আমি যা কিছু বলছি তা-ই প্রকৃত সত্য । [দেখুন, তাবারী, ইবন কাসীর]

৩৯- সূরা আয-যুমার
৭৫ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الزُّمَرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. এ কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হওয়া ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

২. নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি । কাজেই আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে ।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

৩. জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য । আর যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দেবে(১) ।' তারা যে

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

(১) মক্কার কাফের-মুশরিকরা অনুরূপ দুনিয়ার সব মুশরিকও একথাই বলে থাকে যে, আমরা স্রষ্টা মনে করে অন্যসব সত্তার ইবাদাত করি না । আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত স্রষ্টা বলে মানি এবং সত্যিকার উপাস্য তাকেই মনে করি । যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু । আমরা সেখানে কি করে পৌঁছতে পারি? তাই এসব বুজুর্গ সত্তাদেরকে আমরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন । অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি । এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য, ও শক্তি-বল কিছুই নেই । তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল । রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে । তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে । কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় । প্রথমতঃ এসব মূর্তি-বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয় । হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না । আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে ।

বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সে ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত দেন না।

৪. আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল প্রতাপশালী।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

৫. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। সুতরাং তারা একদিকে আল্লাহ্র বান্দাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, অপরদিকে আল্লাহ্ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করছে। তারা আল্লাহ্কে অত্যাচারী জালেম বাদশাদের মত মনে করছে, অথচ আল্লাহ্ সবার ডাকেই সাড়া দেন। তাঁর কাছে কারও অভাব গোপন নাই যে তাকে মাধ্যম ধরে জানাতে হবে। তাছাড়া তারা এ সমস্ত উপাস্যদের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। কোন কোন সত্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে দুনিয়ার মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে। কেননা, কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই ঐক্যমত হওয়া সম্ভব। শির্কের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐক্যমত হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এই ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে অযৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। তাই এ ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। [দেখুন, তাবারী; সা'দী; মাকরিযী , তাজরীদুত তাওহীদিল মুফীদ; ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ওয়াসিতা বাইনাল হাক্কি ওয়াল খালক, ১৫-১৮; ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান, ৩৩৯-৩৪৪; আরও দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস, ১১৯৯-১২১১]

আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা[১]। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। তারপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন[২]। আর তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন‘আম[৩]। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। অতঃপর তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۝

৭. যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ

(১) تكوير অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেয়া। কুরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تكوير শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়। [তাবারী]

(২) একথার অর্থ এ নয় যে, প্রথমে আদম থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে বক্তব্যের মধ্যে সময়ের পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বর্ণনার পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষায়ই এ ধরনের দৃষ্টান্ত বর্তমান। যেমন, আমরা বলি তুমি আজ যা করেছো তা জানি এবং গতকাল যা করেছো তাও আমার জানা আছে। এ ধরনের বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, গতকালের ঘটনা আজকের পরে সংঘটিত হয়েছে। [দেখুন, তাবারী]

(৩) আল-আন‘আম বলতে গবাদি পশু বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে আট জোড়া, কারণ; গবাদি পশু অর্থ উট, গরু, ভেড়া, বকরী। এ চারটি নর ও চারটি মাদি মিলে মোট আটটি নর ও মাদি হয়। [তাবারী,কুরতুবী]

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

নন[১]। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য তা-ই পছন্দ করেন। আর কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদের ফিরে যাওয়া। তখন তোমরা যা আমল করতে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। নিশ্চয় অন্তরে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

৮. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। তারপর যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় তার আগে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অন্যকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, 'কুফরীর জীবন তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।'

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের কুফরীর কারণে তাঁর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হতে পারে না। তোমাদের ঈমান দ্বারাও আল্লাহর কোন উপকার হয় না তোমরা মানলেও তিনি আল্লাহ, না মানলেও তিনি আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায় তাঁর কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের মানা বা না মানাতে কিছু আসে যায় না। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, 'আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার কোন সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতেও আমার বাদশাহীর কোন ক্ষতি হবে না।' [মুসলিম:২৫৭৭]

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

৯. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে[১] সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে[২] এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?' বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় রুকূ'

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِى هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

১০. বলুন, 'হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত[৩], ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে

---

(১) ﴿آنَاءَ الَّيْلِ﴾ এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে আখেরাতের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও آناء اليل বলেছেন ।[ইবন কাসীর, তাবারী]

(২) তবে মৃত্যুর সময় আশাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার কাছে প্রবেশ করে বললেন, তোমার কেমন লাগছে? লোকটি বলল, আমি আশা করছি এবং ভয়ও পাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুটি বস্তু অর্থাৎ আশা এবং ভয় যে অন্তরে এ সময় একত্রিত হবে আল্লাহ্ তাকে তার আশার বিষয়টি দিবেন এবং ভয়ের বিষয়টি থেকে দূরে রাখবেন ।[তিরমিযী: ৯৮৩]

(৩) মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্‌র যমীন যেহেতু প্রশস্ত সুতরাং তোমরা তাতে হিজরত কর, জিহাদ কর এবং মূর্তি থেকে দূরে থাক। আতা বলেন, আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত সুতরাং তোমাদেরকে গুনাহর দিকে ডাকা হয় তবে সেখান থেকে চলে যেও। [ইবন কাসীর]

বিনা হিসেবে[১] ।'

১১. বলুন, 'আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদাত করতে;

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾

১২. 'আরও আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি যেন প্রথম মুসলিম হই ।'

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

১৩. বলুন, 'আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির ।'

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

১৪. বলুন, 'আমি 'ইবাদাত করি আল্লাহ্‌রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে ।

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى ﴿١٤﴾

১৫. 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছে তার 'ইবাদাত কর ।' বলুন, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে[২] । জেনে রাখ, এটাই

فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾

(১) অর্থ সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়- অপরিসীম ও অগণিত দেয়া হবে । কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবী করে আদায় করতে হয় । কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবী ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে । ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতে صَابِرِيْنَ এর অর্থ নিয়েছেন, যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দু:খ-কষ্টে সবর করে । কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صابر বলা হয়েছে । কুরতুবী বলেন صَابِرُوْنَ শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী । পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারী অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয় । তবে সত্যনিষ্ঠ একদল মুফাফসিরের মতে এখানে صابر বলে সাওম পালনকারীদের বোঝানো হয়েছে ।[দেখুন, কুরতুবী, তাবারী]

(২) কারণ তারা এবং তাদের পরিবারের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ হয়ে গেছে । এরা আর কোন

সুস্পষ্ট ক্ষতি ।'

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের জন্য থাকবে তাদের উপরের দিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও আচ্ছাদন। এ দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর ।

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৭. আর যারা তাগূতের ইবাদাত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ । অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে---

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

১৮. যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে । তাদেরকেই আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন আর তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন ।

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾

১৯. যার উপর শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে; আপনি কি রক্ষা করতে পারবেন সে ব্যক্তিকে, যে আগুনে (জাহান্নামে) আছে?

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

২০. তবে যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ[১], যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত;

দিন একত্রিত হতে পারবে না। চাই তাদের পরিবার জান্নাতে যাক বা তারা সবাই জাহান্নামে যাক । কোন অবস্থাতেই তাদের আর একসাথে হওয়া ও আনন্দিত হওয়া সম্ভব নয় । [ইবন কাসীর]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে উঁচু কামরা সমূহ দেখবে, যেমন দেখা যায় আকাশের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল তারকা । [বুখারী: ৩২৫৬; মুসলিম: ২৮৩১]

এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।

২১. আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন তারপর তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে আপনি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পান, অবশেষে তিনি সেটাকে খড়-কুটোয় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

তৃতীয় রুকূ'

২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার রবের দেয়া নূরের উপর রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য(১) এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে,

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ

---

(১) মুজাহিদ বলেন, পুরো কুরআনই সামঞ্জস্যপূর্ণ পুনঃ পুনঃ পঠিত। কাতাদাহ বলেন, এক আয়াত অন্য আয়াতের মত। দাহহাক বলেন, কুরআনে কোন কথাকে বারবার বলা হয়েছে যাতে করে তাদের রবের কথা বুঝা সহজ হয়। হাসান বসরী বলেন, কোন সুরায় একটি আয়াত আসলে অন্য সুরায় অনুরূপ আয়াত পাওয়া যায়। আব্দুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন আসলাম বলেন, বারবার নিয়ে আসা হয়েছে যেমন মুসাকে কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, অনুরূপ সালেহ, হূদ ও অন্যান্য নবীদেরকেও। [ইবন কাসীর] কাতাদা বলেন, এখানে ফরয বিষয়াদি, বিচারিক বিষয়াদি ও শরী'আত নির্ধারিত সীমারেখার কথা বারবার এসেছে। [তাবারী]

تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহ্‌র হিদায়াত, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হেদায়াতকারী নেই।

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْۤءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মত যে নিরাপদ?) আর যালিমদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা অর্জন করতে তা আস্বাদন কর[১]।'

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে শাস্তি এমনভাবে তাদেরকে গ্রাস করল যে, তারা অনুভবও করতে পারেনি।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন, আর আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠিন। যদি তারা জানত!

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে,

---

(১) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?" [সূরা আল-মুলক: ২২] আরও এসেছে, "যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।" [সূরা আল-কামার: ৪৮] আরও এসেছে, "যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে? তোমরা যা ইচ্ছে আমল কর।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪০]

قُرۡاٰنًا عَرَبِیًّا غَیۡرَ ذِیۡ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمۡ یَتَّقُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮. আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیۡهِ شُرَکَآءُ مُتَشٰکِسُوۡنَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلۡ یَسۡتَوِیٰنِ مَثَلًا ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ ۚ بَلۡ اَکۡثَرُهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত; এ দু'জনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না[১]।

اِنَّکَ مَیِّتٌ وَّ اِنَّهُمۡ مَّیِّتُوۡنَ ﴿۫۳۰﴾

৩০. আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

ثُمَّ اِنَّکُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ عِنۡدَ رَبِّکُمۡ تَخۡتَصِمُوۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১. তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবের সামনে পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করবে[২]।

فَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ کَذَبَ عَلَی اللّٰهِ وَ کَذَّبَ بِالصِّدۡقِ اِذۡ جَآءَهٗ ؕ اَلَیۡسَ فِیۡ جَهَنَّمَ مَثۡوًی لِّلۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۳۲﴾

৩২. সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এটা বাতিল ইলাহ ও সত্য ইলাহের জন্য দেয়া উদাহরণ। [তাবারী] অর্থাৎ মুশরিক ও প্রকৃত মুমিন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত নাযিল হলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুনিয়াতে আমরা যে ঝগড়া করছি সেটা কি আবার আখেরাতেও হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তখন যুবাইর বললেন, বিষয়টি তাহলে ভয়াবহ। [তিরমিযী: ৩২৩৬] ইবন উমর বলেন, আমরা এ আয়াত নাযিল হয়েছে জানতাম কিন্তু কেন নাযিল হলো বুঝতে পারিনি। আমরা বলতাম, কার সাথে আমরা ঝগড়া করব? আমাদের মধ্যে এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে তো কোন ঝগড়া নেই। অবশেষে যখন মুসলিমদের মাঝে ফেতনা শুরু হলো তখনই বুঝতে পারলাম যে, এটাই আমাদের রবের পক্ষ থেকে যে ঝগড়ার ওয়াদা করা হয়েছিল তা। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুত্তাকী।

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদের জন্য তা-ই থাকবে যা চাইবে তারা তাদের রবের নিকট। এটাই মুহসিনদের পুরস্কার।

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যাতে এরা যেসব মন্দকাজ করেছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেন এবং এদেরকে এদের সর্বোত্তম কাজের জন্য পুরস্কৃত করেন।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়[১]। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই।

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর যাকে আল্লাহ্ হেদায়াত করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই; আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে

(১) অর্থাৎ তারা আপনাকে তাদের উপাস্য মা'বুদদের ভয় দেখায়। [তাবারী]

চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারীগণ তাঁর উপরই নির্ভর করে।

৩৯. বলুন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করতে থাক, নিশ্চয় আমি আমার কাজ করব[১]। অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে[২]---

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣٩﴾

৪০. 'কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর আপতিত হবে তার উপর স্থায়ী শাস্তি।'

مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪১. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্য; তারপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য, আর আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন[৩]।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪২. আল্লাহ্ই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

---

(১) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ আমিও আমার পূর্ববর্তী নবীদের মত করে ধীরে ধীরে কাজ করে যাব। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব আসবে, তখন আমাদের মধ্যে কে হকপথে আছে আর কে বাতিল পথে আছে, কে পথভ্রষ্ট আর কে সঠিক পথে আছে তা তখনই জানা যাবে। [তাবারী]

(৩) অনুরূপ আয়াত দেখুন, সূরা আল-ইসরা: ১৫।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য[১]। নিশ্চয় এতে নিদর্শন

---

(১) توفى এর শাব্দিক অর্থ লওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্ তা'আলার আয়ত্ত্বাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে বা ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার করায়ত্তে চলে যায় এবং ফিরিয়ে দেয়ার পর জাগ্রত হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না। প্রাণ হরণ করা অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহিক্যভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। আলোচ্য আয়াতে توفى শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে প্রথমে বড় মৃত্যুর কথা পরে ছোট মৃত্যু বা ঘুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও দু'ধরনের মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ "তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। তারপর দিনে তোমাদেরকে তিনি আবার জীবিত করেন যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের ফিরে যাওয়া। তারপর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" [সূরা আল-আন'আম:৬০] এখানে প্রথমে ছোট মৃত্যু বা ঘুমের কথা, পরে বড় মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

মোটকথা: এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে এ অনুভূতি দিতে চাচ্ছেন যে, জীবন ও মৃত্যু কিভাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার করায়ত্ব। শয়নে, জাগরণে, ঘরে অবস্থানের সময় কিংবা কোথাও চলাফেরা করার সময় মানব দেহের আভ্যন্তরীণ কোন ক্রুটি অথবা বাইরের অজানা কোন বিপদ অকস্মাৎ এমন মোড় নিতে পারে যা তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। যে মানুষ আল্লাহর হাতে এতটা অসহায় সে যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে এতটা অমনোযোগী ও বিদ্রোহী হয় তাহলে সে কত অজ্ঞ। সে জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাবার আগে এবং ঘুম থেকে উঠে যে দো'আ করতেন তাতে রূহ ফেরত পাওয়ায় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন। হাদীসে এসেছে, তিনি ঘুমাবার সময় বলতেন: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি মারা যাই এবং জীবিত হই।" আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ "সকল

রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।

৪৩. তবে কি তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলুন, 'তারা কোন কিছুর মালিক না হলেও এবং তারা না বুঝলেও?'

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. বলুন, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন, আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা তাঁরই, তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।'

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর যখন শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হয় তখন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য মাবুদগুলোর উল্লেখ করা হলে তখনই তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. বলুন, 'হে আল্লাহ্, আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন যাতে তারা মতবিরোধ করছে[১]।'

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন। আর তাঁর কাছেই আমরা উত্থিত হবো।" [বুখারী: ৬৩১২]

(১) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত কি দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন, তখন এ দো'আ পাঠ করতেন: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ؛

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝٤٧

৪৭. আর যারা যুলুম করেছে, যদি যমীনে যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং তার সাথে এর সমপরিমাণও তাদের হয়, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণস্বরূপ তার সবটুকুই তারা দিয়ে দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা ধারণাও করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٤٨

৪৮. আর তারা যা অর্জন করেছিল তার মন্দ ফল তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۖ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۗ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٩

৪৯. অতঃপর যখন কোন বিপদ-আপদ মানুষকে স্পর্শ করে, তখন সে আমাদেরকে ডাকে; তারপর যখন তাকে আমরা আমাদের কোন নিয়ামতের অধিকারী করি তখন সে বলে, 'আমাকে এটা দেয়া হয়েছে কেবল আমার জ্ঞানের কারণে।' বরং এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই তা জানে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٥٠

৫০. অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীরা এটা বলত, কিন্তু তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ হে আল্লাহ্‌! জিবরীল, মীকাইল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমানসমূহ ও যমীনের প্রভু, গায়েব ও প্রত্যক্ষ সবকিছুর জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করছে তাতে ফয়সালা করবেন। যে ব্যাপারে মতবিরোধ করা হয়েছে তাতে আপনার অনুমতিক্রমে আমাকে সত্য-সঠিক পথ দিন। নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সোজা পথের হেদায়েত করেন। [মুসলিম: ৭৭০]

৫১. সুতরাং তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের উপরও শীঘ্রই আপতিত হবে তারা যা অর্জন করেছে তার মন্দ ফল এবং তারা অপারগ করতে পারবে না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

৫২. তারা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে রিযিক প্রশস্ত করেন, আর সীমিত করেন? নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৫৩. বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ---আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু(১)।'

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর তোমাদের কাছে শাস্তি আসার আগে; তার পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরজ করল: আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। [বুখারী: ৪৮১০, মুসলিম: ১২২]

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٥٥

৫৫. আর তোমরা তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর(১), তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না ।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۝٥٦

৫৬. যাতে কাউকেও বলতে না হয়, 'হায় আফসোস! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য(২)! আর আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম ।'

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٥٧

৫৭. অথবা কেউ যেন না বলে, 'হায়! আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত

---

(১) এখানে উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে । সমগ্র কুরআনই উত্তম । একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে কুরআন । অথবা, আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম দিকসমূহ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ তা পালন করবে । তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে এবং উপমা ও কিস্সা-কাহিনীতে যা বলেছেন তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে । অপরদিকে যে ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিষিদ্ধ কাজসমূহ করে এবং আল্লাহর উপদেশ বাণীর কানা কড়িও মূল্য দেয় না, সে আল্লাহর কিতাবের এমন দিক গ্রহণ করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম দিক বলে আখ্যায়িত করে । [মুয়াসসার]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক জাহান্নামবাসীকেই জান্নাতে তার যে স্থানটি ছিল তা দেখানো হবে, তখন সে বলবে, হায় যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত করত ফলে তা তার জন্য আফসোসের কারণ হবে । আর প্রত্যেক জান্নাতবাসীকেই জাহান্নামে তার যে স্থানটি ছিল তা দেখানো হবে; তখন সে বলবে, হায় যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত না করত তবে আমার কি হতো! ফলে সেটা তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হিসেবে দেখা দিবে । তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ।' [মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৪৩৫]

হতাম।'

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. অথবা শাস্তি দেখতে পেলে যেন কাউকেও বলতে না হয়, 'হায়! যদি একবার আমি ফিরে যেতে পারতাম তবে আমি মুহসিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!'

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. হ্যাঁ, অবশ্যই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোতে মিথ্যারোপ করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে; আর তুমি ছিলে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. আর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারাসমূহ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে[১]। আর যারা আল্লাহ্‌র

---

(১) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুকায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করবেন আর যাকে ইচ্ছা দান করেন না। [মুয়াসসার, তাবারী]

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾

আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

সপ্তম রুকূ'

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. বলুন, 'হে অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের 'ইবাদাত করতে নির্দেশ দিচ্ছ?'

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. 'বরং আপনি আল্লাহ্রই 'ইবাদাত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।'

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর তারা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে[১]। পবিত্র ও

(১) কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। যার স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এ আয়াতের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এ দু'টি আল্লাহর অন্যান্য গুণাগুণের মতই দু'টি গুণ। এগুলোতে বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর অর্থ সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু পরিচিত কোন অবয়ব দেয়া যাবে না। একথা মানতে হবে যে, আল্লাহর সত্ত্বা যেমন আমরা না দেখে সাব্যস্ত করছি তেমনিভাবে তার গুণও নাদেখে সাব্যস্ত করব। যমীন আল্লাহ তা'আলার হাতের মুঠিতে থাকা এবং আসমান ডান হাতে পেঁচানো থাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সঠিক মর্যাদা, বড়ত্ব ও সম্মান সম্পর্কে মানুষকে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের

মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের উর্ধ্বে।

৬৮. আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে[১], ফলে

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ

অনুমান করতেও অক্ষম) নিজ চোখে দেখতে পাবে যমীন ও আসমান আল্লাহর হাতে একটা নগণ্যতম বল ও ছোট একটি রুমালের মত। হাদীসে এসেছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা দানের সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে (অর্থাৎ গ্রহসমূহকে) তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে। এবং বলবেনঃ আমি একমাত্র আল্লাহ্। আমি বাদশাহ। আমি সর্বশক্তিমান। আমি বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ? কোথায় শক্তিমানরা? কোথায় অহংকারীরা? এভাবে বলতে বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে কাঁপতে থাকলেন যে, তিনি মিম্বারসহ পড়ে না যান আমাদের সে ভয় হতে লাগলো। [মুসলিম:২৭৮৮] অপর হাদীসে এসেছে, ইয়াহূদী এক আলেম এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমরা আমাদের কিতাবে পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে রাখবেন, যমীনসমূহকে অপর আঙ্গুলে রাখবেন, গাছ-গাছালীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন, পানি ও মাটিকে এক আঙ্গুলে রাখবেন আর সমস্ত সৃষ্টিকে অপর আঙ্গুলে রাখবেন, তারপর বলবেন: আমিই বাদশাহ্! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ইয়াহূদী আলেমের বক্তব্যের সমর্থনে এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [বুখারী: ৪৮১১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে মুষ্ঠিবদ্ধ করবেন আর আসমানসমূহকে ডানহাতে গুটিয়ে রাখবেন তারপর বলবেন: আমিই বাদশাহ্! কোথায় দুনিয়ার বাদশাহ্রা? [বুখারী: ৪৮১২, মুসলিম: ২৭৮১] অপর এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! "কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।" সেদিন ঈমানদারগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: হে আয়েশা! সিরাতের (পুলসিরাতের) উপরে থাকবে। [তিরমিযী: ৩২৪২]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিভাবে আমি শান্তিতে থাকব অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ইসরাফীল) শিঙ্গা মুখে পুরে আছে, তার কপাল টান করে আছে এবং কান খাড়া করে আছে, অপেক্ষা করছে কখন তাকে ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে আর সে ফুঁক দিবে। তখন মুসলিমরা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে আমরা কি বলবো? তিনি বললেন, তোমরা বলো, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ رَبِّنَا

فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

আসমানসমূহে যারা আছে ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই বেহুশ হয়ে পড়বে, যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন তারা ছাড়া[১]। তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে[২], ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর যমীন তার প্রভুর নূরে উদ্ভাসিত হবে এবং আমলনামা পেশ করা হবে। আর নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে[৩] এবং সকলের মধ্যে ন্যায়

'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ঠ; আর তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আমাদের রব আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করছি।' [তিরমিযী:৩২৪৩]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর প্রথম আমি মাথা উঠাবো তখন দেখতে পাবো যে, মূসা 'আরশ ধরে আছেন। আমি জানিনা তিনি কি এভাবেই ছিলেন নাকি শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পরে হুশে এসে এরূপ করেছেন। [বুখারী: ৪৮১৩]

(২) প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁক দেয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বর্ণনায় এক হাদীসে এসেছে যে, তা চল্লিশ হবে। বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন: চল্লিশ দিন? তিনি বললেন: আমি তা বলতে অস্বীকার করছি। তারা বললো: চল্লিশ বছর? তিনি বললেন: আমি তাও বলতে অস্বীকার করছি। তারা বললো: চল্লিশ মাস? তিনি বললেন: আমি তাও অস্বীকার করছি। আর মানুষের সবকিছুই পঁচে যাবে তবে তার নিম্নাংশের এক টুকরো ছাড়া। যার উপর মানুষ পুনরায় সংযোজিত হবে। [বুখারী: ৪৮১৪]

(৩) অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত নবী-রাসুলগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় থাকবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ "অতঃপর যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা হবে ?" [সূরা আন-নিসা: ৪১] অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণও। যেমন, এক আয়াতে আছে, ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ "আর সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী।" [সূরা ক্বাফ: ২১]। তদ্রূপ উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ "এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষের জন্য।" [সূরা আল-হাজ্জ:৭৮]

বিচার করা হবে এমতাবস্থায় যে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

৭০. আর প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

অষ্টম রুকূ'

৭১. আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে[১]। অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে আসবে তখন এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে,

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

কোন কোন মুফাসসিরের মতে, আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়েছেন তারাও থাকবেন এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "আর এদের হাত কথা বলবে আমাদের সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের।" [সূরা ইয়াসীন:৬৫] [আরো দেখুন-কুরতুবী]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা কাফের দূর্ভাগাদের অবস্থা বর্ণনা করছেন, কিভাবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে সেদিকে অত্যন্ত কঠোর, ধমক ও কর্কশভাবে নেয়া হবে। যেমন অন্যত্র বলেছেন, "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে" [সূরা আত-তূর: ১৩] এমতাবস্থায় যে, তারা থাকবে পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।" [সূরা মারইয়াম: ৮৬] তাদের অবস্থা হবে এমন যে, তারা বোবা, বধির ও অন্ধ হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক পাবেন না। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব।" [সূরা আল-ইসরা: ৯৭]

‘তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?’ তারা বলবে, ‘অবশ্যই হ্যাঁ।’ কিন্তু শাস্তির বাণী কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭২. বলা হবে, ‘তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!’

قِيلَ ادْخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি ‘সালাম’, তোমরা ভাল ছিলে[১] সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।’

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰىٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর তারা (প্রবেশ করে) বলবে, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেছেন[২] এবং

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ

(১) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে করতে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ যে ওয়াদা তিনি তার সম্মানিত রাসূলদের মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে দিয়েছেন। যেমন তারা দুনিয়াতেও এ দো‘আ করেছিল “হে আমাদের রব! আপনার রাসূলগণের

نَشَآءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾

আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ যমীনের; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছে বসবাসের জায়গা করে নেব।' অতএব নেক আমলকারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

وَتَرَى الْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর আপনি ফেরেশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" [সূরা আলে ইমরান: ১৯৪]

৪০- সূরা আল-মু'মিন
৮৫ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম[১] ।

حٰمٓ ①

২. এ কিতাব নাযিল হয়েছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ---

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ②

৩. পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী, অনুগ্রহ বর্ষনকারী। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্ নেই। ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৪. আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বিতর্ক কেবল তারাই করে যারা কুফরী করেছে; কাজেই দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ④

৫. তাদের আগে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অনেক দলও মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ রাসূলকে পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑤

---

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক জেহাদের রাত্রিকালীন হেফাযতের জন্যে বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে حم لَا يُنْصَرُوْنَ পড়ে নিও। অর্থাৎ হা-মীম শব্দ দ্বারা দো'আ করতে হবে যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে حم لَا يُنْصَرُ (নুন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম-বললে শত্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শত্রু থেকে হেফাযতের দুর্গ।[তিরমিযী ১৬৮২, আবু দাউদ: ২৫৭৯]

পাকড়াও করলাম। সুতরাং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

৬. আর যারা কুফরী করেছে, এভাবেই তাদের উপর সত্য হল আপনার রবের বাণী যে, এরা জাহান্নামী।

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝

৭. যারা 'আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আপনি তাদের রক্ষা করুন।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

৮. 'হে আমাদের রব! আর আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৯. 'আর আপনি তাদেরকে অপরাধের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে (অপরাধের) খারাপ পরিণতি হতে রক্ষা করবেন, তাকে অবশ্যই অনুগ্রহ করবেন; আর এটাই মহাসাফল্য!'

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

দ্বিতীয় রুকূ'

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের অসন্তোষের চেয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ছিল অধিকতর--- যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি ডাকা হয়েছিল কিন্তু তোমরা তার সাথে কুফরী করেছিলে।'

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾

১১. তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোন পথ আছে কি[১]?'

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

১২. 'এটা এজন্যে যে, যখন একমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকা হত তখন তোমরা কুফরী করতে, আর যখন তাঁর সাথে শির্ক করা হত তখন তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে।' সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্‌রই।

---

(১) দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন বলতে বুঝানো হয়েছে তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনি তোমাদের প্রাণ দান করেছেন। এরপর তিনি পুনরায় তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন। কাফেররা এসব ঘটনার প্রথম তিনটি অস্বীকার করে না। কারণ, ঐগুলো বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সে জন্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তারা শেষোক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হওয়া অস্বীকার করে। কারণ, এখনো পর্যন্ত তারা তা প্রত্যক্ষ করেনি এবং শুধু নবী-রসূলগণই এটির খবর দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এ চতুর্থ অবস্থাটিও তারা কার্যত দেখতে পাবে এবং তখন স্বীকার করবে যে, আমাদেরকে যে বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছিলো তা প্রকৃতই সত্যে পরিণত হলো। [দেখুন, তাবারী]

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য রিযিক নাযিল করেন। আর যে আল্লাহ্-অভিমুখী সেই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

১৫. তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আর্‌শের অধিপতি[১], তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে স্বীয় আদেশ হতে ওহী প্রেরণ করেন[২], যাতে তিনি সতর্ক করেন সম্মেলন দিবস[৩] সম্পর্কে।

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. যেদিন তারা (লোকসকল) প্রকাশিত হবে সেদিন আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহ্‌রই, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী[৪]।

---

(১) এর আরেক অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহর আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা আল-মা'আরেজে বলা হয়েছে ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ এ আয়াতে উল্লেখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হলে সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। এ ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদদের কাছে অগ্রগণ্য। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তাআলা মুমিন-মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কুরআনের অন্যান্য আয়াত এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে, ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ﴾ [সূরা আল-আন'আম:৮৩] অন্য এক আয়াতে আছে, ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ﴾ [সূরা আলে ইমরান: ১৬৩]

(২) রূহ অর্থ অহী ও নবুওয়াত।[কুরতুবী]

(৩) কিয়ামতের একটি নাম ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ বা সম্মেলন দিবস। [তাবারী]

(৪) উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ ও ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ﴾ এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ তথা সাক্ষাত ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে।

১৭. আজ প্রত্যেককে তার অর্জন অনুসারে প্রতিফল দেয়া হবে; আজ কোন যুলুম নেই[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ⑰

এমনিভাবে ﴿يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ﴾ এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে নতুন ভুপৃষ্ঠ সমতল করে দেয়া হবে, যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এরপরে ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ﴾ বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যত: বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু একটি হাদীসে এসেছে "কিয়ামতের প্রারম্ভে আহবানকারী আহবান করে বলবেন: হে লোক সকল! তোমাদের কিয়ামত এসেছে, তখন জীবিত মৃত সবাই শুনতে পাবে। আর আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে এসে বললেন: আজকের দিনে কার রাজত্ব? একমাত্র পরাক্রম আল্লাহর জন্যই। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৭৫, ৩৬৩৭] তাছাড়া অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং জিবরাইল, মীকাইল, ইস্রাফীল, প্রমূখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণও মারা যাবে এবং আল্লাহ্র সত্ত্বা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ বলবেন, আজকের দিন রাজত্ব কার? আল্লাহ নিজেই জওয়াব দেবেন: প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর!' হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবী এবং সমগ্র আসমানসমূহকে হাতে গুটিয়ে বলবেন: আমিই বাদশাহ! আমিই পরাক্রমশালী, আমি অহংকারী, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়? কোথায় পরাক্রমশালীরা? কোথায় অহংকারকারীরা? [বুখারী: ৭৪১২; মুসলিম: ২৭৮৮]

(১) অর্থাৎ কোন ধরনের যুলুমই হবে না। প্রতিদানের ক্ষেত্রে যুলুমের কয়েকটি রূপ হতে পারে। এক, প্রতিদানের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান না দেয়া। দুই, সে যতটা প্রতিদান লাভের উপযুক্ত তার চেয়ে কম দেয়া। তিন, শাস্তি যোগ্য না হলেও শাস্তি দেয়া। চার, যে শাস্তির উপযুক্ত তাকে শাস্তি না দেয়া। পাঁচ, যে কম শাস্তির উপযুক্ত তাকে বেশী শাস্তি দেয়া। ছয়, যালেমের নির্দোষ মুক্তি পাওয়া এবং মযলুমের তা চেয়ে দেখতে থাকা। সাত, একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর আদালতে এ ধরনের কোন যুলুমই হতে পারবে না। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে নগ্ন পা, খৎনাবিহীন এবং নিঃস্ব অবস্থায় হাশর করবেন। তারপর তাদেরকে এমনভাবে ডেকে বলবেন যে, দূরের ও কাছের সবাই তা শুনতে পাবে। তিনি বলবেন, আমিই বিচারক। সুতরাং কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, অনুরূপ কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তার কাছে কোন যুলুমের পাওনা অবশিষ্ট থাকবে আর আমি তার বদলা নেব না। এমনকি যদি তা একটি চড়ও হয়। সাহাবাগণ বললেন, আমরা বললাম, কিভাবে তা সম্ভব হবে অথচ আমরা সেখানে নিঃস্ব অবস্থায় হাযির হব। তিনি বললেন, সওয়াব ও গোনাহর

গ্রহণকারী।

১৮. আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন আসন্ন দিন[১] সম্পর্কে; যখন দুঃখ-কষ্ট সম্বরণরত অবস্থায় তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

১৯. চোখসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

২০. আর আল্লাহ্ ফয়সালা করেন যথাযথ ভাবে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কোন কিছুর ফয়সালা করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

তৃতীয় রুকূ'

২১. এরা কি যমীনে বিচরণ করে না? ফলে দেখত তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা এদের চেয়ে যমীনে শক্তিতে এবং কীর্তিতে ছিল প্রবলতর। তারপর

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾

মাধ্যমে সেসবের বদলা নেয়া হবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৩৭-৪৩৮]

(১) আসন্ন দিন বলতে এখানে কিয়ামতের দিবসকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদে মানুষকে বার বার এ উপলব্ধি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিয়ামত তাদের থেকে বেশী দূরে নয় বরং তা অতি সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সংঘটিত হতে পারে। [কুরতুবী] কোথাও বলা হয়েছেঃ ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [আন-নাহল:১] কোথাও বলা হয়েছে ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [আল-আম্বিয়া:১] কোথাও সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [আল-ক্বামার: ১]। কোথাও বলা হয়েছেঃ ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ [আন-নাজম ৫৭]।

আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করলেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ ছিল না ।

২২. এটা এ জন্যে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত অতঃপর তারা কুফরী করেছিল । ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন । নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর ।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۗ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২৩. আর অবশ্যই আমরা আমাদের নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

২৪. ফির'আউন, হামান ও কারূনের কাছে । অতঃপর তারা বলল, 'জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী ।'

إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৫. অতঃপর মূসা আমাদের নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারা বলল, 'মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ ।' আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হবে ।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

২৬. আর ফির'আউন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে আহ্বান করুক । নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে ।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

২৭. মূসা বললেন, 'আমি আমার রব ও তোমাদের রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন প্রত্যেক অহংকারী হতে যে বিচার দিনের উপর ঈমান রাখে না।'

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

চতুর্থ রুকূ'

২৮. আর ফির'আউন বংশের এক মুমিন ব্যক্তি(১) যে তার ঈমান গোপন রাখছিল সে বলল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ,' অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে(২)? সে মিথ্যাবাদী হলে তার

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

---

(১) উপরে স্থানে স্থানে তাওহীদ ও রেসালত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হয়েছে। তার সান্ত্বনার জন্যে মুসা আলাইহিস্‌সালাম ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফির'আউন ও ফির'আউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফির'আউনের গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মুসা আলাইহিস্‌সালাম এর মো'জেযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মোকাতেল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, উনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফের'আউনের দরবারে মূসা আলাইহিস্ সালামকে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনি শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মূসা আলাইহিস্ সালাম কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা আল- কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে: ﴿وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ﴾ 'শহরের প্রান্ত থেকে একজন লোক দৌড়ে আসল'। [সূরা আল- কাসাস; আয়াত-২০] [দেখুন, কুরতবী]

(২) অনুরূপ অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও আপতিত হয়েছিল। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন আসকে বললাম, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবচেয়ে

মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছে, তার কিছু তোমাদের উপর আপতিত হবে ।' নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত দেন না, যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী ।

২৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, যমীনে তোমরাই প্রভাবশালী; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?' ফির'আউন বলল, 'আমি যা সঠিক মনে করি, তা তোমাদেরকে দেখাই । আর আমি তোমাদেরকে শুধু সঠিক পথই দেখিয়ে থাকি ।'

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ
فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ
فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَمَاۤ اَهْدِيْكُمْ
اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

৩০. যে ঈমান এনেছিল সে আরও বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী দলসমূহের দিনের অনুরূপ আশংকা করি ---

وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ
عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩১. 'যেমন ঘটেছিল নূহ, 'আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে । আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না ।

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ
مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

কঠোর যে ব্যবহার করেছিল তা সম্পর্কে আমাকে জানান । তিনি বললেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার সামনে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় উকবা ইবন আবি মু'আইত এসে রাসূলের ঘাড় ধরলো এবং তার কাপড় দিয়ে রাসূলের গলা পেঁচিয়ে ধরলো । ফলে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে আসলেন এবং তার কাঁধ ধরে ফেললেন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রতিরোধ করে বললেন, "তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ্,' অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে ।" [বুখারী: ৮৪১৫]

৩২. আর 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি ভয়ার্ত আহ্বান দিনের,

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩৩. 'যেদিন তোমরা পিছনে ফিরে পালাতে চাইবে, আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই।'

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর অবশ্যই পূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ; অতঃপর তিনি তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাতে সর্বদা সন্দেহ করেছিলে। পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে, 'তার পরে আল্লাহ্ আর কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না।' এভাবেই আল্লাহ্ যে সীমালঙ্ঘনকারী, সংশয়বাদী তাকে বিভ্রান্ত করেন ---

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ ﴿٣٤﴾

৩৫. যারা নিজেদের কাছে (তাদের দাবীর সমর্থনে) কোন দলীল-প্রমাণ না আসলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণার যোগ্য। এভাবে আল্লাহ্ মোহর করে দেন প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে[১]।

اِلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

(১) অর্থাৎ বিনা কারণে কারো মনে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয় না। যার মধ্যে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় লা'নতের এ মোহর কেবল তার মনের ওপরেই লাগানো হয়। 'তাকাববুর' অর্থ ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার যার কারণে ন্যায় ও সত্যের

৩৬. ফির'আউন আরও বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই ---

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾

৩৭. 'আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে; আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' আর এভাবে ফির'আউনের কাছে শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ থেকে এবং ফির'আউনের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই ছিল।

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

পঞ্চম রুকূ'

৩৮. আর যে ঈমান এনেছিল সে আরও বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

সামনে মাথা নত করাকে সে তার মর্যাদার চেয়ে নীচু কাজ বলে মনে করে। স্বেচ্ছাচারিতা অর্থ আল্লাহর সৃষ্টির ওপর জুলুম করা। এ জুলুমের অবাধ লাইসেন্স লাভের জন্য ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াতের বাধ্য-বাধকতা মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকে। ফির'আউন ও হামানের অন্তর যেমন মুসা আলাইহিস্ সালাম ও মুমিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এটে দেন। ফলে তাদের অন্তরে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে جَبَّار ও مُتَكَبِّر শব্দদ্বয়কে قلب এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভাল-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিন্ড (অর্থাৎ অন্তরে) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। [বুখারীঃ ৫২, মুসলিমঃ ১৫৯৯]

৩৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার জীবন কেবল অস্থায়ী ভোগের বস্তু, আর নিশ্চয় আখিরাত, তা হচ্ছে স্থায়ী আবাস।

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

৪০. 'কেউ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তিই প্রাপ্ত হবে। আর যে পুরুষ কিংবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে তবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অগণিত রিযিক।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪১. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে!

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْۤ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

৪২. 'তোমরা আমাকে ডাকছ যাতে আমি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি, যে ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীলের দিকে।

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩. 'নিঃসন্দেহ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও ডাকের যোগ্য নয়। আর আমাদের ফিরে যাওয়া তো আল্লাহ্‌র দিকে এবং নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা আগুনের অধিবাসী।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪. 'সুতরাং তোমরা অচিরেই স্মরণ করবে যা আমি তোমাদেরকে বলছি এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।'

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং ফির'আউন গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল কঠিন শাস্তি;

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৬. আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফির'আউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে[১]।'

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করেছিল তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম সুতরাং তোমরা কি

(১) বহু সংখ্যক হাদীসে কবরের আযাবের যে উল্লেখ আছে এ আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আযাবের দু'টি পর্যায়ের উল্লেখ করছেন। একটি হচ্ছে কম মাত্রার আযাব যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফির'আউনের অনুসারীদের দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় জাহান্নামের আগুনের সামনে পেশ করা হয়। এরপর কিয়ামত আসলে তাদের জন্য নির্ধারিত বড় এবং সত্যিকার আযাব দেয়া হবে। ডুবে মরার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরকে সে আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখানো হবে। এ ব্যাপারটি শুধু ফির'আউন ও ফির'আউনের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অপরাধীদের জন্য যে জঘন্য পরিণাম অপেক্ষা করছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সবাই সে দৃশ্য দেখতে পায় আর সমস্ত সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শুভ পরিণাম প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুন্দর দৃশ্যও তাদেরকে দেখানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধ্যায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে। জান্নাতি ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।" [মুসনাদ:২/১১৩, বুখারী: ১৩৭৯, মুসলিম:২৮৬৬]

আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?'

৪৮. অহংকারীরা বলবে, 'নিশ্চয় আমরা সকলেই এতে রয়েছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন ।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর যারা আগুনের অধিবাসী হবে তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, 'তোমাদের রবকে ডাক, তিনি যেন আমাদের থেকে শাস্তি লাঘব করেন এক দিনের জন্য ।'

وَقَالَ الَّذِينَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা বলবে, 'তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি?' জাহান্নামীরা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই ।' প্রহরীরা বলবে, 'সুতরাং তোমরাই ডাক; আর কাফিরদের ডাক শুধু ব্যর্থই হয় ।'

قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿٥٠﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৫১. নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে[১], আর

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

(১) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রাসুল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতেও । বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত । অধিকাংশ নবী-রাসুলদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় । কিন্তু কোন কোন নবী-রাসূল যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়্যাকে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে । যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়া সাল্লাম, তাদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে । ইবন কাসীর এর দু'টি জওয়াব দেন । এক. এখানে রাসূল বলে সমস্ত রাসূলগণকে বুঝানো হয়নি বরং কোন কোন রাসূল বোঝানো হয়েছে । দুই. এ আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে হোক, কিংবা তাদের ওফাতের পরে হোক । এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত নবী-রাসূল ও মুমিনের ক্ষেত্রে

যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে(১)।

৫২. যেদিন যালিমদের 'ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে দান করেছিলাম হেদায়াত এবং বনী ইস্রাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম কিতাবের,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾

৫৪. পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর আপনি আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন সন্ধ্যা ও সকালে।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৬. নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহ্‌র

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ

প্রযোজ্য। নবী-রাসুলগণের হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। ইয়াহইয়া, যাকারিয়্যা আলাইহিমাস্ সালাম এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম প্রাণী দিয়ে পরাজিত করেছেন। এ উম্মতের প্রাথমিক যুগের কাফেরদেরকে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সদরার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার দ্বীনই জগতের সমস্ত দ্বীনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তার জীবদ্দশায়ই আরব উপদ্বীপের বিরাটাংশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। সেখানে নবী - রাসূল ও মুমিনগণের জন্যে আল্লাহর সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে। [তাবারী]

سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, তারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চান; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি অবশ্যই বড় বিষয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর সমান হয় না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অনুরূপ যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারা আর মন্দকর্মকারী। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

৬০. আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক[১], আমি তোমাদের

(১) 'দো'আ'র শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকরকেও দো'আ বলা হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আরাফাতে আমার দো'আ ও পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণের দো'আ এই কলেমা: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحمد وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شيءٍ قَدِيْرٌ এতে যিকরকে দো'আ বলা হয়েছে। কারণ, দো'আ দু' প্রকারঃ ১. প্রার্থনা বা কিছু পেতে দো'আ করা ও ইবাদাতের মাধ্যমে দো'আ করা। চাওয়া বা প্রার্থনার দো'আ হল - আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাওয়া। এতে চাওয়া আছে, যাচঞা আছে। পক্ষান্তরে ইবাদাতের দো'আর মধ্যে চাওয়া নেই। শুধু নৈকট্য লাভের জন্য যা যা করা হয় তাই এ প্রকারের ইবাদত। নৈকট্য লাভের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কেননা যে আল্লাহর ইবাদাত করে, সে স্বীয় কথা ও অবস্থার ভাষায় তার রবের কাছে উক্ত ইবাদাত কবুল করার এবং এর উপর সাওয়াব দেয়ার আবেদন করে থাকে। পবিত্র কুরআনে দো'আর যত নির্দেশ এসেছে, আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো'আ করা থেকে যত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং

ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ‘ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে[১]।'

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

দো'আকারীদের যত প্রশংসা করা হয়েছে, সে সবই প্রার্থনার দো'আ ও ইবাদাতের দো'আকে শামিল করে থাকে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ “সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে”। [সূরা গাফিরঃ ১৪] আরও বলেন, ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ “আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না”। [সূরা আল-জ্বিনঃ ১৮] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক বাণীতে বলেছেন, ‘দো'আই ‘ইবাদাত। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন'। [আবু দাউদ: ১৪৭৯, তিরমিযি: ২৯৬৯, ইবন মাজাহ: ৩৮২৮] অর্থাৎ প্রত্যেক দো'আই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই দো'আ। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারও সামনে চুড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লাহর কাছে মাগফেরাত ও জান্নাত তলব করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। আলোচ্য আয়াতেও “দো'আ” ও “ইবাদাত” শব্দ দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে যে জিনিসকে দো'আ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সে জিনিসকেই ইবাদাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দো'আই ইবাদাত আর ইবাদতই দো'আ। ঠিক এ বিষয়টিকে আমরা পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ “সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে আহ্বান করে যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার আহ্বানে সাড়া দিবে না? আর অবস্থা তো এরকম যে, এসব কিছু তাদের আহ্বান সম্পর্কে অবহিতও নয়। যখন (কিয়ামতের দিন) মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে, তখন সে সকল কিছু হবে তাদের শত্রু এবং সেগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে”। [সূরা আল-আহকাফঃ ৫-৬]।

(১) উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দো'আ করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করারও ওয়াদা করা হয়েছে। আর যারা দো'আ করে না, তাদের জন্যে শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দো'আ অর্থ যদি ইবাদতের দো'আ বোঝানো হয় তবে দো'আ বর্জনকারী অবশ্যই গুনাহগার এমনকি কাফেরও হবে। আর সে হিসেবেই ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের

সপ্তম রুকূ'

৬১. আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাতকে; যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিনকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾

শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। আর যদি দো'আ বলে 'চাওয়া' বা 'যাচঞা করা' উদ্দেশ্য হয় তখন দো'আ না করলে জাহান্নামের শাস্তিবাণী ঐ সময়ই শুধু হবে যখন সে অহংকারবশত: তা বর্জন করে। কেননা, অহংকারবশত: দো'আ বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দো'আ ফরয বা ওয়াজিব নয়। দো'আ না করলে গোনাহ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কাছে দো'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই। [তিরমিযি:৩৩৭০] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। [তিরমিযি:৩৩৭৩]
উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে বান্দা আল্লাহর কাছে যে দো'আ করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দো'আ কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াব দু'টি। এক. দো'আ কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দো'আ কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে আখেরাতের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। সুতরাং এর যে কোন একটি হলেই দো'আ কবুল হয়েছে ধরে নিতে হবে। দুই. নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে কোন বিষয়কে দো'আ কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এক. হারাম খাবার ও হারাম পরিধেয় পরিধান: হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে ইয়া রব, ইয়া রব, বলে দো'আ করে; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দো'আ কিরূপে কবুল হবে? [মুসলিম: ১০১৫] দুই. অসাবধান বেপরোয়া ও অন্যমনস্কভাবে দো'আর বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে। [তিরমিযি: ৩৪৭৯] তিন. অন্যায় কোন দো'আ যেন না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিম আল্লাহর কাছে যে দো'আই করে, আল্লাহ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দো'আ না হয়। [মুসলিম: ২৭৩৫]

৬২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۡ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. এভাবেই ফিরিয়ে নেয়া হয় তাদেরকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন পবিত্র বস্তু থেকে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। কাজেই তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই।

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের 'ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার রবের কাছ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে। আর আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۡ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ

ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

তারপর আলাকাহ থেকে, তারপর তিনি তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, তারপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে এর আগেই এবং যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যেন তোমরা বুঝতে পার।

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

৬৮. 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি তার জন্য বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।'

অষ্টম রুকূ'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না তাদেরকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. যারা মিথ্যারোপ করে কিতাবে এবং যাসহ আমাদের রাসূলগণকে আমরা পাঠিয়েছি তাতে; অতএব, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে---

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

৭১. যখন তাদের গলায় বেড়ী ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. ফুটন্ত পানিতে, তারপর তাদেরকে পোড়ানো হবে আগুনে[১]।

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حميم অর্থাৎ ফুটন্ত পানিতে ও পরে جحيم অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায়

৭৩. পরে তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে,

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. আল্লাহ্ ছাড়া?' তারা বলবে, 'তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়েছে[১]; বরং আগে আমরা কোন কিছুকে ডাকিনি।' এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫. এটা এ জন্যে যে, তোমরা যমীনে অযথা উল্লাস করতে[২] এবং এজন্যে

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

যে, حميم জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্যে জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ তারা যখন তীব্র পিপাসায় বাধ্য হয়ে পানি চাইবে তখন দোযখের কর্মচারীরা তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে টেনে হেঁচড়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যা থেকে টগবগে গরম পানি বেরিয়ে আসছে। অতঃপর তাদের সে পানি পান করা শেষ হলে আবার তারা তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। সূরা আস-সাফ্ফাতের ৬৭-৬৮ নং আয়াত থেকেও তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, حميم ও جحيم একই স্থান এবং جحيم এর মধ্যেই حميم অবস্থিত। আয়াতটি এইঃ ﴿هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ﴾ [সূরা আর রহমান: ৪৩-৪৪]

(১) অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা বলবে, আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [সূরা আল-আম্বিয়া: ৯৮]

(২) فرح এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লাসিত হওয়া এবং مرح এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ-সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مرح সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فرح অর্থাৎ আনন্দ যদি ধন-সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গোনাহের কাজ দ্বারা হয়, তবে হারাম ও না জায়েয। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও فرح এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [সূরা আল-কাসাস:৭৬] অর্থাৎ আনন্দ- উল্লাস করো না। নিশ্চয় আল্লাহ আনন্দ উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ উল্লাসের আরেক স্তর হল পার্থিব নেয়ামত ও সুখকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মোস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য।

الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

যে, তোমরা অহংকার করতে।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬. তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য, অতএব কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। অতঃপর আমরা তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার মৃত্যু ঘটাই---তবে তাদের ফিরে আসা তো আমাদেরই কাছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর অবশ্যই আমরা আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। আমরা তাদের কারো কারো কাহিনী আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কাহিনী আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রাসূলের কাজ নয়। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে তখন ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তখন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নবম রুকূ'

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا

৭৯. আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে

এ আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ অর্থাৎ বলুন, আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে (তা হয়েছে), সুতরাং এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। [সূরা ইউনুস: ৫৮]

مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٩

তার কিছু সংখ্যকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কিছু সংখ্যক হতে তোমরা খাও।

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٨٠

৮০. আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার এবং যাতে তোমরা অন্তরে যা প্রয়োজন বোধ কর সেগুলো দ্বারা তা পূর্ণ করতে পার। সেগুলোর উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ٨١

৮১. আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٢

৮২. তারা কি যমীনে বিচরণ করেনি তাহলে তারা দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? তারা যমীনে ছিল এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে বেশী প্রবল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٨٣

৮৩. অতঃপর তাদের কাছে যখন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ আসলেন, তখন তারা নিজেদের কাছে বিদ্যমান থাকা জ্ঞানে উৎফুল্ল হল। আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করল।

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ٨٤

৮৪. অতঃপর তারা যখন আমাদের শাস্তি দেখল তখন বলল, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে

শরীক করতাম তাদের সাথে কুফরী করলাম।'

৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার শাস্তি দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না[1]। আল্লাহ্‌র এ বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং তখনই কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

(১) অর্থাৎ আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহনীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে- মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে আর তওবা কবুল হয় না। তিরমিযীঃ ৩৫৩৭, ইবনে মাজাহঃ ৪২৫৩]

৪১- সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্
৫৪ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَة

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. এটা রহমান, রহীমের কাছ থেকে নাযিলকৃত

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ②

৩. এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য,

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ③

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতএব, তারা শুনবে না[১]।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ④

(১) আলোচ্য সূরায় কুরাইশ কাফেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামকে নস্যাৎ করার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবন খাত্তাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কুরাইশ সরদার হামযা মুসলিম হয়ে যান। ফলে কুরাইশ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেয ইবন কাসীর মুসনাদে বায্যার, আবু ইয়া'লা ও বগভী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।
ঘটনা হচ্ছে, কুরাইশ সরদার ওতবা ইবন রবীয়া একদিন একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্ত পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব-যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল,

হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাকনাম), আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন। ওতবা সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল: প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র। আপনি জানেন, কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদুর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব। আবুল ওলীদ বলল: ভ্রাতুস্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত দাওয়াতের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কুরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কুরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনব, সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আবুল ওলীদ। আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা 'ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করতে করতে যখন ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ পর্যন্ত পৌছালেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। অন্য বর্ণনায় এসেছে- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদার আয়াতে পৌঁছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন: আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে

৫. আর তারা বলে, 'তুমি যার প্রতি আমাদেরকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে পর্দা; কাজেই তুমি তোমার কাজ কর, নিশ্চয় আমরা আমাদের কাজ করব ।'

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥

৬. বলুন, 'আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই কেবলমাত্র এক ইলাহ্ । অতএব তোমরা তাঁর প্রতি দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর । আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য ---

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٦

পারেন । ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল । তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র কসম, আবুল ওলীদের মুখমন্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে । সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই । ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন । ওতবা বলল, খবর এই: আল্লাহর কসম । আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি । আল্লাহর কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কখনও নয় । হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর । আমার মতে তোমরা তার মোকাবেলা ও তাকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাকে তার কাজ করতে দাও । কেননা, তার এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই । তোমরা এখন অপেক্ষা কর । অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও । যদি তারাই কুরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাকে পরাভুত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে । আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইয্‌যত হবে তোমাদেরই ইযযত । তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার । তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে । ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই । এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর । [মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ ১৪/২৯৫, মুসনাদে আবি ইয়া'লা, হাদীস নং ১৮১৮, মুস্তাদরাকে হাকিম ২/২৫৩, বাইহাকী, দালায়েল ২/২০২-২০৪]

৭. যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারাই আখিরাতের সাথে কুফরিকারী ।

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার(১) ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

দ্বিতীয় রুকূ'

৯. বলুন, 'তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন(২) দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরী করছ? তিনি সৃষ্টিকুলের রব!

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১০. আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً

(১) মূল আয়াতে ممنون কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটির আরো দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে না বা সে জন্য খোঁটা দেয়া হবে না, যেমন কোন কৃপণ হিম্মত করে কোন কিছু দিলেও সে দানের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা কখনো হ্রাস পাবে না। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে আখেরাতের স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশতঃ ছুটে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না বরং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন-২৯৯৬]

(২) আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, মনে স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুশিয়ারী ও বিবরণ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, ﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ [সূরা আল-বাকারা: ২৮]

لِّلسَّآئِلِينَ ﴿١٠﴾

দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে[১] এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন

---

(১) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় পবিত্র কুরআনে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোনটির পরে কোনটি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবত: মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে- (এক) হা-মীম সাজদার আলোচ্য আয়াত, (দুই) সূরা বাক্বারার ২৯ নং আয়াত ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ এবং (তিন) সূরা আন-নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۞ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۞ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাকারাহ্ ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা আন-নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধুম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধুম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকী প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে ইবন আব্বাস এ আয়াতের উপর্যুক্তরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। [বুখারী: কিতাবুত তাফসীর, বাব হা-মীম-আস-সাজদাহ]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ্ মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবার, আর তাতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন রবিবার, গাছ-গাছালি সোমবার, অপছন্দনীয় সবকিছু মঙ্গলবার, আলো সৃষ্টি করেছেন বুধবার, আর যমীনে জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবার। আর আদমকে শুক্রবার আছরের পরে সর্বশেষ সৃষ্টি হিসেবে দিনের সর্বশেষ প্রহরে আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ে সৃষ্টি করেছেন।" [মুসলিম: ২৭৮৯] এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিকাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে: "আমি আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" [সূরা কাফ:৩৮] এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে অগ্রাহ্য বলে মনে করেছেন। আবার কেউ কেউ বর্ণনাটিকে কা'ব আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। [ইবনে কাসীর] কিন্তু যেহেতু হাদীসটি সহীহ সনদে

বর্ণিত হয়েছে, তাই এটাকে অগ্রাহ্য করার কোন সুযোগ নেই। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল-আলবানী বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন সমস্যা নেই। আর এ বর্ণনাটি কোনভাবেই কুরআনের বিরোধিতা করে না। যেমনটি কেউ কেউ মনে করে থাকে। কেননা, হাদীসটি শুধুমাত্র যমীন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা করে। আর তা ছিল সাতদিনে। আর কুরআনে এসেছে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছিল ছয় দিনে। আর যমীন সৃষ্টি হয়েছিল দুই দিনে। আসমান ও যমীন সৃষ্টির ছয়দিন এবং এ হাদীসে বর্ণিত সাতদিন ভিন্ন ভিন্ন সময় হতে পারে। আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি হওয়ার পর যমীনকে আবার বসবাসের উপযোগী করার জন্য সাতদিন লেগেছিল। সুতরাং আয়াত ও সহীহ হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

সারকথা এই যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায়, প্রথমত: আকাশ, পৃথিবী ও এতদূভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়ত: জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। তৃতীয়ত: জানা যায় যে, আকাশমন্ডলীর সৃজনে দু'দিন লেগেছিল। চতুর্থত: আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টির পর যমীনকে বসবাসের উপযোগী করতে সাতদিন লেগেছিল। এ সাতদিনের সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল, যাতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কোন কোন মুফাসসির উপরোক্ত হাদীস অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুধু কুরআনের ভাষ্যের উপর নির্ভর করেছেন। তাদের মতে, এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই এটা অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝর্ণা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াতে প্রথমে ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে- ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ "আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন"। এতে তফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা তা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কুরআনের বর্ণনার বিপরীত। এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ বলার পর যদি পবর্তমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা-আপানিই

সমভাবে যাচঞাকারীদের জন্য।

ثُمَّ اسْتَوٰىٓ اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿۱۱﴾

১১. তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।'

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾

১২. অত:পর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾

১৩. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, 'আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে, 'আদ ও সামূদের শাস্তির অনুরূপ।'

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. যখন তাদের কাছে তাদের সামনে ও পিছন থেকে রাসূলগণ এসে বলেছিলেন যে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো 'ইবাদাত করো না।' তারা

জানা যেত, কিন্তু পবিত্র কুরআন পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যত: ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চার দিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতে ﴿وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا﴾ বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর]

বলেছিল, 'যদি আমাদের রব ইচ্ছে করতেন তবে তিনি অবশ্যই ফেরেশ্‌তা নাযিল করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, নিশ্চয় আমরা তার সাথে কুফরী করলাম।'

১৫. অতঃপর 'আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহংকার করেছিল এবং বলেছিল, 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে?' তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তারপর আমরা তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু(১) অশুভ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ

(১) এটা صاعقة এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের ১৩ নং আয়াতে আদ ও সামুদের صاعقة বলে বর্ণিত হয়েছে। صاعقة শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صاعقة বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صاعقة ছিল। একেই এখানে ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ এর অর্থ মারাত্মক 'লু' প্রবাহ; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস এবং কারো কারো মতে এর অর্থ এমন বাতাস যা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি হয়। তবে এ অর্থে সবাই একমত যে, শব্দটি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। [দেখুন-তবারী] কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাব সম্পর্কে যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা হচ্ছে, এ বাতাস উপর্যুপরি সাত দিন এবং আট রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিলো। এর প্রচণ্ডতায় মানুষ পড়ে গিয়ে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং মরে মরে পড়ে থাকে যেমন খেজুরের ফাঁপা কাণ্ড পড়ে থাকে [আল-হাক্কাহ:৭]। এ বাতাস যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেলেছে [আয-যারিয়াত:৪২]। যে সময় এ বাতাস এগিয়ে আসছিলো তখন আদ জাতির লোকেরা এই ভেবে আনন্দে মেতে উঠেছিলো যে মেঘ চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। এখন বৃষ্টি হবে এবং তাদের আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু তা এমনভাবে আসলো যে গোটা এলাকাই ধ্বংস করে রেখে গেল [আল-আহকাফ: ২৪, ২৫]

لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑯

দিনগুলোতে; যাতে আমরা তাদের আস্বাদন করাতে পারি দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি[১]। আর আখিরাতের শাস্তি তো তার চেয়ে বেশী লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑰

১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়, আমরা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধপথে চলা পছন্দ করেছিল। ফলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্রাঘাত তাদের পাকড়াও করল; তারা যা অর্জন করেছিল তার জন্য।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑱

১৮. আর আমরা রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করত।

তৃতীয় রুকূ'

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑲

১৯. আর যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑳

২০. পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে[২]।

---

(১) দাহ্হাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে।[দেখুন, বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(২) হাদীসে এসেছে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

২১. আর তারা (জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে বলবে, 'কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে

সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে হে রব, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বন্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ অর্থাৎ ভাল কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এটে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে। [মুসলিমঃ ২৯৩৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এটে দেয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। [মুসলিম:২৯৬৮]

যেসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখিরাত শুধু একটি আত্মিক জগত হবে না, বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত আছে-এ আয়াতটি তারই একটি। শুধু তাই নয়, যে দেহ নিয়ে তারা এই পৃথিবীতে আছে ঠিক সেই দেহই তাদের দেয়া হবে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে এই পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিলো পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত দেহ নিয়ে সে পূর্বের জীবনে কোন অপরাধ করেছিলো সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই যদি সে অবস্থান করে কেবল তখনি সে সেখানে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলোও এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। সূরা আল-ইসরা:৪৯-৫১, ৯৮; আল-মুমিনূন:৩৫-৩৮, ৮২-৮৩; আস-সাজদাহ:১০; ইয়াসীন:৬৫-৭৯; আস-সাফফাত: ১৬-১৮; আল-ওয়াকি'আ:৪৭-৫০ এবং আন-নাযি'আত:১০-১৪।

প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ।’

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. ‘আর তোমরা কিছুই গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না--- বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না ।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. ‘আর তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস করেছে । ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ।’

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে তবে আগুনই হবে তাদের আবাস । আর যদি তারা সন্তুষ্টি বিধান করতে চায় তবে তারা সন্তুষ্টিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না ।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর আমরা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম মন্দ সহচরসমূহ, যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল । আর তাদের উপর শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে, তাদের পূর্বে চলে যাওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায় । নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত ।

চতুর্থ রুকূ’

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

২৬. আর কাফিররা বলে, ‘তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শোন না এবং তা

وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

আবৃত্তির সময় শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।'

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং আমরা অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেব।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এই আগুন, আল্লাহ্‌র দুশমনদের প্রতিদান; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَاۤ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের রব! জিন ও মানুষের মধ্য থেকে যে দু'জন আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নিচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।'

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্', তারপর অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে নাযিল হয় ফেরেশ্‌তা (এ বলে) যে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমরা দাবী করবে(১) ।'

৩২. এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আপ্যায়ন হিসেবে ।

পঞ্চম রুকূ'

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

৩৩. আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজ করে । আর বলে, 'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত(২) ।'

---

(১) ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবী করবে তাই সরবরাহ করা হবে । এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ হবে-তোমরা চাও বা না চাও । অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্খাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না । যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোন বড় লোকেরা মেহমান হয় । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পন সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে । [তিরমিযী: ২৫৬৩]

(২) এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা । তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং অপরকেও দাওয়াত দেয় । বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? মুমিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে । আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায় । এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবতকে আহ্বান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করো: আমি মুসলিম । মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই । কিন্তু আমি মুসলিম বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী । এ থেকে

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর এটি শুধু তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যশীল। আর এর অধিকারী তারাই হবে কেবল যারা মহাভাগ্যবান।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আপনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবেন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ(১)।

বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে সালাতের দিকে আহবান করে। এ কারণেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে ﴿دَعَآ اِلَى اللّٰهِ﴾ বাক্যের পর ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ বলে আযান-ইকামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত সালাত বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আযান ও একামাতের মাঝখানে যে দো'আ হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।[আবু দাউদ: ৫২১]

(১) বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান থাকো। সে অত্যন্ত দরদী ও মঙ্গলকামী সেজে এই বলে তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে যে, অমুক অত্যাচার কখনো বরদাশত করা উচিত নয়, অমুকের কাজের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত এবং এই আক্রমণের জবাবে লড়াই করা উচিত। তা না হলে তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে, এবং তোমাদের আদৌ কোন প্রভাব থাকবে না। এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন অযথা উত্তেজনা অনুভব করবে তখন সাবধান হয়ে যাও। কারণ, তা শয়তানের প্ররোচনা। সে তোমাদের উত্তেজিত করে কোন ভুল সংঘটিত করাতে চায়। সাবধান হয়ে যাওয়ার পর মনে করো না, আমি আমার মেজাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখছি, শয়তান আমাকে দিয়ে কোন ত্রুটি করাতে পারবে না। নিজের ইচ্ছা শক্তির বিভ্রম হবে শয়তানের আরেকটি বেশী ভয়ংকর হাতিয়ার। এর চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি যদি তাওফীক দান করেন ও রক্ষা করেন তবেই মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর

৩৭. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করো না, চাঁদকেও নয়(১); আর সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে,

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾

সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলো। আবু বকর চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন আর তার দিকে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতে থাকলেন। অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক জবাবে তাকে একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন। তার মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর চরম বিরক্তি ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তা তার পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে থাকলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। আবু বকরও উঠে তাকে অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিলো তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তাকে জবাব দিলাম তখনই আপনি অসন্তুষ্ট হলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না। [মুসনাদে আহমাদ:২/৪৩৬]

(১) অর্থাৎ এসব আল্লাহর প্রতিভূ নয় যে এগুলোর আকৃতিতে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করছেন বলে মনে করে তাদের ইবাদত করতে শুরু করবে। বরং এগুলো আল্লাহর নিদর্শন এসব নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা বিশ্ব জাহান ও তার ব্যবস্থাপনার সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং এ কথাও জানতে পারবে যে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই প্রকৃত সত্য। সূর্য ও চাঁদের উল্লেখের পূর্বে দিন ও রাতের উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার জন্য যে রাতের বেলা সূর্যের অদৃশ্য হওয়া ও চাঁদের আবির্ভূত হওয়া এবং দিনের বেলা চাঁদের অদৃশ্য হওয়া ও সূর্যের আবির্ভূত হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এ দু'টির কোনটিই আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ প্রতিভূ নয়। উভয়েই তাঁর একান্ত দাস। তারা আল্লাহর আইনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আবর্তন করছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদ ও সূর্য সম্পর্কে মানুষের আকীদা-বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান ইব্রাহীম মারা গেলে সেদিনই সূর্যগ্রহণ হয়। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে, ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু বা জীবনের জন্য হয় না। বরং এ দু'টি আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে দু'টি নিদর্শন; যা তিনি তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা এরূপ কিছু দেখবে, তখন সালাতের দিকে ধাবিত হবে। [বুখারী: ১০৫৮]

যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর।

৩৮. অতঃপর যদি তারা অহংকার করে, তবে যারা আপনার রবের নিকটে রয়েছে তারা তো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুষ্ক ও ঊষর, অতঃপর যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি যমীনকে জীবিত করেন তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহে ইলহাদ করে, তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে? তোমরা যা ইচ্ছে আমল কর। তোমরা যা আমল কর, নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১. নিশ্চয় যারা তাদের কাছে কুরআন আসার পর তার সাথে কুফরী করে[১] (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে); আর এ তো অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ---

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

(১) এ আয়াতে ذكر বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। [তবারী]

৪২. বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না---সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. আপনাকে শুধু তা-ই বলা হয়, যা বলা হত আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার রব একান্তই ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা।

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. আর যদি আমরা এটাকে করতাম অনারবী ভাষার কুরআন তবে তারা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? ভাষা অনারবীয়, অথচ রাসূল আরবীয়! বলুন, 'এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য।' আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন এদের (অন্তরের) উপর অন্ধত্ব তৈরী করবে। তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান থেকে।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৪৫. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ ঘটেছিল। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি বাণী (সিদ্ধান্ত) পূর্বেই না থাকত তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় তারা এ কুরআন সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. যে সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আর আপনার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নন।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ۝

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না[১]। আর যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন তারা বলবে, 'আমরা আপনার কাছে নিবেদন করি যে, এ ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন সাক্ষী নেই।'

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا

৪৮. আর আগে তারা যাদেরকে ডাকত তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে

(১) একথা বলে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয় বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে, শুধু কিয়ামত নয়, বরং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই। অপরটি হচ্ছে, যে আল্লাহ খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের এত বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন, কোন ব্যক্তির কাজ কর্ম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় নির্ভয়ে যা ইচ্ছা তাই করা ঠিক নয়। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এই বাক্যাংশের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একথাটির পরেই যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বক্তব্যের ধারাক্রম থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের তারিখ জানার ধান্ধায় কোথায় পড়ে আছ? বরং চিন্তা করো কিয়ামত যখন আসবে তখন নিজের এসব গোমরাহীর জন্য কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিয়ামতের তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নকারী এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার মাধ্যমেই জবাব দিয়েছিলেন। একবার সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি দূর থেকে ডাকলো, হে মুহাম্মাদ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কি বলতে চাও, বলো। সে বললোঃ কিয়ামত কবে হবে? তিনি জবাবে বললেনঃ "হে আল্লাহর বান্দা, কিয়ামত তো আসবেই। তুমি সে জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো?" [বুখারীঃ ৬১৬৭, মুসলিম:২৬৩৯]

مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

যাবে এবং তারা বিশ্বাস করবে যে, তাদের পলায়নের কোন উপায় নেই।

لَا يَسْـَٔمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে প্রচণ্ডভাবে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে;

وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

৫০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমরা তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই, তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, ‘এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তবুও তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।’ অতএব, আমরা অবশ্যই কাফিরদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهٖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

৫১. আর যখন আমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনাকারী হয়।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫২. বলুন, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হয়ে থাকে আর তোমরা এটা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে?’

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۵۳﴾

৫৩. অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী?

اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿۵۴﴾

৫৪. জেনে রাখুন, নিশ্চয় তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

৪২- সূরা আশ-শূরা
৫৩ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الشُّورَىٰ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. হা-মীম।

حمٓ ①

২. 'আইন-সীন-কাফ।

عٓسٓقٓ ②
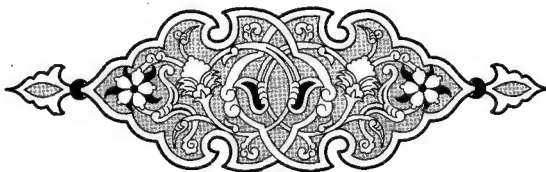
৩. এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্[১]।

كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ③

৪. আসমানসমূহে যা আছে ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ④

৫. আসমানসমূহ উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফেরেশ্‌তাগণ তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যমীনে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ ۚ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ⑤

৬. আর যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে[২] গ্রহণ করে, আল্লাহ্

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ

---

(১) অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দ্রুত ইংগিত এবং গোপন ইংগিত [ইবন হাজার: ফাতহুল বারী: ১/২০৪]

(২) মূল আয়াতে أولياء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস এবং ভিন্ন ভিন্ন অনেক কর্মপদ্ধতি আছে। কুরআন মজীদে এগুলোকেই "আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ওলী বা অভিভাবক বানানো" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে অনুসন্ধান করলে 'ওলী' শব্দটির কয়েকটি অর্থ জানা যায়। একঃ মানুষ যার কথামত কাজ করে, যার নির্দেশনা মেনে চলে এবং যার রচিত নিয়ম-পন্থা, রীতিনীতি এবং আইন-কানুন অনুসরণ করে [আন নিসা:১১৮-১২০; আল-আ'রাফ:৩, ২৭-৩০] দুইঃ যার

وَمَآ اَنۡتَ عَلَيۡهِمۡ بِوَكِيۡلٍ ۝

তাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টিদাতা। আর আপনি তো তাদের উপর কর্মবিধায়ক নন।

وَكَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰى وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَتُنۡذِرَ يَوۡمَ الۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ فَرِيۡقٌ فِى الۡجَنَّةِ وَفَرِيۡقٌ فِى السَّعِيۡرِ ۝

৭. আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি আরবী ভাষায়, যাতে আপনি মক্কা ও তার চারদিকের জনগণকে[১] সতর্ক করতে পারেন এবং সতর্ক করতে পারেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জলন্ত আগুনে।

وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمۡ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنۡ

৮. আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদেরকে একই উম্মত করতে পারতেন; কিন্তু

দিকনির্দেশনার ওপর মানুষ আস্থা স্থাপন করে এবং মনে করে সে তাকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শনকারী এবং ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী। [আল বাকারাহ: ২৫৭; আল-ইসরা:৯৭; আল-কাহাফ:১৭ ও আল-জাসিয়া:১৯] তিনঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, আমি পৃথিবীতে যাই করি না কেন সে আমাকে তার কুফল থেকে রক্ষা করবে। এমনকি যদি আল্লাহ থাকেন এবং আখেরাত সংঘটিত হয় তাহলে তার আযাব থেকেও রক্ষা করবেন [আন- নিসা:১২৩-১৭৩; আল-আন'আম:৫১; আর-রা'দ:৩৭; আল-'আনকাবুত:২২; আল-আহযাব:৬৫; আয-যুমার:৩] চারঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, পৃথিবীতে তিনি অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাকে সাহায্য করেন, বিপদাপদে তাকে রক্ষা করেন। রুজি-রোজগার দান করেন, সন্তান দান করেন, ইচ্ছা পূরণ করেন এবং অন্যান্য সব রকম প্রয়োজন পূরণ করেন [হুদ:২০; আর-রা'দ-১৬, আল-আনকাবূত:৪১]

(১) এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। [তাবারী,ইবনে কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করার সময় মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন: অবশ্যই তুমি আমার কাছে আল্লাহর সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিস্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না। [তিরমিযী:৩৯২৬]

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ۗ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রবেশ করান। আর যালিমরা, তাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৯. তারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

১০. আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন---তার ফয়সালা তো আল্লাহ্‌রই কাছে। তিনিই আল্লাহ্ --- আমার রব; তাঁরই উপর আমি নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

১১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১২. তাঁরই কাছে আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিকাঠি। তিনি যার জন্যে ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা আমরা ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না(১)। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি ডাকছেন তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে

---

(১) দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে 'দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না' কিংবা 'তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। পূর্ববর্তী উম্মতদের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এ ধরনের কাজ থেকে সাবধান করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অত:পর এর ডানে ও বায়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিস্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অত:পর তিনি মধ্যবর্তী সকল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ "আর এটা আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর।" [মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৩৫] এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে নবী-রাসূলগণের অভিন্ন দ্বীনের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাত (সামষ্টিকভাবে সকল উম্মত) থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাধ থেকে সরিয়ে দিল'। [আবু দাউদ: ৪৭৬০] তিনি আরও বলেন, 'জামাত (তথা মুসলিম উম্মতের) উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।' [নাসায়ী: ৪০২০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 'শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অত:পর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা-পৃথক না থাকা। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩২] মনে রাখতে হবে যে, মুসলিমরা সবাই এক উম্মত; তাদের থেকে কেউ আলাদা কোন দল করে পৃথক হলে সে উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটালো। এটাই শরী'আতে নিন্দনীয়।

তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি দ্বীনের দিকে হেদায়াত করেন।

১৪. আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত(১) তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। আর এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে আপনার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয় ফয়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, নিশ্চয় তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

وَمَا تَفَرَّقُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾

১৫. সুতরাং আপনি আহ্বান করুন(২) এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না; এবং বলুন, 'আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং

فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

---

(১) এই মতভেদ সৃষ্টির চালিকা শক্তি ছিল নিজের নাম ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা, পারস্পরিক জিদ ও একগুঁয়েমি, একে অপরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা এবং সম্পদ ও মর্যাদা অর্জন প্রচেষ্টার ফল। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) তাওহীদের দিকে, অথবা এ সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনের দিকে। যার নির্দেশ তিনি সমস্ত নবী-রাসূলদের দিয়েছেন এবং তার ওসিয়ত করেছেন। [জালালাইন; মুয়াসসার]

ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে[১] ।'

---

(১) হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র দৃষ্টান্ত। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে ﴿فَلِذٰلِكَ فَادْعُ﴾ অর্থাৎ যদিও মুশরেকদের কাছে আপনার তওহীদের দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন।

দ্বিতীয় বিধান ﴿وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ﴾ অর্থাৎ আপনি এ দ্বীনে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। কাফেদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দ্বীনের মধ্যে কোন রদবদল ও হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন না। 'কিছু নাও এবং কিছু দাও' নীতির ভিত্তিতে এই পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে কোন আপোষ করবেন না। বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কেরামদের কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: شَيَّبَتْنِيْ هُوْد অর্থাৎ সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদের ১১২ নং আয়াতে এ আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। সেখানেও দ্বীনের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান- ﴿وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ﴾ অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। শুধু কোন না কোন ভাবে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে এসে যাক, এ লোভের বশবর্তী হয়ে এদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি এবং জাহেলী আচার-আচরণের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন অবকাশ সৃষ্টি করবেন না। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে যেভাবে নাযিল করেছেন কেউ মানতে চাইলে সেই খাঁটি ও মূল দ্বীনকে যেন সরাসরি মেনে নেয়। অন্যথায় যে জাহান্নামে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় পড়ুক। মানুষের ইচ্ছানুসারে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তন সাধন করা যায় না। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ চায় তাহলে যেন নিজেকেই পরিবর্তন করে দ্বীন অনুসারে গড়ে নেয়।

চতুর্থ বিধান- ﴿وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ﴾ অর্থাৎ আপনি ঘোষনা করুন: আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি ঈমান এনেছি। অন্য কথায় আমি সেই বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকদের মত নই যারা আল্লাহর প্রেরিত কোন কোন কিতাব মানে আবার কোন কোনটি মানে না। আমি আল্লাহর প্রেরিত প্রতিটি কিতাবই মানি।

পঞ্চম বিধান- ﴿وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ এই ব্যাপকার্থক আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হয়ঃ একটি অর্থ হচ্ছে, আমি এসব দলাদলি থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষ ন্যায়

নিষ্ঠা অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। কোন দলের স্বার্থে এবং কোন দলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা আমার কাজ নয়। সব মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক। আর সে সম্পর্ক হচ্ছে ন্যায় বিচার ও ইনসাফের সম্পর্ক। যার যে বিষয়টি ন্যায় ও সত্য সে যত দূরেরই হোক না কেন আমি তার সহযোগী। আর যার যে বিষয়টি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী সে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও আমি তার বিরোধী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের সামনে যে সত্য পেশ করার জন্য আদিষ্ট তাতে কারো জন্য কোন বৈষম্য নেই, বরং তা সবার জন্য সমান। তাতে নিজের ও পরের, বড়র ও ছোটর, গরীবের ও ধনীর, উচ্চের ও নীচের ভিন্ন ভিন্ন সত্য নেই। যা সত্য তা সবার জন্য সত্য। যা গোনাহ তা সবার জন্য গোনাহ। যা হারাম তা সবার জন্য হারাম এবং যা অপরাধ তা সবার জন্য অপরাধ। এই নির্ভেজাল বিধানে আমার নিজের জন্যও কোন ব্যতিক্রম নেই। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট। মানুষের মধ্যে ইনসাফ কয়েম করা এবং তোমাদের জীবনে ও তোমাদের সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা ও বে-ইনসাফী রয়েছে তার ধ্বংস সাধনের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। পারস্পারিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। চতুর্থ অর্থ এই যে, এখানে عدل এর অর্থ সাম্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি-এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না।
ষষ্ঠ বিধান- ﴿اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ আল্লাহ্‌কেই একমাত্র রব হিসেবে মানব। তিনি আমাদের ও তোমাদের রব। একথা তোমরা স্বীকার করে থাক কিন্তু এ কথার কারণে একমাত্র আল্লাহ্‌রই যে ইবাদাত করতে হবে, তোমরা এটা মানতে রাজী নও। কিন্তু আমি তা মানি। আর আমার অনুসারীরা সবাই এটা মেনে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করে। সপ্তম বিধান- ﴿لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ﴾ অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে, তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না। আর তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে, আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নাই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, জেহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশত:ই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

১৬. আর আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া আসার পর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার এবং তাদের উপর রয়েছে তাঁর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ।

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ্, যিনি নাযিল করেছেন সত্যসহকারে কিতাব এবং মীযান[১] । আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে । অষ্টম বিধান- ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই । কাজেই আমাদেরও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই । নবম বিধান- ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন । দশম বিধান- ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব । সুতরাং তোমরা চিন্তা করে দেখ কি করলে তখন তোমরা উপকৃত হবে । [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(১) অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । এতে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে । ﴿أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ এখানে 'কিতাব' বলে কুরআনসহ সমস্ত আসমানী গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং হক বলতে পূর্বোক্ত সত্যদ্বীনকে বোঝানো হয়েছে । ميزان এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ি-পাল্লা । এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেয়ার একটি মানদণ্ড তাই ইবনে আব্বাস এর তাফসীর করেছেন ন্যায় বিচার । মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে এখানে তাই বোঝানো হয়েছে । সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় হক এবং ميزان শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে । আর তখন 'হকসহকারে' এর অর্থ হবে, হকের বর্ণনা সম্বলিত । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে মীযান অর্থ আল্লাহ্‌র শরীয়ত, যা দাঁড়িপাল্লার মত ওজন করে ভুল ও শুদ্ধ, হক ও বাতিল, জুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয় । ওপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে, 'তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে ।' এখানে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কিতাব সহকারে সেই 'মিযান' এসে গেছে যার সাহায্যে এই ইনসাফ কায়েম করা যাবে । [তাবারী, কুরতুবী]

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾

১৮. যারা এটাতে ঈমান রাখে না তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তা থেকে ভীত থাকে এবং তারা জানে যে, তা অবশ্যই সত্য। জেনে রাখুন, নিশ্চয় কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত কোমল; তিনি যাকে ইচ্ছে রিযিক দান করেন[১]। আর তিনি সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী।

তৃতীয় রুকূ'

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমরা তাকে তা থেকে কিছু দেই। আর আখেরাতে

---

(১) অভিধানে لطيف শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন, দয়ালু, পক্ষান্তরে মুকাতিল করেছেন অনুগ্রহকারী। অন্য অর্থ, সুক্ষ্মদর্শী। মুকাতিল বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার।

আল্লাহ তা'আলার রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহর রিযিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিযিক বন্টনে তিনি বিভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

তার জন্য কিছুই থাকবে না[১]।

২১. নাকি তাদের এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দ্বীন থেকে শরী'আত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের মাঝে অবশ্যই সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

২২. আপনি যালিমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন তাদের কৃতকর্মের জন্য; অথচ তা আপতিত হবে তাদেরই উপর। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের উদ্যানসমূহে। তারা যা কিছু চাইবে তাদের রবের কাছে তাদের জন্য তা-ই থাকবে। এটাই তো মহা অনুগ্রহ।

تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

২৩. এটা হলো তা, যার সুসংবাদ আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। বলুন, 'আমি

ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى

---

(১) একজন ঈমানদারের উচিত আখেরাতমুখী হওয়া। যে আখেরাতমুখী হবে সে দুনিয়া আখেরাত সবই পাবে। পক্ষান্তরে যে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে সে দুনিয়াও হারাবে আখেরাতও পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মহান আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য নিজেকে নিয়োজিত কর; আমি তোমার বক্ষকে অমুখাপেক্ষিতা দিয়ে পূর্ণ করে দেব। তোমার দারিদ্রতাকে দূর করে দেব। আর যদি তা না কর আমি তোমার বক্ষ ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব আর তোমার দারিদ্রতা অবশিষ্ট রেখে দেব।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৩, তিরমিযী: ২৪৬৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ জাতিকে সুসংবাদ দাও আলো, উচ্চমর্যাদা, দ্বীন, সাহায্য, যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠার। তবে এ উম্মতের মধ্যে যে কেউ আখেরাতের কাজ দুনিয়া হাসিলের জন্য করবে, আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৩৪]

الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না[১]।' যে উত্তম কাজ

(১) অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে القربى এর ভালবাসা অবশ্যই প্রত্যাশা করি। এই শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এক দল মুফাসসির এ শব্দটিকে আত্মীয়তা (আত্মীয়তার বন্ধন) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, 'আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় চাই না। তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে বন্ধন আছে তোমরা (কুরাইশরা)' অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এতটুকু আমি অবশ্যই চাই। তোমাদের উচিত ছিল আমার কথা মেনে নেয়া। কিন্তু যদি তোমরা তা না মানো তাহলে গোটা আরবের মধ্যে সবার আগে তোমরাই আমার সাথে দুশমনী করতে বদ্ধপরিকর হবে তা অন্তত করো না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটা চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। যুগে যুগে নবী রাসুলগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তা'আলাই দেবেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের সেরা নবী হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরাইশদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২২৯] তাই আল্লাহ বলেছেন, আপনি মুশরিকদের বলুন, দাওয়াতের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্যে তা গৌরবের বিষয় হবে না।

কোন কোন মুফাসসির القربى শব্দটিকে নৈকট্য (নৈকট্য অর্জন) অর্থে গ্রহণ করেন এবং আয়াতটির অর্থ করেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যের আগ্রহ সৃষ্টি

করে আমরা তার জন্য এতে কল্যাণ বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৪. নাকি তারা বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, যদি তা-ই হত তবে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আপনার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আর আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় অন্তরসমূহে যা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবগত।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মোচন করেন[১] এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।

হওয়া ছাড়া আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্য আর কোন বিনিময় চাই না। অর্থাৎ তোমরা সংশোধিত হয়ে যাও। শুধু এটাই আমার পুরস্কার। এ ব্যাখ্যা হাসান বাসারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনের অন্য এক স্থানে বিষয়টি এ ভাষায় বলা হয়েছে: 'এদের বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অনুসরণ করুক, (আমার পারিশ্রমিক শুধু এটাই)।' [সূরা আল-ফুরকান:৫৭] [দেখুন,তাবারী, ইবনে কাসীর,সা'দী]

(১) আলোচ্য আয়াতে তাওবা কবুল করাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের বিশেষ গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন, যে কোন উষর মরুর বুকে ছিল, তার সাথে ছিল বাহন যার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এমতাবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জাগ্রত হয়ে দেখতে পেল যে, বাহনটি তার খাবার ও পানীয়সহ চলে গেছে। সে তার বাহনের খুঁজতে খুঁজতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল। তারপর সে বলল, যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ব ও মারা যাব। সে তার হাতের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল, এমতাবস্থায় সে সচেতন হয়ে দেখল যে, তার বাহন ফিরে এসেছে এবং বাহনের উপর তার খাবার ও পানীয় তেমনিভাবে রয়েছে। তখন সে আনন্দে ভুল করে বলে ফেলল: আল্লাহ আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব। আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবাতে বাহন ও খাদ্য-পানীয় ফিরে পাওয়া লোকটি থেকেও বেশী খুশী হন। [মুসলিম: ২৭৪৪]

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন; আর কাফিররা, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যদি আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন, তবে তারা যমীনে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছেমত পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৮. আর তাদের নিরাশ হওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; এবং তিনিই অভিভাবক, অত্যন্ত প্রশংসিত।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো; আর তিনি যখন ইচ্ছে তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।

চতুর্থ রুকূ'

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

৩১. আর তোমরা যমীনে (আল্লাহ্‌কে) অপারগকারী নও এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩২. আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে পর্বতসদৃশ সাগরে চলমান নৌযানসমূহ।

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি ইচ্ছে করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক চরম ধৈর্যশীল ও একান্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. অথবা তিনি তারা যা অর্জন করেছে তার কারণে সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। আর অনেক (অর্জিত অপরাধ) তিনি ক্ষমাও করেন;

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই।

فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. সুতরাং তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর যারা কবীরা গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়[১]।

---

(১) এটা খাঁটি মুমিনদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না, বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। তারা রুক্ষ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয় না, বরং নম্র স্বভাব ও ধীর মেজাজের

৩৮. আর যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে এবং তাদের কার্যাবলী পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আর তাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা, যখন তাদের উপর সীমালঙ্গন হয় তখন তারা তার প্রতিবিধান করে।

وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে আছে। নিশ্চয় তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না;

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾

৪২. শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

মানুষ হয়। তাদের স্বভাব প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। তারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করে এবং কোন কারণে ক্রোধান্বিত হলেও তা হজম করে। এটি মানুষের সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদ একে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে [আলে ইমরান:১৩৪] এবং একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের বড় বড় কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে [আলে ইমরান: ১৫৯] অনুরুপভাবে হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন হুরমত বা মর্যাদার অবমাননা করা হলে তিনি শাস্তি বিধান করতেন।” [বুখারী: ৩৫৬০, মুসলিম:২৩২৭]

৪৩. আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

পঞ্চম রুকূ'

৪৪. আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, এরপর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। আর যালিমরা যখন শাস্তি দেখতে পাবে তখন আপনি তাদেরকে বলতে শুনবেন, 'ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি?'

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ

৪৫. আর আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে; তারা অপমানে অবনত অবস্থায় আড় চোখে তাকাচ্ছে; আর যারা ঈমান এনেছে তারা কিয়ামতের দিন বলবে, 'নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে।' সাবধান, নিশ্চয় যালিমরা স্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত থাকবে।

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ

৪৬. আর আল্লাহ্ ছাড়া তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ নেই।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ

৪৭. তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে দিন আসার আগে, যা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ

না এবং তোমাদের কোন অস্বীকার থাকবে না[১]।

৪৮. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে তো আমরা এদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কাজ তো শুধু বাণী পৌঁছে দেয়া। আর আমরা যখন মানুষকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন রহমত আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে, তখন তো মানুষ হয়ে পড়ে খুবই অকৃতজ্ঞ।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. আসমানসমূহ ও যমীনের আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন,

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

৫০. অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে করে দেন বন্ধ্যা; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর কোন মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া, অথবা এমন দূত প্রেরণ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

---

(১) আয়াতের শেষে ﴿مِّن نَّكِيرٍ﴾ বলে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এক. সেদিন কেউ তার অপরাধ অস্বীকার করতে পারবে না। [জালালাইন] দুই. সে দিন কেউ কোনভাবেই আত্মগোপন করতে পারবে না। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার] তিন. সেদিন তার জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। [তাবারী; সা'দী]

ছাড়া, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন, তিনি সর্বোচ্চ, হিকমতওয়ালা ।

৫২. আর এভাবে[১] আমরা আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ থেকে রূহকে ওহী করেছি; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমরা এটাকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হেদায়াত দান করি; আর

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى
مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيمٰنُ وَلٰكِن جَعَلْنٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ
مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلٰى صِرٰطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

(১) "এভাবে" অর্থ শুধু শেষ পদ্ধতি নয়, বরং ওপরের আয়াতে যে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে তার সব কটি । আর 'রূহ' অর্থ অহী [তাবারী] অথবা এখানে রূহ বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে । কারণ, কুরআন হচ্ছে এমন রূহ যার দ্বারা অন্তরসমূহ জীবন লাভ করে । [জালালাইন] । কুরআন ও হাদীস থেকেই একথা প্রমাণিত যে, এই তিনটি পদ্ধতিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দান করা হয়েছে । হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসার সূচনা হয়েছিলো সত্য স্বপ্নের আকারে [বুখারী:৩] এই ধারা পরবর্তী সময় পর্যন্ত জারি ছিল । তাই হাদীসে তার বহু সংখ্যক স্বপ্নের উল্লেখ দেখা যায় । যার মাধ্যমে হয় তাকে কোনো শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিংবা কোনো বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে । তাছাড়া কুরআন মজীদে নবীর একটি স্বপ্নের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে [সূরা আল-ফাতহ:২৭] তাছাড়া কতিপয় হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার মনে অমুক বিষয়টি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, কিংবা আমাকে একথাটি বলা হয়েছে বা আমাকেই নির্দেশ দান করা হয়েছে অথবা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে । এ ধরনের সব কিছু অহীর প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত । বেশীর ভাগ হাদীসে কুদসী এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত । মে'রাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বিতীয় প্রকার অহী দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে । কতিপয় হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ দেয়া এবং তা নিয়ে তার বার বার দরখাস্ত পেশ করার কথা যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময় কথাবার্তা হয়েছিলো যেমনটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে মূসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর মধ্যে হয়েছিলো । এরপর থাকে অহীর তৃতীয় শ্রেণী । এ ব্যাপারে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য দান করে যে, কুরআনকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছানো হয়েছে [আল-বাকারাহ:৯৭, আশ-শু'আরা:১৯২-১৯৫]

আপনি তো অবশ্যই সরল পথের দিকে দিকনির্দেশ করেন---

৫৩. সে আল্লাহ্‌র পথ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রাখুন, সব বিষয় আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যাবে।

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِلَی اللّٰهِ تَصِیْرُ الْاُمُوْرُ ﴿۵۳﴾
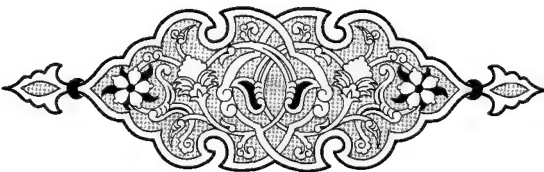
৪৩- সূরা আয-যুখ্রুফ
৮৯ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ;

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. নিশ্চয় আমরা এটাকে (অবতীর্ণ) করেছি আরবী (ভাষায়) কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

৪. আর নিশ্চয় তা আমাদের কাছে উম্মুল কিতাবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হিকমতপূর্ণ।

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ④

৫. আমরা কি তোমাদের থেকে এ উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑤

৬. আর পূর্ববর্তীদের কাছে আমরা বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম।

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ⑥

৭. আর যখনই তাদের কাছে কোন নবী এসেছে তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦

৮. ফলে যারা এদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম; আর গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧

৯. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে?' তারা অবশ্যই

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ⑨

বলবে, 'এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই',

১০. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বানিয়েছেন শয্যা[1] এবং তাতে বানিয়েছেন তোমাদের চলার পথ[2], যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

১১. আর যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে[3] । অতঃপর তা দ্বারা আমরা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে । এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে ।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

১২. আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ

(১) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার শয্যা বা বিছানার মত এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায় । সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয় । অন্যান্য স্থানেও পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । [সূরা ত্বা-হা:৫৩, সূরা আন-নাবা:৬] লক্ষণীয় যে, সে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে, مهد শব্দটির এক অর্থ হচ্ছে, সুস্থির বিছানা বা শয্যা । অপর অর্থ হচ্ছে, দোলনা । অর্থাৎ একটি শিশু যেভাবে তার দোলনার মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল গ্রহকে তোমাদের জন্য তেমনি আরামের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন । ইবনে কাসীর, জালালাইন,আয়সার আত-তাফাসির]

(২) ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়ের মাঝে গিরিপথ এবং পাহাড়ী ও সমতল ভূমি অঞ্চলে নদী হচ্ছে সেই সব প্রাকৃতিক পথ যা আল্লাহ তৈরী করেছেন ।[তাবারী,সা'দী]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য বৃষ্টির একটা গড় পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন যা দীর্ঘকাল প্রতি বছর একই ভাবে চলতে থাকে । এ ক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম নেই যে কখনো বছরে দুই ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হবে আবার কখনো দুইশ ইঞ্চি হবে । তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন মওসুমের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে এমনভাবে বর্ষণ করেন সাধারণত তা ব্যাপক মাত্রায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার জন্য উপকারী হয় । এটাও তাঁর জ্ঞান ও কৌশলেরই অংশ যে, তিনি ভূ-পৃষ্ঠের কিছু অংশকে প্রায় পুরোপুরিই বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে পানি ও লতাগুল্ম শূন্য মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছেন এবং অপর কিছু অঞ্চলে কখনো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন আবার কখনো ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বর্ষন করেন ।[দেখুন, তাবারী]

وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর;

لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

১৩. যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে; এবং বলবে[১], 'পবিত্র-মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে

(১) সওয়ারীর পিঠে বসার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব কথা উচ্চারিত হতো সেগুলোই এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সর্বোত্তম বাস্তব ব্যাখ্যা। আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীর জন্তুর উপর সওয়ার হওয়ার পর তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। তারপর ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا﴾ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করতেন। তারপর এই বলে দো'আ করতেনঃ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াত তাকওয়া ওয়া মিনাল আমালে মা তারদা। আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতওয়ে 'আন্না বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস সাফারে ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলে। আল্লাহুম্মা ইন্নি 'আউযু বিকা মিন ওয়া'সা-ইস সাফারে ওয়া কাআবাতিল মানযারে ওয়া সুয়িল মুনকালাবে ফিল মালে ওয়াল আহল।' [মুসলিম:২৩৯২]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ্ বলে রিকাবে পা রাখলেন এবং সওয়ার হওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। তারপর এ আয়াত অর্থাৎ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا﴾ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত বললেন, তারপর 'আলহামদুলিল্লাহ' তিনবার ও 'আল্লাহু আকবার' তিনবার বললেন এবং তারপর বললেনঃ "আপনি অতি পবিত্র। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন।" এরপর তিনি হেসে ফেললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি কারণে হাসলেন। তিনি বললেন, বান্দা (হে রব, আমাকে ক্ষমা করে দিন) বললে আল্লাহর কাছে তা বড়ই পছন্দনীয় হয়। তিনি বলেনঃ আমার এই বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া ক্ষমাশীল আর কেউ নেই। [মুসনাদে আহমদ:১/৯৭, আবু দাউদ:২৬০২, তিরমিযী:৩৪৪৬]

বশীভূত করতে ।

১৪. 'আর নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী ।'

وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۝١٤

১৫. আর তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে(১) । নিশ্চয়ই মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ ।

وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝١٥

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬. নাকি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা হতে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ ۝١٦

১৭. আর যখন তাদের কাউকে সুসংবাদ দেয়া হয় যা রহমানের প্রতি তারা দৃষ্টান্ত পেশ করে তা দ্বারা, তখন তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যায়, এমতাবস্থায় যে সে দুঃসহ যাতনাক্লিষ্ট ।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝١٧

১৮. আর যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং সে বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ সে কি? (আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত হবে?)

أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝١٨

১৯. আর তারা রহমানের বান্দা ফেরেশ্‌তাগণকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ۝١٩

(১) অংশ বানিয়ে দেয়ার অর্থ আল্লাহর কোন বান্দাকে তাঁর সন্তান ঘোষণা করা । কেননা সন্তান অনিবার্যরূপেই পিতার স্বগোত্রীয় এবং তার অস্তিত্বের একটি অংশ । তাই কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কন্যা বা পুত্র বলার অর্থ এই যে, তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তায় শরীক করা । মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা-সন্তান' আখ্যা দিত । [দেখুন, জালালাইন, আল-মুয়াস্‌সার]

হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

২০. তারা আরও বলে, 'রহমান ইচ্ছে করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলছে।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝٢٠

২১. নাকি আমরা তাদেরকে কুরআনের আগে কোন কিতাব দিয়েছি অতঃপর তারা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۝٢١

২২. বরং তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।'

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ۝٢٢

২৩. আর এভাবেই আপনার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমরা কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি তখনই তার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে থাকব।'

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ۝٢٣

২৪. সে সতর্ককারী বলেছে, 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথ নিয়ে আসি তবুও কি (তোমরা তাদের অনুসরণ করবে)?' তারা বলেছে, 'নিশ্চয় তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার সাথে কুফরিকারী।'

قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ۝٢٤

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. ফলে আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। সুতরাং দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে!

তৃতীয় রুকূ'

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ إِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত।

إِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَإِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৭. তবে তিনি ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর নিশ্চয় তিনি শীঘ্রই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।'

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর এ ঘোষণাকে তিনি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গিয়েছেন তার উত্তরসূরীদের মধ্যে, যাতে তারা ফিরে আসে।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾

২৯. বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে দিয়েছিলাম ভোগ করতে, অবশেষে তাদের কাছে আসল সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّإِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর যখন তাদের কাছে সত্য আসল, তখন তারা বলল, 'এ তো জাদু এবং নিশ্চয় আমরা তার সাথে কুফরিকারী।'

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১. আর তারা বলে, 'এ কুরআন কেন নাযিল করা হল না দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর?'

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা কি আপনার রবের রহমত[১] বণ্টন করে? আমরাই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি এবং তাদের একজনকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; আর আপনার রবের রহমত তারা যা জমা করে তা থেকে উৎকৃষ্টতর।

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এ আশংকা না থাকলে দয়াময়ের সাথে যারা কুফরী করে, তাদেরকে আমরা দিতাম তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করে,

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং তাদের ঘরের জন্য দরজা ও পালংক---যাতে তারা হেলান দেয়,

وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর (অনুরূপ দিতাম) স্বর্ণ নির্মিতও[২]; এবং এ সবই তো শুধু দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার। আর

(১) এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর বিশেষ রহমত, অর্থাৎ নবুওয়াত।সা'দী,জালালাইন]

(২) কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে নবী করা হল না কেন? ৩৩ থেকে ৩৫ নং আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুওয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুওয়ত দেয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। এই সম্পদ তো এমন সব মানুষের কাছেও আছে যাদের ঘৃণ্য কাজ-কর্মের পংকিলতায় গোটা সমাজ পূতিগন্ধময় হয়ে যায়। অথচ একেই তোমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দুনিয়া আল্লাহর কাছে যদি মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ কোন কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না।' [তিরমিযী:২৩২০]

আখিরাত আপনার রবের নিকট মুত্তাকীদের জন্যই।

চতুর্থ রুকূ'

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যে রহমানের যিক্‌র থেকে বিমুখ হয় আমরা তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর নিশ্চয় তারাই (শয়তানরা) মানুষদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়, অথচ মানুষরা (ভ্রষ্ট পথে থাকার পরও) মনে করে তারা (নিজেরা) হেদায়াতপ্রাপ্ত[১]।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾

৩৮. অবশেষে যখন সে আমাদের নিকট আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত!' সুতরাং এ সহচর কতই না নিকৃষ্ট!

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর আজ তোমাদের এ অনুতাপ তোমাদের কোন কাজেই আসবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করেছিলে; নিশ্চয় তোমরা সকলেই শাস্তিতে শরীক।

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾

৪০. আপনি কি শোনাতে পারবেন বধিরকে অথবা হেদায়াত দিতে পারবেন অন্ধকে ও যে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে?

---

(১) অর্থাৎ শয়তানরা সে সমস্ত লোকদেরকে সৎ পথ থেকে দূরে রাখে যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে বিমুখ। শয়তানরা স্মরণবিমুখ লোকদের জন্য ভ্রষ্ট পথকে সুশোভিত করে দেখায়, আর আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও সৎকাজ করাকে অপছন্দনীয় করে রাখে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ বিমুখ লোকেরা শয়তানের পক্ষ থেকে সুশোভিত করার কারণে তারা যে ভ্রষ্ট মতাদর্শের উপর রয়েছে সেটাকেই হক ও হেদায়াতের পথ মনে করতে থাকে। [দেখুন-মুয়াসসার]

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۟ۙ

৪১. অতঃপর যদি আমরা আপনাকে নিয়ে যাই, তবে নিশ্চয় আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব[১];

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ۝

৪২. অথবা আমরা তাদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দিয়েছি, আপনাকে আমরা তা দেখাই, তবে নিশ্চয় তাদের উপর আমরা পূর্ণ ক্ষমতাবান।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৪৩. কাজেই আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথে রয়েছেন।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ۝

৪৪. আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য যিক্‌র[২]; এবং অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِـهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝

৪৫. আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদাত করা যায় এমন কোন ইলাহ স্থির করেছিলাম[৩]?

---

(১) কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেছেন এখন প্রতিশোধ নেয়া বাকী আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু দেখাননি যা তার মনোকষ্টের কারণ হবে। শেষ পর্যন্ত রাসূল চলে গেলেন। অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল, তারা তাদের জীবদ্দশাতেই তাদের উম্মাতের উপর শাস্তি আপতিত হতে দেখেছিলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৭]

(২) আয়াতের এক অর্থ হচ্ছে, এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য স্মরনিকাস্বরূপ। অপর অর্থ হচ্ছে, এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু। অর্থাৎ, সুখ্যাতির বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। [তাবারী]

(৩) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ তো মারা গেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস

পঞ্চম রুকূ'

৪৬. আর অবশ্যই মূসাকে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফির'আউন ও তার নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রবের একজন রাসূল।'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অতঃপর যখন তিনি তাদের কাছে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ আসলেন তখনি তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আমরা তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখিয়েছি তা ছিল তার অনুরূপ নিদর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। আর আমরা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করলাম যাতে তারা ফিরে আসে।

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর তারা বলেছিল, 'হে জাদুকর! তোমার রবের কাছে তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন, নিশ্চয়ই আমরা সৎপথ অবলম্বন করব।'

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর যখন আমরা তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে নিলাম তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা করে বলল, 'হে আমার

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ

করার আদেশ কিরূপে দেয়া হল? অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের জিজ্ঞেস করুন। কোন কোন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসরা ও মি'রাজের রাত্রে নবী-রাসূলদেরকে এ প্রশ্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা কি দেখছ না?	مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. নাকি আমি এ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও প্রায় অক্ষম!	اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾
৫৩. 'তবে তাকে (মূসা) কেন দেয়া হল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সংগে কেন আসল না ফেরেশ্‌তাগণ দলবদ্ধভাবে?'	فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল এক ফাসিক সম্প্রদায়।	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতঃপর যখন তারা আমাদেরকে ক্রোধান্বিত করল তখন আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে একত্রিতভাবে।	فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. ফলে পরবর্তীদের জন্য আমরা তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।	فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৫৭. আর যখনই মার্‌ইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আর তারা বলে, 'আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না 'ঈসা?' এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তাকে আপনার সামনে	وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾

পেশ করে। বরং এরা এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।

৫৯. তিনি তো কেবল আমারই এক বান্দা, যার উপর আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইস্‌রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত[১]।

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۝

৬০. আর যদি আমরা ইচ্ছে করতাম তবে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা যমীনে উত্তরাধিকারী হত[২]।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۝

(১) এটা নাসারাদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা আলাইহিস্‌সালাম-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তার ইলাহ্ হওয়ার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর অসীম ক্ষমতার নমুনা বানানোর অন্য অর্থ, তাকে এমন মু'জিযা দান করা যা না তার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়েছিলো না তার পরে। তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করে তাতে ফুঁ দিতেন আর অমনি তা জীবন্ত পাখি হয়ে যেতো। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতেন এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতেন। এমনকি মৃত মানুষকে পর্যন্ত জীবিত করতেন। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, শুধু অসাধারণ জন্ম এবং এসব বড় বড় মু'জিযার কারণে তাকে আল্লাহর দাসত্বের উর্ধ্বে মনে করা এবং আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে তার উপাসনা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। একজন বান্দা হওয়ার চেয়ে অধিক কোন মর্যাদা তার ছিল না। তাকে নিয়ামতসমূহ দিয়ে অভিসিক্ত করে আল্লাহ্ তাঁর অসীম ক্ষমতার নমুনা বানিয়ে দিয়েছিলেন। [দেখুন,তাবারী]

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে منكم শব্দটির অর্থ করেছেন, بدلاً منكم বা তোমাদের পরিবর্তে। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এপর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি। [ফাতহুল কাদীর]
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, يخلفون। এর অর্থ তারা যমীনের খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করত। অথবা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হতো। আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, তারা তোমাদের মত বংশবিস্তার করত। ফেরেশতারা উত্তরাধিকার রেখে যেত। [ইবনে কাসীর, বাগভী]

৬১. আর নিশ্চয় ‘ঈসা কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না। আর তোমরা আমারই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।

وَاِنَّهٗ لَعِلۡمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمۡتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوۡنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ ﴿۶۱﴾

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই বাধা না দেয়, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيۡطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ ﴿۶۲﴾

৬৩. আর ‘ঈসা যখন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসল, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছি হিকমতসহ এবং তোমরা যে কিছু বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’।

وَلَمَّا جَآءَ عِيۡسٰى بِالۡبَيِّنٰتِ قَالَ قَدۡ جِئۡتُكُمۡ بِالۡحِكۡمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمۡ بَعۡضَ الَّذِىۡ تَخۡتَلِفُوۡنَ فِيۡهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوۡنِ ﴿۶۳﴾

৬৪. ‘নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁর ‘ইবাদাত কর; এটাই সরল পথ।’

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىۡ وَرَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ ﴿۶۴﴾

৬৫. অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কতগুলো দল মতানৈক্য করল, কাজেই যালিমদের জন্য দুর্ভোগ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির!

فَاخۡتَلَفَ الۡاَحۡزَابُ مِنۡۢ بَيۡنِهِمۡ ۚ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡ عَذَابِ يَوۡمٍ اَلِيۡمٍ ﴿۶۵﴾

৬৬. তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ করে কিয়ামত আসারই অপেক্ষা করছে।

هَلۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنۡ تَاۡتِيَهُمۡ بَغۡتَةً وَّهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۶۶﴾

৬৭. বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অন্যের শত্রু, মুত্তাকীরা ছাড়া।

اَلۡاَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذٍۢ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۶۷﴾

সপ্তম রুকূ'

৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۟

৬৯. যারা আমার আয়াতে ঈমান এনেছিল এবং যারা ছিল মুসলিম---

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۟

৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ[১] সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۟

৭১. স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟

৭২. আর এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কাজের ফলস্বরূপ।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۟

৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা খাবে।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۟

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে স্থায়ী হবে;

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۟ۚ

৭৫. তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۟ۚ

---

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ মূল আয়াতে أزواج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রীদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে, আবার কোন ব্যক্তির একই পথের পথিক সমমনা ও সহপাঠী বন্ধুদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তার মধ্যে যেন এই উভয় অর্থই শামিল হয়। ঈমানদারদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মুমিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে। [আদওয়াউল বয়ান]

৭৬. আর আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই ছিল যালিম।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭. তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালেক[১], তোমার রব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন।' সে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী হবে।'

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের বেশীর ভাগই ছিলে সত্য অপছন্দকারী।'

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. নাকি তারা কোন ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? নিশ্চয় আমিই তো চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০. নাকি তারা মনে করে যে, আমরা তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণা শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ। আর আমাদের ফেরেশ্‌তাগণ তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিখছে।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۗ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. বলুন, 'দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তাঁর ইবাদতে ঘৃণাকারীদের অগ্রণী[২];

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾

---

(১) মালেক অর্থ জাহান্নামের ব্যবস্থাপক ফেরেশ্‌তার নাম। কথার ইংগিত থেকে এটিই প্রকাশ পাচ্ছে। [ইবনে কাসীর]

(২) ওপরে عَابِدِيْنَ এর অর্থ করা হয়েছে, ঘৃণাকারী। এটা আরবী বিভিন্ন বাকরীতিতে ব্যবহৃত আছে। অন্য অনুবাদ হচ্ছে, বলুন হে মুহাম্মাদ! যদি রহমানের কোন সন্তান থাকে যেটা তোমরা তোমাদের কথায় দাবী করছ, তবে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করণে ও তোমাদের দাবী অস্বীকারকরণে আমি প্রথম আল্লাহ্‌র উপর মুমিন। কারণ, তাঁর কোন সন্তান থাকতে পারে না। [তাবারী] তখন عَابِدِيْنَ শব্দের অর্থ হবে, مُؤْمِنِيْنَ। আর কথার বাকী অংশ উহ্য থাকবে। তাছাড়া আরেক অনুবাদ হচ্ছে, ইবাদতকারী।

৮২. 'তারা যা আরোপ করে তা থেকে আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং 'আরশের রব পবিত্র-মহান ।	سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন তারা মগ্ন থাকুক বেহুদা কথায় এবং মত্ত থাকুক খেল-তামাশায় যে দিনের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত ।	فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে । আর তিনি হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ ।	وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর তিনি বরকতময়, যার কর্তৃত্বে রয়েছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু । আর কিয়ামতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে ।	وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আর তিনি ছাড়া তারা যাদেরকে ডাকে, তারা সুপারিশের মালিক হবে	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ

অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয়, তাঁর সন্তান আছে তারপরও আমি আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করব । কারণ, আমি তাঁর বান্দা । আর বান্দা স্রষ্টার নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না । [ইবন কাসীর] কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব । বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি । বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম । কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে । কাজেই মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না । এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম । কেননা, মাঝে মাঝে এধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে । [দেখুন, তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর,আদওয়াউল বায়ান]

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

না, তবে তারা ছাড়া, যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

৮৭. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৮৮. আর তার (রাসূল) এ উক্তিঃ 'হে আমার রব! নিশ্চয় এরা এমন সম্প্রদায় যারা ঈমান আনবে না।'

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

৮৯. কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন, 'সালাম'; অতঃপর তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।
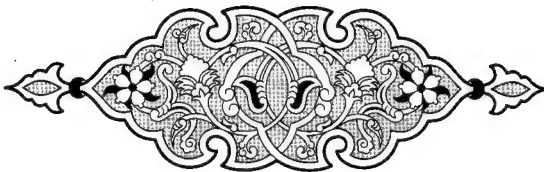
৪৪- সূরা আদ-দুখান
৫৯ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الدُّخَانِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. হা-মীম ।

حمٓ ①

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের(১) ।

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

৩. নিশ্চয় আমরা এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে(২); নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী ।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ③

৪. সে রাতে প্রত্যেক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়(৩),

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ④

(১) 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে ।[সা'দী,মুয়াস্‌সার, জালালাইন]

(২) গ্রহণযোগ্য তাফসীরবিদদের মতে এখানে কদরের রাত্রি বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয় । সূরা কদরে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন শবে-কদরে নাযিল হয়েছে । এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে-কদরই বোঝানো হয়েছে । এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয় । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে, তাওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কুরআন চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর (পঁচিশের রাত্রিতে) অবতীর্ণ হয়েছে । [মুসনাদে আহমাদ:৪/১০৭]

(৩) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ কুরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ, শবে-কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে-কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে । অর্থাৎ, এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে । মাহ্‌দভী বলেন এর অর্থ এই যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্নে, স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয় । কেননা, কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন । অতএব, এ রাত্রিতে এগুলোর স্থির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তাকদীর প্রয়োগ

৫. আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, নিশ্চয় আমরা রাসূল প্রেরণকারী	أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥
৬. আপনার রবের রহমতস্বরূপ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ--	رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٦
৭. আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।	رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۝٧
৮. তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও রব।	لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝٨
৯. বরং তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেল--তামাসা করছে।	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝٩
১০. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ(১),	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝١٠

করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তুমি কোন মানুষকে বাজারে হাঁটাচলা করতে দেখবে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায়। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, প্রতি বছরই এ বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৮-৪৪৯]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত বা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি আলী, ইবন আব্বাস, ইবন ওমর, আবু হুরায়রা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বানী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দো'আর ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধুম্র দৃষ্টিগোচর হত। এ উক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার

আকাশে উত্থিত ধুলিকণাকে ধুম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আ'রাজ প্রমুখের। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের বর্ণনাসমূহ নিম্নরূপ:

হুযায়ফা ইবনে আসীদ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কেয়ামতের সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কেয়ামত হবে না-(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দোখান তথা ধুম্র, (৩) দাব্বা (বা বিচিত্র ধরণের প্রাণী), (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (৫) ঈসা আলাইহিস্‌সালাম-এর অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্যে আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। [মুসলিম: ২৯০১] এছাড়া কিছু সহীহ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দোখান' ধুম্র কেয়ামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ এদের উপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধুম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। এক বর্ণনায় আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধুম্রের মত দেখত। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ তার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুদার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দো'আ করুন। নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করলে, বৃষ্টি হল। তখন ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا﴾ আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ, আমরা কিছু দিনের জন্যে তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমরা প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর ইবনে-মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে।

يَّغْشَى النَّاسَ ۗ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿١١﴾

১১. তা আবৃত করে ফেলবে লোকদেরকে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

رَبَّنَا اكۡشِفۡ عَنَّا الۡعَذَابَ اِنَّا مُؤۡمِنُوۡنَ ﴿١٢﴾

১২. (তারা বলবে) 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে শাস্তি দূর করুন, নিশ্চয় আমরা মুমিন হব।'

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكۡرٰى وَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ مُّبِيۡنٌ ﴿١٣﴾

১৩. তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ ইতোপূর্বে তাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট এক রাসূল;

ثُمَّ تَوَلَّوۡا عَنۡهُ وَقَالُوۡا مُعَلَّمٌ مَّجۡنُوۡنٌ ﴿١٤﴾

১৪. তারপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং বলেছিল, 'এ এক শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল!'

اِنَّا كَاشِفُوا الۡعَذَابِ قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ عَآئِدُوۡنَ ﴿١٥﴾

১৫. নিশ্চয় আমরা অল্প সময়ের জন্য শাস্তি রহিত করব--- (কিন্তু) নিশ্চয় তোমরা তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

يَوۡمَ نَبۡطِشُ الۡبَطۡشَةَ الۡكُبۡرٰى ۚ اِنَّا مُنۡتَقِمُوۡنَ ﴿١٦﴾

১৬. যেদিন আমরা প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন নিশ্চয় আমরা হব প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

وَلَقَدۡ فَتَنَّا قَبۡلَهُمۡ قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ وَجَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ كَرِيۡمٌ ﴿١٧﴾

১৭. আর অবশ্যই এদের আগে আমরা ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছেও এসেছিলেন এক সম্মানিত রাসূল[১],

---

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দোখান তথা ধুম্র, রোম (এর পারসিকদের উপর জয়লাভ), চাঁদ (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), পাকড়াও (যা বদরের প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল) ও লেযাম (বা স্থায়ী আযাব)। [বুখারী:৪৮০৯, মুসলিম:২৭৯৮]

(১) মূল আয়াতে كريم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন তার দ্বারা বুঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে যে অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচার-আচরণ এবং অতীব প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী। সাধারণ গুণাবলী বুঝাতে এ

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. (তিনি ফিরআউনকে বলেছিলেন) 'আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও(১) । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল ।

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾

১৯. 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসব ।

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

২০. 'আর নিশ্চয় আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে তোমরা আমাকে পাথরের আঘাত হানতে না পার(২) ।

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾

২১. 'আর যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমাকে ছেড়ে যাও ।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. অতঃপর মূসা তার রবকে ডাকলেন, 'নিশ্চয় এরা এক অপরাধী সম্প্রদায় ।'

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. (আল্লাহ্ বললেন) 'সুতরাং আপনি

শব্দ ব্যবহৃত হয় না । এখানে মূসা আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । [তবারী, কুরতুবী]

(১) মূল আয়াতে أَدُّوا বলা হয়েছে । আয়াতাংশের একটি অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোর্পদ করো । এই অনুবাদ অনুসারে এটা ইতোপূর্বে সূরা আল-আ'রাফ এর ১০৫, সূরা ত্বাহার ৪৭ এবং আশ-শু'আরার ১৭ নং আয়াতে 'বনী ইসরাঈলদের আমার সাথে যেতে দাও' বলে যে দাবী করা হয়েছে সেই দাবীর সমার্থক ।

(২) تَرْجُمُونِ শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা । এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেয়াও হয় । এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত । কেননা, ফির'আউনের সম্প্রদায় মুসা আলাইহিস সালাম-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল । [তাবারী,ইবনে কাসীর]

আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়ুন, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে ।'

২৪. আর সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিন[১], নিশ্চয় তারা হবে এক ডুবন্ত বাহিনী ।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল অনেক উদ্যান ও প্রস্রবণ;

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

২৬. শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৭. আর বিলাস উপকরণ, তাতে তারা আনন্দ পেত ।

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এরূপই ঘটেছিল এবং আমরা এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন[২] সম্প্রদায়কে ।

كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর আসমান এবং যমীন তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তারা অবকাশপ্রাপ্তও ছিল না ।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৩০. আর অবশ্যই আমরা উদ্ধার করেছিলাম

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

(১) মূসা আলাইহিস সালাম সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফির'আউনের বাহিনী পার হতে না পারে । তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না- যাতে ফির'আউন শুষ্ক ও তৈরী পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে । তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা নিমজ্জিত হবে । [দেখুন,তাবারী]

(২) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এই ভিন্ন জাতি হচ্ছে বনী ইসরাঈল ।[সূরা আশ-শু'আরা:৫৯] অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না । সুরা আশ-শু'আরার ৫৯ নং আয়াতের তফসীরে এর বিস্তারিত জবাবও দেয়া হয়েছে ।

বনী ইস্‌রাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে

৩১. ফির'আউন থেকে; নিশ্চয় সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আর আমরা জেনে শুনেই তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর নির্বাচিত করেছিলাম।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর আমরা তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা(১);

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় তারা বলেই থাকে,

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবার নই।

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে আস।'

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তারা কি শ্রেষ্ঠ না তুব্বা' সম্প্রদায়(২) ও

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

---

(১) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। بلاء শব্দের দু'অর্থ- পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) কুরআনে দু'জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে- এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে-কোন বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এরা কোন জনগোষ্ঠী এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। বাস্তবে তুব্বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এই সম্রাটগণকে তাবাবি'য়ায়ে-ইয়ামন বলা হয়। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে তাদের মধ্যবর্তী এক সম্রাটকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার নাম আস'আদ আবু কুরাইব ইবনে মা'দিকারেব। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে

أَهْلَكْنٰهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

তাদের পূর্বে যারা ছিল তারা? আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অপরাধী।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আমরা আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যকার কোন কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি;

مَا خَلَقْنٰهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আমরা এ দু'টিকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় ফয়সালার দিনটি তাদের সবার জন্য নির্ধারিত সময়।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. সেদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না।

অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দুজন ইহুদী আলেম তাকে হুশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না; কারণ, এটা শেষ নবীর হিজরতভুমি। সম্রাট ইহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামন প্রব্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সে দ্বীন গ্রহণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের উভয় জায়গায় তুব্বার সম্প্রদায় উল্লেখ করা হয়েছে; শুধু তুব্বা উল্লেখিত হয়নি? [দেখুন, তাবারী, ইবন কাসীর, কুরতুবী]

কোন কোন হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। [মুসনাদে আহমাদ:৫/৩৪০]

৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। নিশ্চয় তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

তৃতীয় রুকূ'

৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম গাছ হবে[১]---

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾

৪৪. পাপীর খাদ্য;

طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾

৪৫. গলিত তামার মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে

كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ ﴿٤٥﴾

৪৬. ফুটন্ত পানি ফুটার মত।

كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

৪৭. (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,

خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি ঢেলে দাও-

ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

৪৯. (বলা হবে) 'আস্বাদন কর, নিশ্চয় তুমিই সম্মানিত, অভিজাত!

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

৫০. 'নিশ্চয় এটা তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।'

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে[২]--

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

---

(১) যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা আস-সাফফাতে কিছু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। [ফাতহুল কাদীর] কেননা, এখানে মানুষকে খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য সূরায় বলা হয়েছে, ﴿لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۝ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۝ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۝ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ۝ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ [সূরা আল-ওয়াকি'আ: ৫২-৫৬]

(২) শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গা অর্থ এমন জায়গা যেখানে কোন প্রকার আশংকা থাকবে না। কোন দুঃখ, অস্থিরতা, বিপদ, আশংকা এবং পরিশ্রম ও কষ্ট থাকবে না। হাদীসে

৫২. উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝٥٢

৫৩. তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে।

يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝٥٣

৫৪. এরূপই ঘটবে; আর আমরা তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে,

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ۝٥٤

৫৫. সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۝٥٥

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না[১]। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন-

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۝٥٦

৫৭. আপনার রবের অনুগ্রহস্বরূপ[২]।

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝٥٧

আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতবাসীদের বলে দেয়া হবে, তোমরা এখানে চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না চিরদিন সুখী থাকবে কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হবে না এবং চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। [মুসলিম:২৮৩৭]

(১) অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যেও। কিন্তু সেটা তাদের জন্যে অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্যে অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নেয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নেয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করাকে আল্লাহ তাঁর দয়ার ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করছেন। এর দ্বারা মানুষকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই এই সফলতা আসতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ব্যক্তি তার সৎকর্ম করার তাওফীক বা সামর্থ কিভাবে লাভ করবে? তাছাড়া ব্যক্তি দ্বারা যত উত্তম কাজই সম্পন্ন হোক না কেন তা পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতর হতে পারে না। সুতরাং সে কাজ সম্পর্কে দাবী করে একথা বলা যাবে না যে, তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি বান্দার দুর্বলতা এবং তার কাজকর্মের অপূর্ণতাসমূহ উপেক্ষা করে তার খেদমত কবুল

এটাই তো মহাসাফল্য ।

৫৮. অতঃপর নিশ্চয় আমরা আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. কাজেই আপনি প্রতীক্ষা করুন, নিশ্চয় তারা প্রতীক্ষমাণ ।

فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

করেন এবং তাকে পুরস্কৃত করে ধন্য করেন । অন্যথায়, তিনি যদি সূক্ষ্মভাবে হিসেব নিতে শুরু করেন তাহলে কার এমন দুঃসাহস আছে যে নিজের বাহুবলে জান্নাত লাভ করার দাবী করতে পারে? হাদীসে একথাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেনঃ 'আমল করো এবং নিজের সাধ্যমত সব সর্বাধিক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো । জেনে রাখো, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না ।' লোকেরা বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল, অপনার আমলও কি পারবে না? তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ, আমিও শুধু আমার আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবো না । তবে আমার রব যদি তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করেন ।' [বুখারী:৬৪৬৭]

৪৫- সূরা আল-জাসিয়াহ
৩৭ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

حٰمٓ ۝١

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢

২. এ কিতাব মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিলকৃত।

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

৩. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে মুমিনদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٤

৪. আর তোমাদের সৃষ্টি এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে;

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٥

৫. আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ হতে যে রিয্ক (পানি) বর্ষণ করেন, অতঃপর তিনি তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে অনেক নিদর্শন রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বোঝে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ ۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

৬. এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমরা আপনার কাছে তিলাওয়াত করছি যথাযথভাবে। কাজেই আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াতের পরে তারা আর কোন বাণীতে ঈমান আনবে[১]?

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বা ও তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে "ওয়াহ্দানিয়াত" বা একত্বের সপক্ষে স্বয়ং আল্লাহর পেশকৃত এসব যুক্তি-প্রমাণ সামনে আসার পরও যখন এসব লোক ঈমান গ্রহণ করছে না তখন এমন কি জিনিস আর আসতে পারে যার কারণে ঈমানের সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটবে? আল্লাহর কালামই তো সেই চূড়ান্ত বস্তু যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এই নিয়ামত লাভ করতে পারে। আর একটি অদেখা সত্য সম্পর্কে দৃঢ়

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর[১],

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝

৮. সে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শোনে যা তার কাছে তিলাওয়াত করা হয়, তারপর সে ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। অতএব, আপনি তাকে সুসংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির;

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৯. আর যখন সে আমাদের কোন আয়াত অবগত হয়, তখন সে সেটাকে পরিহাসের পাত্র রূপে গ্রহণ করে। তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে ওরাও নয়। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১১. এ কুরআন সৎপথের দিশারী; আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহের

هَٰذَا هُدًى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ

বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সর্বাধিক যুক্তি সঙ্গত যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব তা এই পবিত্র কালামে পেশ করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ অস্বীকার করতেই বদ্ধপরিকর থাকে তাহলে করতে থাকুক। তার অস্বীকৃতির ফলে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না।[দেখুন, তাবারী]

(১) কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নদর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন কোন বর্ণনা থেকে হারেছ ইবন কালদাহ সম্পর্কে, আবার কোন এক বর্ণনা থেকে আবু জাহল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। كل শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ-- একজন হোক অথবা তিন জন। [কুরতবী,বাগভী]

مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

সাথে কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

দ্বিতীয় রুকূ'

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আল্লাহ্, যিনি সাগরকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যেন তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে। আর যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পার(১) এবং যেন তোমরা (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলুন, 'তারা যেন ক্ষমা করে ওদেরকে, যারা আল্লাহ্‌র দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না। যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন।'

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۡ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তা তারই উপর বর্তাবে,

(১) পবিত্র কুরআনে 'অনুগ্রহ তালাশ করা' এর অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থ হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোঁজ করে উপকৃত হও।[দেখুন, তবারী, সা'দী]

তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের দিকেই প্রত্যাবর্তিত করা হবে ।

১৬. আর অবশ্যই আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব[১] ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করেছিলাম উত্তম বস্তু হতে, আর দিয়েছিলাম তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. আর আমরা তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করেছিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতবিরোধ করেছিল । তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করত, নিশ্চয় আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে সব বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন ।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. তারপর আমরা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন । আর যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না ।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় আপনার কোনই কাজে আসবে না; আর নিশ্চয় যালিমরা একে অন্যের বন্ধু; এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বন্ধু ।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

---

(১) হুকুম শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে । এক-কিতাবের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং দ্বীনের অনুভূতি । দুই-কিতাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করার কৌশল । তিন-বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা । চার-ক্ষমতা বা রাজত্ব [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

২০. এ কুরআন মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা এবং হেদায়াত ও রহমত এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. নাকি যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা মনে করে যে, আমরা জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে ওদের মত গণ্য করব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? তাদের বিচার-সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ!

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾

তৃতীয় রুকূ'

২২. আর আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুযায়ী ফল দেয়া যেতে পারে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন[১] এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্‌র পরে কে তাকে হেদায়াত দিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

---

(১) এই বাক্যাংশের একটি অর্থ হতে পারে এই যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাস হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, সে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে বসেছে এ বিষয়টি জেনে আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। [দেখুন, কুরতুবী]

২৪. আর তারা বলে, 'একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে(১)।' বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো শুধু ধারণাই করে।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না শুধু এ কথা ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে আস।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. বলুন, 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, যাতে

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

---

(১) دهر শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনও দীর্ঘ সময়কালকেও دهر বলা হয়। কাফেররা বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রুপ, কোন ইলাহী আদেশে নয়, বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়। মূলতঃ কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছুকে তারই কর্ম বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্ হাদীসসমূহে দাহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফেররা যে শক্তিকে দাহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ তা'আলারই। তাই দাহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বনী আদম 'দাহর তথা মহাকালকে গালি দেয়, অথচ আল্লাহ বলেন, আমিই প্রকৃতপক্ষে মহাকাল, আমিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাই। [বুখারীঃ ৫৭১৩]

কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ তা জানে না।'

চতুর্থ রুকূ'

২৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই; এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ

২৮. আর আপনি প্রত্যেক জাতিকে দেখবেন ভয়ে নতজানু[১], প্রত্যেক জাতিকে তার কিতাবের[২] প্রতি ডাকা হবে, (এবং বলা হবে) 'আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা আমল করতে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

(১) جاثية এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। ﴿كُلَّ اُمَّةٍ﴾ (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। সেখানে হাশরের ময়দানের এবং আল্লাহর আদালতের এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে, বড় বড় অহংকারীদের অহংকারও উবে যাবে। সেখানে সবাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নতজানু হবে। কোন কোন আয়াত ও বর্ণনায় রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে নবী-রাসূল ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়; কেননা, অল্প কিছুক্ষণের জন্যে এই ভয় ও ত্রাস নবী-রাসূল ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্যে এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেয়া হয়েছে। আবার এটাও সম্ভবপর যে, প্রত্যেক দল বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া كل শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। [দেখুন, ইবনে কাসীর,কুরতুবী,সা'দী]

(২) অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়ানো হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা। [দেখুন, ইবনে কাসীর,সা'দী]

২৯. 'এই আমাদের লেখনি, যা তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে সত্যভাবে। নিশ্চয় তোমরা যা আমল করতে তা আমরা লিপিবদ্ধ করেছিলাম।'

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে পরিণামে তাদের রব তাদেরকে প্রবেশ করাবেন স্বীয় রহমতে। এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

৩১. আর যারা কুফরী করেছে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? অতঃপর তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ أَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. আর যখন বলা হয়, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কিয়ামত--- এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী নই।'

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর তাদের মন্দ কাজগুলোর কুফল তাদের কাছে প্রকাশিত হবে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর বলা হবে, 'আজ আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে রাখব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়টি ছেড়ে গিয়েছিলে। আর তোমাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

তোমাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

৩৫. 'এটা এ জন্যে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।' সুতরাং আজ না তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, আর না তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে।

ذٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. অতএব, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আসমানসমূহের রব, যমীনের রব ও সকল সৃষ্টির রব।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গৌরব-গরিমা তাঁরই[১] এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বড়ত্ব আমার বস্ত্র আর অহংকার আমার চাদর; যে কেউ এ দু'টির কোন একটি নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামের অধিবাসী করে ছাড়বো।" [মুসলিম: ২৬২০]

سُورَةُ الأَحْقَافِ

৪৬- সূরা আল-আহ্‌কাফ
৩৫ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

حٰمٓ ①

১. হা-মীম ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২. এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিলকৃত;

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

৩. আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমরা যথাযথ ভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④

৪. বলুন, 'তোমরা আমাকে সংবাদ দাও, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক আমাকে দেখাও তো তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার কাছে নিয়ে আস যদি তোমরা সত্যবাদী হও[১]।'

---

(১) এ আয়াতে মুশরেকদের শির্ক এর দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবীর সপক্ষে দলিল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলিলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরেকদের দাবির পক্ষে কোন দলিল নেই। তাই এহেন দলিলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলিলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম: যুক্তিভিত্তিক দলিল। এর খণ্ডন বলা হয়েছে ﴿اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ﴾ "এরা যমীনে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি?" দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাসভিত্তিক দলিল। বলাবাহুল্য আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলিল গ্রহণীয় হতে পারে; যা স্বয়ং আল্লাহর

৫. আর সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও গাফেল ।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝٥

৬. আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন সেগুলো হবে এদের শত্রু এবং এরা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে ।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝٦

৭. আর যখন তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন যারা কুফরী করেছে তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা বলে, ‘এ তো সুস্পষ্ট জাদু ।’

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝٧

৮. নাকি তারা বলে যে, ‘সে এটা উদ্ভাবন করেছে ।’ বলুন, ‘যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচাতে

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي

পক্ষ থেকে আসে । যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল; কুরআন ইত্যাদি কিতাব অথবা আল্লাহ মনোনীত নবী ও রাসূলগণের উক্তি । এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে ﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا﴾ অর্থাৎ তোমাদের মূর্তি পূজার কোন দলিল থাকলে কোন ইলাহী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেয়া হয়েছে । এর পর দ্বিতীয় প্রকার ঐতিহাসিক দলীল পেশ করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রাসূলগণের পরম্পরাগত কোন উক্তি পেশ কর । তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথ ভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয় । এর পরবর্তী আয়াতে তাদের শির্কের তৃতীয় প্রকার দলীল পেশ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে । কারণ, তারা হয়ত বলতে পারে যে, তাদেরকে আমরা আল্লাহর শরীক এজন্যই সাব্যস্ত করি যে, তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের কোন উপকার সাধন কিংবা অপকার থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে । তাদের সে দলিল পেশের সম্ভাবনাকে নাকচ করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে না । সুতরাং তাদের শির্কের সপক্ষে কোন যুক্তি বা দলিলই অবশিষ্ট রইল না । [দেখুন, ইবনে কাসীর]

وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧

কিছুরই মালিক নও। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨

৯. বলুন, 'রাসূলদের মধ্যে আমিই প্রথম নই। আর আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে; আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

১০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হয়ে থাকে এবং তোমরা তার সাথে কুফরী কর, আর বনী ইস্‌রাঈলের একজন অনুরূপ কিতাবের আয়াতের উপর সাক্ষ্য দিয়ে তাতে ঈমান আনল; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, (তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে?) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না[১]।

(১) এ আয়াত এবং সূরা আশ-শু'আরার ১৯৬ ও ১৯৭ নং আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও নাসারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালাত ও কুরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্য কি এই মূর্খদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুওয়াত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কুরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতে নিপাত হয়ে যাওয়া

দ্বিতীয় রুকূ'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ⑪

১১. আর যারা কুফরী করেছে তারা যারা ঈমান এনেছে তাদের সম্পর্কে বলে, 'যদি এটা ভাল হত তবে তারা এর দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারত না[১]। আর যখন তারা

জরুরি, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কুরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যখন তোমাদের বনী ইসরাঈলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলিম হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার ওপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। আল্লাহর বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, কুরআন তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা কোন অভিনব জিনিস নয়। পৃথিবীতে প্রথমবারের মত শুধুমাত্র তোমাদের সামনেই তা পেশ করা হয়নি যে, তোমরা ওজর পেশ করে বলবেঃ এ ধরনের কথা তো ইতোপূর্বে মানব জাতির কাছে আর আসেনি। তাই আমরা কি করে তা মানতে পারি। ইতোপূর্বেও এসব শিক্ষা এভাবেই অহীর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের কাছে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাব রূপে এসেছিলো। বনী ইসরাঈলদের একজন সাধারণ মানুষও তা মেনে নিয়েছিলো এবং একথা স্বীকার করে নিয়োছিলো যে অহীই হচ্ছে এসব শিক্ষা নাযিল হওয়ার মাধ্যম। তাই অহী এবং এই শিক্ষা দুর্বোধ্য জিনিস তোমরা সে দাবী করতে পার না। আসল কথা হলো, তোমাদের গর্ব, অহংকার এবং ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা ঈমানের পথে অন্তরায়। খ্যাতনামা ইহুদী আলেম আবদুল্লাহ ইবন সালামসহ যত ইহুদী ও নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দাহহাক প্রমুখ তাফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। যদিও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপরও এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থি নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বানি হিসেবে গণ্য হইবে। [দেখুন, তাবারী]

(১) কুরাইশ নেতারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যেসব যুক্তি কাজে লাগাতো এটা তার একটা। তারা বলতো,

এটা দ্বারা হেদায়াত পায়নি তখন তারা অচিরেই বলবে, 'এ এক পুরোনো মিথ্যা।'

১২. আর এর আগে ছিল মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এ কিতাব (তার) সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায়, যেন তা যালিমদেরকে সতর্ক করে, আর তা মুহসিনদের জন্য সুসংবাদ[১]।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۗ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾

১৩. নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্' তারপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾

'এ কুরআন যদি সত্য হতো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি একটি সঠিক জিনিসের দাওয়াত দিতেন তাহলে কওমের নেতারা, গোত্রসমূহের অধিপতিরা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হয়ে তা গ্রহণ করতো। এটা কি করে হতে পারে যে, কতিপয় অনভিজ্ঞ বালক এবং কিছু সংখ্যক নীচু পর্যায়ের ক্রীতদাস যেমন বিলাল, আম্মার, সুহাইব, খাব্বাব প্রমূখ সর্বাগ্রে ঈমান আনবে অথচ কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এবং আজ পর্যন্ত কওম যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে আসছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করবে? নতুন এই ধর্মে মন্দ কিছু অবশ্যই আছে। তাই কওমের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা মানছে না। অতএব, তোমরাও তা থেকে দূরে সরে যাও, এই প্রতারণামূলক যুক্তি খাড়া করে তারা সাধারণ মানুষকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করতো। তারা মূলত: অহংকারবশেই উপরোক্ত ধরনের কুটতর্কের অবতারণা করত। অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে সে নিজেই বোকা। সূরা আল-আন'আমের ৫৩ নং আয়াতেও কাফেরদের এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, তাবারী,ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অভিনব রাসূল এবং কুরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে ঈমান আনতে আপত্তি হবে। বরং এর আগে মূসা আলাইহিস সালাম রাসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তার প্রতি তাওরাত নাযিল হয়েছিল। ইহুদী ও নাসারা এমনকি কাফেরদের অনেকেই তা স্বীকার করে। [দেখুন, তাবারী]

১৪. তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা আমল করত তার পুরস্কার স্বরূপ।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আর আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে[১] ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস[২], অবশেষে যখন সে পূর্ণ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

---

(১) অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা যত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এছাড়া এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।
আয়াতের শুরুতেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময় কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তান দেখাশোনা করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সন্তানের ওপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন, 'মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে'। [মুসলিম:৪৬২২]

(২) সন্তানদের যদিও মা-বাপ উভয়েরই সেবা করতে হবে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া মায়ের অধিকার এ কারণে বেশী যে, সে সন্তানের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করে। এ আয়াত এ দিকেই ইংগিত করে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। আয়াতেও মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছেঃ (১) কষ্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। (২) কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং (৩) গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই

শক্তিপ্রাপ্ত হয়[1] এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য এবং যাতে আমি এমন সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সংশোধন করে দিন, নিশ্চয় আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত দৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা সূরা আল-বাকারাহ এর ২৩৩ নং আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে অথচ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্যদান ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা, এটা সাধারণ নিয়ম বহির্ভুত ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সংবাদ অবগত হয়ে খলিফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলিফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করেন। এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্নরূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(১) أشد এর শাব্দিক অর্থ শক্তি সামর্থ্য। পবিত্র কুরআনের মোট ছয়টি স্থানে এ শব্দটি এসেছে। তন্মধ্যে সূরা আল-আন'আমের ১৫২, সূরা ইউসুফের ১২, সূরা আল-ইসরার ৩৪, সূরা আল-কাহফ এর ৮২, সূরা আল-কাসাসের ১৪ নং আয়াতে এর তাফসীর করা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স বলে।

১৬. 'ওরাই তারা, আমরা যাদের সৎ আমলগুলো কবুল করি এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের মধ্যে হবে[১]। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য ওয়াদা।

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

১৭. আর যে তার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এ ওয়াদা দাও যে, আমাকে পুনরুত্থিত করা হবে অথচ আমার আগে বহু প্রজন্ম গত হয়েছে[২]?' তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি ঈমান আনয়ন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা

وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

---

(১) এ আয়াতের বিধান অত্যন্ত ব্যাপক। এমনকি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক উক্তি থেকে আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমেনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার কাছে আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন: 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা ﴿أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ﴾ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর কসম। উসমান ও তার সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(২) পূর্বের আয়াতসমূহে মাতা-পিতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে, যে পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটুক্তি করে। বিশেষতঃ পিতা-মাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে। এ আয়াতটি কোন অবস্থাতেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। (যেমনটি শী'য়া সম্প্রদায়ের লোকেরা করার চেষ্টা চালায়।) [দেখুন, ইবনে কাসীর]

সত্য। তখন সে বলে, 'এ তো অতীত কালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।'

১৮. এরা তো তারা, যাদের উপর সত্য হয়েছে আযাবের সে ফয়সালা, যা সত্য হয়েছিল সে সব উম্মতের জন্য যারা গত হয়ে গেছে এদের আগে, জিন ও ইনসান থেকে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

১৯. আর প্রত্যেকের জন্য তাদের আমল অনুসারে মর্যাদা রয়েছে; এবং যাতে আল্লাহ্‌ প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিতে পারেন। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[১]।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

২০. আর যারা কুফরী করেছে যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই যাবতীয় সুখ-সম্ভার নিয়ে গেছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি[২];

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

(১) অর্থাৎ না ভাল লোকদের ত্যাগ ও কুরবানী নষ্ট হবে না মন্দ লোকদেরকে তাদের প্রকৃত অপরাধের অধিক শাস্তি দেয়া হবে। সৎ ব্যক্তি যদি তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকে কিংবা প্রকৃত প্রাপ্যের চেয়ে কম পুরস্কার পায় তাহলে তা যুলুম। আবার খারাপ লোক যদি তার কৃত অপরাধের চেয়ে বেশী শাস্তি পায় তাহলে সেটাও যুলুম। [দেখুন, তাবারী, মুয়াস্‌সার]

(২) অর্থাৎ কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেয়া হয়েছে। এখন আখেরাতে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়; আখেরাতে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন।

কারণ তোমরা যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা নাফরমানী করতে।'

তৃতীয় রুকূ'

২১. আর স্মরণ করুন, 'আদ্ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যখন সে আহকাফে[1] স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল। যার আগে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিলেন (এ বলে) যে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদাত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।'

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয় বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নেয়ামত লাভ করলেও আখেরাতের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(১) যেহেতু কুরাইশ নেতারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করতো এবং নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মোড়লিপনার কারণে আনন্দে আত্মহারা ছিল তাই এখানে তাদেরকে 'আদ কাওমের কাহিনী শুনানো হচ্ছে। আরবে 'আদ জাতি এভাবে পরিচিত ছিল যে, প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডে তারা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী কওম। আয়াতে বর্ণিত أَحْقَافٌ শব্দটি حِقْفٌ শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বালুর এমন সব লম্বা লম্বা টিলা যা উচ্চতায় পাহাড়ের সমান নয়। পারিভাষিক অর্থে এটা আরব মরুভূমির দক্ষিণ পশ্চিম অংশের নাম, বর্তমানে যেখানে কোন জনবসতি নেই। [দেখুন, তাবারী] আহক্বাফ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এক সময় এখানে জাঁকালো সভ্যতার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি বাস করতো। সম্ভবত হাজার হাজার বছর পূর্বে এটা এক উর্বর অঞ্চল ছিল। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন একে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এটা সৌদী আরবের আর-রুবউল খালীর মরু এলাকায় অবস্থিত। যার আভ্যন্তরীণ এলাকায় যাওয়ার সাহসও কারো নেই।

قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক তবে আমাদেরকে যার ওয়াদা করছ তা নিয়ে আস।'

قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি বললেন, 'এ জ্ঞান তো শুধু আল্লাহ্‌রই কাছে। আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি শুধু তা-ই তোমাদের কাছে প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।'

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৪. 'অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন বলতে লাগল, 'এ তো মেঘ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।' না, বরং এটাই তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এক ঝড়, এতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. 'এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' অতঃপর তাদের পরিণাম এ হল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ

২৬. আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তোমাদেরকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিনি[1]; আর

---

(১) অর্থাৎ অর্থ, সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা কোন বিষয়েই তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন তুলনা হয় না। তোমাদের ক্ষমতার ব্যাপ্তি মক্কা শহরের বাইরে কোথাও নেই। কিন্তু তারা পৃথিবীর একটি বড় অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।[দেখুন, তাবারী]

أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; অতঃপর তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; যখন তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর অবশ্যই আমরা ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ; এবং আমরা বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তাদের ইলাহ্‌গুলো তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল। আর এটা ছিল তাদের মিথ্যাচার; এবং যা তারা অলীক উদ্ভাবন করছিল।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا

২৯. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা আপনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম জিনদের একটি দলকে[1], যারা

(১) মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্যে পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কুরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না।

قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

মনোযোগসহকারে কুরআন পাঠ শুনছিল। অতঃপর যখন তারা তার

জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে কয়েকজন সাথীসহ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীসহ বাতনে নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর ওকায বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে দিয়ে পৌঁছল। তারা কুরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। [বুখারী: ৭৭৩, মুসলিম: ৪৪৯, তিরমিযী: ৩৩২৩, নাসায়ী: আল-কুবরা ১১৬৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কুরআন শুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলিম হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কুরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। আরও এক বর্ণনায় আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৫৬] অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বার বার আগমন করেছে। খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।

কাছে উপস্থিত হল, তারা বলল, 'চুপ করে শুন ।' অতঃপর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে ।

৩০. তারা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে, এটা তার সম্মুখস্থ কিতাবকে সত্যায়ন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে হেদায়াত করে ।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩১. 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন, তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন[১] এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন ।'

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩২. আর যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে যমীনে আল্লাহ্‌কে অপারগকারী নয় । আর আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন অভিভাবক নেই । তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে ।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى

(১) ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ﴾ এর من অব্যয়টি আসলে 'কোন কোন' এর অর্থ নির্দেশ করে । এখানে এই অর্থ নেয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহর হক মাফ হবে-বান্দার হক মাফ হবে না । কেউ কেউ من অব্যয়টিকে বর্ণনাসূচক সাব্যস্ত করেছেন । এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন । [জালালাইন, আইসারুত্‌তাফাসীর]

بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٣٣﴾

কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَیْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর যারা কুফরী করেছে যেদিন তাদেরকে পেশ করা হবে জাহান্নামের আগুনের কাছে, (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'আমাদের রবের শপথ! অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বলবেন, 'সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; কারণ তোমরা কুফরী করেছিলে।'

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا یُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ یَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ یُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে।
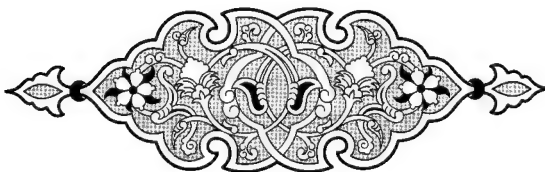
৪৭- সূরা মুহাম্মাদ[১]
৩৮ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যারা কুফরী করেছে এবং অন্যকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত করেছে তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন[২]।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

২. আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে, আর তা-ই তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন[৩]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

---

(১) সূরা মুহাম্মাদের অপর নাম সূরা কিতাল। কেননা, এতে "কিতাল" তথা জেহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের পরেই এই সূরা নাযিল হয়েছে। এমনকি, এর ﴿وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ﴾ আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেনঃ হে মক্কা নগরী। জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিকাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। [তিরমিযী: ৩৮৬০] তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিহিত করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফেরদের সাথে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মূল আয়াতে ﴿اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ﴾ উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাজ-কর্মকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। [দেখুন-আয়সারুত-তাফাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(৩) আয়াতে বর্ণিত بال শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

৩. এটা এজন্যে যে, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের অনুসরণ করেছে এবং যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের রবের প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করেন[১]।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত কর, অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধ; তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। যতক্ষণ না যুদ্ধ এর ভার (অস্ত্র) নামিয়ে না ফেলে। এরূপই, আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে। আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হতে দেন না।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾

৫. অচিরেই তিনি তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন[২] এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন।

---

(১) আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, এভাবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে বলে দেন। তাদের একদল বাতিলের অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কিন্তু অপর দল ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য গ্রহণ করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত করে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।[দেখুন- কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

(২) এখানে হেদায়াত করা বা পথপ্রদর্শনের অর্থ স্পষ্টত জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা।[কুরতুবী]

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦

৬. আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন[১]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝٧

৭. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٨

৮. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٩

৯. এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۝١٠

১০. তবে কি তারা যমীনে ভ্রমণ করে দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۝١١

১১. এটা এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক এবং নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই[২]।

---

(১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: এই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে [বুখারী: ৬৫৩৫]

(২) مولى শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ অভিভাবক। [মুয়াস্‌সার, বাগভী] এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কুরআনের অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ 'অতঃপর তাদেরকে (কাফেরদের) তাদের মাওলার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।' [সূরা আল-আন'আম:৬২]

দ্বিতীয় রুকূ’

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা ভোগ বিলাস করে এবং খায় যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা খায়[১]; আর জাহান্নামই তাদের নিবাস।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৩. আর তারা আপনার যে জনপদ থেকে আপনাকে বিতাড়িত করেছে তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী বহু জনপদ ছিল; আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছি অতঃপর তাদের সাহায্যকারী কেউ ছিল না[২]।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾

১৪. যে ব্যক্তি তার রব প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায় যার কাছে নিজের মন্দ কাজগুলো শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে?

---

(১) অর্থাৎ জীবজন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ পরিমাণ-পরিমাপ মেনে চলে না। অনুরূপভাবে কাফেররাও খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতির ধার ধারে না। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী] তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন এক খাদ্যনালীতে খাবার গ্রহণ করে পক্ষান্তরে কাফের যেন সাতটি খাদ্যনালীর মাধ্যমে খাবার গলধকরণ করে। [বুখারী: ৫৩৯৩]

(২) মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে বড় দুঃখ ছিল। তিনি যখন হিজরত করতে বাধ্য হলেন তখন শহরের বাইরে গিয়ে তিনি শহরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “হে মক্কা! আল্লাহর কাছে তুমি দুনিয়ার সব শহরের চেয়ে প্রিয়। আর আল্লাহর সমস্ত শহরের মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। যদি মুশরিকরা আমাকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।” [মুসনাদে আহমাদ:৪/৩০৫, তিরমিযী: ৩৯২৫, ইবন মাজাহ: ৩১০৮]

১৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত: তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ[১] এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল। আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা (মুত্তাকীরা) কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৬. আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আপনার কথা মনোযোগের সাথে শুনে, অবশেষে আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদেরকে বলে, 'এ মাত্র সে কী বলল?' এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারা অনুসরণ করেছে নিজেদের খেয়াল-খুশীর।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৭. আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ্ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন[২]।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং মদের সাগর। তারপর সেগুলো থেকে আরো নালাসমূহ প্রবাহিত করা হবে। [তিরমিযী: ২৫৭১]

(২) অর্থাৎ তারা নিজেরদের মধ্যে যে তাকওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে তাওফীকই দান করেন। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

১৮. সুতরাং তারা কি শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের কাছে এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ[১] তো এসেই পড়েছে! অতঃপর কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

১৯. কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই[২]। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

তৃতীয় রুকূ’

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

২০. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, ‘একটি সূরা নাযিল হয় না কেন?’ অতঃপর যদি ‘মুহকাম’[৩] কোন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত আপনার দিকে

---

(১) মূলে أَشْرَاطٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। এখানে কেয়ামতের প্রাথমিক আলামতসমূহ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হচ্ছে আল্লাহর শেষ নবীর আগমন যার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি উঠিয়ে বললেন, “আমার আগমন ও কিয়ামত এ দু অঙ্গুলির মত।” [বুখারী: ৬৫০৩, মুসলিম: ২৯৫০, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮]

(২) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে: আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। [তবারী, মুয়াস্‌সার]

(৩) কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন: যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব মুহকামাহ্ তথা অরহিত। [কুরতুবী]

তাকাচ্ছে[১]। সুতরাং তাদের জন্য উত্তম হতো---

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য; অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করত তবে তাদের জন্য তা অবশ্যই কল্যাণকর হত।

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

২২. সুতরাং অবাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে সম্ভবত তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন[২] ছিন্ন

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

(১) তাদের এ অবস্থা অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ “আপনি কি সে লোকদের দেখেছেন যাদের বলা হয়েছিলো, নিজের হাতকে সংযত রাখো, সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও। এখন তাদেরকে যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তাদের এক দলের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমন ভয় পাচ্ছে যে ভয় আল্লাহকে করা উচিত। বরং তার চেয়েও বেশী ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে যুদ্ধের এ নির্দেশ কেন দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু অবকাশ দিলে না কেন?’ [সূরা আন-নিসাঃ ৭৭]

(২) أَرْحَامٌ শব্দটি رِحْمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সুচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رِحْمٌ শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্যে খুবই তাকীদ করেছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। [বুখারী: ৫৫২৯] আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেও দেন এবং আখেরাতেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ নেই। [ইবনে মাজাহ: ৪২১১] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: যে ব্যক্তি আয়ুবৃদ্ধি ও রুযী রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। [মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৯] সহীহ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমুলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। এক হাদীসে বলা হয়েছে: সে ব্যক্তি আত্মীয়ের

করবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

২৩. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, ফলে তিনি তাদের বধির করেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করেন।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

২৪. তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে ওরা বলে, 'অচিরেই আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' আর আল্লাহ্ জানেন তাদের গোপন অভিসন্ধিসমূহ।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং কেমন হবে তাদের দশা! যখন ফেরেশ্‌তারা তাদের চেহারা ও পৃষ্ঠাদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৮. এটা এজন্যে যে, তারা এমন সব বিষয় অনুসরণ করেছে যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এবং তারা তাঁর

সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয় যে কোন প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে। [বুখারীঃ ৫৫৩২]

সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে; সুতরাং তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

চতুর্থ রুকূ'

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯. নাকি যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না[১]?

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

৩০. আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে জানেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

৩১. আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

৩২. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং নিজেদের কাছে হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর অচিরেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন।

---

(১) أضغان শব্দটি ضغن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। [বাগভী, ফাতহুল কাদীর]

৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

৩৫. কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না[১], যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন[২] এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না[৩]।

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾

৩৬. দুনিয়ার জীবন তো শুধু খেল-তামাশা ও অর্থহীন কথাবার্তা। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দেবেন এবং তিনি

إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ﴿٣٦﴾

---

(১) এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে।[বাগভী] কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ﴿وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا﴾ অর্থাৎ কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুকে পড়ে, তবে আপনিও ঝুকে পড়ুন। [সূরা আল-আনফাল:৬১]

(২) এখানে সঙ্গে থাকার অর্থ, সাহায্য-সহযোগিতা ও জ্ঞানে সাথে থাকা। নতুবা আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপরই রয়েছেন।

(৩) অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে তখন তোমাদের জন্য হীনবল হওয়া, কাফেরদের সাথে সন্ধি করা উচিত হবেনা। আর সে গুণ তিনটি হলো, ১. যখন তোমাদের এ ঈমান থাকবে যে, তোমরা কাফেরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরা কাফেরদের উপর প্রবল, ২. আল্লাহ্ সাহায্য-সহযোগিতাকারী হিসেবে তোমাদের সাথে আছেন বলে তোমাদের ঈমান থাকবে, ৩. আর আল্লাহ্ তোমাদের কোন কাজের প্রতিদান দেয়ায় এতটুকুও কমতি করবেন না।[দেখুন- তবারী,বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের ধন-সম্পদ চান না[১]।

৩৭. তোমাদের কাছ থেকে তিনি তা চাইলে ও তার জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন[২]।

إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৮. দেখ, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো কার্পণ্য করছে নিজেরই প্রতি[৩]। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আর যদি তোমরা বিমুখ

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾

(১) আয়াতে বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্যে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে চান। এই আয়াতেও ﴿يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ﴾ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্যে বলার কারণ এই যে, তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত: ﴿مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন: আমি তাদের কাছে নিজের জন্যে কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। [দেখুন-ইবন কাসীর,বাগভী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ।[ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্‌সার]

(৩) অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। [ফাতহুল কাদীর,সা'দী]

হও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারপর তারা তোমাদের মত হবে না[১]।

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তারা বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর আমাদের মত শরী'য়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে উপস্থিত সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উরুতে হাত মেরে বললেন: সে এবং তার জাতি। যদি সত্য দ্বীন সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যদ্বীন হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত। [সহীহ ইবন হিব্বান: ৭১২৩, তিরমিযী: ৩২৬০, ৩২৬১] এখানে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোন সম্প্রদায় আল্লাহর দ্বীন থেকে, রাসূলের সুন্নাত থেকে দূরে সরে যায়, রাসূলের দ্বীনের সাহায্য করতে পিছপা হয়, তবে আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এর স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারা হতে পারে আরব, হতে পারে অনারব, হতে পারে কাছে কিংবা দূরের কোন জাতি। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জাতির মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের জন্য এ খেদমত নিয়েছেন। তারা সবাই পারস্য কিংবা কোন সুনির্দিষ্ট এক জাতি ছিল না। পারস্যের লোকদের মধ্য থেকে যারা এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইবন মাজাহ, নাসায়ী সহ আরও অনেকে। তারা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ছিলেন। এ ব্যাপারে শী'আ, রাফেযী, মু'তাযিলা কিংবা খারেজীদের কোন সামান্যতমও খেদমত ছিল না। বরং তাদের মতবাদ খণ্ডন করতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের যে সমস্ত ইমাম পরিশ্রম করেছেন এ আয়াত তাদেরকেও শামিল করে।

৪৮- সূরা আল-ফাত্হ্
২৯ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ الفَتْحِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ①

১. নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়[১],

---

(১) অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদদের মতে সূরা ফাতহ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মুকাররমা তাশরীফ নিয়ে যান এবং হারাম শরীফের সন্নিকটে হুদাইবিয়া নামক স্থান পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়া মক্কার বাইরে হারামের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে সুমাইছী বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে। এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লাহ প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তার হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটি অংশ। নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তারা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তুতি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা, স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুর্হূতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর তিনি উমরা করতে আসবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলিমদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমরার এহরাম খুলে হুদাইবিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে প্রকাশ্য বিজয় বলে ব্যক্ত

২. যেন আল্লাহ্‌ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন। আর আপনাকে সরল পথের হেদায়াত দেন,

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝٢

৩. এবং আল্লাহ্‌ আপনাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝٣

৪. তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন[১] যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়[২]। আর

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ

করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন: তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। জাবের রাদিয়ালাহু আনহু বলেন: আমি হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। বারা ইবনে আযেব বলেন: তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নি:সন্দেহ তা বিজয়; কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার ঘটনার বাইয়াতে রিদওয়ানকেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিল। [বুখারী: ৪২৮, মুসলিম: ৭৯৪]

(১) سَكِينَةٌ আরবী ভাষায় স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ় চিত্ততাকে বুঝায়। হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 'কুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাতহ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেয়ায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার প্রশ্ন করে বসলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ। এটা কি বিজয়? তিনি বললেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪২০, আবু দাউদ:২৭৩৬, ৩০১৫]

(২) তাদের যে ঈমান এ অভিযানের পূর্বে ছিল, তার সাথে আরো ঈমান তারা অর্জন করলো এ কারণে যে, এ অভিযান চলাকালে একের পর এক যত পরীক্ষা এসেছে তার প্রত্যেকটিতে তারা নিষ্ঠা, তাকওয়া ও আনুগত্যের নীতির ওপর দৃঢ়পদ থেকেছে। এ আয়াত ও অনুরূপ আরো কিছু আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। [আদওয়াউল-বায়ান] ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে এ আয়াত থেকে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর দলীল গ্রহণ করেছেন।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

৫. যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন; আর এটাই হলো আল্লাহ্‌র নিকট মহাসাফল্য।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّاۤنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَاۤىِٕرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ۝

৬. আর যাতে তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দেন। অমঙ্গল চক্র তাদের উপরই[১] আপতিত হয়। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে লা'নত করেছেন; আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

(১) এ যাত্রায় মদীনার আশপাশের মুনাফিকদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীগণ এ সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন না। তাছাড়া মক্কার মুশরিক এবং তাদের সহযোগী কাফেররা মনে করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সংগীগণকে উমরা আদায় করা থেকে বিরত রেখে তারা তাকে পরাজিত ও অপমানিত করতে সক্ষম হয়েছে। [দেখুন- কুরতুবী]

৮. নিশ্চয় আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে(১),

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

৯. যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর(২) ।

لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

১০. নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাই'আত করে(৩) তারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ

(১) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমে বলা হয়েছে যে, 'আমরা আপনাকে شاهد হিসেবে প্রেরণ করেছি । شاهد শব্দের অর্থ সাক্ষী । এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক নবী তার উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন । এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানি করেছে । এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন । দ্বিতীয় যে গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, مُبَشِّرٌ শব্দটির অর্থ সুসংবাদদাতা আর তৃতীয় গুণটি বলা হয়েছে نذير বা সতর্ককারী । উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন এবং কাফের পাপাচারীদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন । [কুরতুবী, আয়সারুত-তাফাসির]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়নের পরে আরো তিনটি কাজ করার জন্য মুমিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে । তবে এগুলোতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে এ নিয়ে দু'টি মত রয়েছে । এক. এখানে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে । অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে তথা তাঁর দ্বীনকে সহযোগিতা করবে, তাঁকে সম্মান করবে, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে । দুই. কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রাসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রাসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর । [কুরতুবী]

(৩) পবিত্র মক্কা নগরীতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হয়ে যাওয়ার খবর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম থেকে হুদাইবিয়া নামক

فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ⑩

বাই'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত[১] তাদের হাতের উপর[২]। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম বর্তাবে তারই উপর এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন।

দ্বিতীয় রুকূ'

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا

১১. যে সকল মরুবাসী পিছনে রয়ে গেছে[৩]

স্থানে গাছের নীচে যে বাইয়াত নিয়েছিলেন সেই বাইয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর]

(১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাত রয়েছে। যেভাবে তাঁর হাত থাকা উপযোগী ঠিক সেভাবেই তাঁর হাত রয়েছে। এ হাতকে কোন প্রকার অপব্যাখা করা অবৈধ। তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর হাত কোন সৃষ্টির হাতের মত নয়। তিনি যেমন তাঁর হাতও সে রকম। প্রত্যেক সত্ত্বা অনুসারে তার গুণাগুণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাত রয়েছে। তবে তাঁর হাত আমাদের পরিচিত কারও হাতের মত নয়।

(২) আল্লাহ বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাই'আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর হাতে বাই'আত করেছে। কারণ, এই বাই'আতের উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। রাসূলের আনুগত্য যেমন আল্লাহ্‌র আনুগত্যেরই নামান্তর, তেমনিভাবে রাসূলের হাতে বাই'আত হওয়া আল্লাহ্‌র হাতে বাই'আত হওয়ারই নামান্তর। কাজেই তারা যখন রাসূলের হাতে হাত রেখে বাই'আত করল, তখন যেন আল্লাহর হাতেই বাই'আত করল। মহান আল্লাহ্ এ কথা বলে সাহাবীদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ তাদের কথা শুনছিলেন, তাদের অবস্থান অবলোকন করছিলেন, তাদের বাহ্যিক অবস্থা ও মনের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন। সে সময় লোকেরা যে হাতে বাইয়াত করছিলো তা আল্লাহর প্রতিনিধি রাসূলের হাত ছিল এবং রাসূলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(৩) এটা মদীনার আশেপাশের সেসব লোকদের কথা যাদেরকে উমরা যাত্রার প্রস্তুতিকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে রওয়ানা হবার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নানা টাল-বাহানার আশ্রয় নেয়। ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্বেও তারা বাড়ী ছেড়ে শুধু এ কারণে বের হয় নি যে, নিজেদের প্রাণ ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এ আয়াতে তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে। [ইবন কাসীর,কুরতুবী]

أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⑪

তারা তো আপনাকে বলবে, ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।তারা মুখে তা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বলুন, ‘আল্লাহ্ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছে করলে কে আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোন কিছুর মালিক হবে? বস্তুত তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।’

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ⑫

১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের কাছে কখনই ফিরে আসবে না এবং এ ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল; আর তোমরা খুব মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়[১]!

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ⑬

১৩. আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না তবে নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑭

১৪. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

(১) অর্থাৎ তোমরা এ ধরনের খারাপ ধারণার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে ধ্বংসের উপযুক্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলে। [জালালাইন] সুতরাং তোমাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। [মুয়াসসার]

সَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা অবশ্যই বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও।' তারা আল্লাহ্‌র বাণী পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের অনুসরণ করবে না। আল্লাহ্ আগেই এরূপ ঘোষণা করেছেন।' তারা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ।' বরং তারা তো বোঝে কেবল সামান্যই।

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

১৬. যেসব মরুবাসী পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলুন, 'অবশ্যই তোমরা আহূত হবে এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তোমরা এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি আগের মত পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

১৭. অন্ধের কোন অপরাধ নেই, খঞ্জের কোন অপরাধ নেই এবং পীড়িতেরও কোন অপরাধ নেই; এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচে নহরসমূহ

প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

তৃতীয় রুকূ'

১৮. অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল(১), অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন(২);

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

১৯. আর বিপুল পরিমান গণীমতে(৩), যা তারা হস্তগত করবে; এবং আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

২০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা(৪)। অতঃপর তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

---

(১) হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে বাই'আত নেওয়া হয়েছিল এখানে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে "বাই'আতে-রিদওয়ান" তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়।[দেখুন-সা'দী] জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুদাইবিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন 'তোমরা ভূ পৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' [বুখারী: ৩৮৩৯, মুসলিম: ৩৪৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। [মুসলিম: ৪০৩৪]

(২) এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খাইবর বিজয়। [কুরতুবী,সা'দী,বাগভী]

(৩) এতে খাইবরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(৪) এখানে কেয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে।[বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

করেছেন। আর তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হাত নিবারিত করেছেন[১] যেন এটা হয় মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন। আর তিনি তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে;

وَّأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾

২১. আর আরেকটি, এখনো যা তোমাদের অধিকারে আসেনি, তা তো আল্লাহ্‌ বেষ্টন করে রেখেছেন[২]। আর আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾

২২. আর যারা কুফরী করেছে তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তারপর তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৩. এটাই আল্লাহ্‌র বিধান---পূর্ব থেকেই যা চলে আসছে, আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

২৪. আর তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী

---

(১) আয়াতে খাইবরবাসী কাফের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। এমনকি গাতফান গোত্র খাইবরের ইহুদিদের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খাইবর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদিদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। [দেখুন- আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোনো কোনো তফসিরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। [বাগভী]

করার পর[১], আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা ।

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

২৫. তারাই তো কুফরী করেছিল এবং বাধা দিয়েছিল তোমাদেরকে মসজিদুল-হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে[২] । আর যদি মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করবে, ফলে তাদের কারণে তোমরা অপরাধী ও দোষী সাব্যস্ত হতে, (তবে অবশ্যই তিনি যুদ্ধের অনুমতি দিতেন । কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে তখন এর অনুমতি দেন নি)[৩] যাতে

---

(১) হাদীসে এসেছে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তান'য়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরন করে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন । এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুরা ফাতহের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ [মুসলিম: ১৮০৮]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদাইবিয়ার কাছাকাছি ছিলেন, কুরাইশরা কিনানাহ গোত্রের এক লোককে রাসূলের সাথে কথা বলার জন্য পাঠাল । সে এবং তার সাথীরা যখন রাসূলের কাছাকাছি আসল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হচ্ছে অমুক । সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা হাদঈ এর পশুর সম্মান করে । সুতরাং তোমরা সেগুলোকে একত্রিত করে তার সামনে পাঠাও । সাহাবায়ে কিরাম তাই করলেন আর তারা তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে তার সামনে আসলেন । সে যখন এ অবস্থা দেখল বলল, সুবহানাল্লাহ! এদেরকে আল্লাহ্র ঘর থেকে বাধা দেয়া ঠিক হবে না । তারপর সে ফিরে গিয়ে বলল: আমি তো হাদঈর উটকে কালাদা (পশুর গলায় পশম বা চুলের মালা) পরানো ও চিহ্নিত অবস্থায় দেখেছি । আমি চাইনা তাদেরকে আল্লাহ্র ঘর থেকে বাধা দেয়া হোক' । [বুখারী : ২৭৩২]

(৩) উপরোক্ত অংশটুকু উহ্য রয়েছে । [জালালাইন]

তিনি যাকে ইচ্ছে নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন(১)। যদি তারা(২) পৃথক হয়ে থাকত, তবে অবশ্যই আমরা তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম(৩)।

২৬. যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা---অজ্ঞতার যুগের অহমিকা(৪), তখন আল্লাহ্ তাঁর

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ

(১) অর্থাৎ যুদ্ধ করার অনুমতি না দেয়ার পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। এক. দুনিয়াবী উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে, মক্কায় যারা এখনও ঈমানদার রয়ে গেছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে কেউ জানে না, তারা যেন তোমাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আর তোমরাই তোমাদের দ্বীনী ভাইদের হত্যার কারণে মনঃকষ্টে না থাক। অপমান বোধ না কর। দুই. আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ চাচ্ছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান এনে তাঁর রহমতে শামিল হয়ে যাবে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ যাদের ঈমান সম্পর্কে তোমাদের জানা নেই, এমন মুমিন নারী ও পুরুষরা যদি আলাদা আলাদা থাকত। আর যুদ্ধের সময় তাদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হতো, তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন। [সা'দী; মুয়াসসার]

(৩) تزيل শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) জাহেলী অহমিকা বা সংকীর্ণতার অর্থ হলো, এক ব্যক্তির শুধু তার মর্যাদা রক্ষার জন্য কিংবা নিজের কথার মর্যাদা রক্ষার জন্য জেনে শুনে কোন অবৈধ কাজ করা। মক্কার কাফেররা জানতো এবং মানতো যে, হজ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারত করার অধিকার সবারই আছে। এ দ্বীনী কর্তব্য পালনে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা ছিল আরবের সুপ্রাচীন ও সর্বজন স্বীকৃত আইন। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদেরকে অন্যায় ও অসত্যের অনুসারী এবং মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী বলে জানা সত্বেও শুধু নিজেদের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে মুসলিমদের উমরা করতে বাধা দান করে। এমনকি মুশরিকদের মধ্যেও যারা সত্যানুসারী ছিল তারাও বলছিলো যে, যারা ইহ্‌রাম অবস্থায় কুরবানীর উট সাথে নিয়ে উমরা পালন করতে এসেছে তাদেরকে বাধা দেয়া একটি অন্যায় কাজ। কিন্তু কুরাইশ নেতারা শুধু একথা ভেবে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর ছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এত বড় দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। তাছাড়া তারা তাকে আল্লাহ্‌র নবী বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। বিসমিল্লাহ লিখতে নিষেধ করেছিল। এ সবই ছিল তাদের জাহেলী সংকীর্ণতা। [দেখুন, বুখারীঃ ২৭৩১,২৭৩২]

رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۟

রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায়[১] সুদৃঢ় করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ্‌ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ রুকূ'

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ

২৭. অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন[২], আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা

---

(১) "কালেমায়ে-তাকওয়া" বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। কালেমায়ে তাকওয়া বলে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এর দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, মুসনাদ:১/৩৫৩]

(২) হুদাইবিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং উমরাহ পালন ব্যতিরেকেই মদিনায় ফিরে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম উমরাহ পালনের সংকল্প রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহি ছিল। এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বপ্ন সত্য হলো না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলিমদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রাসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। তখন এই আয়াত নাযিল করে তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন। যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত পদবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়– এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জওয়াবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে--- মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে, নির্ভয়ে। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) জেনেছেন যা তোমরা জান নি। সুতরাং এ ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

২৮. তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

২৯. মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজ্দায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজ্দার প্রভাবে পরিস্ফুট; এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্

সাল্লাম-এর স্বপ্ন কোনো সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে। [বুখারী: ২৫২৯]

তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের[১]।

(১) منهم অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কেরামই ঈমান এনেছেন সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের সবাইকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। তিনি তাদের উপর সন্তুষ্টি হয়েই এ ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্মের উপর কায়েম থাকবেন। কারণ, আল্লাহ আলীম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারও সম্পর্কে তার জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোনো না কোনো সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবন আবদুল বার রাহেমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না।' এই আয়াতের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বাই'আতে-রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। [আবু দাউদ:৪০৩৪] [আরো দেখুন- ইবন কাসীর]

৪৯- সূরা আল-হুজুরাত
১৮ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ الحُجُرَاتِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে ঈমানদারগণ[1]! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ①

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না[2] এবং নিজেদের মধ্যে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'কা' ইবন মা'বাদ ইবন্ যুরারাহ্‌র নাম প্রস্তাব করলেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আকরা' ইবন হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হলো এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৮৪৭]

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল নবীর সাথে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন ঈমানদাররা তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ্য রাখেন। কারো কণ্ঠ যেন তার কণ্ঠ থেকে উচ্চ না হয়। তাকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে কোন কথা বলছে। তাই সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তার সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না যেমন পরস্পর বিনা দ্বিধায় করা হয়; কারণ তা এক প্রকার বে-আদবি ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। তারা এরপর থেকে খুব আস্তে কথা বলতেন। সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন। [দেখুন, বুখারী:৪৮৪৬, মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৩৭] অনুরূপভাবে রাসূলের কোনো

لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٢

যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٣

৩. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝٤

৪. নিশ্চয় যারা হুজরাসমূহের পিছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٥

৫. আর আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তবে তা-ই তাদের জন্য উত্তম হত[১]।

সুন্নাত সম্পর্কে জানার পরে সেটা মানতে গড়িমসি বা সামান্যতম অনীহা প্রকাশ করাও বে-আদবি। এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অধীন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুজরা মোবারকের সামনেও বেশি উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই তার পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল: আমরা তায়েফের লোক। তিনি বললেন, যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে তবে আমি তোমাদের বেত্রাঘাত করতাম। তোমরা রাসূলের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছ কেন? [বুখারী: ৪৭০]

(১) এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, বনি-তামিমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল, এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪৮৮] এতে এভাবে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা

আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

৬. হে ঈমানদারগণ![১] যদি কোন ফাসিক

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ

করার আদেশ দেয়া হয় ।
সাহাবী ও তাবেয়িগণ তাদের আলেম ও উস্তাদ-মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে– আমি যখন কোনো আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোনো হাদিস লাভ করতে চাইতাম, তখন তার গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম । তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তার কাছে হাদিস জিজ্ঞেস করতাম । তিনি আমাকে দেখে বলতেনঃ হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাত ভাই । আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলতেনঃ আলেম কোনো জাতির জন্যে নবী সদৃশ । আল্লাহ তা'আলা নবী সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তার বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর । [দারমী: ২/১২৩, ১২৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩৩৪, ৫৮১৩, ৬৩৫৫, ৮০৭৫]

(১) এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, বনিল-মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পিতা হারেস ইবনে দ্বিরার বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন । আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করতঃ যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললামঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব । যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে আমি তাদের যাকাত একত্রিত করে আমার কাছে জমা রাখব । আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোনো দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি । এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো দূত আগমন করল না, তখন হারেস আশঙ্কা করলেন যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন । নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানোর কোনো কারণ থাকতে পারে না । হারেস এই আশঙ্কার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন । এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিত তারিখে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন । কিন্তু পথিমধ্যে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তার পুরাতন শত্রুতা আছে । কোথাও

أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ⑥

তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ⑦

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয়

তারা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হলো এবং ওদিকে হারেস জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনারা কোন গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হলোঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রেরণ ও তার প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হলো এবং ওলিদের এই বিবৃতিও শুনানো হলো যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। এ কথা শুনে হারেস বললেনঃ সে আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলিদ ইবনে ওকবাকে দেখিওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেনঃ কখনই নয়; সে আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশঙ্কা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোনো ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৭৯, ৩/৪৮৮]

করেছেন এবং সেটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের কাছে অপ্রিয়। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٨

৮. আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩

৯. আর মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপোষ মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ

১০. মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই[১];

(১) এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে। জারীর ইবন আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাই'আত" নিয়েছেন। 'এক, সালাত কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।' [বুখারী: ৫৫] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।' [বুখারী:৬০৪৪, মুসলিম:৬৩] অপর

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

দ্বিতীয় রুকূ'

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

১১. হে ঈমানদারগণ! কোন মুমিন সম্প্রদায় যেন অপর কোন মুমিন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীরা যেন অন্য

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।” [মুসলিম:২৫৬৪, কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী:১৯২৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। [মুসনাদে আহমাদঃ ১৬/২৯৭, ৭৭৫৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ–কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৪০] অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। [বুখারীঃ৬০১১, মুসলিম:২৫৮৬] আরো একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। [বুখারী: ২৬৪৬, মুসলিম:২৫৮৫] অন্য হাদীসে এসেছে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না আবার তাকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে না। [বুখারী:২৪৪২, মুসলিম:২৫৮০] অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। [মুসলিম:২৬৯৯] হাদীসে আরো এসেছে, কোন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করে তখন ফেরেশতা বলে, আমীন (কবুল কর) আর তোমার জন্যও তদ্রূপ হোক। [মুসলিম: ২৭৩২]

নারীদেরকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না(১); ঈমানের পর মন্দ নাম অতি নিকৃষ্ট। আর যারা তওবা করে না তারাই তো যালিম।

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না(২)। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম ছিল। তন্মধ্যে কোনো কোনো নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনিও সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। [আবু দাউদ:৪৯৬২, মুসনাদে আহমাদ:৫/৩৮০]

(২) এই আয়াতে পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতে তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। (এক) ধারণা, (দুই) কোনো গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গীবত অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলে অসহনীয় মনে করত।
তন্মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে, الظن বা প্রবল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।' [মুসলিম:৫১২৫, আবুদাউদ:২৭০৬, ইবনে মাজাহ:৪১৫৭] অন্য এক হাদীসে আছে 'আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক।' [মুসনাদে আহমাদ:১৫৪৪২] এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কু-ধারণা পোষন করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলিম

বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।' [বুখারী:৪০৬৬, মুসলিম:২৫৬৩]

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে. কারও দোষ সন্ধান করা। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবার দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ "হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গোপনীয় বিষয় খোঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ-ক্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ক্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ক্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" [আবু দাউদ:৪৮৮০] মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে।" [আবু দাউদ: ৪৮৮৮] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্ব-গৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।" [আবুদাউদ:৪৮৮০]

দোষ-ক্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যেও। এ ক্ষেত্রে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি তার সাথী আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ এ ঘরটি কার? বলা হল, এটা রবী'আ ইবন উমাইয়া ইবন খালফ এর ঘর। তারা এখন শরাব খাচ্ছে। আপনার কি অভিমত? অতঃপর আব্দুর রাহমান ইবন আওফ বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছে তা-ই করে ফেলছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করে বলেছেন: 'তোমরা গোপন বিষয়ে অন্বেষণ করো না"। [সূরা আল-হুজুরাত:১২] তখন উমর ফিরে আসলেন এবং তাকে ছেড়ে গেলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৮২৪৯, মাকারিমূল আখলাক:আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল খারায়েতী:৩৯৮,৪২০, মুসান্নাফে আব্দির রাজ্জাক: ১০/২২১] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ক্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাইবে[1]? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

১৩. হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে[2], আর তোমাদেরকে বিভক্ত

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ

ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।" [আবু দাউদ:৪৮৮৯]
আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। গীবতের সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। প্রশ্ন হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।" [মুসলিম: ২৫৮৯, আবুদাউদ:৪৮৭৪, তিরমিযী:১৯৩৪]

(১) এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলিমের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মি'রাজের রাত্রির হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত। [মুসনাদে আহমাদ:৩/২২৪, আবুদাউদ:৪৮৭৮]

(২) আল্লাহর এ বাণীটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত। এক, নেককার ও পরহেজগার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।" [তিরমিযী: ৩১৯৩] অনুরূপভাবে, বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের

أَتْقٰكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার[১]। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৪. বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনলাম'। বলুন, 'তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করেছি', কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ

মাঝামাঝি সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, "হে লোকজন! সাবধান তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি? তারা বলল, আল্লাহর রাসূল পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়।" [মুসনাদে আহমাদ:৫/৪১১] অন্য হাদীসে এসেছে, "তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নাক দিয়ে পায়খানা ঠেলে এমন নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।" [মুসনাদে বায্যার: ৩৫৮৪] আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী"। [ইবনে জারীর: ৩১৭৭২] আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।" [মুসলিম:২৫৬৪, ইবনে মাজাহ:৪১৪৩]

(১) কোন কোন মুফাসসিরের মতে, বড় বড় গোত্রকে شعوب আর তার চেয়ে ছোট গোত্রকে قبائل বলা হয়। অপর কারও মতে, অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় যেহেতু সংরক্ষিত নেই সেহেতু তাদেরকে شعوب বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قبائل বলা হয়। [দেখুন-কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তবে তিনি তোমাদের আমলসমূহের সওয়াব সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৫. তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. বলুন, 'তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবগত করাচ্ছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব সম্পর্কে অবগত। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

سُوْرَةُ قٓ

৫০- সূরা ক্বাফ্[১]
৪৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ক্বাফ্, শপথ সম্মানিত কুরআনের

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١

২. বরং তারা বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছেন। আর কাফিররা বলে, 'এ তো এক আশ্চর্য জিনিস!

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢

৩. 'আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটিতে পরিণত হলে আমরা কি পুনরুত্থিত হব? এ ফিরে যাওয়া সুদূরপরাহত।'

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣

৪. অবশ্যই আমরা জানি মাটি ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমাদের কাছে আছে সম্যক সংরক্ষণকারী কিতাব।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤

৫. বস্তুত তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা তাতে মিথ্যারোপ করেছে। অতএব, তারা সংশয়যুক্ত বিষয়ে নিপতিত।[২]

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥

---

(১) সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু আখেরাত, কেয়ামত, মৃতদের পুণরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীস থেকে সূরা ক্বাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্রবার জুম্মার খোতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। [মুসলিম:৮৭৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের সালাতে এই সূরা পাঠ করতেন [মুসলিম:৮৯১] জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাতে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। (সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্বেও সালাত হাল্কা মনে হতো। [মুসনাদে আহমাদ:১৯৯২৯]

(২) অভিধানে مَرِيْجٌ শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণত ফাসেদ ও দূষিত

৬. তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমরা কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই?

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ⑥

৭. আর আমরা বিস্তৃত করেছি যমীনকে এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা। আর তাতে উদ্‌গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্,

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ⑦

৮. আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑧

৯. আর আসমান থেকে আমরা বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি অতঃপর তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি উদ্যান,

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ⑨

হয়ে থাকে। এ কারণেই কারো কারো মতে, এ শব্দের অর্থ ফাসেদ ও দুষ্ট। আবার অনেকেই এর অনুবাদ করেছে মিশ্র ও জটিল। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশটিতে একটি অতি বড় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ তারা শুধু বিস্ময়ে প্রকাশ করা এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী ঠাওরানোকেই যথেষ্ট মনে করেনি। বরং যে সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন সে সময় তারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে নির্জলা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। অবশ্যম্ভাবীরূপে তার যে ফল হওয়ার ছিল এবং হয়েছে তা হচ্ছে, এ দাওয়াত এবং এ দাওয়াত পেশকারী রাসূলের ব্যাপারে এরা কখনো স্থির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কখনো তাঁকে কবি বলে, কখনো বলে গণক কিংবা পাগল। কখনো বলে সে যাদুকর আবার কখনো বলে কেউ তাঁর ওপর যাদু করেছে। কখনো বলে নিজের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে এ বাণী নিজে বানিয়ে এনেছে আবার কখনো অপবাদ আরোপ করে যে, অন্যকিছু লোক তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারাই তাকে এসব কথা বানিয়ে দেয়। এসব পরস্পর বিরোধী কথাই প্রকাশ করে যে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কেই পুরোপুরি দ্বিধান্বিত। যদি তারা তাড়াহুড়া করে একেবারে প্রথমেই নবীকে অস্বীকার না করতো এবং কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করে আগেভাগেই একটি সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে ধীরস্থিরভাবে একথা ভেবে দেখতো যে, কে এ দাওয়াত পেশ করছে, কি কথা সে বলছে এবং তার দাওয়াতের সপক্ষে কি দলীল-প্রমাণ পেশ করছে তাহলে তারা কখনো এ দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়তো না। [দেখুন-তবারী,ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

কর্তনযোগ্য শস্য দানা,

১০. ও সমুন্নত খেজুর গাছ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর---

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠

১১. বান্দাদের রিযিকস্বরূপ। আর আমরা বৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীবিত করি মৃত শহরকে; এভাবেই উত্থান ঘটবে[১]।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١

১২. তাদের আগেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্ এর অধিবাসী[২] ও সামূদ সম্প্রদায়,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝١٢

১৩. আর আদ, ফির'আউন ও লূত সম্প্রদায়।

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝١٣

১৪. আর আইকার অধিবাসী[৩] ও তুব্বা' সম্প্রদায়[৪]; তারা সকলেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল[৫], ফলে

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۭ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝١٤

(১) এখানে পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলা হচ্ছে, যে আল্লাহ এ পৃথিবী-গ্রহটিকে জীবন্ত সৃষ্টির বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান বানিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর প্রাণহীন মাটিকে আসমানের প্রাণহীণ পানির সাথে মিশিয়ে এত উচ্চ পর্যায়ের উদ্ভিদ জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এ উদ্ভিদরাজিকে মানুষ ও জীব-জন্তু সবার জন্য রিযিকের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা যে, মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। এটা নিরেট নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর,আদওয়াউল-বায়ান]

(২) সূরা আল-ফুরকানের ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'রাস' এর সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা চলে গেছে।

(৩) অর্থাৎ শু'আইব আলাইহিস সালামের জাতি। [ইবন কাসীর] এদের আলোচনা পূর্বেই সূরা আল-হিজর এর ৭৮ নং আয়াত ও সূরা আশ-শু'আরা এর ১৭৬ নং আয়াতের টিকায় করা হয়েছে। এ ছাড়াও এদের আলোচনা সূরা সাদ এর ১৩ নং আয়াতে এসেছে।

(৪) ইয়ামনের সম্রাটদের উপাধি ছিল তোব্বা [ইবন কাসীর] সূরা আদ-দোখানের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) অর্থাৎ তারা সবাই তাদের রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে এবং মৃত্যুর পরে

তাদের উপর আমার শাস্তি যথার্থভাবে আপতিত হয়েছে।

১৫. আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! বরং নতুন সৃষ্টির বিষয়ে তারা সন্দেহে পতিত[১]।

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬. আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর[২]।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে তাদের দেয়া এ খবরও অস্বীকার করেছে। এখানে বলা হয়েছে যে, 'তারা সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল'। যদিও প্রত্যেক জাতি কেবল তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলকেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা যেহেতু এমন একটি খবরকে অস্বীকার করছিল যা সমস্ত রাসূল সর্বসম্মতভাবে পেশ করছিলেন। তাই একজন রাসূলকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকার করার নামান্তর। [ইবন কাসীর]

(১) এটা আখেরাতের সপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে না এবং সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত এ বিশ্ব-জাহানে মানুষের সৃষ্টিকে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করার মত নির্বুদ্ধিতা যাকে পেয়ে বসেনি তার পক্ষে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এবং পুরো এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যে এ দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় বর্তমান এবং দুনিয়া ও আসমানের এসব কাজ-কারবার যে আমাদের চোখের সামনেই চলছে, এটা স্বতই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে এবং এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। তা সত্বেও কেউ যদি বলে যে, কিয়ামত সংঘটিত করার পর সেই আল্লাহই আরেকটি জগত সৃষ্টি করতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় আমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না তাহলে সে একটি যুক্তি বিরোধী কথাই বলে। আল্লাহ অক্ষম হলে প্রথমবারই তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম থাকতেন। তিনি যখন প্রথবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্মের বদৌলতেই আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি তখন নিজের সৃষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অপারগ হবেন কেন? এর কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে? [দেখুন- আদওয়াউল-বায়ান,ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে نحن বা 'আমরা' বলে ফেরেশ্তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। যাতে পরবর্তী

১৭. যখন তার ডানে ও বামে বসা দু'জন ফেরেশ্‌তা পরস্পর (তার আমল লিখার জন্য) গ্রহণ করে[১];	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾
১৮. সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾
১৯. আর মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে এসেছে (সে) সত্যই[২]; এটা (তা-ই) যা থেকে তুমি পালাতে চাচ্ছিলে।	وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾
২০. আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ওটাই প্রতিশ্রুত দিন।	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾
২১. আর সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী[৩]।	وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

আয়াতের সাথে অর্থের মিল হয়। তখন ঐ সমস্ত ফেরেশ্‌তাই উদ্দেশ্য হবে যারা মানুষের প্রাণ হরনের জন্য বান্দার কাছে এসে থাকে। আমার ফেরেশতাগণ তাদের ঘাড়ের শিরার কাছেই অবস্থান করছে। তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক যে কোন সময় তাদেরকে পাকড়াও করবে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিবহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। [ইবন কাসীর]

(১) يتلقى শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেয়া এবং অর্জন করে নেয়া। المتلقيان বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ﴾ অর্থাৎ তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। قعيد শব্দটির অর্থ উপবিষ্ট। [বাগভী,কুরতুবী]

(২) ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, মৃত্যুযন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক। [বুখারী: ৪০৯৪, ৭১৭৫] এখানে সে সত্য বলে আখেরাতের কথা বুঝানো হয়েছে। যে সত্যকে তারা অস্বীকার করত। [জালালাইন]

(৩) এই আয়াতের পূর্বে কেয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে

লَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝٢٢

২২. অবশ্যই তুমি এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, অতঃপর আমরা তোমার সামনে থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর[১]।

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۝٢٣

২৩. আর তার সঙ্গী ফেরেশ্‌তা বলবে, এই তো আমার কাছে 'আমলনামা প্রস্তুত।'

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ۝٢٤

২৪. আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে[২] জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে-

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ۝٢٥

২৫. কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী[৩]।

প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন ফেরেশতা থাকবে। سائق সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোনো দলের পেছনে থেকে তাকে কোনো বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيْدٌ এর অর্থ সাক্ষী। سَائِقٌ যে ফেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সবাই একমত। شَهِيْدٌ সম্পর্কে তফসিরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কারও কারও মতে সে-ও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে। কারও কারও মতে, সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষও বলেছেন। তবে ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আমি তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসিরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখের মতে মুমিন, কাফের, মুত্তাকী ও ফাসেক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) أَلْقِيَا শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোনো ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। [ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(৩) মূল আয়াতে مريب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, সন্দেহপোষণকারী। দুই, সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপকারী। [ইবন কাসীর]

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

২৬. যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছিল, তোমরা তাকে কঠিন শাস্তি তে নিক্ষেপ কর।

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

২৭. তার সহচর শয়তান বলবে, 'হে আমাদের রব! আমি তাকে বিদ্রোহী করে তুলিনি। বস্তুত সেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত(১)।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

২৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না; আমি তো তোমাদেরকে আগেই সতর্ক করেছিলাম।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

২৯. 'আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি যুলুমকারীও নই।'

তৃতীয় রুকূ'

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

৩০. সেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়েছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরো বেশী আছে কি(২)?'

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

৩১. আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের---কোন দূরত্বে থাকবে না।

---

(১) আলোচ্য আয়াতে قَرِينٌ বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবে, 'আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত' এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জাহান্নামে ফেলা হবে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম বলবে, আরো বেশীর অবকাশ আছে কি? অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র পা জাহান্নামে রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে, ক্বাত্ব, ক্বাত্ব। বা পূর্ণ হয়ে গেছি। [বুখারী:৪৮৪৮, ৭৪৪৯, মুসলিম: ২৮৪৬]

৩২. এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল---প্রত্যেক আল্লাহ্-অভিমুখী[১], হিফাযতকারীর জন্য---	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾
৩৩. যারা গায়েব অবস্থায় দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়েছে ---	مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. তাদেরকে বলা হবে, 'শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন ।'	ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾
৩৫. এখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই থাকবে[২] এবং আমার কাছে রয়েছে	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

(১) অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক أَوَّابٌ ('আউয়াব') এর জন্য রয়েছে। 'আউয়াব' এর অর্থ অনুরাগী। এমন ব্যক্তি যে নাফরমানী এবং প্রবৃত্তির আকাংখা চরিতার্থ করার পথ পরিহার করে আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ অবলম্বন করেছে, যে আল্লাহর পছন্দ নয় এমন প্রতিটি জিনিস পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করে তা গ্রহণ করে, বন্দেগীর পথ থেকে পা সামান্য বিচ্যুত হলেই যে বিচলিত বোধ করে এবং তাওবা করে বন্দেগীর পথে ফিরে আসে, যে অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের সমস্ত ব্যাপারে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরক্ত হয়। মুফাসসেরীনদের অনেকেই বলেছেন, যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই 'আউয়াব'। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর,বাগভী] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দো'আ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার এই মজলিসেকৃত সব গোনাহ মাফ করে দেন। দো'আ হচ্ছে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং প্রশংসা আপনারই। আপনি ব্যতীত কোনো হক উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি। [তিরমিযী:৩৪৩৩, আবু দাউদ:৪৮৫৮]

(২) অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই পাবে। চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।' [মুসনাদে আহমাদ:৩/৯, তিরমিযী: ২৫৬৩, ইবনে মাজাহ: ৪৩৩৮]

তারও বেশী[১]।

৩৬. আর আমরা তাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল পাকড়াও করার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে প্রবলতর, তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত; তাদের কোন পলায়ণস্থল ছিল কি?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে অন্তঃকরণ[২] অথবা যে শ্রবণ করে মনোযোগের সাথে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

৩৮. আর অবশ্যই আমরা আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

(১) অর্থাৎ তারা যা চাইবে তাতো পাবেই। কিন্তু আমি তাদেরকে আরো এমন কিছু দেব যা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করা তো দুরের কথা তাদের মন-মগজে তার কল্পনা পর্যন্ত উদিত হয়নি। কারণ, আমার কাছে এমন নেয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্খা ও করতে পারবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছি যা কোন চক্ষু কোনদিনে দেখেনি, কোন কান কোনোদিন শুনেনি এমনকি কোন মানুষের অন্তরেও উদিত হয়নি। [মুসলিম:২৮২৪] তবে আনাস ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এই বাড়তি নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দর্শন ও সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন মহান আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি বর্ধিত কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা শুভ্র করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূল বলেন, তখন পর্দা খুলে দেয়া হবে, তখন তারা বুঝতে পারবে তাদেরকে তাদের রব আল্লাহ্র দিকে তাকানোর নেয়ামতের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত দেয়া হয়নি। আর এটাই হলো, বর্ধিত বা বাড়তি নেয়ামত। [মুসলিম: ১৮১]

(২) ইবন আব্বাস বলেনঃ এখানে 'কলব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসিরবিদ বলেনঃ এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ۝

সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আর আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۝

৩৯. অতএব তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে[১],

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝

৪০. আর তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও[২]।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

৪১. আর মনোনিবেশসহকারে শুনুন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা সালাতের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবিহ করার অর্থ ফজরের সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ করার মানে আছরের সালাত। [ফাতহুল কাদীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সালাতগুলো ছুটে না যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আছরের সালাত। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন। [বুখারী: ৫৭৩] তাছাড়া সে সব তসবিহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি' পাঠ করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশি হয়। [মুয়াত্তাঃ ৪৩৮, বুখারী:৫৯২৬, মুসলিম:৪৮৫৭]

(২) মুজাহিদ বলেন, এখানে فسبح বলে ফরয সালাত বোঝানো হয়েছে এবং ﴿وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ﴾ বা সালাতের পশ্চাতে বলে সেই সব তসবিহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযিলত প্রত্যেক ফরয সালাতের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। [কুরতুবী,কাগভী] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির' পাঠ করবে, তার গোনাহ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়। [মুয়াত্তা:৪৩৯ মুসলিম:৯৩৯]

স্থান হতে ডাকবে,

৪২. সেদিন তারা সত্য সত্যই শুনতে পাবে মহানাদ, সেদিনই বের হবার দিন।

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪৩. আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু ঘটাই, আর সকলের ফিরে আসা আমাদেরই দিকে।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾

৪৪. যেদিন তাদের থেকে যমীন বিদীর্ণ হবে এবং লোকেরা ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে, এটা এমন এক সমাবেশ যা আমাদের জন্য অতি সহজ।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. তারা যা বলে তা আমরা ভাল জানি, আর আপনি তাদের উপর জবরদস্তি কারী নন, কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান করুন কুরআনের সাহায্যে।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

৫১- সূরা আয-যারিয়াত
৬০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ[১] ধূলিঝঞ্ঝার, وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ①
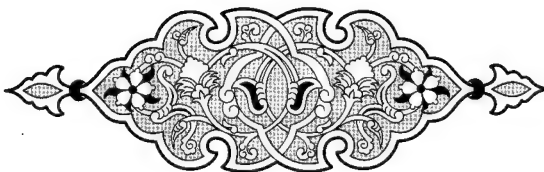
২. অতঃপর বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের, فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ②

৩. অতঃপর স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের, فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ③

৪. অতঃপর নির্দেশ বন্টনকারী ফেরেশ্তাগণের--- فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ④

৫. তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য । اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑤

৬. নিশ্চয় প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী । وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ⑥

৭. শপথ বহু পথবিশিষ্ট আসমানের[২], وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑦

---

(১) ﴿وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا﴾ এখানে الذَّارِيَاتِ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে । তারপর বলা হয়েছে, ﴿فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا﴾ এখানে الحَامِلَات এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী; অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে । তারপর বলা হয়েছে, ﴿فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۞ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا﴾ এখানে الجَارِيَاتِ ও المُقَسِّمَاتِ এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন । কেউ এ কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ দু'টি বাক্যাংশের অর্থও বাতাস [ফাতহুল কাদীর] । অর্থাৎ এ বাতাসই আবার মেঘমালা বহন করে নিয়ে যায় এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে । আল্লাহর নির্দেশানুসারে যেখানে যতটুকু বর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয় ততটুকু পানি বন্টন করে [কুরতুবী] । এ তাফসীর অনুসারে পুরো চারটি আয়াতই ঝঞ্ঝাবায়ূর সাথে সংশ্লিষ্ট । পক্ষান্তরে আরেক দল মুফাসসির الجَارِيَاتِ আয়াতাংশের অর্থ করেছেন দ্রুতগতিশীল নৌকাসমূহ এবং المُقَسِّمَاتِ এর অর্থ করেছেন সেসব ফেরেশতা যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য বরাদ্দকৃত জিনিস যথা রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ ইত্যাদি তাদের মধ্যে বন্টন করে [ফাতহুল কাদির] । আবার কারও কারও মতে الجَارِيَاتِ বলে বোঝানো হয়েছে, তারকাসমূহ যারা তাদের কক্ষপথের প্রতি সহজেই চলে থাকে । আল্লাহ্ তা'আলা এ চারটি বস্তুর শপথ করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া যে বাস্তব তা বিধৃত করেছেন ।[দেখুন,ইবন কাসীর] উপরে যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে তা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাফসীর অনুসরণ করে করা হয়েছে । তিনি এরূপই তাফসীর করেছেন । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) حُبُك শব্দটি حبكة এর বহুবচন । حُبُك শব্দের বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে । বায়ু প্রবাহের

৮. নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত[১]।

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝

৯. ফিরিয়ে রাখা হয় তা থেকে যে ফিরে থাকে[২]।

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝

১০. ধ্বংস হোক মিথ্যাচারীরা[৩],

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ۝

কারণে মরুভূমির বালুকারাশি এবং বদ্ধ পানিতে যে ঢেউ সৃষ্টি হয় তাকেও حُبُك বলা হয় [আদওয়া আল বায়ান]। এখানে আসমানকে حُبُك এর অধিকারী বলার কারণ হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় আসমানে নানা আকৃতির মেঘরাশি ছেয়ে থাকে এবং বাতাসের প্রভাবে বারবার তার আকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কখনো কোন আকৃতি না স্থায়িত্ব লাভ করে, না অন্য আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। অথবা এ কারণে বলা হয়েছে যে, রাতের বেলা যখন আকাশে তারকাসমূহ ছড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তার নানা রকম আকৃতি দেখতে পায় যার কোনটি অন্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না। অথবা, এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حُبُك বলা হয়। কোনো কোনো তাফসিরবিদ এখানে حُبُك এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। তখন আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আসমানের কসম [দেখুন, কুরতুবী]।

(১) যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ বা "তোমরা তো বিভিন্নরূপ উক্তিতে লিপ্ত"। বাহ্যত এতে মুশরিকদের-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও জাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্সির বলেন, এখানে সকল স্তরের মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; তাই এখানে "বিভিন্ন রূপ উক্তির" অর্থ হবে এই যে, তাদের কেউ তো ঈমান আনে এবং তাকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে। [তাবারী]

(২) أفك এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা কুরআন ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন ও রাসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে। [তাবারী] (দুই) এই সর্বনাম দ্বারা পূর্বের আয়াত বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ এরূপ বিভিন্ন উক্তি বলা থেকে সে ব্যক্তিকেই মুখ ফিরিয়ে রাখা হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেছেন এবং তৌফিক দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) الخَرَّاصُوْنَ এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোনো প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পরস্পর

১১. যারা সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত, উদাসীন!

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'প্রতিদান দিবস কবে হবে?'

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾

১৩. 'যে দিন তারা আগুনে সাজাপ্রাপ্ত হবে।'

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾

১৪. বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের শাস্তি[১] আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।'

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

১৬. গ্রহণ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল,

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

১৭. তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়[২],

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে মিথ্যাবাদীরা বলা হয়েছে। এই বাক্যে তাদের জন্যে অভিশাপের অর্থে বদদো'আ রয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) পবিত্র কুরআন এখানে فتنة শব্দটি ব্যবহার করেছে। এখানে 'ফিত্না' শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি অর্থ হচ্ছে, নিজের এ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। অপর অর্থটি হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে যে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো। আরবী ভাষায় এ শব্দটির এ দু'টি অর্থ গ্রহণের সমান অবকাশ আছে [কুরতুবী]।

(২) يَهْجَعُونَ শব্দটি هجوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন মুত্তাকীদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। যারা তাদের রাতসমূহ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীল কাজ-কর্মে ডুবে থেকে কাটায় এবং তারপরও মাগফিরাত প্রার্থনা করার চিন্তাটুকু পর্যন্ত তাদের মনে জাগে না এরা তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিল না। কোন কোন মুফাসসির বলেন: এখানে ما শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে

১৮. আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত[১],

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক[২]।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

২০. আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে যমীনে[৩],

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

সালাত, দো'আ ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়ে সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।" [আবু দাউদ: ১৩২২] ইমাম আবু জাফর বাকের রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি এশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(১) অর্থাৎ মুমিন মুত্তাকীগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। তারা রাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করতো এবং এরপরও রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতো যে, আপনার যতটুকু ইবাদাত বন্দেগী করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা করতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। [ইবনে কাসীর] রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [সূরা আলে ইমরান:১৭] হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। তখন তিনি ঘোষণা করেনঃ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? [বুখারী:১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪ মুসলিম: ৭৫৮]

(২) المحروم বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে [ফাতহুল কাদীর]।

(৩) অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্যে যমীনে আল্লাহ্‌র অনেক নির্দশন আছে। মূলত: যমীনে মহান আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভুপৃষ্টে নদীনালা কুপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারীতা রয়েছে। ভুপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভুখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে

وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও তোমরা কি চক্ষুস্মান হবে না?

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٢

২২. আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু[১]।

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقّٞ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ ٢٣

২৩. অতএব আসমান ও যমীনের রবের শপথ! নিশ্চয় তোমরা যে কথা বলে থাক তার মতই এটি সত্য[২]।

আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন। এ সব নিদর্শনের মধ্যে এ আয়াতে সম্ভবতঃ সেসব নিদর্শনই বোঝানো উদ্দেশ্য, যা আখেরাতের সম্ভাবনা এবং তার অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে [দেখুন, কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর]।

(১) অর্থাৎ আসমানে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তাফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আকাশে থাকা অর্থ "লওহে-মাহফুযে" লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া 'আসমান' বলে ঊর্ধজগতও উদ্দেশ্য হতে পারে। মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এবং কাজ করার জন্য যা কিছু দেয়া হয় তার সবকিছুই রিযিক। আর সমস্ত আসমানী কিতাব ও এ কুরআনে কিয়ামত, হাশর ও পুনরুত্থান, হিসেব-নিকেশ ও জবাবদিহি, পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ বলে সেসবকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমাদের কাকে কি দিতে হবে তার ফায়সালা ঊর্ধজগত থেকেই হয়। তাছাড়া জবাবদিহি ও কর্মফল দেয়ার জন্য কখন তলব করা হবে সে ফায়সালাও সেখান থেকেই হবে [দেখুন,কুরতুবী]।

(২) অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কেয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত, এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। [কুরতুবী;ইবন কাসীর]

দ্বিতীয় রুকূ'

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনার কাছে ইব্‌রাহীমের সম্মানীত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম।' উত্তরে তিনি বললেন, 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক[১]।

فَرَاغَ إِلٰى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর ইব্‌রাহীম তার স্ত্রীর কাছে দ্রুত চুপিসারে গেলেন[২] এবং একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসলেন,

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. অতঃপর তিনি তা তাদের সামনে রেখে বললেন, 'তোমরা কি খাবে না?'

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল[৩]। তারা বলল, 'ভীত হবেন না।' আর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।

---

(১) منكر শব্দের অর্থ অপরিচিত। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন, এরা তো অপরিচিত লোক। [কুরতুবী]

(২) راغ শব্দটি روغ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহ থেকে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা হয়ত এ কাজে বাধা দিত। [কুরতুবী]

(৩) ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত [কুরতুবী]।

২৯. তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে আসল এবং তার গাল চাপড়িয়ে বলল, 'বৃদ্ধা-বন্ধ্যা[১] ।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

৩০. তারা বলল, 'আপনার রব এরূপই বলেছেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ ।'

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

৩১. ইব্রাহীম বললেন, 'হে প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ[২] কি?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

৩২. তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি ।'

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

---

(১) সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে । ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল । তিনি বললেন, প্রথমত, আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা । যৌবনে আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না । এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ যা বললেন তার অর্থ, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন । এ কাজও এমনিভাবেই হবে । কোন কোন বর্ণনা মতে, এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন ইসহাক আলাইহিস্সালাম জন্মগ্রহণ করেন, তখন সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর বয়স একশত বছর ছিল । [ফাতহুল কাদীর]

(২) এই কথোপকথনের মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহর ফেরেশতা । আর মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হয়ে থাকে । তাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত হওয়ার জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম خطب শব্দ ব্যবহার করেছেন । আরবী ভাষায় خطب শব্দটি কোন মামুলি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী অভিযানে আগমন করেছেন? উত্তরে তারা লূত আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের ওপর মাটির তৈরী প্রস্তর (কংকর) বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল । [দেখুন,কুরতুবী;আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ۝٣٣

৩৩. 'যাতে তাদের উপর নিক্ষেপ করি মাটির শক্ত ঢেলা,

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝٣٤

৩৪. 'যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আপনার রবের কাছ থেকে[১]।'

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٣٥

৩৫. অতঃপর সেখানে যেসব মুমিন ছিল আমরা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٣٦

৩৬. তবে আমরা সেখানে একটি পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলিম পাইনি।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝٣٧

৩৭. আর যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমরা তাদের জন্য ওখানে একটি নিদর্শন রেখেছি।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝٣٨

৩৮. আর নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তেও, যখন আমরা তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আউনের কাছে পাঠালাম[২],

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝٣٩

৩৯. তখন সে ক্ষমতার অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিল[৩] এবং বলল, 'এ ব্যক্তি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।'

---

(১) ফেরেশতারা বলল, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত ছিল অথবা প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে [কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর]।

(২) ফির'আউনকে যখন মূসা আলাইহিস্ সালাম সত্যের পয়গাম দেন, তখন ফির'আউন মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। [দেখুন,কুরতুবী,সা'দী]

(৩) ركن শব্দের অর্থ খুঁটি। আবার নিজ পার্শ্বশক্তির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মুফাসসিরগণ এখানে দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক. সে তার শক্তির অহংকারে মত্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। দুই. সে তার শক্তিশালী দলবল ও সেনাবাহিনীসহ মুখ ফিরিয়ে নিল [দেখুন,কুরতুবী]।

৪০. কাজেই আমরা তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং ওদের সাগরে নিক্ষেপ করলাম, আর সে ছিল তিরস্কৃত।

فَاَخَذۡنٰهُ وَجُنُوۡدَهٗ فَنَبَذۡنٰهُمۡ فِی الۡیَمِّ وَهُوَ مُلِیۡمٌ ﴿٤٠﴾

৪১. আর নিদর্শন রয়েছে 'আদের ঘটনাতেও, যখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু[১];

وَفِیۡ عَادٍ اِذۡ اَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمُ الرِّیۡحَ الۡعَقِیۡمَ ﴿٤١﴾

৪২. এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই যেন পরিণত করল চূর্ণ-বিচূর্ণ ধ্বংসস্তুপে।

مَا تَذَرُ مِنۡ شَیۡءٍ اَتَتۡ عَلَیۡهِ اِلَّا جَعَلَتۡهُ كَالرَّمِیۡمِ ﴿٤٢﴾

৪৩. আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তেও, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'ভোগ করে নাও একটি নির্দিষ্ট কাল।'

وَفِیۡ ثَمُوۡدَ اِذۡ قِیۡلَ لَهُمۡ تَمَتَّعُوۡا حَتّٰی حِیۡنٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. অতঃপর তারা তাদের রবের আদেশ মানতে অহংকার করল; ফলে তাদেরকে পাকড়াও করল বজ্র[২] এবং

فَعَتَوۡا عَنۡ اَمۡرِ رَبِّهِمۡ فَاَخَذَتۡهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمۡ یَنۡظُرُوۡنَ ﴿٤٤﴾

(১) এ বাতাসের জন্য الْعَقِيْم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বন্ধ্যা নারীদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অভিধানে এর প্রকৃত অর্থ গরম ও শুষ্ক। যদি শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তা ছিল এমন প্রচণ্ড গরম ও শুষ্ক বাতাস যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকে শুষ্ক করে ফেলেছে। আর যদি শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে তা ছিল বন্ধ্যা নারীর মত এমন হওয়া যার মধ্যে কোন কল্যাণ ছিল না। তা না ছিল আরামদায়ক, না ছিল বৃষ্টির বাহক। না ছিল বৃক্ষরাজিকে ফলবানকারী না এমন কোন কল্যাণ তার মধ্যে ছিল যে জন্য বাতাস প্রবাহিত হওয়া কামনা করা হয় [দেখুন,কুরতুবী;তাবারী]।

(২) সামূদ জাতির উপর আপতিত এ আযাবের কথা বুঝাতে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও একে رجفة (ভীতি প্রদর্শনকারী ও প্রকম্পিতকারী বিপদ) বলা হয়েছে। [সূরা আল-আ'রাফ:৭৮] কোথাও একে صيحة (বিস্ফোরণ ও বজ্রধ্বনি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। [সূরা হূদ:৬৭] কোথাও একে বুঝাতে طاغية (কঠিনতম বিপদ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আল-হাক্কাহ:৫] আর এখানে একেই صاعقة বলা হয়েছে, যার অর্থ বিদ্যুতের মত অকস্মাৎ আগমনকারী বিপদ

তারা তা দেখছিল।

৪৫. অতঃপর তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং প্রতিরোধ করতেও পারল না।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর (ধ্বংস করেছিলাম) এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কে, নিশ্চয় তারা ছিল ফাসেক সম্প্রদায়।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

তৃতীয় রুকূ'

৪৭. আর আসমান আমরা তা নির্মাণ করেছি আমাদের ক্ষমতা বলে[১] এবং আমরা নিশ্চয়ই মহাসম্প্রসারণকারী[২]।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর যমীন, আমরা তাকে বিছিয়ে দিয়েছি, অতঃপর কত সুন্দর ব্যবস্থাপনাকারী[৩] (আমরা)!

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾

এবং কঠোর বজ্রধ্বনি উভয়ই। সম্ভবত: এ আযাব এমন এক ভূমিকম্পের আকারে এসেছিলো যার সাথে আতংক সৃষ্টিকারী শব্দও ছিল। [দেখুন,ইরাব আল-কুরআন]

(১) أَيْد শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও সাওরী রাহেমাহুমুল্লাহ এ তাফসীরই করেছেন। কারণ, এখানে أيد শব্দটি يَدٌ এর বহুবচন নয়। যদি শব্দটি يد এর বহুবচন হতো তবে তার বহুবচন হতো, أَيدِيَ। বরং أيد শব্দটির প্রতিটি বর্ণ মূল শব্দ। যার অর্থই হলো শক্তি। অন্য আয়াতে এ শব্দ থেকে বলা হয়েছে, ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ "আর আমরা তাকে রুহুল কুদুস বা জিবরীলের মাধ্যমে শক্তি যুগিয়েছি" [সূরা আল-বাকারাহ:৮৭, ২৫৩] সুতরাং কেউ যেন এটা না ভাবে যে, এখানে أيد শব্দটি يد এর বহুবচন [দেখুন,আদওয়াউল বায়ান]।

(২) মূল আয়াতাংশ مُوْسِعُوْنَ অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। তাছাড়া مُوْسِعُوْنَ শব্দের অন্য আরেকটি অর্থও কোন কোন মুফাসসির থেকে বর্ণিত আছে, তা হলো রিযিক সম্প্রসারণকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের রিযিকে প্রশস্তি প্রদানকারী। [দেখুন,কুরতুবী] তবে ইবন কাসীর প্রশস্তকারী অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি অর্থ করেছেন, 'আমরা আকাশের প্রান্তদেশের সম্প্রসারণ করেছি এবং একে বিনা খুঁটিতে উপরে উঠিয়েছি, অবশেষে তা তার স্থানে অবস্থান করছে।' [ইবন কাসীর]

(৩) مَاهِدُوْنَ শব্দের অর্থ দু'টি। এক. বিছানার মত সুন্দরভাবে বিছিয়ে দেয়া। দুই. সুন্দর ব্যবস্থাপনা তৈরী করা [দেখুন,কুরতুবী]।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু আমরা সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়[১], যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫০. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও[২], নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট সতর্ককারী[৩]।

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾

৫১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্ স্থির করো না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৫২. এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছেন তারাই তাকে বলেছে, ‘এ তো এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!’

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা কি একে অপরকে এ মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বরং এরা সীমালঙ্ঘনকারী

---

(১) অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃজনের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টিতে আমরা পুরুষ ও নারী জোড়া জোড়া হিসেবে দেখতে পাই। অনুরূপভাবে প্রতিটি বস্তুরই বিপরীত দিক রয়েছে। যেমন, রাত-দিন, জল-স্থল, সাদা-কালো, আসমান-যমীন, কুফরী-ঈমান, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ইত্যাদি। [দেখুন,কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।। [দেখুন,ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কিন্তু এটি আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এ ধরনের কথার উদাহরণ কুরআন মজীদেও বহু স্থানে এসেছে [দেখুন,আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

সম্প্রদায়[১]।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, এতে আপনি তিরস্কৃত হবেন না।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।

مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমি তাদের কাছ থেকে কোন রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে[২]।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনিই তো রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

---

(১) অর্থাৎ একথা সুস্পষ্ট যে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিটি যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মোকাবিলায় এই আচরণ করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একই রকমের কথা বলার কারণ এ নয় যে, একটি সম্মেলন করে আগের ও পরের সমস্ত মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যখনই কোন নবী এসে এ দাওয়াত পেশ করবে তখনই তাঁকে এ জবাব দিতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তাদের আচরণের এ সাদৃশ্য এবং একই প্রকৃতির জবাবের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি কেন? এর একমাত্র জবাব এই যে, অবাধ্যতা ও সীমালংঘন এদের সবার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া এ আচরণের আর কোন কারণ নেই। প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ লোকেরাই যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত ও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে পৃথিবীতে লাগামহীন পশুর মত জীবন যাপন করতে আগ্রহী তাই শুধু এ কারণে যিনিই তাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহভীতিমূলক জীবন যাপনের আহবান জানিয়েছেন তাঁকেই তারা একই ধরাবাঁধা জবাব দিয়ে এসেছে। [দেখুন,কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। [দেখুন,তাবারী]

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾

৫৯. সুতরাং যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের সমমতাবলম্বীদের অনুরূপ প্রাপ্য (শাস্তি)। কাজেই তারা এটার জন্য আমার কাছে যেন তাড়াহুড়ো না করে[১]।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. অতএব, যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য দুর্ভোগ সে দিনের, যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

---

(১) ذَنُوب শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوب শব্দের অর্থ করা হয়েছে প্রাপ্য অংশ বা পালা। [কুরতুবী]।

৫২- সূরা আত-তূর
৪৯ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الطُّوْرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ তূর পর্বতের[১],

وَالطُّوْرِ ۝١

২. শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে[২]

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢

৩. উন্মুক্ত পাতায়[৩];

فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣

৪. শপথ বায়তুল মা'মূরের[৪],

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤

---

(১) বলা হয়ে থাকে যে, সুরিয়ানী ভাষায় طور (তূর) এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরে-সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। তূরের কসম খাওয়ার দ্বারা মহান আল্লাহ্ এ পাহাড়টিকে সম্মানিত করেছেন। [ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]।

(২) লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে পবিত্র কুরআন বোঝানো হয়েছে। আবার কারো কারো মতে এর দ্বারা লাওহে মাহফুজই বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে এর দ্বারা সকল আসমানী কিতাবকে বোঝানো হয়েছে , [ফাতহুল কাদীর]

(৩) رق শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মা'মুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। হাদীসে আছে যে, মে'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে। [বুখারী:৩২০৭, মুসলিম:১৬২] সপ্তম আসমানে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মা'মুর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে পৌঁছে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে বায়তুল মা'মুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। [বুখারী:৩২০৭] তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। প্রতি আসমানেই ফেরেশতাদের জন্য একটি ইবাদতঘর রয়েছে। প্রথম আসমানের ইবাদতঘরের নাম 'বাইতুল ইযযত'। [ইবন কাসীর]

৫. শপথ সমুন্নত ছাদের[১],

৬. শপথ উদ্বেলিত সাগরের[২]---

৭. নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

৮. এটার নিবারণকারী কেউ নেই[৩] ।

৯. যেদিন আসমান আন্দোলিত হবে

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝٥

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝٦

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧

مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ۝٨

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝٩

(১) সমুন্নত ছাদ বা উঁচু ছাদ অর্থ আসমান, যা পৃথিবীকে একটি গম্বুজের মত আচ্ছাদিত করে আছে বলে মনে হয় । [ফাতহুল কাদীর]

(২) مَسْجُوْرٌ শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত । এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে । কোন কোন মুফাসসির একে 'আগুনে ভর্তি' অর্থে গ্রহণ করেছেন । কেউ কেউ অর্থ করেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত করা । তখন আয়াতের অর্থ, সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে । এথেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে । অন্য এক আয়াতে আছেঃ ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [সূরা আত-তাকভীর:৬] কেউ কেউ একে শূন্য ও খালি অর্থে গ্রহণ করেন যার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে । বা শপথ খালি সমুদ্রের যা পরিপূর্ণ হবে । কেউ কেউ একে আবদ্ধ বা আটকিয়ে রাখা বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থে গ্রহণ করেন । তাদের মতে এর অর্থ হচ্ছে, সমুদ্রকে আটকিয়ে বা থামিয়ে রাখা হয়েছে যাতে তার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হারিয়ে না যায় এবং স্থলভাগকে প্লাবিত করে না ফেলে এবং পৃথিবীর সব অধিবাসী তাতে ডুবে না মরে । অথবা জলভাগকে স্থলভাগ গ্রাস করতে বাধা দিয়ে রাখা হয়েছে নতুবা তা অনেক আগেই গ্রাস করে ফেলত । কেউ কেউ একে মিশ্রিত অর্থে গ্রহণ করে থাকেন । অর্থাৎ এর মধ্যে মিঠা ও লবণাক্ত পানি এবং গরম ও ঠান্ডা সব রকম পানি এসে মিশ্রিত হয় । আর কেউ কেউ একে কানায় কানায় ভরা ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করেন । কাতাদাহ্ রাহেমাহুল্লাহ্ প্রমুখ مَسْجُوْر এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ । ইবন জারীর রাহেমাহুল্লাহ এই অর্থই পছন্দ করেছেন । [কুরতুবী] ।

(৩) বলা হয়েছে, একে অর্থাৎ আপনার রবের শাস্তিকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না । বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূরা আত-তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন । তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না । অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি এক রাত্রে প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য ছদ্মবেশে বের হন, এমতাবস্থায় এক লোকের বাড়ির পাশে গিয়ে এ আয়াত শুনতে পান । তিনি তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক মাসের মত সময় অসুস্থ ছিলেন । কেউ তার রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম ছিল না । [ইবন কাসীর]

প্রবলভাবে[১]

১০. আর পর্বত পরিভ্রমণ করবে দ্রুত[২];

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

১১. অতঃএব দুর্ভোগ সে দিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য,

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١١

১২. যারা খেলার ছলে অসার কাজকর্মে লিপ্ত থাকে[৩]।

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝١٢

১৩. যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣

১৪. 'এটাই সে আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।'

هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝١٤

১৫. এটা কি তবে জাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না[৪]!

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝١٥

---

(১) আরবী ভাষায় مور শব্দটি আবর্তিত হওয়া, কেঁপে কেঁপে ওঠা, ঘুরপাক খাওয়া, নড়েচড়ে উঠা এবং বারবার সামনে ও পেছনে চলা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের দিন আসমানের যে অবস্থা হবে একথাটির মাধ্যমে তা বর্ণনা করে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সেদিন ঊর্ধজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ যদি সেদিন আকাশের দিকে তাকায় তবে দেখবে যে, সেই সুশোভিত নকশা বিকৃত হয়ে গিয়েছে যা সবসময় একই রকম দেখা যেতো আর চারদিকে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আসমান এমনভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে যেন মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে। এভাবে পাহাড় নিজ অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ তারা নবীর কাছে কিয়ামত, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনে সেগুলোকে হাসির খোরাক বানাচ্ছে এবং এ বিষয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে গভীরভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে কেবল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছে। আখেরাত নিয়ে তাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য এর তাৎপর্য বুঝার প্রচেষ্টা নয়, বরং তা একটি খেলা যা দিয়ে তারা মনোরঞ্জন করে থাকে। কিন্তু এটা তাদের কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন উপলব্ধি নেই। [কুরতুবী]

(৪) অর্থাৎ দুনিয়াতে রাসূল যখন তোমাদেরকে এ জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সাবধান

১৬. তোমরা এতে দগ্ধ হও, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা ধৈর্য ধারণ না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশে,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৮. তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তাদের রব তাদেরকে রক্ষা করেছেন জলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে,

فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

১৯. 'তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক[১]।'

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔۢا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আর আমরা তাদের মিলন ঘটাব ডাগর চোখবিশিষ্টা হূরের সঙ্গে;

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২১. আর যারা ঈমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا

করতেন তখন তোমরা তো বিশ্বাস করতে না, এখন বলো তোমাদের সামনে বিদ্যমান এ জাহান্নাম কি সেই জাদুর খেলা, নাকি এখনো বুঝে উঠতে পারনি, যে জাহান্নামের খবর তোমাদের দেয়া হতো তোমরা সে জাহান্নামের মুখোমুখি হয়েছো? [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) এখানে "তৃপ্তির সাথে" বা মজা করে কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। মানুষ জান্নাতে যে লাভ করবে কোন প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই তা লাভ করবে। বরং তা হুবহু তার আকাংখা ও মনের পছন্দ মত হবে। যত চাইবে এবং যখনই চাইবে সামনে এনে হাজির করা হবে। সে যা কিছু লাভ করবে তা তার অতীত কাজের প্রতিদান হিসেবে এবং নিজের বিগত দিনের উপার্জনের ফল হিসেবে লাভ করবে। [দেখুন, সা'দী]

بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

হয়, আমরা তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে[১] এবং তাদের কর্মফল আমরা একটুও কমাবো না[২]; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী[৩]।

(১) অর্থাৎ যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমরা তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। [মুয়াসসার] পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ ওয়াদা করা হয়েছে। যেমন, সূরা আর রা'দ এর ২৩ এবং সূরা গাফির এর ৮ নং আয়াত। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়- যাতে সম্মানিত মুরব্বীদের চক্ষুশীতল হয়। সায়ীদ ইবন-জুবায়ের রাহেমাহুল্লাহ বলেন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবে, হে রব! দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে, তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে, হে রব! আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দো'আ করেছে। এটা তারই ফল। [মুসনাদে আহমাদ:২/৫০৯]

(২) আয়াতের অর্থ এইঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, সম্মানিত পিতৃপুরুষদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বা পিতৃপুরুষদের পদাবনতির মাধ্যমে সমান করা হবে। বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের

২২. আর আমরা তাদেরকে বাড়িয়ে দেব ফলমূল এবং গোশ্ত যা তারা কামনা করবে।

وَأَمْدَدْنٰهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র, সেখানে থাকবে না কোন অসার কথা-বার্তা, থাকবে না কোন পাপকাজও[১]।

يَتَنٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরাঘুরি করবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তারা একে অন্যের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে,

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. তারা বলবে, নিশ্চয় আগে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম[২]।

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

২৮. নিশ্চয় আমরা আগেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম, নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

বেলায় এরূপ করা হবে না। একজনের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ সেই শরাব নেশা সৃষ্টিকারী হবে না। তাই তা পান করে কেউ মাতাল হয়ে বেহুদা ও আবোলতাবোল বকবে না, গালি-গালাজ করবে না, কিংবা দুনিয়ার শরাব পানকারীদের মত অশ্লীল ও অশালীন আচরণ করবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ আমরা দুনিয়ায় বিলাসিতায় ডুবে এবং আপন ভূবনে মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন যাপন করিনি। সেখানে সবসময়ই আমাদের আশংকা থাকতো যে, কখন যেন আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ হয়ে যায়, যে কারণে আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

দ্বিতীয় রুকূ'

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝٢٩

২৯. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ, আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি গণক নন, উন্মাদও নন।

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۝٣٠

৩০. নাকি তারা বলে, 'সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।

قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۝٣١

৩১. বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত[১]।'

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝٣٢

৩২. নাকি তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছে, বরং তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়[২]।

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ۝٣٣

৩৩. নাকি তারা বলে, 'এ কুরআন সে বানিয়ে বলেছে'? বরং তারা ঈমান আনবে না।

فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ۝٣٤

৩৪. অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এটার মত কোন বাণী নিয়ে আসুক না[৩]!

---

(১) দুর্ভাগ্য আমার আসে না তোমাদের আসে, তা দেখার জন্য আমিও অপেক্ষা করছি। [মুয়াসসার]

(২) এ দু'টি বাক্যে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে , কারণ তারা একই ব্যক্তিকে অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী উপাধি দিয়েছিল, অথচ এক ব্যক্তি কবি, পাগল ও গণক একই সাথে হতে পারে না। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ কথা শুধু এ টুকু নয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়, বরং এটা আদৌ মানুষের কথা নয় এ রকম বাণী রচনা করাও মানুষের সাধ্যাতীত। তোমরা যদি একে মানুষের কথা বলতে চাও তাহলে মানুষের রচিত এ মানের কোন কথা এনে প্রমাণ করো। শুধু কুরাইশদেরকে নয়, সারা দুনিয়ার মানুষকে এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। এরপর পুনরায় মক্কায় তিনবার এবং মদীনায় শেষ বারের মত এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। [দেখুন ইউনুস:৩৮, হূদ: ১৩, আল-ইসরা: ৮৮, আল-বাকারাহ: ২৩]।

৩৫. তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা[১]?

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না।

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আপনার রবের গুপ্তভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, নাকি তারা এ সবকিছুর নিয়ন্তা?

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. নাকি তাদের কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহন করে তারা শুনে থাকে? থাকলে তাদের সে শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক!

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. তবে কি আপনি ওদের কাছে

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

(১) এ আয়াতে তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছো, কোন স্রষ্টা তোমাদের সৃষ্টি করেননি? নাকি তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? কিংবা এ বিশাল মহাবিশ্ব তোমাদের তৈরী? এসব কথার কোনটিই যদি সত্য না হয়, আর তোমরা নিজেরাই স্বীকার করো যে তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ আর এই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টাও তিনিই, তাহলে যে ব্যক্তি তোমাদের বলে, সেই আল্লাহই তোমাদের বন্দেগী ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তির প্রতি তোমরা এত ক্রোধান্বিত কেন? [দেখুন, কুরতুবী]

এটা ছিল এমন একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন যা মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। হাদীসে আছে, বদর যুদ্ধের পর বন্দী কুরাইশদের মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে জুবাইর ইবন মুতয়িম মদীনায় আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়ায শোনা যাচ্ছিল, তিনি যখন ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব। [বুখারী:৪৮৫৪]

পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তারা এটাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে?

৪১. নাকি গায়েবী বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখছে?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾

৪২. নাকি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে যারা কুফরী করে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার[১]।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. নাকি আল্লাহ্ ছাড়া ওদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে? তারা যে শির্ক স্থির করে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র!

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আর তারা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে, 'এটা তো এক পুঞ্জিভূত মেঘ।'

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. অতএব তাদেরকে ছেড়ে দিন সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে।

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর নিশ্চয় যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে এছাড়া আরো শাস্তি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের সিদ্ধান্তের উপর; নিশ্চয় আপনি

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ

---

(১) মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া ও তাকে হত্যা করার জন্য একত্রে বসে যে সলাপরামর্শ করতো ও ষড়যন্ত্র পাকাতো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী ,ফাতহুল কাদীর]

بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

আমাদের চক্ষুর সামনেই রয়েছেন(১)। আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন(২),

(১) শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আল্লাহর চোখ আপনার হেফাযতে আছে। আপনাকে তিনি তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। [দেখুন, কুরতুবী] অন্য এক আয়াতে আছে ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ "আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাযত করবেন।" [সূরা আল-মায়িদাহ:৬৭]

(২) এরপর আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এখানে تقوم বা "দণ্ডায়মান হন" একথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং এখানে সবগুলো অর্থ গ্রহণীয় হওয়া অসম্ভব নয়। একটি অর্থ হচ্ছে, আপনি যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবেন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে উঠবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ নির্দেশ পালন করতেন এবং মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন কোন মজলিস থেকে উঠার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ্ পাঠ করে। এভাবে সেই মজলিসে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার কাফফারা হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসল এবং সেখানে অনেক বাকবিতণ্ডা করল সে যদি উঠে যাওয়ার সময় বলে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পাঠ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোন হক্ক মা'বুদ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।" [তিরমিযী:৩৪৩৩, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৯৪] তাহলে সেখানে যেসব ভুল ত্রুটি হবে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তুমি যখন মজলিস থেকে ওঠ, তখন তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফফারা হয়ে যাবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা ঘুম থেকে জেগে বিছানা ছাড়বে তখন তাসবীহ্সহ তোমার রবের প্রশংসা কর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিও নিজে আমল করতেন এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর একথাগুলো বলার জন্য সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দো'আই করে, তা-ই কবুল হয়। বাক্যগুলো এইঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

৪৯. আর তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন রাতের বেলা(১) ও তারকার অস্ত গমনের পর(২) ।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝٤٩

"(একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ্ ব্যতীত হক কোন ইলাহ নেই, তাঁর জন্যই যাবতীয় রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা । আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান । পবিত্র ও মহান আল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, তিনি ব্যতীত আর কোন হক ইলাহ নেই, এবং তিনিই মহান । আর আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বাঁচার পথ নেই, কোন শক্তিও নেই)" তারপর বলল, হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন, অথবা দো'আ করল, তার দো'আ কবুল করা হবে । তারপর যদি সে ওযু করে সালাত পড়ে, তবে তার সালাত কবুল করা হবে । [বুখারী:১১৫৪], এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, আপনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবেন তখন আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করুন । এ হুকুম পালনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাকবীর তাহরীমার পর সালাত শুরু করবে একথা বলে, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ [মুসলিম: ৩৯৯] এর চতুর্থ অর্থ হচ্ছে, যখন আপনি আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্য প্রস্তুত হবেন তখন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করুন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটিও স্থায়ীভাবে পালন করতেন । তিনি সবসময় আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা তার খুতবা শুরু করতেন । তাফসীর বিশারদ ইবনে জারীর এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন । সে অর্থটি হচ্ছে, আপনি যখন দুপুরের আরামের পর উঠবেন তখন সালাত পড়বেন । অর্থাৎ যোহরের সালাত । [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন । এর অর্থ মাগরিব, ইশা এবং তাহজ্জুদের সালাত । সাথে সাথে এর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত, সাধারণ তাসবীহ্ পাঠ এবং আল্লাহর যিকরও বুঝানো হয়েছে । [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তারকা অস্তমিত হওয়ার পর । এখানে ফজরের সালাত ও তখনকার তাসবীহ পাঠ বোঝানো হয়েছে । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এখানে ফজরের সালাতের পূর্বের দু' রাকা'আত সুন্নাত সালাতকে বুঝানো হয়েছে । এ দু' রাকা'আত সালাতের ব্যাপারে হাদীসে বহু তাগীদ দেয়া হয়েছে । [কুরতুবী]হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সুন্নাত সালাতের ব্যাপারে ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাত সালাতের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন না । [বুখারী: ১১৬৯, মুসলিম: ৯৪] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফজরের দু' রাকা'আত সালাত দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকেও উত্তম" [মুসলিম: ৯৬]

৫৩- সূরা আন-নাজ্ম[১]
৬২ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ النَّجْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত[২],

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ۝١

২. তোমাদের সঙ্গী[৩] বিভ্রান্ত নয়,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝٢

(১) মুফাসসিরগণ সূরা আন-নাজমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যেমন, সূরা আন-নাজম প্রথম সূরা; যা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ঘোষণা করেন [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াতের সেজদা করেন। মুসলিম ও কাফের সবাই এই সেজদায় শরীক হয়েছিল। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি সে সেজদা করেনি। সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল, ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। সে ছিল উমাইয়া ইবন খালাফ। [বুখারী:১০৬৭, ১০৭০, মুসলিমঃ ৫৭৬] ত্বাবরানীর বর্ণনায় এ কাফেরকে ওলীদ ইবনে মুগীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [মু'জামুল কাবীরঃ ৯/৩৪, হাদীস ৮৩১৬] অনুরূপভাবে এই সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্য নবী হওয়া এবং তার প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। ত্বাবরানীর বর্ণনায় এ কাফেরকে ওলীদ ইবনে মুগীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [মু'জামুল কাবীরঃ ৯/৩৪, হাদীস ৮৩১৬]

(২) নক্ষত্রমাত্রকেই نجم বলা হয় এবং বহুবচন نجوم [ইরাবুল কুরআন]। কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর "সুরাইয়া" অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ শুক্রগ্রহ। [কুরতুবী]। هوى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। [আদওয়াউল বায়ান, সা'দী]

(৩) মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে صَاحِبُكُمْ বা তোমাদের বন্ধু। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় صاحب বলতে বন্ধু, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং সাথে উঠা-বসা করে এমন লোককে বুঝায়। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সঙ্গী'

বিপথগামীও নয়,

৩. আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না(১)। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝

৪. তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى ۝

৫. তাকে শিক্ষা দান করেছেন প্রচণ্ড শক্তিশালী(২), عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ۝

৬. সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা(৩)। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন(৪), ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ۝

বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। [দেখুন, কুরতুবী; আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ সেসব কথা তার মনগড়া নয় কিংবা তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ঐ সবের উৎস নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং হচ্ছে। একইভাবে ইসলামের এ আন্দোলন, তাওহীদের এ শিক্ষা, আখেরাত, হাশর-নাশর এবং কাজকর্মের প্রতিদানের এ খবর মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে এসব সত্য ও তথ্য এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য যেসব নীতিমালা তিনি পেশ করছেন এসবও তার নিজের রচিত দর্শন নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]।

(২) অর্থাৎ তাকে শিক্ষাদানকারী কোন মানুষ নয়, যা তোমরা মনে করে থাকো। মানব সত্তার ঊর্ধ্বের একটি মাধ্যম থেকে তিনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। তাফসীরকারদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ব্যাপারে একমত যে, "মহাশক্তির অধিকারী" এর অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুন্দর। তারা যেমন সুন্দর তাদের চরিত্রও তেমনি। তাই তারা কোন খারাপ সুরত গ্রহণ করেন না। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন সার্বিকভাবে তারা সুন্দর। কোন কোন মুফাসসির مرة শব্দটির অর্থ করেছেন, শক্তিশালী হওয়া। জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তারই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিবেকবান। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন, শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা। এসবগুলোই মূলতঃ ফেরেশতাদের গুণ। [দেখুন, কুরতুবী]

(৪) এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যদি জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হয়, তখন অর্থ হবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে যখন

৭. আর তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বদিগন্তে(১), | وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝

প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। রাসূলকে দেখা দেওয়ার পর পুনরায় তিনি তার জায়গায় ফিরে যান। অথবা সোজা হয়ে যাওয়ার অর্থ জিবরাইল তার সৃষ্ট সঠিক রূপে দাঁড়িয়ে গেলেন। যে প্রকৃত রূপে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি সে প্রকৃত রূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হলেন। আর যদি এখানে সোজা হয়ে যাওয়া দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নেয়া হয় তখন আয়াতের অর্থ হবে, 'তারপর কুরআন রাসূলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল'। আর যদি এখানে সোজা হওয়া দ্বারা আল্লাহকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে তখন এর অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশের উপর উঠলেন। এ সব তাফসীর সবগুলিই সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে এবং সবগুলিই উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দিগন্ত অর্থ আসমানের পূর্ব প্রান্ত যেখানে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূরা আত-তাকভীরের ২৩ আয়াতে একেই পরিষ্কার দিগন্ত বলা হয়েছে। দু'টি আয়াত থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন জিবরাঈল আলইহিস সালামকে দেখেন তখন তিনি আসমানের পূর্ব প্রান্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মূলত: মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন বা প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যমণ্ডিত, সোজা হওয়া, এবং নিকটবর্তী হওয়া এগুলো সব জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা আন-নাজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা আন-নাজম। বাহ্যত মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। ইমাম শা'বী তার উস্তাদ মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন- তিনি একদিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ এবং ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। [বুখারী:৪৬১২, ৪৮৫৫, মুসলিম: ১৭৭/২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, তিরমিযী:৩০৬৮, মুসনাদে আহমাদ:৬/২৪১] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ

এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি। [মুসনাদে আহমাদ:৬/২৩৬] অনুরূপভাবে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু যরকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি জওয়াবে বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে ছয়শত ডানাবিশিষ্ট দেখেছেন। [বুখারী: ৪৮৫৬] ইবনে জারীর রাহেমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল। [তাফসীর তাবারী: ৩২৪৭০] এ সব বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সূরা নাজমের উল্লেখিত আয়াতসমূহ দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবুযর গেফারী, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে-কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেনঃ আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মে'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তার মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেনঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তার আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসেন এবং তাকে ওহী পৌঁছান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে ওঠে। সারকথা এই যে, এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার দেখার কথা ﴿وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى﴾ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

৮. তারপর তিনি তার কাছাকাছি হলেন, অতঃপর খুব কাছাকাছি,

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۞

৯. ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম[১]।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۞

১০. তখন আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন[২]।

فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۞

১১. যা তিনি দেখেছেন, তার অন্তঃকরণ তা মিথ্যা বলেনি[৩];

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۞

মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে এটাই বলা যায় যে, সূরা আন-নাজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিবরাঈলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার নবুওয়াতের প্রারম্ভে। আর দ্বিতীয়টি মি'রাজের রাত্রিতে, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৫৫, ৪৮৫৬]

(১) دَنَا শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং فَتَدَلّٰى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যাবধানকে قاب বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক একহাত হয়ে থাকে। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) এখানে أَوْحٰى (বা ওহী প্রেরণ করেন) ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং عَبْدُهٗ (বা তার বান্দা) এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ওহী নাযিল করলেন। [দেখুন, আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর, তাবারী]। এক হাদীসে এসেছে, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সূরা আল-বাকারাহ্‌ এর শেষ আয়াতসমূহ এবং তার উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করবে না তাদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা। [মুসলিম: ১৭৩]

(৩) فؤاد শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। ﴿مَا رَاٰى﴾ শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। এখানে উদ্দেশ্য তিনি জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম-কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। [মুয়াসসার, কুরতুবী]

১২. তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করবে?	أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ⑫
১৩. আর অবশ্যই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন	وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ⑬
১৪. 'সিদরাতুল মুন্তাহা' তথা প্রান্তবর্তী কুল গাছ এর কাছে(১),	عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ⑭
১৫. যার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া(২) অবস্থিত ।	عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ⑮

এ আয়াতে فؤاد বা অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ অনেকের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তি বা عقل এর কাজ । [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ । তাই কখনও বোধশক্তিকেও 'কলব' (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন ﴿لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ﴾ আয়াতে কলব বলে عقل বা বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ।

(১) এর অর্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জিবরাঈলকে দ্বিতীয়বারের মত তার আসল আকৃতিতে দেখা । [বুখারীঃ ৩২৩৪, মুসলিম:১৭৪] দ্বিতীয়বারের এই দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মে'রাজের রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন । এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় । অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ । মুন্তাহা শব্দের অর্থ শেষপ্রান্ত । সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত । মুসলিমের বর্ণনায় একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে । উভয় বর্ণনার সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা । তাই একে মুন্তাহা বলা হয় । [ইবন কাসীর; কুরতুবী; আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর,ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয় । যমীন থেকে আসমানগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় । [মুসলিম:১৭৩, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৮৭, ৪২২]

(২) المأوى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল । জান্নাতকে مأوى বলার কারণ এই যে, এটাই মুমিনদের আসল ঠিকানা । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

১৬. যখন কুল গাছটিকে যা আচ্ছাদিত করার তা আচ্ছাদিত করেছিল(১), إِذۡ يَغۡشَى ٱلسِّدۡرَةَ مَا يَغۡشَىٰ ١٦

১৭. তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি(২) । مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧

১৮. অবশ্যই তিনি তার রবের মহান নিদর্শনাবলীর কিছু দেখেছিলেন; لَقَدۡ رَأَىٰ مِنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلۡكُبۡرَىٰٓ ١٨

১৯. অতএব, তোমরা আমাকে জানাও ‘লাত’ ও ‘উয্‌যা’ সম্পর্কে أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্পর্কে(৩)? وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ٢٠

---

(১) অর্থাৎ যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল ।[মুসলিম: ১৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৮৭,৪২২] মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল । [কুরতুবী]

(২) زاغ শব্দটি زيغ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপথগামী হওয়া । আর طغى শব্দটি طغيان থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা । উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি ।
তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন শুধু যে জিবরাঈলকে দেখেছেন তাও নয় । জিবরাইল ছাড়াও তিনি জান্নাত দেখেছেন, সিদরাতুল মুন্তাহা দেখেছেন, সেখানে যা পতিত হচ্ছিল তাও দেখেছেন, আল্লাহ্‌র অন্যান্য নিদর্শনাবলী দেখেছেন । মোটকথা: আল্লাহ্ তাকে যা দেখাতে চেয়েছেন তিনি তা স্পষ্টভাবে দেখেছেন । এর বাইরে দেখতে চাননি । এটা মূলত: আল্লাহ্‌র রাসূলের একটি গুণ যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথের বাইরে একটুও যাননি । [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমরা তো তাকে গোমরাহী ও কুপথগামিতা বলে আখ্যায়িত করছো । অথচ এ জ্ঞান তাকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে । আর আল্লাহ তা‘আলা তাকে চাক্ষুষভাবে এমন সব সত্য ও বাস্তবতা দেখিয়েছেন যার সাক্ষ্য তিনি তোমাদের সামনে পেশ করছেন । এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মুশরিক আরবদের তিনজন দেবীর কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যাদেরকে মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং হিজাজের আশে পাশের লোক জন বেশী বেশী পূজা করত । এ তিনজন দেবীর মধ্যে (লাত) এর

২১. তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান?

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ۝٢١

২২. এ রকম বন্টন তো অসঙ্গত[১]।

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ۝٢٢

আস্তানা ছিল তায়েফে। বনী সাকীফ গোত্র তার পুজারী ছিল। লাত শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে জারীর তাবারীর জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ হচ্ছে এ শব্দটি আল্লাহ্ শব্দের স্ত্রীলিংগ। এর অর্থ ঘুরা বা কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া। মুশরিকরা যেহেতু ইবাদাতের জন্য তার প্রতি মনযোগী হতো, তার সামনে ঝুঁকতো এবং তার তাওয়াফ করতো তাই তাকে 'লাত' আখ্যা দেয়া শুরু হলো। এর আরেক অর্থ মন্থন করা বা লেপন করা। ইবনে আব্বাস বলেন যে, "মুলত সে ছিল একজন মানুষ, যে তায়েফের সন্নিকটে এক কঙ্করময় ভুমিতে বাস করতো এবং হজের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের ছাতু ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়াতো।" [বুখারী: ৪৮৫৯] সে মারা গেলে লোকেরা ঐ কঙ্করময় ভূমিতে তার নামে একটা আস্তানা গড়ে তোলে এবং তার উপাসনা করতে শুরু করে। (উয্‌যা) শব্দটির উৎপত্তি 'আযীয' শব্দ থেকে। এর অর্থ সম্মানিতা। এটা ছিল কুরাইশদের বিশেষ দেবী। এর আস্তানা ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী "নাখলা" উপত্যকায়। বনী হাশেমের মিত্র বনী শায়বান গোত্রের লোক এর প্রতিবেশী ছিল। কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন এর যিয়ারতের জন্য আসতো, এর উদ্দেশ্যে মানত করতো এবং বলি দান করতো। কা'বার মত এ স্থানটিতেও কুরবানী বা বলির জন্তু নিয়ে যাওয়া হতো এবং এটিকে সমস্ত মূর্তির চেয়ে অধিক সম্মান দেয়া হতো। (মানাত) এর আস্তানা ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝে লোহিত সাগরের তীরবর্তী কুদাইদের মুশাল্লাল নামক স্থানে। বিশেষ করে খুযা'আ, আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা এর খুব ভক্ত ছিল। তার হজ ও তাওয়াফ করা হতো এবং তার উদ্দেশ্যে মানতের বলি দেয়া হতো। হজের মওসূমে হাজীরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং আরাফাতে ও মিনায় অবস্থানের পর সেখান থেকে মানাতের যিয়ারত তথা দর্শনলাভের জন্য লাব্বায়কা লাব্বায়কা ধ্বনি দিতে শুরু করতো। যারা এ দ্বিতীয় হজ্জের নিয়ত করতো তারা সাফা এবং মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতো না। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৬১] [ফাতহুল কাদীর; তাবারী, কুরতুবী;ইবন কাসীর]

(১) ضيزى শব্দটি ضوز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা, অসংগত কিছু করা। অনেক মুফাসসির এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বণ্টন। অর্থাৎ এসব দেবীদেরকে তোমরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে ধরে নিয়েছো। [কুরতুবী , ফাতহুল কাদীর]এ অর্থহীন আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয়ার সময় তোমরা আদৌ এ চিন্তা করনি যে, মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমানকর ও লজ্জাকর মনে করে থাক। তোমরা চাও যেন তোমরা পুত্র সন্তান লাভ কর। কিন্তু যখন আল্লাহর সন্তান আছে বলে ধরে নাও, তখন তাঁর জন্য কন্যা সন্তান বরাদ্দ কর। এটা কি নিপীড়নমূলক বণ্টন নয়? [মুয়াসসার]

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

২৩. এগুলো কিছু নাম মাত্র যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াত এসেছে(১)।

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

২৪. মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়?

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

২৫. বস্তুতঃ আখেরাত ও দুনিয়া আল্লাহ্‌রই।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশ্‌তা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহ্‌র অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ ﴿٢٧﴾

২৭. নিশ্চয় যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ফিরিশ্‌তাদেরকে(২);

---

(১) অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ এসব পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারপর এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সত্যিকার অর্থে বিশ্ব-জাহানের প্রভুত্ব ও ইবাদাত কার প্রাপ্য তা জানিয়ে দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তাদের একটি নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে, তারা ফেরেশতাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ পর্যন্ত করার সামর্থ ও সাহস রাখে না। তাছাড়া আরো নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে এই যে, তারা তাদেরকে নারী বলে মনে করে এবং আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করে। এসব অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। তারা যদি আখেরাতে বিশ্বাস করতো তাহলে এ ধরনের দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলতে পারত না। [ফাতহুল কাদীর]

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে; আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনই কাজে আসে না[১]।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২৯. অতএব আপনি তাকে উপেক্ষা করে চলুন যে আমাদের স্মরণ[২] থেকে বিমুখ হয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে ।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩০. এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা। নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

৩১. আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ

৩২. যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে, ছোটখাট অপরাধ ব্যতীত[৩]। নিশ্চয় আপনার রবের

---

(১) অর্থাৎ ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এবং আল্লাহর কন্যা এ বিশ্বাসটি তারা জ্ঞান অর্জনের কোন একটি মাধ্যম ছাড়া জানতে পেরেছে বলে অবলম্বন করেনি। বরং নিজেদের অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়টা স্থির করে নিয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই এ সমস্ত আস্তানা গড়ে নিয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে 'যিক্‌র' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরআন, ঈমান, আখিরাত কিংবা ইবাদত হতে পারে। [ফাতহুলকাদীর,আইসারুত তাফাসীর]

(৩) এতে اللمم শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম

مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْٓا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾

ক্ষমা অপরিসীম; তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত---যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন তার সম্পর্কে যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে[১]।

হচ্ছে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না। اللَّمَم শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাট গোনাহ। সূরা আন-নিসার ৩১ নং আয়াতে একে سيئات বলা হয়েছে। এই উক্তি ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে ইবনে-কাসীর বর্ণনা করেছেন। (দুই) এর অর্থ সেসব গোনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত চিরতরে বর্জন করা হয়।[ইবন কাসীর] এই উক্তিও ইবনে-কাসীর প্রথমে মুজাহিদ থেকে এবং পরে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন।[দেখুন, বুখারী: ৬৬১২]

(১) أجنة শব্দটি جنين এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ।[কুরতুবী] আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবি করো না। কারণ, আল্লাহ্-ই ভাল জানেন কে কতটুকু মুত্তাকী"। শ্রেষ্ঠত্ব তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল, বাহ্যিক কাজ-কর্মের ওপর নয়। তাকওয়াও তা-ই ধর্তব্য যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে। যয়নব বিনতে আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর পিতামাতা তার নাম রেখেছিলেন 'বাররা' যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে সৎ হওয়ার দাবি রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়।[মুসলিম: ১৮, ১৯]। অনরূপভাবে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেনঃ তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে এ কথা বলে করঃ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আল্লাহ্‌ভীরু। সে আল্লাহর কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না।[বুখারী: ২৬৬২, মুসলিম: ৬৫, মুসনাদে আহমাদ:৫/৪১,৪৫] এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একটি বর্ণনা এসেছে, সাবেত ইবনুল হারিস আনসারী বলেন, ইয়াহূদীদের কোন সন্তান ছোট অবস্থায় মারা গেলে তারা তাকে বলত, সে সিদ্দীকীনের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন, ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলেছে। কোন সন্তান তার মায়ের পেটে থাকতেই তার সৌভাগ্যবান হওয়া বা দুর্ভাগা হওয়া লিখে নেয়া

তৃতীয় রুকূ'

৩৩. আপনি কি দেখেছেন সে ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়;

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়[১]?

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৫. তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে?

أَعِندَهُۥ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৬. নাকি তাকে জানানো হয়নি যা আছে মূসার সহীফায়,

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৭. এবং ইব্‌রাহীমের সহীফায়[২], যিনি পূর্ণ করেছিলেন (তার অঙ্গীকার)[৩]?

وَإِبْرَٰهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾

হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [মু'জামুল কাবীর লিত তাবরানী: ২/৮১,৮২ হাদীস নং ১৩৬৮]

(১) أكدى শব্দটি كدية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে أكدى এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়,অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। [মুয়াসসার]

(২) মূসা আলাইহিস্ সালামের সহীফা বলতে তাওরাতকে বোঝানো হয়েছে, কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার দু'টি স্থানে ইব্রাহীমের সহীফার শিক্ষাসমূহের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তার একটি স্থান হলো এটি এবং অপর স্থানটি হলো সূরা আল-আ'লার শেষ কয়েকটি আয়াত। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পূর্বে ইসলামের ত্রিশ অংশের পূর্ণ বাস্তবায়ন কেউ করতে পারেনি, এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, 'আর ইবরাহীম যিনি পূর্ণ করেছেন।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৭০] রেসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ বলেনঃ হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্যে চার রাকআত সালাত পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।" [তিরমিযী:৪৭৫]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

৩৮. তা এই যে[১], কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে[২],

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই দেখা যাবে ---

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৪১. তারপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

৪২. আর এই যে, সবার শেষ গন্তব্য তো আপনার রবের কাছে[৩],

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান[৪],

---

(১) এ আয়াত থেকে তিনটি বড় মূলনীতি পাওয়া যায়। কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না। [দেখুন, মুয়াসসার] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ [সূরা ফাতির:১৮] অর্থাৎ কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি যা পরিণতি ভোগ করবে তা তার কৃতকর্মেরই ফল। চেষ্টা সাধনা ছাড়া কেউ-ই কিছু লাভ করতে পারে না। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষ যখন মরে যায় তখন তিনটি কর্ম ব্যতীত আর কোন কাজ তার জন্য বাকী থাকে না। সাদকায়ে জারিয়া বা উপকৃত হওয়ার মত জ্ঞান অথবা এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে"। [মুসলিম: ১৬৩১]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(৪) অর্থাৎ কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষে থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

৪৪. আর এই যে, তিনিই মারেন এবং তিনিই বাঁচান,

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝

৪৫. আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল---পুরুষ ও নারী

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

৪৬. শুক্রবিন্দু হতে, যখন তা স্খলিত হয়,

مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝

৪৭. আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই[১],

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝

৪৮. আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন[২],

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ۝

৪৯. আর এই যে, তিনি শি'রা নক্ষত্রের রব[৩]।

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ۝

৫০. আর এই যে, তিনিই প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন,

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَا ۨالْاُوْلٰى ۝

৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও[৪]; অতঃপর

وَثَمُوْدَاۡ فَمَآ اَبْقٰى ۝

(১) অর্থাৎ যিনি মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয়। সেদিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। [ইবন কাসীর]

(২) غناء শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং أغنى শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। أقنى শব্দটি قنية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন; যাতে সে তা সংরক্ষিত করে। [মুয়াসসার]

(৩) شعرى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি। [কুরতুবী]

(৪) 'আদ' জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দুটি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হূদ আলাইহিস্ সালাম-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আযাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কওমে-নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ছামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি সালেহ আলাইহিস্ সালাম-কে

কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি---

৫২. আর এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কেও, নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত যালিম ও চরম অবাধ্য।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর তিনি উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করেছিলেন,(১)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾

৫৪. অতঃপর সেটাকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার(২)!

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

৫৫. সুতরাং (হে মানুষ!) তুমি তোমার রবের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে(৩)?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

৫৬. এ নবীও(৪) অতীতের সতর্ককারীদের মতই এক সতর্ককারী।

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আযাব আসে। ফলে তারা হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। [কুরতুবী]

(১) مؤتفكة এর অর্থ, উল্টোকৃত। লূত আলাইহিস্ সালাম তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেয়ার পর। তাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। [কুরতুবী]।

(৩) تمارى শব্দের এক অর্থ, সন্দেহ পোষণ করা। আরেক অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। [তাবারী]

(৪) هذا শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা হয়েছে। অর্থাৎ ইনি অথবা এই কুরআনও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্য সংবলিত নির্দেশাবলি নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান। তাছাড়া এর দ্বারা তৃতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে, তা হচ্ছে, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের পরিণতি যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তোমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী। [কুরতুবী]

৫৭. কিয়ামত আসন্ন[১], أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾

৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া কেউই এটা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

৫৯. তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ! أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. আর হাসি-ঠাট্টা করছ! এবং কাঁদছো না[২]? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾

৬১. আর তোমরা উদাসীন[৩], وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾

৬২. অতএব আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা কর এবং তাঁর 'ইবাদাত কর[৪]। فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

---

(১) আয়াতের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়, নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার]। এখানে নিকটে আগমনকারী বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। [কুরতুবী]

(২) ﴿هَٰذَا الْحَدِيثِ﴾ বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, কুরআন স্বয়ং তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যেও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না? [মুয়াসসার]

(৩) سمود এর আভিধানিক অর্থ উদাসিনতা, গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এস্থলে এই অর্থও হতে পারে। মক্কার কাফেররা কুরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করতে ও মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য জোরে জোরে গান বাদ্য শুরু করতো। এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। কাতাদা এর অর্থ করেছেন غَافِلُونَ বা উদাসীন। আর সায়ীদ ইবনে জুবাইর অর্থ করেছেন مُعْرِضُونَ বা বিমুখ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৪) এসব আয়াতের দাবি এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সেজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। [মুয়াসসার] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাজমের এই আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা করলেন এবং তার সাথে সব মুসলিম, মুশরিক, জিন ও মানব সেজদা করল। [বুখারী:৪৮৬২] অপর এক হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নজম পাঠ করত তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করলে তার সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সেজদা করল, একজন কোরাইশী

বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্ঠি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বললঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। [বুখারীঃ ১০৬৭, ১০৭০, মুসলিম:৫৭৬] আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। সে ছিল উমাইয়া ইবনে খালাফ। [বুখারীঃ ৪৮৬৩]।

৫৪- সূরা আল-কামার
৫৫ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْقَمَرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে[১], আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে[২],

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

(১) পূর্ববর্তী সুরা আন-নাজমে ৫৭ ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ বলে শুরু করা হয়েছে। [কুরতুবী] কেয়ামতের বিপুলসংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এক হাদীসে তিনি বলেন, আমার আগমন ও কেয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। [বুখারী:৪৯৩৬, ৬৫০৩, মুসলিম:২৯৫০, মুসনাদে আহমাদ:৫/৩৩৮] আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

(২) এখানে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযায় আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযা হিসাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া কেয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়াও এই মু'জিযাটি আরও এক দিক দিয়ে কেয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহর কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কেয়ামতে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তার রেসালাতের সপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ করেন। এই মু'জিযার প্রমাণ কুরআন পাকের এই আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ এ কথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মু'জিযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী ও ইবনে কাসীর এই মু'জিযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মু'জিযার বাস্তবতা অকাট্য রূপে প্রমাণিত। যা অস্বীকার করা সুস্পষ্ট কুফরী। [দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুলকাদীর]
ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ছিলেন। তখন মুশরিকরা তার কাছে নবুওয়াতের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন

যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পুর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মু'জিযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মু'জিযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগলঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের জন্য অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল। নিম্নে এতদসংক্রান্ত বর্ণনাসমূহের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সাক্ষ্য দাও।[বুখারী:৩৮৬৯, মুসলিম:২৮০০, তিরমিযী: ৩২৮৫, মুসনাদে আহমাদ:১/৩৭৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবি সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে। [আবুদাউদ তায়ালেসী: ১/৩৮, হাদীস নং ২৯৫, বাইহাকী: দালায়েল ২/২৬৬]

জুবাইর ইবন মুতইম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলের যুগে চাঁদ ফেটে গিয়ে দু ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এর এক অংশ ছিল এ পাহাড়ের উপর অপর অংশ অন্য পাহাড়ের উপর। তখন মুশরিকরা বলল, মুহাম্মাদ আমাদেরকে জাদু করেছে। তারপর তারা আবার বলল, যদি তারা আমাদেরকে জাদু করে থাকে তবে সে তো আর দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে জাদু করতে পারবে না। [মুসনাদে আহমাদ:৪/৮১-৮২]

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেনঃ মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নবুওয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে

২. আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটা তো চিরাচরিত জাদু[১] ।'

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢

৩. আর তারা মিথ্যারোপ করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, অথচ প্রতিটি বিষয়ই শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবে[২] ।

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣

৪. আর তাদের কাছে এসেছে সংবাদসমূহ, যাতে আছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা;

وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤

৫. এটা পরিপূর্ণ হিকমত, কিন্তু ভীতিপ্রদর্শন তাদের কোন কাজে

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥

উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল। [বুখারীঃ ৩৮৬৮, মুসলিমঃ ২৮০২]
আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াতের তাফসীর করার সময় বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ঘটেছিল। চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একভাগ পাহাড়ের সামনে অপর ভাগ পাহাড়ের পিছনে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। [মুসলিমঃ ২১৫৯, তিরমিযীঃ ৩২৮৮]
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চাঁদ ফেটেছিল। [বুখারীঃ ৪৮৬৬]

(১) مُسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতদিন একের পর এক যে জাদু চালিয়ে যাচ্ছেন, নাউযুবিল্লাহ-এটিও তার একটি। দুই, এটা পাকা জাদু। অত্যন্ত নিপুণভাবে এটি দেখানো হয়েছে। তিন, অন্য সব জাদু যেভাবে অতীত হয়ে গিয়েছে এটিও সেভাবে অতীত হয়ে যাবে, এর দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব পড়বে না। এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনাআপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। [বাগভী, কুরতুবী]

(২) استقرار এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থাৎ যারা ন্যায় ও সত্যপন্থী, তারা ন্যায় ও সত্যপন্থা অনুসরণের এবং যারা বাতিল পন্থী, তারা বাতিল পন্থা অনুসরণের ফল একদিন অবশ্যই লাভ করবে। তাছাড়া যে সমস্ত নির্দেশ সংঘটিত হবার তা অবশ্যই ঘটবে এটাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না। যারা আল্লাহ্র নির্দেশ মানবে তারা জান্নাতে যাওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি যারা মিথ্যাচার করবে এবং অমান্য করবে তাদের শাস্তিও অবধারিত। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

লাগেনি।

৬. অতএব, আপনি তাদের উপেক্ষা করুন। (স্মরণ করুন) যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝٦

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে[১] সেদিন তারা কবর হতে বের হবে, মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল,

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝٧

৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে[২]। কাফিররা বলবে, 'বড়ই কঠিন এ দিন।'

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨

৯. এদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল--- সুতরাং তারা আমাদের বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল আর বলেছিল, 'পাগল', আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল[৩]।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۝٩

---

(১) অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি অবনতে থাকবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, ভীতি ও আতঙ্ক তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। দুই, তাদের মধ্যে লজ্জা ও অপমানবোধ জাগ্রত হবে এবং চেহারায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। তিন, তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদের চোখের সামনে বিদ্যমান সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে থাকবে। তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার হুঁশও তাদের থাকবে না। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুলকাদীর]

(২) مهطع এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আরেক অর্থ, দ্রুতগতিতে ছুটা। আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) وازدجر শব্দটির অর্থ, হুমকি প্রদর্শন করা হল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ আলাইহিস্ সালাম-কে পাগলও বলল এবং তাকে হুমকি প্রদর্শন করে রেসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। [ফাতহুল কাদীর] অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ আলাইহিস্ সালাম-কে হুমকি প্রদর্শন করে বললঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব। [সূরা আস-শু'আরা:১১৬]

১০. তখন তিনি তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।'

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ﴿١٠﴾

১১. ফলে আমরা উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বারসমূহ প্রবল বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে,

فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

১২. এবং মাটি থেকে উৎসারিত করলাম ঝর্ণাসমূহ; ফলে সমস্ত পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে[১]।

وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

১৩. আর নূহকে আমরা আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেগ নির্মিত এক নৌযানে[২],

وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾

১৪. যা চলত আমাদের চোখের সামনে; এটা পুরস্কার তাঁর জন্য, যার সাথে কুফরী করা হয়েছিল।

تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

১৫. আর অবশ্যই আমরা এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে[৩]; অতএব

وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾

---

(১) অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। [কুরতুবী]

(২) ألواح শব্দটি لوح এর বহুবচন। অর্থ কাঠের তক্তা। আর دُسر শব্দটি دسار এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা এ আযাবকে শিক্ষণীয় নির্দশন বানিয়ে দিয়েছি। তবে অগ্রাধিকার যোগ্য অর্থ হচ্ছে, সে জাহাজকে শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি সুউচ্চ পর্বতের ওপরে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর গযব সম্পর্কে সাবধান করে আসছে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এ ভূ-খণ্ডে আল্লাহর নাফরমানদের জন্য কি দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল এবং ঈমান গ্রহণকারীদের কিভাবে রক্ষা করা হয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুলকাদীর]

উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

১৭. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য[১]; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾

১৮. 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড শীতল ঝড়োহাওয়া নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল দিনে,

تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

২০. তা মানুষকে উৎখাত করেছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

২১. অতএব কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

২২. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

দ্বিতীয় রুকূ'

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৩. সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল,

---

(১) ذكر এর অর্থ দ্বিবিধ (এক) মুখস্থ বা স্মরণ করা এবং (দুই) উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে মুখস্থ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। [কুরতুবী]

২৪. অতঃপর তারা বলেছিল, ‘আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হব।

فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৫. ‘আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি যিক্‌র[1] পাঠানো হয়েছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক[2]।’

أَءُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৬. আগামী কাল ওরা অবশ্যই জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য উষ্ট্রী পাঠিয়েছি, অতএব আপনি তাদের আচরণ লক্ষ্য করুন এবং ধৈর্যশীল হোন।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে।

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল, ফলে সে সেটাকে (উষ্ট্রী) ধরে হত্যা করল।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতএব কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩১. নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক বিকট আওয়াজ;

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

---

(১) এখানে যিক্‌র অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণী ও শরী‘আত। যা তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছে, أشر যার অর্থ আত্মগর্বী ও দাম্ভিক। অর্থাৎ কাফেরদের বক্তব্য হচ্ছে, এ ব্যক্তি এমন যে এর মগজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে এবং এ কারণে সে গর্ব প্রকাশ করছে। [কুরতুবী]

ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক খড়ের ন্যায়[১]।

৩২. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. লূত সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল সতর্ককারীদের প্রতি,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমরা এভাবেই তাকে পুরস্কৃত করে থাকি।

نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর অবশ্যই লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমাদের কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে; কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা[২] শুরু করল।

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর অবশ্যই তারা লূতের কাছ থেকে

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا

(১) যারা গবাদি পশু লালন পালন করে তারা পশুর খোঁয়াড়ের সংরক্ষণ ও হিফাজতের জন্য কাঠ ও গাছের ডাল পালা দিয়ে বেড়া তৈরী করে দেয়। এ বেড়ার কাঠ ও গাছ গাছালীর ডালপালা আস্তে আস্তে শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং পশুদের আসা যাওয়ায় পদদলিত হয়ে করাতের গুঁড়ার মত হয়ে যায়। সামূদ জাতির দলিত মথিত লাশসমূহকে করাতের ঐ গুড়োর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(২) আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে সন্দেহ করেছিল এবং মিথ্যারোপ করেছিল। [মুয়াসসার]

عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝٣٧

তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করল[১], তখন আমরা তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং ভীতির পরিণাম।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣٨

৩৮. আর অবশ্যই প্রত্যুষে তাদের উপর বিরামহীন শাস্তি আঘাত করেছিল।

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝٣٩

৩৯. সুতরাং 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং ভীতিপ্রদর্শনের পরিণাম।'

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝٤٠

৪০. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তৃতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝٤١

৪১. আর অবশ্যই ফির'আউন সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিল সতর্ককারী;

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٤٢

৪২. তারা আমাদের সব নিদর্শনে মিথ্যারোপ করল, সুতরাং আমরা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

---

(১) رَاوَدَ ও مُرَاوَدَةٌ শব্দের অর্থ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে কাউকে ফুসলানো। কওমে লুত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যেই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্যে লূত আলাইহিস্ সালাম-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লুত আলাইহিস্ সালাম দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত আলাইহিস্ সালাম বিব্রতবোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেনঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই আগমন করেছি।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চেয়ে ভাল? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. নাকি তারা বলে, 'আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'

سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে(১),

بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

৪৬. বরং কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময়। আর কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর(২);

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও শাস্তিতে রয়েছে(৩)।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা

---

(১) এটা একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী। অর্থাৎ কুরাইশদের সংঘবদ্ধ শক্তি, যা নিয়ে তাদের গর্ব ছিল অচিরেই মুসলিমদের কাছে পরাজিত হবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ইকরিমা বর্ণনা করেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যে সময় সূরা ক্বামারের এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে, এটা কোন সংঘবদ্ধ শক্তি যা পরাজিত হবে? কিন্তু বদর যুদ্ধে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তার পবিত্র জবান থেকে ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ উচ্চারিত হচ্ছে তখন আমি বুঝতে পারলাম এ পরাজয়ের খবরই দেয়া হয়েছিল। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৭৫]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে, খেলা-ধুলা করতাম। [বুখারী: ৪৮৭৬]

(৩) এছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয় অপরাধীরা দুনিয়াতে রয়েছে বিভ্রান্তিতে আর আখেরাতে থাকবে প্রজ্জলিত আগুনে। [বাগভী] অপর অর্থ হচ্ছে, তারা দুনিয়াতে ধ্বংস ও আখেরাতে প্রজ্জলিত আগুনে। [জালালাইন]

আস্বাদন কর ।'

৪৯. নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে[১],

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ ۝

(১) قدر বা 'কদর' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরি করা । [ফাতহুল কাদীর] এছাড়া শরী'আতের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয় । অধিকাংশ তফসীরবিদ বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, কুরাইশ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় ।[মুসলিম:২৬৫৬] তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য আকীদা-বিশ্বাস । যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের । উপরোক্ত আয়াত ও তার শানে নুযুল থেকে আমরা এর প্রমাণ পাই । তাছাড়া পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও তাকদীরের কথা এসেছে, মহান আল্লাহ বলেনঃ "আর আল্লাহর নির্দেশ ছিল সুনির্ধারিত" । [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৮] অন্যত্র বলেন, "তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তারপর নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে" । [সূরা আল-ফুরকানঃ২] সহীহ মুসলিমে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা 'হাদীসে জিবরীল' নামে বিখ্যাত, তাতে রয়েছেঃ জিবরীল আলাইহিস্‌ সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়ে বলেন যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন, তিনি বললেনঃ "আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা, আর তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান আনা" । [মুসলিম:১] অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন" । বললেনঃ "আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর" । [মুসলিম:২৬৫৩] অনুরূপভাবে তাকদীরের উপর ঈমান আনা উম্মাত তথা সাহাবা ও তাদের পরবর্তী সবার ইজ্‌মা' বা ঐক্যমতের বিষয় । সহীহ মুসলিমে ত্বাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আমি অনেক সাহাবীকে পেয়েছি যারা বলতেনঃ সব কিছু তাকদীর অনুসারে হয়' । আরো বলেনঃ আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সবকিছুই তাকদীর মোতাবেক হয়, এমনকি অপারগতা ও সক্ষমতা, অথবা বলেছেনঃ সক্ষমতা ও অপারগতা" । [মুসলিম:২৬৫৫]

তাকদীরের স্তর বা পর্যায়সমূহ চারটি; যার উপর কুরআন ও সুন্নায় অসংখ্য দলীল-প্রমাণাদি এসেছে আর আলেমগণও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন ।

প্রথম স্তরঃ অস্তিত্ব সম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, সম্ভব এবং অসম্ভব সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর

জ্ঞান থাকা এবং এ সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত থাকা। সুতরাং তিনি যা ছিল এবং যা হবে, আর যা হয় নি যদি হত তাহলে কি রকম হতো তাও জানেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ "যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন"। [সূরা আত্‌তালাকঃ ১২] সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ "তারা কি কাজ করত (জীবিত থাকলে) তা আল্লাহই ভাল জানেন"'। [বুখারী:১৩৮৪, মুসলিমঃ ২৬৫৯]

দ্বিতীয় স্তরঃ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু ঘটবে সে সব কিছু মহান আল্লাহ কর্তৃক লিখে রাখা। মহান আল্লাহ বলেনঃ "আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। এসবই এক কিতাবে আছে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নিকট সহজ। [সূরা আল- হাজ্জঃ৭০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "আমরা তো প্রত্যেক জিনিস এক স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করেছি"। [সূরা ইয়াসীনঃ১২] পূর্বে বর্ণিত 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আসের হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। [মুসলিম:২৬৫৩] তাছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে, ওলীদ ইবনে উবাদাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে অসিয়ত করতে বললে তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যখন প্রথমে কলম সৃষ্টি করলেন তখন তাকে বললেন, লিখ। তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে সে মূহূর্ত থেকে কলম তা লিখতে শুরু করেছে।' হে প্রিয় বৎস! তুমি যদি এটার উপর ঈমান না এনে মারা যাও তবে তুমি জাহান্নামে যাবে। [মুসনাদে আহমাদ:৫/৩১৭] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক্ক ইলাহ নেই এটার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে হক সহ পাঠিয়েছে। অনুরূপভাবে সে মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে। আরো ঈমান আনবে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের। আরও ঈমান আনবে তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর। [তিরমিযী: ২১৪৪]

তৃতীয় স্তরঃ আল্লাহর ইচ্ছাঃ তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "তাঁর ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তখন তাকে বলেনঃ 'হও', ফলে তা হয়ে যায়"। [সূরা ইয়াসীনঃ ৮২] মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ "সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন ইচ্ছাই করতে পার না"। [সূরা আত-তাকওয়ীরঃ ২৯] হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন একথা কখনো না বলে যে, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান আমাকে দয়া করুন, বরং দো'আ করার সময়

৫০. আর আমাদের আদেশ তো কেবল একটি কথা, চোখের পলকের

وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٞ كَلَمۡحِۭ بِٱلۡبَصَرِ ۝٥٠

দৃঢ়ভাবে কর; কেননা আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন, তাঁকে জোর করার কেউ নেই" ।[বুখারী:৬৩৩৯, মুসলিম: ২৬৭৯]

চতুর্থ স্তরঃ আল্লাহ কর্তৃক যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করা ও অস্তিত্বে আনা এবং এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা থাকা। কেননা তিনিই সে পবিত্র সত্তা যিনি সমস্ত কর্মী ও তার কর্ম, প্রত্যেক নড়াচড়াকারী ও তার নড়াচড়া, এবং যাবতীয় স্থিরিকৃত বস্তু ও তার স্থিরতার সৃষ্টিকারক। মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক" । [সূরা আয-যুমারঃ৬২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও" । [সূরা আস-সাফফাতঃ ৯৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একমাত্র আল্লাহ ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কোন বস্তু ছিলনা, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর এবং তিনি সবকিছু লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, আর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন" ।[বুখারী: ৩১৯১]

তাই তাকদীরের উপর ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ চারটি স্তরের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। যে কেউ তার সামান্যও অস্বীকার করে তাকদীরের উপর তার ঈমান পূর্ণ হবে না।

তাকদীরের উপর ঈমানের উপকারিতা: তাকদীরের উপর ঈমান যথার্থ হলে মু'মিনের জীবনের উপর তার যে বিরাট প্রভাব ও হিতকর ফলাফল অর্জিত হয়, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

কার্যোদ্ধারের জন্য কোন উপায় বা কৌশল অবলম্বন করলেও কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করবে; কেননা তিনিই যাবতীয় কৌশল ও কৌশলকারীর নিয়ন্তা। যখন বান্দা এ কথা সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, সবকিছুই আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর অনুসারেই হয় তখন তার আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক প্রসন্নতা অর্জিত হয়।

উদ্দেশ্য সাধিত হলে নিজের মন থেকে আত্মম্ভরিতা দূর করা সম্ভব হয়। কেননা আল্লাহ তার জন্য উক্ত কল্যাণ ও সফলতার উপকরণ নির্ধারণ করে দেয়ার কারণেই তার পক্ষে এ নেয়ামত অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তাই সে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হবে এবং আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করবে।

উদ্দেশ্য সাধিত না হলে বা অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে মন থেকে অশান্তি ও পেরেশানীভাব দূর করা (তাকদীরে ঈমানের কারণে) সম্ভব হয়; কেননা এটা আল্লাহর ফয়সালা আর তাঁরই তাকদীরের ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং সওয়াবের আশা করবে। [উসুলুল ঈমান ফি দাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্]

মত[১]।

৫১. আর অবশ্যই আমরা ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

৫২. আর তারা যা করেছে সবকিছুই আছে 'আমলনামায়',

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর ছোট বড় সব কিছুই লিখিত আছে[২]।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

৫৪. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতি (আল্লাহ্)র সান্নিধ্যে।

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

---

(১) অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠনের জন্য আমাকে কোন বড় প্রস্তুতি নিতে হবে না কিংবা তা সংঘটিত করতে কোন দীর্ঘ সময়ও ব্যয়িত হবে না। আমার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারী হওয়ার সময়টুকু মাত্র লাগবে। নির্দেশ জারী হওয়া মাত্রই চোখের পলকে তা সংঘটিত হয়ে যাবে।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে আয়েশা! যে সমস্ত ছোটখাট গোনাহকে তুচ্ছ মনে কর তা থেকেও বেঁচে থাক, কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এগুলোরও অন্বেষণকারী রয়েছে।" [ইবনে মাজাহ: ৪২৪৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৩১]

৫৫- সূরা আর-রাহ্‌মান[১]
৭৮ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আর-রাহমান[২],

اَلرَّحْمٰنُ ۝١

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন[৩],

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করেন। অথবা তার সামনে তেলাওয়াত করা হলো। তারা নিশ্চুপ থাকলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার কি হলো, আমি দেখতে পাচ্ছি জিনরা তোমাদের চেয়ে উত্তম উত্তর দিচ্ছে। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা কি? তিনি বললেন, যখনই ﴿فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴾ পড়ছিলাম তখনি জিনরা বলছিল 'আমরা আমাদের রবের কোন নিয়ামতকেই মিথ্যা বলি না, আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'। [তাবারী: ৩২৯২৮, বাযযার:২২৬৯]

(২) অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্। সূরাটিকে 'আর-রাহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মক্কার কাফেররা আল্লাহ তা'আলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলিমদের মুখে রহমান নাম শুনে ওরা বলাবলি করতঃ রাহ্‌মান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এখান থেকে সমগ্র সূরায় আল্লাহ তা'আলার দুনিয়া ও আখেরাতের অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা হয়েছে। প্রথমেই علّم বাক্য দিয়ে সূচনা করার উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এর রচয়িতা নন, এ শিক্ষা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তারপর ﴿عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ﴾ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কুরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম কুরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা ও নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন; যা রাজা-বাদশাহরাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী علّم ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে - এক যা শিক্ষা দেয়া হয় এবং 'দুই' যাকে শিক্ষা দেয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তার মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্টজীব এতে দাখিল রয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান, আত তাহরীর ওয়াততানওয়ীর]

৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ[১],	خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝
৪. তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাষা[২],	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝
৫. সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত হিসেবে[৩],	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

---

(১) অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছি। [সূরা আয-যারিয়াত:৫৬]
এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সেটাই হতো বিস্ময়কর ব্যাপার। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছেঃ "পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব।" [সূরা আল-লাইল:১২] আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। বাঁকা পথের সংখ্যা তো অনেক।" [সূরা আন-নাহ্‌ল:৯] অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন মূসার মুখে রিসালাতের পয়গাম শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ তোমার সেই 'রব' কে যে আমার কাছে দূত পাঠায়? জবাবে মূসা বললেনঃ "তিনিই আমার রব যিনি প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি দান করে পথ প্রদর্শন করেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ৪৭-৫০]

(২) মূল আয়াতে البيان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করা। অর্থাৎ কোন কিছু বলা এবং নিজের উদেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তোলা। বাকশক্তি এমন একটি বিশিষ্ট গুণ যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক করে দেয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বাকপদ্ধতি সবাই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যত ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [সূরা আল-বাকারাহ:৩১] আয়াতের তফসীরও।

(৩) حسبان শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। [ইরাবুল কুরআন] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حسبان শব্দটিকে حساب এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦

৬. আর তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সিজ্‌দা করছে(১),

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧

৭. আর আসমান, তিনি তাকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন দাঁড়িপাল্লা,

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨

৮. যাতে তোমরা সীমালজ্ঘন না কর দাঁড়িপাল্লায়।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩

৯. আর তোমরা ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠

১০. আর যমীন, তিনি তা স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١

১১. এতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুর গাছ যার ফল আবরণযুক্ত,

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢

১২. আর আছে খোসা বিশিষ্ট দানা(২) ও

---

(১) نجم শব্দটির পরিচিত অর্থ তারকা হলেও আরবী ভাষায় কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকেও نجم বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] আর কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকার লতা-পাতা ও বৃক্ষ, আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদা করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, সিজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সিজদা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর যদি نجم দ্বারা তারকা উদ্দেশ্য নেয়া হয় তবে অর্থ হবে, তারকা ও বৃক্ষরাজি সিজদা করছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর ,ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) حب এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভিতরে আল্লাহর কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা যায়। এর সাথে সম্ভবত আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদের বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

সুগন্ধ ফুল[১]।

১৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে[২] মিথ্যারোপ করবে[৩]?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

১৪. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে যা পোড়া মাটির মত [৪],

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

(১) ريحان এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা মাটি থেকে তোমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থাও করেছেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) মূল আয়াতে آلاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এ শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীর বিশারদগণ শব্দের অর্থ করেছেন 'নিয়ামতসমূহ' বা 'অনুগ্রহসমগ্র'। [কুরতুবী] তবে মুফাসসির ইবন যায়েদ বলেন, শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে, শক্তি ও ক্ষমতা। [ফাতহুল কাদীর] আল্লামা আবদুল হামীদ ফারাহী এ অর্থটিকে অধিক প্রাধান্য দিতেন।

(৩) আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) এখানে إنسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম আলাইহিস্ সালাম-কে বুঝানো হয়েছে। صلصال এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। [কুরতুবী] কুরআন মজীদে মানুষ সৃষ্টির যে প্রাথমিক পর্যায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য একত্রিত করে তার নিম্নোক্ত ক্রমিক বিন্যাস অবগত হওয়া যায় (১) تراب 'তুরাব' অর্থাৎ মাটি। আল্লাহ্ বলেন, ﴿كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ﴾ [সূরা আলে-ইমরান: ৫৯] (২) طين 'ত্বীন' অর্থাৎ পচা কর্দম যা মাটিতে পানি মিশিয়ে বানানো হয়। আল্লাহ্ বলেন, ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾ [সূরা আস-সাজদাহ:৭] (৩) ﴿طِينٍ لَّازِبٍ﴾ 'ত্বীন লাযেব' বা আঠালো কাদামাটি। অর্থাৎ এমন কাদা, দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে যার মধ্যে আঠা সৃষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [সূরা আস-সাফফাত: ১১] (৪) ﴿صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ 'সালসালিন মিন হামায়িন মাসনূন' যে কাদার মধ্যে গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [সূরা আল-হিজর: ২৬] (৫) ﴿صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ 'সালসালিন কাল-ফাখখার' অর্থাৎ পচা কাদা যা শুকিয়ে যাওয়ার পরে মাটির শুকনো ঢিলার মত হয়ে যায়। আলোচ্য সূরা

১৫. এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম আগুনের শিখা থেকে[১]। وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

১৬. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে? فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾

১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রব[২]। رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

আর-রাহমানের এ আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা এ পর্যায়টি উল্লেখ করে বলেন, (৬) ﴿خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ 'বাশার' মাটির এ শেষ পর্যায় থেকে যাকে বানানো হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার মধ্যে তাঁর বিশেষ রূহ ফুৎকার করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে যাকে সিজদা করানো হয়েছিল এবং তার সমজাতীয় থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন, ﴿اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۞ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ﴾ [সূরা সোয়াদ: ৭১-৭২] (৭) ﴿مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ﴾ "মিন সুলালাতিন মিন মায়িন মাহীন' তারপর পরবর্তী সময়ে নিকৃষ্ট পানির মত সংমিশ্রিত দেহ নির্যাস থেকে তার বংশ ধারা চালু করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ﴾ [সূরা আস-সাজদাহ:৮] এ কথাটি বুঝাতে অন্য স্থানসমূহে نطفة বা শুক্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(১) جان এর অর্থ জিন জাতি। مارج এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। نار অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালে যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়। আর অর্থ ধোঁয়াবিহীন শিখা। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এ কথার অর্থ হচ্ছে প্রথম মানুষকে যেভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার মাটির সত্তা অস্থি-মাংসে তৈরী জীবন্ত মানুষের আকৃতি লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে শুক্রের সাহায্যে তার বংশধারা চালু আছে। অনুরূপ প্রথম জিনকে নিছক আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার বংশধরদের থেকে পরবর্তী সময়ে জিনদের অধস্তন বংশধররা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। মানব জাতির জন্য আদমের মর্যাদা যা, জিন জাতির জন্য সেই প্রথম জিনের মর্যাদাও তাই। জীবন্ত মানুষ হয়ে যাওয়ার পর আদম এবং তার বংশ থেকে জন্ম লাভকারী মানুষের দেহের সেই মাটির সাথে যেমন কোন মিল থাকলো না জিনদের ব্যাপারটাও তাই। তাদের সত্তাও মুলত আগুনের সত্তা। কিন্তু আমরা যেমন মাটির স্তুপ নই, অনুরূপ তারাও শুধু অগ্নি শিখা নয়। [দেখুন, আদওয়াউল বায়ান]

(২) দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ শীত কালের সবচেয়ে ছোট দিন এবং গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে বড় দিনের উদয়াচল ও অস্তাচলও হতে পারে। আবার পৃথিবীর দুই

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

১৮. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয়,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

২০. কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না[১]।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

২১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২২. উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও

গোলার্ধের উদয়াচল ও অস্তাচলও হতে পারে। শীত মৌসুমের সর্বাপেক্ষা ছোট দিনে সূর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। অপর দিকে গ্রীষ্মের সর্বাপেক্ষা বড় দিনে অতি বিস্তৃত কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। প্রতি দিন এ উভয় কোণের মাঝে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে কুরআনের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ [সূরা আল-মা'আরিজ:৪০]। অনুরূপ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য উদয় হয় ঠিক সে সময় অন্য গোলার্ধে তা অস্ত যায়। এভাবেও পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচল হয়ে যায়। [ইবন কাসীর; আততাহরীর ওয়াততানওয়ীর]

(১) مرج এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেয়া। بحرين বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নিচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যেই এখানে বলা হয়েছে যে, 'উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না'। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

প্রবাল[১]।

২৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

২৪. আর সাগরে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)[২];

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

২৬. ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর[৩],

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

---

(১) لؤلؤ শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমুক্তা। যা বৃক্ষের ন্যায় শাখাময়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়- মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির স্রোতধারা প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর]

(২) جوار শব্দটি جارية এর বহুবচন। [ইরাবুল কুরআন] এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। منشئات শব্দটি نشأ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে, এখানে নৌকার পাল বুঝানো হয়েছে যা পতাকার ন্যায় উঁচু হয়। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(৩) এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরি হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে, ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ 'তাঁর চেহারা, সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।' [সূরা আল-কাসাস:৮৮] [ফাতহুলকাদীর, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

২৭. আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা[১], যিনি মহিমাময়, মহানুভব[২];

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৮. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾

২৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী[৩], তিনি প্রত্যহ

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ

(১) এখানে وجه শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা দ্বারা মহান আল্লাহ্ তায়ালার চেহারার সাথে সাথে তাঁর সত্তাকেও বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অবিনশ্বর। তাঁর চেহারাও অবিনশ্বর। তিনি ব্যতীত আর যা কিছু রয়েছে সবই ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন তফসীরবিদ ﴿وَجْهُ رَبِّكَ﴾ এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী; যা আল্লাহ তা'আলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং মানুষের সেইসব কর্ম ও অবস্থা; যা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। [দেখুন, কুরতুবী] এর সারমর্ম এই যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহর জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে, ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ﴾ [সূরা আন-নাহল:৯৬] অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

(২) অর্থাৎ সেই রব মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমাময় হওয়া সত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন। [দেখুন, ইবন কাসীর] পরবর্তী আয়াত এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে বর্ণিত ﴿ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে দো'আ করার জন্য রাসূলের হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে দো'আ করো।' [তিরমিযী:৩৫২৫]

(৩) অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। যমীনের অধিবাসীরা তাদের রিযিক,

فِىۡ شَاۡنٍ ۚ

গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত[১]।

فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৩০. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ

৩১. হে মানুষ ও জিন! আমরা অচিরেই তোমাদের (হিসাব নিকাশের) প্রতি মনোনিবেশ করব[২],

স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুখ-শান্তি, আখেরাতে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আসমানের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না; কিন্তু তারাও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের এই প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তাঁরই কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তার কাজের মধ্যে আছে কারও গোনাহ ক্ষমা করা, কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, কারো উত্থান ঘটানো আবার কারো পতন ঘটানো।" [ইবনে মাজাহ: ২০২] এটি একটি উদাহরণ, মূলত তিনি প্রতিদিন কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করছেন। কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন। অসংখ্য বস্তুকে নতুন নতুন স্টাইল, আকার-আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তাঁর পৃথিবী কখনো এক অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে না। তাঁর পরিবেশ ও অবস্থা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার স্রষ্টা তাকে প্রতিবারই একটি নতুন রূপে সজ্জিত করেন যা পূর্বের সব আকার-আকৃতি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ শান থাকে। এটাকে বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রাত্যহিক তাকদীর। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী; তাবারী]

(২) ثقلان শব্দটি ثقل এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে ثقل বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ অর্থাৎ আমি দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। [মুসনাদে আহমাদ:৪/৩৭১] আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثقلان বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। سنفرغ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। এর বিপরীত কর্মব্যস্ততা। فراغ শব্দ থেকে দুটি বিষয় বুঝা যায়- (এক) পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা

৩২. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

৩৩. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আসমানসমূহ ও যমীনের সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ছাড়া[১]।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

৩৫. তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে আগুনের শিখা ও ধূম্রপুঞ্জ[২], তখন

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا

এবং (দুই) এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। [কুরতুবী] ইবনুল আরাবী,আবু আলী আল-ফারেসী প্রমুখের মতে এখানে কর্মব্যস্ততা উদ্দেশ্য। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে জেনে নাও যে, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর প্রভুত্বাধীন এলাকা থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তোমরা যদি মনে এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাক তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে অতিক্রম করে দেখাও। এখানে আসমান ও যমীন অর্থ গোটা সৃষ্টিজগত অথবা অন্যকথায় আল্লাহর প্রভুত্ব। আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর]

(২) অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شواظ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জ نحاس বলা হয় এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। অর্থাৎ হে জিন ও মানব,

تَنْتَصِرٰنِ ۚ﴿٣٥﴾

তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

৩৬. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ﴿٣٧﴾

৩৭. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্তিম গোলাপের মত লাল চামড়ার রূপ ধারণ করবে(১);

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾

৩৮. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ﴿٣٩﴾

৩৯. অতঃপর সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জিনকে(২)!

জাহান্নাম থেকে তোমরা যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে আথবা হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামের অপরাধীদের কেউ যদি পালাতে চেষ্টা করে তাদেরকে ফেরেশ্‌তাগণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ দ্বারা ঘিরে ফেলবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(১) এখানে কিয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ মহাকাশ বা মহাবিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ বা ভারাসম্যের নীতি অবশিষ্ট না থাকা, মহাকাশের সমস্ত সৌরজগতের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া। আরো বলা হয়েছে, সে সময় আসমান লাল চামড়ার মত বর্ণধারণ করবে। অর্থাৎ সেই মহাধ্বংসের সময় যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে আসমানের দিকে তাকাবে তার মনে হবে গোটা ঊর্ধজগতে যেন আগুন লেগে গিয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ সেদিন কোন মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ এই যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ কেন করলে? কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ, অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুঠে উঠবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٠

৪০. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝٤١

৪১. অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে[১], অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে[২]।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٢

৪২. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝٤٣

৪৩. এটাই সে জাহান্নাম, যাতে অপরাধীরা মিথ্যারোপ করত,

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ۝٤٤

৪৪. তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ঘুরাঘুরি করবে[৩]।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٥

৪৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) سيما শব্দের অর্থ আলামত, চিহ্ন। অর্থাৎ সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ন হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) نواصي শব্দটি ناصية এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা একসময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেয়া হবে। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে বারবার পিপাসার্ত হওয়ার কারণে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ। দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পানির ঝর্ণার দিকে যাবে। কিন্তু সেখানে পাবে টগবগে গরম পানি যা পান করে পিপাসা মিটবে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

তৃতীয় রুকূ'

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান[১]।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾

৪৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট[২]।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾

৪৯. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ﴿٥٠﴾

৫০. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ[৩];

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

৫১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

---

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছে, সবসময় যার এ উপলব্ধি ছিল যে, আমাকে একদিন আমার রবের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের সব কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে। তাদের জন্যই রয়েছে স্পেশাল দু'টি বাগান বা উদ্যান। তারাই এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার]

(২) এখান থেকে প্রথমোক্ত জান্নাতের প্রস্রবণ দু'টির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। বলা হচ্ছে, ﴿ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ﴾ অর্থাৎ উদ্যানদ্বয় ঘন শাখাপল্লববিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশি হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়। [কুরতুবী;ইবন কাসীর]

(৩) প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ সম্পর্কে تَجْرِیٰنِ তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نَضَّاخَتٰنِ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা, প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত জান্নাত দু'টি নৈকট্যবান মুমিনদের। পক্ষান্তরে শেষোক্ত দু'টি জান্নাত সাধারণ ঈমানদারদের। [কুরতুবী]

৫২. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার[১]।

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

৫৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

৫৪. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের। আর দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

৫৬. সেসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না, যাদেরকে আগে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি[২]।

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

---

(১) এখানে প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে ﴿مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু فاكهة বলা হয়েছে। زوجان এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে - শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। অথবা, উভয় বাগানের ফলই হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্টপূর্ণ। এক বাগানে গেলে গাছের শাখা প্রশাখায় প্রচুর ফল দেখতে পাবে। অপর বাগানে গেলে সেখানকার ফলের অবস্থা সম্পূণ ভিন্ন দেখতে পাবে। অথবা, এর প্রতিটি বাগানের এক প্রকারের ফল হবে তার পরিচিত। তার সাথে সে দুনিয়াতেও পরিচিত ছিল-যদিও তা স্বাদে দুনিয়ার ফল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। আর আরেক প্রকার ফল হবে বিরল ও অভিনব জাতের-দুনিয়ায় যা সে কোন সময় কল্পনাও করতে পারেনি। [দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) طمث শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে طامث বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طمث বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) যেসব নারী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব নারী জিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٧

৫৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝٥٨

৫৮. তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٩

৫৯. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝٦٠

৬০. ইহসানের প্রতিদান ইহসান ছাড়া আর কী হতে পারে(১)?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦١

৬১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝٦٢

৬২. এ উদ্যান দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে(২)।

(দুই) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই। [কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর ,ইবন কাসীর]

(১) নৈকট্যশীলদের উদ্যানদ্বয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর বলা হয়েছে যে, ইহসান বা সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হলো, ﴿وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ﴾ আরবী ভাষায় دون শব্দটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, ব্যতীত অর্থে। দুই. কোন জিনিসের নিকটে হওয়া অর্থে বা কোন উঁচু জিনিসের তুলনায় নীচু হওয়া অর্থে। তিন, কোন জিনিসের নিকটে অর্থে। চার. কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিসের তুলনায় নিম্নমানের হওয়া অর্থে। অর্থের এ ভিন্নতার কারণে বাক্যাংশের অর্থ নির্ধারণেও ভিন্ন ভিন্ন মত এসেছে। প্রথম অর্থ অনুসারে কোন কোন মুফাসসির অর্থ করেছেন, এ দু'টি বাগান ছাড়াও প্রত্যেক জান্নাতীকে আরো দু'টি বাগান দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, আগের দু'টি জান্নাতের থেকেও আল্লাহর আরশের নিকটে তাদের জন্য আরও দু'টি জান্নাত থাকবে। তৃতীয় অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, উল্লেখিত জান্নাত দু'টির কাছেই আরও দু'টি জান্নাত থাকবে। তখন জান্নাত দু'টির কোনটিকে অপর কোনটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো হবে না। চতুর্থ সম্ভাবনা হচ্ছে, এ দু'টি বাগান ওপরে উল্লেখিত বাগান দু'টির তুলনায় অবস্থান ও মর্যাদায় নীচু মানের হবে।

৬৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۟ۙ

৬৪. ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি(১)।

مُدْهَآمَّتٰنِ ۟ۚ

অর্থাৎ পূর্বোক্ত দু'টি বাগান হয়তো উচ্চস্থানে হবে এবং এ দু'টি তার নীচে অবস্থিত হবে কিংবা প্রথমোক্ত বাগান দু'টি অতি উন্নতমানের হবে এবং তার তুলনায় এ দু'টি নিম্নমানের হবে। প্রথম তিনটি সম্ভাবনা মেনে নিলে তার অর্থ হবে, ওপরে যেসব জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে অতিরিক্ত এ দু'টি বাগানও হবে তাদেরই। আর চতুর্থ অর্থের সম্ভাবনা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে প্রথমোক্ত দু'টি বাগান উন্নতমানের আর শেষোক্ত দু'টি হবে তার চেয়ে নীচু মানের । এ হিসেবে অনেকেই প্রথম দু'টি জান্নাতকে "মুকাররাবীন" বা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের জন্য এবং পরবর্তী দু'টি জান্নাতকে "আসহাবুল ইয়ামীন"-দের জন্য বলে মত দিয়েছেন। এ অর্থের সম্ভাবনাটি যে কারণে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করছে তা হলো, প্রথমোক্ত জান্নাতে যা বলা হয়েছে শেষোক্ত জান্নাতে তার থেকে কিছু কম বর্ণনা এসেছে। বেশী দেয়ার পর কাউকে কম করে দেয়ার অর্থ হয় না। তাই এর দ্বারা দু'দল মুমিনকে দুটি ভিন্ন ধরনের জান্নাত দেয়া হবে বলাই অধিক গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া সূরা আল-ওয়াকি'আয় সৎকর্মশীল মানুষদের দু'টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি "সাবেকীন" বা অগ্রবর্তীগণ। তাদেরকে "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীও বলা হয়েছে। অপরটি "আসহাবুল ইয়ামীন"। তাদেরকে অন্যত্র "আসহাবুল মায়মানাহ" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের উভয় শ্রেণীর জন্য দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্যের জান্নাতের কথা বলা হয়েছে এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত। এ দ্বিতীয় অর্থটির সপক্ষে একটি হাদীসের ভাষ্য থেকে আমরা প্রমাণ পাই, যাতে জান্নাতের বিবরণ এসেছে, বলা হয়েছে, 'দুটি জান্নাত, যার পান, আহার ও অন্যান্য আসবাবপত্র সবই হবে রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত, যার পান, আহার ও অন্যান্য আসবাবপত্র সবই হবে স্বর্ণের। স্থায়ী জান্নাতে তাদের ও তাদের রবের দীদারের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, মহান আল্লাহ্‌র চেহারার উপর থাকবে অহংকারের চাদর।' [বুখারী: ৪৮৮০, মুসলিম: ১৮০] এ হাদীসের শেষে কোন কোন বর্ণনায় সাহাবী আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রথম দু'টি 'মুকাররাবীন'-নৈকট্য লাভকারীদের জন্য আর শেষ দু'টি জান্নাত 'আসহাবুল ইয়ামীন'দের জন্য। [ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরে সূরা আর রাহমান]

(১) ঘন সবুজের কারণে যে কালো রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادهام বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। [কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর]

৬৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾

৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾

৬৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

৬৮. সেখানে রয়েছে ফলমূল---খেজুর ও আনার।

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

৬৯. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

৭০. সে উদ্যানসমূহের মাঝে রয়েছে চরিত্রবতী, অনিন্দ্য সুন্দরীগণ[১]।

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

৭১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

৭২. তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা[২]।

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

---

(১) خيرات এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حسانٌ এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের নারীগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতে এমন একটি মুক্তার খীমা থাকবে যার অভ্যন্তরভাগ ফাঁকা থাকবে। যার আয়তন হবে ষাট মাইল। তার প্রতিটি কোণে মুমিনের যে পরিবার থাকবে অন্য কোণের লোকজন তাদের দেখতে পাবে না। মুমিনরা সেগুলোয় ঘুরাপিরা করবে। [বুখারী: ৪৮৭৯, মুসলিম: ২৮৩৮]

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

৭৪. এদেরকে এর আগে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

৭৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে[১]।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

৭৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৮. কত বরকতময় আপনার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব[২]!

---

(১) رفرف এর অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র। এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী তৈরি করা হয়। এমনকি এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্যও করা হয়। عَبْقَرِيٌّ অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) সূরা আর-রহমানে বেশির ভাগ আল্লাহ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহার সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছেঃ আল্লাহর পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তার নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায়ের পরে বসা অবস্থায় বলতেন, اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "হে আল্লাহ্ আপনি সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রদানকারী), আপনার পক্ষ থেকেই সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তা) আসে। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় মহানুভব।" [মুসলিমঃ ৫৯১, ৫৯২] কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলে বেশী বেশী করে সার্বক্ষনিক আল্লাহ্‌র কাছে চাও'। [তিরমিযীঃ ৩৫২২, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৭৭]

سُورَةُ الوَاقِعَةِ

৫৬- সূরা আল-ওয়াকি'আহ্(১)
৯৬ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①

১. যখন সংঘটিত হবে কিয়ামত(২),

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②

২. (তখন) এটার সংঘটন মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না(৩) ।

---

(১) হাদীসে এসেছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমাকে হূদ, আল-ওয়াকি'আহ, আল-মুরসিলাত, 'আম্মা ইয়াতাছাআলুনা এবং ইযাসসামছু কুওয়িরাত বৃদ্ধ করে দিয়েছে।' [তিরমিযী: ৩২৯৭] অপর হাদীসে জাবির ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'তোমরা বর্তমানে যেভাবে সালাত আদায় কর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তেমনি সালাত আদায় করতেন; তবে তিনি অনেকটা হাল্কা করতেন। তার সালাত তোমাদের সালাতের চেয়ে অধিক হাল্কা ছিল। অবশ্য তিনি ফজরের সালাতে সূরা আল-ওয়াকি'আহ্ এবং এ জাতীয় সূরা পড়তেন।' [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১০৪]

(২) الواقعة শব্দটির অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী"। এখানে الواقعة বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। ওয়াকি'আহ্ কেয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন সেটা ঘটাতে চাইবেন তখন সেটাকে রোধ করে বা সেটার আগমন ঠেকানোর কেউ থাকবে না। [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, "তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে দিন আসার আগে, যা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করার কেউ থাকবে না।" [সূরা আশ-শূরা: ৪৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "এক ব্যক্তি চাইল, সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত--- কাফিরদের জন্য, এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই।" [সূরা আল-মা'আরিজ:১-২] তাছাড়া আরও এসেছে, "তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আল-আন'আম:৭৩] আয়াতে كاذبة এর অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে, "অবশ্যম্ভাবী"। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, "যা থেকে কোন প্রত্যাবর্তন নেই"। আবার কারো কারো মতে, كاذبة শব্দটি عاقبة ও عافية এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কেয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না। [ইবন কাসীর]

৩. এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত(১); خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

৪. যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে যমীন إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا

৫. এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে পর্বতমালা, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

৬. অতঃপর তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়; فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا

৭. আর তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন দলে ---(২) وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

---

(১) "নীচুকারী ও উঁচুকারী" এর একটি অর্থ হতে পারে সেই মহা ঘটনা সব কিছু উলট-পালট করে দেবে। কেয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তা নীচে পতিত মানুষদেরকে উপরে উঠিয়ে দেবে এবং উপরের মানুষদেরকে নীচে নামিয়ে দেবে। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, সেটার সংবাদ কাছের লোকদেরকে আস্তে আসবে আর দূরের লোকদের কাছে উঁচু স্বরে আসবে। মোটকথা: সেই মহাসংবাদটি দূরের কাছের সবাই শোনতে পাবে। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের সেদিন কাউকে উঁচু জান্নাতে স্থান করে দেয়া হবে আর কাউকে নীচু জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে কাসীর বলেনঃ কেয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডানপার্শ্বে থাকবে। তারা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর ডানপার্শ্বে থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী। দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর বামপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী। তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতি আল্লাহ্‌র সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদগণ। তাদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে। [ইবন কাসীর] মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও মানুষকে এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তারপর আমরা কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমরা মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহাঅনুগ্রহ---" [সূরা ফাতির: ৩২]

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨

৮. অতঃপর ডান দিকের দল; ডান দিকের দলটি কত সৌভাগ্যবান[১]!

وَأَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۝٩

৯. এবং বাম দিকের দল; আর বাম দিকের দলটি কত হতভাগা[২]!

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠

১০. আর অগ্রবর্তিগণই তো অগ্রবর্তী[৩],

أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١

১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত---

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢

১২. নি'আমতপূর্ণ উদ্যানে;

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝١٣

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে;

---

(১) মূল আয়াতে ﴿أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ﴾ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে مَيْمَنَةٌ শব্দটি يمين শব্দ থেকে গৃহিত হতে পারে, যার অর্থ ডান হাত। অর্থাৎ যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। বা যারা ডানপাশে থাকবে। আবার يمن শব্দ থেকেও গৃহিত হতে পারে যার অর্থ শুভ লক্ষণ বা "খোশ নসীব" ও সৌভাগ্যবান। [কুরতুবী]

(২) মূল ইবারতে ﴿أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ﴾ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। مشأمة শব্দের উৎপত্তি হয়েছে شؤم থেকে। এর অর্থ, দূর্ভাগ্য, কুলক্ষণ, অশুভ লক্ষণ। আরবী ভাষায় বাঁ হাতকেও شؤمي বলা হয়। অতএব ﴿أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ﴾ অর্থ দুর্ভাগা লোক অথবা এমন লোক যারা আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং আল্লাহর দরবারে তাদেরকে বাঁ দিকে দাঁড় করানো হবে। অথবা আমলনামা বাঁ হাতে দেয়া হবে। [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে, السابقون অর্থাৎ যারা সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণতায় সবাইকে অতিক্রম করেছে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সবার আগে থেকেছে। আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সবার আগে সাড়া দিয়েছে, জিহাদের ব্যাপারে হোক কিংবা আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে হোক কিংবা জনসেবার কাজ হোক কিংবা কল্যাণের পথে দাওয়াত কিংবা সত্যের পথে দাওয়াতের কাজ হোক। মুজাহিদ বলেন, অগ্রবর্তীগণ বলে নবী-রাসূলগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-সিরীন এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে সালাত পড়েছে, তারা অগ্রবর্তীগণ। হাসান ও কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতে, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী সম্প্রদায় রয়েছে। এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে-কাসীর বলেনঃ এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। পৃথিবীতে কল্যাণের প্রসার এবং অকল্যাণের উচ্ছেদের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী এবং শ্রমদান জীবনদানের যে সুযোগই এসেছে তাতে সে-ই অগ্রগামী হয়ে কাজ করেছে। এ কারণে আখেরাতেও তাদেরকেই সবার আগে রাখা হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে(১)।

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

(১) ثلة শব্দের অর্থ দল অথবা বড় দল। আলোচ্য আয়াতসমূহে দু জায়গায় পূর্ববর্তীও পরবর্তীর বিভাগ উল্লেখিত হয়েছে - নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثلة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে। এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দু রকম উক্তি করেছেন। (এক) আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। (দুই) তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দুটি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে কুরুনে-উলা তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাদের পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ পক্ষের যুক্তির সমর্থনে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। [সা'দী] বলাবাহুল্য কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে - এটা সুদূর পরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এইঃ ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [সূরা আলে ইমরান:১১০] এবং ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৩] তাছাড়া এক হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।" [তিরমিযী:৩০০১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে - এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললামঃ নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।" [বুখারী: ৩৩৪৮, মুসলিম:২২২] অন্য হাদীসে এসেছে, জান্নাতীগণ মোট একশ বিশ কাতারে থাকবে তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে। [তিরমিযী: ২৫৪৬, ইবনে মাজাহ: ৪২৮৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৫৩, ৫/৩৪৭, ৫/৩৫৫] উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের

১৫. স্বর্ণ- ও দামী পাথর খচিত আসনে,

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾

১৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে[১]।

مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. তাদের আশেপাশে ঘুরাফিরা করবে চির- কিশোরেরা[২]

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾

পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ বর্ণনায় দুই তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, এ নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা এ উম্মতের মধ্যে কম হবার নয়।

(১) উপরোক্ত দু আয়াতে জান্নাতের আসনসমূহ কেমন হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে নৈকট্যপ্রাপ্তদের আসন কেমন হবে তার বর্ণনা এসেছে। জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ, তার বাগানসমূহে বসার জায়গা কিভাবে চিত্তাকর্ষকভাবে সাজানো হয়েছে পবিত্র কুরআনের বিভিন্নস্থানে তার বিবরণ এসেছে। এ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্বর্ণ-খচিত আসনে, ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে" অন্যত্র বলেন,"উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান, এবং বিছানা গালিচা;" [সূরা আল-গাসিয়াহ:১৩-১৬] আরও বলেন, "সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।" [সূরা আর-রাহমান:৫৪] আরও বলেন, "তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাব আয়তলোচনা হূরের সংগে;"[সূরা আত-তূর: ২০] এভাবে ঠেস লাগিয়ে বসে তারা পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে অবস্থান করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব; তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে," [সূরা আল-হিজর:৪৭] " ওরা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।" [সূরা আর-রাহমান: ৭৬, "সেখানে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!" [সূরা আল-কাহাফ: ৩১]

(২) অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হূরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খেদমতগার হবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম থাকবে।[বাইহাকী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে] এই কিশোররা খুবই সুন্দর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তার মত।[সূরা আত-তূর: ২৪] আরও বলা হয়েছে, "তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরগণ, যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।" [সূরা আল-ইনসান: ১৯] তাদের চলাফেরায়

১৮. পানপাত্র, জগ ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে[১]।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

১৯. সে সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না---[২]

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

মনে হবে যেন মুক্তা ছড়িয়ে আছে। কোন কোন লোক মনে করে থাকে যে, ছোট ছোট বাচ্চারা যারা নাবালেগ অবস্থায় মারা যাবে তারা জান্নাতের খাদেম হবে। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ; ছোট ছোট বাচ্চারা তখন পরিণত বয়সের হবে এবং জান্নাতের অধিবাসী হবে। পক্ষান্তরে এ সমস্ত খাদেমদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতেই সৃষ্টি করবেন। তাদের কাজই হবে খেদমত করা। তারা দুনিয়ার কোন অধিবাসী নয়। [ইবনে তাইমিয়্যাঃ মাজমু ফাতাওয়া ৪/২৭৯, ৪/৩১১]

(১) أَكْوَابٌ শব্দটি كُوبٌ এর বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। أَبَارِيقُ শব্দটি إِبْرِيقٌ এর বহুবচন। এর অর্থ কুজা। এ জাতীয় পাত্রে ধরার ও বের করার জায়গা থাকে। كأس এর অর্থ সুরা পানের পেয়ালা। যদি পানীয় না থাকে তখন তাকে كأس বলা হয় না। معين এর উদ্দেশ্য এই যে, এই পানীয় একটি ঝর্ণা থেকে আনা হবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর] জান্নাতের পানপাত্র, কুজা, পেয়ালা এ সবই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী হবে। নামে এক হলেও গুণাগুণে হবে আলাদা। তাদের এ সমস্ত সরঞ্জামাদি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭১] আরও বলেন, "তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে--- রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।" [সূরা আল-ইনসান: ১৫] হাদীসেও এ সমস্ত পাত্রের বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুমিনের জন্য জান্নাতে এমন একটি তাঁবু থাকবে, যা এমন একটি মুক্তা দিয়ে তৈরী হয়েছে যে মুক্তার মাঝখানে খালি করা হয়েছে। ... আর রৌপ্যের দু'টি জান্নাত থাকবে সেগুলোর পেয়ালা ও অন্যান্য প্রসাধনী সবই রৌপ্যের। অনুরূপভাবে দু'টি স্বর্ণ নির্মিত জান্নাত থাকবে, যার পেয়ালা ও অন্যান্য প্রসাধনী সবই স্বর্ণের।" [বুখারী: ৪৮৭৮, মুসলিম: ১৮০]

(২) يُصَدَّعُونَ শব্দটি صدع থেকে উদ্ভুত। অর্থ মাথা ব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরা-উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে। [ফাতহুল কাদীর কুরতুবী] আর ينزفون এর আসল অর্থ কুপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা, বা বিরক্তি বোধ করা। মহান আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের যে সমস্ত পানীয় দ্বারা সম্মানিত করবেন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সুরা। কিন্তু সেগুলো কখনো দুনিয়ার মদের মত হবে না। দুনিয়ার মদ বিবেক নষ্ট করে, মাথা ব্যথা সৃষ্টি করে, পেট ব্যথার উদ্রেক করে, শরীর অসুস্থ করে, রোগ-ব্যাধি টেনে আনে। [ফাতহুল কাদীর] মহান আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে

২০. আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে[১],

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝

ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।" [সূরা আস-সাফফাত:৪৫-৪৭] অন্য আয়াতে বলেছেন, "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্তঃ তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর।" [সূরা মুহাম্মাদ:১৫] তাছাড়া সেটা পান করে তারা জ্ঞান-হারাও হবে না। আবার পান করতে বিরক্তি বোধও হবে না। বলা হয়েছে, "তারা তাতে মাতালও হবে না" [সূরা আস-সাফফাত:৪৭] আলোচ্য সূরার আয়াতেও সে সুরার গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, "তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা, পানপাত্র, কুজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, সে সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না। [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:১৭-১৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, দুনিয়ার মদের চারটি খারাপ গুণ রয়েছে। মাতলামী, মাথাব্যথা, বমি ও পেশাব। পক্ষান্তরে জান্নাতের সুরা এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকবে। [কুরতুবী] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ জান্নাতের সুরা সম্পর্কে বলেন যে, "তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে; ওটার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:২৫-২৭]

(১) জান্নাতের ফল-মূল দুনিয়ার ফল-মূলের নামে হলেও সেগুলোর স্বাদ ও গন্ধ হবে ভিন্ন প্রকৃতির। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখনই তাদেরকে কোন ফল থেকে রিযিক দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, পূর্বেও তো আমাদের এই রিযিক দেয়া হয়েছিল, আর তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হয়েছে" [সূরা আল-বাকারাহ:২৫] সুতরাং দেখতে ও নামে এক প্রকার হলেও স্বাদ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সমস্ত ফলের গাছ বিভিন্ন ধরনের হবে। মহান আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, সে সমস্ত গাছের মধ্যে রয়েছে, আঙ্গুরের গাছ, খেজুর গাছ, রুম্মান বা বেদানা গাছ, যেমন তাতে রয়েছে, বরই ও কলা গাছ। আল্লাহ্ বলেন, "মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর" [সূরা আন-নাবা: ৩১-৩২] "সেখানে রয়েছে ফলমূল---খেজুর ও আনার।" [সূরা আর-রাহমান:৬৮] "আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ, কাঁদি ভরা কদলী গাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি, ও প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২৭-৩২] জান্নাতের বাগানে যা থাকবে তার মধ্যে কুরআন যা বর্ণনা করেছে তা খুব সামান্যই। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ্ এ সমস্ত ফলমূলকে অন্যত্র একত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার"। [সূরা আর-রাহমান:৫৩] জান্নাতের

ফল-ফলাদির প্রাচুর্যের কারণে সেখানকার অধিবাসীরা যা ইচ্ছে তা দাবী করে নিবে আর যা ইচ্ছে তা পছন্দ করবে। "সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।" [সূরা সোয়াদ:৫১] "এবং তাদের পছন্দমত ফলমূল" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২০] মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে, তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।[সূরা আল-মুরসালাত: ৪১-৪২] মোটকথা: জান্নাতে সবধরনের যাবতীয় স্বাদের ফল-ফলাদি থাকবে যা তাদের আনন্দ দিবে ও যা তাদের মন চাইবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭১] তাছাড়া জান্নাতের গাছসমূহের আরেকটি গুণ হলো যে, সেগুলো কখনো ফল-ফলাদি শূন্য হবে না। সবসময় সব ঋতুতে তাতে ফল থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপঃ তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী।"[সূরা আর-রা'দ:৩৫] আরও বলেন, "আর প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:৩৩-৩৪] এছাড়া জান্নাতের গাছসমূহ শাখা, কাণ্ডবিশিষ্ট ও বর্ধনশীল হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর যে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট" [সূরা আর-রাহমান:৪৭-৪৯] আরও বলেন, "এ উদ্যান দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? [সূরা আর-রাহমান:৬৩-৬৫] এ সমস্ত গাছের ফল-ফলাদির আরো একটি গুণ হচ্ছে এই যে, এগুলো হাতের নাগালের মধ্যেই থাকবে, যাতে জান্নাতিদের কষ্ট না হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।" [সূরা আর-রাহমান: ৫৫] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "সন্নিহিত গাছের ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।" [সূরা আল-ইনসান:১৪] এছাড়া জান্নাতের গাছের ছায়া; তা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা; মহান আল্লাহ্ বলেন, "যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব।" [সূরা আন-নিসা: ৫৬] "সম্প্রসারিত ছায়া" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:৩০] "মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে" [সূরা আল-মুরসালাত: ৪১] তাছাড়া এ সমস্ত গাছের আরও কিছু বর্ণনা রাসূলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, "জান্নাতের কোন কোন গাছ এমন হবে যে, যার নীচে দিয়ে সফরকারী তার সর্বশক্তি দিয়ে সফর করলেও তা অতিক্রম করতে একশত বছর লাগবে, তারপরও সে তা

২১. আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত নিয়ে[১]। وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ ﴿٢١﴾

২২. আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, وَحُورٌ عِينٞ ﴿٢٢﴾

২৩. যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা[২], كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ ﴿٢٣﴾

শেষ করতে পারবে না" [বুখারী:৩২৫১, মুসলিম: ২৮২৮] অন্য হাদীসে এসেছে, "জান্নাতের গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণের"। [তিরমিযী: ২৫২৫] জান্নাতের গাছ বৃদ্ধি করার উপায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইসরার রাত্রিতে আমি ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে তারপর তাদের জানাবে যে, জান্নাতের মাটি অতি উত্তম। পানি অতি মিষ্ট। আর এটা হচ্ছে গাছবিহীন ভুমি। এখানকার গাছ হলো, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার" [তিরমিযী: ৩৪৬২]

(১) অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখির গোশত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এটা এমন এক নহর যা আমাকে আল্লাহ্ জান্নাতে দান করেছেন। যার মাটি মিসকের, যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, আর যা মধু থেকেও সুমিষ্ট। সেখানে এমন এমন উঁচু ঘাড়বিশিষ্ট পাখিসমূহ পড়বে যেগুলো দেখতে উটের ঘাড়ের মত। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এগুলো তো অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে। তিনি বললেন, যারা সেগুলো খাবে তারা তাদের থেকেও আকর্ষণীয়।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৩৬, তিরমিযী: ২৫৪২, আল-মুখতারাহ: ২২৫৮]

(২) আলোচ্য আয়াতে জান্নাতের নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জান্নাতে দু ধরনের নারী থাকবে।

এক. সে সমস্ত নারী যারা দুনিয়াতে ছিল। তারা সেখানে স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো:

দুনিয়াতে যারা যাদের স্ত্রী ছিল তারা আখেরাতে তাদের স্বামীরা যদি জান্নাতে যায় তখন তারাও তাদের স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এর প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী, "স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও, এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,"[সূরা আর-রা'দ: ২৩] সুতরাং তারা জান্নাতে পরস্পর আনন্দে বসবাস করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।" [সূরা ইয়াসিন:২] আরও বলেন, "তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭০]

দুনিয়াতে যদি কোন মহিলা পরপর কয়েকজনের স্ত্রী ছিল, তারপর যদি সে সমস্ত পুরুষেরা সবাই জান্নাতে যায় এবং সবাই মহিলার জন্য সমপর্যায়ের হয়, তবে সে মহিলা তাদের মধ্যকার সর্বশেষ ব্যক্তিটির স্ত্রী হবে। কারণ মৃত্যুর কারণে তাদের পূর্বের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। স্বামীর জান্নাতে যাওয়ার কারণে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করেছে। সুতরাং মহিলা তার সর্বশেষ যে স্বামীর সাথে ঘর করা অবস্থায় মারা গেছে তার সাথে সে জান্নাতে থাকবে। এর প্রমাণ রাসূল এর বাণী; তিনি বলেন, যে মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে সে তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। [ত্বাবরানী: আল-আওসাত: ৩/২৭৫, নং ৩১৩০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৪/২৭০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আসমা বিন্‌তে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন। আসমা তার পিতা আবু বকরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, বেটি! সবর করো, কোন মহিলা যদি তার স্বামীর সাথে থাকা অবস্থায় মারা যায় তারপর দু'জনই জান্নাতে যায় তবে আল্লাহ্ তাদের দু'জনকে জান্নাতেও এক সাথে রাখবেন। (বিশেষ করে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মানুষ) [তারিখে ইবনে আসাকির, ১৯/১৯৩] অনুরূপ অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার স্ত্রীকে মৃত্যুর সময় বলেন যে, তুমি যদি আখেরাতে আমার স্ত্রী হতে চাও তবে আমার পরে আর কারো সাথে বিয়ে করবেনা। কারণ; একজন মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথেই জান্নাতে থাকবে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তাঁর নবীর স্ত্রীদেরকে নবীর পরে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। [বাইহাকী: আস-সুনানুল কুবরা: ৭/৬৯-৭০, খতিব বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ: ৯/৩২৮] অনুরূপভাবে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মৃত্যুর পরে মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি এই বলে ফেরত দিলেন যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বলেছেন যে, একজন মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথেই জান্নাতে থাকবে। আমি আবুদ্দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। [বুসীরী: ইতহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ: ৪/৩৭ নং ৩২৬৪, ইবনে হাজার: আলমাতালিবুল আলিয়া: ২/১১০]

আর যদি মহিলা কারও স্ত্রী হিসেবে সর্বশেষে ছিল না (যেমন তালাকপ্রাপ্তা ছিল), তখন সে তাদের মধ্যে যারা তার সাথে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী সুন্দর ব্যবহার করেছে তার সাথে থাকবে। অথবা তাকে যে কাউকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হবে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায় (যদিও বর্ণনাগুলো দূর্বল)। এক বর্ণনায় এসেছে, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মহিলাদের কেউ কেউ দু'টি বা তিনটি স্বামীর ঘর করেছে সে

জান্নাতে কার থাকবে? তিনি উত্তরে বললেন, যার ব্যবহার-চরিত্র সবচেয়ে ভাল। [তাবরানী: মু'জামুল কাবীর: ২৩/২২২] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এ প্রশ্নটি উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা করেছিলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তাকে এখতিয়ার দেয়া হবে যে, যাকে ইচ্ছে বাছাই করে নাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে সালামাহ! উত্তম ব্যবহার- চরিত্র দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে গেল। [তাবরানী: মু'জামুল কাবীর ২৩/৩৬৭, হাইসামী: মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৭/১১৯]
জান্নাতে কোন কুমার থাকবে না। প্রত্যেক মুমিনের দু'জন স্ত্রী থাকবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারার লাবন্য হবে পূর্নিমার রাত্রির চাঁদের চেয়েও বেশী। তারা থুথু নিক্ষেপকারী হবে না, শর্দি-কাশি সম্পন্ন হবে না, পায়খানা-পেশাব করবেনা, তাদের পেয়ালা হবে স্বর্ণের, চিরুনি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের আগরকাঠ হবে উন্নতমানের উদকাঠ, ঘাম হবে মিসক, তাদের প্রত্যেকের থাকবে দু'জন করে স্ত্রী, যাদের সৌন্দর্যের প্রমাণ এত স্পষ্ট যে, তাদের হাঁড়ের ভিতরের মজ্জা গোস্ত ভেদ করে দেখা যাবে। [বুখারী: ৩০০৬, মুসলিম: ২৮৩৪]
তবে দুনিয়াতে যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে। তারপর তারা সবাই জান্নাতে যায় তবে তারা সবাই সে লোকের স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এর প্রমাণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
আর যদি কারও স্বামী জান্নাতী না হয় তখন তাকে আল্লাহ্ যার সাথে পছন্দ করেন তার সাথে জান্নাতে থাকতে দিবেন।
জান্নাতী এ সমস্ত নারীরা তাদের দুনিয়ার অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হবে। তারা হবে সবদিক থেকে পবিত্রা। তারা হায়েয, নিফাস, থুথু, কাশি, পেশাব, পায়খানা এসব থেকে মুক্ত থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ, এবং তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫] তাছাড়া তাদের সৌন্দর্যও হবে চিত্তাকর্ষক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যদি জান্নাতী কোন মহিলা যমীনের অধিবাসীদের দিকে তাকাতো তবে আসমান ও যমীনের মাঝের অংশ আলোতে ভরপুর হয়ে যেত, সুগন্ধিতে ভরে দিত। এমনকি তার মাথাস্থিত উড়না দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তা থেকে উত্তম।" [বুখারী: ২৬৪৩, ২৭৯৬]
দুই. সে সমস্ত নারী যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বলা হয় হূর। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা তাদেরকে বড় চোখবিশিষ্টা হূরদের সাথে বিয়ে দেব" [সূরা আদ-দোখান:৫৪] কুরআন ও হাদীসে তাদের কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে:
তারা হবে অত্যন্ত শুভ্র। আর এজন্যই তাদের নাম হয়েছে, হূর। কেননা, হূর শব্দ

দ্বারা ঐ সমস্ত নারীদেরকে বোঝায় যাদের চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত ফর্সা, কোন প্রকার খাদ নেই। আর যাদের চোখের কালো অংশ একেবারে কালো। তারা হবে প্রশস্ত চোখ বিশিষ্টা। তাদের এ দু'টি গুণ আলোচ্য আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে। [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২২]

তারা হবে সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা ও সুভাষিনী। আল্লাহ্ বলেন, "মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী" [সূরা আন-নাবা:৩১-৩৩]

তারা হবে কুমারী আর তারা হবে স্বামী সোহাগিনী, মহান আল্লাহ্ বলেন, "ওদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে--ওদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা," [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ৩৫-৩৭]

তাদের দেখতে মনে হবে যেন মনি-মুক্তা; আল্লাহ্ বলেন, "সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ২৩]

তাদের দেখতে মনে হবে যেন, পরিস্কার ডিম। আল্লাহ্ বলেন, "মনে হয় যেন তারা সুরক্ষিত ডিম্ব।" [সূরা আস-সাফফাত: ৪৯]

তাদেরকে এর আগে কেউ স্পর্শ করেনি। আর তারাও আপন স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকায় না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সেসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না, যাদেরকে আগে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।" [সূরা আর-রাহমান: ৫৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তাদের সংগে থাকবে আয়তনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ।" [সূরা অস-সাফফাত: ৪৮] আরও বলা হয়েছে, "তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।" [সূরা আর রাহমান: ৭১]

তারা দেখতে মূল্যবান পাথরের মত সুন্দর ও মসৃন হবে। আল্লাহ্ বলেন, "তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।" [সূরা আর-রাহমান: ৫৭]

তাদের সৌন্দর্য এমন যে, তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সার্বিকভাবে ফুটে উঠবে। আল্লাহ্ বলেন, "সে উদ্যানসমূহের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।" [সূরা আর-রাহমান: ৭০]

জান্নাতে তারা গানও গাইবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতীদের স্ত্রীগণ (হুরগণও এতে শামিল) তারা এমন সুন্দর স্বরে গান ধরবে যা কোনদিন কেউ শুনেনি। তারা যা বলবে, "আমরা অনিন্দ সুন্দরী, সুশীলা, সন্মানিত লোকের স্ত্রী, যারা আমাদের দিকে চক্ষু শীতল করার জন্য তাকায়" তারা আরও বলবে, "আমরা চিরস্থায়ী সুতরাং আমরা কখনো মরবনা, আমরা নিরাপদ সুতরাং আমাদের ভয় নেই, আমরা স্থায়ী অধিবাসী সুতরাং আমরা চলে যাব না" [তাবরানী: মু'জামুস সাগীর: ২/৩৫, নং: ৭৩৪, আল-আওসাত:৫/১৪৯, নং ৪৯১৭, মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ১০/৪১৯]

দুনিয়াতে কোন জান্নাতী পুরুষকে কোন নারী কষ্ট দিলে জান্নাতের হুরীরা সে জন্য কষ্ট অনুভব করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন মহিলা

২৪. তাদের কাজের পুরস্কারস্বরূপ।

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য[১],

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾

২৬. 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ছাড়া।

إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا ﴿٢٦﴾

২৭. আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

২৮. তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে আছে[২] কাঁটাহীন কুলগাছ[৩],

فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

যখনই কোন জান্নাতী পুরুষকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয় তখনি তার জান্নাতী হূর স্ত্রী বলতে থাকে, "তোমার ধ্বংস হোক, তুমি তাকে কষ্ট দিও না, সে তো তোমার কাছে সাময়িক অবস্থান করছে, অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে"। [তিরমিযী: ১১৭৪, ইবনে মাজাহ: ২০১৪]
সহীহ্ হাদীসের কোথাও একজন মুমিনের জন্য কতজন হূর থাকবে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। এটা আল্লাহ্‌র রহমত ও বান্দার আমলের উপর নির্ভরশীল। তবে শহীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের জন্য নিজেদের স্ত্রী ছাড়াও সত্তরোর্ধ হূর থাকবে। [দেখুন, তিরমিযী: ১৬৬৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৩১]

(১) এটি জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের একটি। এসব নিয়ামত সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের কান সেখানে কোন অনর্থক ও বাজে কথা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ, গালি, অহংকার ও বাজে গালগপ্প বিদ্রূপ ও উপহাস, তিরস্কার ও বদনামমূলক কথাবার্তা শোনা থেকে রক্ষা পাবে। [যেমন, আল-গাশিয়াহঃ১১, মারইয়ামঃ৬২]

(২) অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের পরে তাদের কি কি নেয়ামত থাকবে তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী]

(৩) জান্নাতের নেয়ামতসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কুরআন পাক মানুষের বোধগম্য, ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। হাদীসে এসেছে, এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে একটি কষ্টদায়ক গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করিনি যে, জান্নাতে কষ্ট দায়ক কিছু থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটা কি? বেদুঈন বলল: বরই। কেননা তাতে কাঁটা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সেটা হবে কাঁটাহীন বরই গাছ। প্রতিটি কাঁটার জায়গায় একটি করে ফল থাকবে। এটা শুধু ফলই উৎপাদন করবে। ফলের সাথে বাহাত্তরটি বাহারী রং থাকবে যার এক রং অন্য রংয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৭৬]

২৯. এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ,

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝

৩০. আর সম্প্রসারিত ছায়া(১),

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝

৩১. আর সদা প্রবাহমান পানি,

وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝

৩২. ও প্রচুর ফলমূল,

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝

৩৩. যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না(২)।

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۝

৩৪. আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ(৩);

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝

৩৫. নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে(৪)---

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে এমন গাছ থাকবে যার ছায়ায় ভ্রমণকারী একশত বছর ভ্রমণ করেও শেষ করতে পারবে না।" [বুখারী: ৪৮৮১, মুসলিম: ২১৭৫]

(২) দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে- কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না। [ইবন কাসীর; বাগভী,কুরতুবী]

(৩) فرش শব্দটি فراش এর বহুবচন। অর্থ বিছানা। উচ্চস্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়ত, এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত, স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা, নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। এই অর্থ অনুযায়ী مرفوعة এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; বাগভী]

(৪) أنشأ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। هُنَّ সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فرش এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগবিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। [কুরতুবী] জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজননক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা

৩৬. অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী[১], فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝٣٦

৩৭. সোহাগিনী[২] ও সমবয়স্কা[৩], عُرُبًا اَتْرَابًا ۝٣٧

৩৮. ডানদিকের লোকদের জন্য । لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝٣٨

হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধ ছিল; জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী দূরবর্তী ও লাবণ্যময়ী করে দেয়া হবে। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয করলামঃ সে সম্পর্কে আমার খালা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসচ্ছলে বললেনঃ "জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না"। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ন হয়ে গেল। কোন কোন বর্ণনায় আছে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন। [শামায়েলে তিরমিযী: ২৪০]

(১) أبكار শব্দটি بكر এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। [আইসারুত-তাফাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে কুমারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে কেউ কখনো স্পর্শ করেনি। অথবা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। [কুরতুবী]

(২) عرب শব্দটি عروبة এর বহুবচন। অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী। আরবী ভাষায় এ শব্দটি মেয়েদের সর্বোত্তম মেয়েসুলভ গুণাবলী বুঝাতে বলা হয়। এ শব্দ দ্বারা এমন মেয়েদের বুঝানো হয় যারা কামনীয় স্বভাব ও বিনীত আচরণের অধিকারিনী, সদালাপী, নারীসুলভ আবেগ অনুভূতি সমৃদ্ধা, মনে প্রাণে স্বামীগত প্রাণ এবং স্বামীও যার প্রতি অনুরাগী। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) أتراب শব্দটি ترب এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত মেয়েদের একই বয়স হবে এবং চিরদিন সেই বয়সেরই থকবে। যুগপৎ এ দু'টি অর্থই সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এসব জান্নাতী নারী পরস্পরও সমবয়সী হবে এবং তাদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়সী বানিয়ে দেয়া হবে। [ইবন কাসীর]"জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের শরীরে কোন পশম থাকবে না। দাড়ি থাকবে না। ফর্সা শ্বেত বর্ণ হবে। কুঞ্চিত কেশ হবে। কাজল কাল চোখ হবে এবং সবার বয়স ৩৩ বছর হবে" [তিরমিযী: ২৫৪৫, মুসনাদে আহমাদ:২/২৯৫]

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৯. তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

৪০. এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে[১]।

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

৪২. তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. আর কালোবর্ণের ধূঁয়ার ছায়ায়,

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. ইতোপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকাজে।

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর তারা বলত, 'মরে অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলেও কি আমাদেরকে উঠানো হবে?

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾

---

(১) আয়াতের এক অর্থ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, أَوَّلِينَ বলে এই উম্মতেরই প্রাথমিক লোকদের বোঝানো হয়েছে। আর آخِرِينَ বলে এ উম্মতেরই পরবর্তী লোকদের বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ এ উম্মতের আসহাবুল ইয়ামীন উম্মতের প্রাথমিক লোকদের থেকে একটি বড় দল হবে। আর শেষের লোকদের থেকেও একটি বড় দল হবে। আর যদি আয়াতে أَوَّلِينَ বলে আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সময়ের লোকদের বোঝানো হয় এবং آخِرِينَ বলে এ উম্মতে মুহাম্মদীকেই বোঝানো হয়ে থাকে তবে আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মুমিন-মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। [দেখুন, কুরতুবী]

৪৮. 'এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও?'	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. বলুন, 'অবশ্যই পূর্ববর্তিরা ও পরবর্তিরা---	قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।	لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾
৫১. তারপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যারোপকারীরা!	ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. তারা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম গাছ থেকে,	لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. অতঃপর সেটা দ্বারা তারা পেট পূর্ণ করবে,	فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. তদুপরি তারা পান করবে তার উপর অতি উষ্ণ পানি---	فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾
৫৫. অতঃপর পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।	فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
৫৬. প্রতিদান দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।	هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. আমরাই[১] তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না?	نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. সেটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমরা সৃষ্টি করি[২]?	ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলত কেয়ামত সংঘটিত হওয়ায় এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) ছোট্ট এ বাক্যে মানুষের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। মানুষের

৬০. আমরা তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি[১] এবং আমাদেরকে অক্ষম করা যাবে না ---

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জান না[২] ।

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আর অবশ্যই তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না কেন[৩]?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

জন্ম পদ্ধতি তো এছাড়া আর কিছুই নয় যে, পুরুষ তার শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে দেয় মাত্র । কিন্তু ঐ শুক্রের মধ্যে কি সন্তান সৃষ্টি করার এবং নিশ্চিত রূপে মানুষের সন্তান সৃষ্টি করার যোগ্যতা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে? না আল্লাহ সৃষ্টি করেছে? এ যুক্তির সঙ্গত জওয়াব একটিই । তা হচ্ছে, মানুষ পুরোপুরি আল্লাহর সৃষ্টি । [তাবারী, আদওয়াউল-বায়ান]

(১) অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা যেমন আমার ইখতিয়ারে । তেমনি তোমাদের মৃত্যুও আমার ইখতিয়ারে । [কুরতুবী] কে মাতৃগর্ভে মারা যাবে, কে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মারা যাবে এবং কে কোন্ বয়সে উপনীত হয়ে মারা যাবে সে সিদ্ধান্ত আমিই নিয়ে থাকি । [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না । আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি । তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি । [কুরতুবী] এমনকি তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না । [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ কিভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তোমরা অবশ্যই জান । যে শুক্র দ্বারা তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে তা পিতার মেরুদণ্ড থেকে কিভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, মায়ের গর্ভাশয় যা কবরের অন্ধকার থেকে কোন অংশে কম অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না তার মধ্যে কিভাবে পর্যায়ক্রমে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়ে জীবিত মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে । [কুরতুবী] কিভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সদৃশ কোষের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে এই মন-মগজ, এই চোখ কান ও এই হাত পা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, শিল্প জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্ত করে নেয়ার মত বিস্ময়কর যোগ্যতাসমূহ দান করা হয়েছে? [দেখুন, ইবন কাসীর] এটা কি মৃতদের জীবিত করে উঠানোর চেয়ে কম অলৌকিক

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি[১]?

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝٦٣

৬৪. তোমরা কি সেটাকে অংকুরিত কর, না আমরা অংকুরিত করি?

ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ۝٦٤

৬৫. আমরা ইচ্ছে করলে এটাকে খড়-কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা;

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝٦٥

৬৬. (এই বলে) 'নিশ্চয় আমরা দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি,'

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۝٦٦

৬৭. বরং 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি ।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝٦٧

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে আমাকে জানাও[২]

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۝٦٨

ও কম বিস্ময়কর? অতএব, তা থেকে এ শিক্ষা কেন গ্রহণ করছো না যে, আল্লাহর যে অসীম শক্তিতে দিন রাত এসব আশ্চর্য বিষয়াদি সংঘটিত হচ্ছে তাঁর ক্ষমতায়ই মৃত্যুর পরের জীবন, হাশর নাশর এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মত বিষয়াদি সংঘটিত হতে পারে? [দেখুন, মুয়াসসার]

(১) মানব সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছেঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হেফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরি করেছে বলে দাবিও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুবিশাল মটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরি করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু অপার শক্তিধর আল্লাহ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক। [দেখুন, আদওয়াউল-বায়ান]

(২) অর্থাৎ শুধু তোমাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থাই নয় তোমাদের পিপাসা মেটানোর ব্যবস্থাও আমিই করেছি। তোমাদের জীবন ধারণের জন্য যে পানি খাদ্যের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা তোমরা নিজেরা কর নাই। আমিই তা সরবরাহ করে

৬৯. তোমরা কি সেটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমরা সেটা বর্ষণ করি?

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. আমরা ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত কর সে ব্যাপারে আমাকে বল---

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২. তোমরাই কি এর গাছ সৃষ্টি কর, না আমরা সৃষ্টি করি?

ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আমরা এটাকে করেছি স্মারক[১] এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু[২]।

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾

থাকি। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] আমি তোমাদেরকে শুধু অস্তিত্ব দান করেই বসে নাই। তোমাদের প্রতিপালনের এত সব ব্যবস্থাও আমি করছি যা না থাকলে তোমরা বেঁচেই থাকতে পারতে না। [আদওয়াউল-বায়ান]

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, আমরা এ আগুনকে স্মরণিকা করেছি, এ আগুন আখেরাতের আগুনকে স্বরণ করিয়ে দিবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের এ আগুন যা তোমরা জালিয়ে থাক তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। সাগর দিয়ে দু'বার এটাকে ঠাণ্ডা করা হয়েছে। যদি তা না হতো তবে তা থেকে কেউ উপকৃত হতে পারত না। [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৪৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, ৭৪৬৩, মুসনাদে হুমাইদী: ১১২৯, অনুরূপ বর্ণনা বুখারী: ৩২৬৫, মুসলিম: ২৮৪৩]

(২) উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, "আমরা এটাকে করেছি স্মারক এবং পথচারীদের জন্য উপভোগ্য"। আয়াতে مُقْوِيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মরুভূমিতে উপনীত মুসাফির বা পথচারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ক্ষুধার্ত মানুষ। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে, সেসব মানুষ যারা প্রান্তরে অবস্থান করে খাবার পাকানো, আলো পাওয়া কিংবা তা গ্রহণ করার কাজে আগুন ব্যবহার করে। সে সমস্ত মুসাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কারণ এ সমস্ত মরুচারী ও মুসাফিররা খাবারের জন্য যেমন আগুনের প্রয়োজন বোধ করে তেমনি নিজের শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্যও আগুনের প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমার শক্তি-সামর্থ্যের ফসল। সুতরাং তোমরা ভেবে দেখ কার গুণ-গান করবে। [কুরতুবী]

৭৪. কাজেই আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন[১]।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

তৃতীয় রুকূ'

৭৫. অতঃপর[২] আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের[৩],

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

৭৬. আর নিশ্চয় এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে---

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

---

(১) পূর্ববর্তী যে সমস্ত নেয়ামতের কথা উল্লেখ হলো এবং এটা স্পষ্ট হলো যে, এগুলো একমাত্র মহান আল্লাহ্ই সম্পন্ন করে থাকেন। এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। সুতরাং হে নবী! আপনি সে পবিত্র নাম নিয়ে ঘোষণা করে দিন যে, কাফের ও মুশরিকরা যেসব দোষত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা তাঁর ওপর আরোপ করে তা থেকে পবিত্র এবং কুফর ও শির্কমূলক সমস্ত আকীদা ও আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতিটি যুক্তি তর্কে যা প্রচ্ছন্ন আছে তা থেকেও মহান আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) বাক্যের শুরুতে এখানে একটি لا ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ, 'না'। কোন কোন মুফাসসির এটাকে অতিরিক্ত বলেছেন। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। পবিত্র কুরআনে অতিরিক্ত কিছু নেই। বরং এটি আরবদের একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় لا والله এরূপ বাকপদ্ধতি আরবদের নিকট সুবিদিত। এরূপ স্থলে لا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে বসে আছো ব্যাপার তা নয়। কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কসম খাওয়ার আগে এখানে لا শব্দের ব্যবহার করায় আপনা থেকেই একথা প্রকাশ পায় যে, এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে মানুষ মনগড়া কিছু কথাবার্তা বলছিলো। সেসব কথার প্রতিবাদ করার জন্যই এ কসম খাওয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। এর এক অর্থ তারকারাজি ও গ্রহসমূহের 'অবস্থানস্থল', তাদের মনযিল ও তাদের কক্ষপথসমূহ। অন্য অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়, বা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে; যেমন সূরা নজমেও وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ বলে তাই করা হয়েছে।

৭৭. নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কুরআন[১],

৭৮. যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে[২]।

৭৯. যারা সম্পূর্ণ পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না[৩]।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝٧٧

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝٧٨

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝٧٩

---

(১) কুরআনের মহা সম্মানিত গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে ঐগুলোর শপথ করার অর্থ হচ্ছে উর্ধ জগতে সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা যত সুসংবদ্ধ ও মজবুত এই বাণীও ততটাই সুসংবদ্ধ ও মজবুত। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ সুরক্ষিত বা গোপন কিতাব। একথা বলে এখানে লাওহে-মাহফুয বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ এমন লিখিত বস্তু যা গোপন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা কারো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। [কুরতুবী]

(৩) ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে-মাহফুযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لا يَمَسُّه এর সর্বনাম দ্বারা লওহে-মাহফুযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, সংরক্ষিত বা গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে-মাহফুযকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ পাক-পবিত্র লোকগণ-এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে-মাহফুয' পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। ফেরেশতাদের জন্য পবিত্র কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো মহান আল্লাহ তাদেরকে সব রকমের অপবিত্র আবেগ অনুভূতি এবং ইচ্ছা আকাংখা থেকে পবিত্র রেখেছেন। [কুরতুবী] আয়াতের এ তাফসীরটি সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য; কারণ এর সমর্থনে আমরা অন্যত্র আয়াত দেখতে পাই, যেখানে বলা হয়েছে, "ওটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র, মহান, পবিত্র লেখকদের হাতে।" [সুরা আবাসা: ১৩-১৬] এ আয়াতে 'পবিত্র' বলে ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে বলে সবাই একমত। উপরোক্ত তাফসীর অনুযায়ী কাফেররা কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আরোপ করতো এটা তার জবাব হিসেবে বিবেচিত হবে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণক আখ্যায়িত করে বলতো, জিন ও শয়তানরা তাকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এর জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে, "শয়তানরা এ বাণী নিয়ে আসেনি। এটা তাদের জন্য সাজেও না। আর তারা এটা করতেও পারে না। এ বাণী শোনার সুযোগ থেকেও তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে।" [সূরা আশ-শু'আরা: ২১০-২১২] এ বিষয়টিই এখানে এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "পবিত্র সত্তা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।"

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ এ বাক্যটি ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ বাক্যের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لا يَمَسُّه এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হবে। [কুরতুবী] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এটাকে এমন লোক, যারা 'হাদসে-আসগর' ও 'হাদসে-আকবর' থেকে পবিত্র তারা ব্যতীত কেউ যেন স্পর্শ না করে। (বে-ওযু অবস্থাকে

৮০. এটা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করছ[১]?

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২. আর তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের রিযিক করে নিয়েছ[২]!

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

'হাদসে-আসগর' বলা হয়। ওযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের কিংবা স্ত্রীসহবাসের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয এবং নেফাসের অবস্থাকে 'হাদসে-আকবর' বলা হয়।) কিন্তু আয়াত থেকে এর সপক্ষে দলীল নেয়া খুব শক্তিশালী মত নয়। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে এ মতের পক্ষে দলীল পাওয়া যায়। যেমন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন সাথে নিয়ে কাফের দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন; যাতে তা কাফেরদের হাতে না পড়ে।" [বুখারী: ২৯৯০, মুসলিম: ১৮৬৯] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনে হাযমের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, "কুরআনকে যেন পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ না করে।" [মুয়াত্তা মালেক: ১/২৯৯, মুহাদ্দিসগণ আবু বকর ইবনে হাযমের কাছে লিখা চিঠিটি বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। দেখুন, আলবানী: ইরওয়াউল গালীল, ১২২] তাছাড়া এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, 'হাদসে আকবর' অবস্থায় কোনভাবেই কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে 'হাদসে আসগর' অবস্থায় কোন কোন আলেমের মতে স্পর্শ করা জায়েয আছে। তারা এ আয়াতে বর্ণিত مُطَهَّرُوْنَ দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর উপরোক্ত প্রথম হাদীসের নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কাফেরদের হাতে পড়লে কুরআনের অবমাননার সম্ভাবনা থাকায় নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসটি তাদের নিকট বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া কোন কোন আলেম এ আয়াত থেকে তৃতীয় আরেকটি অর্থ নিয়েছেন। তাদের মতে এখানে مس শব্দ দ্বারা উপকৃত হওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআন থেকে কেবল ঐ সমস্ত লোকরাই উপকৃত হতে পারে যাদের অন্তর পবিত্র। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) আয়াতে مُدْهِنُوْنَ শব্দটি শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা, খোশামোদ ও তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করা, গুরুত্ব না দেয়া এবং যথাযোগ্য মনোযোগের উপযুক্ত মনে না করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানেও কুরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা, মিথ্যারোপ, গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্র নেয়ামতকে দেখেও তোমরা সেগুলোকে অস্বীকার করে যাচ্ছ।

৮৩. সুতরাং কেন নয়---প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়[১]

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾

৮৪. এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার কাছাকাছি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না[২]।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

তোমরা কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে কৃতঘ্ন হচ্ছ। তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করছ। তোমরা শুকরিয়া আদায়ের জায়গায় কুফরী করছ। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, যায়েদ ইবন খালেদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে হুদাইবিয়াতে ফজরের সালাত আদায় করেন। তার আগের রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। সালাত শেষ করে রাসূল মানুষের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের রব কি বলেছেন? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার আর কেউ কাফের এ দু'ভাগ হয়ে গেছে। যারা বলেছে আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে বৃষ্টি লাভ করেছি তারা আমার উপর ঈমান এনেছে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব অস্বীকার করেছে। আর যারা বলেছে আমরা ওমুক ওমুক নক্ষত্রের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বৃষ্টি লাভ করেছি তারা আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্রপুঞ্জের উপর ঈমান এনেছে। [বুখারী: ১০৩৮, মুসলিম: ৭১]

(১) অর্থাৎ যদি তোমরা নিজেদেরকে সর্বেসর্বা মনে করে থাক তবে কেন পার না তোমাদের প্রাণকে তোমাদের শরীরে রেখে দিতে? [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এমতাবস্থায়ও আমরা আমাদের ফেরেশতাদের নিয়ে তোমাদের নিকটেই থাকি। এখানে ফেরেশতাগণ বান্দার নিকটে থাকার কথা বলা হয়েছে। এ মতটিই সবচেয়ে সঠিক মত। ইবনে কাসীর এটাই গ্রহণ করেছেন। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ বলছেন যে, এর পরে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না'। কারণ, ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۝ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ "তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই রক্ষক পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার পাঠানোরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ভুল করে না। তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে তারা ফিরে আসে। দেখুন, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসেব গ্রহনে তিনিই সবচেয়ে তৎপর।" [সূরা আল-আন'আম: ৬১-৬২] সেখানে যেভাবে ফেরেশতা পাঠানোর কথা বলা হয়েছে এখানেও এটাই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর]

৮৬. অতঃপর যদি তোমরা হিসাব নিকাশ ও প্রতিফলের সম্মুখীন না হও[১],

فَلَوۡلَآ إِن كُنتُمۡ غَيۡرَ مَدِينِينَ ۝٨٦

৮৭. তবে তোমরা ওটা[২] ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

تَرۡجِعُونَهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ۝٨٧

৮৮. অতঃপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়,

فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ ۝٨٨

৮৯. তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান[৩],

فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وَجَنَّتُ نَعِيمٖ ۝٨٩

৯০. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,

وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ۝٩٠

৯১. তবে তাকে বলা হবে, তোমাকে সালাম যেহেতু তুমি ডান দিকের একজন।'

فَسَلَٰمٞ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ۝٩١

৯২. কিন্তু সে যদি হয় মিথ্যারোপকারী, বিভ্রান্তদের একজন,

وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ۝٩٢

---

(১) مَدِينِينَ শব্দের এক অর্থ, হিসাব নিকাশের অধীন। কারণ, তারা মৃত্যুর পর হিসাব দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করত। [তাবারী] অপর অর্থ, পুনরুত্থিত হওয়া। যদি তোমরা পুনরুত্থিত না হওয়ার থাক, তবে রূহ ফেরত নিয়ে আস না কেন? [তাবারী] অপর অর্থ, প্রতিফল দেয়া। অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে তোমাদের কাজের প্রতিফল না দিতে হয়, তবে তোমাদের রূহকে ফিরিয়ে নিয়ে আস না কেন? এ অর্থকে ইমাম তাবারী প্রাধান্য দিয়েছেন। কারও অধীন থাকা। অর্থাৎ যদি তোমরা কারও অধীন না থাক, কারও কর্তৃত্ব যদি তোমাদের উপর কার্যকর না থাকে, তবে তোমরা কেন তোমাদের রূহকে দেহে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হও না? [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ আত্মা কণ্ঠাগত হওয়ার পর তোমরা যখন দেখতে পাচ্ছ যে, তোমাদের সেখানে কোনও করণীয় নেই, তখন তোমাদের জন্য উচিত হবে ঈমান আনা। কিন্তু যদি তা না কর, তাহলে যুক্তির কথা হচ্ছে, তোমরা রূহটাকে ফেরৎ নিয়ে আস, যেন মৃত্যুই না আসে। কিন্তু তোমরা সেটাকে ফেরৎ আনতে সমর্থ নও। [জালালাইন; সা'দী; মুয়াসসার]

(৩) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিনের প্রাণ তো জান্নাতের গাছে পাখির আকারে থাকবে, পুনরুত্থান দিবসে তার প্রাণকে তার শরীরে ফেরৎ দেয়া পর্যন্ত এভাবেই সে থাকবে'। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৫৫, ইবনে মাজাহ: ৪২৭১, মুয়াত্তা ইমাম মালেক: ৪৯]

فَنُزُلٌ مِّنۡ حَمِيۡمٍ ۝٩٣

৯৩. তবে তার আপ্যায়ন হবে অতি উষ্ণ পানির,

وَّتَصۡلِيَةُ جَحِيۡمٍ ۝٩٤

৯৪. এবং দহন জাহান্নামের;

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الۡيَقِيۡنِ ۝٩٥

৯৫. নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য ।

فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ ۝٩٦

৯৬. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন(১) ।

---

(১) সুরার উপসংহারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন । এতে সালাতের ভিতরে ও বাইরের সব তাসবীহ দাখিল রয়েছে । খোদ সালাতকেও মাঝে মাঝে তসবীহ বলে ব্যক্ত করা হয় । এমতাবস্থায় এটা সালাতের প্রতি গুরুত্বদানেরও আদেশ হয়ে যাবে । তাসবীহ পাঠের বিভিন্ন ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যদি কেউ বলে ‘সুবহানাল্লাহিল ‘আজিম ওয়া বিহামদিহী” জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয় ।” [তিরমিযী: ৩৪৬৪, ৩৪৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “দু'টি এমন বাক্য রয়েছে যা জিহ্বার উপর হাল্কা, মীযানের পাল্লায় ভারী, রাহমানের নিকট প্রিয়, তা হচ্ছে, “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম’” । [বুখারী: ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসলিম: ২৬৯৪]

৫৭- সূরা আল-হাদীদ
২৯ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ الْحَدِيدِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে[১]। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

২. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③

৩. তিনিই প্রথম ও শেষ; প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে) আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত[৩]।

---

(১) অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। [কুরতুবী; সা'দী]

(২) আয়াতে هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ বলা হয়েছে। عزيز শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাঁর আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যাঁর অমান্যকারী কোনভাবেই তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حكيم শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যা-ই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তাঁর আদেশ নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(৩) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। [আবু দাউদঃ ৫১১০] এই আয়াতের তাফসীর এবং "আউয়াল", "আখের", "যাহের" ও "বাতেন" এ শব্দ চারটির অর্থ সম্পর্কে

هُوَالَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

৪. তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আর্‌শের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়[১]। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন---তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা[২]।

তফসীরবিদগণের বহু উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে "আউয়াল" শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। "আখের" এর অর্থ কারও কারও মতে এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। [সা'দী] যেমন ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [সূরা আল-কাসাস: ৮৮] আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। ইমাম বুখারী বলেন, 'যাহের' অর্থ জ্ঞানে তিনি সবকিছুর উপর, অনুরূপ তিনি 'বাতেন' অর্থাৎ জ্ঞানে সবকিছুর নিকটে। বিভিন্ন হাদীসে এ আয়াতের তাফসীর এসেছে, এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর সময় বলতেন, "হে আল্লাহ্‌! সাত আসমানের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব এবং সবকিছুর রব, তাওরাত, ইঞ্জীল ও ফুরকান নাযিলকারী, দানা ও আঁটি চিরে বৃক্ষের উদ্ভবকারী, আপনি ব্যতীত কোন হক্ক মা'বুদ নেই, যাদের কপাল আপনার নিয়ন্ত্রণে এমন প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আপনি অনাদি, আপনার আগে কিছু নেই, আপনি অনন্ত আপনার পরে কিছুই থাকবে না। আপনি সবকিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই, আপনি নিকটবর্তী, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কেউ নেই, আমার পক্ষ থেকে আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দিন।" [মুসলিম: ২৭১৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৪০৪]

(১) অন্য কথায় তিনি শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটি-নাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়, এক একটি ছোট পাতা ও অংকুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খাল-বিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তোমরা কোন জায়গায়ই তাঁর জ্ঞান, তাঁর অসীম ক্ষমতা, তাঁর শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার আওতা বহির্ভূত নও। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা কোন

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৬. তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭. তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৮. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন[১], যদি

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

নিভৃত কোণে যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। [ইবন কাসীর] ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'সম্যক দ্রষ্টা'। যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের বাইরে থেকেও সবকিছু দেখছেন। তাই এখানে সঙ্গে থাকার অর্থ, সৃষ্টির সাথে লেগে থাকার অর্থ নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা তাঁর দৃষ্টি ও শক্তির অধীন। তাঁর দৃষ্টি ও শক্তি তোমাদের সঙ্গে আছে। [দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়ায যানাদিকাহ: ১৫৪-১৫৮]

(১) কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ প্রতিশ্রুতি বলতে অর্থ করেছেন আল্লাহর দাসত্ব করার সে প্রতিশ্রুতি যা সৃষ্টির সূচনা পর্বে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানকে বের করে তাদের সবার নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন 'সে প্রতিশ্রুতি যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত বিবেক-বুদ্ধিতে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বর্তমান।' [কুরতুবী] কিন্তু সঠিক

তোমরা ঈমানদার হও[১]।

৯. তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑨

১০. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের মীরাস[২]

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ

কথা হলো, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সচেতন প্রতিশ্রুতি, ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানে যে ভাষায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, "আল্লাহ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতের কথা মনে কর এবং তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তার কথাও মনে কর। সে সময় তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ মনের কথাও জানেন।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৭] উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা উভয় অবস্থায় শুনি ও আনুগত্য করে যাই এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করি, ভাল কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করি, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা বলি এবং সেজন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।" [মুসলিম: ১৭০৯, মুসনাদে আহমদ: ৫/৩১৬]।

(১) অর্থাৎ যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় 'তাদেরকে তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে? জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ "তাদের ইবাদত তো আমরা কেবল এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহ্র নৈকট্যের অধিকারী করে দিবে"। [সূরা আয-যুমার:৩] অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। [দেখুন, আততাহরীর ওয়াততানভীর]

(২) ميراث অভিধানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনাআপনি

مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

তো আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে[1] ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়[2]। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ

মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে ميراث শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। [সা'দী, কুরতুবী] এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, একদিন আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বণ্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলামঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। [তিরমিযী:২৪৭০] কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, আখেরাতে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা খরচ করবে তিনি যমীন ও ঊর্ধ জগতের সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক। আজ তিনি তোমাদেরকে যা দান করে রেখেছেন তাঁর কাছে দেয়ার শুধু ঐ টুকুই ছিল না। কাল তিনি তোমাদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশী দিতে পারেন। [ইবন কাসীর] একথাটাই অন্য একটি স্থানে এভাবে বলা হয়েছে, "হে নবী, তাদের বলুন, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ কর তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরও রিযিক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।" [সূরা সাবা:৩৯]

(১) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। [তাবারী; ইবন কাসীর; জালালাইন; মুয়াসসার] তবে কারও কারও মতে, এর দ্বারা হুদায়বিয়ার যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে। [সা'দী]

(২) আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছেঃ ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করত

তাদের চেয়ে যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন[১]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. এমন কে আছে যে আল্লাহ্কে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে এটাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার[২]।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। (দুই) যারা মক্কা বিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেনঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কুরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে। [সা'দী]
শুধু মাগফিরাতই নয়; ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [সূরা আত-তাওবাহ: ১০০] বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন।

(২) এটা আল্লাহ তা'আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্জে হাসানা" (উত্তম ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

১২. সেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের সামনে ও ডানে তাদের নূর ছুটতে থাকবে[১]। বলা হবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই তো মহাসাফল্য।'

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান কর।' তারপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি[২]।

কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নাম-ধামের আকাংখা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ্য হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুইটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই এটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নূর দেয়া হবে। তাদের কারও কারও নূর হবে পাহাড়সম। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম নূরের যে অধিকারী হবে তার নূর থাকবে তার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে। যা একবার জলবে আরেকবার নিভবে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম ২/৪৭৮]

(২) অর্থাৎ সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। 'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾

১৪. মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ ।আর তোমরা প্রতীক্ষা

এ আয়াতের একটি তাফসীর আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তার বক্তব্যের কিছু অংশ পেশ করা হলঃ "অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। মুনাফিক ও কাফেরকে নূর ব্যতীত অন্ধকারেই রেখে দেয়া হবে। আর এ উদাহরণই আল্লাহ্ তাঁর কুরআনে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অথবা তাদের কাজ গভীর সাগরের তলের অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে নূর দান করেন না তার জন্য কোন নূরই নেই।" [সূরা আন-নূর:৪০] অত:পর যেভাবে অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখ দ্বারা দেখতে পায় না তেমনি কাফের ও মুনাফিক ঈমানদারের নূর দ্বারা আলোকিত হতে পারবে না। মুনাফিকরা ঈমানদারদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।' এভাবে আল্লাহ্ মুনাফিকদেরকে ধোঁকাগ্রস্থ করবেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় আর আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকা দিবেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৪২] তারপর তারা যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল সেখানে ফিরে যাবে, কিন্তু তারা কিছুই পাবেনা ফলে তারা তখন ঈমানদারদের কাছে ফিরে আসবে, ইত্যবসরে উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওটার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি। এভাবেই মুনাফিক ধোঁকাগ্রস্ত হতে থাকবে আর মুমিনদের মাঝে নূর বন্টিত হয়ে যাবে। [ইবনে কাসীর]

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে- [ইবনে কাসীর]

করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুম আসল[১]। আর মহাপ্রতারক[২] তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।'

১৫. 'সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের কাছ থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য[৩]; আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল!'

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ مَأْوٰىكُمُ النَّارُ ۚ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৬. যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার জন্য বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি[৪]? আর তারা যেন

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মৃত্যু এসে গেল এবং তোমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রতারণার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারনি। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ইসলাম বিজয় লাভ করলো আর তোমরা তামাশার মধ্যেই ডুবে রইলে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ শয়তান। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সেটিই তোমাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তো আল্লাহকে তোমাদের অভিভাবক বানাওনি যে, তিনি তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন। এখন জাহান্নাম তোমাদের অভিভাবক। সে-ই তোমাদের যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকর এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে? ﴿تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ﴾ এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। কুরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়া [সা'দী]। এটা মুমিনদের জন্যে হুশিয়ারি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা

قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿١٦﴾

তাদের মত না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল--- অতঃপর বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

اعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

১৭. জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ই যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমরা নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার[১]।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে

থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাযিল করেন। ইমাম আ'মাশ বলেনঃ মদীনায় পৌছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উপরোক্ত বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়। [মুসলিম:৩০২৭] মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলিমদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং এ কথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। [তাবারী: ২৭/২২৮]

(১) এখানে যে প্রসঙ্গে একথাটি বলা হয়েছে তা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। কুরআন মজীদে বেশ কিছু জায়গায় নবুওয়াত ও কিতাব নাযিলকে বৃষ্টির বরকতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বৃষ্টিপাত যে কল্যাণ বয়ে আনে নবুওয়াত এবং কিতাবও মানবজাতির জন্য সে একই রকমের কল্যাণ বয়ে আনে। মৃত ভূ-পৃষ্ঠে যেমন রহমতের বৃষ্টির এক বিন্দু পড়তেই শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি আল্লাহর রহমতে যে দেশে নবী প্রেরিত হন এবং অহী ও কিতাব নাযিল হওয়া শুরু হয় সেখানে মৃত মানবতা অকস্মাৎ জীবন লাভ করে। [দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

বহু গুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার ।	
১৯. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তারাই সিদ্দীক[১] ।	وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

(১) এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় । এই আয়াতের ভিত্তিতে কারও কারও মতে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ ।কিন্তু পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয় । আয়াতটি এই, ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ "আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ---যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন---তাদের সংগী হবে এবং তারা কত উত্তম সংগী!" [সূরা আন-নিসা: ৬৯] এই আয়াতে নবী-রাসূলগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ । বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী । নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না । এ কারণেই কেউ কেউ বলেনঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী ।[ইবন কাসীর; কুরতুবী] তাছাড়া কোন কোন হাদীস থেকেও এ তিন শ্রেণীর পার্থক্য ফুটে উঠে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতীরা তাদের উপরস্থিত খাস কামরায় অবস্থানকারীদের এমনভাবে দেখবে যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম থেকে ধ্রুব তারাকে আকাশের প্রান্ত দেশে চলতে দেখতে পাও; দু'দলের মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণে । সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কি নবীদের স্থান যেখানে অন্য কেউ পৌঁছতে পারবে না? তিনি বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ, যার হাতে আমার আত্মা, তারা এমন কিছু লোক যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্যায়ন করেছে ।" [বুখারী: ৩২৫৬, মুসলিম: ২৮৩১] তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোনো না কোনো দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে । কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও ইবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত । নতুবা যে সব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না । এক হাদিস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না ।" [মুসলিম: ২৫৯৮] ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কাউকে অপরের ইযযতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং তাকে খারাপ মনে কর না?

الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

আর শহীদগণ; তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও নূর[১]। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

তৃতীয় রুকূ'

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ

২০. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়[২]। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার

জনতা আরয করলঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইযযতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তার পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

(১) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যে যে মর্যাদার পুরস্কার ও যে মর্যাদার 'নূরের' উপযুক্ত হবে সে তা পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুরস্কার ও 'নূর' লাভ করবে। তাদের প্রাপ্য অংশ এখন থেকেই তাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়। পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ। لعب শব্দের অর্থ এমন খেলা, لهو এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন زينة বা অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لعب এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لهو শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত

الْغُرُوْرِ ۝

উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটোয় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়[১]।

হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে تَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ বা প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত ধারাবাহিকতায় প্রতিটি অর্থেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কুরআন পাক বলে যে, এই সবই হচ্ছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। [দেখুন, সা'দী, তাবারী]

(১) দুনিয়ায় মানুষের কর্মকাণ্ড বর্ণনার পর পবিত্র কুরআন বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে, ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾ এখানে غيث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। الكفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ الكفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। [কুরতুবী] এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলিমরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধন-রত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে কাফের আনন্দিত হয় বলা হয়েছে। এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য- আখেরাতের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ অর্থাৎ আখেরাতে মানুষ এ দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর

سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত(১), যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন(২); আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে। এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ﴾ অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ, প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর আখেরাতের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে আখেরাতের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার। অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার উপদেশাবলীতে বলেনঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমণকারী হও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, সালাতের জামাতে প্রথম তকবিরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী। তাছাড়া عرض শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না–আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। [বুখারী: ৫৬৭৩, মুসলিম:

২২. যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয়ই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি।[১] নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুব সহজ।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

২৮১৬] তাছাড়া জান্নাত যেমন একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে লাভ করা যায় তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সৌভাগ্য ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ কেবল তাঁরই অনুগ্রহে লাভ করা যায়। তিনি যাকে এ ব্যাপারে সুযোগ দিবেন তিনিই কেবল তা লাভ করতে পারে। সুতরাং তাঁর কাছেই এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক তৌফিক চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সালাতের পরে এ কথাটি স্মরণ করে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমি সালাতের পরে اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার যিক্‌র, শুকর এবং সুন্দর পদ্ধতিতে ইবাদত করার তৌফিক দিন।" [আবু দাউদঃ ১৫২২] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অসচ্ছল সাহাবীগণ এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ধনীরা উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। রাসূল বললেন, সেটা কি করে? তারা বললেন, আমরা যেমন সালাত আদায় করি তারাও তা করে, আমরা সাওম পালন করি, তারাও করে, অধিকন্তু তারা সাদাকাহ দেয় কিন্তু আমরা তা দিতে পারি না। তারা দাসমুক্ত করে আমরা তা পারি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এমন বস্তু বলে দিব না যা করলে তোমরা অন্যদের প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যাবে? কেউ তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেনা তবে যদি কেউ তোমাদের মত কাজ করে সেটা ভিন্ন কথা। তোমরা প্রতি সালাতের পরে তেত্রিশ বার করে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদ করবে। (সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়বে)। পরবর্তীতে অসচ্ছল সাহাবাগণ ফিরে এসে বললেন, আমাদের পয়সাওয়ালা ভাইরা আমরা যা করছি তা শুনে ফেলেছে এবং তারাও তা করতে আরম্ভ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন"। [বুখারীঃ ৮৪৩, মুসলিমঃ ৫৯৫]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যমীনের বুকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে জগত সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। যমীনের বুকে সংঘটিত বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

২৩. এটা এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত-অহংকারীদেরকে---[২]

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

২৪. যারা কার্পণ্য করে ও মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

২৫. অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ[৩] এবং

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ

(১) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লাওহে-মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে যাবতীয় তাকদীর নির্ধারণ করে নিয়েছেন"। [মুসলিম:২৬৫৩] এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এ জন্য দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাত সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে আখেরাতের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(২) এ আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে, বলা হয়েছে, আল্লাহ উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। [কুরতুবী]

(৩) بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; তাছাড়া এর উদ্দেশ্য মু'জিযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে; কারণ পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং بينات বলে মু'জিযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে[১]। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ[২]। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন কে গায়েব অবস্থায়ও তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ

২৬. আর অবশ্যই আমরা নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমরা তাদের বংশধরগণের

---

(১) আয়াতে কিতাবের ন্যায় মিযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মিযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন উক্তি এসেছে, কোন কোন মুফাসসির বলেন, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কারও কারও মতে, প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। তাছাড়া আয়াতে কিতাব ও মিযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা হতে পারে। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আয-যুমার: ৬] অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না–পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহফুযে লিখিত ছিল–এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকজা আবিস্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

فٰسِقُوْنَ۝

জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব[১], কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَرَهْبَانِيَّةَ ِۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ

২৭. তারপর আমরা তাদের পিছনে অনুগামী করেছিলাম আমাদের রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মার্‌ইয়াম-তনয় ‘ঈসাকে, আর তাকে আমরা দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া[২]।

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষ বিশেষ নবী-রাসূলের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর এবং পরে নবী-রাসূলগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত নবী-রাসূল ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তারা সব এদের বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নুহ আলাইহিস্ সালাম-এর সেই শাখাকে ঐ গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তারা সব ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধর। এই বিশেষ আলোচনার পর পরবর্তী নবী-রাসূলগণের পরস্পরকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরপর তাদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ রাসূল ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর উল্লেখ করেছেন যিনি শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার শরীয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঈসা আলাইহিস্ সালাম অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। এখানে ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর সাহাবী তথা হাওয়ারিগণের দু'টি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে; তা হচ্ছে, দয়া ও করুণা। এরপর তাদের আরেকটি অভ্যাস বর্ণিত হয়েছে যা তারা আবিস্কার করে নিয়েছিল। আর যা আল্লাহ্ তাদের উপর আবশ্যিক করে দেন নি। আর সেটা হচ্ছে, সন্যাসবাদ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾

আর সন্ন্যাসবাদ[১]---এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমরা তাদেরকে

---

(১) رهبانية শব্দটি رهبان এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ যে অতিশয় ভয় করে। বলা হয়ে থাকে যে, ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তারা এই প্রবণতাকে রুখে দাঁড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই। কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে দ্বীনের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তারা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হলো এবং তাদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانية তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করে। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ কাজের সমালোচনা করেছে; কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল-আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এভাবে তারা নিজেদেরকে শরীয়ত প্রবর্তকের ভুমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। যা স্পষ্টত: পথভ্রষ্টতা। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

মোটকথা: সন্যাসবাদ কখনও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মাধ্যম ছিল না। এটা এ শরীয়তেও জায়েয নেই। হাদীসে এসেছে, একবার উসমান ইবনে মাযউন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে খুব খারাপ বেশে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, আমার স্বামী সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করে আর সারাদিন সাওম পালন করে, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে প্রবেশ করলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলের কাছে এ ঘটনা বিবৃত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললেন, হে উসমান! আমাদের উপর সন্যাসবাদ লিখিত হয়নি। তুমি কি আমাকে আদর্শ মনে কর না? আল্লাহ্‌র শপথ আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর শরীয়তের সীমারেখার বেশী হেফাজতকারী। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/২২৬]

এটার বিধান দেইনি; অথচ এটাও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি[১]। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার[২] এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে[৩] এবং

---

(১) অর্থাৎ তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তাঁর হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাঁর গযব খরিদ করে নিয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

(২) এই আয়াতে ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি ঈমানদার কিতাবী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ বলে কেবল মুসলিমগণকে সম্বোধন করাই পবিত্র কুরআনের সাধারণ রীতি। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারন রীতির বিপরীতে নাসারাদের জন্য ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন ‘নূর’ দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ -সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্‌টি। আর আখেরাতে এমন ‘নূর’ দান করবেন যার মাধ্যমে পুল সিরাতের অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে। [দেখুন, কুরতুবী]

তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. এটা এজন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও ওদের কোন অধিকার নেই[১]। আর নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

(১) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত বিধানাবলী এজন্যে বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান না এনে কেবল ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি ঈমান স্থাপন করেই আল্লাহ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। [দেখুন, মুয়াসসার]

৫৮- সূরা আল-মুজাদালাহ্[১]
২২ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ المُجَادَلَة

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ①

১. আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা; যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শুনেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[২] ।

---

(১) একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু । আউস ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার তার স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবাকে বলে দিলেনঃ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম । ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হতো, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর । এই ঘটনার পর খাওলা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর শরী'আতসম্মত বিধান জানার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলেন । তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কোনো ওহি নাযিল হয়নি । তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ । খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন, আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি । এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল । আমি কোথায় যাব । আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে । এক বর্ণনায় খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছেঃ আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি । এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক বর্ণনায় আছে, খাওলা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেনঃ আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি । এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওলাকে একথা বললেনঃ তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই । সবগুলোই সঠিক হতে পারে) । এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে । [ইবনে মাজাহ:২০৬৩, মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৪৮১] ।

(২) শরী'আতের পরিভাষায় এই বিশেষ মাসআলাটিকে 'যিহার' বলা হয় । এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে যিহারের শরী'আতসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে । এতে আল্লাহ তা'আলা খাওলা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ফরিয়াদ শুনে তার জন্য তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন । তার খাতিরে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এসব আয়াত

الَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾

২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক---তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়, যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মা; তারা তো অসংগত ও অসত্য কথাই বলে(১) । আর নিশ্চয়ই

নাযিল করেছেন । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ সেই সত্তা পবিত্র, যার শোনা সবকিছুকে শামিল করে । যিনি সব আওয়ায ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলা বিনতে সা'লাবাহ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম । কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোনো কোনো কথা শুনতে পারিনি । অথচ আল্লাহ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন, ﴿قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ﴾ [বুখারীঃ ৭৩৮৫, নাসায়ীঃ ৩৪৬০] । তাই সাহাবায়ে কেরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন । একদিন খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন । পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন । কেউ কেউ বললঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন । খলিফা বললেনঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন । অতএব, আমি কি তার কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম । [ইবনে কাসীর]

(১) يُظَاهِرُوْنَ শব্দটি ظهار থেকে উদ্ভূত । আরবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলত أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ এর আভিধানিক অর্থ হলো, "তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত" জাহেলী যুগে আরবদের কাছে "যিহার" তালাক বা তার চেয়ে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হত । কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ ছিল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিন্ন করছে না বরং তাকে নিজের মায়ের মত হারাম করে নিচ্ছে । এ কারণে আরবদের মতে তালাক দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা যেত । কিন্তু "যিহার" প্রত্যাহার করার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকত না । আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে । প্রথমতঃ স্বয়ং প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করেছে । কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য । তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মা হয়ে যায় না । মা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও । কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে । দ্বিতীয়

আল্লাহ্ অধিক পাপ মোচনকারী ও বড় ক্ষমাশীল।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۗ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٣﴾

৩. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে[১], তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۗ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤﴾

৪. কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে[২]; এটা

সংস্কার এই করেছেন যে, যদি কোনো মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরী'আতে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফফারা আদায় করতে হবে। [দেখুন- ইবন কাসীর]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা يعودون শব্দের অর্থ করেছেন يندمون অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। [দেখুন-বাগভী] এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ যিহার কাফফারার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন গোনাহ, যার কাফফারা হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াত শেষে ﴿وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ﴾ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা না জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে। [দেখুন- কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ যিহাবের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা

এ জন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন । আর এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤

৫. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে[১]; আর আমরা সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি--

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

৬. সে দিন, যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাবেন অতঃপর তারা যা আমল করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন; আল্লাহ্ তা হিসেব করে রেখেছেন যদিও তারা তা ভুলে গেছে । আর আল্লাহ্ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী ।

দ্বিতীয় রুকূ'

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৭. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন

দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাবে । [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে كُبِتُوا । এর অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছিত করা, ধ্বংস করা, অভিসম্পাত দেয়া, দরবার থেকে বিতাড়িত করা, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া, অপমানিত করা । [ইবন কাসীর,বাগভী]

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦

না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন[১]। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑧

৮. আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তারপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ

(১) তবে মনে রাখতে হবে যে, সাথে থাকার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন সৃষ্টির ভিতরে বা সৃষ্টির সাথে লেগে আছেন। বরং এখানে সাথে থাকার অর্থ, জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সাথে থাকা। কারণ, আয়াতের শেষে "নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" এ কথাটি বলে তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর, তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থানে রয়েছেন। স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে লেগে আছে বা প্রবিষ্ট হয়ে আছে মনে করা শির্ক ও কুফরী। এ তাফসীরের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা-হা: ৪৬; সূরা আশ-শু'আরা: ১৫; সূরা আল-হাদীদ:৪। এ সব আয়াতের সব স্থানেই এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান তাঁর বান্দাকে পরিবেষ্টন করে আছে। তার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই। এরই নাম হচ্ছে, সাধারণভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে থাকা। তবে এর পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদের সাথে বিশেষভাবেও সাথে থাকেন। আর সে সাথে থাকা বলতে বুঝায় সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিষ্ঠা করা। যেমন সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৪; সূরা আল-আনফাল:১৯; সূরা আত-তাওবাহ: ৩৬; ১২৩; সূরা আন-নাহল: ১২৮; সূরা আল-আনকাবূত: ৬৯ ও সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫ নং আয়াত। এ সব আয়াতে 'সাথে থাকা' সাহায্য-সহযোগিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সৎ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক জানেন ও তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

করে[১]। আর তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা আপনাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন[২]?' জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল!

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝٩

৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে তখন সে গোপন পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না কর[৩]। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো। আর আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত সেখানে দুইজন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুণ্ন হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।" [মুসলিম: ২১৮৪]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবন আস বলেন, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে السَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سَامٌ শব্দের অর্থ মৃত্যু। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। ইয়াহূদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত, আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭০]

(৩) এ ব্যাপারে যে মজলিসী রীতিনীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে, "যখন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় বসা থাকবে, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনের তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন সলা পরামর্শ করা উচিত নয়। কেননা, এটা তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে।" [বুখারী: ৬২৮৮, মুসলিম: ২১৮৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৭৫]

যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

১০. গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। অতএব আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑩

১১. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন[১]। আর যখন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ

(১) বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে মুনাফিকরা মজলিস পূর্ণ করে বসে থাকত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আগন্তুকদের জন্য জায়গা করে দিতে বলতেন কিন্তু তারা নির্বিকার থাকত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদের সাবধান করে দেন। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন কাউকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে, বরং জায়গা করে দাও, আল্লাহ্ও তোমাদের জন্য তা করে দেবেন।" [বুখারী: ৬২৭০, মুসলিম: ২১৭৭] ইসলাম মজলিসের সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু শিষ্টাচার নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেমন: কেউ কারো জন্য নিজের বসার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না বরং অন্যকে জায়গা করে দিবে। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৩৮, ৪৮৩] অন্য হাদীসে এসেছে, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে অপর কাউকে বসাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। বরং তোমরা প্রশস্ত কর এবং বড় করে নাও"। [বুখারী: ২৬৭০] তাই কোন ব্যক্তি আগমন করলে তার জন্য কি দাঁড়াতে হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কারও কারও মতে, আগমনকারীর জন্য দাঁড়ানোর অনুমতি আছে। তারা তাদের মতের সপক্ষে রাসূলের হাদীস "তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি দাঁড়িয়ে যাও" [বুখারী:৩০৪৩, মুসলিম: ১৭৬৮] কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণ এটা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের দলীল হলো, রাসূলের হাদীস, "কেউ যদি এটা পছন্দ করে যে, মানুষ তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, তবে সে যেন জাহান্নামে তার অবস্থান করে

বলা হয়, 'উঠ', তখন তোমরা উঠে যাবে[1]। তোমাদের মধ্যে যারা

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

নিল" [তিরমিযী: ২৭৫৫] তারা পূর্ববর্তী হাদীসে উত্তরে বলেন, হাদীসের শব্দ হলো, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ যার অর্থ, তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতার প্রতি ধাবিত হও। এর অন্য বর্ণনায় এসেছে, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি ধাবিত হয়ে তাকে নামিয়ে নাও" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/১৪১-১৪২] এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এখানে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নেয়ার জন্যই দাঁড়াতে বলা হয়েছে। কারণ; তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন সে জন্য হাঁটতে অক্ষম ছিলেন। ফলে তাকে বাহন থেকে নামিয়ে নেয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কারো জন্য দাঁড়ানোর পক্ষে শক্তিশালী কোন প্রমাণ নেই। কোন কোন আলেম অবশ্য এ ব্যাপারে বিস্তারিত মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে, সাধারণ অবস্থায় যেভাবে মানুষ মানুষকে দাঁড়াতে বাধ্য করে সেভাবে জায়েয নেই, তবে কেউ সফর থেকে আসলে বা কোনো ক্ষমতাশীলের ক্ষমতায় প্রবেশ করলে ক্ষমতাশীলের প্রতি সম্মান করতে ও তার নির্দেশ বাস্তবায়ন ও তার সম্মানের দিকে খেয়াল রেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া জায়েয এবং এটা হিকমতেরও চাহিদা। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম সা'দ ইবনে মু'আয এর জন্য দাঁড়িয়ে তার সম্মান রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে ইয়াহূদীদের মধ্যে তার নির্দেশ ও ফয়সালা বেশী গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে দেখলেই দাঁড়াতে হবে এটা শরী'আত সমর্থিত নয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, "সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রিয় ব্যক্তি কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি যখন মজলিসে আগমন করতেন তখন তারা দাঁড়াতো না, কারণ; তারা জানতো যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৩২, তিরমিযী: ২৭৫৪] এমনকি সাহাবায়ে কিরাম যখনই রাসূলের মজলিসে আসতেন তখনই তারা যেখানে বসা শেষ হয়েছে সেখানে বসতেন। [আবু দাউদ: ৪৮২৫, তিরযিমযী: ২৭২৫] তবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা রাসূলের নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন তারা আসলে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবায়ে কিরাম তাদের জন্য জায়গা করে দিতেন। আর রাসূলই এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে থাকে"। [মুসলিম: ৪৩২, আবু দাউদ: ৬৭৪] সে হিসেবে আবু বকর সাধারনত তার ডান পাশে, উমর বাম পাশে, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম সামনে বসতেন। কারণ: তারা ওহী লিখতেন। তবে কোন ক্রমেই কারও অনুমতি ব্যতীত দু'জনের মাঝখানে বসে দু'জনের মধ্যে পৃথকীকরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন লোকের পক্ষে এটা জায়েয নয় যে, সে দু'জনের মাঝে পৃথকীকরণ করে বসবে তাদের অনুমতি ব্যতীত"। [আবু দাউদ: ৪৮৪৫, তিরমিযী: ২৭৫২, মুসনাদে আহমাদ: ২/২১৩]

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে 'উঠ' বলে যাবতীয় কল্যাণকর কাজ করার জন্য নির্দেশ

ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত[১]।

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ

বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যখনই তোমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াতে, অথবা সৎকাজ করতে বা কোন হক আদায় করতে বলা হয় তখনই তোমরা তা করতে সচেষ্ট হবে। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ যখনই তোমাদেরকে কোন কল্যাণকর কাজের আহ্বান জানানো হয় তখনই তোমরা তার প্রতি সাড়া দিও। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ কাউকে তার বসা থেকে সরে অন্যকে বসার জায়গা করে দেয়া বা রাসূল ও দ্বীনী নেতারা যদি কাউকে বের হতে বলে যদি তোমরা কর তবে এটা মনে করো না যে, এর দ্বারা তোমাদের সম্মানের কোন কমতি করা হচ্ছে বা তোমাদেরকে অবমুল্যায়ণ করা হচ্ছে। বরং আল্লাহ্র নিকট এ নির্দেশ পালনের মধ্যেই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্ তার এ ত্যাগ কখনো খাটো করে দেখবেন না। তিনি তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন। কেননা; যে কেউ মহান আল্লাহ্র দিক বিবেচনা করে বিনম্র হয় মহান আল্লাহ্ তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। আর তার স্মরণকে উঁচু করে দেন। আর এ জন্যই পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" তিনি ভাল করেই জানেন কারা উঁচু মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী আর কারা নয়। [ইবন কাসীর] আবুত তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নাফে' ইবনে হারেসকে উসফান নামক স্থানে দেখা পেলেন। তিনি তাকে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উপত্যকাবাসী (মক্কা) এর উপর কাকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছ? আমের বললেন, আমি ইবনে আবযার উপর তাদের দায়িত্ব দিয়েছি। উমর বললেন, ইবনে আবযা কে? তিনি বললেন, আমাদের এক দাস। উমর বললেন, তাদের উপর তুমি দাসকে দায়িত্বশীল করেছ? তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! সে আল্লাহ্র কিতাবের একজন সুপাঠক, ফারায়েজ সম্পর্কে পণ্ডিত ও বিচারক। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তাহলে শোন, আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ এ কুরআন দ্বারা কাউকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবেন আর কাউকে অধঃপতন ঘটাবেন।" [মুসলিম: ৮১৭]

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

পূর্বে কিছু সাদাকাহ্ পেশ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক[১]; কিন্তু যদি তোমরা অক্ষম হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

১৩. তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার আগে সাদাকাহ্ প্রদানে ভয় পেয়ে গেলে? যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

তৃতীয় রুকূ'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم

১৪. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী শুনে উপকৃত হতো। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলিমও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রাসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। এ নির্দেশের পর অনেকেই কানকথা বলা থেকে বিরত থেকেছিল। এর পরই আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াত নাযিল করে মুমিনদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিলেন। ফলে কারা সত্যিকার মুমিন আর কারা কপট তা ধরা পড়ে গেল। [তাবারী]

বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছেন? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় আর তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে শুনে মিথ্যার উপর শপথ করে।

مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤

১৫. আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। নিশ্চয় তারা যা করত তা কতই না মন্দ!

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٥

১৬. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করেছে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করেছে; সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٦

১৭. আল্লাহ্‌র শাস্তি মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

لَّن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١٧

১৮. যে দিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহ্‌র কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভাল কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী[১]।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ١٨

(১) কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এই আয়াত এক মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেনঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই এক মুনাফিক আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ; দেহাবয়ব বেঁটে গোধুম বর্ণ

১৯. শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। তারাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত[১]।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, 'আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও'। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾

২২. আপনি পাবেন না আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে--- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ

এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন? সে শপথ করে বললঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেই ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪০, ২৬৭, ৩৫০]

(১) মা'দান ইবনে আবি তালহা আল-ইয়া'মুরী বলেন, আমাকে আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তুমি কোথায় থাক? আমি বললাম, হিমসের নিকটে একটি জনপদে। তখন আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কোন জনপদে কিংবা বেদুইনদের তাঁবুতে তিনজন লোক থাকার পরও যদি সেখানে সালাত কায়েম করা না হয় তবে শয়তান সেখানে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তুমি জামা'আতের (সালাতের জামা'আতের) সাথে জীবন অতিবাহিত কর। কেননা, নেকড়ে কেবল দলছুটকেই খায়।" [আবু দাউদঃ ৫৪৭, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৪৮২,৪৮৩]

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা[১]। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম।

(১) এখানে কেউ কেউ রূহ এর তাফসীর করেছেন নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য এ প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ এর তাফসীর করেছেন, কুরআন ও কুরআনের প্রমাণাদি। [বাগভী]

سُورَةُ الْحَشْرِ

৫৯- সূরা আল-হাশ্‌র(১)
২৪ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

২. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তিনিই তাদেরকে প্রথম সমাবেশের জন্য তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন(২) ।

---

(১) এ সূরাকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা সূরা বনী নাদ্বীর বলতেন । সমগ্র সূরা হাশর ইয়াহূদী বনু-নাদ্বীর গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন [বুখারী: ৪৮৮২] ।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দুরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদিনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইয়াহূদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন । চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইয়াহূদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোনো আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না । তারা আক্রান্ত হলে মুসলিমরা তাদেরকে সাহায্য করবে । শান্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল । এমনিভাবে বনু-নাদীরসহ ইয়াহূদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল । মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু নাদীরের বসতি, দূর্ভেদ্য দূর্গ্য এবং বাগ-বাগিচা ছিল । ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত বাহ্যতঃ তাদেরকে এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায় । কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পরে বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয় । এই বিশ্বাসঘাতকার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু নাদ্বীরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইয়াহূদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কুরাইশী কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ করে । দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি চুড়ান্ত হয় । চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন । এরপর বনু নাদ্বীর আরও অনেক চক্রান্ত করতে থাকে । তন্মধ্যে একটি আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত যার কারণে

তাদেরকে মদীনা থেকে চলে যেতে হয়। ঘটনাটি হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করার পর ইয়াহূদীদের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির একটি শর্ত এই ছিল যে, কারো দ্বারা ভুলবশত: হত্যা হয়ে গেলে মুসলিম ও ইয়াহূদী সবাই এর রক্তের বিনিময় পরিশোধ করবে। একবার আমর ইবনে উমাইয়া দমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলিম-ইয়াহূদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য মুসলিমদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহূদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সে মতে তিনি বনু-নাদ্বীর গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, রাসূলকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর এরা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তার উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ ওহির মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইয়াহূদীদেরকে বলে পাঠালেনঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লঙ্ঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হলো। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। বনু-নাদ্বীর মদিনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বললঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দিবে না। বনু-নাদ্বীর তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সদর্পে বলে পাঠালঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু-নাদ্বীর গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু-নাদ্বীর দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরূপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনু-নাদ্বীরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খাইবরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি-কাঠ, তক্তা ও

حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ②

তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কাছে এমনভাবে আসলেন যা তারা কল্পনাও করেনি। আর তিনি তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করলেন। ফলে তারা ধ্বংস করে ফেলল নিজেদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও[১]; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

৩. আর আল্লাহ্ তাদের নির্বাসনদণ্ড লিপিবদ্ধ না করলেও তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে (অন্য) শাস্তি দিতেন[২];

কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইয়াহূদীদের সাথে খাইবর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ' ও 'দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত। প্রথম হাশর রাসূলের যুগে আর দ্বিতীয় হাশর হয়েছিলো উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময়ে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময়ে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তাদের শেষ হাশর হবে কিয়ামতের দিন। কোন কোন আলেমের মতে এখানে প্রথম হাশর অর্থ প্রথম সমাবেশ। অর্থাৎ বনী নাদ্বীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের সৈন্য সমাবেশের ঘটনা। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলিমরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছিলো। লড়াই ও রক্তপাতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরাতে তারা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। [দেখুন- ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(১) গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, মুসলিমগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে বনু নাদ্বীর ও বনু কুরাইযা

আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি ।

৪. এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । আর কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্‌ তো শাস্তি দানে কঠোর ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٤

৫. তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলোকে কাণ্ডের উপর স্থিত রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে[১]; এবং এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌ ফাসিকদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নদ্বীরকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি বনু কুরাইযাকে তাদের স্বস্থানে থাকতে দিয়ে তাদের উপর দয়া দেখালেন । কিন্তু তারাও পরবর্তীতে রাসূলের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করলেন, মহিলা ও সন্তান-সন্ততিদেরকে মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দিলেন । তবে তাদের মাঝে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ অবলম্বন করলে রাসূল তাদেরকে অভয় দিলেন, পরে তারা ঈমান এনেছিল । তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহূদীদের বনু কাইনুকা, বনী হারেসা সহ যাবতীয় গোষ্ঠীকেই মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিলেন । [মুসলিমঃ ১৭৬৬]

(১) বনু নাদ্বীর এর বসতি খেজুর বাগানের ঘেরা ছিল । তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলিম তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খেজুর গাছ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিল । অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হবে । এই মনে করে তারা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন । এটা ছিল মতের গরমিল । পরে যখন তাদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলিমদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল । এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে । [তিরমিযীঃ ৩৩০৩]

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৬. আর আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি(১); বরং আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছে তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন; আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَیْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৭. আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও পথচারীদের(২), যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু

(১) আয়াতে বর্ণিত أفاء শব্দটি فيء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, প্রত্যাবর্তন করানো। যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতীত কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পদকেই 'ফায়' বলা হত। [ইবন কাসীর] সে হিসেবে আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না বরং তা পুরোপুরিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দেবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "বনু নাদ্বীর এর সম্পদ ছিল এমন সম্পদ যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের করায়ত্ব করে দিয়েছিলেন। যাতে মুসলিমদের কোন ঘোড়া বা উটের ব্যবহার লাগেনি। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে হয়নি। সুতরাং তা ছিল বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পদ। তিনি এটা থেকে তার পরিবারের বাৎসরিক খোরাকির ব্যবস্থা করতেন। বাকী যা থাকত তা যোদ্ধাস্ত্র ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ হিসেবে থাকত। [বুখারী: ৪৮৮৫, মুসলিম: ১৭৫৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা 'ফায়' তাঁর রাসূলের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ﴿وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ এ আয়াত পাঠ করে বললেন, এতে 'ফায়' বিশেষভাবে রাসূলকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তবে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে তিনি নিজে সেটা নিয়ে নেননি। তোমাদের উপর নিজেকে প্রাধান্য দেননি। [বুখারী: ৩০৯৩]

(২) أهل القرى বলে এ আয়াতে বনু নাদ্বীর ও বনু কুরাইযা ইত্যাদি গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক(১) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

৮. এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝٨

(১) এ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম সবসময়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত যে অবশ্য পালনীয় তা বর্ণনা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট এক মহিলা এসে বলল, শুনেছি আপনি উল্কি আঁকা ও পরচুলা ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করেন? এটা কি আপনি আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন? নাকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে পেয়েছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ, আমি সেটা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত সব জায়গায়ই পেয়েছি। মহিলা বলল, আমি তো আল্লাহ্‌র কিতাব ঘেটে শেষ করেছি কিন্তু কোথাও পাইনি। তিনি বললেন, তবে কি তুমি তাতে ﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ﴾ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক" এটা পাওনি? সে বলল: হ্যাঁ, তারপর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, পরচুলা ব্যবহারকারিনী, উল্কি অংকনকারীনী, ভ্রু ব্লাককারীনীর প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৮৬, ৪৮৮৭, মুসলিম: ২১২৫, আবুদাউদ: ৪১৬৯, তিরমিযী: ২৭৮২, নাসায়ী: ৫০৯৯, ইবনে মাজাহ: ১৯৮৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৩২] অনুরূপভাবে ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন যে, "তারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফফাত, (এগুলো জাহেলী যুগের বিভিন্নপ্রকার মদ তৈরী করার পাত্র বিশেষ) এ কয়েক প্রকার পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তিলাওয়াত করলেন, ﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ﴾ "[মুসলিম: ১৯৯৭, আবু দাউদ: ৩৬৯০, নাসায়ী: ৫৬৪৩]

এরাই তো সত্যাশ্রয়ী[১]।

৯. আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও[২]। বস্তুতঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٩

(১) এ আয়াতে মুহাজিরদের বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রথম গুণ এই যে, তারা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। তারা মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থক ও সাহায্যকারী- শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা মাতৃভুমি ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতে বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে শীতের তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করতেন।
তাদের দ্বিতীয় গুণ হল, তারা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে মাতৃভুমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টিই তাদের কাম্য ছিল।
মুহাজিরদের তৃতীয় বৈশিষ্ট বা গুণ এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল উপরোক্ত সব কিছু করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলাকে সাহায্য করা অর্থ তাঁর দ্বীনের সাহায্য করা।
চতুর্থ গুণ হল, তারা কথা ও কাজে সত্যবাদী। [তবারী, ইবন কাসীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আনসারগণের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং ঈমানে খাটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। সুতরাং আনসারদের একটি গুণ এই যে, যে শহর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে 'দারুল হিজরত' ও 'দারুল ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তারা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

আনসারদের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, 'তারা তাদেরকে ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন।' এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত: লোকেরা এহেন ভিটে-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্ভ্রমের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্য কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।[দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর,বাগাভী] হাদীসে এসেছে, আনসারগণ এসে বললেন, আমাদের মধ্যে ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে খেজুরের বাগানও ভাগ করে দিন। রাসূল বললেন, না, তা করা যাবে না। তখন তারা মুহাজিরগণকে বললেন, তাহলে আপনারা আমাদের খেজুর বাগানের পরিচর্যায় শরীক হোন আমরা আপনাদেরকে ফলনে শরীক করবো, তারা বললেন, হ্যাঁ। আমরা তা শুনলাম ও মেনে নিলাম। [বুখারী: ২৩২৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা হিজরত করার পর মুহাজিরগণ এসে তাকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যাদের কাছে এসেছি তাদের মত আমরা কাউকে দেখিনি। তারা বেশী থাকলে সবচেয়ে বেশী দানশীল আর কম থাকলে তাতে সহানুভূতির সাথে বন্টন করে দেয়। তারা আমাদেরকে খরচের ব্যাপারে যথেষ্ট করে দিয়েছে। তারা তাদের পেশাতেও আমাদেরকে শরীক করে নিয়েছে। আমরা ভয় পাচ্ছি যে, এরা আমাদের সব সওয়াব নিয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করছ এবং তাদের প্রশংসা করছ।" [তিরমিযী: ২৪৮৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৬]
আনসারদের তৃতীয় গুণ ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ অর্থাৎ 'মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না' এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনু নদ্বীর গোত্রের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলিমদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল। অর্থ এই যে, এ বন্টনে যা কিছু মুহাজিরদেরকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাদের এসব জিনিসের প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেয়াটা খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় "যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তারা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না

যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম[১]।

দেয়া হয়।" [বুখারী: ৩৭৯৪]
আনসারগণের চতুর্থ গুণ হচ্ছে, ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ অর্থাৎ আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্রপীড়িত ছিলেন। এটাই মূলতঃ উত্তম সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে উত্তম সাদাকাহ হচ্ছে, কষ্টে অর্জিত অল্প সম্পদ থেকে দান করা" [আবু দাউদ: ১৬৭৭, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৫৮, সহীহ ইবনে খুজাইমাহ: ২৪৪৪, ইবনে হিব্বান: ৩৩৪৬, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৪১৪] যে সম্পদের প্রয়োজন তার নিজের খুব বেশী তা থেকে দান করতে সক্ষম হওয়া খুব উচু মনের অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তারা খাবারের মহব্বত থাকা সত্বেও তা অন্যদের খাওয়ায়" [সূরা আল-ইনসান:৮] অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "আর সম্পদের প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও তা দান করা" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭] সুতরাং দান বা সাদাকাহ করার সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে, নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে তা দান বা সাদাকাহ করা। আনসারগণ ঠিক এ কাজটিই করতেন। হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলের দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ক্ষুধা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের কাছে খাবার চেয়ে পাঠালেন কিন্তু তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। তখন তিনি বললেন, এমন কোন লোককি পাওয়া যাবে যে, আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করবে? আল্লাহ্ তাকে রহমত করবেন। আনসারী এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান, সুতরাং কোন কিছু বাকী না রেখে সবকিছু দিয়ে হলেও মেহমানদারী করবে। মহিলা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমার কাছে তো কেবল বাচ্চার খাবারই অবশিষ্ট আছে। আনসারী বললেন, ঠিক আছে, রাতের খাবারের সময় হলে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, তারপর আমরা বাতি নিভিয়ে দিব, এ রাতটি আমরা কষ্ট করে না খেয়েই কাটিয়ে দিব, যাতে মেহমান খেতে পারে। কথামত তাই করা হলো, সকালে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনসার লোকটি আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "মহান আল্লাহ্ গতরাত্রে তোমাদের কাণ্ড দেখে হেসেছেন। অথবা বলেছেন, আশ্চর্যন্বিত হয়েছেন।" আর তখনই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল [বুখারী: ৩৭৯৮, ৪৮৮৯, মুসলিম: ২০৫৪]

(১) আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ তা'আলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা

১০. আর যারা তাদের পরে এসেছে[1], তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑩

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সেসব ভাইকে বলে, 'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑪

বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সফলকাম। আয়াতে বর্ণিত شح শব্দের অর্থ কৃপণতা। [বাগভী] কুরআন ও হাদীসে এর নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক; কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করেছিল। তাদেরকে কৃপণতা অন্যায় রক্ত প্রবাহে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং হারামকে হালাল করতে বাধ্য করেছিল। [মুসলিম: ২৫৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, "ঈমান ও কৃপণতা কোন বান্দার অন্তরে এক সাথে থাকতে পারে না" [মুসনাদে আহমাদ ২/৩৪২]

(১) এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিম শামিল আছে এবং এ আয়াত তাদের সবাইকে "ফায়" এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। [ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর] তবে ইমাম মালেক বলেন, যারা সাহাবায়ে কিরামের জন্য কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করবে বা তাদেরকে গালি দেবে তারা 'ফায়' এর সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। [বাগভী]

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾

১২. বস্তুত তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং এরা সাহায্য করতে আসলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; তারপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না।

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

১৩. প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমাদের ভয়ই সবচেয়ে বেশী। এটা এজন্যে যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এরা সবাই সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের ভিতরে অথবা দূর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে; পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। আপনি মনে করেন তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এজন্যে যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. এরা সে লোকদের মত, যারা এদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে[১], আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৬. এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'; তারপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

(১) এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে তা নির্ধারণ করা নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এরা হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস বলেন, এরা হচ্ছে বনু কাইনুকা' এর ইয়াহূদীরা। [ইবন কাসীর]

নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

১৭. ফলে তাদের দু'জনের পরিণাম এই যে, তারা দু'জনই জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের প্রতিদান।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا الظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾

তৃতীয় রুকূ'

১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে[১]। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৯. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো ফাসিক।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই তো সফলকাম।

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ النَّارِ وَأَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

২১. যদি আমরা এ কুরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে আপনি তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত বিদীর্ণ দেখতেন। আর আমরা এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(১) এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে لِغَدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। [কুরতুবী]

চিন্তা করে।

২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তিনি গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী[১]; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু[২]।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ﴿۲۲﴾

২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র[৩], শান্তি-ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَكَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ ﴿۲۳﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম[৪]। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ﴿۲۴﴾

---

(১) অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা তাও তিনি জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোন বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। [ইবন কাসীর,বাগভী]

(২) অর্থাৎ তিনি রহমান ও রহীম বা দাতা ও পরম দয়ালু। একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যার রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যপ্ত এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(৩) মূল ইবারতে القدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قدس। এর অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। [ইবন কাসীর,কুরতুবী]

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে। হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌র এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে কেউ এগুলোর (সঠিকভাবে) সংরক্ষণ করবে (হক আদায় করবে) সে জান্নাতে যাবে"। [বুখারী: ২৭৩৬, মুসলিম: ২৬৭৭]

৬০- সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ্‌[১]
১৩ আয়াত, মাদানী

سورة الممتحنة

(১) এই সুরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে এক গায়িকা নারী মদীনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বললঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হলঃ তবে কি তুমি মুসলিম হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বললঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বললঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল। এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভুত এবং মক্কায় এসে বসবাস করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলিম হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তার স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলিমদের ওপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তার সন্তানসন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তার সন্তানদের ওপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার

মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তার কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-সন্তানদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে মহিলাটির হাতে সোপর্দ করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন বর্ণনায় আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতা'আর পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বললঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললামঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললামঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব। অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে মাথার চুলের খোপ থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলাম। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেনঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ, তার রসূল ও সকল মুসলিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ আমার ঈমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার ছেলে-সন্তানদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা, তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে[১], রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? আর তোমরা যা গোপন কর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেনঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলই আসল সত্য জানেন। কোন কোন বর্ণনায় হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে; আমি একাজ ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার গুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাফেরদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়। [আলোচ্য ঘটনাটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বুখারী: ৩০০৭, মুসলিম, ২৪৯৪, আবু দাউদ: ২৬৫০, তিরমিযী: ৩৩০৫, ওয়াকেদী: আল-মাগাযী: ২/৭৯৭-৭৯৯, ইবনে হিশাম: আস-সীরাতুন নাবওয়ীয়্যাহ, ২/৩৯৮-৩৯৯, তাফসীরে বাগভী: ৪/৩২৮-৩২৯]

(১) এখানে حق বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। [বাগভী]

এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ থেকে।

২. তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহ্‌বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, আর তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে।

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

৪. অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার 'ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন[১]।' তবে ব্যতিক্রম তাঁর

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যতক্ষণ তারা এ সাক্ষ্য দিবে না যে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র

পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের উক্তিঃ 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না[১] ।' ইব্‌রাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল, 'হে আমাদের রব! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং ফিরে যাওয়া তো আপনারই কাছে ।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

৫. 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের ফিতনার পাত্র করবেন না । হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।'

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ

৬. যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে ওদের মধ্যে[২] উত্তম আদর্শ । আর যে

রাসূল । আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে । তারা এটা করলে আমার হাত থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ করতে পারবে । তবে ইসলামের কোন হকের কারণে যদি পাকড়াও করা হয় সেটা ভিন্ন কথা । আর তাদের হিসাবের দায়িত্বভার আল্লাহ্‌র উপরই রইল ।" [বুখারী: ২৫, মুসলিম: ২২]

(১) মুসলিমদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নাত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেয়ার পর ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম যে তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী, কিন্তু তার এই কাজটির অনুসরণ মুসলিমদের জন্যে জায়েয নয় । ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম-এর ওযর সূরা আত-তাওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে মাগফিরাতের দো'আ নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন এ বিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন । [দেখুন-বাগভী]

(২) অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম ও তার অনুসারীদের মধ্যে । [কুরতুবী, বাগভী]

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٦

মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক), নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনি অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।

দ্বিতীয় রুকূ'

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٧

৭. যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্‌ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন(১); এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨

৮. দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণদেরকে

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফের, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্বরই হয়তো আল্লাহ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দিবেন। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কাবিজয়ের সময় বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফের মুসলিম হয়ে যায়। [আল-ওয়াহেদীঃ আসবাবুন নুযুল, ৪৫০] পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ অর্থাৎ "আর আপনি দেখতে পাবেন মানুষদেরকে যে তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করবে" [সূরা আন-নাসর:২] বাস্তবেও তাই হয়েছে। আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের ভীষণ দুশমন ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাদশা নাজাসী তাকে রাসূলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন, ফলে আবু সুফিয়ানের বিরোধিতায় ভাটা পড়ে, তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পুত্র মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা পরবর্তীতে ইসলামের পক্ষের শক্তি হিসেবে নিজেদের শক্তিকে কাজে লাগান। [দেখুন-কুরতুবী]

ভালবাসেন(১) ।

৯. আল্লাহ্ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করাতে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই তো যালিম।

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑨

১০. হে ঈমানদারগণ(২)! তোমাদের কাছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

(১) যেসব কাফের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবাই সমান। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার জননী আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর স্ত্রী 'কুতাইলা' হুদায়বিয়া সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। [বুখারী: ২৬২০, ৩১৮৩, মুসলিম: ১০০৩, আবু দাউদ: ১৬৬৮, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৪৭, ইবনে হিব্বান: ৪৫২]

(২) আলোচ্য আয়াতগুলো একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদীসে এসেছে, "যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধি চুক্তি শেষ করলেন তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা উঠ এবং উটগুলোর 'নাহর' বা রক্ত প্রবাহিত কর তারপর মাথা কামিয়ে ফেল। কিন্তু তাদের কেউই এটা শুনছিল না। শেষপর্যন্ত রাসূল এটা তিনবার বললেন। কিন্তু কেউ না শুনাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামাহ এর কাছে গিয়ে তা বিবৃত করলেন। উম্মে সালামাহ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি এটা বাস্তবে হওয়া চান? তবে আপনি কাউকে কিছু না বলে নিজের উটটি 'নাহর' করুন এবং আপনার মাথা কামানোর জন্য লোক ডেকে তা সম্পাদন করুন। তিনি তাই করলেন। ফলে সবাই তা করতে শুরু করে দিল। আর তখনই

মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে | فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

কয়েকজন মুমিন নারী এসে উপস্থিত। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ এই আয়াত নাযিল করলেন।" [বুখারী: ২৩৭২] এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলিম হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলিম পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠাবেন। এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলিমদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে, সুবাই'আ বিনতে হারেস আল-আসলামিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কাফের সায়ফী ইবনে রাহিবের পত্নী ছিলেন। তখন পর্যন্ত মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলিম মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দাবি জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি। [তাফসীরে কুরতুবী: ২০/৪১০] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলিম নারী হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না সে পূর্ব থেকেই মুসলিম হোক; -যেমন উল্লেখিত ভদ্রমহিলা, অথবা হিজরতের পর তার মুসলিমত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়-নারীদের ক্ষেত্রে নয়। আয়াতের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সুবাই'আ রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে কাফেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন। কোন কোন বর্ণনায় অনুরূপ ঘটনা উম্মে কুলসুম বিনতে-উকবার ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [বুখারী: ২৭১১, ২৭১২]

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো[১]; আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও। তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মাহর দাও। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো

---

(১) আয়াতে মুহাজির নারীকে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। সে পরীক্ষা কি ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, পরীক্ষা ছিল, কালেমা শাহাদাত বলা অর্থাৎ আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলা। তবে এখানে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে; ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ মুহাজির নারীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। [তিরমিযী: ৩৩০৬, অনুরূপ বর্ণনা দেখুন, বুখারী: ৪১৮২, ৪৮৯১, মুসলিম:১৮৬৬, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৭০]

না[১]। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১১. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে রয়ে যায় অতঃপর যদি তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গনীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ প্রদান কর, আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর উপর তোমরা ঈমান এনেছ।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪

১২. হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাই'আত করে[২] এ মর্মে

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا

(১) كَافِرَةٌ শব্দটি كَوَافِر এর বহুবচন। এখানে মুশরিক নারী বোঝানো হয়েছে। [বাগভী]

(২) এ আয়াতে মুসলিম নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়েদসহ শরী'আতের বিধিবিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলিম নারীর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। উমাইমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, "আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরী'আতের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ অর্থাৎ "আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়"। উমাইমা এরপর বলেন, এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশি ছিল।

يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَىِٕسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَىِٕسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿۱۳﴾

১৩. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো আখিরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের বিষয়ে।

আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না।[তিরমিযী: ১৫৯৭, ইবনে মাজাহ:২৮৭৪] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এই শপথ সম্পর্কে বলেনঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে- হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত কখনও কোন গায়র মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।[বুখারী: ৪৮৯১, মুসলিম: ১৮৬৬] বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয়; বরং বারবার হয়েছে। মক্কাবিজয়ের দিনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছিল।[দেখুন, বুখারী: ২২১১, ৭১৮০, মুসলিম: ১৭১৪]

৬১- সূরা আস-সাফ্ফ[১]
১৪ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ الصَّفِّ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি প্রবলপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ②

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

৩. তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④

৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

৫. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

(১) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদল সাহাবী পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তা‘আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সমগ্র সূরা আস-সাফ্ফ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল। [তিরমিযী: ৩৩০৯, সুনান দারমী: ২৩৯০, মুসনাদে আহমদ:৫/৪৫২]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي اسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑥

৬. আর স্মরণ করুন, যখন মার্‌ইয়াম-পুত্র ‘ঈসা বলেছিলেন, ‘হে বনী ইস্‌রাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহ্‌মাদ নামে(১) যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা(২) ।

(১) এখানে ঈসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক সুসংবাদ প্রদত্ত সেই রাসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ । আমাদের প্রিয় শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কয়েকটি নাম রয়েছে, আমি ‘মুহাম্মাদ’, আমি ‘আহমাদ’, আমি ‘মাহী’ বা নিশ্চিহ্নকারী; যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ কুফরী নিশ্চিহ্ন করে দিবেন । আর আমি ‘হাশির’ বা একত্রিতকারী; আমার কদমের কাছে সমস্ত মানুষ জমা হবে । আর আমি ‘আকিব’ বা পরিসমাপ্তিকারী । [বুখারী: ৩৫৩২, ৪৮৯৬, মুসলিম: ২৩৫৪, তিরমিযী: ২৮৪০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮০, ইবনে হিব্বান: ৬৩১৩] তবে রাসূলের নাম এ কয়টিতে সীমাবদ্ধ নয় । অন্য হাদীসে আরও এসেছে, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আমাদেরকে তার নাম উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কিছু আমরা মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম । তিনি বলেছিলেন, আমি ‘মুহাম্মাদ’ ‘আহমাদ’, হাশির, মুকাফফি (সর্বশেষে আগমনকারী), নাবিইউত তাওবাহ (তাওবাহর নবী), নাবীইউল মালহামাহ, (সংগ্রামের নবী) । [মুসলিম: ২৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৯৫, ৪০৪, ৪০৭]

(২) ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর সুসংবাদ প্রদানের কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসেও এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন । জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আমি আমার পিতা (পিতৃপুরুষ) ইবরাহীম এর দো‘আ, ঈসা এর সুসংবাদ এবং আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হয়ে সিরিয়ার বুসরা নগরীর প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেছে ।” [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬০০, অনুরূপ বর্ণনা আরও দেখুন, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৬২] এমনকি এ সুসংবাদের কথা হাবশার বাদশাহ নাজাসীও স্বীকার করেছিলেন । [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৬১-৪৬২]

পরে তিনি[১] যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো স্পষ্ট জাদু ।'

৭. আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয় । আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না ।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

৮. তারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নেভাতে চায়, আর আল্লাহ্, তিনি তাঁর নূর পূর্ণতাদানকারী, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে ।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে ।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

১১. তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

(১) কারও কারও মতে, এখানে 'তিনি' বলে ঈসা আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে । সে অনুসারে بينات বা স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর ইঞ্জীল বোঝানো হবে । তবে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে । সে হিসেবে بينات বা স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা কুরআন বোঝানো হবে । আর এ মতটিই এখানে বেশী প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত । [ফাতহুল কাদীর]

করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!

১২. আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

১৩. এবং (তিনি দান করবেন) আরও একটি অনুগ্রহ, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন(১)।

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হও, যেমন মার্‌ইয়াম-পুত্র 'ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে?' হাওয়ারীগণ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوٓا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّۦنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّآئِفَةٌ مِّن بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ

---

(১) আখেরাতের নেয়ামতের সাথে কিছু দুনিয়ার নেয়ামতেরও ওয়াদা করে বলা হয়েছে, ﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ "এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ। আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।" অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; দুনিয়াতেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। এর অর্থ শত্রুদের উপর বিজয় লাভ। এখানে قريب (বা নিকট) শব্দটি আখেরাতের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قريب (বা আসন্ন) ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খাইবর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تحبونها অর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿وَكَانَ الْإِنسَٰنُ عَجُولًا﴾ অর্থাৎ, মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। [সূরা আল-ইসরা: ১১] এর অর্থ এই নয় যে, আখেরাতের নেয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, আখেরাতের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেয়া হবে। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্‌সার,বাগভী]

اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

বলেছিলেন, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী[১]।' তারপর বনী ইস্‌রাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। তখন আমরা যারা ঈমান এনেছিল, তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল[২]।

---

(১) حَوَارِيِّيْنَ শব্দটি حَوَارِي এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর অনুসারীদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হত। [ইবন কাসীর]

(২) এই আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, ঈসা আলাইহিস্ সালাম আসমানে উত্থিত হওয়ার পর নাসারারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল, তিনি ইলাহ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি ইলাহ্ ছিলেন না বরং ইলাহ্‌র পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল। তারা বলল, 'তিনি ইলাহ্ও ছিলেন না, ইলাহ্‌র পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহর দাস ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।' মূলতঃ এরাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবিলায় প্রবল হয়ে ওঠে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতে উল্লেখিত ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ বা "যারা ঈমান এনেছে" বলে ঈসা আলাইহিস্‌সালাম-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। সে হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদী যারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী তারা সর্বদা বিজয়ী থাকবে। [দেখুন: তাফসীরে তাবারী: ২৮/৬০, দ্বিয়া আল-মাকদেসী: আল-মুখতারাহ: ১০/৩৭৬-২৭৮, নং ৪০২]

৬২- সূরা আল-জুমু'আহ্[১]
১১ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যা আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ②

২. তিনিই উম্মীদের[২] মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত[৩]; যদিও ইতোপূর্বে তারা

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতে সূরা আল-জুমু'আহ এবং আল-মুনাফিকুন পড়তেন । [মুসলিম:৭৭৭, আবুদাউদ: ১১২৪, তিরমিযী: ৫১৯, ইবনে মাজাহ: ১১১৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪২৯-৪৩০]

(২) أُمِّيٌّ বা 'উম্মী' শব্দটির অর্থ নিরক্ষর । আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত । [কুরতুবী, বাগভী]

(৩) নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, (এক) কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত । আয়াতে বর্ণিত 'তেলাওয়াত' শব্দের আসল অর্থ অনুসরণ করা । পরিভাষায় শব্দটি কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয় । آيات 'আয়াত' বলে কুরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন । (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, আয়াতে উল্লেখিত يزكيهم শব্দটি 'তাযকিয়াহ' থেকে গৃহীত । 'তাযকিয়াহ' শব্দটি অভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা । কোন সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয় । এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য । (তিন) কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া । এখানে 'কিতাব' বলে পবিত্র কুরআন এবং 'হিকমত' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে ।

ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে;

৩. এবং তাদের মধ্য হতে অন্যান্যদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি[১]। আর আল্লাহ্

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

তাই অধিকাংশ তফসীরকারক এখানে হিকমতের তাফসীর করেছেন সুন্নাহ্ ।[ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে বর্ণিত آخرين এর শাব্দিক অর্থ 'অন্য লোক'। আর ﴿لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ﴾ এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ, নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। কিন্তু এরা কারা যাদেরকে আয়াতে "অন্য লোক" বলা হয়েছে? এ ব্যাপারে তিনটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। এক. এখানে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী সমস্ত মানুষদের জন্যও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিমকে প্রথম কাতারের মুমিন অর্থাৎ সাহাবায়ে-কেরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ। দুই. কেউ কেউ وآخرين শব্দটিকে اُمِّيّٖنَ এর উপর عطف করেছেন। তখন এ আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। তিন. কেউ কেউ وآخرين শব্দের عطف মেনেছেন وَيُعَلِّمُهُمْ এর সর্বনামের উপর। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। যারা এখনো নিরক্ষর বা 'উম্মী'দের সাথে মিলিত হয়নি তারা নিঃসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বিভিন্ন দেশের মুসলিম। ইকরিমা ও মুজাহিদ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তারা তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও অনাগত আরব অনারব সকল মুসলিম। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া এক হাদীস থেকেও এ অর্থের সপক্ষে দলীল নেয়া যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের পুরুষ ও মহিলাদের বংশধরদের চতুর্থ অধঃস্তনদের থেকেও বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে, তারপর তিনি ﴿وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ আয়াত পাঠ করলেন"। [ইবনে আবি আসিমঃ আস-সুন্নাহঃ ৩০৯]

কোন কোন মুফাসসির এখানে সুনির্দিষ্টভাবে পারস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাদের মতের সপক্ষে তারা দলীল পেশ করে বলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি ﴿وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ﴾ পাঠ করলে আমরা আরয করলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর গায়ে হাত

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪. এটা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৫. যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তারা গাধার মত! যে বহু পুস্তক বহন করে[১]। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে! আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

রাখলেন এবং বললেনঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছুলোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে। [বুখারী: ৪৮৯৭, ৪৮৯৮, মুসলিম: ২৫৪৬, তিরমিযী: ৩৩১০] [বাগভী]

(১) এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি সাধারণ অর্থ এবং অপরটি বিশেষ অর্থ। সাধারণ অর্থ হলো, যাদের ওপর তাওরাতের জ্ঞান অর্জন, তদনুযায়ী আমল এবং তাওরাত অনুসারে দুনিয়াকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা তাদের এ দায়িত্ব বুঝেনি এবং তার হকও আদায় করেনি। বিশেষ অর্থ হলো, তাওরাতের ধারক ও বাহক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে যাদের কাজ ছিল সবার আগে অগ্রসর হয়ে সেই রাসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যার আগমনের সুসংবাদ তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারাই তার সবচেয়ে বেশী শত্রুতা ও বিরোধিতা করেছে এবং তাওরাতের শিক্ষার দাবী পূরণ করেনি। পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তাওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তাওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্বেও তাওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকার হয় না। ইয়াহূদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তাওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦

৬. বলুন, 'হে ইয়াহূদী হয়ে যাওয়া লোকরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য লোকেরা নয়[১]; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧

৭. কিন্তু তারা তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত[২]।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨

৮. বলুন, 'তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের

(১) কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই দাবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, তারা বলত: "ইয়াহূদীরা ছাড়া কেউই জান্নাতে যাবে না" [সূরা আল-বাকারাহ: ১১১]। "জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। আর আমাদেরকে যদি নিতান্তই শাস্তি দেয়া হয় তাহলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেয়া হবে" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮০, সূরা আলে ইমরান, ২৪]। "আমরা আল্লাহর বেটা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৮]।

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের আসল চরিত্র তুলে ধরছেন। তা হচ্ছে, ইয়াহূদীরা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা আখেরাতের জন্যে কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পাঠায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, আখেরাতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার যে দাবি করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবি করে। তারা আরও জানে যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইয়াহূদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে তারা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৪৮, মুসনাদে বাযযার: ২১৮৯ (কাশফুল আসতার), আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ১১০৬১, মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ২৬০৪]

জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে অতঃপর তোমরা যা আমল করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।'

দ্বিতীয় রুকূ'

৯. হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিনে[১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ

(১) এই দিনটি মুসলিমদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুম'আ' বলা হয়। এই দিনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হাদীসে এসেছে; যেমন, "আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগৎকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুম'আর দিন।"[মুসলিম: ২৭৮৯] আরও এসেছে, "যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে, জুম'আর দিন। এই দিনেই আদম আলাইহিস্ সালাম সৃজিত হন, এই দিনেই তাকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। আর কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে।" [মুসলিম: ৮৫৪] আরও এসেছে, "এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে মানুষ যে দো'আই করে, তাই কবুল হয়।"[বুখারী: ৯৩৫, মুসলিম: ৮৫২] আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইয়াহূদীরা 'ইয়াওমুস সাব্ত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং নাসারারা রবিবারকে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমরা সবশেষে এসেও কিয়ামতের দিন অগ্রণী হব। আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। যদিও তাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। কিন্তু তারা এতে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পথ দিয়েছেন। এই যে দিনটি, তারা এতে মতভেদ করেছে। অত:পর আল্লাহ্ আমাদেরকে এ দিনের সঠিক হেদায়াত করেছেন। তা হলো, জুম'আর দিন। সুতরাং আজ আমাদের, কাল ইয়াহূদীদের। আর পরশু নাসারাদের।" [বুখারী: ৮৭৬, মুসলিম: ৮৫৫] সম্ভবত ইয়াহূদীদের আলোচনার পর পবিত্র কুরআনের জুম'আর আলোচনার কারণ এটাই যে, তাদের ইবাদতের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন কেবলমাত্র মুসলিমদের ইবাদতের দিনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে জুম'আর দিন। মূর্খতাযুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হত। বলা হয়ে থাকে যে, আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' রাখেন। কারণ, জুম'আ শব্দটির অর্থ একত্রিত করা। এই দিনে কুরাইশদের সমাবেশ হত এবং কাব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমআর দিন রেখেছিলেন। কিন্তু সহীহ

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨

যখন সালাতের জন্য ডাকা হয়[1] তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও [2]এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর,

---

হাদীসে পাওয়া যায় যে, "আদম আলাইহিস্ সালামের সৃষ্টিকে এই দিন একত্রিত করা হয়েছিল বলেই এই দিনকে জুম'আ নামকরণ করা হয়েছে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৪১২, নং: ১০২৮, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ ৩/১১৮, নং: ১৭৩২, ত্বাবরানী: মু'জামুল কাবীর ৬/২৩৭ নং ৬০৯২, মু'জামুল আওসাত্ব: ১/২৫০, নং ৮২১, মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ২/৩৯০]

(১) نُودِيَ অর্থ যখন ডাকা হয়। এখানে খোতবার আযান বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর,বাগভী] সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ, আবু বকর এবং উমরের যুগে জুম'আর দিনে ইমাম যখন মিম্বরে বসত তখন প্রথম আযান দেয়া হত। তারপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগ আসল এবং মানুষ বেড়ে গেল তখন তৃতীয় আহ্বানটি তিনি বাড়িয়ে দেন" [বুখারী: ৯১২]

(২) আয়াতে বর্ণিত فَاسْعَوْا শব্দের এক অর্থ দৌড়ানো এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ, সালাতের জন্যে দৌড়ে আসতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে সালাতের জন্যে গমন কর।" [বুখারী: ৬৩৬, মুসলিম: ৬০২] আয়াতের অর্থ এই যে, জুমআর দিনে জুমআর আযান দেয়া হলে আল্লাহর যিকিরের দিকে গুরুত্বসহকারে যাও। অর্থাৎ সালাত ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে যেমন অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর সালাত ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না। এখানে 'যিক্‌র' বলে জুম'আর সালাত এবং এই সালাতের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে। বহু হাদীসে জুম'আর দিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মসজিদে হাযির হওয়ার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে জুম'আর দিনে জানাবত তথা অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার মত গোসল করবে, তারপর (প্রথম ঘণ্টায়) মসজিদে হাজির হবে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘণ্টায় গেল সে যেন গরু কুরবানী করল। যে তৃতীয় ঘন্টায় গেল সে যেন শিংওয়ালা ছাগল কুরবানী করল। যে চতুর্থ ঘন্টায় গেল সে যেন মুরগী উৎসর্গ করল। যে পঞ্চম ঘন্টায় গেল সে যেন ডিম উৎসর্গ করল। তারপর যখন ইমাম বের হয়ে যায় তখন ফেরেশতারা (লিখা বন্ধ করে) ইমামের কাছে হাযির হয়ে যিকর (খুতবা) শুনতে থাকে।" [বুখারী: ৮৮১] তাছাড়া এটা অনেকের নিকট দো'আ কবুল হওয়ার সময়। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জুম'আর দিনে এমন একটি সময় আছে কোন মুসলিম যদি সে সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কল্যাণ চায় তবে অবশ্যই তিনি তাকে সেটা দিবেন"। [বুখারী: ৬৪০০]

এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩

১০. অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহ্‌কে খুব বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑪

১১. আর যখন তারা দেখে ব্যবসা অথবা ক্রীড়া-কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়[১]। বলুন, 'আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উৎকৃষ্ট।' আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

---

(১) এই আয়াতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুম'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। এক জুমআর দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কেবল বার জন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৯৩৬, ২০৫৮, ৪৮৯৯, মুসলিম: ৮৬৩]

৬৩- সূরা আল-মুনাফিকূন
১১ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ المُنَافِقُونَ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল।' আর আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি নিশ্চয় তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী(১)।

إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

---

(১) কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, এ ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল। [আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ী:১১৫৯৭ তিরমিযী: ৩৩১৪] কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনী-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় এ আয়াত সংক্রান্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।[তিরমিযী: ৩৩১৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৯২, ইবনে হাজার: মুকাদ্দিমাহ ফাতহুল বারী ১/২৯৫, ৬/৫৪৭, ইবনে সা'দ: তাবাকাতুল কুবরা: ৪/৩৪৯] আর এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। কারণ, ঘটনায় বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। ঘটনাটির সার সংক্ষেপ হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিক যুদ্ধে বের হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম পানির ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এরপর যখন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী একটি কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে পানি ব্যবহার নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলিমদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন, مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ অর্থাৎ 'এ কি মূর্খতাযুগের আহ্বান।' দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন, دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ 'এই স্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় স্লোগান।' অর্থাৎ এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় স্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহ ইবনে সা'দ আল-গিফারী এর বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনে

২. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে | اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

ওবরা আল-জুহানী আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আহত হয়েছিলেন। ওবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলিমদের সাথে আগমন করেছিল। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে। সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেনঃ আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজেলোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলিমদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মজলিস থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাকে বলে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেনঃ না আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেনঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয় নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ

ব্যবহার করে, ফলে তারা আল্লাহ্‌র পথ | إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

আল্লাহর কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এসে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা বলেছিলেনঃ আপনি আব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ে সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কাসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেনঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বললঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবতঃ যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই এ কথা বলেনি।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

বর্ণনাকারী বলেনঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার

থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ!

৩. এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে; তাই

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ③

অবসান ঘটে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুণরায় সফর শুরু করলেন। ইতোমধ্যে উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেনঃ তুমি এক কাজ কর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ওবাদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তখনই বললেনঃ আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কুরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বার বার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসতেন। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কুরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তার শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকে আমার কান ধরলেন এবং বললেন, "হে বালক, আল্লাহ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন"। আর সম্পূর্ণ সূরা আল-মুনাফিকুন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [পুরো ঘটনাটি কোথাও একত্রে বর্ণিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে। বুখারী: ৪৯০০, ৪৯০২, ৪৯০৫, মুসলিম: ২৫৮৪, ২৭৭২, নাসায়ী, ৯৭৭, তিরমিযী: ৩৩১২, ৩৩১৩, ৩৩১৪, ৩৩১৫, মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ১৮২৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩৩৮, ৪/৩৬৮,৩৭৩, ইবনে হিব্বান: ৫৯৯০, দালায়েলুন নাবুওয়ত লিল বাইহাকী: ৪/৫৩-৫৫, সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/৬৯, সীরাতে ইবনে কাসীর: ৩/১০৩]

তারা বুঝতে পারছে না।

৪. আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের আকৃতি আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে এবং তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনে থাকেন। তারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের খুঁটির মতই; তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন; আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে!

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন' তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, আর আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, অহংকারবশত ফিরে যেতে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

৭. তারাই বলে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, যাতে তারা সরে পড়ে।' অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই; কিন্তু মুনাফিকরা তা

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

বুঝে না[১]।

৮. তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে আসলে সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুর্বলদেরকে বের করে দেবে[২]।' অথচ শক্তি-সম্মান তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⑧

দ্বিতীয় রুকূ'

৯. 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত[৩]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑨

---

(১) মুহাজির জাহ্‌জাহ্ ইবনে সা'দ আল-গিফারী ও আনসারী সিনান ইবনে ওবরাহ্‌র ঝগড়ার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-ই এ কথা বলেছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে "তারা বোঝেনা" বলে বুঝিয়েছেন যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ। [দেখুন-কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করছেন যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কারও মতে হজ ও যাকাত

১০. আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) 'হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ্ দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম![১]'

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

১১. আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

এবং কারও মতে কুরআন। হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(১) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেনঃ "যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে- অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়।" তিনি আরও বললেনঃ "আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বলঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।" [বুখারীঃ ১৩৫৩, মুসলিম: ১০৩২, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৯৬]

৬৪- সূরা আত-তাগাবুন
১৮ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ التَّغَابُنِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, আধিপত্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান ।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন(১) । আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা ।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন(২) । আর ফিরে যাওয়া তো তাঁরই কাছে ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর । আর আল্লাহ্

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি মানুষই সেটার উপরই পুনরুত্থিত হবে, যার উপর তার মৃত্যু হয় । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৯০]

(২) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে,"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন ।" [সূরা আল-ইনফিতার: ৬-৮]

অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী ।

৫. ইতোপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? অতঃপর তারা তাদের কাজের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিল । আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

৬. তা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত তখন তারা বলত, 'মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে?' অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল । আল্লাহ্ও (তাদের ঈমানের ব্যাপারে) ভ্রুক্ষেপহীন হলেন; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত ।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ۚ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

৭. কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না । বলুন, 'অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে । তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে । আর এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ ।'

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও যে নূর আমরা নাযিল করেছি তাতে ঈমান আন[১] । আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(১) এখানে নূর বা জ্যোতি বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে । [কুরতুবী]

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

৯. স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে সেদিন হবে লোকসানের দিন(১) । আর যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী । এটাই মহাসাফল্য ।

---

(১) যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে । এই দিনটি হবে লোকসানের । ﴿لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ বা একত্রিত হওয়ার দিবস ও ﴿يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ লোকসানের দিবস- এই উভয়টি কেয়ামতের নাম । একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে । [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে التغابن শব্দটি غبن থেকে উৎপন্ন । এর অর্থ লোকসান । আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غبن বলা হয় । تغابن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া । নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না । কারও কোন দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে । সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে ।” [বুখারী: ২৪৪৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা ও অন্যান্য তফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন । আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশি সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম । সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে; যা অযথা ব্যয় করেছে । হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে ।” [৪৮৫৮] অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, “কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশের পর তাকে জাহান্নামে তার জন্য যে জায়গা রাখা হয়েছিল তা দেখানো হবে ফলে তার কৃতজ্ঞতা বেড়ে যাবে, পক্ষান্তরে কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করলে তাকে জান্নাতে তার জন্য যে স্থান ছিল তা দেখানো হবে, ফলে তার আফসোস বেড়ে যাবে ।” [বুখারী: ৬৫৬৯]

১০. কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমাদের (আয়াত) নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে ফিরে যাওয়ার স্থান!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑩

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑪

১২. আর তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ⑫

১৩. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; আর আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনগণ যেন তাওয়াক্কুল করে।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑬

১৪. 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী-স্বামী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো[১]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑭

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, এই আয়াত সেই মুসলিমদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়। তারপর তারা যখন হিজরত করে মদীনা আসে তখন দেখতে পায় যে, লোকেরা তাদের আগেই দ্বীনের ফিকহ শিক্ষায় অগ্রণী হয়ে গেছে। তখন তাদের খুব আফসোস হয়। [তিরমিযী: ৩৩১৭] তাছাড়া

আর যদি তোমরা তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟
وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়; তারাই তো সফলকাম।

إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু।

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি গায়েব ও উপস্থিত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সন্তান-সন্ততির কারণে মানুষ অনেক মহৎ কাজ থেকেও বিরত হতে বাধ্য হয়। হাদীসে এসেছে, বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) সেখানে উপস্থিত হলেন, তাদের গায়ে দুটি লাল রংয়ের কাপড় ছিল। তারা হাঁটছিলেন আর হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ অবস্থা দেখে মিম্বর থেকে নেমে এসে তাদেরকে তার সামনে বসালেন তারপর বললেন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ"। এ বাচ্চা দু'টিকে হাঁটার সময় হোঁচট খেতে দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। ফলে আমি আমার কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে নিলাম।" [তিরমিযী: ৩৭৭৪, ইবনে মাজাহ, ৩৬০০]

৬৫- সূরা আত-তালাক
১২ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ①

১. হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে কর তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে[১] এবং তোমরা ইদ্দতের হিসেব রেখো। আর তোমাদের রব আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কার করো না[২] এবং তারাও বের হবে না, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়[৩]। আর এগুলো

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণনা করেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায হয়ে বললেনঃ তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেয়া। (তালাকটি রাজ'য়ী তালাক ছিল, যাতে প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে) এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক প্রদানের আদেশই আল্লাহ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন। [বুখারীঃ ৫২৫১, মুসলিমঃ ১৪৭১]

(২) এখানে ইদ্দত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। [দেখুন-ইবন কাসীর]

(৩) প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে তবে সে গুণাহগার হবে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ্ এর পর কোন উপায় করে দেবেন।

২. অতঃপর তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এ দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ②

৩. এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③

বৈধতা নয়; বরং আরও বেশি নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। (দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরী'আতের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। (তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি যারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। [দেখুন-কুরতুবী,বাগভী]

যথেষ্ট[১]। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা।

৪. তোমাদের যে সব স্ত্রী আর ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই[২] তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

৫. এটা আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ⑤

---

(১) তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পাখির ন্যায় রিযিক দান করতেন। পাখি সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।" [মুসনাদে আহমাদ: ১/৩০, তিরমিযী: ২৩৪৪, ইবনে মাজাহ: ৪১৬৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। [বুখারী: ৫৭০৫, মুসলিম: ২১৮, মুসনাদে আহমা: ১/৪০১]

(২) এ আয়াতে তালাকে ইদ্দতের আরও কিছু অবস্থা ও তার হুকুম আহকাম বর্ণিত হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তানপ্রসব সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক। [ফাতহুল কাদীর]

তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۝٦

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে তোমরা বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে বাস করতে দেবে; তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলার জন্য; আর তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে এবং (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর। আর তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী পিতার পক্ষে স্তন্য দান করবে।

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

৭. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। অবশ্যই আল্লাহ্ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٨

৮. আর বহু জনপদ তাদের রব ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑨

৯. ফলে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; আর ক্ষতিই ছিল তাদের কাজের পরিণাম।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩

১০. আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছ। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশ---

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ⑪

১১. এক রাসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার জন্য। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তো তাকে উত্তম রিযিক দেবেন।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

১২. তিনি আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

৬৬- সূরা আত-তাহ্‌রীম
১২ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

১. হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন[১]; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

২. অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন । আর আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।

---

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল স্ত্রীর কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন । একদিন যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন । এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবেঃ আপনি "মাগাফীর" পান করেছেন । (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয় ।) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না, আমি তো মধু-পান করেছি । সেই বিবি বললেনঃ সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল । এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন । তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন । যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মনঃক্ষুণ্ন হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন । কিন্তু সেই স্ত্রী বিষয়টি অন্য স্ত্রীর গোচরীভূত করে দিল । ফলে এ আয়াত নাযিল হয় । [বুখারী: ৪৯১২, ৫২৬৭, ৬৬৯১, মুসলিম: ১৪৭৪] কোন কোন বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন দাসীর সাথে থাকতেন বিধায় আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা রাসূলকে এমনভাবে কথাবার্তা বললেন যে, রাসূল সে দাসীর কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ফলে এ আয়াত নাযিল হয় । [নাসায়ী: ৭/৭১,৭২, নং ৩৯৫৯, দ্বিয়া আল-মাকদেসী: আল-আহাদিসুল মুখতারাহ: ১৬৯৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৯৩]

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾

৩. আর স্মরণ করুন--- যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে জানিয়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবীর কাছে তা প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন(১)। অতঃপর যখন নবী তা তার সে স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এটা জানাল?' নবী বললেন, 'আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।'

إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

৪. যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর), কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা

---

(১) অর্থাৎ সেই স্ত্রী যখন গোপন কথাটি অন্য স্ত্রীর গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই স্ত্রীর কাছে গোপনে কথা ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগ করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন স্ত্রীর কাছের গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, পবিত্র কুরআনে তার বর্ণনা আসেনি। অধিকাংশ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে তা ফাঁস করে দেন। [দেখুন, বুখারীঃ ৪৯১৩, মুসলিমঃ ১৪৭৯] কোন কোন বর্ণনায় আছে, গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করে তাকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অনেক সালাত আদায় করে এবং অনেক সাওম পালন করে। তার নাম জান্নাতে আপনার স্ত্রীগণের তালিকায় লিখিত আছে। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ৪/১৬, ৬৭৫৩, ৪/১৭, ৬৭৫৪, আত-তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দঃ ৮/৮৪, তাবরানীঃ ১৮/৩৬৫, ৯৩৪, বুগইয়াতুল বাহিসঃ ২/৯১৪]

যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা কর[১] তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণও তার সহযোগিতাকারী[২]।

৫. যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী[৩]---যারা হবে মুসলিম, মুমিন[৪], অনুগত, তাওবাকারী, 'ইবাদাতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ⑤

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আমি উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম। আমি তাকে বললামঃ 'কোন সে দুই নারী, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা করেছে?' আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বললেন: 'তারা হল আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) ও হাফসা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা)।' [বুখারী: ৪৯১৪]

(২) অর্থাৎ যদি তোমরা অবস্থানে অনড় থাক, তবে আল্লাহ্, তিনি তো তার বন্ধু ও সাহায্যকারী, অনুরূপভাবে জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। আল্লাহ্ নিজে তার সাহায্য করবেন, অনুরূপভাবে জিবরীল ও আল্লাহ্‌র ঈমানদার নেক বান্দারাও তাকে সাহায্য করবেন। তাকে সাহায্য না করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ্, জিবরীল ও সৎবান্দাদের সাহায্যের পরে ফেরেশতারাও তার সাহায্যকারী। তারা তাকে সাহায্য করবেন। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, "উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ রাসূলের উপর অভিমান করে তার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে পড়ে। তখন আমি তাদেরকে বললাম, এমনও হতে পারে যে, রাসূল যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তবে তার রব তাকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রীসমূহ দান করবেন" তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৯১৬]

(৪) মুসলিম এবং মুমিন শব্দ এক সাথে ব্যবহৃত হলে মুসলিম শব্দের অর্থ হয় কার্যত আল্লাহর হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি এবং মুমিন অর্থ হয় এমন ব্যক্তি যে সরল মনে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। [দেখুন-বাগভী;কুরতুবী]

৬. হে ঈমানদারগণ[১]! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে[২],

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ

(১) এই আয়াতে সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যাবানিয়া'। এ আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দেয়াও তার কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল বা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল বা দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা, তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।" [বুখারী: ৮৯৩, ৫১৮৮]

(২) এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তিকে রহমত করুন, যে নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে, এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়েছে, সে যদি দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে। আল্লাহ্‌ ঐ মহিলাকেও রহমত করুন যে, নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বামীকে জাগিয়েছে, যদি সে দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে।" [আবু দাউদ: ১৪৫০, ইবনে মাজাহ: ১৩৩৬] হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের জন্য সাত বছর বয়সে পৌঁছলেই নির্দেশ দাও, আর তাদেরকে দশ বছর হলে এর জন্য দণ্ড দাও। আর তাদের শোয়ার জায়গা পৃথক করে দাও। [আবু দাউদ: ৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৮০] অনুরূপভাবে পরিবার পরিজনকে সালাতের সময়, সাওমের সময় হলে স্মরণ করিয়ে দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই বিতর পড়তেন তখনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে ডাকতেন এবং বলতেন, "হে আয়েশা! দাঁড়াও এবং বিতর আদায় কর।" [সহীহ মুসলিম, ৭৪৪, মুসনাদে আহমাদ: ৬/১৫২]

شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ⑥

যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশ্‌তাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑦

৭. হে কাফিরগণ! আজ তোমরা ওজর পেশ করার চেষ্টা করো না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তার প্রতিফলই তো দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় রুকূ'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۗ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑧

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর---বিশুদ্ধ তাওবা[১]; সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করবেন না নবীকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাদের নূর তাদের সামনে

(১) তাওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ থেকে ফিরে আসা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে কাছে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। আয়াতে বর্ণিত نصوح শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। এক. যদি نصحة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نصاحة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে "তাওবাতুন নাসূহ" এর অর্থ এমন তাওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি-কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে "তাওবাতুন নাসূহ" শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যে হবে যে, গোনাহের কারণে সৎকর্মের ছিন্নবস্ত্রে তাওবা তালি সংযুক্ত করে। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ "তাওবাতুন নাসূহ" হল মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ থেকে দূরে রাখা। [দেখুন-কুরতুবী]

ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

৯. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান!

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۝٩

১০. যারা কুফরী করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর, তারা ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।'

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ۝١٠

১১. আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদের জন্য পেশ করেন ফির'আউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার রব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।'

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝١١

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَٰنَ الَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ الْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

১২. আরও দৃষ্টান্ত পেশ করেন ‘ইমরান-কন্যা মার্‌ইয়ামের--- যে তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ হতে। আর সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্যতম(১)।

---

(১) এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল বা পরিপূর্ণ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফির‘আউন-পত্নী আসিয়া ও ইমরান তনয়া মারইয়াম পরিপূর্নতা লাভ করেছেন।” [বুখারী: ৩৪১১, মুসলিম: ২৪৩১]

৬৭- সূরা আল-মুল্‌ক[১]
৩০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ المُلْكِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۝١

১. বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব[২] যাঁর হাতে; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য--- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি[৩]?

---

(১) এই সূরাকে হাদিসে "মানি'আ" বা প্রতিরোধকারী নামকরণ করা হয়েছে।[মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৯৮, আবুস শাইখ: তাবাকাতুল ইসফাহানীয়্যিন: ২৬৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র তিরিশটি কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে; সেটা সূরা মুলক। [আবুদাউদ: ১৪০০, তিরমিযী: ২৮৯১, নাসায়ী: আলকুবরা ৭১০, ইবনে মাজাহ: ৩৭৮৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৯৯, ৩২১] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলিফ লাম তানযীল' (সূরা আস-সাজদাহ) এবং 'তাবারাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুলক' (সূরা আল-মুলক) সূরাদ্বয় না পড়ে ঘুমাতেন না"। [তিরমিযী: ২৮৯৭, দারমী: ৩৪১১, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৬, (৩৫৪৫)]

(২) এখানে রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

(৩) মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো فطور যার অর্থ ফাটল, ছিদ্র,ছেঁড়া, ভাঙা-চোরা। [কুরতুবী]

৪. তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ④

৫. আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা[১] এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ⑤

৬. আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; এবং তা কত মন্দ ফিরে যাওয়ার স্থান!

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑥

৭. যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে[২], আর তা হবে উদ্বেলিত।

إِذَا أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ⑦

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ⑧

---

(১) مصابيح শব্দের অর্থ প্রদীপমালা। এখানে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। [বাগভী;ফাতহুল কাদীর]

(২) মূল ইবারতে شهيق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী] যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "জাহান্নামের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে।" [সূরা আল-ফুরকান: ১২] আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "এ জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাসফাস করতে থাকবে।" [সূরা হূদ: ১০৬]

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ⑨

৯. তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।'

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑩

১০. আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না[১]।'

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑪

১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য!

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑫

১২. নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۖ إِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑬

১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ⑭

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

---

(১) অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাদের অপরাধের ব্যাপারে নিজেদের উপর দোষ স্বীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে চুড়ান্ত ফয়সালা করা হবে না।" [আবু দাউদ: ৪৩৪৭, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৯৩]

দ্বিতীয় রুকূ'

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾

১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার কর; আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿۱۶﴾

১৬. তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন[১] তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে?

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿۱۷﴾

১৭. অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী[২]!

---

(১) এর দ্বারা একথা বুঝায় যে, আল্লাহ উপরে থাকেন। এর সপক্ষে হাজারেরও বেশী দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে। মু'আবিয়া ইবন হাকাম আস-সুলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক দাসীকে খুব জোরে চড় মেরেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজটাকে নেহায়েত বড় অন্যায় হয়েছে বলে প্রকাশ করলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে স্বাধীন করে দেব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি দাসীটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসলে তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। [আবু দাউদ:৩২৮২]

(২) সাবধানবাণী মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

১৮. আর এদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)।

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্‌ই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾

২০. দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা তো রয়েছে প্রবঞ্চনার মধ্যে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾

২১. এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে[১]?

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

২৩. বলুন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

---

(১) এখানে কেয়ামতের মাঠে কাফের ও মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের মাঠে কাফেররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। [ইবন কাসীর,বাগভী] হাদীসে এসেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের ওপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? [বুখারী: ৪৭৬০, মুসলিম: ২৮০৬]

২৪. বলুন, 'তিনিই যমীনে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।'

قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. বলুন, 'এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই কাছে আছে, আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

২৭. অতঃপর তারা যখন তা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের চেহারা ম্লান হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, 'এটাই হল তা, যা তোমরা দাবী করেছিলে।'

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও--- যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদেরকে কে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৯. বলুন, 'তিনিই রহমান, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৬৮- সূরা আল-কালাম
৫২ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٓنٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ①

১. নূন---শপথ কলমের[১] এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার,

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ②

২. আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ③

৩. আর নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ④

৪. আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন[২]।

---

(১) মুজাহিদ বলেন, কলম মানে যে কলম দিয়ে যিক্‌র অর্থাৎ কুরআন মজীদ লেখা হচ্ছিলো। [কুরতুবী] কলম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেন, "সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম বলল, কি লিখব? তখন আল্লাহ্ বললেন, যা হয়েছে এবং যা হবে তা সবই লিখ। কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির তাকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।" [মুসলিম: ২৬৫৩, তিরমিযী: ২১৫৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৯] কুরআনের অন্যত্রও এ কলমের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "তিনি (আল্লাহ্) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন"। [সূরা আল-আলাক: ৪]।

(২) আয়াতে উল্লেখিত, "মহৎ চরিত্র" এর অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ দ্বীন। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে ইসলাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো দ্বীন নেই। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, স্বয়ং কুরআন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর "মহৎ চরিত্র"। অর্থাৎ কুরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "মহৎ চরিত্র" বলে কুরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কুরআন শিক্ষা দিয়েছে। [কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেছেন, কুরআনই ছিলো তার

৫. অতঃপর অচিরেই আপনি দেখবেন এবং তারাও দেখবে---

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝٥

৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত[১]।

بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۝٦

৭. নিশ্চয় আপনার রব সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝٧

৮. কাজেই আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝٨

৯. তারা কামনা করে যে, আপনি আপোষকামী হোন, তাহলে তারাও আপোষকামী হবে,

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝٩

১০. আর আপনি আনুগত্য করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক শপথ কারী, লাঞ্ছিত,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۝١٠

১১. পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়[২],

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ۝١١

চরিত্র। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৯১] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো উহ! শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। আমার কোন কাজ দেখে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে কেন? কিংবা কোন কাজ না করলে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে না কেন? [বুখারী:৬০৩৮, মুসলিম: ২৩০৯] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তায় আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[মুসনাদে আহমাদ:২/৩৮১, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬৭০]

(১) مفتون শব্দের অর্থ এস্থলে বিকারগ্রস্ত পাগল। [বাগভী]

(২) কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে যারা "পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়" তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কঠিন সাবধানবাণী শোনানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

১২. কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

১৩. রূঢ় স্বভাব(১) এবং তদুপরি কুখ্যাত(২);

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

১৪. এজন্যে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾

১৫. যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, ‘এ তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কাহিনী মাত্র।’

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

১৬. আমরা অবশ্যই তার শুঁড় দাগিয়ে দেব।

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

১৭. আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি(৩), যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল,

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং তারা ‘ইন্‌শাআল্লাহ্’ বলেনি।

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

“কাত্তাত (যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায় সে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” [বুখারী: ৬০৫৬]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানাব না? প্রতিটি দূর্বল, যাকে লোকেরা দূর্বল করে রাখে বা দূর্বল হিসেবে চলে নিজের শক্তিমত্তার অহংকারে মত্ত হয় না, সে যদি কোন ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে শপথ করে বসে আল্লাহ্ সেটা পূর্ণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসীদের চরিত্র সম্পর্কে জানাব না? প্রতিটি রূঢ় স্বভাববিশিষ্ট মানুষ, প্রচণ্ড কৃপন, অহংকারী।” [বুখারী: ৪৯১৮]

(২) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, زنيم বলে এমন লোক উদ্দেশ্য যার কানের অনেকাংশ কেটে লটকে রাখা হয়েছে যেমন কোন কোন ছাগলের কানের কর্তিত অংশ লটকে থাকে। [বুখারী: ৪৯১৭]

(৩) অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদের পরীক্ষায় ফেলেছি। [কুরতুবী]

১৯. অতঃপর আপনার রবের কাছ থেকে এক বিপর্যয় হানা দিল সে উদ্যানে, যখন তারা ছিল ঘুমন্ত ।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾

২০. ফলে তা পুড়ে গিয়ে কালোবর্ণ ধারণ করল ।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

২১. প্রত্যূষে তারা একে অন্যকে ডেকে বলল,

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

২২. 'তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল তোমাদের বাগানে চল ।'

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. তারপর তারা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে,

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. 'আজ সেখানে যেন তোমাদের কাছে কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে ।'

أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম---এ বিশ্বাস নিয়ে বাগানে যাত্রা করল ।

وَّغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখতে পেল, তখন বলল, 'নিশ্চয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি ।'

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾

২৭. 'বরং আমরা তো বঞ্চিত ।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনো তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?'

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. তারা বলল, 'আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো যালিম ছিলাম ।'

قَالُوا سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. তারপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল ।	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. তারা বলল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী ।	قَالُوا يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾
৩২. সম্ভবতঃ আমাদের রব এ থেকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম ।'	عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর । যদি তারা জানত[১]!	كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৪. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত তাদের রবের কাছে ।	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٣٤﴾
৩৫. তবে কি আমরা মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব?	أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?	مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর---	أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. যে, নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?	إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾

---

(১) মক্কাবাসিদের ওপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর আযাব আসে, তখন এভাবেই আসে । দুনিয়ার এই আযাব আসার পরও তাদের আখেরাতের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং আখেরাতের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে । [দেখুন-কুরতুবী]

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. অথবা তোমাদের কি আমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তাই পাবে?

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে এ দাবির যিম্মাদার কে?

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

৪১. অথবা তাদের কি (আল্লাহ্‌র সাথে) অনেক শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের শরীকগুলোকে উপস্থিত করুক---যদি তারা সত্যবাদী হয়।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে(১), সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সিজ্‌দা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না;

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে ডাকা হত সিজ্‌দা করতে।

---

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, "যেদিন পায়ের গোছা উম্মোচিত করা হবে"। পায়ের গোছা উম্মোচিত করার এক অর্থ অবস্থা কঠিন হওয়াও হয়। আর তখন অর্থ হবে, যেদিন মানুষের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হবে। [বাগভী;ফাতহুল কাদীর] কিন্তু এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ হাদীসে স্পষ্ট এসেছে যে, এখানে মহান আল্লাহ্‌র "পায়ের গোছা" বোঝানো হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাদের রব তাঁর পায়ের গোছা" অনাবৃত করবেন, ফলে প্রতিটি মুমিন নর ও নারী তাঁর জন্য সিজদাহ করবেন। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে প্রদর্শনেচ্ছা কিংবা শুনানোর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করেছিল, তারা সিজদাহ করতে সক্ষম হবে না। তারা সিজদাহ করতে যাবে কিন্তু তাদের পিঠ বাঁকা হবে না।" [বুখারী: ৪৯১৯]

৪৪. অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না ।	فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ।	وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾
৪৬. আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়?	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾
৪৭. নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে!	أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, আর আপনি মাছওয়ালার ন্যায় হবেন না, যখন তিনি বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় আহ্বান করেছিলেন[১] ।	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছত তবে তিনি লাঞ্ছিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন উন্মুক্ত প্রান্তরে ।	لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾
৫০. অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করে তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন ।	فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

(১) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, মাছের পেটের এবং সাগরের পানির অন্ধকারে ইউনুস আলাইহিস সালাম উচ্চস্বরে এ বলে প্রার্থনা করলেনঃ তোমার পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই । আসলে আমি অপরাধী । আল্লাহ তা'আলা তার ফরিয়াদ গ্রহণ করলেন এবং তাকে এ দুঃখ ও মুসিবত থেকে মুক্তি দান করলেন । [সূরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮]

৫১. আর কাফিররা যখন কুরআন শোনে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়ে ফেলবে এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।'

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝٥١

৫২. অথচ তা[১] তো কেবল সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ।

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝٥٢

---

(১) এখানে 'তা' বলে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে কুরআন বোঝানো হয়েছে। তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে 'তা' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। অথচ দু'টি অর্থই এখানে হতে পারে। কুরআন যেমন সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য উপদেশ তেমনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য উপদেশ ও সম্মানের পাত্র। [কুরতুবী]

৬৯- সূরা আল-হাক্কাহ্[১]
৫২ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الحَاقَّةِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

اَلْحَاۤقَّةُ ①

২. কী সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

مَا الْحَاۤقَّةُ ②

৩. আর কিসে আপনাকে জানাবে সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ③

৪. সামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল ভীতিপ্রদ মহাবিপদ সম্পর্কে[২] ।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ④

৫. অতঃপর সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়কারী প্রচণ্ড চীৎকার দ্বারা ।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ⑤

৬. আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা[৩],

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑥

৭. যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিন বিরামহীনভাবে; তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন--- তারা

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑦

---

(১) الحاقة শব্দ দ্বারা কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর, বাগভী]

(২) القارعة শব্দটি قرع শব্দ থেকে উৎপন্ন। قرع শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় খট্‌খট শব্দ করা, হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ করা, কড়া নেড়ে শব্দ করা এবং একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস দিয়ে আঘাত করা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেবে, তাই একে قارعة বলা হয়েছে। তাছাড়া কিয়ামতের পূর্বাহ্নে যে মহাশব্দের মধ্যে তার সুত্রপাত হবে এখানে সেদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। [দেখুন-কুরতুবী]

(৩) ريح صرصر এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচন্ড বাতাস। [মুয়াসসার]

সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়।

৮. অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি বিদ্যমান দেখতে পান কি?

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝٨

৯. আর ফির‘আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল[১]।

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩

১০. অতঃপর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলেন ---কঠোর পাকড়াও।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল নিশ্চয় তখন আমরা তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে,

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝١١

১২. আমরা এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এজন্যে যে, যাতে শ্রুতিধর কান এটা সংরক্ষণ করে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝١٢

১৩. অতঃপর যখন শিংগায়[২] ফুঁক দেয়া হবে---একটি মাত্র ফুঁক[৩],

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

---

(১) مؤتفكات এর এক অর্থ উল্টে দেয়া, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। লুত আলাইহিস্ সালাম এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مؤتفكات বলা হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, صور কী? জবাবে তিনি বললেন, "শিং এর আকারে কোন বস্তুকে বলা হয় যাতে ফুঁক দেয়া হবে।" [তিরমিযী: ২৪৩০, আবু দাউদ: ৪৭৪২]

(৩) পবিত্র কুরআনের কোথাও কোথাও এ দুই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার কথা ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় গোটা বিশ্ব-জাহানের লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সূরা আল-হাজ্জের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ইয়াসীনের ৪৯ ও ৫০ আয়াতে এবং সূরা আত-তাকভীরের ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের চোখের

১৪. আর পর্বতমালা সহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় ওরা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে।

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾

১৫. ফলে সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা,

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

১৬. আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফলে সেদিন তা দুর্বল-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

১৭. আর ফেরেশ্‌তাগণ আসমানের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশ্‌তা আপনার রবের 'আর্‌শকে ধারণ করবে তাদের উপরে।

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৮. সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কোন গোপনই আর গোপন থাকবে না।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৯. তখন যাকে তার 'আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'লও, আমার 'আমলনামা পড়ে দেখ[১];

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾

২০. 'আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।'

اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

সামনে ঘটতে থাকবে। পক্ষান্তরে সূরা ত্বা-হার ১০২ থেকে ১১২ আয়াত, সূরা আল-আম্বিয়ার ১০১ থেকে ১০৩ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াত এবং সূরা ক্বাফ এর ২০ থেকে ২২ আয়াতে শুধু শিংগায় দ্বিতীয়বার ফুৎকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(১) هاؤم শব্দের এক অর্থ, আস। অন্য অর্থ, লও। উদ্দেশ্য এই যে, আমলনামা ডানহাতে পাওয়ার সাথে সাথেই তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদের তা দেখাবে। সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে, লও আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "সে আনন্দচিত্তে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে" [সূরা আল-ইনশিকাক: ৯]

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২১. কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন;

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২২. সুউচ্চ জান্নাতে

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৪. বলা হবে, 'পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।'

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৫. কিন্তু যার 'আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার 'আমলনামা,

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

২৭. 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

২৮. 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾

২৯. 'আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়েছে।'

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾

৩০. ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে, 'ধর তাকে, তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾

৩১. 'তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ কর।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾

৩২. 'তারপর তাকে শৃংখলিত কর এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত'[১],

---

(১) অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে, এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। এ শিকল সংক্রান্ত এক বর্ণনা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৩৩. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ছিল না,

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۝٣٣

৩৪. আর মিসকীনকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না,

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣٤

৩৫. অতএব এ দিন তার কোন সুহৃদ থাকবে না,

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ۝٣٥

৩৬. আর কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া,

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝٣٦

৩৭. যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না।

لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ ۝٣٧

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৮. অতএব আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও,

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝٣٨

৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না তারও;

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝٣٩

৪০. নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের (বাহিত) বাণী[১]।

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝٤٠

৪১. আর এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা খুব অল্পই ঈমান পোষণ করে থাক,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝٤١

৪২. এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٤٢

বলেন, "যদি এ শিকলের একটি গ্রন্থি আসমান থেকে দুনিয়াতে পাঠানো হয় তবে (অতি ভারী হওয়ার কারণে) রাতের আগেই যমীনে এসে পড়বে। যদিও আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। আর সেটা যদি শিকলের মাথার অংশ হয় (অর্থাৎ আরো বড় ও ভারী হয়) তারপর যদি তা জাহান্নামে ফেলা হয় তবে সেটা তার নিম্নভাগে পৌঁছতে চল্লিশ বছর লাগবে"। [তিরমিযী: ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৯৭]

(১) এখানে সম্মানিত রাসূল মানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। [কুরতুবী]

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এটা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾

৪৪. তিনি যদি আমাদের নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন,

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. তবে অবশ্যই আমরা তাকে পাকড়াও করতাম ডান হাত দিয়ে[১],

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা,

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাঁকে রক্ষা করতে পারে।

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর এ কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে,

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾

৫১. আর নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

৫২. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

---

(১) উপরোক্ত অর্থ অনুসারে এটি সিফাতের আয়াত। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ডান হাত সাব্যস্ত হচ্ছে। [ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ ৩/৩৩৮] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, আমরা তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। উভয় অর্থই ইবন কাসীর উল্লেখ করেছেন। এ অর্থটি এদিক দিয়ে শুদ্ধ যে, সাধারণত কাউকে অপমান করতে হলে তার ডান হাত ধরে তার উপর আক্রমন করা হয়। [ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ২/৮৯৮] অপর অর্থ হচ্ছে, তাকে আমরা আমাদের ক্ষমতা দ্বারা পাকড়াও করতাম। [সা'দী; জালালাইন; আর দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আস-সারেমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল: ১৭] এটি শুদ্ধ হলেও আল্লাহ্‌র হাত অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যা অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

৭০- সূরা আল-মা'আরিজ
৪৪ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝١

১. এক ব্যক্তি চাইল, সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত(১)---

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝٢

২. কাফিরদের জন্য, এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই(২) ।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝٣

৩. এটা আসবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, যিনি ঊর্ধ্বারোহনের সোপানসমূহের অধিকারী(৩) ।

---

(১) سَأَلَ শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধান ও জিজ্ঞেস করার অর্থে আসে। তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয়। সে অনুসারে আয়াতের অর্থ হলো একজন জিজ্ঞেসকারী জানতে চেয়েছে যে, তাদেরকে যে আযাব সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে তা কার ওপর আপতিত হবে? আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন এই বলে যে, তা কাফেরদের ওপর পতিত হবেই। আবার কখনও এ শব্দটি আবেদন ও কোন কিছু চাওয়া বা দাবী করার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে باء অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর] অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এসেছে, নদর ইবনে হারেস এই আযাব চেয়েছিল। [নাসায়ী: তাফসীর ২/৪৬৩, নং ৬৪০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০২] সে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ করতে গিয়ে ধৃষ্টতাসহকারে আল্লাহ তা'আলার কাছে আযাব চেয়েছিল। এটি ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো অনেক স্থানে মক্কার কাফেরদের এ চ্যালেঞ্জেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছেন তা নিয়ে আসছেন না কেন? যেমন, সূরা ইউনুস: ৪৬-৪৮; সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৬-৪১; সূরা আন-নামল: ৬৭-৭২; সূরা সাবা: ২৬-৩০; ইয়াসীন: ৪৫-৫২ এবং সূরা আল-মূলক: ২৪-২৭।

(২) এখানে কাফেরদের উপর আযাব আসার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফেরদের জন্যে দুনিয়াতে কিংবা আখেরাতে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এ আযাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসবে যিনি অবস্থান, সম্মান ও ক্ষমতা সর্বদিক থেকেই সবার উপরে। [সা'দী]

(৩) আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ﴿ذِى الْمَعَارِجِ﴾ অর্থ যিনি সুউচ্চ স্থানে আরশের

৪. ফেরেশ্‌তা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়[১] এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর[২] ।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

উপর আছেন; উচ্চতার অধিকারী, আবার ক্ষমতা, সম্মতি প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তিনি সবার উপরে। তার কাছে কোন কিছু পৌঁছার জন্য উপরের দিকেই যায়। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই ঊর্ধ্বারোহনের সোপানসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও রূহুল আমীন অর্থাৎ জিবরাঈল আরোহন করেন। [মুয়াস্‌সার]

(২) আয়াতের অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. মুজাহিদ বলেন, এখানে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে আরশ থেকে সর্বনিম্ন যমীনের দূরত্ব বোঝানো হয়েছে, কিয়ামতের দিনের পরিমাণ বোঝানো হয়নি। দুই. ইকরিমা বলেন, এখানে দুনিয়ার জীবনের পরিমাণ বোঝানো উদ্দেশ্য। তিন. মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেন, এখানে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী সময় বোঝানো উদ্দেশ্য। চার. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে কিয়ামত দিবসের পরিমাণই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমান পঞ্চাশ হাজার বছর। আর এ মতটির পক্ষে বিভিন্ন হাদীসও প্রমাণবহ। বিভিন্ন হাদীসেও কিয়ামত দিবসের পরিমাণকে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, যাকাত না প্রদানকারীকে শাস্তির মেয়াদ বর্ণনার হাদীসে বলা হয়েছে যে, "তার এ শাস্তি চলতে থাকবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, তারপর তার ভাগ্য নির্ধারণ হবে হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে"। [মুসলিম: ৯৮৭, আবু দাউদ: ১৬৫৮, নাসায়ী: ২৪৪২, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৮৩] [কুরতুবী] তাছাড়া অন্য হাদীসে ﴿يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ "যে দিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের সামনে!" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:৬] এ আয়াতের তাফসীরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তা হবে এমন একদিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, তারা তাদের কান পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে"। [মুসনাদে আহমাদ:২/১১২] সুতরাং এখানে কিয়ামত দিবসের পরিমাণই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা লোকভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হবে। কাফেরদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। কিন্তু ঈমানদারের জন্য তা এত দীর্ঘ হবে না। হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ "আমার প্রান যে সত্তার হাতে, তার শপথ করে বলছি এই দিনটি মুমিনের জন্য একটি ফরয সালাত আদায়ের সময়ের চেয়েও কম হবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৭৫] অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে "এই দিনটি মুমিনদের জন্যে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/১৫৮, নং ২৮৩]

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর অথচ

৫.	কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন পরম ধৈর্য ।	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝
৬.	তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর,	اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝
৭.	কিন্তু আমরা দেখছি তা আসন্ন[১] ।	وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝
৮.	সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত	يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

অন্য আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ﴿يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ﴾ "আল্লাহ তা'আলা কাজ-কর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান।" [সূরা আস-সাজদাহ:৫] বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক সালাতের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘন্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন মুফাসসির বলেন, সেই আয়াতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন যা মানুষ অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সে হিসেবে বলা যায় যে, সূরা আল-মা'আরিজে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার বছর সময় কিয়ামতের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে। আর সূরা আস-সাজদাহ বর্ণিত এক হাজার বছর সময় আসমান ও যমীনের মধ্যকার চলাচলের সময় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ে কোন বৈপরিত্ব নেই। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর, সূরা আস-সাজদা, আয়াত নং ৫; তাবারী, সূরা আস-সাজদা, আয়াত নং ৫]

(১) কারও কারও মতে এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি; সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তীতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে তারা কেয়ামতের বাস্তবতা বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত। [দেখুন, কুরতুবী]

৯. এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত,	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩
১০. এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না,	وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠
১১. তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে,	يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ ۝١١
১২. আর তার স্ত্রী ও ভাইকে,	وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝١٢
১৩. আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত,	وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـْٔوِيهِ ۝١٣
১৪. আর যমীনে যারা আছে তাদের সবাইকে, তারপর যাতে এটি তাকে মুক্তি দেয়।	وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝١٤
১৫. কখনই নয়, নিশ্চয় এটা লেলিহান আগুন,	كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥
১৬. যা মাথার চামড়া খসিয়ে দেবে(১)।	نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۝١٦
১৭. জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পিঠ দেখিয়েছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।	تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٧
১৮. আর যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল অতঃপর সংরক্ষিত করে রেখেছিল(২)।	وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝١٨

(১) لظى শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شوى শব্দটি شواة এর বহুবচন। অর্থ মাথার চামড়া। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, যা মস্তিস্ক বা হাত পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে। [ইবন কাসীর, মুয়াসসার]

(২) এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে অস্বীকার করে; তা কাজে পরিণত করা থেকে বিরত থাকে এবং ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে তা পুঞ্জীভূত করে আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। [ইবন কাসীর]

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে[১]। إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী। إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

২১. আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ; وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

২২. তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া[২], إِلَّا الْمُصَلِّينَ

২৩. যারা তাদের সালাতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত[৩], الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

---

(১) هلوع এর শাব্দিক অর্থ ভীষণ লোভী ও অতি ভীরু ব্যক্তি। [কুরতুবী] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এখানে অর্থ নিয়েছেন সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদ লোভ করে। সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ কৃপণ। মুকাতিল বলেন, এর অর্থ সংকীর্ণমনা ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং আল্লাহ্ই কুরআনে এর পরবর্তী দু' আয়াতে এ শব্দের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। [বাগাভী] এখানে মানুষের খারাপ কর্মকাণ্ড ও স্বভাব উল্লেখ করে বলেন যে, সে "যখন দুঃখ কষ্ট সম্মুখীন হয়, তখন হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে কোন সুখ শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়।"। অতঃপর সাধারণ মানুষদের এই বদ-অভ্যাস থেকে সৎকর্মী সালাত আদায়কারী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা এরূপ সৎকর্ম করে, তারা অতিশয় ভীরু ও লোভী নয়। [তাবারী]

(২) আয়াতে সালাত আদায়কারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে সালাত আদায়কারী সর্বদা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী। এখানে সালাত প্রতিষ্ঠার অর্থ ইবনে মাসউদ, মাসরুক ও ইবরাহীম নাখ'য়ী এর মতে, সালাতকে তার ওয়াক্তে ফরয-ওয়াজিব খেয়াল রেখে আদায় করা। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে সালাত প্রতিষ্ঠার অর্থ, সমগ্র সালাতেই সালাতের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা; এদিক সেদিক না তাকানো। সাহাবী ওকবা ইবনে আমের বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সালাতের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে বামে ও আগে পিছে তাকায় না। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে প্রবেশ করে এক মহিলা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলা কে? তিনি বললেন, অমুক (অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার নাম ছিল হাওলা বিনতে তুয়াইত) তারপর তিনি তার প্রচুর সালাত আদায়ের কথা বলছিলেন - তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, থাম, তোমরা যা (সব সময়) করতে সক্ষম হবে

২৪. আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝

২৫. যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের,

لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

২৬. আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

২৭. আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত---

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝

২৮. নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না;

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ ۝

২৯. আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী(১),

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

৩০. তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না---

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

ততটুকুই নিজের উপর ঠিক করে নিবে। আল্লাহ্‌র শপথ, যতক্ষণ তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হবে না ততক্ষণ আল্লাহ্‌ও দিতে ক্ষান্ত হবেন না।" আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেই কাজটি সবচেয়ে প্রিয় ছিল যা কেউ সব সময় করে। [বুখারী: ৪৩, মুসলিম: ৭৮৫, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৫১, ২৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাস ব্যতীত আর কোন মাসে এত বেশী সাওম পালন করতেন না। তিনি পুরো শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন। তিনি বলতেন, "তোমরা যে কাজ (সর্বদা) করতে সক্ষম হবে তাই করবে; কেননা, তোমরা বিরক্ত হলেও আল্লাহ্ (প্রতিদান প্রদানে) ক্ষান্ত হন না।" (অথবা হাদীসের অর্থ, তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ বিরক্ত হন না। তখন বিরক্ত হওয়া আল্লাহর একটি গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে, তবে যেভাবে তা তাঁর সম্মানের সাথে উপযোগী সেভাবে তা সাব্যস্ত করতে হবে। [মাজমূ' ফাতাওয়া ইবন উসাইমীন: ১/১৭৪]) আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সে সালাতই সবচেয়ে প্রিয় ছিল যার আদায়কারী তা সর্বক্ষণ করতে থাকত। যদিও তার পরিমাণ কম হয়। তিনি নিজেও কোন কাজ করলে সেটা সব সময় করতেন।" [বুখারী: ১৯৭০]

(১) লজ্জাস্থানের হিফাযতের অর্থ ব্যভিচার না করা এবং উলঙ্গপনা থেকেও দূরে থাকা, অনুরূপ যাবতীয় বেহায়াপনাও এর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন: সা'দী]

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

৩১. তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালজ্ঘনকারী---

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

৩২. আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী[১],

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝

৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল[২],

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

৩৪. আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে---[৩]

---

(১) আমানত কেবল সে অর্থকেই বলে না যা কেউ কারো হাতে সোপর্দ করে, বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা দায়িত্ব ফরয, সেগুলো সবই আমানত; এগুলোতে ত্রুটি করা খিয়ানত। এতে সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে যেসব হক নিজের উপর কেউ ওয়াজিব করে নিয়েছে সেগুলোও শামিল রয়েছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ত্রুটি করা খিয়ানতের অর্ন্তভুক্ত। অনুরূপভাবে عهدهم বা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি মানে বান্দা আল্লাহর সাথে যে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এবং মানুষ পরস্পরের সাথে যেসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এ উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। এ উভয় প্রকার আমানত এবং উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একজন মুমিনের চরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। [দেখুনঃ তাবারী]

(২) অর্থাৎ, তারা যা জানে তাই সাক্ষ্য দেয়, কোন প্রকার পরিবর্ধন-পরিমার্জন বা পরিবর্তন ব্যতীত সাক্ষ্য দেয়; আর এ সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন থাকে তার লক্ষ্য। [সা'দী]

(৩) এ থেকে সালাতের গুরুত্ব বুঝা যায়। যে ধরনের উন্নত চরিত্র ও মহৎ কর্মশীল লোক জান্নাতের উপযুক্ত তাদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে সালাত দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং সালাত দিয়েই শেষ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] তাদের প্রথম গুণ হলো, তারা হবে সালাত আদায়কারী। দ্বিতীয় গুণ হলো তারা হবে সালাতের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বশেষ গুণ হলো, তারা সালাতের হিফাযত করবে। সালাতের হিফাযতের অর্থ অনেক কিছু। যথা সময়ে সালাত পড়া, দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র আছে কিনা সালাতের পূর্বেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, অযু থাকা এবং অযু করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভালভাবে ধোয়া, সালাতের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো ঠিকমত আদায় করা, সালাতের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি মেনে চলা, আল্লাহর নাফরমানী করে সালাতকে ধ্বংস না করা, এসব বিষয়ও সালাতের হিফাযতের অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

৩৫. তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতসমূহে।	أُولَٰٓئِكَ فِي جَنَّٰتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾
দ্বিতীয় রুকূ'	
৩৬. কাফিরদের হল কি যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে,	فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. ডান ও বাম দিক থেকে, দলে দলে।	عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?	أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾
৩৯. কখনো নয়[১], আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে[২]।	كَلَّآ ۖ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. অতএব আমি শপথ করছি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের রবের— অবশ্যই আমরা সক্ষম[৩]	فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ ﴿٤٠﴾

(১) অর্থাৎ তারা যা মনে করে, যা ইচ্ছা করে, ব্যাপার আসলে তা নয়। [সা'দী]

(২) বুসর ইবনে জাহহাস আল-কুরাশী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ * عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ * أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ * كَلَّآ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তারপর তার হাতের তালুতে থুথু ফেলে বললেন, আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! কিভাবে তুমি আমাকে অপারগ করবে? অথচ তোমাকে আমি এর (থুথুর) মত বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর অবয়ব দান করে সৃষ্টি করেছি তখন তুমি দুটি দামী মূল্যবান চাদরে নিজেকে জড়িয়ে যমীনের উপর এমনভাবে চলাফেরা করেছ যে, যমীন কম্পিত হয়েছে, তারপর তুমি সম্পদ জমা করেছ, তা থেকে দিতে নিষেধ করেছ। শেষ পর্যন্ত যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বল, আমি দান-সদকা করব! তখন কি আর সদকার সময় বাকী আছে?! [ইবনে মাজাহ: ২৭০৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০২]

(৩) এখানে মহান আল্লাহ নিজেই নিজের সত্তার শপথ করেছেন। "উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহ" এ শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, গোটা বছরের আবর্তন কালে সূর্য প্রতিদিনই একটি নতুন কোণ থেকে উদিত হয় এবং একটি নতুন কোণে অস্ত যায়। তাছাড়াও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্রমাগত উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। এ হিসেবে সূর্যের উদয় হওয়ার ও অস্ত যাওয়ার স্থান একটি নয়,

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

৪১. তাদের চেয়ে উৎকৃষ্টদেরকে তাদের স্থলবর্তী করতে এবং এতে আমরা অক্ষম নই।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. অতএব তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন- যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয় তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত।

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে

خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সে দিন, যার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তাদেরকে।

অনেক। আরেক হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের তুলনায় একটি দিক হলো পুর্ব এবং আরেকটি দিক হলো পশ্চিম। তাই কোন কোন আয়াতে مشرق ও مغرب শব্দ একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। [সূরা আশ- শু'আরা: ২৮, ও সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল:১৯] আরেক বিচারে পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল এবং দু'টি অস্তাচল আছে। কারণ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য অস্ত যায় তখন অপর গোলার্ধে উদিত হয়। এ কারণে কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে مشرقين ও مغربين [সূরা আর-রাহমান:১৭] [দেখুন: আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

৭১- সূরা নূহ্
২৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ نُوْحٍ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নিশ্চয় আমরা নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশসহ যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে সতর্ক করুন তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে ।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

২. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী---

قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②

৩. 'এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর, আর আমার আনুগত্য কর[১];

أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ③

৪. 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন[২] এবং

يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ

---

(১) নূহ আলাইহিস সালাম তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের শুরুতেই তার জাতির সামনে তিনটি বিষয় পেশ করেছিলেন । এক, আল্লাহর দাসত্ব, দুই, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং তিন, রাসূলের আনুগত্য ।প্রথমেই ছিল আল্লাহর অবাধ্যতা না করার আহ্বান,কারণ তাঁর অবাধ্য হলে আযাব অনিবার্য । তারপর তাকওয়ার আহ্বান । যার মাধ্যমে রাসূলকে মেনে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান রয়েছে । তারপর রয়েছে রাসূলের আনুগত্যের আহ্বান । তিনি যা করতে আদেশ করেন তাই করা যাবে আর যা করতে নিষেধ করেন তা-ই ত্যাগ করতে হবে । [মুয়াসসার]

(২) مِن অব্যয়টি প্রায়শঃ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার জন্যে ব্যবহৃত হয় । এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ মাফ হয়ে যাবে । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কিত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে । কেননা বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্যে ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে । তা এই যে হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে; যেমন আর্থিক দায় দেনা এবং আদায় যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট

مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত করা হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে!'

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾

৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত ডেকেছি,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

৬. 'কিন্তু আমার ডাক তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾

৭. 'আমি যখনই তাদেরকে ডাকি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়েছে নিজেদেরকে[২] এবং জেদ করতে থেকেছে, আর খুবই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।

দেয়া। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে من অব্যয়টি বর্ণনাসূচক। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) উদ্দেশ্য এই যে তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন আযাবে ধ্বংস করবেন না। [সা'দী]

(২) মুখ ঢাকার একটি কারণ হতে পারে, তারা নূহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য শোনা তো দূরের কথা তার চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না। [মুয়াসসার] আরেকটি কারণ হতে পারে, তারা তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ঢেকে চলে যেতো যাতে তিনি তাদের চিনে কথা বলার কোন সুযোগ আদৌ না পান। [ইবন কাসীর] মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ধরনের আচরণ করছিলো সেটিও ছিল অনুরূপ একটি আচরণ। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তাদের এ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে "দেখ, এসব লোক তাদের বক্ষ ঘুরিয়ে নেয় যাতে তারা রাসূলের চোখের আড়ালে থাকতে পারে। সাবধান! যখন এরা কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে আড়াল করে তখন আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোও জানেন এবং গোপন বিষয়গুলোও জানেন। তিনি তো মনের মধ্যকার গোপন কথাও জানেন।" [সূরা হূদ: ৫]

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾

৮. 'তারপর আমি তাদেরকে ডেকেছি প্রকাশ্যে

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾

৯. 'পরে আমি তাদের জন্য উচ্চস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি অতি গোপনে।'

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

১০. অতঃপর বলেছি, 'তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

১১. 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

১২. 'এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা(১)।

---

(১) একথাটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের জীবনকে শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও সংকীর্ণ করে দেয়। অপর পক্ষে কোন জাতি যদি অবাধ্যতার বদলে ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার পথ অনুসরণ করে তাহলে তা শুধু আখেরাতের জন্যই কল্যাণকর হয় না, দুনিয়াতেও তার ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো।" [সূরা ত্বা-হা ১২৪] আরও বলা হয়েছে, "আহলে কিতাব যদি তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত 'তাওরাত', ইঞ্জীল' ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধানাবলী মেনে চলতো তাহলে তাদের জন্য ওপর থেকেও রিযিক বর্ষিত হতো এবং নীচ থেকেও ফুটে বের হতো।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৬] আরও বলা হয়েছেঃ "জনপদসমূহের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। [সূরা আল-আ'রাফ: ৯৬] অনুরূপভাবে হূদ আলাইহিস সালাম তার কওমের লোকদের বললেন, "হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তার দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবেন।" [সূরা হূদ: ৫২]

১৩. 'তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না[১]!

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝

১৪. 'অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে[২],

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে মক্কার লোকদের সম্বোধন করে সেখানে আরও বলা হয়েছে "আর তোমরা যদি তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আস তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন।" [সূরা হূদ:৩] এ থেকে আলেমগণ বলেন যে, গোনাহ্‌ থেকে তাওবাহ ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না। এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। সালফে সালেহীনও বৃষ্টির জন্য সালাতের সময় এ পদ্ধতির প্রতি জোর দিতেন। কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে একবার দুর্ভিক্ষের সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্য দো'আ করতে বের হলেন এবং শুধু ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেই শেষ করলেন। সবাই বললো, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো আদৌ দো'আ করলেন না। তিনি বললেন, আমি আসমানের ঐ সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখানে থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। একথা বলেই তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো তাদের পাঠ করে শুনালেন। অনুরূপ একবার এক ব্যক্তি হাসান বাসরীর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্রের অভিযোগ করলো। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো, আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বললো, আমার ফসলের মাঠে ফলন খুব কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। লোকেরা বললো, কি ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও সম্মানে পরোয়া করছ না, তবুও তাঁকে তোমরা এতটুকু ভয়ও করো না যে, এ জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দিবেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানো হয়েছে। প্রথমে বীর্য আকারে, মাতৃগর্ভে, দুগ্ধপানরত অবস্থায়, অবশেষে তোমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছ। এসব পর্যায় প্রতিটিই মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। যিনি এগুলো সৃষ্টি করেন, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। আর তিনিই মৃত্যুর পর তাদেরকে পনরুত্থিত করতে সক্ষম। [সা'দী]

১৫. ‘তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে?

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

১৬. ‘আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে;

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

১৭. ‘তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে[১]

وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

১৮. ‘তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং পরে নিশ্চিতভাবে বের করে নিবেন,

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

১৯. ‘আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিস্তৃত---

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾

২০. ‘যাতে তোমরা সেখানে চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে ।’

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ’

২১. নূহ্ বলেছিলেন, ‘হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি[২] ।’

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

২২. আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে[৩];

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

---

(১) অর্থাৎ মাটিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার মত তোমাদেরকে মাটির উপাদান থেকে উৎপন্ন ও উদ্ভূত করেছেন । [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তারা আমার অবাধ্য হয়েছে । তারা সমাজের ধনী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের অনুসরণ করেছে । অথচ এ সমস্ত লোকদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না । [কুরতুবী]

(৩) ষড়যন্ত্রের অর্থ হলো জাতির লোকদের সাথে নেতাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা ।

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۚ

২৩. এবং বলেছে, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্‌, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাস্‌রকে[১]।

নেতারা জাতির লোকদের নূহ আলাইহিস সালামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা করতো। যেমন, তারা বলতো "তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের মতই একজন মানুষের নিকট তোমাদের রবের কাছ থেকে বাণী এসেছে?" [সূরা আল-আ'রাফ: ৬৩] "আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা না বুঝে শুনে নূহের আনুগত্য করছে। তার কথা যদি সত্যিই মূল্যবান হতো তাহলে জাতির নেতা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো।" [হূদ-২৭] "আল্লাহ যদি পাঠাতেই চাইতেন তাহলে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন।" [সূরা আল-মু'মিনূন, ২৪] এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হতেন, তাহলে তার কাছে সবকিছুর ভাণ্ডার থাকতো, তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতেন এবং ফেরেশতাদের মত সব রকম মানবীয় প্রয়োজন ও অভাব থেকে মুক্ত হতেন। [সূরা হূদ, ৩১] নূহ এবং তার অনুসারীদের এমন কি অলৌকিকত্ব আছে যার জন্য তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হবে? এ ব্যক্তি আসলে তোমাদের মধ্যে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। [সূরা আল-মুমিনূন, ২৫] প্রায় এ রকম কথা বলেই কুরাইশ নেতারা লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো।

(১) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ্‌ আলাইহিস্‌সালাম আরও বললেন, তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরা তো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ্‌ আলাইহিস্‌ সালাম এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পর এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, আমরা আমদের দেব-দেবীর বিশেষত: এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি মূর্তির নাম। হাদীসে এসেছে, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কালে ছিল আদম ও নূহ্‌ আলাইহিস্‌ সালাম এর আমলের মাঝামাঝি। তাদের নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত ও বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করলঃ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সমানে রেখে দাও তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং সমপূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল, তোমাদের

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾

২৪. 'বস্তুত তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; কাজেই আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না[১]।'

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

২৫. তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকেও সাহায্যকারী পায়নি।

পূর্বপুরুষের ইলাহ্‌ ও উপাস্য মুর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমা-পূজার সূচনা হয়ে গেল। [বুখারী: ৪৯২০] উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় তাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]
নূহের কওমের উপাস্যদের দেবীদের মধ্য থেকে এখানে সেসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তীকালে মক্কাবাসীরা যাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে; মহা প্লাবনে যেসব লোক রক্ষা পেয়েছিল পরবর্তী বংশধরগণ তাদের মুখ থেকে নূহ এর জাতির প্রাচীন উপাস্য দেব-দেবীদের নাম শুনেছিল এবং পরে তাদের বংশধরদের নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়লে তারা সেসব দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করেছিল। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] 'ওয়াদ্দ' ছিল 'কুদা'আ গোত্রের 'বনী কালব' শাখার উপাস্য দেবতা। 'দাওমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে তারা এর বেদী নির্মাণ করে রেখেছিল। 'সুওয়া' ছিল হুযাইল গোত্রের দেবী। 'ইয়াগুস' ছিল সাবার নিকট জুরুফ নামক স্থানে বনী গাতীফ -এর উপাস্য। 'ইয়াউক' ইয়ামানের হামদান গোত্রের উপাস্য দেবতা ছিল। 'নাসর' ছিল হিমইয়ার অঞ্চলের হিমইয়ার গোত্রের 'আলে যু-কিলা' শাখার দেবতা। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ এই যালেমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা রাসূলগণের কর্তব্য। নূহ্‌ আলাইহিস্‌ সালাম তাদের পথভ্রষ্টতার দো'আ করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্‌ আলাইহিস্‌ সালাম দীর্ঘকাল তাদের মাঝে থেকে বুঝে গিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনবে না। সেমতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। নূহ্‌ আলাইহিস্‌ সালাম তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেয়ার দো'আ করলেন যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। [দেখুন, আয়সারুত তাফাসীর]

২৬. নূহ্ আরও বলেছিলেন, 'হে আমার রব! যমীনের কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দেবেন না[১]।

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

২৭. 'আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির।

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৮. 'হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।'

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

---

(১) আয়াতটির এক অর্থ হচ্ছে, যমীনে বিচরণকারী কাফেরদের কাউকে রেহাই দিবেন না। [মুয়াসসার] অপর অর্থ আপনি যমীনের বুকে কোন গৃহবাসী কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। [জালালাইন] কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তিনি ঐ সময় পর্যন্ত তাদের উপর বদদো'আ করেননি যতক্ষণ তার কাছে ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ "যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তারা যা করে তার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না।" [সূরা হূদঃ ৩৬] এ বাণী তাকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তিনি স্পষ্টই জানতে পারলেন যে, তারা আর ঈমান আনবে না তখন তিনি এ দো'আ করেছিলেন। [কুরতুবী]

৭২- সূরা আল-জিন্
২৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْجِنِّ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا

১. বলুন[১], 'আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিন্‌দের[২] একটি দল

(১) হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে যে, এই ঘটনা তখনকার যখন শয়তানদেরকে আকাশে খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলাহ' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের এই প্রতিনিধিদল সালাতে কুরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগলঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল। আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রাসূলকে অবহিত করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণনা করেন এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেন নি। বরং তার কাছে জিনদের কথা ওহী করে শোনানো হয়েছিল মাত্র।" [বুখারীঃ ৪৯২১, মুসলিমঃ ৪৪৯]

(২) জিন আল্লাহ্ তা'আলার এক প্রকার শরীরী আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। জিন এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর। মানব সৃষ্টির প্রধান উপকরন যেমন মৃত্তিকা তেমনি জিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। পবিত্র কুরআনে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, তারা জিনদের দুষ্ট শ্রেনীর নাম। অধিকাংশ আলেমের মতে, সমস্ত জিনই শয়তানের বংশধর। তাদের মধ্যে কাফের ও মুমিন দু'শ্রেণী বিদ্যমান। যারা ঈমানদার তাদেরকে জিন বলা হলেও তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে শয়তান বলা হয়। তবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনেরা ভিন্ন প্রজাতি, তারা শয়তানের বংশধর নয়। তারা

سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ①

মনোযোগের সাথে শুনেছে[১] অতঃপর বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি[২],

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ②

২. 'যা সত্যের দিকে হেদায়াত করে; ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না,

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ③

৩. 'আর নিশ্চয়ই আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ[৩]; তিনি গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী এবং না কোন সন্তান।

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ④

৪. 'এও যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে খুবই অবান্তর উক্তি করত[৪]।

মারা যায়। তাদের মধ্যে ঈমানদার ও কাফির দু শ্রেণী রয়েছে। পক্ষান্তরে ইবলীসের সন্তানদেরকে শয়তান বলা হয়, তারা ইবলীসের সাথেই মারা যাবে, তার আগে নয়। [দেখুন, কুরতুবী; ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার: আলামুল জিন ওয়াশ-শায়াতিন]

(১) এ থেকে জানা যায় যে; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় জিনদের দেখতে পাচ্ছিলেন না এবং তারা যে কুরআন শুনছে একথাও তার জানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস স্পষ্টভাবে বলেছেন যে; সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি। [মুসলিম, ৪৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৬৫২৬, তিরমিযী: ৩৩২৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫২]

(২) জিনদের উক্তির অর্থ হলো, আমরা এমন একটি বাণী শুনে এসেছি যা ভাষাগত উৎকর্ষতা, বিষয়বস্তু, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিধান ইত্যাদিতে বিস্ময়কর ও অতুলনীয়। [মুয়াসসার]

(৩) جدّ শব্দের অর্থ শান অবস্থা, মান-মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে বলা হয় وتعالى جدّه অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শান, মান-মর্যাদা, অনেক ঊর্ধ্বে। [কুরতুবী]

(৪) شطط শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অতি-অন্যায় ও যুলুম। উদ্দেশ্য এই যে মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শির্কে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে, আমাদের

৫. 'অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলবে না ।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنۡ لَّنۡ تَقُوۡلَ الۡاِنۡسُ وَالۡجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ

৬. 'এও যে, কিছু কিছু মানুষ কিছু জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিয়েছিল[১] ।'

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الۡاِنۡسِ يَعُوۡذُوۡنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الۡجِنِّ فَزَادُوۡهُمۡ رَهَقًا ۙ

৭. 'এও যে, তারা ধারণা করেছিল যেমন তোমরা ধারণা কর[২] যে, আল্লাহ্ কাউকেও কখনো পুনরুত্থিত করবেন না[৩] ।'

وَّاَنَّهُمۡ ظَنُّوۡا كَمَا ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ لَّنۡ يَّبۡعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ

৮. 'এও যে, আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে

وَّاَنَّا لَمَسۡنَا السَّمَآءَ فَوَجَدۡنٰهَا مُلِئَتۡ

সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার শানে অবান্তর কথাবার্তা বলত । অথচ আমরা মনে করতাম না যে কোন মানব অথবা জিন আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে । তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শির্কে লিপ্ত ছিলাম । এখন কুরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে । [ফাতহুল কাদীর]

(১) জাহেলী যুগে আরবরা যখন কোন জনহীন প্রান্তরে রাত্রি যাপন করতো তখন উচ্চস্বরে বলতো, 'আমরা এ প্রান্তরের অধিপতি জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি' । এভাবে ভয় পেলে মানুষরা জিনের আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করত । ফলে জিনের আত্মম্ভরিতা বেড়ে যায় । আয়াতটির আরেকটি অর্থও হতে পারে, এভাবে আশ্রয়-গ্রহণের চেষ্টা করার পরও জিনরা মানুষদের উল্টো ভয় দেখাত । [সা'দী]

(২) আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে । এক. 'মানুষেরা ধারণা করেছিল, যেমন হে জিন সম্প্রদায় তোমরা ধারণা করেছিলে' । [মুয়াসসার] দুই. জিনরা ধারণা করেছিল, যেমন হে মানব সম্প্রদায় তোমরা ধারণা করেছিলে । [কুরতুবী] উভয় অর্থের মূল কথা হলো, মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টদের ধারণার বিপরীতে এ কুরআন এক স্বচ্ছ হিদায়াত নিয়ে এসেছে ।

(৩) এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে । একটি হলো, "মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা কাউকে আর জীবিত করে উঠাবেন না ।" যা উপরে বর্ণিত হয়েছে । অপরটি হলো, 'আল্লাহ কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না ।' [কুরতুবী] যেহেতু কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক তাই তার এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, মানুষের মত জিনদের মধ্যে একদল আখেরাতকে অস্বীকার করতো । কিন্তু পরবর্তী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যের দিক থেকে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ।

حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا ۝

পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ;

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

৯. ‘এও যে, আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম[১] কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝

১০. ‘এও যে, আমরা জানি না যমীনের অধিবাসীদের অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদের মঙ্গল চান[২]।

(১) জিনরা আসমানের সংবাদ শোনার জন্যে উপরের দিকে যেত। হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পর সে বিষয়ে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।” [বুখারী: ৪৭০১,৪৮০০]
সার কথা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নির্বিঘ্নে উপরে আরোহন করে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত লাভের সময় তার ওহীর হেফাযতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির জন্য উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে; কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল, অতঃপর ‘নাখলাহ্’ নামক স্থানে একদল জিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছে, ‘আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদের মংগল চান’। এ আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো, যখন অকল্যাণের কথা বলা হয়েছে তখন তার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ্র দিকে করা হয় নি, পক্ষান্তরে যখন

১১. 'এও যে, আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু সংখ্যক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী[১];

وَّأَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١

১২. 'এও যে, আমরা বুঝেছি, আমরা যমীনে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারব না এবং পালিয়েও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।

وَّأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢

১৩. 'এও যে, আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তাতে ঈমান আনলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না[২]।

وَّأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ۖ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣

১৪. 'এও যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম আর কিছু সংখ্যক আছে সীমালজ্ঘনকারী; অতঃপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নিয়েছে।

وَّأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤

কল্যাণের কথা বলা হয়েছে তখন তার সম্পর্ক করা হয়েছে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে। এর কারণ হচ্ছে, খারাপ ও অমঙ্গলের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দিকে করা বেআদবী। অকল্যাণ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বিষয় হলেও তা মানুষের হাতের অর্জন। আর যত কল্যাণ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিছক অনুগ্রহ। হাদীসেও বলা হয়েছে, "আর যাবতীয় কল্যাণ সবই আপনার হাতে পক্ষান্তরে কোন অকল্যাণকেই আপনার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না"। [মুসলিম: ৭৭১] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও ভাল ও মন্দ দু' প্রকারের জিন আছে এবং আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকেও মত ও পথ একটি নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। [সা'দী]

(২) بخس শব্দের অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেয়া এবং رهق শব্দের অর্থ যুলুম করা, অত্যাচার করা। উদ্দেশ্য এই যে মুমিনের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং আখেরাতে তার উপর যুলুম করে কিছু বাড়িয়ে দেওয়াও হবে না। [ইবন কাসীর]

১৫. 'আর যারা সীমালজ্ঘনকারী তারা তো হয়েছে জাহান্নামের ইন্ধন।'

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

১৬. আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রচুর বারি বর্ষণে সিক্ত করতাম,

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

১৭. যা দ্বারা আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

১৮. আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না(১)।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾

১৯. আর নিশ্চয় যখন আল্লাহ্‌র বান্দা(২) তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তখন তারা তার কাছে ভিড় জমাল।

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

---

(১) مساجد শব্দটি مسجد এর বহুবচন। মুফাস্‌সিরগণ শব্দটি সাধারণভাবে ইবাদাতখানা বা উপাসনালয় অর্থে গ্রহণ করেছেন। তখন আয়াতের এক অর্থ এই যে, মাসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদতের জন্যে নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না। সেগুলোতে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সাথে আর কারো ইবাদাত করো না। যেমন ইহুদী ও নাসারারা তাদের উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শির্ক করে থাকে। অনুরূপভাবে মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকেও পবিত্র রাখতে হবে। হাসান বাস্‌রী বলেন, সমস্ত পৃথিবীটাই ইবাদাতখানা বা উপাসনালয়। তাই আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর এ পৃথিবীতে কোথাও যেন শির্ক করা না হয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ইবাদাতের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।" [বুখারী: ৩৩৫, তিরমিযী:৩১৭] সাঈদ ইবনে জুবাইর এর মতে, মসজিদ বলতে যেসব অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ সিজদা করে সেগুলো অর্থাৎ হাত, হাঁটু, পা ও কপাল বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির অর্থ হলো, সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর তৈরী। এগুলোর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না। [কুরতুবী]

(২) এখানে 'আল্লাহর বান্দা' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [সা'দী]

দ্বিতীয় রুকূ'

২০. বলুন, 'আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না।'

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ۝٢٠

২১. বলুন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক নই।'

قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝٢١

২২. বলুন, 'আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমি কখনও কোন আশ্রয় পাব না[১],

قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ۝٢٢

২৩. 'শুধু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালতের বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে[২]।'

إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۝٢٣

২৪. অবশেষে যখন তারা যা প্রতিশ্রুত তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানতে

حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ

---

(১) অর্থাৎ আমি কখনো এ দাবী করি না যে; আল্লাহর প্রভুত্বে আমার কোন দখলদারী বা কর্তৃত্ব আছে, কিংবা মানুষের ভাগ্য ভাঙা বা গড়ার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা আছে। আমি তো আল্লাহর একজন রাসূল মাত্র। আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার অধিক আর কিছুই নয়। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপার তো পুরোপুরি আল্লাহরই করায়ত্ব। আমি যদি তাঁর নাফরমানি করি তবে তাঁর শাস্তির ভয় আমি করি। [সা'দী, ইবন কাসীর]

(২) এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি গোনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বরং যে প্রসঙ্গে একথাটি বলা হয়েছে তার আলোকে আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে আহ্বান জানানো হয়েছে তা যে ব্যক্তি মানবে না এবং শির্ককেও বর্জন করবে না আর কুফরী করবে, তার জন্য অবধারিত আছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। [দেখুন, সা'দী]

أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

পারবে কে সাহায্যকারী হিসেবে অধিকতর দুর্বল এবং সংখ্যায় স্বল্প।

قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৫. বলুন, 'আমি জানি না তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার রব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন।'

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬. তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না[১],

إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৭. তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন[২],

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾

২৮. যাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, অবশ্যই তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন[৩]। আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গণনা

(১) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলকে আদেশ করেছেন যে, যেসব অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে তাদেরকে বলে দিন, কেয়ামতের আগমন ও হিসাব নিকাশ নিশ্চিত; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন তারিখ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলেন নি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন, না আমার রব এর জন্যে দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন অহীর মাধ্যমে গায়েবী বিষয়ের কোন জ্ঞান তাঁর হেকমত অনুসারে তাঁর রাসূলের কাছে পাঠান তখন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্য চারপাশে প্রহরী মোতায়েন করেন। [সা'দী] আর এখানে প্রহরী বলতে ফেরেশ্তা উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রাসূল নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, ফেরেশতারা তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ ঠিক ঠিক পৌঁছিয়ে দিয়েছে। দুই, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, রাসূলগণ তাঁদের রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিকমত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] আয়াতটির শব্দমালা সবগুলো অর্থেরই ধারক।

করে হিসেব রেখেছেন[১]।

(১) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্ তা'আলারই গোচরীভূত। তিনি প্রত্যেকটি বস্তু বিস্তারিতভাবে জানেন, আর সব কিছুই তিনি হিসেব করে রেখেছেন, কোন কিছুই তার অজানা নয়। [মুয়াস্সার, কুরতুবী]

৭৩- সূরা আল-মুয্যাম্মিল
২০ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে বস্ত্রাবৃত!

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿۱﴾

২. রাতে সালাতে দাঁড়ান[১], কিছু অংশ ছাড়া,

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿۲﴾

৩. আধা-রাত বা তার চেয়েও কিছু কম।

نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿۳﴾

৪. অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে[২];

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ﴿۴﴾

---

(১) এখানে বিশেষভঙ্গিতে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কুরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল। এই আয়াতে তাহাজ্জুদের সালাত কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি সালাতে মশগুল থাকা। এই আদেশ পালনার্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের সালাতে ব্যয় করতেন। ফলে তাদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ ﴿فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ সালাতে দন্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ সালাত আদায় করা সহজ মনে হয়, ততক্ষণ সালাত আদায় করাই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। [ইমাম মুসলিম এই বিষয়বস্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হাদীস নং: ৭৪৬]

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, তারতীল সহকারে পড়তে হবে। ترتيل বলে উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। অর্থাৎ কুরআনের শব্দগুলো ধীরে ধীরে মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে। [ইবন কাসীর] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

৫. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরুভার বাণী[১]।

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন।" [বুখারী:৫০৪৬] উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রাহমানির রাহীম' বলে থামতেন। তারপর 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলে থামতেন। [মুসনাদে আহমাদ:৬/৩০২, আবু দাউদ:১৪৬৬, তিরমিযী:২৯২৭] হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দো'আর বিষয় আসছে সেখানে দো'আ করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। [মুসলিম:৭৭২] আবু যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাতের সালাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌঁছলেন "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ" তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।[মুসনাদে আহমাদ:৫/১৪৯] সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল। তাছাড়া, যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তার কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ্ তা'আলা শুনেন না। [বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪] তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্দারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। অনুরূপভাবে সুন্দর করে পড়াও এর অংশ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কুরআনকে সুন্দর স্বরে পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয়।" [বুখারী: ৭৫২৭] অন্য হাদীসে এসেছে, "তোমরা কুরআনকে তোমাদের সুর দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর" [ইবনে মাজাহ: ১৩৪২] আবু মুসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করতেন বিধায় রাসূল তার প্রশংসা করে বলেছিলেন, "তোমাকে দাউদ পরিবারের সুর দেয়া হয়েছে"। [বুখারী: ৫০৪৮, মুসলিম: ৭৯৩] তাছাড়া হাদীসে আরও এসেছে, "কিয়ামতের দিন কুরআনের অধিকারীকে বলা হবে, তুমি পড় এবং আরোহন করতে থাক। সেখানেই তোমার স্থান হবে যেখানে তোমার কুরআন পড়ার আয়াতটি শেষ হবে।" [আবু দাউদ: ১৪৬৪, তিরমিযী: ২৯১৪]

(১) এখানে ভারী বা গুরুতর বাণী বলে পবিত্র কুরআন বোঝানো হয়েছে। গুরুভার

৬. নিশ্চয় রাতের বেলার উঠা[১] প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর[২] এবং বাকস্ফুরণে অধিক উপযোগী[৩]।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝

বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা অনেক বেশী কঠিন ও গুরুতর কাজ। তাছাড়া এ জন্যও একে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। [বুখারী: ৭৭৫, ৫০৪৩] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। [বুখারী: ২] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তার ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/১১৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০৫] [ইবন কাসীর]

(১) ناشئة শব্দের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত আছে। একটি মত হলো, এর মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতে وطأً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা-সাধনা যা প্রবৃত্তির জন্য অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয় অর্থ হলো, রাত্রিবেলার সালাত দিনের সালাত অপেক্ষা অধিক স্থায়ী ও ফলপ্রসু। কেননা, দিনের বেলা মানুষের চিন্তা-চেতনা বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলা তা থেকে মুক্ত হয়। আরেকটি অর্থ হলো, ইবাদতকারী ব্যক্তিকে সক্রিয় রাখার পন্থা, কেননা রাত্রিবেলা বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও কাজ থেকে মুক্ত হওয়ায় সে সময়ে ইবাদতে নিবিষ্ট হওয়া যায়। [কুরতুবী]

(৩) أقوم শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। আর قيلاً শব্দের অর্থ কথা। তাই এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।' অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃপ্তি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন শরীফ পড়তে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিস্ক ব্যাকুল হয় না। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এর

৭. নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা(১) ।	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝
৮. আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তাঁর প্রতি মগ্ন হোন একনিষ্ঠভাবে(২) ।	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝
৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই আপনি গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে ।	رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

ব্যাখ্যা করেছেন "গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময় ।" [আবু দাউদ:১৩০৪]

(১) سبحاً শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা । এ কারণেই সাঁতার কাটাকে سباحة বলা হয় । এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার জন্য ঘোরাঘুরির কারণে অন্তরের ব্যস্ততা । দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে । [দেখুন, করতুবী; সা'দী]

(২) অর্থাৎ আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিবিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন । এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শির্ক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল । দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করাও এর অর্থের অন্তর্গত । কিন্তু এই تبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانية তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে । কেননা, শরীয়াতের পরিভাষায় رهبانية বা বৈরাগ্য এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমুহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা । পক্ষান্তরে এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া । এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর । রাসূলগণের সুন্নত; বিশেষতঃ রাসূলকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় । আয়াতে تبتل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, মূলত তা হলো সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা এবং এর মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া । [দেখুন, কুরতুবী]

১০. আর লোকে যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন(১)।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝١٠

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে ও বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে(২); এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন,

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝١١

১২. নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শৃংখলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝١٢

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি(৩)।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣

১৪. সেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ

---

(১) এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুকে ত্যাগ করা বা পরিহার করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফেররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। বরং সৌজন্যের সাথে তাদের পরিহার করে চলুন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। [কুরতুবী]

(২) এতে কাফেরদেরকে ﴿أُولِي النَّعْمَةِ﴾ বলা হয়েছে। نَعْمَة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির প্রাচুর্য। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অতঃপর আখেরাতের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে أنكال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾ এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য ضريع , غسلين ও زقوم এর অবস্থা তাই হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তাতে আগুনের কাঁটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। [কুরতুবী] শেষে বলা হয়েছে: ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক অন্যান্য শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑭

বালুকারাশিতে পরিণত হবে[১]।

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

১৫. নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির‘আউনের কাছে,

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ⑯

১৬. কিন্তু ফির‘আউন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا ⑰

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যে দিনটি কিশোরদেরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে,

ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا ⑱

১৮. সে-দিন আসমান হবে বিদীর্ণ[২]। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ⑲

১৯. নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক!

---

(১) সে সময় অতি শক্ত-মজবুত পাহাড়সমূহ দুর্বল হয়ে পড়বে, তাই প্রথমে তা মিহি বিক্ষিপ্ত বালুর স্তূপে পরিণত হবে। অতঃপর বালুর এ স্তূপ বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যাবে। [সা'দী] এরপর গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র অন্যত্র এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, "লোকেরা আপনাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমার রব পাহাড়সমূহকে ধুলির মত করে ওড়াবেন এবং ভূপৃষ্ঠকে এমন সমতল বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উঁচু নীচু বা ভাঁজ দেখতে পাবে না।" [সূরা ত্বা-হা:১০৫-১০৭]

(২) এখানে به শব্দের অর্থ করা হয়েছে, فيه বা 'সে দিন'। তাছাড়া এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, بسببه বা 'এর কারণে' বা له বা 'যে জন্য'। প্রতিটি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে প্রথমটিই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ সেদিনের ভয়াবহতা এমন যে, তাতে আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। [কুরতুবী]

দ্বিতীয় রুকূ'

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

২০. নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহ্‌ই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ[১]। তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না[২], তাই আল্লাহ্

(১) সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই সালাত অর্ধরাত্রির কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনুযায়ী যখন এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে সে নির্দেশ শিথিল ও সহজ করে দেয়া হলো। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) تحصوه এর মূল হলো إحصاء যার অর্থ গণনা করা। যেমন, পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ "আর তিনি (আল্লাহ্) সবকিছু সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন" [সূরা আল-জিন:২৮] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই সালাতে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। [দেখুনঃ কুরতুবী; সা'দী] আবার কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, إحصاء অর্থ কোন কিছু যথানিয়মে কাজে লাগানো বা সক্ষম হওয়া। সে হিসেবে এখানে ﴿لَّن تُحْصُوهُ﴾ শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যেকে যথারীতি সালাত পড়তে সক্ষম না হওয়া। [তাবারী] এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এসেছে, যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, من أحصاها دخل الجنة অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে।" [বুখারীঃ ৬৪১০, মুসলিমঃ ২৬৭৭]। এ অর্থের জন্য দেখুন, শারহুস সুন্নাহ লিল বাগভীঃ ৫/৩১; আল-আসমা ওয়াস সিফাত লিল বাইহাকীঃ ১/২৭; কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিস সাহীহাইন লি ইবনিল জাওযীঃ ৩/৪৩৫; তারহুত তাসরীব লিল ইরাকীঃ ৭/১৫৪; ফাতহুল বারী লি ইবন হাজারঃ ১/১০৬; সুবুলুস সালাম লিস সান'আনীঃ ২/৫৫৬।

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

তোমাদের ক্ষমা করলেন(১) । কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়, আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে । কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড় । আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর(২) এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ(৩) । তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র কাছে(৪) । তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার

(১) تاب শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা । গোনাহের তাওবাকেও এ কারণে তাওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে । কেউ কেউ বলেন, এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । [কুরতুবী]

(২) প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে । এ কারণে কোন কোন তাফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন । কিন্তু সঠিক মত হলো, যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে, এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) মূলত এখানে ফরয ও নফল দান-খায়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে । [সা'দী] আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে । কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমনঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি । [কুরতুবী]

(৪) এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে

হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র কাছে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দিয়েছো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উত্তারাধিকারীর অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।" তখন তিনি বললেনঃ 'তোমরা কি বলছো তা ভেবে দেখো।' লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। [বুখারী:৬৪৪২] [ইবন কাসীর]

৭৪- সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির[১]
৫৬ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত![২]

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١

২. উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন[৩],

قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢

৩. আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣

৪. আর আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤

---

(১) সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির সম্পুর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সুরাও বলেছেন। কিন্তু সহীহ্ বর্ণনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা আল-আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। [ইবন কাসীর]

(২) হাদীসে এসেছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফেরেশতা জিবরাইল আগমন করে ইকরা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার নিকট গমন করলেন এবং তার কাছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে "ফাতরাতুল ওহী" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন, একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক জায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল। [বুখারী:৪, মুসলিম: ১৬১]

(৩) এখানে সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে, قُمْ অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দন্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। أَنذر শব্দটি إنذار থেকে উদ্ভুত। অর্থ সতর্ক করা। এখানে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

করুন[১],

৫. আর শির্ক পরিহার করে চলুন[২], وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

৬. আর বেশী পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না[৩]। وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝

(১) এখানে বর্ণিত ثِيَاب শব্দটি ثوب এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। কখনও কখনও অন্তর, মন, চরিত্র ও কর্মকেও বলা হয়। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা। এর একটি অর্থ হল, আপনি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখুন। কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং 'রূহ' বা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। [সা'দী] একথাটির আরেকটি অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখুন। নিজেকে পবিত্র রাখুন। অন্য কথায় এর অর্থ হলো নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখুন এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে দূরে থাকুন। [কুরতুবী] সুতরাং নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্র থেকে মুক্ত রাখুন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে, ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ২২২] তাছাড়া হাদীসে 'পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ' [মুসলিম: ২২৩] বলা হয়েছে। তাই মুসলিমকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি, যেমন লোক-দেখানো, অহংকার ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে। [সা'দী]

(২) আয়াতে উল্লেখিত الرجز শব্দের এক অর্থ, শাস্তি। অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য কাজ। [ফাতহুল কাদীর] এখানে এর অর্থ হতে পারে, পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা পূজা। তাছাড়া সাধারণভাবে সকল গোনাহ ও অপরাধ বোঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। তাই আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা, শাস্তিযোগ্য কর্মকাণ্ড অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। সকল প্রকার ছোট ও বড় অন্যায় ও গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করুন। [সা'দী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, আপনি যার প্রতিই ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ করবেন, নিঃস্বার্থভাবে করবেন। আপনার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। ইহ্‌সান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাঙ্খাও করবেন না; বেশি পাওয়ার আশায়ও ইহ্‌সান করবেন না। দ্বিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব আপনি পালন করছেন এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবেন না; যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছেন কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় কাজ বলে কখনো মনে করবেন না এবং কোন সময় এ চিন্তাও যেন

৭. আর আপনার রবের জন্যেই ধৈর্য ধারণ করুন।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧

৮. অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে[১]

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨

৯. সেদিন হবে এক সংকটের দিন–

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝٩

১০. যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়[২]।

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١٠

১১. ছেড়ে দিন আমাকে ও যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী[৩]।

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝١١

১২. আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ[৪]

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝١٢

আপনার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করে আপনি আপনার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছেন। [দেখুনঃ কুরতুবী]

(১) ناقور শব্দের অর্থ শিংগা এবং نُقِرَ বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। এখানে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ তথা কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে জড়ো হওয়ার জন্য যে ফুঁক দেয়া হবে তা উদ্দেশ্য। [বাগভী, সা'দী]

(২) এ বাক্যটি থেকে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, সেদিনটি ঈমানদারদের জন্য হবে খুবই সহজ এবং এর সবটুকু কঠোরতা সত্যকে অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। [সা'দী]

(৩) একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। এক, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে সময় সে কোন প্রকার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং মর্যাদা ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না, সে একা ছিল। আমি তাকে সেসব দান করেছি। দুই, একমাত্র আমিই তার সৃষ্টিকর্তা। অন্য যেসব উপাস্যের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য সে আপনার দেয়া তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতায় এত তৎপর, তাদের কেউই তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমার সাথে শরীক ছিল না। [কুরতুবী]

(৪) কেয়ামত দিবস সকল কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে-একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তার নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। তার দশ বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইতিহাসে অনেক বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। [ইবন কাসীর] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা

১৩. এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ[১], | وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ

১৪. আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ– | وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ

১৫. এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই[২]! | ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ

১৬. কখনো নয়, সে তো আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী। | كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۭ

১৭. অচিরেই আমি তাকে চড়ার[৩] শাস্তি | سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۭ

মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণের মধ্যে তার বিশেষ বিশেষ উপাধি ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়। [কুরতুবী, বাগভী]

(১) এসব পুত্র সন্তানদের জন্য شهود শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রুযী রোজগারের জন্য তাদের দৌড় ঝাপ করতে বা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে কিংবা বিদেশ যাত্রা করতে হয় না। তাদের বাড়ীতে এত খাদ্য মজুদ আছে যে, তারা সর্বক্ষণ বাপের কাছে উপস্থিত থাকে বরং তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। [ইবন কাসীর] দুই, তার সবগুলো সন্তানই নামকরা এবং প্রভাবশালী, তারা বাপের সাথে দরবার ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকে। [কুরতুবী]

(২) একথার একটি অর্থ হলো, এসব সত্ত্বেও তার লালসা ও আকাঙ্খার শেষ নেই। এত কিছু লাভ করার পরও সে সর্বক্ষণ এ চিন্তায় বিভোর যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ও ভোগের উপকরণ সে কিভাবে লাভ করতে পারবে। দুই, হাসান বাসরী ও আরো কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, সে বলত, মুহাম্মাদের একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে এবং সেখানে জান্নাত বলেও কিছু একটা থাকবে তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা সে পাপিষ্ঠকে কি শাস্তি দিবেন আয়াতে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাকে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট করা হবে চড়ার শাস্তি দানের মাধ্যমে। কিন্তু কোথায় চড়ানো হবে? বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, তাকে আগুনের পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করা হবে, তারপর সেখান থেকে নীচের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাকে পিচ্ছিল এক পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করা হবে। কোন

দিয়ে কষ্ট-ক্লান্ত করব।

১৮. সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। — إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝١٨

১৯. সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! — فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩

২০. তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল! — ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝٢٠

২১. তারপর সে তাকাল। — ثُمَّ نَظَرَ ۝٢١

২২. তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। — ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝٢٢

২৩. তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করল। — ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝٢٣

২৪. অতঃপর সে বলল, 'এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়[১], — فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۝٢٤

২৫. 'এ তো মানুষেরই কথা।' — إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝٢٥

২৬. অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব 'সাকার' এ — سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝٢٦

২৭. আর আপনাকে কিসে জানাবে 'সাকার' কী? — وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۝٢٧

কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সে পাহাড়টিতে হাত রাখা মাত্রই তা গলতে আরম্ভ করবে, এভাবে প্রতি পদে পদে পা ডুবে যাবে। মূলত শান্তিবিহীন অতি কষ্টের শাস্তি তাকে দেওয়া হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(১) উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত অস্বীকার করার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাকে জাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে তার প্রতি বার বার অভিসম্পাত করেছেন। [ইবন কাসীর]

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৮. এটা অবশিষ্ট রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না[১]।

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

২৯. এটা তো শরীরের চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে,

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩০. 'সাকার'-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী।

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

৩১. আর আমরা তো জাহান্নামের প্রহরী কেবল ফেরেশ্‌তাদেরকেই করেছি[২]; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমরা তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবপ্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। আর কিতাবপ্রাপ্তরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে। আর যেন এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলে, আল্লাহ্

---

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, যাকেই এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে তাকেই সে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েও সে রক্ষা পাবে না। বরং আবার তাকে জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো হবে। [ইবন কাসীর] আরেক জায়গায় বলা হয়েছেঃ 'সেখানে সে মরে নিঃশেষ হয়েও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না' [সূরা আল-আ'লা: ১৩]।

(২) এখান থেকে "আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন" পর্যন্ত বাক্যগুলোতে একটি ভিন্ন প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। "জাহান্নামের কর্মচারীর সংখ্যা শুধু উনিশ জন হবে" একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে যারা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল এবং কথাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল, তাই প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের মাঝখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের দৈহিক শক্তির সাথে তুলনা করে তাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা তোমাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা। তোমাদের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাঙ্ঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।[দেখুন, ইবন কাসীর]

এ (সংখ্যার) উপমা[১] (উল্লেখ করা) দ্বারা কি ইচ্ছা করেছেন?' এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন। আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

দ্বিতীয় রুকূ'

৩২. কখনোই না[২], চাঁদের শপথ,

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

৩৩. শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে,

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়-

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

৩৫. নিশ্চয় জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারীস্বরূপ-

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

৩৭. তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায় তার জন্য[৩]।

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

---

(১) 'উপমা' বলে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা যে উনিশ সংখ্যক প্রহরীর কথা বলেছেন সে কথাটিই উদ্দেশ্য। তারা বলছিল, এ সংখ্যা উল্লেখ করার কী হেকমত ছিল? [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ এটা কোন ভিত্তিহীন কথা নয় যে তা নিয়ে এভাবে হাসি তামাসা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে। [দেখুন, তাবারী]

(৩) এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া। আর পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়। [সা'দী]

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ[১],	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
৩৯. তবে ডানপন্থীরা নয়,	إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
৪০. বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে–	فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে,	عَنِ الْمُجْرِمِينَ
৪২. 'তোমাদেরকে কিসে 'সাকার'-এ নিক্ষেপ করেছে?'	مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
৪৩. তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না[২],	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
৪৪. আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না[৩],	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
৪৫. এবং আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম ।	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
৪৬. 'আর আমরা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করতাম,	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
৪৭. 'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু	حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

(১) رَهِينَةٌ এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া । ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে-মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে । কিন্তু, আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সালাত ঠিকমত আদায় করেছে আমরা তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিলাম না । [কুরতুবী]

(৩) এ থেকে জানা যায় কোন অভাবী মানুষকে সামর্থ থাকা সত্বেও খাবার না দেয়া বা সাহায্য না করা মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটা কারণ । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

আগমন করে[১] ।'

৪৮. ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না[২] ।

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝٤٨

৪৯. অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۝٤٩

৫০. তারা যেন ভীত-ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত একপাল গাধা—

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ۝٥٠

৫১. যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে[৩] ।

فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ۝٥١

৫২. বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا

---

(১) অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছি । শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত বিষয় তথা মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে; তখন আমাদের সব আশা-কৌশলের সমাপ্তি হয় । [সা'দী]

(২) এখানে هُم সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে- (১) তারা সালাত আদায় করত না, (২) তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না; অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত । এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ্ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না । কেননা, তারা কাফের । কাফেরদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না । কেউ করলে গ্রহনীয় হবে না । [দেখুন: ইবন কাসীর; বাগভী; বাদা'ই'উত তাফসীর] কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী-রাসূলগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণগণ-এমন কি সাধারণ মুমিনগণও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্তির পর অন্যান্য মুমিনদের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুলও হবে । তবে কাফের মুশরিকদের কারও জন্য কোন সুপারিশ কাজে আসবে না ।

(৩) ﴿حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ﴾ অর্থ বন্য গাধা । আর قسورة এর অর্থ সিংহ বা তীরান্দাজ শিকারী । এ স্থলে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে । [ফাতহুল কাদীর]

مُّنَشَّرَةً ۝٥٢

গ্রন্থ দেয়া হোক[১]।

كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝٥٣

৫৩. কখনো নয়[২]; বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না[৩]।

كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝٥٤

৫৪. নিশ্চয় এ কুরআন তো সকলের জন্য উপদেশবাণী[৪]।

فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ۝٥٥

৫৫. অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦

৫৬. আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না; তিনিই যোগ্য যে, একমাত্র তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী[৫]।

---

(১) অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি মক্কার প্রত্যেক নেতা ও সমাজপতিদের কাছে যেন একখানা করে পত্র লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আমার নবী, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। [ফাতহুল কাদীর] কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের এ উক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল্লাহর রাসূলদের যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নেব না।" [সূরা আল-আন'আম: ২৪] অন্য এক জায়গায় তাদের এ দাবীও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "আপনি আমাদের চোখের সামনে আসমানে উঠে যান এবং সেখান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, আমরা তা পড়ে দেখবো।" [সূরা আল-ইসরা: ৯৩]

(২) অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোন দাবী কক্ষনো পূরণ করা হবে না। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ এদের ঈমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, তাদের এ দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরং এর আসল কারণ হলো এরা আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ও নির্ভীক। [ফাতহুল কাদীর] এরা এ পৃথিবীকেই পরম পাওয়া মনে করে নিয়েছে। [কুরতুবী]

(৪) এখানে تذكرة তথা 'উপদেশ' বলে কুরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। [ইবন কাসীর]

(৫) আল্লাহ্ তা'আলা ﴿أَهْلُ التَّقْوَىٰ﴾ এই অর্থে যে, একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। তিনি ব্যতীত আর কারও তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা যায় না।

একমাত্র তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকেই বেঁচে থাকা জরুরী। আর ﴿وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই অপরাধী গোনাহ্‌গারের অপরাধ ও গোনাহ্ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

৭৫- সূরা আল-কিয়ামাহ
৪০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের[১],

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ①

২. আমি আরও শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার[২]।

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②

---

(১) কারও বিরোধী মনোভাব খন্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে لا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এ শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকে কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি । অর্থাৎ কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভুত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়া। 'নাফসে লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ক্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ক্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু স্পষ্ট। সৎকাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎকাজ করতে পারত। সে বেশী সৎকাজ করল না কেন? এই অর্থের ভিত্তিতেই হাসান বাসরী রাহেমাহুল্লাহ নাফসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফসে-মুমিনাহ।' তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎকর্মসমুহেও সে আল্লাহ্‌র শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও ক্রুটি অনুভব করে। [কুরতুবী] কেননা, আল্লাহ্‌র শানের হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ক্রুটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। পক্ষান্তরে অসৎ কাজ হলে মুমিনের কাছে এটা অত্যন্ত কঠোর হয়ে দেখা দেয় ফলে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। [বাগভী] মূলতঃ নাফস তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়। নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্নাহ। সাধারণত নাফসে আম্মারা বা খারাপ কাজে উদগ্রীবকারী আত্মা প্রতিটি মানুষেরই মজ্জাগত ও স্বভাবগত। সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝

৪. অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম(১)।

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝

৫. বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়(২)।

بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝

সাধনার বলে সে নফসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ক্রটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। এটাকেই অনেকে বিবেক বলে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যাখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্নাহ বা সন্তুষ্টচিত্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়। এ ধরনের নাফস যাদের অর্জিত হয় তারা দ্বীনী ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে 'কালবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী হয়। আর এ সমস্ত লোকদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, 'যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; 'সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮-৮৯]

(১) অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম যেমন তা এর আগে ছিল, তবে তোমাদের পুনরুত্থিত করতে অসক্ষম হওয়ার কোন কারণ নেই। [কুরতুবী]

(২) তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তার মূল কারণ হলো, তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেরূপ লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুলুম-অত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। এভাবে সে অসৎকাজ করতেই থাকে, সৎপথে ফিরে আসতে চায় না। [মুয়াসসার, ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, "বরং সে তার সম্মুখস্থ বস্তু অর্থাৎ কিয়ামতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে চায়।" কারণ, এর পরই বলা হয়েছে, "সে প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত আসবে"। এ তাফসীরটি ইবনে কাসীর প্রাধান্য দিয়েছেন।

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦

৬. সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামতের দিন আসবে?'

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧

৭. যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে[১],

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨

৮. এবং চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন[২],

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩

৯. আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে[৩]–

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠

১০. সে-দিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায়?'

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١

১১. কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢

১২. সেদিন ঠাঁই হবে আপনার রবেরই কাছে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ ۢ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে[৪]।

---

(১) برق এর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে কথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয়। বরং ভীতি-বিহবলতা, বিস্ময় অথবা কোন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভীতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির-নিবদ্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে।[দেখুন, ইবন কাসীর] একথাটিই কুরআন মাজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।"

(২) এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল– কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।[ইবন কাসীর] তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, চন্দ্র গায়েব হয়ে যাবে, চন্দ্র বলতে কিছু আর থাকবে না।[কুরতুবী]

(৩) চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ, মুজাহিদ বলেন, দু'টিকে একত্রে পেঁচানো হবে।[আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) মূল বাক্যটি হলো ﴿بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ﴾ অর্থাৎ মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক

১৪. বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত[১], | بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। | وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝

বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বদ কাজ করে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার সামনে পেশ করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন, মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎকাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ, উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) [দেখুন, বাগাভী; কুরতুবী] দ্বিতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পুরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, قدّم বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং أخّر বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

(১) আয়াতে بصيرة শব্দটির অর্থ যদি 'চক্ষুষ্মান' ধরা হয়, তখন আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; সে যতই অস্বীকার করুক বা ওযর পেশ করুক। [ইবন কাসীর] এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে ﴿وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا﴾ অর্থাৎ "দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯] সুতরাং তারা তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে যদি بصيرة শব্দের অর্থ 'প্রমাণ' হয় তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। [দেখুন, কুরতুবী]

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি তা নিয়ে আপনার জিহ্‌বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

১৮. কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন,

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

১৯. তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই[১]।

(১) এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন যেন কোথায়ও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায় বা কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলিমদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহবাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না। আয়াতসমুহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। সুতরাং যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কুরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করতেন। তিনি জিবরাঈল থেকে শুনতেন তারপর জিবরাঈল চলে গেলে তা অনুরূপ পড়তেন যেমন জিবরাঈল পড়েছেন। [দেখুন, বুখারী: ৫, মুসলিম, ৪৪৮] এখানে কুরআন অনুসরণ করান মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। অবশেষে বলা হয়েছে আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। [দেখুন, ইবন কাসীর]

২০. কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস;

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝٢٠

২১. আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা কর[১]।

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝٢١

২২. সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢

২৩. তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে[২]।

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣

(১) অর্থাৎ মানুষ আখেরাত অস্বীকার করে কারণ তারা সংকীর্ণমনা ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন; তাই তাদের দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর আখেরাতে যে ফলাফলের প্রকাশ ঘটবে তাকে তারা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে, যে স্বার্থ বা ভোগের উপকরণ বা আনন্দ এখানে লাভ করা সম্ভব তারই অন্বেষণে সবটুকু পরিশ্রম করা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিত, এভাবে তারা দুনিয়াকে চিরস্থায়ী মনে করে। [ইবন কাসীর; মুয়াস্‌সার]

(২) অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমন্ডল হাসি-খুশী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে জান্নাতীগণ স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামা'আতের সকল আলেম ও ফেকাহবিদ এ বিষয়ে একমত। বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। এক হাদীসে এসেছে, "তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে" [বুখারী: ৭৪৩৫, ৫৫৪, ৪৭৩, ৪৮৫১,৭৪৩৪,৭৪৩৬] অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বেহশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপুর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের 'রবের' সাক্ষাতলাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। এটিই হচ্ছে সে অতিরিক্ত পুরস্কার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে, অর্থাৎ "যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর এ ছাড়া অতিরিক্ত পুরস্কারও রয়েছে।" (সূরা ইউনুস: ২৬) [মুসলিম: ১৮১, তিরমিযী: ২৫৫২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৩৩] অন্য হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৪. আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

২৬. অবশ্যই[১], যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে,

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং বলা হবে, 'কে তাকে রক্ষা করবে?'

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

২৮. তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

২৯. আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে[২]।

দেখতে পাবো? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের রবকে এরকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। [বুখারীঃ ৭৪৩৭, মুসলিমঃ ১৮২] এ সমস্ত হাদীস এবং অন্য আরো বহু হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জান্নাতবাসীগণ আখেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। "কক্ষনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাপীগণ)" সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে। [সূরা আল-মুতাফ্ফিফীনঃ ১৫] এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বঞ্চনা হবে পাপীদের জন্য নেক্কারদের জন্য নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এখানে كلا শব্দ দ্বারা 'অবশ্যই' অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। [মুয়াস্‌সার]

(২) ساق এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তখন হবে দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের বিরহ-বেদনা এবং আখেরাতে কি হবে না হবে তার চিন্তায় পেরেশান থাকবে। অর্থাৎ সে সময় দু'টি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি, একজন

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

৩০. সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।

দ্বিতীয় রুকূ'

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ

৩১. সুতরাং সে বিশ্বাস করে নি এবং সালাতও আদায় করে নি।

وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

৩২. বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ

৩৩. তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে,

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ

৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ[১]!

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে[২]?

অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে আখেরাতের জীবনে যাওয়ার বিপদ যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) أولى অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! এখানে কাফিরদেরকে খুবই মারাত্মকভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর বলেন: এটি একটি শ্লেষ বাক্যও হতে পারে। কুরআন মজীদের আরো এক জায়াগায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জাহান্নামে আযাব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবেঃ “নাও, এর মজা আস্বাধন করে নাও। তুমি অতি বড় সম্মানী মানুষ কিনা।” [সূরা আদ-দুখান: ৪৯]

(২) আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে মনে করে যে তার স্রষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? এ-কথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলবেন, “তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?” [সূরা আল মুমিনূন: ১১৫] এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের তাৎপর্য হলো আখেরাত যে অবশ্যই হবে তার প্রমাণ। [দেখুন, ইবন কাসীর]

৩৭. সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾
৩৮. তারপর সে 'আলাকা'য় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন।	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾
৩৯. অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল---নর ও নারী।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾
৪০. তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন[১]?	أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

(১) এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণের একজন তার ঘরের ছাদে সালাত আদায় করত; যখনই সূরা আল-কিয়ামাহ এর এ আয়াতে পৌঁছত তখনই সে বলত: "পবিত্র ও মহান তুমি, অবশ্যই হ্যাঁ", লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা শুনেছি।" [আবু দাউদ: ৮৮৪]

سُوْرَةُ الدَّهْرِ

৭৬- সূরা আদ-দাহ্‌র[১]
৩১ আয়াত, মাদানী, মতান্তরে মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝

১. কালপ্রবাহে মানুষের উপর কি এমন এক সময় আসে নি[২] যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না[৩]?

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ

২. আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে[৪], আমরা

---

(১) সূরা ‘আল-ইনসান’ এর অপর নাম সূরা আদ্‌-দাহর। সাহাবায়ে কিরাম সূরাটিকে সূরা ‘হাল আতা আলাল ইনসান’ বলতেন। [দেখুন, বুখারীঃ ৮৮০; মুসলিমঃ ৮৭৯] এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কেয়ামত জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবার দিন ফজরের সালাতে “সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল আস-সাজদাহ” এবং “হাল আতা আলাল ইনসান” সূরা পড়তেন। [বুখারীঃ ৮৯১, মুসলিমঃ ৮৮০, ৮৭৯]

(২) هل অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এ উত্তরই দিবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই।

(৩) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমন কি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। আয়াতে বর্ণিত “যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না” এর অর্থ বর্ণনায় কয়েকটি মত রয়েছে, এক. এখানে মানবসৃষ্টির পূর্বের অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ অন্তহীন মহাকালের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় তো এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন মানব প্রজাতির আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর মহাকাল প্রবাহে এমন একটি সময় আসল যখন মানুষ নামের একটি প্রজাতির সূচনা করা হল। [কুরতুবী] দুই. সে একটি ধড় ছিল যার কোন নাম-নিশানা ছিল না। পরবর্তীতে রূহ এর মাধ্যমে তাকে স্মরণীয় করা হয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী]

(৪) এখানে মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। বলাবাহুল্য এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর দু'টি আলাদা বীর্য দ্বারা হয়নি। বরং দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে যখন একটি হয়ে গিয়েছে তখন সে সংমিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٢﴾

তাকে পরীক্ষা করব[১]; তাই আমরা তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন[২]।

إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾

৩. নিশ্চয় আমরা তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে[৩]।

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَأَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ﴿٤﴾

৪. নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল, গলার বেড়ি ও লেলিহান আগুন[৪]।

অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা। [কুরতুবী] এটাই হলো দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা।

(২) বলা হয়েছে 'আমরা তাকে বানিয়েছি শ্রবণশক্তি ও 'দৃষ্টিশক্তির অধিকারী'। বিবেকবুদ্ধির অধিকারী করেছি বললে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত হতে পারে। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াত পূর্বের আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার ফলে মানুষের কি অবস্থা হয়েছে তা বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, আমি রাসূল ও আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং ঐ পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি যে কোন পথ অবলম্বন করার। সুতরাং আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেইনি। বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোন্‌টি এবং কুফরীর পথ কোন্‌টি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, "আমরা তাকে দু'টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।" [সূরা আল-বালাদ: ১০] অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে, "শপথ (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া-পরহেজগারীর অনুভূতি দু'টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।" [সূরা আশ-শামস: ৭-৮]

(৪) এখান থেকে উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত দু'টি শ্রেণীর প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ

৫. নিশ্চয় সৎকর্মশীলেরা[১] পান করবে এমন পূর্ণপাত্র-পানীয় থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর[২]---

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

৬. এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ[৩] পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে[৪]।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

৭. তারা মানত পূর্ণ করে[৫] এবং সে

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কাফেরদের জন্যে রয়েছে শিকল, বেড়ি ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত। [কুরতুবী]

(১) তারা এমন সব মানুষ যারা পুরোপুরি তাদের রবের আনুগত্য করেছে, তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রয়েছে। [কুরতুবী]

(২) সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। অর্থাৎ তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল আর তার খোশবু হবে অনেকটা কর্পূরের মত। কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফুর জান্নাতের একটি ঝরণার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে তাতে এই ঝরণার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) 'আল্লাহর বান্দাগণ' কিংবা 'রাহমানের বান্দাগণ' শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ সবাই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে যেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। অসৎলোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর বন্দেগী তথা দাসত্বের বাইরে রেখেছে, তারা যেন এর যোগ্য-ই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের মহান নামের সাথে যুক্ত করে অথবা এর মত সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবেন।

(৪) অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগিতই যথেষ্ট হবে। [ইবন কাসীর]

(৫) এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎকর্মশীল বান্দাগণকে এসব নেয়ামত কিসের ভিত্তিতে

مُسْتَطِيْرًا ۝

দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝

৮. আর তারা মহব্বত থাকা সাপেক্ষে[১] অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে[২] খাবার দান করে[৩],

দেয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। 'মানত' বলা হয় নিজের জন্যে এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তা পূর্ণ করে, আর কেউ যদি নাফরমানির মানত করে সে যেন নাফরমানি না করে।" [বুখারী: ৬৭০০] এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নেয়ামত লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে نذر শব্দ দ্বারা 'কর্তব্য' বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, তারাই জান্নাতের অধিকারী হবে যারা নিজেদের কর্তব্য যেমন সালাত, সাওম, হজ, উমরা ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করেছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নেয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এখানে حبه এর সর্বনাম দ্বারা طعام বা খাবার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেক্‌কার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন, حبه এর সর্বনাম দ্বারা الله তা'আলাকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে এরূপ করে থাকে। পরবর্তী আয়াতাংশ 'আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাওয়াচ্ছি' এ অর্থকেই সমর্থন করে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলিম, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া, মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে -যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না- খাবার দেয়া অতি বড় সওয়াবের কাজ। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা কয়েদি মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও এবং অসুস্থদের সুশ্রুষা কর"। [বুখারী: ৩০৪৬]

৯. এবং বলে, 'শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়[১]।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝٩

১০. 'নিশ্চয় আমরা আশংকা করি আমাদের রবের কাছ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠

১১. পরিণামে আল্লাহ্‌ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে প্রদান করবেন হাস্যোজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা[২]।

فَوَقَىٰهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١

১২. আর তাদের সবরের[৩] পুরস্কারস্বরূপ

وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢

(১) গরীবদের খাবার দেয়ার সময় মুখে একথা বলতে হবে এমনটা জরুরী নয়। মনে মনেও একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহর কাছে মুখে বলার যে মর্যাদা অন্তরে বলারও সে একই মর্যাদা। তবে একথা মুখে বলার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, যাকে সাহায্য করা হবে তাকে যেন নিশ্চিত করা যায় যে, আমরা তার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা অথবা বিনিময় চাই না, যাতে সে চিন্তামুক্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করতে পারে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। অন্য কথায় কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। নেক্‌কার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে। একথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে; "চরম হতবুদ্ধিকর সে অবস্থা তাদেরকে অস্থির ও বিহ্বল করবে না। ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের গ্রহণ করবে এবং বলবে এটা তোমাদের সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।" [সূরা আল-আম্বিয়া :১০৩] এ বিষয়টিই আরেক জায়গায় আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। এসব লোক সেদিনের ভয়াবহতা থেকেও নিরাপদ থাকবে।" [সূরা আন-নামল: ৮৯]

(৩) এখানে 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ঈমানদারগণের গোটা পার্থিব জীবনকেই 'সবর' বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার বা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন

তিনি তাদেরকে প্রদান করবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র ।

১৩. সেখানে তারা হেলান দিয়ে আসীন থাকবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে খুব গরম অথবা খুব শীত দেখবে না[১] ।

مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

১৪. আর তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে গাছের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে ।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

১৫. আর তাদের উপর ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে[২] এবং স্ফটিক-স্বচ্ছ পানপাত্রে---

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾

ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা আকাংখাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, হারাম পন্থায় লাভ করা যায় এরূপ প্রতিটি স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ পরিত্যাগ করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি মর্মবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট এসে ঘিরে ধরে তা বরদাশত করা-এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে, এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে । এটা এমন একটা কর্মপন্থা যা মুমিনের গোটা জীবনকেই সবরের জীবনে রূপান্তরিত করে । এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর । [দেখুন, সা'দী]

(১) কারণ খুব গরম ও খুব শীত তো জাহান্নাম থেকে নির্গত হয় । জান্নাতবাসীরা সেটা কোনক্রমেই পাবে না । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করল যে, হে রব! আমার একাংশ (গরম অংশ) অপর অংশ (ঠাণ্ডা অংশ)কে শেষ করে দিল । তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়া হলো । একটি শীতকালে অপরটি গ্রীষ্মকালে । সেটাই তা তোমরা কঠিন গরম আকারে গ্রীষ্মকালে পাও এবং কঠিন শীত আকারে শীতকালে অনুভব কর ।" [বুখারী: ৩২৬০, মুসলিম: ৬১৭]

(২) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "তাদের সামনে সবসময় স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে ।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭১] এ থেকে জানা গেল যে, সেখানে কোন সময় স্বর্ণপাত্র এবং কোন সময় রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হবে ।

১৬. রূপার স্ফটিক পাত্রে[১], তারা তা পরিমাণ করবে সম্পূর্ণ-পরিমিতভাবে[২]।

قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

১৭. আর সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে যান্‌জাবীল মিশ্রিত পূর্ণপাত্র-পানীয়[৩]

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾

১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম হবে সালসাবীল[৪]।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

---

(১) দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র গাঢ় ও মোটা হয়ে থাকে-আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে, কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ জান্নাতের সব বস্তুর নজীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্রঃ জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পানপাত্র ভরে ভরে দেয়া হবে। তা তাদের চাহিদার চেয়ে কম হবে না আবার বেশীও হবে না। অন্য কথায়, জান্নাতের খাদেমরা এত সতর্ক এবং সুবিবেচক হবে যে, যাকে তারা পানপাত্র পরিবেশন করবে সে কি পরিমাণ শরাব পান করতে চায় সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবে। এর আরেক অর্থ হতে পারে, জান্নাতীরা নিজেরাই তাদের ইচ্ছানুসারে যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে। [সা'দী]

(৩) যানজাবিল এর প্রসিদ্ধ অর্থ শুকনা আদা। কাতাদা বলেন, যানজাবিল বা আদা মিশ্রিত হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। মূলতঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জান্নাতের আদাকে বোঝার উপায় নেই। [ফাতহুল কাদীর] তবে মুজাহিদ বলেন, এখানে যানজাবিল বলে একটি ঝর্ণাধারাকেই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে 'মুকাররাবীন' বা নৈকট্যবান ব্যক্তিগণ পান করবে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ তা হবে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার নাম হবে 'সালসাবীল'। এক হাদীসে এসেছে, জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, যখন এ যমীন ও আসমান অন্য কোন যমীন ও আসমান দিয়ে পরিবর্তিত হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা পুলসিরাতের নিকটে অন্ধকারে থাকবে। ইয়াহূদী আবার বলল, কারা সর্বপ্রথম পার হবে? রাসূল বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহূদী বলল, জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের উপঢৌকন কি? রাসূল বললেন, মাছের পেটের কলিজা, ইয়াহূদী বলল,

১৯. আর তাদের উপর প্রদক্ষিণ করবে চির কিশোরগণ, যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

২০. আর আপনি যখন সেখানে দেখবেন, দেখতে পাবেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশাল রাজ্য।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২১. তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে[১], আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

২২. 'নিশ্চয় এটা তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল প্রসংশাযোগ্য।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

২৩. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৪. কাজেই আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন এবং

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

এরপর কি খাওয়ানো হবে? রাসূল বললেন, জান্নাতের একটি ষাঁড় তাদের জন্য জবাই করা হবে তারা তার অংশ থেকে খাবে। ইয়াহূদী বলল, তাদের পানীয় কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি ঝর্ণাধারা থেকে যার নাম হবে সালসাবীল"। [মুসলিম: ৩১৫]

(১) আয়াতে ব্যবহৃত أساور শব্দটি سوار এর বহুবচন অর্থ কংকন যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য কয়েক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে [যেমন সূরা আল-কাহফ: ৩১, আল-হাজ্জ:২৩, ফাতির: ৩৩]। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা কোন সময় রূপার এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে। অথবা মনমতো কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

তাদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা ঘোর অকৃতজ্ঞ কাফিরের আনুগত্য করবেন না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

২৫. আর আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকালে ও সন্ধ্যায়।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

২৬. আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজ্‌দাবনত হোন আর রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

২৭. নিশ্চয় তারা ভালোবাসে দুনিয়ার জীবনকে আর তারা তাদের সামনের কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে[১]।

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

২৮. আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আর আমরা যখন ইচ্ছে করব তাদের স্থানে তাদের মত (কাউকে) দিয়ে পরিবর্তন করে দেব[২]।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

২৯. নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে ইচ্ছে করে সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে।

---

(১) অর্থাৎ মক্কার কাফেররা যে কারণে আখলাক ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহী এবং তাদের কান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের আহ্বানের প্রতি অমনযোগী, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ হলো, তাদের দুনিয়া-পূজা এবং আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্নতা, উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব।[দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি তাদের ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য মানুষদের নিয়ে আসতে পারি, যারা তাদের কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে এদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি এদের আকার-আকৃতি ও গুণাবলি নিকৃষ্টরূপে পরিবর্তন করে দিতে পারি।[কুরতুবী]

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٣٠

৩০. আর তোমরা ইচ্ছে করতে সক্ষম হবে না যদি না আল্লাহ্‌ ইচ্ছে করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣١

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছে তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালেমরা— তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
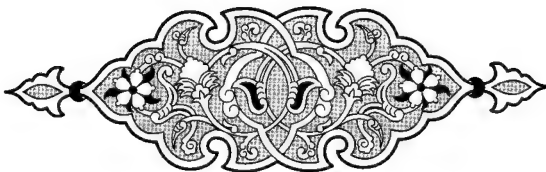
৭৭- সূরা আল-মুর্‌সালাত[১]
৫০ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝

২. অতঃপর প্রলয়ংকরী ঝটিকার,

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝

৩. শপথ প্রচণ্ড সঞ্চালনকারীর,

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝

৪. অতঃপর সুস্পষ্টরূপে পার্থক্যকারীর,

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝

৫. অতঃপর তাদের, যারা মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ---[২]

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝

---

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা এক গুহায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম । ইত্যবসরে সূরা মুরাসালাত অবতীর্ণ হল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরাটি আবৃত্তি করলেন আর আমি তা শুনে মুখস্থ করলাম । সূরার মিষ্টতায় তার মুখমন্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল । হঠাৎ একটি সাপ আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন । আমরা সাপের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু তা পালিয়ে গেল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়েছে । [বুখারী: ৩৩১৭, মুসলিম: ২২৩৪]

(২) এই সূরার প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন । যে পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে কুরআনুল কারীম সেগুলোকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেনি, বরং সেগুলোর নামের পরিবর্তে পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করেছে । যেমন বলা হয়েছে, (এক) একের পর এক প্রেরিত বা কল্যাণ হিসেবে প্রেরিত, (দুই) অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রচন্ডবেগে প্রবাহিত, (তিন) ভালভাবে বিক্ষিপ্তকারী, (চার) ভালভাবে বিচ্ছিন্নকারী এবং (পাঁচ) স্মরণকে জাগ্রতকারী । লক্ষণীয় যে, এগুলো কোন প্রাণী বা বস্তুর বিশেষণ, নাম নয় । কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয় নি । তাই এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপে তাফসীর বর্ণিত আছে । এক দল বলেন, প্রথম তিনটি দ্বারা বাতাস এবং পরের দু'টি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] অপর এক দল বলেন, প্রথম দু'টি দ্বারা বাতাস এবং পরের তিনটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে । [মুয়াসসার] তৃতীয় এক দল বলেন, প্রথম তিনটি বিশেষণ দ্বারা বাতাস, চতুর্থটি দ্বারা কুরআন এবং পঞ্চমটি দ্বারা ফেরেশ্তা বুঝানো হয়েছে । [জালালাইন, আয়সারুত তাফাসীর] কেউ কেউ বলেন যে প্রতিটি

৬. ওযর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য[১]

عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا ۙ﴿٦﴾

৭. নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।

اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿٧﴾

৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত করা হবে,

فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡ ۙ﴿٨﴾

৯. আর যখন আকাশ বিদীর্ণ করা হবে,

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡ ۙ﴿٩﴾

১০. আর যখন পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে,

وَاِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ۙ﴿١٠﴾

১১. আর যখন রাসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে[২],

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡ ؕ﴿١١﴾

বিশেষণ দ্বারা ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। [দেখুন, কুরতুবী] তবে ইমাম তাবারী বলেন, প্রথম আয়াত দ্বারা ফেরেশ্‌তা বা বাতাস– দুটিই উদ্দেশ্য হতে পারে। দ্বিতীয় আয়তটি দ্বারা প্রবাহিত বাতাস; আর তৃতীয় আয়াতটির মাধ্যমে বাতাস, বৃষ্টি বা ফেরেশ্‌তা সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। চতুর্থটি দ্বারা যেকোনো সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী উদ্দেশ্য হতে পারে, চাই তা ফেরেশ্‌তা হোক বা কুরআন হোক, বা অন্য কিছু হোক। আর পঞ্চমটির মাধ্যমে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(১) এ আয়াতটি আগের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। বলা হয়েছে, যে ফেরেশতারা যে উপদেশ ও ওহী নিয়ে আসে তার মাধ্যমে সৃষ্টির পক্ষ থেকে ওজর পেশ করার সুযোগ বন্ধ করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকে। ফাররা বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উপদেশ-বাণী বা ওহী আসে তা মুমিনদের জন্যে ওযর-আপত্তি রহিত করার কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা বা ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় ভয়ানক অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং ঝরে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ চূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণা হওয়ার পর নাই হয়ে যাবে। চতুর্থ অবস্থা হলো, নবী-রাসূলগণের জন্যে তাদের ও তাদের উম্মতের মাঝে বিচারের জন্য উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তারা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাদেরকে জড়ো করা হবে। [মুয়াসসার, সা'দী]

১২. এ-সব স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য?

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾

১৩. বিচার দিনের জন্য।

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

১৪. আর আপনাকে কিসে জানাবে বিচার দিন কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৫. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য(১)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬. আমরা কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. তারপর আমরা পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব(২)।

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮. অপরাধীদের প্রতি আমরা এরূপই করে থাকি।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. আমরা কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২১. তারপর আমরা তা রেখেছি নিরাপদ

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾

---

(১) ويل দ্বারা উদ্দেশ্য ধ্বংস, দুর্ভোগ। অর্থাৎ কতই না দুর্ভোগ ও ধ্বংস রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা সেদিনের আগমনের খবরকে মিথ্যা বলে মনে করেছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে শপথ করে বলেছেন, কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে নি। ফলে তারা কঠোর ও কঠিন শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠল। [সা'দী]]

(২) এটা আখেরাতের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ। এতে বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আদ, সামুদ, কাওমে-লূত, কাওমে-ফির'আউন ইত্যাদিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় মক্কার কাফেরদেরকেও তিনি ধ্বংস করবেন। [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর] এই আযাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে। আর যদি দুনিয়াতে সে আযাব নাও আসে, আখেরাতে তা অবশ্যই আসবে। [ফাতহুল কাদীর]

আধারে[১],

২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

২৩. অতঃপর আমরা পরিমাপ করেছি, সুতরাং আমরা কত নিপুণ পরিমাপকারী[২]!

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য[৩]।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. আমরা কি যমীনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য[৪]?

أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৭. আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم

---

(১) অর্থাৎ মায়ের গর্ভস্থল। একে মহান আল্লাহ তা'আলা মুক্ত বাতাস থেকেও সংরক্ষণ করেছেন। [তাতিম্মাতু আদ্ওয়াউল বায়ান]

(২) এটা মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, যখন আমি নগণ্য এক ফোটা বীর্য থেকে সূচনা করে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে সক্ষম হয়েছি তখন পুনরায় তোমাদের অন্য কোনভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো না কেন? আমার যে সৃষ্টি কর্মের ফলশ্রুতিতে তুমি আজ জীবিত ও বর্তমান তা একথা প্রমাণ করে যে, আমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আমি এমন অক্ষম নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) এখানে এ আয়াতাংশ যে অর্থ প্রকাশ করছে তা হলো, মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার এ স্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা তা অস্বীকার করছে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। [দেখুন, সা'দী] সুতরাং তারা আখেরাত ও পুনরুত্থান নিয়ে যত ইচ্ছা হাসি রঙ-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক এবং এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের তারা যত ইচ্ছা 'সেকেলে' অন্ধবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে থাকুক। যে দিনকে এরা মিথ্যা বলছে যখন সেদিনটি আসবে তখন তারা জানতে পারবে, সেটিই তাদের জন্য ধ্বংসের দিন।

(৪) অর্থাৎ ভূমি জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে। [সা'দী; মুয়াসসার]

مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
পান করিয়েছি সুপেয় পানি(১)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৮. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য(২)।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾
২৯. তোমরা যাতে মিথ্যারোপ করতে, চল তারই দিকে।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾
৩০. চল তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে,

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾
৩১. যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে,

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
৩২. নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপন করবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য,

كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾
৩৩. তা যেন পীতবর্ণ উটের শ্রেণী(৩),

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৪. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

---

(১) অর্থাৎ এ পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুপেয় পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশের উপরেও সুপেয় পানির নদী ও খাল প্রবাহিত করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে আমাকে জানাও তোমরা কি সেটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমরা সেটা বর্ষণ করি? আমরা ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ৬৮-৭০]

(২) এখানে এ আয়াতাংশ এ অর্থে বলা হয়েছে যে যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও কর্মকৌশলের এ বিস্ময়কর নমুনা দেখেও আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করছে এবং এ দুনিয়ার ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন এবং সেখানে মানুষের কাছ থেকে তার কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন এ বিষয়টিকেও যারা মিথ্যা মনে করছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালীতে মগ্ন থাকতে চাইলে থাকুক। তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব কিছু যেদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, এ বোকামির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

(৩) অর্থাৎ জাহান্নামের প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ প্রাসাদের মত বড় হবে। আর যখন এসব বড় বড় স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং চারদিকে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন কালো কিছুটা হলুদ বর্ণের উটসমূহ লম্ফ ঝম্ফ করছে। [মুয়াসসার]

৩৫. এটা এমন এক দিন যেদিন না তারা কথা বলবে[১],

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর না তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে ওযর পেশ করার।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. 'এটাই ফয়সালার দিন, আমরা একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।'

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. অতঃপর তোমাদের কোন কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে[২]।

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾

৪০. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৪১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা[৩] থাকবে ছায়ায় ও

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾

(১) অর্থাৎ সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফেরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেয়া হবে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় তো তোমরা অনেক কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় নিতে। এখন এখানে কোন কৌশল বা আশ্রয় নিয়ে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারলে তা একটু করে দেখাও। কিন্তু আজ তোমাদের কোন কৌশল কাজে আসবে না। আজ তোমরা পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আসমানসমূহ ও যমীনের সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ছাড়া।" [সূরা আর-রহমান: ৩৩] [সা'দী]

(৩) মুত্তাকী শব্দ বলে এখানে সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করা থেকে বিরত থেকেছে এবং আখেরাতকে মেনে নিয়ে এ বিশ্বাসে

প্রস্রবণ বহুল স্থানে,

৪২. আর তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. 'তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।'

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. এভাবে আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী[১]।

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর তখন তারা রুকু করে না[২]।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

জীবন যাপন করেছে যে, আখেরাতে আমাদেরকে নিজেদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম এবং স্বভাব চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই কথাবার্তা, কাজ-কর্মে সত্যবাদিতার প্রমাণ রেখেছে এবং তারা ফরয ও ওয়াজিব সঠিক মত আদায় করেছে। [দেখুন, সা'দী]

(১) অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে। [দেখুন, সা'দী]

(২) এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে রুকুর পারিভাষিক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থ এই যে, যখন তাদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা সালাত পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকু বলে পুরো সালাত বোঝানো হয়েছে। [বাগভী; ইবন কাসীর; সা'দী]

৫০. কাজেই তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে[১]!

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

(১) অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার এবং হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যা হতে পারতো তা কুরআন আকারে নাযিল করা হয়েছে। তারা যখন কুরআনের মত অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে ঈমান আনল না, তখন এরপর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এ কুরআন পড়ে বা শুনেও যদি একে বাদ দিয়ে আর অন্য কোন জিনিসের দিকে ধাবিত হয় তবে তাদের মত দুর্ভাগা আর কে হতে পারে? [দেখুন, সা'দী]

৭৮- সূরা আন-নাবা'
৪০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ النَّبَإِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তারা একে অন্যের কাছে কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١﴾

২. মহাসংবাদটির বিষয়ে[১],

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾

৩. যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে[২]।

الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴿٣﴾

৪. কখনো না[৩], তারা অচিরেই জানতে পারবে;

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾

৫. তারপর বলি কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾

৬. আমরা কি করিনি যমীনকে শয্যা

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾

---

(১) অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়েছেন যে, মহাখবর সম্পর্কে। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, এখানে মহাখবর বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এখানে মহাখবর বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এখানে এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছেঃ "এ ব্যাপারে তারা নানা ধরনের কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে।" অন্য অর্থ এও হতে পারে, দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে তারা নিজেরাও কোন একটি অভিন্ন আকীদা পোষণ করে না বরং "তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।" কেউ কেউ আবার আখেরাত পুরোপুরি অস্বীকার করতো না, তবে তা ঘটতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আমরা তো মাত্র একটি ধারণাই পোষণ করি, আমাদের কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।" [সূরা আল-জাসিয়াহ, ৩২] আবার কেউ কেউ একদম পরিষ্কার বলতো, "আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটিই সবকিছু এবং মরার পর আমাদের আর কখনো দ্বিতীয়বার উঠানো হবে না।" [সূরা আল-আন'আম: ২৯]; "আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটিই সব কিছু। এখানেই আমরা মরি, এখানেই জীবন লাভ করি এবং সময়ের চক্র ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমাদের ধ্বংস করে।" [সূরা আল-জাসিয়াহ্: ২৪] [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে যেসব কথা এরা বলে যাচ্ছে এগুলো সবই ভুল। এরা যা কিছু মনে করেছে ও বুঝেছে তা কোনক্রমেই সঠিক নয়। [মুয়াসসার]

৭. আর পর্বতসমূহকে পেরেক?	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۞
৮. আর আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়,	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۞
৯. আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম[১],	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞
১০. আর করেছি রাতকে আবরণ,	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۞
১১. আর করেছি দিনকে জীবিকা আহরণের সময়,	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞
১২. আর আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ[২]	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞
১৩. আর আমরা সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ[৩] ।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۞
১৪. আর আমরা বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি[৪],	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۞
১৫. যাতে তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۞
১৬. ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۞
১৭. নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিন[৫];	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۞

(১) মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘুমের এক চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কর্মের ক্লান্তির পর ঘুম তাকে স্বস্তি, আরাম ও শান্তি দান করে। [সা'দী]

(২) সুস্থিত ও মজবুত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, আকাশ তৈরি হয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়-সংঘবদ্ধভাবে, তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না, ধ্বংস হয় না, ফেটে যায় না। [তাবারী]

(৩) এখানে সূর্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। [ইবন কাসীর]

(৪) معصرات শব্দটি معصرة এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। [তাবারী]

(৫) অর্থাৎ যে দিন মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিচার-মীমাংসা করবেন সে দিন তথা কেয়ামত নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। [মুয়াসসার]

১৮. সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে[১],

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ

১৯. আর আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বারবিশিষ্ট[২] ।

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ

২০. আর চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা[৩],

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۙ

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওৎ পেতে অপেক্ষমান;

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

২২. সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল ।

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۙ

২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে[৪],

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ

---

(১) অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দু'বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ সময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মনুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে। এ স্থানে শিংগার দ্বিতীয় ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। এর আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই প্রথম থেকে শেষ– সমস্ত মরা মানুষ অকস্মাৎ জেগে উঠবে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) "আকাশ খুলে দেয়া হবে" এর মানে এটাও হতে পারে যে, উর্ধজগতে কোন বাধা ও বন্ধন থাকবে না। আসমানে বিভিন্ন দরজা তৈরি হয়ে সেগুলো হতে সবদিক থেকে ফেরেশতারা নেমে আসতে থাকবে। [ইবন কাসীর]

(৩) পাহাড়ের চলার ও মরীচিকায় পরিণত হবার মানে হচ্ছে, দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। তারপর ভেঙ্গে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে মরীচিকার মতো ছড়িয়ে পড়বে যে, মনে হবে সেখানে কিছু আছে, কিন্তু কিছু নেই। এর পরই যেখানে একটু আগে বিশাল পর্বত ছিল সেখানে আর কিছুই থাকবে না। এ অবস্থাকে অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "এরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড় কোথায় চলে যাবে? এদের বলে দিন, আমার রব তাদেরকে ধূলোয় পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে কোথাও একটুও অসমতল ও উঁচুনীচু জায়গা এবং সামন্যতম ভাঁজও দেখতে পাবে না।" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০৫-১০৭] [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ তারা সেখানে অবস্থানকারী হবে সুদীর্ঘ বছর। আয়াতে ব্যবহৃত أحقاب শব্দটি

২৪. সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীতলতা, না কোন পানীয়---

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া [১];

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৬. এটাই উপযুক্ত প্রতিফল[২]।

جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় তারা কখনো হিসেবের আশা করত না,

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৮. আর তারা আমাদের নিদর্শনাবলীতে কঠোরভাবে মিথ্যারোপ করেছিল[৩]।

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

حقب এর বহুবচন। এর অর্থ নির্ধারণ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, এর দ্বারা 'সুদীর্ঘ সময়' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সুতরাং أحقاب দ্বারা তখন কোন সুনির্দিষ্ট সময় বোঝা উচিত হবে না। তাই উপরে এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'যুগ যুগ ধরে'। এর মানে হচ্ছে, একের পর এক আগমনকারী দীর্ঘ সময় তারা সেখানে অবস্থান করবে। এমন একটি ধারাবাহিক যুগ যে, একটি যুগ শেষ হবার পর আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায়। একের পর এক আসতেই থাকবে এবং এমন কোন যুগ হবে না যার পর আর কোন যুগ আসবে না। [দেখুন: ইবন কাসীর] কুরআনের ৩৪ জায়গায় জাহান্নামবাসীদের জন্য 'খুলুদ' (চিরন্তন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিন জায়গায় কেবল 'খুলুদ' বলেই শেষ করা হয়নি বরং তার সাথে "আবাদান" (চিরকাল) শব্দও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, "তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে। কিন্তু তারা কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৩৭]

(১) মূলে গাস্‌সাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয়ঃ পুঁজ, রক্ত, পুঁজ মেশানো রক্ত এবং চোখ ও গায়ের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের কঠোর দৈহিক নির্যাতনের ফলে যেসব রস বের হয়, যা প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কুকর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না। [মুয়াসসার, সা'দী]

(৩) এ হচ্ছে তাদের জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব ভোগ করার কারণ। তারা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজেদের আসনের হিসেব পেশ করার সময়ের কোন আশা করত না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ যেসব আয়াত পাঠিয়েছিলেন সেগুলো মেনে নিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করত এবং সেগুলোকে মিথ্য বলে প্রত্যাখ্যান করত। [ফাতহুল কাদীর]

২৯. আর সবকিছুই আমরা সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ﴿٢٩﴾

৩০. অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমরা তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব।

فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩২. উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ,

حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾

৩৩. আর সমবয়স্কা(১) উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র।

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৫. সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা বাক্য(২);

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত দানস্বরূপ(৩),

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

---

(১) এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। [মুয়াসসার, সা'দী]

(২) জান্নাতে কোন কটুকথা ও আজেবাজে গল্পগুজব হবে না। কেউ কারো সাথে মিথ্যা বলবে না এবং কারো কথাকে মিথ্যাও বলবে না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকে জান্নাতের বিরাট নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। [সা'দী]

(৩) লক্ষণীয় যে, এসব নেয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, জান্নাতের এসব নেয়ামত মুমিনদের প্রতিদান এবং আপনার রবের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহ্‌র দান বলা হয়েছে। প্রতিদান শব্দের পরে আবার যথেষ্ট পুরস্কার দেবার কথা বলার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময়ে যে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে কেবলমাত্র ততটুকুই তাদেরকে দেয়া হবে না বরং তার ওপর অতিরিক্ত পুরস্কার এবং অনেক বেশী পুরস্কার দেয়া হবে। বিপরীত পক্ষে জাহান্নামবাসীদের জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের যে পরিমাণ অপরাধ তার চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না এবং কমও দেয়া হবে না। [দেখুন, তাতিম্মাতু আদ্‌ওয়াউল বায়ান] কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩৭. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, দয়াময়; তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না[১]।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. সেদিন রূহ্ ও ফেরেশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে[২]; সেদিন কেউ কথা বলবে না, তবে 'রহমান' যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া, এবং সে সঠিক কথা বলবে[৩]।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. এ দিনটি সত্য; অতএব যার ইচ্ছে সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ

৪০. নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; যেদিন

সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউসুস ২৬-২৭ আয়াত, আন নাম্ল ৮৯-৯০ আয়াত, আল কাসাস ৮৪ আয়াত, সাবা ৩৩ আয়াত এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

(১) এই বাক্যটি পূর্বের বাক্যের সাথে সর্ম্পকযুক্ত। এর অর্থ এই হবে যে, এটি সে-রবের পক্ষ থেকে প্রতিদান, যিনি আসমান ও যমীনের রব; তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেয়ামতের ময়দানে কারও কথা বলার ক্ষমতা হবে না; যদি-না তিনি অনুমতি দেন। [মুয়াসসার]

(২) অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে 'রূহ' বলে এখানে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার, সা'দী] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এক বড় আকৃতির ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এখানে রূহ বলে আদম সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। শেষোক্ত দু'টি তাফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে- একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের। [আত-তাফসীর আস-সাহীহ]

(৩) এখানে কথা বলা মানে শাফা'আত করা বলা হয়েছে। শাফা'আত করতে হলে যে ব্যক্তিকে যে গুনাহগারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফা'আত করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র সে-ই তার জন্য শাফা'আত করতে পারবে। আর শাফা'আতকারীকে সঠিক ও যথার্থ সত্য কথা বলতে হবে। অন্যায় সুপারিশ করতে পারবে না। [দেখুন, কুরতুবী]

মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং কাফির বলবে, 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম[১]!'	مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব জিন, গৃহপালিত জন্তু এবং বন্য জন্তু সবাইকে একত্রিত করা হবে। জন্তুদের মধ্য কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমন কি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবেঃ মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা আকাজ্ক্ষা করবে - হায়। আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৪৫ ৪/৫৭৫, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইঃ ৩২২, সিলসিলা সহীহাঃ ১৯৬৬]

৭৯- সূরা আন-নাযি'আত
৪৬ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. শপথ[১] নির্মমভাবে উৎপাটনকারীদের[২],

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ①

২. আর মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের[৩]

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ②

৩. আর তীব্র গতিতে সন্তরণকারীদের[৪],

وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ③

---

(১) এ সূরার শুরুতে কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। এ পাঁচটি গুণাবলী কোন কোন সত্তার সাথে জড়িত, একথাও এখানে পরিস্কার করে বলা হয়নি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া শপথের জওয়াবও উহ্য রাখা হয়েছে। মূলত কেয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে এবং সেগুলো নিঃসন্দেহে সত্য, একথার ওপরই এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। [কুরতুবী] অথবা কসম ও কসমের কারণ এক হতে পারে, কেননা ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম। [সা'দী]

(২) বলা হয়েছে, যারা নির্মমভাবে টেনে আত্মা উৎপাটন করে। এটা যাদের শপথ করা হয়েছে সে ফেরেশতাগণের প্রথম বিশেষণ। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী বলেন, ডুব দিয়ে টানা এবং আস্তে আস্তে বের করে আনা এমন সব ফেরেশতার কাজ যারা মৃত্যুকালে মানুষের শরীরে গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে তার প্রাণ বায়ু টেনে বের করে আনে। এখানে আযাবের, সেসব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এটা যাদের শপথ করা হয়েছে সে ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ। বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মুমিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে আনায়াসে রূহ কবজ করে- কঠোরতা করে না। প্রকৃত কারণ এই যে কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মাগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মুমিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব নেয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সেদিকে যেতে চায়। [কুরতুবী]

(৪) এটা তাদের তৃতীয় বিশেষণ। سابحات এর আভিধানিক অর্থ সাঁতার কাটা। এই সাঁতারু বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ কবজ করার পর তারা দ্রুতগতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়। [কুরতুবী]

৪. আর দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের[১],

فَالسّٰبِقٰتِ سَبۡقًا ۙ

৫. অতঃপর সব কাজ নির্বাহকারীদের[২]।

فَالۡمُدَبِّرٰتِ اَمۡرًا ۘ

৬. সেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে,

یَوۡمَ تَرۡجُفُ الرَّاجِفَۃُ ۙ

৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী[৩],

تَتۡبَعُهَا الرَّادِفَۃُ ؕ

---

(১) এটা তাদের চর্তুথ বিশেষণ। উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয় তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মুমিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নেয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) পঞ্চম বিশেষণ। অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ নির্বাহের ব্যবস্থা করে। [সা'দী]

(৩) প্রথম প্রকম্পনকারী বলতে এমন প্রকম্পন বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় প্রকম্পন বলতে যে কম্পনে সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যমীনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। [মুয়াস্‌সার] অন্যত্র এ অবস্থাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন পৃথিবী ও আকাশসমূহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে, তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৮] এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌র যিকর কর, তোমরা আল্লাহ্‌র যিকর কর। 'রাজেফাহ' (প্রকম্পণকারী) তো এসেই গেল (প্রায়), তার পিছনে আসবে 'রাদেফাহ' (পশ্চাতে আগমনকারী), মৃত্যু তার কাছে যা আছে তা নিয়ে হাজির, মৃত্যু তার কাছে যা আছে তা নিয়ে হাজির। সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী বেশী সালাত (দরুদ) পাঠ করি। এ সালাত পাঠের পরিমান কেমন হওয়া উচিত? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। আমি বললাম, (আমার যাবতীয় দো'আর) এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, অর্ধেকাংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

৮. অনেক হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে[১],	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝٨
৯. তাদের দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে।	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩
১০. তারা বলে, 'আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবই---	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝١٠
১১. চূর্ণবিচূর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١
১২. তারা বলে, 'তাই যদি হয় তবে তো এটা এক সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।'	قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢
১৩. এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ[২],	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝١٣
১৪. তখনই ময়দানে[৩] তাদের আবির্ভাব হবে।	فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤
১৫. আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝١٥

আমি বললাম, তাহলে আমি আপনার জন্য আমার সালাতের সবটুকুই নির্ধারণ করব, (অর্থাৎ আমার যাবতীয় দো'আ হবে আপনার উপর সালাত বা দরুদ প্রেরণ) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তা তোমার যাবতীয় চিন্তা দূর করে দিবে এবং তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দিবে।" [তিরমিযী: ২৪৫৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫১৩, দ্বিয়া: আলমুখতারাহ: ৩/৩৮৮, ৩৯০]

(১) "কতক হৃদয়" বলতে কাফের ও নাফরমানদের বোঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তারা ভীত ও আতঙ্কিত হবে। [মুয়াস্সার] সৎ মু'মিন বান্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। অন্যত্র তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "সেই চরম ভীতি ও আতংকের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিল।" [সূরা আল-আম্বিয়া:১০৩]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজটি করতে তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। এর জন্য শুধুমাত্র একটি ধমক বা আওয়াজই যথেষ্ট। এরপরই তোমরা সমতল ময়দানে আবির্ভূত হবে। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে বর্ণিত ساهرة শব্দের অর্থ সমতল ময়দান। কেয়ামতে পূনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে। একেই আয়াতে ساهرة বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ জমিনের উপরিভাগও হতে পারে। [ইবন কাসীর]

কি[১]?

১৬. যখন তাঁর রব পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'য় তাঁকে ডেকে বলেছিলেন,

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

১৭. 'ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে,'

ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

১৮. অতঃপর বলুন, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও–

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

১৯. 'আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?'

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

২০. অতঃপর তিনি তাকে মহানিদর্শন দেখালেন[২]।

فَأَرَىٰهُ ٱلْءَايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾

২১. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অবাধ্য হল।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾

২২. তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল[৩]।

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾

২৩. অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾

২৪. অতঃপর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।'

فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

---

(১) কাফেরদের অবিশ্বাস, হটকারিতা ও শত্রুতার ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে মূসা আলাইহিস্ সালাম ও ফির'আউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী সকল রাসূলকেও কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু তাদের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। সুতরাং আপনিও সবর করুন। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) বড় নিদর্শন বলতে সবগুলো মুজিযা উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার লাঠির অজগর হয়ে যাওয়া এবং হাত শুভ্র হওয়ার কথাও বুঝানো হতে পারে। [কুরতুবী, মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ হককে বাতিল দ্বারা প্রতিহত করতে চেষ্টা করতে লাগল। [ইবন কাসীর]

২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন[১]।

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝٢٥

২৬. নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য তো এতে শিক্ষা রয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝٢٦

দ্বিতীয় রুকূ'

২৭. তোমাদেরকে[২] সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন[৩];

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ۝٢٧

২৮. তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ۝٢٨

২৯. আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোক;

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝٢٩

৩০. আর যমীনকে এর পর বিস্তৃত

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۝٣٠

(১) نكال শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায় এবং শিক্ষা পায়। [কুরতুবী]

(২) কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব এবং তা যে সৃষ্টি জগতের পরিবেশ পরিস্থিতির যুক্তিসংগত দাবী একথার যৌক্তিকতা এখানে পেশ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে মরে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে, কাফেরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এখানে সৃষ্টি করা মানে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এই যুক্তিটিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পেশ করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আর যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তিনি কি এই ধরনের জিনিসগুলোকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা। সৃষ্টি করার কাজ তিনি খুব ভালো করেই জানেন।" [সূরা ইয়াসীন: ৮১] অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ "অবশ্যি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে অনেক বেশী বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। [সূরা গাফির: ৫৭ আয়াত] [ইবন কাসীর]

করেছেন[১]।

৩১. তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا

৩২. আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

৩৩. এসব তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর ভোগের জন্য।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে[২]

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ

৩৫. মানুষ যা করেছে তা সে সেদিন স্মরণ করবে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য,

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ

৩৭. সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে,

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ

৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

(১) "এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন"-এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কেননা, কুরআনে কোথাও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-বাকারার ২৯ নং আয়াতে। কিন্তু এ আয়াতে আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আসলে কোন বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়। কেননা, পৃথিবী সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বে হলেও পৃথিবী বিস্তৃতকরণ, পানি ও তৃণ বের করা, পাহাড় স্থাপন ইত্যাদি করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর। [ইবন কাসীর]

(২) এই মহাসংকট ও বিপর্যয় হচ্ছে কিয়ামত। এ-জন্য এখানে "আত-তাম্মাতুল কুবরা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "তাম্মাহ্" বলতে এমন ধরনের মহাবিপদ, বিপর্যয় ও সংকট বুঝায় যা সবকিছুর উপর ছেয়ে যায়। এরপর আবার তার সাথে "কুবরা" (মহা) শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই বিপদ, সংকট ও বিপর্যয় হবে অতি ভয়াবহ ও ব্যাপক। [দেখুন, কুরতুবী]

৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাস(১)।

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

৪০. আর যে তার রবের অবস্থানকে(২) ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

৪১. জান্নাতই হবে তার আবাস।

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, 'কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে?'

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا

৪৩. তা আলোচনার কি জ্ঞান আপনার আছে?

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا

৪৪. এর পরম জ্ঞান আপনার রবেরই কাছে(৩);

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا

---

(১) এ আয়াতে জাহান্নামীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, আর পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেবে অর্থাৎ আখেরাতের কাজ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দিবে; তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাহান্নামই তার আবাস বা ঠিকানা। [সা'দী]

(২) রবের অবস্থানের দু'টি অর্থ হতে পারে, এক. রবের সামনে হাজির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে– এ বিশ্বাস করে প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে যে নিজেকে হেফাযত করেছে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। দুই. রবের যে সুমহান মর্যাদা তাঁর এ উচ্চ মর্তবার কথা স্মরণ করে অন্যায় অশ্লিল কাজ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থেকেছে সে জান্নাতে যাবে। উভয় অর্থই এখানে সঠিক। [বাদা'ই'উত তাফসীর]

(৩) এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে উহার প্রকাশ ঘটাবেন; ওটা আকাশমন্ডলী ও যমীনে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। হঠাৎ করেই উহা তোমাদের উপর আসবে।' আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।'[সূরা আল-আরাফঃ ১৮৭] এখানে ঠিক এটাকে বলা হয়েছে যে, এর পরম জ্ঞান রয়েছে আপনার রবের কাছেই। হাদীসে জিবরাঈল নামক প্রসিদ্ধ হাদীসেও জিবরাঈলের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না"। [বুখারীঃ ৫০]

৪৫. যে এটার ভয় রাখে আপনি শুধু তার সতর্ককারী ।

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ۝

৪৬. যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে[১]!

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ۝

---

(১) দুনিয়ার জীবনের স্বল্পতার বিষয়বস্তুটি পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সূরা ইউনুস, আল-ইসরা, ত্বা-হা, আল-মুমিনূন, আর-রূম, ইয়াসীন ও আহকাফে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮০- সূরা 'আবাসা[1]
৪২ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

سُورَةُ عَبَسَ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ①

১. তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন[2],

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ②

২. কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি আসল ।

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ③

৩. আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, ---সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত,

(১) এ সূরাটি সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর সাথে বিশেষভাবে জড়িত। তাঁর মা উম্মে মাকতুম ছিলেন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পিতা খুওয়াইলিদের সহোদর বোন। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন বরং অভিজাত বংশীয় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অন্ধ হওয়ার কারণে জানতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন এর একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞাসা করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গের সাথে আলোচনায় মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহল ইবনে হিশাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলিম হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর এভাবে কথা বলা এবং মামুলী প্রশ্ন নিয়ে তাৎক্ষনিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু পাক্কা মুসলিম ছিলেন এবং সদা সবর্দা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবীর এ বিরক্তি প্রকাশ পছন্দ করলেন না। তিনি আয়াত নাযিল করে তার প্রতিকার করেন। [দেখুন: তিরমিযী: ৩৩২৮, ৩৩৩১, মুয়াত্তা মালেক: ১/২০৩]

(২) عبس শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। تولى শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া। [জালালাইন]

৪.	অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত[১]।	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤
৫.	আর যে পরোয়া করে না,	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥
৬.	আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন।	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦
৭.	অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই,	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧
৮.	অপরদিকে যে আপনার কাছে ছুটে এলো,	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨
৯.	আর সে সশঙ্কচিত্ত,	وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩
১০.	আপনি তার থেকে উদাসীন হলেন;	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠
১১.	কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী[২],	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١
১২.	কাজেই যে ইচ্ছে করবে সে এটা স্মরণ রাখবে,	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢
১৩.	এটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣
১৪.	যা উন্নত, পবিত্র[৩],	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤

(১) অর্থাৎ আপনি কি জানেন এই সাহাবী যা জিজ্ঞেস করেছিল তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তা দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে উপকার লাভ করতে পারত। [দেখুন, মুয়াসসার; সা'দী]

(২) অর্থাৎ এমনটি কখনো করবেন না। যে সব লোক আল্লাহকে ভুলে আছে এবং যারা নিজেদের দুনিয়াবী সহায়-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকারে মত্ত হয়ে আছে, তাদেরকে অযথা গুরুত্ব দিবেন না। ইসলাম, অহি বা কুরআন এমন কিছু নয় যে, যে ব্যক্তি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার সামনে নতজানু হয়ে তা পেশ করতে হবে। বরং সে সত্যের যতটা মুখাপেক্ষী নয় সত্যও তার ততটা মুখাপেক্ষী নয়। বরং তাদেরই ইসলামের মহত্তের সামনে নতজানু হতে হবে। [তাতিম্মাতু আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৩) مكرمة অর্থ সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন। مرفوعة বলে এর মর্যাদা অনেক উচ্চ–তা বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] আর مطهرة বলে বোঝানো হয়েছে হাসান বসরীর

১৫. লেখক বা দূতদের হাতে[১] ।	بِاَيۡدِیۡ سَفَرَةٍ ﴿۱۵﴾
১৬. (যারা) মহাসম্মানিত ও নেককার ।	كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿۱۶﴾
১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ[২]!	قُتِلَ الۡاِنۡسَانُ مَاۤ اَكۡفَرَهٗ ﴿۱۷﴾
১৮. তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?	مِنۡ اَیِّ شَیۡءٍ خَلَقَهٗ ﴿۱۸﴾
১৯. শুক্রবিন্দু থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন[৩],	مِنۡ نُّطۡفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿۱۹﴾

মতে, যাবতীয় নাপাক থেকে পবিত্র। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ কাফেররা এটা পাওয়ার অধিকারী নয়। তাদের হাত থেকে পবিত্র। হাসান থেকে অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, এর অর্থ মুশরিকদের উপর নাযিল হওয়া থেকে পবিত্র। [কুরতুবী] ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ এটি বাড়তি-কমতি ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

(১) سفرة শব্দটি سافر এর বহুবচন হতে পারে। তখন অর্থ হবে লিপিকার বা লেখক। আর যদি سفرة শব্দটি سفارة থেকে আসে, তখন এর অর্থ দূতগণ। এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরও উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথমটিই অধিক শুদ্ধ। সহীহ হাদীসে এ السَّفَرَةُ الْكِرَامُ الْبَرَرَةُ এর তাফসীর ফেরেশতাদেরই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কেরাআতে বিশেষজ্ঞ কুরআন পাঠক সম্মানিত নেককার দূতদের (ফেরেশতাদের) সাথে থাকবে আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে পড়ে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। [বুখারীঃ ৪৯৩৭, মুসলিমঃ ৭৯৮] [ইবন কাসীর]

(২) এর অর্থ, সে কত বড় সত্য-অস্বীকারকারী। তাছাড়া এ আয়াতের আর একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ "কোন জিনিসটি তাকে সত্য অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে?" [তাবারী]

(৩) قدّره অর্থাৎ সুপরিমিত করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। قدّره শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ, বয়স, রিযিক, ভাগ্য ইত্যাদি তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাছাড়া পূর্ব থেকেই প্রতিটি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে তার গায়ের রং কি হবে, সে কতটুকু উঁচু হবে, তার দেহ কতটুকু কি পরিমাণ মোটা ও পরিপুষ্ট হবে। এত সব সত্ত্বেও সে তার রবের সাথে কুফরী করে।[দেখুন, কুরতুবী]

২০. তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন[১]; ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝

২১. এরপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝

২২. এরপর যখন ইচ্ছে তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন[২]। ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝

২৩. কখনো নয়, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনো তা পূর্ণ করেনি। كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝

২৪. অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে[৩]! فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা-বলে মাতৃগর্ভে মানুষকে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনিই তার অপার শক্তির মাধ্যমে মাতৃগর্ভ থেকে জীবিত ও পুর্ণাঙ্গ মানুষের বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। ফলে দেহটি সহী-সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না। এছাড়া আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ায় তিনি তার জন্য নিজের জন্য ভালো বা মন্দ, কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা আনুগত্য বা অবাধ্যতার মধ্যে সে কোন পথ চায় তা তার সামনে খুলে রেখে দিয়েছেন এবং পথ তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ফলে সে শুকরিয়া আদায় করে সৎপথ গ্রহণ করতে পারে, আবার কুফরী করে বিপথে যেতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। একমাত্র তিনিই এগুলো করার ক্ষমতা রাখেন। তারপরও মানুষ তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁর হক আদায় করে না। [সা'দী] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথীরা বলল, চল্লিশ দিন? আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি এটা বলতে অস্বীকার করছি, তারা বলল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি এটা বলতেও অস্বীকার করছি। তারা বলল, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি এটাও বলতে অস্বীকার করছি। তবে মানুষের সবকিছু পঁচে যায় একমাত্র মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের একটি ছোট্ট কোষ ব্যতীত। তার উপরই আবার সৃষ্টি জড়ো হবে।" [বুখারী: ৪৮১৪, মুসলিম: ২৯৫৫]

(৩) মানবসৃষ্টির সূচনা উল্লেখ করার পর মানুষ যে খাদ্যের নেয়ামত ভোগ করে, এখানে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ খাদ্য সম্পর্কে তার একবার চিন্তা

২৫. নিশ্চয় আমরা প্রচুর বারি বর্ষণ করি,	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. তারপর আমরা যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি;	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি শস্য;	فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. আঙ্গুর, শাক-সব্জি,	وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. যায়তূন, খেজুরগাছ,	وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যান,	وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾
৩১. ফল এবং গবাদি খাদ্য[১],	وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য[২]।	مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতঃপর যখন তীক্ষ্ণ আওয়াজ আসবে[৩],	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾

করা প্রয়োজন– কিভাবে এই খাদ্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ যদি এর উপকরণগুলো সরবরাহ না করতেন তাহলে কি জমি থেকে এই খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল? এসব নেয়ামতসমূহ তিনি মানুষকে দিয়েছেন যাতে মানুষ কিয়ামতের প্রস্তুতির জন্য এর সাহায্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে । [কুরতুবী]

(১) أَبّ শব্দটির উপরোক্ত অর্থ ইবনে আব্বাস ও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [সহীহ ইবনে খুযাইমাহঃ ২১৭২]

(২) অর্থাৎ কেবল তোমাদের জন্যই নয়, তোমাদের যেসব গবাদি-গৃহপালিত পশু রয়েছে, তাদের জন্যও। এসব নেয়ামতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত, তার প্রতি শুকরিয়া আদায় করা ও তার নির্দেশাবলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে।

(৩) আয়াতে বর্ণিত الصاخة শব্দটির মূল অর্থ হলো, 'এমন কঠোর ডাক যার ফলে মানুষ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে।' এখানে কিয়ামতের দ্বিতীয় শিংগাধ্বনির কথা বলা হয়েছে। যা পুনরুত্থানের শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া বোঝায়। এই বিকট আওয়ায বুলন্দ হবার সাথে সাথেই মরা মানুষেরা জীবিত হয়ে উঠবে এবং কেয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। [মুয়াসসার, জালালাইন]

৩৫. এবং তার মাতা, তার পিতা,

وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾

৩৬. তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে[১],

وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে[২]।

لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

৩৮. অনেক চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল,

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

৪০. আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

৪১. সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾

৪২. এরাই কাফির ও পাপাচারী।

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

---

(১) এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে, সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। সেদিন মানুষ তার অতি-নিকটাত্মীয়কে দেখলেও মুখ লুকাবে এবং পালিয়ে বেড়াবে। [ইবন কাসীর] প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সূরা মা'আরিজের ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে।

(২) প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে এবং পিতা মাতা স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছ থেকে সেদিন মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। [কাতাদা: দেখুন, ইবন কাসীর] হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংগ হয়ে উঠবে। একথা শুনে তার পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে? জবাবে রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। [নাসাঈ:২০৮৩, তিরমিযী: ৩৩৩২, ইবনে মাজাহ: ৪২৭৬, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৯]।

৮১- সূরা আত-তাকভীর(১)
২৯ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে(২),

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ①

২. আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে(৩),

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ②

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কেউ কেয়ামতকে প্রত্যক্ষ দেখতে চায় সে যেন সূরা 'ইযাস সামছু কুওয়িরাত, ইযাস সামায়ুন ফাতারাত ও ইযাস সামায়ুন সাক্কাত' পড়ে। [তিরমিযী: ৩৩৩৩, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৭, ৩৬, ১০০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫১৫] এখানে প্রথম ছয়টি আয়াতের ভাষ্য কিয়ামতের প্রথম অংশ অর্থাৎ শিঙ্গায় প্রথমবার যে ফুৎকার দেয়া হবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। উবাই ইবন কাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'কেয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন রয়েছে। মানুষ যখন হাটে-বাজারে থাকবে, তখন হঠাৎ সূর্যের আলো চলে যাবে এবং তারকারাজি দেখা যাবে; ফলে তারা আশ্চর্য হবে। তারা তাকিয়ে দেখার সময়েই হঠাৎ করে তারাগুলো খসে পড়বে। এরপর পাহাড়গুলো মাটির উপর পড়বে, নড়া-চড়া করবে এবং পুড়ে যাবে; ফলে বিক্ষিপ্ত ধুলোর মত হয়ে যাবে। তখন মানুষ জিনের কাছে এবং জিন মানুষের কাছে ছুটে আসবে। জন্তু-জানোয়ার-পাখি সব মিশে যাবে এবং একে অপরের সাথে একত্রিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর যখন বন্য পশুগুলোকে একত্র করা হবে" [সূরা তাকভীর: ৫] তারপর জিন মানুষদের বলবে, আমরা তোমাদের নিকট সংবাদ নিয়ে আসছি। তারা যখন সাগরের নিকট যাবে তখন দেখবে তাতে আগুন জ্বলছে। এ সময়ে সপ্ত যমীন পর্যন্ত এবং সপ্ত আসমান পর্যন্ত এক ফাটল ধরবে। এরপর এক বায়ু এসে তাদেরকে মৃত্যুবরণ করাবে।' [তাবারী]

(২) আরবী ভাষায় তাকভীর মানে হচ্ছে গুটিয়ে নেয়া। মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য "তাকভীরুল 'ইমামাহ" বলা হয়ে থাকে। কারণ ইমামা তথা পাগড়ী লম্বা কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মাথার চারদিকে তা জড়িয়ে নিতে হয়। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কারণে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ তার আলোক বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া كُوِّرَتْ এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, "চাঁদ ও সূর্যকে কিয়ামতের দিন পেঁচিয়ে রাখা হবে।" [বুখারী: ৩২০০] [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যে বাঁধনের কারণে তারা নিজেদের কক্ষপথে ও নিজেদের জায়গায় বাঁধা আছে তা খুলে যাবে এবং সমস্ত গ্রহ-তারকা বিশ্ব-জাহানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়াও তারা শুধু ছড়িয়েই পড়বে না বরং এই সঙ্গে আলোহীন হয়ে অন্ধকারও হয়ে যাবে। [সাদী]

৩. আর পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে[১],	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝
৪. আর যখন পূর্ণগর্ভা মাদী উট উপেক্ষিত হবে[২],	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝
৫. আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে,	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝
৬. আর যখন সাগরকে অগ্নিউত্তাল করা হবে[৩],	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝
৭. আর যখন আত্মাগুলোকে সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে[৪],	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

---

(১) পাহাড়সমূহকে কয়েকটি পর্যায়ে চলমান করা হবে। প্রথমে তা বিক্ষিপ্ত বালুরাশির মত হবে, তারপর তা ধূনিত পশমের মত হবে, সবশেষে তা উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণা হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় আর অবস্থিত থাকবে না। [সাদী]

(২) আরবদেরকে কিয়ামতের ভায়াবহ অবস্থা বুঝাবার জন্য এটি ছিল একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। কেননা কুরআন আরবদেরই সম্বোধন করা হয়েছে। আরবদের কাছে গর্ভবর্তী মাদী উট, যার প্রসবের সময় অতি নিকটে, তার চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না । এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয়া হতো। এই ধরনের উষ্ট্রীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে এই দাঁড়ায় যে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা তাদের খেয়ালই থাকবে না। [ইবন কাসীর, সাদী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ হল অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্জ্বলিত করা। কেউ কেউ বলেন, সমুদ্রগুলোকে স্ফীত করা হবে। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, পানি পূর্ণ করা হবে। অন্য কেউ অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা অর্থাৎ সমস্ত সমুদ্র এক করে দেয়া হবে, ফলে লবনাক্ত ও সুমিষ্ট পানি একাকার হয়ে যাবে। হাসান ও কাতাদাহ রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন, এর অর্থ তার পানিসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে ফলে তাতে এক ফোটা পানিও থাকবে না। [কুরতুবী]

(৪) এর অর্থ হচ্ছে, যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। অর্থাৎ মানুষের আমল অনুসারে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হবে। যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা

৮. আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে[১] জিজ্ঞেস করা হবে,

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝

৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল[২]?

بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝

১০. আর যখন আমলনামাগুলো উন্মোচিত করা হবে,

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

১১. আর যখন আসমানের আবরণ অপসারিত করা হবে[৩],

وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝

হবে। কাফের এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাফের এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিকে দিয়ে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত ইহুদীরা ইহুদীদের সাথে, নাসারারা নাসারাদের সাথে, মুনাফিকরা মুনাফিকদের সাথে এক জায়গায় সমবেত হবে। মূলত হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে- ১। পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের ২। আসহাবুল ইয়ামীনের এবং ৩। আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না। [তাবারী, কুরতুবী] এ আয়াতের আরেকটি অর্থও হতে পারে। আর তা হল, 'যখন আত্মাকে দেহের সাথে পুনঃমিলিত করা হবে'। কেয়ামতের সময়ে সকলকে জীবিত করার জন্য প্রথমে দেহকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। অতঃপর আত্মাকে দেহের সাথে সংযোজন করা হবে। [কুরতুবী, ইবন কাসীর] এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

(১) الْمَوْءٗدَةُ শব্দের অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। জাহেলিয়াত যুগের কোন কোন আরব গোত্র কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। [ইবন কাসীর, কুরতুবী] পরবর্তীতে ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে।

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে মারাত্মক ধরনের ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। যে পিতা বা মাতা তাদের মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? [ইবন কাসীর]

(৩) كشطت এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। [কুরতুবী] এর অর্থ অপসারণ করা, সরিয়ে নেয়া। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে অপসারিত করা হবে। [মুয়াসসার, সাদী]

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

১২. আর যখন জাহান্নামকে ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

১৩. আর যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি উপস্থিত করেছে(১)।

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾

১৫. সুতরাং আমি শপথ করছি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৬. যা চলমান, অপসৃয়মাণ,

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

১৭. শপথ রাতের যখন তা শেষ হয়,(২)

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

১৮. শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী(৩)

---

(১) অর্থাৎ কেয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে। [মুয়াসসার]

(২) عَسْعَسَ শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি উপরে আছে, তা হচ্ছে বিদায় নেয়া, শেষ হওয়া। অপর অর্থ হল আগমন করা, প্রবেশ করা। তখন আয়াতটির অর্থ হয়, শপথ রাতের, যখন তা আগমন করে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে সম্মানিত বাণীবাহক ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ বলতে অহী আনার কাজে লিপ্ত ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ-কথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের মতো ফেরেশতাগণের বেলায়ও রাসূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, তা অন্যত্রও বলা হয়েছে, ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ "তাঁকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী" [সূরা আন-নাজম:৫]। তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে; তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে আকাশে পৌছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে أَمِين তথা বিশ্বাসভাজন তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না; আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তার আমানত বা বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়েছেন, তাকে অহীর আমানত দিয়েছেন। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

২০. যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন,	ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾
২১. সে মান্য সেখানে, বিশ্বাসভাজন[১]।	مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾
২২. আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নন[২],	وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন[৩],	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

আর কুরআনকে “বাণীবাহকের বাণী” বলার অর্থ এই নয় যে, এটি ঐ সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিজের কথা। বরং “বাণীবাহকের বাণী” শব্দ দু'টিই একথা প্রকাশ করছে যে, এটি সেই সত্তার বাণী যিনি তাকে বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন। সূরা ‘আল-হাক্কা’র ৪০ আয়াতে এভাবে কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী বলা হয়েছে। সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা। বরং একে “রাসূলে করীমের” বাণী বলে একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পেশ করছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে বাণীকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাণীবহনকারী ফেরেশতার মুখ থেকে এবং লোকদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। [বাদায়িউত তাফসীর]

(১) অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল। তিনি ফেরেশতাদের নিকট মান্য। সমস্ত ফেরেশতা তাকে মান্য করে। তিনি আল্লাহ্‌র বিশ্বাসভাজন; পয়গাম আনা নেয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম বেশী করার সম্ভাবনা নেই। নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা আল্লাহর অহীর সাথে মিশিয়ে দেবেন না। বরং তিনি এমন পর্যায়ের আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয় সেগুলো তিনি হুবহু পৌছিয়ে দেন। [মুয়াসসার, সা'দী]

(২) এখানে সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উম্মাদ বলত এতে তাদেরকে জওয়াব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের বক্তব্য। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রকাশ্য দিগন্তে, মূল আকৃতিতে দেখেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ “সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে” [সূরা আন-নাজম:৬-৭] [ইবন কাসীর] এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী

২৪. তিনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়[১] ।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আর এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয় ।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৬. কাজেই তোমরা কোথায় যাচ্ছ?!

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ,

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য[২] ।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾

২৯. আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন[৩] ।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর সাথে পরিচিত ছিলেন । তাকে আসল আকার আকৃতিতেও দেখেছিলেন । তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই ।

(১) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা গোপন রাখেন না । গায়েব থেকে তার কাছে যে-সব তথ্য বা অহী আসে তা সবই তিনি একটুও কমবেশী না করে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন । [সা'দী]

(২) অন্য কথায় বলা যায়, এ বাণীটি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ একথা ঠিক, কিন্তু এর থেকে ফায়দা একমাত্র সেই ব্যক্তি হাসিল করতে পারে যে নিজে সত্য-সরল পথে চলতে চায় । এ উপদেশ থেকে উপকৃত হবার জন্য মানুষের সত্য-সন্ধানী ও সত্য প্রিয় হওয়া প্রথম শর্ত । [বাদায়িউত তাফসীর]

(৩) অর্থাৎ তোমরা সরল পথে চলতে চাইলে এবং আল্লাহ্র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাইলেই থাকতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা না করবেন । সুতরাং তাঁর কাছেই তাওফীক কামনা করো । তবে এটা সত্য যে, কেউ যদি আল্লাহ্র পথে চলতে ইচ্ছে করে তবে আল্লাহ্ও তাকে সেদিকে চলতে সহযোগিতা করেন । মূলত আল্লাহ্র ইচ্ছা হওয়ার পরই বান্দার সে পথে চলার তাওফীক হয় । বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারেই হয় । তবে যদি ভাল কাজ হয় তাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকে, এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্র শরীয়তগত ইচ্ছা' । পক্ষান্তরে খারাপ কাজ হলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সংঘটিত হলেও তাতে তাঁর সন্তুষ্টি থাকে না । এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্র প্রাকৃতিক ইচ্ছা' । এ দু' ধরনের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে অতীতে ও বর্তমানে অনেক দল ও ফের্কার উদ্ভব ঘটেছে । [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তেকামাহ: ১/৪৩৩; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/১৬৪]

৮২- সূরা আল-ইনফিতার
১৯ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾

২. আর যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾

৩. আর যখন সাগরগুলো বিস্ফোরিত করা হবে,

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾

৪. আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে[১],

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾

৫. তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গিয়েছে[২] ।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾

---

(১) প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে দ্বিতীয় পর্বের কথা বলা হয়েছে। কবর খুলে ফেলার মানে হচ্ছে, তা খুলে তা থেকে মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়া, সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কেয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। মূলে বলা হয়েছে, ﴿مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ﴾। এ শব্দগুলোর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক. যে ভালো ও মন্দ কাজ করে মানুষ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে مَا قَدَّمَتْ এবং যেগুলো করতে সে বিরত থেকেছে তাকে مَا أَخَّرَتْ বলা যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিনে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং কি সৎ অসৎ কর্ম করেনি। [তাবারী] দুই. যা কিছু প্রথমে করেছে তা ﴿مَّا قَدَّمَتْ﴾ এবং যা কিছু পরে করেছে তা مَا أَخَّرَتْ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সম্পাদনের ধারাবাহিকতা ও তারিখ অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব সম্বলিত আমলনামা তার সামনে এসে যাবে। [মুয়াসসার] তিন. যেসব ভালো বা মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে সেগুলো ﴿مَّا قَدَّمَتْ﴾ এর অন্তরভুক্ত। এ মানুষের সমাজে এসব কাজের যে প্রভাব ও ফলাফল সে নিজের পেছনে রেখে এসেছে সেগুলো مَا أَخَّرَتْ এর অন্তর্ভুক্ত। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন(১),

فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ؕ

৮. যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন(২)।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ

৯. কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে থাক(৩);

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ

১০. আর নিশ্চয় নিয়োজিত আছেন তোমাদের উপর সংরক্ষকদল;

আমলানামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে সে তার সওয়াব সবসময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে।" [তিরমিযী: ২৬৭৫, ইবনে মাজাহ: ২০৭, মুসনাদে আহমাদ: ২/৫০৪] [আত-তাফসীরুসসহীহ]

(১) অর্থাৎ মহান আল্লাহ তোমাকে এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। তোমার সামনে সব রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবিলায় তোমার সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। অন্যত্র বলা হয়েছে, " অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে"। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে, যাকে যেরূপে ইচ্ছা সে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আর তা আল্লাহ্ তা'আলার এক বড় নিদর্শন। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ যে জিনিসটি তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে, তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তা হল এই ধারণা যে, দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল, প্রতিদান ও বিচারের জগত নেই। এ বিভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে, মহান আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। [ইবন কাসীর]

১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ;

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾

১২. তারা জানে তোমরা যা কর[১]।

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

১৩. পুণ্যবানেরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে[২];

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾

১৪. আর পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে[৩];

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

---

(১) অর্থাৎ ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। সব জায়গায় সব অবস্থায় সকল ব্যক্তির সাথে তারা এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা জানতেই পারছে না যে, কেউ তাদের কাজ পরিদর্শন করছে। কোন ব্যক্তি কোন নিয়তে কি কাজ করেছে তাও তারা জানতে পারে। তাই তাদের তৈরি করা রেকর্ড একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড। এই রেকর্ডের বাইরে কোন কথা নেই। এ সম্পর্কেই সূরা কাহাফের ৪৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "কিয়ামতের দিন অপরাধীরা অবাক হয়ে দেখবে তাদের সামনে যে আমলনামা পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে তাদের ছোট বড় কোন একটি কাজও অলিখিত থেকে যায়নি। যা কিছু তারা করেছিল সব হুবহু ঠিক তেমনিভাবেই তাদের সামনে আনা হয়েছে"। [কুরতুবী]

(২) পূণ্যবানেরা কি কি নেয়ামতে থাকবে সেটা জানতে হলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র একটু দেখতে হবে। অন্যত্র এসেছে, "অবশ্যই পূণ্যবানদের 'আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে, 'ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? ওটা চিহ্নিত 'আমলনামা। যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে। পূণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে; ওটার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। ওটার মিশ্রণ হবে তাস্‌নীমের; তা একটা প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে। [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১৮-২৮]

(৩) পাপাচারীরা কি কঠিন শাস্তিতে থাকবে সেটা জানতেও আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র দেখতে হবে, সেখানে বলা হয়েছে, "কখনো না, পাপাচারীদের 'আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। সিজ্জীন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? ওটা চিহ্নিত 'আমলনামা। সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের, যারা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে, শুধু প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী এটাকে অস্বীকার করে; তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা।' কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ্‌ ধরিয়েছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে; তারপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তারপর বলা হবে, 'এটাই তা যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ৭-১৭]

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾

১৫. তারা প্রতিদান দিবসে তাতে দগ্ধ হবে;

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আর তারা সেখান থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না[১]।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾

১৭. আর কিসে আপনাকে জানাবে : প্রতিদান দিবস কী?

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾

১৮. তারপর বলি, কিসে আপনাকে জানাবে : প্রতিদান দিবস কী?

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

১৯. সেদিন কেউ কারও জন্য কিছু করার মালিক হবে না; আর সেদিন সব বিষয়ের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র[২]।

---

(১) জাহান্নামীরা কোন সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না, অনুপস্থিত থাকতে পারবে না; মৃত্যুর মাধ্যমেও নয়, বের হওয়ার মাধ্যমেও নয়। সেখানে তাদের জন্যে চিরকালীন আযাবের নির্দেশ আছে। [মুয়াসসার, সা'দী]

(২) অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না; অপর ব্যক্তি তার যত প্রিয় ও কাছের মানুষ-ই হোক না কেন। অনুরূপভাবে সুপারিশও কারও নিজ ইচ্ছার উপর হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ কাউকে কারও জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে। [ইবন কাসীর, সা'দী]।

৮৩- সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন[১]
৩৬ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ المُطَفِّفِينَ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ①

১. দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়[২],

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ কারবার 'কাইল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর প্রেক্ষিতে সূরা আল-মুতাফফেফীন নাযিল হয়। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-আভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। [নাসায়ী: আস-সুনানুল কুবরা: ১১৫৯০, ইবনে মাজাহ: ২২২৩]

(২) تَطْفِيفٌ এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে তাকে বলা হয় مُطَفِّف। [কুরতুবী] কুরআনের এই আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করার জন্য কড়া তাগিদ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে: "ইনসাফ সহকারে পুরো ওজন ও পরিমাপ করো। আমি কাউকে তার সামর্থের চাইতে বেশীর জন্য দায়িত্বশীল করি না।" [সূরা আল-আন'আম:১৫২] আরও বলা হয়েছে: "মাপার সময় পুরো মাপবে এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন করবে।" [সূরা আল-ইসরা: ৩৫] অন্যত্র তাকীদ করা হয়েছে: "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না। [সূরা আর-রহমান: ৮-৯] শু'আইব আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের ওপর এ অপরাধের কারণে আযাব নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেওয়ার রোগ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শু'আইব আলাইহিস্ সালাম এর বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও এ সম্প্রদায়টি এ অপরাধমূলক কাজটি থেকে বিরত থাকেনি।
তবে আয়াতে উল্লেখিত تطفيف শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। সুতরাং প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেয়াই যে আয়াতের উদ্দেশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জনৈক ব্যক্তিকে আসরের সালাতে না দেখে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে একটি ওজর পেশ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, طَفَّفت অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায়ে কমতি করেছ।' এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেয়া ও কম করা আছে [মুয়াত্তা মালেক: ১/১২, নং ২২]। তাছাড়া ঝগড়া-বিবাদের

২. যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,	الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।	وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝
৪. তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে	أَلَا يَظُنُّ أُولَٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝
৫. মহাদিনে?	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝
৬. যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের সামনে![1]	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
৭. কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে[2] আছে।	كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝
৮. আর কিসে আপনাকে জানাবে 'সিজ্জীন' কী?	وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝

সময় নিজের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার পর প্রতিপক্ষের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার সুযোগ দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। [সা'দী]

(১) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'যেদিন সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সামনে দাঁড়াবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে।' [বুখারী: ৬৫৩১, মুসলিম: ২৮৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির এত নিকটে আনা হবে যে, তাদের মধ্যে দুরত্ব হবে এক 'মাইল'। বর্ণনাকারী বলেন: আমি জানি না এখানে মাইল বলে পরিচিত এক মাইল না সুরমাদানি (যা আরবিতে মাইল বলা হয় তা) বুঝানো হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মানুষ তাদের স্বীয় আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। কারও ঘাম হবে গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হবে হাঁটু পর্যন্ত। আবার কারও ঘাম হবে কোমর পর্যন্ত; কারও ঘাম মুখের লাগামের মত হবে।' তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের দিকে ইশারা করেন। [মুসলিম: ২৮৬৪]

(২) سجين শব্দটি سجن থেকে গৃহীত। سجن এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। [ইবন কাসীর] আর سجّين এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। [মুয়াসসার] এটি একটি বিশেষ স্থানের নাম। যেখানে কাফেরদের রূহ অবস্থান করে। অথবা এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। [জালালাইন]

৯. চিহ্নিত আমলনামা[১]।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩

১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের,

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠

১১. যারা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে,

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١

১২. আর শুধু প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারীই এতে মিথ্যারোপ করে;

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢

১৩. যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, (এ তো) 'পূর্ববর্তীদের উপকথা।'

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣

১৪. কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে[২]।

كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤

(১) مرقوم শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে, লিখিত, চিহ্নিত এবং মোহরাঙ্কিত। [কুরতুবী] অর্থাৎ কিতাবটি লিখা শেষ হওয়ার পর তাতে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে ফলে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। আর কিতাব বলতে, আমলনামা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেন, এটা সিজ্জীনের তাফসীর নয়; বরং পূর্ববর্তী ﴿كِتٰبَ الْفُجَّارِ﴾ এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এর প্রমাণ আমরা বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই। সেখানে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ কাফেরদের রূহ হরণ হওয়ার পর বলবেন, اكْتُبُوْا كِتَابَه فِي سِجِّيْنٍ فِي الأَرْضِ السُّفْلٰى "তার কিতাবকে সর্বনিম্ন যমীনে সিজ্জীনে লিখে রাখ"। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৮৭]

(২) ران শব্দটি رين থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রাধান্য বিস্তার করা। [কুরতুবী] ঢেকে ফেলা। [তাতিম্মাতু আদওয়াইল বায়ান] যাজ্জাজ বলেন, মরিচা ও ময়লা। [কুরতুবী] অর্থাৎ শাস্তি ও পুরস্কারকে গল্প বা উপকথা গণ্য করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। কিন্তু যে কারণে তারা একে গল্প বলছে তা হচ্ছে এই যে, এরা যেসব গোনাহে লিপ্ত রয়েছে তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বোঝে না। ফলে পুরোপুরি যুক্তিসংগত কথাও এদের কাছে গল্প বলে মন হচ্ছে। [ইবন কাসীর] এই জং ও মরীচার ব্যাখ্যায়

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

১৫. কখনো নয়; নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব হতে অন্তরিত থাকবে(১);

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর নিশ্চয় তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে;

ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

১৭. তারপর বলা হবে, 'এটাই তা যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে।'

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

১৮. কখনো নয়, নিশ্চয় পূণ্যবানদের আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে'(২),

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

১৯. আর কিসে আপনাকে জানাবে 'ইল্লিয়্যীন' কী?

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

২০. চিহ্নিত আমলনামা(৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বান্দা যখন কোন গোনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে তওবা করলে দাগটি উঠে যায়। কিন্তু যদি সে গোনাহ করে যেতেই থাকে তাহলে সমগ্র দিলের ওপর তা ছেয়ে যায়। [তিরমিযী: ৩৩৩৪ ইবনে মজাহ: ৪২৪৪]

(১) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের রবের দীদার বা দর্শন ও যেয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিনগণ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার ও যেয়ারত লাভে ধন্য হবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই। [ইবন কাসীর]

(২) কারও কারও মতে عِلِّيِّينَ শব্দটি علوّ এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। [ইবন কাসীর] আবার কেউ কেউ বলেন, এটা জায়গার নাম- বহুবচন নয়। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীসে এসেছে যে, ফেরশেতাগণ রূহ নিয়ে উঠতেই থাকবেন حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ "শেষ পর্যন্ত সপ্তম আসমানে উঠবেন তখন মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দার কিতাব ইল্লিয়্যীনে লিখে নাও" [মুসনাদে আহমাদ:৪/২৮৭]। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের কাছে এক স্থানের নাম। এতে মুমিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। [ইবন কাসীর ইবন আব্বাস থেকে]

(৩) এখানেও এটাই সঠিক যে, এটা 'ইল্লীয়্যীন' এর কোন বিশেষণ নয়, বরং পূর্বে উল্লেখিত ﴿كِتَٰبَ الْأَبْرَارِ﴾ এর বিশেষণ। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এর প্রমাণ উপরোক্ত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ "অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দার আমলনামা

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্যপ্রাপ্তরাই তা অবলোকন করে[১]।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾

২২. নিশ্চয় পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে।

تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন,

ইল্লিয়্যীনে লিখে রাখ"। সুতরাং ইল্লিয়্যীন কিতাব নয় বরং আমলনামা বা কিতাব কপি করে রাখার স্থান।

(১) يشهد শব্দটি شهود থেকে উদ্ভূত। شهود এর এক অর্থ প্রত্যক্ষ করা, তত্ত্বাবধান করা। তখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামার প্রতি আসমানের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করবে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া شهود এর আরেক অর্থ উপস্থিত হওয়া। [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম] তখন يشهده এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আর এর অর্থ হবে, প্রতি আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ সেখানে হাজির হবেন এবং সেটাকে হেফাযত করবেন; কেননা এটা নেক আমলকারীর জন্য জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা পত্র এবং জান্নাতে যাওয়ার সফলতার গ্যারান্টি। [আইসারুত তাফাসীর] এটা ঐ সময়ই হবে, যখন ইল্লিয়্যীন দ্বারা আমলনামা বোঝানো হবে। আর যদি ইল্লিয়্যীন দ্বারা নৈকট্যপ্রাপ্তদের রূহের স্থান ধরা হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। সে হিসেবে ইল্লিয়্যীন ঈমানদারদের রুহের আবাসস্থল; যেমন সিজ্জীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। এর স্বপক্ষে একটি হাদীস থেকে ধারণা পাওয়া যায়, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"শহীদগণের রূহ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সবুজ পাখিদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে।" [মুসলিম: ১৮৮৭] এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى﴾ এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুন্‌তাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে, এ কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়। তাই কোন কোন মুফাসসির ইল্লিয়্যীন এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাত। [সা'দী]

২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে;

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝٢٥

২৬. যার মোহর হবে মিস্‌কের[১], আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক[২]।

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۚ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ۝٢٦

২৭. আর তার মিশ্রণ হবে তাস্‌নীমের[৩],

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝٢٧

২৮. এটা এক প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢٨

২৯. নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে উপহাস করত,[৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝٢٩

---

(১) মূলে "খিতামুহু মিস্‌ক বলা হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, যেসব পাত্রে এই শরাব রাখা হবে তার ওপর মাটি বা মোমের পরিবর্তে মিশকের মোহর লাগানো থাকবে। এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ হয়: এটি হবে উন্নত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন শরাব। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে: এই শরাব যখন পানকারীদের গলা থেকে নামবে তখন শেষের দিকে তারা মিশকের খুশবু পাবে। [ফাতহুল কাদীর] এই অবস্থাটি দুনিয়ার শরাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে শরাবের বোতল খোলার সাথে সাথেই একটি বোটকা গন্ধ নাকে লাগে। পান করার সময়ও এর দুর্গন্ধ অনুভূত হতে থাকে এবং গলা দিয়ে নামবার সময় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেও পচা গন্ধ পৌঁছে যায়। এর ফলে শরাবীর চেহারায় বিস্বাদের একটা ভাব জেগে ওঠে।

(২) কোন বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্যে কয়েকজনের ধাবিত হওয়া ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করতে সক্ষম হয় এর নাম تنافس। এখানে জান্নাতের নেয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফেল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে করে সেগুলো অর্জন করার জন্যে অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায় রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামত। এসব নেয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নেয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী।

(৩) তাসনীম মানে উন্নত ও উঁচু। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, কোন ঝরণাকে তাসনীম বলার মানে হচ্ছে এই যে, তা উঁচু থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে আসে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ একথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে ফিরতো: আজ তো বড়ই মজা। ওমুক মুসলিমকে বিদ্রূপ করে, তাকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে বড়ই মজা পাওয়া

৩০. আর যখন তারা মুমিনদের কাছ দিয়ে যেত তখন তারা চোখ টিপে বিদ্রূপ করত।

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. আর যখন তাদের আপনজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে,

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আর যখন মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট[১]।'

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি[২]।

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

গেছে এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাকে চরমভাবে অপদস্থ করা গেছে। মোটকথাঃ তারা মু'মিনদের নিয়ে অপমানজনক কথা-বার্তা, আচার আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিত করত। আর মজা লাভ করত। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ এরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের চক্করে ফেলে দিয়েছেন। ফলে এরা নিজেরা নিজেদেরকে দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সব রকমের আশংকা ও বিপদ আপদের মুখোমুখি হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] যা কিছু এদের সামনে উপস্থিত আছে তা কেবল এ অনিশ্চিত আশায় ত্যাগ করছে যে, এদের সাথে মৃত্যুর পরে কি এক জান্নাত দেবার ওয়াদা করা হয়েছে, আর পরবর্তী জগতে নাকি কোন জাহান্নাম হবে, এদেরকে তার আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে এবং তার ফলেই এরা আজ এ দুনিয়ায় সবকিছু কষ্ট বরদাশত করে যাচ্ছে। এভাবে যুগে যুগে মুমিনদেরকে অপমানজনক কথা সহ্য করতে হয়েছে। বর্তমানেও কেউ দ্বীনদার হলে তার সম্পর্কে বিদ্রূপ মন্তব্য করতে শোনা যায়। [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম]

(২) এই ছোট বাক্যটিতে বিদ্রুপকারীদের জন্য বড়ই শিক্ষাপ্রদ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক মুসলিমরা যা কিছুর প্রতি ঈমান এনেছে সবকিছুই ভুল। কিন্তু তাতে তারা তোমাদের তো কোন ক্ষতি করছে না। যে জিনিসকে তারা সত্য মনে করেছে সেই অনুযায়ী তারা নিজেরাই আমল করছে। তোমরা তাদের সমালোচনা করছ কেন? আল্লাহ কি তোমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন? মুমিনদের কর্মকাণ্ড হেফাযত করার দায়িত্ব তো তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। তাহলে সেটা করতে যাবে কেন? এটাকেই তোমাদের উদ্দেশ্য বানিয়েছ কেন? [দেখুন, ইবন কাসীর]

৩৪. অতএব আজ মুমিনগণ উপহাস করবে কাফিরদেরকে,

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. কাফিররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো?

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ
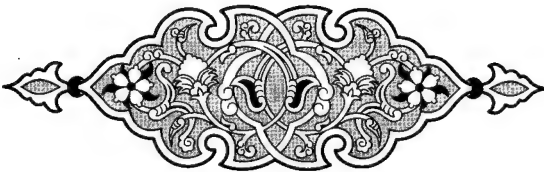
৮৪- সূরা আল-ইন্‌শিকাক্‌
২৫ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে[১],

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢

২. আর তার রবের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়[২] ।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝٣

৩. আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে[৩] ।

---

(১) আর সেটা হবে কিয়ামতের দিন । [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কেয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, ﴿وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ এর মধ্যে أذنت অর্থ শুনেছে তথা আদেশ পালন করেছে । সে হিসেবে ﴿وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ এর শাব্দিক অর্থ হয়, "সে নিজের রবের হুকুম শুনবে ।" এর মানে শুধুমাত্র হুকুম শুনা নয় বরং এর মানে সে হুকুম শুনে একজন অনুগতের ন্যায় নির্দেশ পালন করেছে এবং একটুও অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি । [সা'দী] আর حُقَّت এর অর্থ 'আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল' । কারণ সে একজন মহান বাদশার কর্তৃত্বাধীন ও পরিচালনাধীন । যাদের নির্দেশ অমান্য করা যায় না, আর তার হুকুমের বিপরীত করা যায় না । [ইবন কাসীর; সা'দী]

(৩) مُدَّت এর অর্থ টেনে লম্বা করা, ছড়িয়ে দেয়া । [ইবন কাসীর] পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেবার মানে হচ্ছে, সাগর নদী ও সমস্ত জলাশয় ভরে দেয়া হবে । পাহাড়গুলো চুর্ণবিচূর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া হবে । পৃথিবীর সমস্ত উঁচু নীচু জায়গা সমান করে সমগ্র পৃথিবীটাকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে । কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ "তাকে একটা সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন । সেখানে তোমরা কোন উঁচু জায়গা ও ভাঁজ দেখতে পাবে না ।" [সূরা ত্ব-হা: ১০৬-১০৭] হাদীসে এসেছে, 'কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে । তারপর মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে ।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৫৭১] একথা একাটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য এ বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে যে, সেদিন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের জন্ম হয়েছে ও হবে সবাইকে একই সংগে জীবিত করে আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে । এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গায় দাঁড় করাবার জন্য সমস্ত সাগর, নদী, জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, তথা উঁচু-নীচু সব জায়গা ভেঙ্গে-চুরে ভরাট করে সারা দুনিয়াটাকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত করা হবে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

৪. আর যমীন তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে(১) ।	وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝
৫. এবং তার রবের আদেশ পালন করবে এটাই তার করণীয়(২) ।	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝
৬. হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে(৩) ।	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝

---

(১) অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগিরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। যমীন এসব বস্তু আপন গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে। অনুরূপভাবে যত মৃত মানুষ তার মধ্যে রয়েছে সবাইকে ঠেলে বাইরে বের করে দেবে। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) যখন এসব ঘটনাবলী ঘটবে তখন কি হবে, একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কারণ এ পরবর্তী বক্তব্যগুলো নিজে নিজেই তা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এ বক্তব্যগুলোতে বলা হচ্ছেঃ হে মানুষ! তুমি তোমার রবের দিকে এগিয়ে চলছো। শীঘ্র তাঁর সামনে হাযির হয়ে যাবে। তখন তোমার আমলনামা তোমার হাতে দেয়া হবে। আর তোমার আমলনামা অনুযায়ী তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে। [কুরতুবী] সুতরাং উপরোক্ত ঘটনাবলী ঘটলে কি হবে তা সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ তখন পুনরুত্থিত হবে। তখন পুনরুত্থানের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করবে না। কারণ বাস্তবতা যখন এসে যাবে তখন সন্দেহ করার আর সুযোগ কোথায়?

(৩) كدح এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। [ফাতহুল কাদীর] মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্‌র দিকে চূড়ান্ত হবে। অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু কষ্ট-সাধনা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সে মনে করতে পারে যে তা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে সে সচেতন বা অচেতনভাবে নিজের রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং অবশেষে তাকে তাঁর কাছেই পৌঁছতে হবে। মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতি সামনে এসে যাবে। অথবা এর অর্থ প্রত্যেক মানুষ আখেরাতে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্যে তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত করতে চায়, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত করতে পছন্দ করেন।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۞

৭. অতঃপর যাকে তার ‘আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞

৮. তার হিসেব-নিকেশ সহজেই নেয়া হবে[১]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত করতে চায় না, আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করেন।' আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা -অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোন স্ত্রী- বলেন, ‘আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তা নয়। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু ঘণিয়ে আসে, তখন তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও সম্মানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার কাছে মৃত্যু অপেক্ষা অন্য কিছু প্রিয় হতে পারে না। এভাবে সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত করতে পছন্দ করে, তাই আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করেন। আর কাফির ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন মৃত্যু অপেক্ষা অপ্রিয় আর কিছু থাকে না। সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন'। [বুখারী: ৬৫০৭, মুসলিম: ২৬৮৩]

(১) এতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। তার হিসেব নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, ওমুক ওমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে? ঐসব কাজ করার ব্যাপারে তোমার কাছে কি কি ওযর আছে? নেকীর সাথে সাথে গোনাহও তার আমলনামায় অবশ্যি লেখা থাকবে। কিন্তু গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশী হবার কারণে তার অপরাধগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো মাফ করে দেয়া হবে। কুরআন মজিদে অসৎকর্মশীল লোকদের কঠিন হিসেব-নিকেশের জন্য “সু-উল হিসাব” (খারাপভাবে হিসেব নেয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আর-রা'দ ১৮] সৎলোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: “এরা এমন লোক যাদের সৎকাজগুলো আমি গ্রহণ করে নেবো এবং অসৎকাজগুলো মাফ করে দেবো।” [সূরা আল-আহকাফ ১৬] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। এ কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রশ্ন করলেন, কুরআনে কি ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ বলা হয়নি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয়; বরং কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে পেশ করা। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। [বুখারী: ৪৯৩৯, মুসলিম: ২৮৭৬]

৯. এবং সে তার স্বজনদের কাছে[১] প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে;	وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۟ؕ
১০. আর যাকে তার 'আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক থেকে দেয়া হবে,	وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۟ۙ
১১. সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে;	فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۟ۙ
১২. এবং জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে;	وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۟ؕ
১৩. নিশ্চয় সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল,	اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۟ؕ
১৪. সে তো ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না[২];	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۟ۚۛ
১৫. হ্যাঁ,[৩] নিশ্চয় তার রব তার উপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী।	بَلٰۤى ۛۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۟ؕ
১৬. অতঃপর আমি শপথ করছি[৪] পশ্চিম	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۟ۙ

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, নিজের লোকজন বলতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাথী-সহযোগীদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও একইভাবে মাফ করে দেয়া হয়ে থাকবে। কাতাদাহ বলেন, এখানে পরিবার বলে জান্নাতে তার যে পরিবার থাকবে তাদের বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে, সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আখেরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। সে তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিল না। হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হবে না। কারণ সে পুনরুত্থানে ও আখেরাতে মিথ্যারোপ করত। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ সে যা মনে করেছে তা ঠিক নয়। সে অবশ্যই তার রবের কাছে ফিরে যাবে। অবশ্যই সে পুনরুত্থিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার ﴿اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ﴾ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না বরং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। যৌবন থেকে বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বরযখ

আকাশের

১৭. আর শপথ রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয়;

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

১৯. অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে[১]।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

(মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের জীবন), বরযখ থেকে পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন থেকে হাশরের ময়দান তারপর হিসেব-নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অসংখ্য মনযিল মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। এ বিভিন্ন পর্যায় প্রমাণ করছে যে, একমাত্র আল্লাহই তার মা'বুদ, তিনি বান্দাদের কর্মকাণ্ড নিজস্ব প্রজ্ঞা ও রহমতে নিয়ন্ত্রণ করেন। আর বান্দা মুখাপেক্ষী, অপারগ, মহান প্রবল পরাক্রমশালী দয়ালু আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। [বাদায়ে'উত তাফসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(১) اتسق শব্দটি وسق থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্রিত করা, পূর্ণ করা। চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র পূর্ণ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর]এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মতো দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা উপরোক্ত বস্তুগুলোর শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে"। طبق এর অর্থ অবস্থা, স্তর, পর্যায় ইত্যাদি [ইবন কাসীর] تَرْكَبُنَّ শব্দটি ركوب থেকে। এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানুষ কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং তার ওপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত পরিবর্তন হয় তা তো লক্ষণীয়। তাছাড়া মানুষ নিজেও আল্লাহ্‌র দেয়া সহজ-সরল দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে অন্যান্য বাতিল দ্বীনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের হাতে হাতে বিঘতে বিঘতে অনুসরণ করতে থাকবে, এমনকি তারা যদি ষাণ্ডার গর্তে ঢুকে থাকে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে তাতে ঢুকবে" সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইয়াহূদ ও নাসারা? তিনি বললেন, "তারা নয়তো কারা?" [বুখারী: ৭৩২০, মুসলিম: ২৬৬৯] [ইবন কাসীর] এখানে ইবন জারীর আত-তাবারীর মত হচ্ছে, মানুষকে অবশ্যই কঠিন থেকে কঠিন পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। আখেরাতের পর্যায়গুলোও উদ্দেশ্য হতে পারে। [তাবারী; ইবন কাসীর]

২০. অতঃপর তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না?

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২১. আর যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হলে তখন তারা সিজ্‌দা করে না[১]?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

২২. বরং কাফিররা মিথ্যারোপ করে।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আর তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্‌ তা সবিশেষ অবগত।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. কাজেই আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন;

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

---

(১) অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েত পরিপূর্ণ কুরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্‌র দিকে নত হয় না। سجود এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া, আনুগত্য করা। বলাবাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সাজদার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়াও উদ্দেশ্য। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ সূরা পড়ে সাজদাহ করলেন, তারপর লোকদের দিকে ফিরে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এ সূরা পড়ার পরে সাজদাহ করেছেন। [মুসলিম: ৫৭৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি এশার সালাতে এ সূরা পাঠের পর সাজদাহ করলেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর বললেন, আমি আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে সাজদাহ করেছি, সুতরাং তার সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সাজদাহ করবই।" [বুখারী: ১০৭৮, মুসলিম: ৫৭৮]

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

৮৫- সূরা আল-বুরূজ
২২ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝

১. শপথ বুরূজবিশিষ্ট(১) আসমানের,

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝

২. আর প্রতিশ্রুত দিনের,

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝

৩. এবং দ্রষ্টা ও দৃষ্টের(২)---

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝

৪. অভিশপ্ত হয়েছিল(৩) কুণ্ডের

---

(১) بُرُوْجٌ শব্দটি بُرْجٌ এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে, ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾ এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بُرُوْجٌ এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তাফসীরবিদ এ স্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ। অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্যে নির্ধারিত। আবার কারও কারও মতে, এ অর্থ সুন্দর সৃষ্টি। অর্থাৎ সুন্দর সৃষ্টি আসমানের শপথ। তবে ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারীর মত হচ্ছে, এখানে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানস্থলসমূহ। আর তার সংখ্যা বারটি। সূর্য তার প্রতিটিতে একমাস চলে। আর চন্দ্র এর প্রতিটিতে দুইদিন ও একদিনের তিনভাগের এক অংশ সময় চলে। এতে করে চাঁদের আটাশটি অবস্থান হয়। তারপর সে দু'দিন গোপন থাকে। এই বারটির প্রত্যেকটি একেকটি بُرْجٌ। চন্দ্র ও সূর্য আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব بُرْجٌ এর মধ্যে অবতরণ করে। [ইবন কাসীর] তাই আয়াতের অর্থ হবে, সেই আসমানের শপথ, যাতে রয়েছে চাঁদ ও সূর্যের অবতরণস্থানসমূহ, অনুরূপ তাতে রয়েছে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের অবতরনস্থলসমূহ, যেগুলো নিয়ম মেনে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলছে। এ সুন্দর চলন ও সুন্দর নিয়মই আল্লাহর অপার শক্তি, রহমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করছে। [সা'দী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ﴾ বা প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। আর مشهود এর অর্থ আরাফার দিন এবং شاهد এর অর্থ শুক্রবার দিন। জুম'আর দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিনে কোন সূর্য উদিত হয়নি এবং ডুবেওনি। সেদিন এমন একটি সময় আছে, কোন মুমিন বান্দা যখনই কোন কল্যাণের দো'আ করে তখনই তার দো'আ কবুল করা হয়। অথবা যদি কোন অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তখনই তাকে আল্লাহ্ তা থেকে আশ্রয় দেয়।" [তিরমিযী: ৩৩৩৯]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করার পর মূল কথা বর্ণনা করেছেন। (এক) বুরূজবিশিষ্ট আকাশের; (দুই) কেয়ামত দিবসের; (তিন) আরাফার দিনের

অধিপতিরা---[১]

৫. যে কুণ্ডে ছিল ইন্ধনপূর্ণ আগুন, | النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ

৬. যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল; | إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ

এবং (চার) শুক্রবারের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার ও আরাফার দিন মুসলিমদের জন্যে আখেরাতের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন।

(১) যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে এখানে গর্তওয়ালা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত পড়েছিল এবং তারা আল্লাহর আযাবের অধিকারী হয়েছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এর আরেক অর্থ ধ্বংস হয়েছিল। [সা'দী]
গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার ঘটনা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। এক বাদশার কাছে একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাহকে বললো, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত করো, সে আমার কাছ থেকে এ জাদু শিখে নেবে । বাদশাহ জাদু শেখার জন্য জাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু সেই ছেলেটি জাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন রাহেবের (যিনি সম্ভবত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের অনুসারী একজন সাধক ছিলেন) সাক্ষাত গুণে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারীও হয়ে গেলো। সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো। ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, একথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহেবকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারলো না। শেষে ছেলেটি বললো, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ্য জনসমাবেশে "বিস্‌মি রাব্বিল গুলাম" (অর্থাৎ এই ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। ফলে ছেলেটি মারা গেলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চিৎকার করে উঠলো, আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা তাকে বললো, এখন তো তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্মগ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করালো। তাতে আগুন জ্বালালো। যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হলো না তাদের সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলো । [মুসলিম: ৩০০৫ তিরমিযী:৩৩৪০]।

৭. এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল।

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧

৮. আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসার যোগ্য আল্লাহ্‌র উপর ---

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٨

৯. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; আর আল্লাহ্ সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٩

১০. নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে[১] তারপর তাওবা করেনি[২] তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তাদের জন্য রয়েছে দহন যন্ত্রণা[৩]।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١٠

---

(১) فتنوا শব্দের এক অর্থ হচ্ছে, أحرقوا বা জ্বালিয়েছিল। অপর অর্থ পরীক্ষা করা। বিপদে ফেলা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কাফেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেয়ার সাথে সাথে কুরআন বলছে যে, এই আযাব তাদের ওপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তাওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হাসান বসরী বলেন: বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন তুলনা নেই। তারা তো আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদেরকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখছে, আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন। [ইবনুল কাইয়্যেম, বাদায়ে'উস তাফসীর; ইবন কাসীর]

(৩) এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে– (এক) তাদের জন্যে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, (দুই) তাদের জন্যে দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে গিয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত আলেম রবী ইবনে আনাস বলেন, মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহ্ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾
১২. নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾
১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,	إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾
১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল, অতিস্নেহময়[১],	وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾
১৫. 'আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾
১৬. তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন[২]।	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

আরও বেশি প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলিমদের অগ্নি দগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) الودود শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণিত আছে। কারও কারও মতে, 'ওয়াদূদ' বলা হয় তাকে যার কোন সন্তান নেই। অর্থাৎ যার এমন কেউ নেই যার প্রতি মন টানতে থাকবে। [ফাতহুল কাদীর] তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এর অর্থ, প্রিয় বা প্রিয়পাত্র। [ইবন কাসীর] যার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। যারা তাঁকে ভালবাসেন তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাদেরকে ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসে'। [সূরা আল-মায়েদাহ: ৫৪] তিনি এমন সত্তা যাঁকে তার ভালবাসার পাত্ররা এমন ভালবাসে যে ভালবাসার কোন উদাহরণ দেয়া সম্ভব হয় না। যার কোন তুলনা নেই। তাঁর খালেস বান্দাদের অন্তরে তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে সেটার তুলনা কোন ভালবাসা দিয়ে দেয়া যাবে না। আর এজন্যই ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্বের মূল কথা। যে ভালবাসার কারণে যাবতীয় ভালবাসার পাত্রের উপর সেটা স্থান করে নেয়। অন্য ভালবাসা যদি আল্লাহর ভালবাসার অনুগামী না হয় তবে সেটা বান্দার জন্য বিপদ ও শাস্তির কারণ হয়। [সা'দী]

(২) "তিনি ক্ষমাশীল" বলে এই মর্মে আশান্বিত করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি গোনাহ করা থেকে বিরত হয়ে যদি তাওবা করে তাহলে সে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। তিনি গোনাহগারদের প্রতি এতই ক্ষমাশীল যে, তাদেরকে লজ্জা দেন না। আর তাঁর আনুগত্যকারী বন্ধুদেরকে অতিশয় ভালবাসেন। [ফাতহুল কাদীর] "অতিস্নেহময়" বলে الودود শব্দের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না। কারণ, স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে খাটি

১৭. আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত---	هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾
১৮. ফির'আউন ও সামূদের?	فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾
১৯. তবু কাফিররা মিথ্যারোপ করায় রত;	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾
২০. আর আল্লাহ্ সবদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	وَاللّٰهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾
২১. বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন,	بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾
২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।	فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

হলেই তবে তাকে 'ওয়াদূদ' বলা যাবে। তিনি নিজের সৃষ্টিকে অত্যধিক ভালোবাসেন। তাকে তিনি কেবল তখনই শাস্তি দেন যখন সে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করা থেকে বিরত হয় না। এখানে غَفُوْر বা ক্ষমাকারী বলার পরে وَدُوْدٌ বা অতি স্নেহময় বলে এটাই বুঝাচ্ছেন যে, যারা অন্যায় করে তারপর তাওবাহ করবে, তাদেরকে তিনি শুধু ক্ষমাই করবেন না বরং নিখাদভাবে ভালও বাসবেন। [সা'দী] "আরশের মালিক" বলে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয়েছে যে তিনি যেহেতু আরশের মালিক। আর আরশ সবকিছুর উপরে। তাই তিনিও সবকিছুর উপরে। [ইবন কাসীর] সবকিছু মহান আল্লাহ্র আরশের সামনে অতি নগন্য। বরং সমস্ত আসমান, যমীন ও কুরসী সবগুলোকেই আরশ শামিল করে। [সা'দী] কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ তাঁর হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে না। "শ্রেষ্ঠ সম্মানিত" বলে এ ধরনের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার প্রতি অশোভন আচরণ করার হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। তাছাড়া এটি আরশের গুণও হতে পারে। [ইবন কাসীর] তাঁর শেষ গুণটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তিনি যা চান তাই করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজটি করতে চান তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এ সমগ্র সৃষ্টিকুলের কারো নেই। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মৃত্যু শয্যায় কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনাকে কি কোন ডাক্তার দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললেন, ডাক্তার কী বলেছেন? তিনি বললেন, ডাক্তার আমাকে বলেছেন, আমি যা ইচ্ছা তাই করি। [ইবন কাসীর]

৮৬- সূরা আত-তারিক
১৭ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الطَّارِقِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার;

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ①

২. আর কিসে আপনাকে জানাবে 'রাতে যা আবির্ভূত হয়' তা কী?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ②

৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র[১] ।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③

৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে[২] ।

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④

---

(১) প্রথম শপথে আকাশের সাথে والطارق শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্যে নক্ষত্রকে الطارق বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] কুরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন উজ্জল নক্ষত্রকে বোঝানো যায়। [সা'দী] কোন কোন তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ করে নক্ষত্র 'সুরাইয়া'; যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনি গ্রহ'। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনি গ্রহ উভয়কেই نجم বলা হয়ে থাকে। [ফাতহুল কাদীর] ইবনুল কাইয়েম বলেন, যদি উজ্জল নক্ষত্রের উদাহরণ হিসেবে এ দু'টি তারকাকে উল্লেখ করা হয়, তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এ দু'টিকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এমন কিছু নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। [আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন: ১০০]

(২) এটা শপথের জওয়াব। حافظ শব্দের অর্থ তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের ওপর তত্ত্বাবধায়ক বা আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। [ফাতহুল কাদীর] এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় আখেরাত ও কেয়ামতের চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া অনুচিত। এখানে حافظ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ "নিশ্চয় তোমাদের উপর নিয়োজিত রয়েছে তত্ত্বাবধায়করা, সম্মানিত লেখকরা" [সূরা আল-ইনফিতার: ১০-১১]

৫.	অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে[১]!	فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝
৬.	তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে[২],	خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۝
৭.	এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে[৩]।	يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

তাছাড়া حافظ-এর অপর অর্থ আপদ-বিপদ থেকে হেফাযতকারীও হয়ে থাকে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিন-রাত মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্যে যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ অর্থাৎ মানুষের জন্যে পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হেফাযত করে। [সূরা আর-রা'দ: ১১]
অথবা হেফাযতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করেছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় প্রায়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বিষয়টির জন্য আকাশের ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী প্রত্যেকটি গ্রহ ও তারকার কসম খাওয়া হয়েছে।

(১) এখানে আল্লাহ তা'আলা যে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম তার ওপর মানুষেরই নিজের সত্ত্বা থেকে প্রমাণাদি উপস্থাপন করছেন। মানুষ তার নিজের সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখুক। তাকে কিভাবে কোত্থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে অত্যন্ত দুর্বল বস্তু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যিনি প্রথমবার তাকে সৃষ্টি করতে পারেন তিনি অবশ্যই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন, পরে আবার তিনি তা করবেন, আর এটা তো তার জন্য সহজতর"। [সূরা আর-রূম: ২৭] [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ বীর্য থেকে। যা পুরুষ ও নারী থেকে সবেগে বের হয়। যা থেকে আল্লাহর হুকুমে সন্তান জন্মলাভ করে। [ইবন কাসীর]

(৩) ইবন আব্বাস বলেন, পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাস্থির পানি হলদে ও তরল। সে দু'টো থেকেই সন্তান হয়। [ইবন কাসীর]

৮. নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম[১]।

إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ ۝٨

৯. যেদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে[২]

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ ۝٩

১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না, এবং সাহায্যকারীও নয়।

فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ ۝١٠

১১. শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি[৩],

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ۝١١

---

(১) উদ্দেশ্য এই যে, যিনি প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে প্রথম সৃষ্টিতে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম। [ইবন কাসীর] যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারই বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না, এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা যেতে পারে?

(২) গোপন রহস্য বলতে মানুষের যেসব বিশ্বাস ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কেয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। বা প্রকাশ করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের আমলনামা পেশ করা হবে, আর তখন ভাল-মন্দ, উত্তম-অনুত্তম সবই স্পষ্ট হয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর] আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কেয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দারের পিছনে একটি পতাকা লাগানো হবে যাতে থাকবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের গাদ্দারী" [বুখারী: ৬১৭৮, মুসলিম: ১৭৩৫] সুতরাং সেদিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে।

(৩) আকাশের জন্য (বৃষ্টি বর্ষণকারী) বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'রাজ'আ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। তবে পরোক্ষভাবে আরবী ভাষায় এ শব্দটি বৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ বৃষ্টি মাত্র একবার বর্ষিত হয়েই খতম হয়ে যায় না বরং একই মওসূমে বারবার এবং কখনো মওসূম ছাড়াই একাধিকবার ফিরে আসে এবং যখন তখন বর্ষিত হয়। সুতরাং এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। [ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, আকাশের বৃষ্টি প্রতিবছর মানুষের রিযিক নিয়ে আসে। যদি তা নিয়ে না আসত তবে মানুষ ও জীব-জানোয়ারের ধ্বংস অনিবার্য হতো। [ইবন কাসীর] বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার আর একটি কারণ এটাও হতে পারে পৃথিবীর সমুদ্রগুলো থেকে পানি বাষ্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাষ্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

১২. এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়[১],

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾

১৩. নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾

১৪. এবং এটা নিরর্থক নয়[২]।

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾

১৫. তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে[৩],

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি[৪]।

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

১৭. অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য[৫]।

فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

---

(১) যমীন বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া। [ইবন কাসীর; সা'দী] মুজাহিদ বলেন, পথবিশিষ্ট যমীন যা পানি দ্বারা বিদীর্ণ হয়। অথবা যমীন যা বিদীর্ণ হয়ে মৃতরা পুনরুত্থানের জন্য বের হবে। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী] তবে প্রথম তাফসীরটিই বেশী প্রসিদ্ধ।

(২) আসমান ও যমীনের শপথ করে যে কথাটি বলা সেটা হচ্ছে, কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করা। [ফাতহুল কাদীর] বলা হয়েছে, এ কুরআন হক ও সত্য বাণী। [ইবন কাসীর] অথবা বলা হয়েছে, কুরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা কারী। [ফাতহুল কাদীর] এ কুরআন হাসি-তামাশার জন্য আসে নি। এটা বাস্তব সত্য। [ফাতহুল কাদীর] যা কিছু এতে বিবৃত হয়েছে তা বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। সুতরাং কুরআন হক আর তার শিক্ষাও হক।

(৩) অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য নানা ধরণের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কুরআনের পথ থেকে মানুষদেরকে দূরে রাখতে চাচ্ছে। কুরআনের আহ্বানের বিপরীতে চলার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হক দ্বীন নিয়ে এসেছেন তারা তা ব্যর্থ করে দিতে ষড়যন্ত্র করছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ এদের কোন অপকৌশল লাভে কামিয়াব না হয় এবং অবশেষে এরা ব্যর্থ হয়ে যায় সে জন্য আমিও কৌশল করছি। আমি তাদেরকে এমনভাবে ছাড় দিচ্ছি যে তারা বুঝতেই পারছে না। [ফাতহুল কাদীর]

(৫) অর্থাৎ এদেরকে ছেড়ে দিন, তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তাদেরকে অল্প কিছু দিন অবকাশ দিন। দেখুন তাদের শাস্তি, আযাব ও ধ্বংস কিভাবে তাদের উপর আপতিত হয়। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন, "তাদেরকে আমরা অল্পকিছু উপভোগ করতে দেব, তারপর আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে যেতে বাধ্য করব।" [সূরা লুকমান: ২৪]

৮৭- সূরা আল-আ'লা[1]
১৯ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْأَعْلٰى

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) এ সূরা মক্কায় নাযিল হওয়া প্রাচীন সূরাসমূহের অন্যতম। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মুস'আব ইবনে উমায়ের এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমই মদীনায় হিজরত করে আসেন। তারা দু'জনই আমাদেরকে কুরআন পড়ে শোনাতেন। তারপর আম্মার, বিলাল ও সা'দ আসলেন। তারপর উমর ইবনুল খাত্তাব আসলেন বিশজনকে সাথে নিয়ে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন, মদীনাবাসীগণ তার আগমনে যে রকম খুশী হয়েছিলেন তেমন আর কারও আগমনে খুশী হননি। এমনকি আমি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে একথা বলতে শুনেছি যে, এই হলো আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি আমাদের মাঝে তাশরীফ রেখেছেন। তিনি আসার আগেই আমি 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' এবং এ ধরনের আরও কিছু সূরা পড়ে নিয়েছিলাম।" [বুখারী: ৪৯৪১, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৪৯৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন, "তুমি কেন 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা, ওয়াস শামছি ওয়া দুহাহা, ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগসা" এ সূরাগুলো দিয়ে সালাত পড়ালে না?" [বুখারী: ৭০৫, মুসলিম: ৪৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের সালাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশীয়াহ' পড়তেন। আর যদি জুম'আর দিনে ঈদ হতো তবে তিনি দুটাতেই এ সূরা দুটি দিয়ে সালাত পড়াতেন।" [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৭৭] কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আ ও দুই ঈদের সালাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশীয়াহ' দিয়ে সালাত পড়াতেন। এমনকি কখনো যদি জুম'আ ও ঈদের সালাতও একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে যেত তখন তিনি উভয় সালাতে এ দু' সূরাই পড়তেন। [মুসলিম: ৮৭৮, আবুদাউদ: ১১২২, তিরমিযী: ৫৩৩, নাসায়ী: ১৪২৪, ১৫৬৮, ১৫৯০, ইবনে মাজাহ: ১২৮১] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের সালাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, পড়তেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি এর সাথে 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস'ও পড়তেন। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪০৬, ৫/১২৩, আবু দাউদ: ১৪২৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৩০৫] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই এ আয়াত পড়তেন তখন বলতেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'। [আবু দাউদ: ৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৩২, মুস্তাদরাকে হাকিম:১/২৬৩]

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ①

১. আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন(১),

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ②

২. যিনি(২) সৃষ্টি করেন(৩) অতঃপর সুঠাম করেন(৪) ।

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ③

৩. আর যিনি নির্ধারণ করেন(৫) অতঃপর পথনির্দেশ করেন(৬),

---

(১) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যে পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্র, ইবাদাত, তাঁর মাহাত্মের জন্য বিনয়, দৈন্যদশা ও হীনাবস্থা প্রকাশ পায়। আর তাঁর তাসবীহ যেন তাঁর সত্তার মাহাত্ম উপযোগী হয়। যেন তাঁকে তাঁর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ দিয়েই সেগুলোর মহান অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কেবল আহ্বান করা হয়। [সা'দী]

(২) এখানে মূলত: আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কারণ ও হেতুসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহ্র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত কতিপয় কর্মগত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন। কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করেছেন। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্ব-নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে।

(৪) অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ, মজবুত ও সুন্দর করেছেন। [সা'দী]। অর্থাৎ তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুঠাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।" [সুরা আস-সাজদাহ:৭]

(৫) অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুকে তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। প্রতিটি জিনিস সে তাকদীর অনুসরণ করছে। [সা'দী]

(৬) অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ "তিনি বললেন, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন।" [সূরা ত্বাহা: ৫০] এ হিসেবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি

৪. আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন(১), وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝

৫. পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। فَجَعَلَهٗ غُثَاۤءً اَحْوٰى ۝

৬. শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না(২), سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝

৭. আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া(৩)। اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝

করে এর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। তারপর সে তাকদীর নির্ধারিত বিষয়ের দিকে মানুষকে পরিচালিত করছেন। মুজাহিদ বলেন, মানুষকে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের পথ দেখিয়েছেন। আর জীব-জন্তুকে তাদের চারণভূমির পথ দেখিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(১) তিনি চারণভূমির ব্যবস্থা করেছেন। যাবতীয় উদ্ভিদ ও ক্ষেত-খামার। [ইবন কাসীর] غثاء শব্দের অর্থ খড়-কুটো, আবর্জনা; যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। [ফাতহুল কাদীর] أحوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হেকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে দুনিয়ার চাকচিক্য যে ক্ষণস্থায়ী সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। [কুরতুবী]

(২) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর যে সমস্ত দুনিয়াবী নেয়ামত প্রদান করেছেন সেগুলোর কিছু বর্ণনার পর এখন কিছু দ্বীনী নেয়ামত বর্ণনা করছেন। তন্মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে কুরআন। [সা'দী] এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুসংবাদ জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাকে এমন জ্ঞান দান করবেন যে, তিনি কুরআনের কোন আয়াত বিস্মৃত হবেন না। আপনার কাছে কিতাবের যে ওহী আমরা পাঠিয়েছি আমরা সেটার হিফাযত করব, আপনার অন্তরে সেটা গেঁথে দেব, ফলে তা ভুলে যাবেন না। [ইবন কাসীর;সা'দী]

(৩) এই বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, কুরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আরেকটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا﴾ অর্থাৎ 'আমরা কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই'। [সূরা আল-বাকারাহ:১০৬] তাই 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া' বলে রহিত আয়াতগুলোর কথা বলা হয়েছে। দুই. অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য, কখনো সাময়িকভাবে আপনার ভুলে যাওয়া এবং কোন আয়াত বা শব্দ

নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।

৮. আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ(১)। — وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾

৯. অতঃপর উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দিন(২); — فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾

১০. যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে(৩)। — سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

আপনার কোন সময় ভুলে যাওয়া এই ওয়াদার ব্যতিক্রম। যে ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আপনি স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন শব্দ ভুলে যাবেন না। হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মনসুখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪০৭] অন্য হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে কোন আয়াত পড়তে শোনে বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহমত করুন, আমাকে এ আয়াতটি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল এখন মনে পড়েছে। [মুসলিম: ৭৮৮] অতএব, উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য সহজ সরল শরী'আত প্রদান করবেন। যাতে কোন বক্রতা থাকবে না। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যেখানে স্মরণ করিয়ে দিলে কাজে লাগে সেখানে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এর দ্বারা জ্ঞান দেয়ার আদব ও নিয়ম নীতি বোঝা যায়। সুতরাং যারা জ্ঞান গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়, তাদের কাছে সেটা না দেয়া। যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি যদি এমন কওমের কাছে কোন কথা বল যা তাদের বিবেকে ঢুকবে না, তাহলে সেটা তাদের কারও কারও জন্য বিপদের কারণ হবে। তারপর তিনি বললেন, মানুষ যা চিনে তা-ই শুধু তাদেরকে জানাও, তুমি কি চাও যে লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করুক? [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে এমন ধারণা কাজ করে সে অবশ্যই আপনার উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনবে। [ইবন কাসীর]

১১. আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾
১২. যে ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হবে,	الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٢﴾
১৩. তারপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না[১]।	ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾
১৪. অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়[২]।	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾
১৫. এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

(১) অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না। যার ফলে আযাব থেকে রেহাই পাবে না। আবার বাঁচার মতো বাঁচবেও না। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদও পাবে না। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আর যারা জাহান্নামী; তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। তবে এমন কিছু লোক হবে যারা গোনাহ করেছিল (কিন্তু মুমিন ছিল) তারা সেখানে মরে যাবে। তারপর যখন তারা কয়লায় পরিণত হবে তখন তাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে; ফলে তাদেরকে টুকরা টুকরা অবস্থায় নিয়ে এসে জান্নাতের নালাসমূহে প্রসারিত করে রাখা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা এদেরকে সিক্ত কর। এতে তারা বন্যায় ভেসে আসা বীজের ন্যায় আবার উৎপন্ন হবে।" [মুসলিম: ১৮৫] এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে শুধু কাফের-মুশরিকদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, তারা বাঁচবেও না আবার মরবেও না। অর্থাৎ তারা আরামের বাঁচা বাঁচবে না। আবার মৃত্যুও হবে না যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা জাহান্নামে গেলে সেখানে তাদের গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর মৃত্যু প্রাপ্ত হবে, ফলে তারা অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ থেকে মুক্তি পাবে। এরপর সুপারিশের মাধ্যমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

(২) এখানে পরিশুদ্ধ বা পবিত্রতার অর্থ কুফর ও শির্ক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎ আচার-আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করা। আয়াতের আরেক অর্থ, ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করা। তবে যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে। এখানে تزكى শব্দের অর্থ ব্যাপক হতে পারে। ফলে ঈমানগত ও চরিত্রগত পরিশুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

সালাত কায়েম করে[১]।

১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, | بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট[২] ও স্থায়ী[৩]। | وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

১৮. নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে--- | اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

১৯. ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে[৪]। | صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى

---

(১) কেউ কেউ অর্থ করেছেন, তারা তাদের রবের নাম স্মরণ করে এবং সালাত আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম সালাত অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের সালাত দ্বারা এর তাফসীর করে বলেছেন যে, যে যাকাতুল ফিতর এবং ঈদের সালাত আদায় করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, 'নাম স্মরণ করা' বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্কে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করে স্মরণ করেছে, তারপর সালাত আদায় করেছে। সে শুধু আল্লাহ্র স্মরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। বরং নিয়মিত সালাত আদায়ে ব্যাপৃত ছিল। মূলত: এ সবই আয়াতের অর্থ হতে কোন বাধা নেই। [ফাতহুল কাদীর]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তো শুধু এমন যেন তোমাদের কেউ সমূদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়েছে। তারপর সে যেন দেখে নেয় সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?" [মুসলিম: ২৮৫৮]

(৩) অর্থাৎ আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে আনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী। [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (আখেরাত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর সহীফাসমূহে লিখিত আছে। [ইবন কাসীর]

৮৮- সূরা আল-গাশিয়াহ[১]
২৬ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ
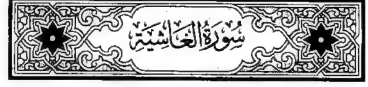
।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে?

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ①

২. সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত[২],

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত[৩],

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③

(১) 'গাশিয়াহ' বলে কিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। এটি কিয়ামতেরই একটি নাম। [ইবন কাসীর] এর আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে, 'আচ্ছন্নকারী'। অর্থাৎ যে বিপদটা সারা সৃষ্টিকুলকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। [ফাতহুল কাদীর] সেদিনের ঘটনা মানুষের যাবতীয় দুঃখকে যেমন আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তেমনি যাবতীয় আনন্দকে মাটি করে দিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট করে দিবে। কোন কোন মুফাসসির 'গাশিয়াহ' এর অনুবাদ করেছেন জাহান্নামের আগুন। কেননা, জাহান্নামের আগুন সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তার প্রতাপে সবকিছু ঢেকে যাবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ﴾ "আর আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল" [সূরা ইবরাহীম: ৫০] আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে, 'গাশিয়াহ' বলে জাহান্নামবাসীদের বোঝানো হয়েছে। কারণ, তারা জাহান্নামকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। সেখানে যেতে ও আযাব ভোগ করতে তাদের বাধ্য করা হবে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থটি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কেয়ামতে মুমিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خاشعة অর্থাৎ হেয় হবে। خشوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। [ইবন কাসীর]

(৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَامِلَةٌ এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَاصِبَةٌ। [ফাতহুল কাদীর] কাফেরদের এ অবস্থা কখন হবে? এ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কাফেরদের এ দুরাবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা, আখেরাতে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। [ফাতহুল কাদীর] কেননা, অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থকে। হিন্দু যোগী ও নাসারা পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলারই

৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে[১]; تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾

৫. তাদেরকে অত্যন্ত উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে; تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾

৬. তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾

সন্তুষ্টির জন্যে দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং আখেরাতে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে। খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন শাম সফর করেন তখন জনৈক নাসারা বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছ দিয়ে যেতে দেখলেন। সে তাঁর ধর্মীয় ইবাদত সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন: এই বৃদ্ধার করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুটি অর্জন করতে পারেনি। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [ইবন কাসীর]

কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহর মতে, তাদের অবিরাম কষ্ট ও ক্লান্তি দু'টোই আখেরাতে হবে। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে অহংকার করেছিল তাদেরকে সেদিন কর্মে খাটানো হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রতিষ্ঠিত করা হবে; এমতাবস্থায় যে তারা তাদের ভারী জিঞ্জির ও ভারী বোঝাসমূহ বহন করতে থাকবে। অনুরূপভাবে তারা হাশরের মাঠের সে বিপদসংকুল সময়ে নগ্ন পা ও শরীর নিয়ে কঠিন অবস্থায় অবস্থান করতে থাকবে, যার পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন, তারা যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র জন্য কোন নেক আমল করেনি, সেহেতু সেখানে তারা জাহান্নামে কঠিন খাটুনি ও কষ্ট করবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাদেরকে কঠিন কঠিন পাহাড়ে ওঠা-নামার কাজে লাগানো হবে। পরে কষ্ট ও ক্লান্তি উভয়টিরই সম্মুখীন হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) শব্দের অর্থ গরম উত্তপ্ত। অগ্নি স্বাভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা এ কথা বলার জন্যে যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত। সে আগুন তাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে ধরবে। [সা'দী]

গুল্ম ছাড়া[১],

৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না।

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿٧﴾

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

৯. নিজেদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্ত[২],

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾

১০. সুউচ্চ জান্নাতে---

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾

১১. সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না[৩],

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾

---

(১) ضَرِيعٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, কাঁটাযুক্ত গুল্ম। অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না কেবল এক প্রকার কন্টকবিশিষ্ট ঘাস। পৃথিবীর মাটিতে এ ধরনের গুল্ম ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারে কাছেও যায় না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, ضَرِيعٌ হচ্ছে জাহান্নামের একটি গাছ। যা খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে না। [ফাতহুল কাদীর]

লক্ষণীয় যে, কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে, জাহান্নামের অধিবাসীদের খাবার জন্য "যাককুম" দেয়া হবে। কোথাও বলা হয়েছে, "গিসলীন" (ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া তরল পদার্থ) ছাড়া তাদের আর কোন খাবার থাকবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, তারা খাবার জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। এর অর্থ এও হতে পারে যে, জাহান্নামের অনেকগুলো পর্যায় থাকবে। বিভিন্ন অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী সেই সব পর্যায়ে রাখা হবে। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেয়া হবে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা "যাককুম" খেতে না চাইলে "গিসলীন" পাবে এবং তা খেতে অস্বীকার করলে কাঁটাওয়ালা ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মোটকথা, তারা কোন মনের মতো খাবার পাবে না। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে ও কাজ করে এসেছে আখেরাতে তার চমৎকার ফল দেখে তারা আনন্দিত হবে। [ফাতহুল কাদীর] এটা তাদের প্রচেষ্টার কারণেই সম্ভব হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর

১২. সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ,

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾

১৩. সেখানে থাকবে উন্নত[১] শয্যাসমূহ,

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

১৪. আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র,

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾

১৫. সারি সারি উপাধান,

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾

১৬. এবং বিছানা গালিচা;

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

১৭. তবে কি তারা তাকিয়ে দেখে না উটের দিকে, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

১৮. এবং আসমানের দিকে, কিভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে[২]?

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ "সেখানে তারা 'শান্তি' ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ।" [সূরা মারইয়াম:৬২] আরও এসেছে, ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ "সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য," [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২৫] আরও বলা হয়েছে, ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ "সেখানে তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য" [সূরা আন-নাবা:৩৫] এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) এ উন্নত অবস্থা সার্বিক দিকেই হবে। এ সমস্ত শয্যা অবস্থান, মর্যাদা ও স্থান সবদিক থেকেই উন্নত। সাধারণত মানুষ এ ধরনের শয্যা পছন্দ করে থাকে। আল্লাহর বন্ধুরা যখন এ সমস্ত শয্যায় বসতে চাইবে, তখনি সেগুলো তাদের জন্য নিচু হয়ে আসবে। [ইবন কাসীর]

(২) কেয়ামতের অবস্থা এবং মুমিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কেয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী

২১. অতএব আপনি উপদেশ দিন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা[১],	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২. আপনি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নন।	لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে	إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. আল্লাহ্ তাদেরকে দেবেন মহাশাস্তি[২]।	فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫. নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমাদেরই কাছে;	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. তারপর তাদের হিসেব-নিকেশ আমাদেরই কাজ।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে, আপনার বর্ণিত ন্যায়সংগত যুক্তি মানতে যদি কোন ব্যক্তি প্রস্তুত না হয়, তাহলে মানা না মানা তার ইচ্ছা। আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মুমিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেয়া। লোকদেরকে ভুল ও সঠিক এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য জানিয়ে দেয়া। তাদেরকে ভুল পথে চলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা। কাজেই এ দায়িত্ব আপনি পালন করে যেতে থাকুন। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) আবু উমামাহ্ আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার নিকট গমন করলে খালেদ তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি সবচেয়ে নরম বা আশাব্যঞ্জক কোন বাণী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মনে রেখ! তোমাদের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে মালিক থেকে পলায়ণপর উটের মত পালিয়ে বেড়ায়"। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৮৫, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৫৫]

৮৯- সূরা আল-ফাজ্‌র[১]
৩০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الفَجْرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. শপথ ফজরের[২], وَالْفَجْرِ ۝١

২. শপথ দশ রাতের[৩], وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছেন, মু'আয তুমি কেন সূরা 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'ওয়াস শামছি ওয়া দুহাহা', 'ওয়াল ফাজর' আর 'ওয়াললাইলি ইযা ইয়াগশা' দিয়ে সালাত পড়ো না? [সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ীঃ ১১৬৭৩]

(২) শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়, যা ঊষা নামে খ্যাত। এখানে কোন 'ফজর' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. প্রত্যেক দিনের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। দুই. এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকাল বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে কারো কারো মতে এর দ্বারা মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য; কারণ এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, যিলহজ্ব মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, কাতাদা ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদদের মতে এতে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] যা সর্বোত্তম দিন বলে বিভিন্ন হাদীসে স্বীকৃত। হাদীসে এসেছে, "এদিনগুলোতে নেক আমল করার চেয়ে অন্য কোন দিন নেক আমল করা আল্লাহ্‌র নিকট এত উত্তম নয়, অর্থাৎ জ্বিলহজের দশ দিন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয় তবে সে ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি"। [বুখারীঃ ৯৬৯, আবুদাউদ:২৩৪৮, তিরমিযীঃ ৭৫৭, ইবনে মাজাহঃ ১৭২৭, মুসনাদে আহমাদ:১/২২৪] তাছাড়া এই দশ দিনের তাফসীরে জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় দশ হচ্ছে কোরবানীর মাসের দশদিন, বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন" [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩২৭, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ৪/২২০, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ীঃ ৪০৮৬, ১১৬০৭,১১৬০৮] সুতরাং এখানে দশ রাত্রি বলে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন : মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনীতে ﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে।

৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের[১] وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

৪. শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে-[২]-- وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝

৫. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য[৩] । هَلْ فِى ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ ۝

কুরতুবী বলেন, জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্বের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল ।

(১) এ দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বিজোড়' । এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না । তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য । কিন্তু জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বেজোড় এর অর্থ আরাফা দিবস (যিলহজ্বের নবম তারিখ) এবং জোড় এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহ্‌র (যিলহজ্বের দশম তারিখ)" । [মুসনাদে আহমাদ:৩/৩২৭] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে যাবতীয় সালাত আর বেজোড় বলে বিতর ও মাগরিবের সালাত বোঝানো হয়েছে । কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে । কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন । তিনি বলেন, ﴿وَّخَلَقْنٰكُمْ أَزْوَاجًا﴾ অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি । [সূরা আন-নাবা:৮] যথা: কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী । এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা । [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে যেহেতু জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এর একটি তাফসীর এসেছে সেহেতু সে তাফসীরটি বেশী অগ্রগণ্য ।

(২) يسري অর্থ রাত্রিতে চলা । অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে । [ইবন কাসীর]

(৩) উপরোক্ত পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফেল মানুষকে চিন্তাভাবনা করার জন্যে বলেছেন, "এতে কি বিবেকবানরা শপথ নেয়ার মত গুরুত্ব খুঁজে পায়? মূলত: حجر এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া । মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে । তাই حجر এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে । এখানে তাই বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর] আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্যে এসব শপথও যথেষ্ট কিনা? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফলত থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল । পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের ওপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি আখেরাতে হওয়া তো

৬. আপনি দেখেননি আপনার রব কি (আচরণ) করেছিলেন 'আদ বংশের---

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি[১]---যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?---

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

৮. যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি[২];

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে–(এক) 'আদ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) ফির'আউন সম্প্রদায়।

(১) 'আদ ও সামুদ জাতিদ্বয়ের বংশলতিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। তাই আয়াতে বর্ণিত ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে 'আদ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম 'আদকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় 'আদের তুলনায় 'আদের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে عاد إرم 'আদে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সূরা আন-নাজমে ﴿عَادًا الْأُولَىٰ﴾ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ذات العماد মূলত: عماد শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ বলা হয়েছে। অপর কারো কারো মতে তারা যেহেতু অট্টালিকায় বাস করত সেহেতু তাদেরকে ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ বলা হয়েছে। কারণ অট্টালিকা নির্মাণ করতে স্তম্ভ নির্মানের প্রয়োজন হয়। তারা সর্বপ্রথম এ জাতীয় অট্টালিকা নির্মাণ করে। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: হূদ আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বললেন,"তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়াগায় অনর্থক একটি স্মৃতিগৃহ তৈরি করছো এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমনা চিরকাল এখানে থাকবে।" [সূরা আশ শু'আরা: ১২৮-১২৯] অন্য আয়াতে আছে, ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ﴾ "আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদ বাসের জন্য। [সূরা আল-হিজর: ৮২]

(২) অর্থাৎ 'আদ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন।" [সূরা আল আরাফ, ৬৯] আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেছেন, "আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে,

৯. এবং সামূদের প্রতি ?- যারা উপত্যকায়[১] পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল;

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

১০. এবং কীলকওয়ালা ফির'আউনের প্রতি[২]?

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝

১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১২. অতঃপর সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝

১৩. ফলে আপনার রব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

১৪. নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

কে আছে আমাদের চাই তে বেশী শক্তিশালী?" [সূরা হা-মীম আস সাজদাহ, ১৫] আরও বলেছেন, "আর তোমরা যখন কারো ওপর হাত উঠিয়েছো প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই উঠিয়েছো।" [সূরা আশ শু'আরা, ১৩০]

(১) উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) أوتاد শব্দটি وتد এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফির'আউনের জন্য 'যুল আউতাদ' (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। ফির'আউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। কারও কারও মতে এর দ্বারা যুলুম নিপীড়ন বোঝানোই উদ্দেশ্য। কারণ, ফির'আউন যার উপর ক্রোধান্বিত হত, তার হাত-পা চারটি পেরেকে বেঁধে অথবা চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে রাখত। বা কোন গাছের সাথে পেরেক মেরে রাখত। অথবা পেরেক মেরে দেহের উপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে তার সেনাবাহিনীকেই কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর অধিকারী। কারণ তাদেরই বদৌলতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাবু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাছাড়া এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাবু গাঁড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাঁবুর কীলকই পোঁতা দেখা যেতো। কারও কারও মতে, এর দ্বারা ফির'আউনের প্রাসাদ-অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। এসবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ফির'আউন মূলতঃ এসবেরই অধিকারী ছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

রাখেন[১]।

১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন[২]।'

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয্‌ক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে হীন করেছেন।'

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

১৭. কখনো নয়[৩]। বরং[৪] তোমরা

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝

(১) এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যাকিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে বিভিন্ন ভাবে ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে- সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্য পাত্র। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] সে আরও মনে করে যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয় পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্রের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে।

(৩) পূর্ববর্তী ধারণা খণ্ডানোর জন্যই মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে বলছেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত ধারণাসমূহ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ সৎ ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। কোন কোন নবী-রাসূল কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন আবার কোনও কোনও আল্লাহ্‌দ্রোহী আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৪) এখানে কাফের ও তাদের অনুসারী ফাসিকদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং

ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

১৮. এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না[১],

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল[২],

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালবাস[৩];

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

২১. কখনো নয়[৪]। যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে[৫],

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

২২. আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশ্‌তাগণও[৬],

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করো না। [ফাতহুল কাদীর] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতে আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী এভাবে থাকবে" এটা বলে তিনি তার মধ্যমা ও তর্জনী আংগুলদ্বয় একসাথ করে দেখালেন। [বুখারী: ৬০০৫]

(১) এখানে তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকে খাবার দাওই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না।

(২) এখানে তাদের তৃতীয় মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা হালাল ও সব রকম ওয়ারিশী সম্পত্তি একত্রিত করে খেয়ে ফেল [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে চতুর্থ মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যাধিক ভালবাস। [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ তোমাদের কাজ এরকম হওয়া উচিত নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(৫) কাফেরদের মন্দ অভ্যাসসমূহ বর্ণনার পর আবার আখেরাতের আলোচনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, যখন ভুকম্পনের মত হয় সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে; তখন কার কি অবস্থা হবে একটু চিন্তা করা দরকার।

(৬) মূলে বলা হয়েছে ﴿وَّجَآءَ رَبُّكَ﴾ এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "আপনার রব আসবেন।" এখানে 'হাশরের মাঠে আল্লাহর আগমন' সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি (আল্লাহ্‌) অবশ্যই হাশরের মাঠে বিচার ফয়সালা করার জন্য স্বয়ং আসবেন। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্‌ তা'আলা হাশরের মাঠে আগমন করবেন এটা সত্য। যেভাবে আসা তাঁর জন্য উপযুক্ত তিনি সেভাবে আসবেন। এই আগমনের অর্থ আমরা বুঝি কিন্তু তিনি

২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে[১], সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, তখন এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে[২]?

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝٢٣

২৪. সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?'

يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ۝٢٤

২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না,

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ۝٢٥

২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে কেউ পারবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ۝٢٦

২৭. হে প্রশান্ত আত্মা!

يَٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧

২৮. তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে[৩],

ارْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨

কিভাবে আগমন করবেন তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমদের বিশ্বাস। দুনিয়ায় কোন বাদশাহর সমগ্র সেনাদল এবং তার মন্ত্রণাপরিষদ ও সভাসদদের আগমনে ঠিক ততটা প্রভাব ও প্রতাপ সৃষ্টি হয় না যতটা বাদশাহর নিজের দরবারে আগমনে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই এখানে বুঝানো হয়েছে।

(১) অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে বা সামনে উপস্থিত করা হবে। হাদীসে এসেছে, "জাহান্নামকে ফেরেশতারা টেনে নিয়ে আসবে, সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে, প্রতি লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে।" [মুসলিম: ২৮৪২, তিরমিযী:২৫৭৩]

(২) মূলে বলা হয়েছে يَتَذَكَّرُ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. يَتَذَكَّرُ এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। সুতরাং সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কী লাভ? [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] দুই. অথবা يَتَذَكَّرُ অর্থ স্মরণ করা। অর্থাৎ সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) এখানে মুমিনদের রূহকে 'আন-নাফসুল মুতমায়িন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার

২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও[1],	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।	وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।
এখন প্রশ্ন হলো, একথা তাকে কখন বলা হবে? বলা হয় মৃত্যুকালে বলা হবে; অথবা, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে পেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা নেককার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ কারণেই সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম দো'আ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ "এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করুন।" [সূরা আন-নামল:১৯] অনুরূপভাবে ইউসুফ আলাইহিস্ সালামও দো'আ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ "আর আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন" [সূরা ইউসুফ: ১০১] এমনকি ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও দো'আ করে বলেছিলেন, ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ "হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন"। [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৩] এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহা নেয়ামত, যা নবী-রাসূলগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

৯০- সূরা আল-বালাদ
২০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ البَلَد

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি[১] শপথ করছি এ নগরের,[২]

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

২. আর আপনি এ নগরের অধিবাসী[৩],

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

---

(১) এ সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে, لا শব্দটির অর্থ, না । কিন্তু এখানে لا শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে । এক. এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত । তবে বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই لا শব্দটি শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয় । উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল আপনার ধারণা নয়; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য । অথবা অমুক অমুক জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আসল ব্যাপার হচ্ছে এই । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) البلد বা নগরী বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর] সূরা আত-ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে أمين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে ।

(৩) حلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে (এক) এটা حلول থেকে উদ্ভূত । অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা । সে হিসেবে আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন । বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায় । কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে । [ফাতহুল কাদীর] (দুই) এটা حلال থেকে উদ্ভূত । অর্থ হালাল হওয়া । এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে; অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না । এমতাবস্থায় তাদের যুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে । অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্যে মক্কার হারামে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে । [ইবন কাসীর] বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল । আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তারপর যখন তিনি তা খুললেন, এক লোক এসে তাকে বলল যে, ইবনে খাতল কা'বার পর্দা ধরে আছে । তিনি বললেন, 'তাকে হত্যা কর' । [বুখারীঃ ১৮৪৬, মুসলিমঃ ৪৫০] কারণ, পূর্ব থেকেই তার মৃতুদণ্ডের ঘোষণা রাসূল দিয়েছিলেন ।

৩. শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে[১]।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝

৪. নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে[২]।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝

৫. সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝

৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি[৩]।'

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝

৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝

৮. আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুচোখ?

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝

---

(১) যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিসসালামই হতে পারেন। আর তাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে এতে আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অথবা وَالِدٌ বলে প্রত্যেক জম্মদানকারী পিতা আর وَلَدَ বলে প্রত্যেক সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে পূর্ববর্তী শপথসমূহের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ﴾ আয়াতে বর্ণিত كبد এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) বলা হয়েছে সে বলে "আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বক্তা তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুঁকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য।

৯. আর জিহ্‌বা ও দুই ঠোঁট? وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝

১০. আর আমরা তাকে দেখিয়েছি(১) দু'টি পথ(২)। وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝

১১. তবে সে তো বন্ধুর গিরিপথে(৩) প্রবেশ করেনি। فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

১২. আর কিসে আপনাকে জানাবে--- বন্ধুর গিরিপথ কী? وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

(১) অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু'টি পথের দিশাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দিয়েছেন। শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এই একই কথা বলা হয়েছে, সেখানে এসেছে, "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।" [সূরা আল-ইনসান: ২-৩]

(২) نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْدٌ এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। [ফাতহুল কাদীর] এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এপথ দুটির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ। এ পথ দু'টির একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বল্গাধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

(৩) عقبة বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথকে। [ফাতহুল কাদীর]

১৩. এটা হচ্ছেঃ দাসমুক্তি[১]

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান[২]--

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾

১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে[৩],

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾

১৬. অথবা দারিদ্র-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

১৭. তদুপরি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য ধারণের, আর পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া-অনুগ্রহের[৪];

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

---

(১) এসব সৎকর্মের মধ্যে প্রথমে দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। বিভিন্ন হাদীসে এর অনেক সওয়াবের উল্লেখ এসেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে কেউ কোন দাসকে মুক্ত করবে সেটা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচিত হবে”। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৪৭, ১৫০]

(২) দ্বিতীয় সৎকর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, বিশেষভাবে যদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কোন মুসলিম ক্ষুধার্তকে অন্নদান ক্ষমাকে অবশ্যম্ভাবী করে”। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৫২৪]

(৩) এ ধরনের ইয়াতীমের হক সবচেয়ে বেশী। একদিকে সে ইয়াতীম, দ্বিতীয়ত সে তার নিকটাত্মীয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘মিসকীনকে দান করা নিঃসন্দেহে একটি দান কিন্তু আত্মীয়দের দান করা দু'টি। দান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২১৪, তিরমিযীঃ ৬৫৩]

(৪) এ আয়াতে ঈমানের পর মুমিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলিম ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎকর্ম সম্পাদন করা। مرحمة এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও যুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। হাদীসে এসেছে, “যে মানুষের প্রতি রহমত

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝١٨

১৮. তারাই সৌভাগ্যশালী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝١٩

১৯. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে কুফরী করেছে, তারাই হতভাগ্য।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝٢٠

২০. তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনে।

করে না আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত করেন না"। [বুখারী: ৭৩৭৬, মুসলিম: ৩১৯, মুসনাদে আহমাদ:৪/৫৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, "যে আমাদের ছোটদের রহমত করে না এবং বড়দের সম্মান পাওয়ার অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়"। [আবুদাউদ: ৪৯৪৩, তিরমিযী: ১৯২০] আরও বলা হয়েছে, "যারা রহমতের অধিকারী (দয়া করে) তাদেরকে রহমান রহমত করেন, তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি রহমত কর তবে আসমানের উপর যিনি আছেন (আল্লাহ্) তিনিও তোমাদেরকে রহমত করবেন।" [আবু দাউদ: ৪৯৪১, তিরমিযী: ১৯২৪]

سُوْرَةُ الشَّمْسِ

৯১- সূরা আশ-শাম্‌স[১]
১৫ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ①

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের[২],

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا ②

২. শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়[৩],

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا ③

৩. শপথ দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে[৪],

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا ④

৪. শপথ রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে[৫],

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ⑤

৫. শপথ আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর[৬],

---

(১) এ সূরা দিয়ে সালাত আদায় করার কথাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছিলেন। [বুখারী:৭০৫, মুসলিম: ৪৬৫]

(২) এখানে ضحى শব্দটি شمس এর বিশেষণ। এ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো দিন, দিনের প্রথমভাগ। [মুয়াসসার, তাবারী] এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, তা হলো, আর শপথ সূর্যের কিরণ বা আলোর। [সা'দী, জালালাইন]

(৩) অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের অনুসরণ করে, সূর্যের পর আসে। এর অর্থ এই হতে পারে যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরপরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। [কুরতুবী]

(৪) এখানে جلاها এর সর্বনাম দ্বারা সূর্যও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার অন্ধকার বা আঁধার দূর করাও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। অথবা যখন তা অন্ধকারকে আলোকিত করে দুনিয়াকে প্রকাশ করে। [কুরতুবী] এর তৃতীয় অর্থ হতে পারে, শপথ সূর্যের, যখন তা পৃথিবীকে প্রকাশিত করে। [ইবন কাসীর]

(৫) অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। এর অর্থ, সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, শপথ রাত্রির, যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে; ফলে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। [কুরতুবী]

(৬) অর্থাৎ শপথ আকাশের ও যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর। এ-অর্থানুসারে ما কে من এর অর্থে নিতে হবে। [তাবারী] আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, শপথ আকাশের এবং

৬. শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর[১],

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

৭. শপথ নফ্‌সের[২] এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর [৩],

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝

৮. তারপর তাকে তার সৎকাজের এবং তার অসৎ-কাজের জ্ঞান দান করেছেন[৪]–

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

তা নির্মাণের। এ অবস্থায় ما কে مصدرية এর অর্থে নিতে হবে। [কুরতুবী]

(১) এর এক অর্থ, শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন। অপর অর্থ হচ্ছে, শপথ পৃথিবীর এবং একে বিস্তৃত করার। [তাবারী]

(২) এখানে মূলে نفس শব্দটি বলা হয়েছে। নফস শব্দটি দ্বারা যেকোনো প্রাণীর নফস বা আত্মা উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার জবাবদিহি করতে বাধ্য মানুষের নফসও উদ্দেশ্য হতে পারে। [সা'দী]

(৩) এখানেও দু রকম অর্থ হতে পারে। একটি হলো, শপথ নফসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। আরেকটি হলো, শপথ মানুষের প্রাণের এবং তা সুবিন্যস্ত করার। এখানে سواها মানে হচ্ছে, নফসকে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে ও সুবিন্যস্তভাবে তৈরি করেছেন। [কুরতুবী] এছাড়া "সুবিন্যস্ত করার" মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, তাকে জন্মগতভাবে সহজ সরল প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন। [ইবন কাসীর]

(৪) এর অর্থ, আল্লাহ্ তার নফসের মধ্যে নেকি ও গুনাহ উভয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং চিনিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক নফসেরই ভালো ও মন্দ কাজ করার কথা রেখে দিয়েছেন; এবং যা তাকদীরে লেখা রয়েছে তা সহজ করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] একথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, "আর আমরা ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।" [সূরা আল-বালাদ:১০] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" [সূরা আল-ইনসান:৩] একথাটিই অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে, "অবশ্যই আমি শপথ করছি নাফস আল-লাওয়ামার" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২] সুতরাং মানুষের মধ্যে একটি নাফসে লাওয়ামাহ্ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। আরও এসেছে, "আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে।" [সূরা আল-কিয়ামাহ্: ১৪-১৫] এই তাফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্যে সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি

৯. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। | قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

হাদীস থেকে এই তাফসীর গৃহীত হয়েছে। তাকদীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। [মুসলিম: ২৬৫০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪৩৮] এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেননি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করতেন, اللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান করুন এবং নাফসকে পবিত্র করুন, আপানিই তো উত্তম পবিত্রকারী। আর আপনিই আমার নাফসের মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।" [মুসলিম: ২৭২২] তাকওয়া যেভাবে ইল্‌হাম হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কোন কোন মানুষের পাপের কারণে তাদের অন্তরে পাপেরও ইল্‌হাম করেন। [উসাইমীন: তাফসীর জুয আম্মা] যদি আল্লাহ্ কারও প্রতি সদয় হন তবে তাকে ভাল কাজের প্রতি ইলহাম করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করতে সমর্থ হয় সে যেন আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করে। আর যদি সে খারাপ কাজ করে তবে তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা উচিত। আল্লাহ্ কেন তাকে দিয়ে এটা করালেন, বা এ গোনাহ তার দ্বারা কেন হতে দিলেন, এ ধরনের যুক্তি দাঁড় করানোর মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়েই রাখা যায়, কোন সমাধানে পৌঁছা যাবে না। কারণ; রহমতের তিনিই মালিক; তিনি যদি তার রহমত কারও প্রতি উজাড় করে দেন তবে সেটা তার মালিকানা থেকে তিনি খরচ করলেন পক্ষান্তরে যদি তিনি তার রহমত কাউকে না দেন তবে কারও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলার অধিকার নেই। যদি আপত্তি না তোলে তাওবাহ করে নিজের কোন ক্রটির প্রতি দিক নির্দেশ করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে তবে হয়ত আল্লাহ্ তাকে পরবর্তীতে সঠিক পথের দিশা দিবেন এবং তাঁর রহমত দিয়ে ঢেকে দিবেন এবং তাকওয়ার অধিকারী করবেন। ঐ ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য যে আল্লাহ্‌র কর্মকাণ্ডে আপত্তি তোলতে তোলতে নিজের সময় নষ্ট করার পাশাপাশি তাকদীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ভাল আমল পরিত্যাগ করে তাকদীরের দোষ দিয়ে বসে থাকে। হ্যাঁ, যদি কোন বিপদাপদ এসে যায় তখন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র তাকদীরে সন্তুষ্টি প্রকাশের খাতিরে তাকদীরের কথা বলে শোকরিয়া আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে গোনাহের সময় কোনভাবেই তাকদীরের দোহাই দেয়া যাবে না। বরং নিজের দোষ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ করে ভবিষ্যতের জন্য তাওফীক কামনা করতে হবে। এজন্যই বলা হয় যে, 'গোনাহের সময় তাকদীরের দোহাই দেয়া যাবে না, তবে বিপদাপদের সময় তাকদীরের দোহাই দেয়া যাবে।' [দেখুন, উসাইমীন, আল-কাওলুল মুফীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ: ২/৩৯৬-৪০২]

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

১০. আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে[১]।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١

১১. সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত[২] মিথ্যারোপ করেছিল।

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢

১২. তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣

১৩. তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও[৩]।'

---

(১) পূর্বোক্ত শপথগুলোর জওয়াবে এ আয়াতগুলোয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, ﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا﴾ এখানে, زكاها শব্দটি تزكية থেকে। এর প্রকৃত অর্থ পরিশুদ্ধতা; বৃদ্ধি বা উন্নতি। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তিকে দুস্কৃতি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে সৎকাজ ও নেকির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম হয়েছে। এর মোকাবেলায় বলা হয়েছে, دَسَّاهَا এর শব্দমূল হচ্ছে تَدْسِيْسٌ। যার মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা; পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই ব্যর্থ, যে নিজের নফসকে নেকী ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে বিভ্রান্ত করে অসৎপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্‌সির আয়াত দুটির আরেকটি অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। [ইবন কাসীর, তাবারী]

(২) অর্থাৎ তারা সালেহ্ আলাইহিস্‌সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুস্কৃতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং সালেহ আলাইহিস্ সালাম যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতেও তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন সূরা আল-আ'রাফ ৭৩-৭৬, হুদ ৬১-৬২, আশ শু'আরা ১৪১-১৫৩, আন-নামল ৪৫-৪৯, আল-ক্বামার ২৩-২৫।

(৩) কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামূদ জাতির লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বলে দিয়েছিল যে, যদি তুমি

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾

১৪. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং উষ্ট্রীকে জবাই করল(১)। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন(২)।

وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا ﴿١٥﴾

১৫. আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না(৩)।

সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মু'জিযা) পেশ করো। একথায় সালেহ আলাইহিস্ সালাম মু'জিযা হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাযির করেন, তিনি বলেন: এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোককে ডেকে একমত হলো এবং বলল, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। [দেখুন: সূরা আল-আ'রাফ ৭৩, আশ-শু'আরা ১৫৪-১৫৬ এবং আল-ক্বামার ২৯]

(১) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, উটনীকে হত্যা করার পর সামুদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, "তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৭৭] তখন "সালেহ আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না।" [সূরা হূদ: ৬৫]

(২) আয়াতে উল্লেখিত دَمْدَمَ শব্দটি এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির ওপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। [কুরতুবী] এখানে سواها এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নিয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ তাদের প্রতি যে আযাব নাযিল করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এর কোন পরিণামের ভয় করেন না। কেননা, তিনি সবার উপর কর্তৃত্বশালী, সর্ব-নিয়ন্ত্রণকারী ও একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুই হতে পারে না। তাঁর হুকুম-নির্দেশ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞারই নিদর্শন। [সা'দী]

৯২- সূরা আল-লাইল[১]
২১ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ اللَّيْلِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١

২. শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢

৩. শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন–

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির[২]।

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤

৫. কাজেই[৩] কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে,

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥

৬. এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে,

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦

---

(১) এ সূরা দিয়ে সালাত আদায় করার কথাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছিলেন। [বুখারী:৭০৫, মুসলিম: ৪৬৫]

(২) এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য এই হতে পারে যে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিপরীত ঠিক তেমনই তোমরা যেসব কর্মপ্রচেষ্টা চালাচ্ছো সেগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং বিপরীত। কেউ ভালো কাজ করে, আবার কেউ খারাপ কাজ করে। [ইবন কাসীর] হাদীসে আছে, "প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় উঠে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্ত করে; আবার কেউ নিজেকে ধ্বংস করে।" [মুসলিম: ২২৩]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কর্ম প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। প্রথমে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা একমাত্র তাঁরই পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'আলা যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে দূরে থাকে এবং উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলেমা'কে বিশ্বাস করা বলতে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং কালেমা থেকে প্রাপ্ত আকীদা-বিশ্বাস ও এর উপর আরোপিত পুরস্কার-তিরস্কারকে বিশ্বাস করা বুঝায়। [সা'দী]

৭. আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ(১) ।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۞

৮. আর(২) কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করলে,

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۞

৯. আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۞

১০. তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ(৩) ।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۞

---

(১) এটি হচ্ছে উপরোক্ত প্রচেষ্টার ফল । যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে করে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার সব উত্তম কাজ করা ও উত্তম কাজের উপায় সহজ করে দেন, আর খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ করে দেন । [সা'দী]

(২) এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা । মহান আল্লাহ্ এখানে তাদের তিনটি কর্ম উল্লেখ করে বলেছেন, যে আল্লাহ্ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তাঁর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা ফরয-ওয়াজিব-মুস্তাহাব কোন প্রকার সদকা দেয় না, আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বনের পরিবর্তে, তাঁর প্রতি ইবাদত করার পরিবর্তে বিমুখ হয়ে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের যাবতীয় বিষয়কে মিথ্যা মনে করে; তার জন্য কঠিন পথে চলা সহজ করে দিব । এখানে কঠিন পথ অর্থ কঠিন ও নিন্দনীয় অবস্থা তথা খারাপ কাজকে সহজ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে । [সা'দী] প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অমিল । কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়, বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর ও বান্দার হকে সামান্য কিছু হলেও ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে । আর বেপরোয়া হয়ে যাওয়া ও অমুখাপেক্ষী মনে করা হলো তাকওয়া অবলম্বনের সম্পূর্ণ বিপরীত স্তর । তাকওয়া অবলম্বনের কারণে মানুষ তার নিজের দূর্বলতা এবং তার স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষীতার মর্ম বুঝতে পারে । এ-জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অখুশি হন এমন কোন বিষয়ের ধারে কাছেও যায় না, আর যাতে খুশি হন তা করার সর্বপ্রচেষ্টা চালায় । আর যে ব্যক্তি নিজেকে তার রবের অমুখাপেক্ষী মনে করে, সে বেপরোয়া হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজে খুশি হন আর কোন কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্কা করে না । তাই তার কাজকর্ম কখনো মুত্তাকীর কর্মপ্রচেষ্টার সমপর্যায়ের হতে পারে না । উত্তম কালমায় মিথারোপ করা অর্থ ঈমানী শক্তিকে নষ্ট করে দিয়ে ঈমানের কালিমা ও আখেরাতের কথা মিথ্যা গণ্য করা । [দেখুনঃ বাদা'ই'উত তাফসীর]

(৩) অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দান করা, আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করা এবং ঈমানকে সত্য

১১. আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে[1] ।

وَمَا يُغۡنِيۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰىؕ ﴿۱۱﴾

১২. নিশ্চয় আমাদের কাজ শুধু পথনির্দেশ করা[2],

اِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدٰىۖ ﴿۱۲﴾

১৩. আর আমরাই তো মালিক আখেরাতের ও প্রথমটির (দুনিয়ার)[3] ।

وَاِنَّ لَنَا لَلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى ﴿۱۳﴾

মনে করা) তাদেরকে আমি সৎ ও উত্তম কাজের জন্যে সহজ করে দেই । পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে খারাপ ও দুর্ভাগ্যের কাজের জন্য সহজ করে দেই । [মুয়াসসার] এ আয়াতগুলোতে তাকদীরের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া আছে । হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা বাকী আল-গারকাদে এক জানাযায় এসেছিলাম । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে আসলেন, তিনি বসলে আমরাও বসে গেলাম । তার হাতে ছিল একটি ছড়ি । তিনি সেটি দিয়ে মাটিতে খোচা দিচ্ছিলেন । তারপর বললেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকের এমনকি প্রতিটি আত্মারই স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেছে । প্রত্যেকের ব্যাপারেই সৌভাগ্যশালী কিংবা দূর্ভাগা লিখে দেয়া হয়েছে । তখন একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের লিখা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে কাজ-কর্ম ছেড়ে দেব না? কারণ, যারা সৌভাগ্যশালী তারা তো অচিরেই সৌভাগ্যের দিকে ধাবিত হবে, আর যারা দূর্ভাগা তারা দূর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হবে । তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা সৌভাগ্যশালী তাদের জন্য সৌভাগ্যপূর্ণ কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে, পক্ষান্তরে যারা দূর্ভাগা তাদের জন্য দূর্ভাগ্যপূর্ণ কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে । তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ।” [বুখারীঃ ৪৯৪৮, মুসলিমঃ ২৬৪৭] [বাদা’ই‘উত তাফসীর]

(১) تردى এর শাব্দিক অর্থ অধঃপতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া । অর্থাৎ একদিন তাকে অবশ্যি মরতে হবে । তখন দুনিয়াতে যেসব ধন-সম্পদে কৃপণতা করেছিল তা তার কোনও কাজে আসবে না । [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ হেদায়াত ও প্রদর্শিত সরল পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা‘আলার । এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, হেদায়াতপূর্ণ সরল পথ আল্লাহ্ তা‘আলার সান্নিধ্যে পৌছে দেয়, যেমনিভাবে ভ্রষ্টপথ জাহান্নামে পৌছে দেয় । পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, “আর সোজা পথ (দেখাবার দায়িত্ব) আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে ।” [সূরা আন-নাহলঃ ৯] [তাবারী, সা‘দী]

(৩) এ বক্তব্যটির অর্থ, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মালিক আল্লাহ্ তা‘আলাই । উভয় জাহানেই আল্লাহ্ তা‘আলার পূর্ণ মালিকানা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত । তিনি যাকে

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾

১৪. অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন[১] সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾

১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾

১৬. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়[২]।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾

১৭. আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে,

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য[৩],

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾

১৯. এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে

ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তিনি সৎপথ থেকে বঞ্চিত করেন। তাই একমাত্র তাঁরই নিকটে হওয়া উচিৎ সকলের চাওয়া-পাওয়া, অন্য কোন সৃষ্টির নিকট নয়। [তাবারী, সা'দী]

(১) এ লেলিহান আগুনের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন যে জাহান্নামীর সবচেয়ে হাল্কা আযাব হবে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পায়ের নীচে আগুনের কয়লা রাখা হবে এতেই তার ঘিলু উৎরাতে থাকবে"। [বুখারী: ৬৫৬১, মুসলিম: ২১৩]

(২) অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"প্রত্যেক উম্মতই জান্নাতে যাবে তবে যে অস্বীকার করবে।" সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, "যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই আমাকে অস্বীকার করল।" [বুখারী: ৭২৮০]

(৩) এতে সৌভাগ্যশালী মুত্তাকীদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া শক্তভাবে অবলম্বন করে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র পথে নিজের গোনাহ্ থেকে বিশুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে। [সা'দী]

হবে[১],

২০. শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়; إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

২১. আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে[২]। وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

---

(১) এখানে সেই মুত্তাকী ব্যক্তির আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে যে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার প্রতিদান বা পুরস্কার দিচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে কোন স্বার্থ উদ্ধারের অপেক্ষায় তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে ব্যয় করছে; বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্যই এমন-সব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতোপূর্বে তার কোন উপকার করে নি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার পাওয়ার আশা নেই। [তাবারী] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াতটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শানে নাযিল হয়েছে। [মুসনাদে বাযযার (আল-বাহরুয যাখখার) : ৬/১৬৮, ২২০৯] আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মু'আযযমার যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল তাদেরকে মালিকদের যুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। যেসব দাসকে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং তার লক্ষ্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না। এ ধরনের মুসলিম সাধারণ দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তার পিতা আবু কোহাফা বললেন: তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখেই মুক্ত করো, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে। আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন: কোন মুক্ত-করা মুসলিম থেকে উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৭২, নং ৩৯৪২]

(২) বলা হয়েছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এত-কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই দুনিয়াতে তার ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং কষ্ট করেছে, আল্লাহ্ তা'আলাও আখেরাতে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত তাকে দান করবেন। [তাবারী] এই শেষ বাক্যটি মুত্তাকীদের জন্য, বিশেষ করে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ্ তাকে সন্তুষ্ট করবেন—এ সংবাদ এখানে তাকে শোনানো হয়েছে। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

سُورَةُ الضُّحَى

৯৩- সূরা আদ-দুহা[১]
১১ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

وَالضُّحٰى ①

১. শপথ পূর্বাহ্নের,

وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى ②
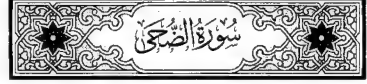
২. শপথ রাতের যখন তা হয় নিঝুম[২]–

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③

৩. আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি[৩] এবং শত্রুতাও করেন নি ।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلٰى ④

৪. আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে শ্রেয়[৪] ।

---

(১) এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার অসুস্থ হলেন ফলে তিনি একরাত বা দু'রাত সালাত আদায়ের জন্য বের হলেন না । তখন এক মহিলা এসে বলল, মুহাম্মাদ আমি তো দেখছি তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে, এক রাত বা দু'রাত তো তোমার কাছেও আসেনি । এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় । [বুখারী: ৪৯৫০, ৪৯৫১, ৪৯৮৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওহী আসতে বিলম্ব হয়, এতে করে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন । এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ-দ্বোহা অবতীর্ণ হয় । [মুসলিমঃ ১৭৯৭]

(২) এখানে سجى এর আরেকটি অর্থ হতে পারে । আর তা হলো, অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া । এখানে দিনের আলো ও রাতের নীরবতা বা অন্ধকারের কসম খেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, আপনার রব আপনাকে বিদায় দেন নি এবং আপনার প্রতি শত্রুতাও পোষণ করেন নি । একথার জন্য যে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই দু'টি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা সম্ভবত এই যে, রাতের নিঝুমতা ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার পর দিনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হওয়ার মতই যেন বিরতির অন্ধকারের পর অহী আগমনের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে । [বাদা'ই'উত তাফসীর]

(৩) এ অনুবাদটি অনেক মুফাসসির করেছেন । [মুয়াসসার, জালালাইন] এখানে ودع এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, বিদায় দেয়া । [ফাতহুল কাদীর, আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৪) এখানে الآخرة এবং الأولى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ আখেরাত ও দুনিয়া নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, আমি আপনাকে আখেরাতে নেয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি । সেখানে আপনাকে দুনিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী নেয়ামত দান করা হবে । [ইবন কাসীর]

৫. আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন[১]।	وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝
৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নি? অতঃপর তিনি আশ্রয়	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝

তাছাড়া الآخرة কে শাব্দিক অর্থে নেয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন الأولى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। তখন আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার জন্য আখেরাত তো দুনিয়া থেকে অনেক, অনেক বেশি উত্তম হবে। [সা'দী] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছাটাইতে শোয়ার কারণে তার পার্শ্বদেশে দাগ পড়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি কিছু তৈরী করে দিতাম যা আপনাকে এরূপ কষ্ট দেয়া থেকে হেফাজত করত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমার আর এ দুনিয়ার ব্যাপারটি কি? আমি ও দুনিয়ার উদাহরণ তো এমন যেমন কোন সওয়ারী কোন গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিল তারপর সেটা ছেড়ে চলে গেল।" [ইবনে মাজাহঃ ৪১০৯, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯১]

(১) অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দিবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের ও কুরআনের উন্নতি, সারা বিশ্বে হিদায়াতের প্রসার, শত্রুর বিরুদ্ধে তার বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। আর তার মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে ও জান্নাতেও তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক অনুগ্রহ দান করবেন। [বাদা'ই'উত তাফসীর] হাদীসে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পরবর্তীতে যে সমস্ত জনপদ বিজিত হবে তা একটি একটি করে পেশ করা হচ্ছিল। এতে তিনি খুশী হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা "অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন" এ আয়াত নাযিল করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে হাজার প্রাসাদের মালিক বানালেন। প্রতিটি প্রাসাদে থাকবে প্রাসাদ উপযোগী খাদেম ও ছোট ছোট বাচ্চারা। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৫২৬]

দিয়েছেন[১];

৭. আর তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন[২] ।

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝

৮. আর তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন[৩] ।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنٰى ۝

৯. কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না[৪] ।

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

---

(১) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কিছু নেয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন । প্রথম নেয়ামত হচ্ছে, আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি । আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল এবং ছোট থাকতেই মা মারা যায় । অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি । অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব,পরবর্তীতে পিতৃব্য আবু তালেব যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করতেন । [সা'দী]

(২) দ্বিতীয় নেয়ামত হচ্ছে, আপনাকে ضال পেয়েছি । এ শব্দটির অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, অনবহিত বা গাফেলও হয় । এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য । নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে, ঈমান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন । অতঃপর নবুওয়তের পদ দান করে তাকে পথনির্দেশ দেয়া হয়, যা তিনি জানতেন না তা জানানো হয়; সর্বোত্তম আমলের তৌফিক দেওয়া হয় । [কুরতুবী, মুয়াসসার]

(৩) তৃতীয় নেয়ামত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন; অতঃপর আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট করেছেন । এখানে أغنى বলতে দুটি অর্থ হতে পারে । এক অর্থ, তিনি আপনাকে ধনশালী করেছেন । অপর অর্থ, তিনি আপনাকে তাঁর নেয়ামতে সন্তুষ্ট করেছেন । [দেখুনঃ ইবন কাসীর, মুয়াসসার]

(৪) এ নেয়ামতগুলো উল্লেখ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, ইয়াতিমের সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না । অর্থাৎ আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধন-সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না । এর মাধ্যমে সকল উম্মতকেই ইয়াতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছেন । [বাদা'ই'উত তাফসীর]

১০. আর প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবেন না[১]।

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

১১. আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন[২]।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

---

(১) দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, অর্থগত ও জ্ঞানগত প্রার্থীকে ধমক বা ভৎর্সনা করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিষেধ করা হয়েছে। যদি ‘প্রার্থী’ বলে এখানে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করুন আর না করতে পারলে কোমল স্বরে তাকে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়ে দিন। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করবেন না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে “আপনি অভাবী ছিলেন তারপর আল্লাহ্ আপনাকে ধনী করে দিয়েছেন।” আর যদি ‘প্রার্থী’কে জিজ্ঞেসকারী অর্থাৎ দ্বীনের কোন বিষয় বা বিধান জিজ্ঞেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই স্নেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দিন এবং ধমক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণীটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে “আপনি পথের খোঁজ জানতেন না তারপর তিনিই আপনাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।” আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, সাহায্য প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। [দেখুন, সা'দী; আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(২) তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, মানুষের সামনে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন, স্মরণ করুন। নিয়ামত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ দুনিয়ার নিয়ামতও হতে পারে আবার এমন-সব নিয়ামতও হতে পারে যা আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতে দান করবেন। [সা'দী] এ নিয়ামত প্রকাশ করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, স্বীকৃতি দেয়া যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ফল। নবুওয়াতের এবং অহীর নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করার মাধ্যমে। এ-ছাড়া, একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তার শোকর আদায় করাও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক পন্থা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ তা'আলারও শোকর আদায় করে না। [আবুদাউদ: ৪৮১১, তিরমিযী: ১৯৫৫, মুসনাদে আহমাদ: ২/৫৮] [কুরতুবী]

৯৪- সূরা আল-ইনশিরাহ্[১]
৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الشَّرْحِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমরা কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি[২]?

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

২. আর আমরা অপসারণ করেছি আপনার ভার,

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

৩. যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল[৩] ।

الَّذِیْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

---

(১) সূরা আল-ইনশিরাহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনায় এ সূরার সাথে সূরা আদ-দোহার অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(২) شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, "কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" [সূরা আল-আন'আম: ১২৫] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের দেয়া আলোতে রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তি তে আছে।" [সূরা আয-যুমার: ২২] এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয়মুক্ত হওয়া, জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধি করার উপযুক্ত করা এবং বক্ষকে প্রজ্ঞার আধার করার জন্য প্রস্তুত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ বিদারণ করে তাকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে পরিষ্কার করে তাতে জ্ঞান ও তত্ত্বকথা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। [মুসলিম: ১৬৪, তিরমিযী: ৩৩৪৬] উপরোক্ত সব কয়টি অর্থই এ আয়াতে হওয়া সম্ভব, আর একটি অপরটির পরিপূরক। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৩) وزر এর শাব্দিক অর্থ বোঝা, আর نقض ظهر এর শাব্দিক অর্থ কোমর বা পিঠ ভারী করে দেয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমরা তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে

৪. আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি[১]। | وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

৫. সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, | فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে[২]। | إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

৭. অতএব আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন | فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝

দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন যে, নবুওয়তের গুরুভার তার অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়া ও তা সহজ করে দেয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(১) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক সম্মানিত করা হয়েছে; কোন সৃষ্টিকে তার মত প্রশংসনীয় করা হয় নি। এমনকি আযান, ইকামত, খুতবা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র নামের সাথেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম স্মরণ করা হয়। এভাবে তার মর্যাদা ও স্মরণ সমুন্নত করা হয়েছে। এ-ছাড়াও তার উম্মত ও অনুসারীদের নিকট তার সম-মর্যাদার আর কেউ নেই। [সা'দী]

(২) আরবী ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লামযুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে العسر শব্দটি যখন পুনরায় العسر উল্লেখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يسر শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লেখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্যে দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু'এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি কষ্টের সাথে তাকে অনেক স্বস্তি দান করা হবে। হাদীসে এসেছে, "নিশ্চয় বিপদের সাথে মুক্তি আছে, আর নিশ্চয় কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি"। [মুসনাদ আহমাদঃ ১/৩০৭] হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ বলেন, 'এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না।' [ফাতহুল কাদীর, তাবারী]

৮. আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন[১]।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب ۝٨

(১) النصب অর্থ কঠোর প্রচেষ্টার পর ক্লান্ত হওয়া। এ প্রচেষ্টাটি দুনিয়ার কাজেও হতে পারে, আবার আখেরাতের কাজেও হতে পারে। এখানে কী উদ্দেশ্য তা নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। সবগুলো মতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ সালাতের পর দু'আয় রত হওয়া। কেউ কেউ বলেন, ফরযের পর নফল ইবাদতে রত হওয়া। মূলত এখানে উদ্দেশ্য দুনিয়ার কাজ থেকে খালি হওয়ার পর আখিরাতের কাজে রত হওয়াই উদ্দেশ্য। শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ্‌রই নিকট মনোযোগী হয়ে সকল ইবাদত যেন তিনি কবুল করে নেন, এ আশা করো। এ আয়াতে মুমিনদের জীবনে বেকারত্বের কোন স্থান দেওয়া হয় নি। হয় সে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে, নয় আখেরাতের কাজে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, সা'দী]

৯৫- সূরা আত-তীন(১)
৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ التِّيْنِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'(২) -এর,

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ①

২. শপথ 'তূরে সীনীন'(৩)-এর,

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ②

৩. শপথ এই নিরাপদ নগরীর(৪)–

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③

(১) বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সফরে দু'রাকা'আতের যে কোন রাকা'আতে সূরা আত-তীন পড়লেন। আমি তার মত সুন্দর স্বর ও পড়া আর কোন দিন শুনিনি।" [বুখারী: ৭৬৭, ৬৭৯, ৪৯৫২, মুসলিম: ৪৬৪, আবু দাউদ: ১২২১, তিরমিযী: ৩১০]

(২) এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরামাহ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জাবের ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ'য়ী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তীন বা আঞ্জির (গোল হালকা কালচে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতে এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তুন বলতেও এই যায়তূনই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তেল বের করা হয়। [কুরতুবী, তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন তীন ও যায়তূন শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ সে যুগের আরবে তীন ও যায়তূন উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েম রাহেমাহুমুল্লাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জারীর প্রথম বক্তব্যটিকে অগ্রাধিকার দিলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তূন দ্বারা এই ফল দু'টি উৎপাদনের এলাকা উদ্দেশ্য হতে পারে।

(৩) বলা হয়েছে "তূরে সীনীন"। এর অর্থ, সীনীন অঞ্চলের তূর পর্বত। এ পাহাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন। [মুয়াসসার] এ পাহাড় সীনীন উপত্যকায় অবস্থিত, যার অপর নাম সাইনা। আর সাইনা বা সিনাই মিসর ও ফিলিস্তিন দেশের মধ্যে একটি মরুভূমি। [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

(৪) এ সূরায় কয়েকটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। (এক) তীন অর্থাৎ আঞ্জির বা ডুমুর এবং যয়তুন। (দুই) সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বত। (তিন) নিরাপদ শহর তথা মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন বৃক্ষও বিপুল উপকারী বস্তু। অথবা এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন

৪. অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে[১],

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

৫. তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি–[২]

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

৬. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার[৩]।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

অঞ্চল, যা অগণিত রাসূলগণের আবাসভূমি। বিশেষ করে তা ঈসা আলাইহিস সালামের নবুয়ত-প্রাপ্তিস্থান। আর তূর পর্বত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা– তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। পরবর্তীতে উল্লেখ করা নিরাপদ শহর হল পবিত্র মক্কা; যা শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মস্থান ও নবুয়ত প্রাপ্তিস্থান। [বাদাইউত তাফসীর, ইবন কাসীর]

(১) তীন ও যায়তূন বা এগুলো উৎপন্ন হওয়ার এলাকা- অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তীন; তূর পর্বত এবং নিরাপদ শহর তথা মক্কার কসম এ কথাটির উপরই করা হয়েছে। বল হয়েছে, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। একথার মানে হচ্ছে এই যে, তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। আয়াতে বর্ণিত تَقْوِيم এর অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে যেরূপ করা উচিৎ, সে-রকমভাবে পরিপূর্ণ আকারে গঠন করা। তা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতি ও আচার-ব্যবহার ও মানুষ্যত্বের মাধ্যমে অন্যান্য সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করেছেন। [বাদা'ই'উত তাফসীর, আদ্‌ওয়াউল বায়ান] আকার আকৃতির বাইরেও আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিবান, বক্তা, শ্রোতা, স্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মুফাসসিরগণ সাধারণত এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, আমি তাকে যৌবনের পর বার্ধক্যের এমন এক অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা করার, বুঝার ও কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে; ছোট শিশুর মত হয়ে যায়।। দুই. আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুষ্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে এর উপযুক্ত প্রতিদান হিসেবে জাহান্নামকে তার আবাসস্থল বানিয়ে দেন। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে মুমিন সৎকর্মশীলগণ এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব মুফাসসির "আসফালা সাফেলীন" এর অর্থ করেছেন, বার্ধক্যের এমন একটি অবস্থা

৭. কাজেই (হে মানুষ!) এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল দিন সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে[১]?

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝

৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝

যখন মানুষ নিজের চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এই আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বয়সের এই পর্যায়েও তারা ঐ ধরনের সৎকাজগুলো করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কোন হেরফের হবে না, কমতি হবে না। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলানামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। [তাবারী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন মুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা মুসাফির হলে আল্লাহ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎকর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।" [বুখারী:২৯৯৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৯৪, ৩/২৫৮] পক্ষান্তরে যেসব মুফাসসির 'ফিরিয়ে দেবার' অর্থ 'জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা' করেছেন তাদের মতে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করে তাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে দুনিয়ায় খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে যায়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে জাহান্নামের হীনতম ও নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হবে। কিন্তু যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না; বরং তারা জান্নাতে এমন পুরস্কার পাবে যার ধারাবাহিকতা কোনদিন শেষ হবে না, যে পুরষ্কারের কোন কমতি হবে না। [বাদা'ই'উত তাফসীর, সা'দী]

(১) এতে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্যে আখেরাত ও কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে? তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে হীনতম ও নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন, তারপরও কেন তোমরা তা অস্বীকার করবে? এর আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে, এসব প্রমাণের পর (হে রাসূল) শাস্তি ও পুরষ্কারের ব্যাপারে কে আপনাকে মিথ্যা বলতে পারে? [কুরতুবী] এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে, "আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছো? [সূরা আল-কলম: ৩৫-৩৬] আরো এসেছে, "দুস্কৃতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে।" [সূরা আল-জাসিয়াহ: ২১]

বিচারক নন[১]?

---

(১) আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের মহাবিচারক নন? তিনি কি সকল শাসকবর্গের মধ্যে সর্বোত্তম শাসক নন? এই ন্যায় বিচারের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রত্যেক অপরাধীকে তার শাস্তি ও প্রত্যেক সৎকর্মীকে তার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা। বিচারকদের শ্রেষ্ঠবিচারক আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উপনীত করেছেন পরিপূর্ণ ন্যায় ও প্রজ্ঞার সাথে; তবুও কি তিনি মানুষের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদানও দেবেন না? [বাদা'ই'উত তাফসীর]

৯৬- সূরা আল-'আলাক[১]
১৯ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ العَلَق

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন[২]-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ①

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে[৩]।

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

৩. পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত[৪]

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③

---

(১) নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ পর্যন্ত সর্ব প্রথম নাযিল হয়। [দেখুন, বুখারী: ৬৯৮২, মুসলিম:১৬০] অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত। কেউ কেউ সূরা আল-মুদ্দাসসিরকে প্রথম সূরা এবং কেউ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ। [আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন: ১/৯৩]

(২) শুধু বলা হয়েছে, "সৃষ্টি করেছেন।" কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড় যিনি স্রষ্টা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের, সমগ্র সৃষ্টিজগতের। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(৩) পূর্বের আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সৃষ্টিজগতের মধ্য থেকে বিশেষ করে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, মানুষকে 'আলাক' থেকে সৃষ্টি করেছেন। 'আলাক' হচ্ছে 'আলাকাহ' শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। [কুরতুবী]

(৪) এখানে পড়ার আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম আদেশটি নিজে পাঠ করার আদেশ, আর দ্বিতীয়টি অন্যকে পাঠ করানো বা অন্যের নিকট প্রচারের নির্দেশ। [ফাতহুল কাদীর] অতঃপর মহান রব আল্লাহ্‌র সাথে الأكرم বিশেষণ যোগ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষাদান করার নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই দান। তিনি সর্বমহান দানশীল ও মহামহিমান্বিত। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, মুয়াস্‌সার]

৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন[১]–

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না[২]।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

৬. বাস্তবেই[৩], মানুষ সীমালঙ্ঘনই করে থাকে,

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ

৭. কারণ সে নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করে[৪]।

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۗ

---

(১) মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনার পর এখানে মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে কলমের মাধ্যমে তথা লেখার শিক্ষা দান করেছেন। তা না হলে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি, বংশানুক্রমিক ক্রমবিকাশ সম্ভব হত না। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পূর্ববর্তীদের জীবন-কাহিনী, আসমানী-কিতাব সব কিছুই সংরক্ষিত হয়েছে লেখনির মাধ্যমে। কলম না থাকলে, দ্বীন এবং দুনিয়ার কোন কিছুই পূর্ণরূপে গড়ে উঠত না। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা'আলা যখন প্রথম সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।” [বুখারী: ৩১৯৪, ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১] হাদীসে আরও বলা হয়েছে, “আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭]

(২) পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা। মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। [সা'দী] কলমের সাহায্যে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানত না। কেউ কেউ বলেন, এখানে মানুষ বলে আদম আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি সূরা আল-বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) كلا বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, حقا বা বাস্তবেই, অবশ্যই হয় এমন। [মুয়াসসার, তাফসীরুল কুরআন লিল উসাইমীন: ১/২৬১]

(৪) অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে

৮. নিশ্চয় আপনার রবের কাছেই ফিরে | إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ⑧

এবং সীমালঙ্ঘন করতে শুরু করেছে। [সা'দী] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, একবার আবু জাহল বলল, যদি মুহাম্মাদকে কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে দেখি তবে আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতে আসলে আবু জাহল তাকে বলল, তোমাকে কি আমি সালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? তোমাকে কি আমি এটা থেকে নিষেধ করিনি? রাসূল তার কাছ থেকে ফিরে আসলেন, আবু জাহলের সাথে তার বিতণ্ডা হলো, তখন আবু জাহল বলল, আমার চেয়ে বড় সভাসদের অধিকারী কি কেউ আছে? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন যে, "সে যেন তার সভাসদদের ডাকে, আমরাও অচিরেই যাবানিয়াদের ডাকব"। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্র শপথ, যদি সে তার সভাসদদের ডাকত তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহ্র যাবানিয়া পাকড়াও করত।[বুখারী: ৪৯৫৮, তিরমিযী: ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫৬, ৩২৯, ৩৬৮] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু জাহল বলেছিল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মুখ ঘসে? তাকে বলা হল যে, হ্যাঁ, তখন সে বলল, লাত ও উযযার শপথ! যদি আমি তাকে তা করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পা দিয়ে দাবিয়ে দিব, অথবা তার মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। সে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তার ধারণা অনুসারে সে তার মাথা গুড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কাছে যাওয়ার পর সে পিছনের দিকে ফিরে আসতে বাধ্য হলো এবং হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমার ও তার মাঝে আগুনের একটি খন্দক দেখতে পেলাম এবং ভীতিপ্রদ ও ডানাবিশিষ্টদের দেখতে পেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে নিকটবর্তী হতো তবে ফেরেশতাগণ তাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলত। তখন আল্লাহ্ নাযিল করেন, "কখনও নয়, মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করে থাকে, যখন সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়..." [মুসলিম: ২৭৯৭]

আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে না করে, ততদিন সে সীমালঙ্ঘন করে না। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে, তাকে তার মায়ের গর্ভে যত্নে রেখেছেন, বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-পদ্ধতির ব্যবস্থা করে দেন; তারপরেও যখনই সে নিজেকে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শুরু করে, তখনই সে এমনকি তার রবের সাথেও সীমালঙ্ঘন করে। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

যাওয়া(১)।

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿٩﴾

৯. আমাকে জানাও (এবং আশ্চর্য হও) তার সম্পর্কে, যে বাধা দেয়,

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ﴿١٠﴾

১০. এক বান্দাকে(২)– যখন তিনি সালাত আদায় করেন।

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ﴿١١﴾

১১. আমাকে বল! যদি তিনি হিদায়াতের উপর থাকেন,

أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ﴿١٢﴾

১২. অথবা তাক্ওয়ার নির্দেশ দেন; (তারপরও সে কিভাবে বাধা দেয়?!)

أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١٣﴾

১৩. আমাকে বল! যদি সে (নিষেধকারী) মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾

১৪. সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ দেখেন(৩)?!

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

১৫. কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে

---

(১) অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করতে থাকুক না কেন, অবশেষে তাকে আপনার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে সে অবাধ্যতার কুপরিণাম তখন স্বচক্ষে দেখে নেবে। [মুয়াসসার, সাদী]

(২) বান্দা বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন "পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।" [সূরা আল-ইসরা: ১]। আরও এসেছে, "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।" [সূরা আল-কাহফ: ১] আরও বলা হয়েছে, "আর আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।" [সূরা আল-জিন: ১৯]

(৩) এখানে আশ্চর্যবোধক এবং তিরস্কারসূচক প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন; তার এ কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন? তবুও সে অবাধ্যতা করছে ও সৎকাজে বাধা প্রদান করছে কেন? [কুরতুবী]

নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে[১]---

১৬. মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ।

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

১৭. অতএব সে তার পারিষদকে ডেকে আনুক!

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾

১৮. শীঘ্রই আমরা ডেকে আনব যাবানিয়াদেরকে[২]।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

১৯. কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না। আর আপনি সিজ্‌দা করুন এবং নিকটবর্তী হোন[৩]।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ﴿١٩﴾

---

(১) سفع এর অর্থ কোন কিছু ধরে কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। আর ناصية শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। আরবদের মধ্যে রীতি ছিল যে, কারও অতি অসম্মান করার জন্য এই কেশগুচ্ছ মুঠোর ভেতরে নেয়া হত। [কুরতুবী]

(২) এখানে যাবানিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাহান্নামের প্রহরী কঠোর ফেরেশ্‌তাগণ। কাতাদাহ বলেন, আরবী ভাষায় 'যাবানিয়াহ' শব্দের অর্থই হলো প্রহরী পুলিশ। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় বিশেষ বাহিনীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবান' শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেয়া। সে হিসেবে 'যাবানিয়াহ' এর অন্য অর্থ, প্রচণ্ডভাবে পাকড়াওকারী, প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়ে নিক্ষেপকারী। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও সালাতে মশগুল থাকুন। সিজদা করা মানে সালাত আদায় করা। অর্থাৎ হে নবী! আপনি নির্ভয়ে আগের মতো সালাত আদায় করতে থাকুন। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দো'আ কর।" [মুসলিম: ৪৮২, আবু দাউদ: ৮৭৫, নাসায়ী: ২/২২৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৭০] অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে, "সেজদার অবস্থায় কৃত দো'আ কবুল হওয়ার যোগ্য"। [মুসলিম: ৪৭৯, আবু দাউদ: ৮৭৬, নাসায়ী: ২/১৮৯, মুসনাদে আহমাদ:১/২১৯]

৯৭- সূরা আল-কাদ্‌র[১]
৫ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ القَدْرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি[২] 'লাইলাতুল কদরে'[৩];

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

---

(১) কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ-স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লাইলাতুল-কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। কদরের আরেক অর্থ তাকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত ও বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেয়া হয়। [সা'দী] পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [সূরা আদ-দোখান:৪] এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পবিত্র রাত্রে তাকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাত্রিতে তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফুয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধি-লিপি আদিকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। [ইমাম নববী: শারহু সহীহ মুসলিম, ৮/৫৭]

(২) এখানে বলা হয়েছে, আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, "রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৫] এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রামাদান মাসের একটি রাত। এই রাতকে এখানে কদরের রাত বলা হয়েছে। সূরা দোখানে এটাকে মুবারক রাত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, "অবশ্যি আমরা একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি।" [সূরা আদ-দোখান: ৩] এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন পাক লাইলাতুল-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এই যে, সমগ্র কুরআন লওহে মাহফুয থেকে লাইলাতুল-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কুরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে পূর্ণ তেইশ বছরে নাযিল করা হয়। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(৩) কুরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল-কদর রামাদান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। এ-সব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, লাইলাতুল-কদর রামাদান

২. আর আপনাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী?

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢

৩. 'লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ[১]।

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

৪. সে রাতে ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ্ নাযিল হয়[২] তাদের রবের অনুমতিক্রমে

تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن

মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই; বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। আবার প্রত্যেক রামাদানে তা পরিবর্তিতও হতে পারে। সহীহ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "রামাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল-কদর অন্বেষণ কর।" [বুখারীঃ ২০২১] অন্য বর্ণনায় আছে- "তোমরা তা শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর।" [বুখারীঃ ২০২০, মুসলিমঃ১১৬৯, তিরমিযীঃ ৭৯২] সুতরাং যদি লাইলাতুল-কদরকে রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রামাদানে পরিবর্তনশীল মেনে নেয়া যায়, তবে লাইলাতুল-কদরের দিন-তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। [ইবন হাজারঃ ফাতহুল বারী, ৪/২৬২-২৬৬]

(১) মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন, এ রাতের সৎকাজ কদরের রাত নেই এমন হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। [মুয়াসসার] এ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসেও বিস্তারিত বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রামাদান আগমনকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমাদের নিকট রামাদান আসন্ন। মুবারক মাস। আল্লাহ্ এর সাওম ফরয করেছেন। এতে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানগুলোকে বেঁধে রাখা হয়। এতে এমন এক রাত রয়েছে যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত্রির কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে তো যাবতীয় কল্যান থেকে বঞ্চিত হলো।" [নাসায়ীঃ ৪/১২৯, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৩০, ৪২৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ ঈমান ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদর রাত্রিতে সালাত আদায় করতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [বুখারীঃ ১০৯১, মুসলিমঃ ৭৬০, আবুদাউদঃ ১৩৭২, নাসায়ীঃ ৮/১১২, তিরমিযীঃ ৮০৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫২৯]

(২) الروح বলে কি বুঝানো হয়েছে মতপার্থক্য থাকলেও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো এর দ্বারা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। জিবরাঈল আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে সমস্ত ফেরেশতা থেকে আলাদা করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। জিবরাঈলের

সকল সিদ্ধান্ত[১] নিয়ে।	كُلِّ اَمۡرٍ ۛ
৫. শান্তিময়[২] সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত[৩]।	سَلٰمٌ ۛ هِیَ حَتّٰی مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ ﴿۵﴾

সাথে ফেরেশতারাও সে রাত্রিতে অবতরণ করে। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে আছে, "লাইলাতুল-কদরের রাত্রিতে পৃথিবীতে ফেরেশতারা এত বেশী অবতরণ করে যে, তাদের সংখ্যা পাথরকুচির চেয়েও বেশী।" [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫১৯, মুসনাদে তায়ালাসীঃ ২৫৪৫]

(১) সকল সিদ্ধান্ত বা প্রত্যেক হুকুম বলতে অন্যত্র বর্ণিত "আমরে হাকীম" (বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ) [সূরা আদ-দোখান:৪] বলতে যা বুঝনো হয়েছে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তাফসীরবিদ একে سلام এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল তথা কল্যাণে পরিপূর্ণ। সে রাত্র সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত। [তাবারী]

(৩) অর্থাৎ লাইলাতুল-কদরের এই বরকত রাত্রির শুরু অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর হতে ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত। [সা'দী]

৯৮- সূরা আল-বায়্যিনাহ[১]
৮ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ البَيِّنَةِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

১. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে এবং মুশরিকরা[২], তারা নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে[৩]--

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে "লাম ইয়াকুনিল্লাযিনা কাফারু" (সূরা) পড়ে শোনাই। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আমার নাম নিয়ে আপনাকে বলেছে? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনে কা'ব তখন (খুশিতে) কেঁদে ফেললেন"। [বুখারী: ৩৮০৮, ৪৯৫৯, মুসলিম: ৭৯৯, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৭৩]

(২) আহলি কিতাব ও মুশরিক উভয় দলই কুফরী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও দু'দলকে দু'টি পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। যাদের কাছে আগের নবীদের আনা কোন আসমানী কিতাব ছিল, তা যত বিকৃত আকারেই থাক না কেন, তারা তা মেনে চলতো, তাদেরকে বলা হয় আহলি কিতাব; আর তারা হল ইয়াহুদী ও নাসারাগণ। আর যারা মূর্তি-পূজারী বা অগ্নি-পূজারী, তারা-ই মুশরিক। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ তারা তাদের কুফরী থেকে নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ না একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে তাদেরকে কুফরীর প্রতিটি গলদ ও সত্য বিরোধী বিষয় বুঝাবে এবং যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে সত্য সঠিক পথ তাদের সামনে পেশ করবে, এর মাধ্যমে তারা কুফরী থেকে বের হতে পারবে। এর মানে এ নয় যে, এই সুস্পষ্ট প্রমাণটি এসে যাবার পর তারা সাবাই কুফরী পরিত্যাগ করবে। তবে তার আসার পরও তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। এরপর তারা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে পারবে না যে, আপনি আমাদের হেদায়াতের কোন ব্যবস্থা করেননি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের কথা আগে আমি আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল, যাদের কথা আপনাকে বলিনি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাত কথা বলেছিলেন। এই রাসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী করা হয়েছে যাতে রাসূলদের পর লোকদের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে।" [সূরা আন-নিসা: ১৬৪-১৬৫] আরও বলেন, "হে আহলি কিতাব! রাসূলদের সিলসিলা দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে। যাতে তোমরা বলতে না পারো আমাদের কাছে না কোন সুসংবাদদানকারী এসেছিল, না

২. আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক রাসূল, যিনি তেলাওয়াত করেন পবিত্র পত্রসমূহ[১],

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

৩. যাতে আছে সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান[২]।

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

৪. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর[৩]।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

৫. আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

এসেছিল কোন সতর্ককারী। কাজেই নাও, এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদানকারী এসে গেছে এবং সতর্ককারীও।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৯]

(১) صحف শব্দটি صحيفة এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে 'সহীফা' বলা হয় লেখার জন্য প্রস্তুত, কিংবা লিখিত পাতাকে, এখানে পবিত্র সহীফা মানে হচ্ছে এমন সব সহীফা যার মধ্যে কোন প্রকার বাতিল, কোন ধরনের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা নেই এবং শয়তান যার নিকটে আসে না। এখনে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো অর্থ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা, প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সহীফা থেকে নয় স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ "ওটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র, মহান, পূত-চরিত্র লেখকের হাতে লিখিত।" [সূরা আবাসা:১৩-১৬]

(২) বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লিখিত লিপিসমূহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে, তা সত্য, ইনসাফপূর্ণ ও সরল-সহজ। এ বিধি-বিধানই মানুষকে সরল পথের সন্ধান দেয়। এ প্রমাণ থাকলেই প্রমাণিত হয় কে প্রকৃত সত্যসন্ধানী। [সা'দী]

(৩) আহলে-কিতাবদের নিকটেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী, পরিচিতি ইত্যাদি জ্ঞান ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে– মুশরেকদের উল্লেখ করা হয়নি। আহলে কিতাবরা সত্যকে জানার পরও অনেকে তা অস্বীকার করেছিল। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ বলা হয়েছে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

আর এটাই সঠিক দ্বীন[১]।

৬. নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম[২]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৮. তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার : স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট[৩] এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

(১) অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এ নির্দেশটি শুধুমাত্র বর্তমান আহলে কিতাবদের জন্য নয়; বরং সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর নেই। এমন কি তারা পশুরও অধম। কারণ পশুর বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি নেই। কিন্তু এরা বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি সত্ত্বেও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৩) এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নেয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের রব! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নেয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।" [বুখারী: ৬৫৪৯,৭৫১৮, মুসলিম: ২৮২৯]

এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে[১]।

---

(১) অন্য কথায় যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক এবং তাঁর মোকাবিলায় দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে জীবন যাপন করে না। বরং দুনিয়ায় প্রতি পদে পদে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে; তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে তাকওয়া অবলম্বন করে। তার জন্যই আল্লাহর কাছে রয়েছে এই প্রতিদান ও পুরস্কার। [তাবারী]

৯৯- সূরা আয-যিলযাল
৮ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন প্রবল কম্পনে যমীন প্রকম্পিত করা হবে(১),

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

২. আর যমীন তার ভার বের করে দেবে(২),

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

(১) ‘যালযালাহু’ মানে হচ্ছে, প্রচণ্ডভাবে জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া, ভূকম্পিত হওয়া।

(২) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মরা মানুষ মাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে এবং যাবতীয় মৃতকে বের করে হাশরের মাঠের দিকে চালিত করবে। মানুষের শরীরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। এই বিষয়টি অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, “হে মানুষ! তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার!” [সূরা আল-হাজ্জ:১] আরও এসেছে, “আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।”[সূরা আল-ইনশিকাক:৩-৪] দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণের যে স্তুপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে। পরবর্তী বাক্যটিতে একথারই প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে, যমীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে। তিন, কোন কোন মুফাসসির এর তৃতীয় একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তুপও সেদিন যমীন উগলে দেবে। [দেখুন: আদ্ওয়াউল বায়ান] আর যদি দুনিয়ার জীবনের শেষভাগে কিয়ামতের আলামত হিসেবে এ সম্পদ বের করা বোঝায় তবে এতদসংক্রান্ত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,“পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। [মুসলিম:১০১৩]

৩. আর মানুষ বলবে, 'এর কী হল[১]?'

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

৪. সেদিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে[২],

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

৫. কারণ আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে[৩], যাতে তাদেরকে তাদের

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا

(১) মানুষ অর্থ প্রত্যেকটি মানুষ হতে পারে। কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পাবার সাথে সাথেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হবে যে, এসব কি হচ্ছে? এটা যে হাশরের দিন একথা সে পরে বুঝতে পারবে। আবার মানুষ অর্থ আখেরাত অস্বীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করতো তা তার সামনে ঘটে যেতে থাকবে এবং সে এসব দেখে অবাক ও পেরেশান হবে। তবে ঈমানদারদের মনে এ ধরনের বিস্ময় ও পেরেশানি থাকবে না। কারণ তখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয় অনুযায়ীই সবকিছু হতে থাকবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীরা বলবে, "কে আমাদের শয়নাগার থেকে আমাদের উঠালো?" এর জবাব আসবে, "এটি সেই জিনিস যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর পাঠানো রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।" [সূরা ইয়াসিন: ৫২] [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(২) যমীন কি জানিয়ে দেবে এ নিয়ে মুফাসসেরীনদের মধ্যে কয়েকটি মত রয়েছে। সম্ভবত সব কয়টি মতই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, এর অর্থ, যমীন তার থেকে যা যা বের করে দিল (সম্পদরাজি) তা জানিয়ে দিবে। এর সমর্থনে একটি হাদীসে এসেছে, "কোন মানুষের জীবন যদি কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে অবসান হওয়ার কথা থাকে তখন আল্লাহ্ তার জন্য সেখানে যাওয়ার একটি প্রয়োজন তৈরী করে দেন। তারপর যখন সে স্থানে পৌঁছে তখন তাকে মৃত্যু দেয়া হয়। তারপর যমীন কিয়ামতের দিন বলবে, হে রব! এটা তুমি আমার কাছে আমানত রেখেছিলে।" [ইবনে মাজাহ:৪২৬৩] দুই. ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আগের আয়াতে যে বলা হয়েছে মানুষ প্রশ্ন করবে, 'যমীনের কি হল'? এর জওয়াব যমীনই দিবে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তিন. আবু হুরায়ারা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এর অর্থ, যমীন তার মধ্যে কৃত ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দাখিল করবে। যমীনের ওপর যা কিছু ঘটে গেছে তার সবকিছু সে কিয়ামতের দিন বলে দেবে। [কুরতুবী]

(৩) এর অর্থ, মানুষ সেদিন হাশরের মাঠ থেকে তাদের আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; তাদের কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ যাবে জাহান্নামে। [জালালাইন,

أَعْمَالَهُمْ ۞ কৃতকর্ম দেখান যায়[1],

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞

৭. কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে[2]।

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۞

৮. আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে[3]।

মুয়াসসার, সা'দী] এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিগত হাজার হাজার বছরে সমস্ত মানুষ যে যেখানে মরেছিল সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থেকে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে এসে যাবে। [সূরা আন-নাবা: ১৮] [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে। প্রত্যেকে দুনিয়ায় কি কাজ করে এসেছে তা তাকে বলা হবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাফের মুমিন, সৎকর্মশীল ও ফাসেক, আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও নাফরমান সবাইকে অবশ্যি তাদের আমলনামা দেয়া হবে। [দেখুন, সূরা আল-হাক্কার ১৯ ও ২৫, সূরা আল-ইনশিকাকের ৭-১০]

(২) এ আয়াতে خير বলে শরীয়তসম্মত সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহর কাছে সৎকর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎকর্ম আখেরাতে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎকর্মের ফল আখেরাতে পাওয়া জরুরী। কোন সৎকর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি যতবড় গোনাহগারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই আখেরাতে তার কোন সৎকামই থাকবে না।

(৩) প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যি তার হিসেব হবে এবং তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোন ছোট সৎকাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে আল্লাহর কাছে একটি অনেক বড় সৎকাজ গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত; কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গোনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গোনাহের স্তুপ জমে উঠতে পারে। [দেখুন; কুরতুবী, সা'দী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো-তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার

বিনিময়েই হোক না কেন" [বুখারী: ৬৫৪০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: "কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোন পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।"[মুসনাদে আহমাদ:৫/৬৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে মুসলিম মেয়েরা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর বাড়িতে কোন জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।" [বুখারী: ৬০১৭, মুসলিম: ১০৩০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন, "হে আয়েশা! যেসব গোনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" [মুসনাদে আহমাদ:৬/৭০,৫/১৩৩, ইবনে মাজাহ:৪২৪৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "সাবধান, ছোট গোনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।" [মুসনাদে আহমাদ:১/৪০২] [ইবন কাসীর]

১০০- সূরা আল-'আদিয়াত[১]
১১ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ العَادِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝١

১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির[২],

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۝٢

২. অতঃপর যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে[৩],

---

(১) এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোনো সৃষ্টবস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করা বাক্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষতঃ সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

(২) العاديات শব্দটি عدو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضبح বলা হয় ঘোড়ার দৌড় দেয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে। কোন কোন গবেষকের মতে এখানে দৌড়ায় শব্দের মাধ্যমে ঘোড়া বা উট অথবা উভয়টিও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে ইমাম কুরতুবী ঘোড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(৩) موريات শব্দটি إيراء থেকে উদ্ভূত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা। যেমন চকমকি পাথর ঘষে

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ

৩. অতঃপর যারা অভিযান করে প্রভাতকালে[১],

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ

৪. ফলে তারা তা দ্বারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে[২];

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ

৫. অতঃপর তা দ্বারা শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে[৩]।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ

৬. নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ[৪]

ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح এর অর্থ আঘাত করা, ঘর্ষন করা; যার কারণে আগুন তৈরী হয়। লৌহনাল পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হয়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) مغيرات শব্দটি إغارة থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেয়া। صبحاً বা 'ভোর বেলায়' বলে আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ করতে হলে তারা রাতের আঁধারে বের হয়ে পড়তো। এর ফলে শত্রুপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্ক হতে পারতো না। এভাবে একেবারে খুব সকালে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রভাতে আলো যেটুকু ছড়িয়ে পড়তো তাতে তারা সবকিছু দেখতে পেতো। আবার দিনের আলো খুব বেশী উজ্জ্বল না হবার কারণে প্রতিপক্ষ দূর থেকে তাদের আগমন দেখতে পেতো না। ফলে তারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারতো না। [দেখুন: কুরতুবী] এখানে অবশ্য জিহাদে আল্লাহ্‌র পথে ব্যবহৃত ঘোড়সওয়ারদের বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) أثرن শব্দটি إثارة থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نقع ধূলিকে বলা হয়। আর به শব্দের অর্থ, সে সময়ে বা শত্রুদের সে স্থানে। অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) وسطن শব্দটির অর্থ কোন কিছুর মধ্যভাগে পৌঁছে যাওয়া। جمعاً অর্থ, দল বা গোষ্ঠী। আর به অর্থ, তা দ্বারা। এখানে তা বলতে আরোহীদের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অশ্বসমূহ ধূলিকণা উড়িয়ে তাদের আরোহীদের নিয়ে শত্রুদের মধ্যভাগে পৌঁছে যায়। [তাবারী]

(৪) এত বড় শপথ করার পরে এখানে যে উদ্দেশ্যে শপথ করা হয়েছে : তা বর্ণনা করা হয়েছে। শপথের মূলকথা হচ্ছে এটা বর্ণনা করা যে, মানুষ তার প্রভুর অকৃতজ্ঞতাই

৭. আর নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী[১],	وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝
৮. আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল[২] ।	وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝
৯. তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে,	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝
১০. আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে[৩]?	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝
১১. নিশ্চয় তাদের রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত[৪] ।	إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

প্রকাশ করে থাকে। كنود বলতে এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ তার রবের নেয়ামতের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। হাসান বসরী বলেন, كنود এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ভুলে যায়। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে 'সে' বলে বোঝানো হচ্ছে, মানুষ নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী। এ সাক্ষ্য নিজ মুখেই প্রকাশ করতে পারে, আবার কাজ-কর্ম ও অবস্থার মাধ্যমেও প্রকাশিত হতে পারে। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে,আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এ অকৃতজ্ঞতার ব্যাপারে সাক্ষী। [ইবন কাসীর]

(২) خير এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। এখানে ব্যাপক অর্থ ত্যাগ করে আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াত ধন-সম্পদকে خير বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ "যদি কোন সম্পদ ত্যাগ করে যায়" [সূরা আল-বাকারাহ:১৮০] এ আয়াতটির অর্থও দু রকম হতে পারে। এক. সে সম্পদের আসক্তির কারণে প্রচণ্ড কৃপণ; দুই. সম্পদের প্রতি তার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। দ্বিতীয় অর্থটির মধ্যেই মূলত প্রথমটি চলে আসে; কেননা সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তিই কৃপণতার কারণ। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ অন্তরের ভালো-মন্দ পৃথক করে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। ফলে গোপনগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে; মানুষের কর্মফল তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। [সা'দী] এ-বক্তব্যটিই অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "যেদিন গোপন রহস্য যাচাই বাছাই করা হবে।" [সূরা আত-তারিক:৯] এ দু আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা কবর থেকে উত্থিত করে, গোপন বিষয় প্রকাশ করার পর যে বিচার ও প্রতিদান প্রদান করা হবে, মানুষ কি তা জানে না? [মুয়াসসার]

(৪) অর্থাৎ তাদের রব তাদের ব্যাপারে অবশ্যই যথেষ্ট অবহিত, তাদের কোন কাজই তার নিকট গোপন নয়। তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বা গোপন সব কাজ-কর্মই তিনি জানেন। তিনি তাদেরকে এগুলোর উপযুক্ত প্রতিদানও দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমসবময়েই

তাদের ব্যাপারে জানা সত্বেও এখানে শুধুমাত্র হাশরের দিন তাদের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ-দিন তার জ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি সকল গোপন প্রকাশ করে দেবেন, কাফেরদের শাস্তি দেবেন, কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন। [সা'দী, ফাতহুল কাদীর, আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

سُورَةُ القَارِعَة

১০১- সূরা আল-কারি'আহ্
১১ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

اَلْقَارِعَةُ ۝١

১. ভীতিপ্রদ মহা বিপদ(১)

مَا الْقَارِعَةُ ۝٢

২. ভীতিপ্রদ মহা বিপদ কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣

৩. আর ভীতিপ্রদ মহা বিপদ সম্পর্কে আপনাকে কিসে জানাবে?

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤

৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত,(২)

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥

৫. আর পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত(৩) ।

---

(১) কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে "কারি'আহ" এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, মহাবিপদ । কারা'আ মানে কোন জিনিসকে কোন জিনিসের ওপর এমন জোরে মারা যার ফলে তা থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হয় । এই শাব্দিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বড় রকমের মারাত্মক বিপদের ক্ষেত্রে "কারি'আহ" শব্দ বলা হয়ে থাকে । [মুজামুল ওয়াসীত] এখানে "আল-কারি'আহ" শব্দটি কিয়ামতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে । আবার সূরা আল-হাক্কায় কিয়ামতকে এই শব্দটি দিয়েই চিহ্নিত করা হয়েছে । [আয়াত:৪] সুতরাং আল-কারি'আহ শব্দটি কিয়ামতের একটি নাম । যেমনিভাবে আল-হাক্কাহ, আত-ত্বাম্মাহ, আস-সাখখাহ, আল-গাশিয়াহ, ইত্যাদিও কিয়ামতের নাম । [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ মানুষ সেদিনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিক্ষিপ্ততা, আনা-গোনা ইত্যাদিতে উদ্ভ্রান্তের মত থাকবে । মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গ । অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল" । [সূরা আল-কামার:৭] আগুন জ্বালানোর পর পতংগ যেমন দিক-বিদিক থেকে হন্য হয়ে আগুনের দিকে ছুটে আসে সেদিন মানুষ তেমনিভাবে হাশরের মাঠের দিকে ছুটে আসবে । [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ যখন মহাদুর্ঘটনা ঘটে যাবে । আর এর ফলে সারা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পতংগরা চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে । পাহাড়গুলো ধূনা পশমের মত হবে, যা হাল্কা বাতাসে উড়ে যাবে । [সা'দী]

৬. অতঃপর যার পাল্লাসমূহ[১] ভারী হবে[২],

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝

(১) এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। মূলে 'মাওয়াযীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি বহুবচন। এর কারণ হয়ত মীযানগুলো কয়েকটি হবে; অথবা যে আমলগুলো ওজন করা হবে, সেগুলো বিভিন্ন প্রকারের হবে। [কুরতুবী] তাছাড়া বান্দার আমলের ওজন হওয়া যেমন সত্য তেমনি আমলকারীর ওজন হওয়াও সত্য। অনুরূপভাবে আমলনামারও ওজন করা হবে।[শরহুত তাহাবীয়া লিবনি আবিল ইয্য: ৪১৯] এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কেয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে-গণনা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো সালাত, সাওম, দান-সদকা, হজ-ওমরা অনেক করে, কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে। মানুষ আমলের যে পুঁজি নিয়ে আল্লাহর আদালতে আসবে তা ভারী না হালকা, অথবা মানুষের নেকী তার পাপের চেয়ে ওজনে বেশী না কম-এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। [দেখুন: মাজমূ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ: ১০/৭৩৫-৭৩৬] এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে: "আর ওজন হবে সেদিন সত্য। তারপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৮-৯] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "হে নবী! বলে দিন, আমি কি তোমাদের জানাবো নিজেদের আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ কারা? তারাই ব্যর্থ যাদের দুনিয়ার জীবনে সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন দেবো না।" [সূরা আল-কাহাফ: ১০৪-১০৫] অন্যত্র বলা হয়েছে, "কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা রেখে দেবো। তারপর কারো ওপর অণু পরিমাণও যুলুম হবে না। যার সরিষার দানার পরিমাণও কোন কাজ থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, কুফরী করা বৃহত্তম অসৎকাজ। গুনাহের পাল্লা তাতে অনিবার্যভাবে ভারী হয়ে যায়। ফলে আর কাফেরের এমন কোন নেকী হবে না নেকীর পাল্লায় যার কোন ওজন ধরা পড়ে এবং তার ফলে পাল্লা ঝুঁকে পড়তে পারে; কারণ তার ঈমান নেই। [সা'দী, সূরা কাহ্ফ: আয়াত-১০৫]

(২) বলা হয়েছে, যার পাল্লাসমূহ ভারী হবে সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। পাল্লাভারী হওয়ার অর্থ সৎকর্মের পাল্লা অসৎকর্ম থেকে ভারী হওয়া। [সা'দী]

৭. সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

৮. আর যার পাল্লাসমূহ হাল্কা হবে(১) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

৯. তার স্থান হবে 'হাওয়িয়াহ্'(২)। فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

১০. আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝

১১. অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন(৩)। نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

---

(১) অর্থাৎ যাদের অসৎকর্মের পাল্লা সৎকর্ম থেকে ভারী হবে। [মুয়াসসার, সা'দী]

(২) মূল আরবী শব্দে أمه বলা হয়েছে। أم শব্দের অর্থ স্থান বা ঠিকানাও হয়, যেমনটি উপরে অর্থের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ হলো, সে জাহান্নামের আগুনে অধোমুখে মাথার মগজসহ পতিত হবে। তাছাড়া যদি أم শব্দটির বিখ্যাত অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, মা। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তার মা হবে জাহান্নাম। মায়ের কোল যেমন শিশুর অবস্থান হয় তেমনি জাহান্নামবাসীদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কোন অবস্থান হবে না। আয়াতে উল্লেখিত 'হাওয়িয়াহ' শব্দটি জাহান্নামের একটি নাম। শব্দটি এসেছে 'হাওয়া' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে নীচুতে পড়ে যাওয়া। আর যে গভীর গর্তে কোন জিনিস পড়ে যায় তাকে হাওয়িয়া বলে। জাহান্নামকে হাওয়িয়া বলার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহান্নাম হবে অত্যন্ত গভীর এবং জাহান্নামবাসীদেরকে তার মধ্যে ওপর থেকে নিক্ষেপ করা হবে। [কুরতুবী]

(৩) এখানে حامية বলে বুঝানো হয়েছে, আগুনটি হবে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও লেলিহান। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আদম সন্তান যে আগুন ব্যবহার করে সেটি জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ উত্তপ্ততা সম্পন্ন, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, এটাই তো শাস্তির জন্যে যথেষ্ট, তিনি বললেন, জাহান্নামের আগুন তার থেকে ঊনসত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত"। [বুখারী: ৩২৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। তারপরও তাকে দু'বার সমুদ্রের মাধ্যমে ঠাণ্ডা করা হয়েছে, নতুবা এর দ্বারা কেউই উপকৃত হতে পারত না।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৪৪] অন্য হাদীসে এসেছে, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হাল্কা আযাব ঐ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তার কারণে তার মগজ উৎরাতে থাকবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৩২] হাদীসে আরও এসেছে, "জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ দিল যে, আমার একাংশ আরেক অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়া হলো, একটি শীতকালে অপরটি

গ্রীষ্মকালে। সুতরাং যত বেশী শীত পাও সেটা জাহান্নামের ঠাণ্ডা থেকে আর যতি বেশী গরম অনুভব কর সেটাও জাহান্নামের উত্তপ্ততা থেকে।" [বুখারী: ৫৩৭, ৩২৬০, মুসলিম: ৬১৭] অন্য হাদীসে এসেছে, "তোমরা যখন দেখবে যে, গ্রীষ্মের উত্তপ্ততা বেশী হয়ে গেছে তখন তোমরা সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ো; কেননা, কঠিন উত্তপ্ততা জাহান্নামের লাভা থেকে এসেছে।" [বুখারী: ৪৩৬, মুসলিম: ৬১৫]

১০২- সূরা আত-তাকাছুর[১]
৮ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে[২] প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা[৩]

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ①

---

(১) تكاثر শব্দটি كثرة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য, প্রাচুর্য লাভ করার জন্য মানুষের পরস্পরের অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা ও প্রতিযোগিতা করা; লোকদের অন্যের তুলনায় বেশী প্রাচুর্য লাভ করার কথা নিয়ে পরস্পরের মোকাবেলায় বড়াই করে বেড়ানো। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] এখানে কী বিষয়ে প্রতিযোগিতা তা বল হয় নি। মূলত দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পুত্র-পরিবার, বংশ, সম্মান-মর্যাদা, শক্তি ও কর্তৃত্বের উপকরণ এবং যেসব বিষয়ে এরূপ প্রতিযোগিতা হয় তার সবই উদ্দেশ্য। [সা'দী]

(২) ألهى 'আলহা' শব্দটির মূলে রয়েছে لهو বা 'লাহও'। এর আসল অর্থ গাফলতিতে নিমজ্জিত করা, ভুলিয়ে দেয়া। [কুরতুবী] যেসব কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে সে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে অন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল হয়ে পড়ে সেই ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দটি বলা হয়ে থাকে। ['উদ্দাতুস সাবেরীন: পৃ.১৭১] অর্থাৎ 'তাকাসুর' তোমাদেরকে তার নিজের মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে নিয়েছে, যার ফলে তার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা তোমাদের তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আখেরাত ও তার জন্য প্রস্তুতি থেকে গাফেল করে দিয়েছে। তার মোহ তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারই চিন্তায় তোমরা নিমগ্ন। আর এই মোহ ও নিমগ্নতা তোমাদেরকে একেবারে গাফেল করে দিয়েছে। আয়াতে এর জন্য কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। [উদ্দাতুস সাবেরীন: ১৮৩-১৮৪]

(৩) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আয়াতটি ঐ যুগের সুনির্দিষ্ট কোন কোন গোত্র বা নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী] তবে এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার যে, আয়াতে 'তোমাদেরকে' বলে শুধু সে যুগের লোকদের বুঝানো হয়নি। বরং প্রত্যেক যুগের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সামগ্রিকভাবে এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়েছে। [কুরতুবী] এর অর্থ দাঁড়ায়, বেশী বেশী বৈষয়িক স্বার্থ অর্জন করা, তার মধ্যে একে অন্যের অগ্রবর্তী হওয়া এবং অন্যের মোকাবেলায় তা নিয়ে গর্ব করার মোহ যেমন ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আচ্ছন্ন করে গোত্র ও জাতিকেও। তাছাড়া আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, প্রাচুর্য লোকদেরকে কোন জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। কারণ, যে জিনিস থেকে তারা গাফেল হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপক। [সা'দী] এর দ্বারা সবকিছুই উদ্দেশ্য যা

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও[১]।

حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ﴿٢﴾

কিছুর প্রাচুর্যের জন্য মানুষ সাধারণত চেষ্টা করে থাকে এবং অহংকার করে থাকে। হতে পারে সেটা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সাহায্য-সহযোগিতাকারী, সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী, মান-মর্যাদা ইত্যাদি যা-ই মানুষ বেশী পেতে চায় এবং অপরের উপর প্রাধান্য নেয়ার চেষ্টা করে। আর যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকেনা [সা'দী] এভাবে মানুষ আল্লাহ থেকে, তাঁর মা'রিফাত থেকে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন থেকে, তাঁর ভালবাসাকে সবকিছুর ভালবাসার উপর স্থান দেয়া থেকে, যার ইবাদতের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা থেকে গাফেল হয়ে গেছে। [সা'দী] অনুরূপভাবে তারা আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে গেছে। [বাদায়ে'উস তাফাসীর]

(১) এখানে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা করবস্থান যেয়ারত কর। এখানে যেয়ারত করার অর্থ মরে গিয়ে কবরে পৌছানো। কাতাদাহ বলেন, তারা বলত, আমরা অমুক বংশের লোক, আমরা অমুক গোত্রের চেয়ে বেশী, আমাদের সংখ্যা অনেক। এভাবে বলতেই থাকল অথচ তারা কমতে কমতে সবাই কবরবাসী হয়ে গেল। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, বলা হয়েছে, যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসা অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। [ইবন কাসীর] এখানে যেয়ারত শব্দটি আরও থেকে বুঝা যায়, কবরেও কেউ চিরকাল থাকবে না, এই দুনিয়া-কবর সবই ক্ষণস্থায়ী; এগুলো যেয়ারত শেষ হলে জান্নাত বা জাহান্নাম চিরস্থায়ী বাসভূমিতে যেতে হবে। [কুরতুবী] আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছে দেখলাম তিনি ﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾ তেলাওয়াত করে বলছিলেন, "মানুষ বলে, আমার ধন! আমার ধন! অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল, অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও, অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে– তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে।" [মুসলিম: ২৯৫৮, তিরমিযী: ২৩৪২, মুসনাদে আহমদ: ৪/২৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুজু করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" [বুখারী: ৬৪৩৯,৬৪৪০] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রতার ভয় করছি না। বরং তোমাদের জন্য প্রাচুর্যের ভয় করছি। অনুরূপভাবে আমি তোমাদের জন্যে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় করছি না, বরং ভয় করছি ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের।"। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩০৮]

৩. কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে(১);	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣
৪. তারপর, কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে;	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤
৫. কখনো নয়! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানে জ্ঞানী হতে---(২)	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝٥
৬. অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে;	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝٦
৭. তারপর অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে(৩),	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝٧
৮. তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে(৪)।	ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝٨

---

(১) অর্থাৎ তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছ। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছো। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। অবশ্যই অতি শীঘ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। [ইবন কাসীর, আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে لو বা 'যদি' শব্দের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কেয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না। [সা'দী]

(৩) উপরে বলা হয়েছে ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। [আদওয়াউল বায়ান] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খবর কোনদিন চাক্ষুষ দেখার মত নয়। মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তূর পর্বতেই তাকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা আলাইহিস্ সালাম এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল; তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭১]

(৪) অর্থাৎ তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ-প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না, সেগুলোতে আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছ কি না; নাকি পাপকাজে ব্যয় করেছ? [সা'দী] এতে সকল প্রকার নেয়ামত এসে যায়।

কুরআন ও হাদীসের অন্যত্র এরকম কিছু নেয়ামতের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে, ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ "কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" [সূরা আল-ইসরা:৩৬] এতে মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। বিভিন্ন হাদীসেও নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দু'টি নেয়ামত এমন আছে যাতে অধিকাংশ মানুষই ঠক খায়। তার একটি হলো, স্বাস্থ্য অপরটি হচ্ছে অবসর সময়।" [বুখারী: ৬৪১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষুধায় কাতর হয়ে বের হলেন, পথে আবুবকর ও উমরও বের হলেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বের হয়েছ? তারা বলল, ক্ষুধা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার নফস তার শপথ, আমিও সে কারণেই বের হয়েছি। তারপর তিনি বললেন, চল। তারা সবাই এক আনসারীর বাড়ীতে আগমন করলেন। আনসারী লোকটির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গিদ্বয়কে দেখে যার-পর-নাই খুশী হয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানোর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী জানালো যে, সে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে গেছে। ইত্যবসরে আনসারী লোকটি এসে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আজ কেউ আমার মত মেহমান পাবে না। তারা বসলে তিনি তাদের জন্য এক কাঁদি খেজুর নিয়ে আসলেন যাতে কাঁচা-পাকা, আধাপাকা, ভাল-মন্দ সব ধরণের খেজুর ছিল। তারপর আনসারী লোকটি ছুরি নিয়ে দৌড়াল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান! দুধ দেয় এমন ছাগল যবাই করো না। আনসারী তাদের জন্য যবাই করলে তারা ছাগলের গোস্ত খেল, খেজুর গ্রহণ করল, পানি পান করল। তারপর যখন তৃপ্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন, "তোমরা কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদেরকে ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করল, তারপর তোমরা এমন নেয়ামত ভোগ করার পর ফিরে গেলে"। [মুসলিম: ২০৩৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াত নাযিল হলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? এটা তো শুধু (আসওয়াদান বা দুই কালো জিনিস) খেজুর ও পানি। রাসূল বললেন, "অবশ্যই তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [তিরমিযী: ৫/৪৪৮, ইবনে মাজাহ:৪১৫৮, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রথম যে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে, আমি কি তোমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ করিনি? আমি কি তোমাকে সুপেয় পানি পান করাইনি?" [তিরমিযী: ৩৩৫৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্

তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আদম সন্তান! তোমাকে ঘোড়া ও উটে বহন করিয়েছি, তোমাকে স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তোমাকে ঘুরাপিরা ও নেতৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছি, এগুলোর কৃতজ্ঞতা কোথায়?" [মুসলিম: ২৯৬৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৯২] এই হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদ কেবল কাফেরদেরকে করা হবে না, সৎ মুমিনদেরকেও করা হবে। আর আল্লাহ্ মানুষকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো সীমা সংখ্যাহীন। সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। বরং এমন অনেক নিয়ামতও আছে যেগুলোর মানুষ কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরোপুরি গণনা করতেও পারবে না।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৪] [আদওয়াউল বায়ান, আত-তাফসীরুসসহীহ]

১০৩- সূরা আল-'আস্‌র[১]
৩ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْعَصْرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সময়ের শপথ[২],

وَالْعَصْرِ ۝١

২. নিশ্চয় মানুষ[৩] ক্ষতির মাঝে

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢

(১) আবদুল্লাহ ইবনে হিসন আবু মদীনাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে দু ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। [তাবরানী, মু'জামুল আওসাত: ৫১২০, মু'জামুল কাবীর: ২০/৭০, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৯০৫৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/২৩৩, ৩০৭]
এ সুরায় একথার ওপর সময়ের শপথ খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছে যারা চারটি গুণাবলীর অধিকারী: (১) ঈমান, (২) সৎকাজ (৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, যদি মানুষ এ সূরা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করত তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। সূরা আছর কুরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী রাহেমাহুল্লাহ-এর ভাষায় মানুষ এ সুরাটিকেই চিন্তা ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। [বাদায়ি'উত তাফসীর]

(২) আয়াতের প্রথমেই সময় বা যুগের শপথ করা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বিষয়বস্তুর সাথে সময় বা যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যে সংঘটিত হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও এই যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে। [সাদী, ইবন কাসীর] কোন কোন আলেম বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রজ্ঞা ও কুদরতের প্রমাণ-নিদর্শন সময় বা যুগেই রয়েছে; তাই এখানে সময়ের শপথ করা হয়েছে। [মুয়াসসার, বাদায়িউত তাফসীর]

(৩) মানুষ শব্দটি একবচন। এখানে মানুষ বলে সমস্ত মানুষই উদ্দেশ্য। কারণ, পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। তাই এটা অবশ্যি মানতে হবে যে, এখানে মানুষ শব্দটিতে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার-ই মধ্যে থাকবে না সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য

নিপতিত[১],

৩. কিন্তু তারা নয়[২], যারা ঈমান এনেছে[৩] এবং সৎকাজ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

প্রমাণিত হবে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, ফাতহুল কাদীর]

(১) আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সওদায় লোকসান হয়, পুরো ব্যবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে। আবার সমস্ত পুঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত মানবজাতি যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে তার থেকে উত্তরণের পথ বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে-- ঈমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশদান। দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দুটি বিষয় অপর মুসলিমদের হেদায়েত ও সংশোধন সম্পর্কিত। [সা'দী]

(৩) এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতিমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে তন্মধ্যে প্রথম গুণটি হচ্ছে ঈমান। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্বীকৃতি দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং কাজ-কর্মে বাস্তবায়ন। [মাজমূ 'ফাতাওয়া ৭/৬৩৮] এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ঈমান আনা বলতে কিসের ওপর ঈমান আনা বুঝাচ্ছে? এর জবাবে বলা যায়, কুরআন মজীদে একথাটি একবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহকে মানা। নিছক তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং তাকে এমনভাবে মানা যাতে বুঝা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভূ ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। তিনিই ভাগ্য গড়েন ও ভাঙ্গেন। বান্দার একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করা উচিত। তিনিই হুকুম দেন ও তিনিই নিষেধ করেন। তিনি যে কাজের হুকুম দেন তা করা ও যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চান তা না করা বান্দার ওপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দুরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করে তাও তাঁর অগোচরে থাকে না। দ্বিতীয়ত রাসূলকে মানা। তাঁকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্যি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া। সাথে সাথে এটার স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যুগে যুগে অনেক রাসূল ও নবী পাঠিয়েছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তার পরে আর

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

করেছে[১] আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের[২] এবং উপদেশ

কোন নবী বা রাসূল কেউ আসবে না। তৃতীয়ত ফেরেশতাদের উপর ঈমান। চতুর্থত আল্লাহর কিতাবসমমূহের উপর ঈমান, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের উপর ঈমান আনা ও কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকা। পঞ্চমত আখেরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটিই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়া। ষষ্ঠত তাকদীরের ভাল বা মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকার বিষয়টি মেনে নেয়া। মূলত ঈমানের এই ছয়টি অঙ্গ যে কোন লোকের নৈতিক চরিত্র ও তার জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য অতীব জরুরি। যেখানে ঈমানের অস্তিত্ব নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্য বিভূষিত হোক না কেন তা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। [বিস্তারিত দেখুন, ড.আবদুল আযীয আল-কারী; তাফসীর সূরাতিল আসর; ড. সুলাইমান আল-লাহিম, রিবহু আইয়ামিল উমর ফী তাদাব্বুরি সূরাতিল আসর]

(১) ঈমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আ'মাল সালেহা। সমস্ত সৎকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরায়ও ঈমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে।

(২) হক শব্দের কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাসের মতে, ঈমান ও তাওহীদ [বাগভী; কুরতুবী] কাতাদা বলেন, কুরআন। [কুরতুবী] সুদ্দী বলেন, এখানে হক্ক বলে আল্লাহকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে হক বলে "শরী'আত নির্দেশিত কাজগুলো করা এবং শরী'আত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিত্যাগ করা বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে, হক বলে এমন কাজ বোঝানো হয়েছে যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর তা হচ্ছে যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজ। সেটা তাওহীদ, শরী'আতের আনুগত্য, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ, দুনিয়াবিমুখ ও আখেরাতমুখী হওয়া সবই বোঝায়। [কাশশাফ] বস্তুত: হকের আদেশের প্রতি অসিয়ত করার বিষয়টি ওয়াজিব হক ও নফল হক উভয়টিকেই শামিল করে। [আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন ৮৩-৮৮] তাই সার্বিকভাবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে: সঠিক, নির্ভুল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী

দিয়েছে ধৈর্যের(১)।

এবং আকীদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা বলতে হবে। আর এটা না করলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং আল্লাহর লা'নতে পতিত হবে। একথাটিই পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে বনি ইসরাঈলদের ওপর লা'নত করা হয়েছে। কারণ এই যে, তাদের সমাজে গোনাহ ও যুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল [সূরা আল-মায়িদাহ:৭৮-৭৯] আবার একথাটি অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, "বনী ইসরাঈলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল করা হয় এবং সেই আযাব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বাঁচানো হয় যারা লোকদেরকে এই গোনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৩-১৬৬] অন্য সূরায় আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে, "সেই ফিতনাটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব বিশেষভাবে শুধুমাত্র সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাহ করেছে। [সূরা আল-আনফাল:২৫] সুতরাং এ সূরায় মুসলিমদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের দ্বীনকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, ততটুকুই জরুরি অন্য মুসলিমদেরকেও ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমতো চেষ্টা করা। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি সাধ্যমতো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ফরয বা দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। [দেখুন, সূরা আলে ইমরান: ১০৪] আর সেই উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে। [দেখুন, সূরা আলে ইমরান ১১০]

(১) 'সবর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এখানে কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। দুই. সৎকাজ করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। তিন. বিপদাপদে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। [মাদারেজুস সালেকীন ২/১৫৬] সুতরাং সৎকর্ম সম্পাদন, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত বিপদাপদ মোকাবেলা করা সবই 'সবর' এর শামিল। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে, হকের নসিহত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটি ঈমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পর অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। [ড. কারী, তাফসীর সূরাতিল আসর পৃ. ৬২-৬৩]

১০৪- সূরা আল-হুমাযাহ্
৯ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الهُمَزَةِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে[১],

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝

২. যে সম্পদ জমায় ও তা বার বার গণনা করে[২];

(১) আয়াতে 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে همز এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দুটি কাজই জঘন্য গোনাহ। [আদওয়াউল বায়ান] তাফসীরকারগণ এ শব্দ দু'টির আরও অর্থ বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণিত তাফসীর অনুসারে উভয় শব্দ মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে: সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে। চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে কারো বংশের নিন্দা করে। কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে। কারো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করে। কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কোথাও এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। কোথাও ভাইদের পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরায়। কোথাও লোকদের নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে। কোথাও কথার খোঁচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষারোপ করে। এসব তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ এসবই মারাত্মক গোনাহ।[পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না। আবার একদিক দিয়ে لمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২২৭] [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ নিজের অগাধ ধনদৌলতের অহংকারে সে মানুষকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে,

৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে[১]; | يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۟

৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে[২] হুতামায়[৩]; | كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۟

৫. আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী? | وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۟

তন্মধ্যে এটি হচ্ছে তৃতীয়। যার মূল কথা হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-- অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। গুণে গুণে রাখা বাক্য থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ লালসার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবে অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরি হক আদায় করা হয় না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দ্বীনের জরুরি কাজ বিঘ্নিত হয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ তাকে চিরন্তন জীবন দান করবে। অর্থাৎ অর্থ জমা করার এবং তা গুণে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশী মশগুল যে নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই। তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। তাছাড়া তাকে এ সম্পদের হিসাবও দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন কোন বান্দার দু'পা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে নিম্নোক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা না হয়, তার জীবনকে কিসে নিঃশেষ করেছে; তার জ্ঞান দ্বারা সে কী করেছে; তার সম্পদ কোত্থেকে আহরণ করেছে ও কিসে ব্যয় করেছে এবং তার শরীর কিসে খাটিয়েছে।' [তিরমিযী: ২৪১৭] [আত-তাফসীরুস সাহীহ]

(২) আরবী ভাষায় কোন জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অর্থে 'নবয' نبذ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। [কুরতুবী, তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] এ থেকে আপনা-আপনি এই ইংগিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের ধনশালী হওয়ার কারণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে ঘৃণাভরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে।

(৩) হুতামা শব্দটির মূল হচ্ছে, হাতম। হাতম মানে ভেঙ্গে ফেলা, পিষে ফেলা ও টুকরা করে ফেলা। জাহান্নামকে হাতম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যা কিছু ফেলে দেয়া হবে তাকে সে নিজের গভীরতা ও আগুনের কারণে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে রেখে দেবে। [কুরতুবী]

৬. এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত আগুন[১], — نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦

৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করবে[২]; — الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧

৮. নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে[৩] — اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨

৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে[৪]। — فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

---

(১) এখানে موقدة অর্থ অত্যন্ত লেলিহান শিখাযুক্ত প্রজ্বলিত আগুন। [মুয়াসসার] এখানে এই আগুনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা প্রকাশ পাচ্ছে। [রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

(২) 'তাত্তালিউ' শব্দটির মূলে হচ্ছে ইত্তিলা। আর 'ইত্তিলা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে চড়া, আরোহণ করা ও ওপরে পৌঁছে যাওয়া। [জালালাইন] 'আফইদাহ' শব্দটি হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ফুওয়াদ'। এর মানে হৃদয়। অর্থাৎ জাহান্নামের এই আগুন হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। হৃদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছাবার একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎচিন্তা, ভুল আকীদা-বিশ্বাস, অপবিত্র ইচ্ছা, বাসনা, প্রবৃত্তি, আবেগ এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র। [ফাতহুল কাদীর] এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অন্ধ হবে না। সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না। বরং প্রত্যেক অপরাধীর হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আযাব দেবে। এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার আগুন মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয়-দহনের তীব্র কষ্ট জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দরজা তো দূরের কথা তার কোন একটি ছিদ্রও খোলা থাকবে না। [ইবন কাসীর]

(৪) ফি আমাদিম মুমাদ্দাদাহ এর একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন এর একটি অর্থ হচ্ছে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উঁচু উঁচু থাম গেঁড়ে দেয়া হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধীরা উঁচু উঁচু থামের গায়ে বাঁধা থাকবে। এর তৃতীয় অর্থ হল এরূপ স্তম্ভসমূহ বা থাম দিয়ে জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদান করা হবে। এ-শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন কথা আল্লাহ জানাননি। এ মতটি ইমাম তাবারী গ্রহণ করেছেন। [তাবারী, ইবন কাসীর]

১০৫- সূরা আল-ফীল[১]
৫ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি কি দেখেন নি[২] আপনার রব হাতির অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন?

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ①

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেননি?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ②

---

(১) এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কাবা গৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশিয়ে দেন। মক্কা মুকাররমায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক প্রকার নবুওয়াতের ভুমিকাস্বরূপ সাব্যস্ত করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। হস্তী-বাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

(২) এখানে ألم تر 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে। বাহ্যত এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কোন কোন মুফাসসির এর সমাধানে বলেন, এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজিদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' বা আপনি কি দেখেননি? শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। [কুরতুবী] অপর কোন কোন তাফসিরবিদ বলেন, যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। তাছাড়া, এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আয়েশা ও আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা দুজন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন। [বাইহাকী: দালায়েলুন নাবুওয়াহ, ১/৫২] [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

৩. আর[১] তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান[২]

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣

৪. যারা তাদের উপর শক্ত পোড়ামাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করে[৩] ।

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤

৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ-সদৃশ করেন[৪] ।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝٥

---

(১) যদি আয়াতটিকে পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ধরা হয়, তখন এ আয়াতটির অর্থ হয়, 'তিনি কি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান নি?' পক্ষান্তরে যদি আয়াতটিকে প্রথম আয়াতটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ হবে, 'আপনি কি দেখেন নি, তিনি তাঁদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন?' [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

(২) أبابيل শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে, যা একটার পর একটা আসে। কারও কারও মতে, শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখির ঝাঁক-কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। [তাবারী] বলা হয়ে থাকে যে, এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। [কুরতুবী]

(৩) উপরে سجيل এর অর্থ করা হয়েছে, পোঁড়া মাটির কঙ্কর। [মুয়াসসার] কারও কারও মতে, ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে শক্ত হয়ে যে কংকর তৈরি হয়, সে কংকরকে سجيل বলা হয়ে থাকে। [জালালাইন] আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ অতি শক্ত পাথরের কঙ্কর। [আদওয়াউল বায়ান]

(৪) عصف এর অর্থ শুষ্ক তৃণ-লতা, শুকনো খড়কুটো। কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা শুষ্ক তৃণ ভক্ষিত হওয়ার পর যা হয়, তদ্রূপই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। [তাবারী, ইবন কাসীর]

১০৬- সূরা কুরাইশ[১]
৪ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ قُرَيْشٍ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ①

১. কুরাইশে[২]র আসক্তির কারণে[৩],

(১) এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে দুটিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন তাঁর খেলাফতকালে কুরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দুটি সূরাকে স্বতন্ত্র দুটি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর তৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়। [কুরতুবী]

(২) কুরাইশ একটি গোত্রের নাম। নদর ইবন কিনানার সন্তানদেরকে কুরাইশ বলা হয়। যারাই নদর ইবন কিনানাহ এর বংশধর তারাই কুরাইশ নামে অভিহিত। কারও কারও মতে, ফিহর ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানাহ এর বংশধরদেরকে কুরাইশ বলা হয়। তবে প্রথম মতটি বেশী শুদ্ধ। [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের বংশধর থেকে কিনানাহকে, কিনানাহর বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ তেকে বনী হাশেমকে, বনী হাশেম থেকে আমাকে পছন্দ করেছেন।" [মুসলিম: ২২৭৬]
কুরাইশকে কুরাইশ নামকরণ করার কারণ কারও কারও মতে, কুরাইশ শব্দটি تقريش থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ কামাই-রোযগার করা। তারা যেহেতু ব্যবসা করে কামাই-রোযগার করে জীবিকা নির্বাহ করত, তাই তাদের এ নাম হয়েছে। কারও কারও মতে, এর অর্থ জমায়েত করা বা একত্রিত করা। কারণ, তারা বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, সর্বপ্রথম কুসাই ইবন কিলাব তাদেরকে হারামের চারপাশে জড়ো করেন, ফলে তাদেরকে কুরাইশ বলা হয়েছে। কারও কারও মতে, তা এসেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা থেকে। কারণ, তারা হাজীদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত। কোন কোন মতে, সাগরের এক বড় মাছের নামকরণে তাদের নাম হয়েছে। যে মাছ অন্য মাছের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। তেমনিভাবে কুরাইশ অন্য সব গোত্রের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। [কুরতুবী]

(৩) মূল শব্দ হচ্ছে إيلاف। এ শব্দটির দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. শব্দটি تأليف থেকে এসেছে। তখন অর্থ হবে, মিল-মহব্বত থাকা, একত্রিত থাকা। অর্থাৎ কুরাইশদেরকে একত্রিত রাখা, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া এবং তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক ঠিক রাখা। দুই. শব্দটি এসেছে ইলফ শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া এবং কোন জিনিসের অভ্যাস গড়ে তোলা। [আদওয়াউল বায়ান] উভয় প্রকার

অর্থই এখানে হতে পারে। উপরে অর্থ করা হয়েছে, আসক্তি ও অভ্যস্ত হওয়া। বলা হয়েছে, কুরাইশদের আসক্তির কারণে। কিন্তু আসক্তির কারণে কি হয়েছে? এ কথা উহ্য আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে, আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্যে ধ্বংস করেছি কিংবা আমি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের সদৃশ এজন্যে করেছি, যাতে কোরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [তাবারী, ফাতহুল কাদীর] কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اعجبوا অর্থাৎ তোমরা কোরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর, তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে, তবুও তারা এ ঘরের রবের ইবাদত করে না! এ মতটি ইমাম তাবারী গ্রহন করেছেন। [তাবারী, মুয়াসসার] কেউ কেউ বলেন, এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا এর সাথে। অর্থাৎ এই নেয়ামতের কারণে কোরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। [ফাতহুল কাদীর, কাশশাফ] কারও কারও মতে, আয়াতের উদ্দেশ্য, এমনিতেই তো কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত সীমা-সংখ্যাহীন, কিন্তু অন্য কোন নিয়ামতের ভিত্তিতে না হলেও আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা এই বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত এই একটি নিয়ামতের কারণে তাদের আল্লাহর বন্দেগী করা উটিত। কারণ এটা মূলত তাদের প্রতি একটা বিরাট অনুগ্রহ। [কুরতুবী, আদওয়াউল বায়ান]

সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামেনের ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দুটি সফরের ওপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যেকোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সুতরাং তাদের উচিত এ ঘর 'কাবার' রবের ইবাদত করা। [ইবন কাসীর; সা'দী]

এ কথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচাও নেই; যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার ওপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। মূলত: মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। [জালালাইন] অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রপিতামহ হাশেম কোরাইশকে ভিনদেশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। [কুরতুবী] সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। [ফাতহুল কাদীর] আলোচ্য সূরাতে আল্লাহ

২.	তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মে সফরের[১]	إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۝٢
৩.	অতএব, তারা ‘ইবাদাত করুক এ ঘরের রবের[২],	فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ۝٣
৪.	যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন[৩]	ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ۝٤

তা‘আলা মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর এসব অনুগ্রহ ও নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে ঈমান ও তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।

(১) শীত ও গ্রীষ্মের সফরের অর্থ হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো । কারণ এ দু’টি শীত প্রধান দেশ । আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরব তথা ইয়েমেনের দিকে । কারণ সেটি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা । [কুরতুবী; সা‘দী]

(২) ‘এ ঘর’ অর্থ কা‘বা শরীফ ।বলা হয়েছে, এ ঘরের রব -এর ইবাদত কর ।এখানে ঘরটিকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত করার মাধ্যমে ঘরকে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য ।[সা’দী] আর এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে । আর তা হচ্ছে, এটি মহান রবের ঘর । অর্থাৎ এ ঘরের বদৌলতেই কুরাইশরা এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে । একমাত্র আল্লাহই যার রব । তিনিই আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়েছেন । আবরাহার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছেই তারা আবেদন জানিয়েছিল ।তাঁর ঘরের আশ্রয় লাভ করার আগে যখন তারা আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না । আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও একটি বংশধারার বিক্ষিপ্ত দল ছিল মাত্র । কিন্তু মক্কায় এই ঘরের চারদিকে একত্র হবার এবং এর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে থাকার পর সমগ্র আরবে তারা মর্যাদাশালী হয়ে উঠেছে । সবদিকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করছে । তারা যা কিছুই লাভ করেছে এ ঘরের রবের বদৌলতেই লাভ করেছে । কাজেই তাদের একমাত্র সেই রবেরই ইবাদত করা উচিত ।[দেখুন: মুয়াসসার, কুরতুবী]

(৩) মক্কায় আসার পুর্বে কুরাইশরা যখন আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তখন তারা অনাহারে মরতে বসেছিল । এখানে আসার পর তাদের জন্য রিযিকের দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে । তাদের সপক্ষে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই বলে দোয়া করেছিলেন ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদাশালী ঘরের কাছে একটি পানি ও শস্যহীন উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করিয়েছি, যাতে তারা সালাত কায়েম করতে পারে । কাজেই আপনি লোকদের হৃদয়কে তাদের অনুরাগী করে দিন, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করুন ।” [সূরা ইবরাহীম ৩৭] তার এই দো‘আ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় ।[তাবারী, আদওয়াউল বায়ান]

এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন[১] ।

(১) অর্থাৎ যে ভীতি থেকে আরব দেশে কেউ নিরাপদ নয়, তা থেকে তারা নিরাপদ রয়েছে। সে যুগে আরবের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে লোকেরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো। কারণ সবসময় তারা আশংকা করতো, এই বুঝি কোন লুটেরা দল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো। কিন্তু কুরাইশরা মক্কায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাদের নিজেদের ওপর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তাদের ছোট বড় সব রকমের কাফেলা দেশের প্রত্যেক এলাকায় যাওয়া আসা করতো। হারাম শরীফের খাদেমদের কাফেলা, একথা জানার পর কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস করতো না। [কুরতুবী, তাবারী]
এখানে লক্ষণীয় যে, সুখী জীবনের জন্যে যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোরাইশকে এগুলো দান করেছিলেন। ﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ﴾ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং ﴿وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ বাক্যে দস্যু ও শত্রুদের থেকে এবং যাবতীয় ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী, আদওয়াউল বায়ান] এভাবে তাদের কাছে জিনিসপত্র সহজলভ্য হওয়া ও নিরাপত্তা বিস্তৃত থাকা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। সুতরাং শুধু তাঁরই ইবাদত করা দরকার। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা উচিত। তাঁর জন্য কোন অংশীদার, শির্ক ইত্যাদি সাব্যস্ত করা থেকে দুরে থাকা কর্তব্য। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা যারাই একমাত্র তাঁর ইবাদত করেছে শির্ক থেকে দুরে থেকে তাঁর দেয়া নে'আমতের শুকরিয়া আদায় করেছে তাদের জন্য নিরাপত্তা ও পানাহার এ দুটি বিষয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করেছে তখনই তা উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল,ফলে তারা যা করত সে জন্য আল্লাহ্ সেটাকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।" [সূরা আন-নাহল:১১২] [ইবন কাসীর]

سُورَةُ المَاعُونِ

১০৭- সূরা আল-মা'উন[১]
৭ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি কি দেখেছেন[২] তাকে, যে দ্বীনকে[৩] অস্বীকার করে?

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ①

২. সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়[৪]

فَذٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ②

৩. আর সে উদ্বুদ্ধ করে না[৫] মিসকীনদের

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ③

---

(১) এ সূরায় বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এতিম ও মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করা হয়েছে; সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে; ইখলাসের সাথে সালাত ও অন্যান্য ইবাদত পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; ছোট-খাটো জিনিস ধার দেয়ার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, যারা এগুলো করে না, এ-সূরায় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তিরস্কৃত করেছেন। [সাদী]

(২) এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনে বর্ণনাভঙ্গী অনুযায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনে দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে "আদ-দীন" শব্দটির অর্থ আখেরাতে কর্মফল দান এবং বিচার। অধিকাংশ মুফাসসিররা এমতটিই গ্রহণ করেছেন। [ইবন কাসীর, কুরতুবী, মুয়াসসার]

(৪) এখানে يدعُّ বলা হয়েছে। এর অর্থ, রূঢ়ভাবে তাড়ানো, কঠোরভাবে দূর করে দেয়া। এতিমদের প্রতি অসদাচরণ করা, তাদের প্রতি দয়া না করে কঠোরভাবে ধিক্কার ও যুলুম করা, তাদেরকে খাদ্য দান না করা এবং তাদের হক আদায় না করাই এখানে উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার, ইবন কাসীর, তাবারী] জাহিলিয়াতের যুগে এতিম ও নারীদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত আর বলা হত, যারা তীর-বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করে তারাই শুধু সম্পত্তি পাবে। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম এ ধরনের প্রথা বাতিল করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

(৫) لا يحضُّ শব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনের খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত

খাদ্য দানে।

৪. কাজেই দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾

৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে(১),

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

৭. এবং মা'উন(২) প্রদান করতে বিরত থাকে।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো। কারণ তারা কৃপণ এবং আখেরাতে অবিশ্বাসী। [ফাতহুল কাদীর]

(১) এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্যে এবং মুসলিম হওয়ার দাবী সপ্রমাণ করার জন্য সালাত পড়ে। কিন্তু সালাত যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল সালাতেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে, নতুবা ছেড়ে দেয়। আর সালাত আদায় করলেও এর ওয়াজিবসমূহ, শর্ত ইত্যাদি পূর্ণ করে না। আসল সালাতের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং ساهون শব্দের আসল অর্থ তাই। সালাতের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্যে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে ﴿عَن صَلَاتِهِمْ﴾ এর পরিবর্তে ﴿فِي صَلَاتِهِمْ﴾ বলা হত। সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনেও একাধিকবার সালাতের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল। [কুরতুবী, ইবন কাসীর]

(২) ماعون শব্দের অর্থ অধিকাংশ মুফাসসিরদের নিকট যৎকিঞ্চিৎ ও সামান্য উপকারী বস্তু। মূলত: মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিয়ে থাকে, যেগুলোর পারস্পরিক লেন-দেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র এ সবই মাউনের অন্তরভুক্ত। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া দোষণীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। আবার কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতে ماعون বলে

যাকাত বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ماعون বলার কারণ সম্ভবত এই যে, যাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম -অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ-হয়ে থাকে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরি। কোন কোন হাদীসে ماعون এর তাফসীর ব্যবহার্য জিনিস, যেমন: বালতি, পাত্র ইত্যাদি করা হয়েছে। [আবু দাউদ: ১৬৫৭] [আদওয়াউল বায়ান, মুয়াসসার, ফাতহুল কাদীর]

১০৮- সূরা আল-কাউছার(১)
৩ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার(২)

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ①

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। ইকরিমা বলেন, এটা নবুওয়ত, কুরআন ও আখেরাতের সওয়াব। অনুরূপভাবে, কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবনের নাম। এ তাফসীরসমূহে কোন বিরোধ নেই; কারণ, কাউসার নামক প্রস্রবনটি অজস্র কল্যাণের একটি। আসলে কাউসার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে এক শব্দে এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দটি মূলে কাসরাত كثرة থেকে বিপুল ও অত্যধিক পরিমাণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন আধিক্য। কিন্তু যে অবস্থায় ও পরিবেশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে শুধুমাত্র আধিক্য নয় বরং কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য এবং এমন ধরনের আধিক্যের ধারণা পাওয়া যায় যা বাহুল্য ও প্রাচুর্যের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। আর এর অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য, যার মধ্যে একটি হল জান্নাতের প্রস্রবন। [ইবন কাসীর]

(২) বিভিন্ন হাদীসে কাউসার ঝর্ণাধারার কথা বর্ণিত হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তার মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ সহ সূরা আল-কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার রব আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব, হে রব! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে তারা নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।" [মুসলিম:৪০০, মুসনাদে আহমাদ:৩/১০২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইসরা ও মিরাজের রাত্রিতে আমাকে এক প্রস্রবনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যার দু'তীর ছিল মুক্তার খালি গম্বুজে

পরিপূর্ণ, আমি বললাম, জিবরাঈল এটা কি? তিনি বললেন, এটাই কাউসার" [বুখারী: ৪৯৬৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, প্রবাহিত একটি নহর। যা কোন খোদাই করা বা ফাটিয়ে বের করা হয়নি। আর তার দুই তীর মুক্তার খালি গম্মুজ। আমি তার মাটিতে আমার দু'হাত মারলাম, দেখলাম তা সুগন্ধি মিস্ক আর তার পাথরকুচি মুক্তোর।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৫২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "কাউসার হচ্ছে এমন একটি নহর যা আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন, তার মাটি মিসকের, দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও সুমিষ্ট, এতে এমন এমন পাখি নামবে যেগুলোর ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এগুলো তো খুব সুস্বাদু নিশ্চয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা এগুলো খাবে তারা আরও কোমল মানুষ"। [তাবারী: ৩৮১৭৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২২১, তবে মুসনাদে আহমাদে আবুবকরের পরিবর্তে উমরের কথা এসেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তার পেয়ালাগুলোর সংখ্যা আকাশের তারকাদের সংখ্যার অনুরূপ"। [বুখারী: ৪৯৬৫] মোটকথা: হাউযের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন অভিজ্ঞ আলেম উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ত্রিশ জনের বেশী সাহাবী এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তবে এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, কাউসার ও হাউয একই বস্তু নয়। হাউযের অবস্থান হাশরের মাঠে, যার পানি কাউসার থেকে সরবরাহ করা হবে। আর কাউসারের অবস্থান হলো জান্নাতে। হাশরের ময়দানের হাউয সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কাউসার ঝর্ণাধারা থেকে পানি এনে হাউযে ঢালা হবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, "জান্নাত থেকে দু'টি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং এর সাহায্যে সেখান থেকে তাতে পানি সরবরাহ হবে।" [মুসলিম:২৩০০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪২৪, ৫/১৫৯,২৮০,২৮১,২৮২,২৮৩] সুতরাং হাউয হলো এমন এক বিরাট পানির ধারা যা আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাশরের মাঠে দান করেছেন। যা দুধের চেয়েও শুভ্র, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, মধুর চেয়েও মিষ্টি, মিসকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ সম্পন্ন। যা অনেক প্রশস্ত, দৈর্ঘ ও প্রস্থে সমান, তার কোণ সমূহের প্রত্যেক কোণ এক মাসের রাস্তা, তার পানির মূল উৎস হলো জান্নাত। জান্নাত থেকে এমন দু'টি নলের মাধ্যমে তার সরবরাহ কাজ সমাধা হয়ে থাকে যার একটি স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের। তার পেয়ালা সমূহের সংখ্যা আকাশের তারকারাজীর মত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার হাউযের আয়তন হচ্ছে 'আইলা' (বায়তুল মুকাদ্দাস) থেকে সান'আ পর্যন্ত, আর সেখানে পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকার মত এত বেশী"। [বুখারী: ৬৫৮০, মুসলিম: ২৩০৩] রাসূলুল্লাহ

দান করেছি।

২. কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন[১]।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ[২]।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "আমার হাউয এক মাসের রাস্তা, তার কোণসমূহ একই সমান, তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, তার ঘ্রাণ মিসকের চেয়েও বেশী উত্তম, তার পেয়ালাসমূহ আকাশের তারকা মত বেশী ও উজ্জ্বল, যে তা থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবেনা"। [বুখারী: ৬৫৭৯, মুসলিম: ২২৯২] মোটকথা: কাউসারের মূল উৎস হলো জান্নাতে। তা থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি হাউযে পানি আসবে। সেখানে তার উম্মতকে তিনি পানি পান করাবেন। তাছাড়া সমস্ত নবীর হাউযের পানির উৎসও এ কাউসারই।

(১) نحر শব্দের অর্থ উট কুরবানী করা। এর প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কুরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালিতে ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা। আরবে সাধারণতঃ উট কুরবানী করা হতো। তাই কুরবানী বোঝাবার জন্য এখানে نحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কুরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রদত্ত কাউসারের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দু'টি কাজ করতে বলা হয়েছে। এক. একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত আদায়, দুই. তাঁরই উদ্দেশ্যে কুরবানী করা ও যবাই করা। [আদওয়াউল বায়ান] কেননা, সালাত শারিরীক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং কুরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। [বাদায়ি'উত তাফসীর]

(২) সাধারণতঃ যে ব্যক্তির পুত্র সন্তান মারা যায়, আরবে তাকে أبتر বা নির্বংশ বলা হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাকে নির্বংশ বলে উপহাস করত। একবার কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহূদী সর্দার মক্কায় আগমন করল। কুরাইশের নেতারা তাকে বলল, আপনি কি মদীনাবাসীদের উত্তম ব্যক্তি ও নেতা? সে বলল, হ্যাঁ, তখন তারা বলল, আপনি কি দেখেন না এই লোকটি যে তার জাতির মধ্যে নির্বংশ সে মনে করে সে আমাদের থেকে উত্তম? অথচ আমরা, হজ ও কাবাঘরের সেবায়েত। তখন কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরা তার থেকে উত্তম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, এতে বলা হয়, "নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই তো নির্বংশ।" আরও নাযিল হয়,

আপনি কি দেখেননা তাদেরকে যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা মূর্তি ও তাগুতের উপর ঈমান রাখে…” । [সূরা আন-নিসা: ৫১,৫২, হাদীসটি বর্ণনা করেন, নাসায়ী, কিতাবুত-তাফসীর, ২/৫৬০, নং ৭২৭, ইবনে হিব্বান, ৬৫৭২] এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্বংশ বলে যে দোষারোপ করা হতো তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বংশ বলে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বেখবর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশগত সন্তান-সন্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কন্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয়। তাছাড়া নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও বিবৃত হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

১০৯- সূরা আল-কাফিরূন[১]
৬ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الكَافِرُونَ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. বলুন, 'হে কাফিররা!

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝١

২. 'আমি তার 'ইবাদাত করি না যার 'ইবাদাত তোমরা কর,[২]

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢

৩. 'এবং তোমরাও তাঁর 'ইবাদাতকারী নও যাঁর 'ইবাদাত আমি করি[৩],

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝٣

---

(১) বিভিন্ন হাদীসে এ সূরার বেশ কিছু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফের দু' রাকা'আত সালাতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন।" [মুসলিম: ১২১৮] অন্য হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করেছেন"। [মুসলিম: ৭২৬] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাকা'আতে এ দু' সূরা পড়তে বিশোর্ধ বার বা দশোর্ধ বার শুনেছি।" [মুসনাদে আহমাদ:২/২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "চব্বিশোর্ধ অথবা পঁচিশোর্ধবার শুনেছি"। [মুসনাদে আহমাদ:২/৯৫] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি তিনি ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আতে এ দু'সূরা পড়তেন।" [তিরমিযী: ৪১৭, ইবনে মাজাহ: ১১৪৯, মুসনাদে আহমাদ: ২/৯৪] তাছাড়া জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্যে কোন দো'আ বলে দিন। "তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন এটা শির্ক থেকে মুক্তিপত্র।" [আবু দাউদ:৫০৫৫, সুনান দারমী:২/৪৫৯, মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৫৩৮] অন্য হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূরা 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' কুরআনের এক চতুর্থাংশ"।[তিরমিযী: ২৮৯৩, ২৮৯৫]

(২) সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব বাতিল উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করত বা করে– সবই এর অন্তর্ভুক্ত। [মুয়াসসার]

(৩) এ সুরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্যে বুখারী অনেক তাফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমানকালের জন্যে এবং একবার ভবিষ্যৎকালের জন্যে

৪. ‘এবং আমি ‘ইবাদাতকারী নই তার যার ‘ইবাদাত তোমরা করে আসছ।

وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝

উল্লেখ করা হয়েছে।[ফাতহুল বারী] অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। ইমাম তাবারীও এ মতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তাফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রথম জায়গায় আয়াতের অর্থ করেছেন এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না। আর দ্বিতীয় জায়গায় আয়াতের অর্থ করেছেন এই যে, আমার ও তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার মত ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। [ইবন কাসীর] সারকথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের ইবাদতপদ্ধতি তাই; যা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত পদ্ধতি স্বকল্পিত। ইবনে-কাসীর এই তাফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কলেমার অর্থ তাই হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ক উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধতি তা-ই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কোন কোন অভিজ্ঞ আলেম বলেন, ২ নং আয়াতের অর্থ, আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত কখনো করবো না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ, আমি এ ইবাদতটা কখনো, কিছুতেই গ্রহণ করবো না। অর্থাৎ তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করা আমার দ্বারা কখনো ঘটবে না অনুরূপভাবে তা শরীয়তেও এটা হওয়া সম্ভব নয়। [মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ১৬/৫৪৭-৫৬৭; ইবন কাসীর]

এর আরেকটি তাফসীরও হতে পারে। আর তা হলো, প্রথমত ২নং আয়াত ﴿لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ অর্থ ‘আমি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে তার ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর’। এর পরে এসেছে, ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ অর্থাৎ তোমরাও বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ইবাদতকারী নও। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴾ অর্থাৎ অতীতে আমার পক্ষ থেকে এরূপ কিছু ঘটেনি। অতীত বোঝানোর জন্য عَبَدتُّمْ অতীতকালীন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর পরে এসেছে, ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ অর্থাৎ তোমরাও অতীতে তার ইবাদত করতে না, যার ইবাদত আমি সবসময় করি। ইবনুল কায়্যিম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। [বাদায়ি'উল ফাওয়ায়িদ, ১/১২৩-১৫২]

৫. ‘এবং তোমরাও তাঁর ‘ইবাদাতকারী হবে না যাঁর ‘ইবাদাত আমি করি,

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾

৬. ‘তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার[১] ।’

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

(১) এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর বলেন, এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে, ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ “আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলবেন, ‘আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের ।” [সূরা ইউনুস: ৪১] অন্য আয়াতে এসেছে, ﴿لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ﴾ “আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য” [সূরা আল-কাসাস:৫৫, আশ-শুরা:১৫] । এর সারমর্ম এই যে, ইবনে-কাসীর دين শব্দকে দ্বীনী ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন । যার অর্থ, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে । অর্থাৎ আমার দ্বীন আলাদা এবং তোমাদের দ্বীন আলাদা । আমি তোমাদের মাবুদদের পূজা-উপাসনা-বন্দেগী করি না এবং তোমরাও আমার মাবুদের পূজা-উপাসনা করো না । আমি তোমাদের মাবুদদের বন্দেগী করতে পারি না এবং তোমরা আমার মাবুদের বন্দেগী করতে প্রস্তুত নও । তাই আমার ও তোমাদের পথ কখনো এক হতে পারে না ।

বর্তমান কালের কোন কোন জ্ঞানপাপী মনে করে থাকে যে, এখানে কাফেরদেরকে তাদের দ্বীনের উপর থাকার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে । তারা এটাকে ইসলামের উদারনীতির প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন । নিঃসন্দেহে ইসলাম উদার । ইসলাম কাউকে অযথা হত্যা বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে অনুমতি দেয় না । কিন্তু তাই বলে তাদেরকে কুফরী থেকে মুক্তি দিতে তাদের মধ্যে দাওয়াত ও দ্বীনের প্রচার-প্রসার ঘটানো থেকে বিরত থাকতে বলেনি । ইসলাম চায় প্রত্যেকটি কাফের ও মুশরিক ইসলামের ছায়াতলে এসে শান্তির বার্তা গ্রহণ করুক । আর এ জন্য ইসলাম প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশবাণী, উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করাকে প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য করণীয় বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছে । [দেখুন, সূরা আন-নাহল:১২৫] মূলতঃ এ সমস্ত জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টিকেই সহ্য করতে চায় না । তারা এখানে আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক কুফরী মতবাদকে জায়েয প্রমাণ করা । এটা নিঃসন্দেহে ঈমান আনার পরে কুফরী করার শামিল, যা মূলত কাফেরদের প্রতি উদারনীতি নয় বরং তারা কাফের থাকা অবস্থায় চিরকালের জন্য তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষের ঘোষণাবাণী ।

আর এ সূরায় কাফেরদের দ্বীনের কোন প্রকার স্বীকৃতিও দেয়া হয়নি । মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা দ্বীনের ব্যাপারে কখনো তাদের সাথে সমঝোতা করবে না– এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বশেষ ও চূড়ান্তভাবে নিরাশ

করে দেয়া; আর তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণাই এ সূরার উদ্দেশ্য। এ সূরার পরে নাযিল হওয়া কয়েকটি মক্কী সূরাতে কাফেরদের সাথে এ দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষ প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "হে নবী! বলে দিন হে লোকেরা, যদি তোমরা আমার দ্বীনের ব্যাপারে (এখানে) কোন রকম সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে (শুনে রাখো), আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের বন্দেগী করছো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি শুধুমাত্র সেই আল্লাহর বন্দেগী করি যার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।" [সূরা ইউনুস: ১০৪] অন্য সূরায় আল্লাহ্ আরও বলেন, "হে নবী! যদি এরা এখন আপনার কথা না মানে তাহলে বলে দিন, তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত"। [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, "এদেরকে বলুন, আমাদের ক্রুটির জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছো সে জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। বলুন, আমাদের রব একই সময় আমাদের ও তোমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করবেন।" [সূরা সাবা:২৫-২৬] অন্য সূরায় এসেছে, "এদেরকে বলুন হে আমার জাতির লোকেরা তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমি আমার কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর আসছে লাঞ্ছনাকর আযাব এবং কে এমন শাস্তি লাভ করছে যা অটল।" [সূরা আয-যুমার:৩৯-৪০]। আবার মদীনা তাইয়েবার সমস্ত মুসলিমকেও এই একই শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ। (সেটি হচ্ছে) তারা নিজেদের জাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের পূজা করো তাদের থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের কুফরী করি ও অস্বীকৃতি জানাই এবং যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনো ততক্ষণ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালীন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৪] কুরআন মজীদের একের পর এক এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনে চলো এবং আমাকে আমার ধর্ম মেনে চলতে দাও-"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন" এর এ ধরনের কোন অর্থের অবকাশই থাকে না। বরং সূরা আয-যুমার এ যে কথা বলা হয়েছে, একে ঠিক সেই পর্যায়ে রাখা যায় যেখানে বলা হয়েছে: "হে নবী! এদেরকে বলে দিন, আমি তো আমার দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদাত করবো। তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও করতে থাক না কেন।"[১৪]। সূতরাং এটাই এ আয়াতের মূল ভাষ্য যে, এখানে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআনে একথাও আছে, "কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর।" [সূরা আল-আনফাল:৬১] তাছাড়া মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম- তার ও ইয়াহূদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই সম্পর্কচ্যুতির অর্থ এ নয় যে, তাদের সাথে প্রয়োজনে সন্ধিচুক্তি করা যাবে না। মূলত সন্ধির বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছেন- "সে সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে।" [আবুদাউদ:৩৫৯৪, তিরমিযী:১৩৫২, ইবনে মাজাহ:২৫৫৩] ইয়াহূদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু এরূপ শান্তিচুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে– আল্লাহ তা'আলার আইন ও দ্বীনের মূলনীতিতে কোন প্রকার দরকষাকষির অবকাশ নেই। [দেখুন, ইবন্ তাইমিয়্যাহ্, আল-জাওয়াবুস সহীহ, ৩/৫৯-৬২; ইবনুল কাইয়্যিম, বাদায়ি'উল ফাওয়ায়িদ, ১/২৪৬-২৪৭]

১১০- সূরা আন-নাস্‌র[১]
৩ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ النَّصْرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়[২]

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ①

২. আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,[৩]

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ②

---

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন এ সূরা নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেন এবং বললেন, "মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৫৭] এ সূরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে। এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উতবাকে প্রশ্ন করে বলেন, কোন্ পূর্ণাঙ্গ সূরা সবশেষে নাযিল হয়েছে? উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি বললাম: 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ'। তিনি বললেন, সত্য বলেছ। [মুসলিম: ৩০২৪] ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, সূরা আন-নাসর বিদায় হজে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [সূরা আল-মায়িদাহ:৩] আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকি ছিল, তখন কালালাহ্ সংক্রান্ত [সূরা আন-নিসা:১৭৬] আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকি থাকার সময় ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮১] আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(২) এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত যে, এখানে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার, ইবন কাসীর] আর বিজয় মানে কোন একটি সাধারণ যুদ্ধে বিজয় নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এমন একটি চুড়ান্ত বিজয় যার পরে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ করার মতো আর কোন শক্তির অস্তিত্ব দেশের বুকে থাকবে না এবং একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে আরবে এ দ্বীনটিই প্রাধান্য বিস্তার করবে। [দেখুন, আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ লোকদের একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করার যুগ শেষ হয় যাবে। তখন এমন এক যুগের সূচনা হবে যখন একটি গোত্রের সবাই এবং এক একটি

৩. তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী[১]।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

বড় বড় এলাকার সমস্ত অধিবাসী কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতস্ফূর্তভাবে মুসলিম হয়ে যেতে থাকবে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। মক্কাবিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়। আমর ইবনে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "মক্কা বিজয়ের পরে প্রতিটি গোত্রই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঈমান আনার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা শুরু করে। মক্কা বিজয়ের আগে এ সমস্ত গোত্রগুলো ঈমান আনার ব্যাপারে দ্বিধা করত। তারা বলত, তার ও তার গোত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। যদি সে তার গোত্রের উপর জয়লাভ করতে পারে তবে সে নবী হিসেবে বিবেচিত হবে"। [বুখারী: ৪৩০২] [বাগাবী]

(১) একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমাকে বদরী সাহাবীগণের সাথে তার কাছে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। তারা এটাকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা বলেই ফেলল, একে আবার আমাদের সাথে কেন? আমাদের কাছে তার সমবয়সী সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তখন উমর বললেন, তোমরা তো জান সে কোত্থেকে এসেছে। তারপর একদিন তিনি তাদের মজলিসে তাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমাকে তাদের মাঝে ডেকে আমাকে তাদের সাথে রাখার ব্যাপারটি স্পষ্ট করারই ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অতঃপর উমর বললেন, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ" সম্পর্কে কি বল? তাদের কেউ বলল, আমাদের বিজয় লাভ হলে যেন আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই তা-ই বলা হয়েছে। আবার তাদের অনেকেই কিছু না বলে চুপ ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনে আব্বাস! তুমি কি অনুরূপ বল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে কি বল? আমি বললাম, এটা তো রাসূলের মৃত্যুর সময়, যা তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে", আর এটাই হবে আপনার জীবন শেষ হয়ে

যাওয়ার আলামত, “সুতরাং আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চান; কেননা তিনিই তো তাওবা কবুলকারী”। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তুমি যা বললে তা ছাড়া এ সূরা সম্পর্কে আর কিছু আমি জানি না।” [বুখারী: ৪৯৭০] সুতরাং সূরার অর্থ হচ্ছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে, তাবলীগ তথা পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব পালিত হয়েছে। অতএব, আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। [ইবনুল কায়্যিম: ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ১/৪৩৬] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর এই দো‘আ পাঠ করতেন سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ [বুখারী: ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৭, মুসলিম: ৪৮৪, আবু দাউদ: ৮৭৭, ইবনে মাজাহ: ৮৮৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ বয়সে বেশী বেশী আগত দো‘আ পাঠ করতেন: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ [মুসলিম: ৪৮৪, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৫] অনুরূপভাবে উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠাবসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ এই দো‘আ পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন। [তাবারী: ৩৮২৪৮]

১১১- সূরা তাব্বাত[১]
৫ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ تَبَّتْ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের[২]

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

(১) হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্‌র বাণী ﴿وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ﴾ "আর আপনি আপনার গোত্রের নিকটাত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন" [সূরা আশ-শু'আরা:২১৪] এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে وَا صَبَاحَاه ('হায়! সকাল বেলার বিপদ') বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেয়া তখন আরবে বিপদাশঙ্কার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত) ডাক শুনে কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল: হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন: আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, تَبًّا لَكَ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟ 'ধ্বংস হও তুমি, এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ'? অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। [বুখারী: ৪৯৭১,৪৯৭২, মুসলিম:২০৮]

(২) আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উয্‌যা। সে ছিল আবদুল মুত্তালিবের অন্যতম সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কারণ, 'লাহাব' বলা হয় আগুণের লেলিহান শিখাকে। লেলিহান শিখার রং হচ্ছে গৌরবর্ণ। সে অনুসারে আবু লাহাব অর্থ, গৌরবর্ণবিশিষ্ট। পবিত্র কুরআন তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। কারণ, জাহান্নামের অগ্নির লেলিহান শিখা তাকে পাকড়াও করবে। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে গিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। রবী'আ ইবনে আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহিলিয়াতের (অন্ধকার) যুগে যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, তিনি বলছিলেন, "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা

দু'হাত[১] এবং ধ্বংস হয়েছে সে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল, সফলকাম হবে"। আর মানুষ তার চতুষ্পার্শে ভীড় জমাচ্ছিল। তার পিছনে এক গৌরবর্ণ টেরা চোখবিশিষ্ট সুন্দর চেহারার লোক বলছিল, এ লোকটি ধর্মত্যাগী, মিথ্যাবাদী। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে পিছনে যেখানে তিনি যেতেন সেখানেই যেত। তারপর আমি লোকদেরকে এ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। লোকেরা বলল, এটি তারই চাচা আবু লাহাব।" [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৪১] অন্য বর্ণনায়, রবী'আ ইবনে আব্বাদ বলেন, আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করে বলছিলেন, "হে অমুক বংশ! আমি তোমাদের সবার নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করতে নির্দেশ দিচ্ছি। আর আমি এটাও চাই যেন তোমরা সত্য বলে বিশ্বাস কর এবং আমার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ কর, যাতে করে আমি আমার আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি।" যখনই তিনি এ কথাগুলো বলে শেষ করতেন তখনই তার পিছন থেকে এক লোক বলত: হে অমুক বংশ! সে তোমাদেরকে লাত ও উযযা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়– সে নতুন কথা চালু করেছে, সে ভ্রষ্টতা নিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা তার কথা শোনবে না এবং তার অনুসরণ করবে না। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, এ লোকটি কে? তিনি বললেন, ঐ লোকটির চাচা আবু লাহাব। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৯২] [ফাতহুল কাদীর, ইবন কাসীর]

(১) يد শব্দের অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশি, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন কুরআনের অন্যত্র ﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ বলা হয়েছে। ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ এর অর্থ কোন তাফসীরকার করেছেন, "ভেঙে যাক আবু লাহাবের হাত" এবং وَتَبَّ শব্দের মানে করেছেন, "সে ধ্বংস হয়ে যাক" অথবা "সে ধ্বংস হয়ে গেছে।" কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এটা আবু লাহাবের প্রতি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীত কালের অর্থ প্রকাশক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মানে, তার হওয়াটা যেন এত বেশী নিশ্চিত যেমন তা হয়ে গেছে। আর যা এ সূরায় কয়েক বছর আগে বর্ণনা করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাই সত্য হলো। এখানে হাত ভেঙে যাওয়ার মানে শুধু শরীরের একটি অংগ যে হাত সেটি ভেঙে যাওয়াই নয়। বরং কোন ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাতে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই এখানে বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] আর আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যথার্থই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার মাত্র সাত আট বছর পরেই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সরদার নিহত হয়। তারা সবাই ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি শত্রুতার

নিজেও।

২. তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন[১] তার কোন কাজে আসে নি।

مَآ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

৩. অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে,[২]

سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

৪. আর তার স্ত্রীও[৩]– যে ইন্ধন বহন

وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۝

ক্ষেত্রে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। এ পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌঁছার পর সে যত বেশী মর্মাহত হয় যে, এরপর সে সাত দিনের বেশী জীবিত থাকতে পারেনি। যে দ্বীনের অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সন্তানদের সেই দ্বীন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার আরো বেশী ও পূর্ণ পরাজয় সম্পন্ন হয়। সর্বপ্রথম তার মেয়ে দাররা হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই ছেলে উতবা ও মু'আত্তাব রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার হাতে বাইআত করেন। [রুহুল মা'আনী]

(১) كَسَبَ এর অর্থ ধন-সম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা, সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র, আর তার সন্তান সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল।' [নাসায়ী: ৪৪৪৯; আবু দাউদ: ৩৫২৮] অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর। এ কারণে কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে كَسَبَ এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। [কুরতুবী, ইবন কাসীর] আল্লাহ তা'আলা আবু লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধন-সম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এ দু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ﴿ذَاتَ لَهَبٍ﴾ বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে। [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল "আরওয়া"। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন ও হরব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে "উম্মে জামীল" বলা হত। আবু লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষী ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক বর্ণনায় এসেছে, এ মহিলা

করে[১],

যখন শুনতে পেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ও তার স্বামীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে অপমানিত করেছেন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বসা ছিলেন। তার সাথে ছিলেন আবু বকর। তখন আবু বকর বললেন, আপনি যদি একটু সরে যেতেন তা হলে ভাল হতো যাতে করে এ মহিলা আপনাকে কোন কষ্ট না দিতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার ও তার মাঝে বাধার সৃষ্টি করা হবে। ইত্যবসরে মহিলা এসে আবু বকরকে জিজ্ঞেস করল, আবু বকর! তোমার সাথী আমাদের বদনামী করে কবিতা বলেছে? তিনি জবাবে বললেন, এ ঘরের (কাবার) রবের শপথ, তিনি কোন কবিতা বলেননি এবং তার মুখ দিয়ে তা বেরও হয়নি। তখন মহিলা বলল, তুমি সত্য বলেছ। তারপর মহিলা চলে গেলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, সে কি আপনাকে দেখেনি? রাসূল বললেন, মহিলা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত একজন ফেরেশতা আমাকে তার থেকে আড়াল করে রাখছিল। [মুসনাদে আবি ইয়া'লাঃ ২৫, ২৩৫৮, মুসনাদে বাযযারঃ ২৯৪] [ইবন কাসীর]

(১) এখানে আবু জাহলের স্ত্রী উম্মে জামীলের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাকপদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে 'খড়ি-বাহক' বলা হত। শুষ্ককাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে এ তাফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে কোন কোন তাফসীরবিদগণ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তার পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কুরআন ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ বলে ব্যক্ত করেছে। ইমাম তাবারী এ উক্তিটি গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দরিদ্র বলে উপহাস করত। পরিণামে আল্লাহ্ এ মহিলাকে লাকড়ি আহরণকারী বলে অপমানজনক উপাধী দিয়ে উপহাস করেছেন। আবার সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আয়াতের অর্থ "গোনাহের বোঝা বহনকারিনী"। [কুরতুবী, ইবন কাসীর]

৫. তার গলায়[১] পাকানো রশি[২]। | فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

---

(১) তার গলার জন্য 'জীদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় গলাকে জীদ বলা হয়। পরবর্তীতে যে গলায় অলংকার পরানো হয়েছে তার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব্ বলেন, সে একটি অতি মূল্যবান হার গলায় পরতো এবং বলতো, লাত ও উয্যার কসম, এ হার বিক্রি করে আমি এর মূল্য বাবদ পাওয়া সমস্ত অর্থ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কাজ করার জন্য ব্যয় করবো। [ইবন কাসীর] এ কারনে জীদ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাঙ্গার্থে। অর্থাৎ এ অলংকার পরিহিত সুসজ্জিত গলায়, যেখানে পরিহিত হার নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন সেখানে রশি বাঁধা হবে। [তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) বলা হয়েছে, তার গলায় বাঁধা রশিটি 'মাসাদ' ধরনের। 'মাসাদ' এর অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। তার একটি হচ্ছে, খুব মজবুত করে পাকানো রশিকে 'মাসাদ' বলা হয়। [বাগাওয়ী] দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, খেজুর গাছের (ডালের) ছাল/আঁশ থেকে তৈরি শক্ত পাকানো খসখসে রশি 'মাসাদ' নামে পরিচিত। [মুয়াস্‌সার] এর আরেকটি অর্থ, খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের মোটা অংশ থেঁতলে যে সরু আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাকানো রশি অথবা উটের চামড়া বা পশম দিয়ে তৈরি রশি। [কুরতুবী] মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ লোহার তারের পাকানো রশি বা লোহার বেড়ি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তার গলায় আগুনের রশি পরানো হবে। তা তাকে তুলে আগুনের প্রান্তে উঠাবে আবার তাকে এর গর্তদেশে নিক্ষেপ করবে। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে। [ইবন কাসীর]

১১২- সূরা আল-ইখ্লাস্[১]
৪ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الإِخْلَاص

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) এ সূরার বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা হলোঃ
এক. এর ভালবাসা জান্নাতে যাওয়ার কারণ; হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে আরয করল: আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন: এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৪১, ১৫০]
দুই. এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা এখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন, এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। [মুসলিম: ৮১২, তিরমিযী: ২৯০০] এ অর্থে হাদীসের সংখ্যা অসংখ্য।
তিন. বিপদাপদে উপকারী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়। [আবু দাউদ: ৫০৮২, তিরমিযী: ৩৫৭৫, নাসায়ী: ৭৮৫২]
চার. ঘুমানোর আগে পড়ার উপর গুরুত্ব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে উকবা ইবনে আমের আমি কি তোমাকে এমন তিনটি উত্তম সূরা শিক্ষা দিব না যার মত কিছু তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং কুরআনেও নাযিল হয়নি। উকবা বললেন, আমি বললাম, অবশ্যই হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। উকবা বলেন, তারপর রাসূল আমাকে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস' এ সূরাগুলো পড়ালেন, তারপর বললেন, হে উকবা! রাত্রিতে তুমি ততক্ষণ নিদ্রা যেয়ো না, যতক্ষণ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। উকবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৪৮, ১৫৮-১৫৯]
পাঁচ. এ সূরা পড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মিত আমল ছিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় ঘুমানোর জন্য যেতেন তখন তিনি তার দু হাতের তালু একত্রিত করতেন তারপর সেখানে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' এ তিন সূরা পড়ে ফুঁ দিতেন, তারপর এ দু' হাতের তালু দিয়ে তার শরীরের যতটুকু সম্ভব মসেহ করতেন। তার মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে শরীরের সামনের অংশে তা করতেন। এমনটি রাসূল তিনবার করতেন। [বুখারী: ৫০১৭, আবু দাউদ: ৫০৫৬, তিরমিযী: ৩৪০২]

১. বলুন[১], 'তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়[২],

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ①

২. 'আল্লাহ্ হচ্ছেন 'সামাদ'[৩] (তিনি

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ②

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩৩৬৪, মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৩৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৪০] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল– আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। [আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ৬/৩৭০, তাবরানী: মু'জামুল আওসাত: ৩/৯৬, মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ৬/১৮৩, নং-৩৪৬৮, আদ-দিনাওয়ারী: আল-মুজালাসা ও জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/৫২৮, নং ১১৪৫] এখানে 'বলুন' শব্দটির মাধ্যমে প্রথমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মুমিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কথা বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা প্রত্যেক মুমিনকেই বলতে হবে।

(২) এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (যাঁর সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করছো) আল্লাহ, একক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সমকক্ষ, সদৃশ, স্ত্রী, সন্তান, অংশীদার কিছুই নেই। একত্ব তাঁরই মাঝে নিহিত। তাই তিনি পূর্ণতার অধিকারী, অদ্বিতীয়-এক। সুন্দর নামসমূহ, পূর্ণ শ্রেষ্ঠ গুণাবলী এককভাবে শুধুমাত্র তাঁরই। [কুরতুবী, সা'দী] আর أحد শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কেননা তিনিই গুণাবলী ও কার্যাবলীতে একমাত্র পরিপূর্ণ সত্তা। [ইবন কাছীর] মোটকথা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে একক, তার কোন সমকক্ষ, শরীক নেই। এ সূরার শেষ আয়াত "আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই" দ্বারা তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত সমগ্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এমনকি সকল নবী-রাসূলদের রিসালাতের আগমন হয়েছিলো এ একত্ব ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার জন্যই। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক মাবুদ বা ইলাহ নেই- সমগ্র সৃষ্টিজগতেই রয়েছে এর পরিচয়, আল্লাহ্‌র একত্বের পরিচয়। কুরআনে অগণিত আয়াতে এ কথাটির প্রমাণ ও যুক্তি রয়েছে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(৩) صمد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, ইকরামা বলেছেন: সামাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যাঁর কাছে সবাই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পেশ করে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন, তিনি এমন সরদার, নেতা, যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ

করেছে এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সমস্ত গুণাবলিতে সম্পূর্ণ পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ। যায়েদ ইবন আসলাম বলেন, এর অর্থ, নেতা। হাসান ও কাতাদা বলেন, এর অর্থ, যিনি তার সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেলেও অবশিষ্ট থাকবেন। হাসান থেকে অন্য বর্ণনায়, তিনি ঐ সত্বা, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক, যার কোন পতন নেই। অন্য বর্ণনায় ইকরিমা বলেন, যার থেকে কোন কিছু বের হয়নি এবং যিনি খাবার গ্রহণ করেন না। রবী ইবন আনাস বলেন, যিনি জন্ম গ্রহণ করেননি এবং জন্ম দেননি। সম্ভবত তিনি পরবর্তী আয়াতকে এ আয়াতের তাফসীর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ, ইবন বুরাইদা, আতা, দাহহাক সহ আরো অনেকে এর অর্থ বলেছেন, যার কোন উদর নেই। শা'বী বলেন, এর অর্থ যিনি খাবার খান না এবং পানীয় গ্রহণ করেন না। আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ বলেন, এর অর্থ, যিনি এমন আলো যা চকচক করে। এ বর্ণনাগুলো ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী, ইবন আবী হাতেম, বাইহাকী, তাবারানী প্রমূখগণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন। [দেখুন, তাবারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

বস্তুত: উপরে বর্ণিত অর্থগুলোর সবই নির্ভুল। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয় কারণ তা অবিনশ্বর নয় একদিন তার বিনাশ হবে। কোন কোন সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। বিপরীতপক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস নিজের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিযিক দেন, নেন না। সমগ্র বিশ্ব জাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি "আস-সামাদ।" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি অমুখাপেক্ষিতার গুণাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত। আবার যেহেতু তিনি "আস-সামাদ" তাই তাঁর একাকী ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনির্ভরশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর "আস-সামাদ" হবার কারণে তাঁর একক মাবুদ হবার

কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী);

৩. ‘তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি(১),

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

৪. ‘এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই(২) ।’

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তারই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, “আস-সামাদ” হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থই রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না। এভাবে আমরা উপরোক্ত অর্থগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি।

(১) যারা আল্লাহর বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য– স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যারোপ করে অথচ এটা তার জন্য উচিত নয়। আর আমাকে গালি দেয়, এটাও তার জন্য উচিত নয়। তার মিথ্যারোপ হচ্ছে, সে বলে আমাকে যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি কখনও আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে কোনভাবেই কঠিন নয়। আর আমাকে গালি দেয়ার ব্যাপারটি হলো, সে বলে আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ আমি একক, সামাদ, জন্মগ্রহণ করিনি এবং কাউকে জন্মও দেইনি। আর কেউই আমার সমকক্ষ নেই।” [বুখারীঃ ৪৯৭৪]

(২) মূলে বলা হয়েছে ‘কুফূ’। এর মানে হচ্ছে, নজীর, সদৃশ, সমান, সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমতুল্য। আয়াতের মানে হচ্ছে, সারা বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমমর্যদাসম্পন্ন কিংবা নিজের গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না এবং আকার-আকৃতিতেও কেউ তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। এক হাদীসে এসেছে, বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন এক লোক সালাত আদায় করছে এবং বলছে, اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ এটা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এ লোকটি আল্লাহকে তাঁর এমন মহান নামে ডাকল যার অসীলায় চাইলে তিনি প্রদান করেন। আর যার দ্বারা দো‘আ করলে তিনি কবুল করেন” [আবু দাউদঃ ১৪৯৩, তিরমিযীঃ ৩৪৭৫, ইবনে মাজাহঃ ৩৮৫৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫০] মুশরিকরা প্রতি যুগে মাবুদদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ

করে এসেছে যে, মানুষের মতো তাদেরও একটি জাতি বা শ্রেণী আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিয়ে-শাদী এবং বংশ বিস্তারের কাজও চলে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও এ জাহেলী ধারণা মুক্ত রাখেনি। তাঁর জন্য সন্তান সন্ততিও ঠিক করে নিয়েছে। তারা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা গণ্য করতো। যদিও তাদের কেউ কাউকে আল্লাহর পিতা গণ্য করার সাহস করেনি। কিন্তু তারা তাদের কোন কোন ব্যক্তি বা নবীকে আল্লাহ্‌র সন্তান মনে করতে দ্বিধা করেনি। এ সবের উত্তরেই এ সূরায় বলা হয়েছে, তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। যদিও মহান আল্লাহকে "আহাদ" ও "আস-সামাদ" বললে এসব উদ্ভট ধারণা–কল্পনার মুলে কুঠারাঘাত করা হয়, তবুও এরপর "না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান" একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তারপর যেহেতু আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা-কল্পনা শিরকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত, তাই মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সূরা ইখলাসেই এগুলোর দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে লোকেরা সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে, "আল্লাহ ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত-পাক-পবিত্র। যা কিছু, আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।" [সূরা আন-নিসা: ১৭১] "জেনে রাখো, এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মনগড়া কথা। আসলে এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।" [সূরা আস-সাফ্‌ফাত: ১৫১-১৫২] "তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্কে তৈরি করে নিয়েছে অথচ ফেরেশতারা ভালো করেই জানে এরা (অপরাধী হিসেবে) উপস্থাপিত হবে।" [সূরা আস-সাফফাত: ১৮৫] "লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর অংশ বনিয়ে ফেলেছে। আসলে মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।" [সূরা আয-যুখরুফ: ১৫] "আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদের স্রষ্টা। আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র-কণ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র এবং তার উর্ধে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। তাঁর পুত্র কেমন করে হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল-আন'আম: ১০০-১০১] "আর তারা বললো, দয়াময় আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। তিনি পাক-পবিত্র। বরং (যাদেরকে এরা তাঁর সন্তান বলছে) তারা এমন সব বান্দা যাদেরকে মর্যদা দান করা হয়েছে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৬] "লোকেরা বলে দিয়েছে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক-পবিত্র! তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এ বক্তব্যের সপক্ষে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর

সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো, যা তোমরা জানো না?" [সূরা ইউনুস: ৬৮] "আর হে নবী! বলে দিন সেই আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীক আর না তিনি অক্ষম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক।" [সূরা আল-ইসরা: ১১১] যারা আল্লাহর জন্য সন্তান গ্রহণ করার কথা বলে, এ আয়াতগুলোতে সর্বতোভাবে তাদের এহেন আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য যে সমস্ত আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, সেগুলো সূরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

১১৩- সূরা আল-ফালাক[১]
৫ আয়াত, মাদানী

سُورَةُ الفَلَقِ

---

(১) সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহেমাহুল্লাহ উভয় সূরার তাফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। সূরা ফালাক-এ দুনিয়াবী বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা আন-নাসে আখেরাতের আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে এ সূরা এবং সূরা আন-নাস উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না; অর্থাৎ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ও ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ আয়াতসমূহ। [মুসলিম: ৮১৪] অন্য বর্ণনায় আছে, তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর এবং কুরআনেও অনুরূপ অন্য কোন সূরা নেই। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৪৮, ১৫৮-১৫৯] এক সফরে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের সালাতে এ সূরাদ্বয়ই তেলাওয়াত করে বললেন: এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ করো। [আবু দাউদ: ১৪৬২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৪৮] অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক সালাতের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন। [আবু দাউদ:১৫২৩ তিরমিযী: ২৯০৩, নাসায়ী: ১৩৩৬, মুসনাদে আহমাদ:৪/১৫৫] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারতনা। তাই আমি এরূপ করতাম। [বুখারী: ৫০১৬, মুসলিম: ২১৯২] উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি সূরা ইউসুফ ও সূরা হূদ থেকে পড়ব? তিনি বললেন, 'বরং তুমি কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক দিয়ে পড়। কেননা, তুমি এর চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় ও অধিক অর্থপূর্ণ আর কোন সূরা পড়তে পারবে না। যদি তুমি পার, তবে এ সূরা যেন তোমার থেকে কখনো ছুটে না যায়' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৪০] সারকথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন।

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বলুন[১], 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ

(১) জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইয়াহূদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইয়াহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনতেন। কিন্তু তিনি আজীবন এই ইয়াহুদীকে কিছু বলেননি, এমনকি তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডল কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইয়াহূদী রীতিমত দরবারে হাযির হত। [নাসায়ী: আল-কুবরা, ৩৫৪৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৬৭] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর জনৈক ইয়াহূদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললেন, আমার রোগটা কি, আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দুব্যক্তি আমার কাছে আসল; একজন শিয়রের কাছে এবং অন্যজন পায়ের কাছে বসল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য জনকে বলল, তার অসুখটা কি? অন্যজন বললঃ ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: কে জাদু করল? অন্যজন বলল, লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম (বনু যুরাইকের এক ইহুদী মুনাফিক ব্যক্তি)। আবার প্রশ্ন হল: কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, তা কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'যরওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কূপে গেলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমাকে সেই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর বস্তুটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, আপনি ঘোষণা করলেন না কেন? (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আর মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া হোক, তা আমি চাইনি। [বুখারী: ৫৭৬৫] তবে এটা মনে রাখা জরুরী যে, জাদুগ্রস্ত হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহর রাসূলের উপর জাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আনে। এগুলো

করছি[১] ....

সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। রাসূলগণ এগুলোর উর্ধ্বে নন। জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাদের জাদুগ্রস্ত হওয়া অবাস্তব নয়। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(১) মুমিন ব্যক্তি কোন জিনিসের ভীতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। মারইয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন অকস্মাৎ নির্জনে আল্লাহর ফেরেশতা একজন মানুষের বেশ ধরে তার কাছে এলেন (তিনি তাকে আল্লাহর ফেরেশতা বলে জানতেন না) তখন তিনি বললেন, "যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" [সূরা মারইয়াম:১৮] নূহ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আবেদন জানালেন, "হে আমার রব! যে জিনিস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তেমন কোন জিনিস আপনার কাছে চাওয়া থেকে আমি আপনার পানাহ চাই।" [সূরা হূদ:৪৭] মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন বনী ইসরাঈলদের গাভী যবেহ করার হুকুম দিলেন এবং তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন তিনি তাদের জবাবে বললেন, "আমি মূর্খ-অজ্ঞদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" [সূরা আল-বাকারাহ:৬৭] হাদীস গ্রন্থগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব "তাআউউয" উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলো তাও অনুরূপ আল্লাহ্র কাছে চাওয়া হয়েছে। যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর সময় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব কাজ করিনি তার অনিষ্ট থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি। [মুসলিম: ২৭১৬] অর্থাৎ কোন খারাপ কাজ করে থাকলে তার খারাপ ফল থেকে পানাহ চাই এবং কোন কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু তা আমি করিনি, যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে তার অনিষ্ট থেকেও তোমার পানাহ চাই। অথবা যে কাজ করা উচিত নয় কিন্তু তা আমি কখনো করে ফেলবো, এমন সম্ভবনা থাকলে তা থেকেও তোমার আশ্রয় চাই। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দো'আ ছিল, "হে আল্লাহ! তোমার যে নিয়ামত আমি লাভ করেছি তা যাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয়, তোমার কাছ থেকে যে নিরাপত্তা আমি লাভ করেছি তা থেকে যাতে আমাকে বঞ্চিত না করা হয়, তোমার গযব যাতে অকস্মাৎ আমার ওপর আপতিত না হয় সে জন্য এবং তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি"। [মুসলিম: ২৭৩৯] অনুরূপভাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলতেন, "যে ইলম উপকারী নয়, যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত নয়, যে নফস কখনো তৃপ্তি লাভ করে না এবং যে দো'আ কবুল করা হয় না, আমি সেসব থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি"। [মুসলিম : ২৭২২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে যেভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন তা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি বিপদ-

উষার রবের(১)

২. 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে(২), مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

আপদ ও অনিষ্টকারিতার মোকাবিলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়াটাই মুমিনের কাজ, অন্য কারো কাছে নয়। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও অনির্ভর হয়ে নিজের ওপর ভরসা করাও তার কাজ নয়।

(১) "ফালাক" শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে ফাটানো, চিরে ফেলা বা ভেদ করা। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর গুণ ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [সূরা আল-আন'আম:৯৬] বর্ণনা করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হল, প্রভাত; রাতের অন্ধকার চিরে প্রভাতের শুভ্রতা বেরিয়ে আসার কারণে এরূপ নামকরণ। কুরআন ব্যাখ্যাদাতাদের বিপুল সংখ্যক অংশ শব্দটির এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর বলেন, এটিই বিশুদ্ধমত, ইমাম বুখারী এ মতটি অবলম্বন করেছেন। "ফালাক" শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি। [ইবন কাছীর, তাবারী] আবার কোন কোন মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে ফালাক বলতে আল্লাহ্ যেসব বস্তু একটি অপরটি থেকে চিরে বা ভেদ করে বের করেছেন, তা সবই উদ্দেশ্য। যেমন, দিবস বের হয় রাতের আবরণ চিরে; বীজের বুক চিরে সব ধরনের গাছ ও উদ্ভিদের অংকুর বের হয়; জমীন থেকে তরু-লতা, ফসল ইত্যাদি বের করা হয়; সব ধরনের প্রাণী মায়ের গর্ভাশয় চিরে অথবা ডিম ফুটে কিংবা অন্য কোন আবরণ ভেদ করে বের হয়; বৃষ্টির ধারা মেঘের স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে নামে। ইমাম তাবারী বলেন, আল্লাহ এখানে আয়াতকে অনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট কোন অর্থে বেধে দেননি। তাই এখানে ফালাক বলতে যা বুঝায় তার সবই উদ্দেশ্য হবে। [আদ্ওয়াউল বায়ান, তাবারী]

(২) আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রাহেমাহুল্লাহ বলেন, شر শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে– (এক) প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যা দ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, (দুই) যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে, যেমন কুফর ও শির্ক। কুরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।
এখানে লক্ষণীয় যে, আয়াতে বলা হয়েছে, "তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি।" এ বাক্যে অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর অনিষ্টকারিতাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সৃষ্টির সাথে। অর্থাৎ একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ যে অনিষ্টকারিতাসমূহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে অনিষ্টকারিতার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণকর এবং কোন না কোন কল্যাণমূলক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি

৩. 'আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়,[১]

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

৪. 'আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়,[২]

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

যেসব গুণ সমাহিত করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো থেকে অনেক সময় এবং অনেক ধরনের সৃষ্টি থেকে প্রায়ই অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে। [বাদায়ে'উল ফাওয়ায়িদ: ২/৪৩৬]

(১) পূর্বোক্ত আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে, ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ এখানে غسق শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وقب এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া বা ছেয়ে যাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষ করে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং অপকার করতে পারে। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ নাযিল হয় সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, সা'দী] সহীহ হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, এক রাতে আকাশে চাঁদ ঝলমল করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও: هٰذَا الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই গাসেক ইযা ওয়াকাব [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৬১, তিরমিযী: ৩৩৬৬]। চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেলায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উজ্জ্বল থাকে না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্তির অর্থ হচ্ছে এর (অর্থাৎ চাঁদের) আগমনের সময় অর্থাৎ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও [ইবন কাছীর]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখো যতক্ষণ রাতের আঁধার খতম না হয়ে যায়।" [বুখারী: ৩২৮০, ৩৩১৬, মুসলিম: ২০১২]।

(২) দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ﴾ এখানে نفث এর অর্থ ফুঁ দেয়া। عُقَد শব্দটি عقدة এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نَفّٰثٰتِ স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। বাহ্যত এটি নারীর বিশেষণ। এটি খারাপ আত্মাকেও বুঝাতে পারে। তখন অর্থ হবে ফুঁকদানকারী খারাপ আত্মা থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি। আবার এটা ফুঁ দানকারীদের সমষ্টিকেও

৫. 'আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের[১], যখন সে হিংসা করে[২] ।'

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

নির্দেশ করতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে ।[আদওয়াউল বায়ান, ফাতহুল কাদীর]

(১) তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, حسد যার শাব্দিক অর্থ হিংসা । হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যাক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যি ছিনিয়ে নেয়া হোক- এ আশা করা । তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না । সুতরাং, হিংসার মূল হলো, কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও সে নেয়ামতের অবসান কামনা করা । হিংসার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ইহুদীরা জাদু করেছিল, হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল । তাছাড়া ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকরা মুসলিমদের ইসলামের নেয়ামত পাওয়া দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত । তাই এ সূরা যেন কুরআনের শেষের দিকে এসেছে মুসলমানদেরকে তাদের নেয়ামত এবং এ নেয়ামতের কারণে তাদের প্রতি হিংসুকদের হিংসা করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই এসেছে । [আদ্ওয়াউল বায়ান] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি হিংসা পোষনকারীর সংখ্যা জগতে অনেক । এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । [তাবারী] এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ । এটাই আকাশে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ । আকাশে ইবলীস আদম আলাইহিস্ সালাম এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র তার ভাইয়ের প্রতি হিংসা করেছিল । [কুরতুবী]

(২) এখানে বলা হয়েছে, 'হিংসুক যখন হিংসা করে' অর্থাৎ তার মনের আগুন নিভাবার জন্য নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়, তার হিংসাকে প্রকাশ করে, সেই অবস্থায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর]

১১৪- সূরা আন-নাস
৬ আয়াত, মাদানী

سُوْرَةُ النَّاسِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বলুন, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের,

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ①

২. 'মানুষের অধিপতির,

مَلِكِ النَّاسِ ②

৩. 'মানুষের ইলাহের কাছে,(১)

اِلٰهِ النَّاسِ ③

৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার(২) অনিষ্ট হতে,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ④

৫. 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤

৬. 'জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে(৩) ।'

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

---

(১) এখানে রব, মালিক এবং ইলাহ এ তিনটি গুণের অধিকারীর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আল্লাহ রব, মালিক বা অধিপতি, মাবুদ সবই। সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর মালিকানাধীন, তাঁর বান্দা। তাই আশ্রয়প্রার্থনকারীকে এ তিনটি গুণে গুণান্বিত মহান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কুমন্ত্রণাদাতা বলতে মানুষের সাথে নিয়োগকৃত শয়তানের কথা বলা হয়েছে, যে সঙ্গী তাকে খারাপ কাজ করাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন শয়তান সঙ্গী নিয়োগ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছেন ফলে তার থেকে আমি নিরাপদ হয়েছি এবং সে আমাকে শুধুমাত্র ভাল কাজের কথাই বলে।" [মুসলিম: ২৮১৪]।

(৩) এখানে দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমটি হল, শয়তান জিন ও মানুষ-উভয় প্রকার মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। এ অর্থে এখানে ناس বলে জিন ও মানুষ সকলকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় মতটি হল: কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান জিনদের মধ্য থেকেও হয়, মানুষের মধ্য থেকেও হয়। এ মতটিই শক্তিশালী। [ইবন কাছীর] অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট থেকে। জিন-শয়তানের কুমন্ত্রণা হল অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখা। শয়তান যেমন মানুষের

মনে কুমন্ত্রণা দেয়, তেমনিভাবে মানুষের নফসও মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকেও এবং তার শির্ক (বা জাল) থেকেও।" [আবু দাউদ: ৫০৬৭, তিরমিযী: ৩৩৯২, মুসনাদে আহমাদ: ১/৯]

فهرس أسماء السور وبيان المكي والمدني منها

মাক্কী ও মাদানীর বর্ণনাসহ সূরাসমূহের নামের তালিকা

إنّ وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد

في المملكة العربيّة السّعوديّة

المشرفة على مجمّع الملك فهد

لطباعة المصحف الشّريف في المدينة المنوّرة

إذ يسرّها أن يصدر المجمّع هذه الطّبعة من القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللّغة البنغاليّة

تسأل الله أن ينفع بها النّاس

وأن يجزي

خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أحسن الجزاء على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله الكريم

والله وليّ التوفيق

রাজকীয় সৌদি সরকারের দাওয়াহ্, ইর্শাদ, ওয়াক্ফ ও
ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মদীনা
মুনাওয়ারাস্থ বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স
পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত
তাফসীর প্রকাশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছে।
মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি এর দ্বারা সবাইকে
উপকৃত করুন এবং আল্লাহর পবিত্র কালাম প্রচারে
খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান
ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর এই বৃহৎ প্রচেষ্টার
জন্য তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, আর আল্লাহ্ই
একমাত্র তাওফীক দাতা।

بعون الله وتوفيقه
تم طبع هذا المصحف الشريف
وترجمة معانيه في مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية
والأوقاف والدعوة والإرشاد في
المملكة العربية السعودية
عام ١٤٣٦هـ

ص.ب ٦٢٦٢ - المدينة المنورة

www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa

আলাহ্
তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে
পবিত্র কোরআনের এই অনুবাদ
ও তাফসীরের মুদ্রণ রাজকীয় সউদী
সরকারের দাওয়াহ্, ইরশাদ, ওয়াক্বফ ও
ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে
বাদশাহ্ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ
কমপ্লেক্স, মদীনা মোনাওয়ারা
কর্তৃক সমাপ্ত ১৪৩৬ হিঃ

পোঃ বক্সনং-৬২৬২, মদীনা মোনাওয়ারা, সৌদি আরব।

www.qurancomplex.gov.sa
contact@qurancomplex.gov.sa

ⓒ **مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤٣٦ هـ**
فهرســة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الأمانة العامة.
مركز الدراسات القرآنية

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنغالية./ مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف. الأمانة العامة. مركز الدراسات
القرآنية - المدينة المنورة ١٤٣٦ هـ

٢ مج.

١٤٨٨ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٨-٠٠-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)
٢-٠٢-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ (ج٢)

١- القرآن - ترجمة - اللغة البنغالية ٢- القرآن - تفسير أ. العنوان
ديوي ٢٢١،٤٩١٤٤ ١٤٣٦/٣٠٥٨

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٣٠٥٨

ردمك: ٨-٠٠-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)
٢-٠٢-٨١٧٣-٦٠٣-٩٧٨ (ج٢)

9 786038 173022

المجلد الثاني

القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره
إلى اللغة البنغالية

وقف لله تعالى من خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولا يجوز بيعه